756.5
012/8

বর্ষসূচী

বৈশাখ—চৈত্র, ১৩৬২

ক্রমিক নং | বিষয় | পৃষ্ঠা

অ, আ

১। আলোচায়ার কবি
—অধ্যাপক বিষ্ণুরঞ্জন গুহ

২। আইনষ্টাইন—প, চ, ভ,

৩। আধিক প্রসঙ্গ—
—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য ৬২, ১৩৪, ২০১, ৩০৭, ৪২৮, ৬৭৩, ৭৪৯, ৭৭৩, ৮৮৬, ৯৪৮

৪। অনবদ্য—শ্রীবুদ্ধদেব ঘটক ১১৪

৫। আয় বিষ্টি—শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ১১৪

৬। আজকে আলোর গান—
শ্রীদেবপ্রসাদ রায়

৭। অচেনা মেয়ে—শহরতলী
—শ্রীশম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

৮। অনেক কিছু পাওয়ার মাঝে
—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ৪৯০

৯। আরাম—শ্রীসুশীল রায় ৪৯৩

১০। আধুনিক বিজ্ঞানের ভূমিকা—
—শ্রীঅমরেন্দ্রকুমার সেন

১১। অপ্রকাশিত—শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

১২। আশ্বিন কন্যাকে—শ্রীঅনিলকুমার রায়

১৩। আলোর আশিস

১৪। আণবিক শক্তির কথা
—শ্রীমনোরম গুহঠাকুরতা

১৫। আলোর অন্তরালে
—শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

১৬। অনন্তা—শ্রীঅবনীনাথ রায়

১৭। অশ্বিনীকুমার দত্তের স্মরণে
—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ ৫২৪

১৮। অপরাহ্ণ—শ্রীমতী পারুল ঘোষ ৫৮৬

১৯। অনন্তমায়া—শ্রীখগুপতি দাশগুপ্ত ৫৮৬

২০। অমৃতলাল রায়—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ৬৮৩

২১। অকণির অভিজ্ঞতা—শ্রীসুভাষ সমাদ্দার ৭১২

ক্রমিক নং | বিষয় | পৃষ্ঠা

২২। অন্তীজ্যোতাবতী দেবী সরস্বতী
—শ্রীঅজিত
আজ সারাদিনের চট্টোপাধ্যায়
শ্রীপ্রশান্তকুমার শতুলক

২৩। অন্ত ভূমিকায়—শ্রীকুমার

২৪। অরণ্যকন্যা—শ্রীপবেন

২৫। আজকে ভোরের গান
—শ্রীমণিক মুখোপাধ্যায়

ই

ইউ, এন, ও বা রাষ্ট্রসংঘ—
শ্রীসচ্চিদানন্দ ঘোড

উ

উচ্চ বিত্ত—শ্রীনগেন দত্ত

উপাধ্যায় বন্ধুবান্ধব—শ্রীচিত্ত মিত্র

এ, ঐ

এক কচি মন—শ্রীঅমলকান্তি ঘোষ ৪১২

এষণা—শ্রীমতী সংযুক্তা কর ৭৫৭

এই পৃথিবীকে—শ্রীপ্রভাকর মাজি

এই ভালবাসা
শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

ক

কালের যাত্রা—সম্পাদকীয় ৭১, ১৪৫ ২১৩, ২৭৯, ৩৫১, ৪১৫, ৬৭৭, ৭৪৭, ৮২৪, ৮৯০, ৯৫১

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা—
শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী

কল্পন—শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কন্যাকুমারিকা—শ্রীশিশিরকুমার দাস

কৃষ্ণদাস পাল—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

৬। কবিতা লিখে যাবো—
—শ্রীমতী নমিতা মুখোপাধ্যায় ২৬১

কৃষ্ণসখী—শ্রীরমেন মজুমদার ৯৪৩

ক্রমিক নং বিষয় : পৃষ্ঠা

ক, খ

জীবন মুক্তার কবিতা—শ্রীআশুতোষ পাল ৫৫
জীবন জিজ্ঞাসা—শ্রীআশুতোষ সান্যাল ১১৫
জাপানী চিত্রশিল্পের ক্রম বিকাশ
—শ্রীরণজিৎকুমার সেন ৩৭৪
যজ্ঞফল—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
১। যবনিকা উৎসবনে (তোমার জন্য)
—শ্রীশম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায় ৬৫
জীবন জিজ্ঞাসা—শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায় ৬৪
জন্মদিন—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ৮১
জয়দেব চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি
—ডাঃ নিহিরকুমার মুখোপাধ্যায় ৮৩

ঝ

ঝুন ঝুন মিষ্টি ছড়া—মৌমাছি ৪৭৯

ট

ট্র্যাজেডি বা দুঃখময় নাটক—
—শ্রীপ্রভাংশু গুপ্ত ৪১৪

ড

ডায়েরী থেকে—শ্রীপ্রভাকর মাজি ৮৬৯

ত

তৃণাঙ্কুর—শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ৪২
তীর—মসউদ আর-রহমান ১৩৫
তোমাকে—শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় ১৮
তবুও নিশ্চিত আমি
—শ্রীসিদ্ধার্থ গঙ্গোপাধ্যায় ৯০
তবুও—শ্রীমতী নমিতা মুখোপাধ্যায় ৯০
তোমার জন্য—শ্রীঅমলকান্তি ঘোষ ২১

থ

থৈত-সঙ্গীত—শ্রীরণজিৎকুমার সেন ১৯-২৩১, ২৫২ ২৯২, ৪৭৮, ৬৫০, ৭২২, ৭৬৭, ৮৪৪ ৯৭
দিনকাল—শ্রীপ্রভাত দেবসরকার ৪৭, ১৯৫, ১৭৫

১। চিরন্তনী—শ্রীমতী সিপ্রা ঘোষ ১১২

ছ

ছবি—শ্রীশান্তনীল দাস
২। ছায়াকুমারী—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
৩। ছায়ালোকে—শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী
৪। ছুটির ঘন্টা—শ্রীপ্রভাকর মাজি

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	দ	
৩।	দেশ ও বিদেশ	৬৬ ১৩৮, ২০৭, ২৭৩, ৪৯২
৪।	দাসখত—শ্রীতারক ঘোষ	১৮৬
৫।	দুই নারী—শ্রীসুভাষ সমাজদার	৫৭৪
৬।	দীঘা—শ্রীপ্রভাকর মাঝি	৫৬০
	ন	
১।	নববর্ষের কবিতা —শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ	
২।	নতুন মা —অধ্যাপক বিভূরঞ্জন গুহ	
	নীড়ের আহ্বান—শ্রীস্নেহাকর ভট্টাচার্য	
	নিরুদ্দেশে—শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী	
	প	
১।	পুস্তক পরিচয় ৬১, ১৪৩, ২১২, ৬০২, ৭৫৪, ৮৮৪	
২।	পৌষের রাত—শ্রীঅনিলকুমার সমাজদার	১৪
৩।	পৃথিবীকে ভালবাসি —শ্রীমতী নমিতা মুখোপাধ্যায়	
৪।	পরিবর্তন—শ্রীঅশোককুমার সেন	
৫।	প্রধানমন্ত্রীর রাশিয়া ভ্রমণ —শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ	
	প্রবহমান—শ্রীমোহন মিত্র	
	ফুটবলের অন্তরীক্ষে —শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	
	পূরবী—শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	
	পাঁচটা লেখুর বীচি —শ্রীজয়দেব রায়	
১০।	প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে—	
১১।	প্রথম শীতের চিঠি —শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ	৫৬০
	প্রণাম—শ্রীঅমলকান্তি ঘোষ	৫৮৭
	প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্র ৫৮৮, ৬৬৭, ৭৩১, ৮৬৬ —শ্রীপ্রভাংশু গুপ্ত	
১৩।	প্রেম ও ক্ষুধা—শ্রীমুলতা কর	
১৫।	ফুলের মত —শ্রীসনৎকুমার মিত্র	
	প্রমথনাথ বসু —শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র	
	পাপিয়া—আমোয়ার হোসেন	
	ব	
	বৈশাখ প্রথম—শ্রীকৃষ্ণ দাশ	৫৩
	বহ্নি-বন্যা—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র ১৫৭, ২৬৫, ৩২২, ৩৩০, ৭৩৪, ৮০৩, ৯১৩	
	বেহালা—শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ	১৬২
	বাংলার সঙ্গীত পরিক্রমা —শ্রীজয়দেব রায়	
	বাউল—শ্রীশান্তকুমার রায়	
	বঙ্গের রূপ—শ্রীসুধীর গুপ্ত	
	বিজ্ঞান জগৎ—গ. চ. ভ.	
	বাংলার পেশাদার রঙ্গালয় —শ্রীপ্রভাংশু গুপ্ত	
	বীতংসে—শ্রীসনৎকুমার মিত্র	
	বিজ্ঞানী লামস্ডিডেন —শ্রীমোহিত দত্ত	
	বন্যার : নদীকে— —শ্রীপ্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	
	বৃষ্টির বিকেল—শ্রীপ্রভাকর মাঝি	
	বিচিত্র রাগিনী —শ্রীপ্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৩২১
	বধূমিতা—শ্রীমতী ইন্দুমতী ভট্টাচার্য	৩৩৯
	বাংলা বাক্যের রূপ ও রীতি —শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	
	বহুব্রীহি—বোপদেব	
	বিশ্বকর্মা—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	
	বাগানে—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	
	বন্যা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	
	বোকা বামুনের গল্প —শ্রীবিশ্ব মুখোপাধ্যায়	
	বাংলার অতি আধুনিক কাব্য —শ্রীনগেন দত্ত	
	বাঁকা—শ্রীতারাপদ রাহা	
	বহুব্রীহি—বোপদেব	
	বিকিনী অটল—শ্রীনগেন দত্ত	
	বৈদেহিকী—	
	যুক্ত—শ্রীঅনিরুদ্ধ কর	
	বাংলা ভাষার বর্ণচোরা শব্দ —শ্রীঅমলেন্দু সেন	

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	ভ	
	ভাষার শক্তি—অধ্যাপক শ্রীবীরানন্দ ঠাকুর	৩৪
	ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়—শ্রীনারায়ণ চৌধুরী	১০৯
	ভার—শ্রীমতী সুনন্দা গুহ	২৩৩
	ভয়—শ্রীমানবেন্দ্র পাল	৪২৬
	ভঙ্গুর—শ্রীসন্তোষ কুমার অধিকারী	৬২০
	ম	
	মুন্না—শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	
	মানবকল্যাণে পরমাণু-শক্তি—	
	—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য	৪০১
	মা বুঝি ঐ আসে—শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী	৪৮১
	মৃত্যুতীর্থ—শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়	৮১৪
	মেঘনাদ সাহা—শ্রীহেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ	৮২৭
	র	
১।	রবীন্দ্রনাথের দুই নারী—শ্রীতারক ঘোষ	৩৭
২।	রাত্রির তপস্যা—শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়	১১৩
৩।	রাত ও দিন—শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত	১৮৭
৪।	রাত ঘোলানো—শ্রীবিকাশ দাশ	১৮৪
৫।	রাণুর ভাই—পল্ অতিয়েন এস. জে.	১৭২
৬।	রাজপুতানার পথে—শ্রীপ্রতিভা দেবী	৪২০
৭।	রামমোহনের পত্র—শ্রীঅভিমন্যু মুখোপাধ্যায়	৩৭১
৮।	রামায়ণের নূতন ভাষা—প্র. না. বি.	৩৮১
৯।	রাজপুরী—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৫১৪
	ল	
	লেখালেখি—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গুহচৌধুরী	
	লাবণ্য—শ্রী ইলা দেবী	
	লীলাপলাশ—শ্রীকৃষ্ণ দাশ	
	শ, ষ, স	
	শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা	
	—অধ্যাপক বিভূরঞ্জন গুহ	
	সাথী—[ডেনিস্ গুডেব]	
	—শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়	
	সূর্যপ্রণাম—শ্রীসনত্ কুমার মিত্র	
	শৈশব ও কৈশোরের কয়েকটি সমস্যা	
	অধ্যাপক বিভূরঞ্জন গুহ	৭৫
৫।	স্মৃতিকথা—শ্রীকালিদাস রায়	৭৯, ১৪২, ২৯৯, ৪২৯, ৬০৯, ৭১৫, ৮৫৪, ৮৯৮
৬।	সমাজ ও জাতীয় জীবন—প্র. কু. সে.	১৩১, ২০১, ২৬৩, ৩৩০, ৪৯৫, ৬৬৯, ৭৪৭, ৭৭৬ ৮৬৩ ৯০৪
৭।	সর্বোদয়—শ্রীভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৫৫
৮।	শ্রাবণী—শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়	৩২৬
৯।	শ্যামলীকে—শ্রীবিকাশ দাশ	৩২৮
১০।	শ্রীশ্রীমহিলমঙ্গিনী—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	৩৫৭
১১।	শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন—শ্রীকালিদাস রায়	৩৬৫
১২।	সভাতা গঠনে কোমলবৃত্তি	
	—ডাঃ মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায়	
	এম. এ, ডি-ফিল	৪২১
১৩।	স্বাবলম্বী—শ্রীতারাপদ রাহা	৪২৫
১৪।	ষাট বছর পরে—শ্রীকৃষ্ণধন দে	৪৫৫
১৫।	সঙ্গীতিকা—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ	৪৫৬
১৬।	সুখে দুঃখে—শ্রীসনত্ কুমার মিত্র	৪৫৯
১৭।	সরকারী বাস—শ্রীপ্রভাত দেবসরকার	৫৬১
১৮।	শবরী—শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য	৪৬৭
১৯।	সুন্দর (শিকার কাহিনী—শিকারী)	৪৭২
২০।	শির দিয়া সার নেই দিয়া	
	—শ্রীমতী কুমরা রায়	৪৮৩
	সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য	
	—শ্রীনারায়ণ চৌধুরী	
	সঙ্গীতের ধারা—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গুহচৌধুরী	
	শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের শান্তি নিকেতন	
	—অধ্যাপক বিভূরঞ্জন গুহ	৫৫৫, ৬১৪
	শীতের প্রার্থনা—শ্রীঅনিলকুমার রায়	৬৪১
	শক্তি-উপাসক জার্মাণ দার্শনিক নীট্‌শে	
	—শ্রীহরিপদ ঘোষাল	৬৬২
	স্বপ্ন—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গুহচৌধুরী	৬৬৪
	শনী—শ্রীঅম্বরনাথ ঘোষাল	৬৯৮
	শর্মিলা ও নীরজা—শ্রীমতী সিপ্রা ঘোষ	৮১০
	স্বপন-পসারীর কবি ও কবিতা	
	—শ্রীপ্রণবকুমার রায়	৮২০
	সজীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
	—শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	৯২৪
	হ	
	হাজার বছর ধরে—শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়	৩০৪
	হৃদয়কে যতো দিন—শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়	৩২৭
	হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—	
	শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	২৮৩
	হেমন্ত বিকালে—	
	—শ্রীপ্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়	৪৫৮
৫।	হারানো কবিতা—শ্রীমতী সিপ্রা ঘোষ	৮৭০
৬।	হতুকো সিংহী—শ্রীমতী ইন্দুমতী ভট্টাচার্য	৮৭১

শান্তিনিকেতনে মহাত্মা গান্ধী

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

অষ্টাদশ বর্ষ | বৈশাখ—১৩৬২ | প্রথম সংখ্যা

শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা

অধ্যাপক—শ্রীবিভুরঞ্জন গুহ

রবীন্দ্রনাথ যেদিন গুটি পাঁচ ছয় ছেলে নিয়ে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম শুরু করেছিলেন সেদিন সেটি নিতান্তই ক্ষুদ্র ব্যাপার ছিল। আজ ক্রমে ক্রমে এর বিকাশ এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানকে রূপান্তরিত করেছে পৃথিবীর একটি উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে। কবির অন্তরে এর সম্পূর্ণ রূপটি সেদিনই ফুটে উঠেছিল তা নয়। তাঁর কাব্যপ্রতিভার যেমন ক্রমবিকাশ ঘটেছে, তাঁর চিন্তার যেমন পরিপুষ্টি ঘটেছে, সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানটিরও ক্রমবিকাশ ও পরিণতি ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের মত সৃজনশীল সদাজীবন্ত কবিপ্রতিভা পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল। আর এই শান্তিনিকেতন সেই জাগ্রত প্রতিভার একটি অনিচ্ছিন্ন প্রকাশ। এই আশ্রম তাঁর সাধনা ও নিষ্ঠার ফল; এই আশ্রম ছিল তাঁর প্রাণ। ফুলের পরম মালী যেমন পরম যত্নের সঙ্গে ফুলের গাছকে জল সিঞ্চন করে প্রতিটি গাছের বেড়ে ওঠার প্রতিটি স্তর মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে, তেমনি যত্নে এ আশ্রমকে তিনি ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও তাঁর আদর্শ ও পরীক্ষায় বিশ্বাসী শিক্ষক ও সহকর্মীরা এই আশ্রমকে তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন। এর বিকাশ তাই বাইরের পরিকল্পনা বা প্ল্যানিং এর ফল নয়—জীবন্ত গাছের মতই এ নিজের স্বাভাবিক নিয়মে গড়ে উঠেছে। এর সূচনা থেকেই এই পরীক্ষায় তাঁর অটুট আস্থা ছিল—তাই এর বিকাশের মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকেই সত্য করে পেয়েছিলেন। ১৩৪৪ সনের ৮ই পৌষ উৎসবে তিনি বলেছিলেন, "বস্তুত সাধনা করার আগ্রহ আমাকে পেয়ে বসেছিল, আমার নিজেরই জন্যে। নিজেকে দিয়ে ফেলার দ্বারা নিজেকে পাওয়ার লোভ আমাকে দখল করেছিল।

ঐ কটি ছোট ছেলে আমার সমস্ত সময় নিলে, অর্থ নিলে, সামর্থ্য নিলে—এইটেই আমার সার্থকতা। এই যে সাধনার সুযোগ ঘটল, এতে করে আমি আপনাকেই পেতে লাগলুম। এই আত্মবিকাশ, এ কেবল সাধনার ফলে, বৃহৎ মানব জীবনের সংস্রবে ক্ষেত্রে।" যদিও বিশ্বভারতীর সম্পূর্ণ রূপ এই শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর মনে স্পষ্ট ভাবে ছিল না কিন্তু তথাপি তাঁর পরীক্ষাটি যে বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। এই আশ্রমের একটি সমগ্রমূর্তি তাঁর মনে রূপ নিয়েছিল—তিনি জেনেছিলেন, তাঁর এ আশ্রম ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক একটি খেয়াল মাত্র নয়। পূর্বোল্লিখিত কুঞ্জলাল ঘোষ মহাশয়ের কাছে লিখিত পত্রে (১৩০৯) তিনি লিখেছিলেন, "আমার মনের মধ্যে একটি ভাবের সম্পূর্ণতা জাগিতেছে বলিয়া অনুষ্ঠিত ব্যাপারের সমস্ত ত্রুটি, নৈস্ব অপূর্ণতা অতিক্রম করিয়াও আমি সমগ্র ভাবে আমার আদর্শকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই—বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যৎকে, বীজের মধ্যে বৃক্ষকে উপলব্ধি করিতে পারি—সেইজন্য সমস্ত দীনতা সত্ত্বেও, তাদের তুলনায় কাজের যথেষ্ট অসংগতি থাকিলেও আমার উৎসাহ ও আশা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে না।"

তপোবনের যে আদর্শ তাঁকে

উৎসাহী করেছিল—সে আদর্শে তাঁর বিশ্বাস অটুট ছিল। তবে এ আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যে যে আচার বা রীতি প্রয়োজন তা কখনো কখনো পরিবর্তিত বা পরিত্যক্তও হয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে তার প্রসারও ঘটেছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাঁর মূল ধারণার সঙ্গে তার অসংগতি নেই। যেমন বলা যেতে পারে প্রথম দিকে ছিল আচার ইত্যাদি পালনের দিকে যতটা জোর দেওয়া হত, তা কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রমশঃ শিথিল করা হয়েছিল—বা পরিত্যক্ত হয়েছিল। তাঁর সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমরা দেখি প্রথম যুগে প্রাচীন ভারতবর্ষের সাহিত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাঁকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু ক্রমশঃ বিশ্বমানবতার আদর্শ তাঁর কাছে গভীরতর সত্য বলে প্রতীয়মান হোল। শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিকাশের ইতিহাসেও এই ধারণার প্রসার আমরা লক্ষ্য করে থাকি। যখন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তখন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ যোগের কথাটাই কবির মনে প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দেশের রাজনৈতিক সংঘর্ষ ইত্যাদি তাঁর মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিলে। মানুষের সঙ্গে মানুষের কৃত্রিম বিচ্ছেদ যে কী ভীষণ সর্বনাশা রূপ নিচ্ছে এ অনুভব করে তিনি ব্যাকুল হয়েছিলেন। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' এবং তার 'নিত্য নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব' তাঁর মনকে ব্যথিত করে তুললো। তিনি অনুভব করতে লাগলেন—মানুষকে প্রকৃতির সাথে শুধু মেলাতে হবে না—মানুষকে মানুষের সাথে মেলাতে হবে, তা নইলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ, অসার্থক। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইয়োরোপ ভ্রমণে গিয়ে যখন তিনি ভারতবর্ষের প্রেম ও শান্তির বাণী দুঃখক্লিষ্ট ইয়োরোপেও শোনালেন তখন তিনি দেখলেন বর্ণের বিভেদ, রাজনৈতিক বিভেদ, —সমস্ত ব্যবধান সত্ত্বে মানুষ মানুষকে ভালবাসতে চায়, মানুষ মানুষের সাথে মিলতে চায়। তাঁর কাব্যানুভূতিতে বিশ্ববোধ বহু পূর্বেই সূচিত হয়েছিল—ইয়োরোপ ভ্রমণের পর এবং গীতাঞ্জলির কবি হিসাবে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'নোবেল প্রাইজ' পাওয়ার পর এই বিশ্ববোধকে একটি সার্থক রূপ দেওয়ার কথা তাঁর মনকে বিশেষভাবে আন্দোলিত করতে লাগলো। তিনি কল্পনা করতে লাগলেন—এমন একটি সংস্কৃতি ও শিক্ষার কেন্দ্র যেখানে বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন সভ্যতার মানুষ একত্র হবে প্রীতি ও শ্রদ্ধার বন্ধনে "দেবে আর নেবে', মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে।" এই আকাঙ্ক্ষার পরিণতি 'বিশ্বভারতী' স্থাপন (১৯২১—৮ই পৌষ ১৩২৮)। ১৩৩০ সালের পৌষ উৎসব উপলক্ষে তিনি বলেছিলেন "প্রথমে আমি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করে এই উদ্দেশ্যে ছেলেদের এখানে এনেছিলুম যে, বিশ্ব প্রকৃতির উদার ক্ষেত্রে আমি এদের মুক্তি দেব। কিন্তু ক্রমশ আমার মনে হয় যে, মানুষে মানুষে যে ভীষণ ব্যবধান আছে তাকে অপসারিত করে মানুষকে সর্বমানবের বিরাট লোকে মুক্তি দিতে হবে। আমার বিদ্যালয়ের পরিণতির ইতিহাসের সঙ্গে সেই আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাটি অভিব্যক্ত হয়েছিল। বিশ্বভারতী নামে যে প্রতিষ্ঠান তা এই আহ্বান নিয়ে স্থাপিত হয়েছিল যে, মানুষকে শুধু প্রকৃতির ক্ষেত্রে নয় কিন্তু মানুষের মধ্যে মুক্তি দিতে হবে। জ্ঞানের তপস্যায় ও শিল্প সৃষ্টির আনন্দ-লোকে পূর্ব ও পশ্চিম সমস্ত বিশ্বজগৎ একটি প্রাণময় মিলনক্ষেত্রে একত্র হবে এ আশা নিয়েই বিশ্বভারতী সৃষ্টি হয়েছিল। তাই তার মূল মন্ত্র হচ্ছে "যত্র বিশ্বম্ ভবত্যেকনীড়ম্।"

আমাদের দেশ অপরের কাছ থেকে কিছুই নেবে না, সবই আমাদের ছিল এ অন্ধতাও যেমন আমাদের অগ্র গমনের পথে বাধা, তেমনি আমাদের কিছুই নেই সবই আমাদের পশ্চিমের কাছ থেকে ধার করে নিতে হবে এমন মানসিক দৈন্যও আমাদের পঙ্গু করে রেখেছে। তিনি একথা গভীর ভাবে বিশ্বাস করেছেন যে প্রত্যেক জাতির নিজস্ব কিছু দেবার আছে, নিজস্ব প্রতিভা আছে। বিশ্বের সভ্যতার দরবারে প্রত্যেক জাতিকে তাই নিজস্ব শ্রেষ্ঠ সম্পদ দান করতে হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে কৌতূহলী ও জিজ্ঞাসু মন নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দানকেও গ্রহণ করতে হবে এবং আপনার করে নিতে হবে। তিনি আমাদের নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পিছনে এই মোহ ও ভীরুতা দেখে দুঃখ বোধ করেছেন। তিনি একটি রচনায় লিখেছেন। ১৩২৬) "আমাদের দেশে দুই রকমের ভীরুতা দেখা যায়। কাহারও ভীরুতা দেশী প্রকৃতিকে রক্ষা করিতে, কাহারও ভীরুতা য়ুরোপীয় শিক্ষা গ্রহণ করিতে। যাঁহারা এই দুই ভীরুতাকেই অতিক্রম করিয়াছেন তাঁহারাই ভারতবর্ষকে বাঁচাইবেন।"

"যখন মৈসুরের নূতন বিশ্ববিদ্যালয় দেখিলাম সেটা এতই বেসুরা বোধ হইল। ইহার মধ্যে আমাদের আপন কিছুই নাই, ইহা একেবারেই নকল। ইহাতেই বুঝিলাম, বিদ্যাসম্বন্ধে ভারতবর্ষ আপন সাহস একেবারেই হারাইয়া বসিয়াছে। যে বিদ্যালয়কে আমরা বিশ্ব-

বিদ্যালয় বলিয়া থাকি, তাহার মধ্যে ভারতবর্ষকে বড়ো জায়গা দিতে আমরা কুণ্ঠিত। যেন বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে য়ুরোপের বাহিরে বিশ্বই নাই। যেন বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষ বলিয়া পদার্থের অস্তিত্বই মেলে না, অথবা অণুবীক্ষণের সাহায্যে ধূলিকণার মধ্যে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায়।"

১৩২৮ সালের ২০শে ফাল্গুন উপদেশ প্রসঙ্গে বলেন- "ছিলেন চিরন্তন সত্যের মধ্যে পূর্ব পশ্চিমের ভেদ নেই। এই বিশ্বভারতীতে সেই সত্যসাধনার ক্ষেত্রকে আমার গড়ে তুলতে হবে। পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের দেওয়া নেওয়ার সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া দরকার। আমরা এতদিন কেবলই পশ্চিমের কাছে হাত পেতে পাঠ নিয়েছি। কিন্তু পশ্চিমের সঙ্গে আমাদের আদান প্রদানের সম্বন্ধ হয় নি। সাহসপূর্বক য়ুরোপকে আমি আমাদের শিক্ষা-কেন্দ্রে আমন্ত্রণ করে এনেছি। এখানে এইরূপে সত্য-সম্মিলন হবে, জ্ঞানের তীর্থ-ক্ষেত্র গড়ে উঠবে। আমরা রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্র খুব মৌখিক বড়াই করে থাকি, কিন্তু অন্তরে আমাদের আত্মবিশ্বাস নেই, যথেষ্ট দীনতা আছে। যেখানে মনের ঐশ্বর্যের প্রকৃত প্রাচুর্য আছে, সেখানে কার্পণ্য সম্ভবপর হয় না। আপন সম্পদের প্রতি যে জাতির যথার্থ আশা ও বিশ্বাস আছে, অন্যকে বিতরণ করতে তার সংকোচ হয় না, সে পরকে ডেকে বিলোতে চায়। আমাদের দেশে তাই শুরুর কণ্ঠে এই আহ্বানবাণী এক সময় ধ্বনিত হয়েছিল "আয়ন্তু সর্বতঃ স্বাহা।"

১৩২৮ সালের ৮ই পৌষ, বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠাদিবসে বিশ্বভারতীর মর্মের কথাটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, "..... প্রথমে যে শিক্ষার আয়তনকে মনে করেছিলাম দেশের প্রয়োজনের মধ্যেই অবরুদ্ধ থাকবে, ক্রমে তা বৃহৎ আকাশে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে লাগল। যে অনুষ্ঠান সত্য তার উপর দাবি সমস্ত বিশ্বের।.....এবার পশ্চিমে গিয়ে দেখেছি যে, পূর্বমহাদেশ কী সম্পদ দিতে পারে, তা সকলে জানতে চাচ্ছে। আজ মানুষকে বেদনা পেতে হয়েছে। সে পুরাকালে যে আশ্রয়কে নির্মাণ করেছিল তার ভিত্তি বিদীর্ণ হয়ে গেছে। তাতে করে মানুষের মনে হয়েছে, এ আশ্রয় তার অভাবকে পূর্ণ করবার উপযোগী নয়। পশ্চিমের মনীষীরাও এ কথা বুঝতে পেরেছেন, এবং মানুষের সাধনা কোন পথে গেলে সে অভাব পূর্ণ হবে তাঁদের তা উপলব্ধি করবার ইচ্ছা হয়েছে।

কোন জাতি যদি স্বাজাত্যের ঔদ্ধত্যবশত আপন ধর্ম ও সম্পদকে একান্ত আপন বলে মনে করে তবে সেই অহংকারের প্রাচীর দিয়ে সে তার সত্যসম্পদকে বেষ্টন করে রাখতে পারবে না। যদি সে তার অহংকারের দ্বারা সত্যকে কেবলমাত্র স্বকীয় করতে যায় তবে তার সে সত্য বিনষ্ট হয়ে যাবে। আজ পৃথিবীর সর্বত্র এই বিশ্ববোধ উদ্বুদ্ধ হতে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে কি এই যুগের সাধনা স্থান পাবে না?... স্বজাতির অচল সীমানার মধ্যে আপনাকে সংকীর্ণভাবে উপলব্ধি করাই কি সবচেয়ে বড়ো গৌরব?

এই বিশ্বভারতী ভারতবর্ষের জিনিষ হলেও একে সমস্ত মানবের ক্ষেত্র করতে হবে। কিন্তু আমাদের দেবার কী আছে। কল্যাণরূপী শিব তাঁর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বেরিয়েছেন। সে ঝুলিতে কে কী দান করবে? আমাদের কি তাঁকে কিছু দেবার নাই? হাঁ, আমাদের দেবার আছে, এই কথা ভেবেই কাজ করতে হবে। এই জন্যই ভারতের ক্ষেত্রে বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।" আর এক জায়গায় লিখেছেন, "Visva-Bharati represents India where she has her wealth of mind which is for all. Visva-Bharati acknowledges India's obligation to offer to others the hospitality of her best culture and India's right to accept from others their best."

কিন্তু পরকে দিতে গেলে নিজেকে জানা চাই। ভারতের মহামানবের সাগরে যে অসংখ্য চিন্তার স্রোতধারা এসে মিশেছে তার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সামান্য। দেশের নানা ধর্ম, নানা সম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতীয় চিত্তার নিজস্ব সম্পদ ছড়িয়ে আছে, তাদের আহরণ পরিশ্রমসাপেক্ষ। সে কাজের জন্যে যে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন তার কেন্দ্র হতে হবে বিশ্ব-ভারতীকে। শুধু সংগ্রহ নয়—সমন্বয়। এই বিভিন্ন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিপরীত ভাবধারার মধ্যে যে ঐক্যের সূত্র আছে—তাকে আবিষ্কার করাও এই আত্মজ্ঞানের একটি প্রধান অঙ্গ। সে কাজও হবে বিশ্বভারতীর শিক্ষক ও ছাত্রদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ সম্বন্ধে ১৩২৬ সালের বৈশাখে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন "ভারতবর্ষ যখন নিজের শক্তিতে মনন করিয়াছে তখন তাহার মনের ঐক্য ছিল—এখন সেই মন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেছে। এখন তাহার মনের বড়ো বড়ো শাখাগুলি একটি কাণ্ডের

সঙ্গে নিজেদের বৃহৎ যোগ অনুভব করিতে ভুলিয়া গেছে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এক চেতনাসূত্রের বিচ্ছেদই সমস্ত দেহের পক্ষে সাংঘাতিক। সেইরূপ, ভারতবর্ষের যে মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শিখ মুসলমান খ্রীষ্টানের মধ্যে বিযুক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে সে মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছে না। দশ আঙুলকে যুক্ত করিয়া অঞ্জলি বাঁধিতে হয়—নেবার বেলাও তাহার প্রয়োজন, দেবার বেলাও। অতএব ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে; এই নানা দ্বারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে।" বিশ্বভারতীর একটি পরিচয়পত্রে বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রের (বিদ্যাভবন) উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে "Rabindranath conceived in the Visva-Bharati the idea of a seat of learning with a three fold objective, each merging with the other and forming one comprehensive whole. His University was, first of all, to be an Indian University helping us to realise the oneness of Indian cultures and traditions. In the second place it was to be an Eastern University the union at one centre of the cultures of the East. And finally it was to be a World University, a meeting place of the East and the West..... Rabindranath's conception of Indological studies includes the extension of our knowledge of the Vedic, Puranic, Buddist, Jain, Zesastrian and Islamic cultures·····Another line of study...was that of the contribution of the major languages and literatures of India. So far, (1950) Bengali, Hindi, Urdu and Oriya have been represented in the Visva-Bharati. Possibilities of extension in other language fields, notably in Tamil, are at present being explored".

এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে হিন্দীভবন (১৯৩৯) ও চীনভবন (১৯৩৭) স্থাপিত হয়। এ জন্য যে অর্থ ও নানা উপকরণ প্রয়োজন, তা অধিকাংশ চীন, তিব্বত ও বাংলার বাইরের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে সংগৃহীত হয়। বাংলাদেশ থেকে সাহায্য তিনি সামান্যই পেয়েছেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার আগেও তাঁর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় বিদেশের মনীষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আদর্শে অনুরক্ত হয়ে যুগল মহাপ্রাণ ইংরাজ এ বিদ্যালয়ে শিক্ষক হয়ে এসেছিলেন —তাঁদের নাম পিয়ার্সন ও সি এফ এণ্ড্রুজ। ভারতবর্ষের বন্ধনমুক্তির জন্যে এঁরা যে চেষ্টা করেছিলেন তার জন্যে প্রত্যেক ভারতবাসী তাঁদের কাছে ঋণী থাকবে। বিশ্বভারতী স্থাপিত হওয়ার পর দেশ ও বিদেশের বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি এখানের কাজের সঙ্গে তাঁদের সাধনা যুক্ত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েক-জনের নাম করা যেতে পারে—বিধুশেখর শাস্ত্রী, সিংহলের মহাস্থবির, শ্রীযুত অমিয় চক্রবর্তী, সিলভাঁ। লেভি, মরিস উইন্টারনিজ্, হেন্ কোনো, তি লেভলী, হেলা ক্রামরিশ, কার্লো ফর্মিকি, জিট্টি, জেমস্ বি প্রাট্। কিতিমোহন সেন, জগদানন্দ রায় এরা পূর্বেই এসেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় বা বিশ্বভারতীকে কেবলমাত্র বিদ্যাচর্চার স্থান হিসাবেই গড়ে তুলতে চাননি। যে শিক্ষায় মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশ হয় নি তা অসম্পূর্ণ—এ মতে তাঁর গভীর আস্থা ছিল। তাই বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেও শিল্পকলা, সঙ্গীত ও হাতের কাজ চর্চার ব্যবস্থা তিনি করেছিলেন। কলাভবন ভারতীয় শিল্পকলার একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নন্দলাল বসুর নেতৃত্বে এ বিভাগ যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আজ ভারতবর্ষে যে কয়টি প্রধান শিল্প-কলার কেন্দ্র আছে তাদের প্রধানদের মধ্যে অনেকেই কলাভবনের ছাত্র ছিলেন—এদের মধ্যে অসিত হালদার, সুরেন কর, মুকুল দে, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রমেন্দ্র চক্রবর্তী ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। হেলা ক্রামরিশ এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কলাভবনে এসেছিলেন শিক্ষিকা হিসাবে।

সঙ্গীত চর্চার কেন্দ্র হিসাবে স্থাপিত হয় সঙ্গীত ভবন। ভীমরাও শাস্ত্রী মহাশয় প্রথম ভবনের ভার নিয়েছিলেন। এখানে গীত, বাদ্য, নৃত্য—সঙ্গীতের

এই তিনটি শাখার-ই এখানে চর্চা হয়। দীনেন্দ্র ঠাকুর এখানে বহুকাল শিক্ষকতা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বহু গান ও নাটক সঙ্গীত ভবনকে প্রাণবন্ত করেছিল। শান্তিনিকেতনের ও পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর ছাত্র ছাত্রীদের বহু অভিনয় নৃত্য ও সঙ্গীত বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে—দেশে ও বিদেশে। বাস্তবিক পক্ষে অনেকের কাছে শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট পরিচয় সেখানে এই বিভাগে। রবীন্দ্রনাথ শিল্পকলা ও সঙ্গীতে নিজে যেমন পারদর্শী ছিলেন তেমনি সমস্ত ছাত্র ও শিক্ষকদেরও অনুরাগী করে তুলতে সর্বদা চেষ্টিত ছিলেন। সঙ্গীত ও শিল্পের মধ্য দিয়ে যে রুচিরম্যতাই লাভ হয় তা নয়, মানুষের সর্বাঙ্গীন বিকাশের পক্ষেও তা অপরিহার্য, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস, তাই বিদুশেখর শাস্ত্রীর মতো বৃদ্ধ মানুষকেও তিনি সঙ্গীত শেখার নেশায় মাতিয়ে তুলেছিলেন।

প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতি নিতান্তই যেন কল্—তাতে ছাত্রেরা প্রাণের রস পায় না—সেখানে শুধুই বুদ্ধির চর্চা। জীবিকার প্রয়োজনেই এশিক্ষা,—তাই এ শিক্ষা নিরানন্দ। তাই এ শিক্ষাব্যবস্থায় ডিগ্রীর দাম অত্যধিক, তাই ছাত্র ও অভিভাবকের উচ্চতম আদর্শ পরীক্ষা পাশ। বুদ্ধির চর্চাও এখানে পুঁথি-পড়ে কয়েকটি তথ্য সংগ্রহ আর তোতাপাখীর মত তা মুখস্ত করার মধ্যেই পর্যবসিত। স্বয়ং আবিষ্কারের আনন্দ, নূতন সমস্যা সমাধানের সাহস—এ সব কিছুই এ প্রচলিত শিক্ষা দেয় না—এ ছিলো রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় ধারণা, তাই তার এই নূতন শিক্ষা ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ নূতন পরিকল্পনায় রত হয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ। তাই বিশ্বভারতীতে উচ্চতম বিদ্যা-চর্চার ব্যবস্থা থাকলেও তাতে ডিগ্রী দেবার ব্যবস্থা ছিল না। বিধি-বিধান, নিয়ম-কানুন গঠন প্রণালী সম্বন্ধে খুব কড়াকড়ি ছিল না। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন শিক্ষকদের ও ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে। তিনি চেয়েছিলেন প্রত্যেক ছাত্রের তার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিকাশের মধ্য দিয়ে সার্থক হয়ে উঠবে। বিশ্বভারতী যখন ক্রমেই বড় হয়ে উঠতে লাগলো, কবিও এর সমস্ত ভার বহন করতে অসমর্থ হলেন। তা ছাড়া ডিগ্রীহীন বিদ্যায় দেশের বর্তমান অবস্থায় দাম নেই এ কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। তাই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এখান থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হোল। তা ছাড়া আশ্রমের চালনার কাজে বহু ব্যক্তি যখন সম্মিলিত হলেন তখন গণতন্ত্রসম্মত পঠন প্রণালীর কথাও উঠলো, তার ফলে বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় তার বিশেষত্ব অনেকটা হারিয়েছিল। এতে কবির মনে কিছু ক্ষোভ জন্মেছিল তা তিনি একাধিক জায়গায় স্পষ্টভাবেই প্রকাশ করেছেন। ১৩৪২ সালের ৭ই পৌষ উৎসবের উপদেশে তিনি বলেছিলেন, "ক্রমে বিদ্যালয় বড়ো হয়ে উঠেছে। আমি যখন এর জন্য দায়ী ছিলুম তখন অনেক সংকট এসেছে সবই সহ্য করেছি, অনেক সময় বহুসংখ্যক ছাত্রকে বিদায় করতে হয়েছে তার যা আর্থিক ক্ষতি যেমন করে পারি বহন করেছি। কেবল এইটুকু লক্ষ্য রেখেছি, যেন ছাত্র শিক্ষক এক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে চলেন। ক্রমে যেটা সহজপন্থা বিদ্যালয় সেইদিকেই চলেছে বলে মনে হয়—শিক্ষার যে সব প্রণালী সাধারণত প্রচলিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশি, সেইগুলিই বলবান হয়ে ওঠে, তার নিজের ধারা বদলে গিয়ে হাই-স্কুলের চলতি ছাঁচের প্রভাব প্রবল হয়ে ওঠে, কেননা, সেই দিকেই ঝোঁক দেওয়া সহজ, সফলতার আদর্শ প্রচলিত আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মাঝখানে জল কনষ্টিট্যুয়ান্স, ঠিক হাল বিদ্যালয় ব্যক্তির অধীন থাকবে না, সর্বসাধারণের রুচিই একে পরিচালিত করবে। আমার কবি প্রকৃতি বলেই হয়তো, কনষ্টিট্যুয়ান্স, নিয়মের কাঠামো,—যাতে প্রাণধর্মের চেয়ে কৃত্রিম উপায়ের উপর বেশি জোর, তা আমি বুঝতে পারি নে, সৃষ্টির কাজে এটা বাধা দেয় বলেই আমার মনে হয়। যাই হোক্ কন্‌ষ্টিট্যুয়ান্সে নির্ভর রেখে আমি এর মধ্য থেকে অবকাশ নিয়েছি, কিন্তু এ কথা তো ভুলতে পারিনে যে এ বিদ্যালয়ের কোন বিশেষত্ব যদি অবশিষ্ট না থাকে তবে নিজেকে বঞ্চিত করা হয়। সাধ্যের বেশি অনেক আমাকে এর জন্য দিতে হয়েছে, কেউ সে কথা জানে না—কত দুঃসহ কষ্ট আমাকে স্বীকার করতে হয়েছে। অত্যন্ত দুঃখে যাকে গড়ে তুলতে হয়েছে সে যদি এমন হয় যা আরও ঢের আছে, অর্থাৎ তার সার্থক তার মানদণ্ড যদি সাধারণের অনুগত হয়, তবে কী দরকার ছিল এমন সমূহ ক্ষতি স্বীকার করবার? বিদ্যালয় যদি একটা হাই-ইস্কুলে মাত্র পর্যবসিত হয় তবে বলতে হবে ঠকলুম।" বাস্তবিকপক্ষে বিশ্বভারতী একটা নৈর্ব্যক্তিক সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়—এর সার্থকতা কিছুই থাকবে না যদি কবি রবীন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ সৃজনী

প্রতিভার বিশেষ পরিচয় এ বহন না করে।

রবীন্দ্রনাথের মনে শিক্ষা গ্রামজীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে এ ভাবটি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ও ছিল—ব্রতী বালক গঠন ইত্যাদি এ ইচ্ছা থেকেই হয়েছিল। কিন্তু লোকসেবা ও গ্রাম উন্নয়নকে শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ করতে হবে এটা তিনি বুঝতে লাগলেন, তাই ইংরাজী ১৯২২ সালে শান্তিনিকেতন গ্রামে এক নূতন গঠনমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হোল। এ প্রতিষ্ঠাকাজে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুরাগী আমেরিকার উৎসাহী সমাজকর্মী লিওনার্ড কে এলমহার্স্ট কে অনুকূলা তিনি লাভ করেছিলেন এলমহার্স্ট এই প্রতিষ্ঠানের ভার গ্রহণ করেছিলেন। এর নয়া দিয়ে কৃষির উন্নতি, সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামের লোকেদের শিক্ষিত করা, কুটির শিল্পের পুনরুজ্জীবন, গ্রামোন্নয়নের নানা বিষয়ে গবেষণার কাজ শুরু করা হয়। ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠানটির কর্মপরিধি বিস্তার উদ্দেশ্য এবং গ্রামজীবনের সঙ্গে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীতায় এ প্রতিষ্ঠানটি নিকটবর্তী গ্রাম শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত হয় এবং এ নূতন পরীক্ষাকে রবীন্দ্রনাথ 'শিক্ষা-সত্র' নাম দেন রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এ প্রতিষ্ঠানের আদর্শ হচ্ছে "to bring back life in its completeness into the villages, making the rural folk self-reliant and self-respectful acquainted with the cultural traditions of their own country and competent to make an efficient use of modern resources for the improvement of their physical, intellectual and economic condition"

যখন রবীন্দ্রনাথ এই শিক্ষা-সত্র প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁর তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—

(1) That its students should be given full opportunity to enter into intimate relationship with the natural and social environment

(2) Secondly, he wanted them to undertake a greate measure of responsibility in meeting the daily requirement of their individual and community life.

(3) Thirdly, he wanted the greatest emphasis to be given to learning through creative occupations, including craftwork, gardening etc, and knowledge of formal subjects to be correlated as far as possible to such basic activities.

তিনি এই শিক্ষা-সত্রে ভারতের তপোবনের আদর্শের সঙ্গে পশ্চিমের কর্মকুশলতার আদর্শকে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন—"he sought to unite with the 'tapovana' ideal of education the western genius of which knows how to clear the path towards a definite end of practical good"

যে সমস্ত ছাত্রেরা অত্যন্ত দরিদ্র এবং যাদের সাহিত্যিক শিক্ষায় যথেষ্ট রুচি নেই এবং যাদের জীবিকা উপার্জনের জন্যে দীর্ঘকাল শিক্ষালাভ করা সম্ভব নয় এমন কয়টি ছেলে নিয়েই প্রথমতঃ এ প্রতিষ্ঠানটি খোলা হয়। এতে জীবিকার্জনের উপযোগী শিল্পকর্ম যেমন, তাঁত বোনা, গালার কাজ, বেতের কাজ, কাঠের কাজ, কৃষি ও পশুপালন ইত্যাদিকে কেন্দ্র করেই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। "the Siksha-satra was the new school he founded in 1924 with a few boys, who either were orphans or whose parents were too destitute to be able to send them to any school whatever' .....Mr Elmhirst's special contribution was his desire to have village boys trained through modern science in the different rural handicrafts and in agriculture. "The Siksha-satra was founded as a model school run on model methods for the building up of the ideal villeger"

প্রথমতঃ ছাত্রদের কাছে কোন বেতন নেওয়া হোত না। কিন্তু আর্থিক ও মনস্তাত্ত্বিক কারণে বেতন নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হোল। কারণ দেখা গেল যে শিক্ষা অবৈতনিক তাকে অভিভাবক বা ছাত্র কেউই মর্যাদা দেন না। তা ছাড়া বিনা পারিশ্রমিকে কোন বিদ্যা গ্রহণ করলে তাতে ছাত্রদের মনে একটা আত্মাবমাননার ক্ষোভ থাকে। তাই সামান্য বেতন নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হোল। তবে যারা দরিদ্র তারা তাদের অবস্থানুযায়ী ক্ষেতের ফসলের কিছু অংশও বেতন হিসাবে দিতে পারতো। এখানে ছাত্রে কলমে শিক্ষার উপরই জোর এবং ছাত্রদের স্বাবলম্বী,

আত্মবল ও নৈতিক শ্রমে বিশ্বাসী করে গড়ে তুলবার শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক ছাত্রকে আত্মকর্তৃত্বে অভ্যস্ত করবার জন্যে, ছোট ছোট ক্ষেত দেওয়া হয়। তাতে তাদের ইচ্ছামত ফসল ফলাবার জন্যে উৎসাহ দেওয়া হয়। শিল্পকর্মের ব্যাপারেও ব্যক্তিগত রুচি বিকাশের জন্যে কিছুটা স্বাধীনতা ছাত্রেরা ভোগ করে। কিন্তু 'শিক্ষিত মজুর' সৃষ্টি করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নয়। ছাত্রদের সর্বাঙ্গীন শিক্ষার দিকেই দৃষ্টি। রুচি ও ক্ষমতা অনুযায়ী বিশ্বভারতীর কলাভবন, সঙ্গীত ভবন ইত্যাদিতে শ্রীনিকেতনের ছাত্রদেরও প্রবেশাধিকার আছে।

শ্রীনিকেতন শিল্পভবনে আশে পাশে গ্রামের পুরুষ ও মেয়েদের অবসর সময় নানা অর্থকরী শিল্পশিক্ষা দানের ব্যবস্থা আছে। এখানে বাংলার বাইরের বিভিন্ন রাজ্য সরকার ছাত্র পাঠান এ সব বিষয়ে শিক্ষাগ্রহণের জন্যে। "Since its inception it has consistently been striving to revive indigenous industries and at the same time provide subsidiary occupation to peasants. Silpa-Bhabana, as this department is called, provides training to village people some of whom take up rural industries as professions while others use their leisure profitably by manufacturing things at home. Training is given in a variety of crafts—weaving, dyeing, carpentry, leatherwork, pottery, paper making, book-binding, bakery, tailoring etc"

গ্রামগুলি যাতে সুস্থ, সুন্দর প্রাণবন্ত জীবিকা ও সামাজিক আনন্দের কেন্দ্র হতে পারে সে জন্যে তিনি আদর্শগ্রাম রচনার কথা চিন্তা করেছিলেন। এ গ্রামগুলি শ্রীনিকেতনের কর্মীদের পরিচালনায় ও গ্রামবাসীদের নিজস্ব সমবেত উদ্যোগ ও উৎসাহে গড়ে উঠবে এই তিনি চেয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্যের কথা তিনি এ ভাবে প্রকাশ করেছেন "We must so endeavour that a power from within the villages may be working alongside of us, albeit undiscernible by us.....If I can free only one or two villager from the bonds of ignorance and weakness there will be built on a tiny scale, an ideal for the whole of India..... Our aim must be to give there villages complete freedom, education for all, the winds of joy blowing across the villages music and recitations going on, as in the old days Fulfil this ideal in a few villages only, and I will say that these few villages are my India. And only if that is done, will India be truly ours."

এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষক অত্যাবশ্যক। চিরাচরিত পদ্ধতিতে যাঁরা শিক্ষা পেয়েছেন তাঁরা অনেক সময় এ নূতন পরীক্ষা সফল ভাবে পরিচালনায় অক্ষম। তাই শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্রের বিনয় ভবন স্থাপিত হয় ১৯৪৮ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর। এখানে শুধু সাধারণ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের শিক্ষণের ব্যবস্থাই নেই—শিল্প, কলা, সঙ্গীত ইত্যাদি বিশেষ বিদ্যাশিক্ষণের ব্যবস্থাও আছে। রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকতেও শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষণের জন্যে শিক্ষা চর্চা বিভাগ স্থাপিত হয়েছিল। বিশ্বভারতীর অন্তর্গত একটি পুস্তক-মুদ্রণ ও প্রকাশন বিভাগ আছে, তাতে শিক্ষার্থীরা বই ছাপা, বাঁধাই ইত্যাদি কাজ শিখবার সুযোগ পায়। আজ শান্তিনিকেতন একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়—ভারত সরকার এর পরিচালনার ভার নিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকতেও শিশুদের শিক্ষা থেকে সুরু করে, মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চতর শিক্ষার জন্যে ব্যবস্থা ছিল,—শিশু-সদন একেবারে ছোটদের জন্যে—পাঠভবন ছয় থেকে ষোল বৎসরের বালক বালিকাদের জন্য—শিক্ষাভবন ইণ্টারমিডিয়েট ও বি এ পরীক্ষার উপযোগী শিক্ষাদানের জন্যে—আর বিদ্যাভবন স্নাতকোত্তর ও উচ্চতর গবেষণার জন্যে। বিশ্বভারতীর আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে গ্রন্থাগার। বিভিন্ন দেশ কবির বিশ্বভারতীর আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা নিদর্শন স্বরূপ বহু গ্রন্থ এখানে প্রেরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের বিনিময়েও নানা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পুস্তকাদি দান করেছেন। নানা দেশের সংস্কৃতি ধর্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে পুস্তক সংগ্রহ অত্যন্ত মূল্যবান্। বিদেশী ছাত্র ও শিক্ষকেরা এখানে এসে থাকবার ও কাজ করবার সুযোগ পান। বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র বিশ্বের মানস-মিলনের যে আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে উদ্বুদ্ধ করেছিল—তা এখানে সার্থক রূপ পেয়েছে। ভারতবর্ষের বিভিন্নরাজ্য থেকেও বহু পুস্তক

ও অর্থ সাহায্য পাওয়া গেছে, কিন্তু বাংলা দেশ থেকে প্রাপ্ত সাহায্যের পরিমাণ সামান্য।

এটি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়—সমস্ত শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরাই বিশ্বভারতীর সীমার মধ্যে অবস্থিত ছাত্র ছাত্রী নিবাসে বাস করে শিক্ষালাভ করে। বোলপুর ও আশে পাশের গ্রামের কিছু ছাত্র ছাত্রীকে বাইরে থেকে এসে ক্লাস করতে অনুমতি দেওয়া হয়।

প্রত্যেক বিভাগেই নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র ছাত্রী গ্রহণ করা হয়। প্রথম যখন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তখন সমস্ত ছাত্রদের ব্যয়ভার রবীন্দ্রনাথ নিজেই বহন করেছেন তার পরে যখন বেতন নেওয়ার প্রথা হোল তাতেও বিদ্যালয়ের খরচ কখনও সংকুলান হোত না—এখনও হয় না। বাস্তবিক পক্ষে ব্যবসায়িক বুদ্ধি দ্বারা এ প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালিত নয়। এবং আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা এর আদর্শ নয়। প্রাচীন ভারতে দেশের রাজা শিক্ষার জন্য রাজস্বের ৬ষ্ঠ অংশ চতুষ্পাঠি টোল ইত্যাদি বিদ্যা প্রতিষ্ঠান রক্ষার জন্য ব্যয় করতেন। ছাত্ররা বিনা ব্যয়ে গুরু গৃহে বাস করে শিক্ষা লাভ করতো। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন এটি অনুকরণীয় আদর্শ।

আমাদের দেশে বর্তমান যুগে দুটি অনন্যসাধারণ মানুষ শিক্ষা সংস্কারের জন্য মৌলিক ও উল্লেখযোগ্য পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছিলেন—একজন রবীন্দ্রনাথ আর একজন গান্ধীজি। এই দুটি পরীক্ষায় এই দুটি মানুষের ব্যক্তিত্বের ছাপ সুস্পষ্ট। দুজনেই প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় বীতশ্রদ্ধ। দুজনেরই মত যে এ-শিক্ষা প্রাণহীন, আদর্শহীন এবং দেশের প্রকৃত প্রয়োজন মেটাতে অক্ষম। দুজনেই বিশ্বাস করেন শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ। দুজনেই দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। দুজনেই বিশ্বাস করেন দেশের শিক্ষা এই সংস্কৃতির ভিত্তির উপরই ভিত্তি করে গড়তে হবে। দুজনেই মনে করেন সরল, শান্ত, শুদ্ধ ও কর্মময় আশ্রমই হবে বিদ্যালয়ের আদর্শ। দুজনেই শিক্ষার ক্ষেত্রে দৈহিক শ্রম ও হাতের কাজকে বিশিষ্ট স্থান ও মর্যাদা দিয়েছেন। দুজনেই মনে করেন শিক্ষা প্রণালীর ঔৎকর্ষের অপেক্ষা শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র শিশুর শিক্ষার পক্ষে অধিকতর প্রয়োজন। দুজনেই তাড়নাদ্বারা পুঁথি পড়ানো ও মুখস্থ করা বিদ্যাকে নিষ্ফল ও নিষ্প্রয়োজন মনে করেন। দুজনেই ব্যক্তিগত উদ্যম ও কর্মকুশলতা বিকাশকে শিক্ষার একটি শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য মনে করেন। দুজনেই প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় এই প্রকৃতির সাহচর্য শিক্ষার জন্য অপরিহার্য মনে করেন। কিন্তু তাঁদের পরীক্ষার মধ্যে পার্থক্যও লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী, তাই ছাত্রদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য তাদের স্বাধীনতাকে তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে চান, শিক্ষার পরীক্ষায় শিক্ষকদের স্বাধীনতাও তিনি খর্ব করতে চান নি। গান্ধী প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য সমাজের ভিত্তির আমূলসংস্কার—তাই তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থায় সামাজিক উদ্দেশ্য, শৃঙ্খলা নিয়মানুবর্তিতা ও বাধ্যতার উপর জোর বেশী। ব্যক্তিগত ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা ও রুচিকে সামাজিক সংহতির প্রয়োজনে শাসন ও নিয়ন্ত্রণের তিনি পক্ষপাতী। বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে বলা হয়েছে" The scheme envisages the idea of co-operative community in which the motive of social service will dominate all the activities of children during the plastic years of childhood and youth" রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়েও সামাজিক রীতি ও ভদ্রতা পালন ও সমাজ সেবায় শিক্ষার সঙ্গেই স্থান রয়েছে, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী গান্ধীজীর চেয়ে পৃথক। তিনি চেয়েছেন সামাজিক কর্তব্যের নথা দিয়ে ব্যক্তির বিশিষ্টতাকে ফুটিয়ে তুলতে। গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গী সমাজ-ভিত্তিক—রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ব্যক্তি-কেন্দ্রিক।

এ উপলক্ষে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। গান্ধীজী একবার তাঁর আশ্রমের কয়েকটি ছেলেকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে বেড়াতে এসেছিলেন এবং একদিন সেখানে বাস করেছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের নিয়ে নিজ হাতে আশ্রম ঝাঁট দেওয়া, ময়লা পরিষ্কার ইত্যাদি কাজ করেছিলেন। গান্ধীজীর আশ্রমে ছাত্রদের এটা নিত্যকৃত্য। শান্তিনিকেতনে তা নয়। গান্ধীজীর এই শান্তিনিকেতন বাস সেখানে স্মরণীয় হয়ে আছে এবং সেই দিনটিতে প্রতি বৎসর শিক্ষক ও ছাত্রেরা আশ্রম মার্জন করে থাকেন। এই সময়ে একদিন তিনি গান্ধীজীর আশ্রমের কয়েক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি করতে তাদের খুব ইচ্ছে করে বা খুব ভাল লাগবে। ছেলেরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নাকি উত্তর করেছিল "আমরা আমাদের শিক্ষককে জিজ্ঞেস করে এসে আপনাকে জানাবো।" এতে সেই ছাত্রদের নিয়মানুবর্তিতা ও বাধ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় সত্য কিন্তু এটাও বোঝা যায়—এশিক্ষায় স্বাধীন ইচ্ছা বিকাশের

পর প্রেরণা নয়, সরল ও বিশুদ্ধ জীবন যাপনের অভ্যাস ছাত্র জীবনের একটি মূল ভিত্তি একথা গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথ এ দুজনের শিক্ষা পদ্ধতিতেই স্বীকৃত কিন্তু এখানেও দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে। গান্ধীজী যতটা সাধনায় বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ ততটা নন। রবীন্দ্রনাথ মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পক্ষপাতী, তাই বুদ্ধি, অনুভূতি ও ইচ্ছা এর প্রত্যেকটিরই বিকাশ শিক্ষার সত্য উদ্দেশ্য বলে রবীন্দ্রনাথের ধারণা। তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে খেলা, আনন্দ, অন্তিনয়ের আয়োজন থাকা চাই। কিন্তু যে খেলা ও আনন্দ সমাজ সেবার ও গঠনাত্মক কর্মের অঙ্গ নয়—গান্ধীজীর কাছে তা মূল্যহীন। গান্ধীজীর দৃষ্টি কর্মী ও সন্ন্যাসীর দৃষ্টি, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কবি ও সৌন্দর্য শিপাসুর। রবীন্দ্রনাথ বৈরাগ্য সাধনে বিশ্বাসী নয়—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।" এই মাটির পৃথিবীর রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শের সাড়া দিয়েই মানুষের আনন্দময় সত্তা বিকশিত হবে—রূপের মধ্য দিয়েই অরূপের সন্ধান মিলবে এই রবীন্দ্রনাথের সাধনা। গান্ধীজী নিজেকে 'বেনে' বলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করে থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে গান্ধীজীর ব্যবসায়ী বুদ্ধির পরিচয় তার শিক্ষা ব্যবস্থায়ও প্রকট। গান্ধীজী এমন একটি গ্রাম-কেন্দ্রিক আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন করতে চেয়েছেন যা দেশের সরকারের উপর নির্ভরশীল হবে না —যা স্থানীয় চেষ্টাদ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে ও রক্ষিত হতে পারবে। তিনি চেয়েছেন দরিদ্র দেশের উপযোগী, দরিদ্র ব্যবস্থা যা দেশের অসংখ্য জনসাধারণের মৌলিক জীবনযাত্রার উপাদান সংগ্রহে সাহায্য করবে। এ শিক্ষাদর্শ স্বভাবতই সংকীর্ণ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষাসত্রে কতকটা এই আদর্শ গ্রহণ করলেও, সমস্ত শিক্ষাকে এই সংকীর্ণ আদর্শে সীমাবদ্ধ করতে ইচ্ছুক নন। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছেন শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমস্ত মানবের সঙ্গে মিলনের সেতু রচনা করতে। তাঁর শিক্ষার বিরাট আয়োজন স্বভাবতঃই আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করতে পারে না এবং দেশের বৃহত্তর জনসাধারণের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে। গান্ধীজীর শিক্ষা-পদ্ধতি তার সংকীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে অধিকতর উপযোগী তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোন আশু উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে শিক্ষার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করতে ইচ্ছুক নন। ১৩২৯ সনের ৯ই ভাদ্র কোন উৎসব উপলক্ষ্যে বলেছিলেন "আমাদের দেশবাসীরা 'ভূমৈব সুখম্' এই ঋষিবাক্য ভুলে গেছে। ভূমৈব সুখং তাই জ্ঞানতপস্বী মানব দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করেও উত্তর মেরুর দিকে অভিযানে যাত্রা করছে, আফ্রিকার অজ্ঞাতপূর্ব প্রদেশে দুর্গম পথে যাত্রা করছে, প্রাণ হাতে করে সত্যের সন্ধানে ধাবিত হচ্ছে। তাই কম জ্ঞান ও তাদের সাধন পথের পথিকেরা দুঃখের পথ অতিবাহন করতে নিষ্কান্ত হয়েছে, তাঁরা জেনেছেন যে ভূমৈব সুখং—দুঃখের পথেই মানুষের সুখ। আজ আমরা সে কথা ভুলেছি, তাই অত্যন্ত ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও অকিঞ্চিৎকর জীবনযাত্রার মধ্যে আত্মাকে প্রচ্ছন্ন করে দিয়ে দেশের প্রায় সকল লোকেরই কাল কাটছে।"

গান্ধীজীর শিক্ষা চরকারূপ শিল্পকর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে—এশিক্ষা শিল্পকর্মকেন্দ্রিক craft centred। কিন্তু যে শিল্পকর্ম গ্রাম্যজীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে সহায়ক নয় বুনিয়াদি শিক্ষায় তার স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথও নানা হাতের কাজকে শিক্ষার একটি প্রধান সহায়ক মনে করেন কিন্তু তা জীবনের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার কাজেই সংকীর্ণ-ভাবে সীমাবদ্ধ থাকবে এটা তাঁর মত নয়। তাই ব্যক্তিক বিকাশের উপযোগী নানা কারুশিল্পেরও স্থান তিনি দিয়াছেন শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে। তাই রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা নানা কর্ম ও ক্রীড়াকেন্দ্রিক activity play centred একথা বলতে পারি। গান্ধীজী কাজের মানুষ (practical) আর রবীন্দ্রনাথ আদর্শবাদী বা idealist। অনাথ নাথ বসু তাঁর একটি প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বলেছেন, "When Tagore speaks of handwork, music and arts as vehicles of creative self expression puts his imphasis on the creative and artistic aspects. But in Basic Education side by side with the creative aspect the social and economic aspect of craft work are stressed." তবে এটা লক্ষণীয় যে, গান্ধীজীর বহু পূর্বে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরীক্ষা শুরু করেছিলেন এবং বুনিয়াদী শিক্ষার মূলনীতি তাঁর শিক্ষা ব্যবস্থার আংশিক রূপ পেয়েছিল 'শিক্ষা-সত্রে' "It is indeed curious to think that Rabindranath, nearly a quarter of a century back anticipated the most progressive educational thoughts and principles yet discovered and gave them a concrete shape in this small modest looking institution, "Siksha-Satra."

গান্ধীজীর মানসিক গঠন রক্ষণশীল ও প্রাচীনপন্থী

এবং পাশ্চাত্য দেশের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিকে তিনি সকৌতুহলে দেখেন। রবীন্দ্রনাথও বিজ্ঞানের উপযোগিতা এবং মানুষের স্বাস্থ্যের ও উৎপীড়নের কাজে এর ব্যবহারের নিন্দা করেছেন। তথাপি তিনি বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন এবং দেশের উন্নয়নের কাজে বিজ্ঞানের ব্যবহার অপরিহার্য বলে মনে করেন, তাই শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীতে বিজ্ঞান চর্চায় তাঁর উৎসাহ ছিল। গান্ধীজী ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ তুলনা করে শ্রীযুত সুনীল চন্দ্র সরকার Education in Free India and Its Central Purpose প্রবন্ধে লিখেছেন—"Gandhiji's truth and non-violence are akin to almost identical with Tagore's message of love and universal brotherhood but still they are distinctly marked off as two distinct attitudes towards life. Whereas Gandhiji concentrates on the eternal problems of evil and evolves a philosophy of action, something like a simplified version of Karma-Yoga suited to the needs and abilities of each and every man, Tagore centres his philosophy on the joy of life, the eternal Ananda of realisation and expression which does not exclude action. Gandhiji established the everyday reality of life in his system and saved his education form the danger of 'escapism' in any form ; he gives it grip over the student mind which has so long been the dream of all educationists. Tagore presents reality in its largest perspective yet attained by man and saves education from the danger of all narrow limitations of place, time and people."

রুশোর সময় (১৭১২-১৭৭৮) থেকে সুরু করে পাশ্চাত্য দেশে যে-সব শিক্ষা সংস্কার বা শিক্ষা সম্পর্কে পরীক্ষা হয়েছে রবীন্দ্রনাথ তাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং তাদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এরকম অনুমান সম্ভবতঃ অন্যায় নয়। রুশোর মত তিনিও বিশ্বাস করেছেন যে, শিশুর শিক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রকৃতির মুক্ত অঙ্গন। রুশোর মত তিনিও প্রকৃতির শিক্ষাকে উচ্চ মূল্য দিয়েছেন। রুশোর মত তাঁরও মনে ছিল শিশুর জন্য অপরিমিত স্নেহ ও করুণা। শিক্ষার ক্ষেত্রে কঠিন শাসন ও পীড়ন হতে শিশুকে মুক্তির পথ দুজনেই দেখিয়েছেন। দুজনেই চেয়েছেন শিশুর অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করে তার আত্মবিকাশের পথ প্রশস্ত করা. দুজনেই বই পুস্তকের গুরুভার থেকে শিশুকে মুক্তি দেওয়ার পক্ষপাতী। কিন্তু দুজনের মধ্যে পার্থক্যও আছে। রুশোর পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে প্রকৃতি বাঘ—মানুষ অনিচ্ছুক প্রকৃতির হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে তার গোপন রহস্য মানুষ তাকে বশ করবে, জয় করবে, ভোগ করবে। রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় দৃষ্টিতে প্রকৃতি কল্যাণময়ী মাতা তা পালন করে. পোষণ করে. শান্ত করে। মানুষের শিক্ষার একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা। আর এক বিষয়েও তাঁদের মধ্যে মৌলিক প্রভেদ রয়েছে। রুশো মানব সমাজব্যবস্থাকে ঘৃণা করেছেন. মানব সভ্যতাকে মনে করেছেন সমস্ত দুঃখ ও বিকৃতির কারণ। তাই রুশো তাঁর আদর্শ ছাত্র Emile সমাজ ও সংসারের আবেষ্টন থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধুমাত্র গৃহশিক্ষকের সান্নিধ্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। রবীন্দ্রনাথও সংসারের আবিলতা ও বিকৃতি থেকে শিক্ষার প্রথম অবস্থায় শিশুকে রক্ষা করা বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন। তাই তিনি তপোবনের আদর্শে আশ্রম বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। কিন্তু মানব সমাজ ও সভ্যতাকে তিনি ঘৃণা করেন নি। সামাজিক রীতি-নীতি. আচার শিক্ষাও শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ বলে স্বীকার করেছেন। তাই তাঁর বিদ্যালয় পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যেই স্থাপিত।

পেষ্টালজী ও আধুনিক সমস্ত শিক্ষাব্রতীর মত রবীন্দ্রনাথও মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তির উপর শিক্ষাকে স্থাপনের পক্ষপাতী। তাই বর্তমানে পাশ্চাত্য দেশে শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে তাঁর মিল রয়েছে, কিন্তু তার বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিষ্ক্রিয় দর্শক মাত্র নন। শিশুর সমস্ত কর্ম উৎসাহ, কর্মোদ্যম—বেগ ও গতি পাবে শিক্ষকের জীবন্ত ও সক্রিয় ব্যক্তিত্ব থেকে। শিশু মনস্তত্ত্ব না জানলে শিশু-শিক্ষার সফল হওয়া যায় না একথা রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেন। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে শিশুর মনকে যেমন বিশ্লেষণ ও স্তর বিভাগ করা হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ মনঃপূত নয়। তিনি মানুষকে খণ্ডিতভাবে দেখতে এবং তার বিভিন্ন শক্তিকে বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা দেওয়ার রীতিতে বিশ্বাসী নন। তাই শিক্ষার আধুনিক প্রণালীগত উন্নতির সম্বন্ধে তাঁর ঔৎসুক্য ও উৎসাহ থাকলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রণালীর উৎকর্ষের চেয়ে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের সদ্ভাবকে তিনি অধিকতর মূল্য দিয়েছেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা

শিশুর শিক্ষা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই সার্থক ও সত্য রূপে ওঠে ফ্রএবেলের এ মতের সঙ্গে তাঁর মিল আছে—শিশুরূপ চারাগাছকে তার স্বকীয় ভাব পূর্ণ ভেতর থেকে বেড়ে উঠতে সাহায্য করাই শিক্ষকের কর্তব্য এবং শিশু নানা ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারও নানা হাতের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভে কিণ্ডারগার্টেনের এ নীতি তিনিও তাঁর বিদ্যালয়ে ব্যবহার করেছেন—কিন্তু কোন প্রণালীর বাহ্যিক ব্যবহারেই তিনি বিশ্বাসী নন। কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার একটি বিশেষত্ব—রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিদ্যালয়ে পরিপূর্ণভাবেই এর ব্যবহার করেছেন।

মন্টেসরী তো প্রায় তাঁর সমসাময়িক। বরং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষা সম্ভবতঃ মন্টেসরীর আগেই সুরু হয়েছিল। শিশুর স্বাধীন সত্তা বিকাশের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মন্টেসরী বলেছেন—"The child who has never learned to act alone, to direct his own actions, to govern his own will, grows into an adult who is easily led and must always lean on others. The school child, being continually discouraged and scolded, ends by acquiring that mixture of distrust of his own powers and of fear, which is called shyness and which later, in grown up man, takes the form of discouragement and submissiveness, of incapacity to put up the slightest moral resistance. The obedience which is expected of a child both in the home and in the school an obedience admitting neither of reason nor of justice prepares the man to be docile to blind forces." একথা রবীন্দ্রনাথের কথাও বটে। মন্টেসরী শিশুর ইন্দ্রিয়ের সচেতনতা ও কর্মকুশলতা বিকাশের উদ্দেশ্যে ও আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদানের জন্যে—খেলাকে একটি প্রধান স্থান দিয়েছেন। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা প্রণালীর সাদৃশ্য আছে। কিন্তু মন্টেসরী শিশুর অলস কল্পনার ক্ষেত্র সংকোচনের পক্ষপাতী এবং তাঁর খেলাও কতগুলি সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতী (Montissori materials) দ্বারা সীমাবদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ শিশুকে অধিকতর স্বাধীনতা দানের পক্ষপাতী।

আমেরিকার বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ জন ডিউইর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শেরও বহু মিল আছে। ডিউইর মতে—শিক্ষাকে সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করলে তা প্রাণ হারায়। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে সমাজ সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সংযুক্ত ও সমন্বয় সাধন। শিক্ষা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতিমাত্র নয় বর্তমান জীবন ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার যোগ থাকা চাই। বিদ্যালয় সামাজিক জীবনেরই একটি জীবন্ত অঙ্গ। প্রকৃত শিক্ষার ফল জীবনের সরলীকরণ ও মানবের সমানাধিকারে বিশ্বাস ও অনুরাগের সর্বাঙ্গীন বিকাশ। Dewey-র নিজের ভাষায় তাঁর শিক্ষাদর্শের কয়েকটি মূল সূত্র দেওয়া হোল।

"I believe that

...all education proceeds by the participation of the individual in the social consciousness of the race.

...the only true education comes through the stimulation of the child's power by demands of the social situation in which he finds himself.

...Education, ..must begin with a psychological insight into the child's capacities interests and habits...These...must be continually interpreted—we must know what they mean. They must be translated into terms of their social equivalent—into what they are capable of in the way of social service"

বিদ্যালয় কি, কি তার কর্তব্য সে সম্বন্ধে Dewey বলছেন :—

I believe that

...the school is primarily a social institution...the school must represent present life—life as real and vital to the child as that he carries on in the home, in the neighbourhood, or on the playground

...the school, as an institution, simplify existing social life.

...as such simplified social life, the school life should grow gradually out of the home.

শিক্ষকের কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি বলছেন :—

"the teachers place and work in the school is to be interpreted from this same (social)

The teacher is not in the school to impose certain ideas or to form certain habits in the child, but is there a member of the community to select the influences which shall affect the child and to assist him in properly responding to these influences"

...the teacher is engaged, not simply in the training of individuals, but in the formation of the proper social life.

every teacher should realise the dignity of his calling; that he is a social servant set apart for the maintenance of proper social order and securing of the right social growth

...in this way the teacher always is the prophet of the true God and the usher in of the true kingdom of God"

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের সঙ্গে এ আদর্শের বহুলাংশে সাদৃশ্য আছে। তবে শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে Dewey অধিকতর সচেতন। রবীন্দ্রনাথের কাছে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশই সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ এবং এ আদর্শ উপযোগী শিক্ষা মানুষকে বাহ্যপ্রকৃতি ও মানব প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মবন্ধনে আবদ্ধ করে। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞান আহরণ নয়—পরিপূর্ণ জীবন to "attain feelness by sympathy with the whole of nature" এই সার্থক শিক্ষার ফল আনন্দময় বন্ধন বুঝি—"Perfect freedom lies in the perfect harmony of relationship which we realise in this world—not through our response to it in *knowing* but in *being*"

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাপ্রণালী সুলভ নয় এবং রবীন্দ্রনাথের জীবন্ত ব্যক্তিত্বের প্রভাবে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী প্রাণবন্ত। সে প্রাণকেন্দ্রের অভাবে এ প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। বাস্তবিক পক্ষে রবীন্দ্রনাথের এ শিক্ষার পরীক্ষা দেশের সাধারণের সমর্থন পায়নি। হয়তো তিনি তাঁর কালের পূর্বেই জন্মেছেন—তাই তাঁর সাধনা ও আদর্শ এদেশের লোক গ্রহণ করতে সমর্থ নয়। শেষ জীবনে একথা তিনি বুঝেছিলেন। এ ব্যর্থতার সুর চরমকালের পূর্বে ১৩৪৭ সনের ৮ই শ্রাবণ প্রার্থনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট "আজ বার্ধক্যের ভাঁটার টানে তোমাদের জীবন থেকে দূরে সরে গেছি। প্রথম যে আদর্শ বহন করে এখানে এসেছিলুম, আমার জীর্ণ শক্তির অসম্পূর্ণতা থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে নিজের হাতে বহন করবার আনন্দিত উদ্যম কোথাও দেখতে পাচ্ছি নে। মনে হয় এ যেন বর্তমান কালেরই বৈশিষ্ট্য। সব কিছুকে সন্দেহ করা, অপমান করা, এতেই যেন তার স্পর্ধা। তারই তো বীভৎস লক্ষণ মারী বিস্তার ক'রে ছুটে উঠেছে, দেশে বিদেশে আজকের দিনের রাষ্ট্রে, সমাজে বিদ্রূপ করছে তাকে যা মানবসভ্যতার চিরদিনের সাধনার সামগ্রী।

...বিরুদ্ধ ভাগ্যের নির্মমতা ভেদ করে সেই যে যাত্রাপথ চলেছিল সম্মুখের দিকে তার দুঃসহ ইতিহাস কেউ জানবে না। আজ এসেছি সেই দুঃখ স্মৃতির ভিতর দিয়ে। উৎকণ্ঠিত মনে তোমাদের মনে খুঁজতে এলাম তার সার্থকতা। আধুনিক যুগের শ্রদ্ধাহীন সন্দেহ দ্বারা এই তপস্যাকে মন থেকে প্রত্যাখ্যান কোরো না—একে স্বীকার করে নাও।"

এই মর্মন্তুদ বেদনাতুর আবেদনই তিনি করেছিলেন গান্ধীজীর কাছে, তাঁর জীবিতকালে গান্ধীজী শেষ যে-বার শান্তিনিকেতন আশ্রমে যান। পরমশ্রদ্ধা দিয়ে জীবনব্যাপী এই সাধনার ফলকে তিনি দেশবাসীর হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন—বিদেশ তাঁর এই দানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছে—কিন্তু দেশ তাঁর এই দানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করুক, এই ছিল তাঁর অন্তরের কামনা। ১৩৪৫ সালের ৮ই পৌষ উৎসবে তিনি বলেছিলেন—"বহুদিনের ত্যাগের দ্বারা, চেষ্টার দ্বারা এই আশ্রমকে দেশের বেদীমূলে স্থাপন করবার জন্য নৈবেদ্য সংরক্ষণকার্য আমার আয়ুর সঙ্গে সঙ্গেই এক রকম শেষ ক'রে এনেছি। দূরের অতিথি অভ্যাগতদের অনুমোদনের দ্বারা আমাদের কাছে এই কথা স্পষ্ট হয়েছে যে এখানে প্রাণশক্তি রয়েছে। ফুলে ফলে বাইরের ফসলের কিছু একটা প্রকাশ এঁরা দেখেছেন, তা ছাড়া তাঁরা এর অন্তরের ক্রিয়াকেন্দ্র দেখেছেন।...আমাদের এই আশ্রমের কর্মেতে আমি যে আপনাকে সমর্পণ করেছি তা সার্থক হবে যদি আমার এই সৃষ্টি আমি যাবার পূর্বে দেশকে সঁপে দিতে পারি। শ্রদ্ধা দেয় যেমন, শ্রদ্ধা

আবেদন। যেমন শ্রদ্ধার দিতে চাই, তেমনি শ্রদ্ধার একে গ্রহণ করতে চাই। এই দেওয়া নেওয়া যেদিন পূর্ণ হবে সেদিন আমার সারা জীবনের কর্ম-সাধনার এই ক্ষেত্র পূর্ণতার রূপ লাভ করবে।"

রবীন্দ্রনাথ আজ নেই। তাঁর এই সাধনার ক্ষেত্র বিশ্বভারতীর ভার ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন। কিন্তু একথা কি বলা যাবে—দেশ তাঁর শ্রদ্ধার দানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে তাঁর তপস্যার পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছে?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার উদ্দেশ্যে একটি কমিশন নিযুক্ত হয়েছিল। মাইকেল স্যাডলার ছিলেন এর সভাপতি। বাংলা দেশের নানা বিদ্যালয় পরিদর্শন করে এদেশের শিক্ষাপদ্ধতির একটি ত্রুটি প্রাণপূর্ণ ঐক্যের আদর্শের অভাবে এই কথা নির্দেশ করেছিলেন—

"In other parts of the world and not least in England, schools and colleges suffer to some extent from, lack of an inspiring unity in their intellectual aim. The mass of new knowledge which now claims a place in schemes of education has not yet found a synthesis. It has not yet been unified intellectually. Still less has it been co-ordinated with spiritual belief. And this dislocation between different departments of the intellectual life and their mal-adjustment to emotional and aesthetic experience result in a lack of those simple authoritative generalitions which compe acceptance, touch every side of human experience and are the groundwork of definite teaching primary and secondary school.

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর শিক্ষাপদ্ধতির মূলে আছে—একটি প্রাণবন্ত সমন্বয়ী আদর্শ। বিশ্বভারতীর এ বৈশিষ্ট্য Sadler Commission লক্ষ্য করেছেন। এ আদর্শ ও উদ্দেশ্য বিশ্বভারতীর Memorandum of Association-এ এ-ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে "To bring the Mind of Man in its realisation of different aspects of truth from diverse points of view.

To bring into more intimate relation with one another, through practical study and research the different cultures of the East on the basis of their underlying unity

To approach the west from the standpoint of such a unity of the life and thought of Asia.

To seek to realise in a common fellowship of study the meeting of the East and the West and thus ultimately to strengthen the fundamental condition of world peace through the establishment of free communication of ideas between the two hemispheres"

Sadler Commission বিশ্বভারতীর পরিদর্শন করেছিলেন এবং সেখানের শুভ সুন্দর সামাজিক পরিবেশ Sadler-এর প্রশংসা অর্জন করেছে "In Bengal a school is thought of too narrowly as a place of instruction. Its possibilities as a society are overlooked.....At school he (the student) ought to feel himself not a mere unit who has to learn things at an appointed time and place, not simply one of a multitude of similar units receiving instruction from his teachers; but a member of a community, responsible for service to it, an active paricipant in its various occupations, attached to it by a network of interest and responsibilities. It cannot be said that this side of education is impracticable in India. To give one example alone, it is highly developed at Bolpur," এ প্রশংসা সামান্য নয়।

আলোছায়ার কবি

স্নেহাঙ্কর ভট্টাচার্য

(১)

জীবনানন্দ বাংলাদেশের আলোছায়ার কবি। এই ছায়া এবং আলো অবিমিশ্র নয়। নিগূঢ় চেতনার, সত্তার প্রথম স্তরে, স্বপ্নের মধ্যে যেমন আলোছায়া অবিরোধী ভাবে পরস্পরে মিশে থাকে জীবনানন্দের কবিতার মধ্যেও তেমনি ছায়া এসে আলোর শরীর ছুঁয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, —আলো ম্লান হয় ছায়ার গভীরে। জীবনানন্দের সমগ্র কাব্য এই আলোছায়ার সুষমায় লাবণ্যময়ী। কখনো তাতে ছায়ার ভাগ বেশি, কখনো বা আলোর। যাঁরা আলো চেয়েছেন তাঁদের কাছে আলো এসে নতুন অর্থে উদ্ভাসিত হয়েছে। আলোয় যাঁদের অরুচি তাঁরা জীবনানন্দের ধূসরতা অন্বেষণ করে ধূসরতর হয়েছেন।

পৃথিবীর নিশিরাত্রির শতচক্রের আবর্তনে সহজ এবং স্বাভাবিক ভাবে প্রতিদিনের যে উজ্জ্বল রোদ প্রাণের অঙ্গনে এসে পড়ে, সেই আলো যেমন প্রাণময়তার দীপ্তি নিয়ে আসে, তাকে ঠিক তেমনি ভাবে গ্রহণ করার মত মনোভঙ্গি সাধন আমাদের নেই, হয়তো বা আজকের দিনে সম্ভবও নয়। ব্যক্তিমানস সময়নিরপেক্ষ নয়। দেশ-কাল-সমাজের ক্লান্তির ছাপ সর্বাঙ্গে বহন করে আলো-কে আমরা কতটুকু পেতে পারি অথবা সেই আলোয় কতখানি উদ্ভাসিত হতে পারি তা নির্ভর করে মনের ওপর। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দর্শন সবটা নয়। মন থেকে বস্তুতে চিন্তার প্রতিফলনে বস্তুরূপ যখন মনোময় হয়ে উঠবে তখনি সেই দেখা, সেই জানা অক্ষয় হয়ে থাকবে।

জীবনানন্দের মনের কেন্দ্রে কোথাও একটা আলোর বিন্দু ছিল বা আমরা জানিনি কিংবা জানতে চাইনি, হয়তো তিনি নিজেও জানতেন না। না হলে বস্তুরূপের মধ্যে, অঙ্কিত চিত্রে তাঁর যে মনকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, অনুভব করেছি তা শুধুই অন্ধকার এ এই কথা আমাদের মনে হতো না। অন্ধকার আছে, অন্ধকারের পটভূমিকাও আছে, কিন্তু সেই অন্ধকারের বুকের কাছে, অন্ধকারের ললিত নির্জনতার মধ্যেই কোথাও আলো রয়ে গেছে ম্লান হয়ে, লীন হয়ে।

আমরা ঘুরেছি যারা বহুদিন মাস ঋতু শেষ হ'লে পর পৃথিবীর সেই কন্যা কাছে এসে অন্ধকারে নদীদের কথা ক'য়ে গেছে ; আমরা বুঝেছি যারা পথ ঘাট মাঠের ভিতর আরো এক আলো আছে : [মৃত্যুর আগে : ধূসর পাণ্ডুলিপি]

হয়তো সেই আলোর স্বরূপ, তার উজ্জ্বলতা এই ব্যাপ্ত অন্ধকারে স্বমহিমায় অনুভূত হয়নি, তবুও এই পৃথিবীর মাঠে ঘাটে আরো এক আলো আছে, ছায়াম্লান।

আরো এক আলো আছে,' দেহে তার বিকাল বেলার ধূসরতা।

[মৃত্যুর আগে, ধূসর পাণ্ডুলিপি]

এই অন্ধকার বেদনার পরিধিকে অতিক্রম করে আলোর অন্বেষণে গিয়ে সেই আলোর উৎসমূল খুঁজতে উন্মুখ হতে পারি, সমগ্র সত্তাকে, অন্ধকারে লালিত নিরুদ্ধ সুখদুখী মনকে অসহ্য যন্ত্রণায় মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে মেলে দিতে পারি আলোর আশীর্বাদ নেব বলে, কিন্তু সেই আলো পূর্ণতায় ভরবে না আকাশের আশীর্বাদের মত ; কিম্বা আকাশের আশীর্বাদ থাকবে,—আমরা পাব খণ্ড খণ্ড করে, আলো আঁধারের কম্পনের ভেতর দিয়ে। কেন না বিচ্ছিন্ন করে নিলেও মনের ঘরের কোণে লুকিয়ে আঁধার-চেতনা ছায়া ফেলবেই, নিজেকে বারবার করে দেখবেই আলোর চোখে। তখন সেই আলোর মধ্যে কালোর প্রতিফলনে কবিসত্তা দুলে উঠবে, আমরা উপহার পাব আশা-বেদনার, আলো অন্ধকারের একখণ্ড দ্যুতি :

আলো আছে তবুও—আলোর তীরে রয়েছে অন্ধকার।

(মনুষ, ১ম বর্ষ, ১৩৬০)

চেতনার পারে এই অপরূপ কল্পন কবিতা হয়ে ঝরে পড়ছে বলেই জীবনানন্দ বাংলাদেশের আলোছায়ার কবি, আলোছায়ার একমাত্র কবি।

(২)

জীবনানন্দের কাব্যে ধূসরতা রয়ে গেছে : অথবা ধূসরতা ছিল সমস্তের মধ্যে, পৃথিবীর নাড়ীর ভিতরে। এই ধূসরতা থেকে তাঁর কাব্য বিচ্ছিন্ন করা যায় না এবং তা সমীচীনও হবে না। তাঁর কবিতা অন্য এক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে সেটা অবিচারই হবে তাঁর প্রতি। যদিও তাতে সমালোচকের কোনো উদ্দেশ্যের সিদ্ধি হতে পারে। কবি—সৎ কবি—নিয়ত নিজের মনের দেহকে ভেঙে ভেঙে এক থেকে অন্য হচ্ছেন। কোনো একটি খণ্ডে তাঁকে সম্পূর্ণ পাওয়া যাবে না, যেতে পারে না।

তবে মনে হয় পৃথিবীর নিরন্ত যন্ত্রণার মধ্যে, ক্লান্তি এবং ক্লেদের মধ্যে—যা নাকি জীবনানন্দের কবিতার চিহ্ন রেখে গেছে—পথ কেটে ধীরে ধীরে বৃহত্তর ও মহত্তর সম্ভাবনাময় শাশ্বত অমল আলোর দিকে তাঁর মন অগ্রসর হচ্ছিল। সেই আলো আমাদের চোখে পড়ে নি। কেন না কবি তাঁর পরিণতির শেষে এক সম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র বৃত্ত রচনা করলে পরে আমরা সেই বৃত্তের কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত দ্যুতিতে স্নান করতে পারি, উদ্ভাসিত হতে পারি, এক স্বতন্ত্র পর্যায়ে তাঁকে চিহ্নিত করতে পারি। কবির সেই পথ দীর্ঘ, যন্ত্রণাময় এবং সমস্ত কবি জীবনের একটি পর্যায়, সমালোচকের কাছে তা শুধু তাঁকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করার উপায়। কিন্তু মৃত্যুর ব্যাপক অন্ধকার সব কিছুকেই আড়াল করেছে বলে আজ হঠাৎ অন্য এক আলো ঝলসে উঠেছে তাঁর শেষদিককার কবিতায়, অন্ধকারে জোনাকির মশালের মত দপ দপ ক'রে জ্বলে উঠেছে, যার এই বিকীরণ অন্য কোনো চেতনার দিক নির্দেশকারী। এই আলো জীবনানন্দের এক নতুন অগ্রগতির আরেকটিক হয়ে থেকে যাবে কবিতার অপার পথে।

পৃথিবীর গাঢ় অন্তস্থতার মধ্যে যে বিশ্বাসের অদ্ভুতত্ব কবিকে চিরকালের বোধে উদ্দীপিত করে সমাজের সনাতন স্বাস্থ্যকে সুস্থতর করে দিতে চাইবে, সেই বিশ্বাস সেই পথের নির্দেশ যান্ত্রিকতার উচ্চকণ্ঠে নিনাদিত হয়ে যে আলোর দিকে যেতে বলে,—অনেক মাছরাঙা রাত্রিতে মোহগ্রস্তের মত ঘুরে ঘুরে জানা যায় তা আলো নয়, আলেয়া। অনেকেই এই করুণ অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞ, আজকে সেটা অজানা নয়। মননে, বোধে তাকে অনুভব না করলে সেই সত্যের সবটাই সত্য নয়।

মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো
না পেলে নিষ্ফল ক্রিয়া : বিশেষণ, নিরাশ্রয়

শব্দের কঙ্কাল :

(১৯৪৬—৪৭ : শ্রেষ্ঠ কবিতা)

গভীর অনুভূতিদেশ থেকে আলো না পেলে নিষ্ফল ক্রিয়া, বিশেষণ ইত্যাদিতে কবিমন আশ্বস্ত হতে পারেনা, আশ্রয় লাভ করতে পারেনা : অথচ সত্যচেতনাকে আশ্রয় না করে কবি উত্তর দিতে অক্ষম। এই অক্ষমতা অসংযমের জন্মদাতা : তাই প্রথমত তাহলে সেই মনের নিভৃতে, মননে দ্বন্দ্বের যন্ত্রণায় উৎপীড়িত হয়েই আলোর বিদ্যুতে স্থিত হতে হয়। সেজন্যে এপথ বন্ধুর, তবে বিশ্বাসের মন্দিরের চূড়া খুব বেশি দূর নয়। যে বলেছে যাবে, অন্বেষণ করবে,—সে একদিন পারেই। কালের প্রবহমাণতায় মাস বছরের মাপকাঠি কবির সেই দুঃসহকর অভিজ্ঞতার পরিমাপ করতে পারে না। জীবনানন্দের সেই যাত্রী মন ছিল :

হৃদয়ে চলার গতি পান আলো রয়েছে, অকূলে
মানুষের পটভূমি হয়তো বা শাশ্বত যাত্রীর।

(যাত্রী : শ্রেষ্ঠ কবিতা)

এবং তাঁর অন্বেষণ আজকের নয়, গত কালের নয়, —সৃষ্টির প্রথম থেকে মনে হয়। কোনো এক

যা দিয়ে তাঁকে উপলব্ধি করবে [illegible] হয়। জীবনানন্দের কবিমানস তার চেয়ে বৃহত্তর পটভূমিকায় কাজ করেছে, ঘুরেছে, ক্লান্ত হয়েছে আর আজকে নিজে শতাব্দের ধূসরতায় নতুন বোধের কথা বলে চলে গেছে। এই নতুন বোধে যাবার প্রস্তুতি আমরা পেয়ে যেতে পারি ইতিহাস নয়,—যে কাল ইতিহাসের আগে থেকে, ইতিহাসকে সৃষ্টি করে, অনেক ইতিহাসকে ম্লান করে আমাদের কাছে ইতিহাসের সব আশা আনন্দ, শিক্ষা-অশিক্ষা এবং অন্য সব চেতনারও সুরভিত পাপড়ি ঝরে নিয়ে আমাদেরই চেতনার কূল ছুঁয়ে গেছে—সেই কালের কাছে, সময়ের দেবতার কাছে হাত পেতে, অবশ্য সত্য মূল্যে। মহাপৃথিবীর দিকে বেদনাবিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাঁর অনেকগুলি ক্লান্ত বছরের সৃষ্টি, রক্তাক্ত অনুভব সেই প্রাপ্তির ষোল আনা না হোক বারো আনা দাম মেটাতে লেগে গেছে।

মৃত্যু আছে, তবু সেই মৃত্যু ভেদ করে উড়ে যাওয়া,
সূর্য নেই, তবু সেই অয়নের সূর্যের বিশ্বাসে।

(শারদীয় দেশ : ১৩৪৯)

জীবনানন্দের নবপর্যায়ের সৌরকরোজ্জ্বল চেতনা এই লাইনটুকু করে উদ্বোধন উৎসব শুরু করেছে। মৃত্যুর পরিধি ভেদ করে সূর্যহীন আকাশেও সূর্যের বিশ্বাস রেখে উড়ে যাওয়ার মত শক্তি অবশ্য তাঁর চেতনার পাখি তখনো সঞ্চয় করতে পারেনি। এই প্রদীপ্ত ঘোষণা কোনো এক স্বপ্ন মুহূর্তের অনুভূতি হবে, একটি স্বচ্ছ ধারাবাহিকতায় তখনো সে সুশৃঙ্খল হয়নি। তবু এই লাইনটুকু নতুনতর পথের ইঙ্গিতে দুঃসাহস এবং বলীয়ান। অনুভূতিতে, মননে নয় কেননা তাহলে তাঁর পরবর্তী সব কবিতাই সমান তেজে বিকীর্ণ হতো, কোনো দুর্লভ মুহূর্তে অন্ধকারের খোলা ভেঙে বিদ্যুতের মত বর্শার ফলকে যে আলোক-রশ্মি এসে পড়ে তেমনি কোনো উপলব্ধি তাঁকে এই চকিত চেতনার আভাস দিয়েছে সন্দেহ নেই।

মহানীলিমার নীচে কোথাও এক অবিনশ্বর আলোড়ন রয়ে গেছে,—এই কথাটি তাঁর শেষ কয়টি কবিতায় বারেবারে উচ্চারিত হয়েছে। যে হিরণ্যগর্ভের আভাসে চিরপ্রাণ, চিরসত্য কম্পিত হচ্ছে, বিচ্ছুরিত হচ্ছে, আলোড়িত হচ্ছে, সেই হিরণ্যগর্ভের আবরণ, মনে হয়, তাঁর কাছে খানিকটা উদ্ভাসিত হয়েছিল। নিরাশার ব্যাপ্ত অন্ধকারে, জীবনানন্দেরই নিজের মত করে ছায়ার কোমল আলোক দিয়ে গড়া পৃথিবীতে সেই আলোর প্রার্থনাটিকা ছিল। তাই অনেক ছায়-বেদনার পরে স্থিত হবার মত, লগ্ন হবার মত উজ্জ্বল কোনো কেন্দ্র তাঁকে আলোর নক্সে পীড়িত করেছিল :

কেবলি আরেক পথ খোঁজো তুমি ; আমি আজ
খুঁজিনাক' আর ;
পেয়েছি অপার খুঙ্কে ধরবার মতো কিছু শেষে
আমারি হৃদয়ে মনে :

(রবিবাসরীয় আনন্দবাজার : কার্তিক : ১৩৬১)

সাতটি তারার তিমিরে প্রতিশ্রুতিলিপ্ত, যুদ্ধ-মহামারী-দাঙ্গার রক্তাবরণে ঢাকা পৃথিবী ধীরে ধীরে চিরকালের আলোকে পূত হচ্ছিল তাঁর কাব্যে :

আকাশ নীল, পৃথিবী এই মিঠে,
রোদ ভেসেছে, ঢেঁকিতে পাড় পড়ে
পদ্মপত্র জল নিয়ে তার—জল নিয়ে তার নড়ে :
পদ্মপত্রে জল ফুরিয়ে যায়।

(শারদীয় দেশ : ১৩৬১)

এক করুণ পরিপ্রেক্ষিতে জীবনানন্দ অনেক দিন এই সাধারণ অনাবিল জীবনের ছন্দ, নীল আকাশের আনন্দ এমন পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করেন নি। পৃথিবীর চিরাচরিত এই চিত্রে সহজ অনির্বচনীয় মাধুরীর স্পর্শ লেগেছে !

হাজার বছর ধরে অন্বেষণ করে, আদি রক্তের নিহিত পাপ বহন করে, সর্বাঙ্গে শতাব্দীর ক্লান্তি ও ক্লেদ মেখে আলোর মুখোমুখি হয়ে তার শেষ আবরণখানি খুলে ফেলতে গিয়ে জীবনানন্দ সহসা স্তব্ধ হলেন। হয়তো সব অন্ধকারের পারে যে আলো আছে তার উপকূলে আমাদের বিশ্রামের অবকাশ রেখে যেতেন তিনি। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। তাই অনেক অন্বেষণের শেষে, মহাজিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে তাঁর লব্ধ জ্ঞান :

তবুও মহাজিজ্ঞাসা ও অপার আশার কালো
অকূল সীমা আলোর মতো,—হয়তো সত্য আলো।

(শারদীয়া পূর্বাশা : ১৩৬১)

তবে এই বিশ্বাটুকু ছিল বলেই তিনি সৎ আধুনিক কবি এবং আলোছায়ার কবি।

[৮]

মাঝখানে কয়েকটা দিন যে কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতে পারলুম না। সেদিন সহরের কি একটা বড় মিটিংয়ে বক্তৃতা শুনে সন্ধ্যার পর এসে বাড়ীতে ঢুকতেই মা'র গলার সাড়া পেলাম। বিশেষ কোনো কাজ ছাড়া ইদানিং মা একেবারেই আমাকে ডাকতেন না। বড় ঘরের মেঝেয় গিয়ে দাঁড়াতেই দেখতে পেলাম, খাটের উপর কাৎ হ'য়ে মা শুয়ে আছেন, শিয়রে ব'সে হৈমন্তী নীরবে, ধীরে মার মাথার উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, একটু দূরেই দেয়ালে টাঙানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আপন মনে বিনুনী রচনা ক'রছে তনুশ্রী।

দুর্বল কণ্ঠে মা ব'ললেন, এই এতক্ষণে বুঝি ফিরলি খোকা, দু'বার খোঁজ ক'রেও তোর দেখা পাইনি; আয় কাছে এসে ব'স্।'

মার কাছে দু'দণ্ড নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সতে দুঃখ ছিল না, কিন্তু পরিবেশটা আদৌ সে নিশ্চিন্ততার পক্ষে উপযুক্ত নয়। দাঁড়িয়ে থেকেই ব'ললাম, 'শরীর কি আবার তোমার খারাপ ক'রলো নাকি মা, কেমন যেন দুর্বল দুর্বল ব'লে মনে হচ্ছে তোমাকে!'

—'সবল আর হ'লাম কোথায় যে, দুর্বল দেখবি না! শ্বাসকষ্টটা আজ দুপুর থেকে আবার বেড়েছে। দু' একদিন না গেলে এটুকু কাটবে না। তা থাক্—।' ব'লে একটুকালের জন্য থামলেন মা, তারপর পুনরায় ব'ললেন, 'আয়, দু' দণ্ড আমার কাছে এসে একটু ব'স।'

এবারে আর নিশ্চেষ্টভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলুম না। পাশে ব'সে মার বুকের উপর দিয়ে মৃদু হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম।

পাশ থেকে হৈমন্তী ব'ললেন, 'এবারে আর আপনার একটুও কষ্ট রইল না দিদি। ছেলের হাতের সেবা পেলে বাপ-মার আর কোনো কষ্টই থাকে না।'

সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে মা ব'ললেন, 'ওরা কাল সকালের গাড়ীতেই চলে যাচ্ছে। বাঁধা-ছাঁদা এদিকে একরকম হ'য়েছে, কাল সকালের দিকে তুই যেন কোথাও আবার হঠাৎ বেরিয়ে যাস্‌নে খোকা; সকাল সকাল খেয়ে নেয়ে ষ্টেশনে গিয়ে ওদের ভালোয় ভালোয় গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসিস্।'

উত্তর না দিয়ে নীরবে একবার মা'র মুখের দিকে চোখ দু'টিকে তুলে ধ'রলাম। অর্থাৎ যারা যাবার তাদের রওনা হ'য়ে পড়াটা অমঙ্গলের কিছু নয়, কিন্তু এমন একটা দায়িত্বের বোঝা কি আমার ঘাড়ে না চাপালেই হ'তো না!

মা কি বুঝলেন কি জানি! কিন্তু এই নিয়ে আর একটি কথাও ব'ললেন না।

পাশ থেকে হৈমন্তী ব'ললেন, 'এতদিন তোমাদের কাছে থেকে কাটিয়ে গেলাম, ঘরে বন্দী হ'য়েই কাটালাম; কোথাও একটা দিনের জন্যে তো নিয়ে বেরোলেই না, তা ছাড়া ঘরে থেকে ভালো ক'রে পরিচয়টুকু অবধি হ'লো না তোমার সঙ্গে সুমন্ত!'

অনুযোগের সূত্রে মা-তে আর মেয়েতে দেখলাম পার্থক্যটা বড় বেশী নেই। শুনে মার বুকের উপরে অলক্ষ্যেই আমার হাতখানি মুহূর্তের জন্য থেমে গেল। চিরকালের উদ্ধত শির, কোথাও কোনদিন তাকে নত ক'রতে শিখিনি; মাথা উঁচু ক'রেই এতক্ষণ ব'সে ছিলাম।

হৈমন্তীর কথার জবাবে কিছু-একটা বলা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু নিজের পক্ষের প্রমাণটাকে ভারী ক'রে তুলতে গিয়ে দেখলাম—একটি কথাও মুখে এলো না। নীরব দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চোখ দু'টিকে তুলে ধ'রে নীরবেই আবার নামিয়ে নিলাম।

শান্ত কণ্ঠে স্নেহের সুর টেনে মা ব'ল্‌লেন, 'খোকা আমার চিরকালই একটু উড়ো উড়ো; ঘর-দোরে ও একটুও বাঁধা থাকবার ছেলে নয়।'

ওপাশে আয়নার সামনে বোধ করি তনুশ্রীর বিনুনী রচনা ততক্ষণে শেষ হ'য়ে এসেছিল। চিরুনীটাকে জায়গা মতো তুলে রেখে এবারে সে ধীরে ধীরে আমাদের সামনে দিয়েই ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে উঠানের দিকে নেমে গেল।

হৈমন্তী ব'ললেন, 'সবার ধাত তো সমান নয় সংসারে, বিয়ে-থা দিলে এটুকু আর থাকবে না সুমন্তর। সংসারের চাপ ঘাড়ে এসে প'ড়লে ঘরের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা কারুর পক্ষেই সম্ভব হয় না। সংসারটা তো নিতান্ত সংসারই নয়, একটা বিরাট পরীক্ষা ক্ষেত্র। মানুষকে সেখানে সতর্ক দৃষ্টি রেখেই চল্‌তে হয়।'

এ যেন মাকে প্রথম পাঠ প'ড়ে প'ড়ে শোনাবার অছিলায় পরোক্ষে আমার প্রতি খানিকটা উপদেশ পরিবেশন। সাইকোলজির ছাত্রের প্রতি খানিকটা সাইকো-এ্যানালিসিসের চাপানি যেন। ইচ্ছে হচ্ছিল না আর ব'সে থাকি।

মা ব'ললেন, 'আমি বেঁচে থাকতে তা আর বোধ করি খোকার হবে না। এক একবার যখন শয্যা নিই, তখন আর মনে হয় না—সেরে উঠবো। যমের দুয়ারে এমন ক'রে যে কাঁটা দিয়ে এসেছি, এও কি বুঝেছি আগে! এক একবার সেরে উঠি আর সেই কথাটাই মনে পড়ে। কিন্তু আর বেশীদিন নেই, আজকাল একটু হ'লেই বড়-বেশী অস্থির হ'য়ে পড়ি। তখনও কি ছাই এম্‌নি ক'রে খোকাকে কাছে পাই!

ধীরে ধীরে এবারে মার বুকের উপর থেকে আমার হাতখানি নেমে এলো। বিস্ফোরণ নয়, আত্মগ্লানিতে। মা হয়ত মনের খেদে সত্য কথাটাই প্রকাশ ক'রলেন, কিন্তু সংসারের সব ক্ষেত্রেই বোধ করি নিজের উপস্থিতি দ্বারা কোনো সত্য ভাষণ শোনা বা তাকে স্বীকার ক'রে নেওয়া কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব হ'য়ে ওঠে না। আমার পক্ষেও হ'লো না।

উঠবার জন্যই কিছুক্ষণ থেকে ইতস্তত: ক'রছিলাম, এবারে মা আর হৈমন্তীর কথার বিচ্ছেদের সুযোগ নিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'আমার সঙ্গে তোমার আর তো কোনো কথা নেই মা?'

—'কথা আর কি!' থেমে মা ব'ললেন, 'কাল ওরা সব চলে যাচ্ছে, দু'দণ্ড তুই কাছে থাকলে সবাই খুসী হয়। এখন তো আর পরীক্ষার পড়া নিয়ে চাপ নেই কিছু, ওদের সঙ্গে ব'সে দু' পাঁচটা না হয় গল্পই করলি! এমন গল্প তো এর-ওর সাথে তুই কতই ক'রে থাকিস্।

বুঝলাম—কথার ইঙ্গিতে কাদের টানতে চেয়া ক'রলেন মা! অণিমা আর লীলা। কতবারই তো তাদের দেখেছেন মা! ইদানিং অণিমা আমার অধ্যয়ন কক্ষে আসা কমিয়ে দিলেও কোনো সময় তার নিয়মিত আবির্ভাবটা মার দৃষ্টি এড়িয়ে যেতো না। বরং চোখের তীব্র দৃষ্টি দিয়েই লক্ষ্য ক'রেছেন মা। পরিবারের রক্ষণশীল ঐতিহ্যের প্রাচীন চাপ উত্তীর্ণ হওয়া একটা দিনের জন্যও মার পক্ষে সম্ভব হ'লো না। আজ আর তা নিয়ে অভিযোগ ক'রে কিছু লাভ নেই। লোকসানের ষোল আনা গ্রহণ ক'রে নিয়েই তবে অনিশ্চিত কোনো লাভের প্রত্যাশা মাত্র।

উঠ্‌তে গিয়েও ওঠা হ'লো না! হৈমন্তী ব'ল্‌লেন, 'পাশ ক'রে এবারে কি ক'রবে ঠিক ক'রেছ?'

ব'ল্‌লাম, 'আপাততঃ কিছু-একটা কাজের চেষ্টা দেখ্‌বো ব'লে মনে ক'রেছি, সেই সঙ্গে সম্ভব হ'লে এম্-এ'টাও প'ড়বো।'

কথা শুনে হৈমন্তী বোধ করি খানিকটা খুসীই হ'লেন, কিন্তু মার কণ্ঠ জ্ব'লে উঠ্‌লো। তাঁর গলার

শব্দে এবারে আর এতটুকুও দুর্বলতা প্রকাশ পেলো না।

বা'লুলেন, 'কাজ মানে তো চাকরী, ঝাঁটা মারি তোর অমন চাকরীর কপালে। বলি, সাত পুরুষে তোদের কেউ চাকরী ক'রেছে যে, সেধে কিছু-একটা গোলামী না নিলে আর শান্তি পাচ্ছিস্ না?'

উত্তরে এতটুকুও আর টুঁ শব্দ ক'রলাম না। জান্‌তাম—মার এমন অকাট্য যুক্তির কাছে কোনো-কিছু ব'লে লাভ নেই।

মাথার উপর থেকে হৈমন্তীর হাতখানিকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর উদ্দেশেই এবারে মা ব'লুলেন, 'আচ্ছা তুইই বল্‌তো হৈম, খোকার এ কোনদিনি রীতি? তেজারতি আর লগ্নি কারবার ক'রেছে বাপের, আর বাপও এমন নয় যে, চিরকাল সমর্থ থাকবে। তাঁর শরীরের দিকটাতেও তো চাইতে হবে! তা নয়, ছেলেকে আমার গোল্‌দীতে পেয়েছে। খানিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে শিক্ষার হাল দাঁড়িয়েছে শেষ পর্যন্ত এই।'

হৈমন্তী কিছু-একটাও না ব'লে এবারে চুপ ক'রে গেলেন। তাঁর এই চুপ ক'রে যাবার মধ্যে কিছু তাৎপর্য না থাকলেও মার কথার মধ্যে যে যথেষ্টই অর্থ নিহিত র'য়েছে, সেটুকু বুঝতে বিশেষ বেগ পেতে হ'লো না। শিক্ষার চাইতে মার কাছে পিতৃ-আদর্শে তেজারতি আর লগ্নির কাজে নিমগ্ন হ'য়ে যাবার মূল্যটাই অধিক। এই নিয়েই আমাদের সংসারের সঙ্গে আমার চিরকালের বিরোধ। এ বিরোধ মেটাবে কে?

এবারে নিঃশব্দেই মার পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে প'ড়লাম। দাঁড়িয়ে পড়া ছাড়া উপায় ছিল না। মার এতবড় খেদোক্তির পর নিরর্থক ব'সে ব'সে গল্প ক'রবার প্রবৃত্তিটা না থাকারই কথা।

হৈমন্তী জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'কি, উঠ্‌লে নাকি?'

এবারে বাধ্য হ'য়েই খানিকটা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ব'ল্‌তে হ'লো: 'একটু জরুরী কাজ আছে, না উঠে পারছি না।'

এরপরেও বোধ করি মার কিছু বক্তব্য ছিল, কিন্তু সে-কথা শোনার মতো ধৈর্য ততক্ষণে প্রায় উত্তীর্ণ হ'য়েই এসেছি; তাই আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না ক'রে সোজা বারান্দার দিকে পা বাড়িয়ে দিলাম।

তনুশ্রীর কথা এতক্ষণ প্রায় মন থেকে মুছেই গিয়েছিল, এবারে সিঁড়ি গলিয়ে উঠোনে নামতেই তার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। এতক্ষণ সারা উঠোনে একা একা পায়চারী ক'রছিল সে। বাইরে ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না। সম্ভবতঃ নিভৃত যৌবনের অবাক অনুভূতি দিয়েই এতক্ষণ একা একা উপভোগ ক'রছিল সে এই জ্যোৎস্নার রূপালী জোয়ারকে। আমাকে চোখে প'ড়তেই কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস ক'রলো: 'কি, এখন গিয়ে বুঝি বইয়ের মধ্যে আবার মুখ ঠেসে ব'স্‌বেন? পারলেন না তো দু'দণ্ড ব'সে গল্প ক'রে কাটাতে!'

ব'ল্‌লাম, 'কি ক'রে গল্প জমাতে হয়, কোনোদিন শিখিনি, বইগুলোকেই তাই চিরকালের সাথী ক'রে নিয়েছি। এতে একটা সুবিধে এই যে, নিজে থেকে কিছু ব'ল্‌তে হয় না, একতরফা বইই অনর্গল ব'লে যায়।'

শুনেছিলাম থার্ড ক্লাস অবধি প'ড়েছে তনুশ্রী, ভবিষ্যতে প্রাইভেট্ ম্যাট্রিক দেবার ইচ্ছে রাখে; অতএব কথাটা তার পক্ষে না বুঝ্‌বার মতো কিছু নয়। কিন্তু এসম্পর্কে একটি কথাও আর উল্লেখ ক'রলো না সে। ব'ল্‌লো, 'বাইরে এমন সুন্দর জ্যোৎস্না থাকতেও আপনার ইচ্ছে করে বন্ধ ঘরে বাতির সামনে গিয়ে ব'স্‌তে?'

ব'ল্‌লাম, 'জীবনটা সব দিক দিয়ে খোলা থাকলেও না হয় বুঝতাম—আকাশ ছোঁয়ার সুযোগ রয়েছে, কিন্তু জীবনে সব দিক থেকেই যারা আবদ্ধ, বন্ধ ঘর ভিন্ন তাদের স্থানই বা কোথায়!'

—'আপনি বড্ড হেঁয়ালী ক'রে কথা বলেন। নিজেকে স্বেচ্ছায় এমনি ক'রে কেবল ঘুরে সরিয়ে নেবার কোনো মানে হয় না।' অনুচ্চকণ্ঠেই কথাগুলো ব'লে মুখে মৃদু হাসি টানলো তনুশ্রী।

সুস্থ মন নিয়ে দেখলে তার এই হাসিকে হয়ত জ্যোৎস্নার সঙ্গে খানিকটা তুলনা করা চ'লতো. কিন্তু একটা মুহূর্তও আর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে হ'চ্ছিল না। ব'ললাম, 'মানুষের আসল সত্তাকে যখন ফাঁক প'ড়ে যায়, তখন হেঁয়ালীটুকুই থাকে তার শেষ সম্বল। এই নিয়েই তাকে চ'লতে হয়। কাছে ঘনিয়ে বসার চেয়ে দূর দিয়ে হেঁটে চলাতেই তখন তার লাভ।' ব'লে নিজের ঘরের দিকেই আবার পা বাড়ালাম।

ফিরে তাকালে তনুশ্রীর অবস্থাটা স্পষ্টই চোখে প'ড়তো. তাই কি আর একবার তার সঙ্গে চোখাচুখি হ'য়ে যাওয়াটাও অস্বাভাবিক ছিল না, কিন্তু আমার এই দু'টি চোখ তখন কি সত্যিই তার জন্য প্রস্তুত ছিল?

ঘরে এসে ইচ্ছে হ'লো না আর ব'সে থাকি। কেমন একটা আকস্মিক অবসন্নতায় যেন সারা দেহ ছেয়ে গেল। সিলিণ্ড্র গ্রন্থরাজির মধ্য থেকে একখানি সাধারণ হাল্কা উপন্যাস টেনে নিয়ে টান টান হ'য়ে শুয়ে প'ড়লাম। তারপর কোথা দিয়ে যে রাত্রিটা কি ভাবে কেটে গেল, নিজেই বুঝতে পারলুম না।

উঠলাম খুব ভোরে ভোরে। এত ভোরে উঠবার কিন্তু কোনোদিনই অভ্যাস নেই। প্রথম প্রত্যুষেই আজ যেন কেন নিজে থেকেই হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখলাম পিঠের নিচে চাপা প'ড়ে গত রাত্রির সেই উপন্যাসখানির অনেকগুলো পৃষ্ঠা বিশ্রী ভাবে দুমড়ে গেছে। মনে পড়লো—বইখানির মাঝা-মাঝি এসে আর পড়া হয়নি। সেইভাবেই কখন নিজের অলক্ষ্যেই পৃষ্ঠাগুলো খোলা ছিল। এবারে সেই দুমড়ানো পৃষ্ঠাগুলোকে যথাসম্ভব সোজা করে নিয়ে একনিঃশ্বাসে বইখানি প'ড়ে শেষ ক'রে নিজের মনেই অনেকক্ষণ হাসলাম। নাটকীয় প্রহসনে একটি ব্যর্থ বিরহকাতর কাহিনী।—নায়ক গেছে বিলেতে. নায়িকা ব'সে ব'সে কাল গণনা ক'রছে। নায়ক ফিরে এলে কোনো জ্যোৎস্নাধবল রাত্রে হবে তাদের বাসর-শয্যা রচনা। কিন্তু নিয়তি মানুষকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করায়, তা কি মানুষই ছাই জানতে পারে? তিন বছর পরে নায়ক ফিরে এলো কেমব্রিজের পাশ করা এক মেমকে বিয়ে ক'রে। অতীতের প্রেম ভবিষ্যতে শুধু ছায়া হ'য়েই বিচরণ ক'রলো. কায়া নিয়ে আর দেখা দিল না।—ভাবলাম বাংলা দেশের লেখকেরা কি এ ভিন্ন মানুষের আর কোনো সমস্যা নিয়ে লিখতে জানে না? দেশ তো আজ অনেকখানি বস্তুতন্ত্রের অনুগামী। বস্তুবাদী সাহিত্যের মধ্য দিয়ে কি যায় না মানুষের চিরন্তন হৃদয়ধর্মকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোলা?

কিন্তু বেশীক্ষণ এই নিয়ে ভাবতে হলো না। অন্যান্য দিন বাড়ীতে আমাদের সকালের চায়ের পাট চুকে যেতে বেলা প্রায় আটটা হয়; আজ সেই তুলনায় অনেকটা ভোরে ভোরেই চুকে গেল। অন্যান্য দিন আমার ঘরে চা আর জলখাবার আসে আমাদের পাচক-রামুনের হাত দিয়ে, কিন্তু আজ বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে গেলাম চায়ের কাপ আর জলখাবারের ডিস হাতে করে নিয়ে তনুশ্রীকে এসে সামনে দাঁড়াতে দেখে। ব'ললো, 'এ ক'দিন তো সাহস করিনি, ভেবেছি—এ হাতের ছোঁয়া চা শেষ পর্যন্ত সত্যিই মুখে উঠবে কি না আপনার! তা আজ যখন চ'লেই যাচ্ছি, ভাবলাম নিয়ে যাই, রাগ ক'রলে তো আর দেখতে আসবো না!'—কথা শেষ ক'রে ঠোঁট চেপে মৃদু হাসলো তনুশ্রী।

বললাম, 'এতদিন এখানে থেকে আমার রাগটাই তবে শুধু চোখে পড়েছে তোমাদের!'

মেঝের দিকে দৃষ্টি রেখে তনুশ্রী বললো, 'এতদিনের মধ্যে রাগিনীটাই বা শুনলাম কবে? যেখানে রাগিনী নেই, সেখানে সবটুকুই রাগ।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি গান গাইতে জানো ?'

—'না, গান আর শিখ্‌লাম কবে ঘর-গেরস্থালীর কাজে শেষ করে আর এমন সময় হয় না যে গলা সাধ্‌তে বস্‌বো ! নইলে—সত্যি কথা বল্‌তে কি, ছোট বেলায় ভারী ইচ্ছে ছিল।' বলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ দুটোকে একবার পিট্‌পিট্‌ করে নিল তনুশ্রী।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ব'ল্‌লাম, 'তা—এখনই বা এমন কি বড় হয়েছ যে শিখ্‌তে বাধা ! কোনো কিছু শিখ্‌বার আবার কিছু-একটা বয়স আছে নাকি ?

এবারে প্রকাণ্ড হাসিতে মুখখানিকে তুলে ধরে তনুশ্রী বল্‌লো, 'আছে বৈ কি ! এখন গলা ছেড়ে ব'াড়ের মতো চ্যাঁচালে লোকে শুধু হাস্‌বে। আমি আর সব কিছু সহ্য করতে পারি, কিন্তু মানুষের টিট্‌কিরি সহ্য করতে পারি না।'

উত্তরে হঠাৎই মুখে এসে গিয়েছিল,—'ধাৎটা তোমার তবে আমার চাইতে বিশেষ কিছু উন্নত নয়', কিন্তু তক্ষুণি নিজের চেতনার উপর কেমন যেন একটা আকস্মিক আঘাত এসে লাগ্‌লো ! বল্‌লাম, 'গাড়ীর সময় কখন্‌ কিছু জানো ?'

তাকিয়ে দেখলাম ঠোঁটের কোণে একটা চাপা হাসি মিলিয়ে গেল তনুশ্রীর। ব'ল্‌লো, 'তাড়াতাড়ি তাড়াতে চেষ্টা ক'রলে কী হবে, বেলা এগারোটার আগে গাড়ী আর প্লাটফর্ম থেকে নড়চে না।'

বুঝ্‌তে অসুবিধে হ'লো না যে, বেলা এগারোটাতেই তবে ট্রেণ। ব'ল্‌লাম, 'যাবার আগে মিথ্যে এমন তাড়িয়ে দেবার প্রশ্ন তুলে শুধু শুধু আমাকে অপরাধী ক'রে যাচ্ছো কেন ? এ বাড়ীতে এতদিন কাটিয়েও কি বুঝতে পারলে না যে, এখানকার একমাত্র সর্বময়ী কর্ত্রী হ'চ্ছেন মা ! কাউকে ধ'রে রাখতে হ'লেও তিনিই রাখেন, কাউকে তাড়িয়ে দিতে হ'লেও তিনিই দেন। তার বাইরে এ বাড়ীতে আর কারুরই অধিকার নেই, এমন কি বাবার অবধি না।'

কথা শেষ হ'তেই বহির্বাটি থেকে বাবার গলার আওয়াজ ভেসে এলো। আমাকেই ডাকছেন তিনি। এমন সময় কোনোদিন নিজে থেকে আমাকে ডাকেন না বাবা। আজ সম্ভবতঃ তনুশ্রীদের যাবার ব্যবস্থা নিয়েই কিছু নির্দেশ দিতে চান তিনি। বাকী চা'টুকু এক নিশ্বাসে শেষ ক'রে তাই উঠে প'ড়বার উদ্যোগ ক'রলাম।

আমার কথার জবাবে তনুশ্রী কিন্তু আর একটি কথাও ব'লবার সুযোগ পেলো না। নিঃশেষিত কাপ-ডিস পুনরায় হাতে গুছিয়ে নিয়ে আমার মুখের উপর ঈষৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ট্রেনে তুলে দিয়ে আস্‌তে শেষ পর্যন্ত আমাকেই যাইতে হ'তে হ'লো। কোনোক্রমেই আর সেটুকু এড়িয়ে যেতে পারলুম না। ভেবেছিলাম—জিজ্ঞাসাবাদের প্রায় সব কথাই তো শেষ হ'য়েছে, নতুন ক'রে আর কীইবা এমন থাকতে পারে ? যথাসম্ভব নিজের গাম্ভীর্য নিয়েই তাই ষ্টেশনে এসে টিকিট কেটে গাড়ীর লেডিস্‌ কম্পার্টমেণ্টে তুলে দিলাম দু'জনকে : হৈমন্তী আর তনুশ্রীকে। সঙ্গে যাবার মতো পুরুষ মানুষ কেউ ছিল না। কথা ছিল—এখান থেকে নিজেরাই রওনা হ'য়ে যাবে, জোড়িং ষ্টেশনে তাদের নামিয়ে নিয়ে যাবার জন্য লোক থাকবে। এরকম তো কতই যায়-আসে আজকাল, তা নিয়ে আজকালকার দিনে ভয় ভাবনাও যেমন নেই, প্রশ্নও নেই কিছু।

উপুর হ'য়ে আমার পায়ে হাত দিয়ে একবার প্রণাম ক'রতে চাইল তনুশ্রী, বাধা দিয়ে নিজেকে যথাসম্ভব খানিকটা দূরে সরিয়ে নিতে চেষ্টা ক'রে ব'ললাম, 'ছিঃ ছিঃ, পায়ে হাত দিতে নেই, ও জিনিষটি আমি কোনো কালেই পছন্দ করি না।'

তনুশ্রী জিজ্ঞেস ক'রলো, 'চিঠি দেবেন তো ?

ক'দিন আলিয়ে গেলাম, এরপর চিঠির ব্যাপারেই না হয় রাগ ক'রে ব'সলেন ! আপনাকে নিয়ে বিচিত্র কিছু নেই।'

ব'ললাম, 'মানুষটা সত্যিই আমি একটু বিচিত্র, এই জন্যেই সংসারে কারুর সঙ্গে আমার খাপ খায় না।'

P 30500

কথাটার জবাব দিলেন এবারে হৈমন্তী, ব'ললেন, 'বাড়ীর শুধু বড় ছেলেই তো নও, একই মাত্র ছেলে তুমি, তোমার কাছে সংসারের আশা অনেক, কারুর সঙ্গে সেখানে খাপ না খেলে চ'লবে কেন বাবা!'

এমন উপদেশ আমি প্রত্যাশা করি নি; বাড়ীর পরিধির মধ্যে হ'লে একথার হয়ত কিছু একটা জবাব দেওয়া যেতো, এখানকার পরিবেশটা সে জবাবের আদৌ অনুকূল নয়। তা ছাড়া গাড়ী ছাড়বারও আর বেশী দেরী নেই। ঘণ্টা প'ড়ে গেছে, হুইসেল বাজ্‌লেই হয়।

একটু কাল থেমে পুনরায় হৈমন্তী ব'ললেন, 'এ ক'দিন বুড়ীর মুখে তোমার কথা ছাড়া আর কথা ছিল না, কেবলই ব'লতো—ভারী অদ্ভুত লোক তুমি। কথাটা কিন্তু একটুও মিথ্যে নয় বাবা। তা যাক্—এবারে একবার উদ্যোগ ক'রে এসো আমাদের ডিহিরীতে। দিদির শরীর যেমন খারাপ যাচ্ছে, বলা তো যায় না ক'দিন আছেন! ডিহিরীতে নিয়ে এলে একটা চেঞ্জ ও তো হবে। এসো একবার উদ্যোগ ক'রে।'

কথাটার আর জবাব দিতে হ'লো না। ইঞ্জিনের চিমনী থেকে গল্ গল্ ক'রে ধোঁয়া বেরিয়ে হঠাৎ একটা তীব্র শব্দে হুইসেল বেজে উঠলো। তারপর গার্ড বাঁশী বাজিয়ে নিশান উড়িয়ে দিতেই গাড়ী ছেড়ে দিল।

[৯]

ইতিমধ্যে পথ চ'লতে গিয়ে হঠাৎ একদিন মনোতোষের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল। এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে দেখা হয়ে যাবে, কল্পনা ক'রতে পারি নি। আমার সম্পর্কে আগাগোড়াই তার খানিকটা 'জেলাসি' ছিল; যতটা পারতো—আমাকে এড়িয়ে চ'লতেই চেষ্টা ক'রতো মনোতোষ। আজ কিন্তু দেখা হ'তেই সাগ্রহে কাছে এগিয়ে এলো। মনে ক'রলাম—অনিমার সঙ্গে তার প্রেমের প্রহসনটাকে সে মিটিয়ে নিতে পেরেছে ব'লেই হয়ত সংকোচ খানিকটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। নইলে একই সহরে অত্যন্ত কাছাকাছি বাস ক'রেও তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের বড়-একটা বালাই ছিল না। এতদিনে হয়ত নিজের অযোগ্যতা আর ভুলের সীমাকে চূড়ান্ত ক'রে দিয়ে সহজভাবে তবে এগিয়ে আসতে পেরেছে সে।

সহজভাবেই বটে! নতুন ক'রে আমার কিছুটা ঘনিষ্ঠতা পাতাবার সুযোগ নিয়ে মনোতোষ ব'ললো, 'রেজাল্ট সম্বন্ধে কিছু জানতে পারলে? শুনছি—এবারে নাকি থার্ড ডিভিসন পার্সেন্টের বেশী পাশ করাবে না ইউনিভার্সিটি। শুনে অবধিই ভয় হচ্ছে!'

ব'ললাম, 'ভয়ের কি আছে, এবারে না হোক নেক্সট ইয়ার তো রয়েছে। পাশ-ফেলের ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর নয়। ডিগ্রী পাবার মোহ থাকলে ওটা কাছাকাছি কোনো এক বছরে নিয়ে নিতে পারলেই হ'লো। আই এ্যাম নাউ প্র্যাক্টিক্যালি টায়ার্ড উইথ দি সাবজেক্ট্। পাশ ফেলের ব্যাপারটা নিয়ে ভাব্‌তে আর একটুও ভালো লাগছে না।'

কথা শুনে বোধ করি খানিকটা হকচকিয়ে গেল মনোতোষ। যে কোনো ছাত্রের পক্ষেই এমন উক্তিটা নির্মমভাবে অভাব্য। কৃতকার্যতার শিখরে দাঁড়িয়ে নবলব্ধ ডিগ্রীটাকে ঊর্ধে তুলে ধ'রে আকাশ-প্রদীপ রচনা করবার জন্যেই যে প্রতিদিনের কৃচ্ছ্রসাধনা। সেখানে পাশ-ফেলের প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা ক'রবার প্রয়োজন আছে বৈ কি!

মনোতোষ ব'ললো, 'তোমাদের সিওর সাক্সেস্, তাই ভাবছো না। আমি এবছর খেয়ে পড়লে ভবিষ্যতে চ'লবার আর কোনো পথই খোলা থাকবে না। বাবা একরকম জবাবই দিয়েছেন।'

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'কেন, ব্যাপার কি?'

—'ব্যাপার আর কি, গরীব মধ্যবিত্তের সংসারে যা হ'য়ে থাকে, তা-ই।' থেমে মনোতোষ ব'ললো, 'প'ড়তে হয় কিছু-একটা চাকরীর প্রত্যাশা নিয়ে; সেই প্রত্যাশায় আঘাত প'ড়লেই গোটা পৃথিবীটা গিয়ে পাতালে আশ্রয় নেয়।'

শুনে মনে মনে হাসলাম। হায় রে বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজ! কিন্তু তার চাইতেও মনে মনে বেশী বিস্ময়

দিলাম মনোতোষকে। দারিদ্র্যের এই তমসুর শক্তির উপরে ভর ক'রেই তবে এতকাল সে 'জেলাসি' পোষণ ক'রে এসেছে আমার উপর। শুধু আমি নই, আমার আর অনিমার দু'জনেরই উপর।

একটু কাল থেমে মনোতোষকে খানিকটা কথান্তরে টান্‌তে চেষ্টা ক'রে ব'ললাম, 'পরীক্ষা দিয়ে অবধি ক'টা কবিতা লিখ্‌লে? এখন তো তোমার মরশুম। ভাগ্য-ক্রমে পরীক্ষার পাশ কাটিয়ে যেতে পারলে একেবারে সোজা ক'লকাতায় গিয়ে 'পোয়েট অব দি সিটি' হ'য়ে ব'সতে পারবে। ক'লকাতায় শুনি সাহিত্যের কিছু অর্থমূল্য আছে। আর পায় কে, দিন তো তোমারই দেখ্‌তে পাচ্ছি।'

ম্লান কণ্ঠে মনোতোষ ব'ললো, 'আমার মেরিটের সুযোগ নিয়ে কি ঠাট্টা ক'রতে চাচ্ছো?'

ব'ললাম, 'ছিঃ ছিঃ, ঠাট্টা কেন ক'রবো! যা সত্য, তাকেই শুধু অকপটে প্রকাশ ক'রলাম।'

এবারে বোধ করি ইচ্ছে ক'রেই কথাটা নিয়ে আর বেশী দূর অগ্রসর হ'তে চাইল না মনোতোষ, নীরবে কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে পথ অতিক্রম ক'রে এক সময় ব'ললো 'ক'দিন হ'রে একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে, তুমি যদি অনুমোদন করো, তবে কাজে হাত দিই।'

কথা শুনে বিস্মিত হ'লাম। আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এতদিন যে আমার বিরুদ্ধে ক্লাসের ছেলেদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে, দুঃসাহসে গোপনে গিয়ে অনিমাকে প্রেমের কবিতা উপহার দিয়েছে, সেই অনবদমিত সিংহপুরুষ শ্রীমান মনোতোষ এ আজ বলে কি? আমার সামান্য একটা অনুমোদনের জন্যেই তার গোটা প্ল্যানটা আঁটকে আছে!

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'কি প্ল্যান?'

এবারে আর এতটুকুও দ্বিধা প্রকাশ পেলো না মনোতোষের কণ্ঠে, ব'ললো, 'অধ্যাপক সিদ্ধান্তর যে বিরোধীটা তুমি ম্যাগাজিনে প্রকাশ ক'রেছিলে, ওটাকে আমি বুক-কর্মে সাইকোলজিক্যাল ভাইজেষ্ট হিসেবে প্রকাশ করতে চাই। তাতে দুটো পয়সা হবার সম্ভাবনা র'য়েছে। আমার এক মামা কলকাতায় একটা পাবলিসিং কনসার্নে কাজ করেন; তিনি এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য ক'রতে পারেন।'

বুঝলাম—এতদিন প্রাণের আবেগে কবিতা লিখে শুধুই ভাবাভিশয্যের দুর্বুদ্ধি ছোটায় নি মনোতোষ, তার পিছনে একটা বড় বিষয়-বুদ্ধিও অনবরত তাকে চালনা ক'রে নিয়ে চ'লেছে। মামার আশ্রয় নিয়ে বুদ্ধিটাকে তবে মোটামুটি মস্ত খেলায় নি সে।

ব'ললাম, 'এ ব্যাপারে আমার অনুমোদনের প্রশ্ন উঠলো কি ক'রে? বই বেরোলে তো অধ্যাপক সিদ্ধান্তর নামেই বেরোবে, অতএব এর যা কিছু দায়-দায়িত্ব—সব তাঁর নিজের। তিনি পারমিশন দিলে তবেই তুমি দায়িত্ব নিতে পারো।'

—'তাঁর পারমিশন আমি পেয়েছি, তাঁর পারমিশন নিয়েই তবে আসছি আমি।' থেমে মনোতোষ ব'ললো, 'প্রয়োজন মতো ক্রিপ্টে তিনি আরও কিছু ম্যাটার এ্যাড্ ক'রে দিতে রাজী হ'য়েছেন।'

শুনে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম আঘাত লাগলো। অধ্যাপক সিদ্ধান্তর বিরোধীটার পিছনে অনিমা আর আমারই বা প্রভাব কিছু কম কি? মনোতোষকে পারমিশন দেবার আগে একটিবার অন্ততঃ জিজ্ঞাসাও তো ক'রতে পারতেন তিনি আমাদের! বই বেরোলে এ সংসারে সব চাইতে বেশী খুশী হবে অনিমা, সেই সঙ্গে আমিও। মনোতোষের অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার দাবীই হয়ত অধ্যাপক সিদ্ধান্তকে আর-কিছু ভাববার অবকাশ দেয় নি, দিলে অন্ততঃ তিনি কর্তব্যভ্রষ্ট হ'তেন না নিশ্চয়ই!

ব'ললাম, 'কাজ তো তবে গুছিয়েই এসেছ, আবার কেন!'

খানিকটা শ্রীতকণ্ঠে মনতোষ ব'ললো, 'সামান্য একটা সৌজন্যের প্রশ্নও আছে তো। তোমার সম্পাদনায় তুমিই ও রচনা প্রকাশ ক'রেছিলে, অতএব তোমার কিছু-একটা অনুমোদনের প্রশ্ন আছে বৈ কি!'

ব'ল্‌লাম, 'কিছু না, কিছু না, আমি একটা মানুষ, আমার আবার অনুমোদনের প্রশ্ন! প্ল্যান তুমি মন্দ আঁটোনি, ভগবান ক'রলে এই নিয়েই তুমি দাঁড়িয়ে যেতে পারবে। জয় হোক্ তোমার।'

অপাঙ্গে তাকিয়ে দেখ্‌লাম—কথা শুনে নিঃশব্দে কেমন একটা বিজয়ের হাসি হাস্‌লো মনোতোষ। হাস্‌বেই তো। আমার আর অনিমার সুকীর্তির উপর সে-ই যে আজ অর্থের আর যশের অধিকারী হ'তে চ'লেছে। হাস্‌লেই বরং বিশ্রী মনে হ'তো মনোতোষকে।

বাণিজ্য-বুদ্ধি মাথায় এসে আগে থেকে নিজেই আমি উদ্যোগী হ'য়ে অধ্যাপক সিদ্ধান্তর কাছ থেকে তাঁর থিওরীর রাইট্ কিনে নিতাম। কথাটা গিয়ে পাড়লে হয়ত রাইটেরও কোনো প্রশ্ন উঠ্‌তো না। কিন্তু অতটা মাথায় আসেনি। এ ব্যাপারে দেখ্‌লাম মনোতোষ নিশ্চি পাকা-মাথার লোক। নইলে অনিমারই এ ব্যাপারে বিশেষ ক'রে সুযোগ গ্রহণ করা উচিৎ ছিল। তাদের সাংসারিক দারিদ্র্যের মধ্যে তবু যা-একটু কোথাও কোনো ফাঁক দিয়ে স্বচ্ছলতা উঁকি দেবার সম্ভাবনা থাকতো! কিন্তু কিলজঙ্কি-পড়া মাথায় এতবড় একটা বাণিজ্য-বুদ্ধি কি সত্যিই এসে আশ্রয় নিতে পারে!

একটুকাল থেমে মনোতোষ ব'ল্‌লো,' 'ভেবেছি, এবারে পরীক্ষায় ডুব মারলে ক'লকাতায় মামার কাছে গিয়ে পাব্‌লিকেশন-বিজিনেসই কেঁদে ব'স্‌বো। মূল-ধনের কিছু প্রশ্ন উঠ্‌বে সন্দেহ নেই, তবে মামা আছেন—এই যা ভরসা।'

ব'ল্‌লাম, 'এর চাইতে পৃথিবীতে আর বড় বান্ধব কেউ আছে নাকি? সংসারে যার মাথার জোর আছে, সেই তো টেক্কা দিয়ে গেল। পরীক্ষা দিয়ে তোমার ভাই ভাগ্য খুলে গেছে, এবারে প্রবল খটিকার বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

ব'লে নিজেই মনে মনে হাসলাম।

নিজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আরও কিছুটা সচেতন হ'তে চেষ্টা ক'রে মনোতোষ ব'ল্‌লো, 'ঠাট্টা ক'রছো—না সিরিয়াস্‌লি ব'ল্‌ছো?'

—'সবটাই যদি ঠাট্টা মনে ক'রবে, তবে আর গায়ে প'ড়ে ব'ল্‌তে এলে কেন?'—দেখ্‌লাম, কথাটা ভারী রূঢ় হ'য়ে যাচ্ছে, তাই থেমে বল্‌লাম: 'জানো তো, জীবনে সুযোগ কখনও বার বার আসে না। অলক্ষ্যের পথ থেকেই তার এন্‌ট্র্যান্স্ এবং এক্‌জিট্। যে তাকে ধ'রতে পারলো, সে-ই বাজি মাৎ ক'রে গেল জীবনে। তোমারও না পারার কিছু নেই। ভগবান চিরদিনই কৃতী পুরুষদের সহায় হন, তুমিই বা তাঁর করুণা থেকে নিরাশ্রিত হবে কেন? মে গড্ গ্রেস ইউ। সুখের দিনে অতীত জীবনটার দিক থেকে যেন একেবারেই মুখ ফিরিয়ে থেকো না। কাছে গেলে অন্ততঃ ব'লতে যেন পাই।'

—'বিলক্ষণ; তুমি কি আমাকে এতখানি ইডিয়ট মনে ক'রেছ সুমন্ত!

বিগলিতকণ্ঠে মনোতোষ এবারে একেবারে ধূলার অতলে নেমে এলো।

মনে মনে ভাবলাম অভিনয়টা মন্দ হ'লো না। এটুকু একরকম অনিমার কাছেই আমার হাতে খড়ি, হাজার হোক্, এ ব্যাপারে মেয়েদের পারদর্শিতার কাছে স্বয়ং ব্রহ্মর্ষি নারদকেও মাথা নোয়াতে হয়। অনিমাই এই অভিনয়ের পথটা খুলে দিয়েছিল আমার সামনে। তার জন্য তাকে আজ কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পেলাম না নিজের মনে।

এতক্ষণ কথায় কথায় মনোতোষের সঙ্গে কম সময় কাটেনি। অনেকটা পথই অতিক্রম করা গেল। এবারে বাড়ীর কাণাকাণি এসে ব'ল্‌লাম, 'ভবিষ্যৎ যেখানে গিয়েই দাঁড়াক্, আমাদের আজকের এই বর্তমানটাই আমাদের জীবনে চিরকালের সত্য হ'য়ে রইল। ব্যবসা ক'রে একদিন তুমি বড় হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো ব্যবসার লভ্যাংশ দিয়েই আজকের এই দিনগুলির ঋণ তুমি শোধ ক'রতে পারবে না মনোতোষ। আচ্ছা, আসি এবারে।'

মনোতোষের কণ্ঠ থেকে কিন্তু এবারে আর একটি শব্দেরও অভিব্যক্তি অনুভব ক'রতে পারলুম না। জানি না—আমার কথাগুলো তার মনের কোনো একটা তন্ত্রীতে গিয়েও সুর হ'য়ে বাজ্‌লো কিনা।

(ক্রমশঃ

সাথী

[ডেনিস ওয়েব]

অনুবাদ—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

বাকী দশ মাইল পথ নদী তার গতি হেলতে দুলতে মোড় বেঁকিয়ে নিয়ে গেছে, দুধারে উপত্যকাকে পাশে রেখে। দুধারে উঁচু ঘাসে ছাওয়া শক্ত পাথরের বাঁধের মাঝখানে নদী বয়ে গেছে। এই বাঁধটার জন্যেই উপত্যকাকে জলে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার কোন সম্ভাবনাই নেই। নদী কখনও বন্যার সঙ্গে সঙ্গে ফুলে ওঠে, আবার জল নেমে গেলে ক্ষীণধারা হয়ে ওঠে। জল যখন বন্যার ছাপিয়ে ওঠে, তখনই মাত্র সমুদ্রগামী জাহাজ অতি কষ্টে ধীরে ধীরে নদীর ভেতর ঢুকতে পারে।

নদীর দুধারে শুনটানা পথ ছেলেটার খুব প্রিয়। ছেলেটা উপত্যকাতেই একটা বড় বাড়ীতে থাকে। প্রতি রবিবার সকালে উপত্যকার ঘোড়ার পিঠে না ছুটে, বাবার সঙ্গে ও এই শুনটানা পথটায় বেড়াতে পেলেই খুশী হয় বেশী।

জলা পেরিয়ে গন্তব্য স্থানে যেতে হলে জলা সম্বন্ধে নিখুঁত অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। ছেলেটার পথ ঘাট সব জানা। ও ভালভাবে জানে কোন জলজে ফুল গাছের কাছে এসে খুব সাবধানে যেতে হবে, তা না হলে একটা বিরাট গর্তে গিয়ে পড়তে হবে। আর এই জন্যে ছেলেটা গর্ববোধ করে। এরই মধ্যে একদিন ও-গাছটার কাছে একটা হলদে সাপ দেখেছিল আবার।

অন্য দিন ছেলেটার সঙ্গে ওর বাবা সমান আনন্দে তাল রেখে কথা বলে কিন্তু আজ এই ধূসর হেমন্তের সকালে ছেলেটির বাবা আশ্চর্য চুপচাপ। অন্যমনস্ক হয়ে ছেলেটার সঙ্গে চলেছেন বাবা।

ছেলেটা বলে ওঠে, 'আচ্ছা বাবা, আজ নিশ্চয় ওখানে আমরা একটা বক দেখতে পাব, কি বল, অ্যাঁ?'

সূর্যের আলোয় যেন ঘুমুচ্ছে নিরীহ পাহাড়গুলো। অন্যমনস্ক ভাবে পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বলেন ছেলের প্রশ্নে, 'হয়ত দেখা পাওয়া যাবে।'

ছেলেটা বাবার উত্তরে সন্তুষ্ট হয়। এর আগে কটা বক ও দেখেছে আরও কত বক দেখবে, সেই কথাই অনর্গল বলে যায় ছেলেটা। ভদ্রলোক চেয়ে থাকেন শুধু দূরের দিকে। ছেলেটা বাবার দিকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে ভাবে, এমনি ভাবে কোন কিছুর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকেও কিছু দেখতে না পাওয়া কি করে সম্ভব?

অদ্ভুত উজ্জ্বল দুটী চোখ, অলিভের মত গায়ের চামড়া, খাড়া গর্বিত নাক, দুটো সুন্দর ঠোঁট, কোণের দিকে একটু ঝুলে পড়েছে। সব জড়িয়ে ভদ্রলোককে বিদেশী বলে মনে হয়। শুধু ছেলেটা বাবার সঙ্গে কথা কইবার চেষ্টা করে যখন, তখন ভদ্রলোকটীর সহজ সুরে কথা শুনলে ওঁকে স্বচ্ছন্দে কোন ইংলিশম্যান বলে মনে হয়। সহজেই অনুমান করা যেতে পারে এই ভদ্রলোক দামী আসবাবপত্র শোভিত, পুরু কার্পেটে মোড়া একটা ঘরে নিজের সামনে টেবিলে একসার টেলিফোন নিয়ে বসে থাকতে পারেন। কিন্তু ভদ্রলোক এখন সাধারণ পোষাকে সজ্জিত! মাথার টুপীটা কপালের ওপর থেকে ওঁর এক চোখের ওপর টেরচা হয়ে নেমে এসেছে।

—'আচ্ছা বাবা, আমরা যতদূর দেখতে পারি, ঘোড়ারাও কি ততদূর দেখতে পায় ?'

—উঁ, হাঁ, হাঁ নিশ্চয়।

ছেলেটা বাবার উত্তরে অনমুমোদনের ভঙ্গীতে গর্বের সঙ্গে বলে ওঠে, 'এটা কিন্তু তুমি ঠিক উত্তর দিতে পারলে না বাবা।'

—'অ্যাঁ, কি বলচো তুমি। সত্যি আমি দুঃখিত। একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। কি বলতো ?'

—'আমি বলছিলাম, ঘোড়ারা কি আমাদের মত দেখতে পায় ?'

—'উঁহু খোকা, আমার ত মনে হয় না। আমার মনে হয় ওরা দেখার চেয়ে কানে শোনা আর গন্ধের ওপর বেশী নির্ভর করে। এই গন্ধ শুঁকে টের পাওয়াটা ওরা অদ্ভুত পারে।

—'ঠিক বলেছ বাবা। গতকাল আমি গোচারণ ভূমিতে গিয়েছিলাম। আমার ত' মনে হল 'চিফ্‌টেন' যতক্ষণ না আমি শীস দিয়েছিলাম, ততক্ষণ আমায় চিনতেই পারে নি। অবিশ্যি শীস আমি ঠিক দিই নি, একটু চেঁচিয়েছিলাম। আমি ত' প্রথমটা অবাক হয়ে গেলাম ও কি অন্ধ হয়ে গেছে। আচ্ছা বাবা, তোমার কি মনে হয় ও অন্ধ হয়ে যেতে পারে ?

বাবার কাছ থেকে কোন উত্তর আসে না। বাবার দিকে সানাক্ষ উদ্বিগ্ন হয়ে ছেলেটা চেয়ে রইল, বাবাকে যেন অদ্ভুত মনে হচ্ছে। যখন পুবে হাওয়া বয়, তখন ঠাণ্ডার বাপটায় ঠাকুমা যেমন কাতর হয়ে পড়ে, তেমনি যেন বাবাও মুষড়ে পড়েছে। কিন্তু এখন ত' কোন পুবে বাতাস বইছে না, তবে ? কুয়াসা থাকলেও আজত' বেশ উষ্ণ সকাল।

—'মা আজ সকালে ওঠে নি কেন বাবা ?'

—'শরীরটা ভাল নেই তোমার মার, সেই জন্যে।'

—'আমার মনে হয় বাবা, মকোদ্দমার ভাবনায় মা ওঠে নি।'

'—মকোদ্দমা, তুমি কি করে জানলে ?'

—'কেন আমায় রাঁধুনী মাসী, যে বললে। ও কি বললে জান বাবা, আমাদের নাকি খুব গোলমালে আর কষ্টে পড়তে হবে।'

—'তাই নাকি, ও এই কথা বলেছে ? রাজাবাবা ছাড়া সব কিছুতে নজর না দিয়ে ও যে কেন পারে না, বুঝি না আমি।' বাবা বললেন।

...পথ বদলে ওরা নীরবে গেটের ওপর উঠল। সমস্ত হলদে ধূলোগুলো করে ঝরে গেছে।

ছেলেটা হঠাৎ বলে, 'আমার মনে হয়, নিশ্চয় কোন ভরত পাখীর বাসা দেখতে পাব এখন। কি বল বাবা, পাব ত ?'

—'হ্যাঁ, পেলেও যেতে পারি' অন্যমনস্ক ভদ্রলোক ছেলের প্রশ্নে বলে উঠলেন।

ছেলেটা অদ্ভুত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বাবার দিকে চায়, 'বাবা; এইবার কিন্তু তুমি ধরা পড়ে গেছো !'

—'কি বলছ, কিসের ধরা ?'

—'হেমন্তকালে কি ভরত পাখীরা বাসা বাঁধে নাকি ?' ছেলেটা ভয়ের আনন্দে চীৎকার করে ওঠে।

—'এই যা, তোমার কাছে একেবারে ধরা পড়ে গেলাম, ইস্।'

—'আচ্ছা বাবা, জামিন কি ?

—'জামিন !'

—'হাঁ, রাঁধুনী মাসী যে বললে, তুমি জামিনে ছাড়া পেয়েছ।'

—'আঃ, আবার সেই রাঁধুনী মাসী।'

—'হাঁ ওই ত বললে। আচ্ছা বাবা মকোদ্দমাটা কি জিনিষ, আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছিনা।'

—এমন কিছু নয়, আমাকে তর্ক করতে হবে কিছু লোকের সঙ্গে এই আর কি। শুনে কতকগুলো ভদ্রলোকদের সঙ্গে আমায় তর্ক করতে হবে। ভদ্রলোকদের রাজস্ব বিভাগের কমিশনার বলে, বুঝলে ত।'

—'হাঁ বাবা, কিসের তর্ক ?'

—'আয়কর নিয়ে। ওরা বলছে আমি নাকি গত পাঁচ বছরে ঠিকঠাক আয়কর দিই নি।'

ছেলেটা ভাবে কই রাঁধুনী মাসী ত' আহকের সম্বন্ধে কিছুই বলে নি। ও আবার জিজ্ঞাসা করে, 'হাঁ বাবা আহকর মানে কি ঠকানো কিছু?' বাবা হেসে ওঠেন ছেলের কথায়। বলেন, 'কথাটা ঠিকই, তবে এই আহকরই আমায় ঠকিয়েছে সব সময়।' কথা থামিয়ে ভদ্রলোক ছেলেকে হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন, 'কোথা থেকে তুমি এই ঠকানোর কথা শুনলে, তোমার রাঁধুনী মাসী বললো বুঝি?'

ছেলেটা বিষণ্ণ ভঙ্গীতে মাথা নাড়ে। ওর এই স্বীকৃতিতে রাঁধুনী মাসীকে নিয়ে যদি কোন গোলমাল হয়। রাঁধুনী মাসী ভালোমানুষ। ও আস্কারা করলে রাঁধুনী মাসী গজগজ করে কিন্তু সবসময় আস্কারা করে ওর কাছ থেকে কিছু না কিছু আদায় করা যায়।

—'আচ্ছা বাবা জামিন পাওয়া মানে কি?'

—'মানে কিছু নয়। সেই যে তর্কাতর্কি হবে, তাতে যে হাজির হব তারই মুচলেকা দেওয়া। কাল আমাকে লণ্ডনে যেতে হবে, তারই কথা দিয়ে এসেছি।'

—'হাঁ বাবা, মিঃ নিকোলায়েমী কি একজন ইহুদী?'

—'কে বললে, না না কে বললে এ কথা। ও একজন গ্রীক। রাঁধুনী মাসীই তোমায় একথা বলেছে বুঝি?'

—'না, ঠাকুমা।'

—'তাই নাকি! কত টাকার জামিন তাও বোধ হয় তোমাকে বলেছে তোমার ঠাকুমা!'

—'না বাবা, তবে রাঁধুনী মাসী বলছিল হাজার...'

ভদ্রলোকের মুখে অনিচ্ছার একটা দুর্বল হাসি খেলে গেল। ওরা দুজনে শুনটানা পথ ধরে এগিয়ে চলল। জল কমে গেছে নদীর, নদীর জল সমুদ্রের দিকে তরতর করে সরে যাচ্ছে, ঢেউয়ের সঙ্গে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের মৃত উদ্ভিদগুলো। আনন্দে ছেলেটা নাক দিয়ে শব্দ করে নিঃশ্বাস নেয়। বাবা চেয়ে থাকেন নদীর জলের দিকে।

দুজনেরা গলায় ছেলেটা বলে ওঠে, 'কোন জাহাজ নেই, ইস্!' ও খুঁটিয়ে নদীর এধার ওধার দেখে কিন্তু কিছুই দেখা যায় না।

ছেলেটা বাবাকে জিজ্ঞাসা করে, 'হাঁ বাবা, জল ত' কমে গেছে, নদী কত গভীর তুমি জান?' বাবার কাছ থেকে কোন উত্তর না পেয়ে ছেলেটা বাবার মত দ্রুত প্রবহমান নদীর কালো জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে হয় যেন নদী ওর পেটের ভেতর দিয়ে বইছে!

ও হঠাৎ আবার জিজ্ঞাসা করে,

কেন নদীতে ডুবে মরে?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, তারা এমন একটা বিশ্রী অবস্থায় পড়ে, যে তারা আর বাঁচবার মত পথ খুঁজে পায় না, তাই...'

—'কি বিশ্রী অবস্থা বাবা?'

—'কতরকমের খারাপ অবস্থা আছে খোকা!'

—'কি রকম, আহকরের মত?'

—'হাঁ, ওটাও একরকম বিশ্রী অবস্থা। যাক ওকথা এখন আমরা যে পথ দিয়ে এসেছি সেই পথ দিয়ে ফিরে যাব, না শুনটানা পথ দিয়ে ব্রিজের কাছে গিয়ে রাস্তা দিয়ে ফিরব, কোনটা?'

—'ব্রিজে চল বাবা, ছেলেটা হাত ধরে শুনটানা পথ ধরে এগিয়ে চলে। ও বলে ওঠে, 'ঠিক যেন দেওয়ালের ওপর দিয়ে যাচ্ছি, না বাবা?'

—'হুঁ।'

—'হাঁ বাবা, অন্য সব লোকেরা আমাদের চেয়ে ছোট বাড়ীতে থাকে না?'

—'হাঁ, আমার ত মনে হয় অধিকাংশ লোক ছোট বাড়ীতেই থাকে। আচ্ছা 'হোয়াইট-এক্সরস্' জায়গাটা ছেড়ে অন্য একটা ছোট বাড়ীতে তোমায় যদি থাকতে হয়, ত' কি করবে খোকা?'

—'আমার কোন কিছুই মনে হবে না বাবা' ছেলেটা কি ভেবে আবার বলে, 'কিন্তু বাবা ঘড়িটা, ওটা কি করে ছেড়ে যাব আমি?'

—'ও কোন ঘড়িটা ?'

—'আস্তাবলের ওপর ঘড়িটা।'

—'কিন্তু ঐ ঘড়িটাই বা কেন, আরও ত' অত জিনিস আছে।'

—'আমি ওটাকে খুব ভালবাসি বাবা। ওর সোনালী কাঁটা দুটো কি সুন্দর! আচ্ছা বাবা, একদিন আমারও সোনা দিয়ে মোড়া দাঁত হবে না?'

—'হাঁ, আমার তাই মনে হয়। কিন্তু সোনার দাঁতের চেয়ে এমনি সুন্দর দাঁত আরও ভালো।'

ছোটছেলেটা বাবার কথা ভাবতে ভাবতে ব্রিজের ওপর চলে চুপচাপ। ওরা দুজনে ব্রিজটার ওপর এসে দাঁড়াল। ছেলেটা নদীর জলে পাথর ছোঁড়ে, ওর বাবা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করেন।

—'তোমার হল খোকা?'

ওরা দুজনে রাস্তা ধরে চলল। ছেলেটা ভাবে ওর জুতোর তলায় যদি বড় বড় পেরেক থাকত, তবে রাস্তা দিয়ে চলবার সময় পাথরে পা ঠুকে ঠুকে ও আগুন জ্বালাত।

হঠাৎ কি ভেবে ছেলেটা বলে ওঠে, 'না বাবা, আমার এই জায়গা ছেড়ে যেতে একটুও ভাল লাগবে না।'

—'হুঁ, এই জায়গাটা ছেড়ে যাওয়া একটা বিশ্রী ব্যাপার। তবে যেখানেই যাও, যা ভালবাসতে তার চেয়ে নতুন কিছু না কিছু তো খুঁজে পাবে।'

ছেলেটা বাবার কথাগুলো ভাবে। ও ভাবতে পারে না, সত্যি এমন কোন জায়গা আছে কিনা, তাদের এই জলা উপত্যকার চেয়ে ভাল হতে পারে। এখান থেকে ও চলে যাচ্ছে এই ভাবনাটার পরেই যেন ও বেশী ক'রে খুঁজে দেখতে চায়, নদীর অসীম শূন্য বুকের ওপর কোন জাহাজের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে কিনা, কোন শীৎকার রব ডানা মেলে উড়ে বেড়াচ্ছে কিনা? না, কোন কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'তোমার বয়স হয়েছে খোকা। তুমিই বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে বড়। কোন কারণে আমায় যদি চলে যেতেই হয় তোমাকে তোমার মার কাছে কাছে থাকতে হবে, তাকে দেখাশোনা করতে হবে। তুমি তা পারবে নিশ্চয়, কি বল, পারবে না?'

—'কেন পারব না, নিশ্চয় পারব।' ছেলেটা উত্তর দেয়।

একশ বছর আগে এই জলা উপত্যকাটা সমুদ্রের তলায় ছিল। সমুদ্রের জাহাজ আসত ড্রাইমিংটন উপত্যকায় মাল খালাস করতে। হলিন্স্ ওর বাগান থেকে অনেক সমুদ্রের সামুকের খোলা খুঁড়ে বার করে ওকে দিয়েছে। সুন্দর লোক হলিন্স্। তার ঠাকুর্দা সমুদ্রের জাহাজকে এখান দিয়ে যাওয়া আসা করতে দেখেছে।

ছেলে বাবাকে বলে হঠাৎ, 'রাঁধুনী মাসীকে নিশ্চয় এসব কথা তুমি বলবে না, কি বল বাবা?'

—'না, না আমি কথা দিচ্ছি খোকা।'

ছেলেটা বাবার প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়, যদিও এই সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশে একটা বিরাট অন্ধকার মেঘের মত একটা অস্বস্তি ওর মনে চেপে বসেছে। চুপচাপ ওরা দুজনে রাস্তা মাড়িয়ে এগিয়ে চলে। লোহার গেটটার কাছে এসে ওরা থামে এক সময়।

ভদ্রলোক বললেন, 'আবার আমরা বাড়ীতে ফিরে এলাম, কেমন! 'ছোট ছেলেটা আবার জিজ্ঞাসা করে ওঠে, 'আচ্ছা বাবা বিচারের শাস্তিটা কি জিনিষ?'

ইউ. এন. ও. বা রাষ্ট্রসংঘ

সচ্চিদানন্দ ছোড়, এম এ

গত ২৪শে অক্টোবর রাষ্ট্রসংঘ প্রতিষ্ঠার নবমবর্ষ পূর্ণ হইয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় সোভিয়েট রাশিয়া, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং গ্রেট বৃটেনের ভিতর যে মহামৈত্রী স্থাপিত হইয়াছিল এবং ভবিষ্যৎ যুদ্ধনিরোধ ও স্থায়ী বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য যুদ্ধক্লান্ত জনসাধারণের আকুল আগ্রহকে যাঁরা রূপায়িত করিয়াছিলেন সেই আমেরিকার শান্তিকামী প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, মহান জননায়ক মার্শাল ষ্ট্যালিন এবং ধুরন্ধর কূটনীতিজ্ঞ উইনস্টন চার্চিল সমগ্র মানবজাতির নমস্য।

পররাজ্যলোলুপ প্রবল পরাক্রান্ত জার্মানীর গতিরোধ করিবার জন্য সমস্ত শান্তিকামী রাষ্ট্রসমূহের একজোট হইবার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং বৃহৎ ত্রিশক্তির কর্ণধারগণের—ষ্ট্যালিন, রুজভেল্ট, চার্চিল এই তিন প্রধানের মধ্যে আলাপ আলোচনার প্রয়োজন তীব্ররূপে অনুভূত হওয়ায়, এই নেতৃবৃন্দ ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৪ঠা হইতে ১১ই পর্যন্ত ক্রিমিয়ার নিকটবর্তী 'ইয়াল্টা' সহরে সম্মিলিত হন। নেতৃবৃন্দ শুধুমাত্র জার্মানীর সম্ভাব্য পরাজয়ের কথাই চিন্তা করেন নাই পরন্তু পৃথিবীর বুক হইতে যুদ্ধের বিভীষিকা চিরতরে নির্মূল করিবার জন্যও সচেষ্ট হন। ১৯৪৪ সালে আমেরিকার 'ডাম্বারটনওক' সহরে রাশিয়া, আমেরিকা এবং বৃটেনের প্রতিনিধিরা স্থায়ী বিশ্বশান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত করেন, 'ইয়াল্টা' সম্মেলনের পর বৃহৎ ত্রিশক্তির নেতৃবৃন্দ সে সম্বন্ধে এক ঐতিহাসিক ঘোষণা পত্র প্রচার করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে ৫২টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা আমেরিকার 'সানফ্রান্সিস্কো' সহরে সম্মিলিত হন এবং স্থায়ী বিশ্বশান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভাবী এক বিশ্বসংস্থার কাঠামোর খসড়া অনুমোদন করিয়া এক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন এবং ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে ৫১টি রাষ্ট্রের সদস্যসম্বলিত U.N.O. বা সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ বা রাষ্ট্রসংঘের জন্ম হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এক নব যুগের সূচনা হয়। রণক্লান্ত এবং উদ্‌ভ্রান্ত পৃথিবীর মানুষ নতুন যুগের আগমন বার্তার ঘোষণাকে সাগ্রহে বরণ করিয়া লয়।

সন্তানহারা জননী এবং স্বামীহারা স্ত্রী আবার নতুন করিয়া ঘর বাঁধিবার স্বপ্নে বিভোর হইয়া উঠে, বাঁচিবার আগ্রহে ভবিষ্যতের রঙীন ছবি আঁকে। এই ভাবেরই অভিব্যক্তি দেখা যায় রাষ্ট্রসংঘের সনদের ভাষায়। এই সনদে রাষ্ট্রসংঘ স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হইল,—

"We the people of the united nations determined to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be tained, and to promote social progress and better standards of life and longer freedom, and for these ends to practice tolerance

ইডেন

together in peace with one another neighbours, and to unite our strength to maintain international peace and security, and to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, armed forces shall not be used, save the common interest, and employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples, have resolved to combine our efforts to accomplish these aims,..... .....have agreed to the present Charter of the U.N. and do hereby establish an international organisation to be known as the United Nations."

অর্থাৎ ভবিষ্যৎ বংশধরদের বিশ্বযুদ্ধের ভয় এবং শোচনীয় পরিণাম হইতে রক্ষা করিতে, মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি স্বীকার করিয়া লইতে, শান্তি এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে, সাধারণ স্বার্থের ব্যতিরেকে ভিন্ন অন্যবল ব্যবহার না করিতে এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ভিতর সহযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়া বিশ্ব-শান্তি রক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি-নিধিরা রাষ্ট্রসংঘের সনদে সাক্ষর করিলেন।

মিঃ চার্চিল

রাষ্ট্রসংঘের দ্বার প্রত্যেক শান্তিকামী রাষ্ট্রের নিকট উন্মুক্ত, কিন্তু সেই রাষ্ট্রের সদস্যপদভুক্তির অধিকাংশ সদস্যরাষ্ট্রের সম্মতির উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রসংঘের বর্তমান সদস্যসংখ্যা ৬০জন।

১৯৪৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর আমেরিকার বিখ্যাত শিল্পপতি জন. ডি. রকফেলার (জুনিয়র) রাষ্ট্র-সংঘের তরে ৮৫ লক্ষ ডলার অর্পণ করিয়া নিউইয়র্ক সহরে এই প্রতি-ষ্ঠানের স্থায়ী ভবন নির্মাণ করিতে অনুরোধ করেন এবং ৩০—১৪ ভোটে এই সম্পর্কে এক প্রস্তাব

অনুমোদিত হয়। রাশিয়া, ইউক্রেন এবং দক্ষিণ আমেরিকার অধিকাংশ রাষ্ট্র এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। পক্ষান্তরে বৃটেন, ফ্রান্স, কানাডা প্রমুখ ১৪টি রাষ্ট্র এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। ১৭ একর জমির উপর ৩৯ তলা সমন্বিত রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরের নির্মাণকার্য যুক্তরাষ্ট্রের মানহাট্টা ষ্টেটের মিডটাউন জেলার 'ইষ্ট' নদীর তীরে ১৯৫০ সালে শেষ হইয়াছে, এবং রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত কার্য এখান হইতে পরিচালিত হয়।

রাষ্ট্রসংঘের উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে তাহার সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য ইহার নিম্নলিখিত ছয়টি প্রধান বিভাগ আছে।

(১) সাধারণ পরিষদ, (২) স্থায়ি পরিষদ, (৩) অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক সংস্থা, (৪) অছি পরিষদ, (৫) আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং (৬) সদর দপ্তর, এই প্রধান ছয়টি বিভাগ ছাড়াও রাষ্ট্রসংঘের আরও কয়েকটি বিভাগ আছে যথা (১) শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি-সংস্থা (U. N. E. S. C. O.), (২) খাদ্য এবং কৃষি-সংস্থা (F.A.O.) (৩) স্বাস্থ্য-সংস্থা (W.H.O.) (৪) আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (I.M.F.), (৫) শ্রম সংস্থা (I.L.O.), প্রভৃতি। নীচের রেখাচিত্র হইতে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইবে :—

রাষ্ট্রসংঘের প্রধান ছয়টি বিভাগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—

(১) সাধারণ পরিষদ :—রাষ্ট্র সংঘের ৬০টি রাষ্ট্রই সাধারণ পরিষদের সদস্য। সমস্ত রাষ্ট্রই সমান, আন্ত-

Organs of the United Nations.

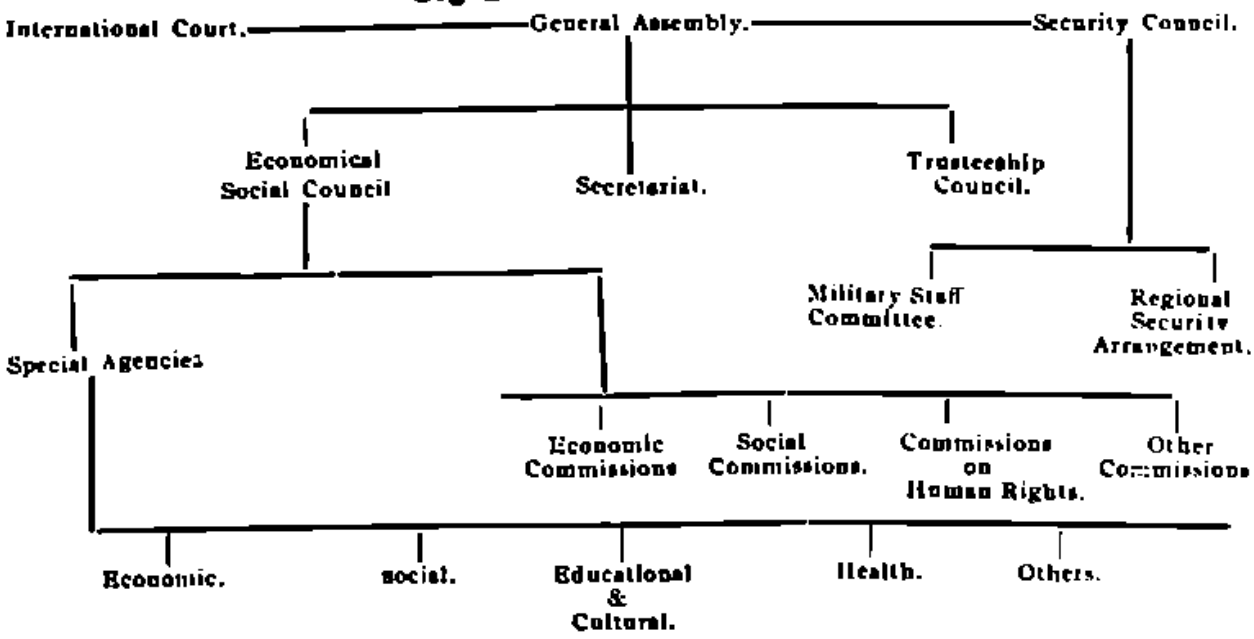

Ref :—(1) Encyclopaedia Americana (1951).
(2) Current Affairs (1954 Ed).

র্জাতিক আইনের এই ধারাটি এখানে প্রযোজ্য এবং ছোট বড় সমস্ত রাষ্ট্রই সাধারণ পরিষদে ১টি করিয়া ভোটের অধিকারী। পৃথিবীর শান্তি বিপন্ন হইতেছে এইরূপ যে কোন বিষয়ের উপর সাধারণ পরিষদের আলোচনার অধিকার আছে এবং উপস্থিত সদস্যরাষ্ট্রের দুই তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যে যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা হইলেই ইহা সমস্ত পরিষদের মতামত বলিয়া গৃহীত হইবে। কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে অবশ্য দুই তৃতীয়াংশ ভোটাধিক্যের প্রয়োজন হয় না, সাধারণ ভোটাধিক্যেই এই সম্বন্ধে প্রস্তাব অনুমোদিত হইতে পারে। সাধারণ পরিষদ কিন্তু নিজেরা কোন চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারেন না। তাহাদের গৃহীত প্রস্তাব স্থায়ি পরিষদের নিকট প্রেরণ করিয়া সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার নির্দেশ দিতে পারেন। সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রই রাষ্ট্রসংঘের তহবিলে নির্ধারিত হারে বাৎসরিক চাঁদা দেন, কোন সদস্যরাষ্ট্র যদি ক্রমান্বয়ে

বছর এই দাবি চালু না রেখে তাহা হইলে সাধারণ পরিষদের বিশেষ অনুমোদন ব্যতিরেকে সেই রাষ্ট্র কোন প্রস্তাবের উপর ভোট দিতে পারেন না।

(২) স্থায়ী পরিষদ :—স্থায়ী পরিষদের সমস্য সংখ্যা হইল এগারো। বৃহৎ পঞ্চরাষ্ট্র—রাশিয়া, আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স এবং জাতীয়তাবাদী চীন (চীনের কাইশেক সরকার শাসিত চীন) ইহার স্থায়ী সদস্য এবং ৬ জন অস্থায়ী সদস্য প্রতি ২ বছর অন্তর সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। বর্তমান সময়ে বেলজিয়াম, ইরাণ, পেরু ব্রাজিল, নিউজিলাণ্ড এবং তুরস্ক এই ছয়টি রাষ্ট্র হইল স্থায়ী পরিষদের অস্থায়ী সদস্য। স্থায়ী পরিষদের কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে সেই সিদ্ধান্তের পক্ষে অন্ততঃ ৭টি সম্মতিসূচক ভোট হওয়া চাই, আবার এই ৭টি ভোটের ভিতর বৃহৎ পঞ্চশক্তির সকলেরই সম্মতিসূচক ভোট থাকা চাই অর্থাৎ বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভিতর মতৈক্য না হইলে স্থায়ী পরিষদের কোন সিদ্ধান্তই কার্যকরী করা চলিবে না। রাষ্ট্রসংঘ সনদের রচয়িতারা দুইটি বিশ্বযুদ্ধ হইতে এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছিলেন যে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি আনিতে হইলে সেই শান্তির স্বপক্ষে অন্ততঃ বৃহৎ পাঁচটি রাষ্ট্রের সম্মতি থাকা চাই, অন্যথায় যুদ্ধের সম্ভাবনাকে দূরীভূত করা যাইবে না। যদি কোন প্রস্তাবের আলোচনায় বৃহৎ পঞ্চরাষ্ট্রের যে কোন একটির অসম্মতি থাকে তাহা হইলে এই অসম্মতিসূচক মনোভাব 'Veto' (ভেটো) হিসাবে গণ্য হইবে এবং এই প্রস্তাব সম্বন্ধে কার্যক্রম স্থগিত থাকিবে। সাধারণভাবে বিচার করিলে এই 'ভেটো' ক্ষমতা অগণতান্ত্রিক, কারণ ইহা দ্বারা ৫টি বিশেষ রাষ্ট্রকে অন্যান্য সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের মতামত অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু অন্যদিকে যদি একথা ধরিয়া লওয়া যায় যে, বৃহৎ পঞ্চশক্তির উপরই পৃথিবীর ভাগ্য নির্ভর করে, যুদ্ধ অথবা শান্তি সম্বন্ধে চূড়ান্ত মতামত দানের ক্ষমতা তাহাদেরই আছে তাহা হইলে যে কোন বিষয় সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার পূর্বে বৃহৎ পঞ্চশক্তির একমত হওয়ার প্রয়োজন, অন্যথায় সে প্রস্তাব কার্যকরী করা যায় না। অতএব অন্যান্য 'ভেটো' ব্যবস্থাটি একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। ভারতবর্ষ একবার স্থায়ী পরিষদের সদস্য ছিলেন এবং স্যার বি. এন. রাও সেখানে ভারতের প্রতিনিধি ছিলেন।

(৩) আন্তর্জাতিক বিচারালয় :—একাধিক রাষ্ট্রের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্বন্ধে কোন বিরোধ উপস্থিত হইলে এবং উক্ত রাষ্ট্রগুলি যদি আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হন, অথবা আন্তর্জাতিক আইনের কিংবা আন্তর্জাতিক সন্ধিচুক্তি সমূহের কোন জটিল ধারার বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়, অথবা রাষ্ট্রসংঘ সনদের কোন ধারার টীকার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নিকট মতামতের জন্য সেগুলি পেশ করা হয়। ১৫ জন বিচারপতি লইয়া এই আদালত গঠিত এবং তাঁহাদের কার্যক্রম ৯ বৎসর কাল। এই সমস্ত বিচারকগণ সাধারণ পরিষদ এবং স্থায়ী পরিষদের ভোটে নির্বাচিত হন। ভারতবর্ষের স্যার বি. এন. রাও এই বিচারালয়ের একজন বিচারপতি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে যে আসন শূন্য হয় তাহাতে নির্বাচনের জন্য ভারতের তরফ হইতে আন্তর্জাতিক আইন বিশারদ খ্যাতনামা পণ্ডিত এবং ব্যবহারজীবী ডাঃ রাধাবিনোদ পালকে মনোনীত করা হয়। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র সচিব স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খান এই পদের জন্য ডাঃ পালের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। গত অক্টোবর মাসে স্যার মহম্মদ জাফরুল্লা খান ডাঃ রাধাবিনোদ পালকে পরাজিত করিয়া সাধারণ পরিষদ এবং স্থায়ী পরিষদ কর্তৃক ভোটাধিক্যে এই বিচারালয়ের বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। এই বিচারালয়ের সদর দপ্তর হল্যাণ্ডের রাজধানী 'হেগ' (The Hague) সহরে অবস্থিত।

(৪) অছি পরিষদ :—পৃথিবীর যে সমস্ত অনুন্নত দেশ এখনও স্বায়ত্ত শাসনের যোগ্যতা অর্জন করে নাই এবং বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর এশিয়া এবং আফ্রিকার যে সমস্ত অনুন্নত অঞ্চলগুলি শত্রু হস্ত হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে সেই সমস্ত অঞ্চলগুলির উপর এই অছি পরিষদ খবরদারি করিবেন এবং যত শীঘ্র সম্ভব এই অঞ্চলগুলিকে স্বায়ত্ত শাসনের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবেন, এবং সাধারণ পরিষদের নিকট এই সম্বন্ধে বিবরণী পেশ করিবেন।

(৫) অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংস্থা :—পৃথিবীর বিভিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, সামাজিক অবস্থা এবং মানবিক অধিকার সম্বন্ধে এই সংস্থা অনুসন্ধান করিবেন এবং উন্নতি বিধায়ক সুপারিশ করিবেন। সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত সদস্য লইয়া এই সংস্থা গঠিত হইবে।

(৬) সদর দপ্তর :—রাষ্ট্রসংঘের দৈনন্দিন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনার জন্য একটি স্থায়ী দপ্তর থাকিবে এবং ইহার সর্বাধিনায়ক হইবেন সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত একজন সেক্রেটারী জেনারেল। রাষ্ট্রসংঘের

ডাঃ ড্যাগ হ্যামারশোল্ড

ডাঃ ড্যাগ হ্যামারশোল্ড, আর সাধারণ পরিষদের প্রথম সভাপতি ছিলেন বেলজিয়ামের মঃ পল হ্যারি স্পাক এবং বর্তমান অধিবেশনের সভাপতি হচ্ছেন চলাডের ডাঃ ডাান ক্রিফেল, ভারতবর্ষের শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত গত অধিবেশনে (অষ্টম অধিবেশন) সাধারণ পরিষদের সভানেত্রী ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় রাশিয়া, আমেরিকা ও বৃটেনের ভিতর যে মহামৈত্রী গড়িয়া উঠিয়াছিল যুদ্ধাবসানে কিন্তু তাহাতে ভাঙন পড়িল। সেই অনাবিল সৌজন্য এবং বিশ্বাস অন্তর্হিত হইল। রাষ্ট্রসংঘ হইয়া উঠিল দুই বিরোধী পক্ষের শক্তি পরীক্ষার কেন্দ্রস্থল, পৃথিবীর আকাশে, বাতাসে আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াল ছায়া পড়িল। এদিকে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর এই জটিল গ্রন্থি উন্মোচনের জন্য পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ উদ্গ্রীব হইয়া উঠিল। বিবদমান দুই পক্ষের বিশ্বাসী একজন নিরপেক্ষ নেতার প্রয়োজন অনুভূত হইল। অগ্রসর হইলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল কোরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে, শান্তি ফিরিয়া আসিল ইন্দোচীনে, মীমাংসার পথে চলিল রাষ্ট্রসংঘে নতুন সদস্য গ্রহণের মতবিরোধ এবং আণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের জটিল গ্রন্থি, নিঃশেষে মিলাইয়া গেল ভারতের বুক হইতে ফরাসী অধিকারের শেষ চিহ্নটুকুও। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে নতুন ভূমিকায় দেখা দিলেন, বিশ্বের শান্তিকামী জনসাধারণ তাঁহাকে গ্রহণ করিল শান্তি এবং মিলনের মূর্তিদূত হিসাবে।

সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও ইহা আশা করা যাইতে পারে যে,রাষ্ট্রসংঘই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহার মাধ্যমে পৃথিবী হইতে যুদ্ধভয় দূরীভূত এবং সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ সাধিত হইবে। অতএব রাষ্ট্রসংঘ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের বুদ্ধি জাগ্রত হওয়া বাঞ্ছনীয়। শান্তিকামী জগতে জনমতের ইচ্ছা পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি আনয়ন করিবেই।

ভাষার শক্তি

অধ্যাপক ধীরানন্দ ঠাকুর

ভাষা মানুষের একটা সম্পদ। এক হিসেবে শ্রেষ্ঠ। মানুষের মানসবৃত্তিনিচয়ের উন্নত সাধনাকে শ্রেষ্ঠ বিত্ত বলে মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু, ভাষা না থাকলে সে সাধনার প্রকাশ হতে পারে না; আর, প্রকাশ না হলে তার উন্নতি সম্ভব নয়। সুতরাং ভাষাকে বাদ দিয়ে মানসিক বৃত্তিগুলোর কথা ভাবা যায় না, ভাববার নয়। তাই বলছিলুম, ভাষার চেয়ে দামী বিষয় আর হতে পারে না। এই কারণেই বলা যায়, ভাষার উন্নতিতে মানুষের উন্নতি। কথাটাকে আর একটু টেনে বলা চলে, ভাষা জাতির অবস্থার পরিমাপক। এখানে উন্নতির কথা বলতে শুধু যে সাংস্কৃতিক অগ্রগতির কথাই ধরা হচ্ছে তা নয়। বৈষয়িক শ্রীবৃদ্ধির কথাও বাদ যায় নি ও থেকে। একটা জাতের বৈষয়িক সমৃদ্ধিরও পরিমাপ করা যায় সে-বিষয়ে চালু শব্দসম্পদ দিয়ে। এমন অবস্থা হতে পারে যে জাতির বিষয় সম্পদগুলো ঘুচে যাওয়ার পর শুধু শব্দগুলো আছে; কিন্তু সে থাকা অল্পকালের। আসলে, বিষয় সম্পদ নষ্ট হয়ে গেলে তদ্বাচক পদসম্পদও অচিরে নষ্ট হয়ে যেতে বাধ্য: বড় জোর, তাদের কংকালগুলো কোষগ্রন্থের কুলুঙ্গিতে ফুল আর ধুলোয় মলিন হয়ে থাকতে পারে। ঐ পর্যন্ত।

ভাষা যখন সবেমাত্র মানব সমাজে গড়ে উঠছিল তখনকার কথা ছিল অন্য। তখন হয়তো একটা জিনিসের গঠন, উদ্ভাবন বা প্রাপ্তির সংগে সংগেই তার নাম বা কথা জুগিয়ে উঠত না; হয়তো বা, অনেক সময় পেরিয়ে যেত ঠিক মতো একটা ভাষা খুঁজে পেতে। কিন্তু এখন? এখন আর মানুষের সে দুরবস্থা নেই। এখন একটা বিষয় আবিষ্কার, পাওয়া বা গড়ে তোলার সংগে সংগেই তার পরিচায়ক শব্দটাও দিয়ে দেওয়া যায়, দিয়ে দিতে হয়, দেয়া হয়ও। এমন কথা কি এখন ভাবা যায় যে কোনো বৈজ্ঞানিক সামগ্রী উদ্ভাবিত হল, অথবা জীবন-চর্চার অন্য ক্ষেত্রে কোনো নোতুন ভাবভঙ্গি বা রীতির আন্দোলন হল, কিন্তু তার উপযুক্ত কোনো ভাষা দেয়া হল না? ভাষা না হলে এখন আর এক মুহূর্ত চলে না সভ্য মানুষের। দিন দিন মানুষের মধ্যে যত দর্শন বিজ্ঞান শিল্পকলার নব নব রূপায়ণ ঘটছে তত ভাষার শক্তি ও সম্পদকে বাড়িয়ে নিতে হচ্ছে। তাইতো বলা যেতে পারে, একটা জাতির জীবন-সাধনার সর্বাংগীন পরিচয় মেলে তার ভাষার কাছ থেকে।

মানুষের সভ্যতার বিবর্তনের ধারাগুলো সাজিয়ে দেখাতে হবে? ভাষা চাই। রং-রেখা-তুলি-পর্দা-ছেনি-হাতুড়ি-শিলা-ধাতু, সুর-তাল অঙ্গ-ভঙ্গি ইত্যাদির মাধ্যমেও জাতির ঐতিহ্যের কিছু অংশ ধরে রাখা যায় সে কথা মিছে নয়; কিন্তু তার বেশীর ভাগই যায় না। তাছাড়া এই বাহনগুলি তত টেকসই নয় যত ভাষারূপী বাহনটি। ভাষা একদিকে যেমন কোমলের চেয়ে কোমল, অপরদিকে তেমনি কঠিনের চেয়ে কঠিন। ভাষা ফুলের চেয়ে নরম, তুলোর চেয়ে হাল্কা, তেমনি গ্রানিটের চেয়ে শক্ত, লোহার চেয়ে ভারী, ভাষা হীরের চেয়ে উজ্জ্বল, কিন্তু নক্ষত্র মানুষের চেয়ে রহস্যময় সংকেতে ভরা, ভাষা রংধনুর চেয়ে বর্ণাঢ্য, কিন্তু আকাশের মত উদার ঐক্যে প্রশান্ত; স্রোতের মত গতিশীল, তবু ভূমির মত স্থির; ভূধরের মত ধ্যান গম্ভীর, কিন্তু হাওয়ার মত খোলামন; আলোর মত স্পষ্ট, কিন্তু আঁধারের মত গভীর; ভাষা প্রাণের মত তাজা, ভাষা প্রেমের মত আনন্দী; রূপের চেয়ে সুন্দর, সংগীতের চেয়ে শ্রব্য। কি নেই ভাষায়? কি সে নয়? রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ—সবই আছে তাতে। যত ভাব যত বস্তু তত ভাষা তত কথা, যত পদার্থ তত পদ।

কী না করা যায় ভাষা দিয়ে? ছবি আঁকতে হবে? হ্যাঁ, তা হতে পারবে ওকে দিয়ে; সে হবে কথার ছবি। ও, ছবি দেখে যে-ভাব এলো মনে তা জানাতে হবে? বেশ তো, তাও চলবে ওতে। পাথরের কি ধাতবিক মূর্তি বানাতে হবে, গড়তে হবে পদুজ-দিনার কিংবা মন্দির, বিহার, না হয়, গির্জা কি মসজিদ? আচ্ছা, তাও হতে পারবে; পারবে কেন, পেরেছেই তো। কথা দিয়ে তোরের হল কতকত কাব্যের মহল, মেমোরিয়েল মসোলিয়ম, কতকত বাগান, বাগিচা, মনজিল। ভাস্কর্য-স্থাপত্য শিল্পের উপলব্ধির কথা প্রকাশ করতে হবে? তাতে তো ভাষা নইলেই নয়। নাচের ছন্দ আর ভংগি? হ্যাঁ, তাও দেখা যেতে পারে বৈকি এতে। কতকত কাব্যে লীলায়িত হয়ে উঠতে দেখা গেছে নৃত্য ভংগি আর নর্তন ছন্দকে। আর গানের কথা? সুরের সংগে বাণীর খাঁটছাড়া বাঁধা হল যখন তখন সংগীতে হল সোনায় সোহাগা। চোখ মেলে ভালো করে তাকালে দেখা যাবে, ভাষার সুরনির্ঝর শুদ্ধতার তুষারের মত জমাট বেঁধে আছে তার ওপর; একটুখানি হৃদয়ভাবের তাপ পেলেই সংহত তার সুরলহরী উচ্ছল কল্লোলে উঠবে ঝংকার দিয়ে। তাইতো বলতে ইচ্ছে করে, ভাষার মত শক্তিশালী জিনিষ কমই আছে।

কোনো জাতিকে বুঝতে হলে, ঠিকমত বুঝতে হলে, তার ভাষাকে জানা চাই, তার ভাষায় বোঝা চাই, কেননা ভাষার মধ্যেই পাওয়া যায় জাতির ইতিহাসকে, ঐতিহ্যকে। কতকগুলো বিশেষ বিশেষ শব্দ সন্ধানের মধ্যে দিয়েও একটা জাতির ইতিহাসের দিগ্‌দর্শন হতে পারে। কোন্ যুগে জাতিটি কোন সাধনার দিকে বেশি ঝুঁকেছিল, কখন কোন্ কোন্ ভাবের সংঘর্ষ ও সমন্বয় ঘটেছিল তার নজীর বহন করে ভাষা। ভাষার সাহায্যে মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যেতে পারে জাতির ধর্মনীতিক, সমাজনীতিক, রাজনীতিক ও অর্থনীতিক অবস্থার।

ভাষার সুষ্ঠু ও পরিণত প্রকাশ সাহিত্যে। ভাষার সাজানো গোছানো রূপই সাহিত্য; ভাষা সাজানো গোছানো হলে রন্ধন হয়ে ওঠে। সাহিত্য ছাড়া ভাষা হতে পারে, কিন্তু ভাষা ছাড়া সাহিত্য কখনই নয়। তবে সাহিত্যবিহীন ভাষা মজানদীর দশা না পেয়ে পারে না। ভাষা কথ্য ও লেখ্য দুটো রূপ নিতে পারে; আবার, ওর দুটো রূপই একরকম হতে পারে। দুটো রূপ থাকলেও একটা অপরটাকে যথেষ্ট সাহায্য করে। দুটোর মধ্যে বিরোধ না থাকতে দেওয়াই উচিত; তাতে ভাষার শক্তি কমে যাবার ভয় থাকে। এ দুইএর মধ্যে যত ঐক্যরূপ থাকবে ভাষা তত জোরালো হবার জো পাবে। সাহিত্য শব্দটা এখন ব্যাপক অর্থেই নেয়া হচ্ছে: যে কোন ধরণের গোছালো ভাষিত রচনাকে সাহিত্য বলে ধরা যাক।

ভাষা যে শুধু অতীত ইতিহাসের দলিল তাই নয়; চলমান জীবন বৃত্তান্তেরও তা অন্যতম সেরা ধারক। এবং ভাবীকালের জীবনাদর্শ ও রূপায়ণ পরিকল্পনারও ইঙ্গিতবাহী।

ভাষা নিজেই একটা শক্তি, কেননা, ভাষা তো শুধু ধ্বনির, অর্থহীন ধ্বনির প্রকাশ নয়, তা প্রাণেরই প্রকাশ, প্রকাশ মনের, মননের, ভাবের, ভাবনার। ভাষা মানুষের বহু উপকারে লাগে, অনেক অসুবিধা দূর করে, মানুষকে দেয় ব্যক্তিত্ব, আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠা। তাই ভাষা সম্পদ। যথার্থ শক্তিমাত্রই সম্পদ, প্রকৃত সম্পদমাত্রই শক্তি। ভাষা সত্যিকারের শক্তি ও সম্পদ। কিন্তু ভাষা যদি হয় প্রাণের প্রকাশ তো প্রাণের শক্তিতেই ভাষার শক্তি। যে জাতির প্রাণশক্তি, মানস শক্তি যত বেশি, সে জাতির ভাষাও তত শক্তিশালী। আবার একথাও অনেকটা ঠিক হয় ভাষার শক্তিতে জাতির শক্তি, ভাষার সম্পদে জাতির সম্পদ, কারণ ভাষার শক্তি সম্পদ জাতিকে শক্তিসম্পদশালী হতে অনেকখানি সাহায্য করে। সুতরাং ভাষার উন্নতি করতে হলে জাতির প্রাণশক্তির পুষ্টি চাই, তেমনি জাতির উন্নতি করতে হলেও ভাষা অর্থাৎ তার পরিণতরূপ যে সাহিত্য তার উন্নতি চাই। জাতির যথার্থ সমৃদ্ধির জন্য যুগপৎ তার প্রাণসত্তার ও ভাষাসত্তার পুষ্টি আবশ্যক।

ও অলাকারে তার
তারে এনে
অনুভাগে
ঘটানো বিশ্ব
সমৃদ্ধি। অনুভাগীদের
হতে চলে তাদের আপন লোক,
সম্মানিত হওয়া দরকার
থাকা আবশ্যক যে তা
সম্মানে জাতির সম্মান।
অনুষ্ঠানে, প্রতিষ্ঠানে, নিষ্ঠায়, সাগ্রহে, ব্যবহারে সে-বোধ
বা সচেতনতা প্রকাশ পায়।

পরিশেষে এই কথাটা এ প্রসঙ্গে ছাড়ে
যদি চর শক্তিশালী বা একটা ভাঙার শক্তি,
তাহলে তার ঠিকমত অনুশীলন না হলে ক্ষয়
অবনতি হওয়াও অবশ্যম্ভাবী, যেমন অন্য সব শক্তির।
এর শক্তির সঞ্চয় ও বৃদ্ধি নির্ভর করে তাদের এর প্রতি
সাধনা, অনুরাগ ও দায়বোধের ওপর। এই বোধ ও
নিষ্ঠা না থাকলে আধুনিক মানুষকে প্রত্যাবাহভাগী হতে
হবে সংস্কৃতি ধর্মের বিচারে।

তার
তাদের ছাড়ে তাদের ছেড়ে।
চর সেজন্য
লোক যাচ্ছের মধ্যে আনতে চয় তা তাদেরকে ও
আনন্দ চয় যাওয়ার মধ্যে। উৎসবের কথা বলে নিশ্চয়ই বলা
তাদের প্রতি প্রত্যেক তাদেরই, বিশেষ করে জাতির.
ব্যক্তির একটা কৃতজ্ঞতার অপরিশোধ্য
কাজে কাজেই থাকা উচিত শ্রদ্ধা ও
তাদের পুষ্টিসাধন ও শ্রীবৃদ্ধির দ্বারা সে দায়
তাদের প্রসার ও প্রচার করে তার
প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করা যেতে পারে।
তাদের নানা জ্ঞান বিজ্ঞান তাদরসের অনুশীলন করে তার
পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা যায় বহু প্রগতিশীল ও
সংস্কৃতিপন্ন তাদের শব্দসম্পদ, বাচনভঙ্গি, বাক্যরীতি, ছন্দ

রবীন্দ্রনাথের 'দুই নারী'

শ্রীতারক ঘোষ

'দুই বোন' উপন্যাসের সূত্রপাতে রবীন্দ্রনাথ নারীর দুটো রূপের পরিচয় দিয়ে বলেছেন :

"মেয়েরা দুই জাতের, কোনো কোনো পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি।

এক জাত প্রধানত মা, আর এক জাত প্রিয়া।

ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি, মা হলেন বর্ষা ঋতু। জলদান করেন, ফলদান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ঊর্ধ্বলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে, দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।

আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু। গভীর তার রহস্য, মধুর তার মায়ামন্ত্র, তার চাঞ্চল্য রক্তে তোলে তরঙ্গ, পৌঢ়ত্ব চিত্তের সেই মণিকোঠায় যেখানে সোনার বীণায় একটি নিভৃত তার রয়েছে নীরবে, ঝংকারের অপেক্ষায়, যে ঝংকারে বেজে ওঠে সর্বদেহে মনে অনির্বচনীয়ের বাণী।"

'দুই বোন' উপন্যাস এই তত্ত্বটিরই জীবনরূপ। সাহিত্যের অন্য রূপের তুলনায় উপন্যাসই বেশী পরিমাণে বাস্তব ঘেঁষা—সেইজন্য রবীন্দ্রনাথ বাস্তব জীবনের উপ-ছায়ায় গড়ে ওঠা একটা কাহিনী এই উপন্যাসে ন্যস্ত করেছেন। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ যে জীবনের ছবি এঁকেছেন তা বাস্তব জীবন নয়—তা ভাবজীবন। জায়া হিয়া আর পুরুষের যে তিনটি প্রবাহ এই উপন্যাসে মিশেছে, রবীন্দ্রনাথের ভাবমানসই তাদের উৎস। জীবনের অতি গভীর একটি তত্ত্বকেই তিনি শিল্প রচনার মধ্য দিয়ে স্ফুট করেছেন।

এই উপন্যাসের প্লটের মধ্যে আমাদের বাস্তবজীবনে সম্ভাব্য কাহিনী আছে। কিন্তু এ হল বাহ্য। উপন্যাসের মধ্যে জীবনের যে বহুমুখীন প্রবাহ, অন্তর্বাহিনীর উত্থান পতনের পরিচয় পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে তাকে প্রকাশ করতে চান নি। তা না হলে, সাধারণ উপন্যাসের আদর্শে যেখানে গল্প সবে জমে উঠেছে, সেখানে তিনি দুটো চিঠি দিয়ে গল্পটাকে আবৃত করে দিতেন না। শর্মদায়িনী নারী শর্মিলা আর ভাবোন্মিচঞ্চলা উর্মিমালা পুরুষ শশাঙ্ক মৌলীর জীবনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে তারই ছবি ফুটিয়ে তোলা রবীন্দ্রনাথের কাম্য ছিল। জীবন-নাট্যের তৃতীয় অঙ্কে যবনিকা টেনে দিয়ে তিনি এই দুই নারীকেই আমাদের কল্পনায় ভাস্বতী করে রেখেছেন।

নারীর এই দুই রূপের পরিচয় কেবল এই উপন্যাসেই যে প্রকাশিত হয়েছে তা নয়, রবীন্দ্রনাথের ভাবকল্পনায় নারীর এই দ্বৈত রূপের বোধটি বহু পুরানো 'বলাকা' কাব্যের একটা কবিতায় তিনি এই 'দুই নারী' তত্ত্বকে ব্যক্ত করেছেন :

কোন ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্র মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
একজনা উর্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনা রাজ্যে রাণী
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী
বিশ্বের জননী তারে জানি
স্বর্গের ঈশ্বরী।

এই কবিতারও বহুকাল আগে 'চিত্রা' কাব্যে 'রাত্রে ও প্রভাতে' কবিতায় নারীর এই প্রিয়া ও

ভাষা রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে একই চরিত্রের মধ্যে নারীর দুটো দিক ফুটে উঠেছে। যে নারী 'মধুযামিনীতে জ্যোৎস্না-নিশীথে' কামনার সঙ্গিনী ছিল, সে ই 'নির্মলবায় শান্ত উষায়' পবিত্রতার কল্যাণের প্রতিমূর্তি হয়েছে।

রাতে প্রেয়সীর রূপ ধরি
তুমি এসেছ প্রাণেশ্বরী,
প্রাতে কখন দেবীর বেশে
তুমি সম্মুখে উদিলে হেসে—

'চিত্রা'র মধ্যে কবির চেতনায় একই নারীতে দুই রূপের সমন্বয়ের বোধটি সুস্পষ্ট। কিন্তু 'মানসী' বা তার আগেকার রচনায় প্রেয়সী আর গৃহিণীর—নর্ম-সঙ্গিনী আর কল্যাণী'র দ্বন্দ্বই কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবি একবার তাঁর কল্পনায় যৌবন-সঙ্গিনী মানস-প্রতিমা সৃষ্টি করেছেন, আবার পরমুহূর্তেই রূপের প্লাবনকে, আবেগের জোয়ারকে অস্বীকার করে নারীর মঙ্গলময়ী মূর্তির জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন। 'মায়ার খেলা'র শান্তা আর প্রমদার মধ্যে নারীর এই দুই রূপের আভাস আছে। 'রাজা ও রাণী'র মধ্যেও এই 'দুই নারী' বোধের প্রভাব আছে। সুমিত্রা ভাষা—কল্যাণী; তার মধ্যে প্রিয়াকে খুঁজে পাবার ব্যর্থ অথচ উদ্যম প্রয়াসই এই নাটকের ট্রাজেডির উপাদান। 'চিত্রাঙ্গদা'র পরিকল্পনায় এই 'দুই নারী' তত্ত্ব রয়েছে।

নারীর দুই রূপের যে সংস্কার রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় বদ্ধমূল হয়েছে তার অন্যতম কারণ এই যে বাল্য-কালেই তিনি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্য আর 'অভিজ্ঞান শকুন্তল' নাটক সাগ্রহে অধ্যয়ন করেছিলেন এই দুটি গ্রন্থে কালিদাসও নর্মময়ী আর শর্মময়ী নারীর রূপ সৃষ্টি করেছেন। দুষ্মন্তের প্রেমমদিরাপানে বিমলা শকুন্তলা আর অকাল বসন্তে মনোরমা পার্বতী, নারীর প্রিয়ারূপের প্রতীক। কণ্বাশ্রমবাসিনী শকুন্তলা আর তাপসী উমা নারীর কল্যাণময়ী মূর্তি। রবীন্দ্রনাথ যে এই দুটি গ্রন্থে নারীর এই দ্বৈধী সত্তার স্বরূপ অনুভব করেছিলেন, তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের দুটি প্রবন্ধ।

'কুমারসম্ভব' কাব্যে অকাল বসন্তের উন্মাদ প্রভাব ভগবান শঙ্করের মনেও ক্ষণিক বিকার এনেছিল—কিন্তু যোগির তৃতীয় নয়নের প্রচণ্ড বহ্নিতে দেহজ কাম ভস্ম হয়ে গেল। শিবকে জীবনের অঙ্গীভূত করে পাবার জন্য উমাকে দুষ্কর তপস্যা করতে হল—কামনার ধূম্রজাল অপসারিত করে তাঁর সত্তা সন্ধ্যা-প্রদীপের মতো শান্তোজ্জ্বলজ্যোতির্ময় হয়ে প্রকাশিত হল একাগ্র সাধনায় গৌরী শিবানী হল—সুন্দর শিব হল। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তল' নাটকে দুর্ভর কামনা শকুন্তলাকে 'তুলারাশাবিবারিঃ' তিলে তিলে দগ্ধ করেছে। কালিদাসের কল্পনায় এই রূপক্লান্তিতা রমণীমূর্তি শাশ্বতী নয়—পুরুষের চিত্তে তাই তার স্মৃতি লুপ্ত হয়েছে। তাকেও তপস্যা করতে হয়েছে—প্রত্যাখ্যানের দুঃসহ লজ্জাকে বহন করে শিরপতপ্রাণা হয়ে তাঁর সন্তানকে লালন করার তপস্যা। মালিনীতটবর্তিনী শকুন্তলা বিভ্রম-বিলাসময়ী—বনপ্রকৃতি তার স্নিগ্ধ তনুর রোমকূপে কখন অলক্ষ্যে মদিরা সঞ্চার করেছে; সে পুরুষের নর্মসহচরী হল। কিন্তু হেমকূটবর্তিনী শকুন্তলা কামনা-হীন প্রেমের দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল; সে ভারত সম্রাট দুষ্মন্তের সহধর্মিনী—ভাবী সম্রাটের জননী।—নারীর জায়ারূপের উজ্জ্বল ছবি এঁকেই কালিদাস তাঁর এই গ্রন্থ-দুটিকে সার্থক করে তুলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন যে কালিদাস তাঁর এই দুটি গ্রন্থে গৃহাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা। ভারতবর্ষের আদর্শকে জয়ী করবার জন্য নারীর কল্যাণী গৃহিণী মূর্তিকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিয়েছেন। 'তাকেন তৃতীয়াঃ' এই মন্ত্রের উপাসক রবীন্দ্রনাথও প্রেয়ের চেয়ে শ্রেয়কেই বেশী মূল্য দিয়েছেন।

তাই তাঁর সাহিত্যেও বারবার প্রিয়াকে অতিক্রম করে কল্যাণীই, গৃহিণীই স্থায়ী মর্যাদা পেয়েছে। তত্ত্বদর্শী রবীন্দ্রনাথ বহুস্থানেই রূপ থেকে স্বরূপে, বস্তু থেকে ভাবে, কৃতি থেকে বিরতিতে, প্রেয়সী থেকে শ্রেয়সীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

নারীর কামনাময় রূপ যে অধ্রুব—যে পুরুষ নারীর মধ্যে কেবল প্রিয়াকেই খোঁজে সে যে মহত্তী বিনষ্টিরই সাধনা করে, এই তত্ত্বটি বোঝাবার জন্যই রবীন্দ্রনাথ 'রাজা ও রাণী' বা 'তপতী' নাটক রচনা করেছেন। বিক্রমের উন্মত্ত প্রেম সুমিত্রাকে শেষে চরম ধ্বংসের মধ্যে নিয়ে গেছে। নারীর যে প্রিয়ারূপ তা পুরুষকে ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে

রবীন্দ্রনাথের 'দুই নারী'

গৃহকোণের প্রেমময় পরিবেশ মধুর বটে, কিন্তু জীবনের রসধারা থেকে তা বঞ্চিত। মানবসত্তাকে অস্বীকার করে যে স্বস্তি, তা আপাত মধুর হলেও জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। একান্ত কামনা চিরকালীন হতে পারে না—মোহের পাশ থেকে মানুষকে চিরদিন আবদ্ধ রাখতে পারে না। যে নারী স্বপ্নের সঙ্গিনী বাইরের জগতে যদি তাকে হারাই, তাহলে জীবন অসার্থক হয়ে ওঠে। সমগ্র জীবনে গৃহিণীরূপে আপনার সত্তাকে প্রসারিত করে দেয় বলেই নারী পুরুষের কাছে অনন্ত আনন্দের উৎস।

রূপজ প্রেম যে মোহ, আর সেই মোহ যে পরিণামে ক্লান্তিকর—কবি 'চিত্রাঙ্গদা'য় তা ব্যক্ত করেছেন। চিত্রাঙ্গদা ধার করা রূপ দিয়ে পুরুষ অর্জুনের চিত্ত আকর্ষণ করল—কিন্তু রূপ সম্ভোগ পুরুষকে বেশী দিন আনন্দ দিল না। জীবনের বৃহত্তর, মহত্তর ক্ষেত্রে বিকশিত হবার জন্য পুরুষের প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠল। সেই জন্যই মর্মসঙ্গিনীকে বিলুপ্ত করে দিয়ে সহধর্মিণীর আবির্ভাব হল। মহৎ জীবনের প্রাণস্পর্শ না থাকলে মানুষ কখনও সার্থক হতে পারে না। কামনার, মোহাবেশের সংকীর্ণ গণ্ডিতে মানুষের প্রাণ ধুকপুক করে—মহৎ জীবনের স্পর্শেই তা তেজোময় হয়ে উঠতে পারে।

অবশ্য নারীর এই কল্যাণী মূর্তিকে বড়ো করে তোলবার জন্য কবি তার প্রেয়সী মূর্তিকে অস্বীকার করেন নি। কবি তো কেবল ক্রান্তদর্শী নন—নিখিল চিত্তের অনুভব যে তাঁর চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মহাকবির কাব্য যে মানবের চিরন্তন কামনার ভূর্জপত্র। শিবের আবির্ভাবের জন্য তিনি সুন্দরকে অপসৃত করেন নি। একদিকে তিনি যেমন জায়ার জয় ঘোষণা করেন, আর একদিকে তিনি মানসমন্থনসম্ভবা প্রিয়ারও বন্দনা করেছেন—যে প্রিয়া

…তপোভঙ্গ করি
উচ্চ হাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুধাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি—
ছড়াতে ছড়ায়ে তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে
নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

কয়েকটি নাটকে নারীর কল্যাণী মূর্তিকে বড়ো করে তুললেও রবীন্দ্র কল্পনায় নারীর প্রিয়া মূর্তিও যে সমান মূল্য পেয়েছে তার সুপ্রচুর নিদর্শন তাঁর সমগ্র কাব্যের মধ্যে ছড়ানো রয়েছে। 'রাত্রে ও প্রভাতে' বা 'দুই নারী' কবিতায় কিংবা 'দুই বোন' উপন্যাসে তিনি নারীর দুটো রূপেরই ছবি এঁকেছেন এবং তাদের কোনটিকেই খাটো করেন নি। অবশ্য এই রচনা'কটিতে নারী দেহহীনা—ভাবস্বরূপা। শর্মিলা গৃহিণীর আদর্শ প্রতিমা—ঊর্মিমালা সখিত্বের রক্তপথচারী প্রেমের আবেগে অধীর হয়ে উঠেছে বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে মর্ত্যের ধূলিরাশি দিয়ে মলিন করে ফেলেন নি। ঊর্মিমালা প্রেমের সুষমা আর সুরভি নিয়ে এই রচনাটির মধ্যে আবির্ভূতা হয়েছে—কবি যখন যবনিকা টেনে দিলেন, তখন তার মধ্যে এতটুকু গ্লানিমা নেই—বরং প্রেমের ছোঁয়ায় সে যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্র সাহিত্যের বহু স্থানেই প্রিয়ার এই অনন্য-সাধারণ রূপ ফুটে উঠেছে। এ থেকে অনুমান করা অসংগত হবে না যে রবীন্দ্রনাথ যদিও আদর্শের দিক থেকে নারীর কল্যাণী মূর্তিকেই শ্রেয় বলে স্বীকার করতেন, তবুও তার প্রিয়া রূপের জন্যও তাঁর কবিসত্তা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। যেখানে কবি আবেগকে শমিত করে জীবনের শাশ্বত সত্যকে প্রকাশিত করেছেন, সেখানে তাঁর ভাব দৃষ্টির গভীরতা ব্যক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু যেখানে তিনি হৃদয়ের অধীরতাকে প্রকাশ করেছেন, সেখানে তাঁর রচনা শিল্পকর্মে অপরূপ হয়ে উঠেছে—কাব্যাদর্শের দিক দিয়ে বিচার করলে এগুলিই সার্থকতর রচনা।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার মধ্যেই দ্বৈধী ধারা ছিল। তাঁর একটা অংশ রূপ থেকে অপরূপের অভিসারে যাত্রা করেছে, আর একটা অংশ রূপের মধ্যে নিমজ্জন করে রূপকে অপরূপ করে প্রকাশ করেছে, তাঁর চেতনার একদিকে অমর্ত্য আনন্দের অভীপ্সা—অন্যদিকে মর্ত্য-লোকের জন্য একান্ত প্রীতি। তাঁর কাব্যের মধ্যে এক দিকে তীব্র বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে, অন্যদিকে মানুষের জীবনের জন্য অন্তহীন মমতা মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই জন্যই তিনি নারীর কল্যাণী মূর্তির কাছে শ্রদ্ধায় সহজ নত করে দিলেও তাঁর কাব্যাত্মা যেন চিরন্তনী প্রিয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে; অন্তর লক্ষ্মীর বন্দনা করেও তাঁর চিত্ত উর্বশীর জন্য উৎসুক হয়েছিল, হয়তো এই জন্যই তাঁর রচনায় একদিকে যেমন ভাবের অতল গভীরতা, অন্যদিকে তেমনই শিল্পের যাদু সৃষ্টি সম্ভবপর হয়েছে।

বাউল

প্রশান্তকুমার রায়

একতারা বগলে নিয়ে ঠোঁটা চন্দন কাটা লোকটা যখন হাঁক দিয়ে আম বাগানের পাশ কাটিয়ে গাঁয়ে ঢোকে তখন সেই চম্পাডাঙ্গার ছেলেরা খেলা ছেড়ে ছুটে এসে তার পিছু নেয়, মেয়েরা ঘরের দাওয়ায় নেমে খুঁটিতে হেলে দিয়ে দাঁড়ায়, রান্নাঘরের বেড়ার ফাঁকে বৌরা উঁকি দেয়। বলে বুঝি বাউল এল। সময় নেই অসময় নেই গাঁয়ে এসে কাজের মানুষের কাজ ভুলিয়ে দেয়, এমন খাপছাড়া পাগল কে কখন দেখেছে! বুড়োরা বলে, তোর বুঝি আর সময় অসময় নেইরে, বাউল। যখন খুশি এলেই হ'ল?

বাউল বলে, প্রাণের টানে বেরিয়ে পড়াই আমার খেলা। তোমাদের ভাল না লাগে দূর করে দিলেই তো পার।

বুড়োরা হাসে। বলে, না-না বস, একটা গান শোনাও। সেই যে, কার দেহ নিয়ে এত খেলা খেলি—সেইটে গাও।

বাউল পাকা দাড়িতে হাত বুলায়। আসন পিড়ি হয়ে বসে। বসে গান গায়। একখানা, দু'খানা, তিন খানা। তারপর উঠে দাঁড়ায়। তখন বৌ ঝিদের কেউ এসে হয়তো খুন্তির মধ্যে চাল দিয়ে যায়, লুকিয়ে হয়তো দু'টো পয়সাও।

এমনি করে বাড়ী বাড়ী ঘুরে গান শুনিয়ে বেড়ায় বাউল। কিছু চায় না তবু লোকে খুশী হয়ে ঝুলি ভরে ভিক্ষা দেয়। বেশ গান করে। চৌধুরীদের বাড়ীতে গান জমে খুব। গান বাধানো চত্বর, প্রকাণ্ড দরদালান, চণ্ডী মণ্ডপ···জমীদার না হলে কি এত ভাল হয়। প্রবাসী ভবিষ্যৎ ভবতোষ অনেক বছর পরে চম্পাডাঙ্গার দেশের বাড়ীতে ফিরেছেন। পল্লীর উন্নতির দিকে তার নজর পড়েছে। কে একজন কথায় কথায় বলেছিল, এতদিনে পল্লীর শ্রী ফিরল। ভবতোষ বাবু গাঁয়ের প্রাণ।

বিয়ে করেই দেশ ছেড়েছিল ভবতোষ, আর ফিরল যখন তখন সে বিপত্নীক। তবু আট বছরের ছেলে অতীকে নিয়ে সে ভুলে থাকতে চায়; আপনাকে ভোলাতে চায় পল্লী উন্নয়নের কাজ কর্মে লিপ্ত থেকে। এই চৌধুরীদের বাড়ীতে বাউল যখন আসে মেয়ে ছেলেরা জোঁকের মত ছেঁকে ধরে তাকে। বলে, এটা গাও, ওটা গাও, সেইটে শোনাও। বাউল গাইতে নারাজ হলে তারা অতীকে লেলিয়ে দেয়। অতীর কথা ফেলতে পারে না বাউল। ঐ আট বছরের বালক কখন যে এসে বাউলের গা ঘেঁসে বসে পড়ে আর গানের তালে তালে মাথা দোলায় বাউল তা টেরই পায় না যেন। গান সারা হলে অতী বলে, আবার কবে আসবে? বাউল বলে, তুমি যেদিন বলবে—

তবে কালকেই এস। আমার তো ছুটি।

না গো চাঁদমণি, বাউল বলে, কাল নয় আসছে হপ্তায় আসবো।

সবাই জানে ওর কথার ঠিক নেই। মেয়েরা দূরে দাঁড়িয়ে হাসে। অতীর সঙ্গে কত আবোল তাবোল কথা হয় বাউলের। বাউল বলে, তোমাকে গান শিখিয়ে দেবো। শুনে অতীও খুব খুশি হয়। তারপর বাউল চলে গেলে সারাদিন সে ঐ গানগুলি গুনগুনিয়ে বেড়ায়। কেনদিন কেউ যদি বলে, ওগো তুমি যে অতীকেও বাউল করে তুললে। ওযে তোমার ভক্ত হয়ে উঠল—

বাউল একটু হেসে বলে, তা আর হবে না? ওর রক্ত আমার রক্ত—এযে সেই জ্যোতির জ্যোতি থেকে নেমে

আসা রক্তধারা। ও বাউল হবে না তো কে হবে! বলে কাঁধে ঝুলি তুলে নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ে বাউল বিড়বিড় করতে করতে।

সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত বাউল সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে। কাপড়, গামছা ও এক ঘটি জল এগিয়ে দিয়ে কন্যা সুতপা তুলসী তলায় প্রদীপ জেলে দিয়ে আসে। তারপর পাখা নিয়ে বাবাকে হাওয়া করতে বসে। তখন কন্যা ও পিতায় কথাবার্তা হয়।

বাবা, আজও অতী তোমার সঙ্গে আসতে চেয়েছিল?

একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে বাউল বললে, হুঁ।

খানিকক্ষণ সুতপা কথা খুঁজে পায় না। এক সময় ধীরে ধীরে মুখ নীচু করে বললে, জানো, বাবা সেদিন ক্ষেতের ছুপুরে যাকে তুমি ঘরে বসতে দিয়েছিলে আজ আবার সে এখানে এসেছিল।

বাউল শুধু বললে, এঁ্যা!

সুতপা বললে, হ্যাঁ, কাল আবার আসবে বলেছে।

বাউল কন্যার মুখের দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে বললে, বেশ।

সুতপা উঠে গিয়ে ঝুলি ঝেড়ে চাল, পয়সা, আনাজ তুলে রাখে। আজ তার মনে একটা খুসীর ঢেউ জেগেছে। বাউলের চোখ তা এড়ায় না। মাতৃহীনা সুতপা পিতার সবটুকু স্নেহ কেড়ে নিয়েছে। আরেক মাতৃহীনের জন্যে উতলা হয় বাউল। সে জমীদার বাড়ীর অতী। সুতপাও অতীর কথা শুনতে ভালবাসে। বাউল যেদিন চৌধুরী বাড়ী থেকে ফেরে সেদিন সুতপা অতীর কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে বাবাকে। আজকে মনের খুশি অবশ্য অন্য কারণে। বার বার তার মনে পড়ছে বিপুল সোমকে। ক' ঘণ্টারই বা আলাপ তবু বিপুলের মধ্যে এমন কি যেন একটা আছে যার জন্যে তাকে ভোলা যায় না। সুতপা ভুলতে পারে না। এই নির্জন পল্লীতে বিপুল যেন একমাত্র যৌবনদীপ্ত উজ্জ্বল পুরুষ বলে সুতপার মনে হয়। দার্জিলিং ছেড়ে আসবার পরে এই বুঝি প্রথম সে ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ পেল, তার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পেল! কত কি ভাবে সুতপা। বিপুলকে সে আবার আসবার নিমন্ত্রণ করে বলেছে, বুঝতেই পারছেন, আমরা গরীব। বাবা ভিক্ষে করে সংসার চালান; তবু যদি আপনি আসেন বাবা খুশি হবেন, আমি খুশি হব। এই জঙ্গল পুরীতে কোন ভাল খাদ্য তো ভুলেও আসে না—

না-না আমি আসবই। সরকারী কাজে আমাকে মাঝে মধ্যে এদিকে তো আসতেই হয়, তা ছাড়া—। সুতপার চোখে চোখ রাখে বিপুল। তা ছাড়া সে কি, সুতপা যেন মুহূর্তে তা বুঝতে পারে। এতক্ষণে লজ্জায় আরক্তিম হয়ে ওঠে সুতপার নিটোল যৌবনসম্পন্ন কপোল।

এই জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম প্রান্তে সুতপাকে যেন কোন এক স্বর্গ মুহূর্তে আবিষ্কার করল বিপুল। জগতের যে কোন আবিষ্কারের চেয়ে এ একটা মহৎ কিছু বলে তার ধারণা। এক রকম নাম জপ করতে করতে চলে এসেছিল বিপুল। পরদিন ভোর না হতেই সুতপার উচ্চকণ্ঠে সাইকেলে চাপল সে। কিন্তু তার আগে বাউলের একতারা বেজে উঠল—বাউল ঘর ছেড়েছে, সুতরাং বিপুলকে নিয়ে একাই ব্যস্ত থাকতে হল সুতপাকে। এই ব্যস্ততা কি এক দিনের। আজকাল কাজেই ঘরের দুয়ারে সাইকেলের ঘন্টি শুনবার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে সুতপা; শব্দ শুনতে পেলেই ঘরের দাওয়ায় নেমে এসে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়।

কথায় কথায় বিপুল একদিন বলেছিল, আচ্ছা সুতপা তোমরা এত কষ্ট করে সংসার চালাও, আমি এসে তাতে ভাগ বসাই, এটা কি ভাল? তার চেয়ে আমিও যদি কিছু যোগ করি—

আগে নেবার মত উপযুক্ত হই—বলতে গিয়ে কি ভেবে থেমে যায় সুতপা।

উপযুক্ত করে নিলে আর আপত্তি থাকবে না, কেমন?

আপনি লোভ দেখাবেন না, বিপুলবাবু। গরীব হলেও আমাদের শিক্ষা আছে।

বিপুল বললে, মানে?

মাথা নীচু করে বললে সুতপা, মানে আপনিই ভাল জানেন। আমি কিছু চাই না।

কিছুই চাও না ?

সুতপা আস্তে বললে, না।

আমাকেও না ?

জানি না। বলে দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায় সুতপা।

আশ্চর্য, সেই মুহূর্তেই ঘরে ঢোকে বাউল। সুতপার বাবা।

আপনি কে বটেন ? ও আপনিই বুঝি বিপুলবাবু, বাউল বললে,—ভাল কখন এলেন ?

এই খানিক আগে। বলে বিপুল হাত তুলে নমস্কার করল। একটু পরে সুতপা এসে দু'জনার পরিচয় করিয়ে দেয়।

এরপর সপ্তাহ দুই কেটে গেল অথচ বিপুলের আর দেখা নেই। সুতপার দিনগুলি যেন এক রঙা হয়ে গেছে। বাউলের চোখে ধরা পড়ে। যৌবনের বাহু, এড়াবে এমন সাধ্য কার। সুতপাকে ডাকে, প্রদীপে একটু তেল দিও, মা।

আজ বুঝি রাত জেগে লিখবে, বাবা ? সুতপা জিজ্ঞেস করল। বাউল বললে, হ্যাঁ, আজ যে লেখার দিন।

ও, বলে প্রদীপে তেল ঢেলে বোতলটা পাশে রেখে দেয় সুতপা বাউল হেসে বললে, তোর বুঝি আজ মনেই ছিল না। বলে পাটি পেতে বাঁধানো খাতাটা কাছে টেনে নেয় বাউল। তার জীবনের সমস্ত ঘটনাগুলি প্রতি সপ্তাহে একবার করে সে স্মরণ করে। আর প্রতি দিনের বিশেষ ঘটনাগুলি বাঁধানো খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখে। কেউ পড়বে বলে নয়, এটা তার অনেক কালের অভ্যাস। চিরটা কাল সে এমন বাউল ছিল না। তারও সমাজ ছিল, সংসার ছিল, শিক্ষা ছিল, দেশোদ্ধারের দীক্ষা ছিল। যে হাতে আজ সে একতারায় ঝংকার তোলে একদিন সে হাতে বোমা পিস্তল ছুঁড়তে হত। অব্যর্থ লক্ষ্য। দেশ দেশান্তরে আত্মগোপন করে ছুটে বেড়ানো সেও এক বাউলেরই জীবন বটে! তারপর রণক্লান্ত সৈনিকের মত যখন সে অসহায় বোধ করছিল তখন সুতপার মা এল অদ্ভুত সঞ্জীবনী নিয়ে জীবন সঙ্গিনী হয়ে। জগতের এও এক আশ্চর্য দিক। তারপর সুতপার জন্ম। বোমা পিস্তল ছেড়ে দেশান্তরী জীবনেও পাকা সংসারী হবার বাসনা ইত্যাদি কত কি ঘটে গেছে এই জীবনটায়। আজ সে যাযাবরের মত ঘুরতে ঘুরতে এই জঙ্গল পরিকীর্ণ দেশে লোকালয়ের বাইরে গ্রামপ্রান্তে নিজের নির্জন আবাসস্থল খুঁজে নিয়েছে। কিন্তু রেহাই নেই এখানেও। কিসের আকর্ষণ এখানে তাকে টেনে এনেছে সে কথা লেখা আছে তার বাঁধানো স্মৃতির খাতায় আর ঐ স্মৃতির পাতায় নিদারুণ দিনের এক মর্মান্তিক কাহিনীও লেখা আছে যা নিরন্তর তাকে বাধা দেয়। সে তার প্রিয়তমা পত্নীর মৃত্যু কাহিনী—শিশুপুত্র বুকে করে পৃথিবী থেকে সে চিরবিদায় নিয়েছে। সেই পাতাটি কারই সে উল্টে দেখে। দেখতে দেখতে আজও তার মুখ চোখের ভাব বিবর্তন হতে থাকে। বিড়বিড় করে কখনো বলে ওঠে, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। জীবনে ঐ একবারই আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিলাম। পাপ এখনো জগতে বেঁচে আছে। আমি পাপী। ক্ষমা করো। বলতে বলতে এক সময় তার কথা বন্ধ হয়ে যায়। দৃষ্টি স্থির হয়ে দাঁড়ায় পুরোনো দিনের একখানি ফটোর উপরে। সেই ফটো সুতপার মার।

পরদিন দুপুরে হঠাৎ ঘরের সামনে সাইকেলের ঘণ্টি বেজে ওঠে। সুতপা বেরিয়ে আসতেই একটি লোক একখানা চিঠি এগিয়ে দেয়। বিপুলের লেখা। ঘরের দরজা বন্ধ করে সুতপা চিঠি খুলল,—

সু—, কাজের অসম্ভব চাপে কয়েকদিন যেতে পারছি না। আমাকে ক্ষমা করো। জানতো, পুলিশে যারা কাজ করে তাদের কত ঝামেলা। ইচ্ছে হয় এ ইন্সপেক্টর গিরি ছেড়ে দিয়ে তোমার নির্জন কাছে গিয়েই সারাক্ষণ থাকি। আসছে সপ্তাহে যাবো। পুলিশ বলে ঘেন্না করবে না তো ? পত্র শেষের যা তা তোমার কাছে গিয়ে জানাবো, কেমন ? ইতি। বিপুল।

পুলিশের লোক! হঠাৎ যেন হোঁচট খায় সুতপা।

ধেরা! আগে জানলে ধেরা হতো। কিন্তু ধেরার কি অবসর দিয়েছে বিপুল। কিছু কি বাকী রেখেছে! মনের মধ্যে তোলপাড় করে বিপুলের কথাগুলি। যে বাপ সমস্ত জীবন পুলিশের বিরুদ্ধে লড়াই করে আজো আত্মগোপন করে আছে তার কাছে বিপুলের এই পরিচয় দিতেও ভয় হয় সুতপার। বাবা একদিন বলেছিলেন, ছেলেটা আসছে না, একবার খোঁজ নেব নাকি, মা? সুতপা বলেছে, না থাক।

এরপর বেশ কয়েকদিন ধরে ভাবল সুতপা। বিপুলকে প্রায় সব কথাই বলা হয়েছে। যা কোনদিন কাউকে বলবে ভাবে নি তাও সুতপা প্রকাশ করে ফেলেছে কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে। সেদিন তেমনি এক দুর্বল মুহূর্তে বিপুলের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে সুতপা বললে, এত সব জেনেও আমাকে সহ্য করতে পারবেন? মায়ের জীবনে একদিন একটু কলঙ্ক লেগেছিল, মৃত্যু তার প্রায়শ্চিত্ত করিয়েছে। আর আমাদের গোটা সংসারটাই তো অভিশপ্ত! আপনি নিজে কেন জড়াবেন?

বিপুলের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, সু, জীবনে ভাঙাগড়া আছেই, অত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? তোমরা তো আর সত্য সত্যই এমন অবহেলিত ছিলেনা, তোমরা তো জাত বাউল নও।

—আমরা বাতুল হ'য়ে গেছি, বিপুলবাবু। আমাদের সমাজ নেই, কোন সংসার নেই, মান, সম্ভ্রম, ভালবাসা কিছু নেই। আমরা বানের জলে খড় কুটোর মত ভেসেই চলেছি। কেউ আমাদের ডাকেনা; ডাকলেও আমরা সাড়া দিতে পারিনে।

বিপুল লক্ষ্য করল, সুতপা আজ যেন বেশি অস্থিরতা প্রকাশ করছে। বললে সে, সু, আজ তোমার মনটা ভাল নেই, তুমি শান্ত হও। তোমার অভাব কিসের? তোমার রূপ আছে, গুণ আছে, প্রাণ আছে—

কিছু নেই, বাধা দিয়ে বললে সুতপা, আমার মাকে যদি আপনি দেখতেন, কি রূপ কি লাবণ্য! সে বলে বোঝান যায় না। যেন অভিশপ্ত কোন দেবী ধরায় নেমে এসেছিলেন! আর তেমনি তার হৃদয়। কিন্তু কি হ'ল? সেই রূপ গুণ হৃদয়ই শেষে তার কাল হ'ল। আমার নিজের দিকে তাকিয়ে আমার ভয় হয়, বিপুলবাবু। বাবা বলেন, আমাকে নাকি ঠিক মায়ের মতই দেখতে!

বিপুল সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে পায় না। কেবল বললে, মার মত স্ত্রী নিয়ে যে মেয়ে জন্মে সে তো ভাগ্যবতী। দেখি, সুতপা, তোমার মায়ের সেই ফটোখানা।

সুতপা ফটো দেখায়। মা'র কোলে এক বালক সন্তান। এক দৃষ্টি চেয়ে থাকে বিপুল সেই দিকে। সুতপার বাবাই এই ফটো তুলেছিল। এ বাড়িটও তাঁর ছিল! আশ্চর্য! বিপুল কি মনে করে বললে, সুতপা আমি তোমাকে এই বনবাসে থাকতে দেবোনা না না, কিছুতেই না!

কি করতে চান?

আমি তোমাকে নিয়ে যেতে চাই।

রঙিন চোখে আমার বাইরের দিকটাই দেখছেন আপনি কিন্তু—

কিন্তু নয়, সুতপা। আজ তোমার বাবার সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার—

তিনি আজ চৌধুরীদের বাড়ীতে গেছেন। ফিরতে রাত হবে।

রাত করে বাসায় ফিরল বাউল। সুতপাকে ডেকে বললে, ছেলেটির সঙ্গে আজ দেখা হল। একটু কি রকম যেন উন্মনা দেখাচ্ছে বাউলকে। একতারার তারটি গেছে ছিঁড়ে। চোখ মুখ উঠেছে ফুলে, রক্তাক্ত। সুতপা বললে, হ্যাঁ এখানেও এসেছিল।

ছেলেটি পুলিশের ইনসপেক্টর তুমি জানতে?

হ্যাঁ—

জেনেও প্রশ্রয় দিলে?

তখন জানতুম না—

বাউল বাধা দিয়ে বললে, সব কথা বলেছ তাকে ?

আর্তস্বরে সুতপা কেবল বললে, বাবা !

হুঁ, বাউল বললে, চল পাততাড়ি গুটোই এবার। অন্য কোথাও চল যাই।

কেন বাবা তাকে সন্দেহ করছ ? সব মানুষ তো আর এক নয়—

বাউল গম্ভীর হ'য়ে উত্তর দেয়, আমার মাথার দাম

সুতপা নিশ্চুপ।

জীবনে আমার দুটো কাজ মাত্র বাকী ছিল, বাউল বলতে থাকে, এক, তোকে পাত্রস্থ করা। আর আরেকবার পিস্তল ধরা—

কেঁপে ওঠে সুতপা ! বাউল বলতে থাকে, কিন্তু তা বুঝি আর হল না।

ঐ বিপুলকে দেখলাম ভবতোষের ঘরে দোতলায় বসে চা খাচ্ছে। আজই নয়, কিছুদিন থেকেই দেখছি। পুলিশের বড় কর্তাও আসে ওখানে। মনে হচ্ছে ভবতোষ চৌধুরী এতদিনে আমাকে চিন্‌তে পেরেছে। জানো, সুতপা, ছেলে-ধরা বলে আজ তার বাড়ী থেকে চাকর দিয়ে আমাকে তাড়িয়ে দিলে। অতীকে পর্যন্ত দেখা করতে দেয়নি। আজ কোথাও ভিক্ষা মেলেনি। যেখানেই যাই, বলে, ছেলে-ধরা এসেছে—বলতে বলতে চোখ লাল হয়ে ওঠে বাউলের। ঘন ঘন শ্বাস ; বুকের পাঁজর ভেঙে হৃৎপিণ্ডটা বেরিয়ে আসতে চায় যেন। সুতপা চোখ নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সেই থেকে বিপুলের মনেও শান্তি নেই। সুতপার আরক্ত নধুর দুটি মুহূর্তের জন্যেও সে বিস্মৃত হতে পারেনা। এ কোন পরীক্ষা ! ভবতোষবাবু তাকে যা বলেছে, সুতপার কাছ থেকে যা সে জেনেছে, সরকার সুতপার মা'র যে ফটো রেখেছে এবং সুতপার ঘরে যে ছবি সে দেখেছে তাতে শংকিত হয়ে উঠল ইন্‌সপেক্টার বিপুল সোম। সত্যিই তাবা যায় না, এই বাউল বেচারী ছ'বছর আগেকার এক ফেরারী খুনী আসামী যার জন্যে গভর্নমেণ্ট বিশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এতদিনেও একে গ্রেফ্‌তার করা সম্ভব হয়নি। বিপুলের সামনে বিরাট ভবিষ্যৎ, প্রভূত অর্থ, অচিরাৎ প্রমোশন আর ভবতোষের প্রস্তাবিত বহুমূল্য উপহার সম্পত্তি ! অন্য দিকে বিপদ সমুদ্রের তালাকূলে দাঁড়িয়ে সুতপা তাকে ডাকছে ! সুতপা, তুমি এ কোন পরীক্ষায় ফেললে। আমিও তো মানুষ। কয়েকদিন থেকে ক্রমাগত ভাবছে বিপুল। আজ থানায় বসে ভাবছিল। সহসা ভবতোষ চৌধুরী এসে বললে, চট্‌পট্‌ তৈরী হয়ে বেরিয়ে আসুন মিঃ সোম। ওয়ারেণ্ট সঙ্গে নিন্ অথবা এমনিতেই চলে আসুন। আসামী পালাবার মতলব করছে। কুইক্ মিঃ সোম। ভবতোষের গরজের নৌকো আজ ডাঙায় চলবার উপক্রম হয়েছে।

বিপুল কি বলতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে বললে ভবতোষ, শুনবার সময় নেই, নেক্ষ্ট্ হেই। জমিদার ভবতোষ অস্থির হয়ে ওঠে।

জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করা চলে না। এই চল্লাভাঙাটাই বলতে গেলে, ভবতোষের হাতের মুঠোয়। অতএব দুই সিপাই নিয়ে ভবতোষের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল বিপুল। এক কর্তব্য বলছে, এগিয়ে চল আরেক কর্তব্য বলছে, থামো, কিন্তু বিপুলের সাধ্য কি সে থামে। গ্রামের মধ্যে এমন একটা খুনী আসামী আত্মগোপন করে আছে ভবতোষ তা সইতে পারবে না। এ দম্ভ থাকে সমাজের এই খুনকে দূর না করতে পারলে তার আর শান্তি নেই। ভবতোষের সঙ্গে দ্রুতগতিতে বিপুল সোম এগিয়ে চলে।

সুতপারা তন্ত্রীতল্পা গুটাতে ব্যস্ত ছিল। আজ আর ঘুং ঘুং শব্দ নয়, সুতপার নাম ধরেই বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকল বিপুল। বলল, আমি উপায়হীন, সুতপা। তোমার বাবাকে আমাদের সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

সুতপা একটি কথাও বললে না। কেবল পিতাকে প্রণাম করে ঘরের মধ্যে গিয়ে সে খিল এঁটে দিল। ভবতোষ বিপুলকে পৌঁছে দিয়েই অনেক আগেই চলে গেছে।

ওরা তখন বাউলকে গ্রামের পথ দিয়ে থানার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। দূর থেকে ভবতোষ ছেলেদের দৌড়িয়ে দিতেই 'ছেলে-ধরা', 'ছেলে-ধরা বলে তারা বাউলের পিছনে পিছনে হাত তালি দিতে দিতে এগিয়ে চলল। গ্রামের বৌ ঝিরা বারান্দা থেকে, রান্নাঘরের বেড়ার ফাঁকে উঁকি দিয়ে বন্দী বাউলকে দেখে পরস্পরে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে। চৌধুরী বাড়ীর সদর রাস্তা দিয়ে যখন ওরা এগিয়ে চলেছে তখন চীৎকার করে কেঁদে উঠল অন্তি—ওকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমি বাউলের কাছে যাব। ভবতোষ ধমক দেয় অন্তীকে। পথ চলতে চলতে ঘ' মেরে দাঁড়িয়ে থাকে গ্রামবাসীরা। বলে, কার মধ্যে যে কি আছে কে জানে। অবাক হয়ে চলে, চলতে চলতে পিছু ফিরে তাকায়। বন্দী বাউল চলেছে।

সারা গ্রামে দু'দিন ধরে বাউলের সম্পর্কে পথে ঘাটে কত বিচিত্র আলোচনা চলল। দুধ কলা দিয়ে গাঁয়ে এতদিন তারা সাপ পুষেছে। গান গায়, হরিনাম করে, সবাই ভেবেছিল ভক্তচূড়ামণী! যাক শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল এই যা রক্ষা। ভবতোষবাবুই গ্রামকে বাঁচালেন! তা না হলে কি হ'তো বলা যায় না।

সেই গ্রামবাসীদের চমকে দিয়ে স্বয়ং ভবতোষ চৌধুরীকেও একদিন আকস্মিক ভাবে পুলিশে বেঁধে নিয়ে শহরে চালান করে দিল। হাট বাজারের মানুষ মাথায় হাত দিয়ে ব্যাপারটার রহস্য খুঁজতে পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করে অবশেষে মন্তব্য করে, কার মধ্যে কি আছে কে জানে! কোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। মানুষের মন সহর মুখী হ'য়ে আছে। কৌতূহলের সীমা নেই অন্ততঃ এ খবর যখন পাওয়া গেছে যে বাউলের মামলার ব্যাপারেই ভবতোষ চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারপর একদিন চম্পাডাঙ্গার মানুষগুলি ভেঙে পড়ল শহরের আদালত কক্ষে। মামলার প্রকাশ—ফেরারী আসামী বাউলের প্রকৃত নাম শ্যামানন্দ—এক কালের গুপ্ত সমিতির বিপ্লবী শ্যামানন্দ। আত্মগোপন করে দার্জিলিংয়ে সে সংসার পেতেছিল ভুটিয়া পল্লীর মধ্যে। সেখানেই প্রবাসী ভবতোষের সঙ্গে তার পরিচয়। ভবতোষের চরিত্র দোষের জন্যেই তার সাধ্বী স্ত্রী আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। তথাপি উচ্ছৃঙ্খল ভবতোষ চরিত্র সংশোধন করতে পারলো না। একদিন, সুতপা তখন তার মামাবাড়ী, শ্যামানন্দ বাড়ী ফিরে স্ত্রীকে ঘরে অনুপস্থিত দেখে ভবতোষের বাড়ীতে খবর নিতে যায় এবং গিয়ে দেখে মদ্যপ ভবতোষ পাশবিক উন্মাদনায় শ্যামানন্দের স্ত্রীকে আকর্ষণ করে শয্যার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পাশে শায়িত শিশুপুত্র অন্তী। চক্ষের পলকে পকেট থেকে পিস্তল বার করে ভবতোষ লক্ষ্য করে দু'দুবার গুলি ছুড়ল শ্যামানন্দ। কিন্তু গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে তার স্ত্রীর মৃত্যু ঘটায়, ভবতোষকে রক্ষা পেয়ে যায়। অন্তী শ্যামানন্দেরই ছেলে। ফটোও তাই প্রমাণ করে। ঐ ছেলেটার টানেই ঘুরতে ঘুরতে ছয় বৎসর পরে শ্যামানন্দ কন্যা সুতপাকে নিয়ে চম্পাডাঙ্গার পার্শ্ববর্তী প্রান্তিয় এলাকায় এসে বাউলের ছদ্মবেশে ঘর বাঁধে। পরবর্তী সংবাদে জানা যায়, বিচারক শ্যামানন্দের বাঁধানো স্মৃতি-কথায় পাণ্ডুলিপিকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। ভবতোষ চৌধুরী অন্তীকে নিজের ছেলে বলে গ্রামবাসীদের কাছে যে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছে, এ কথা আদালতে সে স্বয়ং স্বীকার করেছে।

ওদিকে সুতপা এতদিন কোথায় ছিল কেউ জানতোনা। শ্যামানন্দের মামলার খরচ জোগায় কে তাও কেউ জানেনা। আদালতে শেষের দিন মামলার ফলাফল জানতে লোক সমাগম ঘটেছে

এ চাকরী আমি
সে আর করবে না। সুতপা পরিষ্কার গলায়
বিপুল সোম একখানি চিঠি
করে সুতপার দিকে এগিয়ে
ধরার এই চিঠিতে তাঁর মতামত
পড়।
দ্রুত চিঠিটা পড়ে নিয়ে সুতপা নীরব হয়ে যায়।
অতীর চুলগুলির উপর আঙুল বুলাতে থাকে
বিপুল বললে, পড়লে ?
'হ্যাঁ, চোখ ছাপা ছাপা হয়ে
বললে, এই মুহূর্তে কিছু ভাবতে পারছিনা।
ধীরে ধীরে অতীকে নিয়ে বাইরে
সুতপা। বিপুল হাই দাঁড়িয়ে রইল
জানালাতের পাশে বসে গাছটায় কাক ও কোকিলের কলগান
শ্রবণে হয়ে চলে।

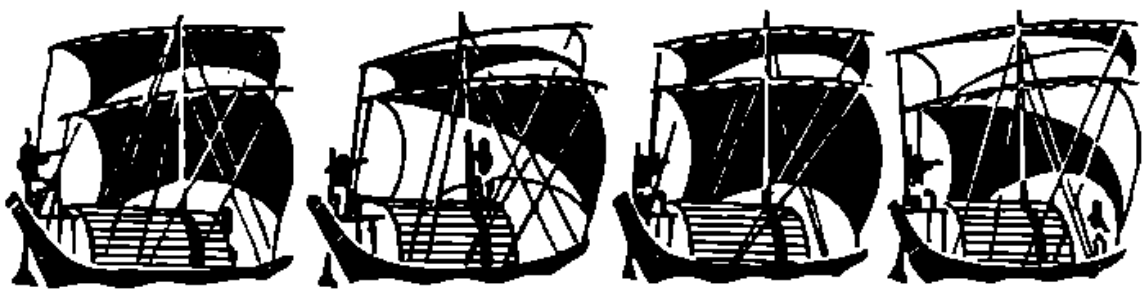

গান্ধীজির সাধনা

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

ভারতের অন্যতম রহস্যগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতে মানব সাধনার কয়েকটি পন্থার উদাহরণ আছে। নরনারী আপন রুচিভেদে ঋজু কুটিল এই সমস্ত পথের যে কোন একটির অনুসরণ করিতে পারে। এইরূপ উদাহরণে ভূমিকা প্রস্তুতপূর্বক মহর্ষি গোপীগণের সাধনায় মানবের চরম ও পরম পন্থার নির্দেশ দিয়াছেন। ব্যক্তি অথবা জাতিকে, জন অথবা গণকে, গ্রাম জনপদ রাজা অথবা জগৎকে কেমন করিয়া ভালবাসিবার অভ্যাস ভালবাসিতে হয়, সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিলে আপনার বলিতে যাহা কিছু সর্বস্ব বিসর্জন দিলে কেমন করিয়া ত্যাগের পথেই অভীষ্ট অর্জিত হয়, ব্রজ গোপীগণ তাহার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। যে মহাভাবস্বরূপিণীর চরণ চিহ্ন অনুসরণ পূর্বক গোপীগণ

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহারই আংশিক বিকাশে কপিলাবস্তুর রাজাবরোধে, জেরুজালেমের সূত্রধর গৃহে, আরবের মরু প্রান্তরে এবং গুর্জরের সুদামা পুরীতে এক একটি অভিনব আদর্শের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল। পৃথিবীর নানাদেশে আরো কত নর নারীর জীবনে এই মহাভাব অংশে কলায় সুবিকাশিত হইয়া উঠিয়াছে, ইতিহাস তাহার বৈচিত্র্যপূর্ণ পরিচয়ের অনেক আলেখ্যই অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা আজ মহাত্মাজীর কথাই আলোচনা করিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতে ধ্রুব এবং প্রহ্লাদের উপাখ্যান লিপিবদ্ধ আছে। উভয়ে বালক বয়সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পঞ্চম বর্ষীয় বালক ধ্রুব: তাঁহার তপস্যা যেমন তীব্র, চরিতার্থতাও তদনুরূপ। ধ্রুবকে কঠোর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে হইয়াছিল। ধ্রুবের তপস্যা ক্ষেত্র মধুবন, অবশ্য স্বয়ং মাছোয়া তাঁহার আনুকূল্য করিয়াছিল। প্রহ্লাদের সাধনা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। তাঁহার সাধনার স্থান শত্রুপুরী। সেখানে তাঁহার আপনার জন বলিতে কেহ ছিল না। প্রহ্লাদ সসাগরা ধরার অধীশ্বর হিরণ্যকশিপুর পুত্র, কিন্তু পিতাই তাঁহার প্রধান শত্রু, এবং অপরিমেয় শক্তিশালী শত্রু। প্রহ্লাদ বালক, প্রহ্লাদ রাজ্যলিপ্সু নহে, রাজ্যে কেহ তাহার সহায়ক নাই, প্রহ্লাদ ষড়যন্ত্র কাহাকে বলে জানে না। পৃথিবীর কোন কিছুকেই প্রহ্লাদ শত্রু বলিয়া মনে করে না। এমনকি শত্রুতা প্রহ্লাদের চিন্তারও অতীত, তথাপি পিতা তাহার শত্রু, কারণ প্রহ্লাদ কৃষ্ণভক্ত। পিতা হিরণ্যকশিপু তাহাকে কৃষ্ণবিমুখ করিতে চাহে, কৃষ্ণ নাম ভুলাইতে চাহে। হিরণ্যকশিপুর আদেশে দুইজন প্রচণ্ড অধ্যাপক ষণ্ড ও অমর্ক প্রহ্লাদকে কৃষ্ণ বিমুখ করিতে, কৃষ্ণ নাম ভুলাইতে ব্রতী হইয়াছে। হিরণ্যকশিপু একদিন শিক্ষার সুফল পরীক্ষার জন্য প্রহ্লাদকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল কিরূপ অধ্যয়ন করিতেছে। প্রহ্লাদ বলিলেন শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ, কীর্তন, তাঁহার নাম স্মরণ, শ্রীকৃষ্ণের পাদসেবন, অর্চন, তাঁহাকে বন্দনা, তাঁহার দাস্য, তাঁহার সহিত সখ্য, তাঁহাকে আত্ম নিবেদন, এই নানাবিধ ভক্তি সাক্ষাৎভাবে শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণপূর্বক অনুষ্ঠানের নামই উত্তম অধ্যয়ন। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের উত্তর শুনিয়া ক্রোধে আত্মহারা হইয়াছে। অতঃপর যে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছে, দানবোচিত বলিলেও তাহার প্রশংসা করা হয়। মত্ত হস্তীর পদতলে নিক্ষেপ করিয়া, পর্বত শৃঙ্গ হইতে ভূতলে আছড়াইয়া, বিষপান করিতে দিয়া এবং

অনন্ত অগ্নিকুণ্ডে ফেলিয়া হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে কৃষ্ণনাম ভুলাইবার অশেষ চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু কোনরূপেই কৃতকার্য হইতে পারে নাই।

মহাত্মা গান্ধীর জীবনে এই ধ্রুব প্রহ্লাদের সাধনার বিস্ময়কর সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছি। ধ্রুবের রাজ্যলিপ্সা ছিল। তিনি পরম পুরুষের আরাধনা করিয়াছেন, তাঁহার সাক্ষাৎকারও লাভ করিয়াছেন, তথাপি সাগরাম্বরা ধরণীর একাধিপত্যের কামনা তিনি ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াও আপন সর্বোচ্চ লোক স্থিতির চিন্তা তিনি ভুলিতে পারেন নাই। রাজরাণী হইয়াও যিনি অবজ্ঞাতা, পিতৃ-অনাদৃতা সেই জননীর মুখচ্ছবিই ধ্রুবের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। গান্ধীজীও নিষ্কাম ছিলেন না। তাঁহার কামনা ছিল—প্রথম কামনা মানবতার মর্যাদা রক্ষা। মানুষের যাহা প্রাপ্য সর্বদেশে সর্বকালে তিনি তাহারই অধিকার রক্ষণে যত্নবান ছিলেন। এ কামনা ব্যষ্টির নহে সমষ্টির; ব্যক্তির নহে জাতির নহে সব মানবের মুক্তি কামনা। আমার মনে হয়, ধ্রুব জননী সুনীতির মত ভারত জননীর মলিন মূর্তিই গান্ধীজীর গতিপথ নিয়ন্ত্রণে অগ্রবর্তিনী হইয়াছে।

মহাত্মাজীর দীক্ষাগুরুর নাম জানি না। তবে তিনি যে রামচন্দ্রের উপাসক, তিনি যে বৈষ্ণব, শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতার মহাবাণীই তাঁহার প্রধান পথ প্রদর্শক, একথা বেশ ভালভাবেই জানি। এ জীবনের তপস্যা ক্ষেত্র শান্তরসাস্পদ মুনি তপোবন নহে, নির্জন গিরি গুহাও নহে। হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল ভীষণ অরণ্য হইতেও ভয়াবহ শত্রুপুরীই গান্ধীজীর সাধনার স্থল। দক্ষিণ আফ্রিকাকে শত্রুপুরী বলিলাম—গান্ধীজী কিন্তু কাহাকেও শত্রু বলিয়া মনে করিতেন না। রাক্ষস হইতেও ক্রূর, দানব হইতেও নিষ্ঠুর, প্রেত হইতেও প্রতিহিংসাপরায়ণ যে বর্বর বুয়র তাঁহাকে লগুড়-পদ-তাড়নে আঘাতের আঘাতে পুতচেতন করিয়া পথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ফেলিয়া দিয়া অবহেলা ভরে পবিত্র পতিতে চলিয়া গিয়াছে, সেই বীভৎস পিশাচের বিরুদ্ধেও গান্ধীজীর কোন বিদ্বেষভাব ছিল না। এইরূপ মরণাধিক যন্ত্রণার মধ্যেও কোন দিন কোন অসতর্ক মুহূর্তেও তিনি আত্মরক্ষার জন্য অঙ্গুলী মাত্র উত্তোলন তো বহুদূরে, একটী প্রতিবাদ বাক্যও উচ্চারণ করেন নাই। আততায়ীর গুলিবিদ্ধ হইয়াও মরণের পূর্বক্ষণে "হারাম" এই মন্ত্রোচ্চারণে যিনি আপনার সমগ্র জীবনের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় চেতনা লোপের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সেই রাম নামই তাঁহার একমাত্র সম্বল ছিল। প্রহ্লাদের সাধনার দ্বিতীয়াংশ প্রথম আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল—পাঁচশত বৎসর পূর্বে একদিন বাঙ্গালী সাধক ব্রহ্ম হরিদাসের জীবনে। তাহার পর দ্বিতীয় প্রকাশ দেখিলাম এই সেদিন একজন ভারতীয় তাপস মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর আত্মনিগ্রহে। পৃথিবীর ইতিহাসে বর্তমান দিনে এ দৃশ্য একেবারে নূতন। এই দৃশ্য দেশ হইতে দেশান্তরে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিলেও সর্বাগ্রে একজন বাঙ্গালী কবিই গান্ধীজীর উদ্দেশে প্রকাশ্যে বন্দনা বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন—
(কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

বারণ যাদের ওঠা ফুটপাথে, তাদের স্বজাতি হ'য়ে,
ফুটপাথে ওঠা পথ যে করিল গোরার চাবুক খেয়ে॥
মার খেয়ে পথে মূর্চ্ছা গিয়েছে, পথ যে ছাড়েনি তবু,
বারে বারে যার জরিমানা করে হার মেনে গোরা প্রভু।
রদ করে বদ্ আইন চরমে রেহাই পেয়েছ তবে,
বীরত্বে বীর সেরা পৃথিবীর নেই জোড়া নেই ভবে।

তপস্যা সকলকেই করিতে হয়। প্রকৃত সাহিত্যিক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, রাজনীতিবিদ্ সকলেরই জীবন সাধনার জীবন। যিনিই মহান্ আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন, মহৎ কার্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহাকেই সুকঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইয়াছে। কিন্তু গান্ধীজীর মত জীবন শিল্পী দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানুষ নিজেকে নিজে কত সুন্দর, কত মধুর, কত বিভূতিময়রূপে গড়িয়া তুলিতে পারে, আপনার চেষ্টায় আত্মোন্নতির অভাবনীয় মহান অভ্যুদয়ের গৌরবোজ্জ্বল শিখরে আরোহণ করিতে

পারে, মহাত্মাজীর জীবন তাহার অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থল। কোনরূপ অতিশয়োক্তি করিতেছি না, কাল্পনিক কোন কিছু আরোপ করিতে চাহিতেছি না, প্রকৃত সত্য বলিয়া যাহা অনুভব করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহাই বিবৃত করিতেছি।

কৃপাময় পুণ্যাত্মার এই রূপ শুধু যেদিন কৃষাণের বেশে ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সেদিনের বুদ্ধিমানগণের অবজ্ঞা উপেক্ষার কথা স্মরণ হইতেছে। তারপর তিনি যেদিন কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া উচ্চারণ করিলেন—"অয়মহং ভো" আমি আসিয়াছি সেদিনের মানুষের ভীতিবিহ্বলতার কথাও ভুলিতে পারিতেছি না। ভারতের জনসাধারণ কিন্তু তাঁহাকে চিনিয়া লইতে, আপনার জন বলিয়া বরণ করিতে একটী দিনও বিলম্ব করে নাই। তিনি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—"ম্যয় যব চলেঙ্গে তামাম দুনিয়া উথল যায়েঙ্গে"। বারবার আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার প্রতি পদক্ষেপে ভারতের জন সমুদ্র উত্তাল হইয়া উঠিয়াছে। মহাত্মাজী চলিয়াছেন, চলিতে চলিতে পথ ভুল হইয়াছে, অথবা অনুবর্তিগণ ভুল করিয়াছে, তিনি ভুল স্বীকার করিয়াছেন।

ভারতব্যাপী আন্দোলন পলকে স্তব্ধ করিয়া দিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। তিনি মনে প্রাণে ভারতীয় ছিলেন, ভারতীয় সাধনার ঐতিহ্য পরম্পরার ধারক ও বাহক ছিলেন। মাত্রের প্রয়োগ ও সংচার তেমনই অব্যর্থভাবেই তাঁহার অধিগত ছিল।

এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চই তিনি কর্মক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তিনি সুদক্ষ রাজনীতিবিদ ছিলেন। সেই সঙ্গে এ কথাও ভুলিলে চলিবে না যে তাঁহার জন্মস্থান এবং কর্মস্থান ছিল পরপদানত ভারতবর্ষ। সুতরাং পরাধীনতার সকলপ্রকার অসুবিধাই তাঁহাকে লঙ্ঘ করিতে হইয়াছিল। অশেষ প্রকারে বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তথাপি, অনেক অচিন্তনীয় দুর্ভোগের মধ্যে পতিত হইয়াও তিনি কখনো উপেয় এবং উপায় এর মধ্যে পার্থক্য অবলম্বন করেন নাই। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে অহিংস সত্যাগ্রহ আপন ব্যক্তিগত জীবনে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে সেই মহান আদর্শকে ব্যাপক রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে সফলকাম হইয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা উপেয় যেমন মহৎ ছিল,

সেই লক্ষ্য লাভের পন্থা বা উপায়ও তেমনই বিশুদ্ধ ছিল। অনেকে মনে করেন উদ্দেশ্য যদি সৎ হয়, তবে তাহা লাভ করিবার জন্য অসৎ পথ অবলম্বন করাটা অন্যায় নহে। যেন তেন প্রকারেণ অসাধু উপায়েও সাধু লক্ষ্যে পৌঁছিলেই কার্যসিদ্ধি। ভারতের গর্ব ও গৌরবের কথা আধুনিক দিনে জন্মগ্রহণ করিয়া, আধুনিক বাতাবরণে বর্দ্ধিত হইয়াও মহাত্মাজী ইহার বিপরীত মত পোষণ করিতেন। রাজনীতিবিদ্ হইয়াও তিনি সৎ লক্ষ্যে উপস্থিত হইবার জন্য সাধু উপায়ই অবলম্বন করিতেন। শাসন ও শোষণে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, পাশ্চাত্য সভ্যতানুমোদিত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পরপীড়নে অভ্যস্ত, কূটনীতি ধুরন্ধর শস্ত্রপাণি যুটিশের সঙ্গে অসম সংঘর্ষেও তিনি কোনদিন বিপথে পদার্পণ করেন নাই। গান্ধীচরিত্র জটিল, মস্তিষ্কসম্বল মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য, তথাপি একথা সত্য তিনি অকপট, তাঁহার আচরণ এবং জীবন পারদর্শপ্রথিত ভাস্বর দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। বাঙ্গলার প্রেমবিগ্রহ শ্রীমন্ মহাপ্রভু যেমন তাঁহার পুণ্য সংস্পর্শে আসা মানুষের প্রকৃতিকেই পরিবর্তিত করিয়া দিতেন মহাত্মা গান্ধীও তেমনই পাশবপ্রকৃতি দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর হৃদয়ের পরিবর্তনই প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার সংস্পর্শে বহু লোহ কাঞ্চন হইয়াছে। অনেক দুষ্কৃতাচারও সাধু হইয়াছে। অসংখ্য পশু মানুষ হইয়া গিয়াছে। মহাত্মাজীর সাধনা-সার্থক জীবন পৃথিবীকে দান করিবার মত বর্ত্তমান দিনে ভারতের এক শ্রেষ্ঠ অবদান।

নববর্ষকে

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

অগোণা অনেক মুহূর্ত্ত গেছি এঁকে—
নীড়হারা পাখি,—বিগত বর্ষ ধ'রে।
ব্যথার সাগর অমথিত র'ল তবু,
তৃষার সরিৎ কৃশ করে দিন দিন।
ব্যথা হ'ল মোর রঙিন্ স্বপ্ন-তুলি—
তৃণা দহে মোর অদাহ্য হৃদয়েরে,
প্রেম যে আমার প্রজ্ঞা-ছদ্মবেশে
ছলিছে আমার মানসপ্রিয়ার ছবি।

নতুন বরষ আগত আজ
গড়িতে নবীন জীবন বেদ—
তীক্ষ্ণ সে-বাণ নির্ম্মমতায়
ছিঁড়িবারে চায় শাবক-প্রাণ!

হে নববরষ, আসিলে আজিকে বৈশাখী খরদিনে—
সারাটা বছর ছড়াবে কী পুনঃ তপ্ত সূর্যজ্বালা?
প্রেম যে আমার কোমল পুষ্প—শুষ্ক ক'রো না তারে
তীক্ষ্ণ প্রেমিকের ভয় ভাঙো তুমি বসন্ত-চুম্বনে।
হে নববরষ, বৈশাখে নহে নহে—
ফাল্গুনে এসো আমার কুটীর-তলে॥

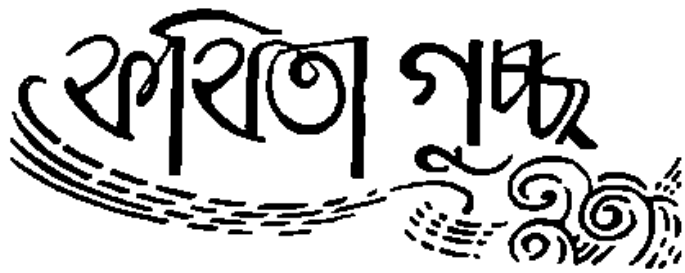

উচ্চবিত্ত

নগেন্দ্র দত্ত

খায় দায় ভালো,
দেহখানা দেখতে শাঁসালো,
শেয়ারেতে টাকা খাটে,
ডিভিডেন্ট বাঁটে।
রাজটিকা জলজ্বল,
মহাজনী যুগের ললাটে।
মধ্যম কেজি জে,
বড় ছেলে ভক্তিস্তুতি করে।
জ্যেষ্ঠতাত ডিপ্লোম্যাট,
বুড়োকর্তা নাম জপে
শিবের মন্দিরে।
কনিষ্ঠটি ব্যাঙ্কের কেরানী।
বংশের নাম-ডোবা পাল-ছেঁড়া
ভগ্ন তরণী।
'জিন্দাবাদ' বলে।
এ যুগের আন্দোলিত ঢেউয়ে
যত্রতত্র দোলে।
অকস্মাৎ দেয়ালেতে চীড়,
জনতার কণ্ঠের ভীড়।
আকাশ মুখর হয়
শঙ্খ-ফণা মেলে।
কালোছায়া গিন্নীমার
রঙীন কপোলে।
থর্ থর্ কলাপাতা,
বেহদ্দ বাতাসে।
হাপরে হাঁপানী ওঠে
দ্রুততাল ক্ষুব্ধ হতশ্বাসে।
কাল রাত্রি,
বিদায়ক নিশ্বাস,
বাসরে বেহুলা জাগে
নিদ্রাহীন চোখে।
বাসুকীর তীব্র ফণা ছোবল-ঝোঁকে ওঠে,
নির্মম ফলকে।
অন্তিম প্রহর কাঁপে,
তারকার গায়।
কে বাজায় অচেনা পুরবী
এ যুগের ঘুমন্ত সন্ধ্যায়?
ধর্মঘট,
শেয়ারের মূল্য পতন।
জীবনের নব মূল্যবোধ,
সজাগ চেতন।

চৈত্রবন

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

একদিন এখানের ছায়া-ছায়া পলাশের বনে
সে কী আগুনের খেলা! সুললিত সুরের ঝংকার
কোকিলের কলকণ্ঠে, ফুলে ফুলে রঙের সম্ভার;
ছিলো এ-কাননভূমি মুখরিত মধুপ-গুঞ্জনে।
সেদিন ফাগুন এসে করে গেলে উদাসী এ-মনে
বসন্ত বনের বাণী, প্রেম-ভীরু মাধবী লতার
ঘোমটায় সলাজ আঁখি; ম্লানমুখী রজনী গন্ধার
পত্রপুটে ভরে দিলে সোহাগের সুরভি-সিঞ্চনে।
তোমার হৃদয়-মধু আজো যেন রয়েছে ছড়ানো
সবখানে। তোলেনি তো পাতা-ঝরা এই চৈত্র দিন
তোমার সংলাপ সুর; বনভূমি এখনো বাঙ্ময়—
বায়ুর মর্মরে তার সেই স্মৃতি রয়েছে জড়ানো;
ঘাসে ঘাসে আঁকা আছে তোমার ধূসর পদচিন;
তুমি শুধু চলে গেছো, রেখে গেছো অপার বিস্ময়।

তৃণাস্তীর্ণ

সন্তোষকুমার অধিকারী

অন্ধ তিমিরে আকাশ যায় না দেখা
হাহাকারে কাঁদে বর্ষার তবা রাত,
প্রত্যাশা নেই, বেদনার মসীলেখা।
তবুও রয়েছে তৃণাস্তীর্ণ মাঠ।

দূরবীনে কাচ আশায় রাত্রিয়ে তুলতে
দোষ কি? না হয় দুর্যোগ কাটবেনা;
তবুও পারবো শ্রাবণের দিনে ভুলং
নাইবা নতুন আশ্বিনে হ'লো চেনা।

রামধনু চোখে যদিই না পড়ে ধরা
জীবনকে তবু ব্যর্থতা নাই দিলে,
এ শুধু নিবিড় নিকষ নিতল কালো
তবু ত ছোঁয়নি হতাশার গাঢ় নীলে।
ইজেলের বুকে সবগুলো রঙ্ ঢেলে
নীল হ'য়ে ওঠা রাত্রিকে কোথা পেলে?
আশা নাই থাক্, আশার স্বপ্ন বুনে
দিনটা কাটাই রাত্রিকে গুণে গুণে;
তারপর যদি শ্রাবণের কালো রাত
তবু ত রয়েছে তৃণাস্তীর্ণ মাঠ!

গ্রেসিয়ারের প্রার্থনা

শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

মৃত্যুর দিনে ভুলে যাওয়া এ-জীবনে
চেয়েছি তোমার করুণা-কণার তাপ,
কত ফাল্গুন উজ্জ্বল স্পন্দনে
ঝরে গেছে, মনে রেখে সুগভীর ছাপ।

শাদা তুষারের এ-মরু শয্যা নাও
একটি নিদাঘে হে সাগর শুধু দাও
হৃদয়-বাষ্প মেঘে মেঘে প্রাণ-লীলা।
হোক অহল্যা—প্রাণময়ী উর্বিলা।

অনেক পাথরে আখর ফেটেছে কবি
পায়নি আমার গহন মনের ছবি।

অনাদি কালের বৈধব্যের ভার
মাথায় চাপানো ভালো নয় বিধাতার।

উষাকে শিশুরা জানায়, "রয়েছে পথ
নব জগতেও অমর ভবিষ্যৎ।"

তাই তোমাকেই বঞ্চিত পৃথিবীর
একক লক্ষ্যে ভেবেছি ধ্রুব ও স্থির।

জানি চাঁদ দেবে সংশয় ঘোলা চোখে
কারো দান তুমি নাও নি তো মাথা পেতে।

উৎসের নাচে নদী-তরঙ্গে গান
পাঠাবো তোমাকে, রাখবোই সম্মান।

কুমারী-মনের শত কামনার তারা
সাহারা-বুকেও আনে যে প্রাণের সাড়া।

ফুলে আর ফলে ভরে দেব বনভূমি,
হে সাগর, দাও হৃদয়-বাষ্প তুমি।

জীবন ও মৃত্যুর কবিতা

শ্রীআশুতোষ পাল

দুঃস্বপ্নিল আকাশের সন্ধ্যা-অবসাদী প্রত্যাশায়
কাশবন-ঢেউ লাগা রাত্রির করুণ হাতছানি.
মৃত্যুর বিহঙ্গ ওড়ে দিনের আকাশে : একখানি
নিথর হিমেল হাত কেঁপে ওঠে হাওয়ার হাওয়ায়।

সূর্যরাঙা আকাশের পশ্চিম দিগন্ত সীমানায়
নিরন্তর হোলিখেলা, চক্রবালে সবুজ বনানী
বিগত দিনের শেষে তন্দ্রাহীন, করে কানাকানি
একান্ত আপন মনে রজনীর চায়ার ছায়ায়।

ক্লথদন্ত দিবসের সন্ধ্যামৃত্যু-আরক্তিম আয়ু,
শতাব্দীর তট প্রান্তে বিসর্পিত গন্ধের চুপাল
ছুঁচোখে রোপণ করে। এ দিবস আশা-জরজর
নিরিবিলি করে যায় অতীতের জীবন সফর।

নিরন্তর চারদিকে পাখা মেলে মনের জটায়ু,
ক্লান্তির দিগন্ত বেয়ে ধীরে নামে প্রশান্ত সকাল।

সূর্য প্রণাম

সনতকুমার মিত্র

তমসার উত্তরণে কুয়াশার পর্দা ছিন্ন কোরে,—
লাল-টিপ সূর্য ওঠে শিশিরের অশ্রুধৌত ভোরে ;
সোনা রোদ দেয় আর উঠে যায় আকাশ ছাড়িয়ে,
তবু ও সে সূর্য যায় মেঘলোকে ক্রমশ হারিয়ে।

এমন অনেক সূর্য—উঠেছে ও ডুবে গেছে ধীরে :
তারই মাঝে "একসূর্য" বিস্মৃতির মেঘলোক ছিঁড়ে,—
আজও তার স্নিগ্ধরশ্মি দিয়ে যায় অকৃপণ হাতে ;
তারই আলো আশা আনে আমাদের অন্ধ আঁখিপাতে।

প্রতিভার রশ্মি তার ছড়িয়েছে মুঠো মুঠো গান,
নীরস মরুর বুকে ছড়িয়েছে সবুজাভ প্রাণ ;
অশান্ত পৃথিবী তাই আজও তাকে প্রণাম জানায়,
আমি তার কথা ভেবে বাথা ঢালি করোজ হাওয়ায়।

অনন্ত আলোক যার "শান্তিলোকে" আজও ঐ ডাকে ;
সেই সূর্য এসেছিল এ মাটিতে "পচিশে বৈশাখে"।

বৈশাখ প্রথম

শ্রীকৃষ্ণ দাশ

বৈশাখের মেঘের অরণ্য সহসা ডালপালা মেলে
ছায়ার আব্রুর গন্ধে মৌনমাটির উন্মুখর আশার
বৃষ্টির শিশির দিয়ে স্নিগ্ধ লাবণ্য কবে মেলে দেবে বলো ?
পীড়িত গাছের যৌবন-পল্লবের আকণ্ঠ আকাংক্ষায়—
মর্মরিত বৃষ্টির প্রার্থনা : আমাকে মুগ্ধ করো নীলকান্তি
নীলাঞ্জন মেঘ—তোমার সৌগন্ধ দিয়ে তন্দ্রাতুর করো॥
রৌদ্রের ব্যাথায় ক্লান্ত পৃথিবী অসংখ্য আকীর্ণফলে পরিচয়
দিলে ঘাসের বিবর্ণ প্রাণ সঘন সঞ্চিত মেঘের
ইন্দ্রনীল বর্ণ চায়। বৃষ্টি দাও—বৃষ্টি দাও : চাতকের গান
আকাশের অম্লান শোভা প্রত্যহ কান্নায় বেদনামুখর করে॥

আষাঢ়ের অতন্দ্র অস্ফুট সন্ধ্যাদিনের এখনো অনেক
দেরী ; শুধু আমস্থর-ঘুমে ঘুঘীসন্ধ্যার গন্ধ স্বপ্নে
দেখা দেয়। বৃষ্টির মেঘ কবে পৃথিবীর পরিপূর্ণ প্রাণে
পাত্র ভরে উজ্জ্বল জল দেবে সান্ত্বরাগে ছুঁয়াতে তাহার ?
একদা বৈশাখে তাই সুবিপুল ডালপালা মেলে—
পল্লবিত মেঘের মহিমা সম্রাটের গৌরব গায় !
তৃষার অরে মুমূর্ষু দিনের আয়ু দুর্লভ তখন,
মেঘের অরণ্যে অবাক প্রার্থনা করে : দাও—জল দাও,
সৃষ্টি স্নিগ্ধ করো, বনস্পতির জীবনস্পন্দনে দাও পুণ্য
করুণার ; মৃত্যু থেকে বিশ্বলোক মুক্ত নবীন হোক

আইনষ্টাইন

গ. চ. ড.

বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-তপস্বী, লোকোত্তর প্রতিভার অধিকারী আইনষ্টাইন আর ইহজগতে নেই। তাঁর তিরোধানে সারা পৃথিবীর শিক্ষিত সমাজ আজ ব্যথিত ও শোকাভিভূত। অসাধারণ চারিত্রিক মাধুর্য, বিশ্লেষণাত্মক মননশক্তি, অনমনীয় দৃঢ়তা এবং অপরিসীম মানবপ্রীতির জন্যে যতটা না হোক, তাঁর অপূর্ব বৈজ্ঞানিক প্রতিভার জন্যেই তিনি পৃথিবীর জনসাধারণের নিকট পরিচিত। বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে তিনি কি করেছেন, সে সম্বন্ধে অনেকেরই সুস্পষ্ট ধারণা নেই; তবে রিলেটিভিটি থিওরী, অর্থাৎ আপেক্ষিকতা বাদই যে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে তাঁর অপূর্ব অবদান—একথা সবাই জানেন। আপেক্ষিকতা বাদ মানুষের চিন্তাধারায় অভাবনীয় বিপ্লব এনেছে। আইনষ্টাইনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হলে এই তত্ত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা থাকা দরকার। অবশ্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষ করে পদার্থ বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই তত্ত্বের ব্যাপক প্রয়োগ সম্পর্কে ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বুঝিয়ে বলা সম্ভব নয়, তবুও অল্প কথায় এর সারমর্ম উদ্ধৃত করছি—'গত পঞ্চাশ বছরে জড় বিজ্ঞানে যে সকল আশ্চর্য আবিষ্কার হয়েছে তার ফলে পূর্ববর্তী কালের অনেক ধারণার ওলটপালট হয়ে গেছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে ভৌতিক জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের ধারণা নিম্নোক্ত কয়টি তত্ত্বের উপ প্রতিষ্ঠিত ছিল; যথা—দেশ, কাল, নিমিত্ত, জড়ের অবিনাশিত্ব এবং শক্তির অবিনাশিত্ব। দেশ বলতে আমরা বুঝি, অনন্ত বিস্তার। যে লক্ষ লক্ষ ছায়াপথের অস্তিত্ব আমরা দূরবীণের সাহায্যে জানতে পারি তাদের বাইরেও যে দেশ আছে—এই জ্ঞান আমাদের স্বতঃসিদ্ধ। দেশের কোথাও শেষ আছে, একথা আমরা ভাবতেই পারি না,—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ নিয়ে দেশ চতুর্দিক জুড়ে রয়েছে। দেশ অনন্ত এবং সর্বব্যাপী।

কাল সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা—কালের কোথাও শেষ নেই। অতীতে যতদূর পানে তাকাই কাল নিশ্চয়ই ছিল; ভবিষ্যতেও যতদূর পানে তাকাই কাল নিশ্চয়ই থাকবে। নক্ষত্র, নীহারিকা, ছায়াপথ সৃষ্টি হওয়ার আগেও দেশ এবং কালস্রোত ঠিক এখনকার মতই ছিল; আবার এগুলি যদি মহাপ্রলয়ে ধ্বংস হয়ে যায় তবুও দেশ এবং কালস্রোত ঠিক এখনকার মতই থাকবে।

নিমিত্ত বলতে বুঝি—কারণ ছাড়া কর্ম হয় না এবং একই রকম কারণ থেকে সব সময় একই রকম কার্যের উৎপত্তি হয়—কোথাও এর ব্যতিক্রম হ'তে পারে না। কারণ ছাড়া কার্য নেই এবং যেখানে কার্য সেখানে তার পূর্ববর্তী কোন কারণ নিশ্চয়ই আছে—এর ব্যতিক্রম হয় না বলেই ভৌতিক জগৎ শৃঙ্খলা বজায় রয়েছে। কারণ এবং কার্য এক অবিচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে বাঁধা।

জড় পদার্থের অবিনাশিত্ব বলতে এই কথা বুঝা যায় যে, জড়ের রূপান্তর হয়, কিন্তু ধ্বংস হয় না। আর জড় পদার্থ যদি অবিনশ্বর হয় তবে এটাও মেনে নিতে হবে যে, জড় পদার্থ চিরকাল ধরেই আছে, কোন বিশেষ মুহূর্তে তার সৃষ্টি হয় নি।

শক্তির অনেক প্রকারভেদ আছে। বিদ্যুৎ, চুম্বকত্ব, আলোক, উত্তাপ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শক্তি। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন রকমের শক্তি মূলতঃ একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। যে কোন রকম শক্তিকে অন্য সব রকম শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় এবং তার ফলে শক্তির মোট পরিমাণের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না।

উক্ত তত্ত্বগুলির উপরেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত জড়বিজ্ঞান দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই তত্ত্বগুলির

উপর ভিত্তি করে ভৌতিক জগতের চিত্র বিজ্ঞান আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছিল তা অনেকটা এই রকম—

দেশ তার অনন্তবিস্তার নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছে। সেই বিরাট ব্যাপ্তির ভিতরে জড় কণাগুলি শক্তির তাড়নে লাফালাফি, দাপাদাপি করছে, ভাঙছে, গড়ছে জোড়া লাগছে। জড় একটা আলাদা জিনিস—শক্তি একটা আলাদা জিনিস। জড়কে নিয়ে শক্তি নিরন্তর ছুটাছুটি, লোফা-লুফি এবং ভাঙাগড়ার খেলায় মত্ত। 'দেশ' সেই খেলার মাঠ আর সেই খেলা চলছে 'কালে'। কালের একঘেয়ে স্রোত অবিশ্রান্ত গতিতে বয়ে চলেছে; তারি সঙ্গে তুলনা করে আমরা বিভিন্ন ঘটনার পৌর্বাপর্য নির্ণয় করছি। ঘটনাগুলি আবার নিমিত্তের শৃঙ্খলে বাঁধা, তারা যেমন খুশী ঘটতে পারে না। দেশ, কাল, নিমিত্ত, শক্তি এবং জড়—সব কয়টি পৃথক পৃথক সত্তা। সবগুলি একত্র মিলিয়েই এই ভৌতিক জগৎ।

কিন্তু বিগত পঞ্চাশ বছরে বিজ্ঞানের এই ভিত্তি নড়ে গেছে। দেশ এবং কাল যে অনন্ত এবং পরস্পর নিরপেক্ষ, একথা বৈজ্ঞানিকেরা আর স্বীকার করেন না। আইনষ্টাইনীয় বিজ্ঞানের মতে, দেশ এবং কাল—এই দুটি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত এবং এই যুক্ত উপাদানের কাঠামোর মধ্যেই আমাদের এই জড়জগৎ খাড়া রয়েছে। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, দেশ অসীম হলেও অনন্ত বিস্তৃত নয়। উদাহরণস্বরূপ ভূপৃষ্ঠের কথা বলা যেতে পারে। কেউ যদি ভূপৃষ্ঠের উপরে অবিরতভাবে হেঁটে বেড়ায় তবে সে কোথাও এমন দেখতে পাবে না যে, পৃথিবীতলের সীমায় পৌঁছে গেছে সামনে আর পা বাড়াবার জায়গা নেই। যতদিন ধরে হাঁটুক, সে দেখতে পাবে তার সম্মুখে ভূপৃষ্ঠ আরো বিস্তৃত রয়েছে। কিন্তু এ থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে না যে ভূপৃষ্ঠের বিস্তার অনন্ত। ভূপৃষ্ঠ অসীম হলেও অনন্ত বিস্তৃত নয়। দেশের সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। আইনষ্টাইনের মতে—দেশ এবং কাল উভয়েই সান্ত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এ তত্ত্ব অঙ্ক কষে পাওয়া গেলেও সাধারণ বুদ্ধিতে ঠিক কম।

ফলেই মহাশূন্যে গ্রহ তারকা নির্দিষ্ট কক্ষপথে সুনিয়ন্ত্রিত গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মহাকর্ষের শক্তি আসলে কি এবং এক জড়পিণ্ডের আকর্ষণ শক্তি কি করে ব্যবধান ডিঙিয়ে অপর এক জড়পিণ্ডের উপর ক্রিয়া করে তার কোন ব্যাখ্যা নিউটনের স্তরে ভিতর ছিল না। আইনষ্টাইন এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন যে, মহাকর্ষ আসলে টানাটানির ব্যাপারই নয়। দেশ এবং কাল অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে তৈরী হয়েছে একটি চতুর্মাত্রিক সত্তা (Time-space continuum)। দেশের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ—এই তিন

মাত্র—কাল এক মাত্রা। এই সত্তার মধ্যে যদি কোথাও কোন জড় পদার্থ না থাকে তবে উহার হয় সংকোচন এবং বিস্তার হয় অনন্ত। কিন্তু এই শূন্যের ভিতরে একবার জড়ের আবির্ভাব ঘটলে শূন্য আর অনন্ত বিস্তৃত থাকে না, উহা হয়ে পড়ে সান্ত। যেখানেই জড়পিণ্ডের অবস্থান সেখানেই তার আশেপাশের সত্তা যেন বেঁকেচুরে যায়। এক গতিশীল পদার্থ যখন অপর কোন পদার্থজনিত এরূপ বাঁকাচুরার মধ্যে এসে পড়ে তখন আর সরলভাবে চলতে পারে না, বাঁকাচুরার রকম অনুযায়ী তার গতিপথও হয়ে পড়ে কুটিল। গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথ রচনার উহাই আসল কারণ। মনে রাখা উচিত যে, বাঁকাচুরা কথাটার ব্যবহার এক্ষেত্রে নিছক রূপক। সূক্ষ্ম গাণিতিক বিষয়কে সাধারণ কথায় বলতে গেলে তা হয়ে দাঁড়ায় তাবার কসরৎ, তাতে বিষয়টার আভাস দেওয়া যায় মাত্র, ঠিকভাবে প্রকাশ করা যায় না।

আইনষ্টাইনের সূত্রগুলিতে দেশ ও কাল যেভাবে পরিমাপ করা হয় তাও অতি অদ্ভুত। আইনষ্টাইনের গণিতে দেশের একক ১,৮৬,০০০ মাইল, অর্থাৎ আলোক রশ্মি এক সেকেণ্ডে যতটুকু পথ অতিক্রম করে; এবং কাল পরিমাপের একক—১ সেকেণ্ড। সাধারণ দৃষ্টিতে আইনষ্টাইনের ব্যাখ্যা আগাগোড়াই মনে হয় যেন একটা হেঁয়ালি। একে শুধু গণিতের মারপ্যাচ বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত—যদি না বাস্তব জগতে এর সমর্থক মিলতো। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাস্তব ভৌতিক জগতের ব্যাখ্যায় যেখানেই নিউটনের সূত্র ও আইনষ্টাইনের সূত্রে ঠোকাঠুকি লেগেছে, সেখানেই জয় হয়েছে আইনষ্টাইনীয় গণিতের। আমাদের দৈনন্দিন ব্যাপারে নিউটনীয় বিজ্ঞানেই যথেষ্ট কাজ চলে, কিন্তু পরমাণু-জগৎ ও নক্ষত্র-জগতের সূক্ষ্ম হিসাবনিকাশে দেখা গেছে যে, নিউটনীয় সূত্র অচল, আইনষ্টাইনীয় সূত্রেরই জয় জয়কার।

আগেকার যুগে মনে করা হতো যে, শুধু জড়-পদার্থেরই ওজন আছে, শক্তির কোন ওজন নেই। আইনষ্টাইন দেখালেন—শক্তিরও ওজন আছে, যদিও জড়ের তুলনায় তা খুবই সামান্য। আলোকশক্তি, উত্তাপশক্তি, গতিশক্তি প্রভৃতি সব রকম শক্তিরই কিছু না কিছু ওজন আছে। জড় ও শক্তির মধ্যে কোন অলঙ্ঘ্য প্রাচীর নেই। জড় ষোল আনা ক্ষয়ে হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে! এরই প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখতে পাই আমরা আটম বোমার।

যাহোক, আইনষ্টাইন যখন জীবিকার্জনের জন্যে সুইস পেটেন্ট অফিসে কাজে নিযুক্ত ছিলেন তখন ১৯০৫ সালে তাঁর আপেক্ষিকতা বাদের স্পেশাল থিওরী প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার পর বৈজ্ঞানিক মহলে সাড়া পড়ে যায়। ১৯০৮ সালে তিনি বিজ্ঞানী হিসাবে প্রথম স্বীকৃতি লাভ করেন। এর পরেই প্রাগের জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন; কিন্তু ১৯১২ সালে অধ্যাপকের পদ নিয়েই জুরিখে ফিরে আসেন। ১৯১৩ সালে জার্মান বিজ্ঞানী নার্ণষ্ট ও প্লাঙ্কের চেষ্টায় জার্মেনীতে ফিরে যান এবং তাঁরা তাঁকে বার্লিনে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদ এবং নতুন গবেষণাগারের পরিচালকের পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। তিনি এই পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৬ সালে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের দ্বিতীয় অংশ, অর্থাৎ জেনারেল থিওরী প্রকাশিত হয়। ১৯২২ সালে তাঁকে নোবেল পুরস্কার প্রদানে সম্মানিত করা হয়। অবশ্য রিলেটিভিটি থিওরীর জন্যে তাঁকে পুরস্কার দেওয়া হয় নি দেওয়া হয়েছিল কোয়ান্টাম মতবাদ সম্পর্কিত গবেষণার জন্যে। এছাড়া তিনি আরও অনেক পুরস্কার ও সম্মানজনক উপাধি পেয়েছিলেন—সেগুলির সংখ্যা এত বেশী যে তিনি নিজেই তার ঠিক হিসাব রাখতে পারতেন না। জীবনে অজস্র সম্মান ও খ্যাতি লাভ করলেও তাঁকে অনেক দুঃখ ভোগও করতে হয়েছে। তাঁর নিজের দেশের লোকেই তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি নষ্ট করে, বইপত্র পুড়িয়ে তাঁকে দেশত্যাগী করেছিল। আইনষ্টাইন তখন বিদেশে ছিলেন। হিটলারের অত্যাচারের ব্যাপার শুনে তিনি আর দেশে ফিরে যান নি। প্রেসনারের আমন্ত্রণে তিনি আমেরিকার প্রিন্সটনে চলে যান এবং সেখানকার ইনষ্টিটিউট ফর আডভান্সড্ ষ্টাডি-র অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যে বালকের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর অভিভাবক এবং শিক্ষকেরা নৈরাশ্য পোষণ করতেন, সেই বালকই আজ বিশ্ববন্দিত আইনষ্টাইনরূপে সারা বিশ্বের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করে গেছেন।

প্রভাত দেবসরকার

[উপন্যাস] [পূর্বানুবৃত্তি]

কথাটা দাদুর কানে তোলবার ইচ্ছে থাকলেও কি জানি কি ভেবে মাধুরী নিজের মনে চেপে গেল। ফুল কাকীমার ব্যবহারের যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় ভিন্ন তাতে পাড়াপড়শী! সত্যিকারের কোন সম্বন্ধ নেই তাদের সঙ্গে। ছেলে ভুলোন আদরে ওঁরা ভুলবেন কেন? সে জিনিস আইনত আমার নয় আত্মীয়তার সম্বন্ধে তার দাবী দুর্বলেরই জন্যে! ভুল ক'রেছে মাধুরী, ইন্দুমতী ঘোষবাড়ির আর পাঁচটা বধূর মত নয়; ফুল কাকীমার শিক্ষা দীক্ষা এদের করো সঙ্গে মেলে না। ছেলেবেলা থেকে দেখছে মাধুরী, ইন্দুমতীর ধরণ ধারণ, চাল চলন, কথাবার্তা সবার থেকে ভিন্ন। সুবোধ কাকার যোগ্যা কিনা সে জানে না, কিন্তু অযোগ্যা বলে কোনদিন মনে হয় নি ফুল কাকীমাকে। এই সেদিন পর্যন্ত ঐ বাড়িতে তাঁর সাহচর্যে অনেকখানি সময় কেটে যেত মাধুরীর। কিছু না, ফুল কাকীমার আশে পাশে ঘুরতে কেমন একটা আকর্ষণ বোধ করতো সে। অতি সাধারণ তবু যেন কত অসাধারণ ঐ ফুল কাকীমা!

দোতলার এই ঘরটার জানালায় দাঁড়িয়ে ওবাড়ির সবটুকু দেখা যায়। উঠানের ভারে ফুল কাকীমার চওড়া লাল পাড় সাড়িটা শুকাচ্ছে, একধারে শিউলী গাছটার তলায় সুবোধ কাকার ছেলেমেয়েদের ঘরকন্না পাতা আছে, ভাঙা পাঁচিলের ছায়া পড়েছে উঠানের আধখানা জুড়ে।

অনেকক্ষণ একভাবে মাধুরী জানালায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। ঠিক এই মুহূর্তে আড়াল থেকে ফুল কাকীমাকে দেখবার তার অদ্ভুত খেয়াল হয়। তাঁর কালকের ব্যবহারের কোন বিপরীত প্রতিচ্ছবি দেখা যায় কিনা।

সুবোধকাকা বুঝি এক সময় বেরিয়ে গেলেন, সেই লোকটি সঙ্গে। মুহূর্তে মাধুরী জানালা থেকে সরে দাঁড়াল, লোকটি যেন একবার এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে, কাল লোকটিকে মুখোমুখি দেখেছিল মাধুরী। আদৌ ভাল লাগেনি। বড় বেশী সপ্রতিভ। তা ছাড়া অন্দর মহলের ঘাটে পথে লোকটিকে নিয়ে অনেক সমালোচনা—কেউ বলে ফুল কাকীমার কোন দূর সম্পর্কে ভাই হয়, কেউ বলে, ভাই না আর কিছু! কেউ বলে, কোন সম্পর্কই নেই, বাইরের লোক! যেটুকু মর্যাদা ঘোষবাড়ির ছিল সেটুকুও সুবাড়ি শেষ করে দিলে—কোথাকার কাকে নিয়ে চলাচলি হচ্ছে রাত দিন। যেমন সুবোধ, তেমনি হয়েছে ইন্দু আজকাল।

বাইরে কর্তাব্যক্তিদের সবার কানে কথাটা উঠেছে। কিন্তু কি করবেন, করবার কিছু নেই। দিন কাল বদলে গেছে, এখন সদর অন্দর বলে কিছু নেই। সামাজ সিঁদকে ঢোকবার যেখানে ছিদ্র ছিল না সেখানে এখন হাতি ঢুকে যাচ্ছে। কে কার ধার ধারে। তার ওপর উনি তো ডাক্তারবাবু, ওঁর কথা আলাদা! ঘরের শত্রু বিভীষণ!

কেমন একটা বৈরী ভাব আছে লোকটির ওপর মাধুরীর। দাদুর মুখে কিছু না শুনলেও উড়ো উড়ো যেসব খবর তার কানে এসে পৌঁচছে তাতে লোকটিকে সহজ বলে মনে হয় না। যত গণ্ডগোলের সৃষ্টি উনিই করছেন গ্রামে এসে। উদয়পুরের শান্তি নষ্টের মূল উনিই। সুবোধকাকা, ফুলকাকীমা ওঁকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন!

মাধুরীর মনে হয়, সেদিন টাকা ফেরৎ দেওয়ার মূলে ঐ লোকটি ছিল। ফুলকাকীমাকে উনিই প্ররোচনা দিয়েছেন। অপমান উনিই করিয়েছেন।

তাদের বংশ মর্যাদাকে সবার সামনে ছোট করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ঐ লোকটি গ্রামে এসেছে। প্রভা কেলিয়ে বেড়াচ্ছে।

মনে মনে মাধুরী কঠিন হ'য়ে ওঠে. আহত আভিজাত্যের সমস্ত আক্রোশটা ঐ লোকটির ওপর গিয়ে পড়ে। কুমারী মনের নিভৃত চিন্তায় প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে। দাদু যদি না পারেন সে ই উদ্যোগী হ'য়ে লোকটিকে গ্রাম ছাড়া করবে। এত বড় স্পর্ধা!

কুল কাকীমার বাড়ির উঠান এখন খাঁ খাঁ করছে। সকাল থেকেই কেমন একটা নিস্তব্ধ নিস্তব্ধতা যেন। কেউ বিশ্বাস করবে না ওই বাড়িতে বসে গ্রাম্যজীবনকে বিপর্যস্ত করতে যত কিছু শলাপরামর্শ হয়! ইন্দুমতীও তাতে একটি বড় অংশ গ্রহণ করেছেন। শ্বশুরকুলের মর্যাদা হানির মূলে তিনিও আছেন।

দাদু ঠিকই করেছেন, বেনামে ওঁদের সম্পত্তি কিনে নিয়েছেন। যারা সম্পত্তির মূল্য বোঝে না, তাদের হাতে সম্পত্তি না থাকাই উচিত। পথের লোক ডেকে এনে যারা ঘর ভাঙে তাদের রাস্তায় বের ক'রে দেওয়াই উচিত। এর বেলায় কাকীমার সম্মানে বাধছে না, যত সম্মানবোধ শ্বশুরের হাত থেকে টাকা নিতে! দয়া, অনুগ্রহ, বড় বড় কথা আছে আবার!

ওদের আর কোন ব্যাপারে মাধুরী থাকবে না। দাদুর সব কাজেই তার সমর্থন জানাবে, তার আশে পাশে যারা আছে তাদের সুখ দুঃখের সঙ্গে নিজেকে বিশেষভাবে জড়িয়ে দেবে। ছোট খুড়ি, ন' খুড়ি, রাঙা কাকী, ভিন্ন বৌদি, হেমাঙ্গিনী, পারুদি, শোভা বৌ বরং সহস্রগুণে তার আপনার। বড় বড় কথা তারা বলে না, বড় বড় ভাব তারা করে না। নীচতায়, ক্ষুদ্রতায় তবু তারা অনেক বেশী আপনার। বড়র পরিচয় তো ওই।

জানালাটা মাধুরী সশব্দে বন্ধ করে দিলে। ঘরের শত্রু বিভীষণদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। দেখাব ওঁরা কি করতে পারেন—কত ক্ষমতা ওদের আছে!

নীচে নেমে এসে মাধুরী সব ঘরগুলোয় একবার ঘুরে বেড়াল, খালি ঘরগুলো অদ্ভুত এক আকর্ষণে তাকে টানতে লাগল। তাদেরও যেন একান্তভাবে সঙ্গীর অভাব। তাদেরও যেন ভয় নিঃসঙ্গতায়।

বাবার ছবির নীচে চুপ করে অনেকক্ষণ মাধুরী দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ তৈলচিত্রটা বড় জীবন্ত মনে হচ্ছে. দীপেন্দ্রনারায়ণের পায়ের তলায় মৃত বাঘটা যেন নড়ছে. পিঠের ওপর শোয়ান বন্দুকটাও যেন আস্তে আস্তে খাড়া হ'য়ে উঠে দীপেন্দ্রনারায়ণের হাতের কাছে এগিয়ে আসছে।

এখন গল্পের মত মনে হয়। মাধুরী তখন শিশু। সুন্দরবনের বন কেটে কিছু সম্পত্তি হাসিল করেছিলেন রমাপতি। দীপেন্দ্রনারায়ণ সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে মাঝে মাঝে বিষয় তদারক করতে যেতেন। রমাপতি পুত্রকে মানা করতেন, দীপেন্দ্র শুনতেন না। সুন্দরবনে বাঘ শিকারের নেশা তখন তাঁকে পেয়ে বসেছে। তারপর একদিন সত্যি সত্যি তিনি বাঘ শিকার ক'রে গ্রামে ফিরেছিলেন. মরা বাঘ দেখতে ঘোষ বাড়িতে সেদিন গ্রাম ভেঁটিয়ে লোক এসেছিল, ভিড়ে ভিড়। বৈঠকখানা ঘরের সামনে আটচালার চত্বরে বাঘটাকে শুইয়ে রাখা হ'য়েছিল। ঝি-এর কোলে উঠে মাধুরীও এসেছিল বাঘ দেখতে। আজও বুঝি একটু একটু মনে পড়ে—তাকে কোল থেকে নামিয়ে ঐ মুবোধকাকা বাঘটার সামনে নিয়ে গিয়েছিলেন। অতটুকু মেয়ে একটু ভয় পায়নি ব'লে সবাই কত অবাক হ'য়েছিল। বাঘের মুখে দাঁড়িয়ে মাধুরী আধ-আধ স্বরে নাকি বলেছিল, হালুম! হালুম! বাঘ খাঁ।

খুব হাসি পড়েছিল উত্তেজিত প্রশংসায়। কি সাহস এতটুকু মেয়ের! বাড়ির আরো অনেক ছেলেমেয়ের তুলনায় মাধুরীর সাহসটা সেদিন বিশেষ প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছিল। তারপর কতদিন তাকে সবাই কোলে নিয়ে হালুম! হালুম! ক'রে আদর করতো।

মাথার ভেতর কেমন যেন ঝিম্ ঝিম্ করে মাধুরীর। স্মৃতি-মন্থনের মাদকতায় কেমন স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে

মাধুরী দীপেন্দ্রনারায়ণের ছবির সামনে। সত্যিকারের একটি বাঘও সে কখনো সজ্ঞান হ'য়ে চোখে দেখে নি। ঘোষবাড়ির কোন বৌ-ঝিকে কবে যেন লোকে নাম দিয়েছিল রায় বাঘিনী! কেন কি অর্থে মাধুরী কোনদিন বোঝে নি। তবে সকলে কিন্তু সমীহ করে ওঁর নাম ক'রতো।

তাকে যদি কেউ আজ রায় বাঘিনী ব'লে ডাকে? সেদিনকার মরা বাঘ দেখে ভয় না পাওয়ার মত সকলের প্রশংসা পাবে না? ঘোষ বংশের রায় বাঘিনী রমাপতির নাতনি।

তাদের বন্দুকগুলো যদি আজ থাকতো। ওই লোকটিকে দেখিয়ে দিত, উদয়পুরে চালাকি ক'রতে আশা বেরিয়ে যেত! একটা বন্দুকও আজ নেই, ওই বাবার ছবির পাশে হুকের মাথায় ক্যানভাসের থাপে ঝুলতো দু দুটো বন্দুক, একটা খাঁড়া আর দুটো বর্শা। সব বাবার সখের জিনিষ। বাড়ির কেউ হাত দিতে সাহস করতো না। কতদিন মাধুরী বাবার পাশে বসে লক্ষ্য করেছে কি অদ্ভুত কৌশলে বাবা বন্দুকগুলো টুক্‌রো টুকরো করে ভেঙে ফেলতেন, আবার কেমন করে' জোড়া লাগাতেন! মাধুরীর চোখের পালক পড়তো না! মাঝে মাঝে বুঝি দীপেন্দ্র নারায়ণ মেয়ের হাতে বন্দুক তুলে দিতেন, কি ভারি, মাধুরী তার বইতে পারতো না। নিজের হাতে বন্দুক নিয়ে দীপেন্দ্রনারায়ণ হেসে উঠতেন। মাধুরী লজ্জা পেয়ে দ্বিতীয়বার শক্তির পরীক্ষায় আবার হাত বাড়াতো।

মাঝে মাঝে বাবা প্রশ্রয় দিলেও মা প্রশ্রয় দিতেন না মেয়েকে। দেখলেই বলতেন, মেয়েকে লক্ষ্মণ তৈরী করচো, পরে ভুগবে। কোনদিন শাশুড়ীকে গুলি করে' বসবে!

মার আশঙ্কা অমূলক। কোথায় বন্দুক আর কোথায় শ্বশুর ঘর! স্বদেশীর সময় সুবোধকাকার জন্যে সব আগ্নেয় অস্ত্রই ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে' নিয়েছে। আর দাদু তার জন্যে উপযুক্ত কোন শ্বশুর ঘর খুঁজে পাননি। কিছু হোক আর নাই হোক, বন্দুক দুটো যদি আজ থাকতো, সবাইকে একবার দেখিয়ে দিত।

অস্ত্র তোলবার হুকগুলোতে মরচে ধরে' কালো হ'য়ে গেছে। ঘরের মধ্যে কেমন একটা ঠাণ্ডা গুমোট, চোখ আলা আলা ভাব। দেওয়ালে টাঙানো ছবি-গুলোর মধ্যে যে সব মানুষের ছায়া আছে তা যেন আজ বড় অস্পষ্ট! একটা কিসের অদৃশ্য পর্দা যেন সবার মাঝখানে। ছবির গলায় শুকনো মালার খস্‌খসানি।

কতদিন ছবিগুলো মোছা হয়নি! অকারণে কর্তব্যে অবহেলা ঘটেছে। সারা দিনরাতে এত কি কাজ মাধুরীকে করতে হয়! কটা ছবি, তাও পরিষ্কার রাখতে পারে না! ছি, ছি!

বাইরে এসে মাধুরী ডাক দিল, পক্ষীর মা! পক্ষীর মা! রান্না বাড়ি থেকে সাড়া এল, কি বলচো গো মাধুদি?

কি কাছে আসতে মাধুরী ধমক দিয়ে বললে, তোদেরও যদি কোন কাজে হুঁস থাকে! কোন কাজ না বললে তোরা করবি না, একবার বলে দিলে হ'বে না!—

পক্ষীর মা চুপ করে ধমক খায়। কারণটা বুঝতে পারে না।

মাধুরী বললে, এদিকে আয় আমার সঙ্গে—নেকার মত চেয়ে থাকলে অমনি হ'লো!

সিঁড়ির নীচে দীপেন্দ্রনারায়ণের ঘরটা দেখিয়ে মাধুরী বললে, রোজ তো রোজ সই ঝাঁটা বুলিয়ে যাও, একবার কি চোখ চেয়ে দেখতে নেই, ধুলোটুল কোথায় আছে! কি হ'য়েচে ঘরখানার মূর্তি।

বিশেষ কিছু ইতর-বিশেষ লক্ষ্য করে না পক্ষীর মা। তাছাড়া অব্যবহার্য ঘর নিয়মিত পরিষ্কার না ক'রলে এমন কিছু আসে যায় না। ধুলোকালির

ভাবনা তার নয়। পক্ষীর মা বিহ্বল দৃষ্টিতে মাধুরীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

মাধুরী ধমকে উঠলো, যাও ঝুলঝাড়া লাঠিটা ভাঁড়ার ঘর থেকে নিয়ে এসো। কারো দ্বারা যদি একটু কাজ পাবার উপায় আছে!

কোমরে আঁচল জড়িয়ে মাধুরী প্রস্তুত হয় ঘর পরিষ্কারের জন্যে, পক্ষীর মা অপরাধীর মত ভাঁড়ার ঘরের দিকে এগিয়ে যায়। সাত সকালে বড়লোকের নাতনীর আবার কি খেয়াল হ'লো!

একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে খুড়িয়ে ছবির মাথার ঝাঁড় দেবার চেষ্টা ক'রলে মাধুরী।

পক্ষীর মা হাই-হাই করে উঠলো, কি করলে দিদিমণি? পড়ে এখনি হাত-পা ভাঙবে! থাকনা বাপু, চুণীলালকে বলবো'খন ও বেলায় এসে করবে! মুখের কথা খসালে হয়।

মাধুরী জবাব দিলে, থাক, অত সাহায্যে আর দরকার নেই! তোমাদের সবাইকে জানা আছে। এবার চুণীদা! কারুর দরকার নেই—

পক্ষীর মা তেমনি উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলে, তা বলে যদি পড়ে যাও, হাত পা যদি ভাঙে, যদি কিছু হয়—

রাগে মাধুরীর হাসি পায়, একসঙ্গে পক্ষীর মা অনেকগুলো যদি বললো! সোজা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে বললে, যদি তোমাদের মুণ্ডু হ'বে তা হ'লে!

পক্ষীর মা অবুঝ, তাই উৎকণ্ঠিত স্বরে বললে, না দিদিমণি তুমি উঠে এসো আমি করছিচি।

তুই যদি পড়ে যাস? তোর যদি হাত-পা ভাঙে? তখন? মাধুরী কৌতুক করে বললে।

সে-তত্ত্ব যে পক্ষীর মার একেবারে নেই তা নয়, মুখে বললে, হুঁ, আমরা আবার পড়বো!

কেন, পড়ার বেলায় বুঝি কেবল আমরা! ভগবান তোমাদের পড়তে দেননি?

পড়লেও আমাদের লাগে না। কত তো পড়চি আজদিন! টুলের পায়ার হাত দিয়ে পক্ষীর মা বললে।

বেশ, কেমন না লাগে দেখি একবার। বই টুল থেকে আমার সামনে পড় দেখি একবার। সাবধানে টুল থেকে মাধুরী নামলে।

ইচ্ছে করে পড়লে কখনো লাগে দিদিমণি! দেখনি ঐ কত ওঁচাই থেকে বাঁচির উপর সব কাপ খায়। একটু কাটে না কোটে না কোথায়।

তুই ইচ্ছে করে পড়িসনি, এমনি পড়িস। লাগে কিনা দেখবো। মাধুরী গম্ভীরভাবে বললে।

মুখের দিকে চেয়ে পক্ষীর মা হেসে ফেললো। বললে, তুমি পেত্যয় যাবে না দিদিমণি, পক্ষী তখন হয়নি, একবার তোমাদের ঐ বড়বাগানে আম চুরি ক'রতে গিয়ে গাছের ডাল ভেঙে কি তোর পড়ে গেছলুম। কতক্ষণ চুপ মেরে গাছ তলায় পড়ে রইলুম, মনে হ'য়েছিল আর বুঝি উঠতে পারবো না, তারপর কি হ'লো জানো দিদিমণি তোমাদের সেই মড়াখেকো, অনামুখো দরোয়ানটা রামধারি সন্ধ্যের সময় বাগানের দিকে আসছিল। বেটার সলার শব্দ শুনতে পেয়ে একেবারে মাঠের রাস্তায় ছুট। নাগাটাগা সব কোথাকে গেল তোমায় কি বলবো।

মাধুরী হঠাৎ রাগ দেখালে, থাক্ চের হ'য়েছে। এখন পার তো ছবিগুলো মুছে ফেল। রাতদিন বকর-বকর খালি।

পক্ষীর মাও হাত পেল না। বিরক্ত হ'য়ে মাধুরী বললে, থাক্ চের হ'য়েছে, কমের হুষীরাম। চুণীদাকে ডেকে আন দয়া করে। টুল থেকে নেমে পক্ষীর মা ঘরের বাইরে যেতে মাধুরী ডাক দিলে শোন। পক্ষীরমা কাছে আসতে মাধুরী বললে, তার আগে এক কাজ কর, চট করে ওবাড়িতে যা একবার। গিয়ে দেখে আয় ফুলকাকীমা কি করছে।

পক্ষীর মা প্রশ্ন করবার আগেই মাধুরী আবার বললে, যাবি আর আসবি; কেউ যদি কিছু জিজ্ঞেস করে, কোন কথা বলবি না কিন্তু।

পক্ষীর মা অবাক হয়, এ আবার আদেশ? তা হ'লে শুধু শুধু যাবে কেন?

এক ছুটে যাবি আর আসবি বুঝলি, মুখ বুজে চলে আসবি।

মাধুরী বললে, সেখানে আবার গল্প দিতে বসো না যেন।

পক্ষীর ঘর থেকে বেরুতে মাধুরী আবার পিছনে ডাকলে, সেখানে যদি কোন লোককে দেখিস গল্প করচে কি বসে আছে কুলকাকীমার কাছে, দূর থেকে দেখে চলে আসবি।

পক্ষীর মা আর চুপ করে থাকতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে, কেন গো দিদিমণি?

মাধুরী ধমকে উঠলো, অত খবরে তোমার দরকার কি। যা বলচি তাই করবি।

কিছু জিজ্ঞেস করলেও বলবো না?

না। রাস্তা দিয়ে মানুষ গেলে কৈফিয়ৎ দিতে হয়? যেন তুই রাস্তা দিয়ে কোথায় যাচ্ছিস এমনি ভাব করবি।

রাতদিন ওবাড়ির ভেতর দিয়ে কত লোকজন তো যাচ্ছে আসছে—সবাইকে ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস ক'রছে, কেন কি বৃত্তান্ত। তোকে কিছু বলবে না, যা। মাধুরী তাড়া দিলে।

কিন্তু কোন্ লোকটি? ডাক্তার বাবুর বাড়ি আবার লোক কোথা? পক্ষীর মা থমকে দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবে। সকাল থেকে দিদিমণির আজ আবার হোল কি? এই বলে এটা কর, আবার বলে ওটা কর—একটা লোক কটা করবে এক সঙ্গে? মেজাজ আজ ভিরিক্ষি!

কি দুর্মতি হয় পক্ষীর মার, হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসে, কার কথা বলচো দিদিমণি, ওই বন্ধু দাদাবাবুর কথা তো?

বন্ধু? মাধুরী যেন চেঁচিয়ে ওঠে। এর মধ্যে বন্ধু আবার এলো কোত্থেকে, সব তাতে জেরা, যা বলচি তাই কর।

না তাই বলচি, বললে কিনা দেখে আসতে লোকের মধ্যে ওবাড়িতে আর কে আছেন। বুড়ি তো সেদি রাতদিন ছেনাপোনা নিয়েই ব্যস্ত, এখন ওই উনি এসেচেন' শুধু গা'য়েক দু'দণ্ড গল্পগাছা ক'রতে পারে।

কে সে? তোর বন্ধু নাকি? মাধুরী বেঁকা সুরে বললে।

আমার একার কেন, গেরাম শুদ্ধ সব্বার বন্ধু তিনি। তুমি তাকে দেখনি দিদিমণি? দেখলে বলতে?

মাধুরী তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, আমার বলে কাজ নেই কোথাকার কে তার ঠিক নেই, বন্ধু।

পক্ষীর মা বললে, বন্ধু ওনার নাম। কাজে-কর্মে বন্ধু বটে, পক্ষীর বাবা সেদিন বলছিল, গরীবের মা-বাপ উনি। তুমি শোননি দিদিমণি কি মুখমিটে কথা ওনার।

মাধুরী রাগ করে' বললে, তোকে যা করতে বল্লুম, তাই করবি, না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মসকরা করবি? কে তোদের বন্ধু তাতে আমার দরকার কি? যাবি কিনা বল?

পক্ষীর মা মাধুরীর অহেতুক উষ্মার কারণ বুঝলে না। অথচ ওই 'নোকটার' খপরই উনি নিতে পাঠাচ্ছেন। কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া ব্যাপারটা।

পক্ষীর মা ঘরের চৌকাঠ পেরুতে মাধুরী আবার ডাকলে, শোন, তোকে কোথাও যেতে হবে না। বাইরে গিয়ে দেখ, চুণীলাকে পাস কিনা।

পক্ষীর মা অবাক হ'য়ে মাধুরীর মুখের দিকে চেয়ে নিজের কাজে গেল। দিদিমণির হঠাৎ আজ কি হলো? এমন তো উনি করেন না কখনো।

সিঁড়ির ঘরের দরজায় শিকল তুলে দিয়ে মাধুরী ওপরে উঠে গেল। সত্যি সেও যেন নিজের ব্যাপারের কোন সংগত কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। মনের এ অহেতুক অস্থিরতা কেন?

[ক্রমশঃ

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য

কাঁদলা বন্দর উন্নয়ন

ভারতের পশ্চিম উপকূলে সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত কাঁদলা এতদিন পর্যন্ত ছিল একটি ব্যবসায়-বাণিজ্যহীন নিতান্ত নগণ্য বন্দর। ভারত বিভক্ত হইবার পর সৌরাষ্ট্র এবং কচ্ছের অন্তর্বর্তী অঞ্চলে একটি প্রধান বন্দর গড়ে তুলবার তাগিদ আসে প্রধানতঃ দুটি কারণে। প্রথমতঃ করাচী বন্দর ভারতের হস্তচ্যুত হওয়ায় সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলের স্বাভাবিক বাণিজ্যের অবনতি এবং দ্বিতীয়তঃ সিন্ধু থেকে আগত উদ্বাস্তুদের তাঁদের পূর্বেকার বাসভূমির অনুরূপ কোন অঞ্চলে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। ১৯৪৯ সালে কাঁদলা পরিকল্পনা রিপোর্ট রচনা আরম্ভ হয় এবং অনেক অনুসন্ধান কার্যের পরে শেষ পর্যন্ত জার্মেনীর সুবিখ্যাত কন্ট্রাক্টর, মেসার্স ম্যাকেজিস্ হেনরিক্ বাট্জার (ইণ্ডিয়া) লিমিটেডকে অপর একটি ভারতীয় কার্যের সহযোগে এই বন্দর উন্নয়নের চুক্তি দেওয়া হয়। স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকার যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, কাঁদলা বন্দর উন্নয়ন পরিকল্পনা তন্মধ্যে অন্যতম। এই পরিকল্পনার মোট খরচ ১৩ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। প্রধান পোতাশ্রয়টি নির্মাণ বাবদ ৭ কোটি ১ লক্ষ টাকা, এবং বন্দর গৃহাদি আরোত্তোলন যন্ত্র, পোতাশ্রয়ের উপকরণাদি, রাস্তাঘাট, জল সরবরাহ, কর্মচারীদের বাসস্থান এবং জল নিষ্কাশন ব্যবস্থাদির জন্য বাকি ৬ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। প্রধান পোতাশ্রয়ের নির্মাণকার্য ১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসে আরম্ভ হয় এবং আশা করা যায় যে, ১৯৫৭ সালের প্রথমভাগেই নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হবে। বন্দর এবং তৈল ক্ষেটি চলতি বছরের জুন মাসের মাঝামাঝি সমাপ্ত হবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে। ৫ মাইল দীর্ঘ নলের মধ্য দিয়ে বন্দর থেকে তৈল কারখানাতে তৈল পাম্প করে নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। নূতন বন্দরটিকে চলমান ভারোত্তোলন যন্ত্র, কাঁচা যুক্ত উত্তোলন ট্রাক্ প্রভৃতি আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত করা হবে।

কাঁদলা বন্দরের উন্নয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি বিশেষ আকর্ষণ হচ্ছে, বন্দরের সন্নিকটে গান্ধীধাম নামে একটি আধুনিক ধরণের নগর স্থাপনের পরিকল্পনা। এই নগর কেবলমাত্র বাস্তুত্যাগীদের বাসস্থানের ব্যবস্থাই করবে না, ব্যবসায় বাণিজ্যের পক্ষে হবে অপরিহার্য। এই নগর পরিকল্পনাটি রচনা করেছেন আমেরিকার সুবিখ্যাত স্থপতি ও নগর পরিকল্পনাকারী মেসার্স আডাম্স্, হাওয়ার্ড এণ্ড প্রীলি নামে একটি ফার্ম। এই নগর পরিকল্পনার সর্ব সমেত ৫ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে বলে হিসাব করা হয়েছে।

সম্প্রতি রেল মন্ত্রী শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রী কাঁদলায় তৈল নির্গমন ব্যবস্থার উদ্বোধন এবং কাঁদলাকে একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দরের মর্যাদা প্রদান-অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করে ভারতের ব্যবসায় বাণিজ্যের ও পরিবহন ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করেছেন। ২ লক্ষ ৭৫ হাজার বর্গ মাইল পশ্চাদ্ভূমি বিশিষ্ট এই বন্দর সাড়ে চার কোটি লোকের ব্যবহারে আসবে। কেবলমাত্র রেল কোম্পানীর আয়ই ১০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাবে বলে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেছেন। কাঁদলা গভীর সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত বলে ভারতের বহির্বাণিজ্যের বহুল

সুবিধা হবে এবং বোম্বাই বন্দরের অতিরিক্ত সমাকীর্ণতা হ্রাস পাবে। কাঁদলা আজ জাতির কাছে এক নূতন আশার আলোক এনে দিয়েছে। কাঁদলার নবরূপ যাঁরা স্বপ্নে দেখেছিলেন এবং স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করতে যাঁদের যত্নের ত্রুটি ছিল না সেই দুই মহাপুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও মিঃ এন. গোপালস্বামী আয়েঙ্গার যাদের কেউ আজ আর বেঁচে নেই তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

ভারত-জার্মাণী বাণিজ্য চুক্তি

ইংলণ্ড কিংবা যুক্তরাষ্ট্রের মত জার্মেনীর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ খুব বেশী না হলেও, নগণ্য নয়। গত বৎসর পশ্চিম জার্মেনী থেকে ভারত ৩৪ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা মূল্যের জিনিষ আমদানী করে এবং ভারত থেকে পশ্চিম জার্মানীতে রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। ১৯৫৩ সালে আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ২৮ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ও ১০ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা। ভারত ও জার্মানীর বাণিজ্যকে আরও সম্প্রসারিত করবার জন্য গত ৩১শে মার্চ নয়াদিল্লীতে ভারত ও জার্মাণ সাধারণতন্ত্রের মধ্যে এক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তিতে অন্যান্য বাণিজ্য চুক্তি থেকে কিছু পার্থক্য আছে। ইহা সীমিত কালের জন্য নয়। ১৯৫৫ সালের ১লা এপ্রিল থেকে কার্যকরী এই চুক্তি যতদিন পর্যন্ত কোন পক্ষ তিন মাসের নোটীশ দিয়ে বাতিল না করবেন, ততদিন কার্যকরী থাকিবে। এই চুক্তিতে বাণিজ্য পণ্যের বিস্তারিত তালিকা দেওয়া নাই। দেশের আমদানী ও রপ্তানী নীতি এবং মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণের নিয়ম-কানুন অনুসারে সকল পণ্যই এই দুই দেশের বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করতে পারবে। ভারতের বর্তমান বিধি অনুযায়ী জার্মেনীকে সহজ মুদ্রা অঞ্চলের অন্যান্য দেশের সমান ব্যবহার করা হয়ে থাকে। জার্মান সাধারণতন্ত্র ও ভারতকে অনুরূপ সুযোগ সুবিধা দেবেন বলে রাজী হয়েছেন। এই সব কারণে এই চুক্তিটিকে দুইটি দেশের পারস্পরিক বাণিজ্যের উন্নতির পথে লৌহ-সেতু বলে আখ্যা দিলেও অত্যুক্তি হবে না। ভারতবর্ষে আমদানীর লাইসেন্স পেটা সহজ মুদ্রা অঞ্চলের জন্য মঞ্জুর করা হয়ে থাকে। সুতরাং জিনিসের প্রকার, দাম এবং ডেলিভারী যদি ভাল হয় তা হলে ভারতীয় আমদানী কারীরা অবশ্যই জার্মেনী থেকে জিনিষ ক্রয় করবেন। জার্মেনীতেও বহু সংখ্যক পণ্যের আমদানী সহজতর করা হয়েছে! তন্মধ্যে, চা, কফি, তুলা, পশম, নারকেলের ছোবড়ার দড়ি, তাল গাছের তন্তু, তামাকু, পশু-লোম, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতির চামড়া ও চামড়ার দ্রব্য, লৌহ পিণ্ড, ম্যাঙ্গানিজ খনি, অভ্র এবং গালা উল্লেখযোগ্য।

ভারত সরকার, অবশ্য তুলাজাত দ্রব্য, দড়ি, পাটদ্রব্য, সিল্ক, কৃত্রিম সিল্ক এবং তুলাজাত বিবিধ দ্রব্য, ছাতে বোনা ফিতা, আনারসের রস প্রভৃতির রপ্তানী বৃদ্ধি করবার চেষ্টায় আছেন। এসব জিনিষের উপর জার্মান সাধারণ-তন্ত্রে নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকলেও, জার্মান সরকার বাৎসরিক নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত ঐগুলোর আমদানীতে স্বীকৃত হয়েছেন। এই ভারত-জার্মানী চুক্তির অপর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, জার্মান সরকার ভারতীয় ও জার্মান ফার্মের মধ্যে কারিগরী সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

ভারতের শিল্পায়ন সমৃদ্ধি

শিল্পে ভারত একটি অনুন্নত দেশ একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাতেও শিল্পের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। কাজেই ভারতীয় শিল্পের উন্নয়নকে যখন মন্থর, সীমাবদ্ধ এবং সুপরিকল্পনাহীন বলে সমালোচনা করা হয়, তখন কিছু বলবার থাকে না। কিন্তু বহু প্রতিকূল ব্যবস্থার মধ্য দিয়েও ভারতীয় শিল্পগুলি যে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে তা স্বীকার না করলে কেবলমাত্র সত্যকেই অস্বীকার করা হবে না, দেশীয় শিল্পপতিদের নিরুৎসাহ করা হবে।

বিগত কয়েক বৎসরে শিল্পের উৎপাদন মোটামুটি সন্তোষজনক হয়েছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে কিছু সংখ্যক শিল্পের উৎপাদন পূর্ববর্তী বৎসর থেকে কেবলমাত্র

বৃদ্ধিই পায় নি, বস্তুতঃ তন্মধ্যে অনেকগুলি শিল্প নূতন নূতন দ্রব্য উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে স্থায়ী দ্রব্য উৎপাদনের নূতন কারখানা স্থাপন এবং পুরাতন কেন্দ্রগুলিকে সুদৃঢ় করার ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া গিয়েছে। ইঞ্জিনীয়ারিং ও রাসায়নিক শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। বস্ত্র শিল্পের কল-কব্জার উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। ইহা ছাড়া পাটকলের কল-কব্জা, সিমেন্ট তৈরীর কল-কব্জা এবং চা তৈরীর বিভিন্ন সরঞ্জামের উৎপাদনের জন্য কতিপয় পরিকল্পনা যথেষ্ট অগ্রসর লাভ করেছে এবং প্রকৃত উৎপাদন বর্তমান বৎসরেই আরম্ভ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

১৯৪৪ সালে কল-কব্জার উৎপাদন বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। টাইপ রাইটার, মিলের কল, শিল্পীয় ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈরীর যে সকল প্রস্তাব গত বৎসর এসেছে তা এখন ভারত সরকারের বিবেচনাধীন আছে। শিল্পের জগতে বিগত বৎসর বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই জন্য যে, সরকারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী স্বয়ং পরিচালিত শিল্পগুলি সরকারের কাছ থেকে উৎসাহ পেয়েছে এবং মোটর সাইকেল, স্পার্ক প্লাগ প্রভৃতি উৎপাদনের পথে যথেষ্ট অগ্রসর হতে পেরেছে। ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলোর সিভলের ক্যাপ, ঘনি-ঘনকদের ব্যাপার আলো, মিল তারের রজ্জু, বিশেষ ধরণের ওয়েল্ডিং ইলেকট্রোড প্রভৃতি দ্রব্যগুলি গত বৎসর উৎপাদিত হয়েছে। ইলেকট্রিক মোটর, ট্রান্সফরমার, সুইচ ও কন্ট্রোল গীয়ার, কেবল ও তার এবং বৈদ্যুতিক পাখা প্রভৃতির উৎপাদন চলতি বৎসরে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। এরোপ্লেন শিল্পের উপযোগী উত্তাপ সহনশীল মিশ্র ধাতুর পাত এবং এলুমিনিয়মের তার গত বৎসর প্রথম উৎপাদিত হয়েছে। ইস্পাত ঢালাই শিল্পও উৎপাদন বাড়াবার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। গত বৎসর দস্তা পেটাইয়ের কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা এবং ১ লক্ষ ৮ হাজার টন ক্লোরোম্যাগানিজ উৎপাদনের পরিকল্পনা মঞ্জুর করা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদনও গত বৎসর অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নূতন নূতন দ্রব্য উৎপাদিত হয়েছে। গুরু রাসায়নিক দ্রব্য, যেমন সালফিউরিক এসিড, সোডা অ্যাস, কষ্টিক সোডা, কাচের পাত এবং রঙ করবার দ্রব্যের উৎপাদন বেড়েছে। নূতন দ্রব্যের মধ্যে পেনিসিলিন, ক্লোরোমাইসেটিন, বিসমাথ সল্ট উল্লেখ যোগ্য। সোডা অ্যাস কারখানা স্থাপনের জন্য আরও তিনটি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে এবং সালফিউরিক এসিডের উৎপাদন আরও এক লক্ষ টন বাড়াবার পরিকল্পনা চলছে। সিমেন্টের উৎপাদন ১৯৪৩ সালের ৩৭ লক্ষ টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৪৪ সালে ৪৪ লক্ষ টনে পৌঁছেছে। আরও ২০টি সরকারী অনুমোদন পেশ পরিকল্পনা ১৯৪৬-৪৭ সালে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়। প্লাষ্টিক ও রঙ শিল্পের উন্নতিও লক্ষণযোগ্য। আখের ছোবড়া থেকে খবরের কাগজ তৈরীর প্রস্তাবটিও ইদানীং গুরুত্ব লাভ করেছে এবং ইহা বিশেষজ্ঞদের বিবেচনাধীন আছে।

আপেলেট ট্রাইব্যুনালের বিলোপ

শিল্পীয় বিরোধের মীমাংসার জন্য সরকারের যে বিচার ব্যবস্থা বর্তমানে চালু আছে তা ত্রুটী বহুল বলে প্রায়শঃই অভিযোগ শোনা যায়। এজন্য লোক সভায় বহুবার কথা উঠেছে এবং বিতর্ক হয়েছে। ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে এক দ্বিপাক্ষিক অধিবেশনে মালিকপক্ষ বর্তমান বিচার ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তনে সম্মতি প্রকাশ করেছিলেন। সম্প্রতি ভারত সরকার বোম্বাই, মাদ্রাজ কলিকাতা এবং লক্ষ্ণৌয়ে অবস্থিত আপেলেট ট্রাইব্যুনালের কার্যালয় ক'টি তুলে দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বর্তমান শিল্পীয় ট্রাইব্যুনালের কিরকম সংশোধন করতে সরকার স্থির করেছেন তা স্পষ্ট জানা না গেলেও খুব শীঘ্রই ১৯৪৭ সালের শিল্পীয় বিরোধ আইনের সংশোধনের জন্য যে একটি বিল লোক সভায় উত্থাপন করা হবে তা এক প্রকার সঠিক। এই বিলে যে সব রদ বদলের ব্যবস্থা আছে তা মোটামুটি এইরূপ—

(১) সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একাধিক রাজ্য সরকার সংশ্লিষ্ট মৌলিক বিরোধ এবং যে সকল রাজ্য সরকারের তাবেদার ভুক্ত বিবাদের ফলাফল সমস্ত দেশের উপর প্রতিক্রিয়া করতে পারে তার বিচারের জন্য একটি 'ন্যাশনাল ট্রাইব্যুনাল' স্থাপিত হবে। হাইকোর্টের অভিজ্ঞ বিচারকদের নিয়ে গঠিত হবে এই ট্রাইব্যুনাল। কেন্দ্রীয় সরকার যেসব বিবাদ এখানে বিচারের জন্য পাঠাবেন তার বিচার এখানে করা হবে এবং সে বিচারের পরে আর কোন আপীল করা চলিবে না। বর্তমান ব্যবস্থানুযায়ী যে কেউ অনুমোদন নিয়ে কোন বিরোধ সুপ্রীম কোর্টে নিয়ে যেতে পারে।

(২) রাজ্য সরকার সমূহের সকল বিবাদ বিচারের জন্য একটি 'ষ্টেট ট্রাইব্যুনাল' গঠন করা হবে হাইকোর্টের বিচারক হবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে। এখান থেকে

যে বিচার করা হবে, তার বিরুদ্ধে কোন আপীল চলবে না। বর্তমানে শিল্পীয় কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে লেবার আপিলেট ট্রাইব্যুনালে আপীল করা চলে।

(৩) ষ্টেট ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল অ্যাক্টের অন্তর্গত সমস্ত ছোটখাট বিরোধের বিচার করা হবে 'লেবার ট্রাইব্যুনালে'। এখানকার রায়ও হবে চূড়ান্ত।

বর্তমানের অফিসিয়াল্ কনসিলিয়েশন্ ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। এখানকার অফিসারগণ এখনকার মত দু'পক্ষের অভিযোগ শুনবেন এবং কোন মীমাংসায় আসতে না পারলে বিরোধ 'লেবার ট্রাইব্যুনালে' কিংবা 'ষ্টেট ট্রাইব্যুনালে' বিচারের জন্য পাঠিয়ে দেবেন। এই বিলের অপর একটি বৈশিষ্ট এই যে শিল্পীয় বিরোধের এবং মালিক মজুরের সম্পর্কের জটিলতা সম্পর্কে অভিজ্ঞ দুই ব্যক্তিকে বিচারকদের সহকারীরূপে গ্রহণ করা হবে এবং তাঁরা নির্বাচিত হবেন অভিযোগকারী দু'পক্ষের মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে।

এই সকল পরিবর্তনকে মালিকপক্ষ মোটেই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি। অপরপক্ষে রাজ্য সরকার-সমূহ এবং লেবার ইউনিয়নগুলি এই পরিবর্তনের প্রস্তাবে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। মালিকপক্ষ মনে করেছেন যে, এই পরিবর্তনের ফলে রাজ্য সরকারসমূহ অত্যধিক ক্ষমতা লাভ করবেন এবং ১৯৫০ সাল থেকে লেবার আপিলেট ট্রাইব্যুনাল শিল্পীয় বিরোধের রায়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য এনে দিয়ে মালিক-মজুর সম্পর্কের যে উন্নতি সাধন করছিলেন, তা ভবিষ্যতের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। যা হোক, বিচারক মণ্ডলী যদি সুনির্বাচিত হন এবং তাঁরা যদি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজে নিয়োজিত হন, তা হলে নূতন ব্যবস্থার বিচার স্বরান্বিত হবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

ভারতীয় কাগজ শিল্পের সমস্যা

ভারতে কাগজের মাথাপিছু কাটতি নিতান্তই নগণ্য। আমেরিকায় মাথাপিছু কাগজের কাটতি যেখানে ৩৪০ পাউণ্ড এবং ইউরোপে ৬০ পাউণ্ড, ভারতবর্ষে সেখানে মাথাপিছু কাটতির পরিমাণ মাত্র ১ পাউণ্ড। ইহা কেবল মাত্র আমাদের দারিদ্র্যের পরিচায়ক নয়, নিরক্ষরতার চরম নিদর্শন। ১৯৫৪ সালে কাগজের উৎপাদন কিঞ্চিৎ বেশী হয়েছে। ১৯৫৩ সালে ভারতে ১,৩১,৭০৪ টন কাগজ উৎপাদিত হয়েছিল এবং ১৯৫৪ সালে তা হয়েছে ১,৪৪,৩২৮ টন। কিন্তু নূতন বাজেটে শতকরা ১০ ভাগ শুল্ক কাগজের উপর আরোপ করায় কাগজ শিল্প স্বভাবতই একটু নিরুৎসাহ বোধ করছে। কাগজের উৎপাদন খরচ কিছুদিন যাবত ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। এ অবস্থায় এই শুল্ক আরোপে কাগজের মূল্য আরও বেড়ে যেতে বাধ্য। কাগজের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ, কাগজ তথা বই সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়া এবং তার পরিণাম নিরক্ষর দেশকে আরও নিরক্ষরতার মধ্যে ঠেলে ফেলে দেওয়া। কিছুদিন পূর্বে ভারতীয় কাগজ উৎপাদক সমিতির সাম্বাৎসরিক সাধারণ সভায় সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে স্যার কীন্ সরকারকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে করারোপ করিতে অনুরোধ জানিয়েছেন। কাগজের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি ও তা' কমান সম্পর্কে মিঃ কীন্ যে আলোচনা করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। কাগজের একটি প্রধান কাঁচা মাল হোল বাঁশ। পাকিস্তান হবার পরে বাঁশের সরবরাহ কমে যায়, কিন্তু সরকারের অবলম্বনীতি বাঁশের চালান বাড়াবার পক্ষে মোটেই উপযোগী হয় নি। তা' ছাড়া বাঁশের রেল ভাড়া সম্পর্কে পূর্বে যে সুবিধা দেওয়া হোত এখন তা বন্ধ করে দেওয়ায়, বাঁশের দাম বেশী পড়ছে। কাগজের কাঁচা মাল হিসাবে বাঁশ অন্য দ্রব্য থেকে শুধু সস্তা নয়, জিনিষ হিসাবেও ভাল। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহ যদি এদিকে একটু সুদৃষ্টি দেন তা' হলে এদেশে সস্তায় খুব ভাল কাগজ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা মোটেই অসম্ভব নয়। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা অদূর ভবিষ্যতে উন্নতি লাভ করবে বলে মনে করা যদি অসঙ্গত না হয়, তা' হলে শিক্ষার বিস্তারও যে অতি দ্রুত হবে একথা অনস্বীকার্য। কাজেই কাগজের বাজার এখানে আছে। কাগজ শিল্পের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের জন্য শিল্পপতি ও সরকারের যুক্ত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।

দেশ ও বিদেশ

আফ্রো-এশিয়ার রাজনৈতিক পটভূমি

দূর-প্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য, কিম্বা আফ্রিকা? ইহারও ভাগ হইয়াছে। দুই মহাদেশ ভাগ হইয়াছে এবং তাহা রাজনৈতিক কারণে। এই ভাগ কাহারা করিয়াছে তাহা জগৎবাসী জানেন। এই ভাগ প্রয়োজনে পড়িয়া হয় নাই—স্বার্থের খাতিরে হইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতি প্রাচ্য জাতি সম্বন্ধে এইরূপ মনোভাব বরাবরই ছিল এমন নহে। উপনিবেশ গঠন করিতে গিয়া পাশ্চাত্য জাতি প্রাচ্যের দুয়ারে কড়া নাড়িয়াছে—অবশ্য হাতে তাহাদের সঙ্গীন ছিল। এই সঙ্গীন দিয়া তাহারা প্রাচ্যের জাতিগুলিকে প্রায় ধরাশায়ী করিয়াছিল। কিন্তু যে সঙ্গীন দিয়া তাহারা প্রাচ্যের জাতিগুলিকে ভূতলশায়ী করিয়াছিল তাহা স্থির হইয়া কাহারো কাঁধে থাকে নাই। বরং ইহা চঞ্চল হইয়া নিজেদের মধ্যে যত্র-তত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থায় পাশ্চাত্য জাতিগুলি বর্তমান শতাব্দীর মধ্যেই দুইটা মহাযুদ্ধ সমাধা করিল। পাশ্চাত্য জাতিগুলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ঠিক ঠাহর করিয়া উঠিতে পারে নাই যে, ইহার ফল কি হইবে। ফল ফলিয়াছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বরগুনে প্রাচ্য জাতিগুলি সঙ্গীনের আঘাত খাইয়া বুঝিয়াছে যে, প্রাচ্য জাতিগুলি আসলে অশক্ত নহে! তার অর্থ প্রাচ্যের জাতিগুলি বিচ্ছিন্ন ছিল বলিয়া এই শৌর্য দেখানে সম্ভব হইয়াছে। ইতিহাসের গতি পরিবর্তন হইয়াছে। কলকব্জা প্রস্তুতকারক পাশ্চাত্য জাতিগুলি আপনাদের রচিত সর্বনাশা বলে আটকা পড়িয়াছে। আণবিক বোমা আবিষ্কার করিয়া এখন ভাবিতেছে—কে কাকে আগে মারিয়া বসে এই আতঙ্কে তাহারা অস্থির। বস্তুত আজ যে পাশ্চাত্যে শান্তির কথা বার বার আমরা শুনিতেছি—তাহা এই ভীত চেতনা হইতে জন্ম লইতেছে। পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস যতই ঘনীভূত হইতেছে ততই ইহার ব্যাপক প্রতিক্রিয় এশিয়া ও আফ্রিকার উপরে দেখা দিবে। মার্কিণরা আণবিক বোমার পরীক্ষা প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপে করিল ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল আমেরিকা মহাদেশ ভোগ করে নাই—ভোগ করিয়াছে এশিয়ার জাতি, জাপানে তেজস্ক্রিয় বৃষ্টি দেখা দিয়াছে। ইহা এশিয়ার পক্ষে ভাবিবার কথা। ইতিপূর্বে পাশ্চাত্য জাতিগুলি প্রাচ্য জাতির উপরস্থিগত যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহা আজ প্রায় বিলীয়মান। এশিয়ার জাতিয়তাবাদ পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক প্রভাব সীমাবদ্ধ করিয়াছে। এশিয়া-আফ্রিকার রাজনৈতিক চিন্তাধারা নানাদিক হইতে ইওরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। তাই তাহারা এশিয়া-আফ্রিকার সম্মেলনকে খুব সুনজরে দেখে নাই। এমনকি বিলাতি পত্রিকাগুলি নানাবিধ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াই মন্তব্য করিয়াছে। কিন্তু আমরা জানি ঐসব মন্তব্য অসাড়, এবং নানা ভ্রান্তিমূলক চেতনা দ্বারা আচ্ছন্ন। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে এশিয়া, আফ্রিকা, ইয়োরোপ ও আমেরিকা মহাদেশগুলি কেহ কাহারো হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাস করিতে পারিবে না। বাস্তব জগত ক্রমশই এক হইতেছে—কিন্তু বিচিত্র।

পূর্ববঙ্গে রাজনৈতিক টনেডো

সংবিধান রচনা এবং তাহার অনুশাসন মানিয়া চলা ইহা সাধারণভাবে বর্তমান জগতের মানুষ বুঝিয়া থাকে। কিন্তু বর্তমান জগৎ যাহা বোঝে তাহা পাকিস্তান বোঝে না। এদের গণপরিষদের সদস্যরা সুদীর্ঘ সাত বছর ধরিয়া চিন্তা করিলেন কি ভাবে সংবিধান রচনা করা যায় —তাহাও শেষ পর্যন্ত Basic Principles Committee

রিপোর্ট পেশ করিল। তাহাতে আবার হাজারো বাধা। পাকিস্তান যেসব কারণে নিজেদের ঘর এখনও সামাল দিতে পারে নাই—তাহার একটা প্রধান কারণ হইল পাকিস্তান নিজেও জানে না সে কি চায়। যদি চাওয়াটা সুস্পষ্ট হইত তবে পাওয়াটা কঠিন হইত না। ভারতবর্ষকে কাটিয়া দু'ভাগ করা—তাহা সম্ভব হইয়াছে। কেন না তখন ইংরেজ সহায় ছিল। ইস্‌লাম বিপন্ন এই নাম দিয়া ভারতের ইস্‌লামপন্থিগণকে কিছুকালের জন্য অন্ততঃ সংহত করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু রাষ্ট্র বিধান গঠন, দেশ শাসন, নব্য সমাজ ব্যবস্থা গঠন—ইহাতে যে পরিমাণ সৎসাহস, সহানুভূতি ও দূরদৃষ্টির প্রয়োজন পাকিস্তানী নেতৃত্বের তাহা নাই। ফলে জনগণ বিশ্রান্ত হইয়াছে। একটা সমাজকে ধর্ম যতখানি সম্ভব রক্ষা করিবার তাহা করিয়াছে আবার ধর্মের বিষেষ জাগ্রত করিয়া আহমদিয়া সম্প্রদায় বিতাড়ন, পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু উৎপীড়ন—এ সবই হইয়াছে। এই সব ঘটনার পুনরাবৃত্তি আজ পাকিস্তানের ইস্‌লাম সমাজকে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইতেছে—তাহা আর কাহারো ভাবিবার যোগ্যতা না থাকিলেও বাঙালী মুসলমান জাতির আছে। ধর্ম দ্বারা জাতীয় বৈশিষ্ট নষ্ট হয় না—বাঙালী জাতির একটা অংশ ইসলামের সেবক হইলেও তাহারা জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারায় নাই। পাকিস্তানের একটি মাত্র সংখ্যা-গরিষ্ঠ জাতি—তাহা হইতেছে বাঙালী জাতি—তাহাকে পদানত করিবার চক্রান্তের অভাব নাই। কিন্তু এই সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া দিয়া নির্বাচনে তাহারা উত্তর দিয়াছে। এমনও দেখা যায় যে নির্বাচন শস্ত্র শক্তিকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয়। বাঙালী মুসলমানের ইচ্ছা যেখানে প্রতিফলিত হইয়াছে, সেইখানেই একটি লৌহ কীলক স্থাপন করা হইয়াছে। ফলে সমস্ত ইচ্ছাটা ছিন্ন মেঘের মত আজ যত্র-তত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! কৃচক্রী চক্র আজ বাঙালী মুসলমানের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে খণ্ড খণ্ড করিবার চেষ্টায় ব্যস্ত।

পাকিস্তান গভর্ণর জেনারেল প্রাক্তন গণপরিষদের এক আইন একবার গ্রহণ করিতেছেন না, আবার তাহাই সিদ্ধ করিয়া কাজে লাগাইতেছেন। এই নীতিগত শৈথিল্য সমগ্র বাঙালী মুসলমান জাতির উপর বিষম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। বাঙলার পূর্বাঞ্চলে আজ যে নূতন নেতৃত্বের সাড়া মিলিতেছে তাহার সম্ভাবনা প্রচুর। তাই ইহাকে সমূলে বিনাশ করিবার চেষ্টাই এই কনস্টেনেশনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বাঙালার পূর্বাঞ্চল হইতে নূতন সমাধান আসিবে।

পাক-আফগান মন কষাকষি

পাকিস্তানের আর একটি সীমান্ত অঞ্চল শান্ত নহে। ইতিপূর্বে এই অঞ্চলে ব্রিটিশ সরকার যথেষ্ট হয়রানী হইয়াছে! ফলে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া তাহারা কাজ চালাইবার মত একটা অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সৃষ্ট অবস্থা বহুদিন কাটিয়াছে। পাকিস্তান সৃষ্টি হইবার পর হইতে তাহা আবার নানাবিধ গোলমাল সূত্রাকারে দেখা দিয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তান একটি ইউনিট হইবে ঘোষণার পর হইতে উক্ত অঞ্চলের অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। পাখতুন আন্দোলন দানা বাঁধিতেছে কিন্তু পাকিস্তান তাহা মানিয়া লইতে রাজী নহে। আফগান রাষ্ট্র পরোক্ষভাবে এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন—ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে নূতন সমস্যা দেখা দিয়াছে। এই সমস্যার অন্তরালে যে একটি রাষ্ট্রগত প্রতিদ্বন্দ্বীতা রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ প্রকাশ্যভাবে ইহা লইয়া বিরোধ সম্ভব নহে ইহা পাকিস্তান ভাল ভাবেই জানে। কিন্তু পাখতুন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী মানিয়া না লইলে ভবিষ্যতে এ সীমান্ত অঞ্চল বৃহত্তর কোন গোলযোগের সূত্রাকারে দেখা দিতে পারে। পাকিস্তান এই কথাটি চিন্তা করিয়া নীতি স্থির করিলে সুবুদ্ধির পরিচয় দিবে।

রাষ্ট্রজোট ও ঔপনিবেশিকবাদ

ঔপনিবেশিকবাদ কথাটি নূতন করিয়া এশিয়ার জনসমক্ষে ধরা দিয়াছে। কথাটি আজ নানা কারণে বিচার করিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে। বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চাশ বছরের মধ্যে দুইটি বৃহত্তম যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইল। শিল্পকলায় নিপুণ পাশ্চাত্য জাতিগুলি চিন্তা করিতেছে তাহাদের সেই পূর্বতন কালের সক্রিয় প্রভাব কিভাবে প্রাচ্য জাতির উপর রাখা সম্ভব হইতে পারে। দুইটি কারণে পাশ্চাত্য জাতি আজ এই কথা ভাবিতেছে। এক হইল প্রাচ্যের শিল্প বিপ্লব শুরু হইয়াছে। এবং এখানে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তার পারদর্শী বহু ব্যক্তির সন্ধান মিলিতেছে। পাশ্চাত্য জাতি যে জ্ঞান একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া মনে হয়—তাহা আসলে ঠিক নহে। এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্র অনেকটা পরিমাণে সমতল। তারপর এশিয়ার রাজনৈতিক চেতনা দাস

মনোবৃত্তি ছাড়িয়া স্বাধিকার বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ফলে রাজনৈতিক সুবিধার জোয়ার একটানা না হইয়া দোটানা হইয়াছে—অর্থাৎ জোয়ার এবং ভাটা দুই খেলিতেছে। কাজেই একদিন যাহাকে তর্জনী তুলিয়া ধমকানো সম্ভব হইত আজ তাহা সম্ভব নহে। এই অবস্থায় পড়িয়া পাশ্চাত্য রাজনীতিকেরা ক্ষমতার অংশীদারী দম্ভ স্বীকার করিয়াছেন। এখন চুক্তি ভিন্ন অন্য পন্থায় স্বার্থ উদ্ধার সম্ভব নহে। তাই জোট পাকাইয়া এই সব সাময়িক চুক্তি সম্পাদিত হইতেছে। দেখা যাইতেছে, এই চুক্তির অংশীদারেরা সমকক্ষ নহেন। তাই সাহায্যপুষ্ট স্বল্প শক্তিশালী অংশীদার অন্যের পক্ষে দুশ্চিন্তার কারণ হইয়াছে। যেসব শক্তিবর্গ এই জাতীয় আঞ্চলিক চুক্তির সিন্ধুতে বদ্ধ তাহারা বৃহৎ রাষ্ট্রের চাপে কতদিন সহজভাবে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিতে পারিবেন জানি না। তবে আপৎ কালে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ সম্মিলনে ক্ষুদ্র যে কর্পূরের মত উবিয়া যাইবার উপক্রম হয় তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যুগস্রষ্টিয়া রাশিয়ার অংশীদারী আলিঙ্গন হইতে মুক্তি পাইয়া আজ সহজভাবে কথা বলিতে পারিতেছে। আমরা জানি না পাকিস্তান কবে এইরূপ মুক্তি পাইবে এবং সহজভাবে কথা বলিবে।

পল্লী বাংলা ও সমাজ সেবা

সংবাদে প্রকাশ, ভারত-সেবক-সমাজ আপাততঃ গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যবিধি রক্ষার কাজকেই অগ্রাধিকার দিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গ খাদ্যের আভ্যন্তরিক বলেন, জাতীয় উন্নয়নে জনসাধারণের কি ভূমিকা হইবে তৎসম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন সবিশেষ ভাবিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা পাঁচশালা পরিকল্পনাকে তিনভাগে ভাগ করিয়াছেন। (১) সরকারী (২) বেসরকারী ও (৩) জনসাধারণের প্রচেষ্টা।

এই জনসাধারণের প্রচেষ্টা সম্বন্ধে অবশ্য এই সংস্থা যথারীতি কাজে হাত দিয়াছেন। ৮১টি ছাত্র ও যুব শিবির খুলিতেছেন। ইহার মধ্যে ১৩টি একান্তভাবে মেয়েদের শিবির হইবে।

প্রত্যেক শিবিরে ৫০ হইতে ১০০ কলেজ বা স্কুলের ছাত্রছাত্রী সমাজ-কর্মী গ্রামের যুবক সম্প্রদায় যোগ দিতে পারিবেন।

সমাজ সেবার আদর্শের দিক হইতে এই ব্যবস্থা সর্বোতভাবে কাম্য। বস্তুতঃ, বৃহত্তর সমাজ এই সব কর্মী, ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে এতাবৎ কাল সেবা-যত্ন পায় নাই। সমাজের বৃহত্তর অংশ এতদিন অবহেলিত ছিল। এই অবহেলার যুগ যদি সত্যসত্যই পার হইয়া থাকে তবে সুখের কথা সন্দেহ নাই। প্রসঙ্গক্রমে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার এই আদর্শ অনুযায়ী একটা এমন কারিকুলাম করা দরকার যার ফলে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা সেবার আদর্শ প্রথম হইতেই গ্রহণ করিতে পারে।

ভিয়েৎনামে আশুন জ্বলিল

দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সেনাবাহিনী এবং প্রধানমন্ত্রীর বিরোধী ভক্ত সর্দারদের সম্মিলিত দলের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধ বিরতির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার দুই দিন পূর্বেই আবার কামানের গোলা চলিতে শুরু করিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতেই ইন্দোচীনকে লইয়া অনেকে মাথা ঘামাইতে শুরু করিয়াছেন। ফলে রাজনৈতিক অভিঘাতের তীব্রতা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। একদিকে মার্কিণরা অপর দিকে ফরাসীরা। তৃতীয় অভিঘাতক চীন, এই ত্রিবিধ অভিঘাতের চাপে পড়িয়া আজ ইন্দোচীন ত্রাহি ত্রাহি ডাক পাড়িতেছে। ইন্দোচীনের অধিবাসীরা আজ এইরূপ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই সব বিভিন্ন ঘটনা ও নেতৃত্বের সমাবেশের পরিপ্রেক্ষিতে আর একটি সংবাদ পাঠ করিবার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। "সাইগনের প্রচণ্ড যুদ্ধ সম্পর্কে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের সহিত আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ভিয়েৎনামে নিযুক্ত তাঁহার বিশেষ প্রতিনিধি জেনারেল জে, লটন কলিন্সকে আহ্বান জানাইয়াছেন।

প্রকাশ ফ্রান্স ও জেনারেল কলিন্স সাইগনে সরকারের পরিবর্তন সমর্থন করিবার জন্য.....মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থা জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের নিকট সুপারিশ করিয়াছেন।"

অভিজ্ঞ পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সরকার পরিবর্তন মূলতঃ ভিয়েৎনামের চিন্তার বিষয় নহে। আসলে ইহা লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন আর সবাই। ইহা হইতেই দক্ষিণ ভিয়েৎনামের আসল চিত্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কথায় বলে যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দৈ। কিন্তু যাহাদের দৈ নেপোয় মারিল তাহারা কি করিবে?

পুস্তক পরিচয়

জাতীয় আন্দোলনে নারী—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

'বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহের' আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

যোগেশবাবু দীর্ঘকাল ধরে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের এ যুগের সামাজিক রাজনৈতিক এবং শিক্ষা-বিষয়ক ইতিহাস সংকলন করে চলেছেন। তাঁর প্রত্যেকটি গ্রন্থ দেশকে ও দেশের সুসন্তানগণকে চিনিয়ে দেবার পক্ষে সহায়ক।

আমাদের জাতীয় আন্দোলনে নারী-সমাজের দান সামান্য নয়। তাঁরাও যে সংগঠন ও পরিচালন-শক্তির, সাহস ও কৌশলের প্রমাণ দিতে পারেন রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে তা দেখা গিয়েছে। কংগ্রেসে মহিলা সদস্য-রূপে বাংলাদেশ থেকে প্রথম যোগ দিয়েছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী ও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়। করলাখনির মজুরাণীদের অবস্থা-সম্বন্ধে তদন্তের জন্যও কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় কামিনী রায়ের সঙ্গে বিহার ভ্রমণ করেন। সরলা দেবী সাহিত্য, ব্যায়ামচর্চা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দেশবাসীকে বীরমন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। দেশাত্মবোধক নানা ব্রত প্রবর্তনের জন্যও তিনি স্মরণীয়া। অন্যান্য মহিলা সাহিত্যিকদের মধ্যে মানকুমারী, গিরীন্দ্র-মোহিনী এবং কুমুদিনী বসু বিশেষভাবে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যোগ রক্ষা করে চলেছেন।

স্বদেশী আন্দোলনে, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহে, বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় এবং আগষ্ট সংগ্রামে বহু বাঙালী নারী দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত দিয়ে গেছেন। সকলের কথাই যোগেশবাবু সযত্নে গুছিয়ে বলেছেন, কোনো দলের কথাই বাদ দেননি।

আজ দেশে স্বাধীনতা এসেছে। যাঁদের ত্যাগ ও তপস্যার ফলে স্বাধীনতা এলো, তাঁদের কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য। —বী.

সম্প্রতি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি সমালোচনার জন্য আমাদের হাতে আসিয়াছে:

(ক) **পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ**: শ্রীচিত্তরঞ্জন দেব। কতকথা: ৬৭-১ মির্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি টাকা।

(খ) **মায়ের গান**: শ্রীবীরেশ্বর বসু। ১৯এন-১ বি, রাজা নবীন্দ্র রোড, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

(গ) **বাংলা সাহিত্যের গল্প**: শ্রীভবদেব রায়। ৯১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

(ঘ) **উন্মেষ**: উপন্যাস—শ্রীবীরেশ্বর বসু। ইষ্ট এণ্ড কোম্পানী ৪২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

(ঙ) **গল্প কিছু নয়**: গল্প সঙ্কলন—শ্রীরামকৃষ্ণ গুপ্ত। শ্রীবিদ্যা নিকেতন, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

(চ) **কলরোল**: কাব্যগ্রন্থ—অনিলকুমার ভট্টাচার্য। দোয়ান বুকস্, কলিকাতা। মূল্য ১।০ মাত্র।

(ছ) **সপ্তপদী**: কাব্যগ্রন্থ—শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। ৪৫ ১ বি, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চারি টাকা।

বাংলা সাহিত্য আজ বহুলাংশে কথাসাহিত্য-প্লাবিত হইলেও তাহার মধ্যে মাঝে মাঝে এমন কিছু সংখ্যক গ্রন্থের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, যাহা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারাকে উত্তরকালের মধ্যে সার্থক রূপায়নের কাজে বিশেষদান হিসাবে গ্রাহ্য। 'পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ' এবং 'বাংলা সাহিত্যের গল্প' এইরূপ দুইখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বাংলার সংস্কৃতি প্রধানতঃ তাহার লোকসংস্কৃতির উপর নির্ভরশীল। লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীতের নানা পর্যায়ের বিভিন্ন রূপরেখার মধ্য দিয়া এই সংস্কৃতি পল্লীর গহন গভীর স্নিগ্ধতা হইতে ক্রমে নগরের রূপ লাবণ্যের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 'পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গে'র ভূমিকায় অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন লিখিয়াছেন: বাঙালী সংস্কৃতিতে পূর্ববঙ্গের দান নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের চোখে নিশ্চয়ই উপেক্ষণীয় নহে: বিশেষতঃ, পূর্ববঙ্গের লোকসংস্কৃতির যে পরিচয় আমরা 'মলুমনসিংহ গীতিকা', 'পূর্ববঙ্গ গীতিকার' মধ্য দিয়া পাইয়াছি, তাহাতে পূর্ববঙ্গ সম্পর্কে যথার্থ কাব্যরসিক ও ঐতিহাসিকের কৌতূহল জাগ্রত হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু পূর্ববঙ্গের পল্লীতে আজিও লোকসংস্কৃতির যে সমস্ত উপকরণ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সেই সকল সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের পথ সুগম করিয়া দিতে পারেন, এইরূপ উৎসাহী তরুণের দল আজ আর চোখে পড়িতেছে

আনন্দের বিষয় যে, চিত্তরঞ্জন দেব বহু শ্রম স্বীকার করিয়া পূর্ববঙ্গে প্রচলিত লোকসাহিত্যের বহু তথ্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং এখনও একই কাজে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির একটি বৃহত্তর গুপ্ত দিককে নতুন করিয়া বাংলা সাহিত্যে সংযোজন করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার এই প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

'বাংলা সাহিত্যের গল্পে' প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের একটা ধারাবাহিক পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। লিপিকার ভবদেব রায় অত্যন্ত নিপুণভাবে বিষয়গুলিকে নানা অধ্যায়ে সাজাইয়া বাংলা সাহিত্যের তরুণ পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিয়াছেন। ভূমিকায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র লিখিয়াছেন : 'বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের বই ২।৪ খানি রচিত হয়েছে, কিন্তু প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে এইরূপ চিত্তাকর্ষক ও সরস রচনার বই আর বোধ হয় প্রকাশিত হয় নি।' খগেনবাবুর বক্তব্যে উচ্ছ্বাস থাকিলেও ভবদেব রায় যে আকারে গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে।

বাংলা সাহিত্যের নীরব শিল্পী বীরেশ্বর বসু। সম্প্রতি তাঁহার দুইখানি বই নতুন ধারায় বাংলা সাহিত্যের উর্বর ক্ষেত্রকে রসসিক্ত করিয়াছে। প্রথম গ্রন্থ 'মায়ের গান', লেখক-রচিত মাতৃসঙ্গীতের সঙ্কলন। ভাবের গভীরতায় ও প্রাণের আকুলতায় গানগুলি ভক্ত হৃদয়ের পুষ্পার্ঘ্য রূপে বিশ্ব মায়ের চরণে নিবেদিত হইয়াছে। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'উন্মেষ', চা বাগানের কাহিনী লইয়া একটি আদর্শ যুবকের প্রণয় ও জীবনাভিষানের ভিত্তিতে রচিত মরমী উপন্যাস। বীরেশ্বরবাবু একাধারে কবি ও ঔপন্যাসিক। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সার্থক শিল্পী। গ্রন্থ দুইখানি বিদগ্ধ সমাজে সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই।

বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্পের আসরে নতুন সংযোজন রামকৃষ্ণ গুপ্তের 'গল্প কিছু নয়'। রচনাশিল্পে বনফুলের প্রভাবলক্ষিত হইলেও 'গল্প কিছু নয়'-এর প্রত্যেকটি গল্প স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। তাহাতে একাধারে প্রেম, ব্যঙ্গ ও সামাজিক সমস্যাগুলির প্রতি ইঙ্গিত একই সঙ্গে রূপ পাইয়াছে। লেখক বাংলা সাহিত্যে খ্যাতির আসনে প্রতিষ্ঠিত না থাকিলেও আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহাকে খ্যাতিমান করিয়া তুলিবে বলা যায়।

'কল্পরোল' কবি-গল্পকার অনিলকুমার ভট্টাচার্যের সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ। অনিলবাবু গল্প, উপন্যাস ও কবিতায় সমান রূপদক্ষ। ইতিপূর্বে তাঁহার যেসব কবিতা আমাদের চোখে পড়িয়াছে, তাহাতে বক্তব্যের চাইতে উচ্ছ্বাস ছিল বেশী। আলোচ্য গ্রন্থে উচ্ছ্বাস অবদমিত হইয়া বক্তব্য স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে মনে হয় কবি যেন এতদিনে তাঁহার জীবন-দর্শন খুঁজিয়া পাইয়াছেন। কবিতাগুলির বিশেষত্ব এই যে, ইহার রচনাভঙ্গী প্রাচীন ও নবীনকালের মধ্যাশ্রয়ী। কাব্যরসিপাসুমাত্রকেই গ্রন্থখানি আনন্দ দান করিবে।

কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্তের বৃহত্তর কাব্য সঙ্কলন 'সপ্তপদী'। ইতিপূর্বে কবির 'মন্দিরের চাবী', 'সাঁঝের প্রদীপ', 'রবীন্দ্র বৈজয়ন্তী', 'শেষের গান' 'দিশারী কপোত', 'চূড়ান্ত ও শিখিধ্বজ' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ পাঠ করিয়া আমরা আনন্দ পাইয়াছি। সেই আনন্দে নবীন সাজ বহন করে 'সপ্তপদী'। আলোচ্য কাব্যে একাধারে মিষ্টিসিজম্, রোমান্স, কাব্যলক্ষ্মীর প্রতি ভক্তের নিবেদন ও স্বাদেশিকতা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিগতপ্রাণ পত্নীর প্রতি শোকসন্তপ্ত স্বামী-হৃদয়ের প্রদ্ধাও সেখানে অনুপস্থিত নয়। রচনারীতিতে রবীন্দ্র-অনুসারী হইয়াও কাব্যে তিনি যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বাংলা কাব্য সাহিত্যের নূতন সঞ্চয় হিসাবে গণ্য। কবিতাগুলির অধিকাংশই ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী, কোন একটি কবিতাও সস্তা চটুলতাদোষে দুষ্ট নয়। ভাবের এমন পবিত্রতা এযুগে বিরল।

বান্দুং সম্মেলন

ইন্দোনেশিয়ার এশিয়া ও আফ্রিকার উনত্রিশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সম্মেলন সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত হয়েছে। এ সাফল্যের পরিমাণ সম্পর্কে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু যে সব রাষ্ট্র এই বৈঠকে যোগ দিয়েছিল তাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে পারস্পরিক বৈষম্যের কথা ভেবে দেখে এটা স্বীকার করতেই হবে যে বৈঠক সফল হয়েছে। অধিকন্তু, বৈঠকে যোগদানকারী কয়েকটি রাষ্ট্র বিভেদ সৃষ্টির জন্য চেষ্টা করেছিল একথা আজ আর গোপন নেই; যদি মনে রাখা যায় যে, সেই ষড়যন্ত্রজাল ভেদ করে এ বৈঠক পরস্পর বিভিন্ন মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে পেরেছে, তা হলে মানতে হবে এ সার্থকতার পরিমাণও নিতান্ত তুচ্ছ নয়। যে সব প্রতিনিধিরা বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মত, আদর্শ ও নীতি কারোই অজ্ঞাত নয়। উপরন্তু, এঁরা যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের মতামত দ্বারা চালিত হন না, তাও অল্পাধিক সকলেরই জানা আছে। এরকম আবহাওয়ার মধ্যে কোন বড় ব্যাপারে এক মত হতে পারাটাই বরং অপ্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও যোগদানকারী রাষ্ট্রপ্রতিনিধিরা শেষ পর্যন্ত সর্ববাদীসম্মত যুক্ত-বিবৃতি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। বৈঠকের সাফল্য সম্বন্ধে এইটাই সবচেয়ে প্রধান কথা। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যে সব রাষ্ট্রনায়কদের আন্তরিক চেষ্টার ফলে এই মতৈক্য সম্ভব হয়েছে তাঁদের আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বৈঠকের ঘোষণা

যুক্ত বিবৃতিতে ঘোষণা করা হয়েছে যে সন্দেহ ও ভয় থেকে মুক্ত হয়ে, এবং পরস্পরের প্রতি শুভেচ্ছা ও সহনশীলতাযুক্ত হয়ে সব জাতির অন্য সব জাতির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত। যে নীতির ভিত্তিতে এই সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব তা হচ্ছে এই :—

১। মানুষের মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রপরিষদের সনদের মূল আদর্শের প্রতি সম্মানপূর্ণ মনোভাব,

২। প্রত্যেক দেশের স্বাধীনতার প্রতি সম্মান ও সীমানা অব্যাহত রাখার অধিকারের স্বীকৃতি,

৩। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সব জাতি ও রাষ্ট্রের সমান অধিকারের স্বীকৃতি,

৪। পররাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা,

৫। রাষ্ট্রপরিষদের সনদের নীতি অনুসারে প্রত্যেক রাষ্ট্রের একক বা সম্মিলিতভাবে আত্মরক্ষার অধিকারের স্বীকৃতি,

৬। (ক) যৌথ আত্মরক্ষা-ব্যবস্থা কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের স্বার্থে নিয়োগ না করা,

(খ) এক রাষ্ট্র কর্তৃক অপর কোন রাষ্ট্রের উপর চাপ না দেওয়া,

৭। কোন দেশের স্বাধীনতা বা সীমানা ক্ষুণ্ণ করার জন্য ভীতি প্রদর্শন বা আক্রমণাত্মক কাজ না করা,

৮। সমস্ত আন্তর্রাষ্ট্রীক বিবাদ বিসম্বাদ রাষ্ট্রপরিষদের সনদ অনুযায়ী পারস্পরিক আলোচনা বা নিজ নিজ মনোনীত মধ্যবর্তী দ্বারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার ব্যবস্থা অবলম্বন করা,

৯। পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি দৃঢ়তর করা

আন্তর্জাতিক দায়িত্ব ও ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে এই নীতি অনুযায়ী কাজ করলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সম্প্রীতি অব্যাহত থাকবে এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার ফলে প্রত্যেক জাতির সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ ঘটবে। সম্মেলনে সমবেত এশিয়া ও আফ্রিকার রাষ্ট্রনায়কদের এই দৃঢ় বিশ্বাস।

ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই ঘোষণার মধ্যে কোনই নতুন কথা নেই। বস্তুতঃ এতে যা যা বলা হয়েছে সবই রাষ্ট্রপরিষদের সনদের মধ্যে আছে। কিন্তু এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, কোন নতুন কথা বলার জন্যই বান্দুং বৈঠক আহূত হয় নি। পুরাণো কথা নতুন করে বলার প্রয়োজনীয়তা উপস্থিত হয় অনেক সময়। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এশিয়া ও আফ্রিকায় এখন এমনি একটা সময় এসেছে। বান্দুং বৈঠক যে সময় বুঝে সেই কথাটা বলতে পেরেছে, এটাই একটা বড় লাভ। তা ছাড়া বৃহত্তর লাভও একটা আছে।

শান্তি রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা আজ পৃথিবীতে সম্ভবতঃ কেউ-ই অস্বীকার করে না। প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতার পথই যে সমৃদ্ধির পক্ষে সার্থকতর—এ স্বীকৃতিও অল্পাধিক সর্বত্রই পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু কার্যতঃ এ পথে পৃথিবীর দেশগুলি আজো বেশী অগ্রসর হতে পারে নি। তার প্রধান কারণ এই যে বড় রাষ্ট্রের কয়েকটি এই নীতি আজও আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারে নি। এ নীতির প্রতি তারা মৌখিক আস্থা না জানাচ্ছে তা নয়, কিন্তু কাজে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে চলেছে। রাষ্ট্রপরিষদের সনদ সুতরাং সার্থক হতে পারছে না।

দ্বিতীয়তঃ—এবং এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির পক্ষে এটা মারাত্মক কথা—যতদূর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, এই বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির অন্ততঃ কয়েকটির উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থনৈতিক সহযোগিতার ছলে এশিয়া ও আফ্রিকার ঔপনিবেশিক শোষণনীতি চিরস্থায়ী করে রাখা। এটা এশিয়া ও আফ্রিকার পক্ষে আপাততঃই বিপজ্জনক এবং পরিণামে বিষবাষ্পেরও পরিপন্থী। সুতরাং গত কয় বছরে এশিয়া ও আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সম্মুখে একটা প্রশ্ন ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠেছে—সেটা হচ্ছে এই: রাষ্ট্রপরিষদের ব্যর্থতা ও কয়েকটি বৃহৎ রাষ্ট্রের এই দুরভিসন্ধি সম্পর্কে এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু করণীয় আছে কি না।

এশিয়া ও আফ্রিকা এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে বান্দুং বৈঠক থেকে। সে উত্তরের তাৎপর্য হচ্ছে এশিয়া ও আফ্রিকার ওপর বাইরের কোন শক্তির হস্তক্ষেপ আর চলবে না। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি ইউরোপ ও আমেরিকার তল্পিবাহক মাত্র—এই মনোভাব এখন ইউরোপ ও আমেরিকার রাষ্ট্রনায়কদের পরিত্যাগ করতে হবে। বান্দুং বৈঠকের এই হচ্ছে দ্বিতীয় লাভ।

অবশ্য একথা সত্য যে, এশিয়া ও আফ্রিকার আত্মসম্বিৎ ফিরে এসেছে এবং এই দুই মহাদেশের কোন জাতিই আর আর অন্যের তাঁবেদার হয়ে থাকতে চায় না, তারা সম্পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণশীল হতে চায়—এটাও নতুন কথা নয়। তা ছাড়া, 'হাত গোটাও' বলে হুমকী দিলেই শোষকরা তাড়াতাড়ি হাত গুটিয়ে নেবে এরকম আশা করাও ভুল। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে, যুক্ত-বিবৃতির মধ্যে বাস্তবিক কোন হুমকী নেই। সরল অকুণ্ঠ ভাষায় মানুষের ন্যায়সঙ্গত দাবীর ঘোষণা আছে। আর আছে যে দাবী এশিয়া ও আফ্রিকার বহু বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন সময়ে এককভাবে ঘোষণা করে আসছিল তারই যৌথ ঘোষণা। এর একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। কিন্তু তবু এটাই যথেষ্ট নয়। দাবী মানতে হলে দাবীর পিছে শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন আছে, ঐক্যের প্রয়োজন আছে। বান্দুং সম্মেলনের সব চেয়ে বড় তাৎপর্য হ'ল এই যে, এই প্রথম এশিয়া ও আফ্রিকার জাতিগুলি পরস্পরের নিকট সান্নিধ্যে আসতে পেরেছে, এই সান্নিধ্যে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হোলো, একে অন্যদের কথা আরও ভালভাবে জানতে পারলো, এবং রাজনৈতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত ব্যাপারে এই সমস্ত দেশগুলির

মধ্যে কার্যকরী সহযোগিতার ভিত্তি রচিত হোলো—যে সহযোগিতার ফলে, আশা করা যায়, এশিয়া ও আফ্রিকার এই দেশগুলি ভবিষ্যতে ক্রমশঃ সবলতর হবে এবং রাষ্ট্রসংঘে নিজেদের যথাযোগ্য স্থান অধিকার করে নিতে পারবে।

রাষ্ট্রসংঘ ও চীন

বিশ্বরাষ্ট্র পরিস্থিতির দিক থেকে বান্দুং সম্মেলনের আর একটা বড় লাভ হোলো এই যে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিতে চীনের পরিচয় আরো ব্যাপকতর হোলো। চীন এশিয়ার অন্যতম প্রধান রাষ্ট্র এবং ভারতের বন্ধু। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু চীনের রাষ্ট্রনায়কদের প্রতি আস্থাশীল। তিনি চেয়েছিলেন যে, এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি চীনকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানুক। বান্দুং-এ তাঁর সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়েছে। যে সব প্রতিনিধি এতদিন পর্যন্ত 'নয়া চীন' সম্বন্ধে অত্যন্ত বিরূপ মনোভাব পোষণ করে এসেছেন, চীন প্রধানমন্ত্রী শ্রী চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে তাঁদেরও প্রায় সকলেই অবশেষে স্বীকার করেছেন যে অন্য মনোভাব চীনের নেই। পারস্পরিক স্বার্থ সম্পর্কেও কিছু তাৎপর্যপূর্ণ বোঝাপড়া হয়েছে বলে মনে হয়। শ্রী চৌ এন লাই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রতিবেশী দেশগুলিতে সাম্যবাদ (কমিউনিজম) প্রচারের জন্য চীন সক্রিয়ভাবে কোন চেষ্টা করবে না। প্রতিবেশীরা পাল্টা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাঁরা নয়া চীনের সরকারকে স্বীকার করবেন এবং এই সরকারকে রাষ্ট্রপরিষদে আসন দেবার জন্য চেষ্টা করবেন।

আজকের বিশ্বরাষ্ট্র পরিস্থিতিতে এই শেষোক্ত প্রতিশ্রুতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নয়া-চীনকে অপাংক্তেয় করে রাখার মূলে রয়েছে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। ভারত কোন দিনই এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রকে সমর্থন করে নি, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নিরন্তর চেষ্টা ছিল এশিয়া ও আফ্রিকার প্রধানতঃ গরিষ্ঠ সংখ্যক দেশের সমর্থন সংগ্রহ করা। বান্দুং সম্মেলনে এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সাম্যবাদী আদর্শ ভাল হোক বা মন্দ হোক, এশিয়া ও আফ্রিকার কোন দেশ আমেরিকার স্বার্থে আমেরিকার নির্দেশে চীনের বিরুদ্ধতা করতে আর প্রস্তুত নয়।

এতে যে নূতন আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে তার ফলও কিছু ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। যথা—যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ফরমোজার ব্যাপার নিষ্পত্তির জন্য চিয়াংকাইশেককে বাদ দিয়েই নয়া-চীন সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে রাজী হয়েছে। এটা অবশ্য খুব বড় একটা ব্যাপার নয়, এবং এইটুকুতেই উল্লসিত হবারও কোন কারণ নেই। তবু একটা নতুন আবহাওয়ার কিঞ্চিৎ নির্দেশ হলেও হতে পারে।

পুনর্বাসন

সংবাদে প্রকাশ যে, বাস্তুত্যাগীদের কাজে নিয়োগ করবার জন্য চাবড়া, গয়েশপুর প্রভৃতি অঞ্চলে কয়েকটি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তর ব্যয় মঞ্জুর করেছেন। এই সব উৎপাদন কেন্দ্রে প্রধানতঃ সতরঞ্চি প্রস্তুত হবে। তাছাড়া সুতা ও দেশী তাঁতে কাপড় বোনার কাজও হবে।

সরকারের এ উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে যে প্রয়োজনের অনুপাতে এ উদ্যমের পরিধি যথেষ্ট নয়। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন দপ্তরের অবহিত হওয়া উচিত।

আমরা যতদূর জানি, চিটাগড় ও হাবড়ায় দুটি উৎপাদন কেন্দ্র আগে থেকেই চলছে। অন্যত্র আরো দু' একটি থাকা সম্ভব। এই সব কেন্দ্রে শুধু জিনিষ তৈরী হচ্ছে না, কারিগরও তৈরী হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুনর্বাসন দপ্তরের পরিকল্পনা অনুসারে যে সব যুবক এখানে কারিগরি শিক্ষালাভ করছে তারা শিক্ষাশেষে স্বতন্ত্রভাবে ছোট কারখানা স্থাপন করে জীবিকা অর্জন করবে। এখানকার শিক্ষাপদ্ধতি সন্তোষজনক কিনা তা অবশ্য বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারেন। যদি সন্তোষজনক

হয়, তা হলে একথা নিশ্চয় বলা যায় যে, এই রকম আরো অধিক সংখ্যক উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন পুনর্বাসন সমস্যা সমাধানের অন্যতম পথ।

উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্ত

আসাম সীমান্ত থেকে আবার উদ্বেগজনক সংবাদ আসছে। নাগা পাহাড় অঞ্চলের অধিবাসীদের এক অংশ বিদ্রোহাত্মক কাজে লিপ্ত আছে সম্ভবতঃ গত কয়েক বছর ধরে। কিছুদিন পূর্বে যখন তাদের কাজের ফলে উত্তর-পূর্ব সীমান্তের এক বিস্তৃত অঞ্চলে অত্যন্ত অরাজকতার অবস্থার সৃষ্টি হয়, ভারত সরকার তখন বাধ্য হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। এর ফলে ঐ সীমান্ত এলাকা কিছুদিন অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল। কিন্তু আবার ছোট খাট গোলমালের খবর পাওয়া যাচ্ছে।

প্রকাশিত সংবাদ থেকে যতদূর বোঝা যায়, নাগাদের মধ্যে প্রধানতঃ দুটি দল আছে। এক দল চরমপন্থী, তারা ভারত রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। অন্যদল স্বায়ত্তশাসনী হলেও ভারতের মধ্যে থেকেই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চায়। সংখ্যালঘিষ্ঠদের গোষ্ঠিগত স্বায়ত্তশাসন নীতি যদি ভারত সরকার মেনে নেন, তবে এই শেষোক্ত দলের সঙ্গে আপোষ করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু আপাততঃ মুস্কিল হচ্ছে এই যে চরমপন্থীদের ভয়ে অন্যদল প্রকাশ্যে কাজ করতেও পারছে না। চরমপন্থীদের কিছু পরিমাণে শান্ত না করতে পারলে, আপোষের কাজে অগ্রসর হওয়া কঠিন। অপর পক্ষে তাদের শান্ত করাও সমানই কঠিন। সংবাদে প্রকাশ, তাদের অস্ত্র আছে। তা ছাড়া, কারো কারো মতে, ব্রহ্মদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করার তাদের ব্যবস্থাও আছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্তের এই সব ভরাই অঞ্চলের অবস্থিতিও এমন যে সশস্ত্র বিদ্রোহীদের দমন করা নিশ্চয়ই সময় সাপেক্ষ। এ সব বুঝেই সীমানা কমিশনের আসাম সফরের ঠিক অব্যবহিত পূর্বে তারা বিদ্রোহ সুরু করেছে। উল্লেখ্য, সীমানা-কমিশনের সদস্যেরা শুধু তাদের রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হবেন, তাই নয়, সশস্ত্র বিদ্রোহ চালিয়ে যাওয়ার তাদের দৃঢ়-সংকল্পের কথাও পরিষ্কার জেনে যাবেন।

এই পরিস্থিতিতে সীমানা কমিশন কি মনোভাব অবলম্বন করবেন, তা অবশ্য বলা যায় না। আলাপ আলোচনার পরিবর্তে অস্ত্র ব্যবহারই যারা প্রথম কর্তব্য মনে করেছে, তাদের সঙ্গে আলোচনার আগ্রহ থাকাও কারো স্বাভাবিক নয়। কিন্তু উত্তর-পূর্ব সীমান্তের শান্তি রক্ষার ব্যবস্থাই ঐ অঞ্চল সম্পর্কে এখন সবচেয়ে প্রথম ও প্রধান কাজ। আমরা আশা করি ব্রহ্মদেশ থেকে গোপনে অস্ত্র সরবরাহের পথ বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভারত সরকার অবহিত আছেন।

মন্দিরা—নববর্ষ

নতুন আশা, নতুন সম্ভাবনা নিয়ে নববর্ষ এলো। আজ স্বাধীন ভারত বর্ষে বর্ষে সোপান অতিক্রম ক'রে উন্নতিশিখরে আরোহণ করুক, এই আমাদের প্রার্থনা।

'মন্দিরা' যেদিন প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল, সেদিন ভারতের আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা ; অধীনতার বিরুদ্ধে জনমনে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত অথচ দেশবাসী ভয়ত্রস্ত। ঝড়ের সংকেত দেখে যে চারণ-চারণীবৃন্দ অভয়বাণী প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাঁদেরই কয়েকজনের হাতে 'মন্দিরা'র সৃষ্টি। তারপর নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে আপন আদর্শ বহন ক'রে সে এতদিন চলে এসেছে।

আজ রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। গড়ার কাজে মন দিতে হবে সকলকে। সাহিত্যে সমাজে সংসারে চাই সুস্থ দৃষ্টি, বলিষ্ঠ চিন্তা, দৃঢ় কর্মশক্তি।

লেখক, গ্রাহক ও অনুগ্রাহকদের সাহচর্যে 'মন্দিরা' নবজীবনের পথে চলতে চায়। মিলিত চেষ্টায় তার সে সংকল্প সফল হ'লেই সে নিজেকে ধন্য মনে করবে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত

এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

মন্দিরা

অষ্টাদশ বর্ষ | জ্যৈষ্ঠ—১৩৬২ | দ্বিতীয় সংখ্যা

শৈশব কৈশোরের কয়েকটি সমস্যা

অধ্যাপক বিভূরঞ্জন গুহ

বুড়ো আঙুল চোষা—[Thumbsucking]

চোষা (sucking) মানব শিশুর সহজাত প্রবৃত্তি। মাতৃস্তন্য পান, এই প্রবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণতি। এতেই শিশু পায় তার জীবনপ্রদ খাদ্য ও গভীরতম তৃপ্তি। যেখানে মায়ের বুকে যথেষ্ট দুধ থাকে না, সেখানে কিন্তু বিকল্প সান্ত্বনা হিসেবে বুড়ো আঙুল চোষে। এ অভ্যাসটি এক বছর বয়সের মধ্যেই হয়। যে সব শিশু মাতৃস্তন্যবঞ্চিত ও বোতলে দুধ খেতে অভ্যস্ত, তাদের মধ্যে এ অভ্যাসটি বেশী দেখা যায়। এ অভ্যাসটি অল্পদিনের মধ্যেই গঠিত হয়ে যায় এবং অনেক শিশু রাত্রিতেও ঘুমের মধ্যে আঙুল চোষে।

একেবারে ছোটশিশুর মধ্যে ও-অভ্যাস চিন্তার কারণ নয়। বোধহয় সমস্ত শিশুই মাঝে মাঝে মায়ের বুকের পরিবর্তে নিজের হাতের আঙুল চোষে এটা ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে করে, তা নয়; চোষার মধ্যেই সে কোন বিশেষ পরিতৃপ্তি পায়। মায়ের বুকের স্নেহময় স্পর্শ শিশু আকাঙ্ক্ষা করে, এটা তার অনুভূতির জীবনের একটি গভীর প্রয়োজন মেটায়। প্রথম ছয়মাস পর্যন্ত, শিশু প্রত্যেকবার মায়ের দুধ (বা বোতল) অন্ততঃ কুড়ি-মিনিট চোষে। যদি মায়ের বুকে দুধ অতিরিক্ত থাকে, বা বোতলের চুষির ফুটো বড় থাকে, তা হলে অল্প সময়েই শিশুর পেট ভরে যায়, কিন্তু সে অতৃপ্ত থেকে যায়। আঙুল চোষার মধ্য দিয়ে এ অতৃপ্তির প্রকাশই অনেক সময়ে দেখা যায়। প্রথম ছয়মাস যে সব শিশু মায়ের বুকের দুধ থেকে আদর পেয়ে তৃপ্ত হয় তারা সাধারণতঃ আঙুল চোষার প্রয়োজন বোধ করে না। একবার অভ্যাসটি গঠিত হয়ে গেলে, যথেষ্ট খাদ্য পেলেও শিশু আঙুল চোষে। খুব শৈশবে চোয়ালের হাড় নরম থাকে, এবং আঙুল চোষার অভ্যাস বেশী চলে শিশুর মুখ চুঁচো হয়ে যায়, দাঁতের মাড়িও সরে যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে,

---

Child man—P 45.

Baby & Speck—P 134

The Natural development of the Child—Bowlay—P 23.

দু'বছরের সময় এ অভ্যাস দূর হয়ে যায়। শিশু তখন অধিকতর খাদ্য পায়, তার মন অবশ্য নানা ক্রিয়ায় উৎসুক হয়, কাজেই সে আর আঙুল চুষে সান্ত্বনা খোঁজে না।

তিন চার বৎসর, বা তার বেশী বয়সের ছেলে মেয়ে যারা আঙুল চোষে, তাদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। তাদের জীবনে অতৃপ্তি আছে, এটা বোঝা যায়। সম্ভবতঃ মার আদর এ শিশু যথেষ্ট পায়নি, তাই অতি শৈশবের জৈবক্রিয়ায় সে ফিরে যাচ্ছে এবং তার মধ্যে নিজের অতৃপ্তির সান্ত্বনা খুঁজছে। অনেক সময় মায়েরা এসব শিশুদের বুড়ো আঙুলে তেতো বা ঝাল মাখিয়ে দেন, বা আঙুলে কাপড়ের বা ধাতুর আঙুল-ঢাকা পড়িয়ে এ অভ্যাস দূর করতে চেষ্টা করেন। এতে কখনো কখনো ফল হলেও, ডাক্তার ও শিশুমনোবিজ্ঞানীরা এর বিরোধী, এতে সে শিশুর অতৃপ্তি ও স্নায়বিক অস্বস্তি অনেক সময় বাড়িয়েই দেওয়া হয়। একেবারে শৈশবে এ অভ্যাস যাতে না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। একবার অভ্যাস হয়ে গেলে ছাড়ানো কষ্টকর। শিশুর পরিবেশ যাতে স্নেহ পরিপূর্ণ হয়, মায়ের আদরে তার যেন কমতি না হয়, পেট ভরে যাতে সে দুধ পায়, আর তার উপযুক্ত নানা বিষয়ে তার বিকাশ যাতে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক ভাবে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

তোৎলামি—[Stammering or Stuttering]

তোৎলামি হচ্ছে কথা আটকে আটকে যাওয়া। সাধারণত আট বছরের আগেই এ দোষ দেখা দেয়। শতকরা নব্বুই বা তারো বেশী সংখ্যক শিশুদের তোৎলামি বিনা চিকিৎসায়ই সেরে যায়। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের মধ্যে এদোষটি বেশী দেখা যায়।

এর বহু কারণ থাকতে পারে। এ দোষ সম্ভবত কিছুটা পরিমাণ বংশগত। মস্তিষ্কে বাক্য উচ্চারণ কেন্দ্রে কোন আঘাত বা অসুস্থতাও এর জন্যে দায়ী হতে পারে। ভারী জিহ্বা এর জন্যে দায়ী, এমন কথা কেউ কেউ বলেন। প্রসিদ্ধ বক্তা ডেমোস্থিনিস্ বাল্যে তোৎলা ছিলেন। তিনি সংকল্প করলেন তোৎলামি সারাতে হবে, তাই তিনি নাকি সর্বদা জিবের উপর পাথরের নুড়ি রাখতেন। মস্তিষ্কের বাম গোলার্ধ (যা দেহের সমস্ত ডান দিকের তথ্যাদি চালনা করে) দক্ষিণ গোলার্ধের উপর আধিপত্য (dominance) স্থাপনে সম্পূর্ণ সক্ষম না হলেও, এটা হতে পারে।

অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী একথা মনে করেন যে শিশুর অনুভূতিগত কোন অস্বস্তি বা অশান্তি তার তোৎলামির একটা প্রধান হেতু। এটা দেখা যায় যে সব ছেলেরা ভীতু, ও আত্মসচেতন তাদের মধ্যেই তোৎলামির ভাগ বেশী। ভয় পেলে, ক্ষেপে গেলে, ঘাবড়ে গেলে তোৎলামী বাড়ে। তোৎলার সব কথাই যে আটকে যায়, তা নয়। এক একজন এক একটা কথায় বেশী আটকে যায়। (যতই সে আত্মসচেতন হয়ে মনে করে আটকাবো না, ততই বেশী আটকে যায়) ডাঃ স্পক্ (Dr. Spock)-এর মতে তিন বৎসর বয়সের সময়, যখন শিশু কিছু কিছু কথা শিখেছে অথচ সব মনের ভাব প্রকাশের পক্ষে তার ভাষার পুঁজি যথেষ্ট নয়, তখন যে আকুলি

Speech Pathology in L. E. Travis Handbook of Child Psychology.

Child Psychology—Skinner Harriman P.—133.

The Natural Development of the Child—A. Howlay P 136

Baby & Child Care—Dr. Benjamin Spock—P 273

A. W. Oates—Left handedness in relation to Speech Defects, Intelligence and Achievement Foum Ed. 7. P 91—105

বিকৃতি তা অনেক সময় তোৎলামির কারণ। তার পাওনা আদরে কম পড়ছে এমন মানসিক অশান্তি বা ঈর্ষা, শিশুর তোৎলামিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। একটি ছোট শিশুর তোৎলামি শুরু হল, যেদিন তার ছোট্ট নতুন আর একটি বোনকে নিয়ে মা হাসপাতালে থেকে ফিরে এলেন। বাবা বাড়ীতে হঠাৎ খুব নমক ধামক করেছেন এর পরেই আর একটি শিশুর তোৎলামি শুরু হ'ল। না হয়ত খুকুর বাহাদুরী দেখাবার জন্যে খুকুকে নূতন একদল অতিথির সামনে সদ্য শেখা কবিতা আবৃত্তির জন্যে দাঁড় করিয়ে দিলেন, তারপরেই শুরু হল খুকুর তোৎলামি। অনেক মনো-বিজ্ঞানীর মতে বেঁয়ে বা ন্যাটা ছেলেদের জোর করে অভ্যাস পরিবর্তন করিয়ে ডান হাতে কাজ করাতে চেষ্টা করালে তোৎলামী দেখা যায়। অনেকে মনে করেন বেঁয়ে হওয়ারই একটা প্রধান কারণ শিশুর জীবন মানসিক অশান্তি বা স্নেহের অভাব।

যদিও এটা খুব মারাত্মক দোষ নয়, তথাপি তোৎলাদের বন্ধুবান্ধবদের অনেক সময় অ্যাপায়। যারা অভিমানী, তারা এর ফলে সমবয়সীদের সঙ্গ এড়ায়, বিমর্ষ হয়ে পড়ে, এটা তাদের ব্যক্তিত্ব স্ফুরণের পরিপন্থী; এতে বুদ্ধির দিক থেকেও তারা কখনো কিছুটা পেছিয়ে পড়ে।

তোৎলামীর লক্ষণ দেখা দিলেই পিতামাতার সতর্ক হওয়া উচিত। শিশুর শারীরিক কোন কারণে এটা হয়ে থাকলে, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া দরকার হতে পারে। সর্বক্ষেত্রেই শিশুর পরিবেশে অশান্তি, উদ্বেগ ও উত্তেজনার কারণ অনুসন্ধান করে তা দূর করা প্রয়োজন। পিতামাতা, শিক্ষক, ভাই, বোন, বন্ধুদের কাছে স্নেহ ও সহানুভূতি পেলে সহজেই এটা সেরে যেতে পারে। কিন্তু বাপ মা ওর জন্যে অতিরিক্ত চিন্তা ভাবনা করলে, তাও ভাল নয়। এটা শিশুর উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে। তার সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহার করা দরকার, তার ত্রুটির জন্যে অতিরিক্ত দয়া দেখালেও, শিশু মনে মনে বিরক্ত হয়। শিশুর দেহ মনের সমস্ত বৈকল্যের চিকিৎসার বেলায়ই পিতামাতা ও শিক্ষকের একথা স্মরণ রাখা ভাল, যে স্বচ্ছবুদ্ধিমার্জিত সহানুভূতি শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় উপাদান। এবং বৈকল্য সত্ত্বেও শিশুর সঙ্গে অন্য স্বাভাবিক শিশুর মতই ব্যবহার করা উচিত।

নখ কামড়ানো [Nail biting]—স্কুলের নীচু ক্লাসে কোন কোন ছেলেমেয়ে দিশাহারা হলে, নখ কামড়ায়। কখনো কখনো এর ফলে নখে ঘা হয়ে যায়। কোন কোন ছেলে মেয়ে বিষম রেগে গেলে, বা ভয় পেলে মাথা ঠোকে (head banging) বা নিজের গায়ের চামড়া খোটে। এ সবই অনুভূতির জীবনে অস্বস্তি বা অসন্তোষের লক্ষণ। হয়তো বাপ মা, বা শিক্ষক মারধোর করেন, জোরে গালাগাল করেন, এতে শিশু নিজের উপর ভরসা হারিয়ে ফেলে, অসহায় বোধ করে। কখনো কখনো বদ্‌রাগী শিক্ষক বা পিতামাতার উপর শোধ তুলবার আকাঙ্ক্ষাটা নিজের উপর পীড়ন দ্বারাই পরোক্ষভাবে মেটায়। কখনো কখনো এমনি করেই সে হয়তো দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়, তার স্নেহবঞ্চিত হৃদয়ের অভিযোগ জানায়।

বোঝা শক্ত নয়, এর চিকিৎসা হচ্ছে শিশুর জীবনে ভয়-রাগ বা অশান্তির কারণটি খোঁজ করা আর তা দূর করা। শাস্তি দিয়ে ফল বরং উল্টো হয়। যে সব ছেলের এ অভ্যাস আছে, তাদের ভয়ের গল্প পড়তে না দেওয়া, ভয়ের ছবি না দেখতে দেওয়া উচিত। মেয়ের বেলায়, তাকে আদর করে সুন্দর নেইল্ পলিশ (Nail polish) ইত্যাদির সেট উপহার দিলে, উপকার হতে পারে। পলিশ দিলে তার হাত সুন্দর দেখায়, মানুষে প্রশংসা

Child Psychology Skinner & Harriman P 133

The Natural Development of child—Bowlay P 64-65

Baby and Child care Dr. B. Spcok P 275

করে, এ দেখলে আর সে নখ কামড়ে, হাতের চেহারা কুশ্রী করবে না।

শয্যামূত্র [Enuresis or bed wetting]—একেবারে বাচ্চা বা তিন বৎসর পর্যন্ত বিছানায় মোতেই। প্রস্রাবটা ধরে রাখাটাও শিক্ষা-সাপেক্ষ। ছোট শিশু সেটা আয়ত্ত করতে পারে না। তবে বিছানা ভিজে গেলে ঠাণ্ডা লাগে, শোবার আরাম নষ্ট হয়, মা বিরক্ত হন, এ কথা অস্পষ্টভাবে শিশু বোঝে। আর অনেক মা-ই ছোট বয়স থেকেই বিছানার বাইরে নির্দিষ্ট সময় পরে পরে শিশুকে প্রস্রাব করান। এ সব থেকে অভ্যাসটা অধিকাংশ শিশুই আয়ত্ত করে ফেলে। আর একটু বড় হ'লে, বিছানায় মুতলে সবাই ঠাট্টা করে, বাবা মা হয়তো শাস্তি দেন, মানুষের কাছে লজ্জা পেতে হয়, কাজেই অধিকাংশ শিশুই সতর্ক হয়ে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় ৩।৭ বৎসর পর্যন্ত বিছানায় মোতার দৃষ্টান্ত কম নয়। কখনো কখনো দশ বারো বৎসর পর্যন্তও এ অভ্যাস দেখা যায়, এমন কি পরিণত বয়সেও বিছানা নষ্ট করে এমন মানুষ আছে।

কোন দৈহিক কারণ, যথা মূত্রাশয়ের পেশীদৌর্বল্য, এর মূলে থাকতে পারে। শিশুকালে বিছানার বাইরে নিয়মিত সময়ে প্রস্রাব করবার অভ্যাসটির অভাবও এর কারণ হতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর পশ্চাতে মানসিক অশান্তি থাকে। ভীতু, অভিমানী ছেলেদের মধ্যে এ অভ্যাস বেশী দেখা যায়। নূতন একটি ভাই বা বোন জন্মালে অনেক শিশু বিছানায় মুততে সুরু করে। তার মায়ের স্নেহের অংশীদারকে শিশু খুসীর চোখে দেখে না। মার স্নেহ সে আর পাবে না, এমন ভয় শিশুর মনে জাগে। মার উপরে তার রাগ ও অভিমানও হয়। সে তার নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়, আর বাবা মার উপর রাগ (aggressive feeling) এ-উপায়ে প্রকাশ করে। শয্যামূত্রের এটা একটা প্রধান কারণ। মা অল্প বয়সে মারা গেলে শিশুদের অনুভূতির জীবনে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়, এবং তার ফলে শয্যামূত্র দেখা দেয়। মা মরা অথবা পরিত্যক্ত শিশু যারা নার্সারীতে মানুষ হচ্ছে, তাদের মধ্যে এ অভ্যাস বেশী দেখা যায়। মায়ের স্নেহের অভাবে শিশুর কত রকমের যে বৈকল্য দেখা দেয় তা বর্তমানের শিশুমনোবিজ্ঞানীরা বহু পর্যবেক্ষণ দ্বারা জানতে পারছেন।

এ রোগ সারাবার উপায় শিশুর দৈহিক ত্রুটি আছে কি না, এটা পরীক্ষা করা এবং প্রয়োজন হলে চিকিৎসা করানো উচিত। নিয়মিত সময় বিছানার বাইরে প্রস্রাব করানোর অভ্যাসটির দিকে মার দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তবে এ বিষয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করে শিশুকে উত্যক্ত ও উদ্বিগ্ন করে তুললে ফল অনেক সময় উল্টো হয়। রাত্রে শোবার আগে প্রস্রাব করানো উচিত। রাত্রে জল কম খেতে দিলে অথবা গ্লুকোজ খেতে দিলে উপকার হতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন, তার অতৃপ্ত স্নেহের আকাঙ্ক্ষা মেটানো। তার মনে নতুন ভাই বা বোনের প্রতি ঈর্ষাটা যাতে প্রবল না হয় সে চেষ্টা করা, এবং তাকে নানা খেলাধূলায় ভুলিয়ে রাখা দরকার। আর এ অপকর্ম করে ফেললে তাতে বেশী লজ্জা দিলে ফল খারাপই হয়। তাকে স্বাভাবিক স্নেহের সঙ্গে এ অভ্যাসটি দূর করতে সাহায্য করলে উপকার বেশী হবার সম্ভাবনা।

শিশুর সমস্ত বৈকল্য-চিকিৎসার বেলায়ই এ উপদেশটি স্মরণ রাখা উচিত। "ভয় এবং তার সঙ্গী উদ্বেগ, এ দুটি মৌলিক অনুভূতি শিশুর সুস্থ জীবনের সবচেয়ে বড় শত্রু, কাজেই পিতামাতা বা শিক্ষক যাঁদের উপর শিশু পালনের দায়িত্ব ন্যস্ত আছে, তাঁদের দেখতে হবে, যাতে শিশুরা এ দুটি অনুভূতি দ্বারা ঘন ঘন বা তীব্রভাবে আক্রান্ত না হয়।"

The Natural Development of the Child—Bowlay P130

Baby & child care—Dr. Benjamin Spock P408

The Natural Development of the Child—Bowlay. P49 & 130

Child Psychology for Professional Worker. F. M. Teagarden, P 187

The Natural Development of the Child—Bowlay P131

স্মৃতিকথা

শ্রীকালিদাস রায়

বনফুলের রাত্রি ও তারাশঙ্করের কবি—উপন্যাসের মোহিতলাল খুব সুখ্যাতি করিতেন। বই দুইখানিই তাঁহার নামে উৎসর্গ করা। বই দুইখানি তিনি মন দিয়া পড়িয়াছিলেন। ইঁহাদের সব বই না হউক কয়েকখানি বই তিনি পড়িয়াছিলেন। কারণ, ইঁহারা ইঁহাদের অনেক বই উপহার দিতেন। যে সব উপন্যাস গল্পের বই লেখকরা তাঁহাকে উপহার দিত—কেবল সেইগুলিই তাঁহার পড়া হইত, গল্প উপন্যাসের বই কিনিয়া-ও পড়িতেন না—কোন লাইব্রেরী হইতে আনাইয়াও পড়িতেন না। বহু লেখকই তাঁহার কাছে পুস্তক উপহার পাঠাইত না জন্যে। অনেকে তাঁহার মতামতের ভিখারীও ছিল না।

একদিন তিনি আমার কাছে মনোজের নরবাঁধের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। আমি বলিয়াছিলাম—নরবাঁধের পর মনোজের অনেক বই বেরিয়েছে—ভালো বইও তাদের মধ্যে আছে। আপনি সে সব পড়েন নি। ইদানীং অন্য লেখকদের অনেক ভালো ভালো গল্প উপন্যাসের বই বেরিয়েছে শুনেছি—আমি কিছু-কিছু পড়েছি। বর্তমান সময়ের কথাসাহিত্য সম্বন্ধে আপনার আমার কোন মতামত প্রকাশ না করাই ভালো। কারণ, কত রাশি রাশি বই বেরুচ্ছে—আমরা তা দেখবারও সুযোগ পাইনা—পড়া দূরে থাক। কাজেই সব বই যখন পড়াই হয় না—তখন আমাদের নীরব থাকাই ভালো। কোন গ্রন্থবিশেষ সম্বন্ধেই আমাদের মত দেওয়া চলে। সাধারণভাবে কিছু বলা চলে না। বই সংগ্রহ করা কঠিন নয়, কিন্তু এত পড়বার আমাদের ধৈর্য বা অবসর কই?

আমার এই উক্তি সাময়িকভাবে তিনি সমর্থন করিয়াছিলেন। সব বই পড়িয়া দেখিবার আগেই ২।১খানা বই পড়িয়া বা মাসিক পত্রে ২।১টা গল্প পড়িয়া মতামত প্রকাশ করিয়া আমি বারবার ঠকিয়াছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীমান প্রমথনাথ বিশীর রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন বইখানি পড়িবার আগে তাহার সাহিত্য সৃষ্টি সম্বন্ধে আমার বিশেষ উচ্চ ধারণা ছিল না। এই পুস্তক পড়ার পর আমি প্রমথর রচনার অনুরাগী হইয়া উঠি—তারপর হইতে তাহার প্রত্যেক পুস্তকখানি পড়িতেছি—এখন আমি তাহার রচনাবলী সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের অধিকারী হইয়াছি। নারায়ণ, মাণিক, বুদ্ধদেব, বিমল ইত্যাদি সুলেখকদের বেশি কিছুই আমিই পড়ি নাই—কাজেই তাঁহাদের সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের অধিকারই আমার জন্মে নাই।

পরিমলের একখানি শ্লেষ-ব্যঙ্গাত্মক গল্প সঙ্কলনের পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকের নাম বা খ্যাতি কোন সাহিত্যিকের মুখে আমি শুনি নাই—কাজেই এই বই আমার পড়াই হইত না। পরিমল এই বই একখানি উপহার দিয়া সমালোচনা করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। কাজেই বইখানাকে critically আমাকে পড়িতে হইয়াছিল। বইখানি পড়িয়া পরিমলের অসামান্য ক্ষমতায় আমি মুগ্ধ হইলাম। পরিমলের অনেক গল্প রাজশেখরবাবুর গল্পের সমকক্ষ একথা আজ মুক্তকণ্ঠে বলিবার অধিকারী হইয়াছি।

একদিন হঠাৎ নরেনের 'রস' গল্পটা পড়িয়া নরেনের শক্তি সম্বন্ধে আমি প্রথম সচেতন হইলাম। প্রবোধকে ঐ গল্প পড়িয়া দেখিবার জন্য বলিলাম। প্রবোধ পড়িয়া এমনই মুগ্ধ হইল যে আজও আমার কাছে সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

সুবোধ ঘোষ ও সুবোধ বসু দুই জনেরই কিছু কিছু পড়িয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি—কিন্তু ইহাদের সব লেখা আমি পড়ি নাই—কাজেই অল্প লেখা পড়িয়া ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার অধিকারী নই।

আমি যখন অসুস্থ তখন একদিন তারাশঙ্কর আমাকে দেখিতে আসিয়াছিল—কথায় কথায় সে দীপক চৌধুরীর 'পাতালে এক ঋতু' পুস্তকখানির মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিল। কাজেই বইখানা পড়িয়া দেখিবার প্রয়োজন হইল। পড়িয়া বুঝিলাম তারাশঙ্করের প্রশংসা আবেগোচ্ছ্বাস মাত্র নয়—সত্যই বইখানা বঙ্গসাহিত্যে স্বাতন্ত্র্যের দাবি করিতে পারে।

আশাপূর্ণার খ্যাতি খুব বাড়িলে তাহার গল্প ২।৪টি পড়িয়া বুঝিলাম—হ্যাঁ, খ্যাতিলাভের যোগ্য সে। এই ভাবে আমাদের বই পড়া। কাজেই কে যে কত ভালো বই লিখিয়াছে—কে যে কত রাবিশ লিখিয়াছে আদৌ জানিনা। পাঠ্য পুস্তকের জন্য গল্প সংগ্রহের প্রয়োজনে ইদানীং অনেক গল্প পড়িতে হইল। স্কুলের পাঠ্য পুস্তকের উপযোগী গল্প খুঁজিয়াই পাওয়া যায় না—কাজেই অনেক গল্পই পড়িতে হইল। এমন বহু গল্পেরই সাক্ষাৎ পাইলাম যেগুলি পাঠ্যপুস্তকে চলিবে না বটে, কিন্তু অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রচনা। পাঠ্য পুস্তকের জন্য প্রয়োজন না হইলে সে সব গল্প পড়াই আমার হইত না।

এখন আমারমনে হয় রবীন্দ্র শিষ্যদের লেখা কবিতাবলী সম্বন্ধে কাহারও স্পষ্ট ধারণা নাই। হাতের কাছে বই না পাওয়া, বই উপহার না পাওয়া এবং রবীন্দ্রনাথের পর কবিতা লেখার জন্য রবীন্দ্রশিষ্যদের কবিতাবলী উপেক্ষিত হইয়া লুপ্তপ্রায় হইতে চলিল। ইঁহাদের কাহারও কাহারও কবিতার চয়নিকা বাহির হইয়াছে—কিন্তু পূর্ব হইতে ধারণা বিরূপ থাকায় সে চয়নিকাগুলিও কেহ মন দিয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গত দশ বৎসরে ইঁহাদের যে কবিতাগুলি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলি শক্তিক্ষীণতারই নিদর্শন।

ইঁহাদের লেখার সহিত অপরিচয় বা সামান্য পরিচয়ের উপর নির্ভর করিয়া মতামত প্রকাশ করা উচিত নয়। নব্য লেখকদেরই বা বলি কেন? প্রবীণ লেখকেরাও ইঁহাদের রচনাবলী মন দিয়া পড়েন নাই। চোখ বুলাইলেই কবিতার রসবোধ হয়না।

১৭।১৮ বৎসর আগে যখন ঢাকায় মোহিতলালের সঙ্গে দেখা হয় তখন মোহিতলাল আমাকে বলিয়াছিলেন —"কুমুদরঞ্জনের যখন এত খ্যাতি তখন নিশ্চয়ই তাঁর রচনার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা অনন্যসাধারণ। কুমুদবাবুর কবিতা আমার ভালো করে পড়া নেই—আমি তাঁর বইগুলো সংগ্রহ করবার চেষ্টা করছি।" তিনি তারপর কুমুদরঞ্জনের কবিতাগুলি পড়িয়া তাঁহার বিশেষ অনুরক্ত হইয়া পড়েন। কুমুদরঞ্জন পূর্বে মোহিত লালকে কোন বই উপহার দেন নাই—তাহার ফলে তাঁহার পুস্তক মোহিতলালের অপরিচিত থাকিয়াই গিয়াছিল।

তবুও মোহিতলাল ভালো পাঠক ছিলেন—বই উপহার দিলে পড়িতেন। বই কয়জনকেই বা উপহার দেওয়া যায়? বই-ই বা কোথায়? কোন প্রকাশক ত কবিতার বই বাহির করিতে চায় না। আর উপহার দিলেই বা কে পড়িয়া দেখিতেছে? অনুসন্ধিৎসাই বা তাঁহার মত কাহার আছে? বই নয়, লেখা নয়, খ্যাতিই হিংসা কিংবা শ্রদ্ধার উদয় ঘটায়। ইদানীং নব্যতন্ত্রের লেখকদের মধ্যে একমাত্র শ্রীমান হরপ্রসাদেরই দেখিয়াছি—রবীন্দ্র যুগের কবিদের রচনা সম্বন্ধে আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা।

সাহিত্যিকরা পরস্পর ঘনিষ্ঠ বান্ধবতা সূত্রে আবদ্ধ, কিন্তু কেহই কাহাকেও খুব ভাল করিয়া চেনেন না। কারণ, যতদূর আমার অভিজ্ঞতা কেহই সহযোগীদের লেখা পড়িয়া দেখেন না। ২।৪টা লেখা সকলেই সকলের পড়িয়াছেন —কিন্তু এক চতুর্থাংশ লেখাও পড়েন নাই। কাজেই অন্তরের পরিচয় পাইয়াছেন বৎসামান্য। ভালো করিয়া

সব লেখা পড়িয়া একটা সম্পূর্ণাঙ্গ ধারণা গঠনের আগ্রহ কাহারও আছে বলিয়া মনে হয় না।

চর্যাপদ হইতে কাজী নজরুলের কবিতাবলী পর্যন্ত সমস্তই আমার পড়া আছে—কাজেই এই সমস্ত কবিতা সম্বন্ধে সম্ভবতঃ আমার মতামত প্রকাশের অধিকার জন্মিয়াছে। কিন্তু তারপর নব্যতন্ত্রের কবিতা ভালো করিয়া পড়া বা বোঝা নাই—কাজেই নব্যতন্ত্রের কবিতা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের আমার অধিকার নাই। তবু যে আলোচনার মুখে মতামত প্রকাশ করিয়া ফেলি তাহা গতানুগতিক স্বভাবদোষে। লেখনী কোনরূপ মতামত প্রকাশে সম্মত হয় না।

আমার মনে হয় নব্য তন্ত্রের কবিদেরও রবীন্দ্রশিষ্যদের অর্থাৎ আমাদের কবিতাবলী ভালো করিয়া কাহারও পড়া নাই। মাসিকপত্রে কচিৎ কখনও প্রকাশিত কবিতায় চোখ বুলাইলে অথবা অপ্রস্তুতভাবে পড়িলে কোন কবির সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মে না। একটি ভাত টিপিলেই হাঁড়ির সব ভাতের পরিচয় পাওয়া যায়—এ কথা সাহিত্য বিচারে চলে না। আমাদের কবিতার বই ঘরে ঘরে ত বিরাজ করে না। পাঠাগারে পাঠাগারেও থাকে না, এমনকি দোকানেও দুই একখানির বেশী মিলে না। তাছা ছাড়া, কবিতা,—গল্প উপন্যাসের মত পড়িলে চলে না,—খুব critically পড়িতে হয়।

বড়ই দুঃখের বিষয় সাহিত্যবিচার সম্বন্ধে যে অধিকারিভেদ আছে তাহা এদেশে কেহ স্বীকার করে না। আমি কেবল বিচারশক্তির কথা বলিতেছি না—আমি বলিতেছি রচনাপাঠের কথা। রচনাবলী ভালো করিয়া না পড়িয়া দায়িত্বশূন্য মতামত প্রকাশের স্পর্ধা দিন দিন বাড়িতেছে—এই স্পর্ধা আগেকার যুগে কাহারও ছিল না। স্পর্ধার দ্বারা নিজেকে প্রকট ও বিখ্যাত করিবার প্রয়াস কখনও প্রশংসনীয় নয় মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা সকলেরই আছে—স্বাধীন বাংলায় তাহা আরও বাড়িয়াছে। কিন্তু এই স্বাধীনতার অপব্যবহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির লক্ষণ নয়।

নব্য তন্ত্রের একজন খ্যাতনামা লেখক একবার লিখিয়াছিলেন, রবীন্দ্রযুগের কবিদের রচনা ধরা পৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের রচনাবলীই যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার পাঠ্য হইয়া বিরাজ করিতেছে—এ সংবাদও বোধ হয় তিনি রাখেন নাই। ধরার অর্থ ঐ লেখক সম্প্রদায়ের মনোভূমি নয়। যুগ ধর্মের পরিবর্তন হইয়াছে সন্দেহ নাই। যুগ ধর্মের পরিবর্তনে সাহিত্যের বিষয় বস্তুর পরিবর্তন ঘটিতে পারে—ভঙ্গীরও পরিবর্তন ঘটিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের শাশ্বত রসাদর্শের পরিবর্তন হয় না। এই সত্যটি উপলব্ধি করিলে দায়িত্বশূন্য মতামত প্রচারের পথ অনেকটা অবরুদ্ধ হইতে পারে।

—বাংলার বিপ্লবযুগের অপূর্ব ইতিহাস—

"বিপ্লবের পদচিহ্ন"—শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দত্ত

বইখানি একবার পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে উঠতে পারা যায় না।

আজই একখানা কিনে পড়ুন এবং ঘরে ঘরে পড়বার সুযোগ দিন। বইখানা আপনার গ্রন্থাগারের সম্পদ হয়ে থাকবে

—বইখানি সম্বন্ধে কয়েকটি অভিমত—

বস্তুতঃ বইখানি পড়তে পড়তে শুধু ভূপেন্দ্রকুমারকে নয়, সমগ্র বিপ্লবীদলকে পাওয়া যায় যাঁরা অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি এবং দুর্বলতা সত্ত্বেও মহৎ। তাঁদের কর্মসাধনা, তাঁদের চিন্তাধারা যেন মাটির গভীরে সমগ্র জাতির তপস্যা—মুক্তির জন্যে, এবং তারও চেয়ে বড়, আলোর জন্যে। এরই সঙ্গে স্বাধীন ভারতের তরুণ-তরুণীদের পরিচয় থাকা শুধু আবশ্যক নয়, অপরিহার্য।

(তরুণের স্বপ্ন)—শ্রীসরোজকুমার রায় চৌধুরী

.....নাসিক-কন্দির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বিবরণ, কারাগারের অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে স্থিত মানুষের মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কাহিনী নানা প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও মানুষের আত্মার পরাজয় স্বীকার না করবার অপূর্ব চিত্র।.....প্রায় চারশত পৃষ্ঠার এই বইয়ে ভূপেনবাবু শুধু নিজের কথাই বলেন নাই; সহকর্মীদের কথা, পুলিশ কর্মচারী জেল কর্মচারী, সরকারী বড় কর্মচারীদের কথা, বিভিন্ন জেলের ব্যবস্থা, অবস্থা, তা সংশোধনের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, জেলে পড়াশোনা, আদর্শ বিচার, দলাদলি, আমোদ-প্রমোদ—সব কথাই অত্যন্ত সরলভাবে বর্ণনা করেছেন।.....

.....বই খানার ঘটনাবিন্যাস উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক, লিখনভঙ্গী মনোজ্ঞ ও সরস। একবার আরম্ভ করলে শেষ না করে উঠা যায় না। সমস্ত বইয়ের মধ্যে একটা সবল সতেজ সহৃদয় ব্যক্তিত্বের ছাপ রয়েছে। তা পাঠকমাত্রকেই মুগ্ধ করবে। আমরা সকলকেই বইখানা পড়তে অনুরোধ করি।

—আনন্দবাজার পত্রিকা—

"Those who want to know about the immortal youths of Bengal in all their glory and of whom Ravindranath sang and gave adequate expression will do well to go through this book. This book will also help future historians who may undertake the task of writing a full and authentic account of Bengal's revolutionary movement. We know how the Bengali youths, forgetful of their personal safety and promises of earthly riches mounted gallows in such a cheerful way that even their executioners were surprised. Only in the Easter Revolution in Ireland we can search for parallels of such acts of individual heroism. We should know the history of this period of Bengal. Let the world also know about them.

—Amrita Bazar Patrika—

সরস্বতী লাইব্রেরী

৬ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২

'মন্দিরা'য় আষাঢ় সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক উপন্যাস

'বহ্নি-বন্যা'

লিখেছেন খ্যাতিমান কথাশিল্পী—গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ভারতের প্রথম স্বাধীনতাযুদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহ এই উপন্যাসের অন্যতম পটভূমি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

সম্পাদক :—মন্দিরা

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

শ্রীসচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কাব্যরসিক ব্যক্তিদের নিকট যতখানি সমাদর লাভ করিয়াছিল পরবর্তীকালে প্রচারের অভাবে এবং অপরিচয়ের দাক্ষিণ্যে ততখানি বিস্মৃতির কবলে উপস্থিত হইয়াছিল। সম্প্রতি অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্রের সম্পাদনায় কিরণধনের একমাত্র কবিতাগ্রন্থ নতুন খাতার একটি পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় বর্তমান যুগের কাব্যামোদী পাঠকগণকে তাঁহার কবিতার সহিত পরিচয় করিবার পুনরায় সুযোগ দিয়াছে।

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের কবিখ্যাতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে তাঁহার কবিজীবনের সঙ্গে সঙ্গেযে যুগে তিনি লেখনী চালনা করিয়া কাব্যসৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই যুগের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। নতুবা তাঁহার পরিকল্পনার এবং রসপ্রেরণার উৎসমূলটির সন্ধান পাওয়া যাইবে না।

বাংলাসাহিত্যের সাময়িক পত্র ও পত্রিকার ইতিহাসে 'ভারতী' একটি যুগান্তকারী পত্রিকা হিসাবে চিরস্থায়ী আসন করিয়া লইয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সম্পাদনায় ১২৮৪ সালে ঐ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পরে স্বর্ণকুমারী দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী, সরলা দেবী ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় যথাক্রমে উহার সম্পাদনা করেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং 'ভারতী'র সহিত সাক্ষাৎভাবে যুক্ত থাকিয়া কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদির দ্বারা ঐ পত্রিকার শ্রী ও সমৃদ্ধি সাধন করিয়া সাহিত্যিক সমাজে উহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বরেণ্য এবং বহুমুখী প্রতিভার সামীপ্য লাভ করিয়া 'ভারতী' গোষ্ঠির লেখকগণ স্ব স্ব শক্তি ও সাধনার দ্বারা বঙ্গভারতীর অর্চনা করিয়া যে-কীর্তি অর্জন করিয়া গিয়াছেন তাহা কাহারও একমাত্র চেষ্টায় সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ।

'ভারতী গোষ্ঠির কবিকুলের মধ্যে যাঁহারা যশস্বী হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্র মোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রিয়ম্বদাদেবী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ বাগচী, কালিদাস রায়, মোহিত-লাল মজুমদার ইত্যাদির নাম স্মরণীয়। ভাবে এবং ভাষার ছন্দে এবং সৌষ্ঠবে, বিষয়বস্তুতে এবং রসপ্রকরণে ইঁহারা সকলেই রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রাপ্ত পাথেয় নিঃশেষে আত্মসাৎ করিয়া স্বজনীবাক্যের দুরধিগম্য প্রদেশে যাত্রা করিয়াছেন ও কাব্যের অনাবিষ্কৃত আলোকতীর্থের সন্ধান দিয়াছেন। তথাপি যুগপ্রেরণার ফলেই হউক অথবা দীক্ষাগুরু প্রদত্ত বীজমন্ত্রটির অদ্বিতীয়তার গুণেই হউক এই সকল কবিগণের জীবনবোধ, কবিমানস এবং কাব্য সৃষ্টিতে তাঁহাদের অলক্ষিতে একটি যোগসূত্র বা ঐক্য রহিয়া গিয়াছে।

ফলে তাঁহাদের রস কল্পনা, সৌন্দর্যপ্রীতি, প্রেম স্বপ্ন, নিসর্গ চিন্তা—এক কথায় জীবন দর্শনে, নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে একটি বর্ণ স্ফুটতর হইয়াছে—জীবনবোধে, নানা সুরের লহরীর মধ্যে একটি সুরের সঙ্গীতরূপ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। সেই বর্ণ ও সেই সুরটি ছিল বলিয়াই সে যুগের বাংলা কাব্য আজিকার মত দুরবস্থার সম্মুখীন হইতে পারে নাই। অতঃপর প্রশ্ন উঠিবে সেই অপূর্ব বস্তুটি কি যাহার অভাবে এযুগের কাব্য জীবন্ত সমাধি লাভ করিতেছে এবং যাহার ধন্বন্তরি-প্রসাদে বিগত যুগের কাব্য মুমূর্ষু অবস্থা হইতেও পুনরুজ্জীবিত হওয়া

উচিত? ইহার উত্তরে এক কথায় বলা যায়—চিরাগত কাব্যাদর্শে অটুট বিশ্বাস; স্বীয় সৃষ্টিকর্মে সনিষ্ঠ আত্ম নিয়োগ, শাশ্বত জীবনের রস-সাধনায় এবং কাব্যের মাধ্যমেই পরমার্থ সত্য দর্শনের আকুল আগ্রহ। অন্য কথায় ইহাও বলা চলে যে মহৎ জীবনে অবিচলিত আস্থা, আপাতিক দুঃখ, শোক, ব্যথা এবং দৈন্যের হাহাকারের মধ্যেও একটি আধ্যাত্মিক সান্ত্বনাবোধ এবং ঐশ্বরিক শক্তির কল্যাণ কল্পনার আশ্বাস লাভই বিগত যুগের কবিগণকে একটি গাঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রাখিয়াছিল। আজ পরমার্থিক সত্যের এবং কল্যাণের সেই নির্ভরশীল আশ্রয় চ্যুত হইয়া আমরা কাব্যের শাশ্বত আদর্শ হইতেই ভ্রষ্ট হই নাই—তাহার আত্মার সম্বন্ধ হইতেও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। ফলে আজিকার কবির রসলোকে আজিকার পাঠকের যেমন প্রবেশাধিকার নাই, তেমনি একই যুগের এক কবির সৃষ্টি কর্মের সহিত অপর কবিগণের সৃষ্টিকর্মের ভাব কল্পনার, ভাষারীতির, ছন্দোবন্ধনের বা অলঙ্করণ বৈচিত্রের আদৌ সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু একথা যাক। আমরা কিরণধনের কবি-পরিচিতিতে ফিরিয়া যাই।

কিরণধনের কবিজীবন অতিশয় স্বল্পায়ু। মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসরের মধ্যে যাঁহাকে জীবন লীলা সাঙ্গ করিতে হইয়াছে (জন্ম ১৮৮৭, মৃত্যু ১৯৩১) এবং জীবনের মাত্র শেষ নয়-দশ বৎসর কাল যিনি কাব্য রচনার সুযোগ পাইয়াছিলেন তাঁহার কৃতির পরিমাণ যে অধিক হইতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য। এই কারণে তাঁহার কবিতাগুলি সংখ্যায় একশতকেও অতিক্রম করে নাই। ১৯২০ সালে কবির পত্নী বিয়োগ হইলে তাঁহার শোকাভিভূত চিত্ত সান্ত্বনার আশায় চারিদিক অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে কাব্যসৃষ্টির মধ্যে সকল সন্তাপ প্রশমিত করিয়া শান্তিলাভ করিল।

সংসারের দুঃখ, শোক, বেদনা, আর্তনাদ সব কবিরই হৃদয়ে বিশেষ এক রস মূর্তি পরিগ্রহ করে। মহাকবি বাল্মীকিও তাঁহার অনুষ্টুপ ছন্দে প্রথম যে কাব্যশ্লোক রচনা করেন তাহার মূলেও চক্রবাক চক্রবাকীর বিয়োগ বিধুর কাহিনী জড়িত রহিয়াছে। কালিদাসের কাব্যসৃষ্টির পশ্চাতে এরূপ কোনও তথ্য আমরা না জানিলেও ইহা সকলেরই সুবিদিত যে, তাঁহার 'মেঘদূত' কাব্যের বিরহীবক্ষের যে হৃদয়াবেগ মন্দাক্রান্তাছন্দে অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার অন্তরালে প্রিয় মিলনকামী প্রেমিকের অন্তর্বেদনার করুণ রাগিণীই ধ্বনিত হয়। পরবর্তী কালে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রমুখ বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যেও প্রিয়ার বিরহ, প্রেমাস্পদকে (তাহা স্বকীয় হউক আর পরকীয়ই হউক) লাভ করিবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা যে গভীরতা লাভ করিয়াছে তাহাও মানব জীবনের স্বভাবগত দেহ বাসনার অতৃপ্তি এবং নর নারীর লৌকিক প্রেমের অসম্পূর্ণতারই নিদর্শন। বৈষ্ণব গীতিকাব্যের এই চরটি পাশ্চাত্য কাব্যাদর্শের সুরের সহিত মিলিত হইয়া বিবর্তিত হইলেও উহার ব্যঞ্জনায় বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। তাই বিহারীলাল হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কাব্য ধারার মূল প্রবাহে কোনও ছেদ নাই। তাহা নিরবচ্ছিন্ন স্রোতোধারায় বাঙালীর রসভূমিকে প্লাবিত করিয়াছে।

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া এই সকল কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, কবি কিরণধন বাংলা কাব্যে যে রস সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা পূর্ব সূরিগণেরই অনুস্মৃতি ভিন্ন অন্য কিছু নয়। অর্থাৎ তাঁহার কবিতা বাংলার এবং বাঙালীর যুগযুগান্ত কালের নরনারীর প্রেম কল্পনার ঐতিহ্য বহন করিয়া এবং যশস্বী কবিকুলের রসধারায় পুষ্ট হইয়া অভিনব মাধুর্যে স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে।

দাম্পত্য প্রেমের লীলা, তাহার নানাভঙ্গী, বিভিন্ন আবহ এবং বিচিত্র আবেশ আমাদের কাব্যে অল্প বিস্তর সব কালেই প্রকাশমান। তবে প্রাক্‌রবীন্দ্রযুগের কবিগণের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন এ বিষয়ে যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা অনন্যসদৃশ। তাঁহার 'অশোক গুচ্ছ', 'গোলাপ গুচ্ছ', 'পারিজাত গুচ্ছ' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ

দাম্পত্য প্রেমরসের অতুলনীয় সৃষ্টি। দেবেন্দ্রনাথের কবিমন আকুল হইয়া বলিয়াছে :

"গগন নীলিমাময়ী হে শ্যামসুন্দরী
রূপ হেরি প্রাণে জাগে একি নেশা ঘোর,
সাধ যায় জীবনের সারাটি শর্বরী,
ওই সুধা পান করে'—ক'রে ফেলি ভোর।"

অথবা—

"যাদুকরি, তুই এলি
অমনি দিলাম ফেলি'
টীকাভাষ্য,—তোর ওই চক্ষু দীপিকায়
বিদ্যাপতি, মেঘদূত, সব বোঝা যায়!"

"...সারারাত্রি জ্বলিছে দেউটি
প্রিয়া চক্ষে কাব্য পড়ি উলটি পালটি।"

পরবর্তী যুগে অনেক কবির কাব্যে এই সুরটি বাজিয়া উঠিলেও দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় সার্থকতা লাভ করে নাই। রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি এবং মানস গঠন গৃহাভিমুখী না হওয়ায় তাঁহার কাব্যেও দাম্পত্য জীবনের প্রেম কল্পনায় এই বিশেষ রূপটি আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। বর্তমান কালের খ্যাতিমান কবি কালিদাস রায়ও অনেক কাব্যে প্রেমের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। কিন্তু ঐগুলির আবেদনও দেবেন্দ্রনাথের ন্যায় গভীরতার দাবী করিতে পারে না। যদিও ঐগুলিতে কবির আন্তরিকতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। যেমন—

"ভুলিনি সই ভুবন ভোলা প্রথম ভালবাসার রাতি
তোমার আঁখি থাকত মুদে মেললে আঁখি বাসর বাতি।"

অথবা—

"গৃহে তোমা পাই প্রিয়ে, পাই নাই প্রকৃতির মাঝে
তোমার বিরহ ব্যথা তাই সখি বেণু বনে বাজে।"

ইংরাজী সাহিত্যে কবি ব্রাউনিং এই বিষয়ে অনবদ্য শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার একাধিক কবিতায় নরনারীর প্রেমের মাধুরী উৎকৃষ্ট রসসৃষ্টির নিদর্শন হিসাবে কাব্য পিপাসু ব্যক্তিগণের চিত্ত আকৃষ্ট করে। আবার ব্রাউনিং অপেক্ষা শেলী অধিকতর শক্তিমান ও প্রতিভা সম্পন্ন কবি হইয়াও তাঁহার যা 'এপিসাইকিডিয়ানে' প্রেমের যে রূপায়ণ করিয়াছেন তাহাতে Love's rare universe'এর সংবাদ থাকিলেও উহা ব্রাউনিংয়ের প্রেম কাব্যের শিল্পরূপের আদৌ সমকক্ষতা লাভ করে নাই। বিশেষতঃ কবিজায়া এলিজাবেথকে উদ্দেশ করিয়া রচিত ব্রাউনিংএর কবিতাগুলি তুলনা করিলে শেলীর কবিতা বিবর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয়। বস্তুতঃ শেলীর প্রেম অসত্য সেই কারণে, তাহা অস্পষ্ট এবং কুহেলিকাচ্ছন্ন। তাহা Desire of the moth for the star and the night for the morrow'র ন্যায় সর্বদাই হৃদয়ে অতৃপ্তির বোঝা লইয়া অধরার পশ্চাতে ধাবিত হয়। কিন্তু ব্রাউনিং-এর প্রেম স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ এবং মর্ত্য মানবীর সুখভোগের জন্য। তাই তাঁহার আকাঙ্ক্ষা—

"Just for the obvious human bliss,
So satisfy life's daily thirst"

এ পর্যন্ত আমরা কাব্যে দাম্পত্য প্রেমের রূপ-কল্পনা সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা করিলাম তাহাকে ভূমিকা হিসাবে গ্রহণ করিয়া কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ব্যাখ্যানে প্রবেশ করিতে হইবে। প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে কিরণধনের কাব্যে ঠিক এই জাতীয় প্রেম উপনীত নয়। অর্থাৎ পত্নী বর্তমান থাকাকালে তাঁহাকে প্রেয়সীরূপে কল্পনা করিয়া উপরোক্ত কবিগণ সঙ্গসুখের এবং মিলন, বিরহ এবং মান-অভিমানের বিচিত্র অনুভূতি, পরিবেশ এবং অবচেতন মানসের বাসনাগুলি বর্ণনা করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিরণধনের কবিতা তাঁহার পত্নীর বিয়োগকাল হইতে সুরু হইয়াছে। অতএব তাঁহার প্রেমে মিলন জনিত সুখ নয়, বিচ্ছেদ-জনিত সুখ-স্মৃতি এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়, দাম্পত্য কল্পনার বাহন হইয়া দেখা দিয়াছে। কিরণধনের পূর্বে আর একজন বাঙালী কবি ঠিক তাঁহারই ন্যায় স্ত্রী-বিয়োগের শোক-

সন্তপ্ত ব্যথিত হৃদয়কে জুড়াইবার জন্য শান্তির অন্বেষণ করিয়াছেন। ঐ কবি বাঙালীর অতিপরিচিত অক্ষয় কুমার বড়াল এবং তাঁহার সেই অমর কাব্যের নাম 'এষা'। অক্ষয়কুমারের এই কাব্য পত্নীর মুমূর্ষু অবস্থা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। শোকের দারুণতা কবির হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া গুমরিয়া উঠিয়াছে সে যে দুঃখের আগুন জুড়াইয়া করে খুন :" সুদীর্ঘ দিন ধরিয়া অন্বেষণের পর কালের প্রলেপ হস্ত যখন তাঁহার ক্ষতস্থানকে শুষ্ক করিয়া দিয়াছে তখনও কবি-হৃদয় সময়ে সময়ে বিমনা হইয়া বলিয়াছে :

"কতদিন গেছে চলে,
নাহি আর গৃহতলে,
মুদ্রিত অঞ্চল-চিহ্ন, চরণের রাগ ;
নাহি আর এলায়ায়,
সেরূপ আভাস হায়,
সে পবিত্র দেহবন্ধ—সে স্বপ্ন সজাগ।"

কিন্তু এখানেই তাঁহার অন্বেষণ থামিয়া যায় নাই। তাঁহার কবিচিত্তের যে পরিণতি আমরা দেখিতে পাই তাহা সকল শোক ও ব্যাকুলতাকে ঈশ্বরের পদপ্রান্তে সমর্পণ করিয়া তাঁহার নিকট লব্ধ প্রেমও আত্মজয় শক্তিতে চিরশান্তি এবং সান্ত্বনালাভ করিয়াছে। কবি তাই প্রার্থনা করিয়াছেন :

"দাও প্রেম, আরও প্রেম, চিরপ্রেমময়।
আরোজ্ঞান, আরোভক্তি,
আরো আত্মজয় শক্তি
তোমার ইচ্ছায় কর মোর ইচ্ছা লয়।"

অক্ষয়কুমারের ন্যায় আরও অনেক কবি পত্নী বিচ্ছেদের শোকগাথা রচনা করিয়াছেন। বঙ্কিমযুগের বিশিষ্ট লেখক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' নামে যে গদ্যকাব্যটি রচনা করিয়াছেন তাহার মূলেও একই বেদনার ধ্বনি প্রবহমান। রবীন্দ্রনাথের ভাব-জীবন এবং কবিমানস অতিশয় স্বতন্ত্র প্রকৃতির হইয়াও ইহজীবনের স্নেহসম্পর্ক একেবারে এড়াইতে পারে নাই। ফলে তাঁহার পত্নীবিয়োগের ব্যথাও হৃদয়মন্থনে দুর্ভ হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ' কাব্যের কবিতা-গুলি এই উক্তির সাক্ষাৎ নিদর্শন। অক্ষয়কুমার বড়ালের ন্যায় তাঁহার শোকস্মৃতিও সাময়িক উচ্ছ্বাসে উথলিয়া উঠিয়া স্তিমিত হয় নাই। তাহা ধীরে ধীরে কবির অন্তর্লোক হইতে বিশ্বলোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া নিজস্ব পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। কবি যেমন শোকের প্রথম সংঘাতে বিভ্রান্ত হইয়া বলিয়াছেন :

"আমার ঘরেতে আর নাই সে যে নাই,
যাই আর ফিরে আসি, খুঁজিয়া না পাই।"

• • •

অথবা "আমার জীবনে তুমি বাঁচ ওগো বাঁচ,
তোমার কামনা মোর চিত্ত দিয়ে যাচ।

কিম্বা—

"প্রতি দিবসের প্রেমে কতদিন ধরে
যে ঘর বাঁধিলে তুমি সুমঙ্গল করে
পরিপূর্ণ করি তারে স্নেহের সঞ্চয়ে
আজ তুমি চলে গেলে কিছু নাহি লয়ে।"

তেমনি পরে এই অস্থিরতাকে দমন করিয়া কবি আপনার ব্যক্তিসত্তাকে ইহজীবনের পরিধি হইতে সরাইয়া লইয়াছেন এবং বিশ্ব জগতের মধ্যে তাহাকে বিলীন করিয়া দিয়াছেন :

ঘরে যবে ছিলে মোরে ডেকেছিলে ঘরে,
তোমার করুণাপূর্ণ সুধা কণ্ঠ স্বরে।
আজ তুমি বিশ্ব মাঝে চলে গেলে যবে
বিশ্ব মাঝে ডাক মোরে সে করুণ রবে।"

কিরণধনের কাব্য পাঠের পূর্বে কিরণধনের সমসাময়িক আর একজন কবির দৃষ্টিতে প্রেম কল্পনা এবং দাম্পত্য লীলার সুখস্মৃতি এবং পত্নীর বিয়োগ বেদনা কিরূপ রসোত্তীর্ণ কাব্যসুষমা লাভ করিয়াছে তাহা দেখিয়া লওয়া যাক। ঐ কবির নাম করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। 'প্রসাদী', 'বরাঙ্গুল', 'শান্তিজল' ও 'ধনুর্ধরা'র কবি হিসাবে করুণানিধান

বাংলা কাব্যে একটি বিশিষ্ট ভঙ্গী, অপূর্ব ছন্দোনৈপুণ্য, অলঙ্কার বৈচিত্র্য, ধ্বনিমাধুর্য এবং নিসর্গ শোভা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কাব্যবীণায় রোমান্টিক সুরের যে একটি ললিত-মধুর অথচ সজল-করুণ রাগিণী নিগত হইয়াছে তাহা কবির স্বকীয় শক্তিমত্তার পরিচায়ক। করুণানিধানের 'উদ্দেশে' নামক কবিতাটি পরলোকগতা পত্নীর স্মারক রচনা। কবির সহিত তাঁহার ইহজীবনের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইয়াছে জানিয়াও তিনি মিলনের দুরাশায় কিরূপ উতলা হইয়াছেন, তাঁহার অশান্ত আবেগ কিরূপে তাঁহাকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া অধরার পশ্চাতে ঠেলিয়া দিতেছে তাহাই এই কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায়। কবি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন :

"মরণের ছায়া 'চিকের' ওপরে
লুটাইছে তব নীলাম্বরী,
হাত বাড়াইয়ে পাইনে নাগাল
পরশের আগে যাওগো সরি।"

করুণানিধানের 'শেষ বাসরে', 'সে' ইত্যাদি কবিতাতেও বিরহ ও বিয়োগব্যথার একই সুর ধ্বনিত হইয়াছে। কবি তাঁহার মানসী প্রিয়ার সম্বন্ধে অন্যত্র যাহা বলিয়াছেন তাহাও লক্ষণীয় :

"সে যে আমার গানের মধু
মানস বনের অপ্সরী,
ফুটিয়ে গেছে মালঞ্চে মোর
ফাগুন মুকুল মঞ্জরী।"

কিরণধনের কবিতা অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং করুণানিধানের কবিতা হইতে কতখানি স্বাতন্ত্র্যধর্মী এবং তাঁহার কাব্যরূপের বৈশিষ্ট্যটি কোথায় এবং তাহার পরিণতি কোনখানে তাহা বুঝিয়া লইতে যাহাতে অসুবিধা না হয় সেইজন্য আমরা 'ধান ভানিতে গিয়া শিবের গীত' গাহিবার ন্যায় বাংলা কাব্যের রোমান্সের যে দিক প্রধান অর্থাৎ নর নারীর হৃদয় সম্পর্ক এবং পতি পত্নীর প্রেম বন্ধনের দুইটি মূলরূপ (মিলন ও বিচ্ছেদ) শ্রেষ্ঠ কবিগণের হস্তে কিরূপ শিল্পশ্রী ধারণ করিয়াছে তাহা অনুধাবন করিলাম। কিরণধন চট্টোপাধ্যায় একটিমাত্র কাব্যের কবি। তাঁহার রচনার শ্রেষ্ঠ অংশই 'নতুন পাতা'য় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এইগুলি ব্যতীত আর যে সমস্ত কবিতা বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় (ভারতী, বঙ্গবাণী, বিজলী, মানসী ও মর্মবাণী, উত্তরা, ভারতবর্ষ, মৌচাক, রংমশাল) আবদ্ধ রহিয়াছে সেগুলি প্রকাশিত হইলে কবির প্রতি অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করা হইবে। কিন্তু যতদিন ঐগুলি প্রকাশিত না হয় ততদিন যেগুলি আমাদের হস্তে আসিয়াছে তাহা পাঠ করিলেই কবিকে বুঝিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। তাঁহার কবিতাগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় : এক—প্রেমরসের কবিতা, দুই—সাময়িক বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত কবিতা, তিন—বিবিধ অর্থাৎ সমাজ চেতনামূলক হাস্যরসাত্মক বা বিদ্রূপাত্মক কবিতা, কিশোর পাঠ্য কবিতা ইত্যাদি। আমরা সর্বাগ্রে প্রেমধর্মী কবিতা গুলিকেই পাঠ করিব। অতঃপর অন্যান্য বিভাগ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

কিরণধনের যে সকল কবিতা রোমান্টিক বা প্রেমধর্মী সেগুলি মুখ্যতঃ পতিপত্নীর দাম্পত্য সম্পর্কের উক্তি প্রত্যুক্তি, দুই সখীর অকপট রসালাপ এবং কিশোর কিশোরীর প্রেম নিবেদনকে অবলম্বন করিয়া রচিত। তাহাতে নরনারীর বিভিন্ন বয়সকালের হৃদয়াবেগের ছবিটি যেমন প্রতিফলিত হইয়াছে তেমনি সখ্য, বাল্য, বাৎসল্যের স্নেহরসের সহিত বৈষ্ণব রসালঙ্কারিকগণ উল্লিখিত মধুররসের সমাবেশ হইয়াছে। বিষয়টি সহজবোধ্য করিবার জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক। 'ব্যথার স্মৃতি', 'কবে সে ডাকলো কোকিল' 'যদি সে' 'প্রতীক্ষায়', 'বিরহে' ইত্যাদি পতি পত্নীর প্রেম সম্পর্কের স্মারক। 'সুখের সাহারা', 'চাঁদের আলোয়' 'ভারি নিষ্ঠুর' 'অতিথি', 'সোনার কাঠি' ইত্যাদি দুই সখীর মৃদু মন্দ আলাপ গুরুজনের পরিহাসে ভরা। 'ভাল লাগে বলে', 'বাতায়ন তলে', 'ভুলে গেছি প্রিয়া', 'নিরক্ষর প্রেম' কল্পনার নিদর্শন। 'আষাঢ়ের

মাংস খণ্ডটা' 'দস্তি', বহঃসন্ধির সদ্যোজাগ্রত মিলন বাসনার প্রতীক। 'আষাঢ়ের বেডী' শাশ্বতত্রয়ীর। পিতা মাতা-পুত্র) স্নেহ নির্ঝরের জীবন্ত কারুচিত্র। এতদ্ব্যতীত 'ভাইবোনে', 'বোনে বোনে', 'খোকার ব্যথা', 'নাতির প্রেম', 'জলের ঘাটে' ইত্যাদি সংসারের বিচিত্র সম্বন্ধ বন্ধনে লব্ধ স্নেহের অকৃত্রিম দান প্রতিদানের সরস ছন্দ-কাহিনী। কিরণধনের প্রেম কবিতাগুলির মোটামুটি পরিচয়ের পর আমরা এইবার কবিতা পাঠে মনোনিবেশ করিব এবং পরিশেষে ঐগুলির রচনারীতি এবং ছন্দোনৈপুণ্য এবং রস প্রকরণের সম্বন্ধে উল্লেখ করিব।

কবির প্রবাস-জীবনের নিঃসঙ্গতার মাঝে তাঁহার পরলোকগতা স্ত্রীর স্মৃতি আসিয়া তাঁহাকে বিহ্বল করিয়া দিয়াছে। মনে হয় জীবনের সমস্ত স্বাদবর্ণ গন্ধ যেন নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার চিন্তামগ্ন অবস্থার মধ্যে এই অনুভূতি জাগে :

"উড়ে আসে খালি শ্মশানের কালি, চিতাধূম, বালি পবনে,
যতকিছু আলো করে দেয় কালো, লাগে নাকো ভালো
জীবনে!"

কবি যখন বিশ্ব প্রকৃতির দিকে ফিরিয়া তাকান তখন রাত্রির অন্ধকারের মধ্যেও তাঁহার অন্তরের নিঃস্বতা অবলুপ্ত হয় না। কবি তাই বলিয়া উঠেন :

"এত আলোপানে হাসি অফুরান সবই ম্রিয়মাণ লাগে যে—
কুটীর আঁধার, নিবিড় ব্যথার স্মৃতি শুধু তার জাগে যে!"

কবির জীবনে প্রেম অলক্ষিতে আসিয়াছে আবার চলিয়া গিয়াছে। এই আসা যাওয়ার খবর যথাসময়ে তাঁহার অন্তরলোকে পৌঁছায় নাই। তাঁহার মানসী প্রিয়ার সহিত মিলনকে সার্থক করিয়া তুলিতে তিনি কি না করিয়াছেন?

"কত না চাঁদনি রাতি চাঁদের সনে
কেটেছে জাগিয়ে প্রেমে সঙ্গোপনে!
কত সে প্রণয়লীলা প্রেমঅভিনয়!
হৃদয়ে হৃদয় রেখে প্রাণ-বিনিময়!"

তথাপি অপরিতৃপ্ত বাসনার অবসান হয় নাই। হৃদয়ের মধ্যে তিনি এক অব্যক্ত ব্যথার গুমরানি এবং বিরহের দাবদাহ অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু কবির এই প্রতীতি জন্মিয়াছে যে জীবনে যেখানে প্রেম-অর্থে শুধু অভিনয় এবং দৈহিকসুখ উপভোগ ব্যতীত আর কিছু নয় সেখানে তৃষ্ণা কখনই নিবারিত হয় না। তাই কবির এই স্বীকারোক্তিঃ

"যেটেনি মিটবে না আর প্রণয়-তৃষা—
পিপাসা জলচে বুকে দিবস নিশা।
বিরহে পথটি চেয়ে মিলন-আশে
কাতরে দাঁড়িয়ে আছো পথের পাশে।"

ফলত মিলনের ক্ষণে কবি যাঁহাকে পরিপূর্ণভাবে লাভ করেন নাই, তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ হইলে কবি বিরহেই যেন অধিকতর শান্তি ও সুখভোগ করিলেন :

"বিরহানলে দহেনা খালি আলে সে আলো আঁধারে,
'কোথা সে' বলে, প্রণয়ে গালি পাড়া কি ভাল কাঁদারে?
গিয়েছ দূরে রয়েছে পড়ে তোমারি যত নিশানা,
যা দেখি ভুভে হাজারোভোরে মাধুরীশত মিশানা."

কবি ইহ জগতে তাঁহার মানসী প্রতিমার সহিত চিরতরে বিচ্ছেদকে প্রথমে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। লৌকিক সম্পর্কের ক্ষুদ্র বন্ধনে প্রেমও যে ক্ষুদ্রতা প্রাপ্ত হয় তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল। বস্তুতঃ মহৎপ্রেম ব্যতীত সত্যকার আনন্দ আসিতে পারে না। কিন্তু মহৎ প্রেমের স্পর্শলাভ করিতে হইলে আপনার জীবনের পরিধিটুকু প্রসারিত করিতে হইবে। কেবলমাত্র দেহের অবচেতন বাসনার ক্ষুধা লইয়া যাহারা প্রেমের সন্ধান করে তাহারা নেশার ভার মত্ততা ভিন্ন আর কিছুই লাভ করে না। তাহাদের অন্ধ তামসিকতা এবং মোহাচ্ছন্নতা শীঘ্রই তাহাদের প্রাণের অভিনব কোমল অনুভূতি এবং রুচির উৎকর্ষকে অপহরণ করিয়া লয়। তাহার পর গভীর হতাশা এবং ব্যর্থতা বোধের শুষ্কতারে অবনত হইয়া তাহারা বলিয়া উঠে ;

"পাইনেকো স্বাদ রঙীন সুরার ওষ্ঠসুধার সুন্দরীর,
ঘনিয়ে আসে ম্লান অবসাদ, বিকল করে দেয় শরীর,
আবার মানুষের চৈতন্য যখন ফিরিয়া আসে তখন,

মোহমুক্ত অপ্রমত্ত পুরুষ প্রেমের উদারমুক্ত আলোক এবং বাতাসে মনের অন্ধকারকে এবং বাসনার জঞ্জালকে দূরীভূত করিয়া স্বচ্ছদৃষ্টিশক্তি লাভ করে এবং বলিতে থাকে :

"চল্ ফিরে যাই, চল্ রে ফিরে প্রেমের যেথা প্রস্রবণ,
যেথায় রাধারাসেশ্বরী, বংশীধারী বৃন্দাবন,
কালিন্দীর ঐ কালোজলে মনের কালি ফেল ধুয়ে
মিলবে সুধা, মিটবে ক্ষুধা, টুটবে বাধা আর বাঁধন !"

ইতিপূর্বে কবি অক্ষয় বড়ালের কাব্যে প্রেমের যে পরিণতির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে কিরণধনের কাব্যেও আমরা সেইরূপ একটি পরিণতির সাক্ষাৎ লাভ করি।

কবি সকল ব্যথা এবং বেদনার মধ্যেও এই শিক্ষালাভ করিয়াছেন ;

দুঃখ-সুখের রাগরাগিণী যুগল সুরে বাজায় বাঁশী,
স্বপ্নজাগরণের মায়া সকরে তার এলো চুলে।"

কবির প্রেয়সী যখন রক্তমাংসের দেহে তাঁহার হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিতা ছিলেন তখন উভয়ের যে প্রেম-সম্পর্ক গড়িয়াছিল মৃত্যুর নিষ্ঠুর আঘাতে তাহা যখন ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, তখন কবির মানসলোকে যে-স্মৃতি সযত্নে লালিত পালিত হইতেছিল কবি তাহাকে মৃত্যুহীন চির অম্লানরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন :

"মনে হতো আগে—
প্রেমের অম্লান জ্যোতি জন্মান্তেও হবে না মলিন,
এ চির বিরহব্যথা প্রাণে লেগে রবে চিরদিন
চিরপ্রেম চির অনুরাগে"

কিন্তু যতই দিন গত হয় ততই প্রেমের স্মৃতি বিবর্ণ মলিন হইয়া যায়। তখন সংসারের স্বরূপ তাঁহার কবিদৃষ্টিতেও প্রতিভাত হয়। তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝিয়া লন :

"প্রেম শুধু দু'দণ্ডের আলাপন, চকিতের নেশা,
ক্ষণিকের চিত্তভ্রান্তি, হাসি খেলা মেলা আর মেশা
যৌবনের সমুদ্র বেলায়।
অকস্মাৎ স্বপ্ন যায় টুটে,
নগ্ন-মূর্তি প্রণয়ের ছি ছি করে ব্যঙ্গ করে উঠে—
কয়—আমি চেয়ে দেখ দেখি
রূপের লালসামাত্র ইন্দ্রিয় বিকার আগাগোড়া মেকি।"

তৎসত্ত্বেও কবিমনের যে দ্বন্দ্ব তাহা থামিয়া যায় না। কবি তখন নিজের অন্তরাত্মার শরণাপন্ন হন। সেখানে কবি এই আশ্বাস পান যে প্রেম মৃত্যুঞ্জয় অর্থাৎ সত্যকার প্রেমের বিনাশ নাই, তাহা অনির্বাণ শিখার ন্যায় চিরদীপ্তিমান। কবি অক্ষয় বড়াল যেমন তাঁহার অনুসন্ধান শেষে ঈশ্বরের নিকট আপনাকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার নিকট প্রেম, ভক্তি, আত্মসমর্পণশক্তি প্রার্থনা করিয়াছেন কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ও তেমনি পথভ্রান্ত হইয়া এই প্রার্থনা জানাইয়াছেন :

"দুয়ার খোলো দুয়ার খোলো,
পড়ছি তারে লুটে,
মাথার বোঝা নামিয়ে রাখি
চরণখানি ছুঁয়ে।"

এবং

"দাও হে দেখা যুগলরূপে হে পীতাম্বর শ্রীহরি।
চরণতলে হৃদয় আমার উঠুক ফুটে মুকুরি,
বাজাও বাঁশী, আঘাত কর আমার প্রাণের তার ছুঁয়ে,
তোমার রূপের চাঁদের আলোয় ভুবন আমার দিকভরি !"

বৈষ্ণব যেমন তাঁহার অন্তরে একটি ভাববৃন্দাবন রচনা করিয়া তাহাতে ইষ্ট দেবতার যুগলমূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই দেবতার বেদীমূলে ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া একাধারে প্রেমের সখ্য, দাস্য ও মধুর রসপান করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করেন, কবি কিরণধনও সেইরূপ তাঁহার মানসলোকে একটি প্রেমের যুগল মূর্তির কল্পনা করিয়া তাহার অনুধ্যান করিয়াছেন এবং ইহজগতের যত অপূর্ণ বাসনা ও ভোগাসক্তিকে সেই দেবতার পাদপীঠে উৎসর্গ করিয়া মর্ত্য প্রেমের অতিশায়ী এক অনাবিল রসসুধা অকুণ্ঠ পান

করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাকেই আমরা কিরণধনের প্রেম কাব্যের পরিণতি বা তাঁহার কবি মানসের পরাকাষ্ঠা এবং রসসৃষ্টির সম্পূর্ণতা বলিতে পারি।

কিরণধনের কবিশক্তির যে দিকটি গৌরবসমুজ্জ্বল এবং রসোত্তীর্ণ সে বিষয়ে আলোচনা করা হইল। অতঃপর আমরা তাঁহার অন্যান্য সৃষ্টিকর্ম্ম সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিব। কিরণধন যেমন একটি মাত্র কাব্যের কবি, তেমনি তাঁহার যে একটি কবিতা অধিকতর পাঠকচিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছে, সেই আধারের আধখানা ভাবে, ভাষায় ব্যঞ্জনায় অনবদ্য কাব্যকর্ম্ম হিসাবে স্মরণীয়। ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে এই কবিতাটি সনা কৈশোরে উত্তীর্ণ স্বামীস্ত্রীর প্রেমগীতি বা love lyric। ইহাতে মান অভিমান মিশ্রিত স্বামীস্ত্রীর জন্মরাগের সূক্ষ্মানুভূতি সকল কাব্যমোদীর রসপ্রাণকে আলোড়িত করে। বস্তুতঃ কিরণধনের এই কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের প্রেমকাব্য ভাণ্ডারে একটি দুর্মূল্য সামগ্রী। ইংরাজী সাহিত্য এমন কয়েকজন কবির

শুনা যায় যাঁহারা একটি মাত্র কবিতাতেই যুগোত্তীর্ণ খ্যাতির প্রসাদ লাভ করিয়াছেন। 'ডেসার্টেড্ ভিলেজের' কবি গোল্ডস্মিথ, 'এলিজির' কবি গ্রে, 'দি রেপ্রিয়েল অফ সার্ অনমুর' এর কবি উলফ' 'দি ব্রিজ অফ সাইজ' এর কবি হুড ইংরাজীশিক্ষিত রসিক দিগের নিকট আজিও বন্দিত। কিরণধনকে যদি তাঁহার অন্ধকারের আধখানার কবি হিসাবে বাঙ্গালা পাঠক চিরস্মরণীয় করিয়া রাখেন তাহা হইলেও তাঁহার প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হইবে।

কিরণধন যখন কাব্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন সেই সময় দেশের জনমানসে একটি অভূতপূর্ব চেতনা সঞ্চারিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র, বিবেকানন্দের স্বদেশমন্ত্র এবং রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমৈত্রীর ও মুক্তির বাণী বাঙ্গালীর দেহ মনে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের যে প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হিসাবে দেশব্যাপী চাঞ্চল্য, রাষ্ট্রীয় আন্দোলন দেখা দিয়াছিল। স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়, আদর্শবাদী অথচ স্পর্শকাতর এবং ভাবপ্রবণ কবির জীবনেও এই সকল ঘটনার তরঙ্গাঘাত তাঁহাদের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় কিরণধনের মনকে আকুল করিয়াছিল। ফলে কখনও তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার জড়বাদকে এবং কপটতাকে কখনও বা রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নামে আত্মস্বার্থসিদ্ধি এবং দলগত রাজনীতিকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করিয়াছেন। মানবতার লাঞ্ছনা, নীতির অবমাননা প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মাচরণ বা বিশ্বাসের বিরোধী যখনই কোনও ঘটনা বা মতবাদের সম্মুখীন হইয়াছেন তখনই বজ্রগম্ভীর স্বরে ও শাণিত কটাক্ষে তাহার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। অবশ্য সমাজের মধ্যে যে দুর্নীতি, ক্লেদ, বঞ্চনা, মালিন্য জীর্ণতা ও কুসংস্কার নিবড় গাড়িয়া আছে তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করা কবির সাধ্যাতীত। তথাপি একজন রসসাধকের নিকট বাস্তবের কঠিন সমস্যাগুলি বিকাশে গুরুত্বলাভ করিয়াছে এবং কবি যে তাহার দারুণতা হইতে পলায়ন না করিয়া নির্ভীকচিত্তে সেই সমস্যাগুলিকে জনসাধারণের নয়নগোচর করিয়াছেন ইহা হইতেই এই কথা প্রমাণিত হয় যে কিরণধন কেবলমাত্র ভাববিলাসী কবি নন, তিনি সমাজ ও যুগধর্ম্মের সচেতন অধিনায়কও ছিলেন বটে। সভ্যতার প্রতি কবিতায় তিনি বলিয়াছেন :

"বড় তোরা ওরে মানুষ, বড় তোদের কীর্ত্তিকলাপ,
সভ্যতার আর রাখলিনেকো বাকি,
কিন্তু একি দেখছি চেয়ে এমন সমুজ সোনার বিশ্ব
আপা-গোড়াই রক্তে মাখামাখি!
মস্ত একটা কসাই-খানা বিপুল বৃহৎ হত্যাক্ষেত্র
কাক-শকুনের লীলার ভূমি করে,
ভুললি গ'ড়ে হায় রে মানুষ এই পৃথিবীর সমস্তটা
শতাব্দীর পর শতাব্দীটা ধরে।"

'বেশ্যা' নামক কবিতায় সমাজের প্রতি কবির কটাক্ষ প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। একই অপরাধের জন্য

পুরুষ ও নারীর প্রতি সমাজের বিভিন্ন অনুশাসন শরৎচন্দ্রের কথাকাব্যে অনবদ্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শরৎচন্দ্রে মনে যে প্রশ্ন জাগিয়াছিল কিরণধনের কবিপ্রাণও সেই একই জিজ্ঞাসায় ব্যথিত হইয়াছে। অতিশয় দৃঢ়তার সহিত অথচ কোমল ভাষায় তিনি সমাজের বিধি ব্যবস্থার এই বৈষম্যকে আমাদের নয়ন-গোচর করিয়াছেন :

"একযাত্রায় পুরুষ নারীর ফললো পৃথক ফল,
বেঁচে থাকো সমাজ তুমি—নাড়চো খাসা কল।"

এবং পরবর্তী কয়েক চরণে যে-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য :

নরকের এই পিছিল পথে দৈবে যারা চায়,
পা দিয়েচে প্রলোভনের প্রবল তাড়নায়,
ভুল করেচে অসাবধানে—সুযোগ অবসর
সমাজ কোথা দেবে তাদের, যাতে অতঃপর
আর না তারা করতে পারে তেমনতর ভুল—
তা নয় সমাজ তাদের বুকে হানচে বজ্রশূল!
বন্ধ করে দিচ্চে তাদের শুধরে নেবার পথ!
বেঁচে থাকো সমাজ তুমি, তোমায় দণ্ডবৎ!"

'তিমিরি' কবিতায় 'জেনে রেখো এই দুনিয়ার সার কণিকা!' এবং 'আর জেনো এই মানব প্রণয় পুরোপুরি ঝুটো' খাঁটি অভিনয়' প্রভৃতি উক্তি এবং 'দ্বীপান্তরে' কবিতায় কয়েদী জীবনের পশ্চাতে সামাজিক ব্যবস্থার অসাম্য এবং প্রতিকূল পরিবেশ এবং 'দুনিয়াদারী' কবিতায় বন্ধুত্বের নামে কৃত্রিমতার সম্পর্ক বাস্তবনিষ্ঠ ভাষায় রূপায়িত হইয়াছে। 'বাহবাবেড়ে' সুরেন্দ্রনাথ, গান্ধী, দেশবন্ধু ও মতিলাল নেহেরুর পারস্পরিক রাজনৈতিক কলহের উজ্জ্বল নিদর্শন। 'বাংলার খদ্দর' কবিতার দুইটি চরণ যেমন অর্থপূর্ণ তেমনি বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের অবিকৃত এবং অভ্রান্ত পরিচয় বহন করিতেছে :

"অন্য প্রদেশ যা করে করুক,
তোরা শুধু কর বাক্যি ব্যয়,"

এবং এই কাব্যের ধুয়াটিকেও প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখিতে বলিব :

"স্বরাজ লাভের সরল পন্থা বাতলে দিয়েছে গান্ধিজী,
বক্তৃতা করে শোনাস্ সেইটে বাংলা এবং ইংরিজি।

'উকিলের কবুলতি' কবিতায় পরিহাসের সহিত বেদনা মিশ্রিত হইয়াছে. 'সিন্নি' কবিতায় খাঁটি বাংলা ধূলির বুনানে আমাদের গৃহসংসারের প্রাত্যহিক প্রয়োজন এবং অভাব অভিযোগকে খাঁধিয়া রাখিয়াছে। 'মা' এবং 'পিতা স্বর্গঃ' শ্রদ্ধাসমন্বিত এবং ভক্তিরসাশ্রিত দুইটি অর্ঘ্য। 'যশ ও প্রেম' এবং 'বাতায়ন তলে' অনুবাদ কবিতা হিসাবে সার্থক। 'নতুন খাতা' কাব্যের প্রথম কবিতায় কবির উদাত্ত আহ্বান একাধারে ভারতবর্ষের বৈদিক ঋষিগণের ধ্যানলব্ধ যুগযুগান্ত কালের সাম্যের বাণীরূপ এবং হিন্দু সভ্যতার গতিশীল অবিনাশী প্রাণশক্তির অপরোক্ষ নিদর্শন। কবি জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের উদ্দেশে এই আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন :

"এস, সবার বুকে আশার প্রদীপ জ্বেলো
মুখে দিই জেলে,
ভয়ের মুখে ভুড়ি মেরে এগিয়ে চলি পা ফেলে।'

কিরণধনের কাব্যপাঠের পর এইবার আমরা তাঁহার কবিতায় গঠনরীতি এবং শিল্পকলার বিষয়ে কিছু উল্লেখ করিব। কিরণধনের অধিকাংশ কবিতাই ভাবে এবং ভাষায় প্রাঞ্জল এবং প্রসাদগুণ যুক্ত। ইংরাজী কাব্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজ দুইজন কবির প্রচেষ্টায় যে poetic diction বা কাব্যপ্রকাশের জন্যে সর্বজন বোধ্য সহজ প্রয়োগের প্রবর্তনা দেখা দিয়াছিল আমাদের বাংলা কাব্যে মুকুন্দরাম, গোবিন্দচন্দ্র প্রমুখ কবিগণের মধ্যে সেই প্রয়াস সার্থকভাবে লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যসৃষ্টির সূচনা হইতে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর 'কণিকায়' যে বিশিষ্ট বাক্‌রীতির প্রচলন করেন পরে 'উৎসর্গ' 'খেয়া' প্রভৃতি কাব্যে তাহা বিবর্তিত হইয়া উত্তরোত্তর রূপ লাভ করে এবং উত্তরকালে 'লিপিকা' 'পলাতকা' নবতম

সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া 'পুনশ্চ', 'শ্যামলী', 'শেষসপ্তক', 'প্রান্তিক' ইত্যাদির মধ্যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে।

কিরণধন রবীন্দ্রনাথের শিষ্যমণ্ডলীর অন্যতম বলিয়া তাঁহার রচনায় ও কাব্যের এই রীতি স্ফূর্তিলাভ করিয়াছে তাঁহার একাধিক কবিতায় উহার স্বাক্ষর বর্তমান। আমরা নিম্নে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধার করিয়া দিতেছি :

"এই বেলা চল বেলাবেলি যাই ছাতে,
উঠবে যে চাঁদ সকাল সকাল আজ রাতে,
টীপ দিতে যে ভুল করেচিস দূর বোকা।
ছোট্ট করে টিপ কেটে নে—কাঁচ পোকা,
এলাচ দিয়ে পান খেয়ে নে এক খিলি ;
লাল রং আর লাল ঠোঁটে তোর নাই দিলি।"
(চাঁদের আলোয়)

"আয় খোকা, তোরে নিয়ে
দূরে সরে যাই,
শুয়ে শুয়ে ছড়া গান
গল্প শোনাই,
হোস নেক তুই ওর
মত নিষ্ঠুর
বউরা যা বলে, দিস
সায় মঞ্জুর।" (আঁধারের বেড়ি)

• •

"বাড়ীতে আজ ভাতের দেরী, মায়ের অসুখ,
বোনের জ্বর,
এমনি কসাই মাষ্টার মশাই শুনবে নাক সে ওজর।"
(ল্যাজকাটা সেপাই)

কিরণধনের কাব্যে ছন্দের বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। সুকৌশল শব্দবিন্যাস তাঁহার কবিতায় এমন প্রতিমধুর সঙ্গীতের ধ্বনি সৃষ্টি করিয়াছে, অনুপ্রাসের এমন সুষমা প্রদর্শন করিয়াছে যাহা পাঠককে চমকিত না করিয়া পারে না।

যেমন,

"কার পরে রোষে এলোচুলে বসে ?
দেখে জ্বলে ওঠে অঙ্গ,
বাঁধিস নি চুল, পরিস নি দুল, কত না জানিস রঙ্গ।"
(সুখের সাহারা)

• • •

"একি জাল-বোনা হায় কল্পনা।
মনে আলপনা আঁকা গো,
মরি কত ছলে স্মৃতিশত দলে
ঘুরে আঁখিজলে রাখা গো।"
(ব্যথার স্মৃতি)

কবি কিরণধন ছন্দযাদুকর সত্যেন্দ্রনাথের অনুসরণেও বিচিত্র ছন্দের কবিতা রচনা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে যে সমস্ত নমুনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে ঐগুলি ব্যতীত আরও কয়েকটি আমরা তুলিয়া দিতেছি আশা করি রসগ্রাহী-পাঠকগণ উহা হইতে কিরণধনের ছন্দের লীলায়িত এবং ধ্বনিকল্লোলিত সুরটি অনুভব করিতে পারিবেন।

"রেগে রাঙা গন গন,
ঘর-দোর ঝন্ ঝন্,
চুড়ি বাজে খন্ খন
কাঁপিয়ে ভিটে" (দস্যি)

"চোখ কর কর
গা ঝিম্ ঝিম্,
ক্লান্ত কাতর—
কী হিম্ সিম্ (নিদ্রাহীনের স্বপ্ন)

একই সঙ্গে নিসর্গ শোভা এবং ছন্দসঙ্গীতও কয়েকটিও কাব্যে মূর্ত হইয়া উঠিতে দেখা যায়। যেমন :

অস্তগিরির পরে—
রঙ উঠেছে রঙের বনে আলোর বৃষ্টি করে।
সবুজ মাঠের ক্ষেতে
ধূপছায়া রঙ শাড়ীর আঁচল কে রেখেছে পেতে।
ঐ গগন কিনারায়,
সাদা মেঘের পাল তুলে কার পানসী ভেসে যায়!"
(প্রতীক্ষায়)

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা

"পদ্মফুলের মতন কেহ
ভাসছে জলে এলিয়ে দেহ,
বাকিয়ে গ্রীবা হাঁসের মত
কেউবা আবার সাঁতার কাটে
দেখে এলাম জলের ঘাটে।" (জলের ঘাটে)

'কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ভাষা যেমন খাঁটি বাংলা বুলির অনুগামী তেমনি তাঁহার শব্দ চয়নের কৃতিত্ব সমধিক স্বীকৃত। কবি হিসাবে তিনি অনন্যসাধারণ হইয়াও স্বকীয় রসসৃষ্টির গুণে স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। যে যুগে তাঁহার কবিশক্তির পরিচয় আত্ম-প্রকাশ করে নাই, সেই সময় তাঁহার কবিতাকে একজন বিশিষ্ট কবি ও সমালোচক কিরূপ সমাদর করিয়াছিলেন নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :

"কবি বাংলার কাব্যকুঞ্জের স্তরের এক বিচিত্র কিরণ ফুটাইয়াছেন—অত্যন্ত ঘরোয়া সাধারণ জিনিসগুলিও তাঁহার ওস্তাদী হাতে এমন মিঠা, এমন সরস হইয়া বিচিত্র তার বর্ণচ্ছটা, তেমনি তার মাধুর্য আর লালিত্য। সমাজের ত্রুটি, বিচ্যুতি, ওস্তামি, ধাপ্পাবাজি, ছুঁচোমির বিরুদ্ধে কবির তুণি শাণিত ছুরির মত যেমন ঝলকিয়া উঠিয়াছে, তেমনি ঘরের কোণের ছোট্ট আস্বাদটুকু অক্লান্ত স্নেহে অমর বিন্দুর মত কক্ কক্ করিতেছে। তারে তারে সুরে এ যেন কোন্ পরীর দেশের স্বপন কবি জাগাইয়া তুলিয়াছেন। সে স্বপ্নে যেমন মাধুর্য, সে স্বপ্ন ফুটানোর কারিগরিও তেমনি বিচিত্র। ছন্দ ভাষা সুর কবির ইঙ্গিতে এমন স্বচ্ছন্দ লীলায় ফুটিয়াছে যে তার গতি আগাগোড়া চালুকা সহজ ও সরল কোথাও আড়ম্বর নাই, প্রজাপতির মত বিচিত্র তার বর্ণ এবং সহজ তার ভঙ্গী।" (ভারতী—চৈত্র, ১৩৬০)

পৌষের রাত

[প্রেম চন্দের হিন্দী গল্প]

অনুবাদক : শ্রীঅনিলকুমার সমাদ্দার

"যে টাকা তোর কাছে রেখেছিলুম সে! ওর হাত থেকে তো বাঁচি। সহানা এসেছে।" হলকু এসে স্ত্রীকে বললো কাঁপতে কাঁপতে মুন্নী। পিছন ঘুরে বললো—"তা তিনটি তো মাত্র টাকা। ওকে দিয়ে দিলে কম্বল কিনবে কি দিয়ে? তুমি? পৌষ মাসের রাতের কন্‌কনে ঠাণ্ডায় ক্ষেত পাহারা দেওয়া সোজা কথা নাকি! হিমে জমে পাথর হয়ে যাবে যে। টাকা হাতে নেই—ওকে সাফ বলে দাও। ফসল কাটা হলে পরে পাবে।"

যমদূতের মতই এসে পড়ছে পৌষ, কম্বল একটা না হলে এ দারুণ শীত কিছুতেই বাগ মানবে না। চিন্তিত মুখে ভাবছিল হলকু। জমীদারের লোক সহানা, সে কি মানবে? ধমকাবে গালাগালি করবে। শেষ পর্যন্ত হয়তো আদালতের পিয়াদা এনে হাজির করবে। শীত তো পরের কথা আগে এ ব্যাটার হাত থেকে তো বাঁচি। অনেক ভেবে শেষ পর্যন্ত হলকু স্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানায়, "দিয়ে দেনা যা আছে। কম্বলের জন্য অন্য উপায় করা যাবে।"

একটু দূরে সরে গিয়ে চোখ মুখ ঘুরিয়ে মুন্নী বললো —'একটু শুনতে পারি কি কি উপায়টা তুমি করে রেখেছো? দান খয়রাত পাবার আশায় আছো নাকি? তা হলেই হয়েছে...যেখানে সেখানে ধার করে করে এমন করেছো যে এখন আর কোথাও হাত পাততে এক ছিদামও পাবার প্রত্যাশা নেই। বার বার তোমায় বলেছি যে চাষ বাস ছেড়ে ছুড়ে দাও। তা তো শুনবে না। বছর তোর খেটে দু'চার নন ঘরে আসতে না আসতেই পাওনাদার কেঁকের মতন ছেঁকে ধরবে। বকেয়া—সুদের পর সুদ—দোকানদারের বাকী সব মিটাবার কার ঘরে এক দানাও বাঁচে না। আমারই পোড়া কপাল কিনা! এ জন্মে আর দুঃখ ঘুচলো না! এর চেয়ে দিন মজুরী করাও ঢের ভালো। রোজ আনি রোজ খাই। বাকী বকেয়ার ধার ধারিনে এমন ক্ষেতির মুখে আগুন। যাও হটো! টাকা পাবে না।

স্ত্রীর চোপানাড়ায় হলকু দমে যাবার পাত্র নয়। তবুও শুয়ে শুয়েই—কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো, 'আমাকে গালাগালি খাওয়ানোই তোর মনের ইচ্ছে ছিল।" চটে গেল মুন্নী এবার। "গালাগালি দেবে কেন? মুখে মুনুক নাকি? গাল দিলেই হল?" বলে সে এমন ভাব করলো যেন সে নিজেই বোঝাপড়া করে নেবে। তবে এটুকুও মুন্নী জানে যে, জমিদারের লোক তার স্বামীর মতন ভালো মানুষ নয়—যে তার ধমকে টলবে। তাই খানিকক্ষণ কি যেন ভাবলো কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেললো—তারপর ঘরের কুলঙ্গী হতে নেকড়ায় বাঁধা তিনটি টাকা এনে হলকুর হাতে দিল। হলকু টাকা নিয়ে বাইরে চলে যেতে মুন্নী পা ছড়িয়ে বসে কাঁদতে লাগলো আর কান্নার ফাঁকে ফাঁকে গালিও পাড়ছিলো। টাকা দিয়ে ফিরে এসে হলকু দেখলো। তারও তখন কান্না পাচ্ছিল।

অনেক কষ্টে এক একটা পয়সা জমিয়ে আট ন' মাসে তিনটি মাত্র টাকা করে তুলেছিলো তাও শেষ হয়ে গেল।

পৌষের দুর্জয় শীতের রাত আসছে। মাত্র কয়েক ছিলিম তামাক আর শত ছিন্ন একখানা সুতীর চাদরের ওপর নির্ভর করে তাকে ক্ষেত পাহারা দিতে হবে। আর সহ্য হয় না! বয়সের সাথে সাথে রক্তের শক্তিও যেন কমে আসছে।

[দুই]

হাড় কাঁপানো পৌষ মাসের প্রথম রাত। মানুষ তো

মানুষ, শীতের প্রতাপে তারাগুলি পর্যন্ত থর থর করে যেন কাঁপছে। ক্ষেতে প্রতি বছরের মত এবারও হলকু দিচ্ছে পাহারা। তা না দিলে একপাল নীল গাই এসে রাতের মধ্যেই ক্ষেত উজার করে দেবে।

পাতা দিয়ে তৈরী এক ছাতা—বাঁশের চাতলের ওপর বসানো তার নিচে বাঁশের খাটিয়া। ক্ষেতের এক কোণে পাতা। তারই ওপর হলকু নিজের শত ছিন্ন ময়লা চাদরখানা গায়ে জড়িয়ে আচ্ছন্নের মত পড়ে আছে। ঘুম আসবে—সে ভয় নেই। যা শীত! সারা গায়ে যেন বরফের চাবুক মেরে চেতন শক্তিটুকুকেও কাঁপিয়ে তুলছে। খাটিয়ার নীচে—জব্বরেরও এই দশা। জব্বর হল হলকুর পোষা কুকুর। এখন বেচারা বুড়ো হয়ে পড়েছে। গায়ের রোঁয়াগুলিও পাতলা—অনেক জায়গায় উঠেও গিয়েছে। শীতেতে সেও কম কাহিল নয়। তার ওপর অনশন—আর অর্ধাশনে সেও হলকুর সম সাথী। গ্রামে বেরিয়ে যে মারামারি কাড়াকাড়ি করে পেট ভরাবে তেমন বয়েস বা শক্তি নেই তার। মনিব বদলানোরও উপায় নেই এ বয়সে। হাড় বের করা জরাজীর্ণ কুকুরকে আশ্রয় দেবে কে? পেটের গহ্বরে মুখটা চুকিয়ে দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে সেও পড়ে আছে খাটিয়াটির নীচে। অনশন জর্জর প্রাণের আর শীতের প্রকোপের কাতরতা ব্যক্ত করছে সে মাঝে মাঝে কুঁ-কুঁ কুঁ করে। ঘুমের আরাম কারও ভাগ্যে নেই না হলকুর না কুত্তোর।

সটান শুয়ে ছিল হলকু। এবার হাঁটুদুটি পেটের কাছে এনে জব্বরের মতনই কুণ্ডলী পাকালো। খাটিয়ার দড়ির ফাঁক দিয়ে নীচের দিকে চেয়ে রইলো। কুঁ-কুঁ করতে করতে জব্বর তার কুণ্ডলীটাকে আরও ছোট করতে লাগলো। হলকু এসব দেখে বললো—"খুব শীত করছে নারে জব্বর? তখন তোকে বললুম—খড়ের গাদার ওপর ঘরেতেই আরামে শুয়ে থাক—তা সে কথা তো তখন শুনলি না। সব জায়গায় আমার আগে আগে চলবি—এখন মর ব্যাটা শীতে!"

শুয়ে শুয়েই জব্বর তার লেজটা নাড়লো—তারপর তার কুঁ কুঁ শব্দকে দীর্ঘতর করলো. একবার গুবার হাই তুললো. তারপর মনিবের স্নেহ তিরস্কারের প্রত্যুত্তর যথেষ্ট হয়েছে ভেবে চুপ করে রইলো।

খাটিয়ার পাশ দিয়ে হাতটা গলিয়ে হলকু হাতটা জব্বরের পেটে বুলিয়ে দিল। বললো—"কাল থেকে আর আসিস্ নি। নইলে তোকে আর ফিরে যেতে হবে না। খবরদার ঠাণ্ডায় জমেই যাবি। বাপরে বাপ্, শালার কি শীত!"

হলকু উঠলো। এক চিলিম তামাক সাজলো। এর মধ্যেই আট ন চিলিম হয়ে গিয়েছে। শীতের বিরুদ্ধে এই তো হাতিয়ার। দম্ দিতে দিতে হলকু ভাবছিল—এইতো সুখ ক্ষেত করবার। তাও যদি ওর পেট খেতে পেতেম। বোধ হয় এ সবই অদৃষ্টের খেলা। নইলে এই গাঁয়েরই তো কত লোকে—তারা তোষক-কম্বল লেপ মুড়ি দিয়ে সুখে ঘুমোয়—শীত ব্যাটা গরম লাগার ভয়ে পালিয়ে আসে আর আমার কপালে!

জব্বর উঠে ততক্ষণে খাটিয়ার নীচ হতে বাইরে আসে হলকু বলে 'কিরে এক চিলিম টানবি? নে টান' এতে শীত যে কমবে তা নয়। এ শুধু মনকে ঝাঁখ ঠারা। খুবলি? আচ্ছা! তোর জন্য কাল থেকে খড় নিয়ে আসবো বাড়ী থেকে। এ রাতটা কোন মতে কাটিয়ে দে

হলকুর পা ঘেঁসে জব্বর বসে—যতক্ষণ না হলকুর তামাক খাওয়া হয় ততক্ষণ হলকু আবার গিয়ে খাটিয়ার আশ্রয় নেয়। ঘুমোবেই এবার সে! তামাকে যেটুকু শরীর গরম হয়েছে তা উবে যাবার আগেই সে ঘুমুতে চায়।

চিলিমের প্রভাব নিমিষেই উবে যায়। পাশ ফিরতে না ফিরতেই আর সেই কন্‌কনে কাঁপুনি। নাম না জানা এক দৈত্যের মতনই শীত যেন বুকে চেপে বসে শ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। কিছুতেই ঘুম আসে না। আবার ওঠে হলকু। ধীরে ধীরে জব্বরকে খাটিয়ার ওপর তুলে নিজের বুকের কাছে শোয়ায়। জব্বরের জন্মে স্নান না করার সারা জীবনের পুঞ্জীভূত দুর্গন্ধ নিঃশ্বাসের সঙ্গে এক

চাপ হলকুর নাকের মধ্যে ঢুকে গেল। জব্বরের দেহের সামান্যতম উষ্ণতাটুকুও হলকুর ভাল লাগছিল তাই সে একবিন্দু আরামের লোভে দুর্গন্ধকে মোটেই গ্রাহ্য করলো না।

জব্বর? সে তো আহ্লাদে মশগুল হয়ে কি করবে আর কি করলে যে তার হলকুর এ আন্তরিকতার প্রতিদানের মধ্যেই কৃতজ্ঞতা হবে ভেবে পাচ্ছিল না। কখনো গা চাটে লেজ নাড়ে কখনো খাট থেকে লাফিয়ে পড়ে কাল্পনিক শত্রুর দিকে ধাবমান হয়—আবার লাফ্ ঝাঁপ্ করে খাটিয়াতে চড়ে। অনেকক্ষণ এইভাবে খেলা করে শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে মনিবের গা ঘেঁসে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রইলো।

[তিন]

প্রায় ঘণ্টাখানেক চুপ চাপ কাটলো। এখন রাত প্রায় চারটে। দুটি প্রাণী জীবন্মৃতবৎ পাশাপাশি পড়ে আছে। ভোরের হাওয়া বইছে কনকনে, সাথে সাথে হাওয়া যেন দেহের নিকৃষ্টতম প্রদেশে পৌঁছে—ভিতরের যন্ত্রগুলোকে বিকল করে দেবার উপক্রম করেছে। আর পড়ে থাকা যায় না। হলকু উঠে বসে—বুকের ওপর হাঁটু দুটি লাগিয়ে তার ভেতর মাথা গুঁজে পড়ে রইলো। অবস্থান বদলালে কি অবস্থা পাল্টায়? সেকেণ্ডের মধ্যে যে কে সেই হল। রক্ত স্রোত যেন বন্ধ হয়ে যাবে! তরল রক্তধারা যেন ধমনীর মধ্যে দইয়ের মত পুরু হয়ে জমে গিয়েছে। হে ঈশ্বর! আজকের এ কালরাতটুকু কি কাটবে না! শীত সমাধিই বুঝি হলকুর ভাগ্য লিখন? উঠে দাঁড়াল হলকু। ছাতাটির বাইরে বেরিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভোর কত বাকী দেখতে লাগলো। সপ্তর্ষি অর্ধপথ এখনও অতিক্রম করে নি। এক পহর এখনো লাগবে মাঝ আকাশে যেতে। গভীর এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে হলকু আবার তামাক সাজতে বসলো। ঘুঁটে ধরাবার সময় কি যেন অকস্মাৎ মনে হওয়ায় উঠে দাঁড়ালো সে। কেন যে এ সামান্য কথাটা তার এতক্ষণ মনে পড়ে নি...তা হলে তো এমন দুর্ভোগ তাকে ভুগতে হত না। চট্ করে ক্ষেতটা পার হয়ে রাশি রাশি শুকনো পাতা চাদরটায় বেঁধে নিয়ে আসলো তারপর ভাবলো এতে হবে কি? তাই আবার গিয়ে আরও পাতা এনে খানিকটা ঘুরে পাতার ঘুনী জেলে দিয়ে আরাম করে তামাক খেতে লাগলো। ওঠরে হতাশন পড়তেই ধমনীর শোণিত প্রবাহে ধীরে ধীরে প্রাণের চাঞ্চল্য সঞ্চারিত হল।

অকস্মাৎ অড়হর ক্ষেতের কথাটাও চট্ করে মনে পড়ে গেল। আবার উঠলো সে গোটা দশ বারো গাছ উপ্ড়ে নিয়ে এলো সে।

জব্বরের ভাগ্যটাও খুললো। পাতা কুড়োনোর সময় দুটি হাড়ের সন্ধান পেল সে। হোক্ না, কেন শুকনো হাড় তো বটে! পরম তৃপ্তিতে জব্বর তাই মুখে করে নিয়ে এসেছে। আগুনের পাশে বসে পুলকিত চিত্তে—চিবুতে লাগলো সে। এক এক বার মাটিতে রাখে বার দুয়েক কুঁ-কুঁ করে—আবার হাড়ে মন সংযোগ করে। এবার আর তার এ কুঁ-কুঁ শীতের কাতর ধ্বনি নয় বেশ আরামের আমেজ।

আগের চাইতে হাওয়া যেন বেশ জোরেই বইছে তবে এখন আর বরফের তীরের মত বিঁধছে না অগ্নি তাপে ইন্দ্রিয়ের মোহ অবস্থা হতে জাগ্রত হওয়ায় হলকু শেষ রাতের ধীর সমীরণ বাহিত মেহেদী ফুলের সুগন্ধে সচেতন হল যেন। চিলিম নামিয়ে কিছুটা সময় মুখ বন্ধ করে নাক দিয়ে হাওয়া হতে গন্ধ শুঁকতে লাগলো। কি মিষ্ট মধুর সুবাস! নগ্ন পদে শিশির ভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে যাতায়াতে পা দুখানি যেন সাড়াহীন হয়ে গিয়েছিল আগুনে সেঁকতে আস্তে আস্তে তাতে যেন চেতনা সঞ্চারের সাথে সাথে ঝিন ঝিন করে একরকম সুচ ফোটানো অনুভূতি হল। ফুলের মিঠেল সুবাসে তা যেন মনেই হয় না।

"কিরে জব্বরা? এখন শীত কচ্ছে নাতো রে?"

জব্বর মিঞার চিরকাল একই ভাষা সেই সনাতনী কুঁ-কুঁ। তবু তার রকম ফের থাকে। হ্রস্ব দীর্ঘ উঁচু-নীচু সমক ঠমক পর্দার তাল লয়—আছে বৈকি! সাথে সাথে সঙ্গত করবার পক্ষে তার লেজ নাড়াটিও কম কাজ নয়! সব অস্ত্রগুলি এক সাথে প্রয়োগ করে বোঝাতে চাইলো যে—"শীত? সে শালা আবার কে? তার নাম তো শুনি নি আমি!"

যদিও এতো সূক্ষ্মতম অর্থ জ্ঞান হলকুর ছিল না তবে এটুকু বুঝলো যে তার জব্বর শীতে আর কাবু নয় এখন। হলকু এবার আপন মনে বলে উঠলো—"এতক্ষণ একথাটা

মনে হয় নি—চাষার আছেলে তো! তাই এই দুর্ভোগ। এক লাফে এই ধুনীটা পার হতে পারিস্ জবরা?" বলে আঙুল দিয়ে কি করতে হবে তা সংকেতে বুঝিয়ে দিল জব্বরকে। মানবিক ভাষা জ্ঞান সম্বন্ধে জব্বরের দখলে সন্দেহ থাকায় ইংগিতের আশ্রয় নিতে হল হল্কুকে। গম্ভীর নেত্রে দীর্ঘ মুখখানা আরও দীর্ঘতর করে জব্বর অগ্নিরাশির পরিমাপ করলো। মিট্ মিটিয়ে চাইলো বার কয়েক হল্কুর দিকে। তার মানে কাল একখাটা তো মুন্সী বিবির কাছে ঘাঁস করবে না! নইলে জব্বরের অদৃষ্টে অনেক দুর্গতি বরাদ্দ আছে। হল্কু হয়তো এই ভাবলো—তাই সে বললো, 'নারে না মুন্সী বিবির কাছে এসব কথা বলবো না। এবার তুই লাফ দেতো দেখি!' হল্কু আবার আঙুল দিয়ে সংকেতে তার কর্তব্য বুঝিয়ে দিল জব্বরকে।

জবরা কি একটু ইতস্তত: করে—কয়েক পা পিছিয়ে গেল, তার পর আগুনের কুণ্ডের উপর দিয়া না হোক এক লাফে পার হল। হল্কু চেঁচিয়ে উঠলো—"শাবাস্! বাহাদুর সাবাস্!"

জবরা কিন্তু ওপাশ হতে আর লাফ দিল না। তার লেজে লেগেছিল আগুনের আঁচ...লোমও কিছু তাতে গেল পুড়ে। ধীরে ধীরে পাশ কাটিয়ে হল্কুর কাছে এল।

[চার]

অড়হরের গাছগুলি সব পুড়ে গিয়েছে—পাতা তো আগেই পুড়ে গিয়েছিল। এখনও দু-এক ঘণ্টা সকাল হতে বাকী। পাশের জঙ্গলটাতে ঘোর অন্ধকার। বড় বড় গাছ যেন পরস্পর মাথা সংযোজিত করে আকাশের গায়ে অন্ধকারের পর্দাখানাকে টানিয়ে রেখেছে। হাওয়ার আন্দোলনে সেই পর্দাখানা যেন সামান্য হেলে দুলে উঠছে···হাওয়ার পরশে নির্বাপিত অঙ্গারস্তূপে মাঝে মাঝে শিখা জ্বলে ওঠে। সাথে সাথে আবার অন্ধকার সাগরের ঢেউগুলির দোলায় যেন লাল রঙের নৌকার পালে কাঁপতে থাকে।

গায়ে জড়ানো চাদরখানা খুলে ফেলে সরিয়ে রেখেছিল হল্কু। এবার আবার সেখানা গায়ে আপাদ মস্তক আবৃত করে ছাইগুলির পাশেই শুয়ে পড়লো। তারপর মুড়ি দিয়েই গুন্ গুনিয়ে গান ধরলো।

সমস্ত রাতের জাগরণ ক্লান্ত চোখ দুটি অলসতায় জড়িয়ে আসে...সুখকর মৃদু উত্তাপ মায়ের কোমল পরশের মতই সারা দেহে হাত বুলিয়ে দেয় যেন।

ভোর রাতটাই নীল গাইদের চরবার সময়। ক্ষেতের বেশ একটু দূরেই চলকু। তা থাকু। জব্বর সিং তো আছে। ভাবনা কি? (জব্বরের এমন নাম হল্কু রেখেছে যে মিথ্যা সিং পাঁড়ে যখন যে পদবী খুশী মত যোগ করা যায়! এমনি নাম সে কুকুরের রেখেছে!)। জব্বর এক নাগাড়ে চেঁচাচ্ছে তাতে ঠিক অনুমান করা যায় না যে কোন জানোয়ার এসেছে কি না। অথবা অতিরিক্ত আরামের হর্ষনিনাদ কি না। জবরা ঊর্ধ্বশ্বাসে তাড়া করাতে হল্কু এবার উঠে বসলো। নাঃ কোন জানোয়ারের সাড়া শব্দ নেই। আর জবরা থাকলে জানোয়ার আসবে তার সাধ্য কি? হল্কু আবার শুয়ে পড়ে। সজাগ থাকবার জন্য এক নতুন চংয়ের সুর ভাঁজতে লাগলো।

গলার শক্তি ক্রমশ: নিস্তেজ হয়ে আসছে। ধীরে ধীরে বুজে এলো চোখের পাতাদুটি। জব্বরের প্রবল ঘেউ ঘেউ শব্দ সুদূরাগত ক্ষীণ কোলাহল ভেসে আসতে লাগলো। লুপ্ত চেতনার রূঢ় আঘাত বাজে না উল্টে ঘুম পাড়ানি গানেরই আমেজ আনে। জাগৃতির সমস্ত দেউড়ী পার হয়ে শেষে হল্কু সুপ্তি সাগরে নিমজ্জিত হয়ে গেল।

রোদ উঠলো পর ঘুম ভাঙলো তার। আলোর ঝরণা ধারায় শিশির কণা মুক্তা দানার মত ঝলমল্ করছে। চোখের পাতা রগ্ড়াতে রগ্ড়াতে ক্ষেতের দিকে চললো। সহসা যেন তার হৃদস্পন্দন বন্ধ হবার উপক্রম হল। ক্ষেতের সবটা যেন চাঁচা ছোলা সাফ্...একটি পাতাও কোথাও নেই। জব্বর সে তো তার শক্তি মত চেঁচিয়েছে কিন্তু মানুষের সাড়া শব্দ না পেয়ে পরম নিশ্চিন্তে নীল গাইয়ের দল ক্ষেত উজাড় করে গিয়েছে।

বিস্ময় বেদনার প্রথম ধাক্কা সামলে হল্কু যেন বেশ আরাম বোধ করলো। এবার থেকে তাকে আর আকাশের নীচে পড়ে পড়ে হিম খেতে হবে না। নীল গাইয়ের দল সেদিক থেকে পরম নিশ্চিন্ত করে দিয়েই গিয়েছে। এবার থেকে আর ক্ষেত খামারের পাট নয়। এবার হতে সে দিন মজুরীই করবে।

পৌষের হিমেল রাতে ঘুমুতে পারবে তো। হোক না তা খড়ে ছাওয়া কুঁড়ে ঘর আর খড় বিছানো বিছানা। শীতের শীতল কশাঘাতের হাত হতে পরিত্রাণ তো সে পেলো। একটি শান্তির শ্বাস ফেললো হল্কু।

[৬]

এসে ঘরে ঢুকতেই চোখে প'ড়লো নীলাকে। অধীর প্রতীক্ষায় সে এতক্ষণ আমার জন্য অপেক্ষা ক'রছিল। বাড়ীতে এমন দ্বিতীয় মানুষটি কেউ নেই, যে দু'দণ্ডের জন্যও দু'টো কথা ব'লে তাকে খুসী ক'রতে পারে। আমি কিছু একটা ব'লবার আগেই সোচ্ছাসে সে কাছে ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে ব'ল্লো, 'কী অদ্ভুত মানুষ আপনি বলুন তো সুরমা!'

স্নিগ্ধ হাস্যে নীলার বেণীবদ্ধ মাথার উপর দিয়ে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ব'ললাম, 'অনেকক্ষণ থেকে বুঝি অপেক্ষা ক'রছো?'

অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে নীলা ব'ললো, 'কখনই তো উঠে যেতাম, কিন্তু জিদ্ চেপে ব'সলো, ভাবলাম দেখি কত দেরী ক'রে আপনি ফিরতে পারেন! ব'সে ব'সে এতক্ষণ আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল।'

ব'ল্লাম, 'ইস্, সত্যিই তো চোখ দু'টো তারী ঘুম-কাতুরে হ'য়ে উঠেছে!' আসলে নীলার চোখে যে দুষ্টুমি ছাড়া আর কিছুই ছিল না, সেটুকু বুঝে ব'ল্লাম না নীলাকে, ব'ললে—এক্ষুনি সে আমাকে মুহুর্মুহু কিল চুঁড়তে শুরু ক'রতো। নীলার এত বড় চরিত্রটা আমার কাছে স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ ব'লেই ওকে কি ভাবে খুসী ক'রতে হয়, সেটুকু জানতাম। ব'ল্লাম, 'বইগুলো আমার প্রায় বিছানার সামিলই হ'য়ে উঠেছে, হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে প'ড়লেই তো পারতে এতক্ষণ টান্ টান্ হ'য়ে!'

দুষ্টুমি মাখা চোখ দু'টোকে বার দু'য়েক ঊর্ধ্বললাটের দিকে নাচিয়ে নীলা ব'ললো, 'বইয়ের উপরে বুঝি কেউ শোয়! বই হ'চ্ছে বিদ্যা, সরস্বতী, তাকে মাথায় রাখতে হয়, পা লাগাতে নেই।'

ব'ললাম, 'বালিশের বদলে তাইতো আমি বই মাথায় দিয়ে শুই। তুমিও তাই ক'রলে পারতে!'

এবারে মুচ্‌কি হেসে নীলা ব'ললো, 'আপনার মাথার তাইতো বইয়ের পোকা ঢুকেছে, ছিট্ আছে আপনার মাথায়।'

এত বড় কথাটা কিন্তু অদ্যাবধি পর্যন্ত কোনোদিন ব'লতে পারে নি। অনিমার বয়সে নীলা যে তার দিদিকে ছাড়িয়ে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই; প্রথম থেকেই ওর মধ্যে সেই অঙ্কুর মহীরুহের শক্তি নিয়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠ্‌ছে। একেবারেই অর্থহীন নয় নীলার কথাগুলো। তার বক্তব্য নিয়ে ভাবতে হয়, চিন্তা ক'রতে হয়। বালকসুলভ চপলতার মধ্যেও মাঝে মাঝে বিজ্ঞজনোচিত অভিব্যক্তি ঘটিয়ে আমাদের প্রজ্ঞার মূলে আঘাত ক'রে বসে নীলা। সে আঘাতে জ্বালা নেই, মাটির প্রদীপের মতই তা স্নিগ্ধ।

ব'ললাম, 'এতদিনে তবু একটা কথার মতো কথা ব'ললে নীলারাণী। পাগল হ'তে আমার আর বেশী দিন নেই।'

—'এখনি বুঝি কিছু বাকী আছে!' দুষ্টুমিতে চোখ দু'টো আর একবার নেচে উঠ্‌লো নীলার। ব'ললো, 'খবরদার, খবরদার, ওকথা ব'ললে সবাই মিলে আপনাকে

নিয়ে পাগ্‌লা গারদে দেবে। তার চাইতে চলুন, দিদি খবর পাঠিয়েছে, এক্ষুণি আপনাকে যেতে হবে।'

—'সে কি, ব্যাপার কি, বলো তো?'

—'গেলেই তা বুঝতে পারবেন। আমি কেমন ক'রে ব'লবো?'

বললাম, 'দিদির বোন তুমি, আন্দাজ ক'রতেও তো কিছু পারো!'

—'থাক্, দরকার নেই। আন্দাজ ক'রতে গিয়ে শেষে মার খাই দিদির হাতে!' থেমে শীলা ব'ললো, 'ছোট আছি, ছোট থাকাই ভালো।'

বিস্ময়ের ভঙ্গীতে চোখ দু'টো কপালে তুলে ব'ললাম, 'সে কি, কে ব'ললে তুমি ছোট আছো! দেখি, এসে দাঁড়াও তো আমার বাপে বাপে। এই দেখ, এক্ষুণি আমার বুক অবধি ঠেলে উঠেছে। তার মানে কি জানো?'

—'কি?' একটা অদম্য কৌতূহলে এবারে চোখ দু'টো ফেটে প'ড়লো শীলার।

ব'ললাম, 'মানে—পুরো চার ফিট এক ইঞ্চি। তোমাকে ছোট ব'লে উড়িয়ে দিলেই হ'লো, হুঁ।'

খুশীতে সারা মুখখানি এবারে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল শীলার। জিজ্ঞেস ক'রলো, 'আপনার বুক অবধি বুঝি আপনি চার ফিট এক ইঞ্চি?'

—'হুঁ, তা ব'লতে পারো। গোটা মানুষটা যখন পুরো সাড়ে পাঁচ ফিট, তখন বুক অবধি চার ফিট এক ইঞ্চি হ'তে বাধা কি!' —ব'লতে গিয়ে হাসি চেপে রাখতে পারছিলাম না।

মুখে খানিকটা স্বাভাবিকতা এনে শীলা ব'ললো, 'আপনি অঙ্কে বুঝি খুব ভালো, সুমন্তদা? আমার কিন্তু মোটেই মন ব'সতে চায় না। এবার থেকে আপনার কাছে ব'সে ব'সে বুঝে নেবো।'

হায় ভগবান, কোথাকার জল শেষ পর্যন্ত কোথায় গড়িয়ে এলো! ব'ললাম, 'তা তো যেন বুঝে নেবে, কিন্তু আমি যে ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলুম না!'

—'দিদির ব্যাপার তো! ও আর বুঝতে হবে না; নিন্, এবারে আর দেরী না ক'রে চলুন আমার সঙ্গে।' ব'লে তার ছোট দু'টি হাতের মধ্যে আমার হাতখানি টেনে নিল শীলা।

কেন যেন এবারে আর চেষ্টা ক'রেও বাধা দিতে পারলুম না। অণিমা এমন ক'রে কিন্তু কোনো দিন খবর পাঠায় না। শীলার মুখে শুনে অবধি রওনা হ'য়ে প'ড়তেই তাই প্রস্তুত হচ্ছিলাম। এবারে বিনা দ্বিধাতেই দরজার বাইরে পা বাড়িয়ে ছিলাম।

অণিমা সাগ্রহেই অপেক্ষা ক'রছিল। পারিবারিক পরিবেশটা দেখলাম দিব্যি নিস্তব্ধ। জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'খবর কি, হঠাৎ এমন জরুরী খবর দিয়ে ডেকে পাঠালে কেন, বলো তো?'

অণিমা ব'ললো, 'কেন, দরজার বাইরে থেকেই বিদেয় হ'য়ে যেতে চাচ্ছো নাকি? এস, ঘরে এসে বসো, চা খাও, তারপর ধীরে ধীরে সব শুনবে।'

ঘরে গিয়ে ব'সতে বাধা নেই, কিন্তু চা খাবার প্রস্তাবনাটা আদৌ সুখকর লাগলো না। সেদিন অত্যধিক ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমাকে চা খাইয়ে দিতে পারে নি অণিমা, তবে পিছনে যে আঘাতটা সারা মনে পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠেছিল, সেটুকু জানি ব'লেই মনে মনে খানিকটা দ্বিধা বোধ ক'রলাম। ব'ললাম, 'এমন অসময়ে কি কেউ চা খায়, ওটা আপাতত বাদ থাক্।'

—'সময় হ'লেই না হয় খেয়ো।' থেমে অণিমা ব'ললো, 'মা আজ সখ ক'রে আমার জন্যে গুড়ির পায়েস ক'রেছিল, তোমাকে ফেলে খেতে ইচ্ছে ক'রলো না, তাই শীলাকে পাঠিয়েছিলাম।'

—'সো ফরচুনেট্, আই এ্যাম্!' বিস্ময় বিস্ফারিত চোখ দু'টো অণিমার চোখের দিকে নিবদ্ধ ক'রে ব'ললাম, 'তুমি তোমার মার এতখানি স্নেহের পাত্রী, এ তো জানতুম না এতদিন!'

হেসে চাপা গলায় অণিমা ব'ললো, 'আমিও সত্যিই জানতুম না। মা যে স্বর্গাদপি গরীয়সী, বি,এ পরীক্ষা দিয়ে অবধি এ বোধটুকু জাগেনি আমার এতদিন। আজ সত্যিই ইচ্ছে হ'চ্ছে না—মাকে ছেড়ে কোথাও যাই।'

—'কেন, কোথাও যাবে ব'লে ঠিক ক'রেছ নাকি ?

—'ঠিক করি নি, ঠিক হ'য়েছে।'

—'কোথায় ?'

এবারে কথা না ব'লে একখানি টেলিগ্রাম এবং সেই সঙ্গে খামে মোড়া একখানি চিঠি আমার হাতের কাছে এগিয়ে দিল অণিমা। টেলিগ্রামটাই আগে খুললাম। সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা : Application granted, join next 1st letter follows, ঠিকানা র'য়েছে পুণিয়ার। বুঝতে কিছুই বাকী রইল না ; তবু নিরাসক্ত মনেই খামের চিঠিখানি খুলে চোখের সামনে মেলে ধ'রলাম। চিঠিখানা বেশ বিস্তৃত। ওখানকার একটা হাই স্কুলের গার্লস্ সেক্শনের জন্ত এ্যাসিষ্টেণ্ট্ হেড মিষ্ট্রেসের পোষ্ট। মাইনে প্রথম এ্যাপয়েণ্ট্মেণ্টে ৭৫৲ টাকা, ডিগ্রী পেয়ে পার্মেনেণ্ট্ হ'লে একটা লিফ্ট্ দিয়ে গ্রেড অনুসারে মাইনে বাড়বে। থাকবার অসুবিধা নেই, হোষ্টেলের সংলগ্নই ছোট্ট কোয়ার্টারের ব্যবস্থা র'য়েছে। স্কুলে গিয়ে কাজে জয়েন ক'রবার সঙ্গে সঙ্গেই এ্যাপয়েণ্ট্মেণ্ট্ লেটার পাওয়া যাবে।

আকাশ থেকে হঠাৎ একটা স্খলিত তারার মতই সহসা আমার হাত থেকে চিঠিখানি প'ড়ে গেল। ব'ললাম, 'কই, এতদিন তো কিছুই জানতে পারি নি !'

অণিমা ব'ললো, 'এখানে ওখানে নানা যায়গাতেই এতদিন চিঠিপত্র দিয়ে চেষ্টা ক'রছিলাম। ইচ্ছে ক'রেই তোমাকে জানাই নি, কাজ না হ'লে লজ্জাটাই শুধু বাড়তো। এ যে আমার কাছে আজ ভগবানের কতখানি প্রসাদ লাভ, তোমাকে ব'লে বোঝাতে পারবো না সুমন্ত। দূরে যাবার দুর্ভাবনায় আজ সত না ম'রছি, তার চাইতে বেশী প্রাণ পেয়ে বেঁচেছি টেলিগ্রামটা পেয়ে। প্রথম প্রথম প'চাত্তর টাকা, মোটামুটি মন্দ কি, না কি বলো ?'

ইতিমধ্যে পাশের দরজা দিয়ে দু' বাটি গুজির পায়েস আর দু' খানি প্লেট ভর্তি ফুল্কো লুচি নিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালো শীলা। ব'ললো, 'নিন্, ধরুন, জল নিয়ে আস্‌চি।'

অরুণাংশু দেবীর যে আজ স্নেহশীলতার এত আতিশয্য কেন, বুঝতে এবারে আর এতটুকুও কষ্ট হ'লো না।

শীলার হাত থেকে অণিমাই প্লেট আর বাটি নামিয়ে নিল। তার আর আমার দু'জনের জন্ত ব্যবস্থা। ব'ললো, 'নাও, লুচিটা গরম থাকতে থাকতে খেয়ে নাও সুমন্ত।'

ব'ললাম, 'নতুন চাকুরি পেয়ে এই ভাবেই বুঝি আজ মিষ্টি মুখের ব্যাপারটা সেরে নিলে ! চালাক তুমি কম নও দেখতে পাচ্ছি।'

—'কি চালাকিটা ক'রলাম, বলো ? আগেই তো ব'লেছি—আমার জন্তে মা আজ গুজির পায়েস ক'রেছিলেন তোমাকে ফেলে একা খেতে ভালো লাগলো না, তাই—' ব'লতে গিয়ে হঠাৎই থেমে গেল অণিমা।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বার এসে দু' গ্লাস জল পৌঁছে দিয়ে গেল শীলা ; জিজ্ঞেস ক'রলো, 'আপনাকে কি এখন চা দোবো সুমন্তদা, না একটু পরে এনে দেবো ?'

ব'ললাম, 'এখনও লাগবে না, পরেও দরকার হবে না। মাকে গিয়ে বলো—চা খাওয়া আমি একরকম ছেড়েই দিয়েছি।'

অণিমা এবারে একবার স্থির দৃষ্টিতে তাকালো আমার মুখের দিকে। কিন্তু ততক্ষণে শীলা আবার নিজেকে দরজার আড়ালে গোপন ক'রে নিয়েছে।

একটুকাল থেমে ব'ললাম, 'তা হ'লে তুমি সত্যিই চ'ললে এখান থেকে ?'

জবাব দিতে পারলো না অণিমা, নীরবে শুধু মাথাটাকে নিচু ক'রে নিল।

ব'ললাম, 'আর কিছু নয়, শেষ পর্যন্ত বড্ড একা প'ড়ে গেলাম। কিছুদিন বড় কষ্ট হবে।'

— তারপর আবার সব ঠিক হ'য়ে যাবে।' একটু একটু ক'রে মাথা তুলে ধীর কণ্ঠে অণিমা ব'ললো, 'দীর্ঘকাল অদর্শনের পর শেষটায় আর মনেও প'ড়বে না —কোথায় কোন্‌দিন কার সঙ্গে ব'সে এমনি ক'রে কখনও গল্প ক'রেছিলে !'

—'এ তুমি কী ব'লছো অনিমা? আমি তোমাকে শেষ পর্যন্ত ভুলে যাবো?' লক্ষ্য ক'রলাম না—ব'লতে গিয়ে অকস্মাৎ গলাটা একবার কেঁপে উঠ্‌লো কি না!

তেমনি ধীর কণ্ঠেই অনিমা ব'ললো, 'সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার মতো মানুষের হৃদয়েরও জোয়ার ভাঁটা আছে তো বটেই! জোয়ারের মুখে একদিন সমুদ্র কাণায় কাণায় যাকে ভ'রে তোলে, আর একদিন ভাঁটার টানে তাকেই সে বিনা দ্বন্দ্বে পরিত্যাগ ক'রে আসে। এর কোনোটাই বোধ করি মিথ্যে নয় সুব্রত।'

কথা কাটলুম না। মনে মনে শুধু ভাবলাম—আজ আবার হয়ত কিছু একটা ছোঁড়ো হাওয়ায় অনিমার ভিতরের মানুষটা অকস্মাৎ ক্ষেপে উঠেছে!

থেমে পুনরায় অনিমা ব'ললো, 'আমার এও জানি, ভাঁটার পথে সমুদ্র যাকে ত্যাগ ক'রে এলো, সে হয়ত একেবারেই তুচ্ছ নয়, সেও পারে নিজের বুকে ফসল ফলাতে, পারে পলি মাটির স্বাচ্ছন্দ্যকে জীবনী শক্তিতে জাগিয়ে তুলতে।'

ব'ললাম, 'তাই পারে, তাই সে চিরকাল পেরে আসচে; এতে এতটুকু ও মিথ্যে নেই অনিমা।'

একটা অনবদ্যমিত উচ্ছ্বাসের মুখেই হঠাৎ এবারে থেমে গেল অনিমা। কথা ঘুরিয়ে নিয়ে ব'ললো, 'তুমিও কোথাও বেরিয়ে পড়ো না এবারে কিছু একটা চাকরী নিয়ে, চাকরীই তো শেষ পর্যন্ত ক'রবে!'

ব'ললাম, 'সেই ইচ্ছেই তো পুরোপুরি। কিন্তু কে দেবে চাকরী! দেখি, পরীক্ষার রেজাল্টটা তো আগে বেরোক্। ছেলেরা অন্তত গ্রাজুয়েট না হ'লে আজকাল-কার বাজারে বড় একটা মুখ পায় না কোথাও। এদিক থেকে মেয়েদের পজিশন অনেক ভালো।'

—'হ্যাঁ, ভালো না ছাই। ভালো যা—তা তো চোখের উপরেই দেখতে পাচ্ছি।' থেমে অনিমা ব'ললো, 'ও কি, ও লুচিখানা আবার কার জন্যে রাখলে? নাও, মুখে দিয়ে নাও, কিছু পাতে রাখতে পারবে না।'

উত্তরে ছোট্ট ক'রে ব'ললাম, 'আজ আবার তেমনি ক'রে ঐ কোমল আঙুলের স্পর্শটুকু আমার ঠোঁটে বুলিয়ে দাও না! এই বোধ করি শেষ, আর তো পাচ্ছি না শীগ্‌গির।'

মুচ্‌কি হেসে অনিমা ব'ললো, 'তপস্যা কোরো, একেবারে নিরাশ হবারও কিছু নেই।'

শুনে আশ্বস্ত হ'লাম। ভাবীকালের একটা শপথ তবু জাগ্রত হ'য়ে রইল মনে। ব'ললাম, 'যাকে কখনও বরমাল্য পাই নি, তপস্যা ক'রে তাকে কখনও দেবীর আসনে বসাতে চাইনে, মানবীকে শুধু মানবীর অধিকারেই জয় ক'রে নিতে চাই; নইলে কোনো কালেই পাওয়া আমার সার্থক হ'য়ে উঠ্‌বে না।'

লুচি আর পায়েসের পাত্র ইতিপূর্বেই শেষ হ'য়েছিল। দু'জনে এতক্ষণ মুখোমুখি হ'য়েই ব'সেছিলাম। অনিমা এবারে তার স্বচ্ছ চোখ দু'টি আমার চোখের দিকে নিবদ্ধ ক'রে ব'ললো, 'তোমাকে আমার আজিও পুরো জানা হ'লো না সুব্রত। প্রতিদিন তোমাকে কেবল নতুন ক'রেই দেখলাম। একটানা অভিজ্ঞতার মধ্যে কোনো-দিনই তোমাকে নিবিড় ক'রে অনুভব ক'রতে পারলুম না।'

ব'ললাম, 'জানা শেষ হ'লে কবেই না জানি খেয়া পারাপার বন্ধ হ'য়ে যেতো। চর প'ড়তো নদীতে। নৌকো চলাচলের তবু একটা পথ যাহোক্ খোলা রইল।'

—'সত্যিই তাই।' ব'লে মুখে ঈষৎ হাসি টেনে নিল অনিমা, তারপর স্বল্পকাল থেমে ব'ললো, 'দিন তো আর ব'সে নেই, আজ দোসরা তারিখ চ'লে যাচ্ছে। মাঝখানে মাত্র তিনটে দিন। এর মধ্যে একটুও আর সময় পেয়ে উঠবো না। চলো না অধ্যাপক সিদ্ধান্তর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আসি!'

এতদিনে তবু কিছুটা যাহোক্ শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে অনিমার। ব'ললাম, 'আপত্তি কিসের! তুমি প্রস্তুত হ'লেই আমি পা বাড়াতে পারি।'

এবার আর এতটুকুও দ্বিধা ক'রলো না অনিমা, ত্রস্তে উঠে গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই সে বাড়ীর ভিতর থেকে বেশ পরিবর্তন ক'রে এলো। স্নো-পাউডারের বাহুল্য

নেই, নিতান্তই শাড়ী আর ব্লাউজটাকে পাল্টে আসা। এই বেশেই সে এতকাল কলেজ ক'রেছে, সঙ্কোচহীন সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছে আমার সঙ্গে।

পথে এসে অণিমা ব'ললে, 'এতকাল অনেক কিছু নিয়ে ঠাট্টা ক'রেছি অধ্যাপক সিদ্ধান্তকে, আজ কেন যেন সেজন্যে বড় অনুশোচনা হ'চ্ছে।'

ব'ললাম, 'সংসারে মনীষাকে কেন্দ্র ক'রেই চিরকাল নানারকম মতবাদ গ'ড়ে ওঠে। তাতে কিছু বা থাকে স্নেহ, কিছু বা ঠাট্টা, কিছু বা স্তুতি। কিন্তু কোনোকালেই তা মনীষার অমর্যাদা ঘটায় না, বরং আরও বাড়িয়ে তোলে তাকে। তোমার ঠাট্টার পিছনেও তেমনি অধ্যাপকের মনীষার স্বীকৃতিটাই বড় হ'য়ে উঠেছিল। তা নিয়ে অনুশোচনার কিছু নেই। যদি থাকেই, তবে তা থেকে যে আমিও মুক্ত নই!'

—'তুমি চিরকাল তাঁকে সম্মানই দিয়েছ সুমন্ত। সেইটেই স্বাভাবিক সম্মান। তোমার মতো অমন ক'রে গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্তব্য আমি পালন ক'রতে পারি নি। থেমে অণিমা ব'ললো, 'কলেজ জীবনটাকে কিন্তু একটা মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারছি না সুমন্ত। এ জীবন আর ফিরে আসবে না।'

ব'ললাম, 'যা যায়, তা আর ফিরে আসে না। তা থাক্। তোমার বিলাতেড্ মনোতোষের খবর কিছু রাখো?'

অবাক চোখে তাকিয়ে এবারে মুখ টিপে হাসলো অণিমা।

ব'ললাম, 'তোমার মেরিট ভাঙিয়ে সে লন্ড্রি-কারবার ক'রে নিল বাজারে।'

—'কি রকম?'

খুলে মনোতোষের গ্রন্থ প্রকাশের প্রয়াসটাকে অসামান্য ক'রে ব'ললাম অণিমাকে।

শুনে চোখ কপালে তুললো অণিমা। 'বলো কি, এর মধ্যে এতখানি মাথায় এসেছে তার?'

ব'ললাম, 'না আসার হেতু কি, মাথা তার চিরকালই পরিষ্কার, নইলে অমন একটা বাজাই কবিতা লিখে তোমাকে কখনও উপহার দিতে পারে!'

—'আবার তো সেই অতীতের গর্ভে গিয়েই পাক খাচ্ছো?' অণিমা ব'ললো, 'সত্যিই তুমি একটা মিষ্টিরিয়াস কথা শোনালে আজ সুমন্ত।'

ব'ললাম, 'মিষ্টিরিয়াস, কিন্তু আন্‌স্যাচ্‌রেল নয়!' জগতে যা কিছু ঘটে, তার পিছনে তার অগ্রগতির একটা স্বাভাবিকতা থাকে। মনোতোষ সেখানে অলৌকিক কিছু করে নি। ভেবেছিলাম অধ্যাপক সিদ্ধান্তকে এ সম্বন্ধে ভালো মন্দ কিছু জিজ্ঞেস ক'রবো, কিন্তু দেখলাম—ব'লে তাঁকে শুধু লজ্জা দেওয়াই হবে।'

অণিমাও কথাটা স্বীকার ক'রেই নিল। অধ্যাপক সিদ্ধান্তর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসবার সময়েও এই স্বীকারোক্তিটাই সে রক্ষা ক'রে এলো।

ফিরে যখন আবার পথে এসে দাঁড়ালাম, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। জনবিরল পথ। ইচ্ছে হচ্ছিল আজ আবার দু'জনে গিয়ে যদি সেই কৃষ্ণচূড়া গাছটার সামনে, কাটিয়ে দিই এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যার অনেকগুলি প্রহর। কিন্তু অণিমা রাজী হ'লো না, অনেকগুলো অসমাপ্ত কাজ নিয়ে তাকে সমাধা ক'রতে হবে। মাঝখানে মাত্র তিনটে দিন, অথচ কিছুরই যে ব্যবস্থা নেই! সংসারে গরীবের জ্বালা সব দিকে। অণিমা ব'ললো, 'কিছু মনে কোরো না তুমি সুমন্ত। সামনের ভবিষ্যৎটাই যদি মিথ্যে না হবে, তবে কৃষ্ণচূড়াই বা ব্যর্থ হবে কেন? অন্ধকারকে বড় ভয় করি। আবার যেন কোনো জ্যোৎস্না রাত্রেই কৃষ্ণচূড়া আমাদের চিরকালের চির সত্যের সাথী হয়।'

উত্তর দিতে পারলুম না।

ধীরে ধীরে ক্রমেই পথ অতিক্রান্ত হ'য়ে আসছিল। বাড়ীর কাছে এসে অণিমা ব'ললো, 'আসি, কেমন?'

ব'ললাম, 'এস।'

মাঝখানে একটা দিন, তারপর একটা দিন হাতে নিয়েই পূর্ণিমার উদ্দেশে রওনা হ'য়ে প'ড়লো অণিমা

নতুন যায়গায় গিয়ে সব কিছুই নিজের হাতে ব্যবস্থা ক'রে নিতে হবে। একটা দিন তার পক্ষে কিছুই নয়। দুপুরে গাড়ী। অমূল্যধনবাবুকে কোর্টে বেরোতে হওয়ায় অণিমাকে ট্রেনে এসে তুলে দেবার লোক ছিল না। একমাত্র শীলা যা ভরসা, কিন্তু শীলাকেও তো বাড়ী ফিরতে হবে! সে ভারটা নিজেই নেবে নিলাম। একটু আগে আগেই ষ্টেশনে এসে টিকিট কেটে গাড়ীতে সুবিধে মতো একটা যায়গা ঠিক ক'রে দিলাম অণিমাকে। গাড়ী ছাড়বার তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। শীলাকে নিয়ে তাই কিছু সময়ের জন্যে কাটিয়ে দেওয়া গেল অণিমার পাশে। শীলা কিছুতেই তার দিদিকে ছাড়তে চাচ্ছিল না। জিজ্ঞেস করলো, 'বলো না দিদি, কত শীগ্‌গির-শীগ্‌গির তুমি ফিরে আসবে?

বোনের চিবুকে স্নেহের হাত স্পর্শ করে অণিমা বল্‌লো, 'খুব শীগ্‌গির-শীগ্‌গির আসবো। তুমি কিন্তু মন দিয়ে লেখাপড়া কোরো, নইলে মোটেই আর ফিরবো না।

অলক্ষ্যে চোখ দুটো একবার ছল্‌ ছল্‌ করে উঠ্‌লো শীলার, বল্‌লো 'আমি কি মন দিয়ে লেখাপড়া করি না?

—করো বৈ কি, সত্যিই করো, আরও বেশী করে করবে। থেমে অণিমা বল্‌লো, যদি বাড়ী ছেড়ে ইতিমধ্যে কোথাও না যাও, তবে শীলা গেলে কখনও কিছু বুঝিয়ে দিও, সুমন্ত। পুর্ণিয়ায় গিয়ে ওর জন্যে আমার বড় কষ্ট হবে।

বল্‌লাম, কষ্টটা শুধু তো শীলার জন্যেই হবে?

জবাব দিল না অণিমা; নীরবে শুধু জানালার মধ্য দিয়ে উন্মুক্ত প্রকৃতির বুকে শূন্য দৃষ্টিটাকে মেলে দিল।

তার পূর্বের কথাটার জবাব দিয়ে এবারে বললাম, 'শীলাকে কখনও বই থেকে কিছু দেখিয়ে দেবার কথা ইতিপূর্বে শীলা নিজেই ঠিক করে রেখেছে, তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি গিয়ে কিরকম কি ব্যবস্থা করলে, চিঠি দিয়ে নিশ্চিন্ত কোরো।

'করবো। থেমে অণিমা বল্‌লো, রেজাল্ট্‌ বেরোতে তো আমাদের আর বেশী দেরী নেই, খবরটা কিন্তু যথা-সময়েই পৌঁছে দিও, বড় চিন্তায় থাকবো।

জিজ্ঞেস করলাম, ছুটিছাটাগুলো ওখানেই কাটিয়ে দেবে না তো?

— ছুটির ব্যাপার কিছু না ঘট্‌লে কি করে বলি। বলে মুখ তুলে কিছুক্ষণের জন্য একবার তাকালো অণিমা আমার মুখের দিকে। তারপর পুনরায় বল্‌লো, শেষ পর্যন্ত এম্‌নি করে বাংলাদেশ ছেড়ে জীবিকার সন্ধানে বাইরে যেতে হবে, এ কথা কিন্তু কোনোদিন কল্পনাও করিনি সুমন্ত।

বল্‌লাম, 'পুর্ণিয়াও একদিন বাংলারই ছিল, আজও বাংলার শ্যামলশ্রী গিয়েই সেখানে দেখতে পাবে। যেভাবে বাংলা-ভাষাভাষী আন্দোলন গড়ে উঠ্‌ছে দুদিন বাদে পুর্ণিয়াকে আবার বাংলার মধ্যে ফিরে পাওয়া হয়ত দুঃসাধ্য কিছু হবে না। তা থাক্‌। আমি ভাবছিলাম—'

— কি?

—'না—মানে—তোমার হয়ত সব দিক দিয়েই একরকম সুবিধে হলো; স্কুলে মেয়েদের নিয়ে মেতে থাকতে পারবে, হোষ্টেলের কোয়ার্টারেও সঙ্গীসাথীর অভাব হবে না। সময়গুলোকে কাটিয়ে দেবার পক্ষে এই তো যথেষ্ট। কিন্তু আজ থেকে যে-নিঃসঙ্গতাকে আমি স্বীকার করে নিলাম, তার শেষ গিয়ে কোথায় পৌঁছাবে, কিছুই জানি নে।

সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু একথার কিছু একটা জবাব দিতে পারলো না অণিমা। একটুকালের জন্যে থেমে তারপর পুরনো কথাটার আর-একবার পুনরাবৃত্তি করে বল্‌লো, 'ওখানে গিয়ে আমি এই আশা নিয়েই নিশ্চিন্তে থাকবো যে, খুব শীগ্‌গিরই তুমি নিজের জন্যে একটা কিছু 'প্রভিশনের' ব্যবস্থা করে নিয়েছ।'

'না নিলে যে তোমাকে ফিরে পাবার চেষ্টাই আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে লক্ষ্মী। চাকরী আমাকে পেতেই হবে।—

হঠাৎ গাড়ীর হুইসেল বেজে উঠ্‌তেই কথা বন্ধ হয়ে গেল।

বার কয়েক বিচলিত দৃষ্টিতে তাকালো অনিমা। নীলা এতক্ষণ নিজেকে শান্ত করে বসে ছিল, এবারে গাড়ী ছাড়বার সময় হয়েছে বুঝতে পেরে অকস্মাৎ চুকরে কেঁদে উঠলো।

সান্ত্বনা দিয়ে অনিমা বল্‌লো, কি হয়েছে, বাবা রইলেন, সুমন্তরা আছেন, কষ্ট কিসের রে খোকা।' তারপর নীলাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে তার চোখে মুখে চুমু খেয়ে বল্‌লো, 'মন খুলে আমাকে অনেক বড় বড় করে চিঠি লিখিস্, তা হলে একটুও আর কষ্ট থাক্‌বে না।'

চিঠি লিখ্‌লেই কি মনের কষ্ট ঘুচে যায়, ঘুচে যেতে পারে।

নীলা আর একটি কথাও বল্‌লো না। তাকে নিয়ে প্লাটফর্মে এসে নেমে দাঁড়াতেই গাড়ী মোশন নিল।

মুখ তুলে শেষবারের জন্য অনিমার মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখ্‌লাম—শাড়ীর আঁচলে চোখ দুটোকে একবার মুছে নিল সে। কান্নার প্লাবনকে সংযমের বাঁধ দিয়ে সে বেঁধে রেখেছে দুচোখে। বল্‌লো, 'শুধু মানুষটাই চলেছি, মনটা পড়ে রইল সুমন্ত।

বল্‌তে যাচ্ছিলাম—'ঐ দেহের মধ্যে পুরে যে আর একটা মনও নিয়ে গেলে এই সঙ্গে,—কিন্তু বলা আর হলো না, গাড়ীটা ততক্ষণে প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। দেখতে দেখতে খণ্ড খণ্ড কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে আকাশটা ঢাকা পড়ে গেল চোখের সামনে। তার মধ্যে কতক্ষণ যে তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি আর নীলা, জানি না।

জ্ঞান হ'য়ে অবধি কোনোদিন বাবার পাশে ব'সে খেয়েছি ব'লে মনে পড়ে না। যখন থেকে স্বতন্ত্র ঘরে স্বতন্ত্র বিছানার অধিকার পেয়েছি, তখন থেকে বাবাকে যথাসম্ভব এড়িয়েই চ'লেছি আগাগোড়া। বাড়ীতে রান্নার জন্য পাচক নিযুক্ত হওয়ার পর খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারটাকেও নিজের স্বাধীন সত্তার উপযোগী ক'রেই নিয়েছিলাম। কিন্তু সেদিন অকস্মাৎ তার ব্যতিক্রম ঘ'টলো। দেখলাম—বাবার আর আমার খাবার ঠাঁই প'ড়েছে পাশাপাশি। বিস্মিত হ'লাম সন্দেহ নেই; ঠাকুরকে জিজ্ঞেস ক'রতে যাবো—ইতিমধ্যে পিছন থেকে বাবার কণ্ঠস্বর জেগে উঠ্‌লো: 'আয়, খেতে ব'স খোকা।'

ব্যবস্থাটা যে বাবার নির্দেশেই হ'য়েছে, বুঝতে অসুবিধে হ'লো না। পিছনে কিছু একটা তাৎপর্য না থাকলে ঠাকুর অন্ততঃ এমন ব্যবস্থা প্রবর্তনায় সাহসী হ'তো না।

খেতে খেতে নানা কথার অবতারণা ক'রে বাবা ব'ললেন, 'তোর মার শরীরের অবস্থা যে রকম চ'লেছে, তাতে যে কিছুই ভরসা পাচ্ছি না, খোকা!'

মা এবারে একটু বেশীই কাতর হ'য়ে প'ড়েছেন সন্দেহ নেই। ব'ললাম, 'একদিন সিভিল সার্জেনকে এনে দেখালে হয় না?'

বাবা ব'ললেন, 'দেখাতে বাধা নেই, কিন্তু তোর মা আর এলোপ্যাথিক ওষুধ খেতে চাচ্ছেন না। ক'বরেজ দেখালে সেও তো দেবে পাঁচন; তাও তো মুখের সামনে নিয়েই ফেলে দেবেন তোর মা। অর্জুন ছালের রস হার্টের পক্ষে উপকারী, ক'দিন দিয়েও তো দেখলাম—খেতে গিয়ে বমির বেগ আসে।'

ব'ললাম, 'তা হ'লে তো আর বাকী থাকে হোমিওপ্যাথি। শেষ পর্যন্ত সেটাও যদি অচল হয়, তবে কি মার চিকিৎসা বন্ধ হবে, ব'লতে চান?'

মুখের ভাত শেষ ক'রে বাবা ব'ললেন, 'আমাকে এখন কি ক'রতে বলিস্, বল?'

ব'ললাম, 'শহরে ভালো হোমিওপ্যাথ ব'লতে ব'য়েছেন ডক্টর চৌধুরী, তাঁকে খবর দিয়েই আপাতত দেখা যাক্ না—কি দাঁড়ায়।'

আপত্তি ক'রলেন না বাবা. ব'ললেন, 'দেখতে চাস, দেখ। তোর মাকে বরং এই নিয়ে একটু বুঝিয়ে বল। বার বার এমনি ক'রে ওষুধ পরিবর্তন ক'রলেই কি রোগ সারে!'

বাবাকে আশ্বাস দিয়ে ব'ললাম, 'ব'লবো।'

ইতিমধ্যে ঠাকুর দ্বিতীয়বার ভাত এনে সামনে দাঁড়ালো। হাত নেড়ে জানালাম—আমার আর চাই না।

মাছের ঝোল দিয়ে বাবা সবে ভাত মাখতে সুরু ক'রেছিলেন। হঠাৎ দেখলাম—হাতখানি থেমে গেল। বিস্ময়ে চোখ তুলে ব'ললেন, 'আজকাল খাওয়ার ছিরি তবে তোর এ-ই হ'য়েছে!'

ব'ললাম, 'কেন, এই কিছু কম খেলাম নাকি?'

বাবা ব'ললেন, 'এত চাট্টি ক'রে খেয়ে তুই হেঁটে চ'লে বেড়াচ্ছিস কি ক'রে?'

পাচক ঠাকুর এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল, এবারে তার কর্তাবাবুকে সমর্থন ক'রে সে ব'ললো, 'আজ্ঞে, দাদাবাবু তো আজকাল এমনিই খাচ্ছেন। আমি গোড়ায় এসে যে পরিমাণ ভাত দিতাম, আজকাল তার তিন ভাগও দিই কিনা সন্দেহ।'

সূত্র পেয়ে বাবা এবারে রামায়ণ সুরু ক'রলেন। ব'ললেন, 'অত্যধিক রাত জেগে পড়াশুনো ক'রে ক'রে এই অপকর্মটি তুই ঘটিয়েছিস খোকা। এ তো দেখছি—দু'দিন বাদে তোকে ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ধ'রবে! একা তোর মাকে নিয়েই অস্থির হ'য়ে উঠেছি, এর পর যদি তুই আবার বিছানা নিস্, তবে আমার একার পক্ষে কি অবস্থা দাঁড়াবে, একবার চিন্তা ক'রে দেখ।'

ব'ললাম, 'আমার কিছু হবে না, এর বেশী আমি খেতে পারলে তো খাবো।'

—'খেতে পারবি না কেন, আমাকে সেই কথাটা বল।' থেমে বাবা ব'ললেন, 'তুই কোন বংশের ছেলে জানিস? আধমুনি কৈলাসের নাম শুনেছিস্, তোর দাদু ছিলেন সেই—আধমুনি কৈলাসের সাক্ষরেদ। তোর বয়সে ঝাউতলীর বিলে থাকতে দেখেছি—সে অঞ্চলে তোর দাদুর মতো খাইয়ে আর দ্বিতীয়টি ছিল না।'

ব'ললাম, 'প্রজাদের উপর লাঠি চালাতে হ'তো কিনা, গায়ের জোর বাড়াবার জন্যে আহারের পরিমাণের তাই কিছু আধিক্য ঘ'টেছিল দাদুর।'

অপ্রিয় সত্য কথাটা যে হঠাৎ এমনি করে প্রকাশ হয়ে পড়বে একথা একটু আগেও ভাবতে পারিনি। কথাটা বলে মনে মনে তাই খানিকটা সমীহ করছিলাম।

কিন্তু বাবা দেখলাম এই নিয়ে কিছু একটাও মনে করলেন না। বরং শান্ত কণ্ঠেই বললেন, লাঠিবাজি করেই তো শেষ পর্যন্ত সবকিছু বানচাল করে দিয়ে গেলেন। নইলে আমাদের জমিদারী কেড়ে নিতে পারে, এমন সাধ্যি ছিল কার? আছেক খুইয়ে গেলেন আমার দাদু, আর বাকী আছেক তোর দাদু। যেতে-যেতে ঝাউতলীর বিলে যে-পাঁচশ বিঘে জমি থেকে গেল, হরিমোহনের চিঠি-পত্রে শুনতে পাচ্ছি তাও প্রায় যায়-যায়।

এ ইতিহাস আমার অজানা ছিল না। অপিসার জন্য কিসের টাকা সংগ্রহের ব্যাপারেই হরিমোহন মণ্ডলের কাছ থেকে এসংবাদ পেয়েছিলাম। বললাম, 'যে জমির সঙ্গে আমাদের জীবনের কোনো যোগ নেই, সে জমি যাওয়াই ভালো। এতকালের রক্ষিত মানুষগুলো তবু সেই জমি থেকে দুমুঠো ধান পেয়ে প্রাণে বাঁচবে।

এবারে বাবা কিন্তু হঠাৎ আশ্চর্যরকম গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'বিধাতাপুরুষ বুঝে শুনেই বোধ করি তাই আর উত্তরাধিকারীদের জন্যে কিছু রাখলেন না। তিনি জানতেন—রাখলেও থাকবে না। তা যাক। যা নিয়ে না চললে দুদিন বাদে সংসার একেবারেই অচল হয়ে যেতে বসবে, সেদিকে এবার থেকে তোকে বিশেষ করে মন দিতে হবে খোকা। শুনলাম—মাথায় তোর চাকরীর নেশা ঢুকেছে, ওটা ভালো নয়। আমাদের বংশে চাকরীকে চিরকাল সবাই মনে করে এসেছে পাইক, পেয়াদা আর

বরকন্দাজের কাজ। যে সামান্য তেজারতি আর লগি কারবারের বাতিটাকে এখনও নিজের হাতে আমি টিন্ টিন্ ক'রে জ্বালিয়ে রেখেছি, তা থেকে আবার কিছু একটা বড় জমিদারী গড়ে ওঠা অসম্ভব কিছু নয়। এতকাল যা খুশী করেছিস, মাথায় বিদ্যে ঢুকিয়েছিস, যথেষ্ট হয়েছে। এবারে ওসব চাকরী-বাকরীর দুর্বুদ্ধি ছেড়ে আমার হাত থেকে কারবারের সব কিছু বুঝে নে। আমারও যথেষ্ট বয়স হলো, তোকে সচ্ছলভাবে সংসারী করে দিয়ে যেতে পারলে আমি নিশ্চিন্ত হই।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়েই এসেছিল। পিঁড়িতে বসেই বাবা অনর্গল বলে গেলেন কথাগুলো। কিন্তু যত সহজ করে বললেন তিনি, তত সহজেই কিন্তু উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। ভগ্ন জমিদারীর অচল কারবারী পলিটাকে ছুঁচাতে আঁকড়ে ধরে বাবা এখনও নতুন জমিদারী পত্তনের স্বপ্ন দেখছেন। সামন্ততান্ত্রিক রক্তের স্বপ্ন এত শীগগিরই কি বিলুপ্ত হতে পারে? সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে আজ কি করে একে একে জমিদারী নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, কি করে সামন্ততন্ত্রের উষ্ণ রক্ত অপমানে অভিশাপে ক্লেদলিপ্ত হয়ে ধীরে ধীরে মিশে যাচ্ছে পাতালগর্ভে সেদিকে যদি একবারও বাবার দৃষ্টি যেতো, তবে অমন করে অস্থির চিত্তের ব্যর্থ স্বপ্নটাকে তুলে ধরতে পারতেন না। কিন্তু একথা নিয়ে বাবার সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। বললাম, 'ঐ তেজারতি আর লগি কারবার ছাড়া আর যা কিছু বলবেন, আমার আপত্তি নেই।

চোখের স্থির দৃষ্টিটাকে এবারে আমার মুখের দিকে নিবদ্ধ করে বাবা বললেন, 'সংসারের রুজি রোজগার বন্ধ করে তবে হাওয়া খেয়ে বাঁচতে চাস? লেখাপড়া শেখার উদ্দেশ্য কি শুধু চাকরী করাই, ব্যবসা করা নয়? বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, এদেশ বাণিজ্য করেই একদিন বড় হয়েছিল; ব্যবসা ছাড়া পথ নেই, ব্যবসা ছাড়া সম্মান নেই। সংসারে যার টাকা আছে, তারই মান সম্মান প্রতিপত্তি, এ পৃথিবীতে অর্থহীনের কোথাও স্থান নেই।

বুঝলাম—বাবা বুঝোতে চাচ্ছেন। নিজেও বুঝি। অর্থ না হলে জীবনের সমস্ত কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষাই মিথ্যে। কিন্তু এসংসারে যে অর্থের গায়ে প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের গন্ধ রয়েছে, সে অর্থ এহাত দিয়ে স্পর্শ করলে আমি নিজেই কি প্রতিমুহূর্তে নিজের মধ্যে দগ্ধ হয়ে মরবো না? বললাম, 'টাকা রোজগারের আরও বহু ভালো পথ রয়েছে। একদিন ভালভাবে এম-এ'টা পাশ করতে পারলে প্রফেসারীও হয়ত পেয়ে যেতে পারি কোনো কলেজে! নিজে শিখে দেশকে শেখানোই তো শিক্ষার আদর্শ।

শুনে বাবা চটলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু বয়সের গাম্ভীর্যে ক্রোধটাকে যথাসম্ভব চেপে রাখলেন নিজের মধ্যে; প্রকাশ পেতে দিলেন না। বললেন, 'বেশ, তবে নিজে যা ভালো বুঝিস্ তা-ই কর।

খাওয়া একটু আগেই শেষ হয়েছিল। এবারে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন বাবা।

কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, 'আমি তবে ডক্টর চৌধুরীকে খবর দিই, এসে তিনি দেখে যান মাকে।'

এবারে আর একটি কথাও ব'ললেন না বাবা। নীরবে মুখ ঘুরে এক সময় বড় ঘরের দিকে চ'লে গেলেন।

বাবার কাছ থেকে স্বাধীনতা পেয়েছি, সন্দেহ নেই; কিন্তু চ'টলে বাবা বড় সাঙ্ঘাতিক মানুষ, তাঁকে টলানো কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। মনে আছে—ইতিপূর্বে কি নিয়ে মার সঙ্গে একবার মত বৈষম্য হওয়ায় ছ' মাস তিনি বড় ঘরের ছায়া অবধি মাড়ান নি। হৈ চৈ নয়, হল্লা নয়, নীরবে আত্ম স্বাতন্ত্র্য রক্ষা ক'রে নিজেকে শুধু ঘুরে ঘুরে সরিয়ে রেখেছেন তিনি। চরিত্রের এ অভ্যাসটা বড় সাঙ্ঘাতিক। ভয় হ'লো—অনুরূপ সাঙ্ঘাতিক কিছু একটাই শেষ পর্যন্ত ঘটিয়ে ব'সবেন কিনা বাবা!

কিন্তু তা নিয়ে ভাববার আর সময় নেই। আপাতত ডক্টর চৌধুরীই একমাত্র লক্ষ্য। তাঁর চেম্বারের উদ্দেশ্যেই

তাই বেরিয়ে পড়লাম।

এসে দেখে শুনে ডাক্তার ব'ললেন, 'দি কেস ইজ্ ভেরী কম্প্লিকেটেড্। অবস্থা একেবারে শেষ ক'রেই তবে আমার হাতে দিয়েছেন। আপনারা রোগটাকে যত ইজি মনে ক'রেছেন, তা নয়। এখন যা অবস্থা হ'য়েছে, এ থেকে যে কোনো মুহূর্তে করোনারী থ্রম্বোসিসে টার্ণ নিতে পারে। আর টার্ণ নেওয়া মানে কি জানেন তো?'

এ সময়ে বাবা অবশ্য কাছে ছিলেন, কিন্তু প্রশ্ন যা কিছু আমাকেই ক'রতে হ'লো। জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'ভালো হবার কোন পথই কি তবে আর খোলা নেই?'

—'আছে।' ডক্টর চৌধুরী ব'ললেন, 'নইলে আর আমাকে ডাকলেন কেন? রুগির মেণ্টাল পিস যাতে কোথাও কোনোক্রমে ব্যাহত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবার প্রয়োজন হবে। তারপর আমার হাত যশ আর আপনাদের অদৃষ্ট।'

মার স্বাস্থ্য যে শেষ পর্যন্ত এই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে দূরে দূরে থেকে এতদিন কল্পনাই ক'রতে পারি নি এতটা। বাবার কথা থেকে কিছুটা আঁচ ক'রছিলাম, তারপর ডাক্তারের কথা শুনে রীতিমত চিন্তার কারণ ঘটলো। সংসারের আদর্শের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আদর্শের খাপ না খেলেও এ জীবনে মা বাবাকে অস্বীকার করি কি ক'রে? স্বভাবতঃই তাই মনের ভিতরটা একবার মোচড় দিয়ে উঠ্লো।

প্রেস্ক্রিপ্সন লিখে দিয়ে ডাক্তার ভিজিট নিয়ে বিদেয় হ'লে নিজে থেকেই এবারে মার পাশে গিয়ে কিছুক্ষণ ব'সলাম। গত ছ' সাত বছরের মধ্যে এমন ক'রে কখনও স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে এসে মার পাশে ব'সেছি ব'লে মনে পড়ে না। দেখলাম—ঘুমিয়ে রয়েছেন মা, ঘুম না হ'লেও অন্ততঃ খানিকটা অবসাদের অবচেতনা। ডেকে বিব্রত করা উচিত হবে না, ডাক্তারের অন্ততঃ তা-ই নির্দেশ। চোখের উপর দিয়ে মুহূর্তকালের জন্য একবার ভেসে গেল সেদিনের সেই ছবিটি। শিয়রে বসে মার মাথার উপর দিয়ে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন হৈমন্তী, ওপাশে আঁচলের সামনে দাঁড়িয়ে বিনুনী রচনা ক'রছে তনুশ্রী। তারপর হৈমন্তীর ছোট খাটো জিজ্ঞাসা, আর মার ছোট খাটো অভিমান। সেদিন হয়ত আরো দু'দণ্ড কাছে ব'সে কথা ব'ললে মা খুসী হ'তেন, খুসী হ'তেই চেয়েছিলেন মা; কিন্তু নিজেকে সেই খুসীর স্রোতে ভাসিয়ে দিতে পারিনি। তার জন্য আজ এতদিন পরে এই গভীর অনুশোচনা হ'লো। মনে প'ড়লো সেদিন ষ্টেশনে হৈমন্তীর শেষ কথাটি: দিদির শরীর যেমন খারাপ যাচ্ছে, বলা তো যায় না ক'দিন আছেন। ডিহীরিতে নিয়ে এলে একটা চেঞ্জও তো হবে!'

কিন্তু এ অবস্থায় কি চেঞ্জটাই সম্ভবসাধ্য? একটু সুস্থ হ'য়ে মা নিজে থেকেই একদিন গিয়ে কিছুকালের জন্য কাটিয়ে আসতে পারবেন ডিহীরিতে। তাতে বাধা নেই, সমস্ত বাধাই হৈমন্তী কাটিয়ে দিয়ে গেছেন।

বাবার মুখে দেখ্লাম—একটিও কথা নেই। আপাতত আমার সঙ্গে তাঁর সমস্ত কথাই প্রায় শেষ হয়েছিল। খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে মুখ ফেরাতেই দেখ্লাম—আমার মুখের দিকে একাগ্র চোখে তাকিয়ে আছেন তিনি। বুঝ্লাম—কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারছেন না, কিম্বা নীরবেই বুঝিয়ে দিতে চাচ্ছেন তিনি আবহ পরিবেশটাকে।

কিছুক্ষণ মার ঘুমন্ত মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে নিজে থেকেই এবারে জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'আমাকে কিছু বলবেন বাবা?

ডক্টর চৌধুরীর কথা শুনে অবধি বাবা যে অনেকখানি মুষড়ে পড়েছেন, এবারে তাঁর কথার মধ্যেই সেটুকু ধরা পড়ে গেল। বললেন, হ্যাঁ—না—মানে বলছিলাম যে, একা বামুন ঠাকুরের উপর নির্ভর করে এ অবস্থায় কি চলতে পারে! চক্রধরপুরে তোর দিদিকে একটা চিঠি দিয়ে যদি কিছুকালের জন্যে আনাতে পারিস, তবে ভালো হয়। ঘর-গেরস্থালীর দিকটা দেখে শুনে আপাতত সেই চালিয়ে

নিতে পারবে। একজন বাউকে সব সময় থাকার দরকার তোর মার পাশে।

বললাম, 'বেশ, দিদিকে আমি কালই চিঠি লিখে দেব।

হতাশার ক্ষত স্থানটাতে এবার যেন খানিকটা প্রলেপ পেলেন বাবা। বললেন, 'তুই তবে আর একটুকাল তোর মার পাশে বস, আমি দৌড়ে ডক্টর চৌধুরীর ডিস্‌পেন্‌সারী থেকে চট্‌ করে ওষুধটা নিয়ে আসি।

বাধা দিয়ে বললাম, 'না, না, আপনি কেন যাবেন, আপনি বসুন, আমার গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসতে দু মিনিটও সময় লাগবে না। আমি এই এক্ষুণি এলাম বলে।

নীরবে মার শিয়র থেকে উঠে ডক্টর চৌধুরীর ডিসপেন্‌সারীর উদ্দেশ্যেই আবার বেরিয়ে পড়লাম। অলক্ষ্যে কখন যে মনটা হঠাৎ সুদূরপ্রসারী হয়ে পড়েছিল, বুঝতে পারিনি। পূর্ণিমার নতুন এ্যাসিষ্টেন্ট্‌ হেড্‌মিষ্ট্রেসকে কেন্দ্র করে তার ছাত্রী-মণ্ডলী-পরিবৃত পরিবেশটি অকস্মাৎ দুচোখে একবার ভেসে উঠে সহসা আবার মিলিয়ে গেল। এ বড় অদ্ভুত স্মৃতি, বড় অদ্ভুত তার দংশন। কালকের ডাকে অণিমার অন্ততঃ দু'লাইনের একটা চিঠি পাওয়া হয়ত একেবারেই বিচিত্র কিছু নয়। সাইকো-এ্যানালিসিসের একটা বড় পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় জয়ী হ'লে অণিমাকে এবারে দু'টো রেজাল্ট্‌ একসঙ্গেই জানিয়ে দিতে পারবো। দু'টো রেজাল্টেই যে যুগপৎ বিস্মিত হবে; আর সেই বিস্ময়ের বেদনা থেকে যে মন্ত্র নেমে আসবে, তা দিয়ে সুরু হবে তার নতুন চিঠির গ্রন্থি রচনা।

সহসা ছিন্ন উর্ণনাভের জালের মতো চিন্তাসূত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ডক্টর চৌধুরীর ডিস্‌পেন্‌সারীর একেবারে দোরগোড়ায় এসে পড়েছি। কম্পাউণ্ডারকে তাগিদ দিয়ে এবারে তাড়াতাড়ি ওষুধটা হাতে না পেলেই নয়।

[ক্রমশঃ]

পৃথিবীকে ভালোবাসি

শ্রীমতী মমিতা মুখোপাধ্যায়

এই পৃথিবীকে আমি ভালোবাসি,
ভালোবাসি আমি তার মাঠ বন
নীলাকাশ। দোয়েলীরা কাঁচুলিতে
ঢাকা তার এলোমেলো যৌবন।
ভালোলাগে বাগিচার যত ফুল,
যত রঙ, যত রস, যত প্রাণ—
কচি মুখ মেয়েদের এলোচুল,
ভালো লাগে তাহাদের হাসি গান।
তাই তো যখন দেখি ভরা মাঠ
পঙ্গপালেরা এসে লুঠছে,
তখনি মুঠিয়ে ওঠে দু'টি হাত
প্রলয়-নাচন জাগে পুচ্ছে।

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

নারায়ণ চৌধুরী

শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় বাংলার একজন প্রথিত-যশা রাগসঙ্গীত শিল্পী। ধ্রুপদ গানে বাংলা দেশের দীর্ঘকালীন একটি ঐতিহ্য বর্তমান, টপ্পা গানেও বাঙালী শিল্পীর খ্যাতি অনেক দিনের। কিন্তু খ্যাল ও ঠুংরী গানে এখনও তেমন কোন সমৃদ্ধ ঐতিহ্য গড়ে উঠতে পারে নি, একথা স্বীকার না করে পারা যায় না। মনে হয় শেষোক্ত ক্ষেত্রে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত-কারদের তুলনায় বাঙালী সঙ্গীত শিল্পীদের সৃষ্টিক্ষমতার যে অপূর্ণতা আছে, ভীষ্মদেবের ন্যায় একজন অমিত কলাকুশল সঙ্গীতশিল্পীর সাধনার ফলে তা বহুলাংশে পূরণ হয়েছে। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ চক্রবর্তী ও পরলোকগত জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী—এঁদের সঙ্গীত নৈপুণ্য বিচার করলে দেখতে পাব আধুনিক কালের সীমার ভিতর বাংলা দেশে খ্যাল গানের চর্চা নেহাৎ কম হয় নি এবং শিল্পগত উৎকর্ষের বিচারে সে সাঙ্গীতিক অবদান উত্তর ভারতীয় সাঙ্গীতিক অবদানের সহিত অনায়াস-তুলনীয়। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে উত্তর-ভারতীয় মুসলমান ওস্তাদদের অশিক্ষা, অনুদারতা ও কুসংস্কারের কঠোর সমালোচনা করলেও একটা জায়গায় এঁদের অবিসম্বাদী শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। সে হচ্ছে ওস্তাদদের স্বাভাবিক রসসৃষ্টির নৈপুণ্য ও শিল্পী মেজাজ। তদনুপাতে হিন্দু সঙ্গীত-কারদের সৃষ্টিভঙ্গি শাস্ত্রীয় অনুশাসনের দ্বারা অতিরিক্ত মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত বলা যায়। এবং যে পরিমাণে হিন্দু সঙ্গীতের উপর শাস্ত্রীয় প্রভাব পড়েছে সেই পরিমাণে তা রুক্ষ-কঠোর হয়ে উঠেছে এবং তার মৌলিক উৎকর্ষ ক্ষুণ্ণ হয়েছে। ওস্তাদদের সঙ্গীতশাস্ত্রের জ্ঞান ত্রুটীযুক্ত হলেও তাঁদের কণ্ঠ ও বাদননৈপুণ্য বিতর্কাতীত।*

হিন্দু সঙ্গীতের সম্পর্কে এই অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে উত্তর ভারতীয় শ্রেষ্ঠ খ্যাল সঙ্গীতাদর্শের প্রভাবে হিন্দু রাগসঙ্গীত শিল্পীদের দৃষ্টি-ভঙ্গির এই রুক্ষতা যে ক্রমশঃ নমনীয় হয়ে আসছে সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। শাস্ত্রীয় শাসনের প্রভাব কিছুকাল আগে পর্যন্ত হিন্দু সঙ্গীতশিল্পীদের প্রকাশভঙ্গির ভিতর যতই যে কাঠিন্যের সঞ্চার করেছিল, একালীন আবহাওয়ার সংস্পর্শে তা বিগলিত হবার লক্ষণ স্পষ্ট। উপরে যে তিনী বাঙালী সঙ্গীত-শিল্পীর নাম করা হল তাঁদের তিনজনাই হিন্দু। কিন্তু তাঁদের গায়নপদ্ধতি ও সুরসৃষ্টির ধারা লক্ষ্য করে এমন কথা কোন মতেই বলা চলবে না যে, উত্তর-ভারতীয় ওস্তাদের শিল্প-নৈপুণ্যের বান থেকে তাঁরা খুব বেশী দূর পিছনে পড়ে আছেন। বিশেষ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় সুররূপায়ণের ক্ষেত্রে পূর্ণ সংস্কারমুক্ত শিল্পী। শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বাধ্যবাধকতার দ্বারা তিনি বদ্ধ নন, পক্ষান্তরে যুগোচিত শিল্পচেতনা তাঁর সঙ্গীতদৃষ্টিকে যথার্থ প্রাণলক্ষণমণ্ডিত করে তুলেছে। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এযুগের একজন প্রধান খ্যালশিল্পী বললে মোটেই বাড়িয়ে বলা হয় না।

পরিতাপের বিষয়, আজ কয়েক বৎসর হল ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠ অন্নবিস্তর মূক হয়ে আছে। তিনি আমাদের মধ্যে থেকেও নেই—গানহারা পাখির মতো তাঁর কণ্ঠের কাকলি সাময়িকভাবে স্তব্ধ।

---

* ভাতখণ্ডেজীর সহিত শ্রীদিলীপকুমার রায়ের সঙ্গীত বিষয়ক আলোচনায় এই তথ্য প্রকাশিত হয়। দিলীপকুমারের 'গীতশ্রী' গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

সেই যে সঙ্গীতশিল্পী ভীষ্মদেব আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রেরণায় পণ্ডিচেরী আশ্রমস্থ হয়েছিলেন তারপর থেকে বাংলাদেশের সঙ্গীত জগতে তিনি আর সক্রিয়ভাবে বেঁচে নেই—এমন কথা বললে মোটেই সত্যের অপলাপ করা হয় না। ভীষ্মদেব কিছু কাল হল কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছেন, কিন্তু তিনি আর পূর্বের মতো সঙ্গীতান্বেষী মহলের অধিগম্য নন। বস্তুতঃ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের পূর্বতন গীতমুখরতার অধ্যায়ের অবসান হয়েছে বললেও চলে। বাংলাদেশের সঙ্গীতজীবনের পক্ষে এটি যে কী অপূরণীয় ক্ষতি তা সহজেই অনুমান করা চলে। হয়তো ভীষ্মদেব আধ্যাত্মিক সাধনার পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছেন, তবে দৃশ্যত এক গভীর মূল্যের বিনিময়ে তাঁকে এই সাফল্য অর্জন করতে হয়েছে। আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে যা আপাত-লাভ তা সঙ্গীত জীবনের পক্ষে সুস্পষ্ট ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়তো সঙ্গীতের প্রতি আমাদের মন কিয়ৎ পরিমাণে পক্ষপাতদুষ্ট তাই একথা বলছি, কিন্তু ও-বিষয়েও যে পক্ষপাতজনিত একদেশদর্শিতা থাকতে পারে না এমন নয়। যা হোক, এই লাভ ক্ষতির হিসাব নিকাশ করলে কী দাঁড়ায় সেইটেই বিচার্য। চূড়ান্ত বিচারে ভিন্নতর অনুভূতির আকর্ষণে সঙ্গীতজগত থেকে শ্রী ভীষ্মদেবের অবসর গ্রহণ দেশের পক্ষে কতটা লাভজনক হয়েছে তা সুধীজনকেই বিবেচনা করতে বলি।

প্রতিভা বিকাশের ইতিবৃত্ত

অতি অল্প বয়সেই ভীষ্মদেবের সাঙ্গীতিক প্রতিভার স্ফুরণ হয়। এক হিসাবে তাঁকে বালক-প্রতিভা (Prodigy) বলা যায়। চৌদ্দ বৎসর বয়সকালে তিনি সর্বপ্রথম যে দুটি টপ্পা গানের রেকর্ড করেন তা থেকেই তাঁর স্বভাবদত্ত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গান দুটির মধ্যে বালক শিল্পীর যে কণ্ঠের স্ফূর্তি ও উৎকর্ষ প্রকাশমান, তা যে কোন প্রথম শ্রেণীর বয়স্ক গায়কের নৈপুণ্যের সহিত তুলনীয়। পরে ভীষ্মদেব একনিষ্ঠ সাধনার দ্বারা তাঁর এই স্বভাবজাত নৈপুণ্য আরও অনেক বেশী পরিমার্জিত ও উন্নত করেন। সাধারণতঃ দেখা যায়, শিশু বা বালক-প্রতিভা হিসাবে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেন তাঁদের শক্তি ও প্রাণস্ফূর্তি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যেন ধীরে ধীরে মিইয়ে আসতে থাকে। যে কিশোর একদা তার বয়সের পক্ষে অকল্পনীয় নৈপুণ্যের দ্বারা সর্বসাধারণের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল সেই কিশোর পরিণত বয়সের সীমায় সমুপনীত হয়ে আর তেমন করে মানুষের মনোহরণ করতে পারছে না—এজাতীয় বিষম দৃষ্টান্ত সঙ্গীতজগতে মোটেই বিরল নয়। শিল্প জগতে প্রতিভার এই উত্তরোত্তর ক্ষীয়মাণতার উদাহরণ বহু ও ঘন সন্নিবিষ্ট। একথার প্রমাণ স্বরূপ আমরা মাষ্টার মদন, চন্দ্রশেখর, কুমার গন্ধর্ব, মাষ্টার মনোহর তার্কে জ্ঞানবিনোদ (ঢাকা) প্রমুখ অনেক কৃতবিদ্যসম্পন্ন বালক শিল্পীর নামোল্লেখ করতে পারি।

কিন্তু ভীষ্মদেব এ নিয়মের এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কণ্ঠের কৃতিত্ব সমধিক প্রকটিত হয়। ভীষ্মদেবের বয়স যখন তেইশ কি চব্বিশ, তার আগেই তিনি কলিকাতার রাগসঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর অসংশয় শিল্পনৈপুণ্য গুণে অবিসম্বাদী প্রতিষ্ঠা অর্জন করে ফেলেছেন দেখতে পাই।

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাঙ্গীতিক জীবনের প্রাথমিক অধ্যায়ে নগেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। এঁর নিকট ধ্রুপদ, খ্যাল, ঠুংরি, টপ্পা সব রকম সঙ্গীতেরই তিনি তালিম পান। পরে তিনি প্রসিদ্ধ বীণকার খলিফা বাদল খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং একাদিক্রমে বহু বৎসর এঁর নিকট খ্যাল শিক্ষা করেন। সমসাময়িক কালে নবদ্বিপের বৃদ্ধ ওস্তাদ বাদল খাঁ সাহেবের নিকট আর যে সকল সঙ্গীত-শিল্পী শিক্ষা গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়, ভীষ্মদেবের এককালীন শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়, শচীন দাস

(মতিলাল), বিভূতি দত্ত প্রভৃতি। বাদল খাঁ সাহেবের নিকট শিক্ষা সমাপনান্তে ভীষ্মদেব কিছুকাল কৈয়াজ খাঁ সাহেবের নিকটও সঙ্গীত শিক্ষা করেন।

কণ্ঠস্বর

ভীষ্মদেবের কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট এমন কথা বলা যায় না। তাঁর কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক চড়া ভাবটি স্বতই তাঁর আওয়াজের ভিতর একটা ধাতব তীক্ষ্ণতার আমেজ এনে দিয়েছে। এই তীক্ষ্ণতা মিষ্টত্বের হানিকারক। সচরাচর হারমোনিয়ম যন্ত্রের "এফ্ শার্প্" পর্দায় তিনি সুর বাঁধেন। তাতেই প্রমাণ তাঁর কণ্ঠ তারা সপ্তকে অন্যান্য পুরুষ শিল্পীর তুলনায় দূরগামী। সাধারণ মোটা গলার গাইয়ের যেটি পঞ্চম স্বর, ভীষ্মদেবের পক্ষে সেটি ষড়জ সুর, তার অর্থ ঠুংরীর স্কেলে তিনি সচরাচর খ্যাল গেয়ে থাকেন। ভীষ্মদেবের কণ্ঠের এই উচ্চগামিতা স্বতই তাঁর গানের সৌন্দর্যকে কিছু পরিমাণে ব্যাহত করেছে, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। সেই সঙ্গে নারীসুলভ ধাতব তীক্ষ্ণতার আমেজ যুক্ত হয়ে তাঁর কণ্ঠস্বরকে আরও অনুপযোগী করে তুলেছে। জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর কণ্ঠের উদাত্ত-গম্ভীর 'বোলদ্ব' আওয়াজ ভীষ্মদেবের কণ্ঠে নেই, সেটি সামান্য পরীক্ষাতেই বিচক্ষণ শ্রোতার কানে ধরা পড়বে।

কিন্তু সাধনার বলে কী না হয়। ভীষ্মদেবের কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃ কিঞ্চিৎ রুক্ষ বটে, তবে অদ্ভুত সুরেলা। দীর্ঘস্থায়ী স্বরসাধন তথা কণ্ঠ পরিমার্জনার দ্বারা তিনি সুরকে অচলপ্রতিষ্ঠ ভাবে তাঁর কণ্ঠে ধরে নিয়েছেন। অচলপ্রতিষ্ঠ অর্থাৎ সুর তাঁর গলায় স্থায়িভাবে বসে গেছে। সুরের আর নড়চড় হবার উপায় নেই। এই স্থায়ী সুরভাবের দৌলতে গানের মধ্যে তিনি কী অনবদ্য সুরের যাদুই না সৃষ্টি করেন। সুর যেন তাঁর কণ্ঠ থেকে নির্ঝরধারার মত অবিরাম ধারায় ঝরে পড়ে। একাধিক আসরে ও অনুষ্ঠানে ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের গান শোনবার আমাদের সুযোগ হয়েছে। তা ছাড়া প্রায়োকোন-রেডিও তো আছেই। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, সুরসৃষ্টির নব নব কৌশল দ্বারা শ্রোতৃ সাধারণের চিত্ত বিমুগ্ধ করবার ক্ষমতায় তাঁর সমকক্ষ শিল্পী বাংলায় নেই বললেই চলে। ভীষ্মদেবের কণ্ঠস্বরের সম্পূর্ণতা বিধানে প্রকৃতির যে কার্পণ্য, সেই কার্পণ্যের পুরাপুরি শোধন হয়েছে ভীষ্মদেবের সুরসৃষ্টির মৌলিকত্ব ও সৌন্দর্যের দ্বারা। সুরের তিনি একজন ঐন্দ্রজালিক স্রষ্টা। এইখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। সঙ্গীত অনুশীলনের ক্ষেত্রে আমরা সহজ মিষ্টত্বের আদর্শ থেকে সুরজ্ঞান তথা সুরসৃষ্টির ক্ষমতাকে সমধিক মূল্য দিই। কণ্ঠের স্বাভাবিক মিষ্টত্ব খুবই বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নেই; তবে মাত্র এই মিষ্টত্বের উপর নির্ভর করে ভারতীয় সঙ্গীত রাজ্যে খুব বেশী দূর অগ্রসর হওয়া যায় না। মিষ্টত্বের চাইতেও যা বেশী পরিমাণে চাই তা হল কণ্ঠের সুরেলা ভাব ও সুরসৃষ্টির ক্ষমতা। এটি না হলে কিছুই কিছু নয়। এই মানদণ্ডে ভীষ্মদেব যে একজন অতি উচ্চ শ্রেণীর গুণী সঙ্গীতজ্ঞ সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করা চলে না।

সরগম্ নৈপুণ্য

ভীষ্মদেবের গানের একটি প্রধান আকর্ষণ হল তাঁর সরগম্। সরগমের কাজে তাঁর শিল্পবোধ ও মৌলিকত্বের তুলনা হয় না। বৈশিষ্ট্যটুকু বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না, যাঁরাই ভীষ্মদেবের গান শুনেছেন তাঁরাই এ কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করবেন। সরগম্-এ রাগাশ্রিত স্বরগুলিকে নিয়ে নানারকম 'ফেরতার' অবতারণা করা হয়। কীর্তনের আসর যোজনার মতো এই 'ফেরতা'গুলি যিনি যত অবলীলাক্রমে উদ্ভাবন করতে পারেন এবং তাতে স্বরবিন্যাসের যত বেশী মৌলিকত্ব প্রদর্শন করতে পারেন, ততই তাঁর সরগমের আবেদন। এই দিক দিয়ে ভীষ্মদেবের 'সরগম্'এর আবেদন অপ্রতিরোধ্য ও গভীর। ভীষ্মদেবের কয়েকটি প্রসিদ্ধ গান—'ফুল বনকি গোঁদন মৈকা' (দেশী তোড়ী), 'অবহুঁ লালন মৈকা' (বেহাগ), 'পিউ পিউ রটত পাপৈয়রা বোলে' (ললিত), 'ঢোলন মাড়ে ঘরে আমি বে' (ভীমপলশ্রী), 'তাঁতে সেলাম মৈ জানাবে' (তিলঙ), 'আরি বাহার' (বাহার), 'কত বসন্ত আপনে' (রাগেশ্রী-বাহার), 'কাসে কাঁহ মেরে

সঙ্গতি (তিলক-কামোদ),
ঝড়ি বহে দুখন (গৌড়-মল্লার),
বসন্ত (রাহার 'পিয়া বসন্ত
ভামনিয়া' ধানী) ইত্যাদি। এ গানগুলির
মধ্যেই তিনি সমুগম্-এর অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন
করেছেন, তাঁর গ্রামোফোন রেকর্ডে গাওয়া
গৌড়-মল্লার, ললিত প্রভৃতি রাগে বিস্তৃত সমুগম্-
গুলির তুলনা হয় না।

উপরের প্রায় সব কটি গানই মধ্য লয়ের গান, কতিপয়
দ্রুত লয়ের। দ্রুত ও মধ্য লয়ের গানে ভীষ্মদেবের
হৃদয় অনায়াস প্রবহমানতা তথা তানের দ্রুততা তাক
লাগিয়ে দেবার মত ছিলিম। হয়তো এ সকল গানে
ধ্রুপদ, সংযোজিত স্থিরতার কিঞ্চিৎ অসদ্ভব আছে, তবে
ভীষ্মদেবের মাদকতার দ্বারা শ্রোতার সে অভাব-
বোধ সম্পূর্ণ আবিষ্ট রাখবার কৌশল তিনি
জানেন। তানক্রিয়ায় ভীষ্মদেব অতি দ্রুত সঞ্চরণক্ষম,
বিলেত যৈরাজ খাঁ সাহেবের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণের পর
'সাপট' তানে তাঁর অনায়াসদক্ষতা বিশেষভাবেই লক্ষ্য
করা যায়। সুর বিস্তারেও ভীষ্মদেবের সৃষ্টিপ্রতিভা
বিশেষ মৌলিকত্বের দাবি করতে পারে। বিশেষ করে
তাঁর নিজস্ব চালের গানগুলিতে। যথা দেবগিরি, বিলাবল,
দুর্গা, মল্লার, বাঁরোয়া, শুদ্ধ-সারঙ, মালকোষ প্রভৃতি
রাগাশ্রিত গানে। এ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বারে বারেই আমরা
পেয়েছি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ভীষ্মদেবের কণ্ঠস্বর
বেরাপী অনুশীলনের ফলে অতীব সুরযুক্ত।
সুরের দিকে তিনি সদা তাঁর সুরবিস্তার
সুরপ্রাচী হবে তা না বললেও চলে।

বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য

ভীষ্মদেবের আর এক কৃতিত্ব হলো
অভিনব রস-রসের সংযোজন। যাকে বলা হয় রাগপ্রধান
বাংলা গান, সেই উচ্চাঙ্গ রাগ সঙ্গীতের আমেজযুক্ত বাংলা
গানে ভীষ্মদেব একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। বলা যেতে
পারে, এই ক্ষেত্রে তিনি একজন নূতন ধারার প্রবর্তকও
বটে। কেন না ইতিপূর্বে ঠিক এই ধরনের
বাংলা গান আর কেউ গেয়েছেন বলে আমরা
জানি না। ভীষ্মদেবের কণ্ঠের সব কয়টি বৈশিষ্ট্য তাঁর
এই বাংলা গানগুলিতে পরিস্ফুট। নাম করলেই গানগুলি
সকলের চেনা মনে হবে—"ফুলের দিন চলো যে অবসান"
(অহল্যাবাঈ), "নবারুণ রাগে তুমি সাধী গো" (ভৈরবী),
"তব লাগি রাধা ওঠে গো কুসুমি" (দেশী-টোড়ী),
"আলোক লগনে" (রামকেলী) ইত্যাদি।

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীতবৈশিষ্ট্যের মোটামুটি
আলোচনা করা হলো। এমন একজন প্রতিভাবান
প্রকৃত শক্তিধর গায়কের কণ্ঠ কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে,
এর চাইতে পরিতাপের বিষয় কিছু হতে পারে না। তবে
আমরা আশাবাদী, আশা করতে ছাড়ব না। ভীষ্মদেবের
এ নিষ্ক্রিয়তাকে চিরন্তন মনে করবার কোনই কারণ নেই।
আবার তাঁর কণ্ঠে গান ফুটবে, তিনি সুরমুখর
হয়ে উঠবেন—এই একান্ত প্রত্যাশা নিয়ে নিবন্ধের
পরিসমাপ্তি ঘটাচ্ছি।

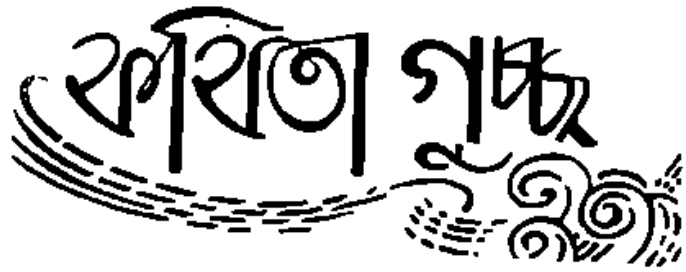

বকের রূপ

শ্রীসুধীর গুপ্ত

[ ]

নদীর তীরে বকের মেলা
আমার এ মন কেবল ভুলায় ;—
সচল ধবল পদ্মফুলে
রঙের তুলি কেবল বুলায়।

কাশের কোমল চামর দুলায়
শরৎ রাণী নদীর কূলে ;
অসীম আকাশ ছেয়ে আছে
সাদা মেঘের ফুলে ফুলে।

এই যে সাদার রূপের জোয়ার
এর তুলনা কোথায় পাবো !
এই জোয়ারে রূপের ধারায়
আনন্দে আজ উজিয়ে যাবো।

[ ]

শীতল নিতল এসো আকাশ,
ঘনিয়ে এসো হিয়ার মম ;
দিগন্তরে যেমন লুটাও,
নদীর ধারায় সিন্ধুর সম।

যেমন মিশাও নীলের বাহার,
তেমনি লুটাও—মিশাও আসি' ;
লুটাও প্রাণে ভাবের স্বপন,
কোমল মেঘের ফুলের রাশি।

বকের মেলা বসুক আমার
জীবন-নদীর কূলে কূলে ;
ভাবের বকের পাখায় এমন
হারাক্ দিশা আপন ভুলে।

[৩]

নদীর কূলে নদীর বালা
নদীর বীণায় বাজায় গীতি,
প্রাণের কূলে ঘনিয়ে আনে
নীরবতায় গভীর প্রীতি।

স্বপন-রঙীন নয়ন মেলে
চাইলে পরে ভুবন পানে,
রূপের তৃষা রূপাতীতের
পরশ জাগায় গোপন প্রাণে।

রূপের-ভুবন—গানের ভুবন
হারায় জীবন নদীর ধারায় ;
বকের পাখায় তখন এ মন
রূপাতীতের রাজ্যে হারায়।

রাত্রির তপস্যা

শ্রীনলীকান্ত রায়

রাত্রির তপস্যা বুঝি হোলো সার্থক
আলোকের রথে এতো সবুজ সকাল।
দুটস্ত কুসুমে হোলো রাতের কোরক,
জীবন সাগরে ঢেউ হোলো উত্তাল!

সারারাত জলে জলে প্রদীপের শিখা—
নিভে গেছে শেষ রাতে ভোরের আভাসে।
জুটিলনা ভিখারীর ভালে রাঙটীকা,
রাত্রির তরে তাই আঁখিজলে ভাসে।

কালো ঐ নভে কতো তারকার ফুল
ঝরে গেলো একমনে মালা কতো হায়,
ভোরের আকাশে তারা ব্যথায় আকুল,
সাদা মেঘে তাই বুঝি নয়ন লুকায়।

রাতের আঁধারে কত নয়নের জল
ঝরিলগো অগোচরে, জানিল না কেউ।
বিরহিণী বোঝেনাকো বিরহীর ছল,
হৃদয় সাগরে তাই আছড়ায় ঢেউ।

এবারেতো রাত্রির বিদায়ের পালা
সূর্যমুখীর ঐ শত অভিশাপে,
দিবসের ছোঁয়া লেগে রাত্রির আলা
পুড়ে বুঝি হোলো শেষ সূর্যের তাপে।

আপনাকে শেষ করে অপরের তরে
কে পারে সহিতে ব্যথা বিদায় বেলায়?
দহনের জ্বালাতেই অন্তর ভরে,
সার্থক রাত্রির এই তপস্যায়!

জীবন জিজ্ঞাসা

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

শুধু ছুটাছুটি আর খাটাখাটি,—এই কি জীবন? হায়রে,
চলে যাযাবর পাখী এক ঝাঁক,—কে কাহার পানে চায়রে!
যত দুই হাতে লুটে আনি টাকা
তবু প্রাণমন কেন লাগে ফাঁকা?
অর্থ বিহীন এই বেঁচে থাকা,—তার লাগি' এত দায়রে।

হায়রে মানুষ! শুষ্ক ফানুস! তুমি প্রাণহীণ যন্ত্র,
কিছু তব নাই, পুড়ে সব ছাই,—রহিল উদরতন্ত্র!
সুন্দর তাই লাজে কুণ্ঠায়
সংসার হ'তে নিয়েছে বিদায়,
মোরা কাপালিক জপিতেছি ব'সে তাহার মরণমন্ত্র!

কোথায় শান্তি? কোথায় তৃপ্তি? কেন সবে উদ্‌ভ্রান্ত?
শত উপচারে দগ্ধ জঠর কিছুতে না হয় শান্ত।
করি' কাড়াকাড়ি, ঘাতপ্রতিঘাত
ভুলে গেছি খাঁটি জীবনের স্বাদ,
আমাদের চোখে জরতী এ ধরা,—নহে সে শ্যামল কান্ত!

এত নির্বোধ জগতের ধাতা! এই লাবণ্যপুঞ্জ,
জ্যোৎস্নার মায়া, গোধূলির ছায়া, কুসুম উতল কুঞ্জ
গড়েছে কেবল খেয়াল খেলায়?
কারো তরে নহে—অকারণে হায়,
কোকিল কূজন, সাগরমন্দ্র, ভ্রমরের গীতিগুঞ্জ?

অনবদ্য

শ্রীবুদ্ধদেব ঘটক

কী করে বোঝাই, কী করে বোঝাই বলো, তবে পারমিতা
ভোর-ভোর মেঘ আকাশ-সকাল আষাঢ়ের টলোমলো
করুণ চোখের ছোঁয়া নিয়ে বলো, কেন এলো, কেন এলো
কচি-রোদ ছবি আঁধার-আমেজে মনটুকু ভরে ভরে
নামে অজস্র হাওয়াদের মীড়, বেদনার সুস্বরে
ক্লান্ত মেঘেরা শাসন মানে না, বেতস-লতায় জলে
ঝরোঝরো করে গোপন ব্যথায় অশান্ত উচ্ছল
গান গেয়ে গেলো ধূসর হৃদয়ে বৃষ্টির সঙ্গীতা।
কী করে বোঝাই, কী করে বোঝাই বলো, মেয়ে
তবে, বলো
কতোদিন আমি চুপি-চুপি বসে আশা-ভেজা বুকে বসে
চেয়েছি এমন সবুজ শান্তি, কবে যে আসবে কবে
আষাঢ়ের মেঘ আমার হৃদয়ে, জল মেয়ে ছলোছলো
আনবে কাজল কান্না-মাধুরী তৃষ্ণার মুখ ছেয়ে—
মাঠ-বন-পথ আমলকী বন ঝমঝম্ তালে ভিজে
জুড়াবে ছড়াবে মাটির গন্ধ প্রাণের সুরভি ভরা :
এ-প্রাণের নদী মত্ত মাতাল সমুদ্র-স্বাদ পেয়ে
তুলবে অতল আশা-মোড়া ঢেউ, তনুতার উদ্দাম
মেঘ-পরীদের আলপনা আঁকা বৃষ্টি-নূপুর-নাম।
কালো মেঘ-মন আশা ছুঁয়ে ছুঁয়ে জলময় ছায়া নামে।
এলোমেলো হাওয়া কাশফুল দোলে, ঝিরিঝিরি ঝিরিঝিরি
নিপুণ বীণার অপরূপ তান, এখন এ-মন শুদ্ধ
এই বেদনার সঙ্গীতে ভরে মূর্ছনা নিয়ে যানে,
বলো পারমিতা, কী করে বোঝাই, এই গীতি-মালা সব
যে আশা ছড়ালো, যে ব্যথা জড়ালো, সবই তা যে
অনবদ্য।

আয় বিষ্টি

সন্তোষকুমার অধিকারী

মন যে আজ ধুলোর মত শুকিয়ে ধূ ধূ করে
তপ্ত হাওয়া গায়ে বেঁধে, গাছের ছায়া কই ?
কোথায় শ্যাম চিকণ মেঘ, কোথায় জল ঝরে।
কই সে ঘোর সবুজ মাঠ, কোথায় তাল তমাল,
কোথায় ঘাস পায়ের ছোঁওয়ায় দূর্বা হ'য়ে থাকে ?
এ' পথে ধূলি রক্তঝরা পলাশ রাঙা লাল।
আয় বিষ্টি ঝেঁপে ঝেঁপে আকাশ রঙ্ মেখে
চৈত্র শেষ রুদ্র দিন দাহনে দেহ শীর্ণ ;
বিষ্টি আয় কালো মেঘে বজ্রনিনাদ হেঁকে।
মাঠে মেঠোন দল বেঁধেছে খোঁপায় গোঁজা পলাশ,
গলায় সুর, লণ্ডনো হাত, নাচের দোলা পায়ে,
নাচুনে সাপ, আগুন জ্বলা চোখে ঝড়ের আভাস।
কোথায় যাই হদ্দুদ মাঠে শুকিয়ে আছে তৃণ
শুকনো বালি ; খুঁড়লে কাঁকর মেলেনা জল বুকে ;
খোয়াই ভেঙে কি লাভ, কোপাই শুকিয়ে হ'লো ক্ষীণ।
আয় বৃষ্টি আকাশ দিয়ে সুরের ছবি এঁকে,
আয়রে আয় তৃপ্তিধারা, অমৃতরস বরণা,
আয় নিদাঘের স্বপ্ন আষাঢ়, আয় অরুণা বেকে।

আজকে আলোর গান

দেবপ্রসাদ রায়

কি জানি কি খেলা পেয়ে কুয়াশার ওড়নায়
ঢেকেছ নিজেকে
আলোর পোশাক খুলে রেখে।
সব আশা ভেঙে চুরে হতাশার শিলীমুখ
যন্ত্রণা নিয়ে
এখনো চলেছ দূর দিয়ে।
জীবনের প্রতি পথে চোর কাঁটা ছেয়ে গেছে ব'লে
আলোর চাতাল থেকে পায়ে পায়ে স'রে তুমি
গিয়েছ আদলে—
ভুলে গেছ পিপাসাকে, আশাবরী আকাশের টান
পড়ে না তোমার মনে, আর এই আমনের ঘ্রাণ
দেখ না এখন ভুলে আলপনা তোমার দু'হাতে
মনের ডানাকে কেটে ফেলেছ যে হতাশার
কঠিন করাতে
তোমার সে পরাজয় মনে মনে লুকোতে না পেরে
নিজের নিকট থেকে নিজেকেই নিতে চাও কেড়ে।
তার থেকে আরবার আলোর পোশাক প'রে এসে
এখানে দাঁড়িয়ে দেখো, আজও সেই মানুষেরা কালজয়ী
মানুষীকে ভালোবেসে বেসে
এখানে দাঁড়িয়ে দেখো পাখী
ধান খায়, বাসা বাঁধে, চোখে চোখে এখনো জোনাকী
মোহের মালিক জলে হীরামন পাখীদের দেশে।
তোমার বসনে যত চোর কাঁটা, আলোর বসনে
কিছু নেই ; সে বরং শুচিতার দিকে
টেনে নেবে আমাদের কামনার প্রথম কলিকে
সে বসন প'রে এইখানে
দাঁড়াও আবার তুমি পাশাপাশি—
সোনাগুঁড়ি রোদের উঠানে
আজকে আলোর দিন, আজকে আলোর গান ক'রে
আমরা সুখের ধান রুয়ে যাব জীবনের মাঠের ভিতরে।

তীর

মসউদ আর-রহমান

যে তীরের বলে একদিন কত ময়ূর শিকার করেছ,
আজ করে গেছে, নেই তাতে বিষ,
নয় তত আর তীক্ষ্ণ।
যে-দুপুরে একে একে ময়ূরের পুচ্ছ-পালখ ছিঁড়েছ,
সে কেঁদে গিয়েছে বিকেলের পথে—
সে-দুপুর উত্তীর্ণ।
শান দিয়ে দিয়ে শরের ফলকে তবু কিছু ধার হল না,
তাই বেঁধে নাক,' উড়ে যায় সব
নীড় ভোলা ঘুনো পক্ষী।
হাতিয়ার গেছে, তবু শিকারের সে তৃষা হারায়ে গেলনা—
বক্ষ কলসে ব্যর্থ ভরে শুধু
ও দু'টি রুক্ষ অক্ষি।

পরিবর্তন

অশোককুমার সেন

চারপাশের প্রাচীন জরাজীর্ণ বাড়ীগুলোর মাঝখানে বিরাট কম্পাউণ্ডওলা প্রাসাদটা দাঁড়িয়ে। চারপাশের সাধারণ পরিবেশ থেকে প্রাসাদের ও তার অধিবাসীদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার জন্ত কম্পাউণ্ডের চারপাশ উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। দোতলা বা তিনতলা থেকে প্রাচীরের বাইরের জগৎটা চোখে পড়ে, কিন্তু প্রাচীরের বাইরে তাকাবার অবসর মানুষের কোথায় ?

এই প্রাসাদেরই তেতলার একটি ঘরে বছর ছয়ের একটি সুকুমার সুদর্শন ছেলে খেলা করছিল—খেলা করছিল ঠিক নয়, খেলবার চেষ্টা করছিল। প্রথমে কাঠের ঘোড়াটার ওপর বসে একটু ঠেলাঠেলি করল ; তারপর সেটা আর পছন্দ হ'ল না। তখন মোটরটার চড়ে একটু ঘরের এধার ওধার করল ; তারপর সেটাও আর ভাল লাগল না। গাড়ী ছেড়ে দিয়ে ঘরের বাইরে এসে একবার ভাল করে দেখল কাছে কেউ আছে কিনা, তারপর বাড়ীর পিছন দিকের জানালার পর্দাটা সরিয়ে বাইরে তাকাল।

বাড়ীর পিছনে স্কুলের বাগান, তারপর উঁচু প্রাচীর। প্রাচীরের ওপাশে অযত্নবর্ধিত আগাছার মত পরস্পর ঘেঁসাঘেসি সারি সারি খোলার ঘর। কয়েকটা ছোট ছোট কোঠা বাড়ীও দেখা যায়, কিন্তু সেগুলোও জীর্ণ। খোলার ঘরগুলি থেকে তাদের বিশেষ কোন স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে না। খোলার ঘরগুলির সামনে দু'তিনটি কল, সেখানে কয়েকজন স্ত্রীলোক ও পুরুষ জলের প্রত্যাশায় দাঁড়িয়ে আছে, দু'একটি স্ত্রীলোক এরই মাঝে স্নান করছে। রাস্তার উপরে বসে একটি শিশু বাটিতে করে কিছু খাচ্ছে, একটা কাক মাঝে মাঝে তার খাবারে ভাগ বসাচ্ছে। রাস্তার ওপাশে বস্তি আর এপাশে এই প্রাসাদের প্রাচীর সংলগ্ন খানিকটা মাঠ। ছেলেটির দৃষ্টি পড়ল এই মাঠে তার বয়সী এবং তার চেয়ে কয়েক বছরের বড় একদল ছেলে একটা তালি দেওয়া ফুটবল যোগাড় করে মহানন্দে খেলা সুরু করেছে। মাঝে মাঝে আনন্দে চিৎকার করছে তারা। ছেলেটিরও বেশ মজা লাগে—কেমন মারছে ছেলেগুলো বলটাকে, আর মাঠের দুধারে ছুটো ইঁটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যে ছেলে দুটো, তারা কেমন আটকে দিচ্ছে বলটা। একমনে খেলা দেখছিল সে, এমন সময় ঘরে এলেন তার মা। ছেলেকে এইভাবে নিজের খেলা ছেড়ে বস্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে তাঁর মুখটা হয়ে গেল ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে ; ছেলেকে ডাকলেন, "খোকন !"

আর তো লুকোবার অবসর নেই একেবারে মায়ের সামনে পড়ে গেছে খোকন। অপরাধ করে হাতে নাতে ধরা পড়লে মানুষের মুখের ভাব যেমন হয় তার মুখখানাও ঠিক তেমনি হয়ে গেল। মা বললেন, "এই তোমার খেলা হচ্ছে খোকন ?" খোকনের মুখ যদিও শুকিয়ে গেছল তবু একটু বীরত্ব করে বলল, "একা একা কি করে খেলব ?"

বাবলু, পিন্টুদের সাথে খেলতে গেলে না কেন ?

অভিমানে খোকনের গলা ভারী হয়ে আসে, "বাবলুরা বুঝি ওদের মত খেলতে পারে !" খোকন হাত বাড়িয়ে মাঠের ছেলেগুলিকে দেখিয়ে দিল।

মা হাসলেন, বললেন, "তোমাকে আমি ওদের চেয়ে ভাল বল কিনে দেব, তুমি মামার কাছে খেলা শিখে নিয়ে বাবলুদের সাথে খেলবে, কেমন ?"

খোকন খুশী হয়ে বলল, "কত বড় বল মা, ওদের মত ?"

না বললেন, "ওদের চেয়ে ভাল।"

হ্যাঁমা, মামা কবে আসবেন? আমাকে যে খেলাটা শিখে নিতে হবে।

এখনি তোমার মামাকে কোন করে দিচ্ছি, কালকে বিকেলে আসবে, কিন্তু ছিঃ খোকন, তুমি আবার ওদিকে দেখছিলে!

খোকন লজ্জিত হয়ে বলল, "তুমি দেখে নিও মা আমি আর কখনও দেখব না।"

সেদিন রাত্রে ঘুমন্ত খোকনের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে খোকনের মা অন্নপূর্ণা দেবী স্বামীকে বললেন, "এরকম একটা বিশ্রী জায়গাতে কেন যে ওরা বাড়ীটা করলেন কে জানে; ছেলে খুলে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘর করা যায় না, চার পাশে যত সব ছোটলোকের বাস। ছেলেটারও কি হয়েছে জানিনা খেলা-ধুলো ছেড়ে দিয়ে ওদিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে। সত্যি বলছি, চোখের সামনে ছেলেটা খারাপ হয়ে যাবে এ আমি সইতে পারব না।" খোকার কপালের ওপর এক ফোঁটা চোখের জল পড়েছিল, আঁচলে করে সেটা সস্নেহে মুছিয়ে দিলেন তিনি।

খোকনের বাবা বীরেন চৌধুরীর নাকটা ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠল। বললেন—"I know how to crush them under my shoes। জুতোর নীচেই এদের রাখতে হয়, পা সরিয়ে নিলেই এরা মাথায় উঠে পড়ে। হাজার বার করে আমি বারণ করে দিয়েছি আমাদের মাঠে কেউ খেলবে না, আমি বাগান করব: তবু ওরা রোজ আসবে? উঃ কী স্পর্ধা! নায়েব বলছিল একদিন একটা কনষ্টেবল দেখালেই ওরা আর আসবে না। কিন্তু জমীদার বীরেন চৌধুরী যাবে পুলিশ ডাকতে। চাবুক মেরে ওদের সিধে করে দেব আমি! কালই বলছি দারোয়ান ছুটোকে।"

তারপর দিন বিকেলে খোকন এবং বাবলুরা একটা নূতন বল নিয়ে খোকনের মামার কাছে খেলার নিয়ম-কানুনগুলো জেনে নিচ্ছে এমন সময় গেটের কাছে গোলমাল শুনে খোকনের মামার পিছনে পিছনে সব ছেলেই সেখানে গেছে উপস্থিত হল। খোকন দেখল তাদের বাড়ীর বড় বড় গোঁফওলা দারোয়ান ছুটো একটা ছেলেকে ধরে টেনে নিয়ে আসছে আর তাদের দারোয়ানে বন্দী হয়ে আছে কে? সেই ছেলেটা—কালকে ওই মাঠে ছুটো ইটের মাঝে দাঁড়িয়ে খেলছিল, কি বলে যেন ওকে? ও, মামা বলছিল গোলকিপার। ভয়ে কাঁপছে ছেলেটা, বয়সে তার চেয়ে একটু বড়। দারোয়ানকে কি যেন বললে সে কাঁদতে কাঁদতে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল খোকন। ওকি? গাড়ী বারান্দার কাছে চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে তার বাবা। ছেলেটাকে তার বাবার কাছেই নিয়ে গেল। খোকনের বাবা তাকে কি বলে বকলেন। ছেলেটা হাত জোড় করে কি যেন বলল। কিন্তু ওকি, খোকনের বাবা চাবুক তুললেন; ওইটুকু ছেলেটাকে মারবেন নাকি? খোকনের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল, সমস্ত জামা কাপড় ঘামে ভিজে গেল।

জমিদার বীরেন চৌধুরীর হাতের চাবুকটা তখন নেমে এসেছে ছেলেটার পিঠে। ধনুকের মত বেঁকে উঠল ছেলেটা। খোকনের পিঠটা শির শির করে উঠল, যেন ওরই পিঠে চাবুক পড়ছে।

শপ্ শপ্ করে যেখানে পারলেন কয়েক ঘা মেরে বীরেন চৌধুরী বললেন, "বার করে দাও জানোয়ারটাকে।" একটা দারোয়ান টানতে টানতে গেটের বার করে দিল তাকে। চোখের জলে সমস্ত জগৎটা ঝাপ্সা হয়ে এল খোকনের কাছে। সহসা ওপরে তাকিয়ে দেখে তার মা, এতক্ষণের সমস্ত ব্যাপার তাঁর চোখের সামনে ঘটে গেছে।

• • •

তারপর দীর্ঘ বাইশ বছর কেটে গেছে। সেদিনের খোকন আজ ব্যারিষ্টার তরুণ চৌধুরী। সেদিনের খোকনের জায়গা নিয়েছে তরুণের তিন বছরের শিশুপুত্র।

সেই প্রাসাদেরই পূর্বোক্ত ঘরে বসে কথা বলছিলেন ব্যারিষ্টার তরুণ চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী অলকাদেবী। তাঁদের শিশুপুত্রটি ঘরের মধ্যে খেলা করছে।

ব্যারিষ্টার বললেন,
কেমন লাগল অলকা ?"

অলকাদেবী বললেন, "এক্সেলেন্ট, তুমি যে এরকম লেকচার দিতে পার এ আমি ভাবতেও পারি নি তরুণ। তারপর যখন তুমি মজুরদের দুঃখ কষ্টের কথা বর্ণনা করলে তখন আমার পাশের কয়েকজন ভদ্রলোক বলছিলেন,—ভদ্রলোকের প্রকৃত সিম্‌প্যাথি আছে মজুরদের জন্য। হি রিয়েলী ফীল্‌স্ ফর দি সাফারারস্।"

ওদের কথাবার্তায় বাধা পড়ল; নায়েব এসে জানালেন, "আজ্ঞে কত্তামশাই আপনাকে একবার আসতে বললেন।"

নায়েবের সঙ্গে তরুণ নীচে নেবে এলেন পিতার কাছে। জমিদার ধীরেন চৌধুরী এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। ছেলের হাতে জমিদারীর ভার ছেড়ে দিতে চান। ছেলেকে জমিদারীর কাজকর্ম শেখানোর জন্য মাঝে মাঝে তার সাথে পরামর্শ করেন। কোনও একটা দরিদ্র গ্রামের প্রজারা খাজনা দেয় নি; বলছে, "ভাল বৃষ্টি হয় নি, সামান্য ধান হয়েছে—খাজনা দিলে খেতে পাব না। এ সনের খাজনা মাপ করুন, পরের সনে দেবতা দয়া করেন তো সব শুধে দেব।" নায়েব জমিদারের হুকুম নিতে এসেছে—গত বছরের খাজনাও কিছু কিছু বাকি, এখন কি করা উচিত। ধীরেন চৌধুরী ছেলের মত চাইলেন।

তরুণ বললেন, "এসেই বার বার মাপ করলে জমিদারী চলবে কি করে? খাজনা দিতে না পারে তো উঠে যাক না। বৃষ্টি হয়নি ধান হয়নি ওসব বাজে কথা। এরারে তো বৃষ্টির জন্যে মোটরে ছাড়া বাইরে বেরোনোই যায় নি। বাজে খরচ করে পয়সা ওড়ায়, ফাঁকি মারে। পাইক নিয়ে জোর করে খাজনা আদায় করতে হবে।"

ধীরেন চৌধুরী একটু তৃপ্তির হাসি হাসলেন, ছেলেটা মানুষ হল। নায়েবকে বললেন, "তাহ্‌ ব্যবস্থাই কর।"

তরুণ চৌধুরী যখন নিজের ঘরে আবার প্রবেশ করলেন তখন তাঁর স্ত্রী পার্টিতে যাবার জন্য ড্রেস করছেন; বললেন, "বালীগঞ্জের বাড়ীটায় করে যাওয়া হবে বলতো? এরকম একটা এন্‌ভায়রন্‌মেন্টে থাকতে আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়—একটা সোসাইটি নেই।"

তরুণ বললেন, "আর মাসখানেকের মধ্যেই হবে বোধ হয়।" হঠাৎ ছেলের দিকে দৃষ্টি পড়তে দেখলেন সে চেয়ারে দাঁড়িয়ে জানালার পাশে তাকিয়ে আছে তার কাছে যেতে দাঁড়াতেই ছেলেটা তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললে, "বাবা আমি ওখানে বেলাতে যাব।"

তরুণ চৌধুরী তাড়াতাড়ি জানা
ছেলেকে বললেন,
অনেক ভল কিনে

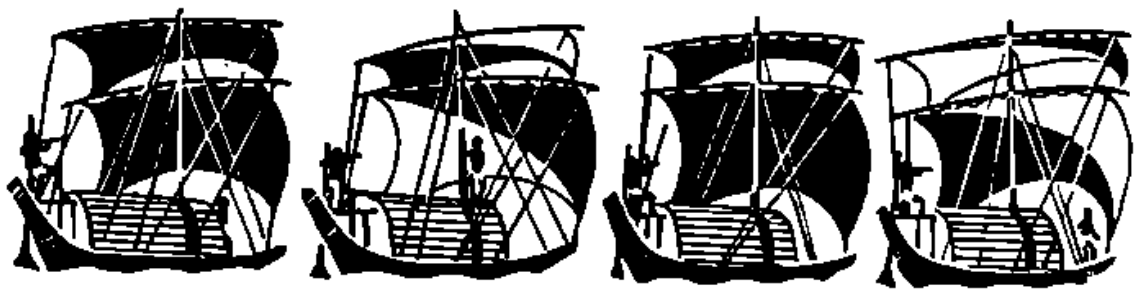

প্রভাত দেবসরকার

[উপন্যাস] [পূর্বানুবৃত্তি]

পক্ষীর মা সেই যে গিয়েছে ফেরবার নাম নেই। অপেক্ষা যারা করেছে।

মাধুরী ঘর-বার করে অস্থির হয়ে উঠল। দোতলার জানালায় এসে দাঁড়াল। কোথায় কে, কাঁকা উঠান ঘেরে আরো কাঁকা, শিউলী গাছের তলায় ধুলো উড়ছে, দুই পাতা গৃহস্থালী পরিত্যক্ত। তাড়া পাঁচিলে কাঠবেড়াল ঘোরাঘুরি করছে। ওদিকে ইসুফকাকীমার রান্নাঘরের চালে বিফল মনোরথ একটা কাক তারস্বরে চীৎকার করছে। তোরে শুকতে দেওয়া লাল-পাড় শাড়িটা কখন উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে—তারের সুতোয় রোদ ঝল্‌সাচ্ছে, তপ্ত লোহার শলা যেন।

এখান থেকে এইটুকু যাবি আর আসবি! তা নয়, গেছে কোথায় আড্ডা দিতে! পা ছড়িয়ে বসেছে গল্প করতে। এমন ছিল না পক্ষীর মা, ঘুষের কথায় অপেক্ষা কেবল—পোষা কুকুরের অধম ছিল, এখন মাথায় উঠেছে, অবাধ্যর একশেষ! বন্ধু পেয়েছে আর কি, মনীষকে মানবে কেন!

আজই সব বিদায় করে দেবে মাধুরী। দুই পক্ষর চেয়ে শূন্য গোয়াল ঢের ভাল। ভুলই হয়েছে তার ওকে পাঠান। বুঝিয়ে পেয়েছে, বন্ধুর সঙ্গে পিরীত হচ্ছে!

কে জানে কি ভেবেছে এই অন্নদাস লোকগুলো। যার খায়, যার পরে তারই ওপর টেক্কা মারে। জানে না তাড়িয়ে দিলে কোথায় থাকবে, কি খাবে। তবু বেয়াদপী করবে! কালই দাদুকে বলে বাস তুলে দেবে, সাতকাঠা জমিটা কেড়ে নেবে। পাড়ার লোকের সঙ্গে পিরীত করবার জন্য তো আর তাত কাপড় দিয়ে লোকগুলোকে পোষা হয়নি! তাত ছড়ালে আসার কাকের অভাব! ছোট লোকদের কখনো নাই দিতে নেই।

পিছনে শব্দ হতে জানালা থেকে মাধুরী মুখ ফেরালে।

একি তুমি, এ অসময়ে কুসুমদি! অকালে—মাধুরী অভ্যর্থনা করলে সাগ্রহে।

কিন্তু কেমন ভাবলেশহীন ভাবে কুসুম বললে, এই এলুম তোমাদের খবর নিতে!

মাধুরী হেসে বললে, ও, দাদু বুঝি ত্যাগ করচে? তাই বল —

তবু কুসুমের কোন ভাবান্তর নেই, পরিহাসে কেমন অপারক যেন আজ। বললে, ত্যাগ আর কি! অনেক দিন আসতে পারি নি, ভাবলুম যাই একবার রাঙাবৌ কি করছে দেখে আসি।

রাঙাবৌ-এর ওপর বড় যে দরদ! ব্যাপার কি? মাধুরী রহস্য করলে।

খাটের বাজু ধরে কেমন যেন কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইল কুসুম। মাধুরীর দিকে ঠায় চেয়ে বললে, বড়বাবুকে দেখলুম না, কোথায় গেছেন?

কেন? আচলে বেঁধে নিয়ে যাবে নাকি! এত খোঁজ তো ভাল নয় দিদি! মাধুরী এগিয়ে এল।

না, তাই জিজ্ঞেস করছি! কোথায় গেলেন? কেমন যেন উদ্বিগ্ন মনে হয় কুসুমের কণ্ঠস্বর।

মাধুরী আর রহস্য করে না। ভয় চকিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, কেন দিদি কি হয়েছে? সকাল বেলায় ওঁর খবর!

কুসুম বললে, বড়বাবুকে একটু সাবধানে থাকতে বলো দিদি, দিন-কাল ভাল নয়। একটা গোলমাল হবে শুনছি।

গোলমাল ? কিসের গোলমাল ! কে করবে গোলমাল ? দাদুকে সাবধান হতে হবে তার জন্যে ! মাধুরী প্রশ্ন করলে সবিস্ময়ে।

হাঁ, বাবুকে সামলে রেখো···রাগটা ওদের এখন বড়-বাবুর ওপর। বলা যায় না কখন কি হয়। কুসুম সতর্ক করলে। সাপের খোঁ।

ইস্-স্ ! করুক না দেখি ওরা কি করতে পারে ! মণের মুলুক না কি ! মাধুরী বললে, চালাকি বার করে দেবে একবার থেকে।

তবু বাবুকে একটু দেখে শুনে চলতে বলো ভাই আমার বড় ভয় করে। এমন তো কোনদিন দেখিনি, শুনিনি। কুসুম তেমনি ভয় বিহ্বল। কি দিনকাল পড়লো !

মাধুরী জেরা করলে, কি শুনলে তুমি যার জন্যে এত ভয় পাচ্ছ ? গ্রামে বাস করতে হবে না ? ওরা ভেবেছে কি ? সাপের পাঁচ পা দেখেছে সব ! করাটা অমনি সোজা কিনা।

না, না দিদি, তুমি একটু দেখো। বুড়ো মানুষ কোথায় কি হবে কিছু বলা যায় না। ওরা সব কদিন ধরে কি সব বলাবলি করচে, আমি শুনিচি।

মাধুরী উল্টো চাপ দিলে, তা যদি তোমার সত্যিই হয়ে থাকে এতদিন বলনি কেন ? নাম কর কে কি বলেছে—

কার নাম করবো, কজনের নাম করবো ? অন্ধকারে ক'জনকে আর চিনতে পারি। ওর ওপর সবার আক্রোশ।

আক্রোশ ! মাধুরী দাঁতে দাঁত চাপলে। দাঁড়াও আমি আসচি—

বেশীদূর মাধুরীকে যেতে হলো না ! হাঁপাতে হাঁপাতে পক্ষীর মা ছুটে এল, কাঁদা-মাখন হ'য়ে বললে, সর্বনাশ হয়েছেন দিদিমণি, কর্তাবাবুকে ওরা খুন করে ফেললে, শীগ্‌গীর এস—

হঠাৎ মাধুরীর পা দুটো যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেল। পক্ষীর মার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না কিছুতে।

কুসুমও ঘর থেকে বেরিয়ে এল হন্তদন্ত হয়ে, বিকৃত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, কি হয়েচে পক্ষীর মা ?

পক্ষীরমা তেমনি সুরে বললে, বাইরে এস, দেখতে পাবে সব। ঐ খামারে কি সব হচ্ছেন, কর্তাবাবুকে ওরা ঘিরে ফেলেচে।

সদর-বাইরে হৈ-হৈ চীৎকারটা দূরাগত তরঙ্গো-চ্ছ্বাসের মত শোনা যাচ্ছে। দিনদুপুরে ডাকাত পড়েছে যেন উদয়পুরে।

পড়ি-কি-মরি করে মাধুরী ছুটতে ছুটতে সিংদরজার ওপর এসে দাঁড়াল। সামনে অগণিত মানুষের ভিড়। সারা গ্রাম কেঁটিয়ে খামারে লোক জড় হ'য়েছে। কোথায় দাদু ? দাদুকে ওরা কোথায় সরিয়ে ফেললে ?

বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে 'দাদু ! দাদু' বলে কাতর চীৎকার করতে করতে ভিড়ের মধ্যে মাধুরী ছুটে এল। দাদু কৈ ? দাদু ! রমাপতির কড় খাওয়া বিপর্যস্ত কম্পিত দেহটা নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে মাধুরী বাঘবাঘিনীর মত গর্জন করে উঠলো, খবরদার বলচি, আর একটি কথা নয় ! সামনে থেকে সরে যাও সব !

কিছুক্ষণের জন্যে ভিড়টা স্তব্ধ হয়ে থাকে। হঠাৎ একটা অভাবনীয় ঘটনা যেন ঘটে গেছে। এমন একটা ব্যাপারে উদয়পুরের ঘোষবাবুদের অন্তঃপুর থেকে এমন প্রতিবাদ আসবে, কেউ ভাবেনি। একেবারে অসম্ভব, অবিশ্বাস্য।

ভিড় ঠেলে জগবন্ধু এগিয়ে এল। মাধুরীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললে, সবাই সরে যাবে কিন্তু তার আগে উনি কথা দিন—এদের সব দাবী মেনে নেবেন। জমার হার কমাবেন।

কেন, আপনার হুকুমে ? প্রদীপ্ত কণ্ঠে মাধুরী বললে।

হুকুম নয়, অনুরোধ ! জগবন্ধু বললে। সবার জন্যে গ্রামের জন্যে, উনি এটুকু করুন।

অনুরোধের এই যুক্তি ধরণ। বুড়ো চোর পেয়ে হাজার জনে মিলে মারতে এসেচেন। মাধুরী ব্যঙ্গ করলে।

ছি, ছি, ওকি কথা বলছেন! শুধু শুধু মারতে যাবে কেন—ওর কাছে আমরা আবেদন করছি। সপ্রতিভ কণ্ঠে জগবন্ধু বললে।

মারের আর কি বাকি রেখেছেন! হয়ে গুণ্ডা না মারলে বুঝি মার হয় না? কি ভেবেছেন আপনারা? মাধুরী রুষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, মনে করেছেন দেশের শাসনকর্তা কেউ নেই! যা খুশী তাই করবেন।

জগবন্ধু হাত জোড় করলে। বললে, এদের কথা একবার আপনাদের ভেবে দেখুন। অন্যায় দাবী এরা এরা করেনি। একে যা খুশী বলা যায় কি?

মাধুরী কোন কথা শুনতে চায় না। তেমনি চেঁচিয়ে বললে, এ জায়গা আমাদের, এখানে বিনা হুকুমে কারো দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, আমি বলছি, একপা যেন আর না এগোয় কেউ—ভাল হবে না।

জগবন্ধু সবাইকে কি ইঙ্গিত করলে। ভিড়টা ভিলিল চলো। সবার দিকে চেয়ে বললে, বেশ আপনিই বলুন ওঁর হ'য়ে এদের দাবী মেনে নিচ্ছেন।

মাধুরী কোন কথা বললে না, রমাপতির হাত ধরে পিছনে ফেরবার চেষ্টা করলে।

জগবন্ধু বললে, কই, কিছু তো বললেন না? এরা দাঁড়িয়ে আছে।

কেউ দাঁড়াতে বলেনি। বলবার কিছু নেই, ছোটলোকদের সঙ্গে ভদ্রলোকের কথা চলে না। মিথ্যে আশা।

ছোটলোক! ভদ্রলোক! জগবন্ধু বুঝি হাসলে কথাটা বলে। ভাল—

জগবন্ধু চুপ ক'রে যেতে হঠাৎ ভিড়টা চক্রাকারে চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেল। বেড়া আগুন যেন।

মাধুরী খানিক থমকে কি ভাবলে, তারপর দর্পিত কণ্ঠে বললে, গণ্ডগোল যদি করবার ইচ্ছে থাকে কর, কিন্তু এমন কাপুরুষের মত ব্যবহার করতে লজ্জা করে না তোমাদের! আর কথায় তোমরা নাচছ সে তোমাদের কে? এতদিন তোমাদের কে রক্ষা করে এসেছে...অকৃতজ্ঞ নিমকহারাম সব! সরে যাও বলছি—ভাল হবে না!

জগবন্ধু অদূরে দাঁড়িয়ে রইল। ভিড়ের মধ্যে কিছু চাঞ্চল্য দেখা গেল। কিন্তু মাধুরীর কথায় কোন ফল হলো না, মজা দেখা তাদের এখনো শেষ হয় নি।

হঠাৎ রমাপতি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, কি ভেবেছো তোমরা? কি পেয়েছো তোমরা? শিবু, তোমরাও কি দাঁড়িয়ে তামাসা দেখবে এখনো। সব চুপ করে আছ, তোমাদের কোন ইজ্জত জ্ঞান নেই!

কাঁদে আটখানা সিংহের আস্ফালনে ভয়ের কোন কারণ নেই। জনতা তেমনি স্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল অদূরে। উদ্যুক্ত খামারের ওপর থেকে সমস্ত ছাড়া উধাও।

এতক্ষণে বেণী এগিয়ে এসে বললে, বড়বাবু, আমি এদের ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, গরীবদের কথা মনে রাখবেন—মাঠে জল পড়ে গেছে। আপনারা রাজা লোক, সামান্যর জন্যে আপনাদের কিছু যাবে আসবে না। গরীবগুলো বাঁচবে। সবাই রাজী হয়েছেন, কেবল আপনি হলেই—

রমাপতি সবার মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন, শিবশঙ্কর রাজচন্দ্র, ফকরুদ্দিন, অমূল্যরতন, বিধুভূষণ কারো মুখে কোন কথা নেই। তা হ'লে?

চোখ নামিয়ে খানিক থেমে রমাপতি মাধুরীকে বললেন, ওদের বলে দে আমি আমি সবাইকে বিনা পয়সায় দিয়ে দেব। ওদের যেমন খুশী ওরা চষে নিক।

জনতা জয়ধ্বনি করে উঠলো। জগবন্ধু মাধুরীকে উদ্দেশ ক'রে বললে, আপনি ওকে নিয়ে যান, রোদে কষ্ট হচ্ছে।

থাক! যথেষ্ট হয়েছে—জুতো মেরে গরু দান করতে হবে না! জগবন্ধুকে একরকম অগ্রাহ্য করে মাধুরী সামনে এগিয়ে গেল।

জনতা তখনো সোল্লাসে চীৎকার করছে। বেণী মণ্ডল এসে রমাপতির পায়ের ধুলো নিলে। রমাপতি এমন ভাবে তার দিকে চাইলেন যেন কোন কিছু তাঁর বোধগম্য হচ্ছে না। পাগল স্বপ্নের ঘোরে কি যেন কি বলে ফেললেন।

নাতনীর হাত ধরে আস্তে আস্তে রমাপতি সিংদরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। পিছনের জনতা হঠাৎ কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। বাধা অতিক্রান্ত জলোচ্ছ্বাস স্থির যেন।

অন্য দিনের চেয়ে সদর বৈঠকখানায় আজ হ্যারিকেন লণ্ঠনের আলোর জোরটা কম। আসল 'ডিট্‌জ' লণ্ঠন আর আসে না জার্মাণী থেকে, পুরোণ জিনিস জোড়া তালিতেও আর চলে না। দেশীর তো কথাই নেই! বাইরে জোনাকির আলো চের বেশী উজ্জ্বল।

তক্তপোষের এক ধারে তাকিয়া ঠেস দিয়ে মুদ্রিত নয়ন রমাপতি। সামনে কালীপ্রসাদ চুপ করে বসে। দরজার সামনে বেঞ্চিতে বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা করছে।

খানিক পরে চোখ চেয়ে রমাপতি বললেন, চুয়াল্লিশ ধারা ওরা অমান্য করবে?

কালীপ্রসাদ বললে, তাই তো শুনচি···বটতলার মাঠে সভা হ'বে, শোভাযাত্রা বেরুবে! কি হে বৈকুণ্ঠ, তাই নয়?

আজ্ঞে হাঁ, বেনী খুড়ো, অধর, পীতাম্বর আমাকে কাল বলে গেছে! ভয় দেখিয়েছে সভায় না গেলে এক-ঘরে করবেন।

সভা কিসের? রমাপতি প্রশ্ন করলেন।

জয় হ'য়েচেন তার জন্যে। কলকাতা থেকে বক্তৃতা দিতে লোক আসচেন শুনচি।

জয়! কিসের জয়? কার জয়? রমাপতি কালী-প্রসাদকে জিজ্ঞেস করলেন।

কালীপ্রসাদ ঠোঁটের আড়ালে হেসে তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে, ঐ যে আপনাকে সেদিন বাগে পেয়ে কি সব বলিয়ে নিয়েচে তাতেই মনে করছে—

জয়!

রমাপতি মৃদু-স্বরে যেন হুংকার দিলেন। হাঁ, বলেচি বিনা পয়সায় ওদের জমি চষতে দেব। পারে তো ওরা চষে নিক, ক্ষমতা থাকে কেড়ে নিক। বিনা পয়সায় জিনিষ যখন ওদের জয় কি! জয় হ'য়েচে?

কালীপ্রসাদ বললে, বটতলার মাঠ আমাদের সরকারী···ওখানে মিটিং আমরা কিছুতে ক'রতে দেব না। দরকার হলে বাধা দেবো।

রমাপতি হাসলেন, বাধা তোমাকে-আমাকে কষ্ট করে দিতে হবে না, থানা থেকেই দেবে। ১৪৪ ধারা জারি করে গেচে পুলিশ থেকে—বটতলার মাঠ, আগুনখাকির পোড়, এই থামার, কুল বাড়ি। এ আর উদয়পুরের জমিদার নয়।

কালীপ্রসাদ বললে, পুলিশ থেকে তেমন তো কোন উৎসাহ দেখা যাচ্চে না।

সময় হলেই দেখতে পাবে। এ্যাদ্দিন আমরা চাইনি, তাই···খুব ভুল করেচি···পুলিশ আনতে আর কতক্ষণ! রমাপতি বললেন। নিজের বাড়ির কেলেঙ্কারি আর থানা পুলিশ জানে কেন? কিন্তু আর নয়, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। জারির কাগজ দেখতে চাও।

না, তাই বলচি। বড্ড বাড়িয়ে তুলেচে সব... সেদিনের পর আরো যেন নাচন-কুঁদন আরম্ভ হ'য়েচে ঐ বৈকুণ্ঠর কাছে শুনুন না, সাপের পাঁচ পা তো তুচ্ছ।

মুখিয়ে বৈকুণ্ঠ বললে, আমাকে তো রাতদিন ছ'লো গালি-গালাজ ক'রছে—বৈমান, পা-চাটা, কত কি বলচে, কিনা আমি বাবুদের জমির ন্যায্য দাম নিতে চেইছি। আমিও আপনাকে বলে রাখলুম এর বিচার আপনারা না করেন, আর একজন করবেন। সে-বাপে জন্ম দেয়নি যে, দিনকে রাত বলবো। বাবুদের জমি নিজের বলে জোত করবো। চিনি তো ওদের সবাইকে কার কত মুরোদ। বেনী খুড়োও নাকায় আবার অর্জুনও নাকায়, পীতাম্বরও নাকায়। হাসি পায় সত্যি বলচি আপনাকে, পিপীলিকার পক্ষ গজিয়েছেন। বেলাবেলি যাবার বন্দোবস্ত করেছেন। ঠিক করেচো আপনি, পুলিশ নইলে টিট্ হবেন না। যা নয় তাই, নয়া-নয়া কথা কইলে অমনি হোল। দিন পুলিশ লাগিয়ে—শালারা পোঁদের আলায় হরি হরি করুক।

রমাপতি জিজ্ঞেস করলেন, কত জমি তোমার সঙ্গে ব্যবস্থা হয়েছে বৈকুণ্ঠ? সামলাতে পারবে তো।

সে-কেমনতা কি আছেন বাবু! সামান্য ক' বিঘে ছোটবাবু দিয়েছেন দয়া করে। আপনারা পায়ে রেখেছেন তাই। আমিও বলছি, নুন খেয়ে কখনো নেমকহারামী করবো না। বানের জলে এ গাঁয়ে ভেসে আসিনি...আপনাদের খেয়ে মানুষ।

রমাপতি বললেন, আর ক' বিঘে নিতে পার?

আজ্ঞে, বৈকুণ্ঠ বললে, একার পক্ষে আর সম্ভব হবে না। পঞ্চাশ বিঘে চাষ করি কায়ক্লেশে, নিজের দুশ বিঘে ঐ আপনাদের দয়ায় হয়েছেন—দু'জোড়া বলদে আর কত তুলবেন! তা'পর একা মনিষ্যি, ছেলেটা থেকে না—পারিও না।

রমাপতি বললেন, তোমার ছেলে ঐ দলে আছে নাকি?

বৈকুণ্ঠ জিভ কাটলে, ছি, ছি। খলে রক্ত ফেল তুমি না তা'লে। আপনাদের আশীর্বাদে সে একরকম ভালই আছেন, বাইরে বাইরে—গান-বাজনা, যাত্রা নিয়েই থাকে বাড়িতে আর থাকে কটা দিন!

রমাপতি বললেন, বেশ। তুমি তা হলে বলে বেড়াও যে বাবুদের সব জমি তোমার সঙ্গে বিলি-বন্দোবস্ত হয়েছে। তুমিই লোক লাগিয়ে এবারে চাষ-আবাদ করবে। আগে থেকে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক হয়েছে।

বৈকুণ্ঠ মাথা চুলকলে।

কালীপ্রসাদ বললে, সে ওরা বুঝবে—ঘোষেদের জমিজমার হিসেব এখন ওদের মুখে-মুখে, ফচ্‌কে ছোঁড়াটা পর্যন্ত জানে কোন মাঠে কত জমি—কোন বাড়ির কত? বৈকুণ্ঠর কথা ওরা বিশ্বাস করবে না।

রমাপতি চঠে উঠলেন, বিশ্বাস না করে বয়েই গেল। বলবি বাবুরা জমি এমনি দিয়েছে—যা পারবি, যেমন পারবি, যা খুশী চাষ করবি। ওদের দেখে ভয় নাকি!

কালীপ্রসাদ বললে, ভয় ওদের নয়, ভয় ঘর-সন্ধানী বিভীষণদের! শুনতে পাই শিববাবুই চলে পড়েছেন—অনেক টাকা আগাম নিয়েছেন বেণীর কাছ থেকে। কি হে বল না কত টাকা?

তা বিশ কুড়ি হবে বৈকুণ্ঠ বললে।

আর কে কে নিয়েছে! বল না? কালীপ্রসাদ বললে।

অত বাবু জানি না, ঐ ওরা সব বলছিল—বাবুদের বাড়ির সবাই নিয়েছেন শুনতে পাই। বাকি আছেন বড়বাবু কেবল.....তা ও তো উনি.....বৈকুণ্ঠের যেন হঠাৎ খেয়াল হয়, চুপ করে যায়।

উনি কি? চুপ করলি কেন, বল.....কি শুনেচিস বল? রমাপতি বললেন।

না তাই বলচি, ওরা বলছিল আপুনিও নেবেন কিনা! ওরা তো বলে ফাউ ওটোকা! বৈকুণ্ঠ ফোড়ন দেওয়ার মত বললে।

ফাউ! বড় বড় হ'য়েচে সব!

রমাপতি বললেন।

সেই তারে বলচি আমার কথা ওরা বিশ্বাস করবে না বাবু! কাল মিটিং, আরো কি সব বলবে, আমরা যারা আপনাদের শ্রীচরণে পড়ে রয়ে আছি তাদের দু'পায়ে থেৎলাবে এবার।

মগের মুল্লুক! মুখু দেখেচে কাঁধ দেখেনি বেটারা! দুটো লোক জড় করে ইতরামী করলেই হ'লো! এইবার বুঝবি ঠেলাটা, কোন বেটা রুখে করে!

রমাপতি গড়গড়ার নলটা হাতে তুলে নিলেন।

কালীপ্রসাদ ইঙ্গিত করলে। বৈকুণ্ঠ পা মুড়ে তক্তাপোষের ওপর ওঠে, গড়গড়ার মাথা থেকে কলকেটা তুলে নিলে।

রমাপতি বললেন, তুমি যেন, যাক। তুনীকে ডাক।

কালীপ্রসাদ বললে, ঐ দিক না। জাত যাবে মা··· নে, যা যা...ঐখানে সব আছে।

বৈকুণ্ঠ উঠে যেতে কালীপ্রসাদ বললে, ব্যাপার কিন্তু খুব সহজ মনে হয় না, কি বলেন কাকা?

রমাপতি উত্তর দিলেন না, চোখ বুজিয়ে রইলেন।

কালীপ্রসাদ শুনিয়ে-শুনিয়ে বললে, চাষাপাড়ার মেয়ে-

মধ্যে লেগেছে—বেণীর মেয়েটা শুনতে পাই দলের সর্দার! ডাক্তারের জন্যে ধন-মান সব গেল। রাত দুপুরে আবার কি সব হয় যেন ওঁদের।

রমাপতি বললেন, কালি! কি বলবো যা তা।

অনেক দিনের আক্রোশ পরচর্চায় মিটচ্ছে, কালী-প্রসাদ বললে, বলা বলির কিছু নেই সবাই জানে। চণ্ডী দেউলের রাখাল পাড়ুই ও মেয়েকে অনেকদিনই তুলে দিয়ে গেছে……তারপর থেকে আমাদের ডাক্তারের সঙ্গে যত যা কিছু বলুন না—এখন তো আরো সুবিধে উনি পাও আর ইনি পাওনী! দেখালে বটে একখানা। কাকে শাসন ক'রবেন, কার মুখে হাত চাপা দেবেন!

রমাপতি চুপ করে রইলেন। সত্যি কিছু বলবার নেই—এর চেয়ে আরো নোংরা কথা হয়তো ওঁকে শুনতে হবে। কুলনাশের সময় বুঝি এমনি মতিভ্রম হয় সারা বংশের। কোথায় সুবোধ আর কোথায় পাড়ার সামান্য একটা চাষী কন্যা! ছি, ছি!

কালীপ্রসাদ আরো রহস্যজনক সংবাদ সরবরাহের অভিপ্রায়ে উদ্যোগী হ'তে রমাপতি বাধা দিয়ে বললেন, থাক কালি, যথেষ্ট হ'য়েছে। আর দরকার নেই আমি সবাইকেই চিনি।

একটু যেন অপ্রস্তুত বোধ করে কালীপ্রসাদ স্বগত নিম্নাবাদে। কিন্তু মুহূর্তের জন্যে। নির্লজ্জের মত বললে, অমনি অধঃপতন হয়েছে আজকাল ডাক্তারের। ঘরে অমন সতীলক্ষ্মী থাকতে এমন মতিগতি হ'বে কেন। সেদিন রাতদুপুরে ওজদের ঐ ভিটেটার কাছে মেয়েটার আঁচল ধরে বাবুর কি আদিখ্যেতা! অমন দেবতুল্য চরিত্র না হলে জাতির সর্বনাশ করবে কি করে। আপনি আমি তাই পারি?

রমাপতি বিরক্তির সুরে বললেন, ওসব কথা এখন থাক কালি।

কালীপ্রসাদ মুখ নীচু করে বললে, না তাই বলচি। ওরাই আবার মুখ নাড়ে কিনা।

বৈকুণ্ঠ তামাক সেজে ঘরে ঢুকতে রমাপতি বললেন, তোমরা কেবল লক্ষ্য কর ওরা কি করছে। কাল দিনটা কেবল—

কাল কেন কাকা! কালীপ্রসাদ সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে।

হাঁ, কালই…কালই এর একটা বিহিত হবে। রমাপতি অনেকটা অন্যমনস্কের মত বললেন।

কালীপ্রসাদ পীড়াপীড়ি করলে না। বিস্ময়ান্তরের অভিপ্রায়ে বললে, ঐ দলের সব কটাই অমনি! পীতাম্বর যার উদ্ খেতে খুদ নেই, তার অবস্থাটা যদি চোখে দেখতেন। ঐ সন্ন্যাসী, চালচুলো যার নেই, সেও কি না লম্বা লম্বা কথা কয়। শুনতে পাওয়া যায় আবার ঐ পীতাম্বরের সঙ্গে বেণীর মেয়েটার এদিক-ওদিক আছে। সাধে আর রাখাল পড়ুই নেয় নি, ভেঙে দিয়েছে। আপনি দেখবেন, বেণী যেমন তাকে তুলতে হবে। মনে করেছে জল উঁচু চিরকাল থাকবে—তাটা পড়বে না কখনো!

রমাপতি গড়গড়ায় মৃদু মৃদু টান দিলেন। এসব কথায় তেমন উৎসাহ বোধ করছেন না। জল উঁচু হয়তো চিরকাল থাকবে না, কিন্তু তার জন্যে যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়েছে তার মালিন্য কোন কালেই ঘুচবে না—উদয়পুরের ঘোষেদের মান সম্ভ্রম চিরতরে ঘুচে যাবে!

মনে-মনে বিরূপ, কঠিন হয়ে উঠলেও কোথায় যেন একটা ভারি অবসাদ বোধ করেন রমাপতি, আর তেমন যেন জোর পান না। জীর্ণ বাসের অনেকখানিই জীর্ণ হয়ে গেছে—

রমাপতি বললেন, ঠিক আছে, কাল তুমি বরং একবার তোর থাকতে থানার দিকে যেও। আমার সব ঠিক করা আছে, কেবল সংবাদটা দেওয়া। পার তো আর ক'জন হাতের লোক দিয়ে আজ রাতেই বটতলার মাঠে একটা বেড়া দিয়ে দিও। বেড়া ভাঙলে ট্রেসপাস চার্জ-এ ফেলা যাবে।

কালীপ্রসাদ কি যেন বলতে গেল আমতা-আমতা করে, রমাপতি বাধা দিয়ে বললেন, যাক ঐতেই হবে—বেড়া-বেড় আর দিতে হবে না। পার তো কিছু খবর

ঐ সঙ্গে থানায় দিয়ে এসো···বৈকুণ্ঠকে শাসিয়েছে, তোমাকে কি সব বলেচে—

বৈকুণ্ঠ বললে, যাক গে বাবু···আমাকে যা বলেচে বলতে দেন না···কত বলবে! নালিশ ফরিদের দরকার নেই···বলতে দিন, আমার গায়ে ফোস্কা লাগচে না।

রমাপতি বললেন, ভয় হলো বুঝি? বুঝেচি।

বৈকুণ্ঠ প্রতিবাদ করে বললে, কখ্খনো নয়···ও শালাদের আমি ভয় করি না···ভয় নাকি ওদের? ···আসুক মুখের ওপর বলবো। হুঁ, ভয়। তোদের খাই না; পরি?

বেশ, তা হলে কাল যেও। তোমার কোন ভয় নেই। রমাপতি অভয় দিলেন।

কালীপ্রসাদ বললে, তা হলে তুমি আমায় ডেকে নিয়ো বৈকুণ্ঠ।

কালীপ্রসাদ বৈকুণ্ঠ নিঃশব্দে উঠে গেল। খানিকটা যেন অপ্রস্তুত বোধ করলে, আগামী কালের আশঙ্কা তাদের মুখে চোখে স্পষ্ট। কে জানে কি হবে রাত পোহালে কাল। এমন অবস্থা তাদের, এখন তারা না ঘাটের না ঘরের। সারা গ্রামে আজ তাদের মুখ রাখবার জায়গা নেই। যেন কত অপরাধ করেছে তারা। শিবশঙ্কর, সুকুমার, জীবনরতন, রাজীবলোচন যারা ওদের বিপক্ষে এত করলো, তারা কিন্তু আজ দিব্যি আছে। সব দোষ এখন বৈকুণ্ঠ, কালীপ্রসাদের। ওদের মত বুড়ো যদি চুপ করে থাকে তা হলে তাদের দুজনকেই এখন পায়ের তলায় থেৎলাবে। কার লাঠি এখন কার ঘাড়ে এসে পড়বে কে জানে। শালা নারাণ সেখটার জন্যে এমন কাণ্ড হলো। বৈমান কাঁহাকার। দুনিয়ায় কাউকে বিশ্বাস নেই—কেউ কারো নয়, কারো মুখের দিকে চাওয়া বেয়াদবী। মুখ সর্বস্ব সব।

দেখা যাবে কাল। কালীপ্রসাদ ক্রুর সর্পের মত ফোঁসল দেবে। শেষ চেষ্টা হিসেবে পরেশবাবুকে করে দেখবে।

বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে বৈকুণ্ঠকে কালীপ্রসাদ অনেক বোঝালে—শেষ-বেশ দার্শনিক তত্ত্ব আওড়ালে, জীবনটাই মিথ্যে, কার আর ক'দিন।—কে কার কে তোমার। অর্থাৎ আগাগোড়াই ফাঁকি—দাদাই বল, আর খুড়োই বল কেউ কিছু নয়। সঙ্গে কিছু জাতি নিন্দাও কালীপ্রসাদ করলে—রমাপতিকেও ছেড়ে কথা বল্‌লে না। সত্যি বলতে কালীপ্রসাদ কখনো ভয় পায় না—বাবা-খুড়োকে খাতির করে না। রমাপতির জন্যেই এত কাণ্ড। গণ্ডগোল করে মিটে যেত। উনিই যত নষ্টের গোড়া।

বৈকুণ্ঠ কোন সাড়া শব্দ করলে না। বাবুদের ব্যাপার সে কেমন করে বুঝবে।

উদয়পুরের সূর্য-উদয় সে দিন কিছু অস্বাভাবিক ছিল না। রোজকার মত বেণী মণ্ডলের বাড়ির পূবদিকে বাঁশ ঝাড়ের তলায় রক্তা-গোলক কিছুক্ষণের জন্যে স্থির হ'য়ে ধীরে ধীরে মাথার ওপর উঠে এল। আরও কিছুক্ষণ পরে বেণী মণ্ডলের খামারের উপর একে-একে দুয়ে-দুয়ে লোক জড় হতে লাগল। জগবন্ধু এল। ডাক্তারবাবু এলেন। তে-রঙা ঝাণ্ডা নিয়ে বেণীর মেয়ে সুবাসিনী সবার সামনে এসে দাঁড়াল। পীতাম্বর হাতে একটা লাল-ঝাণ্ডা নিয়ে সবার পিছনে দাঁড়িয়েছে।

জগবন্ধু স্লোগান দিলে, লাঙল যার জমি তার।—দুনিয়ার মজুর এক হও। দুনিয়ার কৃষক এক হও। ইন্‌কেলাপ জিন্দা-বাদ। বল উদয়পুরের কৃষক-কী জয়। লাল ঝাণ্ডা কি জয়।

মাঝখান থেকে একজন ক্ষীণকণ্ঠে বললে, বন্দে-মাতরম্। জয় হিন্দ!

কিন্তু জগবন্ধুর কণ্ঠস্বর কিছু ছাড়িয়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল—এন্‌কেলাপ জিন্দাবাদ। উদয়পুরের কৃষক-প্রজা কী জয়। জমার হার কমাতে হবে, নইলে জমি ছাড়তে হবে। জমীদারি প্রথার উচ্ছেদ চাই। জমির মালিক কারা? জলকাদা খাটে যারা! জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হোক। লাল ঝাণ্ডা কি জয়। দুনিয়ার কৃষক এক হও।

ডাক্তারবাবু পূর্ববর্তী হয়ে শোভা যাত্রা চালনা করতে

লাগলেন। স্মিতমুখে পিছু-পিছু সুবাসিনী পতাকা নিয়ে চলতে লাগল। বেণী মণ্ডল পাশে-পাশে চলল।

ঠিক সেই ভাবে শাসনহীন খামারের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে রমাপতি চেয়েছিলেন। খামারের এ কোণে বুড়ো তাল গাছটা তেমনি নিবাত, নিষ্কম্প হয়ে খাড়া আছে। উন্মুক্ত খামারে সকালের রোদের ছায়ার জাজিম পড়েছে যেন। খোঁটায় বাঁধা গরুগুলো ঘুলো শুকচে কেবল।

রমাপতি চমকে উঠলো।

একি, তুই? রমাপতি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন।

সত্যিই বুঝি নাতনীকে চিনতে পারছেন না তিনি। একি অপরূপ বেশ মাধুরীর! যেন কোন যুদ্ধ জয়ে চলেছে—গাছ-কোমর করে কাপড়টা দেহের সঙ্গে জড়ান, কপাল ভাসিয়ে চুল বাঁধা টান-টান করে। সারা মুখাবয়ব অদৃশ্য এক উত্তেজনায় ঘম্-ঘম্ করছে।

রমাপতি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, কি ব্যাপার? সকালে উঠেই কোমর বেঁধে ছুটে এসেচিস্, মারবি নাকি? একটা শাদা ঘোড়া আর একখানা তলোয়ার থাকলে একেবারে ঝাঁসি কি-রাণী! রাণী দুর্গাবতী।

মাধুরী পরিহাসে যোগ দিলে না। সোজা তক্তা পোষের ওপর উঠে বললে, ওরা নাকি আজ কি সব করবে বটতলার মাঠে?

রমাপতি গম্ভীর হ'য়ে বললেন, কি আবার করবে! করলেই অমনি হ'লো। মগের মুল্লুক পেয়েছে! কে তোকে বোল্লে?

মাধুরী বললে, সবাই বলচে, আমাদের ধানের গোলাও নাকি লুট-পাট করবে শুনচি।

আরো গম্ভীর হ'য়ে রমাপতি বললেন, করুক না দেখি। মুখের কথা অমনি, করলেই হলো।

মাধুরী বললে, যদি করে কি ব্যবস্থা করবে?

ব্যবস্থা! রমাপতি যেন খানিক চিন্তা করেন, বললেন, অত সোজা ভেবেচিস তুই? অত সাহস এখনো হয়নি—

ব্যাপারটা সোজা না ভাবলেও খুব একটা অসম্ভব কিছু মনে হয় না মাধুরীর। সেদিন দাদুকে নিয়ে কি কাণ্ডটা না ওরা করলে! ইচ্ছে করলে সব পারে ওরা। বিশেষ করে ওদের দলের ঐ লোকটি—কিছু একটা করবার জন্যে সদাসর্বদা মুখিয়েই আছে যেন। অথচ কি যে ওর স্বার্থ কে জানে—এ গাঁয়ে এক কাঠাও নিজস্ব জমি নেই ওর। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, লোক ক্ষেপাচ্ছে। একবার বাগে পায়, মাধুরী লোকটাকে দেখিয়ে দেবে মজা।

মাধুরী বললে, পুলিশে খবর দেওয়া উচিত, মারতে মারতে সব সোজা করে দিক। তুমি কিছু করবে না, কেবল—

দাদুর মুখের দিকে চেয়ে মাধুরী হঠাৎ থেমে গেল। কথাটা ঠিক ওভেবে সে বলেনি। মনেও করেনি। দাদুর ক্ষমতায় তার এখনো অটুট বিশ্বাসই আছে। বাগে পেলে হাতীকেও লোকে উপহাস করে। সংশোধন করে মাধুরী বললে, তোমার কাছে ওরা কতক্ষণ? ঐ লোকটাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দাও না দাদু।

রমাপতি বললেন, কাকে তাড়াতে বলচিস্? নিজের ঘরের কথা ভেবেচিস্।

ওঁদের আস্কারাতেই তো অমনি হয়েচে। আমাদেরই খাচ্ছে আবার আমাদের সর্বনাশ করচে। মাধুরী সায় দিলে।

ও ক'রবে না কেন! কে জানিস ও? কথাটা বলে ফেলেই সঙ্গে-সঙ্গে সামলে নিতে রমাপতি যেন বললেন, সুবোধের জন্যে মান-সম্ভ্রম সব গেল। অনেক আশা ছিল ছোকরার ওপর—

কে ও দাদু, সুবোধ কাকাদের ঘরে যে লোকটা আছে? গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খাচ্ছে। আবার সবার নাকি বন্ধু হয়েচেন।

কে? রমাপতিকে যেন বিশেষ চিন্তিত মনে হয়, হয়তো ওঁর অনুমান সম্পূর্ণই অমূলক! প্রমাণ কিছু নেই, মাত্র একদিন তিনি ছোকরাকে সামনাসামনি

শুধু মনে হয়েছে তারই কথা, অদৃষ্টের অদ্ভুত পরিহাসের মত...অতীতের কবর খুঁড়ে ভূত বেরিয়েছে। এক কন্যার জননী স্বামিহীনা গৌরমণিকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করবার চেষ্টা হরচন্দ্র বিশেষভাবে করেছিলেন আজ বুঝি তার বিচার হ'চ্ছে এতদিন পরে। শ্বশুরবাড়ি থেকে একদিন কাঁদতে-কাঁদতে নাকি নিঃস্ব-কন্যার হাত ধরে বেরিয়ে গিয়েছিলেন গৌরমণি—তাঁর পক্ষে এতবড় অংশে সেদিন কেউ বলবার ছিল না। তিনি মরে দাঁড়ালে এত বড় এজমালি বিষয়ের এক সপ্তমাংশ আর দু'টি অংশে সমান ভাবে ভাগ হ'য়ে যাবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত গৌরমণি ছাড়েননি, ভাইয়েদের আশ্রয়ে গিয়ে 'পলার ছটের' প্রার্থনা করেছিলেন। রমাপতি তখন ছোট, বড়দের কাছে যা শুনেছিলেন তাতে বুঝেছিলেন—গৌরমণি তেমন সুবিধার মেয়ে-মানুষ ছিলেন না, খেতে-পরতেও নাকি তাঁকে দেওয়া উচিত নয়। প্রার্থনায় গৌরমণি বলেছিলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর দেওর-ভাসুর তাঁর সঙ্গে বিশেষ দুর্ব্যবহার করেন, এমন কি তাঁর ধর্মকর্মের প্রতিবন্ধক হয়—১২৫০ সালে কার্তিক মাসে যখন তিনি গয়া-কাশী-বৃন্দাবন-পুরী যাবার জন্যে বিবাদী পক্ষদের বলেন তখন তাঁরা তাঁর মাসহারার টাকাটা পর্যন্ত বন্ধ করে দেন। তিনি নাচারের করে তীর্থ যাত্রা করেন এবং গয়াতে স্বামী শ্বশুরের পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করেন। এক-বৎসর পরে অবস্থা এমনি চরমে ওঠে যে, তাঁর ওপর নারায়ণ পর্যন্ত শুরু হয়। বাধ্য হ'য়ে তিনি পিত্রালয়ে আশ্রয় নেন...

গৌরমণির কোন পুত্র সন্তান ছিল না। কিন্তু তাঁর একমাত্র কন্যা হরিদাসীর কালক্রমে সন্তানাদি হ'য়েছিল। বিষয়ের উত্তরাধিকারী হবে রমাপতি সব খবরই রেখেছিলেন। বহুদিন পূর্বে রমাপতির পিতা বেণীমাধবের নিকট মাঝে-মাঝে দীনদর্শন একটি লোক আসা যাওয়া করতো—কয়েকদিন এই বৈঠক-খানায় শোয়া-বসা করে একদিন চলে যেত। বাপের কাছে রমাপতি লোকটির সঠিক পরিচয় পাননি, কিন্তু বয়সকালে জানতে পেরেছিলেন লোকটি কে, কেন আসা-যাওয়া করে—উদ্দেশ্যই বা কি! রমাপতি কর্তা হতেও কয়েকমাস লোকটি এসেছিল, কিন্তু তারপর আর আসেনি আজ লোকটির নাম মনে পড়ছে রমাপতির—সুদর্শন রায়। পরিচয়ও জেনেছিলেন, হরিদাসীর দৌহিত্র বংশধর। অনিয়মিতভাবে লোকটি আসতো থাকতো, কিন্তু আর কারো সঙ্গে বিশেষ আলাপ পরিচয় করতো না। যেন নিজের পাওনাটি আদায় হ'লে আর এক দণ্ডও এখানে সে থাকবে না। তার একটি পুত্র সন্তানের কথাও রমাপতি শুনেছিলেন। তারপর সুদর্শন রায় যখন বেশ কিছু-দিনের জন্যে আর উদয়পুরে দর্শন দেয়নি তখন রমাপতি ভেবেছিলেন—যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে, গৌরমণির তরফ থেকে আর কোন দাবীদার উদ্ভব হবে না। নাবালক বড় হতে-হতে তাঁর দিন শেষ হয়ে যাবে।

জগবন্ধু আর ভিক্ষাপাত্র হাতে উদয়পুরে আসেনি। আত্মীয়তার সূত্র ধরে উদয়পুরের ঘোষেদের সম্পত্তির দাবীদার হয়নি। হয়তো জানেই না সে তার উত্তরা-ধিকারের গোপন রহস্য!

কিন্তু ভয় পেয়েছেন রমাপতি! অনেকদিন পরে সুদর্শন রায় আবার অন্য মূর্তিতে উদয়পুরে দেখা দিয়েছে। চোরের মত হেয় হীন, অবজ্ঞাত হ'য়ে নয় বীরের মত মুখোমুখি সামনাসামনি বোঝাপড়া করতে চায়। আশ্চর্য পরিহাস অদৃষ্টের। কত ভাগ হয়ে গেছে পূর্বপুরুষের সম্পত্তির আরো কত ভাগ হবে কে জানে।

রমাপতি বললেন, কে আবার, লোকার কোথাকার শালাতে এসেছে! সাহস থাকলে সামনে আসতো—

হঠাৎ বাইরে একটা হৈ-হৈ, চীৎকার শোনা গেল দুচার বার বন্দুকের যেন আওয়াজ হলো। দক্ষিণ-বাতাসে আওয়াজ যেন খুব কাছে মনে হচ্ছে।

মাধুরী ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে দাদুর দিকে চেয়ে বললে, দাদু, গণ্ডগোল বোধ হয় আরম্ভ হয়ে গেছে।···মুসলমান পাড়ার ওদিক থেকে শব্দ আসছে।

রমাপতিও কান পাতলেন। সব বুঝলেন। কিন্তু বন্দুকের শব্দ কেন? পুলিশ কি গুলি চালাচ্ছে?

ব্যাপারটা নিজে থেকে দেখতে হয়। জনতা প্রতিরোধের ব্যবস্থা তিনি পূর্বাহ্নে করেছেন, কিন্তু হঠাৎ তা এমন উগ্র মূর্তি ধারণ করবে, তাঁর ধারণার অতীত। আবার যেন একবার বন্দুকের আওয়াজ হলো।

রমাপতি বললেন, তুই এখানে দাঁড়া, আমি একবার দেখে আসি—

মাধুরী বাধা দিলে, না তুমি যেতে পারবে না এসময়।

রমাপতি অদ্ভুত একরকম করে নাতনীর দিকে চাইলেন—তার মানে?

মাধুরীও লজ্জিত হলো। দাদুকে বাধা দেবার স্পর্ধা তার অমার্জনীয়। ছেলেমানুষ পেয়েছে রমাপতিকে, বাইরে গোলমাল বলে নাতনীর আঁচলে তিনি মুখ লুকিয়ে থাকবেন? ভীরু কাপুরুষ রমাপতি ঘোষ?

হৈ-হল্লাটা ক্রমেই বাড়তে লাগল। মনে হলো তরঙ্গ স্তব্ধের মত ক্রমেই যেন এগিয়ে আসছে। পূর্বাহ্নের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হয়েছে প্রতিরোধের।

রমাপতি আর দাঁড়ালেন না। তক্তাপোষ থেকে নেমে তীর বেগে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

মাধুরী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল হত বিস্ময়ে। হঠাৎ কি বলবে, কি করবে যেন সে ভেবেই পেল না। মনের যে জোর নিয়ে বাঘিনীর মত শত্রুর ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল তা যেন মুহূর্তে অন্তর্হিত হলো। অদ্ভুত এক ভয়ে সমস্ত মন আচ্ছন্ন হলো।

কে ঐ জগবন্ধু রায়, যার কথা বলতে-বলতে দাদু চুপ করে গেলেন? লোকটাকে কি করে জব্দ করা যায়? উচিত মত শিক্ষা দিয়ে গ্রাম থেকে দূর করে দেয়। অসহ্য লোকটার দাম্ভিকতা।

বাইরে আর কোন শব্দ হয় না। চরাচর আশ্চর্য স্তব্ধ, সব বিরোধ যেন মুহূর্তে মিটে গেছে, প্রগাঢ় শান্তিতে উদয়পুর ডুবে আছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে মাধুরী অট্টালিকার ওপর এসে দাঁড়াল। সামনে ঠাকুর দালানটা শূন্য খাঁ-খাঁ করছে। ভিতর বাড়ি থেকে কোন সাড়া-শব্দ আসছে না—যেন উদয়পুরের ঘোষেরা অনাগত শত্রুর ভয়ে দুর্গ ছেড়ে কোথায় সরে গেছে। আশ্চর্য, এদের কারো মনে এতটুকু যদি ভাবনা থাকে। যত দায় যেন মাধুরীদের।

সিং দরজার দিকে নজর পড়তে মাধুরী পাথরের মত অসাড় হ'য়ে গেল। সোজাসুজি দৃষ্টি পথে স্পষ্ট দেখতে পেল, তারা যেন নিঃশব্দে রমাপতির অচৈতন্য দেহটাকে বহন করে আনছে!

কি হলো দাদুর এরি মধ্যে? মাধুরী পড়ি-কি মরি করে ছুটে গেল এগিয়ে, দাদু! দাদু!

যারা এগিয়ে আনছিল তারা তেমনি নিঃশব্দে এগিয়ে আসতে লাগল সিং দরজার দিকে। এদের কাউকে মাধুরী চেনে না। হয়তো এরাই এ গ্রামে গোলমাল পাকিয়ে তুলেছে। এখন ভাল মানুষ সেজে বাবুকে মেরে ধরে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে! হাড় বজ্জাত সবাই।

মাধুরী এগিয়ে এসে বিহ্বল স্বরে জিজ্ঞেস করলে, কি হয়েছে দাদুর?

লোকগুলি চুপ করে রইল। মহা অপরাধীর মত তারা নির্বাক!

মাধুরী চীৎকার করে বললে, কি করেছো তোমরা দাদুর? কি হয়েছে!

রমাপতির দেহটা কাঁধে কাঁধে একেবারে শূন্যে তোলা। কাছে এসে মাধুরী দেখলে, নিমীলিত চক্ষু রমাপতির কোন সাড় নেই। ঘাড়টা বুঝি ভেঙেই গেছে।

চণ্ড কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, কি করেচো তোরা মধু? কে?

শবাধারবাহীর মত লোকগুলি এগিয়ে এল, সিং দরজার ভিতর দিয়ে রমাপতির বৈঠকখানার সামনে এসে দাঁড়ালো। কার কথা তারা বলবে?

মাধুরী বিহ্বল দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে দেখলে—এত ভিড় কখন হলো কে জানে। ঘোষবাড়ির আবাল বনিতারা এসে দাঁড়িয়েছে।

নিজেকে মাধুরী শক্ত করে নিলে। এ সময়ে হাত পা ছাড়িয়ে ফেললে ক্ষতি তারই হবে। দৃঢ় কণ্ঠে বললে, এইখানে রাখ।

ইতিমধ্যে কে যেন একটা মাদুর আর বালিশ যোগাড় করে এনে বৈঠকখানার সামনে বিছিয়ে দিয়েছিল। মাধুরী তার ওপর বসে পড়ে বললে, আমার কোলে শুইয়ে দাও।

রমাপতির হতচেতন দেহটা নামিয়ে দিয়ে লোকগুলি তেমনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। আশে-পাশে ভিড়ও তেমনি জমে রইল।

পাতুর মাথাটা কোলের ওপর টেনে নিয়ে মুহূর্তের জন্যে বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ে কি যেন পরীক্ষা করে নিলে মাধুরী। তারপর আহত ব্যাঘ্রীর মত চীৎকার উঠলো, সামনে থেকে সরে যাও সব—মজা দেখতে এসেচো!

ভিড় সরলো না। এত বড় মানুষটার এমনি অবস্থায় তারা নিশ্চিন্ত হয়ে মুখ বুজে যে যার ঘরে সরে যায় কি করে, মাধুরীর কথা তারা শুনবে কেন? যে-সে লোক নাকি রমাপতি ঘোষ উদয়পুরের! মজা তারা দেখতে আসে নি, বিরাট মহীরুহ পতনের শব্দ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ছুটে এসেছে। উদয়পুরের আভিজাত্যের শেষ নিদর্শনটুকু আজ শেষ হলো।

মাধুরী তেমনি বিরক্ত হয়ে বললে, হাঁ করে কি দেখচো সব! যাও ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো!

[আগামীবারে সমাপ্য]

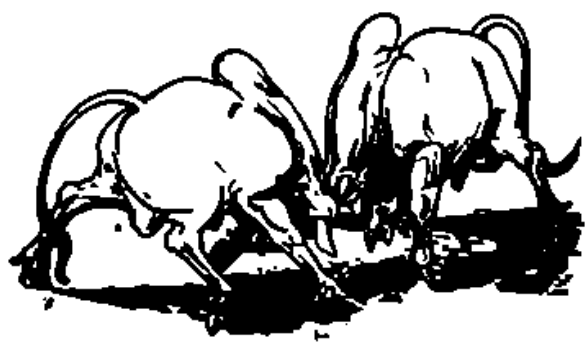

সমাজ ও জাতীয়জীবন

[র. কু. সে.]

বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে এসে আজ আমরা মনের দিক থেকে একেবারেই দেউলিয়া হ'য়ে প'ড়েছি। হৃদয়ের যে স্বাভাবিক বৃত্তিতে একদিন আত্মীয়তার পাহাড় গ'ড়ে উঠেছিল প্রতিবেশী আর প্রতিবেশের মধ্যে, অলক্ষ্যেই সে পাহাড় কবে ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেল। আমার উত্তুঙ্গ শিখর থেকে ধ্বা'সে প'ড়লো মানুষের জীবন। একথা উপনিষদের ঋষি উচ্চারণ ক'রেছিলেন : আত্মানং বিদ্ধি, অর্থাৎ—'আত্মাকে জানো।' গীতার 'সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ', অর্থাৎ 'সর্ববিধ যোগের মধ্যে সমদর্শিতা. সমতাই যোগ. সমতাই আত্মজয়'কে নতুন ক'রে আবার উদ্‌গীত হ'তে শোনা গেল বুদ্ধদেবের কণ্ঠে : 'আত্মদীপো ভব', অর্থাৎ—'আত্মদীপ হও, আপন আলোকে আপন পথ দেখে চলো।' সেই আত্মদর্শনের মধ্যে রয়েছে সমাজদর্শনের রূপ : 'know thyself, know thy neighbour.'—এই যে নিজেকে দেখে প্রতিবেশীকে দর্শন, নিজের মধ্যে প্রতিবেশের সম্মোহন, তাকেই ভবিষ্যৎকালে সাম্যবাদ আখ্যা দিয়ে মানুষ একদিন চেয়েছে প্রচলিত সমাজের নবতম সংস্কার।

আসলে সমতা জ্ঞান থেকেই সাম্যবাদের সৃষ্টি। সেই সাম্যবাদ অর্থে 'সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ' আজ সমষ্টিগত মানব-জীবনে দুর্যোগ হ'য়ে দেখা দিয়েছে। তার প্রধান মূলে দাঁড়িয়ে আছে সাম্রাজ্যবাদী মনোবৃত্তির প্রভাব। সাম্রাজ্যবাদের নীতি হচ্ছে,—'Divide and Rule', অর্থাৎ—'ভাগ করো এবং সেই ভাগের উপরে ভোগ্য-বস্তুকে শোষণের দ্বারা আত্মশাসনে রাখো।' সাম্রাজ্য-বাদের এই অদ্ভুত লক্ষণ স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো—প্যালেষ্টাইনে, ইন্দোনেশিয়ায়, ইন্দোচীনে, ব্রহ্মে; অর্থাৎ—যখন যে ভূমিখণ্ডকেই স্পর্শ ক'রেছে সে, সেইখানেই বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হ'য়ে সেই 'Divide and Rule'কেই সদম্ভে রোলারের মতো চালিয়েছে। মানুষকে ভাগ ক'রে দিয়েছে সে মানুষের গোষ্ঠী থেকে। গোষ্ঠী অর্থে সঙ্ঘ, সঙ্ঘ অর্থে শক্তি, সেই শক্তিকে বড় ভয় সাম্রাজ্যবাদের। সেই শক্তি একদিন আত্মশক্তি হ'য়ে অসুর দলনে লাগিয়ে পড়া এমন অসম্ভব কিছু নয়। সাম্রাজ্যবাদকে বাঁচতে হ'লে এই শক্তির অপসারণ দরকার সর্বাগ্রে এবং সেই অপসারণ কার্যে নামলো সে একদিন বেয়নেট হাতে বাগিয়ে—আন-বিক শক্তি যার অত্যাধুনিক উপজীব্য। নিজের জীবিকা সংস্থানের জন্য সাম্রাজ্যবাদকে বেয়নেট থেকে আবিষ্কার ক'রতে হ'লো এ্যাটম বম্‌কে। নইলে তার 'Divide and Rule' বানচাল হ'য়ে যায়. নইলে অস্ত্রোবস্ত্রে তার নিজের ঘরে টান পড়ে। এই যে আত্মস্বার্থসর্বস্বতার খাতিরে গোষ্ঠিধর্মী মননপ্রধান বিশ্বকে অনাধুনিকভাবে ছাঁটাই ও নিষ্পেষণ ক'রে রাখা, এ ইতিহাস নতুন নয়. এ ইতিহাস দু'শো বছরেরও অতীতের ইতিহাস।

কিন্তু এ যদি শুধু ইতিহাসের প্রতিশ্রুতিকর গল্প হ'তো, তবে আজ হয়তো মানুষের জীবনে কোনো সমস্যার প্রশ্নই উঠতো না। কিন্তু দেখা গেল সাম্রাজ্যবাদ শুধু আত্মস্বার্থসর্বস্বতার খাতিরেই পৃথিবীর বিরাটতম গোলার্ধে নিজেকে টিকিয়ে রাখবার চেষ্টা করে নি, সেই টিকে থাকবার আবরণে সে বিষাক্ত ক'রে তুলেছে মানুষের মনকে। সেই মনের পরিচয় আজ উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছে সারা বিশ্বের সমাজ-ব্যবস্থায়। সেই বিশ্বের পরমাণু-বিন্দুতে ব'সে আপনার মধ্যে আপনি পাক খেয়ে মরছি আমরা—বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নসূর্যতাপিত মানুষেরা।

ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যে একদিন যে মননশক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল, সেই মননশক্তি সাম্রাজ্যবাদী নীতির

সংস্পর্শে এসে অসহিষ্ণু আর শ্রীকাতর হ'য়ে উঠলো। একদিন ভারতভূমি থেকে ইংরেজশক্তি নিশ্চিহ্ন হ'লো বটে, কিন্তু সমাজের কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ একেবারে মরলো না। দেশের এক শ্রেণীর উঁচু স্তরের মানুষ ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ সম্রাট হ'য়ে শোষণ-রজ্জুকে আঁকড়ে রইলেন। ইংরেজ চ'লে গিয়েও তাই দেশের মন ফিরলো না। কিন্তু সে মন রিক্ত, বিপর্যস্ত, হতমান। অর্থাৎ—সে মন আজ একেবারে দেউলিয়া হ'য়ে গেছে। ভারতের যে ঔপনিষদিক বাণীকে নতুন ক'রে আবার আমরা ফিরে পেলাম রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলী'তে, 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো'র মধ্যে যে মননসাধন মানবীর অস্তিত্বে নতুন ক'রে আবার আমরা নিমজ্জিত হ'য়ে যাবার অবকাশ পেলাম, সে অবকাশ কিন্তু একটা নীতিগত অবকাশ (Ethical chance) মাত্র, আসলে তা বাস্তবন্দী জীবনে বড় বেশী সাড়া জাগলো না। এর মূলে র'য়েছে বিবর্তনচক্রে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের উপর সেই সাম্রাজ্যবাদের শাকুনিক ক্রিয়া। 'সভ্যতার সঙ্কটে' রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে তাই দুঃখের সঙ্গে একদিন উচ্চারিত হ'তে শুনলাম: '...ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ ক'রে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ ক'রে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে?'

সেদিন যেটা নিতান্তই একটা আনুমানিক ভাষণমাত্র ছিল, পরবর্তীকালে হাড়ে হাড়ে তার প্রতিফলন ঘটলো ইংরেজ-বিবর্জিত এই দেশে। সেই লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনায় আজ কীটের মতো আত্মদংশনে আমরা মেতে উঠেছি। একদিন বুদ্ধদেব ব'লেছিলেন: 'আত্মদীপো ভবঃ', অর্থাৎ—'আত্মদীপ হও, আপন আলোকে আপন পথ চিনে চলো।' সে বাণী আজ কদর্থে ব্যবহার ক'রে নিয়ে ব্যবহারিক জীবনে আমরা কীট হ'য়ে নিজের হলে নিজে বিদ্ধ হচ্ছি। দেউলিয়ার চরম অবস্থা ভিন্ন একে আর কী বলা চলে?

আসলে দেশগত প্রাণশীলতার জন্মগত কৃষ্টির ভিত্তিতে হৃদয়ের সহজ সম্পদকে হারানোই তো হ'লো দেউলিয়া অবস্থা। দু'শো বছরের কৃত্রিম নীতির চাপে প'ড়ে জাতিগত সহজ প্রাণশীলতাকে হারিয়েই আজ আমরা দেউলিয়ার এই চরম অবস্থায় এসে পৌঁছেছি। অবিশ্বাসের কৃষ্ণ মেঘে সারা মন আমাদের আচ্ছন্ন, মমত্ববোধের পরিবর্তে জিঘাংসাবৃত্তি এসে আশ্রয় নিয়েছে সমাজজীবনে, চতুর্দিকে ভেজালের স্রোত, adulteration-এর চমৎকারিত্ব চারদিকে, জীবন থেকে তা ছিটকে প'ড়েছে গিয়ে জীবন-সৃষ্টির উপাদানে; ঘুষ আর তেলে ভেজাল এখানে নিতান্তই একটা সাধারণ কথা। মনে এসে ভেজাল বাসা বেঁধেছে ব'লেই খাদ্যবস্তুতে গিয়ে ঢুকেছে সেই ভেজাল; অর্থাৎ—নিজের সৃষ্টির মধ্যে নিজেই পাক খাচ্ছি আমরা উর্ণনাভের মতো। অন্যকে মেরে নিজে মরছি। নিজেকে দিয়ে যে অপরকে বিচার করা, অন্যের মধ্যে যে নিজের প্রতিমূর্তিকে দর্শন করা—এ বোধ বিবর্জিত হ'য়ে আজ আমরা মুখল নিয়েছি হাতে। মানুষ কেবল তার আদিম বৃত্তিতেই শুধু সচেতন—একথা যদি স্বীকার ক'রে নিতে হয়, তবে বলতে হয়—সভ্যতা নিতান্তই একটা ফাঁকা কথা মাত্র। আদর্শের কথা তবে মিথ্যা, নীতির কথা তবে নিতান্তই একটা প্রলাপোক্তি ভিন্ন কিছু নয়। কিন্তু সত্যিই কি তাই? তা হ'লে সম্ভবতঃ মানুষ তার আচারে-বিহারে, পরিচ্ছদে-পরিধানে আজ এত চমৎকারিত্বের পথে এসে দাঁড়াতে পারতো না। কিন্তু দেখা গেল পরিচ্ছদের চমৎকারিত্বের সঙ্গে হৃদয়ের চমৎকারিত্বের বিন্দুমাত্র মিল নেই। এই গরমিল থেকেই আজ আমরা মানসিক দুর্দশার চরম অবস্থায় এসে পৌঁছেছি।

আসলে আমাদের জীবনকে অক্টোপাশের মতো বেঁধে রেখেছে নানা জাতের পাপ। দুর্যোধনকে উপলক্ষ্য ক'রে গান্ধারীর প্রতি একদা ধৃতরাষ্ট্র ব'লেছিলেন: 'পাপের দুয়ারে যখন পাপ এসে সহায় মাগছে, তখন ধর্মের সঙ্গে সন্ধি করা মিথ্যে।' সেই পাপ কুরুক্ষেত্র থেকে এসে প্রবেশ ক'রেছে বিংশ শতাব্দীর এই মধ্যাহ্ন

ক্ষেত্রে। উদ্বাস্তু ক্ষেত্রে তাই দেখতে পাই ভলান্টিয়ারের পাপাচরণ। যখন যৌন প্রবৃত্তির তাড়নায় একদল মানুষ ঘুরছে সাধুর ছদ্মবেশে নারীর পিছনে, তখন স্বতন্ত্র দল ছুটছে কারুর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বড় রকমের কিছু ডাকাতির ফিকিরে। আমরা আজ যৌন মক্ষিকা সেজে নারীকে পথ ক'রে দিচ্ছি পতিতালয়ে, ডাকাত সেজে সমাজ-জীবনকে ঠেলে দিচ্ছি মৃত্যুর মুখে, ঘাতক হ'য়ে দেশের মাটিকে রাঙিয়ে তুলছি দেশের মানুষেরই বুকের রক্তে। উপরে আমাদের সাধুত্বের ছদ্মবেশ। এইভাবে দেখতে পাওয়া যাবে—দুর্নীতির একটা সরল রেখা চ'লে গেছে ছোট মুদীর তুলাদণ্ড থেকে শিক্ষিত সাধারণের মধ্য দিয়ে পাইকেরী বড় ব্যবসায়ীর বৃহত্তর কারেন্সি পর্যন্ত।

সর্বত্রই নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবার সুযোগে অপরকে সংহার করা। আসলে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা বা Individualism থেকেই এসেছে বিশ্বকে ছোট করে দেখা, পারিপার্শ্বিককে উপেক্ষা করা। Individualism-এর উৎকর্ষে 'Collectivism'কে পুরোপুরি অস্বীকার করাই হ'লো। কিন্তু প্রকৃত সাম্যবাদ এই Collectivism-এর উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সেখানে প্রতিটি ব্যক্তির ভাগ্য জড়িয়ে র'য়েছে প্রতিটি ব্যক্তির সঙ্গে। সেখানে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ঘেরাটোপে সমষ্টিগত সমাজজীবন শ্বাসরুদ্ধ নয়। প্রত্যেকেই যদি আমরা প্রত্যেকের সঙ্গে সুখে-দুঃখে সমান অংশী হ'তে পারি, 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' জ্ঞানে প্রত্যেকেই যদি নিজের মধ্যে সকলের সন্নিবেশন ঘটাতে পারি, তবে সেখানে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বীজাণুতে প্রতি-বেশকে বিকৃত করবার প্রশ্ন আদৌ আসে না। সেখানে ভাবে ভাষায়, আচারে নিষ্ঠায় সবাই আমরা একাত্ম এবং একদেহ। মানুষকে 'আত্মদীপ' হবার মূলে র'য়েছে এই কথা। Know thyself, know thy neighbour' একথার অর্থ হ'চ্ছে নিজেকে দিয়ে গোটা সমাজের স্বীকৃতি। এখানে ভেজালের সৃষ্টি ক'রবে কার বিরুদ্ধে কে, কে কাকে নামাবে নিচে, কে কার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সর্বনাশ ঘটাবে? তবে যে তাকেই সেই ভেজালের জালে জড়িয়ে প'ড়তে হবে, নামতে হবে নিচে থেকে নিচে, সর্বনাশ আসবে নিজেরই জীবনে। এই বোধশক্তি নেই ব'লেই না বাঁচতে পারছি আমরা ব্যক্তিগতভাবে, না বাঁচাতে পারছি আমাদের সমাজকে। দু'শো বছরের সাম্রাজ্যবাদী আলোকে এতই আমাদের চোখ ধেঁধে গেছে যে, সেই ধাঁধা কখন অলক্ষ্যে সারা দেশের মনকে পরিণত ক'রেছে কাদুরে। কাদুর যেমন অন্তঃসারশূন্য, শুধু কতকগুলো বায়ুময় গ্যাসের সমষ্টি, কৃষ্টিবিভ্রান্ত ও সহজতাবিবর্জিত আমাদের আজকের এই শতাব্দী-মনও তেমনি অন্তঃসারশূন্য হ'য়ে প'ড়েছে। অবস্থাটা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে 'ন যযৌ, ন তস্থৌ' গোছের। ত্রিশঙ্কুর মতো দুলছি আমরা বায়বীয় শূন্যে; অথচ অলক্ষ্যে কখন রচনা হ'য়ে গেল আমাদের সমষ্টিগত সমাজ-জীবনের ফাঁসির দড়ি। পাপে পাপে অপরাধের পাহাড় গ'ড়ে উঠে সেই পাহাড় ধ্বসে প'ড়ছে ভূমিগর্ভে।

অথচ দেখতে পাচ্ছি—পৃথিবী দ্রুতপদে এগিয়ে যাচ্ছে অগ্রগতির পথে। তা কি শুধু একটা অসত্যের আশ্রয়েই? খুব সম্ভব নয়। নিত্য নূতন ক'রে জাতি গ'ড়ে উঠছে সাম্য, মৈত্রী আর স্বাধীনতার উজ্জ্বল আলোয়। সে সাম্য জাতির সমষ্টিগত জীবন-স্বার্থের উপর ভিত্তিশীল। সে মৈত্রী একজনকে দিয়ে আর একজনকে স্বীকার ক'রে নেবার উপর প্রতিষ্ঠিত, সে স্বাধীনতা ঐ সাম্য আর মৈত্রীর আশ্রয়ে জ্ঞানালোকে উজ্জ্বল। সেই জ্ঞানলাভ আমাদের জীবনে কবে ঘটবে? কবে আমরা তেমন ক'রে মুক্ত কণ্ঠে ব'লতে পারবো: 'আমি সংবেদনশীল হবো, আমি সুন্দর হবো, সবার ভালো দিয়ে আমি আমার নিজের ভালো করবো, আমি সকলের হ'য়ে মনুষ্যত্বকে শোধন ক'রবো, শোভন ক'রবো।'—এই অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে যতদিন না আমরা আমাদের ব্যবহারিক জীবনে তার পূর্ণ রূপকে জাগ্রত ক'রে তুলতে পারছি, ততদিন মানুষ হিসেবে, সামাজিক জীব হিসেবে আমাদের পক্ষে সভ্যতার বড়াই করা নিতান্তই বিকৃত-মস্তিষ্কের পরিচায়ক মাত্র।

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য

ভূমি সংস্কারে অগ্রগতি

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বত্ববান্ জোত কৃষকদের সৃষ্টি করে কৃষিকে বেসরকারী মহলের উপর ছেড়ে দেওয়াই ভারতের ভূমি সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরু। উদ্দেশ্য মহৎ এবং সুবিবেচনা প্রসূত সন্দেহ নেই কিন্তু যে গতিতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে ভারত এগিয়ে চলেছে তাতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করা চলে না। একমাত্র জমিদারী ব্যবস্থার বিলোপ করতেই বহুদিন কেটে গিয়েছে। ত্রিবাঙ্কুর কোচিন ও মহীশূরে এখনও মধ্যস্বত্ব বিদ্যমান আছে। কোন কোন রাজ্যে বিশেষ করে বিহার, উড়িষ্যা এবং আসামে জমিদারী প্রথার বিলোপ হয়েছে মাত্র আংশিক। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি খুব সাহসিকতার সঙ্গে জমিদারী প্রথার বিলোপ করেছেন। উড়িষ্যা প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য মাথাপিছু জমির পরিমাণ নির্ধারণ করবার পূর্বে প্রবাসী জমিদারদের সম্পর্কে কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন। উৎপন্ন শস্যের মাত্র ১/৩ অংশ নির্ধারিত হয়েছে বর্গাদার জমিদারের জন্য। তবে তাঁরা যদি নিজেরা চাষ আবাদের ব্যবস্থা করেন তাহলে মাথাপিছু আর্দ্র হলে ৭ একর এবং শুষ্ক হলে ১৪ একর জমির মালিকত্ব পাবেন।

জমির উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্বত্ববান্ জোত-কৃষক শ্রেণীর সৃষ্টি দ্বারা সমাজে স্থায় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা অবশ্যই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সমাজের এক শ্রেণীর উপকার করতে গিয়ে অপর কোন শ্রেণী যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। মধ্যস্বত্বভোগীদের মধ্যে উদার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন ব্যক্তি অনেক আছেন। এদের কাছ থেকে সমাজের পাবার কিছু নেই একথা মনে করা উচিত নয়। এদের নৈতিক কাঠামো যাতে ভেঙ্গে না পড়ে তা দেখার প্রয়োজনীয়তা আছে।

ভূমি সংস্কার সম্পর্কে আমাদের সমাজের লক্ষ্য আজ সুনির্দিষ্ট। সেই লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্য সংস্কার ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করবার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সমবায় আন্দোলনে সরকারী নিয়ন্ত্রণ

প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ এদেশে সমবায় আন্দোলন চলে আসছে কিন্তু দুঃখের বিষয় এতদিনেও এই আন্দোলন এদেশে ব্যাপকতা লাভ করে নি। এই আন্দোলনকে জনপ্রিয় ও সুদূর প্রসারী করবার জন্য সরকার কিছুদিন পূর্বে ষ্টেট ব্যাঙ্ক গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পল্লী অঞ্চলে সমবায় আন্দোলন প্রসারের জন্য ভারত সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের এক সংশোধন করেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আপাততঃ ১০ কোটি ও ১ কোটি টাকা নিয়ে যথাক্রমে রাষ্ট্রীয় কৃষি ঋণ (দীর্ঘ মেয়াদী) তহবিল ও রাষ্ট্রীয় কৃষি ঋণ (স্থিতিকারক) তহবিল নামে দুটি তহবিল খুলবেন। প্রথমটি থেকে রাজ্য সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, ভূমি বন্ধক ও প্রাথমিক সমিতিগুলির শেয়ার কিনবার জন্য ও তাদের সভ্যদের কৃষির জন্য দীর্ঘকালীন ঋণ দেবার জন্য ঋণ মঞ্জুর করা হবে। এবং অভাবিত কোন আকস্মিক কারণে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির স্বল্পকালীন ঋণ আদায় বিলম্বিত হলে ঐ ঋণগুলিকে মাঝারি দীর্ঘ ঋণে রূপান্তরিত করবার জন্য অপর তহবিলটি থেকে ঐ ব্যাঙ্কগুলিকে অর্থ সাহায্য করা হবে।

ষ্টেট ব্যাঙ্ক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্য প্রণালী সম্পর্কে

পরিষ্কার করে জানা না গেলেও, এটুকু জানা গিয়েছে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দীর্ঘ ও মাঝিদীর্ঘ ঋণের ব্যবস্থা করবে এবং ষ্টেট ব্যাঙ্ক সমবায় এবং মার্কেটিং সমিতিগুলিকে স্বল্পকালীন ঋণের যোগান দেবে। ষ্টেট ব্যাঙ্কের অপর একটি উদ্দেশ্য হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে সঞ্চয় ও ব্যাঙ্কিং প্রবৃত্তি গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

এই সব ব্যবস্থাকে সমবায় আন্দোলনে সরকারী অংশ গ্রহণের সূত্রপাত বলে মনে করা যেতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সংশোধনী আইন ষ্টেট ব্যাঙ্কের মত গোরওয়ালা কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী করা হয়েছে। এই আইন বিধিবদ্ধ হবার প্রাক্কালে নয়াদিল্লীতে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের এক অধিবেশনে একে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করা হয়েছে। তাদের মতে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়ে তুলতে ও তাদের উন্নয়ন করতে হলে সরকারী অংশ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে কেবলমাত্র পল্লীঅঞ্চল থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না।

পূর্বেই বলা হয়েছে, আমাদের দেশে প্রকৃত সমবায় আন্দোলন এখনও গড়ে ওঠে নি। তার কারণ হিসাবে গোরওয়ালা কমিটি বলেছেন যে পল্লী অঞ্চলের যে সকল মহাজনদের কবল থেকে সমবায় সমিতিগুলি গরীব চাষীদের মুক্তি দেবে বলে মনে করা গিয়েছিল তাঁরাই দেখা গেল অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা করছেন। এখন আমাদের সমবায় আন্দোলনকে আমূল পুনর্গঠন করে উপযুক্ত লোকের হাতে তার পরিচালনা ব্যবস্থা দিতে হবে। তা না হলে কেবলমাত্র সরকারী অংশ গ্রহণ দেশের নৈতিক শক্তি জাগিয়ে তুলতে পারবে না। সমবায় ব্যবস্থা উপযুক্ত পরিচালকের দায়িত্বে না থাকলে কোটি কোটি টাকা ঢাললে তা অপচয়েরই সামিল হবে।

বর্তমানে পল্লী অঞ্চলে ঋণের প্রয়োজনীয়তা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমির মধ্যস্বত্ব বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে কৃষকদের অর্থের প্রয়োজনীয়তা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এত অর্থের যোগান কেবলমাত্র সরকারই দিতে সক্ষম এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়েই তা পৌঁছোবে কৃষকদের হাতে। এই অর্থ যাতে ইপ্সিত উদ্দেশ্যে ব্যয় হয় তার জন্যে সরকারী তদারকের প্রয়োজন আছে।

ভারতীয় সাইকেল শিল্প—

পরিবহণ ব্যবস্থা ভারতে একটি মস্তবড় সমস্যা। বহুদিন পূর্ব থেকেই সাইকেল স্থানীয় পরিবহণে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে এসেছে। গ্রামে কিংবা সহরে সহজে যাতায়াতের পক্ষে সাইকেল একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ভারতবর্ষ সাইকেলের একটি বড় বাজার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বিদেশ থেকে আমদানীকৃত সাইকেল দিয়ে দেশের চাহিদা মেটানো হোত। স্বাধীনতা অর্জন করবার পর জাতীয় সরকার শিল্পোন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং সাইকেল শিল্পও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সাইকেল শিল্পকে সংরক্ষণ দিয়ে সরকার এই শিল্পের গুরুত্ব দেন। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাতেও সাইকেল শিল্পকে শিল্পোন্নয়নে প্রাথমিকত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই শিল্পের উন্নয়নের জন্য সরকার বেসরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে আগত পরিকল্পনা অনুমোদন করার এক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তদনুযায়ী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৩টি পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটি বছরে ১ লক্ষ সাইকেল উৎপাদনে সক্ষম হবে। প্রতিষ্ঠান তিনটির নাম আটলাস সাইকেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ লিমিটেড্, সেনেপত, হিন্দ সাইকেল লিমিটেড্, টি, আই, সাইকেলস্ ও সেন র‍্যালে ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ লিমিটেড। এর মধ্যে আটলাস ও সেনেপত পুরোপুরি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। অপর প্রতিষ্ঠান দুটির বৈদেশিক অংশীদার আছে।

ভারতীয় সাইকেল শিল্পের অনেক সমস্যা আছে। সাইকেলের এমন অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে যা এদেশে তৈরী হয় না কিংবা তৈরী হলেও বিদেশজাত দ্রব্যের মত ভাল হয় না। এগুলি বিদেশ থেকে চড়া দামে

আমদানী করতে হয়। অন্যান্য শিল্পের মত সাইকেল শিল্পেরও মার্কেটিং একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভারতীয় সাইকেলের মার্কেটিং এ ত্রুটি সমস্যা আছে। সাইকেল শিল্পে সংরক্ষণ থাকলেও বিদেশ থেকে সাইকেলের আমদানী বন্ধ হয় নি। এর উপর জনসাধারণের বিদেশী দ্রব্যের রুচির পরিবর্তন খুব বেশী হয়নি। দেশী সাইকেলের গঠন ও 'ফিনিশ' বিদেশী দ্রব্যের মত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও দেশী দ্রব্য তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি। তারপর আছে দামের তারতম্য। একমাত্র সংরক্ষণের সাহায্যে সকল সমস্যার সমাধান হয় না। বিদেশ থেকে চড়া দামে আমদানীকৃত অল-প্রত্যঙ্গ দিয়ে গড়া সাইকেলের দাম বিদেশের বহুদিনের অভিজ্ঞ বৃহদায়তন শিল্পজাত দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে না। তাহলেও ভারতীয় সাইকেলের দাম তুলনায় খুব বেশী নয়।

আমাদের সাইকেলের উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করবার প্রয়োজনীয়তা সকলেই স্বীকার করবেন।

ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথা ও সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট—

বহু বিতর্কিত কোম্পানী আইন সংশোধনী বিল সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট কিছুদিন পূর্বে লোক-সভায় উপস্থিত করা হয়েছিল। কমিটি যথাসম্ভব এই বিলকে আইনে পরিণত করবার জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন। জুলাই মাসে লোকসভার পরবর্তী অধিবেশনে বিষয়টি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে বলে আশা করা যায়।

শেয়ারবাজার, মূলধন নিয়ন্ত্রণ, বীমা, ব্যাঙ্কিং প্রভৃতির কার্যবিধি তদারক করবার জন্য কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একটি বিশেষ দপ্তর খোলার প্রস্তাব করেছেন। ম্যানেজিং এজেন্সী সম্পর্কে কমিটি বিলের ধারাগুলির বহুল সংশোধন করেছেন। যৌথ-কোম্পানী-গুলিকে তপশীলভুক্ত ও তপশীল বহির্ভূত এই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। চলতি ম্যানেজিং এজেন্সীগুলির কার্যকাল সম্পর্কে কমিটি প্রস্তাব করেছেন যে তা যদি পূর্বেই শেষ না হয়ে যায় তবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞপ্তির এক নির্দিষ্ট তারিখ থেকে তিন বছর পরে নতুবা ১৯৬০ সালের ১৪ই আগষ্ট শেষ হবে। ঐ নির্দিষ্ট তারিখের পর কোন কোম্পানী পূর্বতন কিংবা অপর কোন ব্যক্তিকে ম্যানেজিং এজেন্টরূপে পুনর্নিয়োগ বা নিয়োগ করবেন না এবং যেখানে ওই তারিখে কোন ম্যানেজিং এজেন্ট ছিল না সেখানে কোন ম্যানেজিং এজেন্ট নিয়োগ করা হবে না। আর তপশীল বহির্ভূত কোম্পানী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে কোম্পানীর সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত না হলে কোন কোম্পানী ম্যানেজিং এজেন্ট নিয়োগ করবেন না। এসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার তখনই অনুমোদন দেবেন যদি ম্যানেজিং এজেন্টের নিয়োগ সাধারণের স্বার্থ-বিরুদ্ধ না হয়, প্রস্তাবিত ব্যক্তি ম্যানেজিং এজেন্ট নিযুক্ত হবার উপযুক্ত হন ও তাঁর নিয়োগের সর্তগুলি ন্যায়সঙ্গত হয় এবং তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের ইপ্সিত কোন সর্ত পূর্ণ করেছেন।

১৯৬০ সালের ১৪ই আগষ্টের পর কোন ব্যক্তি এককালীন দশটির বেশী কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্টের কার্য পরিচালনা করতে পারবেন না। ম্যানেজিং এজেন্সীর হস্তান্তর করতে হলে সে বিষয়ে প্রস্তাব কোম্পানীর সাধারণ সভায় গৃহীত হবার পর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। এই আইন কার্যকরী হবার পর উত্তরাধিকার বা অন্য সূত্রে ম্যানেজিং এজেন্ট নিয়োগ সম্পর্কে কোম্পানীর সমস্ত চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কোন পাব্লিক কোম্পানী কিংবা পাব্লিক কোম্পানীর অন্তর্ভুক্ত প্রাইভেট কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট যদি কোন ফার্ম বা যৌথ কোম্পানী হয় এবং তার সংবিধানে কোন পরিবর্তন করা হয় তা হলে ওই পরিবর্তনের তারিখ থেকে ৬ মাস পরে অথবা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুগৃহীত কোন সময়ান্তে তার কার্যকাল শেষ হবে।

কোম্পানীর সেক্রেটারী ও ট্রেজারারদের সম্পর্কে কোন পরিবর্তন করতে কমিটি পক্ষপাতি নন, যদিও তাঁরা ম্যানেজার কিংবা ম্যানেজিং এজেন্টের মত একইপ্রকার কাজ করে থাকেন। শুধু পার্থক্য এই যে তাঁরা পরিচালকমণ্ডলীতে কোন মনোনীত ব্যক্তিকে নিয়োগ করতে পারেন না। এদের পরিচালন ব্যবস্থার উপর উপযুক্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে কমিটি তাঁদের আইনে স্বীকৃতি দিতে সুপারিশ করেছেন।

ম্যানেজিং এজেন্সীর স্বপক্ষে কিংবা বিপক্ষে বলবার প্রচুর সুযোগ আছে। ম্যানেজিং এজেন্সী সম্পর্কে এই কড়া ব্যবস্থায় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। হিন্দুস্থান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মিঃ কোঠারী ইহাকে বিশ্বাসের মূলে কঠোরাঘাত বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু একটু উদার দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখলে সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট সুচিন্তিত বলেই মনে হবে।

চায়ের দামের অবনতি—

গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে লণ্ডনে চায়ের দাম ক্রমেই কমে আসছে। জানুয়ারীতে যার দাম ছিল ৭ শিলিং এখন তা নেমে এসেছে ৩½ শিলিংএ। এ ব্যাপারে কলিকাতা চা ব্যবসায়ী সমিতি স্বভাবতই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ভারতের চা ব্যবসায়ীগণ তাঁদের মজুত মাল বিক্রী করতে এখনই অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। চায়ের দামের এই অবনতির জন্য তাঁরা কয়েকটি কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। তৎন চায়ের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রচুর পরিমাণ নিকৃষ্ট শ্রেণীর চা বাগান থেকে কলিকাতা আসে এবং তার কিছু অংশ যুক্তরাজ্যে চালান দেওয়া হয়। ব্যবসায়ের দিক থেকে বিদেশের বাজারে নিকৃষ্ট শ্রেণীর চা পাঠানো মোটেই বিচক্ষণতার কাজ হয় নি। তা ছাড়া লণ্ডনে মজুদ চা অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে। এর কারণ সম্পর্কে লণ্ডন থেকে পূর্ণ বিবরণ পাওয়া না গেলেও, জানা গিয়েছে যে লণ্ডন ডক ষ্ট্রাইকের সময় যে সব চা অন্য বাজারে চালান দেওয়া হয়েছিল তা আবার লণ্ডনে গিয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্যান্য দেশ থেকে চায়ের যোগানও আশাতীত বৃদ্ধি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক চা সমিতির হিসাবে ১৯৫৪ সালে পৃথিবীর বাজারে মোট ১৩০ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড চায়ের যোগান আসে, কিন্তু ঐ সময়ে পৃথিবীর মোট চাহিদা ১২৮ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল।

১৯৫৪ সালে চায়ের দাম যেমন আশাতীত বৃদ্ধি পেয়েছিল এবারকার হ্রাসও হয়েছে তেমনি অস্বাভাবিক। এই অস্বাভাবিক অবস্থা দূর করে চায়ের বাজারে স্থিতি ফিরিয়ে আনবার জন্য সমস্ত উৎপাদক দেশগুলির একযোগে উপায় উদ্ভাবন করে তা কার্যকরী করতে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

নূতন কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের বৃদ্ধি

কয়েক বছর থেকে সরকারী রাষ্ট্রীয়করণ নীতির ভীতির দরুনই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক নূতন মূলধনের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। কয়েকদিন পূর্বে এক সরকারী পরিসংখ্যানে গত বছর নূতন যৌথ কোম্পানীসমূহের মূলধন আশাতীত বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রকাশিত হয়েছে। গত জানুয়ারীতে যে দশমাস শেষ হয়েছে তাতে নূতন কোম্পানীগুলির অনুমোদিত মূলধন ছিল ১৯২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা; অনুরূপ সময়ে ১৯৫৩-৫৪ সালে তার পরিমাণ ছিল ৩৯ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। বিশেষ করে লক্ষণীয় এই যে ১৯৫৪-৫৫ সালে মোট ৯৮৮টি কোম্পানী গঠন হয় এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে ঐ সংখ্যা ছিল ২৮৪টি অর্থাৎ প্রায় সমান। সব থেকে বেশী অনুমোদিত মূলধন নিয়ে স্থাপিত হয় ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কর্পোরেশন। তার মূলধন ২৫ কোটি টাকা। গত ১৯৫৪ সালের এপ্রিল থেকে গত জানুয়ারী পর্যন্ত দশমাসে মোট ৪২৬ টি কোম্পানী ব্যবসায় গুটিয়ে নেয়। এই কোম্পানীগুলির আদায়ীকৃত মূলধন ছিল ৩ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। ১৯৫৩-৫৪ সালের অনুরূপ সময়ে ঐরূপ কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৪৫২ এবং তাদের আদায়ীকৃত মূলধন ছিল ২ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা।

গত জানুয়ারী পর্যন্ত দশমাসে আদায়ীকৃত মূলধন মোট ৩৭ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা বেড়েছে। পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ সময়ে তার পরিমাণ ছিল ৩২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা।

দেশ ও বিদেশ

শান্তির দূত নেহেরু

নেহরুজীর মস্কো যাত্রা করিয়াছেন, দেশ বিদেশে তাহার জল্পনা-কল্পনা শুরু হইয়াছে। মার্কিণ স্বরাষ্ট্র সচিব ডালেসকে সাংবাদিকরা চাপিয়া ধরিয়াছেন, বিষয়টা কি খুলিয়া বলুন। এই সাক্ষাৎকারের ফল ভাল হইবে কিনা? মিঃ ডালেস বলেন, সব সময়ই তিনি ভালর জন্য আশা করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে এইরূপ আশাবাদী অতীব বিরল কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে (মিঃ ডালেস) বিশেষ কোন কিছু আশা করার কারণ তিনি দেখেন না। কেন না, শ্রীনেহেরুর পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁহার কিছুই জানা নাই। এই কথা কয়টির মধ্যে একটু তিক্ততার সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে। এশিয়ার যে সব রাজনীতিকদের নাকে দড়ি দিয়া তিনি ঘুরাইতেছেন এবং যাঁহাদের যে কোন রাজনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে পূর্বাহ্নে খবর পাইয়া থাকেন—তাঁহাদের দলে নেহেরুজীকে না পাইয়া ডালেস সাহেব একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছেন। তাই ব্যক্তিগত আশাবাদের সঙ্গে বিদ্রূপাত্মক ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়াছেন। অথচ এশিয়ার রাজনীতিতে শ্রীনেহেরুজীর কি দান, তাহা তিনি নিজেও জানেন। এবং মার্কিণ বৈমানিক মুক্তির পর তিনিই নেহেরুজীকে অভিনন্দন পাঠাইয়াছিলেন। বিশ্ব রাজনীতিতে নেহেরুজীর শান্তি প্রচেষ্টা যে মার্কিণ রাজনীতিকে কতখানি রক্ষা করিয়াছে—তাহা উত্তরকালের ঐতিহাসিক প্রমাণ করিবে। কেননা, এশিয়ায় মার্কিণ নীতি এইরূপ একরোখা হইয়া উঠিয়াছিল যাহার ফলে এশিয়াবাসী আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। ভিয়েৎনাম, কোরিয়া, ফরমোজা—এই সব দেশই মার্কিণ নীতির স্বাদ অনুভব করিয়াছে। কিন্তু ভারত এই সবকটি দেশেই তাহার শান্তির নীতি অনুযায়ী কাজ করিয়াছে। এই শান্তির অব্যাহত নীতিই আজ নেহেরুজীকে মস্কো যাইতে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। যে মস্কো শ্রেণী দ্বন্দ্বের রাজনৈতিক দর্শনের উপর ভিত্তি করিয়া গৃহযুদ্ধের জন্য অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে। সে-ই আজ বিরোধ, দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিবিধ আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া বুঝিয়াছে রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন কার্যে শান্ত পরিবেশ অপরিহার্য। মানুষকে বাঁচাইতে হইলে কড়ের মুখে ছাড়িয়া দিয়া বাঁচানো যায় না। তাই আজ মানুষ গড়া, সমাজ গঠন—রাষ্ট্রের দর্শন হিসাবে গ্রহণীয় হইয়াছে। মাঠে শস্য জন্মাইয়া যদি শুধু সৈন্যদের ভরণ-পোষণ করিতে হয় তবে যাহারা শস্য জন্মাইল তাহারা কোথায় যাইবে? এই প্রশ্ন সূত্রে আসিয়াছে বৃহত্তর সমাজ, শিল্পবস্তু ও সম্পদের উদ্বেগ, মানুষে-মানুষে সম্বন্ধ বিচার, রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে সম্বন্ধ বিচার। গোটা দুই বিশ্বযুদ্ধ করিয়া রাষ্ট্র ধুরন্ধরেরা বুঝিয়াছেন মানুষকে বাঁচিবার উপাদান না দিয়া রাইফেল দিলে—সে রাইফেল দাতার কাছে ফিরিয়া আসে। এবং কিরূপ নির্মম বেগে তাহা ফিরিয়া আসে তাহা চীনের চিয়াং-কাই-শেখ প্রমাণ করিবেন।

আজকে বিশ্ববাসী প্রশ্ন করিতে পারেন, বর্তমান বিশ্বে শান্তির দূত কে? আমরা বলিব, শ্রীনেহেরু। ইহা অতিশয়োক্তি নহে। ভারত রাষ্ট্র সৃষ্টি হইবার পর হইতে নেহেরুজীকে যে সব উত্তেজনামূলক পরিস্থিতির মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হইয়াছে—তাহাতে পাশ্চাত্যের যে কোন জাতি বিরোধ বাধাইয়া শান্তির সমাধান খুঁজিত। মার্কিণ জাতির ইতিহাস খুলিয়া দেখুন, যে সব কারণে তাহারা রাইফেল উঁচাইয়া যুদ্ধ করিয়াছে তাহা ভারতের ক্ষেত্রে বহুবার ঘটিয়াছে। ভারতের রাজনীতিতে নেহেরু-লিয়াকৎ চুক্তি ভারতীয় নেতৃত্বের ধৈর্য ও সাহসের

মহৎ পরিচয়। পাশ্চাত্যবাসী যেদিন এই চুক্তির কূটনৈতিক দিকটা খতাইয়া দেখিবেন সেদিন বুঝিবেন নেহেরুজী কত বড়, প্রকৃত শান্তিবাদী।

চার প্রধান মিলিত হইবেন

ইয়োরোপীয় রাজনীতির মর্মকথা যাঁহারা জানেন—তাঁহারাই এ কথা স্বীকার করিবেন যে, ইহারা সবাই মিলিয়া আলাপ আলোচনা করেন যাঁর যাঁর স্বরচিত বক্ষে বসিয়া। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিবার পূর্বে এইরূপ বহু বৈঠকী রাজনৈতিক মজলিশ হইয়াছে। প্যারিসে কিলগ-ব্রিঁয়া চুক্তি সমাপন করিয়া সবাই স্থির করিল আর যুদ্ধ নয়। এই সব মহৎ প্রতিজ্ঞা ১৯২৮ সালে সবাই করিয়াছিল। ইহার কয়েক বৎসর পরই ইয়োরোপে আগুন জ্বলিল। আরও এইরূপ দল বাঁধিয়া সলাপরামর্শ হইয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ বন্ধ রহে নাই। বস্তুত, ইয়োরোপে রাজনৈতিক ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই এইরূপ সঙ্ঘটিত হইয়া রহিয়াছে যে, তার একটি সামান্য অংশ স্পর্শ করিলেই অন্য অংশে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। এই অবস্থায় যুদ্ধের আশঙ্কা কোন দিনই তিরোহিত হয় না। তূণীরে অস্ত্র রাখিয়া শান্তি সম্বন্ধ গড়িয়া তোলা যায় না। একথা ইয়োরোপকে কে বোঝাইবে? কাজেই চার প্রধানের বৈঠক জিনেভাতে বসুক অথবা সুইজারল্যাণ্ডেই বসুক, মন খুলিয়া কেহই কথা বলিবেন না। তবু ফরাসীর কূটনৈতিক মহলসূত্রে যে খবর পাওয়া যাইতেছে তাহাতে মনে হয় রাশিয়া আলোচনা করিতে রাজী হইবে। তবু ভাল, এখন মার্কিনরা প্রাণ খুলিয়া কথা বলিলেই হয়।

ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচন

ইংল্যাণ্ডের সাধারণ নির্বাচন হইয়া গেল। শ্রমিকদল পরাজিত। শ্রমিকদলের এই পরাজয় কোন রাজনৈতিক আদর্শবাদের পরাজয় বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন। আসলে তাহা নহে। ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল দল অনেক ঠেকিয়া শিখিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন কিছু ত্যাগের সময় আসিয়াছে। যে সমস্ত মতবাদকে রক্ষণশীল দল খুব কড়া বলিয়া মনে করিতেন, এবং যাহা গ্রহণ করিলে সমাজতন্ত্র হইবার সম্ভাবনা আছে—তাহা তাহারা কাল-প্রভাবে হজম করিতে শিখিয়াছে। কাজেই গণতন্ত্রী দেশের বুদ্ধিমান নির্বাচক মণ্ডলী দুই দলের মধ্যে সাধারণ তারতম্য লইয়া মাথা ঘামায় নাই। তা ছাড়া আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে উত্তেজনা অনেকটা পরিমাণে প্রশমিত হইয়া আসিতেছে। রাশিয়ার যদি কোনরূপ অনমনীয় মনোভাব থাকিত তবেই নির্বাচক মণ্ডলীকে শান্তির কথা বোঝানো যাইত। রাশিয়া বৈদেশিক নীতিতে 'সহ-অবস্থিতি' কথাটি চালু করিয়া দিয়া শ্রমিকদলের কাজে ব্যাঘাত জন্মাইয়াছে। মিঃ ইডেন ফরমোজা ও ইন্দোচীন সমস্যায় যেরূপ ধৈর্য ও সাহসের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তিনি নির্বাচক মণ্ডলীর শ্রদ্ধা পাইয়াছেন।

ইংল্যাণ্ডের রেল ধর্মঘট

মিঃ ইডেন পাকাপোক্ত প্রধান মন্ত্রী হইয়া ঘরোয়া সমস্যায় জড়াইয়া পড়িয়াছেন। রেল ধর্মঘট তাঁহাকে বিশেষ ফ্যাসাদে ফেলিয়াছে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলা যাইতে পারে পুরোপো গণতন্ত্রের দেশ ইংল্যাণ্ডে, তার সরকার—স্বদেশবাসী শ্রমিকদের ফাঁকে পাইলে ছাড়িয়া কথা কয় না। বেতন বৃদ্ধির অভিযোগ এদেশে এবং বিদেশে সর্বত্র রহিয়াছে। কিন্তু এদেশের শ্রমিক যদি বেতন বৃদ্ধির অভিযোগ নিয়া আসে অথবা ধর্মঘট করে তবে তাহা কোন বিশেষ মন্ত্রীসভা বিরোধী না হইয়া, রাষ্ট্র বিরোধী আখ্যা পায়। রাষ্ট্র আর মন্ত্রীসভা যে এক নহে তাহা এদেশবাসী কবে বুঝিবে। তা ছাড়া ইডেন মন্ত্রীসভা যে ধৈর্য ও সাহসের সহিত শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইয়া যাইতেছেন তাহা এদেশে বিরল। এদেশে উভয় পক্ষ কে কাকে কতটা জব্দ করিবে তাহার জন্য তৎপর হইয়া ওঠে। সমস্যাকে জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে না দেখিয়া দলগত ভিত্তিতে উভয়পক্ষই দেখেন। ফলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় শীঘ্রই ইংল্যাণ্ডের শ্রমিক ধর্মঘট অবসান হইবে। যতশীঘ্র ধর্মঘট অবসান হয় ততই মঙ্গল কেন না, ব্রিটিশ চলাচল ব্যবস্থার সঙ্গে বিশ্ব বাণিজ্যের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে।

গোয়া সত্যাগ্রহ

নয়াদিল্লীর প্রাক্কালে নেহেরুজী গোয়া সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসাবেই করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এবং তাহার মন্তব্য সম্বন্ধে কিছু কিছু বিরূপ আলোচনাও হইয়াছে। কেহ কেহ হায়দরাবাদের ন্যায় পুলিশী অভিযান চালাইবার জন্য নেহেরুজীকে অনুরোধ করিয়াছেন। হায়দরাবাদের ক্ষেত্রে যাহা সম্ভব হইয়াছে গোয়ার ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নয়, তাহা যে কোন অভিজ্ঞ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক স্বীকার করিবেন। কেন না, গোয়ার সমগ্র রাজনীতিটা আন্তর্জাতিক কূটনীতি দ্বারা সমাচ্ছন্ন। পর্তুগীজ সরকার 'ন্যাটোর' অংশীদার—'ন্যাটো' কাহাদের প্রেরণায় ও স্বার্থে সংগঠিত হইয়াছে তাহা অনেকেই জানেন। এবং সুযোগ পাইলেই যে পর্তুগীজ সরকার 'ন্যাটোর' সহায়তা মাগিবেন তাহা বেশ স্পষ্ট। সেইরূপ কোন শক্তির যদি সমর্থন না থাকিত তবে পর্তুগালের মত একটি ক্ষুদ্র দেশ এতখানি স্পর্ধা দেখাইতে সাহস পাইত না। এবং যে-সব কারণে সব আলাপ আলোচনা দানা বাঁধিতেছে না তাহার প্রধান কারণ হইল কোন আপাত অদৃশ্য শক্তির নেপথ্য সমর্থন। ভারত সরকারকে ইহার আন্তর্জাতিক দিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া কাজ করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ গোয়া আন্দোলন যত ভিতর হইতে দানা বাঁধিবে ততই ভারত সরকারের পক্ষে বিশ্বের দরবারে বলিবার মত কিছু থাকিবে। সে ক্ষেত্রে ভারতে ও গোয়াতে যে ভারতভুক্তি আন্দোলন চলিতেছে তাহা ভারত সরকারের শান্তনীতিকে সমর্থন করিতেছে। জনসাধারণের দাবী উন্মুখ হইয়া উঠিলেই স্থানীয়-শাসন-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িবে। গোয়ার অর্থনৈতিক জীবন ভারতের সহায়তার উপর নির্ভর করে। ভারতকে হয়ত সেই শেষ অস্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে—তাহাতে অবশ্য গোয়ার সাধারণ মানুষ বেশী দুর্ভোগ ভুগিবে। কিন্তু পর্তুগীজ সরকার যেভাবে ভারতের প্রতি হুমকী দিতেছেন তাহাতে পর্তুগালের দুর্বলতা ধরা পড়িতেছে। ইহা পর্তুগীজ সরকারের দুর্বলতার লক্ষণ। যে কেহ স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, অতদূর হইতে গোয়া শাসন সম্ভব নয়—প্রধানত ভারতের মত রাষ্ট্র যদি তার বিরোধী থাকে। যতদিন ব্রিটিশ সরকার ভারতে থাকিয়া পর্তুগীজদের বন্ধুত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন—ততদিন গোয়ার শাসন সম্ভব হইয়াছে। আজ আর তাহা সম্ভব নয়—কাজেই গোয়া মুক্তি অনিবার্য, শুধু সময় সম্পর্কে ধৈর্য ধরিতে হইবে।

কুটীর শিল্প

ভারতের কুটীর শিল্পের প্রসার হোক ইহা আমাদের সবারই কামনা। কিন্তু এই কামনা-বাসনাকে এযাবৎ-কাল কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। আমরা যে কোন কারণেই হোক যান্ত্রিক শিল্প বিপ্লবের আওতায় পড়িয়া হস্তচালিত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য অনুভব করিতে পারি নাই। ফলে আমাদের সব শুভ প্রচেষ্টাই শুভ ইচ্ছার স্তরে রহিয়া গিয়াছে। কিছুদিন ভারত সরকার এক শিল্পনীতি ঘোষণা করেন তাহাতে যন্ত্রচালিত কাপড়ের কলগুলিতে শতকরা কত ভাগ মাল উৎপাদন করিতে পারা যাইবে তাহা বাঁধিয়া দেয়। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য হইল কুটীর শিল্পজাত বস্ত্রকে অবাঞ্ছিত প্রতি-যোগীর হাত হইতে রক্ষা করা। এই জাতীয় প্রতিযোগিতা কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যকে বাজারে সর্বত্রই সম্মুখীন হইতে হয়—ফলে জাতির একটা বিরাট অংশ অর্ধ বা সম্পূর্ণ বেকার হইয়া পড়ে এবং সমগ্র সম্পূর্ণ অর্থনীতি ধ্বংস হয়। এই অবস্থার মধ্যেই দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দেশের কুটীর শিল্প পুনরুজ্জীবিত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি। তাহা হইলেও একটি বিষয় এখানে ভাবিয়া দেখিবার আছে, যে অবস্থার মধ্যে আজ এই কুটীর শিল্প সংস্কার সাধিত হইতেছে তাহা পূর্বের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা। সমাজের রুচিবোধ, ক্রেতার ঔচিত্য বোধ, বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় পশ্চিম-

বঙ্গের জন্য পাঁচ কোটি টাকা ধার্য হইয়াছে। প্রকাশ ভারত সরকার চলতি আর্থিক বৎসরে তাঁতশিল্পজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুতের নিমিত্ত তন্তুবায়দের সুলভে কাঁচামাল সরবরাহের উদ্দেশ্যে রাজ্যসরকারকে ১৮লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণিত হইবে সরকারের তরফ হইতে অবস্থার উন্নতির নিমিত্ত চেষ্টা চলিতেছে। শোনা যাইতেছে যে, রাজ্য সরকার তাঁতীদের মজুরী দিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইবেন। তাহাতে অবশ্য তাঁতীরা নগদ মূল্য পাইবে। এবং আমরা আশা করি ন্যায্য মূল্যই পাইবে। কিন্তু ক্রেতা সাধারণ যেন অযথা মূল্য দিয়া বিপদগ্রস্ত না হন। কেননা, সরকারের মধ্যস্থতায় যাহা বিক্রি হইবে তাহার দর কত পড়িবে তাহা ক্রেতার জানা নাই। সরকার খরচ-খরচা করিয়া দ্রব্যমূল্য যেন এইরূপ না করেন যাহাতে লোকে দাম শুনিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হয়।

পূর্ব বাংলায় পার্লামেন্টারী শাসন

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা সূত্রে উল্লেখ করিয়াছিলাম যে, "বাঙালী জাতির একটা অংশ ইস্‌লামের সেবক হইলেও তাহারা জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারায় নাই।" বর্তমান পরিস্থিতিতে পূর্ববঙ্গে পার্লামেন্টারী শাসন প্রথার পুনঃপ্রবর্তনের মাঝে আমাদের এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যাইবে। কেন না, বাঙালী মুসলমান গণতান্ত্রিক অধিকার লইয়াই আন্দোলন করিয়াছিল। এই আন্দোলন তাহারা লীগ শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বাহ্যত করিলেও—আসলে ইহা বাঙালী মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলন। তাহার কারণ জাতীয় বৈশিষ্ট্য, ভাষা, লোক সংস্কৃতি এক স্বধর্মী জিগিরের চাপে বিপন্ন হইতে শুরু করিয়াছে। নদী বহুল পূর্ব বাঙালার লোক সংস্কৃতি রুক্ষ অনুর্বর পাঞ্জাবের লোক সংস্কৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। এই বৈচিত্র্য করাচীর শাসকেরা স্বীকার করেন নাই। ধর্মের নামে খণ্ড ছিন্ন পাকিস্তানকে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাই আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন বাঙালী মুসলমানের কাছে বড় হইয়া উঠিয়াছে। করাচী হইতে যতটা শাসন সম্ভব তাহাও করিয়া দেখা গেল, ফল কি হইয়াছে তাহাও করাচী বুঝিয়াছে। তাই আজ দায় পড়িয়া পুনরায় পার্লামেন্টারী শাসন প্রবর্তন করিতে হইল। কিন্তু বিপদ কাটে নাই, বাঙালী মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে বহু কাঁটা রহিয়াছে তাহার মধ্যে বিশেষ একটি হইতেছে পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হইয়াও—অন্যান্য জাতির সহিত ভারসাম্য।

ইহাদ্বারা বাঙালী মুসলমানের ভবিষ্যৎ আন্দোলনকে ঠেকানো যাইবে। ভূগোল যেখানে একটি জাতিকে বহু দূরবর্তী করিয়াছে সেখানে সাম্রাজ্যশাসন একদিন না একদিন অপরিহার্য হইয়া পড়িবে। এবং নিয়মতান্ত্রিক প্রথায় সেই আন্দোলন যাহাতে না আসিতে পারে সেই জন্যই পূর্ব বাঙালার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের ভারসাম্য বাঁধিয়া দেওয়া। যদি বাঙালী মুসলমান ইহা মানিয়া লয়—তবে তাহারা স্বাধীনতার ভবিষ্যতকে আগাম বাঁধা দিয়া রাখিবে। বর্তমানে শাসনব্যবস্থা চালু করার জন্য তাহারা যে ব্যবস্থাই মানিয়া লউক না কেন, যদি গণপরিষদে গঠনতন্ত্র রচনা কালেও অনুরূপ কিছু মানিয়া লয়—তবে পূর্ব বাঙালার ভবিষ্যৎ লইয়া ছেলেখেলা হইতেছে বুঝিব। পূর্ব বাঙালার বর্তমান মন্ত্রিপরিষদে কোন সংখ্যালঘু সদস্য গ্রহণ করা হয় নাই। তবে খবরে প্রকাশ যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হইতে মন্ত্রী নিয়োগ হইবে। এখানে একটি বিষয় বিচার করিয়া দেখা দরকার, সমগ্র জাতি হিসাবে ধরিয়া লইয়া মন্ত্রী সভা গঠিত হওয়া উচিত। এবং মন্ত্রী সভা যোগ্যতার ভিত্তিতে গঠিত হওয়া উচিত। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সমগ্র পূর্ব বাংলার একটা বিশেষ অংশ স্বীকার করিয়া লইয়া যোগ্য ব্যক্তিকে মন্ত্রীর আসন দেওয়া উচিত। অন্যথায় আরো বিভেদ সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমরা আশা করি বর্তমান মন্ত্রীসভা তদ্রূপ কোন ভুল করিবেন না।

মধ্যপ্রাচ্য

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনীতির মূল সূত্রটা এখনও

পাশ্চাত্য রাজনীতিবিদদের হাতে আইকা পড়িয়া আছে। এই ফরমোজা সমস্যা সামধান করিতে গিয়া হেননকে এক বার লণ্ডন একবার ওয়াশিংটন ছুটাছুটি করিতে হইতেছে। বস্তুত পক্ষে ফরমোসা দুর্বলাচোর বিশেষ সমস্যা নহে। মূল চীনের ভূখণ্ড হইতে বিতাড়িত হইয়া চীয়াং কাইশেক যে অল্পটুকু চীনের সামান্য অঞ্চল অধিকার করিয়াছে—তাহা বৃহত্তর রাজনৈতিক সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে দেখিলে ক্ষুদ্র অনুমিত হইবে কিন্তু বিষয়টাকে বাড়াইয়া তোলা তাহা কাহারো-কাহারো স্বার্থে। আসলে সমস্যা এই স্বার্থের ধাঁটা উৎপাটনের সমস্যা।

যে দলটি গত পঁচিশ ছাব্বিশ বছর যাবৎ চীনে প্রভুত্ব করিয়া জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিতে পারিল না—পাছাকে আবার দল বাঁধিয়া চীন জয়-এ উৎসাহ দেওয়া সমীচীন নহে। অন্তত রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় নহে মাও-সে তুং বাহির হইতে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া চীনের রাজত্ব দখল করে নাই। বরং সে ভেতরে থাকিয়া গৃহ যুদ্ধের মাধ্যমে ক্ষমতা অধিকার করিয়াছে। গৃহযুদ্ধ বৃহত্তর জনসাধারণের বিক্ষোভের ভিতর দিয়া বিস্তার লাভ করিয়াছে। এই ব্যাপক অসন্তোষ-চেতনাও সহযোগিতা অন্তের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। এবং এক অসন্তোষের কারণ তৎকালীন সরকার ও সরকারপুষ্ট দল। স্বদেশ ও স্বজাতি হইতে বিতাড়িত চীয়াং আজ পরসাহায্যপুষ্ট হইয়া পাচোর শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার উপর বাজ হানিতেছেন। কাজেই এশিয়ার রাজনীতিকেরা আজ এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিতেছেন। হেনন অবশ্য, ইডেন, ডালেস সবাইকেই বুঝাইতেছেন যে, ফরমোজার উপর বিশ্বশান্তি নির্ভর করিতেছে—কিন্তু ইহারা ভাবিতেছেন "negotiation from a position of strength." এই নীতি আশ্রয় করিয়া পাশ্চাত্য রাজনীতিকেরা আলাপ-আলোচনা করিবার পূর্বে strength বাড়াইবার কাজে লাগিয়া গিয়াছেন। ফলে দৌড়াদৌড়ি সার হইতেছে। তবু চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে—কেননা, পাশ্চাত্য জাতি আগুন জ্বালিলে এশিয়াকেও সেই আগুনে পুড়াইয়া মারিবে। হেননের চেষ্টা সফল হউক।

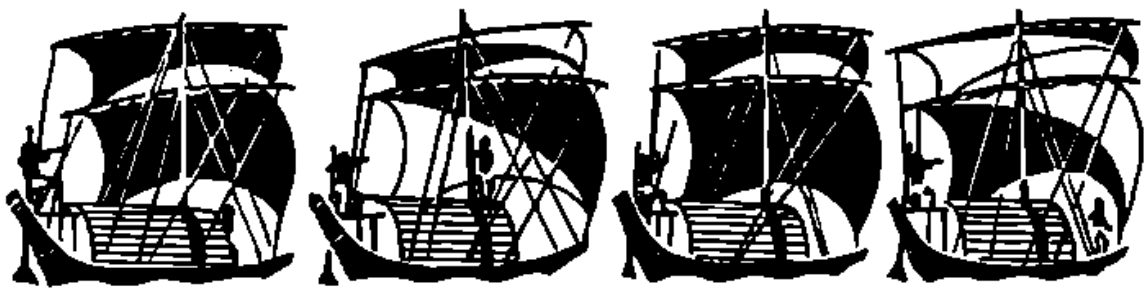

পুস্তক পরিচয়

বঙ্কিম রচনাবলী : ২য় খণ্ড। উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র বাংলা রচনা। সাহিত্য সংসদ্ : ৩২এ, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা—৯। মূল্য ১২৷৷০।

শুধু উপন্যাসকার হিসাবে নয়, প্রবন্ধকার হিসাবেও বঙ্কিম আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে আদর্শস্থানীয়। যুক্তি ও কল্পনা, পাণ্ডিত্য ও রসবোধের এমন সমন্বয় সাহিত্য-সংসারে সুলভ নয়। আর, লক্ষণীয় তাঁর অসামান্য শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা। কেবল স্বাভাবিক প্রতিভা নয়, কঠোর তপস্যা, উদ্দেশ্যের পবিত্রতা। মানবের হিতসাধন এবং নির্মল সৌন্দর্য সৃষ্টি, এই ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনার লক্ষ্য।

জ্ঞানের কোন ক্ষেত্রে তাঁর অনায়াস প্রবেশাধিকার ছিল না? কাব্য, ইতিহাস, ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান সকল ক্ষেত্রেই তিনি অসামান্য মনীষার নিদর্শন রেখে গেছেন। সেই সমগ্র নিদর্শন সর্বদা ব্যবহারযোগ্য একটিমাত্র খণ্ডে সংবদ্ধ হয়ে একসঙ্গে আজ পাঠকবর্গের হাতে পৌঁছোলো। ইতঃপূর্বে কোনও সুলভ সংস্করণ এমন মজবুত ও সুদৃশ্য আকারে দেখা দেয় নি।

আলোচ্য গ্রন্থ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে : লোক রহস্য, কমলাকান্ত এবং মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত। দ্বিতীয়ভাগে : বিজ্ঞান রহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ এবং সাম্য। তৃতীয়ভাগে : কৃষ্ণ চরিত্র, ধর্মতত্ত্ব, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম (দুঃখের বিষয় সূচীপত্রে ছাপা হয়েছে 'দেহতত্ত্ব')। চতুর্থ ভাগে : সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা, সাময়িকপত্রে প্রকাশিত ও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা, পত্রাবলী ও সহজ রচনা শিক্ষা। পঞ্চম ভাগে : গদ্যপদ্য, বাংলা রচনা, অসম্পূর্ণ রচনা, সংযোজনী ও পরিশিষ্ট।

ছাপা বাঁধাই ও কাগজের দিক দিয়ে সাহিত্য সংসদ্ প্রকাশিত বঙ্কিম রচনাবলীর দু'টি খণ্ডই লোভনীয় হয়েছে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের তথ্যপূর্ণ ভূমিকা অনুসন্ধিৎসু সাহিত্য সেবীর সমাদর লাভ করবে।

বঙ্গ সাহিত্যের শাশ্বত সম্পদকে যাঁরা এমন মনোজ্ঞ আকারে অল্প মূল্যে প্রচার করবার ভার নিয়েছেন তাঁরা পাঠকবর্গের আন্তরিক ধন্যবাদভাজন।

বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা : শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। বিশ্ব বিদ্যাসংগ্রহ। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ৷৷০।

পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা গ্রন্থ নয়, সহজ ভঙ্গীতে লেখা বাংলা গীতি কবিতার আদি কথা : চর্যাপদ থেকে আরম্ভ ক'রে বৈষ্ণব পদাবলী পর্যন্ত। রচনার সরল মাধুর্য সাধারণ পাঠককেও আকর্ষণ করবে। আধুনিক রীতির গীতি-কবিতা বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে, কিন্তু গীতি-রস আমাদের পুরোনো কবিতাতেও প্রচুর পরিমাণে ছিল। লেখকের মতে "বাংলার মাটিতে গানের আবেগ এতই প্রবল যে বাংলা এপিক কাব্যেরও প্রাণবস্তুটি হচ্ছে আসলে লিরিক।" ছেলে ভুলানো ছড়া, বাউল গান, পদাবলী, এ সবের লিরিক সুর তো স্পষ্টতঃই ধরা পড়ে। গ্রন্থকার কবিওয়ালাদের যুগ পর্যন্ত কেন এলেন না জানি না,—হয়তো একেবারে 'গোড়ার কথা' নয় ব'লেই—তবে তাঁদের এবং শাক্ত কবিদের গানেও গীতি-কবিতার রসই বর্তমান। আলোচ্য গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য এবং হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

মেঘ ও চাঁদ : শ্রীঅজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০বি, কলেজ রো, কলিকাতা—৯। দাম ৸০।

কবিতার মত মধুর, রূপকথার মত স্বপ্নময় একটি বাল্য প্রেমের কাহিনী। জটিলতা নেই, আবিলতা নেই, ফুলের মত পবিত্র, শিশিরের মত স্নিগ্ধ এই প্রেম।

জলাঙ্গীর তীর। বুড়ো কুমোর কৃত্তিবাস, তার ছেলে নয়নচাঁদ। আর নামডাকা কর্মকার নিরঞ্জন, তার নাতনী মেঘনা। দু'জনে খেলা করে। নয়নচাঁদ গান গায়, বাঁশী বাজায়। একদিন জলের ঘোরে সোনার কাঠি রূপার কাঠির সন্ধানে চাঁদ (নয়নচাঁদ বেরিয়ে পড়লো পথে, নামলো নদীর জলে, ধরা দিলো ঘুলির ছাতছানিতে পরদিন মেঘ (মেঘনা) এসে দাঁড়ালো তীরে, বাঁশীটি ফেলে দিলো ঘুলির মাঝখানে।

বর্ণনার গুণে ক্ষুদ্র কাহিনীটি রেশ রেখে যায় মনে, গানের সুরের মত।

কণিকা : শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত। ৪৪।১, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য ২৲।

কালীকিঙ্করবাবু একাধিক কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা। ভাবের বিশুদ্ধি এবং মার্জিত ভাষা ও ছন্দ তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। বর্তমান গ্রন্থেও সেই বিশেষত্ব পরিস্ফুট। পুরোণো সাহিত্য এবং ইতিহাস থেকে তিনি যেমন কোন কবিতার প্রেরণা পেয়েছেন; যেমন, কথাসরিৎসাগর

থেকে 'জীমূতবাহন কথা', মহাভারত থেকে 'স্বর্গারোহণ' এবং অন্যান্য উৎসারিত নয়। কিন্তু চিত্র প্রকাশের পরিচায়ক হিসাবে কবিতাগুলি উপভোগ্য।

ব্রহ্মাণ্ড মায়ের কথা ঃ প্রকাশক শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সেন শান্তি আশ্রম, বৈদ্যনাথ, দেওঘর। দাঁওতাল পরগণা। মূল্য ১০ তৃতীয় সংস্করণ।

ব্রহ্মাণ্ড মা ৺কালভিনী দেবী। ত্রিপুরায় তাঁর জন্ম, দেওঘরে দেহাবসান। সাধন পথে তিনি কতদূর অগ্রসর হয়েছিলেন, এই উপদেশাবলী থেকে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। ছোট ছোট কথাগুলি গভীর ভাবপূর্ণ যেমন, "জ্ঞানে এক, প্রেমে দুই, কাজে বহু, চরম সত্য দ্বৈতও নয়, অদ্বৈতও নয়, তাহা দ্বৈতাদ্বৈতবর্জিত।" বাক্যাবলী, পদ্য, চিঠি, প্রশ্নোত্তর, মায়া, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম মীমাংসা এবং ষটচক্র—এই কয় অংশে এ গ্রন্থ বিভক্ত। ধর্মানুরাগী গ্রন্থখানি পড়ে উপকৃত হবেন।

পূজার অভিনয়ে নূতনত্ব চাহিলে

মন্মথ রায়ের নাটক

কারাগার—মুক্তির ডাক—মহুয়া

সুবিখ্যাত নাটকত্রয় এক খণ্ডে প্রকাশিত : মূল্য ৩৲

জীবনটাই নাটক

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত একাধারে পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক : ২৷৷০

মহাভারতী

১৯০৫ হইতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত মুক্তি-আন্দোলনের ঘাতপ্রতিঘাতে উদ্বেগ একটি চাষী-পরিবারের পঞ্চাঙ্ক জীবন-নাটক একটিমাত্র দৃশ্যপটে রূপায়িত। মূল্য ২৷০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স : ২০৩।১।১, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিঃ—৬

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবৎসর শেষ হবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আয়োজন চলছে। প্রথম পরিকল্পনা থেকে এ পরিকল্পনার বিশেষত্ব অনেক বিষয়ে আছে। তন্মধ্যে প্রধান হল জনসাধারণের মতামত আহ্বান করা এবং দ্বিতীয় হল প্রায় সোয়াকোটি নূতন কাজের বা চাকুরীর সংস্থান করা। এ পরিকল্পনার অন্তর্গত উন্নয়ন কাজ সমূহকে মোটামুটি কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(ক) গ্রামের স্থানীয় উন্নয়ন-কার্য কুটির উৎপাদন ও তৎসংযোগে নূতন কর্ম সংস্থান (গ) বৃহৎ শিল্প (Heavy Industry) এবং (ঘ) নদী-উপত্যকায় বাঁধ ও সেচের ব্যবস্থা। এর মধ্যে জনসাধারণের দিক থেকে প্রথম দুটির বিশেষত্ব সব চেয়ে বেশি। প্রত্যেক মহকুমা হাকিমদের মারফৎ গ্রামের প্রতিনিধিদের আহ্বান করা হচ্ছে তাদের স্থানীয় উন্নয়ন কাজের তালিকা প্রণয়ন করতে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এভাবে গ্রাম্য লোকদের মতামত চাওয়া হয়নি। সে-অভাব পূরণের জন্য স্থানীয় উন্নয়ন-কার্য হিসাবে একটি নূতন ব্যবস্থা বছর দেড়েক হল সুরু করা হয়েছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গণসংযোগকে বিশেষ স্থান দেওয়া হচ্ছে। আমরা আশা করি গ্রামের জনসাধারণ এ সুযোগ গ্রহণ করবে। গ্রাম্য দলাদলি ভুলে তারা স্থানীয় উন্নয়ন-কার্যের দিকে মন দেবে। আমাদের দেশের উন্নয়ন-কার্য গণতন্ত্রের পদ্ধতিতে সাধিত হচ্ছে, তাই জনসাধারণের সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন আছে। সরকার যেভাবে জনসাধারণের মতামত আহ্বান করছে তা খুবই আনন্দের বিষয়। এছাড়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্বন্ধে সর্বোচ্চ স্তরেও বেসরকারী মতামত আহ্বান করা হচ্ছে। ভারতবর্ষের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ্‌দের নিয়ে এক সংস্থা গঠন করা হয়েছে (Panel of Economists)। এই পরিকল্পনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পূর্বে অর্থনীতিবিদদের সংগে প্রায়ই আলোচনা করা হচ্ছে। প্রথম পরিকল্পনায় এরূপ বেসরকারী অর্থনীতিবিদদের সংগে কোন পরামর্শ করা হয়নি। সে ত্রুটিও এবারে সংশোধিত করা হল।

কুটির উৎপাদন ও প্রায় সোয়া কোটি নূতন চাকুরী সৃষ্টির প্রতি যে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে তা এই পরিকল্পনার একটি বিশেষত্ব। বর্তমান ভারতে অন্যতম প্রধান সমস্যা হল বেকার সমস্যা। এটা প্রায় সর্ববাদিসম্মত যে বেকার সমস্যা দূর করার পক্ষে ছোট ছোট উদ্যোগ (Industry) ও কুটির উৎপাদন সবচেয়ে কর্মোপযোগী। গ্রাম পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে এবং তখনকার অবস্থায় এর বিশেষ প্রয়োজনও ছিল।

খাদ্য ও বস্ত্রের অভাব পাঁচ-ছয় বছর পূর্বে আমাদের সকলকেই বিচলিত করেছিল। অন্যান্য নিত্যকার ব্যবহার্য দ্রব্যের অভাবও বেশ প্রখর ছিল। তাই তখন উৎপাদন বাড়ান বিশেষ প্রয়োজন ছিল। খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব আজ প্রায় দূর হয়েছে, আজ প্রয়োজন হয়েছে লোকের আয় বাড়ান তাই দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে প্রায় সোয়া কোটি নূতন চাকুরীর সংস্থান করা এবং

জাতীয় আয় প্রতি বৎসরে শতকরা পাঁচ টাকা হিসাবে বাড়িয়ে পরিকল্পনার শেষ বর্ষে শতকরা পঁচিশ টাকা আয় বাড়ান। বৃহৎ কারখানায় বা বড় উদ্যোগে (Industry) জাতীয় উৎপাদন বাড়ান যতটা সহজ ব্যক্তিগত আয়ের সমতা আনয়ন করা ও বেকারদের কর্মসংস্থান করা তত সহজ নয়।

এই দ্বিতীয় পরিকল্পনার অপর দুইটি কর্মবিভাগ—বৃহৎ উদ্যোগ বা ইণ্ডাষ্ট্রি (Heavy Industry) ও নদী উপত্যকার বাঁধ ও সেচকার্য মোটামুটি প্রথম পরিকল্পনা অনুসরণে ধরা হয়েছে। ভারতবর্ষের অর্থনীতি মূলতঃ কৃষিমূলক এবং ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তাতে তার খাদ্যের চাহিদা মিটান একটা স্থায়ী সমস্যা; তাই সেচের ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রথম পরিকল্পনায়ও সেচ ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। বড় ইণ্ডাষ্ট্রি স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কোন যুক্তির প্রয়োজন আছে বলে করিনা। আজও বহু ইস্পাত ও রাসায়নিক দ্রব্য বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় এবং অনেক কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়। এজন্য বড় বড় কারখানা স্থাপন করা বিশেষ দরকার।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৪,৬০০ কোটী টাকা। হয়ত শেষ পর্যন্ত টাকার পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে। রাষ্ট্রের বর্তমান আয় থেকে এ টাকার যোগান হতে পারে না। তাই প্রস্তাব হচ্ছে যে অতিরিক্ত ট্যাক্স বসিয়ে আরও ১০০ কোটি টাকা বেশি উঠিয়ে এই উন্নয়ন-কার্য সম্পন্ন করতে হবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার দুটা মূল উদ্দেশ্য হল জাতীয় মোট আয় বাড়ান এবং সোয়া কোটি নূতন চাকুরীর ব্যবস্থা করা। জাতির মোট আয় বাড়লে ব্যক্তিগত আয়ও বাড়বে। কাজেই লোকের ট্যাক্স দেওয়ার ক্ষমতা পূর্বের চেয়ে বাড়বে। কিন্তু তবুও ১০০ কোটি টাকা নূতন ট্যাক্স তোলা সম্ভব হবে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। সাধারণতঃ ট্যাক্স সর্বশ্রেণীর লোককে কম বেশী আঘাত করে। এমন কোন ট্যাক্স যদি নির্ধারণ করা যায় যা মূলতঃ ধনীদের উপর পড়বে তা হলে কম আয়ের সাধারণ লোকের উপর চাপ বেশি পড়বে না। ট্যাক্স অনুসন্ধান কমিশন এবিষয় আলোচনা করেছে। এই কমিশন দুটী বিশেষ ট্যাক্সের সুপারিশ করেছে—(১) সম্পত্তির উপর ট্যাক্সের হার (Estate-Duty) বৃদ্ধি করা এবং (২) মূলধন বৃদ্ধির উপর ট্যাক্স (Capital Gains Tax) কিন্তু ভারতবর্ষে ধনীর সংখ্যা অতি নগণ্য, কাজেই এই দুটি ট্যাক্স থেকে দশ-বারো কোটি টাকার বেশি আদায় হওয়ার সম্ভাবনা কম।

শেষ পর্যন্ত উন্নয়ন কার্যের জন্য নূতন কোন ট্যাক্স বসান ভিন্ন অন্য কোন পথ থাকবে না। একথা যে কেবল ভারতবর্ষেই প্রযোজ্য তা নয় সব দেশকেই এই পথ নিতে হয়েছে। রুশিয়াতে প্রথম অবস্থায় জনসাধারণের আহার্য সামগ্রী পর্যন্ত কমিয়ে বিদেশে রপ্তানী করতে হয়েছিল। নিতান্ত প্রয়োজনীয় আহার্যের পরিমাণও এজন্য কম করতে হয়েছিল; অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্যও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল। সেখানে তো সবই ছিল সরকারী বরাদ্দ ও রেশনিংয়ের অনুযায়ী। বর্তমানে আমাদের দেশে জাতীয় আয়ের শতকরা সাত টাকার মত বাঁচান হয় এবং শতকরা তিরানব্বই টাকার মত খরচ করা হয়। অন্যান্য দেশে শতকরা চৌদ্দ পনর টাকা বাঁচান হয় এবং ঐ টাকা দিয়ে দেশের উন্নয়ন-কার্য করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্বে আমাদের দেশে মোট জাতীয় আয়ের শতকরা চার টাকা বাঁচান হত। এই পাঁচ বছরে সঞ্চয়ের পরিমাণ শতকরা সাত টাকায় উঠেছে। আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়ে শতকরা এগার টাকা পর্যন্ত করবার প্রস্তাব হয়েছে। জাতীয় আয়ের যে পরিমাণ টাকা বাড়ান যায় তা দিয়েই ভবিষ্যতে উন্নয়ন-কার্য সাধন করতে হয়। সরকারী ট্যাক্স সঞ্চিত আয়ের মধ্যে গণ্য হয়।

আশাকরি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জনসাধারণের সহযোগিতা পূর্বের চেয়ে বেশি পাওয়া যাবে এবং জনসাধারণ এই পরিকল্পনায় উন্নয়ন-কার্যের ফলে পূর্বের চেয়ে বেশি উপকৃত হবে। আমাদের দেশে এই উন্নয়ন-কার্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাধিত হচ্ছে কাজেই কারুর কাছ থেকে জোর করে কিছু আদায়ের প্রস্তাব এতে নেই। তাই জনসাধারণের স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা এর সাফল্যের জন্য প্রয়োজন। ভারতবর্ষের অর্থনীতিবিদ্‌গণ বলেছেন যে এই পরিকল্পনায় জাতীয় সম্মান ও শক্তির পরীক্ষা লওয়া হবে (a challenge to the nation)। আমরা আশাকরি এই পরীক্ষায় জাতি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হবে।

হাবড়ায় সত্যাগ্রহ—

আজ কিছুদিন যাবৎ উদ্বাস্তুনিবেশ হাবড়াতে সত্যাগ্রহ চলছে। হাবড়াতে একটি ছ'দল সহর উপনিবেশ (Urban Colony), তার আশে-পাশে কয়েকটি গ্রাম্য উপনিবেশ (Rural Colony) আছে। সহর কলোনীর নাম হল অশোকনগর। সরকার থেকে নিজের পরচায় ছোট ছোট দালান করে উদ্বাস্তুদের কিস্তীবন্দী প্রথায় দেওয়া হচ্ছে। তারই পাশে কল্যাণগড় উপনিবেশে অবস্থা ও ব্যবস্থা অশোকনগরের চেয়ে সর্ব বিষয়েই খারাপ। অথচ উভয় উপনিবেশেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক বাস করে। কৃষিজীবী উপনিবেশ এর কোনটাই নয়। মূল টাকার পরিমাণ এবং অন্যান্য ব্যবস্থার পার্থক্য অসন্তোষের সৃষ্টি না করে পারে না। তার উপর পুনর্বসতি বিভাগের ধীর ও মন্থর গতি এই অসন্তুষ্টিকে আরও বাড়িয়ে তোলে। কল্যাণগড়ের অধিবাসীদের নিকট বহুদিন পূর্বে কতকগুলি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় এবং সেগুলি অত্যন্ত সাধারণ রকমের কিন্তু তা আজও পূরণ করা হয়নি।

তারপর দীর্ঘকাল আশায়-আশায় থেকে কল্যাণগড়ের উদ্বাস্তুগণ সত্যাগ্রহ করার নোটিশ দেয়। তারা যে সব দাবী জানায় তন্মধ্যে একটি হল কল্যাণগড়কেও সহর উপনিবেশ বলে গণ্য করতে হবে। তাদের অন্যান্য দাবী ইতিমধ্যে নীতি হিসাবে সরকার মেনে নিয়েছে যেমন খাদ পূরণ করা, যাতে বর্ষার দিনে জল না দাঁড়াতে পারে, কয়েকটী রাস্তা তৈরী করা, পানীয় জলের জন্য কূপগুলিকে মেরামত করা প্রভৃতি দাবী কয়েকমাস পূর্বেই সরকার স্বীকার করে নিয়েছিল। কিন্তু এই মৌখিক স্বীকারের উপর উদ্বাস্তুগণের আস্থা ছিলনা, কারণ স্বীকৃত হলেও একাজগুলি অনেকদিন পড়ে আছে। উদ্বাস্তুগণের অন্য দাবী যে কল্যাণগড়কে সহর উপনিবেশ বলে গ্রহণ করতে হবে, তাও সরকার মেনে নিয়েছিল। এবং সেই অনুসারে সরকারী চিঠি ঐ অঞ্চলে গিয়েছিল।

তাসত্ত্বেও হাবড়াতে সত্যাগ্রহ শুরু হয়েছে এবং এই সত্যাগ্রহ পরিচালকদের মধ্যে ওখানকার খ্যাতনামা কংগ্রেসকর্মীরাও অনেক আছেন। এ ব্যাপারটি অনেকটা রহস্যজনক। একদিকে সরকারী কর্মচারীদের অত্যন্ত উদাসীন মনোভাব ও মন্থরগতি, অপর দিকে কিছু মতলবী লোকের চক্রান্ত এই সত্যাগ্রহের জন্য দায়ী। তবে এই সত্যাগ্রহ নিরুপদ্রব ভাবে চলছিল। হাবড়ায় ইঞ্জিনিয়ার অফিসের মত একটি অফিস আছে, তারই সামনে জনকয়েক উদ্বাস্তু বসে থাকতেন, তাঁদের গ্রেপ্তার না করলে হয়ত আস্তে-আস্তে এ হুজুগ কমে যেত এবং এ অঞ্চলের শান্তি শৃঙ্খলারও বিশেষ কোন ক্ষতি হত না। প্রথম কয়েকদিন কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি কিন্তু একদিন হঠাৎ জনগণকে গ্রেপ্তার করা হল কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীসমেত। তারপর থেকে রোজই কিছু কিছু সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করা হয়।

হাবড়ার মত স্থানে সত্যাগ্রহে গ্রেপ্তার হওয়ার জন্য লোকের অভাব হবে বলে আমরা মনে করি না। সত্যাগ্রহের সূচনা ও প্রবর্তন যাঁরা করেছেন, এর পরিচালনার ভার তাঁদের হাতেই থাকবে এমন ধারণা করবার কারণ। নেই গোলমালের সুযোগ দেখলে তাকে পাকিয়ে তোলার লোকের অভাব হবে না বা বাইরে থেকে লোক যোগানোর অভাবও হবে না। সত্যাগ্রহীগণ তাদের দাবী আরও ব্যাপক করে তুলেছে। এখন আশে-পাশের আরও ৪।৫টি উদ্বাস্তু উপনিবেশকেও তাদের দাবীর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। কাজেই এই সত্যাগ্রহের সমাপ্তি কোথায় এবং কিভাবে হবে আমরা জানি না। হাবড়ার মত স্থানে সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করার পূর্বে মন্ত্রীসভায় এ সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছিল কিনা, কিংবা এ বিষয়ে মন্ত্রীসভার নীতিগত নির্দেশ (Policy decision) ছিল কিনা জানি না। মোটের উপর এ ব্যাপারে বাংলা সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিভাগের তৎপরতার কোন পরিচয় আমরা দেখি না। আশা করি মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় অবিলম্বে এ সম্বন্ধে নিজে বিচার করে এ সত্যাগ্রহের একটি সুরাহা করবেন। এই অপ্রিয় ঘটনার সত্বর পরিসমাপ্তি আমরা কামনা করি।

গোয়া—

ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পরও দুটি অংশে বিদেশী শাসন ছিল—কতক ছিল ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল পণ্ডিচারী ছিল তার প্রধান কেন্দ্র, এবং বাংলাদেশে চন্দননগর তার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। চন্দননগর কয়েক বৎসর পূর্বে ফরাসীরা ভারত সরকারের হাতে ছেড়ে দেয় এবং আজ তা পশ্চিম বাংলার অংশ। দক্ষিণ ভারতে পণ্ডিচারী মাহী, কারিকেল ও ইয়ানেম ফরাসী অধিকৃত অঞ্চল ছিল, তন্মধ্যে পণ্ডিচারী বাদীত অপর তিনটি অতিক্ষুদ্র। প্রায় ৮।৯ মাস হল ফরাসীরা এই অঞ্চলগুলি কার্যতঃ ভারত সরকারের ছেড়ে দিয়েছে। এই হস্তান্তরের আইনগত বিধিব্যবস্থা এখনও হয়নি। কিন্তু কার্যতঃ ৮।৯ মাস,

যাবৎ এই চারিটি অঞ্চলই সম্পূর্ণভাবে ভারত সরকারে শাসনাধীন আছে।

ইহা ব্যতীত পর্তুগীজদের অধীনস্থ গোয়া দামন ও দিউ এই তিনটি বিদেশী অধিকৃত অঞ্চল ভারতবর্ষে আছে। তন্মধ্যে গোয়া অপেক্ষাকৃত বড় ও অপর দুটি অপেক্ষাকৃত ছোট। ভারত সরকারের পক্ষ হতে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বার বার ঘোষণা করেছেন যে ভারত বলের কোন অংশে বিদেশী অধিকার ভারতবর্ষ বরদাস্ত করবে না। অথচ ভারতবর্ষ শান্তির পথ ত্যাগ করে যুদ্ধ সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে এ সমস্যার মীমাংসা করতে চায় না। ফরাসীরা অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল জাতি; উহাদের ইতিহাসে মহৎ আদর্শবাদের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। তাই তারা ভারতের দাবী যুক্তি সঙ্গত বলে মেনে নিয়েছে। কিন্তু পর্তুগীজ ইতিহাসে কখনও কোন মহৎ আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায় না বরং পরিচয় পাওয়া যায় অত্যন্ত ছোট মনের এবং প্রকৃত বিরোধিতার। ক্ষুদ্র দেশ, জল হস্ত্যতার এবং অনুন্নত ও সামরিক বলে দুর্বল বিদেশীর রাজ্য থেকে অর্থ লুণ্ঠনে ছিল এই জাতির বিশেষত্ব। তাদের পক্ষে ভারতের দাবীর যুক্তিসঙ্গতি অনুভব করা কঠিন। ভারত যদি অস্ত্রবলের পথ অবলম্বন করত তাহলে হয়ত পর্তুগীজ ভারতের দাবী সহজে মানতে পারত।

আজ প্রায় ২ বছর যাবৎ পর্তুগীজ শাসনের বিরুদ্ধে গোয়া দামন ও দিউয়ে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলছে। কিন্তু ভারতবর্ষ সে পথ নেবে না তাই ধৈর্যের সঙ্গে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে। সত্যাগ্রহীদের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার চলছে। ভারত সরকার থেকে প্রতিবাদ করেও কোন প্রতিকার পাওয়া যায় নি। এই সত্যাগ্রহ এতকাল গোয়া অধিবাসীরা চালাচ্ছিল—অবশ্য ভারতীয় ভূমি থেকে; ভারত সরকারের নীতি ছিল যে কোন ভারতীয় নাগরিক যাতে এই সত্যাগ্রহে না যায়। আজ সে নীতি কতকটা শিথিল করা হয়েছে। কারণ জনসাধারণের একটু সামান্য উৎসাহ পেলে লক্ষ লক্ষ অধিবাসী এই গোয়া অভিযানে অগ্রসর হত কিন্তু পণ্ডিত জওহরলালের অভিমত যে গোয়ার স্বাধীনতার অভিযান মুখ্যত গোয়ার অধিবাসীরা চালাবে। আমরাও এই মত সমর্থন করি।

গোয়ার অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক লোক খৃষ্টান। পর্তুগীজ সরকার ভারতের বিরুদ্ধে একটি প্রচার চালিয়েছেন যে গোয়া ভারতের সঙ্গে যুক্ত হলে সেখানকার খৃষ্টধর্ম, সংস্কার ও অনুষ্ঠানে ভারত সরকার বাধা দিবে। ভারত সরকারের মৌখিক প্রতিবাদের মূল্য হয়ত সবাই দিবে না কিন্তু গোয়ার খৃষ্টান অধিবাসীরা এমনকি খৃষ্টান ধর্মযাজকগণও এই অমূলক প্রচারের প্রতিবাদ করেছে। এবং সমবেত ভাবে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগ দেওয়ার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেছে।

বর্তমানে সত্যাগ্রহ অভিযান ব্যাপক ও তীব্র হয়ে উঠেছে। আমরা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে অনতিবিলম্বে অহিংস পন্থাতে গোয়া ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হবে এবং তথাকার পর্তুগীজ শাসনের অবসান হবে। আজ ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে স্বেচ্ছাসেবকদল গোয়া সত্যাগ্রহে যোগদানের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে, অথচ এই সত্যাগ্রহে গোয়ার অধিবাসীদের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে। গোয়া সরকার তাদের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেছে, বিদেশ থেকে অতিরিক্ত মূল্যে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করছে কিন্তু সব করেও জনসাধারণের আর্থিক দুর্গতি দূর করতে পারছেনা। ভারতবর্ষের সাহায্য ও সহযোগিতা ভিন্ন যে গোয়া আলাদা ভাবে টিকে থাকতে পারে না তা সেখানকার অধিবাসীরা বেশ বোঝে, কিন্তু গোয়ার পর্তুগীজ শাসন কর্তারা তা এখনও বোঝে না। ভারতবর্ষ ইচ্ছা করলে এমন সব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে যাতে গোয়ার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হবে। কিন্তু এর ফলে গোয়ার অধিবাসীদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে; গোয়ার জনসাধারণের দুঃখকষ্ট বাড়াতে চায় না বলেই ভারত সরকার সে সবব্যবস্থা এখনও করে নি।

বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অহিংসা সংগ্রাম পরিচালনার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে, তাই গোয়ার অধিবাসীদের সংগ্রাম সহানুভূতির সঙ্গে অনুমান করতে পারি। কিন্তু পর্তুগীজরা ইংরেজের চেয়ে অনেক অসভ্য ও অনুন্নত। তাই মনে হচ্ছে গোয়ার অধিবাসীদের সংগ্রাম ইংরেজের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের চেয়ে কিছুটা কষ্টকর হবে, তবুও তাদের জয় অনিবার্য আমরা আশা করি এই বছরের ভিতরই গোয়া ভারতবর্ষে সংযুক্ত হবে। আমরা গোয়ার অধিবাসীদের এই সত্যাগ্রহের সাফল্য কামনা করি।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত
এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

অষ্টাদশ বর্ষ | আষাঢ়—১৩৬২ | তৃতীয় সংখ্যা

মোহিতলালের পত্র (৩)*

৩৮, নীলক্ষেত রোড,
রমনা, ঢাকা।
১ কার্ত্তিক ১৩৩৯

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র ও কবিতা 'মহাকাল'† পাইলাম। কবিতাটিতে ভাষা ও ছন্দের সংযম, শালীনতা এবং গাঢ় গাম্ভীর্য ফুটিয়াছে। প্রথম Stanzaর শেষ ছত্রটি ভালো হইয়াছে। 'মৌনতা' ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ, 'উৎকর্ষতা'র মত। আশা হয়, আপনি কাব্যসাধনায় ব্রতী হইলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। আপনার কল্পনার ambition আছে। জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আপনার হৃদয় ও দৃষ্টিশক্তি যতই তীক্ষ্ণ ও সচেতন হইবে, ততই আপনার কবিতার সৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাইবে। Diction ও technique সম্বন্ধে আপনি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছেন।

'সাহিত্য ও জীবন' সম্বন্ধে আপনি যে কথা বলিতে চান তাহা বুঝিতে পারিতেছি। তবে কথাটা খুব গভীর—এ সমস্যা সম্যকরূপে সমাধান করিতে হইলে নিখিল কাব্যকলা এবং যুগে যুগে তাহার বিচিত্র বিকাশের সন্ধান করিতে হইবে—Nature ও Art, Life ও Poetry, Particular ও Universal, Abstract ও Concrete—এইরূপ যত দ্বন্দ্ব মানুষের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে উভয়ের সমন্বয়মূলক একটা তত্ত্ব খুঁজিয়া বুঝাইতে হইবে। Subjective ও objective—Real ও Idealএর দ্বন্দ্ব কেমন করিয়া রসসৃষ্টিতে মিলাইয়া যায়—Fact ও Truth—Perception ও Imagination—এ দুইয়ের কোন্‌টা বড় এবং কেন? সৃষ্টিশক্তির লক্ষণ কি? কাব্যসৃষ্টিতে যে সত্যের উপলব্ধি হয়, রসচেতনায় সে সত্যের মূল্য কি? বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্ব জীবন ও জগৎকে যেভাবে উপস্থিত করে, কাব্য হইতে তাহা স্বতন্ত্র, ইহা কাব্যের গৌরব না অগৌরব? জীবন ও জগৎ-রহস্যের চরমতম উপলব্ধি কাব্যেই সম্ভব। অতএব উৎকৃষ্ট কাব্যের লক্ষণ কি? কাব্য জীবনেরই

* অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত।

† 'কল্লোলে' প্রকাশিত, পরে 'কুটীরের গান'-এর অন্তর্ভুক্ত।

নিগূঢ় ও সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি, জীবনের সঙ্গে কাব্যের এই সম্বন্ধ কোন্‌খানে? কাহাকে জীবনধর্ম্ম বলে—কবিকল্পনা এই জীবনধর্ম্মের অনুসরণ করে কোন্ অর্থে ও কিভাবে? সৌন্দর্য্য ও সত্য—এই দুই তত্ত্বের সমন্বয় হয় কাব্যে। Imagination নামক কবির যে দৈবীশক্তি তাহার authenticity কোথায়?—ইত্যাদি নানা প্রশ্নের মীমাংসা দ্বারা সাহিত্য ও জীবনের নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থির করা দরকার। এ সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত বহু চিন্তা ও মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে—বড় বড় কবি ও সমালোচক এই দুরূহ সমস্যার নানারূপ মীমাংসা করিয়াছেন, আধুনিক য়ুরোপে এবিষয়ে অতি অপূর্ব্ব আলোচনা চলিয়াছে। আপনি 'শনিবারের চিঠি'তে (গত বৎসরের সকল সংখ্যা—ভাদ্র হইতে শ্রাবণ) এবিষয়ে বহু আলোচনা দেখিতে পাইবেন; বিশেষ করিয়া 'কাব্য ও জীবন' নামক দুই সংখ্যায় সমাপ্ত যে দীর্ঘ-প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, সেইটি আপনাকে পড়িয়া দেখিতে বলি। এ সম্বন্ধে ঐ পত্রিকার 'আলোচনা' বিভাগে তর্কবিতর্ক আছে।

আশাকরি কুশলে আছেন। আমার বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ ও আলিঙ্গন লইবেন। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

(স্বাঃ) শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

(৪)

৩৮, নীলক্ষেত রোড,
রমনা, ঢাকা
১.৩.১৯৩০

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। মাঝে মাঝে এরূপ পত্র পাইলে আনন্দিত হইব জানিবেন। আশাকরি আপনি সপরিবারে ও সবান্ধবে কুশলে আছেন।

আপনি রবিবাবুর 'পরশপাথর' কবিতাটির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমি ইহার পক্ষপাতী নয়। এইরূপ ব্যাখ্যা পদ্ধতিই আমার মতে সমীচীন নয়। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সর্ব্বত্র একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা—বিশেষতঃ 'ভগবানে'র অবতারণা—করা উচিত নয়। আবার সর্ব্বত্রই 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি'র বিরুদ্ধে protest অন্বেষণ করার চেষ্টাও যুক্তিযুক্ত নয়। এইরূপ ব্যাখ্যাপদ্ধতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন স্বর্গীয় অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়। রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের কাব্যমন্ত্র তাঁহার যৌবনের কাব্যসাধনাতেও আবিষ্কার করার এই প্রবৃত্তি আজকাল একটু প্রবল হইয়াছে দেখিতেছি—কিন্তু তাহাতে রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনাকেই খর্ব্ব করা হয়।

'পরশপাথর' কবিতাটির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে কোনও গোলযোগ হইবার কারণ আছে বলিয়া আমার মনে হয়না—তবে যাঁহারা 'পসারিনী' কবিতারও একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিবার পক্ষপাতী, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। 'ক্ষ্যাপা' চরিত্রটিই এই কবিতার মূল প্রেরণা, 'পরশপাথর' বস্তুটি কি তাহার নির্ণয় নির্ভর করিবে এই ক্ষ্যাপা চরিত্রটির সম্যক্ ধারণায়। 'ক্ষ্যাপা'র প্রতি কবির যে বিপুল শ্রদ্ধার ভাব ঐ কবিতাটিতে আবেগ সঞ্চার করিয়াছে তাহাই পাঠককে এ বিষয়ে নিঃসংশয় করিয়া দেয়। 'ক্ষ্যাপা' নামটির মধ্যেই এমন একটা নিন্দাচ্ছলে স্তুতির ব্যঞ্জনা আছে যে ওই একটি শব্দের দ্বারাই তাহার প্রতি কবির মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে। ক্ষ্যাপা সেই মানুষ যে মানুষ স্বল্পে সন্তুষ্ট নয়—যে মানুষ তাহার দীনতা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র সম্পদ তুচ্ছ করিয়া দুর্লভের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করে—এইরূপ Idealist dreamer যাহারা তাহারাই জগৎ সৃষ্টির রহস্যভেদ করিতে গিয়া ব্যর্থ জীবনের মহিমায় নর-চরিত্র মহীয়ান করিয়া তোলে। সাধারণ জীবনযাত্রার সুখদুঃখ, লাভক্ষতি, সাংসারিক বিষয়বুদ্ধিসম্মত সুসাধ্য সাধনা তাহাদিগকে আকর্ষণ করিতে পারে না—সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া সেই এক বস্তুর সন্ধানে একজীবনে বিফল হইয়াও তাহারা আর এক জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। পরশপাথরলাভ ভগবৎসাক্ষাৎকার নয়—এ সন্ধান ভক্তিবিশ্বাসের সাধনা নয়—ইহা মানুষের জ্ঞানপিপাসার

চরমতম সন্ধান। মানুষ ভগবানের দাস নয়, দোসর হইতে চায়—সৃষ্টিরহস্যের মূলে যে একটিমাত্র তত্ত্ব আছে যাহাকে আবিষ্কার করিতে পারিলে সদসৎ অভিমান আর থাকে না, জ্ঞানের যে চরম অবস্থায় সৃষ্টির এই বহুবৈচিত্র্য ও বিরোধ নিমেষে লয় পায়, সর্ব বস্তু সৎ-রূপে উদ্ভাসিত হয় মৃত্যুও অমৃতরূপে প্রকাশিত হয়—লোহাও সোনা হইয়া যায়—সেই মহাজ্ঞানের পরশমণির সন্ধান মানুষ যুগ যুগ ধরিয়া নানাপন্থায় নানা সাধনায় করিয়া আসিতেছে আজ তাহাই বিশেষ করিয়া বিজ্ঞান-পন্থায় দাঁড়াইয়াছে। এই বস্তুকে 'ভগবান' বলিলে মানুষের জ্ঞান নয়—বিশ্বসৃষ্টির রহস্যভেদের পুরুষকার প্রবৃত্তি নয়—বাস্তব জগতের প্রতি উদাসীন একটা অন্ধ আধ্যাত্মিক সাধনার প্রবৃত্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া অথবা ভক্তিপ্রেমের সরল বিশ্বাসে সাংসারিক জীবনযাত্রাকেই নিশ্চিন্ত সাধনার ক্ষেত্র বলিয়া অলস আত্মপ্রসাদের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কবিতায় এই জীবনযাপনের আদর্শকে মহিমান্বিত করার বহু প্রমাণ থাকিলেও এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মানুষের এই শান্ত সাধনা—এই একক আত্ম-প্রত্যয়ের পুরুষকারকে, তাহার সর্বত্যাগী একনিষ্ঠ সংকল্পকে নিদারুণ ব্যর্থতার গৌরবেই গৌরবান্বিত করিয়া নমস্কার করিয়াছেন। বিশ্বাস অটল, সংকল্পও অটল—তথাপি মানুষের শক্তির সীমা আছে, তাই লক্ষ্যস্থির রাখিয়া আসনে বসিয়াও সাধক তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তন্দ্রাঘোরে দেখিতে পায় 'ধরা দিয়া পলায়েছে সকল বাসনা'। এত বড় tragedyর মধ্যেও সে আশা ত্যাগ করে না বরং যেন মনে হয়, যাহার সম্বন্ধে সে বিশ্বাস হারাইতেছিল হয়ত সে বস্তু নাই, তাহাকে পাইবার কল্পনাও বৃথা বলিয়া মনে হইতেছিল, সেই বস্তুর অস্তিত্বের প্রমাণ পাইয়া সে যেন আশ্বস্ত হইল—এ জীবনে হয়ত আর সময় নাই, সে বোধ হয় নিজে আর তাহাকে পাইবে না, কিন্তু তাহার প্রমাণ রাখিয়া যাইতে পারিল। সোনার শিকল তাহার সাক্ষী। 'গ্রামবাসী ছেলে' (average, অল্পবুদ্ধি কল্পনাহীন মানুষ) আর তাহাকে উপহাস করিতে পারিবে না—লোহা সোনা হইয়াছে দেখিয়া তাহারা বিস্ময়বিমূঢ় হইয়াছে। এ সাধনা বৈরাগ্যসাধনা নয়, মানুষের পরম কল্যাণের পরমসম্পদের সন্ধান। এ সন্ধানের এখনও শেষ হয় নাই, হইবে কিনা কে জানে? কিন্তু এই সন্ধানে যুগে যুগে যে সকল যোগী সাধক বিজ্ঞানপন্থী আপনআপন জীবন উৎসর্গ করিয়া সেই রহস্য সমাধানের ইঙ্গিত-অভিজ্ঞান মানবজাতিকে পুরুষানুক্রমে দান করিয়া যাইতেছেন, তাহার মূল্য অল্প নহে—প্রকৃতির সেই মুখাবগুণ্ঠন যতটুকু সে অপসারিত করিয়া পারিয়াছে, এবং জ্ঞান শক্তিতে শক্তিমান হইয়া জীবনযুদ্ধে দেহে ও মনে জয়ী হইয়াছে, তাহার জন্য মানুষ এই সকল 'অ্যাপা'র নিকটেই ঋণী। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় এইরূপ মহাপুরুষের জীবনের tragedyর দিকটা বিশেষ করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং এই grand attempt ও grand failureএর মহিমাতেই মুগ্ধ হইয়াছেন। এই জন্যই আমার মতে এই কবিতার সর্বপ্রধান বিষয় বা কাব্যসৃষ্টির প্রধান প্রেরণা পরশপাথরও নয়, অন্য কোনও incidentও নয়—ওই পরশপাথর ও incidentগুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি এক ধরণের মহান চরিত্র উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু কবিতাটির রচনাভঙ্গীতে 'অ্যাপা'র প্রতি যে কটাক্ষের ভাণ করিয়াছেন তাহাতে রস আরও উজ্জ্বল হইয়াছে, ইহাই উৎকৃষ্ট আর্ট। কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'অ্যাপা' চরিত্রের মহিমা স্থানে স্থানে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। সমুদ্রমন্থনের কাহিনী অ্যাপার সাধনাকে একটা বিরাটত্ব দান করিয়াছে এবং পরিশেষে যে সকরুণ উপসংহার অংশটি রহিয়াছে তাহাতে, এই ব্যাপারে কবির প্রাণের attitude অতিশয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আমার মনে হয় পরশপাথরের ব্যাখ্যায় কোনও গোলযোগ নাই—এ কবিতায় কোনও অস্পষ্টতা নাই, ইহার রূপক কল্পনায় কবি কোনও গূঢ় আধ্যাত্মিক ভাবনার বশবর্তী হ'ন নাই; এই জন্যই এ কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের একটি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা।

আজ এই পর্যন্ত। আপনার যখন যাহা প্রশ্ন থাকে জিজ্ঞাসা করিলে যতদূর সাধ্য সমাধানে সাহায্য করিব। আমার প্রীতি নমস্কার জানিবেন। ইতি—

আপনার

(স্বাঃ) শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

স্মৃতিকথা

(শরৎচন্দ্র)

কবিশেখর কালিদাস রায়

শরৎদাকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আপনি, রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক লেখা ত পড়েন না।" তাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—"পড়ি বৈ কি! কেদারবাবুর বই ২।৩খানা, চারুর বই ২।৩খানা, প্রভাতবাবুর বই ৩।৪খানা পড়েছি। তাছাড়া সুধী ঠাকুরের গল্প, সুরেন উপীন, গিরীন, সৌরীন ইত্যাদির বই পড়েছি—মেয়েদের মধ্যে অনুরূপা, নিরুপমার বই পড়েছি।"

আমি—কিন্তু অমুক কথাসাহিত্যিকদের বই পড়েছেন ব'লে মনে হয় না।

শরৎচন্দ্র—কিছু কিছু পড়েছি বৈ কি। তবে তোমরা যেমন ক'রে পড়েছ তেমন ক'রে পড়িনি। এরা লেখেও বড় বেশি। নিলীপের বইগুলো ত পড়েইছি। ব্যাপারটা কি জান—সবচেয়ে আমার অভিযোগ আমাদের লেখকরা জানে না—লেখার বিষেটার সঙ্গে না লেখার বিষেটাও শিখতে হয়। নিজেই সব কথা বলব—কিছুই ফাঁক রাখব না, এটা বড় আর্টিষ্টের লক্ষণ নয়। পাঠককে অত অবহেলা করলে চলবে কেন? তার বুদ্ধি বিবেচনা রুচি আছে—তাকে ফাঁক পূরণের অবসর দিতে হবে। তার বিবেচনা বুদ্ধিকে মর্যাদা না দিলে সে প্রসন্ন হবে কেন? এক একজন গাইয়ে আছে দেখেছ, একবার গান ধরলে আর থামতে চায় না। কোথায় থামলে শ্রোতা খুশী হয় তা তারা বোঝে না। এক একজন বক্তা আছে বক্তৃতা করতে উঠলে এক কথা একশো বার বলবে কিছুতে থামবে না। যেন শ্রোতারা সব মহামূর্খ! তেমনি লেখকও আমাদের মধ্যে সব আছে তারা কলম চালাতে জানে কিন্তু থামতে জানে না। আমার মনে হয়, থামতে জানাই বড় লেখকের লক্ষণ। সাহিত্যের পক্ষে উচ্ছ্বাস বা অতিভাষণটা বড় নয়, সংযমটাই বড়। ইঙ্গিত ব্যঞ্জনায় যেখানে কাজ চলে সেখানে বাগ্‌বিস্তার কি বিরক্তিকর নয়? বরং কথিতের চেয়ে অকথিত বেশি থাকলেই ভালো হয়।

আমি—যেমন অক্ষয় বড়ালের কবিতা—এতে অকথিত ৭৫% কথিত ২৫%, আর দেবেন সেনের কবিতা ঠিক উল্টা।

শরৎচন্দ্র—হাঁ, শুধু কথাসাহিত্য কেন—সব সাহিত্যেই ত তাই। কথাসাহিত্যেই হোক্ আর নাটকেই হোক্ Dialogue সব ছোট আর যত ইঙ্গিত ব্যঞ্জনায় পূর্ণ হবে ততই ভালো নয় কি আর্টের দিক হতে—বড় বড় বক্তৃতা থাকলে কি ভালো আর্ট হয়?

আমি—Shakespear-এর নাটকে কিন্তু বড় বড় বক্তৃতা থাকত—

শরৎচন্দ্র—Shakespear ছিলেন কবি নাট্যকার। কবি নাট্যকারদের লেখায় তা থাকে—তাছাড়া সেকালে ইংলণ্ডের শ্রোতারা ঐরূপই ভালবাসত—তারা একসঙ্গে কাব্যনাট্য দুইই উপভোগ করত। তারপর দুটা দেশ ভাগাভাগি হয়ে গেছে। আজকাল বিলাতের কোন নাটকে কি অত বড় বড় বক্তৃতা থাকে?

আমি—কথাসাহিত্যে অতিকথনের নিন্দা রবীন্দ্রনাথও করেছেন রাজসিংহের সমালোচনায়।

শরৎচন্দ্র—অতিকথন আসে কেন জান? কোন কোন লেখক লেখিকা পরিশ্রম ক'রে অনেক বইটই পড়ে, সেই সব বইএ যা কিছু লিখেছে সব লেখার মধ্যে পুরে দিতে চায়। দেখাতে চায় দেখ আমি কত পণ্ডিত। তারা ভাবল প্রতিষ্ঠা নিতে চায়—একদিকে সাহিত্যের মর্যাদা আর একদিকে পাণ্ডিত্যের মর্যাদা। বরং পাণ্ডিত্যের মর্যাদা সে পেতে পারে। সাহিত্যিক মর্যাদা সে হারায়। এমনও দেখবে—বিলাত ফেরত লেখক সে যে বিলাত গিয়েছে তা জানাবার বা প্রচার করবার জন্য বিলাতী অভিজ্ঞতা-সূত্র উপন্যাসের মধ্যে পুরে দেয়।

আমি—পাণ্ডিত্যের কি কোন স্থান নেই কথা-সাহিত্যে?

শরৎচন্দ্র—থাকবে না কেন? এমন পণ্ডিত চরিত্র অঙ্কন করতে হবে যে চরিত্রের সঙ্গে প্লটের বেশ রস সঙ্গত মিল আছে—তার মুখে পাণ্ডিত্যের কথা শোভন

হতে পারে, তবে বক্তা পণ্ডিত হলেই শুধু চলবে না শ্রোতা পণ্ডিতের চরিত্রও চাই। এরূপ চরিত্র মুখ্য হলে চলবে না, গৌণ চরিত্র হতে পারে। লেখকের জবানী পাণ্ডিত্য প্রকাশটা কথাসাহিত্যে একটা আবের মত উঁচু হয়ে উঠে। বঙ্কিমবাবু পণ্ডিত কম ছিলেন না. কিন্তু বিষবৃক্ষ আর সীতারাম ছাড়া নিজের জবানী পাণ্ডিত্য কোথাও প্রকাশ করেন নি। কথাসাহিত্য পাণ্ডিত্য প্রকাশের নয় পাণ্ডিত্য গোপনের ক্ষেত্র। পাণ্ডিত্য রসকে ছাড়িয়ে না যায়।

আমি—তবে কি কথাসাহিত্যের তত্ত্বেরও স্থান নাই?

শরৎচন্দ্র—খুব আছে—তবে তত্ত্বটার বিশ্লেষণও নয় —তত্ত্বের প্রতিপাদনও নয়। একটা তত্ত্বকে কঙ্কাল স্বরূপ আশ্রয় ক'রে রস রক্ত মেদ মজ্জা ও শেষ লাবণ্য দিয়ে এমন ক'রে ঢাকতে হবে যে ভিতরে কঙ্কালের কাঠামো আছে বোঝাই যাবে না—যেমন দেব প্রতিমাতে বোঝা যায় না—তত্ত্বের কঙ্কাল যে একটা আছে তা তোমরা সমালোচকরা অধ্যাপকরা খুঁজে বার করবে—সেই আবিষ্কারের আনন্দইত সমালোচনার আনন্দ। একটা তত্ত্ব কঙ্কাল স্বরূপ না থাকলে লেখাটা খাড়া থাকবে কিসে? একেবারে ভগীরথ হয়ে যাবে যে! শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্য মাত্রেরই অন্তরালে একটা তত্ত্বের কঙ্কাল থাকে।

আমি—হাঁ, চিত্রাঙ্গদার মত কাব্যেও সেইরূপ একটা তত্ত্বের কঙ্কাল আছে। তাই কাব্যখানা খাড়া হয়ে চলছে। আচ্ছা, রচনাটি যদি চিত্রাত্মক হয়, তবে তার অন্তরালেও কি তত্ত্ব থাকবে?

শরৎচন্দ্র—মূর্তির অন্তরালেই তত্ত্বের কঙ্কাল চাই—চিত্রের আবার কাঠামো কি? চিত্রকে ত খাড়া হতে হয় না—চিত্র দেওয়ালের গায়ে আশ্রয় পায়। চিত্রের জন্য চাই পটভূমিকা। সে পটভূমিকা হবে এমন একটা সামাজিক পরিবেষ যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। আমার চিত্রাত্মক লেখার পরিবেষ তাই আমার আবাল্য পরিচিত হুগলী জেলার মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবার। চিত্রাত্মক রচনার নায়ক নায়িকাকে সাথে আমি দেশ ছাড়া ক'রে বর্মায় এনেছি? বর্মার সমাজ আমার সুপরিচিত।

আমি—এ বিষয়েও কি আমাদের তরুণ লেখকেরা ভুল করেছে?

শরৎচন্দ্র—ভুল করছে বৈ কি কেউ কেউ, যে ইঙ্গবঙ্গ সমাজকে রাজপথে লেখক দেখেছে তার বেশী জানে না—সেই ইঙ্গবঙ্গ সমাজকে যারা পটভূমিকা করছে তারা ভুল করছে। সেজন্য দরকার নানা সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশা—কারণ এক সমাজ হতে পাত্রপাত্রীকে অন্য সমাজে নিয়ে যেতে হয়। একটা সমাজের মধ্যে ঘুরালেই বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় না। নিম্ন শ্রেণীর লেখকদের কথা লিখব অথচ তাদের সঙ্গে মিশতে ঘৃণা বোধ করব। জীবনে কলমের দাগ বইব না, স্বচক্ষে কিছু দেখব না. পরের মুখে ঝাল খেয়ে, বই পড়ে, তাল ভাষা জেনে নেব। আশ্রমে গিয়ে গুরুর সেবা করব, ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলব, তাতে কবিত্ব লেখা চললেও চলতে পারে, জীবন্ত চরিত্র নিয়ে কথাসাহিত্য রচনা চলে না। সাহিত্যিক শক্তি যোগবলে বা প্রাণায়াম ক'রে পাওয়া যায় না। শুচিবাগীশরা কথাসাহিত্য না লিখে গীতার ভাষ্য, কিংবা যোগবাশিষ্ঠের অনুবাদ করলেই পারে।

আরে বাবু অশুচি কথাই যদি লিখতে হয় তাতেই বা কি? তোমার জবানী ত নয়, অশুচি নায়ক নায়িকার মুখ দিয়ে ত সে বলা হচ্ছে। যার মুখে যে কথা সাজে তাই বসানো হচ্ছে! একটা লম্পটের মুখে মোহমুদ্গর বা একটা সতীর মুখে পতিতার মত কথা না বললেই হ'ল। তাসা যাই হোক, নিজের প্রাণের গভীর অনুভূতিই, পাত্রপাত্রীর বুকে সঞ্চার করতে হবে।

আমি—আপনি তাই করেছেন বলেই ত অনেকে কোন চরিত্রকে আপনার আত্মচরিত্র মনে করে।

শরৎচন্দ্র—তা করুক, তা করলেও বুঝতে হবে চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়েছে, কারণ আমি নিজে জীবন্ত। আর খুব মিথ্যেও ত নয়। এমন চরিত্র আমি খুব কমই আঁকি যার মধ্যে আমি সহজে প্রবেশ না করতে পারি। আমার জীবনে একটা পাষণ্ড হতে একজন সাধু সজ্জন পর্যন্ত সবই যে আছে। আমি বহু জীবনের মধ্য দিয়ে স্তরে স্তরে উঠেছি। বহু জীবনের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি আমার মধ্যে রয়ে গেছে।

আমি—আপনার মত ত একজন সাহিত্যিক বড় সাহিত্যিক হবার জন্য নিজের সামাজিক জীবন ত্যাগ ক'রে বহু জীবনের সঙ্গে নিজেকে demified ক'রে বেড়াতে পারেনা; সমাজের সবরকম স্তরে টিকিট কিনে আবাবর্ত ভ্রমণের মত ভ্রমণ করে জ্ঞান অর্জন করে আসতে পারে না। স্বভাবতই আপনার জীবন দৈবের ঘাত-প্রতিঘাতে নানা দশা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে নানা দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।

শরৎচন্দ্র—হাঁ এটাকেই আমি বিধাতার করুণা মনে করি। তা না হ'লে চেষ্টা ক'রে আমার দ্বারাও ভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করা সম্ভব হ'ত না একথা আমি স্বীকার করি। আজকাল একদল সাহিত্যিক ইচ্ছা করে লেখায় নোংরামির প্রশ্রয় দিচ্ছে। আরে বাপু—নোংরামির তোরা কি জানিস। তোদের বিদ্যে ত

কলেজের কমনরুমে—নয়ত চায়ের আড্ডায়। কোথায় কোথায় নোংরা যে আছে তার সন্ধানও ত জানিস না বাপু। সন্ধান জানলেও সবই কি সাহিত্যে দেবার কথা? কত যে তা হতে বাদসাদ দিতে হয় তাও জানার দরকার—নোংরা জিনিষগুলো নিম্নশ্রেণীর লোকদের নিত্যসঙ্গী বলে দিতে গেলেই সাহিত্য হয় না—উচ্ছৃঙ্খলতাই হয়।

আমি—অনেকে প্রচলিত সমাজ শাসনের বিদ্রোহকেই সাহিত্যে নূতনত্ব সৃষ্টি মনে করছে।

শরৎচন্দ্র—আমাদের সমাজ সংস্কারে অনেক গলদ আছে স্বীকার করি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে আমি অন্যায় মনে করিনা। কিন্তু Young Bengal যা মনে করেছিল. হিন্দুর যা কিছু, মার সিঁদুর পরা হিন্দুর সতীলক্ষ্মী. মেয়েরা পর্যন্ত—হিন্দুর ভাষা ভূষা পর্যন্ত পরিত্যাজ্য, তেমনি হিন্দুর যা কিছু সবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে কখনো সৎসাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। সাহিত্যিকের উচিত ধ্বংস বুদ্ধির সঙ্গে নয় সংস্কার বুদ্ধির সঙ্গে অগ্রসর হওয়া।

আমি—আপনিই শেষ প্রশ্নে এইরূপ বিদ্রোহের কথা বলেছেন।

শরৎচন্দ্র—তুমি ছাই বুঝেছ শেষ প্রশ্ন। আমি ধ্বংসমূলক বিদ্রোহের কথা বলিয়েছি কার মুখ দিয়ে? তার জন্ম কোথায়? তার শিক্ষা দীক্ষা কি? সে কার মেয়ে? হিন্দু সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? সে ত অমনি কথাই বলবে। কমলকে ত আর একটা মহীয়সী মহিলা ক'রে তুলিনি যে সতী নারীরা তার বচনগুলো বেদবাক্য ব'লে মেনে নেবে।

আমি—এরূপ চরিত্র সৃষ্টির সার্থকতা কি তবে?

শরৎচন্দ্র—একটা বিচিত্র চরিত্র সৃষ্টি করে গতানুগতিক সমাজে আলোড়ন আনা। উল্টো কথাগুলো বলিয়ে সবাইকে ভাবতে শিখানো।

আমি—অর্থাৎ বলতে চান Thesis এর পাশে antithesis এর অবতারণা ক'রে Synthesis আনবার চেষ্টা।

শরৎচন্দ্র—তা হলেই দেখ—আমার চেষ্টাটা সংস্কার-মূলক। দুটা বিপরীত দিকের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য সৃষ্টির প্রেরণা দেওয়া।

আমি—কিন্তু কমলে বড় বেশী Emphasis পড়ে গিয়েছে।

শরৎচন্দ্র—একটা চরম দিক দেখতে গেলেই ত Emphasis দিতেই হবে। কিন্তু এই যে করুণকে অতিকরুণ করা, বীভৎসকে অতিবীভৎস করা, লোভীকে অতিলোভী করা, দুর্দান্তকে অতিদুর্দান্ত করা, মহৎকে মহত্তম করে দেবতা বানানো—ক্লেশকে দুর্বিসহ ক্লেশে পরিণত করা এ Emphasisএর সার্থকতা কি?

আমি—সার্থকতা এই—চোখে আঙুল না দিয়ে দেখালে আমাদের দেশের লোক দেখে না। অতিরিক্ত রঙ না চড়ালে আমাদের পাঠকদের চোখে পড়ে না। যেমন পাঠক সাহিত্যও তেমনি হবে।

শরৎচন্দ্র—কেন তা হবে? দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য অথবা অকারণে Emphasis দিয়েও আর্ট নষ্ট করা যায় না। পাঠকের রুচির অনুগত হ'য়ে চলবে কেন? পাঠকের রুচিই বদলে দেব। বঙ্কিম, রবীন্দ্র তাই করেছেন।

আর একটা কথা—Emphasis দিয়ে নয় এমন ষ্টাইলে এমন টেক্‌নিকে লিখতে হবে যেন পাঠকের উদাসীন মনকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। সেজন্য গোড়ার দিকে যতদূর সম্ভব interesting picture দিতে হবে যাতে পাঠক খানিকদূর পড়ে না থেমে আগ্রহের সঙ্গে আগায়। মাঝখানে uninteresting বাদানুবাদ তত্ত্ব বিচার ইত্যাদিও চালানো যায়। গোড়ার দিকে কেবল যা সত্য তাই দিতে হবে—পরে অনেক মিথ্যাও চালানো যেতে পারবে। পাঠককে কথায় কথায় ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পারলে Emphasis দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

আমি—শ্রীকান্তের ১ম পর্বে আপনি তাই করেছেন বটে—কিন্তু ইন্দ্রনাথে একটু Emphasis পড়ে গিয়েছে বোধ হয়।

শরৎচন্দ্র—কিছুমাত্র না—যা সত্য, তাই বলা হয়েছে। তবে এখানে facts are stranger than fiction. ইন্দ্রনাথকে দেখলে একথা বলতে না।

সর্বোদয়

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

'সর্বোদয়' একটি বৈপ্লবিক শব্দ। পরিবর্তন বা রূপান্তর মাত্রই বিপ্লব নয়, মূল্যবোধের (values) পরিবর্তনকে বিপ্লব বলা যেতে পারে। তাপের তারতম্যে বরফ অথবা বাষ্পে জলের রূপান্তর ঘটে। কিন্তু লবণাক্ত জলে পাতন ক্রিয়ার পর যদি তিনি মিশ্রিত করা যায় তবে বলা যেতে পারে যে, জলের স্বাদে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। সর্বোদয়ে এই রকম এক বিপ্লবের, সমাজ-ব্যবস্থায়, রাষ্ট্র-কাঠামোর এমনকি প্রচলিত ভাবধারার আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে।

সর্বোদয় কথাটির একটু ইতিহাস আছে। Ruskinএর Unto this last বইটির প্রভাব গান্ধীজীর জীবনে অত্যন্ত প্রবল; এই বইটি থেকে তিনটি মূল শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন,—"(১) সকলের কল্যাণের মধ্যেই ব্যক্তির কল্যাণ নিহিত, (২) সকলেরই যখন কাজ করে নিজের জীবিকা অর্জনের অধিকার আছে তখন একজন উকিলের কাজের মূল্য, একটি নাপিতের কাজের মূল্যের সমান ও (৩) শ্রমজীবীর অর্থাৎ কৃষকের ও কারিগরের জীবন মর্যাদাকর।" গুজরাটি ভাষায় এই বইটির ভাবানুবাদ প্রকাশ করে তিনি নাম দিলেন সর্বোদয় অর্থাৎ সকলের কল্যাণ। প্রচলিত মতবাদে দেখতে পাই, 'অধিক সংখ্যক লোকের অধিকতম কল্যাণের' (greatest good of the greatest number: কথাই স্বীকার করা হয়েছে। এই মতবাদের ব্যবহারিক রূপে ৫১ : ৪৯এর অনুপাতকে মেনে নিতে হয়। অপর দিকে সকলের সর্বোত্তম কল্যাণের পথ-ই হল সর্বোদয়ের পথ।

প্রশ্ন হবে, এ কি সম্ভবপর? মানুষের মধ্যে বিভিন্নতা আছে, বৈচিত্র্য আছে, সুতরাং সকলের কল্যাণ কি করে হবে? কথাটি সত্য সন্দেহ নেই, আর এই সত্যের স্বীকৃতি-ই রয়েছে সর্বোদয় ভাবধারার মধ্যে। সকল মানুষ একজাতীয় রুচি সম্পন্ন নয়, একটি মাত্র করমূলার সমগ্র মানব সমাজের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। একটি নির্দিষ্ট আবর্তের মধ্যেই মানব-সমাজের বিবর্তন হয় না। মানুষের জীবনও ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত নয়। তবু মানব-জীবনের ও মানব-সত্তাতার মধ্যে একটি সাধারণ সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। তা হ'ল মানুষের নিজেকে প্রকাশ করার বিকশিত হবার আকাঙ্ক্ষা। সৃজনেচ্ছা মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি। এই আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তিই মানুষকে সমাজবদ্ধ করেছে। সমাজ ব্যতীত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে না—জৈবিক প্রয়োজনে যেমন মানুষের পক্ষে সমাজের প্রয়োজন তেমনি স্ব-প্রকাশের জন্যও মানুষের কাছে সমাজ অত্যাবশ্যক। এজন্যই মানুষ সমাজকে সুন্দর থেকে সুন্দরতর করতে চেয়েছে। যে-সমাজে তার জৈবিক প্রয়োজনের-ই শুধু সমাধান হবে সেই সমাজ মানুষের কাম্য নয়; প্রার্থিত সমাজ হল সেই সমাজ যেখানে সে বাঁচবার অধিকার পাবে, প্রাণে ও মনে মানুষ যেখানে জীবিত থাকবে। বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্য কিন্তু এই প্রার্থিত সমাজের পথে অন্তরায় নয়। বিভিন্নতার মধ্যে একটি ঐক্যভাব বিদ্যমান। প্রতি-সরণের মধ্য দিয়ে সূর্যরশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। কিন্তু তাদের উৎস একটি-ই। মানুষের জীবনেও এইরকম একত্ব রয়েছে। সর্বোদয় ভাবধারায় এই অন্তর্নিহিত একত্বকে স্বীকার করা হয়েছে। বৈচিত্র্যকে বিচ্ছেদ মনে না করে একটি সম্পূর্ণতার উপাদান রূপেই গণ্য করা হয়েছে। মানুষের শুভিচ্ছতাও

তো এই কথার সমর্থন করে। তাই সমাজ গঠনে এই মূলনীতির অঙ্গীকৃতি থাকলে ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে আবদ্ধ হতে হবে। সমাজে ব্যক্তি মানুষের পূর্ণ বিকাশের যেমন সুযোগ থাকবে তেমনি সমাজের সুসংবদ্ধতার জন্য ব্যক্তি মানুষ স্বেচ্ছায় সমাজের অনুজীবী থাকবে। সমষ্টি ও ব্যষ্টির পারস্পরিক অবলম্বন হবে সমাজের মূলসূত্র। বিজ্ঞান-জগতে জড় ও তেজের পরস্পর রূপান্তরের সূত্র আজ আবিষ্কৃত হয়েছে। সমাজ জীবনেও এই মূলনীতির স্বীকৃতি থাকা দরকার। তাহলে সকলের কল্যাণের অবকাশ অলস কল্পনামাত্র হবে না। তবু একথা স্বীকার করতে হয়, পূর্ণতালাভ সম্ভবপর নয়। লক্ষ্য যদি পূর্ণতার প্রতি থাকে আর প্রচেষ্টা যদি আন্তরিক হয় তবে সিদ্ধিলাভের অনুভূতি হবে। "লক্ষ্য আমাদের কাছ থেকে অনুক্ষণ সরে যায়।··· উদ্যমের মধ্যে তৃপ্তি, প্রাপ্তির মধ্যে নয়। পূর্ণ উদ্যম হল পূর্ণ জয়"—গান্ধীজীর এই উক্তি অত্যন্ত বাস্তবিক।

এজন্য সর্বোদয় সমাজের রূপ হল সহযোগী সমাজ। সমাজের আর্থিক সংগঠনের বুনিয়াদ প্রতিযোগিতা না হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সমাজ গঠিত হবে। অর্থনীতি জীবনের একমাত্র পরিচয় নয়, কিন্তু সমাজের একটি বড় অঙ্গ, একথা স্বীকার করতে হয়। তাই জীবনের পূর্ণ বিকাশের উপযোগী করেই আর্থিক সংগঠন প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতা প্রবৃত্তির উপর সমাজের সংগঠন থাকলে সমাজ ও ব্যক্তি মানুষের পারস্পরিক অবলম্বনের সূত্রটি হারিয়ে যাবে। এজন্য আর্থিক সংগঠন থেকে এই প্রবৃত্তিকে যতদূর সম্ভব দূর করতে হবে। অর্থনীতির মূলসূত্র অভাব-চাহিদা-ও -যোগান করলে প্রতিযোগিতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাবে। অভাবের বিশেষত্ব-ই হল যে, তার সীমা নেই। তাই অভাবের পরিতৃপ্তি সাধনেরও শেষ নেই। কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে জীবনকে জটিল করে তোলার চেষ্টা এই ব্যবস্থায় বিদ্যমান থাকে। আর তাই প্রতিযোগিতার সংগ্রামে অবশ্যম্ভাবীরূপে বৈষম্যের আবির্ভাব হয়। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এই বৈষম্যের গতি কিছু পরিমাণে রুদ্ধ করা যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রে ব্যক্তি-মানুষ সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রযন্ত্রের এক একটি নিষ্প্রাণ অংশে পরিণত হয়। সেখানে মানুষ প্রাণে বাঁচে কিন্তু মনে মরে যায়। এজন্য অর্থনীতির বা আর্থিক সংগঠনের ক্ষেত্রে অভাবকে বড় করে দেখলে চলবে না। অভাব ও প্রয়োজনের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। প্রয়োজনের সমাধানই হবে সহযোগী সমাজের লক্ষ্য।

স্বাবলম্বী সমাজই হল সর্বোদয় সমাজের রূপ। মানুষই সব কিছুর চরম মানদণ্ড। মানুষ তার প্রয়োজনের সমাধানের জন্য সমাজের উপর নির্ভর করে। তাই এই অবলম্বনের ক্ষেত্র সম্ভবমত সংক্ষিপ্ত করা আবশ্যক। উৎপাদন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত না করে স্বাবলম্বী গ্রামরাজ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ গ্রামে গ্রামেই প্রস্তুত হবে, বৃহৎ উৎপাদনকেন্দ্রগুলি রাষ্ট্র বা সমবায় দ্বারা পরিচালিত হবে। উৎপাদন কেন্দ্রীভূত হলে বণ্টনও কেন্দ্রীভূত হতে বাধ্য। আর এই দুটির জন্যই জটিলতা ও বৈষম্য সৃষ্টি হয়। তাই যতদূর সম্ভব অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ হবে সর্বোদয়ের লক্ষ্য। উদ্বৃত্ত অর্থ (surplus value) শোষণ করে রাষ্ট্রের কল্যাণ করার চেষ্টা নিছক মরীচিকা মাত্র। কারণ সমাজের একটি অঙ্গে শোষণ থাকলে অন্যান্য অঙ্গেও তা সংক্রামিত হবে। এজন্য শোষণ-মুক্ত সমাজ গঠন করতে হলে অর্থকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে শ্রম-কেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। অর্থ উপার্জনের শক্তিতে মানুষে মানুষে আকাশ পাতাল ভেদ। তাই সাম্য প্রতিষ্ঠার মূল কথা হল অর্থকেন্দ্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন করা। শ্রমের ক্ষেত্রে ভেদ যম সুতরাং শোষণমুক্ত ও সাম্যযোগী সমাজ গঠন করতে হলে শ্রমকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রয়োজন। পুঁজি থাকবে না তা নয়, কিন্তু পুঁজি যেন মানুষের অভিভাবক না হয়। সর্বোদয় সমাজে আর্থিক পরিকল্পনার তিনটি রূপ—গৃহোদ্যোগ, গ্রামোদ্যোগ ও রাষ্ট্রোদ্যোগ। বৃহৎ যন্ত্রের

(পরবর্তী অংশ ২০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

১২৬৩ সনের অগ্রহায়ণ মাস। দুইটি বাঙালী ব্রাহ্মণ হাঁটা-পথে মীরাট যাইতেছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠের নাম মৃত্যুঞ্জয়, কনিষ্ঠটি তাঁহার ভাগিনেয়—নাম হীরালাল। মৃত্যুঞ্জয়ের বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি, হীরালাল সতেরো পূর্ণ হইয়া আঠারোয় পা দিয়াছে—তরুণ বালক মাত্র।

আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি সে দিনটা হীরালালের সুপ্রভাত হয় নাই। ভোর হইতেই মামা বকাবকি ও গালাগালি শুরু করিয়াছেন। এখনও এই, বেলা প্রথম প্রহর পার হইবার মুখেও, তাহা বন্ধ হয় নাই। মাতুলের রাগের কারণ মুখ্যতঃ এই, তিনি বহুদিন পশ্চিমে চাকরী করিতেছেন, এখানকার শীত সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা আছে! তিনি চাহিয়াছিলেন একটি রেজাই আনিতে। (পশ্চিমে লেপকে রেজাই বলে)—এই অর্বাচীন ভাগিনেয়টি তাহা আনিতে দেয় নাই। তরুণ ভাগিনেয় থাকিতে মামা আর কিছু মাল বহিবেন না—বোধকরি ইহা বুঝিয়াই সে প্রবল আপত্তি তুলিয়াছিল। বলিয়াছিল, 'এই ত সবে শীতের শুরু—এখন কাঁথাতেই বেশ ভাল চলে যাবে। আর ক-টা দিনই বা, কাশী পর্যন্ত যখন রেল গাড়ীতে যাচ্ছি তখন ভাবনা কি, বাকী পথ ত শুনেছি সাত দিনে মেরে দেওয়া যায়।'

কিন্তু বাংলা দেশে শীতের শুরু হইলেও, পশ্চিমে ইতিমধ্যেই জাঁকাইয়া শীত পড়িয়াছে, জলে এমন কামড় লাগিতেছে যে সকালে সেদিকে ঘেঁষা দুষ্কর। সূর্যোদয়ের পরও স্নান করিয়া সন্ধ্যা করিতে বসিলে আঙুল বাঁকিয়া যায়। কাঁপুনি শীতে ঘুম হইতেছে না ভাল করিয়া। গতকাল যে চটীতে ছিলেন সে চটিওয়ালা দয়া করিয়া দুখানা কম্বল দিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে হিতে বিপরীতই হইয়াছে। কম্বল দুইখানি শিশুতে বোঝাই ছিল—ঘুমন্ত হয়ই নাই—সারারাত বসিয়া দুইজনে গা চুলকাইয়াছেন। আরও আশঙ্কা তাঁহাদের কাঁথাতে বা লিয়ানেও বোধকরি দুই চারিটি ছারপোকা চালান হইয়া গেল। সেই ভয়ে ব্রাহ্মণ ভোর বেলা উঠিয়াই কাঁথাগুলি নিজে হাতে করিয়া রোদে মেলিয়া দিয়াছেন এখনও কত দিন রাত জাগিয়া কাটাইতে হইবে কে জানে। পথ সাত দিনে না হউক দশ দিনেই শেষ করা যাইত—কিন্তু দল ছাড়া পথ চলা নিরাপদ নয়। তাঁহারা যে দলের সহিত যাইতেছেন, সে দলে তিন চারটি বৃদ্ধ এবং সদ্যঃপ্রসূতিনারী আছে। তাহাদের গরুর গাড়ীতে চাপানো হইয়াছে। ফলে দৈনিক দুই বেলাতে সাত আট ক্রোশের বেশী হাঁটা যাইতেছে না।

এগুলি মুখ্য কারণ।

বিরক্তির কতগুলি গৌণ কারণও আছে।

এবার তাঁহার স্ত্রীর সুপারিশ ছিল ছোট শ্যালকটির

গুরু। কিন্তু বিধবা বোন কান্নাকাটি করায় তাহাকে আনিতে পারেন নাই। আসিবার সময় স্ত্রীর অপ্রসন্ন মুখ দেখিয়া আসিতে হইয়াছে। আগেকার দিন হইলে দুইজনকেই আনা চলিত কিন্তু সে সব দিন আজকাল আর নাই। সাহেব স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন, 'তোমরা এক একবার দেশে গিয়ে যদি তিন চারটে করে বেকার ছোকরা ধ'রে আনো ত আমি নাচার। অত চাকরী আমার কাছে নেই। তাহ'লে কিন্তু সিপাইর চাকরী নিতে হবে। একটি ক'রে এনো—চেষ্টা করব। Remember, one at a time.

কমিশারিয়াটের চাকরী—মেজর সাহেবের সুপারিশ ছাড়া হইবার যো নাই। আর সাহেবও এক কথার মানুষ। সুতরাং শালাকে আনিতে ভরসা হয় নাই। তাহার এখন ষোল বছর বয়স। এধারে ভাগ্নে আঠারোয় পড়িয়াছে। বোন সেই যুক্তিতেই ঝিঁঝিয়া গিয়াছেন, 'সতেরো পার হ'ল দাদা, এখনও যদি উপায় করতে না পারে ত কবে করবে? নীলাম্বরের ত বেটের এই ষোল সবে—দুবছর পরেই নিয়ে যেয়ো না। চাই কি, ওর এইখেনে কলকাতাতেও হয়ে যেতে পারে। ওর ত মাথার ওপর বাপ আছেন, তোমার ভাগ্নের কে আছে বলো?'

অকাট্য যুক্তি। তবু মনটা ঠিক খুশী হয় না। বোনের সহিত ঘর করিতে হয় না। স্ত্রী গৃহিণী। ইহার শোধ তুলিতে তাঁহার এত কষ্টের পয়সা কতগুলি যে পিত্রালয়ে চালান করিবে, তাহার ঠিক কি। মৃত্যুঞ্জয়ের আশঙ্কা সেইখানেই।

এছাড়াও বিরক্তির কারণ আছে।

টানা রেলগাড়ী চলিতেছে আজকাল। অনেকখানি আগাইয়া যাওয়া চলিত। তাহাতে বাদ সাধিলেন স্ত্রী। উড়ানির প্রান্ত চাপিয়া ধরিয়া মাথার দিব্য দিলেন 'কাশীর পর রেলগাড়ীতে আর বাঙ্গালীর যাবার যো নেই, আমি বেশোমশাইয়ের কাছে শুনেছি। গোয়ারা নাকি বড্ড মার ধোর করে। ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীশ্চান করে দেয়। তুমি আমার বাকি দিয়ে যাও যে—কাশীর পর হাঁটা পথে যাবে, নয়ত নৌকোয় যাবে।'

'হ্যাঁ—তা যাবে না! আমার বাবার জমিদারী আছে কি না। নৌকোয় যাবে! তাছাড়া নৌকোয় আজকাল হামেশা ডাকাত পড়ছে।'

'বেশ, তাহ'লে হাঁটা পথে যেও। না, না—আমায় বাকি দিয়ে যাও। নইলে আমার মাথা খাবে মরা মুখ দেখবে!'

অগত্যা 'বাকি' দিতে হইয়াছে। কিন্তু দোষ যাহারই হউক সে ঝালটাও বেচারা হীরালালের উপর পড়িয়াছে।

সকাল হইতেই চলিয়াছে গজগজানি, 'তোমার বাপু যত বিপরীত কাণ্ড, বুঝেছ? তোমার বয়সে আমরা স্বরূপগঞ্জের হাট থেকে ছমণ চালের বস্তা মাথায় করে এনেছি। এত বড় সাজোয়ান ছেলে, বল্লম যে, একখানা রেজাই নিয়ে যাই তা নয়। বলে ভারী হবে! কটা দিনই বা, কাঁথা নিয়ে চলুন? না হয় আমিই বইতুম রে বাপু। এখন কাঁথায় শীত ভাঙছে? তাই দে না হয়, তোর কাঁথাখানাও—কেমন বয়সের জোর দেখি। থাকগে খালি গায়ে। তাও ত দেখি তোমার শীত আমার চেয়ে বেশী। চান করতে নামাবে এক প'র বেলায় তাও হি-হি করো। বলি মায়ের দুধ খেয়েছিলে, না খাওনি?'

স্নান, আহ্নিক সমস্তর ফাঁকে ফাঁকেই চলিয়াছে আক্রমণ। হীরালালের সুগৌর মুখ ক্ষণে ক্ষণেই রক্তবর্ণ ধারণ করিতেছে। এতখানি বয়স পর্যন্ত খেলাধূলা করিয়া বেড়াইয়াছে, কখনও মার কাছে বকুনি খায় নাই। বার বারই তাই তাহার চোখে জল আসিয়া যায়। কিন্তু এখানে অভিমানের কোন মূল্য নাই বলিয়াই সে প্রাণপণে সেই উদ্গত অশ্রু দমন করে।

সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া পশ্চিমের তোকা সোনালী রঙের বুটি ভর্তি দুই ডেলা গালে ফেলিয়া মৃত্যুঞ্জয় একঘটি গলায় জল প্রাণপণে দাঁত বাঁচাইতে বাঁচাইতে উঃ আঃ শব্দ করিয়া গলায় ঢালিয়া দিলেন

তাহার পর অকস্মাৎ হীরালালের উপর আর এক ধমক কাঁজিয়া উঠিলেন, 'বলি নবাব পুত্তুরের মত বসে থাকলেই চলবে? কাঠ কুঠো আনতে হবে না! উনুন ধরাতে হবে না—না তাও আমাকে করতে হবে? তোমাকে সঙ্গে আনাই আমার বরমারি হয়েছে। চাল ডাল চেয়ে এনেছ দোকানীর কাছ থেকে? বাসন-গুলো একবার গঙ্গামাটি বুলিয়ে নিয়েছ?'

হীরালাল নিঃশব্দে চাল ডালের পুঁটুলিটা মামার সামনে রাখিয়া উনান ধরাইতে বসিল। মামার আগে সে স্নান ও সন্ধ্যা গায়ত্রী শেষ করিয়াছে। বটগাছের ছায়ায় রান্নার স্থান নির্বাচন করিয়া জল-হাত দিয়া লেপিয়াও রাখিয়াছে। উনান অর্থে এখানে তিনটি নুড়ি পাথর। তাহাই সাজাইয়া সে কাঠ ধরাইতে লাগিল। দোকানী ঘুঁটের উপর করিয়া কিছু আংরা দিয়াছে, তাহাতেই প্রাণপণে ফুঁদিতে দিতে তাহার চোখ-মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

মামা কিন্তু তখনও থামেন নাই।

'বলি পাথর তিনটে ধুয়েছিলে বাপু, না কি? কে না-কে হয়ত রেঁধে ফেলে দিয়ে গেছে—সন্তিক জাতের সক্‌ড়ি খাবো নাকি শেষ পর্যন্ত?'

'পাথর তিনটে যে চান করার আগেই গঙ্গা থেকে ধুয়ে এনে রাখলুম মামা।'

'কে জানে বাপু, তোমাদের কি সে আক্কেল আছে? আক্কেল থাকলে আর এমন কাণ্ড হয়। লোকে কথায় বলে এক ব্যাগুন দুনে পোড়া! একখানা কাঁথা তরসা তাও গেল পিণ্ডতে বোঝাই হয়ে। পিণ্ড কি আর রোদে মরে? এখনও এত পথ বাকি,—এখন থেকে রাতের বেলা ধুনি জ্বালিয়ে সারারাত বসে কাটাও, আর কি! ঘুম আর হচ্ছে না—সে দফা গয়া।'

অতিকষ্টে কাঠ ধরিল। মৃত্যুঞ্জয় গজ গজ করিতে করিতে রান্না চাপাইলেন। কিন্তু ডাল নামাইয়া সেই হাঁড়িতেই ভাত চাপাইতে গিয়া আর এক বিভ্রাট বাধিল। জলের ঘটি হইতে আলগোছে জল ঢালিতে গিয়া ঘটিটা হাঁড়ীতে ঠেকিয়া গেল।

'এই নাও! ঘটিটা গেল আবার সক্‌ড়ি হয়ে।··· যাও দিকি বাবু চট্‌ করে ঘটিটা মেজে আর এক ঘটি জল নিয়ে এসো দিকি, নাও—হাঁ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না হাঁদার মত। শরীরটা একটু নাড়ো।'

রান্না এখনও চলিতেছে, শেষ অবধি ঘটিটা মাজিয়াই খুলিতে পোরা হইবে সুতরাং এখন ঘটিটা সক্‌ড়ি হইয়া গেলে এমনই কি মহাভারত অশুদ্ধ হইবে হীরালাল তাহা বুঝিল না, তবে মামার হুঙ্কারটা বুঝিল, সে দিশাহারা হইয়া ছুটিল গঙ্গাতীরে মামার অনবধানতার প্রায়শ্চিত্ত করিতে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে দিনটা তাহার সুপ্রভাত হয় নাই, সেখানে আর এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। বাঁধা ঘাট নয়—নরম এঁটেল মাটির উঁচু-নিচু পাড়, তাহারই উপর একটা উঁচু অংশ হইতে হাত বাড়াইয়া ধুইতে গিয়া ঘটিটা হাত হইতে পড়িয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে অনেক জলের ভিতর গিয়া পড়িল। শীতকালের কাক চক্ষু জল—বহুবার মাজা ঘটিটা দেখিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। এত দূরেই পড়িয়াছে যে এক কোমর জলে না নামিলে তাহার উদ্ধারের আশা নাই।

মুহূর্তমাত্র ইতস্তত করিল সে, গিয়া কাপড়টা ছাড়িয়া শুষ্ক গামছা পরিয়া আসাই উচিত। কিন্তু সেই অত্যল্প কালের মধ্যেই অসহিষ্ণু মামার উগ্রমূর্তি চোখের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল। সে আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া কোমরে উড়ানি বাঁধা অবস্থাতেই জলে নামিয়া পড়িল। কাপড় এবং উত্তরীয় দুইটিই ভিজানোর কোন প্রয়োজন নাই—একথা ভাবিবারও সময় মিলিল না।

অদৃষ্ট মন্দ হইলে বিভ্রাট বাড়িয়াই যায়; এঁটেল মাটির ঘাট, যেখানে সকলে স্নান করে সেখানে খানকতক ইট বিছানো আছে—তাড়াতাড়ি হইবে বলিয়া হীরালাল সেখানে যায় নাই—সামনেই এক জায়গায় নামিয়া পড়িয়াছে। জলে পা পিছ্‌লাইয়া অকস্মাৎ গভীর জলে গিয়া পড়িল। একে সে সাঁতার

জানিত না, কলিকাতার ছেলে সাঁতার কাটার সুবিধা হয় নাই—তাহার উপর তখনকার পশ্চিমের গঙ্গা এখনকার মত ছিলনা তখন বড় বড় জাহাজ চলিত—দেখিতে দেখিতে হীরালাল ডুব জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে খরস্রোতে ভাসিয়া চলিল।

২

তখনকার দিনে 'রইস' বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা নৌকায় যাতায়াতই পছন্দ করিতেন। তাই নদীর বুকে নানা ধরণের বজরা নৌকা হামেশাই ঘোরাফেরা করিত। অদৃষ্টক্রমে হীরালাল যেখান দিয়া ভাসিয়া যাইতেছিল তাহার কাছেই একটি বজরা অনেকক্ষণ হইতে অলস মন্থর ভাবে ভাসিতেছিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া অনায়াসেই অনুমান করা চলে যে, তাহার এখান হইতে যাইবারও ইচ্ছা নাই—আবার কূলে ভিড়িতেও আপত্তি আছে। মাঝি ঠিক নোঙর করে নাই কিন্তু হাল ধরিয়া বসিয়া নৌকাটা যতদূর সম্ভব একস্থানেই রাখার চেষ্টা করিতেছিল। কোন ধনী লোকের বজরা হইবে, কারণ জানালায় জানালায় তেলছেটের পর্দা লাগানো। সমস্ত বজরাটিতে লাক্ষার রং, দরজা ও জানালার মাথায় হাতীর দাঁতের কাজ করা। দাঁড়ি ও মাঝিদেরও বেশভূষা সাধারণ মাঝিদের হইতে একটু ভিন্ন ধরণের, কিন্তু মূল্যবান।

হীরালাল এ বজরা লক্ষ্য করে নাই, করিবার কথাও নয়। কারণ এমন বজরা নিত্য কত যায় গঙ্গার বুকের উপর দিয়া। এ কয়দিন দেখিয়া দেখিয়া সে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু নৌকার মালিক বা আরোহী তাহাকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কারণ তিনি বহুক্ষণ হইতে পর্দার ফাঁকে দূরবীন লাগাইয়া বসিয়া আছেন এবং নদী-তীরের নরনারীদের লক্ষ্য করিতেছেন। অলস কৌতূহল বশত হীরালাল যখন হইতে ঘটি হাতে নদীতীরে নামিয়াছে তখন হইতে তাহাকেও লক্ষ্য করিয়াছেন। তাহার অগাধ জলে পড়িয়া যাওয়াও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই, কিন্তু তিনি গোলমাল বা চেঁচামেচি করেন নাই। তাঁহার অব্যর্থ সন্ধানী দৃষ্টিতে তিনি চকিতের ভিতর দেখিয়া লইয়াছেন যে, স্রোতের যে গতি তাহাতে বালকটি এইখান দিয়াই ভাসিয়া যাইবে।

আরোহী ঠিক নয়—আরোহিনী। কারণ দূরবীন হাতে যে বসিয়াছিল সে স্ত্রীলোক।

স্ত্রীলোক তবে ঠিক সাধারণ স্ত্রীলোকের মত নয়। বুদ্ধি বা তৎপরতা কোনটারই যে বিন্দুমাত্র অভাব নাই তাহা পরবর্তী আচরণেই ধরা পড়িল।

সে কাহাকেও ডাকিল না, মুহূর্তমাত্র ইতস্তত ও করিল না। চোখের নিমেষে গায়ের ওড়নাটা ফেলিয়া দিয়া জানালা দিয়াই জলে লাফাইয়া পড়িল এবং একহাতে জানালার চৌকাঠটা ধরিয়া আর এক হাত বাড়াইয়া মজ্জমান হীরালালের চুলের মুঠিটা ধরিয়া টানিয়া আনিল।

ইতিমধ্যে জলে পড়ার শব্দে মাঝি মাল্লারা ছুটিয়া আসিয়াছে। তাহারা হীরালালকে টানিয়া তুলিল। রমণীটি কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা করিল না, অবলীলা-ক্রমে, অত্যন্ত লঘু সঞ্চারে নিজেই লাফাইয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার মুখ আগের মতই প্রশান্ত, ভাবলেশহীন। যেন এমন একটা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটে নাই। শুধু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে তাহার বঙ্কিম ওষ্ঠাধরের প্রান্তে সামান্য একটুখানি সাফল্যের হাসি বোঝা যায় মাত্র।

হীরালাল বেশ খানিকটা জল খাইয়া ফেলিয়াছিল। তবে মাঝি মাল্লারা এসব ব্যাপার ভাল বোঝে, তাহাদের চেষ্টায় সে শীঘ্রই খানিকটা জল বমন করিয়া সুস্থ হইল এবং খানিক পরে তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাসও স্বাভাবিক অবস্থায় আসিল। আরও একটু পরে চোখ মেলিয়া তাকাইল। ততক্ষণে তাহাকে একটা শুষ্ক বস্ত্র জড়াইয়া গালিচার উপর শোয়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। সে সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়া একটু একটু করিয়া চারিদিকে তাকাইয়া দেখিল। দেখিল সে একটি বজরার ভিতর শুইয়া আছে। ঘরে দামী আসবাব পত্র, ভাল ভাল ছবি। ফুলদানীতে ফুল। আর—আর তাহার সামনে একটি সুন্দরী তরুণী বসিয়া আছে, তাহার পরণে পশ্চিমা পোষাক, মাথার উপর হাল্কা রেশমের উত্তরীয়।

সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল! এবার তরুণীটি কথা কহিল। হিন্দুস্থানী ভাষায় প্রশ্ন করিল, 'তুমি কে? কোথা থেকে আসছ? কোথায় যাবে? জলে পড়লে কি করে? আমি না থাকলে যে মারা পড়তে!'

কাছেই মাঝি দাঁড়াইয়াছিল, সে এবার হাত-পা নাড়িয়া হীরালালকে বুঝাইয়া দিল, 'মালেকান্ নিজে জলে নেমে তোমাকে টেনে তুলেছেন—তা জানো? আমরা কেউ আগে দেখতেও পাইনি।'

হীরালাল বাল্যকালে মুন্সীর কাছে কিছু উর্দু পড়িয়াছিল। তাহাড়া এই ক'দিনে পথে কিছু কিছু হিন্দীও শুনিয়াছে। সে কোন মতে তাহার সহিত কিছু বাংলা মিশাইয়া সংক্ষেপে নিজের ইতিহাস বিবৃত করিল। শুনিয়া তরুণীটির মুখ ক্ষণেকের জন্য যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিল, 'ও তুমি কমিশারিয়েটে কাজ করবে—সে ত ভাল কথা!'

'কাজ পাব কিনা জানি না, কাজের জন্যই যাচ্ছি।'

'ঠিক পাবে। নিশ্চিত আশা না থাকলে কি আর তোমার মামা নিয়ে যাচ্ছেন!'

হীরালাল এবার একটু জল চাহিল।

স্ত্রীলোকটি ইতস্তত করিয়া কহিল, 'তোমাকে এখানে জল খেতে দেব না। তোমার গলায় ত পৈতে দেখছি—নিশ্চয়ই হিন্দু। আমি মুসলমান।'

হীরালাল বেশ শুছাইয়া জবাব দিল, 'আমি ব্রাহ্মণ। কিন্তু তা হোক আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন আমার কাছে আপনি প্রণম্য।'

'তা হোক। চলো তোমাকে পাড়ে নামিয়ে দিই গে। তোমার মামা বোধ হয় এতক্ষণে তোমার আশা ছেড়ে দিয়েছেন। ওখানে নেমে জল খেও!'

তরুণীর ইঙ্গিতে মৌকা এবার তীরের দিকে ফিরিল। হীরালাল কহিল, 'আপনার কাছে চির ঋণী রইলাম।'

তরুণী হাসিয়া কহিল, 'ঋণ রাখতে আমি দেব না। দেখো একদিন কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে নেব।'

হীরালাল জোর দিয়া কহিল, 'সে ত আমার পক্ষে সৌভাগ্য!'

'দেখা যাক। যখন পাওনাদার দোরে গিয়ে দাঁড়াবে তখনও সৌভাগ্য ভাবো কি না!'

মৌকা তীরের কাছাকাছি গিয়া থামিল। ঘাট নাই, ঘাটে লাগিতে পারিল না। মাঝি নামিবার সুবিধার জন্য একখানা লম্বা তক্তা ফেলিয়া দিল।

সত্যই মৃত্যুঞ্জয় ইহার ভিতর কাঁদিয়া কাঁটিয়া মাথা খুঁড়িয়া হাট বসাইয়া দিয়াছেন। নিরাপদে জলের ধার হইতে অনেক দূরে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছেন, 'ওরে, তার যে একটা ছেলেরে, আমি তাকে গিয়ে কি বলব রে! ...ওরে ছোঁড়া কি অদ্ভুত জলে আমার সঙ্গে বেরিয়েছিল রে! ...ওরে, ওকে এনে এক্ষুনি আমি যে জেরবার হয়ে গেলুম রে! কোথা থেকে এমন শত্রু সঙ্গে এলো রে!'

দু'চার জন জলেও খানিকটা করিয়া নামিয়াছে। কিন্তু হীরালাল ঠিক কোনখানে ডুবিয়াছে—ডুবিয়াছে কি ভাসিয়া গিয়াছে কিছুই কেহ জানে না। তাই ঠিক কি করিতে হইবে তাহাও কেহ বুঝিতে পারিতেছে না।

জানালার পর্দা ঈষৎ ফাঁক করিয়া তরুণী ব্যাপারটা বুঝিয়া লইল। একটু হাসিয়া বলিল, 'তাড়াতাড়ি যাও! ওঁরা বড় কাতর হয়েছেন!'

হীরালাল একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, আপনার নাম ঠিকানা কিছুই যে জানা হ'ল না।'

'কিছু দরকার নেই। সময় হ'লে আমিই যাবো তোমার কাছে। শুধু নামটা জেনে রেখো—আমিনা, তবে লোকে আমাকে ডাকে হুশেনী বিবি বলে।'

ব্রাহ্মণ হইয়া মুসলমান কন্যাকে নমস্কার করা ঠিক হইবে না। ...আশীর্বাদ করারও বয়স হয় নাই। বিদায় সম্ভাষণটা কিভাবে জানানো উচিত ঠিক করিতে না পারিয়া হীরালাল খানিকটা বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে বাহির হইয়া আসিল।

মামা প্রথমটা তাহাকে দেখিয়া আনন্দে জড়াইয়া ধরিলেন। খানিকটা গালিগালাজ করিলেন, আশীর্বাদও করিলেন কিছু কিছু। তাহার পর সংক্ষেপে সব ইতিহাস শুনিয়া নিজে আর একবার স্নান করিলেন, হীরালালকেও স্নান করাইলেন। আবার নূতন করিয়া রান্নার জোগাড় হইল, কারণ সে জাতে কাকে মুখ দিয়াছে। আবার শুরু হইল বকাবকি, গজগজ করা। এবার বরং কিছু বেশীই—কারণ বাড়তি হিসাবে ঘটিটার শোকও যোগ হইয়াছে।

গোলমালে ঘটিটার কথা কাহারও মনে ছিল না, বরং লোকের পায়ে-পায়ে সেটা আরও দূরে গিয়া পড়িয়াছিল। এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

[ক্রমশঃ]

বেহালা

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

এক

এতো বিচ্ছিরি লাগছিল! যতো আমোদ আহ্লাদেই ডুবে থাকি না কেন, সংগে সংগে যদি লেখাপড়ার ছ'পন্তালা নামের পেছনে যোগ করতে না পারা যায় তা হ'লে বড়ো খারাপ লাগে। দু' একটা মেয়ে আবার ঠিক দুর্বল স্থানে আঘাত দিয়ে কথা বলে, সকলের সামনে তখন এতো লজ্জা লাগে যে কী আর বলব তা!

সেদিন নাইট ক্লাব থেকে ফিরেছি অনেক রাতে। খেলার শেষে যার যার মতো সবাই গা এলিয়ে দিল। আমাকে অনেকটা দূর তো যেতে হবে। কউ আসে না। শেষ পর্যন্ত রাখালদাই এগিয়ে এলো অবলাবান্ধব হ'য়ে। ওদের গাড়ীতে বললাম।

ওপরে উঠে দেখি মিনুরা সব ঘুমিয়ে। রাখালদার মোটর ছাড়বার হতাশ শব্দ শোনা গেল। বুঝতে পারলাম—বেচারা বড়ো নিরাশ হয়েছে।

…মিনুর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। বেলা দশটা বেজে গেছে। সামনে দেখি বিকাশদা। মুখটা করুণ। অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। বুঝতে পারলাম—পরীক্ষার খবর বেরিয়েছে। মিনু বলল—"জানিস, মালা, তুই আর আমি—দু'জনেই ফেল!"

সমস্ত ব্যাপারটা নিমেষের মধ্যে মাথার ভেতরে ঢুকে ভীষণ উত্তাপ জাগিয়ে দিল। পাশের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। মনে পড়ল কেন আমি এসেছিলাম এখানে। কলকাতায় থাকলে ম্যাট্রিকটা এবার পাশ করতে পারব এই আশায় বাবা রেখে গিয়েছিলেন মিনুদের বাসায়। ম্যাট্রিক-ও পাশ করতে না পারলে লোকের কাছে মুখ দেখাব কী ক'রে? গতবার ফেল করেছি পড়াশুনো ক'রে-ও। এবার তো পড়াশুনো একদম করিনি। কেবল হৈ চৈ নিয়ে মেতে ছিলাম। বিকাশদার কাছে আমি আর মিনু পড়তে বসতাম। সকালে একঘণ্টা আর রাতে একঘণ্টা। বিকাশদার উৎসাহ ভীষণ; কলকাতার এক প্রান্ত থেকে কড় জল ভেঙে-ও রোজ আসে পড়াতে। আমি এখানে আসবার আগে সে মিনুকেই পড়াতো. এখন মিনুর চেয়ে আমাকেই বেশী পড়ায়। নিয়ে যায় একসহিবিশনে, মেট্রোতে, মিউজিয়ামে। …সব কিছুর ছোট্ট একটা উত্তর নিষ্ঠুর ইউনিভার্সিটি জানিয়ে দিল—"ফেল্।"

…তারপর থেকে আর বিকাশদার সঙ্গে বেরোই নি; রাখালদা তো আর আসতেই ভরসা পায় নি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেঁদেছি অঝোরে আর ভেবেছি—জীবনটাকে উপভোগ করবার পথে এই দুঃসংবাদ বাধা হ'তে পারতো না, যদি আমার জীবন এভাবে না চালাতাম। কেঁদেছি আর ভেবেছি—ভেবেছি আর গুণেছি, কতোগুলো ব্যর্থ প্রহরের মালা গেঁথে আনন্দে ভরপুর হ'তে চেয়েছিলাম; তাকিয়ে দেখিনি যে একেবারে নরম সুতোয় নিরর্থকের মাল্য রচনা ক'রে চলেছি!

তিন দিন পরে বাবা এলেন। একেবারে কলকাতা থেকে কেরঙ্গর! অন্তবিহীন পথ।

দুই

মা'র হ'য়ে আমিই চিঠি লিখে দিলাম পিয়ালতলার পিসীমার কাছে। ওখানে থেকে পরীক্ষাটা দেব সে কথা জানিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল। বিনা দ্বিধায় চ'লে আসবার আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি দিলেন পিসীমা। কাজেই আবার দিন কতক পরে কেরঙ্গর থেকে চ'লে এলাম

শিয়ালতলা। একজন মাষ্টার রেখে দেবেন বাবা আমাকে পড়াবার জন্যে।

হাওড়া থেকে অন্য একটা লাইনে শিয়ালতলা। সবুজ পাতায় মোড়া গ্রামটা। অদ্ভুত ভালো লাগল বাংলা দেশের এই গ্রামটাকে, প্রথম দৃষ্টিতেই। কেরঞ্জরের খনিজ কর্কশতা এখানে নেই, তার বদলে আছে মিষ্টি হাওয়া খেলানো সবুজ নরম ধান ক্ষেতের ছবি। কলকাতার বাস্-ট্রামে দালান-কোঠায় আভিজাত্য নেই এখানে—আছে একটা পটে আঁকা ছবির সৌন্দর্য। আমার দেশেই যে এমনি সুন্দর জায়গা আছে তা তো আগে জানতাম না।

আমাদের উদ্দিষ্ট বাড়ীটার যখন ঢুকলাম তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। ছোট্ট সাদাসিধে বাড়ীটা। ঘরে ঢুকতেই দেখি—খাটের ওপরে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটি ছেলে ঘুমিয়ে আছে গভীর ভাবে, বুকের ওপর একটা রঙচটা বেহালা, ডান হাতটা বেহালার এক প্রান্ত স্পর্শ ক'রে আছে। খুব সম্ভব এই হচ্ছে সেই বহুকথিত সাগরদা, ছোটো বেলা থেকেই আছে পিসেমশাইদের সংসারে, লেখাপড়ায় খুব ভালো,—সংসারে ওর আর কেউ নেই।

ওকে না জাগিয়ে আমরা পাশের ঘরে ঢুকলাম। আমাদের দেখেই পিসীমা ছুটে এলেন।

বাবা সেদিনই চ'লে গেলেন। ঠিক হ'ল সাগরদাই আমাকে পড়াবে।

রাত্রে গেলাম সাগরদার ঘরে। বললাম, "তোমাকে কিন্তু একটা বিষয় বিরক্ত করতে এলাম। আমাকে একটু পড়াশুনো বুঝিয়ে দেবে তো? দু'বার ফেল মেরেছি, কাজেই বুঝতে পারছ কেমন ছাত্রী। তবে এটুকু ভরসা দিতে পারি যে ভালো মাষ্টারের হাতে পড়লে ভালো করতে পারবো। কেমন, দেবে তো?"

জানি নে—আমার বিনা ভূমিকায় 'তুমি' বলে সম্বোধন করবার জন্যেই না অন্য কোনো কারণে—অত্যন্ত বিব্রত হ'য়ে ধরা-গলায় জবাব দিল সাগরদা—"বেশ তো, এসো!"

শুধু কথা। নিরাভরণ সুর। ক্ষুণ্ণ হ'লাম। অনেক বিকাশদা রাখালদাকেই দেখেছি! দেখা যাবে ধ্যান ভেঙে তপস্যার ফল পায়ে দিতে হয় কিনা। চিঠি লিখে দিলাম কলকাতায় মিনুর কাছে—বিকাশদাকে নিয়ে যেন একবার আসে, আমি ওদের সঙ্গে কিছুদিন কলকাতায় কাটিয়ে আসব।

কয়েকদিন পরে ওরা এলো। সাগরদাকে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। বিকাশদাকে টেনে নিয়ে বাড়ীটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালাম। নীরব দর্শক সাগরদাকে ইচ্ছে ক'রেই দেখালাম যে, আমি অবহেলার পাত্রী নই। বিকাশদার সঙ্গে এক চেয়ারে বসে গল্প করলাম। সাগরদার দিকে কিছুক্ষণ পরে তাকাতেই দেখি সে কখন চলে গেছে। ছুটে গেলাম ওর ঘরে, সামনের বইটে বন্ধ করে হাত ধরে টানতে টানতে বললাম, "যা রে, কেমন তুমি, সবাই ও ঘরে আর তুমি এখানে এসে পড়া আরম্ভ ক'রে দিয়েছ!"

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "চলো, যাচ্ছি।"

তিন

দিন সাতেক পরে ফিরে এলাম কলকাতা থেকে। লক্ষ্য করলাম, সাগরদা একটু উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। আমাকে দেখে করুণভাবে হাসল একটু।

এখন থেকে ট্র্যান্সলেশন করতে করতে হঠাৎ চ'লে যেতে লাগল অন্য প্রসঙ্গে—এসে পড়ত রবীন্দ্রনাথের সুন্দর সুন্দর কবিতা, কীট্স্-শেলীর সুন্দর সুন্দর লাইন। টুকে রাখতাম কোনো ভালো কথা শুনলে। কখনো কখনো পড়তে পড়তে রাত বারোটা বেজে যেত। পাশের ঘরে পিসীমারা সবাই ঘুমিয়ে পড়ত। আমার ঘরটা মাঝখানে—তার একধারে সাগরদার ঘর, অন্য ধারে পিসীমাদের। হয়তো বারোটা একটা পর্যন্ত প'ড়ে চলেছি—হঠাৎ জানালা দিয়ে সাগরদা বলত—"মালা, এবার শুতে যাও।"

—একটা আনন্দের স্পর্শ পেতাম এই গভীর রাত পর্যন্ত পড়ায়; আমার ভুল হয় কোথায়, সব সাগরদার তীক্ষ্ণ নজরে ধরা প'ড়ে গিয়েছিল। বারে বারেই আমাকে

সেই সব ভুল শুধরে দিত। তা ছাড়া তার পড়ানোর মধ্যে এমন একটা দরদ-মাখা আন্তরিকতার ছোঁয়া থাকতো যে ঘুমের আরামও ভুলে যেতাম। পড়তাম তাই রাত জেগে। অদ্ভুত লাগবে হয়তো বিকাশদাদের কাছে এ ব্যাপার।

অনেক দিন শুনেছি পাশের ঘর থেকে সেই বেহালার সুর। সুর দিতে জানলে একটা জড় যন্ত্রও যে কতোটা প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ দিত সাগরদা। অত্যন্ত মৃদু সুর, কিন্তু অত্যন্ত করুণ। মনে হ'ত, সাগরদা যেন প্রত্যেক রাতেই একটা নির্দিষ্ট কোনো সুর ফুটিয়ে তুলতে চায়। দরজা-জানালা বন্ধ ক'রে বাজাক—তবু মনে হ'ত যেন দেয়ালের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে যেত সেই সুর, বাতাসের সঙ্গে মিশে দিক দিগন্তরে ছুটে যেত কার উদ্দেশে। কল্পনার চোখে দেখতাম—সাগরদা অন্ধকারে কেঁদে চলেছে আর বাজাচ্ছে বেহালা। কোনো কোনো দিন সকালে উঠে দেখতাম, সত্যি সত্যিই তার সারা চোখ-মুখ ফুলে গেছে, যেন অবিরল কান্নায় বিনিদ্র রাত কাটিয়েছে সে।

অনেক দিন দেখেছি, বেহালাটা নিয়ে সে বেরিয়ে গেছে অন্ধকারের মধ্যে। জিজ্ঞেস করেছি—"কোথায় যাচ্ছ?" জবাব দিত—"কোথায় আবার, এই ওদিকে।" দু'তিন দিন আবার সে একদম ফিরতোই না। যখন ফিরতো, রুক্ষ শুষ্ক চেহারা দেখে বোঝা যেত অনেক দূরে ঘুরে ঘুরে অনাহারে অনিদ্রায় কাটিয়েছে এ ক'দিন। ভারী খারাপ লাগত। জিজ্ঞেস করলে শুধু করুণভাবে হাসত, আর বলত, "বেহালা বাজিয়ে এলাম।"

একটা বছর কেটে গেল। ভালোভাবে পরীক্ষা দিলাম। এবার পিয়ালতলা ছেড়ে আবার যেতে হবে কেয়ুরু। শীগ্‌গিরই বাবা এসে নিয়ে যাবেন। কেন জানি নে—পিয়ালতলাকে ছেড়ে চ'লে যেতে বড়ো খারাপ লাগছিল। পিয়ালতলার করুণ মানুষটি এক বছরের মধ্যেই কোন্ আবেশে যেন আমার মনকে করুণ করে ফেলেছে। —একটা বছরের শুধু পরিবর্তন দেখেছি পিয়ালতলায়। বৈশাখের তপ্ত গরমেও পেয়েছি কার যেন ছায়া; বর্ষার অবিশ্রান্ত বাদল ধারা যেন অবিরল অশ্রুকণার রূপ নিয়ে মনের গহনে চ'লে গেছে—আর চঞ্চল ফাল্গুন আমার মনকেও করেছে করুণ, অসহনীয়। ফাল্গুনের পিয়ালতলা একেবারেই অসহ্য ঠেকেছে—হু হু ক'রে কতো শতাব্দীর বিচ্ছেদ বেদনা নিয়ে অশ্রু ভেজা হাওয়ার ঝাপ্‌টা এসে প্রাণ মন ভ'রে দিয়ে গেছে। আর শীতের শিশির মাখা সকাল প্রভাতের সুখনিদ্রাকেও ভেঙে দিয়েছে—উঠেছি, তুলেছি রক্ত রাঙা গোলাপ সাগরদার টেবিলে রাখবার জন্যে। —সেই পিয়ালতলা ছেড়ে চ'লে যেতে কষ্ট লাগা তো স্বাভাবিক। সুধা-শ্যামলিম এদেশ থেকে যেতে হবে কেয়ুরুরের মরুভূমিতে!

কিন্তু যাবার আগে সবচেয়ে বড়ো হ'য়ে বুকের মধ্যে বাজছিল যে চিন্তাটা তা হচ্ছে এই যে এতোদিন কাছে থেকেও সাগরদাকে জানতে পারলাম না। আমার রূপ আমাকে করেছিল গরবিনী। ইচ্ছে ক'রেই তাই কতো গরীবীর গর্ব ভেঙে খান্‌খান্ করে দিয়েছি আমার কটাক্ষে। কিন্তু—কোথাও তো নিজেকে হারিয়ে খুঁজতে হয় নি। কোথাও তো কেউ ভালোবাসার ধারে কাঁদাতে পারে নি! সাদা কাগজের ওপর নরম পেন্সিলের দাগ কিছু দিনের মধ্যেই উঠে গেছে!—কিন্তু এখানকার স্পর্শ যে গভীর দাগ কেটে ফেলেছে। এই বিরাট পৃথিবীতে স্বপ্নের মতো কেন সুন্দর লাগছে এই পিয়ালতলাকে?

এখানে আছি আর দু'দিন। কাল সকালেই সাগরদার কাছে স্পষ্ট ক'রে সব বলতে হবে-ই।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি সাগরদার ঘর বাইরে থেকে বন্ধ। পিসীমাকে জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, "ওই খ্যাপার কথা আর বলিসনে, একটু কিছু কইব কী রাগ ক'রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। কয়েকদিন চলবে খোঁজা খুঁজি, শেষে অবশ্য নিজেই এসে হাজির হবেন। কতোদিন বলেছি, সাগর, এবার একটু চাকরি-বাকরির চেষ্টা করো, বড়ো হ'য়ে গেছ। আর অমনি ব'লে উঠবে—এই চললাম! কয়েকদিন পরে শুধু

হাতে ফিরে আসবে। শুধু হাতে নয়, ওর বুকের ধন বেহালাটা নিয়ে। ওই বেহালা বাজিয়েই ও ম'লো।

পিসীমার বিরস গলার সুরে মর্মাহত হ'লাম। জিজ্ঞেস করলাম আবার—"কী বলেছিলেন ওকে?"

—"কাল তো তুই সাড়ে আটটার মধ্যেই শুয়ে পড়লি। আমাদের শুতে শুতে হ'ল প্রায় দশটা। আমি শুতে যাব, দেখি তোর ঘরে সাগর ঢুকলো। আমি বললাম—কী চাই? ও বলল যে তোর বিছানায় নাকি ওর একটা বই আছে তাই নিতে এসেছে। মশারী তুলে কী যেন খুঁজে দেখল, তারপর চ'লে গেল। ও চ'লে যেতেই আমি মশারী তুলে দেখলাম, তোর মাথার কাছে তিনটে গোলাপ রেখে গেছে ও। বেরিয়ে এসে বললাম ওকে, 'ফুল রাখতে যাওয়া হয়েছিল, কেমন? সাবধান!'—ব্যস, আর অমনি ও ঘরের বাইরে এসে বলল, 'এবার যে এই গেলাম আর ফিরব না।' সংগে নিয়ে গেল ওর সংগী বেহালাটাকে। পাগল আর কাকে বলে।"

আমি অধীর হ'য়ে জিজ্ঞেস করলাম—"ওকে যেতে দিলেন ওই অন্ধকার শীতের রাতে?"

পিসীমা বললেন, "ওর সংগে পারবে কে বল? আর মধ্যে মধ্যেই তো ও বেরিয়ে যায়—কোথায় যায় কী করে ভগবানই জানেন।"

বসলাম এসে সাগরদার টেবিলে। মাথার ভেতরটা দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলছিল। মনের মধ্যে একটা চাপা কান্না ডুকরে ডুকরে জেগে উঠতে লাগল। পিসীমাদের ওপর-ও মনটা বিরূপ হ'য়ে গেল।

সমস্ত বই অগোছাল ভাবে প'ড়ে আছে। এক গাদা খাতা। লাল, সবুজ আর কালো—তিন রকমের কালির দোয়াত টেবিলের ওপরে। পাশে একটা ভাঙা সুটকেস্। খুঁজতেই চাবিটা পেলাম। সব কিছুর মধ্যেই সাগরদার হাতের ছোঁয়া হাতের চিহ্ন। খুলে ফেললাম সুটকেস্। একটা বাঁধানো খাতায় লেখা তার ডায়রি। সাগরদা আমাকে যে অধিকার দিয়েছে তার বলে নিশ্চয়ই আমি পড়তে পারি সবকিছু। টেনে নিলাম খাতাটা কোলের ওপর।

চার

সাগরদার মুখ থেকে যা শুনি নি, তার লেখা থেকে তা জানলাম।

সেবার বি, এ. পড়ে সাগরদা। এক ফাল্গুনী অপরাহ্নে স্বরসংগী বেহালাটাকে হাতে ক'রে পড়ন্ত রোদের ছায়াকে অনুসরণ করতে করতে পিয়ালতলা ছাড়িয়ে অনেকদূর এসে পড়েছে সাগরদা, এতোদিন রয়েছে পিয়ালতলায় কোনোদিনই এদিকে পা বাড়ায়নি। দীর্ঘ হ'তে দীর্ঘতর হ'য়ে শেষ পর্যন্ত তার নিজের ছায়াই গেল মিলিয়ে।—সামনে একটা বিল। ও-পারটা লালচে আভায় জ্বল্ জ্বল্ করছে। তখনো দেখা যাচ্ছে সাদা বকের ঝাঁক আর পানকৌড়ির খেলা। তীরে কাঁচা ঘাসের সবুজ জাজিম পাতা। বেহালায় সুর এসে গেল মনের অজানতে। কতোক্ষণ বাজিয়েছিল খেয়াল নেই, যখন ঘুম ভাঙলো দেখল চতুর্থীর এক ফালি চাঁদ তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। বেহালাটা তুলে নিয়ে পেছন ফিরে তাকাতেই চোখে আরেক ফালি চাঁদের চাহনি। লক্ষ্য করেনি আগে যে একটু দূরেই দ্বিতল বাড়ি একটা। তারই একটা আলো-ঝল্মল্ জানলার পটে আঁটা এক চতুর্থীর চাঁদ, মুখের এক ধারটায় আলো প'ড়ে ঝক্‌মক্ করছে। ওই জানালাটার নিচ দিয়েই পিয়ালতলা যাবার রাস্তা। অগ্রসর হ'ল সেদিকে সাগরদা। অদৃশ্য হ'ল জানালার পাশে সেই মুখখানা; কিন্তু তার বদলে খুলে গেল নিচের দরজা। বেরিয়ে এলো একটি মেয়ে। কাছে আসতেই মেয়েটি বলল, "আপনিই বেহালা বাজাচ্ছিলেন? কী সুন্দর বাজাতে পারেন!"

সাগরদা হতবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল; তারপর মেয়েটিই আবার বলল, "আপনি এদিকে বোধ হয় এই প্রথম এলেন? আপনাকে তো আগে আর কোনোদিন দেখি নি!"

সাগরদা বলল, "হাঁ এই প্রথম এদিকে এলাম। আমি থাকি পিয়ালতলায়।"

সাগরদা এগিয়ে গেল, সংগে সংগেই দরজাটা বন্ধ হ'য়ে গেল।

এরপর কয়েকদিন হ'য়েই সাগরদার পথ ওই বিলের ধারে বেঁকে গেছে। ওই বাড়িটার পাশে আসতেই সেই মুক্তনয়নার জন্ম তার দৃষ্টি এদিকে-ওদিকে ফিরত। কিন্তু সাগরদার জন্যে অপেক্ষা ক'রে দরজা খুলে ওই সময়ে সে কোনোদিনই থাকে নি। সাগরদা বিলের ধারে এগিয়ে গেছে। বাজিয়েছে বেহালা। কিছুক্ষণ পরেই দেখতে পেত জানালার ধারে সেই মুখ। বাজানো থামিয়ে রওনা হ'ত পিয়ালতলার পথে। কিন্তু আর কোনোদিনই দরজা খুলে দাঁড়ায় নি সেই সুরমুগ্ধা।

কিন্তু ওই যে জানালার ধারে এসে দাঁড়াতো সে, তাতেই সাগরদার বেহালায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা হ'ল। যে-সুরের জন্য শিল্পীর সাধনা, সেই সুরময় দেখা দিয়েছে। ঘর তাই হ'য়ে উঠেছে তার প্রাণময়, গীতিময়।

একদিন ব'সে ব'সে অবিশ্রান্ত ভাবে বাজিয়ে চলেছে বেহালা—কিন্তু তবু দেখা নেই তার সেই জানালার ধারে। প্রাণতন্ত্রী বেদনাকে সাগরদা রূপ দিতে লাগল। বেহালার সুরে। চোখের জলের সংগে সুরের রেশ মিশে যেতে লাগল। কয়েকজন জেলে এসে কাছে নৌকো বাঁধল, শুনতে লাগল তন্ময় হ'য়ে বেহালা বাজানো। কিন্তু যার জন্যে এতো সাধনা সাধা হ'ল তার আর দেখা মিলল না। বিমর্ষ হ'য়ে ফিরল সাগরদা পিয়াল-তলায়, অনেক রাতে।

সেদিন বাড়ি ফিরে সাগরদা তার সমস্ত চেতনাকে কেন্দ্রীভূত ক'রে বেহালায় সুর চড়িয়েছে; সমস্ত প্রাণময়-পরিবেশকে অতিক্রম ক'রে চেতনাহীন হৃদয়ের নির্যাস নিঙড়িয়ে তার-ই সুরদান করতে চেয়েছে বেহালার তন্ত্রীতে।

পরদিন সেই সুরসৃষ্টির উৎকর্ষণ শরীরে অনুভব করতে করতে সাগরদা গিয়ে বসেছে তার ঘাসের আসনে। পর্জন্যদেব-ও যদি অতীতে সুরমোহে প্রসন্ন হ'তে পারেন, আকাশ থেকে নেমে আসতে পারেন মাটিতে,—তবে কেন তার ছলনাময়ী রহস্যময় দূরত্বের অন্ধকার থেকে পরিচয়ের সূর্যালোকে দেখা দেবে না?

খুব সন্তর্পণে তাকিয়ে দেখলো—জানালার ধারে কেউ নেই। বিলের ওপরেও নেই কোনো ডিঙি। প্রথম আদিম মানুষের মতো একা যেন সে-শুধু প্রকৃতির পরিবেশে! বেহালাটা হাতে তুলে নিল সাগরদা, একটা টান দিতেই ছিঁড়ে গেল তার! হতাশ মনে নামিয়ে রাখল বেহালাটা। চোখের পর্দা ঠেলে বেরোতে লাগল অশ্রুর বন্যা—অবরুদ্ধ সুরপ্রেরণার ব্যর্থ প্রতিশ্রুতি পরিগ্রহ ক'রে। সন্ধ্যাবেলায় বিলের জলে সেদিন অনুরণিত হ'ল না কোনো সুর; শুধু প্রকৃতির নীরবতার মধ্যে অন্ধকার নেমে এসে মুছে দিয়ে গেল তার মনের পত্রলেখা!

বাড়ি ফিরে সাগরদা পড়ল জ্বরে। টাইফয়েড্। পঁয়ত্রিশ দিন পরে ছাড়ল। বায়ুপরিবর্তনের জন্য পাঠানো হ'ল তাকে বৈদ্যনাথধামে; অবশ্য বেহালাটা যেতে পারল না তার সংগে, বন্দাস্ টাউনের এক মুক্ত আলো-হাওয়া-ভরা বাড়িতে মাস তিনেক থাকতে তবে আগের স্বাস্থ্য ফিরে পেল সাগরদা। মনের মধ্যে কিন্তু গুমরে গুমরে করুণ সুরে বেজে উঠত সেই শেষ-না-করা রাগিণী—অনেকদূর থেকে সাদা বকের ঝাঁক আর পানকৌড়ির ছবি ভেসে আসত নীলপাহাড় ডিঙিয়ে।

পিয়ালতলার সেই আগের জীবনের খেই তুলে নিতে সাগরদাকে অনেকটা পরিশ্রম করতে হ'ল। ধূলিমাখা ছেঁড়া তার বেহালায় আবার নতুন ক'রে তার এবং সুর যোজনা করল সাগরদা। কিন্তু বিলের ধারের সেই রাস্তাটা যেন ঠিক পথ চিনিয়ে নিতে পারছে না তাকে। ধীর পায়ে গেল সেদিকে। সে-বাড়িটা ঠিক-ই আছে; শুধু সাদা রঙটা পালটিয়ে ফিকে সবুজ করা হয়েছে। জানালাটা তেমনি ভাবে খোলা। বিলের ধারে এগিয়ে

গেল। সবুজ ঘাসেরা অনেকটা বড়ো হয়েছে। বিলের জল কানায় কানায় ভ'রে গেছে। ফুলের বিলাস আর মেঘের বৈচিত্র্য দিয়ে আঁকা নতুন এক পটচিত্র। হঠাৎ তার মনে প.ড়ে গেল—বর্ষা এসে গেছে। শেষ যখন সে এখানে এসেছিল তখন ছিল ফাল্গুনের অসহ্য আলা: আর এখন বিরাট বর্ষার গম্ভীর সহাস্য পরিবেশ।

বেহালার সুর তুললো সাগরদা। ঘোলাটে জলের বিরাট সবতল ছুঁয়ে ছুঁয়ে সান্ধ্য প্রকৃতিকে আবার সজাগ করে তুললো সেই সুর। ডিঙি বেয়ে যাওয়া জেলেরা ও মাঝিরা মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখে কে বাজায়। সাদা বকেরা সূর্যের শেষ আভায় ঝাঁপ দিয়ে উড়ে যেতে যেতে হঠাৎ বোধ হয় সচকিত হ'য়ে ফিরে দেখে কে বাজায়। তেমনি জানালাটার ধরে-ও হঠাৎ দেখা গেল একটা মুখ—হয়তো দেখছে অনেকদিন পরে আজ আবার কে বাজায়। ভীত মনে সেদিকে তাকাতেই সাগরদার তাল কেটে গেল; থামালো বেহালা। এগোলো বাড়িটার দিকে।

জ্যোৎস্না-ঢালা রাত্রি। আধো-আলো আধো-ঢাকা পথ দিয়ে বাড়িটার সামনে এলো সাগরদা। দরজাটা খুলে গেল। কিন্তু এবার একজন নয়, দু'জন। সুশ্রী এক যুবক তার হাত ধ'রে। মেয়েটি বলল সাগরদাকে, "অনেকদিন পরে আসা হল এদিকে, নয়?" তারপর সংগীর চোখের দিকে চেয়ে বলল, "জানো, এ বেশ বেহালা বাজাতে পারে। শুনবে একদিন?"

সাগরদার মনে অদ্ভুত শক্তি এসে গিয়েছিল। বলল মেয়েটিকে, "আপনি যদি একটু এদিকে আসতেন—"

মেয়েটি স'রে এল একদিকে। সাগরদা বলল, "আপনাকে এতোদিনেও চিনতে পারলাম না। কিন্তু থাক সে কথা—ওই ভদ্রলোক কে?"

জবাব দিল মেয়েটি ভুরু কুঁচকে—"অত জানবার কী প্রয়োজন তোমার? তুমি এতো সাহস পেলে কোথায়?"

"কেন, আমার বেহালার কাছ থেকে!"—ব'লেই সাগরদা পা বাড়ালো সামনের দিকে।

পিছনে প'ড়ে রইল রঙ-পালটানো বাড়িটা।

পাঁচ

স্টেশনে পৌঁছে মালীমার কাছে চিঠি দিলাম। জবাবে জানতে পারলাম সাগরদার কোনো খবর নেই। প্রত্যেক বারেই জবাব আসত সাগরদা ফেরে নি।

পরীক্ষার ফল বেরোলো। সবাইকে অবাক ক'রে পাশ করলাম ফার্স্ট ডিভিশনে। কলকাতা থেকে অনেক 'কন্‌গ্র্যাচুলেশন' মাখা চিঠি এলো। বিকাশদারও। কিন্তু যাকে সবচেয়ে আগে আমার সবটুকু ধন্যবাদ জানানো কর্তব্য, সে কোথায়? বিস্মৃতির উদাসী অন্ধকারে চারপাশের সবাই তাকে ডুবিয়ে রেখেছে।...

দিনের পর দিন চলে গেছে। সাগরদার কথা আস্তে আস্তে ভুলে গেছি। যে প্রাণের মধ্যে একদিন তার স্মৃতি পারার মত জ্বল্ জ্বল্ করত, আজ আর সেখানে সাগরদার একটুখানিও অবশেষ নেই। নিষ্ঠুর হৃদয়!

তাই যখন এক আই, এ, এসের সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে গেল, সাগরদার স্মৃতি জেগেছিল ঠিকই, কিন্তু বিষাদের ছায়া ফেলতে পারে নি। বেচারার জন্য হয়তো জানিয়েছিলাম একটু সমবেদনা।

সুরঞ্জন আমাকে পেয়ে সুখীই হ'য়েছিল; ওর কাছ থেকে আমারও আর চাইবার কিছু ছিল না। সারাদিন সরকারী কাজে থাকে ব্যস্ত; রাত্রি বেলায় নামিয়ে নেয় বেহালাটা। অত্যন্ত দামী বেহালা। চেষ্টা করে সুর তোলাতে। অনেক দিন একজন মস্ত বড় বেহালা বাদকের কাছে থেকে শিখেছে বেহালা বাজানো; তবুও খুব ভালো ক'রে সুর তুলতে পারে না ও। সে সম্বন্ধে অবশ্য সে নিজেই সচেতন। প্রায়ই বলত মোজার্ট আর বীটফেনের কথা সেই সঙ্গে এসে পড়ত রোমাঁ রোলাঁর জীবন কথা আর জাঁ ক্রিস্তফের কাহিনী।

হঠাৎ মনে পড়ে যেত অনেকদিন পেছনের শিরালতলার কথা। ভাঙা বেহালায় সাগরদা চেষ্টা করত সুর তুলতে। অদ্ভুত সুন্দর সেই সুর—এখনো মনের মধ্যে যেন তার কাঁচা ছাপ রয়ে গেছে! এ কথা মনে পড়তেই মনের মধ্যে কেমন একটা করুণ আনন্দের ছোঁয়া লাগত!

একদিন অনেক দেরি ক'রে ফিরল সুরঞ্জন বাসায়, চোখে মুখে কেমন যেন অস্বাভাবিকতার ছাপ। কাছে গিয়ে বললাম, "ব্যাপার কী ?"

"ব্যাপার অদ্ভুত।" বলতে থাকে সে, "এক উকিল বন্ধুর সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলাম। এ-কথা সে-কথার পর সে আমায় বলল তাদের এক কেস্-এর কথা। অভিযোগ এনেছে স্বামী যে তার স্ত্রীকে আসামী ভুলিয়ে নেবার জন্যে তার অনুপস্থিতিতে তার বাড়ীতে এসেছিল। আসামী অবশ্য বাড়ীর ভেতর ঢোকে নি—বাইরের দরজার সামনে ব'সে বাজাচ্ছিল বেহালা।"

—"বেহালা ?"

—"হ্যাঁ, বেহালা বাজাচ্ছিল। রাস্তায় লোক জমে গেল। তার সামনে পড়তে লাগল পয়সা, আনি প্রভৃতি। কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ খুলে গেল দরজা; ভেতর থেকে ছুটে এল অভিযোগকারীর স্ত্রী। এসে পড়ল বেহালা-বাদকের পায়ে। মাথা খুঁড়তে লাগল বারে বারে। তন্ময় হ'য়ে অদ্ভুত করুণ সুরে বাজাচ্ছিল বেহালাবাদক। থামলো তার বাজানো এক সময়। মুখের দিকে তাকালো ভালো ক'রে; তারপর অদ্ভুতভাবে হেসে বলল—"জানতাম আমি, জানতাম। আমার বেহালার সুর একদিন তোমার কানে পৌঁছবেই—এ আমি জানতাম। জানতাম আমি, একদিন তোমার গর্ব ভাঙবেই।" স্ত্রীলোকটি সম্বিৎ ফিরে পেল, দেখল তার চারপাশে কতো লোক—অনেকেই তার চেনা—তক্ষুনি দৌড়ে বাড়ীর ভেতর ঢুকল, দরজা দিল বন্ধ ক'রে।

তার স্বামী বিকেলে এসে দরজা ধাক্কায়, তবু তা খোলে না। শেষে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখে—তার স্ত্রী ফাঁসি দিয়েছে।

—বেহালা বাদক অবশ্য তখনো ব'সে বেহালা বাজাচ্ছিল এক মনে—তার চারপাশে অসম্ভব ভীড়—দূর থেকে লোক আসছিল সে সুর শুনে—কাজেই পুলিশকে আর বেশি ছোটাছুটি করতে হয় নি।"

আমার সারা শরীর কাঁপছিল। জিজ্ঞেস করলাম,—"বিচারে বেহালাবাদকের কী হ'ল ?

—কী আর হবে—উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। কিন্তু আমার কী মনে হচ্ছে জানো মালা ? যদি ওই বাদকের বেহালা বাজানো শুনতে পেতাম ! দেখতাম, কী আছে তার মধ্যে—যার জন্যে বন্ধ দরজা খুলে এসে একজন নারী তার পায়ে পড়তে পারে !"

—"আচ্ছা, ওদের নাম কী জিজ্ঞেস করেছিলে ?"

—"হ্যাঁ, স্বামীর নাম সতীশ গোস্বামী; স্ত্রীর নাম মল্লিকা।"

—"আর বেহালাবাদকের নাম ?" ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি।

—"ও নাকি কিছুতেই বলে নি ওর নাম-ধাম-পরিচয়। শুধু বলেছে—'আমি বেহালা বাজাই।' অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, 'ঘর নেই আমার, বাড়ী নেই আমার, মা-বাবা-প্রিয়জন কেউ নেই। যারা ছিল তাদের একজন আজ গলায় দড়ি দিল !' ব'লেই অদ্ভুত হাসিতে ভেঙে পড়ল সে। হাসি থামিয়ে আবার বলল, 'আরেকজন আছে—কিন্তু কোথায় আছে, জানি নে ! এবার তাকে টেনে আনবো বেহালার সুর দিয়ে !' আবার পাগলের হাসি হেসে উঠল। এর পর হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেল সে। বলল, 'কিন্তু সে তো চেনে না আমার সুর ! কী হবে সেখানে গিয়ে ! যে চিনতো, সে তো আজ গলায় দড়ি দিয়েছে !' ওর হাতে তখনো ছিল একটা বেহালা —পুরোণো বেহালা। হঠাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিল সেটা। চুরমার হ'য়ে গেল ওর বেহালাটা !"

বাংলার সঙ্গীত পরিক্রমা

শ্রীজয়দেব রায়

বাংলা দেশ সঙ্গীতের দেশ। প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত বাংলা দেশের সাহিত্য ও চিন্তাধারা সঙ্গীতকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। বাংলা দেশের সঙ্গীত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ; কেবলমাত্র রসতৃপ্তি সাধনই তাহার উদ্দেশ্য নয়। বাংলার গান একাধারে সাহিত্যের ধারক ও বাহক, ধর্মের উদ্গাতা, দর্শনের পথিপ্রদর্শক, তাহার মধ্যে রহিয়াছে চিন্তার সঙ্গে কর্মের যোগসূত্র। অনাসক্ত বৈরাগ্যের সঙ্গে কর্মচঞ্চল জীবন-দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে বাংলা গানে। তাহা পথিক জীবনের মিলনানন্দের মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবনের চির বিরহের আর্তির সুরকে ধ্বনিত করিয়াছে।

ভারতীয় সঙ্গীত বিজ্ঞানাশ্রিত, তাহার সুরের কলা কৌশলই প্রধানতঃ রসিক চিত্তকে আকৃষ্ট করিত। সে সঙ্গীত ছিল বহু সাধনাপ্রসূত, বহু শ্রমার্জিত। গায়কদের সে সঙ্গীত গাহিবার জন্য যেমন সাধনার প্রয়োজন হইত, শ্রোতাদের তাহার রসোপলব্ধির জন্যও তেমনই কর্ণকে প্রস্তুত করিতে হইত। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বুঝিবার যোগ্যতা সাধনার দ্বারা অর্জন করিতে হইত। এ বিষয়ে অধিকার ভেদ খুব প্রখর ছিল।

মূল গীতিরস হইতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত কোনদিন বিচ্যুত হয় নাই। বাংলা দেশে কিন্তু সেই প্রাচীনকাল হইতেই সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যের সূত্রপাত হয়। বাঙালী জাতির এই স্বাতন্ত্র্য প্রচেষ্টা, এই বৈশিষ্ট্য কেবল সঙ্গীতই নয়, সকল সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেই পরিস্ফুট।

বাংলার সঙ্গীত সাহিত্যের মধ্যেই আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের উপাদান রহিয়াছে। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা' প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"বাংলা সাহিত্যের মধ্যে বাঙালী জাতির ইতিহাস লুকানো আছে। ...বাংলার সঙ্গীতসাহিত্যও অপূর্ব এবং অনন্যসাধারণ। কবির গান, পাঁচালীর গান, শ্যামা-বিষয়ক গান, কীর্তন, গাথা প্রভৃতি যত রকমের সঙ্গীতসাহিত্য ছিল বা আছে, তাহাদের শ্রেণী বিভাগ, বিশ্লেষণ এবং সে সকল হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ এখনও কেহ করে নাই; অথচ বাঙালীর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ঘটনার উল্লেখ এই সকল গানে ও ছড়ায় নিবদ্ধ আছে।"

কীর্তন গানের সৃষ্টির বহু পূর্ব হইতেই বাংলার নিজস্ব সাঙ্গীতিক আদর্শ পূর্ণাঙ্গরূপ গ্রহণ করিতে সুরু করে। বৌদ্ধতান্ত্রিকদের 'চর্যাচর্যগান' হইল প্রাচীন সাহিত্য, তথা সঙ্গীতের আদিতম নিদর্শন। সে গানগুলি বাউলের রীতিতে নানা রাগরাগিণীসমাশ্রিত লোক-সঙ্গীত। এই গানগুলির ঠারে ঠোরে প্রহেলিকার কথা বলার ভঙ্গীটি পরবর্তী যুগের গানে কতকটা সঞ্চারিত হইয়াছিল।

চর্যাগানের পরই বাংলা দেশের প্রথম নিজস্ব গানের সৃষ্টি হইল—বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন বাংলার লোকসঙ্গীতের ও সাহিত্যের নানা ধারার মুখ খুলিয়া দিয়াছে, উহা হইতে নানা প্রবাহে যাত্রা, পাঁচালী, কীর্তন, দেহতত্ত্ব গান, তরজা, কবির গান, লৌকিক বিরহগীতি, কৃষ্ণগীতি প্রভৃতি বহু ধারা বহিয়া আসিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই বাংলার প্রথম আসরসঙ্গীতের সূত্রপাত হয়। চণ্ডীদাস তাঁহার রাধাকৃষ্ণের প্রেমাভিনয়ের আখ্যানবস্তু সংগ্রহ করিয়াছিলেন শ্রীজয়দেবের গীত-গোবিন্দ হইতে। সহজবোধ্য সরস প্রাকৃত ভাষায় রাধাকৃষ্ণের কেলিলীলা বর্ণনা করিয়া বড়ু চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি বাংলা সঙ্গীতের প্রজাপতিরূপে পরিগণিত।

বিদ্যাপতি ঠাকুরের মৈথিলি পদগুলি ব্রজবুলিতে রূপান্তরিত হইয়া বাঙালীদের সহজে অধিগম্য হইয়াছিল। তাঁহার পদাবলীই এ দেশে বৈষ্ণবগীতিসাহিত্যের অক্ষয় উৎস।

শ্রীচৈতন্যদেব নিজে জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী আস্বাদন করিতেন—

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, শ্রীগীত গোবিন্দ।
এই তিন গীত করায় প্রভুর আনন্দ॥

তাঁহার পর পদাবলী সঙ্গীতের রসধারায় অজস্র সঙ্গীত ভাসিয়া গেল।

ধর্মকে আশ্রয় করিয়া কয়েক শতাব্দী বাংলা দেশের সমস্ত সঙ্গীত রচিত হইয়াছে। প্রথমে বৈষ্ণব সঙ্গীত, তাহার পর আসিল শাক্ত সঙ্গীত। এক এক যুগের সকল কবি মিলিয়া একই ধরনের গীত রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন।

এই শ্রেণীর ভাগবতী গীতির পাশাপাশি লৌকিক প্রেমগীতির ধারাও প্রবাহিত হইয়াছে। পল্লীসঙ্গীতের ভণিতার গানে রাধাকৃষ্ণের ভবানীতে নরনারীর প্রাকৃত বিরহ মিলনের ব্যাকুল আবেদনই অভিব্যক্ত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের গীতিকবিরা আরো বেশীদূর আগাইয়াছেন। তাঁহারা রাধাকৃষ্ণকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়াও প্রেমগীতি রচনা করিয়াছেন।

বাংলাদেশের সমস্ত সাহিত্য মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের পূর্বে গানের মধ্য দিয়াই স্থায়িত্ব অর্জন করিয়াছিল। কেবল মাত্র কাব্য কাহিনীই নয়; দর্শন, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, সাহিত্যের রস বিচার পর্যন্ত এইভাবে সুরছন্দে কণ্ঠে কণ্ঠে উদ্গীত হইয়া অক্ষয়তা লাভ করিয়াছে।

ইংরেজ আমলের প্রথম যুগে বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটিল। শিক্ষা, চিন্তাধারা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্মজীবন সকল ক্ষেত্রেই আমূল পরিবর্তন হইল। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই বিপ্লব আনিলেন নিধুবাবু। তিনি পশ্চিম হইতে হিন্দুস্থানী গীতিরীতিকে কণ্ঠে বাহিয়া লইয়া আসিয়া বাংলা গানে টপ্পা রীতির প্রবর্তন করিলেন। তার পর হইতে বাংলাদেশের গানের প্রধান মূর্ছনাপথ হইয়া দাঁড়াইল এই 'টপ্পা' রীতি।

টপ্পাকে আশ্রয় করিয়া কবির গান, পাঁচালী ও নবপর্যায়ের যাত্রাগানের উদ্ভব হইল। কীর্তন রীতির সঙ্গে টপ্পা রীতির যোগ হওয়ায় আসরের গানে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইল। কীর্তন গানের একটি বিজ্ঞানসম্মত গঠন-রীতি তৈয়ারী হইয়াছিল, কীর্তনের নিজস্ব ছন্দ, সুর, রীতি, ভাব প্রভৃতি সুনির্দিষ্ট। টপ্পায় কিন্তু সে সব বিধি বিধানের বাধা-বাঁধন না থাকায় শ্রোতারা বৈচিত্র্য অনুভব করিতে লাগিল।

টপ্পা গানে ভারতীয় প্রাচীন সঙ্গীত বা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মূল রীতিনীতিকে যতদূর সম্ভব অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করা হইয়াছিল। তাহার ফলে জনসমাদর লাভ করিবার জন্য সঙ্গীতে অঙ্গ কলার প্রাদুর্ভাব ঘটিল, নিছক কলার বাঁধুনি, প্রহেলিকা, ছড়া এবং সঙ্গত অসঙ্গত আঁকর টিপ্পনী ও বাক্যজাল বিস্তার করিয়া শ্রোতাদের বিমোহিত করিবার একটি প্রচেষ্টা হইল। নাগরিক শ্রোতাদের রসতৃষ্ণা মিটাইতে তখন অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ, বিকৃত রস বিশিষ্ট নানাপ্রকার গান রচিত হইয়াছে—সেগুলি শাশ্বত রসবস্তুর অভাবে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই।

কবির গানের পর পাঁচালীতে আবার ভক্তিরস সঞ্চারের চেষ্টা হইয়াছে। যাত্রার আসরে পৌরাণিক পালায় অভিনয়ের দ্বারাও সে চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু কীর্তনের সেই ভক্তিস্নিগ্ধ রসবিমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীর আর পুনরাবর্তন হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বাংলা সঙ্গীতে আবার বহুদিন পরে নবজীবনের সূত্রপাত হইল। তাঁহার সুরমায়া-স্পর্শে সঙ্গীতের সকল ক্ষেত্রে সৌন্দর্যের সঞ্চার হইল। তিনি, তাঁহার ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল বিদেশী সুরকে বাংলা গানে সঞ্চারিত করিয়া আর একটি নূতনধারার সূচনা করিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশী গানে উদাত্ত সুরের সৃষ্টি করিলেন। অতুলপ্রসাদ বাংলা গানে

করিলেন।

নজরুল ইসলাম বাংলা দেশে এক শ্রেণীর আধুনিক গানের প্রবর্তক। 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' তাহার সুরের আভিজাত্যের জন্য অপেক্ষাকৃত বিলম্বে-জনপ্রিয়। নজরুল ইসলাম তাঁহার গানে গায়কদের সুর সম্বন্ধে অত্যধিক স্বাধীনতা দেওয়ায় সাধারণ শিল্পীমহলে তাহার সাময়িক সমাদর হইয়াছে।

দিলীপকুমার পুনরায় উচ্চাঙ্গভঙ্গির গীতিরীতির প্রবর্তনে ব্রতী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও হালে সে প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়াছেন।

আধুনিক বাংলা গান আমাদের সঙ্গীতজগৎ হইতে ক্রমেই বহুদূরে লইয়া যাইতেছে। বহু সঙ্গীতজ্ঞের মতে এ গতি অবনতিরই দিকে। আধুনিক বাংলা গানের সুরস্বেচ্ছাচারের সম্বন্ধে বিখ্যাত সঙ্গীতবিদ্ শ্রীসৌম্যেন্দ্র-অবসান করিতেছি—

"রীতিবিরুদ্ধতা ছন্দে রসের ওজনবোধ সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব, সৃষ্টবস্তুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে বেখাপ্পা যোগাযোগ, রূপের অবয়বের প্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে গুরুচণ্ডালী দোষ। এটা গানেও ঘটে, যেমন আধুনিক গানে ঘটছে। রূপ ভাঙবার অধিকার আমি স্বীকার করি। এ অধিকার আমি কিছুতেই ছাড়তে রাজী নই। তবু ভেঙে-চুরে জুড়বার সময় মনে রাখতে হবে যে, এই টুকরোগুলোর মধ্যে সমগ্রের একটা ব্যঞ্জনা আছে, যেমন, হাতের অংশের মধ্যে সমগ্র হাতের ব্যঞ্জনা আছে—লেজের নেই। চোখের টুকরোগুলোর মধ্যে পূর্ণচোখের মধুরিমার আভাস আছে গজদন্তের নেই। তাই জুড়তে গেলে একটা সমগ্র আদর্শের ছবি মনে রাখতেই হবে, নইলে রসসৃষ্টি হবে উটের বীভৎস, যা চোখে পড়ে আধুনিক গানের কথায় ও সুরে

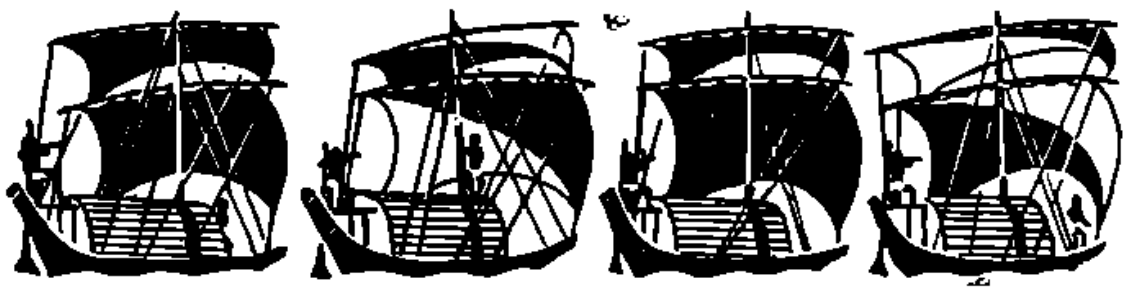

রাণুর ভাই

পল্ গুতিয়েম্, এস্. জে.

আমি খ্রীষ্টভক্ত ; জন্মান্তরে আমার বিশ্বাস নেই…

• • •

তরকারি বড্ড কাল হয়েছিল সেদিন…। আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে তিনিয়ে পড়েছিলাম। হজম করতে করতে "স্পেনের শ্রেষ্ঠ গল্প" বইটা পড়ছিলাম। আমার মাথা দুলছিল এদিক ওদিক…। হঠাৎ নবজন্ম লাভ করলাম—রাণুর ভাইয়ের রূপান্তরে !

• • •

আমার বাবা বিলাত-ফেরৎ একজন ইঞ্জিনিয়ার, বাড়ী প্রায়ই থাকেন না। মফঃস্বলে তাঁর চাকরি। তিনি কিন্তু আমার পড়াশোনার অদ্ভুত ব্যবস্থা করে গেছেন : আধা-ইংরেজ মিস্ রিবেরো হচ্ছেন আমার গৃহশিক্ষয়িত্রী। মোটের ওপরে আমার ভাল লাগে এই মিস্‌কে, ভাল লাগে তাঁর অনবগুণ্ঠিত তরঙ্গিত চুল। ছবি আঁকা ও পিয়ানো বাজানো ছাড়া তিনি আমাকে পড়ান, বিলাতের ইতিহাস। তাঁর মতানুসারে বিলাত হচ্ছে পৃথিবীর একমাত্র সভ্যদেশ…। মিস্ রিবেরো ইংরেজি গানের অত্যন্ত পক্ষপাতী। বেশ মজাদার কিন্তু ঐ সব ইংরেজি গান। কালকে যেটা শিখেছিলাম তার মর্ম এই—"তামাক খেতে খেতে টমকাকা তাঁর কুটীর থেকে বের হলেন"। পরের কলি জানিয়েছিল যে "তাঁর কুটির" থেকে বের হলেন টমকাকা, তামাক খেতে খেতে"। এই অত্যাবশ্যক বক্তব্যটা তিনচারবার শোনানোর পরে গানটা শেষ হয়, টমকাকা ও তাঁর তামাকের অন্ত আর কোন খবর না দিয়ে…। বেশ মজা বটে !

মিস্ রিবেরোর বিস্তারিত পরিচয় নাই বা দিলাম। একক্ষেত্রে কিন্তু তাঁর শাসন ভীষণ কড়া। সেটা হচ্ছে আজুল চাটার ব্যাপার। এই অপরাধ তাঁর নজরে পড়লে আর রক্ষে নেই ; ভাতের ওপর সন্দেশ পড়বে না পেটে। এ-ছাড়া আমার নালিশ করার আরও একটা কারণ আছে : বাংলা বলা আমার একেবারে মানা। এই নতুন নিষেধের কারণ যে কি—বুঝতে পারি না, তবে এইটুকু বুঝি যে মহাপাতকের মধ্যে বাংলা বলা হচ্ছে সবচেয়ে নিন্দনীয় এবং অমার্জনীয় অপরাধ, কেন না ধরা পড়ার মানে আবার সন্দেশের ভাগ ছাড়ানো। আমার নীতিপুস্তকে পড়েছিলাম যে গরীব ছেলেরা কখনও সন্দেশ খেতে পায় না। তারা সব সময় বাংলা বলে কি না !

আজ দাদা ফিরে এসেছেন পুজোর ছুটিতে, তিনি খড়্গপুর-ইন্‌স্টিট্যুটের ছাত্র। এই দু-চার মাসের মধ্যে বড্ড শৌখিন হয়ে গেছেন আমার দাদা। সাহস পেলে তাঁকে বলতাম তাঁর গালপাট্টা কামাতে। তাতে কিন্তু মিস্ রিবেরোর ঘোরতর আপত্তি : দাদা তো আর ছোট ছেলে নন ! তিনি যে পুরোপুরি মানুষ হয়ে উঠেছেন—তার প্রমাণ হচ্ছে বুঝি ঐ গালপাট্টা।

আমার পড়াশোনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করাই দাদার যেন একমাত্র উদ্দেশ্য। এতে অবশ্য আমার খুব সুবিধে, বেড়ালের সঙ্গে খেলা করি ও কাগজের ছোট নৌকো বানাই ইংরেজি খাতার পাতা ছিঁড়ে। মিস্ রিবেরো কিছুই লক্ষ্য করেন না। দাদা তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন বলে। তাঁরা কি সব বলেন বোঝা যায় না ; বেশ ফিস্ ফিসে তাঁদের কথাবার্তা। বোধহয় মিস্

রিবেরো দাদাকেও দেখাতে চান টমকাকার রোমাঞ্চকর কাহিনী···।

মা মাঝে মাঝে আসেন পড়ার ঘরে তদারক ক'রতে। দাদাকে এখানে আনাগোনা করতে দেখে মায়ের মুখে ছায়া পড়ে। "ও এইমাত্র চুকেছে একটি কলম চাইতে"। এই বলে মিস্ খেলার সরঞ্জামের বাক্স খুলে দাদার হাতে একটা কলম বাড়িয়ে দেন। দাদা কি কলম জমাচ্ছেন" না কি? জিজ্ঞেস করলাম মিস্কে; তিনি উত্তর দিলেন: "বাচ্চারা এসব ব্যাপারে মাথা না গলালেই বাঁচি। তাই তো বাচ্চারা কলম-টলম তো জমায় না, জমায় ষ্ট্যাম্প···।

মিস্এর সঙ্গে সাইকেলে চড়ে প্রায়ই বেড়াতে যাই লেকএর দিকে···। হঠাৎ একদিন ভাড়া-করা সাইকেল চালিয়ে দাদা আমাদের সাথে এসে জুটলেন। তিনি ও মিস্ কথা বলতে বলতে এগিয়ে যান, আমি তাঁদের পিছনে চলি বেশ খানিকটা তফাতে। তাঁরা বলেন—তিনজনে পাশাপাশি সাইকেল চালানো বড় বিপজ্জনক আর আইন বিরুদ্ধ।

• • •

মা আমাদের সঙ্গে বসে খান। ক'দিন ধ'রে খাবার সময় তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথা বেরোয় না। মেজের কাপড়ের ঘুনানি দেখেন মা আনমনে···।

• • •

আজ ঘটেছে এক কাণ্ড।

দাদা ও মিস্ খেতে এসেছেন অনেক দেরী করে। বললেন বিশেষ দরকারী কাজ ছিল নাকি তাঁদের ফুলবাগানে।

—"সব বাজে কথা—" বলে মা দাদার দিকে আড় চোখে দেখছিলেন; একটু পরে মিস্ কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। মা আমাকে বোঝালেন যে তরকারিতে পিঁয়াজ একটু বেশী দেওয়া হয়েছিল বলে মিস্ অসুস্থ বোধ করছিলেন। মিস্ পিঁয়াজ দেখতে পারেন না কি না ছুচোখে। আমি কিন্তু পিঁয়াজের গন্ধও পেলাম না আজকের তরকারিতে।

কাল রাতে ক্লাস হয়নি, মিস্ রিবেরো তাঁর ঘর থেকে বের হননি বলে। মা নিজের কামরায় দাদার সঙ্গে কথা বলছিলেন। দাদা যখন বাইরে আসেন, তখন দেখি তাঁর চোখ লাল।

ওপর তলা থেকে অনেক বাক্সপত্র নামানো হচ্ছে, তার সঙ্গে মিস্এর টিয়ার খাঁচা। মা বললেন যে আমার শিক্ষয়িত্রী বাড়ী যাচ্ছেন কয়েকদিনের জন্য, তাঁর মায়ের বড্ড জ্বর···। বাড়ী খাঁ খাঁ করে, টিয়া কিন্তু অভ্যেস মত বক্‌বক্ করছে। মিস্ নামলেন রবিবারের কাপড় পরে, রুমাল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে···। কেউ এল না তাঁকে বিদায় দিতে। তাকিয়ে রইলাম দরজার পেছন থেকে; আমার চোখের পাতা ভিজে যাচ্ছিল।

রাস্তার ভিড়ে মিস্এর গাড়ি মিশে গেল: টিয়া পাখি তখনও আওড়াচ্ছে টমকাকার সেই তামাকের গল্প···

আমার পড়াশোনা অনেকদিন স্থগিত রইল। বেকার বসে, অনন্যোপায়ে, কাগজের ফৌজ-জাহাজের কারখানা খুলে দিলাম। তদারক করে আমার খেলার সাথী বেরাল, উৎসাহদায়ক নয়নে। আর কোনও দিন কোনও মিস্ আসছেন না আমাকে শেখাতে? না; মার মত, শুনলাম বদলে গেছে। তাঁর মত এখন এইরূপ:

এক নম্বর: বাঙালীর ছেলে বাংলা ভাষাই বলুক। —তাই বলুক না ..আর সন্দেশ খাক।

দু নম্বর: কোনও শিক্ষয়িত্রী আমাদের চৌকাঠ আর কোনও দিন মাড়াবেন না।

—এর কারণটা যে কি, তা আমার জানা নেই।

তিন নম্বর: টমকাকার ও কাহিনী বেকুবি ছাড়া আর কিছুই নয়।

—এটুকু অবশ্য আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম···।

• • •

আমার বুড়ো, দাঁতপড়া শিক্ষকের নাম ইন্দুবাবু। আঙুল চাইতে দেখেও বকেন না।

আমার পাশে আর আসেন না পড়ার সময় কলম চাইতে।

শেফালি এসেছে; বড়দিনের ছুটি কাটাবে আমাদের এখানে। মা আমাকে বলেছেন তার সঙ্গে লক্ষ্মীছেলের মত খেলতে। শেফালি আমার পিসতুতো বোন; দুজনে মাথায় এক, বয়সেও প্রায় এক। আমার আগে তাকে পরিবেশন করতে মা কোনদিনও ভোলেন না। ওটার নাম ভদ্রতা।

কলের থালায় বাকি ছিল একটিমাত্র ডালিম তার ওপর আমার লোলুপ দুষ্টি দৃঢ়-নিবদ্ধ। শেফালি খেয়ে ফেলল কলটাকে। একটুকরোও চাখলাম না। সে অভদ্র···।

• •

আমার ভুল ভেঙেছে। তাকে অভদ্র বলেছিলাম; কেন? সে তো বেশ আমুদে মেয়ে। ক···ত খেলা জানে সে. রামায়ণের ক···ত গল্প! দুজনে মিলে রাবণপুরী বানিয়েছি, বাবার লাইব্রেরীর বই নিয়ে.....

তাকে বুঝি ভালবাসি আমি। বেরালকে যেমন বাসি?...(মনে মনে) না, তবে খু···ব ভালবাসি তাকে।

• •

বা. বেরালের চেয়েও বেশী।

তার সঙ্গে প্রায়ই বাগানে যাই খেলাধূলা করতে; কত কিনা জানে শেফালি। আর কি সুন্দর তার হাসি।

বাগানের ওধারে মালীর বাসা। তার মেয়ে খেঁদি পাঁচুর সঙ্গে কথা কইছে। পাঁচু কর্ণী মিস্ত্রির ছেলে। খেঁদীর চোখে বুঝি ধূলিকণা পড়েছে। পাঁচু কাছাকাছি এসে তার মুখের দিকে খুব মন দিয়ে তাকায়। না, আমার আন্দাজ ঠিক হয়নি; শেফালির ধারণা আলাদা। শেফালির ধারণা—এক, আমি মূর্খ; দুই, ওরা বাস্তুহারা, বৈশাখ মাসে তাদের বিয়ে।

বিয়ে! কি মজা। আমরাও দুজনে কালকে বিয়ে খেলা খেলব।

সারা রাত চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। খুব ভোর বেলায় উঠে গেলাম বাগানে খেলা করতে:

...মা এলেন, খেলাটা থামালেন। বেশ জোর কিন্তু তাঁর গলায়।

খেতে বসে তিনি বললেন যে শেফালিকে বাড়ী ফিরতে হবে। মেয়েকে না দেখে পিসিমার মন নাকি কেমন করছে। এই বলে মা মেজের কাপড়ের ঘুনালি দেখছিলেন আনমনে।

বুঝেছি আজ মা মিনুদের আর বাড়ী আনেন না কেন।

বিকালে ঘুম যখন ভাঙল, তখন দেখি আমার কোলের ওপর খোলা সেই "স্পেনের শ্রেষ্ঠ গল্প" বইটা। Perraultএর "ছেলেবেলা" পড়তে পড়তে আমি উড়ে-ছিলাম রাণুর ভাইএর স্বপ্নলোকে।

দরজায় ধাক্কা পড়ল। স্কুলের এক ছেলে এসে জানাল যে বৈঠকখানায় এক ভদ্রলোক বসে আছেন আমার অপেক্ষায়।

নেমে এলাম। ভদ্রলোকটি দেখলাম "নবালোক" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়। তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে আমি "নবালোকে"র জন্যে একটি গল্প লিখতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সে তো অনেক দিনের কথা। তিনি কিন্তু নাছোড়বান্দা, বললেন যে লেখা না পাওয়া পর্যন্ত তিনি আমার চৌকাঠে বসেই করবেন আমরণ নিরম্বু উপবাস।

আমি অতি সাধাসিধে ভালমানুষ—কারও অনিষ্ট চাইনে, আর চাইলে, লাশ আমার ঘরের সামনে! তাই রাণুর ভাইয়ের স্বপ্নলোকে আমার সেই যাত্রার গল্প লিখে ফেললাম। তার সমস্ত দায়িত্বভার সম্পাদকের ঘাড়ে।

বাংলার পেশাদার রঙ্গালয়

শ্রীপ্রভাংশু গুপ্ত

১৮৬৮ সন। কলকাতায় তখন শখের সম্প্রদায়ভুক্ত বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার ক্লাবের নাম-ডাক খুব। পরে এই শখের থিয়েটার ক্লাব শ্যামবাজার নাট্যসমাজে রূপান্তরিত হয়েছিল। শ্যামবাজার নাট্যসমাজের বিশিষ্ট অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন প্রথিতযশা নট নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও বাংলার লেজেণ্ডারী ও গ্যারিক নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ। বাংলা দেশে প্রথম ঐ শ্যামবাজার নাট্যসমাজই বাঙালীর পেশাদার রঙ্গালয় ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত করেন।

সেকালে শখের থিয়েটারের প্রচলন ছিল খুব,—হঠাৎ পেশাদার রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার মূলে যথেষ্ট কারণও ছিল। শখের থিয়েটারগুলি ধনী ব্যক্তি বিশেষের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হ'ত। একমাত্র নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ঐসব থিয়েটারে প্রবেশের অধিকার ছিল। সাধারণ লোকের পক্ষে শখের থিয়েটারে অভিনয় দর্শন করা মোটেই সম্ভবপর ছিল না। তা ছাড়া, ব্যক্তি বিশেষের খেয়ালে যেমন নাট্যকলার সৃষ্টি হ'ত,—কাজের স্রোতে ভাটা পড়লে সেই নাট্যশালার অস্তিত্বও লোপ হ'ত—ধারাবাহিক ক্রমোন্নতির কোনো উপায় ছিল না। এই সব কারণে, শ্যামবাজার নাট্য সমাজের উৎসাহী যুবকরা সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত করেছিলেন। প্রথমেই কিন্তু অভিনয় প্রদর্শনের জন্য টিকিট বিক্রয় করা হয় নি। এ বিষয়ে দলে যথেষ্ট মতভেদ ছিল। টিকিট বিক্রয়ের সপক্ষে প্রধান ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিপক্ষে প্রধান ছিলেন নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি ছিল থিয়েটারের সিন্, পোষাক, পরচুলা ইত্যাদির খরচ টিকিট-বিক্রয়লব্ধ টাকা থেকে তুলে নেওয়া সমীচীন ও সঙ্গত,—অপর পক্ষে গিরিশচন্দ্রের যুক্তি তাঁর লেখা থেকেই জানতে পারা যায়। তিনি লিখেছিলেন—"সাধারণ-সমক্ষে টিকিট বিক্রয় করিয়া অভিনয় করা আমার অমত ছিল, কারণ একেই তো তখন বাঙ্গালীর নাম শুনিয়া ভিন্ন জাতি মুখ বাঁকাইয়া যায়, এরূপ দৈন্য অবস্থা ন্যাশনাল থিয়েটারে দেখিলে কি না বলিবে—এই আমার আপত্তি। ন্যাশনাল থিয়েটারের নামে অনেকেই বুঝিবে যে, ইহা জাতীয় রঙ্গালয়, বঙ্গের শিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সমবেত চেষ্টায় ইহা স্থাপিত, কিন্তু কয়েকজন গৃহস্থ যুবা একত্র হইয়া ক্ষুদ্র সরঞ্জামে ন্যাশনাল থিয়েটার করিতেছে, ইহা বিসদৃশ জ্ঞান হইত। ইহাই মতভেদ।"

এর পাল্টা উত্তর হিসেবে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী প্রভৃতি এই যুক্তি দেখালেন, নাট্যশালার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সবই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। এত টাকা-পয়সা খরচ করা যখন তাঁদের সাধ্যের অতীত, তখন তাঁদের যে রকম সামর্থ্য সেইরকম আয়োজনে রঙ্গালয়ের কাজ সমাপ্ত করা যুক্তিসঙ্গত। পরিশেষে টিকিট বিক্রয়েরই ব্যবস্থা বজায় রইলো। গিরিশচন্দ্র দল থেকে বিদায় নিলেন।

নীলদর্পণ

ন্যাশনাল থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ অর্থাৎ ষ্টেজ স্থাপিত হ'ল কলকাতার চিৎপুর অঞ্চলে মধুসূদন সান্যালের প্রমোদের বহির্বাটির প্রাঙ্গণে। প্রথম অভিনয় হয় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'। 'নীলদর্পণ' মঞ্চস্থ করা স্থির হ'লে পর পুরোদমে রিহার্সাল চল্‌লো। ১৮৭২ সনে শুভ জগদ্ধাত্রী পূজার দিন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে নীলদর্পণের ড্রেস রিহার্সাল হ'ল। ঐ সময়ে সুবিখ্যাত

অভিনেতা অমৃতলাল বসু ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগদান করেন। অভিনয় দিবসের কয়েকদিন আগেই সেকালের পত্রিকা সুলভ সমাচারে ঘোষণা করা হ'ল, "সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমরা আগামী ৭ই ডিসেম্বর শনিবার তারিখে শ্রীকৃষ্ণ মল্লিকের বাটির সম্মুখে মৃত মধুসূদন সান্যাল মহাশয়ের বাটিতে রঙ্গভূমির ও বঙ্গভাষার অঙ্গপুষ্টির নিমিত্ত রঙ্গভূমে আবির্ভূত হইতে ইচ্ছুক ও যত্নবান হইয়াছি। সেদিন নীলদর্পণের অভিনয় হইবে। টিকিটের মূল্য—প্রথম শ্রেণী ১৲ টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণী ।০ আনা।"

নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক ও ধর্মদাস সুর, ষ্টেজ ম্যানেজার, এই দুজনের নামে ঐ ঘোষণা প্রকাশিত হয়।

নির্দিষ্ট দিনে নীলদর্পণের অভিনয় শেষ হ'ল। অভিনয় শেষে হিসেব ক'রে দেখা গেল মোট চার শো টাকার টিকিট বিক্রয় হয়েছে। ১২ই ডিসেম্বর তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকায় নীলদর্পণ অভিনয় সম্বন্ধে প্রকাশিত সমালোচনা থেকে জানা যায় অভিনয় দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করেছিল। এই বিশেষ অভিনয়টি বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম অভিনয় হিসেবে বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। নীলদর্পণের প্রথম ও দ্বিতীয় অভিনয়ের মাঝামাঝি ন্যাশনাল থিয়েটারে দীনবন্ধু মিত্রের আরো দুখানি নাটক অভিনীত হয়েছিল। প্রথম—'জামাই বারিক', অভিনয়ের তারিখ ১৪ই ডিসেম্বর। দ্বিতীয়—'সধবার একাদশী', অভিনয়ের তারিখ ২৮শে ডিসেম্বর। ১৮৭৩ সনের ৬ঠা জানুয়ারী দীনবন্ধু মিত্রের 'নবীন তপস্বিনী' নাটকখানি অভিনীত হয়। এই অভিনয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই অভিনয় রজনীতেই সর্বপ্রথম প্রম্পটার বা স্মারকের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল। এর পর ১১ই জানুয়ারী মঞ্চস্থ করা হয় দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' নাটকখানি। ঐ সময় ন্যাশনাল থিয়েটারে সর্বপ্রথম বুধবারেও অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৭৩ সনের ১৫ই জানুয়ারী বুধবার অভিনীত হ'য়েছিল দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'। এর পর আর কোনো নতুন নাটক মঞ্চস্থ না করে ঐ রঙ্গমঞ্চে নবীন তপস্বিনীর দ্বিতীয় অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। অভিনয়ের তারিখ ১৮ই জানুয়ারী। ২৪শে জানুয়ারী অভিনীত হয় 'নবনাটক'।

১৮৭৩ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখটি বাংলার নাট্যকলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ তারিখে মাইকেল মধুসূদন দত্তের ঐতিহাসিক নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' মঞ্চস্থ করা হয়। এতদিন ধ'রে সামাজিক নাটকগুলিরই অভিনয় চলছিল, প্রথম ব্যতিক্রম হ'ল কৃষ্ণকুমারী নাটক। ঐ অভিনয়ের সময় গিরিশচন্দ্র ঘোষ পুনরায় ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগদান করেন। গিরিশচন্দ্র স্বয়ং ভীম সিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

অভিনেত্রীর আবির্ভাব

কৃষ্ণকুমারী নাটক অভিনীত হবার কিছুদিন পরেই বাংলার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। ঐ সময় শরৎচন্দ্র ঘোষ বেঙ্গল থিয়েটার নামে একটি সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসে বেঙ্গল থিয়েটারের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইতিপূর্বে নারী ভূমিকায় পুরুষেরাই অভিনয় করতেন, কিন্তু এই বেঙ্গল থিয়েটারেই সর্বপ্রথম নারী ভূমিকায় অভিনেত্রী নিয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

আদি ন্যাশনাল থিয়েটার দুই দলে বিভক্ত হ'য়ে যায়,—প্রথম দল ন্যাশনাল থিয়েটার এবং দ্বিতীয় দল হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার নাম নিয়ে অভিনয় করতে থাকেন। কিছুদিন পরে দুই দল পুনরায় একদলে পরিণত হয়,—এই মিলিত দলের পরিচালিত থিয়েটারের নাম হয় গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। গিরিশচন্দ্র অবৈতনিক অভিনেতা ও নাট্যাচার্যরূপে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ নন্দিনী', নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ', মাইকেলের 'মেঘনাদ বধ', রমেশচন্দ্র দত্তের 'মাধবী কঙ্কণ' প্রভৃতি নাট্যাকারে রূপান্তরিত ক'রে ঐ থিয়েটারে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। এর পর গিরিশচন্দ্র বেতনভোগী অভিনেতা ও নাট্যাচার্য-

রূপে ঐ থিয়েটারে স্বরচিত নাটক মঞ্চস্থ করেন। ইতিমধ্যে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের পরিচালকবর্গের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের মতবিরোধ হয়। ফলে তিনি এক ধনী ব্যক্তির সাহায্যে ১৮৮৩ সনে ষ্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। এই ষ্টার থিয়েটারেই তিনি অভিনয় করতে থাকেন, কিন্তু কিছুদিন পরে এমারেল্ড থিয়েটার স্থাপিত হ'লে তিনি ঐ রঙ্গালয়ে যোগদান করেন।

বাংলা দেশের শখের থিয়েটার থেকে যে সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্ম হয়, তাই ক্রমে শাখা-প্রশাখায় নানা নামে দেখা দিতে লাগলে। ক্রমে বেঙ্গল থিয়েটার, ষ্টার থিয়েটার, এমারেল্ড থিয়েটার, সিটি থিয়েটার, মিনার্ভা থিয়েটার, ক্লাসিক থিয়েটার, কোহিনুর থিয়েটার, বীণা থিয়েটার, মনোমোহন থিয়েটার, প্রেসিডেন্সী থিয়েটার প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়।

গিরিশ প্রতিভা

সাধারণ রঙ্গালয়ের ভিত্তি স্থাপনের পর থেকে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত যতগুলি নাট্যশালা স্থাপিত হয়েছিল, তার অধিকাংশই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গিরিশচন্দ্রের সাহায্যে পুষ্টিলাভ করেছিল। ১৯১২ সনে নটগুরু গিরিশচন্দ্রের তিরোধান হয়। ঐকালের মধ্যে তিনি নানা শ্রেণীর বহু নাটক রচনা ক'রে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। নাট্যশালার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে গিরিশচন্দ্রের সহযোগীরূপে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর, ধর্মদাস সুর, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, অমৃতলাল বসু এবং আরো কয়েকজনের দান অপরিশোধ্য বলা যেতে পারে। ঐদিক দিয়ে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, তারকনাথ পালিত, গিরিশচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ও অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দানও কম নয়। সেকালের অভিনেত্রী, সুকুমারী দত্ত, তারাসুন্দরী, মানদা দাসী, তিনকড়ি, নরীসুন্দরী, কুসুমকুমারী, বিনোদিনী ও সুশীলাবালার নামও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নবযুগ

বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের নবযুগ আরম্ভ হয় ১৯২১ সনে,—পুরাতন যুগের তিনটি মাত্র রঙ্গালয়ের তখন অস্তিত্ব ছিল,—ষ্টার, মিনার্ভা ও মনোমোহন। ঐ সময়ে পার্শী ব্যবসায়ী জে, এফ্ ম্যাডান বেঙ্গল থিয়েট্রিকাল কোম্পানী স্থাপিত করেন। ঐ কোম্পানীর রঙ্গমঞ্চে প্রথম 'অপরাধী কে?' নামে একখানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। ঐ বৎসর বর্তমান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ি ঐ নতুন নাট্যশালায় যোগদান ক'রে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের "আলমগীর" নাটকে নামভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ঐ সময়েই মিনার্ভা থিয়েটারে দুইজন বিশিষ্ট অভিনেতার আবির্ভাব হয়,—শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র ও শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়। যাই হোক্, ঐ সময়ে ষ্টারে তখন মহাসমারোহে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'অযোধ্যার বেগম' নাটকখানির অভিনয় চলছিল,—এই অভিনয়ের সময়ই সর্বপ্রথম রবিবারে ম্যাটিনি অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

নাট্যমন্দির ও 'সীতা'

১৯২৩ সন বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের একটি বিশিষ্ট বৎসর। ঐ বৎসরে ষ্টারে আর্ট থিয়েটারে দলভুক্ত হ'য়ে দেখা দিলেন তিনকড়ি চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো অনেকে। ইতিমধ্যে শিশিরকুমার ম্যাডানের বেঙ্গল থিয়েট্রিকাল কোম্পানীর সংস্রব ত্যাগ ক'রেছিলেন ঐ থিয়েটারে প্রতিভাবনা অভিনেতা নির্মলেন্দু লাহিড়ীর পরিচালনায় নাটক মঞ্চস্থ হতে লাগলো। ১৯২৩ সনে শিশিরকুমার কলকাতার ইডেন গার্ডেনের এগ্‌জিবিসনে দ্বিজেন্দ্রলালের "সীতা" সর্বসমক্ষে মঞ্চস্থ করলেন। পরে তিনি অ্যালফ্রেড থিয়েটারে যোগদান করেন। ঐ সময়ে ষ্টারে সর্বপ্রথম একাঙ্কিকা নাটিকার অভিনয় হয়,—মন্মথ রায়ের 'মুক্তির ডাক'। ষ্টারে তখন শনি ও রবিবারে মহাসমারোহে চলছিল অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'কর্ণার্জুন'। ১৯২৪ সনে শিশিরকুমার মনোমোহন থিয়েটার নাট্যমন্দিরে রূপান্তরিত ক'রে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর "সীতা" মঞ্চস্থ করেন।

আর্ট থিয়েটারের কর্ণধার ও শিশির-অভিনীত সীতা বাংলার নাট্যশালার ইতিহাসে যুগান্তরের সৃষ্টি করেছিল। পরে শিশিরকুমার শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয়ে বিপুল প্রতিভা প্রয়োগ কৌশলের পরিচয় দেন। আর্ট থিয়েটারের পরিচালকবর্গ রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' ও 'গৃহ-প্রবেশ' নাটক মঞ্চস্থ করবার সময় যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন

আর্ট থিয়েটারের শক্তিমান অভিনেতা ও পরিচালিকার দল ও শিশির সম্প্রদায় বাংলার নাট্য-প্রযোজন-কৌশল, সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়ের বিশেষ উন্নতিসাধন করেন।

এই প্রসঙ্গে বাংলার নাট্য-সাহিত্যের তথা সাধারণ রঙ্গালয়ের যে সব নাট্যকারের দান অমূল্য, তাঁদের কয়েকজনের নাম উল্লেখ ক'রে বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করবো।—

দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, মনোমোহন বসু, মনোমোহন রায়, রাজকৃষ্ণ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নিশিকান্ত বসু, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। যাঁদের উপন্যাস নাট্যাকারে রূপান্তরিত ক'রে নাট্যশালার শ্রীবৃদ্ধি হ'য়েছে, তাঁদেরও দান কম নয়,—বাংলার পুরাতন যুগের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নবযুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

প্রভাত দেবসরকার

[উপন্যাস] [পূর্বানুবৃত্তি]

ডাক্তার।

যেন সমস্বরে বিস্মিত প্রশ্ন হলো। ডাক্তার কোথায় পাবে? পুলিশে তো তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে কখন।

মাধুরী বললে, না, না, কামারপোলের সুরেন ডাক্তারকে খবর দাও···দাদুর নাম করে' বল বিশেষ তাড়া, এখ্‌খুনি যেন আসেন।

একজন পরিচারিকাকে আঁচলের চাবি খুলে দিয়ে মাধুরী বললে, যা তো হারুর মা, বামুনদিকে গিয়ে বল সিন্দুক খুলে কুড়িটা টাকা দিতে। কে যাবে? তুমি! বেশ, পাল্কী করে' নিয়ে এস সুরেনবাবুকে, এখুনি আসা চাই, যাও যাও—

বার বার মাধুরী ঝুঁকে পড়ে রমাপতির নিঃশ্বাস পরীক্ষা করে' দেখতে লাগল। এখনো কিছু তার বোধগম্য হচ্ছে না। এই তো সবে আধ ঘণ্টাও হয় নি দাদু শঙ্খ শুনে বটতলার মাঠের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন—ওরি মধ্যে একি ঘটনা ঘটলো! অজ্ঞান, অচৈতন্য! কেন? বন্দুকের গুলি এসে লেগেছে তাঁর বুকে? উদ্যত বিদ্রোহী প্রজারা তাঁকে পীড়ন করেছে? না, বিদ্রোহীরা তাঁকে হত্যা ক'রে ঘরে তুলে দিয়ে গেল।

কাকে জিজ্ঞেস করলে মাধুরী উত্তর পাবে—কে ঠিক সংবাদটা দেবে? এরা মজাই দেখতে এসেছে। বটতলার মাঠের পাঠ চুকিয়ে এখানে ভিড় করছে।

ভিড়ের মধ্যে কে যেন বলে উঠলো, ঐ পুলিশ আসছে! পুলিশ আসছে! ···ওরে বাবা লাল পাগড়ী!

পালা! পালা।

মুহূর্তে ভিড় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ঘোষবাড়ির আবাল বৃদ্ধ বনিতারাও অদৃশ্য হ'ল। একা রমাপতিকে নিয়ে মাধুরী অপেক্ষা করতে লাগল।

পুলিশ আসতে আনুপূর্বিক ঘটনাটা মাধুরী জানতে পারলে। বটতলার মাঠে পুলিশ কয়েকটা ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে, তাতে কোন ফল না হওয়ায় লাঠি চার্জ করে। তারপর কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। চার জন পুরুষ দু'জন মহিলা আছেন তার মধ্যে। একজনকে তারা বিশেষভাবে চেনে, তিনি হচ্ছেন ডাক্তারবাবু। দু'জন মহিলার মধ্যে একজন অন্যান্য ব্যাঙ্ক ক্যারেক্টারের। এই গ্রামেই তার বাড়ি, রক্ষিতা শ্রেণীর মেয়েমানুষ। পুলিশ তার সম্বন্ধে অনেক খবরই জানে। ভেতরে ভেতরে এই আন্দোলন সেই জিইয়ে রেখেছিল। অনেককে সাহায্য করতো।

রমাপতিবাবুর জ্ঞান থাকলে সব ইন্‌ফরমেশানই তারা পেত। মিটিং-এর পাণ্ডাদের গ্রেপ্তারের পর অনেকটা ডাক্তারবাবুর অনুরোধেই জনতা ফিরে গ্রামের দিকে আসে। পুলিশ ভাবে হয়তো গোলমাল উপস্থিত মিটে গেল। ইঁট-পাটকেল খেয়ে গুলি-গোলা ছোঁড়ার আর হাঙ্গামা করতে হবে না।

কিন্তু কার কথা কে শুনবে! একটা মাঠ পেরুতে না পেরুতে পুলিশকে কে যেন ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলে, ছত্রভঙ্গ জনতা গ্রামের পথেই আর একটা হাঙ্গামা বাধিয়েছে। রমাপতিবাবুকে খুন করেছে! বাবুদের ধানের গোলা লুট করবে বলে এগিয়ে চলেছে। জনতাকে বিশ্বাস করাই পুলিশের ভুল হ'য়েছে। আগেভাগে সাবেস্তা না ক'রে একটুতে ছেড়ে দেওয়া উচিত হয় নি—গুলিতে কয়েকজনকে জখম করা উচিত ছিল।

মাধুরী হাত নেড়ে কি যেন বললে, পুলিশ অফিসার

খানিক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরের বাইরে এদিক-ওদিক কৌতূহলী কয়েকজন ঘোরাঘুরি করতে লাগল।

এখন সাক্ষী-সাবুদ সংগ্রহ করা দরকার। রমাপতি-বাবুর এ অবস্থার প্রকৃত বিবরণ কি? কার দ্বারা কি হ'য়েছে! সত্যি কি খুন হ'য়েছেন?

পুলিশ অফিসারটি বাইরে এসে বৈঠকখানার রোয়াকের সামনে দাঁড়াল—চোখ তুলে চারিদিক চেয়ে দেখলে। আশ্চর্য, এত বড় বাড়ির একজনও পুরুষ মানুষ এ সময় উপস্থিত নেই। রমাপতিবাবু কি আত্মীয়দের দ্বারা পরিত্যক্ত? মানুষের এমন বিপদে যারা সাহায্যের জন্য আসে না তারা কেমন জ্ঞাতি-গোত্র? অথচ যে বিরোধের এই পরিণতি তার উদ্যোক্তা রমাপতি একা ছিলেন

ঘোষ বংশের অনেকে থানায় গিয়েছিলেন নালিশ জানাতে। প্রধান বাদীর নাম রমাপতি ঘোষ থাকলেও উত্তাপ ছিল অনেকের। তাঁরা এখন কোথায়?

একটি ছোট ছেলেকে সামনে দেখে পুলিশ অফিসারটি বললে, শোন খোকা, দেখ তো ভেতরে কে আছেন! ডেকে নিয়ে এস।

ছেলেটি ফুল্ ফুল্ করে চেয়ে পিছু হটতে লাগল। পুলিশ অফিসারটি এগিয়ে গিয়ে ছেলেটির হাত ধরলে, পালাস কেন?

বিকট শব্দ করে ছেলেটি কেঁদে উঠলো! সারা ঘোষবাড়িটা যেন চমকে উঠলো। পুলিশ অফিসারটি বিরক্ত হ'য়ে বললে, আচ্ছা আলাতন!

রমাপতির বৈঠকখানার সামনে দু'জন পুলিশ পাহারা রেখে অফিসারটি থানায়ে এসে দাঁড়ালে। দেখলে, আশেপাশে অনেকে তখনও ঘুর ঘুর করছে।

বয়স্ক দু'জনকে কাছে আসবার নির্দেশ করলে অফিসারটি। ভয়ে ভয়ে লোক দুটি আসতে অফিসার বললে, তোমরা এখানে কি করচো?

লোক দুটি চুপ করে মাথা চুলকতে লাগল।

কি করচে? তোমরা দেখেচো কে মেরেচে? পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করলে।

লোক দুটি মাথা নাড়লে, অর্থাৎ কিছুই তারা জানে না। মারামারির খবর তারা রাখে না।

পুলিশ অফিসার চটে গেল, মজা দেখতে এসেচো সব! দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি—ঘুঘু সিং।

আমতা আমতা করে কাঁদ কাঁদ স্বরে একটি লোক বললে, আমি মাঠের তল্ গরু বাঁধতে গেছলুম, তেখন দেখি—

তাড়া দিয়ে পুলিশ অফিসার বললে, কি দেখলে।

দ্রষ্টব্য বস্তুর হিদাবটা বুঝি হারিয়ে যায়। সব একাকার হ'য়ে যায়।

দেখলুম ঐ চাঁদনির কাছটায় খুব ভিড় জমেছেন।

জেরা করে পুলিশ অফিসার জিজ্ঞেস করলে, কাকে কাকে দেখলে সেখানে? ভিড় যেন?

বড়বাবু ধুলোর ওপর শুয়ে আছেন! ঠিক স্মরণ হয় না কাকে কাকে দেখেচি বাবু।

শুয়ে থাকতেই দেখেচো বাবুকে? কাউকে মার-ধোর করতে দেখনি? ঠিক বলচো?

হ্যাঁ বাবু, ওনাকে কে মারবে!

বড় সাধু সব! তোমরাই মেরেছ! পুলিশ অফিসার ধমকে উঠল। সত্যি কথা বল বলচি!

আজ্ঞে না বাবু, কাউকে দেখিনি মারধোর করতে! সবাই মিলে বাবুকে ধরে আনলুম!

পুলিশ অফিসার বললে, ঠিক আছে, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না! চালান না দিলে শায়েস্তা হবে না—চল থানায়, চকি গাছে না চড়ালে সত্যি কথা বেরোবে না। সব শালা শয়তান!

সঙ্গের আর একটি লোক বললে, আমি বাবু ওসব কিছু দেখিনি। খামারে এসে দেখি বড়বাবুকে সবাই মিলে নিয়ে যাচ্ছেন!

মজা দেখ্‌ছিলে? উল্লুক কাঁহাকার! চল থানায় আরো মজা দেখাব! ইয়ার্কি মারতে এসেচো এখানে, তার কি বাচ্চা! চল থানায়। পুলিশ অফিসার ধরতে এগিয়ে এলেন।

দু'জন কন্‌ষ্টেবল এসে লোক দু'জনকে ধরল।

পুলিশ অফিসার তখনো তদ্বি করলে, কি নাম তোমার? তোমার কি নাম?

অর্জুন!

তোমার?

সন্নিসী!

ওদের সবাইকে চেনো? বেণী মণ্ডল, পীতাম্বর মণ্ডল, অধর হালদার? দু'জনেই চুপ করে রইল। পুলিশ অফিসার ইঙ্গিত ক'রলে। কন্‌ষ্টেবল ওদের টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে গেল। আরো যারা এদিক ওদিক ছিল সরে পড়ল অবস্থা দেখে।

বৈঠকখানা ঘরে এসে পুলিশ অফিসারটি দেখলে মাধুরী তেমনি চুপ করে বসে আছে। রমাপতিবাবু যেন ঘুমচ্ছেন।

অস্ফুটে মাধুরীকে সম্বোধন ক'রে অফিসারটি বললে, দেখুন- উপস্থিত দুজনকে গ্রেপ্তার করে' নিয়ে যাচ্ছি, আরো গ্রেফ্‌তার করবো দরকার হ'লে। অত্যন্ত দুঃখিত যে উনি এভাবে আহত হ'লেন! দু'জন পাহারা রেখে যাচ্ছি, কোন কিছু হ'লে থানায় খবর দেবেন!

মাধুরী তেমনি বসে রইল কোন সাড়া শব্দ করলে না। জানালার বাইরে দিনের আলোটা কেমন যেন কালো দেখাচ্ছে।

যাবার সময় পুলিশ অফিসারটি বললে, একজন লোককে আমরা আজ ধরতে পারিনি, সে পালিয়েচে। এ দলের সর্দার! জগবন্ধু রায়! কাওয়ার্ড!

হঠাৎ মাধুরী ঔৎসুক্য প্রকাশ করে ছেলেমানুষের মত: তাকে আপনারা ধরতে পারেননি?

পুলিশ অফিসারটি অক্ষমতা স্বীকার করে।

তাহ'লে আর কাকে ধরলেন, দাদুর মুখের দিকে চেয়ে মাধুরী চুপ করে যায়।

পুলিশ অফিসার আস্ফালন করলে, যাবে কোথায়... ঠিক ধরবো দেখবেন!

আর দেখেছে! যিনি দেখবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে খাড়া ছিলেন তিনি তো ধরাশায়ী! আর কে কি দেখাবে। দাদুর পরে আর কিছু থাকবে না উদয়পুরে, আর কেউ থাকবে না উদয়পুরে—কায়েমের সকল প্রভাব, প্রতিপত্তি শেষ হ'য়ে যাবে! চাষার মুল্লুক হবে উদয়পুর।

দাদুর সঙ্গে সে-ও যদি যেতে পারতো। অভিমানের অহঙ্কারের প্রতিহিংসার একটা ক্ষোভ যেন মাধুরীর সারা দেহকে বিবশ করে দেয়। মনে মনে মাধুরী দাদু! দাদু! বলে' হাহাকার করে ওঠে!

যারা এসেছিল তারা পুলিশ দেখে চলে গেছে। মনে হ'চ্ছে ধারে কাছে কেউ নেই। পুলিশ এসে উদয়পুরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে ধরে নিয়ে গেছে। উদয়পুর চিরকালের মত শান্ত হ'য়ে গেছে।

দাদু বলেছিলেন, ও কে আবার? লোফার! লোফার গিরি করতে এসেছে উদয়পুরে—কাজ নেই, কর্ম নেই! একের নম্বর কাওয়ার্ড!

লোকটাকে পুলিশ ধরতে পারলে না! তারি বাহাদুরী করেছে ডাক্তারকাকা আর বেণী মণ্ডলকে ধরে।

কিন্তু কুসুমদি ওর মধ্যে গেল কি করে? উদ্ধত প্রজাদের নাকি আবার সে উস্কানি দিয়ে বেড়িয়েছিল। দাদুর খেয়ে-পরে এমনি বিশ্বাসঘাতকতা করলো শেষে! বিশ্বাস হয় না! পক্ষীরমা হ'লে না হয় কথা ছিল! কি স্বার্থ কুসুমদির? কোন অভাবই তো দাদু রাখেননি, খাওয়া পরার বাঁধা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন —চাষের জমি, বসবাসের জায়গা, পুকুর বাগান। তবে কেন একাজ কুসুমদি করতে গেল—কার জন্যে করতে গেল? কে তাকে দীক্ষা দিলে—কার কথায় তার এমন মতিভ্রম হ'লো!

এক সময়ে তাদের অনেক করেছে কুসুমদি, কিন্তু আজ যা করলো সে-সব-করাকে ছাড়িয়ে গেছে। পতিতার ঠিকই পরিচয় দিয়েছে! স্রষ্টা না হ'লে অমন বিশ্বাসঘাতিনী হ'তে পারেনা। ভালমানুষ সাজতে

সেদিন এসেছিল—দাদুর জন্যে যেন কত উৎকণ্ঠা, কত ভাবনা। আজ কি করলে?

দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে মনে মনে মাধুরী বললে, মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিতে হয় অমন মেয়ে মানুষের।

দাদু কি আর উঠে-হেঁটে বেড়াবেন না, তখন দেখবে কেমন করে' ও মাগী গাঁয়ে বাস করে! নেহাৎ দাদু ছিল তাই—

উঃ, কোন মানুষকেই বিশ্বাস নেই। এই গাঁয়ের জন্যে দাদু কি না করেছেন! আজ দাদু মরলে এরাই দাদুকে মারবে। নিমকহারাম সব।

গাঁয়ের লোকের কথা ছেড়ে দিলে জাতিরাই বা কি? এতবড় বিপদে কেউ একবার উঁকিও মারলে না। পুলিশ দেখে সব ইঁদুরগর্তে ঢুকলো। স্বার্থপর, হিংসুকের দল সব। কেন যে দাদু এদের জন্যে গ্রামের লোকের সঙ্গে বিরোধ করেছিলেন। কি লাভ হ'লো। ওঁরা তো যে-যার সরে পড়েছে।

সর্বনাশটা কেবল তাদের মাথার ওপর দিয়েই বয়ে গেল। ঝড়-ঝাপ্টার আঘাত কেবল তাদেরই সইতে হ'লো। কৃষক নেতা জগবন্ধু রায় যেন তাদের জব্দ করবার জন্যে উদয়পুরে এসেছিল। ডাক্তারকাকার সম্মান, তাদের প্রতিপত্তি নষ্ট করতে চেয়েছিল। শয়তান কাঁহাকার! প্রাণ নষ্ট করে গেল! লোফার, কাপুরুষ! কোনদিন কি আর উদয়পুরে আসবে না!

হঠাৎ দোরের বাইরে পাহারওলার গলা পাওয়া গেল। কে যেন ঘরে আসতে চাইছে, পাহারাওলা তাকে বাধা দিচ্ছে। হুকুম নেই।

কিন্তু আগন্তুক কোন হুকুম শুনতে রাজী নয়, সোজাই আসতে চায়। পাহারওলা কিছুতে ঠেকাতে পারছে না তাকে।

গলাটা যেন মাধুরীর চেনা-চেনা। ফুলকাকীমা নয় তো? কিন্তু তিনি কেন। ওঁরও তো—

সাদা চাদরে আপাদমস্তক ঢেকে ইন্দুকাকীমা অন্দর মহল ত্যাগ করে সদর বাড়িতে এসেছেন। পর্যাপ্ত আবরণে তাঁর সঙ্কোচ ঘোচেনি, জড়িত সরমে এখনো তাঁর পদক্ষেপ কম্পিত।

ধীরে ধীরে তক্তাপোষের ওপর উঠে এসে ইন্দুমতী মাধুরীর কাঁধের ওপর হাত রাখলেন। মাধুরী কাঠ হ'য়ে রইল।

ইন্দুমতী পাশে বসে অস্ফুটে ডাকলেন, উঠে আয়! খাবি না, চান করবি না?

তেমনি কাঠ হ'য়ে মাধুরী বসে রইল, কোন সাড়া করলে না।

ইন্দুমতী বললেন, তুই যা, আমি বসচি ততক্ষণ। ডাক্তার এলে খবর দেব'খন—

মনে মনে অনেক কঠিন কথা বলবার জন্যে মাধুরী ঠিক করে রেখেছিল ইন্দুমতীকে। শুধু আজ নয়, আরো অনেক দিন থেকে তাঁরা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করছে। সমবেদনা দেখাবার কোনই দরকার নেই! তাঁরা যদি প্রশ্রয় না দিতেন গ্রামে কখনো এমন ব্যাপার ঘটতে পারতো না! কোথাকার একটা উঠকো লোককে দিয়ে সবার মুখে চুন-কালি দিলেন! এখন এসেছেন কাটা ঘায়ে প্রলেপ দিতে! না, না কোন সম্পর্ক নেই তাঁদের সঙ্গে! মাধুরী চায় না কোন সান্ত্বনা ওঁদের।

তপ্ত স্বরে ইন্দুমতী বললেন, কথা শোন, যা যা...উঠে গিয়ে মুখে কিছু দিয়ে আয়! অনেক বেলা হ'য়ে গেছে।

তবু বুঝি মাধুরী মুখ তুলতে পারে না, মনে হয় মুখ তুললে এমন একটা দুর্বলতা প্রকাশ পাবে যাতে শত্রু পক্ষ মনে মনে হাসবে!

ইন্দুমতী মাধুরীর হাত ধরলেন। কথা শুনবি না? যা, যা ওঠ—

আর মাধুরী নিজেকে সামলাতে পারলে না, শত্রুর সামনে ভেঙে পড়ল, হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো: আমাদের কি হ'লো ফুলকাকীমা!

ইন্দুমতীরও চোখে জল, বাষ্পাকুল কণ্ঠে বললেন, কাঁদিস নি মা। কি হ'য়েচে ওঠ! সব ঠিক হ'য়ে যাবে!

মাধুরী কোঁপাতে লাগল। কে বলবে এ অভিমানে না, অনুযোগে না, অহঙ্কারে ?

মাধুরীর মাথাটা বুকের মধ্যে নিয়ে হাত বুলাতে বুলাতে ইন্দুমতী বলতে লাগলেন, এ সময় কি কাঁদতে আছে ? শক্ত না হ'লে সহ্য করবি কি করে ? অমন ভেঙে পড়িস নি মা ! ঠাকুর আবার ভাল ক'রে উঠবেন ! ভয় কি, আমি আছি ! ওঠ, মা মুখে কিছু দিয়ে আয় !

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মাধুরী বললে, কাকাকেও নাকি ওরা ধরে নিয়ে গেছে ?

সহজ কণ্ঠে ইন্দুমতী বললেন, হ্যাঁ, তাতে কি হ'য়েছে !

মাধুরী জিজ্ঞেস করলে, কিছু হয়নি ? সত্যি বলচো কুলকাকীমা ?

হ্যাঁরে, সত্যিই বলচি ! যে কাজের জন্যে ওঁকে ধরেছে যেদিন বুঝবে সবার ভালর জন্যে সে-কাজের দরকার আছে সেইদিন আবার ওঁকে ছেড়ে দেবে ! উনি তো অন্যায় কিছু করেন নি ! আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়, স্বামী গর্বে গর্বিতা ইন্দুমতী বললেন।

বুঝি আর কিছু বলবার নেই মাধুরীর। কুলকাকীমার দুঃখের তুলনায় তার দুঃখ এমন কি ! এখন কাকে সে দায়ী করবে এই অবস্থার জন্যে ? সুবোধকাকা অন্যায় করেননি, তার দাদুও অন্যায় করেননি, তা হ'লে এতবড় অন্যায় আজ ঘটলো কি করে ? দুষ্কৃতি-কারী কে ?

মাধুরী আর কাঁদলে না। চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। ইন্দুমতীর দিকে কি ভেবে খানিক চেয়ে রইল।

হয়তো তার এ প্রশ্নের উত্তর তিনি দিতে পারবেন।

বীতংসে

সমর কুমার মিত্র

ওঁড়ো ওঁড়ো রোদ,—ঘাসগুলো আর বাঁশের পাতায় মিশে
সবুজ সাড়ীর জমিতে মাখানো হোলুদ ছোপের মত
রয়েছে ছড়ানো, জড়ানো রয়েছে শিরীষের শীষে শীষে।
আমি মনে ভাবি – বিদায়ী সে রোদ ছবি এঁকে যায় কত।

"বেলা বয়ে যায়"—চতুর তিতির বলে কিচ্ কিচ্ সুরে,
বক বলাহক সাদা ডানা নেড়ে সাদা স্বপনের জালে
নীল সাগরের মায়া ঢেউ তোলে, চোখের দৃষ্টি ঘুরে
কে যেন কেমন টানে আর মনে সুরের আবীর ঢালে।

জলুকে চলেছে কলসী ভরণে কুলবধূ থরথর :
ছলকে উঠছে কলসীর জল ছন্দ কাঁপনে তার
অবশ এ মন আবেশে মুগ্ধ গীত ধ্বনি মর্মর
কান পেতে শোনে, বীতংসে পাখী ঝাপটায় ডানা তার।

শত বীতংসে মন বিহংগ ফিস্ ফিস্ ইশারায়
মুক্তি স্বপ্ন কল্পনা করে বার বার যায় উড়ে,—
অন্বেষণের যায় পথ থেকে ক্লান্তিকে মেখে গায়
নীড়ে ফিরে আসে : তবু বুক ভরে অনাগত এক সুরে।

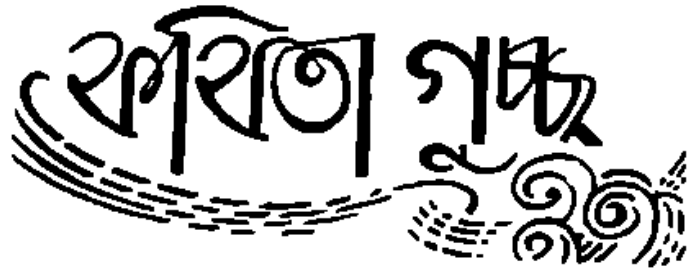

রাত-মোহানা

বিকাশ রায়

মাঝ্‌রাতে মায়া পরীরা যখন ছড়ায় ঘুম,
শুদ্ধ পৃথিবী প্রান্তর-বন চুপ নিঝুম—
শুধু একখানি চাঁদ জ্বলে দূর বনের ধার,
ঘোরা দিগন্ত জলে ছায়া কাঁপে নীল তারার,
আসতে তুমি কী পার না তখন মিঠেল পায়,
আমার রিক্ত মনের গভীরে বন-ছায়ায় ?

ঘুমিয়েই থাকে কলুষ পৃথিবী, ঘুমায় কাজ,
বড় সাহেবের কাণে বিষ ঢালা ফন্দীবাজ।
হিংস্র শ্বাপদ, মুখর সহর, ব্যস্ত দিন
অচেতন ঘুমে,—জাগবে না ঘুম অন্তহীন।
সেই নিরালায় বুকে মুখ রেখে একটি ক্ষণ,
ভরে দিও প্রাণ বর্ষণে সখি বন্ধ্যা-মন !

শান্ত নিঝুম রাত্রির চাঁদ ছড়াবে আলো,
মুছিত মাঠে, তন্দ্রিত বন লাগবে ভালো।
হাওয়া ফিস্‌ফিস্ করা স্পন্দিল শুধাক-বন,
অপরূপ হয়ে উঠবে হঠাৎ চোখে তখন।
রঙ্‌লাগা নদী, শিশিরের রাত, কিয়ানো মাঠ,
উদ্বেগহীন নিমেষেক খুলে রেখে কপাট।

ঝাউ-শাল বনে উদ্দাম-হাওয়া বাজাবে মল,
চাঁদ ঝরে হবে লাজুচিনি-দ্বীপ কী উজল।
যাবে উড়ে মন মাল্টা কিংবা সুমাত্রায়,
অথবা সুদূর মিশরের নীল আকাশ-ছায়।
মন দেবে তার ডানা থেকে ঝেড়ে অন্ধকার,
মানবে না বাধা-নিষেধ যুক্তি কিছুই আর।

তোমাকে

শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

বেসেছিনু ভোমা ভাল, তাই মোরে করিলে ভিখারী
আমারে করিয়া রিক্ত দগ্ধ হলে তুমি পলে পলে
তোমারে দেখিয়া ম্লান, মোর প্রাণ উঠে উথলিয়া
কেন না তোমারে যে গো বাসি আমি ভাল।

প্রতিহিংসা ? তার জন্য স্বার্থের সংঘাতে,—
নহে কভু যেথা আছে প্রাণের স্পন্দন,
আঘাতে আঘাত হানা সেও কি সম্ভব ?
তার তরে যে আমারে বাসিয়াছে ভালো ?

জানি আমি, তব প্রাণে গুমরিয়া উঠিছে কি ধ্বনি।
ক্ষমা ? সে তো তার দিতে হবে সে যে আছে বাঁধা
তব প্রেমে।
ভুলে যাওয়া তোমার আঘাত, হবে তাও কাল স্রোতে
কিন্তু রয়ে যাবে স্মৃতিটুকু, প্রস্তরের মতো
যাহা তুমি ফেলেছিলে খেলাছলে তটিনীর বুকে ;
বিদ্ধুরিত হয়েছিল জল, উঠেছিল তরঙ্গ আঘাতে।
তটিনী রাখিল বুকে তোমার আঘাত
সযতনে আবরিয়া আপনার স্নেহরস দিয়া।

হাজার বছর ধরে

(কবি জীবনানন্দ দাশকে)

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

তুমি নেই।
সত্তার অন্তর লোকে কিছুতেই
সত্য বলে মনে হয় না তো!
নামহীন অরণ্যের কোনো এক জলপ্রপাত-ও
এমনি থামেনা কোনো বিরতির বুদ্বুদ রেখেই। আর
সময়ের অজানা অন্ধকার
সাঁকো পার হয়ে এক রৌদ্রের বেলার মত মন
নিয়ে এসেছিল নেমে বনবিরি নদীর মতন
বয়ে বয়ে মৃদু স্বচ্ছ ধারার জীবন
অগণন ঢেউ তুলে, মন ছেনে রঙ নিয়ে ছবি
এঁকেছিলে পলাতক সময়ের, জীবনের সত্য আজ সবই;
সত্য নয়—তোমার এ সরে যাওয়া জীবনের পটভূমি থেকে
বাংলার মাঠ—ধান পাল বনে নদীর নারীর রূপ এঁকে।
যে পথিক হাজার বছর পথ হেঁটে শ্রাবস্তির
অন্ধকারে, অজন্তার স্তূপে, এথেন্স মিশর রোম ব্যাবিলনে
পুরাতন পৃথিবীর মানুষের আর প্রকৃতির
পরিচয়ে, লাবণ্যের ভঙ্গুরতা বহমানতায়
মেঘ-রৌদ্রে নদী ছুঁয়ে সমুদ্রে মাটিতে এক প্রাণের সন্ধানে
সময়ের সীমাহীনতায়
রেখে গেলো নিস্পৃহ শান্তিময় সে মহাজীবন
সুজাতার সেবা নিয়ে প্রজ্ঞারূঢ় বুদ্ধের মতন
ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে,
হৃদয়ের অপরূপ দীপ্তি নিয়ে ঝরা পালকের জিজ্ঞাসায়
ধূসর পাণ্ডুলিপি রেখে, সাতটি তারার
তিমিরের উল্লাসে মহাপৃথিবীর প্রার্থনার ত্রাসে
হৃদয়ের শিশিরের স্বেদ ঢেলে পাখির ডানায় ঘাসে
চিন্তায় মুক্ত স্বচ্ছতায় আর।

কল্পনা

শ্রীদেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

কেন যেন ভাল লাগে আঁধারে কুয়াশা হয়ে যেতে!
ভোর না হতেই আভাসেতে
কোমল আলোক ভাসে। ঘুমভাঙা ফুলে কাণাকানি।
ও-মাঠে শিউলী ফুল স্তূপ হয়ে পড়ে আছে। গন্ধে দু'চোখ
আনচান্।
প্রজাপতি হয়ে উড়ে সারা মাঠখানি
ঘুরে আসি। কত ফুল, আহা কত ফুল অম্লান।

কোথাও চড়ুই ওড়ে, কোনদিকে শালিকের সুর।
জান না? অনেক দিন শালিকের সঙ্গে মিতালী
আমার! সবুজ ডালে ব'সে ব'সে কত গান চালি
ছোট এক টিয়া হয়ে। ধীরে ধীরে চারপাশে অথই দুপুর
নিঝুম নিঝুম ছায়া নিয়ে আসে।

আকাশে ও-কারা ব'সে? ওরা বুঝি আজও ভালবাসে
আমার গানের সুর, কথা নেই, শুধু সুর—কথা ভুলে গেছি
তবুও তখনই যেন মেঘ হয়ে ভূবাষ্পের পাখনা মেলেছি
আকাশে। কেমন যেন উছল উতল লাগে মন, চারপাশ।
এ-কি, এযে সেই মাঠ। এতবড়ো? এত ঘাস।
তখনই কি ভেবে মনে মনে
ঘাসফুল হয়ে গেছি ঘাসের গহনে॥

সারাটা দুপুর ধরে, তারপরে, বাতাসে অপার ঢেউ শুনি।
চুপিসাড়ে ঘাস সব কথা কয়, কাণ পেতে শুনি;
তাদের গভীর প্রেম দূর নদীজলে গিয়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে
জাগে;
ঘাস ফুল-নদী, আহা, কেন যেন সব ভাল লাগে।

কন্যা-কুমারিকা

শিশিরকুমার দাশ

সহস্র যোজন আজ অতিক্রম ক'রে
পথের অজস্র ক্লেশ তাকে মেখে পায়
মহান মৃত্যুর এক নিরন্তর সুরে মন ভ'রে
দাঁড়ালাম হে মহা নীলিমা।

তোমার উজ্জ্বল রব আমারই চলার গান গায়
আমাকে ইঙ্গিত দেয় পার হ'তে মৃত্যুর সীমা।

আমাকে বিকীর্ণ করো তোমার প্রাণের নীলিমায়
এত যে উজ্জ্বল প্রাণ, এত মাঠ এসেছি যে ফেলে

বেদনার এত তাপ বেঁধে রাখে যারা নিরবধি
তাদেরও আমার দিও সমস্ত কল্লোল তাও
দিও ঢেলে
বিরতির সন্ধ্যালোকে আরতির দীপগুলি জ্বেলে
আমাকে বিস্তীর্ণ করো হে মহাউদধি।
আমাকে বিলীন করো তোমার উদ্যত গানে
করো করো গ্রাস
যেমন করেছ তুমি এই মাটি, হে সমুদ্র,
হে মহা আকাশ।

অচেনা মেয়ে : শহরতলী

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

সকালের বুক থেকে খসে পড়া রোদের আঁচল
এখানে লুটায় এসে। কোঁটা কোঁটা শিশিরের জল
অভিমানে গলে পড়ে আকাশের টানা চোখ থেকে।
চিঠি বিলি গলি আছে ; তবু কত পাখি যায় ডেকে !

কাঠ আটা রূপসীর চলাফেরা এখানেও রোজ।
ইলিশের কাঁটা নিয়ে লোভী কাক তেমনি নিখোঁজ।
ঠেলাওলা হেঁকে যায় : কাঁসারীর জোর বিকিকিনি।
যেন মনে হয় এ মেয়েকে এখনো না চিনি !

বিকালের রাঙা আলো এখানেও খেলে যায় দোল !
বাতাসের গাড়ী গেলে কেঁপে ওঠে অশথের পোল।

পাখিদের পিছু নিয়ে কোথা থেকে আসে সাঁঝ বেলা ;
ঘরে ঘরে আলো জ্বলে। গাছে বসে আঁধারের মেলা।

হৃদয়ের ছুঁই দিয়ে এখানেও দেহ বিকিকিনি।
তবু যেন মনে হয় এ মেয়েকে এখনো না চিনি।

দাসখত

শ্রীতারক ঘোষ

দাসখত লিখে দিছি তারি পায়ে, করি না বিশ্বাস
যাকে আমি মন থেকে কোনো দিন। যাকে করি ঘৃণা
প্রাণ থেকে, প্রতিদিন তারি অর্থ করেছি রচনা।
জীবন করেছে ব্যর্থ জরাজীর্ণ নিরর্থ অভ্যাস।

এখানে পড়িল বাধা, জীবনের আকুতি, নিশ্বাস
সবি যেন রুদ্ধ হয়। অগ্নিব্রতা তাপসী চেতনা
আচারের নিষ্পেষণে মৃতপ্রায়। সত্যের প্রেরণা
মুছে গেছে ঘুচে গেছে বিশ্বাসের পরম আশ্বাস॥

মাঝে মাঝে মনে হয় শেষ হোক তুচ্ছ এ জীবন
অসংখ্য ঢেউয়ের সঙ্গে অকুণ্ঠিত কঠিন সংগ্রামে।
বিশ্বাসের জয় হোক। সৈনিকের সার্থক মরণ
এ জীবনে সত্য হোক। তবু হায় নিশ্চিন্ত আরামে
সুখ সুপ্ত অহমিকা অহেতুক ভয়ে শুধু কাঁপে
অবমাননার দিন তবুও সে অনায়াসে যাপে॥

রাত ও দিন

শ্রীমৃণালকান্তি দাশগুপ্ত

(রাত)

ওগো অতন্দ্রী ! তামসী তন্দ্রাহীনা
অরুণ বরণি ধ্যানী অসিত প্রিয়া,—
তুমি তমঃ মন্থে সলিত লাস্য—
সম্মুখে তব উন্মীলু অরবিন্দ,
তোমার সাধনা সিদ্ধিতে হাসে উষা।
ওগো ও তমস্বিনী !
তব অন্তর তন্দুরা তানে—
দ্যুলোক দুহিতা উষা,
মুঠা মুঠা আলো দু হাতে বিলায়
তন্দ্রালু ধরা চোখ্ মেলে চায়
ঘুম ভেঙে যায়—
শাখি শাখে জাগে পাখী.
কল কোলাহলে মুখর বিশ্ব
নীলিমায় জাগে রবি।

(দিন)

ছুটে চলিয়াছ কোন অভিসারে—
কঠোর কঠিন রুদ্র ?
দিবে না—দিবে না পরশ দিবেনা
রজত শুভ্র মৃগী ;—
কোথায় চলেছ বিনোদ বিহারে মাতি—
ক্ষণেক দেখায় এতই ত্বরিত কেন.
ওগো ভাস্বর দিবাকর পৃথিবীর ?
ওরে সমস্ত ওরে উন্মাদ !
সম্মুখে তোর নিথর রাতের কালো !
চিরন্তনের ঘূর্ণাবর্তে
দুইটি জীবন বাঁধা.
শুধু ছুটাছুটি আর লুটোপুটি—
ব্যর্থ প্রেমের-বাঁধা।
তোর মিলনের মত্ত লালসা
পৃথিবীতে আনে রাত্রি.
তবুও মিলন—
ঘটেনাত' দুজনায়
হায়রে হায়,
অভিসারে চালে
অভিশাপ শিরে
তবু শাশ্বত আশা লয়ে বুকে
দিন খোঁজে রাত—
রাত খোঁজে দিন
নিখিল বিশ্বভুবে,
দুটি অন্তর কাঁপে থর থর
বিরহ ব্যথায় বড়ে।

বিজ্ঞান জগৎ

গ. চ. ভ.

জীবনশক্তির উৎস

কাঠ, কয়লা, তেল, গ্যাসোলিন প্রভৃতি পদার্থ থেকে আমরা শক্তি আহরণ করে থাকি। এদের অন্তর্নিহিত শক্তি আসে কিন্তু সূর্য থেকেই। কিন্তু এসব পদার্থ থেকে কার্যোপযোগী শক্তি আহরণ করা ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। কাজেই সোজাসুজি সূর্যকিরণ থেকে আমাদের প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণ করা সম্ভব হলে তা নিশ্চয়ই সহজলভ্য ও স্বল্পব্যয়সাধ্য হতো। মানুষ আজও তা করতে সমর্থ হয় নি; কিন্তু চেষ্টার বিরাম নেই। পৃথিবীর পৃষ্ঠে প্রতিদিন অপরিমিত সূর্যকিরণ' পড়ে অথবা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—বৈজ্ঞানিকেরা এ ব্যাপার বহুকাল ধরেই লক্ষ্য করে আসছেন এবং সূর্যকিরণকে সোজাসুজি কাজে লাগাবার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টাও করছেন। বহুকাল পূর্বেই অনেকগুলি কুণ্ডপৃষ্ঠ কাচের সমবায়ে সূর্য-কিরণ সংহত করে বাষ্প উৎপাদন এবং তার সাহায্যে জলসেচন করে মরুভূমির স্থানবিশেষকে উর্বর ভূমিতে পরিণত করবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। সূর্য-কিরণের সাহায্যে আজকাল অনেক স্থলেই সহস্র সহস্র জলাধার উত্তপ্ত করে গরম জল সরবরাহ এবং তার সাহায্যে বাষ্প উৎপাদন করে ইঞ্জিন চালাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এমন কি, সূর্য-চুল্লীতে রান্নার ব্যবস্থাও চলছে। এগুলিকে অবশ্য প্রকৃত কার্যকরী ব্যবস্থা বলা চলে না, ভবিষ্যৎ গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রাথমিক সূচনা মাত্র।

জাগতিক শক্তির মূল উৎস হলো সূর্য। আলোকরূপে সূর্য তেজ বিকিরণ করে; পৃথিবী তার কিয়দংশ শোষণ করে নেয়। জানা, অজানা যাবতীয় শক্তির ক্রিয়াকলাপ এই সঞ্চিত তেজেরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র। সূর্যের তেজ যদি আলোকরশ্মি রূপে না এসে কয়লা রূপে পৃথিবীতে আপতিত হতো তাহলে পৃথিবীর প্রতি একর জমিতে প্রতি মাসে প্রায় দু-হাজার মণ কয়লা সঞ্চিত হতে দেখা যেতো। হিসাব করে দেখা গেছে—২৪৩ টন কয়লা পুড়িয়ে যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায়, গ্রীষ্মকালের তিন মাসে প্রতিএকর জমিতে সূর্য থেকে আলোক-রূপে সে পরিমাণ শক্তি আপতিত হয়ে থাকে। কিন্তু সূর্য থেকে আগত এই বিপুল তেজরাশি পৃথিবী সঞ্চয় করে রাখতে পারে না। বিবিধ রাসায়নিক পদার্থকে খাদ্যবস্তুতে পরিবর্তিত করবার জন্যে উদ্ভিদ-জগৎ এই শক্তির শতকরা একভাগ মাত্র ব্যবহার করে থাকে; বাকী প্রায় সমস্ত অংশই বাজে খরচে নষ্ট হয়ে যায়।

যা হোক, আধুনিক মানুষ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবলে আজও যার কিছুমাত্র হদিশ পায় নি, পৃথিবীতে আবির্ভূত হবার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ভিদ-জগৎ সেরূপ একটি অদ্ভুত কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছে। কৌশলটি হচ্ছে, সাধারণ জল ও বাতাস থেকে দেহপুষ্টির উপযোগী খাদ্য প্রস্তুতের প্রক্রিয়া। উদ্ভিদ-জগৎ সূর্যকিরণের সাহায্যে অজৈব রাসায়নিক পদার্থসমূহ শোষণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই খাদ্যে রূপান্তরিত করে দেহের পুষ্টিসাধন করে। উদ্ভিজ্জাত এই খাদ্যবস্তু উদরসাৎ করেই প্রাণী-জগৎ তার অস্তিত্ব রক্ষা করছে। প্রাণী-জগৎ উদ্ভিদের অনুগ্রহপুষ্ট। উদ্ভিদের অস্তিত্ব না থাকলে প্রাণী-জগতের অস্তিত্ব সম্ভব হতো

না। অজৈব পদার্থ থেকে উদ্ভিদ নিজেই নিজের খাদ্য প্রস্তুত করে; কিন্তু প্রাণীরা তা পারে না। উদ্ভিদ থেকে তারা সেই খাদ্য সংগ্রহ করে। নিরামিষাশী প্রাণীরা উদ্ভিজ্জ পদার্থ থেকে শরীর পুষ্ট করে, আর আমিষাশী প্রাণীরা তাদের দেহ উদরসাৎ করে জীবনধারণ করে। এই হলো প্রাকৃতিক রীতি। প্রাণীরা পরভোজীর মত উদ্ভিদদেহের উপর নির্ভর করেই বেঁচে আছে। কিন্তু উদ্ভিদেরা কি উপায়ে মাটি, জল, বাতাস প্রভৃতি অজৈব পদার্থগুলিকে খাদ্যবস্তুতে রূপান্তরিত করে? সেটা একটা গুরুতর রহস্য। এই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যে বৈজ্ঞানিকেরা বহুকাল থেকেই নানারকম গবেষণা করে আসছেন। তার ফলে আজও কিছু তথ্য জানা গেছে বটে, কিন্তু প্রকৃত রহস্য অনেক উদ্ঘাটিত হয় নি। যতদূর জানা গেছে তার মোটামুটি ব্যাপারটা এই—

গাছ শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে জল টেনে নেয় এবং পাতার গায়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রমুখে বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড সংগ্রহ করে সূর্যকিরণের সহায়তায় সঙ্গে সঙ্গেই এই পদার্থগুলিকে শর্করা ও অন্যান্য কার্বোহাইড্রেট জাতীয় পদার্থে রূপান্তরিত করে। উদ্ভিদের এই খাদ্যপ্রস্তুত প্রণালীকে বলা হয় 'ফটোসিন্থেসিস'। এটা যে একটা রাসায়নিক প্রক্রিয়া, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু কিভাবে এই প্রক্রিয়া সংঘটিত হয় তার সঠিক সন্ধান আজও পাওয়া যায় নি। পরীক্ষায় দেখা গেছে—দু-হাত লম্বা এবং দু-হাত চওড়া জায়গার মধ্যে যতগুলি পাতা বিছিয়ে রাখা যায়, ততগুলি পাতা কেবলমাত্র জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড সহযোগে সারাদিনে এক আউন্সের তিনভাগের একভাগ চিনি উৎপাদন করতে পারে। অথচ ১০,০০০ ভাগ বাতাসের মধ্যে মাত্র ৩ ভাগ কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে। এই সামান্য পরিমাণ পদার্থ সংগ্রহ করে কি উপায়ে এত দ্রুতগতিতে তা থেকে এত অধিক পরিমাণ চিনি উৎপাদন করে, সেটাও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। কোন রসায়নবিদ্ পরীক্ষাগারে আজ পর্যন্ত উদ্ভিদ-অবলম্বিত প্রক্রিয়ার খাদ্য প্রস্তুত করতে পারেন নি। যতটুকু পেরেছেন তাতে প্রকৃত সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। মোটের উপর, উদ্ভিদ যে কি উপায়ে জল আর বাতাস থেকে এত সহজে খাদ্যবস্তু উৎপাদন করে তা সত্যই এক বিস্ময়কর সমস্যা। বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশেষজ্ঞেরা এই সমস্যা সমাধানে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন।

কেউ কেউ সমস্যাটিকে এভাবে দেখেছেন যে, ঘাসের বর্ণ সবুজ হয় কেন? পরীক্ষার ফলে বহুকাল পূর্বেই জানা গেছে—বৃক্ষপত্রের ক্লোরোফিল, অর্থাৎ সবুজ কণিকা সূর্যালোকের বর্ণসপ্তকের সমুদয় বর্ণ শোষণ করতে পারে না। বৃক্ষপত্রকে অ্যালকোহলে ডুবিয়ে গরম করলে সবুজ কণিকাগুলি বেরিয়ে আসে। এই সবুজ পদার্থকে বর্ণ-বিশ্লেষণী যন্ত্রে পরীক্ষা করলে দেখা যায়—সবুজ কণিকাগুলি বর্ণছত্রের লাল এবং নীল রশ্মি সম্পূর্ণভাবে শোষণ করে কেবলমাত্র সবুজ রশ্মিকেই ছেড়ে দিচ্ছে। এ জন্যেই কণিকাগুলি আমাদের চোখে সবুজ বর্ণে প্রতিভাত হয়। এতে কিন্তু আসল প্রশ্নের মীমাংসা হয় না, জটিলতা বেড়ে যায়। প্রশ্ন ওঠে, বৃক্ষপত্র কেবলমাত্র সবুজ রশ্মিকেই ছেড়ে দেয় কেন? সবুজ রশ্মি থেকে শক্তি সংগ্রহে এমন কি অসুবিধার সৃষ্টি হয়, যাতে এই খাদ্য সংগঠন প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটতে পারে?

কোন কোন বিশেষজ্ঞ আবার সমস্যাটিকে এভাবে দেখছেন যে, বৃক্ষদেহের অভ্যন্তরস্থ কল-কৌশলের কিরূপ কার্যপ্রণালী চলছে তা জানতে পারলে আমরা জীবনের রহস্য উদ্ঘাটনে অনেকটা অগ্রসর হতে পারবো। কারণ জীবনের অস্তিত্ব বজায় রাখবার প্রধান অবলম্বন হলো খাদ্য। অজৈব মৌলিক পদার্থ থেকে সেই খাদ্য একমাত্র উদ্ভিদই প্রস্তুত করতে পারে। 'ফটোসিন্থেসিস' প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত তথ্য সঠিকভাবে জানা গেলে বৈজ্ঞানিকেরা রাসায়নিক তত্ত্ব সম্পর্কিত বহুবিধ জটিল রহস্য উদ্ঘাটনে সক্ষম হতে পারেন। দৃষ্টান্তের সাহায্যে কথাটা আরও পরিষ্কার হতে পারে। পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতা ও তার অগ্রগতি মূলতঃ পেট্রোলিয়াম নামক খনিজ তেলের উপরই

নির্ভর করে। অবিশ্রান্ত ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর এই সম্পদ দ্রুতগতিতে হ্রাস পাচ্ছে। ফটোসিন্থেসিসের রহস্য অবগত হতে পারলে পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি হাইড্রোকার্বন জাতীয় পদার্থ ইচ্ছামত উৎপাদন করবার ক্ষমতা মানুষের আয়ত্তাধীন হবে। তা ছাড়া কৃত্রিম উপায়ে অতি সুলভে খাদ্যপ্রাণ ভিটামিন জাতীয় পদার্থসমূহ উৎপাদন করাও অসম্ভব হবে না। সূর্যরশ্মি সংগ্রহকারী বৃক্ষপত্রের সবুজ কণিকাগুলি লৌহ, ম্যাগ্নেসিয়াম ও অন্যান্য পদার্থের সমবায়ে গঠিত একপ্রকার অতি জটিল যৌগিক পদার্থ, আমাদের দেহাভ্যন্তরে রক্তের লোহিত কণিকাগুলি যেভাবে অবস্থান করে, ইহারাও কতকটা সেই ভাবেই বৃক্ষপত্রে অবস্থান করে। পাতা থেকে আলাদা করে এই সবুজ কণিকাগুলিকে কাচপাত্রে রেখে পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে—তাদের ফটোসিন্থেসিস্ প্রক্রিয়া চালাবার ক্ষমতা থাকে না। এর প্রধান কারণ হয়তো উত্তপ্ত করে বের করবার ফলে কণিকাগুলির জীবনীশক্তি না থাকা। কাজেই কেবল রাসায়নিক প্রক্রিয়াই নয়, জীবনীশক্তির সঙ্গে এই প্রক্রিয়ার একটা অচ্ছেদ্য যোগাযোগ রয়েছে বলেই মনে হয়।

জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড সহযোগে বৃক্ষপত্র অতি দ্রুতগতিতে চিনি তৈরী করে। এই চিনি আবার নানা উপায়ে পরিবর্তিত হয়ে উদ্ভিদদেহের বিভিন্ন অংশ সংগঠনে ব্যয়িত হয়। জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাহায্যে পরীক্ষাগারেও চিনি তৈরী করা সম্ভব। কিন্তু এই দুটি পদার্থ থেকে কৃত্রিম উপায়ে চিনি তৈরী করতে হলে মধ্যবর্তী পন্থারূপে একে ফরম্যালডিহাইড নামে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থে পরিবর্তিত করতে হয়। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত এই চিনির কিন্তু স্বভাবজাত চিনির মত পুষ্টিকর ক্ষমতা নেই। অধিকন্তু প্রস্তুত-প্রণালীও উদ্ভিদ-অবলম্বিত প্রক্রিয়ার মত সহজসাধ্য নয়। উদ্ভিদবিদেরা অনেক দিন থেকেই এই ধারণা পোষণ করতেন যে, রাসায়নিকেরা জল ও কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে যে রীতিতে চিনি উৎপাদন করতে পারেন, উদ্ভিদপত্রেও চিনি প্রস্তুতের জন্যে অনুরূপ প্রক্রিয়াই চলছে। কিন্তু পরবর্তী কালের গবেষণার ফলে এই প্রচলিত ধারণার সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয়েছে। রেডিও-অ্যাকটিভ কার্বন ডাইঅক্সাইড উদ্ভিদদেহে শোষণ করিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। আশা করা গিয়েছিলো, এই রেডিও-অ্যাকটিভ কার্বন ডাইঅক্সাইড সহযোগে উদ্ভিদদেহে যে ফরম্যালডিহাইড উৎপন্ন হবে তাও রেডিও অ্যাকটিভ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রত্যেক পরীক্ষায় তার বিপরীত ফলই পাওয়া গেছে। এতেই বুঝা যায়, উদ্ভিদ-দেহে চিনি তৈরী করবার জন্যে পূর্বোক্ত উপায়ের কোন বিপরীত প্রক্রিয়াই চলছে অথবা এর সঙ্গে অন্য কোনরূপ প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, উদ্ভিদেরা সূর্যরশ্মির দৃশ্য বর্ণছত্র থেকে লাল ও নীল বর্ণের রশ্মিগুলিই শোষণ করে নেয়। গতিশক্তিসম্পন্ন সবুজ ও পিঙ্গল বর্ণের ব্যাক্টিরিয়া দৃশ্য বর্ণছত্রের লাল প্রান্তের কিয়দংশ এবং অদৃশ্য লোহিতাতীত রশ্মি থেকেই অধিক পরিমাণে তেজ আহরণ করে থাকে। এরা কর্দমাক্ত জলাভূমির নীচে বাস করে বলেই হয়তো অদৃশ্য লোহিতাতীত রশ্মির উপরই বিশেষভাবে নির্ভর করে থাকে। কারণ দৃশ্য আলো কর্দমের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু অদৃশ্য আলো তা অনায়াসে ভেদ করে যায়। উদ্ভিদেরা যে বেছে বেছে লাল, নীল এবং লোহিতাতীত রশ্মি ব্যবহার করে, নিশ্চয়ই এর কোন বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে। উদ্ভিদ যে উপায়ে খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করে বলে এতকাল ধারণা প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গে অন্য কোন প্রক্রিয়া জড়িত থাকাই সম্ভব। উদ্ভিদ যে সব খনিজ পদার্থ আহরণ করে, হয়তো তার কিয়দংশ ক্যাটালিষ্টের মত কাজ করে। খুব সম্ভব বৃক্ষপত্র কর্তৃক শোষিত পদার্থ থেকে অক্সিজেন বের করে দেবার জন্যে সূর্যরশ্মির প্রয়োজন হয়। অক্সিজেন বেরিয়ে গেলে পাতার ভিতরে অন্ধকারে রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হয়। মোটের উপর, এই রহস্য বিশেষভাবে জানতে পারলে জীবনীশক্তির মূল উৎসের বিভিন্ন অভিব্যক্তির ধারার অনেক রহস্য জানবার সুবিধা হবে।

[৭]

দিন কয়েক কেটে গেলে একদিন ভোরে ঘুম থেকে উঠে মার শিয়রে ব'সে চক্রধরপুর থেকে দিদির আসা সম্পর্কে মার সঙ্গে কথা ব'লছিলাম। অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ অনেকটা যেন সুস্থবোধ ক'রছিলেন মা, কথা ব'লতে তাই আগ্রহও দেখা গেল কিছুটা। এ ক'দিনের মধ্যে এত সহজভাবে মার মুখে কথা ফোটে নি। ডক্টর চৌধুরীর অষুধে অনেকটা কাজ হ'য়েছে বোঝা গেল। ইতিমধ্যে পাচক ঠাকুর এসে খবর দিল—বাইরে কে একজন বুড়ো ভদ্রলোক আমাকে ডাকছেন।

বাড়ী ব'য়ে এতদিন আমার সান্নিধ্যে যারা এসেছে, চিন্তা ক'রে দেখলাম, তাদের মধ্যে বুড়ো কেউ নেই। কখনও স্কুল-কলেজের দু' একজন বন্ধু, তা ছাড়া বিশেষ ক'রে অণিমা আর শীলা। এর বাইরে বড়-একটা কাউকে স্মরণ ক'রে উঠতে পারলুম না।

এসে বহির্বাটিতে পা দিতেই অবাক হ'য়ে গেলাম। অধ্যাপক সিদ্ধান্ত। ব'ললাম, 'হঠাৎ আপনি স্যার? খবর কি? তা ছাড়া বাড়ীটাই বা চিনলেন কি ক'রে?'

—'এ কি ক'লকাতা সহর যে নম্বর ছাড়া বাড়ী চিনতে অসুবিধে!' হেসে অধ্যাপক সিদ্ধান্ত ব'ললেন, 'চিনে আমি ঠিকই নিয়েছি। তা ছাড়া খবরও আছে বৈ কি! কিছু খবর নিয়েই তো এসেছি, কী খবর হ'তে পারে বলো দিকি?'

আশ্চর্য প্রশ্ন বটে। ক্লাসে ব'সে অবধি পড়াবার ফাঁকে কোনোদিন এমন কৌতূহল রেখে কোনো প্রশ্ন করেন নি অধ্যাপক সিদ্ধান্ত। কিছুক্ষণ ইতস্তত: ক'রে ব'ললাম, 'আপনার বইটার প্রকাশ সম্পর্কে তো?'

এবারে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন অধ্যাপক সিদ্ধান্ত, ব'ললেন, 'ও হরি, মনোতোষের মুখে তা হ'লে তুমি যাহোক্ শুনতে পেয়েছ! বাট আনফরচুনেটলি দি হাজ ফেইল্ড দি এগ্‌জামিনেশন।' কথা শেষ করতে গিয়ে মুখখানি হঠাৎ কেমন গম্ভীর হ'য়ে উঠলো অধ্যাপক সিদ্ধান্তর।

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'সে কি, এরই মধ্যে খবরটা জেনে ফেলেছেন?'

—'নট আন-ন্যাচরাল। হিয়ার ইজ দি রেজাল্ট।' ব'লে পকেট থেকে একখানি কাগজ টেনে বার ক'রতে ক'রতে অধ্যাপক সিদ্ধান্ত ব'ললেন, 'অণিমা অনার্সে ফাই সেকেণ্ড ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছে, আর তুমি পাশ কোর্সে এগিয়ে গিয়ে টেক্কা মেরেছ। তাই তোমাকে কন্‌গ্রাচুলেশন জানাতে এলাম সুমন্ত।'

—'কন্‌গ্রাচুলেশন নয়, বলুন আশীর্বাদ। আপনাদের আশীর্বাদের জোর না থাকলে যে অর্ডিনারী এই পাশ-কোর্সটাও এবারে মারা যেতো স্যার।' ব'লে উপুড় হ'য়ে একবার পায়ের ধুলো নিলাম অধ্যাপক সিদ্ধান্তের। তারপর বললাম, 'চলুন, ঘরে গিয়ে ব'সবেন, চা খেয়ে তবে যাবেন।'

কিন্তু রাজি হ'লেন না অধ্যাপক সিদ্ধান্ত, ব'ললেন, 'ব'সবার আমার সময় কোথায় বলো? তুমিই বরং একসময়ে আমার ওখানে গিয়ে চা খেয়ো।'

ব'ললাম, 'এসে এমনি ক'রে চ'লে যাবেন, জান্তে পারলে বাবা বড় দুঃখ পাবেন।'

—'আমার কাজের কথাটা বুঝিয়ে বোলো, তবে আর দুঃখ পাবেন না।' অধ্যাপক সিদ্ধান্ত ব'ললেন, 'আমাদের কলেজে রেজাল্ট এসে পৌঁছাতে আরও হয়ত একটা দিন লাগবে, আমি প্রাইভেট সোর্সে ক'লকাতা থেকে মাত্র কয়েকটা রেজাল্টই টেলিগ্রামে আনিয়েছি। আগে থেকে তাই এক্সপোজ্‌ড না হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়।'

সম্মতিসূচক ঘাড় হেঁকিয়ে কথাটা সমর্থন ক'রে নিলাম। অধ্যাপক সিদ্ধান্তর একান্ত কৃপাই ব'লতে হবে বৈ কি! আমাদের কয়েকজনকে ভালোবাসেন ব'লেই আমাদের নিয়ে তাঁর উৎকণ্ঠার শেষ নেই। এমন ভালোবাসা সংসারে দুর্লভ।

কিন্তু নিজের উপরেও বড় কম বিস্ময়বোধ হ'লো না। রেজাল্ট বেরোনো সম্পর্কে গত কয়েক দিনের মধ্যে একটা কথাও মাথায় আসে নি। এতকাল সংসারের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থেকেছি, নিজেকে নিয়ে ভাবতে তাই বাধা আসেনি, এ ক'টা দিন সংসারের সঙ্গে নিজেকে বড় বেশী জড়িয়ে ফেলেছি ব'লেই ব্যক্তিগত চিন্তা থেকে ধীরে ধীরে কেমন বিযুক্ত হ'য়ে প'ড়ছিলাম।

অধ্যাপক সিদ্ধান্ত কিন্তু আর বিন্দুমাত্র দেরী ক'রলেন না! ধীরে ধীরে তিনি আবার তাঁর বাড়ীর পথেই পা বাড়ালেন। ব'ললেন, 'এসো এক সময় সুব্রত, আমি তোমাকে এক্সপেক্ট ক'রবো।'

এমন ক'রে কোনো অধ্যাপকই বোধ করি কোনো ছাত্রকে ডাকেন না! একটু গলা উঁচিয়েই ব'ললাম, 'খুব শীগ্‌গিরই একদিন আসবো স্যার, আপনার কাছে না যেতে পারলে যে আমার নিজেরই ভালো লাগবে না!'

একটি কথাও আর না ভুলে ধীরে ধীরে চোখের আড়াল হ'য়ে গেলেন অধ্যাপক সিদ্ধান্ত।

নিজেও আর অপেক্ষা ক'রলাম না। জানতাম পাশের সংবাদটা মা কিম্বা বাবার কাছে তেমন রুচিকর হবে না, তবু গ্রাজুয়েট হবার এতবড় গৌরবকে একান্ত নিজের মধ্যেই দমিয়ে রাখ্‌তে পারলুম না। বাবা বাড়ীতে ছিলেন না। মার শিয়রে এসেই আবার ব'স্‌লাম, ব'ল্‌লাম, 'আমি পাশ ক'রে ডিগ্রী পেয়েছি মা, আজ আমার সবচেয়ে গৌরবের দিন! আমাদের পরিবারে কোনোদিন কেউ যে-ডিগ্রী নিতে পারে নি, আজ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ডিগ্রী নিতে পেরেছি। আমাদের কলেজের অধ্যাপক সিদ্ধান্ত এসে জানিয়ে গেলেন। এ যে আমার কতবড় সৌভাগ্য, তোমাকে বুঝিয়ে ব'ল্‌তে পারবো না মা। ওঠো, উঠে ব'সে আমার মাথায় তোমার পায়ের ধুলো দাও।'

আপত্তি ক'রলেন না মা, কষ্ট ক'রে উঠে ব'সে সত্যি-সত্যিই পা দু'খানি বাড়িয়ে দিলেন। তাতে আর হাত স্পর্শ না ক'রে স্পন্দিত ডিগ্রীধারী মাথাটাই নীরবে ঠেকিয়ে নিলাম। ধুলো লাগ্‌লো কিনা মাথায়, জানি না, তবে পুণ্যার্জ্জন হয়ত পুরোপুরিটাই হ'য়ে গেল।

মা ব'ল্‌লেন, 'তবে আর কি! চাকরীটা এবারে কবে থেকে সুরু ক'রছিস, বল!'

কথাটার পিছনে যে কিছু শ্লেষ ছিল, তা বুঝ্‌তে কষ্ট হ'লো না। ব'ল্‌লাম, 'আজ্‌কালকার বাজারে চাকরীটা এমন কিছু মাসীর হাতের মোয়া নয় যে, ইচ্ছে ক'রলেই পাওয়া গেল। চেষ্টা ক'রতে হবে বৈ কি!'

—'তোর বাবার মতটাও তো নেবার প্রয়োজন, না—সে-প্রয়োজন তুই বোধ করিস না?' ব'লে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন মা।

ব'ল্‌লাম, 'যদি প্রয়োজন হয়, তবে নেবো বৈ কি! কিন্তু খুব বেশী দরকার হবে ব'লেও মনে করি না।'

ভেবেছিলাম—এবারে কিছু একটা রূঢ় শব্দই ব্যবহার ক'রে ব'স্‌বেন মা, কিন্তু দেখ্‌লাম—এসম্পর্কে আর একটি কথাও ব'ল্‌লেন না তিনি।

বেলা ক্রমেই একটু একটু ক'রে বাড়ছিল। এক-সময়ে মার শিয়রের পাশ থেকে উঠে পড়বার উদ্যোগ

ক'রলাম। অণিমাকে চিঠি কিম্বা টেলিগ্রাম পাঠাবার আগে তাদের বাসায় অন্ততঃ খবরটা পৌঁছে দেওয়া কর্তব্য! অমূল্যধনবাবু তাঁর বোকারী জীবনের দারিদ্র্যের মধ্যে অন্ততঃ কিছুটাও তবে সান্ত্বনা পেয়ে আশ্বস্ত হতে পারবেন।

উঠ্‌তেই যাচ্ছিলাম। হঠাৎ নিজে থেকেই মা আবার কথা ব'লে উঠলেন। ব'ল্‌লেন, 'চাকরী করিস, গোলামী করিস, যা ইচ্ছে তাই কর, আমি দেখ্‌তেও যাবো না। তার আগে ঘরে আমার বউ এনে দিবি, এই ব'লে রাখ্‌ছি। শ্বাস থাকতে থাকতে তবু তাকে আমি নিজের হাতে ঘর-গেরস্থালীর কাজগুলো শিখিয়ে দিয়ে যেতে পারবো।'

তর্ক তুল্‌লাম না এই নিয়ে মার সঙ্গে। ডাক্তারের বারণ। ব'ল্‌লাম, 'তাই দিও!' তারপর মার দ্বিতীয় কথার আর অপেক্ষা না রেখেই দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে প'ড়লাম।

পূর্ণিমার গিয়ে একটা পৌঁছ-সংবাদ দিয়েছিল বটে অণিমা, কিন্তু তাতে বিস্তৃত কিছু লেখা ছিল না। না থাক্‌বার কারণ ছিল। গিয়ে নিজেকে নিয়ে গুছিয়ে উঠ্‌তে বক্‌মারী কম নয়। সেই বক্‌মারী মিটিয়ে উঠতে কয়েকটা দিন সময় চাই তো বটেই। কিন্তু তা হ'লেও মনের দিক দিয়ে সান্ত্বনা পাচ্ছিলাম না মোটেই। কৌতূহল ছিল—ইতিমধ্যে তার আর কোনো চিঠি এসে পৌঁছালো কিনা নীলার হাতে। কিছুমাত্র দ্বিধা না ক'রে অণিমাদের বাড়ীর দরজায় এসেই একসময় তাই দাঁড়িয়ে প'ড়লাম।

কড়া ন'ড়তেই নীলা বেরিয়ে এলো।—'ওমা, কি আনন্দ, সুব্রতদা আপনি?'

ব'ল্‌লাম, 'আমি না, ভূত।'

—'ভূত না—বলুন অদ্ভুত।' ব'লে সহাস্যে এসে আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো নীলা। তারপর ব'ল্‌লো, 'আজ আর আপনাকে কিছুতেই ছাড়চি না। মাকে বলি, আজ আপনি এখান থেকে খেয়ে তবে যাবেন।'

শুনে চ'ম্‌কে উঠ্‌লাম। এ বলে কি নীলা! অণিমা পর্যন্ত যা কোনোদিন করতে সাহস পায়নি, নীলার কাছে তা যেন একেবারেই তুচ্ছ। ব'ল্‌লাম, 'না, না, খাওয়া দাওয়ার হাঙ্গামা করলে কিন্তু আমি আর মোটেই আসবো না তোমাদের বাড়ীতে। ওতে আমার ভারী অরুচি।'

চোখ দু'টোকে এবারে খুব বড় ক'রে নীলা ব'ল্‌লো, 'তা—রুচিটা কিসে শুনি?'

কিন্তু সে-কথাও নীলাকে শুনিয়ে লাভ নেই। যা রুচি ছিল, তা আজ আর হাতের নাগালের মধ্যে নেই, বাংলা ছেড়ে তা বিহারের ভূমিখণ্ডে গিয়ে মিলেছে। তবু নীলার সঙ্গে যতটুকু ঠাট্টা করা চলে, সেটুকু বজায় রেখেই এবারে তার কথার জবাবে ব'ল্‌লাম, 'তোমার দিদির চিঠি।'

—'কি দুষ্টু আপনি সুব্রতদা। আপনি ব'লবার আগেই আমি বুঝেছিলাম। কিন্তু তাই ব'লে আমরা কি একেবারেই কিছু নই?' ব'লে দুষ্টুমিভরা চোখ দু'টোকে একবার পিট্‌পিট্ ক'রে নিল নীলা।

তার মাথার উপর দিয়ে আদরের হাত বুলিয়ে দিয়ে ব'ল্‌লাম, 'তোমার দিদির চাইতে তুমিই কি আমার কাছে কিছু কম! তুমি আমার নীলারাণী, আমার লক্ষ্মী বোনটি।'

এবারে খুশীতে একেবারে গ'লে গেল নীলা।

ব'ল্‌লাম, 'তা—পৌঁছ-সংবাদের পরে দিদির কি আর একটা চিঠিও পেলে না নীলারাণী?'

—'কৈ, না তো! আপনি পেয়েছেন বুঝি?'

—'আমি পেলে বুঝি এম্‌নি ক'রে জিজ্ঞেস করি?' ব'ল্‌লাম, 'পরীক্ষায় দিদি তোমার খুব বেশী-বেশী নম্বর পেয়ে পাশ ক'রেছে। তোমার মাকে এ খবরটা পৌঁছে দেবার দরকার।'

নীলার উৎসাহ এবারে দেখে কে? ব'ল্‌লো, 'সত্যি, দিদি পাশ ক'রেছে, খুব বেশী-বেশী নম্বর পেয়ে পাশ ক'রেছে? কি মজা—' ব'ল্‌তে দিয়ে হঠাৎ

থম্‌কে দাঁড়ালো শীলা, জিজ্ঞেস ক'রলো : 'আপনি ?'

ব'ললাম : 'আমিও।'

এবারে আর একটি কথাও না ব'লে হাতে তালি বাজাতে বাজাতে দ্রুত বাড়ীর ভিতরে চ'লে গেল শীলা।

একটু বাদে অরুণাংশু দেবী নিজেই এসে উপস্থিত হলেন এ-ঘরে। পিছনে পিছনে শীলা। প্রযুক্তিতে বাধলেও মাথা নিচু ক'রে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রলাম অরুণাংশু দেবীকে। ব'ললাম, 'আমাকে বোধ করি আপনার চিন্‌তে অসুবিধে হ'চ্ছে না ?'

—'বিলক্ষণ, অসুবিধে হবে কেন! তাছাড়া শীলার মুখে যে সবসময় তোমার নাম লেগেই র'য়েছে। এতও চিনেছে ও তোমাকে! তা—অণিমার পাশের খবরটা তুমি তা হ'লে জানতে পেরেছ বাবা ?'

—'জান্‌তে পারা মানে কি, আমাদের অধ্যাপকই যে জানিয়ে দিলেন! অনার্সে হাই সেকেণ্ড ক্লাস পেয়ে সেকেণ্ড হ'য়েছে অণিমা। অধ্যাপক সিদ্ধান্তের ক্লাসে এমন ভালো রেজাল্ট্ এবারে কারুর হয়নি।' ব'লে চোখ দু'টোকে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে নিবদ্ধ করতে চেষ্টা ক'রলাম অরুণাংশু দেবীর মুখের দিকে। দেখলাম—শান্ত মুখের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে কেমন একটা খুসীর জ্যোতি স্ফুরিত হ'য়ে উঠচে।

শীলা ততক্ষণে আরও অনেকখানি কাছে এগিয়ে এসেছিল। অরুণাংশু দেবী কিছু একটা ব'ল্‌বার আগেই সে বল্‌লো, 'এত করে বল্‌লাম সুমন্তদাকে যে, আজ আমাদের এখান থেকে খেয়ে তবে যাবেন, কিন্তু শুনলেন না সুমন্তদা! এবারে তুমি একবারটি নিজের মুখে বলো না মা ?'

অরুণাংশু দেবীর এবারে অপ্রস্তুত হবার কথা। কথাটাকে চাপা দেবার জন্য তাড়াতাড়ি তাই নিজে থেকেই বল্‌লাম, 'না, না, খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে কি আছে। শীলার জন্মদিনে তো সেবার কত কিছু খেলাম। আবার কখনও সুবিধে মতো একসময়—

কথা শেষ হলো না। বাধা দিয়ে অরুণাংশু দেবী বললেন, 'তাই বলে চা না খেয়ে কিন্তু উঠে যেয়ো না বাবা। ব'সো, আমি এক্ষুণি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'—ব'লে সোজা অন্দরমহলে গিয়েই আবার আশ্রয় নিলেন অরুণাংশু দেবী।

একটু বাদে শীলাকেও আবার যেতে হলো।

দ্বিতীয়বার এসে কিন্তু আর এঘরে ঢুকলেন না অরুণাংশু দেবী। শীলাকে দিয়েই তিনি চা পাঠিয়ে দিলেন। চা'র সঙ্গে টা'টাও কম নয়। দু'খানা পরোটার সঙ্গে ওম্‌লেট আর বেগুনভাজা। শীলার উপস্থিতিতে এতকিছু যে আমি একা খেতে রাজি হবো না, তা শীলাও জানতো। পাছে সাধাসাধির ব্যাপারটা বেড়ে যায়, তাই নিজেও একটা স্বতন্ত্র প্লেটে প'রোটা আর বেগুনভাজা নিয়ে এসে আমার মুখোমুখি হ'য়ে বস্‌লো। বললো, 'গরম থাকতে থাকতে তাড়াতাড়ি খান, নইলে কাপের চা'টা শেষ পর্যন্ত বরফ-জল বলেই খেতে হবে।'

বললাম, 'বরফ-জল কেন হ'তে যাবে, চা ঠিক চা-ই থাকবে। এই তো খাচ্ছি আমি।' তারপর প্লেট-খানিকে হাতের কাছে টেনে নিয়ে খেতে খেতে ব'ললাম, 'তোমার যে কি কি সব পড়া আমার কাছে গিয়ে বুঝে নেবার কথা ছিল, তৈ গেলে না তো !'

এবারে তর্জনী নাচিয়ে শীলা ব'ললো, 'যাবো, সবুর করুন না, এরপর বিরক্ত হ'য়ে বলবেন—আমার বড্ড কাজ বেড়েছে, কাল থেকে আর এসো না তুমি।' বলে নিজেই সকৌতুকে হেসে উঠলো শীলা।

নিজেও যে হাসি সম্বরণ ক'রতে পারলুম, তা নয়। বললাম, 'না গিয়েই এতখানি, গিয়ে না জানি কি বলবে !'

হাসির বেগ যথাসম্ভব কমিয়ে শীলা ব'ললো, 'গিয়ে তো ব'লবো ঘোড়ার ডিম, আসলে যাওয়াই হচ্ছে না সুমন্তদা। বেলা যে কোথা দিয়ে ফুরিয়ে যায়, নিজেই বুঝতে পারি না।'

বললাম, 'স্কুলের রুটিনের মতো সময়গুলোকে ভাগ ভাগ ক'রে নাও, দেখবে—তবে আর এতটুকুও অসুবিধে থাকবে না।'

—'এবার থেকে তাই নেবো।' ব'লে উঠে দাঁড়ালো শীলা। চা খাওয়া ততক্ষণে আমার শেষ হ'য়ে গিয়েছিল। কাপ আর ডিস দু'টোকে হাতে তুলে নিয়ে এবারে বাড়ীর ভিতরেই আবার রেখে আসতে যাচ্ছিল সে, বললাম, 'আমি এখন চলি, দিদির চিঠি এলে আমাকে জানিয়ো কিন্তু।'

স্বভাবগত দুষ্টু হাসি মুখে টেনে শীলা বললো, 'আপনিই আগে পাবেন, তারপর আমরা।'

মনে মনে বললাম—তাই যেন হয়। কিন্তু মুখে কি ছাই এত বড় কথাটা এত ছোট ক'রেও খুলে বলা গেল! বললাম, 'তোমার দিদি, তোমাকেই তো আগে লিখবে।' তারপর শীলার কথার আর অপেক্ষা না রেখেই ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে প'ড়লাম!

অণিমাকে একটা টেলিগ্রাম না পাঠিয়ে অবধি আশ্বস্ত হচ্ছিলাম না। বিহারের মাটিতে ব'সে কেমন ক'রে শুনতে পাবে সে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষণা? টেলিগ্রামটা যত তাড়াতাড়ি গিয়ে তার হাতে পৌঁছায়, ততই মঙ্গল।

এতক্ষণে পোষ্ট অফিসে এসে টেলিগ্রামটা ক'রে তবে শান্তি পেলাম। শেষ অক্ষর কয়েকটা মাত্র বসিয়ে দিলাম: 'Latter follows'।

কিন্তু ঘরে এসে যখন কাগজ-কলম টেনে নিয়ে চিঠি লিখতে বসলাম, একটি শব্দও কিন্তু কলমে এলো না। এতক্ষণ ধরে কত কথাই না মনে এসে ভিড় করছিল, কিন্তু কলম ধরতে গিয়ে দেখলাম—আঙুলগুলো কেমন আড়ষ্ট হয়ে আসছে,—কলমটা কিছুতেই চলছেনা। এমনটা কিন্তু কোনোদিন হয়নি, হয়তো এমন মুহূর্ত এর আগে কোনো-দিন আসেনি ব'লেই হয়নি। সাইকোলজির ছাত্র হয়ে নিজেই বুঝতে পারলুম না—মনোবিজ্ঞানে এ অবস্থাটাকে কি বলে? অণিমা কাছে থাকলে এই নিয়ে তর্কের ঝড় বইয়ে দিতে পারতুম তার সঙ্গে। আজ এই নিঃসঙ্গ জীবনে নিজের উপরেই শুধু বার বার ক'রে ধিক্কার এলো। চিঠি লেখা আর হ'লো না। মনটা অকস্মাৎ কখন্ সুদূরপ্রসারি হ'য়ে অতীতের বিলীয়মান দিনগুলির মধ্যে গিয়ে ঘুরে বেড়তে লাগলো। সেই চাঁদ, সেই কৃষ্ণচূড়ার শাখা, সেই অবারিত মাঠ, ক্লাসের সেই কৌতূহলোদ্দীপ্ত প্রতীক্ষ-মান মুহূর্তগুলো—সব কিছুর সঙ্গে কী নিবিড় ভাবেই না অণিমা জড়িয়ে রয়েছে! হু-হু ক'রে উঠলো একবার মনটা। স্মৃতি সুখকর হলেও তার দংশন বড় বিষাক্ত। সেই বিষাক্ত দংশনেই নিজের মধ্যে কেবল দংশিত হ'তে থাকলাম।

[৩]

বাবার নির্দেশ মতো যথাসময়েই চক্রধরপুরে চিঠি পাঠিয়েছিলাম। খবর পেয়ে একটা দিনও আর অপেক্ষা করে নি দিদি। জামাইবাবু আর মন্টুকে নিয়ে চ'লে এলো। গাড়ী এসে দোর-গোড়ায় দাঁড়াতেই দিদির চোখ দু'টোর দিকে লক্ষ্য গেল। ত্রাসে দুশ্চিন্তায় কেমন যেন ছলছল্ ক'রছে চোখ দু'টি। জিজ্ঞেস ক'রলো, 'মা কেমন আছেন আগে বল্?'

ব'ললাম, 'এসে যখন প'ড়েছ, তখন সচক্ষেই দেখতে পাবে। আপাতত হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট হ'চ্ছে, ইতিমধ্যে অবস্থা বড-একটা বাড়াবাড়ির দিকে যায় নি।'

দিদি আর দ্বিরুক্তি না ক'রে দ্রুত পায়ে এগিয়ে মার শিয়রে গিয়ে ব'সলো। গাড়ী থেকে নামবার সময় দিদির কোল থেকে মন্টুকে নিজের কোলে টেনে নিয়েছিলাম। আগের চাইতে এখন কিছু বড় হ'য়েছে মন্টু, দেখে মনে হ'লো—খানিকটা ভব্য-সভ্যও হ'য়েছে সেই অনুপাতে। ব'ললাম, 'খুব যে চুপচাপ, ব্যাপার কি মন্টুবাবু? কোথায় এসেছ বলো দিকি?'

মিষ্টি আধো আধো কণ্ঠে মন্টু ব'ললো, 'মামাবাড়ি।'

দিব্যি কথা শিখেছে মন্টু।

জামাইবাবুকে জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'কে শিখিয়ে দিয়েছে, দিদি—না আপনি?'

রসিকতা ক'রে জামাইবাবু ব'ললেন, 'মামাবাড়ী সম্পর্কে ছেলেমেয়েরা তাদের মার কাছ থেকেই সব শেখে। বাপের ফাংশন সেখানে খুব বেশী থাকে না।'

ব'ললাম, 'কেন, বাসেরাই বা কিছু পর নাকি ?'

মুচ্‌কি হেসে জামাইবাবু ব'ললেন, 'পর না হ'লেও ব্যাপারটা তো আসলে মেয়ে ঘটিত, মাতুলালয়ের ব্যাপার-গুলো চিরকাল তাই বিশেষ ক'রে মাতৃ-সম্বন্ধই থেকে যায়।'

ব'ললাম, 'খুব যে একেবারে রস-সাগরে ডুব দিয়েছেন, দেখতে পাচ্ছি। সংসার-ধর্মে হঠাৎ এমন সন্ন্যাস ভাব এলো কবে থেকে, বলুন তো জামাইবাবু ?'

—'জ্ঞানিক যার দার্শনিক, সন্ন্যাস ভাব না এসে তার উপায় কি ?' হাসি গোপন ক'রে জামাইবাবু ব'ললেন, 'তাছাড়া কি এর মধ্যে একটিবারও এমন সময় হ'লো না যে চক্রধরপুর যাওয়া চলে !'

ব'ললাম, 'অনুযোগটা মধুর সন্দেহ নেই, কিন্তু সময় কি সত্যিই ছিল ! এতদিন পরীক্ষার পড়া নিয়ে রীতিমত কৃচ্ছ্রসাধন ক'রেছি, পরীক্ষা দিয়ে অবধিও তো কম এ্যাংজাইটিতে কাটলো না ! এতদিনে পাশের খবরটা বের হওয়াতে কিছুটা নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছি। এবারই বরং যাবার কিছুটা সুযোগ হ'লো। তা ছাড়া দু' পাঁচ জায়গায় ঘুরে ঘুরে কিছু-একটা প্রতিশনের ব্যবস্থাও তো দেখতে হয় !'

—'হাপি নিউজ।' সোচ্ছ্বাসে উচ্চ-গ্রামে গলা তুলে জামাইবাবু ব'ললেন, 'মিষ্টি মুখের ভাগ্য নিয়েই তবে এবারে শ্বশুরালয়ে পদার্পণ ক'রেছি, দেখতে পাচ্ছি। তা এরই মধ্যে হঠাৎ এমন কি জলে প'ড়েছ যে, এক্ষুনি কিছু-একটা চাকরীতে না ঢুকলে নয় !'

ব'ললাম, 'নইলে ঘরে থেকে আমি শুকিয়ে ম'রবো। তেজারতি আর লম্বি কারবার ক'রে সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করা যায় সত্য, কিন্তু শিক্ষা আর জ্ঞান নিয়ে মানুষ হওয়া যায় না।'

ঠাট্টা ক'রে জামাইবাবু ব'ললেন, 'কথাটা ভুল ব'ললে, বলো—কন্যা সম্প্রদান করা যায় সত্য, কিন্তু কন্যা ঘরে আনা যায় না।'

ব'ললাম, 'তেমন একটা ব্যাপারও ইতিমধ্যেই না ঘটাতে চেষ্টায় আছেন !'

হাতে তালি বাজিয়ে মুখে হাসি টেনে জামাইবাবু ব'ললেন, 'তবেই দেখ, কথাটা কি মিথ্যে ব'লেছি ! মিষ্টি মুখের ভাগ্য নিয়েই এবারে আমার শ্বশুরালয়ে পদার্পণ। নইলে এমন অসময়ে আমিই বা ছুটি নিয়ে আসবো কি করতে !'

—'যান, আপনি একটুও সিরিয়াস হ'তে পারছেন না, সব কথাতেই আপনার শুধু ঠাট্টা।' ব'লে জামাই-বাবুকে আর কিছু-একটাও ব'লবার অবকাশ না দিয়ে মন্টুকে মার কাছে পৌঁছে দেবার জন্য বড় ঘরের দিকে পা বাড়ালাম।

ইতিমধ্যে দিদিই ফিরে এসে বারান্দা থেকে মন্টুকে টেনে নিয়ে গেল। ব'ললো, 'এতক্ষণ মন্টুকে না দেখে মা কেবলই তাড়া দিচ্ছিল।'

ব'ললাম, 'বুঝতে পেরেই তো তাই এগিয়ে এলাম ! নইলে তোমার ছেলে যে-রকম কথা শিখেছে, তাতে দিব্যি ব'সে ব'সে গল্প ক'রে সময় কাটিয়ে দিতে পারতুম।'

দিদি ব'ললো, 'মার চোখের দৃষ্টি দেখে তো কিছুই ভালো বোধ ক'রছি না রে সুমু !,

ব'ললাম, 'লিভারের দোষে অমনটা হয়, ডাক্তারও সেই কথাই ব'লেছেন। তা ছাড়া একদিন পর-পর এসে ডাক্তার দেখে যাচ্ছেন, তিনি যখন এখনও নিরাশ হন নি, তখন আমরাই বা হঠাৎ কিছু বিচলিত হ'য়ে পড়ি কেন ! বরং যেটুকু পরিচর্যার অভাব ছিল, তুমি আসায় এবারে সেটুকু রক্ষা পেল।'

উৎকণ্ঠার সুরেই দিদি ব'ললো, 'ডাক্তারকে তুই আর-একবার ভালো ক'রে বুঝিয়ে বল্।'

—'আমি বুঝিয়েছি, এবারে তুমি বুঝিয়ো। আজ বিকেলেই ডাক্তারের আসার কথা আছে।' ব'লে নিজের কাজের অছিলাতেই কিছু-সময়ের জন্য একবার বাইরে বেরিয়ে প'ড়লাম। সুবিধে ছিল যে, ঠিক সেই মুহূর্তেই

বাবা এসে বাড়ীতে প্রবেশ ক'রলেন। জামাতা বাবাজীর সঙ্গে কথা বলার পক্ষে তিনি একাই যথেষ্ট।

এরপর ঠিক দু'টো দিনও কাটলো না। সকালের প্রথম ডাকেই নীল রঙের একখানি খাম এসে উপস্থিত আমার নামে। পোষ্ট অফিসের স্পষ্ট দু'টো সীল জল্ জল্ ক'রছে খামের উপরে: একটা পুনিয়ার, আর একটা আমাদের এই সহরের। ডাকে আমার ঠিকানায় এই প্রথম চিঠি এলো অপিমার। প্রাথমিক পৌঁছ-সংবাদের চিঠিটা শীলার সঙ্গে একযোগেই এসেছিল, শীলাই হাতে ক'রে এনে দিয়েছিল চিঠিটা। তার মধ্যে প্রাণ ধর্মের বিশেষ কিছু সাড়া ছিল না। এবারের চিঠিটা পেয়ে স্বভাবতঃই মনটা তাই উৎসুক হ'য়ে উঠলো। খাম খুলে অতি দ্রুত তাই চোখ বুলিয়ে গেলাম অক্ষরগুলোর উপর দিয়ে:

সুন্দর!

তোমার চিঠি পেলাম—না যেন আকাশের চাঁদ পেলাম হাতে। আজকের সমস্যা-সঙ্কুল জীবনের কাছে চাঁদের কিরণ একেবারেই চাপা প'ড়ে আছে; তোমার টেলিগ্রামটাই আজ সেই চাঁদের মূর্তি ধ'রে এলো। সহস্র চাঁদের কিরণে এ আলো উদ্ভাসিত। ভগবান যে এমন ক'রে মুখ তুলে চাইবেন, কল্পনা করতে পারিনি। তার আগে ঋণ স্বীকার করতে হয় তোমার। তুমিই তো আমাকে কৃতকার্যতার পথে এগিয়ে দিলে, জয়ের তিলক এঁকে দিলে ললাটে! তুমি যদি পাশে না থাকতে, তবে হয়ত ফিসের টাকার অভাবে সেদিনই আমার সমস্ত জীবনের উপর দিয়ে শিক্ষার যবনিকা নেমে আসতো। তুমি পাশে দাঁড়িয়ে উইংস্-ম্যানের কাজ ক'রলে, দিলে না আমার জীবন-নাট্যমঞ্চের উপর সে পর্দা নামতে; বরং নতুন একটা গ্ল্যাস লাইটের জোরাল কেলে সংসারের দর্শকবৃন্দের কাছে মুখখানিকে আমার উজ্জ্বল ক'রে তুললে। সব দিক দিয়ে তুমি শুধু ভালই ক'রে তুললে আমাকে, এ জীবনে সত্যিই কি তোমার এ ঋণ শোধ করতে পারবো!

এখানে এসে অবধি নিজেকে নিয়ে বড়-বেশী ভাবিয়ে উঠতে পারি নি। এ যেন নতুন ক'রে জীবন সম্বন্ধে অভ্যস্ত হওয়া। তুমি ব'লেছিলে অনাবিল স্বাচ্ছন্দ্যে সময়গুলো কেটে যাবে আমার মুক্তবেণী ধারার মতো; কিন্তু তার কিছুমাত্র আভাষও যদি আজ অবধি খুঁজে পেলাম! সময় কোথাও স্থির নয়, সময় তার আপন গতিতে ঠিকই ব'য়ে যায়; সেই সঙ্গে যদি মানুষের মনটাও ব'য়ে যেতে পারতো, তবে বুঝি আর দুঃখ ছিল না! দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা কেবলই নিজেকে হাতড়ে মরছি! কি যেন নেই, কি যেন পেতে চাই! এমন দুরপনেয় আকাঙ্ক্ষা কিন্তু আগে কোনোদিন জাগে নি। আজ কেবলই আকাঙ্ক্ষার দুয়ারে মাথা খুঁড়ে মরছি। চাকরী পেয়েও তাই মনে হ'চ্ছে—এ যেন আমার দ্বীপান্তর বাস।

কিন্তু ছিঃ ছিঃ ছিঃ, আমিই বা কিরকম? পৃষ্ঠা জুড়ে শুধু আমার নিজের ঢাকই পিটিয়ে চ'লেছি! জানো তো, মেয়েরা একটু উচ্ছ্বাসপ্রবণ। তারা কথা বলে কম, কিন্তু যখন বলে—তখন বানির বাঁধের মতো তাদের মনের বেড়া ধ্বস্ পড়ে। তোমার খবর না পাওয়া অবধি উৎকণ্ঠায় থাকবো। যাও নাকি মাঝে মাঝে অধ্যাপক সিদ্ধান্তের কুটীর-আশ্রমে, দেখা হয় নাকি মাঝে মাঝে প্রেম-বিক্ষুব্ধ কবি মনোতোষের সঙ্গে? আজও বুঝি জ্যোৎস্না-পুলকিত সন্ধ্যায় ছুটে যাও সেই কৃষ্ণচূড়ার প্রান্তরে? না, না, থাক্ সে কথা। ইতিমধ্যে শীলার চিঠিতে আমাদের সংসারের কথা কিছু জানতে পেরেছি, সেই সঙ্গে তোমারও। ভাবছি শীলা যদি আমার ঠিক পিঠোপিঠি হ'তো, তবে এতদিনে সে ছিঁড়েখুঁড়ে নিতো তোমাকে আমার কাছ থেকে। দেখ্‌ছি—এ ব্যাপারে হিংসে আমার ক্রমেই দিন

দিন বেড়ে যাচ্ছে। মেয়েরা যে কেমন ক'রে মেয়েদের সহ্য ক'রতে পারে না—নিজের দিকে তাকাতে গিয়ে আজ যেন তা বড়বেশী স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে। তোমার পাশে দ্বিতীয় নারী দেখ্‌লে আমি কি সত্যিই স্থির থাকতে পারবো? গীতা থেকে সুরু ক'রে দর্শন শর্য্যন্ত 'নন্‌এ্যাটাচ্‌ড্‌ ওয়ে অব লাইফ'-এর সংজ্ঞা নিয়ে আমরা যতই মস্তিষ্ককে পীড়িত ক'রে তুলি না কেন, জীবনের বস্তুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাকে সম্ভব ক'রে তোলা কি খুবই সহজ? বোধ করি না। এই একটি মাত্র 'না'-এর উপরেই সম্ভবতঃ পৃথিবীর যা-কিছু ললিত-কলা, কাব্য, সাহিত্য দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েদের জীবনেই সেই সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে বেশী; তাইতো তাদের নিয়েই পৃথিবীতে যত কিছু সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ। এই তো আমাদের সাইকোলজি। একে বোধ করি ইচ্ছে ক'রলেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

শীলার দিকে একটু লক্ষ্য রেখো। ও বড় একা পড়ে গেছে। জানোতো, সংসারে গরীবদের জীবনে স্নেহটুকুও দুর্লভ। তোমার চিঠির প্রত্যাশায় রইলুম। ইতি—

তোমার অণিমা।

চিরকাল দারিদ্র্যের দুঃখটাই অণিমার সারা মনকে আচ্ছন্ন ক'রে রইল, পারলো না একটা দিনও তার ঊর্ধ্বে উঠে নিজেকে সে স্বচ্ছন্দ জীবন-ধর্মে সুখী ক'রতে। চিঠি পড়া শেষ ক'রতে গিয়ে নানা দিনের নানা কথা এসে ধীরে ধীরে মনটাকে ঘিরে দাঁড়ালো। বিনা দ্বিধায় নিজেকে একদিন মৃত্যুর কোলে পর্যন্ত ঠেলে দিতে চেয়েছিল অণিমা। সংসারে মায়ের কোলের স্নেহ যার জন্য রইল না, মৃত্যুর কোলের শান্তি তার কাছে একটা মহাস্বপ্ন ছিল কি! সেদিন আশাবাদের কথা শুনিয়ে নির্ভরে বুক বাঁধতে ব'লেছিলাম অণিমাকে। কথা রেখেছিল সে। আজ তার কাছে সে-দিনের সে-জীবনের পরিবর্তন হ'য়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই ব'লে দুঃখবাদকে অতিক্রম ক'রে আজও সে আশার আলোকে জীবনকে উজ্জ্বল ক'রে তুলতে পারে নি। আজও সেখানে আমাদের সেই কলেজ-ম্যাগাজিন-সম্পাদনার মতো মাঝে মাঝে কিছু পুরুষালি হস্তক্ষেপের প্রয়োজন।

অণিমার চিঠির উত্তরে তাকে চিঠি দিতে এবারে আর একটা দিনও দেরী ক'রলাম না। ক'দিন ধ'রে কেবলই তাকে চিঠি লিখবার জন্য মনটা অস্থির হচ্ছিল। কাগজ-কলম টেনে নিয়ে এবারে তাই তার বিশেষ বিশেষ প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে পরে লিখলাম:

…প্রেমময়ী শুচিস্মিতা তুমি। বল যে তোমার কাছেই আমার রয়ে গেল! আমার জীবনে তোমার প্রেম—সে যে স্বর্গের চেয়েও স্বর্গীয়। প্রেমের তীর্থে আমি মুগ্ধ তীর্থঙ্কর। প্রেমময়ীর প্রতীক্ষাতেই এখানে আমার প্রতিটি মুহূর্ত তার অচল অবরোধের মধ্যে কণ্টকিত হ'য়ে উঠছে। তুমি এলে তবে এ'কাঁটা ফুল হ'য়ে ফুটবে।

মা সেদিন ব'লছিলেন—আমাকে চাকরী ক'রতে হ'লে আগে ঘরে তাঁকে বৌ এনে দিতে হবে। ব'লেছিলাম—'দেবো'। সেই থেকে কেবলই তোমার শুভাগমনের প্রতীক্ষা ক'রছি। কবে আস্‌বে তুমি বলোতো, কবে আস্‌বে আমার জীবন-বীণার তারগুলিকে চিরদিনের জন্য সুরে বেঁধে দিয়ে?

কাজের বিধিব্যবস্থা অবশ্য আজও কিছু-একটা হ'য়ে ওঠেনি! ভাবচি—কাগজের 'কর্মখালি' দেখে দেখে চুকবো কিনা কপালটা একবার এ-দুয়ার থেকে সে-দুয়ারে! বলা যায় কি ভাগ্য কোথায় কখন্ হঠাৎ সুপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। দর্শন আর মনোবিজ্ঞান নিয়ে পাশ করলাম, এবারে জীবন-দর্শনে ফেল করলে আমিই বা কিসের জোরে আমার জীবনে সার্থক করে তুলবো তোমার প্রেমকে? আপাততঃ মাকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছি, হার্ট'টা

প্রায় যেতেই বসেছিল, সম্প্রতি হোমিওপ্যাথিকে কিছু কাজ হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। এতকাল বাড়ীর উঠোনে অবধি আমার পা পড়তো না, আজকাল ক্রমেই যেন কেমন জড়িয়ে পড়ছি সংসারের তন্ত্রীতে। ক্রমেই অত্যন্ত হচ্ছি সংসার সম্বন্ধে। এবারে শুধু তোমার আসার পথ প্রতীক্ষিত। প্রেম নাও। ইতি—তোমার

সু—

নামটা স্বাক্ষর ক'রতে গিয়ে হঠাৎ থামতে হলো। লিখতে গিয়ে অনিমার সম্বোধিত নামটাই কলমে এসে গিয়েছিল, কিন্তু কেন যেন নিজের সম্বন্ধে কুণ্ঠা এলো, 'সু'র পরে তাই মিত্রের আসল নামের বাকী শব্দ দুটোই বসাতে যাচ্ছিলাম, ইতিমধ্যে পিছন থেকে হঠাৎ দিদির কণ্ঠ ভেসে উঠ্‌লো। কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'চিঠি লিখছিস কাকে?'

কাগজখানিকে ভাঁজ করে রাখতে রাখতে বললাম, 'আমার এক ক্লাস-ফ্রেইণ্ডকে। তুমি চিনবে না।'

দিদি তবু প্রশ্ন করলো: 'নাম কি? কোথায় থাকে?'

চিঠির কাগজখানাকে এবারে খামে ভরতে ভরতে কিছু না লুকিয়ে সংক্ষেপেই জবাব দিলাম: 'অনিমা মিত্র, থাকে পুর্ণিয়ায়।'

মুচকি হেসে দিদি বললো, 'মেয়ে ক্লাস-ফ্রেইণ্ড, তাই এত চিঠি লেখার ঘটা!'

বললাম, 'আশ্চর্য হবারই কথা বটে।' তারপর কখন যে নিজের অজ্ঞাতেই খামের মুখ বন্ধ করে টিকানা লিখে ফেললাম, নিজেই ঠাহর করতে পারি নি।

দিদি বল্‌লো, 'অনুমানটা তবে এর আগেও আমার মিথ্যে হয়নি।'

—'মানে?' খানিকটা নির্বোধের মতো দৃষ্টিতেই এবারে চোখ দুটোকে দিদির মুখের দিকে তুলে ধরলাম।

মুখ টিপে হেসে দিদি বললো, 'মানে তোর এই লেডি-ফ্রেইণ্ড সম্পর্কে।'

দু'হাতের মুঠোর মধ্যে খামখানিকে ঘোরাতে ঘোরাতে বল্‌লাম, 'সেবার টাকা পাঠিয়ে এরকমই কিছু একটা লিখেছিলে বটে।'

—'লিখেছিলাম নাকি?' দিদি বললো, 'তাহ'লে বোধ করি তোর জামাইবাবু পাশে ব'সে কথাটা যোগ ক'রে দিয়েছিল! আমি কি পারি তোর সঙ্গে ঠাট্টা ক'রতে, বয়সে আমি তোর বড় না?

দিদির কথার ভঙ্গী দেখে সহসা এবারে সশব্দে হেসে উঠ্‌লাম। ব'ললাম, বড়র মানও রেখেছ যেমনি, আর বড়ও তুমি তেমনি; খুব হ'য়েছে যাহোক্।'

দিদিও হাসি দমন ক'রতে পারেনি, বল্‌লো, 'মান রাখি কি ক'রে বল্, মান্যগণ্য যদি না করবি, তবে কি মান থাকে!' ব'লে আর এক মুহূর্তও দেরী ক'রলো না দিদি, যেমন একান্ত অকারণেই আমার অধ্যয়ন-কক্ষের ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তেম্‌নি অকারণেই মুখে হাসি গোপন ক'রে নিয়ে ধীরে ধীরে আবার বাড়ীর ভিতরের দিকে চ'লে গেল।

নিজেও আর অপেক্ষা না ক'রে উঠে পড়লাম। চিঠিটা গিয়ে তাড়াতাড়ি ডাকে ছাড়তে পারলেই শান্তি পাই। নাম স্বাক্ষরটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত অসম্পূর্ণই থেকে গেল। খামের মুখ খুলে ইচ্ছে হলোনা আর নতুন ক'রে কলম ধ'রতে। চিঠিখানাকে সেই অবস্থাতেই তাই এক্সপ্রেস ডাকে ছেড়ে দিয়ে আস্‌তে রওনা হ'য়ে প'ড়লাম। মনের মধ্যে একটা সুর কেবলই গুন্‌গুন্ ক'রছিল। সেদিন রাত্রে অনিমার কণ্ঠে উচ্চারিত সেই সুললিত আবৃত্তির শেষ ক'টি লাইন—

...'তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশীর রবে
পূর্ণ হবে রাতি:
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি।'

জানিনা—কি তাৎপর্য লুকিয়ে র'য়েছে এই আকস্মিক সুর-জাগৃতির মধ্যে, এ কি 'ইন্‌টেন্‌সিটি অব্ ইকুইলিব্রিয়াম'? এ কি দু'জনের মনের একই সাম্যাবস্থার প্রতিরূপ? কিছু একটাও আর ভাবতে পারলুম না, অথচ তারই মধ্যে মুহূর্তের জন্য হ'লেও আমার সমস্ত চিন্তা নিমজ্জিত হ'য়ে গেল।

[ক্রমশঃ

(১৫৬ পৃষ্ঠার পর)

ব্যবহার যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। তাই বলে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতি অস্বীকার করা হবে, তা নয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় এক একটি কেন্দ্রে স্থূল উৎপাদনের ব্যবস্থা না রেখে সকল লোককে কাজের সুযোগ করে দিতে হবে। অর্থের বিনিয়োগের পরিবর্তে মানুষ-শক্তিকে (man power) পূর্ণ নিয়োগ করতে হবে। কৃষি ও শিল্পের সুসমঞ্জস অর্থনীতি (balanced economy) হল সর্বোদয় আর্থিক সংগঠনের মূল কথা।

সত্যাকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্যও এই সম্ভাব্য ক্ষুদ্রতম অর্থনৈতিক একক (unit) সৃষ্টির প্রয়োজন। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের অর্থ-ই হল ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা সৃষ্টি করা। আর ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থাও কেন্দ্রীভূত হওয়া স্বাভাবিক। তা হলে বৈষম্য, অর্থনীতির ক্ষেত্রে ও রাজনীতির ক্ষেত্রে থাকতে বাধ্য। এজন্য সাম্য, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় শাসন যন্ত্রের বিলোপ আবশ্যক। কিন্তু সম্পূর্ণ বিলুপ্তি বাস্তবক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। তাই শাসনের প্রয়োজন যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করা হল সর্বোদয়ের লক্ষ্য। যেটুকু ক্ষমতা রাষ্ট্রের থাকবে, তারও যাতে অপব্যবহার না হয় তার জন্য গ্রাম রাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। গ্রামগুলি হবে এক একটি ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র। জীবনধারণের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদন ও বণ্টন গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে নিষ্পন্ন হবে, আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য প্রত্যেকটি গ্রাম পরস্পরের উপর নির্ভরশীল থাকবে। এই সহযোগ ও যোগাযোগের জন্য রাষ্ট্র থাকবে। এর ফলে রাষ্ট্রে ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা কমে যাবে। রাষ্ট্রকে সর্বশক্তিমান করে গণতন্ত্রকে জিইয়ে রাখতে প্রতিনিধিদের ফিরিয়ে আনার (re call) ব্যবস্থা থাকলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তা অলীক বলেই প্রমাণিত হবে। কেন না রাষ্ট্রব্যাপী ক্ষমতার অপব্যবহার হলে ফিরিয়ে আনা যে সম্ভবপর নয় তা সহজেই অনুমান করা যায়। আর আমরা এও জানি যে, প্রত্যেক কাজেরই (action) সমান ও বিপরীত গতি (action) আছে। সুতরাং শাসন যন্ত্রেই যদি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ হয় তবে সমাজ ব্যবস্থায় তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। ফলে অশান্তির সৃষ্টি হবে, সাম্য স্থাপন তো দূরের কথা। এজন্য গান্ধীজী বলতেন, "মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে ক্ষমতা অর্জিত হলেই নয় বরং ক্ষমতার অপব্যবহার কালে সকলের পক্ষে তার প্রতিরোধ করার শক্তি অর্জিত হলেই স্বরাজ আসবে।" এই জন্যই, এই বিরোধ করার শক্তিকে নিরন্তর জাগ্রত রাখার জন্য, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকেন্দ্রীকরণ হল সর্বোদয়ের উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন হবে, বহির্বিশ্বের সঙ্গে, দেশ রক্ষার ব্যাপারে কি সর্বোদয়ের লক্ষ্য নেই? উত্তরে পাল্টা প্রশ্নই করতে হয়, সর্বোদয় সমাজ যখন প্রতিষ্ঠিত হয় নি তখনও কি ঐ সম্পর্কে কোন সঠিক কিছু বলা যায়? কিন্তু এই পাল্টা প্রশ্নই উত্তর নয়। আজ পৃথিবী এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে রয়েছে। পুরাতন পদ্ধতিতে এর মীমাংসা হবার নয়। জাত্যভিমান ও কেন্দ্রীকরণের ফলে এই বিরাট সমস্যা আজ দেখা দিয়েছে। এ থেকে মুক্তি পাবার একটি পথই আছে; এবং তা হল গণ্ডীর বাইরে আসা। কৃত্রিম ভৌগোলিক গণ্ডী সৃষ্টি করে পৃথিবীব্যাপী হানাহানির সুযোগ সৃষ্টি করা। আজ গণ্ডী মুক্ত হওয়া প্রয়োজন, হানাহানি বন্ধ করতে মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার প্রয়োজন। এজন্য সর্বোদয় সমাজ যে পথের কল্পনা করে তার সার্থকতারই উপর নির্ভর করে এই অনিশ্চিত অবস্থার সমাধান।

কী ভাবে তা হবে? স্বভাবতঃই এর উত্তর হল বিপ্লব করে। ক্ষমতা অধিকার করে নয়, বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষমতা সৃষ্টি করেই তা হতে পারে। একদিকে কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার বিনাশ আর অপর দিকে বিকেন্দ্রীভূত সমাজ রচনার প্রবৃত্তি। একদিকে মানুষের মনে বিপ্লবের বীজ বপন আর অপর দিকে বস্তুস্থিতির পরিবর্তন। এক কথায় সর্বোদয়ের পক্ষে প্রবৃত্তি ও পরিস্থিতির সৃষ্টি। ভূদান, সম্পত্তিদান, শ্রমদান প্রভৃতি সেই পথেই প্রচেষ্টা। কিন্তু প্রচেষ্টা যখন যান্ত্রিক না হয়ে বুদ্ধিযুক্ত হয় তখনই সার্থক হয় বিপ্লব, প্রতিবিপ্লবের সম্ভাবনাও দূর হয়। তাই সর্বোদয় মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করতে চায় না, স্বাধীন ও সাম্যযোগী মানুষই সর্বোদয় আদর্শের প্রতিভূ।

সমাজ ও জাতীয়জীবন

[র. কু. সে.]

শিক্ষার মূলগত অর্থ হ'চ্ছে—প্রকৃত জ্ঞানের দ্বারা ভালোভাবে বাঁচবার পথ রচনা ক'রে চলা। তার জন্যে প্রথম দরকার আত্মোপলব্ধি, দ্বিতীয় প্রয়োজন—জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে নিজের জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া, তৃতীয় প্রয়োজন—জীবনকে নিয়মানুবর্তিতার অনুগামী ক'রে তোলা, চতুর্থতঃ প্রয়োজন—নিজের আবশ্যকীয় কাজগুলিকে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মধারার সঙ্গে সমন্বিত ক'রে নেওয়া, এবং সর্বশেষ প্রয়োজন—বাকী জীবনের সম্ভার স্বরূপ এই সব সমন্বিত বিষয়গুলিকে শুদ্ধ রুচিবোধ অনুভূতির দ্বারা দেশের কল্যাণের কাজে ব্যয় করা। জ্ঞানের পথে এই ব্যবস্থাকে শিক্ষার পরমার্থ কার্যক্রম ব'লে অভিহিত করা যায়। এর কোনো একটি দীনই অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। সবগুলি দীনকে মিলিয়ে একটি অখণ্ড জাগ্রত প্রাণসত্তা দাঁড়িয়ে আছে।

এই প্রাণ জীবনকে নব নব আধারে সঞ্জীবিত ক'রে তুলছে। জীবনে তাই বাঁচবার প্রশ্নটাই বড়। মানুষের মতো বাঁচা, কুকুরের মতো বাঁচা নয়। যে যে শীলাচরণের দ্বারা দিয়ে জীবনকে সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্তিতার অনুগামী ক'রে সুফলের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই শীলাচরণগুলির অনুশীলনই আগে প্রয়োজন। এই প্রয়োজন মেটাতে হ'লে চাই যথোপযুক্ত শিক্ষা ও জ্ঞান। যা কিছু ভালো মন্দের বিচার, যা কিছু শুভাশুভের পার্থক্য তা নির্ভর করে একমাত্র শিক্ষা ও জ্ঞানের উপর। পাশ্চাত্য মনীষী Herbert Spencer এই প্রশ্নটিই তুলে ধ'রে তার সমাধানের নির্দেশ দিয়ে ব'লেছেন :

'How to live? that is the essential question for us. Not how to live in the mere material sense only, but in the widest sense. The general problem which comprehends every special problem is—the right ruling of conduct in all directions under all circumstances. In what way to treat the body in what way to treat the mind; in what way to manage our affairs; in what way to bring up a family; in what way to behave as a citizen; in what way to utilise those sources of happiness which nature supplies—how to use all our faculties to the greatest advantage of ourselves and others—how to live completely? And this being the great thing needful for us to learn, by consequence, the great thing which education has to teach. To prepare us for complete living is the function which education has to discharge; and the only national mode of judging of an educational course, is, to judge in what degree it discharges such function.

আমাদের যে বাঁচা, তা পরিপূর্ণ বাঁচা নয়। নানা তালে আমরা খণ্ডিত। কোনো কিছুর মধ্যেই আমরা সম্পূর্ণ নই। ঘরে যখন গৃহী হ'য়ে থাকি, তখনও যেমন নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সংসারের মধ্যে দিতে পারি নে, তেমনি সমাজে যখন আমরা লৌকিক কাজে রত, তখনও সমাজের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পারি নে। আমাদের যেটা 'আমি', তার কিছু এখানে, কিছু ওখানে; কোথাও সে সমগ্রভাবে নয়। তাই যখন আমরা

• দি খুঁজি, তাও পূর্ণ ক'রে পাই না; তারও কিছু এখানে, কিছু ওখানে। মানুষ হ'য়ে বাঁচবার এটা লক্ষণ নয়। একটি জীবকে ধ'রে যদি আমরা বিচার করি, তবে দেখবো—তার যেমন অস্থি, মজ্জা, রক্ত, মাংস, অন্ত, প্রত্যঙ্গ, মন ও আত্ম মিলিয়ে সে সম্পূর্ণ, তেমনি প্রকৃত মানুষ ব'লে তাকেই গ্রহণ ক'রবো, যে তার সমস্ত কিছু মিলিয়ে একটি নিশ্চিষ্ট সত্তা ও পূর্ণতায় সম্পূর্ণ। তার বুদ্ধিবৃত্তি ও মননধর্ম মিলিয়ে নিজের মধ্যে সে সমস্ত কিছুকে সম্পূর্ণ ক'রে গ্রহণ ক'রছে এবং সমস্ত কিছুর মধ্যে নিজেকে সে সম্পূর্ণরূপে দিতে পারছে। যেখানে এই পাবার প্রশ্ন নেই, সেখানেই খণ্ড খণ্ড হ'য়ে মানুষের জীবনসত্তা ছোট ছোট জীব বিশেষে মাত্র পরিসমাপ্ত হচ্ছে। এই পরিসমাপ্ত রূপটিই ক্ষুদ্র পৃথিবীর বৃহত্তর রূপ। সেখানে বহুতর জন্তুতে মানুষে ও পশুতে খুব বেশী পার্থক্য নেই। পশুত্বের সেই পঙ্ক থেকে মানুষকে যদি তার আপন মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হ'য়ে সম্পূর্ণ হ'তে হয়, তবে প্রয়োজন মানবীয় সাধ্য সম্পর্কে জ্ঞান। সেই জ্ঞানের কথাই Herbert Spencer তাঁর রচনায় তুলে ধ'রেছেন।

এইভাবে জীবনের বিভিন্ন নীলাচরণের মধ্য দিয়ে মানুষ যখন প্রজ্ঞাশীল হ'লো, তার প্রয়োজন তার সমাজ-বিকাশে পাঠ গ্রহণ। ব্যক্তিগত শুভই শুভ নয়, যতক্ষণ সমষ্টিগত শুভকর্মের দ্বারা সমাজ-মানসের শুদ্ধি সাধিত হচ্ছে, ততক্ষণ সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে কোনো ব্যক্তি-মানসিকতাই বৃহত্তর জীবনক্ষেত্রে সার্থক হ'তে পারছে

'To enjoy a good life' বা ভালোভাবে জীবন যাপন ক'রবার এই অর্থ নয় যে, সমাজের সমষ্টিগত মানুষের যা-হোক, তা-হোক আমার ভালো নিয়ে আমি থাকতে পারলেই হ'লো। মানুষ আসলে তার নিজেকে নিয়ে সম্পূর্ণ নয়, বৃহত্তর সমাজ ও বৃহত্তর দেশের সে মাত্র একজন। এইভাবে বহু একের ঐক্য নিয়ে সমাজ ও দেশ। সেখানে একের সুখ সুখ নয়, সবাইকে মিলিয়ে যে সুখ, সেই হ'চ্ছে একের সুখ। আমার ভালোভাবে বাঁচবার মূলে আমার নিজের প্রয়াস যতখানি, তার অধিক প্রভাব সমাজের; সমাজ অর্থে সমষ্টিগত মানুষ। আমি যতক্ষণ না সেই সমষ্টির হচ্ছি, যতক্ষণ না সমষ্টির সুখ-দুঃখ আমার সুখ-দুঃখ হ'চ্ছে, ততক্ষণ 'আমি'র যে মূল্য, তা অর্থহীন। Herbert Spencer তাই বল্‌লেন: 'the goodness of a society ultimately depends on the nature of its citizens; and since the nature of its citizens is more modifiable by early training than by anything else; we must conclude that the welfare of the family underlies the welfare of society.'—'family' অর্থে ব্যক্তি এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবার। এই ব্যক্তি এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবার নাগরিক হিসেবে যতবেশী উদার, উন্নত ও পরিশীলনশীল হবে, সমাজ-মানসও ততবেশী উদার ও উন্নত হবে।

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রাস্তাঘাটের গুরুত্ব—

দেহের শিরা-উপশিরার মত, রাস্তা-ঘাট দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে ব্যবসায়-বাণিজ্যের, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ও অন্যান্য সুযোগ করে দিয়ে দেশের প্রাণশক্তিকে সতেজ করে রাখে। অথচ, এরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের দেশে এখনও একপ্রকার অবহেলিত হয়ে আছে। বৈঠক অনেক বসেছে, আলোচনার পর আলোচনা হয়েছে পরিকল্পনাও প্রস্তুত হয়েছে, কিন্তু কার্যতঃ ফল হয়েছে নগণ্য। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনাতেও রাস্তা-ঘাটের গুরুত্ব স্বীকার করা হয়েছে পরিকল্পনার কার্যকালও প্রায় শেষ হতে চলেছে, কিন্তু রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন কতটা হয়েছে? বিশাল দেশের পক্ষে অকিঞ্চিৎকর।

দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া রচনা চলছে এবং এই সময়ে যাতে এই বিষয়টি যথাযথ গুরুত্ব পায় তা দেখা দরকার। দেশকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যেতে হলে রাস্তাঘাট দিয়ে সমস্ত দেশকে ছেয়ে ফেলতে হবে। তার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য যে, রাস্তাঘাটের মত দেশের আরও অনেক কিছু একই সঙ্গে উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং দেশের অর্থের ভাণ্ডার অফুরন্ত নয়। কিন্তু তাই বলে, দেশের ভবিষ্যৎ রাস্তাঘাটের প্রকৃতরূপ নির্ণয় করা এবং তাকে কার্যে পরিণত করবার জন্য সুচিন্তিত কর্মপন্থা অবলম্বন করা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় অবশ্য কর্তব্য।

আধুনিক রাস্তা-ঘাট নির্মাণ অত্যন্ত খরচ-বহুল এবং ইহা এমন একটি সম্পদ যা থেকে প্রত্যক্ষভাবে কোন আয় নেই, অথচ ইহা নির্মাণ ও মেরামতের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। আধুনিক শিল্পীয় দেশগুলিতে কেবলমাত্র রেলপথের মাল গমনাগমনের জন্য নয়, দেশের যে অঞ্চলে রেলপথের প্রসার অলাভজনক সেখানে সংযোগস্থাপন এবং আপৎকালে রেলপথের বিকল্প ব্যবস্থার জন্য রাস্তাঘাটের প্রসার প্রয়োজন কিন্তু অর্থ যখন প্রথম এবং প্রধান চিন্তার বিষয় তখন একমাত্র সমাধান হচ্ছে অগ্রাধিকার অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া। রাষ্ট্রীয় সড়কের মধ্যে যেগুলো দেশরক্ষার স্বার্থে ও যেখানে রেলপথ নেই বা হবার সম্ভাবনা নেই সেইগুলো প্রথম বিবেচিত হওয়া উচিত। পল্লী অঞ্চলের রাস্তা-ঘাট উন্নয়নেও তেমনি অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, বিশেষ করে এগুলো নির্মানে খরচ যখন অল্প এবং গ্রামীণ সমৃদ্ধি আনবার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়।

কিন্তু, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ করলেই প্রকৃত সমস্যার সমাধান করা হবে, মনে করলে ভুল করা হবে রাস্তাঘাটের সঙ্গে সঙ্গে যান-বাহনের উন্নয়ন সাধন করাও একান্ত দরকার। সরকারের সেদিকে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া বাঞ্ছনীয়।

রেলপথের পুনর্বিন্যাস—

তদানীন্তন রেল-মন্ত্রী মিঃ গোপালস্বামী আয়েঙ্গার

নতুন রেলপথের পুনর্বিন্যাস করবার সিদ্ধান্ত নেন, রেলের বিভিন্ন সংস্থা থেকে তার অবশ্যম্ভাবী কুফল চিন্তা করে প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল। কিন্তু বিচক্ষণ মন্ত্রী কোন প্রতিবাদে বিচলিত না হয়ে যে ব্যবস্থা করলেন তার ফল (প্রত্যক্ষ না হলেও) স্বীকার করলেন বর্তমান রেলমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী, যাঁর সকল তিনি পূর্বাঞ্চলের রেলপথকে আবার দুই ভাগে ভাগ করে প্রায় পূর্বের অবস্থায় আনবার ঘোষণা করেছেন। নিয়ামদহ বিভাগ নিয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের মোগলসরাই পর্যন্ত অঞ্চলের নাম হবে ইষ্টার্ণ রেলপথ

পূর্বতন বি, এন্, রেলপথের নামকরণ হবে সাউথ ইষ্টার্ণ রেলপথ। আগামী ১লা আগষ্ট থেকে এই নূতন ব্যবস্থা কার্যকরী হবে। শ্রীশাস্ত্রী স্বীকার করেছেন যে বর্তমান ইষ্টার্ণ রেলপথে চাপ অত্যন্ত বেশী

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উন্নয়নমূলক কার্যের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার শাসন-ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়তে

পরিবর্তন সমৃদ্ধিরই আভাস, কিন্তু যে পরিবর্তন যদি সুফলপ্রসূ না হয় তবে তা অবনতিরই লক্ষণ! রেল-বিভাগে শেষোক্তটিই দেখা যাচ্ছে। বার বার পরিবর্তনের জন্য কেবলমাত্র অগণিত অর্থ-ব্যয়ই নয়, কর্মচারীদের নিদারুণ দুর্ভোগ ভুগতে হয়। অধস্তন কর্মচারীদের বেতন সামান্য। তাঁদের নূতন যায়গায় বদলি করার অর্থ ঐ সামান্য বেতন থেকে ইচ্ছাপূর্বক আরও কিছু অংশ কেড়ে নেওয়া। যাহোক ভুলের এই শিক্ষাই যেন রেল-দপ্তরের পক্ষে যথেষ্ট হয় এবং ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের পূর্বে দেশের দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিদের মতামত একেবারে উপেক্ষা করা না হয়।

কয়লার চাহিদা—

কয়লা এমন একটি পদার্থ যা ঘরের রান্না থেকে সুরু করে বড় বড় শিল্প চালাবার পক্ষে অপরিহার্য। স্বভাবতঃই তার চাহিদা সর্বদাই আছে। দেশ যখন শিল্পায়নের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন সেই চাহিদাও বেড়ে চলে সমান তালে। ১৯৫৪ সালে ভারতে কয়লার চাহিদা ৩৯৫ লক্ষ টন ছিল বলে অনুমান। ১৯৫৭ সালে এই চাহিদা বেড়ে গিয়ে ৪৫০ লক্ষ টনে দাঁড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জল্পনা-কল্পনা থেকে যতটা জানা যাচ্ছে তাতে ১৯৬০ সালে কয়লার চাহিদা ৬০০ লক্ষ টন কিংবা তদূর্ধ্ব দাঁড়াবে।

দেশে যে কয়লা-খনি আছে, তাতে এই চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধি করা বিশেষ অসুবিধাজনক হবে বলে মনে হয় না। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে উৎপাদকেরা অধিকতর আয়ের আশায় উৎফুল্ল হবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসাধারণও দেশের সমৃদ্ধির আভাসে আনন্দ বোধ করবেন বলে মনে করা স্বাভাবিক। কিন্তু একটু বাস্তব দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে দেখলে, খুব বেশী আশাবাদী হওয়া চলে না। বর্তমানে দেশের কয়লার উৎপাদন চাহিদা অপেক্ষা কম নয়, কিন্তু বছরের পর বছর ধরে জনসাধারণ তাঁদের প্রয়োজনানুসারে কয়লার সরবরাহ পাচ্ছেন না। তার প্রধান কারণ অ-পর্যাপ্ত পরিবহন ব্যবস্থা। ইদানীং পরিবহনের কিছু উন্নতি হচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তা এত আস্তে হচ্ছে যে বর্তমান চাহিদার তো নয়ই, বর্তমান উৎপাদনের পক্ষেও তা যথেষ্ট নয়। ১৯৬০ সালে কয়লার উৎপাদন ৬০০ লক্ষ টন হলে পরিবহন ব্যবস্থা বর্তমানের দ্বিগুন হওয়া আবশ্যক। কিন্তু রেল দপ্তরের পরিকল্পনায় এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় না যে তারা ঐ সময়ের মধ্যে রেলপথের এরূপ কোন সম্প্রসারণ করতে পারবেন। ভবিষ্যতের স্বাভাবিক চাহিদার সঙ্গে সরবরাহ ঠিক রাখতে হলে পরিবহনের দ্রুত সম্প্রসারণ দরকার। আর তা সম্ভব না হলে কয়লা ব্যবহারে মিতব্যয় আনা আবশ্যক।

১৯৫৪ সালে ষ্টক বাজারের অবস্থা—

ষ্টক বাজার দেশের সঞ্চিত অর্থের রূপ নির্ণয় করে। সুতরাং তার ভালোর মন্দে জনসাধারণের সন্তোষ কিংবা অসন্তোষের কারণ আছে। ১৯৫৪ সালে ষ্টক বাজারের অবস্থা মোটামুটি সন্তোষজনক ছিল। এজন্য কতকগুলি

কারণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোরিয়া যুদ্ধের মন্দার স্তর থেকে সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং পর পর দুটি মৌসুমী পাওয়ার এবং সরকারী সক্রিয় প্রচেষ্টার ফলে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি এবং চালের বাজার স্ফীত হওয়ার রপ্তানী বাণিজ্যে আয় বৃদ্ধি অন্যতম কারণ। গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে অনেকগুলি শেয়ারের দাম বেড়ে যায়। কিন্তু সরকারী নীতি ও কর-তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের বিলম্বের দরুণ ষ্টক বাজারের অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বিগত বৎসর অর্থ-বিনিয়োগকারীদের পক্ষে সন্তোষের কারণ ছিল, কারণ বাজার ধরে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ভাল লক্ষণ বিদ্যমান ছিল। দেশের সমৃদ্ধিতে ষ্টক বাজার একটি বৃহৎ অংশ গ্রহণ করে আসছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। বেসরকারী গঠীকারকদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে সরকারের উপর তাঁদের আস্থা এবং রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সাধনে তাঁদের অংশ গ্রহণের উপর। ষ্টক বাজারের বিরুদ্ধে অনেক সমালোচনা হয়ে থাকে, হয়ত তার স্বপক্ষে খুব শক্ত যুক্তিও আছে, কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ষ্টক বাজার দেশে অর্থ-সঞ্চয়ের অনুপ্রেরণা যোগায় এবং দেশের শিল্পে সেই সঞ্চিত অর্থের বিনিয়োগ করে জাতীয় সমৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

ব্যাংক ব্যবসায়ে উন্নতি—

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার বাৎসরিক রিপোর্টে জানা গিয়াছে যে ১৯৫৯ সালে ভারতে পূর্ববর্তী বছর অপেক্ষা ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ে অধিকতর কার্যকলাপ হয়েছে এবং ব্যাঙ্কের অর্থের সরবরাহও বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাঙ্কিং কাজ বৃদ্ধি পাবার কারণ অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ বৃদ্ধি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে, যদিও অপ্রত্যাশিতভাবে নয়, অর্থের যোগান বৃদ্ধি। এ বছর দেশের জনসাধারণের মধ্যে অর্থের যোগান ১২৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায় (১৯৫৩ সালে ইহা ৩৩ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছিল)। এই বৃদ্ধির প্রধান কারণ বাজেট ঘাটতি ও ব্যাঙ্ক ক্রেডিটের পরিমাণ বৃদ্ধি। ১৯৫৯ সালে অর্থ বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য। বাজারে অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও বিনিময়পত্রের মূল্য চড়া ঘুরে থাকুক আরও কমে গিয়েছে। বছরের প্রথম দিকে দাম একটু বাড়লেও এপ্রিল মাস থেকে দাম কমতে থাকে এবং সারা বছরে পাইকিরী মূল্য শতকরা ৬½ ভাগ কম ছিল।

ব্যাংক ক্রেডিট এ বছর ৬৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়; কিন্তু ১৯৫২ সালে তা ৬৬ কোটি টাকা হ্রাস পেয়েছিল, আর ১৯৫৩ সালে কোটি টাকা। ১৯৫৩-৫৪ সালের কর্মমুখর মরসুমে ব্যাংক ক্রেডিটের পরিমাণ ছিল ১১২ কোটি টাকা, কিন্তু ১৯৫২-৫৩ সালে এর পরিমাণ ছিল মাত্র ৮৬ কোটি টাকা। ক্রেডিটের চাহিদা এবছর বেশী থাকলেও কাটকা বাজারের প্রভাব তেমন ছিল না। ব্যাংক ক্রেডিটের প্রসার হওয়ায় ব্যবসায় বাণিজ্যের গতিবিধি ও উৎপাদন বেড়ে যায় এবং দ্রব্যমূল্য হ্রাস পায়।

তপশীল ব্যাংকের আমানত এবছর ৯১ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৩ সালে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল মাত্র ৮ কোটি টাকা।

লগ্নীর সম্পর্কেও ব্যাংকগুলি তাদের অর্থের অধিকতর ব্যবহার করেছে। ন্যাশনাল প্লান লোন প্রভৃতিতে অর্থ বিনিয়োগ করায় এ বছর তপশীল ব্যাংকের অর্থ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। কেবলমাত্র সরকারী ঋণ পত্রতেই ১২ কোটি টাকা বেশী বিনিয়োগ করা হয়েছে।

ভারতের বৃহত্তর ১৮টি তপশীলভুক্ত ব্যাংকের লাভ ক্ষতির হিসাবে দেখা যায় যে এবছর সর্বমোট আয় ২ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ৩১ কোটি লক্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বৃদ্ধির ¾ অংশ সুদ ও বাট্টা থেকে এসেছে। খরচ বাদ দিয়ে নীট লাভ ৪০ লক্ষ থেকে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ পর্যন্ত হয়েছে।

লৌহ ও ইস্পাত মন্ত্রণা-দপ্তর—

ভারত সরকারের উৎপাদন দপ্তর থেকে বিচ্ছিন্ন করে লৌহ ইস্পাতের জন্য একটি নূতন দপ্তর খোলা

হয়েছে। এই দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছেন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী মিঃ টি. টি. কৃষ্ণমাচারী এবং সেক্রেটারী মিঃ এস. ভূতলিঙ্গম্। পরবর্তীকালে এই দপ্তরের লৌহ ব্যতীত তামা, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ, এলুমিনিয়ম্ প্রভৃতি নিত্য ধনিজ পদার্থের দপ্তরে রূপান্তরিত হবার সম্ভাবনা আছে। আপাততঃ এই নূতন দপ্তর লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে সরকারী পরিকল্পনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এবং কার্যতঃ শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধীনেই থাকবে। বে-সরকারী মহলের লৌহ প্রতিষ্ঠান গুলিকে এই দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত করে ক্রমে এই দপ্তরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন দপ্তরে পরিণত করা যেতে পারে। সরকারী মহলের কেন্দ্রগুলোকে একটি লৌহ ও ইস্পাত বোর্ডের উপর চাপিয়ে দেওয়া

কিনা সে বিষয়ে গবেষণা চলছে এবং এই বোর্ডের সভাপতি ঐ দপ্তরের মন্ত্রীকে করবার জন্ম প্রস্তাবও এসেছে।

জাতীয় পরিকল্পনা ঋণ—২য় দফা—

জাতীয় পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত করবার জন্ম সরকার অর্থ সংগ্রহের যে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন জাতীয় পরিকল্পনা ঋণ তন্মধ্যে একটি। বছর এপ্রিল মাসে সরকার ১৯৬৪ সালের এপ্রিল পরিশোধ্য জাতীয় পরিকল্পনা ঋণ পত্র (প্রথম দফা) বাজারে ৯৮।০ টাকায় ছাড়েন। এবছরও সরকার আবার দ্বিতীয় দফায় সাড়ে তিন টাকা হারের ১০০ কোটি টাকার ঋণপত্র আগামী ১লা জুলাই থেকে ৫ই জুলাই পর্যন্ত বাজারে ছাড়বেন বলে ঘোষণা করেছেন। ১০০ টাকার ঋণপত্র ৯৮।০ টাকায় বিক্রী করা হবে এবং ১৯৬৫ সালের ১লা জুলাই এই ঋণের টাকা পরিশোধ করা হবে।

অভিজ্ঞতা যদি ভবিষ্যতের গতির পূর্বাভাষ দিতে সক্ষম হয়, তা হলে বলা যায় যে এই ঋণপত্র অতি সহজেই বিক্রী হয়ে যাবে। সরকারী শিল্প নীতির অস্পষ্টতার দরুণ জন-সাধারণ ব্যবসায়ে ঝুঁকি নিতে সহজে চায় না। সুতরাং বিনা ঝুঁকিতে প্রতি এক শত টাকা হতে বছরে সাড়ে তিনটাকারও কিছু বেশী আয় নিশ্চয়ই নির্বিচারে গ্রহণ যোগ্য, বিশেষ করে বিনিয়োগ যখন কেবলমাত্র দশ বছরের জন্ম।

দেশ ও বিদেশ

মার্কিন মুলুক চকল—

মার্কিন মুলুকের 'নিউইয়র্ক টাইমস্' সংবাদপত্রের সম্পাদক নানা কারণে বেসামাল হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথমত ইনি বোধহয় সব সময় মনে করেন ভারত প্রভাবপুষ্ট একটি ছোট বেলুন। শুধুমাত্র বিশেষ এলাকার আকাশে ঘুরিয়া বেড়াক আমরা দেখিয়া খুশী থাকি।

দ্বিতীয় কারণ, কোন রাজনৈতিক মতবাদকে অসীম ঘৃণার চক্ষে দেখিতে গিয়া সম্পাদক নিজ মানসিক সজাগ চেতনা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। ফলে সে যখনই সেই তথাকথিত ঘৃণিত রাজনৈতিক মতবাদের সহিত কাহারো সংস্রব দেখেন তখনই আঁৎকাইয়া ওঠেন। কাজেই অন্যের যে একটি দৃষ্টিভঙ্গী আছে তাহা বুঝিতে চান না। বস্তুত এইসব মানসিক বিভ্রান্তির ঘোরে পড়িয়াই 'নিউইয়র্ক টাইমসে'র সম্পাদক মহাশয় অসংলগ্ন মন্তব্য করিতে শুরু করিয়াছেন। মস্কো হইতে রুশ-ভারত যুক্ত বিবৃতি পাঠ করিয়াই মহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। এবং তাহার ক্রুদ্ধ স্বভাব ও মেজাজ ভাষার মধ্যে ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি বলিতেছেন, বুলগানিনের সহিত যুক্ত ঘোষণায় স্বাক্ষর করিয়া শ্রীনেহেরু শুভেচ্ছার পরিচয় দিলেও নাকি সাধারণ বুদ্ধির অভাবের পরিচয় দিয়াছেন। তাইত আমরাও ভাবিতেছি অভাব কোথায় ঘটিল এবং কাহার বুদ্ধির ঘটে অভাব ঘটিল, নেহেরুজীর না উক্ত সম্পাদক মহাশয়ের?

বিশ্বশান্তি কংগ্রেস—

সম্প্রতি হেলসিংকি-তে বিশ্বশান্তি সম্মেলন বসিয়াছে। ভারত তাহার প্রতিনিধি সেখানে পাঠাইয়াছে। ভারতীয় প্রতিনিধি দল প্রতিটি রাষ্ট্রকে চৌ-নেহেরু পঞ্চশীল নীতি অনুমোদনের জন্য আহ্বান জানাইয়াছেন। আজ সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে শান্তি আন্দোলন শুরু হইয়াছে তাহার মূল কারণ, বিশ্বের জনগণ ক্রম-সচেতন মন লইয়া রাষ্ট্র ব্যাপারে উৎসাহ ও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেছে। এই সজাগ দৃষ্টিভঙ্গী মূলত এশিয়াবাসীর রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে আসিয়াছে। কেননা, ইয়োরোপীয় রাজনীতির আসল 'বখরা'টা এশিয়া ভূখণ্ডে রহিয়াছে। তাই এশিয়াবাসী যখন সজাগ হইয়া উঠিয়াছে তখন ইয়োরোপ ও আমেরিকা সচকিত হইয়া উঠিয়াছে। ইতিপূর্বে অজ্ঞ জনসাধারণের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া যেমন ভাগ-বাঁটোয়ারা করিবার সুযোগ ছিল আজ তাহা ক্রমশই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। ইন্দোচীন ও কোরিয়ার এই কূটনৈতিক ভাগাভাগিটা ব্যর্থ হইয়াছে। তাই ভারত ও চীন যেদিন পঞ্চশীল নীতি গ্রহণ করিল সেইদিন হইতেই বিশ্বরাজনীতির মোড় ঘুরিল। সহ-অবস্থিতির কথা সবাই জোর গলায় প্রচার করিল। কেননা, হিসাব কষিয়া দেখা গিয়াছে যে ইয়োরোপীয় জাতীয় চেতনা যে স্তরে আছে তাহাতে সশস্ত্র প্রভুত্ব দেখানে বেশীদিন টেকেনা। গৃহ যুদ্ধ বাধিয়া শেষে জন ক্ষয়, অর্থ ক্ষয় দুশ্চিন্তা ও শান্তি নষ্ট। কাজেই যতদিন এশিয়ার ঘাড়ের উপর দিয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে চলুক। এই নীতিটা সোজাসুজি আইজেনহাওয়ার নির্বাচনকালে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ফল যে খুব ভাল হইয়াছে এমন নহে। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইয়োরোপকে একটি নির্মম সত্য স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে। সে সত্য হইল যে, বর্তমানকালে যুদ্ধে কেহ জয়ী হয় না। আর যদি-বা জয়ী হয় সে জয়

রক্ষা করিতে বহু অর্থ ঢালিতে হয়। এবং সে অর্থও পরে পাওয়া যায় না। ইয়োরোপে মিত্রশক্তি যুদ্ধে জিতিয়াছে কিন্তু পরাজিত শত্রুকে হাটুতে ভর করিয়া দাঁড়াইবার নিমিত্ত মার্শাল প্ল্যান করিয়া টাকা দিতে হইয়াছে। ইতিপূর্বের ডয়েস্ প্ল্যান, ইয়ং প্ল্যান মাঠে মারা গিয়াছে। যুদ্ধের যে টাকাটা ক্ষুণ্ণাকা হিসাবে পাওয়া গিয়াছে তাহাকেই পণ্যদ্রব্যে রূপান্তরিত করিয়া সাহায্য, লদন ইত্যাদির মারফৎ পাঠাইতে হইতেছে। এই খেলাইত যুদ্ধ ও তথাকথিত না-যুদ্ধ কালে চলিতেছে। এশিয়ার রাজনীতিকগণ ইহার আসল সূত্র আবিষ্কার করিয়াও এতদিন কিছু বলিতে পারেন নাই। প্রাচ্যে ভারত ও চীনের রাজনৈতিক পরিবর্তন এশিয়ার রাজনীতির পরিবর্তন তথা বিশ্বের রাজনীতির পরিবর্তন। কাজেই আজ পঞ্চশীল নীতি ও শান্তির নীতি নানা কারণে বিশ্বের স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে এবং পাশ্চাত্য রাজনীতিকরা একদিন অনুভব করিবেন যে শান্তির আন্দোলন এশিয়ার দান। এবং সেই দান ইয়োরোপ গ্রহণ করিয়া ইয়োরোপ চিত্ত প্রাজ্ঞ হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক কমিউনিজম

রাষ্ট্র সঙ্ঘের দশম বার্ষিক সম্মেলনে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে মার্কিণ পররাষ্ট্র সচিব জন ফষ্টার ডালেস ইয়োরোপের শৈত্য-লনর কৌশলের অবসান কামনা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি আন্তর্জাতিক কমিউনিজম যাহাতে প্রসার না লাভ করে তদ্বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন। বর্তমানে প্রায় সব রাষ্ট্রে আন্তর্জাতিক কমিউনিজম সমস্যাটি অল্প-বিস্তর দেখা দিয়াছে। দেশের অভ্যন্তরে একটি শ্রেণীর রাজনৈতিক দল রুশব্যবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া ইহার কৃষ্টি ও সভ্যতা জগদ্ব্যাপী প্রচার করিতেছেন। যে মার্কসীয় দর্শনের উপর ভিত্তি করিয়া এই কমিউনিজম জন্ম বাঁধিয়াছে বলিয়া দাবী করা হয়, তাহার মৌলিক সংস্কারের চেষ্টা না হইলেও ব্যাখ্যার অদল-বদল সর্বত্র হইতেছে। ইহাতে আশ্চর্য বা হতভম্ব হইবার কিছু নাই। কেননা, যে দর্শন একটি ক্রিয়াশীল সমাজকে গঠন করিতে যাইতেছে তাহাকে বহু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পথে যাইতে হইবে। রুশ রাজনীতিক দল যে প্রথায় ও যে নীতিতে মার্কসবাদের বাস্তব ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছিল তাহা চীন সর্বাংশে মানিয়া লয় নাই। তাহাকে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করিতে হইয়াছে। আদর্শবাদের গন্ধ মাপিয়া বাস্তব সত্যে পৌঁছাইতে চায় নাই। অতএব আন্তর্জাতিক কমিউনিজম এইখানে চিরপরিচিত প্রথা হইতে একটু গতিশীল হইল। এবং পূর্বের তুলনায় গভীর অভিজ্ঞতার ভর করিয়া একটু সাবালকের মত কাজ করিতে শুরু করিল।

ইহার পরের দফা ইন্দোচীন এবং কোরিয়া। এই দুটি ছোট রাষ্ট্রের পর-প্রভুত্ব লোপ করিতে যে কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় যুদ্ধের সামরিক ভগ্নাংশ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। কেননা গত দ্বিতীয় যুদ্ধই এই জাতি দুইটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এ ক্ষেত্রে এই দুইটি শক্তিশালী রাষ্ট্র দুই আদর্শবাদকে চালু করিতে গিয়া আন্তর্জাতিক কমিউনিজম আমদানী করিয়াছেন। কোরিয়া সাইবেরিয়ার প্রান্তে অবস্থিত, যদি ভূগোলকে স্বীকার করিতে হয় তবে রাশিয়ার সঙ্গে তার সখ্য রাখিতেই হইবে। সেইদিক হইতে রুশরা প্রভাব ছড়াইবার সুযোগ মার্কিণদের তুলনায় বেশী পাইবে। আর ইন্দোচীন চীনের নৈকট্য হেতু চীন বেশী প্রভাব বিস্তার করিবার সুযোগ পাইবে। এই দুইটি রাষ্ট্র সম্পর্কে যাহা ঘটিয়াছে পৃথিবীর আর কোন রাষ্ট্রে এমন সুযোগ ঘটে নাই। জাপান কোরিয়া সম্পর্কে যে সুযোগ পাইয়াছিল তাহা সে হারাইয়াছে—তাহার সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচ্যের কমিউনিজম প্রসার বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। কিন্তু আমাদের মনে হয় আন্তর্জাতিক কমিউনিজমকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। কেননা বিশ্বের প্রায় সব দেশেই অর্থ নৈতিক সমস্যা আজ যেরূপ আকার ধারণ করিতেছে—তাহার সমাধান প্রায় সবই একই পথে খুঁজিবার চেষ্টা করিতেছে। সাধারণ মানুষের

রাজনৈতিক চেতনা আজ পুঁজিবাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে। পুঁজিবাদী বুঝিয়াছে যে, শ্রমিককে অসন্তুষ্ট রাখিয়া সুষ্ঠু উৎপাদন সম্ভব নহে। পুঁজিবাদ ইহাও বুঝিয়াছে যে, তাদের অঢেল মুনাফার দিন পার হইয়া আজ এক নব্য সমাজ ব্যবস্থা আপনা হইতেই দানা বাঁধিতেছে। এই দানা বাঁধিবার কাজটি কমিউনিজম সহায়তা করিতেছে মাত্র। ডালেস সাহেব যদি ভাবিয়া দেখিতেন যে, ইহা একটি সমাজ-ব্যবস্থা হইতে উদ্ভূত তবে কমিউনিজম হইতে ভয়ের কারণ থাকিত না। কিন্তু বিষয়টির মীমাংসা এই পথে নহে। তিনি যদি ভারতের রাজনৈতিক দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেন তাহা হইলেই কমিউনিজমের আপেক্ষিক গুরুত্ব তাহার কাছে হ্রাস পাইত। ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সহনশীলতা, পঞ্চশীলনীতি আন্তর্জাতিক কমিউনিজম প্রসারের মূলে কুঠার আঘাত হানিয়াছে। ভারতের কমিউনিজম চোঁড়া সাপের মত পড়িয়া রহিয়াছে।

পাকিস্তানের নব-গণপরিষদ

পাকীস্তানে এক গণপরিষদ ভাঙিয়া আর এক গণ-পরিষদ গঠিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে পাকীস্তানের কয়েকটি আমূল পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্ব্ব বঙ্গের সাধারণ নির্বাচন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভায় নূতন সদস্য গ্রহণ, লীগের প্রভাবের ক্রমবিলীয়মান অবস্থা! এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নূতন গণপরিষদ বিচার করিতে হইবে। পাক গভর্ণর জেনারেল মিঃ গোলাম মহম্মদ এই সমস্ত ঘটনার আলোড়নে আবর্ত্তিত হইয়াও পাকীস্তানের অস্তিত্ব রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পাকীস্তানের পূর্ব্ব ও পশ্চিম অংশে যে পরিমাণ মত বিরোধ দেখা দিয়াছে তাহাতে মনে হয় পূর্ব বাঙলার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানে একটি বিশেষ শক্তিশালী দল ক্ষমতাবান হইয়া উঠিতেছে। ফলে পূর্ব বাঙলায় সাধারণ মানুষের কৃষ্টি ও সভ্যতা বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কারণ যদি গঠনতন্ত্রে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হয় তবে আজ না হউক কাল পশ্চিম পাকিস্তানের ধনী ব্যবসায়ী এবং তাহাদের অন্যান্য সাঙ্গো-পাঙ্গরা বা পূর্ব পাকিস্তানকে একটি নবতর উপনিবেশে পরিণত করিতে সমর্থ হইবে। গঠনতন্ত্রে যদি সংখ্যা গরিষ্ঠরা তাহাদের ন্যায্য অধিকার না পায় তবে তাহা পরে স্বল্প সংখ্যক সংখ্যালঘিষ্ঠের শাসনে পরিণত হইতে পারে। এই বিপদ ঠেকাইতে হইলে পাক-শাসনতন্ত্রে বিশেষ রক্ষা কবচ থাকা প্রয়োজন।

এ গেল শাসনতন্ত্রের মৌলিক ধারা ও উপধারার কথা। পূর্ব বঙ্গে নির্বাচনের পর হইতে মিঃ সুরাবর্দ্দী নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক খেলা খেলিয়াছেন। এবারে আসল কথা খুলিয়া বলিয়াছেন। পাক-প্রধান মন্ত্রিত্ব পাইলে তিনি যেসব দুরূহ জটিল আইন গত সমস্যা গঠনতন্ত্র আলোচনা কালে দেখা দিবে—তাহা সমাধানে তাঁর তিনি সমর্থন সমর্পণ করিবেন। খবরটা এইরূপ-ভাবে পরিবেশিত হইয়াছে যে, তিনি সমর্থন জয় করিতে না পারিলে গঠনতন্ত্রের গলদ থাকিয়া যাইবে এবং অনেক কিছু বেফাঁস হইয়া যাইবে। এক কথায় গঠনতন্ত্র রচনায় তিনি অপরিহার্য। মিঃ সুরাবর্দ্দীর প্রতিভার পরিচয় বাঙলাদেশ পাইয়াছে। কৃকলাশের মত রঙ বদলাইবার ক্ষমতা তাহার আছে। এবং প্রয়োজনবোধে কূটনীতিজ্ঞ বর্ষণ করিবার কৌশল তিনি জানেন। এইরূপ একটি বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি যে নিজ আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে গিয়া পূর্ব বঙ্গে যুক্তফ্রন্টের ভাঙন ধরাইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমাদের মনে হয় পূর্ব বঙ্গের যুক্তফ্রন্টের-এ ভাঙন ধরিয়া ভাল হইয়াছে, এবং কংগ্রেসদল যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন করিয়া বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন। পূর্ব্ব বঙ্গে সুরাবর্দ্দী নেতৃত্ব ও হক নেতৃত্ব যুগপৎ চলিতে পারে না। কেননা এই দুয়ের মাঝে মৌলিক বিরোধ রহিয়াছে। এই বিরোধ নব নির্ব্বাচিত গণ-পরিষদেও প্রবেশ করিয়াছে। কাজেই পূর্ব্ব বঙ্গের গণ-পরিষদসদস্যগণ খুব সতর্কতার সহিত কাজ করিবেন বলিয়া আশা করি। পশ্চিম পাকীস্তানে সুরাবর্দ্দী সাহেব যে খুব শক্ত পদি আঁটিয়া বসিতে পারিবেন এমন সম্ভাবনা কম।

চালাইয়া যতদিন চলে চলিবে। কিন্তু কোন মহৎ কিছু গঠনের হাত তাহার নাই। যে কাজে তিনি হাত পাকাইয়াছেন, সেই কাজেই আবার তার চেয়ে কোন পাকের হাতের কাছে তাঁহাকে হার মানিতে হইবে।

যুক্তফ্রন্ট জীন্দাবাদ !!

বিদ্রোহী আলজিরিয়া

আফ্রিকার মহাদেশের অনেক অঞ্চলের খবরই আমরা পাই না। যাহা পাই তাহা স্বল্প বলিতে হইবে। সম্প্রতি প্যারিস হইতে রয়টার আলজিরিয়ার সম্পর্কে একটি খবর দিয়াছেন। এবং সে খবরটি আলজিরিয়া সম্পর্কে ফরাসী পার্লামেন্টারী কমিটির বিবৃতি হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, বিদ্রোহীদের (২) মোট সংখ্যা হইবে ২৫০০ শত আলজিরিয়ার মত দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল ও আরব জনসাধারণের মনোভাব উভয়টিই বিদ্রোহীদের কার্যে সহায়তা করিতেছে।... বিদ্রোহীদের সহিত সংঘর্ষে নিরাপত্তা বাহিনীর মোট ১০৪ জন নিহত হয়। ৩০২ জন বিদ্রোহী নিহত হইয়াছে এবং ৩৪৭ জন বিদ্রোহী বন্দী হইয়াছে। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ১২৯ জন ফরাসী ও অসামরিক আরব অধিবাসী নিহত হইয়াছে।

অভিজ্ঞ পাঠক ইহা হইতে অবস্থার আসল রূপ চিনিতে পারিবেন। আলজিরিয়াবাসী ফরাসী ঔপনিবেশিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছে এবং জাতি হিসাবে আলজিরিয়া আরবরা তাহাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিয়াছে। ইহাকে 'সন্ত্রাসবাদ' নাম দিয়া আসল সত্যবিকৃত করা হইয়াছে মাত্র। আলজীরিয়দের দাবী যে যথার্থ তাহা ওখানকার ফরাসী সৈন্যরা অবধি অনুভব করিতেছে। তাহাদের মনে অস্পষ্ট সন্দেহ জাগিয়াছে যে, তাহারা সত্য-সত্যই কোন জাতির যুক্তি সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে সঙ্গীন ধরিয়াছে কিনা। ইতিপূর্বে তিউনিসিয়া সম্পর্কে ফরাসী যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিল আলজীরিয়া সম্বন্ধেও সেই নীতি গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য পরে ঠেকিয়া তিউনিসিয়া নীতির পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে। এ ক্ষেত্রেও যে নীতির পরিবর্তন হওয়া উচিত এমন ইঙ্গিত রিপোর্টে পাওয়া যাইতেছে বটে। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি এখনও মন স্থির করিতে পারেন নাই। তিনি নিজেই হয়ত একবার যাইতে পারেন।

গোয়া সত্যাগ্রহ

গোয়া সত্যাগ্রহ এক নব পর্যায় পৌঁছিয়াছে। ইতিপূর্বে আন্দোলন যে স্তরে ছিল বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহার বিশেষ পরিবর্তন হইয়াছে। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তর পর্যন্ত গোয়ার মুক্তি আন্দোলন সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। ইহা আশার কথা যে সমগ্র ভারতবাসী তাহাদের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য বিদেশী পর্তুগীজদের শাসন-পাশ মুক্ত হইতে চাহে। পর্তুগীজ সরকার হয়ত এতটা আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এখানে ভারতে যাহা হইতেছে—তাহাও হইতেছে-ই, কিন্তু খাস ভ্যাটিকান সিটিতে মহামান্য পোপের সঙ্গে নেহেরুজী আলাপ-আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছেন না, গোয়া মুক্তি আসন্ন। পর্তুগীজ সরকার ভারতের বিরুদ্ধে এইরূপ প্রচার করিয়াছেন যে, ভারতে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ভবিষ্যত বিপন্ন ; ইহা যে কত বড় মিথ্যা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। আমরা রোম হইতে যে সংবাদ পাইয়াছি—তাহাতে বোঝা যায় যে, মহামান্য পোপও বুঝিতে সমর্থ হইয়াছেন ভারতে সেরূপ কিছু ঘটে নাই। গোয়া আন্দোলনের ইহাই হইল নূতন দিক।

অত্যাচারের অবিচারের যে সংবাদ আসিতেছে—তাহা আমরা আসলে শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে করি। জনতা শিথিল হইবার মুখে অত্যাচার ও অবিচার উগ্র হইয়া থাকে।

ভারতীয় নৌ-বহর

ভারতীয় নৌবহরের ক্রমোন্নতি জাতির গৌরবের বিষয় বলিয়া সবাই স্বীকার করিবেন। গত আট বছরের মধ্যে একটি জাতি সামরিক প্রয়োজনের তুলনায় আংশিক

হইলেও, যুগোপযোগী নৌবহর গড়িয়া তোলা সহজ কথা নহে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে ভারতের রাষ্ট্র শক্তি—তাহার অত্যাবশকীয় প্রয়োজন মিটাইতে কাল হরণ করেন নাই। ভারত আগামী ছয় বছরের মধ্যে ৩০টি যুদ্ধ জাহাজ, ১২টি ফ্রিগেট, ৮টি coastal মাইন সুইপার, এবং আরও কতগুলি inshore মাইন সুইপার সংগ্রহ করিয়া নৌবহরের সম্পূর্ণতা বিধান করিবে। কিন্তু ইহা সবই বিদেশ হইতে ক্রয় করিতে হইতেছে।

পূর্ববঙ্গে মাতৃভাষা।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা পূর্ববঙ্গের প্রাথমিক স্কুলসমূহে বাঙলা ভাষাভাষী ছাত্রদের বাধ্যতামূলকভাবে উর্দু শিক্ষাদান বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ দিয়াছেন। চার বৎসর পূর্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলে উহা প্রবর্তিত হইয়াছিল। বর্তমান আদেশে উর্দু ভাষাভাষী ছাত্রদের বাঙলা ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সুপারিশ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। যাহা হউক বাঙালী মুসলমানের মনে স্বস্তি ফিরিয়া আসিল। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের কামনা সফল হইয়াছে। বাঙালীর মাতৃভাষা বাঁচিয়া থাকুক।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্য

জোহানেসবার্গে অনুষ্ঠিত গণ-কংগ্রেসে শ্বেতাঙ্গ অথবা কৃষ্ণাঙ্গ নির্বিশেষে সমি, স্বাধীনতা ও শান্তির প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী মাত্রেরই অধিকার পুনরায় দাবী করা হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সমগ্র অঞ্চল হইতে ২,৮৪৪ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। তাহারা প্রতিজ্ঞা করেন যে, গণতান্ত্রিক অধিকার সমূহ অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গগণ একযোগে সমস্ত শক্তি ও সাহস নিয়া সংগ্রাম চালাইয়া যাইবেন। দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীদের অধিকার ও প্রতিজ্ঞা বিবৃত করিয়া কংগ্রেসে একটি 'স্বাধীনতা সনদ' গৃহীত হইয়াছে। উপরিউক্ত সংবাদ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বহু শ্বেতাঙ্গবাসীরা দক্ষিণ আফ্রিকার সামগ্রিক উন্নতি কামনা করিয়া থাকেন। দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয়তাবাদী সরকার বলিয়া যাহা চলিতেছে তাহাকে শ্বেতগোষ্ঠী সরকার বলাই ভাল এই শ্বেতগোষ্ঠীবাদ দেশের শাসক শ্রেণীর মন হইতে যতদিন না ঘুচিতেছে ততদিন এই সমস্যার সমাধান নাই। কিন্তু এইরূপ অর্ধসত্য এবং বিকৃত সত্য লইয়া কোন জাতি সত্য জগতে এতাবৎ কালের মধ্যে দাঁড়াইতে পারে নাই। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের এই বিকৃত চিন্তাধারার জন্য আজ তাহারা বিশ্বের কোন জাতির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ নহে বরং বিশ্বের অন্যান্য জাতি বিকৃত চিন্তার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকাকে ঘৃণাই করিয়া থাকে। এই ঘৃণা ও অশ্রদ্ধাই একদিন দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের বড় অভিশাপ বলিয়া গণ্য হইবে।

পুস্তক পরিচয়

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। মিত্র ও ঘোষ। শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৪৲।

গ্রন্থকার সুপরিচিত। ইতঃপূর্বে তাঁর 'রবীন্দ্র কাব্যপ্রবাহ' ও 'রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ' রবীন্দ্র সমালোচনা গ্রন্থ হিসাবে সমাদর লাভ করেছে। তাঁর লেখা কেবলমাত্র বিশ্লেষণ নয়, সাহিত্যিক মন নিয়ে তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের মর্মে প্রবেশ করেছেন, তার রসাস্বাদন করেছেন। দেশী ও বিদেশী সাহিত্যে তাঁর পড়াশুনার পরিধি বিস্তৃত। তাই তাঁর উপলব্ধিতে আছে গভীরতা এবং বিচারে প্রকাশ পেয়েছে মানস সমৃদ্ধি। বর্তমান গ্রন্থের প্রথমাংশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিবার্টবক্তৃতার বক্তৃতামালারূপে পঠিত হয়েছিল। বাকি অংশ আলোচ্য বিষয়কে সম্পূর্ণতা দিয়েছে। ১৮৮৪ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত রবীন্দ্র-রচিত সমস্ত গল্প এ আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। "রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতাগুলির পরেই রবীন্দ্র প্রতিভার বিশেষ প্রকাশরূপে ছোট গল্পগুলির স্থান। ...পল্লীবঙ্গই তাঁহার ছোটগল্পের যথার্থ ক্ষেত্র।" এই পল্লীবঙ্গ প্রধানতঃ মধ্যবঙ্গ, উত্তর ও পূর্ববঙ্গের সঙ্গে তার যোগ নিবিড় যোগ। এই অঞ্চলের একখানি সুন্দর মানচিত্র গ্রন্থমধ্যে দেওয়া হয়েছে। প্রচ্ছদপটে পদ্মার ছবিখানিও চমৎকার।

ছোট গল্পের প্রকৃতি, উপন্যাসের সঙ্গে তার পার্থক্য, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের বিভিন্ন শ্রেণী—সমস্তই এ বইয়ে সযত্নে আলোচিত হয়েছে। শ্রীপুলিনবিহারী সেন সংকলিত তথ্যপঞ্জী রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগীর কাছে বিশেষ মূল্যবান। দু' একটি বিষয়ে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সঙ্গত মনে করি। ২য় পৃষ্ঠার পাদটীকায় তিনি বলেছেন "মুকুট গল্পটি গল্পগুচ্ছে সন্নিবেশিত না হইলেও এটিকে ছোটগল্প বলিয়াই ধরা উচিত।" অথচ ৭ম পৃষ্ঠায় তাঁর মন্তব্য "বস্তুতঃ মুকুট ছোট গল্প নয় ছোট উপন্যাস মাত্র।" ৬৪ পৃষ্ঠায় আছে "ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাঁহার বিখ্যাত Ode to the Intimation of Immortality কবিতায়...", কবিতাটির নাম কি 'Ode on Intimations of Immortality' নয়? ঐ পৃষ্ঠাতেই ব্যবহৃত 'ক্রীডমান' শব্দটি কি ব্যাকরণসম্মত?

বইখানি সাধারণ পাঠকের উপভোগ্য এবং ছাত্রগণের বিশেষ উপযোগী হয়েছে, সন্দেহ নেই।

বাংলা সাহিত্যের নরনারী—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৷৷০।

প্রায় দু' বছর হ'লো প্রমথবাবুর এ বইখানি প্রকাশিত হয়েছে। এর অধিকাংশ রচনা সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং তখনই পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সাহিত্য রসিক গ্রন্থকার বড়ু চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ ক'রে পরশুরাম পর্যন্ত প্রধান প্রধান প্রায় সমস্ত লেখকের রচনা থেকে উল্লেখযোগ্য নরনারীর চরিত্র বেছে নিয়ে তাদের উপর আলোকপাত করেছেন। যাঁরা ঐ সকল চরিত্রের সঙ্গে পূর্ব-থেকে পরিচিত তাঁরা স্মরণ করে আনন্দ পাবেন, যাঁরা পরিচিত ন'ন তাঁরাও সংক্ষিপ্ত আলোচনার মধ্য দিয়েই স্মরণযোগ্য পরিচয় লাভ করবেন। এতে আছে ৪০টি চরিত্র চিত্র: চণ্ডীদাসের রাধা; মুকুন্দরামের ভাঁড়ু দত্ত ও ফুল্লরা; ভারতচন্দ্রের হীরামালিনী; টেক চাঁদের ঠকচাচা; মধুসূদনের রাবণ, প্রমীলা, নববাবু; দীনবন্ধুর কাঞ্চন; বঙ্কিমের রোহিনী, মনোরমা, হীরা, ইন্দিরা, লবঙ্গলতা, কমলাকান্ত, মুচিরামগুড়; গিরিশ চন্দ্রের ভজহরি; হরপ্রসাদের ভবতারণ পিশাচেশ্বরী; রবীন্দ্রনাথের দেবযানী, মালিনী, ধনঞ্জয় বৈরাগী, রসময়ী, বিনোদিনী, আনন্দময়ী, গোরা ও অমিত রায়, নিখিলেশ ও সন্দীপ, শচীশ, বিপ্রদাস ও মধুসূদন, অতীনকুমার, সোহিনী; প্রভাতকুমারের রমাসুন্দরী, শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত, রাজলক্ষ্মী, রতন, সাবিত্রী, অচলা এবং পরশুরামের শ্যামানন্দ ব্রহ্মচারী।

পাঠক এ বই পড়ে অল্পক্ষণের মধ্যে বাংলা আখ্যান সাহিত্যের সুবিস্তৃত অংশ সানন্দে পরিদর্শন করবার সুযোগ পাবেন।

বাংলা ভাষার ভূমিকা: শ্রীশুভঙ্কর বসু। একক প্রকাশনী, ৪৪৬।১ কালীঘাট রোড, কলিকাতা। দাম ২৲০।

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত বড় বইখানি বহুকাল যাবৎ দুষ্প্রাপ্য। তাঁর 'বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' কয়েকটি প্রবন্ধের সংগ্রহমাত্র, সুশৃঙ্খল ধারাবাহিক আলোচনা নয়। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেনের 'ভাষার ইতিবৃত্ত'-ও স্থানে স্থানে অতি সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণ পাঠকের পাঠোপযোগী নয়। অথচ বিষয়টি চিত্তাকর্ষক এবং সকলের জ্ঞাতব্য। এ অবস্থায় সহজ ও সরল একখানি ছোট বইয়ের প্রয়োজন ছিল। শুভসত্ত্ববাবু সেই প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করেছেন। দুরূহ পারিভাষিক কথায় তিনি বক্তব্য বিষয়কে আচ্ছন্ন করে ফেলেন নি, দৃষ্টান্ত সহকারে যথাসম্ভব সরল ভাষায় আলোচনা করেছেন। সাধারণ পাঠক এবং প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে বইখানি খুব উপযোগী হয়েছে।

এতে আছে ছ'টি পরিচ্ছেদ: সাধারণ কথা, ধ্বনি প্রসঙ্গ, শ্বাসাঘাত, সংজ্ঞা-প্রকরণ, রূপতত্ত্ব এবং পরিশিষ্ট।

দু' এক জায়গায় একটু খটকা লাগলো। কলকাতা বাসীরা সত্যই কি কানাই, নাঁদ এবং মাঁ উচ্চারণ করেন? (পৃ: ৬০)। ১০৩ পৃষ্ঠায় লেখক বলেছেন: "এমন দেখা গেছে যে, বিশেষ্য পদকেই উত্তম পুরুষের সর্বনাম হিসেবে বক্তা ব্যবহার করে ফেলেছেন। ...যেমন, গরীবের কুটীরে পদধূলি যদি দেন, অধম বাধিত হবে।" উত্তম পুরুষের অর্থে হ'লেও—ব্যাকরণের দিক দিয়ে 'উত্তম পুরুষের সর্বনাম হিসেবে'—'অধম' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে, একথা বলা যায় কি?

কয়েকটি ছাপার ভুল চোখে পড়লো। আগামী সংস্করণে সেগুলির সংশোধন বাঞ্ছনীয়। নীড়ই এই সুপাঠ্য বইখানির নূতন সংস্করণ দেখতে পাবো আশা করি।

একক: বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৬২। চতুর্দশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। সম্পাদক: শ্রীশুভসত্ত্ব বসু। ৪৪৬।১, কালীঘাট রোড, কলিকাতা—২৬। মূল্য ।০।

ত্রৈমাসিক কবিতাপত্র। বাংলা সাময়িক পত্রের বাজারে ইদানীং মন্দা চলেছে। এ অবস্থায় চৌদ্দ বছর ধরে একখানি কবিতাপত্র চালিয়ে আসা সহজ কথা নয়। প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের সাহিত্যপ্রীতির ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। বর্তমান সংখ্যায় বিভিন্ন কবির ২০টি কবিতা, কয়েকখানি নূতন কাব্যের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ও শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'শিল্প ও বিজ্ঞাপন' নামে একটি প্রবন্ধ আছে।

গন্ধবণিক: সম্পাদনায়: সমীর ঘোষ, প্রিয়নাথ জানা। কাশী নিকেতন, ২১৭, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম ৸০।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের মুখপত্র। প্রধান উপদেষ্টা—শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। বাংলা ভাষায় কতগুলি সাময়িকপত্র চলছে—ক'জন খবর রাখি? কত স্বল্প পরিচিত পত্রিকায় কত ভালো লেখা বেরোয়, সে সব আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। প্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাও অনেক সময় চোখে পড়ে না। পাঠকদের এইসব তথ্য সরবরাহ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে উদ্যোক্তারা এই পত্রিকাখানি প্রকাশে প্রবৃত্ত হয়েছেন। প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছে ১৩৬২—২৪শে বৈশাখ। এ জাতীয় পত্রিকা বোধ হয় এই প্রথম প্রকাশিত হ'লো। অথচ এর উপযোগিতা যথেষ্ট, সে কথা বলা বাহুল্য। আলোচ্য সংখ্যায় আছে চল্‌তি (বাংলা) সাময়িকপত্র সমূহের তালিকা, ১৯৫৫, জানুয়ারী—এপ্রিল, চার মাসে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের পরিচয়, ঐ সময়ের মধ্যে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থের বিবরণ, আচার্য সুশীলকুমার দে মহাশয়ের গ্রন্থাবলীর বিবরণ এবং ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ডঃ মুলুক রাজ আনন্দ প্রভৃতির কয়েকটি প্রবন্ধ।

আশা করি, ভবিষ্যতে সম্পাদকগণ কেবল পুস্তক ও প্রবন্ধের তালিকা নয়, উল্লেখযোগ্য রচনার একটু বিস্তৃত পরিচয়ও দিতে চেষ্টা করবেন। আমরা পত্রিকাখানির প্রচার ও সাফল্য কামনা করি।

নীরঞ্জনা: কানাই সামন্ত। এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৩৲।

যদিও রবীন্দ্র প্রভাব একালের প্রায় সকল কবিরই উপর কিছু না কিছু লক্ষিত হয়, তবু প্রত্যক্ষতঃ রবীন্দ্র প্রভাবিত কবিদের প্রতি অতিআধুনিকেরা বিরূপ। আর এই বিরূপতাবশে অনেক সময়ে তাঁদের কাব্যের প্রতি তাঁরা অবিচার করে থাকেন।

বর্তমান রবীন্দ্রপন্থী কবিদের মধ্যে শ্রীযুক্ত কানাই সামন্ত শক্তিমান। তাঁর কল্পনা আছে; স্বকীয় দৃষ্টি, অনুভূতি ও রচনাসৌষ্ঠবেরও তিনি অধিকারী। এ কাব্যে তার নিদর্শন প্রচুর। আত্মপ্রচারের উগ্রচেষ্টা তাঁর কোনো দিনই নেই; কিন্তু কাব্যরসিক তাঁর কবিতাগুলিকে উপেক্ষা করবেন না। 'ঘুঘু ঘু' কবিতাটি আমাদের বিশেষভাবে ভালো লাগলো। —ধী।

শ্রীনেহেরুর প্রত্যাবর্তন :

ভারতের প্রধান মন্ত্রী সোভিয়েট দেশ ভ্রমণ ক'রে ফিরেছেন। সেখানে তাঁর আন্তরিক ও অভ্যর্থনা সাম্প্রতিক কালের একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা। 'লৌহ-যবনিকা'র দেশ সম্বন্ধে অনেক রকম গুজব বাজারে প্রচলিত ছিল। তাই সেখানে তাঁর আদান ও বিপুল সমাদর অনেককে বিস্মিত করেছে! বিশেষ করে' তিনি যখন গোড়া থেকেই নিরপেক্ষতা ঘোষণা করেছেন তখন তাঁর এমন সংবর্ধনা কেন?

কোন পক্ষভুক্ত না হয়ে শান্তির পথ অনুসরণ করবেন,—একথা যখন তিনি প্রথম ঘোষণা করেছিলেন তখন অনেকে তাঁর ঘোষণার গুরুত্ব আরোপ করেন নি; কেউ কেউ তাঁর আন্তরিকতায়, কেউ বা তাঁর বিচক্ষণতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে মোটের উপর সকলেই তাঁর নীতির সমর্থন করছেন। যেসব দেশ যারা বলতেন রুশ-পক্ষে সরাসরি যোগ না দেওয়া মানেই মার্কিন-পক্ষভুক্ত হওয়া, তাঁরাও তিক্ততা সংযত করেছেন।

ভারতের শান্তি-নীতি বিভিন্ন দেশের মনের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে এবং করছে। নারায়ণ-শঙ্কিত পৃথিবী এই নীতিরই প্রতীক্ষা করছিল। দেশে দেশে শান্তির দাবি প্রবল হয়ে উঠছে দেখে শক্তিগর্বিত দেশের শাসকেরাও কথার কাঁজ কমিয়েছেন। চতুঃশক্তি-বৈঠকের সাফল্য কামনা করে বিবৃতি দিয়েছেন রুশ-মার্কিন উভয় পক্ষ। দীর্ঘকাল ব্যর্থ চেষ্টার পর এবারে উভয় পক্ষের এক সঙ্গে বৈঠকে যোগ দেবার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

ভারতবর্ষ যদি রুশ অথবা মার্কিন কোনও পক্ষভুক্ত হ'ত, তাহলে সে বিশ্বরাজনীতিতে এই মর্যাদালাভ ও প্রভাব বিস্তার করতে পারতো না। সেই যোগদানে যুদ্ধের সম্ভাবনাই প্রবলতর হ'ত। সে তা করেনি। রাষ্ট্রের স্বাধীনতারক্ষার অধিকার মেনে নিয়ে সে পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে।

ভারতের বৈদেশিক নীতি প্রথম থেকেই লক্ষণীয়। বহুদিন ধরে' প্রাচ্য দেশগুলি পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীদের দাবার ঘুঁটি হয়ে আসছে। বাইরের প্রভাব-মুক্ত করে' এগুলিকে সংহত করবার প্রয়াস স্বাধীনতালাভের পর থেকেই ভারতবর্ষ করে' আসছে। যারা দাবার ঘুঁটি হ'তে চায় না, যারা মনেপ্রাণে শান্তিকামী, তাদের ঐক্যবদ্ধ করাই যুদ্ধবাদ প্রতিরোধের প্রথম ও প্রধান উপায়। এ প্রয়াসে সে ক্রমশঃ সাফল্য অর্জন করছে।

ভারতীয় পার্লামেন্টের প্রতিনিধিদের কাছে মার্শাল তরোশিলভ বলেছেন, "মিঃ নেহেরুর মানবপ্রীতি এমনি প্রবল যে তিনি পৃথিবীর সংকট এড়াবার জন্যে সর্ববিধ চেষ্টায় প্রবৃত্ত। সেই জন্যেই আমরা তাঁকে ভালোবাসি।"

শুধু সোভিয়েট দেশে নয়, যুগোস্লাভিয়াতেও তিনি সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছেন। আসবার সময়ে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর আমন্ত্রণও তিনি রক্ষা করে এসেছেন। অনেকেই আজ তাঁর প্রতি উৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছেন।

চতুঃশক্তি বৈঠক :

১৮ই জুলাই থেকে জেনিভাতে চতুঃশক্তি বৈঠক শুরু হচ্ছে। রুশিয়া, আমেরিকা, ইংরেজ, ফরাসী চারটি রাষ্ট্রের

মধ্যে পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা হবে। পারস্পরিক মিলনের পথ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত না হলেও পূর্বাপেক্ষা সুগম বলে বোধ হচ্ছে। বর্তমান সোভিয়েটনীতি পূর্বের তুলনায় উদারতর, আমেরিকার সোভিয়েট বিরুদ্ধতাও কম তীব্র। সংশয়, অবিশ্বাস পুরোপুরি কাটেনি, তবু রাজনৈতিক আবহাওয়া দেখে আশা হ'চ্ছে মুখোমুখি আলোচনায় কিছু সুফল ফলতে পারে। ঠিক মিত্রতা-স্থাপন হয়তো হবেনা, তবে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থিতির নীতি পালিত হ'লেই আপাততঃ যথেষ্ট, মানব সমাজ সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে অব্যাহতি পাবে।

যদি এ বৈঠক সাফল্যমণ্ডিত হয় তবে ভারতীয় নীতি অনেকাংশে জয়যুক্ত হবে। শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টিতে ভারতের দান যথেষ্ট। কোরিয়া ও ইন্দোচীনে যদি ভারতবর্ষ যুদ্ধবিরতির ঐকান্তিক চেষ্টা না করতো এবং নানা দেশে আলাপ-আলোচনার পটভূমি রচনা না করতো তবে চতুঃশক্তির আপোস-সম্ভাবনা এতটা অগ্রসর হ'তো কিনা সন্দেহ।

বিশ্বাস ও সন্দেহ—

পরস্পরের মনে বিশ্বাস উৎপাদন সহজ নয়। বিশেষতঃ যেখানে দীর্ঘকাল উভয়ের মধ্যে শত্রুতা চলে আসছে, সে ক্ষেত্রে। তবু, অতিরিক্ত সন্দেহ-প্রকাশের ফলে বিরোধের তীব্রতা বাড়ে, অবিশ্বাস ঘনীভূত হয়। রুশ-মার্কিন-প্রচার-পদ্ধতির ফলে দু'টি দেশের মধ্যে ব্যবধানই ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়েছে। অকারণ দোষারোপ, অতিরঞ্জন ও অপলাপ বিদ্বেষ বাড়িয়েছে। আজ উভয়ের কথাবার্তার একটু সুর বদলেছে। যদি সত্যই এদের শুভবুদ্ধির উদয় হয়, অপপ্রচারের পরিবর্তে সত্য-সন্ধানের আগ্রহ জাগে, তবে মিটমাটের পথ প্রশস্ততর হবে।

বৈজ্ঞানিকের সতর্কবাণী—

আঠারোজন নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এক যুক্তিবিবৃতিতে আণবিক অস্ত্রব্যবহার নিষেধ করে সকলকে সতর্ক ক'রে দিয়েছেন যে, ঐ অস্ত্র ব্যবহৃত হ'লে দেশ-কে-দেশ নির্মূল, নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। তাঁরা বলেছেন: "আমরা সত্যের লক্ষ্য করছি, বিজ্ঞান মানুষকে আজ আত্মবিনাশের উপকরণ জোগাচ্ছে। আধুনিক অস্ত্রসমূহ ব্যবহারের ফলে সারা পৃথিবী তেজস্ক্রিয় শক্তির সংস্পর্শে এলে বহু জাতি হয়তো সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যেতে পারে।"

আত্মহত্যার পথে চলেছি, অথচ খেয়াল নেই! ঐ সকল মারণাস্ত্র নিয়েই আমাদের কত গর্ব। যদি নিজের এবং পরের কল্যাণ চাই, তবে ধ্বংসের পরিবর্তে গঠনের, হিংসার পরিবর্তে সহযোগিতার পথ অবলম্বন করতে হবে।

কলকাতার হাসপাতাল—

কলকাতার হাসপাতালের অব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায়। অনেকে যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার বা চিকিৎসার সুযোগ পান না। কাগজে সে সম্পর্কে অনেক খবর বেরিয়েছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেও অনেকে ঐ অভিযোগ সমর্থন করেন। কিছুদিন আগে সরকার পক্ষ থেকে এবিষয়ে বলা হয়েছে, অভিযোগগুলি অংশতঃ অমূলক। যে-সব ক্ষেত্রে রোগী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়নি, সে সব ক্ষেত্রে হাসপাতালে সত্যই স্থানাভাব ছিল, অথবা রোগীর অভিভাবকেরা নিয়মানুযায়ী অর্থব্যয় করতে পারেননি। ত্রুটি কোথাও নেই বা হয়নি, সরকার সে কথা বলেননি, তবে বলেছেন, অধিকাংশ ত্রুটি অনিচ্ছাকৃত এবং অনেক ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থায় তার সংশোধন সরকারের সাধ্যাতীত। স্থানাভাব, হাসপাতালের তুলনায় রোগীর সংখ্যাধিক্য ইত্যাদি মেনে নিলেও ভুক্তভোগীদের মনে হবে আর একটু সহৃদয়তা তাঁরা আশা করতে পারেন। বিপন্ন হয়ে যাঁরা যান, তাঁরা চিকিৎসকের কাছ থেকে শুধু আইনের যুক্তি শুনতে যান না, কিঞ্চিৎ মানবীয় সহানুভূতি আশা করে যান। সেটুকু না পেলে স্বভাবতঃ তাঁরা ক্ষুণ্ণ হ'ন। আকস্মিক দুর্ঘটনায় পীড়িত ব্যক্তিও যদি যথাসময়ে চিকিৎসার সুযোগ না পায়, কয়েক ঘণ্টা

করতে বা যেতে বাধ্য হয়, তবে তার
ডাইট-পরিবর্তন কোনক্রমেই সন্তুষ্ট বা নিশ্চিন্ত হ'তে
হাসপাতালের রোগীদের প্রতি
হচ্ছে, এমন কথাও শোনা যায়
পেটের ভিতর তোয়ালে থেকে
কে লাফিয়ে পড়ে মরেছে,
গেছে। এ অবস্থা নিশ্চয়ই রাজনীতির
চাকুরির নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে বসে' ডাক্তার
তাঁদের সামাজিক দায়িত্ব ভুলে না
অনুভব করতে পারে,
রোগীদের নির্ভরযোগ্য আশ্রয়, তাঁদের বাঁচাবার
সাধ্যমত চেষ্টায় কর্তৃপক্ষ অবহেলা

হাবড়া সত্যাগ্রহ—

হাবড়ায় উদ্বাস্তুরা কতকগুলি অভিযোগ নিয়ে অনেকদিন ধরে' সত্যাগ্রহ করছেন। এবিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। সত্যাগ্রহী ও সরকার উভয় পক্ষেরই আগে থেকে এর ফলাফল সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত ছিল। কতটা দাবিদাওয়া ন্যায়সঙ্গত ও পূরণযোগ্য, এবং সেটুকু আদায়ের জন্য দীর্ঘদিন সত্যাগ্রহ করাই প্রকৃষ্ট পন্থা কিনা, সত্যাগ্রহীদের সেবিষয় ধীরভাবে বিচার করা কর্তব্য। সরকার পক্ষেরও এব্যাপার বেশীদিন গড়াতে দেওয়া ঠিক হয়নি, অল্পে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করলে ভালো হ'তো। যাহোক্, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহের এবং আরও দু'একজন শ্রদ্ধাভাজন নেতার উপস্থিতিতে সরকার ও সত্যাগ্রহীদের মিটমাট সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা হয়। সরকার পক্ষ সত্যাগ্রহীদের কতকগুলি দাবি মেনে নেন এবং সত্যাগ্রহী পক্ষের প্রতিনিধিরা সত্যাগ্রহ প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি দেন। কাগজে সেই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়। অথচ, এই মিটমাট মেনে না নিয়ে এখনও সত্যাগ্রহ করছেন। তাঁরা আপোষ-আলোচনার অংশ-গ্রহণকারী প্রতিনিধিদের আপন দলের মুখপাত্র বলে স্বীকার করছেন না। জোর করে দাবি আদায়ের এবং নিজেদের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলগঠনের প্রবৃত্তি আজ অনেকক্ষেত্রেই উদ্বাস্তুদের ক্ষতিসাধন ক'রছে। সুবিবেচনা, স্বাবলম্বন এবং শ্রমশীলতাই তাঁদের যথার্থ কল্যাণের পথ।

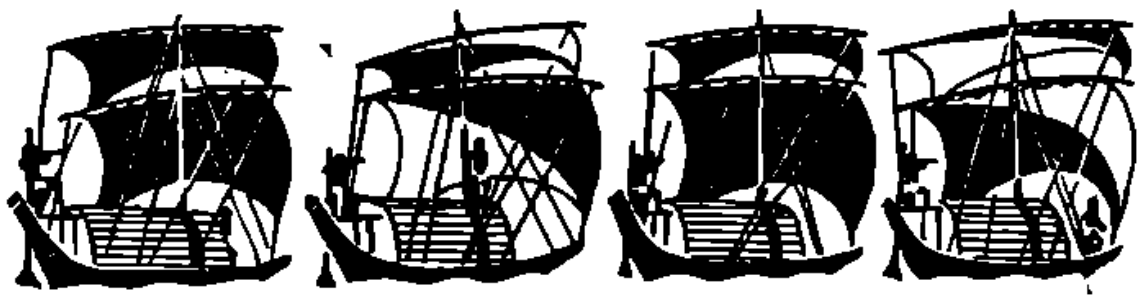

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত
এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত

CALCUTTA
CENTRAL
LIBRARY.
UNIVERSITY

অষ্টাদশ বর্ষ | শ্রাবণ—১৩৬২ | চতুর্থ সংখ্যা

কৃষ্ণদাস পাল

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বর্ষার রাত্রি—আকাশে মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, বাতাসে আর্দ্রতা; পল্লীর কর্মকোলাহলের অবসান হইয়াছে; পথে জল—পথ বিরলপথিক; পথ অন্ধকার—কারণ তখন এ কলিকাতায় গ্যাসের আলোক জ্বলিত না—বিদ্যুতের আলো কল্পনাতীত, বড় রাস্তাগুলিতে লণ্ঠনে তৈলের আলোক জ্বালান হইত, গলিগুলিতে তাহাও ছিল না। সেই রাত্রিতে—পল্লী যখন সুপ্ত তখন মধ্য কলিকাতার ফাঁসারীপাড়ার এক তরুণ খোলার ঘরে চৌকীর উপর জীর্ণ মাদুরে বসিয়া একটি মাটীর প্রদীপের আলোকে পুস্তক পাঠ করিতেছিল। সময় সময় তাহার অনাবৃত পৃষ্ঠদেশে জীর্ণ চালের খোলার মধ্য দিয়া দুই এক বিন্দু জল পড়িতেছিল—তখন সে একটু সরিয়া বসিতেছিল—কিন্তু পাঠে তাহার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হইতেছিল না। কৃষ্ণবর্ণ তরুণের মুখে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য—মনে অবিচলিত দৃঢ়সঙ্কল্প—সব বাধা অতিক্রম করিয়া বড় হইতে হইবে। তাহার বিশ্বাস—

"The heights by great men reached and kept
Were not attained by sudden flight,
But they, when their companions slept
Were toiling upwards in the night."

কারণ, প্রতিভা কি? আমেরিকার বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বলিয়াছেন, প্রতিভার শতকরা ৫ ভাগ মাত্র অবশিষ্ট ৯৫ ভাগ সাধনা—পরিশ্রম।

এই তরুণের সম্বন্ধে কবি হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"হাবল থেকে অনারেবল কে আর এমন আছে?"—বৈদ্য হইতে তিনি আপনার সাধনায় সর্বজনসম্মানিত—ব্যবস্থাপক সভার সমাদৃত সদস্য হইয়াছিলেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় দরিদ্র তিলি পরিবারে কৃষ্ণদাস পালের জন্ম হয়। এই পরিবার সুতার ব্যবসা করিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণদাসের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র দারিদ্র্যগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

পল্লীর পাঠশালায় বিদ্যারম্ভ করিয়া কৃষ্ণদাস গৌরমোহন আঢ্যের বিদ্যালয়ে (বর্তমান ওরিয়েন্টাল সেমিনারী) পাঠ করেন এবং তথায় বাঙ্গালায় ব্যুৎপত্তির জন্য পুরস্কার পদক লাভ করেন। এই সময়ে হিন্দু কলেজে "হীরা বুলবুল" নাম্নী রূপজীবার পুত্রকে হিন্দু কলেজে প্রবেশাধিকার প্রদান করায় রক্ষণশীল হিন্দুদিগের দ্বারা

—বহুবাজারের রাজেন্দ্রলাল দত্তের পরিচালনায় হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ডি. এল. রিচার্ডসন তাহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হ'ন। কৃষ্ণদাস কিছুদিন সেই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং রিচার্ডসন প্রমুখ অধ্যাপকদিগের নিকট শিক্ষালাভের সুযোগ লাভ করেন। হিন্দু কলেজের প্রথম ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকে স্বাধীন চিন্তা সম্বন্ধে অতিরিক্ত ও অনাবশ্যক আগ্রহে হিন্দু সমাজের প্রচলিত আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন—এমন কি প্রচলিত সংস্কার মাত্রই কুসংস্কার বলিয়া মনে করিতেন। কৃষ্ণদাস সে বিষয়ে তাঁহাদিগের পদানুসরণ করেন নাই—হিন্দু সংস্কারের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। বরং তিনি বিজবর ব্রেটোর মতাবলম্বী ছিলেন—"যে ব্যক্তি তাহার নিজদেশের ধর্মকে ঘৃণার্হ করে, সে সর্বনিকৃষ্ট অপরাধী—মৃত্যুদণ্ডই তাহার উপযুক্ত দণ্ড।"

কৃষ্ণদাস ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজে প্রবেশ করেন। তাহারও পূর্বে অর্থাৎ গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে পাঠকালেও কৃষ্ণদাস রাজনীতিক ব্যাপারের আলোচনা করিতেন। তখনই তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাদি তাঁহার বয়সের লেখকের পক্ষে অসাধারণ বলিয়া বিবেচিত হইত। তিনি নির্ভীকভাবে মতপ্রকাশ করিতেন এবং ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে একবার প্রসিদ্ধ খৃষ্টধর্মযাজক ও পণ্ডিত ডক্টর ডাফের মতের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস যখন কলেজে ছাত্র তখন দ্বারকানাথ ঠাকুর জর্জ টমসন নামক এক জন ইংরেজকে এ দেশে আমন্ত্রণ করিয়া আনেন। তিনিই রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ বাঙ্গালীদিগের রাজনীতিতে শিক্ষাদাতা ও বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা। কৃষ্ণদাস টমসনের বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস সংবাদপত্র পাঠে আগ্রহশীল ছিলেন—কিন্তু সংবাদপত্র কিনিবার অর্থ তাঁহার ছিল না। তিনি লোকের নিকট চাহিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেন এবং সময় সময় সংবাদপত্রে প্রকাশ জন্য রচনা পাঠাইয়া বিনিময়ে পত্র পাইতেন। পল্লীতে একটি বিতর্কসভা ছিল—তাহার বার্ষিক চাঁদা দেড় টাকা মাত্র। সেই চাঁদা দিবার সামর্থ্যও কৃষ্ণদাসের ছিল না। কিন্তু তিনি সভার আবৃত্ত ছিলেন—সেই জন্য তাঁহাকে বিনা চাঁদায় সদস্য করিয়া লওয়া হয়। কৃষ্ণদাস সেই সভার এক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য টমসনকে আমন্ত্রণ করিতে গমন করিলে টমসন বলেন, তিনি সাহিত্য সভায় বক্তৃতা করা অকিঞ্চিৎকর মনে করেন—কেবল রাজনীতিক বিষয়ে বক্তৃতা করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে একখানি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্র দেখাইয়া টমসন বলেন, এ দেশে কেবল এক জন ভারতীয় রাজনীতি বুঝেন—তিনি ঐ পত্রের সম্পাদক—হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সেইদিন হইতে কৃষ্ণদাস হরিশচন্দ্রের আদর্শের অনুগামী হইতে কৃতসঙ্কল্প হ'ন। তিনি একটি অবৈতনিক সমিতির সম্পাদকের নিকট হইতে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' আনিয়া পড়িতেন—সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সংবাদপত্র পাঠ করিতেন। তিনি সাহস করিয়া 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশ জন্য প্রবন্ধ পাঠাইলে যখন তাহা প্রকাশিত হয়, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা ছিল না।

কলেজ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস ২৪ পরগণা জিলার জজের আদালতে অনুবাদক নিযুক্ত হ'ন। কিন্তু কয় দিন পরেই জজ তাঁহাকে অযোগ্য বিবেচনা করায় তাঁহার চাকরী যায়!

কৃষ্ণদাসের অধ্যয়নস্পৃহা অসাধারণ ছিল। কিন্তু দারিদ্র্য তাঁহার পক্ষে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভের অন্তরায় হয়।

দরিদ্র হইলেও কৃষ্ণদাসের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ম্লান হয় নাই। কয়জন বন্ধুর সহিত একযোগে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি একখানি ইংরেজী মাসিকপত্র প্রচারে প্রবৃত্ত হ'ন। সে পত্র কয় মাসেই বিলয়ভূমিষ্ঠ বিদ্যুতের মত অন্তর্হিত হয়। তখন তিনি নানা সংবাদপত্রে রচনা পাঠাইতে থাকেন এবং কানপুরে 'সেণ্ট্রাল ষ্টার' পত্র প্রকাশিত হইলে তিনি তাহার সংবাদদাতা নিযুক্ত হ'ন। তাহার পরে কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রবর্তিত 'হিন্দু

ইণ্টেলিজেন্সার' পত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে তাঁহার স্থান হয়। তিনি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে কয়টি প্রবন্ধ লিখেন এবং সেগুলি দেখিয়া হরিশচন্দ্র মন্তব্য করেন—"বাঁচিয়া থাকিলে কৃষ্ণদাস দেশের অনেক কাজ করিতে পারিবে।"

এই সময় কৃষ্ণদাস "নব্য বাঙ্গালীর সমর্থন", "বিদ্রোহ এবং জনগণ", "নীলের চাষ" প্রভৃতি বিষয়ে পুস্তিকা রচনা করেন। প্রথমোক্ত পুস্তিকা কলিকাতা ছোট আদালতের অন্যতম বিচারক হরচন্দ্র ঘোষ নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। সেই প্রবন্ধ বিশেষ সমালোচনার বিষয় হয় এবং লোক যখন সকল জানিতে পারে যে, তাহা একজন ছাত্রের রচনা, তখন অনেকে বিস্মিত হ'ন।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে অতিশ্রমে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়। বাঙ্গালী বেদনার্ত হৃদয়ে বুঝিল—"অসময়ে হরিশ ম'ল"—সুতরাং "প্রজার এ বার প্রাণ বাঁচান ভার।" হরিশচন্দ্রের মৃত্যুতে কে 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সম্পাদনার ভার লইবেন, তাহা বিবেচনার বিষয় হয়। তৎকালীন সকল সৎকার্য্যে উৎসাহী কালীপ্রসন্ন সিংহ সে ভার লইয়া শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে সম্পাদক করিয়া কিছুদিন উহা পরিচালিত করেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন যত উৎসাহ-সম্পন্নই কেন হউন না—তিনি চপলস্বভাব হেতু কোন কার্য্যে একনিষ্ঠভাবে মনোযোগ দিতেন না। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার উৎসাহ-শিখা নির্ব্বাপিত হইলে "হিন্দু পেট্রিয়ট" হস্তান্তরিত হয়। যখন, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পরিচালকগণ কাণ্ডারীবিহীন তরণীর অবস্থাপ্রাপ্ত পত্র লইয়া বিব্রত, তখন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কৃষ্ণদাসকে উহার সম্পাদক করিতে পরামর্শ দেন। তখন কৃষ্ণদাসের বয়স ২৩ বৎসর মাত্র। আর এদেশে সাংবাদিকতার জনক হরিশচন্দ্রের পরিচালিত পত্র তখন এদেশে ভারতীয়দিগের সর্বপ্রধান পত্রের গৌরবোজ্জ্বল। ইংলণ্ডে পীট যখন অল্প বয়সে প্রধান মন্ত্রী হ'ন, তখন বলা হইয়াছিল—

"A sight to make neighbouring
nations stare,
An Empire entrust'd to a school-boy's
care."

এ যেন তেমনই হইল। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনোনয়নে ভুল হয় নাই। কারণ, তিনি প্রতিভার স্বরূপ বুঝিতে পারিতেন। বর্ষাধিক কাল অথবা দুর্বল 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নূতন সম্পাদকের চেষ্টায় পূর্বগৌরব লাভ করিল—যেন মৃতের দেহে আবার জীবন-সঞ্চার হইল।

যুবক কৃষ্ণদাসকে 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পরিচালকরা প্রথমে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। সেই জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর ও হরচন্দ্র ঘোষ তাঁহার কার্য্য লক্ষ্য করিতেন। কিন্তু অল্পদিনেই তাঁহারা বুঝিতে পারেন, কৃষ্ণদাসকে কার্যভার দিয়া তাঁহারা তাঁহার উপর অনায়াসে নির্ভর করিতে পারেন। সেই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত কৃষ্ণদাস 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের সম্পাদক ছিলেন—ঐ পত্রেই তাঁহার মত প্রচারিত হইত। জীবনের শেষ দশায় দীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল তাহার বিবরণই ভারতের ইতিহাস ছিল বলিলে অসঙ্গত হয় না। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের সম্পাদক হইবার সময় হইতেই তিনি 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান' সভার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হ'ন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঐ সভার সম্পাদকের পদে বৃত হ'ন এবং সভার কার্য প্রধানতঃ তাঁহার পরামর্শেই পরিচালিত হইত। যে সভায় দিগম্বর মিত্র, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভৃতি ব্যক্তি ছিলেন, তাহাতে তিনি যে সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বুদ্ধি, বিবেচনা ও দূরদর্শিতার জন্য।

কেহ কেহ বলেন, তিনি 'বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের' সহকারী সম্পাদক ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার সৌভাগ্যের পথ সুগম হয়। কিন্তু সৌভাগ্য কি? সুযোগ লাভ করিলে তাহার সদ্ব্যবহারেই সুভাগ্য সমুদিত হয়।

ইংরেজ শাসকরাও তাঁহার প্রশংসা করিতেন। কিন্তু জমীদারপ্রধান সভার সম্পাদক হইলেও তিনি কখন সভাভ্রষ্ট হ'ন নাই। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন ইংলণ্ডের রাণীর জ্যেষ্ঠপুত্র—যুবরাজ (তৎকালে রাজা সপ্তম এডওয়ার্ড। ভারতে আগমন করেন, তখন এ দেশে যে আনন্দোচ্ছ্বাস লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা আংশিকরূপে কৃত্রিম হইলেও একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না। তাহার প্রধান কারণ, দীর্ঘকালব্যাপী স্বৈরশাসনের পরে ও মুসলমান শাসনের পতনদশায় নানারূপ বিশৃঙ্খলার অবসানে—ইংরেজ শাসনে লোক ধন প্রাণ মান—নিরাপদ মনে করিতে পারিয়াছিল। কৃষ্ণদাসও যুবরাজকে সম্বর্দ্ধনার উদ্যোগীদিগের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন:—

"আপনি যে স্থানেই গমন করেন, সেইস্থানেই প্রকৃত অবস্থা গোপন করিবার জন্য নূতন বর্ণলেপ ব্যবহৃত হয়—আপনি প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে পারেন না। আপনার নয়নরঞ্জনের জন্য সমস্ত বৃটিশ সাম্রাজ্য সুধাধবলিত করা হইয়াছে—আপনি যাহা দেখিতে পান, তাহা স্বরূপ নহে—কৃত্রিমতার বিকাশ। সর্বত্র যে আনন্দ সহকারে আপনি সম্বর্দ্ধিত হইতেছেন তাহাতে আপনার মনে হইতে পারে, দেশের লোক সর্বতোভাবে সন্তুষ্ট—কিন্তু তাহা মনে করিলে আপনি ভুল করিবেন।"

যখন যুবরাজকে সম্বর্দ্ধনার জন্য জমীদাররাও পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছিলেন, তখন জমীদারপ্রধান সভার সম্পাদকের পক্ষে এইরূপ স্পষ্টবাদিতার পরিচয় প্রদান করা যে বিশেষ প্রশংসার্হ তাহা বলা বাহুল্য।

এইস্থলে বলা যায়, ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কংগ্রেসে "স্বরাজ" যে ভারতবাসীর কাম্য তাহা কেহ সাহস করিয়া বলেন নাই। ঐ বৎসর—কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার ২০ বৎসর পরে—দাদাভাই নৌরোজী উহা বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে "স্বরাজে"র ব্যাখ্যা করেন—বৃটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশসমূহে যে রূপ স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত, তাহাই। স্বরাজ কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে কৃষ্ণদাস লিখিয়াছিলেন—ভারতীয়রা "হোম রুল" দাবী করিতেছে—সেই কথাই বলিতে হইবে। অবশ্য তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত "হোম রুল" এ স্বাধীনতা নহে—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। লক্ষ্য করিবার বিষয় এ বিষয়েও তিনি কংগ্রেসের বহুপূর্ববর্তী।

ইংরেজ সরকার তাঁহাকে উপাধি দিয়া তাঁহার গুণের আদর করিয়াছিলেন। অবশ্য যে সকল ধনী ও জমীদারকে তিনি পরামর্শ দিয়া পরিচালিত করিতেন, তাঁহারা "রাজা" বা "মহারাজা" উপাধি পাইলেও কৃষ্ণদাস সে সম্প্রদায়ের নহেন বলিয়া 'রায় বাহাদুর' উপাধি পাইয়াছিলেন। উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে তিনি লিখিয়াছিলেন—"রায় বাহাদুর" দিগের তালিকায় নিজ নাম দেখিয়া তিনি বিশেষ বিস্ময়ানুভব করিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তিনি কি বিষম অপরাধ করিয়াছেন যে, তাঁহাকে এই দণ্ড প্রদান করা হইয়াছে? তিনি মন্তব্য করেন, যদি সে বিষয়ে তাঁহার মত গৃহীত হইত, তবে তিনি বলিতেন—যে সকল ইংরেজের তুলনায় তিনি তুচ্ছ—তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা কোনরূপ উপাধি গ্রহণ করেন নাই, তিনি তাঁহাদিগের আদর্শেরই অনুসরণ করিতে চাহিতেন।

কৃষ্ণদাস উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ পাঞ্জাবে ইংরেজের অত্যাচারের প্রতিবাদে উপাধি বর্জ্জন করার পূর্বে ইংরেজ সরকার কাহাকেও উপাধি প্রদানের পূর্বে তাহা জানাইতেন না এবং সাম্রাজ্যের সুরক্ষণ্য আয়ার ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাপ্ত উপাধি বর্জ্জন করার পূর্বে বিশেষ কৃষ্ণদাসের সময়ে উপাধি প্রত্যাখ্যানের বা বর্জ্জনের কথা কল্পনাতীত ছিল। এমন কি বিদ্যাসাগর মহাশয়ও—"সি, আই, ই"—"ছাই" বলিলেও উপাধি বর্জ্জন করেন নাই। কৃষ্ণদাসের সময়ে উপাধি লইতে অস্বীকার করিবার মত লোকও বাঙ্গালী সমাজে ছিলেন। ইংলণ্ডের যুবরাজ এডওয়ার্ড যখন এ দেশে আগমন

করেন, সেই সময় বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার ছোটলাট মানবীয় তারকনাথ পরামাণিককে 'রাজা' উপাধি দিতে চাহিয়া কৃষ্ণদাসকেই সে কথা বলিয়া পরামাণিক মহাশয়কে লইয়া যাইতে বলিয়াছিলেন। পল্লীর সম্পর্কে কৃষ্ণদাস তাঁহাকে পিতৃব্য বলিতেন। কৃষ্ণদাস যখন তাঁহাকে যুবরাজের কাছে যাইতে হইবে বলেন, তখন বিস্মিত তারকনাথ তাহার কারণ জানিতে চাহেন, এবং কারণ জানিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া বলেন, "বাবা, ও সব আমার দ্বারা হ'বে না। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি 'রাজা' হও—আমি লোককে বলব 'আমি রাজার খুড়া—রাজার চাইতে রাজার খুড়া যে বড়, কৃষ্ণদাস।" এই তারকনাথের বর্ণনায় হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

"কণ্ঠে তুলসীর মালা, দীন হীন বেশ—
কাঁধেতে চাদর ফেলা—পোষাকের শেষ;
সহরের দীন, দুঃখী, দরিদ্র অনাথ
আনন্দে দু' হাত তুলে যখনি সাক্ষাৎ।"

সুরেন্দ্রনাথ আচার ও রবীন্দ্রনাথ বিদেশী সরকারের কার্য্যের প্রতিবাদে উপাধি বর্জ্জন করিয়া বিদেশীর শাসনের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। কিন্তু উপাধি লাভের জন্য বহু লোক অর্থের অপব্যয়ও করিয়াছেন —উপাধি লাভ করিতে না পারিয়া ভগ্নহৃদয়ে শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন—ইহাও জানা আছে। কৃষ্ণদাস উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন নাই বটে, কিন্তু উপাধি সম্বন্ধে তাঁহার মত যে ভাবে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—তাঁহাদিগের তরুণ বয়সে দেখিয়াছেন দুই জনকে—এক জন ঘোড়া, তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আর একজন কৌশলী, তিনি কৃষ্ণদাস পাল।

কৌশলী কৃষ্ণদাস সাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিয়াছিলেন, যদি প্রমাণ অভ্রান্ত হয়, তবে জয় অনিবার্য্য। প্রমাণ অভ্রান্ত হইলে আলোচনায় মন্তব্য প্রকাশে শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করিবার প্রয়োজন হয় না—সবল মত অনায়াসে সরল ভাবে ব্যক্ত করা যায়। তিনি মত প্রকাশের পূর্ব্বে বিশেষ পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিতেন—উপকরণ পরীক্ষা করিয়া যাহা আবশ্যক তাহাই গ্রহণ করিতেন। সেই জন্য তিনি যাঁহাদিগের মতের বিরোধিতা করিতেন, তাঁহারাও তাঁহার যুক্তির অকাট্যতা স্বীকার করিতেন এবং স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইলেও তাঁহার উক্তির নিন্দা করিতে পারিতেন না। সার জর্জ্জ ক্যাম্পবেল বাঙ্গালা বিহার উড়িষ্যার ছোটলাট ছিলেন। কৃষ্ণদাসকে কর্ত্তব্যহেতু 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে তাঁহার বহু কার্য্যের নিন্দা ও প্রতিবাদ করিতে হইত। কিন্তু সার জর্জ্জ বুঝিয়াছিলেন কৃষ্ণদাস তাঁহার সমালোচনা করিবার অধিকারী। সেই জন্য কোন নূতন বড়লাট এ দেশে আসিলে কৃষ্ণদাসকে তাঁহার সহিত পরিচিত করাইবার সময় তিনি তাঁহাকে 'বন্ধু' বলিয়া অভিহিত করিয়া বলিয়াছিলেন—ইনি আমার বন্ধু কৃষ্ণদাস পাল—ইনি প্রায়ই আমাকে গালি দেন।" ঐ বড়লাট ইংলণ্ডে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্র পাঠ করিয়া কৃষ্ণদাসের অসাধারণত্বের পরিচয় পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাসের মৃত্যুর পরে একাধিক ইংরেজ রাজ-কর্ম্মচারী তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল উক্তি করিয়াছিলেন, সেই সকল হইতে বুঝিতে পারা যায়, তিনি ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদিগের কার্য্যের সমালোচক—সময় সময় তীব্র সমালোচক হইলেও তাঁহারা কৃষ্ণদাসের গুণে মুগ্ধ ছিলেন। বড়লাটের ব্যবস্থাপনা সভার সার কোটিনে ইলবার্ট বলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বয়সে ছাত্ররা উপাধি লাভ করে সেই বয়সে এদেশের পুরাতন সংবাদ পত্রের পরিচালনা ভার পাইয়া কৃষ্ণদাস তাঁহার রচনা কৌশলে, আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে সকল তথ্য সংগ্রহে, অসাধারণ ধৈর্য্য পরিচয়ে, ন্যায়নিষ্ঠা ও উদ্যমতা-বর্জ্জন জন্য তিনি যে ২৩ বৎসর কাল উহার পরিচালক ছিলেন, তাহার মধ্যে উহাকে মরণাহত অবস্থা হইতে নবজীবনে সঞ্জীবিত করিয়া এদেশে ভারতীয়দিগের পরিচালিত সংবাদপত্রের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

সাংবাদিক কৃষ্ণদাসের কাছে সাংবাদিকের "ধর্ম্ম" সম্বন্ধে অরবিন্দের উক্তি সহজেই মনে হয়—জনীর মত প্রাপ্ত উপকরণ গ্রহণ করিয়া—তাহাতে যাহা চিত্তাকর্ষক ও কাযের উপযোগী তাহা বাছিয়া লইয়া তাহাই সুস্পষ্ট রূপে ও সমুজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করাই সাংবাদিকের "ধর্ম্ম"।

সংবাদপত্রের সম্পাদকরূপে কৃষ্ণদাসকে সমসাময়িক সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও সমস্যা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে হইত এবং যে দীর্ঘকাল তিনি 'হিন্দু পেট্রিয়টের' সম্পাদক ছিলেন, তাহার মধ্যে সেরূপ ঘটনার অভাব ঘটে নাই—সেরূপ সমস্যাও আর দেখা দেয় নাই।

বিষয়ে সাম্প্রদায়িক সম্পর্কে সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়াছিল, সমস্যায় সমগ্র দেশের অধিবাসীদিগের উন্নতি বা অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল।

লর্ড লিটন ভারতীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সঙ্কোচক আইনের দ্বারা যে মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা নিন্দনীয় এবং ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইয়া গ্লাডষ্টোন তাহার বর্জ্জন করিতে বড়লাট লর্ড রিপনকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। ঐ আইন বর্জ্জিত হইবার পরে কৃষ্ণদাস বলিয়াছিলেন—উহা আইন হিসাবে গোক্ষুরসর্প; ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ দুর্দ্দিনে উহা পূর্ব্বে প্রচারিত না করিয়াই দুই ঘণ্টার মধ্যে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল। এক জন ইংরেজ রাজনীতিক এ দেশের সংবাদপত্রকে যে মত-প্রকাশের-স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; আর এক জন ইংরেজ রাজনীতিক তাহাই হরণ করেন—উভয়ে একই স্বাধীন দেশের অধিবাসী হইলেও উভয়ের মনোভাবে কি প্রভেদ! এই আইন কুল—কিন্তু অপরাধ অপেক্ষাও শোচনীয়।

লর্ড লিটন ইংলণ্ডের বস্ত্রোৎপাদকদিগের স্বার্থরক্ষার্থ যখন ভারতের আর্থিক ক্ষতি করেন, তখন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন তাহার প্রতিবাদ পত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া বড়লাটের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, সে পত্র কৃষ্ণদাসের রচনা এবং ইংরেজের পরিচালিত পত্র 'পাইওনিয়ার'ও তাঁহার যুক্তি খণ্ডন করা সম্ভব নহে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সমালোচনায় অসহিষ্ণু লর্ড লিটন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকারী এসোসিয়েশনের সদস্যদিগকে অবহিত ভাবে নিন্দা করেন। কৃষ্ণদাস তাহার উত্তরে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা কশাঘাতেরই মত। তিনি আরও বলেন, ভারতে আমলাতন্ত্রের প্রভাবে লর্ড লিটনের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হইয়াছে—নহিলে কবি হইয়া তিনি কখন এরূপ ব্যবহার করিতে পারিতেন না। তাঁহার আক্রমণে তিনি যেমন সম্ভ্রমহারা হইয়াছেন, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের তেমনই সম্ভ্রমবৃদ্ধি হইয়াছে।

কলিকাতা কর্পোরেশনে কৃষ্ণদাস সরকারী দলের বিরোধীদিগের নেতা ছিলেন বলিলে অসঙ্গত হয় না। তাঁহার নেতৃত্বের কারণ—তিনি আলোচ্য বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া, তাহার সুবিধা অসুবিধা বিচার করিয়া, তাহা সম্ভব কি না দেখিয়া তবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। ইংলণ্ডের রাজনীতিক জোসেফ চেম্বারলেন যখন বার্মিংহামে মেয়র ছিলেন, তখন তিনি তথায় তাঁহার প্রাধান্যের কারণ বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছিলেন—সকল সমিতিতেই দেখা যায়, ১৩জন সদস্যের মধ্যে ১২জন আলোচ্য বিষয়টি বিশেষ বিবেচনা না করিয়া অধিবেশনে যোগ দেন—তাঁহারা অপরের মতানুগামী হইয়া থাকেন; আর এক জন বিষয়টি বিবেচনা করিয়া তিনি যাহা চাহেন, তাহাতেই সকলকে সম্মত করাইবেন এই সঙ্কল্প লইয়া গমন করেন; তাঁহার জয় অনিবার্য। কৃষ্ণদাস প্রস্তুত হইয়া যাইতেন, তাঁহার বিরোধীদিগের যুক্তি খণ্ডন করিবার উপকরণ ও স্বীয় মত প্রতিষ্ঠিত করিবার আবশ্যক আয়োজন লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। যুক্তির সঙ্গে তাঁহার বাক্‌চাতুর্য্য লোকের মন আকৃষ্ট করিত, মত প্রভাবিত করিত। হেন্‌রী হ্যারিসন বলিয়াছেন, তিনি বিশুদ্ধ ইংরেজীতে তাঁহার উক্তি প্রকাশ করিতেন, সে ভাষা যে তাঁহার মাতৃভাষা নহে, তাহা বুঝিতে পারা যাইত না। তিনি—গায়কের সুর যেমন পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠে

তেমনই ভাবে ক্রমে ক্রমে সুর উচ্চ করিয়া শ্রোতৃগণের মন প্রস্তুত করিয়া শেষে যখন উপসংহারে উপনীত হইতেন, তখন শ্রোতারা তাঁহার মতই আপনাদিগের মত বলিয়া মনে করিতেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদকরূপে তিনি যেমন ভূমিসংক্রান্ত-বিধি-নিষেধ সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করার সকল বিষয় নখদর্পণে দেখিতেন, তেমনই কর্পোরেশনের নিয়মাদি মনোযোগ সহকারে পাঠ ও বিশ্লেষণ করায় কর্পোরেশনের যে কোন বিষয়ে তাঁহার মত অভ্রান্ত বলিয়া মনে হইত। উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার শ্রমশীলতা বিচার বিশ্লেষণ শক্তি তাঁহার অসাধারণ সাফল্যের কারণ ছিল। তাঁহার বক্তৃতায় কোথাও যুক্তির শৈথিল্য বা চিন্তার ত্রুটি লক্ষিত হইত না। সে বক্তৃতা পাঠ করিলেও প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। রিচার্ড টেম্পল তাঁহার ভারত সম্বন্ধীয় একখানি পুস্তকে লিখিয়াছিলেন—

"ব্যবস্থাপক সভার ভারতীয় সদস্যদিগের মধ্যে, আমার কার্যকালে যাঁহারা বিশেষ উপযোগী ছিলেন, কৃষ্ণদাস পাল তাঁহাদিগের শীর্ষস্থানীয়। যদি ব্যবস্থাপক সভায় বিরোধীদলের কোন কাজ সম্ভব ছিল, তবে তিনিই সাধারণতঃ সেই কাজ করিতেন। সভার কাজ ইংরেজীতে পরিচালিত হইত—কৃষ্ণদাস ইংরেজীতে উত্তম বক্তা ছিলেন, তাঁহার উচ্চারণ বিশুদ্ধ ছিল এবং তিনি অনেক ইংরেজের অপেক্ষা দ্রুত ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতে পারিতেন। তার্কিক হিসাবে তিনি সর্বদা প্রস্তুত ও কার্যক্ষম ছিলেন। আমি যে সকল ভারতীয়কে জানি তাঁহাদিগের মধ্যে সার তাঞ্জোর মাধব রাওয়ের পরেই কৃষ্ণদাসের নাম উল্লেখ করিতে হয়। আইন প্রণয়নে কৃষ্ণদাসের সাহায্য বিশেষ মূল্যবান ছিল।"

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারক সার রিচার্ড পার্ল—কৃষ্ণদাসের কৌশল, ধৈর্য, এবং উত্তেজনার কারণ থাকিলেও অনুত্তেজিত থাকা—এই সকল অসাধারণ গুণের প্রশংসা করিয়াছিলেন। ব্যবস্থাপক সভায় ও সংবাদপত্রে প্রবন্ধে বিশেষ উত্তেজনাদ্যোতক বিষয়ের আলোচনাকালেও কৃষ্ণদাস অসাধারণ ধৈর্য্যের পরিচয় দিতেন। যেন তিনি ধৈর্য্যের সাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাসের গৃহে প্রতিদিন বহু লোকের সমাগম হইত—ধনী, জমীদার, বড় ব্যবসায়ী হইতে দীন দরিদ্র নরনারীও নানা কার্যে পরামর্শ বা সাহায্য লাভের আশায় তাঁহার নিকট আসিতেন। তিনি এমনই শিষ্টাচারসিদ্ধ ছিলেন যে, সকলকেই মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতেন—যাঁহার উপকার করিতে পারিতেন না বা যাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করা অসম্ভব হইত, তিনিও কৃষ্ণদাসের শিষ্টাচারে মুগ্ধ হইতেন—রাগ করিতে পারিতেন না।

তাঁহার কাজও অল্প ছিল না। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার ও 'জাষ্টিস অব দি পিস' নিযুক্ত হইয়াছিলেন ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো'ও ছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে—মৃত্যুর মাত্র এক বৎসর পূর্বে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহাকে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্বাচিত করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদকরূপে তাহার কর্ণধার ছিলেন। অথচ তিনি সকল কাজই যত্নসহকারে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতেন। মনে ভাবিতেন, যে কাজ করিবার উপযুক্ত তাহাই ভাল করিয়া করিবার উপযুক্ত।

কৃষ্ণদাস যখন কর্মক্ষেত্রে তখন, ইলবার্ট বিলের আন্দোলনে এ দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত ইংরেজদিগের যে বিরোধ ঘটে, তাহারই ফলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময়ে লর্ড লিটন ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রের মতপ্রকাশ-স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করায় ভারতীয় সাংবাদিকদিগের প্রতি অনাস্থা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা হয়। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্যদিগের সম্বন্ধে বড়লাট

লর্ড লিটনের অশিষ্ট ও দুষ্ট ব্যবহারের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। এ সকলই বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইলবার্ট বিল সম্বন্ধীয় আন্দোলনকালে একজন ইংরেজ বড়লাট রিপণকে অপমানিত করে ও তাঁহাকে বলপূর্ব্বক জাহাজে তুলিয়া এদেশ ত্যাগ করাইবার পরিকল্পনাও করে। আবার বাগ্মী লালমোহন ঘোষের বক্তৃতার ফলে, বাঙ্গালী এটর্ণীরা প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ব্রানসনকে কোন মামলায় নিযুক্ত করিতে অস্বীকার করায় তাঁহাকে ভারত ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। লালমোহন ভারতীয়দের গ্লানিকারী ইংরেজদিগের সম্বন্ধে বলেন, তাহারা তাহাদিগের নিঃশ্বাসে এ দেশের আকাশ বাতাস কলুষিত করিয়াছে। এই সকল ঘটনার মধ্যে কৃষ্ণদাস দৃঢ় থাকিলেও কখনও ধৈর্য্য হারান নাই। তিনি বলিয়াছিলেন—"আমরা বর্ত্তমান সম্বন্ধে অধিক মনোযোগী ও বর্ত্তমান সম্বন্ধে অধিক সম্পৃক্ত হইলেও মানুষ কেবল বর্ত্তমানের মত জীবন যাপন করে না। মানুষ যদি ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা না করে—ভবিষ্যতের জন্য কাজ না করে—ভবিষ্যতের জন্য জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ না করে—তবে তাহার মনুষ্যত্বের উন্নতি হইতে পারে না।" তিনি বিশ্বাস করিতেন, বর্ত্তমানের ভুলভ্রান্তি, অত্যাচার অনাচার—ভবিষ্যতে দূর হইবে ও মানুষ তাহার যাহা প্রাপ্য তাহা লাভ করিবে। সেই কথা মনে করিয়া মানুষকে বর্ত্তমানে কাজ করিয়া যাইতে হইবে—"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে।"

কৃষ্ণদাসের কাজের বাহুল্য ছিল, পারিবারিক জীবনও দুঃখকষ্টশোকশূন্য ছিল না। তথাপি তিনি অবিচলিতভাবে আপনার কর্ত্তব্য পালন করিয়া গিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন; অর্থ ও সম্মান তাঁহাকে সে বিষয়ে কোনরূপ পরিবর্ত্তন করাইতে পারে নাই। গল্প আছে, এক বার হেনরী হ্যারিসন পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়া তাঁহার গৃহে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বোধ হয়, তিনি অশ্বারোহণে কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে কোন স্থান পরিদর্শনের পরে প্রত্যাবর্ত্তন পথে তাঁহার গৃহে গিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বাহন অশ্ব কোথায় রাখিয়া আসিয়াছেন জিজ্ঞাসায় যখন হ্যারিসন বলেন, কৃষ্ণদাসের গৃহদ্বারে এক জন ভৃত্য বা শ্রমিক ছিল—তিনি তাহাকেই ঘোড়া ধরিতে বলিয়া আসিয়াছেন, তখন কৃষ্ণদাস চঞ্চল হইয়া গৃহদ্বারে গমন করেন এবং হ্যারিসনকে বলেন, ঐ ব্যক্তি তাঁহার পিতা। হ্যারিসন লজ্জিত হইয়া ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। পিতৃভক্ত কৃষ্ণদাস কখনও পিতাকে তাঁহার অভ্যস্ত বেশ ও ব্যবহার বর্জ্জন করিতে বলেন নাই।

কৃষ্ণদাস মনে করিতেন—তিনি জনসাধারণের এক জন—তাহাদিগের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তাহাদিগের বিশ্বাসভাজন—তাহাদিগের কাজে জীবন উৎসর্গ করিতে পারিলে মনে করিবেন—জীবন সার্থক হইয়াছে। জনসাধারণের আনন্দবিধান জন্য প্রতি বৎসর কাঁসারী পাড়া হইতে যে "সঙ" বাহির হইত তিনি তাহার জন্যও সাহায্য প্রদানে কার্পণ্য করিতেন না।

কৃষ্ণদাস স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু তিনি সমাজ-সংস্কারের বিরোধী ছিলেন না। যে সংস্কার সতর্কতা সহকারে ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়, তিনি তাহার সমর্থন করিতেন।

তিনি উচ্চ-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন—এমন কি উচ্চ-শিক্ষার ক্ষতি করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের প্রস্তাব তাঁহার নিকট আদর লাভ করিত না।

যোগ্যতাহেতু ও ব্যবহারগুণে তিনি ভারতীয়দিগের মত বিদেশীদিগেরও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন।

কিছুদিন রোগ ভোগ করিয়া ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই কৃষ্ণদাস লোকান্তরিত হ'ন। তখন তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসর মাত্র। এই অল্পকালের মধ্যে—২৩ বৎসর কার্য্যকালে তিনি সর্ব্বত্র সম্মানিত হইয়াছিলেন।

যে দরিদ্র বালক এক দিন অর্থাভাবে বিদ্যালয়ে উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিতে বা আবশ্যক পুস্তক ক্রয় করিতে পারে নাই—অর্থাভাবে যাহার সংবাদপত্র পাঠের

আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা দুঃসাধ্য ছিল—যে সামান্য চাকুরীতে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল—সেই বালক অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জন করিয়া বরেণ্য হইয়াছিল। যাঁহারা সমাজে ধনের ও সম্মানের জন্য প্রসিদ্ধ তাঁহারা কৃষ্ণদাসের গৃহে আসিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেন। অথচ দরিদ্রের জন্য তাঁহার দ্বার অবারিত ছিল। তিনি প্রসিদ্ধ কবি গ্রের সুবিদিত উক্তি—নিজ শ্রমে ব্যর্থ করিয়াছিলেন—

"Chill penury repress'd their noble rage
And froze the genial current of the soul."

মানুষ যদি শ্রমকাতর না হয় এবং তাহার উন্নতির আকাঙ্ক্ষা যদি অনির্বাণ করিতে পারে, তবে সে যে সকল বাধা—সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া জয়ী হইতে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন—বাঙ্গালীদিগের মধ্যে কৃষ্ণদাস পাল তাঁহাদিগের অন্যতম। তিনি বিপদে অকুতোভয়, কার্যসিদ্ধিতে কৌশলী, ভাষণে মিষ্ট, ব্যবহারে মিষ্ট ছিলেন—উচ্চ চিন্তাধারার পক্ষে অনাড়ম্বর জীবন যে বাধার সৃষ্টি করে না, তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

এক হিসাবে কৃষ্ণদাস তাঁহার দেশবাসীর জন্য—বিশেষ দরিদ্র ও অবসাদিত সম্প্রদায়ের তরুণদিগের জন্য আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। সেই আদর্শ আমাদিগের প্রাচীন সমাজের আদর্শ—নূতন সমাজের জন্য তাহার প্রয়োজন সকলেই অনুভব করিবেন ও করিতেছেন। আত্মশক্তিতে প্রত্যয়, দৃঢ় সঙ্কল্প, শ্রমে আগ্রহ, উত্তেজনার সময় ধৈর্য্য—এই সকল মানুষকে সর্ব্বাবস্থায় সাফল্যলাভে সাহায্য করিয়া জয়ী করে।

বিজ্ঞানী হামফ্রি ডেভি

মোহিত দত্ত

বিজ্ঞানসাগরে অবগাহন করতে করতে শরতের মেঘের মত মন ভেসে যায় সুদূর প্যানজ্যান্সের মার্কেট স্কোয়ারে। স্কোয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে শাদা মার্বেল পাথরের তৈরী বিজ্ঞানী হামফ্রি ডেভির উদাত্ত প্রতিমূর্তি। আর সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূরের কেনেডা শহরের সমাধি উদ্যানের সাইপ্রেসকুঞ্জে মর্মর-জাগানো হাওয়ার যেন ভেসে আসে একটি অতৃপ্ত আত্মার আকুল দীর্ঘশ্বাস। মনের বেলাভূমিতে ঘটনার ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ে।.....

প্রায় একশো সত্তর বছর আগেকার কথা। কর্ণওয়ালের প্যানজ্যান্স তখন আজকের মত এমন কলগুঞ্জনমুখর হয়ে উঠেনি। শিল্পে, বাণিজ্যে আর কল-কোলাহলে মুখর হয়ে উঠেনি তার পথ, ঘাট, মাঠ, প্রান্তর—পাহাড় আর বনভূমি। মাউন্টস্ বে'র মাথার উপরে দাঁড়িয়ে সুন্দরী প্যানজ্যান্স। দক্ষিণ-পশ্চিমে ইংলিশ চ্যানেলের নীল জলরাশি; আর একদিকে ঘিরে রয়েছে আটলান্টিকের অপার বিস্তার। উপরে নীল আকাশের শান্ত নিঃসীম নীলিমা। এমনি অপরূপ এই প্যানজ্যান্সের নিবিড় নিভৃত পথে পথে ঘুরে বেড়ায় একটি অদ্ভুত ছেলে—নাম তার হামফ্রি ডেভি। ক্রান্ত মধ্যাহ্নের আবেশে স্বাধিল হয়ে উঠেছে প্যানজ্যান্স। রাস্তার ধারে ধারে হুষর্ণ আর ক্যামেলিয়ার ঝোপ। মধুর একটা মৃদু গন্ধ ভেসে আসে। ভারি ভালো লাগে ডেভির। মৃদু হাওয়া বয় পাতার বুকে পুলকের শিহরণ জাগিয়ে। ফসলের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পথের ধারের মাঠে কাজ করে চলে কৃষাণেরা। এ ঘাসের বুক থেকে ও ঘাসের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা সবুজ গ্রাসহপার। বাঃ! কী চমৎকার! কী মজা। খুসীতে হাততালি দিয়ে উঠে ছেলেটি। এগিয়ে চলে ডেভি। এবার ক্লান্তি এসেছে তার সমস্ত চেতনায়। পা দুটো যেন আর চলতে চায় না। পথের ধারেই দাঁড়িয়ে একটি উইলো গাছ। একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে সে। না, ধারে কাছে কেউ কোথাও নেই। আস্তে আস্তে নিজেকে ঘাসের বিছানায় বিছিয়ে দিলে। আঃ, কী আরাম! নীল আকাশে শাদা শাদা মেঘেরা ভেসে চলেছে তো চলেইছে, দূরের একটা পীচ গাছের শাখা থেকে ভেসে আসছে নাইটিঙ্গেলের সুর। মৃদু হাওয়া বয়ে আনছে মার্টেলের মৃদু-মধুর গন্ধ। আনন্দের বন্যায় প্লাবিত হয়ে যায় ডেভির মন, আর তার মনে আশ্চর্য একটি কবিতার জন্ম হতে থাকে। এমনি আরো কতবার হয়েছে। এই পৃথিবীর ফুল, ফল, লতা, পাতা, পাহাড়, নদী, বনভূমি—সবই ভারি ভালো লাগে তার। আবেশে স্বপ্ন ঘনায় তার মনে। ধীরে ধীরে কখন ঘুম এসে চুম্বন দিয়ে যায় তার চোখের পাতায়, টেরই পায় না সে। নাইটিঙ্গেল পাখীটা তখনও গান গেয়ে চলেছে দূরের পীচগাছে।...

১৭৭৮এর ১৭ই ডিসেম্বরের কোন এক শীতার্ত তুষারঝরা মুহূর্তে সুন্দরী প্যানজ্যান্সেই প্রথম পৃথিবীর ধূসর আলোয় চোখ মেলে চেয়েছিল এই অদ্ভুত ছেলেটি আমাদের হামফ্রি ডেভি। দিন ভেসে চলে শরতের মেঘের মত। তুষার ঝরে, বরফ জমে। মার্চ এপ্রিলের কলহাস্যে নীলাভ বরফ গলে গলে যায়। বরফগলা জলে সতেজ হয়ে ওঠে সুন্দর সবুজ ঘাস, কোপ, গুল্ম। দিন আসে আর যায়। রাত্রিও তার অন্ধকার পক্ষছায়ায় পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে দিয়ে দিয়ে যায় আর আসে। আর প্রকৃতির সৌন্দর্যমুগ্ধ ডেভিও বর্ষ অতিক্রম করে করে চলে। স্কুলে ভর্তি হয় কিন্তু পড়াশুনায়

তেমন মন বসেনা; তাই কৃতিত্বও দেখাতে পারে না তেমন করে। প্যানজাসে কিছুদিন পড়াশুনা করবার পর তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় টুরোর গ্রামের স্কুলে। স্কুল ছাড়বার পর বেকার দিনগুলো কেটে যায় প্যানজাসের পথে ঘুরে ঘুরে, নীল আকাশের দিকে চেয়ে চেয়েকবিতা রচনা ক'রে আর চমৎকার গল্প বলে বলে। নয় বছর বয়সের সময় থেকেই ডেভি থাকত জন টনকিন্ নামে এক ভদ্রলোকের কাছে। বেশ হেসে খেলেই দিনগুলো তার বয়ে চলেছিল। কিন্তু ষোলবছর বয়সের সময় হঠাৎ বাবাকে হারিয়ে একেবারে মুষড়ে পড়ল ডেভি। আকুল কান্নায় ঝাপ্‌সা হয়ে এল তার চোখের দৃষ্টি। মনের গভীরে বেদনার মেঘ ঘনীভূত হয়ে উঠে। কেবলি কান্না পায়। বাবার কাঠখোদাইএর যন্ত্রগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে—আর কেবলি কাঁদে। ধীরে ধীরে নিজেকে তৈরী করে নেয় ডেভি। এমনি করে কাঁদলে তো তার চলবে না। তাকে যে দৃষ্টি প্রসারিত করে দেখতে হবে পৃথিবীর প্রান্তসীমা। দুরন্ত ঝড়ের ঝাপ্টাকে প্রতিরোধ করে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে কঠিন মৃত্তিকার উপর। প্রতিবেশীরা এসে পরামর্শ দেয়, তার বাবার ব্যবসাই আরম্ভ করবার জন্যে। কিন্তু ডেভি তার মনের কাছ থেকে স্বীকৃতি পায় না খুঁজে। চুপচাপ ঘুরে বেড়ায় প্যানজাসের পথে পথে। কি সে ভাবে, সেই জানে। এমনি সময়ে ডেভি একদিন বোয়লেজ নামে প্যানজাসের এক ডাক্তারের নজরে পড়ে গেল। তিনি তাকে নিযুক্ত করলেন তাঁর একজন শিক্ষানবিশ হিসাবে। কাজটা বেশ পছন্দ হয় ডেভির। বেশ লাগে যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে। হঠাৎ এক সময় কোন এক শুভমুহূর্তে তার মনের মণিকোঠায় এসে পৌঁছয় মহাসাগরের আহ্বান। তাকে বড়ো হতে হবে। শুধু দিন যাপনের, শুধু প্রাণধারণের গ্লানির উর্ধ্বে তাকে উঠতে হবে। তাকে দেখতে হবে বিশ্বের বিস্তার। জানতে হবে তার অন্তরের অন্তর্লীন বার্তাকে। কিন্তু শুধু সন্দেহ জাগে মনে। এর জন্যে যে শিক্ষার প্রয়োজন তাতো তার নেই। তবে?... কিন্তু হতাশার নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ে না ডেভি। শিক্ষানবিশির ফাঁকে ফাঁকে যে অবকাশটুকু পাওয়া যায়—সেই অবকাশটুকুতেই সে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে পড়াশুনার মধ্যে। যেমন করেই হোক লেখাপড়া তাকে শিখতেই হবে ভাল করে। যন্ত্রপাতি ও ঔষধপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি তার একটা অদ্ভুত আকর্ষণ জমে উঠে। প্রকৃতির বহিঃসৌন্দর্য ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায় তার মনের দিগন্ত থেকে। প্রকৃতির আন্তর রহস্যই এবার তাকে উন্মনা করে তোলে। এই রহস্য তাকে উদ্‌ঘাটন করতে হবে। এবার নাইট্রিজেনের সুরে আর মার্টেলের গন্ধে আর ঘুম পায় না তার—আবেশে স্বপ্নিল চোখে আর পুরনো স্বপ্ন ঘনায় না এমন কি কর্পক্রেকের কর্কশ শব্দেও বিক্ষিপ্ত হয় না তার মন। কেবল পরীক্ষা করে চলে।...

ডেভির জীবনে ১৭৯৯ একটি স্মরণীয় বৎসর। উনিশবছর বয়স তখন তার। এই সময় বিশ্ব বিখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী লাভোয়সিয়র ও নিকলসনের রসায়ন বিজ্ঞানের বইগুলো এসে পৌঁছয় তার হাতে। বই-গুলোর অন্তরে লীন হয়ে যায় ডেভি। মনের বেলাভূমিতে আনন্দের ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ে। রসায়ন-বিজ্ঞানের তারে তার জীবনের সুর বেঁধে নিতে চায়। নতুন করে আবার সুরু হয় তার বৈজ্ঞানিক গবেষণা। ছেলেবেলার আনন্দঘন দিনগুলো হারিয়ে যায় কর্মমুখরতার অন্তরালে। এবার থেকে শুধু অনুসন্ধান— অনুসন্ধান আর অনুসন্ধান। জন টনকিনের চিলেকোঠায় নির্জনে চলে তার গবেষণা। যখন তখন অপ্রত্যাশিত ভাবে ভেসে আসে বিস্ফোরণের আওয়াজ। এই সময়ে ডেভি পরিচিত হলো ডাক্তার বেডোজের সঙ্গে। ডেভির প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে, ডাক্তার বেডোজ তাকে ব্রিষ্টলে তাঁর নব-প্রতিষ্ঠিত নিউম্যাটিক মেডিকেল ইনষ্টিটিউসনের তত্ত্বা-বধায়ক নিযুক্ত করলেন। সুতরাং এবার তাকে যেতে হবে ব্রিষ্টলে। আনন্দের উত্তেজনায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়

ডেভির সমস্ত সত্তা। শহর ব্রিষ্টলের আহ্বানে এসে পৌঁছয় তাঁর মনের মণিকোঠায়। স্বপ্নের ঢেউ ভেসে আসে লণ্ডন থেকে ইউরোপ থেকে—সমস্ত পৃথিবীর প্রান্ত থেকে। বুকের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আনন্দের অনুরণন নৃত্যায়িত হতে থাকে। পৃথিবীর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে ডেভি। তার প্রতিভা সীমায়িত হয়ে থাকবে না প্যানজাল্সের এই পরিধির মধ্যে। বন্দী হয়ে থাকবে না কর্ণওয়ালের সীমার মধ্যে। তা ছড়িয়ে যাবে ব্রিষ্টল থেকে লণ্ডন, লণ্ডন থেকে ইউরোপে—ইউরোপ থেকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে। পুলকের বর্ষাধারায় অভিসিক্ত হয়ে যায় তার অন্তর-সত্তা। তবুও ব্যথার মর্মর জাগে মনে। যাবার বেলায় ক্ষণিকের জন্যে বিভ্রম জাগে চিত্তে। এই সুন্দরী প্যানজাল্স ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে ব্রিষ্টলে। একটা অব্যক্ত আকুল কান্নার ঝড় গুমরে গুমরে উঠে। দূরের কি একটা গাছ থেকে ভেসে আসে ক্রিকেটের ডাক। প্যানজাল্সের দুটু হাওয়ার পরশ লাগে ডেভির চুলে, মুখে—মনে। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। তবু যেতেই হবে। 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ী—বেলা দ্বিপ্রহর'। দূর থেকে ভেসে আসে মহাসাগরের আহ্বান। ব্রিষ্টল, লণ্ডন, ইউরোপ !.....

• • •

১৭৯৮-এর শরৎকালে ডেভি এসে পৌঁছলেন ব্রিস্টল সহরে। কর্মমুখর দিনগুলো এগিয়ে চলে অভ্রান্ত গতিতে। ল্যাবরেটরীর স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকেন ডেভি। কিন্তু বাস্তবে স্বপ্নে সংঘাত বাধে না। বিজ্ঞান-কল্পনার আকাশ পথে তাঁর মন পাখা মেলে উড়ে বেড়ায়। ক্ষণে ক্ষণে বিজ্ঞানী চিত্ত বাস্তব থেকে কল্পনায় —কল্পনা থেকে বাস্তবে কেবলি বিহার করে চলে। যন্ত্রপাতিগুলো গুঞ্জন করে ওঠে। কাঁচের শিশির বিচিত্র রঙিন জিনিষগুলো হাতছানি দিয়ে ডাকে আর ডাকে। ডেভি হারিয়ে যান—হারিয়ে যান বিজ্ঞানের অতলস্পর্শ গহন গভীরে। এখানে এই ব্রিস্টলের ল্যাবরেটরী থেকেই সুরু হয় তাঁর আবিষ্কার জীবনের সত্যিকারের পথ পরিক্রমা। ব্রিষ্টলে আসার পরের বছরই প্রকাশিত হয় তাপ ও আলোক সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত মৌলিক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধ প্রকাশের পেছনে ছিল তাঁর কর্ণওয়ালের গবেষণা। তাঁর প্রথম সার্থক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হল—ঘাস, বেতস ও অন্যান্য শস্যের বহিরাবরণে সিলিকা নামে রসায়নিক পদার্থের অবস্থান। এই সময়ে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী প্রিষ্টলি আবিষ্কৃত নাইট্রাস অক্সাইডকে বিজ্ঞানীরা একটা বিষ গ্যাস বলে মনে করতেন। ডেভি পরীক্ষা করতে করতে সাহস করে একবার এই গ্যাস শুঁকলেন। দেখলেন, শুঁকতে বেশ চমৎকার লাগে। কেমন একটা অপূর্ব অথচ আশ্চর্য আনন্দের অনুভূতি জাগে। ডেভি খুব খুশী হয়ে উঠেন। হাসির দীপ্তিতে তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। কিন্তু ডেভি এই গ্যাসের ক্রিয়ায় অজ্ঞান হয়ে যান। তাঁর যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখনও মুখে তাঁর হাসির আভা, আর স্বপ্নিল চোখে নীল স্বপ্ন।...ডেভি তাই এই গ্যাসের নাম দিলেন 'লাফিং গ্যাস'। কিন্তু শুধু পরীক্ষা আর নামকরণ করেই তিনি ক্ষান্ত রইলেন না। বিশ্বের দরবারে তাঁর বার্তা পৌঁছে দেবার জন্যে তিনি তাঁর প্রবন্ধ 'Researches, Chemical and Philosophical, chiefly Concerning Nitrous Oxide and its Respiration' প্রকাশ করলেন ১৭৯৯এর ৯ই এপ্রিলে। তাঁর এই গবেষণার সাফল্যের সানন্দ স্বীকৃতি এল বিজ্ঞানী সমাজের কাছ থেকে। তারি পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে লণ্ডনে নব-প্রতিষ্ঠিত 'রয়াল ইনষ্টিটিউসনে' রসায়নের লেকচারার ও ল্যাবরেটরীর পরিচালক নিযুক্ত করা হল ...আবার আনন্দের ঢেউ-এ ঢেউ-এ মথিত হয়ে যায় ডেভির অন্তর সত্তা। তাঁর লণ্ডনের স্বপ্ন কি বাস্তবে রূপায়িত হয়ে আসছে? ব্রিস্টলের স্বপ্ন তাঁর সার্থক হয়েছে। এবার লণ্ডন। তারপর ইউরোপ; তারপর? আনন্দের আতিশয্যে বেরিয়ে এলেন বাইরে। কান্ত

কুঞ্জন শান্ত নিজন সন্ধ্যাবেলা'। একা একা পথে পথে ঘুরে বেড়ালেন ডেভি। বড়ো ভালো লাগছে আজ এই ব্রিস্টলের সন্ধ্যা। আর ক্ষান্তকূজন নির্জনতা। কর্ণওয়াল ছেড়ে আসবার সময়ও এমনি ভালোই তাঁর লেগেছিল। কিন্তু এই ভালো লাগার সঙ্গে সঙ্গে একটা বেদনার্ত অনুভূতিও মনে জাগে। কেন এমন হয় তাঁর? ব্রিস্টলের মায়া!' তাঁর গবেষণামন্দিরের অব্যক্ত আকুল পিছু ডাক।' ব্রিস্টল তাঁকে ডাকছে। এমনি প্যানজাল্সও একদিন তাঁকে ডেকেছিল। ডেভির কবি আর বিজ্ঞানী মনে সংঘাত বাধে। কবি-মন নিছনের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে থাকতে চায়; কিন্তু বিজ্ঞানী মন এগিয়ে যেতে চায় মহাসাগরের আহ্বানে। বিজ্ঞানী মনই জয়ী হয়। ডেভি এসে পৌঁছলেন লণ্ডনে—পৃথিবীর জ্ঞানী, গুণী, শিল্পী, সাহিত্যিক আর বৈজ্ঞানিকের লীলানিকেতন। লণ্ডনের রয়াল ইনষ্টিটিউসনে প্রথম দিনের প্রথম বক্তৃতায়ই ডেভি সকলের চিত্ত জয় করে নিলেন।.....

পরীক্ষামূলক রসায়ন বিজ্ঞানের গবেষণা তখন সবেমাত্র সুরু হয়েছে। এই সময়ে ডেভি আবিষ্কার করলেন যে বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিয়ে রাসায়নিক পদার্থকে বিশ্লেষণ করা যায়। তাঁর এই অপূর্ব আবিষ্কার সমগ্র বিজ্ঞানী সমাজে নিয়ে এল অভূতপূর্ব প্রাণস্পন্দন: ডেভির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল দিক হতে দিগন্তরে। গবেষণা মন্দিরের নির্জন কক্ষে দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেন। বিজ্ঞানসাধনার গহন গভীরে হারিয়ে যায় তাঁর দৈনন্দিন জীবনের আর আর প্রয়োজন। সকাল কখন দুপুর হয়, দুপুর কখন বিকেলে গড়িয়ে যায়—খেয়ালই থাকেনা বিজ্ঞান-পাগল বিজ্ঞানীর, কিন্তু শুধু গবেষণা করলেই তো চলে না। চলে না শুধু বিজ্ঞানের অন্তরে লীন হয়ে যাওয়ায়—তার মাঝে হারিয়ে যাওয়ায়। সেই গবেষণাগুলোকে রূপায়িত করে তুলতে হয় কালির রূপরেখায়। তাই দিনের ক্লান্তির শেষে বিজ্ঞানের হাজারো পাওনাকে চুকিয়ে দিয়েও রাত্রির নিবিড়তায় আবার বসতে হয় প্রবন্ধ রচনায়; বিজ্ঞান সাহিত্যের নতুন উপকূলে আবার ক্লান্ত তরণী ভিড়াতে হয়। তাতেও বিরতি নেই! সেই প্রবন্ধ আবার পাঠাতে হয় রয়াল সোসাইটিতে; বক্তৃতা করে বুঝিয়ে দিতে হয় সব কিছু। তারপরেও রয়েছে রয়াল ইনষ্টিটিউসনের কাগজ 'জার্ণালে'র যুগ্ম সম্পাদকের কাজ।...সময় এগিয়ে চলে জীবনের সাথে পা ফেলে ফেলে। কিন্তু কোনদিন কোন মুহূর্তে ক্ষণিকের জন্যেও বিশ্রান্তি আসে না তাঁর মনে। বিরক্তিতে উঠে যেতে ইচ্ছে হয়না কখনো।.....

১৮০১এর জুন মাস। রয়াল সোসাইটির হলঘর বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের ছাত্রদের সমাবেশে গুঞ্জ হয়ে রয়েছে। আজ এখানে ডেভি বক্তৃতা করবেন, বিদ্যুৎ রসায়ন সম্বন্ধে তাঁর নতুন গবেষণার উপর। যথাসময়ে তিনি পাঠ করলেন তাঁর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ An account of some Galvanic Combinations formed by an arrangement of Single Metallic plates and fluids. এর দুই বছর পরে তাঁর গবেষণার পুরস্কার স্বরূপ তিনি রয়াল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন। এই সদস্য থেকে ক্রমে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী ও জীবনের শেষের দিকে প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত হয়েছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানেই ডেভির বিজ্ঞান প্রতিভা চরম উৎকর্ষ লাভ করে। ডেভির যা কিছু প্রতিষ্ঠা, যা কিছু কৃতিত্ব—সমস্ত কিছুর মূলেই রয়েছে এই বিশ্ববিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের অবদান। রয়াল সোসাইটিকে বাদ দিয়ে যেমন ডেভির পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, তেমনি ডেভিকে বাদ দিয়েও সম্ভব নয় রয়াল সোসাইটির পরিচয় দেওয়া। ডেভি আপনার পরিশ্রম আর প্রতিভার নির্যাস দিয়ে সযত্নে করে তুলেছিলেন এই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানটিকে। রয়াল সোসাইটির সঙ্গে সঙ্গে ডেভির নাম পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় প্রতি সপ্তাহে তিনি একটি করে নতুন আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেছেন, আর তা দেখবার জন্যে বিপুল

জনসমাগম হয়েছে। ১৮০৩ ও ১৮০৪এ তিনি রয়াল সোসাইটিতে যথাক্রমে পড়ে শুনালেন 'On Astringent Vegetables and their operation in Tanning', 'An Account of some Analytic Experiment on Wavellite' ও 'On the Method of Analysing Stones Containing a fixed Alkali by Boracic Acid'.

১৮০৬এর নভেম্বরে প্রথম বাকেরিয়ান বক্তৃতায় তিনি আবার বিদ্যুৎ রসায়ন সম্বন্ধে তাঁর নতুন গবেষণার কথা ঘোষণা করলেন। তিনি দেখালেন যে, বিদ্যুৎ বিশ্লেষণে এসিডগুলো যায় পজিটিভ পোলের দিকে আর ক্ষারক বা বেসগুলো যায় নেগেটিভ পোলের দিকে। তিনি আরও জানালেন যে, রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক আকর্ষণের মূল কারণ একই। বিদ্যুৎ-রসায়ন সম্বন্ধে তাঁর এই গবেষণার জন্যে ফ্রান্স তাঁকে পুরস্কৃত করল। অথচ সেই সময় ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের দারুণ যুদ্ধ চলছে। পুরস্কার পেয়ে ডেভি বলেছিলেন, "আমাদের এই দুই দেশ যুদ্ধমান বটে, কিন্তু পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।".....

ডেভির গবেষণার আগে ক্ষারক ল্যাবক্যালিগুলোকে মৌলিক পদার্থ বলে মনে করা হত। অবশ্য বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ল্যাভয়সিয়ে এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, ল্যাবক্যালাইন অক্সাইডগুলো হয়ত কোন অজানা ধাতুর অক্সাইড। সে যাই হোক, বিদ্যুৎ রসায়নের গবেষণায় কৃতকার্য হয়ে এবং ভল্টেইক ব্যাটারীর বিপুল বিশ্লেষণ ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ করে, তার উপর ল্যাভয়সিয়ের অনুমানে আকৃষ্ট হয়ে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে ডেভি চেষ্টা করলেন বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিয়ে অ্যালকালি বিশ্লেষণ করতে। তীক্ষ্ণধী বৈজ্ঞানিক নিজেকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দিলেন তাঁর এই গবেষণার কাজে। কিন্তু পরাজয়ের বেদনা নিয়ে ফিরতে হল না তাঁকে। বিজ্ঞান-ভারতী তাঁর গলায় পরিয়ে দিলেন সাফল্যের বরমাল্য। আবিষ্কৃত হ'ল সোডিয়াম ও পটাসিয়াম ধাতু। সেই দিন গবেষণার কৃতিত্বে ডেভি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলেন সম্পূর্ণভাবে। তাঁর এই আবিষ্কার সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেন তাঁর দ্বিতীয় বাকেরিয়ান বক্তৃতায়। এর পরেই তিনি হঠাৎ দারুণ ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রায় চার মাস ধরে অবিরাম সংগ্রাম চলে রোগের সঙ্গে। আরোগ্যলাভের পর আবার মেতে উঠলেন তাঁর গবেষণায়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে রয়াল সোসাইটিতে ঘোষণা করলেন তাঁর ম্যাগনেসিয়াম ও ট্রনসিয়াম আবিষ্কারের কাহিনী। কিন্তু তিনি এলুমিনা, সিলিকা ও জিরকনিয়াকে বিশ্লেষণ করতে পারলেন না। এই বৎসরই তৃতীয় বাকেরিয়ান বক্তৃতায় পটাশিয়াম, সালফার, ফস্ফরাস্ ও কার্বণের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর গবেষণার কথা প্রকাশ করেন। ১৮০৯এর নভেম্বরে চতুর্থ বাকেরিয়ান বক্তৃতায় প্রমাণ করে দেখালেন যে, অক্সিমিউরিয়াটিক এসিড একটি মৌলিক পদার্থ এবং তিনি তাঁর নাম দিলেন ক্লোরিন, আর মিউরিয়াটিক এসিড হল এই ক্লোরিন ও হাইড্রোজেনের একটি পদার্থ।...ডেভির খ্যাতি তখন শৈলশীর্ষে আরোহণ করেছে। ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজ তাঁকে এল.এল.ডি উপাধিতে ভূষিত করল। তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে ১৮১২র ৮ই এপ্রিলে প্রিন্স রিজেন্টও তাঁকে নাইট উপাধিতে সম্মানিত করলেন। এই বছরেই হঠাৎ এক অতর্কিত বিপর্যয়ে তাঁকে আবার দীর্ঘদিনের জন্য শয্যা গ্রহণ করতে হল। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ফ্রান্সে আবিষ্কৃত নাইট্রোজেন ক্লোরাইড নিয়ে গবেষণা করবার সময়ে হঠাৎ দারুণ বিস্ফোরণের ফলে তিনি চোখে অত্যন্ত আঘাত পান। কর্মমুখর আর আবিষ্কার পাগল বৈজ্ঞানিক বিছানায় পড়ে কেবল ছটফট করেন। দৈহিক যন্ত্রণা তাঁকে তেমন বিপর্যস্ত করতে পারে না। গবেষণা করতে না পারার বেদনাই তাঁকে অস্থির করে তোলে। কেমন একটা অসোয়াস্তি। ভালো লাগে না এমন নির্জীব হয়ে পড়ে থাকতে। একটা বিরক্তিকর গ্লানি আর অস্বস্তি আর অস্থিরতা।...

আরোগ্য লাভের পরই স্থির করলেন—এবার বেরুতে হবে বাইরে। সমস্ত স্বপ্নই তো তাঁর প্রায় সার্থক হয়ে এসেছে। ক্রিস্টল, লণ্ডন, ইউরোপ, এমন কি পৃথিবীর স্বপ্নও বুঝি সার্থক হয়ে এল! কিন্তু হৃদয়ের তৃপ্তি কই? তৃপ্তি কই তাঁর অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানী মনের? বিজ্ঞানভারতীর ডাক তো বারে বারেই এসে পৌঁছয় তাঁরে দ্বারে। কাব্যভারতীও আসন পেতে রয়েছেন মনের গোপনে। তাই বিজ্ঞান গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে চলে কবিতা রচনা। তাঁর কল্পনাপ্রবণ মনের মাধুরী মিশিয়ে সৃষ্টি করে চলেন কবিতার পর কবিতা। কিন্তু তবু অতৃপ্তি থেকে যায়। প্রাচীন রঙিন চিত্রের রং সম্বন্ধে গবেষণা করবার জন্যে বাইরে তাঁকে বেরুতেই হবে। তাই ১৮১৩এর অক্টোবরে স্ত্রী এপ্রীস ও তাঁর সুযোগ্য সহকারী মাইকেল ফ্যারাডেকে নিয়ে এসে পৌঁছলেন ফ্রান্সে। ফরাসী বৈজ্ঞানিকেরা তখন আয়োডিনকে একটা যৌগিক পদার্থ বলে মনে করতেন। আয়োডিন সম্বন্ধে কিছু গবেষণা করে তিনি চলে এলেন মন্টপেলিয়েরে। সেখান থেকে গেলেন ইটালী। ইটালীর জেনোয়া আর ফ্লোরেন্সে আবার কিছুদিন আয়োডিন সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়ে তিনি চলে গেলেন রোমে। সেখান থেকে এসে পৌঁছলেন নেপল্‌সে। এখানে প্রাচীন চিত্রশিল্পীদের আঁকা রঙিন চিত্রের বিভিন্ন রঙের নমুনা সংগ্রহ করে ১৮১৫এর এপ্রিলে তিনি আবার ফিরে এলেন লণ্ডনে।...

১৮১৯ সাল ডেভির বিজ্ঞানী জীবনের সব চাইতে স্মরণীয় বৎসর। এই সময়ে তিনি আবিষ্কার করলেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দান, অগ্নিনিরোধ প্রকৃতি ও বিশ্ববিখ্যাত খনিশ্রমিকের বন্ধু সেফ্‌টি-ল্যাম্প। তখন প্রায় প্রতিদিন নিউক্যাসেলের কয়লা খনি থেকে 'ফায়ার ড্যাম্পের' বিস্ফোরণে অসংখ্য দুর্ঘটনার খবর আসছে। শত শত অসহায় শ্রমিক অকালে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে অন্ধকার অন্ধগহন গহ্বরে. কেউ প্রতিকার করতে পারছে না এর। ডেভির মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। কেমন করে এর প্রতিকার করা যায়? কেমন করে? এমনি ধারা কিছুতেই চলতে পারে না। যেমন করেই হোক এই দুর্ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবেই। শত শত মৃত শ্রমিকের অসহায় বেদনাবিধুর স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় পরিজনের দীর্ঘশ্বাস আর আকুল কান্না ভেসে আসে নিউক্যাসেল থেকে—লণ্ডনের বস্তি থেকে। মৃত শ্রমিকের ক্ষত বিক্ষত দেহ তাঁর কল্পনায় ভেসে উঠে। অস্থির হয়ে ওঠেন ডেভি। বিজ্ঞান সাধনার চরম পরীক্ষা আজ তাঁর সামনে। মানুষের দুঃখ বেদনাই যদি দূর করতে না পারল তবে কি প্রয়োজন বিজ্ঞানের? কি প্রয়োজন তাঁর এই বিজ্ঞান সাধনার? ডেভি নিজেকে অপমানিত বোধ করেন। এতদিন কি করেছেন তিনি? দরদী ডেভির মন আকুল হয়ে উঠে। চঞ্চল হয়ে ওঠে সমস্ত সত্তা। কিন্তু তবু শান্ত হতে হয়। আবেগে আকুল হলে তো বিজ্ঞানীর সাধনা চলে না। চলে না মানব হিতৈষী গবেষকের গবেষণা। চিত্ত শান্ত করে তাই তিনি স্থির করেন—গবেষণা চালিয়ে যাবেন যতদিন না সাফল্যের সায়াহ্নে এসে পৌঁছয় তাঁর সাধনা। নিউক্যাসেল খনির মালিকদের অনুরোধ করে পাঠান—ওই বিস্ফোরক গ্যাস অর্থাৎ ফায়ার ড্যাম্প লণ্ডনে তাঁর ল্যাবরেটরীতে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। যথাসময়ে সেই গ্যাস এসে পৌঁছয়। তারপর গবেষণা চলে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেন ডেভি, নিজের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যায় নিজেরি কাছে। পরীক্ষার শেষ প্রান্তে এক স্বর্গীয় দীপ্তি আর পুলকে উদ্ভাসিত হয়ে যায় তাঁর মুখ। বিজ্ঞান বিজয়ী। দুর্ঘটনাকে সম্পূর্ণভাবে জয় করে ফেলেছেন বিজ্ঞানী ডেভি। এই আবিষ্কারে তাঁর প্রশংসায় উদ্বেল হয়ে উঠল পৃথিবীর সমগ্র মানব সমাজ। আর কিছু নয়, শুধু এই 'সেফ্‌টি ল্যাম্প' আবিষ্কারের জন্যেই ডেভি পৃথিবীতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কিন্তু বিজ্ঞান-সাধক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে ডেভির শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার হল বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডে।...

এত আবিষ্কারের পরেও এই অসাধারণ বিজ্ঞানীর ক্লান্তি আসেনা দেহে অথবা মনে। প্রকৃতির গোপন কথা থেকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ভেসে আসে। আর গবেষণা মন্দিরের নির্জন কক্ষে ডেভি কেবল তার উত্তর খুঁজে বেড়ান।...

ডেভির ছিল একটি অপূর্ব কবি মন। তিনি যে উত্তরজীবনে এতবড় একজন বিজ্ঞানী হবেন এবং একেবারে ছেলেবেলায় কোনদিন কল্পনাও করতে পারেন নি। বিজ্ঞানের আলোক রশ্মি অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই এসে প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর উপর। তাঁর মনটা ছিল অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ। তাঁর লেখা কবিতাগুলোই তার প্রমাণ দেয়। আর বক্তা হিসেবেও তিনি ছিলেন পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ বক্তার সমতুল্য। যদিও কণ্ঠ-

স্বরটি তাঁর তেমন মধুর ছিল না—কিন্তু বাচনভঙ্গীটা ছিল অপূর্ব। তাছাড়া বক্তৃতার ভাষাটিও ছিল আশ্চর্য লালিত্য ভরমণ্ডিত। বিশ্ববিখ্যাত কবি কোলরিজ পর্যন্ত যেতেন তাঁর বক্তৃতা শুনতে। কোলরিজ নিজেই বলেছেন, 'I attend Davy's lectures to increase my stock of metaphors'.

লেখক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি যা লিখেছেন—একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে তা প্রত্যাশাই করা যায় না। হয়তো মনের মণিকোঠায় একজন শিল্পী ছিল বলেই এমনটি সম্ভব হয়েছে। আইজাক ওয়াল্টনের অনুকরণে 'Salmonia' অথবা 'Days of flyfishing' এবং 'Consolations in Travel' অথবা 'Last Days of a Philosopher'এর প্রতি পাতায় পাতায় রয়েছে তাঁর কবি মনের প্রশান্ত স্বাক্ষর। আর তাঁর বিজ্ঞানের বইগুলো ত অপূর্ব। 'Philosophical Researches' 'Elements of Agricultural Chemistry', 'Electro-chemical Researches', 'Elements of Chemical Philosophy'—এই বইগুলো পৃথিবীর বিজ্ঞান সাহিত্যের অক্ষতম সম্পদ।...

ডেভির মনটা ছিল প্রভাত সূর্যের মত আশার উজ্জ্বল। নৈরাশ্যকে ঘৃণা করতেন তিনি। তাঁর মত তাকুরী, কর্মতৎপর ও বিচক্ষণ গবেষক খুব কম দেখা যায়। অত্যন্ত অল্প সময়ে তিনি তাঁর পরীক্ষার সাফল্য শীর্ষে উন্নীত হতেন। তাঁর মতে 'Rapidity is power'—সেই শক্তি।—

অমানুষিক পরিশ্রমে এবার ডেভির স্বাস্থ্য একেবারে পড়ে। তবু তিনি হার মানতে চান না। অসুস্থ দেহ নিয়েই ল্যাবরেটরীতে যান। কিন্তু আর পারেন না। বুঝতে পারেন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার দিন এসে গেছে। এখন বিশ্রামই সবচাইতে আগে প্রয়োজন। কিন্তু তবু নিজের প্রয়োজনের দিকে তাঁর নজর নেই, খেয়াল নেই, চৈতন্য নেই। তাঁর জীবনে কোনদিনই ছিল না প্রসন্ন অবকাশ। কিন্তু আজ তাই একান্ত করে প্রয়োজন। গবেষণা মন্দিরের নির্জন কক্ষ থেকে জানালার ফাঁক দিয়ে ক্লান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেন, শীত এসে গেছে লণ্ডনে। হিমেল হাওয়া বইছে বাইরে। এবার ঝরবে তুষার—ঝরে পড়বে ধরণীর ধূলায়। হিমেল হাওয়ার স্পর্শে তিনিও কি ঝরে যাবেন? জীবনের সন্ধ্যা কি ঘনিয়ে এল তাঁর? কিন্তু এখনো যে অনেক কাজ বাকী—অনেক তথ্য যে এখনো রয়ে গেছে অনুদ্‌ঘাটিত?.....

তখন ১৮২৭ সাল। হঠাৎ সন্ন্যাসরোগের আক্রমণে আক্রান্ত হলেন ডেভি। ফলে বায়ু পরিবর্তনের জন্যে যেতে হল র‍্যাম্সগেয়ার। সেখান থেকে গেলেন সালজবুর্গে। কিন্তু অসুখ বেড়ে উঠল। শরতের শেষে একটু সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন লণ্ডনে। ১৮২৮এর শীতকালে গিয়ে পৌঁছলেন রোমে। কিন্তু সেখানে গিয়েও নিস্তার পেলেন না; আক্রান্ত হলেন পক্ষাঘাত রোগে। ডেভি বুঝলেন, আর তাঁর অব্যাহতি নেই। মৃত্যুর পদধ্বনি যতই এগিয়ে আসে, তিনি ততই ভুলে থাকতে চান পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় নেওয়ার কথা। বড়ো সুন্দর এই পৃথিবী—বড়ো মধুময় এর আকাশ, বাতাস, ফুল, ফল আর পাখীর গান। প্রকৃতির অন্তর রহস্য থেকে চোখ ফিরিয়ে আজ আবার ডেভি চেয়ে দেখলেন বাইরের নীল আকাশের নীলিমা, সাদা মেঘের স্তরকে স্তরকে আকাশের বুক ভরে উঠেছে। আপেলের বনে হাওয়া বয় শিরশির মর্মর ধ্বনি তুলে। দূরে নির্জন বনান্তের নীলরং।.....

তাঁর অসুখের খবর পেয়ে স্ত্রী ও ভাই ছুটে আসেন রোমে। তাঁরা ডেভিকে ভালোভাবে চিকিৎসা করাবার জন্যে নিয়ে আসেন জেনেভায়। কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা। ক্লান্ত পথিকের যাত্রাপথ শেষ হয়ে এসেছে। পথের শেষে পৃথিবীর ধূসর আলোয় দিনের শেষখেয়া পার হয়ে তাকে যেতে হবে—আর রেখে যেতে হবে তাঁর নত মস্তকের প্রণাম।.....

১৮২৯এর ২৯শে মে। মে মাসের সুন্দর হাওয়া বইছে পাইন, পপ্‌লার আর আপেলের বনে গুঞ্জনধ্বনি তুলে। কি একটা নাম না জানা পাখী ডাকছে অতি মিষ্টি সুরে। বাতাসে যেন ভেসে আসছে মাটেলের গন্ধ। বহু দূরের অসীম আকাশ বনরাজিনীলা পৃথিবীর শিয়রের কাছে নত হয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে ডেভির জীবনে নামল নীলসন্ধ্যা। স্বপ্নিল দুই চোখ বেয়ে ভেসে এল দিনশেষের শেষখেয়া।

ভার

শ্রীমতী সুনন্দা গুহ

দুপুরের রোদ মাথায় করে দরজায় কড়া নাড়তে নাড়তে বিরক্ততে গা জ্বলে যাচ্ছিল অসীমের। আচ্ছা কর্মভোগ যা হোক। অথচ না বেরিয়েও উপায় ছিল না, বিরক্ত ভাবে আবার কড়াটা খট্‌খট করে নাড়লো অসীম।

'কি ব্যাপার?' দুপুরের ঘুম চোখ থেকে মুছতে মুছতে কুঞ্চিত মুখে প্রশ্ন করলো বিনোদ বাগচী, আরে ঘোষ, এসো এসো, এই রোদ্দুরে!

বাইরের অন্ধকার ঠাণ্ডা ঘরে কৌচে বসতে বসতে কপালের ঘাম মুছলো অসীম।

বিনোদ বাগচী পকেট থেকে কুঞ্জী সিগারেটের একটা প্যাকেট বের করলো 'ঘোষ আখো, কি গেট আপ আর কি অদ্ভুত ফ্লেভার কোথায় থেকে পেয়েছি বলো তো।'

অসীম জাপানী মেয়ে আঁকা ছাই ছাই প্যাকেটের দিকে হাত বাড়ালো 'সুন্দরী জাপানীস্?

'খাস্, এ মার্কেটে পাওয়া যায় না। কাল এক জাপানী জাহাজের কলকব্জা তদারকের কাজে গিয়েছিলাম ক্যাপ্টেন খুশী হয়ে এই প্যাকেটটী হস্তান্তরিত করেছেন অবশ্য, বিনোদ বাগচী চোখ মটকে হাসলো, দিতে নাকি তাকে অনেক স্বার্থত্যাগ করতে হ'য়েছে। একটা টেনে দেখবে নাকি?

অসীমের ঠোঁটে একটা পাতলা হাসি ঝিলিক মারলো—'থাক্ ধন্যবাদ আমি তো অ্যাকোর্ড করতে পারবো না, মিছিমিছি অভ্যেস করে লাভ কি, বিনোদ বাগচী সিগারেটটা নিজের ঠোঁটে চেপে ধরে লাইটার ধরলেন, তা অবশ্য। আচ্ছা, তুমি কি করছ আজকাল, এয়ারওয়েজের কাজ ছেড়ে দিয়েছে শুনেছি। কর কি এখন?

অসীম একটুক্ষণ চুপ করে রইল, এই খুচখাচ রেডিও ফেডিও সারাই আর কি। তোমার কাছে একটু দরকারে এসেছিলাম আমি।

'দরকার?' বিনোদ বাগচী প্রশ্নাকুল হ'লেন—কি বিষয়ে?'

অসীমের কান দুটো গরম হয়ে উঠলো—'কিছুদিন আগে তোমার রেডিওগ্রাম সারিয়েছিলাম, বিলটা ক্লিয়ার করা হয়নি বাগচী।'

'বিল? বিনোদ বাগচী সাততলা বাড়ীর ছাদ থেকে সোজা মাটীতে পড়লেন, 'কবে রেডিও সারালে আবার তুমি?'

'তা অবশ্য অনেকদিন হ'বে, মাস ছয়েক আগে' অসীম মনে করাতে চেষ্টা করলো।

বিনোদ বাগচী এবার প্রচণ্ডভাবে হেসে উঠলো, 'ঘোষ, ইউ আর সিম্পলি পিকিউলিয়ার—সেই রেডিও সারাবার জন্য তোকে আমি পে করবো আর তুইও তাই নিবি?—আরে যা!'

অসীম মরীয়া হ'য়ে ঘাড় নাড়লো, 'আমাকে আজ তুমি অন্ততঃ পনেরোটা টাকা দাও। আমার বড্ড দরকার—আমার একজন আত্মীয়া হাসপাতালে—'

'আত্মীয়া' বিনোদ বাগচী একটু থতমত খেলো, 'কে, তোর কোন বৌদি?' অসীম অধৈর্যভাবে মাথা নাড়লো। 'তাদের অসুখে তোকে টাকা দিতে হ'বে কেন, 'তাদের ফাইনান্স করবার জন্য তো দাদারাই আছেন। ইনি আমার আত্মীয়া।'

'তোর আত্মীয়া! তুই আবার বিয়ে করলি কবে?' বাগচীর বিস্ময় ফুলছাড়া।

'আঃ বিয়ে নয়—দেরী করছিস কেন। টাকাটা মোর এখুনি দরকার।' অসীম অস্থির হয়ে উঠলো।

'মাই গুডনেস! যেন ইট ইজ এ লস্ত অ্যাফেয়ার—জুটলি কি করে এই বুড়ো বয়সে, অ্যাঁ? বিনোদ বাগচী অপরিমাণ কৌতূহলে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'প্রেম?' অসীম বিচিত্র হাসলো, 'সে তর্ক থাক্, টাকা দিতে পারবি?' এবার বিনোদ বাগচী গম্ভীর হ'লো, 'ঘোষ, তোমাকে খোলাখুলিই বলি—মাসের শেষ সপ্তাহ, এখন আমার হাত একেবারে খালি। লাইফ ইনস্যুরেন্সের প্রিমিয়াম বাকী, এমন কি লয়েডস এ আমার কারেণ্ট অ্যাকাউণ্ট একশোর নীচে পড়ে গেছে। আমার পক্ষে তাই—

অসীম একবার বাগচীর মুখে তাকালো—তারপর নেমে এলো রাস্তায়। পরের জন্ত, নিতান্ত অপরের জন্ত এই খামখা অপমান।

প্রেম? বাগচীর কথাটা মনে পড়তে দুঃখেও হাসি পেলো অসীমের। ভাগ্যিস বাগচী কণিকাকে দেখে নি। আর কি করে যে উড়ে এসে ঘাড়ে চেপে বসেছে সে আবার এক গল্প।

ষ্টেশন উত্তরপাড়ায় ঘটেছিল দুর্ঘটনাটা। হাতের থেকে ক্রাচটা ছিটকে পড়ে গেছে। অসীমের পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছিল মেয়েটা।

'আহা হা, ইস্ দেখুন তো এমন সাহস করতে হয়, দুহাতে মেয়েটাকে তুলে ধরতে ধরতে অসীম আক্ষেপ প্রকাশ করলো। মেয়েটার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। দুটী চোখ সন্তবিপদের কাপটায় ভীরু পাখীর মত বেপমুমান্।

ষ্টেশনের লোকজনতা এসে চারপাশে ভীড় করে দাঁড়ালো—কণিকা কথা বলতে পারছিল না—অসীম ওর হাতটা তুলে দেখতে পেলো কনুই থেকে অনেকটা জায়গা স্লাইডর্মে ঘষটানো খেয়ে ছড়ে গেছে—

'বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছেন দিদিমণি,' চায়ের দোকানের ছোকরা লক্ষ্মীকান্ত গলা বাড়ালো—'আস্ত দুই মানুষ চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে কাটা পড়ে—আপনি আবার ক্রাচ নিয়ে উঠতে গেছেন।'

এইবার কণিকা কথা বললো—ইশারায় দূরে ছিটকে পড়া ক্রাচটা দেখিয়ে বললো, 'আমি আর দাঁড়াতে পারছি না, আমাকে একটু বেঞ্চিতে নিয়ে বসান।' অসীমের কাঁধে ভর দিয়েই বেঞ্চে গিয়ে বসলো কণিকা। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, শিগ্‌গির একটু জল আনুন, পা-টা বেঁধে দিন দয়া করে।'

আর পকেট থেকে রুমাল নিয়ে কণিকার পায়ে বাঁধতে গিয়েই প্রথম লক্ষ্য করলো অসীম, কণিকার পায়ের একটা পাতা অস্বাভাবিক ভাবে দোমড়ানো আর সেই পায়েই আঘাত লেগে রক্ত ঝরছে।

ইস্স্' একটা অস্ফুট সহানুভূতির আক্ষেপ করে অসীম তার মুমাসকার মাত্র সাথী রুমাল দিয়ে পা-টা বেঁধে দিল। কিন্তু অনেক দেরী হ'য়ে গেছে অসীমের ফ্যাসাদে পড়ে। এখানে এক বাড়ীতে রেডিও সারাবার কথা চারটেতে। নমস্কার করে উঠে দাঁড়ালো অসীম 'আচ্ছা আসি তবে।'

কিন্তু ততক্ষণে কণিকার দুচোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এসেছে। মনে মনে বিরক্ত লাগলেও ভদ্রতা করে দাঁড়াতে হলো অসীমের, 'কি, খুব লাগছে কি?'

কণিকা প্রাণপণে ঠোঁট চেপে আবেগের কণ্ঠরোধ করতে চাইল, কিন্তু ওর গলা থেকে একটা ব্যথার আর্তনাদ বেড়িয়ে এল।

একটু রুক্ষভাবেই বললো অসীম, 'কোথায় যাবেন আপনি। একলা একলা ক্রাচ নিয়ে যেতে না পারলে অবশ্য আমি পৌঁছাতে পারি। কিন্তু আমার একটা জরুরী কাজ ছিল।'

তেমনি আবার কাঁদতে লাগলো কণিকা 'আমি যে উঠতে পারছি না, কলকাতায় যাবো কি করে?'

'একা একা এভাবে আসেনই বা কেন? এখানে

কি কাজ?' অসীমের বিরক্তি ততক্ষণ রাগের আকার ধরেছে।

'এখানে কাজ করি আমি, রিহ্যাবিলিটেশন ক্যাম্পে—

'ঠিক আছে—চোখ বুজুন, কিছু হয়নি আপনার। আমি পৌঁছে দেব আপনাকে। সেই থেকে সিন্ধবাদের গল্পের বুড়োর মত পরোপকারের দায় ঘাড়ে চেপে বসেছে অসীমের।

দোষের মধ্যে অসীম তার এক পরিচিত আর্ত সেবায়তনের ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল কণিকাকে।

ধুলো কাদা মাখা রুমাল খুলে বাঁধা পা-টা ভাল করে পরিষ্কার করে অনেকক্ষণ পরীক্ষার পর ডাঃ সরকার একটা অ্যান্টিটিটেনাস ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জে ভরতে ভরতে বল্লেন, 'ওকে এখানে দুয়েক দিন থাকতে হবে নইলে পা-টা সেপটিক হয়ে যাবে। কেউ মাড়িয়ে দিয়েছিল বুঝি?'

হ্যাঁ সেজন্যই ট্রেন ধরতে পারলাম না—তখন গাড়ী ছেড়ে দিয়েছিল কিনা।'

'ভাল করেননি ওরকম দুঃসাহস করে, তবে একটা ভাল হ'য়েছে আপনার পা-টা তো জন্ম থেকে বাঁকা মনে হয় না—তাই কি?'

কণিকা মমতাতুরে ওর দোমড়ানো পায়ের পাতার দিকে তাকালো 'না, জন্ম থেকে নয়।'

'তবে আমার মনে হয় একটা মেজর অপারেশন করলে পা-টা ভাল হয়ে যেতেও পারে—অবশ্য প্রব্যাবিলিটি—কিন্তু এটা আমি করে দেখতে চাই। অসীম, এঁকে আমার হাঁসপাতালে ভর্তি করে দাও।'

অসীম কংক্রিট বাঁধা ছাদের দিকে উর্ধ্বমুখে দাঁড়িয়েছিল, এবার হতাশভাবে হাত নেড়ে বল্লো 'আমাকে বলে কিছু হ'বেনা। উনি থাকতে পারবেন কিনা উনিই বলতে পারবেন।'

ডাঃ সরকার কণিকার দিকে চোখ ফেরালেন 'কি বলেন আপনি? পা-টা আপনার এমনিতেই একটা মাইনর অপারেশন করতে হবেই। তার জন্য দিন পাঁচেক আপনাকে হাঁসপাতালে থাকতেই হ'বে। তারচেয়ে একবারে যদি একটা মেজর অপারেশন করিয়ে নেন তাহলে মাসতিনেকের রেষ্ট নিলেই একেবারে সেরে যেতে পারবেন। আমার এখানে ফ্রি বেড একটা খালিও আছে। আপনার না খরচ কুলালে কিছু না হয় না দেবেন। অপারেশন ও আমি নিজেই করবো, তবে ওষুধ টনুধ ইত্যাদি আর নিজের দরকারী কাপড় চোপড়ের ব্যবস্থা আপনাকে করতে হ'বে।

কণিকার মুখ অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো—'একেবারে সেরে যাবে, না?' 'একেবারে হয়তো সারবে না—তবে ক্রাচ ছাড়া চলতে পারবেন তাই বা মন্দ কি? অপারেশন আনসাকসেসফুল হ'লেও আগের চেয়ে খারাপ হ'বে না গা?' কণিকা খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, ওর মনের মধ্যে একটা উন্মত্ত মথন চলছে, যদি আর পদে পদে কৌতূহলী দৃষ্টির হুচোট খেয়ে ওকে চলতে না হয়—যদি পূর্ণাঙ্গ শরীরের লাবণ্যে ওরও মুখের ওপর পড়ে কোন অনুরাগ বিভাসিত পুরুষ নয়ন—তার চেয়ে মহা সৌভাগ্য ওর আর কি হ'তে পারে।

কিন্তু নিষ্প্রভ মলিন মুখে ধীরে ধীরে কণিকা, 'মাথা নাড়লো, 'না, আমার পক্ষে সম্ভব হ'বে না বেশীদিন থাকা। আপনার দয়ার জন্য ধন্যবাদ। আপনি মাইনর অপারেশনটাই করুন।'

অসীম বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে ওর মুখে তাকালো, তারপর তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞেস করলো, 'বোকামো করছেন কেন? আর কোথাও এমন সুযোগ পাবেন নাকি? নেহাৎ সরকারের মাথায় এখনও কতগুলো আইডিয়া-লিজমের পাগলামো রয়েছে—আর কোথাও এমন সাহায্য পাবেন কি করে?'

কণিকার দুচোখে বেদনার বাঁধ বুঝি এই মুহূর্তেই ভেঙ্গে পড়বে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সে বল্লো—'না, আমি তিনচার মাস বিশ্রাম করলে চলবে না—আমিই আমার পরিবারের একমাত্র উপার্জ্জনশীল লোক।'

'তা এতদিন চাকরী করে জমাতেও পারেন নি কিছু? অসীম বিরক্ত হ'য়ে উঠলো—'পা সেরে গেলে রোজ তেলি পাসেঞ্জারী করতেও এমন কষ্ট পেতেন না—নয়তো কোনদিন গাড়ীর নীচে পড়বেন।'

'তা আর কি করবো'—ব্যথাবিহ্বল শান্ত দুচোখ তুলে কণিকা নিজেকে সান্ত্বনা দিল, 'পরে টাকা জমিয়ে দেখা যাবে।'

এতক্ষণ বাদে ডাক্তার সরকার কথা বল্লেন, 'এর পরে আপনার পা এমন নরম অবস্থায় আর থাকবেই না হয়তো। করতে হ'লে এখনই করুন। আচ্ছা অসীম তুমিই বা কি করছ, বিয়ে টিয়ে করনি—দায় দায়িত্ব নেই, এদের দায়িত্বটা দু চার মাস চালিয়ে দাও না—উনি তো চাকরী করেন পরে শোধ দিয়ে দেবেন।'

অসীমের হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হ'য়ে গেল। পাগল নাকি—নিজে খেতে পায় না—বেকার মানুষ—আবার এই দুদিনে আরেক পরিবারের ভার নিয়ে বসবে!

খানিকক্ষণের জন্য সবাই চুপচাপ—ঘুরন্ত ফ্যানটার শব্দ শুধু। অসীম অনুভব করলো দুজোড়া চোখ ওর মুখের ওপর ন্যস্ত আছে—তার একটাতে আশা আর সাহস—আরেকটাতে আশা নেই। শুধু কম্পিত প্রতীক্ষা। অসীম সার্টের ভেতরে ঘামতে লাগলো।

তারপর হঠাৎ ও নিজের গলা শুনলো, নির্বোধ আর নিরুৎসাহিত, 'আচ্ছা চেষ্টা করবো।'

ডাঃ সরকার সজোরে অসীমের পিঠ চাপড়ে দিলেন।

•

তারপর থেকে সেই মহত্বের, সেই বোধহীন শিক্ষালয়ের দাম দিচ্ছে অসীম—একমাস নয়, দুমাস নয়, চার চার মাস! রোজ দুপুর বেলায় কাঁ কাঁ রোদে ঘুরে ঘুরে পুরোন বন্ধু বান্ধবদের বাড়ী গিয়ে সন্ধান নেয় অসীম—রেডিও খারাপ আছে কিনা, অথবা গ্রামোফোন অথবা ইলেক্‌ট্রিক গীটার। বসে বসে সারাদিন কঠিন পরিশ্রম করে চা খাওয়ার সময় কথাটা পাড়ে—টাকার কথা। অধিকাংশ সময় বন্ধুরা ঠাট্টা মনে করে চা খাইয়েই বিদায় দিতে চায়। কিন্তু আজকাল অসীম ছিনে জোঁক। টাকা না পেলে উঠবেনা বাড়ী ছেড়ে। শেষকালে সন্ধ্যা বয়ে গেলে বন্ধু আর থাকতে না পেরে বিরক্ত হ'য়ে বলে, 'কি ছোটলোক হ'য়েছিস্ অসীম, এইটুকু কাজের জন্য আবার রেম্যুনারেশন কি?'

'কি করবো বল্? ধার চাইলে তো দিবিনা—তাই কাজ করেই চাইছি। জানিস তো বেকার মানুষ।' অসীম স্বচ্ছন্দে উত্তর দেয়। এই প্রথম ও সুস্থ সুকণ্ঠে ঘোষণা করে সে বেকার। আগে একথা বলতে ওর হৃদয় অভিমানে স্ফীতবক্ষ হ'য়ে যেত, এখন অনায়াসে সেই দিয়েই সে করুণা আকর্ষণ করে।

তারপর মাস শেষে গোটা পঁচাত্তর টাকা মাণিকতলায় এক ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে—কণিকার বাড়ী পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও ওর।

সময় পেলে সামান্য কিছু ফল কিনে সেবায়তনে যেতে হয় কণিকার কাছে। কণিকা ওকে প্রত্যাশা করে, না গেলে হতাশ হয়। যাক্ সবই যখন হচ্ছে তখন আর কোন ভদ্রতারই ত্রুটী রাখে না অসীম। কণিকাকে জানাবার দরকারই বা কি সে দুঃস্থ বেকার? জীবনে অন্ততঃ একবার অসহায় নারীর দায় বওয়ার উদ্যম গ্রহণ করবে অসীম—আর যাই হোক্ এ দায় তো অনন্ত নয়।

বিকেলবেলা একটীমাত্র দামী স্যুট যেটা নিতান্তই ভাল কাপড়ের ছিল বলে এবং যথেষ্ট যত্নে রাখা বলে এতদিন টিকেছে, গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে অসীম।

বেরোবার ঠিক মুখেই পেছন থেকে দুচারটা বিষাক্ত মন্তব্য কানে আসে।

'অসীম ঠাকুরপো চল্ল কোথায়?'

'সেই লেংড়ীর বাড়ী ছাড়া আবার কোথায় যায়।'

আজকাল দেখি খুব রেডিও সারায়! যাক্ ওই মেয়েটার কল্যাণে কিছু কিছু কাজ করছে—নইলে পুরুষ মানুষ, রোজ দুপুরবেলায় ঘোর দিয়ে ঘুমুচ্ছে, দেখলেই তো গা জ্বলে যেতো আমার। প্রেমে পড়বার শতেক গুণ!'

বৌদিদের গলা। মমতার বাষ্পও নেই কোন কথায়।

অসীমের মন আকণ্ঠ তিক্ততায় ভরে গেল। একটা ভুয়ো পৌরুষের মর্যাদা রাখতে এত দাম দিতে ও আর পারে না। তাও যদি মেয়েটা সম্বন্ধে ওর একটুমাত্রও দুর্বলতা থাকতো।

হাসপাতালে কণিকাকে দেখে ওর ক্রোধ দ্বিগুণিত হয়ে উঠলো। কণিকার সমস্ত পা ফুলে উঠেছে। কাল থেকে একটু একটু চলাফেরার অনুমতি পেয়েছে তাই নবলব্ধ সুস্থ পা দিয়ে চলার উৎসাহে আজ সেই পা টাটিয়ে ফুলে জ্বর এসে গেছে।

অসীম একেবারে মুখের ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠলো, 'আপনি কি কচি খুকী নাকি? নিজের ভালমন্দ বুঝতে পারেন না।'

হয়তো বেদনার জন্য কিছুটা সহানুভূতি প্রত্যাশা করেছিল, ওর মুখটা ম্লান হ'য়ে এল, 'জানি আপনার বড্ড অসুবিধা হচ্ছে আমার জন্য। আমি অফিস জয়েন করলে ছমাসের মধ্যেই সব দিয়ে দেব।'

'থাক, থাক আর ভালমানুষী করতে হবে না' রাগে অসীম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, আপাততঃ ডাক্তারের পরামর্শ মত থেকে আমাকে কৃতার্থ করুন, তবেই হবে। কণিকা একবার অসীমের মুখে তাকালো সে মুখে তিক্ততম বিদ্বেষ স্পষ্ট রেখায় ফুটেছে—মমতার মাধবী-বীথি সে মুখে বৃথাই দেখতে চেয়েছিল কণিকা। একটা বোকা বইবার দায়িত্ব নিয়ে ও যেন নিজেকে আর ক্ষমা করতে পারছে না। কণিকার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। এমনটি ও চায় নি। এমনভাবে অনাত্মীয়লোকের স্কন্ধে আরোহণ করা যে কতখানি গ্লানির তা অসীম কি জানবে।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে কণিকা উত্তর করলো, 'আর কখনো এমন ভুল হবেনা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'না হ'লেই ভালো' অবহেলার সঙ্গে পকেট থেকে কয়েকটা কমলালেবু বের করে টেবিলে সাজিয়ে রাখলো অসীম। 'এইগুলো খাবেন দয়া করে ঠিক সময়ে।'

কণিকা দেয়ালের দিকে মুখ করে ছিল, উত্তর দিল না।

'কি? কানে গেল?' অসীম অসহিষ্ণু হ'য়ে প্রশ্ন করলো।

এবার মুখ ফেরালো কণিকা। চোখের জলে ওর সারা মুখ ভেসে যাচ্ছে—বিদীর্ণ স্বরে ও বল্লো, 'কেন আপনি এগুলো এনেছেন, এখন যেন্না করে দয়া না হয় নাই করতেন আপনি। আপনি কি বোঝেন না পঙ্গু না হ'লে এ দয়া আমি কখনো নিতাম না?'

অসীম হতভম্ব হ'য়ে গেল, এ রোদনোচ্ছ্বাস সে প্রত্যাশা করেনি—কল্পনা করে নি এই মর্মবেদনার, কি হ'ল?'

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কণিকা উত্তর দিতে পারলো না। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে ও কান্নায় খণ্ড বিখণ্ড হ'য়ে যাচ্ছিল—কার কাছ থেকে কি প্রত্যাশা করেছিল কণিকা? অন্যের ওপর দায় ছেড়ে দেবার পরম নির্ভরতায় হঠাৎ একটা অনন্তবের স্বপ্ন দেখছিল কণিকা—দয়ার বদলে দেখেছিল আরো গভীরতর কোন হৃদয়ানুরাগ। সে ভুলের লজ্জা কি করে মুছবে সে?

মুখ তুলে রোদনস্নাত মেঘের মত একটু হাসতে চেষ্টা করলো কণিকা, বল্লো, 'আর আপনি আসবেন না। বাড়ীতে আমার ছোটবোনকে একটু খবর দেবেন, এর পরে এই একটা মাস নিজের ব্যবস্থা আমি নিজেই করবো। আপনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, কিছু মনে রাখবেন না।'

'ওঃ বেশ' অসীমের মুখ হঠাৎ আশ্চর্যভাবে কালো দেখালো। এতটা স্বনির্ভরতা ওর কেমন ধৃষ্টতার মতো লাগলো। কণিকার সুরের মধ্যে কেমন একটা অস্পষ্ট বিদ্রোহ। যেন কোন অবনিগূঢ় চেতনায় বলে সে জেনেছে অসীম জীবিকাহীন, তাই তার সামান্য উপকারে এত তর্জন গর্জন এত অসন্তোষ রোষ অসীমের।

যাক্‌গে, রাস্তায় নেমে নিজেকে ভারমুক্ত ভাবতে চেষ্টা করলো অসীম। একটা মস্ত দায় থেকে রক্ষা পেয়েছে ও। কিন্তু কি অকৃতজ্ঞ কণিকা, এতদিনের পরিশ্রমের কোন মূল্যই যেন নেই ওর কাছে।

দুচারদিন বাড়ী থেকে বেরোল না অসীম, আর কোন প্রয়োজনও নেই আপাততঃ।

চা দিতে এসে বৌদি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'আজকাল তোমার রোগীর কাছে যাওনা?' কথাটার মধ্যে একটা অন্তর্গূঢ় বিদ্রূপ ছিল। অসীম কোন কথা না বলে কাপটা হাতে নিল।

'কেন যাও না, সে সেরে গেছে?' বৌদি নাছোড়-বান্দা প্রশ্ন করলেন।

'যাইনা, ইচ্ছে'—বিরসমুখে কাপটা খালি করে অসীম দাঁড়িয়ে পড়লো। আজ বিকেলে একটু অন্য কোথাও ঘুরে এলে হয়। হাতঘড়িতে অভ্যাস মত সময় দেখে মনে হ'ল হাসপাতালের গেট বন্ধ হ'য়ে যাবে। তারপরেই বিরক্তভাবে ভাবলো তা দিয়ে ওর দরকার কি?

কিন্তু জামা গায়ে চড়িয়ে হঠাৎ তার মনে হ'ল কোথাও যাবার জায়গা ও নেই। চাকরীবান বন্ধুদের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা কাজের; শ্রমিক-মালিকের—সেখানে বৈকালিক আসরে সে অবাঞ্ছিত। কিছুদিন আগে পর্যন্ত হাসপাতালে রোজ যেতে বিরক্ত লাগলেও, সেটা ওর একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজ ছিল। কিন্তু আপাততঃ 'ওথেলো'স্ অক্যুপেশন গন।' জামা খুলে ফেলে ঘরের মধ্যেই খানিকক্ষণ পায়চারী করলো অসীম। দুচেকটা ভাঙ্গা রেডিও কয়েকবার খোঁচাল। তারপর যখন ম্লান কর্মহীন অন্ধকার ঘনিয়ে এলো তখন বিক্ষিপ্ত পায়ে ঘরে পায়চারী করতে করতে অসীম ভাবলো, এই নিরর্থক স্থিরতার চেয়ে, তার দায়বহন অনেক ভালো ছিল।

কণিকার যাবার দিন ঘনিয়ে এলো। ডাক্তার সরকার বিল পাঠিয়েছেন। হাসপাতালে থাকার খরচ কিছু ধরেন নি ডাঃ সরকার। কিন্তু ওষুধগুলোর দাম আছে—আরো আছে ওর পায়ের জন্য তৈরী বিশেষ ভাবে অর্ডার দেওয়া একজোড়া জুতো—তা ভিন্ন নার্সদের কিছু পারিশ্রমিক, সব মিলিয়ে শ দেড়েক টাকা।

বিলটা হাতে নিয়ে চুপ করে বসে রইল কণিকা।

এত টাকা, এ টাকার জন্য কার মুখ চাইবে সে। নির্ভর করবার কোন 'পৌরুষ-কুলিশ বাহু' জানা নেই কণিকার। চব্বিশ বছর সংসারের ঘানিতে ঘোরবার পর কণিকা একবার শুধু নিভৃত নীড়ের আরামের সন্ধান পেয়েছিল—কিন্তু সে তো সবই ওর স্বপ্ন কল্পনা। অসীম কেবলমাত্র দয়াই করেছিল কণিকাকে। আত্মীয় পরু মেয়ের দায়বহনের নির্বুদ্ধিতা কদিন আর রইল তার?

তবু খোঁড়াতে খোঁড়াতে কণিকা ডাক্তারবাবুর চেম্বারে উঠে এলো। আরো যদি কিছুটা সময় পাওয়া যায় এখানে থাকার, বিলটা আস্তে আস্তে শোধ দিতে পারবে সে।

কিন্তু দরজার সামনে এসেই স্তব্ধ হ'য়ে গেল ওর পা। চেম্বার ডাক্তারবাবুর চেয়ার শূন্য, তার সামনের চেয়ারে অসীম বসে আছে।

কণিকা দেখতে পেলো, ওকে দেখেই অসীমের মুখের ওপর একটা ভয়ের পাংশু ছায়া ভেসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকে একটা তীব্র বেদনা মোচড় দিয়ে উঠলো।

গলা পরিষ্কার করে নিয়ে অসীম এবার কথা বল্লো, 'এই যে আপনি, ভাল আছেন?'

স্থির গলায় কণিকা বল্‌লো, 'ভালই, ডাক্তারবাবু নেই?'

'একটু বাইরে গেছেন' অসীম বিপন্ন বিব্রতমুখে ভদ্রতা রক্ষা করতে চেষ্টা করলো।'

'তা আজ তো আপনার চলে যাওয়ার দিন, ব্যবস্থা হয়েছে, রিক্সা ডেকে দেব একটা?'

কণিকার মুখে অসীমক্লান্তিহত একটুকরো হাসি

ফটলো, বল্লো, 'ধন্যবাদ, কিন্তু আজ বোধহয় আমার যাওয়া হ'বে একটা দিন বাকী আছে'।

অসীম দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর একবার অনিশ্চিতভাবে পকেটে হাত ঢোকালো, 'কি করা যায়।'

'থাক্' কণিকার মুখে বিদ্রূপ তীব্র রেখায় চমকে গেল, 'আপনার দয়া দাক্ষিণ্যের ভাবনার অনর্থক অপব্যয় করবেন কেন? আর আপনার দায় ভার হ'তে চাই না, অনেকদিনই তো কষ্ট দিলাম।'

অসীমের চোখ গভীর কুণ্ঠায় মাটীতে নিমগ্ন হ'ল।

কণিকা আরেকবার অসীমের মুখে তাকালো, 'অনেক দেনা রইল আপনার কাছে। শোধ কিন্তু একদিনে করতে পারবো না।'

এবার অসীমও মুখ তুলে কণিকার মুখে তাকালো, বল্লো, ঋণ যে একদিনে শোধ হ'য় না সে আমি জানি, না হয় দিনে দিনেই শোধ দিলেন।'

কণিকা বিমূঢ়ভাবে অসীমের মুখে তাকালো।

আরেকটু এগিয়ে এলো অসীম—আরো অনেক কাছে বল্লো, 'শুধু তার বইবার কষ্টটার হিসেব রেখেছো কণিকা, দায় বইতে না পারার কষ্টের খবরটা রাখবে না? জানো না কোন দায় বইতে মধুর, জানো না কোন ভার বইতে না পেরে পুরুষের দিন শূন্য হ'য়ে যায়।'

অপ্রস্তুত কণিকার মুখে পরম অস্থির লাবণ্য অতর্কিতে চড়িয়ে গেল। কিন্তু দুহাতে তুলে সে মুখ ঢাকতে দিল না অসীম। আর এখন তার দরকারই বা কি?

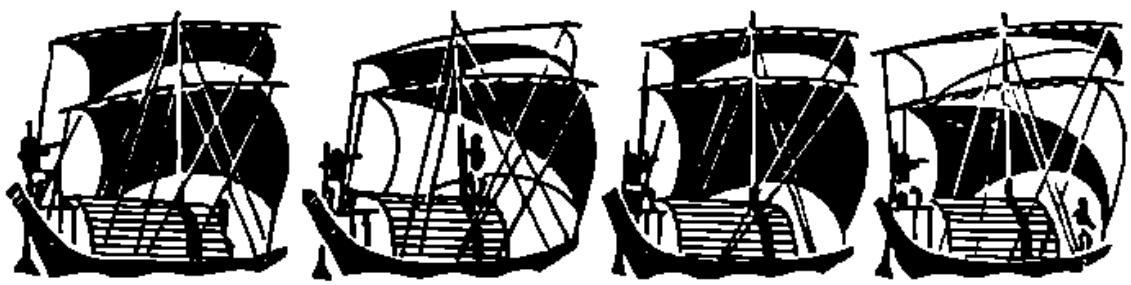

রাজপুতানার পথে

শ্রীপ্রতিভা দেবী

পুজো এলেই মনে হয়, বেরিয়ে পড়ি। শরতের সোনালী আলো, নির্মল নীল আকাশ যেন দূরের পানে টানে। আত্মীয়োপম দু'জন ভদ্রের ব্যক্তির কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম দিল্লীতে আর জয়পুরে যাবার। বিশেষ করে ইতিহাসের পাতায় রাজপুতানার গৌরব কাহিনী পড়ে ছেলেবেলা থেকে তার প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করে এসেছি: মনে হ'লো এ সুযোগ ছাড়া হবেনা।

দিল্লীতে আতিথ্য জুটলো: ভালোই। 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' কোয়ার্টারে মধুর প্রীতিপূর্ণ আবেষ্টনে 'চেনা-অচেনার ভিতে' কাটলো কয়েকদিন। যুগ-যুগান্তরের স্মৃতি-বিজড়িত দিল্লী—'শত সম্রাট্-প্রেয়সী', আজ স্বাধীন ভারতের রাজধানী! তবু, মনে হ'লো যথেষ্ট আধুনিক ও প্রাণবন্ত নয়। যান-বাহনের তো যথেষ্টই অসুবিধা; খানকয়েক মাত্র বাস্, অনেক দেরিতে দেরিতে আসে, পুরাণা-দিল্লী-অঞ্চলে আছে ট্রাম—তা মোটেই সুশ্রী বা সুখকর নয়; আর টাঙ্গা—চড়তে মন্দ নয় কিন্তু ব্যয়-সাধ্য। সাইকেল্-আরোহী প্রচুর। চড়তে জানলে, সাধারণ লোকের পক্ষে ঐটেই হয়তো সুবিধাজনক! তাও অনেক স্থলে ভিড় ঠেলে এগোনো কঠিন। 'ট্রাফিক্-কণ্ট্রোল' তেমন নিখুঁত নয়।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখলাম: দুর্গ, কুতুব-মিনার, হুমায়ুনের সমাধি ইত্যাদি। বাদ্‌শাদের বিচিত্র ভোগের আয়োজন—বাগান, ফোয়ারা, স্নানাগার। একদিকে যমুনা বইত দুর্গের পাশ দিয়ে। কত জ্যোৎস্না-রাত্রে প্রেমগুঞ্জন মিশেছে তার কল্লোল-ধ্বনির সঙ্গে। একটা বিশেষত্বের কথা মনে হ'ল। আধুনিক পাশ্চাত্য-সভ্যতার ভোগবিলাস যেন অনেকটা প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন। কিন্তু ঐ যুগের ভোগবিলাসের সঙ্গে প্রকৃতির সহজ যোগ ছিল।

ক্ষমতা-গর্বিত বাদ্‌শাদের সব স্বপ্ন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। কত অশ্রু, কত রক্ত দিয়ে গড়া এই বিরাট্ খেলা। কত পরিশ্রম, কত অর্থ সযত্নে দীর্ঘকাল ধরে গেঁথে তুলেছে এর পাথরের পর পাথর। সকল কল্পনার সমাধিস্তূপ পড়ে রয়েছে আজ পথের ধারে। দর্শকের মনের কোণে ক্ষণেকের জন্যে উঁকি দিয়ে যায় অতীতের অস্পষ্ট ছবি, শৌর্য বীর্য প্রণয় ষড়যন্ত্রের গোপন লীলা যেন দৃষ্টি-অগোচরে আজও নিঃশব্দে চলেছে এখানে।

'রাজঘাট'—জানিনা, কোনকালে কোন রাজার বিশ্রামঘাট ছিল কিনা এখানে যমুনার কূলে,—আজ অগণিত ভারতবাসীর মনোরাজ্যের রাজার পুণ্যস্মৃতি বহন করে বক্ষ। এখানকার উদ্যান তাঁর উদার নিষ্পাপ পুষ্প-কোমল হৃদয়ের সুন্দর প্রতীক।

* *

দিল্লী-বাস ফুরোলো। রওনা হ'লাম জয়পুরের পানে। দুটো গাড়ি আছে ওখান থেকে, একটা সকালে ছেড়ে বিকেলে পৌঁছয়, আর একটা সন্ধ্যায় ছেড়ে পরদিন ভোরবেলা পৌঁছয়। সকালেরটাতেই রওনা হ'লাম, কারণ তা না হ'লে রাত্রের অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাবোনা। সহযাত্রীদের কারও কারও সঙ্গে আলাপ হ'লো। কেউ চলেছেন আজমীর, কেউবা আমেদাবাদ। মনে মনে আমার ধারণা ছিল রাজপুতানার শুরু থেকেই মরুভূমি। গাড়ি থেকে দেখলাম, তা নয়। ফসল-ক্ষেত,

মাঠ, পাহপালা চোখ জুড়িয়ে দিলো। আর পাহাড়ের শ্রেণী। ঐ কি আরাবল্লী, যার নাম গল্পে-উপন্যাসে অসংখ্যবার পড়েছি? বাংলাসাহিত্যে রাজপুতানা অনেকখানি জায়গা অধিকার করে রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল—প্রতিটি বাঙালী নরনারীর মনে জাগিয়ে দিয়ে গেছেন রাজপুত বীরপুরুষ ও বীরনারীর প্রতি শ্রদ্ধা, তাদের মনে অক্ষয় ক'রে এঁকে দিয়ে গেছেন মেবার পাহাড়ের ছবি। বাঙালীর মন 'যেখানে যত মহৎ আছে' তাকে বরণ ক'রে নিতে কার্পণ্য করেনি। এমনি কত কি ভাবতে ভাবতে দুধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে চললাম। দূরে শৈল-রেখা, কাছে প্রান্তর, গাছতলায় গরু মোষ ছাগল নিয়ে রাখালেরা বিশ্রাম করছে। প্রকৃতির কোলে সহজ সরল তাদের জীবন।

বিকেলে পাঁচটায় পরে পৌঁছলাম জয়পুরে। আমন্ত্রণকারী ডঃ বাহাদুরী উপস্থিত ছিলেন স্টেশনে। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় সুন্দর ঝকঝকে তাঁর বাড়িখানি। ঘোড়ার গাড়িতে করে পৌঁছলাম সেখানে। রাস্তাঘাট, বাড়িঘর যা চোখে পড়লো সবই বেশ পরিচ্ছন্ন। অধ্যাপকের বাড়ির সামনে ফুলের বাগান। দরজার উপরে ফুলে-ভরা লতা।

জয়পুর শহরে সেবার হৈ-চৈ। বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন চলছে। শ' চারেক প্রতিনিধি এসেছেন। আমরাও অতিথিরূপে সম্মেলনে যোগ দিলাম। মন্দ লাগলোনা সুদূর রাজস্থানে এত বাঙালীর সমাবেশে। বক্তারা অনেকেই বাংলা ও রাজস্থানের মানসিক যোগের কথা উল্লেখ করলেন। এক কালে বাঙালী ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের সর্বত্র। ঝাঁসি, উদয়পুর, হায়দরাবাদ—নানাস্থানে অনেক বাঙালী বাসিন্দার সন্ধান পেয়েছি। জয়পুরের সঙ্গে বাঙালীর সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ। আধুনিক জয়পুর-শহরের নির্মাতা বিদ্যাধর ভট্টাচার্য। জয়পুর-রাজের মন্ত্রিরূপে বাঙালীরা যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। অম্বর-প্রাসাদের কালী নাকি বিখ্যাত যশোরেশ্বরী; তাঁর পূজারী বাঙালী ব্রাহ্মণ পুরোহিত। বর্তমান জয়পুর-রাজের অন্যতমা রাণী বাঙালী-কন্যা। উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক ও ব্যবসায়ীরূপে বহু বাঙালী ওখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। শিল্পী কুশল মুখোপাধ্যায় ও-অঞ্চলে প্রসিদ্ধ।

একালে জয়পুর-রাজ বোধহয় জয়পুরেই বেশী থাকেন। তাঁর পূর্বপুরুষের স্মৃতিমণ্ডিত বিরাট্ প্রাসাদ অম্বরে। স্থানীয় লোকে বলে আম্বের। মহারাজ মানসিংহের আম্বের। জয়পুরের ত্রিপোলি-ফটক পার হয়ে টাঙা ভাড়া করলাম। সুন্দর পথ। দু'ধারে পাহাড়। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। একটি হ্রদ। ...পৌঁছলাম গন্তব্যস্থলে। তিন দিক্ পাহাড়ে-ঘেরা সুরক্ষিত ছিল এ রাজ্য। পাহাড়ের ধার যত ক'রে বাঁধানো। উপরে নানাস্থানে বুরুজ, Watch-tower. কি বিরাট্ প্রাসাদ পাহাড়ের উপরে। নীচে দিয়ে পাহাড়ী রাস্তা চলে গেছে দিল্লী পর্যন্ত।

পাহাড়ের উপর কিছুদূর উঠে গেলাম—সামনে বাগান, পিছনে প্রস্তরশালা। অনেক মূর্তি ও মৃৎপাত্র। গন্ধার-রীতির মূর্তিতে কেউ কেউ গ্রীক শিল্পের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। অস্ত্রশস্ত্র, রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলের মানচিত্র ও মন্দিরাদির পরিচয় দেখতে দেখতে ভাবতে লাগলাম, বিরাট্ ভারতবর্ষের কতটুকু দেখেছি, কতটুকু জানি।

তিন যুগের রাজবাড়ি। যিনি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর বাড়ি ছোটখাট, অপেক্ষাকৃত অনাড়ম্বর। মানসিংহের আমলের বাড়ি তার তুলনায় অনেক বড়। চাকচিক্যের চূড়ান্ত হয়েছে জয়সিংহের আমলে। স্নানঘর, ফোয়ারা—ভোগের বিচিত্র উপকরণ। অপূর্ব শীষমহল, অসংখ্য রঙিন কাচে ঝলমল। রঙিন কাচে খচিত রাধাকৃষ্ণ মূর্তি। কালীমন্দিরে পূজা চলছে। অনেকে বলেন, যশোরেশ্বরীকেই এখানে এনে স্থাপিত করা হয়েছে। বাঙালী পুরোহিতেরাই এতদিন পূজা করে এসেছেন। সম্প্রতি নাকি রাজস্থানী পুরোহিতও নিযুক্ত হয়েছেন। মন্দিরের সামনে পাথরে তৈরি সুন্দর কদাগাছ।

এই প্রাসাদ থেকে কিছু নেমে গিয়ে দেখলাম, মীরার মন্দির। বড় শান্তিময়। মন্দিরের চারপাশ ঘিরে কারুকার্য। ভিতরে শ্রীকৃষ্ণ-মূর্তি। অনেক পৌরাণিক কাহিনীর ছবি খোদাই করা রয়েছে পাথরের দেয়ালে। খোদিত আছে হাতী ঘোড়ার মূর্তি।

পুরাকালের স্মৃতি বহন ক'রে ফিরে এলাম। বীরত্বের, প্রেমের, ভক্তির নানামুখী ধারা। প্রাচুর্য ছিল জীবনে। ভোগের কত উপকরণ। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় দুর্গে প্রাসাদে সৃষ্টিশক্তির অফুরন্ত নিদর্শন। হাতীশালে ঘোড়াশালে বীর হৃদয়ের চাঞ্চল্যের ছায়া। ঐ পার্বত্য চালু পথ বেয়ে হাজার হাজার যোদ্ধা ছুটে গিয়েছে রণক্ষেত্রে। সমরবাদ্যের অনুকম্পন জেগেছে শিরায় শিরায়; অস্ত্রের কল্পনায় প্রকম্পিত হয়েছে চতুর্দিক। আরাবল্লীর পাদদেশে আছে সমতলভূমি। কিন্তু জীবনযাত্রার সহজ সমতলগতি বোধহয় কাম্য ছিলনা রাজপুত বীরদের। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' লঙ্ঘন করবার বাসনাই উন্মত্ত করেছে তাঁদের। শৈলশিখরে প্রোথিত তাঁদের জয় পতাকা, আকাশস্পর্শী তাঁদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার দুর্গচূড়া।

জয়পুরের প্রাচীন শিল্পকলা এত বিখ্যাত কেন, না দেখলে ধারণা করা যায় না। তার স্থাপত্য মনোহর। পাথরে কাটা জাফ্‌রি দুর্গ-প্রাসাদের অপরূপ অলঙ্কার। আলো-বাতাসের প্রবেশ পথ এই 'জালি-প্রাচীর' একদিকে দরবার গৃহ ও অন্দরের মাঝখানে থেকে আব্রু রক্ষা করছে, আবার অন্যদিকে অন্দর বাসিনীদের কৌতূহলও চরিতার্থ করছে। শিল্পীর ইঙ্গিতে পাথরে ফুটেছে রূপ।

আজকাল আমরা ডিনামাইট দিয়ে পাহাড় ভাঙতে শিখেছি। প্রাচীনেরা কিন্তু পাহাড়কে বশ ক'রে নিতে জানতেন। শিখরে শিখরে সাজিয়ে গেছেন তারা ভোগ-আহুতির পঞ্চ প্রদীপ।

জয়পুরের 'হাওয়া-মহল' সুবিখ্যাত। জাফ্‌রিতেই এ বিরাট প্রাসাদের প্রধান শোভা।

জাদুঘরে নানা শিল্প-সামগ্রী সংগৃহীত হয়েছে। বহু মূর্তি, পুরাতন মুদ্রা, পোষাক-পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র, রাজপুত চিত্রকলার নিদর্শন এবং কিছু কিছু ভারতের বাইরেকার শিল্পবস্তুও সেখানে দেখলাম।

চিড়িয়াখানায় সব জীবজন্তুকে খাঁচায় বন্দী করা হয়নি। তাদের বিচরণের সুযোগ রেখে চারদিক ঘিরে চওড়া পরিখা কেটে দেওয়া হয়েছে।

একদিন বিকেলে গেলাম স্থানীয় রাজবাড়িতে। সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকে প্রথমে ডাইনে বাঁয়ে দপ্তরখানা। তারপরে বর্তমান দরবার-গৃহ। বিরাট্ নাটমন্দির; বিশেষ বিশেষ লোকের বসবার জন্ত পাথরে বাঁধানো উঁচুবেদী। দ্বিতলে গেলাম পুঁথিঘর। সেখানে জয়পুরের পুরুষানুক্রমিক রাজাদের তৈলচিত্র এবং আরও অনেক বড় বড় ছবি টাঙানো রয়েছে। অনেক পুরোনো পুঁথির সংগ্রহ। সুন্দর ভাবে লেখা, কোনো কোনো পুঁথি সচিত্র। বাংলা রামায়ণ মহাভারতও সেখানে আছে। আবার আছে ঐ দুই মহাকাব্যের ফার্সী অনুবাদ। অতি ক্ষুদ্র, সুস্পষ্ট অক্ষরে বোধহয় দু'ইঞ্চি পাশে আড়াইগজ লম্বা তুলট কাগজে—সমগ্র গীতা। চিত্র-শোভিত 'চণ্ডী'। নীচের তলায় একস্থানে অস্ত্রাগার। সেখানে প্রবেশ করতেই যেন দেহ রোমাঞ্চিত হ'লো। সমরসজ্জা বলতে যা-কিছু বোঝায় সবই সেখানে বর্তমান। ক্ষত্রিম অশ্বে যোদ্ধমূর্তি—লৌহবর্ম পরিহিত, তীরধনুধারী; ভূপ, গদা, তলোয়ার, প্রাচীন আগ্নেয়াস্ত্র।

রাজপুরী-মধ্যে গোবিন্দজীর মন্দির। রাজরাণী মীরার কথা মনে পড়লো। গোবিন্দজীর কাছেই তিনি একান্তভাবে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন।

একদিকে গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-বিধি পর্যবেক্ষণের জন্ত 'যন্তর-মন্তর।' দিল্লীর যন্তর-মন্তরের' চেয়ে এটি অনেক বড় মনে হ'লো। পূর্বেও প্রকৃতির লীলারহস্ত বোঝবার জন্তে মানুষের কৌতূহল এবং চেষ্টা কম ছিল না। 'বিজ্ঞান' আজকের নয়, দীর্ঘকাল ধরে' সে সোপানে সোপানে এগিয়ে চলেছে। পাথরে লোহার বিচিত্র ছন্দ

কেটে, রেখা ও অঙ্কপাত ক'রে, কুণ্ড ও গোলকের সাহায্যে যাঁরা পুরোনো দিনে সূর্য-গতি-নির্ণয় ও সময়-নিরূপণ করতেন, তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তি কোনমতেই নগণ্য নয়। সম্ভবতঃ জয়সিংহ দিল্লী, মথুরা এবং কাশীতে 'যন্তর-মন্তর' স্থাপন করেছিলেন।

• •

কয়েকদিন জয়পুরে থেকে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে আজমীর। ভোর ৪টায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে ষ্টেশনে গেলাম। দিল্লী আমেদাবাদ মেলে উঠে বসলাম। ছাড়লো ৫৩ টায়। আজমীরে পৌঁছল ৯টায় একটু পরে। খবর পেলাম, কাছাকাছি বাঙালী ধর্মশালা এবং হোটেল আছে। আছে বটে, তবে ধর্মশালার বাড়িখানি খসে-পড়ে-পড়ে অবস্থায় এবং হোটেলের রান্না দায়ে পড়লেই সহ্য করা চলে।

পাণ্ডাদের বক্তৃতা শুনে বাসে ক'রে রওনা হ'লাম পুষ্করতীর্থে। নামধাম আদায়ের জন্য পাণ্ডাদের চেষ্টার অবধি নেই। পাহাড়-পথে ঘুরে ঘুরে উঠে চললো বাস্। আবার নাম্‌লো। দু'দিকে গাছপালা। ১০।১১-নাগাদ পৌঁছলাম পুষ্কর গ্রামে। বেষ্টনমন্দিরে গোবিন্দমূর্তি দু'টি, সাম্‌নে বড়, পিছনে ছোট। 'চল' আর 'অচল'। সিঁড়ি বেয়ে গিয়ে দেখলাম চতুর্মুখ ব্রহ্মার মন্দির। পুষ্কর সরোবর পাহাড়ে ঘেরা; চারিদিকে ঘাট। পাণ্ডা ও ভিখারীর উৎপাত কম নয়। ফুল-নারকেল অর্ঘ্য দিয়ে স্নান ক'রে উঠলাম। পাণ্ডাজী আমাদের পুণ্য না করিয়ে ছাড়লেন না। পাহাড়ের উপরে সাবিত্রী-মন্দির। ফোটামুটি দেখে শুনে ধর্মশালায় ফিরলাম। কিঞ্চিৎ আহারান্তে আবার পরিভ্রমণ। মোগল আমলের একটি দুর্গ ও মসজিদ আজমীরে। আর 'সুভাষবাগ'—আগেকার নাম দৌলতবাগ। চমৎকার বাগান। এক-প্রান্তে শ্বেত পাথরের চারটি ছত্রী, শ্বেত-পাথরের প্রাঙ্গণ এবং অলিন্দ। অলিন্দের ঠিক নীচেই আনা-সরোবর। কোন-কোন বাঙালী ভ্রমণকারী কবিত্ব ক'রে আনা-সরোবর লিখেছেন, কিন্তু সেটি ওর প্রকৃত নাম নয়। রাজা আনাজী রাজত্ব করেছিলেন ১১৩৪-'৫০ খ্রীঃ, তাঁরই স্মৃতি জড়িত ঐ নামে। পাহাড়ের কোলে বহুদূর-বিস্তৃত জলাশয়, অপূর্ব তার শোভা। ছত্রীতে চেয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। ওপারে পাহাড় নেমে এসে শেষ হয়ে গেছে জলরেখার কিছু উপরে। চারদিক্ শান্ত স্থির। কাছে একটি জৈনমন্দির। কবে কোন্ বিদেশী ছবিতে যেন পাহাড়কোলে এম্‌নি এক সরোবরের ছবি দেখেছি, মনে হ'লো।

ফিরলাম বাজারের পথে। খুব ভিড়, পথ অপরিষ্কার। বাজনা বাজিয়ে বিয়ের মিছিল চলেছে। অবগুণ্ঠিতা কন্যা, গলে পুষ্পমাল্য, বিচিত্রবর্ণ সজ্জায় নারীদল সঙ্গে।

আজমীর বাস শেষ হ'লো। যে-কুলির সাহায্যে ধর্মশালায় গিয়েছিলাম, তাকে জানিয়েছিলাম রাত্রের গাড়িতে চিতোর রওনা হবো। দেখলাম, সে এসে আমাদের ফেরবার আগেই বসে আছে। ব'ল্‌লো তাড়া-তাড়ি খেয়ে নিতে, নেরি হ'লে গাড়িতে ভালো জায়গা মিল্‌বেনা,—সারারাত্রি থাকতে হবে গাড়িতে। ওসব দেখে কুলিদের ব্যবহার প্রায়ই বড় মিষ্টি মনে হয়েছে। যাত্রীদের সুবিধার দিকে তারা দৃষ্টি রাখে। গরীব তারা, কিন্তু কর্তব্যজ্ঞান তাদের প্রবল।

চিতোর স্টেশনে গাড়ি থাম্‌লো। তখনও অন্ধকার। সহযাত্রীদের প্রশ্ন ক'রে জানা গেল, কিছুদূরে একটি জৈন ধর্মশালা আছে। জিনিষপত্র সেখানে রেখে টাঙা ভাড়া করে গেলাম চিতোর দুর্গ অভিমুখে। ইতিহাসের স্বপ্ন-লোক। রাণাপ্রতাপের চিতোর। রাজপুত বীরগণের স্মৃতিতীর্থ। সে বীরভূমির ধ্বংসাবশেষ দেখবার আগ্রহ মনে মনে পোষণ করে এসেছি দীর্ঘকাল। এতদিনে সুযোগ মিল্‌লো।

বালুময় পথে টাঙা চলেছে। গাম্ভেরী নদীর উপরে সেতু। নদী প্রায় শুষ্ক, জলের ধারে ধারে এবং নীচে পাথরের টুক্‌রো। ধূলিধূসর গ্রামপথ। দুধারে গাছপালা ভোরের আলোয় হাসছে। গ্রাম্য বাজার, সংকীর্ণ গলি—লেখা আছে Road to fort—'দুর্গের পথ'।

স্টেশন থেকে চিতোরগড় তিনমাইল, দু'মাইল সমতল, একমাইল চড়াই'। সমতল ছাড়িয়ে কিছুদূর উঠে দুর্গ-পুরীর সিংহদ্বার, ওখানে বলে 'পোল'। পূর্বদিকে সূর্যের পানে মুখ ক'রে যে দ্বার তার নাম 'সূরযপোল'। একে একে আর সাতটা সিংহদ্বার পার হলাম—বারল-পোল, টুটা পোল, হনুমান পোল, গণেশ পোল, জোড়লা পোল, লক্ষ্মণ পোল রাম পোল। উপরে ওঠবার পথটি যথেষ্ট রাজনৈতিক ও সামরিক বুদ্ধি নিয়ে তৈরি। ঘুরে ঘুরে পাহাড়ের উপর দিকে উঠেছে সিঁড়ি। সমগ্র দুর্গটি সমতল থেকে অনেক উঁচুতে, শৈলশিখরে অবস্থিত। সমতলের দিকের প্রাচীরে শত্রুবৈক্ষণপথ ও বন্দুক রাখবার ফুকর। প্রয়োজনমত বর্শা চালাবার জন্যও আছে উপযুক্ত ছিদ্র। প্রাচীরের তলার দিকে আছে সৈন্যদের পা রাখবার জায়গা। সিংহদ্বার গুলিতে প্রকাণ্ড কবাট, তাতে কতকগুলি বিরাট কড়া লাগানো, আর বর্শামুখের মত বহু কলক। উপরে একদিকের দুর্গ প্রাচীরের পাশ থেকে বহুদূর পর্যন্ত নীচেকার দৃশ্য দেখা যায়।

কোন্ সুদূর অতীতে ৭২৮ খ্রীস্টাব্দে বাপ্পারাও স্থাপন করেছিলেন চিতোর গড়। সেদিনের রাজারা সমগ্র রাজ্যটিকে সমর্পণে রাখতে চেয়েছিলেন পাঁচিল দিয়ে। চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ায় আলাউদ্দীন খাল্জির নীড়ে জ্বালালেন আগুন। পদ্মিনীর রূপের আগুনে তাঁর মন পুড়েছিলো। চিতোরের যুবা ও বৃদ্ধ সমরানলে আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত হ'লো। তেরো হাজার রাজপুতনারী আত্মাহুতি দিলেন জৌহরব্রতে। আজও আছে সে পবিত্র ব্রতস্থল, সে যজ্ঞকুণ্ড। শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে আপনি মাথা নত হ'লো তার সামনে। কুণ্ডের চার পাশে ছোট ছোট গাছের জঙ্গল। একপাশে বড় বড় পাথরের মাঝখানে সিন্দুর-চিহ্ন—বীর নারীগণের সতীত্বের সাক্ষী। আগুনে ঝাঁপ দেবার আগে নাকি তারা এই চিহ্ন রেখে গিয়েছিলেন।

বাপ্পারাওয়ের মহল, তার ধনাগার, অস্ত্রাগার। দু'টি বিশাল কামান আছে সেখানে। এই মহলের সামনে তখন ভারত সরকারের রাজস্থানী সৈন্যদের কুচকাওয়াজ চলছিলো। জৌজী বাজনা বাজছিল সঙ্গে। জয়মল, প্রতাপ কুম্ভ প্রভৃতির ভগ্ন, জৈনমন্দির দেখলাম একে একে। ভীমসিংহ-পদ্মিনীর বিরাট মহল জরাজীর্ণ। রাণা কুম্ভের জয়স্তম্ভ আজও অটুট। দেড়শ' সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম উপরে।

গোমুখী-গঙ্গা···একটি দু'মুখী ঝর্ণা, তার জল এসে পড়ছে এক প্রকাণ্ড সরোবরে সুন্দর ক'রে বাঁধানো সরোবরটি। ঝর্ণার মুখের নীচে ক'রে দেওয়া হয়েছে একটি শিবলিঙ্গ। তারই মাথায় পড়ছে জল। এত স্বচ্ছ সুস্বাদু জল, ইচ্ছা হ'লো স্নানের ও পানের। একটি রাজপুতানী কাপড় গামছা দিয়ে সাহায্য করলেন। জলস্পর্শে সমস্ত ক্লান্তি যেন মুহূর্তে চলে গেল, দেহ মন স্নিগ্ধ হ'লো।

ওখানকার রাণারা হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখাতেই বিশ্বাসী ছিলেন। তাই বিষ্ণু, শিব, কালী এবং জৈন তীর্থংকরগণ—সকলেরই মন্দির দেখা গেল। চিতোরেশ্বরী কালী, আবার রাণী মীরার রণছোড়জী। অনেক দিনের শোনা একটি গানের পদ মনে এলো: "মা তোমার মায়াবিভূতি কে জানে মা তোমা বিনে।" চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কখনও হেসেছেন নগর-লক্ষ্মীরূপে, কখনও দেখা দিয়েছেন খড়্গ-খড়্গধারিণী হয়ে কখনও বা সন্তানের রক্তপিপাসায় চীৎকার করেছেন "মায়্ ভুখা হঁ।" আবার তাঁরই অন্যমূর্তি প্রেমময় নবঘনশ্যাম।

বর্তমান রাজা ভূপাল সিংহের পিতা ফতেসিংহের তৈরী নূতন রাজপ্রাসাদ। নূতন,—কিন্তু পুরাতন প্রাসাদরাজির গৌরব এতে নেই। জরাজীর্ণ হয়েও পুরাতন দুর্গ অতুলনীয় মহিমা নিয়ে বিরাজ করছে। নূতন বাড়িতে এখন র'য়েছে পুলিস ট্রেনিং স্কুল। নিকটে গণেশ মন্দির; তার সামনে পদ্মের মধ্যে ফতেসিংহের মূর্তি। দুর্গের কেন্দ্রস্থল থেকে ঘুরে চালু পথে নেমে গিয়ে চিতোরেশ্বরী-মন্দির। সেখানে কালীমূর্তি ছাড়া আছে শ্বেত-পাথরে গড়া অম্বা-মূর্তি। আর শিবলিঙ্গ।

* * *

চিতোর থেকে উদয়পুর। ট্রেণে তিন চার ঘণ্টার রাস্তা। বিকেল দেড়টায় গাড়িতে উঠে বসে রইলাম, তিনটে-চল্লিশে ছাড়বে। বোধহয় ছাড়তে একটু দেরি হ'লো। পৌঁছতে রাত আটটা বেজে গেল। টাঙ্গা ক'রে সোজা সূরয পোলে ফতে মেমোরিয়াল ধর্মশালায়। প্রকাণ্ড ঝকঝকে প্রাসাদ। হোটেলের মত ঘরভাড়া নিয়ে থাকতে হয়। ভাড়া অনুসারে কামরার আয়তন ও সাজসজ্জা। দেড় টাকার বেশ বড় কামরাই পেলাম। ঐ-ই সব-চেয়ে কম ভাড়া। কাছের হোটেল থেকে ভাত আনিয়ে খাওয়া গেল। নিশ্চিন্ত নিদ্রায় রাত কাটলো।

জয়পুর থেকে এখানকার এক পাঞ্জাবী ডাক্তার ভদ্রলোকের কাছে একখানা পরিচয়পত্র নিয়ে এসেছিলাম

রাত্রে খোঁজাখুঁজি করা কঠিন ব'লে বেরোইনি। সকালে বেরোলাম ওঁর সন্ধানে। যেতেই তিনি অনুযোগ ক'রলেন, রাত্রে কেন তাঁর ওখানেই এসে উঠিনি—এই জন্যে। জয়পুর থেকে তিনিও চিঠি পেয়েছিলেন এবং আমাদের থাকবার বন্দোবস্ত করে খাবার নিয়ে অনেক রাত্রি পর্যন্ত ব'সে ছিলেন। যাহোক আশাতীত আদর-অভ্যর্থনা পেয়ে জলযোগ ক'রে তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে সব দ্রষ্টব্য স্থান দেখবার জন্যে গাড়ি ভাড়া ক'রে বেরিয়ে পড়লাম। রাজপ্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন 'পিছোলা হ্রদ' (প্রকাণ্ড কৃত্রিম হ্রদ)। ঐ হ্রদের মধ্যে দু'টি তিনমহলা প্রমোদ ভবন 'জগনিবাস' ও 'জগমন্দির'। রাজবাড়িই বটে; স্বপ্নের রাজপুরী।

আগে নৌকোয় ক'রে 'জগনিবাস' ও 'জগমন্দির' গেলাম। চারদিকে জল, মাঝখানে দু'টি শ্বেত-পুরী। পুরীর ভিতরে গেলে আর মনে থাকেনা হ্রদের মধ্যে আছি। কক্ষে কক্ষে কত সাজসজ্জা, কত ছবি! উঠান, বাগান, মন্দির। বাগানের ফুলে ফুলে ভ্রমর-গুঞ্জন। কতগুলি চিত্র ধাঁধাঁ যুক্ত। বনের ছবি,—কোথায় আছে হাতী লুকোনো? গাছের ডালে কোথায় আছে বানর? মেঘের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে হস্তিমূর্তি। এসব নাকি 'নাথুদ্বার' রীতির শিল্প। নাথুদ্বার এ অঞ্চলের বিখ্যাত মন্দির। সেই মন্দিরে নাকি এই রকম শিল্পের অনেক নিদর্শন আছে। প্রমোদ-ভবনের বাইরের দিকে বড় বড় সিঁড়ি নেমে গেছে জলের মধ্যে। দুই পাশে পাথরের প্রকাণ্ড শ্বেতহস্তী।

একটি ভবন থেকে অন্য ভবনে নৌকো ক'রেই যেতে হয়। শুনলাম এই হ্রদ-পুরীতেই একদিন চিতোর-রাজ বিদ্রোহী বিপন্ন খুররম্ (শাজাহান) কে আশ্রয় দিয়েছিলেন। যে মোগলদের সঙ্গে চিতোরের দীর্ঘকাল শত্রুতা চলেছে, সেই মোগল বংশেরই রাজকুমার আত্মগোপন ক'রেছিলেন চিতোর-রাণার শরণাগত হ'য়ে।

পিছোলা হ্রদের আয়তন ২½ মাইল × ১½ মাইল। তার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে 'স্বরূপসাগর' ও 'ফতেসাগর' নামে দু'টি হ্রদ। ওপারে পাহাড়, চূড়ার উপরে 'সজ্জনগড়'। রাণা সজ্জনসিংহ শিকারের সুবিধার জন্যে নাকি ঐ প্রাসাদ তৈরি করিয়েছিলেন। ওখান থেকে তীল শিকারীদের নিয়ে তিনি বেরুতেন শিকারে।

হ্রদের জল পার্শ্বপথে প্রবেশ করেছে প্রধান প্রাসাদের মধ্যেও। রাণীরা যাতে রাজবাড়ির ভিতর থেকেই হ্রদে যেতে পারেন এবং সাধারণ লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন, সেই জন্য এই ব্যবস্থা।

বিশাল রাজপুরী। ছায়া পড়েছে জলে। কত কারুকার্য পাথরের গায়ে। কোথাও কোথাও রঙিন কাচ ঝলমল করছে। পুরী অভ্যন্তরে কৃষ্ণমন্দির, শিবমন্দির। প্রাসাদ-প্রাচীরে সাতটি আলোকস্তম্ভ। রাজার অনুপস্থিতিতে জ্বলে দুধারের দু'টি আলো। তিনি এলে সবগুলি জ্বলে ওঠে। বিশাল প্রাঙ্গণে আগে হাতীর লড়াই হ'ত; অলিন্দে রাজা ও পারিষদবর্গের বসে' দেখবার কায়গা। প্রাঙ্গণ-পার্শ্বে হাতীশালা, আজকাল মোটর-গ্যারাজ। মহলের পর মহল পার হ'তে মনে হ'তে হ'তে লাগলো—এ বিপুল ঐশ্বর্যবিলাস অতীতের স্মৃতি-রূপেই থাকবে বেঁচে। রাজসমারোহের দিন আজ শেষ হ'ত চলেছে।

রাজার বাগান, চিড়িয়াখানা, মিউজিয়ম ইত্যাদি দেখে গেলাম 'সহেলিয়োঁকা বাগে'। রাজকীয় প্রমোদকুঞ্জ। বিস্তীর্ণ জলাশয়, তাকে ঘিরে পঞ্চাশটি ফোয়ারা। তার সঙ্গে বিজলী বাতির 'ডুম' লাগানো। যখন আলোগুলি জ্বলে, তখন অপূর্ব শোভা হয় এ কুঞ্জের। এই 'বাগের' বিপরীত দিকে কৃষি ও শিল্পবিদ্যালয়। শিক্ষক-শিক্ষণের জন্যও কাছাকাছি আছে একটি বিদ্যাভবন।

ফিরলাম পাঞ্জাবী ডাক্তার তন্ত্রলোকের বাড়ির দিকে। স্বরূপসাগর, ফতেসাগর ছলছলিয়ে উঠছে ঢেউয়ে ঢেউয়ে। পাশের রাস্তা দিয়ে চলেছে গাড়ি। দুঃখ রইলো, যাওয়া হ'লোনা কয়েক ক্রোশ দূরে জয়-সমুদ্রে, যেখানে বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপাদনের বিপুল আয়োজন হ'য়েছে; আর 'নাথুদ্বারে', যেখানকার মন্দিরে অগণিত যাত্রীর ভিড়।

•

পরের দিন ছাড়তে হ'লো উদয়পুর। মনের কোণে স্মৃতি লেগে রইলো এক স্বপ্নলোকের,—যে স্বপ্নের ছোঁওয়া লেগেছিলো ইতিহাস থেকে, আর রূপ প্রত্যক্ষ ক'রেছিলাম এখানে এসে। এদেশের শিল্পীদের কাঠের খেলনা বিখ্যাত, তারই কয়েকটি নিদর্শন সংগ্রহ ক'রে নিলাম বাড়ির শিশুদের জন্যে, যাদের জীবন এখনও 'অর্ধেক স্বপন'।

চিরন্তনী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

ক্ষুদ্র গোপালপুর গ্রাম—

ট্রেনের পথ নয়—বাসেরও নয়, এ পথে চলে গরুর গাড়ী,—অসহায়ের সহায়, দুর্বলের বল, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। বৎসরে কয়টা মাস—অগ্রহায়ণের শেষ হতে চৈত্র মাস পর্যন্ত দু' চারখানা লরী যাতায়াত করে মাল বইবার জন্য, বর্ষাকালে এ পথ চলতে লরী অচল—সেই পথে চলতে পারে আদিম যুগের তৈরী গরুর গাড়ীই মাত্র।

পথ বটে—অর্থাৎ এমন জঘন্য পথ কদাচিৎ যদি দেখা যায়। কাঁচা রাস্তা—সোজা চলে গেছে, কোথাও এঁকে বেঁকে নূতন পথ সৃষ্টি করেছে। এই পথে শীতের সময় হ'তে গ্রীষ্মকাল পর্যন্ত এক হাঁটু করে ধুলো জমে থাকে, গ্রীষ্মের পরেই তার রূপ যায় বদলে। শুকনো ধুলো তখন কাদাজলে পরিণত হয়, সে পথ চলা তখন দুষ্কর। পথিককে চলতে হয় পথ এড়িয়ে আশ পাশের মাঠ ভেঙে,—বন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পথ সৃষ্টি করে।

গোপালপুরের পাশ দিয়ে বইছে ইচ্ছামতী নদী। শীত হতে গ্রীষ্ম পর্যন্ত ঝিনি ঝিনি করে বয়ে যায়, বর্ষায় ধরে উদ্দাম রূপ। তখন কূল ছাপিয়ে আবর্তে আবর্তে ছুটে চলে কোনদিকে কে জানে।

এই নদীর কোলে—তীরে যেখানে তাজন জেগেছে সেখানেই ভরত ঘোষের জীর্ণ বাড়ীখানা।

গাঁয়ের লোক অনেক বলেছে—"ও ঘরের মায়া ছাড়ো খুড়ো—নূতন করে একখানা ঘর বাঁধো। দেখছো তো; কোন সময়ে নেমে যাবে ইচ্ছামতীর গর্ভে, যা তাজন ধরেছে, একটা চিড় খেতে আর কতক্ষণ।"

ভরত মৃদু হাসে,—এই তার জবাব। দাওয়ার বসে তামাক সাজে, আর কড়ি বাঁধা হুঁকাটার মাথায় কলকে বসিয়ে তামাক টানে।

বাইরে থেকে লোকে দেখে মনে করে তার কোন চিন্তা নাই,—নদীর গতি সে লক্ষ্য করে না।

কিন্তু সত্যই তাই কি?

দাওয়ার নিচে হাত বারো তের পরেই চলছে ইচ্ছামতী নদী। নদীর মর্জি—বলা তো যায় না, এই রাতেই ফাটল ধরতে পারে, তারপরে যে কোন মুহূর্তে চলে যেতে পারে নদীর গর্ভে।

পরিণাম ভেবেও ভরত কপালে হাত বুলায়, জোরে তামাক টানে—।

(২)

সাত পুরুষের ভিটের মায়া—।

ভরত যখন ছোট তখন এই নদী বইতো এক মাইল দূর দিয়ে। মায়ের সঙ্গে ভরত চলতো নদীর ঘাটে—সে পথ আজ ফুরাত না। বাড়ী জুড়ে নদী অবধি পথের দু'পাশে ছিল তাদের ধানের জমি,—প্রচুর ধান উৎপন্ন হতো সে জমিতে। যা বাড়ীতে বড় দুইটী গোলা, পূর্ণ হয়েও উদ্বৃত্ত থাকতো প্রচুর এবং সেগুলি বিক্রয় করে সংসারের অন্য ব্যয় হতো।

ভরতের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নদী এগিয়ে আসে—জমি নেমে যেতে থাকে অতল জলের তলায়।

ক্রমে দু'টা গোলা না হোক, একটা গোলাতেও ধান ভর্তি হয়।

মাত্র দশ বৎসর বয়সে ভরত পাঁচ বৎসরের যে মেয়েটিকে বিবাহ করেছিল, পনেরো বৎসর ঘর করে

নিঃসন্তানা সেই মেয়েটি মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে বিধবা গেছে। তারপর ভরত বহুকাল আর বিবাহ করে নি। সম্বন্ধ অনেক এসেছিল; ভরত সব কাটিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু ভগবানের মার—দুনিয়ার বার। ভরত আজও বলে—জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে—কথাটা সত্য। তাই প্রায় ষাটের সীমানায় পৌঁছে ভরত বিবয়বর্ষ উপলক্ষে চাঁদপাড়ায় গিয়ে কয়েকদিন পরে সঙ্গে করে নিয়ে এলো সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী অষ্টাদশী তরুণী ভামিনীকে!

পিতৃমাতৃহীনা ভামিনী, মামার বাড়ীতে আবর্জনার মতই বেড়ে উঠেছিল। মামা কালিকেশ ছিল অত্যন্ত ধূর্ত,—হাতে পায়ে ধরে ভরতের স্কন্ধে ভামিনীকে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হল নিশ্বাস ফেলে। অবশ্য ভরতও তাকে পাঁচ বিঘা জমি—যাতে কালিকেশ ভাগে চাষ বাস করতো, সেটা লেখাপড়া করে দান করে দিল।

তরুণী ভামিনী, শত অবহেলা এবং ঘৃণার মধ্যে মানুষ হলেও স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি বৃদ্ধ ভরত ঘোষের গলায় তাকে বরমালা অর্পণ করতে হবে। তরুণ জীবনে অনেক আশাই ছিল তার—দানের সময় ভরতের শুষ্ক শীতল খসখসে হাতের উপর হাতখানা রাখার সঙ্গে সঙ্গে সে তার সকল আশা হারিয়েছিল।

মামার বাড়ী হতে বিদায় মুহূর্তে তার চোখে এতটুকু জল দেখা যায় নি;—সে যেন পাথর হয়ে গেছে, সুখ দুঃখ, আঘাত বেদনার অনুভূতি সে হারিয়েছে। বিবাহের সম্বন্ধ পাকা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে হাসতে ভুলে গেছে; স্বামীর সঙ্গে যাওয়ার সময় সে একফোঁটা চোখের জলও ফেলেনি।

মামী সদুঃখে বলেন, "—ওই যে গো, কথাই আছে না—"পরের ছলো খায় দায় বন পানে যায়—" এর হয়েছে ঠিক তাই। এতকাল—এতটুকু বেলা হতে খাইয়ে দাইয়ে মানুষ করলাম, যাওয়ার সময় একটা কথা পর্যন্ত বললে না—চোখের জল ফেলা ত দূরের কথা—"

ভামিনী আসে স্বামীর ঘরে—ঘর করতে।

একদিনেই সে আগোছালো সংসার গুছিয়ে ফেলে যেখানে যা তুলবার তোলে। প্রতিবেশিনীরা দেখতে আসে, খুসি হয়ে বলে, "না, নতুন বউ বেশ গুছানো মেয়ে বটে। ঘরে পা দিতে না দিতে কেমন গুছিয়ে গাছিয়ে ফেললে সব দেখ।"

সম্পর্কীয়া ভ্রাতুষ্পুত্রী বিকৃতমুখে বলে, "তা আর পারবে না? বয়সে তো বড় কম হয় নি, আঠারো উনিশ বছর বয়সে আমাদের ঘরের মেয়েরা যে তিন ছেলের মা হয় বাছা।

ভামিনী হরিমতীকে ভালো করে চিনে রাখে। সম্পর্কীয় জ্যেঠাকে দুবেলা তার বাড়ীতে সে ভাত খাওয়াতো, তার পরিবর্তে আশা করতো জ্যেঠার নিষ্কর আশর যা কিছু আছে, তার ছেলে নেত্যহরিকেই জ্যেঠা দিয়ে যাবে।

নূতন বিবাহ করে এই বয়সে বউ নিয়ে আসা আর যে কেউ সহ্য করুক, হরিমতী মোটেই সহ্য করতে পারে নি, তাই রোখের বশে কথা শুনিয়ে দিতেও ছাড়ে না।

সঙ্কুচিত হয় জ্যেঠা ভরত ঘোষ, কিন্তু ভামিনী সঙ্কুচিত হয় না! নেহাৎ নূতন বউ, তাই তার ঝগড়ার প্রবৃত্তি শিকেয় তোলা রইলো। ভবিষ্যতে সে হরিমতীকে দেখে নেবে এই রইলো তার সংকল্প।

(৩)

সেই ভামিনী—হঠাৎ সে একদিন গেল হারিয়ে।

হ্যাঁ, হারিয়ে যাওয়াই বটে। প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে গিয়েছিল কলকাতায় কালীঘাটে পূজা দেওয়ার জন্য। মানতের পূজা—এবং সে মানত তার বৃদ্ধ স্বামীর রোগ মুক্তির জন্য। কিছুদিন আগে ভরতের হয় বাত-শ্লেষ্মা বিকার,—বিখ্যাত কবিরাজ হরেন দাস রোগী দেখেছিলেন। ঔষধও তিনি দিয়েছিলেন—তবু বলেছিলেন। "তবু ঠাকুর দেবতাকে মনে রেখো বউমা—শুধু ওষুধপত্রে কিছু হয় না—ঠাকুর যদি মুখ তুলে না চান। আমি বাপু কপাল ঠুকে ওষুধ

চিঠি—তবু মানত করো। বুড়ো মানুষ, তাই বাতব্যেমো বিকার, একটা কিছু অঘটন ঘটতে কতক্ষণ!"

ঠাকুর দেবতাকে তামিনী কোনদিন মানে না—কেনই বা মানবে? কি করেচে তার ঠাকুর দেবতা—কি ভালো হয়েছে তার? জ্ঞান হয়ে পিতামাতাকে দেখে নাই, মানা মামী কোনদিন মুখের দিকে তাকান নি। তারপর পাঁচ বিঘে জমি পাওয়ার লোভে মামা তাকে তুলে দিল এক তিনকেলে বুড়োর হাতে—; জীবনে সে পেলে কি?

ঠাকুর দেবতাকে সে কোনদিন এতটুকু শ্রদ্ধা দেখায় নি; বিতৃষ্ণায় চিরদিন সে মন্দিরের দরজা হতে ফিরে এসেছে, পূজা কোনদিনই দেয় নি।

তবু ঠাকুর দেবতার কাছেই মানত করলে সে—তার স্বামী সুস্থ হয়ে উঠুক, সে এখানে ঠাকুর বাড়ীতে ষোড়শোপচারে পূজা দেবে, কালীঘাটে মা কালীকে বুকের রক্ত দিয়ে পূজা দিয়ে আসবে।

ভালো হয়ে উঠলো ভরত—; তামিনী গ্রাম্য দেব মন্দিরে উপবাস করে ষোড়শোপচারে পূজা দিলে। তার পরে একদিন পূজার জন্য প্রতিবেশিনী কুসুম ও রমার মায়ের সঙ্গে চলে গেল কলকাতায়।

আর সে ফিরলো না।

মাস খানেক পরে ফিরে এলো কুসুম ও রমার মা। অশ্রুচোখে তারা ভরতকে জানালে—কি কাল রোগই হল গো বউটার, যমে ধরলো আর গেল। চিকিৎসের ত্রুটি করলো না ঘোষ মশাই, একেবারে শেষ হয়ে গেল। একটা খবর তোমায় দিতে পারলাম না।

ওলাউঠো—রোগের নামও শোনা যায়।

বৃদ্ধ ভরত সুখে বাস করেছিল তিনটা বৎসর মাত্র, আবার যা ছিল সেই অবস্থায় দাঁড়ালো।

কিন্তু হরিমতী বলে, ওদের কথা বিশ্বাস করোনা জ্যেঠামশাই, নতুন বউ পালিয়ে গেছে গো। পুজো-আচ্ছা দিয়ে ওরা কালিঘাটে কোন পাণ্ডার বাড়ীতে ছিল,—ছাড়ার হোক—কলকাতাটা দেখে বেড়িয়ে আসবে তো; একদিন নাকি গড়ের মাঠে না কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল, সেখান হতে নতুন বউ সরে পড়েছে, ওরা অনেক খুঁজেও তাকে আর পায়নি। লোকে কি বলবে, তুমি আবার ভাববে চিন্তোবে, তাই সাহস করে সত্যি কথা বলতে পারে নি।

নিঃশব্দে থাকে ভরত, একটি কথামাত্র সে বলে না; মনে হয় সে একেবারে পাথর হয়ে গেল।

তিন বৎসর ঘর করেছে তামিনী ভরতকে নিয়ে যেন সে পুতুল খেলা করেছে, ঘড়ির বদলে আকাশের সূর্য দেখে স্নান আহার বিশ্রাম করতে হয়েছে, একটু অনিয়ম করার যো ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে, ঝগড়া করে তামিনী বাড়ী মাথায় করেছে।

অতিরিক্ত যত্ন তার—তার সে যত্নে হাঁপিয়ে উঠেছে ভরত।

গাঁয়ে কি সুখ্যাতি—"আহা, এমনি বউ আর হবে না—জ্যান্তো সতী সাবিত্রী গো নইলে, ওই তিনকেলে বুড়ো স্বামীকে কেউ এমন যত্ন করতে পারে? হাতের তেলোয় করে রেখেছে বুড়োকে,—এমন যত্ন আত্তি কোন মেয়ে করতে পারে না আজকালকার যুগে।

নূতন কোন বউ গ্রামে এলে তামিনীর পায়ের ধুলো নিয়ে যায়, শাশুড়ীরা উপদেশ দেন—এই রকম হতে শেখো, আখেরের কাজ হবে।

কেবল হরিমতির মুখখানাই বিকৃত হয়ে ওঠে, বিকৃত কণ্ঠে সে বলে দেখা যাক, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। কথায় বলে—যা রয় সয় তাই ভালো "অতি" জিনিষটা মোটেই ভালো নয়। অমন সুন্দরী মেয়ে, সে নাকি আজকের যুগে ওই সদাচারী তিনকেলে বুড়োর সেবায় জীবনপাত করবে, একি সম্ভব? একি সেই আদ্যিকালের রাম রাবণের যুগ, তাই সে-দিনকার সীতা সাবিত্রী আজ জন্মাবে? তাও যুক্তির যদি রাম সত্যবানের মত ঘোয়ারী হতো—।"

শেষ দেখবার আশা ভরত করেছিল, শেষ দেখাও হল। কিন্তু সার্থক হল না।

দেখা গেল—গহনাপত্র যা ছিল সব তামিনী নিয়ে গেছে, তা ছাড়া জমী বাঁধা দিয়ে ভরত এনে দিয়েছে দুইশো টাকা—খরচ পত্র পূজা প্রভৃতির জন্য সে টাকাও সব হাতছাড়া হয়েছে।

হরিমতী বলে, একবার কলকাতায় যাও না জ্যেঠামশাই, আমার নেত্য তোমায় নিয়ে যাবেখন। সে তো বড়বাজারেই একটা মনিহারী দোকানে চাকরী করছে,—কলকাতার আদ্যি নাড়ি সব খবর রাখে সে। ক'দিন তার ওখানে থেকে গঙ্গা চানটা করা যাবে, রাঙ্গুসীকে খুঁজেও দেখা যাবে।"

"না—"

ভরত দৃঢ়ভাবে মাথা নাড়ে।

পুরুষের এক কথা—

—না,— কোথায় যাবে ভরত?

ইচ্ছা করে যদি তামিনী গিয়ে থাকে—থাক। যেখানেই থাক, সুখী হোক সে।

আজ সামনের বিক্ষুব্ধ নদীস্রোতের পানে তাকিয়ে ভরত ভাবে—তার মস্ত বড় ভুল হয়ে গেছে। কালিকেশ হয় তো তার হাতে পায়ে ধরেছিল—সে কেন রাজি হল ওই সুন্দরী তরুণীটিকে বরণ করে নিতে? হয় তো তরুণ কেউ আসতো তাকে বরণ করতে, ভরত নিজের বয়সের কথা কেন ভাবলে না সে দিন,—কেন মেয়েটার ভবিষ্যৎ নষ্ট করলে?

কি দিতে পেরেছে সে তামিনীকে, দিয়েছে আসের স্ত্রীর কাপড় গহনা কিন্তু তামিনী তো কিছুই বড় চায় নি, সে কিছু ব্যবহারও করে নি।

কি মনে করে ভরত তামিনীর বাক্সটা কম্পিত হাতে খোলে।

কাপড় সব সাজানো রয়েছে, দুখানি শাড়ি মাত্র নিয়ে গেছে। শাড়িগুলা তুলতেই চমকে ওঠে ভরত—শাড়ির নিচে সাজানো আছে সমস্ত গহনা, একশত টাকার দশখানা নোট।

দুই হাতে কপালটা চেপে ধরে ভরত।

না,—সে আসবে না জেনেই গেছে। সে ভরতের দেওয়া জিনিষ দুখানি কাপড় ছাড়া আর কিছুই নেয় নি। একশো টাকা সে নিয়ে গেছে, উপস্থিত তার খরচ তো ছিল।

হাঁফাতে হাঁফাতে এসে হরিমতি খবর দেয়—"জানো গো জ্যেঠামশাই, আমার নেত্য নিজের চক্ষে সেই রাঙ্গুসীকে দেখে এসেছে। ও মা মা মা, আমি কেমনে যাব, জ্যেঠামশাই, আমার যে নিজের গাল নিজে চড়াতে ইচ্ছে করছে।"

সত্যই গরম ক্ষোভে সে নিজের গালে চড় মারে। ফ্যাল, ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ভরত। নতুন বউয়ের প্রসঙ্গে সে একেবারে বোবা হয়ে যায়।

হরিমতি বললে, আমার কথাটায় বিশ্বেস কর জ্যেঠামশাই। সে বউ নাকি ছবিতে নাবে—গান করে, কথা বলে, আমি কেমনে যাব—মা মা মা মা—

ভরত ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, ছবিতে নাবা কি?

হরিমতি বললে, "ওই যে গো—যাকে বলে বাইসকোপ, ও আমরা বনর্থায় ঢের দেখেছি। তুমি যা পাড়াগেঁয়ে ভূত, সহর বাজারে যদিই বা কালে কস্মিনে গেছ। পালিয়ে আসবার পথ পাওনি। আমরা বনর্থায় গিয়ে কত বাইসকোপ তেইশকোপ—এমন কি পঁচিশকোপ পর্যন্ত দেখে এসেছি। সেই যে গো—ছুটিতে কথা বলে, অ্যাক্টো করে, নাচে আবার গান গায়।

ভরত মুখ ফিরায়। বাইসকোপের গল্প সে শুনেছে যদিও নিজে কখনও চোখে দেখে নি।

হরিমতী একটা দম নেয়, বললে "সেদিন আমার নেত্যহরি কোথায় তাগাদায় গিয়েছিল, পথের ওপর মটোর গাড়ী হতে নামলো নতুন বউ। আমার নেত্যহরির একেবারে চোখ কলসে গেল—এমনই তার সাজপোষাকের জলুস। নতুন বউ দেখেই কিন্তু চিনতে পেরেছে নেত্যকে, হাতছানি দিয়ে সে তাকে ডেকে গাঁয়ের কথা, তোমার কথা সব জিজ্ঞেস করেছে। তোমার কথায় নাকি খুব ভাবনা হয়েছে, বার বার করে বলেছে "ওই নদীতে কোন দিন মানুষ সুদ্ধ ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তোমার দাদুকে টেনে নিয়ে যাও তোমাদের বাড়ী—ও বাড়ীতে আর থাকতে দিয়ো না।"

হরিমতী আরও কি সব বলে, কানে আসে না ভরতের। সে চোখের সামনে দেখছে চওড়া লাল শাড়ী, সিঁথায় চওড়া সিন্দুর, হাতে লাল শাঁখা তামিনীকে সারাদিন উপবাস করে থেকে স্বামীর কল্যাণ কামনায় পূজা দিয়ে বুঝি ফিরে এলো সে।

নদীর একটানা কুল কুল শব্দ কানে আসে—আরও এগিয়ে আসছে নদী—

বর্ষায় নদী স্ফীত হয়ে উঠেছে, তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলে ছুটছে। নদীর বুকে নৌকা ভেসে চলেছে, দাঁড়িরা দাঁড় ফেলছে, কপাকপ, কপাকপ, মাঝি হালে বসে গান ধরেছে—

ওই যে দূরে গাঁয়ের কোলে—

যেথা মাটির প্রদীপ জ্বলে

সেইখানে ওই কুঁড়ে ঘরে একলা তুমি আছো

পিয়া, একলা তুমি আছো—

ওরত অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকে—

না আর গাঁয়ের কোলে সে বধূ নাই, ভেসে গেছে সে স্রোতের মুখে কুটোর মতই,—

তা যাক—তা যাক; সে সুখী হোক—শান্তি পাক, এই কামনাই করেছে ওরত। সে আর কয়দিন বাঁচবে; তারপরে কি হতো তামিনীর? কে তাকে দেখতো? দুদিন পরে তাকে যেতেই হতো—সেদিন হয়তো তার দিন থাকতো না, তার চেয়ে দুদিন আগে গেছে—ভালো—অনেক ভালো।

কত কষ্টেই সে কাটিয়েছে তার জীবনের একুশটা বৎসর। আঠারো বৎসর কেটেছে মামার বাড়ী দাসীবৃত্তি করে, তিন বৎসর কাটলো এখানে—এ ও তো দাসীবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

মাত্র দুই বৎসর সে সুখের মুখ দেখেছে—আহা তাই হোক, তার সুখ শান্তি চিরস্থায়ী হোক।

সেই অলঙ্কারভূষিতা মূর্তিটি মনে জাগাবার চেষ্টা করে ওরত। কিন্তু মনে জাগে লালপাড় শাড়ি, সিঁদুর আলতা শাখা পরা তামিনীর মূর্তি।

(৫)

হুড়মুড়—হুড়মুড়—দারুণ শব্দ শোনা যায়।

সাবনেই আরও দু'হাত জায়গা ভেঙে নদী গর্ভে যায়, সঙ্গে সঙ্গে নদীর জল কেঁপে ফুলে আসে, যেন সহস্র বাহু বাড়িয়ে আকুলি বিকুলি মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

কাঁথাখানা মুড়ি দিয়ে বারান্দায় একটা মাদুরের উপর পড়ে আছে ওরত।

বার বার জ্বর আসছে, ম্যালেরিয়া এবার পূর্ববেগে আক্রমণ করেছে। বিখ্যাত গাঁয়ের হরেন দাসের ঔষধ মোটেই ধরলো না।

বৃদ্ধ হরেন দাস হতাশভাবে বললেন, "ওষুধ বিষুধ তো চেয়েই হল ঘোষমশাই, ঠাকুর দেবতার মানত করলে হয়তো ভাল হতে পারে। সেবার সেই যে বউ মা মানত করে—"

সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে ওরত—"রসাতলে যাক তোমার ঠাকুর দেবতা কোবরেজ, মোদ্দা—বাঁচতে আমি চাই নে। বয়েসও তো বড় কম হল না—ষাট উতরে গেছে। বাঁচাবার ওষুধ দেওয়ার চেয়ে নিদেন-কালটা যাতে শিগ্‌গীর এগিয়ে আসে এমনি ওষুধ যদি দিতে পারো তাই দাও দেখি, একটা কাজের মত কাজ হবে।"

হরেন দাস অপ্রস্তুত ভাবে মাথা চুলকাল মাত্র।

নিদেনকালই এগিয়ে আসে।

হরিমতী নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাওয়ার অনেক চেষ্টা করেছে, ওরত যায় নি।

মন বলছে—সে আসবে, অন্ততঃ পক্ষে তাকে দেখতেও তামিনী একবার আসবে। ওরত মনে মনে তাকে ডাকছে, ডাক তার ব্যর্থ হবে না।

সে ক্ষমা চাইবে—এই ক্ষমা চাইবার অপেক্ষা করছে মরণপথযাত্রী। তামিনীর ঠিকানা জানে না, জানলে একখানা পত্র দিয়ে ক্ষমা চাইত।

চোখের দৃষ্টি হারিয়ে গেছে ওরতের,—হাঁফের মত টান ধরেছে। এমনই ভাবে দম নিতে নিতে কখন এক সময় দম ফুরিয়ে যাবে।

জলের কুল কুল শব্দটা স্পষ্ট শোনা যায়; হয়তো এ শব্দও সে শুনতে পাবে না, চোখের মত শ্রবণ-শক্তিও হয় তো হারিয়ে ফেলবে।

হরিমতী আজ আসেনি। কাল সে স্ট্যাম্পের ওপর

গাইন করিয়ে নিয়ে গেছে ভরতের কম্পিত হাতখানা ধরে, বুঝতে পেরেও আপত্তি করে নি ভরত। সে চলে যাচ্ছে, মাটির জিনিষ যে খুসি নিয়ে নিক, সঞ্চয় করে রাখবার সময় উত্তরে গেছে।

ঝিক ঝিক ঝিক—ইঞ্জিন চলার শব্দ শোনা যায়।

একখানা মোটর লরি ভেসে আসে, হঠাৎ তার ইঞ্জিনের শব্দটা বন্ধ হয়ে যায়, মনে হয় কাছেই কোথায় থেমে গেল।

বড় জল পিপাসা—কোথায় আছে জলের পাত্রটা, কাঁথার মধ্য হতে হাতখানা বার করতে চায় ভরত, হাত ওঠে না।

"জল—একটু জল—"

দৃষ্টিহীন দু'চোখের কোণ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে, ফিস ফিস করে শেষ প্রার্থনার বাণী শোনা যায়—'জল—একটু জল—'

আশ্চর্য—কে যেন তার মুখে জলদেয়,—পরমস্নেহে কে তার মাথাটি সুকোমল কোলে তুলে নেয়,—কার চোখের উষ্ণ জল ভরতের ললাটে গণ্ডের উপর ঝরে পড়ে?

"কে—কে কে—?"

উচ্চারণ করতে যায় তবুও শব্দ বার হয় না।

"আমি—ওগো, আমি তামিনী, তোমায় নিয়ে যেতে এসেছি আমার কাছে।"

মৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে ওঠে—

তামিনী এসেছে, আর্তকণ্ঠে ডাকছে, "দেখুন দেখুন ডাক্তারবাবু, একটু দেখুন, ওষুধ দিন।"

মোটর লরি সে ডাক্তার এনেছে, ঔষুধ এসেছে বাক্সে বোঝাই হয়ে,—

কিন্তু না, কোন কাজেই লাগলো না, ডাক্তার হতাশভাবে রোগীর হাত নামিয়ে রাখলেন—

হাহাকার ক'রে ভরতের প্রাণহীন বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে তামিনী—

"ওগো, আমায় ক্ষমা করে যাও, শুধু আমায় ক্ষমা করে যাও, তোমার ক্ষমার বাণী আমার জীবনে পরম শান্তি এনে দেবে। আমায় ক্ষমা কর—ওগো আমায় ক্ষমা কর—"

ওদিকে ইচ্ছামতী গর্জন করে—এই ধরটুকুকে গ্রাস করবার জন্য সে বাহু বিস্তার করছে।

দু'দিন বাদে হয়তো সবই হবে জলময়, ভরত ঘোষ নামে একজন লোক কে এখানে বাস করতো তা লোকে ভুলে যাবে।

এই জগতের চিরন্তন নিয়ম।

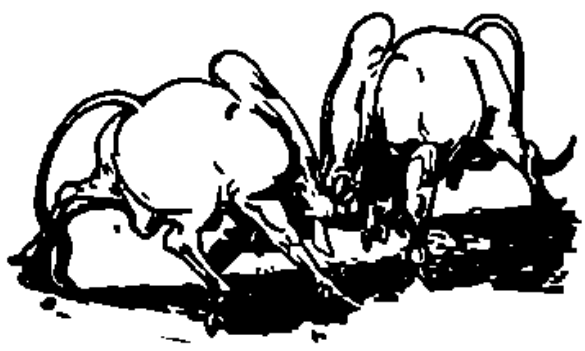

[৪]

চিঠি আসার ফলে খানিকটা আবার নিজের দিকে ঠেলে দেবার সুযোগ পেয়েছিলাম। এই অবকাশে নিজেদের সহরেই একবার চেষ্টা ক'রে দেখ্‌লাম—কোথাও বাজের কিছু-একটা সুবিধে করা যায় কিনা। কলেজের হেড্‌ ক্লার্কের পদটি শীঘ্রই খালি হবার কথা। ছিল, সেখানেও একবার গোপনে সন্ধান নিতে চেষ্টা ক'রলাম। কেরানী জীবনের কথা কল্পনা ক'রে ধিক্কারও এলো বড় কম নয়; দর্শন আর মনোবিজ্ঞানের ছাত্র হ'য়ে শেষ পর্যন্ত কেরানীগিরীই কি জীবনের একমাত্র অবলম্বন হ'য়ে দাঁড়াবে? কিন্তু উপায় কি! আমাদের সমাজ-ব্যবস্থা আজও সেই স্তরে এসে পৌঁছায় নি—যেখানে মানুষ তার নিজের রুচি অনুযায়ী আপন গ্রাসাচ্ছাদনের পথকে আশ্রয় ক'রে দাঁড়াতে পারে। অতএব নগদ পাওনাকে সাগ্রহে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত; কিন্তু আপাতত সমস্ত যুক্তিই মাটি হ'য়ে গেল। আদালত কাছারী থেকে সুরু করে কোথাও কিছু একটাও সুবিধে করা গেল না। কলেজে গিয়ে শুন্‌লাম—হেড্‌ ক্লার্ক আরও দু'বছরের এক্সটেন্‌শন নিয়ে বহাল তবিয়তে তাঁর গদি আগ্‌লে আছেন। সস্নেহে কাছে ডেকে নিয়ে ভাইস্‌-প্রিন্সিপাল ব'ল্‌লেন, 'তুমি বরং ডিটেইন্‌ না ক'রে এম, এ-টা দাও। পাশ ক'রে এলে তখন এখানেই ফিলজফি-ডিপার্টমেন্টে কিছু একটা সুবিধে হ'য়ে যাবে।

অর্থাৎ প্রফেসারী। শুনে মনটা মুহূর্তের জন্য একবার খুসী হ'লো। প্রফেসারই যে হ'তে চাই! ছাত্রদের নিজের হাতে গ'ড়ে তুল্‌তে পারবো, শত শত ছাত্রের জীবনের মধ্যে অনন্তকাল হ'য়ে বেঁচে থাকবো—যেমন ক'রে বেঁচে থাকবেন অধ্যাপক সিদ্ধান্ত। হঠাৎ চিন্তায় বাধা প'ড়লো, স্বপ্ন ভেঙে গেল মন থেকে। প্রতি-বারের মতই আর একবার মনে হ'লো—অধ্যাপক সিদ্ধান্তই বা কি পেলেন তার জীবনে? চাকরী জীবনটাও তো আর শান্তিতে কাটলো না। চারদিকে ক্লিক, ষড়যন্ত্রের জাল ফেলে চারদিকে অসহযোগের আন্দোলন চালাচ্ছে সবাই। গান্ধীজী কি নন-কো-অপারেশনের পথই না দেখিয়ে গিয়েছেন দেশবাসীকে! যে ইংরেজ এতকাল লক্ষ্য ছিল, সে লক্ষ্য হয়েছে আজ প্রতি দ্বিতীয় ব্যক্তি। এও সেই ইংরেজ-শাসনেরই ফল। এ সমাজ-ব্যবস্থায় এমনটা হ'তে বাধ্য। অধ্যাপক সিদ্ধান্তকেও তাই বাধ্য হ'য়ে সবার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে হ'য়েছে।

তিনি সেদিন তাঁর বাড়ীতে যেতে বলা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত যেতে উঠতে পারিনি। লজ্জা হ'লো। চাকরী সন্ধানের পথে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে তাই অধ্যাপক-গৃহে গিয়েই উপস্থিত হ'লাম।

—'এস, এস।' ব'লে সাদর আহ্বান জানিয়ে কাছে টেনে নিয়ে বসলেন অধ্যাপক সিদ্ধান্ত। ব'ল্‌লেন, 'ক'দিন তোমাকে দেখ্‌তে না পেয়ে কাল রাত থেকেই ভাবছিলাম—আজ বিষ্টুকে একবার তোমার খোঁজে পাঠাবো।'

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'ব্যাপার কি, বিশেষ কাজ কিছু আছে নাকি স্যার?'

—'না, কাজ কিছু নয়।' মুহূর্তক্ষণ থেমে অধ্যাপক

সিদ্ধান্ত ব'ল্লেন, আপাতত বেশ-কিছুকালের লম্বা ছুটি নিয়ে আমি বাইরে চ'লে যাচ্ছি। ইচ্ছে আছে কিছুকাল উত্তর ভারতে কাটিয়ে ভারপর বৃন্দাবনেই যাহোক একটা স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা ক'রে নেবো।'

ব'ল্লাম, 'তা হ'লে সত্যি সত্যিই আপনি এবারে রিটায়ার ক'রছেন, বলুন!'

—'কতকটা সেরকমই। তবে সে প্রশ্ন এখন আস্‌চে না, আপাতত: কিছুকাল ছুটিটাই ভোগ ক'রবার ইচ্ছে।'

—'তারপর?' বিচলিত কণ্ঠেই প্রশ্নটা ক'রলাম।

অধ্যাপক সিদ্ধান্ত ব'ললেন, 'তারপর শরীরের অবস্থা বুঝে ওখান থেকেই হয়ত রেজিগ্‌নেশন দিতে হবে। এ ভিন্ন উপায় নেই। এ বয়সে এখন আর নিজের উপর আস্থা রাখ্‌তে পারছি না।'

অস্ফুটকণ্ঠে ব'ললাম, আপনাকে তা হ'লে এবারে সত্যি সত্যিই হারালাম স্যার।'

—'কাছে থেকেও তো একদিন হারাতে হ'তো। এ বরং তার চাইতে ভালোই হবে।' ব'লে একটু-কাল থেকে বিষ্টুচরণের উদ্দেশে একবার হাঁক দিলেন তিনি।

বিষ্টুচরণকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেল না। যখন এলো সে, দু'হাতে দু' কাপ চা নিয়েই সে ঘরে এসে প্রবেশ ক'রলো।

আড়াল থেকেই সে হয়ত দেখে থাক্‌বে আমাকে, মনিবের পক্ষ থেকে পরবর্তী ব্যাপারটা অনুমান ক'রে সে একেবারে প্রস্তুত হ'য়েই দর্শন দান ক'রলো।

অধ্যাপক সিদ্ধান্ত ব'ল্লেন, 'এই দেখ, সাধে কি বলি বিষ্টুচরণের বুদ্ধি আছে মাথায়।'

মুখ টিপে হেসে ব'ল্লাম, 'মাথাওয়ালা লোকের কাছে থাকলে বোকারও বুদ্ধি হয়, আর বিষ্টুচরণ তো চালাক লোক।'

কথাটা কিন্তু গিয়ে এবারে বিষ্টুচরণের ব্রহ্মতালুতে ঘা দিল। ব'ল্লো, 'চালাকি আমি করিনা বাবু।'

ব'ল্লাম, 'মিথ্যে কথা ব'ল্লে তো! এইমাত্র যে লুকিয়ে আড়াল থেকে কাজ গুছিয়ে এলে, চালাকি করলে না তো কি?'

এবারে লজ্জায় মাথা নিচু করে নিল বিষ্টুচরণ. এবং একটুকালও আর অপেক্ষা না করে বাঁকাচোখে একবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে পুনরায় বহির্ভূত হ'য়ে গেল।

হাসির মাত্রা এবারে খানিকটা বেড়ে যেতেই ব'সেছিল, অধ্যাপক সিদ্ধান্ত ব'ল্লেন, 'ঠাট্টাটুকুও বোঝে না বিষ্টু। আজকাল এমন ছেলে পাওয়া যায় না।'

উত্তরে কিছু একটাও বলা সম্ভব হ'লো না। বিষ্টু-চরণকে নিয়ে অধ্যাপক সিদ্ধান্তর গর্ব যে কতখানি, তা জানতুম। জানতুম ব'লেই তার সম্বন্ধে প্রকাশ্যে কিছু-একটা মন্তব্য করা কঠিন হ'লো।

স্বর থেমে অধ্যাপক সিদ্ধান্তই আবার ব'ল্‌তে শুরু ক'রলেন: 'বুঝেছ সুমন্ত, যাবার দিনটাও একরকম স্থির করেই ফেলেছি, পরশু সন্ধ্যায় এখান থেকে রওনা হ'য়ে গিয়ে ক'ল্‌কাতায় হুন-এক্স্‌প্রেস ধ'রবো। তোমাদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হ'চ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু উপায়ও নেই কিছু। পারোতো মাসে মাসে এই বুড়ো মাষ্টারের খবরটা নিও। ঠিকানা পাঠিয়ে দেবো।'

—'তাই দেবেন।' ব'লে উপুর হ'য়ে অধ্যাপক সিদ্ধান্তর পায়ের ধুলো গ্রহণ ক'রলাম।

আশীর্বাদ ক'রে তিনি ব'ল্‌লেন, 'মহৎ হও, উন্নত হও, উজ্জ্বল হও, কল্যাণ হোক্ তোমার।'

এর চাইতে বড় আশীর্বাদ বোধ করি পৃথিবীতে আর কিছু নেই। কতবারই তো এম্‌নি করে তিনি আশীর্বাদ ক'রেছেন, আজ্‌কের আশীর্বাদটা যেন তার চাইতেও একটা বিশেষ রূপ নিয়ে দেখা দিল। তা অনেকক্ষণ আগেই শেষ হ'য়েছিল; কিন্তু একটাও যে আর প্রশ্ন তুলে ধ'রবো, এমন কোন কথাই খুঁজে পেলাম না। নীরবে তাই সেই আশীর্বাদের বাণী বহন ক'রেই একসময় তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

তাঁর এই ছুটি নিয়ে চ'লে যাবার পিছনে যে কতবড় বেদনা লুকিয়ে আছে, তা সংসারে আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি !

পথে এসে এবারে সোজা বাড়ীর দিকেই পা বাড়ালাম।

এসে বড় ঘরের দাওয়ায় উঠ্‌তেই দেখ্‌লাম দিদি ব'সে ব'সে মার বুকে ওষুধ গরম ক'রে মালিশ ক'রে দিচ্ছে, খানিকটা দূরে একটা টুলে ব'সে জামাইবাবু কি একখানি বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে চ'লেছেন।

ঠিক প্রকৃতিস্থ অবস্থায় ছিলেন না, থাকলে আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে কিছু-একটা ব'লতেন। কাছে গিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে জামাইবাবুকে জিজ্ঞেস ক'রলাম—'হঠাৎ কিছু-একটা আবার নতুন উপসর্গ দেখা দিল নাকি মার ?'

উত্তরে জামাইবাবু নীরবে বারান্দায় ডেকে নিয়ে এসে আমাকে ব'ল্‌লেন, 'হার্টের সেই একই কম্‌প্লেন, তুমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার ঠিক পরে পরেই হঠাৎ কেমন অস্থির হ'য়ে প'ড়লেন ; তোমার দিদিকে ডেকে ব'ল্‌লেন—কাছে গিয়ে বুকখানিকে একবার চেপে ধরতে। কর্তামশাই বাড়ীতেই ছিলেন, অবস্থা দেখে ছুট্‌লেন ডাক্তারের কাছে। যাবার আর মালিশের জন্য দু'টো নতুন ওষুধ প্রেস্‌ক্রাইব ক'রে দিয়েছেন ডাক্তার। ওষুধ খাওয়ানো হ'য়েছে, মালিশও চ'লেছে। কিন্তু এসে অবধি এ তো আজ যা প্রথম দেখ্‌ছি, তাতে এই নিয়েই মফঃস্বল সহরে মাকে আর ফেলে রাখা সমীচীন মনে ক'রছি না। ক'লকাতায় নিয়ে গিয়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি ক'রে দেবার দরকার।'

ব'ল্‌লাম, 'হার্টের রোগে এমনটা হয়। প্রথম দিকে এর চাইতেও বেশী হ'য়েছিল। ডক্টর চৌধুরী কিছু জবাব না দেওয়া পর্যন্ত নতুন ব্যবস্থাই বা কি করা যেতে পারে! মুস্কিল হ'য়েছে এই যে, এলো-প্যাথিক বা ক'ব্‌রেজি—কোনো ওষুধই মা মুখে নেবেন না, বমি ক'রে ফেল্‌বেন। কম্‌প্লেক্সও যে একটা নয়।'

—'তাও অবিশ্যি এসে অবধিই দেখ্‌তে পাচ্ছি। কিন্তু কর্তাঠাকুর যে এই নিয়ে উতলা হ'য়ে প'ড়েছেন ; ওঁকেই বা সান্ত্বনা দিই কি ব'লে ?' ব'লে নির্ভর-যোগ্য কিছু একটা জবাব শুন্‌বার প্রত্যাশাতেই আমার মুখের দিকে চোখ দু'টো তুলে ধ'রলেন জামাইবাবু।

ব'ল্‌লাম, 'বাবাকে সান্ত্বনা স্বয়ং ব্রহ্মা এলেও দিতে পারবেন না। কোনোদিনই তো নির্বিকল্প প্রকৃতির মানুষ নন্ বাবা, সব কিছুকে নিজের হাতে বাজিয়ে না নিলে ওঁর চলে না। বাবা নিজে থেকে সান্ত্বনা না পাওয়া অবধি আপনি আর দিদি শত চেষ্টা করলেও কিছু হবে না। নয়তো মাকে নিজের মুখে ব'ল্‌তে হবে—'ওগো, আমি ভালো হ'য়ে গেছি, তুমি আর মিছে মিছি এমন উতলা হ'য়ো না।'

চোখ নামিয়ে কিছুক্ষণের জন্য চুপ ক'রে রইলেন জামাইবাবু, তারপর ব'ল্‌লেন, 'আমাকে এখন তবে কি ক'রতে বলো ? এ ব্যাপারে তো দেখতে পাচ্ছি আমার কোনো ফাংশনই নেই !'

ব'ল্‌লাম, 'সংসারে লোক থাকলে ফাংশনের কি কিছু অভাব আছে, কাজ কিছু না-কিছু জুটেই যায়। আপাতত ব'সে ব'সে খানিকটা মেন্টাল ওয়ার্কই করুন।'

—'ভালোই ব'লেছ। দার্শনিক না হলে এমন ওয়ার্ক কেউ দিতে পারে !' ব'লে ঘরের দিকেই আবার যেতে উদ্যত হ'লেন জামাইবাবু।

বাধা দিলাম না। নিজেরও সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্তি এসে গিয়েছিল। নিজের অধ্যয়ন কক্ষে এসে তাই টান টান হ'য়ে শুয়ে প'ড়লাম। শুয়ে যে নিশ্চিন্ত হ'লাম, তা নয়, মার সম্বন্ধে ভাবনা এবারে খানিকটা বেড়ে গেল। সংসারটা আমাদের যে নীতির উপরেই দাঁড়িয়ে থাক, আর যে নীতির বিরুদ্ধেই আমি বিদ্রোহ করিনা কেন; মা তো মা-ই বটে, মার আসন শূন্য হ'লে গোটা সংসারটা একদিনেই ভেসে যাবে।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে কখন্ যে অন্যমনস্কভাবে খানিকটা তন্দ্রা এসে গিয়েছিল, বুঝতে পারিনি। যখন চোখ

মেলাম, দেখলাম—শিয়রে ব'সে মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে টিপে হাসছে দিদি।

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'কি, মালিশ শেষ ক'রে এলে?'

দিদি ব'ললো, 'তা তো এলাম, কিন্তু এমন মজার ব্যাপারটা এতদিন কেন লুকিয়ে রেখেছিলি রে সুমু?'

—'কেন, ব্যাপার কি?' কৌতূহলটা এবারে আমার নিজের কাছেই ভারী হ'য়ে উঠলো।

দিদি জিজ্ঞেস করলো, 'তনুশ্রী কেমন দেখতে রে?'

ব'ললাম, 'মনে হচ্ছে, খানিকটা তৈরী হয়েই যেন প্রশ্নটা করলে।'

—'মানে, মার কাছে সব শুনলাম কিনা, তা—ই।' থেমে দিদি জিজ্ঞেস ক'রলো, 'তা—এসে তারা কদিন ছিল এখানে, কিছুই তো চিঠিতে তুই লিখিস্‌নিরে সুমু?'

—লিখবার কিছু ছিল না, তাই লিখিনি।' কৌতূহলের বশেই প্রশ্ন করলাম, 'তা—মার কাছে কি শুনলে, কি ব'ললেন মা?'

—'হৈম মাসীদের খুব প্রশংসা করলেন। দিদি ব'ললো, 'আচ্ছা তুইই বল সুমু, জীবনে যাদের কোনদিন চোখে দেখলাম না, মুখে-মুখে তাদের প্রশংসা শুনে লাভ কি?'

বললাম, 'লাভ-লোকসানের ব্যাপারটা মার সঙ্গে' ক'রলেই পারতে। মন্টু কোথায়, মন্টুর যে অনেকক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না!'

—'মন্টুকে নিয়ে পাচক ঠাকুর বাইরে বেরিয়েছে' থেমে পূর্বের প্রশ্নটাকেই পুনরায় তুলে ব'ললো দিদি: 'তা—তনুশ্রী কেমন দেখতে রে?'

ব'ললাম, 'একেবারে অপ্সরী, হ'লো তো? তোমাদের মেয়েদের কী যে স্বভাবদোষ, বুঝি না! কে কেমন কার মতো কে দেখতে, এ ভিন্ন তোমাদের যেন কথা নেই। কেমন দেখতে, সেটুকুও বা মাকে জিজ্ঞেস করতে বাধলো কিসে!'

হেসে দিদি ব'ললো, 'বাধেনি রে, বাধেনি, সব শুনেছি! উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, টানা টানা ভ্রু, টিকোলো নাক, পাপড়ির মতো পাতলা দুটি ঠোঁট, চেহারা গড়ন, লম্বায় মানানসই। অপ্সরী না হ'লেও দশ জনের মধ্যে একটি। কেমন লাগলো তনুশ্রীকে, এবারে বল্‌ দিকি?'

এক কথাতেই কোনোরকমে প্রসঙ্গটা শেষ ক'রতে চেয়ে ব'ললাম, 'অত্যন্ত বিশ্রী, গায়ে প'ড়ে কাজলামী ক'রতে এক নম্বরের ওস্তাদ মেয়ে।'

—'কেন, তোর সঙ্গে বুঝি কাজলামি ক'রেছে, দিলেই পাঁরতিস কান দু'টো মলে!'—চোখ দুটো নাচাতে নাচাতে হাসতে লাগলো দিদি।

ব'ললাম, 'শেষে এই নিয়ে কিছু একটা ফৌজদারী বেধে উঠতো আর কি!'

হাসতে হাসতেই দিদি বললো, 'নয় উঠলোই বেধে, আদালতে দশজনের সামনে দাঁড়িয়ে বলতিস—আমার প্রাণেশ্বরীকে আমি মারি ধরি যা ইচ্ছে তাই করি, তা নিয়ে কার আবার কি ব'লবার আছে!'

প্রাণেশ্বরী। শব্দটা শুনে হঠাৎ চমকে উঠলাম। এ বলে কি দিদি! বিস্ময়ের কণ্ঠেই জিজ্ঞেস করলাম, 'কি বললে?'

দিদি ব'ললো, 'মিথ্যে বললাম না কি কিছু? মা তো শুনলাম সনন্দ ব্যবস্থাই পাকা করে ফেলেছেন। তা—তোরই বা এমন অবাক হবার কি আছে! তুইই তো শুনলাল—ঘরে বউ আনা নিয়ে মাকে কথা দিয়েছিস!'

ব্রহ্মতালুটা হঠাৎ যেন কেমন শির-শির ক'রে উঠলো। এ অসম্ভব, এ যে ভাবতে পারিনি, এ যে মুহূর্তের জন্যেও কল্পনা করতে পারিনি! শরীরের যে অবস্থা নিয়ে মা সেদিন ঘরে বউ আনবার কথা ব'লেছিলেন, ডাক্তারের নির্দেশের দিকে তাকিয়েই তাতে আমি সম্মতি জানিয়েছিলাম মাত্র। কিন্তু তাই ব'লে তনুশ্রীর মতো মেয়েকে শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করতে হবে, ছিঃ ছিঃ ছিঃ! অনিমা আর তনুশ্রী—কার সঙ্গে কী তুলনা। সংসারের ষড়যন্ত্র কি শেষ পর্যন্ত এমন ক'রেও মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

বললাম, এতদিন বাড়ীতে থেকেই বহু অবাধ্যতা

ক'রেছি, এবারে বোধ করি আমাকে বাড়ী ছাড়তে হ'লো দিদি !'

—'তোরা ছেলেরাও বাপু কম নস্। বিয়ের নাম শুনলেই গোড়ায় ফোস্ ক'রে উঠবি, শেষে তো দেখি বউ ছাড়া আর ধ্যান জ্ঞান কিছু নেই !' খেমে দিদি ব'ললো, 'মার সাধ হয়েছে, আপত্তি করিসনে কিছু। আজ যদি কাল না না থাকলে এই নিয়ে সারা জীবন তোকে দুঃখ পেতে হবে। তোর বউ যে আমাদের কত আদরের হবে, সে কি বুঝতে পারিস নে সুমু ?'

ব'ললাম, 'আমিই যথেষ্ট আদরের হয়েছি, এখন বাকী আছে আমার বউ।'

কথা কাটলো দিদি : 'বউরাই সংসারে আদরের হয়। এনেই দেখ্‌না ঘরে বউ !'

ব'ললাম, 'আপত্তি নেই ; কিন্তু চাকুরী-বাকুরী কিছু-একটা না পাওয়া অবধি এসম্বন্ধে আমি কিছু ভাবতে পারছি না।'

এবারও কথা কেটে দিদি বললো, জীবনে চাকুরীর দিন অনেক পাবি, কিন্তু না গেলে আর ফিরে আসবেন না এমন নয় যে জলে পড়েছিস ; বাবা যে কটা দিন সমর্থ আছেন, সংসারে অন্ততঃ খাওয়া-পরার ভাবনা সে ক'টা দিন না-ই করলি। কথা রাখ সুমু, মার এ-অবস্থায় তাকে দুঃখ দেওয়া ঠিক হবে না।'

—'কিন্তু নিজে সারা জীবন দুঃখ পেয়ে মা বাবাকে সুখী ক'রতেও যে আমি পারছি না। কোনোকালেই তোমাদের কারুর রুচির সঙ্গে আমার রুচি মিল্‌লো না, এ বিধাতার অভিশাপই ব'ল্‌তে হবে। তা যাক্, কিন্তু মার মন-গড়া এ সম্বন্ধে আমি একবিন্দুও রাজি নই।'

কথাটা স্পষ্ট করেই বললাম দিদিকে। কারণ, দিদি যা নিয়ে আজ কথা কাটছে, তা যে দিদির নিজের কথা নয়, সেটুকু ভালো ক'রেই জানি। আমার যা কিছু বক্তব্য, তাও যে দিদির মুখ দিয়ে মার কাছে গিয়ে প্রকাশ পাবে, এও আমার অজানা নয়।

দিদি ব'ল্‌লো, 'মা তবে কথা দিয়ে কথার খেলাপ ক'রবেন, ব'ল্‌তে চাস ?'

কথা শুনে এবারে রাগ হ'লো, ব'ললাম, 'এমন কিছু কথা দিয়েই যদি থাকেন, তবে তার আগে আমাকে অন্ততঃ একটিবার জানানো উচিত ছিল না কি ? আমি রুচি খোকাটি নই, ভালোমন্দ বিবেচনা আমার নিজেরও কিছু আছে। ওখানে ও সম্বন্ধ হ'তে পারে না, এতে মা যদি দুঃখ পান, আমার কিছু ক'রবার নেই।'

শান্তকণ্ঠে দিদি ব'ললো, 'এতো আর তোর শেষ কথা হ'তে পারে না। মাকে আঘাত দেওয়া তোর ঠিক হবে না সুমু। বাড়ীর একমাত্র ছেলে তুই, তোকে বিয়ে দিয়ে না-বাবা ঘরে বউ আন্‌বেন, এর চাইতেও কি সুখের কিছু আছে !...'

দিদি আরও কিছু একটা ব'ল্‌তে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে ব'ললাম, 'তাতে আমার সুখ কিছু ঘটবে কিনা, তা কি কেউ তলিয়ে দেখেছে ?'

—'তবে কাকে নিয়ে তুই সুখী হ'তে চাস্, বল ?' প্রশ্নাতুর দৃষ্টিতে এবারে চোখ দু'টোকে আমার মুখের পানে তুলে ধ'রলো দিদি।

জবাবটা অতি সহজ ছিল, কিন্তু সহজ বলেই বোধ করি সঙ্গে সঙ্গেই প্রকাশ ক'রতে পারলুম না। অনাবশ্যকভাবে কিছুক্ষণ হাতের রেখার দিকে তাকিয়ে নীরবে ব'সে রইলুম।

প্রসঙ্গটাকে আরও খানিকটা ঘোরালো ক'রে দিদি এবারে প্রশ্ন ক'রলো, 'তোর সে লেডি-ক্রেইগটিকে চিঠি লিখ্‌ছিলি, তার বয়স কত, দেখ্‌তে কেমন ?'

যথাযথ উত্তর না দিয়ে ব'ললাম, 'বয়স আমার কাছাকাছিই হবে, পরীক্ষায় এবারে হাই সেকেণ্ড ক্লাশ অনার্স পেয়েছে সে, পুণিয়ায় আপাতত মাষ্টারী নিয়ে আছে।'

—'তাকেই তবে তুই মন প্রাণ দিয়েই ভালোবাসিস বল ?' প্রশ্নের সমাধানটা প্রায় প্রশ্নের সূত্রেই ক'রে ফেলতে যাচ্ছিল দিদি।

ব'ললাম, 'নইলে আর তাকে এমন চিঠি লিখি কি ক'রে !'

—'তাকে হ'লে তবে তুই বিয়ে করতে রাজি আছিস ?'—প্রশ্ন আর ঘুরোতে চায় না দিদির মুখে।

ব'ললাম না যে 'রাজি আছি', ব'ল্‌তে গিয়ে নিজের কাছেই কেমন যেন লজ্জা পেলাম ; ব'ললাম, অনিমা গরিব, কিন্তু তার প্রেম রাজসিক, তাকে ইচ্ছে করলেই সরিয়ে দেওয়া যায় না।'

এরপর কিন্তু আর একটি প্রশ্নও করলো না দিদি। কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল, তারপর নিঃশব্দেই একসময় ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

(ক্রমশঃ)

প্রধান মন্ত্রীর রুশীয়া ভ্রমণ

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু আজ আন্তর্জাতিক জগতে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করেন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর হতে তিনি বরাবরই ঘোষণা করেছেন—পৃথিবীর দুইটি শক্তিগোষ্ঠীর কোনটির সঙ্গেই তিনি ভারতকে যুক্ত করতে চান না; উভয়ের প্রতি যথাসম্ভব নিরপেক্ষ থেকে বাস্তব দৃষ্টিতে বিশ্বের শান্তিসাধনা করাই তাঁর বিশ্ব রাজনীতির মূল কথা ছিল। তখন অনেকে তাঁর এই মতকে বিদ্রূপ করেছে। প্রথম দিকে বিশেষ করে কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে এমন একটা অবস্থা দাঁড়িয়েছিল যে দুনিয়াতে ভারতের মিত্র বলে কেহ ছিল না। রুশীয়া বা সোভিয়েট রাষ্ট্র সম্বন্ধে লোকের মনে বরাবরই কতকটা সন্দেহ ও কতকটা আতঙ্কের ভাব ছিল এবং রুশীয়াও তার কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র-গোষ্ঠীরবাইরে কোন দেশের সঙ্গে হৃদ্যতা স্থাপন করতে উদ্‌গ্রীব ছিল না। তখন তার রাজনীতিতে বিশ্ব কমিউনিষ্ট বিপ্লবের কথা প্রবল ছিল। অপর দিকে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র তখন মার্শাল সাহায্য (Marshal Aid) বিতরণ করেছিল। কাজেই অনেকেরই মনে ধারণা ছিল ব্রিটেন ও আমেরিকার সঙ্গেই ভারতবর্ষের হৃদ্যতা হতে পারে এবং আমেরিকা থেকেই ভারতবর্ষ উন্নয়ন কাজের জন্য সাহায্য পেতে পারে। আমেরিকার উদ্দেশ্যও ছিল রুশীয়ার সঙ্গে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের বিষয়ে ভারতবর্ষকে আমেরিকার পক্ষে থাকার কোন রীতিতে রাজী করানো। কিন্তু পণ্ডিতজী যখন এই রকম কোন মনোভাবের পরিচয় দিলেন না বরং দরকার মত বিষয়ের ও অবস্থার পার্থক্য অনুসারে আন্তর্জাতিক সমস্যায় স্বাধীন মত প্রকাশ করতে লাগলেন, তখন আমেরিকা নানাভাবে ভারতের প্রতি কষ্ট হবার ভাব প্রকাশ করেছিল। উন্নয়ন কাজের জন্য আমেরিকা থেকে অর্থ পাবার সম্ভাবনা বেশ ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। কাশ্মীর সমস্যাও জটিল হয়ে পড়েছিল। তখন অনেকে পণ্ডিতজীর রাজনীতিতে আস্থা রাখতে পারেনি।

কিন্তু পণ্ডিতজী এতে বিচলিত হননি। বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার তিনি বজায় রেখেছেন। এর ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক্ষেত্রে কেবল যে ভারতের মর্যাদা বেড়েছে তা নয়, আন্তর্জাতিক মন কষাকষি ও পারস্পরিক সন্দেহ কমানোর পক্ষেও ভারত বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাইএর সঙ্গে যুক্ত বিবৃতিতে পণ্ডিতজী যে সহ-অবস্থান ও পঞ্চশীল নীতি ঘোষণা করেন, তা আজ বিশ্বের অনেক লোকই মেনে নিয়েছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর হতেই অর্থাৎ সোভিয়েটের স্থাপনা হতেই রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র ও দেশের মধ্যে একটা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব চলে এসেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রসমূহকে তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেত—(১) সোভিয়েট বা কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র (২) ইতালী ও জার্মাণির ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র ও (৩) অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্রের শ্রেণী বিভাগ দাঁড়াল—কমিউনিষ্ট ও অ-কমিউনিষ্ট। প্রথম দলের নেতা হল সোভিয়েট রুশীয়া এবং দ্বিতীয় দলের নেতা দাঁড়াল আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র। উভয়েই উভয়ের সম্বন্ধে ভীত ও সন্দিগ্ধ। তার ফলে বিশ্ব রাজনীতি চলছিল একই ধারা বেয়ে অর্থাৎ সামরিক শক্তি সংগ্রহ করে কে কাকে ধ্বংস করতে

পারে এই চেষ্টায়। উভয়েই যে নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে এক সঙ্গে বাস করতে পারে, এ ধারণা কারোর মনেই ছিলনা। পণ্ডিত নেহেরুই সর্বপ্রথম জোর গোরে এই মত প্রচার করলেন। এই মত অনুসরণ করার প্রথম দৃষ্টান্ত হল চীনের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপনের চেষ্টা। ঐ ঘোষণাতেই প্রথম সহ-অবস্থান ও পঞ্চশীল নীতির কথা বলা হয়।

পণ্ডিত নেহেরুর রাজনীতির আর একটি মূল নীতি চীন সম্পর্কে এসে যোগ দিল। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই কংগ্রেস দাবী করছিল যে প্রথমত এশিয়া থেকে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন অবিলম্বে গুটোতে হবে এবং আস্তে আস্তে আফ্রিকা থেকেও ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন রহিত করতে হবে। চীন প্রত্যক্ষভাবে কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের উপনিবেশ ছিলনা; কিন্তু সব ইউরোপীয় রাষ্ট্রই ওখানে ঔপনিবেশিক অধিকার ভোগ করত। তার ফলে চীনের অবস্থা ছিল সাত ভূতের মেলা। চিয়াং কাইশেক চীনের এই অবস্থা ঘুচাতে পারেন নি কিন্তু কমিউনিষ্ট চীন তা ঘুচিয়েছে। তাই নূতন চীনের প্রতি পণ্ডিত নেহেরুর একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। যখন আমেরিকা ও বৃটেন প্রমুখ রাষ্ট্র চীনকে অপাংক্তেয় করে রাখার চেষ্টা করেছিল পণ্ডিত নেহেরু তখন চীনের পক্ষ সমর্থন করে দাবী করলেন যে চীনকে যুক্তরাষ্ট্র সংঘের (United Nations) সভ্য করে নেওয়া উচিত। গত বছর পণ্ডিতজী চীনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে চীন ভ্রমণে যান। চীনের ভাল ও মন্দ সবই দেখে আসেন। ফিরে এসে চীনের তিনি সুখ্যাতিই করেছেন, কিন্তু নিজের দেশ ও জাতি সম্বন্ধে তাঁর আস্থা ও গৌরব বোধ একবিন্দুও হ্রাস পায়নি। ঐ কথা তিনি বার বার স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। এবার তিনি সোভিয়েট রাষ্ট্র ও অন্যান্য কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র সমূহ ঘুরে এলেন। এসব দেশের রাষ্ট্র প্রধান মন্ত্রীদের সঙ্গে মিলে সহ-অবস্থান ও পঞ্চশীল নীতি তিনি ঘোষণা করেছেন। পণ্ডিতজীর এই সফরের ফলে সহ-অবস্থান মেনে নেওয়ার স্বীকৃতি ইউরোপের বিভিন্ন কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র ঘোষণা করেছে। সব দেশের মনেই একটা আশঙ্কা আছে যে বিভিন্ন দেশে কমিউনিষ্ট দলের মারফৎ ও আন্তর্জাতিক কমিউনিষ্ট দলের সংস্থা বা কমিনফর্ম(Cominform) মারফৎ বিভিন্ন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে সোভিয়েট রুশীয়া হস্তক্ষেপ করত বা করতে পারে। সহ-অবস্থান নীতির স্বীকৃতির পর, আশা করা যায় যে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র সম্বন্ধে এই সন্দেহের অবসান হবে। আজ জেনেভাতে যে চারটি প্রধান জাতির রাষ্ট্রশ্রেষ্ঠদের পারস্পরিক আলোচনা হয়ে গেল, তাও মূলত এই নীতির স্বীকৃতির জন্যই সম্ভব হয়েছে। এখানে একটা ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ফরাসী বিপ্লবের পর সমস্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সমবেত হল, এদের মধ্যে ব্রিটেন ছিল সবচেয়ে অগ্রণী। বিপ্লবী গণতান্ত্রিক ফ্রান্সকে ধ্বংস করার কত চেষ্টাই না এরা করেছে; কিন্তু বিপ্লবী ফ্রান্সের চিন্তাধারা সমস্ত ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ১৮৩০-৩২ সালে শাসন সংস্কারক আইন দ্বারা (Reforms Act) ব্রিটেনও ফরাসী মূলনীতিকে স্বীকার করে নিয়েছিল। কয়েক বৎসর পরে ব্রিটিশ রাজনীতির গোড়ার কথা হ'য়ে দাঁড়াল গণতান্ত্রিক ফ্রান্সের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করা। বিপ্লবের সময় ফ্রান্সেও বহু অনাচার হয়েছে, তা কেউ কোনদিন মেনে নেয়নি। রুশ বিপ্লবকেও যদি ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহলে তার সম্বন্ধে এতটা আতঙ্কের কোন কারণ থাকে না। রুশ বিপ্লবে যে সব অনাচার হয়েছে, তা ইতিহাস কোনদিন মেনে নেবে না। কিন্তু রুশ বিপ্লবের মূল নীতি অনেক দেশেই নিজ নিজ অবস্থা অনুযায়ী গ্রহণ করেছে। আজ রুশীয়ার পক্ষেও প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছে কতকটা সহজ অবস্থা লাভ। চিরস্থায়ী বিপ্লব (permanent revolution) বা বিশ্ব বিপ্লব (world revolution) নীতি নিয়ে একটা জাতির চিরকাল যুদ্ধ্যমান হ'য়ে বাস করা কঠিন। ষ্টালিন-নীতি, ষ্টালিনের মৃত্যুর সঙ্গেই হয়ত লোপ পেয়েছে। ১৯১৭ সাল হ'তে রাশিয়ার লোক সহজ অবস্থা দেখল না;—কেবলই আতঙ্ক, কেবলই যুদ্ধের আয়োজন। ইউরোপীয় জাতিসমূহ একে আঘাত করতে চেয়েছে; রুশীয়াও তাদের আঘাত করতে চেষ্টা করেছে। আজ রুশীয়ার নূতন নাগরিকগণ স্বভাবতই চাইবে একটা সহজ শান্তির অবস্থা।

রুশীয়া ও ইউরোপের অন্যান্য কমিউনিষ্টদের মধ্যে পণ্ডিতজী আদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছেন। সাধারণত কমিউনিষ্টদের মধ্যে বাইরের লোকদের গতিবিধি খুব অবাধ নয়, কিন্তু পণ্ডিতজীকে এঁরা প্রায় সর্বত্রই নিয়ে গিয়েছেন এবং অনেক কিছুই দেখবার সুযোগ দিয়েছেন। তাঁকে যে সম্মান কমিউনিষ্ট দেশসমূহ দেখিয়েছে তার কোন তুলনা হয় না। এসব যে নিছক লোক ভুলানো খেলা, তা মনে করবার কোন কারণ নেই। কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের মনোভাবের সত্যিকার পরিবর্তন কিছু হচ্ছে, এই কথা অনুমান করার যথেষ্ট কারণ আছে।

পণ্ডিতজীকে তারা এত আদর করেছে—তা একেবারে উদ্দেশ্যহীনও হয়ত নয়, তারা আশা করে তাদের ভাল জানলে বিশ্বে শান্তিস্থাপনের পক্ষে তাঁর সামর্থ্য ও যোগ্যতা বাড়বে। এবং তার ফলে রুশীয়া মন কষাকষি (mental tension) থেকে সহজ অবস্থা পেতে পারবে। আমরা আশা করি পণ্ডিতজীর প্রভাবে বিশ্ব রাজনীতির গতির পরিবর্তন হচ্ছে ও হবে। নিজ জাতি ও রাষ্ট্রের কর্ম ও শাসনপদ্ধতি এবং উন্নয়ন কার্য সম্বন্ধে তাঁর আস্থা ও গৌরবের বিন্দুমাত্রও হ্রাস হয়েছে বলে আমরা মনে করিনা। কিন্তু কমিউনিষ্ট দেশসমূহ থেকে কিছু শেখবার বা তাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যমূলক সম্বন্ধ স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা তিনি মানছেন ও প্রচার করেছেন। ভারতীয় কমিউনিষ্টগণের পক্ষে একটা আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়ত হয়েছে। কংগ্রেস শাসন ও পণ্ডিত নেহেরুর বিরোধিতাই এরা এতকাল করে এসেছে; অথচ যাদের ইঙ্গিতে এরা করে তারা পণ্ডিত নেহেরু ও তাঁর শাসনের সুখ্যাতি করতে দ্বিধা বোধ করে নাই। ভারতীয় কমিউনিষ্টগণ এতদিন যে ভুল পথে চলছিল হয়ত এখন তারা তা বুঝতে পেরেছে।

রুশ বিপ্লবের নায়কদের প্রথম মত ছিল বিশ্ব বিপ্লব ভিন্ন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কোন এক দেশে স্থাপিত হতে পারে না। কিছু দিনের মধ্যেই তাঁরা স্থির করলেন—এক দেশেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপিত হতে পারে। এর প্রথম ব্যর্থতা হ'ল জার্মানীতে এবং হাঙ্গেরীতে। রোজা লাক্সেমবার্গ (Rosa Luxemburg) ও বেলা কুনের (Bela Kun) চেষ্টা ঐ দুই দেশে ব্যর্থ হ'ল। এই রকম সময়ে লেনিন বলেছিলেন—"বাক্সে (Suitcase) ভরে বিপ্লবকে এক দেশ হ'তে অন্য দেশে চালান দেওয়া যায় না।" কিন্তু তবুও বিশ্ব-বিপ্লবের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা এরা ত্যাগ করে নি; বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্টদল ঐ বিপ্লব সাধনের যন্ত্র স্বরূপ রইল। কমিনটার্ন (Commintir) এবং গত যুদ্ধের পর কমিনফর্ম (Comminform) নামক কম্যুনিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট দলসমূহের পরিচালনা ও নেতৃত্বের জন্য গঠিত হ'য়েছিল। কিন্তু আজ এরা বিশ্ব-বিপ্লবের আদর্শকে তেমন প্রাধান্য দিচ্ছে না। ঐ মতের প্রধান ধারক ছিলেন ষ্টালিন; আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরিক রাজনীতিতে এর যা রূপ—তা ষ্টালিন শাসনে পুরাপুরিই ফুটে উঠেছিল। এই মতের শেষ চিহ্ন বেরিয়ার (Beria) মৃত্যুর সঙ্গে লোপ পেল। কম্যুনিষ্ট দলের সম্পাদক (Secretary) ক্রুশেভ (Khrushev) আজ নূতন মত আনছেন। লেনিন কোন সরকারী পদের অধিকারী ছিলেন না; ছিলেন কেবল দলের সম্পাদক। ষ্টালিনও বহুদিন পর্যন্ত তাই ছিলেন; পরে মহাযুদ্ধের সময় তিনি প্রধানমন্ত্রী হ'লেন। ক্রুশেভও আজ কোন সরকারী পদের অধিকারী নন।

রাশিয়া আজ যে নূতন পথ নিচ্ছে—তা হ'ল অনেকটা সহজভাবে বাস করার—আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরিক উভয় ক্ষেত্রে। তাই আজ তারা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রকর্তাদের নিজ দেশে আহ্বান করছে এবং অপর দেশের আহ্বানও তারা গ্রহণ করছে। ২।৩ বছর পূর্বে যুগোস্লোভিয়াতে বুলগানিন ও ক্রুশেভের গমন ও টিটোর সঙ্গে আপোষের চেষ্টা করার কথা কেউ বললে তার পরিণাম হ'ত বিশ্বাসঘাতক আখ্যায় মৃত্যু। পশ্চিম জার্মেনীর প্রধান মন্ত্রীকে এরা আহ্বান করেছে; এবং ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রীর আহ্বানে এরা ব্রিটেনে যেতে রাজী হয়েছে। কূটনৈতিক মেলা মেশায় ও খানা পিনায় এরা আজ খুব খোলা-মেলাভাবে অপরের সঙ্গে মিশছে। চরিত্রে রুশরা অনেকটা প্রাচ্য-ধর্মী; সহজভাবে ঢিলাঢালা ভাবে মেলা মেশা করাই এদের স্বভাব; কিন্তু এতদিন তা চাপা ছিল। পণ্ডিতজীর রুশিয়া ভ্রমণ এই সন্ধিক্ষণে হ'য়েছে। এবং ওরাও হয়ত চেয়েছে—পণ্ডিতজীকে উপলক্ষ্য ক'রে এরা আন্তর্জাতিক সমাজে সহজভাবে মেলামেশা সুরু করবে এবং পণ্ডিতজীকে দিয়ে তাদের এই পরিবর্তিত নীতি কার্যে পরিণত করার পক্ষে সহজ হবে। রুশীয়া হ'তেই পণ্ডিতজী ব্রিটেনে যান এবং রুশীয়া সম্বন্ধে তাঁর মত ব্রিটেনের কর্তৃপক্ষকে বলেন। এর পর জেনেভাতে চার শক্তির সম্মেলন হয়; এবং সেখানে রুশ নেতাদের পরিবর্তিত আচরণে এঁরা বিস্মিত হ'লেও, অন্তত ইংরাজ মন্ত্রীদের নিকট তা খুব আকস্মিক মনে হয় নি। মূল কথা হ'ল—পণ্ডিতজীর রুশীয়া ভ্রমণ বিশ্ব রাজনীতি ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করছে।

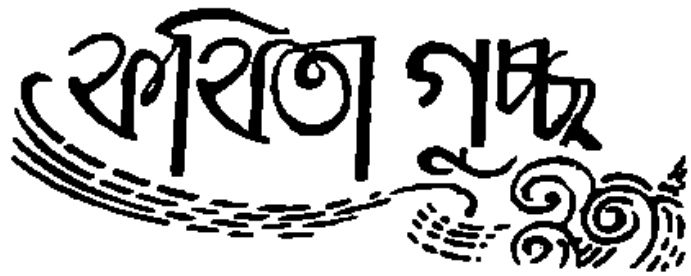

একটি আধুনিক রূপকথা

শ্রীঅনিলকুমার রায়

রাজকন্যা গো, রাজকন্যা গো, রাজার কুমার নেই।
সাত পর্বত, সতেরো নগর,
মেঘমালা গ্রাম, দুখের পাহাড়,
শঙ্খনদীর উপকূল হ'য়ে দশার্ণদেশেই
সপ্তডিঙার নোঙর ফেলবে যে-তোমার জন্যেই,
রাজকন্যা গো, রাজকন্যা গো, সে-রাজকুমার নেই।
আর শাপান্ত রাজকন্যার মহলে নিঝুম
শয্যার পাশে সোনার কাঠিতে ঘুমান্ত ঘুম
ভাঙবেনা সে-তো। রাজকন্যা গো সে-দেশে
পড়েছে বাজ
রাজকন্যা গো, এক মা'র বুক দু'ভাগ হয়েছে আজ।

রাজপুত্তুর জীবনের আঙা-মাস্তুলে ফুটপাতে
খোঁজে উপকূল ধলেশ্বরীর। বার বার কী নেশায়
ঘর ঘর ক'রে কাঁপে—পা' দু'টোকে লাজলের
মতো চষে।
পথে পথে শত বোন পারুলের বুকভাঙা কান্নায়
জাগে সাত ভাই চম্পারা জাগে চন্দ্রবেতিয়ার চরে
বলেছে, ফিরবে আবার সবাই
ঘুড়িগঙ্গার কড় শেষ হ'লে
ইচ্ছামতীর জোয়ারের টানে ঘরে।

মুলাফির রাজপুত্তুর জাগে অমরাবতীর মাঠে
দেউলিয়া রাজপুত্তুর জাগে কটকে ও কলকাতায়
যাযাবর রাজপুত্তুর পথ হাঁটে,
নাম লেখে তারা দুর্জয় প্রাণে মৃত্যুঞ্জয়ী খাতায়।
রাজকন্যা গো, নীড় বাঁধবে সে
বাঁধ-বাঁধা জমি সুন্দর বনে বনে
সন্দেশখালি—ঘ গীপে আর
কল্পাবতীর সিঁড়ি-ভেঙে-যাওয়া ঘাটে।
মৌ-কলসীর নীড় বাঁধবে সে
শীতলাক্ষীর হিজল-বেতসী বনে,
মেঘনার ঢেউয়ে পদ্মার কল্লোলে,
কর্ণফুলীর তপোবনে আর
সুবর্ণরেখা তীরে।
দু'চোখে স্বপ্ন বিশল্যকরণীর
নীড় বাঁধবে সে বাঁশীতে ফুঁদিয়ে
ভাটিয়ালি গানে,
দিদিমা শঙ্খ বাজায়।
রাজকন্যা গো, জীবনের সেই কার্তিকে-অঘ্রাণে
দীপ জেলে দাও ঘরে ঘরে গানে গানে।
রাজপুত্তুর খুঁজে খুঁজে ফেরে জীবনের বন্দর
রাজকন্যা গো এবার তুমিও বাঁধো বন্ধুর ঘর॥

মানুষের দেশ

শ্রীকাশীনাথ বাগচী

ইতিহাস ঘুমে জেগে উঠে এক সাড়া,
দুঃখীর দল বুকে নিয়ে বল মোজা হয়ে সব দাঁড়া।
অতীত রাতের লজ্জিত কালো প্রান্তরে হয় ভোর,
প্রভাত আলোর অমিয় আঘাতে খুলনো রসির ডোর
কুটি কুটি হ'ল কেটে
নতুন ধানের গান গেয়ে আর গোড়ামাটী মাঠে হেঁটে।

কাছে আর দূরে চলে নানা সুরে বাজি,
"খেয়া দাও খুলে, পালখানি তুলে, হালে
বসিয়াছে মাঝি।"
বালুচরে ছিল খেলাঘর তাই ঝড় নিয়ে বৈশাখ
মেঘের আঁধার রচি চারিধার দিত দস্যুর হাঁক ;
শেষ তার কারসাজি
প্রেতের মতন পালায় ভরাসে লোহণের ভেজবাজি।

দুয়ার দেবার প্রহর হয়েছে সারা।
আকাশে এসেছে আলোর আমল, পৃথিবীটা হল পাড়া
মামলা গলির গলাগালি আর বলাবলি হয় মিছে,
এক শোণিতের ধমনীতে বহুরূপী মাজ দিছে ;
তাইকে পেয়েছে ভাই
সকল দেশের মানুষ আজিকে মানুষের দেশে আয়।

মরে আতঙ্কে রণ ঝঙ্কার শংকা,
ভূমিতে ঘুমায় রাবণের শব, পুড়ে ছাই পুরী লঙ্কা।

হাটেতে নিলাম রাজ্যপাটের, তারপর মহাকাল চিতা,
লভিছে শান্তি পরশান্তি, শুচি সুন্দরী সীতা ;
নির্বোধ পায়রোবি
বোবা অশ্রুর ডোবা হয়ে যায় সোনালী জলের নদী।

কবিতা লিখে যাবো

শ্রীমতী নমিতা মুখোপাধ্যায়

আশ্বিনের খাম-খেয়ালী আকাশটাকে দেখে
বেলায় হাসি পায়,
ফর্সা হবে, তাইতে বুঝি সাবান মেখে-মেখে
স্নানের সাধ যায়।

আশ্বিনের সরল মাটি, ঘাটের ধানে দুধ,
বাতাসে আগমনী ;—
পাতার ফাঁকে লুকোয় মুখ কিশোরী আবদুল
অজন্তা নদী।

পাশের বাড়ি বৌদিদির তিনটি ছেলেমেয়ে
একটি আরো হবে,
নিঃস্ব হয়ে গিয়েও আহা মিষ্টি চোখে চেয়ে
হাসেন গৌরবে।

লক্ষ্মী, তুমি দুবেলা যেন অন্ন দিও দুটি,
জীবনভোর কবিতা লিখে যাবো—
ওদের দিও কৌচোও ভ'রে, আমার ভরা মুঠি
মনের সুখে তোমার গুণ গা'বো।

অভিসারিকা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

গাগরী লইয়া যমুনায় যাবো যায় ;
আকাশের চাঁদ দেখে আর শুধু হাসে ;
আলিপনা আঁকে রাধার গাগরী-গায়,
তনু-লতিকায়, এলায়িত কেশ-পাশে ;
আলিপনা আঁকে যমুনার তীরে—নীরে,
অভিসারিকার পথটিরে ঘিরে-ঘিরে।

(২)

তেজানো দুয়ার নিশীথের ব্রজ-পুরে,
ঘুমায় যে যা'র আরাম-শয়নে শুয়ে,
কা'র হিয়া যেন গলিয়া ঝরিছে সুরে,
জোছনার সাথে মাটিরে দিতেছে ধুয়ে।
যমুনা-সলিল সুরে আর জোছনায়
বিরহিণী-হিয়া কাঁদিয়া লইতে চায়।

(৩)

উচাটন মনে অচেতন পুরী-পথে
চলেছে কিশোরী রসের গাগরী কাঁখে।
কেহ সাথী নাই, চাঁদ তাই নত হ'তে
হাস্যময়ী দূতী পথে—পথে চেয়ে থাকে :
হাসিতে-খুসীতে রাধার পরাণ ভরি'
অবসান বুঝি করিবে সে—বিভাবরী !

(৪)

রূপালী রাতেরে মায়া-ভরা ক'রে দিয়ে
প্রেমিকের বাঁশী পরাণ ছাপিয়ে বাজে ;
সে যেন কোথায় রাধিকারে যাবে নিয়ে
রাসের-রসের সাধের বাসর মাঝে !
রসিকা নাগরী গাগরী লইয়া যায় ;—
সে বাসর তা'রে চাঁদ কি দেখালো হায় !

বন্যায় : নদীকে

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আহা নদী, কৃপা করো, একটু সংযত করো ক্ষুধা
মানুষের অসহায় প্রাণ কাঁপে। কাঁপে যে বসুধা
তোমার প্রলয় রূপে। চারিদিকে জল থৈ থৈ :
তুমি যেন কোন এক উন্মাদিনী নারীর মতোই
ছুটে যাও স্রোতোবেগে। একবার শোনো নদী, শোনো
তুমি তো মাটিরই মেয়ে, তবুও কি দুঃখ নেই কোনো
মাটিকে মথিত করে। এই তো সেদিনও নদী তুমি
শ্যামলে সবুজে ভ'রে দিয়েছিলে তীরবর্তী ভূমি
অজস্র স্নেহের দানে। দু' চোখে অবাক স্বপ্ন ছেয়ে
চাঁদের আলোয় বসে চলেছিলে গান গেয়ে গেয়ে :
কলকল্ ছলছল্। আহা তারা কোথায় কোথায় ?
আজ শুধু চারিদিকে ধ্বংসের রুদ্রপদ শোনা যায়।
কেমন তো ছিলে তুমি হুগোময় প্রাণোজ্জ্বল নদী,
বলো তবে কেন আজ নেই পাড়-ভাঙার অবধি।

সমাজ ও জাতীয় জীবন

[র. কু. সে.]

আমাদের এই যে প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা—তা কতকগুলো অব্যবস্থিত অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, বরং কতকগুলো নীতির দ্বারা চালিত। সেই নীতি হ'চ্ছে জীবনকে মহত্তর উপাদানে গ'ড়ে তোলা। জীবনের সর্ব অবস্থার সঙ্গে এই মহত্ত্ব-চিন্তাকে সংপ্রথিত ক'রে না নিতে পারা পর্যন্ত মনুষ্যত্বের মর্যাদা নেই। যথার্থ মনুষ্যত্ববোধ যার আছে, সে তাই তার সমসাময়িক কালের প্রচলিত পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই ক'রে মাথা তুলে দাঁড়ায়। সেই তার মনুষ্যত্বের জয়। জীবনকে এই জয়ের পথে তুলে ধ'রতে হ'লে সমগ্র জীবন-বোধের মধ্যে আগে তাই প্রয়োজন সেই মহত্তর উপাদানগুলিকে গ্রহণ ক'রে তার নিয়মানুগ অনুশীলন করা। উপাদানগুলিকে প্রধানতঃ এইভাবে শ্রেণী বিভক্ত করা যেতে পারে, যথা : (ক) আমার সমগ্র ব্যক্তি-সত্তার পূর্ণ পরিস্ফুরণের জন্য যতখানি শিক্ষা ও জ্ঞানের প্রয়োজন, তা গ্রহণ ক'রবো, (খ) আমার কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা নীতিগতভাবে আমি আমার নিজের জীবন ও নিজের আত্মপরিজনকে বাঁচাবার জন্য যে পরিমান ন্যায্য অর্থের প্রয়োজন, তা উপার্জন ক'রবো এবং (গ) আমার উপার্জিত অর্থের যদি কোনো উদ্বৃত্তাংশ সঞ্চয় করা সম্ভব হয়, তবে সেই সঞ্চিত সম্পদ আমি আমার দেশের কল্যাণের কাজে ব্যয় ক'রবো। আর্থিক এই ব্যয় ভিন্ন আরও একটি বড় ব্যয় আছে, তা হ'চ্ছে নিজেকে ব্যয় করা। নিজেকে না দিতে পারলে কাউকে কোনো দেওয়াই সার্থক হ'য়ে ওঠে না। এই দেওয়া নানাভাবে ঘটে। কেউ দেয় চিন্তা, কেউ দেয় সাহচর্য, কেউ দেয় স্নেহ, কেউ দেয় জ্ঞান। আর্থিক ব্যয়ের সঙ্গে এই জাতীয় নৈতিক ব্যয়গুলো এসে যতক্ষণ না একত্রে মিলছে, ততক্ষণ উপাদান হিসেবে জীবন কোথাও সমগ্রকে ধ'রতে পারছে না। অথচ জীবনের অর্থ কখনো সামগ্রিকতাকে ছেড়ে নয়। সমগ্রকে পাবার জন্যই আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা। পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা ক'রে দেখতে পাবো, যে জাতি এই ধরণের জীবন-চর্চার মধ্য দিয়ে যত বেশী এগিয়ে এসেছে, সেই জাতি তত বেশী উন্নত হ'য়েছে।

এই উন্নতির প্রথম সোপান হ'চ্ছে 'মানসিক গঠন' বা 'make up of mind', আমার পথ কি, আমার উদ্দেশ্য কি জীবনের, কোন্ কাজের জন্য আমি প্রস্তুত, কিভাবে আমি নিজেকে সমাজে পরিবেশন ক'রতে পারি—এগুলি সম্বন্ধে জীবনের গোড়াতেই মনের একটা স্থির সিদ্ধান্ত খাড়া হ'য়ে যায়। এই সিদ্ধান্তই হ'চ্ছে 'মানসিক গঠন'। এমন একটা সংপ্রতিষ্ঠিত মন নিয়েই প্রধানতঃ আমরা কর্মপথে অগ্রসর হই। তাতে কেউ বা কৃতকার্য হই, কেউ বা হেরে যাই। কিন্তু হেরে যাবার অর্থ এই নয় যে, মানসিক গঠনকে আমরা বিপরীত পথে চালিত ক'রে নৃশংস হ'য়ে উঠবো। দস্যু আর তস্করের যে বৃত্তি, তা এই বিপরীত পথে চালিত মানসিক গঠন নয়, তা অনেকটা স্বভাবধর্মী ও দলিয় বৃত্তি। Rationalism-এর তা ধর্ম নয়।

Rationalism বলে যে, মানুষ যে কোনো অবস্থার মধ্য দিয়েই চলুক না কেন, সে তার নিজের সত্তাভ্রষ্ট হ'য়ে কোনো কাজ ক'রবে না। মানুষের মধ্যে পশু আছে সন্দেহ নেই, সেই পশুকে অবদমিত করাই হ'চ্ছে সত্যাশ্রয়ীর কাজ। সেই সত্য হ'চ্ছে জীবনের মহত্তর উপাদানগুলির অনুধ্যান। পূর্বে একথার উল্লেখ ক'রেছি। এর চর্চা নির্ভর করে দু' শ্রেণীর শিক্ষার উপর ; প্রথম হ'চ্ছে Moral Education বা নৈতিক শিক্ষা, এবং এই শিক্ষার যেখানে শেষ, সেখানে দ্বিতীয়তঃ আসছে

Social Education বা সমাজ-শিক্ষা। আমাদের ধারণা থাকা উচিৎ—আমাদের কোনো একক সত্তা নেই, প্রত্যেকেই আমরা সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ জীবনের একদিকে আমাদের পরিবার পরিজন, অন্যদিকে আমাদের স্বজাতি বান্ধব। উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের পূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য র'য়েছে। সেই কর্তব্য থেকে চ্যুত হ'লেই আমরা criminal হ'য়ে প'ড়বো।

তা যদি পড়ি, তবে আমাদের মনুষ্যত্বের সার্থকতা কোথায়? ভারতবর্ষ যে চিরকাল এই মনুষ্যত্বেরই সাধনা ক'রেছে, সাধনা ক'রেছে প্রাণকে সুরে ছন্দে নতুন প্রাণের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে। সে প্রাণ সত্যে বিধৃত, ন্যায়ে আশ্রিত ও ধর্মে নিয়োজিত। এই সাধনার মন্ত্রই ভারতবর্ষ তার সন্তানদের দিয়ে এসেছে।

কিন্তু আমাদের প্রচলিত জীবনযাত্রার মধ্যে আমরা আজ তার ব্যত্যয় লক্ষ্য ক'রছি না কি? প্রাণধর্মের পরিবর্তে আজ অতিরিক্ত মাত্রায় অর্থনীতি সন্ত্রাসারিত হ'য়ে প'ড়ে একদিকে যেমন মানুষে মানুষে বৈষম্য প'ড়ে উঠ্‌ছে, তেম্‌নি কোনো একটি মানুষই জীবনের মহত্তর উপাদানের ক্ষেত্রে মানসিক সংগঠনের দ্বারা মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে পারছে না। প্রচলিত এই সমাজ তথা রাষ্ট্রব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবি এই ফলের মধ্যেও মানুষের একটা মহত্তর ক্ষেত্র ছিল, যেখানে সে অন্ততঃ নিজের মনুষ্যত্বকে ফাঁকি দিয়ে সমাজের নৈতিক মানকে আঘাত ক'রবে না। সেই ক্ষেত্রটি হ'চ্ছে উপরে উদ্ধৃত উপাদান সমূহের চর্চা। যেখানে মানুষের নৈতিক চরিত্র খাঁটি, সেখানে একমাত্র অর্থনৈতিক চাপ তাকে খুব বেশী পরাভূত ক'রতে পারে না। কিন্তু মানুষ ক্রমেই আজ অর্থনীতির দাস হ'য়ে জীবনকে ছোটাই ক'রে ফেলেছে। জীবন যে কত বড়, আমাদের সমাজ-জীবনে আজ আর তার বড় বেশী উপলব্ধি লক্ষ্য করি না। তার ফলে আজ সর্বত্র দুর্নীতি এসে আশ্রয় ক'রেছে। তার কয়েকটি মাত্র উদাহরণই এখানে যথেষ্ট হবে, যেমন—ঘুষ বা উৎকোচ গ্রহণ। দরিদ্র সাধারণের চাইতে অর্থবানেরা অধিকতর ঘুষ খান। এই ঘুষের ব্যাপার অফিস-আদালতের উঁচুতলা থেকে সুরু ক'রে রেলওয়ে, পুলিশ, হাসপাতাল, বিদ্যালয় প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সামাজ বাজুধার পর্যন্ত এসে ঠেকেছে। ধর্মীয় পীঠস্থানগুলিতে অবধি ঘুষের অভাব নেই। এ কি শুধুই সমাজের একটানা দারিদ্র্যের অবশ্যম্ভাবি ফল, না তার বাইরে আরও কিছু? তেম্‌নি চ'লেছে পণ্যে ভেজালের মিশ্রণ। প্রাণকে প্রাণের মধ্যে জাগিয়ে দেবার পরিবর্তে প্রাণ দিয়ে আজ প্রাণঘাতি কাজ ক্রমেই বেড়ে উঠ্‌ছে। অথচ এই সামাজিক পাপগুলি সম্বন্ধে সচেতন থেকেও সমষ্টিগতভাবে আমরা তার প্রতিবিধান ক'রছি না। প্রত্যেকেই মনে ক'রছি, কোনোভাবে আমার নিজের কাজটা হ'য়ে গেলেই হ'লো, কে যায় ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে! কিন্তু বনের মোষ না তাড়ালে এদিকে ঘরের অন্নও যে বিষ হ'য়ে উঠ্‌ছে, সে ভাবনা আমরা ভাবিনা। এতবড় মেরুদণ্ডহীন চরিত্র-ভ্রষ্টতা বোধ করি এর আগে কখনও ভারতবর্ষে আসে নি।

আমরা রাষ্ট্রিকক্ষেত্রে যত বেশী সচেতন এবং প্রগতিবাদী সমাজ-জীবনের অন্তর-ক্ষেত্রে আমরা ততবেশী রক্ষণশীল। এর ফলে আমরা আজ বিনষ্টির পথে এসে দাঁড়িয়েছি। আজ আর আমাদের সমাজজীবনে মানসিক গঠনশীলতার কোনো বিশেষ মূল্য দেখা যাচ্ছে না—যে মূল্যের দ্বারা জীবন সার্থক হয়, উন্নত হয়। ফলে জাতি হিসেবে ক্রমেই আমাদের চারিত্রিক অধোগতি ঘট্‌ছে। এই অধোগতি থেকে কি ভাবে উদ্ধার পেতে পারি—তার মীমাংসা আছে জীবনের মহত্তর উপাদান-গুলির অনুশীলনের মধ্যে।

ভারতের প্রাচীনতম ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হ'য়ে আমরা যদি আমাদের জীবন সম্পর্কে বিচার ক'রে দেখি, তবে দেখবো—আজকের মতো চরিত্রভ্রষ্ট হ'য়ে নিজেদের মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দেবার জন্য আমরা নই। আমাদের জীবনের একটা মহত্তর অর্থ আছে; জীবন সম্পর্কে মহত্তর চিন্তা দ্বারাই সেই অর্থকে আজ আবার নতুন ক'রে খুঁজে বার ক'রতে হবে। যা পাপ, যা কলুষ, যা প্রাণঘাতি, যা দণ্ডনীয়—তাকে জীবন থেকে সরিয়ে না দিলে জীবনকে আমরা পূর্ণ ক'রে পাবো না। আমাদের প্রচলিত সমাজ তার নিজেকে পুনরুদ্ধারের কাজে ব্রতী হ'লে তবেই সেই পাওয়া সার্থক হ'তে পারে।

৩

এখনকার কানপুর শহর, বিশেষত এই দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরের কানপুর দেখিয়া কেহ একশ' বছর আগেকার কানপুর কল্পনা করিতে পারিবেন না। তখন অনেক ফাঁকা মাঠ পুষ্করিণী পড়িয়াছিল সত্য—কিন্তু যেখানে বসতি ছিল সেখানে একেবারে ঘেঁষাঘেঁষি ঘর বাড়ী, গায়ে গায়ে লাগানো। পথ নিতান্তই সংকীর্ণ, ডুলি বা পাল্‌কী ছাড়া কিছুই যাইবার উপায় ছিল না, এক্কা চলিত বটে তবে সে কেবল গায়ের জোরে। চওড়া রাস্তা বানাইয়া জমি অপব্যয় করার কোন অর্থ সেকালের লোক বুঝিত না—এ কালের বড় মোটর গাড়ী, বাস বা লরী চলাচলের কথা তাহারা হয়ত কল্পনাও করে নাই—তাছাড়া বহুলোক কাছাকাছি বাস করায় একটা নিরাপত্তাও ছিল। অরাজকতা তখন চারিদিকেই, রাহাজানি ও ডাকাতি ত নিত্যনৈমিত্তিক। এখনও এই কারণেই, গ্রামাঞ্চলে চারিদিকে অজস্র ফাঁকা জমি পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও, মানুষ বাস করে একেবারে গায়ে গায়ে ঘর বাঁধিয়া, ফলে মহামারী বাধিলে খাঁ উজাড় হইতে দেরী লাগে না।

কিন্তু আমরা বলিতেছিলাম কানপুরের কথা।

সেই খিঞ্জি কানপুরের আরও খিঞ্জিপাড়া হইল উকীল মহল্লা। সংকীর্ণ পাথর-বাঁধানো রাস্তা, তাহার দুই দিকে দুই-তলা তিন-তলা বাড়ী, একটির কার্নিশ আসিয়া লাগিয়াছে আর একটির কার্নিশে। ফলে দিবাকালেও নিচের দিকে সূর্যালোক প্রবেশ করে না। একতলার ঘরে চিরাগ না জ্বালিলে আর যাহাই হউক লেখাপড়ার কাজ চলে না। পথের দু'ধারে বিপণিশ্রেণীর অভাব নাই—দুধ-দহি-পেড়া হইতে শুরু করিয়া চাল-ডাল-তেল-ঘি এবং তামাকু-হুঁকা-টিকিয়ার অসংখ্য দোকান চারিদিকে। ছোট ছোট দোকানই বেশী—সূর্যোদয় হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত দোকান খুলিয়া বসিয়া থাকে খরিদ্দারের আশায় এবং সেই কারণেই রাস্তাটা কিছু আলোকিত থাকে। কারণ এই সব দোকানেই সিরারাত্র একটি করিয়া অর্ধ-মশাল জ্বলিতে থাকে। পাঙ্খা বা পালবালিশ যাহাই বলুন—ঐ আকারের একটা চারিদিক ঢাকা পাত্র কোলে; তাহাতে বন্দুকের মত নল লাগানো আছে। সেই নলে আছে এক গোছা ছেঁড়া নেকড়া, পলতের মত। ঐ পাত্রে থাকে রেড়ি বা কড়ুয়ার তেল। আর ঐ পলতের গোছা সেই তেলের জোরে মশালের মত জ্বলে। তাহাতে আলো যত না হউক ধোঁয়া হয় প্রচুর। সে ধোঁয়া পথটুকু ত বটেই, অধিকাংশ সময় দোতালা অবধি দুধারের বাড়ীগুলিকে কালসা আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। শীতকালে ভাল করিয়া চোখ মেলিয়া তাকানো যায় না।

এই উকীল মহল্লারই একপ্রান্তে উকীল নানকচাঁদের বাড়ী। সাধারণ দ্বিতল বাড়ী, বিশেষত্বের মধ্যে—নিচের

তলায় প্রবেশের কোন সদর দরজা নাই। দুইদিকে দুইখানি-হিসাবে দোকান ঘর, আর তাহারই মধ্য দিয়া দোজা খাড়া সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছে একেবারে দোতলা পর্যন্ত। ডানদিকে দেওয়ালের গা বাহিয়া একগাছা মোটা দড়ি টাঙানো না থাকিলে সে সিঁড়িতে ওঠা-নামা করাই কষ্টসাধ্য হইত।

সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলে একটি পাথরের নিচু ঢালি বারান্দা, সেই বারান্দার চারিদিকে কয়েকখানি আধো অন্ধকার ঘর—এইগুলি হইল উকীল সাহেবের দফ্‌তরখানা। একটিতে তাঁহার মোহরার বসে, একটিতে কাগজপত্র থাকে—আলকাতরা মাখানো সারি সারি টিনের বাক্সয়। পথের দুদিকে যে দুটি ঘর—সিঁড়ির ঠিক দুই পাশে—তাহার একটি হইল খাস উকীল সাহেবের গদী, আর একটি তাঁহার বৈঠকখানা। সেখানে তাঁহার একটু শয়নের ব্যবস্থাও আছে।

এই বারান্দারই অপর প্রান্তে অন্দরমহলে যাইবার রাস্তা। সেখানে পৌঁছিলে নিচে নামিবার সিঁড়ি মিলিবে। আর সেইখান দিয়াই আছে আর একটি পথ—সে পথে পিছনের একটি অব্যবহার্য পরিত্যক্ত খাপরার বাড়ীতে যাওয়া যায়। এই বাড়ীটি চাবি দেওয়াই থাকে। এটুকুও নানকচাঁদের সম্পত্তি। এটি তিনি নাকি এক আত্তরওলাকে ভাড়া দিয়া রাখিয়াছেন, সে তাহার কাঁকো কাচের শিশি এবং তেল রাখিবার পাৎলা চামড়ার 'ঝুপি' রাখে ঐ ঘরগুলিতে। কিন্তু আসলে এটি পিছনের সংকীর্ণতর গলিপথে বাহির হইবার একটি রাস্তা। নানকচাঁদের কিছু সম্ভ্রান্ত মহিলা মক্কেলও ছিল—তাহাদেরই জন্য এটি ব্যবহৃত হইত। অনেক সময় তাঁহাদের জনসাধারণের দৃষ্টি বাঁচাইয়া আসার প্রয়োজন হইত। পূর্বাহ্নে সংবাদ দিলে নানকচাঁদ এই বাড়ীর দরজা খোলা রাখিবার বন্দোবস্ত করিতেন—মক্কেলরা সংকেত করিলেই একটি প্রায়-মূক খাসী নিঃশব্দে কপাট খুলিয়া ভিতরে আলোতে পথ দেখাইয়া উপরে লইয়া আসিত আবার কাজ মিটিলে তেমনিই সেই পরিত্যক্ত খানাবাড়ীর ভিতর দিয়া গিয়া পথে তুলিয়া দিত। ঐ পিছনের রাস্তা দিয়া সাধারণত যাহারা যাতায়াত করিত তাহারা বোধহয় এই আলাচোরা খাপরার বাড়ীটার সহিত নানকচাঁদের প্রাসাদোপম ভিনমহলা বাড়ীটার যোগাযোগ কল্পনা পর্যন্ত করিতে পারিত না।

নানকচাঁদের দ্বিতলের বৈঠকখানা ঘরে পৌষমাসের মাঝামাঝি এক সন্ধ্যায় কয়েকজন লোক একত্র হইয়াছিলেন। মাঝারি আকারের ঘর, তাহার একপ্রান্তে একটি খাটিয়া। খাটিয়াতে একটি শয্যা গোটানো আছে, প্রয়োজন মত উকীল সাহেব উহা ব্যবহার করেন। বাকী মেঝের সবটাই জুড়িয়া ফরাস পাতা। সাধারণ 'দরী' বা শতরঞ্জির উপর দামী জাজিম পাতা তাহার উপর গোটাকতক তাকিয়া ফেলা। একদিকে দেওয়াল ঘেঁষিয়া একটি ছোট কাঠের চৌকা বাক্স, তাহাতেই বোধকরি নানকচাঁদের কাগজপত্র থাকে, বাক্স বন্ধ করিয়া তাহার উপর কাগজ রাখিয়া লেখাও চলে—অর্থাৎ বর্তমানকালে যাহাকে 'ডেস্কো' (ডেস্ক) বলে—তাহারই দেশী সংস্করণ। কারণ বাক্সর পাশেই আছে মাটির দোয়াতদান, গোটা দুই খাগের কলম এবং বালুকার পাত্র। সেকালে বালিই ব্লটিং পেপারের কাজ করিত।

বাক্সর পাশেই একটি মাটির চিরাগ-দানে এক চিরাগ বা প্রদীপ জ্বলিতেছে। প্রয়োজন হইলে আর একটি আলোও জ্বালানো যাইতে পারে—ঘরের কোণে সে ব্যবস্থাও আছে। একটি পিতলের বাতিদানে দেশী মোমবাতি সাজানো আছে। সম্ভবত রাত্রে লেখাপড়ার দরকার হইলে উকীল সাহেব উহা জ্বালান।

আমরা যে বিশেষ সন্ধ্যার কথা বলিতেছি—সে সন্ধ্যায় যাঁহারা নানকচাঁদের গৃহে জমায়েত হইয়াছিলেন তাঁহারা কেহই সাধারণ অর্থে মক্কেল নহেন। সাধারণ মক্কেলরা অবশ্য এ ঘরে বসেন না—তাঁহাদের জন্য গদীঘর আছে। বিশেষ মক্কেল আসিলেই এ ঘরের প্রয়োজন হয়—কিন্তু আজ বাক্স বন্ধ—কাগজপত্রের কোন চিহ্ন নাই। বাক্সর পিছনে তাকিয়ায় ঠেস দিয়া নানকচাঁদ

গুড়গুড়িতে তামাক টানিতেছেন। তাঁহার মুখ গম্ভীর, বরং একটু চিন্তাকুল। তিনি ছাড়া ঘরে আছেন আর দুটি মহিলা। দুজনেই তরুণী এবং রীতিমত সুশ্রী। দুজনের মুখের গঠন এবং বেশভূষা দেখিলে মোটামুটি এটা কল্পনা করিতে বাধে না যে—ইহারা দুই ভগিনী. ইহাদের অবস্থা ভাল—ইহারা মুসলমান। ইহাদের জন্যও গুড়গুড়ির ব্যবস্থা হইয়াছে। সেকালে হিন্দুর গৃহে মুসলমানের জন্য এবং মুসলমানের গৃহে হিন্দুর জন্য স্বতন্ত্র গুড়গুড়ির ব্যবস্থা থাকিত।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নানকচাঁদ করসীর মুখ হইতে নিজের মুখ সরাইয়া কথা কহিলেন. 'যার জন্য তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছি, অনেক আগেই তার আসা উচিত ছিল। এখনও কেন পৌঁছল না তা জানি না। একটু ভাবনা হচ্ছে—কারণ সে বিলায়েৎ-ফেরৎ লোক, জবানের ঠিক রাখে।...তবে তার আর কি—কোথাও আটকে পড়েছে হয়ত! যাক্ আমিনা—তোমার কথা বলো একটু—শুনি ততক্ষণ!'

আমিনা বিবি নিঃশব্দে তামাক টানিতেছিল, সেও করসীর নল সরাইয়া তরুণীর হাতে দিয়া কহিল, 'লোকটি কে উকীল সাহেব? কী তার পরিচয়? আমি কি তাকে দেখিনি?'

নানকচাঁদ বলিলেন, 'পরিচয় সে দিতে বারণ করেছে। পরিচয় তার আমি জানিও না। নামটা জানি। কিন্তু নাম যে নিজেই বলবে। এইটুকু শুধু বলতে পারি যে সে লেখাপড়া জানা লোক, খানদানী ঘরের ছেলে। লিখাপড়ি সে বহুৎ করেছে। সাহেবদের মত আংরেজী বলতে পারে। দু দফে সে বিলায়েৎ গিয়েছিল। একবার নেপালের জঙ্গবাহাদুর রাণার মন্ত্রী হয়ে—আর একবার আজিমুল্লা খাঁর মুন্সী হয়ে। তোমাদের যা লক্ষ্য, তারও তাই লক্ষ্য। কী ক'রে সে খবর পেয়েছে যে নানা সাহেবের প্রিয়তমা হুসেনী বিবি এর ভেতর সমস্ত ফৌজী-ঘাঁটি মায় বাংলা মুলুকের বারাকপুর, দমদম, কলকাত্তা পর্যন্ত ঘুরে এসেছে। সঙ্গে এনেছে কলকাত্তার কেল্লার নক্সা।...তাই সে আমাকে এসে ধরেছে যে একবার হুসেনী বিবির সঙ্গে তার দেখা করিয়ে দিতে হবে।'

আমিনার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু সে মুহূর্তের জন্য; কহিল. 'এ খবর সে আর দেবে—নিশ্চয়ই আপনি দিয়েছেন।'

এতখানি জিভ্ কাটিয়া নানকচাঁদ কহিলেন, 'জয় রামজীকি! তা কখনও হ'তে পারে? কারুর কথা কারুর কাছে বললে আজ আর নানকচাঁদকে ক'রে খেতে হ'ত না বিবি সাহেব। না তাহ'লে তোমরাই এমন ক'রে বিশ্বাস করতে পারতে?...সে ভয় নেই বিবি. তেমন বাপে আমায় জন্ম দেয়নি; যা কান দিয়ে শুনব তা মুখ দিয়ে আর বেরোবে না—বোলুনেওয়ালার হুকুম না হ'লে।... এ খবর সে-ই জোগাড় করেছে। এও সে জানে যে তোমার মেহেরবানী আছে এ বান্দার ওপর। তাই আমাকে এসে ধরেছে। অবিশ্যি—' এইখানে একটু গলাখাঁকারী দিয়া নানকচাঁদ গলাটা পরিষ্কার করিয়া লইলেন—'অবিশ্যি তার জন্য সে কিছু দিয়েছেও। জানো ত বিবি আমার নিয়ম, কিছু নগদ হাতে না পেলে কোন পরোপকার আমি করি না।'

আমিনা হাসিয়া কহিল, হ্যাঁ, আমার একটু কাজও আছে।'

সে নিজের কামিজের ভিতর হাত ঢুকাইয়া একছড়া মুক্তার মালা বাহির করিয়া নানকচাঁদের সামনে ফেলিয়া দিল। ব'লল, 'টাকা চাই। ইহুদী জহুরীর কাছ থেকে কিনেছিল নানাসাহেব—বিশ হাজার টাকা দাম।'

নানকচাঁদ চিরাগের আলোয় মালাটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া বলিলেন, 'জানি। কিনেছিলেন কিন্তু আদালা বেগমের জন্য। এ ত চোরাই মাল বিবি. এর বেশী দাম পাবে না। এ বেচা কঠিন।'

আমিনার চোখের কোলে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

'যে কাজে নেমেছি উকীলসাহেব, এখানে সত্য ধর্ম ইমান সব তুচ্ছ। টাকা চাই-ই আমার। কৃপণ নানা-সাহেব যা দেয় তাতে কুলোয় না। বিশেষত আদালাই

তার বেশী প্রিয়। আজিজন বেচারী আর কত দেবে বলুন। এ মালা আমাকেই দেবার কথা—আদালা জোর ক'রে আদায় করেছে। তেমনি জব্দ করেছি ওকে, বেমালুম সরিয়েছি, সে টেরও পায়নি।···কাল সন্ধ্যার ভিতর আমার দশ হাজার টাকা চাই উকীলসাহেব।'

উকীলসাহেব চিন্তিত মুখে আর একবার মালাটি বাতির আলোতে তুলিয়া ধরিলেন। তারপর কহিলেন, 'এখানকার জহুরীরা এ মালা দেখলেই চিনতে পারবে। শেষে কি বুড়োকালে মান খোয়াব?'

দ্বিতীয় তরুণীটি এতক্ষণ একমনে তামাক টানিতেছিল, সে এবার মুখ খুলিল, 'আপনার শতেক দুয়ার খোলা উকীল সাহেব। আর সেই জন্যই ত আপনার কাছে ছুটে আসি। একে আপনি ঠিক চোরাই মালের কারবার বলে ভাবছেন কেন—এ ত দেশেরও কাজ।'

নানকচাঁদ মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিলেন। চাপা-চাপা মুখে কহিলেন, 'তোমরা তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করো বলেই তোমাদের এই আব্দারগুলো আমি মেনে চলি। নইলে পোদ্দারী করা আমার ব্যবসা নয়। অর্থলোভ আমার আছে—কিন্তু চোরা-গোপ্তা এসব কাজ করায় বড় ঝুঁকি আজিজন বিবি।...তবে এটাও আমি বলে রাখছি—এর আগেও বলেছি, তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। আংরেজ সরকার তোমরা ভাঙতে পারবে না। আর তাতে দরকারও নেই। অনেকদিন পরে একটু শান্তির মুখ দেখেছি। আবার ঘুরে ফিরে তোমার ঐ নানাসাহেবের খয়রে গিয়ে পড়লে দেশ বলতে আর কিছু থাকবে না। আবার মারাঠার হাতে কিম্বা মুঘলবংশের ঐ কুলাঙ্গারদের হাতে দেশকে তুলে দিতে চাই না আমি। তবে তোমরা বিশ্বাস করো—তোমাদের কথা আলাদা।'

আমিনা প্রদীপের কম্পমান শিখাটার উপর দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া নানকচাঁদের কথা শুনিতেছিল, সে উত্তর দিল, 'এতদিন বলিনি, আজ বলে রাখছি বাবু নানকচাঁদ, আংরেজ সরকার এদেশ থেকে অত সহজে যাবে তা আমিও বিশ্বাস করি না। বেত—যদি এই নানাসাহেব ভাঁতিয়া টোপীর দল মানুষ হ'ত। যেমন ঘুঘুপন্থ পেশোয়া তেমনি তার মন্ত্রী ঐ আজিমুল্লা! ঘেন্না করে, উকীলসাহেব, ওদের দিকে চাইলে আমার ঘেন্না করে। আপনি আজও জানেন না, আমি আংরেজদের সঙ্গে মিশেছি, আমরা দুই বোনই আংরেজী জানি—আমি জানি ওদের তাড়ানো কি দেশ শাসন করা এই লম্পট, কামুক, বিলাসী, অকর্মণ্য লোকগুলোর কাজ নয়। ওদের হাতে দেশ পড়লে তা জাহান্নমে যাবে—তাও জানি। কিন্তু, কিন্তু আমাদেরও উপায় নেই উকীল সাহেব—!'

বলিতে বলিতে যেন আমিনার কণ্ঠ সাপের মতই হিস্ হিস্ করিয়া উঠিল, 'আমরা যে আগুন জ্বালতে চলেছি তাতে আমরাও পুড়ে মরব, এও জানি। তবু, তবু জ্বালতেই হবে। আর কোন কথা আমি জানিনা—আমি শুধু জানি, কতকগুলো আংরেজ মরবে। সেই আমার পরম লাভ। পারলে আমি ওদের দেশটা সুদ্ধ মহাসাগরের জলে ডুবিয়ে দিতুম। কিন্তু তা সম্ভব নয়—এমন কি ওদের এদেশ থেকে তাড়ানোও সম্ভব নয়। তাই যেটুকু সম্ভব—সেটুকুই করে যাবো, যতদূর সম্ভব তাই ক'রে যাবো। আংরেজ মারতে হবে—এই আমার ব্রত, এই আমার তপস্যা। নিজের হাতে, হাঁা, নিজের হাতেও মারতে পারতুম। কিন্তু সে কটা মারব? একটা, দুটো, নয়তো দশটা। তাতে আমার তৃষ্ণা মিটবেনা বাবুজী। আমি চাই শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে আংরেজ মারতে। সেই পরিমাণ আগুন জ্বালাতে হবে। দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জ্বালাব সে আগুন। তারই সমিধ্ খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

বোধ করি দম লইবার জন্যই থামিল আমিনা, তাহার পর কহিল, 'এরা রাজা হবে? ঐ লোভী স্বার্থসর্বস্ব কামুক বাঁদরগুলো? আমি কি পাগল, বাবুজী, যে তাই বিশ্বাস করব? ওরাও সমিধ্। কালে ওরাও পুড়বে। আমার তপস্যার, আমার মরণ যজ্ঞের ফলাফল আমিই ভাল জানি নানকচাঁদজী, চোখ বুজলেই আমি তা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই।...তবু, তবু থামতে আমি পারব না।···

টাকা আমার চাই-ই। তার জন্য ঘুরি ছুচ্ছুরি কিছুতেই পিছ্‌পা হলে চলবে না।'

আমিনা বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। চোখে তাহার উন্মাদিনীর দৃষ্টি, সারা শরীর রংনী-বিষুব্ধা সর্পিণীর মত দুলিতেছে, নিঃশ্বাস দ্রুত হইতে দ্রুততর হইয়া উঠিয়াছে—সারা মুখে যেন কে আগুনে রং লেপিয়া দিয়াছে এমনিই লাল—এই দারুণ শীতের রাতেও তাহার ললাট কণ্ঠ ঘামে ভরিয়া গিয়াছে।...তাহার সে মূর্তির দিকে চাহিলে ভয় করে। নানকচাঁদও ভয় পাইয়া হাত-দুই সরিয়া বসিলেন।

৪

পশ্চিমের বাড়ীতে সেকালে জানালা বড় একটা থাকিত না। এ ঘরেও ছিল না। থাকার মধ্যে একটি দরজা, শীতের ভয়ে তাহাও বন্ধ ছিল। ফলে, প্রদীপের ধোঁয়া ও তামাকের ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস যারপরনাই ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

কতকটা সেই কারণেই—হয়ত আমিনার ললাটের স্বেদ-বিন্দু লক্ষ্য করিয়াও, নানকচাঁদ উঠিয়া গিয়া দরজাটা খুলিয়া দিলেন। কান পাতিয়া কি যেন শুনিবার চেষ্টা করিলেন। কোন সাড়া শব্দ নাই। শীতের ভয়ে অন্তঃপুরিকারাও যে যার ঘরে দরজা দিয়া রেজাইএর নীচে ঢুকিয়াছেন। ভিতর দিকে একবার চাহিয়া দেখিলেন, সেখানে না দেখা যায় কোন আলো না পাওয়া কোন শব্দ; তখন আবার কপাটটা ভেজাইয়া দিয়া নানকচাঁদ নিজের আসনে আসিয়া বসিলেন।

'একটু গরম দুধ খাবে আজিজন বিবি?'

আজিজনের আগেই আমিনা উত্তর দিল, 'না না—কিছু দরকার নেই। আমি শান্ত হয়েছি, আপনি স্থির হয়ে বসুন।'

আমিনা আজিজনের হাত হইতে করসীটা টানিয়া লইল।

নানকচাঁদও তাহাকে আর একটু শান্ত হইবার অবকাশ দিলেন। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে তামাক টানিবার পর প্রশ্ন করিলেন, 'তারপর, কি রকম দেখে এলে? সব প্রস্তুত?'

আমিনার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল, 'শুধু দেখতে যাইনি উকীল সাহেব, প্রস্তুত করতেই গিয়েছিলুম। সে কাজ যতদূর সম্ভব সেরে এসেছি। সমস্ত উত্তর ভারতে যেখানে যত ব্যারাক আছে সব জায়গাতেই একথাটা ছড়িয়ে পড়েছে যে ইংরেজরা ওদের ধর্ম নষ্ট করতে চায়, সবাইকে ক্রীশ্চান করবে এই ওদের ইচ্ছে। তবিদেও কিছু হয়ে গেল বৈ কি! নতুন বন্দুক এনেছে কোম্পানী, তার টোটা তৈরী হচ্ছে কলকাতার কেল্লায়। সে টোটায় জড়ানোর জন্যে এক রকম তেলা কাগজ আমদানী করেছে, সে রকম কাগজ এর আগে দেখিনি কখনও।'

নানকচাঁদ সাগ্রহে বলিলেন, 'কি রকম তেলা? তুমি দেখেছ?'

আমিনা উত্তর দিল, 'দেখেছি বৈ কি! শক্ত অথচ তেলা—এপিঠ্ ওপিঠ্ দেখা যায়। এমনি পাতলা কাগজে তেল মাখালে যেমন দাঁড়ায় তেমনি, অথচ কোন তেল হাতে লাগেনা।...আমাদের সুবিধে হয়ে গেল। আমরা রটিয়ে দিয়েছি যে শুয়োরের চর্বি দিয়ে এই কাগজ তৈরী। শুয়োরের চর্বি না হলে এমন কখনও হ'তে পারে না। শুয়োরের চর্বিতে হিন্দু মুসলমান দুজনেরই জাত যাবে—আর তখনই ধরে সবাইকে ক্রীশ্চান করে দেবে।'

নানকচাঁদ অবিশ্বাসের সুরে কহিলেন, 'একথা কি সবাই বিশ্বাস করবে? মানুষ কি এতই বোকা?'

'অনেকে করবে উকীল বাবু। আমাদের দেশের লোক—ধর্মের কথায় ঠিক এতটাই বোকা হয়ে পড়ে। কথাটার কানাঘুষো শুনেই কেল্লা থেকে তিন চারজন সিপাই জমাদার হাবিলদার ডেকে কাগজ পুড়িয়ে সাহেবরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করছিল যে কাগজে চর্বি নেই—কিন্তু তবু কেউ বিশ্বাস করেনি।...তাছাড়া আরও রটিয়েছি—রটিয়ে দিয়েছি যে সিপাইদের যে আটা দেওয়া হচ্ছে—তাতে আছে গোরু আর শুয়োরের হাড়ের গুঁড়ো। বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে সিপাইদের যে, এই কটা

আংরেজের এত জোর নেই যে এত বড় দেশটার রাজত্ব করে। যা কিছু করেছে সিপাইরা—আর আংরেজ বসে খামোকা ওদের ওপর রাজত্ব করছে।'

'তারপর?' নানকচাঁদ সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন।

'সিপাইদের অসন্তোষের আরও কারণ আছে।' আমিনা বললে, 'মাইনে কম, অথচ প্রত্যেকেরই বড় সংসার। অনেক সিপাইর দুটো তিনটে করে বৌ আছে। এদেশে কোম্পানীর ফৌজে কেউ কাজ করছে শুনলে তার আত্মীয়স্বজন সব ভাবে যে সে তাদের খাওয়াতে বাধ্য—সবাই এসে ঘাড়ে চাপে। মান মর্যাদা হারাবার ভয়ে সিপাইও চুপ করে থাকে। ফলে সবাইকারই দেনা। সিপাইদের একথাও বোঝাবার চেষ্টা করা হচ্ছে যে কাজ সমানই করে ওরা, বরং আংরেজের চেয়ে বেশীই করে। অথচ ওদের চেয়ে আংরেজ সিপাইদের মাইনে বহুগুণ বেশী। বুঝেছেন? আয়োজন কোনও দিক থেকে বাদ থাকছে না।'

নানকচাঁদ ক্ষণকাল নিঃশব্দে আমিনার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। আমিনার মুখে সগর্ব হাসি। সে পুনশ্চ কহিল, 'আর একটা ভারি সুবিধে হয়ে গেছে, জানেন? স্বয়ং খোদাতালা সুবিধেটা করে দিয়েছেন।'

'কী রকম?'

'কারা যেন একটা মজার খেলা সুরু করেছে। দুপুর রাত্রে গ্রামে কোন একজনের বাড়ী কেউ দুখানা রুটি ফেলে দিয়ে যায়। তার সঙ্গে লেখা থাকে, যে তাকেও এমনি করে ছটা গ্রামে এই রুটি পৌঁছে দিতে হবে। নইলে অনিষ্ট হবে। সে বেচারা প্রাণের ভয়ে তাই করে। এমনি করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলেছে রুটির খেলা। আমরা সেই সুযোগে সিপাইদের ভেতর রটিয়ে দিয়েছি যে সমস্ত দেশ তৈরী আছে। সিপাইরা জাগলে দেশও জাগবে—লড়াই সুরু হলে সবাই দলে দলে এসে সিপাইদের দিকে যোগ দেবে। টাকা আর রুটি—অন্ততঃ এদুটোর ত অভাব হবে না। এই যে রুটি চালাচালি চলছে—এতেই আসন্ন বিপ্লবের খবরই পাঠানো হচ্ছে।'

নানকচাঁদ আবারও অবিশ্বাসের সুরে কহিলেন, 'একথা তারা বিশ্বাস করছে?'

'করছে বৈ কি!'

'তাজ্জব!...তারি তাজ্জব! ফৌজে গেলে কি মানুষ এতই বোকা হয়!'

আজিজন কহিল, 'কেন, এতে অবিশ্বাস করবারই বা কি আছে?'

'আছে বৈ কি বিবি সাহেবা! আমাকে কেউ একথা বোঝাতে এলে আমি প্রশ্ন করতুম, যে বিদ্রোহ আসন্ন এই খবরটা দেওয়া হচ্ছে, না বিদ্রোহ করতে বলা হচ্ছে! প্রস্তুত থাকতে বলা হচ্ছে না প্রস্তুত আছে এই খবর দেওয়া হচ্ছে! এ রুটির অর্থ কি?'

'যে যা প্রশ্ন করছে সুবিধামত তাকে সেই কথাই বলা হচ্ছে।'

'কিন্তু গ্রামের লোক এ রুটির মধ্যে কী খবর খুঁজে পাবে? রুটী পাঠানোর দরকারই বা কি? কেউ কি এ প্রশ্ন করছে না?'

'সে প্রশ্ন করলে আমরা বলব যে সোজাসুজি বিদ্রোহের খবরটা ত আর প্রচার করা যায় না! তাই এই রুটির ছদ্মবেশ।'

'কিন্তু রুটি পাঠানোর যে এই অর্থ—সেটা ত আগে তাহলে প্রচার করতে হয়েছে। নইলে শুধু মাঝরাত্রে রুটি এসে পৌঁছলে সাধারণ লোক কি বুঝবে। আর রুটি পাঠানোর অর্থ যদি আগে প্রচার করা হয়ে থাকে ত রুটি পাঠানোর কোন প্রয়োজনই থাকে না। না, বিবিজান—এ বড় পেঁচালো ব্যাপার। এ যারা বিশ্বাস করছে ওদের গর্দানের ওপর মাথাটা নেই। ফৌজের সম্বন্ধে ক্রমেই হতাশ হচ্ছি।'

আমিনা ও আজিজন দুজনেই হাসিয়া উঠিল। আমিনা কহিল, 'সবাই যদি আপনার মত বুদ্ধিমান হ'ত ত আমাদের কাজ চলত কি ক'রে? আর তাহ'লে তারা আট টাকা মাইনেতে ফৌজেই বা কাজ করতে

যাবে কেন? তারা ত উকীল নানকচাঁদের মত মাথা খাটিয়েই হাজার হাজার টাকা রোজগার করতে পারত!'

নানকচাঁদ কথার উত্তর না দিয়া নীরবে আরও কিছুক্ষণ তামাক টানিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন, 'পাঞ্জাবী সিপাইরা তোমাদের দিকে আসবে মনে করো?'

'না, বাবুজী। ওরা এক আশ্চর্য জাত। এই সেদিনের মার-খাওয়া একেবারে ভুলে গেল।'

'কিম্বা ভোলেনি। যারা মেরেছে তাদের হিম্মত জানে! আবার তাদেরই হাতে মার খাবার ইচ্ছে নেই। রাজপুতরা?'

'ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। রাজপুত রাজারা যে কী করবেন।'

তারা কেউ তোমাদের দিকে আসবে না। অন্তত নানাসাহেবের নাম থাকলে ত নয়ই। মারাঠাদের হাতে বহু দুঃখ তারা পেয়েছে, আংরেজদের তাড়িয়ে সে জায়গায় মারাঠারাজ বসাতে তারা আর চাইবে না। ...হুঁ। বোঝা গেল। ভেলেজীরা?'

'সন্দেহ আছে এখনও।'

'না বিবিসাহেব। তাহ'লে একাজে এগোনো তোমাদের উচিত হয়নি। আশা ভরসা বড়ই কম। আগুন জ্বালছ বটে—তবে সে আগুনে পতঙ্গের মত তোমাদেরই ঝাঁপ দিয়ে পড়তে হবে।'

'দেখা যাক। দমদম থেকে দিল্লী মায় কলকাতা পর্যন্ত—আংরেজ ফৌজ যা আছে সিপাই আছে তার দশগুণ। আর এইখানকার আংরেজ যদি ঘায়েল করতে পারি—বোম্বাই, মাদ্রাজ সব জায়গায় সিপাইরাই জাগবে। বেগতিক দেখলে চাই কি পাঞ্জাবী রাজপুতরা সর্দাররাও আমাদের দিকে আসবে।'

'ওরাও মুলুক থেকে ফৌজ আনাবে।'

'শুনেছি বাবুজী আড়াই মাস সময় লাগে ওদেশ থেকে এদেশে পৌঁছতে।'

'আড়াই মাস খুব বেশী সময় নয়, হুসেনী বিবি। তাছাড়া গোর্খারা আছে। আংরেজদের হাতে না রাখলে ওরা পাহাড়ের চলবে না।...এখনও সময় আছে, এখনও নিরস্ত হও! মুঘল রাজ মরে পচে গেছে, দিল্লীতে এখন চিল শকুনের আড্ডা। পেশোয়া বংশও মরে গিয়েছে বিবি, সে আর বাঁচবে না। পুঁথিপুত্তুরকে দিয়ে পরলোকের নামে পিণ্ডিই দেওয়া চলে শুধু, ইহলোকে আর কোন সুবিধে হয় না। ভাখো—ভাল ক'রে ভেবে ভাখো!'

আমিনা পাথরের মূর্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া রহিল কিছুক্ষণ। তাহার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'না, ফেরার আর কোন উপায় নেই। নরকের পথে অনেকদূর নেমে এসেছি। যেদিন এই দেহটা ঐ নানাসাহেবের লালসার খোরাক করে দিয়েছি সেই দিনই ত চিতাশয্যা বিছিয়েছি নিজে-হাতে বাবুসাহেব, পুড়ে মরা ছাড়া এর ত আর কোন গতি নেই। আর পুড়ি যদি ত—আরও দু চার জনকে পোড়াতে ছাড়ব কেন? কার কি হবে—তা নিয়ে আর মাথা ঘামাব না। আমাদের দুই বোন আগুন জ্বালাতে এসেছি, আগুন জ্বালিয়ে চলব, যতক্ষণ বাঁচি। নিজের দেহকে স্ফুলিংগ করেছি—ভারতব্যাপী সমিধের উপযুক্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—তাই না?...না, আর বাঁচবার, সাবধান হবার, ফেরবার কোন পথ কোথাও খোলা নেই।'

নানকচাঁদের কিন্তু শেষের দিকে আমিনার কথার দিকে কান ছিল না। তাঁহার অত্যন্ত কান কোন দূর পদশব্দ শুনিতেছিল। আমিনার বলা শেষ হইতেই বলিয়া উঠিলেন, 'ঐ বোধ হয় তিনি এসেছেন—এতক্ষণে।'

তাহার পর উঠিয়া গিয়া কপাট খুলিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস আসিয়া প্রদীপের শিখাটা কাঁপাইয়া তুলিল। আগন্তুক ঘাড়টা উঁচু করিয়া দেখিল বাহিরের জমাট বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে একটি ক্ষীণ আলোক শিখা ক্রমশ কাছে আগাইয়া আসিতেছে। একটু পরেই আগন্তুক ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সংগের আলোক-সহচরীটি যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল,

চলিয়া গেল। নানকচাঁদ তাহার দরজাটি সন্তর্পণে বন্ধ করিয়া দিলেন।

তিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন, প্রদীপের ক্ষীণ আলোতেও তাঁহাকে বেশ ভাল করিয়া দেখা গেল। তিনিও মুসলমান, বয়সে পৌঁছিতে এখনও অত্যন্ত সুপুরুষ, উজ্জ্বল গৌরবর্ণের সহিত দাড়ি গোঁফ চমৎকার নাসিকা ও ললাট—সমস্তই সুডৌল ও চাপকান পরণে, মাথায় সাদা পাগড় করা টুপী। ঘরের মাঝামাঝি আসিয়া তিনটি ছবি মহিলার মাঝামাঝি একটা স্থানের দিকে করিয়া ঈষৎ অভিবাদনের ভঙ্গী করিলেন।

নানকচাঁদ ততক্ষণে নিজের জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এইবার তিনি পরিচয় করাইয়া দিলেন, এ, এঁর কথাই তোমাদের বলছিলুম : ইনিই আমার মহম্মদ আলি খাঁ। বুন্দেলখণ্ডের লোক আর এঁরা—এঁদের পরিচয় ত জানেনই।'

রে পরস্পর অস্পষ্টতা সহিয়া গিয়াছে। দুই জনই দুইজনকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়াছেন, ফলে একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধতা ঘরের মধ্যে।

নানকচাঁদ আগে অতটা বুঝিতে পারেন নাই। এখন আমিনার দিকে তাকাইয়া তাহার স্তম্ভিত দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দণ্ডায়মান মহম্মদ আলি খাঁর মুখে চোখ তুলিয়া তাকাইলেন।

মহম্মদ আলি খাঁ নিথর নিষ্পন্দ প্রস্তর মূর্তির মত অবিচল অবস্থায় দাঁড়াইয়া। তাঁহার দৃষ্টি বিস্ময়-বিস্ফারিত স্থির। একটু একটু করিয়া সেই প্রসারিত চোখদুটি বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল, ক্রমে সে বাষ্প গলিল। আয়ত চোখের কোল বাহিয়া সে জল ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঝরিয়া কপোল ভাসাইয়া দাড়ির প্রান্ত বহিয়া বুকের কাছে জামাটা ভিজাইতে লাগিল।

ততক্ষণে রমণী দুইটিরও স্তম্ভিত অবস্থা কাটিয়াছে। আজিজন নিজের হাতের কঙ্কণ দিয়া নিজের ললাটে আঘাত করিল। আমিনা অস্ফুট কণ্ঠে কী একটা বলিয়া উঠিল। ভাল করিয়া তাহার কণ্ঠে স্বরও ফুটিল না। পরমুহূর্তেই সে চেতনা হারাইয়া আজিজনের কোলে ঢলিয়া পড়িল।

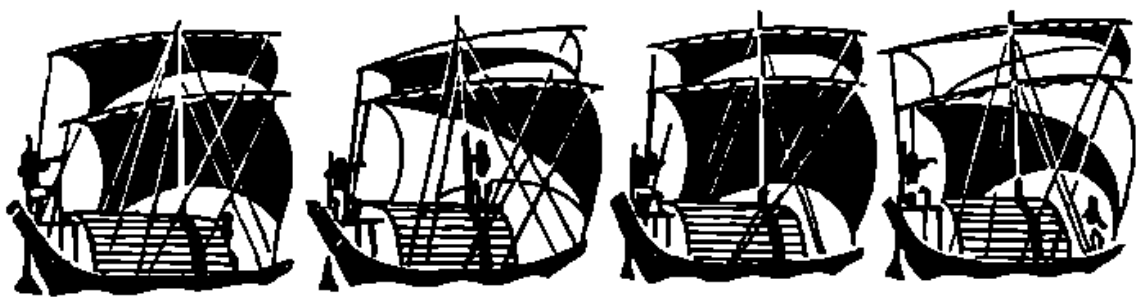

দেশ ও বিদেশ

পাকিস্তানের পট পরিবর্তন—

পাকিস্তান উত্তেজনা ও কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার কেন্দ্রভূমি হইয়াছে। আজ যাহা ঘটনার পরিণতি বলিয়া মনে হয় কাল তাহা মনে হয় অত্যদ্ভুত ঘটনার সূচনা মাত্র। ইহার একটি প্রধানতম কারণ হইল পাকিস্তানের মানসজগৎ এইরূপ অস্থির ও অস্বাভাবিকতাপূর্ণ যে কি করিবে, কোন পথে চলিবে তাহার কোন সুশৃঙ্খলিত ধারা নাই। মিঃ মহম্মদ আলী প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন অস্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে। তাঁহার কার্যভার পরিত্যাগও তদ্রূপ একটি অস্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে সাধিত হইল। কেন এইরূপ ঘটিল তাহা সবারই মনে এক প্রশ্নের অবতারণা করিবে। প্রশ্নটা এইরূপ ভাবে আসিতে পারে: তবে কি পাকিস্তানে গোলাম মহম্মদ নেতৃত্বের অবসান হইল? নবনিযুক্ত পাকিস্তান গভর্ণর ইস্‌কান্দার মির্জা, ও সুরাবর্দী আঁতাত কি এতদিনে পূর্ণ হইল?

ইসকান্দার মির্জা গভর্ণর জেনারেল হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লীগের নেতৃত্ব পরিবর্তিত হইল। এবং আওয়ামি লীগের সঙ্গে খোদ লীগ মিতালী পাতাইল। ইহা কি পাকিস্তানে নূতন নেতৃত্ব শক্তিশালী হইবার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র? ইহার পশ্চাতে যে সব শক্তি সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে—তাহার মধ্যে প্রধানতম হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনবিরোধী শক্তি। পূর্ব পাকিস্তান স্বায়ত্তশাসন ও সংখ্যাপরিষ্ঠতার দাবী তুলিতেই পাকিস্তানের পশ্চিম অংশ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। এই শঙ্কাকে আরও উগ্র করিয়া তুলিয়াছে পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বিরোধী আন্দোলন। লীগ নেতারা মনে করিতেছেন পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট হইলে আভ্যন্তরীণ বিরোধ প্রশমিত হইবে। কিন্তু ইহাতে যে অনেক অংশ খুসী হইবে না তাহা খান আবদুল গফুর খানের বক্তৃতায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। ইস্‌কান্দার মির্জা পাকিস্তানের গভর্ণর জেনারেল হইবার পর তিনি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। এই অধিকার তিনি সংবিধান গঠন, পাকিস্তান সমাজ গঠন, ইত্যাদি ব্যাপারে প্রয়োগ না করিয়া যদি সীমান্ত নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেন তবে হয়ত পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ রাজনীতি আরও জটীল আবর্তে ঘূর্ণায়মান হইবে। আজ পাকিস্তানের চিন্তাশীল লোকদের ভাবিবার বিষয় হইতেছে, আজও একটি সুষ্ঠু সংবিধান রচনা সম্ভব হইল না। এবং এই আট বছরের মধ্যে বহু ঘটনা সাধারণ মানুষের দুঃখ বাড়াইয়াছে বই কমে নাই। এইসব বাস্তব ঘটনার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সব রাজনীতির মূলনীতি স্থির করিবার সময় আসিয়াছে।

চার প্রধানের মিলিত প্রচেষ্টা—

পৃথিবীর রাজনৈতিক স্রোতের মোড় ঘুরিতেছে। ইতিপূর্বে যাহা কূটনৈতিকেরা নিজেদের এলাকার বিশেষ কার্যাবলী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন—তাহা আজ দেশ নেতাদের আয়াসসাধ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পেশাদার কূটনৈতিকেরা সব ব্যাপারের মধ্যেই কিছু গুঢ় কারণ খুঁজিয়া পান। ফলে অনেক সময় আসল সমস্যা অকারণে জটিলতার সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্য পৃথিবীতে এইরূপ সন্দেহ দোষদুষ্ট অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। কোন রাষ্ট্র হয়ত কোন কারণে একটি কাজ করিয়াছে—অন্য রাষ্ট্র তাহার এক বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া বিষয়টি জটিল

করিয়া তুলিয়াছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অনেক ঘটনাই উপস্থিত করা যাইতে পারে। এইরূপ ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা পাইবার পর পাশ্চাত্ত্য নেতারা ভাবিলেন পরস্পর সন্দেহ দ্বারা কোন সমস্যাই সমাধান সম্ভব নহে। ইন্দোচীন সম্পর্কে যে আলোচনা চীনের নেতা, ব্রিটেনের নেতা ও ফ্রান্সের নেতার মধ্যে হইয়াছে—তাহাতে পরস্পর পরস্পরকে বুঝিবার অনেকখানি সুযোগ ঘটিয়াছে এবং আলাপ আলোচনার অনেক সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। জেনেভার চার প্রধানের যে বৈঠক হইয়া গেল তাহার ভিত্তিভূমি রচনা করিয়াছে পূর্বোল্লিখিত জেনেভা বৈঠক। ভারতের পঞ্চশীল নীতির মধ্যে যে আলাপ আলোচনার দ্বারা বিষয়সমূহের মীমাংসার কথা উল্লেখ আছে তাহা এইরূপে সম্মেলনের মধ্যে বিকাশ লাভ করিতেছে। অস্ত্রের হানাহানি যেমন সামরিকভাবে সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে—তেমনি আলাপ-আলোচনায় বিরোধের বিষয় বুঝিতে সাহায্য করে। এই কৌশল অবলম্বন করিয়া পৃথিবীর নূতন ইতিহাস রচনা করিবার দিন আসিয়াছে। চার প্রধানের সম্মেলনে এই কথাই স্বীকৃত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নূতন মনোভাব লইয়া কাজ করার যে শান্তিপূর্ণ অভিপ্রায় সমগ্র মানবজাতির মনে রহিয়াছে উহারই অনুপ্রেরণায় আজ আমরা এখানে মিলিত হইয়াছি। আমাদের সুমহান দেশসমূহের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ শান্তির পথ খুঁজিয়া লইবেন ইহাই সমগ্র জগতের সকল অধিবাসীর মনের আকাঙ্ক্ষা।" ইতিপূর্বে রাজনৈতিক নেতারা জাতির নামে যুদ্ধ করিয়াছেন। যুদ্ধ করিয়া নেতারা বুঝিয়াছেন যে, অধিবাসীরা কত দুরূহ অবস্থার মধ্যে পড়েন। এই অবস্থার হাত হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত নেতারা অস্ত্রবাদে আর কি শক্তি আছে তাহাই খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহেন। সম্ভবত সেই শক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে পরস্পরের সমস্যার প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা অবশ্য কর্তব্য। অবশ্য ইহার পশ্চাতে আর একটি ভয়ও ক্রিয়া করিতেছে। তাহা হইতেছে আণবিক বোমার ভয়। তাহা সব দেশের জনসাধারণকে সমানভাবে ভীত করিয়া তুলিয়াছে। ভয়-মুক্ত নূতন পৃথিবী গঠন করিবার জন্যই আজ নেতারা অগ্রসর হইয়াছেন। কিন্তু যে সমস্যায় কণ্টকিত বলিয়া মনে করেন তাহা মূলতঃ ইয়োরোপীয়। আসলে বিষয়টি কিন্তু সমস্যার এক দিক মাত্র। কেন না, এশিয়া খণ্ডে যে সমস্যা পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলি সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে তাহার সঙ্গে বহু বৃহত্তর রাজনৈতিক কারণ সংশ্লিষ্ট, কিন্তু জেনেভার সম্মেলনে সে বিষয়ের উল্লেখ নাই—একথা মার্শাল বুলগানিন উল্লেখ করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। শুধু মাত্র সশস্ত্র বা সম্মিলিত আর্যাণ জাতি গঠিত হইলেই বিশ্বে শান্তি আসিবে এমন কথা নাই। এ-ও ত হইতে পারে যে, ইয়োরোপীয় জাতিগুলির সমস্যা সমাধান করিয়া প্রাচ্যকে শায়েস্তা করিবার কাজে লাগিবে। কেন না, প্রাচ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের নীতিতে সন্দেহের অবকাশ এখনও রহিয়াছে।

এগারোজন বৈজ্ঞানিক—

আমাদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস লইয়া আগাইতে হইতেছে, প্রাচ্যের তরফ হইতে শুভেচ্ছার অভাব নাই। জেনেভায় চীন-মার্কিন আলোচনা শুরু হইয়াছে। এই আলোচনা সম্ভব করিয়া তুলিতে ভারতের তরফ হইতে কম আয়াস-সাধ্য খরচ করিতে হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ মেনন ভারতের দৌত্য-কার্য করিয়া একটি সভা প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা হইতেছে এই, আলাপ-আলোচনায় অনেক সন্দেহ নিরসন হইয়া থাকে। বস্তুত তাহাই হইয়াছে। চীন-মার্কিন প্রতিনিধিরা যখন রাজনীতি বিষয় আলোচনা করিবেন তখন তাঁহারা নিশ্চয় উভয়ই উভয়ের মতামতের সত্যতা অনুভব করিতে পারিবেন।

উদ্দেশ্যের সততা যদি স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় তবে বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে কোন অসুবিধা হইবে না। বর্তমান আন্তর্জাতিক

ঘটনাবলী দেখিয়া মনে হয় যেন কেহই কাহারো উদ্দেশ্য সম্বন্ধে খুব সন্দীহান হইয়া কাজে হাত দিতেছেন না। তাই চীন-মার্কিন আলোচনার প্রাক্কালে এগারো-জন মার্কিন বৈমানিকের মুক্তি নানাদিক দিয়া শুভ সম্ভাবনাপূর্ণ এবং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাসে সহায়তা করিবে। কিন্তু মার্কিন দেশে যে সব চীনা নাগরিক রহিয়াছে তাদের সম্পর্কে কোন সীদ্ধান্তে পৌঁছানোর সময় হইয়াছে এবং আলোচনাটা যদি সমাধান উদ্দেশ্যে হয় তবে হয়ত নেহেরুজীর এশিয়া সম্পর্কে শীর্ষ-আলোচনার প্রস্তাব কার্যকরী হইতে পারে।

অষ্ট্রীয়ার স্বাধীন রাষ্ট্ররূপ—

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে জার্মান সৈন্য অষ্ট্রীয়াতে প্রবেশ করিবার পর হইতে অষ্ট্রীয়ার স্বাধীন রাষ্ট্ররূপ বিনাশ হয়। তাহার পর হিটলারের পতন, জার্মানির বিভক্ত অবস্থা, দ্রুত ইতিহাসের ঘটনাবলীকে অন্যদিকে ঠেলিয়া দিয়াছে কিন্তু অষ্ট্রীয়ার স্বাধীনতা ফিরিয়া আসে নাই। কালচক্র ঘুরিয়া যেখানে ছিল সেইখানেই যেন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ব্রিটেন, আমেরিকা, সোভিয়েট রাশিয়া ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়ার মাঝে সন্ধির ফলে—অষ্ট্রীয়ার স্বাধীনতা ফিরিয়া আসিল। ইয়োরোপীয় কূটচক্রের মাঝে অষ্ট্রীয়ার অস্তিত্ব এতদিন আবদ্ধ ছিল। আজ তাহার মুক্তি হইল। ইহা ইয়োরোপীয় রাজনীতির শুভলক্ষণ বলিতে হইবে।

চীন-মার্কিন নয়া সম্পর্ক—

চীন ও মার্কিন সরকার উভয়ই বৃহৎ দেশ—তাহাদের সমস্যাগুলি বিভিন্ন দিক হইতে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া উভয়ই বিচার করিয়া থাকে। উভয় দেশই বহুদিন মনকষাকষির পর বুঝিয়াছে যে বিরোধ করিয়া লাভ নাই। ব্রিটেন চীনের সঙ্গে বাণিজ্য করিতে চাহে। অতএব সে পূর্বাহ্নেই একটা আপোষ-রফা করিয়া লইয়াছে। চীনের মত সম্ভাবনাপূর্ণ বাজার নষ্ট হইলে মার্কিন বণিক মহলে যে কিছু প্রতিক্রিয়া হইবে না তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। যুদ্ধোত্তর মার্কিন পৃথিবীতে পণ্যদ্রব্যের যে স্ফীতিভাব দেখা দিবে তাহা সাধারণভাবে বলা চলে। কিছু পূর্বে খবর পাওয়া গিয়াছিল যে মার্কিন দেশ কৃষিপণ্য বিক্রির নিমিত্ত এশিয়ার বাজার খুঁজিতেছে। ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, মার্কিনরা তাহাদের উদ্বৃত্ত মাল বিক্রি করিবার নিমিত্তই বাজার খুঁজিতেছে। এশিয়ার পৃথিবীতে চীনের বাজারের গুরুত্ব অনেক বেশী। কেননা, চীন এখন দেশ গঠনকাজে ব্যস্ত, তাহার যন্ত্র হইতে শুরু করিয়া অনেক কিছুই প্রয়োজন—অথচ রাশিয়া যে সব কিছুই দিতে সমর্থ হইবে এবং অতি দ্রুততার সহিত সমর্থ হইবে এমন সম্ভাবনা কম। কেননা রাশিয়াকে নিজের যুদ্ধোত্তর গঠনের কাজে যথেষ্ট কালক্ষেপন করিতে হইবে। তাহার উৎপাদন ব্যবস্থার সহিত পূর্ব ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আর তাছাড়া পূর্ব-ইয়োরোপীয় অঞ্চলে রাশিয়ার যৌথিক শিল্পের সংগঠন সবচেয়ে শক্তিশালী।

পূর্ব ইয়োরোপের ছোট-খাট রাষ্ট্রগুলিই রাশিয়ার উপর নির্ভরশীল। ইহার উপর চীনের দায়িত্ব বহনে রাশিয়া কতখানি তৎপর হইবে বলা মুস্কিল। অথচ রাজনৈতিক কারণে রুশ-চৈনিক সম্বন্ধ অটুট রহিয়াছে, ইহার ভালমন্দের ফল উভয় মিলিয়া ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু চীনের সমাজ গঠন ও শিল্প গঠন অতি দ্রুততার সহিত সম্পন্ন করা প্রয়োজন। চীন এক-পোয়া শতাব্দী গৃহযুদ্ধ করিয়া আজ প্রায় নিঃস্ব। এই নিঃস্ব অবস্থা হইতে পরিত্রাণ পাইতে চৈনিক নেতৃত্ব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এতদিন ফরমোজা সমস্যা চীনের নাকের ডগায় তিল স্বরূপ ছিল। চীন ইহা বুঝিয়াছে যে, ফরমোজাকে বিশ্ব সমস্যায় পরিণত করিয়া আপাততঃ চীনের সংগঠন কার্য ব্যাহত হইবে। তবে ফরমোজা যে তাহার হাতের মুঠোয় রহিয়া গিয়াছে ইহা সে জানে। ব্রিটেন কার্যত এই অবস্থা অর্থাৎ ফরমোজা চীনের যুক্তিবদ্ধঅবস্থা স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এবং মার্কিনরা তাহা বুঝিয়াছে। কিন্তু এই কারণেই চীন-মার্কিন মনকষাকষি সম্ভব নয়। অথচ

এদিকে চীনকে necessary evil হিসাবে মানিয়া লইবার মত মনও মার্কিন দেশে প্রস্তুত হইতেছে। ফরমোজা কুক্ষিগত হইলেও ভাল খরিদ্দার নহে—অতএব নিরাপদ দূরত্বে থাকিয়া যদি চীনের সঙ্গে একটা যুঝা-পড়া সম্ভব হয় আপত্তির কি থাকিতে পারে? তাছাড়া এশিয়ার ও পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রে মতামত ক্রমশই চীনের স্বপক্ষে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। একমাত্র দক্ষিণ আমেরিকার কিছু সংখ্যক রাষ্ট্র 'হিজ মাষ্টারস্ ভয়েসে' কথা কহিতেছে। কাজেই মার্কিন রাজনীতিকেরা চীনকে লইয়া বড় বিব্রত বোধ করিতেছে। এ অবস্থাটা মার্কিন রাজনীতি জগতে খুব সুখকর অবস্থা নহে। এই উত্তরপক্ষের অস্বস্তিকর অবস্থাই চীন-মার্কিন সম্পর্কের পর্দা অপসারিত করিতেছে। চীন-মার্কিন পর্দার ওপরে মিতালীর ছায়া পড়ুক।

স্বদেশী আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী—

আমাদের জাতীয় জীবনের উন্মেষ হইয়াছে কবে তাহার একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন থাকা উচিত—সম্ভবত এই চেতনা বোধই বাঙালী জাতিকে হঠাৎ স্বদেশী আন্দোলনের স্মৃতি জাগাইয়া তুলিয়াছে। জাতি যখন নিজস্ব সত্তা হারাইয়া ফেলে, অথবা নিজস্ব কিছুকে রূপ দিতে অসমর্থ হয় তখন ঐতিহাসিক নিদর্শন খুঁজিয়া বেড়ায়। সেই গৌরবময় ঐতিহাসিক ঘটনার দিনে যাহারা জন্মায় নাই—সেদিনের স্মৃতি যাহাদের মনে গভীর রেখাপাত করে নাই—সেই দিনের সেই ইতিহাসের সন্ধান ইঙ্গিত যাহারা অনুভব করিতে পারে নাই তাহারাই আজ বাঙালা দেশ ভাগে সম্মতি দিয়া জাতির আত্মখণ্ডনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে। স্বদেশী যুগের স্মৃতি আজ যাহাদের মনে জাগিতেছে তাহারা কি শান্ত মনে বাঙালী জাতির এই বর্তমান দুর্দশা স্বীকার করিতে পারেন? হয়ত ইহা ইতিহাসের ধারা। উত্তাল তরঙ্গের ক্লান্ত নির্জীব ঢেউ থাকিয়া থাকিয়া গর্জন করিতে চাহে। তাই আজ সভা সমিতিতে যখন সেই ক্লান্ত নির্জীব জীবনের গর্জন শুনি তখন মনে হয় ঐতিহ্যকে সম্মান না করিয়া ঐতিহ্যের প্রদর্শনী শুরু হইয়াছে। আর দশটা বার্ষিক প্রচেষ্টার মত, এও একটা প্রচেষ্টা, মৃত গৌরবকে পুনরুজ্জীবিত করিবার প্রচেষ্টা। আমরা দুঃখভারাক্রান্ত মনেই এই উক্তি করিতেছি—যে ব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা রক্ষা করিতে পারি নাই। তবু মনকে জীয়াইয়া রাখিতে হইবে আজ আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের কথা স্মরণ করিয়া চক্ষুর জল ফেলিতে হইবে। রাখীবন্ধনের কথা স্মরণ করিয়া চক্ষুর জল ফেলিতে হইবে। এই অনুশোচনা ও প্রায়শ্চিত্ত জাতিকে আবার নবতর গৌরবের পথ উন্মুক্ত করিবে। সেই উন্মুক্ত পথ বাহিয়া আবার আমরা স্বদেশী আন্দোলনের যুগের আদর্শ সৌধে পৌঁছাইব। সেই দিন আজিকার এই সভা সমিতি স্মৃতি রক্ষার আন্দোলন হয়ত সার্থক হইয়া উঠিবে। বাঙালী জাতি আজ একথা কহিতে পারে:

'গিয়াছে দেশ দুখ নাই
আবার তোরা মানুষ হ'।

দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের মন মেজাজ—

দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক ঘোষণায় প্রকাশ যে, সীংম্যান রী কোন বিশেষ তারিখের মধ্যে নিরপেক্ষ তদারকী কমিশনকে দক্ষিণ কোরিয়া ত্যাগ করিয়া যাইতে ফতোয়া জারী করিয়াছেন। আর অন্যান্য যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে মনে হয় সীংম্যান রী একটা নূতন চাল খেলিয়া দাবার বাজী মাৎ করিবার তালে আছেন। তবে তিনি সময় বুঝিয়া চাল দেন নাই। কেন না, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী যথার্থ উপলব্ধি করেন নাই বোঝা যাইতেছে, নতুবা বিশ্বের সর্বত্রই যখন আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধান হইতে চলিয়াছে তখন অসময় তদারকী কমিশনকে রক্তচক্ষু দেখানো সুবুদ্ধির পরিচয় নহে।

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য

জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আমদানী নীতি—

১৯৫৬ সালের শেষ বর্ষার্ধের আমদানী নীতি প্রণয়নে পারস্পর্য ও স্থিতি-মান (stability) রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমদানী নীতি ও পদ্ধতিকে দেশের উন্নীয়মান অর্থ-নীতির পরিপ্রেক্ষিতে পর্যালোচনা ও সংশোধন করা হয়েছে। নূতন আমদানী নীতিতে কতকগুলি দ্রব্যের আমদানী সহজসাধ্য করা হয়েছে, যেমন, এন্টিমনি খনি পিণ্ড, লেখা ও ছাপার কাগজ, ব্লিচিং পাউডার, সেলুলোজ স্বচ্ছ কাগজ ইত্যাদি। এর কতগুলি হয় দেশের শিল্পের জন্য প্রয়োজন নয় তো এগুলোর দেশীয় উৎপাদন বর্ধমান চাহিদার যোগান দিয়ে উঠতে পারছেনা। আবার কতক-গুলি দ্রব্য যেমন, টর্চ লাইটের বাল্ব, পালিশ ও পালিশের উপাদান, এসেটিক্ এসিড্, আমোনিয়ম্ ক্লোরাইড, ক্যালশিয়ম কার্বাইড্ প্রভৃতি কতিপয় রাসায়নিক দ্রব্য, বাস্তুকাটা করাত ইত্যাদি, যেগুলোর দেশীয় উৎপাদন চাহিদার যোগান দিয়ে উঠতে সক্ষম, তাদের আমদানীর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। এই ব্যবস্থার ফলে দেশের শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে আমদানী নীতির ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক রক্ষা করা হয়েছে। দেশের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পোগুলোর উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য, মিশ্র-ধাতু, লৌহ ও ইস্পাত দ্রব্য, এলুমিনিয়মের টিউব, জুট ববিন প্রভৃতি ১৮টি দ্রব্যের আমদানীর উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করা হয়েছে। ডলার অঞ্চল থেকে আমদানীর অধিকতর সুযোগের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং ক্ষুদ্র ও নূতন আমদানীকারকদের সুবের তুলনায় কিছু বেশী সুবিধা হয়েছে।

এই আমদানী নীতি রচনাকালে আমদানী উপদেষ্টা পরিষদের, বণিক সমিতির ও শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক বিভিন্ন শাখার সুপারিশগুলি বিবেচনা করে দেখা হয়েছে।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় আখের চাষ—

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে আখের চাষ হয় বটে কিন্তু তার উৎপাদন পদ্ধতি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত নয়। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় মোট আখ-উৎপন্ন অঞ্চলের মাত্র ¼ অংশ অর্থাৎ ছয় লক্ষ পঁচিশ হাজার একর জমিতে অধিক ফসল ফলাবার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় আখের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাবে বলে মনে করা যাচ্ছে। উৎপাদন বাড়াবার জন্যে ছোট ছোট সেচ পরিকল্পনা, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বীজ সরবরাহের জন্য বীজ সংরক্ষণাগার, আধুনিক যন্ত্র-পাতির সরবরাহ, কারিগরী জ্ঞানের যোগানে, পঙ্গপাল ও রোগ থেকে ফসল সংরক্ষণ এবং আখ উৎপাদনে প্রতিযোগিতার জন্য পুরস্কার বিতরণ প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আপাততঃ দুটি নির্দিষ্ট প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে। তন্মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে কারখানার আখের সরবরাহ ও কৃষকদের কাছে আখের বীজের সরবরাহ ত্বরান্বিত করবার জন্য রাস্তাঘাট ও যান-বাহনের সুবন্দোবস্ত করা। আর দ্বিতীয়টি, কৃষকদের সার কিনবার জন্য দীর্ঘ সময়ে পরিশোধ্য প্রয়োজনানুযায়ী ঋণের ব্যবস্থা করা।

এই প্রস্তাব দুটি সরকারী অনুমোদন লাভ করলে আখের উৎপাদন বাড়াতে অনেকটা সাহায্য করা হবে। আখের উৎপাদন বাড়ান বর্ত্তমানে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। জন-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যের চাহিদা বেড়ে গিয়েছে, কিন্তু চিনির উৎপাদন বস্তুতঃ হ্রাস পেয়েছে। ১৯৪৪-৪৫ সালে চিনির উৎপাদন মাত্র ১৩ লক্ষ টন হয়েছে, কিন্তু ১৯৪৯-৫০ সালে ভারতে চিনির উৎপাদন হয়েছিল ১৫ লক্ষ টনেরও কিছু বেশী। আখের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আর একটি দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। সেটি হচ্ছে আখে চিনির অংশ বাড়ান। ভারতে আখের চিনির অংশ গড়ে শতকরা দশ ভাগ মাত্র। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় চিনির উৎপাদন লক্ষ্য ২২½লক্ষ টন ধরে বলে অনুমান অর্থাৎ বর্ত্তমান উৎপাদনের দ্বিগুণ। সে জন্য উৎকৃষ্ট শ্রেণীর প্রচুর আখের সরবরাহ প্রয়োজন।

জীবন-বীমা জাতীয়করণ—

ইম্পিরিয়াল ব্যাংক জাতীয় করণের পরই যখন জীবন-বীমা জাতীয়করণের কথা-বার্ত্তা শোনা যাচ্ছে, তখন তাকে ভিত্তিহীন গুজব বলেই ছেড়ে দেওয়া যায় না, বিশেষতঃ ব্যবসায়ীমহল যখন ইতিমধ্যেই বেশ আলোড়িত হয়ে উঠেছেন। সরকারীভাবে কোন কথা প্রকাশ না পেলেও, দিল্লীর রাজনৈতিক মহলে যে এ নিয়ে কিছু না কিছু আলোচনা হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। সমাজতন্ত্রের আদর্শে গঠিত কোন দেশের পক্ষে দেশের প্রধান প্রধান শিল্পগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হবে তা অবশ্যই সঙ্গত। কিন্তু আমাদের দেশে যখন অর্থ নৈতিক মান বহু নিম্নে, বেকার সমস্যা প্রকট, এবং অন্যান্য সমস্যার অন্তাব নেই তখন জীবন-বীমা জাতীয় করণের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয়েছে কিনা তা ভেবে দেখা দরকার।

প্রথমতঃ জীবন বীমা জাতীয় করণে সরকারী কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে। দেশে অর্থ-সঞ্চয় বাড়িয়ে তোলা এবং সেই বর্দ্ধিত সঞ্চয়কে দেশের উন্নয়নের কাজে লাগান? প্রায় অনুরূপ কারণে ইম্পিরিয়াল ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে। কিন্তু ব্যাংক ও বীমাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করবার জন্য একই যুক্তি-তর্কী দিয়ে বিচার করা চলেনা। লোকের অর্থের নিরাপত্তা ও ব্যবসায়ীদের লেনদেনের জন্য ব্যাংকের প্রয়োজন অনস্বীকার্য, কিন্তু বীমা করায় লোকের আগ্রহ কতটুকু? অন্যান্য উন্নত দেশের মত আমাদের দেশের জন সাধারণ বীমার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে খুব সচেতন হয়ে ওঠেন নি, হয়ত আর্থিক অস্বচ্ছলতা তার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় বীমা ব্যবসায় যে এত উন্নতি করে চলেছে, তা একমাত্র ব্যবসায়ীদের দক্ষতার জন্য। পরিচালনার ত্রুটি হলে যে কোন মুহূর্ত্তে এই ব্যবসায়ে অবনতি আসতে পারে। সুতরাং সরকারী পরিচালনায় সর্বদা উপযুক্ত পারদর্শিতা রক্ষা করা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে। মিঃ এ, ডি, শ্রফ্ বীমা রাষ্ট্রায়ত্বকরণের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে এর দ্বারা ভারতীয় বীমা ব্যবসায়ে কেবল মাত্র ক্ষতি সাধন করা হবে। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে ভারতীয় বীমা শতকরা ২১৪ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু পোষ্টাল বীমা বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র শতকরা ১৬ ভাগ। অতএব সরকার বীমার পরিচালনা গ্রহণ করলে এক গুরু দায়িত্বই গ্রহণ করবেন। মিঃ শ্রফ্ বলেছেন যে বীমা তহবিলের উপর কঠোরতর নিয়ন্ত্রণ ও ঐ তহবিলের আরও ভাল নিয়োগ যদি সরকার ইচ্ছা করেন, তা হলে রিজার্ভ ব্যাংক যেমন অন্যান্য ব্যাংকের ঋণের প্রকৃতি সম্পর্কে সময় সময় সুপারিশ করে থাকে, তেমনি ভাবে সেই উদ্দেশ্য সাধন করা যেতে পারে।

জীবন বীমা রাষ্ট্রায়ত্ত করবার আগে অবশ্যই এ নিয়ে লোক-সভায় বহু তর্ক যুদ্ধ হবে। কিন্তু বিল উত্থাপনের আগে সমস্ত দিক গভীর ভাবে বিচার করে দেখা দরকার। বীমা রাষ্ট্রায়ত্ত হলে বে-সরকারী শিল্পীয় মহল ও ষ্টক মার্কেটে কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তাও চিন্তনীয়।

২২শে শ্রাবণ :

পঁচিশে বৈশাখ আর ২২শে শ্রাবণ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব আর তিরোভাব দিবসরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে আমাদের স্মৃতিতে। তিরোভাব-দিবসে সাধারণতঃ আমরা তাঁর স্মরণের আয়োজন করিনা, কারণ মহাপুরুষের মৃত্যুকে আমরা স্বীকার করতে চাইনা। সত্যই এ মৃত্যু চিরবিদায় বা চিরবিচ্ছেদ নয়; মূর্তিতে তিনি নেই, মনোময় হয়ে তিনি বিরাজমান। আমাদের ধ্যানে ও স্বপ্নে, চিন্তায় ও কল্পনায় তিনি পরিব্যাপ্ত। আমাদের দৃষ্টিও আজ তাঁর দৃষ্টিধারায় প্লাবিত; তাই বর্ষা ও শরৎকে দেখছি তাঁরই অনুভূতি নিয়ে, ঋতুতে ঋতুতে উৎসবের আয়োজন করছি তাঁরই কবিতা আর গানের ডালি সাজিয়ে। প্রকৃতি আমাদের চোখে সুন্দর হয়েছে তাঁর ভাবের রঙে রঙীন হয়ে, মানব মহিমাও বিচিত্র ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তাঁর প্রতিভা-জ্যোতিস্পর্শে।

সুরেন্দ্রনাথ :

স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি-বার্ষিকী-দিবস সম্প্রতি উদ্‌যাপিত হ'লো। ভারতের মুক্তি সাধনার ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। 'স্বদেশী আন্দোলনের' প্রধান মন্ত্র-উদ্‌গাতা তিনি। বাগ্মিতায়, নিষ্ঠায়, বিচক্ষণতায় তাঁর সমকক্ষ ব্যক্তি দুর্লভ। একদিন হয়তো জাতি নূতন নায়কের নির্দেশে নূতন পথে চলেছে, কিন্তু তাঁর নেতৃত্বের মর্যাদা সে কোনদিন ভোলেনি এবং ভুলবেনা। তাঁর কাছ থেকে সে যে প্রেরণা, যে মন্ত্র লাভ করেছিল তা তার অবিস্মরণীয় সম্পদ্।

বিদ্যাসাগর দিবস :

আর এক মহাপুরুষের স্মৃতিবার্ষিকীও অনুষ্ঠিত হ'লো উপযুক্ত আয়োজন-সহকারে। সমাজে ও সাহিত্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দান অমূল্য! শুধু কথা দিয়ে নয়, কাজ দিয়ে দেশ-সেবার পথ তিনি দেখিয়ে গিয়েছেন। দেশ অর্থে তিনি দেশবাসী বুঝতেন, তাই দেশের কুলি, মেথর, এদেরও সেবা—কায়িক সেবা—করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি। সাম্যের বাণী প্রচার নয়, তার প্রত্যক্ষ প্রয়োগ দেখি তাঁর কর্মজীবনে। স্মৃতিবার্ষিকী অনুষ্ঠাতৃগণ এ উপলক্ষ্যে যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন তা খুবই সময়োপযোগী হয়েছিল।

শিল্পী রমেন্দ্রনাথ :

কলিকাতার সরকারী শিল্পকলা-মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের বিয়োগে ভারতীয় চিত্রশিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হ'লো। অবনীন্দ্রনাথের প্রধান শিষ্যবর্গের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। দেশে ও বিদেশে তাঁর প্রতিভা স্বীকৃত ও সম্মানিত হয়েছিল। তাঁর চিত্রাবলী দেখলে স্পষ্ট অনুভব করা যায় একটি সংকীর্ণ রীতি বা ভঙ্গীর মধ্যে তিনি আপন সাধনাকে সীমায়িত করেননি; নূতন নূতন প্রকাশ ভঙ্গীর সন্ধান করেছেন এবং তাতে সাফল্যও অর্জন করেছেন। 'প্রাচ্যশিল্পে'র পক্ষপাতীদের সকলের মধ্যে এই নূতন পথের সন্ধান সব সময়ে দেখা যায়না; সেই কারণেই কেউ কেউ এঁদের সংকীর্ণ দৃষ্টি সম্পর্কে অভিযোগ করেন। রমেন্দ্রনাথের চিত্রাবলী সম্পর্কে সে অভিযোগের কারণ নেই। তাঁর প্রতিভা শিষ্যবর্গের সাধনার মধ্য দিয়ে সার্থকতা লাভ করুক।

পাকিস্তান প্রসঙ্গ

একই সঙ্গে ভারত ও পাকিস্তান—তাদের স্বাধীন রাষ্ট্র-

জীবন শুরু করে। ভারতবর্ষ তার নূতন সংবিধান গঠন করে প্রায় ৪ বছর হল সেই অনুসারে নির্বাচন কার্য্য শেষ করেছে। আজ সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে ভারতের শাসনতন্ত্র একটা খ্যাতি অর্জন করেছে। আন্তর্জাতীক উন্নয়ন কার্যের জন্যও বিভিন্ন স্থান থেকে ভারত সুখ্যাতি পেয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত পাকিস্থান তার সংবিধানও গঠন করতে পারেনি। তাদের সংবিধান পরিষদ (Constituent Assembly) নানা প্রকার বাজে বিষয় নিয়ে তাল-বাহানা করে সাতটি বছর কাটিয়েছে। তার পর সেই পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে নূতন সংবিধান-পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এ নিয়ে বহু মামলা মোকদ্দমাও হয়ে গিয়েছে। যা হোক শেষ পর্যন্ত সংবিধান-পরিষদ গঠিত হয়ে প্রথম মিলিত হ'ল মারীতে (Murree)। কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা ছিল করাচীর রাজনৈতিক আবহাওয়া হতে দূরে বসে মারীর শীতল হাওয়ায় সংবিধান গঠন করবে। কিন্তু তাতেও নানা গোলমাল বেধে উঠেছে। সংবিধান গঠনে তাদের প্রধান বাধা হল ব্যক্তিগত ক্ষমতা স্পৃহা এবং আঞ্চলিক ঈর্ষা ও বিদ্বেষ। পূর্ব বাংলায় পাকিস্থানের অর্ধেকের বেশী লোক বাস করে, কিন্তু যে কোন প্রকারে পূর্ব বাংলাকে দাবিয়ে রাখা কর্তৃপক্ষের অন্যতম উদ্দেশ্য। তার প্রথম ধাপ হিসাবে পশ্চিম পাকিস্থানের সমস্ত প্রদেশকে একত্র করে একটা প্রদেশে পরিণত করার চেষ্টা। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জনসাধারণের কাছ থেকে আপত্তি ও বাধা খুবই স্বাভাবিক। সেই জনসাধারণের আপত্তিকে অতিক্রম করার জন্য পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্গত যে তিনটি প্রদেশে গণতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত ছিল সেই তিনটি প্রদেশেরই মন্ত্রীমণ্ডলীকে বরখাস্ত করতে হয়েছে। এই কাজ সাধন করার জন্য সিন্ধু প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী করা হয়েছে কুখ্যাত খুরোকে। তিনি তখন সিন্ধু বিধান পরিষদের সভ্যও নন। ইদানিং বিধান পরিষদের সভ্য তিনি নির্বাচিত হয়েছেন। করাচীর বিভিন্ন কাগজে তাঁর নির্বাচনের যে বিবরণ বের হয়েছে তা কোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতির গণ্ডীর বাইরে। নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র দাখিল করার আফিসের সামনে পুলিশ মোতায়েন করে রাখা হয়েছিল। ফলের সম্ভাব্য চারজন প্রতিদ্বন্দ্বী মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে এলে পর পর চারজনকেই গ্রেপ্তার করা হয়। কাজেই আর কেউই মনোনয়ন পত্র দাখিল করতে পারেনি।

এদিকে খান আব্দুল গফুর খান পাঁচ বছর জেল বাসের পর খালাস হয়ে এসেও নিজের প্রদেশে যাবার অনুমতি বহুদিন পাননি। মারীতে সংবিধান পরিষদের অধিবেশনের সময় সীমান্ত প্রদেশের মুখ্য মন্ত্রী হঠাৎ ঘোষনা করেন যে খান আব্দুল গফুর খানকে নিজ প্রদেশে যেতে দিতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। তখন কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ইসকান্দার মীর্জা দাঁড়িয়ে বলতে বাধ্য হলেন যে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সরকার বরাবরই খাঁ সাহেবের দেশ প্রত্যাগমনে আপত্তি করেছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার তার উপর ওই বাধা নিষেধ জারী রেখেছিল কিন্তু ওই প্রদেশের মুখ্য মন্ত্রীর এই ঘোষণার পর তিনি আর কোন নিয়ন্ত্রণ তার উপর রাখতে রাজী নন এবং তখনই ওই সব নিষেধ আজ্ঞা রহিত করার আদেশ জারী করেন। খান আব্দুল গফুর খান নিজ প্রদেশে ফিরে গিয়েছেন। সেখানকার লোক তাঁকে বরাবর বাদশা খাঁ বলে অভিহিত করত। সাত বছর পরে তাঁর দেশ প্রত্যাগমনে লোক তাঁকে বাদশাহর মতনই অভ্যর্থনা জানিয়েছে। ইতিমধ্যে সীমান্ত প্রদেশের মুখ্য মন্ত্রীকে বরখাস্ত করে সেখানে এক নূতন মুখ্য মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গের অবস্থাও বেশ ঘোরালো। মুসলীম লীগের অবশ্যম্ভাবী পরাজয়ের পর ফজলুল হক প্রধান মন্ত্রী হন। তার দু-একটা বেফাঁস কথার সুযোগ নিয়ে মন্ত্রীমণ্ডলীকে বরখাস্ত করে ওখানে গভর্ণরী শাসন প্রবর্তন করা হয়। অবশেষে শাসন চালানোর জন্য কেবল মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রীমণ্ডলীকে বরখাস্ত করেই পাকিস্থান কেন্দ্রীয় সরকার নিরস্ত থাকল না; মৃদু পন্থী গভর্ণারকে সরিয়ে ইস্‌কান্দার মীর্জাকে সেখানে পাঠানো হল কতকটা জঙ্গী চালে শাসন কার্য চালানোর জন্যে। দেশদ্রোহী

বিশ্বাসঘাতক অনেক ভাল ভাল আখ্যা তখন ফজলুল হককে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এখন আবার সেই ফজলুল হকের সঙ্গেই মিতালী করেই প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ আলী নিজের কর্তৃত্বকে কায়েম করতে চেষ্টা করছেন। পূর্ব বাংলার নির্বাচনের সময় যদিও সুরাবর্দী ফজলুল হকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মুসলীম লীগের বিরোধিতা করেছেন তবুও তাদের পারস্পরিক ঈর্ষা বিদ্বেষ একটুও কমেনি।

পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় সরকারের কে প্রধান মন্ত্রী হবে এবং কার ঘাড়ে পা দিয়ে কে ওই উচু স্থানে উঠবে এ নিয়ে মহম্মদ আলী ও সুরাবর্দীর মধ্যে বেশ খোলাখেলাই দ্বন্দ্ব চলেছে। যাকে দেশবিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক বলে অভিহিত করেছিলেন মহম্মদ আলীর ইচ্ছা আজ তাঁরই সাহায্যে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ অধিকার করেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্থানের অনেকেই তার এই মত সমর্থন করে না; তাদের ইচ্ছা সুরাবর্দীর সঙ্গে সহযোগিতা করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করা হোক। অপরদিকে গুজব নিজে প্রধান মন্ত্রী না হলে সুরাবর্দী অবশ্য কোন মন্ত্রীমণ্ডলী সমর্থন করবেন না। এই দ্বন্দ্বের ফলে পাকিস্থান কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রীমণ্ডলীর অবস্থা কি দাঁড়াবে বলা কঠিন। পাকিস্থানের গভর্ণর জেনারাল জনাব গোলাম মহম্মদ অনেক দিন বিদেশে ছিলেন; কিছু দিন হল তিনি ফিরে এসেছেন। এতদিন পর্যন্ত পাকিস্থান রাষ্ট্রের ক্ষমতা মোটামুটি তাঁর হাতেই ছিল। তিনি এখন কোন দিকে ঝোঁক ফিরাবেন তা দেখবার বিষয়।

পাশাপাশি দুটি রাষ্ট্র—একটি সুস্থিরভাবে নিজের শাসন কার্য চালিয়ে সমাজ কল্যাণ মূলক কাজে শক্তি নিয়োগ করছে—আর একটি রাষ্ট্র পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহ নিয়েই ব্যস্ত আছে।

গোয়া-সঙ্কট

১৫ই আগষ্ট গোয়ার সত্যাগ্রহীদের ব্যাপক অভিযান এবং নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের ওপর বর্বর পর্তুগীজ সরকারের অমানুষী নৃশংসতার কাহিনী আজ সর্বজনবিদিত। এ কাহিনী এখনও শেষ হয়নি। কবে, কিভাবে শেষ হবে তাও জানা যাচ্ছে না। সুতরাং লাভ-ক্ষতির হিসাব নিকাশের সময় এখনও আসে নি।

সমগ্র ভারতবর্ষের জনসাধারণ পর্তুগীজ সরকারের এই বর্বরতায় বিক্ষুব্ধ হয়েছে। ক্ষোভের কারণ শুধু এই নয় যে, নিরস্ত্র অহিংস জনতাকে গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। বিক্ষোভের গভীরতর কারণ এই যে, গোয়া ভারতবর্ষেরই অংশ, দেশের এই অংশে বিদেশী দস্যুদল সমস্ত ন্যায়, নীতি, মনুষ্যত্বকে উপেক্ষা করে ভারতবর্ষের সন্তানদের জন্তু জানোয়ারের মত গুলী করে মারছে, অথচ এর বিরুদ্ধে সার্থক কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা সম্ভব হচ্ছে না। সত্যাগ্রহীরা মৃত্যু নিশ্চিত জেনেই গিয়েছেন, এই সব মৃত্যুঞ্জয় শহীদদের কাছে মরণ কোন ভয়ের ব্যাপার নয়। দেশ কিন্তু তাঁদের জন্ত ব্যথা না বোধ করে পারে না। তবুও এই ব্যথাই সব নয়, সত্যাগ্রহীদের এই মৃত্যু ও মরণাধিক যন্ত্রণার মধ্যে থেকে আর একটা সমস্যা স্পষ্ট হয়ে উঠলো—সেটার গুরুত্ব কিছু কম নয়। সেটা হচ্ছে দুর্মদ দানবশক্তির কাছে মানবের আত্মিক শক্তির অসহায়তা—অন্ততঃ আপাতদৃষ্টিতে। ভারতের জনসাধারণের ক্ষোভের এইটিই হচ্ছে অন্যতম প্রধান কারণ। আজ প্রায় সকলের মনেই এই প্রশ্ন জাগছে যে, নির্লজ্জ দানবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আত্মিক বলের সত্যই কোন কার্যকারিতা আছে কি না।

পর্তুগীজ সরকারের বর্বরতা সুতরাং ভারত সরকারের সমস্যা কঠিনতর তুলছে। ভারতের জনসাধারণ দীর্ঘদিন ধরে অহিংস প্রতিরোধের কার্যকারিতায় বিশ্বাস করে এসেছে। এই বিশ্বাসের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রধান-মন্ত্রী শ্রীনেহেরু বর্তমানের হিংসা-কণ্টকিত বিশ্বসমস্যার নতুন সমাধানের পথ প্রদর্শন করছেন এবং সে পথে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু লোকের আস্থা সৃষ্টি হচ্ছে এমন আভাসও পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু সে বিশ্বাসের ভিত্তি ভারতবর্ষেই যদি টলায়মান হয়ে ওঠে, তাহলে বাইরের লোকের আস্থা অতি সহজেই নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার ফল কল্পনাতীত ভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সমস্যা সুতরাং বিহার ভারতেরই সমস্যা নয়, সমগ্র পৃথিবীর জনসাধারণের সমস্যা।

পাশ্চাত্যের পরীক্ষা

এই ঘোষণার ব্যাপারে ইউরোপ ও আমেরিকার জনমতের প্রতিক্রিয়া সুতরাং লক্ষ্য করবার মত। লক্ষ্যণীয় তেমন কিছু এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। ওই সব দেশের সাম্রাজ্যবাদীরা কত নিপুণ ব্যাকগ্রাউণ্ড বিস্তার করতে পেরেছে ভবিষ্যতের জন্য ভারতবর্ষের জনসাধারণের আগ্রহ নেই বিষয় একমাত্র হচ্ছে এই জনসাধারণ পর্তুগীজদের সমর্থন করবে, না, মনুষ্যত্বের এক অকৃষ্ঠ নিন্দা করবে। [illegible] স্থির করা বিশ্বনীতির কথা বলছেন অভিনয় করছেন, অপরা কথাগুলো সেটা ধরা পড়বে। শুধু সরকারই একটা কঠিন পরীক্ষায় সম্মুখীন হয়েছেন মাত্র পাশ্চাত্য জগৎ আজ এই পরীক্ষায় নিশ্চয় পাশ্চাত্য জগতের অন্তত কিছু অংশে যদি মনুষ্যত্ব বোধ জাগ্রত হয় তবে ক্ষুদ্র সন্দেহ নেই যে ভারতের কোন অংশে দাঁড়িয়ে সে দলাদলি চালিয়ে যায়।

ছাত্র ও সরকার

সাম্প্রতিক ঘটনা উপলক্ষ্য করে পাটনায় ছাত্র ও পুলিশ-দলের মধ্যে যে সংঘর্ষ হোলো সেটা কম ক্ষোভের কথা নয়। আরো লক্ষ্যণীয় এই যে ছাত্রদের এই বিক্ষোভ শুধু পাটনা শহরেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, বিহারের আরো নানাস্থানে এটা ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সংঘর্ষ এখন বিচার বিভাগের তত্ত্বাবধীন, সুতরাং এ সম্পর্কে এখন কোন মন্তব্য করার সময় আসে নি। তবে সাধারণভাবে একথা বলা যেতে পারে যে, ছাত্রদল ও বিহার সরকার দুই তরফ থেকেই এমন অসহিষ্ণুতার প্রমাণ পাওয়া গেল যার দ্বারা আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে শ্রীনেহরুর শক্তি বৃদ্ধি পাবে না এবং কাজে কাজেই ভারতের মাথা নীচু হবে। আরো ক্ষোভের কথা এই যে, গোয়ায় যখন ব্যাপক সত্যাগ্রহের আয়োজন চলছে যার ফলে যে কোন মুহূর্তে সাংঘাতিক কিছু ঘটতে পারে, এমনকি আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা বিরাট তোলপাড় হতে পারে, ঠিক সেই সময় বিহারে এই ঘটনা। ঘটনার কারণ যাই হোক, যত গুরুতর হোক, ছাত্রনেতা বা বিহারের পুলিশ কর্তৃপক্ষ—কারোই যে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে কোন জিনিষ বিচার করে দেখার শক্তি নেই, সেটাই প্রমাণিত হোলো এই ব্যাপারে। এ প্রমাণ জাতির পক্ষে গর্বের কথা নয়।

প্রেস লিমিটেড ৩নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত
'মন্দিরা' কার্যালয় ৩নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত

UNIVERSITY

মন্দিরা

অষ্টাদশ বর্ষ ভাদ্র—১৩৬২ পঞ্চম সংখ্যা

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বর্ষাকাল। ধারাবর্ষ দুর্দ্দিন; রাত্রি হইতে যে বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে, প্রভাতেও তাহার বেগ নিবৃত্ত হয় নাই। আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন। পথ জলময়—পথে পথিকের সংখ্যা অতি অল্প। এই অবস্থায় কলিকাতার উপকণ্ঠে—ভবানীপুরে একখানি জীর্ণ গৃহে এক তরুণ চিন্তায়—দুশ্চিন্তায় মগ্ন। ঘরে চাউল নাই—অর্থও নাই। থালা বা অন্য কোন তৈজস বিক্রয় করিয়া বা বন্ধুক দিয়া যে পয়সা পাওয়া যাইবে, তাহাতে চাউল কিনিয়া আনিলে, তবে ভাত রন্ধন করা হইবে। বাড়ীতে লোকের সংখ্যা দরিদ্রের পক্ষে নগণ্য নহে—তরুণ স্বয়ং, তাঁহার মাতা, ভ্রাতা ও পত্নী। বাড়ীর বাহির হইবার উপায়ও নাই; কারণ, ছত্রের অভাব। বিধাতার একি বিধান? অদৃষ্টের একি উপহাস?

এই সময় সেই বৃষ্টির মধ্যে গৃহদ্বারে দুই জন লোকের আবির্ভাব হইল—এক জন কোন জমীদারের কর্ম্মচারী, আর এক জন তাঁহার সহচর। ঘরে প্রবেশ করিয়া আগন্তুকদিগের মধ্যে যিনি প্রবীণ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাড়ীতে আছেন কি? তরুণই হরিশচন্দ্র জানিতে পারিয়া তিনি "খেরো" জড়ান পুলিন্দা হইতে একখানি দলিল বাহির করিয়া বলিলেন, সেখানির ইংরেজী অনুবাদ করিয়া দিতে হইবে—জরুরী কাজ, বিলম্ব করিলে হইবে না। শুনিয়া আগ্রহে হরিশচন্দ্র পারিশ্রমিক সম্বন্ধে কোন কথাও না বলিয়া কাগজ কলম লইয়া দলিলখানি অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। কাজ শেষ করিয়া তিনি যখন মূল দলিল ও তাহার ইংরেজী অনুবাদ আগন্তুককে দিলেন তখন আগন্তুক কোমরে জড়ান "সেঁজিয়া" লইয়া তাহা হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া হরিশচন্দ্রকে দিলেন। হরিশচন্দ্র তাহা ভগবানের দয়া বলিয়া গ্রহণ করিলেন। পাটোয়ারী বুদ্ধিসম্পন্ন চতুর জমীদারের কর্ম্মচারী সস্তায় কাজ সারিয়াছেন বুঝিয়া উৎফুল্ল চিত্তে বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলেন। তখন বৃষ্টির বেগ কিছু কমিয়াছে। আগন্তুক বিদায় লইতে না লইতে হরিশচন্দ্র উপার্জ্জিত টাকা দুইটি লইয়া জননীর নিকট হইতে পাত্র লইয়া ভিজিতে ভিজিতে চাউল আনিবার জন্য দোকান অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই অতর্কিত উপার্জ্জনে সেদিনের মত সেই দরিদ্র পরিবারের অন্ন জুটিল। দরিদ্র পরিবারের অন্নাভাব স্থায়ী ছিল—যশোদার দড়ীর দুই মুখ কখন মিলিত না।

এই দরিদ্র তরুণই আপনার চেষ্টায় সব বাধা অতিক্রম করিয়া যে যশ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা অনায়াসলভ্য নহে—সাধনাসাপেক্ষ। তিনি দরিদ্রের আশ্রয়, উৎপীড়িতের উদ্ধারকর্ত্তা, অত্যাচারীর ভীতির কারণ, সমাজে সম্মানিত—এ দেশে প্রথম প্রসিদ্ধ সাংবাদিক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি যখন মৃত্যু-শয্যায় তখন মধুসূদন দত্ত বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন—হরিশের মৃত্যু দেশের পক্ষে বিশেষ ক্ষতির কারণ হইবে; এ সময়ে স্বাধীন চিন্তার পক্ষ সমর্থন করিতে তাঁহার মত শক্তিশালী আর কেহই নাই। অথচ তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রগণের দ্বারা দেশে স্বাধীন চিন্তার প্রসার বর্দ্ধিত হইয়াছে। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি একক কিপ্তপ্রায় ইংরেজ সমাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ধৈর্য্যের জন্য—ন্যায়ের জন্য যে উপদেশ দিয়াছিলেন, বড়লাট লর্ড ক্যানিং তাহা সাদরে গ্রহণ করায় চারিদিকে লেলিহান শিখা বিস্তারকারী অত্যাচার নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল—তিনি শাসকদিগকে কর্ত্তব্য বুঝাইয়া সংযত করিয়াছিলেন। তাহার পরে প্রজার দুর্দ্দশায় বিচলিত হইয়া তিনি অত্যাচারী নীলকরদিগের অত্যাচার-বিষবৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করিবার দুষ্কর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া অসাধারণ সাফল্য লাভ করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন—ন্যায়ের জয় অবশ্যম্ভাবী—সবলের অত্যাচার কখন স্থায়ী হয় না। নীলকরদিগের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার সহিত সংগ্রাম করিয়া ক্ষতবিক্ষত বিজয়ী সেনাপতির মত যখন তিনি মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে—পরার্থে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া শেষে জীবনও দান করেন তখন, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত শোকোচ্ছ্বাস লক্ষিত হইয়াছিল—বাংলার পল্লীপ্রান্তর মুখরিত করিয়া যেমন "দীরাজের" গান শ্রুত হইত—

"নীল বাঁদরে সোণার বাংলা করলে এ বার ছারেখার;
অসময়ে হরিশ ম'ল লঙ-এর হ'ল কারাগার"

তেমনই শোক সভায় সমবেত হইয়া বহু বাঙ্গালী ও ইংরেজ তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছিলেন—সুদূর বোম্বাই সহরে তাঁহার গুণমুগ্ধ এক জন শিক্ষিত পার্শী বহু যত্নে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন—কারণ, তিনি শিক্ষিত ভারতীয়ের আদর্শ বলিয়া বিবেচিত হইতেন।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল (বৈশাখ) মাসে কলিকাতার উপকণ্ঠে ভবানীপুরে মাতুলগৃহে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রামধন মুখোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ কুলীন বংশীয় ছিলেন। কুল লক্ষণ :—

আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্॥

অর্থাৎ কৌলীন্য গুণজ—পূর্ব্বোক্ত নববিধ গুণ না থাকিলে কেহ কুলীন হইতে পারেন না। কিন্তু বাঙ্গালায় বল্লাল সেনের সৃষ্ট নিয়মে কৌলীন্য বংশজ হইয়া পড়ে—কুলীনের পুত্র কুলীন হইবেন। বহু সামাজিক প্রথার মত এই প্রথাও অপব্যবহারে কদাচারে পরিণত হয়। কুলীনরা কৌলীন্য হেতু বহু বিবাহ করিতেন এবং স্ত্রীপুত্রাদির ভার শ্বশুর-পরিবারকে গ্রহণ করিতে হইত। রামধনের তিন পত্নী ছিলেন—তাঁহাদিগের মধ্যে কল্যাণী দেবী হারানচন্দ্র ও হরিশচন্দ্র দুই পুত্রের জননী। হরিশচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা মাতুল-পরিবারেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

পাঁচ বৎসর বয়সে বালক হরিশচন্দ্র স্থানীয় পাঠশালায় বাঙ্গালায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া সাত বৎসর বয়সে ইংরেজী অক্ষর পরিচয় করিয়া বিনাবেতনে শিক্ষার্থী-রূপে স্থানীয় ইউনিয়ন স্কুলে প্রবেশ করেন। কিন্তু সংসার প্রতিপালনের জন্য অর্থার্জ্জনের প্রয়োজনে তাঁহাকে চৌদ্দ বৎসর বয়সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া অর্থার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হয়।

বিদ্যালয়ে হরিশচন্দ্রের ছাত্র জীবনের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কেবল শুনা যায়, তিনি যখন বিদ্যালয়ের ছাত্র তখন একদিন একটি গোরা সৈনিক উদ্ধত ব্যবহার করিলে তিনি সতীর্থদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তাহাকে এমনভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন যে, তাহাকে পালাইয়া অব্যাহতি লাভ করিতে হয়। মনুমক্ষিকা ক্ষুদ্র হইলেও

তাহারা যখন দলবদ্ধ হইয়া আক্রমণ করে, তখন হস্তীকেও পলায়ন করিতে বাধ্য করিতে পারে।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনা যদি সত্য হয়, তবে তাহাতে প্রতিপন্ন হয়—"The child is father of the Man." তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনের একটি ঘটনা রাজনারায়ণ বসু বিবৃত করিয়াছেন। এক বার তিনি কোন বাবুর সহিত ট্রেনে যে কামরায় যাত্রী ছিলেন, তাহাতে এক জন ইংরেজ সৈনিক কর্ম্মচারী তাঁহাদিগের সহযাত্রী ছিলেন। কর্ম্মচারীটি তাঁহার পার্শ্বে ও বন্ধু সম্মুখের বেঞ্চে বসিয়াছিলেন। কর্ম্মচারীটি এমনভাবে পদদ্বয় প্রসারিত করিয়াছিলেন যে, তাহা হরিশচন্দ্রের বন্ধুর গাত্রপার্শ্বে আসিয়াছিল। হরিশচন্দ্র বন্ধুর সহিত আসন পরিবর্ত্তিত করিয়া আপনার পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া কর্ম্মচারীটির দেহপার্শ্বে রক্ষা করিলেন। "আর কখন দুই পকেটে দুইটি পিস্তল না লইয়া আমি রেলে চড়িব না"—বলিয়া কর্ম্মচারীটি পরবর্ত্তী ষ্টেশনে সে কক্ষ ত্যাগ করেন।

এ ব্যবহার অত্যাচারের ও অনাচারের দমনকারীর উপযুক্ত। এই হরিশচন্দ্রই অকুতোভয়ে বড় লাট লর্ড ডালহৌসীর সামন্ত রাজ্য আত্মসাৎ করার নীতির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং ক্ষমতাদর্পিত নীলকর বিষধরের কণ্ঠ সবলে পিষ্ট করিয়া তাহার বিষদন্ত উৎপাটিত করিয়াছিলেন।

বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া বালক হরিশচন্দ্র কখন কাহারও পত্র লিখিয়া দিয়া, কখন কাহারও বিল লিখিয়া দিয়া দুই চারি আনা উপার্জ্জন করিতেন। এইরূপ কিছু দিন বেকার অবস্থায় দুঃখ ভোগ করিয়া তিনি যখন কোন বিদেশীর নিলাম ঘরে বিল লেখকের চাকরী লাভ করেন, তখন তাঁহার বয়স প্রায় চৌদ্দ বৎসর—মাসিক বেতন দশ টাকা। কিছুদিন সেই কাজ করিবার পরে তিনি বেতন বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিলে যখন তাহা প্রত্যাখ্যাত হয়, তখন তিনি, আত্মসম্মান আহত হইল মনে করিয়া, সে চাকরী ত্যাগ করেন।

কয় বৎসর অভাবে অতিবাহিত হয়—কষ্টের অন্ত ছিল না, কিন্তু তাহাতেও ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সামরিক হিসাব বিভাগে মাসিক ২৫ টাকা বেতনের একটি চাকরী খালি হয়। সন্ধান পাইয়া হরিশচন্দ্র প্রার্থী হইয়া পরীক্ষা দিয়া চাকরী লাভ করেন। তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই বিভাগে চাকরী করিয়াছিলেন—বেতন ২৫ টাকা হইলেও তাঁহার মৃত্যুকালে মাসিক ৪ শত টাকা হয়। সেই অর্থেই তিনি তাঁহার দেশবাসীর হিতার্থ সংগ্রাম করেন। তিনি যে দুই জন য়ুরোপীয়ের অধীনে চাকরী করিতেন, তাঁহারা তাঁহার দক্ষতার আদর করিয়া তাঁহাকে পুস্তকাদি দিয়া সাহায্য ও তাঁহার সাংবাদিক কার্য্যে তাঁহাকে উৎসাহিত করিতেন। তখন সরকারের ভারতীয় কর্ম্মচারীদিগের পক্ষে সাংবাদিকের কার্য্যে বা রাজনীতির ব্যাপারে যোগদান নিষিদ্ধ ছিল না। সে নিষেধ প্রথম ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন লর্ড নর্থব্রুক এ দেশে বড়লাট, সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল বাঙ্গালার ছোট লাট। তবে তাহার পরেও ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীরা সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন—কিন্তু প্রকাশ্যভাবে নহে।

বিদ্যালয়ে হরিশচন্দ্রের অধিক শিক্ষালাভ হয় নাই। কিন্তু বিদ্যালয় ত্যাগের পর হইতে—নানা অসুবিধার মধ্যেও তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন নাই, জ্ঞানার্জ্জনের আগ্রহ শিথিল হইতে দেন নাই। যখন তাঁহার মাসিক বেতন দশ টাকা, তখনও তিনি কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া পুস্তক কিনিয়া পড়িতেন। সামরিক বিভাগে কেরাণী হইয়াই তিনি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীতে নিয়মিত ভাবে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। তথায় তিনি প্রতিদিন দুই বা তিন ঘণ্টাকাল পুস্তক, সংবাদপত্র প্রভৃতি পাঠ করিতেন এবং পাদরী ডফের বক্তৃতা শুনিবার জন্য কলিকাতায় আসিতেন। তিনি ৪ মাসের মধ্যে 'এডিনবরা রিভিউ' পত্রের ৭৪ খণ্ড তিন বা চারিবার অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি ইংরেজী ভাষায় রচনা-কৌশল আয়ত্ত করেন এবং ভারতীয় ও ইংলণ্ডের ইতিহাসে ও রাজনীতিতে ব্যুৎপত্তি

লাভ করেন। দর্শন শাস্ত্রেও তাঁহার জ্ঞান যে গভীর ছিল, তাহা ভবানীপুর ব্রাহ্ম সমাজে তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতায় প্রতিপন্ন হয়। আবার তিনি ভবানীপুরে শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রমুখ আইন ব্যবসায়ীদিগের সহিত আলোচনাকালে আইনগত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সদস্য হইয়াছিলেন, তখন প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ব্যারিষ্টার মর্টি ও প্রমুখ বিখ্যাত আইনজ্ঞদিগের সহিত আলোচনা করিতে সমর্থ হইবার জন্য আইনে দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এইরূপে তিনি সাংবাদিকের কার্য্যের জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

হরিশ্চন্দ্র প্রথমে কালীপ্রসাদ ঘোষের 'হিন্দু ইন্‌টেলিজেন্সার' পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করেন এবং সময় সময় ইংরেজ-পরিচালিত 'ইংলিশম্যান' পত্রেও তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইত। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের সম্পাদকরূপেই তিনি খ্যাতিলাভ করেন ও দেশবাসীর অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন। তিনি সেই পত্রের সম্পাদক হইবার পূর্ব্বেই সে কাজের জন্য আপনাকে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তখনই তাঁহার রচনা-দক্ষতা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ভারতীয়দিগের পক্ষ হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ছাড়ের সময় বৃদ্ধির বিরুদ্ধে যে আবেদন ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা রচনার ভার তিনিই পাইয়াছিলেন।

'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের প্রথম অধিকারী মধুসূদন রায় বলিয়াছিলেন—প্রতি বৃহস্পতিবারে রাত্রিকালে হরিশ্চন্দ্র পত্রের কার্য্যালয়ে আসিয়া একদিনে অবিশ্রান্ত ভাবে সব প্রবন্ধ, সংবাদ, বিদেশী সংবাদের সারসংগ্রহ—সব লিখিয়া শেষ করিতেন। ইহা অসাধারণতার পরিচায়ক।

যখন কলিকাতায় কালাকার ষ্ট্রীটে একটি মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারী মধুসূদন রায় একখানি ইংরেজি (সাপ্তাহিক) পত্র প্রকাশে আগ্রহশীল হইয়া শ্রীনাথ, গিরিশচন্দ্র ও ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ ভ্রাতৃত্রয়ের সম্পাদনায় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্র প্রচারিত করেন। হরিশ্চন্দ্র তখন সামরিক বিভাগের হিসাব দপ্তরে মাসিক এক শত টাকা বেতনে চাকরী করেন। তিনি সময় সময় পত্র সম্পাদনকার্য্যে সম্পাদকদিগকে সাহায্য করিতেন। ঘোষ ভ্রাতৃত্রয় ক্রমে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'র সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন। তখন হরিশ্চন্দ্রকেই সম্পাদকের কার্য্যভার গ্রহণ করিতে হয়।

তখনও এ দেশে ইংরেজী শিক্ষার উল্লেখযোগ্য বিস্তার ঘটে নাই; সুতরাং ইংরেজী পত্রের পাঠকসংখ্যা নগণ্য ছিল। যে সকল বাঙ্গালী ইংরেজী জানিতেন, তাঁহারাও ইংরেজ-পরিচালিত সংবাদপত্রেরই আদর করিতেন—ভারতীয়-পরিচালিত ইংরেজী পত্র যে আদরের যোগ্য হইতে পারে, তাঁহাদিগের সে বিশ্বাসও ছিল না। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের কার্য্যালয় বড়বাজারের একটি সামান্য গলিতে অবস্থিত থাকাও তাহার অনাদরের অন্যতম কারণ ছিল।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন অসুস্থ হইয়া স্বাস্থ্য লাভের আশায় "পশ্চিমে" গমন করেন। তাঁহার ছাপাখানাটি বিক্রীত হয়। তখন 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ভবানীপুরে "সত্যজ্ঞান সঞ্চারিণী সভার" ছাপাখানায় মুদ্রিত হইতে থাকে। সেই সময়ে হরিশ্চন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট প্রেস' নাম দিয়া ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাহাতেই পত্রখানি মুদ্রিত হইতে থাকে। হরিশ্চন্দ্রের ভ্রাতা হারানচন্দ্র ছাপাখানার ও সংবাদপত্রের অধ্যক্ষ হইয়া কাজ করিতে থাকেন। তখন পত্রের মূল্য বার্ষিক দশ টাকা; কিন্তু তাহার গ্রাহকসংখ্যা শতাধিক নহে। পত্রখানির ছাপা প্রভৃতি বাহ্যিক রূপও আকর্ষক ছিল না। পত্রের কার্য্যালয় সদর দেওয়ানী আদালতের নিকটে (ভবানীপুরে) স্থানান্তরিত হওয়ায় উহার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় এবং ভবানীপুরের ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীরাও আপনাদিগের পত্রীয় পত্র বলিয়া তাহার আদর করিতে আরম্ভ করেন। তখন কলিকাতায় যেমন 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার' ব্যতীত আর কোন ভারতীয়-পরিচালিত ইংরেজী সংবাদপত্র ছিল না,

তেমনই মাদ্রাজে 'মাদ্রাজ রাইজিং সান' ও বোম্বাইএ 'হিন্দু হার্বিঞ্জার' ছিল। হরিশচন্দ্র ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিশেষ দক্ষতা সহকারে ও প্রভূত আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়া পত্র পরিচালিত করেন। পরবৎসর যখন বিধবা-বিবাহ আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন হরিশচন্দ্র ঐ আন্দোলন সমর্থন করেন। তাহাতে তিনি রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের অপ্রীতিভাজন হইলেও স্বীয় মতেই দৃঢ় ছিলেন। তিনি কখন মত বিক্রয় করিতেন না এবং আর্থিক দুরবস্থাকালেও বন্ধুবান্ধবের সাহায্য দানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতেন। ইহা হরিশচন্দ্রের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

তাঁহার বন্ধু ধনী প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ 'হিন্দু পেট্রিয়টের' উন্নতি সাধনের জন্য অর্থ-সাহায্য দিতে চাহিলে হরিশচন্দ্র প্রথমে তাহাতে অসম্মত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে যখন পত্রের ছাপা শোচনীয় হইতে থাকে, তখন তাঁহাদিগের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সাহায্য গ্রহণে সম্মত হইয়াছিলেন।

এ দিকে 'হিন্দু পেট্রিয়টে' প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতে লাগিল। তিনি হিন্দু সভ্যতায় ও য়ুরোপীয় সভ্যতায় প্রভেদ দেখাইয়া হিন্দু সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিলেন, য়ুরোপীয় সাংবাদিকরা তাহার প্রতিবাদে তাঁহার উপস্থাপিত যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিলেন না। পাণ্ডিত্যে ও দার্শনিক বিচার-বুদ্ধিতে হরিশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইল। তিনি ইংলণ্ডের শ্রমিকদিগের কর্ম্মবিরতি বা ষ্ট্রাইকের সহিত এ দেশের ধর্ম্মঘটের প্রভেদ বুঝাইয়া দিলেন। ধর্ম্মঘটের উৎপত্তি হয়ত অনেকে অবগত নহেন। বাঙ্গালা ইহার উদ্ভবস্থান। মহারাজা নন্দকুমার যখন প্রবল-প্রতাপ তখন তিনি প্রতি বৎসর দুর্গোৎসবের সময় স্বগ্রাম ভদ্রপুরে যাইয়া সমাজের লোকদিগকে বস্ত্র বিতরণ করিতেন। সে বস্ত্র স্থানীয় তন্তুবায়রা কয় মাস ধরিয়া বয়ন করিত। কয় জন তোষামোদকারী নন্দকুমারকে বলেন, তাঁহার মত ব্যক্তির পক্ষে লোককে শান্তিপুরের ভাল কাপড় দেওয়াই তাঁহার মর্য্যাদার উপযুক্ত। নন্দকুমার সেই প্রস্তাবই গ্রহণ করেন। তাহা শুনিয়া স্থানীয় তন্তুবায়গণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া একটি ঘট গঙ্গাজলে পূর্ণ করিয়া তাহা স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করে, কাপড় বুনিবার নির্দ্দেশ না পাইলে তাহারা নন্দকুমারের গৃহে পূজায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবে না এবং বাঙ্গালায় সর্ব্বত্র তাহাদিগের স্বব্যবসায়ীদিগকে তাঁহার জন্য বস্ত্র বয়নে বিরত থাকিতে বলিবে। তাহারা সেই ঘট গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে মাথায় বহন করিয়া লইয়া গেল—সর্ব্বত্র তন্তুবায়রা তাহাদিগের সঙ্কল্পের সমর্থন করিয়া সহানুভূতির পরিচয় দিল। শান্তিপুরেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হইল না। কাজেই নন্দকুমারের কর্ম্মচারীরা যখন কাপড়ের জন্য দাদন দিতে টাকা লইয়া শান্তিপুরে গমন করিলেন, তখন শান্তিপুরের তন্তুবায়রা দাদন লইতে অস্বীকার করিল —সমাজকে তাহারা অবজ্ঞা করিতে পারে না। নন্দকুমার বুঝিলেন, সমাজের শক্তির নিকট নবাবের চালকের প্রভাব ও পরাভব স্বীকার করে। যিনি মুসলমান মীরজাফরকে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পানে প্ররোচিত করিয়াছিলেন, তিনি ভদ্রপুর অঞ্চলের তন্তুবায়দিগের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিয়া—কিছু অর্থদণ্ড দিয়া তাহাদিগকেই বস্ত্র বয়ন করিতে দিলেন। সে ব্যাপার বিনা উপদ্রবে শেষ হইল।

যুক্তির অকাট্যতাহেতু 'হিন্দু পেট্রিয়টের' প্রবন্ধ মনোজ্ঞ হইত, এবং সকলেই সে সাফল্যের সমাদর করিতেন।

হরিশচন্দ্র যাহা প্রয়োজন ও সত্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন, তাহা প্রকাশ করিতে দ্বিধা করিতেন না। সুপ্রিম কোর্টের যে সকল বিচারক বড়লাট প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে সেই "দৌর্ব্বল্যের জন্য "courtier judge" বলিয়া নিন্দা করিতেন।

লর্ড ডালহৌসীর মত যোগ্য বড়লাট এ দেশে কম আসিয়াছেন। তিনি নানাদিকে নানারূপ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ সম্বন্ধে অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন ছিলেন। ভারতে বৃটিশের

প্রত্যক্ষ অধিকার বিস্তৃত করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। সেই জন্য তিনি নানা কারণ দর্শাইয়া বহু সামন্ত রাজ্য বৃটিশ শাসনাধীন করিয়াছিলেন। ফলে দেশের এক সম্প্রদায়ের মধ্যে অসন্তোষের উদ্ভব অনিবার্য হয়। তিনি রাজ্য বাজেয়াপ্ত করিবার জন্য যে সকল কারণ দেখাইতেন সে সকল অনেক স্থলেই বিচার সহ নহে—ছল মাত্র। সরকারের চাকরীরা হরিশচন্দ্র সাংবাদিকের কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইয়া বড়লাটের নীতির তীব্র নিন্দা করিতে থাকেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' যে নির্ভীকতার পরিচয় দিত, তাহা অসাধারণ। তিনি যে বড়লাটের নীতির প্রতিবাদ করিতে কিরূপ কঠোরতা অবলম্বন করিতে পারিতেন, তাহা তাঁহার কানিংহাম নামক ঐতিহাসিকের প্রতি ব্যবহারে বুঝা যায়। সরকারী চাকরীরা কানিংহাম শিখদিগের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে সমস্ত মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া তিনি কোন কোন স্থানে ইংরেজের নিন্দা করিয়াছিলেন। সেই জন্য সত্য প্রকাশের "অপরাধে"—তিনি লর্ড ডালহৌসীর বিরাগভাজন হয়েন—বড়লাট তাঁহাকে অপদস্থ করেন ও তাঁহার পুস্তকের যতগুলি পাওয়া গিয়াছিল, নষ্ট করিবার নির্দ্দেশ দেন। কিন্তু ইংরেজ সরকারের চাকরীরা হইয়াও হরিশচন্দ্র বড়লাটের অবলম্বিত নীতির প্রতিবাদ করিতে ভয় পান নাই। সাংবাদিকের কর্ত্তব্য সম্পাদনে হরিশচন্দ্র কাহারও তুষ্টি বিধানের জন্য বা ভয়ে অনবহিত হইতে পারিতেন না।

দেশে তখন নানা কারণে অসন্তোষ-বিস্তার লাভ করিয়াছিল। অবশ্য লর্ড ডালহৌসীর অবলম্বিত নীতি সে সকলের অন্যতম। সেই অসন্তোষ সিপাহী বিদ্রোহে আগ্নেয় গিরির অগ্নি বিকাশের মত সহসা আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তাহার আরম্ভ। সিপাহীদিগের বিদ্রোহের জন্য ইংরেজের মিথ্যা উক্তি প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। বন্দুকে যে টোটা দন্তে কাটিতে হইত তাহা যাহাতে সিক্ত করা হইত, তাহা গরু ও শূকরের চর্বি। তাহাতে সিক্ত টোটা দন্তে কাটা হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম্মবিরোধী। সিপাহীরা সে কথা বলিলে ইংরেজ সামরিক কর্ম্মচারীরা অনায়াসে মিথ্যা কথা বলেন, ঐ চর্বি গরুর ও শূকরের নহে। ইহাতে সিপাহীরা ইংরেজের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহানুভব না করিয়া পারিল না। দেশের যে সকল লোক অন্যান্য কারণে ইংরেজের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারা সিপাহীদিগের অসন্তোষের অগ্নিতে ইন্ধন যোগ করিতে লাগিলেন। আর মুসলমানদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক ইংরেজকে বিতাড়িত করিয়া ভারতে আবার মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা দিল্লীর নামশেষ বাদশাহ বাহাদুর সাহকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টায় বহু মুসলমান রাজ্যের সাহায্য লাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহার শিখা প্রবল বেগে চারিদিকে ব্যাপ্তিলাভ করিল।

এইরূপ ক্ষেত্রে অত্যাচার ও অবিচার চলিয়াই থাকে। তাহাই হইল। কোন কোন স্থলে বিদ্রোহীরা নিষ্ঠুরভাবে ইংরেজ নরনারী হত্যাও করিল। কিন্তু নিষ্ঠুরতা, অত্যাচার ও অনাচার এক পক্ষেই সীমাবদ্ধ রহিল না—ইংরেজরাও তাহাই করিতে লাগিল। তখন লর্ড ক্যানিং ভারতে বড়লাট। তিনি অধিকাংশ ইংরেজের মত বিপদে ধৈর্য্যহারা ও বিকৃতবুদ্ধি না হইয়া স্থিরভাবে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে প্রয়াসী হইলেন। সেজন্য তিনি যেমন ইংরেজ সম্প্রদায়ের নিন্দাভাজন হইলেন, তেমনই হরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলেন। কলিকাতায়ও ইংরেজরা ভয়ে এমন আত্মহারা হইয়াছিলেন যে, মহিলারা গৃহ ত্যাগ করিয়া জাহাজে আশ্রয় লইয়াছিলেন—পুরুষরা অস্ত্রসজ্জিত না হইয়া পথে বাহির হইতেন না।

হরিশচন্দ্র একদিকে ভারতীয়দিগের অত্যাচারের নিন্দা করিতে লাগিলেন, সরকার সংবাদপত্রের মত-প্রকাশ-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিলে সে ব্যবস্থা ইংরেজ ও ভারতীয় সকলের পক্ষে প্রযোজ্য বলিয়া তাহাতে আপত্তি করিলেন না—অপর দিকে ভয়ে হতবুদ্ধি ইংরেজদিগকে ব্যঙ্গ করিয়া ভুল বুঝিতে সাহায্য করিতে লাগিলেন ও

সরকারকে ধৈর্যসহকারে ন্যায় নীতিতে অবিচলিত থাকিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তিনি শাসক ও শাসিত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যস্থরূপে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করিতে লাগিলেন। ইংরেজরা যখন সিপাহী প্রভৃতির নিষ্ঠুরতার বিবরণ বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিয়া প্রতিহিংসা বৃত্তির পরিচয় দিতেছিলেন—প্রতিশোধ লইবার জন্য সরকারকে উত্তেজিত করিতেছিলেন, তখন হরিশচন্দ্র লিখিলেন—

"এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, বিদ্রোহীরা যখন পরাভূত হইতে আরম্ভ করে, তখন ইংরেজের দ্বারা প্রতিহিংসা গ্রহণ অতিরিক্ত মাত্রায় আরম্ভ হয় এবং যেভাবে প্রতিশোধ গৃহীত হয়, তাহা যেকোন সভ্য সরকারের কর্মচারীদিগের পক্ষে কলঙ্কজনক। এলাহাবাদ সহরেই ৬ই জুন হইতে ১৬ই জুলাই—এই সময়ের মধ্যে প্রায় আট শত লোককে ফাঁসি দেওয়া হয়। এক জন সিখ নিহত হইলে—সিখদিগকে সহরবাসীর উপর প্রতিশোধ লইতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। সেনাপতি নীল যখন বারাণসী হইতে এলাহাবাদ পর্য্যন্ত অভিযান করেন, তখন যে সকল গ্রামবাসীকে হত্যা করা হয়, তাহারা ইংরেজের বিরোধিতা করিতে আসে নাই—অর্থাৎ তাহারা নিরপরাধ। সৈনিকরা আর যে সব অত্যাচার করিয়াছে, সে সকলের আলোচনা আর করিব না। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, তাহাদিগকে যদি শৃংখলা রক্ষা করিতে বাধ্য করা হইত, তাহা হইলে ঐরূপ বীভৎস অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতে পারিত না। নদীর উভয় কূলে মাইলের পর মাইল গ্রামগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হইয়াছিল। এ কথা সত্য যে, যাহাদিগকে এইরূপে দণ্ডিত করা হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ কঠোর দণ্ড লাভের উপযুক্ত। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, যে ইংরেজের আইনের নীতি—দশ জন অপরাধী অব্যাহতি লাভ করে সে-ও ভাল, তথাপি যেন এক জন নিরপরাধ দণ্ডিত না হয়—পদদলিত করিয়া হত্যাবিলাসী-দিগের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা হইয়াছিল। সেনাপতি নীলের নিষ্ঠুরতার জন্য বারাণসীতে আবার আক্রমণ হয়। ইংরেজ রাজকর্মচারীদিগের ঐরূপ নিষ্ঠুরতার জন্যই গ্রামের লোক অসন্তুষ্ট হয় ও আবার বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগ দেয়। বড়লাট স্থানীয় রাজকর্মচারীদিগকে সতর্ক করিয়া দিলে ভাল হয়।"

হরিশচন্দ্র ইংরেজ রাজকর্মচারীদিগের যে অত্যাচারের বিবরণ দিয়াছিলেন, আমরা বহু দিন পরেও—অসহযোগ আন্দোলনকালে পাঞ্জাবে জালিয়ানওয়ালাবাগের পৈশাচিক ঘটনার কেন্দ্রস্থানে তাহার পরিচয় পাইয়াছি। সেই ভাবের পরিচয় পাইয়া সভ্য জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছিল এবং তৎকালীন ভারত-সচিবও মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সে ব্যবহার সভ্য সমাজের পক্ষে কলঙ্কজনক।

যখন 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া', 'ইংলিশম্যান', 'হরকরা', 'মফঃ গেজেট'—ইংরেজ পরিচালিত অধিকাংশ সংবাদপত্র নিষ্ঠুরভাবে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য আকুল, তখন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' একক অত্যাচার-সমুদ্রের তরঙ্গমধ্যে দৃঢ় শৈলের মত স্থির ও ধীর থাকিয়া সভ্য সরকারকে কর্তব্য-বুদ্ধির সন্ধান দিয়াছিলেন। বড়লাট লর্ড ক্যানিং তাঁহার নিকট আপনার উদার নীতির সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন। যে দিন 'হিন্দু পেট্রিয়ট' প্রকাশিত হইবে, সেদিন লাটভবন হইতে অশ্বারোহী ভৃত্য যাইয়া হরিশচন্দ্রের গৃহদ্বারে অপেক্ষা করিত—প্রকাশমাত্র পত্র লইয়া যাইতে হইবে।

মনে রাখিতে হইবে, তখনও দেশীয় সংবাদপত্রের শৈশব অতিক্রান্ত হয় নাই—তখনও দেশীয় সংবাদপত্র অবজ্ঞাত। সেই সময় হরিশচন্দ্র তাঁহার পত্রে দেশ-বাসীর কল্যাণকল্পে যে বীরবিক্রমে তাহাদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা সংবাদপত্রের ইতিহাসে স্মরণীয়। প্রভাবশালী শাসক সম্প্রদায়ের পাশবিক হিংসা ব্যর্থ করিবার জন্য এই বাঙ্গালী সাংবাদিকের চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই। তিনি যে নীতির সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক ও প্রশংসনীয়।

এখনও জাতীয়তার লইয়া কেহ ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস রচনা করেন নাই। যদি কখন

সেভাবে ইতিহাস লিখিত হয়, তবে সেই বিক্ষোভ-কালীন অত্যাচারের অন্ধকারমধ্যে হরিশচন্দ্রের কীর্তি অরুণকিরণরঞ্জিত অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গের মত প্রতীয়মান হইবে—দিবালোকে বিকাশের অগ্রদূতরূপে দেখা দিবে। তখন তাঁহার নিকট দেশের লোকের ঋণের গুরুত্ব উপলব্ধ হইবে।

সিপাহীবিদ্রোহ নিবৃত্ত হইল। তাহা ভারতের ইতিহাসের রক্তে কলুষিত একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইংরেজ জয়ী হইল।

কিন্তু দুই বৎসর যাইতে না যাইতে বাঙ্গালায় নূতন বিপদ দেখা দিল। নীল প্রস্তুত করিয়া লাভবান হইবার আশায় বহু ইংরেজ ভারতের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, বিশেষ বাঙ্গালায় কুঠী করিয়াছিল। বাঙ্গালা (বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা) হইতে প্রতি বৎসর যে নীল রপ্তানী হইত, তাহার মূল্য প্রায় ৩ কোটি টাকা। খাস বাঙ্গালার কয়টি জিলায় উৎপন্ন নীলের হিসাব এইরূপ—

জিলা	মণ
রাজসাহী	৩,৫১২
মালদহ	২,৭৭৭
মুর্শিদাবাদ	৪,৯১২
নদীয়া	৮,০২০
যশোহর	৮,৯১৫
ফরিদপুর	১,৪৮৮

অতিরিক্ত লাভের জন্য নীলকররা প্রজার উপর অকথ্য অত্যাচার করিত। বিচারকরা তাহাদিগের স্বজাতীয়—ইংরেজ; পুলিস তাহাদিগের আজ্ঞাবহ। মফঃস্বলে তাহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারিত। তাহাদিগের অত্যাচারের বিবরণ দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নাটকে পাওয়া যায়।

প্রজাসাধারণের প্রতি অত্যাচার হরিশচন্দ্রকে বিচলিত করিল। তিনি প্রতিবিধান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে প্রজার পক্ষাবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন। ঘটনাস্থল সকল হইতে নানা লোক তাঁহাকে প্রবন্ধের উপকরণ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে মনোমোহন ঘোষ (পরে বিখ্যাত ব্যারিষ্টার), শিশিরকুমার ঘোষ (পরে 'অমৃত-বাজার পত্রিকা'র প্রবর্ত্তক ও সম্পাদক), দীনবন্ধু মিত্র ('নীলদর্পণের' গ্রন্থকার) রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (তখন নদীয়ার স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর), গিরিশচন্দ্র বসু (তখন কৃষ্ণনগরে পুলিস দারোগা)—এই কয়জনের নাম জানিতে পারা গিয়াছে।

প্রজারা—সকল শ্রেণীর বাঙ্গালী—সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল—হরিশচন্দ্র তাহাদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। প্রজা-দিগের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন দেখিয়া বাঙ্গালার ছোটলাট বিস্মিত ও বড়লাট ভীত হইলেন। বাঙ্গালার জনগণ ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যাহা করিল, তাহা পরবর্ত্তীকালে সত্যাগ্রহের প্রথম প্রবর্ত্তন ও আদর্শ।

প্রধানতঃ 'হিন্দু পেট্রিয়টের' প্রবন্ধের ফলে নীল সম্বন্ধে অনুসন্ধান জন্য যে কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার সভাপতির জিজ্ঞাসায় হরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

"আমি সমস্ত বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, বর্ত্তমানে যে ভাবে নীলের চাষ হয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে প্রজার অহিতকর। সকল বিষয়ে আমি বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি এবং সুযোগ পাইলেই আমার মত প্রকাশ করিয়াছি।"

সেই মত প্রকাশের ফলে ভারত সরকার আর ব্যাপারটি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই—তদন্তের জন্য কমিশন নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ের মত উপেক্ষা করা প্রয়োজন মনে করিয়া-ছিলেন। হরিশচন্দ্রের জয় হইয়াছিল—লেখনীর শক্তি যে তরবারীর শক্তিকে পরাভূত করিতে পারে, তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছিল—ভারতীয় সংবাদপত্রের শক্তি সকলে প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।

দারিদ্র্য-দুঃখের তিক্ততা স্বয়ং অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া হরিশচন্দ্র দরিদ্রের দুঃখে বিগলিত হইতেন। আর তিনি অত্যাচার অবিচার সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার সমগ্র সাংবাদিক জীবন অত্যাচার ও অনাচারের সহিত সংগ্রাম। লর্ড ডালহৌসীর মত দুর্দ্ধান্ত বড়লাটের নীতির প্রতিবাদ করিতে তিনি ভীত হন নাই। সিপাহী

বিদ্রোহের সময় তিনি প্রায় সমগ্র য়ুরোপীয় সম্প্রদায়ের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন - লর্ড ক্যানিংকে পূর্ণ সমর্থন করিয়াছিলেন—দেশের মূক জনসঙ্ঘের প্রতিনিধিরূপে রাজকর্মচারীদিগকে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। নীলকরদিগের অত্যাচার হইতে প্রজাসাধারণকে রক্ষা করিবার ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সত্যই বলিতে পারিতেন—আমি জনগণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, জনগণ আমাকে বিশ্বাস করে—যদি প্রয়োজন হয়, আমি তাহাদিগের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিব। তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। নীলকরদিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়—তিনি তাহাতে দুঃখিত হন নাই। মফঃস্বল হইতে প্রজারা আসিলে কলিকাতায় তাঁহার গৃহে আহার ও আশ্রয় পাইত। তিনি তাহাদিগের জন্য আবেদনাদি লিখিয়া দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চাকরীর কাজ ছিল, বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কাজ ছিল; সর্ব্বোপরি 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদন ছিল। কাজের আগ্রহে তিনি ভুলিয়া যাইতেন—মানুষের শক্তির সীমা আছে, মানুষের পক্ষে বিশ্রামও প্রয়োজন।

এদিকে সমৃদ্ধ, শক্তিশালী ও সমগ্র য়ুরোপীয় সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সমর্থিত নীলকররা তাঁহাকে দলিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। তিনি যেন সপ্তরথী কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত ও আক্রান্ত অভিমন্যুর মত সংগ্রাম করিতেছিলেন। ঘরের অর্থ এবং শারীরিক ও মানসিক শক্তি ব্যয় করিয়া—নিঃশেষ করিয়াও তিনি জয়ী হইবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্কল্পে অবিচলিত ছিলেন। একবার যখন সরকার তাঁহাকে একটি বড় চাকরী দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তখন তিনি সে প্রস্তাব অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন—তিনি ভারতীয় সাংবাদিকতার যে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা ত্যাগ করিয়া কোন সাম্রাজ্যেও মন্ত্রিত্ব করিতে যাইতে পারেন—ইহা কল্পনাতীত। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন মাত্র ৩৬ বৎসর বয়সে অতিশ্রমে হরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তিনি জানিতেন, তিনি বৃদ্ধা মাতাকে ও বিধবাকে নিঃস্ব রাখিয়া যাইতেছেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই দরিদ্র প্রজাদিগকে সর্ব্ববিধ সাহায্যে বঞ্চিত করিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেন, তাঁহার অর্থ নাই, কিন্তু যে সময় ও শ্রম তিনি তাহাদিগকে দিতে পারেন, তাহা দিতে তিনি তখন কুণ্ঠিত হইতেন না।

স্বাধীন দেশে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি অনেক কাজ করিতে পারিতেন—

"To mould a mighty state's decree
And shape the whispers of a throne."

কিন্তু পরাধীন দেশে তিনি জনগণের অধিকার অর্জ্জনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন—ভয় করেন নাই, তাই জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার ত্যাগে জনগণ অধিকার লাভ করিয়াছিল।

হরিশচন্দ্রের চেষ্টায় সরকার নীলকরদিগের অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই কমিশনে নীলকরদিগের অত্যাচার প্রতিপন্ন হয়। হরিশচন্দ্র স্বয়ং সেই কমিশনে সাক্ষ্য দিয়া অবস্থার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছিলেন।

জয় যখন তাহার করতলগত তখন তাঁহার জীবনান্ত হয়। তিনি এই স্বস্তি লইয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি যুদ্ধে জয়ী হইয়াছেন—নীলকরের অত্যাচারের অবসান হইবে—প্রজা তাহার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইল।

নীলকররা তাঁহার বিরুদ্ধে যে মামলা উপস্থাপিত করিয়াছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার জন্য ডিক্রী পাইয়া তাঁহার মাতার ও পত্নীর আশ্রয় গৃহটি বিক্রয় করাইবার হীন চেষ্টা করিলে উদার-হৃদয় কালীপ্রসন্ন সিংহ তাহাদিগের প্রাপ্য টাকা দিয়া অর্থের সদ্ব্যবহার, দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন ও মানসিক তৃপ্তিলাভ করেন।

যে দরিদ্র বালক অর্থাভাবে বাল্যকালেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, যে চাকরীর সন্ধানে অনেক কষ্টও ভোগ করিয়াছিল—সে আপনার সাধনার সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিল—ধনের জন্য নহে, ধন তিনি তুচ্ছ করিতেন—মনীষার ও উদারতার সম্মিলনে দৃঢ়তা ও ন্যায়নিষ্ঠার জন্য।

হরিশচন্দ্রের জীবন—দেশসেবার ও দেশবাসীর সেবার আদর্শ; তিনি যে সময় সে আদর্শ প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন সে কাজে আত্মনিয়োগ করিবার আগ্রহ সাধারণ ছিল না। তিনি ইচ্ছা করিলে ব্যবসায়ে বা ওকালতীতে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে সব পথ অবলম্বন না করিয়া সাংবাদিকতার পথে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া—দারিদ্র্য বরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ত্যাগ অসাধারণ। আর সেই জন্যই তিনি তাঁহার কার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন—জয়ী হইয়াছিলেন। তিনি আমাদিগের স্মরণীয় ও বরণীয়।

[৮]

সেদিন সারা রাত্রির মধ্যে যদি একটিবারও ঘুম এলো! কেমন একটা দারুণ অস্বস্তিতে সমস্তটা মন কেবলই বিমিয়ে উঠতে লাগ্‌লো। কল্পনার বাঁধ ভেঙে আজ এ কি বন্যা নেমে এলো জীবনে! মার অসুস্থতার জন্য গোড়া থেকেই সংসারের দিকে একটু বেশী নজর দিয়েছিলাম, দিয়েছিলাম অবশ্য বাবার মুখের দিকে তাকিয়েই; নইলে আমার মতো ছন্নছাড়াকে আমাদের সাংসারিক পরিবেশ এমন ক'রে কখনও পেতো না, পাবার সুযোগ হ'তো না তার। সেই সুযোগ গ্রহণ করেই মা তাঁর ইতিকর্তব্যের প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত করবার অবকাশ পেলেন। এতদিন পরে আজ প্রথম বুঝ্‌লাম—কেন আত্মীয়তার সূত্র ধ'রে চিঠিরী থেকে হৈমন্তী তাঁর মেয়েকে নিয়ে কিছুকাল এখানে এসে কাটিয়ে গেলেন। একটা দারুণ স্বার্থ মনে মনে গোপন ক'রেই তিনি এসে মার শিয়রে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মা-ও যথেষ্টবার তাঁদের নিয়ে বেড়াবার নাম ক'রে তাঁদের সঙ্গে আমাকে ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠবার জন্য উৎসাহিত ক'রেছেন। এতবড় আত্মীয়টি আসবার আগে পর্যন্ত কিন্তু যার মধ্যে এতখানি উৎসাহ দেখা যায়নি। আজ সব কিছু জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। এমন কি তনুশ্রী অবধি স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো আমার চোখে। আমার এই অধ্যয়নকক্ষে এসে বই গুছিয়ে রাখা থেকে সুরু ক'রে তার সহজ প্রাণস্পর্শী আলাপ পর্যন্ত সব কিছুর পিছনেই বিশেষ একটা উদ্দেশ্য ছিল, উদ্দেশ্যটা ঠিক স্পষ্ট তার নিজের না থাকলেও দু'পক্ষের মায়ের ছিল। সেই পরম উদ্দেশ্যের স্বাভাবিক অভিব্যক্তিটাই এতদিনে ঘ'টলো।

এ ঘটনাকে সত্যিই কি স্বীকার ক'রে নেওয়া চলে? ঘটার দিক থেকে কিছুই হয়ত বাদ প'ড়লো না, কিন্তু আমি, আমার মন, আমার স্বাধীন চিন্তা আর ঐতিহ্য, আমার এতদিনের তিলে তিলে গ'ড়ে তোলা প্রেম, প্রেমের সৌধ—সে কি একমুহূর্তেই ধূলিসাৎ হ'য়ে যাবে না? অণিমাকে না পেলে আমিই বা কোন্ সুখ নিয়ে বাঁচবো! অণিমা ভিন্ন এজীবনে যে আর কাউকে কল্পনা করিনি! কোনোদিন কেউ এসে যে আমার মন থেকে তার আসন কেড়ে নিতে পারে—ভাব্‌তেও গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। অণিমা শুধু তো আমার সহপাঠিনী বন্ধুমাত্রই নয়, সে যে আমার জীবনের সমস্ত অংশ জুড়ে একটি ঐক্য-সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা। আমাদের এতদিনের দ্বৈত জীবন-সাধনার তিলে তিলে আমরা যে প্রেম-সঙ্গীত রচনা ক'রেছি, সেই সঙ্গীতে কথা আর সুর মিলে দু'জনে আমরা একাত্ম হ'য়ে উঠেছি। তা থেকে কিছু-একটাকে খসিয়ে নিলেই যতি নষ্ট হ'য়ে যাবে, সেই সঙ্গে জীবনটাও। এ জীবনের মূল্যের চাইতে যার কথার মূল্যটাই কি বেশী হলো? কথা কি আমিই দিই নি অণিমাকে? তার কাছে কথার খেলাপ ক'রে তাকেই বা কোন্ প্রাণে দুঃখ দেবো, কোন্ মুখ নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবো তার সামনে?

ঘড়িটা অচল ছিল না, স্পষ্ট সে তার ঘণ্টা বাজিয়ে চ'লেছে। এক-একটা প্রহর অতিক্রান্ত হ'য়ে ক্রমেই

উষার উদয়লগ্ন নিকটতর হ'য়ে আসছে। কানে এসে বাজছে পেণ্ডুলামের টিক্ টিক্ শব্দ। চোখ দু'টো কিছুতেই আর এক হ'লো না। পারলুম না একটা মুহূর্তের জন্যও ঘুমোতে। মনের ভিতরটা কাঁটায় কাঁটায় ক্ষয়ে যেতে লাগলো। অধ্যয়ন-কক্ষের নিঃসঙ্গ শয্যায় শুয়ে চিরটা কালই তো কাটিয়ে দিলাম; কিন্তু আজকের মতো এমন নিঃসঙ্গতা জীবনে কোনোদিন অনুভব করিনি। এখানে আমার এই নিবিড় একচ্ছত্র রাজ্যে ব'সে কত দিনই তো দর্শন আর মনোবিজ্ঞান নিয়ে অণিমার সঙ্গে বড় বইয়ে দিয়েছি, কতদিনই তো কলহান্তে মুখর করে তুলেছি অলিন্দ কত মুহূর্ত! সময়গুলো কোথা দিয়ে বয়ে গেছে—টেরও পাইনি; তারপর ঘড়ির বেল বেজে উঠতেই দু'জনে আশ্চর্যরকমভাবে সচকিত হয়ে উঠেছি। কতদিন কত সন্ধ্যা কত আবৃত্তি করেই না কেটেছে! আমার এই ছন্নছাড়া জীবনের কোথাও যদি ভালোবাসা বলে কিছু থাকে, তবে সেই ভালোবাসা, সেই প্রেমের একমাত্র উৎস অণিমা। এখনও আমার অধরে তার সুধার স্পর্শ লেগে আছে, এখনও তার সেই কচি ডাঁটার মতো আঙুলগুলো যেন আবেগে মূর্চ্ছনায় কেবলই কথা বলে উঠছে, বলছে: 'আমাদের এই আছিকে চিরন্তন রূপ দিয়ে জীবনকে সার্থক করে তুলবে তুমি,—বলো, এই চাঁদকে সাক্ষী ক'রে বলো তুমি।'—এমনি করেই তার প্রতিদিনের প্রত্যেকটি কথা এসে একে একে মনটাকে একেবারে তোলপাড় ক'রে দিল। পারলুম না নিজেকে নিয়ে ভিটোতে। জীবনে কোনোদিন রাত্রি জাগিনি, মনে হ'তো—স্বপ্নের মতই বুঝি রাত্রিটা মনোরম, কিন্তু আজ নিশীথ রাত্রির নির্জনে শুয়ে কেবলই মনে হতে লাগলো—কী বীভৎস আর কী নির্মমই না এই রাত্রি! বাইরে যে একেবারেই অন্ধকার ছিল, তা নয়; অন্ধকারের একটা সমাচ্ছন্ন রূপ আছে জানি। আজকের রাত্রিটা আলোয়-অন্ধকারে মিশে কেমন একটা শ্মশান-বৈরাগীর রূপ নিয়েছে। উঠে মিনিট-কয়েকের জন্য একবার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। ঊর্ধ্বদিকে প্রসারিত করে কিছুক্ষণ লক্ষ্য ক'রলাম নক্ষত্রমণ্ডলীর দিকে। ধীরে ধীরে তিমিত হ'য়ে আসছে তারাগুলি। শেষ নিশিযামের প্রচ্ছন্ন ছাপ প'ড়েছে গ্রহমণ্ডলে। কোনো একটা গাছের ঊর্ধ্বশাখা থেকে একবার কলরবে মুখর হ'য়ে উঠলো কয়েকটা পাখী। মাথার উপর দিয়ে বোধকরি একটা বাদুড়ই উড়ে গিয়ে সামনের দেবদারু গাছে গিয়ে ঝুলে পড়লো। পাতাগুলো একবার আন্দোলিত হ'য়ে তারপর আবার স্থির হ'য়ে গেল। আর খানিকবাদেই হয়ত দূরে মুন্সীদের মস্‌জিদ বাড়ী থেকে আজানের ধ্বনি উঠে পাড়াটাকে সচকিত করে তুলবে, পথে পথে বেরোবে প্রভাত-ফেরী।—প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই মনটাকে ধীরে ধীরে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনের গতি স্বতন্ত্র। পারলুম না তাকে একটা মুহূর্তের জন্যও শান্ত করতে। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতো কেবলই ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো। এসে আবার শয্যায় আশ্রয় নিলাম। ঘড়িতে আবার বেল বাজলো, তারপর আরও কতবার। ক্রমে ক্রমে কেটে এলো রাত্রির নিস্তব্ধতা। পাড়া-প্রতিবেশীদের হাঁকডাক সুরু হ'লো ধীরে ধীরে। ক্রমে বেলা হ'লো। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতে আর ইচ্ছে হলো না। মদ খেলে মাতালের কি অবস্থা হয় জানিনা, কিন্তু তার চাইতেও যেন কঠিন নেশার মধ্য দিয়ে সারা রাত্রিটা আমার কেটে গেল।

সকালে যদি শীলা এসে না ডাকতো, তবে যে আরও কতক্ষণ অবসন্নের মতো পড়ে থাকতাম, বলতে পারি না। শীলা এসে ঠেলে তুলে বললো, 'বাব্বাঃ, এতো ঘুমও ঘুমোতে পারে মানুষ। কী কুম্ভকর্ণ আপনি, সুমন্তদা! আটটা বেজে গেছে সেই কোন্‌কালে, এখনও আপনার উঠবার নাম নেই। উঠবেন কেন, জমিদার মানুষ, চিন্তা-ভাবনা তো আর নেই।'

আলস্য ত্যাগ করে উঠে বসতে বসতে বললাম, 'জমিদারদের বুঝি চিন্তাভাবনা কিছু থাকেনা? কিন্তু কি জানো শীলারাণী, আজ যে-ভাবে সারা দেশ থেকে

ভবিষ্যৎ-চিন্তা উচ্ছেদ হচ্ছে, তাতে চিন্তাভাবনা কিছু-কিছু তাদের মধ্যে ঢুকেছে।'

কিছু-একটা বিপদের কথা কল্পনা করে শীলা ব'ললো, 'তবে উপায় ?'

—'উপায় আর কি!' বললাম, 'উচ্ছেদ হলে, প্রজারা কিছু সুখ-সুবিধে পেয়ে খেয়ে-পরে দু'চো বেশীদিন বাঁচতে পারবে। ভবিষ্যৎ আর বর্তমানের ব্যবধানটাও ঘুচে যাবে।'

চোখ পাকিয়ে কিছু-একটা ঘুসী হবার মতো কণ্ঠে শীলা বললো, 'সমান আর পদবীতে তবে তারা এক হয়ে যাবে, বলুন ?'

বললাম, 'তা যদি নাও হয়, তবু প্রজা-রাজ্যে বলী-নিধন ব'লে কিছু থাকবার সুযোগ রইবে না।'

—'তা-ই বলুন।' শীলা বললো, স্কুলের শোভনাও সেদিন এই কথাই বলেছিল: বলেছিল—দেশে নাকি সাম্যবাদ আসবে। শোভনাদের এই ধরণের কি-একটা সঙ্ঘ আছে, সে তাদের সেই সঙ্ঘের হ'য়ে কাজ করে। আমাদেরও সেবার ব্রতে বলেছে।'

'বলেছে নাকি ?'

—'নয় তো কি !'

বুঝতে এবারে আর কিছুই বাকী রইল না। বুঝলাম—সারা দেশে আজ কম্যুনিজমের যে হাওয়া বইছে, সেই হাওয়া এসে শীলার বন্ধুদেরও আচ্ছন্ন করেছে। শীলাও তা থেকে বাদ যাবে না। বাদ যেতে পারে না। দেশের উপর-তলার মানুষগুলোর এতকালের একতান্ত্রিকতাই বাধ্য করেছে দেশের কচি কচি হৃদয়গুলিকে সেই হাওয়ায় ভেসে যেতে।

শীলার হাতের দিকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলাম, 'হাতে তোমার ওখানা কি বই, সাম্যবাদের বুঝি ?'

—'না, বিসম্বাদের।' হেসে শীলা বললো, 'বড্ড মুস্কিলে পড়েছি ইংরেজির রিটিমিটি নিয়ে। বাবা তো আর মানে-বই কিনে দেবেন না, স্কুলে যেটুকু বুঝিয়ে দেয়, তাতেও কুলোয় না। আজ তাই উদ্যোগ ক'রে পড়াটা বুঝে নিতেই এলাম।' তারপর একটুকাল থেমে ব'ললো, 'যাই বলুন, আমরা কিন্তু সত্যিই এখনও স্বাধীন হইনি সুমন্তদা। স্বাধীন হলে নাকি আবার ইংরেজি পড়তে হতো !'

এমন দিনের আলাপেও এই প্রশ্নটাই তুলে ধরেছিল শীলা। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, প্রশ্নটার আজও জবাব খুঁজে পাইনি। বললাম, 'কেন, তোমাদের স্কুলে এখনও হিন্দি শেখাতে আরম্ভ করেনি ?'

—'সামনের বছর থেকে সুরু হবে শুনছি।' হেসে শীলা বললো, 'শুনে আমাদের স্কুলের দরোয়ানের কি আনন্দ, তাদের ভাষা কিনা, তাই। তা দরোয়ানের মুখে এতদিন হিন্দি শুনে শুনে ভাবছি—হিন্দি-পাঠ সুরু হলে তাও এক রগড়ের ব্যাপারই হবে।'

কৌতূহলের সঙ্গেই সহাস্যে প্রশ্ন করলাম, 'কেন, হিন্দিরও কি ইংরেজির মতো অবস্থা হবে নাকি ?'

শীলা তার সহজ বুদ্ধি নিয়েই বললো, 'ধুর্—কদ্বুতা হায়, বাতা হায়, যাতা হায়, বসর, লেকিন—এসব নাকি আবার ভাষা। বাংলা ছাড়া আমার কিছু ভালো লাগে না সুমন্তদা।'

বললাম, 'বাঙালী মাত্রের কাছেই তাই। তা যাক, তুমি একটু বসো, আমি চট্ করে মুখটা ধুয়ে আসি। তারপর একসঙ্গে চা খেতে খেতে তোমার পড়া বুঝিয়ে দেবো।'

তা-ই দিলাম। উঠে কলতলা থেকে ঘুরে এলে ব্যায়ামের মতো বসে পড়লাম শীলার ইংরেজি পাঠ্য নিয়ে। পাচক ঠাকুর এসে চা আর তরি-রুটি দিয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'জামাইবাবু কি করছেন ?'

পাচক ঠাকুর বললো, 'তিনি আজ নিজে থেকেই বাজারে বেরোলেন। আমাকে যেতে দিলেন না, বললেন—ততক্ষণ বন্টুকে নিয়ে তুমি থাকো, আমি ঘুরে আসি।'

বন্টুর খোঁজ নিয়ে জানলাম—মার পাশে ব'সে খেলছে। আর কোনো প্রশ্ন ছিল না, প্রশ্ন থাকলেও

জবাব দেবার মতো অবকাশ ছিল না পাচক ঠাকুরের। উনুনে কি-একটা চাপিয়ে এসেছিল, দেরী হ'লে পোড়া লাগবার সম্ভাবনা। মন্টুর কথা শেষ ক'রেই তাই সে অন্তর্ধান হলো।

শীলা কিন্তু পাঠ বুঝে নিয়ে চট্ করেই উঠে গেল না।

বললাম, 'দিদির জন্যে দুঃখটা এতদিনে তবু যা হোক কাটিয়ে উঠতে পেরেছ, না কি বলো শীলারাণী?'

একটু থেমে শীলা বললো, 'আমরা সবাই এখানে, দিদি একা একা ঘুরে প'ড়ে আছে; দুঃখ হয় না, আপনিই বলুন সুমন্তদা?'

দুঃখটা কি আমারই কম হচ্ছে! বললাম, 'হয় না আবার! তোমার দিদির যা কাণ্ড, চাকরী নিয়ে ঘুরে না গেলে যেন রামায়ণ অশুদ্ধ হয়ে যেতো!'

বিদুষী শীলা এবারে আরও বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে ব'ললো, 'আপনি আমাদের সংসারের সব কিছু জানেন না সুমন্তদা, দিদি চাকরী না নিলে আমাকে অবধি আজ স্কুল থেকে নাম কাটিয়ে নিয়ে ঘরে বসে থাকতে হ'তো। কোর্টে উকীল-মোক্তারদের আজকাল বিশেষ পসার নেই। তাছাড়া স্বাস্থ্য নিয়েও ইদানিং পেরে উঠছেন না বাবা।'

শীলা আজ আর সেই ছোট্টটি না থাকলেও এখন-কিছু গৌরীশৃঙ্গ হয়ে ওঠেনি যে, সংসারের কাণ্ডটা সহ্য করতে পারে। অথচ আশ্চর্য যে, এইটুকু বয়সে সংসার-অভিজ্ঞতার একটা স্পষ্ট চিহ্ন তার মধ্যে সূচিত হয়ে উঠেছে। দুঃখও হলো, হাসিও পেল। দুঃখ হলো দেশের দারিদ্র্যের কথা চিন্তা করে, যে দুঃখে মানুষ হাসে—সেই দুঃখের অভিঘাতে শীলার মতো কমনীয় জীবনকে অবধি গুঁড়িয়ে যেতে দেখে সঙ্গেসঙ্গেই হাসি এলো। আমি তাদের সাহায্যে লাগতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতাম, কিন্তু পথ খোলা নেই কোনো-দিকে। এদেশের গ্রাজুয়েট ছেলের জন্য চাকরীর আসন খালি ক'রে কেউ বসে নেই। ভেবেছিলাম—নিজেদের সহরে যখন কিছু হলো না, একবার কলকাতায় গিয়েই না-হয় চেষ্টা করে দেখি। কিন্তু কলকাতার সমাজের সঙ্গে কোনোকালেই বড়-একটা পরিচয় নেই, বার দুয়েক নিতান্ত সখ মেটাতেই মাত্র ঘুরে এসেছি; পথে দাঁড়িয়ে দেখেছি—কী অফুরন্ত জীবনস্রোত সেখানে। সে স্রোতে হারিয়ে যেতে সময় লাগে না। সেখানে গিয়ে ভালোবাসার কুটীর সাজিয়ে বসা যত সহজ, কুটীর নির্মাণ তত সহজ নয়।

কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, 'দিদি চলে গিয়ে সত্যি তোমার বড় অসুবিধে হ'য়েছে। তা—এ পর্যন্ত দিদির কাছে ক'পাতা চিঠি লিখলে শীলারাণী?'

—'ক' পাতা আবার লিখবো, কী লিখবো—তাই তো খুঁজে পাই না।' থেমে শীলা বললো, 'অন্তবার নতুন কিছু লিখতে চেষ্টা করি, অন্তবার ঐ এক কথাই কেবল কলমের মুখে এগিয়ে আসে—'তোমাকে ছেড়ে একটুও ভালো লাগছে না দিদি, তুমি শীগগির চলে এস।'

বললাম, 'আমিও এবারে ঐ কথাই লিখবো। যদি না আস, তবে আড়ি।'

—'লিখবেন, দুজনে লিখলে তবে খুব জোর হবে।' মনে হলো—কথাটা বলতে গিয়ে খানিকটা খুশী বোধই করলো শীলা। তারপর স্বল্পকাল থেমে বললো, 'যদি না আসে তো ঠিক করেছি—আমিও দিদির কাছেই চলে গিয়ে ওখানে থেকেই পড়বো।'

বললাম, 'শেষ পর্যন্ত তবে তোমাকেও হারাবো? এতটা কিন্তু প্রাণে সইবে না শীলারাণী।'

এবারে কিছু-একটাও না বলে আমার মুখের দিকে চোখ দুটো তুলে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো শীলা। তারপর কিছুক্ষণ কেটে গেলে বললো, 'আপনি কিন্তু আজকাল আমাকে আর একটুও ভালোবাসেন না না সুমন্তদা। একটাও আর ছবির বই দেন না আমাকে!'

সত্যিই অপরাধ। ছবির বই কিম্বা ক্যালেণ্ডার না দিলে যে শীলাকে ভালোবাসা দেখানো যায় না, অনিমা চলে যাবার পর থেকে একথাটা প্রায় ভুলেই

দিয়েছিলাম। অপরাধ বৈ কি! আদর করে এবারে তাই শীলাকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম, 'ক'দিন ধরে মনটা ভালো নেই কিনা, সব কথা তাই সব সময় মনে থাকেনা। এবারে তোমার জন্যে নিশ্চয়ই আবার নতুন বই নিয়ে আসবো। কিছুতেই ভুলবো না।'

—'আচ্ছা, দেখবো কেমন না ভোলেন।' বলে এবারে আর অপেক্ষা করলো না শীলা। উঠে বাড়ীর পথে পা বাড়াবার উদ্যোগ করে বললো, 'দিদিকে তা হলে আসতে লিখ্‌বেন কিন্তু, পারেন তো আজই লিখুন না সুমন্তদা, বেশ মজা হবে

বললাম, 'লিখ্‌বো।'

খুশী হ'য়ে এবারে তর্ তর্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল শীলা।

বেশ কাটছিল এতক্ষণ। রাত্রীর অবসন্নতার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। রাতটাকে যত বীভৎস ঠেকেছিল, প্রভাতটা কিন্তু প্রায় ততখানিই উজ্জ্বল হ'য়ে দেখা দিল। শীলার মতো এমন প্রাণপূর্ণ উজ্জ্বলতা ঔজ্জ্বল্যেরই স্বাক্ষর বে! শীলার কথার সূত্র টেনেই ভাবলাম—দিদির কথার পর আর চুপ করে থাকা চলে না। অন্বিতার চিঠির অপেক্ষা না রেখে এবারে ব্যাপারটা খুলে তাকে লিখ্‌বার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সংসারকে যত সহজভাবেই আমি গ্রহণ করিনা কেন, সংসার আমাকে সেভাবে নেবে না। 'সংসারোয়ং অতীব বিচিত্র': মিথ্যে বলেননি একদিন শঙ্করাচার্য। এখানে আত্মধর্ম রক্ষা করে চলার মতো কঠিন কাজ আর কিছু নেই। 'ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া': এই ক্ষুরধার সংসারপথকে অতিক্রম করেই যদি না যাওয়া গেল, তবে যে শিক্ষা জ্ঞান সব কিছুই মিথ্যে। এতকাল দর্শন আর মনোবিজ্ঞান নিয়ে তবে খেটে মরলাম কেন?

অন্বিতাকে চিঠি লিখ্‌বার উদ্দেশ্যেই এবারে কাগজ আর কলমের জন্য হাত বাড়াতে যাচ্ছিলাম, ইতিমধ্যে বড় ঘর থেকে হঠাৎ ডাক পড়লো। কাল রাত্রি থেকে মার শিয়রে গিয়ে একটিবারের জন্যও বসিনি, বসবার মতো মনও ছিল না। ডাকটা তাই একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। সাড়া দিয়ে একটুকাল বাদে বিনা দ্বিধাতেই গিয়ে মার শিয়রে বসে পড়লাম। অভিমানে দুঃখে আমার সমস্তটা মন তখন ভারী হয়ে উঠেছে।—জিজ্ঞেস করলাম, 'আজ কেমন বোধ করছো মা?'

কোনো ভূমিকার অবতারণা না ক'রে স্পষ্টকণ্ঠেই মা ব'ললেন, 'বোধ আবার কি! আমি জানি, এ রোগ আমার সারবার নয়। এখন ভালোয়-ভালোয় সংসারে তোদের শান্তিতে রেখে যেতে পারলে আমি বাঁচি।'

ব'ললাম, 'এই কথা শুনবার জন্যেই কি আমাকে তবে আসতে হ'লো?'—

'না, আরও কথা আছে, একটু স্থির হ'য়ে ব'স্।' ব'লে ঘরের এপাশে ওপাশে টাদু-মাদু-তাকিয়ে কি যেন একবার ভালো ক'রে লক্ষ্য ক'রলেন মা। ঘরে দিদি আর মন্টু ছাড়া আর কেউ ছিল না।

মন্টুকেই খানিকটা চটিয়ে নিতে চেষ্টা ক'রলাম। জানতাম—মা চটালে মন্টুর কাপাকাপি সুরু হবে না।

কিন্তু সে সুযোগ দিলেন না মা। ব'ললেন, 'আমি হৈমকে কথা দিয়েছি, তুইও কি আমি ঘরের বউ ক'রে আনবো। একথা যে আমি খেলাপ ক'রতে পারি না, তা তুই জানিস্ খোকা?'

ব'ললাম, 'জানি। কিন্তু—'

—'কিন্তু কি?'

—'অবশ্য পারস্পর্যে কোথাও কোনো কথার খেলাপ হ'লে তাতে দোষ থাকে না।'

—'দোষগুণের বিচার আমি তোর সঙ্গে ক'রতে চাই না খোকা। এতদিন স্বাধীনভাবে যা-ইচ্ছে ক'রেছিস, তাতে আমরা টু-শব্দটিও ক'রতে যাই নি। কিন্তু সব ব্যাপারেই চিরকাল তা চলবে না।' চোক গিলে মা ব'ললেন, 'করুণার মুখে আমি সবই শুনেছি, কিন্তু যে পথে পা বাড়াতে চাস তুই, এ সংসারে কোনোদিনই তা হ'তে পারে না।'

আপাঙ্গে একবার দিদির মুখের দিকে তাকালাম। মূর্তিমতী করুণা নিয়ে ঘরের একপাশে দিদি দাঁড়িয়ে আছে।

মার কথার জবাবে ব'ল্লাম, 'দিদিকে কোনো কথাই আমার খুলে বলা হয়নি, তবু যেটুকু তুমি শুনেছ, তারও ওজন কমখানি নয়। তা যাক্। ঘরে তোমাকে বউ এনে দেবো, এ কথা আমি বলেছিলাম; তাতে এখনও আমার আপত্তি নেই। আপত্তি শুধু ঐখানটায়, যেখানে তুমি পুরোপুরি মত ব্যক্ত ক'রে ব'সে আছ।'

একটা দারুণ জ্বালা নিয়েই মা এবারে ব'ল্লেন, 'তা হ'লে আমার অপমান হোক্, এই তুই চাস খোকা?

—'অপমানিত হ'তে তো তোমাকে কেউ বলছেনা। সম্পূর্ণ ব্যাপারটা আমার উপর ছেড়ে দিয়ে তুমি অনায়াসেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারতে। বিয়ে যখন আমি ক'রছি, তখন আমারও যে ব্যক্তিগত কিছু মতামত থাকতে পারে, এ কথা তোমার বোঝা উচিৎ ছিল মা।' —ব'লে মনে মনে একবার ডাক্তারের কথাটা স্মরণ ক'রলাম। কোনো ঘটনা দ্বারাই মাকে উত্তেজিত করা উচিৎ হবে না। কিন্তু এমন একটা রুঢ় বাস্তবের ভিতের উপর পা রেখে মাতৃতন্ত্রের ক্রিয়াকে কিছুতেই দমিয়ে রাখ্তে পারছিলাম না।

জবাবে মা ব'ল্লেন, 'তোমার মতামত মানে তো কলেজে-পড়া মাষ্টারনিকে এনে ঘরজায় দাঁড় করাতে চাও! ওসব ফিরিঙ্গিয়ানা এ সংসারে ঢুকতে পারবে না। অন্ততঃ যে-ক'টা দিন আমি বেঁচে আছি, এ সংসারে এ-বিধান ততদিন অটুট থাকবে।'

ব'ল্লাম, 'তোমার বিধানটাই বড় হবে, আর আমার জীবনটা কিছু নয়? মা হ'য়ে ছেলের শান্তি তবে তুমি চাও না?'

এতক্ষণ বালিশে মাথা রেখেই মা কথা ব'লছিলেন, এবারে উত্তেজনায় মাথাটা একবার উপরের দিকে তুলে ব'সলেন। ব'ল্লেন, 'শান্তি চাই ব'লেই যেখানে আমি ভালো বোধ ক'রেছি, কথা দিয়েছি। এসব ছেলেখেলা নয় খোকা; আমাদের সমস্ত মান-সম্ভ্রম এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে। পাঁজিতে আমি দিন দেখে রেখেছি, ফাল্গুনের ১৭ই, এদিনের আর নড়চড় হ'তে পারে না। ঐ দিনই তোকে বিয়ে ক'রতে হবে এবং ঐখানেই।'

রাগে দুঃখে ভিতরটা আমার পুড়ে যাচ্ছিল। ব'ল্লাম, 'তোমাদের খুশীর জন্যে দিন সম্পর্কে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু স্থান সম্পর্কে আমি মত দিতে পারলুম না। যাকে তুমি ফিরিঙ্গিয়ানা ব'লে ঠাট্টা ক'রছো, তার মতো বনেদী বাঙালীয়ানা আর কিছু আছে ব'লে আমি বিশ্বাস করি না। অনিমাকে আমি আগে থেকেই কথা দিয়েছি, সে-কথা ফিরিয়ে নেওয়া চলে না।' ব'লে সবেগেই উঠে প'ড়লাম মার শিয়র থেকে।

—'কি, কি বল্লি?' উত্তেজনায় সমস্ত শরীর থর্থর করে কাঁপছিল মার। ক্রমে এবারে আরও খানিকটা উঠে বসে বল্লেন, 'বেশ, তবে তোর কথাই তুই রাখ খোকা, আমি মানুষের কাছে হেয় হ'য়ে একটা দিনও আর সংসারে বাঁচতে চাইনা।'

মার শিয়র থেকে উঠে দ্রুত নিজের অধ্যয়নকক্ষের দিকেই পা বাড়িয়েছিলাম, উঠোন পেরিয়ে আস্তে গিয়েই পুনরায় দিদির গলার সাড়া পেলাম: 'সুমু, শীগ্গির এদিকে আয়, মা যেন কিরকম ক'রছে!'

—ব্যাকুল আর্তনাদ।

শুনে শুধু আমিই নই, বাইরের বৈঠকখানা ঘর থেকে দৌড়ে এলেন বাবা। জামাইবাবু বোধ করি সেই সময়েই বাজারের আনুসঙ্গিক কাজ সেরে সবেমাত্র বাড়ীতে এসে পা দিয়েছেন, দিদির চিৎকারটা তাঁরও কানে গিয়ে পৌঁছাতে তিনিও শশব্যস্তে দৌড়ে এলেন। এমন কি আমাদের পাচকঠাকুরটি অবধি বাদ গেল না।

ফিরে এসে দেখি—মূর্চ্ছা গেছেন মা, দাঁতকপাটি লেগে ঘন ঘন নিজের মধ্যে আক্ষোলিত হচ্ছেন। তাড়াতাড়ি জল এনে মার চোখে মুখে ছিটিয়ে দিলাম, দিদি জোরে হাওয়া দিতে লাগলো শিয়রে বসে। বাবা বিচলিত হ'য়ে কেবলই অধীরতায় ভেঙে পড়ছিলেন,

...পাশ দিয়ে বল্‌লাম, 'এমন উতলা হবেন না, আপনি জামাইবাবুকে সঙ্গে নিয়ে একবার ডাক্তারের কাছে যাবেন তো? ডাক্তারকে সঙ্গে করে ফিরবেন।'

কিছু ইতস্তত: করলেও কথা

সঙ্গে সঙ্গেই উকীল চৌধুরীর চেম্বারের দিকে ছুটলেন, সেই সঙ্গে জামাইবাবুও

মা কিন্তু একটু বাদেই জ্ঞান ফিরলো। বুঝতে বাকী ছিল না—মায়ের কোন্ অবস্থায় তিনি জ্ঞান হারিয়েছিলেন। ডিসিডে ইঞ্জেক্ট করলাম গরম এক কাপ দুধ এনে মাকে খাইয়ে দিতে। দুধ ডিসি ফ্রিজই নিয়ে এলো, কিন্তু সেটুকু খাওয়ালো না। চোখ খুলে ডিসির মুখের দিকে বার দুয়েক নরম দৃষ্টিতে তাকিয়ে চোখ বুজিয়ে নিলেন মা। মনে করলাম—রাগটা হয়ত আমার উপর, তখন আমার উপস্থিতিতে মা হয়ত কিছুই প্রকাশ করতে রাজি হবেন না। নিজেকে এই ইঙ্গিত করেই একটু আড়াল করে নিলাম। কিন্তু ডিসি বাড়ি করতে পারলো না মাকে।

আঃ, আমাকে নিরুদ্ধ করিস নে করুণা। আমাকে নিশ্চিন্তে থাকতে দে

ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়েই বাবা আর জামাইবাবু ফিরলেন। মার নাড়ি, বুক প্রভৃতি পরীক্ষা ক'রে ডাক্তার পনেরো বিশ মিনিট পর-পর দু'তিনটি ইন্‌জেক্‌শন্ ক'রে কিছুক্ষণের জন্য একবারে স্থির হ'য়ে বসে বল্‌লেন, 'প্রেসেন্টকে অমত ক'রলে চল্‌বে না, প্রেসক্রাইবড্ ডায়েট যা—তা প্রেসেন্টকে খেতেই হবে। কিন্তু একটা মেন্টাল 'সক্' থেকেই এ কাণ্ডটি ঘ'টেছে। এ সম্পর্কেই পূর্বে আমার স্পেশাল এডভাইস ছিল।'

ডিসি পূর্বের অবস্থাতেই দুধের কাপ-হাতে মার শিয়রে দাঁড়িয়ে ছিল। ডাক্তারের কথার জবাবে কি একটা ব'ল্‌তে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল সে।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বাবা নীরবে একবার আমার মুখের দিকে তাকালেন। বুঝলাম—কি বল্‌তে চান তিনি। জবাবে আমার কিছুই বল্‌বার ছিল না, মাথা নিচু ক'রে ধীরে ধীরে তাই নিজের অধ্যয়ন-কক্ষে এসেই পুনরায় আশ্রয় নিলাম।

[ক্রমশঃ]

স্মৃতিকথা

কবিশেখর কালিদাস রায়

পাঁচ বৎসর বয়স হইতে এগারো বৎসর বয়স পর্যন্ত আমাকে থাকিতে হইয়াছিল আমার নিজের গ্রামের বাড়ীতে। এ গ্রাম রাঢ়দেশে কাটোয়া মহকুমায়। ভাগীরথী হইতে তিন ক্রোশ, অজয় নদ হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত, বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীখণ্ড হইতে আড়াই ক্রোশ দক্ষিণে আমাদের গ্রাম। বৈষ্ণকুলপঞ্জিকাতে এই গ্রাম কচরি নামে অভিহিত।

আমাদের পূর্বনিবাস অজয়তীরের কোগ্রামে (উজানি)। সাধক কবি লোচন দাস ঠাকুর আমাদের বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বংশধর আমি নই। লোচন ছিলেন নিঃসন্তান, যৌবনেই সংসার ত্যাগী। অজয়ের ভাঙনের জন্য কোগ্রাম থেকে নিকটবর্তী পালিগ্রামে আমরা উঠে যাই। তারপর বহু পুরুষ ধ'রে আমরা কড়ুই গাঁয়ের অধিবাসী। শুনেছি আমাদের এক পূর্বপুরুষ গৌড়ের সুলতানের দরবারে চাকুরি করতেন। ইনি ছিলেন শ্রীখণ্ডের যশোরাজ খান ও কুলীন গ্রামের গুণরাজ খানের সমসাময়িক। আমাদের বংশের সকলেই ছিলেন চাকুরিজীবী। আমার প্রপিতামহ ও পিতামহ দুজনেই যশোহর জেলার রামনডাঙা নীল-কুঠিতে চাকরি করতেন। সেকালের যা অতি সাধারণ নাম—পিতামহের সেই নাম ছিল অর্থাৎ তাঁর নাম ছিল ঈশ্বরচন্দ্র রায়। এই রামনডাঙা নীলকুঠির কথা বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছামতীতে আছে। পিতামহ নীল-কুঠির দেওয়ানি পাওয়ার পর কুঠিয়াল সাহেবের সঙ্গে নানা বিষয়ে মতভেদ হওয়ায় জন্য চাকরি ছেড়ে চলে আসেন। আমার পিতামহী ছিলেন পদকল্পতরুর সংকলয়িতা গোকুলানন্দ সেনের বংশের মেয়ে। আমার মাতুলালয় অগ্রদ্বীপ—পরে নবদ্বীপ। আমার মাতামহী ছিলেন টেক্কার পদকর্তা উদ্ধব দাসের বংশের মেয়ে। এই সামান্য বংশ পরিচয়টা দিলাম, কারণ এর সঙ্গে আমার সাহিত্যিক জীবনের হয়ত কিছু সম্বন্ধ আছে।

পাঁচ বছর হতে এগারো বৎসর বয়স পর্যন্ত সময়টাই আমার সাহিত্যিক জীবনের পক্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

আমার পিতা যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় কাসিমবাজার রাজবাড়ীতে চাকরি করতেন।

পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত কাসিমবাজারে পিতামাতার কাছেই ছিলাম। সেখানে এত বেশি ম্যালেরিয়ায় ভুগতে লাগলাম—যে পিতা আর আমাকে তাঁর কাছে রাখতে পারলেন না—তখন পর্যন্ত আমি পিতামাতার একমাত্র সন্তান। গ্রামের বাড়ীতে কাকা ও বিধবা পিসীমার কাছে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। ম্যালেরিয়ায় শরীর কঙ্কালসার, প্রকাণ্ড পিলে পিয়াওঠা পেটটাকেই শুধু কাঁপিয়ে তুলিয়ে রেখেছিল। কাকা পাশের গাঁয়ের বিখ্যাত কবিরাজ আনন্দবল্লভ রায়কে ডেকে দেখালেন। তিনি বললেন—এযে সাংঘাতিক অবস্থা। যোগীন ছেলেটার দফারফা ক'রে বাড়ীতে পাঠিয়েছে। দেখি বাঁচাতে পারি কিনা।

তিনি চিকিৎসা করতে লাগলেন—নানা প্রকার ওষুধ দিয়ে। আশ্চর্য্যের বিষয়, কুইনিন না খেয়েই কবিরাজী ওষুধেই একটু একটু ক'রে রোগ সারতে লাগল। পথ্যের ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর। ওষুধের চেয়ে পীড়ার চেয়ে পথ্যের ব্যবস্থাই খুব বেশী পীড়াদায়ক হয়ে উঠল। মনে আছে—খেতে না পেয়ে কেবলি কাঁদতাম।

ভাত খাওয়া একরূপ ভুলেই গিয়েছিলাম। বাড়ীময়

মুড়িমুড়কির ছড়াছড়ি। একমুঠো মুড়ির জন্ত কি ব্যাকুলতাই প্রকাশ করতাম! তাদের খাদ্য একেবারেই বন্ধ ছিল। অনেক কাঁদাকাটা করায় স্নেহময়ী খুড়ীমা একদিন একটা ছোলের বড়ি আমাকে খেতে দিয়েছিলেন। তার জন্ত খুড়ীমার কি বাগ্‌দত্ত!

কবিরাজ মশায় তাঁর ভবিষ্যৎ নাতজামাইকে শেষপর্যন্ত বাঁচিয়ে তুললেন। বাঁচিয়ে তুলতে তাঁর ছয় মাস লেগেছিল। জানিনা কতটা জল-হাওয়ায়, কতটা ওষুধ পত্রের জোরে।

এই ছয় মাস খেলাধুলা করতে পাইনি, ছুটোছুটি করতে পাইনি, হাতে খড়ি হলেও পড়াশুনা করা সম্ভব হয়নি। বাড়ীতে দ্বিতীয় বালক বালিকা ছিল না। সঙ্গিহীন হয়ে একলা শুয়ে কিংবা জানলায় বসে থাকতাম। শুধু মনে পড়ে—কত কি যেন ভাবতাম। এই ছয় মাসই আমাকে কল্পনাপ্রবণ ক'রে তুলল।

অনেকটা সুস্থ হয়ে পাঠশালায় ভর্তি হ'লাম। পাঠশালার শিক্ষকের নাম শশী বৈরাগ্য। বৈরাগ্য একজন সদ্‌গোপ চাষীর উঠানে জামগাছ তলায় পড়ুয়াদের পড়াতেন। বোধহয় সদ্‌গোপ চাষীর চণ্ডীমণ্ডপে আমাদের পাঠশালা বসত। এই চণ্ডীমণ্ডপে থাকত চাষীর ছুরী, বই, লাঙল, কোদাল ও চাষের অন্যান্য যন্ত্রপাতি, বীজধান, দড়াদড়ি, পাটের বস্তা, পাঠকাঠির বোঝা ইত্যাদি।

পাঠশালার শাসন ব্যবস্থা আলালের ঘরের দুলালের সময় হ'তে পরের পাঁচালীর সময় পর্যন্ত একই রূপ ছিল। কাজেই পড়ুয়ারা কঠোর শাসন তাড়নার অধীন ছিল। গুরুমশায় সিসীমারে ওরে আমাকে কিছুই বলতেন না—কিন্তু অন্যান্য পড়ুয়ার কঠোর শাস্তি দেখে আমার শুকপ্রায় লিলেও চমকিয়ে উঠত। সর্বদাই ওরে ওরেই লিখতাম। লিখতে গিয়ে হাত কেঁপে যেত। অন্য পড়ুয়ার পিঠে যে ছড়ির ঘা গুলো পড়ত, তাদের কতকটা আঘাত নিজের গায়েই অনুভব করতাম। পিঠের পেশী কুঞ্চিত হ'ত, বুক দুর দুর করত। পড়ুয়ারা যে শাস্তিভোগ করত, তা পড়াশুনার জন্ত বা পাঠশালার শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্ত ততটা নয়। পড়ুয়াদের বাপদাদারা গুরুমশায়ের কাছে এসে নালিশ করত বাড়ীতে উপদ্রব করবার জন্ত বা ভাই-বোনদের মারধোর করার জন্ত, মার কথা না শোনার জন্ত। সে সমস্তের দণ্ড হ'ত পাঠশালায়। গুরুমশাই ছিলেন বিচারক।

আগেকার পাঠশালায় তিনটি ক্লাস ছিল—কলাপাতার ক্লাস, তালপাতার ক্লাস ও কাগজের ক্লাস। আমাদের সময়ে কলাপাতার ক্লাস আর ছিল না। মাটির উপর কাঠখড়ি দিয়ে লেখার ক্লাসের পর তালপাতার ক্লাস। তার পর সেলেটের ক্লাস, তার পর কাগজের ক্লাস। তালপাতার ক্লাসে পড়ানো হ'ত বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় ১ম ভাগ, সেলেটের ক্লাসে ২য় ভাগ ও ধারাপাত কাগজের ক্লাসে শিশুশিক্ষা, শুভঙ্করী, কথামালা ইত্যাদি।

বড় বড় পড়ুয়ারা একখানা বইয়ে সুর ক'রে পড়ত—বন্দো মাতা সুরধুনী পুরাণে রহিমা শুনি, পতিত পাবনী পুরাতনী। আমার শুনতে বড় ভালো লাগত। শুনে শুনে আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। এইভাবে কবিতার সঙ্গে আমার জীবনে প্রথম পরিচয় ঘটে।

ছুটির আগে ওড়াকিয়া পণ্ডাকিয়া পণকিয়া ও নামতা লেখানো হ'ত। ছেলেরা দল বেঁধে সুর ক'রে কি যেন বলত। আমি বসে বসে শুনে ভারি আমোদ পেতাম। ঘোষকদের দলে তখনও আমার ঠাঁই হয়নি। শুনে শুনে আমার অনেকটা মুখস্থ হয়ে যেত—কিছুই অর্থ বুঝতাম না। আমার মনে হ'ত গুরুমশায় বোধহয় গান শেখাচ্ছেন।

গুরুমশায় মোড়ায় বসতেন—আমরা তালপাতার চাটাইয়ে। চাটাই, দুয়োর কালির দোয়াত, পরের কলম ও পাততাড়ি বগলে, কোঁচড়ে মুড়ি বেঁধে পাঠশালায় যেতে হ'তো। গুরুমশায়কে মাসে এক আনা, একটা সিধে এবং ৵০ করে পয়সা দিতে

হ'তো। মোড়ায় ব'সে গুরুমশায় অঙ্ক কষতে ব'লে চেঁয়া দিয়ে শনের দড়ি কাটতেন। এ দড়ি ঐ আশ্রয়-দাতার জন্ত। এজন্তও তিনি আশ্রয়-দাতার কাছ হতে সিধে, তেল তামাক এবং এটা ওটা পেতেন।

পাঠশালায় পড়ুয়াদের মধ্যে উচ্চজাতির ছেলে খুব কম ছিল—বেশির ভাগই চাষী, কামার, কুমোর, তেলি তাঁতীদের ছেলে। তারা পাঠশালার পড়া শেষ ক'রে আপন আপন জাতব্যবসাই করত। ২।১জন ছাড়া তাদের সবাই মরে গেছে—তাদের কথা লিখবার জন্ত আমি এখনো বেঁচে আছি।

গাঁয়ের পাঠশালায় সব জাতের ছেলেদের মধ্যে যেরূপ মেলামিশি হয়, তাতে জাত্যাভিমান একেবারেই থাকে না। পরবর্তী জীবনে এ অভিমান এসে জোটে।

বেশিদিন পাঠশালায় পড়া হয়নি। একদিন পাঠশালা ছেড়ে গাঁয়ের ছাত্রবৃত্তি ইস্কুলে যেতে হ'ল। শশী-পণ্ডিত তাঁর সমস্ত বিদ্যা আমাকে দেওয়ার সুযোগ না পেয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন। সেই পণ্ডিতের কথা স্মরণ ক'রে আজ আমার চোখে জল আসছে। অল্পশিক্ষিত হয়ে শিক্ষায় যিনি দীক্ষাগুরু তাঁকে আমরা একেবারে ভুলে যাই। অল্পশিক্ষিত পল্লীবাসীরা এত সহজে ভোলে না।

ছাত্রবৃত্তি স্কুল বসতো গাঁয়ের একটি ভদ্রলোকের বৈঠকখানায়—স্কুলের পৃথক গৃহ ছিল না। এখানে হেডপণ্ডিত ছিলেন ১৮৲ টাকামাহিনার একজন নর্ম্যাল জৈবাষিক পাশকরা শূদ্রজাতীয় সজ্জন ব্যক্তি। দ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন ছাত্রবৃত্তি পাশকরা একজন ব্রাহ্মণ এবং তৃতীয় পণ্ডিত ছিলেন ছাত্রবৃত্তি পাশকরা একজন কায়স্থ। এখানেও শাসন ছিল অত্যন্ত কঠোর—পড়াশুনায় ফাঁকি দেওয়ার কোন উপায় ছিল না।

দ্বিতীয় পণ্ডিতের হাঁকডাকে ও বেত্র চালনায় সমস্ত স্কুল ছিল ভয়ে কম্পমান। ইনি অত্যধিক প্রহার ক'রে এক এক সময় বড়ই মুস্কিলে পড়ে যেতেন; কোন কোন ছাত্র মারের চোটে অজ্ঞান না হলেও অজ্ঞান হওয়ার ভান করত—তখন মুখে চোখে জল দিতে হ'ত। কখনও কখনও গাছের ডাল দিয়ে মারার জন্ত রক্তপাত হ'ত—খেজুরছড়ির মারে গায়ে কালসিটে পড়ে যেত। আমি ও ভয়ে কাঠ হয়ে থাকতাম। আমি দুর্বল, রুগ্ন ও স্বভাবতঃ শান্ত সুশীল ছিলাম, পড়াশুনায় আমার কিছুমাত্র অমনোযোগ ছিল না, কাজেই কোনদিন মার খেতে হয়নি। তবে তাঁর হুঙ্কারেই আধমরা হয়ে যেতাম।

এঁকেই কাকা বাড়ীতে পড়ানোর জন্ত নিয়োগ করলেন বৎসামান্ত দক্ষিণায়। তিনি কিন্তু দক্ষিণার কথাই ভাবতেন না, কি ক'রে ক্লাসের মধ্যে প্রথম হতে পারি সেইদিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। তিনি প্রাতঃকালে বাড়ীর দরজায় যে একটা হাঁক দিতেন সে হাঁকের প্রতিধ্বনি পরবর্তী ছাত্রজীবনে শকুন্তলা নাটকে পেয়েছিলাম দুর্বাসার 'অয়মহং ভোঃ' এই হুঙ্কারে।

সবচেয়ে বিপদ হ'তো যখন সকালে স্কুল বসত গ্রীষ্মকালে এবং গ্রীষ্মের ছুটির সময়ে। তিনি আসতেন বেলা ২টার সময়। পড়তে ব'সে ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসত, আর ঠেলা খেয়ে খেয়ে চমকে উঠতে হ'ত। এঁর শিক্ষার প্রধান বিষয় ছিল অঙ্ক। ইনি গণিতের শাণে চড়িয়ে আমার বুদ্ধিকে শাণিত করবার চেষ্টা করেছিলেন। যাই হোক তাঁর শিক্ষার ফলেই এম-এ পর্য্যন্ত গণিতের পথ আমার পক্ষে বেশ সুগম হয়েছিল। হাইস্কুলে গিয়ে গণিতে কখনো প্রথম ছাড়া দ্বিতীয় হইনি।

হেডপণ্ডিতম'শায় ছিলেন শান্তপ্রকৃতির তীক্ষ্ণবুদ্ধি শিক্ষক। তিনি প্রহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর পাঠনা ছিল চিত্তাকর্ষক। তিনি কোন একটি শক্ত অঙ্ক দিয়ে মাঝে মাঝে বলতেন—যে এই অঙ্ক কষতে পারবে তাকে একপোয়া রসগোল্লা দেব। রসগোল্লা তাঁকে দিতে হ'ত না, কারণ কেউই সে অঙ্ক কষতে পারত না। একবার এই বিড়ালের ভাগ্যেই শিকে ছিঁড়েছিল মনে আছে। তাতে দ্বিতীয় পণ্ডিতের কী উল্লাস!

বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পড়াতেন। আমাদের সময়ে এণ্ট্রান্স, এফ.এ ইত্যাদি পরীক্ষায় বাংলা ব'লে একটা বিষয়ই ছিল না একথা

তখন আমার ছাত্রেরা জিজ্ঞাসা করে—"আপনি স্যার, এত বাংলা শিখলেন কি করে?" তারাত জানে না—আমাদের ছাত্রবৃত্তি স্কুলে বাংলা শিক্ষার মান কত উঁচু ছিল। ছাত্র বৃত্তিতেই আমার বাংলা ভাষাশিক্ষা সমাপ্ত হয়েছিল। আজ যখন ব্যাকরণ ও রচনার বড় বড় বই লিখি, তখন সেই খড়ো চালের গ্রাম্যস্কুলটি এবং সদ্‌গোপজাতীয় প্রধান পণ্ডিতের কথা মনে পড়ে। ছাত্রবৃত্তি স্কুলেই সংস্কৃত ব্যাকরণের অর্ধেকটা আমার আয়ত্ত হ'য়ে গিয়েছিল।

পরবর্তী ছাত্রজীবনে যেসব বিষয় পড়েছি সে সব বিষয়ে গোড়া পত্তন হয়েছিল সেই গ্রামের স্কুলেই। আমাদের পাঠ্য ছিল এই বইগুলি—আখ্যানমঞ্জরী, বোধোদয়, চরিতমালা (বিদ্যাসাগর), চারুপাঠ (অক্ষয় কুমার দত্ত), বস্তু বিচার (রামপতি ন্যায়রত্ন), পদ্যপাঠ তিন ভাগ (যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়), বাংলার ইতিহাস (রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়), পাটীগণিত (পি ঘোষ, যাদব), জ্যামিতি (ব্রজমোহন মল্লিক)—এইগুলি ছাড়া পরিমিতি, পদার্থবিদ্যা, ভূবিদ্যা, ভূগোল, শরীর পালন, লোহারাম শিরোরত্নের ব্যাকরণ, ঈশানচন্দ্র ঘোষের ইতিহাস ইত্যাদি।

আমি যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি তখন ছাত্রবৃত্তি স্কুল মাইনার স্কুলে পরিণত হ'ল। ভিন্নগ্রাম হ'তে একজন এন্ট্রান্স পাশকরা শিক্ষক এলেন। তখন আমার ১০ বছর বয়সে প্রথম ইংরাজি শিক্ষার সূত্রপাত হ'ল। আজ আমাদের স্কুলবিভাগে যে নিয়ম প্রবর্তিত হ'ল—ঠিকসেই নিয়মেই আমার শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল। তবে তখন ইংরাজী ছাড়া মাইনার স্কুলে অন্যান্য বিষয়ের মান ঢের বেশি উন্নত ছিল। এখনকার ছেলেদের শিক্ষা হয় জনারণ্যে। আমার শিক্ষা বি-এ পর্য্যন্ত জনবিরল বিদ্যালয়-কক্ষেই হয়েছিল। বাল্যাবধি শিক্ষকদের মুখের একটি কথাও হারাইনি।

দশ ও এগারো বৎসর বয়সের সময় আমি এক পাগলের কাছে সকাল বেলায় পড়তে যেতাম। সেখানে আমার সহপাঠিনী ছিল প্রতিবাসী কালীপ্রসন্ন কাব্যের কন্যা, সে ছিল আমার সহোদরা ভগ্নীর মত। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার ফোঁটা সেই ব্রাহ্মণ কন্যার কাছেই পেতাম। আমার সে ভগিনী বহুদিন স্বর্গতা। তার নাতনী আজ তারাশঙ্করের পুত্রবধূ। পাগল হলেও ঐ শিক্ষকের পাঠনা ছিল অপূর্ব।

সেকালে গ্রামের স্কুলের ছেলেরা পাঠ্য পুস্তক ছাড়া অন্য কোন বই পড়ার সুযোগ পেত না। কারো বাড়ীতে ত পাঁজি ছাড়া কোন বই থাকত না।

আমি আমাদের পুরাতন সিন্দুক ঘেঁটে ৪ খানি বই-উদ্ধার করেছিলাম—অতিজীর্ণ অবস্থায়। কোন বই-এরই প্রথম দিকের পাতগুলি ছিল না। একখানি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, আধখানি কাশীদাসী মহাভারত, একখানি চৈতন্যচরিতামৃত ও একখানি চৈতন্য ভাগবত। চৈতন্য চরিতামৃত বুঝিতে পারিনি—বাকি তিনখানি মাঝে মাঝে পড়তাম। এই বইগুলো পড়ে আমার কল্পনা কোন অতীত যুগে চলে যেত এবং আকাঙ্ক্ষা জাগত মনে ঐরূপ বই আরো পড়তে। মনে বহু প্রশ্নের উদয় হ'ত—কাকেই বা জিজ্ঞাসা করব? কবিরাজ গোকুলানন্দ সেন ও শরৎ চন্দ্র সেন নামে আমার দুইজন আত্মীয় ছিলেন। তাঁদের মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করতাম—তাঁরা সাধ্যমত উত্তর দিতেন। তাঁদের স্কুলে পড়া বিদ্যা কিছুই ছিল না। গোকুল দাদা যাত্রার নাটক লিখতেন। তাঁর একখানা নাটকের নাম ছিল দুর্গাসুরবধ। দুর্গাই ত অসুর বধ করেছিলেন—দুর্গাসুর আবার কি? তাঁর নাটকের খাতা পড়ে দেখলাম—দুর্গ ব'লে একজন অসুর ছিল তারই বধ হচ্ছে নাটকের বিষয়বস্তু। তাঁর কাছেই শুনেছিলাম রামায়ণ মহাভারতের মত ১৮ খানা পুরাণ আছে সে-সব পুরাণে অনেক অসুরের কথা আছে। তাদেরও বধ করতে হয়েছিল—বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাদের। অনেক মানুষের রাজাও দৈত্যদানব অসুর বধ করেছেন।

কিন্তু সে সব বিবরণ পাব কোথা? জানবার আকাঙ্ক্ষা মনে পীড়া দিত।

পদ্যপাঠের কবিতাগুলো বড় ভাল লাগ্‌ত, সব কবিতা প্রায় মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। পণ্ডিতরা বলতেন—এই সব হ'ল বাংলার সবচেয়ে সেরা কবিতা। পদ্যপাঠের পদ্যর মত মিল দিয়ে পদ্য লিখবার সাধ হ'লো। গোপনে লিখতে লাগলাম—বেণীর ভাগ দেবতার বন্দনা। দেবতাদের সংস্কৃতে লেখা স্তবগুলো শরৎ দাদার কাছে সব শিখেছিলাম। শরৎ দাদার কাছে একখানা অমরকোষ অভিধান ছিল। তার অনেকটা মুখস্থ ক'রে ফেলেছিলাম।

এই সময়ে আমাদের একখানা গদ্য-পদ্য সংকলন পাঠ্য নির্বাচিত হ'ল। তাতে পৌষ মাসে একটা কবিতা ছিল। কবিতাটার প্রথম দুই লাইন—

পশ্চিমে ডুবিছে ইন্দু সম্মুখে উদার সিন্ধু
শিরোপরি অনন্ত বিমান।

সেই কবিতার নীচে রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর নাম ছাপা ছিল। রবীন্দ্র নাথের নাম এই প্রথম শুনলাম। কবিতাটা বড় মিষ্টি লাগল। পণ্ডিত মহাশয় কবিতাটা পড়ানোর সময় বল্‌লেন—এটা একজন নতুন কবির লেখা, লেখা কাঁচা, দেখছনা বিমান শব্দের অর্থ যে আকাশ নয়, তা তিনি জানেন না। তা ছাড়া—শিরঃ+উপরি—শিরোপরি সন্ধি হয় না, তাও কবি জানেন না।" শুনে মনটা খারাপ হ'য়ে গেল। কারণ, আমার কবিতাটা বড় মিষ্টি লেগেছিল।

আমাদের পাড়ার একজনের বাড়ীতে একজন শিক্ষিত জামাই এসেছিলেন। তাঁর কাছে একখানা বই ছিল—বই এর নাম বিবমুক্ষ। জামাই বাবু ঘুমুলে বইখানা রুদ্ধ-নিশ্বাসে পড়ে ফেল্‌লাম। বড় চমৎকার লাগল। কুন্দর জন্য মনটা খারাপ হয়ে গেল—চোখে জল এলো। আহা কি অভাগিনী। সাতদিন ধ'রে গল্পটা আমার মনে ঘুরতে লাগল। জামাই বাবু চ'লে গেলে একটা বইএর পাতা তাঁর ঘরে কুড়িয়ে পেলাম। তাতে একটা কবিতা ছাপা ছিল, সবটা ছিল না। কবিতাটার ১ম চরণ—

বেলা যে পড়ে এলো জলকে চল।

কবিতাটা পড়ে অবাক হ'য়ে গেলাম। মনে হ'ল এত চমৎকার লেখা ত পদ্যপাঠে পড়িনি। সবটা না পেয়ে কি অস্বস্তিই না হ'ল।

সম্পূর্ণ নূতন ছন্দ, পয়ার নয়, ত্রিপদী নয়, অথচ পড়তে কোন অসুবিধা হ'ল না। কি মধুর! বধূর প্রাণের কথা এমন ক'রে কি ক'রে কবি জান্‌লেন? যতটা পেয়েছিলাম সবটা মুখস্থ হয়ে গেল। কবির খবর আমার অজানা থেকে গেল। বুঝলাম, পদ্য পাঠ ছাড়াও অনেক ভালো কবিতা আছে—হায় সে সব কবিতার কথা কবে কি ক'রে জানব? কত লোককে কবিতাটা শোনালাম—কেউ মুগ্ধ ও হ'ল না, বিস্মিতও হ'ল না। অথচ আমার বিস্ময়ের অবধি নেই। এই বৈষম্যও নতুন বিস্ময়ের সৃষ্টি করল।

মাইনার স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়া শেষ হবা মাত্র একদিন আমার পিসতুতো দাদা একেবারে অক্রূরের মত এসে হাজির। কাকাকে তিনি বললেন—"বড়মামা পাঠিয়ে দিলেন, কালিদাসকে কাসিমবাজারে নিয়ে যাব, সেখানে হাইস্কুলে ভর্তি করতে হবে।" এ একবারে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

তারপর কান্নাকাটির পালা। পিসীমা যত কাঁদেন, খুড়ীমা যত কাঁদেন, আমি তত কাঁদি। স্কুল হ'তে বিদায় নিয়ে এলাম সবাইকে গর্ব ভরেই বল্‌লাম—শহরে পড়তে যাচ্ছি—মা বাবার কাছে থাকব। সেখানে আমাদের কোঠা বাড়ী আছে। তবে ছুটি পেলেই আসব।

তারপর উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিত মশায়কে প্রণাম করতেই বজ্রানল বৃষ্টিধারায় গ'লে গেল। পণ্ডিত মশায় বালকের মত কেঁদে আমাকে বুকে চেপে ধরলেন—আমি আর অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না—আমিও কাঁদতে লাগলাম। পণ্ডিত মশায় অশ্রুগদগদকণ্ঠে বল্‌লেন—"বাবা, যাও খুব বড় বিদ্বান হও। দেশের মুখ উজ্জ্বল করো, তোমার এই গরীব শিক্ষকদের ভুলো না। তোমার ত গাঁয়ের স্কুলে পড়বার কথা নয়—শহরে তোমার বাবা-মা থাকেন, আমরা তোমাকে কি ক'রে ধ'রে রাখব বলো! তবে

আর একটা বছর পরে মাইনর পাশ করে গেলেই হ'তো। কথা দিচ্ছি যদি আসতেন তবে তাঁকে বুঝিয়ে ব'লতাম, বিনোদকে ব'লে লাভ নেই।"

বৃদ্ধ পণ্ডিত মশায় আজিতে সন্তোষ তাঁকে হাত তুলে নমস্কার করলাম। আজ সেকথা ভেবে হাসি পায়।

কিছু বছর পরে কোন এক উপলক্ষে গাঁয়ে গিয়েছিলাম পোষ্টাফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করলাম। পণ্ডিত মশায়—'কর কি কর কি' ব'লে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সমবেত উচ্চবর্ণের লোকেরা অবাক হয়ে গেল—বোধ হয় ভাবল আমি খৃষ্টান হয়ে গিয়েছি। পণ্ডিত মশায়ের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তিনি বললেন, "আমার শিক্ষা দেওয়া সার্থক!" ষষ্ঠীবাবা বললেন—'কালিদাসের যত সব বাড়াবাড়ি।'

গ্রাম ছেড়ে চলে আসতে কি বেদনাই না পেয়েছিলাম। শহরে গিয়ে একমাস লেগেছিল সামলাতে। এ বেদনা কেন? মা বাপের কাছে আসছি স্ফূর্তি হবারই কথা। সঙ্গীদের প্রতি যে বিশেষ টান ছিল তাও নয়। স্কুলের প্রতি যে খুব মমতা ছিল, তাও নয়। নতুন নতুন বই পাচ্ছি না ব'লে বরং ক্ষোভই ছিল। তখন বুঝতে পারিনি—পরে বুঝেছিলাম—গ্রামের পথ, ঘাট, মাঠ, দীঘি পুকুর, গাছপালা—এই সমস্তকেই ভালবেসেছিলাম। শহরে এসে যখন গাঁয়ের কথা মনে পড়ত—তখন কোন মানুষকে মনে পড়ত না—মনে পড়ত তার গাছপালা, মাঠঘাট।

আমার বাল্যশিক্ষার কথা বললাম। এছো বাহ্য। সেল শিক্ষার কথা বলতে বাকি থাকল।

"মুন্না"

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

কিশোর বেলা থেকে ঘোড়ার গাড়ী বলতে মনে হত, অতি সাধারণ গোছের দেখতে একটা লাল রঙের গাড়ী। সামনে পেছনে যার তিনটে দাঁড়ির নামাবলি; আর যে গাড়ীটা মিউনিসিপ্যালিটির খোয়া ওঠা রাস্তায় চলতে সুরু করলে রীতিমত সোরগোল উঠত আশপাশে। আর একটা জিনিষ শোনা যেত, তা হল শিশুকণ্ঠের আহ্বান 'কোচোয়ান পেছনে ছিপটি'!

অন্ গিলপিনের ঘোড়ার গাড়ী করে সপরিবারে প্রতিবেশীদের সচকিত করে না গেলেও, পালে পার্বণে, দরকারে অদরকারে এই লাল রঙের গাড়ীটাই হাজির থাকত আমাদের বাড়ীর সামনে। আর কোচোয়ানের আসনে বসে থাকত নিরীহ একটি মানুষ, মুন্না। বাবার এই গাড়ীটা ছাড়া অন্য কোন গাড়ী পছন্দই হত না, তার কারণ মুন্না কিনা তা বলতে পারব না, তবে ঘোড়ার গাড়ী ডেকে আনতে বললে স্বাভাবিক প্রবণতায় আমরা মুন্নার গাড়ীটাকেই ডেকে আনতাম।

অবশ্য গাড়ীটা মুন্নার নয়, ছিপটি হাতে দুটো জন্তুকে দিয়ে মানুষ টানানোই ওর কাজ। জন্তুদুটোর ভাগ্যে যেমন জোটে দানাপানি তেমনি ওর পাওনা হয় সামান্য কয়েকটা তঙ্কা। আর নিঃসন্দেহে যত বেশী অঙ্কের জোটাতে পারে ও, তত গাড়ীর মালিকের কাছে আদর বাড়ে ওর। আর বাবা নিয়মিত অঙ্কের ওর গাড়ীর, বাবাকে খাতির করার ব্যাপারটায় বাবা ত খুশী হবেনই, আমরাও গৌরব বোধ করতাম।

আমার বয়স কিছু বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শহরটারও। কিন্তু যে শহরটার যৌবনে পদার্পণ করে, শহরের মানুষদের মধ্যে সভ্যতার আলোয় আলোকিত হয়ে সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, সেই শহরের মানুষই প্রাকসভ্যতা আদিম প্রবৃত্তিকে মাথায় তুলে নাচল। শহরের মানুষ পাশের লোককে, নিজের লোককে সুখের অন্তরায় ভেবে একে অন্যের বুকের ওপর তুলে ধরল ছুরি। উচ্ছল হাসির ঝর্ণাধারায় যে রাজপথ মুখরিত হওয়া উচিত, সেই রাজপথে গড়িয়ে গেল মানুষের রক্ত।

লালরঙের গাড়ীটা সুরুতে দু একদিন মাত্র দাঁড়িয়ে ছিল বাড়ীর সামনে। বিভিন্ন বাহনে একটা লোক ভয়ে ভয়ে শীচ বাঁধানো রাস্তায় হাড়বেরকরা ঘোড়া দুটোকে নিয়ে টেনে নিয়ে গিয়েছিল তিনটে দাঁড়িওলা গাড়ীটা। কিন্তু কেউ সাহস করে চড়েনি সেই গাড়ীটায়।

শুধু লাল গাড়ীটা নয়, ট্রাম লাইনের মোড়ে, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড অফিসের পেছনে যেখানে সার সার গাড়ী দাঁড়িয়ে থাকত, দিন ফুরোবার আগেই, তাদের একটাকেও আর দেখা গেল না। না গাড়ীর মানুষদের, না গাড়ীর জন্তুদের। একটা ঘোড়া ছিটকে এসেছিল এ পাড়ায়। পাড়ার ছোট ছোট ছেলে বেওয়ারিশ জন্তুটার পিঠে চেপে ঘোড়ায় চড়ার সখ মিটিয়েছিল কিছুদিন।

রাজপথে রক্তের দাগ মুছে গেছে, রহমানের বিড়ির দোকানের আলো আবার ফুটপাথে এসে পড়েছে। সবার সঙ্গে দেখা গেছে মুন্নাকেও। মুন্নার গাড়ী আর নেই। মুন্না আবার হাজির দিয়েছে আমাদের বাড়ীতে। আবার নতুন কেনা পুরোন অষ্টিন গাড়ীটা ধোয়া মোছা করার ভার নেয় মুন্না; একটা গাড়ী চালানো আর একটা গাড়ীর তত্ত্বাবধান করা দুটোর তফাত থাকলেও, স্বস্তি পেয়েছে মুন্না।

সেই কিশোর বেলা থেকে ওকে দেখে আসা সত্ত্বেও,

মুন্নার সঙ্গে আমার কোনদিনই অন্তরঙ্গতা খুব বেশী এগোয়নি। তবে মুন্নার সম্বন্ধে সব কিছুই আমার জানা হয়ে গেছে এতদিনে। আর এর জন্যে মেয়েদের একটা গুণের প্রশংসা করতেই হয়, পরচর্চা বলে একে বদনাম দিলেও ক্ষতি নেই। মুন্নার ওপর মা মোটেই খুসী ছিলেন না; তবে মুন্নার বউ যে মুন্নাকে ছেড়ে দিয়ে ওরই চোখের সামনে অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘর করছে অথচ শুধু ছেলেটার মুখ চেয়ে মুন্না নতুন একটা 'নিকের' কথা ভাবে না, এ ব্যাপারটার মার প্রশংসা আমি শুনেছি।

মা এই সামান্য মেয়েলী ব্যাপারটায় খুসী হোন আপত্তি নেই, আমি খুসী হয়েছি ওর সম্বন্ধে অন্য খবরটায়।

হাজার হোক গাড়ী কেনাই চলে, তাকে তেল জুগিয়ে যত্ন আত্তি করে চালানোই শক্ত, তাই বাধ্য হয়ে বাবা, মাথা পড়ে যাওয়া সত্ত্বেও পুরোন অষ্টিন গাড়ীটাকে বিদায় দিলেন। গাড়ীটা বিক্রীর পর, মুন্নাকে কোন কিছু কাজ দিয়ে সাহায্য না করতে পেরে, ওকে বাবা মাঝে মাঝে টাকা পয়সা দিতেন আর মা গরগর করতেন রাগে। বাবার সামনেই আমার কাছে বাবার প্রশ্রয়ের কথা বলতেন। বাবা পালটা রেগে যেতেন, টাকা পয়সা ত তিনি দেনই, কিন্তু ও ত' আর শুধু হাতে নেয় না! সংসারের কোন না কোন ভারী কাজ করে দিয়ে বা কোথা থেকে যোগাড় করে আনছে কোন না কোন জিনিষ তা সে গরুর জন্যে ভুষিই হোক বা আর কিছুই হোক।

লাল রঙের গাড়ীটার কোচোয়ানের জেল্লাদার সিল্কের লুঙ্গি আর মুখভর্ত্তি পানের আমেজ কবে শেষ হয়ে গেছে, চুপচাপ কতদিন বাড়ীর সামনের রকটায় বসে থাকতে দেখেছি ওকে। ছেলেটা ওর ওয়েল্ডিংয়ের কাজ শিখেও ওর খুব কাজে আসবে বলে ভরসা নেই ওর, পরিশ্রম বিক্রাবার মত সুযোগেরও অভাব ঘটেছে, শুধু রকের ওপর বিষণ্ণ মুখে বসে থাকা ছাড়া কোন দিন আমাদের কিছুই বলেনি।

সেদিন খালি বলেছিল, 'বড়িয়া ঘড়িয়া বই আছে বাবু, লেবেন'?

নিরাশ করেছিলাম ওকে, কারণ ওর এই সস্তায় যোগাড় করে দেওয়ার ব্যাপারটা আমার ভাল লাগেনি। বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে, দোকান থেকে ভুষি চেয়ে চিন্তে ওর নিয়ে আসা সম্বন্ধে, মায়ের অভিযোগটা খারাপ লেগেছিল বলেই।

ঘোড়ার গাড়ীর দিন তখনও ফুরোয়নি, শুধু নিজের দিন ফুরিয়েছে এই বিশ্বাসে বাবা কর্মজীবন থেকে অবসর পেতেই, চলে গেলেন বাইরে, স্বভাবতঃই মুন্নাকে আর আমাদের বাড়ীর সামনের রকটায় দেখতে পাইনা।

.....ট্রাম ষ্ট্যাণ্ডে ট্রামের পাদানিতে পা দিচ্ছি। ডাক এল, 'বাবু', আমাকে, হাঁ আমাকেই ডাকছে কে! রহমানের বিড়ির দোকানের সামনে বিড়ি গরম করার জন্যে উনুনের বাক্সটার পাশে ফুটপাথ থেকে ডাকছে মুন্না। আশা করিনি মুন্না এই সুরে ফুটপাথের ওপর বসে আমায় ডাকবে। ওর পাশে একটা লাঠি পড়ে রয়েছে। শতছিন্ন একটা পোষাক, মুখটা কোলাকোলা।

চেয়ে রইলাম বিস্ময়ের মত। তারপর উঠে পড়লাম ট্রামে। ওর এই ডাকে যে আবেদন ছিল, তার অর্থ আমি যে বুঝতে পারিনি তা ত নয়, তবে কেন সাড়া দিতে পারলাম না? ১ম বাসে যখন ভিখারীকে সকলের মধ্যে মাত্র একজন যাত্রী নিছক দয়া পরবশেই পয়সা দেয় সসঙ্কোচে, অন্য সবাই তার দিকে চেয়ে দেখছে হয়ত এই কারণেই, তেমনই ওকে ফুটপাথ পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে কিছু দিয়ে এলে সবাই চেয়ে দেখবে, এই ভয়ে ওকে কি কিছু দিলাম না? নাকি কোনদিন যে শুধু হাতে কিছুই হাত পেতে নেয়নি, সামান্যত দিয়েছে পরিশ্রম, না হয়ত এনে দিয়েছে অর্থের পরিপূরক তা যতই সামান্য হোক, তাকে আজ সামান্য কিছু ভিক্ষা দেওয়াটাই অস্বাভাবিক বলে থমকে গেলাম আমি।

আশ্চর্য, ভিখারীকে ভিক্ষা না দিলে ভিখারী যে কিছু ভাবতে পারে, এটা ভাবাই অস্বাভাবিক। কিন্তু মুন্না যখন ফুটপাথে বসে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে, তখন ভাবছি মুন্না আমার সম্বন্ধে কি ভাবছে এই মুহূর্তে?

লেখাবলি *

সুচরিতেষু,

আপনার সম্পাদিত "প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন" গ্রন্থ সংপ্রতি দেখিলাম। উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ১৯৪২এ প্রকাশিত হয়। তারপর উহার বোধ হয় আর কোন ভাগ কি সংস্করণ বাহির হয় নাই।

ঐ গ্রন্থের "সম্পাদকের নিবেদন" পাঠ করিয়া গ্রন্থ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের বিশেষতঃ "শব্দকোষ" প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে অভিলষিত হইতেছি! আপনার সৌজন্যের কথা সর্ব্বত্র বিদিত আছে! তাহার উপরে নির্ভর করিয়াই এই ক্ষুদ্র পত্রের অবতারণা করা হইল। আশা করি আপনার অমূল্য সময়ের কিঞ্চিৎ তন্নিমিত্ত ব্যয়িত হইলে আপনার সুজনতারই সম্যক্ পরিচয় প্রদত্ত হইবে, নিঃসন্দেহ!

গ্রন্থের নাম "প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র ও দলীল সঙ্কলন" দিলে অশোভন হইত না। কেননা, গ্রন্থের ভিতরে যে সমস্ত পত্র আছে, তাহার ভাষা দলীল সদৃশ—পত্রের ভাষা হইতে প্রভেদ। বিষয়বস্তুতেও দলীলের কথা লক্ষিত হয়। এমন কি পত্রগুলি দলীলেরই ন্যায় আড়াআড়ি ভাবে করা দেখা যায়। পত্রের প্রতিপাদ্যবস্তুতে আরজী, দরখোয়াস্ত, হুকুম, এক্‌রারনামা, কবুলিয়ৎ, প্রভৃতির যাহা উল্লেখন আছে, তাহা দলীলের অন্তর্গত। উহাদের বয়ানও তদ্রূপ! ঐ সব পত্রে আরবী, ফার্সী, উর্দু, হিন্দী, ইংরাজী, দেশজ, প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা প্রায়ই অপভ্রংশরূপে, বর্ণবিন্যাসের ত্রুটীতে অর্থ স্থির করায় পরিপন্থী। ইতিহাসের দিকে হয়ত কিছুটা মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে কতটা হইবে, যাহারা ঐ বিষয়ের আলোচনা করেন, তাহারা সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন।

ভারতে পত্র লিখার প্রচলন অতি প্রাচীন। 'পত্র' শব্দটি সংস্কৃত। লৌকিক সাহিত্যে ইহার প্রচলনও সুপ্রাচীন। মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলে আছে—"অস্মিন্ শুকোদরস্নিগ্ধে নলিনীপত্রে নখৈঃ নিক্ষিপ্ত-বর্ণং কুরু" (৩য় অঙ্ক)। এখানে 'পত্র' শব্দের প্রয়োগ সুষ্ঠু। প্রাচীনতা প্রকাশ করে, তাহাও সুস্পষ্ট। প্রাচীন যুগের মহর্ষি পাণিনীর "অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ" অথবা "অষ্টকম্ পাণিনীয়ম্" গ্রন্থের বৃত্তিকার মহামুনি বররুচি কাত্যায়ন (খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী) রচিত "পত্রকৌমুদী" (সংস্কৃত ভাষায় লেখন), উনবিংশতি শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালা ভাষার গঠন সময়ে রামরাম বসুর "লিপিমালা" (১৮০২ খ্রীঃ), মধ্য ও আধুনিক সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭—১৯০৫) "পত্রাবলী", রাজেন্দ্রলাল মিত্রের (১৮২২—১৮৯১) "পত্রকৌমুদী" (বাঙ্গালা ভাষার লেখ), স্বামী বিবেকানন্দের "পত্রাবলী," বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১—১৯৪১) "যাত্রী", "ছিন্নপত্র", প্রভৃতি লেখ্য দীর্ঘ গ্রন্থ সুরুচিসম্পন্ন, সুচিন্তিত এবং সুলিখিত বটে! ইহারা সাহিত্যের জলন্ত উদাহরণ! চিঠী শব্দটি বাঙ্গালা কিংবা সংস্কৃত শব্দ নহে। কিন্তু 'পত্র' অর্থে বাঙ্গালা ভাষায়

---

*লেখা (লিখ্ + অ—ভাবে)—স্ত্রীং। লিখন।

আবলি (ली), স্ত্রীং, (আ—বল—কর্ত্তৃবাচ্যে—ই)—শ্রেণী।

"Epistles, Letters বুঝাইতে 'লেখ'—'লিপি' 'পত্র', 'লেখা', 'লেখন' অপেক্ষা সুষ্ঠু এবং ভাবদ্যোতক! বর্ণ-বিন্যাসে আয়াসহীন, সুখোচ্চার্য লঘু শব্দের বহুল প্রচারে ক্ষতি কি?"—"প্রবাসী," পৌষ—১৩৪৯, পৃঃ ৩৭৪, পঙ্‌ক্তি ২।

প্রচলন সমধিক। ব্যুৎপত্তি ভাষান্তর হইতে আগত—'চিট্ঠী', 'চিট্ঠা' হইতে 'চিঠি', তাহা হইতে 'চিট্টি', চিট্টা' (See, Wilson's "Glossary" Enlarged edition, Calcutta, 1910, p. 175; also, Rev T. Craven's "New Royal Dictionary," Part Two, Lucknow, 1911, p. 61)। পালি ভাষায় 'লিটক', 'লিকার', 'লেতক' শব্দের দ্বারাও 'পত্র' বুঝায়। প্রাচীন কালে উহা যে বিদ্যমান ছিল তাহাও তদ্দ্বারা অনুধাবনের যোগ্য। এদেশে ফার্সী ভাষা এক সময়ে আদালতেরও ভাষা ছিল—"As English is the Court language now, so Persian was the Court language in Pre-British & Early-British days. Although Persian had ceased to be the language of the Courts in 1837, still in the Sudder Diwani Adalat and the Nizamat Adalat—the then highest judicial tribunals of Appeal (Civil and Criminal) in Calcutta—Persian and Urdu lingered as remnants and re-collections of Muhammadan Courts. Urdu was still regarded as the *lingua franca* of India, and the Delhi College was established in 1829 to impart Western education through the medium of Urdu. But the College was closed during the dark days of 1857."—See, "Barisal Hitaishi," Vol. LVII, 19, 1949, p. 2, col. 4, *s. v.* Svarup Ch. Guha—A Biographical Study. শুধু যে রাজকীয় ভাষা ছিল এমত নহে, সরকারী দফ্তর-খানায় চিঠী-পত্রাদিও ফার্সী ভাষায় লিখিত হইত। ফার্সী ভাষায় "দস্তুর্ সিয়িস্তান" পত্রের নিদর্শন গ্রন্থ!

সংস্কৃত ভাষায় 'কোষ' শব্দের আরেক অর্থ—অভিধান। ইহার বানান 'কোশ'ও হয়। কুশ্. ঘ—কর্তৃবাচ্যে-অস্। পুংলিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ দুইই হয়। বোম্বাই প্রদেশের সংস্করণে 'কোশ' এই বানান দৃষ্ট হয়। কাশী অঞ্চলে এবং বাঙ্গালার 'কোষ' বানানের প্রচলন অধিক দেখা যায়। আরবী, ফার্সী শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় হইলে transliteration এ ('অনুলিখন' বা 'অনুলেখন'—সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩২৪, পৃঃ ১৬৫ দ্রষ্টব্য) হওয়া সমীচীন। যে ভাষার যে শব্দ, তাহা সেই ভাষার বিশুদ্ধ ভাবে লেখাই বিধেয়। নহিলে অর্থ প্রস্ফুট হয় না। "শব্দ কোষে" (পৃঃ ২০৭-২৩০) তাহাই অনুসৃত হয়। উহার শব্দের অর্থ স্থানে স্থানে বেমন বিসদৃশও ঠেকে। পৃথক্ কাগজে কিছু কিছু সমাধানের জন্য প্রয়াসী রহিলাম।

প্রতিপাদ্যবিষয়ের সূক্ষ্ম আলোচনা এবং উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভের জন্য পাঠ করার পক্ষে "গ্রন্থ-পঞ্জী" (Bibliography র প্রয়োজন। উহা এমন ভাবের হওয়া আবশ্যক, যদ্দ্বারায় পাঠকবর্গের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়। প্রামাণিক গ্রন্থের উল্লেখন সমীচীন। তদ্দ্বারাও পাঠক-বর্গের সহায়তা হইতে পারে। Bibliography—D. Dictionaries (pp. 97-99) শীর্ষকের অন্তর্গত "Hema Kosh" গ্রন্থখানা কি সংস্কৃত গ্রন্থ? যদি হইয়া থাকে, তবে জৈনপণ্ডিত হেমচন্দ্র উহার রচয়িতা। তিনি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগে কুমার-পাল মালব প্রদেশে রাজত্ব করেন। পণ্ডিতকুলবর্য্য হেমচন্দ্র তাঁহার সভাসদ ছিলেন এবং তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেই গ্রন্থগুলি হেমচন্দ্রের প্রতিভোদ্ভিত রত্নরাজি, সংস্কৃত-সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। তন্মধ্যে "প্রাকৃত ব্যাকরণ," "অনেকার্থশব্দসংগ্রহ", "অভিধান-চিন্তামণি," "দেশীনামমালা" (প্রাকৃত অভি-ধান) প্রধান। সংস্কৃত ভাষার টীকাকারগণ "হেমকোষ" নামে হেমচন্দ্রের 'কোষ' বলিয়া কোথাও উল্লেখ করেন নাই। যেখানেই উহার উল্লেখন আছে, সেখানেই "ইতি হেমচন্দ্র :" অথবা "ইতি অভিধান-চিন্তামণি :" দৃষ্ট হয়। বলিতে পারি না "হেমকোষ" গ্রন্থখানা অন্যমীয় ভাষায় কি না? ঐ "গ্রন্থ পঞ্জী"তে আরও কয়েক খানা বাঙ্গালা

এবং ফার্সী অভিধানের নাম প্রদত্ত হইলে পাঠকবর্গ তদ্দ্বারা উপকৃত হইবেন এরূপ ভরসা করা যায়।

আপনার নিকটে সম্পূর্ণ অপরিচিত, কিন্তু আমার পিতৃদেব স্বর্গত অবিনাশচন্দ্র গুহ মহাশয় আপনার নিকটে সুপরিচিত ছিলেন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যদেশীয় নানা-ভাষার নানাবিষয়ে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য থাকায় তিনি শিক্ষিতমণ্ডলীর নিকটে সমাদৃত হইতেন। আরবী এবং ফার্সী ভাষায় তিনি ইল্‌ম্ (আ—বিদ্যা। আলিম্—বিদ্বান্ —Allama—profound scholar) ছিলেন—"Late Avinas Chandra Guha, M.A., B.L., an erudite scholar of Classical Languages of the West & the East, whose learning was envied by most Persians themselves, for his vast knowledge and unrivalled command over Persian language and deep erudition in Persian culture, who was an authority on Hindu Law, an eminent jurist as well of the Calcutta High Court."—"Advance," Calcutta, Wednesday, March 26, 1952, p. 4, col. 4. সঙ্গীত-শাস্ত্রেও তাঁহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। *

আমার পিতামহ স্বর্গীয় স্বরূপচন্দ্র গুহ (১৮২৪-১৮৮১) মহাশয় বাকরগঞ্জ জিলার প্রধান উকীল (আ—বকীল্—vakil) ছিলেন। আরবী, ফার্সী, উর্দু, প্রভৃতি ভাষায় তিনি প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার অধিকারী ছিলেন! ফার্সী ভাষায় তাঁহার মোকদ্দমার সওয়াল্ জবাব্ তদানীন্তন সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের নিকটে বিস্ময়জনক ব্যাপার হইত! সেই নিমিত্ত তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আরবী, ফার্সীতে গভীর জ্ঞান থাকায় তিনি "মুন্সী" পদবাচ্য ছিলেন—"The word "Munshi" is of Arabic origin, from নশিউন or নসিউন (nasiun)—to grow, and therefrom ইন্‌সা (insa)—to cause to grow, now used in the sense of writing. It is meant amongst others—a learned, a good hand in correspondence and a past-master in composition."—See, "Barisal Hitaishi," Vol. LVII, 19, 1949, p. 2, col. 4, *s.v.* Svarup Ch. Guha—A Biographical Study. ফার্সী ভাষায় তিনি আলিম্ (Allama) ছিলেন—"The proficiency of certain men in Eastern Classics (*i.e.* in Arabic, Persian), both written & spoken, is a theme of wonderful thing to many Muslims themselves. East has produced many such eloquent and impressive speakers in Eastern Classics; among them Svarup Chandra's is a household word certainly to conjure with."—Do., Do, 22, 1949, p. 3, col. 3, *s. v.* Do., Do.

বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালীদের ভিতরে দিল্লীর প্রবাসী-রূপে শিক্ষাব্রতনে যাঁহারা খ্যাতি লাভ করেন, তন্মধ্যে আপনি শীর্ষস্থান বিমণ্ডিত করায় সুদূর বাকরগঞ্জ জিলাবাসী পরম গৌরব মনে করে!

আশা করি পত্রোত্তরে বাধিত করিবেন।

ইতি—

বশংবদ

শ্রীবিজেন্দ্রনাথ গুহচৌধুরী।

সংক্ষিপ্ত বিবরণ যাহা পৃথক্ কাগজে দেওয়া হয় —
পত্রের সঙ্গে—

শব্দ কোষ ১-৮।

আ। আয়েক্কা—অপেক্ষাকৃত। ই। ইজাফা—ইত্যাদি। উ। উমেদার—উমেদার। এ—এখতিয়ার—এতবার। ও। ওক্ত—ওয়াক্ত। ক। কএদ—কয়েদ। খ। খয়ের খাঁ—খোশামুদে। গ। গরদিশ—গ্রহচক্র। চ। চাকলা। জ। জাবেদা—জমাবন্দী। ত। তকরার—তাকাদা। দ। দফা—দোস্ত। ন। নিস্পি। প। পরোয়ানা—পাতশাহী। ফ। ফরমদা—ফারখত। ব। বরখেলাফ—বাবৎ। ম।

* "সোনার বাংলা", ঢাকা, ৪৩শ সংখ্যা, ১৩৫৬, পৃঃ ৪-৮, *s. v.* "গীত-বিতানে অবিনাশচন্দ্র।"

Bibliography

D. Dictionaries

Vidyavinoda, Rajani Kanta—Bangiya-Sabdasindhu, Calcutta, 1907.

Vidyalankara, Rama Kamala—Sachitra Prakritivada Abhidhana, Sixth ed., 1911, Calcutta.

Ray, Jogesa Chandra—Bangala Sabda Kosa, Bangiya—Sahitya—Parishat, Calcutta.

Das, Jnanendra Mohan—Bangala Bhasara Abhidhana, Second edition, revised and enlarged, 1344 B. S., Calcutta.

Palmer, E. H.—Persian Dictionary.

Transliteration বা 'অনুলিখন,' 'অনুলেখন'—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত বাঙ্গালা ভাষার অভিধান গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের ভূমিকা (কলিকাতা, ১৩২৩), বিশেষতঃ পৃঃ ১০-১৩, এবং পরিশিষ্ট ভাগের প্রতিবর্ণীকরণের নিয়ম (পৃঃ ১৪৩৬-১৪৪১, ১৪৬১-১৪৭৪) এবং পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম ভাগ (১৩৪৬ সাল), পৃঃ ২৩-২৪, পৃঃ ৩০-৩১, পৃঃ ২১-২২এর ধারানুযায়ী অনুসরণ করা হইয়াছে। তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি ! *

মান্যবরেষু,

আপনার অনুগ্রহ পত্র পাইলাম। আপনি নবসম্পাদিত "প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলন" ১০ বৎসর পরে এত যত্ন সহকারে পাঠ করিয়াছেন তাহার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এই পত্রের উদ্দেশ্য আপনার আপত্তি খণ্ডন করা নহে। কি কারণে শব্দকোষে আরবী পারসী শব্দের যথাযথ অনুলিখন হয় নাই, কি কারণে সঙ্কলনের বর্ত্তমান নামকরণ হইয়াছে তাহাই বলিব। ভাষার দিক দিয়া সাহিত্যের দিক দিয়া এই পত্রগুলির কোন মূল্য আছে কি না তাহা বিচারের ভার ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের, আমি অনধিকার চর্চ্চা করিব না।

প্রথম কথা যদি archives অর্থে দলীল শব্দের প্রয়োগ হয়, তবে সঙ্কলিত পত্রগুলি দলীল অর্থাৎ নহে। এ পর্য্যন্ত ঐ অর্থে দলীল শব্দের প্রয়োগ দেখি নাই। দুই একটি ব্যতীত ইহার মধ্যে একরার নামা বা কবুলিয়ত জাতীয় দলীল নাই। ইহার প্রায় সকলই পত্র। আড়াআড়ি স্বাক্ষর করা সেকালের রীতি ছিল। এই রীতি কেবল বাঙ্গালা পত্রে নহে মৎ সম্পাদিত Sanskrit Documents এ ও পুরীর পণ্ডিতদিগের লেখা চিঠিতে দৃষ্ট হইবে। যাহাদের মোহর ছিল তাহারা স্বাক্ষরই করিতেন না। দলীল পত্রে প্রধানতঃ প্রাচীন ভাষারই ব্যবহার হয়, ইংরাজীতেও দলীলের ভাষা বর্ত্তমান কালের ভাষা হইতে পৃথক। একদিন যাহা প্রচলিত ভাষা ছিল এখন কেবল দলীলেই তাহার ব্যবহার দেখা যায়।

শব্দ কোষে টীকা টিপ্পনী পণ্ডিতজনের প্রয়োজন হয় না। ইহা সাধারণ শিক্ষার্থীর জন্য। পত্রে যে শব্দের যে রূপ আছে শব্দকোষে সেইরূপ দিলেই সাধারণ শিক্ষার্থীর সুবিধা হয়। যাহারা আরবী, পারসী জানেন তাহারা লেখনীতে প্রদত্ত আরবী, পারসী শব্দই পাইবেন।

আমি এই সঙ্কলন সম্পাদনে যে সকল পুস্তক ব্যবহার করিয়াছি তদতিরিক্ত কোন বইর উল্লেখ করি নাই। এখানে মহাজনদের পদাঙ্কই অনুসরণ করিয়াছি।

"হেম কোষ" সম্বন্ধে আপনার সন্দেহের কারণ বুঝিলাম না। Bibliographyতে স্পষ্ট লেখা আছে হেমচন্দ্র বরুয়া কৃত "হেম কোষ"। হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণির সহিত ভুল করিবার কারণ বুঝিলাম না।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে ঐতিহাসিক কাগজপত্রে সম্পাদকের একটা সর্ব্বমান্য রীতি আছে। কোন শব্দের বর্ণবিন্যাসের ব্যতিক্রম করার অধিকার সম্পাদকের নাই। ইংরাজী ফরাসী ঐতিহাসিক দলীল পত্রের সম্পাদনে এই রীতিই গৃহীত হইয়াছে। আমি পাণ্ডিত্যের দাবী

---

* ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে দিল্লীতে কলিকাতা হইতে প্রদত্ত ২।৯।১৯৫২ ইং তারিখের পত্র

করিতে পারি না। আরবী, পারশীও জানি না। বিশ্ববরেণ্য পণ্ডিতেরা যে নিয়ম প্রচলন করিয়াছেন, তাহাই মানিয়া চলি। কোন কোন শব্দ অপ্রচলিত বলিয়া, কোন কোন শব্দের বিকৃত রূপের জন্য অর্থ বোধের অসুবিধা হয়। এই অসুবিধা দূর করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। চেষ্টা হয়ত সফল হয় নাই।

ইতি—

নিবেদক

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ সেন †

সুচরিতেষু,

আপনার ১৮।১।৫২ তারিখের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আপনার অমূল্য সময়ের কথঞ্চিৎ আমার ক্ষুদ্র পত্রের জন্য যে ব্যয়িত হইয়াছে, তজ্জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন!

প্রাচীন কাগজ-পত্রাদিকে দলীল বলিতে কোন বাধা আছে কি না জানি না। দলীল শব্দটি আরবী। ইহার প্রকৃত অর্থ হইতেছে কোন বিষয়ের লিখিত প্রমাণ, document. তাহা প্রাচীন হউক আর অর্বাচীন হউক। দলীল শব্দের সঙ্গে আরেকটি শব্দের নিবিড় সম্বন্ধ। তাহা এই—'দস্তাবেজ'। শব্দটি ফার্সী—দস্ত্+আবেজ্। অর্থ—লিখিত প্রমাণস্বরূপ কাগজ্-পত্র।' একার্থবোধক দুইটি শব্দ। ইংরাজিতে এই ধরণের শব্দের প্রয়োগ আছে। বাঙ্গালায় ভূরি ভূরি, সংস্কৃতেও অভাব নাই। Archives শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'দলীল' যে না বুঝায় এমত নহে। তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় এই—"Place in which public records are kept; the place in which government records are kept. Fr. (*-if,-ive*), f.LL. *archi* (*v*) *um* f.Gk. *arkheion* public office (arkhe government)—usually used plural." মহাফেজ—ফা। মহাফিজ। অর্থ—দপ্তরের কেতাব-পত্র, ফাইল, ইং রক্ষক record-keeper, তাহা হইতে মহাফেজ-খানা—আদালত বা অন্য দপ্তরের বহি, খাতা, নথি, পত্র, যে গৃহে সংরক্ষিত হয়, record room. Record অর্থে 'দলীল' সুস্পষ্ট। মূল্যবান্ কাগজ্ মাত্রেই 'দলীল'। সংরক্ষিত হয় বলিয়াও উহার গুরুত্ব অনেক। আদালতে মামলা সংক্রান্ত কার্য্যাদিতে পক্ষ কর্তৃক দাখিল্ হইলে তিরিশ বৎসরের কালের কাগজের তসদীক্ করার আবশ্যক হয় না*। কাজেই, Archives অর্থে 'দলীল' শব্দের প্রয়োগ শুদ্ধ এবং সুষ্ঠু। শব্দের সব অর্থের প্রকাশ বিরল। ব্যুৎপত্তির দ্বারা নির্ণীত, অথচ প্রয়োগ নাই। না থাকিলেও অর্থে অশুদ্ধ হয় না। প্রাচীনত্বের দিকে 'পত্র'ও দলীল হইতে কি বাধা আছে? আমাদের এষ্টেটের মহাফেজ-খানায় ইতিহাস প্রসিদ্ধ বহু প্রাচীন দলীল দেখা যায়। তাহাতেও অড়াআড়ি ভাবেই সহী আছে। দলীল ছাড়া বহু প্রাচীন পত্রও আছে, যাহার নিম্নেই পত্রস্থ ব্যক্তি দৃষ্ট হয়। মোহর সঙ্গে স্বাক্ষরই শুদ্ধ। অতি প্রাচীন কাল হইতে তাহা চলিয়াও আসিতেছে। "যাহাদের মোহর ছিল তাহারা স্বাক্ষরই করিতেন না"—এ কথা ঠিক্ বলিয়া মনে হয় না। কেননা, আমাদের মহাফেজখানায় রক্ষিত দলীলেও মোহর সহিত স্বাক্ষরই দেখিয়াছি। কেবল মোহর আছে, স্বাক্ষর নাই এমন নহে! এ কথা সত্য, কালে যাহা প্রচলিত, অকালে তাহা অপ্রচলিত হয় এবং দলীলেই মাত্র পর্য্যবসিত থাকে। প্রাচীনতার দিকে উহা একটি অকাট্য প্রমাণ, নিঃসন্দেহ।

যে অভিধান প্রামাণিক এবং নির্ভরযোগ্য, তাহাই ব্যবহার করা বিধেয়। দুই-একখানা অভিধানের যে নামোল্লেখ "গ্রন্থ-পঞ্জী"তে দেখা যায়, তাহা উক্ত পর্য্যায়ের কোনটিরই মধ্যে পড়ে না। প্রমাদযুক্ত অভিধান ব্যবহার করা কোন ক্রমেই সঙ্গত নহে। শব্দার্থ বিশিষ্ট নিবন্ধ-লেখককে স্মরণ করাইবার কি প্রয়োজন আছে?

† শ্রীবিজেন্দ্রনাথ গুহ মহাশয়ের নিকটে কলিকাতায় দেওয়া ১৮।১।৫২ ইং তারিখের পত্র।

* Evidence Act, sec. 90 (Presumption as to documents thirty years old). 18 W. R. 485, 1921 Pat. 49. 5 Pat. L.J. 563. 57 I.C. 786, 5 Dom.L. R. 144.

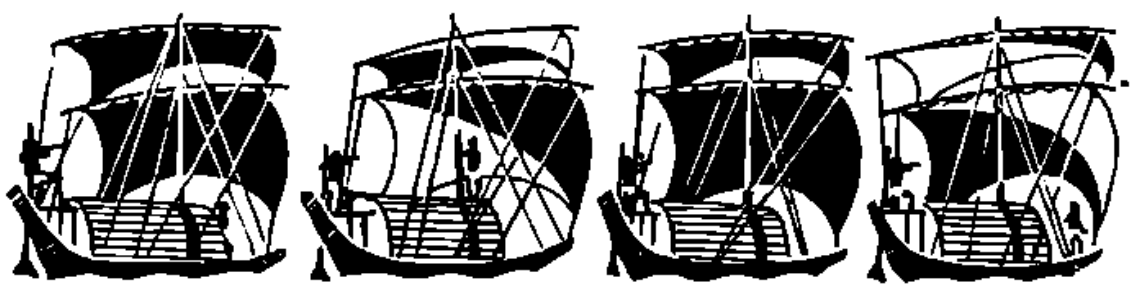

"অনেক কিছু পাওয়ার মাঝে"

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

এক

অধ্যাপক অলক ঘোষের নীরস ক্লাসেই আমরা হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেললাম যে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে দার্জিলিং যেতে হবে। পেছনের বেঞ্চে অবশ্য আমরা কেবল দু' জন ছিলাম—সুব্রত, নিশীথ, রথীন, তারাশংকর, অসিত ও আমি। অধ্যাপক ঘোষের লেকচারের প্রতি যে আমরা বিন্দুমাত্র-ও অমনোযোগী নই সে-প্রমাণ দিতে সর্বদাই প্রস্তুত থেকে আমরা চটপট ঠিক ক'রে ফেললাম আমাদের কর্মসূচী।

তাই পাঁচ পাঁচ পঞ্চার তারিখ সকাল সকাল সাড়ে ন'টার শেয়ালদহ ষ্টেশনে আমরা মিলিত হ'লাম। দশটা পঁচিশে ছাড়ল নর্থ বেং একস্‌প্রেস্। ট্রেনে যখন এখন যেতে পারব-ই না তখন রেলগাড়ি ছাড়া আর উপায় কী? "আরাম হারাম হ্যায়" বাণীকেই তাই মাথুকরী ক'রে আমরা রওনা হ'লাম।

ছোট্ট একটা কামরা। দু'টো পাখা আছে, কিন্তু তার মধ্যে একটা কেবল সচল। দু'টো বেঞ্চ আমরা অধিকার ক'রে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে আমাদের এক বেঞ্চে লক্ষ্য করলাম এক বয়স্ক ভদ্রলোক বেশ পা গুটিয়ে ব'সে নৈনিক বসুমতী পড়া সুরু ক'রে দিয়েছেন। নিশীথকে আমরা বলি বড়দা—এ যাত্রায় সেই আমাদের ম্যানেজার। বড়দা-ই জিজ্ঞেস করে ভদ্রলোককে, "ও দাদা, কতদূর যাবেন?" নির্বাক, নিরুত্তর সে ভদ্রলোক। কিছুক্ষণ বাদে আরেকবার জিজ্ঞেস ক'রে সেই এক-ই নির্বাক প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল। বললাম, "বড়দা, চেপে যাও!"

দক্ষিণেশ্বর ষ্টেশনে গাড়িটা দাঁড়াল। আমরা-ও নেমে দাঁড়ালাম, যাত্রার সময় একটু পুণ্যের স্পর্শ যদি পাওয়া যায়। চারধারের মেটে আর সবুজ রঙের মধ্যে রক্তরাঙা কৃষ্ণচূড়া সহজেই আকর্ষণ ক'রে নেয় মনকে।

গাড়িতে উঠবার আগে বুদ্ধি ক'রে কিছু লজেন্স কিনে নিলাম। বড়দার হাতে বিতরণের ভার দেওয়াতে প্রথমেই সে বসুমতী-পাঠরত ভদ্রলোককে দু'টো সাংলো। চশমার তল থেকে দু'টো চোখ বের ক'রে একগাল হেসে ভদ্রলোক মুখপৎ আপত্তি ও গ্রহণ করলেন আমাদের আমন্ত্রণ, এবং তক্ষুণি গালে গুঁজে দিলেন দু'টো লজেন্স। এবার আর আমাদের জিজ্ঞেস করতে হ'ল না তাঁর গন্তব্যস্থানের কথা—আমরা-ও আর একটি অসমবয়সী বন্ধুলাভ ক'রে ধন্যতারী হ'লাম।

...কী করা যায় সারা দিনটা? সংগে কোনো জিনিসের-ই অভাব নেই—আছে আগাথা ক্রিষ্টি, আছে তাস, আছে সুব্রতর সংগীত আর আমার সারেংগী। প্রথমে আমরা তাস খেলতে বসলাম—জমল না। বন্ধ ক'রে রাখা হ'ল তাস। আগাথা ক্রিষ্টিও কেউ পড়ল না। অগত্যা সুব্রত, আমি আর বড়দা আরম্ভ করলাম উচ্চাংগ সংগীতের আসর। কিন্তু তা-ও জমল না। হংসধ্বনির পর বেহাগ, তারপর কয়েকটা ঠুংরি, তারপর তারানা—সবই চলল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার নৈষ্ঠিক সারেংগী হ'ল বাজাতে নারাজ, বড়দার বেঞ্চের ওপর তবলা বাজানো-ও হ'য়ে উঠল বেতাল—কাজেই সুব্রত আর কতো পারে চালাতে! রথীন ও অসিত বাবাজীরা রেলগাড়ির চঞ্চলা নিদ্রাদেবীর ক্ষণিক প্রসাদ লাভ করেছে। তারাশঙ্কর ক্যাপষ্টান ফুঁকে চলেছে টিন বা'র করে।

রামপুরহাট। কেলনারকে ছোটাছুটি করতে দেখে

আমাদের কিদে পেয়ে গেল। পকেটে ইস্তিরি-করা অনেকেরই পঞ্চাশটি টাকা—কাজেই একটু-ও কিদে সহ্য করবার কথা নয়। এরপর তিনপাহাড় ষ্টেশন আসতেই শোনা গেল এখানকার চা খুব ভালো। কাজেই চা-পান-ও উপেক্ষিত রইল না।

ছ'টার আগে-ই সকরিগলিঘাট এসে গেল। নামতে হবে জেনে সবার-ই কেমন যেন অস্বস্তির ভাব রয়ে গেল। এর মধ্যেই শেষ দীর্ঘ ও বিচিত্র পথ শেষ হয় নি—কিন্তু প্রথম ভাগটা তো শেষ হ'য়ে গেল।

এরপর ষ্টিমারে যেতে হয়। কিন্তু লঞ্চ-এ গেলে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ব'লে তা'তেই আমরা মোটঘাট ক'রে নিয়ে গেলাম। একমাত্র অসিত-ই একটা কুলী ক'রে তার পরিচ্ছন্ন পোষাক এবং মেহনতী জনতার প্রতিনিধি কুলীর প্রতি সুবিচার করল।

একঘণ্টা ধ'রে সুন্দর সান্ধ্যভ্রমণ হ'ল লঞ্চে। নিম্নশ্রেণির লোকে। অপূর্ব লাবণ্য নিয়ে কয়েকজন অল্পবয়সী চীনা মহিলা আমাদের সামনে দিয়ে গেলেন পেছনের বেঞ্চে। বড়দা বাংলা ভাষায় ওদের আয়তনা ও টিকটিকি খাওয়ার জন্য গঞ্জনা শুনিয়ে দিয়ে অর্থহীন দৃষ্টি লাভ করল।

মনিহারিঘাট। শিলিগুড়ি যাবার গাড়ি তখনো দেয় নি। আর শোনা গেল, নিকটেই একটা উত্তম "সামিস" ভোজনালয় আছে। নোট্‌গুলো তখনো তাদের অস্তিত্ব ঘোষণা করছিল। তাই পালা ক'রে ছুটলাম খেতে। এঁড়েদের ডালনা আর মাংস দিয়ে যে সুস্বাদু নৈশ-আহার হ'ল, আহা, সে-কথা আর ভুলব না। এতো সুন্দর খাওয়া অনেকদিন খাইনি।

কিছুক্ষণ পরে গাড়ি দাঁড়াল: হৈ চৈ ক'রে উঠে পড়লাম। আমি আর তারাশংকর দু'টো বাংক অধিকার করে হোল্ড্-অল্ খুলে বিছানা সাজিয়ে ফেললাম। ওদের কী হ'ল সে দেখা চলে না এ-সময়ে। এ-সব ক্ষেত্রের নীতি হচ্ছে—"United we stand, divided we sit".

যে গাড়ি ছাড়বার কথা রাত ন'টা তিরিশে, তা বোধ হয় সাড়ে বারোটায় ছাড়ল। বোধ হয়, কারণ তার আগেই নিদ্রিত হ'য়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ ভীষণ চেঁচামেচি শুনে জেগে উঠলাম। শুনলাম ক্যাটিহার জংসন এসেছে এবং এক রাশ লোক উঠছে কামরার মধ্যে। এ ওর মাজানো বিছানার ওপর নোংরা পুটলি রাখে, ও ব'সে পড়ে ঘুমন্ত লোকের মুখের ওপর, এর সঙ্গে ওর হাতাহাতি বচসা—সব আরম্ভ হ'য়ে গেল, এবং রেল কর্তৃপক্ষের পুনঃপুনঃ ঘোষণা সত্ত্বেও সন্দেহ রইল না তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের সুখসুবিধা সম্বন্ধে। হৈ চৈ এর মধ্য থেকে শুনলাম, বড়দা শুয়ে পড়েছিল বেঞ্চের নিচে—ক্যাটিহারে এক বুড়ো ওর হাত মাড়িয়ে দিয়েছে সম্পূর্ণভাবে। তার ফলে বড়দার শুধু ঘুমই ভাঙে নি, রক্তপাতও ঘটেছে কিছু।

ঘণ্টা দুয়েক দেরী হলেও শিলিগুড়িতে আমরা পৌঁছলাম ঠিকই। এবার আরম্ভ হ'ল আসল ভ্রমণ—এতক্ষণ ছিল অসহ্য পরিক্রমণ। শিলিগুড়ি সমুদ্র সমতল থেকে বেশি উঁচুতে নয়, কাজেই যে সাড়ে সাত হাজার ফিট উঠতে হবে তা হ'ল সুরু।

যে পথে চলতে মনে হয় এই বুঝি পা ফসকে প'ড়ে গেলাম, সেই পথে মানুষের হাতে তৈরী রেলগাড়ী ছুটে চলেছে বেগে। একটা পাহাড় থেকে আরেকটা পাহাড়ে যাওয়ার জন্য কতো পরিশ্রম করতে হয় রেলগাড়িকে—ঘুরে ঘুরে, এগিয়ে পিছিয়ে, ঠেলা মেরে মেরে উঁচুতে উঠতে হয়। মাঝখানে বিরাট খাদ—ভীষণ গভীর এবং বিস্তৃত—নিচের চা বাগানগুলোকে মনে হয় যেন সবুজ রঙের পিটুলি দিয়ে আলপনা আঁকা—সেই খাদের চারধার বার কয়েক ঘুরে উঠতে হবে গাড়িকে। ওপরে উঠে এসে যদি পিছনে তাকানো যায়—ভাবতে পারা যায় না কিছুতে যে কী ক'রে আমরা এলাম এ পথ! পথের দুর্গমতা যতই বাড়তে থাকে ততই বুঝতে পারা যায় নিশ্চয়ই এ পথের শেষে এমন সম্পদ আছে যার জন্যে এতো কষ্ট ও এতো অর্থব্যয়ও অপ্রয়োজনীয় মনে হয়নি পথ নির্মাতাদের কাছে।

বৈচিত্র্যেরও একটা সীমা আছে ; কিন্তু এ যে অসীম বৈচিত্র্য। এতো সহস্র চিত্রপট প্রতি মুহূর্তে এখানে আঁকা হচ্ছে নতুন নতুন রঙের তুলিতে, যে কোনো একটা দৃশ্যকে সব চেয়ে সুন্দর ব'লে ধরা যায় না। সৌন্দর্যসন্ধানী মন তাই প্রথমে হয় বিস্ময়বিমূঢ়, তারপর হয় বৈচিত্র্যচঞ্চল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হ'য়ে যায় তন্ময়, উদাসীন। শত শত কাব্যের রাগিণী একসঙ্গে প্রাণের তন্ত্রীতে আঘাত হানে ; তার ফলে, যে সুর শোনা যায় তাতো কোনো এক বিশিষ্ট সুর নয়—শত শত ব্যঞ্জনাভরা সুরসমষ্টি। এপথে এলে তাই অকবি হয়তো কবিতে পরিণত হয়, কিন্তু কবির ঘটে বিভ্রান্তি।

আমাদেরও এতো সহ্য হ'ল না। স্বরচিত কোনো শ্লোক বেরোল না, তাই ধীরে ধীরে মন্দাক্রান্তায় তালে তালে আবৃত্তি করতে লাগলাম অনেকদিন আগেকার পড়া মেঘদূতের বিলাপ—

"ধূম-জ্যোতি :-সলিল-মরুতাং ক্ব মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক্ব পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু॥"

বড়দা কোনো দিনই কবি নয়—তবু রচনা ক'রে আবৃত্তি করতে লাগল তার নিজস্ব কবিতা—

"এম্-এ পাশ ক'রে প্রেমে পড়া নাহি যায়—
এখানে যে তাই ব্যর্থ অর্থনীতি
মেঘের রাজ্যে পৃথিবী পন্ডময়
বলদালো রুটি যেন পূর্ণিমা চাঁদ!

অসিত এতক্ষণ নীরব ছিল ; এবার মুখর হ'য়ে বলল—

"আমার কবিতা যেন কচি কচি পণ্ডারের ছানা
দার্জিলিংয়ের ট্রেণে যেন আফ্রিকা থেকে আনা।

দুই

স্টেশন থেকেই মুক্তবাজী আমাদের পাকড়াও ক'রে নিয়ে গেলেন তাঁর ইণ্ডিয়ান হোটেলে। আসল নাম ভদ্রলোকের অবশ্য মুক্তাফী—গনেশ চন্দ্র মুক্তাফী। সামনেই গালাগাল দেবার জন্য বড়দা অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের বলে রচনা ক'রে ফেলল তার ওই নাম।

এই প্রথম কুলী করলাম। ছুটিয়া রমণী। আমাদের দু'জনের মালপত্র ওরা দু'জনে নিয়ে চলল। কপালের সংগে আটকিয়ে দিঠে ঝুলিয়ে ওরা মালপত্র নেয়। একেই তো এতো ওজন, তার ওপর দার্জিলিংয়ের খাড়া ঢালু পথ। কাজেই বারো আনা ক'রে পয়সা ওরা নিলে বটে কিন্তু তার জন্য কোনো শোক অনুভব করলাম না।

মস্ত বড় ঘর একটা দেখিয়ে দিলেন মুক্তবাজী। আমাদের মন ওঠে নি দেখে বললেন, "আমার হোটেলে এটাই হচ্ছে বেস্ট্ ঘর এই তো আপনারা আসবার আগে স্কটিশের বারোজন মেয়ে এই ঘরে থেকে গেলেন। আর এই যে দেখছেন জানালাটা—সকাল বেলায় এর পাট দু'টো খুলে দিলেই দেখতে পাবেন কাঞ্চনজঙ্ঘা।"

ভুল হ'য়ে গেছে মুক্তবাজীর বেশভূষার পরিচয় দিই নি। কারণ পরে বুঝলাম—এর একটা বিশেষ অর্থ আছে। ছেঁড়া, ময়লা একটা কাপড় পরা, সাদা রঙের জামাটা-ও মেটে হয়ে গেছে। মাথার চুল উসকো খুসকো রোগা চেহারা। সব মিলিয়ে বেশ একটু প্রলিটারিয়েট গোছের দেখায়।

আমরা তখনো কিছু বলি নি। বড়দাই বলল, "এই ঘরে থাকতে হবে জানলে আমরা দার্জিলিং আসতুম না। যাক্ গে—মুক্তাফীদা, আমরা দু'জন এক ঘরে থাকব, আপনি সাড়ে চারটাকা বলেছিলেন, আমরা দেব প্রত্যেকে চার টাকা ক'রে। এ কন্‌সেশনটুকু না করলে—আমাদের কুলী এখনো বিদায় দিই নি—

একমুহূর্ত ভাবলেন মুক্তবাজী, তারপর বললেন, "আচ্ছা, ঠিক আছে। আপনাদের খুশী করা নিয়েই কথা—দু'চার আনার জন্যে আটকাবে না।

তখন সন্ধ্যে হ'য়ে গেছে। আমরা চটপট বিছানা তৈরী ক'রে ফেললাম। তারপর গরম জলে স্নান ক'রে একটু সুস্থ হওয়া গেল। সারাটা রাস্তায় শরীরের যা অবস্থা এবং চেহারার যা হাল হ'য়েছিল কালিতে করলায়

তাতে আমাদের তিনবারই উপায় ছিল না সিকসথ ইয়ার ইকনমিক্সের ছাত্র ব'লে।

খাবার টেবিলে ব'সে মুক্তবাজীর ওপর সমস্ত রাগ ভুলে গেলাম। কলকাতার দুর্লভ বাঁধাকপির ঘণ্ট, মুসুরীর ডাল আর গরম গরম মাংস—আহা! আমি নাই! বা গেলাম বিলেত, নাই বা পেলাম রাজার খিলেৎ—পরজন্মে যেন শুধু মুক্তবাজীর ইণ্ডিয়ান্ হোটেলের বোর্ডার হ'তে পারি।

খাওয়া শেষ হ'লে অমনি সুবোধ বালকের মত 'হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া বিশ্রাম করিতে' বসলাম না। গরম কাপড়ে সিকসথ ইয়ারের ছাত্র সেজে বেড়াতে বেরোলাম। রাত হ'য়ে আসছিল—তাই বেশীদূর না গিয়ে মালে গিয়ে বসলাম। লোক বেশী নেই—পেটরোগাদের শ্বাসপ্রশ্বাসে ম্যল্ দূষিত হয় নি তাই।

ফিরে এসে সবাই বার বার বাড়ীতে চিঠি লিখতে লাগল। তারাশংকর কাব্য ক'রে লিখল তার বান্ধবীর কাছে এক চিঠি, আমাদের আবার জোর ক'রে প'ড়ে শোনালো। আমি শুয়ে পড়লাম লম্বা হ'য়ে। কল্পনা করা যেত না কলকাতায় থাকতে এক লেপ-কম্বল চাপানোর কথা। চোখ বুজে ভাবতে লাগলাম সারা দিনকার ঘটনাগুলো। মনে পড়ল লজেন্স খেয়ে অস্থায়িক হওয়া সেই ভদ্রলোকের কথা। কিন্তু তন্দ্রাঢ়ানো চোখ তারো চেয়ে বেশি মনে পড়তে লাগল লকে অনেকক্ষণ ধ'রে দেখা এক কৃষ্ণকলির একজোড়া কালো হরিণ চোখ।···

এক সুনিদ্রার পর ঘুম ভাংলো ভোর বেলায়। মুখ বের করে ওপরে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। পুরোণো চুনকাম সারি বেঁধে চটে গিয়ে কতকগুলি অদ্ভুত আলোয়ারের রূপ নিয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে তিন চারটে রূপ নিয়েছে ঠিক গণ্ডারের মতো। অসিত জেগে উঠেছে দেখে বললাম, "ওই স্যাখ, তোর কচি কচি গণ্ডারের ছানা।

কিন্তু তার উত্তর না দিয়ে অসিত চেঁচিয়ে উঠল জানালা খুলে দিয়ে। "কাঞ্চনজঙ্ঘা"! কাঞ্চনজঙ্ঘার নাম শুনেই সবার ঘুম দূর হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখলাম —মনে হ'ল রজতশুভ্র পুঞ্জীভূত তুষারস্তূপের ওপর সূর্য-কিরণ ফেলে নীল আকাশের পটভূমিতে কাঞ্চনজঙ্ঘা-শীর্ষের প্রতিটি রেখা অনুপম দক্ষতায় কোন্ মহাশিল্পী যেন এইমাত্র এঁকে রেখে উঠলেন। নীরব নত দৃষ্টিতে আমরা বার বার ধন্যবাদ দিতে লাগলাম সেই শিল্পীকে, যিনি আজ আমাদের জীবনের পরমতম লক্ষ্যের সত্তাকে সার্থক ক'রে দিলেন। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা মাইল পঞ্চাশেক। কিন্তু মনে হয় না কিছুতে যে এতো সুন্দর এতো দূরের জিনিষ হতে পারে।

ইতিমধ্যে চা ও টিফিন এসে গিয়েছিল। খেতে খেতে একটু পরেই আবার চেঁচিয়ে উঠল অসিত, কাঞ্চন-জঙ্ঘা কই গেলো?" ততক্ষণে কাঞ্চনজঙ্ঘা মেঘের চকল অবগুণ্ঠনে আবৃত করে ফেলেছে তার সুন্দর শোভা। কেবল সাদা মেঘ আর মেঘ—যেন চুনকাম করা বিরাট এক দেয়াল।···

ঘরে তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। যার বার্চহিল —রাজভবনের ওধারে একটা পাহাড়। ক্রমেই অভ্যস্ত হয়ে গেলাম আমরা খাড়াপথে উঠতে। প্রায় ত্রিশ ডিগ্রি কোন বেয়ে উঠতে হয় আমাদের পথ। টন্‌টন্ করে পা। এখানে কিছুদিন এরকম হাঁটাচলা করতে পারলে পায়ের গুলি নিশ্চয়ই বড় হবে। এখানকার অধিবাসীদের পায়ের দিকে তাকালেই তাদের বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে।

তারাশংকর বার বার জিজ্ঞেস করছিল রডোডেনড্রন্ ফুলের কথা। এখানে ওখানে লাল ফুল দেখলেই আমরা বলি—',ওই তোর রডোডেনড্রন্!" "কিন্তু উদ্ভিদ শাখা কই?—এ রডোডেনড্রন্ হতেই পারে না।" কেউই চিনি না—কাজেই জোর দিয়ে বলা যায় না।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনাও ঘটে গেল। লাডেন লা রোডের ওপর এক সুসজ্জিত সাহেবী দোকান—সামনে সাজানো অনেকগুলি ফুলের টব। দোকানটা অবশ্য নার্সারী নয়—মোটরগাড়ী ভাড়া দেওয়ার ও সারাইয়ের

দোকান। বড়দাকে অনুসরণ ক'রে আমরাও ঢুকে পড়লাম। এক বুড়ো সাহেব কাগজপত্র ওল্টাচ্ছিলেন—মুখ তুলে চাইলেন। বড়দা এক লালফুলের গাছের দিকে একবার তাকিয়ে সাহেবকে বলল ইংরেজিতে—"আচ্ছা, আপনি আমাদের চিনিয়ে দিতে পারেন রডোডেনড্রন্ ফুল?" বাঙালী অ্যাকসেন্টের জন্যই হোক বা অভাবনীয় বলেই হোক—সাহেব কিছুই বুঝতে পারল না—উঠে হাঁক দিল, "বাহাদুর!" আমরা প্রত্যুত্তরের অনুসরণ করতেই দেখতে পেলাম—অনতিদূরেই বাহাদুর একটা ল্যাণ্ড-রোভারে স্টার্ট দিচ্ছে। বললাম বড়দাকে—"সাহেব ভেবেছে আমরা বুঝি গাড়ী ভাড়া করতে এসেছি!" বড়দা বলল সাহেবকে, "মিষ্টার আপনাকে বোধ হয় ঠিক বোঝাতে পারিনি। আমরা গাড়ী নিতে আসিনি। আমরা আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম—রডোডেনড্রন্ ফুল কোনগুলোকে বলে।"

ততক্ষণে বাহাদুর ল্যাণ্ডরোভার নিয়ে এসে হাজির। সাহেব অবশ্য এবার বুঝতে পেরেছিলেন আমাদের উদ্দেশ্য। বাহাদুরকে বললেন চলে যেতে। তারপর চেয়ারে বসে হতাশকণ্ঠে বললেন, "আপনারা চিনতে চান রডোডেনড্রন্? কিন্তু সে তো এখন হবে না—ফেব্রুয়ারীতে ও ফুল ফোটে।" ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বেরিয়ে আসি ব্যবসায়ীর দোকান থেকে। মার্চ হিলের রাস্তায় চলতে চলতে আমরা তাই বিশেষ আশান্বিত ছিলাম না রডোডেনড্রন্ গুচ্ছের জন্য। কিন্তু এক জায়গায় দেখা মিলল একটা বারো তেরো ফিট উঁচু গাছের—তার শাখাগুলিকেও 'উদ্ভত' বলা যায় অনায়াসে, এবং তাতে ফুটে আছে থোকো থোকো লাল রঙের ফুল। ততক্ষণে "ইউরেকা, ইউরেকা" বলে তারাশংকর চেঁচিয়ে উঠেছে। চেঁচিয়েই ক্ষ্যান্ত হয়নি—রামভক্তের মতো সুরসুর ক'রে গাছে উঠে পড়েছে। কবিকল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে আমরা ধ্রুবনিশ্চিত হলাম যে এ রডোডেন-ড্রন-ই। এক এক গুচ্ছ ক'রে সবাই কোটের পকেটে লাগালাম। (পরে অবশ্য প্রমাণিত হয়েছিল—আমরা রডোডেনড্রন-ই নিয়েছিলাম)।

মার্চ হিল থেকে ফিরবার পথেই ধরল একটু বৃষ্টি। আমরা প্রায় মুক্তেশ্বরের সরাইখানায় এসে পড়েছি এমন সময় বেশ জোরে পড়তে লাগল। তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লাম পাশের দিলখুসা রেস্তোরাঁয়। সুসজ্জিত একখানা ঘর—কিন্তু লোকজন নেই-ই। কেবল এক সুদৃশ্য নেপালী ভদ্রলোক ব'সে খবরের কাগজ ওল্টাচ্ছিলেন। অসিত এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল ইংরেজিতে—"আচ্ছা, ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে আর মোহন-বাগানের মধ্যে যে খেলা হ'য়ে গেল তার খবর কী?"

ভদ্রলোক অদ্ভুত অমায়িক; বললেন, করছেন তাই!"

—"ক' গোলে মোহনবাগান হারল?"

—"তিন-এক গোলে। এই দেখুন"—ব'লে হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডটা ছেড়ে দিলেন।

সূত্র পেয়ে আমরা ভদ্রলোকের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললাম। তাঁর নাম হচ্ছে দেবপ্রসাদ রাই। স্থানীয় চা বাগানের অংশীদার। দার্জিলিংয়ে প্রভাবশালী লোক। মার্জিতরুচি এবং শিক্ষিত। যখন জানলেন আমরা ঘট বর্ষ অর্থনীতির সব মাসতুতো ভাই, জিজ্ঞেস করলেন অধ্যাপক অন্নান দত্ত ব্রুসেল্স থেকে কবে দেশে ফিরছেন। মাঝে মাঝে কাজের জন্য কলকাতায় যান। তিনিই আমাদের পথ বাৎলে দিলেন কী ক'রে টাইগার হিলে যাওয়া যায়। উপদেশ দিলেন হেঁটে যেতে। নওজোয়ান সব—ঘোড়ায় ক'রে যাবো কোন দুঃখে? —শেষ পর্যন্ত অবশ্য আমাদের টাইগার হিলে গিয়ে তেনজিং-বিজিত এভারেষ্ট শৃংগ দেখা আর হ'ল না। অন্য কোনো কারণের জন্য নয়—গিয়ে খুব সম্ভব এভারেষ্ট দেখা যাবেনা এই আশঙ্কায়। খোঁজ নিয়ে জানলাম—যাঁরা বহু কৃচ্ছ্রসাধন ক'রে টাইগার হিলে গিয়েছিলেন, তাঁরা ব্যর্থ মনোরথ হ'য়ে ফিরে এসেছেন। এমন মেঘভরা দিনে এভারেষ্ট কেন—কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখাই দুর্লভ ভাগ্যের কথা। আমরা যে প্রাতঃকালে কাঞ্চনজঙ্ঘার বিশ্ববন্দিত সৌন্দর্য দেখেছি—এটাই আমাদের এভারেষ্ট অদর্শনের

দুঃখ ভুলিয়ে দিল। যখন আরও শুনলাম যে, আমেরিকা ইংলণ্ড প্রভৃতি জায়গা থেকে যে সব ভ্রমণকারীরা আসেন—তাঁরা অনেক সময় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখতে না পেয়ে কেঁদে ফিরে যান—তখন বাল্যে পড়া 'একদা ছিল জুতা চরণযুগলে' কবিতার সারমর্মটা হৃদয়ঙ্গম ক'রে পরম সান্ত্বনা লাভ করলাম।

টাইগার হিলের সঙ্গে কালুট যাবার প্রস্তাবও করা হয়েছিল। বারো শ ফিট উঁচু পাহাড়। সেখানে গেলে নাকি দেখতে পাওয়া যায়—ডান হাতে রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা আর বাম হাতে এভারেস্ট। এরকম দৃশ্য পৃথিবীতে আর কটা মিলবে? একথা আমাদের কাছে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে বলেছিল এক নেপালী মাখনবিক্রেতা। সময় অভাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাদ দিতে হ'ল কালুট যাওয়ার প্রস্তাব।

অর্থনীতির ছাত্র আমরা—তাই বাজার ও হাটে যেতে আমাদের বেশ ভালো লাগে। আমাদের হোটেল থেকে নিচে বাজার। একটা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম—নেমে দেখা দেখে বুঝি এই সিঁড়িটাই হচ্ছে একটা লেন। এখানকার পথঘাট এখানকার প্রকৃতির মতোই বিচিত্র।

বাজারে ঢুকলাম। পসার দেখব না পসারিনীদের দেখব ঠিক করতে পারলাম না। মনে প'ড়ে গেল আসবার পথে তিনধরিয়া ষ্টেশনে চা কিনবার কথা। অপূর্ব লাবণ্যময়ী এক মেয়ে ষ্টেশনে চা বেচতে এসেছিল। চায়ের সঙ্গে সুখাদ্যও নিয়ে পসারিনী এসেছিল সেখানে। এখানেও তাই। ডিমের ডজন কত, আলুবখরার সের কত, বাঁধাকপির দাম কী—এসব প্রশ্ন অবান্তরই মনে হ'ল। দেখলাম, যে মাখন বেচছে, তার স্বাস্থ্য কতো সুন্দর, বয়স ত্রিশ ছাড়িয়ে গেলেও চোখে মুখে কেমন কচি কিশোরীর হাসি। কপোল যেন আপেলের রঙ গুলিয়ে রাঙা, হাতের কবজি সাদা হাতীর শুঁড়ের মত। জিনিষ কিনবে কেন, না কিনবে না কেন—কিন্তু এসে একবার দেখে যাও আমার সযত্ন পসারের সম্ভার। এই আবেদন যেন প্রতিটি পসারিনীর চোখে মুখে ছড়ানো। জানি, দার্জিলিংয়ের সাধারণ লোকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। দার্জিলিংয়ের যে চকমকি সভ্যতার চোখ ধাঁধানো আলো, জানি সে সভ্যতার সিলসুড যারা তাদের দুঃখ কষ্টের অবধি নেই। তবু এদের যে চোখের হাসি দেখলাম আর মুখের মিষ্টি ডাক শুনলাম, মনে হয় তারা যেন ভুলিয়ে দিতে চায় তাদের দুর্দশার কথা তা দিয়ে।

বড়দার দেখাদেখি পাঁচ আনা ক'রে নেপালী টুপী কিনলাম। তখন জানতাম না যে কেবল পাঁচ আনার বিনিময়ে এতো আনন্দের ভাণ্ডারের চাবিকাঠি মেলে।

ঠিক নেপালী কায়দায় ডান ধারে বেঁকিয়ে আমরা টুপী প'রে বেড়াতে বেরোতাম। প্রথমে আমাদের দেখে আমাদের হোটেলের নেপালী ছেলেরা তো হেসেই অস্থির। সুন্দর মিষ্টি তাদের ডাক—"ও নেপালী বাবু!" রাস্তায় এক পুলিশ ছিল দাঁড়িয়ে। W. B. P. ছাপ মারা। কিন্তু কলকাতার পুলিশের মতো নিরেট গম্ভীর এরা নয়। যেখানে হাসাটা স্বাভাবিক, সেখানে এরা গম্ভীর হয় না। আমাদের মাথায় নেপালী টুপী দেখে প্রথমে মুচকি হাসি হাসল, তারপর কাছে এলে একেবারে লম্বা ক'রে হাসতে লাগল। বলল, "ঠিক নেপালী ব'লে মনে হচ্ছে!" পুলিশেও যে হাসতে পারে সে সত্যটা এতদিন বিশ্বাস করি নি। দার্জিলিংয়ে দেখলাম তার প্রথম ব্যতিক্রম।

একটা বাড়ির দরজা খোলা। দরজার কাঠের উপর দাঁড়িয়ে দু'জন নেপালী মেয়ে—। যুবতী, কিন্তু বয়স কতো ঠিক করা যায় না আমাদের অনভ্যস্ত চোখে। আমাদের দেখে ওরা খলখল ক'রে হেসে উঠল। আমরাও প্রত্যুত্তরে হাসলাম। ওরা তখন আরো জোরে হেসে বলল, "নেপালী!" এরকম হাসি আমাদের জন্য প্রত্যেক জায়গায় দেখলাম ছড়ানো। শিশু, কিশোরী, যুবতী, বৃদ্ধা—সবাই সমানভাবে হাসে। সে-হাসির মধ্যে নেই কোনো কপট কটাক্ষ; নেই কোনো কষ্ট কল্পনা, নেই কোনো সংযত হবার প্রয়াস, নেই কোনো ব্যংগ। ঋজু-

পাউডার ছাড়াও যে মেয়েদের কপোলে আপেলী আভা, অচেতন-বক্ষ-অঞ্চল বারে বারে না টেনেও যে মেয়েরা লজ্জা ও লাজিত, আগুভোষ বিল্‌ডিংসের শিক্ষা না পেয়েও সে মেয়েরা অচেনা বিদেশীর সঙ্গে আলাপ করতে এবং মুক্তোর মত হাসতে জানে,—তাদের কাছে কলকাতার এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ভদ্র মেয়েদের রূপ কেমন বিকট হ'য়ে দেখা দেয়। কলকাতার রাস্তা দিয়ে অন্য দেশী কোনো লোক যদি ওইরকম কোনো টুপী প'রে মেয়েদের সামনা দিয়ে যায়, তবে সবচেয়ে ভালো বিশেষণ যা সে পাবে তা হচ্ছে—"পাগল।" আর হাসি। কলকাতার অনেক মেয়েরা অনেক সময় হাস্যকর হ'তে পারে কিন্তু হাসতে পারে না কখনো সরলভাবে। তবে চোখ ঘুরিয়ে সাদা দাঁতের ফাঁক দিয়ে আধখানা বাঁকা হাসি হাসবার যে বড়া সিনেমা জগৎ থেকে এনেছে—সে মহান্ ঐশ্বর্যের কথা বলছি না। দার্জিলিংয়ের মেয়েরা এ রসে বঞ্চিত।

সত্যি, যা দেখে পুলিশ থেকে আরম্ভ ক'রে গৃহস্থের মেয়ে পর্যন্ত সরল হাসি হাসতে পারে, মনে হ'ল, সেই টুপী প'রে আমরা দিগ্বিজয় করতে পারি এখানে। আমরা দার্জিলিংয়ে এসেছি ম্যালে ব'সে দুর্বল পাকযন্ত্রকে উৎসাহিত করবার জন্যে নয়, বা কেবল পাহাড় আর পাইন দেওদার ইত্যাদি সরলবর্গীয় সবুজ বৃক্ষশ্রেণী দেখবার জন্যও নয়। আমাদের ইচ্ছা দার্জিলিংয়ের প্রাণের পরিচয় নেবো। একটা আন্তর্জাতিক সহরের অন্তরতম সুরটি শোনা সহজ কথা নয়। তবু আমরা আংশিকভাবে অন্তত: সফল হয়েছিলাম, যে দেশ শুধু কবির কবিতার দেশই নয়, বিরহী যক্ষের মেঘদূতের দেশও শুধু নয়—যে দেশে স্বর্গের সরলতা মাখানো হাসির কর্ণা,—প্রতিজ্ঞা করলাম আমরা সে দেশে আবার আমরা আসব, সে দেশের লোককে আমরা প্রাণভ'রে ভালবাসব।

[তিন]

"দাদারা ফিরলেন?"

অবাক হয়ে আমরা তাকাই। আপাদগোড়া সাহেবী পোষাক পরিহিত ইনি আবার কে এলেন যিনি আমাদের ভাই হন? মুখের দিকে তাকাতেই দেখি আমাদের মুস্তাফীদা—মুক্তবাজী। বড়দা-ই আমাদের হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার, মুস্তাফীদা?"

"ব্যাপার আর কী—তবে আজ আমার হোটেল একদম ভ'রে গেছে—হাউস-ফুল। আর নানা দেশ থেকে লোক আসেন কিনা তাই এই ড্রেস। যাকগে—একটা কথা। আপনাদের পাশের ঘরে চারজন ভদ্রলোককে জায়গা দিয়েছি—তাদের কিন্তু বলবেন না যে আপনারা চার টাকায় আছেন! বুঝতেই তো পারছেন—"

বুঝতে পারলাম সব-ই। মুক্তবাজীর ড্রেস পাণ্টানোর মাহাত্ম্যও বুঝতে পারলাম। আমরা যেদিন আসি সেদিন হোটেল প্রায় খালি—তাই তিনি পরেছিলেন ছেঁড়া ধুতি আর ময়লা সার্ট। আজ হোটেল ভর্তি—তাই স্যুট ও টাই হাঁকিয়েছেন। দার্জিলিংয়ের প্রায় প্রত্যেক দোকানেই দেখেছি একটা করে ব্যারোমিটার। বুঝলাম মুস্তাফীদার ড্রেসই হচ্ছে তাঁর হোটেলের ব্যারোমিটার।

কিন্তু মুক্তবাজী ঠকাননি তাঁর পাঁচ টাকার বন্দোবস্তের। আমাদের চেয়ে তাদের টিফিনে বেশী খরচ হয়ত একটা কলা বা দুটো পাপরভাজা; লাঞ্চের সময় তাদের বেশি দিতেন হয়তো একটা রসোগোল্লা ও একটু দই। অর্থাৎ দিনে তাদের পেছনে আমাদের চেয়ে বড় জোর চার আনা বেশি খরচ করতেন। কিন্তু পেতেন বেশি এক টাকা করে। বেঁচে থাকলে মুক্তবাজী উন্নতি করতে পারবেন নিশ্চই।

আমাদের মতো যারা আসে হোটেলে, দু'বেলা খেয়ে ঘরে তালা লাগিয়ে সারাদিন ঘোরে, রাতে এসে খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কখনোই তাদের কৌতূহল জাগেনা হোটেলের কর্মীদের খোঁজখবর নেবার। আমাদের-ও জাগেনি। কিন্তু একদিন হঠাৎ রাত এগারোটায় বাইরে থেকে আসছিলাম। অন্ধকার কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ঠক্

হুক্ ক'রে ওপরে উঠছি। তেতলার কোণের একটা ছোট্ট ঘরে হোটেলের চাকরবাকরদের জায়গা। দেখি—একটা ছেলে খাচ্ছে। সারাদিনের নিরলস শ্রমের পর এখন সে খাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম—খাচ্ছ? শুনেই ও বেরিয়ে এল। হাতে একটা বাটি। তার মধ্যে দু'খানা রুটি আর অল্প একটু ডাল। তাই খাচ্ছে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে। খাওয়া শেষ হল। বললাম, "ওইটুকু খেয়ে পেট ভরে?" বলল সে, "আর যে নেই বাবু!" জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় শোয়। দেখিয়ে দিল মেঝে, কাঠের মেঝে। একটা ছেঁড়া চট। যেখানে আমাদের তিনটে কম্বল ছাড়া হয় না—সেখানে এরা একটা চটে কাজ সেরে নিচ্ছে। হয়তো বা সহ্য হ'য়ে গেছে এদের। কিন্তু শীত কী তাও লাগে না?

আরেকটা ছেলে—নাম রামবাহাদুর। জল দেবার কাজে সব সময়ে নিযুক্ত। দেখতে যেন ঠিক বয়কে ঢাকা একটা সাদা পাথরের দেবশিশুমূর্তি। গাল দুটো ঠাণ্ডায় ফেটে পড়ছে—রক্তিম আভায় সূর্যোদয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। তার হাত ও পায়ের দিকে তাকালেই শরীর শিউরে ওঠে। দগ্‌দগে ঘা হ'য়ে গেছে অবিরত জলে থাকতে থাকতে। পায়ে কেবল একটা ছেঁড়া সার্ট—সারাটা বুক অনাবৃত। হাড়হিম-করা হুরন্ত শীত কী ওর হাড়ের মধ্যে গিয়ে ধাক্কা লাগাতে এতটুকুও ইতস্ততঃ করে? কিন্তু মুখে ওর হাসিটি লেগেই আছে, শিবের মাথায় চন্দ্রকলার মত।

এদের দেখে মনে হয়—এরা হয়তো নিজেদের ব্যথা নিজেরাই জানে না। তাই অসুরের মত কাজ ক'রে যায়, শিশুর মত হাসে এবং নামমাত্র খাইনে, কিঞ্চিৎ খাদ্য ও অল্প সময়ের জন্য একটু ঘুম—এই পেয়েই সন্তুষ্ট।···

আমরা কিন্তু অবসর মুহূর্তেই খুঁজি সেই যাকে পাইনি, যাকে পাবো না, তাকে পাবার জন্য! অপেক্ষা ক'রে থাকি সেই অনন্ত মুহূর্তের জন্য—সেই শিলং পাহাড়ে লাবণ্যের সংগে অমিত রায়ের অতর্কিত মোটর দুর্ঘটনার মতো আকস্মিক কিছুর জন্য।

—তৈরি হ'য়ে আমরা পাঁচজনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি—অসিত তালা-বন্ধ ক'রে আসবে তার জন্য অপেক্ষা করছি। কিন্তু অসিতের আর দেখা নেই। অনেকক্ষণ না দেখে বিশেষ চিন্তান্বিত হ'য়ে উঠলাম ওপরে। দেখি, আমাদের এক জানালা দিয়ে অসিত বিমুগ্ধ নয়নে, একাগ্রচিত্ত হ'য়ে নিচে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ ওর কাছে প্রকাশিত হ'য়ে বললাম, "বইতে এতটা মন দিলে অনায়াসে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে যাবি—কিন্তু এখানে ব্যাপারটা কী?" নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—আশ্চর্য সুন্দর এক প্রস্ফুটিত যৌবনা উষু হ'য়ে কাপড় কাঁচছে, একটা কাঁচা শেষ হ'লে দড়িতে মেলে দিচ্ছে। স্বচ্ছন্দ কর্ম-ব্যস্ততায় তার বুকের আঁচল খুলে খুলে যাচ্ছে, মাথার চুল কপালে চোখে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করছে। সাবানে ও জলে ভিজে গিয়ে ফিকে গোলাপী রঙের কাপড়খানা গায়ের সংগে আটকে গেছে দৃঢ়ভাবে। সব মিলিয়ে এমন কিছুর সৃষ্টি করছে যার জন্যে অসিতের নিচে নেমে না আসা সম্পূর্ণ উচিত হ'য়েছে বলতেই হবে।

অসিত বলল, "স্নান করবার জন্য কাল বাথরুমে গেছি। এক জায়গায় গিয়ে দেখি দরজা বন্ধ। আমি আস্তে ধাক্কা মেরেছি আর খুলে গেছে দরজাটা। চমকে গেছি! ভেতরে এক মেয়ে ব'সে গায়ে সাবান মাখছিল আপন মনে। ছুটে চ'লে এলাম। কিন্তু তার মুখ একবার দেখে নিয়েছিলাম। সে-ই আজ ওখানে এতক্ষণ ব'সে কাপড় মেলছিল। বল্, যাই কী ক'রে ওকে ফেলে?

বুঝলাম ব্যাপারটা। পরের দিন আবার অসিতকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আর সবাইকে বসিয়ে রেখে আমি বেরোলাম। ঠিক যা ভেবেছিলাম। দোতলার একটা ঘরে ঢুকে অসিত পরম আগ্রহে চা-বিস্কুট খাচ্ছে। বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। অসিত বেরোলে পর বললাম, "বাঃ, বেশ তো আলাপ জমিয়ে ফেলেছিস্! তারপর খবর কী?"

অসিত বলল, "আলাপ জমাতে আর কী? বৌদি ব'লে ডাকলেই একেবারে অন্দর মহলে প্রবেশের অধিকার

পেয়ে যাবে! কিন্তু আশ্চর্যের কথা হচ্ছে—আমি চুকতেই সেই যার জন্যে যাওয়া সে বেরিয়ে যায়—তারপর একবারেও আসে না!"

বললাম, "হবে হবে, বাথরুমের কথা ভেবেই হয়তো সে এখনো লজ্জায় মরছে!"

সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় মুখ ধোবার জন্য যখন রাম-বাহাদুরের কাছে যাচ্ছিলাম, দেখি অসিতের সেই রোমান্স! কিন্তু মুখশ্রী দেখে একটু অবাকই হ'লাম। কোঁচো কোঁচো রুজ-পাউডার-মেখে এত টকটকে সুন্দর কোনো বাঙালীর মেয়ে হ'তে পারবে না। আর বেশ একটু বেঁটে। অনেকটা নেপালী মেয়েদের মত! কিন্তু নাক মুখ তো বেশ চোখা চোখা। আর ওর দু' চারটে বাংলা কথাও কাল শুনেছিলাম।

এত সুন্দর চেহারা দেখে যতোটা অবাক হ'য়েছিলাম, তারো চেয়ে বেশি অবাক হ'লাম যখন দেখলাম সে রাম-বাহাদুরের সংগে হেসে হেসে গায়ে হাত দিয়ে কথা বলছে! আমাকে দেখেই সে নিমেষে অন্তর্হিত হ'ল।

পরের দিন অসিত নিয়ে এল আরেকটা খবর। মেয়েটা যেমনভাবে বাংলা বলে ঠিক তেমনিভাবে বলতে পারে নেপালী কথা! নিশ্চয় দার্জিলিংয়ে আছে অনেক-দিন ধ'রে। অসিত জানালো যে সে আলাপের চেষ্টা করেছিল। মেয়েটা কাছে এসে সাদা হরিণ চোখে তাকিয়েছিল। অসিত জিজ্ঞেস করেছিল নাম তার। "আমার নাম? আমার নাম কামতা!" ব'লেই খিলখিল ক'রে সাদা দাঁতের হাসি হেসে সে পালিয়ে গিয়েছিল বনের হরিণের মতো।

সেই থেকে অসিতের কামতা নামটা পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর মনে হ'ল। চ'লে গেল তার মন অযোধ্যা, কাবেরী কোশল কামতা মেয়ে। মনের পর্দা ভিড় ক'রে আসতে লাগল নিপুনিকা চতুরিকা মালবিকার দল। আর দার্জিলিংয়ের পাহাড়ের মাথায় এক খণ্ড মেঘ দেখলেই মেঘদূতের শ্লোক আবৃত্তি করত। বলত, "ওই যে শিলিগুড়ি থেকে মেঘখানা দার্জিলিং হ'য়ে অলকার দিকে ছুটে চলেছে!" বোটানিকাল গার্ডেন্স-এ ঢুকে মানা করা ফুল-ও ছিঁড়তে লাগল। যে অসিত প্রত্যেক দিন ক্যাম্ফারাইডিন মাখে, সে তেল ব্যবহার করা ছেড়ে দিল—অর্থাৎ, একেবারে এক উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের ক্ল্যাসিকাল রূপ গ্রহণ করল।

কিন্তু তার মেঘের ছায়ার মতই কাকী রইল অজানা অধরা! অসিতের অপেক্ষা অনেক মুহূর্তের অপেক্ষা রইল উপেক্ষিত হ'য়ে।...

আর মাত্র একদিন বাকী আছে আমাদের দার্জিলিং ছেড়ে যাওয়ার। স্বভাবতঃই, অসিতের সংগে সংগে আমি-ও বেশ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিলাম এ কয়েকদিনে। বাইরে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ তত খারাপ লাগে না; মুক্তেশ্বর'জীর হোটেলে এলেই কোথা যে উধাও হয় মন!

সন্ধ্যে সাতটা তখন। ভদ্রতরা সবাই নিচে নেমে গেছে। আমি রয়েছি কেবল ওপরে, ঘরে তালা লাগিয়ে নিচে নেমে যাব। তালা লাগিয়ে ধীর পায়ে আসছিলাম। রাস্তার এক পাশে ছোট একটা ঘর। দরজাটা অল্প একটু ফাঁক ছিল! ভেতরে লাইট জ্বলছিল তীব্রভাবে। পাশ দিয়ে আসবার সময়েই নজর পড়ল। আশ্চর্য! সেই মেয়েটা আর একজন লোক। কী যেন কথা বলছিল। এক দৌড়ে নিচে নেমে গেলাম। অসিতকে বললাম এই কথা। "অসম্ভব, এ হ'তেই পারে না!" বলল অসিত। কিন্তু লক্ষ্য ক'রে দেখলাম ওর মনটা শুকিয়ে গেছে কেমন যেন।

পরদিন মোটঘাট বাঁধা ছাড়া হ'ল। দশটায় ট্রেন। মুক্তেশ্বরজীর পাওনা মিটিয়ে দিলাম। তারপর এলো বাহাদুরেরা। "বাবু, বখসিস্!" রামবাহাদুরকে আমরা একটা জামা আর একটা জুতো দিয়ে গেলাম। তা ছাড়া সামান্য কিছু পয়সা-ও ওদের দিলাম। অসিতের দিকে তাকিয়ে দেখি ও চারধারে কাকে যেন চোখের দৃষ্টিতে খুঁজে বেড়াচ্ছে। একটু পরেই একরাশ আলোকের মত বলসিয়ে দিয়ে এল সেই মেয়ে। পরণে নীলাভ রঙের একটা শাড়ি। এসেই রামবাহাদুরের কাছে গেল দৌড়ে,

তারপর ওর পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেখলো কতো বকসিস পেয়েছে ও। রামবাহাদুর হাসি ভরা মুখে দেখালো জুতো আর জামাটা। দেখে সে-ও খুশি। তারপর তাকালো আমাদের দিকে।

কিন্তু তার মুখ থেকে যে সুধাকরা কথাটা বের হ'ল তার জন্যে অসিত বোধ হয় মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কাকী বলল, "বাবু, বখসিস্?"

তাকিয়ে দেখি, অসিত চ'লে গেছে হোল্ড-অল্ নিজের পিঠেই নিয়ে। কাকী নামের মানে হয়তো একটু আগেই সে বুঝতে পেরেছিল।

[চার]

এক আনা ক'রে দক্ষিণা দিলে মালের এক ধারে সুন্দর সুসজ্জিত নিরালা এক বাগানে প্রবেশ মেলে। এক সন্ধ্যায় আমরা ঢুকেছিলাম সেখানে। আমাদের মাথায় ছিল যথারীতি নেপালী টুপী। কেবল তারাশংকরের মাথায় ছিল একটা ওয়াটারপ্রুফ ক্যাপ।

আমাদের টুপী দেখে অনেকেই উৎসুক হয়—সে-কথা আগেই বলেছি। কেউ হাসে, কেউ বা হেসে কথা বলে, কেউবা টুপীটা ঠিক ক'রে পরিয়ে দেয়। বাঙালীদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। বিদেশে নাকি বাঙালী মাত্রেই সজ্জন। সঞ্জীবচন্দ্রের এ-কথাটা এখন বোধ হয় আর খাটে না। বিশেষ ক'রে দার্জিলিংয়ে। অবশ্য যাঁরা জানেন না তাঁরা বলবেন—দার্জিলিং কী বিদেশ? যাঁরা কোনো মতবাদের ভারে কুব্জ হন নি, তাঁরাই জানেন দার্জিলিংয়ের সংগে বাংলা দেশের আত্মিক মিল কতো কম। একমাত্র রাজনৈতিক আকস্মিকতা ছাড়া আর কোনো কারণই হয়তো দেখানো যাবে না যার জন্যে দার্জিলিং বাংলাদেশের একটি অচ্ছেদ্য অংশ। অবশ্য সংস্কৃতিগত দিক থেকে পৃথক হ'লেও-ও বাংলাদেশের বাইরে থাকতে পারে না অনেক কারণে—এবং চায়-ও না,—কিন্তু এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে কতগুলি আলী কমিশন রয়েছেন। আমাদের মনে শুধু এই কথাটাই জেগেছে যে পশ্চিমবাংলা সরকারের এমন নীতি অনুসরণ করা কর্তব্য যার ফলে পাহাড়ী জাতিরা অনুভব করতে পারে যে তারা বাঙালী, যে তাদের-ও ভাগ্যে স্বাধীনতার সূর্য উদিত হয়েছে। অনেক পাথর কেটে, অনেক পাহাড় ভেঙে, অনেক অর্থ ব্যয় ক'রে, অনেক দিনে ব্রিটিশরা এ সহরটি গ'ড়ে তুলেছিল। ভাগ্য-ক্রমে আজকের পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল গ্রীষ্মের অসহ্য কলকাতাকে ছেড়ে দার্জিলিং বাস করতে পারেন। কিন্তু যাদের তিল তিল রক্তক্ষয়ে গ'ড়ে উঠেছিল দার্জিলিংয়ের পথঘাট, তার বিস্ময়কর নগরশোভা—সেই পাহাড়ী মজুরদের দুঃখদুর্দশা দূর করাবার জন্য উত্তরাধিকার হিসেবে আমাদের দায়িত্ব তো ব্রিটিশ প্রভুদের দুর্বীনিত অবিচারের প্রতিবিধান করা। পশ্চিমবাংলা সরকার অনেক চেষ্টা করেছে এবং করছে, কিন্তু এখনো সেদিন আসবার অনেক বাকী যেদিন হুগলী হাওড়া বর্ধমানের লোকদের মতো দার্জিলিংয়ের লোকেরা-ও পশ্চিমবাংলাকে নিজেদের সরকার ব'লে মানবে।

যে কথা বলছিলাম। মালের বাগানটায় ঢুকে এক-ধারে রেলিংয়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। রাস্তাটা প্রায় দশফিট নিচে। ট্রেনে পরিচিত অনেক ভদ্রলোকের সংগে দেখা হ'য়ে গেল। রাস্তার ধারের বেঞ্চগুলোতে কলকাতার বালিগঞ্জিয়ান মেয়েরা ব'সে। কাজেই প্রত্যেকেই আমরা অল্পবিস্তর শাড়ি-সচেতন, পৌরুষ জাহির করতে সবাই প্রস্তুত। তবে ইতরবিশেষ আছে। অসিত যেমন তার শাড়ি-সচেতনতা দেখার নিরালায় ব'সে করুণ নয়নে চেয়ে—এক কথায় একটা রোমান্টিক চেহারা ধারণ ক'রে, তারাশংকর আবার তার ঠিক উল্টো। ও যেন মধ্যযুগ থেকে কালভ্রষ্ট এক নাইটেরাণ্ট—সব সময় শিভলরি দেখানোর জন্য উদ্যতপক্ষ।

আমাদের টুপির দিকে তাকিয়ে অনেকেই অনেক রকমের মন্তব্য প্রকাশ করতে করতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে ঘুরল দু'টি নেপালী ছেলের কথায়। ওরা নিচ দিয়ে যাবার সময় আমাদের দেখে একটু অকারণ হাসি হেসে বলল, "You look like Nepalise!"

আমি বললাম, "Do we?"

ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল—তারাশংকর এক লাফে এগিয়ে গেল রেলিংয়ের ধার পর্যন্ত, তারপর মাথাকে সচকিত ক'রে নাটকীয় ভংগীতে মাথা থেকে ওয়াটারপ্রুফ ক্যাপটা খুলে চেঁচিয়ে বলতে লাগল,—"Do you think this is a Nepalese Cap? This is an international Waterproof Cap!"

আমরাই অবাক হয়ে গেছি এত উচ্চ শব্দে তারার কথা শুনে। কিন্তু মুসকিল বাধালো তারাশংকরই। শাড়ি-সচেতনতায় ও ভুলে গেল স্থান-কাল-পাত্র। ও যতই চেঁচায়, নেপালী ছেলে দু'টো ততই রেগে যায়। নেপালী ছেলেদুটো হয়তো ভেবেছিল যে তারাশংকর ওদের গালাগাল দিচ্ছে আর ঠাট্টা করছে। রাস্তায় অনেক লোক জমে গিয়েছিল। একটা ভারী বিশ্রী অবস্থার সৃষ্টি হ'তে যাচ্ছিল—এমন সময় হিন্দী সিনেমার অদ্ভুত যোগাযোগের মত—হঠাৎ শোনা গেল কার যেন ডাক, "কীরে তারা, ঝগড়া করছিস কেন?" তাকিয়ে দেখি—তারার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু! এক ছুটে নিচে নেমে তারা মিলিত হ'ল তার বন্ধুর সংগে।

আমরা এতক্ষণ নির্বাক দর্শক-ই ছিলাম। মনে মনে সবাই তারাশংকরের হঠকারিতার জন্ত শাপশাপান্ত করছিলাম—এমন সময় দেখা গেল সেই নেপালী ছেলে-দু'টো এসেছে দলবল নিয়ে। আমরা নিচে নেমে ওদের কাছে গেলাম। একজন বলল, "ও কাঁহা ভাগ গিয়া?"

আমরা কিছুতে বোঝাতে পারছিলাম না যে তারাশংকর ভেগে যায়নি—এক বন্ধুর সংগে দেখা হওয়ায় চলে গেছে। ওদের বিশ্বাস আমরা মিথ্যে কথা বলেছি, কারণ বন্ধুর সংগে যদি ও গিয়েই থাকে তবে আমরা গেলুমনা কেন? আমরা যতই বোঝাতে চেষ্টা করলাম যে একজনের বন্ধু হলেই যে সে সকলের বন্ধু হবে এমন কোনো কথা নেই, ততই ওরা আমাদের মিথ্যেবাদী বলে মনে করতে লাগল।

শেষে অনেক কষ্টে, অনেক ক্ষমা চাওয়ার পর, অনেক লোকের—যেমন ডি, পি, রাই-এর—নাম করবার পর ওদের শান্ত করা গেল। মাল্-এ একটু আগেই অনেক বাঙালী ছিল—তাকিয়ে দেখি, সব হাওয়া। নেপালী ছেলেদের দলের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একজন পিলে-চ্যাপটা বাঙালী, আগাপোড়া কিছু না শুনেই সে শাসাতে লাগল, "ওরা যখন রেগে গেছে তখন নিশ্চয়ই আপনারা খারাপ কিছু করেছেন!" সঞ্জীবচন্দ্রের সময়ে পালামৌতে এরকম বাঙালীপুংগবের অভাব নিশ্চয়ই ছিল।

—পাঁচ—

জীবনের এক শুভসময়ে দার্জিলিং এসেছিলাম। সংগীরা ছিল একেবারে একান্ত। এত আনন্দ, এত উপভোগ—হয়তো আর অতি অল্প ক্ষেত্রেই সম্ভব হবে এ জীবনে। আজ থেকে বহুদিন পরে নিরালায় বসে দার্জিলিংয়ের অমর স্মৃতিকে পটভূমিতে রেখে হয়তো অনেক কল্পনার, অনেক কাহিনীর রূপরেখা আঁকব। কিন্তু আজ স্মৃতি নয়—দার্জিলিংয়ের জীবন্ত চিত্রপট সর্বদা চোখের সামনে; কাজেই আজকের লেখনীর প্রকাশ-ক্ষমতা অন্য রকমের। চোখের খুব কাছে কোনো বস্তুকে ধরলে স্পষ্টভাবে কিছুই দেখা যায়না; তেমনি আজকের এ দিনলিপিতে-ও হয়তো দার্জিলিং সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণাই শুধু দিতে পারব। কিন্তু তা-ও দিতে পারব কিনা সন্দেহ জাগে। বিশ্বের সৃষ্টিকর্তার যে দক্ষহাতের চিহ্ন এখানকার প্রকৃতিতে ছড়ানো, সেই বিরাট সৌন্দর্যের পায়ে অর্ঘ্য দিতে পারি শুধু হৃদয়-ভরা বিস্ময়, আর কিছু নয়।

দার্জিলিংয়ে যে কদিন ছিলাম—সবচেয়ে ভাল লেগেছিল চ'লে আসবার আগের দিন—ঘুমের পথে। স্থির হ'ল—হেঁটে ঘুম পর্যন্ত যাব। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে আমরা রওনা হ'লাম ঘুমের দিকে।

দার্জিলিংয়ের পথে ঘুম হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু স্টেশন। দার্জিলিং ৬৮১২ ফিট্ উঁচু, আর ঘুমের উচ্চতা হচ্ছে ৭৪০৭ ফিট্। দার্জিলিং আসবার সময় ট্রেন যেই ঘুম স্টেশনে ঢুকলো অমনি দেখলাম এক রাশ সাদা সাদা মেঘ

ঢুকলো জানালা দিয়ে কামরার ভেতর। তাড়াতাড়ি স্যুটকেস থেকে গরম চাদর বের করতে হয়েছিল।

সেই ঘুমের আশ্চর্য পথ। ঘুমের বিখ্যাত 'লুপ'টা ভালো ক'রে দেখলাম। মস্ত বড় 'লুপ'। বিরাট একটা দড়ির-ফাঁসের মতো ইস্পাতের রেললাইন—যা ধরে ধরে রেলগাড়ী অনেকটা উঁচুতে উঠে যায়।—যতো এগোই ততই কুয়াশা আর মেঘের ওড়না ঢেকে দেয় দিগন্তরের মুখ। নিচে তাকিয়ে দেখি—লম্বা একটা গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে সাদা সাদা মেঘবলাকা ভেসে উড়ে চলেছে। আমরা নিজেরাই ক্ষণেক্ষণে একে অন্যের দৃষ্টির অন্তরালে চ'লে যাচ্ছি। কখনো কখনো একটা পাহাড়ী বাঁকের মাথায় দেখতে পাওয়া যায় এক ঝলক সূর্যরশ্মি—শুধু রশ্মিপথটাই আলোকিত, আর সব কিছু কুয়াশায় ঢাকা। মেঘ ও রৌদ্রের এমন লুকোচুরি খেলার কথা হাজার কল্পনার সাহায্য নিলেও বোঝা যেতনা কখনো। মনে হয়—সারাটা জীবন যাথা খুঁড়ে তপস্যা করি, আর প্রার্থনা করি প্রকৃতিকবির কাছে—আমাকে অন্তত: এক কণা ক্ষমতা দাও যাতে ক'রে অন্তত: কিছু দিনের জন্য অক্ষয় ক'রে রাখতে পারি আমার এই ভাস্বর স্বপ্নকে। কাঞ্চনের দেশ নেমে এসেছে চোখের সামনে। মেঘে মেঘে যে পাহাড় গাছ মানুষ সব ছেঁয়ে যাওয়া, বিরহী যক্ষের সেই বহুযুগ ধ'রে ছেড়ে দেওয়া মেঘদূতের সুশীতল স্পর্শ সারা দেহে শিহরণের সংগে অনুভব করা আর সেই দিগ্‌ভ্রান্ত প্রকৃতির সংগে একাত্ম হয়ে অবাক হ'য়ে যাওয়া—সবই কল্পনার অলীক জগৎ ছেড়ে বাস্তবতার রূপ নিয়ে এল চোখের সামনে।

...বিরাট উঁচু, খাড়া পাহাড়। কুহেলিতে মেঘের অবগুণ্ঠনে অস্পষ্ট, রহস্যময়। তারই নিচ দিয়ে যেতে যেতে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের হারিয়ে যাওয়া লুসির সন্ধান পেলাম। কতকগুলি ছাগল চড়াচ্ছিল কচি একটা মেয়ে। পাহাড়ী পথে একলা ওকে কে ছেড়ে দিলে! গায়ে ওর কচি সবুজ রঙের একটা ওড়না—পাহাড়ী দেশে কে ওকে এমন সুন্দর রঙের ওড়না দিয়েছে কে জানে। সাদা ধবধবে দু'টি পা, আর সাদা ফুলের মতো ছোট মুখ—এই কেবল দেখা যাচ্ছিল! দুরন্ত হাওয়ায় আর কুয়াশার বারে বারে সে অদৃশ্য হচ্ছিল আমাদের দৃষ্টিপথের পরিধি থেকে। আমরা হাত তুললাম; দূর থেকে মিষ্টি গলায় ও যেন কী বলল। অনেকক্ষণ ধ'রে সুব্রত ও আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সবুজ ওড়না আর সাদা গোলাপী তার মুখ ভেসে উঠছিল অপূর্ব শোভা নিয়ে। আস্তে আস্তে কালো কালো অস্পষ্ট ছাগলদের পেছনে পেছনে সেই কোন্ যুগের অপ্সরী-পরী মরমী কবির হারিয়ে যাওয়া ছোট্ট শিশুর বেশ ধ'রে পাশের পাহাড়ে অদৃশ্য হ'য়ে গেল!...

ঘনতর কুয়াশা আর শীতলতর মেঘের স্তর দু'হাতে সরিয়ে সরিয়ে আমরা ঘুমে পৌঁছলাম। স্টেশনের সামনে সুন্দর ছোট্ট একটা চায়ের দোকানে, ক্ষণিকের আশ্রয় মিলল। কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা যায় বাইরের রহস্যময় প্রকৃতি।—কলকাতার বসন্ত কেবিন থেকে কত শত মাইল দূরে ব'সে আছি ভাবতেই বুকের মধ্যে আনন্দের শিহরণ জাগে। গোল হ'য়ে ব'সে অমৃতের চেয়েও সুন্দর চা পান করতে করতে ভাবলাম—ভগবান, জীবন দিয়েছো, কিন্তু তাকে আজ সার্থক করবার-ও সুযোগ দিয়েছো, তোমাকে ধন্যবাদ, তোমাকে প্রণাম।

ওখান থেকেই আমরা ফিরে চললাম। ঘুম মনাস্টারি আমরা দেখি নি, কারণ সারনাথে এরো চেয়ে বড়ো দেখেছি। সিকল লেক্-ও আমরা দেখলাম না। আমরা লেক্ বা মনাস্টারি দেখতে তো ঘুমের দেশে আসি নি—তাই আমরা ফিরলমে।

ফেরবার পথে বুঝলাম—ভগবান আরো কত বেশি মঙ্গলময়। সেই মেঘের ওপরে হারিয়ে যাওয়া আবছা সবুজ ওড়না ঢাকা পাহাড়িনী বালিকা রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে। দূর থেকে ওকে যতো সুন্দর দেখাচ্ছিল তারো চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর দেখালো কাছ থেকে। কী অপূর্ব প্রসন্নতা আর সরলতা তার মুখে! সুব্রত জিজ্ঞেস করল তার নাম। অবাক চোখে অদ্ভুত সুন্দর উত্তর দিল

সেই মেয়ে—"মেয়ে নাম? মায়া তো সাক্ষী হ!' চারধারের যতটুকু সৌন্দর্যসুধা ছিল সব মিলিয়ে সে তার অধরটাকে প্রস্ফুটিত ফুলের মতো মেলে ধরল এই একটি কথায়! বাপ-মায়ের আদর সে পায় নি; পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে হয় তাকে ছাগল চরাতে আর কাঠ আনতে। কী খেয়ে ও এত হাস্যময়? একখানা পাতলা কাপড়ই এই শীতের দেশে ওর সম্বল! তাই সে আমাদের বুঝিয়ে বলল—"আমার আবার নাম? আমি তো খুকী!" কী আবেগ দিয়ে সরল মনে মেয়েটি যে একথা বলল—সাধ্য কী আমার তা ব্যক্ত করতে পারি!

অনেকক্ষণ আমরা ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ফিরে চললাম। নিচেই ওদের ঘর; মায়ের কাছ থেকে চ'লে আসবার তাগিদ আসতেই মেয়েটা চেঁচিয়ে যা বলল তার মানে হয়ত এই: "যাচ্ছি মা, এই যে ভিন্ন দেশী বন্ধুরা এসেছে এদের সংগে একটু কথা ব'লে নিই!" আমাদের দিকে অনেকক্ষণ ধ'রে তাকিয়ে রইল সে। ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না—তবু চললাম দার্জিলিংয়ের দিকে। আস্তে আস্তে মিলিয়ে যেতে লাগল সমুজ আভা। শেষ বারের মত তাকিয়ে দেখলাম। একটা বাঁকের মাথায় দাঁড়িয়ে এক পুলিশ—আর সব কিছু ও কুয়াশায় ঢাকা। আস্তে আস্তে পুলিশও ঢেকে গেল। একটা করুণ আনন্দ বুকের পাঁজরের মধ্যে গুঁজে রেখে আমরা ফিরে চললাম দার্জিলিংয়ের দিকে।

দার্জিলিং থেকে কালই চ'লে যাব। কিন্তু ভগবান, যে স্বর্গীয় মাধুরীর খোঁজ পেলাম এখানে—তাকে যেন জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে সার্থক হ'তে পারি। অভিজ্ঞ এবং বিজ্ঞ লোক হয়ত বলবেন—"আপনারা দার্জিলিংয়ের অনেক কিছুই দেখেন নি।" দুঃখ নেই তাতে। কিন্তু মানুষের মনের প্রকৃত পরিচয়টা এখানে প্রাণভরে পেয়েছি ব'লে জীবন সার্থক। অনেক কবিতার ছবি দেখলাম চোখের সামনে, প্রকৃতির অনেক গবিত দৃশ্যও দেখলাম নয়ন ভ'রে; কিন্তু সেই সংগে এখানকার সাধারণ মানুষের মনের পরিচয়টাও পেয়েছি। সেই পরিচয়টা কী তা এককথায় ব্যক্ত করা যায় না—কারণ তা প্রতিটি মুহূর্তের বিচিত্র পরিচয় দিয়ে পূর্ণ। তবে এক কথায় শুধু এটুকুই বলতে পারি—এখানকার সাধারণ মানুষদের 'এটিকেটে'র বালাইটা বড়ো সহজ।

কবিতা গুচ্ছ

শ্রাবণী

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

বোশেখ তার সূর্য ছুঁড়ে
ছড়ালো যত রৌদ্রশর
বিঁধলো বুক দগ্ধ মেঘ
হানলো মন পিপাসা ঝড়।
ঘাসের গান শিশিরে তার
পেলোনা সুর, কী হাহাকার
জাগলো বনে, বনান্তরে
কাল বোশেখী হাওয়ার স্বর
ওড়ালো, ধু-ধু বোশেখ বুঝি
ভাঙলো সুখ, সুখের ঘর।

চৈত্র আমাকে যে-আশা দিয়েছে
পলাশের সুরে শিশিরের গানে
সব কেড়ে নিয়ে ধু-ধু বৈশাখ
কী গহন তৃষা এঁকে দিলো প্রাণে!

তবু কি মন হারালো? না, না,
প্রেমিক কোন শিল্পী ফের
নতুন রঙে নতুন ছবি
আঁকলো দেখি। সে স্বপ্নের
ছড়ালো রঙ মেঘে-আকাশে
মাটির বুকে সবুজ ঘাসে
আবার এলো শ্রাবণ, এলো
শ্রাবন, তার সমুদ্রের
এ-সুরে কার নূপুর! বুঝি
তোমারই, তুমি এসেছো ফের!!

প্রবহমান

মোহন মিত্র

দিয়েছ যা এ তাতেই ঢের নাইবা আর দিলে
চাইনা আমি কিছুই আর মিনতি ভরা চোখে
আকাশ আজ সাগর বুকে যেটুকু ছায়া ফেলে
স্পর্শে তার মনটি যায় মনের মত লোকে।

হৃদয় মত উতল হোক তবুও আমি জানি
অজস্রতার ছোঁয়াচ লেগে উঠছে তাতে ঢেউ
হাজার কথা ঝিকমিকিয়ে পড়ছে মনে খসে
তাদের স্বর তোমায় বলে: মনের মত কেউ।

যেটুকু চাওয়া শূন্য ঘর পূর্ণ করে তোলে
যেটুকু রবি আলোর বীজ শিশির কানে বলে
তেমি আমি শুনেছি গান তোমার মুখে চুপে
যেটুকু দাও সেটুকু নিয়ে হৃদয় বয়ে চলে।

হৃদয়কে যতো দিন

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

হৃদয়কে যতোদিন কর্তব্যের পরিমাপ দিয়ে
করেছি বিচার—ততো দিন ততো বড়ো অতৃপ্তির
সব বোঝা বয়ে চলি, তবু কেন ব্যর্থ স্বপ্ন নিয়ে
বোঝেনা সরেনা মন ভেঙে দিতে কুণ্ঠার প্রাচীর।
আহা, কতো ভালো হতো—যদি এই মনকে রাঙিয়ে
ফুটতো একটি ফুল যেখানে সে অন্ধকার তীব্র,
উঠতো একটি গান সে কুণ্ঠার প্রাচীর ছাড়িয়ে।
তাহলে, পাখির মতো খুঁজে পেতো এ হৃদয়—নীড়।

অথচ অনেক প্রশ্ন ভেবে দেখি—এমনি জটিল—
সমাধান কিছু নেই ; কিছু তার হয়তো বুঝিনা :
প্রতিটি পৃথক বৃত্ত, অনায়ত্ত অথচ বর্ণিল
বেদনায় রাঙা মন, হৃদয়কে হয়তো খুঁজিনা ;
চিড় থাকে, নীড় নেই—গান গাই। বিক্ষত ফেনিল
মনের মত্ততা ঠেলে আনবে কে গান অনাবিল!

ছবি

শান্তনীল দাস

পড়েছিল এক পাশে, তাকিয়ে দেখিনি বহুদিন ;
অনাদরে, অবজ্ঞায়, ধূলিজালে বিবর্ণ মলিন :
কাজের শৃংখলে বাঁধা আমার এই প্রতিটি নিমেষ,
শেষ কোথা ? কোথা এর শেষ ?

সহসা কাজের জাল ছিঁড়ে যায় : বাহিরে আকাশ
কালো মেঘে ছেয়ে গেছে ; একটি ছোট্ট অবকাশ
এল এই প্রাচীর ঘেরা ব্যস্ততার সংকীর্ণ পিঞ্জরে ;
চেয়ে দেখি সে ছবিটে পড়ে।

কাছে গিয়ে তুলে নিই, সযতনে মুখখানি তার
মুছে দিই ; সে মুখের পানে চেয়ে দেখি বার বার,
কত চেনা সে আমার—আজ কোথা গেছে যে হারিয়ে,
তবু আমি রয়েছি বাঁচিয়ে।

এত মানুষের ভীড়ে আমি একা—বড় অসহায় ;
কারা আসে প্রতিদিন ? কেন আসে ? কেন চলে যায় !

কল্পনা

শ্রীআদিত্যনাথ মিশ্র

ভুলোট মেঘের মত ভেসে-আসা কল্পনা ও আশা
এই যদি সত্য হয় হোক তাতে কোনো ক্ষতি নেই,
পশ্চাতের আমি বলে, অর্থহীন ওরা সর্বনাশা ;
এখানে হারায়ে ফেলি চলমান জীবনের খেই।
কুজ্ঝটিকা-ঘিরে-থাকা দীপ্তিহীন নিস্তেজ প্রভাত,
প্রাত্যহিক সূর্যোদয়ে আলো কোথা পায়নিকো কেউ,
ছোট বড় এইরূপ আজো কতো আঘাত সংঘাত,
অশান্ত আবেগ ভরে হৃদয়ের কূলে তোলে ঢেউ।

কল্পনা-বিলাসী মন কল্পনার মাঝে বেঁচে রয়,
জীবনে তোলায় তার মধুমাখা স্মৃতি রোমন্থন
কল্পনার মধুরসে ভরে যায় অলিন্দ নিলয়
ঐহিক দিনের দুঃখ-ব্যথা কেন হবে চিরন্তন ?
আমার দেহের বর্ম গড়ে নিয়ে কঠিন ইস্পাতে
বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াবোই সম্পূর্ণ নির্ভীক,
জীবনে স্বীকার করি, কিন্তু তার আঘাত সংঘাতে
কখনো যাবেনা বলা কল্পনাকে মিথ্যা বা অলীক।

শ্যামলীকে

বিকাশ দাশ

শ্যামলী পড়ে কি মনে কোনো মুগ্ধ-বসন্ত বিকেলে,
সে উদ্‌ভ্রান্ত ছিল মন একটু হাতের ছোঁয়া পেলে!
একটু চোখের চাওয়া, একটু নরম হাসি দিয়ে,
মনের পলাশ বনে দিতে কি যে আগুন জ্বালিয়ে!
সেদিন এখন মৃত,—শিলীভূত স্মৃতির কবরে,
শ্যামলী তোমার কথা তবু ফিরে ফিরে মনে পড়ে!!

শ্যামলী তোমার স্বপ্নে ভরে আজো আমার সকাল,
সোনা হয় নদীজলে ঝরে ঝরে গোধূলির লাল।

উদাস করুণ হয় শিরীষের ডালপালাগুলি,
খোঁপায় ফুলের গন্ধে নেচে ওঠে ধূলির গোধূলি।

শ্যামলী তোমার স্মৃতি মেখে এসে সন্ধ্যার আকাশ,
বনবাউ ফেলে শুধু একটি নিভৃত দীর্ঘশ্বাস।
চাঁদে-ধোওয়া আর কোনো অবাক রাত্রির নিরালায়,
মাঠ কাঁপে, কাঁপে বন, মন বলে, 'নাই তুমি নাই।'

ভরে যায় বেদনায়,—শূন্য রাত, ফাঁকা লাগে মন,
শ্যামলী তুমি ত নেই, তুমি শুধু স্মৃতির গুঞ্জন!!

এক কচি মন

অমলকান্তি ঘোষ

জলের মতন তার রঙ নেই,
পারার মতন শুধু অস্থির।
কচি মন গান গায় হাল্কা হাওয়ায়,
সহজ সরল সুর যেন কবিতায়।

ঐতিহ্যের নাম নেই ছবির কোণায়,...
সাগরের মত মনে ঝা দোলে ঘুনুক,

মাটির কবিতা কেউ যদি ঝা শোনায়,
কচি মন নয় উন্মুখ।

এ লেখায় আজো কিছু রং নেই।...
এ মেঘ ফ্যাকাশে, নয় গম্ভীর;
ভেসে যাবে বাতাসের সঙ্গেই।

বৃষ্টির বিকেল

প্রভাকর মাঝি

বৃষ্টির বিকেল এলে সহসা কখন
হু হু করে উঠে সারা মন।
বনে মাঠে জোপে ঝাড়ে একটানা বৃষ্টির নূপুর,
ঘুম-ঘুম মনে জাগে সুর।
আঁধার স্মৃতির দ্বার ঠেলে
মেঘ-কন্যা মেয়ে এসে একটি প্রদীপ দেয় জেলে।
সে মেয়ের হাসির ছোঁয়ায়
হৃদয় শিউরে উঠে, শঙ্খচিল ডাক দিয়ে যায়।
যৌবনিত জারুলের উঁচু ডালে সারা রাত ধ'রে
জোনাকিরা ঝিকমিক্ করে।
শিহরণ জাগে দুর্বাঘাসে,
রামধনু হাসে।

মনে যে ভাবনাটুকু ফুটে,
অকস্মাৎ তা' কখন একটি কবিতা হ'য়ে উঠে।
ঘুচে যায় সব সংশয়,
পৃথিবী আশ্চর্য মনে হয়।
বৃষ্টির বিকেলে বার বার,
চকিতে উজ্জ্বল হয় স্মৃতির দুয়ার।

বিচিত্র রাগিনী

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

এবারে কোন্ গান গাইবে বল তুমি,
এবারে সেই গানে কি দেবে সুর
ফাগুন যায় যায়! হাওয়ায় শোনা যায়
পাতার ঝরে-পড়া মৃদু নূপুর।

কি এক অপরূপ তোমার গান গাওয়া
কত নতুন সুরে বিরামহীন:
সুরের সৌরভে হৃদয়-মন ছাওয়া
স্বপ্নে ভরে দেওয়া রাত্রি দিন!

কখনও মেঘে মেঘে মেদুর মায়াবতা,
কখনও কুয়াশায় করুণ রেশ:
শিশিরে ভেজা ঘাস। কখনও নীলাকাশ,
নদীতে, মাঠে, বনে স্বপ্নাবেশ!

তবে সে গান গেয়ে আমারও প্রাণে প্রাণে
কাকলি ছল্ ছল্ কথা জাগাও,
সময়, হে সময়! তোমার অবদানে
সুরের ছন্দের ছোঁয়া লাগাও।

সমাজ ও জাতীয় জীবন

[র. কু. সে.]

সম্প্রতি হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদান ক'রে বলশেভিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ভারতীয় সাংস্কৃতিক দল স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ক'রেছেন। বাংলা থেকে এই দলে ছিলেন প্রধানতঃ ডাঃ মেঘনাদ সাহা, শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীনরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁরা বিভিন্ন বক্তৃতায় বলশেভিক রাষ্ট্রের উন্নতির বিভিন্ন মুখী ধারা সম্পর্কে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আমাদের শুনিয়েছেন। সুখের বিষয় যে, এই একই সময়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুর মুখ থেকেও তাঁর সাম্প্রতিক রুশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা আমরা শুনতে পেয়েছি এবং ছায়াচিত্রে তাঁর অভিনন্দনের দৃশ্যাবলী দেখে চমৎকৃত হ'য়েছি। তাঁদের সকলের বক্তব্য থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার হ'য়ে উঠেছে যে, সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে রুশ আজ তার স্বদেশে শিল্প সম্ভারণ ও যন্ত্রপাতির উন্নতি বর্ধনই মাত্র করছে না, সেই সঙ্গে দেশের কোটি কোটি জনসাধারণকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্মানের সঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রতেও বদ্ধপরিকর হ'য়ে উঠেছে। অশিক্ষা আর দারিদ্র্য আজ সেখানে অতীতের বিস্মৃত ছায়া ভিন্ন আর কিছুই নয়। তার সঙ্গে সঙ্গে জাতির জীবনে এসেছে ঔপনিবেশিক বুদ্ধি। মনলা মোকদ্দমা ব'লে সাধারণতঃ কিছু নেই। এর মূলে আছে রুশবাসীর জাতীয় গৌরবের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা, নিজেদের সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে অত্যধিক চেতনা এবং দেশকে সমবেতভাবে অগ্রগতির পথে চালিয়ে নেবার দুর্বার প্রাণশক্তি। বিভিন্ন ইউনিটের মাধ্যমে আজ এই কাজগুলি সংসাধিত হ'য়ে চ'লেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে সব চাইতে যেটি চমকপ্রদ বিষয়, তা হ'চ্ছে রুশ-জনসাধারণের জ্ঞানান্বেষণ বৃত্তি ও লৌকিক ব্যবহার।

তুলনামূলকভাবে বিচার ক'রতে গেলে ভারতবর্ষের মতো স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে উপরোক্ত গুণগুলির কোনোটিরই আমরা অধিকারী নই। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, কেন নই? তার একটি বড় কারণ হ'চ্ছে আমাদের বিগত কাল এক হাজার বছরের পরাধীনতা—যার সর্বশেষ গ্লানি জ'মে উঠেছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের শাসনে। এই সুদীর্ঘকালের ইতিহাসের আওতায় থেকে আমরা সাম্রাজ্যবাদী মননশীলতার মধ্যে এমন ভাবে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েছিলাম যে, আমাদের নগণ্য সংখ্যক এক শ্রেণীর মানুষের সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ ভিন্ন বাকী দেশটাই অন্ধকারে ঢাকা প'ড়ে গিয়েছিল—যার ইতিহাস রুশ দেশের জার-শাসিত অতিশপ্ত কালকেও হার মানায়। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হ'য়েছিল দাসত্ব বৃত্তি। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট যখন সেই দাসত্ববৃত্তির শৃঙ্খলটা ভেঙে পড়লো, তখনও কিন্তু রাতারাতি এদেশের প্রাণ চেতনায় নব প্রগতিবাদের এষণা জেগে উঠ্‌তে দেখা গেল না। তার কারণ হ'চ্ছে এই সুদীর্ঘকালের পরাধীনতার অভ্যাস। অভ্যাসের পরিবর্তনও অভ্যাসের দ্বারাই সম্ভব। সে অভ্যাস আমাদের অন্তরাত্মা গ'ড়ে ওঠেনি।

এই গ'ড়ে না ওঠার একটা বড় কারণ হ'চ্ছে—এদেশের শৃঙ্খলমুক্তির পর যাদের নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাবার পথ পেলো, তাদের সঙ্গে দেশের জনসাধারণের যোগাযোগের অভাব। এদিক থেকে আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের ঔদাসীন্যও যতটা দায়ী, বামপন্থী কর্মীদের অধিকতর শ্লোগানবাদী কর্মতৎপরতাও ঠিক ততটাই দায়ী। এই উভয় শ্রেণীর কর্মীদের কাছ থেকেই এদেশের জনসাধারণ বহু দূরে প'ড়ে রইল। কিন্তু রুশের

যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সামনে র'য়েছে, সে দৃষ্টান্তে সর্বপ্রথম আকৃষ্ট হন রবীন্দ্রনাথ ও পরে শ্রীনেহেরু, সেই গণসৌহার্দ্যকর দৃষ্টান্ত আমাদের দেশ অভাবধি গ্রহণ ক'রে উঠতে পারলোনা। এর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন ছিল রাষ্ট্রিক প্রস্তুতি। কিন্তু আমাদের ভারত-রাষ্ট্র অভাবধি সেভাবে প্রস্তুত হ'তে পারেনি। ফলে আজও আমাদের সমাজে একশ্রেণীর নগণ্যসংখ্যক লোক সাম্রাজ্যবাদী অনুশাসনের শুরুয়া এঁটে সগর্বে বুক ফুলিয়ে চ'লেছেন, এবং বাকী অগণিত গণজীবন যে-তিমিরে সেই-তিমিরেই অবলিপ্ত হ'য়ে আছে। সম্প্রতি নানাদিকে রাষ্ট্রিক কর্মপ্রচেষ্টা দেখা দিয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার সঙ্গেও জনসাধারণের জাগ্রত চেতনাকে সংযুক্ত রাখা হয়নি। ফলে এদেশের জনসাধারণ যা কিছু ক'রছে, তা ক'রছে নৈর্ব্যক্তিকভাবে, তারা জানে—তারা নিমিত্তমাত্র, রাজের ও ফলভোগের যা কিছু দায়-দায়িত্ব, তা রাষ্ট্র-পরিচালকদের। বলশেভিক দেশ থেকে আজ এই মনোভাবের উচ্ছেদ করা হ'য়েছে। উচ্ছেদ করা হ'য়েছে ডিক্টেটরী শাসনের দ্বারা নয়, জনসাধারণকে রাষ্ট্র সম্পর্কে সচেতন ক'রে ও রাষ্ট্রিক অধিকারের সুযোগ দিয়ে। তাই সেখানকার প্রত্যেকটি মানুষ জানে—তাদের প্রত্যেকের জীবন ও আচরণের মধ্যে নতুন ক'রে জন্ম নিচ্ছে দেশ। এমনি ক'রেই তাদের ব্যবহারিক আচরণের মধ্য দিয়ে দেশ ক্রমান্বয়ে উন্নত হতে চ'লেছে। এজন্য একদা বলশেভিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন হ'য়েছিল জনসাধারণের মনকে তৈরী ক'রবার।

আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রেও আজ সর্বাগ্রে সেই পন্থাটি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এখানে এখনও প্রতি তিনজনে ত্রিমত, প্রতিটি রাস্তায় বিভিন্ন দল ও দলগত মতবিরোধ। মানুষের মতবাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেও এই বিভিন্নমুখী মতবাদকে জাতির একটি নির্দিষ্ট মননশীলতায় গ'ড়ে তোলা যায়: সেই মনন বস্তুটি হ'চ্ছে—প্রত্যেকটি ব্যক্তির দৈনন্দিন কর্ম, আদর্শ ও আচরণের দ্বারা দেশের কল্যাণ ও অগ্রগতি। মহাত্মা গান্ধী তাঁর স্বাধীনতা-সংগ্রামের গোড়া থেকেই এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন—'আগে মানুষের মনের পরিবর্তন প্রয়োজন, কারণ মনের মধ্যেই জন্ম নিচ্ছে দেশ।' সেই সঙ্গে আজ সব চাইতে বেশী প্রয়োজন—গণসংযোগ। রাষ্ট্রের মেরুদণ্ডই হচ্ছে—জনসাধারণ, অতএব রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পর্কে যতক্ষণ না জনসাধারণকে সচেতন ও আগ্রহশীল করে তোলা যাচ্ছে, ততক্ষণ জাতির কোনো মহৎ পরিকল্পনাই কৃতকার্য হ'য়ে দাঁড়াতে পারছে না। এদিক দিয়ে শুধু বলশেভিক রুশই মাত্র নয়, তার মতো আরও যদি কোনো আদর্শবাদী দেশ থাকে, তার তাদের কাছ থেকেও আমাদের আজ মহৎ দৃষ্টান্তগুলি অনুসরণ ক'রে তা দেশের কাজে নিয়োগ ক'রবার অত্যন্ত বেশী প্রয়োজন হ'য়ে প'ড়েছে। শুধু লোকমুখে বা বইয়ের পৃষ্ঠায় দৃষ্টান্ত-গুলিকে পাঠ ক'রে চমৎকৃত হবার যে কোনো মূল্য নেই, এই কথাটি আজ আমাদের জাতিগত ভাবে বুঝবার সময় এসেছে।

নানকচাঁদের বাড়ীর বৈঠক ভাঙিল সেদিন অনেকরাত্রে। প্রথম প্রহর তা কবে বহু পূর্বে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দ্বিতীয় প্রহরও শেষ হয় হয়। নিচের দোকান পাট বন্ধ করিয়া দোকানদারেরা যে যাহার ঘরে চলিয়া গিয়াছেন—দুই একজন এখনও মায়া কাটাইতে পারেন নাই বটে—তবে তাঁহারাও করিয়া ভিতরে বসিয়া কাজ করিতেছেন ফলে পথ জনবিরল ও অন্ধকার—সেদিকে চাহিলে সাধারণ গৃহস্থের ভয় ভয় করে।

নানকচাঁদই প্রথমে কপাট খুলিয়া বাহিরে আসিলেন—তাঁহার পিছনে পিছনে বাকী তিনজন। যে দাসী মহম্মদ আলি খাঁকে পথ দেখাইয়া আনিয়াছিল সে তখনও অপেক্ষা করিতেছে। বোধ হয় এই রকমই হুকুম ছিল। এদের বাড়ী হইতে অন্তঃপুরে যাইবার পথে সিঁড়ির মুখটায় সে একটা অতিশয় মলিন কাঁথা মুড়ি দিয়া নীচে কুণ্ডলী অবস্থায় বসিয়া আছে—অথবা বলা উচিত বসিয়া বসিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার সামনের ডিবরাটা তখনও জ্বলিতেছিল—কুয়াসাচ্ছন্ন নিবাত আবহাওয়ার জন্য তাহার শিখাটা নিষ্কম্প, স্থির—যদিও তাহাতে আলো অপেক্ষা ধূমোদ্গীরণই হইতেছিল বেশি। নানকচাঁদ বুড়ীকে ডাকিলেন না—হয়ত সেটা শুধু অনুকম্পাই নয়, তাহার মূলে সতর্কতার প্রশ্নও কিছু ছিল, সে যাহা হউক—তিনি কাছে আসিয়া সন্তর্পণে ডিবরাটা তুলিয়া লইলেন এবং তাহার শিখাটা একটু উজ্জ্বল করিয়া দিয়া পাশের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেলেন।

বোধকরি অনাবশ্যক বোধেই তিনি তাঁহার অনুগামীদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না—অথবা তাহাদের সঙ্গে আসিতে কোন ইঙ্গিতও করিলেন না। তাহারাও সেজন্য অপেক্ষা করিল না। নিঃশব্দে সেই সংকীর্ণ সিঁড়িপথে কোন মতে জান বাঁচাইয়া তাঁহার পিছনে পিছনে একক হিসাবে অনুগমন করিতে লাগিল। সিঁড়ি পার হইয়া একটা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে সুড়ি পথ—তাহার পর সামান্য একটু উঠান। উঠানটায় রাশিকৃত আবর্জনা—কোথাও কোথাও বর্ষায় আগাছাও গজাইয়াছিল, এখনও তাহার চিহ্ন বিদ্যমান। ভুঁকো কাঁচের শিশি-ভাঙাই বেশি—তাহার মধ্য দিয়া খালি-পা বাঁচাইয়া যাওয়া কষ্টকর। উপস্থিত সকলকার পায়েই জুতা থাকাতে অবশ্য সেজন্য কোন অসুবিধা হইল না। তবে যথাসম্ভব সন্তর্পণেই তাঁহারা উঠান পার হইলেন। নানকচাঁদ চাবি দিয়া দরজা খুলিলেন, তাহার পর এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া উহাদের বাহিরে যাইবার পথ দিলেন।

মহম্মদ আলি খাঁ ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছিলেন, সে ঘোড়া বাহিরে বাঁধা ছিল। শিক্ষিত ঘোড়া—আলো দেখিয়া যেন আড়ানোড়া দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল কিন্তু কোন শব্দ করিল না। মহম্মদ খাঁ কোন বিদায় সম্ভাষণ করিলেন না—নানকচাঁদের দিকে ফিরিয়া ঘাড়টা ঈষৎ একটু নত করিলেন মাত্র—তাহার পর নিঃশব্দ ত্বরিৎ-গতিতে ঘোড়ার উপর উঠিয়া বসিলেন। ঘোড়াও বোধ হয় এই ইঙ্গিতটুকুরই অপেক্ষা করিতেছিল, সে চোখের

নিমিষে সেই পাথর বাঁধানো সড়কে ঘুরের প্রতিধ্বনি জাগাইয়া অদৃশ্য হইয়া গেল!

আমিনা ও আজিজনের ডুলিও অপেক্ষা করিতেছিল। এবার তাহারা ডুলি আনিয়া একেবারে দরজার সামনে নামাইল। আজিজনের সাধারণ ডুলি—শুধু বসিবার জায়গায় একটা দামী গদী পাতা—আমিনার ডুলি কিন্তু ধনী গৃহিনীরই উপযুক্ত। চারিদিকে তেলতেটের ঘেরা-টোপ, তাহাতে সলমাচুমকির কাজ করা—ডিবার আলোতে ঝকমক করিয়া উঠিল।

আজিজনও নানকচাঁদকে দুই হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিল শুধু—কোন বিদায় সম্ভাষণ জানাইল না। কেবল ডুলিতে পা দিয়া একবার কি মনে করিয়া আমিনার দিকে ফিরিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বলা হইল না। নিঃশব্দে গিয়া আবার নিজের ডুলিতে উঠিল।

আজিজনের ডুলি পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমিনা এতক্ষণ কেমন একরকম তন্দ্রাচ্ছন্নের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এবার যেন ঘুম ভাঙিয়া জাগিয়া উঠিল। একটা ছোট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নানকচাঁদকে শুধু বলিল, 'কাল সন্ধ্যার সময়?'

নানকচাঁদ ঘাড় নাড়িলেন।

আমিনা ডুলিতে উঠিয়া বাহকদের নির্দেশ দিল, 'ঘাটে চলো।'

শহরের একপ্রান্তে সতীচৌরা ঘাট। কবে কোন্ বিস্মৃত অতীতকালে কোন্ সতী এখানে সহগমন করিয়াছিলেন, তাহারই স্মৃতি বহন করিতেছে এই ঘাটটি। সে সতীদেবীর একটি মন্দিরও আছে—কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ অঞ্চলে ভদ্রলোকদের আসা যাওয়া খুব কম। প্রধানত জেলে-নৌকার মাঝিদেরই আড্ডা এখানটায়—মন্দিরটিও তাহারাই জাঁকাইয়া রাখিয়াছে। কাছাকাছি বসতিও বিশেষ নাই, ঘাটের চারিদিকে উঁচু পাড়ে ঘন আগাছার জঙ্গল। জেলেরা দিনের বেলা শুধু ঘাটে কিছু ভীড় করে—সন্ধ্যার পর যে যাহার নৌকায় আশ্রয় লয়। নৌকাগুলিও ঠিক ঘাটে থাকে না, কিছু দূরে জলের মধ্যে একটার সহিত আর একটা বাঁধা থাকে। ফলে কোন এক খুঁটিকে কেন্দ্র করিয়া যেন একটি ভাসমান নীড় গড়িয়া ওঠে।

আমিনার ডুলি যখন আসিয়া ঘাটের মুখে থামিল তখন সতীচৌরা ঘাট নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। মন্দির গরমের দিনে বহু রাত্রি অবধি খোলা থাকে, তখন এখানে কিছু কিছু গান বাজনাও হয়—কিন্তু এই দুর্দান্ত শীতের রাত্রে, গঙ্গার হাড়কাঁপানো হাওয়ায় কোন ভক্ত বেশিরাত্রে মন্দিরে পূজা দিতে আসিবে—এ সম্ভাবনা কম। সুতরাং পূজারী বহুক্ষণ আগেই মন্দির বন্ধ করিয়া বাসায় চলিয়া গিয়াছেন—সম্ভবত এতক্ষণে রেজাইয়ের ভিতর তাঁহার নাসিকা গর্জন চলিতেছে। সারা ঘাট জনমানব শূন্য। নৌকাগুলিতেও আলোর চিহ্ন নাই, বস্তুত কুয়াশায় জল-নৌকা কিছুই ভাল করিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, সব যেন লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

আমিনা ডুলি হইতে নামিয়া সেই গাঢ় অন্ধকারেই সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া গেল। তারপর একেবারে শেষ ধাপের কাছে গিয়া খুব আস্তে একটি শীষ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি শীষে তাহার উত্তর আসিল। খুব নিকটেই কেহ দাঁড়াইয়া আছে এবং যে আছে সে পুরুষই—শীষ শুনিলে তাহা অনুমান করিতে দেরি হয় না।

কিছুই দেখা যায় না—কাহাকেও না। আমিনার বুকটা কি একটু ছাঁৎ করিয়া উঠিল?

কিন্তু সে ভয় পাইলেও বিহ্বল হইল না। তাহার কোমরে গোঁজা ছিল একটি ছোট্ট পিস্তল, ক্রস্ত হস্তে সেটি খুলিয়া লইয়া চাপা কণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল, 'কে?'

'আমি—বেটি। আমি—'

'ও, মৌলবী সাহেব। আসুন—সালাম।'

এতক্ষণে চোখ অন্ধকারে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। আমিনা দেখিল ঘাটেই একটি নৌকা বাঁধা আছে, একেবারে তাহার সামনে—আর সেই নৌকা হইতেই দীর্ঘ দেহ এক মৌলবী নামিয়া আসিলেন।

আমিনা নিশ্চিন্ত হইয়া নিশ্চলটি কোমরে গুঁজিল। মৌলবী তাহা এই অন্ধকারে লক্ষ্য করিলেন, হাসিয়া কহিলেন, 'অস্ত্র পেয়েছিস্ বেটি ?'

'সব রকম বিপদের জন্যই প্রস্তুত থাকা ভাল নয় কি ? যদি অপর কেউ হত ?'

'তা বটে, ঠিকই।'

মৌলবী সিঁড়ির একটা ধাপের উপর বসিলেন, তারপর পাশের জায়গাটা দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, 'বসো আমিনা।'

আমিনা বসিল বটে কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বরেই অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পাইল। কহিল, 'তারপর ?'

মৌলবী বলিলেন, 'আমার কাজ আমি ক'রে যাচ্ছি। আরা, বক্সার, কাশী, চুনার, এলাহাবাদ, মির্জাপুর—শেষ করেছি। এবার যাবো লক্ষ্ণৌ হয়ে ফৈজাবাদ, জৌনপুর। যেখানে যাচ্ছি, আগুন জ্বালাচ্ছি। যে কোন মুসলমান, মুসলমান পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করে—তারই রক্ত তাতিয়ে তুলতে পারব বেটি তুমি কিছু ভেবোনা। কিন্তু টাকা চাই। অনেক টাকা। নোন্নাদের টাকা না খাওয়ালে চলবে না, আমার একার দ্বারা ত সব কাজ হ'তে পারে না।'

'টাকা তৈরী আছে। কাল এমনি সময় সর্দার খাঁ টাকা নিয়ে ঘাটে উপস্থিত থাকবে। কিন্তু আপনি —আপনি একটু সাবধানে থাকবেন মৌলবী সাহেব। আংরেজ জাত বড় শয়তান।'

'তা আমি জানি আমিনা। শয়তানের নজর পড়েছে। ছায়ার মত গোয়েন্দা ফিরছে আমার পিছু পিছু কদিন থেকেই। আজ অনেক কষ্টে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে এসেছি—কুয়াশা ছিল বলেই সুবিধা !'

'যদি আপনাকে গ্রেপ্তার করে যদি—যদি—আর কিছু ?'

আমিনার কণ্ঠস্বরে আন্তরিক উদ্বেগ ফুটিয়া উঠিল।

মৌলবী সাহেব করুণ প্রসন্ন হাসি হাসিলেন। বলিলেন, 'যদি কি—ফাঁসী দেয় যদি ? আহ্‌মেদউল্লা তোমার বাপের নিমক খেয়েছে অনেকদিন। তোমাদের অপমানের শোধ নিতে তোমাদের কাজে যদি তার জান যায় ত সে পরোয়া করবেনা আমিনা। তবে তোমার কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে—এই যা আফ্‌সোষ !'

আমিনা দুই হাত বাড়াইয়া তাঁহার ডান হাতখানা চাপিয়া ধরিল, কহিল, 'দরকার নেই মৌলবী সাহেব। আমার জন্য আপনি অনর্থক জীবন বিপন্ন করবেন না। যা পারি আমিই করব। আপনার যদি কোন ক্ষতি হয় ত আমি খুদাতালার কাছে কি জবাব দেব ?'

'সে জবাব আমিই না হয় তোমার হয়ে দিয়ে দেব মা ! তুমি কিছু ভেবো না।'

বলিতে বলিতেই তাঁহার অত্যন্ত কান খাড়া হইয়া উঠিল। দূরে মাঝ দরিয়া দিয়া কোন একটি ডিঙি যাইতেছে—যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে—তবু তাহার শব্দ সেই অখণ্ড নিঃশব্দের মধ্যে বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়।

চকিতের মধ্যে আহ্‌মদউল্লা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আমিনার মাথায় হাত রাখিয়া বোধকরি কী একটা আশীর্বাদই করিলেন—তাঁহার পর আরও চাপা গলায় শুধু বলিলেন, 'কাল এমনি সময়ে !' তাহার পরই এক লাফে তাঁহার ডিঙিতে উঠিয়া ঘাটের সিঁড়িতে একটা ধাক্কা দিলেন—ডিঙিটা নিঃশব্দে সোজা গিয়া মাল্লাদের নৌকার গীপের সহিত লাগিয়া গেল। আর তাহার কোন পৃথক অস্তিত্ব রহিল না।

দূরের নৌকাটি কাছে আসিতেছে। আমিনাও ঘাটের সিঁড়ি বাহিয়া দ্রুতগতিতে উপরে উঠিয়া গেল। গুলিতে উঠিয়া বাহকদের আদেশ করিল, বাড়ী চলো—জলদি।'

(৬)

কানপুরের মূল শহর হইতে তিন-চার ক্রোশের ভিতরই বিঠুর প্রাসাদ। শেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও যখন পদীচ্যুত হন তখন তাঁহাকে কোথায় রাখা হইবে—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে তাহা একটা সমস্যা হইয়া

দাঁড়াইয়াছিল। অনেক তদ্বিরের ও আবেদন নিবেদনের পর বড়লাট এই বিঠুর স্থানটি নির্বাচন করেন। প্রথমটা বাজীরাও কিছুতেই বিঠুরে থাকিতে রাজী হন নাই, কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন যে, জায়গাটা বড়ই অস্বাস্থ্যকর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এইখানেই তাঁহাকে থাকিতে হয়—এবং ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৫১ পর্যন্ত—এই তেত্রিশ বৎসর এখানে কাটাইয়া তিনি প্রমাণ করিয়া দেন যে, এখানের জল-হাওয়া খুব খারাপ নয়।

এই দীর্ঘ কালে বিঠুর ও তাহার আশে পাশে এক বিরাট বসতি গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজা নির্বাসিত হইলেও রাজা—তাঁহার লোকজন সিপাহী শান্ত্রী জাঁকজমক কিছু কিছু ত থাকিবেই। রাজার বার্ষিক ভাতা না পাইলেও পেশোয়ার পোষ্যপুত্র নানা ধুন্ধুপন্থ সে সব ছাঁটিয়া ফেলিতে পারেন নাই—নামে বা মর্যাদায় না হউক, ইংরেজ কোম্পানীর চোখে না হউক—ইহাদের কাছেই পেশোয়া সাজিয়া বসিয়া আছেন।

বংশ এবং পেশোয়া নামকে চিরস্থায়ী করিতে বন্দী ও নির্বাসিত বাজীরাও কম চেষ্টা করেন নাই। রাজ্যচ্যুত হইবার পরও অসংখ্যবার বিবাহ করিয়াছেন—এবং সেদিকে যখন কোন আশা-ভরসা থাকে নাই তখন প্রায় একসঙ্গে তিনটি পোষ্যপুত্র লইয়াছেন। আমরা যখনকার কথা বলিতেছি তখন একজন গিয়াছেন—দুইজন আছেন, নানা সাহেব ও বালা সাহেব।

কিন্তু এতকাণ্ড করিয়াও পেশোয়া উপাধি অব্যাহত থাকে নাই। ইংরেজ কোম্পানী স্বীকার করেন নাই নানা সাহেবকে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেও নানা সাহেব পেশোয়া বাজীরাওয়ের আট লক্ষ টাকা বার্ষিক ভাতার অধিকারী হন নাই। তাহার জন্য নানা লড়িয়াছেন ঢের। বহু টাকা খরচ করিয়া আজিমুল্লা খাঁকে বিলাত পাঠাইয়াছেন—বিলাতী দরবারে আবেদন নিবেদন জানাইতে—কিন্তু কোন ফল হয় নাই। সত্তর লক্ষ টাকা খরচ করিয়া আজিমুল্লা খাঁ দুই হাত ভরিয়া বিলাতী প্রীতি আনিলেও কোম্পানীর ওপর কোন হুকুম-নামা আনিতে পারেন নাই।

ইহার পর অনুমান করা অস্বাভাবিক নয় যে, নানা সাহেব ইংরেজদের বিষ নজরে দেখিবেন। কিন্তু বাস্তব সেরকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বরং তাঁহার ইংরেজ-প্রীতি যেন দিন দিন বাড়িয়াই যাইতেছে। বিঠুর প্রাসাদে খানা ও নাচের মজলিশ আগেও বসিত—এখন ত প্রায় প্রতি শনিবারে বাঁধাবরাদ্দ হইয়া গিয়াছে। এবং সে মজলিশে আসেন না যে, জেলা হাকিম হইতে শুরু করিয়া কানপুর গ্যারিসনের মিলিটারী অফিসাররা, সকলেই দলে দলে উহাতে যোগ দেন; সস্ত্রীক ত বটেই কখনও কখনও পরিবারের অন্য পরিজন সমেতও। বিঠুরের নিমন্ত্রণ এমনই লোভনীয়—যে পাইলে কেহই প্রত্যাখ্যান করেন না।

তাহার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমত নানা সাহেব 'সাহেব লোগে'র সম্মান জানেন, অর্থাৎ কাহাকে কতটুকু খাতির করিতে হইবে সে সম্বন্ধে তাঁহার দিব্য জ্ঞান আছে। পান ভোজনের বন্দোবস্তটা ইংরেজী মতেই হয়—এমন কি কাঁটাচামচগুলি পর্যন্ত খাস সেফিল্ডের। 'খানা' ও 'পিনা'র অর্থব্যয় করিতে নানার কোন কার্পণ্য নাই, ভাল আহার্য ও দামী বিলাতী সুরা—ইহার কদর তিনি জানেন। তাছাড়া সাহেবদের সহিত নানা মিশিতে জানেন। তাঁহার বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা, তাঁহার রসিকতা প্রভৃতি ঠিক অপর দেশীয়-রাজাদির মত নয় অর্থাৎ ভোঁতা নয়। নাচের সময় গদীতে দেহ এলাইয়া দিয়া ঠিক 'মজা' দেখেন না—বুড়ি হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনও কখনও নিজে ত যোগ দেনই, অন্য সময়ও অতিথিদের ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইয়া তাঁহাদের সাহচর্য উপভোগ করেন। এই সব কারণে নানা সাহেব তাঁহার জাতশত্রু সাহেবদের প্রিয় ত বটেই—বিশ্বাস ভাজনও।

যে রাত্রে আমিনা নানকচাঁদের বাড়ী গিয়াছিল সেটা ছিল শুক্রবার। পরেরদিন শনিবার—সাহেবদের আপ্যায়িত করিতে নানা ব্যস্ত থাকিবেন, ইহা জানিয়াই আমিনা নানকচাঁদ ও আহ্‌মেদউল্লার সহিত টাকা লেন-দেনের ব্যবস্থা করিয়াছিল কিন্তু কার্যকালে তাহা ঠিক ঘটিল না

সন্ধ্যায় আমিনা নিজের ঘরে বসিয়া কয়েকটি চিঠি লিখিতেছে এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল—মহারাজ পেশোয়া এই দিকেই আসিতেছেন!

চকিতে আমিনা অসমাপ্ত চিঠিটা বিছানার নিচে লুকাইয়া ফেলিল, তারপর দর্পণের দিকে তাকাইয়া বেশভূষা একটু ঠিক করিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত আলস্যে একখানা বই লইয়া শুইয়া পড়িল। যেন এতক্ষণ সে অখণ্ড মনোযোগের সহিত এই বইখানাই পড়িতেছিল।

নানা সাহেব নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম যৌবনের সীমাকে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে কিন্তু প্রৌঢ়ত্বে প্রবেশ করিতে তাঁহার এখনও অনেক দেরি। ভুঁড়িটা একটু স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বটে তবু তাঁহার চালচলন হইতে যৌবনসুলভতা একেবারে মুছিয়া যায় নাই। নানা-সাহেবের পরণে সাধারণ মারাঠীর পোষাক, কেবল কোমরবন্ধ ও উষ্ণীষে আভিজাত্যের চিহ্ন কিছু কিছু আছে। দাড়ি ও দাড়ী কামানো, মুখ অবরোধের দরুণ শৌখিন থাকিলেও তাহা অস্বাভাবিক হইয়া ওঠে নাই। তাঁহার ললাটে তখনও সকালের পূজার চিহ্ন বিভূতি রহিয়াছে। দুই কানের মুক্তালঙ্কারের মূলে চন্দনের চিহ্ন, গলায় একটি মুক্তার মালা।

নানা ঘরে ঢুকিয়া একেবারে আমিনার শয্যার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তারপর তাঁহার অত্যন্ত মিষ্টকণ্ঠে ডাকিলেন, 'হুশেনী।'

আমিনা যেন চমকিয়া উঠিল, 'এ কী, পেশোয়াজী স্বয়ং! কী ভাগ্য আমার। আজ এমন নিশীথ রাত্রে সূর্যোদয় ঘটিল!'

নানা সাহেব হাসিলেন। বলিলেন, 'হুশেনী বিবি—বিলেত হ'লে এসব কথাবার্তা তোমার বহুৎ কাজে লাগত। মুর্খ পাহাড়ীর কাছে এসব বিদ্যা একেবারে মাঠে মারা যাচ্ছে।'

আমিনা শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এখন সাহেবকে বসিতে বলিয়া সে নিজেরও তাঁহার পায়ের কাছে বসিল। নানা সস্নেহে তাহার কাঁধে একটা হাত রাখিলেন।

আমিনা বলিল, 'তারপর? দাসীকে কী হুকুম?'

'হুকুম ছাড়া কি আসার অন্য কোন কারণ থাকতে পারে না হুশেনী?'

'সে এখানে কেন থাকবে জনাব? তার জন্য আপনার পিয়ারী আদালা বেগম আছে।...তাছাড়া এমন অসময়ে রূপসী যেন সাহেবদের অন্তর রোশনী চোখের সামনে থাকতে কি মাটির চিরাগদের এমনি মনে পড়ে?'

নানা সাহেবের মুখে বারেক একটা ছায়াপাত হইল। তিনি কহিলেন, 'আদালার কথা আর ব'লো না। সে বড় ক্ষেপে আছে কাল থেকে। তার একটা—তার একটা দামী জিনিষ চুরি গেছে?'

'ও, তাই নাকি? কী জিনিষ মহারাজ?'

'একটা দামী মুক্তোর মালা।'

'এই! তা এতে তার দুঃখ করার কি আছে? তাকে প্রত্যহই ত কত দামী উপহার দিচ্ছেন। তার ভেতর কি গেল আর কি রইল—তারও কি হিসেব থাকে নাকি আদালার? বোকা গেল সেই জন্যই—মহারাজ তাকে এত পেয়ার করেন। খুব হুঁশিয়ার মেয়ে!'

নানা সাহেবের দুই চোখ নিমেষের জন্য জ্বলিয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, 'আমার পিতা-পিতামহ প্রত্যহ দামী জিনিষ উপহার দেবার হিম্মৎ রাখতেন ঠিকই—কিন্তু আমি, আমার কি আর সে ক্ষমতা আছে হুশেনী, তাহলে আর ভাবনা কি ছিল। আমি ত আজ ভিখারী।

'আপনার দাসী হুশেনীর জীবনের স্বপ্নই হ'ল যে আপনাকে হিন্দুস্থানের মসনদে দেখবে—জনাব!'

'ও তোমার পাগলামী হুশেনী। ইংরেজ প্রবল—আজ আর, ওদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে সারা হিন্দুস্থানে এমন শক্তি কৈ?'

'যদি ঈশ্বর দিন দেন ত ওদের শক্তি নিয়েই ওদের মারব মহারাজ। আপনি শুধু ক্ষণকাল ধৈর্য ধরুন!'

'ও সব কথা থাক হুসেনী, শুধু শুধু মন খারাপ।... আমি ভাবছি আদালার ঘর থেকে ওর গহনা চুরি করলে —এ সাসাদে এমন সাহস কার!'

ছোট্ট একটি হাই হাতের আড়ালে সামলাইয়া লইয়া আমিনা কহিল, 'খোঁজ করুন—চোর ধরা পড়বে বৈকি।'

'ওর দিকে আমি প্রথম চোটে কয়েদে রাখতে বলেছি। তাতেও না হয় দুদিন ঠাত্তি পারদে রাখলেই পেট থেকে কথা বেরোবে। সে কথা থাক্—শোন, যে দরকারে আমি এসেছি।—

'হাঁ, সেইটিই ত জানতে চাইছি। দরকার ছাড়া যে এমন অসময়ে দাসীর কাছে আপনি আসেন নি—তা আমি জানি।' আমিনার মুখে ঈষৎ ব্যঙ্গের হাসি।

ধরা পড়িয়া নানা ঈষৎ অপ্রতিভ হইলেন। হাসিয়া কহিলেন, 'শোন আজ ওদের ব্যারাক থেকে গর্ডন সাহেব এসেছেন। তিনি কথায় কথায় বলেন যে নেটিভ মেয়েদের কাছে ইংরেজী লেখাপড়া এখনও স্বপ্নের অগোচর। তার জবাবে আমি হঠাৎ বলে ফেলেছি যে আমার মহালেই এমন ভারতীয় মেয়ে আছে যে মেম-সাহেবদের মতই ইংরেজী বুলি বলতে পারে।... সেই শুনে পর্যন্ত তিনি পীড়াপীড়ি করছেন—তোমার সঙ্গে আলাপ করবেন। তুমি একবারটি চলো, লক্ষীটি।

'আমি বাইরে যাবো—একঘর অচেনা পুরুষের মধ্যে?'

'দোষ কি। তুমি তো ঠিক অপর মেয়েদের মত পর্দানশীন নও—তা ছাড়া, হয়ত গর্ডন সাহেব ভাবছেন যে আমি একটা মিছে চাল দিয়েছি ওঁর কাছে।'

আমিনা কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিল। তাহার পর বলিল, 'আপনি ত জানেন সেপোয়া—আংরেজদের ওপর আমার একটা বিজাতীয় ঘৃণা আছে। আমার মালিকের সঙ্গে যারা বেইমানী করেছে—তাদের দিকে তাকাতে পর্যন্ত আমার ঘৃণা বোধ হয়।' শেষের দিকে আমিনার কণ্ঠস্বর বুঝি একটু গাঢ় হইয়াও আসিল।

নানা সাহেব সস্নেহে ও সপ্রেমে তাহার কাঁধে একটু চাপ দিলেন কহিলেন, 'জানি হুসেনী তুমি ছাড়া আমার এ দিকটা কেউ এমন ক'রে ভাবে না। তবু, আমারই সম্মান রাখতে তোমার যাওয়া দরকার। নইলে আমাকে তারা হয়ত মিথ্যাবাদী ভাববে।'

আরও মুহূর্ত কয়েক আমিনা চুপ করিয়া রহিল। বোধ করি তাহার মাথায় চিন্তার ঝড় বহিয়া গেল এই অত্যল্প সময়েই। তাহার পর শান্ত কণ্ঠেই সে জবাব দিল, 'আপনি যান জনাব—আমি এই পোষাকটা বদলে নিয়ে যাচ্ছি।'

'হাঁ, তাই এসো। বেশ একটু সেজেগুজে!' খুশী হইয়া নানা সাহেব চলিয়া গেলেন।

নানা অদৃশ্য হইতেই আমিনার ললাটে ভ্রুকুটি ঘনাইয়া আসিল। স্থির নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া কী যেন খানিক ভাবিয়া লইল। তারপর অনুচ্চ কণ্ঠে ডাকিল, 'মুসম্মৎ।'

'জী, বেগম সাহেবা—আমাকে ডাকছিলেন?'

দাসী আসিয়া দাঁড়াইল।

গলা আরও নীচু করিয়া আমিনা কহিল, 'সর্দার খাঁকে ডাকু। খুব তাড়াতাড়ি, এখানে নয়—ঐ পাশের ঘরে। আর শোন—সে যখন আসবে আর কেউ না এসে পড়ে, একটু হুঁশিয়ার থাকবি।'

মুসম্মৎ এ সবে বোধ করি অভ্যস্ত; সে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। আমিনা যথাসম্ভব ক্ষিপ্রহস্তে তাহার প্রসাধন করিতে লাগিল। বেশ পরিবর্তন তখনও শেষ হয় নাই, মুসম্মৎ আসিয়া সংবাদ দিল, 'সর্দার খাঁ এসেছে বেগম সাহেবা।'

'এসেছে—ও। আচ্ছা, তাহলে এখানেই নিয়ে আয়। তুই বাইরে থাক—মহলের দরজার কাছে। কেউ না বিনা খবরে চলে আসে।'

মুসম্মৎ আবারও বাহির হইয়া গেল। আমিনা দর্পণের দিকে ফিরিয়া ললাটের উপর হইতে চূর্ণ কুন্তল-গুলি সরাইয়া অত্যন্ত লঘু হস্তে দুই চোখে সুর্মার রেখা টানিয়া লইল।

এবং সে রেখা টানা তখনও শেষ হয় নাই—তাহার সেই অনিন্দ্য সুন্দর মুখের প্রতিচ্ছবির পাশে আর একটি

...ফুটিয়া উঠিল পুরুষের মুখ—কিন্তু কুৎসিত।

...ভয়ঙ্কর মুখ কল্পনা করাও কঠিন। আসিল ...ার, দীর্ঘ ঘন কৃষ্ণ শ্মশ্রু, ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ, ছোট চোখ, স্থূল-...মাংসল, মদকৃক্ষ পেশীবহুল, কুঞ্চিতকেশ এবং তদুপরি সারা ...দেহ সুগভীর ক্ষতচিহ্ন—সবটা মিলিয়া তাহাকে ...ভয়ঙ্কর করিয়াই তুলিয়াছিল। তবু সেই ভয়াবহ মুখের দিকে চাহিয়াই আমিনার সারা মুখ উজ্জ্বল ও প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে দরজার ভিতর দিয়াই আগন্তুককে ডাকিয়া কাছে আসিতে বলিল।

...র খাঁ কাছে আসিতে আমিনা ঘুরিয়া দাঁড়াইল ...কোন প্রকার ভূমিকা করিয়া কহিল, 'সর্দার, ...ুব জরুরী দুটো কাজ আছে, মন দিয়ে শুনে রাখ। ...উর্দাল পাড়ায় নানকচাঁদ বাবুজীর বাড়ীতে যাবি। তিনি ...তোকে দু-থলি টাকা দেবেন। সেই টাকা নিয়ে তুই ...সোজা চলে যাবি ...ঘাটে। সেখানে মৌলবী সাহেব অপেক্ষা ...করবেন। তাঁকে এক থলি টাকা দিবি, তাহলেই তিনি ...সেখানে থাকুন—কাছে আসবেন। তাঁকে এক থলি টাকা দিবি—আর একথলি নিয়ে এখানে আসবি। শুনেছিস ...কাজে? ভুল হবে না ত? টাকা কেউ রাস্তাজানি ...করে না নেয়। তা হলে তোর আর মুখ দেখব না!'

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া আমিনা চুপ করিল। সর্দার খাঁ এতক্ষণ একদৃষ্টে আমিনার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। সে তাহার মুখের কোন ভাব ফোটা কঠিন কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র বর্তুলাকার চোখের তারা ...ড়া সম্ভব হইলে দেখা যাইত—সবটা ঘোলাইয়া একটা ...অদ্ভুত মুগ্ধ ভাবই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এতক্ষণ পরে সে কথা কহিল, গম্ভীর অথচ শান্ত কণ্ঠে বলিল, 'কোন গোলমাল হবে না মালেকান্—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

আমিনার মুখ প্রসন্নতর হইল—তাহার দুই চোখে ফুটিয়া উঠিল অবিশ্বাস্য একটা স্নেহ। সে আরও কাছে আসিয়া সর্দার খাঁর দুই কাঁধে দুইটা হাত রাখিল। তারপর ঈষৎ গাঢ় কণ্ঠে কহিল, 'সে আমি জানি সর্দার। এ পৃথিবীতে একমাত্র তুই-ই আমাকে সত্যি সত্যি ভালবাসিস্। এক এক সময়, হ্যাঁ—এক এক সময় একথাও মনে হয় যে, থাক্ এসব, সব কিছু ছেড়ে কোনো দূর গাঁয়ে গিয়ে তোর সঙ্গেই ঘর বাঁধি। আমার জীবন ত গেছেই—এই তুচ্ছ দেহটা দিয়ে তোর জীবন যদি সার্থক হয় ত হোক! কিন্তু সে তুই বুঝবি না সর্দার—তুই যা!'

সর্দারের সেই দানবীয় মুখও কিছুকালের জন্য যেন—স্নেহে, প্রেমে, কৃতজ্ঞতায়, চরিতার্থতায় রমণীয় ও স্নিগ্ধ হইয়া আসিল। কিন্তু সে কোন কথা কহিল না, অধিক কিছু আশা করিল না—যেমন আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

ক্রমশঃ

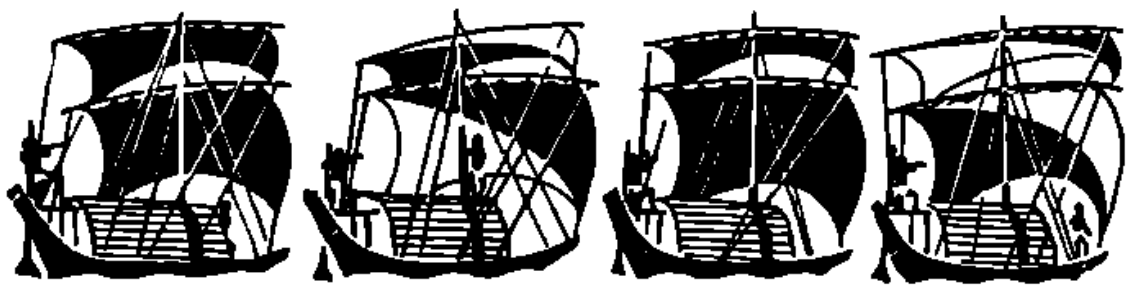

বধূমিতা

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

আজও রোজকার মত স্কুলের বাসখানা এসে দাঁড়াতে ফিট্‌ফাট্‌ প্রশান্তি গট্‌গট্‌ করে এসে উঠে বস্‌ল। আর আজও রোজকার মত—সামনের প্রকাণ্ড বাড়ীটার জানালার পর্দা একটুখানি ফাঁক ক'রে মৌন প্রশস্তিতে মুখর হ'য়ে দুটি আঁখি উজ্জ্বল শ্রদ্ধায় তাকিয়ে রইল তার দিকে। নিত্যকার এই কাজ। শত ব্যস্ততা থাক্‌লেও বাসের হর্ণ শুনে বধূমিতা সব ফেলে ছুটে আস্‌বে দোতলার এই ঘরখানায় যেখান থেকে দেখা যাবে তার অতীপ্সিতাকে। প্রশান্তি চলে যাবে তার কর্মমুখর, সঙ্গী-বহুল, যুক্তজীবনে—অবরোধের কাঠিন্য সকলের অগোচরে ঈষৎ শিথিল ক'রে ঘুমন্ত চোখে সঙ্গীবিহীন বধূমিতা চেয়ে থাক্‌বে সেই দীর্ঘ পথের দিকে—তার শেষ কোথায় কে জানে? মেদারিক্ত বপু, সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসার কষ্টটুকুও সহ্য করতে না পেয়ে হাঁপাতে থাক্‌লেও কঠিন শাসনে চাপা হুংকার দিয়ে উঠ্‌বেন শাশুড়ী মদালসা, "বৌমা, ওকি, পর্দা সরিয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে আছে যে? এত বল্‌লেও শুন্‌বেনা? ঐ মাষ্টারণীকে দেখতে ছুটে আস্‌বে? কি আছে দেখবার শুনি? যাও নিচে।"

ঘুমন্ত চোখ দপ্‌ করে জ্বলে উঠলেও কোমলতায় জোর করে মদিরায়িত ক'রে সংক্ষেপে বল্‌বে বধূমিতা, "এই যে যাই, মা!" এই কোমলতা ঘৃতাহুতি দেবে অগ্নিতে। "ভিজে বেড়াল, ভাজা মাছখানি উল্টে খেতে জানেন না." এই সাধারণ মেয়েদের মত কথা না ভেবে পারবেন না জমিদারগৃহিণী বসুন্ধরাক্রান্ত হীরেজহরতের চলন্ত বিজ্ঞাপন অসাধারণা মদালসা।

সর্বাঙ্গের অলঙ্কার ঝম্‌মল্‌ ক'রে মিহি ঢাকাই শাড়ীর জামদানী আঁচল সুবিন্যস্ত ক'রে লীলায়িত ভঙ্গিমায় নেমে যাবে বধূ নিচের তলায়—তেলের বাটি নিয়ে অপেক্ষারতা দাসীর কাছে—ব'সে ব'সে মাথায় তেল মাখিয়ে দেবে যে ত্রিনয়ন্তা ঘরে—সৌন্দর্যবর্ধনে সচেষ্ট গৃহিণী নিজের—বধূরও। "চিরকাল হ'য়ে আস্‌ছে এই এ বংশে—কত্তারা, ছেলেরা বারমুখো, তা রাশ আল্‌গা ক'রলেতো চলবেনা—খুঁটি শক্ত ক'রতে হবে," বলেন মদালসা—তাই সৌন্দর্য লক্ষ্মীকে বাঁধবার দৃঢ়তম প্রচেষ্টা।

তেলমাখার পর বত্তরকমের রূপটান আছে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা বা অন্যটার প্রয়োগে স্নান—তারপর চুল শুকান, তারপর প্রসাধন। এতটুকু ফাঁকি দেবার যো নেই মদালসার দৃষ্টির সার্চলাইটের সামনে—বনেদী জমিদার বাড়ীর আসবাব, এতটুকু ধূলিমলিনতার ছোঁয়াচ্‌ লাগবেনা তাতে। "ঐ রূপটুকু আছে তাই, আর তো কিছু নেই। গোমড়ামুখে হাসি নেই, রং তামাসার ধার পাশ দিয়ে ঘেঁষেনা—তা রূপও যদি যায় তো দেবে ঝাঁটা মেরে দূর ক'রে, "মুখোস খুলে ফেলেন গৃহিণী মেয়ে ঈশানীর কাছে।

"কেন মা, তখনতো বলেছিল সবাই, বনেদী ঘর ছাড়া মেয়ে এনোনা, তুমিই তো রূপ দেখে আর পাশ করা শুনে ধড়ফড়িয়ে আন্‌লে।" ঠোকে ঈশানী।

—"আন্‌লুম কি আর সাধ ক'রে বাছা? ছেলে যে বেঁকে বস্‌ল। লেখাপড়া জানা মেয়ে ছাড়া বিয়ে করব না—তা বনেদী ঘরের মেয়ে কে কটা পাশ দিয়েছে যে দোষা হবে?"

—"দাদার তো ঐ আছে—এদিকে তো ফিরেও তাকায়না বৌয়ের দিকে।"

"তাকায় না কি সাধে? ঐতো বৌয়ের দাসী বলে,

ছেলে ঘরে ঢুকলেই নাকি বড় বড় লেক্‌চার দিতে আরম্ভ ক'রত বউ। পুরুষমানুষ, তাস পাশা খেলবে, আমোদ আহ্লাদ করবে, তা তোর অত টিক্‌টিক্ করা কেন বাপু?"

"জমিদার বাড়ীর চাল জানবে কেমন ক'রে? সে বলতে হয় আমাদের—দাদা তো তবু রোজ বাড়ী আসে—তোমার জামাইতো অর্দ্ধেক দিন বাগান বাড়ীতে—জমিদারী নিয়ম যা—তোমার খুসী আমোদ আহ্লাদ ক'রবে—তা ব'লে আমি হিংসের জলে পুড়ে মরব কেন?"

"নিজেকে তারী রূপসী ভাবে। ও চায় ছেলে আমার ভেড়া হ'য়ে রাতদিন ওর কাছে কাছেই ঘুর্‌ঘুর করুক—ডাকসাইটে রায়বংশের ছেলে তা বোধ হয় মনেই থাকেনা ওর।"

"আসলে ধুঁটেকুড়ুনী রাজরাণী হ'লে যা হয়, মনে করে কেউ কেটা হ'য়ে গেছি আমি, স্বামীও থাকবে আমার পায়ের তলায়।" মোক্ষম মন্তব্য ক'রে চলে যায় উচ্চনীচ কণ্ঠস্বরে।

আহারান্তে বাড়ীর সকলে দেবে দ্বিপ্রাহরিক ঘুম—প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত—তারপর গা ধোওয়া, সান্ধ্যপ্রসাধনের পালা।

বধূমিতার চোখে ঘুম আসবেনা—এবাড়ীতে মেয়েদের সহজে পুস্তক জোগার রেওয়াজ ছিলনা যদিও—তবু কিন্তু বাপের বাড়ী থেকে আনা—কিছু বারমহল থেকে আনা আছে ওর ঘরে—আর আছে খাতা কলম। পড়ে বই বধূমিতা, আর লেখে—মন যা চায়।

"পারিনা, পারিনা সহ্য ক'রতে এই আসবাব হ'য়ে থাকা। এই শাড়ী-গহনার স্তূপ বেঁধে কাঁটার মত আমায় —মন নেই যেন আমার, আমি যেন কাঠের পুতুল একটা —খাওয়াচ্ছে, দাওয়াচ্ছে, নাওয়াচ্ছে, ধোয়াচ্ছে—কিন্তু অন্তর? নিঃসীম হাহাকারে ভরা আমার অন্তর। এসব চাইনা আমি—এসব চাইনা। আমি চাই সামনের বাড়ীর প্রশান্তির মত হ'তে—সুন্দর, মার্জ্জিত, সংস্কৃতি সম্পন্ন, বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝলমল্।

—মূর্ত্তিমতী বিদ্যার মত—অমনি একটি পরিবেশ—শান্ত, স্নিগ্ধ। সরল অনাড়ম্বর—শান্তির নিলয় একটি ছোট গৃহ"—লিখতে লিখতে এত তন্ময় হ'য়ে যায় সে যে কখন স্বামী রজত এসে আড্ডোপাঙ্গ প'ড়ে ফেলেছে তা টেরও পায়নি—"ওঃ এসব চাইনা, চাইনা—কি চাই, ওরে বাবা, কুকুরের পেটে ঘি সহ্য হবে কেন?"

চম্‌কে উঠ্‌লেও চুপ ক'রে থাকে বধূমিতা, খাতা সাম্‌লাতে সাম্‌লাতে।

"কাঠের পুতুলই তো, তাছাড়া মেয়েমানুষের আর কি সংজ্ঞা আছে?" কলেজ অবধি পড়েছিল রজত। উত্তর না পেয়ে নির্ম্মম হ'য়ে ওঠে—স্বামিত্ব বোধ চাড়া দিয়ে ওঠে তার—"কথাও কওয়া হয়না যে, গ্রাহ্য নেই, নয়?" খাতাটা কাড়তে কাড়তে বলে সে—তবুও নিরুত্তর বধূমিতা—"কোন্ পীরিতের লোক আছে তাই ভাল লাগেনা শুনি? সামনের বাড়ীর ছেড়মাষ্টারণীকে ভাল লাগে, না তার মেনীমুখো স্বামীকে? এবার দপ্ ক'রে জ্বলে ওঠে স্তিমিত প্রদীপ—মুখ সাম্‌লে কথা বলবে —চলে যাও এঘর থেকে।"

"কার ঘর শুনি? তোমার বাবার?"

"বাবার হ'লে এরকম ইতরামি করার কথা উঠ্‌তোই না।"

"কি? এত বড় কথা? আমি ইতর?" আক্রমণ করবার আগেই ঘর ছেড়ে চলে যায় বধূমিতা। প্রশান্তিকে দেখার মত এসকল ব্যাপারও প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনে তার।

পিত্রালয়ে যাবারও হুকুম নেই তার। রায়বাড়ীর গগনস্পর্শী মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় তাতে। "মেয়ে এনেছি—মনুসংহিতাপি শাস্ত্রেই আছে (পরম পণ্ডিত ছিলেন মদালসার পিতা) তাব'লে পাঠাতে পারবনা যেখানে সেখানে" বলেন তিনি। সেজন্য কনিষ্ঠার বিবাহে বধূমিতার

শিত্রালয়ে যাওয়ার কথাই চলেনি। পরে কিন্তু অমিতা দিদির সঙ্গে দেখা না ক'রে পারেনি।

নববিবাহিতা বোনটির অঙ্গে সামান্য অলংকার দু'চারটি, জ্যেষ্ঠার অঙ্গ ঝলমল্ করে। মুখটা মোচড়ে দিয়ে ওঠে বধূমিতার। অনেক দ্বিধা করে—কিন্তু অবশেষে গলার, হাতের কিছু কিছু না খুলে দিয়েও পারেনা। "ওকি দিদি, কেন দিচ্ছ তাই, তোমার শাশুড়ী কি বলবেন?" "কেনরে মিতু, তোর দিদি কি এতই পর হ'য়ে গেছে, কিছু দিতে গেলে পরের মত বাধা দিচ্ছিস্?" কিন্তু মুকটা তার টিব্ টিব্ করে।

"না, না, তোমাকে দেখ্তে পেলাম এইতো ঢের, দিদি, ওসব দিওনা, তাই," মিনতিভরা কণ্ঠে বলে মিতু। "হ্যাঁরে, এটুকু স্বাধীনতা নেই কি তোর দিদির? আস্বি জান্লে আগে কিছু ঠিক করে রাখতাম। আমার জিনিষ দেব তাতে তুই অমন করছিস কেন"

কিন্তু নিজের জিনিষ নয়—মদালসার মুখ এতখানি, ঈশানীর চোখে কৌতুক মিশ্রিত সপ্রশ্নদৃষ্টি—কি মল্লিকা তো বলেই ফেল্ল, গরীবের ঘরের মেয়ে জানে বড়লোক দিদির কাছে এলে কিছু পাব।—কিছুইতো নেই গায়ে—হাতে খালি কটা খয়াটে খয়াটে চুড়ি—কে বলবে বিয়ের কনে।" কিন্তু মদালসা এত জোরের তাড়ানিতেই বোধ হয় মুখপাত্র হ'য়ে যা কিছু বলবার সবই বল্ল রজত—

"দানছত্তর খুলেছ কার পয়সায়? আসে কেন বাপের বাড়ীর লোক মুখ পোড়াতে? মাথা কাটা যায় পরিচয় দিতে - খালি বাগাবার মতলবে আসা।" স্থির হ'য়ে বসে শোনে বধূমিতা।

যতসব আত্মীয়কুটুম্বের জঞ্জাল, এ বাড়ীতে ঢোকে কোন্ সাহসে?" আর একটা জঞ্জাল আছে ব'লেই"—ধীরে ধীরে জবাব আসে এবার।

"জুতিয়ে বিদেয় ক'রে দোব সব জঞ্জালকে"—

"তাহ'লে তো বাঁচি, প্রাণ খুলে ধন্যবাদ দিই তাহলে—"

"বেরোও, বেরোও, দূর হ'য়ে যাও—মুখ দেখতে চাইনা তোমার"—এগিয়ে আস্তে আস্তে বলে রজত।

রোজকার মত আজও ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বধূমিতা, কিন্তু অন্যদিনের মত পাশের ঘরে নয়, একটা দৃঢ়সংকল্পের ছাপ পড়ে তার মুখে।

হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর বাড়ী এসেছে সন্ধ্যার দিকে প্রশান্তি—প্রধান শিক্ষিকা, তাই ছুটির ঘন্টা পড়লেই মরি তো পড়ি ক'রে অন্য শিক্ষিকাদের মত যো নেই বাড়ী আসবার—ক্লার্ক হিসাব মেলাবে, তাকে দিয়ে সই করাবে, তবে ছুটি তারও, স্কুলের ঝি, দারোয়ান, ক্লার্কেরও। পরীক্ষা চলেছে বাৎসরিক, বকেয়া বেতন দিতে এতদিনে বাধ্য হ'য়েছেন অভিভাবকেরা—আদায়ও যত গোলমালও তত। তার ওপর পরীক্ষার খাতেলা—খাতা মেলান—বুঝিয়ে দেওয়া—মাথার ঝিকুটি নড়ে যাবার যো!

বাড়ী আসতেই হাসি হাসি মুখে এগিয়ে আস্লো প্রশান্তির স্বামী পরমেশ—মন ভাল থাকলে হাসিই পেত উত্তর—কিন্তু আজ ভাবলেশহীন মুখে গট্ গট্ ক'রে চুকে পড়লো প্রশান্তি। জুতো খুলে হাতের ব্যাগাদি রেখে ব্যস্ত হ'লো সাবান তোয়ালে নিয়ে স্নানের চেষ্টায়। ব্যাপার সুবিধের নয় দেখে আস্তে আস্তে মুখ চুণ ক'রে ফিরে গেল পরমেশ স্বস্থানে অর্থাৎ লেখার টেবিলে।—লেখক সে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ হ'তে পারেনি, তবু ধরে আছে আঁকড়িয়ে, ঐ তার সাধনা ঐ তার তপতপ। আয়ের ঘর শূন্য, স্ত্রীর উপার্জনে নির্ভর, দেশে মা ও বিধবা বোনের খরচও দিতে হয় স্ত্রীকে। প্রশান্তি শিক্ষিতা, দাম্ভিতা—অশিক্ষিতা মেয়েদের মত কিছু বলেনা অবশ্য চট্ ক'রে।

স্নান করে কাপড় জামা তারে দিতে দিতে কত কথাই মনে হয় প্রশান্তির, প্রধান শিক্ষিকা প্রশান্তির নয়, দরিদ্র ঘরের বধূ প্রশান্তির। "মুখের রক্ত তুলে যে আসব, তা যতক্ষণ না একটু চা করব নিজে ততক্ষণ মুখে দেবার যো নেই—কি ভাগ্য আমার—স্বামী, তার সাতগুষ্টি সব

দেখো—আমার দিকে দেখবার কেউ নেই, একটা যে লোক রাখব তারও উপায় নেই—মরণ হ'লেই বাঁচি।" নিজের অজ্ঞাতসারেই কয়েকবার হতাশদৃষ্টি সামনের বিরাট বড় বাড়ীটার দিকে প্রসারিত হয়।

চা খেতে ব'সে প্রশান্তি বলে, "শোন, এ মাসে মোর মাকে টাকা পাঠাতে পারবনা—মাধবীর মেয়ের বিয়ে, কিছু দিতে হবে।"

"সে কি করে হবে, মাকে না দিলে ওরা কি উপোষ ক'রে থাকবে?

"আর আমার এতদিনকার বন্ধু, তার মেয়ের বিয়ে, কিছু দেবনা আমি?"

"দেবে, দু'চার টাকার কিছু দাও, মায়ের টাকা বন্ধ করা চলবেনা। কান দুটো লাল হ'য়ে ওঠে প্রশান্তির—"তোমার কথায় নাকি? কি আমার দায়? তোমার মা বোনকে পুষতে যাব আমি?" ধৈর্যের বাঁধ আর থাকেনা। "অনেক করেছি,—আর পারছিনা, রেহাই দাও তোমরা আমাকে।"

"কি ক'রেছি ক'রেছি কর, কে তোমার টাকা চায়? কিছু বলিনা তাই, চোরের মত আছি; এত দর্প তোমার কিসের?" "কে চায়? তাইতো, এ্যাত্তা পোষ্টা, গুষ্টিবর্গকে পোষে কে? লজ্জা করেনা মুখ নাড়তে? ভারী পৌরুষ দেখাচ্ছ—আমরা হলে গলায় দড়ি দিতাম।"

"কি! তোমার পয়সায় খাওয়ার খোঁটা?—আর যদি খাই তো আমার অভিবড় দিব্যি রইল।"

"ওঃ মুখে অমন সবাই বলে—দেখব—ও তেজ কতক্ষণ থাকে—মেয়েমানুষের অধম, স্ত্রীর পয়সায় বসে বসে খায় যে তার বাক্যই সার—আর কিছু মুরোদ নেই—" আরও কি ব'লতে গিয়ে সামলে নেয়—দরজা খোলা ছিল হুঁস্ ছিলনা. "ছিঃ!" কার যেন পায়ের শব্দ—তাড়াতাড়ি দেখতে যায় সে, কে শুনে ফেলল এসব কথা? ঘট্ ক'রে একটা জামদানী শাড়ীর ঝিলিক্ যেন অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

.....হাঁপাতে হাঁপাতে বাগানের লোহার সিঁড়ি দিয়ে তর্ তর্ ক'রে ওপরে উঠে যায় বধূমিতা—সারা গা দিয়ে গল্ গল্ ক'রে ঘাম ছোটে তার—মুখে ফুটে ওঠে বিচিত্র হাসি!

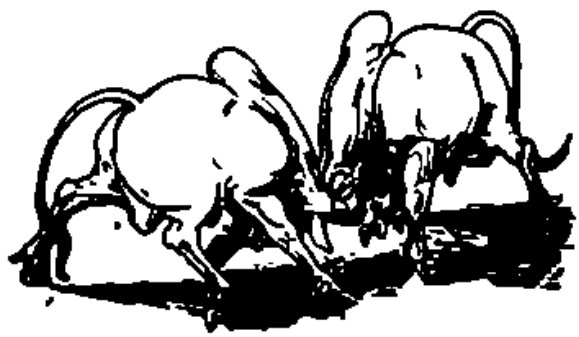

রুক্মিণী

রমেন মজুমদার

সুমিতা বলে ও আমায় ভালোবাসে। কিন্তু আমি তো জানি ও আমায় কত ঘৃণা করে। আমি মদ খাই। আমি মাতাল। আমি দুশ্চরিত্র। কুমারীর জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলি। ঘরছাড়া করে আনি কত তরুণীকে। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি জানি তুমি কি বলবে। তুমি বলবে: শেখর, তোমার রোগ-শয্যার পাশে বসে সুমিতাকে কাঁদতে দেখেছি সেদিন। এটা কি ভালোবাসার নিদর্শন নয়?—তোমার কথা আমি অস্বীকার করিনা বিমল। আমি জানি ও আমার জন্য কাঁদে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ওকে কাঁদতে দেখেছি আমি। শুকিয়ে যাওয়া জলের চিহ্ন দেখেছি ওর গালের ওপর। তুমি যদি ওর চোখের দিকে তাকাও ভালো করে, তাহলে দেখতে পাবে ওর চোখের নীচে স্পষ্ট কালো দাগ—চোখ লাল হয়ে গেছে কাঁদতে কাঁদতে। আমার জন্যই ও কাঁদে। কিন্তু তবু আমি বলব ও আমায় ভালোবাসেনা—আমায় ঘৃণা করে। একটা নির্বল নির্বারিণী পঙ্কিলপঙ্কে নিমজ্জিত শূকরকে যেমন ঘৃণা করে ও আমায় ঠিক তেমনি ঘৃণা করে। এতে আমি ওকে দোষ দিইনা বিমল। সারাটা জীবন যার কৃচ্ছ্রসাধনে কেটেছে, জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে একজন পুরুষকে ভালোবাসা কি সম্ভব তার পক্ষে? ওর বুভুক্ষু হৃদয় গুমরে গুমরে কাঁদে সন্তানের স্নেহস্পর্শের জন্যে। ওর সমস্ত হৃদয়ের সঞ্চিত স্নেহভালোবাসা উজাড় করে ঢেলে দেবার কেউ নেই। আমি জানি—আমি জানি বিমল, ওর স্নেহের ফল্গুধারাকে আমিই আটকে রেখেছি। ওর মাতৃত্বকে আমিই হত্যা করেছি। ওকে আমি বিকশিত হতে দিইনি। জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা বাসনা সব গলা টিপে মেরে ফেলে দিয়েছি।

কিন্তু তুমিতো আমায় সম্পূর্ণ দোষ দিতে পারোনা বন্ধু। তুমিতো জানো বিয়ের পরদিনই আমায় বিলেত চলে যেতে হোলো ব্যারিষ্টারী পড়বার জন্যে। সেখানে আলাপ হোলো মেলনীর সাথে—শুভক্ষণে কি অশুভক্ষণে তা বলতে পারবনা। আলাপ আমাদের ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হোলো। বিশ্বাস করো বিমল ওর কাছে আমি কিছুই লুকোইনি—সব বলেছিলাম। বলেছিলাম: আমি বিবাহিত। দেশে আমার নবপরিণীতা বধূ আছে। বাবার একমাত্র ছেলে আমি। মা নেই। আমি যদি তোমাকে সাথে করে দেশে ফিরে যাই তাহলে বাবা আমার মুখদর্শন করবেন না। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর বুকে শেল বিধবে। আমি পারবনা—আমি পারবনা তোমায় নিয়ে যেতে আমার দেশে। তুমি আমায় মুক্তি দাও মেলনী। আমি সর্বক্ষণ সুমিতাকে আমার চোখের সামনে দেখতে পাই। তাকে তুমি আচ্ছন্ন করে রেখনা।

তার উত্তরে মেলনী কি বলেছিল জানো? বলেছিল: আমিও তো বাবার একমাত্র মেয়ে। বাবার সমস্ত সম্পত্তি, লণ্ডনের বাড়ী সবইতো আমি পাবো। দেশে ফিরে যেতে না চাও এখানেই নতুন করে ঘর বাঁধো আমায় নিয়ে। এখানে প্র্যাকটিস করো। বলো প্রিয়তম, যাবেনা আমায় ছেড়ে।

সত্যি বিমল, সেদিন রাগ করেছিলাম মেলনীর পরে ওর এই ব্যবহারে। কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারিনি রাগ করে। ওর মধ্যে যেন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে। আর সেই শক্তি আমায় আকৃষ্ট করে ওর প্রতি। ওর প্রতিটি কথা অপূর্ব ছন্দোময় ব্যঞ্জনায় ভরা—প্রতিটি পদক্ষেপ চটুল। মোহাবিষ্টের মত চোখ ছুটো দিয়ে ও যখন আমার দিকে তাকায় তখন আমি সব ভুলে যাই।

ভুলে যাই সুমিতাকে—ভুলে যাই আমার বৃদ্ধ পিতাকে। চুটি ঠোঁট যখন এক হয় তখন আমার মনে হয় আমি পৃথিবী থেকে বহু উর্ধ্বে চলে গেছি।

রবীন্দ্রনাথের দেশের লোক আমি। সুতরাং আমিও কবি—এই ছিল ওর ধারণা। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ওর প্রিয় কবি। সঞ্চয়িতা থেকে কবিতা পড়ে শোনাতে বলতো ওকে। ইংরেজিতে অনুবাদ করে বোঝাতে বলতো। যতক্ষণ আমি কবিতা পড়ে যেতাম ততক্ষণ ও একান্ত অভিনিবেশ সহকারে তাকিয়ে থাকত আমার মুখের দিকে। পড়া শেষ হলে ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসত ছোট্ট একটা শব্দ—অপূর্ব।

বেশ মনে আছে আমার—একদিন 'দেবতার গ্রাস' পড়ছিলাম—

……অতি মূর্খ নারী আমি,
কী বলেছি রোষবশে ওগো অন্তর্যামী,
সেই সত্য হল? সে যে মিথ্যা কতদূর
তখনি শুনে কি তুমি বোঝনি, ঠাকুর।
শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ, দেবতা।
শোননি কি জননীর অন্তরের কথা।……

পড়বার ফাঁকে ওর চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম একবার। দেখতে পেলাম—চোখের কোণ বেয়ে জল-ধারা নেমে এসেছে ওর রক্তাভ গালের ওপর! চোখের পাতা ভিজে। পড়া শেষ হলে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বলল: তুমি আরো ভালো করে আমায় বাঙলা শেখাও। আমি বাঙলায় কবিতা লিখব। বুঝতে শিখব মানুষের অন্তরের ব্যথা। বাঙলা ছাড়া আর কোনো ভাষায় মানুষের অন্তরের অব্যক্ত বেদনা ফুটে উঠতে পারে না।—পারে না মানুষকে বিহ্বল করে দিতে বাঙলা সুন্দর—বাঙলা মধুর।

আর ওর ভালো লাগত আমার কবিতা। কেননা তার অন্তরের ইতিহাস ওর কাছে ছিল সুস্পষ্ট। ও জানত ও-ই আমার কবিতার উৎস। ওকে রূপ দিই আমার কবিতার মাঝে। ওকে বসাই পদ্মাসনে ও-ই আমার প্রথম কবিতা—আদি কবিতা। আমি স্রষ্টা আর ও সৃষ্টি। তাই ওকে আমি ভালোবাসি। নজরুলের কবিতা থেকে বলেছিলাম:

তুমি আমায় ভালোবাসো তাই তো আমি কবি।
আমার এরূপ—সে যে তোমার ভালোবাসার ছবি॥
আপন জেনে হাত বাড়ালো—
আকাশ বাতাস প্রভাত-আলো,
বিদায় বেলায় সন্ধ্যা তারা
পুবের অরুণ রবি—,
তুমি ভালোবাসো ব'লে ভালোবাসে সবি?

ও বলেছিল আমার গলা জড়িয়ে ধরে: সত্যি শেখর, তুমি আমায় এত ভালোবাসো! তুমি সার্থক! তুমি মহান!

ওর জন্মদিনে আমায় নেমন্তন্ন করল ওদের বাড়ীতে। জিজ্ঞেস করলাম ওকে: তোমার জন্মদিনে কি উপহার দেব আমি?

ও বলল: মূল্যহীন অথচ অমূল্য। একটী কবিতা। বাঙলার লেখা। তোমার ভালোবাসার নিদর্শন—যা অবিনশ্বর। শাশ্বত। স্বর্গীয়।

সন্ধ্যায় উৎসব। ঠিক সময়ে যেয়ে উপস্থিত হলাম। বহুলোক আমন্ত্রিত হয়েছেন। খাবারের টেবিলে বিপুল আয়োজন। মদিরার প্রাচুর্য। ডিনারের পর ডান্সের ব্যবস্থা হয়েছে।

খাবার শেষে হঠাৎ নিভে গেল ঘরের উজ্জ্বল বাতিটা। আর সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল একটা নীলাভ বাতি। শুরু হয়ে গেল নরনারীর নৃত্য। মদিরার নেশায় ধরেছে সবাইকে। মধুর বাজনা বেজে চলেছে আর তালে তালে পা পড়ছে আর উঠছে। ছন্দোময় জীবনের এক অধ্যায়। আনন্দের অনুরণন। স্পন্দন।

নাচতে নাচতে এক সময় আমার হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল মেলনী। চুকল পাশের একটা ঘরে। ঘরের মধ্যে সবুজ আলোর প্লাবন। দেয়ালে টাঙানো বিচিত্র রকমের ছবি। দেশ বিদেশের প্রখ্যাত-

নামা শিল্পীর স্বাক্ষর। মনীষার নিকাশ। ব্রোঞ্জের একটা নগ্ননারীমূর্তি তাকিয়ে আছে অপলক নেত্রে আমাদের দিকে।

মেলনী আমার গলা জড়িয়ে ধরে বসে পড়ল একটা সোফার ওপর। মোহাবিষ্ট চোখ দুটো তুলে ধরল আমার মুখের পানে। আমার সমস্ত সৌন্দর্য যেন নয়ন ভরে আহরণ করছে। অদ্ভুত তৃষ্ণা। স্বপ্ন ঘনিয়ে এল ওর দু চোখে। দিগ্‌বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে ওকে টেনে নিলাম আমার বুকে—ঠিক হৃৎপিণ্ডের ধারে। অপূর্ব এক আবেগের সাথে নিশ্চিহ্ন করে চলেছি একটা বনবল্লরীকে। এতটুকু বাধা নেই।

আস্তে আস্তে মেলনী মুখ উঁচু করে তাকাল আমার দিকে। বলল: শেখর, তুমি আমায় এত ভালবাসো। তুমি সার্থক। তুমি মহান!

এর কিছুদিন পর মেলনীর বাবা মারা গেলেন। আর আমার জীবন-নাটকের একটা অঙ্ক যবনিকার অন্তরালে ঢাকা পড়ে গেল। শুরু হোলো নতুন জীবন। মেলনী আর আমি। হাসি আর আনন্দ।

জানলার ধারে বসে থাকি আমি। কবিতা লিখি। মানুষের অন্তরের কথা। একটা অশ্রুবিন্দু আর হাসির ঝলক একটা—এরই সংমিশ্রণে তৈরী হয় আমার কবিতা-সুন্দরী। তার অর্চনা করে মেলনী।

আর চেয়ে দেখি সামনের পার্কটাকে। গ্রীষ্মে সমস্ত গায়ে সোনালী রোদের গুঁড়ো মেখে খেলা করে বেড়ায় ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা। বাহুবদ্ধ তরুণ তরুণী হাসির ফোয়ারা ছোটায়। নির্মল আনন্দ-দায়রে করে অবগাহন। হেমন্তের শেষে ঝরে পড়ে গাছের পাতা। কাঁপতে কাঁপতে ভূমি স্পর্শ করে। শীতের রাতে তুষার ঝরে ঝির্‌ ঝির্‌ করে। সকালেও তার জের চলে। সমগ্র নগর তুষারে আকীর্ণ। কুয়াশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন বা কখনো। আবার গাছে কচি পাতা জন্মায় বসন্তের স্পর্শে। পাখি গান গায়। বাতাসে দোলা লাগে। আসে গ্রীষ্ম। আনন্দ।

এমনি করে জীবনের এক একটা দিন গাছের পাতার মত খসে পড়ে। মেলনী আর আমি—বিধাতার দুটী অপরূপ সৃষ্টি। একসূত্রে গাঁথা।

* * *

দশ বছর কেটে গেল আমাদের অলক্ষ্যে। একটা একটা করে পাতা ঝরতে ঝরতে একদিন দেখা গেল পাতা আর ঝরে না। থমকে গেছে মাঝে। নিয়মের ব্যতিক্রম। আরো একটু পরিবর্তন হয়েছে সহচরি। মেলনী যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। আমায় এড়িয়ে চলতে চায় আজকাল। বেশি কথা বলেনা আমার সাথে। দেখা হলে যেন একটু বিব্রত হয়ে পড়ে। কুণ্ঠিতও বা একটু। পাশাপাশি দুটো ঘরে আমরা দুজনে থাকি। এ ব্যবস্থাও মেলনীর। আমার বলবার কিছুই নেই। আমি যে স্রষ্টা—

আজো কবিতা লিখি। আমার নিজের কথা। শুধু অশ্রু দিয়ে তৈরি। জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দেখি তুষার পড়ছে ঝিরঝির্‌ করে। শাদা হয়ে গেছে সব। আমার মনের মত শাদা। সোনালী রোদের গুঁড়া মেখে ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করে বেড়ায় প্রেমিক-প্রেমিকা বিহার করে। পাখি গান গায়। আমি লিখি কবিতা। আনন্দ আর দোলা দেয় না আমার হৃদয়ের তন্ত্রীতে। ওঠেনা সুর।

আমি যখন কাব্যের মধ্যে ডুবে থাকি অথবা তুষার পাত দেখি তখন পাশের ঘরে মেলনী প্রসাধন করে। অপরূপ বেশে নিজেকে সাজায়। সেন্টের গন্ধ বাতাসের সাথে উড়ে আসে আমার নাসারন্ধ্রে। জানিয়ে দেয় আমার ব্যর্থতার কথা। মনে করিয়ে দেয় আমি স্রষ্টা হলেও সৃষ্টিকে ধরে রাখবার ক্ষমতা আমার নেই। আমি শিল্পী—আমি কবি। শুধু গান গেয়ে যাবো। চাইবার কিছুই নেই আমার। দিয়ে যাবো শুধু।

সেদিন পড়ছিলাম:

...শুনেছি আমারে ভালোই লাগেনা,
নাইবা লাগিল তোর।
কঠিন বাঁধনে চরণ বেড়িয়া
চিরকাল তোরে রব আঁকড়িয়া
লোহার শিকল ডোর।
তুই তো আমার বন্দী অভাগী বাঁধিয়াছি কারাগারে,
প্রাণের বাঁধন দিয়েছি প্রাণেতে, দেখি কে খুলিতে
পারে।

হঠাৎ দরজার পর্দা সরে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করল মেলনী। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। চোখের কোণে অশ্রুবিন্দু টলমল্‌ করছে। ঠোঁট দুটো কাঁপছে থর থর করে। আমার হাত ধরে একান্ত অনুনয়ের সুরে বলল: ও কথা বোলোনা শেখর, আর কক্ষণো ও কথা বোলোনা। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠের স্বর আর

শোনা গেল না। শুধু কাঁপতে লাগল দুটো ঠোঁট; আমার এতদিনের পুঞ্জীভূত অভিমান মুহূর্তে গলে জল হয়ে গেল। মেলনীর কোমল তনুলতা আমার বুকে টেনে এনে চুম্বন নিতে গেলাম ওর রক্তরাঙা ঠোঁটে। চুম্বন যখন প্রগাঢ় হয়ে উঠছে তখন ও আমার বাহু বন্ধন ছিন্ন করে ছুটে পালিয়ে গেল ঘর থেকে বাণবিদ্ধ হরিণীর মত। আমার ভুল বুঝতে পারলাম আমি। তীব্র জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠলাম। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হোলো এই চরম ব্যর্থতায়।

কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। আরো আছে। না, না অধৈর্য হলে চলবে না বিমল। তোমায় আমার সব কাহিনী শুনতে হবে। তা না হলে আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে না যে।

আমার জন্যে আরো দুঃখ তোলা ছিল। তখনো যে এত বাকী তা কে জানত? বিশ্বের সবচেয়ে বড় দুঃখের নায়ক ইডিপুসের দুঃখের চেয়ে আমার দুঃখ কোনো অংশে কম নয়।

এক তুষার ঝরা নির্জন রাতের আঁধারে একটা বিষাক্ত শায়ক এসে বিঁধল আমার জঠরপিণ্ডে। টকটকে লাল রক্ত ঝরে পড়ল।

মেলনী অভিসার শেষে ফিরে এসে আমায় বলল: আমি আর তোমায় ভালোবাসতে পারছিনে, দেখ। অন্তরের মিল যেখানে নেই সেখানে শুদ্ধতা হতে পারে না —ভালোবাসা যেতে পারে না। তাই কালই আমরা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করব। আর আমার বন্ধু স্নিগ্ধের সাথে শুরু করব নবীন যাত্রা। শিগ্‌গিরই আমরা বিয়ে করব। তা বলে তোমায় এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে বলছিনে। তুমি এক সময় আমার বন্ধু ছিলে। ইচ্ছে করলে তুমি আমাদের সংসারে পেয়িং গেষ্ট হয়ে থাকতে পারো।

বলতে পারো বিমল, এর চেয়ে আমার মাথায় বাজ পড়ে সমস্ত দেহটাকে ভস্মীভূত করে দিলনা কেন? যাকে আমি সবচেয়ে—ভালোবাসি, তার আঘাতই যে বাজে বেশী। আমার মর্ম পুড়ে ছাই হয়ে যেতে লাগল। সে তীব্র দাহ ব্যক্ত করবার মত ভাষা আমার নেই। আজ আশ্চর্য হয়ে ভাবি, তখন আমার হার্টফেল হয়নি কেন?

মেলনীর কথার পরে কথা বলতে পারিনি। ক্ষোভে অভিমানে আর বিস্ময়ে আমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। সম্বিৎ ফিরে আসতেই অনুভব করলাম একটা যাতনা।

পরদিন সকালের প্লেনেই রওনা হলাম ভারতের উদ্দেশে। হয়তো সুমিতা আমার ক্ষত পুরিয়ে দেবে। আমার অভাব ঘুচিয়ে দেবে। এই ছিল আশা। কিন্তু সে আশা আমার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোলো। আর একটা আঘাত পেলাম আমি। সে আঘাতের জ্বালা আরো তীব্র—মর্মান্তিক। প্রকাণ্ড অট্টালিকার একটা ছোট্ট ঘরে বিগ্রহের সামনে নির্বাক হয়ে সুমিতার শুভ তপশ্চারিণীর মুখ আমায় শিহরিত করে দিল। দেহ থেকে যৌবনের প্লাবন নেমে যাচ্ছে ধীরে—ধীরে। শীর্ণ দেহ—গৌর কান্তি! তুষার শুভ্রতা। ধূপ আর চন্দনের গন্ধ ওর সমস্ত শরীরে মাখানো। ওর চোখে চোখ পড়লে আপনাহতেই মাথা নত হয়ে আসে শ্রদ্ধায়। ওর অনর্ঘ্য মনের দুয়ারে আমার বিবিক্ষা বারবার প্রতিহত হয়ে ফিরে এল। আপনার করে নিতে পারলামনা ওকে। আমাকে দেবার ওর কিছুই নেই!

আঘাতের পর আঘাত খেয়ে আমি উন্মাদ হয়ে গেলাম। উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলাম। হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে কোনো বাধা মানিনি। অন্তরের জ্বালা নেভাতে মদ চালতে লাগলাম। আর লোকে আমায় আখ্যা দিল বাতাল—দুশ্চরিত্র। দিক। ক্ষোভ নেই তাতে। আমার দিন ঘনিয়ে এসেছে। বেশি দিন আর বাঁচবনা। ডাক্তার বলেছে আমার লিভার পচে গেছে। সারবার কোনো আশা নেই। দুঃখ নেই তাতে আমার। বাঁচতে আর চাইনে। আঘাত বহনা আর সহ্য হয়না। পৃথিবীকে আগে খুব সুন্দর ভাবতাম। কিন্তু এখন দেখি এর চেয়ে কুৎসিত আর কিছুই নেই। তাই মনে হয় সুমিতা আমায় ভালোবাসেনা—ঘৃণা করে। ও কাঁদে—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাঁদে—চোখে জল জমে ওঠে। কিন্তু সেটা আমাকে ভালোবাসার নিদর্শন নয়। ও আমায় ভালোবাসেনা—ভালোবাসে আমার তাপিত তৃষিত বুভুক্ষু আত্মাকে। তাই তাই ও কাঁদে।

মেলনীর সাথে আমার আর দেখা হবেনা একথা একেবারে সত্যি। কিন্তু তোমার সাথে তো কোনোদিন দেখা হতে পারে। যদি হয় তাহলে ওকে বোলো: ওর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পৃথিবীর কুৎসিত রূপটা ও-ই আমায় দেখিয়েছে উন্মুক্ত করে।

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য

সমৃদ্ধির পথে পশ্চিমবঙ্গ—

স্বাধীনতা লাভের পর দেশের শিল্পীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিতে পশ্চিম বঙ্গের দান নিশ্চয়ই সামান্য নয়। দেশের অর্থনৈতিক সমতা আনয়নে যে সকল ক্রিয়া-কলাপ সাহায্য করেছে তাদের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হয়ত সময়োপযোগী।

সেচ-ব্যবস্থা—

মেসাঞ্জোর বাঁধ নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ায়, মযূরাক্ষী পরিকল্পনা পশ্চিম বঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলে পরিগণিত হয়েছে। পনের কোটি টাকা মূল্যের এই পরিকল্পনা থেকে ৬ লক্ষ একর জমি উপকৃত হবে এবং ২০০০ কিলোওয়াট্ জল-বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।

গত বছর জুন মাসে ৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সোনারপুর-আরাপাঁচ-মাথলা জল-নিকাশন পরিকল্পনার প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় পর্ব এবং ৯৯ লক্ষ টাকার বাগজোলা-যাত্রাগাছি পরিকল্পনা আগামী বছরের মধ্য-ভাগের আগেই সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।

স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ১৬৯টি সেচ ও জল-নিকাশন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই সকল পরিকল্পনার ব্যয় ১৯'৮৯ কোটি টাকা অনুমান করা হয়েছে এবং এর থেকে ১২ লক্ষ একর জমি উপকৃত হবে। সুন্দরবন অঞ্চলে বাঁধ সংস্কারে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, আলিপুর দুয়ার, শিলিগুড়ি এবং মাথাভাঙ্গা অঞ্চলে বন্যা-নিবারণের জন্য ৪'১০ কোটি টাকা মূল্যের পরিকল্পনার হাত দেওয়া হয়েছে। এর প্রায় ৬০ ভাগ কাজ এক কোটি টাকার সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট কাজ আগামী বছর মে মাসে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।

বিদ্যুৎশক্তি উন্নয়নের জন্য পাঁচটি বিভিন্ন পরিকল্পনার হাত দেওয়া হয়েছে। গড়িয়া, রাজপুর, সোনারপুর, গৌরীপুর, জয়নগর-মজিলপুর, ডায়মণ্ড-হারবার, রাণীগঞ্জ কয়লা-খনি অঞ্চল, বনগাঁও, কুচবিহার, দিনহাটা, শিলিগুড়ি ও কালিয়াং অঞ্চলে বিদ্যুৎশক্তি সম্প্রসারণের জন্য পাঁচশালা পরিকল্পনার বহির্ভূত অতিরিক্ত পরি-কল্পনায় এ পর্যন্ত ৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। বিদ্যুৎশক্তির উন্নয়নে তদারক করবার জন্য গত ১লা মে থেকে ষ্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড গঠন করা হয়েছে। নিজস্ব ১৭টি ও বেসরকারী ৮টি—মোট পঁচিশটি সরবরাহ কেন্দ্র বর্তমানে এই বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত আছে।

জমিদারী প্রথার বিলোপ—

বহু-বিতর্কিত জমিদারী প্রথার বিলোপসাধন পশ্চিম বঙ্গের অন্যতম সাফল্য। গত ১৫ই এপ্রিল থেকে এই প্রদেশের সমস্ত জমিদারী অর্থাৎ জমি, খনি ও খনিজ পদার্থ, বন, মৎস্যাগার প্রভৃতি সরকারের অধীনে চলে গিয়ে মধ্যস্বত্বের বস্তুতঃ বিলোপ হয়েছে। আইনকে কার্যকরী করার জন্য সমস্ত প্রদেশে বিভিন্ন জরীপ-সংক্রান্ত কাজ পূর্ণোদ্যমে চলেছে। আইন অনুযায়ী তিন বছরের মধ্যে এসব কাজ শেষ করতে হবে।

কৃষি—

কৃষি বিভাগেও পশ্চিম বঙ্গের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য।

গত ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৮৯টি ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়েছে এবং এর থেকে ৪২০০০ একর জমি উপকৃত হয়েছে। ৩৩৪টি জলাশয় সংস্কার করে ৩২০০০ একর জমিকে উপকার করা হয়েছে। তাছাড়া জমির সার ও ভাল বীজ দিয়ে কৃষকদের অনেক সাহায্য করা হয়েছে। জাপানী প্রথায় ধান-চাষের পরিকল্পনা সন্তোষজনক ভাবে অগ্রসর হয়ে চলেছে। পশ্চিম বঙ্গে এখন ৬৫০টি কৃষির পরীক্ষা কেন্দ্র আছে। উচ্চশ্রেণীর গরুর প্রজননের জন্য এপর্যন্ত ৮৮৫টি উচ্চশ্রেণীর ষাঁড় পল্লী অঞ্চলে বিতরণ করা হয়েছে।

হরিণঘাটা—

হরিণঘাটা ডেয়ারী ফার্মে এখন প্রতিদিন ৩০০ মন দুধ উৎপন্ন হচ্ছে। মুজাফ্ফরপুর ও পাতিয়ালায় গবাদি পশুর প্রদর্শনীতে এখান থেকে প্রেরিত গবাদি পশু পুরস্কার পেয়েছে।

বন—

৩০ বর্গমাইল পরিমিত অঞ্চলে বনের সৃষ্টি করে পশ্চিম বঙ্গ বনের প্রয়োজনীয়তার পরিচয় দিয়েছে। তাছাড়া নদীবাঁকীকে সংরক্ষণ ও তার জল ব্যবহারোপযোগী রাখবার জন্য, খালের ৩০ মাইল তীরভূমিতে সেগুন ও বাবুলগাছ রোপণ করা হয়েছে।

মৎস্য-চাষ—

প্রদেশের অভ্যন্তরে এবং অগভীর ও গভীর সমুদ্রে মাছ শিকারের পরিকল্পনা বেশ সন্তোষজনক ফল দিয়েছে। বিভিন্ন জলাশয়ে মাছের চাষ করবার জন্য ৩'৮৮ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয় এবং তা থেকে ইতিমধ্যেই ১৬৪ টন মাছ পাওয়া গিয়েছে। গরীব জেলেদের মাছ শিকার করবার জন্য ৬৭ খানি নৌকো ও ২৪ বেল সুতো স্বল্প দামে বিতরণ করা হয়।

শিক্ষা—

শিক্ষিত শ্রেণীর বেকারত্বের লাঘবের জন্য গত বছর প্রায় ৩৫০০ নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলির ছাত্র সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষের মত এবং এর জন্যে ১০,৩৯১ জন নূতন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। বয়স্কদের শিক্ষার জন্য এই প্রদেশে ৭৫৮টি শিক্ষায়তন সরকারী উদ্যোগে খোলা হয়েছে। তার মধ্যে ৪৫০টি নৈশ বিদ্যালয়। প্রায় ৭৫০০০ জন ছাত্র এই কেন্দ্রগুলিতে বিদ্যাভ্যাস করে থাকেন।

জন-স্বাস্থ্য—

চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য হাসপাতালের উন্নয়ন কার্য ক্রমশঃ এগিয়ে চলেছে। বিনামূল্যের দুগ্ধ বিতরণ কেন্দ্র যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ম্যালেরিয়া নিবারণ কার্যও বেশ ফলপ্রসূ হয়েছে। পল্লী অঞ্চলে ভাল জল সরবরাহের জন্য গতবছর ৪১১টি নূতন টিউব্-ওয়েল্ স্থাপন করা হয়েছে, ৬০৭টি টিউব্-ওয়েলের সংস্কার এবং ১৩৪টি কূপ খনন করা হয়েছে।

পল্লী মঙ্গল পরিকল্পনা—

পল্লীর অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য পল্লীজাত শিল্পীয় দ্রব্যের বিনিময় সম্পাদন করবার পরিকল্পনাটি বেশ সমাদৃত হয়েছে। গত জুন মাস পর্যন্ত প্রায় ৮,৮৬২ টাকার দ্রব্য বিনিময় করা হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষকদের জমির সার ও উচ্চ শ্রেণীর বীজ বিতরণ করা হয়েছে। মাছের চাষ বাড়াবার জন্য ২'২ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে। ১৬০০০ একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আরও ১৬০০০ একর জমির সংস্কার করা হয়েছে। ১২৯ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কার্য হাতে নেওয়া হয়েছে এবং ৪৭ মাইল পাকা রাস্তা ও ৬৭৮ মাইল কাঁচা রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। আর সামাজিক শিক্ষা কেন্দ্র খোলা হয়েছে ৮৪৯ টি।

কুটীর শিল্প—

ইট তৈরী, বাসন তৈরী, খেলাধূলার সামগ্রী তৈরী, সমবায় সমিতির মাধ্যমে তাঁত বস্ত্রের বিক্রয় ব্যবস্থা প্রভৃতি কাজ ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে চলেছে।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসন—

কিছুদিন থেকে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে সরকারী দৃষ্টি-ভঙ্গীর

পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এবং সরকার যে এ সমস্যার সমাধানে তৎপর হয়েছেন তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। হাবড়াতে এ-পর্যন্ত তিন হাজার বাড়ী তৈরী হয়েছে এবং যাদবপুর অঞ্চলের গাড়ুলী বাগানে ১০০০ পরিবারের বাসোপযোগী বাড়ী তৈরী হচ্ছে। ১৯৫৪-৫৫ সালে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ২৬·৮১ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্যাম্পে ২৬·৭২ কোটি টাকা সাহায্য করা হয়েছে। এপর্যন্ত ৩,৩২,০০০ টি পরিবারকে পুনর্বাসন সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

এম্প্লয়ীজ্ স্টেট ইনস্যুর‍্যান্স

গত ১৫ই আগষ্ট পশ্চিমবঙ্গে এম্প্লয়ীজ্ স্টেট ইনস্যুর‍্যান্স স্কীম প্রবর্তন করা হয়েছে। ১৯৪৩ সালের ১লা জুলাই পশ্চিম বঙ্গে প্রথম এই স্কীমটি প্রবর্তনের ঘোষণা করা হয়, কিন্তু নানা বিঘ্নের দরুণ অবশেষে ঘোষণার দু'বছর পরে ১৫ই আগষ্ট তা প্রকৃতপক্ষে এখানে প্রবর্তিত হোল। প্রথমে কলিকাতা এবং হাওড়াতে এই স্কীমটিকে চালু করা হয়েছে এবং তার ফলে ২,২৫ ০০০ জন কর্মচারী উপকৃত হবে। আস্তে আস্তে পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত শিল্পীয় অঞ্চলে এই স্কীমটিকে সম্প্রসারিত করা হবে।

১৯৫২ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারী এম্প্লয়ীজ্ স্টেট ইনস্যুর‍্যান্স স্কীম সর্ব প্রথম কানপুর ও দিল্লীতে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়। একমাত্র ভারতেই নয় সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এই পরিকল্পনাটি অভিনব, যেহেতু শেষ পর্যায়ে ২৫ লক্ষ কর্মচারী এই পরিকল্পনা থেকে উপকৃত হবে। এই পরিকল্পনাটি এপর্যন্ত দিল্লী, কানপুর, নাগপুর, বোম্বাই সহর ও সহরতলী, কোয়াটোর, পোন্নালিয়র, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, রতলম্, হায়দরাবাদ, সেকেন্দ্রাবাদ ও পরিশেষে পশ্চিম বঙ্গে, প্রবর্তিত হয়েছে এবং মোট ৭·২৫ লক্ষ জন কর্মচারী এপর্যন্ত এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এই পরিকল্পনাটি সংশ্লিষ্ট আইনের অন্তর্গত সমস্ত শ্রমিকের পক্ষে বাধ্যতামূলক। আপাততঃ যে সকল কারখানায় ২০ কিংবা তদধিক শ্রমিক নিয়ে সারা বছর কাজ হয় তাদের প্রত্যেক কর্মচারী এই আইনের অন্তর্গত, অবশ্য তাঁর মাসিক বেতন ৪০০ টাকার উপরে হোলে চলবে না। এই আইনের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে যাঁরা লেখাপড়ার কাজ করেন এমন কর্মচারীও এই আইনের সুযোগ সুবিধা পাবেন। সরকার ইচ্ছা করলে যে কোন সময়ে যে কোন শিল্প ও কৃষি কিংবা অপর কোন বিভাগে এই আইন প্রয়োগ করতে পারবেন।

এই পরিকল্পনাটির পরিচালনার জন্য এম্প্লয়ীজ্ স্টেট্ ইনস্যুর‍্যান্স কর্পোরেশন নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। এর সভাপতি ও উপসভাপতি হচ্ছেন যথাক্রমে কেন্দ্রীয় শ্রম-মন্ত্রী ও স্বাস্থ্য-মন্ত্রী। এই সংস্থায় আছেন চিকিৎসক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি, লোক-সভার সভ্য এবং শ্রমিক ও মালিকের প্রতিনিধিগণ। তা ছাড়া ভারত সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলকে সভাপতি করে নিয়ে এই সংস্থাকে চিকিৎসা বিষয়ের উপদেশ দেবার জন্য মেডিক্যাল বেনিফিট্ কাউন্সিল নামে অপর একটি সংস্থা স্থাপিত হয়েছে।

এম্প্লয়ীজ্ স্টেট ইনস্যুর‍্যান্স স্কীমের পরিচালনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে, তা প্রধানতঃ মালিক ও শ্রমিকেরদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হবে। শ্রমিকদের বেতন অনুযায়ী তাদের চাঁদার হার নির্ধারিত হয়েছে। দৈনিক আয় যাঁদের এক টাকার নীচে, তাঁদের কোন চাঁদা দিতে হবে না, কিন্তু তাঁরা স্কীমের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। শ্রমিকদের চাঁদার পরিমাণ তাঁদের আয়ের শতকরা দু'ভাগের সামান্য বেশী। মালিকদেরও চাঁদার পরিমাণ নির্ধারণ করবার জন্য শ্রমিকদের বেতনকে আটটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। শ্রমিকদের বেতন যেখানে খুব অল্প সেখানে বেতনের শতকরা ১½ ভাগ চাঁদা মালিকদের দিতে হবে।

শ্রমিক মালিকের চাঁদা বাদে, চিকিৎসার জন্য যে ব্যয় হবে তার ½ অংশ বহন করবেন রাজ্য সরকার এবং বাকী ½ অংশ এই ইনস্যুর‍্যান্স সংস্থা এবং প্রথম দিকে পরিচালন —ব্যয়ের ½ অংশ বহন করবেন কেন্দ্রীয় সরকার।

এই স্কীমে পাঁচ প্রকারের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা আছে, তা হচ্ছে—চিকিৎসা সংক্রান্ত, অসুস্থতা সংক্রান্ত, প্রসূতি সংক্রান্ত, অকর্মণ্যতা সংক্রান্ত এবং নির্ভরশীলতা সংক্রান্ত।

চিকিৎসা সংক্রান্ত—

কর্মরত অবস্থায় কোন রকম আঘাত প্রাপ্ত হোলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। কলিকাতা এবং হাওড়ার জন্য মোট ৪৪২ জন চিকিৎসক এবং ৭৩ জন কেমিষ্ট নিযুক্ত হয়েছেন। সাময়িক ভাবে হাসপাতালে কেবলমাত্র এই জন্য ১১০টি বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পাশাপাশি বন্দোবস্তের জন্য নীলরতন সরকার হাসপাতাল, উত্তরপাড়া সরকারী হাসপাতাল এবং উলুবেড়িয়া হাসপাতালে মোট ৩০০টি নূতন বেডের ব্যবস্থা করা হবে।

অসুস্থতা সংক্রান্ত—

অসুস্থ হয়ে কাজে যোগদান করতে অক্ষম হোলে ৩৬৫ দিনে ৬৫ দিন পর্যন্ত টাকা দিয়ে সাহায্য করা হবে। সাহায্যের পূর্ণ হার শ্রমিকের সাপ্তাহিক বেতনের $\frac{1}{2}$ অংশের মত হবে।

অকর্মণ্যতা সংক্রান্ত—

কর্মরত অবস্থায় আঘাত পেয়ে যদি কোন শ্রমিক অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, তাহলে ঐ অকর্মণ্যতার কালের জন্য বেতনের অর্ধেক টাকা সাহায্য করা হবে। অকর্মণ্যতা যদি দেহের কোন একটি বিশেষ অঙ্গের হয় তবে আনুপাতিক হারে সাহায্য করা হবে।

নির্ভরশীলতা-সংক্রান্ত —

কর্মরত অবস্থায় আঘাত পেয়ে যদি কোন শ্রমিকের মৃত্যু হয়, তবে তার বিধবা এবং সন্তান সন্ততিদের অথবা তাদের অবর্তমানে অপর নির্ভরশীলদের পেন্সন দেবার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ভারত-জাপান বাণিজ্য—

১৯৪৩-৪৪ সালে ভারত থেকে জাপানে ২৪ কোটি টাকা মূল্যের দ্রব্য রপ্তানী হয়েছে। ভারত এবং জাপানের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রচুর সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে। স্থলপথে ও জলপথে মালপত্র চলাচলের সুব্যবস্থা করা গেলে ভারত থেকে জাপানে অধিকতর পরিমাণে লৌহখনি রপ্তানি করা যেতে পারে। ঠিক একই ভাবে ম্যাঙ্গানীজ, অভ্র, ক্রোমিয়াম, মায়েসাইট প্রভৃতি যেসব খনির চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে জাপানে রয়েছে, তাদের রপ্তানী বৃদ্ধি করা যেতে পারে। লবণ আর একটি সামগ্রী যার রপ্তানী জাপানে প্রচুর পরিমাণে করা সম্ভব। তবে একটি অসুবিধা আছে, তা হচ্ছে এই যে জাপানে লবণের দর ভারতে পাইকারি দরের প্রায় সমান। সুতরাং লবণের রপ্তানী বৃদ্ধি করতে হলে এর উৎপাদন খরচ আরও হ্রাস করাতে হবে। এজন্য উৎপাদকদের উৎপাদন প্রণালীর পরিবর্তনের চিন্তা করতে হবে। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য রক্ষা করতে হলে আর একটি জিনিষের প্রয়োজন—সে জিনিষটি হচ্ছে দ্রব্যের রকম ও মান বজায় রাখা। সুতরাং জাপানের সঙ্গে বাণিজ্যেও সে কথাটি বিস্মৃত হলে চলবে না। জাপানে কফি, তুলার ছাঁট প্রভৃতি জিনিষেরও চাহিদা আছে।

জাপান থেকে ভারতও অনেক জিনিষ আমদানী করে। তার মধ্যে লৌহ-জাত দ্রব্য ও অন্যান্য কলকব্জা অন্যতম এবং এসব দ্রব্যের আমদানী আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। বস্তুতঃ এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে উভয় দেশই উপকৃত হবে।

স্বদেশী আন্দোলনের স্মৃতি

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে লর্ড কার্জনের বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বাংলা বিদেশী বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের সঙ্কল্প গ্রহণ করে। মহাত্মা গান্ধী তাঁর 'হিন্দ্ স্বরাজ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

যাকে সবাই জাতীয় জাগরণ বলে মনে করে তা বঙ্গ বিভাগ থেকে সুরু হয় "(What you call the real awakening, took place after the partition of Bengal.) তিনি এই সম্বন্ধে ঐ পুস্তকে আরও অনেক কথা লিখেছেন। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে স্বদেশী আন্দোলন সুরু হয়েছিল তাই হল আমাদের জাতীয় জাগরণের সূচনা। তার পরে ভারতবর্ষে অনেক আন্দোলন এসেছে; তা হয়ত ব্যাপকতায় ও তীব্রতায় পুরাণ স্বদেশী আন্দোলনকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ইতিহাসে হামেসাই এমনি ঘটনা ঘটে থাকে; পরবর্তী বিকাশ ও অভিব্যক্তি আদিম সূচনাকে ছাড়িয়ে যায়। এবং সেইখানেই হ'লো প্রথম সূচনার সার্থকতা। সূচনা যদি সেখানেই পর্যবসিত হয় তা হলে তা নিতান্তই ব্যর্থ। স্বদেশী আন্দোলন জাতির জীবনী বাংলার সীমাবদ্ধ গণ্ডির ভিতর যে প্রেরণা এনে দিল তা সমগ্র ভারতে জাতির বিস্তৃত ক্ষেত্রে জাতীয় মুক্তির আন্দোলন রূপে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত এই সব আন্দোলনের ফলেই আজ ভারত রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভ করেছে।

এ স্বদেশী আন্দোলন কেবল বিদেশী বর্জন ও বিদেশী বস্ত্র পোড়ানতেই পর্যবসিত ছিল না, জাতির জীবনকে বিভিন্ন দিকে গড়ে তোলার প্রেরণাও এর মধ্যে ছিল। স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন ও প্রচলন এই আন্দোলনের একটা মূল নীতি ছিল। এই আন্দোলনের সুযোগ নিয়েই বোম্বাই প্রদেশের কাপড়ের কলগুলি দাঁড়িয়ে যায়। তখন বোম্বাই কলের যে সব কাপড় বাঙালী পরত আজকাল-কার যুবকগণ তাকে চট বলে হয়ত মনে করবে। এটা একটা পরিতাপের বিষয় যে, বাঙলার আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে বাঙলায় কোন কাপড়ের কারখানা দাঁড়াতে পারল না। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল ঐ দিনের বাঙালীদের আগ্রহ ও উৎসাহের প্রতীক স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তার উপর দিয়ে নানা বিপর্যয় গিয়েছে যা বাঙালী চরিত্রের পক্ষে মোটেই শ্লাঘার নয়। বঙ্গলক্ষ্মী এখনও টিকে আছে এবং হয়ত বর্তমান কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে এর উন্নতিই হচ্ছে। স্বদেশী Industry গঠনের দিকে আজও বাংলা খুব বিশেষ কিছু করতে পারে নি।

স্বদেশী আন্দোলনের আরও কতগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। এটা ছিল আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক আন্দোলন। দলে দলে যুবকগণ সঙ্কল্প নিয়েছিল সেবাব্রত কৃচ্ছ্রসাধনের জীবন যাপন করবে। ব্যক্তিগত চরিত্রের পবিত্রতা বজায় রেখে সত্য ও প্রেমকে জীবনের মূলমন্ত্র করে তারা চলবে এই ছিল তখনকার যুবকদের আদর্শ। সত্য, প্রেম, পবিত্রতা এ হ'লো মানুষের চিরন্তন ধর্ম (Eternal Values)। আজকার যুবকসমাজ এ ধর্ম সম্বন্ধে তেমন আগ্রহশীল নয়,—সেটা জাতির পক্ষে পরিতাপের বিষয়। যুবকগণ তখন সঙ্কল্প নিয়েছিল ঐ মন্ত্রে নিজেদের চরিত্রকে গঠন করে তারা কর্মযোগের সাধনা করবে—গীতার নিষ্কাম কর্মসেবা গ্রামে গ্রামে গিয়ে গ্রামকে পুনর্গঠিত

করতে হবে; দুঃস্থ ও আর্তের সেবা করতে হবে, হিন্দু মুসলমানে মৈত্রী স্থাপন করতে হবে, জাতীয় শিক্ষা প্রচলন করতে হবে, এই সবই ছিল তখনকার দীক্ষা। পরবর্তী কালে গান্ধীজির নেতৃত্বে গঠনমূলক কাজ বলে যা পরিচিত হচ্ছিল তার সবই স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে অঙ্কুররূপে ছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের রজত জয়ন্তীর উৎসব পালন বাংলা দেশে হয়ে গেল। এই আন্দোলনের গোড়ার উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গ ভঙ্গ রোধ করা। ১৯১১ সালে বঙ্গ ভঙ্গ রহিত করা হয়েছিল। যাকে ঘুসাব্যস্ত ব্যবস্থা (Settled fact) বলে ইংরাজ ঘোষণা করেছিল তাকে এই আন্দোলনের ফলে ছয় বছর পরে তাদের পালটাতে হয়েছিল। কিন্তু যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য তারা বঙ্গ বিভাগ করেছিল তার পরিবর্তন তারা কোনদিনই করে নাই এবং সেই উদ্দেশ্যেরই শেষ পরিণতি হ'লে ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগ ও বঙ্গ বিভাগ। আজ স্বাধীনতা লাভের পর আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে ভারত ও বঙ্গ বিভাগের দুঃখ না জেগে পারে না। স্বদেশী আন্দোলনের রজত-জয়ন্তীর সময় বাঙালীর আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত—স্বদেশী আন্দোলনের আদর্শ ও দীক্ষা আমাদের জীবনে আজ কতটুকু আছে। ব্যক্তিগত জীবনে আমরা সত্য, প্রেম পবিত্রতার আদর্শ কতখানি বজায় রাখতে পেরেছি অথবা সমষ্টিগত জীবনে সেবা ও মৈত্রীর পথেই বা আমরা কতটা চলতে পারছি। জাতির আর্থিক বুনিয়াদ গঠন করার যে সঙ্কল্প ছিল তাও আজ আমাদের স্মরণ করা প্রয়োজন। স্বদেশী আন্দোলনের দীক্ষা ও সাধনাকে জীবনে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত ক'রে আজকের পরিবর্তিত অবস্থায় ও পরিস্থিতিতে বাঙালী যদি তার কর্তব্য পথ নির্ধারিত করে চলতে না পারে তাহলে স্বদেশী আন্দোলনের রজত জয়ন্তী উৎসবের সার্থকতা বিশেষ নেই।

ভারতীয় নাগরিক অধিকার বিধেয়ক

গত ৫ই আগষ্ট ভারতের গৃহমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ নাগরিক অধিকার নির্দ্ধারণের জন্য একটী বিধেয়ক বা (Bill) ভারতীয় লোকসভায় উপস্থিত করেন। এই বিলটী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় সংবিধানে ৫ থেকে ১১ ধারা পর্যন্ত নাগরিক অধিকার সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে। তাতে মোটামুটি সংবিধান রচনার সময় নাগরিক অধিকারের যোগ্য কারা হবে তাই নির্দেশ করা হ'য়েছে। ভারত বিভাগের ফলে প্রায় কোটি খানেক লোক বর্তমানে পাকিস্থান অঞ্চল থেকে ভারতে এসেছে এবং এখনও প্রতি মাসে প্রায় লাখ খানেক করে লোক পূর্ব পাকিস্থান থেকে ভারতে আসছে। তাদের অনেকেরই নাগরিক অধিকার এখনও নেই তা ছাড়াও কোন বিদেশী স্বেচ্ছায় এখানে এসে নাগরিক অধিকার অর্জন করতে পারে। আবার যাদের সে অধিকার আছে তারাও ইচ্ছা করলে ভারতীয় নাগরিকত্ব বর্জন করতে পারে। ভারতীয় সংবিধানের ১১ ধারায় এই সব বিষয় নির্ধারণ করে আইন করার অধিকার ভারতীয় সংসদ বা Parliamentকে দেওয়া হয়েছে। এতদিন যে এই সম্বন্ধে কোন বিল উপস্থিত করা হয়নি তা সত্যই পরিতাপের বিষয়!

পন্থজী তাঁর প্রাথমিক ভাষণে বলেছেন যে, বিশেষ করে পাকিস্থান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্যই এই আইনের জরুরী প্রয়োজন হয়েছে। সংবিধানের ৬ ধারায় বলা হয়েছে ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই এর পূর্বে যারা পাকিস্থান থেকে ভারতে আসে নাই তাদের নাগরিক অধিকার থাকবে না, ততদিন পর্যন্ত ১১ ধারা অনুসারে Parliament আইন করে তাদের নাগরিক অধিকার না দেয়। পূর্ব পাকিস্থান থেকে ঐ তারিখের পরে প্রায় ৩০।৩২ লক্ষ উদ্বাস্তু এসেছে। এই বিধান পাশ হলে তারা সকলেই নাগরিক অধিকার পাবে, যদি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার করে আবেদন করে। পন্থজী লোক সভায় বলেছেন যে, আগামী নির্বাচনের পূর্বে যাতে এই সব উদ্বাস্তুরা নাগরিক অধিকার পায় তার জন্য এই আইন তাড়াতাড়ি পাশ করা প্রয়োজন।

বাঙলার দিক থেকে এই আইনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। এই বিলে মোটামুটি বলা হয়েছে কি কি উপায়ে নাগরিক অধিকার পাওয়া যেতে পারে বা তা বর্জন করাও যেতে পারে; কোন কোন বিশেষ অবস্থায় কোন ব্যক্তির নাগরিক অধিকার রাষ্ট্র যে কেড়ে নিতে পারবে তার বিধানও এতে করা হয়েছে। পাঁচ উপায়ে নাগরিক অধিকার পাওয়া যেতে পারবে :—

(১) ভারতে জন্ম

(২) বংশগত অর্থাৎ ভারতের বাহিরে জন্ম হলেও তার পিতা মাতা যদি ভারতের নাগরিক হয়।

(৩) আবেদন করে নাগরিকের তালিকায় নাম ভুক্ত করান—উদ্‌বাস্তুরা এই পর্যায়ের অন্তর্গত হবে।

(৪) কোন বৈদেশিক দীর্ঘকাল বাস করে নাগরিক অধিকার লাভ করতে পারবে (Naturalisation)।

(৫) নূতন অঞ্চল ভারতের অধীভূত হ'লে সেখানকার অধিবাসীরা নাগরিক অধিকার পাবে। আশা করা যায় গোয়ার অধিবাসীরা শীঘ্রই এই ব্যবস্থায় বলে ভারতের নাগরিক তালিকা ভুক্ত হবে।

সব দেশেই নাগরিক অধিকার নিয়ন্ত্রণের আলাদা আইন থাকে। ভারতবর্ষে এতদিন যে ছিল না তাতে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। আরও আগেই সরকারের এদিকে মন দেওয়া উচিত ছিল। এই আইনের একটি বিধান সম্বন্ধে কোন কোন মহলে আপত্তি হতে পারে, বিশেষ Commonwealth এর অন্তর্গত দেশ সমূহের অধিবাসীরা ভারতে Commonwealth citizen কমনওয়েলথের নাগরিকের অধিকার পাবে। এটা একটা আলাদা পর্যায়ের—কতকটা দ্বৈত নাগরিক অধিকারের মত। এই ব্যবস্থায় আমরা আপত্তির কোন কারণ দেখি না। ভারতীয় নাগরিকরাও কমনওয়েলথের ভিতর এমনি অধিকার ভোগ করবে। কমনওয়েলথের বাইরে Irish প্রজাতন্ত্র সম্বন্ধেও এই একই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কিন্তু আমাদের বিশেষ আপত্তি আছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে এই পর্যায় ভুক্ত করা বিষয়ে। ভারতীয় নাগরিকদের প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকা বর্বরোচিত আচরণ করে আসছে। আজ বহু বৎসর যাবৎ দক্ষিণ আফ্রিকার সাথে ভারতের রাজনৈতিক ও ব্যবসা বাণিজ্যগত সম্পর্ক রহিত করা হয়েছে। আশা করি শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকাকে এই তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হবে। পণ্ডিত পন্থ ও কতকটা এতে তাঁর স্বীকৃতি জানিয়েছেন।

পূর্ব বাংলা হতে আগত ৩০।৩৫ লক্ষ লোক আজ নাগরিক-অধিকারহীন, ইংরাজীতে যাকে বলা যায় Stateless people। এই বিধেয়ক পাশ হলে তারা সবাই নাগরিক অধিকার পেতে পারবে; বাংলার তরফ থেকে এইটাই সবচেয়ে বড় কথা! কিন্তু উদ্বাস্তুদের যে আবেদনপত্র স্বাক্ষর করে নিজেদের নাম নাগরিকের তালিকাভুক্ত করতে হবে এই ব্যবস্থা আমরা সমর্থন করি না। এতে তাদের অনর্থক হয়রানি হ'বে। তাই কোন সহজ পন্থা বের করা দরকার। আশা করি বিলটি পাশ হবার সময় এমনি ২।১ টি দোষ ত্রুটি যা আছে, তা সংশোধন করা হবে। অন্যান্য বিদেশী কেউ নাগরিক অধিকার গ্রহণ করতে চাইলে কোন সঙ্গত কারণ থাকলে সরকার সেই অধিকার প্রত্যাহার করতে পারবে, উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধেও বিলে ঐ প্রকার বিধান আছে। কিন্তু লোকসভার আলোচনার সময় গৃহমন্ত্রী স্বীকার করেছেন ঐ ব্যবস্থা উদ্বাস্তুদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হ'বে না এবং বিলের ঐ অংশ পরিবর্তন করা হ'বে। ঐ বিধান থাকলে উদ্বাস্তুদের প্রতি খুবই অন্যায় করা হত। যাক সুখের বিষয় পন্থজী এর পরিবর্তন করতে রাজী হ'য়েছেন।

দুর্গাপুর খাল—

দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার প্রধান খাল, দুর্গাপুর খাল ৯ই আগষ্ট উদ্বোধন করা হয়েছে। ভারতীয় উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন আনুষ্ঠানিক ভাবে এই খালে জল প্রবেশের কাজ উদ্বোধন করেছেন। এই খালটী ৮৬ মাইল লম্বা। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত দুর্গাপুর নামক স্থান থেকে দামোদরের জল বহন করে এই খাল ত্রিবেণীর কাছে গঙ্গা নদীতে এসে যোগ দিয়েছে।

এই খাল থেকে আরও অনেক ছোট ছোট খাল কেটে সেচের জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। ঐ সমস্ত সেচ খালের মোট দৈর্ঘ্য হবে অন্ততঃ ১৫০০ মাইল। ১৩লক্ষ একর জমি এ থেকে সেচের জল পাবে এবং আশা করা যায় ৫০ লক্ষ মণের উপর অতিরিক্ত চাউল আমরা এ থেকে পাব।

এই খাল কেবল সেচের জলই সরবরাহ করবে তা নয়। প্রায় প্রতি বৎসরই দামোদরের বন্যায় পশ্চিম বাংলার অন্তর্গত ৪।৫টি জেলার ফসল নষ্ট হ'তো, লোকের বাড়ীঘরও ধ্বংস হ'তো। দামোদরকে বলা হতো অকরুণ নদী;—প্রায়ই বন্যাতে লোকের এত দুঃখ কষ্ট ঘটাত বলেই দামোদরের এই কুখ্যাতি হয়েছিল। আশা করা যায় এই খাল কাটার পর বন্যার আশঙ্কা একেবারে লোপ না পেলেও বহু অংশে কম হবে। দামোদর উপত্যকার পরিকল্পনা প্রথম সুরু হয় বন্যা নিরোধের জন্যই। পশ্চিম বাংলার দিক থেকে এটা একটা গুরুতর সমস্যাই ছিল দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার সংস্থা প্রধান অধিনায়ক (Chairman) তাও আশ্বাস দিয়েছেন ঐ অঞ্চলের লোকদের: No more flood for them, no more devastation, no more loss of life, of crops or of cattle—আর বন্যা হবে না, ধ্বংস হবে না, মানুষ ও গো-মহিষাদির জীবননাশ বা ফসলহানি আর হবে না।

এই খাল দিয়ে দুর্গাপুর থেকে কলিকাতা পর্যন্ত নৌকা বা ষ্টীমার যোগেও মালপত্র বহন করা যাবে! প্রায় ২০ লক্ষ টন মাল এই খাল দিয়ে চলাচল করতে পারবে বলে হিসাব করা হয়েছে। রেল দিয়ে এই মাল চলাচল করতে এখন রেলের উপর যে চাপ পড়ে তা অনেকটা কমে যাবে এবং মালপত্রের দ্রুত বহন সহজ হবে। সব দিক দিয়েই এই খাল বাংলার ও ভারতের আর্থিক উন্নতির বিশেষ সহায়ক হবে। আজ প্রায় ৮।৯ বছর হলো দামোদর উপত্যকার উন্নয়ন কাজ সুরু হয়েছে। ২।৩ বছর পূর্বে এর বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ চালু হয়েছে। এই খাল উদ্বোধনের পর বন্যা নিরোধ ও সেচের কাজ চালু হলো বলা চলে। স্বাধীনতা লাভের পর যে সব উন্নয়ন পরিকল্পনা ভারতবর্ষে গৃহীত হয়েছে দামোদর পরিকল্পনা বোধহয় তার ভিতর সর্বপ্রথম। এই খাল কাটার কাজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই সম্পন্ন হয়েছে। বাংলার ও ভারতের খাদ্য সমস্যার সমাধানের পক্ষে একটা প্রধান পরিকল্পনার বিকাশে ও সাফল্যে আমরা জাতিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

নাগরিক অধিকারের প্রাদেশিক গণ্ডি—

নাগরিক অধিকারের আইনের প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের মনে আসছে। সাধারণতঃ নাগরিক অধিকার রাষ্ট্রের সর্বত্র সমানভাবে কার্যকারী থাকে; একই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলে আলাদা আলাদা গতি এর মধ্যে থাকতে পারে না। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নির্দেশ করা হয়েছে। তাতেও এই কথাই বলা হয়েছে যে ধর্ম, ভাষা বা বর্ণের পার্থক্যের জন্য নাগরিক অধিকারের কোন তারতম্য হবে না; কিন্তু এ সব সত্ত্বেও ভাষার ভিত্তিতে নাগরিক অধিকারের তারতম্য বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও আছে। সংবিধানের ১৬ ধারার ৩ উপধারাতে কোন বিশেষ অঞ্চলে বা প্রদেশে একটা নির্দিষ্ট সময় বাস করার উপরে সেই অঞ্চলে চাকরী পাওয়া সম্বন্ধে কিছু বাধা নিষেধের উল্লেখ আছে। সংবিধানের ৩৭ ধারার খ উপধারায় বলা হয়েছে সংবিধান রচিত হওয়ার পূর্বে ঐ সম্বন্ধে যে সব আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক আইন চালু ছিল তা পার্লামেন্ট অথবা বদল বা রহিত না করা পর্যন্ত চালু থাকবে। প্রাদেশিক বিধান সভা তা পরিবর্তন করতে পারবে না। এই সংবিধানের সুযোগ নিয়ে কোন কোন প্রদেশ নানা রকম ভেদমূলক বিধি বিধান এখনও চালু রাখছে।

আসাম প্রদেশ অন্য প্রদেশের লোক ও স্থানীয় লোকের অধিকার সম্বন্ধে একটা বিশেষ পার্থক্য বজায় রাখছে। স্থানীয় বা Indigenous লোকের সংজ্ঞা হচ্ছে আসাম প্রদেশের অধিবাসী এবং আসামী ভাষাভাষী

অথবা কোন উপজাতীয় ভাষাভাষী, কেবল কাছাড় জিলায় এখানকার স্থানীয় ভাষাভাষী লোকদের ও স্থানীয় অধিবাসী ধরা হবে, এবং স্থানীয় অধিবাসী না হ'লে কাউকে কোন জমির অধিকার দেওয়া হবে না। এই নীতি পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুর আগমন উপলক্ষ্যে ১৯৪৮ সালের মে মাসে আরও বিশেষ করে ঘোষণা করা হ'লো।

"পাকিস্তান থেকে এই প্রদেশে উদ্বাস্তুদের আসার ফলে যে জরুরী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তাতে, এই প্রদেশের নগরে ও গ্রামে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, সরকার পুনরায় ঘোষণা করছেন যে এইরূপ স্থানীয় অধিবাসী নয় এমন কোন লোককে কোনক্রমেই জমি দেওয়া হবে না। জমী যিনি ব্যবস্থার দিক থেকে যে সব লোক আসামের বাইরে থেকে এসে এখানে বাস করছে, এখানে তারা জমী ও বাড়ীঘর অর্জন এবং আসামকে সর্বতোভাবে তাদের মাতৃভূমি হিসাবে গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাদেরকে আসামী বলে গণ্য করা হবে না।

সাব-ডিভিসনাল অফিসার, সাব-ডেপুটি কালেক্টার ও ভূ-স্বত্ব বিভাগের সমস্ত কর্মচারীদের নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন উপরোক্ত আদেশের তাৎপর্য সম্পূর্ণ অনুধাবন করেন এবং তদনুসারে কাজ করেন। যদি কোন কর্মচারী এ আদেশের ব্যত্যয় করেন, সরকারের নিকট যেন অভিযোগ পেশ করা হয় যাতে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।"

তা ছাড়া আর এক শ্রেণীর নাগরিকদের ধরা হ'লো প্রবাসী (domiciled) তাদের সংজ্ঞা নিচে দেওয়া হ'লো।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে (২০শে) আইন সভায় তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলৈ মহাশয়ের ঘোষণা অনুসারে :

"বহিরাগতকে আসামের বাসিন্দা বলে গণ্য হতে হলে নিম্ন সর্তগুলি পূরণ করতে হবে :—

১। কোন জেলায় নিরবচ্ছিন্ন দশ বছর বাস করতে হবে এবং সেখানে নিজের বাড়ী থাকা চাই।

২। আমৃত্যু সেখানে বসবাস করবার অভিপ্রায় থাকা চাই।

৩। আসামের বহির্ভূত পূর্ব-বাসস্থানে কোন ভূ-সম্পত্তি থাকা চলবে না।

৪। পূর্ব-বাসস্থানে বার বার গতাগতি চলবে না।

৫। পূর্ব বাসস্থানের আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে কোন স্বার্থ সম্পর্কিত যোগাযোগ রক্ষা করা চলবে না।"

এতে দেখা যায় যে আসামে বসতে হবে এমনি অঙ্গীকার পর্যন্ত দিতে হবে। আসামের বাহিরে আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে যাওয়া বা অন্যত্র কোন ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হওয়া এতে মানা করা আছে। আসামের বাহিরে আত্মীয় স্বজন থাকলে তাদের খোঁজ খবর নেওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ।

এই সব সর্ত অতিক্রম করে আসামী ভাষাভাষী নয় এরকম কোন ভারতীয় নাগরিকের আসামে জীবিকা অর্জনের কোন ব্যবস্থাই হ'তে পারে না। শুনা যায় কিছুদিন পূর্বে আসামের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিম বাংলার মুখ্য মন্ত্রীর সঙ্গে এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তখন তিনি নাকি বলেছেন সংবিধানের ৩৫ ধারার খ উপধারা অনুসারে এই সব তিনি বদলাতে পারেন না, কিন্তু সংবিধানে ৩৫ ধারায় যে সব বিষয় নিষেধ করা হয়েছে তা হ'লো ১৬ ধারার ৫ উপধারার উল্লিখিত বিষয় এবং সেখানে উল্লেখ আছে কেবল মাত্র চাকরীর (employment or appointment to an office); জমির অধিকার সম্বন্ধে কোন উল্লেখ তাতে নেই। ৩৫ ধারার খ উপধারাতে বলা হয়েছে—ঐ সম্বন্ধীয় যে সমস্ত আইন বিভিন্ন প্রদেশে চালু আছে (now in force) তার পরিবর্তন কেবল পার্লামেন্ট করতে পারবে, প্রাদেশিক বিধানসভা করতে পারবে না। তা ছাড়া আমরা দেখছি আসামে এই সব বিষয়ে কোন আইন চালু নেই। এ সব হ'লে আসাম সরকারের প্রশাসনীয় নীতি ও আদেশের (adminis-

trative policy and orders) কম, কাজেই সংবিধানের কোন ধারাতে এসব পরিবর্তন করার পক্ষে আসাম সরকারের কোন বাধা আছে বলে আমাদের মনে হয় না।

আমাদের আবেদন হ'লো ভারত সরকারের বিষয় সচিবের নিকট; তিনি যখন ভারতীয় নাগরিক অধিকারের আইন প্রণয়ন করছেন তখন তাঁর এটা দেখা উচিত যে প্রাদেশিক নীতি ভারতীয় নাগরিক অধিকারকে বিভিন্ন অঞ্চলে খর্ব না করে। তিনি যদি সেই সতর্কতা অবলম্বন না করেন তাহলে নাগরিক অধিকারের মূল্য খুব সামান্যই থাকবে। একই রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকারের একই ও অবিচ্ছিন্ন থাকা দরকার।

গোয়া সত্যাগ্রহ ও কংগ্রেস—

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি সাম্প্রতিক অধিবেশনে গোয়া সম্বন্ধে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন—প্রস্তাবের সারমর্ম হচ্ছে এই যে কংগ্রেস গোয়ার মুক্তির জন্য ভারতীয় নাগরিকদের তরফ থেকে ব্যক্তিগত বা সংঘবদ্ধ সত্যাগ্রহ সমর্থন করবেন না। প্রস্তাবে গোয়া পরিস্থিতির দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে, ১৫ই আগষ্টের সত্যাগ্রহীদের প্রতি পর্তুগীজ বর্বরতার নিন্দা করা হয়েছে, এই ধরণের সত্যাগ্রহে বর্তমান সমস্যার সমাধান হবে না এই মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে এবং উপসংহারে কংগ্রেসকর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তাঁরা যেন প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে জনসাধারণকে প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করে বোঝান। সত্যাগ্রহ যাঁরা করেছেন তাঁদের নিন্দা করা হয় নি, বরং তাঁদের সাহস, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের প্রশংসা করা হয়েছে, এবং সত্যাগ্রহে হতাহতদের ও তাঁদের আত্মীয় স্বজনদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, কংগ্রেস কর্মীরা এখন জনসাধারণকে এই প্রস্তাবের তাৎপর্য কি করে বোঝাবেন? প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে, সুতরাং অনুমান করা যায় যে সব সদস্য সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রস্তাবের মর্ম তাঁরা সহজেই বুঝেছেন। কিন্তু অন্যদের কাছে এটা সহজে বোঝাতে পারবেন এমন আশা আমরা করছি না। এর প্রধান কারণ, এই প্রস্তাবে রেতি-বাচের দিকটা যত পরিষ্কার, ইতি-বাচের দিকটা ততটা নয়। কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ কি অহিংসের পথে গোয়া মোচন করতে চাইছেন তা বোঝা গেল, কিন্তু কি তাঁরা করতে চাইছেন তার যেন হদিশ মিলছে না। অথচ গোয়াতে পর্তুগীজ সরকারের শাসন যেমন অনড় হয়েছে এবং বিশেষতঃ সত্যাগ্রহীদের প্রতি যে ভীষণ নৃশংস ব্যবহার পর্তুগীজরা করেছে তাতে ভারতবর্ষের জনসাধারণ ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠেছে। নিষ্ক্রিয় বসে থাকা এখন আর সম্ভব নয়। কোন না কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতেই হবে। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস যদি কোন সক্রিয় পন্থা না নেয়, অন্য রাজনৈতিক দল বা দলেরা নেবে, এবং জনসাধারণ বিধাগ্রস্ত হ'বে, সম্ভবতঃ কংগ্রেস নেতৃত্বে তাদের আস্থা নিখিল হতে যাবে। বিরোধীদলেরা তাদের দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য গোয়া পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে চাইছে, কংগ্রেস পক্ষ থেকে এ অভিযোগের কোন মূল্য হবে না।

অপরপক্ষে, ১৫ই আগষ্টের সত্যাগ্রহের যে পরিণতি হয়েছে তাতে বর্তমান পরিস্থিতিতে সত্যাগ্রহের উপযোগিতা সম্বন্ধে বহুলোকের মনে সংশয় দেখা দিয়েছে। জনসাধারণ আরো ঘোরালো কোন ব্যবস্থা চায়, অর্থাৎ সামরিক ব্যবস্থা। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী নেহেরু ঠিকই বলেছেন—খুব ছোট মাপের হলেও সেটা যুদ্ধই, এবং যেহেতু বলপ্রয়োগ ভারত সরকারের নীতি নয়, ভারতবর্ষ যুদ্ধের পথ অবলম্বন করতে পারে না।

তবু এটা নিশ্চয় যে এই উভয় সঙ্কটের মধ্য থেকে পথ একটা খুঁজে বার করতেই হবে। এ সম্বন্ধে সরকার কি করছেন বা কংগ্রেস কি সুপারিশ করতে চায় তার কোন ইঙ্গিত আলোচ্য প্রস্তাবে থাকলে ভাল হোতো।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত
এবং 'মন্ত্রিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে [illegible] কর্তৃক প্রকাশিত

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

মন্দিরা

অষ্টাদশ বর্ষ | আশ্বিন —১৩৬২ | ষষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনী

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

রাজর্ষি সুরথ শত্রুর আক্রমণে সর্বস্ব হারাইয়া বনে পলাইয়া গিয়াছেন। সেখানে এক বৈশ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বৈশ্যকে তাঁহার পত্নী পুত্র ধনজন হরিয়া গৃহ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় রাজা-বৈশ্য সুরথ বনে আসিয়াও রাজ্যের কথাই চিন্তা করিতেছেন। আর যাহারা তাঁহাকে গৃহ হইতে দূর করিয়া দিয়াছে, সমাধি বৈশ্য সেই স্ত্রী পুত্রের সংবাদ না পাইয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। পরস্পরের পরিচয়ে দুইজনে আপন আপন দুঃখের কথা, মনের এই অবস্থার কথা আলোচনা করিয়া মহর্ষি মেধসের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত নিবেদন পূর্বক এই শোচনীয় মানসিক বিকৃতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীশ্রীদুর্গা সপ্তশতী—শ্রীশ্রীচণ্ডীর অবিভাবের ইহাই হেতু।

সুরথ বলিলেন, মহামায়ার প্রভাবের ফলেই ঐরূপ ঘটে। সেই মহামায়া দেবীই পরমা মুক্তির হেতুভূতা আবার তিনিই সংসার-বন্ধের কারণ। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই মহামায়া কে? তাঁহার উদ্ভবের হেতু কি, তাঁহার কর্মই বা কি? তাঁহার চরিত্র এবং প্রভাবের কথা আমায় বলুন। ঋষি বলিলেন, সেই দেবী নিত্যা, তিনি জগন্মূর্তি, তুলাদণ্ড বিশ্বের সাধন ভজন তত্ত্ব তেমন নহই তাঁহার, তিনিই সমস্ত। দেবগণের কার্য সিদ্ধির জন্য যখন তিনি আবির্ভূতা হন, সেই নিত্যা হইয়াও লোকে তখন উৎপন্না বলিয়া জানে। এই জগতের ঈশ্বরী তিনি, পালয়িত্রী তিনি, আবার সংহারকারিণীও তিনি। এই বলিয়া দেবীর আবির্ভাব ও স্বরূপের প্রসঙ্গে ঋষি মধুকৈটভ বধ, মহিষাসুর বধ ও শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ বর্ণনা করিলেন। আমরা সংক্ষেপে মহিষাসুর বধের কথা বলিতেছি।

দেবাসুরের যুদ্ধ শত বৎসর চলিতেছে। মহিষাসুরের সেনাপতি মহাবলী অসুরগণ দেবরাজ ইন্দ্রসহ দেবগণকে স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছে। বিপন্ন দেবগণ ব্রহ্মা, শিব সহ বিষ্ণুর শরণ গ্রহণ করিয়াছেন। দেবগণের দুর্বলতায় এবং অসুরগণের অত্যাচারের কথা আলোচনায় ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেবগণেরও ক্রোধ হইল। এই সময়ের দেবতার ক্রোধে সর্বদেবতাদেহ হইতে অতুল অনল উঠিল। অন্য সকলের মত দেহ পুঞ্জীভূত আলোয় হইতে বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইল। সর্বদেবতাদেহোদ্ভূত সেই তেজঃ এক রমণীর আকার পরিগ্রহ করিল। এই দেবীই মহিষাসুর নিবর্হকারিণী শ্রীশ্রীমহিষমর্দিনী।

শম্ভুর তেজে দেবীর বদনমণ্ডল, যমের তেজে কেশকলাপ, বিষ্ণুর তেজে বাহুযুগল, চন্দ্রের তেজে স্তনযুগল, ইন্দ্রের তেজে কটিদেশ, বরুণের তেজে জঙ্ঘা এবং উরু, পৃথিবীর তেজে নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে চরণকমল, সূর্য তেজে চরণ

অঙ্গুলিসকল, বসুগণের তেজে করাঙ্গুলিসমূহ, কুবেরের তেজে নাসিকা, প্রজাপতিগণের তেজে দন্তনিচয়, পাবকের তেজে নয়নত্রয়, সন্ধ্যার তেজে ভ্রূদ্বয়, বায়ুর তেজে কর্ণযুগল এবং অপরাপর তেজে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগঠিত হইল। দেবগণ সেই দেবীকে দেখিয়া আপন আপন অস্ত্রশস্ত্র হইতে অনুরূপ অস্ত্রশস্ত্রাদি নিষ্কাশিত করিয়া দেবীকে প্রদান করিলেন। শম্ভু শূল দিলেন, বিষ্ণু চক্র দিলেন, প্রজাপতি অক্ষমালা, ব্রহ্মা কমণ্ডলু, ইন্দ্র বজ্র, বরুণ শঙ্খ, অগ্নি পাশ, বায়ু চাপ, কাল খড়্গ ইত্যাদি দান করিলেন। এইবার অলঙ্কারের পালা। কেহ নূপুর, কেহ কেয়ূর, কেহ হার, কেহ মুকুট, কেহ অন্যান্য অলঙ্কার দিয়া দেবীকে সাজাইলেন। হিমালয় বিবিধ রত্নের সহিত বাহনস্বরূপ একটি সিংহ আনিয়া দিলেন। এই দেবীই সিংহবাহিনী মহিষমর্দ্দিনী।

এই দেবী সমবেত শক্তির প্রতীক। জগতের মঙ্গলকারক শক্তিই দেবশক্তি। অসুরশক্তির অত্যাচারে অমঙ্গলের প্রাবল্যে সেই দেবশক্তির যখন অভিভব ঘটে, মঙ্গল পর্য্যুদস্ত হয়, সত্য শিব সুন্দরের অপহ্নবে মিথ্যা, অশুভ এবং মালিন্য, লোভ হিংসা দ্বেষ বিশ্বকে পশুশালায় পরিণত করে, তখনই এই দেবী আবির্ভূতা হন। জগতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সকলে মিলিয়া অন্তরের আকুতিতে অকপট আর্ত্তিতে কায়মনোবাক্যে দেবীর শরণাগত হইলে তিনি কৃপা করিয়া দর্শন দেন এবং সর্ববিঘ্ন বিনাশ করেন। এই দেবী শুধু শক্তিরূপীই নহেন তিনি সৌন্দর্যময়ী। তাই দেবগণ অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে তাঁহাকে অলঙ্কারেও সাজাইয়া দেন। এই জন্যই কবি বলিয়াছেন তিনি কালরাত্রি, মহারাত্রি এবং মোহরাত্রি। আবার তিনিই—

"সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী।"

দেবগণের তেজে দেবীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠনের বর্ণনাটীও রহস্যপূর্ণ। লীলাবিগ্রহে দেবী মহাদেবের শক্তিস্বরূপা, তাই শম্ভুর তেজে মায়ের উত্তমাঙ্গ বদনমণ্ডল গঠিত হইয়াছে। প্রধানতঃ মুখ দেখিয়াই মানুষ চিনিতে হয়, দেহের প্রধান অংশই মস্তক। শম্ভুর তেজের ইহাই রহস্য। যমের তেজে কেশপাশ। তাই তো যে দানব জননীর কেশাকর্ষণ করিয়াছে, সে মৃত্যুকেই আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে। রমণীকে অকারণ অপমানিত লাঞ্ছিত করিবার জন্য তাহার কেশাকর্ষণে কখনো কাহারো কল্যাণ হয় নাই। চন্দ্রের তেজে জগজ্জননীর স্তনমণ্ডল গঠিত হইয়াছে। সে পীযূষধারা নিখিল জগতের জীবন, তাহার আকর তো সুধাকরের নির্য্যাসেই সুগঠিত হইবার কথা। অখিল বিশ্ব যে পীযূষ স্তন্যপানে বাঁচিয়া আছে, তাহার উৎস এখানে সোম সংজ্ঞায় পরিচিত। সোম শব্দটি লক্ষণীয়। বিষ্ণুর তেজে বাহু। বাহুতেই জননীর পালনী শক্তি নিহিত। সংহারাস্ত্রও বাহুতেই বিধৃত রহিয়াছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে এই সংহার-কার্য পালনের সৌকর্য্যেই প্রয়োজনীয়। এইরূপ অন্যান্য তেজেরও গভীর অর্থ আছে। অস্ত্র ও অলঙ্কারের বর্ণনায় এইরূপ গভীরার্থ দ্যোতক ব্যঞ্জনা রহিয়াছে।

বাঙ্গালী এই মহিষাসুর মর্দিনীরই পূজা করে। মহর্ষি কাত্যায়ন ইহাকে প্রথম পূজা করিয়াছিলেন, তাই দেবীর অন্য নাম কাত্যায়নী। বাঙ্গালীর পূজোপকরণের মধ্যেই বাঙ্গালার সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় আছে। পূজায় যেমন ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেরই সংযোগ সম্বন্ধ আছে, তেমনই শৌর্য বীর্য সৌন্দর্যের মহিমান্বিত প্রকাশ ও বিকাশের দ্যোতনা আছে। আবার পূজার উপকরণে কৃষি, শিল্পস্থাপত্য, ভাস্কর্য, তক্ষণ শিল্পের প্রয়োজনীয়তা আছে। পূজায় বাণিজ্যজাত দ্রব্যসম্ভার আছে, ললিত কলার অবদানপরম্পরা আছে। কিন্তু আমরা সে ঐতিহ্য বিস্মৃত হইয়াছি। তথাকথিত সার্বজনীন পূজার প্রাবল্যে পূজার আসল উদ্দেশ্যই ভুলিয়া গিয়াছি। পূজায় এখন ভাস্করের যথেচ্ছাচার, অশ্লীল নৃত্য গীত ও মাইকের উৎপাত, নিষ্ঠাবান পুরোহিতের পরিবর্তে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব এবং নানান্ কদাচারের উপদ্রব আমাদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়াছে। মহিষাসুর বধের নিগূঢ় মর্ম, দেবী মহিষমর্দিনীর আবির্ভাবরহস্য, তাঁহার তত্ত্ব ও তথ্য আমরা কিছুই জানি না। তাই আমাদের পূজাও বিফল হয়।

গ্রাম-উন্নয়ন

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রসঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের প্রধান সচিব ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় যে ব্যবস্থা করিতে বলিতেছেন, তাহা অনেকের সমর্থন লাভ করিবে। তিনি মনে করেন, জাতির উন্নতি সাধন করিতে হইলে উপর হইতে তাহা চাপাইয়া দিবার চেষ্টা না করিয়া নিম্ন হইতে তাহা সাধনের চেষ্টা করাই সঙ্গত এবং তাহাতে অধিক সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। বিশেষতঃ তাহা না হইলে শাখা-প্রশাখার ভারে দীর্ণকায় বৃক্ষের 'দশা' ঘটিতে পারে—সমাজ ও জাতি সেই "উন্নতির" ভার সহ্য করিতে অক্ষম হইতে পারে।

জাতির ও দেশের উন্নতি দৃঢ়, সবল ও স্থায়ী করিতে হইলে গ্রাম হইতে তাহার আরম্ভ করাই সঙ্গত। কারণ, এ দেশকে গ্রাম-প্রধান না বলিয়া গ্রামপ্রাণ বলিলেই প্রকৃত অবস্থা বিবৃত করা হয়। ভারতবর্ষ—তথা বাঙ্গালা এখনও কৃষকের দেশ বলা যায়। আর এ দেশে অধিবাসী-দিগের শতকরা মাত্র ২০ জন সহরে বাস করে এবং অনেক সহরই বিস্তার প্রাপ্ত গ্রাম। বাঙ্গালায় কয়টি সহর করিতে আছে?

এ দেশে ইংরেজ শাসনের ফলে যে নগরমুখী সভ্যতা দেশবাসীকে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করে, তাহার ফলেই গ্রামসমূহের অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে—এখনও সে অবস্থার পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে না।

সুখের বিষয় ও আশার কথা, সেদিকে মনীষীদিগের মনোযোগ দেখা যাইতেছে। খৃষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই গ্রামের পুনর্গঠনের, গ্রাম্য সমিতি প্রতিষ্ঠা ও তাহাদিগের মধ্যে দেশের জনসাধারণকে স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন অনুভব করিয়া-ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন:—

"আমরা যদি জাতি হিসাবে বিলুপ্ত না হইয়া জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি, তবে শক্তির যে সকল কেন্দ্র আমাদিগের পক্ষে স্বাভাবিক সেই সকল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে এবং তাহাই প্রয়োজন। সে সকলের মধ্যে স্বাবলম্বী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম্যসমিতি সর্বপ্রধান। তাহাই উন্নতির ভিত্তি—ভারতীয় জীবনের পুরাতন বা সনাতন ভিত্তি এবং ভারতীয় শক্তির উৎস। এ দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে গ্রামকেই তাহার ভিত্তি করিতে হইবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে এক বিষয়ে সতর্ক হইতে হইবে—যে কারণে অতীতে আমাদিগের জাতীয় উন্নতির গতি প্রহত হইয়াছিল, তাহা যেন আমরা আবার বরণ করিয়া না লই। আমাদিগের নূতন জাতীয় জীবনে গ্রাম যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র না হইয়া প্রতিবেশীদিগের সহিত সম্বন্ধযুক্ত—এক গোষ্ঠির অংশ হয়।"

ভারতীয় সভ্যতার প্রথম অভ্যুদয়ের সময় গ্রামের অবস্থা ও ব্যবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার পরিচয় আমরা মনু-সংহিতায় পাই। সেই বিবরণ পাঠ করিলে মনে হয়, ভারতে গ্রাম স্বায়ত্ত-শাসনশীল—গণতন্ত্র-শাসিত ছিল। গ্রামের বিধিবিধান ঐ সংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছিল। এই গণতান্ত্রিকতার পরিচয় বৌদ্ধ যুগেও সপ্রকাশ। বৌদ্ধ যুগে নির্মিত গৃহে গ্রাম্যসমিতির অধিবেশন-স্থান দেখা যায়। গৌতম বুদ্ধ যখন মৃত্যুশয্যায় তখন আনন্দ সেই সংবাদ মল্লপ্রধানদিগের নিকট বহন করেন—তাঁহারা তখন গ্রামের কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন—সংবাদ

পাইয়া ভঙ্গ করিয়া যুদ্ধকে দেখিতে আগমন করেন

ভারতে সমাজ গ্রামে ছিল এবং গ্রামকে অর্থাৎ গ্রামের সমাজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য গ্রামে আবশ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইত। ভারতে বিপ্লবের বাত্যা বহিয়া গিয়াছে—বিজয়ের বন্যা প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে—কিন্তু জাতির প্রাণকেন্দ্র গ্রাম নষ্ট হয় নাই। তখনও গ্রামের দেবালয়ে আরতির শঙ্খনাদ হইয়াছে, তখনও গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা পাঠ করিয়াছে—শিক্ষকরা অধ্যাপনা করিয়াছেন, তখনও গ্রামের লোকের বিবাদের যে মীমাংসা গ্রামের পঞ্চায়েতের দ্বারা হইয়াছে, তাহা অমান্য করিবার সাধ্য কাহারও হয় নাই।

গ্রামের এই গুরুত্ব মুসলমান শাসনের শেষ পর্যন্ত—এমন কি ইংরেজ শাসনের আরম্ভ কালেও অব্যাহত ছিল—লোক কার্যোপলক্ষে নানাস্থানে যাইলেও গ্রামের সহিত তাহাদের যোগসূত্র ছিন্ন হইত না, যাঁহারা অন্য স্থানে ব্যবসায়ে বা চাকরীতে অর্থার্জন করিতেন, তাঁহারা গ্রামের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট থাকিতেন—গ্রামে বার মাসে তের পার্বণের ব্যবস্থা ছিল—গ্রামের সমাজ তাঁহারা সমাজ বলিয়া জানিতেন ও মানিতেন।

ইংরেজী শিক্ষায় ও য়ুরোপীয় সভ্যতায় আমাদিগের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। পরিবর্তন এত দ্রুত হয় যে, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই গ্রামের দুর্দশা ঘটে—সংস্কারের অভাবে পুষ্করিণীর জল অপেয় ও রোগের কারণ হয়, পথ দুর্গম হইয়া দাঁড়ায়, রাস্তা জঙ্গলে পরিণত হইয়া ভয়াবহ হয়।

শিল্পের প্রথম সমৃদ্ধির সময় ইংলণ্ডেও গ্রামের এইরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছিল। প্রায় এক শত বৎসরকাল গ্রামাঞ্চল সহরের অধিবাসীদিগের খেলার মাঠ বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহার পরে তথায় মতের পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে। তথায় মনীষীরা বুঝিয়াছেন—গ্রামের ধ্বংস হইলে সমগ্র দেশের ধ্বংস অনিবার্য হয়। সেই জন্য ইংলণ্ডে গ্রামের উন্নতি-সাধন-কার্য আরম্ভ করা হয়। পরপর দুইটি মহাযুদ্ধে ইংরেজের অর্থনাশ হইয়াছে এবং দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংলণ্ডের অস্তিত্বও বিপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধের পরেই তথায় যে পুনর্গঠনকার্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে গ্রাম উপেক্ষিত হয় নাই—গ্রামের উন্নতি সাধন কার্য পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে।

কিন্তু ইংলণ্ড ধনী। তাহার বিপুল সম্পদ ব্যবহার করিয়া সে তাহার গ্রামের দ্রুত উন্নতি সাধন করিতে পারে—পথের উন্নতি ও বিদ্যুৎসরবরাহ তথায় সহজসাধ্য। ভারতে তাহা সম্ভব নহে। অথচ এ দেশে গ্রামের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে। বিশেষ প্রীষ্মপ্রধান দেশে দ্রুতবর্ধমান লতাগুল্ম প্রভৃতির উপদ্রব অসাধারণ। গ্রামের অবস্থার অবনতির একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। যখন মারহাট্টারা চৌথ আদায় করিবার জন্য বাঙ্গালা আক্রমণ করিত, তখন বর্ধমানে কাঞ্চননগর সমৃদ্ধ গ্রাম ছিল—তখন বর্ধমান নগর দামোদর তীরে কাঞ্চননগরেই ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ধমানের জমীদারের সেনাবল ও জনবল একযোগে মারহাট্টাদিগকে পরাভূত ও বিতাড়িত করিলে সেই জয়ের স্মৃতিচিহ্নরূপে কাঞ্চননগরে নদীর সান্নিধ্যে কয়টি গৃহ নির্মিত হইয়াছিল। সেগুলি হইতে রক্ষীরা শত্রুর আগমন লক্ষ্য করিতে পারিত; বিপদ-সম্ভাবনা জানাইয়া দিতে পারিত। এখন সহর সরিয়া আসিয়াছে—কাঞ্চননগর এখন তাহার উপকণ্ঠে। অল্প-দিনের মধ্যেই কাঞ্চননগর জঙ্গলে পূর্ণ হয়, পূর্বোক্ত গুরুত্বজ্ঞাপক গৃহগুলি ভগ্নদশাগ্রস্ত হইলে—সে সকলের মধ্যে একটিমাত্র সংস্কৃত করিয়া সরকারের পুরাবস্তু বিভাগ রক্ষা করিয়াছেন। বোধ হয় ৩০ বৎসর পূর্বে তথায় বসিয়া শিকারপ্রিয় জমীদার বনবিহারী কাপুর ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছেন। গ্রাম জনবিরল হইয়াছে—জঙ্গলে বাঘ আশ্রয় লইয়াছে—গ্রামের অবশিষ্ট অধিবাসীরা বাঘের ভয়ে গ্রাম ত্যাগ করিয়াছে।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় কৃষি কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। তাহাতে লিখিত হয়—

'যদি শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী আদ্য দূর করিতে হয়, তবে সরকারের যত উপায় আছে সবই গ্রামের উন্নতি

সাধন কার্যে প্রয়োগ করিতে হইবে। যাহারা গ্রামে বাস করে তাহাদিগের জীবনের ও পরিবেশের সঙ্গে সরকারের যে সকল বিভাগের সম্বন্ধ আছে সেই সকল বিভাগকেই সঙ্ঘবদ্ধ ও অবিচলিত চেষ্টায় সে কাজ করিতে হইবে।"

কিন্তু এত দিন তাহা হয় নাই। এখনও যে পূর্ণোদ্যমে হইতেছে, তাহা বলা যায় না। অথচ গ্রাম-সমস্যা বর্তমানে ভারতে (পশ্চিম বঙ্গেও) জটিল সমস্যা ও সেই সমস্যার আশু সমাধান একান্ত প্রয়োজন। ইহার জটিলতার কারণ নিম্নলিখিত সমস্যার সমাধান ব্যতীত তাহার সমাধান সম্ভব নহে :—

(১) স্বাস্থ্য-সমস্যা। গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন জন্য আবশ্যক অর্থব্যয়ে অগ্রসর হইতে হইবে।

(২) কিসে গ্রাম্য জীবন সুখময় হয়, স্বাস্থ্যসম্পন্ন ও সমৃদ্ধ করা যায়, সে বিষয়ে গ্রামবাসীদিগের জ্ঞানের অভাব শোচনীয়।

(৩) আবশ্যক উপায় অবলম্বনের উৎসাহের অভাব।

(৪) ব্যক্তিগত চেষ্টায় তেমন ফল হইবে না, সুতরাং সমবেত চেষ্টা অবলম্বন করিতেই হইবে। সেও এক সমস্যা।

ইহার সমাধান না হইলে জাতির উন্নতি সাধিত হইতে পারে না।

যতদিন গ্রামের অধিবাসীদিগকে পরমুখাপেক্ষিতা এমন কি সরকারের মুখাপেক্ষিতা ত্যাগ করিতে প্রস্তুত করা না যাইবে, ততদিন যে কোন প্রকার উন্নতি যদি সম্ভব হয় তাহা হইলেও সময়সাধ্য হইবে। এই কারণে একাধিক দেশে গ্রাম উন্নয়নের জন্য সমবায় নীতি অবলম্বিত হইয়াছে। ডেনমার্ক ও আয়ারল্যাণ্ড তাহার উদাহরণ। আয়ারল্যাণ্ডের কথা বিশেষভাবে বিবেচ্য; কারণ, আইরিশ প্রজার অবস্থা বহুলাংশে বাঙ্গালার প্রজার অবস্থার মত ছিল।

দুঃখের বিষয় বাঙ্গালায় জাতীয় সরকার সমবায় নীতির উপযোগিতা উপলব্ধি করিলেও তাহা উপেক্ষা করিতেছেন। আমরা ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। যখন ম্যালেরিয়া বাঙ্গালায় প্রবল হইয়াছিল, তখন তাহার উপদ্রব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। বাঙ্গালার গভর্ণর হইয়া আসিয়া লর্ড রোণাল্ডসে যে অনুসন্ধান করেন তাহাতে প্রকাশ পায়, বৎসরে ম্যালেরিয়ায় বাঙ্গলায় সাড়ে ৩ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ লোকের মৃত্যু হইতেছিল। যদি এক শত বার ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত হইলে এক জনের মৃত্যু হয় ধরা যায়, তবে ঐ কারণে বৎসরে ২০ কোটি দিন লোক অসুস্থ থাকে। ইহার অর্থনীতিক ফলও ভয়াবহ। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে লোকগণনার রিপোর্টে বলা হইয়াছিল, ম্যালেরিয়া বাঙ্গালীর দারিদ্র্যের অন্যতম প্রধান কারণ; উহাতে বাঙ্গালী উৎসাহহীন হয়। প্রদেশের যখন এই অবস্থা তখন ডক্টর গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে বহু গবেষণার পরে সমবায় প্রথায় কেন্দ্রীয় ম্যালেরিয়া নিবারক সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। সমিতি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই রেজেষ্টারী করা হয়। ইহাতে লোককে স্বাবলম্বী হইয়া গ্রামে গ্রামে শাখা সমিতি করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতিবিধানে প্রোচিত করা হয়। অল্পদিনের মধ্যেই অখণ্ড বাঙ্গালায় ২৪৬৮গুলি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়! সেগুলির মধ্যে ১৪০৬গুলি বর্তমান পশ্চিম বঙ্গে অবস্থিত। এই শেষোক্তগুলির মধ্যে ৪৯৮গুলি সমবায় সমিতির আইনানুসারে রেজেষ্টারী করা হয়—অবশিষ্ট গুলি স্বেচ্ছাচালিত থাকে।

এই সমিতির আবশ্যক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিলে জাতীয় সরকার দেশকে বিশেষ উপকৃত করিতে পারিতেন। ইহার বৈশিষ্ট্য—ইহা গ্রামের লোককে স্বাবলম্বনে শিক্ষিত ও উৎসাহিত করে। বিস্ময়ের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব এই প্রতিষ্ঠানের বিষয় অবগত থাকিলেও স্বাস্থ্য বিভাগ ইহার সুযোগ গ্রহণ না করিয়া ইহাকে সর্ববিধ সাহায্যে বঞ্চিত করিয়াছেন। বিভাগের বিশ্বাস, যে কাজ সরকার করিবেন

তাহা কখন কল্যাণকর হইতে পারে না! আমরা আশা করি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই সমিতির বিষয় পুনর্বিবেচনা করিবেন এবং ইহার ৩০ বৎসরেরও অধিক কালের অভিজ্ঞতা ও কাজ ব্যর্থ না করিয়া দেশের কাজে প্রযুক্ত করিবেন।

শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রামে করিতেই হইবে। একাধিক গ্রাম লইয়া গ্রামমণ্ডলী করিয়া প্রাথমিক, কারিগরী ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা হইবে, এই নীতি ভারত সরকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। যাহাতে তাহার ব্যবস্থা করিতে বিলম্ব না হয়, সে বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। জাপানে সরকার যে সঙ্কল্প গ্রহণ করায় দেশের উন্নতি অসাধারণ দ্রুত হইয়াছিল তাহা কাহারও অবিদিত নাই সে সঙ্কল্প এই, দেশে কোন অন্ধ পরিবার ও কোন পরিবারে এক জনও অশিক্ষিত ব্যক্তি থাকিবে না। নাগরিক সকলেই অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইবে, এই ভিত্তির উপর ভারতের শাসন-পদ্ধতি রচিত অথচ আজও সেই ভিত্তি সম্পূর্ণ হয় নাই! ভারতে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা জনমতের ভিত্তিতে রচিত। কিন্তু তাহা যে ইংলণ্ডের গণতন্ত্রের অনুসরণ, সেই ইংলণ্ডে কি হইয়াছিল? তথায় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার আইনে যখন কারিগর, সামান্য গৃহস্থ প্রভৃতিকে ভোটের অধিকার প্রদান করা হয়, তখন কোন কোন অদূরদর্শী সে ব্যবস্থা বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রবার্ট লো সত্যই বলিয়াছিলেন, "আমরা এখন আমাদিগের নূতন প্রভুদিগকে (অর্থাৎ ভোটদাতাদিগকে) অন্ততঃ শিক্ষা দিব।" যাঁহারাই ভোটপ্রার্থী হইবেন তাঁহাদিগকেই ভোট পাইবার অধিকার প্রতিপন্ন করিতে হইবে। ভোটার যদি অশিক্ষিত হয়, তবে সে তাহার বিচার-বুদ্ধির সম্পূর্ণ প্রয়োগ দ্বারা অধিকারের সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে না। ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হইবার পূর্ব্বে ধনী ও জমীদাররা তাঁহাদিগের অর্থ ও প্রভাব হেতু অনায়াসে ভোট সংগ্রহ করিতে পারিতেন—তাহাতে অনাচারই প্রশ্রয় পাইত। দেশের সকল লোক শিক্ষিত হইলে সেই অবাঞ্ছিত অবস্থার অবসান হয়।

প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাহার অভাবহেতুই এখন সকল শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার পথে অগ্রসর হয়, অথচ কারিগরী শিক্ষায় শিক্ষিত লোক অল্পদিনে অধিক উপার্জ্জনক্ষম হয়। কারিগরের প্রয়োজনও অনেক। বিশেষ গ্রামে যাহারা কারিগরী শিক্ষা লাভ করে, তাহারা একক বা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া—বিশেষ সমবায় পদ্ধতিতে—গ্রামেই অনেক আবশ্যক দ্রব্য প্রস্তুত করিতে পারে। তাহা সামান্য লাভ নহে। য়ুরোপের অনেক স্থানেই কেবল দুই শ্রেণীর ছাত্র উচ্চ-শিক্ষার্থী হয়—যাহারা মেধাবী আর যাহারা আর্থিক অবস্থার সচ্ছলতাহেতু উচ্চ শিক্ষার ভার বহন করিতে পারে। অবশিষ্ট ছাত্ররা শিল্প বা অন্য দিকে যায়—তাহাতে অকারণ সময় নষ্ট ও অর্থের অপব্যয় হয় না।

গ্রামে শিল্প প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। সেকালে কথা ছিল, বাঙ্গালী অঋণী ও অপ্রবাসী হইয়া গ্রামে বাস করিত —"ক্ষেতে ভাঁতে গো-তে" স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত। ক্ষেতে আবশ্যক শস্যাদি উৎপন্ন হইত, ভাঁত বলিতে কেবল বয়ন শিল্পই বুঝাইত না—নানা শিল্প—তন্মধ্যে ভাঁতই প্রধান। আর গোসম্পদ দুগ্ধের জন্য, চাষের জন্য ও সারের জন্য আদৃত ছিল। এখন আর সে অবস্থা নাই।

কৃষিকার্য্যেও এখন সমবায় নীতি যে বিশেষ সুফলদায়ক, তাহা ডেনমার্কে, জার্ম্মানীতে ও আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রতিপন্ন হইয়াছে। জার্ম্মানীতে সমবায় প্রথায় নাগরিক জীবনের কিরূপ উন্নতি সাধন সম্ভব হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া ইংলণ্ডে জার্ম্মান প্রথার প্রবর্ত্তন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে তাহা দেখাইবার জন্য ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট কমিশন

নামক এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে এ দেশে আমরা উপকৃত হইতে পারি। তাহাতে দেখা যায়, জার্মানরা কৃষিতে যেমন শিল্পেও তেমনই সমবায় নীতি প্রযুক্ত করিয়া দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। আয়ার্ল্যাণ্ডে কৃষিকার্যে কিরূপে সমবায় নীতি প্রযুক্ত করা যায়, তাহার জন্যই "আইরিশ এগ্রিকালচার‍্যাল অর্গ্যানাইজেশন সোসাইটি" ("আই এ ও এস") প্রতিষ্ঠিত হয়। হোরেস প্লাংকেট তাহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। আজ সেই কার্যের জন্য তাঁহার নাম সর্বত্র পরিচিত। তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডের কৃষক-দিগকে বুঝাইবার জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রথম পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে সরল ভাষায়—সহজ-বোধ্য ভাবে সমিতির উদ্দেশ্য ও তাহার উপযোগিতা বিবৃত করা হইয়াছিল। ঐ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রবর্তিত প্রথায় কাজ করিয়া কিরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহা 'ক্রয়াল রিকন্‌স্ট্রাকসান ইন আয়ার্ল্যাণ্ড" অর্থাৎ আয়ার্ল্যাণ্ডে গ্রাম্য পুনর্গঠন নামক পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে। ঐ পুস্তকের ভূমিকায় রাসেল বুঝাইয়াছিলেন :—

"জাতীয়তার ভাব সংস্কৃতিসঞ্জাত। কিন্তু যখন কেহ দেখে, তাহার প্রতিবেশীরা বা নিয়োগকারী (মুখে) ঐ আদর্শ স্বীকার করিলেও কার্যতঃ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাহাকে দারিদ্র্য ভোগ করায় তখন সে স্বভাবতঃই ঐ আদর্শে আস্থাহীন হয়। সমবায় পদ্ধতি লোকের স্বার্থ অনেকাংশে সমৃদ্ধ করে—তাহাতে ক্রয়, উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যক্তিগত না হইয়া গোষ্ঠিগত বা জাতীয় ব্যাপার হয়।" ইহা সাধারণ লাভ নহে।

আমরা যেকয়টি দেশের কথা বলিয়াছি, সেই কয়টিই শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা দেশের লোকের সম্পদ বর্ধিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। আয়ার্ল্যাণ্ড দরিদ্র ও কৃষিপ্রধান দেশ ছিল। কিরূপে তথায় ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া লোকের আয় বৃদ্ধি করা যায়, সে বিষয় বিবেচনা করিবার-জন্য বৃটেনের পার্লামেণ্ট যে "রিসেস কমিটী" নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার ৪১৯ পৃষ্ঠাব্যাপী রিপোর্ট পাঠ করিলে আমাদিগের সরকার উপকৃত হইতে পারেন। গল্প আছে, কোন ব্যক্তিকে—তিনি কেন প্রসিদ্ধ লেখকদিগের রচনা পাঠ করেন না জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার মৌলিকতা ক্ষুণ্ণ হইবে। আমাদিগের সরকার যেন তেমনই মনে না করেন, অন্যান্য দেশের দৃষ্টান্ত অধ্যয়ন করিলে তাঁহারা মৌলিকভাবে কাজ করিতে পারিবেন না! কেন্দ্রীয় সরকার যে আমেরিকার টেনেসীভ্যালি উন্নয়নের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া এ দেশে দামোদর নদের জল নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন, তাঁহারা যে বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনিয়া এ দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা যে কৃষিকার্যে জাপানী প্রথার প্রবর্তন করিতেছেন, তাহাতে মনে হয়, তাঁহারা বিদেশের অভিজ্ঞতার সুযোগ লইতে কুণ্ঠানুভব করেন না। সেই জন্যই আমরা বাঙ্গালার শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে আইরিশ অনুসন্ধানের সুযোগ গ্রহণ করিতে বলিতেছি। নানা দেশ হইতে কি কি শিল্প আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রবর্তিত করা যায়, তাহা "রিসেস কমিটীর" সদস্যগণ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। এমন কি ফুল ও ফল-মূলের চাষে আয়ার্ল্যাণ্ড কিরূপ লাভবান হইতে পারে, তাহার আলোচনাও তাঁহারা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন,—মিষ্টার হার্টলাবের মতে, আয়ার্ল্যাণ্ডের উত্তরাংশে উপসাগরের কূলে তরকারী ও ফলের চাষ করিলে তাহাতেই কর্ক প্রদেশের ২০ হাজার লোক কাজ পাইতে পারে। ল্লানগহিক ও ব্যান্টি উপসাগরের কূলে "আর্টিচোক" তরকারীর চাষ করিলে তাহা সিসিলির ও চ্যানেল দ্বীপের চাষের মত ফলপ্রদ হইতে পারে। ইত্যাদি।

সার জন এণ্ডারসন বলিয়াছেন, কি বিস্ময়ের বিষয় বাঙ্গলায় জমীর ও লোকের অভাব না থাকিলেও কৃষক বৎসরে প্রায় ৬ মাস কাজের অভাবে অলস হইয়া থাকে! বাঙ্গালা পূর্বে কৃষিপ্রাণ ছিল না—কৃষি তাহার সর্বপ্রধান কাজ হইলেও লোক কৃষিকার্যের অবসরে নানা শিল্পে ব্যাপৃত থাকিত। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বেও (অন্তত)

বাঙ্গলার কোথায় কোন শিল্প আছে, সরকার তাহার সঠিক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সকল পুস্তিকা হইতে অনেক তথ্য পাওয়া যাইবে। যাহারা সেই সকল শিল্পে আত্মনিয়োগ করিয়া আসিয়াছে, তাহাদিগের বংশধরগণ সেই সকল শিল্পে স্বাভাবিক প্রবণতা লাভ করে। ইহা উড়িষ্যার রৌপ্যের তারশিল্প সম্পর্কে মধুসূদন দাস মহাশয় বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, উড়িষ্যার ঐ শিল্পে যাহারা নিযুক্ত তাহাদিগের পুত্রেরা জিহ্বায় রাখিয়া তারের স্থূলত্ব স্থির করিতে পারে। শিল্পী-বংশের সন্তান-দিগকে যদি বর্তমান কারিগরী বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তবে তাহারা সহজেই শিল্পী হইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে সেরূপ শিক্ষায়তনও যে নাই, এমন নহে। কিছুকাল পূর্বে ভূপেন্দ্রনাথ বসুর প্ররোচনায় কলিকাতার একজন ধনী (মাণিকলাল শীল) পিতার নামে একটি অবৈতনিক কারিগরী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ৪ লক্ষ টাকা সরকারী হেপাজাতে দিয়া গিয়াছিলেন। তাহাতে যে বিদ্যালয় (পান্নালাল শীল বিদ্যামন্দির) বেলগাছিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাতে কাপড় বয়ন, ছুরী কাঁচি প্রস্তুত করা, বেতের কাজ, ঘড়ী সারান, ছুতার মিস্ত্রীর ও রাজমিস্ত্রীর কাজ শিখান হয়। কোম্পানীর কাগজের সুদের হার কমায় ঐ বিদ্যালয়ের আয় অর্ধেক হইয়াছে। সরকার সাহায্য দিয়া ও পরিচালনে সহযোগিতা করিয়া যদি বিদ্যালয়টির বিস্তারে সাহায্য করেন, তবে বহু বালক বালিকা কুটীর শিল্পে শিক্ষালাভ করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে বা সমবায় নীতিতে কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে।

বাঙ্গলায় কুটীর শিল্পে গৃহের নারীরা এমন কি বালক-বালিকারাও কাজ করিত বলিয়াই উৎপাদনব্যয় কম হইত। বর্তমান অবস্থায় যাহাতে পুরুষদিগের মত নারীরাও সময়ের সম্যক সদ্ব্যবহার করিতে পারেন, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে, কতকগুলি শিল্পে নারীরা সহজেই শিক্ষালাভ করিয়া কার্যোপযোগী হইয়া অর্থার্জন করিতে পারেন। শতবর্ষ পূর্বেও বাঙ্গলার মধ্য, নিম্নমধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর সম্প্রদায়ের নারীরা যেমন চেঁকিতে চাউল কুটিতেন—তেমনই সমাজের উচ্চস্তরে নারীরা চরকায় সূতা কাটিয়া অর্থার্জন করিতেন। তখন চলিত কথা ছিল—

"চরকা আমার স্বোয়ামী পুত ;
চরকা আমার নাতী,
চরকার দৌলতে আমার
দুয়ারে বাঁধা হাতী।"

চরকায় সূতা কাটিয়া হাতী রাখা সম্ভব হইত কি না সন্দেহ ; কিন্তু দেখা যায়, পঞ্জাবে লুধিয়ানায় আজ ছোট ছোট কলে ঘরে ঘরে পশমী জামা প্রস্তুতি করিয়া গৃহস্থ মহিষ রাখিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে পল্লীগ্রামে—বাসস্থা করিতে পারিলে—মোজা, গেঞ্জী প্রভৃতি বয়নের সেইরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে। গ্রামের পুষ্করিণী পরিষ্কৃত হইলে তাহাতে মৎস্যের চাষ হয়, গ্রামের জঙ্গল দূর করিলে ম্যালেরিয়া যায়, পানীয় জলের সুব্যবস্থা হইলে কলেরা হয় না, ফলের ও সবজির চাষে উন্নতিসাধন করিলে লোক প্রচুর পরিমান পুষ্টিকর খাদ্য পায়। আর গ্রামে চাষের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠা করিলে গ্রামের লোকের কাজের যেমন অভাব হয় না, তেমনই অর্থাভাবও থাকে না। সমবায় প্রথায় গ্রামে ঋণ দান সমিতি, পণ্য বিক্রয় সমিতি, পণ্যোপকরণ ক্রয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। গ্রামে বিদ্যালয়—সাধারণ ও কারিগরী, চিকিৎসালয়, পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

গ্রামকে নূতনভাবে—বর্তমান অবস্থার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।

এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে সুযোগ পাইয়াছেন, তাহার সদ্ব্যবহার করা হইতেছে কি ? পূর্ববঙ্গ হইতে যে উদ্বাস্তুরা আসিতেছে, তাহাদিগের জন্য ভারত সরকারের যেমন উদ্বেগের অভাব নাই, তেমনই অর্থব্যয়ও হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সে কাজে সহযোগ করিতেছেন। কিন্তু কলিকাতার উপকণ্ঠে এক একটি পরিবারকে আড়াই কাঠা জমী ও গৃহ দিয়া কি হইবে ? তাহাতে কেবল বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। আর সরকারী সাহায্যে লোকের আত্মসম্মানজ্ঞান ও কাজ করিবার উৎসাহ ক্ষুণ্ণ হইতেছে।

আজ প্রয়োজন বর্তমানের প্রয়োজনে আদর্শ গ্রাম রচনা করিয়া তাহাতে অধিবাসীদিগকে স্বাবলম্বী করা—তাহাদিগের স্বাস্থ্যের, শিক্ষার ও শিল্পের সুযোগ সৃষ্টি করা – সকলের সমবেত চেষ্টায় দেশকে সমৃদ্ধ করা। সে কাজে গ্রামই কেন্দ্র ও শক্তির উৎস হইবে।

আমরা সরকারকে সেই কাজে অবহিত হইতে ও তাহাতে সকলের সহযোগ আকৃষ্ট করিতে বলিব।

শরৎচন্দ্রের চরিত্রহীন

শ্রীকালিদাস রায়।

চরিত্রহীন পুস্তকখানির উপর শরৎচন্দ্র খুব ভরসা রাখিতেন। তাহার বিশিষ্ট কারণ আছে। ইহা সাধারণ গতানুগতিক গল্পসর্বস্ব উপন্যাস নয়। অবসর বিনোদনের জন্য যে নভেল পড়া হয় এবং পড়িয়া কিছুক্ষণ পরেই ভুলিয়া যাওয়া হয়, চরিত্রহীন সে শ্রেণীর নভেল নয়। এই নভেলখানি শরৎচন্দ্র খুব পরিশ্রম করিয়া অন্তরের দরদ দিয়া লিখিয়াছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে বইখানি দুইটি ভ্রষ্টচরিত্রা নারীর জীবনকাহিনী মাত্র। এক হিসাবে বইখানিকে কতকটা উদ্দেশ্যমূলকও বলা যাইতে পারে। ইহার অন্তরে যে উদ্দেশ্য আবিষ্কার করা যাইতে পারে তাহা সমাজকল্যাণমূলক নয়, সমাজসংস্কারের ইপ্সিত ব্যঞ্জনাও ইহাতে নাই—ইহাকে গতানুগতিক সংস্কারের সংস্কারমূলক উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে।

নারী-চরিত্র সম্বন্ধে বিশেষতঃ তথাকথিত অসতী নারীদের চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের সংস্কারকে যুক্তির আঘাতে এবং সত্যের আলোকপাতে বিচলিত করা সম্ভবতঃ শরৎচন্দ্রের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ইহাতে সমাজ সংস্কারের কথা উঠে না। গতানুগতিক সংস্কারের মধ্যে একটি আলোড়ন আনিয়া আমাদের বিচার বুদ্ধিকে সত্যনিষ্ঠ করিয়া তুলিবার একটা প্রয়াস দুইটি নারী-চরিত্র অঙ্কনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে বলিয়া মনে হয়।

প্রথমে কিরণময়ীর কথাই ধরা যাক। কিরণ অসামান্য সুন্দরী ও বিদুষী। তিনকুলে তাহার কেহ নাই, কোন একটা সুশৃঙ্খলশিষ্ট পারিবারিক আবেষ্টনীর মধ্যে সে প্রতিপালিত হয় নাই! সে স্বামীর সঙ্গ পাইয়াছে শিক্ষাদিনী রূপে, চন্দ্রশেখরবর্ষী স্বামীকে সে ভালবাসিতে পারে নাই, স্বামীর প্রতি মনোভাব পরিবর্তনের অবসর সে পায় নাই—স্বামীও তাহারপ্রতি মনোভাব পরিবর্তনের সুবিধা পায় নাই।

সংসারের প্রতি যে পুরুষের যথাযোগ্য অনুরাগ নাই, দাম্পত্য জীবনের কর্তব্য পালনে বা দায়িত্ব বহনে যাহার আগ্রহ নাই, সংসারযাত্রার উপযোগী আধিক সঙ্গতি নাই, তাহার বিবাহ করার ন্যায্য দাবি নাই। বিবাহ করিলেও অসামান্য সুন্দরীকে বিবাহ করা তাহার পক্ষে নির্বুদ্ধিতার কাজ। কিরণের স্বামী কিরণকে বিবাহ করিয়া ভুল করিয়াছিল। কিরণ ছিল অসহায়া বালিকা, সে এই

নিষ্পিষ্টতার প্রথাগত পূজার বলি মাত্র। আমাদের সমাজের কুব্যবস্থা, অবিচার, অনাচার অনেকটা এইরূপ অবাঞ্ছিত বিবাহের জন্য দায়ী।

কিরণের তরুণ যৌবনে তাহার স্বামী দীর্ঘকাল যক্ষ্মা রোগে ভুগিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিল। বিধবা হইয়া সে একটা পরিবারের মধ্যেও স্থান পাইল না, কোলে তাহার একটি শিশু সন্তানও নাই। অথচ তাহার অন্তরে অতৃপ্ত বাসনার বহ্নি জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন, অন্য কেহ নহে, স্বয়ং বিধাতাই। সে বহ্নির তৃষ্ণা তাহার সর্বাঙ্গে। জীবনে কোন মহত্তর ব্রতের সন্ধান বা সুযোগও সে পায় নাই। এইরূপ শত শত কিরণ সমাজের পক্ষে মূর্তিমতী সমস্যা। সমাজ বা শাস্ত্র এই সমস্যার সমাধানের কি করিয়াছে? এইরূপ নারীর জীবনের পরিণতি কি হইতে পারে শরৎচন্দ্র তাহার একটি চিত্র চরিত্রহীনে দিয়াছেন।

সমাজ এই শ্রেণীর নারীকে ঘৃণা করে। তাহার চরিত্র সংস্কারের বা তাহাকে সুপথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করেনা, তাহার অন্নবস্ত্রের সংস্থানেরও কোন ব্যবস্থা করেনা। দেহে রূপযৌবন থাকিলে তাহাই অন্নবস্ত্রের সংস্থানেরও উপজীব্য ও উপকরণ হইয়া উঠে। তাহার অন্তরে বিধাতার দ্বারা সংরক্ষিত বাসনাবহ্নিও স্বভাবতই ইন্ধন চায়। শরৎচন্দ্র এই শ্রেণীর নারীর জীবন-সমস্যার বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং সেই বিশ্লেষণকে বাণীরূপ দান করিয়াছেন চরিত্রহীনে।

কিরণময়ীর মত অভাগিনীর পক্ষ হইতে যাহা কিছু বলিবার শরৎচন্দ্র কিরণের নিজের মারফতেই বলিয়াছেন —নানা পরিস্থিতিতে। এই জন্যই কিরণময়ীকে বিদ্রূপ, প্রগল্‌ভতা ও মুখরা করিয়াছেন। তাহার সব উক্তিতে যে যুক্তি আছে তাহা হয়ত নয়। যেখানে যুক্তি নাই—সেখানে আছে বঞ্চিত হৃদয়ের সঞ্চিত কামনার আবেগোচ্ছ্বাস—তাহার তৃষিত চাতকী-কণ্ঠের আবেদন। এই চাতকী ফটিক জলই চাহিয়াছে—অভাবে সে নর্দ্দমার নোংরা জল পানেই উদ্যত হইয়াছে।

কিরণ এমন প্রশ্নও করিয়াছে—কাহারো ন্যায্য অধিকারে যদি হস্তক্ষেপ করা না হয়—তাহা হইলে অন্তরের দহনে ইন্ধন দান করিলে কি অপরাধ? জগতের প্রায় সকল দেশের সমাজ নরনারীর এই স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া সমস্যার সমাধান করিয়াছে। আমাদের সমাজ কি শুধুই ঘৃণা করিবে, শাসন করিবে, অপাংক্তেয় করিয়া রাখিবে, সুবিচার করিবে না? দশজনে যেখানে পুরা-দস্তুর ভোগসুখে যথেচ্ছাচার করিবে, সেখানে একজন কেবল অদৃষ্টের দোহাই দিয়া সারাজীবন আত্মবঞ্চনা ও আত্মত্যাগই করিবে? সর্ব সুখে বঞ্চিত হইয়া সমাজের জন্য আদর্শ সৃষ্টি করিবে? এই প্রশ্নটাই গ্রন্থখানির অনেক পৃষ্ঠার মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শরৎচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠ ন্যায়নিষ্ঠ মনের এই আবেদনই, এই Catholicismএ ভ্রষ্টচরিত্রার প্রতি সহানুভূতি বলিয়া মনে হয়। শরৎচন্দ্রের এই সহানুভূতি বাঙালী সমাজের সকল অভাগিনীর জন্যই। কিরণের মত একই পরিস্থিতিতে না হইলেও বহু নারীর প্রাণের বার্তা শরৎচন্দ্রের কণ্ঠে কিরণের মারফতে ধ্বনিত হইয়াছে। কিরণ বাংলার একশ্রেণীর অভাগিনীদের প্রতিনিধিস্থানীয়া—তাই কিরণের আত্তি আকুলতায় একটু বেশী মাত্রায় emphasis দেওয়া হইয়াছে। কিরণকে এমন প্রখর বর্ণে রঞ্জিত করা হইয়াছে যে, সে কাহারও চোখ এড়াইবে না—এবং চক্ষুকে পীড়িতই করিবে। চরিত্রহীন যদি বাঙালী পাঠককে না ভাবাইতে পারিয়া থাকে—তবে শরৎচন্দ্রের রচনা অনেকটা ব্যর্থ হইয়াছে।—বুঝিতে হইবে তাঁহার রচনা সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই।

এই গ্রন্থ রচনার পর প্রায় ৫০ বৎসর অতীত হইয়াছে। ৫০ বৎসর সমাজের নৈতিক আদর্শের এবং নৈতিক বিচার-মানের যে পরিবর্তন হইয়াছে—তাহা পাঁচ শত বৎসরেও হয় নাই। সমাজ ঢের বেশি উদার হইয়াছে। হয়ত তাহা কিরণের মত স্বৈরাচারীদিগের আঘাতে আঘাতেই হইয়াছে। আজ সকল প্রকার প্রণয়কেই সমাজ বিবাহ সংস্কারের দ্বারা পরিশুদ্ধ ও বিধি

সংগত করিয়া লইতে পারিয়াছে। তাই আজকালকার কথাসাহিত্যিকদের স্বাধীনা প্রেম-নায়িকাদের কিরণের মত আর বক্তৃতা করিতে হয় না।

শরৎচন্দ্রের সময়ে নরনারীসম্পর্কে যে সমস্যাগুলি ছিল—তাহাদের অনেকগুলির অনেকটা সমাধান হইতেছে। আজকালকার ঔপন্যাসিকরা নরনারীর তথাকথিত অবৈধ প্রণয় লইয়া এবং নারীর অধিকার হরণের সমস্যা লইয়া শরৎচন্দ্রের মত বিপন্ন হ'ন না বা নারীর পক্ষে তাঁহাদের এত ওকালতি করিতে হয় না। মনস্তত্ত্ব গত জটিলতাও তাঁহাদের রচনায় অনেক কমিয়া আসিয়াছে।

এই প্রগতির ফলে সমাজের হয়ত সুবিধা হইয়াছে, কিন্তু সাহিত্যের খুবই ক্ষতি হইয়াছে। সমস্যাই কথা-সাহিত্যকে পুষ্টি ও রস দান করে। বর্তমান যুগে অন্যান্য অনেক গুরুতর সমস্যা আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়াই বর্তমান যুগের কথাসাহিত্য দুর্বল হইয়া পড়ে নাই।

সমাজের মতিগতির পরিবর্তন ঘটিলেও চরিত্রহীনের মূল্য কমে নাই। ক্ষুধিত তৃষিত রমণীহৃদয়ের চিরন্তন আবেদন সমস্যার রূপে না হইলেও রসসৃষ্টির প্রেরণারূপে আজিও সাহিত্যের উপজীব্য হইয়া আছে। ঐ আবেদনই আবার নব নব সমস্যার জন্ম দিতেছে—ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে। চরিত্রহীন তখনকার সাধু সমাজে অসহ্য হইয়াছিল—আজকালকার সুধীসমাজে তাহা উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। চরিত্রহীনের চেয়ে ঢের বেশী কুরুচি-মূলক সাহিত্য আজকালকার সুধী সমাজকে সহ্য করিতে হইতেছে। সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকই আগামী যুগের একটু অগ্রবর্তী হইয়া আবির্ভূত হ'ন ভোরের পাখীর কাজ করিতে। শরৎচন্দ্রও বর্তমান যুগের ভোরের পাখী। কিরণময়ী তাহার অনুকূল যুগের আগেই আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাকে কূল ভ্রষ্টা না বলিয়া যূথভ্রষ্টা বলিতে হয়। যুগভ্রষ্টা হওয়ায় যূথভ্রষ্টা হইয়া সে দণ্ড ভোগ করিয়াছে—তাহাকে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে। এ যুগের ঔপন্যাসিক হইলে রূপসী কিরণকে সিনেমায় নামাইয়া দিত।

আরো একটু মনোযোগের সঙ্গে পড়িলে দেখা যাইবে। কিরণের প্রতি শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি নাই। শরৎচন্দ্র যে সহানুভূতির সহিত কিরণ চরিত্র অঙ্কন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—পরে তিনি সে সহানুভূতি সংহরণ করিয়াছেন।

কিরণের ভুল-ভ্রান্তিকে শরৎচন্দ্র সমর্থন করেন নাই। তাঁহার সমস্ত সহানুভূতি গিয়া পড়িয়াছে সাবিত্রীর উপর। কিরণময়ীকে তিনি তাঁহার অনুকম্পিতা অভাগিনীদের প্রতিনিধিত্ব দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই।

কিরণ স্বামীকে পাইয়াছিল বহু দিন ধরিয়া; স্বামী তাহার শুধু পতিগুরু নয়, শিক্ষাগুরুও। এই স্বামীকে সে ভালবাসিতে পারে নাই।

ভালোবাসাও অনেকটা অনুশীলনের ফল। সে অনুশীলন শৈবলিনীর মতো সে-ও করে নাই। মুমূর্ষু স্বামীর কক্ষের পাশের কক্ষেই সে তাহার রূপ যৌবন দিয়া অনঙ্গ ডাক্তারকে প্রলুব্ধ করিতেছে, অথচ তাহাকেও সে ভালবাসে না। যদি অর্থের জন্যই তাহার এই আচরণের প্রয়োজন হইয়া থাকে—তবু কাপটা কিছুতেই ভাল নয়। ইহার চেয়ে দেহ দান ঢের ভালো ছিল। যে সমাজ মানে না, পরকাল মানে না, সতীধর্ম মানে না, ভগবান মানে না, ঐহিক সুখভোগই যাহার একমাত্র কাম্য, তাহার এ ভণ্ডামি কেন?

তারপর বিপৎকালে একমাত্র রক্ষক, যে ভবিষ্যতের প্রতিপালক, স্বামীর পরম বন্ধু, পত্নীর প্রতি একনিষ্ঠ সাধুচরিত্র উপেন্দ্রকে স্বামীর মৃত্যুর অল্পকাল পরেই প্রেম-নিবেদন প্রকৃতিস্থা মার্জিতরুচি রমণীর লক্ষণ নয়। তারপর উপেনের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া সে বর্বর নারীর মত প্রতিহিংসা গ্রহণে উদ্যত হইল—ইহা ভালোবাসার লক্ষণ নয়। দিবাকরকেও সে ভালোবাসে নাই—তাহার ইহ-পরকাল ধ্বংস করিয়া সে উপেনের প্রণয় প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ লইতে চাহিয়াছিল। ইহার চেয়ে পাপিষ্ঠার কাজ কি হইতে পারে? ইহার চেয়ে সে যদি গৃহত্যাগ করিয়া গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিত—তাহা হইলে

কিছু সহানুভূতি থাকিলেও হৃদয়হীনা কিরণের প্রতি কোন সহানুভূতি ছিল না। কিরণ অনুকম্পিতা অভাগিনীদের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে নাই। অতএব দেখা যাইতেছে চরিত্রহীনের অন্তরালে একটি বিশিষ্ট বিকৃতরুচি হৃদয়হীনা নারীর জীবনকাহিনী। এই অংশে লেখকের কোন উদ্দেশ্য সন্ধান না করাই ভালো।

হৃদয়বতী নারী সাবিত্রীই বাংলার অভাগিনীদের প্রতিনিধিস্থানীয়া।

শেষ পর্যন্ত উপেনের বিচারটাই শরৎচন্দ্রের বিচার। শরৎচন্দ্র উপেন্দ্রের মারফতেই তাহার বাধার ব্যথিত হইয়াছেন—তাহার সবল নারীত্বের মর্য্যাদাও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

সাবিত্রী ছিল কুলীন বাবুদের ঘরের মেয়ে—সে শৈশবে বিবাহিতা হইয়া বিধবা। এই বালিকা যখন যুবতী হইল, তাহার অন্তরে বিবাহিত জীবনের জন্য আকাঙ্ক্ষা জন্মিল। এই আকাঙ্ক্ষা এযুগের বিচারে দূষিত নয়। এই আকাঙ্ক্ষার পরিতর্পণের জন্যই সে গৃহ ত্যাগ করে। সে আকাঙ্ক্ষা তাহার মিটে নাই।

সংসার জীবন যখন তাহার অদৃষ্টে ঘটিল না, তখন সে দাসী বৃত্তি অবলম্বন করিল। তবু গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করিল না।

সাবিত্রীর হৃদয়ে কোন সংসারের গৃহিণীপনা করিয়া পাঁচজনকে সেবা শুশ্রূষা ও প্রতিপালন করিবার—বাসনাই ছিল প্রবল, পত্নীত্ব লাভের আশা সে পোষণ করে নাই।

একটা মেসের ভাণ্ডারের ভার পাইয়া সে এই বাসনার কতকটা নিবৃত্ত করিয়াছিল। ইহা অবশ্য দুধের তৃষ্ণা ঘোলে মিটানো। সাবিত্রী বামন-ঠাকুর কি ছিল না, ইউরোপে এই শ্রেণীর পরিচারিকার কাজ নিরাশ্রয়া তরুণ রমণীরই বৃত্তি; এইরূপ সেবিকাকে House-Keeper বলে। সাবিত্রীর ভাষাভূষা আহার বিহার আকৃতি প্রকৃতি তরুণ হৃদয়ের কল্পনার মতই।

সাবিত্রী যে কাজ করিত তাহা কিন্তু প্রৌঢ়ার কাজ। সাবিত্রী যুবতী, সে প্রাণপণ চেষ্টায় সতীধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু যৌবনজল-তরঙ্গ রোধিবে কে? যৌবন ধর্ম্মের একটা পৃথক দাবি আছে। সে কতকটা অজ্ঞাতসারে সতীশকে ভালোবাসিয়া ফেলিল। সাবিত্রী সতীশের সঙ্গে কতকটা প্রেমিক প্রেমিকার অভিনয় করিয়া তৃপ্তি পাইত। সতীশ বিচলিত হইয়া পড়িল। সাবিত্রী তাহার প্রেমপাত্রকে বাঁচাইবার জন্য সরিয়া পড়িল। সাবিত্রীর শুধু আত্মসংযম নয়, স্থান-কাল-পাত্রবোধও ছিল।

সাবিত্রী চলিয়া গেল। সতীশকে ভুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সতীশের বিপৎকালে দূরে থাকিতে পারিল না। তারপর সে পত্নীত্ব লাভের সুযোগ বিসর্জন দিল এবং সতীশকে সামাজিক কলঙ্ক হইতে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য আবার সরিয়া পড়িল। কিন্তু তাহাকে ফিরিতে হইল। শেষে বুক ফাটিয়া গেলেও সে সরোজিনীর হাতে সতীশকে সমর্পণ করিল। ইহাই সাবিত্রীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

সমাজের অবিচারের ফলে এই মহীয়সী নারীটির জীবন ব্যর্থ হইয়া গেল। সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিকূল থাকিলে যুবক যুবতীর স্বাধীন প্রণয় যত প্রকারের পরিণতি লাভ করিতে পারে, তাহাদের মধ্যে সাবিত্রী সতীশের প্রণয়ের পরিণতি একটি। প্রণয় মূলক নাট্য বা উপন্যাসে প্রণয়ের পথকে সহজ সরল সুগম করা হয় না। তাহা হইলে উপন্যাস বা নাটক গড়িয়াই উঠে না। নায়ক নায়িকার মিলনের পথে বাধা ও ব্যবধানের সৃষ্টি করিতে হয়। শকুন্তলা, রোমিও জুলিয়েট হইতে তারাশঙ্করের কবি পর্য্যন্ত একই ধারা চলিয়া আসিতেছে। ঐ বাধা ব্যবধান যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তাহাই প্রণয় মূলক নাটক বা উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য।

সমাজ-ধর্ম্ম-জাতিবর্ণ-গত, দেশকালপাত্র-গত বাধার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে ও পরিস্থিতিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সামাজিক ব্যবস্থা ও চরিত্রগত বক্রতা এই বাধার সৃষ্টি করে। শরৎচন্দ্র এই বাধাকে ট্রাজিক রূপেই চিত্রিত করেন। সে বাধা অতিক্রান্ত হইল না

তাহা সমাজের অবিচারের পরিণতি বলিয়াই ধরা যাইতে পারিত। সে কোন সংস্কার মানে না, অথচ দিবাকরকে দূর দেশে লইয়া গিয়া ছয় মাস একঘরে বাস করিয়া সতী সাজিতে চাহিয়াছে—ইহা তাহার ভণ্ডামি এবং দিবাকরকে অবিরত নির্যাতন, তাহার পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা।

দিবাকর কলঙ্ক তার মাথায় লইয়া অশেষ দুর্গতি ভোগ করিল কি জন্য? দেহ নষ্ট হয় নাই বলিয়া কিরণের অসার গৌরবটার কোন মূল্যই নাই। যে নারী কোন সুপুরুষ যুবকের সঙ্গে একঘরে রাত্রিবাস করিয়া অসিধারা-ব্রত পালন করিতে পারে সে ত তপস্বিনী! তাহার সম্বন্ধে প্রবৃত্তির দুর্দম তাড়নার কথা উঠিতে পারে না। তবে সে একটা ধ্রুব আশ্রয় ত্যাগ করিয়া দুর্গতির নরকে নামে কেন? এই অপ্রকৃতিস্থ স্বৈরাচারের পরিণতি অশেষ দুঃখ ও মস্তিষ্কেরও অপ্রকৃতিস্থতা। কেবল তাহাই নয়, নাস্তিক কিরণ ভগবান ভগবান বলিয়া পাগল হইতেছে মা-কালীর প্রসাদ লইয়া রোগগ্রস্ত উপেনকে দান করিতেছে—এইত তাহার চরম প্রায়শ্চিত্ত-বিধান। এই সব হইতে মনে হয় অভাগিনী কিরণের প্রতি শরৎচন্দ্রের বলিয়া চরিত্রহীন মিলনান্ত হইতে পারিল না। সাবিত্রীর সংস্কারই এখানে প্রবল হইয়া বাধা অতিক্রম করিতে দিল না।

শরৎচন্দ্র গভীর মমতার সঙ্গে সমাজের অসত্য ব্যবস্থায় নির্যাতিতা সাবিত্রীর চরিত্র অঙ্কন করিয়া উপেন্দ্রের মারফতে তাহার জীবনের সার্থকতার একটি পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। কিরণময়ী চরিত্রটিকে এই চরিত্রের অনুপূরক বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তাহা অনুপূরক নয় প্রতিপূরক বা প্রতীপ।

সাবিত্রী ভাল বাসিয়াছিল কিন্তু অপাত্রে ভালবাসা ন্যস্ত করে নাই। যাহাকে সে ভালবাসিয়াছিল তাহার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণই খুঁজিয়াছিল নিজে আত্মত্যাগ করিয়া। কিরণ অযাচিত ভালবাসা অর্পণ করিয়াছিল—তাহার কল্যাণ তাহার কাম্য ছিল না। পত্নীপ্রেমে গর্বিত ও পরিতৃপ্ত উপেনকে ভালবাসিবার অধিকারই তাহার ছিলনা। ঐ ভালবাসা ভালোবাসার জন্য মাত্র স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য। দিবাকরকেও সে আদৌ ভালবাসে নাই। কিরণ ছিল প্রেমের অভিনেত্রী—প্রেমিকা নয়।

সাবিত্রী সতীশকে ভালবাসিয়া সেবাপরায়ণা গৃহলক্ষ্মীর মর্যাদার স্বপ্ন দেখিত—সত্যসত্যই গৃহলক্ষ্মীর আশা পোষণ করিত না। সাবিত্রীর ভালবাসা দৈহিক রূপকেও অবলম্বন করে নাই—সতীশকে সে যেন স্নেহ যত্ন পরিচর্যার ভিক্ষু অসহায় জীব মনে করিয়া তাহার প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়।

সাবিত্রীরও রূপ ছিল। কিরণময়ীর মত না হইলেও সাবিত্রী কুরূপা নিশ্চয়ই ছিলনা, কিন্তু সে নিজের রূপের উপর নির্ভর করিতনা—তাহার রূপের গর্বও ছিলনা—রূপকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার কোন চেষ্টাও তাহার ছিলনা। কিরণময়ীর রূপ ছিল তাহার অভিনেত্রীর ব্যবসায়ের মূলধন, তাহার উপরে ছিল বিদ্যা। এজন্য তাহার অহঙ্কারও ছিল। রূপ ও বিদ্যা তাহার চরিত্রে একটা অসার আভিজাত্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই আভিজাত্যের অভিমানে সে দরিদ্র স্কুল মাষ্টার, অনন্ত ডাক্তার, নিরাশ্রয় দিবাকর—কাহাকেও সে তাহার উপযুক্ত প্রেমপাত্র মনে করিতে পারে নাই। সে ভাবিয়াছিল—উপেনই তাহার একমাত্র প্রেমপাত্র হইবার যোগ্য।

কিরণময়ীর প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের আক্ষেপ এই—একাধারে এমন রূপ ও বিদ্যা ব্যর্থ হইয়া গেল? পাঠকের সহানুভূতি যখনই কিরণময়ীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে—শরৎচন্দ্র তখনই তাহার পথরোধ করিয়া বলিয়াছেন—দেখনা কিরণ কত দর্পিতা, কত হঠকারিণী। কত স্বেচ্ছাচারিণী, কত কপটাচারিণী। পক্ষান্তরে সাবিত্রী সম্বন্ধে যখনই পাঠকের একটু ঔদাসীন্য আসিয়াছে, তখনই তাহার নারীত্বের মহিমময় চিত্র একখানি চোখের সম্মুখে ধরিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র দেখাইয়াছেন—কিরণ কেবল সমাজের অবিচারে নয়—নিজের স্বেচ্ছাচারে দহিতা—শেষ পর্যন্ত পাগলিনী।

শরৎচন্দ্র বলিতে চাহিয়াছেন—কিরণ যে দোষটা অপরাধে অপরাধ করে নাই,তাহা সতীত্বধর্ম রক্ষার জন্য নয়, আভিজাত্যবোধে বশতঃ।

সতীশকে সাবিত্রী মনের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল —সে জন্যই তাহার সাবিত্রী নাম সার্থক। কিন্তু সেবা পরিচর্যার দ্বারাই কেহ মৃত্যু হইতে রক্ষা পায় না—তবে সে সতীশের চিত্তে বলসঞ্চার করিয়াছিল। সতীশের জীবনীশক্তি ছিল অফুরন্ত। ইহার উপর বেশী জোর দেওয়ার প্রয়োজন নাই। বহু প্রলোভন দুঃখ দুর্ঘটনা অপমানের মধ্যেও সাবিত্রী যে তাহার সতীধর্ম রক্ষা করিয়াছিল এই জন্যই সে অন্বর্থনামী।

কিরণময়ী নিজ দেহেরই পরিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা সাধন প্রয়াসী করিত; সংসারের শ্রীসৌষ্ঠবের দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না।

সাবিত্রী নিজ দেহ সম্বন্ধে উদাসীনা ছিল, কিন্তু যেখানেই সে থাকিত সেখানেই সে একটা লক্ষ্মীশ্রী, পরিচ্ছন্নতা ও সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করিত। এবং যাহার সংসর্গে সে আসিত—তাহারই সে অকাতরে সেবা যত্ন করিত—শরৎচন্দ্রের মতে হিন্দু নারীর বিশেষত্বই এইখানে।

এই জন্যই সাবিত্রী মেসের দাসী হইয়াও উপন্যাসের নায়িকার গৌরব লাভ করিয়াছে।

আরো দুইটি নারীচরিত্র এই গ্রন্থে আছে। একটি সুরবালা আর একটি সরোজিনী। সুরবালা সুখের সংসারে একান্ত পতিনিষ্ঠা ভাগ্যবতী আদর্শ হিন্দু নারী। সে পতিগৌরবে গৌরবান্বিতা। তাহার জীবনে কোন দ্বন্দ্ব বা পরীক্ষা নাই। সে একেবারে ব্যক্তিত্বহীনা না হইলেও অন্ধভাবে হিন্দু-সংসারের রীতিনীতি প্রথাপদ্ধতিও ঐতিহ্য মানিয়া চলে। এইরূপ নারী সংসারের পক্ষে লক্ষ্মী—কিন্তু এই লক্ষ্মীদের লইয়া সাহিত্যসৃষ্টি হয়না। চরিত্রহীনে সুরবালা একটা গৌণ চরিত্র। কিরণময়ী বলে—সেই ঝঞ্ঝার গুরু। কিরণময়ীর ইহা কথার কথা। জীবনে তাহার অনুসরণ সে করে নাই! করিবারউপায়ও ছিলনা।

সরোজিনী ইঙ্গবঙ্গ সমাজের কন্যা—নিজে টলটল ছাকাইয়া বেড়াইতে যায়। এই সমাজের মেয়েদের প্রতি শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা ছিলনা। শরৎচন্দ্র যেন তাহার আভিজাত্যকে দণ্ডিত করিবার জন্যই মূর্খ সতীশের অনুরাগিণী করিয়া তুলিয়াছেন। ইঙ্গবঙ্গসমাজের মেয়েরা শশাঙ্কমোহনের মত গোবর গণেশ ব্যারিষ্টারকে ভালোবাসিতে পারেনা—কিন্তু সতীশের মত অশিক্ষিত পদমর্যাদাহীন যুবককেও ভালবাসিতে পারে না। শরৎ-চন্দ্র জোর করিয়া তাহাকে সতীশের প্রেমানুরাগিণী করিয়াছেন।

সমাজের বাস্তবক্ষেত্রে যে প্রেম জন্মে—শরৎচন্দ্র সে শ্রেণীর প্রেম এখানে দেখান নাই—মাটক নভেলে যাহাকে প্রেম বলিত, সেই প্রেমই সরোজিনীতে সঞ্চার করিয়াছেন। এ প্রেম সেই প্রেম যাহা প্রেমাস্পদের কোন ত্রুটি দেখিতে পায় না—ইহা অন্ধ প্রেম। এইরূপ Love at first sight ধরণের প্রেম লইয়া সাহিত্য রচনার Convention শরৎচন্দ্রের যৌবন কালেও প্রচলিত ছিল। সাবিত্রীর প্রতি সতীশের দুর্নিবার আকর্ষণও এইরূপ নভেলী প্রেম বাস্তব জগতের প্রেম নয়।

অন্যান্য নারীগুলির মধ্যে কিরণ, সুরবালা, সাবিত্রীর চেয়ে ঢের বেশী জীবন্ত ওজস্বিনী, অঘোরমণী, মোক্ষদা, কাদিনী বোষ্টমী। ইহাদের চরিত্রে কৃত্রিমতার লেশ মাত্র স্পর্শ নাই। মূল চরিত্রগুলি অনেক সময় লেখকের নিজের কথা মুখস্থ বলে—সেজন্য তাহাদের আগাগোড়া জীবন্ত রাখা শক্ত—তাহা করিতে গেলে লেখকের অভিপ্রায় সব সময় সিদ্ধ হয়না।

সতীশ চরিত্রটি প্রাণবন্তই বটে, শরৎচন্দ্র নিজের জীবন হইতে এই চরিত্রে জীবনীশক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। তবে সতীশের চরিত্রে ব্যক্তিত্ব নাই। সৎশিক্ষা বা সৎসমাজের প্রভাবে চরিত্রটি গঠিত হয় নাই। এই চরিত্রটি যেন এখনো গঠনের পথে। সতীশের একজন অভিভাবকের প্রয়োজন ছিল। মেসে তাহার অভিভাবকতা করিয়াছে সাবিত্রী। কিরণময়ীও অভিভাবকতার চেষ্টা করিয়াছিল। তাহার আসল অভিভাবক ছিল উপেন্দ্র।

ধনীর আদরের দুলালদের চরিত্র সুগঠিত হইতে একটু বিলম্বই হয়। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে সতীশের চরিত্র আস্তে আস্তে গঠিত হইতেছে। এখন পর্যন্ত সে অব্যবস্থিত-চিত্ত—এখনও তাহার জীবন একটা ধ্রুব আশ্রয় লাভ করিতে পারে নাই। কখনও সে মহাপ্রাণ, কখনও সে হীনচেতা, তাহার ভালবাসা যেমন প্রখর, তাহার ঘৃণা বিদ্বেষও তেমনি প্রখর। তাহার আসক্তি যেমন প্রবল, অনাসক্তি তেমনি প্রবল। অতুল সম্পদ সে ভোগ করিতেও জানে না, ত্যাগ করিতেও জানে না।

সতীশ চিন্তা করিতেও শিখে নাই, কল্পনা করিতেও শিখে নাই। সে বর্তমানকেই চেনে, অতীত তাহার কাছে বিস্মৃতপ্রায়, ভবিষ্যতের কথা সে কোন দিন ভাবেও না। জীবনের প্রতি খুব একটা মমতাও নাই। উপেন্দ্রকে গুরুর মত ভক্তি করে, কিন্তু উপেন্দ্রকে অনুসরণ করেনা। ইংরাজিতে এরূপ চরিত্রকে বলে volatile. সতীশের চরিত্রের একটা ধ্রুব সংস্থিতি না থাকিলেও ইহা জীবন্ত।

রামমোহনের পত্র

শ্রীঅভিমন্যু মুখোপাধ্যায়

[১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের অন্তর্গত ব্রিষ্টলে রাজা রামমোহন রায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন; লক্ষণীয় বিষয় নব্য ভারতের প্রবর্তকের মৃত্যু ভারতে নয়, বিদেশে। কিন্তু এ মৃত্যু তাঁরই পক্ষে উপযুক্ত। পৃথিবীর এক প্রান্তে তাঁর জন্ম, আর এক প্রান্তে মৃত্যু। সে তো একই পৃথিবী। আর রামমোহন ছিলেন পৃথিবীর নাগরিক। রামমোহনের কর্ম ও চিন্তার আলোচনায় এ সত্যটি প্রকাশিত না হয়ে পারে না। ভারতবর্ষ তখন এমন একটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল, যার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভারতের জ্ঞান ও চিন্তার সঙ্গে পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও চিন্তার একটা সমন্বয়ের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তার পথে বাধা ছিল জাতীয় সঙ্কীর্ণতা। রামমোহন সেই বিদেশী আলোটি প্রথম তুলে ধরলেন। তার মানে এই নয় যা কিছু বিদেশী তারই মর্যাদা তিনি দিয়েছিলেন, আর এদেশীয় সবকিছু তাঁর কাছে বিষবৎ ছিল। তিনি প্রকৃত সমন্বয়বাদী। তাঁর একেশ্বরবাদ ভারতেরই উপনিষদ্ ও বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতীয়ধর্ম ও আচারও তিনি বর্জন করেন নি। আবার ইউরোপের যতটুকু তখন প্রয়োজন ছিল সেইটুকু নিতে অস্বীকার করার মৌঢ়ও তাঁর ছিল না। চিন্তা ও কর্মের এই সার্বভৌমিকতা ও আন্তর্জাতিকতাবোধ তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র।

বাঙালীদের মধ্যে রামমোহনই সর্বপ্রথম বিলাত যাত্রার সৌভাগ্য লাভ করেন। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে রামমোহন প্রচুর সম্বর্ধনা লাভ করেন। ফ্রান্সে যাবার আগে ছাড়-পত্র চেয়ে রামমোহন যে আবেদন করেন তারই বাংলা অনুবাদ নীচে দেওয়া হ'ল। এর একটি নকল লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসে আছে। রামমোহনের চিন্তার সার্বভৌমিকতা ও আন্তর্জাতিকতাবোধের এটি একটি মূল্যবান দলিল। সমস্ত মানুষ ও সমস্ত দেশ নিয়ে যে এক পৃথিবী, একথা তাঁর পত্রে অতি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতে ভাল লাগে যে, অতদিন আগে বিদেশে এক বাঙালীর কণ্ঠে সকল-জাতি-গঠিত এক সংসার কথা ধ্বনিত হয়েছিল। সেইজন্যই আবেদন পত্রটির অনুবাদ ও প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে। অনুবাদে সচেতনভাবেই সাধুভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। পত্র অনুবাদক।

পররাষ্ট্র সচিব, ফ্রান্স

মহাশয়,

ফ্রান্স হইতে বহু হাজার মাইল দূরের এক দেশের অধিবাসী একজন বিদেশীর পত্র পাইয়া আপনি হয়তো আশ্চর্যান্বিত হইবেন। আমার নিজের উপলব্ধি ও স্বাধীন ও সভ্য জাতিগুলির পুরোভাগে অবস্থিত একটি দেশের প্রতি শ্রদ্ধা আমাকে উদ্বুদ্ধ না করিলে আমি কখনোই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতাম না।

যে ফ্রান্স প্রকৃতির অনুগ্রহ পাইয়াছে, বিজ্ঞান ও কলার চর্চায় আপনাকে যে অলঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছে, সর্বোপরি স্বাধীন শাসনতন্ত্রের অধিকারী হইবার সৌভাগ্য যাহার ঘটিয়াছে, বিগত বারো বৎসর ধরিয়া আমি সেই ফ্রান্স ভ্রমণের ইচ্ছা (কয়েকটি ফরাসী ও ইংরাজী সাময়িক পত্রিকায় যাহা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে।) পোষণ করিয়া আসিতেছি। ধর্ম ও জাতিগত বিদ্বেষ ও অন্যান্য বহু বাধা অতিক্রম করিয়া অবশেষে যখন আপনার তীরভূমির ঠিক সম্মুখে আসিয়া পৌঁছাইয়াছি, তখন শুনিলাম রাষ্ট্রদূত অথবা ইংলণ্ডে ফ্রান্স-সচিবের নিকট হইতে সুস্পষ্ট অনুমতি না পাইলে আপনার রাজ্যে প্রবেশের অধিকার আমার নাই।

এইরূপ বিধি এশিয়ার জাতিগুলির মধ্যেও নাই (যদিও তাহারা ধর্মবিদ্বেষ ও রাজনৈতিক বিবাদবশতঃ পরস্পরের প্রতি চরম শত্রুভাবাপন্ন)। অবশ্য চীন একটি ব্যতিক্রম। চীনাজাতি বিদেশী এবং নূতন প্রথা ও ভাবধারা সম্বন্ধে অধিক মাত্রায় সন্দিগ্ধ। যে ফ্রান্সজাতি সৌজন্য ও সর্ববিষয়ে উদারতার জন্য এত প্রসিদ্ধ, তাহাদের মধ্যে এই নিয়মের অবস্থিতি দেখিয়া আমি বিস্মিত হইতেছি।

বর্তমানে ইহা সর্বজন স্বীকৃত যে কেবলমাত্র ধর্ম নহে, পক্ষপাতমুক্ত সাধারণ জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা এই সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে সমগ্র মানবজাতি একটি বিরাট পরিবার। অসংখ্য জাতি ও গোষ্ঠী সেই পরিবারেরই বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা। সেইজন্য সকল বাধা অপসারিত করিয়া সকল উপায়ে মানবীয় সম্পর্ক দৃঢ় করিবার ইচ্ছা সকল দেশের শিক্ষিত মানুষেরই হওয়া আবশ্যক, যাহাতে সমগ্র মানবজাতির পারস্পরিক সুযোগ সুবিধা আদান প্রদানের ব্যাপারে উন্নতি হয়।

বোধহয় এই যুক্তি দেখানো হইবে যে কোন দুইটি জাতির মধ্যে যুদ্ধ ও শত্রুভাব থাকিলে (নিজেদের স্বার্থ যথার্থভাবে না বুঝিবার ফলেই সম্ভবতঃ যাহার উদ্ভব হইয়াছে) রাষ্ট্রনীতির প্রয়োজনে এই সকল সাবধানতা-মূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন রহিয়াছে। কিন্তু ইহা কেবলমাত্র যুদ্ধাবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পরিপার্শ্বস্থ দেশগুলির সহিত ফ্রান্স যদি যুদ্ধে রত থাকিত, কিংবা সেই দেশের লোককে বিপদজনক বলিয়া মনে করিত, তাহা হইলে এইরূপ অস্বাভাবিক সাবধানতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্য বুঝা যাইত।

কিন্তু বহু বর্ষ ধরিয়া ইউরোপে সাধারণ শান্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং বিশেষ করিয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ড এই দুই জাতি এবং তাহাদের বর্তমান সরকারের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব নাই। তবু এই নিয়মের কারণ কি কিছুতেই তাহা আমার বোধগম্য হইতেছে না। অন্ততঃ-পক্ষে ইহা ফ্রান্সের আন্তরিকতা ও বিশ্বাসের অভাবই প্রকাশ করিতেছে।

শান্তির সময়ও এইরূপ বিধিনিষেধ অব্যাহত রাখিবার পক্ষে নিম্নলিখিত কারণগুলি উপস্থাপিত করা হইতে পারে, যদিও আমার মনে হয়, উপযুক্ত পরীক্ষার দ্বারা তাহাদেরও অসারতা প্রতিপন্ন করা যায়।

প্রথমতঃ যদি বলা হয় দুশ্চরিত্রদিগকে ফ্রান্সে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না, তাহা হইলে তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে চরিত্রের প্রশংসাপত্র এবং কোন ব্যক্তির আচার ব্যবহারের অনুসন্ধানের উপর ভিত্তি করিয়া ফরাসী রাষ্ট্রদূত ছাড়পত্র প্রেরণ করেন না সুতরাং ইহা সম্ভাব্য বিপদের প্রতিকারে অক্ষম।

দ্বিতীয়তঃ গুরুতর অপরাধীদিগকে বিচারের হাত হইতে পলায়ন করিতে না দেওয়াই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বিভিন্ন জাতির মধ্যে অপরাধী সমর্পণের চুক্তির মধ্যেই ব্যাপারটির সমাধান রহিয়াছে।

তৃতীয়তঃ খাতকদিগকে উত্তমর্ণের হাত এড়াইতে না দেওয়া যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেও ইহা নিষ্প্রয়োজন। কারণ দেউলিয়া আইন অনুসারে খাতকদিগকে তাহাদের নিজের দেশেও স্বল্পমেয়াদী কারাবাসের পর মুক্তি দেওয়া হয়। সুতরাং স্বদেশ হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত নির্বাসন আমার মতে গুরুতর শাস্তি।

চতুর্থত রাজনৈতিক বিষয় যদি ইহা প্রযোজ্য হয়; তাহা হইলে আমার ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগের আদৌ প্রয়োজন নাই। কিন্তু সাধারণক্ষেত্রে আমার মনে হয় শাসনতান্ত্রিক সরকারগুলির উদ্দেশ্য আরও উত্তমরূপে সাধিত হইবে যদি দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক বৈষম্যের প্রতিটি ব্যাপার একটি সংস্থার নিকট উপস্থাপিত করা হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের বিধান সভা হইতে সমসংখ্যক সভ্য লইয়া এই সংস্থা গঠিত হইবে। জাতি দুইটিকে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে হইবে। প্রত্যেক জাতি হইতে পর্যায়ক্রমে এক বৎসরের জন্য একজন করিয়া সভাপতি নির্বাচিত হইবেন। সভার স্থান কোন বৎসর একটি দেশের মধ্যে হইবে, পর বৎসর অপর একটি দেশে। যেমন ইংলণ্ডের ডোভার এবং ফ্রান্সের ক্যালে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

শাসনতান্ত্রিক সরকারযুক্ত দুইটি সভ্য দেশের নাগরিকদের স্বার্থজড়িত সকল অনৈক্য—রাষ্ট্রনৈতিক হউক বা বাণিজ্যিক হউক—এইরূপ সংস্থাই তাহার ন্যায্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাধান করিবে। উভয়েরই তাহাতে সন্তুষ্টি লাভের সম্ভাবনা এবং ফলে যুগ যুগ ধরিয়া তাহাদের মধ্যে প্রগাঢ় শান্তি ও বন্ধুত্ব বজায় থাকিবে।

জরুরী বাণিজ্যিক ও অন্যান্য বিষয়ে ছাড়পত্র প্রথা যে অসুবিধা সৃষ্টি করিতেছে, তাহা লইয়া কিছু বলিতেছি না। কিন্তু ছাড়পত্রের আবেদনের অর্থ যে অন্য রাজ্যে ঢুকিবার পূর্বে আবেদনকারীর চরিত্রের প্রশংসাপত্র অত্যাবশ্যক ইহারই যৌন সম্প্রতি; ইহা আমি না বলিয়া পারিতেছি না। সুতরাং যে কেহ আবেদন অগ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনার জন্য কুণ্ঠা বোধ করিতে পারেন কেননা ইহার ফলে শান্তিপূর্ণ নাগরিক হিসাবে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে এক প্রতিকূল ধারণার সৃষ্টি হইবে।

সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা করিয়া ফরাসী সরকার যদি দীর্ঘ দিন প্রচলিত অন্য কোন কারণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলেও আমি ঐ দেশ দেখিবার তীব্র বাসনা বশতঃ আমার উপর যে সকল সর্ত আরোপিত হইবে, তাহা মানিয়া চলিব। কেননা ফ্রান্সের বর্তমান সুসভ্য সরকারের বিরুদ্ধে কোন মত পোষণ করিতে আমি দুঃখিত না হইয়া পারি না। ভবদীয়,

রামমোহন রায়

জাপানী চিত্রশিল্পের ক্রমবিকাশ

রণজিৎ কুমার সেন

প্রত্নতত্ত্বানুসারে প্রাচীনকালে জাপানের অধিবাসিবর্গ পাথর খোদাই শিল্পের অনুশীলন করিত এবং পূর্ব-পুরুষদের পূজার জন্য পাথরের প্রতিমূর্তি প্রস্তুত করিত। এই খোদাই মূর্তিগুলি ছিল অবয়ব, বর্ম পরিহিত, তরবারী বিদ্যা অন্যপ্রকার অস্ত্রসজ্জিত ও সমাধি রক্ষকরূপে প্রস্তুত ভাস্কর্য। এতদ্ব্যতীত প্রাচীনকালে মৃৎ এবং শবাধারের উপরে চক্রাকারে খোদিত জিনিষ প্রস্তুত হইত। ইহা দ্বারা জাপানে আদিমবাসিগণ যে সাধারণভাবে জীবন যাপন করিত, তাহা প্রতীয়মান হয়। পুরাকালে জাপানীদের বাসগৃহগুলিও অতি সাধারণ পদ্ধতিতে বাবলমুক্ত অকর্তিত কাঠের দ্বারা প্রস্তুত করা হইত এবং তখন জাপানে বিশেষ বিশেষ আকারের মাটির অবয়ব পুতুল প্রস্তুত হইত—যে সকল শিল্প প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ব্যতিতও সুকুমার শিল্পিগণেরও চিত্ত আকর্ষণ করিত।

প্রাচীন জাপানে একটি নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত ছিল যে,

উচ্চপদস্থ মৃতব্যক্তির সমাধির পাশে তাহার অনুচরবর্গের মধ্য হইতে কোনো একটি জীবিত ব্যক্তিকে নির্বাচিত করিয়া গোর দেওয়া হইত। পরে কোনো এক সম্রাটের শাসনকর্তা কর্তৃক এই অদ্ভুত বিভীষিকা প্রথা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল; জীবিত ব্যক্তির পরিবর্তে মৃত্তিকা দ্বারা প্রস্তুত মনুষ্যাকৃতি, পক্ষী, অশ্ব প্রভৃতির অবয়ব এবং অস্ত্রশস্ত্র ও গার্হস্থ্যদ্রব্যসমূহ প্রোথিত করা হইত। এই সকল মাটির প্রস্তুত জিনিসের বিশেষ কিছু শিল্পমূল্য না থাকিলেও বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত ইহা ছিল জাপানের একমাত্র শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে চীন ও কোরিয়া হইতে শিল্পকার ও ব্যবসায়িগণ জাপানে আসিতে থাকে। যুবরাজ Shataku নামক মহাদেশের সাংস্কৃতিক উন্নতিসাধনের একজন বিখ্যাত নেতা, জনসাধারণকে তিনি শিল্পানুশীলনে ক্রমবর্ধমান আসক্তি সহকারে নিযুক্ত থাকিবার জন্য উৎসাহ দান করিতেন। ইহার ফলে দুইটি বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দির নির্মিত হয়। ওই সকল গঠন হইতে ধারণা করা যায়, ঐ যুগে চীনা স্থাপত্য শিল্প কি প্রকার ছিল। ছোট আকারের মন্দিরগুলির গায়ে স্থাপিত ধাতুসমূহের উপর হলুদে ফুলের লতায় নক্সাঙ্কিত চিত্রগুলির সঙ্গে গ্রীসের অনুরূপ কলাচিত্রের সাদৃশ্য আছে। ৬৯২-৬৯২ খৃষ্টাব্দকালে জাপানের ভাস্কর্যসমূহ একই স্থান হইতে উদ্ভূত ছিল না, কিছু বা চীন ও কোরিয়া হইতে আসিত, কিছু বা জাপানস্থিত চীনা ভাস্করগণের হাতে প্রস্তুত এবং কতকগুলি জাপানী ও বিদেশী ভাস্করগণের সংযুক্ত প্রচেষ্টার দ্বারা সম্পন্ন। এই যুগে চারুশিল্পের বিশেষ বিস্তৃতি লাভ ঘটে এবং ইতিহাসপাঠের পক্ষে অমূল্য উল্লেখযোগ্য বিষয়-সমূহ স্থান লাভ করে।

চীনের শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যসমূহ পূর্বে কোরিয়া উপদ্বীপের মধ্য দিয়া জাপানে আসিত, কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে চীন ও জাপানের মধ্যে জনগণের যাতায়াত ও পারস্পরিক মেলামেশা বর্ধিত হওয়ায় চীনের উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যসমূহ কোরিয়ার মধ্যবর্তিতা ব্যতীতই সরাসরি জাপানে আসিতে লাগিল। এই যুগের শিল্প সম্বন্ধে একটি বিশেষ ঘটনা এই যে, চিত্রশিল্পগুলি মহাদেশ হইতে আমদানী করা হইত এবং বৌদ্ধ চিত্রগুলি চীন ও ভারতবর্ষের যাজকগণের দ্বারা চিত্রিত হইত। 'ইর্যুজি' মন্দিরের প্রাচীর গাত্রের চিত্রসমূহে ইহার স্বাক্ষর রহিয়াছে। এই মন্দিরের দেওয়াল গাত্রের চিত্রগুলি শিল্পবিজ্ঞানে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিক অগ্রবর্তী এবং বর্তমানে অবস্থিত

জাপানী শিল্পীর তৈরী ডল পুতুল
(মানুষের মতই পুতুলগুলিকে বিছানায় শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে)

যে কোনো কাষ্ঠনির্মিত অট্টালিকা প্রাচীরের চিত্রসমূহের শ্রেষ্ঠ উদাহরণরূপে অত্যন্ত মূল্যবান হিসাবে গ্রহণযোগ্য। আলোচ্য শতাব্দীতে এই চিত্রগুলি এবং অন্যান্য আমরানী-কৃত চিত্রশিল্পসমূহের উদাহরণ হইতে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, এই চিত্রশিল্পসমূহ উহার উৎপত্তিস্থান ভারতবর্ষ হইতে পূর্বদেশীয় দেশগুলিতে অণুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। এই যুগের শ্রেষ্ঠ আদর্শশিল্পকার্যের দৃষ্টান্ত 'নারা' (Nara) মন্দিরে বুদ্ধদেবের এবং তদীয় দুই শিষ্যের ব্রোঞ্জধাতু নির্মিত প্রতিমূর্তি। এই প্রতিমূর্তি সম্পর্কে আরবীয় শিল্পগঠন-অনুকরণে আঙ্গুর ফলের নক্সা খোদিত কারুকার্য-গুলি বিশেষ চিত্তাকর্ষক। নক্সাগুলি পশ্চিম ভারত হইতে উদ্ভূত হইয়া 'হান' (Han) বংশের স্থিতিকালে চীনে প্রবর্তিত হইয়া 'Tang' যুগে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে।

অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধসম্রাট 'Nara'-যুগের জাপানী চারু শিল্প রক্ষা করিতে বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। বুদ্ধদেবের বৃহৎ মূর্তি গঠন এবং বিখ্যাত 'Todaiji' মন্দির নির্মাণে এই যুগের একটি প্রধান শিল্পকার্য। উল্লেখযোগ্য যে, বৌদ্ধসম্রাটের মৃত্যুর পর যে সকল শিল্পদ্রব্য তাঁহার দখলে ছিল, তাহা Nara-র শিল্প সম্বন্ধীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত হইয়াছে। উক্ত শিল্পদ্রব্যগুলি যে কেবল দুষ্প্রাপ্য চিত্রশিল্প ছিল তাহাই নয়, উহার মধ্যে বহু প্রয়শিল্পদ্রব্যও ছিল, যথা :—রঞ্জন করা কাপড়, লাক্ষার বার্নিশ করা জিনিস, স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত বিভিন্ন আধার, চীনামাটির বাসন এবং লিখিবার যন্ত্র ও দ্রব্য প্রভৃতি। চীনের রাজকীয় পরিবারবর্গ হইতে সংগৃহীত Tang-এর প্রস্তুত উৎকৃষ্ট নৈপুণ্য-প্রকাশক দ্রব্যসমূহও

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জাপান এবং চীনের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ ব্যতীত পূর্বদেশ, রোমসাম্রাজ্য, পারসিয়া, ভারতবর্ষ এবং চীনের পশ্চিম দেশসমূহ হইতে প্রাপ্ত বহু শিল্পসামগ্রীও 'Nara'-মাদুঘরে দৃষ্ট হয়। সকল রকমের সাংস্কৃতিক আকৃতি এবং উৎপন্ন দ্রব্য এই যুগে বিদেশ হইতে জাপানে আমদানী করা হইত। জাপানীরা ঐ সকল শিল্প সম্বন্ধীয় জ্ঞান ও শিক্ষালাভ করিয়া অনুরূপ দ্রব্যাদি বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে প্রস্তুত করিতে পারিত—যাহা বৈদেশিক দ্রব্যাদি হইতে কোনো অংশে নিকৃষ্ট হইত না। সাধারণতঃ চীনদেশের অনুকরণেই এই সকল শিল্পদ্রব্যের অধিকাংশ প্রস্তুত হইত, ফলে অবশ্যম্ভাবী-রূপে জাপানীশিল্পে চৈনিকশিল্পের প্রভাব ঘটে। অবশ্য এই প্রভাব কাটাইয়া উঠিবার জন্য পরবর্তী সময়ে আন্দোলন গড়িয়া ওঠে সন্দেহ নাই। ইহার ফলে নবম শতাব্দীতে দেশীয় শিল্প-যাজকদের নবতর প্রচেষ্টায় নতুন শিল্পের উদ্ভাবন দেখা যায়। এই সময়ে জাপানে পর্দা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া ওঠে এবং তদ্দ্বারা দেশীয় দৃশ্য চিত্রাঙ্কনের উদ্দীপনা বিষয়ে বিশেষ সহায়তা হইত। 'কিয়োটোর' (Kyoto) দেবমন্দিরসমূহের প্রতিমাগুলিতে এই যুগের আদর্শ ভাস্কর্য শিল্পের পরিচয় গাঁথা আছে। জাপানী দেবতাদিগের প্রতিমাসমূহের গঠন সম্বন্ধীয় খোদাই শিল্পের প্রচলনও এ যুগের একটি স্মরণীয় ঘটনা বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

নবম শতাব্দীর শেষভাগে চীনের সঙ্গে জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ায় উভয় দেশের সর্বপ্রকার সম্ভোগের সুবিধা ছিন্ন হয়। ইহার ফলে নিজস্ব আত্ম-স্বাতন্ত্র্যকালে জাপানীশিল্পে দেশীয় প্রতিভা ও প্রভাব বিস্তারের সুযোগ ও সম্ভাবনা দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে শিল্পজাতীয় বৈশিষ্ট্য পূর্ণভাবে সংরক্ষিত হইতে থাকে। এই যুগের চিত্রকরগণ চিত্রাঙ্কনে এরূপ একটি দেশীয় পদ্ধতি অনুসরণ করেন, যাহার প্রথম উদ্ভব ঘটে চীনের 'Tang' যুগে। চিত্রাঙ্কনের জন্য এসময়ে জাপানীরা কাগজের তরফা ও ভাজ করা পর্দা প্রভৃতি মনোনীত করে। এতদ্ব্যতীত জাপানী চিত্রাঙ্কনপদ্ধতির অনেক স্কুলও এসময়ে স্থাপিত হয়, যেখানে পার্চমেণ্ট কাগজের উপরের চিত্র নূতনভাবে পরিবিষ্ট হইয়া পরবর্তী শতাব্দীতে বিকাশ লাভ করে। ধর্মবিষয়ক চিত্রাঙ্কন ক্ষেত্রেও জাতীয় প্রকৃতি ও ভাব বিশেষ ভাবে রক্ষিত হয়। ইহার অত্যল্পকালের মধ্যে প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের মতবাদ-ঘটিত নীতি প্রচারের পদ্ধতিতে বৌদ্ধ-ভাস্কর-বিদ্যাচর্চার অসাধারণ অবনতি ঘটে। কাঠের উপর খোদাই কারুকার্য অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা লাভ করে, কিন্তু এই শিল্প প্রধানতঃ রাজপুরুষ প্রভৃতির বাসকসম্প্রদায়ের গৃহের আসনাদি নির্মাণকার্যেই নিবদ্ধ ছিল। শিক্ষিত ভাস্করগণ জনগণের সঙ্গে সহযোগিতা রক্ষা করিয়াই এই খোদাই কার্য করিত। প্রতিমা নির্মাণ প্রভৃতির কাজ যখন শেষ হইত, তখন উহার বিভিন্ন অংশগুলি একত্র করিয়া লাক্ষা দ্বারা চিত্রিত ও সিল্‌ট করা হইত। এক্ষেত্রে বিখ্যাত শিল্পী জোকোর (Jocho) প্রতিষ্ঠিত স্কুলের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার সঙ্গে সঙ্গে স্থপতি-বিদ্যারও উন্নতি ঘটে। বলা প্রয়োজন যে, জাপানের স্বাতন্ত্র্যনীতি অবলম্বনের তিন বৎসরের মধ্যে শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে Yamato জাতির বৈশিষ্ট্য-প্রকাশক স্বদেশী পদ্ধতি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উন্নতি লাভ করে।

জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১১৯২—১৩৩৭ খৃষ্টাব্দ যুগ (Kamakura যুগ নামে অভিহিত) জাপানী শিল্পের চরমোৎকর্ষের যুগ। এই ১৪০ বৎসরে জাপানের পুরুষপরম্পরাগত কিংবদন্তী সম্বন্ধীয় চিন্তা ও ভাবাবেগ পূর্ববর্তী যুগের প্রভাবান্বিত আভিজাত্যিক সংস্কৃতির উপরে প্রবলভাবে অগ্রগতিলাভ করে। সাংস্কৃতিক বিকাশের এই-রূপ পরিবর্তনে শিল্পের উপর প্রতিক্রিয়া ঘটে এবং দেশের ভিতরে ও বাহিরে শিল্পের আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। কারণ, এই সময়ে চীনে 'Sung' যুগের পর 'Juan' যুগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী যুগের অর্জিত সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের স্রোত জাপানে প্রবাহিত হইতে থাকে।

এই সময়ের আর-একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা মঙ্গল-

জাপানী মৃৎশিল্পীমাটির মূর্তি প্রস্তুত করিতেছে।

প্রতিকৃতি চিত্রের প্রবর্তন। সাধারণতঃ বলিতে গেলে এ পর্যন্ত ভাস্কর্য ব্যতীত প্রতিকৃতি পুনঃপ্রকাশের অন্য কোনো প্রণালী ছিল না। এবারে প্রতিকৃতি-চিত্রের শিল্প-নৈপুণ্য দ্রুত প্রগতির পথে অগ্রসর হয় এবং সর্বোৎকৃষ্ট নৈপুণ্য প্রকাশক চিত্রগুলি বিখ্যাত 'Shingoji' মন্দিরে সংরক্ষিত হইতে থাকে। ভাস্কর্য শিল্পের দিক দিয়াও এই যুগ আরও বহু চিত্রের উদ্ভাবন করে। এতদ্ব্যতীত খোদাই-শিল্প, লাক্ষার প্রস্তুত জিনিষপত্র, মৃৎশিল্প এবং বিভিন্ন ধাতু-প্রস্তুতশিল্প জাতীয় শ্রম-শিল্পগুলিও এই সময়ে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। এতকাল স্থপতি-বিদ্যা নিতান্তই সাদাসিদা ব্যাপার ছিল, এবারে যদিও তাহার ষ্টাইল পরিবর্তিত হইল, কিন্তু বহু কাগজের ওঁাজে তৈরী এই স্থাপত্যকার্যও এতদিনে একটা নতুন দিক খুঁজিয়া পাইল।

রীতি অনুসারে যখনই চৈনিক সংস্কৃতি উচ্চতম সীমায় উন্নীত হইত, তখনই জাপান ও চীন—এই উভয় দেশের মধ্যেই হ্রাসপ্রাপ্ত সংযোগ ও আদান-প্রদান সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত হইত এবং তাহার ফলে জাপানী দেশীয় চিত্রশিল্পের স্কুলসমূহ চীনের ক্ষমতাশালী 'Sangyuan' (সাংয়ুয়ান) পদ্ধতির চিত্রশিল্পের প্রভাবের সহিত প্রতিযোগিতায় আসিয়া উঠিতে পারিত এই সময়ের প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ছিলেন Mincho (মিংচো)। তাঁহার তুলির কার্যে চীনের 'Sang-Yuan' যুগের চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতির প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। অধিকন্তু তিনি এই যুগের প্রধান চিত্রকর ছিলেন, কারণ তাঁহার শিল্প-কৌশলে মহাদেশীয় শিল্পবিজ্ঞান চিন্তাধ ও টেক্‌নিকে পূর্ণতা লাভ করে। দেশীয় শিল্পে 'Sung-Ming' পদ্ধতির অগ্রগতি ও প্রচলনও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চীনের সঙ্গে উৎসাহজনক বাণিজ্যনীতি দ্বারাই প্রধানতঃ এই নব পদ্ধতির শিল্প-আন্দোলন সম্ভব হয়। এসময়ে অসংখ্য চীনা শিল্পোৎপন্ন দ্রব্য আমদানী হইতে থাকে এবং তাহার দ্বারা জাপানের গৃহশিল্পগুলি সাতিশয় উদ্দীপিত হইয়া ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে Sung-Yuan পদ্ধতিতে কাগজে কালির রেখার দ্বারা ছুইং চিত্রও উন্নতি লাভ করে।

ইহার পর Nabunaga এবং Hideyoshi-র সাময়িক ডিক্টেটারি শাসনাধীনে সামাজিক হাঙ্গামা জাপানকে বিশেষ আলোড়িত করিয়া তোলে। এই যুগের চিত্রের বিশেষত্ব হইতেছে বৃহৎ পরিমাণ উজ্জ্বল জাকজমকশীল বর্ণবিন্যাস। Osaka দুর্গ এবং জাপগীরহিত

বৃহৎ অট্টালিকাসমূহের প্রাচীরের চিত্রসমূহ এই সময়কার বিভিন্ন চিত্রকরদের আঁকানো শিল্পের নিদর্শন। মুখোস-শিল্পও এই সময়েই প্রবর্তিত হয় এবং ধাতব শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটে।

চীন হইতে জাপানে যে সমস্ত শিল্পের প্রচলন হয়, তন্মধ্যে বয়নশিল্পের ওলবাহার রেশমী কাপড় এবং ব্রোকার ও ব্রুটিদার সাটিন কাপড় অন্যতম। পরবর্তী যুগ ১৬০৩ হইতে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত Yedo যুগ। এই যুগ টোকিওতে Takungawa Shoyuns কর্তৃক প্রবর্তিত হয় এবং এই রাজত্বের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার বিলুপ্তি ঘটে। Yedo যুগের প্রথম ভাগে সমুদ্র পারের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে জাপানীদের সংযোগ স্থাপিত হইল এবং ইহার দ্বারা বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতি ঝোঁক দেওয়া হইল। যেহেতু এপর্যন্ত Spaniards এবং Portugeese ভিন্ন অন্য কোনো ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে জাপানের আদান-প্রদান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনো ব্যবহার ছিল না, এখন পারস্পরিক সংযোগের ভিত্তিতে জাপানে আগত ইংরেজ ও ওলন্দাজদের সঙ্গে স্বাধীনভাবে জাপানীদের সম্পর্ক গড়িয়া উঠিল। ইহার ফলে জাপানে প্রতীচ্যপদ্ধতিতে শিল্প সৃষ্টি সুরু হইল। এ সময়কার খ্যাতিমান চিত্রকরদের মধ্যে Korin অন্যতম। তাঁহার শিল্প বিদেশীদের কাছে পরম বিস্ময়কর ছিল।

Yedo যুগের Ukiyoye পদ্ধতির চিত্র মৌলিকতা হিসাবে একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টমান শিল্পকার্য। জনপ্রিয় নাটকে এবং সাহিত্যে এই শিল্পের দ্রুত বিকাশ লক্ষ্য করিবার মতো। এই পদ্ধতির চিত্র দুই প্রকারের ছিল, যথা—হাতে তৈরী চিত্র এবং রং দ্বারা মুদ্রিত চিত্র। কাগজে কালিদ্বারা মুদ্রিত চিত্রসমূহ ছিল খোদিত ভারী কাষ্ঠখণ্ডের উপরে রং দ্বারা চিত্রিত চিত্রসমূহের অগ্রদূত। প্রভূত পরিমাণে উৎপাদনের জন্য এই মুদ্রণ প্রণালী গ্রহণের পূর্বে রঙের কাজের জন্য তুলি ব্যবহৃত হইত। খোদিত কাষ্ঠখণ্ডের মুদ্রণের জন্য প্রথমে লাল এবং সবুজ—এই দুইটি রঙেরই ব্যবহার ছিল। পরে Horunobu পাঁচ রঙের উন্নত প্রণালীর মুদ্রণ আবিষ্কার করেন। অতঃপর Utamaro ও Hokusai-এর ন্যায় সুনিপুণ শিল্পকদের হাতে খোদিত কাষ্ঠ হইতে রঙের মুদ্রণপ্রণালী আরও উন্নত হয় এবং অবশেষে পরিসমাপ্ত চিত্রগুলি শিল্প সম্বন্ধীয় উৎকর্ষ হিসাবে মৌলিক হস্তচিত্রিত চিত্রকার্যগুলিকে অনেক বেশী অতিক্রম করে। Ukiyoye পদ্ধতিতে দেশদৃশ্যের চিত্র বিখ্যাত শিল্পী Hiroshige কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। এই যুগের স্থপতি-শিল্পের দৃষ্টান্ত বিখ্যাত Nikko অট্টালিকাসমূহে দৃষ্ট হয়—যাহা চারুশিল্পের প্রকৃত নমুনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রসাধন বিষয়ে অধিকতর যোগ্য বলিয়া বিবেচিত।

অবশেষে এমন সময় উপস্থিত হইল—যখন জাপানীরা তাহাদের যুগব্যাপী নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল এবং বৈদেশিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া তাহাদের স্বদেশে যে-দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহা উন্মুক্ত করিতে প্রয়াসী হইল। বিদেশীদের সঙ্গে সংযোগ রহিতের জন্য জাতীয় আন্দোলন চলিতে থাকা সত্ত্বেও ওলন্দাজগণ ব্যতীত ও রুশ, বৃটিশ, ফরাসী এবং আমেরিকাবাসিগণ জাপানে আসে। ইতিপূর্বেই হল্যান্ড হইতে পাশ্চাত্য শিল্প ও বিদ্যা নাগাশিকীর ভিতর দিয়া জাপানে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহার দ্বারা জাপানে পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে তৈলচিত্র প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং এইরূপে Yedo যুগের শেষভাগে পাশ্চাত্য শিল্প সজোরে জাপানে নিজের স্থান করিয়া নিয়াছিল।

জাপানী শিল্পের ইতিহাসে বর্তমান যুগ আরম্ভ হয় সত্তর বৎসরেরও ঊর্ধ্বকাল যাবৎ—যখন সম্রাট Meiji টোকিওতে সাম্রাজ্যশাসন সুরু করেন। এই সময়ে যে সমস্ত চারুশিল্প সর্বপ্রথম Mesopotamia-এ উদ্ভূত হয়, তাহা ভারতীয় ও চীনাশিল্পের সহিত মিশ্রিত হইয়া পূর্বাকাশে বিস্তৃতি লাভ করিতে থাকে।

Meiji-র পুনঃ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জাপানী ইতিহাসে

শুকুমণি (ডল)

নতুন একটি সম্ভিক্ষণ উপস্থিত হয়। দেশ স্বাধীনভাবে বৈদেশিক সংযোগের জন্ত উন্মুখ হইয়া ওঠে এবং ইউরোপীয় সংস্কৃতির অন্তঃপ্রবাহ জলপ্লাবনের ন্তায় সেই সংযোগের অনুসরণ করে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা অনতি-কালের মধ্যেই জাপানে প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। এই অসাধারণ পরিবর্তন স্থপতিশিল্পের উপরও সরাসরি প্রভুত্ব বিস্তার করিল এবং জাপানে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে অট্টালিকাসমূহ গঠিত হইতে লাগিল। স্থপতিশিল্পে এইরূপ আমূল পরিবর্তন চারুশিল্পের অন্তান্ত শাখার উপরও কম প্রভাব বিস্তার করে নাই।

১৮৮০ সালে টোকিওর রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের মার্কিন অধ্যাপক Fenollosa জাপানের স্বদেশী চিত্রশিল্পের স্কুলসমূহ পরিদর্শন করিয়া মুগ্ধ হন এবং এই স্কুলসমূহ রক্ষা করিতে একটি নতুন আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। তাঁহার প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া গভর্ণমেণ্ট ১৮৮৯ সালে 'Tokyo Academy of Fine Arts' স্থাপন করেন। এই আন্দোলনের ফলে জাপানী পদ্ধতিতে আগেকার পুরাতন স্কুলসমূহ পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় এবং বহু-সংখ্যক চিত্রকর পুনরায় জনপ্রিয় হইয়া ওঠেন। ১৯০৭ সালে Education Office কর্তৃক প্রথম 'শিল্প-মেলা' উদ্বোধিত হয়। এই স্কুলের বিশিষ্ট প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে Yokyoaina, Taikan, Shimomura, Kanzan, Taniguchi, Kokyo, Kikuchi, Keigetsu এবং

জাপানী নারীশিল্পী কাপড়ের সাহায্যে পুতুল তৈরী করিতেছে।

Toji Kaku প্রভৃতি চিত্রকরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জাপানী শিল্পের আর একটি নব আন্দোলন গড়িয়া ওঠে জার্মানদিগের আগমনের সঙ্গে। পরে ১৯১৯ সালে Imperial Academy of Fine Arts স্থাপিত হওয়ার সময় এই আন্দোলন আরও অধিক সম্প্রসারিত হয়। France, Germany এবং Italy কর্তৃক জাপানে নূতন শিল্প-বিদ্যালয়সমূহ সংস্থাপিত হইতে শুরু করে। পাশ্চাত্য চিত্রের ধারা প্রথমতঃ ফরাসীদিগের ধারণা ও সংস্কার হইতে উৎপন্ন হইয়া ইউরোপীয় প্রভাবের বহু ধাপ উন্নতির ক্রম অতিক্রম করিয়া আসিয়া বিভিন্ন শক্তি সম্পন্ন ও উন্নতিশীল চিত্রকরের সৃষ্টি করে—যাঁহারা দেশীয় চিত্রশিল্পের উন্নতির জন্য গবেষণা শুরু করেন। Imperial Academy of Fine Arts প্রতিষ্ঠার মূলে ছিলেন বিখ্যাত জাপানী মনীষী Okakura Kakuzo.

উপরোক্ত এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের শিল্পীগণ ব্যতীতও জাপানে বহু চিত্রকর আছেন—যাঁহারা প্রাচ্য শিল্পোদ্যমের গভীরতা বজায় রাখিয়া এবং দেশের জাতীয় শিল্পের ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের সংঘর্ষের বহু উর্ধ্বে থাকিয়া প্রসিদ্ধ শিল্পদ্রব্যসমূহের উৎপাদন করিয়া কম যশস্বী হন নাই। তাঁহারা সম্মিলিতভাবে জাপানী চিত্রসমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পদ্ধতির চিত্রশিল্পের বিস্ময়কর উন্নতি ১৯১৩ সালে একদল কর্মঠ শিল্পীর প্রতিষ্ঠিত 'Nikakai' নামক সমিতির প্রচেষ্টায় সাধিত হইয়াছিল। এই কর্মঠ শিল্পিবৃন্দ Imperial Academy of Fine Arts এর বিশুদ্ধ বিদ্যালয় সংক্রান্ত কার্যপদ্ধতির প্রবণতায় অসন্তুষ্ট এই বিদ্যালয়ের সীমা হইতে মুক্ত হইয়া শিল্পকার্য সম্পাদনে তাঁহাদের স্বকীয় উদ্ভাবনী বৃত্তির বিশেষ পথ অনুসরণ করেন। ইতিপূর্বে ১৯০৪ সালে প্রাচীনতম পাশ্চাত্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান Pacific Art Society প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৯৩০ সালে শিল্পজগতের কতিপয় চরমপন্থী কর্তৃক Independent Art Association স্থাপিত হয়। এই চরমপন্থীরা প্রাচীন স্কুলের রীতি-নীতি হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিয়া এই সমিতি গড়িয়া তোলেন।

এই সকল দল ছাড়াও বহু চিত্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে। সেগুলির মধ্যে Japanese Painting Society, The Creative Print Association of Japan এবং National Art Association প্রধান।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাষ্ট্রের বিভিন্ন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাপানী চিত্রশিল্পের মূলত পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। একদা ভারতীয় শিল্প জাপানের আদর্শ ছিল; অধুনাতন ভারত-জাপান বাণিজ্যিক সংযোগের বলে আবার আশা করা যায়, ভারতীয় শিল্পপদ্ধতি অচিরেই জাপানের নতুন শিল্পকর্মকে নতুনভাবে প্রভাবিত করিবে। জাপানী খেলনা-শিল্প বিশ্ববিখ্যাত। তাহার প্রভাব আজ প্রায় সর্ব দেশেই সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় শিল্প উৎপাদনের কাজে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই প্রভাবশীলতার দ্বারাই আজ জাপানী শিল্পের বিশ্বব্যাপী সার্থকতা।

সহস্র হস্ত-সম্প্রসারিত ভঙ্গীতে
'ইয়াহাটোমিন্‌গিও' শিল্প।

রামায়ণের নূতন ভাষ্য

প্র. না. বি.

অভিরামবাবু একজন মনীষী ব্যক্তি। তাঁহার মনীষা যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি শক্ত, অনেকটা মহিষের শিঙের মতো। উক্ত বস্তুর আঘাতে তিনি যে-কোন সমস্যাকে ধরাশায়ী করিতে সক্ষম। এমন অনেক ভূপতিত সমস্যার প্রাণহীন দেহে তাঁহার গতিবিধির পথ আকীর্ণ। তাঁহার কৃপাতেই প্রথম বুঝিলাম যে ডেপুটি বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় যথোচিত প্রোমোশন না পাইবার ফলেই ইংরাজ সরকারের ভারপরতা সম্বন্ধে সন্দিহান হন, আর এ যেন সরকারের উচ্ছেদ কামনা করিয়া আনন্দমঠ উপন্যাস রচনা করেন।

আবার তাঁহার কৃপাতেই প্রথম বুঝিলাম যে মাইকেল নিরন্তর ঋণভারে পীড়িত ছিলেন বলিয়াই ব্রজাঙ্গনা কাব্য লিখিয়াছিলেন। দু'য়ে যোগাযোগ ভালো বুঝিলাম না, রাধাবিরহ ও অর্থবিরহ কোন্ সূত্রে যে যুক্ত তিনিও খুলিয়া বলিলেন না, আমিও শুধাইতে সাহস পাইলাম না। মনীষী ব্যক্তিদের একটি অপরিহার্য লক্ষণ ক্রোধ। অভিরামবাবুতেও সে লক্ষণ ছিল। তাই তিনি যা বলিতেন নীরবে পরিপাক করিতাম।

অতঃপর একদিন অভিরামবাবু নাসারন্ধ্রদ্বয় প্রচুর নস্যচূর্ণে পূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ সানুনাসিক স্বরে বলিলেন, হৃদয়বাবু আপনাদের রবি ঠাকুরের এই কবিতাটির মর্ম বুঝতে পারেন?

তারপরে আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া অধিকতর সানুনাসিক স্বরে আবৃত্তি আরম্ভ করিলেন—

"আমার কাছে রাজা আমার রইলো অজানা।
তাই সে যখন ভলব করে পাঠায় খাজানা
মনে করি পালিয়ে গিয়ে দেবো তারে ফাঁকি,
রাখবো দেনা বাকি—
তাই জেনেছি ঋণের দায়ে
ডাইনে বাঁয়ে
বিকিয়ে যাবো নাইকো আমার ঠিকানা।"

আবৃত্তি শেষ করিয়া শুধাইলেন, বলুন এঁর অর্থ কি?

অবশ্য একটা অর্থ জানিতাম, কিন্তু সে অর্থ যে অভিরামবাবুর পরিকল্পিত অর্থ নয় তাহাও জানিতাম, তাই বলিলাম—আপনিই বলুন।

রবীন্দ্রনাথ জমিদার বলেই আপনাদের ভগবানকে জমিদাররূপে কল্পনা করেছেন, বুঝলেন না?

অবশ্যই বুঝিলাম, নতুবা তর্ক উঠিয়া অফিসের বেলা অতিক্রান্ত হইবে। সেদিন আমার ভাগ্য ভালো ছিল, তাই অভিরামবাবু জমিদার রবীন্দ্রনাথ ও জমিদার শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে অধিক বাগ্‌বিস্তার না করিয়াই প্রস্থান করিলেন।

কয়েকদিন পরে অভিরামবাবু এক তাড়া কাগজ হাতে মদীয় নিবাসে উপস্থিত হইয়া বিনা ভূমিকায় বলিলেন—একটি প্রবন্ধ লিখেছি।

আমি মনে মনে শঙ্কা মানিয়া বলিলাম, অফিসের বেলা হ'ল যে।

তিনি সে কথায় কর্ণপাত মাত্র না করিয়া বলিলেন, রামায়ণের একটি নূতন ভাষ্য রচনা করেছি।

আমি মুখে কৃত্রিম উল্লাস সঞ্চার করিয়া বলিলাম, বেশ তো সন্ধ্যাবেলা শোনা যাবে।

নিন শুনুন। অবশ্য এখন সারমর্ম বলবো, সন্ধ্যাবেলায় প্রবন্ধটি প'ড়ে শোনাবো।

পড়িয়া রহিল অফিস ও অফিসের বেলা।

নিশ্চয়ই স্বীকার করেন যে মানুষের ইতিহাস Thesis, Antithesis ও Synthesis-এর তিন চাকায় ভর ক'রে চলে।

স্বীকার করিলে আলোচনা সংক্ষিপ্ত হইবে আশায় বলিয়া উঠিলাম, নিশ্চয়, নিশ্চয়।

রামচন্দ্র হচ্ছেন কৃষি সভ্যতার প্রতিনিধি, সে হচ্ছে থিসিস্। আর রাবণ হচ্ছে বাণিজ্য সভ্যতার প্রতিনিধি, সে হচ্ছে এন্টিথিসিস্। এবারে বলুন তো সিন্‌থিসিস কি? বলিয়া সগর্বে আমার দিকে চাহিলেন।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া তিনি সদম্ভে বলিয়া উঠিলেন,

"অতঃপর ঘূর্ণী হয়ে পবন নন্দন
বাহির করিল লেজ সহস্র যোজন।"

হনুমান হচ্ছে রাম রাবণের সিনথিসিস, বুঝলেন না? হনুমান।

এরপ্রকার সিনথিসিসের জন্য আমি আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না, তাই স্বভাবতই বিস্ময়ে নীরব রহিলাম।

তখন তিনি পুনরায় শুরু করিলেন, রাম কৃষি সভ্যতা থিসিস্, রাবণ বাণিজ্য সভ্যতা এন্টিথিসিস্, হনুমান এদুয়ের মিলন—সিনথিসিস্।

কিন্তু এ দুয়ের মিলন বলতে কোন্ সভ্যতা বোঝায়?

এ আর বুঝলেন না? টেকনোক্র্যাসি, হনুমান হচ্ছে টেকনোক্র্যাট, মহাকারিগর, কাজেই সে এ দুয়ের সমন্বয় বা সিনথিসিস।

বলেন কি মশায়, রামায়ণ তো ভক্তিরসের কাব্য।

ও সব আপনাদের কাছে। আপনারা সাহিত্য বিচার করেন, প্রেম, ভক্তি প্রভৃতির দূরবীক্ষণ দিয়ে, আর আমরা মানে প্রফেসিয়রগণ বিচার করি অর্থনীতির অণুবীক্ষণ বাগিয়ে। মশায় জগৎটা অর্থনীতির তেজিমন্দিতে তালে তালে পা ফেলে চলছে। সেই চলার পথের ছন্দকেই বলে থিসিস্, এন্টিথিসিস্ ও সিনথিসিস্, বুঝলেন।

কিন্তু তখন আর হাঁ, না বলিবার তত আবশ্যক ছিল না, কারণ অফিসের বেলা বহুক্ষণ অতিক্রান্ত। অতঃপর তিনি প্রকাণ্ড এক টিপ নস্য গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। আর আমার মনের মধ্যে রামায়ণের নূতন ভাষ্য 'বাহির করিল লেজ সহস্র যোজন।'

ক'দিন আর অভিরামবাবুর দেখা নাই, ভাবিলাম একদিন সন্ধান লইব। এমন সময়ে উত্তরের পরিচিত এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

হাঁ মশায়, অভিরামবাবুর খবর কি?

জানেন না বুঝি?—ভদ্রলোক বড়ই বিপন্ন।

কি রকম?

ওঁর স্ত্রী ঘর ছেড়ে বৈদিক ধারণ ক'রে—মঠে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন।

হঠাৎ?

হঠাৎ নয়। অভিরামবাবু যেমন প্রচণ্ড নাস্তিক, ওঁর স্ত্রীর তেমনি ধর্মের প্রবল টান। শেষে আর স্বামীকে সহ্য করতে না পেরে ভদ্র মহিলা মঠে গিয়ে উঠেছেন।

শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, আর তখনই মনে পড়িল, থিসিস্ ও এন্টিথিসিস্। কিন্তু সিনথিসিস্‌ও যে হাতের কাছে প্রস্তুত ছিল তাহা কি জানিতাম!

আরও বিপদ কি জানেন! ওঁর একমাত্র সন্তান পুত্রটিও নিরুদ্দেশ।

কোথায় গেল?

কেউ জানে না। কিম্বা যে জানতো সেও নিরুদ্দেশ।

কে?

পাড়ার একটি মেয়ে।

দু'জনে একসঙ্গে গেছে?

যোগাযোগ দেখে তাই মনে হয়।

শুধু হাতে ছেলেটি নিরুদ্দিষ্ট হ'ল?

একেবারে শুধু হাতে নয়। বাপের টাকাকড়ি ও মায়ের অলঙ্কার কিছুই রেখে যায় নি। আচ্ছা, এখন আসি। আর এক সময়ে এসে বিস্তারিত খবর দিয়ে যাবো।

বুঝিলাম যে অভিরামবাবুর ভাষ্য কেবল রামায়ণ সম্বন্ধেই সত্য নয়, তাঁর নিজ পরিবার সম্বন্ধেও সমান প্রযোজ্য। কেননা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে পিতা অভিরামবাবু নাস্তিক্যের প্রতিনিধি তিনি থিসিস্, মাতা ধর্মের প্রতিনিধি তিনি এন্টিথিসিস্—আর পুত্র প্রেমের প্রতিনিধি সে সিনথিসিস্। আর এ সবের মূলে অর্থনীতির ধাক্কাটাও সক্রিয়—পুত্র যাইবার সময় টাকাকড়ি ও অলঙ্কার লইতে ভোলে নাই। বুঝিলাম যে, অভিরামবাবুর মনীষা ও ভাষ্য সভাই আসল বস্তুকে বহুদূর ছাড়াইয়া গিয়াছে—তাহা ঐ হনুর লেজের মতোই বিপুল রহস্যময়। মাথার মধ্যে ক্রমাগত পাক হইয়া ঘুরিতে লাগিল—

"অতঃপর ঘূর্ণী হয়ে পবন নন্দন
বাহির করিল লেজ সহস্র যোজন।"

• • •

পূরবী

[গল্প]

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

জানি না কোনদিন এ চিঠি আপনি পড়বেন কিনা, কারণ প্রথমতঃ আমি আপনার সঠিক নাম জানি না। আমার দু একজন লেখক বন্ধু আপনাকে যে নামে অভিহিত করে থাকেন, সে নামে আপনাকে পত্র দিলে আপনার পক্ষে মানহানির মামলা আনাই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়তঃ···ক্ষমপ্রতি এই যে একমাত্র পুস্তকের পাণ্ডুলিপি ছাড়া আর কিছু আপনি পাঠ করেন না, এমন কি স্বল্পখ্যাত কোন লেখকের রয়ালটির জন্য তাগাদা দেওয়ার চিঠিও নয়।

তবু বাধ্য হয়ে আপনাকে চিঠি দিতে হ'ল, কারণ এ ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই। আমি নিজে গিয়ে আপনার কাছে সব কিছু বলতে পারলে খুবই ভালো হতো, কিন্তু ভগবান সে শক্তিও অবশিষ্ট রাখেন নি।

ব্যাপারটা আপনাকে খুলেই বলি।

মাস সাতেক আগে আপনি কৃতান্তনাথ সান্যালের একটি উপন্যাস প্রকাশ করেছিলেন, নাম 'সুদূর দিগন্তে।' বইটি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে, এর প্রমাণ—ইতি-মধ্যেই আপনারা দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। আশা করা যায় সংস্করণান্তর করার গোপন রহস্য আপনার অবিদিত নয়। কিন্তু আপনি প্রথম শ্রেণীর প্রকাশক। এ ধরণের কিছু করবেন এমন কথা ভাবতেও পারি না।

বইটি আপনি পড়েছেন কিনা জানি না। সব বই আপনার পক্ষে পড়াও সম্ভব নয়। উপরন্তু কৃতান্তনাথ স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক। ইদানিং যে মুষ্টিমেয় সাহিত্যিকদের ওপর বাংলা দেশের পাঠক-সম্প্রদায় আশা ভরসা রাখেন, কৃতান্তনাথ তাঁদের অন্যতম। আমার মনে হয় এ বই পড়লে আপনি কিছুতেই ছাপতে পারতেন না। বইটি আগাগোড়া একটি পরিবারের কুৎসার কাহিনী। কুৎসার উপর রং ফলিয়ে তাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে, যে কোন ভদ্র পাঠক পাতা ওল্টাতেও লজ্জাবোধ করবেন। কিন্তু এ বইয়ের এখন বিক্রী দেখে আমার পক্ষে মর্মাহত হওয়াই স্বাভাবিক। তবে কি এদেশে ভদ্র পাঠকের সংখ্যা বিরল!

কৃতান্তনাথ যেমন ছদ্মনাম নয়, তেমনি বইয়ের পাত্র পাত্রী কাউকে লেখক ছদ্মনামের মুখোস পরান নি। সবই স্পষ্ট, উলঙ্গ, অস্পষ্টতার বালাই নেই। আক্ষেপ আমার সেইখানেই। আর এ বইয়ের কাটতি হ'য়েছে এই কারণেই। নাম ধাম মিলিয়ে এমন মুখরোচক কাহিনী চাটনীর কাজ করে, অবশ্য ভরপেট খাওয়ার পর। সম্ভবতঃ এ সময়ে আমি কলকাতায় থাকলে অনেক পাঠক পাঠিকা আলাপ করার নামে আমাকে দেখে যেতেন, যে উৎসাহ নিয়ে আমরা চিড়িয়াখানায় নতুন কেনা শিম্পাঞ্জী দেখতে যাই, কিংবা দুটো মাথাওলা সদ্যোজাত শিশু।

আমাকে দেখতেই বেশী লোক আসতো। কারণ সমস্ত বইটাতে আমিই একমাত্র চরিত্র যার ওপর লেখক বিদ্বেষ আর ঘৃণার সমস্ত কালি উপুড় করে দিয়েছেন। আপনার বইটা পড়া থাকলে বুঝতে পারতেন আমিই অজিত প্রকাশ, নায়িকা হিমানীর স্বামী, কিন্তু নায়ক নই। সারা বইটাতে আমাকে দেখানো হ'য়েছে দুর্বৃত্ত হিসাবে, কারণে অকারণে স্ত্রীর ওপর নির্যাতন করি, স্ত্রীর রোজগারে সংসার চালাই। গ্রন্থকার উত্তমপুরুষে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। এর স্বামীর হাত থেকে

স্ত্রীকে উদ্ধার করতে এসে দাঁড়িয়েছেন দুজনের মাঝখানে। সংসার-মন্থনে অঞ্জলি ভরে বিষ কণ্ঠস্থ করে, অন্য সকলকে বিলিয়েছেন অমৃত।

কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। আপনি ভাবতে পারেন আমি আত্মদোষ-ক্ষালনের চেষ্টা করছি, নিজেকে বাঁচাবার ধর্ম, কিন্তু সে চেষ্টা করে আমার কোন লাভ নেই, কারণ সোজাসুজি ডাক্তারেরা কিছু বলে নি, তবে কানাঘুষোয় আমি শুনেছি, আমার পরমায়ুর পরিধি আর মাস খানেক। ছোকরা একটি ডাক্তার আমায় আশ্বাস দিচ্ছেন দিনের পর দিন, আমি সেরে উঠবো। ওষুধপত্রে খুব উপকার হয়েছে। কিন্তু এসব আশ্বাসে আমার আস্থা নেই। রোজ সকালে তাজা রক্তের দিকে চেয়ে আমি বুঝতে পারি, আমার জীবনী-শক্তি ক্ষয়ে আসছে, ঘিয়ের শিখা প্রদীপের মত নিভে যাবার আর দেরী নেই।

লেখকের সঙ্গে আলাপ আমার কলেজ জীবন থেকে। তখন থেকেই তিনি ছোট খাটো কয়েকটি পত্রিকায় লিখে কিছু নাম করেছেন। ছাপার অক্ষরে পত্রিকায় যাঁদের নাম বেরোয়, তাঁদের সম্বন্ধে আমাদের ধারণা কত উঁচু তা লিখে জানাবার চেষ্টা করবো না। তাঁরা আমাদের কাছে প্রায় স্বর্গচ্যুত দেবতার সামিল। তাঁদের পাশে বসতে পারলে, কথা বলতে পারলে আমরা ধন্য হয়ে যাই। বিয়ের সময় তাঁকে নিমন্ত্রণ করা সম্ভব হয় নি, কারণ কৃতান্ত তখন চাকরী করছেন জবলপুরে। পরে কৃতান্তর সঙ্গে একদিন দেখা হ'য়ে গেলো অনেকদিন পরে, শুনলাম চাকরী ছেড়ে দিয়ে তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে পুরো-পুরিভাবে নামবেন। উচ্ছ্বসিত হ'য়ে অনেক কথা সেদিন বলেছিলাম। যে কলমে বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধন হবে, সে কলমে দিনের পর দিন 'মিলিটারী একাউন্টসের' হিসাব রাখার কোন সার্থকতা নেই। প্রতিভার অপমান। এত কথার সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে আসার আমন্ত্রণও তাঁকে জানিয়েছিলাম। আমার স্ত্রীও তাঁকে দেখতে খুব উৎসুক এমন কথাও বলেছিলাম।

মিথ্যা কথা অবশ্য বলেছিলাম। কারণ আমার স্ত্রীর সাহিত্য সম্বন্ধে উৎসাহ আমার নিজের খেলাধূলা সম্বন্ধে উৎসাহের মতনই। কিছুদিন আগেও আমার ধারণা ছিলো ধ্যানচাঁদ মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী আর গোষ্ঠ পাল বটতলা পাল এণ্ড কোম্পানীর সিনিয়র পার্টনার। ম্যাট্রিকটা পাশ করার জন্য দু' একটা সাহিত্যিকের ছিটে ফোঁটা যা কিছু গরল গলাধঃকরণ করতে হয়, আমার স্ত্রী তার বেশী করে নি। মাঝে মাঝে লাইব্রেরী থেকে ভালো ভালো বই দু' একটা এনে দিয়েছি, বইগুলো সম্বন্ধে মতামতও জিজ্ঞাসা করেছি তাকে, কিন্তু আশাপ্রদ কোন উত্তর পাই নি। একদিন মনের কথা স্পষ্টই আমাকে বলেছে।

এই সব ছাই পাশ না এনে, পাকপ্রণালী একটা লাইব্রেরীতে পাও কিনা দেখো তো? কতকগুলো নতুন রান্না করে তোমায় খাওয়াবো।

পাকপ্রণালী আনা সম্ভব হয় নি, নতুন বই আনাও বন্ধ করে দিয়েছিলাম। নিজের পড়ার ইচ্ছা হ'লে লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়তাম কিংবা অফিসে বসে।

আশ্চর্য কাণ্ড, আমন্ত্রণ জানাবার দিন সাতেকের মধ্যে কৃতান্ত আমার বাসায় গিয়ে হাজির। হাতে তাঁর সদ্য প্রকাশিত একখানা উপন্যাস। সমাদর করে ঘরে বসালাম। এক ফাঁকে ভিতরে গিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে এলাম বাইরে। আলাপ করিয়ে দিলাম। কৃতান্তের কোন জড়তা নেই। দশ মিনিটের মধ্যে এমন কাণ্ড করলেন যেন দশ বছর ধরে তাঁর আসা যাওয়া আমার বাড়ীতে।

জানিনা ধৈর্য ধরে এতটা আপনি পড়েছেন কিনা। এত খুঁটিয়ে সব কথা বলতে গেলে পাতাও অনেকখানি হ'য়ে যাবে তাছাড়া আপনিও বিরক্ত হ'য়ে উঠবেন। এর-পর আমি সংক্ষেপে সারছি। ধরে নিন কৃতান্তনাথ একটি কুমির, আর আমি খাদ কেটে তাকে আমার সংসারের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে ফেলেছি।

কৃতান্তনাথ আসতে লাগলেন। প্রথম দিকে মাসে

একবার, তারপর ক্রমে ক্রমে সপ্তাহে একদিন, শেষ দিকে একদিন অন্তর। আগে পাঁচটার পরে, তারপর কোন বিশেষ সময়ে নয়, যে কোন সময়ে। তবে দুপুরের দিকেই বেশী।

একদিন গলির মোড়ে পাড়ার গুটি তিনেক ছোকরা আমাকে ঘিরে ধরলো।

একটা কথা!

কি আবার ব্যাপার! পুজোর তো ঢের দেরী, আবার চাঁদা দেবার কি মরশুম এলো? চাঁদা নয় অন্য ব্যাপার।

আপনার বাড়ীতে ওই যে ফর্সা মতন লম্বা লোকটি আসেন, উনিই কি কৃতান্তনাথ সান্যাল?

সগৌরবে ঘাড় নাড়লাম। হ্যাঁ উনিই। বিশেষ বন্ধু আমার। প্রায় আসেন। ছেলেরা উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলো।

—তার আমাদের ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন। আমাদের ক্লাবের উৎসবে ওঁকে সভাপতি করবো। দেখে চক্ষু সার্থক করবো।

তখন কৃতান্তনাথের বেশ নাম হয়েছে। গোটা চারেক বই খুব চালু। ছাত্র ছাত্রীদের মুখে মুখে নাম। একখানা বইয়ের মহরতও হ'য়ে গেছে।

এমন একটা লোককে বাড়ীতে আনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি, ভাবতেও নিজেকে ভগীরথের সগোত্র বলে মনে হলো।

যোগাযোগ হ'লো। ক্লাবের উৎসবে আমরাও নিমন্ত্রিত হলাম। বসলাম সামনের সারিতে। হোমরা-চোমরাদের পাশাপাশি। কৃতান্তনাথ শুধু নামী লেখকই নন, সুন্দর বক্তাও, তার পরিচয় পেয়ে ঘরে ফিরলাম।

কিছুদিন পর অফিসে গিয়েই শুনলাম চেয়ারম্যান দেহ রেখেছেন, অফিস ছুটি। চেয়ারম্যানের সঙ্গে মুখোমুখী মোলাকাত হবার কোন সুযোগ ঘটে নি, কারণ সুদূর বিলাত থেকে ভদ্রলোক ভারতবর্ষের মাটিতে কোনদিন পদার্পণ করেন নি। তবু কষ্ট হ'লো, কারণ শুনেছিলাম এ কোম্পানীর পত্তন তিনি করেছিলেন। রক্ত দিয়ে লালন ক'রে তিলে তিলে গড়ে তুলেছিলেন।

কিছুক্ষণ অফিসে ঘোরাফেরা করে বাড়ীতে ফিরে এলাম। দরজার সামনে দাঁড়িয়েই অবাক। প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলছে।

মুস্কিলে বড় না পড়লাম, বিস্মিত হলাম তার চেয়েও বেশী। পথে পথে অবশ্য ঘুরতে হবে আমাকে, কারণ বাড়তি চাবির বালাই নেই, কিন্তু তালা দিয়ে কোথায় যেতে পারে হিমানী? আমাকে না জানিয়ে, এমন সময়ে!

নিরুপায়। জানাশোনা এক মেসে গিয়ে দুপুরটা কাটিয়ে দিলাম, ফিরলাম ছটা নাগাদ। হিমানী ফিরেছে।

চা জলখাবার নিয়ে দাঁড়াতেই কথাটা বললাম।

স্পষ্ট দেখলাম হাতটা কেঁপে শাড়ীতে চা ছিটকে পড়লো। দু গালে রক্তের ছিটে, দুপুরে এসেছিলে নাকি? হিমানী জড়ানো গলায় জিজ্ঞাসা করলো।

ঘাড় নাড়লাম। অফিস যেতেই ছুটি হয়ে গেছে সে কথাটাও জানালাম।

—দুপুরে সুটিং দেখতে গিয়েছিলাম। জলখাবারের প্লেট নামাতে নামাতে হিমানী বললো।

—সুটিং?

—মানে কৃতান্তদার সঙ্গে। ওঁরই বই।

কৃতান্তদা! আমার সঙ্গে কৃতান্তনাথের আলাপ বহু দিনের কিন্তু আমি এখনো কোন আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ করতে পারি নি তাঁকে, সম্বোধনও করি কৃতান্তবাবু বলে। কিন্তু কৃতান্তদা!

মনে মনে তারিফ করতে শুরু করলাম। ইদানীং বাইরের ঘরে আমি বসে থাকলেও, কৃতান্তনাথ পাশ কাটিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে বসেছেন। বেতের মোড়া নিয়ে চৌকাঠে চেপে। খবরের কাগজ পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কথাবার্তা কানে এসেছে। শিল্প আর সাহিত্য সম্বন্ধে রংদার কথা। রচনা শুধু নিছক কল্পনাই নয়, তার সঙ্গে লেখকের নিজের

রক্ত মেশানো বই। অভিজ্ঞতার রক্ত। অর্ধেক হয়তো কল্পনা, কিন্তু বাকি অর্ধেক জীবনের স্বরূপ। উত্তরে হিমানী ফিসফিসিয়ে কি বলেছে, কানে আসে নি। কৌতূহল খুবই ছিলো, কিন্তু খবরের কাগজের নেশা ছিলো আরো প্রবল। কাগজ ফেলে কথা শুনতে ভিতরে যেতে ইচ্ছা করে নি। আর সেটা শোভনও হ'তো না।

অনেকক্ষণ প'রে হিমানী ষ্টুডিংয়ের জাঁকজমকের কথা বললো। কৃতান্তনাথ সেটের মধ্যমণি। কারণে অকারণে ডিরেক্টর, ক্যামেরাম্যান থেকে নায়ক-নায়িকারা পরামর্শ করে। সকলেই তারিফ করে তাঁর সংলাপের।

কিছুক্ষণ চলে যাওয়ার পরে হিমানীর খেয়াল হ'লো আমি খবরের কাগজের পাতায় ডুবে গেছি। একটি কথাও আমার কানে যায় নি। এটা কিন্তু সত্য নয়। খবরের কাগজটা কেবল একটা আড়াল। প্রত্যেকটি কথা শুধু কানেই নয়, মরমেও পৌঁছেচে।

'সুদূর দিগন্তে' বইটা যদি আপনি ভালো ক'রে পড়ে থাকেন, তা হ'লে বুঝতে পারবেন এই পর্যন্ত কৃতান্তবাবু ঠিক সত্যি কথাই লিখেছেন। এরপর অজিতপ্রকাশের তরফ থেকে সন্দেহের অবতারণা করা হয়েছে। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কৃতান্তবাবুর নাম জড়িয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত। হিমানীর শিশুমনকে আমি নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে নাস্তি নষ্ট করে দিয়েছি।

কিন্তু বিশ্বাস করুন। এ সমস্ত কৃতান্তবাবুর কল্পনা, রং ফলাবার প্রয়াস। আমি স্ত্রীকে বাধা দিই নি, কঠিন কথা একটুও বলি নি একদিনের জন্য। কৃতান্তবাবু ঠিক আসতে লাগলেন। নিয়মিত। তাঁর বইয়ের চিত্ররূপ দেখিয়ে আনলেন আমাদের। দর্শকমণ্ডলের সপ্রশংস উচ্ছ্বাসের উত্তরে বিনয়নম্র ভাব কোটালেন মুখে। হিমানী ছবিখানা দেখলো, কৃতান্তকে দেখলো তার চেয়ে বেশী। কৃতান্ত নাথের হাতে তুলে দেওয়া ফুলের মালা নিজের হাতে তুলে নিলো। কৃতান্তের কৃতিত্বের অনেকটা তার পাওনা এমন ভঙ্গীও করলো।

কৃতান্তনাথের সব প্রকাশিত বই বাড়ীতে আসতে লাগলো। হিমানীর পাশাপাশি আমার নামও লেখা থাকতো কৃতান্তনাথের হস্তাক্ষরে, কিন্তু সেটুকু শুধু সৌজন্য। কেবল বইয়ের পাতাতেই রইলাম পাশাপাশি, নয়তো সারাক্ষণ হিমানীর পাশে রইলো কৃতান্তনাথ।

ব্যাপার একদিন চরমে উঠলো। এ ঘটনার উল্লেখও বইটাতে আছে, কিন্তু অন্যভাবে।

শরীর একটু খারাপ বোধ হওয়ায় অফিস কামাই করে বাড়ীতেই রয়েছি। দুপুরে দরজা ঠেলে কৃতান্তনাথ ঘরে ঢুকলেন। হাতে ভেলভেটের বাক্স। আমাকে দেখে সামান্য একটু অপ্রস্তুত, কিন্তু মুখের রেখায় একটা নির্বিকার ভাব, চাউনীতেও সঙ্কোচের ছায়া নেই।

—কি হে, শুয়ে আছো? কথার উত্তর দেবার আগেই কৃতান্ত পাশে এসে বসলেন, ভেলভেটের বাক্স খুলে সামনে মেলে ধরলেন।

দামী হার। ঝকঝকে নতুন। প্রয়োজনের চেয়েও যেন বেশী পালিশ করা।

—এটা নিয়ে এলাম হিমানীর জন্য। কৃতান্তনাথের কথায় হাসির মিশেল।

বইটাতে আছে লক্ষ্য ক'রে থাকবেন, আমি চটে চীৎকার করে উঠলাম। হুঙ্কার ক'রে চৌকাঠের বাইরে যেতে বললাম কৃতান্তনাথকে। পাড়ার কয়েকজনের সামনে অপমানিত করলাম, গালিগালাজ করলাম ইতর ভাষায়। সবই করলাম কিন্তু সুবিধামত হারটা ফেরত দিলাম না। সে হার অবশ্য আমি স্ত্রীর গলাতেও পরাই নি, পরালাম জয়ন্তীর গলায়, যে জয়ন্তী রূপমহলে সখীর দলে নাচে, যে জয়ন্তীর পিছনে আমার মাইনের বেশী অংশটুকু আমি অঞ্জলি দিই।

রূপমহলে কোন জয়ন্তী নাচে কিনা আমার জানা নেই, কিন্তু তেমন কোন জয়ন্তীকে আমি চিনি না, কাজেই তার সঙ্গে কোন অবৈধ সম্পর্কের কথা অবান্তর। এ জয়ন্তী হয়তো কৃতান্তনাথের সৃষ্টি। অজিতপ্রকাশের নামের ওপর ধুলোবার আর এক পোঁচ কালি।

আমি ঠিক কি ক'রেছিলাম শুনুন। খুব শান্ত গলায় কেবল আমি বলেছিলাম, হিমানীর জন্য হার?

—কেন ভাই বোনকে দিতে পারে না কিছু? আমার নিজের সোন নেই, আমি যদি এনেই থাকি।

এর মাঝখানে হিমানী এসে পড়লো। পাশের ঘরে কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিলো, কৃতান্তের গলার আওয়াজে এ ঘরে এসে দাঁড়ালো। আমি কিন্তু লক্ষ্য করলাম এইটুকুর মধ্যেই সে হালকা প্রসাধন সেরে এসেছে। চুলটা আঁচড়েছে, মুখে সাবান পাউডারের প্রলেপ, আর মহলা শাড়ীটাও বদলেছে।

এসেই হারের দিকে নজর। হাত দিয়ে-তুলে নিয়ে হার ছড়া নিজের গলায় পরলো। পিছু হেঁটে দেয়াল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখে বললো, বাঃ, প্যাটার্নটা তো বেশ! কার জন্ত এনেছেন কৃতান্তদা?

অভিনয় আমি ভালো বুঝি না, নারীচরিত্র সম্বন্ধে খুব ওয়াকিবহাল নই, কিন্তু সে মুহূর্তে মনে হ'লো হিমানী নিপুণ অভিনেত্রী। রঙমঞ্চে কিংবা সেলুলয়েডে কেমন করবে আমি না, কিন্তু সংসারজনকে স্বামী আর অনাত্মীয় এক পুরুষের সামনে মুখচোখের যা ভাবভঙ্গী দেখালো, তা তুলনাহীন।

আমি সেদিন অসুস্থ হ'য়ে বাড়ীতে না থাকলে, এমন একটা অভিনয়ের সুযোগ হিমানী পেতো না, সেকথাও মনে পড়লো। হারের এ প্যাটার্ন কৃতান্তনাথের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিমানীর পছন্দ করা কিনা, তাও ভাবলাম।

এর দিন কয়েক পরেই কৃতান্তনাথ একদিন এলো আর একটা কাগজের মোড়ক হাতে করে। আমি বাইরে বেরোচ্ছিলাম, আমাকে আবার টেনে আনলো ভিতরে।

—এই নাও।

—কি?

—আরে খুলেই দেখোনা।

খুললাম। দামী ওকের পাইপ। সঙ্গে টোব্যাকো পাউচ।

—কিন্তু এ মেশা তো আমার নেই কৃতান্তবাবু।

—ধরবে বলেই তো আনলাম। তোমার ভাবী মুখে পাইপ মানাবে ভালো।

কথা না বাড়িয়ে উপহার তুলে নিলাম। আজো তোলাই আছে। নাকের বদলে নরুণে আমার লোভ কম।

এরপরের ইতিহাস আরো দ্রুত। সিনেমায়, শুটিংয়ে হোটেলে যেখানেই কৃতান্তনাথের যাওয়ার প্রয়োজন সেখানেই পার্শ্বচারিণী হিমানী। এমন কি দু' একটা হাল্কা সিনেমার কাগজে ওদের দুজনের পাশাপাশি ছবিও বেরিয়ে গেলো। কানাঘুষো শুনলাম কৃতান্তনাথের দু' একটা বইতে নাকি হিমানীরও ছোট খাটো পার্ট থাকবে।

একদিন কথায় কথায় হিমানীকে জিজ্ঞাসাও করে ফেললাম। স্বরে পরিহাসের তরলতা মিশিয়ে।

হিমানী ভ্রূ কুঁচকে ফিরে দাঁড়ালো। ওই যে কৃতান্তদার সঙ্গে ঘুরি ফিরি কিনা, তাই পাঁচজনের চোখ টাটাচ্ছে। ইনিয়ে বিনিয়ে কাহিনী রচনা করছে। অবশ্য কৃতান্তদাকে একবার বললেই, এখনি বন্দোবস্ত করে দেবেন। ডিরেক্টররা ওঁর কথায় ওঠে বসে।

আর কিছু বললাম না, অন্ধ মানুষের হয় তো চোখ টাটায়, কিন্তু যার বুক টাটায় তার দিকেও লক্ষ্য নেই হিমানীর।

এর মধ্যে ঝিন্দিরপুরের এক ক্লাব থেকে অবশ্য উৎসব হ'লো কৃতান্তনাথের। শুধু ফুলের তোড়াই নয়, টাকার তোড়াও দিলো। খবরটা আমি আগে কিছু শুনিনি। খাওয়া দাওয়ার পর বাতি নিভিয়ে বসেছিলাম বাইরের ঘরে, মোটরের আওয়াজে উঠে দাঁড়ালাম। হিমানী। ঝলমল পোষাকে প্রসাধনে যেন নতুন মানুষ। হাতে জড়ানো মালা আর ফুলের তোড়া। কৃতান্তনাথের গৌরব-দীপ্তির কিছুটা হিমানীর মুখেও।

এই সময় বন্ধু বান্ধব দু' একজন কানাকানি করতে লাগলো। বাড়ী বয়ে আমাকেও উপদেশ দিয়ে গেলো। হাটে, মাঠে, ঘাটে কৃতান্তনাথের পাশাপাশি হরদম যে হিমানীকে দেখা যাচ্ছে, ব্যাপার কি? এত উদার আমি

কোনদিনই ছিলাম না। এ উদারতার কড়া দাম দিতে হয়, তার জন্ত প্রস্তুত আছি আমি? অতীত থেকে কয়েকটা জলন্ত উদাহরণও বন্ধুরা দেখালো।

ঘুমোবার আগে এক রাত্রে মন ঠিক করে ফেললাম। হিমানী শাড়ী পাট করে রাখছিলো, তাকে কাছে ডাকলাম।

ইদানীং ডাকলে হিমানী কাছে আসে, আগে কিন্তু না ডাকলেও আসতো, খাটের বাজু ধরে দাঁড়ালো।

ভূমিকা বাদ দিয়ে সোজাসুজিই বললাম, একটু বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে। পাঁচজনে পাঁচকথা বলছে।

—পাঁচজনে মোটেই পাঁচকথা বলছে না, যা বলবার বলছো তুমিই। তোমার মতন এমন ইতর মন আর কার আছে?

উত্তেজিত হবার মতন উত্তর, কিন্তু নিজেকে সামলে নিলাম। অত নিজের বুকের। যত বাড়াবো ততই ঘা বাজবে।

আমি থামলেও হিমানী থামলো না। কৃতান্তনাথ মানুষ হিসাবে যে কত উঁচু তার কিরিস্তি চললো। এমন দেবতার নামে যে কলঙ্কের ইঙ্গিত করে সে যে কত নিচু স্তরের তার ঠিক ঠিকানা নেই।

এইখানে সম্ভব হ'লে বইটা খুলে দেখবেন। ছশো তার পাতা। সেখানে দেখবেন অজিতপ্রকাশ হিমানীর গলা টিপে ধরেছে। চীৎকার করে বলছে, তোকে একেবারে শেষ করে দেবো। এত বড় স্পর্ধা, কথার ওপর কথা। শুধু গলা ধরে ঝাঁকুনীই নয়, ঠেলে আমি হিমানীকে ফেলে দিলাম। ঘরের কোণে রাখা মদের ডিকাণ্টারের ওপর পড়ে তার কপাল কেটে গেল। এতক্ষণ ছিলো চোখের জল, এবার তাতে মিশলো দেহের রক্ত।

কপাল চেপে দাঁড়িয়ে উঠে হিমানী, আদালতী ভাষায় বক্তৃতা দিতে শুরু করলো। আগুন সাক্ষী করে বিয়ে করে আনলেই দায়িত্ব হয় না, শয্যাসঙ্গিনীকে সহধর্মিণীর মর্যাদা দিতে হয়। দুপায়ে দেহটাকেই নিষ্পেষণ করা চলে, মনকে নয়। যে আঘাত করেছে অজিতপ্রকাশ সে আঘাত শুধু হিমানীর অঙ্গেই নয়, সে আঘাত লেগেছে যুগযুগান্তরের নারীত্বের মর্যাদায়। এ অপমান হিমানী সইবে না, কিছুতে নয়।

বাইরে দুর্যোগময়ী রাত্রি। আবক্ষলম্বা আবরণে নিজের দুঃখজর্জর দেহ ঢেকে হিমানী অন্ধকারে মিশিয়ে গেলো।

আমি জানি, এইখানটা অনেকের কণ্ঠস্থ, বিশেষ ক'রে লভ-কলেজে ওঠা ছেলেমেয়েদের। হিমানীর বাছাই করা কথাগুলোই তারা মনে রাখেনি, ফাঁকে ফাঁকে অভিশাপও দিয়েছে লম্পট, মদ্যপ অজিতপ্রকাশকে। কিন্তু বিশ্বাস করুন হিমানীর ঘরছাড়ার কারণ এ নয়।

কৃতান্তনাথ মানুষ হিসাবে যে কত উঁচু তার পরিচয় পেলাম সপ্তাহ খানেকের মধ্যে।

কি একটা পর্ব উপলক্ষে অফিস ছুটি। হিমানী বসেই ছিলো। কোণের দিকে চেয়ারে বসে সোয়েটার বুনছিলো। কৃতান্তনাথের মেয়েটার। অত টাকা পাউণ্ডের উল কিনে সোয়েটার পরার মতন অবস্থা আমার নয়। কৃতান্তনাথকে যে কিনতেই হয়েছে এ নাও হতে পারে। কিছুদিন আগেও কৃতান্তনাথ দেখিয়ে গেছেন গোটা তিনেক ম্যাক্সলার, একটা দাস্তানা। সবই তাঁর ভক্ত পাত্রিকাদের উপহার, দাস্তানাটা শুধু তাঁর শেষ বইয়ের নায়িকা অতসী দেবীর দেওয়া।

কৃতান্তনাথ ঘরে এসে ঢুকলেন। তখনো মোটর কেনেন নি, যাতায়াত ট্যাক্সিতে।

শ্রীরামপুরে কি একটা সভা আছে সেখানে যাবার আগে যাত্রাভঙ্গ করলেন কয়েক মিনিটের জন্ত।

বসলেন না, সময় নেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললেন, দেখেছো হিমানীর কি চেহারা হয়েছে?

অনেকবার দেখেছি। আর একবার দেখলাম। মনের পরিবর্তন ধরতে পারার কথা নয়,—অন্ততঃ সে অভিজ্ঞ চোখ আমার নেই, কিন্তু দেহের কোন পরিবর্তন হ'লে নজরে পড়তো।

—কেন, কি হ'য়েছে হিমানীর?

—হয় নি সি তাই বলো। শরীরে রক্ত নেই, হজম হচ্ছে না। খাওয়ার পরে পেটে একটা ব্যথার মতনও হচ্ছে।

আশ্চর্য, এত ব্যাপার অথচ ঘুণাক্ষরে একটি কথা হিমানী আমাকে বলে নি। মুখ বুজে সব সহ্য করেছে, স্বামীদেবতাকে বিচলিত করে নি।

হিমানীর দিকে মুখ ফেরালাম। এমন মুখের ভাব করলো যেন এখনও রয়েছে যন্ত্রণা।

—তোমার শরীর খারাপ তাতো বলো নি?

—বললেই সব হ'তো। হিমানী ঠোঁট ওল্টালো, তুমি ওষুধে পত্তরে আমাকে একেবারে ঢেকে ফেলতে।

শুধু কথাই তুললো না হিমানী, দাঁতের সবটুকু বিষও ঢেলে দিলো।

কথা বলতে গিয়েই বাধা পেলাম। চেয়ারের ওপর একটা পা তুলে কৃতান্ত আরম্ভ করলেন, একটা স্যুটিংয়ের ব্যাপারে শিমুলতলা যাবো। দিন পনেরোর জন্ত। যদি আপত্তি না থাকে হিমানীও চলুক না আমাদের সঙ্গে। যদি কিছুটা উপকার হয়।

হিমানীর দিকে পলকের জন্ত চোখ ফেরাতেই মনে হ'লো, যন্ত্রণার লেশমাত্র নেই, বরং চাপা হাসির ঝিলিক দুটি চোখে।

হিমানী না থাকলে আমার অসুবিধা একটু হবে। চাকরের ওপর সংসার ছেড়ে দিতে হবে, যাতে আমি মোটেই অভ্যস্ত নই। স্বভাবতঃই আমি পরনির্ভর। কিন্তু স্ত্রীর শরীর সারবার পথে বাধা হ'য়ে দাঁড়াতে মন সরলো না। বলা যায় না, হয়তো সত্যিই হিমানীর শরীর খারাপ। বাইরে থেকে কতটুকু বোঝা যায় মানুষের। তা ছাড়া, কৃতান্তনাথ একা নন। প্রায় সমস্ত ইউনিট চলেছে সঙ্গে। মাত্র পনেরো দিনের ব্যাপার।

সবই বুঝলাম, কিন্তু একটা কাঁটা বিঁধে রইলো বুকের মাঝখানে। নড়তে চড়তে খচ ক'রে উঠতে লাগলো। এর চেয়ে রক্তক্ষরণ হওয়াও বোধ হয় ভালো ছিলো।

আমার মৌনভাব ওরা সম্মতির লক্ষণ ব'লেই ধ'রে নিলো। হিমানী ঘর ছাড়লো।

দিন পনেরো থাকার কথা, কিন্তু দিন বিশেক পরে খোঁজ নেবার চেষ্টা করলাম। প্রথমে ওদের দিয়ে যাওয়া ঠিকানায় চিঠি, সে চিঠি দিন চারেক পরে ফেরৎ এলো। সর্বাঙ্গে শীলমোহরের ছাপ নিয়ে। ছাপ নয়, ওগুলো যেন কালশিরা। আমার মনই ফিরে এলো সারা গায়ে অপমানের কালি মেখে।

ইউনিয়নের দিন চারেক হাঁটাহাঁটি ক'রে খবর মিললো। শিমুলতলায় নয়, কৃতান্তনাথ গেছেন বম্বে, ওদেশের চিত্র প্রযোজকদের আমন্ত্রণে। কতদিন থাকবেন বলা মুস্কিল। এমনও হ'তে পারে, আর হয়তো ফিরবেনই না। একটার পর একটা কাহিনী রূপায়িত হবে সেলুলয়েডে।

মাস তিনেক কাটলো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে লুকোচুরি ক'রে। কিছুটা নিজের মনের সঙ্গেও। মাঝে মাঝে ভাবলাম, ছুটি নিয়ে একবার বম্বে চলে যাই। দাঁড়াই হিমানীর মুখোমুখি। কিন্তু ইচ্ছা হ'লো না। আমাকে দেখলেই হয় তো বাড়বে পুরানো ব্যথাটা। নীরক্ত হ'বে চোখের পাতা, বিবর্ণ দুটি ঠোঁট।

কিছুদিন আগে এক সিনেমা জার্ণালে কৃতান্তনাথের ছবি দেখলাম। একটা বইয়ের মহরতে ডিরেক্টরের পাশে দাঁড়িয়ে। এপাশে ওপাশে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা রয়েছে কিন্তু সেরা অভিনেত্রীটি ধারে কাছে কোথাও নেই।

কিছুটা খবর পেলাম বম্বে-ফেরত এক বন্ধুর মুখে। জুহুতে দেখেছে দুজনকে। হাতে হাত। সমুদ্র-সৈকতে পাশা-পাশি। সমুদ্রের হাওয়া হিমানীর পক্ষে ভালো কিনা ডাক্তাররা বলতে পারবেন, কিন্তু ক'লকাতার জলহাওয়ায় আমার দমবন্ধ হ'য়ে এলো।

ঠিক দিন তিনেকের মধ্যেই ব্যাপারটা ঘটলো। অফিসে কাশির সঙ্গে কোঁটা দুয়েক। প্রথমে মনে হ'লো বোধ হয় গলা চিরে গিয়ে থাকবে। অবশ্য বুক তো চিরে গেছেই, এ রক্তক্ষরণে কিছুটা কমে হয় তো বুকের ব্যথা। কিন্তু পরের দিনও একই ব্যাপার। বাথরুমে পৌঁছোবার আগেই রুমালে পড়ে গেলো। বেশ কয়েক কোঁটা। ডেসপ্যাচার মনোহর বাবু আঁতকে উঠলেন। ছাপোষা বাঙালী, এমন টাটকা রক্ত কখনও দেখেন নি।

মুহূর্তে খবরটা অফিসে রটে গেলো। সমবেদনার পশলা।

সহানুভূতির স্রোত। আমার ধারণা ছিলো হিমানীর ব্যাপারটা বোধহয় কেউই জানে না, কিন্তু ভুল ধারণা। আমাকে সমবেদনা জানাবার ছল ক'রে সবাই পাড়লো হিমানীর কথা। স্বামীর এই সর্বনাশ, আর কি ক'রে সে ঘুরে স্বরে র'ইলো। এমন একটা রোগের কারণই যে হিমানী, এ বিষয়ে সবাই একমত। আঘাত থেকেই তো এ রোগের সৃষ্টি। এর চেয়ে বড়ো আঘাত স্বামীর পক্ষে আর কি হ'তে পারে!

সারা বইতে আপনি আমার রোগের এ খবর পাবেন না। রোগের একটা উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু সেটা লিভার সংক্রান্ত। অত্যধিক সুরা পানের ফল। অদমিত অত্যাচার-জনিত ব্যাধি। আপনার পক্ষে যাদবপুরে আসা

সম্ভব কিনা জানি না। শুনেছি আপনার দামী গাড়ী আছে। যদি কোনদিন এ দিকে আসার সুযোগ হয়, মিনিট পাঁচেকের জন্য ফটকের মধ্যে গাড়ী ঢুকিয়ে একটু খোঁজ নিয়ে যাবেন। ততদিন আমি হয় তো থাকবো না, কিন্তু জিজ্ঞাসা করবেন এনকোয়ারী অফিসে, কিংবা ডাক্তার মল্লিককে তের নম্বর বেডের রোগী অজিতপ্রকাশ সেনের পাঁজরা ফোঁপরা, কীটদষ্ট ছিলো, কিন্তু তার লিভার সম্পূর্ণ সতেজ। এ্যালকোহলের ছিটে ফোঁটা কোথাও নেই।

চিঠিটা দীর্ঘ হ'য়ে যাচ্ছে। কেবলই ভয় হ'চ্ছে আমার পরমায়ুর চেয়ে দীর্ঘ না হয়, তা হ'লে আফসোসের অন্ত থাকবে না। বন্ধু-বান্ধবদের চেষ্টায় এখানে বেড পেয়েছি, শুনলাম অফিসের ছোট সাহেবও তদ্বির করেছিলেন। এখানকার এক ডাক্তার তাঁর বিলাতের বন্ধু। একটানা ষোলো বছর কাজ করেছি ওই অফিসে: বুকের রক্ত দিয়ে, সে প্রমাণও হয়েছে।

আজ সকাল থেকে যন্ত্রণাটা বড় বেড়েছে। চিঠি লিখতে কষ্ট হ'চ্ছে। ডাক্তার নার্সরা প্রথম প্রথম ছুটে আসতো লিখতে দেখলে। ধমক দিতো। সরিয়ে দিতো কাগজ কলম। আজকাল ওরা আর কিছু বলে না। আমার অন্তিম ইচ্ছায় বাধা দিতে চায় না।

'সুদূর দিগন্তে' বইটার শেষ পরিচ্ছেদটুকু অনুগ্রহ করে পড়বেন। একবার পড়া থাকলেও। দেখবেন প্রতি ছত্রে হিমানীর সম্বন্ধে বিষ ছড়ানো হ'য়েছে। কাঠ-মল্লিকাকে চন্দ্রমল্লিকা করতে চেয়েছিলেন কৃতান্তনাথ, ধূপকাঠিকে অগুরু। সম্ভব হয় নি। কৃতান্তনাথের উচ্চ আদর্শের নাগাল পায় নি হিমানী। দু' হাতে কাদা ঘেঁটেছে, নিজের সর্বাঙ্গে ছিটিয়েছে। কিন্তু কৃতান্তনাথকে বিচলিত করতে পারে নি তাঁর সাধনা থেকে, বিচ্যুত করতে পারে নি। কিন্তু ক্ষমা নেই কৃতান্তনাথের অন্তিমানে। বিশেষ করে যারা তাঁর সাধনার অন্তরায় তাদের ওপর কোন রকম কৃপা দেখানো সম্ভব নয়।

স্বীকার করবেন রচনা নৈপুণ্য কৃতান্তনাথের অসাধারণ, ভাষার কেরামতি অলাদাক্ত। পড়ার সময়ে মুগ্ধ না হ'য়ে উপায় নেই, সত্য মিথ্যার চর ছাপিয়ে রসের প্লাবন। দাঁড়াবার মাটি সরিয়ে সেই জলোচ্ছ্বাসে ডুবিয়ে দেবে আপনাকে। বইয়ের এই পরিচ্ছেদ পড়ার পরে আমার মনেও একটা দ্বিধা এসেছিলো, সংশয়ের দোলা।

হিমানী কৃতান্তনাথের আদর্শের মর্যাদা বুঝি সত্যিই রাখতে পারে নি।

কিন্তু আমার ভুল ভেঙেছে। কাল বেলা চারটের সময় সব দ্বন্দ্বের অবসান:

হিমানী এসেছিলো।

ছিন্ন ময়লা পরিচ্ছদ। দু' চোখে কালির পোঁচ। কঙ্কাল দেহ। আমাকে দেখে অঝোরে কান্না। তার কান্না থামাতে গিয়ে আমার চোখ ভরে এলো জলে।

তার কাছেই সব শুনলাম। কৃতান্তনাথ সরে দাঁড়িয়েছেন পাশ থেকে। স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন হিমানীকে, পুরণো পুতুল নিয়ে খেলা করতে তাঁর ভালো লাগে না। কোনদিনই লাগে নি।

নতুন পুতুল জুটেছে। ব্যারিষ্টার গজদারের বিদুষী স্ত্রী তিতিয়ান গজদার। রেসের মাঠে, ইডিয়োর ফ্লোরে, সমুদ্রের কিনারে সর্বত্র দুটিকে একসঙ্গে দেখা যায়।

কৃতান্তনাথের ইচ্ছা শীতকালটা কেটে গেলেই দু'জনে ইউরোপ পরিক্রমায় বেরোবেন। নতুন চোখে দেখবেন বিদেশী শিল্পকলা আর সাহিত্য। নতুন প্রেরণায় বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করবেন।

হিমানীকে কোন আশ্বাস দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। আমি নিজেই মুমূর্ষু, পরিমিত আয়ু, কোন্ সাহসে হিমানীকে নতুন ক'রে বাঁচার মন্ত্র দেবো?

আপনার কাছে অন্তিম অনুরোধ, দ্বিতীয় সংস্করণে যদি সম্ভব না হয়, অন্ততঃ তৃতীয় সংস্করণে বইটা বদলাবার চেষ্টা করবেন। সোজাসুজি এ চিঠি দেখাবেন কৃতান্তনাথকে। বলবেন, অজিতপ্রকাশ নেই, হিমানীর যা চেহারা দেখেছি, সেও হয়তো বেশী দিন থাকবে না, কালি দিটোবার লোকই যদি না থাকে তা হ'লে মিথ্যে কলঙ্ক লেপনের কি প্রয়োজন। যা সত্য, তাই সাহিত্যের আধার হোক। মন্থনে যদি বিষই ওঠে তবে তার কিসের? প্রকৃত সাধক অঞ্জলি ভ'রে বিষ পান ক'রে নীলকণ্ঠই হয়, ফাঁকি আর মিথ্যাচারের অমৃত সেবন ক'রে অমর হ'তে চায় না।

আমার এই শেষ অনুরোধটুকু আশা করি রাখবেন। আর কিছু বলবার নেই।

যজ্ঞফল

[একাঙ্কিকা]

মন্মথ রায়

—ও যে অট্টহাসি। ও কি মা-ই হেসে উঠ্‌লেন বাবা?

—হ্যাঁ, বাবা। ও তিনি-ই।

—তারপর……?

—তারপর… সকল চিকিৎসা যখন শেষ হল, কিছুতেই কিছু হ'ল না, তখন আমার গুরুদেবের শরণাপন্ন হ'লুম।

—গুরুদেব। তা' তিনিও এসে খুব ঘটা করেই শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলেন নিশ্চয়।

—না বাবা, অবিশ্বাসের কথা নয়। তিনি সত্যসত্যই মহাপুরুষ। তাঁর পিতামহ সিদ্ধ তান্ত্রিক ছিলেন; শ্মশানেই থাকতেন। এঁরা অবশ্য গৃহী, কিন্তু গুরুদেবের নিজের মুখে শুনেছি, গৃহী হ'তে পেরেছেন, শুধু বৈরাগ্যে আর ভোগে তাঁর ভেদ জ্ঞান দূর হয়েছিল ব'লে।…

—এসব কথা আমি ভালো বুঝিনে। তারপর বলুন শুনি…

—তিনি এসে যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞের পর আমাকে ডেকে হেসে বল্‌লেন - "কালিকাপ্রসাদ, প্রত্যাদেশ পেলুম এই বছরেই পুত্রমুখ দর্শন করবে।" হৈম পাশের ঘরেই ছিল, এক বুঠো বোহর নিয়ে-ছুটে এসে গুরুদেবকে প্রণাম করলে। গুরুদেব আশীর্বাদ করলেন "সুপুত্রবতী হও।"

—তারপরেই বুঝি আমি হলুম…?

—না, অত সহজে তুমি আমাদের দয়া করনি বাবা। গুরুদেব বল্‌তেন—"সুপুত্র কত আরাধনার ধন!" হৈম কি তোমার জন্য কম তপস্যা করেছে!

—তপস্যা?

—হ্যাঁ বাবা, তপস্যা। গুরুদেব বল্‌লেন—"শুধু ছেলে হ'লেই তো হবে না, ছেলের মত ছেলে হওয়া চাই; নইলে এতবড় জমিদারী—একটা রাজ্য—এটা তো চালিয়ে যেতে হবে।"

—বটে! আমি যে অন্নের গ্রাসটিও মুখের ভিতর ঠিক মত চালনা করতে শিখি নি—সেও যে মাসিমার কাজ ছিল বাবা।

—হবে, বয়েস হ'লে সব হবে। বি-এ পাস দিলেই কি বয়স হ'ল বাবা?

—থাক্। তারপর…

—তারপর তিনি আমাকে একদিন বল্‌লেন—"কালিকা-প্রসাদ, হৈমীর মধ্যে মা ষষ্ঠীদার বিকৃতি দেখ্‌তে পাচ্ছি।" এই ব'লে জ্বালিনী, কুলকুণ্ডলিনী, মূলাধার পদ্ম, ষট্‌চক্র… কি সব বল্‌লেন আমরা তো অতশত বুঝতে পারিনে বাবা। শেষে বল্‌লেন—"সেই শক্তি ওতে সুপ্ত রয়েছে, তা'কে জাগ্রত করতে হবে।" বল্‌লেন—"যোগনিদ্রা তোমরা বুঝবে না, কিন্তু আজকালকার hypnotic suggestion হয়ত বুঝতে পারবে?…

—হ্যাঁ, ওটা বুঝি বটে।

—তারপর হৈমকে নিয়ে তাঁর কি সাধনা। দুপুর রাত্রে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, কিন্তু তাঁদের…

—বাবা! ঐ…আবার। এবার চীৎকার করে' কাঁদছেন! মা, মা? নিশ্চয়—

—হ্যাঁ বাবা, তিনিই। ওতে ভয় পেয়ো না তুমি—

—আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে চলুন না বাবা…

—ওটা একটু থামুক। সে-ই এঘরে আসবে নিশ্চয়।

—আমাকে তো চিনতে পারবেন। কি হবে?

—আমি চিনিয়ে দেব!

—কিন্তু চিনিয়ে দিলেই কি চিন্‌তে পারবেন?

—বোধহয় না। তবু চেষ্টা করে' দেখ্‌ব। তুমি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘট্‌ল। রাতদিন বিভীষিকা দেখ্‌ত।

—ঐ গুরুদেবকেই। গুরুদেবকে চিঠি লিখলুম, তিনি

উত্তরে লিখলেন—"ভগবানের ভার সহ্য করতে পারছে না।"

—গুরুদেবকে নিয়ে এলেন না কেন ?

—তাঁর আর সুযোগ পেলুম কই বাবা ? সন্ধান করে' জানলুম তাঁর ডাক এসেছিল, তিনি হিমালয়ে চলে' গেছেন।

—তারপর ?

—তারপর উন্মত্ততা ক্রমে চরমে গিয়ে দাঁড়াল। ঐ বিভীষিকা দেখতে দেখতে একদিন তোমাকে গলা টিপেই মেরে ফেলে আর কি।

—বেঁচে যেতুম বাবা তবে।

—ছিঃ বাবা। অক্ষয় অমর হও তুমি। আমার জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা তুমি। তোমার মুখের দিকে চেয়েই এতদিন আমি সংসারে রয়েছি···কাছে এস বাবা, না, আরো কাছে এস।···যখন দেখলুম প্রসূতির ঐ অবস্থা, আমি তখনই তোমাকে তোমার মাসিমার ওখানে পাঠিয়ে দিলুম।

—হাঁ বাবা, আমার সেই বন্ধ্যা মাসিমা বাগযজ্ঞ না করেও আমাকে পেয়ে পুত্রবতী হবার আনন্দ পেয়েছেন। তারপর···?

—তারপর এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখলুম। তুমিও চোখের আড়াল হ'লে—সেও ভালোমানুষটি হয়ে গেল কে বলবে যে সে না হয়েছিল, পাগল হয়েছিল। যেন কিছুই হয় নি। সে যেন আমাদের সেই নববধূ হৈম—মাঝখানে যে এত কাণ্ড হয়ে গেল, সে যেন আমরা সবাই একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিলুম—তার বেশী আর কিছু নয়। ডাক্তাররা দেখে বললে—"বেশ হয়েছে। ছেলের কথা আর মনে করিয়ে দেবার দরকার নেই—হিতে বিপরীত হবে।" সেই থেকে তুমি তোমার মাসিমার ওখানেই মানুষ হয়েছ, আমি চুরি করে চুপি চুপি তোমাকে দেখে এসেছি। তুমিও এতদিন জেনে এসেছ ঐ মাসিমাই তোমার মা···যে তোমাকে গর্ভে ধরেছিল সে মরে গেছে।

—বাবা, তবে আজ আমাকে এখানে আনা আপনার উচিত হয়নি ; আমি মাসিমার ওখানেই ফিরে যাই।

—না বাবা, তোমার মা তোমাকে দেখবার জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন···

—তবে তিনি শুনেছেন ?

—শুনেছেন।

—কে শোনাল ? কেন শোনাল ?

—সেই কথাই বলছি। গত মঙ্গলবারও বেশ শান্ত ছিল, রাত্রে বেশ ঘুমচ্ছিল। হঠাৎ জেগে উঠল। আমার হাত দু'খানি তাঁর হাতের মুঠোয় নিয়ে বুকের উপর রেখে সহজ সরল ভাবে আমায় বললে—"সব সময় তুমি মুখখানি ভার ক'রে থাক কেন ?" আমি একটু হাসলুম···হাসতে চেষ্টা করলুম। সে আমার হাত দু'খানি নিয়ে খেলা করতে করতে বললে—"তোমার ছেলে হ'ল না বলে—না ?" আমি কোন কথা কইলুম না। সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আবার পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল। সারারাত ঘুমলো না। পরদিন সকাল বেলা উঠে পরে আমায় প্রণাম ক'রে নিজে জল এনে আমার পা দুইয়ে দিয়ে বললে—'আজ আমার এ সাধে বাদ সেধো না'—এই বলে চুলের বেণী খুলে আমার পা দুখানি মুছে দিলে। মনে হ'ল গুরুদেবই এ প্রথাটির প্রচলন করেছিলেন ; তিনি বলতেন, "ভক্তিমতী নারীর এই সেবাটুকু বড় মধুর।"

—তারপর তারপর ?

—তারপর উঠে আমার পালঙ্কে বসিয়ে, সম্মুখে এসে আমার গলাটি জড়িয়ে ধ'রে বললে "একটি পুষ্যিপুত্র নিলে হয় না ?" মূর্খ আমি···মূঢ় আমি। তখন আমি না ব'লে থাকতে পারলুম না তোমার কথা। বাগযজ্ঞ আর গুরুদেবের কথা সম্পূর্ণ গোপন ক'রে বললুম "তোমার ছেলে হয়েছিল হৈম···কিন্তু, সে হবার পরেই তোমার খুব অসুখ হয়, বাঁচবার কোন আশাই ছিল না ; ছেলের অমঙ্গল হবে জেনে তা'কে তা'র মাসিমার হাতে সঁপে দিয়েছি, তোমার সোনার চাঁদ ছেলে সেইখানেই মানুষ হচ্ছে।' শুনে সে যেন নেচে উঠল। আনন্দে বিস্ময়ে সে অপরূপ হয়ে উঠল। তখনি জিদ্ ধরল তোমাকে তার কোলে এনে দিতে হবে। আমিও স্বীকার হলুম। তারপর থেকেই নিজের হাতে তোমার জন্য ঘর সাজিয়েছে,

খাবার তৈরী করেছে, তোমাকে দিয়ে দিয়ে ঘর আলো-করা বৌ আনবে বলে ঘটক ডেকে পাঠিয়েছে.—কি যে করেছে আর কি যে না করেছে সে বলবার নয়। আমি তোমাকে আনবার পথে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা ক'রে সব কথা বললুম. তিনিও বললেন "না, আর ভয় নেই। আপনি স্বচ্ছন্দে ছেলে নিয়ে আসুন।" কিন্তু···

—কিন্তু ?···

—কিন্তু পুরোহিত মহাশয় পঞ্জিকা দেখে বলে পাঠালেন এ দু'দিন বড় খারাপ দিন. পুত্রমুখ দেখবার পক্ষে বড়ই অশুভ। আমি সেই শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছি। কিন্তু বিলম্ব দেখে সে আবার উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, সে একদণ্ডও আর অপেক্ষা করবে না। আবার সে সেই পূর্বের মত ক্ষেপে উঠেছে, কখনো কাঁদছে. কখনো হাসছে. যাকে দেখছে তারই হাত পা জড়িয়ে ধ'রে বলছে—"আমার ছেলে এনে দাও···এখনি না এনে দিলে আমি আত্মঘাতী হব—"

—বাবা, আপনার পঞ্জিকা রেখে দিন, আমি তাঁর কাছে এই চললুম···

—হ্যাঁ বাবা, যাবে বৈকি ! শুভ মুহূর্ত এসেছে বোধ হয়। র'সো, আমি ঘড়ি দেখছি···বাঃ. শুভ যোগের যে চার মিনিট পার-ই হয়ে গেছে দেখছি···যাও বাবা, এসে···

—আপনি···

—না বাবা, আমি ঠিক এ সময়টায় যেতে চাইনে···

কাঁদা পাচ্ছে···এসো এসো···রামচরণ, আরে রামচরণ ! গেলি কোথা ?

—এই এসেছি, আজ্ঞে···

—যে ব্যাটা এই ঘর থেকে এখনি বেরিয়ে গেল দেখলি ?

—আজ্ঞে

—ও তোদের ছোটকর্ত্তা, আমারি ছেলে। সে শুনিস এখন। পথে আসতে নদীর ধারে হাঁস চরতে দেখে বাবা আমার শিকারের জন্য মেতে উঠেছিল। আমার বন্দুকটা আনবার জন্য কেবলাকে কখন বলেচি. এখনো তো সে এল না···

—আজ্ঞে সে বন্দুক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আমিও তো বন্দুকই খুঁজছিলাম···

—এই যে কেবলা···বন্দুক পেলি ?

—আজ্ঞে, বন্দুক মার হাতে···

—সে কি !

—হ্যাঁ কর্ত্তা···আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছেন—

[পাশের ঘরে গুড়ুম গুড়ুম গুড়ুম শব্দ]

—ওকি ! ওকি ! তবে কি আত্মহত্যা করল ?

—না···না···না···হাঃ হাঃ হাঃ। আত্মহত্যা করিনি··· গুরুহত্যা···

—আমার ছেলে ? আমার ছেলে ?

—কে তোমার ছেলে ? হাঃ হাঃ হাঃ ! তোমার আবার ছেলে ! গুরুদেব···গুরুদেব···অবিকল গুরুদেব···সেই চোখ···সেই মুখ···সেই স্বর···হাঃ হাঃ হাঃ···

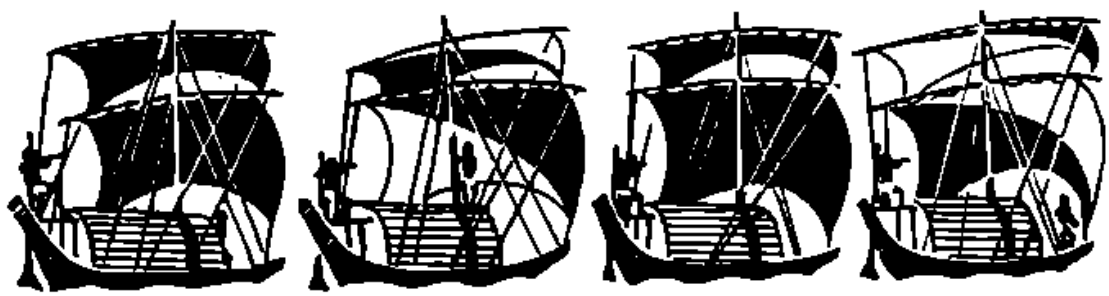

ছায়ার মায়া

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

কলকাতার জল কিছুতেই সহ্য হচ্ছে না—স্থির করলুম কয়েকদিন কোথাও ঘুরে আসব। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন, 'বিন্ধ্যাচল ত তোমাকে বেশ স্যুট্ করে, সেখানেই কেন যাও না।

কথাটা মন্দ লাগল না। কিন্তু বিন্ধ্যাচলে যে বাড়ীতে প্রত্যেকবার যাই, সেটাতে ইলেকট্রিসিটি নেই। এই পচা গরমে পাখা ছাড়া ত চলবে না। জেবেচিন্তে পাণ্ডাকে চিঠি লিখলুম, বিজলী আছে এমন বাড়ী ঠিক করো। নিয়ে পাখা ভাড়া করা যাবে।

সাতদিন পরে পাণ্ডার কাছ থেকে উত্তর পেলুম। বাবুজী যেমনটি চাইছেন ঠিক তেমনিটিই পাওয়া গেছে মির্জাপুর শহরে, গঙ্গার ওপর। বিজলী ত আছেই—আলো পাংখা সব লাগানোই আছে। সাহেবের বাড়ী—ফার্নিচার ভি সব আছে। কোন তকলিফ্ হবে না—বাবুজী এসে পৌঁছলেই হয়। কেরায়া ভি বহুত সস্তা—মোটে ত্রিশ রুপৈয়া।

এ যেন মেঘ না চাইতেই জল।

টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডারে ত্রিশটি টাকা পাঠিয়ে, তারপর এক শুভদিন দেখে ট্রেনে চড়ে বসলাম। সঙ্গে রইল এক ঠাকুর, একটি চাকর এবং ভাগ্নীজামাই হরিদাস। হরিদাস অফিস থেকে এক মাসের ছুটি নিয়ে বসেছিল—প্রস্তাবটা করতেই রাজী হয়ে গেল। একটি সঙ্গী পেয়ে আমিও বেঁচে গেলাম। হরিদাস সিগারেট খায় না—সুতরাং মামা শ্বশুরের সঙ্গে যেতে তার আপত্তি নেই।

পৌঁছে দেখলাম সে এক বিরাট কাণ্ড। কতকালের প্রকাণ্ড বাড়ী। বিরাট পাঁচিল-ঘেরা বাগানের ভেতর দোতালা মস্ত বড় বাড়ী। এক একটি তালা বোধহয় বিশফুট উঁচু, কিংবা আরও বেশি। সবই বড় বড় ব্যাপার। চালাই লোহার ফটক দুটো যেন দৈত্য-পুরীর কপাট। বিপুল সিঁড়ি। দরজা জানলাগুলো দশ ফুট ক'রে উঁচু। এক একটা ঘর—কুড়ি ফুট লম্বা, ষোল ফুট চওড়া। নিচের তলায় খান-পাঁচেক ঘর—ওপর তলায় খান-তিনেক। এছাড়া নিচে ভেতর দিকে চাকর বাকরদের জন্য আউট হাউস আছে—সেখানেও সার সার ঘর। খোলা হাঁ-হাঁ করছে। ভেতরে জমে ওঠা জঙ্গলের গাদায় গাছ গজিয়ে গেছে সে সব ঘরে।

এত বড় বাড়ীটার মোটে ত্রিশ টাকা ভাড়া? পাণ্ডা-জীকে জিজ্ঞাসা করলুম।

তিনি একটু তাচ্ছিল্যের সুরেই উত্তর দিলেন, 'এখানে কে এত টাকা দিয়ে ভাড়া নিচ্ছে বলুন। যে আসে তারই দু-একটা ঘর দরকার হয়। কাজেই ভাড়া কমাতে হয়। ভাড়াটে আরও আসে, নিচের তলায় বসিয়ে দেব। আপনাদের জন্য ওপর তলা দুইয়ে সাফ করে রেখেছি! নিচের তলাও সাফ্ করা আছে—কিন্তু আপনার ত দরকার হবেনা।'

ওপর তলায় পৌঁছে বেশ আনন্দ হ'ল। বড় বড় ঘর। তাতে দামী মেহগনি খাট—গদীপাতা। পাখা আছে, আলো আছে। ওয়ার্ডরোব, দাঁড়া আয়না টেবিল চেয়ার। বাথরুমে সাহেবী প্রথা। বাথটব অবধি আছে।

'কার বাড়ী এটা পাণ্ডাজী?' হরিদাস প্রশ্ন করলে।

'বাড়ী ত বাবুজী এক সাহেবের।' পাণ্ডাজী সবিস্তারে বলতে শুরু করলে, 'আগে এখানে নীলকুঠির এক

সাহেব থাকত। তারপর তার ছেলের কাছ থেকে কেনে আর এক সাহেব। ওর ছিল কার্পেট-গালিচার কারবার, সে আবার নতুন করে বাড়ীটাকে তৈরী করে। তারপর বিহার ভূ-কম্প হয়, মনে আছে আপনার?—সেই সময়ে সাহেবের বিবি ছেলেমেয়ে সব ছিল ওর শ্বশুর বাড়ী মজঃফরপুরে। এক মিনিটে সব খতম—সেই খবর পেয়ে সাহেব ছুটল সেখানে—আর ফিরল না। ওখান থেকে সোজা বিলেত চলে গেল। এই বাড়ীর জিম্মেদারী দিয়ে গেল ওর ভাতিজাকে। সে সাহেবের বড়া ভারী কারবার আছে ইলাহাবাদে, জৌনপুরে, চুনারে সে এ বাড়ীতে কি করবে? এখানের চাবি দেওয়া আছে এক পুলিসের দারোগার কাছে। কেউ কিরায়ামে নেয় ত দেয়—নইলে পড়েই থাকে।'

মোটামুটি বাড়ীটা ভালই। চারিধারে বিস্তৃত বারান্দা। ইজিচেয়ার আছে, বসে বসে গঙ্গা দেখার খুব সুবিধা। আমি ত তখনই বসে পড়লাম। হরিদাস আর পাণ্ডা মিলে বাজার হাট করলে—একটা স্থানীয় চাকরও ঠিক হল—জল তোলার জন্যে। কলকাতার 'বাবু' চাকর এই সিঁড়ি ভেঙে জল তুলতে পারবে না।

এক কথায় গৃহস্থালী পেতে বসা গেল।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর শুয়েছি সকাল করেই, কিন্তু ঘুম আসছে না। তার প্রধান কারণ—দুপুরে একটু দিবানিদ্রা হয়েছে, তার ওপর শুয়েছি রাত নটায়—কলকাতায় তখন সন্ধ্যা রাত। রাত বারোটার কম বাড়ীতে কোনদিনই শোওয়া হয় না। সুতরাং ঘুম আসাটাই বিচিত্র। তার ওপর অসহ্য গুমোট। পাখাগুলো বহুদিনের অব্যবহারে প্রায় অচল হয়ে উঠেছে। তেল যে তাতে কত কাল পড়েনি তার ঠিক নাই। কাজেই পাখা ঘুরছে মন্থরতম গতিতে, তাতে কিছু ক্যাচ্ ক্যাচ্ আওয়াজ হলেও হাওয়া হচ্ছে না কিছুমাত্র। ঘামে এখনই মাথার বালিশ ভিজে উঠেছে। শুধু এপাশ ওপাশ করছি।

সবচেয়ে বিপদ এই—হরিদাস দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। এইটে আরও অসহ্য। আপনার ঘুম হচ্ছে না—অথচ পাশেই একজনের নাকের ডাক নিয়মিত ছন্দে গর্জন করে চলেছে—এ কতক্ষণ সহ্য করতে পারেন?

বিরক্ত হয়ে উঠে বসলাম:

বাইরে যাকে ব'লে নিঃসীম অন্ধকার। কালো মেঘের স্তূপ ঝুঁকে পড়েছে গঙ্গার ওপর। ফলে গঙ্গার জলও কালো হয়ে উঠেছে—সবটা জড়িয়ে একটা একাকার কালিমা। সামান্য হাওয়াও নেই কোথাও।

ওপরের তিনটা ঘরের একপ্রান্তের ঘরটা আমরা নিয়ে ছিলাম—আর এক প্রান্তের ঘরে ছিল ঠাকুর ও চাকর। মাঝের ঘরটা খালিই পড়েছিল। একেবারে খালি নয় ঠিক—বাক্স স্যুটকেস ইত্যাদি মালপত্রগুলো। কিন্তু এ ঘর থেকে ও ঘর অবধি মাঝের দরজাগুলো খোলাই ছিল। ফলে ও পাশের ঘর থেকে ঠাকুরদের নিয়মিত নিঃশ্বাস পড়ার শব্দও নিস্তব্ধ আর্দ্র হাওয়া ভেদ করে এখানে এসে পৌঁচ্ছিল।

এক কথায় সবাই ঘুমোচ্ছে, আমি ছাড়া।

বিরক্তিতে মন ভরে গেল। স্লিপিং ট্যাবলেট বা ঘুমের বড়ি সঙ্গেই ছিল—কলকাতাতে ত ওটি নিত্যসঙ্গী কিন্তু এখানে ওটা ব্যবহার করব না প্রতিজ্ঞা করেছিলাম; সে প্রতিজ্ঞা আর রাখা গেল না দেখছি। এমন করে জেগে থাকার জন্য এখানে আসিনি—

বালিশের নিচে থেকে হাতড়ে ট্যাবলেটের শিশিটা বার করলুম। জল পাশেই আছে টুলের ওপর। কিন্তু বড়িটা বার ক'রে নিয়ে জলের গ্লাসের দিকে হাত বাড়াব এমন সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। মাঝের ঘরের দু'টো কম্যুনিকেটিং দোরই খোলা ছিল সম্পূর্ণ—হঠাৎ সেই চারখানা পাল্লা বিরাট শব্দে বন্ধ হয়ে গেল—এবং এক মুহূর্ত পরেই আবার নিঃশব্দে খুলে গেল।

কী রকম হ'ল? কোথাও এক বিন্দু বাতাস নেই গঙ্গার বুকে জমাট মেঘ, গাছের পাতার ডগাটুকু পর্যন্ত কাঁপছে না। আমাদের ঘরের জানলার পাল্লাগুলো খোলাই রয়েছে—মাঝের ঘরটার বাইরের দিকের—অর্থাৎ দালান

এবং বারান্দা দুদিকেরই—কপাট বন্ধ, হাওয়া তো কোথাও থেকে আসবার কথা নয়! হাওয়া নেইও—তবে এ বন্ধ হ'ল কোথা থেকে, বন্ধ করলে কে!

সে প্রচণ্ড আওয়াজে সকলেরই ঘুম ভেঙে গেছে। হরিদাস ঘুমের ঘোরে চোর চোর বলে লাফিয়ে উঠেছে। ওধারে ঠাকুরের কণ্ঠে বহুদিন পরে মাতৃভাষা ধ্বনিত হয়েছে—'আউ! হেলা কড?'

আমি অবশ্য প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই টর্চ জেলে উঠে দাঁড়িয়েছি। ছুটে গিয়ে আলোটাও জেলে দিলাম। পনেরো বাতির আলো মিট মিট করতে লাগল অত বড় ঘরটায়—কিন্তু তা হোক, সবই দেখা যাচ্ছে অন্তত।

এর পর আমরা চারটি প্রাণী তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলাম সব। তিনটে ঘরের কাবোর্ড খুলে, ওয়ার্ডরোব খুলে, খাটের তলা, বাথরুম—সব। দালানের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বাইরের বারান্দা বানরের ভয়ে মজবুত এক্সপ্যাণ্ডেড্ নেটালের জাল দিয়ে ঢাকা। কোথাও থেকে বাইরের কোন লোক আসবার সম্ভাবনা নেই। তবে এতবড় দরজার ভারি ভারি দু' ইঞ্চি পুরু কাঠের পাল্লা বন্ধ করলে কে—আবার তৎক্ষণাৎ খুললেই বা কে! খুব বেশী রকম ঝড় না উঠলে এ রকম হবার কথা নয়—অথচ বাতাস ত একেবারেই নেই। আর বাতাস এলে অত জানলা-গুলোও ত বন্ধ হতে পারত!

কোন মীমাংসাই হ'ল না। অনেকক্ষণ ধ'রে গুলতানি সার হ'ল শুধু। আমার তরুণ জামাতা বাবাজী হুকুম করলেন ঠাকুর চাকরকে, 'তোরা বরং এই ঘরে এসে শো।'

তারা ঠিক আর অতটা করলে না—আমাদের ঘরের সামনে বারান্দায় এসে শুল।

কিন্তু পরের দিন ভোর বেলা উঠে আর সন্দেহ রইল না যে কোন লোকই এসেছিল আগের দিন রাত্রে। কারণ আমার বাথরুমের ঠিক মাঝখানে একরাশ ময়লা বা পুরীষ।

প্রথম ভেবেছিলাম আমার মূর্তিমানরাই কেউ ঘুমের ঘোরে উঠে এ কার্য করেছে কিন্তু তারা নানারকম কঠিন শপথ ক'রে অস্বীকার করলে। তা ছাড়া ওধারের ঘরের সঙ্গেও বাথরুম আছে। আমি বারবার সকলকে বলে দিয়েছি আমার বাথরুম যেন কেউ না ব্যবহার করে। তৎসত্ত্বেও এই কাণ্ড করবে, এমন সাহস কারুর নেই। তাছাড়া আমার ত সমস্ত রাত ভাল ক'রে ঘুমই হয় নি—ওরা কেউ উঠলে আমি টের পেতুম।

মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। একে ত এই প্রকাণ্ড হানা বাড়ীটায় এসে পর্যন্ত মনটা কেমন ভারি ভারি লাগছে—সমস্ত আবহাওয়াটাই যেন থুক চাপ তার ওপর এসব কী কাণ্ড!

সেদিন রাত্রে বাথরুমে চাবি দিয়ে শু'লাম। বাকের ঘরের দরজার কপাটগুলো ছিট্ কিনি দিয়ে আটকে দিলাম। সতর্কতার কোন ত্রুটি কোথাও রইল না। সেদিন ঘুমও এসে গেল সকাল সকাল—

অকস্মাৎ কিন্তু আবার সেই শব্দ!

দড়াম—দড়াম—

চমকে ঘুম ভেঙে গেল। ছিট্ কিনি লাগিয়েছি আমি নিজের হাতে—মজবুত ছিট্ কিনি—সে খুললে কে? আজও ত হাওয়া নেই। কাল পাখাটা সামান্য ঘুরছিল আজ সেটুকুও নেই। সন্ধ্যা থেকে অচল হয়ে রয়েছে।

তবে?

সকলেই উঠে পড়েছে ইতিমধ্যে। আজও তন্ন তন্ন ক'রে খোঁজা হ'ল—কিন্তু সে কতকটা কলের মতই। কারণ সকলেই জানে যে বাইরের লোক কেউ নয়, বাইরের লোক আসবার কথা নয়—

মুখ শুকিয়ে উঠেছে আজ সকলেরই। হরিদাসের পা-দুটো অল্প কাঁপছে তা আমি আগেই লক্ষ্য করেছি। ঠাকুরের চোখে মুখে ত স্পষ্টই বিদ্রোহের ভাব। আমি বেগতিক বুঝে আগেই বললাম, 'বাকের ঘরের এই দরজা-গুলোও বন্ধ করে দাও, আর তোমরাও এই ঘরে এসে শোও।'

বাকী রাতটুকু ভাল ক'রে ঘুম হ'ল না। ভোর

বেলাই উঠে পড়লাম, প্রাতঃকৃত্য সেরে গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাবো বলে।

কিন্তু বাথরুমের চাবি খুলে ভিতরে গিয়ে দেখি—ঠিক আগের দিনের মত সেই একই জায়গায়—ময়লা! চাবিটা তখনও আমার হাতেই ধরা আছে। সারারাত বালিশের তলায় ছিল।

হরিদাস বললে, 'মামাবাবু চলুন, আজই একটা অন্য বাড়ী দেখে উঠে যাই।'

আমি বললুম, 'আখো তুমি আমি দুজনেই সায়েন্সের ছাত্র। আমরা যদি এইভাবে সামান্য কারণে পালাই ত লোকে বলবে কি? বিজ্ঞানপাঠকে ধিক্কার দেবে যে! আমাদের এত দিনের শিক্ষা সংস্কৃতি তবে কী কাজে লাগবে?'

অগত্যা হরিদাস চুপ ক'রে রইল বটে কিন্তু মনে মনে যে খুব জোর পেলেনা—তা তার মুখ দেখেই বুঝলুম।

সন্ধ্যার সময় পাণ্ডাজী এলেন।

'বাবুজী, কোই তক্‌লীফ্‌ ত নেহি হোতা হ্যায়?'

একটু চটেই ছিলুম। বললুম, 'ঠাকুর, খুব বাড়ী দিয়েছ। তোমার খুব দয়া। এখন এখান থেকে বেরোতে পারলে বাঁচি।'

পাণ্ডাজী একটু যেন কেমন ভাবেই প্রথম প্রশ্নটা করেছিলেন। এখন আমার কথা শুনে তাঁর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে উঠল, 'কেঁও বাবুজী, কেয়া বাত হ্যায়? এয়সা কোই ডর-উর ত নেই লাগতা?'

তৎক্ষণাৎ চেপে ধরলে হরিদাস, 'কেন, তুমি ভয়ের কথা জিজ্ঞেস করছ কেন? কী ব্যাপার বলো ত?'

'নেহি নেহি বাবুজী—এয়সা কোই খাস্‌ বাত নেহি হ্যায়। আমি ভাবল কি এত্তা বড় বাড়ী আছে, আর বাবুদের ভি আদমী কম—ডর ত লাগতেই পারে!'

প্রশ্ন করলুম, 'ঠিক ক'রে বল ঠাকুর—কোন ভয়ডর সত্যিই আছে কি না।'

'না, না কুছুনা, কুছুনা, এমন বাড়ী আপনাকে হামি দেব? বিন্ধ্যবাসিনী জানেন, আমি আপনাদের জন্য কেতো ভাবনা রাখি।'

তাহ'লে ঠাকুর—এ সব ব্যাপার কি বলো ত!'

খুলে বললাম ঘটনাটা।

শুনতে শুনতে পাণ্ডা ঠাকুর একটু সরে বসলেন কাছাকাছি—সেটাও লক্ষ্য করলুম। তারপর উত্তর করলেন, 'নেহি নেহি বাবুজী, ইসব ভ্রান্তি হ্যায়। এ রোকম কত্তি কত্তি হোতা হ্যায় বাবুসাহেব। লেকিন কুছ ডর নেহি—গঙ্গামায়ীকী ইলাকা, হ্যায় বিন্ধ্যবাসিনী মাতাকী আস্থান—ইয়া কুছ ডর নেহি। জয় রামজীকি।'

বলে তিনি উঠে পড়লেন। হরিদাস বসতে বললেও তিনি বসলেন না—বললেন, জরুরী কাজ মনে পড়ে গেছে, বসবার উপায় নেই। তারপর আমাদের সমবেত নমস্কারান্তে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাতটা তুলে "জয় সীতারাম, জয় সীতারাম" বলতে বলতে নেমে গেলেন।

তখন বারান্দায় বসে ছিলাম। সেদিন সন্ধ্যাবেলাই বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে। পরিষ্কার আলোয় দেখলাম পাণ্ডাজীর পিছু পিছু কথা কইতে কইতে যাচ্ছে আমাদের চাকর হারু।

ফিরে এলে এম্‌নি অলস কৌতূহলেই প্রশ্ন করলুম, 'তোর আবার পাণ্ডাজীকে কি দরকার হ'ল রে?'

সে হেসে বললে, 'আমার কেন দরকার হবে বাবু। দরকার ঠাকুর মশাইয়েরই। সিঁড়ির মুখে আমাকে পাকড়াও করলেন। বললেন জিয়াসা ফটক তক্‌ পঁওছায় দেও, বহুত 'ডর লাগতা।'

হরিদাস ত চটে আগুন, বলে—'কাল এলে ওর টিকি কেটে ছেড়ে দেব। ভণ্ড জোচ্চোর কোথাকার। জেনে শুনে একটা ভূতুড়ে বাড়ীতে তুলে দিয়েছে—আবার মুখের সামনে সাওখুড়ি ভাখোনা।'

অতি কষ্টে তাকে ঠাণ্ডা করি।

সেদিন রাত্রে আর দরজায় আওয়াজ হ'ল না। কারণ মধ্যের ঘর একেবারে বন্ধ করে শুয়েছি। কিন্তু তবু মাঝ

রাতে কেন জানি না ঘুম ভেঙে গেল। উঠে প্রাকৃতিক কার্য সেরে এসে শুলাম—কিন্তু আর কিছুতেই ঘুম এলো না। ঘড়িতে দেখি রাত দুটো, এখন আর ঘুমের ওষুধ খাবার মানে হয় না! জেগেই রইলাম।

একটু পরে মনে হ'ল দূর থেকে কী এক ধরণের সঙ্গীতের শব্দ ভেসে আসছে। খুব মৃদু—কিন্তু অস্পষ্ট নয়। ক্রমে আর একটু জোর হ'ল। কে যেন নাচ্‌ছে কোথায়, সুদূর পারে—তার সঙ্গে সারেঙ্গী তবলার সঙ্গত চলছে—ভাল লাগল খুব। কান পেতে শুনতে লাগলুম।

বেশ নাচছে তালে তালে। অতি মধুর লাগল আওয়াজটা।

এত রাতে নাচগান হচ্ছে কোথায়?

বেরিয়ে বারান্দায় এলাম—আরও মৃদু হয়ে গেল। পাড়ায় কোথাও নয়।

ভেতরের দালানে এসে দাঁড়াতে আরও জোর হ'ল বরং।

আরে—এ যেন মনে হচ্ছে আমাদের ভেতরের বাগানেই নাচ গান হচ্ছে—

জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম কেউ কোথাও নেই ত। কুয়াতলা, নিচের খোলা বারান্দা, বাঁধানো চাতাল সবই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নাচ গান ত দূরের কথা—নাচুনেরই চিহ্ন নেই কোথাও। ওপাশের আউট হাউস-গুলো তেমনি ভয়াবহ অন্ধকারের মধ্যে হা—হা করছে, সেখানেও জনমানবের অস্তিত্ব নেই, থাকা সম্ভবও নয়।

অথচ বেশ মনে হচ্ছে ঐ নিচে থেকেই—

আস্তে আস্তে দালানের খিল খুলে সিঁড়িতে বেরিয়ে এলুম। বাইরের দিকে। খোলা সিঁড়ি চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে। একটুও ভয় হ'ল না তখন। শুধু কৌতূহল আর ঐ মধুর শব্দের দিকে একটা অদম্য আকর্ষণ।

নেমে এসে বাগানে পড়লাম।

ক্রমেই স্পষ্টতর হচ্ছে শব্দটা। যেন মনে হচ্ছে ঐ নিমগাছের পাশের বাঁধানো চাতালটা থেকেই শব্দটা আসছে। যেন ঐখানে নাচছে কেউ—

আরও কাছে এলাম।

সঙ্গীতে ডুবে যাচ্ছি। মধুর সঙ্গীত আর লঘু পায়ের নাচ। অশ্রান্ত, অক্লান্ত সে নাচ। কখনও দ্রুত কখনও বিলম্বিত তার লয়—কিন্তু থামছে না কখনই। সারেঙ্গ-তবলারও যেমন বিশ্রাম নেই, তেমনি ঘুঙুরেরও না।

অভিভূতের মত এগিয়ে গেলাম বাঁধানো চাতালটার কাছে।

হ্যাঁ, এইখানেই ত। এইখানে ত নাচ হচ্ছে। মনে হ'ল আমার সামনেই নাচছে কে, তাকে ছুঁতে পাচ্ছি না। দেখতে পাচ্ছিনা, একথাও ক্রমশ যেন ভুলে গেলাম। মনে হ'ল ঐ ত ওর পেশোয়াজের প্রান্ত উড়ছে আমার চোখের সামনে, ঐ ত শুনতে পাচ্ছি তার দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ার শব্দ। এমনকি আমারই আশে পাশে বসে যারা তবলা ঠুকছে বা সারেঙ্গে ছড়ি টানছে তাদের ক্লান্ত দ্রুত নিঃশ্বাস শুনতে পাচ্ছি। যেন তার উষ্ণতাও অনুভব করছি,—

কতক্ষণ এই ভাবে বসে ছিলাম জানি না—হঠাৎ একটা কুকুর ডেকে উঠতে যেন তন্দ্রা ভঙ্গ হ'ল।

এ কি, কত রাত হ'ল।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত চারটে বাজে। উঠে পড়লাম তাড়াতাড়ি। এখন যেন কেমন গা-টা ছম্ ছম্ করছে। খোলা আউট হাউসগুলোর দিকে চেয়ে মনে হ'ল তারা যেন ওখানে থেকে তাকিয়ে আছে আমার দিকে নিঃশব্দে—কিন্তু হিংস্র দৃষ্টি মেলে—

এক রকম ছুটেই ওপরে চলে এসে দালানের দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলাম।

চমকে উঠে হরিদাস তন্দ্রা-জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, 'কে?'

উত্তর দিলাম, 'কেউ না, আমি!'

পরের দিন সকালেও কথাটা কাউকে বললাম না। মনে মনে ঠিক করলাম, সে রাত্রেও যদি ঐ রকম শুনি ত এদের ডেকে শোনাব।

কিন্তু তার আগেই সন্ধ্যারাতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। বাড়ীতে তখন কেউ ছিল না, হারুকে সঙ্গে নিয়ে হরিদাস গিয়েছিল বাজারে—ঠাকুর রান্না করছে, আমি আস্তে আস্তে নেবে এসে সেই বাঁধানো চাতালের কাছে দাঁড়ালুম। সে সময়ই কিছু শুনতে পাওয়া যায় কিনা—এইটে পরীক্ষা করে দেখাই আমার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কিছুই শোনা গেল না—বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও না।

শোনা কিছু গেল না বটে কিন্তু হঠাৎ একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলুম। আকাশ নির্মেঘ, শুক্লাচতুর্দশীর চাঁদ বেশ খানিকটা উঠে পড়েছে ইতিমধ্যেই। পরিষ্কার ফুটফুটে জ্যোৎস্না! কোথাও মেঘের কোন চিহ্নও নেই। তবু মনে হ'ল যে আমার মাথায় এবং চারপাশে কিসের একটা ছায়া। যেন এক টুকরো মেঘ ঠিক আমার মাথা আর চাঁদের মাঝে আড়াল রচনা করে রেখেছে। অথবা একটা চাঁদোয়া কি তেরপল খাটানো হয়েছে আমার মাথার ঠিক ওপরে।

অকস্মাৎ একটা দারুণ আতঙ্ক অনুভব করলুম, যা এ ক'দিন একদম করিনি। এমন ভয় পেয়ে গেলুম যে ভরসা করে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখতেও পারলুম না। অবশ্য দেখার দরকারও ছিল না—কারণ সামনে পিছনে যেদিকে তাকাচ্ছি চক্‌চকে উজ্জ্বল জ্যোৎস্না—কোথাও মেঘ নেই। খামোকা আমারই মাথার ওপর ঐ মেঘটি এসে স্থির হয়ে থাকবে—এ কখনও সম্ভব নয়।

ভয়ে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে এসেছিল। পা দুটোও যেন এবার ভেঙে পড়তে চাইছে, আর এতটুকু জোর নেই।

স্মরণ করবার চেষ্টা করলুম ইষ্টমন্ত্র—সব যেন গুলিয়ে গেল। কোন মতে সীতারাম নাম মনে এল। অস্ফুট কণ্ঠে একবার উচ্চারণ ক'রে—দু এক পা পিছিয়ে এলাম। ছায়াটাও সঙ্গে সঙ্গে সরে এল। আমি আর আমার চার পাশে তিন হাত করে মাত্র স্থানে সেই ছায়া।

এবার একটু দ্রুতই পিছিয়ে গেলাম।

ছায়াও ঠিক সেই গতিতে সরছে।

মনে হ'ল মাথা থেকে শির দাঁড়া বেয়ে বরফ জল কে ঢেলে দিচ্ছে। পায়ে আর একটুও বল নেই। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে—

কিন্তু যেতেই হবে এখান থেকে। কে জানে হয়ত এখনই ঐ পদার্থটা আমার ওপর পড়ে আমাকে আচ্ছন্ন করে দেবে। চিরকালের মতই হয়ত নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যাবে—

মনে পড়েছে—মনে পড়েছে—

ইষ্টমন্ত্রটা মনে পড়ে গেছে। মা বাঁচাও, মা রক্ষা করো—

একটু যেন পায়ে জোর এল। কিন্তু পিছু হঠ্‌তে হঠ্‌তে এ কোথায় এসে পড়েছি। ওপরের সিঁড়ি ত ওদিকটায়—?

তখন আর ভাববার সময় নেই। টলতে টলতে হাৎড়াতে হাৎড়াতে দু'বছরের শিশুর মত দৌড়তে লাগলাম সোজা ফটকের দিকে।

কী সর্বনাশ! ছায়াটাও সঙ্গে সঙ্গে আসে যে।

আমিও যত জোরে দৌড়ই ওটাও তত জোরে চলে—সেই আমাকে ঘিরে আছে অশরীরী বা শরীরী কোন ছায়া।

অনেকদিন আগে এক মার্কিন ছায়াছবিতে প্রকাণ্ড ভ্যাম্পায়ার বা রক্ত চোষা বাদুড় দেখেছিলাম—তেম্‌নিই কোন ভ্যাম্‌পায়ার আমাকে তাগ্ করছে না ত।

অস্ফুট একটা আর্তনাদ ক'রে যেন ঠিক্‌রে ফটকের বাইরে রাস্তায় এসে পড়লাম।

আঃ! কী শান্তি!

ছায়াটা আর নেই।

আমাদের বাড়ীর ঠিক পাশেই এক বুড়ো মুসলমানের দোকান ছিল। তামাক, টিকিয়া, পাতা, কাঠ, কাঠ-কয়লা, কিছু মাটির বাসন এমনি রকমারী জিনিষ বিক্রী করত। সন্ধ্যা বেলা খদ্দের বিশেষ থাকত না বলে দোকানের সামনে খাটিয়াটি পেতে বসে গুড়গুড়িতে তামাক টান্‌ত।

তখন আর আমার একমুহূর্তও দাঁড়াবার অবস্থা নেই। চলবার শক্তি ত নেই-ই। কোন মতে এসে ধপাস করে বসে পড়লাম সেই মুড়োরই চারপাইয়ের একধারে।

বৃদ্ধ কিন্তু কিছুমাত্র বিস্মিত হ'ল না। বরং সস্নেহ সহানুভূতির সুরেই বললে, 'কেঁও বাবুজী, ডর লাগ্ গিয়া—কেয়া ?'

হাঁ, বড়ে মিয়া বহুত।...কেয়া, জেরা পানি পিলাইয়ে গা ?'

'জী হাঁ, বহুত খুশি সে! লেকিন্ বাবুজী, ম্যায় মুসলমান্ হুঁ!

'উস্‌সে কেয়া ? পানিকা ভি ধরম হ্যায় ?' কোনমতে বলি। গলা এমন শুকিয়ে গেছে যে—কথা কওয়াও যাচ্ছে না।

বলা নয়—কড়কড়ে মাজা লোটাতেই জল এনে খাওয়ালে বড় মিঞা। তারপর পাশে বসে বললে, 'বাবুজী, আপ্‌কা বহুত তন্দুরস্তি হ্যায়। আপকে আগে আউর কোই এক রোজ ভি হঁয়া ঠহরনে নেহি সকা।'

'লেকিন বাত কেয়া হ্যায় বড়ে মিঞা—হঁয়া কৈ জানো হ্যায় কেয়া ?'

'জরুর! ইয়ে বাত ত সবকোই জানতা হ্যায়। কোই কোই পরদেশী কভি লে লেতা, বেচারে। লেকিন ইঁয়া তো কোই আদমি রাতমে উহ্ ফটককে অন্দর নেহি জায়গা! সচ্ বাবুজি!'

ততক্ষণে একটু সুস্থ হয়েছি। বড় মিঞাকেই চেপে ধরলাম।

ব্যাপারটা কি জানা দরকার।

বড় মিঞা মুহূর্ত-কয়েক নিঃশব্দে গুড়গুড়িতে টান দেবার পর সেটা নামিয়ে রেখে যা বললেন, তার অন্তার্থ হচ্ছে এই :—

বহুদিন আগে যখন নীল কুঠির সাহেব এ বাড়ীতে থাকত—তখনকার ঘটনা। তখন এই আসগার মিঞা খুব শিশু—এখন ওর চার কুড়ি বয়স হয়েছে। ঘটনাটা সে শুনেছে তার বাপজানের কাছ থেকে।

সাহেব বড় মাতাল ছিল, আর দুর্দান্ত বদমেজাজী। ওর জন্য বিরক্ত হয়ে একদিন ছেলেমেয়ে নিয়ে বিলাইত চলে গিয়েছিল আর ফেরেনি। সাহেব একাই থাকত। মাঝে মাঝে নাচওয়ালী আনাত দু' একটা কিংবা রেণ্ডি—সারারাত হল্লা করত।

একবার কার মুখে প্রশংসা শুনে লক্ষ্ণৌ থেকে আনালে জহরাবাইকে। জহরাবাই অনেক সাধ্য-সাধনার দৈনিক হাজার টাকার কড়ারে এল তিনদিনের জন্য।

প্রথম দিনটা গেল। দ্বিতীয় দিনে সাহেব ওর দিকে হাত বাড়াল। জহরাবাই পিছিয়ে গিয়ে বললে, 'খবরদার সাহেব। আমি সে নাচওয়ালী নই। নাচ দেখাবারই কথা আমার সঙ্গে—অন্য কোন কথা নেই।'

সাহেব বললে, 'বেশ সে কথা এখন থোক। কত টাকা চাই ?'

জহরা বললে, 'দশ হাজার টাকা দিলেও না তার জন্য অন্য মেয়েমানুষ আছে। তাদের আনিয়ে নাও।'

সাদা সাদনা। সাহেব চেক বই এনে বসল, কত টাকা দিতে হবে।'

জহরাবাই অচল অটল। তার সঙ্গে যেটুকু কথা আছে তার বেশী সে পারবে না।

তৃতীয় দিনে সাহেব—ঐ যে বাঁধানো চত্বরটা—ঐখানে নাচের মজলিশ বসালে। দর্শক একা সাহেব—ফটক সন্ধ্যা থেকে বন্ধ হয়ে গেছে, কেউ আসতে পারবে না। বসে বসে নাচ দেখছে আর বোতলের পর বোতল মদ খাচ্ছে। শেষে রাত বারোটার সময় জহরাবাই হাত জোড় করে ছুটি চাইলে।

সাহেব অকস্মাৎ দু হাতে দুটো পিস্তল বার করলে। বললে, 'উহু' contract is contract—তিন রাত তোমার নাচবার কথা। কোন সময়ের হিসেবত ছিল না। আজ সারারাত তোমাকে নাচতে হবে। কাক ডাকলে তবে ছুটি। খেয়েছো কি গুলি করব।'

ওদের মুখ শুকিয়ে উঠল। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপানে সাহেবের চোখ দুটো লাল, মুখখানা দানবের মত বীভৎস

[পরবর্তী অংশ ৫১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

মানব-কল্যাণে পরমাণু-শক্তি

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

জড় ও শক্তির অভিন্নতা সম্বন্ধে আইনষ্টাইনের পূর্বে বৈজ্ঞানিকদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। জড় বিলুপ্ত হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং শক্তি বিলুপ্ত হয়ে জড়ের উৎপত্তি ঘটে গাণিতিক হিসাবে এ তত্ত্ব অভ্রান্ত প্রতীয়মান হলেও বাস্তব প্রমাণের অভাবে ব্যাপারটা তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের কোঠাতেই পড়ে রইল। বিভিন্ন গবেষণার ফলে সমর্থনসূচক কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া গেলেও অনেককাল পর্যন্ত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর কিছু সার্থকতা দেখা গেল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মান বিজ্ঞানী অটো হান নিউট্রন কণিকার আঘাতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াস অর্থাৎ কেন্দ্রীয় বস্তুকে ভেঙে তার চেয়ে অনেক কম ওজনের সম্পূর্ণ পৃথক দুটি

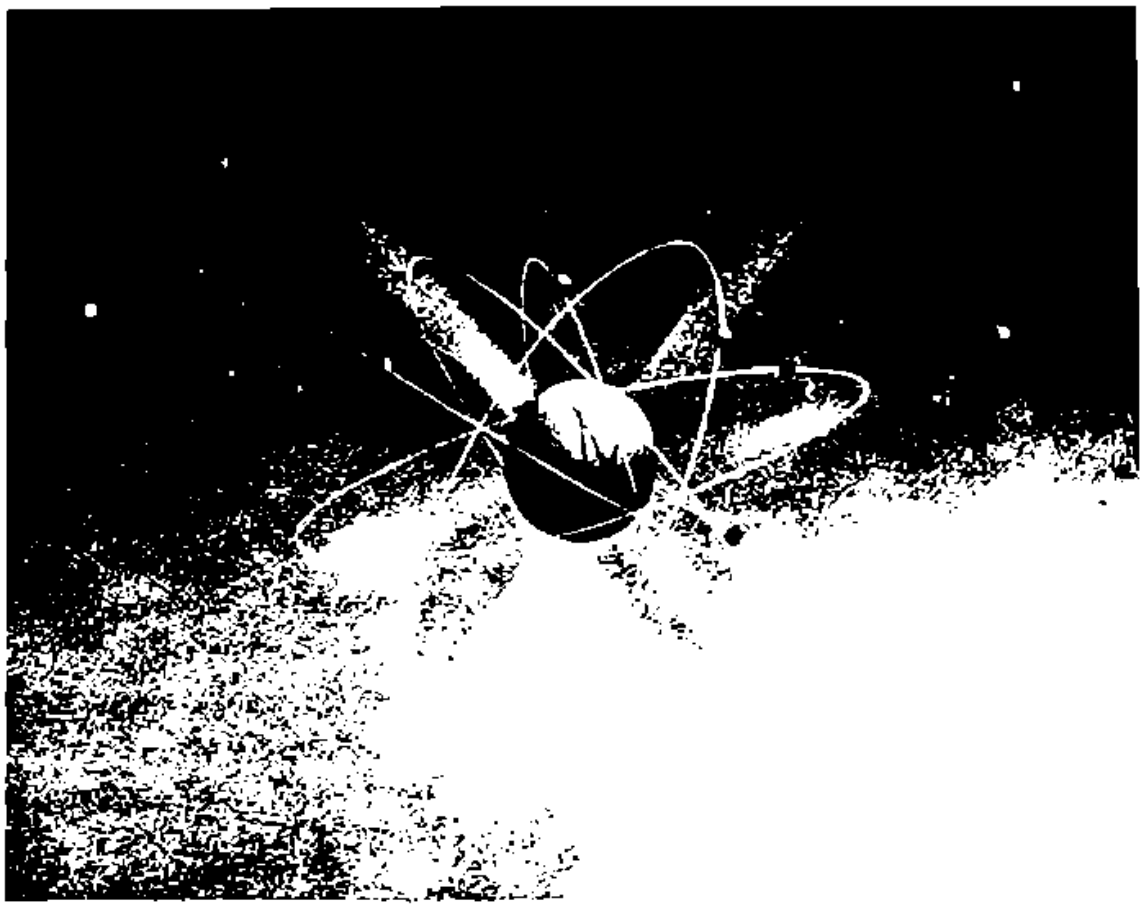

পরমাণুর আভ্যন্তরীণ গঠন। ভিতরের বড় গোলাকার বস্তুটি নিউক্লিয়াস বাইরের ছোট গোলাকার বস্তুগুলি ইলেকট্রন।

পদার্থের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সন্ধান পেলেন। এরূপ ভাবে ভাঙনের ব্যাপারটাকে বলা হয় 'ফিসন'। এই ফিসন অর্থাৎ ভাঙনের ফলে প্রচণ্ড শক্তি উৎপত্তির প্রমাণও পাওয়া গেল। হিসাবে দেখা গেল, ভাঙনের পর কেন্দ্রীয় পদার্থের খানিকটা কম পড়ছে। সেই পদার্থটুকুই ধ্বংস হয়ে প্রচণ্ড শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই অভাবনীয় আবিষ্কারের ফলেই পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যে আণবিক বোমা ও রিয়্যাক্টর বা পারমাণবিক চুল্লী নির্মাণের সম্ভাবনা কার্যকরী হয়েছিল। তারপর মিত্র-শক্তির বৈজ্ঞানিকদের সমবেত প্রচেষ্টায় পরমাণু-শক্তিকে ধ্বংসাত্মক কাজে লাগাবার যে ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হলো তার ভয়াবহ বাস্তব রূপ দেখা গেল ১৯৪৫ সালে হিরোসিমার উপর প্রথম অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণে। ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর কেন্দ্রীয় বস্তু অর্থাৎ নিউক্লিয়াস ভাঙনের ফলে অ্যাটম বোমা থেকে প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হয়; কাজেই একে ইউরেনিয়াম বোমাও বলা যেতে পারে। ইউরেনিয়াম বোমার পর প্লুটোনিয়াম বোমার আবির্ভাব হয়। তারপরে, মাত্র কিছুকাল আগে, অ্যাটম বোমার চেয়ে বহুগুণ শক্তিসম্পন্ন হাইড্রোজেন বোমার আবির্ভাব ঘটেছে।

পরমাণু থেকে এই যে প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হয়, একে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজনীয় কাজে কেমন করে লাগানো যেতে পারে, অ্যাটম বোমার আবির্ভাবের পূর্বেই সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম কল্পনা করে-ছিলেন। অতি উৎসাহী একজন লিখেছিলেন—যদি আমরা পরমাণু-শক্তিকে আয়ত্তে আনতে পারি তবে আমাদের ব্যবহারিক জীবনের প্রায় সব রকমের সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে। একজন গণিতের অধ্যাপক বলেছিলেন—পরমাণু-শক্তি আমাদের আয়ত্তাধীন হলে ইচ্ছামত যে কোন পদার্থের রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হবে। এক ডেলা চিনি থেকে এত শক্তি সংগ্রহ করা যাবে যাতে মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর বুকে বিসুভিয়াসের মত প্রকাণ্ড একটা গর্ত সৃষ্টি করা মোটেই অসম্ভব হবে না। ১৯২৮ সালে অধ্যাপক লিওনার্ড হিসাব করে দেখেছিলেন যে, এক ছটাক তেলের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে যে প্রচণ্ড শক্তি পাওয়া যাবে তাতে মরিটেনিয়ার মত জাহাজও আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিতে পারবে এবং পঞ্চাশ লক্ষ টন কয়লা পুড়িয়ে যে শক্তি পাওয়া যাবে, এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম ধ্বংস করতে পারলেও ততটা শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব হয়।

যাহোক, অ্যাটম বোমার অভাবনীয় শক্তি-উৎপাদক ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়ার পর বৈজ্ঞানিকেরা পরমাণু-শক্তিকে ধ্বংসের কাজে না লাগিয়ে মানব-কল্যাণে গঠন-মূলক কাজে নিয়োজিত করবার উপায় উদ্ভাবনে মনোনিবেশ করেন। এর ফলে নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টর বা পারমাণবিক চুল্লীর আবির্ভাব ঘটে। এই রিয়্যাক্টরের সাহায্যে প্রচণ্ড তাপ সৃষ্টি করে আজকাল আমাদের ব্যবহারিক জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই বহুবিধ কাজ চালানো হচ্ছে। ইতিমধ্যেই বৈজ্ঞানিকেরা কৃষি, শিল্প, চিকিৎসা এবং যান্ত্রিক ব্যাপারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে অভাবনীয় কৃতিত্ব প্রদর্শনে সমর্থ হয়েছেন। পরমাণু-শক্তিকে মানুষের আয়ত্তে আনা এবং বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের ইতিহাস যেমন বিরাট তেমনি বিস্ময়কর। সেসব বিষয় সংক্ষেপে পর্যালোচনা করাও সম্ভব নয়। তবে মানব-কল্যাণে এই শক্তি কতটা প্রযুক্ত হয়েছে সে সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে দু-একটি কথা আলোচনা করবো। এ বিষয়ে আলোচনার আগে, কেমন করে পরমাণু থেকে শক্তি আহরণ করা হয়, সে সম্বন্ধে মোটামুটি দু-একটি কথা বলা দরকার।

কয়লা বা তেল পুড়িয়ে আমরা তাপ উৎপাদন করি। সেই তাপে জল বাষ্পে পরিণত হয়। সেই বাষ্পের সাহায্যে আমরা কল চালাই, ইঞ্জিন চালাই জাহাজ চালাই। কাজেই তাপ হলো মূল শক্তি। পরমাণু-শক্তিও তাপরূপেই প্রকাশ পায়; কিন্তু এই তাপ উৎপাদন প্রণালী সম্পূর্ণ পৃথক। সামান্য পরিমাণ কোন পদার্থকে কোন উপায়ে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করতে পারলে

সেই বিলুপ্ত পদার্থটুকু প্রচণ্ড শক্তিতে পরিবর্তিত হয়। এই শক্তি তাপরূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু কথা হচ্ছে—কি ভাবে পদার্থকে ধ্বংস করে তাকে শক্তিরূপে আহরণ করা সম্ভব? যে কোন পদার্থকেই ধ্বংস করবার উপায় জানা নেই. তবে ইউরেনিয়াম ধাতুর অতি সামান্য অংশকে মাত্র ধ্বংস করে শক্তিতে রূপান্তরিত করবার উপায় জানা গেছে এবং সেই উপায় অবলম্বনেই অ্যাটম বোমা ও রিয়াক্টর থেকে শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে।

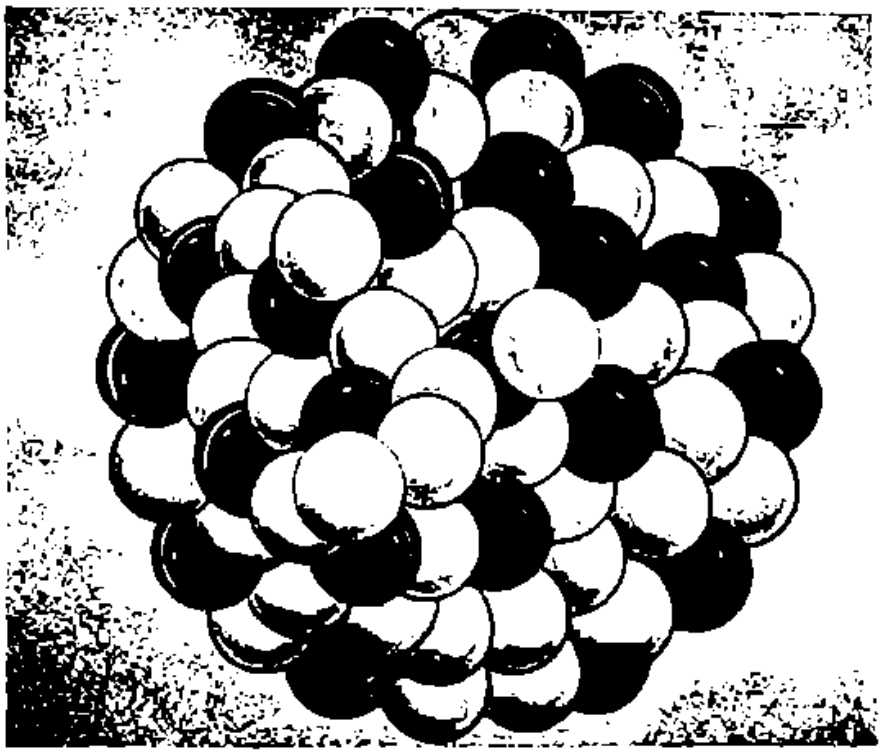

নিউক্লিয়াসের ভিতরে প্রোটন (কালো) এবং নিউট্রন (সাদা) কণিকাগুলি এভাবে সজ্জিত থাকে। ক্যাডমিয়াম নিউক্লিয়াস।

কথাটা আর একটু খুলে বলা দরকার। ইউরেনিয়াম ধাতুটির মধ্যে ২৩৪, ২৩৫ এবং ২৩৮, এই তিন রকম ওজনের পরমাণু দেখা যায়। ২৩৫ ওজনের ইউরেনিয়াম পরমাণুকে নিউট্রন কণিকা দিয়ে আঘাত করলে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। সংঘাতের ফলে পরমাণুর কেন্দ্রীয় পদার্থ থেকে দু-একটি কণিকা বেরিয়ে গিয়ে পরমাণুটির সাম্যাবস্থা আসবার পরিবর্তে মোটা-রকমের পদার্থটাই ছোট-বড় দু খণ্ডে ভেঙে যায়। এর ফলে বিভাজিত পরমাণু থেকে কয়েকটি নিউট্রন নির্গত হয়। এই নিউট্রনগুলি অন্যান্য ইউরেনিয়াম পরমাণুর সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটিয়ে সেগুলিকে ভেঙে ফেলে। একে বলা হয় শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া ঘটে অতি অল্প সময়ের মধ্যে। এই হলো পরমাণুর বিস্ফোরণ বা ভাঙন প্রক্রিয়া। এর ফলে যে প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হয় তাকে নিয়ন্ত্রণ না করা চলে তা থেকেই আসে অ্যাটম বোমার ধ্বংস শক্তি। আর এই শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে অন্য রকমের শক্তিতে রূপান্তরিত করবার পর মানব-কল্যাণে বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত করা যায়। কিন্তু কথা হচ্ছে—ভাঙনের ফলে পরমাণু থেকে এত শক্তি নির্গত হয় কেমন করে? পরীক্ষার ফলে জানা গেছে—ভাঙনের

ফলে যে সব পদার্থ উৎপন্ন হয় তাদের মোট ওজন মূল পরমাণুর ওজনের চেয়ে কিছুটা কম। এই কমতি অংশটুকুই বিলুপ্ত হয়ে শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং সেই শক্তিই তাপরূপে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমানে ইউরেনিয়াম ২৩৫ এবং প্লুটোনিয়ামই পারমাণবিক শক্তির উৎসরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে; তাছাড়া শক্তি উৎপাদনের কাজে থোরিয়াম ব্যবহারেরও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে।

অ্যাটম বোমার শক্তি উৎপাদনের কাজে শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম ২৩৫-কে সাধারণ ইউরেনিয়াম থেকে পৃথক করে নিতে হয়; কিন্তু রিয়্যাক্টরে ব্যবহারের জন্যে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম ২৩৫-এর পরিবর্তে প্রায় আধা-আধি থাকলেও চলে। রিয়্যাক্টর থেকে আলো ও তাপরূপে প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হয়। প্রচণ্ড বেগে নিউট্রন কণিকা নির্গত হতে থাকে এবং গতিবেগ মন্থর করবার জন্যে সেগুলিকে বিশুদ্ধ গ্র্যাফাইটের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। রিয়্যাক্টরে বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম ২৩৫ ব্যবহার করলে অধিকাংশ পরমাণুর মধ্যে শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়ার ভাঙন ঘটবার ফলে যে ধারণাতীত তাপশক্তি উৎপন্ন হবে তাতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবার সম্ভাবনা। ক্যাডমিয়ামের সাহায্যে রিয়্যাক্টরের শক্তি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

রিয়্যাক্টরকে পারমাণবিক চুল্লী বলা যেতে পারে। রিয়্যাক্টর থেকে যেমন তাপরূপে প্রচণ্ড শক্তি নির্গত হয় তেমনই উৎপন্ন হয় প্লুটোনিয়াম ও অন্যান্য তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। আজকাল কৃষি, শিল্প ও চিকিৎসার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে পরমাণু শক্তির ব্যবহার হচ্ছে তার মূল উৎস হলো এই তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ। রিয়্যাক্টরে উৎপন্ন তাপ-শক্তি কি ভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে—সে বিষয়ে সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলছি। রিয়্যাক্টরের প্রচণ্ড তাপে জলকে বাষ্পে পরিণত করে তার সাহায্যে ডায়নামো চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হচ্ছে। তাছাড়া অদূর ভবিষ্যতেই এই ব্যবস্থায় জাহাজ, বিমান ও কলকারখানা চালানো সম্ভব হবে বলেই মনে হয়। ইতিপূর্বেই রিয়্যাক্টর-চালিত সাবমেরিনের খবর জানা গেছে। ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স্ নৌবহরের নটিলাস নামক সাবমেরিনের কথা অনেকেই অবগত আছেন। নটিলাসের পরিচালন শক্তির উৎস হচ্ছে—রিয়্যাক্টর। এই রিয়্যাক্টরে প্রায় বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম ২৩৫ আলানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রিয়্যাক্টরের উচ্চ তাপে জল থেকে বাষ্প তৈরী করে টারবাইন চালানো হয়। কিন্তু এর একটা প্রধান অসুবিধা এই যে, রিয়্যাক্টর এবং তার অনিষ্টকারী রশ্মি-প্রতিরোধক বেষ্টনী প্রভৃতির জন্যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে যায়; তাছাড়া এ সবের ওজনও খুব বেশী।

আইসোটোপের সাহায্যে পরমাণু শক্তিকে কেমন করে মানব-কল্যাণে নিয়োগ করা হচ্ছে এখন তার একটু আভাস দেওয়া দরকার। আইসোটোপ বলতে কি বুঝায় সেটাই আগে দেখা যাক। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ড্যাল্টন বলেছিলেন, যে কোন মৌলিক পদার্থের প্রত্যেকটি পরমাণু একই রকমের এবং একই ওজনের হবে। আধুনিক রসায়ন বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি গড়ে উঠেছিল এই তত্ত্ব এবং অপর কয়েকটি তত্ত্বের উপর। এই সূত্রানুসারে প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের পারমাণবিক ওজন অখণ্ড অর্থাৎ পূর্ণসংখ্যক হওয়া দরকার, ভগ্নাংশ হতে পারে না। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল, অনেক ক্ষেত্রেই এর ব্যতিক্রম ঘটে। ক্লোরিন (৩৫·৪৬), তামা (৬৩·৫৪), দস্তা (৬৫·৩৮), প্ল্যাটিনাম (১৯৫·২৩) প্রভৃতির কথা দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। এর একটি মাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে এই যে, এসব মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি পরমাণু সমান ওজনের নয়। কিন্তু ড্যাল্টনের মতের বিরুদ্ধে বলে এই ধারণা পরিত্যক্ত হয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কারের ফলে পণ্ডি একই মৌলিক পদার্থের বিভিন্ন ওজনের পরমাণুর অস্তিত্বের কথা প্রকাশ করেন এবং একই মৌলিক পদার্থের একই রকম রাসায়নিক প্রকৃতিবিশিষ্ট বিভিন্ন ওজনের পরমাণুর নাম দেন—আইসোটোপ। পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, অধিকাংশ মৌলিক পদার্থেই বিভিন্ন ওজনের আইসোটোপের অস্তিত্ব রয়েছে। যেমন সাধারণ ক্লোরিনের মধ্যে ৩৫ ও ৩৭

মহাবলিপুরম
শ্রী সালেশ্বরের গুহাবলেশ

শ্রীরঙ্গনাথের মন্দির

দ্রৌপদীর রথ
মহাবলিপুরম্

দ্রৌপদীর
মহাবলিপুরম

মহাবলিপুরম

ছয়দিনে বার্লি-চারার উপর রেডিওথ্যাকটিভ ফসফরাসের বিকিরণের প্রভাব। বাঁ থেকে ডানে ক্রমশঃ বিকিরণের প্রভাব কমিয়ে আনা হয়েছে।

ওজনের দু' রকমের পরমাণু দেখা যায়। অথচ পৃথক পৃথক ভাবে উভয়ের মধ্যে ক্লোরিনের একই রাসায়নিক গুণ বিদ্যমান। আবার তেজস্ক্রিয় ধাতু ইউরেনিয়ামের আছে ২৩৪, ২৩৫ এবং ২৩৮—এই তিনটি আইসোটোপ।

যা হোক, বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে তেজস্ক্রিয় পদার্থের আইসোটোপ নিয়ে। কারণ বর্তমানে কৃষি, শিল্প ও চিকিৎসায় যে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে তার প্রধান উৎস হলো তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ—যাকে আমরা রেডিও আইসোটোপ বলে জানি। যদি স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া কয়েকটি মাত্র আইসোটোপের উপরই আমাদের নির্ভর করে থাকতে হতো তবে মানব-কল্যাণে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রও খুবই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তো। কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা এমন কতকগুলি উপায় আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছেন যাতে

করা,
এই
আণবিক শক্তি ভেঙে দিয়ে ক্ষয়
হয় বলে একে বলা হয়
পরমাণুর নিউক্লিয়াসের
নিউক্লিয়াসে পরিবর্তিত করা হয় এবং
কেই কৃষি, শিল্প ও চিকিৎসায় নানাভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অবশ্য বিস্ফোরণ থেকে উৎপাদিত নিউট্রন কণিকার পরিবর্তে সাইক্লোট্রন প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে প্রোটন, ডয়টেরন অথবা আলফা কণার গতিবেগ বৃদ্ধি করে তাদের সাহায্যে তেজস্ক্রিয় পরমাণু উৎপাদন করা যেতে পারে কিন্তু বিস্ফোরণের তুলনায় সে ব্যবস্থা বড় ব্যয়-সাপেক্ষ। এ পর্যন্ত ৭০০রও বেশী কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ তৈরী করা সম্ভব হয়েছে।

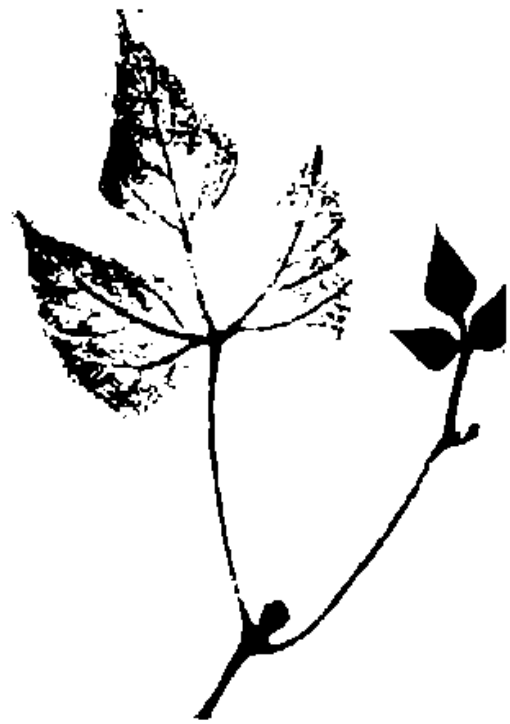

[রেডিও আইসোটোপ (ফসফেট) দিয়ে উদ্ভিদের পরীক্ষায় কালো অংশগুলিতে বেশী পরিমাণ ফসফেট জমা হয়েছে।]

পি ইউটন নিঃসৃত হয় তারসঙ্গে স্যোই সাধারণ রৌদ্রিক পদার্থে থেকে রেডিও আইসোটোপ উৎপন্ন হয় যেমন থেকে উৎপন্ন হয় কোবাল্ট ৬০, অর্থাৎ রেডিওকোবাল্ট। এই রেডিও কোবাল্ট চিকিৎসা ও অন্যান্য কাজে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে। রেডিও কোবাল্ট অতিকাল এক্স-রে ফটোগ্রাফী এবং রেডিয়াম চিকিৎসার স্থান গ্রহণ করেছে। কোন কোন রেডিও আইসোটোপ থেকে এত তীব্র গামা-রশ্মি নিঃসৃত হয় যে, সেগুলি ছয় ইঞ্চি পুরু পাইপের ভিতর দিয়ে শত শত মাইল দূরে বিভিন্ন রকমের তেল পাঠানো হয়। দুটি তেলের সঙ্গমস্থলে সামান্য একটু রেডিও আইসোটোপ দিয়ে কখন কোন্ তেল আসছে বা কখন কোন্ তেল আসা শেষ হলো, গাইগার কাউন্টার যন্ত্রের সাহায্যে তা অনায়াসেই ধরা যেতে পারে।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক্স-রে ছবির মত ছবি তোলবার ব্যাপারে রেডিও কোবাল্টের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন রকমের রোগের প্রতীকার ও রোগ-

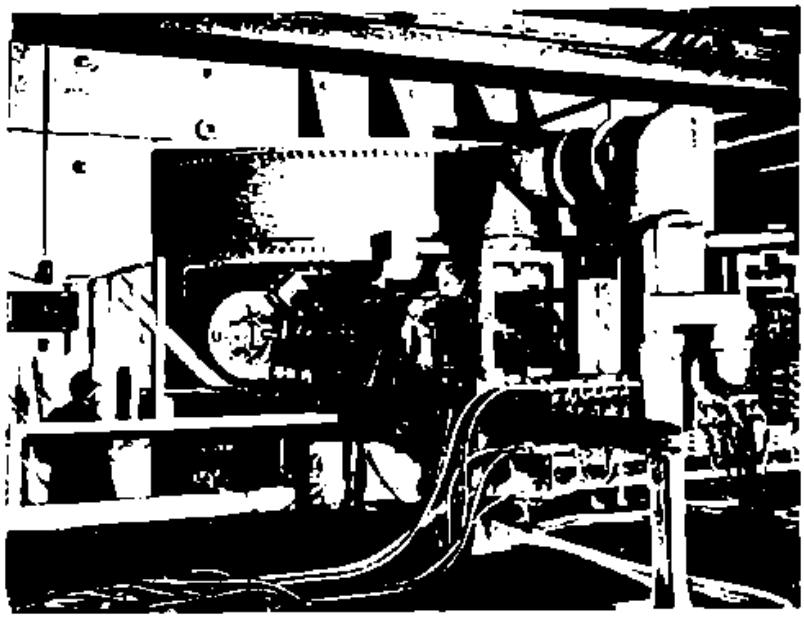

সাইক্লোট্রন যন্ত্র

ইস্পাতে অনায়াসে ভেদ করে যেতে পারে। এই রকমের আইসোটোপগুলিকে ধাতব পদার্থের রেডিওগ্রাফীর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ঢালাই-করা ধাতব পদার্থ বা ওয়েল্ড-করা জিনিসে কোন ত্রুটি আছে কিনা, সেটা ধরবার জন্যে রেডিও কোবাল্টের ব্যবহার খুবই সাফল্য লাভ করেছে। রেডিও আইসোটোপের সাহায্যে তৈরীর কাজ চলবার সঙ্গে সঙ্গেই ধাতুপাত এবং কাগজ ইত্যাদি সবত্র সমান পুরু আছে কিনা তা অনায়াসেই জানা যায় এবং ত্রুটি থাকলে তৎক্ষণাৎ সংশোধনের ব্যবস্থা করা যায়। একই নির্দেশের ব্যাপারে রেডিও আইসোটোপ আজকাল চিকিৎসকের প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তেজস্ক্রিয় লৌহ খাইয়ে দিয়ে অথবা ইনজেকসন করে দেখা হয়—কিভাবে এবং কোন্ কোন্ স্থানে সেটা রোগীর দেহে সঞ্চারিত হয়। এর ফলে বুঝা যায়, রোগীর দেহে কতটা নতুন রক্তকোষ তৈরী হচ্ছে এবং তাতে কতটা সময় লাগছে। রক্তাল্পতা রোগের ধরণ এবং কারণ অনুসন্ধান করবার জন্যে ভিটামিন বি১২-এর সঙ্গে রেডিও কোবাল্ট মিশিয়ে রোগীকে দেওয়া হয়। রেডিও অ্যাকটিভ

ছাদওয়েলে স্থাপিত পরীক্ষামূলক রিয়াক্টর।

ছাড়ে অ্যাকটিভ
ট্রেসারের সাহায্যে আরও অন্যান্য চিকিৎসা এবং খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে অনেক উন্নতি-সম্ভব হয়েছে। রেডিও অ্যাকটিভ কার্বন ও ফসফরাসের সাহায্যে উদ্ভিদের পুষ্টি বৃদ্ধি ও ফলোৎপাদন প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কিছু ব্যাপার সঠিক ভাবে জানা সম্ভব হয়েছে। মাটি বা সারের সঙ্গে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ মিশিয়ে দিলে উদ্ভিদের কোন্ স্থান দিয়ে কোন্ পদার্থ যায় এবং কোন্ পদার্থ কোন্ স্থানে অবস্থান করে, পরিষ্কারভাবে তার সন্ধান পাওয়া যায়। তাছাড়া তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের বিকিরণের প্রভাবে উদ্ভিদের পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নততর উদ্ভিদ উৎপাদনের সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে মোটের উপর, মানুষ পরমাণু-শক্তিকে কল্যাণমূলক কাজে লাগাবার প্রচেষ্টার প্রথম ধাপেই যেরূপ সুফলের পরিচয় দিয়েছে তাতে মনে হয়, অদূরভবিষ্যতে এর প্রভাব আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পরিব্যাপ্ত হবে।

আয়োডিন, থাইরয়েড সম্পর্কিত রোগ নিবারণ ও প্রতীকারে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গেই ব্যবহৃত হচ্ছে। শরীরের দ্রুত বর্ধন-শীল তন্তুগুলির মধ্যে ফসফরাসের আধিক্য দেখা যায়। কাজেই শরীরের কোন কোন তন্তুর অতিবৃদ্ধি-জনিত বিশেষ বিশেষ রোগ প্রতিকারে রেডিও ফসফরাস ব্যবহার করে খুব ভাল ফল পাওয়া যাচ্ছে। অস্থি-মজ্জার এক রকম রোগ প্রতীকারের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা জানা ছিল না। রেডিও ফসফরাস ইনজেকসনে এই রোগ প্রতীকারের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। ক্যান্সার প্রভৃতি যে সব রোগে এতদিন রেডিয়াম ব্যবহৃত হতো, সে সব ক্ষেত্রে রেডিয়ামের পরিবর্তে এখন তেজস্ক্রিয় স্বর্ণ, কোবাল্ট, ট্যান্টেলাম প্রভৃতি

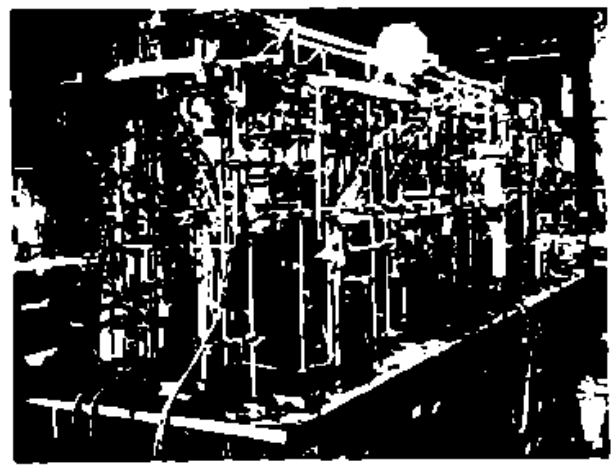

সিনফিল্ডের আইসোটোপ লেবরেটরীর একাংশের দৃশ্য।

ফুটবলের অন্তরীক্ষে

[গল্প]

শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়

সমস্ত সহরটা গমগম করছে ; আজ এদের একটা ফুটবল কম্পিটিশনের ফাইনাল।

জায়গাটা একটা রেলের কলোনী। রেল থেকেই কম্পিটিশনটা চালায়। ব্যবস্থা ভালো। মাঠটা করগেটেড টিন দিয়ে ঘেরা, ভেতরে গ্যালারী আছে বসবার জন্য মাঠের দু'দিকে। টিকিট চার আনা আর দু'আনা করে।

এখানে দিন দুয়েকের জন্য একটা কাজে এসেছি। বাজারে কাজ, বিকালে ফুটবলের জন্য শুনলুম দোকান-পাট বেশীর ভাগ বন্ধই থাকে, তাহলে খেলাটাই না হয় দেখে আসা যাক তাহলে। টিম দুটো শুনলুম ভালো, বসবার ব্যবস্থাও রয়েছে, ঘণ্টাখানেক সময় ভালোই কাটবে।

যেতে যেতে কিন্তু উৎসাহ কমে আসতে লাগল। যতই এগুচ্ছি, এদিক দিয়ে, ওদিক দিয়ে, সেদিক দিয়ে লোকের ভীড় যেন ততই চাপ বেঁধে আসছে। হন হন করে চলেছে সবাই, মুখে নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রভাষায় খেলার আলোচনা—কালপরশু যে সেমি-ফাইনাল দুটো গেল, তার আগেরও, সেগুলো একটু বিশিষ্ট ছিল। আজকের খেলা নিয়েও জল্পনা – কোন্ টিমের কে নামী খেলোয়াড়, কিরকম চাল্ ; তারপর রেফারী। আমায় পেছনে ফেলে সবাই চলেছে এগিয়ে, ভদ্রভাবেও নয়, ধাক্কাধুক্কি, কনুইএর গুঁতো ক্রমেই যাচ্ছে বেড়ে। ইচ্ছাকৃত অসদাচরণ নয় হয়তো, তবু উৎসাহ আসছে ক'মে, এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকিট কিনে ভেতরে প্রবেশ করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে কি ? কাউন্টারের কিরকম ব্যবস্থা তাও তো জানা নেই। এদিকে ভীড় ঠেলে ফেরাও যেন ক্রমে অসম্ভব হয়ে উঠছে। তারপর অবস্থাটা বুঝে নেওয়ার জন্য ভীড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে একটু পাশে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় একটি ছোকরা মনের কথা জেনে নিয়েই যেন পাশাপাশি এসে মুখ তুলে প্রশ্ন করল—"ফিরে যাবেন নাকি স্যার ?"

একবার সামনের জনস্রোতের দিকে চেয়ে নিয়ে বললুম – "তাই তো মনে করছি।"

ছোকরা একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল, বলল—"কেন ? কি দুঃখে শুনি ? টিকেট করার ভাবনা ? তবে আমি রয়েছি কি করতে ?···একখানা যাকে বলে খেলা হবে—ওদিকে দাসগুপ্ত—সেন্টারে, এ তরফে ইয়াসিন, হাকে, আগুন ছুটে যাবে। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।"

প্রশ্ন করলুম—"পারবে কিনতে টিকিট ?"

কামিজের পিঠটা সামনে টেনে ধরল—প্রায় আধা-আধি ছেঁড়া ; হেসে বলল—"সাড়ে টিকিট দেখলে তো বিশ্বাস করবেন ? কালকের সেমিফাইনালে।···আসুন আপনি। "তবে একটু পা চালাতে হবে।"

ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে ছিপছিপে অথচ বেশ পেশী বহুল শরীরটা ক্ষিপ্রভাবে দোলাতে দোলাতে এমন সটসট করে এগিয়ে যেতে লাগল সে, আমার আর বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না। কাছাকাছি এসেও পড়েছিলাম মাঠের, একটা কাউন্টার থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে হাত পেতে বলল—"এবার দিন স্যার।"

ব্যাগ খুলে আটটা এক আনি বের করে হাতে দিলুম। তেলোয় বিছিয়ে নিয়ে একটু ভালো ক'রে পরখ ক'রে—"অচল কিছু থাকে তো দিন না। সোঁৎ বছরে এই একটা

চাল—আট আনি, দো-আনি, চার আনি।...খুটিয়ে দেখবার সময় পায় নাতো।" চোখের কোণ টিপে একটু হাসল।

বললুম—"ঐ নিয়ে যাও তুমি।"

কিউ জাতীয় কিছু নয়। চাপ ভীড়, চাপের চোটে লোকের ঘাড়ে পর্যন্ত লোক উঠে গেছে এক এক জায়গায়, অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে ছোকরা ঢুকে পড়ল তার মধ্যে দেখা গেল, সে মিনিট খানেকও নয়, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল।

বেরিয়ে আসতে মিনিট পাঁচেক লাগল। চেনা যায় না অমন সযত্নে তেল চুকচুকে ক'রে আঁচড়ানো চুল কি হয়ে গেছে, সর্বাঙ্গে ঘাম, মুখটা রাঙা হয়ে গেছে, নাকের কাছটা ছড়ে গিয়ে একটা রক্তের টানা দাগ; জামার পেছন দিকটা আর ছেঁড়া নয়, প্রায় আধা-আধি উড়ে গেছে একেবারে।

একখানা টিকিট হাতে দিয়ে বলল—"দেখলেন তো স্যার? পৃথিবীতে কিছু শক্ত নয়; হদিসটুকু জানলেই হোল।...অধীনের নাম গোকুল।" প্রশ্ন করলুম—"ভেতরে গিয়ে বসতে পারব তো একটু।" "আপনার মনে হবে রাজ-সিংহাসনে বসে আছেন; আমি আছি নাহলে কি করতে? আসুন...এই দিকে।"

গেটের বকেয়াটুকুও ওই সামলালে, তারপর ভেতরে কোথায় এসে দাঁড়ালুম আমরা, দেখলুম এখন পর্যন্ত ভীড় যা জমেছে তা বেশীর ভাগ দু'আনার টিকিটের-ই। গ্যালারী ভরে নি, মাঝে মাঝে বেশ ফাঁকও আছে। এগিয়ে উপরে উঠে যাব, গোকুল বিড়ি ধরাচ্ছিলো, জিজ্ঞেস করল—"ওপরে যাচ্ছেন, আপনি নামবেন না?"

প্রশ্নটা একটু দুর্বোধ্য ঠেকল, একটু হেসে বললুম—"নামব না মানে?...আমি ত খেলছি না। ওপরেই সুবিধে জায়গা যখন রয়েছেই। তা ভিন্ন দরকার পড়লে ছাতাটাও খোলা যাবে।...তুমি চাওতো নিচের সারিতেই বলো না হয়; পৌঁছে তো দিলে আমায় একরকম ক'রে।"

আর একটা দেশলাই কাঠি জেলে বাঁ-হাতটা ওপর দিয়ে বাড়িয়ে দিল, অর্থাৎ—এক্ষুনি আপনি। তারপর বিড়িটা ভালো ক'রে ধরিয়ে নিয়ে উঠে এল। বলল—"ঠিক তো। আপনি তো আর নামতে যাচ্ছেন না। নিচে থাকলে একটা লাফ দিয়েই ভেতরে ঢুকে পড়া যায়, তাতে সুবিধে অনেক। তা হোক, এখানেই বসি আজ, আপনাকে নিয়ে এদুম, খেলার মুখ থেকে ঘুরিয়ে, একটা ঝুঁকি নেওয়া হোল তো।"

জিগ্যেস করলুম—"অ্যারেস্ট হয় নাকি?"

বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে বলল—"বাবা নেই; তবে কখিচ কখনও।...আপনি আপনার পার্টি নিয়ে দু'কথা বললেন, আমি আমার পার্টি নিয়ে দু'কথা বললুম, কারুরই কারুর কথা বরদাস্ত হোল না, আপনার মুখ দিয়ে বেফাঁস একটা কথা বেরিয়ে গেল; ওদিকেও কিছু লোক ছুটে গেল, এদিকেও কিছু লোক ছুটে গেল...ইতিমধ্যে ওদিকে একটা গোল, কি হাপ-সাইড, কি প্লেন্‌টি; আপনিও ঘুরে দেখতে লাগলেন আবার, আমিও ঘুরে দেখতে লাগলুম।...হয়, তবে আজ তো দু'টো দলই বাইরের—কে কার হয়ে বলবে বলুন। তাই আজ সবার ভাগ বেশি করে অল্প অল্প জায়গায়!...ছাতাটা দিন স্যার এবার।"

প্রশ্ন করলুম—"কি করবে?"

"আপনি শুধু দেখে যান কি করি। ভেবেছেন এরকম খালি থাকবে বাকি? আজ আবার ফাইনাল তো।"

ছাতাটা নিয়ে তার কাপড়টা যথাসম্ভব টেনে চওড়া করে নিয়ে আমার ডান পাশটাতে রেখে দিল। তারপর নিজের ছেঁড়া কুর্তাটা খুলে জড়োসড়ো করে আমার বাঁ পাশে রেখে দিয়ে বলল—"এবার ছেড়ে দিক কত লোক ছাড়বে।"

আমি ছাতাটার দিকে চেয়ে নিয়ে প্রশ্ন করলুম—"মানবে? রেখে তো দিলে, আবার ঘুদিকে।"

"না মেনে উপায়? এই তো আমি মেনেছি।"

ছাতার পরও খানিকটা জায়গা ছেড়ে বসে পড়ল। বলল—"আপনার দুজন লোকের জায়গা রাখতে হয়েছে—অফিস বন্ধ হওয়ার পর তারা আসবে, সবাই তো ফুটবল নিয়েই নেই।...ছাতা সরিয়ে তোমার জায়গাটুকু দিয়ে দিতে হবে? আবদার কম নয় তো!...একটু বোলচাল

দিতে হবে আর, দেখছেনই তো, ভালোমানুষের দুনিয়া নয় এটা। আর আমিও তো পাশেই রয়েছি। আমি ভদ্দরলোক দেখে সে জায়গাটা ছেড়ে দিয়ে বসে আছি, আমায় ডিঙিয়ে সেখানে গিয়ে কেউ বসলে বরদাস্ত করব কেন ?···আপনি বিনা উজুরে বসুন। হদিস না জানলে একটা ভদ্দরলোকের ঝুঁকি খামোকা নিতে গেলুম কেন বলুন ?"

খানিকটা অস্বস্তিকর তো বটেই, তবু বেশ একটু কৌতুকবোধ করছি। প্রশ্ন করলুম—"তুমি না হয় ডান দিকটা সামলালে, বাঁ দিকটা ?"

গোকুল মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভীড়ের মধ্যে কি যেন খুঁজছিল, হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল—"এখানে রে, লোংচা। আমি এখানে, উঠে আয় !"

ওদিকে ভীড়ের মধ্যে থেকে ওরই সমবয়সী একটা ছোকরা হাত তুলল, তারপর একজন প্রৌঢ় গোছের ভদ্রলোকের হাত ধ'রে ভীড় থেকে বেরিয়ে এসে গ্যালারীতে উঠে এল। আমার মনে হোল দুজনের মধ্যে খুব সূক্ষ্ম একটু দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল—যেন, তুই আজ এঁকে ফাঁসিয়েছিস ?···ওরা এসে দাঁড়াতেই গোকুল উঠে পড়ে আমার বাঁ দিক থেকে নিজের জামাটা তুলে নিল, বললে—"আসুন স্যার, এই যে আপনার জায়গা রিজার্ভ রাখা রয়েছে।"

বুঝলুম এরা এই ক'রে লোক ধরে ধরে ফুটবলের বরাতটা চালায়। বেশ দক্ষতাও অর্জন করেছে এতে। সুবিধা আছে বৈকি, কেননা আমার যারা তো টিকিট করে প্রবেশ করা কোন মতেই সম্ভব হোত না ; কিন্তু অপর পক্ষের সুবিধা যে ওরা সব সময় দেখে এমন মনে হোল না। সন্দেহটা হোল ভদ্রলোককে দেখেই—স্থূল শরীর, বেশ বয়স হয়েছে, চেহারায় খেলা দেখবার একটা আগ্রহ বা ঔৎসুক্য তিলমাত্র নেই, তার ওপর চোখে এমন মোটা চশমা যে গ্যালারীর ওদিকে ওঁর দৃষ্টি হাতখানেকও যাওয়ার কথা নয়। সন্দেহ হতে জিগ্যেস করলাম—সুবিধে হবে কি ওঁর এতদূর থেকে দেখা ?

পাশাপাশিই রয়েছি, তবুও মাথাটা আমার মুখের এত কাছে ঝুঁকিয়ে নিয়ে এলেন যে বুঝলুম কানের অবস্থা আরও খারাপ।

লাংচাই গলা বাড়িয়ে মুখটা আমার দিকে ঘুরিয়ে বলল—"এই এক ঝুঁকি নিয়ে হায়রাণ দেখুন না স্যার, নতুন মানুষ পথ হারিয়েছেন, রিকশাও পাচ্ছেন না, আজ সব এদিকেই তো। বললুম—ভীড়ের চাপে মারা যাবেন, তার চেয়ে ভীড় পাতলা হয়ে যাক, দিয়ে আসব সঙ্গে করে। আদ্ধেক মুখে বলে, আদ্ধেক ইসারা করে একটু এই ঘাটে টেনে তুলেছি। বসুন, ভীড় পাতলা হোক।

আমরা মিনিট কুড়ি আগে এসে পৌঁছেছিলাম, আরম্ভের সময়ই যত এগিয়ে আসতে লাগল, গ্যালারী আর চারি দিকের জায়গাগুলো ততই তাড়াতাড়ি ভর্তি হয়ে আসতে লাগল। গ্যালারীর সারি দুটো গোলের পেছন দিকে। মনে হোল আমাদের যে গ্যালারীটাতে এনে হাজির করেছে সেটাতে গোকুলের শ্রেণীর দর্শকই যেন বেশি। ওদিককার গ্যালারীটা যেন একটু ভদ্র—কতকটা কলকাতার হোয়াইট ষ্ট্যাণ্ডের মতো। ওদিকে গিয়ে বসতে পারলেই হোত ভালো ; কিন্তু ভীড় জমে উঠেছে। যেতেও হবে অনেকটা ঘুরে, জায়গাও কিরকম পাওয়া যাবে বলা যায় না : বসেই রইলাম।

মিনিট দশেক থাকতে এক এক করে দুটো টীম এসে নামল, তাদের অভ্যর্থনা ক'রে একটা কলরব উঠল চারিদিকে, তাদাটা অবশ্য পুরোপুরি অভ্যর্থনারই নয়, পাচ-মিশালী ; ওরা একটু প্র্যাকটিস ক'রে নিল, তারপর যথারীতি টসের পরে খেলোয়াড়দের সাজিয়ে হুইসিল বাজিয়ে খেলা আরম্ভ হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই একটা যে কলরোল উঠল একেবারে পঁচিশ মিনিটের মাথায় প্রথমার্ধের শেষে গিয়ে সেটা ঠাণ্ডা হোল। দূরের আওয়াজের তফাতগুলো বেশ স্পষ্টভাবে ধরা যায়, তবে আমাদের গ্যালারীর চীৎকার থেকে যতটা বুঝতে পারলাম দাশগুপ্ত কি রকম খেলছে কিম্বা ইয়াসিন কি রকম খেলছে সেদিকে মোটেই খেয়াল নেই এরা চায়

প্রতি মিনিটেই একটা ফাউল, কিম্বা হ্যাণ্ডবল, কিম্বা 'হাপসাইড' কিম্বা 'প্লেনটি' দিচ্ছে রেফারি। কি যে দেবে সে-সম্বন্ধেও কোনও মতৈক্য নেই, যে আওয়াজটা উঠছে আমাদের ঘিরে তাতে মনে হচ্ছে যেন সব কথাগুলাই একসঙ্গে উপস্থিত রয়েছে—তুমুল হট্টগোলের মধ্যে যার যে-কথাটা মনে আসছে সেই কথাটাই যেন বের ক'রে দিচ্ছে মুখ দিয়ে। একেবারেই কানের কাছে, গোকুল সেটাকে বলছে ফাউল, ল্যাংচা সেইটেকেই বলছে হ্যাণ্ডবল বা পেনালটি বা যা খুশি তাই। অভিমতের মধ্যে এরকম অরাজকতা কখনও দেখিনি। দাঁড়িয়ে উঠেছে সবাই, আমাদের শুদ্ধ উঠে দাঁড়াতে হয়েছে। কিন্তু খেলা দেখব কি, পদে পদেই এদের হট্টগোলে যেন বিভ্রান্ত ক'রে দিচ্ছে।

একটা গোল হল, পরিষ্কার। গোকুল "গোল!" বলে চেঁচিয়ে উঠল, ল্যাংচা চেঁচিয়ে উঠল—"নো গোল!" —প্যালারীর ওপর একটু লাফিয়েও উঠল। মনে হোল আরও সবার মধ্যে অভিমতটা এইরকম তাগাতাগি হয়ে গেছে আধাআধিতে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার অভিমতের পার্থক্য নিয়ে কারুর সঙ্গে কারুর মনোমালিন্য নেই। দেখলুম বিরুদ্ধ মন্তব্য নিয়ে চেঁচাবার সময় গোকুল আর ল্যাংচা পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে হাসছেও ওরই-মধ্যে।

বিশ্রামের সময় এলে রহস্যটুকু অনেক পরিষ্কার হোল। এতক্ষণ এত মেতে ছিল যে মানা করলেও কোন ফল হোত না, প্রশ্ন করলেও কোন উত্তর পাওয়া যেত না বিশ্রামের হুইসিল পড়লে গোকুল একটা বিড়ি বের ক'রে আমার পানে চেয়ে বলল—"নাঃ, গলাবাজিই সার হোল স্যার।"

বললুম—"তোমরা গলাবাজি করছিলে কেন ভাই তো বুঝলুম না। খেলাও পরিষ্কার হচ্ছে, রেফারিও ভালো, অথচ কিছু একটা হ'লেই পাঁচজনে পাঁচরকম বলে চেঁচিয়ে উঠছ। ব্যাপারখানা কি?"

গোকুল বিড়িটা ধরিয়ে একটা টান দিয়ে বলল—ল্যাংচা বলছে ফাউল, আমি সেইটুকেই বলব প্লেনটি, আপনি বললেন হাপ-সাইড, উনি বলবেন কর্নার, এর মধ্যে মস্ত একটা ইয়ে আছে স্যার—রেফরির মাথা গুলিয়ে যাবে কিনা..."

প্রশ্ন করলাম—"তাতে লাভটা কি?"

"অপরাধ নেবেন না, কিন্তু আপনি যে হাসালেন স্যার, শুধু লাভ দেখলেই কি চলে দুনিয়ার? ফুর্তি ব'লে কি কিছু থাকতে নেই, বলুন? পয়সা খরচ ক'রে এসেছি সব..."

বললুম—"খরচ ক'রে এসেছ তেমনি একটা ভালো খেলাও তো দেখছ।"

"খেলার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটা কি বলুন না স্যার? দুটো পার্টি খেলবে, তার মধ্যে একটা জিতবে, লীডটা ছাড়িয়ে খানিকটা চেল্লাবে, সেটা হারবে, ল্যাজ মুখে ক'রে বাড়িমুখো হবে। আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধটা কি? আমরা চাই একটু ফুর্তি; রেফারি পাঁচজনের পাঁচ রকম কথার মাথা গুলিয়ে গিয়ে একটা বেফাঁস কিছু ক'রে বসল—গোল-কিকের জায়গায় কর্ণার দিলে, কি কর্ণারের জায়গায় প্লেনটি দিয়ে বসল, একটা গোলমাল উঠল, বুঝলুম—হ্যাঁ পয়সাটা সার্থক হচ্ছে। হাপ-টাইম হয়ে গেল, তা একবার ফিল্ডের মধ্যে পা দিতে পারলুম না এ পর্যন্ত। এ খেলায় আমাদের কি বলুন না, যারা খেলছে তারা খেলছে।"

ল্যাংচাও একটা বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে ঘাড়টা বাড়িয়ে শুনছিল, বলল—"একে তো এবার ঐ রেফরিটুকু ওয়সা।

গোকুলকেই বললুম—"বুঝলুম না তো।"

বলল—"সাদা কথা স্যার, বোঝবার কিছু নেই তো। যেমন ধরুন পরশুকার খেলাটায় আমরা ছিলুম লেবেন ইষ্টার্ণ দলের দিকে, তা গা ক'রে ছিলুম লেবেন হিরোজের ওপর, আবার সদর বাজারের ওরা তাগ করে ছেল আমাদের ইষ্টার্ণসের ওপর—নিজের নিজের পাড়ার দল কিনা। আবার একটা বাইরের দল আর একটা লোক্যাল দল যদি রইল তো তাতেও কাজ হয়—তখন আবার পাড়া ভুলে আপনি আমি সবাই বাইরেরটার ওপর তাগ করে

থাকে কিনা। তা এবার দেখুন না কপালগুণে ছুটোই যা দাঁড়াল, কারুর সঙ্গে কারুর কোন সম্বন্ধই নেই, কাজেই তহবিল তো এখন ঐ রেকর্বিটুকু। তা দেখুন না, আধেক খেলা হয়ে গেল, ধরা ছোঁওয়া দিলে না এখন পর্যন্ত··· ফিল্ডে যে চুকবে লোকে তা একটা কিছু ছুতো চাই তো, চক্ষুলজ্জা আছে তো সবার।"

ল্যাংচা সেইরকম কতকটা বিমর্ষভাবে কি বলতে যাচ্ছিল এমন সময় আবার হুইসিল বেজে উঠল, সবাই হুড়োহুড়ি করে উঠে দাঁড়াল, কথাগুলো চাপা পড়ে গেল।

এবার যেন সবাই আরও প্রাণপণে চেষ্টা করল রেফারিকে বিভ্রান্ত করে তুলতে, বিশেষ ক'রে আমাদের এদিককার লোকগুলো। একটা পাল্টি প্রথমার্ধে ছুটো গোল দিয়ে অগ্রসর হয়ে ছিল, তারপর দ্বিতীয়ার্ধের গোড়াতেই আর একটা চালিয়ে দেওয়ায়—খেলার ধার ঘরে গিয়েছিল। ওদিক থেকে এদিকে মনটা এসে পড়ায় আমি একটা কথা ভেবে একটু অস্বস্তি অনুভব করছিলুম—ওতাদের কবলে পড়ে যাই নি তো? বিশেষ ক'রে চিন্তিত হয়ে উঠছিলুম ভদ্রলোকটির জন্য। একবার মনে হোল এ হাঙ্গামের মধ্যে থেকে বেরিয়ে যাই। তাহলে কিন্তু একাই যেতে হয়, ওঁর চক্ষুকর্ণের যে রকম অবস্থা তাতে, কথা ক'য়ে তো নয়ই, ইশারাতেও ওঁকে সে সম্বেহটা বোঝানো যাবে তার আশা কম। কি করব চিন্তা করছি, ইতিমধ্যে প্রায় দশ মিনিটের মাথায় এদিক থেকেও একটা গোল ক'রে দিতে, খেলাটাতে হঠাৎ একটা বেগ এসে গেল এবং আরও পাঁচ মিনিটের মধ্যে আরও একটা গোল শোধ দিয়ে দেওয়ায় সমস্ত খেলাটার চেহারাই গেল বদলে। ওদিক থেকে চিন্তাটা আবার মাঠের দিকে চলে গেল। শোধ হোক, তারপর দেখা যাবে।

অল্প সময়ই ছিল বাকি, প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা তীব্রতর হ'য়ে উঠতে উঠতে এত সময় হঠাৎ সমাপ্তির হুইসিলটা বেজে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে গ্যালারীর অমন চাপ ভীড় একটা বিরাট জলপ্রপাতের মতোই গেল উছলে নেবে, তারপর চারিদিককার ভীড়ের সঙ্গে উন্মুক্ত মাঠটায় পড়ল ছড়িয়ে।

এতক্ষণে গোকুলের 'নামার' অর্থটা বুঝতে পারলুম। গুরুমল যে গ্যালারীর একেবারে ওপরের থাকে গিয়ে বসেছিলুম, নয়তো অবস্থাটা যে কি হোত ভাবতেও শরীর হিম হয়ে আসে।

সমস্ত সঙ্কটটা ছুটি ছাতার ওপর দিয়ে গেল। ঠিক হুইসিল হবার সঙ্গে সঙ্গে হুজনে তড়িৎগতিতে আমাদের হুজনের ছাতা ছুটো কুড়িয়ে নিয়ে চক্ষের নিমিষে এমনভাবে ভীড়ের মধ্যে মিশে গেল যে ধরা ছুয়ের কথা, হাত বাড়াবারও সময় পেলুম না।

ভীড় নেমে যেতে পকেটগুলোয় হাত দিয়ে দেখলাম, না, যেখানকার যা ঠিকই আছে। ওঁর সঙ্গেও কথা কইবার ফুরসৎ হোল। ছাতাটা যে গেছে সেটা নেমে কুলতে গিয়ে টের পেলেন। বিহ্বলভাবে চাইতে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলুম, বললুম—"পকেট দেখুন, অল্পের উপর দিয়েই গেছে।

পকেট ঠিক আছে, কিন্তু টিকিট কিনতে একটা পাঁচ টাকার নোট দিয়েছিলেন, চেঞ্জ ফেরৎ দেয় নি তো। জিগ্যেস করতে বললেন—সময় দিলে কোথায় যে চাইবেন। ভীড়, তার ওপর শীত দেওয়ার অনুষ্ঠানটা রয়েছে, ঘেরাঘুরির মধ্য দিয়ে বেরুবার উপায় নেই। গ্যালারীতে বসেই যতখানি পারা গেল ব্যাপারটা আলোচনা করা গেল ওঁর সঙ্গে। ভীড় সম্বন্ধে একটা আতঙ্ক এসে গেছে, পাতলা হাওয়ার পরও খানিকটা চুপচাপ করে বসেই রইলুম। তারপর উঠলুম, ওঁকে পৌঁছে দিয়ে ফিরব।

ভীড় আরও পাতলা হয়ে এসেছে। গেট দিয়ে বেশ একটু ভারাক্রান্ত মনেই আস্তে আস্তে বেরুচ্ছি এমন সময় একটা ডাক শুনে সচকিত হয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম—"স্যার! স্যার! একটু দাঁড়িয়ে যাবেন।"

দেখি আমরা যেখানটা দাঁড়িয়েছিলাম গ্যালারীর ওপর সেই দিক থেকে হুজনে হন হন করে চলে আসছে। ওঁর জামার খুঁটটা ধরে নিয়েছিলাম, আমরাও এগুলুম।

খুব ফুর্তির সঙ্গে কি একটা কথা আলোচনা করতে করতে আসছে হুজনে, চোখে মুখে হাসি উছলে পড়ছে। কাছে আসতে আসতে গোকুল বলল—আমরা ভাবছি আপনারা ওখানেই থাকবেন। ছাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন যে! ভুল হোল না স্যার, পৌঁছুতে পৌঁছুতে পুলিশে ঘিরে ফেললে কিনা, তবে ল্যাংচা হাঁকড়ে ছিল একটা বাড়ি পেছন থেকে। আমি যে ভীড়ের মধ্যে থেকে বের করতেই পারলুম না আপনার ছাতাটা।"

ল্যাংচা কতুয়ার পকেটের মধ্যে থেকে চারখানা এক টাকার নোট আর একটা আট আনি বের ক'রে ছাতাটার সঙ্গে ভদ্রলোকের হাতে তুলে দিল, কাণের কাছে মুখটা বাড়িয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে বলল—"আপনার ছাতার পয় আছে, তবে গ্যালটিকের বাঁট আর নেবেন না, বড্ড পয়লাগে ভেঙে গেল!"

আরাম

[গল্প]

সুশীল রায়

ছোট ডিস্‌পেন্সারি। চেয়ার টেবিল ও আলমারির কোন পারিপাট্য নেই। এখানে ডিস্‌পেন্সারির মাপে ছোট হয়েই বসে থাকেন ডাক্তার অখিল ব্রহ্মচারী।

আয়ও বড় না। সংসারটাও ছোট। এই জন্যে বেশ চলে যাচ্ছে এই সংসার। ব্রহ্মচারীর মনটা, অনেকে বলে, বড় নির্জীব। কোনো চাহিদা নেই তাঁর, কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই।

ব্রহ্মচারী বলেন, সুখে যখন আছিই, তখন অসুখ বাধিয়ে লাভ কী? তাতে আরামটা কোথায়?

হরিপদ জোয়ার্দার খুব প্রাচীন লোক। তাঁর সমাজ কালো, সেই দৈন্যটা ঘুচিয়ে দিয়েছে দুধের মত সাদা তাঁর মুখ ভরতি দাড়ি আর গোঁফ। তামাক খেয়ে-খেয়ে মুখের কাছটা হলুদ হয়ে গেছে সেই দুধ-সাদা দাড়িগোঁফের। বলেন, আরাম? আপনার কথা শুনে আমি বলি, আরাম! ও-জিনিষ চাইবেন না। আরাম চেয়েছেন কি মরেছেন। ওর বদলে চাই আয়াস-কষ্ট-শ্রম-সংগ্রাম।

ব্রহ্মচারী বলেন, কার সঙ্গে লড়ব?

—নিজের সঙ্গে। নিজের ভাগ্যের সঙ্গে।

হরিপদ জোয়ার্দার তামাক টানতে আরম্ভ করেন, তাঁর দাড়িগোঁফ ভেদ ক'রে অদ্ভুতরূপ রঙের ধোঁয়া বের হয়ে সূক্ষ্মে মিলিয়ে যায়।

বাঁ হাতের চেটো দিয়ে হুঁকোর মুখটা মুছতে মুছতে জোয়ার্দার বলেন, এসব অভ্যেসও করেন নি? কোনো আকাঙ্ক্ষা না রেখে পরম আরামে বসে থাকলে, মশাই, কোনোই আরাম পাওয়া যায় না। চাই সংগ্রাম, চাই ক্লান্তি, তারপর চাই এই মৌজ।

হরিপদ জোয়ার্দার আবার হুঁকো টানতে আরম্ভ করেন, অনর্গল ধোঁয়া বের হয়ে সূক্ষ্মে মিলিয়ে যেতে থাকে।

চেয়ারের মধ্যে ডুবে বসে থাকেন ডাক্তার ব্রহ্মচারী। ঠোঁটের উপরে হাসির আভাস খেলা করে। নিমেষেই আবার অদৃশ্য হয়ে যায় সেই হাসিটা। হরিপদ জোয়ার্দারের কথাগুলো তাঁর হুঁকোর ধোঁয়ার মতই সূক্ষ্মে মিলিয়ে যায়। কিন্তু ওই ধোঁয়ার মত ওই কথাগুলোরও একটা সৌরভ যেন আছে—সেটা মিলিয়ে যেতে একটু সময় নেয়।

গা এলিয়ে দিয়ে বসে ছিলেন ডাক্তার অখিল ব্রহ্মচারী। এবার একটু সোজা হয়ে বসার জন্যে ঝোঁক দিলেন।

কেশে উঠলেন হরিপদ জোয়ার্দার, সঙ্গে সঙ্গে হাসলেনও তিনি, বললেন, হাঁ। অবিকল এমনি একটা ঝোঁকের কথাই বলছিলাম। জীবনে এই ঝোঁকটা চাই!

এসব পরামর্শ ভালো লাগে না অখিলের। নিটোল আর নিস্তরঙ্গ পানা-পুকুরে ঢিল ছুঁড়ে কেন অকারণ এই আলোড়ন সৃষ্টি করা?

ডাক্তার অখিল ব্রহ্মচারী এবার কথা বলল, গলাটা সাফ করে নিয়ে বলল, আপনি তো সারা জীবন সংগ্রাম করলেন, কী লাভ হ'ল তা'তে?

—লাভ হল না? অট্টহাস্য করে উঠলেন হরিপদ জোয়ার্দার, লাভ হয়েছে বৈকি। বেঁচে গিয়েছি। বেঁচে আছি। নইলে খতম হয়ে যেতাম কবে! এই-যে দাড়ি দেখছ, আর এই-যে গোঁফ—শণের মত দেখতে হয়েছে এখন। কিন্তু যখন এই গোঁফের রেখাই পড়েনি তখন থেকে শুরু হয়েছে লড়াই।

কিন্তু অখিলের ঐ এক কথা, আবার জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু কী লাভ হ'ল তা'তে।

জোয়ার্দার হাসলেন, বললেন, বুঝেছি। আমার দিকে চেয়ে চেয়ে বার বার ঐ কথা জিজ্ঞাসার মানে বুঝিনি ভেবেছ?

একটু চুপ করে রইলেন হরিপদ জোয়ার্দার, একমনে অনেকক্ষণ ধরে হুঁকো টানলেন, তারপর বললেন, ঠিকই বলেছ। দৈন্য ঘোচাতে পারিনি। কিন্তু কথা কি জানো, ডাক্তার বাবু? দীন হয়ে নেই। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করেছি ও করছি, আর, হয়তো আরো করব। এ লড়াইয়ে ঐশ্বর্য লাভ করতে পারিনি বটে, কিন্তু দারিদ্র্যকে কাবু করেছি। নইলে আমাকে সেই কবে কাবু করে ফেলত। দারিদ্র্যকে যে হারিয়েছি তার প্রমাণ আমিই—আমি বেঁচে গিয়েছি। আমি বেঁচে আছি।

অখিল অস্ফুটে বলল, আমিও তো বেঁচে আছি জোয়ার্দারবাবু।

জোয়ার্দার বললেন, তুমি তোমার এই ডিস্‌পেন্সারির চেয়ার টেবিল আর আলমারির মত কথা বলছ, ডাক্তারবাবু, ও গুলোও তো বেঁচে আছে। কিন্তু ও ধরণের বাঁচার কথা বলছিনে, বলছি—মানুষের মত বাঁচার কথা। জীবনে চাই একটা ঝোঁক, আর সেই সঙ্গে কুঁকি।

দরজা ফাঁক ক'রে উঁকি দিচ্ছিল মৃণালিনী। কথাগুলো সে শুনছিল না, গিলছিল। বেশ ভালো লাগছিল তার, বেশ আরাম লাগছিল এই কথাগুলো শুনে।

অনেক স্বপ্ন ছিল মৃণালিনীর চোখে, বিয়ের আগে। অনেক সাধ ছিল তার, এবং অনেক ইচ্ছা। একজন ডাক্তারের সঙ্গে তার বিয়ের কথা হচ্ছে শুনে সারাটা গা পুলকে কেমন শিউরে উঠেছিল তার। কিন্তু হায় রে, সেই এম, বি, ডিগ্রীটা একেবারে যেন কিছুই না। না, একেবারে কিছু না ব'লে উড়িয়ে দিয়ে লাভ কি? ওর নামের পাশে এম, বি, দেখে মৃণালিনী মনে মনে হাসে, বলে, হ্যাঁ, ঠিকই। ওর মানে বোকা বুদ্ধি।

অখিলের এই গা-ছাড়া চরিত্রটা মৃণালিনীর পছন্দ না। একটা ডাক্তার, সে অমন রুগীর মত নির্জীব হয়ে বসে থাকবে কেন? চালা হ'য়ে বসে পুরুষের মত আচরণ করতে হবে না?

দরজা ফাঁক ক'রে মৃণালিনী সব কথা শুনল। এতে তার একটু পুলকিত হবারই কথা। কেবল একা একা মৃণালিনীই অখিলকে চাঙ্গা করার জন্যে চেষ্টা করলে কোনো ফলই যে হবে না, তা সে বুঝতে পেরেছে। বাইরের আরো কেউ যে অখিলকে অবিরল সেইভাবেই উৎসাহ দিচ্ছে—এটা আশার কথা, এবং আনন্দেরও।

বেলা বারোটা বেজে গেল। ডিস্‌পেন্সারি এখন খালি, জোয়ার্দারও চলে গেছেন। অখিল ধীরে ধীরে উঠল, গা-মোড়ামুড়ি দিল, হাই তুলে তুড়ি দিতে দিতে ডিস্‌পেন্সারির দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে ভিতরে ঢুকতে গিয়েই দাঁড়াল মৃণালিনীর মুখোমুখী।

মৃণালিনী বললে, কি এম, বি? শুনলে? মাথায় কিছু ঢুকল?

—কিসের কথা বলছ?

—বুড়ো জোয়ার্দারের কথা।

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিল অখিল ব্রহ্মচারী, বলল, হ্যাঃ। ও-ও একটা মানুষ, ওর কথা শুনে খানায় পা দিই আর কি। ওর মত হাল আমাদের না হওয়া পর্যন্ত বুঝি সুখ নেই?

মৃণালিনী বলল, বুঝেছি। তোমার ব্রহ্মচারী হওয়াই ভালো ছিল। এদিকে ঘরে তো দু'টি বাচ্চা। তারও বয়স হচ্ছে ধীরে ধীরে। কত আর কর জান? বাড়ির খরচ কত জান?

—জানি নে।

—বাঃ। জেনে দরকার নেই। চান-খাওয়া ক'রে বিশ্রাম কর। অনেক পরিশ্রম গেছে। অতক্ষণ ডিস্‌পেন্সারিতে চুপচাপ বসে থাকার কি বেহদ্দ কষ্ট?

মৃণালিনী রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

বিয়ে হয়েছে আজ সাত বছর। এই কয় বছরের মধ্যে অখিলের এতটুকু উন্নতি দেখতে পায় না মৃণালিনী। যে পরিবর্তনটুকু হয়েছে তা কেবল অখিলের চেহারার। আগে প্রত্যেক দিন গোঁফদাড়ি কামিয়ে ছিমছাম থাকত, এখন সে অভ্যাসও ছেড়েছে। বলে বলে, কে দেখছে? এই জুদে একটা জায়গা, এখানে অত চাল চটক মানায় না।

মৃণালিনী বলে, দেখার কি কেউ নেই। আমি কি

মানুষ না? আমার চোখ দুটো কি তোমার মত নির্জীব?

অখিলের চেহারা পরিবর্তনের সঙ্গে আরও একটা পরিবর্তন ঘটেছে বটে। আগে বাড়ির লোকসংখ্যা ছিল দুই, এখন হয়েছে চার। দীপু আর পুতুল এসেছে তাদের সংসারে।

নৈহাটি ষ্টেশন থেকে রেল লাইন বরাবর পুব দিকে চলে গেছে রাস্তা, সেই রাস্তা ধরে পাঁচ সাত মিনিট চলার পর সদর রাস্তার উপরেই এই বাসা। এই বাসা নিয়েছে তারা বছর পাঁচেক আগে। এই বৈঠকখানা ঘরটা হচ্ছে ডাক্তার অখিল ব্রহ্মচারীর ডিস্‌পেন্সারি।

রাস্তার উপরেই ঘর, তাই লোক সমাগম লেগেই আছে। কিন্তু সব লোক, মৃণালিনীর ভাষায়, কাজের লোক নয়। অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে কোনো কাজ পাবার আশা নেই।

কথাটা ঠিকই। তারা আড্ডা দেয় এখানে, কিন্তু কোনো অসুখ-বিসুখে দরকার হলে ডেকে নিয়ে আসে শাঁখারী রোড থেকে ডাক্তার ভবতোষ সেনকে। খুব চালাক-চতুর আর চটপটে ডাক্তার সে। পসার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভুঁড়িও বাড়ছে। সেই সঙ্গে আরো জীবন্ত হয়ে উঠছে ডাক্তার সেন।

হরিপদ জোয়ার্দার প্রত্যহ আসেন। প্রত্যহই তিনি ছলে-বলে-কৌশলে উপদেশ দেন অখিলকে। বলেন, এক-এক সময় ভাবি—এসব অশ্লিল কথা বলতে যাই কেন। বলি কি লাভে? চোখের সামনে যদি দেখি একজন ইয়ং ম্যান নিজেকে এইভাবে শেষ করছে, তাহলে মুখ দিয়ে না বেরিয়েই পড়ে। কিছু মনে ক'রো না ডাক্তার।

চেয়ারের মধ্যে ডুবে বসে ডাক্তার অখিল ব্রহ্মচারী বলেন, মনে করার আছে কি? দৌড়ো-দৌড়ি আর দাপা-দাপি করে বেড়ালেই-যে এসার রুগী পাব, তার কি মানে আছে? রোগ জিনিষটা কি আমার ইচ্ছার উপর? আমার দরকার ব'লে রোগ মানুষের হতেই হবে?

হরিপদ জোয়ার্দার বোঁয়া ছেড়ে হাসলেন, বললেন, অভিভাবকের মত অনেক উপদেশ দিলাম। এবার ঠাকুরদার মত একটা কথা বলি, কি বল?

—বলুন।

জোয়ার্দার চেয়ার একটু টেনে নিয়ে ভালো হয়ে বসে বললেন, অমন স্ত্রীরত্ন পেয়েছ। তার উপরও কি টান নেই হে? অমন রূপ আর ওই রং একটু তোয়াজ চায়। গোলাপ-চারার যত্ন নিতে হয় একটু সৌখীন হাত দিয়ে, একটু দরদের সঙ্গে।

ওই রূপ আর ওই রং—তা বটে। মৃণালিনীর কথার একটু কাঁজ আছে, কিন্তু রূপটা সত্যিই বড় মোলায়েম। বিয়ের পর কিছুদিন স্ত্রীর রূপ নিয়ে একটা চাপা অহংকার অখিলের ছিল। কিন্তু ক্রমশঃ ওই রূপ গা-সওয়া হয়ে যাওয়ায় অখিল সেকথা ভুলেই ছিল। আজ জোয়ার্দার তাকে খুঁচিয়ে একটু জাগিয়েই দিলেন যেন।

কিন্তু এ জাগরণ স্ফুলিঙ্গের চমকের মত। অখিলের মুখ পলকের জন্যে পুলকিত হয়েই আবার যে তিমির সেই তিমির হয়ে গেল।

জোয়ার্দার বললেন, উঠি!

—আচ্ছা আসুন।

ডিস্‌পেন্সারির দরজা বন্ধ করে ব্রহ্মচারী অন্দরে চলে গেল।

কিন্তু অন্দরে এখন আরামের চেয়ে উত্তাপ বেশী। বাবার পায়ের শব্দে ভয় পেয়ে যায় দীপু আর পুতুল। বারান্দার এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকে দুজন। এ ছাড়াও, ছেলে-মেয়ে দুটি বাড়ির এই আবহাওয়ায় কেমন যেন ভীতু-ভীতু চেহারার হয়েছে।

ধমকি দেয় মৃণালিনী, বলে, অমন বেকুবের মত চোখ করে তাকাবি তো তোদের চোখ গেলে দেব। পাজি কোথাকার।

অখিল বেকুবের মত তাকিয়ে থাকে, তার পর গেঞ্জি খুলে তারের উপর মেলে দিতে দিতে অন্য দিকে চেয়ে বলে, ব্যাপার কি?

চট করে জবাব আসে এ-কথার, থমকে দাঁড়িয়ে মৃণালিনী বলে, ব্যাপার গুরুতর। অনাহার আসন্ন।

অখিল সাহসে ভর করে বলে, বাজে কথা ব'লো না। মানুষ অনাহারে মরে না, মরে লোভে।

মৃণালিনী বলল, সে মানুষ কারা জানিনে। হয়তো তারা বনে থাকে। যাও-না, বনবাসী হও গিয়ে, তাহলে সব ঝঞ্ঝাট মিটে যায়।

গা জ্বলে গেল অখিলের, কিন্তু এ-কথার কোনো উত্তর দিল না। উত্তর দেবার কোনো কথাও তার অবশ্য নেই। পুজো এসে গেল, দীপু-পুতুলের জন্যে কিছু কেনার ইচ্ছে তার হয়েছিল, কিন্তু সে ইচ্ছাটাও মুহূর্তে নিভে গেছে। রুগী বড় কম। কম কেন, একেবারে নেই বললেই হয়।

মৃণালিনী ছুটোছুটি করে কাজ করে বেড়াচ্ছে। কী যে তার এত কাজ, কে জানে। ছুটোছুটি করতে করতেই সে বলতে লাগল, পেটে নেই বিদ্যে, নইলে আমি নিজেই নিতেম কোনো কাজ। এ দুঃখ সইনা।

অখিল বলল, অসুখ বিসুখ কেমন কমে গেছে দেখছ না।

—দেখছি বই-কি। মহামারী না লাগলে রুগী তুমি পাবে না। কেন, ওষুধের লেন পাচ্ছে না রুগী? সেও এম, বি, তোমার চেয়ে বেশি কিছু না। কিন্তু তফাৎ এই, সে বোটা বুদ্ধি নয়।

বড় আঁতে ঘা দিচ্ছে আজকাল মৃণালিনী। কিন্তু এসব কথার উত্তরই-বা কী।

মৃণালিনী বলল, এখনই যার রুগী নেই, ছ-মাস বাদে তার কী হবে কে জানে। শীত এলে তো রোগ আরো কমে যাবে।

কথাটা বেশ পছন্দ হল অখিলের। বলল, শীত-কালটা ডাক্তারদের পক্ষে বড় দুঃসময়।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিকই বলেছ। সারাটা বছরই তোমার অবশ্য শীতকাল। গর্তের মধ্যে ভড়িগুড়ি দিয়ে তাই বসে বসে দিন কাটাচ্ছ।

মৃণালিনীর ভালো লাগেনা আর কোনো কথা বলতে। তার জীবনের সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে ভেঙে গেছে। এখন চোখের সম্মুখে সাংঘাতিক দুঃস্বপ্ন। দীপু আর পুতুলের মুখের দিকে সে তাকাতে পারে না।

খেতে বসে অখিল বলল, আর-কিছু র'াধ নি?

—না।

ব'লেই ঘটি কাৎ করে হাত ধুয়ে রান্নাঘর থেকে বেগে বেরিয়ে গেল মৃণালিনী। এ কী মর্মান্তিক প্রশ্ন। শুধু একটা শাক আর একটা ভাত, আজ অনেক কষ্টে এই ব্যবস্থা করতে পেরেছে মৃণালিনী। তার সর্বাঙ্গ তাই ক্ষোভে আর দুঃখে জ্বালা করছে।

অখিল বিশ্রামের জন্যে টান হয়ে শুয়ে আঙুলে-আঙুলে জড়িয়ে দুই হাত চোখের উপর দিয়ে শুয়ে আছে। মৃণালিনী কোনো কথা বলল না তাকে। দীপুকে দরজা বন্ধ করতে বলে সে বেরিয়ে গেল।

শাঁখারী রোড পেরিয়ে সরু গলি দিয়ে পশ্চিম দিকে চলে গেল সে। রাস্তার কল দিয়ে অনর্গল জল পড়ছে অথবা। অপচয় ভালো লাগল না মৃণালিনীর। কল বন্ধ করে দিয়ে কড়া নাড়ল।

দরজা খুলে দিয়ে মনোরমা বলল, কী খবর? এস, ভিতরে এস।

বড় সংকটে পড়ে সে এসেছে, কিন্তু সংকটের কথা বলতে তার সংকোচ আছে। বলল, সারাদিন ঘরে বসে বসে সময়ের অপচয়ই করি। এখানে টেলিফোনে অপারেটর নেবে শুনলাম। তোমার দাদার হাত আছে।

মনোরমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ ক'রে মৃণালিনী চলে এল। হ্যাঁ, রূপ বটে। রাস্তার লোক চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল তাকে।

পানের দোকানে গুঞ্জন বাজল, নৈহাটিতে এ-রূপসী কার ঘরের বে?

যাকে এখানে আগে রাস্তায় কেউ কখনো দেখে নি, যাকে দেখে পান বিড়ির দোকানে গান গেয়ে উঠত সকলে চাপা গলায়—কাদের কুলের বউ গো তুমি, সে অচিরে হয়ে উঠল সদর রাস্তার নিত্যপথিক।

জোয়ার্দার বললেন, উত্তম। চেষ্টা।

অখিল বলল, বিশ্বাস করিনে। উত্তমও না, চেষ্টাও চেহারা।

—যাই হোক। যার যা হাতিয়ার তাকে তাই নিয়েই লড়তে হবে।

অখিল প্রতিবাদ ক'রে বলল, তাই ব'লে চেহারা বেচে?

দুই হাত তুলে বাধা দিলেন জোয়ার্দার, যেন হায়-হায় ক'রে উঠলেন, বললেন, বলতে নেই হে, বলতে নেই। ওসব বিশ্রী কথা বলতে হয় না, বিশেষ ক'রে নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে। কুলবধূ। স্বয়ং লক্ষ্মী।

লক্ষ্মী সদয় হলে এই ভাবেই হয়। একটা রুগী এসে হাজির হল বিনা নোটিশে।

সোজা হয়ে বসল, ডাক্তার অখিল ব্রহ্মচারী। রুগীকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করল, রোগনির্ণয় করল, তারপর বলল, খাবার ওষুধ লাগবে আর লাগবে ইন্‌জেকশন।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আজ ডাক্তারী আরম্ভ করেছে অখিল ব্রহ্মচারী। জোয়ার্দারের বড় ভালো লাগছে আজ। তিনি বসে-বসে অখিলের হাতের কাজ লক্ষ্য করছেন। সিরিঞ্জের সূঁচ পরিষ্কার করল সে, ওষুধ ভ'রে নিল, রুগীর হাত ধ'রে নিপুণভাবে কী সুন্দর ইন্‌জেকশনই দিল সে।

রুগী চলে গেলে জোয়ার্দার বলল, এই তো চাই। যার যা হাতিয়ার। আমার শিখতে ইচ্ছে করে এই কাজ। বড় সূক্ষ্ম কাজ হে।

অখিল বলল, এমন-কিছু কঠিন না। ভালো ক'রে দেখে নিলেই পারা যায়।

চোখ দুটো বড় ক'রে জোয়ার্দার বললেন, বটে?

মৃণালিনী নৈহাটি টেলিফোন-এক্সচেঞ্জে এখন অ্যাপ্রেন্টিস। বেশি না, তবু কিছু পাচ্ছে। বলতে গেলে সংসার চলছে ওতেই। বালেন্সে দু-পাঁচ টাকা অখিল যা পায়, সেটা বাড়তি।

অখিল নীরব আর নির্বিকার। বাধা দেবার শক্তিও তার নেই, মানা করার সাহসও নেই। যে দিন নাইট ডিউটি পড়ে মৃণালিনীর, সে-রাত্রে অখিল বড় বিপদে পড়ে। দুই ছেলেমেয়েকে সামলাতে হয়, সেই সঙ্গে নিজেকেও। বড় অস্থির-অস্থির ঠেকে তার।

সকাল সাতটা নাগাদ ফিরল মৃণালিনী। শীতের সকাল। ঠোঁট দুটো শুকিয়ে কেমন নীল হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা লেগে দুই চোখ লাল হয়ে উঠেছে।

অখিল আড়চোখে একবার তাকাল তার দিকে, তারপর কোনো কথা না ব'লে ডিস্‌পেনসারিতে গিয়ে বসল।

দুপুরবেলা অখিলকে খেতে দিয়ে মৃণালিনী পাশে বসে বলল, আজ আসার পথে ভবতোষ সেনের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা।

মুখে গ্রাস দিয়েই বিষম খেল অখিল।

একটু পরে মৃণালিনী বলল, তোমার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

—কেন?

—কী জানি। বললেন, পসার এখন কেমন?

—কি উত্তর দিলে?

—কিছু বলিনি।

এইভাবে কাটা-কাটা কথার মধ্যে দিয়ে কেটে যাচ্ছে? দুপুরের ডিউটি আর রাত্রেই ডিউটি পড়ছে পালা ক'রে। নিয়মিত কাজ ক'রে চলেছে মৃণালিনী।

একদিন জিজ্ঞাসা করল অখিল, এতদিন যে কথা তার মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল, সেই কথা জিজ্ঞাসা করে বসল সে, বলল, কে জোগাড় ক'রে দিল এই কাজ?

—মনোরমার দাদা।

—সে আবার কে? ভবতোষ সেনের বোন বুঝি?

—না। তার দাদার নাম বিপিন দত্ত। টেলিফোনেই কাজ করেন।

—হুঁ।

একবার আড়চোখে অখিল তাকাল স্ত্রীর দিকে।

কয়েকদিন বাদে দুপুরের ডিউটি সেরে সন্ধ্যার কিছু আগে ফিরল মৃণালিনী। অখিলকে বলল, আজ ভবতোষ সেনকে দেখলাম। উঃ, কী টাইফ।

...দে ?

—কই কি।

শুন হয়ে বসে রইল অখিল। শরীরটাও তার ভালো নয়টাও বড্ড অস্থির।

—শরীর খারাপ নাকি ? অমন শুকনো-শুকনো দেখাচ্ছে কেন ?

অখিল উত্তর দিল না।

পরদিন দুপুরের ডিউটি দেবার জন্যে যখন বেরিয়ে গেল তখন জোয়ার্দার আর অখিল ডিস্‌পেন্সারিতে বসে আছে। পটু আর পুতুল ঘরে বসে খেলা করছে।

জোয়ার্দার বলল, কী ডাক্তার, শরীর বুঝি খারাপ ?

—হ্যাঁ। বড় দুর্বল হয়ে পড়ছি।

—ওষুধ খাও।

—তাই ভাবছি। ভাবছি, একটা ইনজেক্‌শন নেব।

জোয়ার্দার বলল, ভবতোষ সেনকে ডাক তবে। বল তো আমি ধরে দিই।

চোখ-দুটো লাল হয়ে উঠল অখিলের। বলল, সব কথায় ভবতোষ সেন কেন জোয়ার্দারবাবু। এ কী এমন কঠিন কাজ। আপনি শিখবেন বলছিলেন সেদিন, আসুন হাতে ধ'রে শিখিয়ে দিচ্ছি এক্ষুণি।

নিজে হাতে সব রেডি ক'রে দিয়ে অখিল জোয়ার্দারকে দিয়ে নিজের শিরার মধ্যে ইনজেকশন দিইয়ে নিল। বলল, কি দিলে জান ?

অখিলের এই অতর্কিত জিজ্ঞাসায় হরিপদ জোয়ার্দার ঝুঁকে পড়ে একটু শঙ্কিত হয়েই যেন জিজ্ঞাসা করল, কী ?

চেয়ারের মধ্যে ডুবে ব'সে অখিল হাসি হাসল অদ্ভুত। উত্তর দিল না। শুধু বলল, কী আরাম।

টেবিলের উপরে দুই হাতে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল হরিপদ, বলল, কি ? উত্তর দিলে না যে।

ক্রমেই যেন নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগল অখিল। চোখের দৃষ্টি নিষ্প্রভ হয়ে আসতে লাগল।

ভয়ার্ত চীৎকার ক'রে উঠল হরিপদ জোয়ার্দার। অখিলের গায়ে ধাক্কা দিয়ে সে ডাকতে লাগল, ডাক্তার, ডাক্তার।

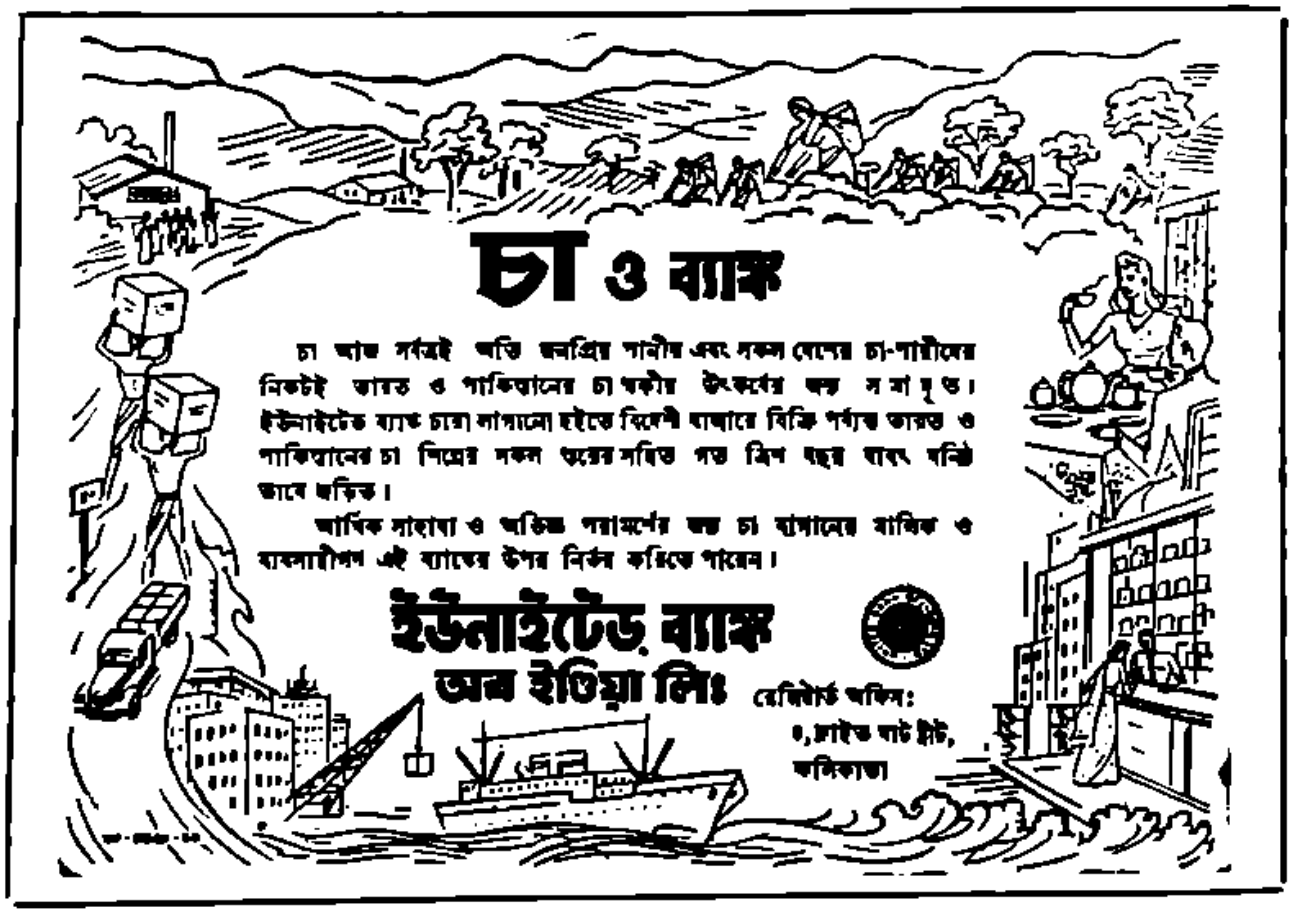

আধুনিক বিজ্ঞানের ভূমিকা

[প্রবন্ধ]

অমরেন্দ্রকুমার সেন

মানুষই হ'ল একমাত্র জীব যে প্রশ্ন করে, যে সব কিছু শিখতে চায়, জানতে চায়, নতুন নতুন জিনিষ তৈরী করতে চায়। তাই অন্য সব জীবজন্তু অপেক্ষা মানুষ আজ সবচেয়ে বড় হতে পেরেছে।

মানুষের এই জানবার কৌতূহলই হ'ল বিজ্ঞানের আরম্ভ কিন্তু শেষ নয়। অনেক জিনিষ যেমন আমরা জানতে পেরেছি তেমনি অনেক জিনিষ এখনও জানতে পারিনি। যেমন ম্যালেরিয়া কি করে হয় আগে আমাদের জানা ছিল না কিন্তু আজকাল একজন শিশুও জানে যে মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয় অথচ ক্যান্সার কি করে হয় অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও আজও আমরা জানতে পারিনি।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে কোনো সমস্যার সমাধান করতে হ'লে দরকার খুব মন দিয়ে সেই সমস্যাটি লক্ষ্য করা এবং পরীক্ষা করা। সেই পরীক্ষার ফলাফলের ওপরই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাবে। পরীক্ষা হয়ত এক দিনে এক মাসে এমন কি এক বছরেও শেষ হবে না।

বছরের পর বছর ধরে অনেক দেশের অনেক বিজ্ঞানী হয়ত একই সমস্যা সমাধানের জন্যে পরীক্ষা চালিয়ে যাবেন, তারপর একদিন কোন এক দিন সফল হবেন।

পৃথিবীতে অনেক দিন আগেই অনেক চিন্তাশীল লেখক ও বিজ্ঞানী জন্ম গ্রহণ করে আজকালকার বিজ্ঞানের আরম্ভ করে গেছেন। ভারত, চীন, মিশর, গ্রীস ও রোম এদিক থেকে সবার আগে আছেন।

গত তিন শ' বছরের মধ্যে বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে এসেছে। এর গোড়ায় আছে তিনটি ব্যাপার। প্রথমটি হ'ল দূরবীণ, অণুবীক্ষণ আর থার্মোমিটারের আবিষ্কার। এই যন্ত্রগুলি মানুষের পর্যবেক্ষণের পরিধি বাড়িয়ে দিয়েছে। এই তিনটি যন্ত্রের সাহায্যেই মানুষ গ্রহ নক্ষত্র কিংবা রোগজীবাণু দেখতে শিখল, উত্তাপ মাপতে শিখল।

দ্বিতীয়টি হ'ল ছাপাখানার আবিষ্কার যার জন্যে জ্ঞানের আদান-প্রদান অনেক হ'ল। আর, তৃতীয়টি হ'লো লোকের বিজ্ঞানের প্রতি ক্রমবর্ধনশীল আগ্রহ। তাদের জানবার কৌতূহল ক্রমে বাড়তে লাগল। তবে একথা ঠিক যে শিল্প আর সাহিত্য যত তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেছে বিজ্ঞানের বেলায় তা হয় নি কারণ গোড়ার গোড়াই বিজ্ঞানকে অনেক বাধা পেতে হয়েছে।

অনেক দিন থেকেই ভারতের পণ্ডিতেরা জানতেন সূর্য হ'ল সৌরজগতের কেন্দ্র, তার চারদিকে পৃথিবী, বুধ, মঙ্গল, শুক্র, বৃহস্পতি ইত্যাদি সব গ্রহরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিদেশের অনেক পণ্ডিতরা এ কথা বিশ্বাস করতেন না; তাই যখন ষোলো শতাব্দীতে পোলাণ্ডের একজন পণ্ডিত, যাঁর নাম কোপনিকাস, বললেন যে আমাদের পৃথিবী একটি গ্রহ এবং তা সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন তাঁর কথা সকলে আজগুবি বলে উড়িয়ে দিয়েছিল।

আরও একশ' বছর গেল। ইটালির একজন পণ্ডিত গ্যালিলিও একটা দূরবীণ তৈরী করলেন। তিনি সেই দূরবীণ আকাশের গ্রহ নক্ষত্র দেখতে লাগলেন। তিনিও একদিন কোপনিকাসের মতে মত দিলেন। গ্যালিলিওকে সকলে পাগল বলল, শুধু তাই নয়, তাঁকে জেলে দেওয়াও হয়েছিল। গ্যালিলিও আরও অনেক কিছু আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু তিনি তথাকার লোকজনের সমর্থন পান নি। তখন দিনকালই ছিল আলাদা। আজকাল কোনো বিজ্ঞানী নতুন কিছু আবিষ্কার করলে তাঁকে যেমন

সম্মান জানানো হয়, তখন ছিল উল্টো ব্যাপার। তখন অপমান করাই ছিল নিয়ম। গ্যালিলিওর মতো পণ্ডিত লোকেরা এত লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করে আজকালকার বিজ্ঞানের গোড়া পত্তন করে গেছেন।

আইজাক নিউটনের সময় আবার দিনকাল অনেক সহজ হ'য়ে এ'ল। তখন মানুষের জ্ঞান কিছু বেড়েছে।

ইংরেজের ইতিহাসে নিউটনকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন তলটেয়ার। নিউটনের সমতুল্য বিজ্ঞানী আর একজন জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তিন শত বৎসর পরে, আমাদের কালে। তাঁর নাম আইনস্টাইন। বহু আবিষ্কারের মধ্যে নিউটন কর্তৃক মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার বিজ্ঞানের নানা জটিল সমস্যার সমাধান করতে পেরেছে। নিউটন ছিলেন বিনয়ী, তিনি বলতেন; জ্ঞান সাগরের তীরে তিনি কেবল ঝিনুক আর নুড়ি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন, জ্ঞানের মহাসাগরে পাড়ি জমাতে এখনও ঢের দেরী।

কোপনিকাস, গ্যালিলিও, কেপলার ও নিউটন যে সকল তথ্য আবিষ্কার করে গেলেন যন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি একে একে প্রমাণিত হ'ল। কত নতুন নতুন গ্রহ নক্ষত্র আবিষ্কৃত হ'ল, তাদের পরিধি ও পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব জানা গেল। চাঁদের ত মানচিত্রই আঁকা গেল। যত সমস্যার সমাধান হচ্ছে, আবার তেমনি কত নতুন সমস্যা জন্মছে।

এই রকম করেই মানুষ একটির পর একটি শক্তির পরিচয় পেলো এবং সম্ভব হ'ল ষ্টিমইঞ্জিন, মোটর গাড়ী, ডায়নামো। জানা গেল যে তাপ, আলো অথবা বিদ্যুৎ, এই সকল শক্তি কখনও নষ্ট হয় না তবে তাদের রূপান্তর ঘটতে পারে। একখণ্ড লৌহ তারের ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ চালাতে তারটি গরম হয়ে ওঠে এবং শেষে এতই গরম হয় যে আলো বেরুতে থাকে। বিদ্যুৎ রূপান্তরিত হ'ল তাপ নামে শক্তিতে, আর তাপ রূপান্তরিত হ'ল আলোয়। আজকাল ত মানুষ বিদ্যুৎকে চাকর করেই ফেলেছে।

প্রাচীন গ্রীকেরা বিদ্যুতের অস্তিত্ব জানতেন। আঠারো শতকে গ্যালভানি এবং ভোল্টা নামে ইটালির দু'জন বিজ্ঞানী বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করেন এবং আমেরিকার বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রমাণ করলেন যে, আকাশের বিজলী আর মানুষের তৈরী বিদ্যুতে কোনো তফাৎ নেই। ক্রমে মাইকেল ফ্যারাডে ডায়নামো তৈরী করলেন আর সবশেষে এডিসন বিজলী বাতি জ্বালিয়ে দিলেন।

প্রাচীনেরা দু'টি বিজ্ঞান ভাল করে জানতেন, পদার্থ-বিদ্যা আর জ্যোতির্বিজ্ঞান। প্রাচীন হিন্দুদের রসায়ন বিদ্যা উত্তমরূপে জানা ছিল। আধুনিক রসায়ন শাস্ত্র রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত হ'ল আঠারো শতকে। জোসেফ ব্ল্যাক হলেন এই শতকের প্রথম রাসায়নিক। তিনি কার্বন ডাই-অক্সাইড আবিষ্কার করেন। তিনি তখন তার নাম দিয়েছিলেন 'স্থির বাতাস।' ক্যাভেণ্ডিশ আবিষ্কার করলেন হাইড্রোজেন গ্যাস আর আর্গন নামে গ্যাস; তাছাড়া তিনি বহু সূত্র ও তথ্য আবিষ্কার করে গেছেন। শীল নামে আর একজন বিজ্ঞানী অক্সিজেন, টার্টারিক অ্যাসিড, ক্লোরিন ও মলিবডিক অ্যাসিড আবিষ্কার করেন। বহু জৈব রসায়ন, যেমন গ্লিসারিন, ল্যাকটিক, অক্সালিক, সাইট্রিক ও গ্যালিক, প্রুসিক অ্যাসিড এবং কেফিনও তিনি আবিষ্কার করেন।

এই শতাব্দীতে অসাধারণ প্রতিভাশালী একজন ফরাসি বিজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর নাম লাভোয়াসিয়ে। নানা তথ্যের মধ্য দিয়ে রসায়ন বিজ্ঞানকে তিনি পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু ফরাসী বিদ্রোহের সময় গিলোটিনে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়। আরও কয়েকজন এই শতকেই রসায়ন বিজ্ঞানকে আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেন, তাঁরা হলেন প্রিষ্টলি, বার্থোলেট, ডালটন ও হামফ্রে ডেভি। রসায়ন বিজ্ঞান আজ অনেক এগিয়ে এসেছে। আজ সে মানুষের কতই না উপকার করছে।

আঠারো শতাব্দীর শেষে ও উনিশ শতকের গোড়ায় এক দল লোকের ধারণা হ'ল প্রাচীনকালের গাছপালা, জীবজন্তু এবং মানুষের রূপ এখন থেকে বিভিন্ন রকম

[পরবর্তী অংশ ৫১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সভ্যতা গঠনে কোমলবৃত্তি

ডা: মিহিরকুমার মুখোপাধ্যায় এম-এ, ডি-ফিল.

রক্ষাবৃত্তি জৈবিক, এর মূল অনুসন্ধান করতে মানবিক মানসিকতার সহস্র সহস্র বৎসরের পরিধি পার হয়ে যেতে হয় নির্বিকল্পে। পুরানো পৃথিবীর স্নেহশ্যামল বক্ষে অতীতের নিশ্চিহ্ন শুশ্রূষাপরীদলে হয়ত জেগে উঠেছিল আধুনিক স্নেহমমতার অঙ্কুর। বিজ্ঞানীকে আরো অতলে নামতে হয়, সুকুমার বৃত্তির জন্মলগ্নে। ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির সর্বময় কর্তৃত্বের তমসাভোরণ, ক্ষুধিত স্বার্থ নিত্য ক্ষুধাতুর লোভ রক্ত নৃশংসতার রাজ্যে—ধরণী বসুন্ধরার তখন শৈশবাবস্থা। সে অবিস্মরণীয় দিগন্ত পার হয়ে গেছে বহুদিন, পৃথিবীতে আর তার দেখা মেলে না, এখানে শুধু ফসিল।

তবু সেই অপরিমেয় প্রাণীরাজ্যে অবগাহন করেন তত্ত্বানুসন্ধিৎসু। দেখা যায় আজকার মানবিক সভ্যতার আশ্রয়স্থল সুকুমার বৃত্তিগুলি সেখানে নেই, একদম অনুপস্থিত। তাহলে বোঝা যাচ্ছে এরা পরে এসেছে, হৃদয়ের কোমল ভাব জেগেছে অনেক পরে। স্নেহ, প্রেম, করুণার অভিব্যক্তি হয়েছে, সুকুমার বৃত্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত জৈব বিবর্তনের সঙ্গে। চিন্তা করলে দেখা যাবে স্নেহ বৃত্তি মানবসভ্যতার অন্তস্থলে, মানুষের যা-কিছু মহৎ যা-কিছু কল্যাণের সুমধুর রসসংযুক্ত সমস্ত কোমলবৃত্তিস্পর্শ সংজ্ঞাতো।

মানব সভ্যতার ঊষাকালে বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞানের অভ্যুদয় ও নীতিবিকাশ শ্রেষ্ঠ ঘটনা কিন্তু মানবমন কোমল রসাভিসিক্ত না হলে উদারতা ও পরার্থপরতার বিকাশ সম্ভাবনা কোথায়? রক্ষাবৃত্তি ইতর প্রাণীকুলে সচরাচর দেখা যায়, সেজন্য মানুষের চেয়ে পুরানো। রক্ষাবৃত্তি যে পর্যন্ত না কোমল দরদবোধে রূপান্তরিত হয়েছে সে অবধি মানসিক বৃদ্ধির আগমন সম্ভাবনা হয় নি; জৈব বৃত্তিতে স্বাধীনতার স্বল্প অবসর মানসিকতায় প্রকৃতির দাসত্ব পরিহারের পূর্ণ প্রয়াস, উচ্চতর প্রাণীমহলে (যেমন বনমানুষ) এর প্রারম্ভ। যেখানে প্রাণীকুল বুদ্ধিকৌশলে নৈপুণ্যে পারদর্শিতা লাভ করেছে, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে জননী ও সন্তানের নিবিড় সংযোগ সেখানে; নবজাতকের শৈশব হতে কৈশোরের তটরেখা অবধি মাতার অবিমিশ্র স্নেহধারাপ্লুত সুকোমল অঙ্কের আশ্রয় পরিচর্যা, জীবন ধারণে সাহচর্য, জীবন রক্ষায় জীবনপাত্র—শুধু উচ্চ প্রাণী-মহলে মেলে। জীবনস্ফুরণোপযোগী জৈব বাসনার সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ হেতু এ বৃত্তি তীব্র ক্ষুরধার ও গভীর।

সময়ের অগণিত প্রান্তর পার হয়ে এসে মদরাগবৃত্তির অশোভন ঔদাসীন্য ও বন্য আত্মসুখ পরিমার্জিত হয়েছে। জৈবজীবন নিয়ে অভিনব পরীক্ষায় ব্রতী প্রকৃতি 'আহার-বিহার-সংহার-পরিহারের' অনাবরণ নির্লজ্জতা দৃঢ় পদ-ক্ষেপে পরিত্যাগান্তে ক্রমপরিপুষ্ট স্নেহসুন্দর পরিতৃপ্তিজনিত আনন্দস্বাদপরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মন-অভিব্যক্তির গোড়ার দিকে মাতৃস্নেহের বিকাশ, এ স্নিগ্ধ মধুর প্রবৃত্তি আবির্ভাবে পশুজনোচিত স্ত্রী-পুরুষের স্বার্থসর্বস্ব আকর্ষণে ছেদ পড়েছে খানিকটা, জৈব ইতিহাসে প্রথম সাহচর্য ভাবের উদয়, ভালবাসার আর একটি বিশাল অনাবাসিত প্রান্তর উন্মুক্ত হওয়ায় অমলিন স্বার্থান্ধতার পরিসমাপ্তি। নিপীলিকা মধুপ অনেক দিক দিয়ে মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী, আত্মরক্ষা তাগিদের চেয়ে বংশরক্ষাবৃত্তি প্রবল এদের সভ্যতায়, সৃজনী সংহতি চমৎকার, তবু লক্ষ লক্ষ বৎসরে বিশেষ কিছু তারতম্য ঘটেনি এদের জীবনযাত্রায়, কিছুই শেখেনি, শুধু প্রবৃত্তির

দাস। স্নেহবৃত্তি অনুভূত খাতে প্রবাহিত হয়ে যন্ত্ররূপে পরিবর্তিত। সভ্যতা এদের বুদ্ধিবিরহিত, ভাবলেশহীন নিষ্প্রাণ।

স্নেহ উন্মেষের প্রকৃত তাৎপর্য সন্তান সাহচর্য ও শিক্ষায়। অভিভাবকের সমস্ত অভিজ্ঞতা কৌশল বুদ্ধিবৃত্তি নির্বিচারে গ্রহণের সুবর্ণ সুযোগ শিক্ষাকালে। জন্মের অব্যবহিত পরক্ষণেই জীবিকা নির্বাহে আত্মসমর্পণ করবার প্রয়োজন নেই, সেজন্য শিক্ষায় অপর্যাপ্ত অবসর, অথচ সুযোগ ক্রমে ক্রমে স্ফুরণ হয় প্রবৃত্তিগুলির। জাতির অভিজ্ঞতা ব্যক্তিমানসে যুক্ত হওয়ার বাকি সমৃদ্ধ হয়ে উঠে, তার সন্তান-সন্ততি সে অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হয় না বরং তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রায় আরো শুদ্ধ ব্যক্তিমানস: জাতির বুদ্ধি একটা যন্ত্রিহীন সরলতা, শিক্ষার মাধ্যমে তাকে সুসংস্কৃত করে নেওয়ার অবসর উদয়ন। লক্ষ্য করে দেখা গেছে যে যে জাতির শিক্ষাবসর তথা স্নেহসান্নিধ্য যত দীর্ঘ তারা তত উন্নত ও প্রগতিশীল।

মানুষ এর ব্যতিক্রম নয়। বিবর্তনের বুদ্ধিধারায় শ্রেষ্ঠ প্রতীক মানুষ, এই আত্মবুদ্ধিসম্পন্ন শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান কারণ শিক্ষা। আমাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে মনের নিহিত পটভূমিকারূপ অতীত অভিজ্ঞতা; বর্তমান এর দোসর আবার ভবিষ্যতের আভাসও মেলে এখান থেকে। ব্যক্তিজীবন একটা প্রাসাদের ন্যায়, এর ভিত্তিভূমি সুবিস্তৃত জাতিমানস, এর কাঠামো গড়ে উঠে স্নেহ সাহচর্য শিক্ষায়, যেখানে তার চূড়া নীল আকাশ ছুঁই ছুঁই করে সে তার ভবিষ্যতের দূরদৃষ্টি। স্নেহ সাহচর্য বঞ্চিত হতভাগ্য জীবনে সংহতি শৃঙ্খলার সুযোগ নেই। অনেক মানুষই এরূপ জীবনযাপনে বাধ্য, উত্তরকালে এরা সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও উদাহরণ হতে পারে না এদের কার্যকলাপ একদেশদর্শী ও সঙ্কীর্ণ। প্রতিভাবান মুকুল বিরল নয় কিন্তু সর্বজনমান্য মনীষী নগণ্য। এক পাশ্চাত্য মনোবিদের মতে মাতৃমুখ (এবং সাহচর্য) যে সৌভাগ্যবান পেয়েছেন অধিক, উত্তরকালে তিনি দানশীল।

সুকোমলবৃত্তি মানবজন গঠনে আর একটি বড় কাজ করেছে। ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিক যজ্ঞনশাল যুগ যুগ ধরে সামাজিকের একমাত্র কর্মপ্রণালী ছিল। ভালবাসার আকর্ষণ আবিষ্কার করল সম্পূর্ণ নতুন চিন্তাসূত্র। কোন পরম শুভদিনে স্বার্থী প্রেমবন্ধন দেখা দিয়েছিল জানা নেই তবে সে কেবল অনুরাগসর্বস্বের মাহেন্দ্রক্ষণ নয়। বুদ্ধিজীবী মানুষের জীবন নিয়ে সমাজ নীতিবোধ সব গড়ে উঠেছে এই ধারাপথেই—আজ এরই জয়জয়কার। অনুরাগের মহিত নেশা নিরাবরণ পশুপ্রবৃত্তিতে ভাটন ধরিয়ে আস্বাদ দিয়েছে কান্তাপ্রেমের। প্রিয়জন হয়ে উঠেছে আপন, সন্তান-সন্ততি নিয়ে গঠিত হয়েছে পরিবার গোষ্ঠি সম্প্রদায়। দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারে ব্যক্তি-স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয় কিছু কিছু, খানিকটা সুবিধাও আসে, সাহচর্য ভাবের উদ্ভব, সমাজের প্রতিষ্ঠা এইরূপে। সমাজ আমাদের সর্বস্ব ঔদ্ধত্য ও আত্মকেন্দ্রিকতাকে বিদূরিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। হিংসা আক্রোশের রক্ষণশীলত্ব হ্রাস হয়ে দেখা দিয়েছে বিনয় শিষ্টাচার। ব্যক্তিমানসকে অক্ষুণ্ণ সমাজ-সচেতন করার নিমিত্ত পিতৃভাববুক্ত বিবেকের অভ্যুদয়, গোষ্ঠির ভিতর ঐক্য আনতে এসে দাঁড়াল জাতিত্ব ও দেশপ্রেম (মাতৃ আদর্শ)। কৃষ্টিসাধনায় আত্মসুখ পরিপন্থী। বিবেক তাই ব্যক্তিস্বার্থবলিতে আহ্বান করে,—নীতিবোধের সূত্রপাত এইখানে। আত্মপ্রেম ও ব্যক্তিস্বতন্ত্রতার অখণ্ডতা থাকল না। প্রিয়জন ও আত্মীয়স্বজন, গোষ্ঠিভ্রাতা ও নিজ দেশবাসী উপস্থিত হল ভালবাসার দাবী নিয়ে, কর্তব্যের দুন্দুভি বেজে উঠেছে।

স্নেহপ্রেম বর্তমান সভ্যতাকে বর্ণবিলাসময় ভাবপরিবেশযুক্ত করে তুলেছে মাঝে মাঝে। আত্ম আরোপিত সংযমের প্রকাশ এখন বিরল নয়। একে সুপরিকল্পিত দরদবোধের ফল্গুধারা বলাই উচিত। আধুনিক মানুষ কেবল স্বার্থত্যাগেই ক্ষান্ত নয়, তার পরার্থপরতা স্নেহবিগলিতধারাপুষ্ট, অপরিচিত বিদেশীর ক্লেশদুঃখ শ্রবণ করেই তার মন বেদনাভারাক্রান্ত। পৃথিবীর এক প্রান্তের অধিবাসী ভূকম্পন জলপ্লাবন চর্তিক্ষ মহামারীর প্রকোপগ্রস্ত হলে

অপর প্রান্তের লোকেদের মনে দুশ্চিন্তার ছায়া নামে—কি উপায়ে উপশম হবে তাদের দুর্দশা! মানবহিতৈষী বিশ্বপ্রেমিকের মনের অন্তরালে প্রবাহিত স্নেহসংযুক্ত অমৃতধারা। সে সুকোমল মহাপ্রাণ পৃথিবীর সর্বসাধারণকে সন্তানবৎ গ্রহণ করেছে, অহরহঃ জনকল্যাণকামনা তার ধর্ম। ধর্মাচার্যের তৃপ্তি জীবের দুঃখমোচনের পন্থা উদ্ভাবনে, পার্থিব ভয় ভাবনা চিন্তাকে উপেক্ষা করে আত্মশক্তি তাঁর সহানুভূতির অনাবিল রসস্বাদে উদ্বুদ্ধ। অক্লান্তকর্মী সমাজসেবীর নিঃস্বার্থ সেবাব্রতের আকর্ষণ কোথায়? ভোগ বিলাস রূপরসের জগৎ থেকে আপনাকে নিঃশেষে বঞ্চিত করে অকৃত্রিম সমাজহিতৈষীর কি সুখ? দরদ তাঁর বিশ্বজনীন। সামাজিক বৃহত্তর স্বার্থের কল্যাণে অনেক সময় ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা, উন্নতি, পারিবারিক প্রীতি বলাঞ্জলি দিতে হয়, কিন্তু দেনাপাওনার বিচারশক্তি তখন মনুষ্যধর্মবোধে লীন। স্নেহপ্রেমের প্রগাঢ় উপচিকীর্ষায় হৃদয় ভরপুর। বস্তুতঃ, সমস্ত কল্যাণ কামনার অন্তঃস্থলে অবস্থিত স্নেহস্নিগ্ধ জীবনরস। ধনসম্পদ সমারোহে জড়তত্ত্বের প্রাধান্য, ভোগবিলাস ও আভিজাত্যবোধে হৃদয়ের স্নেহপ্রীতি অবদমিত। অপরিমিত উচ্চাশা ও অহংবোধের উদ্দাম বেগ কোন কোন ব্যক্তিকে কেবলই প্রতিদ্বন্দ্বিতা অভিমুখে ঠেলে দিচ্ছে, সে মর্যাদা-ঘাতপ্রতিঘাত-বিক্ষুব্ধ চিত্তের, দুর্দাম জৈব পুরুষকার ছাপিয়ে উঠেছে বস্তুজগতের রসজ্ঞানকে।

সভ্যতাপুষ্ট মানুষ দর্শন বিজ্ঞান সৌন্দর্য সাহিত্যকথা সৃষ্টিতে অনগ্রসর নয়, জীবনযাত্রা হয়ে উঠেছে দুরূহ। ভদ্রভাবে বেঁচে থাকবার চিন্তা আজ অধিকাংশের মনে। একশ্রেণীর আকাশচুম্বী আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে বর্তমান ক্ষুধাতুর উগ্র বাসনা, যেখানে সুকুমার বৃত্তির কোন আভাস নেই, মহত্ত্বের কোন প্রতিধ্বনি নেই, উপভোগের আদিম উল্লাসে সে ক্লান্ত ফলরবমুখর। অন্যদিকে রয়েছে যুদুক্ষু সমাজের অবরুদ্ধ বেদনা, হৃদয়ভারভর্জরিত বঞ্চিতের মর্মপীড়া। এই অসামঞ্জস্যকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছে সুদূর অতীত হতে, জীবজীবনের অন্তর্নিহিত আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ। রোষ ঘৃণা দম্ভ দিগ্বিজিগীষা মানুষের চেয়ে প্রাচীন, বিবর্তনধারা স্বার্থকতামণ্ডিত হয়ে ওঠেনি এই বৃত্তিগুলির বিকাশে অথচ এরা বর্তমান আজও। আবার অভিব্যক্তির ঐ রুদ্রবিস্তারকে ব্যঙ্গ করবার জন্যই যেন মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হন জ্ঞান ভক্তি পবিত্রতার প্রতীক মনীষীরা, তাঁদের সাধনার দয়ার্দ্র শীতুষধারা মাতৃস্নেহানুরূপ, সুগভীর আত্মীয়তা স্থাপন করে আপামর জনসাধারণের সঙ্গে, এ ধারায় কোমল ভাবব্যঞ্জনা। কৃতজ্ঞতা ঔদার্য দয়ালুতা উপচিকীর্ষা, দয়া মহানুভবতা প্রভৃতি সদ্গুণের সমাবেশ হয়েছে অতি আধুনিককালে, মানুষ যখন দেবত্বের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছে।

উত্তরকালে পিতামাতার অস্তিত্ব সন্তানের ব্যক্তিত্বে লীন, তার গুণগানে মাতাপিতার উল্লাস, গৌরবে আত্মশ্লাঘা; তার অবনতিতে তার অপমান লজ্জা। আনন্দবেদনার এই অনুভূতি উচ্চ পর্যায়ে অতিবিশ্ব হয় জাতিতে সমাজে দেশে। কোন টেষ্টেমোজনের অথবা অলিম্পিক দর্শকবৃন্দ এর সত্যতা একবাক্যে অনুমোদন করবেন। মানুষের সমাজজীবনে এর প্রভাব অপরিসীম। সুকুমার বৃত্তির সঙ্গে কোমলবৃত্তির সংযোগ মানুষকে ভাষা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় অনুপ্রাণিত করেছে। একদিকে ক্ষমাদাক্ষিণ্য দেখাতে সে যেমন আগ্রহান্বিত অন্যদিকে অন্যায়কে দমন করতে অশিষ্টাচারকে সংযত ও প্রতিরুদ্ধ করতে সে সদাই তৎপর; নৈতিক রোষের (moral indignation) পশ্চাতে অবস্থিত উৎপীড়িত প্রতিবেশী সহচরদের প্রতি বাৎসল্যভাব। আপন আত্মজের ব্যথাকাতর আহ্বানে যখন সে ছুটে যায় কারণ নির্ণয়ে, শত্রুর মূলোৎপাটনের প্রয়াস করে, ঠিক তেমনি সহচরদের প্রতি অন্যায় প্রতিরোধকল্পে প্রতিষ্ঠা হয়েছে শাস্তির। শাস্তি অনুষ্ঠানের পশ্চাতে বর্বর রমণীসুলভ প্রতিহিংসা।

স্নেহের সহিত সভ্যতার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য, সভ্যতার উত্থান পতনের সঙ্গে মাতৃশক্তি অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। পিতামাতার কর্তব্য সম্বন্ধে যে সমাজ সম্যকরূপে অবহিত নয় সে সমাজ অচিরে ধ্বংস হয়েছে। এবিষয়ে সামাজিক অনুশাসন যেখানে শিথিল, তারা অধিকদিন সম-অবস্থায় কখনই থাকতে পারেনা, বহির্জগৎবিচ্ছিন্ন ছোটখাট স্বতন্ত্র সভ্যতাগুলির অস্তিত্ব লোপ হবার এই প্রধান কারণ। জ্ঞানবুদ্ধি বিবেকের অগ্রগতির ফলে ব্যবহারিক জীবনের সুখ সুবিধা বেশ বাড়ে, ভোগ উপচারের আড়ম্বর হয় প্রচুর কিন্তু, মনোজগঠনের প্রধান উপাদান মূল আদিম প্রবৃত্তিগুলি সরলভাবে বিকশিত হয়না, জটিলত্বের গোলকধাঁধায় বিকৃতরূপ ধারণ করে। প্রাচীন স্পার্টা ও মিশরে জননবৃত্তি সাবলীল গতিচ্যুত হয়ে কোথায় উপনীত হয়েছিল সকলেই জানেন, স্বাভাবিক রীতির

ব্যভিচার ও সমাজসিদ্ধ আচরণে অনিয়ন্ত্রিততা গোষ্ঠী-জীবনের মূলে কুঠারাঘাত করেছিল, অন্যান্য অনেক বিষয়ে আদর্শস্থল হয়েও ওরা ধ্বংস এড়াতে পারেনি। গর্ভপাত শিশুহত্যা জন্ম-নিয়ন্ত্রণ পরিমিত জনসংখ্যা গোষ্ঠীর উন্নতির প্রধান অন্তরায়, ছোটখাট অনেক অখ্যাত সমাজ আজ এই কারণে অবলুপ্তির পথে।

স্নেহভাব সকল ধর্মে স্পষ্ট। হিন্দুধর্মে আরাধ্য দেবদেবীর সঙ্গে সম্পর্ক পিতামাতার; প্রোটেস্টান্টদের ঈশ্বর পরম পিতা। অপর সকলে সন্তান; ক্যাথলিক মাতা ও শিশুর সম্বন্ধ সবচেয়ে পবিত্র; চীন জাপানের বৃহৎ অংশ পূর্বপুরুষের উপাসনায় সন্তুষ্ট। এক যুগের লোকের সঙ্গে পরবর্তী যুগের যোগসূত্র নিবিড়, পরিবার ও গোষ্ঠী হতে এই ভাব উদ্ভব। অনাগত ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য আমরা যতখানি কষ্টসহ করি, ত্যাগ-স্বীকার করি, নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তত করি কিনা সন্দেহ। প্রচলিত ধর্মসমূহে যে ভক্তি প্রেম সাম্য অহিংসা ও পুণ্যপথের সন্ধান বিদ্যমান রয়েছে মনুষ্যত্বের অন্তর্গুঢ় কোমল ভাবে তার সূচনা, বন্দনীয় ধার্মিকগণের অন্তরে সেই মাতৃশক্তির পূর্ণ প্রকাশ। তাই ধর্মের শিক্ষা ও নীতি, কথা ও সৌন্দর্য্য ভক্তির মাধ্যমে, মানুষের দলিতকোমল বৃত্তিকে আশ্রয় করে তার প্রচার।

কোন মানুষকেই অধম দুরাত্মা অথবা পুণ্যাত্মা সাধু বলা চলেনা, প্রত্যেকের মনে মৃদুমধুর ভাব আক্রোশের সঙ্গেই বর্তমান। একই ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন-রূপ ধারণ করতে পারে অতি সহজে। অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও উগ্র অসহযোগ যেখানে মানবিক শিষ্টাচার উল্লঙ্ঘন করে মারাত্মক রকমের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত মানসিক ব্যাধি সেখানে প্রকট বটে কিন্তু সে-মনে সুকুমার বৃত্তিসমূহের প্রাধান্য খর্ব হয়েছে মনে করতে হবে।

মানব অভিব্যক্তির শেষ পর্যায়ে যে সামাজিক বৃত্তি-গুলির উন্মেষ হয়েছে তারা কোমল কান্ত ভাব সমাচ্ছন্ন। সৌন্দর্য্য ও আন্তরিকতাপূর্ণ এই সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি মনো-জগতের মানবকে ক্রমশঃ প্রগতির পথে পরিচালিত করছে তাই মনোবিদের দৃষ্টিতে আজকের মানুষ গতযুগের মানুষের চেয়ে অধিক সহানুভূতি সম্পন্ন, উন্নত। কৃতজ্ঞতা আগ্রহ, করুণা, প্রশংসা প্রভৃতি বৃত্তির অন্তরে স্নেহ-কোমল রেশ আছে মাতৃস্নেহসঞ্জাত অনুভূতি।

বর্তমান সভ্যতায় স্নেহ প্রীতির সঙ্কীর্ণতা গেছে কেটে, বুদ্ধি ও শিক্ষার সংস্পর্শে সুকুমার বৃত্তির একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারা দেখা যাচ্ছে। পশুজনোচিত প্রগাঢ় তীব্রতা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে আজ তার পরিধি বিস্তৃত; জীবন্মলভ প্রচণ্ডত্ব অনেকাংশে গেছে কমে, সমৃদ্ধি হয়েছে বিস্তারে। আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে সুকুমার বৃত্তিগুলির প্রাধান্য, লক্ষণীয়, ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে স্নেহ প্রেম মমতা। দিন দিন আমরা পূর্ণ মানবত্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছি ক্রমবর্ধমান জনহিতৈষিতা তার প্রত্যক্ষ পরিচয়। সহযোগিতা ও সাহচর্য বাড়ছে, মিত্রতা ও প্রীতি-সম্বন্ধ ক্রমশঃ পরিবার হতে গোষ্ঠী, সম্প্রদায় হতে জাতি শেষে জাতি ধর্মদেশ নির্বিশেষে সমুদয় মানব সাধারণের ভিতর পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে, মানুষের দক্ষিণাচার ভৌগোলিক বাধা অবহেলাভরে উপেক্ষা করে দিকে দিকে দেশে দেশে ওড়াচ্ছে সাম্যমৈত্রীর বিজয় বৈজয়ন্তী। সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদের অর্থ নৈতিক দিকটা বিশিষ্টরূপে লোকচক্ষে প্রতিভাত আবার সর্বমানবকে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করবার অকুণ্ঠ প্রয়াসও এদের ভিতরে, পথের পার্থক্য থাকলেও লক্ষ্য এক। ক্রীতদাস প্রথা বিলোপের জন্য সর্বনাশা যুদ্ধযুদ্ধ করতেও কিছু লোক পশ্চাৎপদ হননি একালে কিন্তু ১৭।১৮ শতাব্দী পূর্বে গ্লাডিয়েটরদের নৃশংস প্রাণনাশে বিরত হতে বলায় রোমের আমোদপ্রিয় জনতা এক সাধুকে ইঁইর বৃষ্টি করে সংহার করে। স্নেহবিগলিত অনুকম্পার প্রভাব মানুষের মধ্যে বিস্তৃত হচ্ছে ধীরে ধীরে কালের অগ্রগতির সঙ্গে। ইংরাজদের ভারত ত্যাগ ও আমেরিকানদের ফিলিপাইন ত্যাগের পিছনে কোমল প্রবৃত্তি সমূহের কার্যকারিতা নেই বলতে মনুষ্যত্বের অব-মাননা করা হয় অথচ মাত্র এক শতাব্দী পূর্বে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা পরিত্যাগের কথা অতি অল্প লোকই চিন্তা করতে পারত। আজ আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষা যে মানুষেই সীমা-বদ্ধ নেই, গোহত্যা নিরোধ আন্দোলন, কৃষাপ্রথা বিরোধী আইন, পশুক্লেশ নিবারণী সভার কার্যকারিতা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অনুরাগ স্নেহ প্রেম আজ ব্যক্তিগত প্রবৃত্তির বেড়া-জাল অপসারিত করে সর্বজনীনত্বের পথে।

স্বাবলম্বী

শ্রীতারাপদ রাহা

[গল্প]

জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি। তিনটের সময় বাড়ি ফিরে এলাম। ক'দিন দারুণ গরম পড়েছে। দিন দশেকের মধ্যে আকাশে এক টুকরো ছেঁড়া মেঘেরও দেখা মেলে না। উত্তর আর মধ্যপ্রদেশে প্রতিদিনই সর্দিগর্মিতে লোক মরছে. কাগজ খুললেই চোখে পড়ে। কলকাতায় লোক গরমে অজ্ঞান হয়ে পড়ছে। এ সব খবর জানা সত্ত্বেও বেরুতে হয়েছিল, কারণ এক বইয়ের দোকান থেকে আজই টাকা পাবার কথা ছিল। আজ শনিবার দোকান সকাল সকাল বন্ধ হয়ে যাবে, সুতরাং রোদের ভয় আর করি নি। ভয় ছিল বরং—আজ না গেলে টাকা যদি না পাই! ওদের ত বিশ্বাস নেই, বললেই পারলে—যেদিন আসতে বলেছিলাম, আসেন নি ত!

টাকা না পেলে আমার সব প্ল্যানই ভেস্তে যাবে। প্ল্যান অবশ্য আর কিছুই নয়, গিন্নী, বউমা এবং মেয়েকে নিয়ে পুরীতে একটু হাওয়া বদলাতে যাওয়া। গিন্নী বহুদিন ধরে পায়ের বাতে ভুগছেন। ওঁর কোন বন্ধু বলে দিয়েছেন পুরীর সমুদ্রতীরে গরম বালুর মধ্যে পা ডুবিয়ে রাখলে এ ব্যথা নির্ঘাত সারবে। বৌমারও সর্দিকাশি সারছে না, সুতরাং ওদের পুরী যাওয়া অত্যাবশ্যক হয়ে উঠেছে। আর ওদের নিয়ে গেলে মেয়েটাকেই বা কার কাছে রেখে যাই! আর এদিকে আমার ছুটিও ফুরিয়ে আসছে। যে শরীরটা খাটিয়ে ওদের ভরণ পোষণ সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করব তাকে মাঝে মাঝে একটু মেরামত করবার প্রয়োজন আছে বই কি!

টাকা অবশ্য পেয়েছি, কিন্তু গরমে একেবারে আধমরা হয়ে ফিরে এসেছি। কেউ জোর করে জলের মধ্যে মাথাটা বেশিক্ষণ ডুবিয়ে রাখলে বাতাসের জন্য প্রাণটা যেমন আই-চাই করতে থাকে, ঠিক তেমনি একটা আকুলতা জাগছিল একটু ছায়াশীতল আশ্রয়, জল আর বাতাসের জন্য।

বাড়ি এসে কয়েকবার ঘন ঘন কড়া নাড়তে পুত্রবধূ গৌরী এসে দরজা খুলে দিয়ে গেল. গিন্নী ও তার কন্যা তখন দিবানিদ্রাসুখ ভোগ করছে। গৌরীর চোখেও দেখলাম—তখনও ঘুমের ঘোর। তাকেও আর বিরক্ত করতে চাইলাম না। দরজা খুলে দিয়েই সে উলতে উলতে উপরে চলে গেল। কানে এল গিন্নী তন্দ্রালস কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করছেন, কি, উনি এলেন?

হাঁ।

যে কাজের জন্য গিয়েছিলেন, তা সিদ্ধি হ'ল?

শুনিনি।

বেশ, পরে শুনব 'খন।

এরপর আর ওদের কোন কথা কানে এল না।

দুজনেই বোধ হয় আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

এই অগ্নিবর্ষী গ্রীষ্মের দুপুরে ওদের ঘুম পাবে,—এ ত অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু পুরুষেরও ঘুম পায়। পরজন্ম যদি থাকে, এবং তাতে ইচ্ছামত জন্মগ্রহণ করার যদি মানুষের হাত থাকে, তবে তাতে মেয়ে হয়ে জন্মানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ভেবে মনে মনে একটু হাসবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু হাসি এল না, তার বদলে কি রকম যেন একটা বেদনার ভাব জেগে উঠল মনে।

আশ্চর্য হ'লাম। ব্যাপারটা ত নূতন নয়। ওদের দোষ দি-ই বা কি করে? বারান্দার বেসিনে হাতমুখ ধোবার ব্যবস্থা আছে, নীচে আমার বসবার ঘরে 'ফ্যান' আছে, আর তার পাশের ঘরেই আছে কুঁজোয় জল। আমার শ্রান্তি ক্লান্তি অপনোদন করবার সকল ব্যবস্থাই ত পুরোমাত্রায় রয়েছে।

তবু কি একটা বেদনা জাগতে লাগল মনে। মনকে ধমক দিয়ে বেসিনে বেশ করে হাত মুখ ধুয়ে এলাম। টেবল ফ্যানটা চালাতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তখনই মনে পড়ল আজ চার দিন সেটা বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে, বাইরে থেকে এসে সারাব বলে আর কারখানায় দেওয়া হয় নি। বাড়িতে ঐ একটি মাত্র ফ্যান। অগত্যা খবরের কাগজ দিয়ে বাতাস খেতে সুরু করলাম। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল, কিন্তু একটু না জিরিয়ে ত জল খেতে পারি না। ঘড়ি দেখে পাঁচ মিনিট পরে জল খাব ঠিক করলাম।

যথাসময়ে পাঁচ মিনিট কেটে গেল। কুঁজো থেকে পর পর দু' গেলাস জল গড়িয়ে খেয়ে ইজিচেয়ারে ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিলাম' হাতে সেই খবরের কাগজের পাখা। একটু ঘুমোবার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু ঘুম এল না, মনের মাঝে খচ্ খচ্ করে কি যেন বিঁধতে লাগল। কিন্তু আমিও ছাড়বার পাত্র নই, মনকে এলিয়ে দিলাম সাইকোলজীতে যাকে 'রিলাক্স' করা বলে। এমনি করলে অনেক সময় আমার দিব্যি ঘুম আসে।

কিন্তু ঘুম এল না,—এল এক স্বপ্ন; অতীত স্মৃতির এক ছায়া।...

ঠিক এমনি জ্যৈষ্ঠের এক দুপুর। তবে বেলা তিনটে নয়, বারো কি সাড়ে বারো। সেবার ম্যাট্রিক দেবার পর দুই বন্ধু বেড়াতে বেরিয়েছি। পাড়া গাঁ। দুজনের মাতুলীয় বাড়ী খোয়া ত আছেই, তা ছাড়া মামুদপুরে যাব রাজা সীতারামের রাজধানী মামুদপুর। সেখানেই—চলেছিলাম। ঠিক ছিল পথে আমার মামীমার বাপের বাড়িতে গিয়ে সেদিন দুপুরে খাওয়া দাওয়া করব। কিন্তু তা বুঝি আর হয়ে ওঠে না। নবগঙ্গার খেয়া পার হয়ে নদীর ধারের পথ ধরে ঘণ্টা খানেক চলবার পর শুনি গন্তব্যস্থল আমাদের আরও তিন মাইল। পা আর চলে না। মাথায় ছাতা থাকলেও এগুতে যেন আর পারছি না। অগত্যা একটা ঘাটের উপর বটের ছায়া পেয়ে সেখানে দু'জন বসে পড়লাম: একটু জিরিয়ে নেওয়া যা'ক। কতক্ষণ সেখানে বসেছিলাম, কি ভাবছিলাম, কি দেখছিলাম মনে নেই। কত লোক স্নান করে যাচ্ছিল সেদিকেও আমাদের খেয়াল ছিল না, হঠাৎ একটা কোমল স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম—

তোমরা কোথায় যাবে, বাবা?

তাকিয়ে দেখি নীচের পাড় থেকে উঠে এসে কলসী কাঁখে সদ্যস্নাতা এক মহিলা পরম স্নেহে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে আছেন: এই রোদ্দুরে কোথায় চলেছ, সোনারা?

বন্ধু হতভম্ব হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালে। একটু ইতস্তত: করে আমিই উত্তর দিলাম, যাব আমরা বসিরা।

না, এত রোদ্দুরে আর বসিরা যায় না, মাণিক! মুখ দু'খানা শুকিয়ে যে একেবারে আমসী হ'য়ে গেছে,... একেবারে কালি লেপে দিয়েছে।

কি উত্তর দেব ভেবে না পেয়ে আমি এবার বন্ধুর মুখের দিকে চাইলাম। বন্ধু উত্তর দিলে, আর কতদূর বা আছে? পারল আমরা যেতে।

মহিলার কণ্ঠে এবার ধমকের সুর: পাগলামি করো না, বাবা,—বসিরা যেতে গেলে মারা পড়বে তোমরা। সে এখনও অনেক দূরে,...তোমাদের মা কাছে থাকলে এই রোদ্দুরে তোমাদের বেরুতে দিত? পেটে ধরি নি বলে আমার কথা শুনবে না তোমরা?

শুধু কথা নয়, মহিলাটির কথার সুরের মাঝেও এমন কিছু ছিল যে 'না' বলা আর আমাদের সম্ভব হ'ল না। সুতরাং আমরা আর দ্বিরুক্তি না করে তাঁর নির্দেশ মত তাঁরই পিছু পিছু ঘাটের উপরেই তাঁদের বাড়িতে উঠে এলাম।

বাড়িতে ঢুকেই হাঁকলেন, মাদু, শীলা, তরি, একটা মাদুর আর পাখা নিয়ে আয়।

বারো তেরো বছরের একটা ছোট মেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে একবার উঁকি দিয়েই মাদুর আর পাখা আনতে আবার ঘরে ঢুকল। মা কলসী নামাতে রান্নাঘরে ঢুকে

ছিলেন, সেখান থেকে বললেন, ওদের ঐ আমগাছের নীচে বসতে দে, টিনের ঘরের বারান্দায় গরম হবে।

এইবার ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম বাড়িতে এক রান্নাঘর বাদে সবই টিনের ঘর। বাইরের ঘরের পাশে ঘনপত্রবিশিষ্ট একটা আমগাছ। মাধু তারই শীতল ছায়ায় আমাদের মাদুর বিছিয়ে দিয়ে বাতাস দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনই মাতৃ-আহ্বানে সে আবার রান্নাঘরে দিকে গেল। পরক্ষণেই একটা গামলা আর এক ঘটী জল আনলে সে আমাদের হাত-মুখ ধোবার। আমরা ভেবে দেখি নি আগে, কিন্তু হাত-মুখ ধোবার পর মনে হ'ল,—সত্যই ত, এরও প্রয়োজন ছিল;

আমাদের হাত মুখ ধোয়া হয়ে গেলে মাধু দাঁড়িয়ে আমাদের বাতাস দিতে সুরু করলে। পাখার বাতাসের দরকার ছিল না, কারণ দক্ষিণে নদীর দিক থেকে দিব্যি বাতাস আসছিল। মাধুকে জানালাম আমরা সে কথা। কিন্তু মাধু কি তা শোনে? বারণ করলে সে শুধু হাসে। বেশি পীড়াপীড়ি করলে সে বললে, মা বলে দিয়েছে, না দিলে মা রাগ করবে।

মাধুর সঙ্গে দুই একটা কথা বলবার পরই মাধুর মা এলেন, হাতে দুটি পাথরের বাটিতে খানিকটা করে আকের গুড়। মাধুকে হাঁকলেন, মা, দৌড়ে গিয়ে মেটে কলসী থেকে দু' গেলাস জল ভরতি করে নিয়ে আয়।

জীবনে অত তৃপ্তির সঙ্গে আর কোনদিন জল খেয়েছি বলে মনে হয় না।

মাধু আবার আমাদের বাতাস করতে লাগল। কয়েক মিনিট পর মাধুর মা একটা বাটিতে আমাদের মাখবার তেল দিয়ে গেলেন।

স্নান করে এসে দেখি—মাধু এক হাতে আয়না-চিরুণী, আর এক হাতে দু'খানা ধোপ দুরস্ত কাপড় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক ঘরের বারান্দায় দু'খানা পীড়ি পাতা, আর দু' গেলাস জল।

কাপড় আর আয়না-চিরুণীর অবশ্য আমাদের দরকার ছিল না, ও আমাদের সঙ্গেই ছিল—আমাদের পুটলীতে। আমাদের গলার সাড়া পেয়ে মাধুর মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে একটু সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, রান্নার সামান্য একটু দেরী আছে, তোমরা একটু জল খেয়ে নাও বাবা। শুনে আমরা এ ওর মুখের দিকে তাকালাম। মাধুর মা আমাদের আর কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে প্রায় তখনই দুটো পাথরের রেকাবীতে আম, কাঁঠাল, মুড়ি আর আকের গুড় এনে ডাকলেন, এসো এটুকু মুখে দিয়ে নাও, বাবা।

এটুকু অবশ্য সে নয়, কিন্তু খেতে বসে বুঝলাম, এরও বড় প্রয়োজন ছিল,—পথশ্রমের পর স্নান করে এসে এত খিদে পেয়েছিল আমাদের!

কিছুক্ষণ পরই খাবার ডাক পড়ল আমাদের। গরম ভাতের এক পাশে কিছুটা করে গাওয়া ঘি, ডাল, কাঁঠালের আঁটি ভাজা, মাছের ঝোল, দুধের বাটিতে আবার আম আর আকের গুড়।

অমন পরিতৃপ্তির সঙ্গে পরিপূর্ণ আহার জীবনে আর ক'দিন ঘটেছে—জানি না। খেয়ে এসে দেখি সেই আমগাছের নিচেই আমাদের বিছানা করা হয়েছে। সাবেক মাদুরটার উপর আর একটা শীতলপাটি বিছিয়ে তাতে জল সিঞ্চন করা হয়েছে। মাথার দিতে ছোট দুটি নকসী কাঁথায় ঢাকা দুটো বালিস।

মাধু আবার আমাদের বাতাস দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তখনও তার খাওয়া হয় নি, তা ছাড়া নদীর দিক থেকে এমনি দিব্যি হাওয়া আসছিল, তাই একরকম জোর করেই আমাদের সেবা থেকে তাকে বিরত করলাম।

বিকেলে বিদায় নেবার সময় মাধুকে সঙ্গে নিয়ে মাধুর মা যখন আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের মাঝে কি যেন ঠেলে উঠতে লাগল, আর বলতে লজ্জা নেই চোখের অবস্থাও আমার স্বাভাবিক ছিল না।

—কিন্তু আজ বুঝেছি জীবনে মাধুর মার দেখা না পেলেই ভাল ছিল; স্বাবলম্বী হয়ে নিজে জল গড়িয়ে খেতে গিয়ে এমন বেদনা জাগত না মনে।

অপ্রকাশিত

মন্মথগোপাল সেনগুপ্ত

[গল্প]

সে বেলা চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে বসেছি। হঠাৎ দরজায় টুক টুক। উঠে দোর খুলতেই দেখি নার্সের পোষাক পরা ফুট ফুটে একটি মেয়ে। বয়স বছর একুশ বাইশের বেশী হবে না।

নমস্কার করে বললেন, আপনিই কি প্রফেসার অমিয় দাশগুপ্ত? আমার সঙ্গে আসতে হবে একবার আপনাকে —যাদবপুর যক্ষ্মা হাঁসপাতালে।

কেন?

একটি পেশেন্ট আপনাকে একবার দেখার জন্যে অস্থির হয়েছেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা পূরণের জন্যেই আমাকে পাঠিয়েছেন কর্তৃপক্ষ আপনার বাড়ে।

বললাম, একটু অপেক্ষা করুন, তৈরী হয়ে নিচ্ছি। যক্ষ্মা হাঁসপাতাল।

বছর পঁয়ত্রিশ বয়সের শীর্ণ শয্যাশায়িনী মহিলা এক গুচ্ছ মাথার শিয়রে তাঁর জানলার আলমারিতে শিশি বোতল এক রাশ—তারি সঙ্গে দু-চারটে নেবু-বেদানা। তার পাশে বিছানার ধারে ছোট্ট টিপয়ে গল্পের বই খান কতক—ওপরেরখানা আমারই লেখা!

দেখলাম, ম্লান ঠোঁটে তাঁর একটুকরো হাসি। সুন্দরী ছিলেন কোন কালে—কেশে, কপোলে, চোখের চাওয়ায় তার ক্ষীণ অবয়ব খুঁজে পাওয়া যায় যখন এখনো।

বুঝলাম, কোন ভক্ত পাঠিকা—ওপরের বই খানার যক্ষ্মা নিয়ে গল্পটা আছে, তাই পড়েই বোধ হয় আকৃষ্ট হয়েছেন লেখককে একবার দেখতে! জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলাম।

ভাঙা গলায় বললেন তিনি, চিনতে পারছো?

না তো!

উলিপুরের খেলার সাথী রেণুকে মনে আছে?

রেণু?

যার জন্যে কামরাঙা পাড়তে গাছে উঠে পেয়ারকুলের কোপে পড়ে গিয়েছিলাম! যাকে খুশী করার জন্যে ছিরিধর গোয়ালার মাচা থেকে পসা চুরি করে ধরা পড়েছিলাম এবং মেজকাকার হাতে প্রচণ্ড ঠেঙানো খেয়েছিলাম? আমার সঙ্গে মেলা বারণ হয়ে গেলে যে ইচ্ছে করে স্কুলের পথে দাঁড়িয়ে থাকতো, বড় সড়ক দিয়ে আমার বাড়ী ফেরার সময় দেখা হবে বলে। বিয়ে হয়ে সে শ্বশুর বাড়ী চলে গেলে, মন কেমন করতো আমার অকারণেই, কান্না ভরা চোখে তাকিয়ে থাকতাম লোহাগড়ার পথের দিকে—জেলা বোর্ডের বড় সাঁকোটার ওপর, কোটালীর মাঠ পেরিয়ে, কুমুরিয়ার বিলের ধারে, যেখান দিয়ে পাল্কী চেপে চলে গেছে রেণু, তার সিল্কের পাঞ্জাবী পরা স্বামীর সঙ্গে।

সেই রেণু!

সে আজ বিধবা, জীর্ণ, যক্ষ্মাগ্রস্ত।

মুছে যাওয়া সমস্ত অতীতটা তখন মুহূর্তেই ভেসে উঠলো মনের আয়নায়। সেদিন ছিল আশ্চর্য্য সুন্দর সোনালী সকাল, আর আজ দেখছি মেঘাচ্ছন্ন, ধূসর, বর্ষণময় সন্ধ্যা। হু হু করে উঠলো বুকের ভিতরটা। উকিল হরিপ্রিয় বাবুর মেয়ে রেণু, আর ডেপুটি রাজচন্দ্র বাবুর ছেলে রাজীব—দুজনে দুজনের ছিল কৈশোর-সঙ্গী সে কত দিন আগে? দ্বিধা জড়িত কণ্ঠে বললাম, রেণু, তুমি রেণু? কি আশ্চর্য্য!

তারপর আপনিই মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, এখনো মনে করে রেখেছো তাহলে আমাকে? কিন্তু কি করে জোগাড় করলে তুমি আমার ঠিকানা?

দু মিনিট চুপ করে রইলো রেণু।
গাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে জলের ধারা।

সেই অশ্রু চোখেই ম্লান একটু হাসি টেনে এনে বললো রেণু, মেয়েরা ফুরোতে দেয় কি পুরানোকে কোন দিন? দিতে পারে কি?

তারপর একটা ঢোক গিলে বললো, জীবনে তোমার মতো কিছু পেলে হয়ত ভুলতাম। কিন্তু তা পাইনি—তাই স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটি, সেখান থেকে সাহিত্য, খবরের কাগজ, ভেলখানা, ইউরোপ, যেখানে তুমি গেছো সেখানেই পিছু পিছু ছুটেছে তোমার আমার সারা দিনরাত্রির কল্যাণ কামনা।

আবার একটা ঢোক গিলে বললো, আমার বোন-পো অমলীশ তোমার বই ছাপায়—তারি কাছে পাই তোমার সব খবর। ঠিকানাও দিয়েছে সেই আমাকে।

ভয়ে ভয়ে বসলাম বিছানার এক কোণে। ধরলাম আস্তে করে রেণুর শীর্ণ নীল ঠাণ্ডা ডান হাতখানা। সে হাতে তখন মৃত্যু ঘুমিয়ে আছে।

বালিশের তলা থেকে বের করে কালো মলাটের পুরানো বিবর্ণ একখানা খাতা তুলে দিল সে আমার হাতে।

বললো, বিয়ের রাতে আমার হাতে গুঁজে দিয়েছিলে তোমার এই কবিতার খাতা—ত্রিশ বছর একে আগলে রেখেছি আমি অনেক যত্নে। সেদিন তুমি ছিলে শুধু আমার কবি—আজ হয়েছো অনেকের, তাই তোমার হাত দিয়েই দেশের কাছে পৌঁছে দিলাম আমি এই কবিতাগুলো।

তিন দিন পরে আবার গেলাম হাসপাতালে। বিছানা খালি। সেই নার্সটি যাচ্ছিলেন হল দিয়ে। বললেন, কালই মৃত্যু হয়েছে তাঁর—বারবার বলছিলেন আপনার কথা, বলতে বলতেই শেষ হয়ে গেল সব।

চলে এলাম। বালা কালের সেই সেকুবীর কবিতা গুলো—সেগুলো যে এখন কোন কাজে লাগবে, তাই ভাবনা।

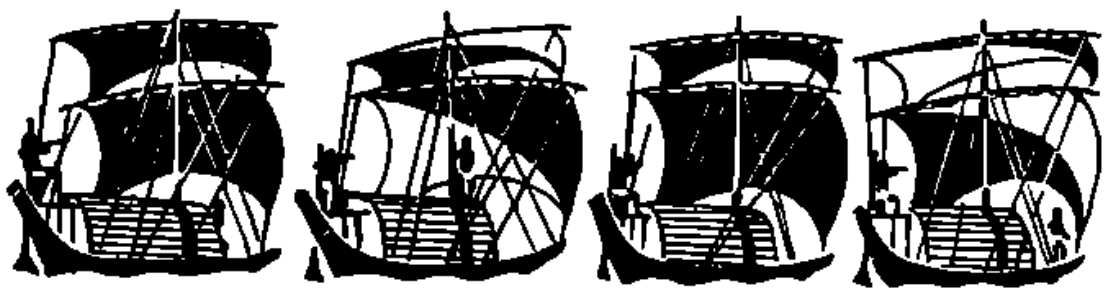

বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কাব্যসৃষ্টির কাজে চিন্তাশীলতা যেমন বাঞ্ছনীয় তেমনি আশঙ্কাজনকও বটে। কারণ চিন্তা সাহিত্য স্রষ্টার বন্ধুও বটে শত্রুও বটে। এক এক সময়ে আমরা দেখি যে বহুদিনের চিন্তার ফলে অনেক রচনায় লেখকের হাত খুলে গেল; আবার আর এক সময় দেখি যে অধিক চিন্তার ফলে লেখকের রচনা-শক্তি প্রায় লোপ পেতে বসল। কার্যকারণসম্পর্কে সুস্থ ও সঠিক চিন্তার সাহায্যে রচনার উৎকর্ষ সাধন করা যায় কিন্তু মাত্রাজ্ঞানের অভাবে রচনা প্রাণহীন রসহীন মৃতদেহের মত শোকাবহ দৃশ্যের অবতারণা করে। অন্তরে আছে একটি মরমী ছন্দ, আছে সঙ্গতি, আছে সংস্কার, আছে সুখদুঃখ মধ্যাহ্ন নিবসের সযত্নে রক্ষিত অরণীয় মুহূর্ত, আছে নিশীথঅন্ধকারের গভীর উপলব্ধি, আছে নীরবতা, আছে মুখরতা, আছে জীবনের শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ, আছে সমাহিত চিত্তের জাগরণ ও বিশ্রাম, আছে রোষ শোক দুঃখ নৈরাশ্য ভরা মৃত্যুর বাস্তব ও কাল্পনিক ধারণা, আছে আশা ভরসা উদ্দীপনা আর তারই মধ্যে আছে অনন্ত-প্রবাহ—; সে প্রবাহের গতিবেগ কখনও দ্রুত কখনও মন্থর;—এই সমস্তের গভীরে আছে নূতন সৃষ্টির উন্মাদনা। তাকে অবলম্বন করে আকাশের অনন্ত তারকার মত আছে অসংখ্য রচনাত্মক মুহূর্ত। বাহিরে তার প্রকাশ নেই—সেই মুহূর্তগুলি অপণ্য তারকার মতই ঝরে' পড়ে, যে কয়টি থেকে যায়, তাদেরই মধ্যে হয় কাব্য সৃষ্টি। একজন গ্রীক সমালোচক বলেছেন—আলোর মধ্যে নয়, বরং অন্ধকারেই রসের সৃষ্টি হয়—It is not in the light, but rather in darkness that lucidity is born.

আবার কেউবা বলেছেন—পর্যাপ্ত আলোকের মধ্যেই মহত্তম শিল্পকলা ও সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। এই দুটি মতের মধ্যে কোনটাই উপেক্ষা করার নয়। কবি বা কথাশিল্পী এই অবিরাম আলো অন্ধকার, সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনার মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন রেখে সকল দ্বন্দ্ব ও বিরোধের সামঞ্জস্য খুঁজে দেখবেন, বিচ্ছিন্নতা ও বিরুদ্ধতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করবেন। নতুবা কি চিন্তায়, কি উপলব্ধিতে, কি প্রেরণায়, কি ভাবস্মৃতিতে কবি-মনের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যাবে না। বিশিষ্ট কোনও এক প্রকার ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের নির্দিষ্ট কোনো সম্পর্ক নাই, সাহিত্যের ভাষা এমনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে দর্শন শাস্ত্রের ভাষার সহিত তার সাদৃশ্য থাকা সম্ভব নয়। যুক্তি তর্কে বা বাকবিতণ্ডায় নয়, ভাষার ভাবপ্রবণতার সঙ্গে সাহিত্যের সত্যকার সম্পর্ক। সেজন্য সাহিত্য-স্রষ্টার মননের সঙ্গে ভাষার একটা সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু চিন্তাশীলতার আতিশয্য ও ভাষার মধ্যে সেটা দেখতে পাওয়া যায় না। কারণ ভাষার জটিলতায় প্রকাশ পায় চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তার অসংলগ্নতা। ভাষার স্পষ্টতায় প্রকাশ পায় চিন্তার স্পষ্টতা। কিন্তু কাব্য রচনার ক্ষেত্রে ভাষা সম্পর্কে সব সময় একথা খাটে না। সাহিত্যে ভাষার অস্পষ্টতা অনেক স্থলে তাৎপর্যপূর্ণ এবং আবশ্যকও বটে। এমনও হতে পারে যে মনের অনুভূতি কোনও পদ বা বাক্যাংশে প্রতিধ্বনিত হোল কিন্তু তার যুক্তি-যুক্ত কোনও অর্থ খুঁজে পাওয়া গেল না। এমন পদ বা বাক্য, চিন্তা করে ব্যবহার করা যায় না; হঠাৎ এটা বিদ্যুতের মত এসে পড়ে—তার দ্বারা প্রকাশিত হয় সেই বাক্যের উৎস, অজ্ঞাতের অজ্ঞেয়তা। বস্তুবিষয়ের যে সত্যতা নিরূপণে লেখক সচেষ্ট তার প্রকাশ গুলির এটাই যেন একটা বিশেষ রূপ।

আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত না হলেও এই প্রতিধ্বনির মধ্যে আছে এমন একটি শক্তি যা সাহিত্য-রচনার পক্ষে বিশেষ সহায়ক। জানা অজানার যুগল-মিলনে উদ্ভূত সাহিত্যই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য—কাব্য সাহিত্য ত' বটেই। এই মিলনের আনুষ্ঠানিক রীতি পদ্ধতি প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত; যাকে বলে Conventions of literature। সর্বপ্রথম স্বেচ্ছাকৃত মনোনয়ন, তারপরই আসে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ ও সৃষ্টির প্রয়োজন বোধ—তারপর অনুরাগ, আবেগ ও প্রবল মানসিক উত্তেজনা (যাকে কামশাস্ত্রে বলা হয়েছে 'রভস') এই মানসিক ক্রিয়া ও বাহ্যপ্রক্রিয়ার পরিপূর্ণতার মধ্যে হয় সত্যকার কাব্যসৃষ্টি।

এইখানে কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে আসে চিন্তাধারার ক্রিয়া ও তৎপ্রণোদিত মানসিক প্রতিক্রিয়া; কাব্যরস সম্ভোগের মধ্যেও সেই কারণে চিন্তাধারার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। কাব্য থেকে সেই কারণে মহৎ চিন্তাকে পৃথক করা যায় না; কারণ চিন্তা এখানে মননশীলতাকে সুবিন্যস্ত করে—তার ফলে কাব্যসৃষ্টি সুন্দর ও স্থায়ী হয়। কাব্যসাধনাকে সমগ্রভাবে একটি পূর্ণ সৌন্দর্য রূপে উপলব্ধি করতে হবে। কাব্যে ভাব-ধারণা আছে, কিন্তু তার শক্তি কতখানি কাজে লেগেছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে সেই বিশেষ কাব্য সৃষ্টির সাফল্যের মধ্যে। যে ভাবধারণা সার্বজনীন তাকে আশ্রয় করে যে কাব্য গড়ে উঠবে—সেও হবে সার্বজনীন। কাজেই সাহিত্য থেকে তার অন্তর্নিহিত ভাবধারণাকে কখনই পৃথক করে দেখা যায় না। তাতে সাহিত্যের প্রকৃতি সম্পর্কে ভ্রান্তি উৎপত্তির আশঙ্কা থেকে যায়।

সাহিত্যের বা কাব্যের সত্য, জীবনের সত্য থেকে কদাচ পৃথক নয়। পাছে সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে নীতি বোধের গোলমাল করে ফেলি, তাই এই দুটি সত্যকে দুদিক থেকেই দেখা দরকার। অর্থাৎ দেখতে হবে সাহিত্যের বক্তব্যবিষয়ের সঙ্গে সাহিত্যিকের মনোভাবের সম্পর্কটা কি রকম। যা' বলা হয় তা লেখকের উপলব্ধিতে জোরালো হয়ে ওঠে, কিন্তু যে সম্বন্ধে বলা হয় তার সঙ্গে প্রকৃত বিষয় বা তথ্যের এবং উপলব্ধির কতখানি সম্বন্ধ তা' বিচার করে দেখার অর্থ ই হচ্ছে জীবনের সত্য ও সাহিত্যের সত্যকে পৃথক করে দেখা। কাব্য বিচারের এটা মাপকাঠি হতে পারে না।

যদি কেউ প্রত্যক্ষ ভাবে জীবনকে না জেনে অন্যভাবে অর্থাৎ পরোক্ষভাবে জানতে চান, অথবা জেনেও তিনি জ্ঞানের সহায়ক রূপে আরও কিছু পেতে চান, তা'হলে একটি রসোত্তীর্ণ কবিতা বা শ্রেষ্ঠ গল্প ও উপন্যাস অপেক্ষা জীবনীর শিক্ষা অধিকতর কার্যকরী হ'তে পারে; কিন্তু মনের উপর প্রভাব বিস্তারে কোনও উৎকৃষ্ট কবিতা গল্প বা উপন্যাসের যে শক্তি আছে, জীবনীর তা থাকা সম্ভব নয়, তবে আসল ঘটনা বাদ দিয়ে বা আসল ঘটনার উপর রঙ চালিয়ে সামাজিকে কেলিয়ে ফাঁপিয়ে অসামাজিক করে যদি কোনও জীবনী, উপন্যাস বা কাব্যের উপাদানে রচিত হয় তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র।

কাব্যে কল্পনাশক্তির স্বাধীনতা আছে, কিন্তু সেটা অন্যান্য কথাশিল্পের মতই নিয়মানুগ, কিন্তু জীবনীর মত সুনির্দিষ্ট ঘটনা বা তথ্যের দ্বারা উপন্যাস বা কাব্যের গতি সীমিত নয়। এটা আমরা বিবেচনা করে দেখি না বলেই সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের গরমিল দেখি। তখন উপন্যাসের চরিত্রের মত আসল চরিত্রকে বস্তুজগতে দেখে ভুল বুঝে থাকি। উপন্যাসের বলিষ্ঠ চরিত্র তাই সাধারণ মানুষের জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। Oscar Wilde সেই জন্য বলেছেন—"জীবন আর্ট বা শিল্পের অনুকরণ করে।" সাহিত্য অনুশীলনের দ্বারা এই সত্য আমরা উপলব্ধি করে থাকি। তেমনি উপলব্ধি করি যে কাব্যকে অনুসরণ করে চলে জীবন—যে জীবন সৃষ্টির অনুপ্রেরণায় নিত্য নূতন হয়ে ওঠে,—নূতন রসের সন্ধান পায় এই পৃথিবীর মাটি, জল, আলো, বাতাস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের মধ্যে। সে জীবন পৃথিবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায়

অপরূপ হয়ে ওঠে—যেমন অপরূপ হয়ে ওঠে তার কাব্য।

কিন্তু এই ভাবে সাহিত্যের অনুশীলন না করে যদি কেবল সাহিত্যে প্রকাশিত চিন্তাবলির দ্বারা আকৃষ্ট হই এবং পরে সাহিত্য থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে জীবনের আদর্শ ও আচরণ নীতির বিষয়েই শুধু চিন্তা করতে থাকি তাহলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বার যথেষ্ট আশঙ্কা থেকে যায়। সাহিত্যের যে কোনও শ্রেষ্ঠ রচনার মধ্যে রয়েছে বাক্যবিন্যাস আছে, রয়েছে চিন্তার সমাবেশ আছে, অনুভূতি ও উপলব্ধির রস-মাধুর্যের যে অভিব্যক্তি আছে—সে সকল সংমিশ্রিত ভাবময় রূপময় রসময় বস্তু আমরা আমাদের সৌন্দর্যবোধের দ্বারা, গ্রহণশীল মনের প্রসারের দ্বারা, সাহিত্যের প্রতি আমাদের সংস্কারগত আদর্শগত ও অধ্যাত্মদৃষ্টিগত প্রয়োজনবোধের দ্বারা গ্রহণ করব,—এ বিষয়ে সহায়ক হবে আমাদের স্থির বুদ্ধি, সূক্ষ্মদৃষ্টি ও অবিকৃত চিন্তা-শক্তি। সাহিত্য সৃষ্টি ও সাহিত্য উপভোগ ব্যাপারে এর চাইতে বেশী সার্থকতা আর কি থাকতে পারে?

কাব্যে রসের স্থান সকলের উপরে, সে রস "ব্রহ্মস্বাদ সোদর"—অর্থাৎ ব্রহ্ম আস্বাদের সমান। এই রস থাকে কবিচিত্তে, কবি সেই রস কাব্যধারায় পান করান পাঠক চিত্তকে। এ রস অনুভূতিসাপেক্ষ; সংজ্ঞা বা বর্ণনায় তাকে প্রকাশ করা যায় না। কাব্যের রস প্রথম কবির মনে পরিণতি লাভ করে, তারপর কবির লেখনীমুখে তার অভিব্যক্তি হয় একটি সর্বাঙ্গসুন্দর রসোত্তীর্ণ কবিতায়। পাঠকচিত্ত সেই রসে অভিষিক্ত হয়। যে আনন্দে নিমগ্ন হয়ে কবি কাব্য রচনা করেন, সেই আনন্দ কাব্যপাঠে লাভ করেন পাঠক। কবি-চিত্ত ও পাঠকচিত্তের মধ্যে এই ভাবে অপূর্ব যোগা-যোগের সৃষ্টি হয়। আমার আজকার আলোচনা তাই নিয়ে। এবং এই রসের কথাই আলোচনার প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা আমার বস্তুসম্পর্কে।

মানুষের প্রথম ও শেষ পরিচয় এই মাটির সঙ্গে—কাজেই মাটির মায়া ছেড়ে, পৃথিবীর বন্ধন কাটিয়ে এমন কোনও জগতের পরিচয় কবি জানেন না—যেখান থেকে তিনি অভাবনীয় কোনো ঘরানার সংগ্রহ করতে পারবেন—অচিন্তিতপূর্ব কোনো কাব্য-রচনার জন্য। কাজেই কাব্যজগৎ বস্তুজগৎ ছাড়া নয়—অর্থাৎ বাস্তবের সঙ্গে যোগ থাকবেই—যদিও সেই ভিত্তির উপর সমাসীন থেকেও কবির মন উধাও হয়ে যাবে বস্তুনিরপেক্ষ ভাবজগতে—যেমন জীবনদর্শনের প্রকৃতি Transcendental লোকোত্তর বা অলৌকিক—এবং Immanental—অন্তর্নিহিত বা স্বতঃপ্রসূত।

বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে কবিমনের ঘাত প্রতিঘাতে 'ভাব'এর উৎপত্তি হয়, কেউ কেউ একে বলেন Emotion—কিন্তু চিত্তের বৃত্তি হচ্ছে ভাব বা ভাবাবেগ। অলঙ্কার শাস্ত্রে একে 'ভাব'ই বলা হয়েছে। এই ভাব শাস্ত্রকারগণ নয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয় জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম। এগুলি মানব মনের স্থায়ী ভাব। সঞ্চারী ভাব যুগে যুগে আসে যায়—কখনো দুর্বল, কখনো প্রবল, কিন্তু আগেকার নয়টি ভাব মানব-মনের চিরন্তন সম্পদ। মানুষের মত কবির মনও এগুলির প্রভাবের অধীন। এই ভাবসম্পদ হ'তেই কাব্যের প্রেরণা আসে কবির কাছে। মাটি যেমন তার অন্তরের রসে বেলা, চামেলী, গোলাপ ও রজনীগন্ধার ধরণীকে বিভোর করে দেয়—কবিও তেমনি ভাবের রসে কাব্যকে নানারূপে, নানারসে, নানা গন্ধে ভরপুর ক'রে তোলেন ও নানা বিচিত্র কল্পনায় তার রূপের বৈচিত্র্যে পাঠকের মনকে মুগ্ধ করে রাখেন।

ভাবের উদয়ের পর তার স্মৃতি কবিচিত্তে জমা থাকে—তাকেই বলে "ভাবস্মৃতি।" ভাবস্মৃতিকে কবি কল্পনা সহযোগে তোলেন, কবিচিত্তে তখন চলে কবিতার গুঞ্জন, ছন্দে ছন্দে, তালে তালে, মাত্রায় মাত্রায়, গতিতে গতিতে সেই ভাবস্মৃতি বহুত হ'তে থাকে—প্রকাশের বেদনা তখন সুমধুর মূর্ছনায় অধীর হ'য়ে ওঠে—তার পরিপূর্ণ পরিণতিতেই হয় প্রকৃত কাব্যের সৃষ্টি। জার্মান কবি হাইনে (Heine) এই ভাবস্মৃতিকে জাগিয়ে

তোলবার জন্ত বলছেন—

Rise old dreams, at this my bidding !
Fling thy gates wide, heart o' mine !
Lo ! a mystery of sweet weeping,
And a flood of song divine.

কাব্য ও আধুনিক কাব্য সম্বন্ধে এ প্রসঙ্গে কিছু বলা দরকার। "প্রকৃত কাব্য" কথাটির উল্লেখ এখানে তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে প্রকৃত কাব্য অর্থে রসোত্তীর্ণ কাব্যের কথাই বলা হয়েছে—। কাব্য রসোত্তীর্ণ হ'লেই কালোত্তীর্ণ হ'য়ে বেঁচে থাকতে পারে। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ পাঠকগণের কাছে রসপরিবেশক সত্যকার কাব্যই কাব্য সুতরাং আধুনিক কাব্য বলে কোনও কাব্যকে মার্কামারা করে দিলে তার জাত থাকে না। অর্থাৎ কাব্য বিচারের নিক্তিতে এর কোনও মূল্য নির্ধারণ করা চলে না। 'আধুনিক' কথাটি কাব্যের লক্ষণ নয়—উপলক্ষণ মাত্র। কোন বিশিষ্ট একটি কাল যদি কাব্যের জীবনকাল নির্দেশ করে দেয় তাহলে তার আনন্দ দানের শক্তিও স্বভাবতই বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ বলতে হবে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—বিশেষ একটা চাপরাশ-পরা সাহিত্য দেখলেই গোড়াতেই সেটাকে অবিশ্বাস করা উচিত। 'সাহিত্য, বিশেষ কারখানার প্রাচীন বা অর্বাচীন মার্কামারা বস্তাবন্দী মালের ভাণ্ডার নয়—সাহিত্য প্রতিভার আত্ম-পরিচয়ের স্বাতন্ত্র্য আত্মসমাহিত।" তার ভিতরকার মৌজ আছে বলেই চাপরাশের দেমাক বেশি হয়। কোনো একটা উদ্ভট রকমের ভাষা বা রচনার ভঙ্গী বা সৃষ্টিছাড়া ভাবের আমদানির দ্বারা যদি একথা বলবার চেষ্টা করা হয় যে, যেহেতু এমনতরো ব্যাপার ইতিপূর্বে কখনো হয়নি, সেই জন্তই এটাতে সম্পূর্ণ নূতন যুগের সূচনা হ'ল, সেটাও অসঙ্গত।

তাহলে আসল কথা দাঁড়ায় এই যে, যে কোনো যুগের কাব্যই হোক না কেন, সেটা সত্যকার কাব্য হোল কিনা সেইটাই বিচারের বিষয়। কাজেই শুধু ভঙ্গীটাকে বড় ক'রে কোনো কাব্যের বিচার চলে না। আধুনিক কবিরা যদি 'আঙ্গিক' নিয়েই ব্যস্ত থাকেন তাহলে সর্বাঙ্গসুন্দর কবিতা রচনা করতে পারবেন না—এর প্রমাণ আমরা সাময়িক পত্রের পাতায় পাতায় পেয়ে থাকি। এ মন্তব্যে যদি কেউ ক্ষুণ্ণ হ'ন আমি সবিনয়ে ক্ষমা চাইব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আশ্বস্ত হ'তে বলে নিবেদন করব যে, আমি আধুনিক কবিদের সংস্কারক সেজে বসিনি—আধুনিক কালের পরিবেশে যে আঙ্গিকের পরিবর্তন এনেছে—তাকে আমিও স্বীকার করে নিয়েছি কিন্তু আঙ্গিকের অতি-অভিনয়ে যে কবিত্বশক্তির অযথা অপব্যয় ঘটছে আমি তাকেই লক্ষ্য করে এ মন্তব্য করছি। আধুনিক কবিদের মধ্যে আমি প্রতিভার সন্ধান পেয়েছি—নূতন চিন্তাধারা, নূতন মননশীলতা রচনায় নিত্য নূতন অপূর্বতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু বেদনা পেয়েছি কবিতা রচনায় আঙ্গিকের ব্যায়াম লক্ষ্য করে; ভাবকে নির্মমভাবে সঙ্কুচিত করে—ভাবস্মৃতিকে উপেক্ষা করে, শুধু নূতন কিছু করবার মোহে যাঁরা বাংলা কাব্য সাহিত্যে অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন—আমার অনুযোগ শুধু তাঁদেরই বিরুদ্ধে।

"ভাবটাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে অর্থের বিপদ ঘটিয়ে, ভাষাগুলোকে স্থানে অস্থানে ডিগ্‌বাজি খেলিয়ে, পাঠকের মনকে পদে পদে ঠেলা মেরে, চমক লাগিয়ে দেওয়াই সাহিত্যের উৎকর্ষ? চরম সন্দেহ নেই। এর একটি মাত্র কারণ হচ্ছে এই,—আলাপের সহজ শক্তি যখন চলে যায়,—সেই বিকারের দশায় প্রলাপের শক্তি বেড়ে ওঠে। বাইরের দিক থেকে বিচার করতে গেলে প্রলাপের জোর আলাপের চেয়ে অনেক বেশি—একথা মানতেই হয়। কিন্তু তা নিয়ে শঙ্কা না করে লোকে যখন গর্ব করতে থাকে—তখনি বুঝি, সর্বনাশ হোলো বলে।" কালক্রমে সেই আঙ্গিকপ্রধান রচনাগুলির অকাল মৃত্যু ঘটেছে। এখনও জলবুদ্‌বুদের মত যে সকল আধুনিক কবিতা শুধু তাদের দুর্বোধ্যতার জন্ত বাহোবা নিতে চাইছে—তারা নিজেদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও অক্ষমতার জন্ত ক্রমশঃ

হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছে। হাওয়া বদলেছে—বদলাতেই হবে, কারণ যে, রসোত্তীর্ণ কাব্যসাহিত্যের জন্যই বাঙালীর গর্ব—। একদিন এই সাময়িক স্রোতের আবিলতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেই। সেই স্রোতের আবর্তন শেষ হলে সত্যকার মুক্তার সন্ধান আমরা কিছু কিছু পাব বলে আশা করছি এবং ভবিষ্যতে নূতন স্রোতের গতিবেগে ভেসে আসবে বাণী পূজার প্রস্ফুটিত শুভ্র শতদল।

যুগধর্মে বস্তুনিরপেক্ষ কাব্যরচনা সমাজ-সচেতন মনের পরিচয় নয়—এমন কথাও শুনে থাকি, অর্থাৎ বলা হয় যে বাস্তবতা ও তার অতিরিক্ততা নিয়ে কবিতা রচনা করতে গেলে বর্তমানে উদ্‌ভ্রান্ত মন ও বিশৃঙ্খল পরিবেশের প্রতিচ্ছবি তাতে থাকবেই। তাতে Imagery থাকলেই যথেষ্ট হোল, কালের ছাপমারা ভঙ্গি থাকলেই চলবে। যখন নিত্য নূতন পরিবর্তনের পথে যুগের ক্রান্তি চলেছে, কখনও নিঃশব্দে, কখনো সশব্দে, চোখে যা দেখেছি, কানে যা শুনছি, মনে যা ভাবছি, অন্তরে যা অনুভব করছি—তার মধ্যে যখন না আছে শৃঙ্খলা, না আছে সুসংযত সুসংহত চিন্তাধারা; ঘটনাপরম্পরার সঙ্গতি নাই, আচার আচরণের সংলগ্নতা নাই,—প্রত্যেক বিষয়বস্তুও আলাদা, চারিদিকে যেন একটা এলোমেলো ভাব, পারিপার্শ্বিকের চাপে যখন মন উদ্‌ভ্রান্ত, চিত্তবৃত্তি উন্মার্গগামী তখন কাব্য রচনার সংযত ও সংহত রীতি প্রত্যাশা করাই ত অস্বাভাবিক। সম্প্রতি মানুষের জীবনে যখন আনন্দই নাই তখন কাব্য পাঠে আনন্দ পেতে চাও কোন আক্কেলে? এ মন্তব্য জাঁকালো বটে কিন্তু কাব্যের রূপ ও রীতির বিচারে যুক্তিসহ নয়। এই প্রসঙ্গে একজন যশস্বী আধুনিক সাহিত্যিক বলেছেন—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে নির্দিষ্ট নিয়মিত কোনো কাজ করবার থাকলে সাহিত্যিক যুবকরা শুদ্ধ ও সুস্থভাবেই জীবন কাটাতেন; কাজের অভাবেই সাহিত্য চর্চার উৎকর্ষ চেষ্টায় নিজেদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছেন।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - "অন্যান্য সকল বেদনার মতোই সাহিত্যে দারিদ্র্য-বেদনারও যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু ওটার ব্যবহার একটা ভঙ্গিমার অঙ্গ হয়ে উঠেছে যখন তখন সেই প্রয়াসের মধ্যে লেখকেরই শক্তির দারিদ্র্য প্রকাশ পায়। আমরাই রিয়ালিটির সঙ্গে কারবার করে থাকি, আমরাই জানি কাকে বলে 'লাইফ'. এই আক্রমণ করবার ওটা একটা সহজ এবং চলতি প্রেস্‌ক্রিপসনের মতো হয়ে উঠেছে। দেশের দারিদ্র্যকে এরা কেবল নব্য সাহিত্যের নূতনত্বের খাঁজ বাড়াবার জন্যে সর্বদাই কাঁচা মশলার মত ব্যবহার করেন। এই ভাবুকতার কারি পাউডারের যোগে একটা কৃত্রিম পন্থা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়ে উঠ্‌ছে। এই উপায়ে বিনা প্রতিভায় এবং অল্প শক্তিতেই বাহোবা পাওয়া যায়, এই জন্যই অপটু লেখকের পক্ষে এ একটা মস্ত প্রলোভন এবং অবিচারক পাঠকের পক্ষে একটা সাহিত্যিক অপথ্য।"

কোন কোন সময় এই প্রকার কবিতার মধ্যে কামাতুরতার নির্লজ্জ আকুতি নিরাশ যুব জীবনের দুর্বলতা প্রকাশ করে। বস্তুতন্ত্রের দোহাই দিয়ে যদি আমরা নিছক কাম তত্ত্বের উগ্রতায় কবিতাকে বিশিষ্ট আবহরসে জারিয়ে তুলি, তাহলে তা' পানশালার চাটের মত খুব রোচক হ'বে বটে কিন্তু আমাদের জীবনে কদর্য জঞ্জাল যে তাতে স্তূপীকৃত হয়ে উঠ্‌বে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যেখানে ইঙ্গিতে ব্যঞ্জনায় বা ভাববিন্যাসের কুশলতায় অনেক গুহ্য কথাও অনায়াসে বা অনায়াসে ব্যক্ত হ'তে পারে,—গোপনতার পর্দার উপর বিচিত্র আলোক সম্পাতে গহন মনের রহস্য যেখানে রূপায়িত হতে পারে, এমন কি নিছক রতিবিলাসও অপূর্ব কাব্যরসে সঞ্জীবিত হয়ে আনন্দ দিতে পারে, সেখানে কাব্যের সেই দুরূহ অথচ স্বাভাবিক পথ পরিহার করে Realism এর পরাকাষ্ঠা দেখানর মধ্যে কাব্যস্থিতির কোনও কৃতিত্ব নাই। যে রতি-বাসনা মানবমনের চিরন্তন বস্তু, যাকে সুন্দর করে', মধুর করে' কত কাব্য মহাকাব্যের সৃষ্টি হোল তাকে নিয়ে বাজার চলতি বটতলার সাহিত্য করে তোলার মধ্যে বাহাদুরি আছে কোথায়? কেউ কেউ বলে থাকেন যে "বে-আব্রুতাই নিত্য পদার্থ; তাঁরা ভুলে যান—যা নিত্য, তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধের যে আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, সে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য, এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রেসি তাল ঠুকে বল্‌ছে—এই আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অনাবৃতাই আর্টের পৌরুষ।" কবিপ্রতিভা

সকলের থাকে না, কিন্তু ভালো কবিতা, সুখপাঠ্য কবিতা লিখে আনন্দ দান করবার শক্তি নিয়ে যারা জন্মেছেন—তাঁদের জীবনের আসল সম্পদ হারিয়ে গেলে সেটা বাংলা সাহিত্যেরই দুর্দিন বলে বিবেচনা করব। এবং আশা রাখব আকাশগঙ্গার অনাবিল ধারাধারে তাদের এই অহেতুক অভিমান ভেসে চলে যাবে। বর্তমান স্রোতাবর্তের সঙ্গে আকাশগঙ্গার স্নিগ্ধ ও পবিত্র বারিসঙ্গম আমরা যে একদিন দেখতে পাব তার আভাস আমরা এখন থেকেই পাচ্ছি—দোনো কোনো আধুনিক কবির স্বরূপে ক্রম পরিবর্তন দেখে মনে হচ্ছে আশা আমাদের অমূলক নয়। আধুনিক কবিতার সার্থকতা নাই—একথা আমি মনে করি না,—সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে এবং তার পরিমাণও অকিঞ্চিৎকর নয়। কারণ, বিপ্লবের আপাত-নিষ্ঠুর রূপটাই তার সবখানি নয়। ধাক্কা লাগে, ওলোটপালট হয়, ক্ষয় ক্ষতিও হয়, কিন্তু ভবিষ্যৎ সৃষ্টির পথে তার অবদানকে কোনও বুদ্ধিমানই তুচ্ছ বলে মনে করবে না। চিরাচরিত পথ ছেড়ে যাঁরা নূতন পথের সন্ধানে বেরিয়ে ছিলেন—তাঁদের মধ্যে পাথের যথেষ্ট ছিল, কারো বা একেবারেই ছিল না—তবুও তাঁরা পথ অতিবাহন করে এসেছেন, পায়ে চলার পথে পদচিহ্ন পড়েছে—একদিন হয়ত নব শ্যাম তৃণদলে পদচিহ্ন অস্পষ্ট হয়ে যাবে, বনবাসী বিহঙ্গেরা আর সে পথের ধারে তাঁদের পদশব্দের দিকে উৎকর্ণ হয়ে থাকবেনা, কিন্তু তাঁরা যে-যাত্রা সুরু করেছিলেন তার প্রয়োজন ও সার্থকতার উচিত মূল্য দিতে নিরপেক্ষ মন সর্বদাই প্রস্তুত থাকবে।

আমার এই কথাগুলির সমর্থনে রবীন্দ্রনাথের মূল্যবান মন্তব্যটি বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। তিনি বলেছেন যে "বাংলা সাহিত্যে কাব্যসৃষ্টির মধ্যে আজ একটা নব উদ্যম জেগেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এই চেষ্টা প্রচলিত বিধানের বাঁধন ভাঙতে প্রবৃত্ত বলেই ক্ষণে ক্ষণে, স্থানে স্থানে অতিকৃতি অতি ভঙ্গীতে গিয়ে পৌঁছায়। আন্তরিক বেগের থেকেই তার উদ্ভব, আত্মপ্রচারের অতিশয় স্পর্ধা থেকে, কোথাও বা ব্যর্থ বিদেশী অনুকরণ থেকে। অপেক্ষা করতে হবে। অতি সজাগ ঔদ্ধত্য ক্রমে ক্রমে শান্ত হয়ে আসবে। তখন রূপসৃষ্টির স্বাভাবিক পরিণতি দেখা দেবে। অনেক কিছু লুপ্ত হবে, আলোড়িত সমুদ্রের জলবিম্বের মত। আবার অনেক কিছুই পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠবে নব যুগের বাণীকে নূতন ভাষায় বহন ক'রে। ক্রমশঃই এই কথাটা স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকবে যে গায়ে-পড়া ধাক্কা-দেওয়া নূতনত্ব—আত্মশক্তিতে গভীর অবিশ্বাসেরই প্রমাণ। যার সৃষ্টির ক্ষমতা আছে, সে পুরাতনকে জোর করে এড়িয়ে যায় না, পুরাতনের ভূমিকাতেই সে নূতনকে উদ্ভাবিত করতে পারে।"

আমার শেষ কথা এই যে নূতনত্বের মোহে অন্ধের মত এগিয়ে গেলে পথভ্রষ্ট হতে হবে। অন্তরের মণি কোঠায় অনির্বাণ দীপশিখাকে অবহেলা করে, আতসবাজীর আলোকে পথের সন্ধান মিলবে না। নিত্যকাল ধরে কবির চিত্তলোকে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ দুঃখ বেদনা ও আনন্দ ধ্বনিত হয়ে চলেছে। আঘাত সংঘাতের মূক বেদনার মূর্ত ও মুখর প্রতীকই ত কবি। আত্মসমাহিত উপলব্ধির দ্বারা সহজ চৈতন্যের উজ্জ্বল বর্ণবিন্যাসে, প্রতিভার যাদুস্পর্শে কবি সেই বেদনা ও আনন্দকে রূপে রূপে, রসে রসে প্রকাশ করে তুলছেন। ভাবসমুদ্রের তরঙ্গ দোলায় কবি-মানস অনন্তকাল ধরে পারাপার করবে,—সোনার তরী তার ইন্দ্রধনুর পাল তুলে নিরুদ্দেশ যাত্রা করবে, চির কৌতুকময়ী লীলাসঙ্গিনীর করুণ নিঙ্কণে আবেশবিহ্বল চোখে সোনার স্বপ্নে সে বিভোর থাকবে চিরদিন,—রূপসৃষ্টির সাধনা সেখানে নয়নাভিরাম, রসের অঙ্কুরন্ত মাধুর্য সৃষ্টির আনন্দে সেখানে পরিপূর্ণ।

আমরা জানি অভাবের দিনে, ক্ষুধা তৃষ্ণার দিনে কবিকে লোক উপেক্ষা করে চলে, কাড়াকাড়িতে হানাহানিতে যে নেতৃত্ব করে, মানুষ তখন তাকেই বড় বলে সম্মান করে, কিন্তু যখন কাড়াকাড়ি শেষ হয়ে যায়, দ্বেষ হিংসা শান্ত হয়ে আসে, তখন মনে পড়ে কবিকে—তখন লোকে কবিকেই বলে,—বলো তোমার দেশান্তরের কথা, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়া রাজপুত্রের কথা, হাতীর দাঁতের পালঙ্কে নিদ্রাবতী রাজকুমারীর কথা।—কারণ শত বাধা সহস্র বিপত্তি বিড়ম্বনার মধ্যে গভীর দুঃখ ও বেদনার মধ্যে আসল খোঁজ ত তারই জন্য। তাই তারা বলে তুমি, প্রথম সন্ধ্যায় আকাশে শুকতারা জ্বালিয়ে কে প্রতীক্ষা করে? কার জন্য প্রতীক্ষা করে? শ্রাবণের গভীর রাত্রে আকাশ থেকে ঝরঝর ধারা ঝরে কার জন্য? অন্ধকার রাত্রে তারার আখরে আকাশে ও কার কথা লেখা? বাসন্তী পূর্ণিমার চাঁদ ও পৃথিবী কেন মুখোমুখী শুব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে;—বল তুমি কবি, তুমিইত এ রহস্যের সন্ধান জান।

পাঁচটা লেবুর বীচি

শ্রীজয়দেব রায়

[বিশ্ববিখ্যাত ডিটেকটিভ শার্লক হোমসের সহকারী ডাঃ ওয়াটসন গল্পটি বলেছেন, তাঁর নিজের ভাষায় এখানে গল্পটি বলা হচ্ছে]

একদিন বর্ষার রাত্রিতে আমি আর হোমস্ তাঁর বৈঠকখানায় বসে গল্প করছিলাম। ঘণ্টা দু-তিন ধরে বাইরে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়ছিল, সার্সির মধ্য দিয়ে বিদ্যুতের ঝলকানি এসে ঢুকছিল, মাঝে মাঝে ঘর কাঁপিয়ে মেঘ গর্জন ক'রে উঠ্‌ছিল। এমন সময় কে যেন জোরে কলিং-বেল টিপ্‌ল।

হোমস্ বল্‌লেন—"এতো রাতে কে আবার এলো? নিশ্চয় খুব বিপদে পড়েছেন ভদ্রলোক! ডাক্তার আর ডিটেকটিভের কাছে যে যত রাত্রিতে আস্‌বে, তার তত বিপদ বুঝ্‌তে হবে।

ঝরঝর করে জল ঝরাতে ঝরাতে একটি তরুণ ঘরে ঢুক্‌ল, তার অবস্থা তখন বেশ শোচনীয়। রাত্রি জাগরণ আর দুশ্চিন্তার চিহ্ন তার সর্বাঙ্গে। হোমস ব্যস্ত হয়ে তার হাত থেকে ওয়াটার-প্রুফটা নিয়ে আগুনের কাছে তার চেয়ারটা সরিয়ে দিলেন, এক কাপ গরম চা আনিয়ে দিয়ে তারপর বললেন—

"আপনি যে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল থেকে আস্‌ছেন, তা আপনার জুতোয় মাখা চকখড়ি দেখেই বুঝ্‌তে পারছি। এতো রাতে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছেন যখন, বিপদটা তখন বেশ সঙ্গীন। তা ছাড়া আপনি এমন বিচলিত হয়ে পড়েছেন যে ওয়াটার-প্রুফটাও গায়ে দিতে ভুলে গেছেন?

ভদ্রলোক ব্যাকুল হয়ে বল্‌লেন—"সত্যিই তাই, আপনার কাছে আমার পরামর্শ নিতে হবে। আমার নাম জন ওপেন শো, গত দু-পুরুষ ধরে আমাদের পরিবারের উপর দিয়ে একটা না একটা বিপদ চল্‌ছেই। আমার ঠাকুরদার দুই ছেলে ছিল—আমার বাবা গরীব লোক ছিলেন, তিনি গ্রামের বাড়ীতে বাস করছিলেন। আমার কাকা যৌবনে বাড়ী থেকে পালিয়ে আমেরিকায় চলে যান; সেখানে থেকে কিভাবে যেন প্রচুর টাকা নিয়ে ইদানীং তিনি আমাদের সঙ্গে বাস করছিলেন।

কাকা ছিলেন অত্যন্ত রগচটা আর মাতাল; লোক জনের সংস্পর্শ এড়িয়েই চল্‌তেন। কিভাবে আমি তাঁর নেকনজরে পড়ে যাই, আমাকে তিনি পোষ্যপুত্র নেবার বন্দোবস্ত করছিলেন। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি আমিই দেখ্‌তাম।

খোস মেজাজে থাকলে অতি ভদ্র, কিন্তু একবার রেগে গেলে আমরা সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলতাম। গ্রামের বাড়িটার সংস্কার ক'রে চারপাশের বিস্তীর্ণ জমি কিনে নিয়ে তিনি মধ্য যুগের পলাতক জমিদারের মতো কাল কাটাতেন। তাঁর বাড়িতে একটা ছোট বন্ধ ঘরে আমরা কেউ ঢুকতে পেতাম না। সে ঘরটায় উঁকি মেরে দেখেছি কয়েকটা তোরঙ্গ আর কাগজের বাণ্ডিল ছাড়া আর কিছুই নেই।

গত বছর মার্চ মাসে তাঁর নামে একটা চিঠি এলো, এটা আমাদের ভারি আশ্চর্য লাগলো। কারণ, তাঁর নামে কোন দিন কোন চিঠিপত্র আসত না। চিঠিটা আমিই হাতে করে তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম। ডাকঘরের ছাপ ছিল পণ্ডিচেরির। চিঠিটা খুলতেই পাঁচটা শুকনো কমলা লেবুর বীচি ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল।

আমি হাসতে গিয়ে কিন্তু কাকার মুখের পানে চেয়ে থমকে গেলাম। তিনি ভয়ে থরথর ক'রে কাঁপছিলেন। খামের মধ্যে ঐ বীচিকটা ছাড়া আর একটা ছোট কাগজ ছিল, তাতে লেখা কেবল 'K.K.K.'। কাকা অস্ফুট স্বরে শুধু বললেন "হা ভগবান! আমাকে শেষ পর্যন্ত এরা ধরল!"

আমাকে কোন কথা বলতে না দিয়ে তিনি ছুটে গিয়ে সেই ছোট ঘরটার মধ্যে গিয়ে ভিতর থেকে চাবি বন্ধ করলেন। আমরা বাইরে থেকে বুঝতে পারলাম তিনি সেই তোরঙ্গ থেকে কাগজের বাণ্ডিলগুলো বের ক'রে পোড়াচ্ছিলেন। অল্পক্ষণ পরে তিনি ঘর থেকে বে'র হয়ে এসে আমাকে গম্ভীর স্বরে বললেন—"এখনি আমার উকিলকে ডেকে নিয়ে এস, আমি উইল করব।"

ঘরের দরজার কাছে বাক্সটা পড়ে ছিল, তার উপরে লেখা দেখলাম সেইরকম তিনটে 'K'।

উকিল এলে তিনি তাঁর সব সম্পত্তি বাবার নামে লিখে দিয়ে বললেন—"তোমরা এ সম্পত্তি সুখে-শান্তিতে ভোগ করতে বোধহয় পারবে না। যাই হোক, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।"

এরপর তিনি যে ক'দিন বেঁচে ছিলেন, সারাক্ষণ মদ খেয়ে মাতলামি করেছেন আর পিস্তল হাতে বাগানে ছোটাছুটি করেছেন। সেদিন মাঝ রাত্তিরে তিনি বাগানে ঐভাবে বেরিয়ে গেলে আমরা তাঁর খোঁজে বেরুলাম। বাগানের এক কোণে তাঁকে মৃতাবস্থায় পাওয়া গেল। খুব কাছে থেকে তাঁর পিছন দিক্ দিয়ে গুলি করা হয়েছিল।

আমার বাবা সেই থেকে কাকার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হলেন।

এ সময়ে হোমস তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন—

"চিঠিটা আসার কতদিন পরে তিনি মারা যান?"

ওপেনশো মনে মনে হিসাব ক'রে বললেন—"চিঠিটা আসে ১০ই মার্চ, আর তাঁকে মৃতাবস্থায় পাওয়া যায় ২রা মে তারিখে।"

হোমসের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন—"তারপর?"

—"কাকার মৃত্যুর পর আমি ও বাবা তাঁর সেই ছোট ঘরের জিনিষ পত্র তন্ন তন্ন ক'রে খুঁটে দেখলাম। 'K.K.K.' লেখা সেই বাক্সটার সমস্ত কাগজ পত্র তো তিনি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন, কেবল একটা আধ-পোড়া কাগজ কেমন ক'রে বাক্সটার গায়ে লেগে ছিল। মনে হয় কাগজটা কোন ডায়েরির পাতা। কাগজটা আমি নিয়েই এসেছি।

বাবা এখানে বাস করার কয়েকমাস পরে গত জানুয়ারী মাসের এক দিন ডাকের চিঠিগুলো থেকে একটা খাম খুলে তিনি বিস্ময়ে চীৎকার ক'রে উঠলেন। ছুটে গিয়ে দেখি তাঁর হাতের খামটায় 'K.K.K.' লেখা, আর কমলালেবুর শুকনো পাঁচটি বীচি টেবিলের ওপর পড়ে। এবার একটা চিঠিও সঙ্গে ছিল—"কাগজ পত্রগুলো বাগানের Sun Dial এ রেখে দেবেন।"

এ চিঠিটার ছাপ ছিল ভাণ্ডি পোষ্টাপিসের। বাবা অবাক হয়ে বললেন, "কিসের কাগজপত্র? কেউ রগড় ক'রে বীচিগুলো পাঠিয়েছে, বুড়ো মানুষের সঙ্গে এ কেমন ধারা ইয়ার্কি!"

আমি বললাম—"দেখুন, কাকার মৃত্যুর আগেও এরকম চিঠি এসেছিল, কাগজপত্র যা ঘরে আছে, সবই ওখানে রেখে দিন।"

তিনি রাজী হলেন না। ঘটনার তিন দিন পরে তিনি এক বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে যান। আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম, ভেবেছিলাম এ বাড়ীর বাইরে তাঁর কোন আশঙ্কা নেই। কিন্তু ভুল করেছিলাম, কারণ তার পরের দিনই বাবার বন্ধুর টেলিগ্রাম পেয়ে ছুটে গিয়ে শুনলাম, তিনি বেড়াতে গিয়ে পাহাড় থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

হত্যা সন্দেহ করার কোন কারণই ছিল না। কিন্তু আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম কে তাঁকে মেরে গেছে। আমি সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'লাম, জানতাম কাকা আমেরিকায় গিয়ে এমন একটা কাণ্ড করেছিলেন যে তার ফল আমরা এখনও ভোগ ক'রে চলেছি।"

হোমস্ বাধা দিয়ে বললেন—"সম্পত্তি বেচে ফেল্‌লেন না কেন?"

ওপেন শো' বললেন—"সে চেষ্টা যে করিনি, তা নয়। মনে হ'ল কোন অভিশাপ আমাদের বংশে লেগেছে। ওর হ'ল এ বাড়ী অন্য কারো হাতে গেলে তারও এ দুর্ভোগ সুরু হবে। কি দরকার, অপরকে শনির দশায় টেনে এনে? তারপর নানা গণ্ডগোলে এ সব ব্যাপার অনেকটা ভুলেই গিয়েছিলাম।

কিন্তু পরশু সকালে ঠিক আগের মতো পাঁচটা লেবুর বীচি আর এই চিঠিটা পেয়েছি—'কাগজপত্রগুলো বাগানের Sun Dial-এ রেখে দাও'—এবারের ছাপ লণ্ডনের।

হোমস্ ব্যস্ত হয়ে বললেন—"কাগজপত্রগুলো রেখে দিয়েছেন তো?"

ওপেন শো একরকম কাঁদো কাঁদো মুখে বললেন—"না, আমি এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম যে কিছুই ক'রে উঠতে পারি নি। কাল সারাদিনই পুলিশের কাছে ঘোরা-ঘুরি করেছি। আজ হঠাৎ আপনার কথা মনে পড়তেই একরকম ছুটে এসেছি। আপনি দয়া ক'রে আমাকে বাঁচান।"

হোমস্ চিন্তিত হয়ে বললেন—"আপনি নিজে এতদূর না আসলেই ভালো করতেন। তাছাড়া চিঠিটা পেয়েই চলে এলেন না কেন? পোড়া ডায়েরী না কি বলছিলেন, দেখি?"

জন পকেট থেকে একটা আধপোড়া কাগজ বে'র ক'রে আমাদের হাতে দিলেন, তাতে লেখা আছে; ৪ঠা হার্ডসন এলো।

৭ই ম্যাকালো, প্যারামুর ও সেণ্ট আগষ্টিনের জন ক্লে-কে চিঠি দেওয়া হ'ল।

৯ই ম্যাকালোকে সরানো হ'ল।

১৮ই প্যারামুরের সঙ্গে আলোচনা হ'ল।

১৯শে জন ক্লে-কে সরানো হ'ল:

এই পর্যন্ত প'ড়ে হোমস্ ব্যস্ত হয়ে বললেন—"আপনি এখনই বাড়ী গিয়ে এই কাগজটা আর আপনার কাকা যে বাকি কাগজ পুড়িয়ে ফেলেছেন তা জানিয়ে একটা চিঠি Sun dial-এ রেখে দিন। এখন প্রতিশোধ কিংবা রহস্যোদ্ধারের কথা ভাববার সময় নয়।"

জন চলে যাচ্ছিলেন, হোমস্ আবার তাঁকে ডেকে বললেন, "দেখুন সব সময় আপনার বিপদের আশঙ্কা আছে। ভিড়ের মধ্য দিয়ে যাবেন, আর যেখানে বিপদ ঘটতে পারে এমন কোথাও যাবেন না। সব সময় সতর্ক থাকবেন···আমি পরে আপনাকে খবর দেবো।"

* *

ওপেন শো চলে গেলে পর হোমস হেসে বললেন—"রহস্য ভেদ হয়ে গেছে। দেখি আমেরিকান এনসাইক্লো-পিডিয়ার 'K' বইটা। বুঝতে পারছ, কর্ণেল ওপেনশো কি কারণে পল্লীগ্রামে বাস করছিলেন? কি জন্য তিনি আমেরিকা থেকে পালিয়ে এসেছিলেন?"

তিনটে জায়গা থেকে চিঠিগুলো এসেছে। প্রথমে এলো পণ্ডিচেরি থেকে,—প্রায় সাত হপ্তা লাগল তারপর তাঁর মারা পড়তে। প্রেরকের সেখান থেকে জাহাজ ক'রে এখানে আসতে ততদিনই লাগে।

তারপর দ্বিতীয় চিঠি এলো ভাণ্ডি থেকে—দু'দিন পরেই ওপেন শো'র বাবা মারা পড়লেন। তার মানে বুঝতে পেরেছে চিঠির প্রেরককে বেশ দূর থেকে খুন করতে আসতে হয়েছে।

আমি বললাম—"তাহ'লে বলছ জনের বিপদ যে কোন সময় ঘটতে পারে।"

হোমস চিন্তিত হয়ে বললেন—"তাই দেখছি! কর্ণেল যে সব কাগজ নিয়ে পালিয়ে আসেন সেগুলো একটা জাহাজ ক'রে আমেরিকা থেকে কয়েকজন সন্ধান করতে এসেছে। তাদের কাছে এ কাগজগুলোর দাম এতো বেশি যে, তা' না পেয়ে তারা একটার পর একটা খুন ক'রে চলেছে।"

একজন লোকের পক্ষে এতোগুলো হত্যা এমন সতর্কতার সঙ্গে সম্ভব নয়, মনে হয় এর পেছনে একদল

লোক আছে। তা হ'লে 'K. K. K.' একজনের নাম নয়—কোন প্রতিষ্ঠানের স্মারক চিহ্ন।

আমি এনসাইক্লোপিডিয়া খুঁজে দেখে বললাম—'K. K. K.' হচ্ছে 'Ku Klux Klan'; তার সম্বন্ধে কি বলছে শোন—

গৃহযুদ্ধের পর এই গুপ্ত দলটি দক্ষিণ রাষ্ট্রের সেনানায়করা গঠন করে। এরা আমেরিকার নানাস্থানে রীতিমত ত্রাসের সঞ্চার করে। যারা এদের কথা বা আদেশ শুনত না, তাদেরকে এরা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করত। শত্রুর কাছে এরা পূর্বাহ্নে একটা বিশেষ চিহ্ন যেমন,ওকগাছের শুকনো পাতা, মেলন বীচি, অথবা কমলালেবুর পাঁচটা শুকনো বীচি পাঠিয়ে দিত। যদি এদের কথা মতো কাজ হ'ত—তা হ'লে কোন বিপদ হ'ত না। কিন্তু কথা না শুনলে অদ্ভুত ভাবে এরা শত্রুকে হত্যা করত। সরকার নানাভাবেই চেষ্টা ক'রে এদের দল ভেঙে দেয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও এদের প্রভাব কমে নি।

হোমস্ বললেন—"বুঝতে পারছ, কর্ণেল ওপেনশো এদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে দলকে দল সরকারের কাছে ধরিয়ে দেন, তাতে তিনি প্রচুর পুরস্কার লাভ ক'রে ইংলণ্ডে চলে আসেন। এমন কি তাঁর কাছে তাদের যে গোপন কাগজপত্র ছিল সেগুলো নিয়েও পালিয়ে আসেন।

তিনি নিজেও যে আগে এ দলের একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন, তা তাঁর ডায়েরীই প্রমাণ করছে। তিনজন লোককে তাঁরা সতর্ক করে দেন, তাদের মধ্যে একজন রাজী হওয়ায় বেঁচে যায়। তাদের কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হ'লে তারা সেই কাগজগুলো উদ্ধার করার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়ে।

• • •

পরদিন সকালেই কাগজের প্রথম পাতায় একটা খবর আমার চোখে পড়ল, আমি চীৎকার করে উঠলাম—

"হোমস, তুমি দেরি ক'রে ফেলেছ, এই দেখো—

কাল রাত্রিতে কুয়াসার মধ্যে তাড়াতাড়ি ট্রেন ধরতে গিয়ে জন ওপেন শো নামে একটি যুবক ওয়াটার্লু ব্রীজ থেকে পা হড়কে পড়ে মারা গেছে। তার পকেটে যে কাগজপত্র ছিল—তা থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।

হোমস খানিকটা গুম হয়ে থেকে বললেন—"আমাকে এবার রীতিমত চ্যালেঞ্জ করা হ'ল। আমারই অসাবধানতায় ছোকরা বেঘোরে মারা গেল। ওকে কাল যেতে দেওয়া আমারই অন্যায় হয়েছে। আমি ভাবিনি এরা এতো তাড়াতাড়ি কাজ হাসিল করবে।...আচ্ছা আমি এর প্রতিশোধ নেবো। আহা! বেচারা আমার শরণ নিল, আর আমি তাকে বাঁচাতে পারলাম না। হায়, হায়!" সারাদিন শার্লক হোমস বাইরে বাইরে কাটালেন। তারপর রাত্রিতে ফিরে এসে আমাকে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"পাঁচটা লেবুর বীচি যোগাড় করে দাও তো!"

সেগুলো নিয়ে একটা খামে পুরে তিনি আমাকে বললেন এই ঠিকানাটা লেখো—

ক্যাপ্টেন সেলডন ব্যাঙ্ক

লোন ষ্টার, দাভানা, ফ্লরিডা।

আমি বললাম—"কিভাবে যোগাড় করলে?"

হোমস পকেট থেকে কতকগুলো কাগজ বের করে বললেন—"আমি জাহাজ কোম্পানীগুলোর কাগজপত্র ঘেঁটে তারিখ মিলিয়ে দেখলাম একমাত্র Lone Star জাহাজটিই ঠিক ঐ সময়ে পণ্ডিচেরী, ডাণ্ডি আর কাল পর্যন্ত লণ্ডনে ছিল। আজই সকালে সেটা বন্দর ছেড়ে আমেরিকায় ফিরে গেল। খোঁজ ক'রে জানলাম জাহাজে একদল সন্দেহ যোগ্য প্রকৃতির আমেরিকান আছে, তারা ঘটনার দিনগুলিতে দল বেঁধে বন্দরে নেমে নানাস্থানে গিয়েছিল।

এই চিঠির পাঁচটা লেবুর বীচি তারা গন্তব্যস্থানে গিয়েই নাটকীয় ভাবে পাবে। তা ছাড়া স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে আমেরিকার পুলিসকে টেলিগ্রাম করেও দেওয়া হয়েছে।

† বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্যার আর্থার কোনান ডয়েল এর গল্প অবলম্বনে।

ছায়ালোক

সন্তোষকুমার অধিকারী

[গল্প]

দেখা হওয়াটা এমনই আকস্মিক যে প্রথমটা চিনতেও অসুবিধে হ'লো ললিতার। কিন্তু তার সামনে এসেই ব্রেক ক'ষে দাঁড়িয়ে গেছে মোটরটা। আর ষ্টিয়ারিং ধ'রে যে ব'সে আছে সে নির্ভুলভাবেই সুবিমল।

জায়গাটা কালীঘাট ট্রামডিপোর কাছে। ললিতা এমন সময়ে বড় বেরোয় না বাড়ী থেকে। তার ওপর বাচ্চাটার জ্বর কাল থেকে। কিন্তু তার স্বামী মন্মথ আজ বিকেল থেকেই বাড়ীতে রয়েছে। আর···আর আজ সন্ধ্যেতেই যে নেমন্তন্ন তার কলেজের দিনের বন্ধু মঞ্জুর বাড়ীতে। মঞ্জুর বিয়ের তারিখ এটা।

নেমন্তন্ন দুজনেরই ছিল। কিন্তু পমিটার জ্বর। তাকে নিয়ে যাওয়া চলে না। আর মন্মথ? তার এমন জামা-কাপড় নেই যা প'রে সে ভদ্র জায়গায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যায়। জামাকাপড় কি ছাই ললিতারই ছিল। তবু মন্মথ রিফিউজি কর্ণারে কাপড়ের ছোট্ট দোকান দিয়েছে একটা। এক রাত্তির পরবার জন্যে নতুন একটা কাপড় এনে দিয়েছে সে দোকান থেকে। বাড়ী ফিরেই এ কাপড় আবার ভাঁজে ভাঁজে পাট করে ফেরত দিতে হবে। ভাঁজ নষ্ট হ'লে চলবে না।

হেঁটেই চলেছে সে। হাজরার মোড়ে গিয়ে বাসে উঠবে। তার আগে কিছু ফুল কেনা দরকার। খালি হাতে কি যাওয়া যায়! মঞ্জুর বিয়ের দিন। বছর বছর সে বিয়ের দিনে উৎসব করে। নেমন্তন্ন করে শুধু তাকেই। একটু আগেই বেরিয়েছিলো ললিতা। কিন্তু যাব রাস্তাতে হঠাৎ একটা প্রাইভেট কার এসে থামবে তারই মুখের সামনে আর ষ্টিয়ারিং ধরে থাকা মোটরের মালিক যে বহু পরিচিত এক দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইবে তারই মুখের দিকে তা কি ভেবেছিল সে?

সুবিমল অবশেষে দরজা খুলে মাটিতে পা দিলো। সাদা পায়জামার ওপরে পরদের নতুন ইস্ত্রিকরা পাঞ্জাবী। ঠিক সেই আগেকার মতই দাহান্ত ছেলেমানুষ চেহারা। বরং একটু ফরসা হ'য়েছে সুবিমল।

—তুমি সত্যিই ললিতা?

লাইটপোষ্টের উজ্জ্বল আলোতে ললিতাকে আগের মতই লাবণ্যময়ী দেখাচ্ছে। আসার সময় শিশির তলাটা মুছে স্নো ঘসেছে গালে। পাশের ঘরে বিমলার কাছ থেকে চেয়ে একটা নকল মুক্তোর মালা পরেছে গলায়। ললিতার চোখে অতীতের এক স্বর্গলোকের স্বপ্ন। মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রয়েছে সুবিমল।

—ওকি, অমন ক'রে তাকিয়ে দেখছো কি? লোকে হাসবে যে। চলো, তোমার গাড়ীতেই উঠে বসি বরং। আমায় না হয় পৌঁছে দেবে একটু।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই ললিতা সামনের সিটে উঠে বসলো। আর তার পেছন পেছন উঠে এলো সুবিমল। ষ্টিয়ারিং ধ'রে বললো—কোনদিকে যাবে?

—যাবো ত' লাস্সডাউনে। কিন্তু কিছু ফুল কেনা দরকার। কোথায় পাবো বলোত?

—চলো নিউ মার্কেটে যাই। বরং এই অজুহাতে একটু গল্প করার সময় পাওয়া যাবে। সত্যি তোমাকে যে আবার দেখতে পাবো সে আসাই করিনি। কি সুন্দর তুমি দেখতে হ'য়েছো ললিতা?

ললিতা অনেকদিন আগেকার একটা রোমাঞ্চ অনুভব করলো মনে মনে। আনন্দের একটা সাড়া পাচ্ছে যেন। কিন্তু একটা ক্ষোভও তার সঙ্গে ছায়া মেলে রয়েছে।

সুবিমলও ভালো ব্যবহার করেনি তার সঙ্গে। সেই কলেজে পড়ার সময় যে ছেলে তার গান শুনে পাগল

হ'য়ে গিয়েছিল শেষ পর্যন্ত সে নিতান্ত স্বাভাবিক মানুষের মতই আত্মগোপন করেছিল।

ললিতা সেদিন বলল—আমায় বিয়ে করো সুবিমল, সেদিন আর সাড়া দেয়নি সে। শুধু সাড়া দেয়নি তা নয়, কাপুরুষের মত লুকিয়েছিলো। তাকে আর খুঁজে পায়নি ললিতা।

—এমনকি তার বোর্ডিংয়ে গিয়েও পায়নি। সুবিমল তারপরেই কলিকাতা ত্যাগ করেছিলো। সে আজ পাঁচ বছর আগেকার ঘটনা।

একটা অভিমানে চিকচিক করে উঠল ললিতার চোখ।

বললো—মোটর কিনলে কবে? প্রশ্নটার উত্তর দিলনা সুবিমল। ললিতার লাল সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে সুবিমল বললো—

তোমার বিয়ের খবর পেয়েছিলাম। কিন্তু কোথায় বিয়ে করলে তা শুনি নি। স্বামী কি করেন?

—ব্যবসা। কাপড়ের দোকান···

—দেখেই মনে হচ্ছে। তোমার অভিজাত্য এখন ত' নিশ্চয়ই বেড়ে গিয়েছে। ব্যবসায়ী স্বামীর মোটর নেই? হেঁটে বেরিয়েছো যে বড়?

ললিতা চমকে গেল। কি ভাবছে সুবিমল? ব্যঙ্গ করছে সে, না সত্যিই তাকে বড়লোক বলে ভাবছে?

সুবিমল তার শুভ্র গলায় কোলানো মালার দিকে চেয়ে বললো—তোমার সৌন্দর্যবোধ বড় তীক্ষ্ণ। এত সহজে এত সুন্দর সাজতে আর কোন মেয়েকে দেখিনা। তুমি তো বেশ ভালোই আছো-না ললিতা?

ললিতা নিঃশব্দ হয়ে বসে রয়েছে। তার ভাবহীন মুখে মনের কথা পড়া যায়না। পড়া গেলে দেখা যেত সে মনে এখন শুধু জীবনের প্রথম প্রেমের রোমাঞ্চ নয়। এমন কি সন্ধ্যের চৌরঙ্গীর সফরমাণ চিত্রও নয়, সে মনে শুধু ফুটে রয়েছে একটি দুঃস্থ চিন্তা।

কাল পমিকে ডাক্তার না দেখালে নয়। কিন্তু তার ভাণ্ডার নিঃশেষ করে খুচরো আনি দুয়ানিতে একটি টাকা নিয়ে বেরিয়েছে সে। মঞ্জুর বিয়ের রাত্রে সে না গিয়ে পারেনা। কি ভাবছে সুবিমল? একদিন সে বলেছিল —ললিতার জন্য সব কিছু-দিতে পারে সে। দেখে মনে হচ্ছে সুবিমল বেশ ভালোই আছে। পাঁচ দশটাকা নিশ্চয়ই সে চ্যারিটি করতে পারে।

চাইবে নাকি ললিতা?

সুবিমল কি ভাবছে কে জানে? প্রথম প্রেম তার জীবনে নিষ্ফল হয়নি মনের আয়নায় গভীর দাগ কেটে গেছে। সে ব্যর্থ নয়। ললিতা তো তুলেই ধরেছিলো নিজেকে। কিন্তু তবু এগোতে পারেনি সুবিমল। কাপুরুষের মত পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলো। প্রেমের অপমৃত্যুর চেয়ে বিরহের মাধুর্যে অনেক বেশী সৌন্দর্য।

কিন্তু ললিতা যে এতদিন পরে আবার ফিরে আসবে আর এমনই ভাবে তার সাহচর্য পাবে সুবিমল, তাকি ভাবতে পেরেছে সে?

গাড়ী এসে দাঁড়িয়ে গেল। লিণ্ডসের ফুটপাথে ঘেঁসে। গাড়ী রেখে নীচে নামলো সুবিমল।

বললো—এসো।

গাড়ী থেকে নামলো ললিতাও। পথের ওপাশ থেকে দুচারটি চোখ হয়ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কি ভাবছে কে জানে? সত্যিই যদি সে সুবিমলের স্ত্রী হ'তো?

—তুমি বিয়ে করেছো কিনা বললেনা যে?

নীরবে মাথা নাড়লো সুবিমল।—তাহলে তুমি কি রোধ করলে ললিতা? তুমি কি বিশ্বাস করোনা যে আমার জীবনে আর কোন নারীর ছায়া পড়তে পারেনা?

এ'র উত্তর দিতে গেলে কাঁদতে হ'বে ললিতাকে। সে কথা না বলে শুধু এগিয়ে গেলো। পাশে পাশে চললো সুবিমল।

একবাড় রজনীগন্ধা পছন্দ হ'লো তার। ঝাড়টা হাতে তুলে নিয়ে বললো এটি, নিই?

—নাও কত দাম ওটার?

দোকানী বললো—বারো আনা।

ললিতার দিকে এক ঝলক চেয়ে দেখলো সুবিমল। না তার পার্স বার করার আগেই সুবিমলকে দাম মিটিয়ে দিতে হ'বে। ঠকতে পারেনা সে।

বুকপকেটের ভাঁজ থেকে একটাকার নোট বার করে এগিয়ে দিল সে। চার আনার পয়সা অবহেলার সঙ্গে পকেটে ফেললো।

কিন্তু ললিতাই আবার বললো—সেই মিঠে তবকমোড়া পান নাওনা দুটো? একটি আমার একটি তোমার!

সেই ভালো। দুটো পান কিনলো সুবিমল। আরও দুটো কিনলো। বললো একটি এখন খাও আর একটি রেখে দাও। বাড়ী গিয়ে খাবে।

চার আনা পয়সা রেখে দিয়ে ফিরে চললো সুবিমল। ললিতা ফুলের তোড়াটি বুকের কাছে নিয়ে এগিয়ে বললো। এই মুহূর্তে তার বুকটি ফুলে উঠেছে। ঈর্ষ্যা করছে সে অদেখা ভাগ্যদেবতাকে? কি ক্ষতি হ'তো সেই স্বেচ্ছাচারী দেবতার যদি সুবিমলের সঙ্গে তার জীবনের যোগ ঘটতো?

আবার গাড়ীতে উঠে বসেছে সুবিমল। তার পাশে ঘন হয়ে বসেছে ললিতা। তার শাড়ীর স্পর্শ, তার চুলের গুচ্ছ আঘাত করছে সুবিমলের দেহকে। তার ফুলের গন্ধে ভোর হয়ে উঠেছে দুপাশের বাতাস। কিন্তু সমস্ত সময়টা যেন মুহূর্তের রঙে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে সুবিমলের কাছে।

হায়! কেন সে বিয়ে করতে পারলোনা ললিতাকে?

দুটো বিক্ষুব্ধ আকুল চিত্ত পাশাপাশি বসে রইলো পাথরের মত মন নিয়ে। গাড়ী পৌঁছে গেছে ল্যান্সডাউন মার্কেটে। পরের মোড়েই নামবে ললিতা। সুবিমল যেন মানুষ নেই। যন্ত্রের মত ষ্টিয়ারিং ঘুরিয়ে যাচ্ছে শুধু। আর ললিতা আরও সরে এসেছে কাছে। কি যেন বলবে সে! না, না বলতে দেবেনা সুবিমল। কোন কথাই বলতে দেবেনা। এই মুহূর্তে যদি সে মোটর শুদ্ধ গিয়ে আছড়ে পড়ে একটা লাইটপোষ্টে কিম্বা কোন বাড়ীর দেয়ালে!

ললিতা ভাবছিলো কেমন করে বলবে সে? কিছু না থাক। যার কাছে সবকিছুই আশা করেছিল সে, মাত্র পাঁচটা টাকা চেয়ে নিজেকে আর নামাবেনা ললিতা। বরং এই ভালো সুবিমল জেনে থাক তার অভাব নেই। বিলাসী ব্যবসায়ীর স্ত্রী সে। হায়! সুবিমল যদি তাকে প্রত্যাখ্যান না করতো?

হাসিখুসী বাড়ীটার মধ্যে বেশ সহজ ভাবেই ঢুকে গেল ললিতা। সুবিমল অপেক্ষা করলো না। গাড়ী চালিয়ে দিলো। স্পীড বাড়িয়ে দিলো গাঁয়ারে। ললিতা দুচোখ ভরা স্বপ্ন নিয়ে গেছে। থাক্ সে স্বপ্নে ভোর হ'য়ে। ভেঙ্গে চূর্ণ হয়ে যাবে সুবিমল শুধু খুলে ধরতে পারবেনা নিজেকে। ছোট হ'তে পারবেনা প্রেমিকার চোখে।

ললিতা ত' কোনদিনই মানবেনা যে বড়লোকের গাড়ীর সোফার তার একরাত্রের খাওয়ার মূল্যে ফুল কিনেছে তার জন্যে।

তার জীবনের একমাত্র সখের সামগ্রী পরণের পাঞ্জাবীর শূন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে শ্রান্ত সুবিমল ভাবছে ললিতার কথা। বড়লোকের বউ ললিতা। হায়, ললিতাকে যদি সে পেত তার জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে!

নতুন মা

অধ্যাপক — বিভুরঞ্জন গুহ

তোমরা যারা নতুন মা হয়েছ তাদের কাছেই দুটি কথা। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে, তাই এ প্রয়াস। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রের বিধি ছিল, "পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ" আর নতুন যুগের শাস্ত্র বলছে পঞ্চাশোর্ধ্বে বই লেখার উপদেশ দেবে। নতুন শাস্ত্রের বিধিই মানছি ; কারণ নতুন মানুষদের কল্যাণে মন তো আছে শুধু ভূগোলের পাতায়।

ছোট্ট মা তুমি। কত গর্ব, কত আনন্দ, কত আশা তোমার, ছোট্ট খোকা বা খুকুকে ঘিরে। সত্যি শিশু ভগবানের শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ, তোমার ছোট্ট সংসারের নতুন প্রাণ-কেন্দ্র, তোমাদের স্বপ্ন ও কল্পনার বাস্তব রূপায়ণ। শিশুকে নিয়ে গর্ব করার অধিকার তোমার আছে। একটি গল্প শোন। কর্ণেলিয়া ছিলেন রোম্যান স্পেনের শাসক প্রসিদ্ধ বীর ও বিচক্ষণ নেতা টাইবেরিয়াস সেম্‌প্রোনিয়াস গ্রেকাস (খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক) এর মনস্বিনী সহধর্মিণী। কর্ণেলিয়ার পিতা ছিলেন ইতিহাস প্রসিদ্ধ বীর সিপ্পী ও এ্যাফ্রিকেনাস। সুমাতা হিসাবে কর্ণেলিয়ার নাম রোমের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। কর্ণেলিয়ার সুশিক্ষায় তাঁর ছেলেরাও পিতার মত প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। দুজনেই দেশের লোকেদের দ্বারা ট্রিবিউন নির্বাচিত হয়েছিলেন। কর্ণেলিয়া বড় ঘরের মেয়ে, বড় ঘরের ঘরণী, কিন্তু তাঁর কোন বিলাস ব্যসন ছিল না। একবার একজন মহিলা তাঁর বাড়ীতে এসে, নিতান্ত সাধারণ আসবাবপত্র, পোষাক ইত্যাদি দেখে অবাক হয়ে কর্ণেলিয়াকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনার মূল্যবান রত্নাদি নেই ?" কর্ণেলিয়া তাঁর দুটি সন্তানকে কাছে টেনে সগর্বে বলেছিলেন, "এই আমার শ্রেষ্ঠ রত্ন।" কর্ণেলিয়ার মত কত রত্নগর্ভা মা আমাদের দেশের কত মহাপুরুষকে ধারণ করেছেন—পালন করেছেন—গঠন করেছেন। তাঁরা নীরবে তাঁদের সেবাহস্তের প্রসাদ রেখে গেছেন—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার উল্লেখ নেই। তবু তাঁরা নমস্যা।

তুমিও সেই সুমাতা। ভগবান তোমার কাছে ন্যাস রেখেছেন তাঁর একটি অমূল্য রত্ন। তাকে পোষণ করবার গঠন করবার পবিত্র দায়িত্ব, বিশেষ করে তোমার। তোমাদের দুজনের কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে এবং তোমাদের বহু বহু পূর্বপুরুষের কাছ থেকে অপ্রত্যক্ষভাবে শিশু পেয়েছে তার দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি যা এখনও সম্পূর্ণ অপরিপুষ্ট, অপরিণত, পেয়েছে কতগুলি অন্ধ প্রবৃত্তি ও আবেগ, যা বর্তমানে সম্ভাবনা মাত্র ; যার থেকে ক্রমে গঠিত হবে তার মন, বুদ্ধি, অনুভূতি, ইচ্ছা, চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব। শুধু বংশধারার গতিতে শিশু যা নিয়ে জন্মগ্রহণ করলো তাই তার ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে

এমন ধারণা ভুল। শিশুর মধ্যে কোন্ সম্ভাবনা ফুটে উঠবে, কোন্ বৃত্তিপ্রবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করবে, কোন্ সদ্‌গুণ বিকশিত হবে তার অনেকটা নির্ভর করে তার যত্ন, তার পুষ্টি, তার সংসার পরিবেশ, তার সমাজ তার শিক্ষার ওপরে। তাই তুমি সম্ভ্রান্তের মেয়ে, ভাল ঘরে বিয়ে হয়েছে একথা ভেবে তোমার শিশু সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার অবসর নেই। আর তোমার বা তোমার স্বামীর বংশে কোথায় কোন্ দোষ বা রোগ বা কলঙ্ক লেগেছিল বলে তোমার শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আতঙ্কিত হবার বা নিরাশ হবারও হেতু নেই। খুব কম রোগই বংশগত, কোন রোগই বিনা এ নিয়েও সন্দেহ আছে।

কাজেই মস্ত তোমার দায়িত্ব। শিশুর প্রথম দু'তিন বৎসর তুমিই শিশুর খাদ্যদাত্রী, তার রক্ষয়িত্রী, তার সেবিকা, সহচরী, ধাত্রী। তুমিই প্রথম শিক্ষাদাত্রী, তুমিই তার সংসার, সমাজ বন্ধু, চালিকা, গঠয়িত্রী। শিশু জানে না-ই তার সর্বোচ্চ। মাতার তুলনায় পিতা শিশুর কাছে গৌণ—নগণ্য। এজন্য সে পিতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষাই করে।

শিশু প্রথম যখন জন্মে এবং তারপর দু' তিন মাস পর্যন্ত সে খুব সুদৃশ্য জীব নয়। তিন চার বছরের শিশু যেমন হেসে, নেচে, খেলে, আধোআধো কথা বলে, অদ্ভুত অনুকরণ ক'রে মন কেড়ে নিতে পারে, একেবারে কচি বাচ্চা তা কিছুই পারে না। কেমন কুশ্রী কোঁচকানো চামড়া, অমসৃণ, রুক্ষ লালচে লালচে রং, পাতলা সরু সরু লোম, কুৎকুতে চোখ, মাথা হয়তো প্রায় ন্যাড়া, কেমন যেন আঁশটে গন্ধ,—আর ব্যবহার? ঘুমিয়েই থাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বিশ ঘণ্টা, জাগে যখন ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদে, লাল পড়ে, বমি করে, তা ছাড়া আরো সব কুকর্ম আছে। ওর বাবা তো ওকে প্রথম দেখে চমকে উঠে, শেষে কতকটা ঘাবড়ে যাওয়া, কতকটা যেন ঠকে গেছে (হাসপাতালে ওরা আবার বদলে দেয় নি তো?) এমন মুখ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলো। হয়তো প্রথম দেখে তুমিও যেন বিশ্বাস করতে পার নি—এই কি ছিল তোমার স্বপ্ন সাধ? এই তোমার রঙীন কল্পনা কি ওই? অসহায় মাংসপিণ্ডের দিকে তাকিয়ে তোমার বুকের ভেতরটা মুচড়ে কেঁদে ওঠে, তুমি বল "বাছারে আমার! এত তোকে সবাই অবহেলা করে, আমি তোকে ঢেকে রাখবো আমার ভালবাসা দিয়ে—আর কেউ তোর না থাক, আমি তোর সঙ্গে আছি।" এই অহেতুক নিঃস্বার্থ করুণা দিলে তোমার চোখের দৃষ্টি বদলে, শিশু হোল তোমার সুন্দর, হোল তোমার আপন। এই ভালোবাসার দামে কিনে নিলে শিশুর হৃদয়কে। এটা শুধু কল্পনার কথা নয়—আধুনিক শিশু মনোবিজ্ঞানের কথা।

"শিশুর জীবনের প্রথম বছরটার কথা এভাবে চিন্তা করো। সে জেগে ওঠে কারণ সে ক্ষুধার্ত; সে কাঁদে কারণ সে খেতে চায়। তার ছোট মুখ দিয়ে মাইটি পরম আগ্রহে চুষতে আরম্ভ করে, সমস্ত শরীরে তার আনন্দের শিহরণ জাগে। যতক্ষণ সে দুধ খায় ততক্ষণ বুঝতে পারা যায় এটা তার পক্ষে একটি গভীর নিবিড় অনুভূতি। সম্ভবতঃ দুধ খেতে খেতে সে ঘামিয়ে ওঠে। খাওয়ার মাঝখানে হঠাৎ যদি মাই ছাড়িয়ে নেওয়া হয় তবে সে ভীষণভাবে চীৎকার করে। যদি আশ মিটিয়ে পেট ভরে সে খেয়ে থাকে, তবে তার যেন সুখের নেশায় ঘুম এসে যায়। যখন সে ঘুমিয়ে থাকে, তখনও মনে হয় সেই সুখ স্বপ্নই দেখছে। তার ঠোঁট দুটি থেকে থেকেই চুক্ চুক্ করে কাঁপতে থাকে যেন সে স্তন্যপান করছে আর তার সমস্ত মুখে ছড়িয়ে যায় প্রশান্ত আনন্দের আভা। এসব মিলিয়ে এটাই বোঝা যায় তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুখ এই স্তন্যপানে। জীবন সম্বন্ধে তার প্রথম দৃষ্টিভঙ্গী নির্ভর করে তার এ খাদ্য গ্রহণ সম্পূর্ণ তৃপ্তিকর ও নির্বাধ হয় কি না তার উপর। পৃথিবীর সম্বন্ধে তার প্রথম ধারণা সে সংগ্রহ করে যে ব্যক্তিটি তার খাদ্য জোগায় তাকে তার কেমন ভাল লাগে তার থেকে।" [১]

বাজারে এখন এতো রকমের ভাল 'বেবী ফুড' বেরিয়েছে আর এতো তাদের প্রচারমাহাত্ম্য আর

(১) Dr. Benjamin Spock—Pocket Book of Baby and Child Care, P. 22

বোতলে খাওয়ানো কতগুলি বিষয়ে সুবিধাজনকও বটে তাই পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে তোমরা অনেকে এদিকে ঝুঁকেছ। কথাটা একটু আলোচনা করা যাক।

বোতলে খাওয়ানোর সুবিধে হচ্ছে, এতে মাকে আটকে থাকতে হয় না। তাছাড়া শিশু যথেষ্ট খাদ্য পাচ্ছে কিনা এ নিয়ে অযথা মাকে চিন্তা করতে হয় না—যখন ইচ্ছে করলেই বোতলে দুধের পরিমাণ বাড়ানো যায়।

আর একটা কথা হয়তো তোমরা শুনে থাকো, বা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে থাকো। সেটা হচ্ছে শিশুকে স্তন্যদান করলে মার স্বাস্থ্যের হানি হয়, বিশেষ করে তার হাড়গুলি থেকে ক্যালসিয়াম প্রচুর পরিমাণে ক্ষয়িত হয়। আর একটা কথা যেটা সলজ্জভাবে গোপনে তোমরা আলোচনা করো, কিন্তু বিদেশী মেমরা খোলাখুলি ভাবেই বলেন—সেটা হচ্ছে যে, শিশুকে মাই দিলে মা'র 'ফিগার' খারাপ হয়ে যায়। কাজেই স্তন্যদান "নৈব নৈবচ।"

বোতলের সুবিধে আছে সত্য। কিন্তু এতে বিপদের আশঙ্কাও আছে। যদি চুমি ও বোতল সব সময়ে সাবধানে এবং সযত্নে ধোয়া না হয় তবে তাতে নানা বীজাণু বাসা বাঁধবে। বাসি তৈরী খাদ্য অনেক সময় শিশুর পক্ষে বিষ। চুমির ফুটো বেশী বড় বা বেশী ছোট হ'লে শিশুর কষ্ট হয়, অতৃপ্তি জন্মে।

স্তন্যদানে মার দেহের ক্ষতি হ'তে পারে বা হয়ে থাকে—বিশেষ করে মাতা যদি রুগ্ন হন। কিন্তু সাধারণতঃ সুস্থ যে কোন মাতা উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের দ্বারা স্তন্যদানদ্বারা যে ক্ষতি হয় তা পূরণ করে নিতে পারেন। একজন অ্যামেরিকান বড় ডাক্তারের মত উদ্ধৃত করছি—"হয়তো তোমরা জেনে থাকবে শিশুকে স্তন্যদান করলে মা'র অনেকখানি ক্ষয় হয়—অর্থাৎ মা ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কথাটা একেবারে বাজে। অবশ্যই যে মা শিশুকে স্তন্যদান করেন তাঁকে বেশী পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য খেতে হবে, ঠিক যেমন তাঁকে বেশী খেতে হয় যদি তাঁকে দুবেলা সাঁতরাতে হয়। কিন্তু যে স্ত্রীলোক স্বাস্থ্যবতী ও সুখী তাঁর স্বভাবতঃ খাদ্যের প্রয়োজনের সঙ্গে ক্ষুধা বেড়ে যায়। সুস্থ মাতার পক্ষে এক মাস নিয়মিত সন্তরণে যে পরিমাণ ক্লান্তি হয় এক মাস নিজ শিশুকে স্তন্যপান করালে তার চেয়ে বেশী ক্লান্তি হয় না। তবে যদি তার ওজন কমে যেতে থাকে বা অস্বাস্থ্যের অন্য লক্ষণ স্পষ্টভাবে দেখা দেয় তখন তা বন্ধ করাই উচিত।" [২]

'ফিগার্' নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্বন্ধে আবার একজন ডাক্তার লিখেছেন—"শিশুকে স্তন্যদান করাতে হলে বেশী খেতে হবে, কাজেই 'মুটিয়ে যাবার' ভয় আছে—এটা খুব সঙ্গত আশংকা নয়।...তাঁর নিয়মিত ওজন থেকে বেশী ওজন বাড়া নিষ্প্রয়োজন। শিশুকে স্তন্যদান করালে স্তনের গড়ন নষ্ট হয়ে যাবে এটাও খুব ঠিক নয়। আমার নিশ্চিত ধারণা অধিকাংশক্ষেত্রেই স্থায়ী কোন বিকৃতি ঘটে না। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, যে সব মাতা দু' তিনটি সন্তানের জননী হয়েছেন এবং তাদের স্তন্যদান করেছেন তাঁদের স্তন পূর্বাপেক্ষা সুগঠিত হয়েছে। দুটি বিষয় সম্ভবতঃ এবিষয়ে ফলের বিভিন্নতার জন্যে অনেকখানি দায়ী। মাতা যদি শুধু সন্তান পালনের সময় নয়, তার পূর্বেই গর্ভাবস্থায় যখন স্তনের আয়তন বৃদ্ধি পায়, তখন থেকেই ভাল বক্ষাবরণ (brassiere) পরিধান করেন তবে বক্ষের চামড়া ঢিলে হয়ে যাওয়া এবং ঝুলে পড়া নিবারণ করতে পারেন। আর একটি দরকারী জিনিষ হচ্ছে এ সময়টায় যাতে শরীরে বেশী চর্বি জমার এজাতীয় খাদ্য সাবধানে বর্জন করেন।" [৩]

অ্যামেরিকা, ইংলণ্ড, কলের দেশ, কৃত্রিমতার দেশ, তাই কৃত্রিম খাদ্য, যান্ত্রিক খাদ্যব্যবস্থা নিয়ে বহু তাঁরা আলোচনা করেছেন। কিন্তু বহু পরীক্ষা, বহু গবেষণা করে তাঁরা আজ স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, শিশুর পক্ষে

(২) C. Anderson Aldrich & Mary M. Aldrich—Feeding our Old Fashioned Children.

(৩) Dr. Benjamin Spock.—Baby & Child Care P. 30-31.

মাতৃত্বের বিকল্প নেই মাতৃস্নেহের মানসিক কোন পরিবর্তন নেই সে কথাটাই আজ বলতে চাচ্ছি।

আবার আমেরিকান্ ডাক্তারের মত উদ্ধৃত করছি—"শিশুকে স্তন্যদানই স্বাভাবিক। সাধারণ সূত্র হিসাবে একথা বলা যায়, স্বাভাবিক পথে কাজ করাই সবচেয়ে নিরাপদ—যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি নিশ্চিতভাবে এর চেয়ে ভাল পন্থা আবিষ্কার করতে পার। শিশুকে স্তন্যপানের যতগুলি উপকারিতা আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, হয়তো তার আরো অনেক উপকারিতা আমরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান্ নই বলে আবিষ্কার করতে পারিনি। মাকে শারীরিক ভাবে স্তন্যদান সাহায্য করে। যখন শিশু স্তন্যপান করে তখন তার ফলে জরায়ুর পেশী সঙ্কোচে সঙ্কুচিত হতে থাকে। এতে জরায়ুর স্বাভাবিক আকার ও অবস্থায় ফিরে আসা ত্বরান্বিত হয়।···

···তোমরা শুনে থাকতে পারো স্তন্যদান শিশুকে নানা ব্যাধি থেকে রক্ষা করে (মায়ের বুক থেকে দুধ নির্গত হওয়ার আগে আর একটি তরল পদার্থ ক্ষরিত হয় তার নাম কলোস্ট্রাম (colostrum), তার প্রতিষেধক গুণ আছে। এটা অবশ্য প্রমাণিত হয়নি। তবে যে সব শিশু মায়ের বুকের দুধ খায় তাদের চেয়ে যারা বোতলে দুধ খায়—তাদের হজমের গোলযোগ বেশী দেখা দেয়। মায়ের বুকের দুধের আর একটা সদ্গুণ, তা সর্বদাই নির্মল। এ দুধ থেকে শিশু কোন আন্ত্রিক ছোঁয়াচে রোগের জীবাণু (intestinal infection) পেতে পারে না। আর সাংসারিক কাজের দিক থেকে বহু সময় ও পরিশ্রম ও দুর্ভোগ বাঁচে। বোতলে খাওয়ালে বোতল-চুমি-ধোওয়া জীবাণুমুক্ত করা, দুধ তৈরী করা ঠাণ্ডা করা ইত্যাদি বহু হাঙ্গামার দরকার। পথ চলতে গেলে এটা বিশেষ করে টের পাওয়া যায়। অবশ্যই এতে পয়সা বাঁচে। আর একটা সুবিধা যেটা হয়তো অনেক সময়ই আলোচনা করা হয় না। সেটা হচ্ছে এতে শিশুর চোষা প্রবৃত্তির (sucking instinct) সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটে। যতক্ষণ সে মায়ের বুকে আছে, সে এই প্রবৃত্তির যথেচ্ছ পরিতৃপ্তি পেতে পারে। আমার মনে হয়, এজন্যেই যে সমস্ত শিশু মায়ের বুকের দুধ খায়, তারা আঙুল চোষে কম।" [৪]

কিন্তু 'এহো বাহ্য'। এতদিন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানীরা ব্যাপারটার আলোচনা করেছেন বাইরের দিক থেকে; শিশু ও মাতার দৈহিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে। কিন্তু কিছুদিন থেকে দৃষ্টি পড়েছে ভেতর দিকে—মানুষের মনের দিকে। যে মা শিশুকে খাওয়াচ্ছেন তাঁর যেমন একটি মন আছে, তৃপ্তি অতৃপ্তি আছে, তেমনি মন আছে শিশুর—আছে তার তৃপ্তি অতৃপ্তি, সুষ্ঠু পরিণতি বা বিকার।

শিশু যখন তোমার বুকের দুধ খেয়ে তৃপ্ত হয় তখন তোমার প্রাণে যে স্বর্গীয় আনন্দ জাগে তার কি কোন তুলনা আছে? স্বামীর ভালবাসার আনন্দে এক অপূর্ব স্বাদ—তেমনি আর এক অপূর্ব স্বাদ—শিশুর স্তন্যপানে। যখন তাকে তুমি নিজের বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করে তুলছো তখন তুমি সত্যি জানছো তুমি মা—শিশু তোমার আপন। তুমি শিশুকে আপন দেহের অস্থি-মজ্জা দিয়ে গড়ে তুলছো, নিজের বুকের রক্ত দিয়ে তাকে পালন করছ—তুমি তোমার শিশুকে এমন কিছু দিচ্ছ যা পৃথিবীতে আর কেউ দিতে পারে না। এতেই জন্মালো শিশুর উপর তোমার অসংশয় অচ্ছেদ্য দাবী। এ নাড়ীর টান ছেঁড়া যায় না। [৫]

নারীর জীবনে এ গভীর পরিতৃপ্তির প্রয়োজন আছে তার সুস্থ বিকাশের জন্যে। বিত্তশালিনী বিদেশী মা'রা ওয়েটনার্স (wet nurse) রাখেন শিশুকে স্তন্য দেবার জন্যে। শিশু পালনের ঝঞ্ঝাট তাঁরা এড়াতে চান। সেই অবসর সময়টুকু তাঁরা ভরিয়ে তুলতে চান নানা আমোদ-প্রমোদ, স্ফূর্তি ও বিলাসে। কিন্তু বুকের হাহাকার তো মেটে না। আজ ইয়োরোপ ও আমেরিকার মনোবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। তাঁরা বলেছেন পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকাণ্ড অভিশাপ হচ্ছে—তা গৃহ-বন্ধন, পারিবারিক জীবনকে শিথিল করে দিচ্ছে—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের নামে উচ্ছৃঙ্খলতায় মেতে উঠেছে ইয়োরোপ ও আমেরিকার নরনারী। অতৃপ্ত মাতৃত্ব ও অতৃপ্ত পারিবারিক জীবন নারীদের ক্ষেত্রে শতকরা পঁচানব্বুইটি মানসিক বিকারের জন্য দায়ী। [৬] শিশুর দিক থেকে এর কুফল আরো বেশী ভয়াবহ। মাতৃস্তন্য-বঞ্চিত শিশুদের মানসিক বিকার নিয়ে গত মহাযুদ্ধের পর থেকে বহু গবেষণা হয়েছে ও হচ্ছে। যুদ্ধের সময় বোমার আঘাতে বহু গৃহ বিধ্বস্ত হয়, বহু শিশু মাতৃহীন

(৪) Dr. Benjamin Spock.—Baby and Child Care P32.

(৫) Dr. Bowbly—The Development of Motherlove (Pelican)

(৬) Dr. Mildred Creak—Presidential address, National Baby Welfare Council (1353)

হয় এবং বহু শিশুকে পিতামাতার কাছ থেকে সরিয়ে নিরাপদ দূর গ্রামে গ্রামে অনেক নার্সারীতে লালনপালন করবার ব্যবস্থা হয়। নার্সারীতে শিশুদের যত্ন ও শিক্ষা সম্বন্ধে দু'জন মহিলা মিস্ এ্যানাক্লায়েড ও মিস্ ডোরথী বার্লিংহাম অগ্রণী হয়েছিলেন। তাঁরা যা করেছেন তার তুলনা নেই। নার্সারী সম্বন্ধে তাঁদের আশা অত্যন্ত উচ্চ। কিন্তু তাঁরাও সিদ্ধান্ত করেছেন, এসব নার্সারীতে শিশুদের দৈহিক যত্ন বাড়ীর চেয়ে অনেক বেশী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হয়, কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশুদের দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। কিন্তু মনের ও অনুভূতির সুস্থ বিকাশ অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হয় এবং শিশুরা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনোবৃত্তি নিয়ে গড়ে উঠতে পারে না। [৭]

শিশু যখন স্তন্যপান করে তখন সে পায় তার জীবনের নিবিড়তম তৃপ্তি। কাজেই যে মা তার এই তৃপ্তির কারণ সেই তার কাছে সব চেয়ে মিষ্টি, সব চেয়ে সুন্দর, সব চেয়ে কাম্য। এই ভালবাসা তার এমন নিবিড় যে এ ভালবাসার বস্তুকে সে একেবারে গিলে ফেলতে চায়, একেবারে নিজের মধ্যে নিয়ে এক করতে চায়। পরম তৃপ্তির মুহূর্তে দুষ্টু খোকা মার স্তনকে কামড়ে গিলে ফেলতে চায়। ফ্রয়েড্ পন্থীরা এ অভিজ্ঞতা থেকেই বলেন, শিশুর জীবনের ভালবাসার প্রথম প্রকাশ মুখে (oral)। এ তৃপ্তির পরে যেখানে বাধা আসে, (যখন মায়ের বুকের দুধ কম থাকে অথবা যখন বোতলে দুধ খাওয়ানো হয়, অথবা অনিচ্ছুক ধাত্রী তাকে দুধ দেয়) তখন শিশুর মানসজীবন ক্রোধে উদ্বেল হয়ে ওঠে। বারে বারে এমন অতৃপ্তি ঘটলে সে কারণটিকে অন্ধভাবে, নিষ্ঠুরভাবে ঘৃণা করে, আর তার এ-আক্রোশ প্রকাশ করে কামড়ে, চিবিয়ে, কখনো বা খামচে। শিশুর জীবনে এ অতৃপ্তি তার মানসিক সুস্থ বিকাশকে ব্যাহত ক'রে, বিকৃত করে। নার্সারীতে যে সব শিশু মানুষ হয়েছে, তাদের কথায় প্রায়ই শোনা যায় "কামড়ে দেব, কুটি কুটি করে ফেলব, একেবারে গিলে খেয়ে ফেলব।" এসব কথা তাদের বিকৃত মনেরই পরিচয় বহন করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব শিশু বড় হয়ে নিষ্ঠুর, অত্যাচারী, হৃদয়হীন হয়ে থাকে।[৮] শিশু অপরাধীদের অনেকের বাল্যজীবনেই ঘটেছে সুস্থ মাতৃস্নেহের অভাব। [৯]

যদি স্ব-স্বাস্থ্যের জন্যে শিশুকে নিজের বুকের দুধ দিতে না পারো তা হলে খোকার পাশে শুয়ে বোতলে করে তাকে খাওয়াও। দেখো ছুঁদির ফুটোটা বেশী বড়ো বা বেশী ছোট না হয়। তোমার বুকের উষ্ণস্পর্শ শিশুকে পেতে দাও। যদি খুব অসুস্থ না হও বোতল শেষ হয়ে গেলে ঘুমের আগে পর্যন্ত শিশুকে শুন্য দাও। সে যেন বঞ্চিত বোধ না করে।

যদি সামর্থ্যে কুলায় এ সময়টা তোমাকে সাহায্য করার জন্য একজন ঝি রাখো। নিজে সুস্থ থাক—শান্ত থাক—আনন্দময়ী থাকো। শিশুর কাজ যতটা পারো নিজহাতে করো। কাজগুলি নোংরা কাজ কিন্তু মায়েরই কাজ। কি করে জানি না, শিশু বোঝে এতটুকু তুমি ওকে ভালবাসো। তোমার আনন্দ ওকে সুস্থ রাখে। তোমার উদ্বেগ, তোমার রাগ ওকে সচকিত করে, উদ্বিগ্ন করে। ভাল মা হতে গেলে নির্মলদেহ হতে হবে, শান্ত সুন্দর স্নেহশীল-মনও হতে হবে। যা হওয়া সহজ কথা নয়।

তাই বলে শিশুকে সারাদিন কোলে করে বসে থাকবে তা-ও নয়। শিশু কাঁদলেই কোলে নিতে হবে, যাই দিতে হবে তা নয়। প্রথম থেকেই আস্তে আস্তে শিশুকে স্বাবলম্বী করে তোলো। অনাদরে শিশুকে যেমন নষ্ট করা যায়, অতি আদরেও শিশুকে নষ্ট করা যায়। বেশী কোলে রাখলে শিশুর স্বাস্থ্যের হানি হয়, ওর অভ্যাসটিও খারাপ হয়।

শিশুর সঙ্গে সহজ ব্যবহার করো, অতিমাত্রায় উদ্বিগ্ন হয়ো না। শিশু তোমার আনন্দের কারণ হোক—তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ নিবিড়তর করুক। শিশুকে তোমাদের আপন করে নাও।

---

(৭) Burlingham & Freud—Infants without families and young children in war time.

(৮) Agatha Bowley—The Natural Development of the Child. P, 14-15

(৯) Cyril Burt—The Young Delinquent.

বহুব্রীহি

[রস-রচনা]

(নের-বানর-কথা)-বোপদেব

কলিকাতার শীতের সকালের রৌদ্র যেন আংসিদ্ধ মুরগীর ডিমের কুসুমের মত। তার উপরে দিনটা যদি রবিবার বা ছুটির দিন হয়, তবে প্রত্যুত্তরৌদ্রের রোচকতা নরম-ভাজা মামলেটের মত অনিবার্য হইয়া ওঠে। এমন দিনে সহরের গলিতে গলিতে সকালবেলায় রৌদ্রস্নাত রোয়াকে রোয়াকে জনসঙ্ঘের সাংস্কৃতিক সম্মেলন জমিয়া যায়।

রাজধানীর সাংস্কৃতিক ইতিহাস যদি কখনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে লেখা হয়, তবে সম্ভবতঃ রবিঠাকুর ও সিনেমার পর সবচেয়ে বড় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু হইবে রোয়াকের আড্ডা, সংক্ষেপে যাহাকে বলে, রক-ক্লাব। এ-বৈঠক লার্বজনীন, সোবিয়েৎ সমাজ ও শ্মশানের মত এখানে আসিলে সবাই সমান। আলোচনার বিষয়েও "শ্রেণী" বিভেদ নাই, তবে বারো হইতে বিরানী পর্যন্ত সকল বয়সের পুরুষেরই সাধারণ পার্লামেন্ট বলিয়া এখানে শ্লীলতার একটা লক্ষ্মণ-গণ্ডী টানা আছে, সেটা কেহ লঙ্ঘন করেনা। অনেক পূর্বে বাঙ্গালদের এ-বৈঠকে আসন দেওয়া হইত না, কিন্তু বর্তমানে সে ভেদবোধ উঠিয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন খ্যাটার হইতে শুরু করিয়া ইলিশ মাছের দুর্মূল্যতা এবং "আরা বারীর" সুবিধা-অসুবিধা পর্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বিষয়ের আলোচনা এই সব স্থানীয় পার্লামেন্টে হইয়া থাকে।

রামী ধোবানীর গলিতে রবিবার সকালে এমনি একটি বৈঠক বসিয়াছে। কর্তাব্যক্তিরা বাজার সারিয়া, ছেলেরা বই বন্ধ করিয়া তৈরী হইয়া হাজির। বয়স্করা উপবিষ্ট, তরুণেরা দণ্ডায়মান। সামনেই নেপোর চায়ের দোকান, সেখান হইতে দু-চার গ্লাস হাফ্-ডবল চা আসিতেছে কর্তাব্যক্তিদের গলা ভেজানো এবং মগজের বরফ গলানোর জন্য। যেসব তরুণ আপিসে "বেরোয়" না অর্থাৎ পিতাঠাকুরের হোটেলে আহারাদি সম্পন্ন করে তাহারা কামানে-ওয়ালাদের সামনে চা খায় না, বিড়িটা আশটাও লুকাইয়া খায়। বাজারে মন্দা পড়িবার আগে যে-পরিমাণ চা চলিত এখন আড্ডায় তার সিকিও চলেনা, হাঁসের ডিমের মামলেট ত' উঠিয়াই গিয়াছে। তবু নেপোর আয় কমিয়াও বিশেষ কমে নাই, কারণ এক পয়সার হাফ্-কাপ এখন চার পয়সায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে. তালমন্দ আস্বাদ লইয়াও কেহ বড় একটা গোলযোগ করেনা।

বালমের জঙ্গল হইতে এক বানরী (অথবা কিন্নরী) আসিয়া একটি রবার-বন্ধুকের পৃষ্ঠদেশ হঠাৎ আক্রমণ করিয়াই হাসিয়া পালাইয়াছে, এই সংবাদ আজকার মুখ্য

বিষয়বস্তু। প্রবীণ ও তরুণেরা বাংলা ইংরাজী সমস্ত কাগজ তন্ন তন্ন করিয়া পড়িয়া ঐ সংবাদের যতটুকু সম্ভব রস নিংড়াইয়া চাখিয়া লইয়াছেন, এখন গণ-বিশ্লেষণের মাইক্রোস্কোপের তলায় ফেলিয়া তাহার ছিবড়াগুলি হইতে আর কি বাহির করা যায় তাহাই আলোচ্য।

বিড়িতে সুখটান দিয়া পাড়ুই মশায় বলিলেন, "বুঝলে চক্কোত্তি, স্রেফ্ পাঁজা, স্রেফ পাঁজা।"

চক্কোত্তি অনেক দেখিয়া-শুনিয়া অর্ধেক চুল পাকাইয়াছেন। পাড়ার লোক বলে, যতগুলি চুল পাকিয়াছে তাহার প্রত্যেকটি এক একটি ভূয়োদর্শনের ফল। তিব্বতী সাধু হইতে ফেক্‌রাদার্লে'র বড় সাহেবের আর্দালী পর্যন্ত সকলেই তাঁহার পরিচিত এবং কোন না কোন রহস্যময় সূত্রে তাঁহার নিকট বাধিত। এক কথায় বলিতে গেলে তিনি একটি অভিজ্ঞতার তোলো হাঁড়ি। কথার দাম আছে বলিয়া চক্কোত্তি মশায় বক্তৃতাধী, তবে যেটুকু ছাড়েন তাহার তলস্ব আছে।

চক্কোত্তি সংক্ষেপে বলিলেন, "পাঁজা কেন? খুবই সম্ভব।"

পল্টু সেন বয়সে তরুণ, তার আপিসে বেরোয় নাই অর্থাৎ বেকার বলিয়া এখনও তর্কে অরুচি হয় নাই। পল্টু বলিল, "চক্কোত্তি-কা ত' সম্ভব বলেই খালাস, একটা লেডি বাঁদর এসে' কারিনারি ক'রে গেল জলজ্যান্ত একটা মানুষের ওপরে, ত'র ওপর হেসে পালিয়ে গেল, এ যদি গুল না হয় তো গুল বলে কাকে?"

খগেন দাস পূর্ববঙ্গের লোক, অর্থাৎ বাঙাল। পঁচিশ বৎসর পশ্চিমবঙ্গে বাস করিয়া সে "ছাপের ভাষা এক্যারে ভুইল্যা গেছে সিমা", কিন্তু বাস্তহারা হইবার ধাবী তাহার ষোল আনা বজায় আছে। সে পল্টু সেনের ডেঁপোমিকে কোনদিনই বরদাস্ত করিতে পারিত না, তাই বলিল "হঃ, তোমারে ballছে গুল্? ধানগাছের তক্তা দেইখ্যা বাগের চক্ষু সাদাবড়া হইয়া যায় তারা এ পিথিবীর বোঝব কি? কত কি অইতে পারে হার কি খোঁজ রাখ? এই যে ছিলেটের খন সেদিন খবর আইল, এ্যাত লুকে মারবেইড্ আখছে। তুমি দ্যাহ নাই বইলাই কি মৎস্যকন্যা মিথ্যা অইয়া গেল?"

চক্কোত্তি ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "বাঙালটার বুদ্ধি না থাকলে কি হবে, কথাটা বলেছে ঠিকই।"

বিকাশ মাষ্টার ছাত্রজীবনে বড় নৈয়ায়িক ছিলেন। খগেন দাসের তর্কের ফাঁক তাঁহার কাণ এড়ায় নাই। তিনি পার্লামেন্টারী কায়দায় বলিলেন, "পল্টুর পক্ষে কিছু বলতে চাইনে, কিন্তু খগেনবাবুর সিলেটি মৎস্যকন্যা যদিস্যাৎ সত্যি হয়, তা থেকে কেমন করে সিদ্ধান্ত করা যাবে যে মালয়ের বানর-কন্যাও সমান সত্যি?"

সুবিধা পাইয়া পল্টু ফোড়ন দিল, "মৎস্যকন্যাই কি সত্যি? ও আর একখানা স্টান্ট, কাগজওলারা আর খবর পাচ্ছিল না তাই ফুলুসে ছেড়ে দিয়েছে। গুল নয়তো, একেবারে ডলেটিন।"

খগেন দাস কর্মী লোক, অর্থাৎ খাটিয়া খায়, লজিকের প্যাঁচ এড়াইয়া চলে। তবুও এ আক্রমণের পাল্টা জবাবের একটা সোজা রাস্তা আছে অনুমান করিয়া বলিল, "হঃ, পিরথিবির হগ্‌গলেই গুল মারতে আছে আর সত্যমিথ্যা বোঝবেন কত কুপা ব্যাং ঘাসোর ব্যাঙলা ছাড়ইয়া জগৎ নাই!"

বিচে ওরফে উৎপলকুমার বসু রায় চৌধুরী তের বৎসরের তরুণ, এখনও ডাক নামের সঙ্গে সৈফুক পদবী যোগ করার যোগ্যতা অর্জন করে নাই। তবে বাপের সঙ্গে রফ্-ক্লাবে বসিয়া আড্ডা দেওয়ার জন্মগত অধিকার সে কিছুদিন হইল কায়েম করিয়া লইয়াছে। বিচে-র হঠাৎ ভূগোলজ্ঞান টন্‌টন্ করিয়া উঠিল, সে বলিল, "কেন, ডায়মণ্ড হারবার! পল্টুদা, ডায়মণ্ড হারবার যাও নি?"

এখন, পল্টুর পূর্ণ ক্যালুকেশিয়ানত্ব একাধারে তাহার গোপন লজ্জা এবং নাগরিক উৎকর্ষের অক্ষেত্ত বর্ম। কর্পোরেশন ও হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির বাহিরে খাপদ-সংকুল কয়েকটি জাঙ্গল জনপদ আছে, যেখানে বিজলীবাতি নাই, রাস্তায় শুরকীর ধুলা ওড়ে মেয়ে-পুরুষে মিলিয়া

পুকুরের জলে ডুবিয়া স্নান করে, রাত্রির অন্ধকারে কি কি-লোকা শেয়াল কুকুরের ডাকের ফাঁকে ফাঁকে নিস্তব্ধতার শূন্যতা দিলে চমকাইয়া দেয় এবং ছেলেরা গাছে চড়িয়া লাফালাফি করে—এরকম একটা জগৎ ঘরের আশেপাশে ছড়াইয়া আছে তাহা পল্টু মোটামুটিভাবে জানে। কলিকাতায়ও যে কেহ কেহ মোহনবাগানের খেলা দেখিবার জন্য মাঠের গাছে চড়িয়া থাকে সে তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছে—কিন্তু তাহারা ধারণা, তাহারা মানুষ নয়! হয় খোট্টা না হয় মুসলমান। ডাইনও হারবার কতদূরে এবং কি, তাহার জন্য তাহার কৌতূহল অতি ক্ষীণ; ঘিদিরপুরের ডকের মত একটা কিছু, কিন্তু তার চেয়েও জাঁকালো জমকালো আলোকলমল জায়গা হইবে এই রকম কল্পনা করিয়া লইয়াছে। এখন খগেন দাশের ভীমের গদা এবং দিদির অভিমন্যুর খোঁচা খাইয়া পল্টু বেশ কাহিল বোধ করিতে লাগিল।

বিকাশবাবু এবারেও পল্টুর শিখণ্ডী হইলেন। এক টুকরা সুপারী মুখে ফেলিয়া বলিলেন, "খগেনবাবু আর্গুমেণ্টাম অড্ হোমিনেম (argumentum ad hominem—ব্যক্তিগত আক্রমণমূলক তর্ক) করে' কাজ হাঁসিল করতে চাইলে চলবে কেন?"

বৈঠকের দশজনের শতকরা অন্ততঃ আশি জন উক্ত ভাষের প্যাঁচের নামই শোনেন নাই। কিন্তু বিকাশ মাষ্টারের পাণ্ডিত্যের চাঁদের আলোর কাছে কেহই নিজ জোনাকীপোকা বলিয়া নিজেকে স্বীকার করিতে চাহিলেন না। পাতুই মশায় এ বিষয়ে একেবারে সংস্কারমুক্ত! ঘুঘিমালের কারবারে চটের থলিতে ভরিয়া লক্ষ্মীঠাকরুণ এবং সরাহন গণেশকে ঘরে আনিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং সরস্বতীর সঙ্গে আজীবন আড়ির কথা জাহির করিতে তাঁহার আপত্তি তো নাই, উল্টা পক্ষে আগ্রহই আছে। তিনি মন্তব্য করিলেন, "কি ছরবেহর ঘুকুনি বাড়লে ম্যাষ্টর, কিছুই বুঝলুম না। আজকাল যে কি হচ্ছে, বুঝলে চক্কোত্তি. ছোকরারা পার্কে বাংলায় বক্তৃতা করে, সে যে কি বলে, ঠাওর করা যায় না। সেদিন দেখলুম, শশিবাবুর শালাটা খুব লায়েক সেজে ইস্পিচ দিচ্ছে। কাকে যেন পাতি যুজো না কি বলে গাল দিতে লাগলো আর সঙ্গে সঙ্গে জন বিশ-ত্রিশ ছোকরা হাততালি দিয়ে বলে উঠলো ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ আর বসে বসে ঘুঁসি পাকিয়ে কসরৎ করতে লাগলো। না ইংরিজি, না বাংলা, না ভর্টিং পিত্তি! ম্যানেজার বলছিল ওরা নাকি রুষদের টাকা খেয়ে এদেশের পুরুষদের পেছনে লেগেছে। যাক সে কথা, এখন ম্যাষ্টর সোজা বাংলায় বলতো ব্যাওরখানা কি?"

বিকাশ মাষ্টার আমাদের পাঁচজনের মত লোক। উৎসাহ চাগাইলে ইংরাজী, রাগিয়া গেলে হিন্দী এবং রসাক্রান্ত হইলে রবিঠাকুর তাঁহার জিহ্বায় ভর করেন। একেই ত উৎসাহের জোয়ারের মুখে ভাসিয়া আসা ইংরাজী বয়েৎকে বাংলায় বুঝাইয়া বলা ভগীরথের গঙ্গা আনার মত কষ্টকর, তাহার উপর বঙ্গ ভাষার ইল-লিকিতের ফাঁক ও ফাঁকি, রকের উপযুক্ত মোহনভোগ করিয়া পাতে পাতে দিতে হইলে বিকাশ মাষ্টার কেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর চতুর্বর্গ করিয়াও পার পাওয়া যায় না। সুতরাং মাষ্টারের তর্কস্রোত শুকনো ডাঙ্গায় চড়িয়া থামিয়া গেল। অথচ পাতুইমশায় পাড়ার মুরুব্বি, তাঁহার নিজস্ব গাধাটিকে মানুষ করার জন্য মাষ্টারের মোটা উপরি আয় হয়। সুতরাং "জল পড়ে পাতা নড়ে"র মত সুখসেবা করিয়া লজিক বুঝাইতেই হয়। রবিঠাকুর বোধ হয় এই অবস্থাকেই বলিয়াছেন, "মুখে নাহি নিঃসরে ভাষ, অন্তরে নির্বাক বহ্নি!"

রক-ক্লাবের একটা পরম সুবিধা এই যে, কোন কথাই দাঁড়াইতে পায় না, গড়াইয়া চলে। কাজেই কাহারো বিদ্যার দৌড়ের পরীক্ষা হইতেও পারে না, হয়ও না। বিকাশ যতক্ষণে কাশিয়া গলা সাফ করিয়া আমতা-আমতা করিয়া গৌরচন্দ্রিকা ভাঁজিতে প্রস্তুত, ততক্ষণে কথার সুতা আর একজনের কাছে চলিয়া গেছে।

পাড়া-পুরোহিত রামনিধি ভট্টাচার্য কোন সময় রোয়াকাধিষ্ঠ হইয়াছেন এবং প্রত্যেকের সাড়ানের নক্সের কৌটা হইতে মোটা একটিপ নস্য লইয়া খড়্গ-নাসার

ব্যায়ভবিবরে গুঁজিয়া দিয়াছেন তাহা কেহ লক্ষ্য করে নাই। হঠাৎ একটা বোম-মার্কিক পেল্লায় হাঁচির আওয়াজে তাঁহার অস্তিত্ব সর্বসাধারণে বিঘোষিত হইল। হাঁচি সামলাইয়া ভট্টাচার্য বলিলেন—"ম্যাষ্টর মোদ্দা কথাটা বল্‌ছে এই যে, পল্টু ধ্যাধ্‌ড়া গোবিন্দপুর দেখেনি বলে তেলিনিপাড়ার কালীকমলিওয়ালির মন্দির থাকতে হ'বেই এ দাবীর কোন যুক্তি নেই "

পাড়ুই, পল্টু খগেন দাস এবং আরো অনেক সভ্যবৃন্দ মূলের চেয়ে টীকার অর্থ—বেশী বুঝিয়াছেন মনে হইল না। কিন্তু যুক্তিনাই বলিলে যুক্তির অন্নতা স্বীকার করা হয়, সুতরাং কেহই সোজা পথে গিয়া কথার সুতা টানিল না।

ভট্টাচার্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটা অর্ধনারী পুরো নরকে জড়িয়ে ধরে' হেসে, পালিয়েছিল এতে তোমরা অবিশ্বাসের কি পাও? মহাভারতে এরকম দৃষ্টান্ত তো হামেশাই আছে। ভীমের কাঁচা বয়সের প্রণয়িনী হিড়িম্বার কথাই ধরোনা কেন। হিড়িম্বা কি মানুষী ছিল?"

চক্কোত্তি মহাভারতের সুলুক-সন্ধান কিছু কিছু রাখেন। তরুণেরা স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে মহাভারতের পরিক্রমা নির্যাস পড়িয়াছে এবং ক্লাশ প্রমোশন পাইবার পর প্রায় বেমালুম ভুলিয়া সারিয়াছে, সুতরাং তাহারা আর অঢেনা ডালায় পা দিল না। চক্কোত্তি একটা কুটপ্রশ্ন তুলিলেন, "কিন্তু হিড়িম্বা ছিল ত' রাক্ষসী। ইচ্ছামত চেহারা বদল করতে পারত। ছিল পেত্নী, ভোল ফিরিয়ে হ'য়ে গেল পরী। দেখেই ভীমসেন পা পিছলে আলুর দম!"

ভট্টাচার্য ভূয়োদর্শনে চক্কোত্তির চেয়ে কম যান না। শিবরাত্রি ও দোল-পূর্ণিমার রাত্রে সপরিবারে অল্পাইট সিনেমা ও থিয়েটার দেখিয়া থাকেন, তা ছাড়া মধ্যে মধ্যে অকস্মদয়েও, অবশ্য একলা। রকক্লাবের বিশ্বকোষের মারফৎ তারা-তারকাদের হাঁড়ির খবরও অল্পবিস্তর জানেন। তাই তিনি পাল্টা প্রশ্ন করিলেন, "কেন, থ্যাটার-সিনেমার ছোঁড়া-ছুঁড়িরা যে বেমালুম চেহারা পালটায়, বুড়ি ছুঁড়ি হয়, তারা কি বানরী না রাক্ষসী? মেক-আপে সবই হয় তারা, সবই হয়। তা' ছাড়া যৌবন বড় শক্ত চিজ্ তারা, কথায় বলে যৌবনে কুকুরী ধন্যা। দেখনা, ভীমের না হয় স্থূল রুচি, কিন্তু অর্জুন কি করেছিলেন? নাগকন্যা উলূপী নিশ্চয়ই মানুষী নয়, কিন্তু অর্জুন তার সাথে কন্টিবদল করেছিলেন। বলো হে চক্কোত্তি!"

চক্কোত্তি বিড়ির ধোঁয়ায় মাথা খেলাইয়া কথাটা এক-রকম স্বীকার করিয়া লইলেন। কিন্তু বিকাশ মাষ্টার আপত্তি তুলিয়া কহিল, "উলূপী মানুষ নয় বল্‌লেন কি করে?

ভট্টাচার্য কহিলেন, "মহাভারতখানা একবার কালিয়ে নাও হে মাষ্টার। উলূপী থাকত পাতালে, গঙ্গার জলের নীচে। মানুষ কখনো তেমন থাকতে পারে?"

এইবার খগেন দাসের মওকা। সে বলিল, "তবে আমাগো মৎস্যকন্যার কথা সইত্যা নয়? পরাশর ঋষির সঙ্গে সইত্যাবতীর"—

ভট্টাচার্য হাসিয়া বলিলেন, "আরে সত্যবতী তো জেলের মেয়ে, তার গায়ে ছিল মহলা আর মাছের আঁশটে গন্ধ! পরাশরের হাতে পড়ে' সাবান আতর-সুগন্ধি মেখে পোশাক-আশাক পরে' হয়ে দাঁড়াল অপরূপ সুন্দরী।"

পল্টু ফোপিয়া বলিল, "অত হাজার বছর আগে সাবান! সব গাঁজাখুরী!"

ভট্টাচার্যও জবাব দিলেন, "খোকা, অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। সেকালে যে সাবানের ব্যবস্থা ছিল, তার প্রমাণ আছে। বয়স হ'লে বাৎস্যায়নের কামসূত্র পড়ে' দেখো।"

পাড়ুই আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "বলো কি ভট্‌চায্যি সাবান ছিল!"

প্রফেসর সান্যাল এতক্ষণ নীরবে কথা শুনিতে-ছিলেন। তাঁহার আসল বৃত্তি কেরানীগিরি, কিন্তু সর্বদা মোটা মোটা ইংরাজী বই বগলে করিয়া ঘোরেন বলিয়া

রক-ক্লাব বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে প্রফেসর উপাধি দিয়াছে। তিনি এবার আসর নিলেন।

"সাবান কেন, আরো অনেক আধুনিক জিনিষই আগে ছিল। এছাড়া, সম্ভবতঃ বন্দুক, বোমা, এরোপ্লেন—এসবও ছিল, যদি পুরাণের কথায় বিশ্বাস করতে হয়। বিশ্বাস করা না করা অবশ্য আপনাদের হাত। তবে সমস্তই যে একেবারে গাঁজাখুরী নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। যেমন আর্যদের ভারতে আসার অনেক আগে সিন্ধুদেশে, দ্রাবিড়ে একটা সভ্যতা ছিল যার সমান হ'তে আর্যদের অনেক দিন লেগেছে।

"মহাভারতের যুগের কথাই ধরুন। ইন্দ্রপ্রস্থ সহরে রাজার বাড়ী তৈরী করেছিলেন ময়দানব। ময় ছিলেন দানব—কাজেই আর্য নন, আর্যদের হিসাবে হয়তো মানুষ নন। তিনি এসেছিলেন হিমালয়ের উত্তরে কৈলাস অঞ্চল থেকে, যেটা বর্তমান তিব্বত। ভাল ভাল বাসনপত্র—যেমন স্বচ্ছ পাথর, লালনীল পাথর, যা সম্ভবতঃ জাড (Jade)—এসব তিনি তাঁর দেশ থেকে এনেছিলেন। তখনও আর্যেরা টাউন-প্ল্যানিং জানতেননা বলে' মনে হয়।"

চক্রোত্তি অর্ধস্ফুট বলিলেন, "ময়—মাও—সেতুং!"

"তারপর রামায়ণে রাক্ষসদের লঙ্কাপুরী আর দৈত্যদের পাতালপুরীর বর্ণনা। রাজের অযোধ্যা জনকের মিথিলা তো তা'র কাছে অজ পাড়াগাঁ।"

ভট্টাচার্য আপত্তি করিয়া বলিলেন, "কেন ভট্টিকাব্য রঘুবংশে—"

প্রফেসর বলিলেন, "সে তো কাব্য, কল্পটলেখন। পুরাণ নয় তো! তারপর, দেখুন লক্ষ্য করে' রাক্ষসদের আর বানরদের জ্ঞান-বুদ্ধি। মেঘনাদ আকাশে চড়ে' যুদ্ধ করত। হনুমান লাফ দিয়ে সাগর পার হ'ত, এমন কি লঙ্কা থেকে এক লাফে হিমালয় অঞ্চলে গন্ধমাদন পর্বতে গিয়ে উপস্থিত হ'ত। আর ইঞ্জিনিয়ারিং এর বুদ্ধি কত! পাথর দিয়ে সমুদ্র বন্ধন যারা করতে পারে তা'রা মানুষের চেয়ে কম সভ্য বলতে পারেন? বড়ি হিসাবে শ্রবেণই বা কি কম ছিল? মরা লক্ষ্মণকে তো বাঁচিয়ে দিলে। কই, তা'র আগে বা পরে ওষুধ দিয়ে মরা বাঁচিয়েছে কেউ?"

বিকাশ মাষ্টার শুধাইল, "এসব সত্যি বলে' আপনি মানেন?"

"সব সত্যি মনে করি না। তবে এটা সত্য যে, আর্যেরা যাদের মানুষ বলে' মনে করতেন না, হয় দেবতা নয় দানব নয় বানর বলতেন, তাদের সভ্যতার মান আর্যদের চেয়ে অনেক উঁচু ছিল।"

পাণ্ডুই মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আমরা আর্যবংশধররা একথা মানি না।"

প্রফেসর হাসিয়া ফেলিলেন। "আপনার চেহারা বা রক্তে যেটুকু আর্যরক্ত আছে তা কোন পাখিব চেষ্টেই ধরা পড়বে না। তবে নিজেদের আর্য বলতে চান বলুন, কে বারণ করতে পারে? হিট্‌লারও তো জার্মাণদের খাঁটি আর্য বলে' দাবী করতো।"

পল্টু বলিল, "হিট্‌লারের কথা ছেড়ে দিন স্যার। আপনি কি বলতে চাইছেন যে মালয়ের বানর-বানরীরা রামায়ণের বানরদের মত সভ্য?"

ক্লাবের সকলে এক বাক্যে হাসিয়া ফেলিল।

প্রফেসার দমিলেন না। "এক মিনিটের সাক্ষাতের রিপোর্টের ওপরে কোন কথাই বলা যায় না। তবে দ্রবীড় কুলী যে মানুষের মধ্যেই বিশেষ সভ্য তা বলা যায় না। প্রায় পর যদি এমন কোন জাতি থাকে যা'রা মন্ত্র করতে জানে, তা হ'লে অসভ্য মানুষের সাথে তা'দের দাম্পত্য বন্ধন একেবারে অসম্ভব হ'বে কেন?"

কথাটা ভাবিতেই প্রবীণ সভ্যদের মুখে মুচকি হাসি জাগিল।

"তা'র পর, যা'রা এই প্রায়-নরদের দেখেছে তাদের বুদ্ধিশক্তির ওপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা অসম্ভব। তা'দের গায়ে লোম আছে, কষের দাঁত বেরিয়ে থাকে ছোট ল্যাজ আছে, গায়ে দুর্গন্ধ এর সবটা সত্যি নাও হ'তে পারে। কথা হ'চ্ছে, মালয় দেশেও মহাভারতের যুগ থেকে আছে,

সেখানে মানুষও ততদিন থেকে আছে,

সে দেখা যায় নি কেন ?"

পাণ্ডুই বলিলেন, "তা' অনেক লোকে দেখেছে তো ! সবাই কি আর ভুল করতে পারে ?"

"যদি সেই অনেক জনের বুদ্ধি কম হয় তা'হলে ভুলের তিলোত্তমা হ'তে পারে। মনে নেই, সেদিন দুপুরে চোর এসেছিল পাড়ায় ? দশবাড়ীর গিন্নী স্বচক্ষে দেখেছেন, কিন্তু কেউ দেখেছেন কালো মোটা লোক, কেউ দেখেছেন ফালা ফরসা লোক, কেউ দেখেছেন চাঁচা খোঁচ-দাড়ি, কেউ দেখেছেন লম্বা দাড়ী। শেষ পর্যন্ত বস্তির খোঁড়া নবুনে সন্ধ্যে বেলায় এসে বললে, দুপুর বেলায় সে-ই বাজে কাগজের বস্তা পিঠে নিয়ে গলির ওমুখ থেকে এমুখে এসে ঘরে ঢুকেছিল। দেখা আর ঠিক দেখার অনেক তফাৎ মশাই !"

ভট্টাচার্য বলিলেন, "তা'হলেও পুরাণে প্রমাণ আছে, সত্য জীবের, তা সে মানুষই হোক বা আর যাই হোক, আলাদা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকতে পারে। শ্বেতদ্বীপে নারদ যেসব পুরুষদের দেখেছিলেন, তাঁদের চারটে মুখ, আটটা ছোট দাঁত আর আটটা বড় দাঁত ছিল।"

প্রফেসর হাসিয়া বলিলেন,

—লাখোদের মুখোমুখী অবস্থায়

অনেকগুলি মাথা আর দাঁত আছে মনে হ'বে

কথাটা ভট্টাচার্যের মনঃপূত হইল না। কিন্তু সেই কথা বলিলেন চাঁছোলি "সবই শুনলাম, সবই বুঝলাম। কিন্তু আসলে ওরা বানর নয়, বানর ছাল পরা চীনে কম্যুনিষ্ট। লুকিয়ে সন্ধান নিতে এসেছিল। প্রোব্ সাহেব মালয় থেকে তাঁর সম্বন্ধীর চিঠি পেয়েছেন, আমাকে নিজে বলেছেন।"

তরুণ পল্টু মধ্যে মধ্যে একটু-আধটু মতামত করিয়া থাকে, বিশেষ করিয়া গল্পটা যা গল্পগুজবে মতন থাকিলে। সে মনে মনে প্রোব্ সাহেবের মুণ্ডপাত করিতে লাগিল। বিচে সিংহচর্মাবৃত গরিলা-কথা এবং উলঙ্গের গল্প সব পড়িয়াছিল, সে এই সব কপট বানরদের পরিণাম ভাবিতে লাগিল। বারোটা বাজিয়াছে, বেলো দোকান বন্ধ করিয়া চাবী হাতে আসিয়া দাঁড়াইল। সভা ভঙ্গ হইল।

মালয়ের প্রায় নয়রা নাকি নিখোঁজ হইয়া গিয়াছে।

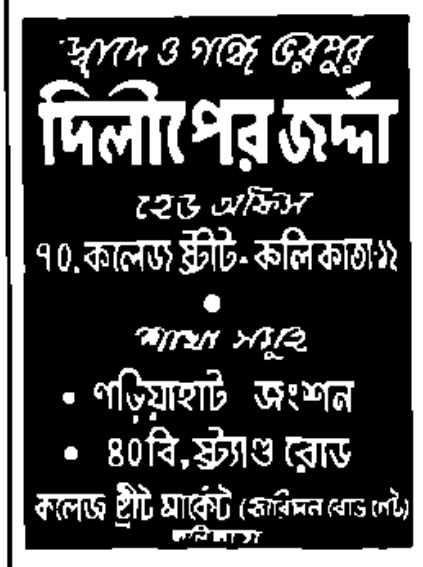

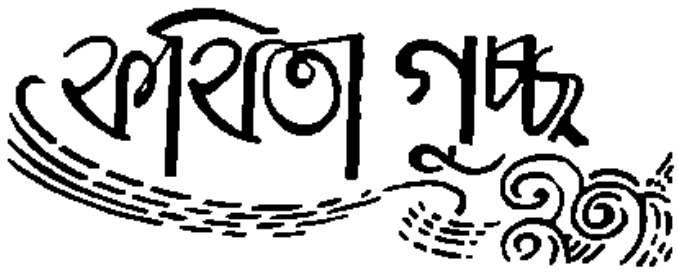

বিশ্বকর্ম্মা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

গড়ি যা বিশাল ভূনিম্নীক্ষ্য যা অনিরূপনীয়—
অসীম এবং অকূলস্থই প্রিয়।
বিরাট এবং বিপুলের কারবারী,
অচিন্তনীয়ে আনি রূপ দিতে পারি,
ভানু, বিদ্যুৎ, অণুর গঠনে—
মোর পরিচয় নিয়ো।

২

ক্ষীন ক্ষীন ক্ষীণ শীর্ণকে করি—বৃহৎ বৃহত্তর,
জীর্ণ ঘাটকে বহিত্র বন্দর,
খণ্ড খণ্ড শিলা কোথা আছে পড়ি,
আকাশচুম্বী মহাদ্রি তাতে গড়ি,
খেলার ঘর যা খেয়ালেতে রচি
হয় তা 'বরদুদর'।

৩

স্পর্দ্ধী, দর্পী, সাম্রাজ্যকে দিই মৃদু কম্পন,—
ধূলিসাৎ হয় রহেনা নিদর্শন।
বিন্ধ্যকে তুলি, সূর্য্যকে করি রোধ,
সমুদ্র গড়ি, আনি কপিলের ক্রোধ,
স্ফীত যত নগ নগরীরে করি
অতলে নিমজ্জন।

৪

অখিল-গুরুর ইচ্ছাকে শুধু রূপ দেওয়া মোর কাজ,
ভাবের তো নই, কর্ম্মের অধিরাজ;
নরের সৃষ্টি অচিরেই পায় লয়।
দর্পের লেশ সৃষ্টি যে নাহি সয়।
দোর্দ্দণ্ডের সৃষ্টি কৃষ্টি—
কোথা? কোথা তারা আজ?

৫

প্রেমই সকল সৃষ্টির প্রাণ—সেই ত শক্তিধর
অবিচ্ছিন্ন ধারা তার সুন্দর।
সর্ব্বশক্তি-উৎসের সাথে যোগ,
সবে সাফল্য, সকলি তার অমোঘ,
তারি উপাদান তারি কল্পনা
আমি তার কারিকর।

ষাট বছর পরে

শ্রীকৃষ্ণধন দে

আজি তো'রা আর নিভাস্ না দীপ, জেলে রাখ্
বাতায়নে,
সব গৃহদ্বার রেখে দে খুলিয়া দক্ষিণ সমীরণে,
রজনীগন্ধা তুলে আন শুধু সন্ধ্যা-অন্ধকারে,
চাঁদ ওঠে কিনা দেখে আয় তো'রা কাজ্‌লাদীঘির পা
ফুলের শয্যা পাতি'
বিদায়ের দিনে এসে দে আমার হারানো পহেলি রাতি !

সাদা সাদা মেঘ ভিড় করে' আছে আকাশের এককোণে,
নবমঞ্জরী ফেলে নিঃশ্বাস রক্ত-অশোক-বনে।
কোথা হ'তে এক ডেকে ওঠে পাখী জানি না'ক কতদূরে,
স্মৃতির দুয়ারে এনে দেয় যেন ভুলে-যাওয়া বন্ধুরে !
আজি শুধু পড়ে মনে—
গানখানি মোর হারায়েছি কবে কোন্-সে ফাগুন-খনে।

যে চির পিয়াসী ফিরিয়াছে হায়, কত বনে পর্ব্বতে,
কত মরুবুকে সাগরের তটে কত প্রান্তরে পথে.—
আজি তারে আমি ফেলেছি চিনিয়া বাতাবিলেবুর বাসে,
ফেলেছি দেখিয়া দাঁড়াতে তাহারে অশোককুঁড়ির পাশে !
তা'রে কভু ভোলা যায় ?
আজো সে যে মোরে ডাক দিতে আসে চুপিচুপি
জানালায় !

পুবে দেখা যায় সবে ওঠে চাঁদ নারিকেলপাতা-ফাঁকে,
তা'রি আবাহনে হাসিয়া আকাশ দু' বাহু বাড়ায়ে থাকে,
দীঘির ওপারে দেবদারু বনে কার স্বর আজো জাগে,
যেন দূর হ'তে চিরসাথী মোর অনেকের দেখা মাগে !
আমি যে চিনেছি তা'রে,
ইঙ্গিতে আজি ডেকেছে সে মোরে জীবন-অন্তপারে !

মনে পড়ে' যায় মিলন রাতিটি স্বপন কুহেলি মাখা,
উন্মন যবে যৌবন-পরী মেলেছে রূপালী পাখা.
নিদাঘী আঁখিতে কি ছবি আঁকিতে কে পটুয়া ধরে তুলি,
পুরাতনী ধরা পারি নি চিনিতে আপনারে ছিনু ভুলি,
আজি মরণের তীরে
শেষ বিদায়ের চুম্বন দিতে সে রাতি কি এল ফিরে ?

কাঁদিস্ না তোরা, চেয়ে দেখ আজ মিলনোৎসব ভরা
আকাশের সাথে পূর্ণিমারাতে কানাকানি করে ধরা !
পল্লীর পথ চেয়ে দেখ আজ ফুলে-ফুলে গেছে ছেয়ে,
চাঁদের আলোয় নিতে আসে মোরে স্বপনপুরীর মেয়ে !
কেন আঁখি ছল্-ছল্ ?
ষাট্ বছরের যৌবন মোর হবে না'ক নিষ্ফল !

সঙ্গীতিকা

(Henri de Regnier লিখিত Odelette কবিতার
[গদ্য অনুবাদ])

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

আমার প্রেমের কথা—
সে গোপন কথা যদি কাউকে ব'লে থাকি—
তবে বলেছি—মন্থরগতি জলধারাকে ;—
যখন তার শান্ত বুকের উপর ঝুঁকে পড়ি
তখন সে আমার অন্তরের কথা শুনে নেয়।

আর যদি ব'লে থাকি—
তবে ব'লেছি চঞ্চল বায়ুকে—
যে বৃক্ষ শাখার ফাঁকে ফাঁকে
মৃদু হাসি ও গুঞ্জনের রব তোলে।

আমার ভালবাসার কথা,
আর কাউকে যদি ব'লে থাকি,
তবে ব'লেছি বনের বিহঙ্গকে—
যে বায়ুর তালে তালে
উড়ে যায় আর গান গায়।
আর যদি ব'লে থাকি—
তবে ব'লেছি প্রতিধ্বনিকে।

আমার বিরাট প্রণয় দিয়ে
—সুখে দুঃখে—
যদি কাউকে ভালবেসে থাকি
সে হ'ল তোমার দুটি আঁখিকে ;
আমার মহৎ প্রেম—
যদি কিছু চেয়ে থাকে
তবে সে চেয়েছে—
হে মহান—
তোমার স্নিগ্ধ মোহন মুখখানা ;
তোমার মুখের দিকে চেয়েই
বিকশিত হয়েছিল আমার প্রেম।

আমার মহান ভালবাসা দিয়ে
যদি কাউকে ভালবেসে থাকি—
তবে সে হ'ল
তোমার পেলব তনু,—
আর তোমার শীতল হস্তযুগল ;—
—স্নিগ্ধ স্পর্শ আকর্ষণ ক'রেছিল—
—আমার প্রেমকে।
আর তোমার সর্বসত্তার ছায়াকে-ই
খুঁজে বেড়াচ্ছি—
আমার মহৎ প্রেম দিয়ে।

আশ্বিন কন্যাকে

শ্রীঅনিলকুমার রায়

একটি মেয়ে বলো কি নাম দেবো তাকে হেমন্তের মাঠে
সোনালী চুল
বেঁধেছে খোঁপাতেই। সে-নামে ডেকে ডেকে করেছে
কতো চাঁপা কতো বকুল।

শীতের মেঘডম্বরে পাখিরা গান গেয়ে উষ্ণতাপ দিয়ে
ভরেছে নীড়
কুয়াশা ছিঁড়ে ফেলে সে মেয়ে ভালবেসে মধুকে ভাসিয়েছে
সেই তিমির।

মহুয়া ফাল্গুন তানপুরার তারে ইমনসাহানাকে
সেধেছে আর
বসন্তের পাখি ডেকেছে এসো এসো হে বৈশাখ এসো
মধুকাহার

গলায় দিয়ে, হাতে কুঙ্কুমকলি বেঁধে আকাশ ভেঙে যাও
রোদের গান
রক্তকরবীর রক্তের নদী থেকে স্নান দাও দাও।
পূরবী তান

করুক ফুল হ'য়ে ভোরের শিউলীর, আকাশ-পলাশের
অগ্নিকোণ
হৃদ্যুতী ফুলে মুখর হোক তারা। রক্তকমলের
অমুক মন।

যোগেশ জলে যাক শ্রাবণ মুছে যাক। অপরাজিতা মেয়ে
অনেকবার
এসেছো এই কভু সোনার সিঁড়ি ভেঙে, এবার তোলো
তোলো সে ঝঙ্কার।

একটি মেয়ে আছা সে নাম দেবো তাকে যে নামে ডাকে
ফুল সোনালি দিন
মধুর হ'য়ে নাচে পাখি ও পাখালির খুশির সরোবরে
এ-আশ্বিন।

এই পৃথিবীকে

প্রভাকর মাঝি

এই পৃথিবীকে ভুলে যেতে পারো যদি
আরেক পৃথিবী ভাববে তোমারে কাছে।
হাতছানি দিয়ে, সুপ্ত সুপ্তি দিয়ে কভু
সকালে বিকেলে ডাকবে সে নিরবধি।

দেখবে সেখানে রোদ করে চিক্ চিক্
সাঁতসেঁতে নয় শরীর কিংবা মন।
পাহাড়ার চোখে কখন কান্না নেই
এক মুঠো ভুলে উজল চার দিক।

প্রতিদিনকার খেরালি মানুষটাকে
নামতে হয় না জৈবিক সংগ্রামে।
পদে পদে নেই হোঁচট খাওয়ার ভয়—
দু' চোখে কেবল নীলটুকু জেগে থাকে।

জোনাকিরা জ্বলে সমস্ত রাত ধরে,
দস্তর হাসি জেগে নেই হায়নারা।
শিশির-ছিটানো ঘাসফুলগুলো থেকে
অদ্ভুত এক মাধুর্য পড়ে ঝরে'।

এই পৃথিবীকে ভুলবে হঠাৎ যেই
সেই পৃথিবীর গান কানে বাজবেই।

নীড়ের আহ্বান

স্নেহাকর ভট্টাচার্য

তবে ধানের মাঠে প্রাচীন বৃক্ষের নীচে জন্মলাভ ক'রে
আমোদ অজ্ঞান পাখি উড়ে গেল অন্য কোন্ আকাশেরপারে
তাদের সঙ্গীত শুনে উষার বিচিত্র রথচক্রের রেখায়
আরেক আকাশ তলে প্রাণ-কন্যা নীলিমার দীপ্ত অভিসারে।
উজ্জ্বল পলকে মোহময় মন ঘুম ভেঙ্গে চেয়ে দেখে তার
বিচূর্ণ তারার স্তূপে ক্ষণা তোলে অবিশ্বাসী জীবনের বোধ ;
চলে যাবার জলে তখনিত শোকশুভ্র স্বগত আলাপ :
ফিরবেনা তুমি আর বীতশোক হে চঞ্চল আলোর কপোত।

তোমাকে-হারিয়ে দেখে সুদূর কল্পলোকে বঞ্চক-বিদ্যুত
আবেক আলোর বীজে চিন্ময় মুকুল কোটে অন্ধকার ধূলে,
উর্মীল শুরুকে জলে তেজোময় বহ্নিশিখ মনের গহনে—
জীবন জটিল ওই ছিঁড়ে ফেলে প্রেম সেই শান্ত উপকূলে।
কোথাও স্বপ্নের ধূপে আনন্দিত হাওয়া লাগে,
চোখের আড়ালে—
নীহারিকা উদ্ভাসিত, অনন্ত ইশারা আনে দূর ছায়াপথ—
শঙ্খের আহ্বান আর সাগর কন্যার গানে মুক্ত রাঙাপালে
এখানে ফিরবে কবে বীতশোক হে চঞ্চল আলোর কপোত।

তোমাকে নতুন রূপে কী করে চিনবো আমি বলে যাও তবে
যখন আবার দেখা হবে এই নিরালোক কক্ষ মোহনায়,
শঙ্কিত অতীত ভেঙে চেতনায় সদ্যোজাত অনিন্দ্য বিশ্বাসে
হবে সেই চেনা পাখি ? আমার এ জাহাজের মাস্তুল চূড়ায়
মৃত্যুর মতনও ধ্রুব সত্য পরিণতি নেই গোপন পাহাড়ে
একটি বিন্দুতে শুধু বৃত্ত আঁকে অন্ধকার ভাবনার স্রোত—
অনন্ত আশ্বাস নিয়ে বটের শান্তির ঘটে শিশিরের ডাকে
কখন ফিরবে নীড়ে বীতশোক হে চঞ্চল আলোর কপোত।

হেমন্ত বিকাল

(মিহির গুপ্তকে)

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

অপরূপ মনে হলো তাকে সেই সন্ধ্যার আলোতে।

আকাশের ম্লান পটে দিগন্ত সূর্যের মরুরিমা
তখন বিবর্ণ, ক্লান্ত ; সন্ধ্যার করুণ যবনিকা
রেখালীন রজনীকে ধীরে ধীরে নেবে এলে পরে
জোনাকির মৃদুভাষ, ঝিঁঝিঁদের নির্জন প্রহরে
সে যখন বিলম্বিত দীর্ঘ দুই চক্ষু স্বপ্নশিখা
আনিবে তাকালো, এই হৃদয়ের চেতনার স্রোতে
তাকে মনে হলো যেন অন্তহীন সুদূরের সীমা।

সুর হতে অন্য সুরে অবিরাম তার যাওয়া-আসা।
প্রাণের সবত তুচ্ছ, সামান্য কথার তারে-তারে
গানের মূর্ছনা তুলে বেদনার দুঃখের পাহাড়ে
সে যেন নির্ঝর ধারা আনন্দের হৃদয়কুসুমে
যে আলে সৌরভস্নিগ্ধ অম্লানকুসুম ভালবাসা !

অপরূপ লেগেছিল তাকে সেই সন্ধ্যার আলোতে।

এষণা

শ্রীসংযুক্তা কর

সমুদ্র সন্ধানী চোখে খুঁজেছি অনেক
চলে গেছি কত দূর ! কত শত নানা রঙ
আকাশের তলে ;
চলে গেছি কত শত জানা অজানারে
তোমার দরশ তবু পাই নি বারেক ।

তোমারে চাওয়ার পথে করেছে কতই রঙ,
কত শত রামধনু স্বাগত জানালো,
কত সন্ধ্যা কত উষা কত শত স্বপ্ন-হিম
এপথে ছড়ায় ;
কাছে গিয়ে আমি শুধু পেলাম কেবারে
প্রবাল মুকুতাগুলি চিরদিন ঘুরে রয়ে গেল !

কতদিন চিল-ওড়া নীলাম্বর রূপালী দুপুরে
অথবা থমকে থাকা মেঘলা বেলায়
সাগর-সৈকতে কিম্বা ছায়াভরা বনপথে
পাহাড়িয়া পথে
তোমারে পাওয়ার ছন্দে বারবার বহুরূপে
ছুলেছি ক্ষণেক যেন সংশয় দোলায় ।

তোমারে চাওয়ার পথে জ্বালায়ে রেখেছি দীপ
আমার হৃদয়-ধূপ পুড়ে পুড়ে ঘুরে ঘুরে
চলেছে তোমার নিত্য নীরব সন্ধানে ।
তোমার অমর্ত্যপানে আমার কল্পনালোক
জেগে আছে তন্দ্রাহারা সুন্দরের ধ্যানে ।

সুখে দুঃখে

সনতকুমার মিত্র

শরত্ তার আকাশের অথৈ নীল জলে
মেঘের কল্লা পালক খুঁটে মহা সুখ অঞ্চলে
সারাটি দিন চপল হয়, অথচ তার মাঝে
হঠাৎ মেঘ-মাছিকে ছুঁয়ে অজানা কোন লাজে
কপোলে লাল আলোর আলপনার জাল এঁকে ;
হয়েছে ছুটি ? এসো না ছুটে ! আমাকে ওঠে ডেকে ।

আবার এই চপল মেয়ে রাতের ওড়নাতে
তারার টিপ সাজাবে ধীরে, গানের ঝরণাতে
ভরাবে নদী, ছড়াবে তার সাদার আলপনা
নদীর নির্জনের সেই দু' কালি জাল বোনা
সবুজ শত কাশের নীবে, সেখানে চেয়ে থেকে ;
হয়েছে ছুটি ? এসো না ছুটে ! আমাকে ওঠে ডেকে

অতল আগুন

শ্রীকৃতান্তনাথ বাগচী

বিকেল আকাশে এলোমেলো মেঘে সোনালী রেশ,
নিরুদ্দেশের মেশায় বলাকা মেলেছে ডানা,
ঘাসের উপরে রঙে রঙে আসে জাদুর দেশ,
কেবলারুদের স্বপ্ন দেখিতে নাই যে মানা।

বানাম পাতার তাস-খেলা শেষে ঘুমায় হাওয়া,
আবেশ ঘনায় শ্বেত করবীর অবাক চোখে,
সাথীহারা বাউ দিন-ফুরানোর উদাস পাওয়া,
ছায়া-নিরালায় মৌমাছি কাঁদে মধুর শোকে।

গজদন্তের পদ্মকে নীল ঘরোবা খুলে,
চাঁদপারাবত পক্ষ এনেছে চঞ্চুপুটে,
টলমল করে সন্ধ্যা তোমার আঁখির কূলে,
আকুল অলকে রাতের উতলা আঁধার জুটে।

তোমার হৃদয় সাগর-বেলায় দাঁড়ায়ে একা
যাযাবর প্রাণ হারানো মাণিক ফিরিছে খুঁজি,
কপালে কালের অলখ কালিতে নিয়তি লেখা,
তুমি বেদ, যুদু, আমি ইতিহাস-ভাষ্য, বুঝি।

তারার মন্ত্র তাপস আকাশ সমাধি ভরি,
তোমার বুকের অতল আগুনে ডুবিয়া মরি।

নির্জন প্রার্থনা

সমর চক্রবর্তী

নিভৃতে হৃদয় নিয়ে একা একা দগ্ধ হওয়া ভাল।
বিরল মুহূর্তে পাওয়া,
অন্তর প্রীত হাওয়া
তাই নিয়ে পরম অচিন্ত্য দীপ জ্বালো

তোমাকে দিয়েছি আমি,—
ফাল্গুনের রূপোবরা মহুয়ার গন্ধভরা রাত,
চৈত্রের এলোমেলো অলস দুপুর।
মনে হয় তবু যেন,—
তুমি এক নির্জন তারার মত একান্ত সুদূর।

আমাকে দাওনি তুমি মনোময় অলোক বৈভব।
আমি শুধু হবো ধূপ, ধূপের সৌরভ।

সরকারী বাস

[গল্প]

প্রশান্ত দেবসরকার

মাথাটা একটুখানি ঘুরিয়ে দিয়েই কেমন খটকা লেগেছিলো। কিন্তু আর ভাববার উপায় ছিল না, বেশ মনে হ'ল সত্যেনের পাশের ভদ্রলোক লক্ষ্য ক'রেছেন! ডেকে ফিরলে কি ভাববে, ছি!

তবু যতবার লোকটাকে চোখের উপর ঘুরতে ফিরতে দেখে ততবার খটকা লাগে। চোক গিলে মাছের কাঁটা লাগার মত।

টিকিট! টিকিট! করে যেন অস্থির করে' মারছে লোকটা। ওর দিকে না তাকিয়েই সত্যেন ওর মুখ বিকৃতিটা লক্ষ্য ক'রতে পারে। টিকিট চাওয়ার মধ্যে কেমন একটা সন্দেহের রেশ আছে আজ। কণ্ডাক্টারী করছে না, ঠক বাছছে!

সরকারী বাসটাও আজ তেমনি চলেছে গজেন্দ্র গমনে, রাজনন্দিনীর গতরই সার! স্ফীতোদরার নড়তে কষ্ট হ'চ্ছে!

যুক্তি অকারণেই সত্যেন গরম হ'য়ে ওঠে। কণ্ডাক্টারকে চেঁচিয়ে বলে তোমাদের মতলবটা কি। গাড়ি এই-ভাবে যাবে?

কণ্ডাকটার উত্তর দেবার আগেই সত্যেন চেঁচিয়ে ওঠে আবার, চালাকি পেয়েছো! মাংনা!

ঘণ্টাটার দড়িটা জোরে নেড়ে দিয়ে কণ্ডাকটার বলছে, রাস্তা জাম আছে!···'জাম' আছে! তা হ'লে আর কি—কৃতার্থ হ'য়ে গেলুম! আরো যেন চেঁচামেচি করার ইচ্ছে ছিল সত্যেনের, কিন্তু সহযাত্রীদের মুখের দিয়ে চেয়ে চুপ করে গেল। তার কি, দেরি সবারই হচ্ছে।

বেশ অপ্রস্তুত মনে হয় নিজেকে সত্যেনের, শুধু শুধু গোলমাল বাধাতে চাইছিল—বাস আবার কবে এর চেয়ে জোরে চলে। নতুন বাসে চড়ছে!

ভিড়ও হয়েছে তেমনি। লেজ-কোলা পাখীর মত মাটির সঙ্গে মিশে চলেছে বাসটা মুখ উঁচু করে'। আওয়াজ ও তেমনি, গোঁয়ানি কেবল!

চাক্ষুষ ভিড়টা যতই খারাপ লাগুক, মনে মনে ট্রাম-বাসের এই ভিড়ের কেমন যেন একটা আকর্ষণ আছে। ঐ মাথা গলিয়ে, পা মাড়িয়ে চিড়েচেপ্টা হ'য়ে আসা-যাওয়া করার মধ্যে কেমন একটা মাদকতা আছে;-এর নেশার মত, দেখে দেখে বেছে বেছে ঠিক ঐ ভিড়ওলা বাসেই সত্যেন ওঠে। ঝুলে দাঁড়িয়ে গাদাগাদি করে যেতে যেন সমধিক আরাম পায়। কতদিন তর্কাতর্কি হ'য়েছে ভিড়ের মুখে সহযাত্রীদের বাধা পেয়ে: খুসী। আপনারা বাধা দেবার কে? অত যদি স্পর্শকাতর, ট্যাক্সি করে গেলেই পারেন, কেউ বারণ করবে না। ভিড় তা কি হয়েছে?

এই ভিড় ঠেলে টালীগঞ্জ থেকে টালা পর্যন্ত নিত্য আসা-যাওয়া ক'রতে ক'রতে একটা 'স্ক্রাব' এসে গিয়েছিল সত্যেনের। ভিড়ের মধ্যে কখন টুপ করে উঠে পড়ে, নেমে আসে। অবলীলাক্রমে! বহু বাঞ্ছিত যেন।

ঘাড় কাৎ করে পাশটা সত্যেন চেয়ে দেখলে, থৈ থৈ ভিড় কেরোর পায়ের মত কিল্-বিল্ করছে। লেডিজ সীটে মূর্তিগুলো বরণ-ডালার মত ধরে ধরে সাজান। একজনে রক্ষে নেই আবার দু'জন, সামনে পিছনে। নেইআঁকড়ের মত টিকিট চাওয়ার বায়না! শুনলে গা জ্বলে যায়! তোর কি, চুপ করে থাক না—দেখছিস ভিড়!

দাঁড়ান—এক ভদ্রলোক খিঁচিয়ে উঠলেন, অমন অস্থির হ'চ্ছো কেন, টিকিট পালিয়ে যাবে নাকি? চুপ ক'রে দাঁড়াও—

যত সব ইয়ে! হ্যাণ্ডেল ছেড়ে পকেট হাতড়ে টিকিটের পয়সা বার ক'রতে সত্যিই কষ্ট হয় ভদ্রলোকের। ঘাড়ে পড়েন কি, মাথা ভাঙেন কারো!

গায়ের জ্বালায় সত্যেনও ফোড়ন কাটলে বসে বসে। ওরা ওই রকম! দেখছে লোক দাঁড়াতে পারছে না, তবু টিকিটের তাড়া। কেউ লেগেই আছে—পাঞ্জাবীদের বাড়া! কাজ দেখাচ্ছে!

কাজই দেখাচ্ছে! এত বিরুদ্ধ মন্তব্যেও কণ্ডাক্টারের দু'জন কর্তব্যে অবিচলিত, লক্ষ্যে স্থির। মুট মুট করে টিকিট আদায় করে টিকিট দিয়ে যাচ্ছে জনে জনে। কৌশল ওদের আয়ত্ত হ'য়ে গেছে, ভিড় ওদের গা-সওয়া!

রুখে কোন লাভ নেই। মুখে ব্যথা। যে যার নিয়ে ব্যস্ত। বসবার একটু আসনের জন্যে কতকগুলো লোক যেন শকুনের মত চেয়ে আছে। আর কোন লক্ষ্য নেই। মরুক গে কার কি, সে তো আরামে বসে যেতে পারছে। চুপ-চাপ কোন রকমে মিনিট দশেক কাটিয়ে দিতে পারলেই হয়, তারপর ভিড় ঠেলে নামতে নামতে আরও পাঁচ মিনিট, তারপর ঝুপ করে গন্তব্যে নেমে পড়া! ও বেচারা যত পারে তারপর 'টিকিট, টিকিট' করুক না! সত্যেন কিছু বলতে আসবে না।

কিন্তু এই পনেরো মিনিটই যে কাটতে চায় না। ট্রাফিক জাম লেগেই আছে, তার ওপর 'জেনানা বাঁহকে!' —যেমন ক'রে পার দুমড়ে বেঁকে কুঁকড়ে ওদের বসবার জায়গা করে দাও। বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ওঁদের আগমনে চলন্ত বাসটা স্তব্ধ হয়ে যায় কতক্ষণ। কে জানে আরো কতবার যে অমন বজ্রপাত হবে! পার্ক ষ্ট্রীট পেরুতেই ডবল ডেকারটা খুড়ো হয়ে গেল, জং ধরলো বুঝি কলকব্জায়! পাশ কাটিয়ে কত বাস আগে পিছে ছুটে গেল। চৌরঙ্গীতে হাওয়ার কত বয়ে যাচ্ছে।

আলো ছায়ায় বাইরেটা সুন্দর। আসন্ন অপরাহ্ণে অদ্ভুত রঙ ধরেছে মাঠে-ঘাটে। কোন মানে হয় না এত কষ্ট করে এমন সময় বাসে ট্রামে যাবার। তার চেয়ে হেঁটে গেলেই সব দিক থেকেই নিশ্চিন্ত, নির্ভাবনা। কণ্ডাক্টারের হাত থেকে রেহাই!

মাঝ রাস্তায় হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে সত্যেন আবার বসে পড়ল। পাশের স্ত্রীলোক জিজ্ঞেস করলেন, নামবেন নাকি?

না! সত্যেন চাপ দিয়ে একধারে সরে গিয়ে বললে।

ভদ্রলোক বুঝি সত্যেনের ধরণ দেখে মনে মনে হাসলেন। লোকটা কি, খামকা উঠলোই বা কেন, বসলই বা কেন- যদি না নামবে! শুধু কি পাশের ভদ্রলোক, যারা সতৃষ্ণ নয়নে সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারাও। শুধু শুধু ওঠ-বস করে এ আবার কোন ভদ্রলোক! পাগল নাকি, গন্তব্য জানে না?

হঠাৎ সামনে থেকে ভিড়ের চাপটা যেন মারমুখো হ'য়ে ওঠে। যারা বসে আছে তাদের ওপরই আক্রোশটা বুঝি। হুড়-মুড়।

ভিড় সামলাতে কণ্ডাক্টার বললে, দয়া করে একটু সরে সরে যান সামনের দিকে—মুখটা ছেড়ে দিন।···টেনে চলুন, কোথাও বাঁধবেন না।

শুধু বেল টিপে নয়, পিঠ চাপড়ে যান্ত্রিক অশ্বটাকে চালা করতে হয়। তাই কি ভিড় সামলানো যায়, ভেতরটা অরাজক অবস্থা।

তারপর খানিকটা বেশ এল বাসটা, গতিবর্ম ছাড়া আর কোন বালাই নেই। কণ্ডাক্টার দু'জন দু'মুখে স্থির হয়ে আছে। এখন যত গোলমাল যাত্রীরাই করছে। বেশ বোঝা যায় দণ্ডায়মান ভিড়টা কাঁই হয়ে আছে,—একটু ফাঁক পেলেই কেটে পড়বে।

জানালার বাইরে থেকে দৃষ্টিটা ভিতরে ফেরাতে সত্যেনের কেমন যেন মাথাটা ঘুরে গেল। চোখের ওপর অদ্ভুত একটা ঝিলিমিলি পর্দা নাচছে যেন! ভেড়া-বেঁকা কিম্ভূত মূর্তিগুলো।

এখন পাশের ভদ্রলোকের ওপরই রাগ হয় সত্যেনের সব চেয়ে বেশি, ভদ্রলোক ক্রমেই চেপে এসেছেন।

বিরক্তির সুরে সত্যেন বললে, বসুন তাহলে উঠে দাঁড়াই।

কেন! কি হ'লো? ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা ক'রলেন।

তেমনি বেঁকা সুরে সত্যেন বললে, আপনি একাই বসুন! দু'জনের জায়গা যখন হচ্ছে না—

সে কি! ভদ্রলোক হাত যুড়ে বললেন, আসুন আসুন!

না, আর কিছু বলা চলে না এর ওপর।

কিন্তু ঠিক মত বলতে পেরে স্বস্তি কোথায়? ভদ্রলোক যতই নির্বিরোধ হোন, কেমন চক্ষুশূল যেন। সেই উঠেছেন মামবার আর নাম নেই—শেষ পর্যন্ত সঙ্গে যাবেন নাকি পাহারা দিতে দিতে! দিব্যি প্যাট হ'য়ে বসে আছেন পথ আগলে।

শুষ্ক সুরে সত্যেন জিজ্ঞেস করলে, কদ্দুর যাবেন?

ট্রামে-বাসে আলাপটা অভাবনীয় হ'লেও ভদ্রলোক আপ্যায়িত হ'য়ে বললেন, চড়কডাঙা। আপনি?

টালিগঞ্জ। যেন জরুরি করেছে সত্যেন বাসে উঠে, এখন নামতে পারলেই বাঁচে।

ভদ্রলোক বললেন, এখনো অনেকটা।

আর বলেন কেন? সত্যেন মুখ নাড়া দিলে। বাস না গরুর গাড়ি।

ভদ্রলোক বোধ হয় হাসলেন অনুভাবন করে, যা বলেছেন।

আকাশের তারাকে আড়াল করে চৌরঙ্গীতে আলোর ফুল ফুটলো। একটি ছুটি করে, ঐ লেল্যাণ্ড বাসটার কাঁপুনির মত আলোর চমক থর-থর করছে চোখের ওপর। বাতাসে ঝিম্ ধরেছে পোড়া পেট্রোলের গন্ধে।

হঠাৎ আর্তনাদ করে বাসটা থেমে গেল। কৌটোর মধ্যে মশলা মুড়ি মেশানোর মত ভিড়টা একাকার হ'য়ে গেল। বসা দাঁড়ান এখন সমান।

যাত্রীদের মুখে প্রশ্নটা উচ্চকিত হবার আগেই কণ্ডাক্টার বললে, সামনে প্রাইভেট পড়েছিল···খুব বেঁচে গেছে।

গায়ের ধুলো ঝেড়ে এক ভদ্রলোক বললেন, বাস চালাচ্ছে না ইয়ারকি মারছে...কত জাকানিই না শিখেছে, ট্রাফিক জ্ঞান, প্রাইভেট...আর কি আছে? ড্রাইসেন্স কোথাকার।

অম্লান বদনে কণ্ডাক্টার বললে, বড্ড গাড়ি-ঘোড়া বেড়ে গেছে স্যার!

ভদ্রলোক ধমকে উঠলেন, গাড়ি ঘোড়া বেড়েছে না, তোমরা বেড়েছো! যে কাজে হাত দেবে সেই কাজেই গণ্ডগোল! যত সব—

হঠাৎ পাশ থেকে একজন যাত্রী বলে উঠলেন, ওকে বলছেন কেন—ওর কি দোষ?

মার মূর্তি ভদ্রলোক রেগে বললে, তবে কাকে বলবো? আপনি তো বেশ বলছেন মশাই!

আপনিও তো বেশ বলছেন!

আলবৎ বলবো! আপনার গায়ে লাগবে কেন?

অন্যায় বললে সবার গায়ে লাগে।

কি অন্যায় বলেছি? পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করুন—

আপনিই জিজ্ঞেস করুন। যা-তা কথা বললেই অমনি হ'লো।

কেন, আপনাকে দেখে ভয়!

ভয় নয়, ভদ্রতা শিখুন আগে।

ক্রমে স্বর যেমন উচ্চ হ'য়ে ওঠে ভদ্রলোক দু'জন তেমনি পরস্পরের সামনে এগিয়ে আসতে চেষ্টা করেন। আগে ভিড়টা প্রাকার-বিশেষ, নতুবা একটা ধুলোধুনিই হ'য়ে যেত—রণভূমি কি যুদ্ধক্ষেত্র!

মাঝখানে পড়ে কণ্ডাক্টারই শেষ পর্যন্ত শান্ত করবার চেষ্টা করে; যাদ দিন! কেন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছেন? কতক্ষণ, এক্ষুনি তো যে-যার নেমে যাবেন! আমার দোষ হ'য়েছে স্বীকার করছি!

উত্তেজিত দ্বিতীয় ভদ্রলোক বললেন, কখখনো না, আপনি দোষ স্বীকার করবেন না! যা তা অমনি বললেই হ'লো—চালাকি পেয়েছে।

প্রথম ভদ্রলোকও না-ছোড় বান্দা, বললেন, মুখ সামলে কথা বলবেন বলছি। যত সব লোফার কাঁহাকার।

আর রাগ সামলান যায় না—ভিড়টা দুজনকে নিয়ে টাগ-অব-ওয়ার শুরু করে, সামলানই দায়! তর্জন-গর্জন সমানে চলে।

লোফার? খুব ভদ্রলোক উনি! কণ্ডাক্টার ওঁর খাসতালুকের প্রজা। বেড়েছেন! উনিই বেড়েছেন—

সত্যেনের পাশের ভদ্রলোক বললেন, আর কেন, এবার থামুন বা মশাই! যথেষ্ট হ'য়েছে!

তা বলে ভদ্রতা নেই? কণ্ডাক্টারী করছে বলে কি মানুষ নয়?

কে বলছে মানুষ নয়! সবাই মানুষ। এবার একটু চুপ করুন, আমরা পৌঁছে যাই তারপর আপনারা যত পারেন—

সত্যেন আর বুঝি চুপ করে থাকতে পারে না, মন্তব্য করলে—এদের জন্যেই বেড়েছে! অভদ্রের মত দেখলেন না তখন থেকে টিকিট-টিকিট করে অস্থির করে মারছে। যত আসকারা পেয়েই তো—

বাঃ বেশ বলছেন। ওর ডিউটি ও করবে না?

কথার মধ্যে শ্লেষ ছিল। সত্যেন ক্ষেপে পড়ল, খুব ডিউটি দেখাচ্ছেন! ভদ্রলোকদের মুখের কাছে বার বার হাত নাড়াটা কোন দেশী ভদ্রতা শুনি?

বার বার না চাইলে অনেকে আবার দেয় না কিনা! টিপ্পনী কেটে ভদ্রলোক বললেন।

তার মানে! সবাইকে আপনার মত ভদ্রলোক ভাবেন না! সত্যেনের গায়ে কথাটা খুবই লাগে।

আপনার মত ভাববো! ভদ্রলোক ফুট করে যেন কামড়ে দেন। সত্যেন হাত গুটিয়ে সিট ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে : রাসকেল।

ভাগ্যে হাতটা গুটনোই থাকে। আরো পাঁচজন সহযাত্রীর সহযোগিতায় লেসারিত হ'তে পারে না। আশ্চর্য, কোথাকার হাওয়া কোনদিকে বইতে সুরু করল!

সেই কণ্ডাক্টার এসেই সকলকে সামলায়। কেন মিথ্যে আপনারা মাথা গরম করছেন। কতক্ষণের বা মামলা। নেবে গেলে আর হয়তো কারো সঙ্গে কখনো দেখাই হ'বে না। চুপ করে যান।

ভিতরে খেয়ে-ঘুমে যেতে খানিকটা বেশ নিস্তব্ধ হ'য়ে বাসটা এগিয়ে আসে। চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে এলগিন রোডের মোড়ে এসে পড়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যে আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। ওঠা-নামা, গাদাগাদি, ঠেলাঠেলি, বিরক্তি, উল্লাস, বাঁধা, ছাড়া।

সেই থেকে বাইরের দিকে চোখ রেখে সত্যেন চুপ করে থাকে। ভদ্রলোকের কথার জ্বালা যেন ভুলতে পারে না। নিজে থেকে কোন কথা না কইলেই হ'তো, কি দরকার ছিলো পরের ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে! সত্যিই তো কণ্ডাক্টারদের কি দোষ! টিকিট চাওয়াই তো ওদের কাজ; টিকিট চেয়ে তো আর অপরাধ করেনি! তোমার ভাল না লাগলে কি হ'বে।

বার কয়েক ডান হাতটা পকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে আবার বার করে নিলে সত্যেন। আন্দাজে কি যেন নাড়াচাড়া করে ঠাহর করলে। বাসের ভিতর বিহ্বল দৃষ্টিটা ফিরিয়ে কি যেন দেখলে। কিছু যেন আর বোধগম্য হচ্ছে না। মনের এমন অবস্থা আর কখনো হয়নি সত্যেনের। আজ সব যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে। কণ্ডাক্টারটা কিন্তু সেই দাঁড়িয়ে আছে চোখের ওপর!

বড় মাতব্বর হ'য়েছে! গভর্মেণ্টের আর কাজ ছিল না, যত সব ভদ্রলোকদের ধরে ধরে কণ্ডাক্টারী করাচ্ছে: (কত দুঃখু যেন ঘুচবে!) উঁচু নীচু কথা বলবার উপায় নেই, অমনি কোঁস করে ওঠেন আর ভদ্রলোকেরা! যেন সব মেদো-ঘুড়ো।

বোধ হয় একটু বিমনাই হ'য়ে পড়েছিল সত্যেন। কি কুক্ষণে এই বাসে উঠে সে আজ বাড়ি ফিরছে! সবাই মিলে যেন আজ তাকে অপদস্থ করতে চায়। তার কৌশলটা যেন সবাই ধরতে পেরেছে। পুরোণ পাপী।

নিজের মনকে আবার শাসন করে সত্যেন। এসব কি ভাবছে সে শুধু শুধু! কোন দোষই সে করেনি, কোন অপরাধও না। কিসের অন্যায়? কিসের পাপ? কিছু না! বরং বেশ করেছে খুব করেছে, আরো করবে—কাউকে দেখে সে ভয় করেনা। ভয়ের কি আছে?

কে জানে সত্যি ভয়ের কিছু আছে কিনা, আর থাকলেও তা নিয়ে মনে মনে এত আন্দোলন কেন? এক সময় পাশের ভদ্রলোক একটু সরে বসে' জিজ্ঞেস করলেন, কি, আপনার অসুবিধে হচ্ছে?

শুষ্ক কণ্ঠে সত্যেন বললে, না।

ভদ্রলোক বোধ হয় মনে মনে হাসলেন। সহযাত্রীর হাব-ভাব কেমন কেমন যেন! হদিস পাওয়াই ভার! পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে ঝগড়া করবেন, আবার রাগও দেখাবেন! বাসে কত রকমের যাত্রী যে ওঠা-নামা করে! চিড়িয়াখানা।

সত্যেন চেয়ে দেখলে, সামনের ছুটো সিট আগে কণ্ডাক্টারের আত্মীয় সেই ভদ্রলোকটি কখন ঠিক বসে পড়েছেন। এখন মনেই হয়না, এই একটু আগে উনিই কণ্ডাক্টারের পক্ষ নিয়ে সহযাত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন।

কিন্তু ওঁর কি স্বার্থ? হঠাৎ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সত্যেনের মনে হ'লো ভদ্রলোক তারই মত কৌশলী। তারই মত বিশেষ একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

কণ্ডাক্টারটাকে ডেকে কানে-কানে বলে দেবে নাকি, আসল উদ্দেশ্যটা। ওঁর কি? ঐ করে বৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছেন! উনি একজন—

সত্যেন লক্ষ্য করলে, কণ্ডাক্টারটা ইচ্ছে করেই ওঁকে বাদ দিলে। ভদ্রলোক এমন ভাবে বসে আছেন, যেন কখন ওঁর টিকিট কাটা হয়ে গেছে। চালাকি আর সে বুঝতে পারেনি! রতনে রতন চেনে। বাজী রেখে সত্যেন বলতে পারে—

কিন্তু নিজের সঙ্গে বুঝি আর বাজি রাখতে হবেনা সত্যেনকে। ভদ্রলোক কণ্ডাক্টার ঘুরতেই টিকিটের পয়সা বার করে দিলেন। এমন ভাবে পয়সাটা বার ক'রছেন যেন খুব একটা বাহাদুরীর কাজ করছেন। কেমন একটা দেখান ভাব সহযাত্রীদের।

রাগে সত্যেন চোখটা ফিরিয়ে জানালার বাইরে পাঠিয়ে দেয় অন্ধকারে। আলোর ইসারা অদ্ভুত! যদি এখনি সব আলো নিভে যায়, নিজের মনকে কি সত্যেন শান্ত ক'রতে পারবে? কি দরকার তার কে টিকিট কাটলো না কাটলো খোঁজ করে? সে নিজে কেটেছে কি?

আবার পাশের ভদ্রলোক আড় চোখে চেয়ে দেখছেন, তেমনি কৌতুক বোধ ক'রলেন সহযাত্রীর অহেতুক চাঞ্চল্যে! চোখাচোখি হ'তে জিজ্ঞেস করলেন, নামবেন নাকি?

গম্ভীর হ'য়ে সত্যেন বললে, না!

ও, আপনি তো সেই টালিগঞ্জে নামবেন। ভদ্রলোক মুচকি হাসলেন। হ্যাঁ। আপনিও তো সেই চড়কডাঙ্গায় নামবেন। কৌতুক ক'রতে গিয়ে কেমন রেগে ওঠে সত্যেন। আজ সবাই মিলে তার পিছনে লেগেছে। কি ক'রেছে সে।

কিন্তু গণ্ডগোল বেধেই আছে—একটা না একটা। এবার কণ্ডাকটার বেছে বেছে ঠিক ধরে ফেলেছে' ড্রাইভারের পিছনের সিটটায় ভদ্রলোক ঘুমতে ঘুমতে আসছিলেন শ্যামবাজার থেকে, বার কয়েক বুঝি ঘুমের ঘোরেই মাথা নেড়েছেন। কিন্তু তবু কণ্ডাকটারের সন্দেহ যায়নি। ভদ্রলোক, ফট্ ক'রে যা তা তো আর বলতে পারে না.....লক্ষ্য করে' করে' এতক্ষণে যেই চোখ খুলেছেন অমনি টিকিট চেয়েছে···তাতেই এত কাণ্ড।

গোলমালটা বেশ পাকিয়ে ওঠে। নানা রকম লঘুগুরু মন্তব্য চারিদিক থেকে বর্ষণ হ'তে থাকে। নানা টীকা টিপ্পনী, চিমটি কাটার মত।

কে জানে ঘুমন্ত যাত্রীটির কি বলবার আছে আত্মপক্ষ সমর্থনে। তা ছাড়া তাঁর কথা কে আর শুনছে। পুলিশ আদালত নানান কিছু নিয়ে তখন মোর গোল সুরু হয়েছে, কণ্ডাকটারটা একপাশে দাঁড়িয়ে কেমন আড়চোখে যেন সবার দিকে চেয়ে হাসছে।

সত্যেনের গা জ্বালা ক'রে ওঠে, এতে হাসবার কি আছে। টিকিট করেনি, টিকিট করবে। তা নিয়ে অত গণ্ডগোল কেন। চোর না ডাকাত, সবাই মিলে একটা নিরীহ ভদ্রলোকের পিছনে লেগেছে? যত শয়তান ঐ কণ্ডাকটারগুলো। টিকিট না হ'লে যেন মহাভারত অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে। ইচ্ছে করে—

কিন্তু না।

সেই ভদ্রলোক মন্তব্য ক'রলেন, ডিউটি কি আর ওরা সাধে করে, অনেক জ্বালায়। ফাঁকি দিতে পারলে কে আর ছাড়ে। দেখলেন তো—বাসে চড়বেন, কিন্তু টিকিট করবেন না·····আশ্চার।

বাস ভর্তি ছি-ছি-টা তখন যেন মর্মভেদ করে' কোথায়

কোথায় যেন ধোরাঘুরি করছে। সত্যেনের পাশের ভদ্রলোকও অস্ফুটে ছি-ছি করলে। সামান্য কয়টা পয়সার জন্যে এ মনোবৃত্তির কোন সমর্থন কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না আর।

কে জানে সত্যেনের কি হয়, বলা নেই কওয়া নেই কট্ করে' আসন ছেড়ে উঠে পড়ে উন্মত্তের মত দরজার দিকে এগিয়ে যায়। পাশের ভদ্রলোক হা-হা করে ওঠেন: একি এখানে নামছেন; আপনি তো টালিগঞ্জে যাবেন! এখনো অনেক দেরি—

কোন দিকে সত্যেন চায় না, কোনো কথায় কান দেয় না। ডুবন্ত ব্যক্তির কুটি আঁকড়ানোর মত বাসের দড়িটা লক্ষ্য করে' পড়ি-কি-মরি করে' এগিয়ে যায়। তার খুশী, যেখানে ইচ্ছে সেখানে নামবে।

বাসটাও বুঝি তার পিছনে লেগেছে। দড়ি ধরে অমন করে' নাড়া দিতেও থামলো না, খোঁ ভরে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু আশ্চর্য, চারিদিক থেকে এত বাধাবিপত্তিতেও সত্যেন আর রাগ করলে না। কেমন যেন তার হাত-পা হারিয়ে গেছে—আর এক মুহূর্ত দেরি নয়। যেন ভূতে তাড়া করেছে ধরলো বলে।

বাধা না পেলে কিন্তু বাস থেকেই সত্যেন লাফিয়ে পড়তো। এত অহেতুক কৈফিয়ৎ বাণে জর্জরিত হ'তে হ'তো না। কি মশাই। কি মশাই? অমন ক'রছেন কেন? বাস থামতে দিন, পাগল নাকি।

কিন্তু রক্ষা, বাসটা মাত্র রাস্তায় থেমে গেল। বোঁটা খসা ফলের মত সত্যেন ঝুপ করে নেমে পড়ল।

তারপর নিশ্চেষ্টের মত খানিক দাঁড়িয়ে রইলো রাস্তায় হঠাৎ খুব আঘাত লেগে মানুষ যেমন হতচেতন হ'য়ে পড়ে তেমনি, কিসের জন্য সে এখানে নেমে পড়ল?

সরকারী বাস চোখের ওপর থেকে সরে গেছে। জনসমুদ্র মিলিয়ে গেছে। অচঞ্চল ট্রাফিক পুলিশের চোখ লাল।

সত্যেন ধীরে ধীরে পাঞ্জাবীর পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলে। বার কয়েক এধার-ওধার উচ্চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। না, দেখবার বা লক্ষ্য করবার কেউ নেই। সাইন বোর্ডের আলোগুলো সাক্ষী কেবল।

ডান হাতের বন্ধ মুঠোটা অনেকক্ষণ খুলতে পারলে না সত্যেন। স্থির দৃষ্টি কেমন যেন আবিল হয়ে উঠলো। এমনি করে নিজের সঙ্গে লুকোচুরি বুঝি চলে না রোজ... ছি, ছি।

ঝন্ ঝন্, টং করে' শব্দ হ'তে সত্যেন চমকে উঠলো। সারা দেহটা যেন তার কেঁপে উঠলো।

মুঠো কখন আলগা হ'য়ে গেছে। সামনের বাসটা ধরবে বলে' সত্যেন পা বাড়ালে।

পিছন থেকে পথচারী একজন চেঁচিয়ে বলে উঠলো, ও মশাই আপনার কি পড়ে গেল যে। শুনবেন, ও মশাই।

শুনলেও সত্যেন দৃক্‌পাত করলে না। বাসটাকে লক্ষ্য ক'রে মুঠো আল্‌গা হাতটা বাড়িয়ে দিলে হাণ্ডেলের দিকে।

তখনো লোকটা চেঁচাতে লাগল, আরে মশাই আপনার পয়সা পড়ে গেল যে!

বাসে উঠে ভিড়ের মধ্যে মিশে স্বস্তির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সত্যেন নিজের মনে বললে, বাক্ গে।

রাস্তার গাড়ি-ঘোড়ার ঐকতানিক শব্দের সঙ্গে অদ্ভুত একটা রহস্যময় শব্দ কিছুক্ষণ মিশে রইল। কয়েকটি দস্তা-তামা ধাতুখণ্ডের পতন-উদ্ভূত।

শবরী

[গল্প]

শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য

কলিকাতা। রাতের আকাশ নেমে এসেছে বড় বড় বাড়ীর মাথায়। ওপারে গড়ের মাঠের ফাঁকায় হাওয়া নিশ্বাস ছাড়ছে। এপারে বিরাট দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে থাকা বাড়ীগুলো শেষরাতের আবছা আঁধারের স্বপ্নে ধূসর। কলিকাতা ঘুমায় না, অসাড় প্রতীক্ষায় রাত জাগে। চোখে স্বপ্ন আছে, তন্দ্রা আছে, কিন্তু ঘুম নেই। রাতের অদাড়তায় অনুভব করা যায় তার মর্মমূলে অনাগত দিনের ঘুমন্ত অধীর প্রতীক্ষা। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রাত জাগছে!

ক্রমে রাত শেষ হয়ে আসে। ডিপো থেকে বেরিয়ে আসে দু' একখানা ট্রামগাড়ী। সবজী বোঝাই গাড়ী ঠেলে সবজিওয়ালা চলতে থাকে। সাড়া জেগে ওঠে। ফিকে আলোর আভাস পাওয়া যায়—ফিকে ধূসর রঙএ ঢাকা বাড়ীগুলো। তারপর হঠাৎ আলোর ঝলক লাগে তা'দের মাথায়। প্রভাত হয়ে আসে। জেগে ওঠে কর্মকোলাহল।

ডিপো থেকে ট্রাম বেরিয়ে আসে। অতি অভ্যস্ত পদে ধীর মন্থর পদক্ষেপে বেরিয়ে আসে সুমিত্রা। চুণ বালি খসে যাওয়া আগের আমলের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ী, এমন বাড়ী কালীঘাট এলাকায় দু' একখানা আজো দেখা যায়। একটু ইতস্তত: করে সুমিত্রা ট্রামের রাস্তায় নামে, ট্রাম আসতে ট্রামে উঠে বসে পড়ে. পাশের বাড়ীর জানালায় কেউ আছে কিনা দেখে নেয়। জানালায় দাঁড়িয়ে গোবিন্দ দেখে সুমিত্রাদি চলে গেল। জানালা থেকে সরে যায় সে।

সকাল ছ'টা থেকে বারোটা সুমিত্রার ডিউটি। সাতদিন পর পর ডিউটি বদলায়—সকাল, বিকেল, রাত। মধ্য কলিকাতার বড় হাসপাতালের নার্স সুমিত্রা। একই হাসপাতালে এতোদিন এক নাগাড়ে আর কোন নার্স কাজ করেনি। ছেলেবেলা থেকে গোবিন্দ দেখছে—অন্তত: ষষ্ঠর পনেরো তো দেখছেই।

সুমিত্রা নার্স। রোগী ঘাঁটে, রোগীর সেবা করে, কিন্তু রোগ তার হয় না। একদিন তাকে রোগে ভুগতে দেখেনি কেউ, একদিন কাজে কামাই করতে দেখেনি তাকে। ছেলেবেলা থেকে দেখছে গোবিন্দ. এতোটুকু পরিবর্তন দেখেনি সুমিত্রার। শ্যামলা মেয়ে. রোগা গড়ন, সুশ্রী চেহারা, দেহে অপূর্ব এক লাবণ্য, ভালো স্বাস্থ্য। আগেও যা দেখেছে আজো তাই দেখছে। যতোদূর মনে পড়ে আগে বয়স মনে হতো একুশ বাইশ, আজ এতো বছর পরে এখনও প্রায় তাই মনে হয়—বড় জোর পঁচিশ ছাব্বিশ বলা যেতে পারে। অদ্ভুত মনে হয় গোবিন্দের।

পাশাপাশি বাড়ী, বুদ্ধি হওয়া থেকে সুমিত্রাকে একই ভাবে দেখে আসছে গোবিন্দ। সুমিত্রার চোখে কম করেও দশ বারো বছরের ছোট সে। এই সুমিত্রাদি তার কাছে এক বিস্ময়। এতো বড় পরিবারের মাঝখানে থেকেও যেন সুমিত্রাদি একা. ওবাড়ীর সঙ্গে যাতায়াত আর ঘনিষ্ঠতা রয়েছে গোবিন্দদের। সুমিত্রা নিজে কথা বড় একটা বলেই না. সুমিত্রাকে নিয়ে অন্যদেরও বড় একটা আলাপ করতে গোবিন্দ শোনেনি। মনে হয় সকলে সমীহ করে চলে, দেখলে একটা সম্ভ্রমের ভাব জেগে ওঠে আপনা থেকেই।

বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই গোবিন্দের প্রচণ্ড কৌতূহল জাগিয়ে আসছে এই সুমিত্রাদি। অন্য সকলের মতো গোবিন্দও সুমিত্রাকে এড়িয়ে চলেছে চিরদিন। সুমিত্রার চোখের ওপর গোবিন্দ বড় হয়ে উঠেছে, সুমিত্রা গোবিন্দের এ কৌতূহলের কথা জানে। বহুদিন গোবিন্দকে লক্ষ্য করছে সুমিত্রা, দূর থেকে সে দেখছে।

সুমিত্রা যেন এক নিস্তরঙ্গ সাগর। গোবিন্দ সাহিত্য চর্চা করে, তার কথাবার্তায় ঝিলিক মারে সে পরিচয়। গোবিন্দ একদিন সুমিত্রাকে জিজ্ঞাসা করেছিল,—আচ্ছা

সুমিত্রাদি, সাহারে এতো যে ঢেউ উঠছে, তোমার মনে কোন ঢেউ এসে লাগে না ?

কথা শুনে কৌতুকে চেয়ে দেখেছিল সুমিত্রা, মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছিল,—লাগবে না কেন ভাই, ঢেউ ওঠে না। মনের তটভূমিতে বহু শুকিয়ে থাকা পিপাসার্ত ঢেউএর খবর মিলতে পারে—ঢেউ খেলানো এক বিরাট মরুভূমি।

উত্তর শুনে বিস্মিত হয়েছিল গোবিন্দ। কিন্তু বিস্ময়ের তার তখনো বাকি। বললো,—মানলাম তরঙ্গিত মরুভূমি। কিন্তু সে তো ধাঁ ধাঁ বালি, হাওয়ার ঢেউ !

এবার আর হাসলো না সুমিত্রা, উত্তর দিল,—বড়ো হাওয়া, ধাঁ ধাঁ বালিতেও দোলা তোলে।

গোবিন্দ না ধমে বললো,—হয়তো তোলে কিন্তু তাতে লাভ কি ? পিপাসা মেটাবার একবিন্দু জল তো আর মিলবে না মাথা খুঁড়লেও।

সুমিত্রা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল,—ওই দোলা তোলাই হাওয়ার লাভ। ভেতরে যে করুণা ধারা কন্ধ হয়ে বয়ে চলে সে তো আর বাইরে থেকে দেখা যায় না গোবিন্দ।

গোবিন্দ বললো,—তা'হলে মরুভূমিতেও তরল পদার্থ আছে ?

সুমিত্রা হাসলো,—আছে বই কি, ধারাও ছোটে।

সুমিত্রাকে ঠিক বুঝতে পারলো না গোবিন্দ। মনে মনে বললো,—ওয়েসিসও হয়তো আছে। কিন্তু কোথায় ? এ প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজে পেলো না সে। 'বড়ো হাওয়া' বলে কি বোঝাতে চায় সুমিত্রাদি ? বহু পিপাসার্ত ঢেউএর খবর মিলতে পারে ! খবর করবে কোথায় ?

সুমিত্রা যা বললো তার থেকে অদ্ভুত একটা কিছুর আভাস পাওয়া গেল ; কিন্তু কি তা একেবারেই বোঝা গেল না। এরপর রীতিমতো কৌতূহলী হয়ে উঠলো গোবিন্দ। পেছনে ইতিহাস একটা আছেই, সুমিত্রাদিকে কিসে এমন ক'রলো তাকে জানতে হবে। কিন্তু এ কৌতূহল মেটাবার সহজ কোন উপায় তার চোখে পড়লো না। তার এ অহেতুক কৌতূহলে হয়তো অবাক হবে সবাই, কে কি ভাববে কে জানে ! লজ্জায় কৌতূহল চেপে রাখলো সে। অথচ সুমিত্রার আর তার বয়সের পার্থক্যে সত্যি লজ্জিত হবার তার কোন কারণই নেই। বড়দি সুমিত্রাদির সমান বয়সী, হয়তো জানে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলবে না, হয়তো মনে মনে হাসবেই শুধু। তা'ছাড়া বড়দির যা মুখের ধার ! তার চেয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করা ঢের ভালো।

একদিন মাকে জিজ্ঞাসা করলো গোবিন্দ,—সুমিত্রাদির বিয়ে হয়নি মা ?

মা মাথা নাড়লেন,—না, ভয়ানক জেদী আর চাপা মেয়ে। বিয়ের ঠিক হয়েছিল কিন্তু করলে না। অথচ শুনেছি ওই ছেলেকেই না কি তার পছন্দ ছিল।

—কিন্তু কেন ? বিয়ে না করার কারণ একটা নিশ্চয় আছে।

—এ কৈফিয়তের উত্তর পাবার উপায় নেই গোবিন্দ ! ভয়ানক চাপা মেয়ে। কেউ কিছু বলতে পারবে না।

গোবিন্দ হতাশ হলো। শেষ পর্যন্ত ঠিক করলো সুমিত্রাদিকেই জিজ্ঞাসা করবে সে। আলাপ করা সহজ নয়, কি ভাবে আলাপ আরম্ভ করবে গোবিন্দ ঠিক করে উঠতে পারলো না। এদিকে সুমিত্রার দিকে নজর দেবার আর সময়ও হলো না তার। বন্ধুকে নিয়ে ব্যস্ত রইলো সে ক' দিন দিনরাত।

মেসে থেকে চাকরি করতো সে বন্ধুটি। বাড়ী গ্রামে, বউ আর এক মেয়ে আছে সেখানে। দেখবার কেউ নেই কলিকাতায়। সেদিন অফিস যাবে বলে তৈরী হয়েছে, হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। জ্ঞান ফিরে এলো না বহু চেষ্টাতেও। খবর পেয়ে ছুটে গেল গোবিন্দ।

মেসের পাসের ডাক্তারখানার ডাক্তার এলেন। জ্ঞান কিন্তু কিছুতেই ফিরে এলো না আর। ডাক্তার দেখলেন, হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলে চলে গেলেন তিনি।

সঙ্গে সঙ্গেই হাসপাতালে বন্ধুটিকে নিয়ে গেল গোবিন্দ, দেখে মাথা নাড়লেন ডাক্তারেরা। বহুদিনের পোষা রোগ, পাকস্থলীতে পুরানো ঘা। অপারেশন করতে হবে, প্রচুর রক্ত দিতে হবে রোগীকে।

গোবিন্দ নিজে রক্ত দিল। কুলালো না, কিনে এনে দিল ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে। অপারেশনের পরে জ্ঞান ফিরে এলো। ডাক্তারেরা আশা দিলেন, রোগী এবার বাঁচতেও পারে। এদিকে রোগীর আত্মীয়রাও দু'একজন এসে পৌঁছালেন। একটা সঙ্কটময় অবস্থা চলছে। রাত-বিরেতে কখন কি দরকার হয়। আত্মীয়দের থাকবার ব্যবস্থা হল হাসপাতালেই।

দু'দিন কাটলো। তৃতীয় দিনে শ্বাসকষ্ট দেখে অবাক হলেন সবাই। জল দেবার নিয়ম নেই, পিপাসাকাতর রোগী—পাশের বেডের রোগীর মুখ হাত বাড়িয়ে এনে খেয়ে নিয়েছে সে।

অক্সিজেন দেওয়া হল। রোগীর জ্ঞান কিন্তু আর ফিরে এলো না। রোগশয্যার পাশে গোবিন্দ একঠায় বসে আছে সেই সকাল থেকে। শেষ রাতে রোগী মারা গেল। মৃত-দেহের পাশে এক চেয়ারে গোবিন্দ বসে রইল চুপচাপ।

আশ্চর্য, এ তিন দিনে ডাক্তার-নার্স অনেক দেখেছে গোবিন্দ কিন্তু সুমিত্রাকে একবারও দেখতে পায়নি সে। সুমিত্রাদির কথা মনেই পড়েনি তার। অবশ্য এতো বড় হাসপাতালে কে কোথায় আছে বলা শক্ত, খুঁজে বের করাও অসম্ভব। মৃতদেহের পাশে গোবিন্দ বসে আছে, সুমিত্রা এসে ঢুকলো। রোগীর বিছানার পাশে বসে গোবিন্দকে বললো,—বাঁচাতে পারলে না গোবিন্দ, এ রোগী বাঁচবে না আমি জানতাম!

—তুমি জানতে সুমিত্রাদি?—কথা বলতে পেরে গোবিন্দ যেন বেঁচে গেল।

—ওর স্ত্রী আর মেয়ে এসেছে, বসিয়ে রেখেছি, বলে দিয়েছি সকালের আগে দেখা হবে না।—

কিছু বলবার আর সময় পেলো না গোবিন্দ। হঠাৎ একটা হৈ-চৈ শব্দ উঠলো—ছুটোছুটি—পায়ের শব্দ! মনে হলো অনেকে একসঙ্গে উপরে উঠছে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল সুমিত্রা। গোবিন্দ কিছু বুঝতে পারলো না।

অল্প পরেই সুমিত্রা নেমে এলো উপর থেকে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত: করলো, তারপর আবার ঘরে ঢুকে বিছানার পাশে গিয়ে বসলো সে।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল গোবিন্দ,—কি হয়েছে সুমিত্রাদি?

—শুনলাম কাপড় তুলতে গিয়ে চারতলার ছাদ থেকে সাবিত্রী পড়ে গেছে, গুঁড়ো হয়ে গেছে একেবারে। বড় ভালো মেয়ে ছিল।

—সাবিত্রী কে? নার্স?

মাথা নাড়লো সুমিত্রা।

—পড়লো কি করে?

—আমিও তো তাই ভাবছি। ছাদ থেকে এমনি পড়বার উপায় নেই। পড়বার জন্যে চেষ্টা করতে হয়েছে।

—কিন্তু কসরৎ করে পড়তে গেল কেন?

নি:সংশয় কণ্ঠে উত্তর দিল সুমিত্রা,—চারতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। এ কি করলো পোড়ারমুখী! বড় ভালো মেয়ে ছিল গোবিন্দ!

—আত্মহত্যা? আত্মহত্যা করতে যাবে কেন?

হাসলো সুমিত্রা কিন্তু কথায় বেশ ঝাঁজ প্রকাশ পেলো,—ব্যর্থ প্রেম! হয়তো কাউকে ভালোবেসেছিল, বিশ্বাস করেছিল কোন পুরুষকে! আরে, পুরুষমানুষকে বিশ্বাস করতে আছে? প্রেম তো ওদের ভারি, দুদিন মজা লুটে সরে দাঁড়ায়। এতোটা বয়স হলো এই সাধারণ কথাটা বুঝলিনে? বেশ হয়েছে মরেছে,—সুমিত্রা উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গোবিন্দ তর্ক করতে পারতো কিন্তু করলো না। সুমিত্রাকে এভাবে কথা বলতে সে শুনেনি কোনদিন। তার মনে হল, শুধু আলাপ করবার নয়—সুমিত্রাদিকে জানবার পথ সে দেখতে পেয়েছে। নিজের এ আবিষ্কারে মন ভরে উঠলো গোবিন্দর। আপাততঃ সদ্য বন্ধু-বিয়োগ-ব্যথা চাপা পড়ে গেল।

কয়েকদিন পরের কথা। সন্ধ্যার পর টেবিলের সামনে বসে সুমিত্রা সস্তা দামের পাতলা এক এক্সারসাইজ বইএ হিসেব লিখছে। গোবিন্দ এসে ঘরে ঢুকলো।

মুখ তুলে গোবিন্দকে দেখে নিল সুমিত্রা। এ কয়দিন

গোবিন্দের কথা তার মনেই ছিল না। সুমিত্রা জানে গোবিন্দ তার সম্বন্ধে ভাবে। কি ভাবে গোবিন্দ? কেন ভাবে!

খাতায় মনোযোগ রেখেই সুমিত্রা বললো.—কি খবর গোবিন্দ! বলো।

বলবার আগেই গোবিন্দ হেসে পড়েছে। বললো,—তোমার কাছেই এসেছি সুমিত্রাদি।

সুমিত্রা যেন বিস্মিত হয়েছে,—আমার কাছে? কেন বলো তো?

—অভয় দাও তো বলি।

—এবে একেবারে রূপকথার রাজপুত্রের ভূমিকা,—প্রশ্রয়ের সুরে বললো সুমিত্রা,—বেশ, বলো, অভয় দিলাম।

সুমিত্রার চোখের দিকে নজর রেখেছে গোবিন্দ, সে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা একটুও কমেছে বলে মনে হলো না। ঘরিয়া হয়ে উঠলো গোবিন্দ,—তুমি আমাকে কি ভাবো সুমিত্রাদি? ছেলেমানুষ!

—কিছুই ভাবিনে, ভাববার মতো কিছু আছে বলে মনে করিনে।

—যা ভাবো তা সত্যি নয়।

হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো সুমিত্রা.—কে বললে তোমাকে?

ভয় পেলো গোবিন্দ কিন্তু দমলো না। বললো.—এই বুঝি তোমার অভয় দেওয়ার নমুনা। তোমাকে আমি কতো ভয় আর ভক্তি করি যদি জানতে! তুমি কি সুমিত্রাদি?

গোবিন্দের দিকে চেয়ে সুমিত্রা মাথা নাড়লো,—আমি কি পরে বলছি, আগে তোমার কথা বলো! নির্ভোহ করবো আগে মোহ কাটুক।

গোবিন্দ দেখলো চোখের ভাব বদলেছে সুমিত্রার, সাহস পেলো সে। জিজ্ঞাসা করলো.—সেদিন তুমি এ রকম করে বললে কেন সুমিত্রাদি? গালাগাল দেওয়াটা কি—সত্যি পুরুষ জাতের ওপর এ রাগ কেন তোমার?

হেসে মাথা নাড়লো সুমিত্রা, বললো—নিরুপায় না হলে কেউ আত্মহত্যা করেনা গোবিন্দ! রাগই দেখলে, অভ্যাসের বহরটাও দেখতে পেলে। প্রেম যেন সলতের আগুন, একবার জ্বললো তো না পুড়িয়ে আর নিভবে না।

এ তার প্রশ্নের উত্তর কিনা ঠিক বুঝতে পারলো না গোবিন্দ। বুঝলো সুমিত্রাদি একটা কিছু বলতে চায়। সময় নষ্ট না করে সঙ্গে সঙ্গে সে বললো,—নিশ্চয় তুমি মেয়েদের কথা বলছো না সুমিত্রাদি?

হেসে উত্তর দিল সুমিত্রা,—মেয়েদের কথাই বলছি।

—তা' হলে তুমি সত্য বলছো না।

—মিথ্যে বলবো কোন দুঃখে বলো!

কি বলছে খেয়াল করলো না গোবিন্দ আর। এ সুযোগ হারালে চলবে না, বলতে হবে বলেই সে বলে চললো,—ঘরে বাইরে মেয়েদের প্রেমের নমুনা দেখছি না? তুমি যতো ছোট ভাবো ততো ছোটটি আর নেই সুমিত্রাদি! নমুনা দু'একটা শুনবে?

—শুনবো কেন? আমি মেয়ে, সবই আমার জানা। যা' দেখছো সেটা ইতিহাসের বিষয়বস্তু নয়—নিয়ম। আর আমি যা' বলছি সেটা নিয়মেরও বেশী। তাই বলে কোনটাই মেকি নয়। প্রথম প্রস্তুতি, দ্বিতীয় পূর্ণতা।

—মানে?—

মানে দুই-ই সত্য, তবে রকমফের আছে। যা দেখছো সেটা প্রকৃতির খেলা, কারো নিজের হাত নেই তাতে—মেয়েদের রক্তমাংসমজ্জায় এ প্রেম মিশে আছে। আর আমি বলছি মেয়েদের আত্মার গোপনে যা' জড়িয়ে আছে তার কথা। ক্ষেত্রবিশেষেই তার প্রকাশ, সকলে তার নাগাল পায় না। কিন্তু নাগাল পাবার ইচ্ছেই রূপ পায় তাদের বিশেষ প্রকৃতিতে। যে কোন ভাবেই হোক, একবার জ্বললে নিঃশেষে না পুড়িয়ে আর নিভবে না। বুঝলে গোবিন্দ কেন প্রেমকে সলতের আগুন বলেছি?

—স্পষ্ট হলো না সুমিত্রাদি!

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো সুমিত্রার চোখ। ইতস্তত: না করে বললো.—দাঁড়াও, স্পষ্ট করে বলছি। একটা বিশেষ ঘটনার

নমুনা দিই। ছেলেমেয়ে দু'জনেই আমার জানা। মনে করো রূপকথার রাজপুত্র আর রাজকন্যা—মেয়েটির নাম অশ্রুমতী আর ছেলেটির নাম দেবকুমার। ছেলে বেলা থেকে একসঙ্গে বড় হচ্ছে দু'জন, খেলার সাথী। রূপেগুণে দু'জনেই সমান। ক্রমে মেয়ের বয়স হলো এগারো আর ছেলের পনেরো। বুদ্ধি তখনো কাঁপসা, বুঝলেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে না সব। দু'জনেই দু'জনকে ভালোবাসে। অশ্রুমতীর ভারি ইচ্ছে দেবকুমারের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। দেবকুমার কিন্তু এসব ব্যাপারে তখন সম্পূর্ণ উদাসীন। অশ্রুমতীকে তার ভালো লাগে, এই পর্যন্ত, এর বেশী নয়।

একদিন বিকেল বেলা। অশ্রুমতী বসে বঁটি দিয়ে পেন্সিল কাটছে। পেন্সিল ক্রমেই ছোট হচ্ছে, কাটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না কোনমতেই। দেবকুমার গিয়ে পাশে বসলো, দেবকুমারের কথাই তখন ভাবছিল সে। পেন্সিল কাটা বন্ধ রেখে অশ্রুমতী বললো,—তোমার কথাই ভাবছিলাম আমি। তোমাকে আমি বিয়ে করবো,—কেমন রাজী?

মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দিলো দেবকুমার,—ইস্, তোমাকে বিয়ে করতে আমার বয়ে গেছে।

অশ্রুমতী চটলো,—আমাকে বিয়ে করবে না?

—না।

—বলো করবে?

—না।

ভয় দেখালো অশ্রুমতী, সিক্ত হয়ে উঠলো তার চোখ মুখ,—রাজী হও বলছি, নইলে এই বটি দিয়ে আমি আমার বাঁ হাত কেটে দেবো!—অশ্রুমতী ডান হাতে বঁটি তুলে নিল।

—তোমার হাত কাটবে, তাতে আমার কি? কাটো না দেখি!

—তোমার কিছু নয়?—নিমেষে ডান হাতে বটি তুলে নিজের বাঁহাতের ওপর গায়ের জোরে কোপ দিল অশ্রুমতী।

চোখের পলক পড়বার আগে দেবকুমার নিজের ডান হাত বাড়িয়ে দিল। বঁটির সম্পূর্ণ কোপ পড়ল দেবকুমারের হাতে। বঁটির ধারাল মাথার ঘায়ে অশ্রুমতীর বাঁ হাতের কব্জে আঙুল আলগা হয়ে উড়ে গিয়ে ঠিকরে পড়লো মেঝের ওপর। দেবকুমারের হাতও কেটে গেল অনেক খানি। রক্তের ফিনকি ছুটলো। লোক জড়ো হবার আগেই কাটা হাত নিয়ে সে বাড়ী থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল দেবকুমার। কেউ জানতে পারলো না কিছু।

সুমিত্রা থামলো। বিস্মিত গোবিন্দ প্রশ্ন করলো,—তারপর?

—তারপর।—সুমিত্রা বলে চললো,—সেই যে বেরিয়ে গেল দেবকুমার আর ফিরে আসেনি। কতো ভাবের লোক এসেছে গেছে, দেবকুমারের সেই শূন্য আসনে কাউকে বসাতে পারেনি অশ্রুমতী। যাকে চেয়েছিল সে পেলে না, আর যারা তাকে চেয়েছিল তাদের গ্রহণ করতে পারলো না। আজ পঁচিশ বছর দেবকুমারের জন্যে অশ্রুমতী প্রতীক্ষা করে আছে—দিন গুনছে আজ পঁচিশ বছর।

গোবিন্দ যেন ঠিক বুঝতে পারছে না, বললো, আজ পঁচিশ বছর? এ যে সর্বনাশী প্রতীক্ষা সুমিত্রাদি—শবরীর প্রতীক্ষা।

হেসে উঠে দাঁড়ালো সুমিত্রা,—মহাকবির রামরাজত্বে এক শবরী ছিল, তেমন শবরী আজো আছে। তোমরা কেউ মহাকবি নও। বাইরে থেকে মানুষকে দেখতে পাওয়া যায় না গোবিন্দ, অন্তর দিয়ে মানুষকে দেখতে শেখো।

বলতে বলতে টেবিলের ওপর সুমিত্রা অনমনে নিজের বাঁহাত রাখলো। বিস্মিত হলো গোবিন্দ। এই প্রথম তার নজরে পড়লো সুমিত্রার বাঁ হাতের কব্জে আঙুল নেই।

সংসারে অনেক কিছু ঘটে যা বৈজ্ঞানিকের ব্যাখ্যার অতীত, বস্তুবাদী বিজ্ঞানীরও গবেষণার পাল্লার বাইরে। এসব অলৌকিক ঘটনাকে শুধু বিশ্বাসী মন নিয়ে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই।

ভূত প্রেতের সংস্কার আর দশটি বালকের মতো যথাকালে আমার মনেও বাসা বেঁধেছিল। তারপর শিকারী-জীবনে রাত-বেরাতে অনেক ভূতুড়ে জায়গায় গিয়েছি, ভূতের সাক্ষাৎ পাইনি। যখন অতিলৌকিক শিকার বহু প্রতীক্ষার পরও দিত না, তখন বিরক্ত হয়ে একটা ভূত-প্রেতেরও আবির্ভাব কামনা করেছি। কিন্তু তা-ও কোনদিন সফল হয় নি। তখন এই সিদ্ধান্তই করেছিলাম বলিষ্ঠ মন ভূত-দর্শনের উপযোগী নয়। বালকদের দৌর্বল্য সংস্কারে মনকে তন্ত্র হিসাবে অবস্থান করলেও কোনদিন তা আমার স্নায়ুপুঞ্জের ওপর আধিপত্য করবার সুযোগ পায় নি।

পুনিয়ায় নল-খাগড়ার বনের ধারে সারা রাত মাচানে কাটিয়েছি—একা; অবশ্য বন্দুক থাকতো, কিন্তু ভূতের বিরুদ্ধে ওসব একেবারেই অর্থহীন। আসামের জঙ্গলে, তরাই-এতে পাহাড়ের সানুদেশে, জলপাইগুড়ির নিবিড় বনে শিকারের অভিজ্ঞতা আমার আছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে গাছের ফাঁকে ফাঁকে শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদ যখন উঁকি-ঝুঁকি মারত, তখন বন হয়ে উঠত রহস্যময়, কিন্তু তাতে কোন ভয়ের বীজ লুকিয়ে আছে বলে কোন রাতে কল্পনাও করিনি। সত্যি কথা বলতে কি, জঙ্গলে উত্তেজনার শিহরণ অনুভব করেছি, কিন্তু ভয়ে গা-ছম-ছম করেনি। আমার ভণিতার উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, আমি যে একজন নির্ভীক বীর-পুরুষ পাঠককে শুধু তাই সমঝিয়ে দেওয়া। আমার এই মানসিক প্রতিচ্ছবিটিই হল আমার বর্তমান কাহিনীর পটভূমিকা। এই ভূমিকাটুকু বাদ দিলে আমি আজও যে বিরাট এক প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে রয়েছি, পাঠকবৃন্দ তার যথার্থ গ্রহণে অসমর্থ হবেন। এ জন্যেই আমার সাহস সম্বন্ধীয় ভণিতাকে কেউ অহমিকার দৃষ্টান্ত বলে ধরে নেবেন না।

একবার কার্যব্যপদেশে জলপাইগুড়ির কাছে এক চা-বাগানে গিয়েছিলাম। আমার বন্ধু মহামহিমান্বিত বড়বাবু আমাকে দর্শনমাত্রই বললেন, ওহে, শিকারী-প্রবর, ভাল সময় মতো এসে পড়েছ। তোমার ভাগ্যকে অভিনন্দন জানাবার মতো ভাষা আমার নেই।

আমি কৌতূহল চেপে রেখে গম্ভীর কণ্ঠে বললাম, জরুরী কাজে এসেছি। হাতে সময় মাত্র একদিন। বাক্য-বাহুল্য শোনবার সময় নেই। তোমার বক্তব্য চট ক'রে বলে ফেল।

বড়বাবু বললেন, তোমার ভর সইছে না। তবে শোন। ওই পুব-কোণার চা-বাগিচাটার ওপাশে বড় যে টিলাটা দেখা যাচ্ছে তার চার ফার্লং দূরে জঙ্গলের কাছে একটা নালা আছে। সেই নালার ধারে আজই শেষ রাত্রে একটা গরু মারা পড়েছে।

—ওঃ, বেশ ভালো কথা। তা ব্যাঘ্র মহারাজের কবে থেকে এ তল্লাটে শুভাগমন হয়েছে?

—সপ্তাহখানেক। এদিকে বড় সাহেব আবার বাগানে নেই। বাঘ মারে কে? কুলী আর আশেপাশের বস্তীতে ত্রাহি ত্রাহি রব পড়ে গেছে। ইতিমধ্যেই তিনচারটি গরু মোষ বাঘের পেটে আশ্রয় পেয়েছে।

আমি বললাম, কুছ পরোয়া নাই। আমার সঙ্গে এক-জন লোক দিতে হবে।

বড়বাবু বললেন, বড় সাহেবের বুড়ো আর্দালি রহমত তোমার সঙ্গে থাকবে। বড় সাহেবের সঙ্গে অনেক শিকারে গিয়েছে, ভারী অভিজ্ঞ লোক।

আমার চির-বিশ্বস্ত ৪০০-বোর এক্সপ্রেস রাইফেলটি সঙ্গেই আছে। বাঘ শিকারের জন্যে মন তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠল। আজ রাত্রেই ওর ভবলীলা সাঙ্গ করতে হবে। কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার সময় নেই। শিকারীর আগমন সংবাদ পেয়ে জনসাধারণও আশ্বস্ত হয়েছে।

শীতের বিকেল দেখতে দেখতে গড়িয়ে এল। বেলা তিনটে নাগাদ রহমতকে নিয়ে আমি রওনা হলাম। সঙ্গে যথেষ্ট গরম কাপড় চোপড় ও কম্বল। দরকার হলে সারা রাত থাকতে হবে।

একদল কুলী আগেই বাঁশ, দড়ি, কুড়াল ইত্যাদি মাচান বাঁধার উপকরণ নিয়ে যাত্রা করেছিল। নালা থেকে প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটা শক্ত জাম গাছে তারা মাচান বেঁধে ফেলেছে।

মাটি থেকে প্রায় বিশ ফিট ওপরে কাণ্ড থেকে ডাল-পালা বেরিয়েছে। কুলীরা ডালে ডালে আড়াআড়িভাবে বাঁশ বিছিয়ে এবং ডালের সঙ্গে সেগুলি বেশ শক্ত করে বেঁধে তার ওপর বড়সড় একটা চারপায় রেখে দিয়েছে। তারপর সেই বুকনীতের সামনে পাতাশুদ্ধ কয়েকটি ডাল-পালাও ঝুলিয়ে দিল পরদা হিসেবে। মাচানটি সর্বাঙ্গ-সুন্দরই হল। রাত কাটাতে কোন অসুবিধা হবে না।

'মরী' দেখবার জন্যে আমি ও রহমত খালটার ধারে গেলাম। খালে জল নেই, বালুকা-গর্ভের ওপর নিহত গাভীর মৃতদেহ। চিল-শকুনির আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্যে মৃতদেহটি ডালপালা দিয়ে ঢাকা আর মৃত গাভীর পেট চিরে নাড়ি-ভুঁড়িও বের করা। বাঘটি যে পাকা কসাই সন্দেহ নেই। হত্যা করার পর শিকারের সদ্গতি করার আর ফুরসৎ পায়নি। বালুর ওপর পাঞ্জার দাগও দেখলাম। বাঘের পাঞ্জা।

বাঘ সন্ধ্যার আগেই ভোজন-পর্ব সমাধা করতে আসবে অনুমান করলাম। বাঘ অতি সন্দিগ্ধ জানোয়ার। মরীর পারিপার্শ্বিক অবস্থা যথাপূর্বং না থাকলে মরীর কাছেও সে ঘেঁষবে না, লোভ সম্বরণ করে প্রস্থান করবে। কোথাও এতটুকু শব্দ হলে তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান! চরম নৈঃশব্দ আর অসাধারণ সতর্কতা হল ব্যাঘ্র-শিকারের গোড়ার কথা, লক্ষ্য-ভেদ নৈপুণ্য তার পর!

মরীর কাছ থেকে আমরা মাচানে এসে উঠলাম। বাটিয়া বেশ আরামদায়ক বোধ হওয়ায় সঙ্গের কম্বলগুলি কুলিদের হাতে দিয়ে দিলাম। মিছিমিছি বোঝা বাড়িয়ে লাভ নেই। চায়ের ফ্লাস্কটা একটা ডালে ঝুলিয়ে রাখলাম, বিস্কুটের টিনটাও রইল হাতের কাছে।

কুলীরা ফিরে গেল। আমি আর রহমত সারা রাতের মত আসন নিলাম। আমাদের আশ্রয়দাতা গাছটি মরী থেকে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে। সূর্যের শেষ রশ্মি লেগে বালির ওপর চিকচিক করছে মৃতদেহটা। মৃতদেহটা এতক্ষণে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে। আমাদের ডান দিকে একটা ঝোপ; ঝোপ ছাড়িয়ে নালার ওপারে নিবিড় বন ঝোপ আর ওপারের বনের মধ্যে একটা প্রশস্ত ফাঁকা জায়গা।

যতক্ষণ সূর্যের আলো ছিল, মরীর দিকে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে রইলাম। ক্রমে নালার ওপারের বৃক্ষকুলের

হাওয়া দীর্ঘতর হতে হতে এক সময়ে সন্ধ্যার আঁধারে মিলিয়ে গেল। সারা দিন নিস্তব্ধ পর বনভূমি জেগে উঠতে আরম্ভ করেছে। আমাদের সামনে কয়েকটা গাছে একদল বাঁদরের কিচির-মিচির শুরু হল, একটা পেচক তীক্ষ্ণ রবে রাত্রির আগমন ঘোষণা করে গেল। আমাদের গাছের নীচেও অন্ধকার গাঢ়তর হয়ে উঠল। মরীটাও ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। আবছা অন্ধকারে বাঘের আবির্ভাব হলে গুলী ফস্কাবার ভয়ে কিছু শঙ্কিত হলাম।

আধ ঘণ্টা কেটে গেল চুপচাপ। বাঘের দেখা নেই। তবে ইতিমধ্যে আমাকে আশ্বস্ত করে আকাশে চাঁদ উঠল। গাছের ফাঁকে ফাঁকে চন্দ্রালোকের মায়া রচিত হল, খালের বালুকা-রাশি রূপোর মত স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। জ্যোৎস্না-লোকে মরী স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বাঘ এলে তাকে পরিষ্কার দেখা যাবে।

হঠাৎ বাঁদরগুলি তারস্বরে মহা কলরব জুড়ে দিল। স্পষ্ট বোঝা গেল ওরা কিছু দেখেছে। হয়তো বাঘই। রহমত আমার জামার হাতা ধরে টান দিল। তার দীর্ঘ ও পেঁয়াজের ঝাঁঝালো গন্ধযুক্ত দাড়ি আমার প্রায় গালে ঘুলিয়ে সে ফিস্ ফিস্ করে কিছু বলল। কিন্তু আমাকে সতর্ক করবার প্রয়োজন নেই। আমি রাইফেলটা তাক করে প্রস্তুত হয়ে বসলাম। চারদিকে ডালপালার মধ্যে রাইফেল নাড়াচাড়া করা বড্ড কঠিন কাজ। এতটুকু শব্দ হলেও বাঘ পালাবে।

কিন্তু বাঘ এল না। বাঘ যে সন্দিগ্ধ হয়েছে সন্দেহ নেই! তবে সে যে কোন না কোন সময়ে আসবেই তা-ও ধরে রাখা যেতে পারে। বাঁদরগুলো গোলমাল করতে থাকলে কী করেই বা সে আসে।

বাঘের আশু আগমনের সম্ভাবনা নেই দেখে বন্দুকটা নামিয়ে রাখলাম। ইতিমধ্যে চারপাই-এর দড়িগুলো ছুরির ফলার মত শরীরে বিঁধতে আরম্ভ করেছে। কম্বল-গুলি থাকলে তা বিছিয়ে আরাম পাওয়া যেত। কম্বলগুলি ফিরিয়ে দেওয়ায় এখন আফ্‌শোষ হতে লাগল। রহমতেরও সেই অবস্থা। সে বেচারীও অস্বস্তি বোধ করছে।

রাত্রি নিবিড় হতে লাগল। চাঁদ ক্রমেই ঊর্ধাকাশে উঠছে। বিস্কুটের টিনটা খুলে দু চারটা বিস্কুট খাওয়া গেল। বিস্কুটের পাতলা কাগজের মৃদু মচমচ শব্দও যেন বনের অন্তহীন নিস্তব্ধতার মধ্যে ঝঞ্ঝনাদের মত মনে হল। রহমত একটু গল্প ফাঁদবার প্রয়াস করেছিল, ইঙ্গিতে তাকে নিরস্ত করলাম।

আমি ও রহমত দুজনেই বিস্ফারিত চোখে মরীর দিকে একাগ্র হয়ে রইলাম। কিন্তু ক্রমে আমার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসতে লাগল, মাথা চিবুকের নীচে ঝুঁকে পড়তে লাগল। ট্রেনে আসতেও ক্লান্তি হয়েছিল। ঘুম আমার সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়তে লাগল।

রহমত কানে কানে বলল, বাবু ঘুমাইয়া পড়েন। আমি নজর রাখমু।

আমি আরও কতক্ষণ মরীর দিকে তাকিয়ে শেষে জেগে থাকার সংগ্রামে নিরস্ত হলাম। চার পাইয়ের অনাবৃত দড়ি শয্যার উপরে পড়লাম।

কতক্ষণ নিদ্রাভিভূত ছিলাম বলতে পারি না। হঠাৎ ঘুমের মধ্যে টের পেলাম কেউ আমার বাহু ধরে টানছে, জোরে ধাক্কা দিচ্ছে। প্রথম প্রথম আমি তা গ্রাহ্যই করি নি। স্খলিত নিদ্রাকে আবার জোড়া দিতে চেষ্টা করতে লাগলাম। ঘুমের মধ্যে চেতনা বিলুপ্ত হতেই আবার শরীরে প্রবল ঝাঁকুনি, বার বার। শেষ পর্যন্ত ঘুম ভেঙে আমাকে উঠতে হল। স্থান কাল এবং মাচান বাসের উদ্দেশ্য মনে পড়ল।

রহমতের দিকে চেয়ে দেখলাম দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে সে অঘোরে নিদ্রা যাচ্ছে। মাথা তুলে মাচানের সামনে পাতার পরদার ভেতর দিয়ে যা দেখলাম তাতে চক্ষু স্থির। মন্থর পদে রাজকীয় চালে বাঘ মরীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। জ্যোৎস্নায় তার গায়ের হলদে ডোরা স্পষ্ট। নিঃ-সন্দিগ্ধ অভিসার।

আমি রহমতের হাত ধরে ঠেলা দিলাম, কিন্তু সে জাগল না। শব্দ হবার ভয়ে রহমতকে আর তুলবার চেষ্টা করলাম না। আমি নিঃশব্দে রাইফেল তুলে লক্ষ্য স্থির করলাম, তারপর ট্রিগার টিপলাম।

এক ঝলক আগুনের সঙ্গে প্রচণ্ড আওয়াজ হল। মুহূর্তের জন্য আমার চোখ ঝলসে গেল। গুলী ঠিক লেগেছে তো? পর মুহূর্তেই দেখলাম বাঘ শূন্যে একবার লাফ দিয়ে বালুর উপর দিয়ে জঙ্গলের দিকে দৌড় দিল।

বন্দুকের আওয়াজে রহমত ধড়মড় করে জেগে উঠল। দু'চোখ রগড়ে জিজ্ঞাসা করলে, বাবু কি হইল? বাঘ মারা পড়ছে না কি?

—হাঁ, ঐ দেখ। (জঙ্গলের কিনারে বাঘ স্থির হয়ে পড়ে আছে)।

রহমত চেয়ে দেখল, তারপর আবার চোখ বুজল।

রহমত তাহলে আমাকে জাগায়নি। সত্যি সত্যিই সে ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল।

তবে কে আমাকে জাগাল? কে আমাকে ক্রমাগত ধাক্কা দিল? ভূত? আমার মনের ভ্রান্তি? নিংবা কোন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়?

শুক্ল রজনী কোন উত্তর দিতে পারল না। বাকী রা-আমার আর ঘুম হল না। মনের মধ্যে শুধু তোলপাড় হতে লাগল কে আমার ঘুম ভেঙে দিল? কে সে সুহৃদ?

রাত্রি প্রভাত হল। কিন্তু গত রজনীর ঘটনাকে নিশার স্বপন বলে উড়িয়ে দিতে পারলাম না।

দেবেশের জর্দা
স্বাদে ও গন্ধে
মনে এনে দেয়
আনন্দ।

১, হ্যারিসন রোড
কলিকাতা

এস.সি.সরকার
এণ্ড কোং
স্বর্ণশিল্পী ও মণিকার
১২৫ বি.বহুবাজার ষ্ট্রীট-কলিকাতা ১২

ফোন।
৩৪-২৪০৩

শাখা
১৬৭-বি.বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২

[পরিচালনা : শ্রীঅনিলেন্দ্র চৌধুরী]

আলোর আশীষ

আশ্বিনে আজ সোনার আলো রঙ ছড়ালো মনে,
জাগল বকুল পলাশ-পারুল শিউলি-কাশের বনে।
দোয়েল-শ্যামা তান ধরেছে :—
মৌমাছি তাই গুণগুণিয়ে
আলোর বাণী যায় শুনিয়ে :—
'দিন ফুরালো ঘুমিয়ে-থাকার নূতন জাগার ক্ষণে,
পৌঁছল আজ সকল ঘরের
কোণে।'
এর তরিয়ে ছুটছে নদী ছাপিয়ে কূলে কূলে,
ডাকছে সবায়, 'আয় ছুটে আয় আয়রে পরাণ
খুলে!'
'নবীন দিনের ডাক পড়েছে
খুশীর হাওয়ায় মায়ের আঁচল ভরছে ফুলে ফুলে,
করছে শিশির ঘাসের বুকে মায়ের এলোচুলে!'
তোমরা আছ যে যেখানে সবাই শোন ডাক,
আজকে আলোর পুলক যত সবার ঘরে থাক!
এই 'জগৎ'-এর সুরে সুরে
বাজুক্ বাঁশী অনেক দূরে
ভরুক্ হাসি, সোনার হাসি—দুঃখ-ব্যথা থাক্,
আলোর আশীষ আজকে সবাই সমান করেই পাক।

বাগানে

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পুরোনো বাগানের বুড়ো মালী সকালে সন্ধ্যায় কাজে লেগেই থাকে—বাগানের কাজে, বাড়িঘরের কাজে। ফল ধরাতে, ফুল ফোটাতে ওস্তাদ সে মালী। মালীর হাতের বাগানখানি রঙিন ফুলে সবুজ পাতায় রসালো ফলে ভরাই থাকে ছয় ঋতু, বারো মাস।

সে কত কী স্বপ্ন—রঙের স্বপ্ন, রসের স্বপ্ন, আলোর স্বপ্ন ছায়ার স্বপ্ন দিয়ে গড়া সেই বাগানের ভিতরেই বুড়ো মালির মাটির ঘর, সেখানে থাকে তার ফুটফুটে ছেলেটি—সে যেন আকাশের পানীটি খাঁচায় ধরা। সুন্দর বাগানে সেই সুন্দর বালক ঘোরে ফেরে হাসে কাঁদে খেলে। কেমন তা মনই জানে, সে মনই জানে, ও সে ওস্তাদ সেই বুড়ো মালীর পুরোনো বাগানই জানে।

ঝড় বাদলে সে একদিন ফুলে ফুলে ফুলন্ত এতটুকু একটি নতুন গাছের কচি ডাল ভিজে ঘাসে এলিয়ে পড়েছে—সে যেন অঘোরে ঘুমিয়ে আছে সবুজ কর্মাটি। একেই নিয়ে কথা বুড়োতে ছেলেতে।

বৃষ্টি থেমে ওঠা সকালের আকাশখানি; সোনালি রোদের স্পর্শে যেন পদ্মমধুর মত মিঠে, চন্দনবর্ণ। নতুন গাছের বাসিন্দা পাখী, বড়ে এলিয়ে পড়া কচি ডালে বসে আছে প্রজাপতি—সেও নড়েনা চড়েনা। পাখী প্রজাপতি দুজনেরই বাসা হারিয়ে দুঃখ বাজে।

এই সময় মালীর ঘরের দরজা খোলে। একটুখানি শঙ্ক নিয়ে বার হয় মালিনী—ফুলের খোঁজে চায় এধার ওধার। দেখে ফুলপাতের ঝাড় ছেলে পড়া। ছেলেকে ডেকে বলে—একে তুলে দে মাচানে।

[শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

ছেলে তুলে ধরতে চায় গাছ, পারে না। ফুলগাছ যেন ঘুম ঘোরে চুলে চুলে পড়তেই চায়। ছেলে দুই হাতে গাছকে জড়িয়ে ধরে বলে—ওঠো, ওঠো! গাছ বলে—না, না, ঘুম-ঘুম করে আমার পাতা।

এতে ওতে জড়াজড়ি—ডালে পালায় ফুলে পাতায় আর ছেলেতে মিলে ঝিলিমিলি খেলা। এর চোখের আলো ওর শিশির ভেজা ফুলের রঙে মিশে যায়। ফুলগাছ আপনার বোঝা নিয়ে ছেলের কাঁধে সেই ভর—ফুলে ফুলে ফুলন্ত ভার—ঘুমে ঘুমে ঘুমন্ত পাতার ভরে থোওয়া সবুজ রঙের ভার। ছেলের মুখে তার বইতে আনন্দ, বুকে তার সইতে বেদনা। আলো ছায়া এরি উপর ঝিলিমিলি ঢেউ খেলে চলে।

দুয়োরে দাঁড়িয়ে মালিনী দেখে
বাগানে দুই মায়ের দুই ছেলেতে খেলা।
মা, ঘরের ছেলে বাইরের ছেলে, দুয়ে
লুটোপুটি খেলা আঙিনায়, রৌদ্রে ছায়ায়,
মাটির উপরে।

মালিনী চলে রাতে করে পড়া ফুলে ফুলে সাজি ভরে নিতে। মালী বার ছয় বাগানের তলাতেকে কাটারি বাঁশ দড়ির সোজা হাতে। ছেলে-খেলা খেমে যায়—কাজ সুরু হয় বাগান পরিষ্কারের। ছোটো ছেলের হাতেও ওঠে খোন্তা। ছেলেকে বলে মালী—উপড়ে ফেল ওটাকে, গাছটা মরেছে। ভেঙে-পড়া ফুলগাছের গোড়ায় গোড়ায় পড়ে তখন ক্ষুর-ধার অস্ত্র বিদ্যুতের সমান—ছোট হাতের তালে তালে। উপড়ে ফেলে গাছ মালী।

খুকুর মেলা ঘর

অখিল নিয়োগী (স্বপনবুড়ো)

সত্যি বলছি, ছোটমামাটা একেবারে হাবা। আমার খেলাঘরের কোনো ব্যাপার যদি ও বোঝে।

'কেমন হাসি' সইটের ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের আজ বিয়ে। কাল রাত্তিরে বসে সাজাচ্ছিলাম। হঠাৎ হাত থেকে পড়ে একটা ভাঙই গেল ভেঙে। বল্লাম, ছোট-মামা শীগ্‌গির একটা পুতুল এনে দাও, ভাঙা হাতওয়ালা কনের কি করে বিয়ে হবে?

বলে কি তোমরা শুনবে?

ছোটমামা বলে, আমার ল্যাবরেটারীতে নিয়ে আয় ভাঙা হাত জুড়ে দিচ্ছি। যত অলুক্ষণে কথা। ভাঙা কনের বিয়ে হলে একটা অমঙ্গল হবে না?

আচ্ছা, ঠাকুমা যা বোঝে—ছোটমামা তা বোঝে না? ভাগ্যিস্, পুতুলওয়ালা এসে পড়েছিল, তাই কোনো রকমে মুখ রক্ষে হ'ল।

মেয়ের বিয়ে, এতগুলো লোককে নেমন্তন্ন করেছি··· পল্টা, মিন্টু, ভাবলা, টুনী, নেপলা, কানু, সন্তু, তার ভুলো কুকুর, গণেশের বেড়াল, মিন্টুর টিয়া, যজ্ঞি ব্যাপার বলতে পারো তোমরা। লুচির ব্যবস্থা কর্তে হবে ত? সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে সেই কাজেই লেগে পড়েছিলাম। সারারাত একেবারে দু' চোখের পাতা ভরে এক কর্তে পারি নি।

অনেকগুলো লুচি ভেজিয়ে এনেছি, এমন সময় রাঙা-কাকা এসে বল্লে,—খুকু, সকাল বেলা কাঁঠাল পাতা কুড়োচ্ছিস্ কেন?

আচ্ছা, এই কথা শুনলে কার রাগ না হয় বলো? কে ওকে বুঝিয়ে দেবে যে ওগুলো কাঁঠালপাতা নয়...লুচি?

বড়দের এত কম বুদ্ধি কেন হয় তাই শুধু ভাবি। তারপর তোমরাই বলো না, এত বড় মেয়ন্তন্ন বাড়ীতে কি কেবল লুচি হ'লেই চলে? কুটুম-বাড়ী নিন্দে হবে না? বিশেষ না হয় ঠাকুমাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো।

তাইত দুপুর বেলা বসে আপন মনে পায়েস রান্না করছি...হঠাৎ ওপর থেকে সেজদা চীৎকার করে উঠলেন, ওরে খুকি, ঘটি ঘটি জল ঢেলে উঠোনে কাদা তৈরী করছিস্ কেন? শীগ্‌গির উঠে আয়—

আমি হাসবো কি কাঁদবো বুঝতে পারিনে—এটা যে কাদা নয়—পায়েস···সে কথাও কি সেজদা বুঝতে পারে না - যে কথা মিনু বুঝতে পারে, টুনী বুঝতে পারে—এমন কি সন্তুর ভুলো কুকুরটাও যে কথা জানে, সেজদার মগজে কি কিছুতেই সে কথা ঢোকে না? তোমরাই বলো!

তারপর বিপদ কি আমার কম? মাসীমার বেনারসী সাড়ী—

দেরাজের মধ্যে ত পড়েই ছিল! মাসীমা ত সে সাড়ী আর পরে না! খানিকটা না হয় কাঁচি দিয়ে কেটেই নিয়েছি কনের জন্যে—তাই বলে বাড়ী শুদ্ধ লোকের হুলুস্থুল করবার এত কি কাণ্ড ঘটেছে? এই ত গত বছর বন্যার সময় কত লোককে কত কাপড়-জামা-সাড়ী দিলে তোমরা—আমি টুঁ শব্দটি করেছি? আজ যখন আমার মেয়ের বিয়ের জন্যে সাড়ীর একটুখানি শুধু কেটে নিয়েছি —অমনি পৃথিবী রসাতলে গেল?

তোমরাই বলো...একে 'এক চোখোমী' বলে না? তারপর ধরো দিদির সিল্কার মেদিনের ডালাটা···অমনি ঘরের কোণে পড়ে আছে কতকাল। কেউ হাত দিয়ে দেখেনা...ধুলোও ঝাড়েনা···

আমি সন্তুকে ডেকে যেই ওটা কেটে কুটে আর কাঠ লাগিয়ে বর আসনার পাখী তৈরী করিয়েছি অমনি সকলের মাথার টনক্ নড়ে উঠ্‌ল।

ওকি...তোমরা মুখ টিপে টিপে হাসছ যে?

ঝুন্ ঝুন্ মিষ্টি ছড়া

মৌমাছি

ছাগলছানা, ছাগলছানা
খাসনিয়ে ঘাস করছে মানা
ঘাস চেটেছে ফড়িং, পোকা
এঁটো ওঘাস খাস্‌নি বোকা,
ভাল্ লাগেনা তুসি চানা ?
বেশ ! খাওয়াবো ঘুষ্‌নি দানা !

উগ্‌ড়ি মুগ্‌ড়ি মুগের ডাল
এঁটো সগ্‌ড়ি শুগ্‌লি-কাল
দখলের দই অম্বলে উচ্ছে
বড্ডই আজ খাবার ইচ্ছে।

কুল্ কুলুটি দোদল চাঁপা
তলুতা বাঁশের পেটটা কাঁপা
কাঁপা বাঁশের ফুটোয় সুর
বাজয়ে বাঁশি ভুর্ ভুর
ভেসে যা সেই অ—নে—ক দূর।

অং বং হং চং
শুক্তিফুলের হল্‌দি রঙ
হল্‌দি রঙে কাজল ছিটে
ফুল-ভাঁড়ারের মউটা মিঠে
মউ খাবি না খাঁদবি মালা ?
মৌমাছির হুল—উঃ কী জ্বালা !

আণবিক শক্তির কথা

মনোরম গুহঠাকুরতা

গেলো মহাযুদ্ধের শেষের দিকে জার্মানীর সে সময়কার সর্বাধিনায়ক হিটলার সারা দুনিয়ার মানুষকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁর হাতে এমন শক্তিশালী মারাত্মক অস্ত্র আছে, যা দিয়ে মুহূর্ত মধ্যে সমস্ত দুনিয়াকে তিনি ধ্বংস করে দিতে পারেন। কিন্তু হিটলার যতদিন ক্ষমতায় আসীন ছিলেন ততদিন তিনি তাঁর এই দম্ভোক্তির কোন প্রমাণ দিতে পারেন নি।

এরপর এক ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্রের কথা জানা গেলো ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট। সেদিন জাপানের হিরোশিমা বন্দরের উপর অ্যামেরিকানরা ফেললে 'অ্যাটম বোমা।' ভয়ঙ্কর ব্যাপার। অজস্র মানুষ সেখানে মরলো, ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট সব ধ্বংস হয়ে একেবারে ভঠ্‌নঠ্ হয়ে গেলো। চারদিকে উঠ্‌লো হাহাকার।

এ ধরণের অস্ত্র এর আগে আর কোন যুদ্ধেই ব্যবহার করা হয় নি। এর ধ্বংসাত্মক শক্তি দেখে ভয়ে মানুষ কাঁপতে লাগলো। কখন কোথায় কি ঘটে বলা যায় না।

এই অস্ত্রের কথা বলেই হয়ত পৌরুষ দেখিয়েছিলেন হিটলার, কিন্তু যে কারণেই হোক, এর ব্যবহার তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

যে পরম আণবিক শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে এই অস্ত্রটি এমন মারাত্মক ধ্বংসলীলা ঘটালো, শুধু কি এরকম ধ্বংস করবারই ক্ষমতা তার না আরও কিছু তার দ্বারা সম্ভব ?

এ একদিকে যেমন মানুষের অসম্ভব ক্ষতি করতে পারে, তেমনি, উপকারও মানুষের করতে পারে অসম্ভব।

এ বোমা হিরোশিমার পড়বার পর সেখানে এই আণবিক শক্তির সংস্পর্শে এসেও যারা বেঁচে রইলো তারা অনেকেই জীবনের মত পঙ্গু হয়ে গেলো, কেউ হারালো দৃষ্টিশক্তি, কারও চুল পেকে একদম সাদা হয়ে গেলো, কারও দাঁত পড়ে গেলো। এমনি সব অঘটন ঘটলো সেখানে। আর অন্যদিকে ধ্বংস নগরী হিরোশিমা হয়ে উঠ্‌লো ফলে ফুলে, শাক-সব্জী ও শস্যক্ষেত্রে সুশোভিত। এর জমির উর্বরাশক্তি বহু গুণে বেড়ে গেলো। এমনি অদ্ভুত দ্বিমুখী শক্তি এ জিনিসটির।

যে শক্তি দিয়ে ধ্বংস করা যায় তা মানুষের হিতে ব্যবহার করাই যে ভালো আজকের দিনে মানুষের মাথায় এ শুভ-বুদ্ধি ঢুকতে সুরু করেছে। কারণ বিগত মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলার রূপ আজও মানুষ ভুলতে পারেনি বা সহজে পারবেও না। পৃথিবীতে যে সব জাতি বিজ্ঞান অনুশীলনে অগ্রসর, আণবিক-শক্তিকে মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করবার জন্য তাঁরা ব্যাপকভাবে অনুশীলন আরম্ভ করেছেন সবাই। এসব প্রচেষ্টার যতটা ফল এখন পর্যন্ত জানা গেছে তাতে আলো জ্বালবার কাজে, রেলগাড়ী, জাহাজ, কলকারখানা প্রভৃতি চালাবার কাজে অর্থাৎ যেখানেই শক্তির প্রয়োজন সেখানেই আণবিক শক্তির ব্যবহার সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে।

জমির উর্বরা-শক্তি বাড়িয়ে ফসলের পরিমাণ বাড়ানো এবং রোগের চিকিৎসায় এই আণবিক শক্তির ব্যাপক ব্যবহার যাতে হতে পারে তার চেষ্টাও চলছে বিশেষভাবে। মস্তিষ্কের ক্যান্সার ইত্যাদির মত দুরারোগ্য ব্যাধিও এর সাহায্যে নিরাময় করা চল্‌বে বলে বিজ্ঞানীরা বলছেন। চিকিৎসার ব্যাপারে আণবিক শক্তি অসাধ্যসাধন করতে পারবে বলে মনে হয়। দেহের যে কোন অংশ রোগগ্রস্ত হলে এর সাহায্যে তা নির্ণয় করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা চলবে।

সম্প্রতি অ্যামেরিকায় আণবিক শক্তির সাহায্যে ঘড়ী তৈরীর একটি পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই ঘড়ী লক্ষ লক্ষ বছর চল্‌লেও এতে সময়ের তারতম্য কখনও ঘটবে না। চাবী দেওয়ারও প্রয়োজন হবে না।

আণবিক শক্তি মানুষের যে কি উপকার করবে ভবিষ্যতে, সে কথা বলে শেষ করা যাবে না। আবার অপব্যবহারের জন্য অনিষ্টও যে কত রকম করবে তা-ও হয়তো অন্তহীন। মাঝে মাঝে আণবিক বোমার পরীক্ষা চল্‌ছে নানা জায়গায়, একথা তোমরা অনেকেই হয়ত জানো। তার ফল যে কি বিষময় হয়েছে তা-ও তোমরা খবরের কাগজে হয়ত দেখে থাকবে। শুধু তাই নয় এটি প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম এবং ব্যবস্থারও বহু বিঘ্ন ঘটিয়াছে বলে বিজ্ঞানীরা বল্‌ছেন। সম্প্রতি নানাস্থানে যে অতিবৃষ্টি, বন্যা, অস্বাভাবিক গরম ইত্যাদি দেখা যাচ্ছে এ-ও প্রকৃতির ওপরে আণবিক শক্তির প্রতিক্রিয়া বলে বৈজ্ঞানীক মহলে কেউ কেউ অনুমান করেন।

আণবিক শক্তি কি করে সংগৃহীত হয় সে কথা বলতে হলে এমন অনেক কথা বলতে হবে যা হয়ত তোমরা এখন বুঝতে পারবে না। তবে সহজে একটা কথা তোমাদের বলছি। ইউরেনিয়াম নামক একপ্রকার পদার্থ থেকে এই জিনিষটি পাওয়া যায় নানা প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে। এক পাউণ্ড ইউরেনিয়ামের বিশ ভাগের এক ভাগ থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তা প্রায় এক শ' টন কয়লা থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তার সমান।

মানুষ যে যুগে প্রথম আগুনের ব্যবহার শিখেছিলো সেইদিনই প্রথম মানব-সভ্যতার ইতিহাসে রূপান্তর ঘটতে সুরু করে। তারপর এলো গ্যাস ও বিদ্যুতের যুগ। মানব সভ্যতা দ্রুত গতিতে এগিয়ে চল্‌লো উন্নতির পথে। এখন সুরু হয়েছে আণবিক শক্তির যুগ। এযুগে মানুষের সুখ সম্পদ বৃদ্ধি হয়ে কোথায় গিয়ে যে পৌঁছবে তা আজ কল্পনার বিষয় হলেও একদিন নিশ্চয়ই তা সত্যে পরিণত হবে।

মা বুঝি ওই আসে

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

দেখতে কি পাও ভোরের আলোয় রং ধরেছে সোনার,
আলো-ছায়ায় চল্‌ছে খেলা আকাশে জল যোনার।
শীস্ দিয়ে ওই দোয়েল শ্যামা গাইছে বনে বনে,
সাদা মেঘের স্বপ্ন ভাসে নীল গগনের মনে।
কে যেন ওই উস্‌কে দিল তারা-দীপের বাতি
উছল হ'য়ে জোছনা উঠে উজল হ'ল রাতি।
শিউলি শিথিল লুটিয়ে পড়ে শিশির ভেজা ঘাসে,
ফুলে ফুলে চরণ ফেলে মা বুঝি ওই আসে।
আসছে মাতা আসন পাতা দবুজ ঘাসে বচা,
মাথায় ওপর নীল চাঁদোয়া লক্ষ মাণিক খচা।
মা আসে ওই বুঝি ওগো মা বুঝি ওই আসে,
(তাই) জলে-স্থলে নভোতলে শারদশোভা হাসে।

কবি যদি হতে চাও

শান্তশীল দাস

কবি যদি কেউ হতে চাও ভাই,
বলি তবে শোন চুপ করে—
কাঁচ-কলা কুচো খেও চার পাঁচ
প্রতিদিন উঠে খুব ভোরে।
তারপরে দিও ডন বৈঠক,
গুনে গুনে ঠিক একশ বার,
সাথে সাথে চাই একটি গেলাস
শরবৎ কচি কচু-পাতার।
নিমপাতা বাটা মেখে এক থালা
ভাত খেয়ে নিও সাড়ে ন'টায়,
গালে ফেলে দিও পিপুলের গুঁড়ো
মাঝে মাঝে, যদি তেষ্টা পায়।
চিচিঙ্গে ভাজো জলযোগ ক'রো
ঠিক বেলা দু'টো হবে যখন,
খেও অন্তত গুনে পাঁচখানা,
বেশী খেতে যদি না চায় মন।
বিকেলেতে এসে ইস্কুল থেকে,
কিছু নয়, শুধু পগা চায়—
কচি শিউলীর পাতা খাওয়া চাই—
ক'রো নাকো যেন ঘুখটি তায়।
রাত্তিরে খাবে অল্প-স্বল্প,
একটি ছটাক শুক্‌নো খই,
তার সাথে এক মুঠো ছোলা ভাজা,
শেষ কালে এক চামচে দই।
ব্যস, এইমতো করে যাও ঠিক,
বছর তিনেক, ভুল না হয়,
দেখো, কবি তুমি হবে নিশ্চয়ই
একথা মোটেই মিথ্যা নয়।

বন্যা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্যা কখনো দেখেছ বন্ধু, শুনেছ হাওয়ার ভাষা?
তেমন ভাগ্য না হ'লে কখনো, না হলে তেমন আশা,
চুপ করে শোনো, বলিব আজিকে বন্যা কাহারে কয়,
বলিব আজিকে ক্রুদ্ধ হাওয়ার কেমনে আগুন বয়।
সবে কোন সালে মনে নাই আজি, ফুঁসিল নদীর জল,
মত্ত নাচনে লুটিয়া লইল কত যে শিশুর দল।
দলিয়া পিষিয়া চাঁছিয়া মুছিয়া বন্যা নাচিয়া চলে,
শীতল পানীর কত যে ভীষণ আগুন কে সে কথা বলে।
শান্ত তটিনী দেখেছিনু আমি, দেখেছিনু তার রূপ,
রুদ্র মূরতি দেখিনু যখন, কণ্ঠ হইল চুপ!

এ শুধু বন্ধু জলের নাচন, নদীর বন্যা-গীতি,
এই শুধু নহে বন্যা কাহিনী, নহে তো এখানে ইতি।
আরো যে বন্যা দেখেছি নয়নে, সে যে গো রক্তময়,
বক্ষ হইতে তরল সিঁদুরে মুক্ত বন্যা বয়।
কেবা যে চিরিল কাহার বক্ষ, সেকথা আজিকে থাক্,
বন্যার ফলে শুষ্ক হইল কত যে স্নেহের ডাক।
আজো তো ভুলিতে পারি না বন্ধু, সে ব্যথা মরমে যত,
কে যেন পরাণে আঘাত হানিছে হাতুড়ী পেটার মত।
শয়নে-স্বপনে ভুলি ভুলি করে ভুলিতে চেয়েছি সব,

সহসা আইসে প্রাসাদ পার্শ্বে ধনীর উচ্চ রব।
ঘৃণা বিদ্বেষ দম্ভ তাহার বন্যার মত আসে,
বিদ্যা-বিনয়, সম্মান মনে লাঞ্ছিত হয়ে ভাসে।
শিরা শকুনির দৃষ্টি বুলিয়ে ধনীর নয়নে অই,
সকল বন্যা সয়েছিনু সখা, আজিকে কেমনে সই?

গুরু নানক শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। নানকের অনুবর্তিগণ সাধন ভজন নিয়েই থাকতেন। কিন্তু মুসলমান বাদশরা যখন তাঁদের নানাভাবে অত্যাচার শুরু করল, তখন তারা নিজেদের ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করবার জন্য রীতিমত সামরিক সম্প্রদায়ে পরিণত হ'ল।

শিখধর্ম হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মিলিত রূপ। আকবর এ ধর্মের মধ্যে নিজের ধর্মাদর্শের আংশিক রূপ দেখেছিলেন। তিনি শিখদের যে ভূমি দান করেন, সেই ভূমির উপরই অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দির গঠিত হয়েছে। আওরঙ্গজেব শিখা সম্প্রদায়ের মুসলমানদেরও বিধর্মী মনে করতেন। শিখ ধর্মের মধ্যে ইসলামী ভাব থাকলেও শিখদের তিনি কাফের মনে করতেন। ফলে শিখদের উপরও আওরঙ্গজেব বিরূপ ছিলেন এবং তাদের ধর্মাচরণে বাধার সৃষ্টি করতেন।

আওরঙ্গজেবের অত্যাচারে শিখগুরু তেগবাহাদুর প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বাদশাহী ফৌজ বিদ্রোহ দমন করতে এল।

তেগবাহাদুর ও তাঁর তরুণ পুত্র গোবিন্দ সিংহ প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করলেন। কিন্তু যখন দেখলেন যুদ্ধে পরাজয় সুনিশ্চিত, তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন—"সত্বরই তো আমাকে বন্দী করে দিল্লী নিয়ে যাবে, সেখানে আমাকে নিষ্ঠুরভাবে মোগলরা হত্যা করবে। কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে শিখ জাতির ভবিষ্যৎ আশা ভরসাও যেন শেষ না হয়। তারা যাতে আবার সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে পারে, তার ব্যবস্থা করে যেতে হবে। তাদের পরিচালনা করবার মতো শক্তি আছে একমাত্র গোবিন্দরই, তাকে বাঁচাতে হবেই।"

তিনি পুত্র গোবিন্দকে ডেকে বললেন—"বৎস, প্রত্যেক কাজেই অধিকার ভেদ আছে, যুদ্ধে প্রাণ দেওয়ার অধিকার তোমার এখনও জন্মায় নি।"

গোবিন্দ ব্যাকুল হ'য়ে বললেন—"বাবা, তাই বলে তীরুর মতো আমাকে কি যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করে যেতে হবে?"

তেগবাহাদুর ম্লান হাসি হেসে বললেন—"এ যুদ্ধ থেকে আমাদের অনেক শিক্ষা হয়েছে, সে শিক্ষার ফল

করবে তোমার হাতে। তুমি শিখদের সামরিক জাতিরূপে গড়ে তোল। তুমিও যদি এখন মৃত্যুবরণ ক'র, তবে আমার সৎকারই বা করবে কে? আমার দেহটা বিধর্মী-দের হাত থেকে তুমি রক্ষা করবে, আর আমার হত্যার প্রতিশোধ নেবে—এই ভরসাতে আমি হাসিমুখে শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করব।

আমি দীর্ঘকাল বেঁচেছি, অত্যাচারী মুসলমান বাদশার অধীনে নজরবন্দী বা কারাবন্দী হয়ে বাঁচবার বাসনা আমার নেই। দেখ, অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় বিদ্রোহী হয়েছি, কিন্তু সমস্তকে প্রস্তুত হয়ে মোগলের বিরুদ্ধে দাঁড়াই নি। কাজেই এই অসাময়িক বিদ্রোহে যে পরিণাম, তা আমার উপর দিয়েই যাক্।

তোমাকে আমি রেখে যেতে চাই, তুমি শিখ জাতিকে নতুন মন্ত্রে দীক্ষিত করবে, নতুন করে তাদের গড়ে তোল, গুরু নানকের দিকের স্বপ্ন তুমি সফল করবে।"

গুরু গোবিন্দ সিংহের শেষ আশা পূর্ণ করবার জন্য শপথ করলেন দৃঢ় অথচ স্থির কণ্ঠে বললেন—"বাবা আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আপনাদের স্বপ্ন সার্থক ক'রে তুলব।"

তারপর তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে নিরাপদ স্থানে চলে

তেগবাহাদুরকে মোগল সৈন্য বন্দী করল। হাত না বেঁধে তাঁকে দিল্লী নিয়ে গেল।

* * *

আওরঙ্গজেবের সম্মুখে তাঁকে উপস্থাপিত করা হলে দূতই তাঁর কাছে প্রস্তাব করলেন—

"দেখ, তুমি যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ক'র, তবে তোমাকে মুক্তি দেবো। উপরন্তু প্রচুর ধনসম্পদ উপহার দিয়ে তোমাকে দেশে পাঠিয়ে দেবো।"

তেগবাহাদুর স্বপ্নাতরে বললেন—"দেখুন বাদশা, আমরা ধর্মের জন্য হাসিমুখে প্রাণ উৎসর্গ করতেই এসেছি। আমাকে প্রলোভন দেখিয়ে জয় করতে পারবেন না। আর বয়স হয়েছে, কতদিনই বা বাঁচতাম, ধর্মের জন্য যদি প্রাণ দিতে পারি তবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব। এতে সমগ্র জাতির মধ্যে নতুন শক্তির সঞ্চার হবে।

কূটনীতিজ্ঞ বাদশাহ তখনই তাঁকে হত্যা করতে চাইলেন না। তিনি আশা করছিলেন তেগবাহাদুরের সাহায্যে তিনি শিখজাতিকে শান্ত করে রাখতে পারবেন।

তিনি বললেন "তোমাকে যদি এখনই হত্যা করা যায়, তাতে কি তোমার লাভ হবে?"

তেগবাহাদুর হেসে বললেন—"লাভ আমার নিজের হবে না, কিন্তু জাতির লাভ হবে। আর লাভ এই হবে যে বারবার আপনার ঐরূপ হীন প্রস্তাব আর শুনতে হবে না।"

গুরু তখনই প্রাণোৎসর্গ করে ধর্মের মাহাত্ম্য ও মহিমা বজায় রাখতে চাইলেন—"আচ্ছা, তুমি যদি তোমার ধর্মের কোন মহিমা দেখাতে পারো তবে তোমাকে মুক্তি দেবো।"

তেগবাহাদুর বললেন—"বেশ, আমার ধর্মের মহিমা আমি দেখাচ্ছি; কিন্তু জীবন্ত দেহে মুক্তি আমি চাই না। আমাকে এক টুকরা কাগজ দিন, আমি আমার ধর্মের মহিমা চিরকালের জন্য দেখিয়ে যাচ্ছি।"

এক টুকরা কাগজে তিনি কি একটি কথা লিখে গলায় বেঁধে রাখলেন, তারপর বললেন—

"আপনার জল্লাদ যেন এই কাগজ টুকরার নীচে আমার গলায় কোপ দেয়।"

বাদশা তাঁর ভেলকি দেখবার জন্য এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তখনই জল্লাদকে তেগবাহাদুরের মাথা কেটে ফেলতে আদেশ দিলেন। তার পর শিখগুরুর রক্ত থেকে কাগজটা হাতে করে বাদশা শুধু পড়লেন—"শির দিয়া, সার নেই দিয়া"।

আওরঙ্গজেবের দম্ভ চূর্ণ হ'ল। তিনি গুরুজীর ধর্মের মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষ ক'রে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। বোধহয় মনে করলেন—একটা কাফেরের প্রাণ নিয়ে খোদার প্রিয় কাজই করলেন এবং অনেকটা পুণ্য সঞ্চয় করলেন।

আলোর অন্তরালে

শ্রীপতিতপাবন বন্দ্যোপাধ্যায়

এলবার্ট আইনষ্টাইন

বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রুসেলস্ শহরের রেল ষ্টেশনে জনকয়েক পদস্থ কর্মচারী প্লাটফর্মে পাইচারী করছেন। রাজপ্রাসাদের গাড়ী বাইরে অপেক্ষা করছে। রাণী পাঠিয়েছেন সম্মানিত অতিথিকে রাজকীয় অভ্যর্থনা ক'রে প্রাসাদে নিয়ে যাবার জন্যে। প্লাটফর্মের অন্যান্য লোক, সকলেই চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে দামী পোষাক পরা প্রাসাদ কর্মচারী আর রক্ষীদলকে দেখে—না জানি কোন জন আসছেন! আরও অবাক হ'য়ে গেছে রাণীর নিজের ঝকঝকে লাইমোজাইন গাড়ীখানাকে অপেক্ষা ক'রতে দেখে।

ট্রেন এলো যথা সময়ে। চঞ্চল হ'য়ে উঠলো প্লাটফর্মের লোকেরা। যাত্রীদলের উঠানামার ভীড়ের মাঝেও রাজ-কর্মচারীরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা ক'রছেন—কামরার ভিতর থেকে অতিথি নামলেই নিয়ে যাবেন। কই! কেউ তো তেমন নেই! কোথায় যা কে! রেল কর্তৃপক্ষ কয়েক মিনিট বিলম্ব ক'রলেন, রাজপ্রাসাদের কর্মচারীরা যাতে কামরাগুলো দেখে নিতে পারেন। ট্রেন ছেড়ে গেল। অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে যাবার জন্য যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা ভাবলেন, অতিথি হয়তো তাঁর মত পরিবর্তন ক'রেছেন কোনো কারণে, তাই এলেন না। প্রাসাদে ফিরে গিয়ে তাঁরা রাণীকে জানালেন।

কর্মচারীরা যখন রাণীকে তাঁদের বিফলমনোরথের কথা ব'ললেন—তখন রাণীর চোখে পড়লো ধূলো মাখা এক বাউণ্ডুলে লোক বগলে বেহালা আর হাতে একটা সুটকেশ নিয়ে শিস্ দিতে দিতে ছেলে ছুলে আসছে যেন প্রাসাদের দিকে। অতিথি না আসার দরুণ মনটা একটু খারাপ, তার উপর এই অবধুতের আনেরী চাল দেখে তাঁর মেজাজ গেল বিগড়ে। তাঁর কর্মচারীদের ডেকে হুকুম দিতে যাবেন যে এই লোকটাকে যেন এখুনি বের ক'রে দেওয়া হয়; কিন্তু তা আর দেওয়া হ'লো না। নিকটে আসতেই নিজেই এগিয়ে গিয়ে হাসি মুখে আপ্যায়িত ক'রে ব'ললেন—"আসুন আসুন, গাড়ীতে এলেন না কেন?"

সরল হাসি হেসে অতিথি বললেন—"আমি তো ভাবিনি যে আমার জন্যে গাড়ী পাঠানো হবে। ট্রেন থেকে নেমে মনের আনন্দে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলুম। বেশ ভালো লাগলো হাঁটতে।

দু'জনেই হাসতে লাগলেন।

এই বেহালা বগলে বাউণ্ডুলে ধরণের লোকটি আধুনিক বিজ্ঞান জগতের চূড়ামণি ডক্টর এলবার্ট আইনষ্টাইন, সে কথা রাজ-কর্মচারীরা জানবেন কেমন ক'রে! তাঁরা মনে ক'রেছিলেন রাণীর নিমন্ত্রিত—তাঁর চাল-চলন পোষাক পরিচ্ছদেও নিশ্চয় তাঁর ছাপ থাকবে। এঁর কিন্তু কিছুই ছিল না। নূতন আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞান জগতে যিনি বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছেন, তাঁর চেহারা দেখলে তার কোনো আভাসই পাওয়া যেতো না। তিনি বিজ্ঞানী-দের নূতন আলো দেখিয়েছেন—আলোর ভিতর দিয়ে।

বোকা বামুনের গল্প

শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায়

এক দেশে এক বামুন থাকত। বেচারা বড় গরীব। কোন রকমে ভিক্ষে ক'রে বামুনের দিন চলত। সকাল বেলা ভিক্ষের বেরিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে যা কিছু ভিক্ষে মিলত, সন্ধ্যার পর তাই খেয়ে, কোন রকমে সে দিন কাটাত।

গরীব হলেও বামুন কিন্তু ঠাকুর দেবতায় খুব বিশ্বাস করত, আর রোজ সকালে উঠে শিবের মন্দিরে গিয়ে পুজো ক'রে তবে ভিক্ষে করতে বেরুত।

একদিন এক ঘটনা ঘটল। ভিক্ষের বেরিয়ে সারাদিন রোদে রোদে ঘুরে বামুন সেদিন কোন ভিক্ষেই পেল না। দুপুর বেলা অনেক ঘুরে অবশেষে ক্লান্ত হ'য়ে সে একটা গাছতলায় শুয়ে পড়ল।

একে দারুণ রোদ, তার ওপর খুবই খিদে পেয়েছে, গাছের ছায়ায় শোয়া মাত্রই বামুন ঘুমিয়ে পড়ল অঘোরে। যখন ঘুম ভাঙল, তখন সূর্য ডুবে গেছে, সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

কি আর করে, তাড়াতাড়ি উঠে সামনের পুকুর থেকে আঁজলা ভরে জল খেয়ে সে পথ ধরে আবার চলতে লাগল।

সেদিন শিব আর দুর্গা দু'জনে বেরিয়েছিলেন বেড়াতে। শিব আর দুর্গা এঁরা দেব-দেবী কিনা, তাই আমরা যেমন বেড়াতে বেরুই পথে, এঁরা তেমনি বেড়াতে বেরিয়েছেন আকাশে। অনেক পথ-ঘাট পেরিয়ে তাঁরা দু'জনে গল্প করতে করতে চলেছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ দেখলেন নীচের পথ দিয়ে বামুন চলেছে ধীরে ধীরে।

ঠাকুর-দেবতারা মানুষের মনের কথা জানতে পারেন কিনা, তাই দুর্গা বললেন শিবকে, দেখ, ঐ যে বামুনটি পথ দিয়ে যাচ্ছে, ও বড় গরীব কিন্তু তোমার পুজো না করে ও কোনদিন ভিক্ষে বেরোয় না। ওর একটা ব্যবস্থা করো, কিছু টাকাকড়ি পাইয়ে দাও।

শিব হাসলেন।

দুর্গা কিন্তু বার বার ধরে বলতে লাগলেন, আহা, বেচারা বড় ভাল মানুষ, ওর যাতে খাওয়া পরার দুঃখু ঘোচে, তুমি সেই রকম একটা ব্যবস্থা করে দাও।

শিব আবার হাসলেন। তারপর বললেন, জানি ও আমার খুব ভক্তি করে, পুজো না ক'রে ভিক্ষের বেরোয় না, কিন্তু হলে কি হবে, ও যে বেজায় বোকা!

দুর্গা তবু নাছোড়বান্দা, বললেন, তা হোক। যা হোক কিছু ওকে পাইয়ে দাও।

শিব বললেন দেখবে? দিলেও ও কিন্তু ওর বোকামীর জন্য কিছুতেই তা নিতে পারবে না।

দুর্গা বললেন, বেশ ত' তুমি দিয়েই দেখ না, ও কেমন বোকামীর জন্য না নিতে পারে।

শিব হাসলেন। তারপর বললেন, বেশ, তা'হলে মজাটা দেখ, বলে তিনি এক থলি মোহর বামুনের যাবার পথের ওপর ফেলে দিলেন।

বামুন পথ হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ ভাবলে, এ পথ ত' তার খুবই চেনা—রোজই ত' সে এই একই পথ দিয়ে যায়। আজ বরং চোখ বুজে একবার হেঁটে গিয়ে দেখুক ঠিক যেতে পারে কিনা।

এই কথা ভেবে বোকা বামুন চোখ বুজে পথ হাঁটতে লাগল। যেখানে শিব মোহরের থলি ফেলে দিয়েছিলেন, সে জায়গাটাও সে চোখ বুজে হেঁটে পেরিয়ে গেল।

শিব বললেন, দেখলে ত' বোকা বামুনের কাণ্ড-কারখানা?

কিন্তু বামুন বোকা হলেও শিবের ওপর তার খুব ভক্তি ছিল।

কিছুদিন পরে দিনরাত শিব ঠাকুরকে ডাকতে ডাকতে

একদিন স্বয়ং শিব উপস্থিত হয়ে বললেন, বলো কি বর চাও ?

বোকা বামুন স্বয়ং শিবকে সামনে দেখে খুব থতমত খেয়ে গেল। অনেক ভেবে সে বললে, আমায় একজন লোক দিন প্রভু, যে আমি যা হুকুম করব তৎক্ষণাৎ তাই করে দেবে।

শিব বললেন, তথাস্তু। কিন্তু তাকে যদি কোন কাজ না দিতে পারো ত' সে তোমাকে তখুনি মেরে ফেলবে।

বামুন ভাবল কাজের অভাব কি !. পৃথিবীতে কাজের কি অভাব আছে।

যাই হোক, শিব তখুনি একজন অনুচরকে পাঠিয়ে দিলেন। অনুচর এসে বামুনকে প্রণাম করে দাঁড়াল। বোকা বামুন ত' খুবই খুশি। তখুনি তাকে একটা কাজের হুকুম করে দিলে।

অনুচর নিমেষের মধ্যে সে কাজ শেষ করে সামনে এসে দাঁড়াল।

এমনি করে দিনের পর দিন যা হুকুম করতে লাগল বামুন, শিব ঠাকুরের পাঠানো সেই অনুচর নিমেষের মধ্যে সেই কাজ শেষ করে আবার কাজের জন্যে এসে দাঁড়ায়।

শেষে বামুন দেখলে এ এক মহাবিপদ। এত কাজই বা কোথায় পাওয়া যায়। একদিন একটা কাজের হুকুম করেই বামুন গিয়ে শিব পুজোয় বসল।

শিবের অনুচর কাজটা শেষ করেই বামুনের পেছনে এসে দাঁড়াল।

এদিকে বামুন কিন্তু তখন প্রাণভয়ে একমনে শিবকে ডাকছে।

কিছুক্ষণ পরে শিব এসে উপস্থিত হয়ে বললেন, কি চাই ?

বামুন কাঁদতে কাঁদতে বললে, প্রভু, ভীষণ বিপদে পড়েছি। আপনার অনুচরকে যে কাজই হুকুম করি, চক্ষের নিমিষে সে তাই করে ফেলে আবার এসে দাঁড়ায় আমার সামনে; আর কাজ চায়। এখন দেখছি মহা মুস্কিল —আপনি অনুচরকে ফিরিয়ে নিন, আর আমি ওকে চাই না।

শিব বললেন, তা হয় না। তোমাকে যা দিয়েছি, তা আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

তা'হলে কি হবে প্রভু ? ও যে আমাকে তা'হলে প্রাণে মেরে ফেলবে।

শিব কিছুতেই রাজী হন না, বামুনও কিছুতেই ছাড়বে না। অনেক কাকুতি-মিনতি করার পর শিব হেসে বললেন, বোকা বামুন, ঘটে তোমার একটুও বুদ্ধি নেই। এক কাজ কর, আমার অনুচরকে বলো, একবার ওঠো আর একবার বোস। এই কাজ শেষ করলে তবে অন্য কাজ দেব।

শুনে খুশি হয়ে বামুন বললে, আঃ বাঁচলাম।

তারপর থেকে শিবের অনুচর বামুনের আদেশে একবার উঠতে লাগল, আর একবার বসতে লাগল। এই ওঠ-বোসের কাজ সে আর শেষ করতে পারল না।

বোকা বামুনও বেঁচে গিয়ে মনের সুখে দিন কাটাতে লাগল।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য

নারায়ণ চৌধুরী।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের একটি ত্রুটি আমার যা মনে হয় তা হচ্ছে লেখকদের মধ্যে প্রজ্ঞা-দৃষ্টির অভাব। বর্তমানে যাঁরা বাংলা সাহিত্যে রচনানিরত আছেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই স্বাভাবিক ভাষাশক্তির অধিকারী, তাঁদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতাও উচ্চস্তরের; কিন্তু দেখা যায়, এক ধরণের মৌলিক চিন্তাশক্তির অভাবে তাঁদের অধিকাংশ রচনা সাধারণ কাহিনী বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে, তদপেক্ষা উচ্চস্তরে পৌঁছতে পারে না। বিশেষ করে নবীন লেখক সম্প্রদায়ের রচিত কথাসাহিত্যকে লক্ষ্য করেই এ কথা বলছি।

এখনকার লেখকগণ তাঁদের গল্প-উপন্যাসের সৌকর্য-বিধানে লিপিচাতুর্যের পাশে পাশে আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্য সাধনেও বিশেষ যত্নবান। কাহিনীর প্রসঙ্গন, বিন্যাস ইত্যাদিতে কে কত অভিনবত্বের সংযোজন করতে পারেন সে বিষয়েও তাঁরা খুবই তৎপর। তাঁদের অনেকেরই সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা আছে গোড়াতেই সে কথা বলেছি। এই সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার দ্বারা তাঁরা যে অভিজ্ঞতা চয়ন করেন সে সকল অভিজ্ঞতাকে তাঁরা সাধ্যমত মনোজ্ঞ ভাষায় ও ভঙ্গিতে পরিবেশনে যত্নের ত্রুটি রাখেন না। তাঁদের ভাষাজ্ঞান যেমন নিপুণ তেমনি আধুনিক বিদেশী কথাসাহিত্যের আঙ্গিক ও রচনাশৈলীর সঙ্গেও তাঁদের পরিচয় কিছু কম নয়। এই দুইয়ের যোগাযোগে—অর্থাৎ লিপিকুশলতার সঙ্গে অভিনব আঙ্গিক জ্ঞানের সমন্বয়ে তাঁরা গল্প-উপন্যাস-রম্যরচনার আকারে যে কথাসাহিত্য পরিবেশন করেন তার রূপ খুবই শোভন ও সুদৃশ্য হয়। রচনার মধ্যে Smartnessএর—বুদ্ধিচাতুর্যের—পরিচয় থাকায় সে সকল গল্প-উপন্যাস এ কালীন রুচিবিশিষ্ট পাঠকদের খুবই মনঃপূত হয়। সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্য লিপিনৈপুণ্যে ও আঙ্গিকবৈশিষ্ট্যে যে বিশেষ প্রশংসা দাবী করতে পারে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু এখানে এসেই আমাদের প্রশংসা নিরস্ত হওয়া উচিত: আশা ও আশ্বাসব্যঞ্জক বাক্যাবলীকে আর অধিক-দূর টেনে নিয়ে গেলে সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা সৃষ্টির কাজে সহায়তা করা হবে। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের একটি মূলগত ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছি। কত কত লেখক ও তাঁদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হবার চেষ্টা করি, কিন্তু তাঁদের রচনায় জীবনদর্শন ও প্রজ্ঞার বিশেষ কোন পরিচয় পাই না। না পেয়ে মন নিরাশ হয়, মনের ভিতর অতৃপ্তি থেকে যায়। সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যের ধারাধরন বিচার করে আমার এই ধারণা হয়েছে যে, এ সাহিত্যের রচয়িতা যেমন নবীন বয়সী লেখক তেমনি এ সাহিত্যের ভোক্তাও মূলতঃ নবীন সম্প্রদায়। একটি নির্দিষ্ট বয়সের সীমা অতিক্রমকারী বৃহৎ পাঠকসমাজকে আকর্ষণ করবার মত উপাদান এ সাহিত্যে নেই। যে সাহিত্য পাঠে মানুষ জীবনে পথ চলবার নির্দেশ পায়, গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত হয়, নিগূঢ় সৌন্দর্যানুভূতির দ্বারা পরিপ্লাবিত হয়ে যায়,সে সাহিত্য আর এ সাহিত্য এক বস্তু নয়। বিচক্ষণ পাঠককে নাড়া দিতে পারে, তাঁর ভিতর গভীর চিন্তার উদ্রেক করতে পারে, এমন মালমসলা দিয়ে আজকের দিনের সাহিত্যের ইমারত গঠিত নয়। বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস সকল, যেমন 'লা মিজারেবল্,' 'ক্রাইম এ্যাণ্ড পানিস্‌মেণ্ট,' 'রাদার্স কারামাজোভ,' 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীস,' 'দি রিসারেক্‌সন,' 'জাঁ ক্রিস্‌তফ্,' 'দি ফরসাইট্ সাগা,' 'গোরা,' 'পথের পাঁচালী,' প্রভৃতি মানুষের অস্তিত্বের একেবারে মর্মমূল

ঘরে টান দেয়। সে সকল উপন্যাস একবার দুইবার তিনবার, বারবার পড়তে ইচ্ছা হয়। পড়া হয়ে যাবার পরও সে সকল উপন্যাস পাঠের রেশ দীর্ঘকাল মনের ভিতর অনুরণন তুলতে থাকে। শুধু তাই নয়, শ্রেষ্ঠ উপন্যাসপাঠের ফলে পাঠকের মনোজীবনের অঙ্গীভূত হয়ে যায়, তাঁর জীবনকে সমৃদ্ধতর উপাদানে মণ্ডিত করে। এক-একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের প্রভাব আজীবন মনের ভিতর লিপ্ত হয়ে থাকে—এ অভিজ্ঞ পাঠকদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি।

পরিতাপের বিষয়, এখনকার কালে যে সকল গল্প-উপন্যাস লেখা হচ্ছে তাদের মান এ সকল গ্রন্থের উৎকর্ষের মানের নিকটবর্তী হওয়া তো দূরের কথা সে আদর্শই তাদের সামনে নেই। সহজ লিপিকুশলতা ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার দ্বারা নবীন লেখকগণ তাঁদের গল্প-উপন্যাসকে যতটা পরিমাণ আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তা তাঁরা করেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই তাঁদের কৃতিত্বের সীমানা। তার পরেই শূন্যতা। এক শূন্যতার কারণ আধুনিক লেখকদের মধ্যে জীবন বোধের অভাব, আদর্শবাদের অভাব, গভীরতর অর্থে নীতিজ্ঞানের অভাব। শেষোক্ত কথাটির কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সহজ নীতিজ্ঞান সব লেখকের মধ্যেই অল্পবিস্তর থাকে—এ না হলে সাহিত্যিক সৃষ্টিই সম্ভব নয়—কিন্তু যে গভীর নীতিবোধ মানুষের মনকে আদর্শবাদী অভীপ্সায় পূর্ণ করে, তার অস্তিত্বকে প্রবল ভাবানুভূতির দ্বারা আন্দোলিত করে, সে জাতীয় নীতিবোধ এখনকার কালের লেখকদের মধ্যে দৃষ্টিগ্রাহ্য ভাবে অনুপস্থিত। ফলে আধুনিক রচনা পড়ে মন ভরে না, কোথায় যেন মনের কোণায় আদর্শবাদীর ধ্যান-ধারণার অভাবজনিত অপরিতৃপ্তি থেকে যায়। সাম্প্রতিক লেখকগণ সংবাদপত্রের রিপোর্টের ধরনে খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত দিয়ে এক ধরনের ব্যঞ্জনাগুণবিরহিত কথাসাহিত্যের সৃষ্টি করেন যা সংবাদ পত্রের রিপোর্টের মতই কুশলী হাতের রচনা, কিন্তু রসসৃষ্টির পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ। এঁদের খুঁটি-নাটি বর্ণনার ক্ষমতা আছে, নানা বিচিত্র তথ্য ও সংবাদের দ্বারা রচনাকে সমৃদ্ধ করে তোলার কৌশল জানা আছে, কিন্তু রচনার depth বা গভীরতা নেই। গভীরতা নেই তার কারণ তাঁদের মনোভঙ্গীতে দার্শনিক প্রজ্ঞার অভাব। চিন্তাশীলতার বড় কেউ একটা ধার ধারেন না। দার্শনিকতার অনুশীলনের তাঁদের কোনরূপ অভিপ্রায়ও নেই, ধৈর্যও নেই। সাম্প্রতিক লেখকগণ বাস্তববাদী বলে আপনাদের অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু বাস্তববাদের পিছনেও দার্শনিকতা আছে। বস্তুতঃ, খোদ বাস্তববাদ বস্তুটিই একটি দর্শন। আদর্শবাদী দর্শনের মত বাস্তববাদী দর্শনেরও একটা বিশিষ্ট সংস্কার আছে, ঐতিহ্য আছে, তার একাধিক প্রবক্তা আছে। অথচ দুঃখ এই যে, সাম্প্রতিক রিয়ালিষ্ট লেখকগণের রচনা প্রয়াসের পিছনে কোনরূপ দার্শনিক চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় না। আদর্শবাদী দর্শনের কথা ছেড়েই দিলাম, কিন্তু বাস্তববাদী দর্শনের বা চিহ্ন কোথায়? বেশীর ভাগ সাম্প্রতিক লেখক প্রকাশ্যতঃ বামপন্থাশ্রয়ী, তাঁরা কথায় কথায় মার্ক্সবাদের দোহাই পেড়ে থাকেন। কিন্তু তাঁদের রচনারীতি অনুধাবন করলে দেখা যাবে, তাঁদের সাহিত্যই মার্ক্সবাদী দর্শনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচিতির সাক্ষ্য বহন করে না। এ কথার প্রমাণ রচনার চিন্তাশৃঙ্খলার অভাব। দার্শনিকতার অভ্যস্ত মনের চেহারা কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ থাকে—এখনকার সাহিত্যে এ চেহারার ছাপ দেখতে পাই নে।

এমন বলব না যে সাহিত্যের ভিতর জানিয়ে শুনিয়ে নিতান্ত প্রকট ভাবে দার্শনিকতার আরোপ করতে হবে। কথাসাহিত্য সৃষ্টিধর্মী রচনা, সেটি প্রবন্ধ নিবন্ধ সন্দর্ভ নয় যে তাতে সজ্ঞানে চিন্তা ও যুক্তিশৃঙ্খলার অবতারণা না করলে তার জাত মারা যাবে। কিন্তু প্রচ্ছন্ন দার্শনিকতা বলে একটি বস্তু আছে। সেটি যে কোন রচনার তলায় তলায় অনুস্যূত থাকতে পারে, থাকা উচিত। বিশেষতঃ কথাসাহিত্যে, আরও চিহ্নিত করে বললে, কথাসাহিত্যের উপন্যাস শাখায় এ বস্তুর সংযোজনের একান্ত আবশ্যকতা আছে। কেন না এটি এমন এক বস্তু যার প্রসাদে উপন্যাস যথার্থ উপন্যাস হয়, অভাবে অন্য সব দিক দিয়ে উৎকর্ষ-

লক্ষণান্বিত হয়েও রচনা দ্বিতীয় শ্রেণীর কোঠায় নেমে পড়ে। সাম্প্রতিক বাংলা কথা-সাহিত্যের এইখানেই সব চেয়ে বড় গলদ। এখনকার উপন্যাসকারদের মনোভঙ্গীর ভিতর সহজ চিন্তাশীলতার, জীবনবোধের প্রভাব নিরতিশয় অল্প। তাঁরা পর্যবেক্ষণনির্ভর লেখক বর্ণনাকুশল লেখক, তার বাড়া কিছু নয়। তাঁদের লিপিনৈপুণ্যে চমৎকৃত হই, কিন্তু সেখানেই চমৎকারিত্বের শেষ। আধুনিক গল্প-উপন্যাস পাঠকের অস্তিত্বের মর্মমূল ধরে টান দেয় না, তা শুধু মনের বহিরাঙ্গকে স্পর্শ করেই ক্ষান্ত হয়।

অপেক্ষাকৃত প্রবীণ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে কিন্তু এ অপূর্ণতা দেখতে পাই নে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ বর্তমান আলোচনায় তুলব না, কারণ তাঁদের চিন্তাশীলতা মননশিতা প্রজ্ঞা সর্বস্বীকৃত। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় মনস্বী লেখক বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় কেউ আবির্ভূত হন নি। রবীন্দ্র ব্যক্তিত্ব থেকে দার্শনিকতা বাদ দিলে কবির ব্যক্তিত্বের একটি বড় অংশই দৃষ্টির অগোচরে চলে যায়। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের দৃশ্যপটের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে আমরা দেখতে পাব, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের যে তিনজন ঔপন্যাস রচনায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়—তাঁরা তিনজনই প্রজ্ঞাবাদী লেখক। সহজ জ্ঞানের সংস্কার তাঁদের তিনেরই রচনার ভিতর অনুস্যূত হয়ে আছে। প্রকৃত সংজ্ঞার্থে যাকে মননশিকতা বলে তা অবশ্য এঁদের ব্যক্তিত্বের ভিতর তেমন দেখা যায় না, এবং একথাও সমান সত্য যে ব্যাপক অধ্যয়নের দ্বারা নিজ নিজ জ্ঞান বুদ্ধিকে পরিমার্জিত ও উন্নত করার অবকাশ এই ত্রয়ী লেখকের জীবনে অল্পই উপস্থিত হয়েছে—বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের করায়ত্ত নানাবিধ সামাজিক সুবিধা-সুযোগ এ কালীন লেখকদের স্পষ্টতঃই অনায়ত্ত—, তবু একথা কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না যে, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজ নিজ ক্ষেত্রে সহজ চিন্তাশীলতার অধিকারী। ত্রয়ীর প্রত্যেকেরই একটি জীবন দর্শন আছে—তা ভুল হোক আর যাই হোক। প্রত্যেকেই নিজ নিজ পথে জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলি নিয়ে চিন্তা করেছেন এবং সে চিন্তার ফল তাঁদের উপন্যাসের ভিতর গ্রথিত করেছেন। হতে পারে এই চিন্তা অবীত বিন্যাসিত নয়, এই চিন্তার পিছনে মানসিক শৃঙ্খলা কিংবা অমোঘ যুক্তি বুদ্ধির সোষ্ঠবতা না থাকা খুবই সম্ভব, তবু বলব এই ত্রয়ী লেখকের উপন্যাসের ভিতর এমন কিছু আছে যা পাঠককে মৌলিক জীবন দর্শনের আস্বাদন দেয়, তার অনুভূতিকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', 'অপরাজিত', 'আরণ্যক'; তারাশঙ্করের 'রাই কমল', 'কবি', 'পঞ্চগ্রাম', 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' ও 'আরোগ্য নিকেতন'; এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'দর্পণ' প্রভৃতি গ্রন্থের নামোল্লেখ করতে পারি। জীবন ও মৃত্যুর তাৎপর্য সম্পর্কে গভীর চিন্তাভাবনা বিভূতিভূষণের উপন্যাসের একটি প্রধান উপজীব্য, তেমনি তারাশঙ্করের উপন্যাসে ভালো-মন্দয় মেশানো মনুষ্য চরিত্র সম্পর্কে সেহসুলভ অন্তর্দৃষ্টি ও দার্শনিক নির্লিপ্ততার ভাবটি একান্তভাবে পরিস্ফুট। তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে বহু চরিত্রের ভীড় সৃষ্টি করলেও এই ভিড়ের জঙ্গলের মধ্যে তিনি নিরাসক্ত স্রষ্টার আসনে সমাসীন। তারাশঙ্করের শিল্পী মানসের এই যে নিরাসক্তি, এ নিরাসক্তি আমার সুনিশ্চিত ধারণা, সহজ দার্শনিক জ্ঞান থেকে পাওয়া। তারাশঙ্করের রচনায় ভাবুকতার ছড়াছড়ি, আর এই ভাবুকতা দার্শনিকতারই স্বগোত্র। দার্শনিকতা ও ভাবুকতা সতত পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলে।

অপর পক্ষে, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার ছত্রে ছত্রে দৃষ্টিভঙ্গীর অনন্যতা পরিস্ফুট। মাণিকবাবুর রাজনৈতিক দর্শনের সহিত আমাদের ঐক্য নেই, তাঁর রচনার আত্যন্তিক দেহবাদী সংস্কার আমরা সুস্থ সাহিত্যের অগ্রগতির পথে ক্ষতিকর বলে মনে করি; তা সত্ত্বেও বলব, মাণিকবাবুর রচনার ভিতর দার্শনিকতার সংস্কার অবলীলাক্রমে প্রথিত হয়ে আছে। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীই এমন যে, গভীরত্বসন্ধানী মননের অভ্যাস না থাকলে এ দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত হওয়ার নয়। মাণিকবাবুর দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য তাঁর সহজ জ্ঞানের পরিচায়ক।

এঁদের সমসাময়িক আর দু'জন লেখকের মধ্যে আমরা একই রূপ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই—যদিও এঁরা প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক নয়, গল্প লেখক। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সুবোধ ঘোষ। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় ও ছোট গল্পে চৈনিক শিল্পিসুলভ গুহ্য কঠিন সংযম ও সহজ প্রজ্ঞা অনুলিপ্ত হয়ে আছে। দুঃখের বিষয় নিষ্ঠা ও চর্চার অভাব হেতু এবং বিগত কয়েক বৎসর ভিন্নতর জীবিকায় এক নিবিষ্টভাবে নিয়োজিত থাকার ফলে প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর এককালীন

বাস্তবতা থেকে বহু দূরে সরে গেছেন।
তবু তাঁর পূর্বতন সততার কারণে বর্তমানও অস্বীকৃত হয় না।

শক্তিশালী ছোট গল্প লেখক সুবোধ ঘোষ মূলত গল্প রচনায় প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। ছোট গল্পে একটি আইডিয়া বা ভাববস্তুর জোর যেন সেটি তাঁর আদর্শবাদী মনের গঠন প্রমাণ করে অধিকন্তু এটি তাঁর সহজ চিন্তাশীলতার দ্যোতক তথাকথিত বিশুদ্ধ নন্দনবাদীদের মত সুবোধ ঘোষ Art for Art's sake নীতিতে আদৌ বিশ্বাসী নন, তাঁর প্রতিটি রচনার শেষ ও সমাজের কল্যাণ চিন্তা সংযোজিত। জীবনের সূচনা থেকেই তিনি এই কল্যাণবুদ্ধি আহরণ করেছেন বলে মনে হয়।

উপরি-উল্লিখিত লেখকদের সম্পর্কে যে কথা বলা চলে পরবর্তী কালের লেখকদের সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করতে পারলে খুশী হওয়া, কিন্তু নবীন লেখকগণ সত্যকার খুশি হওয়ার অবকাশ বড় কম যেন সেইটেই আক্ষেপ। একটা কথা এখানে প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করতে চাই কথাটি

এ যুগে হয় সাম্প্রতিক বাং লেখক-সকলেই অল্পবিস্তর পরশুরামের দাদার উত্তর সাধক সেই কারণেই এঁদের রচনায় মননশীলতার ছাপ দেখতে পাওয়া যায় পরশুরাম মূলতঃ প্রথম শ্রেণীর গল্প-বলিয়ে লেখক প্রজ্ঞাবান আদৌ নন। বঙ্কিম-রবীন্দ্রসুলভ সার্বিকতা থেকে তিনি বহু দূরে ছিলেন, এবং সবসময় ওই নিরাপদ দূরত্বে থাকতেই ভালবাসতেন জীবনের ছোক অন্তরালের ছোক পরশুরামের এই চিন্তাবিমুখতা আধুনিক কালের কথাসাহিত্যিকদের ভিতর সঞ্চারিত হয়েছে দুই একটি লক্ষণীয় ব্যতিক্রম মিলে প্রায় সব অগ্রবীণ ও নবীন লেখকই মূলতঃ গল্প বা জীবনের গভীরে তাঁদের কল্পনাশক্তি খুব কম ক্ষেত্রেই সঞ্চারিত। সহজ অর্থে, সাম্প্রতিক লেখকদের কোনরূপ জীবনদর্শন বা জীবনবোধ নেই, সে কারণে তাঁদের সাহিত্য বহুলাংশে খণ্ডিত।

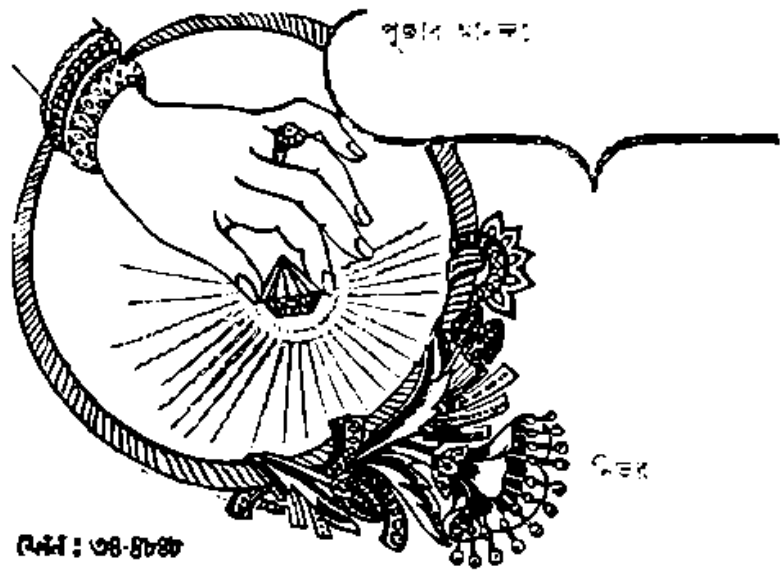

বাংলার অতি আধুনিক কাব্য

অগেন দত্ত

)

যে নূতন পথে মোড় ফিরিবার বহু-পূর্ব হইতেই বাংলা কাব্যের একটা অস্পষ্ট গতি দেখা দিয়াছিল। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমুখ কবিরা যে সুর লইয়া আসিয়াছিলেন তাহা রবীন্দ্রকাব্য হইতে বিভিন্ন। এ কথা সাহিত্য সমালোচকেরা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের সর্বব্যাপক প্রভাব যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বা মোহিতলাল কেহই এ এড়াইতে পারেন নাই। ইহাতে অগৌরবের কিছু নাই কেননা, প্রভাব যখন কবি-মানসে কাঁটার মত না বিঁধিয়া, মর্ম্মস্পর্শী সুরে পরিণত হয় তখন তাহা কাব্যের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। বস্তুত সব কাব্যই নবরূপে জন্ম লইবার পূর্বে ঐরূপ একটি প্রভাবপুষ্ট শিশুর মত আবির্ভূত হইয়া থাকে। সেই নবজাত কাব্য-শিশুর হাতার ছন্দটি তখনও পরিপুষ্টতা লাভ করে নাই বটে, কিন্তু মাধুর্য্যে কাব্যজগৎ অনুরঞ্জিত। ইহা যে সুর সম্পদ রচিয়া আনে তাহা সমালোচকের সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়ায় সমালোচকের কর্ম হইতেছে এই সুরের মর্ম্মরসবেত্তা পাঠক সমাজের কাছে পরিবেশন করা। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল বাংলা কাব্য জগতে আসিয়া যেখানে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন ঠিক সেইখানে আর একটা আবেগময় নবীন প্রবাহ সৃষ্ট হইল। বয়সে নবীন, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা স্বল্প—কিন্তু প্রাণে তীব্র অনুভূতি আছে আর আছে দুরন্ত স্পন্দন, আর একটু বলিয়া রাখি, স্পর্দ্ধাও আছে। এই স্পর্দ্ধা একটা সচেতন বিদ্রোহের মত। এই বিদ্রোহ অবশ্য রবীন্দ্র প্রতিভার সম্মোহনী শক্তির বিরুদ্ধে। এই বিদ্রোহ যে শুধুই বিক্ষোভের স্ফুরণ, সুরুচিত নিছক অভিব্যক্তি প্রকাশের গোটা কয়েক ভাষা মাত্র তা একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করিলেই বোঝা যাইবে।

"জ্যোতির্ময়, আজি মম জ্যোতিহীন বন্দীশালা হতে
বন্দনা-সংগীত গাহি তব।
স্বর্গ লোভ নাহি মোর, নাহি মোর পুণ্যের সঞ্চয়
লাঞ্ছিত বাসনা দিয়া অর্ঘ্য তব রচি আমি আজি :
শাশ্বত সংগ্রামে মোর আহত বক্ষের যত রক্তাক্ত
ক্ষতের বীভৎসতা,
হে চির সুন্দর, মোর নমস্কার-সহ লহো আজি।"

লাঞ্ছিত বাসনা দিয়া চির সুন্দরের প্রতি অর্ঘ্য রচনা করার প্রবৃত্তি যখন অন্তরে জাগে তখন দেহবাদীর আক্ষেপ, অবচেতন মনের উদগ্র লালসার কথাই মনে পড়ে। দেহ-বাদের এই সুর অতি আধুনিক বাংলা কাব্যে আসিয়াছে কতগুলি ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা হইতে। এই আকাঙ্ক্ষার ভিত্তি হইল সামাজিক স্তর। এবং বাঙ্গালী মধ্য বিত্তের সামাজিক স্তরটি ব্রাহ্ম আন্দোলনের পর আবার রূঢ় গোঁড়ামীর দ্বারা একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। রূঢ় নীতির বাঁধন সমগ্র সমাজ দেহকে ঘিরিয়া রাখিয়াছিল। কোথায় যেন চাপা একটা অস্পষ্ট ক্ষোভের গুঞ্জন ধ্বনিত হইতেছিল। অথচ সহজ প্রকাশের পথ খুঁজিয়া পায় নাই। তাই এখানে-ওখানে দুই একটা সামাজিক বিদ্রোহ ঘটিয়াছে মাত্র। কিন্তু আসল বিদ্রোহ তখনও দানা বাঁধিতে পারে নাই। উনিশ' একুশ সালের রাজ-নৈতিক আন্দোলন সমাজের উপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল তাহাতে সমাজ-জীবনে নর-নারীর অবাধ সংমিশ্রণের পথ প্রশস্ত হইল। নারী এবং পুরুষের উভয়েরই জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হইল। এই সামাজিক বিপ্লব নারী এবং পুরুষের মনে অসহ আবেগ সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু এই সব আবেগের মূলে জীবনের এক গভীর আদর্শবাদ তখনও

ছিল। কিন্তু যে আদর্শবাদ একদিন সমাজে নারীকে দেবীর আসনে বসাইয়াছিল—এবং জীবনের আত্মানুসন্ধানের মাঝে নিপীড়ন-ব্রতকে মহৎ বস্তুরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহার কথঞ্চিৎ পতন হয়। ভ্রষ্ট-জীবনধারা সমাজের উচ্চবিত্তের মাঝে প্রকট হইয়া পড়ে। উচ্ছৃঙ্খল জমিদারনন্দন সাধু সাজিয়া স্বকার্য সাধন করে—এমন দৃষ্টান্তের আর অন্ত নাই। সংযম ও সাধুতার অন্তরালে যখন ভোগবতী নদী দেহের দুকূল ছাপাইয়া উপচাইয়া পড়িতেছিল—তখন সংযমকে আমরা আত্ম-পীড়নের চোখে দেখিতে শিখিলাম। মানসিক সংযম সাধনার প্রথম পর্যায় যে পীড়ন নাই এমন জোর করিয়া বলা চলে না। কিন্তু জীবনে যদি পীড়নটাই প্রবল হইয়া ওঠে তবে ইহার অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি আর আস্থা থাকে না। বস্তুত তাহাই সমাজ জীবনে দেখা দিয়াছিল। আশৈশব ব্রহ্মচারী কোথায় কোন এক অজ্ঞাত কারণে নিজের পতনের ইতিহাস লিখিয়া চলিলেন। তখন স্বতই মানব মনের অন্তরালে এই সংযমধর্মী কঠোর ব্রতের প্রতি সন্দেহের উদ্রেক হইল। তখন দেহের একটি বিশেষ আবেগ ও উল্লাসকে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতে চলিল। দেহ সৌন্দর্যকে ম্লান জ্যোছনার তৃপ্তির মত মনে না হইয়া, মনে হইল এ সৌন্দর্যের শিখা। দেহের আবেগ সংযত করিতে না পারিয়া মনে হয় উহার মাঝে ঝাঁপাইয়া পড়ি, ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এই দেহ বিলীন করিয়া দেই। কিন্তু বাস্তবে এই দেহ বিলীন হয় না, শুধু ঝাঁপাইয়া পড়াই সার হয়। বাঙালী উচ্চবিত্তের জীবনেতিহাসে এইরূপ ঝাঁপাইয়া পড়িবার দৃষ্টান্তের অন্ত নাই। এই সামাজিক পরিবেশ বাংলার অতি আধুনিক কাব্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ইহা বাদে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবও রহিয়াছে-ই।

যাঁহারা দেহবাদীরূপে বাংলার অতি আধুনিক কাব্যে দেখা দিলেন, তাহারা অসহ ব্যক্তিচেতনা, উগ্র আমিত্ববোধ লইয়া আসিলেন। কবি বুদ্ধদেব ইহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহার 'বন্দীর বন্দনা' কাব্যগ্রন্থ এই উগ্র আমিত্ববোধের খসড়া মাত্র। পরবর্তীকালে তিনি যত কবিতা লিখিয়াছেন তাহা 'আমি'ত্বের আগোল ভাঙিয়া নির্বিকার বিলীন সত্তায় পরিণতি লাভ করে নাই। বরীন্দ্রনাথেরও প্রথম যৌবনের কবিতায় মাধুর্যপূর্ণ আমিত্ব-চেতনা ("নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ") দেখা দিয়াছিল কিন্তু তাহা জীবনের মহৎ উপকূলের সন্ধান পাইয়া, বৃহৎ সত্তার নীচে মাথা নত করিয়াছে। সত্যের এই অপূর্ব অনুভূতি শুধু আত্ম-চেতনার বিলুপ্তিতেই সম্ভব। কবি বুদ্ধদেবের সেই বিলুপ্তিবোধ তখনও জাগ্রত হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া চিরসুন্দরের পূজা তিনি করেন নাই এমন নহে। তবু তাঁর মানসচেতনা যেন সচেতনভাবে স্ব-আত্মার আক্ষেপেই সাড়া দিয়াছে।

[২]

বাংলার অতি আধুনিক কাব্যে কবি বুদ্ধদেব যে 'আমিত্ব' চেতনার পরিচয় দিয়াছেন আর একজন সেই 'আমি'কে হারাইয়া যন্ত্রের জটীল পথে বিকলাঙ্গ জীবনের শুধু ব্যঙ্গ সমারোহ দেখিয়াছেন। এই দৃষ্টি তাঁহার স্বকীয় সামাজিক সত্তার কেন্দ্র হইতে মুক্ত। দেহের বাণীতে তার সুরের প্রণতি বঙ্কারিয়া ওঠে। জীবন দেখিবার ভঙ্গী, এবং তাহা হইতে রস গ্রহণের দক্ষতা প্রেমেন্দ্রবাবুর যেমন —তেমন হয়ত তাঁহার সমকালীনদের অনেকেরই নাই। ইহার অর্থ এই নয় যে, ঐ জাতীয় দক্ষতা অন্যে অর্জন করেন নাই। জীবনানন্দ, অচিন্ত্যকুমার স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু কাব্যে জীবনদর্শন, জীবনানন্দের ও প্রেমেন্দ্রের যেভাবে পরিস্ফুট, সেভাবে অন্য কাহারো মাঝে নহে। জীবনানন্দবাবু জীবনকে পরিস্ফুট নূতন আলোকে সন্ধান করিয়াছেন। কিন্তু জীবন সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন কিনা জানি না, তবে কাল-চেতনা তাঁর সমগ্র মানসলোকে নূতনভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে, এবং সেই কাল-চেতনাকে তিনি বুদ্ধির বিবরে যথাযথরূপে প্রতিপালন করিয়া রসের হাটে বিকাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁর চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। কথার সার বাঁধিয়া রসের মক্ষিকাকে মধু সন্ধানের পথ দেখাইয়াছেন। ফলে লম্বাটানা কথার সড়কের কোল ঘেঁসিয়া কালস্রোত আপনি বহিয়া গিয়াছে। পাঠকের মন রসের সন্ধান করিতে-করিতে এক সময় এই কালস্রোতে ডুব দিয়া লয়। সহসা

ইতিহাসের ব্যক্তির স্বল্প-আলোর ঝলকের মত ঝলসিয়া ওঠে পাঠকের মনের আকাশ প্রদীপ্ত হয়।

"বুদ্ধকে স্বচক্ষে মহানির্বাণের আশ্চর্য শান্তিতে চলে যেতে দেখে—তবু অবিরল অশান্তির হাতি ভিক্ষা করে —এখানে তোমার কাছে দাঁড়ায়ে রয়েছি।"

রবীন্দ্রকাব্যেও ইতিহাস স্থান পাইয়াছে। কিন্তু সে ইতিহাসের অন্তর হইতে রসের নির্ঝরিণী বহিয়াছে। ইতিহাস উপকরণের রূপ লইয়া নিছক বেশে ধরা দিয়াছে। আমরা সন্ন্যাসী উপগুপ্তের কাহিনীর রোমান্স অন্তরে পাঁথিয়া রাখিয়াছি। সে মনের তলায় বাস করে। কিন্তু জীবনানন্দের ইতিহাস চেতনা এইরূপ যে তাহা সহসা অন্তরে প্রবেশ না করিয়া বুদ্ধিদীপ্ত স্মৃতির সৌধ রচনা করে। পাঠকের মনে যাহা অন্তরনিবাসী নহে তাহা কতটা স্থায়ী রসসমৃদ্ধ হইতে পারে বলা কঠিন। তবু মনের উপরে গভীর রেখাপাত করিয়া যায়, নূতন সুরের আবেশ মনে ছড়ায়।

৩]

মনের এক বিশেষ ভাব প্রবাহ যখন দুর্দমে বেগে বহিতে থাকে, তখন মনটা যেন বলাপাতার মত কাঁপিতে থাকে। ইহাকে ঠিক মানসিক চাঞ্চল্য বলা চলে না। অথচ স্থিরতা যাহাকে বলে তাহাও যেন নয়। সম্ভবত এই অবস্থার মাঝে অচিন্ত্যকুমারের 'অমাবস্যা'র সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। কবি-মানসে জীবন-বোধ জাগ্রত হইয়াছে, প্রেমের সাড়া মিলিয়াছে; মমতা পুষ্পরেণুর মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে কিন্তু বাসনার কীট তাহার উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছে। বাসনা বহ্নি আকারে দেখা না দিলেও কোথায় যেন ঝিকি-মিকি জ্বলিতেছে। সেই বাসনাবিদ্ধ প্রেম,—তারই কথা তারই বিচিত্র লহরী ছন্দবন্ধে হইয়াছে। অচিন্ত্যকুমারের ছন্দ জটীল নয়, স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ।

"কণ্ঠে মিলন-মালা,
সে-জ্বালা জুড়াও—বিধাতা ও মোর বুকে জ্বলে
যেই জ্বালা।
নীরন্ধ্রে নব-গুপ্ত সুধার ভূষণ শোভিছে কিবা,
কার লীলায়িত ভুজ বন্ধনে বন্দী মৃণাল-গ্রীবা!
জলতরঙ্গ বাজিল কি দেহে অপূর্ব ঝঙ্কার,
পুরাতন রস-রভসে শিহরি উঠিছো পুনর্বার।"

সমগ্র 'অমাবস্যা' কাব্য গ্রন্থখানির মধ্যে একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। প্রেম ত্যাগের দ্বারা মহিমামণ্ডিত নয়, ভোগের দ্বারা খানিকটা ক্ষুণ্ণ বটে, তবু যেন গুঞ্জরের কোন তন্ত্রীতে বাঁধাতুর সুর রহিয়া-রহিয়া বাজিতে থাকে। এই সুরটি মনের পরতে আসিয়া যা মারে তাহাতে অসহ তীব্রতা নাই, আছে স্পর্শমধুর অনুভূতি। এ অনুভূতি বাংলার অতি আধুনিক কাব্য জগতে দুর্লভ। যদিও অমাবস্যা কথাটি সমগ্র জীবন চেতনার উপর এক ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারের ভয়াবহ বিভীষিকার কথা স্মরণ করাইয়া দেয় তবু সে অন্ধকার বিষাদের নির্মম পরিচ্ছেদ।

[৪]

প্রেমেন্দ্রবাবু কাব্যে যে জীবনের সন্ধান করিয়াছেন সে জীবন গড়পড়তা মানুষের। তাহাদের অন্তস্তল যে দুঃখে, যে বেদনায় আপ্লুত প্রেমেন্দ্রবাবু যেন সেখানেই গভীর ধ্যানমগ্ন সন্ন্যাসীর মত অন্তর্দৃষ্টি দিয়া কি দেখিতেছেন। একটা জাগতিক দুঃখকে তিনি রসের স্তরে উন্নীত করিয়াছেন। জীবন ব্যর্থ ব্যথাতুর কিন্তু ক্ষুব্ধ মূছমন্দ তটিনীর মত স্বচ্ছন্দ সংযত গতিতে বহিয়া যাইতেছে। দুই পাশে কূল প্লাবনের স্পৃহা নাই। নিস্পৃহ কর্মমুখর জীবন যেমন চলে এ-ও ঠিক তেমনি। গোধূলি বেলায় সূর্যের নীরব মিনতির মত, বনান্তরালে পাখীরা সবই কূলায় ফিরিতেছে বটে, তবু যেন বিচ্ছেদের পাত্র বেদনায় পূর্ণ, কিন্তু তাতে তরঙ্গের উচ্ছ্বাস নাই। এই নিস্পৃহ তরঙ্গের সংযত আন্দোলনই বোধ হয় প্রেমেন্দ্রবাবুর জীবন দর্শন। প্রেমেন্দ্রবাবুর সমগ্র কাব্যের মধ্যে ভাবের এমন মিতব্যয়িতা আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমার মনে হয় তিনি অনেক পরিণত বয়সে কাব্য রচনায় হাত দিয়াছিলেন। তাই জীবনের অনেকখানি তাঁর কাব্যে জুড়িয়া বসিয়াছে। প্রত্যক্ষ অনুভূতি যখন তীব্রতা হারাইয়া নির্মল, নিস্তেজ হইয়াছে, যখন ম্লান মাধুর্য রসে পরিপূর্ণ

তখন যেন জীবনের ছন্দ সংগত সুরে বাজিয়া উঠিল। কাব্যে জীবনানুভূতি যদি দ্রষ্টা ও স্রষ্টার স্তরে না পৌঁছায় তবে সে কাব্য রসসিক্ত হয় না। জীবনানুভূতিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দৃষ্টি দিয়া দেখিতে হইবে। আমার জীবনকে আমার চোখে, আমার জীবনকে অপরের চোখে—এই দুই চোখেই দেখিতে হইবে। এবং সে দৃষ্টি হইবে নিস্পৃহ, উত্তেজনাবিহীন। মন যেখানে উত্তেজনা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছে সেইখানেই ফেনিলোচ্ছল ভাব স্তিমিত হইয়া জীবনতটের সমবর্তী হইয়াছে। জীবনতট সমবর্তী ভাবধারা একটা গভীর সুরের মত অনুক্ষণ বাজে, কিন্তু তাহা সঙ্গতিবিহীন সুরের অলঙ্কার বিন্যাস নহে। মানস চেতনা যতই সুরে নিমগ্ন হইতেছে ততই চোখে সুদূর-

"যদিও সকল চাওয়া-পেন পুষ্পতলে
আনি মুক্ত বাথা-সিন্ধু ঘোলে ;
যদিও অশ্রুর মূল্যে কোন স্বর্গ মিলিবে না জানি,
হাসি-অশ্রু-উচ্ছলিত তবুও দুর্দিন
এ বিশ্বাস জীবনের বিষপাত্রখানি
ওষ্ঠে তুলি' ধরি,
নিঃশেষিয়া যাবো পান করি—
শুধু তার সমতন অনুরাগ ভরি'
জীবন-শিয়রে বসি খেলা করে সে স্বপ্ন-সুন্দরী।"

॥ লেখাপড়ার ভালো বই ॥

AN INTRODUCTION TO MODERN ECONOMICS

—Prof. P. K. Ghosh, M.A. Rs. 8-8-0

INTER. BENGALI DIGEST

[6th Year of Publication : 1956-57 Rs. 3-0-0]
—Prof. M. Sen, M. A.

ভালো ভালো বই ॥

BOOKS OF GENERAL INTEREST.

জন বোয়ারের—
এ পিলগ্রিমেজ Rs. 2-4-0
আর. এল. ষ্টিভেনসনের—
ছোটদের ডক্টর জেকীল এ্যাণ্ড মিষ্টার হাইড
অনুবাদক—শ্রীঅনল বন্দ্যোপাধ্যায় Rs. 1-8-0
রমেশচন্দ্র দত্তের—
রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা Re. 1
মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত Re. 1/-
—সম্পাদক ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
দেবকুমার ঘোষের—
শিলানগরের রাণী Rs. 2/-
মেঘ সুন্দর Rs. 1/4 -

NOTES ON পাঠ-সংকলন—Rs 3-8-0 [28th year of Publication : 1957.] By—Jagatiaran Das.

ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ., পি.এইচ.ডি. বলেন : পাঠ্য পুস্তক অধ্যয়ন করিতে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী টীকা-পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া অনুভব করে তাহাদের নিকট শ্রীজগৎতারণ দাস লিখিত পাঠ-সংকলনএর টীকা-পুস্তকখানি বিশেষ আদরণীয় হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এই টীকা-পুস্তকখানি ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী সহজবোধ্য ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

শ্রী ভারতী পাবলিশার্স
৫, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

ভয়

মানবেন্দ্র পাল

এ পাশে বড়ো বড়ো গাছ—জমাট অন্ধকার, আর ও পাশে শহরের উপকণ্ঠ। এ পাশে ভাঙা মন্দির, পোড়ো বাড়ি, বট অশ্বত্থের জটলা, আর ও পাশে নতুন বাড়ির কাঠামো, ছোট্ট এক সেবাশ্রম আর পুরনো অচল এক চালের কলের ভগ্নাংশ।

এই ছয়ের মাঝ দিয়ে চলে গিয়েছে তারকেশ্বর লাইন। আর গিয়েছে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড এই রেলপথের বুক এ কোঁড় ও কোঁড় করে।

ও পাশে ভাঙা কলবাড়ির কাছে এসে বাস দাঁড়ায়—যাত্রীবাহী বাস। জোরে জোরে হর্ণ বাজে। পাশের গুমটি ঘর থেকে নীল জামা গায়ে ছবিলাল বেরিয়ে আসে তাড়াতাড়ি। এদিক ওদিক একবার দেখে নিয়ে গেট খুলে দেয়।

আর একবার হর্ণ বাজিয়ে ড্রাইভার গাড়িতে ষ্টার্ট দেয়। উর্দ্ধশ্বাসে গাড়ি ছোটে। অনেকটা লেট হয়ে গেছে।

ও পারের ভাঙা মন্দির পাশে ফেলে বাস বেরিয়ে যায়। কালো কুচকুচে পীচ ঢালা গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড আবার কেমন মড়ার মতো পড়ে থাকে।

মড়ার মতো শুধু গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডটাই পড়ে থাকেনা—এ অঞ্চলের হাওয়াটাই যেন কেমন থমথমে। এদিকে আম-আনলকী, পলাশ-কৃষ্ণচূড়া সব যেন কেমন থমকে রয়েছে। লোক—নেই, জন—নেই, নেই বাসভূমি। শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। মাঝখান দিয়ে কেবল এগিয়ে গিয়েছে পীচ ঢালা পথ। আর ওই তারকেশ্বর লাইন।

কালো পীচ—কালো জঙ্গল আর তারই মাথায় মাথায় ইঞ্জিনের কালো ধোঁয়া এক এক জায়গায় জমাট বেঁধে ওঠে। তবু এ অবস্থা বেশিদিন থাকবে না। এরই মধ্যে ওই তো নতুন বাড়ির কাঠামো উঠছে। সেবাশ্রম রয়েছে। হয়তো শিগ্‌গির কলবাড়িটাও ভাঙা হবে। তৈরী হবে কলকাতার অনুকরণে রাজপ্রাসাদ।

এতো ভবিষ্যতের কথা, কিন্তু দুঃসাহস ওই 'বীণা পেন্টিং ওআর্কস্'এর মালিকের। এই নির্জন পথের ধারেও বাসা বেঁধেছে।

বেশি দূরে নয়, ওই গুমটি ঘরের বিপরীত দিকে, রেল লাইনের দক্ষিণ পাশে।

বাস-যাত্রীদের কেউ কেউ দেখতে পায়, ছোট্ট একটা বাড়ি। গলায় তার ঝুলছে মস্ত কী এক সাইন বোর্ড।

তারকেশ্বরের যাত্রীরা আরও স্পষ্ট দেখে। দেখে, ছোট্ট একখানা বাড়ি আর সেই বাড়ির অর্ধেক জুড়ে মস্ত সাইন বোর্ড ঝকঝক করছে—'বীণা পেন্টিং ওআর্কস্'।

বীণা পেন্টিং ওআর্কস্এর দিকে তাকাতে তাকাতে কখনো কখনো দেখা আর একখানি মুখ—ছটি চঞ্চল চোখ। বেশিক্ষণ দেখা যায় না। কালো ধোঁয়া উড়িয়ে ট্রেন তখন ডিস্‌ট্যান্ট সিগন্যাল অতিক্রম করে যায়।

বীণাকে বেশিক্ষণ দেখা না গেলেও বীণা দেখে অনেকক্ষণ। যতক্ষণ দেখা যায় ট্রেনের ধোঁয়া, ততক্ষণ তাকিয়ে থাকে।

দিনে রাতে অনেকবার ট্রেন যাতায়াত করে। রাত্রের অন্ধকারে ট্রেনের ওপর তার মোহ থাকে না—যতক্ষণ দিনের আলো ততক্ষণ বীণা উৎকর্ণ। মন্নু তো জানা আছেই তবু শব্দ পেলেই ছুটে আসে। বীণা পেন্টিং ওআর্কসের ঝুলন্ত সাইন বোর্ডের নীচে ছোটো ছোটো জানালার ফাঁক দিয়ে যতটুকু দেখা যায়, ততটুকুই আকুল আগ্রহে দেখে।

এ দেখাটা শুধু তার মোহ নয়। চঞ্চল দৃষ্টি তার চলন্ত গাড়ির প্রতি কক্ষে কাকে যেন অনুসন্ধান করে ফেরে।

বীণা একদিন হঠাৎই যেন কাকে দেখেছিল তারকেশ্বর-গামী ট্রেনের খোলা জানলার ধারে। দেখেই যেন চমকে উঠেছিল। একান্ত চেনা একটি মুখ অনেকদিন আগের!

আশ্চর্য, সে মুখ এত দূর থেকে বীণাকেও চিনতে ভুল করেনি।

যেদিন দেখল, সেদিন আর কোনো কাজ করতে পারল না বীণা। কোথায় যেন তলিয়ে গেল তার মন। কী এক রোমাঞ্চকর পুলক তার মনের গহনে থেকে থেকে শিউরে উঠতে লাগল।

কিন্তু এতবড়ো আনন্দের সংবাদ পরিবেশন করবার পাত্র নেই। যে আছে সে তো ওই গোপেন। সর্বনাশ!

শুধু সে-দুপুরটা নয়, তারপর থেকে এমনি কত দুপুর কাটল; বীণা কী এক দুর্বার আগ্রহে ছুটে এসে দাঁড়ায়। বাড়ি কাঁপিয়ে লাইনের বুকে শব্দতরঙ্গ তুলে ইঞ্জিন ছুটে যায়। বীণা তাকিয়ে থাকে;—যদি আর একবার দেখা মেলে। শুধু চোখের দেখা।

তারপর এমনি করে দুপুর গড়িয়ে যায়, বিকেল আসে। বিকেল ফুরিয়ে যায়, সন্ধ্যে আসে। সন্ধ্যে আসে, আর রাজ্যের অন্ধকার যেন ভিড় করে নামে তার বাড়ির চারি পাশের আম-আমলকীর পাতা বেয়ে। অন্ধকার জমাট বেঁধে ওঠে রেল লাইনের দু'পাশে, শালুক-ভরা ওপাশের পুকুরটার কোলে কোলে। সেই অন্ধকারের মাঝে কেবল ছবিলালের গুমটি ঘরে একটা ম্লান আলো জ্বলে। আর জ্বলে লালবাতি ডিসট্যান্ট সিগন্যালের মাথায়।

বীণা তাড়াতাড়ি খিল বন্ধ করে চুপ চাপ ঘরের এক কোণে গিয়ে বসে। মনটা ভারী হয়ে থাকে—গা ছমছম্ করে। ভালো লাগে না—কিছুতেই ভালো লাগে না এ নিঃসঙ্গ জীবন।

অথচ জীবনসঙ্গী তো তার আছে। একেবারে নতুন। তবু দুর্ভাগ্য, সে নতুনত্বের আস্বাদ বীণা কতদিন পেল?

কিন্তু এই দুর্ভাগ্যকেই একদিন দূর থেকে সৌভাগ্যের জয়পতাকা বলে ভ্রম হয়েছিল। ভ্রম হয়েছিল শুধু বীণার নয়, বীণার দূর সম্পর্কের মামার এবং নিকট সম্পর্কের অনেকগুলি সঙ্গী-সাথীরও—বীণার বর যা-তা নয়! একেবারে ছবি আঁকিয়ে।

কিন্তু—

এই তো কটা মাস গেছে। কিন্তু কোথায় সেই গুণী ব্যক্তিটি? বাইরে-ঘরটিতে শিল্পীর রঙ তুলি গড়াগড়ি যায়—যেন কোনোদিনই কেউ ব্যবহার করেনি। কবেকার কতকগুলো সাইন বোর্ড ধুলোয় মলিন হয়ে এক পাশে পড়ে রয়েছে।

কিন্তু বাইরের সাইন বোর্ড এরই মধ্যে দুবার রঙ করা হয়েছে। সেদিকে গোপেনের প্রখর দৃষ্টি।

অনেকদূর থেকেও তাই সাইন বোর্ডটা ঝক্‌ঝক্ করে, ঝলমল করে বীণা পেন্টিং ওআর্কস্।

কিন্তু গোপেন কাজ করে কই? একটা দিনও তো বীণা দেখল না গোপেনকে রঙ তুলি নিয়ে বসতে। অথচ ভোর না হতেই মানুষটা বেরিয়ে যাবে তাড়াতাড়ি, যেন কত কাজ! আর ফিরবে সেই রাত দুপুরে। তাও একা নয়, সঙ্গে দু জন তিন জন থাকবেই।

বাড়ি ফিরেই নিজের ভাগের ভাত নিয়ে বসবে বাইরের ঘরে। ভাগাভাগি করে খাবে। তারপর বীণাকে বলবে, তুমি খিল দিয়ে শুয়ে পড়ো, আমরা বাইরের ঘরে শোব।

দেখতে দেখতে আলো নিবে যায়, ঘর অন্ধকার হয়ে আসে। কিন্তু বীণা শোয় না।

বীণা শোয় না। কেমন করে শোবে? কোনা মেয়ে কি চায়, গভীর গাঢ় রাত বন জঙ্গলের শতেক বিপদ-ভয়ের মধ্যে একা একা কাটাতে? মাঝ রাতে যদি ভয় পেয়ে ঘুম ভেঙে যায়, তা হলে সে ভাঙা-ঘুমের স্বাদ কি একা মেটে?—বিশেষ যে একবার সঙ্গ পেয়েছে!

প্রথম প্রথম মনকে বুঝিয়েছে, তারপর অভিমান করেছে, তারপর রাগ। এখন জেগেছে দুর্বার কৌতূহল।

ভাক্তার পুরুষ তো! এখানে এসে পর্যন্ত একটা রাতও একা ফিরবে না? সারাদিন কোথায় থাকে? সারা রাত কী করে?

একদিন সুযোগ পেয়ে বীণা বলে ফেলেছিল,—আমার এখানে আর মন টিকছে না।

গোপেনের দীর্ঘ দেহটা একটু কুঁকড়ে উঠল। চোখ দুটো ছোটো ছোটো করে ঠাট্টার সুরে বললে—কেন?

—সারা দুপুর একা একা থাকি, কেমন বিশ্রী লাগে।

গোপেন আশ্চর্য হয়ে বললে—বিশ্রী লাগবে কেন?

রাগ হ'ল বীণার। কিন্তু মুখে বললে—ভয় করে।

—ভয়! গোপেন অট্টহাসি হেসে উঠল।

বললে—ভয় পেলে এখান থেকে ছবিলালকে ডেকো। ওই তো ন'টি ঘর!

গোপেন সেদিন বীণাকে আর কিছু বলতে দেয় নি। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গিয়েছিল। যেন অনেক কাজ।

কিন্তু বীণা রাতে শোয় না। আলো নিবিয়ে অন্ধকারে পা টিপে টিপে এসে দরোজায় কান লাগিয়ে শোনবার চেষ্টা

কিছুই শুনতে পায় না। হয়তো একটু শব্দ হ'ল খুট্—অমনি ঘর সুদ্ধ সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। একটু পরে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে—ফস্। তারপর আবার সব চুপ।

দরজার আড়ালে থেকে বীণারও সর্বাঙ্গ যেন কেমন অকল্যাণের আশঙ্কায় ছম ছম করে ওঠে।

একদিন বীণা মনে মনে স্থির করলে, যেমন করেই হোক এ জায়গা ছাড়তেই হবে। এখানে এভাবে একা একা থাকা যায় না। এখানে কী এক সর্বনেশে বিপদ যেন ওৎ পেতে রয়েছে। তার স্বামী গোপেন নিজে যেন সঙ্গে করে সেই সর্বনাশকে বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গীরা যেন এক একটা কালো ছায়া।

অথচ কেন যে এমন মনে হয়, তা নিজেও বুঝতে পারে না।

একদিন বীণা গোপেনকে জিগ্যেস করতে গিয়েছিল। জিগ্যেস করেছিল—ওরা কারা?

প্রথমে গোপেন একটু থমকে গিয়েছিল। তারপর কঠিন স্বরে বলেছিল—কেন?

—এমনি জিগ্যেস করছি।

মুহূর্তখানেক কী ভেবে গোপেন বলেছিল—ওরা আমার বন্ধু।

—কিন্তু—

গোপেন যেমন একরকম কঠোর স্বরে বীণাকে থামিয়ে দিয়েছিল—আর কিছু কৈফিয়ৎ চেয়ো না।

বীণার চোখের পাতা দুয়ে গিয়েছিল অপমানে লজ্জায়। আর কিছু জিগ্যেস করে নি, কথাও বলে নি।

কিন্তু কথা না বললেও যে আর চলছে না। এ নির্জন বনভূমি যে সারা দুপুর ধরে তার কণ্ঠরোধ করে বসে। কী এক দুঃসহ বেদনা—কী এক অসহ্য নিঃসঙ্গতা যে তাকে মুহূর্তে মুহূর্তে ক্ষত বিক্ষত করে দেয়।

তাই বীণা একদিন মনে মনে স্থির করলে, যেমন করে হোক এ জায়গা বদলাতেই হবে। এ জায়গা বদলালেই এ বন্ধুগুলোও বিদেয় হবে। গোপেন হয়তো তুলি রঙ নিয়ে বসবে নতুন উৎসাহে।

সেদিন অনেক ভেবে চিন্তে বীণা শুটিশুটি মিষ্টি কথা বললে।

গোপেন সবিস্ময়ে বললে—এ কী কাঁদছ কেন?

বীণা বললে—তুমি এখান থেকে বাসা তুলে দেবে কিনা বলো।

গোপেনের কপালের নীচের গভীর ক্ষত চিহ্নটা বেঁকে উঠল। বললে—কেন?

—আমি এখানে টিকতে পাচ্ছি না।

—ছেলেমানুষী কোরো না!

গোপেন চলে যাচ্ছিল, কিন্তু বীণা সহসা ওর জামা ধরে টানল। বললে—আমার সারা দুপুরটা কী ভয়ে থাকতে হয় জান?

—কীসের ভয়?

—জানি না। সে মুখ ফুটে বলা যায় না।

গোপেন বিচলিত হয়ে জিগ্যেস করলে—শুনিই না।

এদিক ওদিক চেয়ে বীণা বললে—কী জানি জায়গাটা বড়ো খারাপ। সমস্ত দুপুর—

হঠাৎ বীণা একটু থামল। চোখ দুটো যেন কেমন ভয় পেয়ে বড়ো বড়ো হয়ে উঠল। এগিয়ে এল গোপেনের বুকের নীচে। ওর হাতটা নিজের মুঠোয় টেনে নিল।

—হ্যাঁ। সমস্ত দুপুর আমার ঘরের চারিদিকে পায়ের শব্দ পাই। কে যেন ঘুরে বেড়ায়। দরোজা ঠক্ ঠক্ করে। ইঁট ফেলে কুয়োতলায়। মাগো!

বীণা অকস্মাৎ গোপেনকে সর্বাঙ্গে দিয়ে জড়িয়ে ধরে।

গোপেন সে বন্ধন থেকে বীণাকে সরিয়ে দিয়ে গম্ভীর ভাবে বলে—তুমি দেখেছ কাউকে?

বীণা নিচু গলায় বলে—দেখব আর কাকে? সে কী দেখা যায়!

গোপেন মাথা নিচু করে অনেকক্ষণ কী যেন ভাবে! তারপর কোনো উত্তর না দিয়েই বেরিয়ে যায়।

শীতের সন্ধ্যা যখন নেমে এল, তখন ঘরের কোণে ছোট্ট হারিকেনটা জেলে আজ বীণা অনেক দিন পর হঠাৎ আশা করলে গোপেন আজ একা আসবে। আসবেই। না এসে পারবে না।

প্রথম শীতের এই রোমাঞ্চটা কত মধুর—কত দুর্লভ—মেয়ে হয়ে বীণা বোঝে আর পুরুষ হয়ে গোপেন বুঝবে না?

কিন্তু গোপেন সত্যিই বোঝে না। কিম্বা গোপেন যা বোঝে তার কাছে এসব ক্ষণিকের পুলক কিছুই নয়। হয়তো তাই আজও যখন গোপেন ফিরল তখন দেখা গেল সঙ্গে তার তিনজন সঙ্গী।

দরোজা খুলে দিতেই বীণার মুখটা ভারী হয়ে উঠল।

গোপেন হেসে বললে—দেখেছ, আজ কিন্তু সকাল সকাল ফিরেছি।

বীণা উত্তর দিলে না। হন হন করে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। গোপেনও এল। হাসি হাসি মুখ।

বললে—কী আজ আর দুপুরে কেউ ঘোরা ফেরা করেছিল?

বীণা বললে—আমার কথা বিশ্বাস না হয়, নিজে একদিন লুকিয়ে থাকলেই টের পাবে।

গোপেন হো হো করে হেসে উঠল।

বললে—তোমার আঁচল ধরে রাত্রিদিন বসে থাকলে আমার চলে গিন্নি? দাও ভাত দাও দিকি। দুটো চাল বেশি নিয়েছিলে তো? আজ আবার নিরেটাও এসেছে।

কথা শেষ হতেই হঠাৎ ওর চোখ পড়ল দেওয়ালে। আঁতকে উঠল যেন—ও কী!

আশ্চর্য হল বীণা—কেন?

—আমার ফটো টাঙিয়ে রাখতে কে বললে?

বীণার মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে গেল।

গোপেনের একখানা বাঁধানো ফটো অনেকদিন ধরে তার বাক্সর পড়েছিল। আজ দুপুরে সেটা বের করে টাঙিয়েছিল। টাঙিয়েছিল আর এক দৃষ্টে তাকিয়ে মনে মনে বলেছিল'—

—আজ তুমি একা আসবে।

কিন্তু আশ্চর্য গোপেন। তখনই এক হাঁচকা মেরে পেরেক শুদ্ধ ফটোটা ছিঁড়ে নিয়ে বাইরে ঘরে চলে গেল।

অবাক বিস্ময়ে বীণা দাঁড়িয়ে রইল। বুঝতে পারল না তার অপরাধটা কোথায়।

পরের দিন দুপুরে হঠাৎ অসময়ে গোপেন এসে হাজির। বীণা প্রথমে চমকে উঠেছিল। ভেবেছিল, বুঝি প্রমাণ চাইতে এসেছে, সত্যি কারও পায়ের শব্দ বাড়ির চারিদিকে পাওয়া যায় কি না।

কিন্তু না, গোপেন সে কথা ভুলে গিয়েছে। এখন যেন কেমন বিভ্রান্ত দেখাচ্ছে। কেমন বোকার মতো হাসি মাখা চাউনি।

—বীণা!

—বলো।

—এই দেখো তোমার জন্যে কী এনেছি।

—ওমা হার! একী সোণার হার! লকেট! কোথায় পেলে?

গোপেনের ঠোঁটে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠল।

বললে—গেলে মানে ? চুরি করেছি না ডাকাতি করেছি ?

লজ্জিত হয়ে বীণা বললে—না না, তা বলছি না—

—তুমি কি মনে কর, আমার স্ত্রীকে একটা সোণার হার দেবার যোগ্যতাও নেই ?

বীণা আর কিছু বললে না। শুধু এগিয়ে এসে আদরের সুরে বললে—তুমি পরিয়ে দাও।

বীণার গলায় হারটা ঝুলিয়ে দিতে দিতে গোপেন বললে—কিন্তু সব সময় পরে থেকো না। বড় খারাপ জায়গা।

হ্যাঁ, আর একটা কথা। এই হারের কথা যেন আমার বন্ধুরা জানতে না পারে।

গোপেনের শেষ কথাটায় বীণার বুকে যেন কেমন একটা ধাক্কা লাগল।

আপনা আপনিই মুখ থেকে বেরিয়ে এল—কেন ?

গোপেন কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে বীণার পানে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বললে—তোমার এই কথার কথার 'কেন' বলাটা বদলাবার চেষ্টা কোরো বীণা।—যদি বাঁচতে চাও।

এই বলে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল।

দু' তিনটে দিন কেটে গেল।

দুশ্চিন্তায় বীণার ঘুম হয় না। কেমন যেন দিনে দিনে বিশ্রী লাগছে তার এই পরিবেশ। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন গোপেনও দুর্জ্ঞেয় হয়ে উঠছে। এ কী জ্বালা !

বীণা নিজে থেকে যত ধরা দিতে চায়, গোপেন যেন ততই সরিয়ে দেয়। এ জগতে বীণা যেন তার কাছে কিছুই নয়। একটা প্রয়োজনের নিমিত্ত। তার চেয়ে ঢের বেশি আকর্ষণ রয়েছে, যার পেছনে সারা দিনরাত ঘুরছে। বীণার দিকে ফিরে তাকাবার ফুরসৎ নেই।

কিন্তু এতো অভিমানের ব্যথা। তার চেয়েও আর এক তীক্ষ্ণ সন্দেহ মাঝে মাঝে বীণাকে চকিত করে দেয়।

এই সেদিন হঠাৎ দুপুরে এসেছিল দুজন খাকি পোশাক পরা পুলিশ। অনেকক্ষণ তারা সাইন-বোর্ডটার দিকে তাকিয়ে কী দেখল। তারপর কড়া নাড়ল।

বীণা ভয়ে ভয়ে দরোজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়ালো।

—এখানে কজন লোক থাকে ?

কে একজন কর্কশ স্বরে প্রশ্ন করেছিল।

বীণা প্রথমে উত্তর দিতে পারে নি।

আবার সেই কর্কশ স্বর—বলো।

—একজন।

—কে হয় তোমার ?

—স্বামী।

—কী করে ?

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল সেদিন। সত্যি, কী করে তার স্বামী ?

—কী করে ?

বীণা একবার ভাবলে, বলে ফেলে, সে জানেনা।

কিন্তু—

বলে ফেললে—সাইন বোর্ড আঁকে।

দুজনে নিচু গলায় একবার কী আলোচনা করলে। তারপর চলে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বীণা।

কিন্তু না। আবার ফিরে এল তারা।

এবার দ্বিতীয়জন জিগেস করলে নরম গলায়—হ্যাঁ মা, এখানে কোনো জীপ গাড়ি দেখেছ ? জীপ ? জীপ ? মানে ছোটো মটোর গাড়ি ? এই ধরো ছাই রঙের।

বীণা মাথা নেড়ে জানিয়ে দিয়েছিল, না।

কিন্তু তারা চলে গেলে হঠাৎই মনে পড়ে গেল একদিন সত্যিই অমনি একটা জীপ দেখেছিল, এই কিছু-আগে, ওই শুমটি ঘরের পাশে।

গোপেন ফিরলে সেদিন ভয়ে ভয়ে বীণা সব কথা খুলে বলেছিল।

আশ্চর্য। গোপেন তার কোনো উত্তর দেয় নি। তখনি বাইরের ঘরে এসে সঙ্গীদের সঙ্গে বিড়ি ধরিয়ে কী আলোচনা করতে লাগল। একটু পরে শুধু বীণাকে আদেশ করেছে—দরোজা বন্ধ করে তুমি শুয়ে পড়ো।

এ আদেশ তো নিত্য নৈমিত্তিক। তবু আঘাতটা নিত্যই নতুন করে এসে লাগে।

ফোটো—শ্রীরামকিঙ্কর সিং

সার্থক সৃষ্টি

কোলে বিস্কুট

খুট্ খুট্ করে দরোজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল।

চমকে উঠল বীণা।

—কে?

নিজের চমকানোতে নিজেই লজ্জিত হল। গোপেন এসেছে। এ কদিন তো একটু সকাল সকালই ফিরছে। কর্তব্যপরায়ণ স্বামী।

বীণা উঠে খিল খুলতে গেল। মনে মনে ভাবল, কিন্তু এত সকাল সকাল ফিরল? এই তো সবে সাতটার ট্রেনটা গেল একটু আগে।

হবেও বা।

তবে কি আজ ও একাই এসেছে?

বুকটা দুরু দুরু কেঁপে উঠল। মনের ভেতর একটা খুশি নেচে উঠল।

বীণা গিয়ে খিল খুলে দিল।

কিন্তু—

কিন্তু পরক্ষণেই দরোজা ঠেলে যে মানুষটি নিঃশব্দ পায়ে এসে দাঁড়ালো তাকে দেখে বীণা চমকে উঠল।

—এ কী তুমি!

আগন্তুক হাসল। বললে—সেদিন দূর থেকে চিনতে তা হলে ভুল করনি।

বীণার মুখে কথা সরল না।

মনে হচ্ছে এ যেন এক স্বপ্ন।

—কী দেখছ অমন করে? শঙ্করকে চিনতে পারছ না?

বীণার বুকের ভেতর তোলপাড় করতে লাগল। এ কী অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা! শীতের এই নিস্তব্ধ রাত্রে অতীতের সেই দুঃসাহসী শঙ্কর আজ হঠাৎ এল কোথা থেকে!

শঙ্কর গলার স্বর নিচু করে জিগেস করলে—আর কেউ আছে?

বীণা মাথা নাড়ল।

—যাক সৌভাগ্য! সেদিন ট্রেণ থেকে দেখার পর কেবলই চেষ্টা করেছি তোমার কাছে আসব বলে। কিন্তু সুযোগ পাই না। নানা দিকে নানা কাজ। তার ওপর যখন খুশী এলেই তো হল না। একবার মাত্র আসব—কিন্তু দেখতে হবে সে আসা যেন ব্যর্থ না হয়।

কথা শেষ করেই শঙ্কর বীণার গালে একটু আদরের স্পর্শ দিল।

বীণা শিউরে উঠল।

শঙ্কর হাসল—কী, ভয় পাচ্ছ?

বীণা উত্তর না দিয়ে পায়ে পায়ে পেছতে লাগল।

শঙ্কর বললে—কিন্তু বীণা, তুমি তো জান, আজ কত দূর থেকে আমি আসছি,—কতদিন পরে!

হয়তো বীণা তা জানে কিন্তু এই মুহূর্তে তার উত্তর দেবার ক্ষমতা আর নেই। শঙ্কর—সেই লোভী দুঃসাহসী শঙ্কর এই মুহূর্তে যে তাকে বন্দী করে ফেলেছে!

শুধু কোনোরকমে মুখটা সরিয়ে নিয়ে অস্পষ্ট আকুল স্বরে বললে—তুমি যাও।

শঙ্কর থমকে গেল।

—তুমি চলে যেতে বলছ! বেশ যাচ্ছি। কিন্তু আর কোনো দিন আমায় দেখা পাবে না।

শঙ্কর ফিরে যাচ্ছিল।

যদি যাওয়া হ'ত তা হলে আজ এই রাত্রে তারকেশ্বর লাইনের চকচকে রেলপথ হয়তো অন্য কোনো এক অন্ধকার কালিমার হাত থেকে রক্ষা পেত।

কিন্তু—

দরোজায় সেই মুহূর্তে একটু শব্দ হ'ল। পরক্ষণেই খিল-খোলা দরোজা ঠেলে ঘরে ঢুকল গোপেন, পেছনে তার নিত্যসঙ্গী দু'জন।

সেই মুহূর্তে হঠাৎই বীণা আর্ত চীৎকার করে উঠল। শঙ্কর থমকে দাঁড়ালো।

গোপেন দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এল। কোনো কথা কইল না। শুধু লোহার মতো কঠিন একটা হাত দিয়ে শঙ্করের শার্টের কলার চেপে ধরল।

সভয়ে বীণা একবার তাকালো গোপেনের মুখের দিকে। কী যেন বলতে চাইল, কিন্তু বলা হল না। গোপেনের দীর্ঘ দেহখানা তখন থর থর করে কাঁপছে—দু'চোখে আগুনের মতো দৃষ্টি যেন জ্বলছে আর কপালের নীচে ক্ষত চিহ্নটা কী বীভৎসভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে।

গোপেন কোনো কথা বললে না। সঙ্গীদের কী ইসারা করলে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আষ্টে পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল

মুহূর্ত ভাবল বীণা কাপড়ে। তারপর ধরাধরি করে গেল লাইনের ধারে।

বাইরে তখন ঘন কালো জমাট অন্ধকার। শেষ অগ্রহায়ণের হাড়-কাঁপানো শীত সেই অন্ধকারের বুকে যেন তার কালো বরফের আসন পেতেছে।

কত মুহূর্ত গেল কে জানে? কত মিনিট? কত ঘণ্টা? দেওয়ালের গায়ে ঠেসান দিয়ে মূর্তির মতো নিশ্চল নিষ্পন্দ বীণা দাঁড়িয়ে আছে। কী যেন ঘটে গেল। কোনো কিনারা পাচ্ছে না। মনে হচ্ছে এ যেন একটা দুঃস্বপ্ন!

দুঃস্বপ্ন নয়। ওই যে লাস্ট ট্রেণটা আসছে! কত দূরে, কিন্তু আজ এত সিটি দিচ্ছে কেন? বাড়িটা এত কাঁপছে কেন? এত জোরে কেন ছুটছে ইঞ্জিনটা? ওই চাকার তলায় যদি আজ কেউ পড়ে যায়?

বাইরের ঘরে জুতোর শব্দ হ'ল। চমকে উঠল বীণা। না গোপেন ফিরে এসেছে। কিন্তু আর সব? শঙ্কর?

কেমন এক রকম পৈশাচিক হাসি গোপেনের মুখে ফুটে উঠল।

বললে—আর ভয় নেই। এবার থেকে সারা দুপুর নিশ্চিন্ত হয়ে থেকো। ও বেটা আর কোনো দিন আসবে না। জন্মের সাধ মিটেছে।

কথা শেষ করে নিজেই আজ দরোজায় খিল লাগালো। তারপর—

হ্যাঁ আজ অনেক দিন পর শেষ অগ্রহায়ণের এই একটি মাত্র রাতে গোপেন এল একা,—বীণার বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই সোহাগ-কাঙালের রাত!

আজ গোপেনের দু'চোখে যেন কেমন এক মত্ততা। আজ যেন অনেক দিন পর ও আবার হঠাৎ আবিষ্কার করেছে বীণা সুন্দরী, যুবতী—বীণা তার স্ত্রী। আজ যেন নতুন করে আবিষ্কার করেছে, তার ওপর আর কারও দাবী নেই।

গোপেন এগিয়ে আসছে।

কিন্তু বীণা তখন সামনে থেকে সরে গিয়েছে।

মন্মথ রায়ের নাটক

মহাভারতী আড়াই টাকা

মুক্তি আন্দোলনের ভিত্তিতে রচিত সুপ্রসিদ্ধ জাতীয় নাটক

নীরকাশিম, মমতাময়ী হাসপাতাল, রঘুডাকাত

অভিনব নাটকত্রয় একত্রে একখণ্ডে : ৫৲ টাকা

কারাগার, মুক্তির ডাক, মহুয়া

প্রসিদ্ধ নাটকত্রয় একত্রে একখণ্ডে : ৩৲ টাকা

জীবনটাই নাটক আড়াই টাকা

রঙমঞ্চ ও তাহার অন্তরালে নটনটীদের জীবন নাই

অন্যান্য বিখ্যাত নাটক

অশোক ২৲ সাবিত্রী ২৲ সতী ১৷৷০ বিদ্যুৎপর্ণা ৸০ রূপকথা ৸০ রাজনটী ৸০ কৃষাণ ২৲ খনা ২৲ চাঁদসদাগর ২৲ উর্ব্বশী নিরুদ্দেশ ৷৷০ কাজল রেখা ৸০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৮

আপনার নিজস্ব জাতীয়

বীমা প্রতিষ্ঠান

হিন্দু ফ্যামিলি এনুয়িটি ফাণ্ড লিঃ

প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

—হিন্দু ফ্যামিলি বিল্ডিংস—

পি, ১৩ মিশন রো এক্সটেন্সন্, কলিকাতা—১

—প্রতিষ্ঠিত ইং ১৮৭২—

বিগত ১৯৫৪ সালের ভ্যালুয়েশনে একচুয়ারী কর্ত্তৃক অনুমোদিত

বোনাসের হার

আজীবন বীমা—২০৲ | মেয়াদী বীমা—১৬৲ | প্রতি হাজার টাকায় প্রতি বৎসর

BENGAL JUTE MILL

COMPANY LIMITED

8, Dalhousie Square East,
CALCUTTA.

Manufacturers of all Qualities of

JUTE GOODS

FASHIONABLE JUTE CARPETS
For All Purposes and at Economical Rates

Available in Various Shades and Designs

JACQUARDS, DOBBIES, FLOOR RUNNERS,
CHAIR CLOTHS & SCHOOL MATTINGS.
ALSO JUTE WEBBINGS

Twines, Spool and Cops Our Specialities

WANTED AGENTS FOR UNREPRESENTED AREAS

TELEGRAMS & CABLES
CALCUTTA-(INDIA).
"HEMPBALER"

TELEPHONES
MILLS: HOWRAH-13
OFFICE **22-6853-58**

গ্রন্থাগার ও গবেষণা

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

গতিক বৎসর হইল, গ্রন্থাগার আন্দোলন ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে, বেশ দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন স্থানে বৎসরের ভিতরে সভা-সমিতি-সম্মেলনের আয়োজন হইতেছে। বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিকগণ বিদেশে গমনান্তর তথাকার গ্রন্থাগার পরিচালনা এবং গ্রন্থাগারের সাধারণ প্রয়োজনীয়তাও স্বচক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। সরকারের সামাজিক শিক্ষা (Social Education) বিভাগ সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের একটি প্রকৃষ্ট উপায়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন এই গ্রন্থাগারকে। প্রতি বৎসর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন জেলায়—সহরে ও পল্লীতে যে সকল গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাদের অর্থসাহায্যও করিয়া আসিতেছেন। আজিকার দিনে জনশিক্ষাকল্পে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সর্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে।

জনশিক্ষা তথা সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার ব্যপদেশে গ্রন্থাগার যেমন প্রয়োজন, তেমনি আর একটি ব্যাপারেও উহার আবশ্যকতা অত্যধিক। বিভিন্ন দেশের জ্ঞানভাণ্ডার যে সব গ্রন্থে বিধৃত তৎসমুদয়ের সমাবেশ হয় এখানে। জ্ঞান ত্রিবিধ—কালজ্ঞান, দেশজ্ঞান ও লোকজ্ঞান। এই ত্রিবিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার এই গ্রন্থাগার। আবার এই ত্রিবিধ জ্ঞানের অনুশীলন ও গবেষণার ক্ষেত্রও হইল এই স্থল। কাজেই শিক্ষার্থী ও গবেষক উভয়েরই তীর্থস্থান স্বরূপ গ্রন্থাগার বিরাজ করিতেছে। ব্যক্তিগত জীবনে ইহা কতখানি উপলব্ধি করিয়াছি বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। গবেষণা-ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের আবশ্যকতা কত তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস এখানে দিতে প্রয়াস পাইব।

বাংলা দেশে যতগুলি সাধারণ গ্রন্থাগার আছে তাহার মধ্যে 'ন্যাশনাল লাইব্রেরী' বাদে অতি অল্পই শতবর্ষের পুরাতন। এই সকল গ্রন্থাগারের সঙ্গে সঙ্গে এই সময়ের মধ্যে কতকগুলি পারিবারিক গ্রন্থাগারও গড়িয়া উঠে। পারিবারিক গ্রন্থাগারের পক্ষে উত্থান ও বিলয় যত দ্রুত ও স্বাভাবিক, সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষে তেমনটি সচরাচর ঘটে না। এইজন্য পারিবারিক গ্রন্থাগারের মূল্যবান গ্রন্থাদি যত তাড়াতাড়ি সাধারণ গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত হয় ততই মঙ্গল। আবার যে সকল পুরাতন গ্রন্থাগার আছে তাহারও পরিমার্জন ও সংশোধন এবং সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। নচেৎ এতদিন যেরকম হইয়াছে, সেইরূপই বহু মূল্যবান্ গ্রন্থ ও পুথিপত্র বিনষ্ট হইবে, বাংলার এবং বাঙালীর সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ লইয়া গবেষণা ও অনুসন্ধানের একটি প্রকৃষ্ট উপায় আমাদের হাতছাড়া হইয়া যাইবে। এইরূপ আশঙ্কার কারণগুলি আগে নিবেদন করি।

উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান ধারক ও বাহকরূপে রাজা রাধাকান্ত দেবের প্রসিদ্ধি। তিনি ঐ সময়ে বহু প্রচেষ্টা ও প্রতিষ্ঠানের পুরোভাগে ছিলেন। প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াপন্থী বলিয়া পরবর্তী কালে তাঁহার ভাগ্যে নিন্দা-প্রশংসা দুই-ই জুটিয়াছে। তিনি যদি আর কিছু না-ও করিতেন, একমাত্র শব্দকল্পদ্রুমের সংকলয়িতারূপেই তিনি অমর হইয়া রহিতেন। রাজা রাধাকান্ত স্বকীয় গ্রন্থাগারে সেযুগের ইংরেজী-বাংলা সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, সমসাময়িক ইংরেজী বাংলা সংস্কৃত ফার্সী পুস্তক এবং বহু অমুদ্রিত পুথি ও পাণ্ডুলিপি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি নিজে যে সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাহার মুদ্রিত বিবরণ তো রাখিতেনই, উপরন্তু ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-সভার কার্যবিবরণের নকল, দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ ব্যক্তিগণকে তিনি যে সকল পত্র লিখিতেন তাহার প্রতিলিপি

প্রভৃতিও নিজ গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে—কলিকাতায় দেড় শত, সওয়া শত বৎসরের পুরানো বহু প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু দুই তিনটি বাদে তাহাদের কার্যবিবরণী মুদ্রিত বা অমুদ্রিত অবস্থায় কোথাও আছে বলিয়া জানি না। কাজেই নানা কারণে গ্রন্থাগারটি অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সংস্কৃতির ঐতিহাসিক উপকরণের একটি ধনিবিশেষ। গত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এখান হইতে এ বিষয়ে আশাতীত উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থাগারটি বাঙালী জাতির একটি বিশেষ সম্পদ।

কিন্তু পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে আমরা প্রথম যখন এখানে যাতায়াত আরম্ভ করি তখনই ইহার ভগ্ন দশা। ইহার পূর্বে কোন কোন গুণী ব্যক্তি এখানে যাতায়াত করিতেন, কিন্তু তাঁহারা এখানকার এতাদৃশ উপকরণ-প্রাচুর্য সত্ত্বেও হয়ত ততটা অবহিত ছিলেন না। গ্রন্থাগারটি প্রধানতঃ এক বেহারার তত্ত্বাবধানে থাকিত। সপ্তাহান্তে দ্বার খুলিয়া সে ঝাড়পোঁছ করিত। গ্রন্থাগারিকও এক জন ছিলেন। প্রতি রবিবার সকালে তিনিও হাজিরা দিতেন। কিন্তু ঐ হাজিরা পর্যন্ত। তিনি একবার দেখা দিয়াই বড়শীর ছিপ হস্তে প্রাঙ্গণস্থ পুষ্করিণীতে মাছ ধরিতে চলিয়া যাইতেন। গ্রন্থাগারটির পশ্চিম দিকে পুষ্করিণী, তাহার পশ্চিমে প্রকাণ্ড খেলার মাঠ। গ্রন্থাগারের বারান্দা হইতে একনাগাড়ে অনেক দূর দৃষ্টি যাইত। আমরা পুরাতন বই পত্রাদি ঘাঁটিয়া দ্বিপ্রহরে চলিয়া আসিতাম। গ্রন্থাগারিকের বড়শীর ছিপ কিন্তু অবিরাম মৎস্যাকুলকে আকর্ষণ করিয়াই চলিত। আমাদের চোখের সামনেই খেলার মাঠ তুলিয়া দেওয়া হইল, পুষ্করিণী বুজিয়া গেল। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট সকল সৌন্দর্য-মাধুর্যকে বিলীন করিয়া দিয়া তাহার ভিতর হইতে বিরাট রাস্তা বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। সে মাঠ ও বোজানো পুষ্করিণীর উপর এখন বহু ইমারত উঠিয়াছে। পঁচিশ বৎসর পূর্বে আর পরে এ স্থানের কি অদ্ভুত পরিবর্তন! তবে গ্রন্থাগারটির অবশেষ এখনও সেখানে আছে। কত বৎসর চলিয়া গেল, কিন্তু গ্রন্থাগারিকের একবার দর্শন দিয়াই মাছ ধরিতে গিয়া বসিবার দৃশ্য এখনও চোখের সামনে যেন ভাসিতেছে।

এই তো গেল খাস কলিকাতার বুকের উপরের একটি বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত পরিবারের গ্রন্থাগারের অবস্থা। ইহারই অল্প দিন পরে আমরা উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীতে যাই। এই গ্রন্থাগারটির পরিবেশ অতীব মনোরম। গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত এই সুদৃশ্য গ্রন্থাগার-ভবনটি। অপর পার হইতেও এ ভবনটি দেখিয়াছি, বড়ই সুন্দর লাগিয়াছে। উত্তরপাড়ার জমীদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অপূর্ব কীর্তি এই গ্রন্থাগার। ভবনটির নিম্নতলে গ্রন্থাগার, দ্বিতলে আগন্তুকদের বাসোপযোগী কক্ষোষ্ঠ। পাণ্ডী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বহু গবেষক এখানে অবস্থান করিয়া গবেষণা-কার্যে রত থাকিতেন। কবিবর মধুসূদন দত্ত অসুস্থ অবস্থায় কিছুকাল এখানে সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন। বহু মনীষী ও সাহিত্যিকের পদরেণু-পূত এই গ্রন্থাগার-ভবনটি জাতির একটি তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ। আমরা এখানকার সুসজ্জিত গ্রন্থরাজি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে উহার অনাদর দৃষ্টে ক্ষোভোদ্রিক্তও হই। ভবনটির ভিতর অংশ ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে দক্ষিণ দিকের বারান্দায় গিয়া পৌঁছিলাম। সেখানে দেখি, কতকগুলি বাঁধানো দীর্ঘায়তন বড় বড় বই স্তূপীকৃত এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। দুই-একখানার পাতা উল্টাইয়া বুঝিলাম, এগুলি গত শতাব্দীর প্রথম দিকের বহু মূল্যবান সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র। এগুলি যে কত প্রয়োজনীয় তাহা আমরা গ্রন্থাগারিককে বুঝাইয়া বলি এবং সুষ্ঠুরূপে সংরক্ষণের অনুরোধ জানাই। 'সংবাদ রসরাজে'রও বাঁধানো ফাইল এবং হিন্দু পেট্রিয়টের কতক আনুমা সংখ্যা অন্যত্র দেখিয়াছিলাম। কিছুকাল পরে যখন পুনরায় লাইব্রেরীতে গেলাম, তখন ঐসব ছড়ানো বইও কাগজপত্রের অস্তিত্বই খোঁজ করিলাম। যতদূর মনে হইতেছে, তখন গ্রন্থাগারিক বদল হইয়াছেন। নূতন গ্রন্থাগারিক কিছুই বলিতে পারিলেন না; বারান্দায় গিয়া দেখি সবই পরিষ্কার, কাগজ পত্রের চিহ্ন পর্যন্ত সেখানে নাই।

পুস্তক ও পত্রিকাদির খোঁজে একবার কাশিমবাজারে যাই। মহারাণী স্বর্ণময়ী একটি সুন্দর গ্রন্থাগার নিজ প্রাসাদে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সে যুগের বহু সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা এবং পুস্তক—বাংলা দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির ইতিহাস রচনায় আজ যাহা বিশেষ প্রয়োজন, এখানে সংগৃহীত ও সুরক্ষিত ছিল। ভক্তিভাজন স্বর্গত মৃণালকান্তি ঘোষের মুখে শুনিয়াছি, অমৃত বাজার পত্রিকার প্রথম দিকের ফাইল নষ্ট হইলে মহারাণী স্বর্ণময়ী নিজস্ব গ্রন্থাগার হইতে ইহার এক একটি কপি করিয়াছিলেন। বড় আশা করিয়া কাশিমবাজারে গিয়াছিলাম। কিন্তু গিয়া কি শুনিলাম! গ্রন্থাগারটির মূল্যবান পুঁথিপত্র আর পাইবার উপায় নাই, প্রায় সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অগ্রজপ্রতিম সুকবি সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অনেকের রাজবাটী লইয়া গেলেন। কি কারণে মনে নাই, গ্রন্থাগারটির ভিতরে প্রবেশ করা তখন সম্ভব হয় নাই।

ইহার কিছুকাল পূর্বে স্বর্গত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বহরমপুরের রামদাস সেনের লাইব্রেরীতে পুস্তকাদির খোঁজে যাই। সে লাইব্রেরীটিও বেশ সমৃদ্ধ। একটি প্রকোষ্ঠের আলমারী খুলিয়া দেখা গেল, উই আর ইঁদুর পালা দিয়া বইপত্র নষ্ট করিতে লাগিয়া গিয়াছে। এক-খানির পাতা খুলিয়া দেখিলাম 'মুখার্জিস ম্যাগাজিন'। সে যুগের বিদ্বান্ মনীষী ও সাংবাদিক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত এই সাময়িকপত্রখানি বাঙালীর সাহিত্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধে পূর্ণ থাকিত। ঐ সময়কার সামাজিক ইতিহাস রচনায় এখানির আবশ্যকতা কে অস্বীকার করিতে পারে? রামদাস সেনের এই গ্রন্থাগারটি জাতীয় লাইব্রেরীতে দান করা হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি।

কলিকাতা হইতে মাত্র তের মাইল দক্ষিণে চাংড়ী-পোতার বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরীতে বহু বার যাইতে হইয়াছে। গ্রন্থাগারটি ছোট, কিন্তু একটি বিষয়ে এর প্রয়োজনীয়তা ঢের বাড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ চাংড়ীপোতার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে, 'সোমপ্রকাশ' নামে একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। সে সময়ের প্রচলিত সংবাদপত্র হইতে এখানির নূতন সুর, নূতন আদর্শ, ভাষার পরিপাট্যও অতিরিক্ত। বিদ্যাসাগর মহা-শয়ের উপদেশেই নাকি তিনি এখানি প্রকাশ করেন। সাপ্তাহিক খানি দীর্ঘকাল নানাভাবে স্বদেশের সেবায় নিরত ছিল। অন্যান্য পত্রিকার মত এখানির ফাইলও দুষ্প্রাপ্য। মাত্র চাংড়িপোতার বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরীতেই সোমপ্রকাশের বহু বৎসরের ফাইল রক্ষিত আছে। তবে প্রথম কয়েক বৎসরের ফাইল এখানেও পাওয়া যাইবে না। সোমপ্রকাশের অমূল্য ও দুর্লভ ফাইল-গুলির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা দেখিয়া মনে হয়, বৈজ্ঞানিক প্রথায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা না হইলে এগুলিও বেশীদিন হয়ত থাকিবে না।

চুঁচুড়ার ভূদেব লাইব্রেরীর কথাও এই প্রসঙ্গে একটু বলি। ভূদেব মুখোপাধ্যায় শুধু উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং শিক্ষাবিদই ছিলেন না, তিনি ছিলেন চৌখোস সাং-বাদিক। তৎসম্পাদিত শিক্ষাদর্পণও একখানি অভিনব ধরনের সাপ্তাহিক ছিল। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, সাহিত্য নানা বিষয়ে তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধ নিবন্ধ ইহাতে স্থান পাইত। ইহার অনেকগুলি পরে তাঁহার বিভিন্ন পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। শিক্ষাদর্পণেরও ভাষা, বাচনভঙ্গী, সমা-লোচনা-রীতি দ্বারা তখন 'অমৃত বাজার পত্রিকা' বিশেষ প্রভাবান্বিত হইয়াছিল বলিয়া আমার ধারণা। ভূদেব পরে দীর্ঘকাল যাবৎ 'এডুকেশন গেজেট' পরিচালনা ও সম্পাদনা করিয়াছিলেন। এখানি সরকারী সাহায্য পাইত। ভূদেবকে অতি সাবধানে ইহার বিষয়-সমাবেশ করিতে হইত। হেমচন্দ্রের ভারত-সঙ্গীত প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বড়ই বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। সমালোচনা ব্যপদেশে সংবাদ-পত্র সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা তাঁহাকে অবশ্যই পাঠ করিতে হইত। এইরূপ কতকগুলি বাংলা পত্র-পত্রিকার ফাইল ভূদেব লাইব্রেরীতে সুরক্ষিত ছিল। এ ছাড়া ভারতীয় সাহিত্য ইতিহাস ও সংস্কৃতিমূলক বিস্তর

পুস্তকও এখানে রহিয়াছে। এ লাইব্রেরীর পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা হইতে বহু নূতন বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে, বহু অজ্ঞাত বা স্বল্পজ্ঞাত বিষয়ের উপরে আলোকপাত করা সম্ভব হইয়াছে। বর্তমানে এই অত্যাবশ্যক অমূল্য গ্রন্থাগারটি তালাবন্ধ অবস্থায় আছে! চুঁচুড়া হইতে বঙ্কিম-পার্ষদ ও শিষ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'সাধারণী' সম্পাদনা করিতেন। এই পত্রিকাখানির সম্পূর্ণ ফাইল চুঁচুড়াতেই তাঁহার পুত্রের আনুকূল্যে ব্যবহার করিতে পাইয়াছি। শ্রীরামপুর কলেজ গ্রন্থাগারেও এখন পর্যন্ত এমন সব অমূল্য আকর-গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা রহিয়াছে যাহা সে যুগের শিক্ষা-সংস্কৃতির গবেষকের পক্ষে বিশেষ সহায়ক।

এবারে পুনরায় কলিকাতার কথায় ফিরিয়া আসা যাক্। সংবাদপত্র প্রসঙ্গে আরও দুই-একটি কথা বলিয়া রাখি। কেননা বহুস্থানে যেসব পুরাতন সংবাদপত্রের ফাইল দেখিয়াছি যে-কোন গ্রন্থাগারের পক্ষে তাহা অমূল্য সম্পদ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সে যুগের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা কৃষ্ণদাস পালের কলিকাতার বাসভবনে তাঁহারই 'সম্পাদনায় প্রকাশিত 'হিন্দু পেট্রীয়টে'র বহু বৎসরের ফাইল বিশেষ অনাদৃত অবস্থায় দেখিয়াছি। কৃষ্ণকুমার মিত্র সম্পাদিত 'সঞ্জীবনী'র প্রায় সম্পূর্ণ ফাইল তাঁহার ভাড়াটিয়া বাড়ীতে পুত্রের তত্ত্বাবধানে আছে। কিন্তু এমনি আর কতদিন জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকিবে সে বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। বিখ্যাত সাংবাদিক গিরিশচন্দ্র ঘোষের পৌত্রের হেপাজতে তৎসম্পাদিত 'বেঙ্গলী' 'হিন্দু পেট্রিয়ট' এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান মিরর'-এর ফাইল রহিয়াছে। এগুলিও দেখিবার সুযোগ বড় একটা ঘটে না। শুনিয়াছি, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পারিবারিক গ্রন্থাগার দুর্লভ পুস্তক-সমৃদ্ধ। কিন্তু ব্যবহারের সুযোগ কয়জনের ভাগ্যে ঘটিতেছে? কোন কোন উৎসাহী গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষ পূর্বোক্ত সংবাদপত্রের ফাইলগুলি উদ্ধারে সচেষ্ট হইতে পারেন। অল্পকাল পূর্ব পর্যন্ত জীবিত পত্র-পত্রিকার ফাইলও এখন পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে। 'সার্ভেন্ট', 'ফরওয়ার্ড', 'লিবার্টি', বাঙ্গলার কথা, বঙ্গবাণী প্রভৃতির ফাইল কোথাও পাওয়া যাইবে কি? রাষ্ট্রগুরু দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' পত্রিকার ফাইলও ধারাক্রমে পাওয়া যাইতেছে না। তবে সংবাদপত্র সংরক্ষণ ব্যাপারে ন্যাশনাল লাইব্রেরী বা জাতীয় গ্রন্থাগার খুবই আগ্রহশীল এবং সচেষ্ট। এই গ্রন্থাগারের কথাই এখন বলিব।

কলিকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ইতিহাস বড়ই বিচিত্র। বয়সে এসিয়াটিক সোসাইটির পরেই ইহার স্থান। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের সহযোগিতায় ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুর্থ বৎসরের শেষ হইতে প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ ইহার গ্রন্থাগারিক ছিলেন 'আলালের ঘরের দুলাল'-প্রণেতা বিখ্যাত সাহিত্যিক ও দেশকর্মী প্যারিচাঁদ মিত্র। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, শিক্ষা, বিজ্ঞান, কৃষি নানা দিকে স্বদেশে ও বিদেশে যত উল্লেখযোগ্য পুস্তক লিখিত এবং প্রকাশিত হইত, কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরীতে সে সমুদয়েরই স্থান হইত। সে-যুগের বহু প্রসিদ্ধ মনীষী যৌবনে এখানেই বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া বিদ্যার অনুশীলনে তৎপর হইয়াছিলেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, গিরিশচন্দ্র ঘোষ—আর কত জনের নাম করিব?—এখানে নিয়মিত অধ্যয়নের দ্বারা নানা বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। ১৯০৯ সনে কলিকাতা পাব্লিক লাইব্রেরী গবর্ণমেণ্টের একাধিক বিভাগীয় লাইব্রেরীর সঙ্গে মিলিত হইয়া 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী' নামে একটি পুরাপুরি সরকারী গ্রন্থাগারে পরিণত হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর বর্তমানে ইহার নামকরণ হইয়াছে "ন্যাশনাল লাইব্রেরী।"

পাঠক-পাঠিকা হয়ত লক্ষ্য করিয়াছেন, একটি বিষয়ের উপর আমি বিশেষ জোর দিতেছি এবং গুরুত্ব প্রদান করিতেছি। কোন যুগের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে সমসাময়িক পুস্তক-পুস্তিকা আবশ্যক, কিন্তু সে

সমসাময়িক সৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্র-পত্রিকা-গুলি হইতে সমাজ-জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যে তথ্য সম্ভবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিচয় পাই এমনটি আর কিছু হইতে পাওয়া সম্ভব নয়। একজন মনীষী বলিয়াছেন, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস লিখিতে হইলে লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকার ফাইল না ঘাঁটিয়া উপায় নাই। উনবিংশ শতাব্দী যেমন বিশ্বের পক্ষে, তেমনি ভারতের পক্ষেও একটি গৌরবময় যুগ। পরাধীন অবস্থাতেও যুগ প্রবর্তক রামমোহন হইতে কত প্রতিভাবান্ শক্তিশালী সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম-সংস্কারক, সাহিত্য বিজ্ঞান সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সেবক এবং রাজনৈতিক কর্মীর যে উদ্ভব হইয়াছিল আগেকার দিনে, এই স্বাধীন পরিবেশের ভিতরেও ভাবিতে বিস্ময় লাগে। এই সকল নেতার উৎসাহে উদ্যোগে বহু শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, এবং সর্বোপরি রাজনীতিক প্রতিষ্ঠানও বাংলা দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ জাতির রেনেসাঁ।

পুনরুজ্জীবনের যুগ। পরবর্তী প্রচেষ্টাসমূহ জাতিকে অধিকতর সঞ্জীবিত এবং সর্বপ্রকারে শক্তিশালী করিয়া তোলে। এই সকল আয়োজন-উদ্যোগের তথ্যপূর্ণ কাহিনীর পরিচয় মিলে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায়। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় তথা ভারতীয় সমাজ-জীবনের ধারাবাহিক যথাযথ ইতিহাস রচনায় সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা একেবারে অপরিহার্য।

যে কথা বলিতেছিলাম। ন্যাশনাল লাইব্রেরী এই দিক হইতে আমাদের পক্ষে একটি অত্যাবশ্যক ও বিশেষ মূল্যবান্ প্রতিষ্ঠান। গত শতাব্দীর সংবাদ পত্র, সাময়িকপত্র—বিশেষতঃ ইংরেজী পত্র-পত্রিকাগুলি এখানে সংগৃহীত হইয়া সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। তবে এ বিষয়েও যে সময়ে সময়ে কতকটা ত্রুটি পরিলক্ষিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বাংলা ভাষার পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সুব্যবস্থা এখানে ছিল বলিয়া মনে হয় না। ইংরেজী পত্র-পত্রিকার লাইব্রেরী মফঃ হইলেও কোন কোন পত্রিকার ফাইল ধারাক্রমে কচিৎ পাওয়া যাইবে। তথাপি একটি বিষয়ে সুবিধা আছে। ১৮৫০-৬০ সনের মধ্যেকার পত্র-পত্রিকায় বিষয়-বিশেষ অনুসন্ধান করা এক সময়ে বর্তমান লেখকের প্রয়োজন হইয়াছিল। ঐ সময়কার প্রয়োজনীয় ইংরেজী সংবাদপত্র কোন একখানি ধারাবাহিকভাবে পাওয়া না গেলেও বিভিন্ন পত্রিকার সাহায্যে উক্ত বিষয়টি সম্পর্কে তথ্যসংগ্রহ সম্ভবপর হইয়াছিল। আপনি 'বেঙ্গল হরকরা' বা 'ইংলিশম্যানে'র সব ফাইল পাইবেন না, তবে ঐ সময়কার 'মর্নিং ক্রনিকল', 'হিন্দু ইন্টেলিজেন্সার', 'হিন্দু পেট্রিয়ট' 'সিটিজেন' প্রভৃতি এবং বাংলা কোন কোন পত্রিকার দ্বারা ফাঁক পূরণ করিয়া লইতে পারিবেন।

সময়ে সময়ে পুস্তকে ও পত্র-পত্রিকায় গ্রন্থাগার ভারাক্রান্ত হয়। তখন স্থান-সংকুলানে বা যত্নপূর্বক সংরক্ষণে ব্যাঘাত ঘটে। তখন কর্তৃপক্ষ কাজেই কিছু বই বাদ দিতে বা ছাড়কাট করিতে বাধ্য হন। ইংরেজী ভাষায় ইহাকে 'weed out' বলে। কি কি বই বাদ দিতে হইবে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ বা ভারপ্রাপ্ত কর্মীর মর্জির উপর ইহা কমবেশী নির্ভর করে। হয়ত একসময়ে যাহা অপ্রয়োজনীয় মনে হইয়াছে, পরে অনেকে তাহা অতি প্রয়োজনীয় বোধ করিতে পারেন। এইরূপ প্রয়োজনীয় বলিয়া যাহা একদা বিবেচিত হইয়াছিল কালে আবার তাহা নিতান্তই অপ্রয়োজনীয় বোধ হওয়া বিচিত্র নয়। এইজন্য কোন একটি সাধারণ নীতি বা মান সম্মুখে রাখিয়া বাড়াই বাছাই করিলে অন্ততঃ বিপদে পড়িতে হয় না। কর্তৃপক্ষের বিচার-বিবেচনার কিরূপ ভ্রান্তি ঘটিতে পারে কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা তাহা এখানে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কয়েকটি ইংরেজী পত্র-পত্রিকার (যেমন, সাপ্তাহিক 'এনুকোয়ারার', মাসিক 'ইণ্ডিয়া রিভিউ') উল্লেখ ১৯০৪ সনের ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর ক্যাটলগে আছে। ঐ সময়কার সমাজ-জীবনের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে এগুলি দেখার বিশেষ প্রয়োজন হয়। কিন্তু খোঁজ করিয়া জানিলাম—এগুলি এখন আর পাওয়া যাইবে না, কারণ 'weed out' করা হইয়াছে। সেযুগের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক বিবরণ এবং সভ্যগণ কর্তৃক পঠিত বা রচিত প্রবন্ধাদি 'ট্রান্‌জ্যাক্‌শানস্' বা প্রবন্ধ-পুস্তক লিপিবদ্ধ থাকিত। সদস্যগণের তালিকা ও কোন কোনটিতে নাম-ঠিকানা-পেশা সমেত রিপোর্ট বা প্রবন্ধ-পুস্তকের শেষে

দেওয়া হইত। সেযুগের একটি বিখ্যাত সাংস্কৃতিক-প্রতিষ্ঠানের একত্রে বাঁধানো তিন বৎসরের রিপোর্ট ও প্রবন্ধ-পুস্তক এসিয়াটিক সোসাইটিতে ছিল এবং তাহা হইতে প্রচুর 'নোট্‌স্' লিখিয়া লইয়া পুস্তকে ও প্রবন্ধে ব্যবহারও করিয়াছি। কিন্তু এখন আর এ অমূল্য বস্তুটির খোঁজ মিলিতেছে না। বাঙালীর জাতীয় সম্পদ বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের কথাও এই প্রসঙ্গে একটু বলি। বাংলার উচ্চ শিক্ষার ইতিহাস রচনা করিতে গিয়া বুঝিয়াছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দিককার মিনিট্‌স্ ও ক্যালেণ্ডারগুলির প্রয়োজনীয়তা কত অধিক। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বাক্ষরযুক্ত ঐ সকল মিনিট্‌স্ ও ক্যালেণ্ডার সাহিত্য-পরিষদে ছিল ; কিন্তু এক সময়ে কর্তৃপক্ষ উহা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া 'weed out' করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বৎসর হইতেই এগুলি সেখানে ছিল। বিভিন্ন ব্যাপারে ইহার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে এবং পরিষদের কোন কোন কর্তৃপক্ষকে নানাস্থানে ইহার জন্য অনুসন্ধানও করিতে হইয়াছে। এখন দেখিতেছি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ন্যাশনাল লাইব্রেরী ব্যতীত অন্য কোন স্থানে প্রথমাবধি ঐগুলি পাইবার উপায় নাই। সরকারী ভূতত্ত্ববিভাগের পক্ষ হইতে শতাব্দী যাবৎ ভারতের খনিজ সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা-অনুসন্ধান চলিয়াছে। এই সকল পরীক্ষা নিরীক্ষা অনুসন্ধানের কথা বিভিন্ন প্রবন্ধাকারে বিভাগীয় *Records* বা পুস্তকে বিবৃত। সাহিত্য-পরিষদে ইহার এক সেট এক সময়ে সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু স্থানাভাবের ওজুহাতে কর্তৃপক্ষ 'weed out' করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অথচ কিছুদিন পূর্বে এ বিষয়ে খোঁজ করিতে গিয়া ঐ কথাই শুনিতে পাই। আর দৃষ্টান্ত বাড়াইব না!

বাংলা দেশে জাতীয় শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির লিখিত উপকরণ বিশেষভাবে সংগৃহীত রহিয়াছে কলিকাতার চারিটি প্রতিষ্ঠানে—এসিয়াটিক সোসাইটি অব্ বেঙ্গল, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ এবং সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদে। ন্যাশনাল লাইব্রেরী বাদে অন্য তিনটির কোনটিই শুধু মাত্র নিছক গ্রন্থাগার নহে। আমরা এখানে শুধু গ্রন্থাগার অংশের কথাই বলিতেছি। এই চারিটি প্রতিষ্ঠানই ভারতবর্ষের, এবং বিশেষ করিয়া বাংলা দেশের সমাজ-জীবন আলোচনা-গবেষণার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। বিশ্ব-বিদ্যালয়, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা পল্লী-গ্রন্থাগারগুলির (কলিকাতা ও মফস্বলের) কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি না। এসব স্থলেই আলোচনা-গবেষণার বহু তথ্য বা উপকরণ হয়ত মিলিবে। কিন্তু এমন কতকগুলি সর্বজনগম্য কেন্দ্র আবশ্যক, যেখানে স্নাতক পরবর্তীকালে যুবকগণ ঐ সকল বিষয়ের অনুসন্ধানে রত থাকিতে পারেন। বিভিন্ন দিক হইতে উক্ত প্রতিষ্ঠান চতুষ্টয়কে শক্তিমান ও সক্রিয় করিয়া তোলা জাতির এবং রাষ্ট্রের বিশেষ কর্তব্য। ন্যাশনাল লাইব্রেরীর 'ন্যাশনাল' কথাটি নানা কারণেই সার্থক হইয়াছে। কিন্তু জাতির দিক হইতে এই সার্থক প্রতিষ্ঠানটির কার্য আরও ব্যাপকতর ও গভীরতর করা একান্ত প্রয়োজন। ন্যাশনাল লাইব্রেরী ব্রিটিশ মিউজিয়ামের আদর্শে পুনর্গঠিত হওয়া উচিত। বহু শতাব্দী ধরিয়া জগতের বিভিন্ন অংশ হইতে পুঁথিপুস্তক এবং শিল্প দর্শনাদি সংগ্রহ পূর্বক ইংরেজ জাতি ইহাকে বিশ্ব-জ্ঞানভাণ্ডারে পরিণত করিয়াছে। অনেকে হয়ত জানেন না, কার্ল মার্কস্ এই ব্রিটিশ মিউজিয়ামে নিয়মিত অধ্যয়ন দ্বারা যে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার যুগান্তকারী গ্রন্থে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ন্যাশনাল লাইব্রেরীকে আমরা মুদ্রিত ও অমুদ্রিত পুস্তকে সম্পূর্ণ দেখিতে চাই। রিপোর্ট পুস্তিকা বা পত্রী তাহা যত ক্ষুদ্র বা অকিঞ্চিৎকরই হউক, সবই এখানে সংরক্ষিত থাকিবে। ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে 'weed out' এর কোন প্রশ্ন থাকিবে না। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ, কি সংস্কৃত সাহিত্য-পরিষদের আদর্শ সম্যক অনুসৃত হইলে উভয়ই ক্ষুদ্রতর আকারে হইলেও আমাদের জাতীয় ভাষা সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির একটি প্রকৃষ্ট পরিচয়-কেন্দ্ররূপে গণ্য হইতে পারে। অমুদ্রিত পুঁথির বিষয় এখানে অধিক কিছু বলিব না। ইহার গুরুত্বও যে কত তাহা বর্তমানে বিশেষ উপলব্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য কলিকাতার এবং মফস্বলে পারিবারিক গ্রন্থাগারগুলিতে, বহুতর অপচয় সত্ত্বেও এখনও যে অমূল্য জ্ঞান-ভাণ্ডার অবশিষ্ট আছে তাহা গবেষকগণের সহজ লভ্য করিয়া দেওয়া আবশ্যক। সরকার আইন বলে যেমন সুরা দ্রব্যাদি সংরক্ষণের ভার লইয়া থাকেন সেইরূপ আইন করিয়া দুর্লভ পুস্তক ও পত্রি-পত্রিকার আগার পারিবারিক গ্রন্থাগারগুলি সাধারণগম্য ও ব্যবহারোপযোগী করিয়া দিতে পারেন না?

ট্র্যাজিডি বা দুঃখময় নাটক

শ্রীপ্রভাংশু গুপ্ত

[নাটকের শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে সকল নাট্য সমালোচকদের মত অভিন্ন নয়,—তাহ'লেও নাটককে মূলতঃ চার পর্যায়ে বিভক্ত করা যেতে পারে এবং এই মূল শ্রেণী-বিভাগ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু মতভেদ নেই। যথা—(১) রস-প্রধান, (২) ভাব-প্রধান, (৩) রূপ-প্রধান ও (৪) উদ্দেশ্য-প্রধান।]

রস-প্রধান ব'লতে বোঝায় কমেডি, ট্র্যাজিডি, মেলো-ড্রামা ও ফার্স। ভাব-প্রধান ব'লতে বোঝায় ক্লাসিকাল, রোমান্টিক ও বাস্তব। রূপ-প্রধান ব'লতে বোঝায় গীতি-নাট্য ও মূক-নাট্য এবং উদ্দেশ্য-প্রধান ব'লতে বোঝায় সমস্যামূলক নাটক, রূপক নাটক ও চরিত্র নাটক।

রস প্রধান পর্যায়ভুক্ত ট্র্যাজিডি অর্থাৎ বিয়োগান্ত ও দুঃখময় নাটক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

নাটক হিসেবে ট্র্যাজিডি নাট্য-গোষ্ঠীর ভেতর একটি নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করলেও প্রাচীন সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে বিয়োগান্ত ও দুঃখময় নাটকের কোনো স্থান ছিল না।

অতীত যুগে দুটি দেশ নাট্য-সাহিত্যে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল,—গ্রীস ও আমাদের ভারতবর্ষ। ট্র্যাজিডির জন্ম গ্রীসে এবং এই বিশেষ শ্রেণীর নাট্য-সাহিত্যে গ্রীক নাট্যকাররা বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। গ্রীক পণ্ডিত অ্যারিস্টটল তাঁর "পোয়েটিক্স্" নামক অলংকার গ্রন্থে ট্র্যাজিডি সম্বন্ধে অনেক কিছু আলোচনা করেছেন। ট্র্যাজিডির সংজ্ঞা, স্বরূপ, রস-পরিবেশের রীতি, উদ্দেশ্য ইত্যাদি অনেক কিছু বোঝাবার চেষ্টা ক'রেছেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতবর্ষে সংস্কৃত নাট্যকার ট্র্যাজিডিকে সব সময়ই বর্জন ক'রে গিয়েছেন। কমেডি বা সুখময় নাটক রচনায় ভারতীয় নাট্যকার অপূর্ব শক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যকারের বিয়োগান্ত ও দুঃখময় নাটকের প্রতি এই বৈরাগ্যের অবশ্য যথেষ্ট কারণ ছিল। সে যুগে সমাজ শাসন করতেন ব্রাহ্মণরা। সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিটি বিধান দিতেন তাঁরা। তাঁদের নীতিগত আদর্শ ও মতবাদ অনুসরণ ক'রেই নাট্যকার নাটক রচনা ক'রতেন। ব্রাহ্মণ-নির্দিষ্ট আদর্শের মূল কথা ছিল এই,—দুঃখ ও বেদনার ভেতর দিয়ে মানুষের জীবনে আসে সাফল্য ও শান্তি। আগুনের পরশে সোনার কলঙ্ক যেমন অপসারিত হয়, তেমনি দুঃখ-ক্লেশের পরশে মানুষের গ্লানির অবসান ঘটে। সুতরাং দুঃখ-দুর্দশার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সুখ। এবং এই কারণেই নাটকীয় ঘটনার গতি ও সংঘর্ষ অনুযায়ী স্বাভাবিক পরিণতি ট্র্যাজিডির দিকে অগ্রসর হ'লেও নাট্যকার তাকে জোর ক'রেই সুখময় ঘটনায় শেষ ক'রে যবনিকা ফেলতেন। ঘটনার মোড় ফেরাবার জন্য প্রয়োজন হ'লে সংস্কৃত নাট্যকার দৈব, অভ্যাকর্য ও অলৌকিক ঘটনার সাহায্য গ্রহণ ক'রতেন। এমন কি সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের সম্রাট স্বয়ং কালিদাসও এই নিয়মের বাইরে যেতে পারেন নি,—ব্রাহ্মণ-নির্দিষ্ট নীতিগত আদর্শ তিনিও ক্ষুণ্ণ ক'রতে পারেন নি।

বর্তমান সমালোচকের দৃষ্টিতে কালিদাস রচিত শকুন্তলা সূক্ষ্মভাবে বিচার ক'রলে দেখা যায়, কাহিনীর স্বাভাবিক ঘাত-প্রতিঘাতে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলনের কোনো পথ ছিল না। এই নাটকের স্বাভাবিক পরিণতি, বিচ্ছেদ ও দুঃখ। কিন্তু নাট্যকার এই দুঃখময় পরিণতি অর্থাৎ ট্র্যাজিডিকে স্বীকার না ক'রে দৈবানুগ্রহে নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটিয়েছেন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলা নাটকে কাব্য ও কবিত্বের প্রাচুর্য বিচার ক'রে ঐ নাটকের স্বাভাবিক পরিণতি সমর্থন ক'রলেও তিনি একথাও ব'লেছেন—"মীবরের হাত হইতে আংটি পাইয়া যেখানে দুষ্মন্ত আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন, সেইখানে ব্যর্থ পরিতাপের মধ্যে য়ুরোপীয় কবি শকুন্তলা নাটকের যবনিকা ফেলিতেন। শেষ অঙ্কে স্বর্গ হইতে ফিরিবার পথে দৈবক্রমে দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার যে মিলন হইয়াছে তা' য়ুরোপের নাট্যরীতি অনুসারে অবশ্য ঘটনীয় নহে। কারণ শকুন্তলা নাটকের আরম্ভে যে বীজ বপন হইয়াছে, এই বিচ্ছেদই তাহার চরম ফল। তাহার পরেও দুষ্মন্ত-শকুন্তলার পুনর্মিলন বাহ্য উপায়ে দৈবানুগ্রহে ঘটাইয়া তুলিতে হইয়াছে। নাটকের ঘটনাসূত্রে, দুষ্মন্ত-শকুন্তলার ব্যবহারে এ মিলন ঘটিবার কোনো পথ ছিল না।"

সংস্কৃত নাট্যকারের নাটক-রচনায় বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেলেও দুঃখময় ও বিয়োগান্ত নাটকের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবহেলার ফলে সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে কোনো ভারতীয় "ওথেলোর" সৃষ্টি হয়নি।

যাই হোক্, ট্র্যাজিডি বলতে বিয়োগান্ত নাটক বোঝালেও এর প্রকৃত অর্থ, দুঃখময় নাটক,—কারণ বিয়োগান্ত নাটক মাত্রেই ট্র্যাজিডি নয়। সেক্সপীয়ার রচিত ট্র্যাজিডির পরিণতি যদিও মৃত্যু, তা'হলেও বর্তমান যুগে মৃত্যুটাই বড় ট্র্যাজিডির শেষ পরিণতি ব'লে গ্রহণ করা হয় না। নায়ক-নায়িকার মিলন না হ'লেই বা নায়কের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'লেই যে সেটা ট্র্যাজিডি বলতে হবে, এমন কিছু কথা নেই। যদি নাট্যকার নায়ক-নায়িকার মিলন না ঘটান এবং যদি এই বিচ্ছেদের ভেতর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের—তথা পৃথিবীর কিছু ভালো হয়, তাহ'লে ট্র্যাজিডি বলা যেতে পারে না।

সমগ্র কাহিনীর সুর বিচার ক'রে নির্ণয় করতে হবে নাটকখানি ট্র্যাজিডির পর্যায়ভুক্ত কিনা।

ট্র্যাজিডি সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন—"কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাণ্ডবদিগের জয় হইল, তখনই মহাভারতের যথার্থ ট্র্যাজিডি আরম্ভ হইল। তাঁহারা দেখিলেন জয়ের মধ্যে পরাজয়। এত দুঃখ, এত যুদ্ধ, এত রক্তপাতের পর দেখিলেন, রাজ্য পাইয়াও কোনো সুখ নাই। পাইবার জন্য উদ্যমই সমস্ত সুখ। কয়েকহস্ত জমি মিলিল বটে, কিন্তু হৃদয়ের দাঁড়াইবার স্থান সে দেখিতে পাইল না যেখানে সে তাহার উপার্জিত উদ্যম নিক্ষেপ করিয়া সুস্থ হইতে পারে, ইহাকেই বলে ট্র্যাজিডি।

আবার বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন—"সূর্যমুখির সহিত নগেন্দ্রের শেষকালে মিলন হইয়া গেল বলিয়াই কি "বিষবৃক্ষ" ট্র্যাজিডি নহে? যখন মিলনের মুখে হাসি নাই, যখন মিলনে বুক ফাটিয়া যাইতেছে, তখন তাহার অপেক্ষা আর ট্র্যাজিডি কি আছে। কুন্দনন্দিনীর সমস্ত শেষ হইয়া গেল বলিয়া "বিষবৃক্ষ" ট্র্যাজিডি নহে,—কুন্দনন্দিনী ত' এ ট্র্যাজিডির উপলক্ষ্য মাত্র। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর মিলনের বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু চিরকাল বাঁচিয়া রহিল,—ইহাই ট্র্যাজিডি।"

সুতরাং ট্র্যাজিডি বিচারে সর্বাগ্রে বিচার করতে হবে সমগ্র কাহিনীর সুর। নায়ক-নায়িকার মিলন, মৃত্যু বা বিচ্ছেদের ওপরই শুধু ট্র্যাজিডির মাপ-কাটি নির্ভর করে না।

বহু সমালোচকের মতে শ্রেণী হিসাবে নাট্য-সাহিত্যে ট্র্যাজিডির স্থান সব চেয়ে ওপরে। অবশ্য এ-কথা সকলে স্বীকার করেন না। তবে যে নাটকের মধ্যে দুঃখের বিভীষিকার আবির্ভাব হয়, অশ্রু, ব্যথা, বেদনা ও ব্যর্থতা যে নাটকের উপাদান, সে নাটক মঞ্চস্থ হ'লে লোকে তা' দেখে কেন, প্রকাশিত হ'লে সে নাটক লোকে পাঠ করে কেন, সে নাটক লোকে অভিনয়ই বা করে কেন?

যে দুঃখ বেদনা জীবনে আত্মপ্রকাশ ক'রলে মানুষ ভেঙে পড়ে, সেই দুঃখ-বেদনার বাস্তবরূপ দেখবার জন্য মানুষের এত আগ্রহ কেন? বাস্তব জীবনে আমরা যা প্রতিমুহূর্তে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি, মঞ্চে তার প্রত্যক্ষ রূপ দেখবার জন্য আমাদের এই কৌতূহল একটু অস্বাভাবিক নয় কি?

প্রবাসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত ক'রে দিলাম।

"দুঃখ অপ্রিয় নয়, সাহিত্যই তাহার প্রমাণ। যা কিছু আমরা বিশেষ ক'রে অনুভব করি তাতে আমরা বিশেষ ক'রে আপনাকেই পাই। সেই পাওয়াতেই আনন্দ। চারিদিকে আমাদের অনুভবের বিষয় যদি কিছু না থাকে, তাহ'লে সে আমাদের পক্ষে মৃত্যু, কিংবা যদি কেবলমাত্র তাই থাকে যাতে স্বভাবতঃ আমাদের ঔৎসুক্যের অভাব বা ক্লান্তি, তাহ'লে মনে অবসাদ আসে, কেননা তাতে ক'রে আমাদের আপনাকে অনুভব করাটা সচেতন হ'য়ে ওঠে না। দুঃখের অনুভূতি আমাদেরকে সব চেয়ে বেশী চেতিয়ে রাখে, কিন্তু সংসারে দুঃখের সঙ্গে ক্ষতি এবং আঘাত জড়িয়ে থাকে, সেইজন্য আমাদের প্রাণ-পুরুষ দুঃখের সম্ভাবনায় কুণ্ঠিত হয়। জীবন-যাত্রার আঘাত বা ক্ষতি সাহিত্যে নেই ব'লেই বিশুদ্ধ অভাবটুকু ভোগ ক'রতে পারি।"

যাই হোক্, মানুষের ট্র্যাজিডি পড়বার, দেখবার বা তাকে রূপ দেবার আগ্রহের মূলে বলা যেতে পারে নাট্যকার স্বয়ং চরিত্রগুলির দুঃখ বেদনায় দর্শকদের মন সহানুভূতিতে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে, তখন সেই পরম মুহূর্তে নিজ হৃদয়ের অন্তস্তলে যে মহীয়ান রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তাতে সে বিমল আনন্দের সন্ধান পায়!

ট্র্যাজিডি-বোধের মধ্যে তিনটি উপাদান নিহিত থাকে,—দুঃখবোধ, সংঘর্ষ এবং কার্যকারণত্ব,—অর্থাৎ ইংরাজীতে আমরা যাকে বলি suffering, struggle ও causality. একটিমাত্র উপাদান নিয়ে বা তিনটির একটি বা দুইটিকে নিয়ে ট্র্যাজিডির সৃষ্টি হয় না। শুধু দুঃখবোধ থাকলে তার ফল হয় শোক। শুধু সংঘর্ষে প্রকাশ পায় বীরত্ব। শুধু কার্যকারণত্বে প্রকাশিত হয় যুক্তিসিদ্ধতা। এই তিনের সমন্বয় হ'লে তবেই সৃষ্টি হয় ট্র্যাজিডি।

ট্র্যাজিডির মধ্যে চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বের লীলা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হ'য়ে ফুটে ওঠে। সেকালের গ্রীক ট্র্যাজিডিতেও এই অন্তর্দ্বন্দ্বের পরিচয় পাওয়া যায়,—তবে নাট্য-সাহিত্যের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ বর্তমান বিয়োগান্ত ও দুঃখময় নাটকে নানা বিচিত্র রং ও পরিবেশের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ ব'লতে বোঝায় মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ। য়ুরোপীয় নাট্যকারের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের এই বৈচিত্র্য প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করে প্রথম ইব্‌সেন ও মেটারলিঙ্কের নাটকে। যদিও এই দুইটি প্রখ্যাতনামা নাট্যকারের রচনাকৌশল অভিন্ন নয়, তা হ'লেও এই মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ বিষয়ে দুজনের মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য মেলে। তবে এ বিষয়ে মেটারলিঙ্কের বিশ্লেষণ ধারা আরো গভীর ও সূক্ষ্ম বলা যেতে পারে।

প্রাচীন ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যে ট্র্যাজিডিকে স্থান দেওয়া হয়নি সত্য, কিন্তু সাহিত্যে করুণ রস যে মানুষের মনে দুঃখানুভূতির ভেতর দিয়ে সুখানুভূতির উদ্রেক করতে পারে, তা সেকালের পণ্ডিতগণ স্বীকার করেছেন। সাহিত্য-দর্পণে তাই বলা হ'য়েছে—

"করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎপরং সুখম্।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্॥

অর্থাৎ করুণা প্রভৃতি রসে মনে যে অপূর্ব সুখ উৎপন্ন হয়, তার একমাত্র প্রমাণ মহানুভব ব্যক্তির নিজের চিত্তের অনুভূতি। সংস্কৃত সাহিত্যে করুণ রসপ্রধান কাব্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ 'উত্তররাম চরিত' ও 'রঘুবংশ'।

বাংলা নাট্যসাহিত্য প্রথম ট্র্যাজিডির হিসেবে মাইকেল মধুসূদন রচিত "কৃষ্ণকুমারী" নাটকখানির নাম উল্লেখ করা চলে। এর আগে যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত রচিত 'কীর্তিবিলাস নাটক' (১৮৫২) ও উমেশচন্দ্র মিত্র রচিত 'বিধবা-বিবাহ-নাটক' (১৮৫৬) ট্র্যাজিডির পর্যায়ভুক্ত হ'লেও এই দুইখানি নাটকের নাটক হিসেবে বিশেষ কিছু মূল্য নেই। বাংলা নাট্য-সাহিত্যে পূর্ণাঙ্গ ট্র্যাজিডি ব'লতে আমার মনে হয় দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পন" নাটকখানি। এই "নীল-দর্পন" নাটকখানি বাংলা নাট্যশালার প্রথম যুগে এক যুগান্তরের সৃষ্টি ক'রেছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল' ও 'বলিদান' বাংলা নাট্য-সাহিত্যে দুঃখময় নাটকের দুইটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন'ও এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ট্র্যাজিডি দর্শকদের মনে যে-রকম রেখাপাত করে,—সে-রকম গভীরভাবে রেখাপাত কমেডি করে না। এর কারণ বোধ করি মানুষের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। মানুষ মানুষকে ভালোবাসে,—এইটিই হ'ল পরম সত্য,—যদিও সাংসারিক আবর্তে মানুষের এই সুকুমার বৃত্তি সব সময়ে প্রকাশিত হয় না। কাজেই রঙ্গমঞ্চে পাত্র-পাত্রীর দুঃখ বেদনায় দর্শকের মন উদ্বেলিত হ'য়ে ওঠে—সমবেদনায় হৃদয় দ্রবীভূত হয়—এবং হৃদয়ে এই রেখাপাত হয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাই বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে, "Tragedy is the noblest form of drama."

পড়িবার মত বই

বিপ্লবের পদচিহ্ন—৫৲

শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দত্ত

বিপ্লবযুগের উজ্জ্বল ইতিহাস। প্রত্যেক গ্রন্থাগারের মূল্যবান সম্পদ।

"যাঁহাদের প্রাণদানে ও সংগ্রামে দেশের প্রথম স্বাধীনতার ভিত্তি রচিত হইয়াছে তাঁহাদেরই কাহিনী এই "বিপ্লবের পদচিহ্ন" এবং বাঙ্গালীর বুকে এই পদচিহ্ন যতদিন অম্লান ও স্পষ্ট রহিবে, ততদিন বাঙ্গালীর মৃত্যু নাই—ইহাই হইল গ্রন্থের মর্মবাণী"—দেশ।

".....গ্রন্থটি বস্তুতঃ বাংলার বিপ্লব ইতিহাসের ক্রমবিকাশের একটা বড় অধ্যায়। বইখানার ঘটনাবিন্যাস উপন্যাসের চেয়েও চিত্তাকর্ষক, লিখনভঙ্গী মনোজ্ঞ ও সরস। একবার আরম্ভ করলে শেষ না ক'রে উঠা যায় না। সমস্ত বইয়ের মধ্যে একটা সরল, সতেজ, সহৃদয় ব্যক্তিত্বের ছাপ রয়েছে। তা' পাঠক মাত্রকেই মুগ্ধ করবে।"—আনন্দবাজার।

"Those who want to know about the immortal youths of Bengal in all their glory and of whom Rabindranath sang and gave adequate expression will do well to through this book."

AMRITA BAZAR PATRIKA

সৃষ্টি ও সভ্যতা ২৷৷০

শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ

[শোভন দ্বিতীয় সংস্করণ]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভূমিকাসহ। সৃষ্টির আদি হইতে সভ্যতার উন্মেষ বিকাশ ও পরিণতির প্রাঞ্জল ইতিহাস। সর্বত্র উচ্চপ্রশংসিত। যদিও ছোটদের জন্য লিখিত, তবুও বড়দের জ্ঞাতব্য কথাও অনেক আছে। বিষয়বস্তুতে, ভাষার সরসতায়, ছবিতে ও প্রচ্ছদপটের পরিপাট্যে পুস্তকখানি অপূর্ব ও মনোজ্ঞ।

প্রাপ্তিস্থান : সরস্বতী লাইব্রেরী

৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

[অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লাইব্রেরী]

সদ্য প্রকাশিত দুই খানা বই

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত [সচিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ] ২৲

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

বাংলা সাহিত্যে শিশুদের উপযোগী বই বেশী নাই। এই বইখানি সেই অভাব কিছুটা পূরণ করিবে। সরস এবং সহজ ভাষায় ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু লইয়া অরুণবাবু পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। সুন্দর বাঁধাই, সুদৃশ্য প্রচ্ছদপট।

দিনকাল ৫৲

প্রভাত দেবসরকার

রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে লর্ড কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কালে কালে তাহার বিরুদ্ধে অনেক ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে জমিদার-প্রজায় যে বিরোধ ঘনাইয়া উঠিল "দিনকাল" তাহারই বাস্তব রূপ। উপন্যাসের কাহিনীকে যাঁহারা প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কয়েকজন—জমিদার রমাপতি ঘোষ, তদীয় দৌহিত্রী অষ্টাদশী মাধুরী, জমিদার বধূ ইন্দুমতী, কৃষকনেতা জগবন্ধু রায়, সর্বজনমান্য দেশকর্মী ডাক্তার ইত্যাদি।

—অরুণবাবুর অন্যান্য বই—

জীবনের বসন্ত ২৸০

ভাষায়, কল্পনায় ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গ গল্প সাহিত্যের আসরে স্থান পাইবার যোগ্য।

—আনন্দবাজার

রূপকথা ২৲

বাবিলোনীয় উপকথার দেব দেবীদের নিয়ে রচিত কয়েকটী সরস গল্প। কল্পনার অভিনবত্বে ও মৌলিকত্বে প্রতিটি গল্প অতুলনীয়। লাইনো টাইপে ছাপা এই সুদৃশ্য বইখানি আনন্দোৎসবে প্রিয়জনকে দেবার পক্ষে একখানি আদর্শ উপহার। সুধীসমাজে এই পুস্তকের সমাদর অবশ্যম্ভাবী"—বসুমতী।

সরস্বতী লাইব্রেরী

৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

[অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লাইব্রেরী]

রাজপুরী

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ছেলেবেলা হইতে রাজপুরীর কথা শুনিয়া আসিতেছি। দেখিবার বড় লোভ। রূপকথার বইয়ে দেখিতাম, ঝকঝকে রাজ বাড়ীর ছবি—সামনে বাগান, সিংহদ্বার, তার সম্মুখে নদী না সমুদ্রের ঢেউ, কাছাকাছি আর তেমন কোনো বাড়ী নাই, থাকিতে পারে না; কত গ্রাম, কত শহর লইয়া বিরাট রাজ্য, তাহার মধ্যে একখানি মাত্র অমন বাড়ী।

বড় হইয়া আসিয়াছি রাজধানীতে। গাড়ী ঘোড়ার অনুক্ষণ ধর্ষিত পথ, প্রাসাদে প্রাসাদে অবরুদ্ধ দৃষ্টি, কিন্তু হায়, রাজপুরী? সে তো এমন সকল বাড়ীর সঙ্গে গায়ে গায়ে লাগিয়া থাকিতে পারে না, সে হইবে একক। তাহার এদিকে ওদিকে কত আকাশ, কত অবকাশ, সিংহদ্বার পার হইয়া প্রশস্ত পথ ধরিয়া বহুদূর যাইবে অশ্বারোহী প্রহরী-দল, দুই ধারে সুসজ্জিত দীর্ঘ তরুশ্রেণী, তারপর দেখা দিবে মর্মর-রচিত সোপানশ্রেণী, দক্ষিণে বামে বহুদূর প্রসারিত; অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া অর্ধশত সোপান অতিক্রম করিয়া তবে রাজদূত উত্তীর্ণ হয় অলিন্দে। প্রাসাদ শিখরে অথবা বাতায়নপার্শ্বে হয়তো কোনো দিন দেখা দেয় রাজকন্যার মুখ; শুভ্র মুখে আসিয়া পড়ে অস্ত সূর্যের সোনালী আভা; প্রবালরক্ত দুইটি অধর; প্রলম্বিত বন-ছায়ার মত আজানুচুম্বিত কেশরাশি।

হায়রে স্বপ্ন! এ যুগে রাজপুরীর কল্পনাই বা সহ্য করিবে কে? সাম্যের ঢেউ আসিয়া সব ভাসাইয়া লইয়া যাইবে। তবু মনের কোণে লাগিয়া আছে একখানি ছবি, এ জন্মে তাহা মুছিবার নয়। মেঘে মেঘে রং ছড়াইয়া নামে সন্ধ্যা; অবসরের দিনে তখন বসিয়া বসিয়া সেই ছবিখানি দেখি।

• • • • •

ভারতবর্ষে প্রতি মিনিটে যক্ষ্মারোগে একজন লোকের মৃত্যু হয়। মানুষের এই চরম শত্রুর প্রতিরোধ প্রচেষ্টায় ন্যাশনাল টিউবারকিউলসিস এ্যাসোসিয়েশনকে যথাসাধ্য সাহায্য করুন।

সহঃ সভাপতি :—

শ্রীএস, কে, বসু
আইন সচিব
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ডক্টর এম, এম সাহা
এম্ পি

শ্রীসূর্য্যকুমার বসু
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
(দি ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্ লিঃ)

স্বাঃ শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ
(মেম্বর প্ল্যানিং কমিশন)
সভাপতি

স্বাঃ শ্রীঅনিলকুমার বসু
জে. সেক্রেটারী

[৫২০ পৃষ্ঠার পর]

দেখতে ছিল। প্রমাণস্বরূপ তাঁরা শিলার ওপর নানা পাছপালার ও জীবজন্তুর কঙ্কালের ছাপ ও গভ-আবিষ্কৃত মানুষের মাথার খুলি এবং জন্তুর কঙ্কাল উপস্থিত করলেন। বাস্তবিক পুরণো যুগের জীবজন্তু ও গাছপালা মোটেই আধুনিক কালের মতো ছিল না। কিন্তু এসবের আকৃতির তফাৎ কি করে হ'ল তা কেউ প্রমাণ করতে পারলেন না।

ফরাসি বিজ্ঞানী লামার্ক বললেন, উত্তরাধিকারসূত্রে জীবজন্তুরা নানা প্রকার গুণ পায় কিন্তু জীবমাত্রেই পরিবর্তনশীল। যে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিত্য ব্যবহারে লাগে তাদের উন্নতি হয় কিন্তু যাদের ব্যবহার হয় না তাদের অবনতি হয়। অসংখ্য বছর ধরে এই উন্নতি আর অবনতির ধারা চলতে থাকে। সব জিনিষটার ব্যাখ্যা হ'ল না। সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করলেন চার্লস্ ডারউইন এবং অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস তাঁদের "যোগ্যতমের উদ্বর্তন" এই তথ্য দ্বারা। ১৮৫৯ সালে ডারউইনের যুগান্তকারী বই "অরিজিন অফ স্পিসিস্" প্রকাশিত হয়। যে সামান্য কয়খানি বই মানুষের চিন্তাধারাকে উল্টে দিতে সক্ষম হয়েছে এই বই তাদের মধ্যে অন্যতম।

উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষ কতকগুলি গুণ পায় যাদের বলা হয় হেরিডিটি বা পুরুষানুক্রমিতা। অষ্ট্রিয়ার গ্রিগর মেণ্ডেল পুরুষানুক্রমিতার মূল তথ্যগুলি আবিষ্কার করেন। মেণ্ডেলের তথ্য পাঠ করে আমরা এখন জানতে পারি বংশের ছেলে বেঁটে বা লম্বা হয় কেন, চুল বা চোখ কেন কটা হয়।

বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় বুঝতে পারি আমাদের অসুখ-বিসুখ হ'লে। রোগ মুক্তির জন্য সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করতে হয়, তা সে ম্যালেরিয়া সারাতেই হোক কিংবা ফোড়া কাটতেই হোক অথবা আলট্রা ভায়োলেট রশ্মির প্রয়োগেই হোক। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন উন্নতি হয় নি, তখনও পুরোপুরি হাতুড়েদের যুগ চলেছে। কিছু কিছু আরোগ্যকারক ওষুধ বা প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছিল কিন্তু কেন তারা রোগ সারাতে বা প্রতিরোধ করতে পারে তার জবাব কেউ দিতে পারত না।

আঠারো শতাব্দীতে বসন্ত রোগের খুবই প্রাদুর্ভাব ছিল কিন্তু কোনো প্রতিকার ছিল না। বসন্তের টিকে আবিষ্কার করলেন এডওয়ার্ড জেনার। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, যে সব গোয়ালিনী দুধ দোহন করেন তাঁদের অনেকের হাতে বসন্তের গুটির মতো ঘা হয়, বসন্তের মড়কের সময় তাদের বসন্ত হয় না। তিনি তাদেরই একজনের হাতের ঘা থেকে রস নিয়ে অন্য লোকের হাতে টিকে দিয়ে সাফল্য লাভ করলেন।

রোগের কারণ যে জীবাণু, মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কৃত না হ'লে সে তথ্য হয়ত জানা সম্ভব হ'ত না। মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করেন হল্যাণ্ডের লিউবেনহুক। কিন্তু জীবাণুদের জন্যে রোগ হয় এবং একজনের দেহ থেকে অপরের দেহে সংক্রামিত হয়, তা আবিষ্কার করলেন লুই পাস্তুর। রোগ-জীবাণু থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা আবিষ্কার করলেন লিষ্টার। এঁরা দু'জন ছাড়া সূত্রপাত করলেন রবার্ট কখ্, পল আলিখ, ডোম্যাক, ফ্লেমি, ওয়াক্সম্যান প্রমুখ বিজ্ঞানীরা তাকে পূর্ণতা দিলেন।

বিংশ শতাব্দীতে একটি নতুন বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে—মনোবিজ্ঞান, যার জন্য পায় সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ফ্রয়েডের প্রাপ্য।

ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে পদার্থবিদ্যা দ্রুত এগিয়ে চলতে শুরু করল। বিংশ শতাব্দী আরম্ভ হতে না হতেই জে. জে. টমসন, রাদারফোর্ড ও প্রাক্ত অণু-পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে নতুন আলোর সন্ধান দিলেন। আইনষ্টাইনের মতবাদ অনুযায়ী বস্তুকে যে পুরোপুরি শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়, অ্যাটম বোমা বিস্ফোরণে তার প্রমাণ হ'ল। ইতিমধ্যে রন্টগেন আবিষ্কার করেছেন এক্স-রে এবং মাদাম কুরি স্বতঃদীপ্ত রেডিয়াম।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধ থেকে পারমাণবিক যুগের সূচনা হয়েছে। সন্ধান পাওয়া গেছে অফুরন্ত শক্তির। বিজ্ঞান এখন মানুষের আয়ত্তে কিন্তু এবার থেকে তাকে কল্যাণধর্মী জ্ঞান অর্জন করতে হবে যাতে নাকি তাকে বিজ্ঞানের শক্তি প্রয়োগে আরও সাবধান হতে হবে।

৪০০ পৃষ্ঠার পর]

চেয়ে উঠেছে। কাঁপতে গুলি ঠাসা পিস্তল—কারুরই ধরতে সাহস হ'ল না। বাইজী ও নেচে যায়, তবলচি সারেঙ্গীও বাজিয়ে যায়। আর একাগ্র উগ্র দৃষ্টিতে স্থির হয়ে বসে সেই নাচ দেখে সাহেব হাতে সেই উদ্যত পিস্তল।

একবার ভ্রান্তিতে পা আপনিই থেমে গিয়েছিল, সাহেব সঙ্গে সঙ্গে এমন গুলি ছুঁড়লে একটা বাইজীর কানের কেয়োপাত নিয়ে চলে গেল—আর একটা গেল সারেঙ্গীর টুপী ফুটো করে। হা-হা ক'রে হেসে উঠল সাহেব শিশুর মত।

'চালাও চালাও, নইলে বুঝেছ ত আমার হাতের টিপ? গুলি ঠাসা আছে পিস্তলে। নচ খেলে আমার হাতের টিপ খোলে ভাল।'

আবারও সেই হা-হা হাসি।

অগত্যা নাচতে হয়।

অবশেষে সত্যিই মাথার ওপর কাক ডেকে উঠতে সাহেব উঠে দাঁড়াল। বাইজীও থামল। কিন্তু এতক্ষণ যেন পিশের ঘোরে নাচছিল, থামার সঙ্গে সঙ্গে বুক ধুকধুক করতে লাগল—একেবারে নতুন! ঐ অবস্থা দেখেও কিন্তু সারেঙ্গী তবলচীরা আর দাঁড়ায় নি সোজা উঠে, পাঁচিল টপকে পথে নেমে দৌড়ে পালিয়েছিল, একদম ইষ্টিশনে।

তখনও আলো ফোটবার একটু দেরী ছিল। সাহেবের চাকুরে সাহেবের মগ আরদালী ঐখানে মাটি দিয়ে দিলে কেয়েটাকে।

এই পর্যন্ত বলে বড় নিক্কা থামল।

আমি বললাম, 'তারপর?'

তারপর আর কি! কথাটা জানা-জুষা হ'ল। পুলিশে খবর দিতে শুরু করলে। বেগতিক দেখে সাহেব একদিন সে ঐ পিস্তলটা লাগিয়েই আত্মহত্যা করলে।

তারপর অনেকদিন বাড়ী খালি পড়েছিল—পঞ্চাশ ষাট বছর। বাড়ী ঘর ভেঙে পড়ে গেল গাছপালা বনজঙ্গলে ঢেকে গেল সবটা। তারপর এল এই গালিচাওয়ালা ডামকাম সাহেব। সে ওসব মানত না। জলের দামে জমিটা কিনে নতুন করে সবটা তৈরী করালে, মনের মত ক'রে সাজিয়ে নিজে এসে উঠল। কিন্তু কিছু দিন পরেই মেমসাহেব আর টিকতে পারল না। নানা রকম উপদ্রব হতে লাগল। মেমসাহেব পাদরী আনালে, কত ভজন গান-টান হ'ল, কিন্তু কিছুতেই কিছু না। শেষে সাহেব মেমে ভীষণ ঝগড়া। সাহেব বলে মানুষকে কখনও ভয় করলুম না, ভূতকে ভয় করব? নেভার! মেম বললে, তুমি থাকো তবে—আমি চললুম! মেমসাহেব চলে গেল বাপের বাড়ী মুজঃফরপুরে। ব্যস্—হ'ল ডুকল্প, সব শেষ হয়ে গেল। সাহেবও সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে গেল।

সেই থেকে পড়েই আছে বাবুজী। কে বাস করবে এখানে? অজানতে কেউ যদি ভাড়া নেয়—একরাত পরেই পালায়। এই যা আপনিই দেখলুম তিন চার দিন কাটালেন। কিন্তু আর থাকবেন না হুজুর, ভালয় ভালয় চলে যান অন্য কোথাও। বাড়ীর অভাব কি!

হরিদাস বাজার করে ফিরেছে তখন—তাকেও ডেকে আসগার মিঞা সদুপদেশ দিয়ে দিলেন। হরিদাস আমার মুখে সব ঘটনা শুনে বললে, 'কোনমতে রাতটা এই পথে কাটাবো মামা—ও বাড়ী আর ঢুকছি নি। কাল সকালে অন্য বাড়ী দেখে মালপত্র নিয়ে চলে যাওয়া যাবে।'

অতি কষ্টে বুঝিয়ে তাদের নিয়ে বাড়ীতে ঢুকলাম। কিন্তু সেদিন সারারাত কারুরই ঘুম হ'ল না।

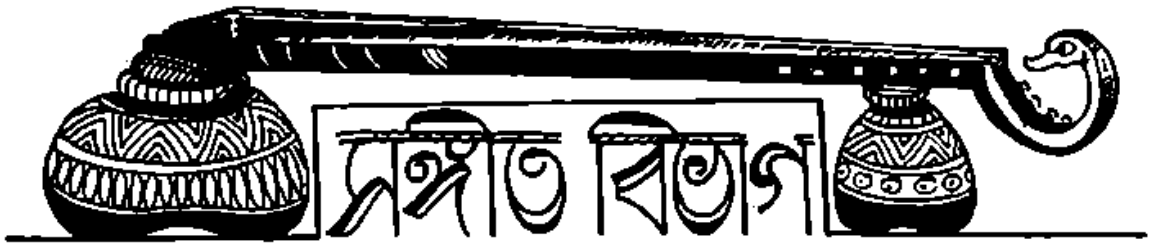

সঙ্গীতের ধারা

শ্রীবিজেন্দ্রনাথ গুহচৌধুরী।

সঙ্গীতের উৎপত্তি বৈদিক কালে। তখন উদাত্ত, অনুদাত্ত এবং স্বরিত এই তিন স্বর ভেদে গান হইত। তিন বেদের অন্তর্গত সামবেদ প্রধানত সোমযাগের তত্ত্ব হইলেও অন্যান্য যাগের কথা ইহাতে আছে। এই সব যাগ উদাত্তাদি স্বরে গীত হইয়া সম্পন্ন হইত। ঐ প্রণালী "নারদীয়া শিক্ষা," "নিদানসূত্র" গ্রন্থে দেখা যায়। সামগাচার্য্য শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমীর সম্পাদনায় কলিকাতা হইতে অনেকানেক বৈদিক গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে "সামপ্রকাশনম্"† নামে একটি গ্রন্থ বাহির হয়। উহার ভিতরে সামগানের কথা পাওয়া যায়। রাগ-রাগিণীর যে উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা ভরতমুনির পরে। সামগান অতীব মধুর। বাঙ্গালা দেশে উহার প্রচলন তেমন নাই। রীতিমত ভাবে সামবেদ হইতে গান নির্ব্বাচিত করিয়া "স্বরলিপি" প্রকাশকরণ সঙ্গীতবেত্তা, সুধীসমাজ (*connoisseur*), সঙ্গীতরচনাকারী (*maestro*, "মন্দিরা"—আষাঢ়, ১৩৬১, পৃঃ ১৮৭—১৯২; ঐ, ভাদ্র, ১৩৬১, পৃঃ ৩১৩—৩১৭ দ্রষ্টব্য) পিতৃদেব অবিনাশচন্দ্রের অভিপ্রেত বাধা ছিল; কিন্তু মৃত্যুর করাল গ্রাসে পতিত হওয়ায় হইতে পারে নাই। পারিলে সঙ্গীত-জগতে একটি অপূর্ব অবদান থাকিত। দীন লেখক তাহার পিতৃদেবের অভিলাষ পরিপূর্ণ করার মানসে সচেষ্ট আছে!

বৈদিক যুগ, পুরাণের যুগ, মহাভারতের যুগ, রামায়ণের যুগের পরে লৌকিক যুগ। এই যুগই 'নবজীবন' যুগ। তাহাই 'রেনেসাঁস' (re-nasans)—"a new birth: the period (in the 15th century) at which the revival of arts and letters took place, marking the transition from the Middle Ages to the modern world." অথবা "Re-vival of art & letters under influence of classical models in 14th—16th centuries, period of its progress, style of art & architecture developed by it. From French (*renaitre* be born again) after *naissance* birth, cf. Renascence." কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেন—"প্রবল প্রতিক্রিয়ারূপে রেনেসাঁসের যুগ আসিয়াছিল।" এই যুগেই সংস্কৃত লৌকিক সাহিত্যের 'নবজীবন' কিংবা অভ্যুত্থান হইয়াছিল। সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাস (খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে‡) এই যুগের লোক। ভারতের বহু শতাব্দীর পরে য়ুরোপের 'রেনেসাঁস' (renaissance)। সৃষ্টি, কলা, শিল্প, স্থাপত্য বিদ্যার নবযুগ হইতে অর্ব্বাচীন যুগের অবস্থান্তর-প্রাপ্তি হয়। কালিদাসের তথা জগতের শ্রেষ্ঠ নাটক "অভিজ্ঞান-শকুন্তলা" এই যুগেরই রচনা। এই নাটকেই সঙ্গীতশালার উক্তি দেখা যায় এরূপ—"নেপথ্যে বীণা-শব্দঃ। বিদূষকঃ (কর্ণং দত্ত্বা)—ভো বয়স্য! সঙ্গীতশালাঽভ্যন্তরে অবধানং দেহি তাল-লয-বিশুদ্ধায়াঃ বীণায়াঃ স্বর-সংযোগঃ শ্রূয়তে। জানে তত্র ভবতী হংসপদীকা বর্ণপরিচয়ং করোতীতি ৫ম অঙ্ক। শুধু সংগীতশালা কেন, সংগীত বিদ্যারও যে চর্চ্চা ছিল, কবি কালিদাসের তাহা অজ্ঞাত ছিল না, তাহাই প্রতীয়মান হয় সাঙ্গীতিকী শব্দে—বীণা (তি-তার যুক্ত যন্ত্র), তাল, লয়, স্বর-সংযোগ। সাতটি স্বর—স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি, হিন্দুদের দ্বারাই সঙ্গীত-শাস্ত্রে প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল। John Baptist কে প্রাচীন লাতিন্ ভাষার স্তোত্রে যে সম্মাননা প্রদর্শন করান হয়—*da, re, mi, fa, sa, la, be*, তাহাও ঐ সাতটি স্বরের সঙ্গে

†সামপ্রকাশনম্ (সামবেদস্য) আচার্য্যশ্রীসত্যব্রতসামশ্রমিণা সম্পাদিতম্। কলিকাতাসত্যযন্ত্রে মুদ্রিতম্। সংবৎ ১৯৪১।

‡See Richardson & Johnson's *Persian Dictionary*, *s. v.* "*Durr i mufassal.*"

সামঞ্জস্য আছে। স্বর-সংযোগই ইংরাজী ভাষায় permutations & combinations of various স্বর অর্থাৎ স্বরালাপ বটে। অথর্ববেদের মধ্যে বীণা (আধুনিক কালের সপ্ত তার বিশিষ্ট যন্ত্র "পরিবাদিনী," "সেতার"), দুন্দুভি, মুরলীর উল্লেখ পাওয়া যায়। অভিজ্ঞান-শকুন্তলার ৪র্থ অঙ্কে দুর্বাসার শাপ শকুন্তলার প্রতি—"তুই, যাহার কথা ভাবিতেছিস্ সে তোকে ভুলিয়া যাইবে," তাহাই যেন সার্থকতা লইতেছে ইহাতে—

("আকাশে গীয়তে)

অভিনবমধুলোলুপো গুবাংগুথা পরিচুম্ব্য চূতমঞ্জরীম্।
কমলবসতিমাত্রনির্বৃতো মধুকর বিস্মৃতোঽস্যেনাং কথম্॥"

(৪।১)

ইহা গান—তাল, লয়, স্বর-সংযোগ সমন্বিত। গানের পক্ষে যাহা প্রয়োজনীয়, তাহারই সমাবেশ এখানে। ৪র্থ অঙ্কে শকুন্তলা পতিগৃহে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তাহার যে ক্রিয়া-কলাপ তাহা বৈদিক গৃহসূত্রানুমোদিত। বৈদিক একাদশাক্ষর 'ত্রিষ্টুপ্' ছন্দে। বৈদিক গান কালিদাস বিদিত ছিলেন, আভাস তাঁহারই লেখায়—

"অনী বেদিং পরিতঃ কুশস্তম্ব্যাঃ
সরিন্ময়ঃ প্রাক্তসংস্তীর্ণদর্ভাঃ।
অপন্নবো ছুরিতং হব্যগন্ধৈ-
র্বৈতানাস্যাং বহ্নয়ঃ পাবয়ন্তু॥"

(৪।৭)

সত্যই, কালিদাস কবি, সঙ্গীতজ্ঞ! জয়দেব—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ কবি। অনুমান খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার রচিত "গীতগোবিন্দ" (গীতি-কাব্য) সব গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় আর দ্বিতীয়টি নাই। বীর-ভূম জিলায় "কেন্দুবিল্ব" গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনের পঞ্চরত্নের শ্রেষ্ঠ 'রত্ন' ছিলেন। ইঁহার রচিত "চন্দ্রালোক" সংস্কৃত ভাষার প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ। সঙ্গীতের অনুপ্রেরণা জয়দেবের মধ্যে ছিল, তাই, তিনি সঙ্গীত রচনায় তৎপর ছিলেন—

গুর্জ্জরী রাগ যতিমঠতালাভ্যাং গীয়তে।

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডলধৃতকুণ্ডলকলিতললিতবনমাল
জয় জয় দেব হরে॥

দিনমণিমণ্ডলমণ্ডনভবখণ্ডনমুনিজনমানসহংস
কালিয়বিষধরগঞ্জনজনরঞ্জনযদুকুলনলিনদিনেশ॥
মধুমুরনরকবিনাশনগরুড়াসনসুরকুলকেলিনিদান
অমলকমলদললোচনভবমোচনত্রিভুবনভবননিধান॥
জনকসুতাকৃতভূষণজিতদূষণসমরশমিতদশকণ্ঠ
অভিনবজলধরসুন্দরধৃতমন্দরশ্রীমুখচন্দ্রচকোর॥
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু
শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতম্॥

(সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ, বঙ্গবাসী সং, কলিকাতা, ১৩০৭ সাল, পৃঃ ২)।

ভক্তজনের অর্চ্চনা ভক্তজনোচিত বটে! রচনা সুললিত, সুমধুর!

গুর্জ্জরী রাগিণীর ধ্যান:

"শ্যামা সুবেশী মলয়জমাণাং
মৃদুস্তনসংপন্নবতন্নমধ্যে।
শ্রুতিস্বরাণাং দধতী বিভাগং
তন্ত্রিমুখা দক্ষিণগুর্জ্জরীয়ম্॥" সংগীতদর্পণে ৫।৮০

ধনিসাগরেসানিধপমগরেসা। মধনিসামধপসাসানিধমপরেসা॥

সঙ্গীতদর্পণের মতে মেঘ রাগের স্ত্রী গুর্জ্জরী, মতান্তরে বৃহৎসংগীতরত্নাকরের মতে ভৈরব রাগের স্ত্রী গুর্জ্জরী, দ্বিতীয় প্রহরার্দ্ধে এবং বাসরে গেয়, ধৈবতাংশ-গ্রহন্যাস, সম্পূর্ণা, সপ্তমী মূর্চ্ছনা, বহু মিশ্রিতা, পুনঃ রামক্রী-টোড়ী সংযুক্তা, বরাটী মিশ্রিতা। শৃঙ্গার রস।

বিদ্যাপতি—ইনি পদপ্রণয়ন কর্ত্তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হন। লক্ষ্মণ-শাকের তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে বিহার প্রদেশস্থ দ্বারভাঙ্গা জিলান্তর্গত "বিসফি" গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে বিদ্যাপতির জন্ম হয়। বিদ্যাপতির কৌলিক উপাধি 'ঠাকুর'। কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য প্রভাবে যুবরাজ শিব-সিংহের সুদৃষ্টিতে পড়ায় অল্প বয়সেই মিথিলাধিপতি দেব-সিংহের সভায় সমাদৃত হন। যুবরাজ ২৯০ লক্ষ্মণ-সংবতে

বিদ্যাপতি ঠাকুরকে উক্ত "পিসৃকি" গ্রাম দান করেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপে বিদ্যাপতি শিবসিংহের এরূপ উল্লেখ করেন—

ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন নব যুবতি
ইহ রসকূপ যো জানে।
রাজা শিবসিংহ রূপনারায়ণ
লছিমা দেবী পরমাণে॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস জান।
নৃপ শিবসিংহে লছিমা পরমাণ॥

* *

রাজা শিবসিংহে লছিমাদেবী সঙ্গ।
ভণয়ে বিদ্যাপতি মনহু নিশঙ্ক॥
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

বিদ্যাপতির সঙ্গীতের উপলব্ধি, তাহারই প্রকাশ—

বেলোয়ার।

বাজত ত্রিগি ত্রিগি ধোত্তিম ত্রিমিয়া।
নটতি কলাবতী শ্যাম সঙ্গে মাতি
করে কত তাল-প্রবন্ধক ধ্বনিয়া॥
ডগ মগ ডম্ফ ত্রিমিকি ত্রিমি মাদল
রুণু ঝুনু মঞ্জরী বোল।
কিঙ্কিণী রণরণি বলয়া কনয়া ধ্বনি
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল॥
বীণ্ রবাব্ মুরজ স্বরমণ্ডল
সা রি গ ম প ধ নি সা বহুবিধ ভাস।
ঘেটিতা ঘেটিতা ঘেনি মৃদঙ্গ গরজনি
চঞ্চল স্বরমণ্ডল কক রাস॥
শ্রমভরে গলিত লোলিত কবরীযুত
মালতী-মাল বিথারল মোতি।
সময় বসন্ত রাস-রস বর্ণনে
বিদ্যাপতি-মতি ক্ষোভিত হোতি॥

বিদ্যাপতিকে শিক্ষকদের "আমাদের বিদ্যাপতি মৈথিল" বলিতেন। তাঁহার মতে "বিদ্যাপতি তুলসীদাসেরও পূর্ব্বে, কবীরেরই প্রায় সমকালে।" ("নব্যভারত," বৈশাখ, ১৩০৯, পৃঃ ১৮, পঙ্‌ক্তি ২)। বিদ্যাপতির পদাবলী শিক্ষকদের কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহার মুখে নিম্নলিখিত পঙ্‌ক্তিগুলি শুনা যাইত—

কামদ।

সুন্দর কুলশীল ধনী বর যুবক
কি করব লোচন-হীনে।
কি করব তপ জপ দান ব্রত আদিক
যদি করুণা নাহি দীনে॥

অর্থ গভীর-দ্যোতক, সন্দেহ নাই! সঙ্গীতে কামোদ, কামদ, কামোদী। মেঘ রাগের বহুত। (সঙ্গীত-চন্দ্রিকা ২।৩৮), নিশা দ্বিতীয় যামে গেয়।

"ভৈরবী না দিয়ে বাদ, কামদে কেদারে সাধ উদয় হবেরে আপনি কল্যাণ"—গোবিন্দ ব্রহ্মচারী।

ধানশী।

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহি শুননু
শ্রুতি পথে পরশ না গেল॥
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আবার—

ধানশী।

তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী সমাজে।
তোহে বিসরি মন তাহে সমপিনু
অব মঝু হব কোন কাজে॥
মাধব হাম পরিণাম-নিরাশা।
তুহুঁ জগতারণ, দীন দয়াময়,
অতএ তোহারি বিশোয়াসা॥
ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ভাব-সম্মিলনে, পুনর্মিলনে ও আত্ম-নিবেদনে সত্যই

প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ! শব্দ-তত্ত্বের প্রয়োজন আছে, তাই শব্দ-তাত্ত্বিক, পরম বৈয়াকরণ, পরম ধর্মশাস্ত্রবিৎ, উত্তর-মীমাংসাদুরন্ধর, নিষ্কাশের অবিনাশগ্রন্থের আলোচনা হইতে উদ্ধৃত করি—"বিদ্যাপতিতে মোহি মোহে মোহে মো বা মহু, এবং তুয়া তু বা তো আছে। বিদ্যাপতির দ্বিতীয়া এবং চতুর্থীও মোহে মোর বা মুকে, এবং তোহে (তোঁহে পৃথক্ শব্দ। তার মূল তুমহে।) তোর বা তোই। ষষ্ঠীতে তুহুকেও আছে। সকলেরই মূল নহ বা মহ্যম, তুহ বা তুহ্যম।" ("নব্যভারত," বৈশাখ, ১৩০৯, পৃঃ ২১, পঙ্‌ক্তি ১)। • • • "বিদ্যাপতিতে মোহি আছে। অন্য অকার লুপ্ত হইলে মহ্ ও তুহ্ হয়।" ("নব্যভারত," বৈশাখ, ১৩০৯, পৃঃ ২১, পঙ্‌ক্তি ১)। • • "বিদ্যাপতির মৈথিলীতেও মোর হামার তোর তোহর তোহার প্রভৃতি র যুক্ত ষষ্ঠ্যন্ত পদ পাওয়া যায়। তা ছাড়া সিয়ার জিয়ার সখীর প্রভৃতিও আছে। কিন্তু সেগুলি খাঁটী বিদ্যাপতির হইলে বাঙ্গালারই দেখা-দেখি গড়া হইয়াছিল মনে হয়।" ("নব্যভারত," বৈশাখ, ১৩০৯, পৃঃ ১৯, পঙ্‌ক্তি ১ হ.ব. "ভাষাতত্ত্ব।")(২))। সঙ্গীতের দিকে ধনশ্রী, ধানশী। দীপক রাগের স্ত্রী (সঙ্গীতার্ণবে ২।৩১), তৃতীয় প্রহরাৎ পর গেয়। ধনশ্রী রাগিণীর ধ্যান :

"দূর্বাদলশ্যামতনুর্মনোজ্ঞা
কান্তং লিখন্তী বিরহেণ দূনা।
স্বেদে কপোলে দধতি দৃগম্বু-
নিষ্যান্দিধৌতকুচা ধনশ্রীঃ ॥"

সংগীতদর্পণে ২।৭৪

হনুমন্মতে মালশ্রী গৌরীসংযুক্তা, টোড়িকামিশ্রিতা পূর্ণা, পঞ্চস্বরসংস্থিতা, শেষ যামে দিনে গেয় মতান্তরে। বীররসে প্রযুজ্য। গীতের সঙ্গে রাগ-রাগিণী ও তাল প্রদত্ত হয়। যেখানে তাল দেওয়া নাই, সেখানের তাল গায়কের স্বেচ্ছাধীনে গেয়। চণ্ডীদাস (১৩০৯ শকে ?), জ্ঞানদাস (১৬০০ শক), গোবিন্দদাস (১৫২৪ অথবা ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ?), নরোত্তমদাস (১৪৫৩-১৫০৯ শকাব্দ), বলরামদাস, চন্দ্রশেখর, শশিশেখর, কবিশেখর ('সখি হে চামারি দুখের নাহি ওর' পদটি যাহা বিদ্যাপতির বলিয়া প্রচলিত, তাহা তাঁহার লেখা নহে। উহার রচয়িতা ছইতেছেন এই কবিশেখর), কবিবল্লভ ("রসকদম্ব" প্রণেতা। 'সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়' এই পদটিও বিদ্যাপতির নামে খ্যাত, কিন্তু উহাও তাঁহার রচনা নহে। রচনা কবিবল্লভের), রামানন্দ (খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দী), রাধামোহন, যদুনন্দন, প্রেমদাস, প্রভৃতির পদাবলী উৎকৃষ্ট এবং রাগ-রাগিণীর পরিবেশে পরিবেষিত।

তান-লয়ে গান করিবার উপযোগী ছন্দোবদ্ধ রচনার নাম "পাঁচালী।" গীতি—কাব্য বিশেষ। উহার পাঁচটি ভাগ—(১) গান, (২) সাজ বাজান, (৩) ছড়া কাটান, (৪) গানের যুদ্ধ এবং (৫) নাচ। এই পঞ্চাঙ্গের সমবায়ে "পাঁচালি"র সৃষ্টি। মনোমোহন গীতাবলীতে উল্লেখ আছে এরূপ—"যদিও হাফ্-আখ্‌ড়াই ও দাঁড়কেবির ন্যায় পাঁচালিতেও দুইদলে সঙ্গীত সংগ্রামই হত, কিন্তু উহাদের ন্যায় উহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তর প্রত্যুত্তর চলিত না। অর্থাৎ কবিতে যেমন এক দল পূর্বপক্ষরূপে আসরী গান গাইলে অপর দল উত্তরপক্ষরূপে তৎক্ষণাৎ তাহার জবাব বাঁধিয়া গান করেন। পাঁচালিতে তৎপরিবর্তে পূর্বাভ্যস্ত ছড়া ও গানের লড়াই হইত। যে দল অপেক্ষাকৃত উত্তমরূপে ছড়া কাটাইতে ও গান গাইতে পারিতেন, সেই দলের ভাগ্যেই জয়শ্রী দীপ্তিমতি হইয়া বিমান লাভ ঘটিত।" পালা বাঁধিয়া সাধারণত দেবতার মাহাত্ম্য কথা অথবা ধর্ম সঙ্গীত গীত হয়—"ভিন্ন কবিরত্ন গান শ্রীধর্মসঙ্গীত—এত দূরে পালা সাঙ্গ শুন সর্বজন। মুখ তরি বলহরি পাপবিমোচন।" (কবি ঘনরাম চক্রবর্তীর "ধর্মমঙ্গল")। "এই সঙ্গের যাত্রার দলের গুরু ঠাকুরদাস আরও দুএকটি পালা রচনা করিয়াছিলেন।" "হরিবল পালা হইল সার"—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র। উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের সমাবেশে "পাঁচালী" পালা হইত। রাগ-রাগিণীর সমন্বয়ে উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন করিত। পাঁচালী রচয়িতাদের মধ্যে দাশরথি রায়ের "পাঁচালি" সুবিখ্যাত এবং সর্বজন বিদিত। ইহার রচিত পাঁচালীর ৬০টি পালা মুদ্রিত হইয়াছে। বর্তমান

জিলার অন্তঃপাতী কাটোয়ার সন্নিকট বাঁদমুড়া গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে দাশরথি রায়ের জন্ম হয়। পাঁচালীতে ইঁহার যশঃ ও খ্যাতি সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং তদ্দ্বারায় প্রভূত অর্থ উপার্জ্জনও করিয়াছিলেন। সেই সময়ে আবালবৃদ্ধবনিতা দাশরথি রায়ের পাঁচালি শুনিয়া মহামুগ্ধবৎ বিমোহিত হইত। "কৃষ্ণকালী-বর্ণন," "রুক্মিণী-হরণ," "শ্রীরাধিকার কলঙ্ক-ভঞ্জন," "মানভঞ্জন," "সত্যভামা প্রভৃতির দর্পচূর্ণ," "সত্যভামার ব্রত," "গোপিগণের বস্ত্রহরণ," "নবনারী কুঞ্জর," "শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী," "নন্দোৎসব," শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা," "ব্রহ্মার দর্পচূর্ণ," "কালিয়দমন," "অক্রূর-সংবাদ," "শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলা," "নন্দবিদায়," "উদ্ধব-সংবাদ," "দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ," "দুর্ব্বাসার পারণ," "কুরু-ক্ষেত্র," "রামোদ্ভব," "রামচন্দ্রের বিবাহ," "রাম বনবাস ও সীতাহরণ," "সীতা অন্বেষণ," "মায়াসীতাবধ," "তরণীসেন-বধ," "মহীরাবণ বধ," "লক্ষ্মণের শক্তিশেল," "রাবণ বধ," "রামচন্দ্রের দেশাগমন," "লবকুশের যুদ্ধ," "কাশীখণ্ড," প্রভৃতি পাঁচালীর পালার গানসমূহ উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত বিশিষ্ট। নিদর্শনরূপে দাশরথি রায়ের রচিত গান নিম্নে প্রদত্ত হইল—

সিন্ধু—পোস্তা।

ত্বং মায়ারূপিণী দুর্গে কে জানে মায়া জননী।
কখন দরিদ্রজায়া, কখনও হও রাজরাণী॥
ত্বং গুরুত্ব ত্বং হি কর্ত্তা, ধর্ত্তা তুমি হৈতা।
দয়াময়ী দয়াযুক্তা, সৃজন লয়কারিণী॥
তুমি সুখ, তুমি ক্লেশ, ত্বং পীযূষ, তুমি বিষ।
তুমি আদ্য, তুমি শেষ, তুমি অনাদ্যরূপিণী॥
সরলা অতি দুর্ব্বলা, অচলা অতি চঞ্চলা।
কুলহীনে কুলবালা কুলোজ্জ্বলাকারিণী॥

সংস্কৃত ও বাঙ্গালার মিশ্রিত সঙ্গীত-রচনা তৎকালে প্রচলিত ছিল। ভক্তজনের মায়ের বর্ণনা ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ-ব্যঞ্জক কথা, তাহা নিঃসন্দেহ! সঙ্গীতে সিন্ধু ভৈরবের স্ত্রী (সংগীতদর্পণে ২।১৫-১৯), মতান্তরে নটনারায়ণের, ধারে গেয় উপরাগ। সিন্ধু রাগিণীর ধ্যান—

"প্রলম্বকর্ণা বপুষা চ গৌরী
বীণা দধানা সুরপুষ্পসক্তী।
বক্ত্রেণ রক্তাক্ষরভূষণীয়ং
গীতেষু দক্ষা খিল সৈন্ধবীতি॥"

—সঙ্গীতরত্নাকরে।

বৈরবতাংশসন্ন্যাস, সম্পূর্ণ, মতান্তরে তৃতীয় সুরে গেয়। ধনিসারেগমপধপমগরেসানিধ। সপধমগরেসারগরেসানিধ। তাল—৪ মাত্রা। রসিকচন্দ্র রায় (১২২৭—১৩১২ সাল, দাশরথি রায়ের পরম সুহৃৎ), রাম বসু (১১৯৪—১২৩৮ সাল), হরু ঠাকুর (১১৯৫—১২১৫ সাল), নিত্যানন্দ বৈরাগী (১৭৬১—১৮২১ খ্রীঃ), এন্টনী সাহেব, নীলমণি পাটনী, নীলু ঠাকুর, যজ্ঞেশ্বরী, তোলা ময়রা, শ্রীধর কথক, যদুনাথ ঘোষ, নিধুবাবু (রামনিধি গুপ্ত, ১১৪৬—১২৪৫ সাল), প্রভৃতি বিখ্যাত পাঁচালী রচয়িতা ছিলেন। ইঁহাদের সময়ে সঙ্গীত বিদ্যার উৎকর্ষ প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

বঙ্কিম যুগে বিদ্যমান ছিলেন শ্রুতিধর, সঙ্গীতজ্ঞ, যদু ভট্ট। বেদের এক নাম "শ্রুতি" ("শ্রুতিস্তু বেদো বিজ্ঞেয়ঃ"—মনু ২।১০)। "যত্র শ্রূয়তে ধর্ম্মানুশাসনশব্দঃ সা শ্রুতিঃ"—বেদাতিথি। আচার্য্যের নিকটে বেদাধ্যয়ন হইত মুখে মুখে। শিষ্য শিক্ষা করিতেন স্মৃতি শক্তিতে। আচার্য্যের ঐ ভাবে শিক্ষা দান এবং শিষ্যের গ্রহণে বেদের নামান্তর হইল "শ্রুতি।" শ্রু (ধর্ম্মাধর্ম্ম) শ্রবণ করা + তি (ক্তি)। লিখন প্রণালী সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে বেদ শিষ্যানুশিষ্যক্রমে শ্রুতি পরম্পরায় চলিয়া আসে। স্মৃতি-শক্তির সাহায্য হইতেছে অবলম্বন। তাই, যদু ভট্ট শ্রুতিধর। যেখানে একবার যে গান তিনি শুনিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ আয়ত্ত করিয়াছেন। শক্তি ছিল তাঁহার অপূর্ব্ব! বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। যদু কর্ত্তৃক বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁটালপাড়ার বাস ভবনে

("গঙ্গার গৈরিক পর সে দিব্য ত্রিবেণী-তর
ঘুলিতেছে ঘুলি পাক ফণিনী মতন,

কোঁকারে কোঁকারে ধুটে—
ছোড়ে কাঁটালপাড়া কাঁপে ঘন ঘন !"

—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গুহ।

"নব্যভারত," জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১, পৃঃ ২১, ১.৮."অন্তোষ্টি।" শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "বঙ্কিম-জীবনী," ১৩৩৮, পৃঃ ১৭৬-১৭৮, "শোকোচ্ছ্বাসে"ও দ্রষ্টব্য) সুর-সংযোগে মাতৃস্তুতি "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীতটি গীত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাহা শ্রবণে আনন্দিত হইয়া গর্ব্বের সহিতই প্রকাশ করিয়াছিলেন—"গানটি বাঙ্গালী হৃদয় অনুপ্রাণিত করিবে !" যদু ঐ গানের সুর "মল্লার—কাওয়ালী"তে দেন। মল্লারে গান্ধার ; আর নিখাদ স্বর দুইটি বর্জ্জিত—"গনিধীনোঽপি মল্লারঃ।" বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গীত চর্চ্চা করিতেন। তাঁহার রচিত অনেক উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত পাওয়া যায় ("সঙ্গীতসার-সংগ্রহ," ১ম খ, ১৩০৭, পৃঃ ৩৫৮—৩৬০ দ্রষ্টব্য)। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য এবং ভ্রাতুষ্পুত্র (অগ্রজ শ্যামাচরণের পুত্র) ঔপন্যাসিক শ্রীশচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—"কাঁটালপাড়ায় একজন বহুবিশ্রুত গায়ক বাস করিতেন, তাঁহার নাম যদুভট্ট তানরাজ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে মাসিক ৭০৲ সত্তর টাকা (পরবর্ত্তী সংস্করণে "মাসিক পঞ্চাশ টাকা" লিখিত আছে) বেতন দিতেন। এই যদুভট্টের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গীতাদি শিক্ষা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সুকণ্ঠ ছিলেন কিন্তু তাঁহার তান লয় বোধ অনন্যসাধারণ ছিল। হারমোনিয়ম যন্ত্রে তিনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন"—"বঙ্কিম-জীবনী", পৃঃ ৬২ ; ঐ, ১৩০৮, পৃঃ ৩৬১ দ্রষ্টব্য। যদুনাথ ভৈরব রাগে সিদ্ধ ছিলেন। "ভট্ট" একটি উপাধিবিশেষ—"বেদান্তিজ্ঞে পণ্ডিতে চ।" যাঁহারা বেদে অভিজ্ঞ, তাঁহারাই ঐ উপাধির অধিকারী। জানিনা, যদু ঐ উপাধির অধিকারী ছিলেন কি না ? বর্ত্তমানে পদবীর সংকোচন করান হইয়া থাকে। যেমন, মুখোপাধ্যায়—মুখো, বন্দ্যোপাধ্যায়—বন্দ্যো, চট্টোপাধ্যায়—চট্টো, চক্রবর্ত্তী—চক্র, ভট্টাচার্য্য—ভট্ট, প্রভৃতি। যদুর সম্পূর্ণ নাম যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, সংক্ষিপ্তাকারে যদু ভট্ট কথিত হয়। রবীন্দ্রনাথও যদুর নিকটে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তিনি বলেন, "তাঁর কাছে যে গানগুলি শিখেছিলাম তা' আমার সমস্ত বর্ষার গানকে আপ্লুত ও স্পন্দিত ক'রেছে !" তিনি 'ধ্রুপদ' সঙ্গীতও যদুর নিকট হইতে শিখিয়াছিলেন। সঙ্গীত-বিদ্যার পারদর্শিতার জন্য যদুর উপাধি ছিল—"রঙ্গনাথ," "তানরাজ," "সুর-সাগর," "সঙ্গীত-রত্নাকর।" তদানীন্তন ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় 'সুর-সৃঙ্গারী' কাশেম আলি (ত্রিপুরা-রাজের সভা-গায়ক) যদুর অদ্ভুত প্রতিভায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি যদু নও, যাদু !" যদু সঙ্গীত রচনায় দক্ষ ছিলেন। প্রায় দুই শত কি তিন শত হিন্দী গান তিনি রচনা করেন—যাহা মার্গ-সঙ্গীতের অপরিহার্য্য অঙ্গ ! কয়েকটি নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

ধ্রুপদ : বাহার—তেওরা।

আজু বহত সুগন্ধ পবন
সুবন্ধ মধুর বসন্ত মে।
হর মধুর পর
বৃথ মধুপ মদহর
নিরত কর রব কুসুমে।
কহি কোয়েলিয়া কুহু করহি
অমুয়াকে ডাবে রজমে।
কহি বেলি চামেলি তলাব গেঁদা
চম্প রঙ্গ বিরজমে ॥

যদুর বিখ্যাত বসন্ত কালের সঙ্গীত। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে এইটি বসন্ত বর্ণনার অনন্যসাধারণ রচনা ! মদনমোহন ভক্ত বিষ্ণুপুরের মহারাজা গোপাল সিংহের অনুরোধে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালের এক নিশীথে মাত্র কয়েক চিন্তা করিয়া যদু ঐ সঙ্গীতটি রচনা করেন। তাহা শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকটে প্রগাঢ় ভাবেই প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। সঙ্গীতে বহার, বাহার—সম্পূরণ। ফার্সী শব্দ, অর্থ—বসন্তকাল। তাল —৭ মাত্রা।

বৃন্দাবনী সারঙ্গ—তেওরা।
জয় প্রবল বেগবতী সুরেশ্বরী
জয়তি জয় গঙ্গে—
ত্রিজগতত্তারিণী জগৎ-করুণ-
নাশিনী পার্ব্বতী।

সপ্তস্বরে। বী—বাদী, স—সংবাদী, আরোহী, অবরোহী, স্থায়ী, সঞ্চারী—আলাপে। ঠাট—সা রা মা পা না র্সা, বাঁট, জাতি, শ্রুতি মূর্চ্ছনায়ে। উদয়কাল তান গমকে, তাল মান লয়ে। তিন গ্রামে ঔডব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণে। গ, ধ বর্জ্জিত। দিবা ২য় প্রহরে গেয়। বাদিত্র—মৃদঙ্গে। তাল—৭ মাত্রা।

কাফি—সুর ফাঁকতাল :

কম ঝুম বরসে আজু বদরিয়া···

কাফি, কাফী—ভরতমুনির মতে শুদ্ধা রাগের স্ত্রী। সম্পূরণ। গা নি। আশাবরী, গুর্জ্জরী ও ভৈরবী যোগে উৎপন্না রাগিণী। কাফির সহিত অন্য রাগিণী যোগে—কাফি-কানাড়া, কাফি-টোড়ী, ইত্যাদি। দিবা ১১ হইতে ১৬ দণ্ড পর্য্যন্ত গেয়। পূর্ণ রাগ। সা গ, প। আরবী শব্দ, অর্থ—পর্য্যাপ্তি। ফারসীতে "কৈফ" হইতে উৎপন্ন। অর্থ—অনুভূতি (perception, emotion)। তাল—১০ মাত্রা।

কীর্ত্তন

আজ লৌ অছ্‌তী ছাতী কাহ কে ন রঙ্গ রাতী
যৌবনকে মদ মাতী মীঠে মন রৌনেকী।
সে নয়ন রাতী চুনরী ও চুরী রাতী
দেখ দেখ মুকুতাতী বোল নাহি মৌনেকী।
কেতিক মনৌতি সা মানী যহ চন্দ্রমুখী
হৈ তো চিত চোর নন্দলাল বড়ে ঠৌনেকী।
ঝুট নাহি বোলত যদুনাথ কী সোঁ বার বার
যা কো ঠৌর লাই হৌ সেবাহী বিন গৌনেকী

—সঙ্গীত রাগকল্পদ্রুম, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা, সংবৎ ১৯৭৩, পৃঃ ১৫৩, সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাবলী-সংখ্যা ৪৫।

ছায়ালোকের প্রদর্শনীতে নারীর সঙ্গে প্রেম এবং দেশ-দেশান্তরে যন্ত্রের যে পরিভ্রমণ সঙ্গীতের অতৃপ্ত বাসনা পরিপূর্ণের জন্য, তাহা নিছক কল্পনা-প্রসূত, ইতিহাস বহির্ভূত ঘটনা। ঐরূপ কল্পনা-প্রসূত ঘটনা আরও পাওয়া যায়। হয়ত, ইতিহাসের দিক্ সব সময়ে অনুসরণ করিয়া চলা সম্ভবপর হয় না, তবে কি তজ্জন্য 'reckless liberty'র প্রশ্রয় দেওয়া সমীচীন? ইতিহাসকে বর্জ্জন করা চলে না। ইতিহাসের সঙ্গে কাহিনীর সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিলে কাহিনীর উৎকর্ষই সাধিত হয়, ক্ষুণ্ণ হয় না। তাহাই শ্রেয়ঃ এবং তাহাই প্রেয়ঃ।

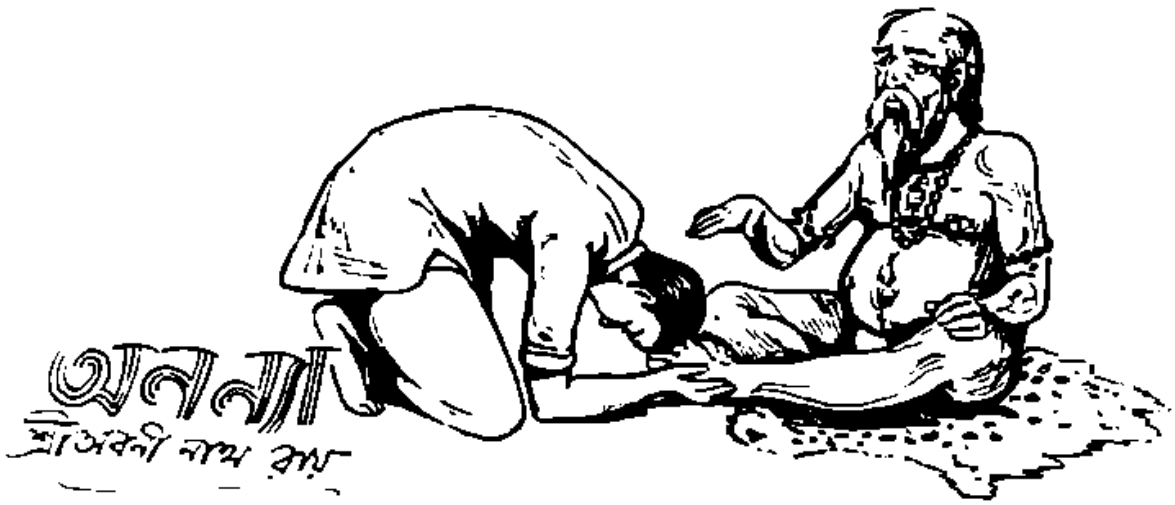

(কাঁপা গলায়)

অসিত—

আমি মীরা কথা বলছি···

হ্যালো ডার্লিং

হ্যাঁ, কখন দেখা হবে ?

দেখা আপিসের পর ছাড়া আর কখন হবে ?

তা হ'লে ধর স' ছটা···

হ্যাঁ, স' ছটা···

প্রাচী সিনেমার পাশে রেষ্টুরাণ্টে ?

হ্যাঁ, ওখানেই দাঁড়িয়ে···

বেশ, তাই ঠিক থাকলো। কিন্তু দেরী কোরো না আমাকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে না হয়···

না না—সে কি কথা ? তোমার মেজাজ কি আমি জানি নে ? বরঞ্চ আমি স'ছটার একটু আগেই পৌঁছাবো ছাড়া দেরী হবে না···

আচ্ছা, ছেড়ে দিই ?···

আচ্ছা···বাই বাই।

প্রাচী সিনেমার পাশের রেষ্টুরাণ্ট। সময় ছ'টা বেজে ৪০ মিনিট। একটি সুবেশ যুবক এসে রাস্তায় দাঁড়ালো। কোনো যার কারো জন্যে অপেক্ষা করছে। পরিধানে কোট প্যাণ্ট, হাতে রিষ্টওয়াচ, ব্যাক ব্রাস করা চুল, মাজা চিকন শ্যামল গায়ের রং।

উল্টো দিকের ফুটপাথে একটি তন্বী যুবতী ট্রাম থেকে নেমে পড়লো।

অসিত এগিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি মীরার হাত দু'খানি ধরে ফেলে বল্‌লে, এই যে তুমি ঠিক সময়েই এসে গেছ, মীরা···

মীরা দ্রুতভঙ্গী ক'রে হাত ছাড়িয়ে নিল, মুখে বল্‌লো, ইস্, তুমি কি যে কর তার ঠিক নেই—রাস্তার মাঝখানে হাত ধরছো কেন ?

অসিত দমে গেল। ঘাড় নীচু করে বল্‌লে, চল, এই ত রেষ্টুরাণ্ট···

দু'জনে একটি পর্দাঘেরা ঘরের মধ্যে এসে বসলো।

অসিত জিজ্ঞাসা করলে, কি খাবে, মোগলাই পরোটা ?

মীরা ঘাড় নেড়ে বল্লে, হুঁ।

আর কি, মাংস ?

মীরা আবার ঘাড় নাড়লো।

অসিত জানতো এই দুটি খাদ্যবস্তু মীরার অত্যন্ত প্রিয়। বন্ধুকে ছেড়ে দু'জনের মত মোগলাই পরোটা এবং মাংস আনার অর্ডার দিল।

খাওয়া দাওয়ার পর মসলা মুখে দিয়ে দু'জনে আবার

রাস্তায় বেরুলো। মীরা খুব উদ্ভসিত—তার মুখে একেবারে খৈ ফুটছে। সমানে গল্প করতে করতে চলেছে—কখনো অসিতের হাতটা ধরে, কখনো হাত ছাড়ে। অসিত তার পাশে পাশে তাল রেখে চলেছে।

অসিত একবার মীরার মুখের দিকে তাকিয়ে নিল—তার পর বললে, তুমি না বলেছিলে কয়েকটা জিনিষ কিনতে হবে?

মীরা থেমে দাঁড়ালো। বললে, এই ত দোকান। চল ত দেখি।

দু'জনে একটা ষ্টেশনারি দোকানে ঢুকলো।

অসিত বলে, কুন্তলীন তেল ত তোমার পছন্দ?

মীরা ঘাড় নাড়ে।

আচ্ছা একটা কুন্তলীন তেল। সাবান—কোন সাবান বলবো?

বোধ হয় সিসারিনই ভালো। কি বল?

হ্যাঁ সিসারিনই ভালো।

আচ্ছা, সিসারিন সাবান হ'ল। আর কি? বলগেটের টুথপেষ্ট একটা না?

মীরা ঘাড় নাড়ে।

তার পর একটা সেন্ট ত নিতেই হবে। কোন্ সেন্ট তোমার পছন্দ? এ বিষয়ে ত আবার মেয়েদের অনেক পছন্দ অপছন্দ আছে।

মীরা একটু চুপ করে থেকে বলে, দেখ ত ক্যালিফোর্নিয়া পপি আছে কিনা?

দোকানদার এগিয়ে এল। কতকগুলি এসেন্সের শিশি সামনে ধরে দিল।

তার মধ্যে থেকে বেছে একশিশি ক্যালিফোর্নিয়া পপি মীরা তুলে নিল।

আচ্ছা, এ সব ত হ'ল। আর একটা নেল পলিশ বোধ হয় তোমার দরকার। তোমার ত আবার জুতোর ভেতর থেকে লাল পলিশওয়ালা নখ বেরিয়ে না থাকলে জুতো পরে তৃপ্তি হয় না···

মীরা অসিতের দিকে তাকিয়ে ভ্রূভঙ্গী করে বলে, ইস্ তাই বুঝি?

একটা নেল পলিশের শিশি মীরা পছন্দ করে বেছে নেয়।

কেনাকাটা সেরে দাম চুকিয়ে দু'জনে শিয়ালদা ষ্টেশনের দিকে রওনা হ'ল।

মীরা কলকাতার বাইরে থাকে। ট্রেনের সময় হয়ে গিয়েছিল। মীরাকে ট্রেনে পৌঁছে দিয়ে অসিত বিদায় নিয়ে ফিরে গেল।

[২]

এর কিছু দিন পরের কথা। সেদিন ইডেন গার্ডেনের একাংশে মীরা এবং অসিতের দেখা। বেশ বোঝা যাচ্ছে পূর্বের একটা ব্যবস্থা মত সেখানে দু'জনে এসেছে। দু'জনেরই মুখ গম্ভীর। ঘাসের উপর হাতের মধ্যে চাত দিয়ে মুখোমুখী হ'য়ে বসেছে।

মীরা বলে, তোমার কাছ থেকে আমি অন্যরকম উত্তর প্রত্যাশা করেছিলুম, অসিত।

অসিত ঘাড় নীচু ক'রে কি ভাবছিলো, মীরার কথায় যেন জেগে উঠলো, বললে, তা আমি জানি, মীরা। আমার উত্তর শুনে আমাকে তুমি অপরাধী ব'লে মনে করবে এ আমি অনুমান করতে পারি। বাস্তবিক আমার ব্যবহার বিশ্বাসঘাতকের মতই হয়েছে কিন্তু আমি সে রকম ব্যবহার না ক'রে পারি নি।

মীরা যেন জ্বলে উঠলো, বললে, সে রকম ব্যবহার না ক'রে পারি নি, এ কথা এখন বলবেই ত! পুরুষেরা চিরকালই এই রকম স্বার্থপর নিজেদের সুখ সুবিধার কথাই কেবল ভাবে কিন্তু একজন কুমারী মেয়ের জীবন নিয়ে যে খেলা করা হচ্ছে, সে কথা তাদের মনে থাকে না।

অসিত আহত হ'য়ে বললে সে কথা তুমি বলতে পার মীরা। কিন্তু ভগবানের নাম ক'রে বলছি আমি তোমাকে সত্যই ভালবাসি। আর ভালোবাসি বলেই তোমাকে আমার অভিশপ্ত জীবনের সঙ্গে জড়াতে চাই নে। আমি আজই তোমার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। আর কখনো তোমার জীবনে আমার ছায়া পড়বে না।

আমি তোমাকে দূরে চলে যেতে বলিনি·

কাছেই টেনে নিতে চেয়েছিলুম। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই। তবে চলে যেতে চাইছ কেন? তুমি আমার কাছ থেকে আর কি চাও?

মীরা একেবারে ভেঙে পড়লো—চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে লাগলো।

অসিত মীরার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললে, আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি—এর মধ্যে অতিরঞ্জন এতটুকু নেই। গত ছয়টা মাস আমার যে কি আনন্দ, কি উৎসাহ, কি প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে কেটেছে, সে কেবল আমিই জানি। বিবাহ আমি করতে পারবো না জানতাম, কিন্তু তবু তোমার প্রস্তাব আমি এড়াতে পারি নি। নিরালায় তোমাকে একবার দেখা ও তোমার কথা শোনা, টেলিফোনে তোমার কণ্ঠস্বর একবার ভেসে আসা—এ ছিল আমার প্রতিদিনের তপস্যা। তাতে তোমার ক্ষতি হয়েছে আমি বুঝেছি—সেই ক্ষতি আর বাড়াতে চাই নে। আমি এখন বহুদূরে চলে যেতে চাই—সেখানে গিয়ে তোমাকে ভুলবার সাধনায় নিজেকে নিমজ্জিত ক'রে রাখবো।

মীরা বলে, তোমার কথার হেঁয়ালি আমি ধরতে পারছি নে। তুমি বলছো আমাকে ভালোবাসো, আমি তোমাকে ভালোবাসি তার সহস্র প্রমাণ পেয়েছ। তুমি অবিবাহিত—তবে আমাদের মিলনের পথে বাধা কোথায়?

আবার একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, তুমি বলছো তুমি দূরে গিয়ে আমাকে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করবে—কিন্তু ভেবে দেখেছ কি আমি কি করবো? আমি তোমাকে কি ক'রে ভুলবো?

মীরা আবার কাঁদতে লাগলো—কাঁদতে কাঁদতে বলে, আর ভুলতে চাইলেই ভোলা যায় নাকি? এ কি জিওমেট্রির থিয়োরেম যে এই করলে এই হবে, আর তাই হ'য়ে গেল? আমি ভুলতে চাইলেই বা আমার মন ভুলবে কেন? সেখানে শত সহস্র স্মৃতি সঙ্গীন উঁচিয়ে রয়েছে না?

অসিতেরও চোখ অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে এসেছিল। সে এইবার বললে, বিবাহ করা যেন আমার পক্ষে অসম্ভব সে কথা বলতে হলে আমার পূর্ব জীবনের এক অতীত অধ্যায়ে আলোকপাত করতে হয়। তুমি যদি শুনতে রাজী থাক তবে সে ঘটনা আমি বলতে পারি, যদিচ সে কাহিনী আমি আর কারো কাছে আজ পর্যন্ত বলিনি।

মীরা কিছু না ব'লে শোনার জন্য উদ্গ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

অসিত আরম্ভ করলো :—

সীতা আর আমি দু'জনে ছোট বেলা থেকে এক বাড়ীতে মানুষ হয়েছিলুম। ছোট বেলায় দু'জনে একসঙ্গে খেলেছি, মারামারি করেছি, ঝগড়া করেছি। ম্যাট্রিক পাশ ক'রে দুজনেই পড়তে কলকাতা গেলুম—সীতা ভর্তি হ'ল বেথুনে, আমি স্কটিশ চার্চে। তখনো আমাদের প্রতিদিনের দেখা শুনা ছিল নিয়মিত। সীতার মনের সকল গোপন কথা আমি জানতুম, আমার মনের সকল কথাও সীতার অগোচর ছিল না। কিন্তু এইবার সেখানে তৃতীয় এক ব্যক্তির আবির্ভাব হ'ল—সে হিমাংশু। হিমাংশুর বোন প্রভা সীতার সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তো—তারই মধ্যস্থতায় তাদের আলাপ পরিচয় হয়েছিল।

কিছুদিন যেতে না যেতে বুঝতে পারলুম সীতার মনের সকল খবর আমি জানি নে—আমার কাছে লুকিয়ে রাখতে চায় এমন সংবাদও তার মনের পাতায় জমা হ'য়ে উঠেছে। আমি সাবধান হলুম। কিন্তু আমার আসন তার মন থেকে যে কোনদিন লুপ্ত হ'য়ে যেতে পারে, এমন আশঙ্কা আমার মনে স্থান পায় নি। আমি ভেবেছিলুম আমার আসন পাকা—বহুদিনের হাসি কান্নার দোলায় দোলায় যে ইমারত গড়ে উঠেছে ছোট-খাটো ঝঞ্ঝাবাতের সাধ্যও নেই তার এতটুকু টলায়।

কিন্তু আমার ভুল ভাঙলো সেইদিন যে দিন শুনলাম সীতা পালিয়ে গিয়ে হিমাংশুকে বিয়ে করেছে।

অসিত একটু নড়ে চ'ড়ে বসলো—তার কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মত শোনাচ্ছে।

—সমগ্র নারী জাতির উপর ঘেন্না ধরে গেল। এরা যে সব পারে। এমন কোন দুষ্কর্ম নেই যা এরা করতে ভয়

পায়, এমনি একটা ধারণা আমার জীবনকে একেবারে বিষাক্ত করে তুললো, দিনরাত যেন দুষানলে দগ্ধ হ'তে লাগলুম—সে সময়কার দিনরাত যে আমার কেমন ক'রে কেটেছে তা বলতে পারি নে……

মীরা অসিতের একখানা হাতে চেপে ধ'রে বলে, তোমার যদি কষ্ট হয় তবে এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ ক'রে দাও।

অসিত মাথা নাড়া দিয়ে বলে, না শেষ পর্যন্ত সব কথা আমাকে বলতেই হবে। নয়ত আমার দিকটা তুমি বুঝতে পারবে না—আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না।

মীরা চুপ ক'রে তাকিয়ে রইল।

—মনের যখন এই রকম মাতাল অবস্থা, যখন আমার চারিদিকে দাবানল জ্বলে উঠেছে, সেই সময় আমার গুরুদেবের কাছে গিয়ে তাঁর শরণাপন্ন হলুম। তাঁর কাছে শান্তি প্রার্থনা করলুম—মনে মনে বলুম, প্রভু, আমাকে এই সর্বধ্বংসী লেলিহান আগুনের গ্রাস থেকে পরিত্রাণ কর।

পরম কারুণিক গুরুদেব তাই করলেন- জগতের উপর যে বিতৃষ্ণা হয়েছিল তার হাত থেকে আমাকে বাঁচালেন—আমাকে শান্তি দিলেন। কিন্তু তাঁর পায়ে হাত দিয়ে আমাকে একটা কঠিন শপথ করিয়ে নিলেন। তাঁর কথাগুলি এখনো যেন কানে শুনতে পাচ্ছি……

অসিত সম্মোহিতের ন্যায় বলতে লাগলো, তিনি বল্লেন, "বৎস, তোমার মনের কষ্ট আমি বুঝতে পেরেছি। তুমি নারীজাতির কাছ থেকে কঠিন আঘাত পেয়েছ। তোমার পথ ও নয়—তুমি আরো উন্নততর পথের জন্য সৃষ্টি হয়েছ। বিবাহ, ঘর সংসার—এ সব তোমার জন্য নয়। আমি তোমাকে শ্রেষ্ঠতর পথে নিয়ে যাব।"

তারপর থেকে গুরুদেবের মন্ত্র জপ করি আর মনে মনে বলি, বিবাহ আমার জন্য নয়, ঘর সংসার আমার জন্য নয়—আমার পথ স্বতন্ত্র……কিন্তু তবু তোমার কথা ভুলতে পারিনে—সংসারের দিকে তোমার দুর্নিবার আকর্ষণ আমার সব কাজ থেকে আমাকে টেনে তোমার কাছে নিয়ে আসে, তোমার কথার মিষ্টি সুর শোনার জন্য আমার কান তৃষিত হয়ে থাকে……

মীরা অনেকক্ষণ চুপচাপ রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে; তা হ'লে এখন যেতে দাও—একদিকে গুরুদেব, অন্যদিকে আমি।

অসিত জিব কেটে বলে, তা কি হয়? গুরুদেব ইজ্ অলওয়েজ গুরুদেব—তাঁর বাণী অভ্রান্ত, তাঁর নির্দেশ অমোঘ। তাই ত আমি তোমার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

—কিন্তু বিদায় নিতে হবে কেন? গুরুদেবের পা ছুঁয়ে শপথ করেছ, সেই জন্য বিবাহ না হয় না করতে পারলে কিন্তু দূরে চলে যেতে হবে কেন?

না, অনেক দূর এগিয়েছি—আর নয়। তোমার মনের যতটা ক্ষতি হয়েছে তা অপূরণীয়—আর সেটা বাড়াবো না। তোমার কল্যাণের জন্যই তোমার কাছ থেকে আমার পালানো দরকার। দেরি হ'লে ক্ষতি আরও বেশি হবে।

তোমার ঠিকানা দিয়ে যাও দরকার হ'লে চিঠি লিখবো।

না—কোন রকম সেন্টিমেন্ট আর রেখে যাবো না। পরে সেইটুকু অবলম্বন করেই সম্বন্ধটা আর মুছতে চাইবে না। আমি নিজেকে নিঃশেষে মুছে ফেলে দিতে চাই। আমাদের এই কয়েক মাসের আলাপ পরিচয়কে একটা দুঃস্বপ্ন ব'লে মনে ক'রে ভুলে যেতে চেষ্টা কোরো। মীরা—

এই কথা বলে অসিত এক রকম ছুটেই ইডেনগার্ডেন-এর সীমানা তাপ ক'রে বাইরে বেরিয়ে গেল।

[৩]

অসিত চলে যাওয়ার পর মীরা কতক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে সেখানে বসে ছিল সে সম্বন্ধে তার কোন হুঁস ছিল না। তার সমস্ত চেতনা লুপ্ত ক'রে দিয়ে যেন হাজার দামামা তার চারিপাশে বেজে চলেছে তখন। এক সময় সম্বিৎ পেয়ে সে উঠে দাঁড়ালো এবং তাড়াতাড়ি নিয়ানদা ষ্টেশনের দিকে ধাবিত হ'ল।

তখুনি একখানি ট্রেন ছাড়ছিলো—মীরা ছুটে গিয়ে একটি একলা কামরায় ঢুকে পড়লো।

দুর্ভাগ্যক্রমে ট্রেনখানি একটি মাত্র ষ্টেশন গিয়ে দাঁড়ালো। খবর মিলে জানা গেল ট্রেন আর যাবে—সামনে একখানি ইঞ্জিন পড়ে গেছে। সে লাইন মুক্ত হওয়ার আগে ট্রেন চলাচল বন্ধ।

অনেক লোক ট্রেন থেকে নেমে হেঁটেই যেতে আরম্ভ করলো। ট্রেনের ছাড়বার সময় যখন অনিশ্চিত, তখন কতক্ষণ তারা বন্ধ কামরার ভিতর পড়ে মরবে?

মীরার বাড়ী সেখান থেকে আরো নাইল দূরে। রাত্রির অন্ধকারে যারো মাইল পথ অতিবাহন করা একাকিনী এক নারীর পক্ষে শুধু বিপদজনক নয়, অসম্ভব বলেই মনে হয়। কিন্তু মীরার তখন বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত অবস্থা। সে ট্রেন থেকে নেমে পায়ে হেঁটেই রওনা হ'ল।

ভোর রাতে দরজায় করাঘাত শুনে মা যখন দরজা খুলে দিলেন তখন মীরার চেহারা দেখে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। মেয়ে তখন দাঁড়াতে পারছে না—টলছে। "কী হয়েছে মা, আমার"—বলে মা মেয়েকে ধরে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

সকালে দেখা গেল জ্বরের উত্তাপে মীরার সর্বাঙ্গ পুড়ে যাচ্ছে। সমস্ত মুখখানি রক্তে বোঝাই হয়ে গেছে।

ডাক্তারকে কল দেওয়া হ'ল। ডাক্তার রোগিণীকে পরীক্ষা ক'রে বল্লেন, এত শিগ্‌গির বলা যায় না, তবে বোধ হচ্ছে জ্বরটা আর যাবে না—বাঁকা পথ ধরেছে—বুকেও সর্দি বসেছে···

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত
এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত

মন্দিরা

অষ্টাদশ বর্ষ | কার্তিক—১৩৬২ | সপ্তম সংখ্যা

স্মৃতি-কথা

[বাল্য জীবন]

কবিশেখর কালিদাস রায়

১৮৯৩ হইতে ১৯০০ সাল পর্যন্ত আমি আমার গ্রামের বাড়ীতে ছিলাম। সে সময়ে আমাদের গ্রাম্য অঞ্চলে জীবনযাত্রার মান কি ছিল তাহাই এখানে লিপিবদ্ধ করিব। ইহাকে মধ্যবিত্ত-পরিবারের জীবনযাত্রা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। দরিদ্র পরিবারের জীবন-যাত্রা—ইহা হইতে অনুমেয়। আমাদের গ্রামে কোন ধনী লোক ছিল না। আমার পিতামহ যশোহরের জেলার মেকেঞ্জি সাহেবের নীলকুঠির দেওয়ান ছিলেন। তাঁহার বহুসংখ্যক প্রতিপাল্য ছিল। পুত্র একটি—আমার পিতা। সেকালে একজন বড় চাকুরিয়া হইলে তাঁহার গৃহে দূরবর্তী আত্মীয়েরা বিশেষ করিয়া জ্ঞাতিকুটুম্বদের নিরাশ্রয় বিধবারা সকলে আশ্রয় লইত। ইহাই ছিল সেকালের প্রথা। আমার পিতা কালিমবাজার রাজবাড়ীতে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মাহিনার অর্ধাংশ তিনি গ্রামের বাড়ীতে পাঠাইতেন। আমাদের সকলই বিঘা জমি ছিল। বাড়ীতে দুইখানা লাঙলের চাষ ছিল। বলদ, মহিষ ছাড়া একপাল গরু ছিল। কাকার তখনও কোন সন্তান সন্ততি হয় নাই। অতএব আমাদের পরিবারকে মধ্যবিত্ত পরিবার বলা যায়, গ্রামের লোকে আমাদের অবস্থাপন্ন মনে করিত। এই পরিবারের জীবনযাত্রাকে আদর্শ ধরিয়া সেকালের রাঢ়দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান নির্ণয় করা যাইতে পারে।

রাস্তার দুই পারে আমাদের ছিল দুইটা বাড়ী। যে বাড়ীতে আমরা বাস করিতাম সেটি ছিল ভদ্রাসন বাড়ী, আর রাস্তার পর পারের বাড়ীর নাম খামারবাড়ী। এই খামারবাড়ীই গোলাবাড়ী। এখানে কয়েকটি মরাইএ বা বাখারে ধান বাঁধা থাকিত, খড়ের পালা থাকিত, একাংশে দুইখানা গোয়াল ছিল আর একাংশে প্রকাণ্ড একখানা বৈঠকখানা ঘর ছিল। এই বৈঠকখানা ছিল কাঠ বাঁশের তৈরি, খড়ের ছাউনি দেওয়া। ইহা ছিল তিন কুঠারিতে ভাগ করা। মাঝের কুঠারিকে চলঘর বলা যাইতে পারে। এই বৈঠকখানা ঘরে আলকাতরা মাখানো জানালা ছিল অনেকগুলি। এ বৈঠকখানা আমার বাবার আমলের, পিতামহের আমলের নয়। ইহার দেওয়ালে ছিল সারি

সারি বসুধারার দাগ। দূরবর্ত্তী গ্রামের বিবাহযাত্রীরা পথে এই বৈঠকখানায় একদিন থাকিয়া নান্দীমুখ সম্পন্ন করিত—ঐ বসুধারাগুলি তাহার চিহ্ন। একখানি পাখী বারেন্দার সাঙার উপর বাঁধা থাকিত। অসংখ্য পায়রা রাতদিন বকম্ বকম্ করিত পাখীটিতে ও ঘরের সাঙায়। ঘরের মেজে নোংরা হইত, দিনে দুইবেলা ঝাঁট দিতে হইত। সকাল বিকাল এই বৈঠকখানায় পাঠশালা বসিত। সন্ধ্যার সময় গাঁয়ের সখের যাত্রার দলের রিহার্সেল হইত, কোন পরিবারের ঘর পুড়িয়া গেলে উদ্বাস্তু পরিবার এখানে অস্থায়ী আশ্রয় লইত, গ্রামে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা সরকারী কর্ম্মচারী আসিলেও এখানে আশ্রয় দেওয়া হইত তখন সতরঞ্চ জাজিম ও মোটা বালিশ বাহির হইত, প্রকাণ্ড একটা পাখাও একজন কুলি চালাইতে থাকিত অন্য সময়ের জন্য ছেঁড়া সতরঞ্চ ও মাদুর ব্যবহৃত হইত। একটা কুঠারিতে একটা তক্তাপোশ ছিল।

বাহির বাড়ী ঢুকিতে একটা বড় দরজা ছিল—তাহার দুইপাশে দুইখানি ঘর, সম্মুখে দুইটি বাড়ি বা রোয়াক। সন্ধ্যাকালে সেই রোয়াকের একটিতে পাড়ার ভদ্রলোকেরা ও অন্যটিতে চাষী লোকেরা বসিয়া গল্পগুজব করিত। ঘরের ভিতর চাষের যন্ত্রপাতি, বীজ, খইল, তামাকের বস্তা ইত্যাদি থাকিত। দুই একটা মোড়া থাকিত, টেবিল চেয়ার সমস্ত বাড়ীতে কোথাও ছিল না। মোড়ায় বসিয়া কারা পাই বা শনের দড়ি পাকাইতেন।

ভদ্রাসন বাড়ীরও সকল ঘর খড়ের ছাউনি। ভদ্রাসন বাড়ীর দুইটি ভাগ ছিল। ছোট ভাগটিতে একটি ঠাকুর ঘর (ছোট)। তাহার খাড়ি পৈঠা বাঁধানো। আর একখানি শোবার ঘর, তাহা আধা বাহিরের, আধা অন্দরের। অন্দরের দিকে একটা দরজা ছিল। এই ঘরখানির গোটা কাঠামোটা শাল কাঠের। বৃহত্তর অংশে ছিল চারি পাঁচখানি ঘর। একখানি পিতামহের আমলের, তাহাতে একেবারে জানালা ছিল না। এই ঘরেই বাড়ীর মূল্যবান জিনিস পত্র থাকিত। প্রকাণ্ড একটা কাঠের সিন্দুক, বেতের কয়েকটি ঝাঁপি ও টিনের তোরঙ্গে ঘরখানি ছিল ভরা। এখনকার মত ট্রাঙ্ক সুটকেস দেখি নাই। এই বদ্ধ ঘরে কি করিয়া বালাকালে সারা রাত্রি শুইয়া থাকিতাম এখন ভাবিতে গেলে শ্বাসকষ্ট উপস্থিত হয়। বোধ হয় খড়ের চাল বলিয়া অক্সিজেনের অভাব হইত না। একখানি ভাণ্ডার ঘর, ইহাতে বাঁশের তাকে থাকিত অসংখ্য হাঁড়ি। আর একখানিকেও ভাণ্ডার ঘরই বলা যাইতে পারে, এঘরে খড়ের জালা বসানো থাকিত, আলু থাকিত, তরকারি-পত্র, চাল ডালের বস্তা ইত্যাদি থাকিত। বারেন্দার এক কোণে জাঁতা বসানো থাকিত। প্রয়োজন হইলে এই ঘরও স্ত্রীলোকদের শোওয়ার জন্য ব্যবহৃত হইত। পুরুষ আত্মীয় আসিলে বৈঠকখানার কুঠারিতে স্থান পাইত। এই ভাণ্ডারঘরে ইঁদুরের উপদ্রব ছিল খুব বেশি। একবার আমাকে ইঁদুরে কামড়াইয়া দেয়, ভাগ্যক্রমে বিষ হয় নাই। আর একখানি হেঁসেলঘর—দুইপাশে বিস্তৃত, আঁশ ও নিরামিষ। আর একখানি চালাঘর, তাহারও দুইটি ভাগ—একভাগ খোলা, সেখানে মুড়ি ভাজা হইত, চালার মধ্যে কাঠ-খুঁটে থাকিত। তখনও কয়লার প্রচলন হয় নাই, রাঁধা খুঁটেতেই হইত। এই চালাতেই গুনিয়াছি আমার জন্ম হইয়াছিল। ইহারই চালে লাউ কুষ্মাণ্ড ফলিত। উঠানের মাচায় শশা, সীম, বিঙের লতা উঠিত। বাড়ীতে দুইটি নারিকেল গাছ ছিল। ঘরে তক্তাপোশ ছিল, কিন্তু আমরা শুইতাম মেজের উপরে—গ্রীষ্মকালে মাদুরের উপরে, শীতকালে কাঁথার উপরে। তোষক ২।১টা ছিল সে কেবল বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য কিংবা বাবা বাড়ী আসিলে তাঁহার জন্য। মশারীর ব্যবস্থাও তদনুরূপ। আমরা কখনো মশারি টাঙাইয়া শুই নাই, যদিও মশার প্রাদুর্ভাব ছিল খুবই বেশী।

বাবা পূজার সময় আমার জুতা ও জামা কিনিয়া দিতেন। কিন্তু জুতা কখনো পরিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। স্কুলে যাইতাম খালি পায়ে এবং গায়ের উপর একখানা উড়ানি জড়াইয়া। এই উড়ানির খুঁটে মুড়ি বাঁধা থাকিত। শীতকালে দোলাই ব্যবহার করিতাম। ৯।১০ বছর বয়স হইলে র‍্যাপার ব্যবহার করিতে পাইতাম।

খুব শীত পড়িলে জামা গায়ে দিতাম। কাপড় ছিঁড়িলে কাপড় পাইতাম। টাকায় দু'খানা কাপড় পাওয়া যাইত। কিন্তু প্রায়ই সেলাই-করা কাপড় পরিতে হইত। কাপড় কখনো ধোপাবাড়ী যাইত না, গ্রামে ধোপাও ছিল না। ভিন্ন গ্রাম হইতে ধোপা আসিলে বাড়ীবাড়ী ঘুরিয়া ২।১ খানা করিয়া ময়লা দেশী শাড়ী সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইত, একমাস পরে সে ফিরিয়া আসিত। আমাদের কাপড়-চোপড় সবই সাজিমাটি দিয়া কাচা হইত।

কাকার একজোড়া চটিজুতা ছিল। তিনি গ্রামান্তরে যাইতে হইলে তাহা পরিতেন এবং জামাও গায়ে দিতেন। হাটে বা গ্রামের মধ্যে কাহারও বাড়ী নিমন্ত্রণে যাইতে হইলে উড়ানী ব্যবহার করিতেন। তাঁহার একটা তালি দেওয়া এবং সাদাকাপড়ের মলাট দেওয়া ছাতাও ছিল। অনেক ভদ্রলোক তালপাতার ছাতাও ব্যবহার করিতেন।

গ্রামের পথ দিয়া কোন জুতাজামাপরা লোক গেলে তাহার রক্ষা ছিল না। প্রত্যেক লোক তাহার নিকটে কোথায়, কোথায় কি কাজে গিয়াছিল, এবং সে কি করে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা না করিয়া ছাড়িত না। অনেকেই একবেলা থাকিয়া আহারাদি করিয়া যাইবার জন্য তাহাকে পীড়াপীড়ি করিত। কোনক্রমে সে বিশ্রাম করিতে বসিলে তাহার চারিধারে ভিড় জমিয়া যাইত।

এইবার আহারাদির কথা বলি। প্রাতঃকালে মুড়ি-গুড় কিংবা গুড়ের পাটালি দিয়া প্রাতরাশ হইত। চা নামক পদার্থটির কথা আমাদের জানা ছিল না। পাউরুটির নামও শুনি নাই। তবে বাবা বাড়ী এলে একটিন করিয়া বিস্কুট আনিতেন। কাজেই বিস্কুটের স্বাদ জানা ছিল। স্কুলে যাইবার আগে ভাত খাইতাম আলুসিদ্ধ, বেগুনপোড়া এক আধটা ভাজা ও বড়ির টক দিয়া। কারণ তখন তরকারি কোটার সময়, প্রধান তরকারি তখনও হইত না, ভালও হইত না। বেলা একটার আগে পল্লীগ্রামের লোকেরা খায় না। যাহা কিছু রান্না হইত তাহা রাত্রে খাওয়া হইত। দুই বেলা রান্নার প্রথা ছিল না। সন্ধ্যার সময় উনুন জ্বলিত না। কেবল পাঠশুড়ি কিংবা শুকনা পাতা, গাছের শুকনা ডগলি ইত্যাদির সাহায্যে দুধটা গরম করিয়া লওয়া হইত। কেরোসিনের কুপি সন্ধ্যার পর ২।১ ঘণ্টা জ্বলিত। দরজাতেও একটা কুপি বা লণ্ঠন জ্বলিত। দিনের রান্না তাতেতরকারিপত্র হইতে কতক অংশ নিমাত করিয়া রাখা হইত। বলা বাহুল্য সন্ধ্যার সময় তরকারি বিশেষ করিয়া ডালটা টকিয়া যাইত। মাষকলাইয়ের অত্যন্ত তরল ডাল ছাড়া অন্য কোন ডাল হইত না। বিশিষ্ট অতিথি বা আত্মীয় আসিলে মুগ মুসুরির ডাল হইত। সপ্তাহে দুই দিন হাট বসিত পার্শ্ববর্তী গ্রামের প্রান্তে, বাবা একখানি গামছায় বাঁধিয়া তরকারিপত্র কিনিয়া আনিতেন। সাধারণতঃ রান্না হইত —শাক, টক, মাষকলাইয়ের ডাল, একটা প্রধান তরকারি, একটা কিছু সিদ্ধ, মাসে মাসে এক-আধটা ভাজা। পুকুরে পাওয়া যাইত কলমী শুকনীর শাক, বাড়ীর উঠানে পালং নটিয়ার শাক। তাহা ছাড়া শাকওয়ালীরা আসিত, চাল দিয়া তাহাদের কাছে শাক কেনা চলিত। টক সাধারণতঃ তেঁতুলেরই, তাহাতে থাকিত থেঁড়ো, ঝিঙে, বড়ি, লাল আলু, বেগুন ইত্যাদি। কুল বা আমড়ার টক হইলে তাহাতে আর কিছু থাকিত না। প্রধান তরকারি—হয় মোচার ঘণ্ট, নয় লাউএর ঝাল, কুমড়ার ডালনা, আলু পটোলের ডালনা,—এইরূপ একটা কিছু। সাধারণতঃ আলু, ঝিঙে, করলা, ওল, কচু, বড়ি, কাঁচকলা এইরূপ কোন একটা সিদ্ধ করিয়া নুন তেল মাখিয়া খাওয়া হইত। ভাজা মাঝে মাঝে হইত, কিন্তু তাহাকে ভাজা না বলিয়া ছেঁচকি বলাই ঠিক—পটোল, আলু, বেগুন, ঝিঙে, উচ্ছে, করলা, বড়ি ইত্যাদি ভাজা হইত। বিশিষ্ট অতিথি বা আত্মীয় আসিলে ইহার সঙ্গে যোগ করা হইত বড়া। এই বড়া মাষকলাই, ডিম কিংবা পোস্তর; আর মাছ সংগ্রহ করিয়া তাহার ঝোল, ঝাল কিংবা টক। এই সঙ্গে ঘরে পাতা দইও দেওয়া হইত। রাত্রিকালেও তাঁহার জন্য রান্না হইত। বাসি খাইতে দেওয়া হইত না। জলখাবার কিন্তু মুড়ি ছাড়া আর কিছু নয়।

মাছ অতি দুর্লভ ছিল। হাটে মাছ পাওয়া যাইত না। তির গ্রাম হইতে মাছ বিক্রয় করিতেও আসিত না। মাসে দুই একদিন পুকুরে মাছ ধরানো হইত। শরিকানি পুকুরের মাছের অংশ মিলিত খুব কমই। যখন মাছ ধরা হইত—তখন মাছের টক হইত। কোল কাল হইত বলিয়া মনে পড়ে না। মাছের টক করার উদ্দেশ্য দু'বেলা ত চলিবেই—তার পর দিনও চলিবে। মাছ কাটা হইলে তাহার কাঁটা, পটকা, আঁশগুলোও পাড়ার লোকেরা লইয়া যাইত।

ইহা ছাড়া, বর্ষার শেষে ও শরৎকালে ধানের জমিতে জল বাহির করিয়া দিতে হইলে আড়া বসানো হইত। তখন কই, টেংরা, শোলের বাচ্চা, নেটা, চ্যাং, পাঁকাল, পুঁটি ইত্যাদি মাছ পাওয়া যাইত। এই মাছের টক বা ঝাল হইত। শীতের শেষে মেঠো পুকুরগুলোর জল কমিয়া গেলে বাগ্দীর মেয়েরা জালি দিয়া কুচো চিংড়ি, পুঁটি, টেংরা ইত্যাদি ধরিয়া চালের বদলে বিক্রয় করিত। পলুই দিয়া এই সকল পুকুরে বাগ্দীরা কই, মাগুর, শোল ইত্যাদি ধরিত। সে মাছের পরিমাণ এত কম যে গ্রামের খুব কম লোকেই তাহা পাইত। ফলে বৎসরের অধিকাংশ দিন আমরা নিরামিষই খাইতাম। ইলিশ বা বড় চিংড়ি মাছ বাল্যকালে কখনও খাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। খুব বড় রুই কাতলার ভাগ্য গাঁয়ে পাওয়া যাইত না। আমাদের কখনও মামলা মোকর্দ্দমা করিতে হয় নাই, কাজেই কাকার কাটোয়া যাওয়ার প্রয়োজন হয় নাই। সেজন্য কাটোয়া হইতে মাছ বা অন্য দুর্লভ খাদ্য কিছু আসার সুবিধা ছিল না।

আমরা বাল্যকালে কতকগুলো তরকারির সন্ধান রাখিতাম না। যেমন—কপি, টেঁড়স, শালগম, গাজর, বিলাতী বেগুন (টমেটো), বিট, ওলকপি।

আলু চাষে হইত, কাজেই টকেও আলু দেওয়া হইত। মূলা ক্ষেতে হইত, মূলা তরকারিতে থাকিত, কাঁচা মূলা দিয়া মুড়ি খাওয়াও হইত। পেঁয়াজ আমাদের বাড়ীতে প্রবেশ করিতে পাইত না। বাবা শীতকালে কখনও বাড়ী আসেন নাই। কাজেই শহর হইতে কপি আসার সুবিধা হয় নাই। পটোল আমাদের গাঁয়ে বা নিকটবর্ত্তী গাঁয়ে জন্মিত না—সেজন্য পটোল দুর্লভই ছিল। নিকটবর্ত্তী গ্রামে মিষ্ট ডাঁটা, থেঁড়ো, বেগুন, কচু প্রচুর জন্মিত। কাজেই এইগুলি তরকারির প্রধান অঙ্গ হইত। সিদ্ধের মত পোড়ায় হাঙ্গামা কম। সেজন্য বেগুন, আলু, সিদ্ধে পুড়াইয়া খাওয়া হইত। রাত্রিকালে তরকারির টানাটানি হইলে ছোলাভাজাকে গুঁড়াইয়া নুন-তেল মাখিয়া লওয়া হইত। রাত্রের জন্য কখনো কখনো মাষকলাইএর ডালের চাপড়ি করিয়া রাখা হইত। বাড়ীতে ছিল তিনজন মুনিষ স্থায়ী ভাবে, অন্ততঃ একজন বাড়ীও ছিল, একজন রাখাল, একজন ঝি, পরিজনগণের চেয়ে পরিচরের সংখ্যাই বেশী। মুনিষ রাখালের আহারের মানের দ্বারা চাষী ভদ্রলোকদের বাড়ীর আহারের মান নিয়ন্ত্রিত হয়। আমাদেরও হইয়াছিল তাহাই। পৃথক করিয়া গৃহস্থের আহার্য প্রস্তুত হইত না। তাহারাও যাহা খাইত আমরাও তাহাই খাইতাম। দুবেলা রান্না হইলে হয়ত কিছু পার্থক্য ঘটিতে পারিত। মুনিষ রাখাল মোটা চাউলের ভাতই খায় এবং চায়ও। কাজেই সরু ধান বোনা বা, সরু চাল রান্নার প্রথাই ছিল না। তাহারা অন্য তরকারির চেয়ে টকই বেশী ভালবাসে। কাজেই বাড়ীতে টকেরই প্রাধান্য ঘটিয়াছিল। দিন তিন ছটাক তেলের রোজ ছিল—তাহা হইতে মাখিতে কিছু যাইত, মুনিষরা মাখিবার জন্য অনেকটুকু তেল লইত। রাত্রে গরুকে খাবার দিবার জন্য ও গোয়াল তদারক করিবার জন্য রাখাল পৃথক তেল লইত—প্রদীপ জ্বালিতেও কিছু যাইত। কাজেই রান্নার বেলায় তেলের টানাটানি হইত। মুনিষ গৃহিণীরা মুনিষদের জন্য বাড়ীতে ভাত লইয়া যাইত। সেই ভাতেই মুনিষের পরিবারের সকলের আহার চলিয়া যাইত। চাষের সময় এই ভাতের দুইটি ভাগ হইত। দিনের বেলার ভাত কাকা মাঠে নিজে বহিয়া লইয়া যাইতেন। রাত্রের বেলার ভাত মুনিষ গৃহিণী বাড়ী লইয়া যাইত—তাহার পরিমাণ অনেক

বেশী। তরকারির জন্য মুনিষদের কোন অভিযোগ হইত না—বাড়ীতে লওয়া আতটার পরিমাণ কম না হইলেই হইল।

এই যে আহারের মানের কথা বলিলাম—তাহা গ্রামের চিরপ্রচলিত মান। এই মান অনুসরণই প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। ইহার অন্যথাচরণের কথা কেহ ভাবিতেও পারিত না। ইহাকে উল্লঙ্ঘন করাকে সকলে বড়মানুষি মনে করিত এবং তাহা করিলে অচিরে যে দারুণ দারিদ্র্য আসিয়া পড়িবে তাহাই ভাবিত।

কাকা ভাবিতেন, জীবনযাত্রার মান সকলের সঙ্গে একরূপ না রাখিলে সকলের ঈর্ষার পাত্র হইয়া সহানুভূতি হারাইতে হইবে। গ্রামে বাস করিতে হইলে সকলের সঙ্গে মিল ও সামঞ্জস্য রাখিয়া চলার প্রয়োজন। তাহা ছাড়া উচ্চতর মানের সন্ধানও তিনি রাখিতেন না। গ্রামে উপাদেয় দ্রব্যাদিও পাওয়া যাইত না।

আমি তখন গাঁয়ের বাড়ীর একমাত্র সন্তান—কাকা ও পিসীমার অত্যন্ত স্নেহাস্পদ—আমি গাইনার স্কুলে পড়িতেছি। এজন্য যে আমার আহারাদির পৃথক ব্যবস্থা থাকার প্রয়োজন একথা তাঁহারা কখনো চিন্তাও করেন নাই। আমার নিজেরও তাহা কোনদিন মনে হয় নাই। মনে হইলে ভালো খাওয়ার জন্য আমি ঝোঁক ধরিতে পারিতাম, বায়না ধরিতে পারিতাম। তাহা ধরিলে কাকা পিসীমা ব্রস্ত হইয়া তাহা করিতেন। আমার মাথা ধরিলে তাঁহাদের আহার নিদ্রা ঘুচিয়া যাইত। দুধ মাছের জন্য তরকারি-পত্রের জন্য বায়না ধরা যায়—ইহা আমার ধারণার অতীত ছিল। যাহা গাঁয়ে পাওয়াই যায় না—যাহা গাঁয়ের ছেলেরা কেহই খায় না—তাহার জন্য যে বায়না ধরা চলে না, সেটুকু বুঝিবার মতো বুদ্ধি আমার ছিল। তবে কাঁটালের গাড়ী গাঁয়ে আসিলে 'কাঁটাল কেনো' বলিয়া ঝোঁক ধরিতাম বই কি! সরু চালের ভাত, মুগের ডাল, ভাল করিয়া ভেজে ভাজা খাস্ত, মাছের ঝোল, ভাতে ঘি, ক্ষীর সন্দেস এই সব মানুষে নিত্য খায় কিনা তাহাও জানিতাম না। আমাদের আর্থিক অবস্থা কেমন তাহাও বুঝিতাম না।

আমার এখন মনে হয় বাল্যকালে আমি যে খাদ্য খাইয়াছি—তাহাতে বোধ হয় কবি হওয়া চলে। হয়ত নিকটবর্তী গ্রামে সদ্যজাত কাশীরাম বা দাশরথি ইহাই খাইয়া অতবড় কবি হইয়াছিলেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হইতে হইলে বোধ হয় এ খাদ্যে সুবিধা হয় না। আমাদের অঞ্চলে যাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হইয়াছেন—তাঁহারা সকলেই অবস্থাপন্ন ঘরের বিদেশে প্রতিপালিত সন্তান।

পাড়ার লোকের বাড়ীতে কুটুম্ববাড়ী হইতে যে তত্ত্ব আসিত তাহাতে উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন থাকিত না—আসিত বড় বড় বাতাসা, কদমা, ওলা খুব জোর ছানার গন্ধযুক্ত মোণ্ডা। যাহার বাড়ীতেই তত্ত্ব আসুক, তাহার অংশ আমাদের বাড়ীতেও আসিত। মাসী পিসীর বাড়ী হইতে বাতাসার সঙ্গে ঘন ক্ষীর বা নারিকেলের রসকরা আসিত।

বাবা পূজার সময় এক মাস ছুটি পাইয়া বাড়ী আসিতেন। সেই সময়ে খাদ্যের মান কিছু উন্নত হইত। তিনি মাখনমাইয়ের ডাল খাইতেন না। তাঁহার জন্য কাকা কিছু সরু চাউলও সংগ্রহ করিতেন। আমাদের চাষে সরু চাউল হইত না। তখন পুকুরে ঘন ঘন মাছ ধরানো হইত। মা সঙ্গে আনিতেন—মিষ্টি আমের আমচুর, আমসত্ত্ব, সুজি, চিনি, ঘি, বেসন। কি মিষ্টান্ন আনিতেন মনে নাই। মাঝে মাঝে হালুয়া, পরোটা, লুচি পাওয়া হইত। বিশেষ করিয়া বিজয়ার রাত্রে।

পূজার সময়ে সকল বাড়ীতে নারিকেলের নাড়ু, তিলের নাড়ু, মুড়ির নাড়ু ও মুড়কি তৈয়ারি হইত। বিজয়ার রাত্রে যাহারা প্রণাম করিতে আসিত তাহাদের ঐ সব খাইতে দেওয়া হইত। মা ঐ রাত্রে সকলকে নিমকি তৈয়ারি করিয়া খাওয়াইতেন।

আখের গুড়ের অভাব আমাদের ছিল না। কারণ, চাষে প্রচুর গুড় হইত। কিন্তু খেজুরের গুড় পাইলে আখের গুড় ভালো লাগিত না। খেজুর গুড়ের পাটালি রীতিমত সন্দেশের মর্যাদালাভ করিত। গ্রামে খেজুর গুড় জন্মিত না—যদিও গ্রাম ছিল খেজুর গাছে পরিপূর্ণ।

ফলের মধ্যে আমরা প্রচুর পাইতাম তাল, বেল, কুল, জাম ও ফুটি। গ্রীষ্মকালে তালশাঁস যথেষ্ট পাওয়া যাইত—কিনিতে হইত না। তালগাছ হইতে তালের কাঁদি পাড়ানো হইত। ভাদ্রমাসে ২।১ দিন চালের গুঁড়ি দিয়া তালের বড়া হইত। নারিকেল খুব দুর্লভ ছিল না। কিন্তু নারিকেলের নাড়ু করিয়া খাইতে হয় ইহাই জানিতাম। তরকারিতে নারিকেল ব্যবহারের প্রথা ছিলনা। নারিকেল ভাঙ্গিয়া শাঁস খাইবার প্রথাও ছিলনা। আজকাল যাঁরা পেঁপে গাছ রোপণ করিয়াছেন তাঁহারা বলিবেন যে পেঁপে গাছ হয়, তখন কাহারও বাড়ীতে পেঁপে গাছ দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তবে পেঁপের স্বাদ অজ্ঞাত ছিল না। আতা গ্রামেই জন্মিত—প্রচুর না হইলেও কখনোসখনো খাইতে পাইতাম। গাঁয়ের বাগানের আম তেমন মিষ্ট ছিলনা। উৎকৃষ্ট আম তখনো খাই নাই। ভিন্ন গ্রাম হইতে আম বিক্রয় করিতে আসিত। সে আমও অম্লমধুর। বাবা যদি কোন আষাঢ়ে বাড়ী আসিতেন তাহা হইলে মুর্শিদাবাদী আম খাইবার সুবিধা হইত। কিন্তু পূজার সময় ছাড়া অন্য সময়ে বাড়ী আসিতেন না। সেজন্য কমলা লেবু, লিচু ইত্যাদি ফলের স্বাদ আমার অজ্ঞাতই ছিল। খেজোয়াড়ী খেজুর তখনো খাই নাই, গ্রামের খেজুরই চুষিতে হইত। কাঁঠাল আমাদের গ্রামে জন্মিত না। তবে আষাঢ় শ্রাবণে পাটুলি অঞ্চল হইতে কাঁঠালের গাড়ী আসিত। তখন ২।১টা কাঁঠাল কেনা হইত। কাঁঠালের বীচি বড়ই উপাদেয় মনে হইত। কাহারো বাড়ী তখন কাঁঠাল আসিলে কয়েক কোয়া আমাদের বাড়ীতে আসিত। অন্ততঃ দুই কোয়া আমার ভাগে পড়িত। কাঁঠাল আমার অমৃতোপম মনে হইত। কাসিমবাজারে কাঁঠাল এত সুলভ ছিল যে গুরুপাক বলিয়া পরে কোন দিন কাঁঠাল স্পর্শ করি নাই। মালপহের সঙ্গে পাড়ার একটি পরিবারের কুটুম্বিতা ছিল—তাহার ফলে ফজলী আমের চাকা আমাদের বাড়ীতে আসিত। ফজলি আমের স্বাদ পাইয়া ভাবিতাম—এত বড় আম সবটাই মিষ্ট। যে দেশে ফজলি ফলে তাহারা কি ভাগ্যবান! কলা হাটে পাওয়া যাইত, কিন্তু কলা যে পূজা-পার্বণ ছাড়া অন্য সময়ে কেনা বা খাওয়া চলিতে পারে এ ধারণা কাহারো ছিলনা। অথচ এক পয়সায় ৪।৫টা কলা তখন পাওয়া যাইত। গাঁয়ে কলার চাষও ছিলনা। তরমুজের কালি পাড়ার লোকের বাড়ী হইতেই আসিত। তরমুজ গন্ধ ছাড়া অন্যত্র পাওয়া যাইতনা। কাগজিলেবু গাঁয়ে পাওয়া যাইতনা—ব্যায়ামশীড়া হইলে উহা আনাইতে হইত।

এইত গেল ফলের কথা। বাড়ীতে গাইগরু পোষা হইত। কিন্তু বলদ মহিষের যেরূপ যত্ন হইত গাইগরুর তেমন যত্ন হইতনা। আমাদের অঞ্চলে গরুতে দুধ দেয় বড় কম। তিনটা গরু দোহাইলে হয়ত একসের দুধ মিলে। বাল্যকালে দুধ হইতে একেবারে বঞ্চিত হই নাই। রাত্রিকালে দুধ খাইতাম—ঘরে পাতা দই ও ভাতের সঙ্গে মাঝে মাঝে খাইতে পাইতাম। আমাদের দেশের গাইয়ের দুধ ঘন ও মিষ্ট। গোরুর পেটেই এক বলক যেন আওটানো হইয়া যাইত। মিঠা সর তুলিয়া রাখিয়া সেই সর হইতে যে সামান্য ঘৃত জন্মিত তাহা গৃহাগত আত্মীয়কুটুম্ব বা বিশিষ্ট অতিথির জন্য রাখিয়া দেওয়া হইত। নেকড়া দিয়া লাল পিঁপড়াগুলি ছাঁকিয়া ফেলিয়া তাহাদের ভাতে দেওয়া হইত।

পরবর্ত্তী সংখ্যায় নৈমিত্তিক আহার্য্যের কথা বলিব।

কার্ত্তিকচন্দ্র বসু

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

মধ্য কলিকাতার একটি গলিতে একখানি ক্ষুদ্র গৃহে বসিয়া একজন তরুণ চিন্তা করিতেছিল। ভ্রাতাভগিনীর কলরব—এমন কি পিসীমা'র আহ্বানও যেন তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল না। কয়দিন হইতে তাহার সদা প্রফুল্ল মুখে চিন্তার ছায়া লক্ষিত হইতেছিল। আজ কলেজ হইতে ফিরিবার পরে সেই ছায়া নিবিড় হইয়াছিল। কলেজে অধ্যাপক যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সে মনোযোগ সহকারে লিখিয়া লইয়াছিল—কিন্তু পাঠ্য পুস্তকের সহিত তাহা মিলাইয়া লওয়া প্রয়োজন, অথচ পাঠ্য পুস্তক ক্রয় করিবার সামর্থ্য তাহার নাই। যে ব্যবস্থায় সে মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশের সুযোগ অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহাই সে সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে—তাহার পরে ব্যয়সাধ্য পাঠ্য পুস্তক ক্রয় করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। এই অবস্থায় সে কি করিবে, ভাবিতেছিল। যে সমুদ্রের তরঙ্গে তাড়িত হয় সে যদি সহসা উদ্ধারের উপায় পায়, তবে যেমন আনন্দিত হয়, কিছুক্ষণ পরে তরুণ তেমনই আনন্দলাভ করিল। সে আনন্দের কারণ—তাহার সঙ্কল্প, তাহাকে কলেজের সব পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি লাভ করিতে হইবে—সে তাহাই করিবে। সে কখন সেই সঙ্কল্প-ভ্রষ্ট হয় নাই—তাই সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। সেই তরুণ—কার্ত্তিকচন্দ্র বসু।

১২৮০ বঙ্গাব্দের (১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ) ৩০শে কার্ত্তিক চব্বিশ পরগণা জিলার সোনারপুর থানার অন্তর্গত চাংড়িপোতা গ্রামে প্রসন্নকুমার বসুর দ্বিতীয় পুত্র কার্ত্তিকচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বংশের গৌরব ও পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তির সৌরভ যথেষ্ট ছিল, কিন্তু পরিবারে অর্থের প্রাচুর্য্য ছিল না—অভাবের আভাস ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কার্ত্তিক পূজার দিন জন্মগ্রহণ করায় তাঁহার নাম—কার্ত্তিকচন্দ্র হয়। কার্ত্তিকচন্দ্র যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার অগ্রজ প্রবোধচন্দ্রের বয়স দুই বৎসর। পিতা প্রসন্নকুমার কলিকাতার কোন য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীর কার্য্যালয়ে সামান্য বেতনে চাকরী করিতেন। "যেমন তেমন চাকরী—দী-ভাত"—চলিত কথা থাকিলেও প্রসন্নকুমারের অগ্রজ রাজকুমার সামান্য ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কার্ত্তিকচন্দ্রের জন্মের অল্পকাল পরে রাজকুমার কলিকাতায় —গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে একখানি গৃহ ক্রয় করেন। তদবধি দুই ভ্রাতা সপরিবারে সেই গৃহেই বাস করিতে থাকেন। সেই গৃহেই কার্ত্তিকচন্দ্রের দুই ভগিনীর জন্ম হয়। কিন্তু তাঁহার জননী যখন আসন্ন-প্রসবা সেই সময় রাজকুমারের মনে হয়, তিনি বাড়ী বিক্রয় করিয়া সপরিবারে কাশীবাসী হইবেন। গৃহ কিনিয়া লইবার মত অর্থ প্রসন্নকুমারের ছিল না। অগত্যা গৃহ বিক্রীত হইলে তিনি উহারই একাংশ ভাড়া লইয়া তাহাতে বাস করিতে থাকেন। তথায় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র চারুচন্দ্র ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

অর্থের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও এবং অভাবের সহিত সংগ্রাম অনিবার্য্য হইলেও সুবিধায় পাইয়া প্রসন্নকুমার রামাপুকুরে বহু কাঠা জমী কিনিয়াছিলেন। অগ্রজ কাশীবাসী হইবার পরে তিনি ঋণ করিয়া সেই জমীর একাংশে একখানি ক্ষুদ্র একতল গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু সেই সময়ে অতর্কিত বিপদে তিনি অভিভূত হইলেন—তাঁহার পত্নী-বিয়োগ ঘটিল। তিনটি পুত্র—তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠের বয়স মাত্র দেড় বৎসর ও দুইটি কন্যা লইয়া গৃহিণী-হীন সংসারে থাকিয়া প্রসন্নকুমার বিপন্ন হইলেন। এই অতর্কিত বিপদে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে উদ্ধারলাভের

উপায় পাইলেন। তাঁহার অপরা ভগবতারিণীর পুত্র-সন্তান ছিল না—তাঁহার একমাত্র কন্যাও তখন বিবাহিতা। তিনি ভ্রাতার অবস্থায় ব্যাকুল হইয়া আসিয়া সেই সংসারের ভার গ্রহণ করিলেন—যেন কাণ্ডারীবিহীন তরণীতে কাণ্ডারী হইলেন। মাতৃহীনদিগকে তিনি অঙ্কে তুলিয়া লইলেন। তাহারা মাতৃশোক ভুলিল—চারুচন্দ্র তাঁহাকেই "মা" বলিতে আরম্ভ করিল।

আর্থিক অবস্থা যেরূপ তাহাতে প্রসন্নকুমারের পক্ষে সংসারী রাখা সম্ভব ছিল না। পিসীমাকেই সংসারের সকল কাজ করিতে এবং শিশুদিগের লালন পালন করিতে হইত। প্রবোধচন্দ্র সর্ব্বাগ্রজ—কিন্তু তিনি বাল্যকাল হইতেই অধ্যয়ন তপস্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন—অন্য কোন দিকে মন দিতেন না। কাজেই ৯।১০ বৎসর বয়স্ক বালক কার্ত্তিকচন্দ্রকেই সাংসারিক কার্য্যে পিসীমাকে সাহায্য করিতে এবং ভগিনীদ্বয়কে ও ভ্রাতাকে দেখিতে হইত। প্রয়োজনে তিনিই দ্রব্যাদি আনিতে বাজারে যাইতেন। সুখের বিষয়, কাজে কার্ত্তিকচন্দ্রের আনন্দ থাকা ত পরের কথা আনন্দ ছিল। তিনি কাজই ভাল বাসিতেন—হাসিমুখে বাড়ীর সব কাজ করিয়া প্রতিবেশী-দিগকেও কাজে সাহায্য করিতেন। সেই জন্য পল্লীতে তাঁহার বিশেষ আদর ছিল—তিনি নিমন্ত্রণ খাইয়া ও লোকের উপকার করিয়া বেড়াইতেন। এই সময় বাজারে ব্যবসায়ীদিগের কাজ লক্ষ্য করিবার যে সুযোগ তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই। ভবিষ্যৎ জীবনে ব্যবসাক্ষেত্রে তাহাতে তাঁহার বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

বাল্যকালে—প্রথম ছাত্র জীবনে কার্ত্তিকচন্দ্র বিশেষ কৃতিত্ব-পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাহার কারণ একাধিক, গৃহে কাজ অনেক ছিল, প্রতিবেশীদিগকে কাজে সাহায্য করা ছিল এবং নানারূপ পুস্তক পাঠের নেশা ছিল। গল্প, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, কবিতা—কোন বিষয়ই তিনি অনাদর করিতেন না। বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস প্রভৃতির কোমলকান্ত পদাবলী তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। এই সকল কারণে তিনি প্রথম পাঠদশায় পাঠ্য পুস্তকে সমধিক মন দিতেন না। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত রিপন কলেজের (বর্ত্তমানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) স্কুল বিভাগ হইতে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ঐ কলেজে প্রবেশ করেন ও এফ. এ (বর্ত্তমান ইন্টার-মিডিয়েট) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন তাঁহাকে ডাক্তারী শিক্ষার জন্য মেডিক্যাল কলেজে দিবার প্রস্তাব হয়। সেই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার সময় কার্ত্তিকচন্দ্র যাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহাতে তিনি বুঝিলেন—দরিদ্রের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার পথে বিঘ্ন অনেক। মেডিক্যাল কলেজে পুত্রের পাঠের ব্যয়ভার বহন করা প্রসন্নকুমারের পক্ষে দুঃসাধ্য। কিন্তু সে বিপদেও তিনি অপ্রত্যাশিতরূপে সাহায্য পাইলেন—তাঁহার এক বন্ধু অবস্থা অবগত হইয়া কার্ত্তিকচন্দ্রকে তাঁহার পুত্রের গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। কলেজের বেতনের সংস্থান হইল। কিন্তু চিকিৎসাবিদ্যার গ্রন্থগুলির মূল্য অধিক—সে সব ক্রয় করিবার কোন ব্যবস্থা কার্ত্তিকচন্দ্র করিতে পারিলেন না। সে জন্য তিনি চিন্তিত হইলেন। কলেজে অধ্যাপক যাহা বলিতেন তাহা তিনি সযত্নে লিখিয়া লইতেন বটে, কিন্তু পুস্তক পাঠ ব্যতীত তাহা সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। সে জন্য তাঁহাকে সতীর্থদিগের গৃহে যাইয়া পুস্তক পাঠ করিতে হইবে—ইহা দারিদ্র্যের দণ্ড। কিন্তু দারিদ্র্য দূর করিবার কোন উপায় ত তাঁহার ছিল না। কাজেই তাঁহাকে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে হইবে। প্রতি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া তাঁহাকে বৃত্তি লাভ করিতেই হইবে—নহিলে শেষ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করা সম্ভব হইবে না।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তার ভাব দূর হইয়া গেল। কার্ত্তিক-চন্দ্র স্থির করিলেন, খেলা, পাঠ্যপুস্তকাতিরিক্ত পুস্তক পাঠ, অন্য কাজ—সব সযত্নে বর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিতে হইবে। তাঁহার এক দিনও বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকা চলিবে না; কারণ, অধ্যাপকের কথা লিখিয়া লইতে হইবে; আর তাহার পরে কোন সতীর্থের কাছে যাইয়া মূল পুস্তক পাঠ করিয়া বিষয়টি আয়ত্ত করিতে হইবে।

ঐন্দ্রজালিকের দণ্ডস্পর্শে যেমন মানুষের পরিবর্তন হয়, গল্পে আছে—তেমনই যে দৃঢ়সঙ্কল্পে মানুষের স্বভাবের পরিবর্ত্তন সম্ভব হয় এক দিনে কার্ত্তিকচন্দ্র তাহা দেখাইলেন। পল্লীর চপলস্বভাব, হাস্যপরিহাসপ্রিয়, পাঠ্য পুস্তকাতিরিক্ত পুস্তক পাঠে আগ্রহশীল যুবক এক দিনে গম্ভীরপ্রকৃতি, পাঠ্যপুস্তক পাঠে নিবিষ্টচিত্ত অধ্যয়নশীল যুবকে পরিণত হইল। কয় বৎসর কার্ত্তিকচন্দ্র কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সর্বপ্রধান ছাত্র হইয়া পরীক্ষায় পর পরীক্ষায় সাফল্য ও বৃত্তি লাভ করিলেন। আর কোন দিকে তাঁহার মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয় নাই। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ২৪ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম, বি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন—কেবল উত্তীর্ণ হইলেন না, শরীরতত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্ব, প্রসূতিবিজ্ঞান, শস্ত্রচিকিৎসা প্রভৃতি প্রায় সকল বিষয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেন এবং সর্বোচ্চ পরীক্ষার্থীরা প্রাপ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কার পাইলেন। দৃঢ়সঙ্কল্পের ও ঐকান্তিক পরিশ্রমের জয় হইল।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কার্ত্তিকচন্দ্র চক্ষুচিকিৎসা বিভাগে—হাসপাতালে কাজে যোগ দিয়া অল্পকাল মধ্যে চক্ষুচিকিৎসায় খ্যাতিলাভ করিলেন। কিন্তু সঙ্কীর্ণ কর্ম-ক্ষেত্রে একটি বিভাগে চাকরীর বন্ধন তাঁহার সহ্য হইল না। চাকরী ত্যাগ করিয়া তিনি স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসা অবলম্বন করিলেন। তখনও সকল বিষয়ে বিশেষজ্ঞের আদর হয় নাই; দেশ দরিদ্র—চিকিৎসককে নানারূপ রোগের চিকিৎসা করিতে হইত। নানা বিভাগেই কার্ত্তিকচন্দ্রের খ্যাতি দিন দিন ব্যাপ্তিলাভ করিতে লাগিল। আবার তাঁহার সহৃদয়তা রোগী আকৃষ্ট করিতে লাগিল—অর্থের জন্য তিনি কখন রোগীকে পীড়িত করিতেন না—সময় সময় বিনা পারিশ্রমিকে চিকিৎসাও করিতেন—লোকসেবায় আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিতেন।

অল্পকালের মধ্যেই কার্ত্তিকচন্দ্র প্রসিদ্ধ ঔষধ ব্যবসায়ী বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপক চিকিৎসক-রূপে যোগ দিলেন। দীর্ঘ ২০ বৎসর কাল ঐ প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংযুক্ত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানে তখন যেন মণিকাঞ্চনযোগ হয়। নানা বিভাগে চিকিৎসায় নিপুণ কার্ত্তিকচন্দ্র ব্যবস্থাপক, আর বটকৃষ্ণ পালের জ্যেষ্ঠপুত্র ভূতনাথ পাল তাহার কার্য্যাধ্যক্ষ। ঐ প্রতিষ্ঠানেই ভূতনাথ বাবুর জাগ্রতাবস্থার কর্মক্ষেত্র এবং নিদ্রার স্বপ্নের বিষয় ছিল। প্রতিষ্ঠানটি সমগ্র প্রাচ্যে অন্যতম প্রধান ঔষধ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের গৌরব লাভ করিল।

বাল্যাবধি কার্ত্তিকচন্দ্র কর্মপ্রিয় ছিলেন। এখন একদিকে তাঁহার পসার বৃদ্ধিতে অপরদিকে বটকৃষ্ণ পাল প্রতিষ্ঠানে তিনি বিস্তৃত কার্যক্ষেত্র পাইলেন।

তখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রেসিডেন্সী কলেজের পরীক্ষাগারে তাঁহার সহকর্মী চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ীর সহিত এক যোগে এ দেশে একটি ঔষধ প্রস্তুত করিবার কারখানা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। ক'জন উৎসাহী যুবক—বিশেষ ডক্টর অনুলাচরণ বসু—তাহাতে যোগ দিয়াছেন। শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার দুই বৎসরের মধ্যে, ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে, প্রফুল্লচন্দ্র কার্ত্তিক-চন্দ্রকে ঐ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে আহ্বান ও প্ররোচিত করিলেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাস্যুটিক্যাল ওয়ার্কসে উন্নতির জোয়ার বহিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও চন্দ্রভূষণবাবু পরীক্ষায় ও শিক্ষাদানে সমস্ত জীবন অতি-বাহিত করিয়াছিলেন—প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার দিক তাঁহা-দিগের অধিক সময় লইতে পারিত না—সে দিকে তাঁহাদিগের অভিজ্ঞতারও অভাব ছিল। শেষোক্ত অভাব কার্ত্তিকচন্দ্র দূর করিলেন—বিশেষ বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানীর সহিত তাঁহার যোগ থাকায় প্রতিষ্ঠানের প্রস্তুত ঔষধাদি বিক্রয়ের সুবিধা হইল। বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানী ও বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠান—পরস্পরের সাহায্যে পরস্পর উন্নতি লাভ করিতে লাগিল। উভয়ের মধ্যে যোগসেতুরূপে কার্ত্তিকচন্দ্র বিরাজ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিচক্ষণতা, ব্যবসাবুদ্ধি, দূরদৃষ্টি ও অভিজ্ঞতা বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানের দ্রুত উন্নতির অন্যতম প্রধান কারণ হইল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ দশ বৎসর তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ছিলেন—১৯০০

হইতে ইহা লিমিটেড লায়েবিলিটি কোম্পানীতে পরিণত হইলে তিনি প্রথমে উহার অন্যতম ডিরেক্টার হইয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ম্যানেজিং ডিরেক্টার ছিলেন। তাঁহার কার্যকালে প্রতিষ্ঠানের মূলধন ২৫ হাজার টাকা হইতে ৫ লক্ষ টাকা করা হয় এবং কলিকাতার উপকণ্ঠে মাণিকতলায় বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে বিরাট কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ জমী প্রথমে কার্তিকচন্দ্র স্বয়ং বেঙ্গল প্রতিষ্ঠানকে হস্তান্তরিত করেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠান সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে কার্তিকচন্দ্র তাহার সহিত সম্বন্ধ বর্জন করিয়া নিজস্ব গবেষণাগার—"ডক্টর বসুর ল্যাবরেটারী" স্থাপিত করেন। দেশীয় ভেষজসমূহের বৈজ্ঞানিক ব্যবহার ও তাহাদের ঐ সকলের ক্রিয়া সম্বন্ধে গবেষণা ইহার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ও কাজ হইলেও পরে ইহা বিবিধ-বিভাগসমন্বিত বিরাট প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং নানা রোগের ঔষধ ইহাতে প্রস্তুত করা হইতে থাকে। এই প্রতিষ্ঠানের নানা উল্লেখযোগ্য কার্যের মধ্যে দুইটির উল্লেখ করিতেছি—

(১) সর্পগন্ধা আজ সমগ্র সভ্যজগতে রক্তের চাপ ও অনুরূপ রোগে অমূল্য ঔষধ বলিয়া বিবেচিত ও আদৃত। এই উদ্ভিদের গুণ-পরীক্ষা প্রথমে এই গবেষণাগারে হয়। কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন ব্যবসায়ব্যপদেশে পাটনায় গমন করিলে নার আলি ইমাম ও সার হাসান ইমামের বৃদ্ধ পিতা তাঁহাকে একটি গাছ দিয়া বলেন, তিনি কোন সাধুর নিকট উহা পাইয়াছেন—উহা উন্মাদ রোগে ঔষধরূপে ব্যবহার করিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি সুফলও পাইয়াছেন; কিন্তু বিশেষ পরীক্ষার সুযোগ তাঁহার নাই—কবিরাজ মহাশয় তাহা করিতে পারেন। কবিরাজ মহাশয় ইহার অল্পদিন পরেই অসুস্থ হওয়ায় উহার পরীক্ষা করিতে পারেন না বটে, কিন্তু রোগশয্যায় কবিরাজ গণনাথ সেনকে ডাকিয়া উহার পরীক্ষা করিতে বলিয়া যান। কবিরাজ গণনাথ তাঁহার বন্ধু কার্তিকচন্দ্রকে উহা বলিলে কার্তিকচন্দ্র স্বীয় গবেষণাগারে উহার বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করেন এবং তখন কার্তিকচন্দ্র ও গণনাথ একযোগে সে সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন তাহাতে উহার গুণবর্ণনা ছিল—তাহাই পরবর্তী বহু গবেষকের গবেষণার ভিত্তি।

(২) আয়ুর্বেদে অর্জুনগাছের ছাল হৃদ্‌রোগের ঔষধ বলিয়া বিবৃত আছে। অ্যালোপেথিক চিকিৎসকগণ উহার উপযোগিতা স্বীকার করিতে দ্বিধা অনুভব করেন। ডক্টর বসু তাঁহার গবেষণাগারে পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন করেন—সুস্থ দেহে উহার কোনরূপ ক্রিয়া দেখা যায় না বটে, কিন্তু হৃদ্‌রোগগ্রস্ত রোগীর দেহে উহার ক্রিয়া কল্যাণকর। আয়ুর্বেদে উল্লিখিত ঔষধোপকরণ যে ফলপ্রদ তাহা প্রতিপন্ন হয়।

কার্তিকচন্দ্র যখন বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টারের কাজ করিতেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রতিপত্তি বিস্তার করিতেছিলেন, তখনই তিনি ভারতীয় ভেষজোপকরণ সম্বন্ধে ইংরেজীতে যে পুস্তক রচনা করেন, তাহা ঐ বিষয়ে আদৃত প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—পূর্বে ডাক্তার কানাইলাল দে ও ডাক্তার দুর্গাদাস কর তাঁহাদিগের গ্রন্থে এক বা একাধিক দেশীয় ঔষধের উল্লেখ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রতিষ্ঠান ও কার্তিকচন্দ্রের পূর্বে বহুবিধ দেশীয় ভেষজের ব্যবহার—বিদেশী ভেষজের সহিত প্রতিযোগিতামূলকভাবে আরম্ভ হয় নাই।

নিজস্ব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পরেই কার্তিকচন্দ্র তাঁহার ঈপ্সিত একটি কাজ করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঔষধ দিয়া জাতির স্বাস্থ্যের উন্নতি করা সম্ভব নহে। অজ্ঞতাই অনেক স্থলে রোগের ও রোগ বিস্তারের কারণ—সেই জন্য লোককে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন করিতে হইবে—তাহাদিগের নিকট স্বাস্থ্যবার্তা প্রচার করিতে হইবে। সেই প্রচারকার্য নিয়মিত ও ব্যাপকভাবে করিবার জন্য তিনি কতকগুলি স্বাস্থ্যপত্র প্রকাশ করেন—

(১) ইংরেজীতে "হুড অ্যাণ্ড হেলথ"—ত্রৈমাসিক পত্র;

(২) বাঙ্গালায় "স্বাস্থ্য-সমাচার" ;

(৩) হিন্দীতে "স্বাস্থ্য-সমাচার" ;

(৪) উর্দুতে "তন্দুরস্তি" ;

(৫) ইংরেজীতে "হেল্‌থ অ্যাণ্ড হ্যাপিনেস"।

এতগুলি পত্রের নিয়মিত প্রকাশ অপরের ছাপাখানার উপর নির্ভর করিয়া করা দুঃসাধ্য বুঝিয়া কার্তিকচন্দ্র আপনার প্রয়োজনে বিরাট ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। কার্যের পরিধি বিস্তারের জন্য আকাঙ্ক্ষা সর্বদাই তাঁহাকে উৎসাহিত করিত—অনুশীলনে তাঁহার কাজ করিবার শক্তিও বর্ধিত হইত।

ভারত সরকার যখন ভেষজোপকরণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান জন্য এক সমিতি নিযুক্ত করেন, তখন তাঁহারা কার্তিকচন্দ্রকে তাহার অন্যতম সদস্য মনোনীত করেন। সেই সম্পর্কে তাঁহার রিপোর্ট (১৯৩১ খৃষ্টাব্দে) বিশেষ মূল্যবান তথ্য ও প্রস্তাবে পূর্ণ।

অনুসন্ধান পরীক্ষা ও গবেষণার ফলে তিনি কোন কোন ভেষজের গবেষণার প্রয়োজন বুঝিয়া আয়ুর্বেদীয় গবেষণার জন্য গবেষকদিগকে নিজ গৃহে স্থান প্রদান করিয়াছিলেন।

যাহাকে "কাজ-পাগলা" বলে, কার্তিকচন্দ্র তাহাই ছিলেন।

(১) তিনি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ঔষধের জন্য "ডিষ্টিলেসান প্ল্যাণ্ট" স্থাপিত করেন। ভারতবর্ষে এ বিষয়ে তিনিই অগ্রণী।

(২) ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ঘুনিয়ন "ডিষ্টিলারী" নাম দিয়া যে কারখানা প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে প্রতিদিন ৩ শত গ্যালন "রেক্টিফাইড স্পিরিট" উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল। তিনিই এ দেশে এদেশীয়দিগের মধ্যে সর্বাগ্রে ঔষধাদি প্রস্তুত করিবার জন্য সুরাসার ব্যবহারের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এই অধিকার ইংরেজ সরকার য়ুরোপীয়দিগের কারখানায় বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কার্তিকচন্দ্র যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাতে সরকার কোন যুক্তিতেই তাঁহাকে সেই অধিকারের বাহিরে রাখিতে পারেন নাই।

(৩) ১৯২০ খৃষ্টাব্দে কার্তিকচন্দ্র "বসু ল্যাবরেটরীর" বিস্তার সাধন করিয়া তাহা লিমিটেড লায়েবিলিটি কোম্পানীতে পরিণত করেন।

(৪) ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলিয়াঘাটায় সকল যন্ত্রসমন্বিত যে কারখানা স্থাপিত করেন তাহাতে দৈনিক ৬ টন 'অ্যাসিড' উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা ছিল। এই কারখানায় নানাবিধ 'হেভি কেমিক্যাল' এবং বীজাণু পরিশোধক দ্রব্যও প্রস্তুত হইত।

(৫) ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে কার্তিকচন্দ্র চিকিৎসকদিগকে 'ষ্ট্যাণ্ডারডাইজড' ফার্মাসিউটিক্যাল ঔষধ ও দেশীয় উপকরণে প্রস্তুত ঔষধ সরবরাহ করিবার জন্য "ফিজিওলজিক্যাল ল্যাবরেটরী" স্থাপিত করেন। তাঁহার ঔষধাগারেই এ দেশে প্রথম সেঁকো-ঘটিত—যৌন ব্যাধির ঔষধ প্রস্তুত করা আরম্ভ হয়।

(৬) ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার বেলিয়াঘাটার কারখানায় জলের কলের টিউবের মুখ নির্মাণের এবং বিবিধ যন্ত্রের জন্য লোহের ঢালাই করা অংশ প্রস্তুতের ব্যবস্থা করেন।

(৭) তাঁহার বেলিয়াঘাটা সাবানের কারখানায় কার্বলিক, গ্লিসারিণ, কাপড়-কাচা নানারূপ সাবান উৎপাদনের এবং নলকূপের উপকরণ নির্মাণের ব্যবস্থা হয়।

(৮) ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা—মাণিকতলায় একটি শুষ্ক পরিষ্কৃত করিবার কারখানা স্থাপিত করিয়া ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে আবশ্যক অভিজ্ঞতা অর্জনের পরে তাহা, বর্ধিত করিয়া "রাজলক্ষ্মী সুপার ফ্যাক্টরীতে" পরিণত করিয়া ২৪-পরগণা বসিরহাটের অন্তর্গত মৈত্রবাগানে স্থানান্তরিত করেন। যাহাতে কারখানার জন্য উপকরণের অভাব না হয়, সেই জন্য তিনি তথায় বিস্তৃত জমিতে ইক্ষু চাষের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন।

যে কোন লোকের পক্ষে আপনার চিকিৎসা ব্যবসায় আবশ্যক মনোযোগ দিয়া—এতগুলি কাজ করা যে অসাধারণ দক্ষতার ও কর্মপ্রচেষ্টার পরিচায়ক তাহা বলা বাহুল্য।

চিকিৎসকরূপে তাঁহার খ্যাতি যত বর্ধিত হইতেছিল,

তাহাতে তত অধিক সময়ও দিতে হইতেছিল। আবার তিনি অন্যান্য কাজেও অবহেলা করেন নাই। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি "ড্রাগ এনকোয়ারী কমিটিতে" যে বিস্তৃত মন্তব্য দেন তাহার উল্লেখ পূর্বে করিয়াছি। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি নিখিল ভারত মেডিক্যাল কনফারেন্সে ভেষজ বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেন।

কার্ত্তিকচন্দ্র ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে স্বাস্থ্যকর স্থান বাছিয়া বৈদ্যনাথ-দেওঘরে একটি স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অন্যান্য কাজে তাঁহার পক্ষে নিয়মিতভাবে তথায় গমন অসম্ভব বুঝিয়া তিনি যখন তাহার জন্য কি ব্যবস্থা করিবেন, তাহা চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় কলিকাতা কর্পোরেশন তত্রস্বাস্থ্য কর্ম্মচারীদিগের জন্য স্বাস্থ্য-নিবাস প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিলে তিনি সানন্দে কর্পোরেশনকে সেই-জন্য সংগৃহীত জমি দিয়াছিলেন।

কার্ত্তিকচন্দ্র বৈদ্যনাথ-দেওঘরে স্বাস্থ্য নিবাস প্রতিষ্ঠার যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা বৃথা হইতে দেন নাই। সেই অভিজ্ঞতার ফল লাভের জন্য তিনি ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সান্নিধ্যে তত্রস্বাস্থ্য ব্যক্তিদিগের জন্য একটি বিশ্রাম-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন করেন। কলিকাতার নিকটে প্রতিষ্ঠানটি তিনি সর্বদা পরিদর্শন করিতে পারিবেন মনে করিয়া ইহা করেন। কিন্তু উহাতে কাজ আরম্ভ হইবার পূর্বেই বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে তাহার জন্য নির্ম্মিত অট্টালিকা দেখিয়া সরকার সাময়িক প্রয়োজনে ব্যবহারার্থ উহা অধিকার করেন।

কার্ত্তিকচন্দ্র স্বগ্রামে গ্রামোন্নয়নের কার্যে কি করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিব। গ্রামের লোকের ঈর্ষ্যা, সঙ্কীর্ণচিত্ততা ও বাধা-সৃষ্টির জন্য স্বগ্রামে তাঁহার কাজ আশানুরূপ সাফল্যলাভ করে নাই। কিন্তু তাহারই অভিজ্ঞতা লইয়া তিনি ২৪ পরগণার কৃষ্ণপুর ও তাহার নিকটবর্তী গ্রাম লইয়া "পল্লী সংস্কার সমিতি" প্রতিষ্ঠিত করিয়া বালকবালিকাদিগকে বিনাবেতনে প্রাথমিক ও কুটীরশিল্প শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। তথায় পাঠশালার সঙ্গে তাঁতশালা ও কৃষিশালা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গ্রামবাসীদিগকে স্বাবলম্বী ও উন্নতিশীল করিবার আয়োজন তিনি করিয়াছিলেন। যে অঞ্চল লইয়া তিনি কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাই এখন "কার্ত্তিক-পুর" নামে পরিচিত। স্থানটি উত্তর কলিকাতা হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই কেন্দ্রে তিনি তাঁহার প্রায় ৪ শত বিঘা জমী, পুষ্করিণী, বাগান প্রভৃতি "কার্ত্তিকপুর কৃষি সমবায় উপনিবেশ" নাম দিয়া দেন। বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত বাস্তুহারাদিগের বাসজন্য দিয়া গিয়াছেন। ইহা কার্ত্তিকচন্দ্রের অন্যতম বিরাট কীর্ত্তি।

এইবার আমরা স্বগ্রামের জন্য কার্ত্তিকচন্দ্র কি করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় দিব। যদিও তিনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ, শিক্ষালাভ ও ব্যবসা করিয়াছিলেন, তথাপি পৈত্রিক গ্রামের প্রতি তাঁহার অনুরাগ কখন শিথিল হয় নাই। তিনি যে ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নাই, পরন্তু অভাবের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহাকে বিদ্যার্জ্জন করিতে হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ আমরা করিয়াছি। সুতরাং তিনি যদি অর্থ সম্বন্ধে অধিক অবহিত হইতেন, তবে তাহা অস্বাভাবিক মনে করা যাইত না। কিন্তু তিনি —বিখ্যাত ধনকুবের ও ব্যবসায়ী কার্ণেগীর মতই মনে করিতেন—ধনী অবস্থায় মৃত্যু অপমানজনক—অর্থাৎ মানুষ যে অর্থ উপার্জ্জন করিবে, তাহার পক্ষে লোকহিতে অকাতরে ব্যয় করাতেই তাহার সার্থকতা। সেই বিশ্বাস-বশে অর্থোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে কার্ত্তিকচন্দ্র প্রথমে পৈত্রিক গ্রামের উন্নতি সাধনে অবহিত হইয়া তাহার জন্য অর্থ ও সময় ব্যয় করিতে থাকেন।

কলিকাতার দক্ষিণে চাংড়িপোতা গ্রাম এক সময়ে সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু কলিকাতা যতই উন্নতিলাভ করিতে থাকে, সে ততই নিকটবর্তী গ্রামসমূহ হইতে ধনী জ্ঞানী অধিবাসী-দিগকে আকৃষ্ট করিতে আরম্ভ করে। বিশেষ পুত্রকন্যার শিক্ষাদান, অর্থোপার্জ্জন, চিকিৎসা প্রভৃতির জন্য লোক কলিকাতায় আসিতে থাকে। কার্ত্তিকচন্দ্রের পিতৃব্য ও পিতাও তাহাই করিয়াছিলেন। গ্রামের অর্থ ও মনীষী গ্রাম হইতে চলিয়া আসায় ফলে গ্রাম শ্রীহীন হয়, বাস্তু

উদ্ধার হইয়া জঙ্গলাকীর্ণ হয়, সংস্কারাভাবে পুষ্করিণী জলজ গুল্মে আবৃত ও পঙ্কিল হওয়ায় তাহার জল ব্যাধি-বিস্তারের কারণ হয়, গ্রামের পথঘাট সবই অব্যবহার্য হইতে থাকে। গ্রামের লোক সঙ্কীর্ণচিত্ত হয়—কারণ, তাহারা উচ্চ আদর্শ পায় না। অনেক স্থলেই গ্রামে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা গ্রামবাসীর পক্ষে সাধ্যাতীত হয়। বিদেশী সরকার গ্রাম উন্নয়নের প্রয়োজন বুঝিতেন কি না সন্দেহ; কারণ, ইংলণ্ডেও সরকারের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইয়াছিল। বিশেষ বিদেশী সরকার শাসনের সঙ্গে শোষণেই অবহিত থাকিতেন। লর্ড কার্জন যখন এ দেশে বড়লাট তখন তিনি বলিয়াছিলেন—এ দেশে বৃটিশ শাসনের দুই দিক, শাসন আর শোষণ; সরকার শাসনকার্য পরিচালিত করেন আর বিদেশী ব্যবসায়ীরা শোষণ করেন। যদিও তিনি বলিয়াছিলেন, সাম্রাজ্যে যে রস অধিবাসীদিগের পুষ্টিসাধনে ব্যবহৃত হওয়া সঙ্গত, তাহা এক দল বিদেশী শোষণ করে, ইহা তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তথাপি বৃটিশ শাসনাধীন ভারতে—সাম্রাজ্যবাদী লর্ড কার্জন বিদেশী ব্যবসায়ীদিগের উন্নতিসাধনের চেষ্টাই করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার গ্রাম জলকষ্টে ও জল নিকাশের ব্যবস্থার অভাবে বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িতেছিল—কোন কোন স্থানে জমী চাষ করিবার লোকেরও অভাব হয়—অধিকাংশ স্থানে ম্যালেরিয়ায় জীর্ণ কৃষকরাও আবশ্যক শ্রম করিতে অক্ষম হয়। বহুদিনের অবহেলায় গ্রাম উন্নয়নের সমস্যা অত্যন্ত জটিল হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বহু বাধা অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও কার্ত্তিকচন্দ্র সে কাজে অগ্রসর হইয়াছিলেন—ইহা তাঁহার সঙ্কল্পদৃঢ়তার ও অসাধারণ নিষ্ঠার পরিচায়ক।

কার্ত্তিকচন্দ্র প্রথমে গ্রামে গমনের পথ সুগম করিলেন। রাত্রায় আলোক দানের জন্য ঢালাইকরা লৌহের দীপাধারযুক্ত পথের পার্শ্বে দেওয়া হইল। তাহার পরে গ্রামের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য হইল—

(১) পাঠাগার প্রতিষ্ঠা। সেজন্য যে গৃহ নির্মিত হইল, তাহা গ্রামের মনীষী দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের নামে উৎসৃষ্ট হইল। এই বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহকর্মী ছিলেন এবং তাঁহাকে পুরোভাগে রাখিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় 'সোম প্রকাশ' সংবাদপত্র পরিচালিত করিয়াছিলেন। পাঠাগারে পুস্তক সঞ্চিত হইল।

(২) চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা। গ্রামে দুইটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল—

(ক) এলোপ্যাথিক

(খ) কবিরাজী।

কবিরাজী ঔষধালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে ঔষধ প্রস্তুত করিবার কারখানাও স্থাপিত হইল।

(৩) গোশালা প্রতিষ্ঠা। দুগ্ধের অভাব দূর করিবার জন্য উন্নতভাবে গো-পালন শিক্ষা দিবার জন্য গ্রামে গোশালা প্রতিষ্ঠিত হইল।

(৪) শ্মশান ঘাট প্রতিষ্ঠা। গ্রামে শ্মশান ঘাট ভাল ছিল না। কার্ত্তিকচন্দ্র ঘাট বাঁধাইয়া—শববাহীদিগের বিশ্রাম জন্য গৃহ নির্মাণ করাইয়াই নিরস্ত হইলেন না—যাহাদিগকে মৃত্যুকালে "তীরস্থ" করা হইত, তাহারা যাহাতে রৌদ্রে বা বৃষ্টিতে কষ্ট না পায়, সেজন্যও কক্ষ নির্মাণ করাইলেন।

(৫) পানীয় জল সংস্থান। গ্রামে বিশুদ্ধ জলের অভাব যে অস্বাস্থ্যের অন্যতম কারণ, তাহা বুঝিয়া কার্ত্তিকচন্দ্র সেই অভাব দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। সে জন্য তাঁহাকে কত চিন্তা করিতে হইয়াছিল এবং তাহা কিরূপ ব্যয়সাধ্য তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। প্রথম জল-সংস্থান। সে জন্য তাঁহাকে গভীর নলকূপ বসাইয়া কাজ করিতে হইবে। তাহার পরে সেই জল উচ্চস্থানে রক্ষিত আধারে উপনীত করিতে হইবে। সে জন্য উচ্চস্থানে জলাধার রাখিয়া—বয়লার বসাইয়া যন্ত্রের সাহায্যে জল উহাতে তুলিতে হইবে। তাহা হইতে ঐ জল নলে আসিয়া মধ্যাকর্ষণের ফলে প্রবাহিত করিয়া গ্রামের চারিপার্শ্বে প্রদানের ব্যবস্থা হইল। জল সরবরাহের ব্যবস্থা সর্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছিল বটে, কিন্তু গ্রামের কতকগুলি লোকের তাহা সহ্য হইল না—তাহারা চাহিল, জল তাহাদিগের গৃহে গৃহে দিতে হইবে—পথিপার্শ্বে অবস্থিত

"কল" হইতে তাহারা জল লইবার "কর" স্বীকার করিবে না! তাহা কিন্তু অসম্ভব। তাহারা নানা উপায়ে—কল ভাঙ্গিয়া কার্ত্তিকচন্দ্রের পরিকল্পনার ও গ্রামের উন্নতির পথে বাধা দিল—তাহারা যে আপনাদের ও সমগ্র গ্রামের কি ক্ষতি করিল, তাহাও তাহারা বুঝিতে চাহিল না। নিরুপায় হইয়া কার্ত্তিকচন্দ্র জল সরবরাহের ব্যবস্থা বন্ধ করিলেন। বহু অর্থ নষ্ট হইল; অথচ গ্রামের লোক যদি সহযোগিতা না-ও করিয়া কেবল বাধা প্রদানে বিরত থাকিত, তাহা হইলে সমগ্র গ্রামের উন্নতি সাধিত হইত।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, ঐরূপ বিরোধিতাও কার্ত্তিকচন্দ্রকে গ্রামের হিতকর কার্য্যে বিরত করিতে পারে নাই। তিনি স্ব-গ্রামে লব্ধ অভিজ্ঞতায় লাভবান হইয়া যে অন্য গ্রাম প্রতিষ্ঠার ও গ্রামোন্নয়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করিয়াছি। কেবল তাহাই নহে, তিনি বলিয়াছিলেন, গ্রামের নারীরা যে প্রসবকালে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্য না পাইয়া প্রাণও হারায়—অনেকেই কলিকাতায় আসিয়া প্রসব করিবার সুযোগ পায় না, তাহা বড়ই বেদনাদায়ক—তাহার প্রতীকার করা তাঁহার কর্ত্তব্য। সেই জন্য পরিণত বয়সে—পূর্ব্ব-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলেও—তিনি গ্রামে একটি প্রসূতিসদন প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু বার্দ্ধক্যজনিত অক্ষমতায় স্বয়ং সে কাজ সম্পন্ন করিতে পারেন নাই এবং প্রায় ২৫ হাজার টাকা ঐ কাজে ব্যয় করিবার পর উহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করিলে সরকার অবশিষ্ট আবশ্যক অর্থ ব্যয় করিয়া কাজ সম্পূর্ণ করিয়াছেন।

আপনার অপরিসীম চেষ্টায়—সাধনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—দারিদ্র্য হইতে ঐশ্বর্য্যে উপনীত হইয়া কর্ম্মবীর কার্ত্তিকচন্দ্র তাঁহার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ ও মূল্যবান সময় দেশের লোকের হিতকর কার্য্যে প্রযুক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার দেশবাসীদিগের জন্য যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা সাধনায় সমুজ্জ্বল, ত্যাগে পূত ও মনুষ্যত্বের মহিমায় দেদীপ্যমান।

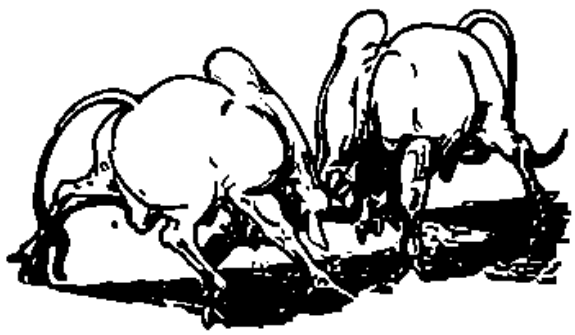

প্রধানমন্ত্রী নেহরুর জন্মদিনে

১৪ই নভেম্বর (২৭শে কার্তিক, ১৩৬২) সমগ্র ভারতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহারলাল নেহরুর ৭৩তম জন্মদিবস প্রতিপালিত হয়। এই দিবস শিশু-দিবসরূপে সর্বত্র অপরিসীম উদ্দীপনার সহিত উদ্‌যাপিত হয়। এই শিশু সমাবেশে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে নেহরুজী বলেন,

> তোমরাই জাতির ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার স্থল। আমি আমার মানসপটে তোমাদের উজ্জ্বল মুখ-মণ্ডলে ভবিষ্যৎ ভারতের চিত্র দেখিতে পাই।

বস্তুত একথাটাই একটি জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রার জন্মদিনে সবার মনে পড়ে। নেহরুজী বর্তমান বিশ্বের অতি বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বপূর্ণ শ্রেষ্ঠ মানব।

তাঁর সমগ্র চিন্তাধারার মধ্যে ভবিষ্যৎ ভারত ও আগামী দিনের নেতার কথাই বেশী করে মনে পড়বে, কেননা তিনি মনে করেন

তাই তিনি বলেছেন—

> তোমাদের উপর আমার বিপুল আশা-ভরসা রহিয়াছে এবং তোমরা বড় হইয়া মানব জাতির আদর্শ স্থল হইবে এবং সক্রিয়ভাবে তোমাদের দেশের সেবা করিবে—সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।

সমগ্র বিশ্বের রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক শুভ সম্ভাবনার স্থল আজ এশিয়া, এই এশিয়ার মহান মানুষটি সমগ্র বিশ্বের শান্তির জন্য অবিরাম শ্রম করিয়া যাইতেছেন। তাঁর মহৎ প্রচেষ্টায় ভারতের অতীত গৌরবই প্রতিফলিত হইতেছে। ভারত সহনশীলতার আদর্শভূমি। ত্যাগ, ধৈর্য, সাহস ও সংযম ভারতের অবিনশ্বর গুণাবলী। এই মহৎ গুণে মহিমান্বিত নেহরুজী আমাদের ভবিষ্যৎ দিনগুলি পরিচালনা করুন। আমরা সর্বশক্তিমানের কাছে তাঁর সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি—তিনি শতায়ু হন।

অশ্বিনীকুমার দত্তের স্মরণে

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

১২ই নবেম্বর, পরলোকগত অশ্বিনীকুমার দত্তের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভারতসরকারের রাজস্ব ও প্রতিরক্ষাবিষয়ক সচিব শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ যে বেতার বক্তৃতা প্রদান করেন তার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ।

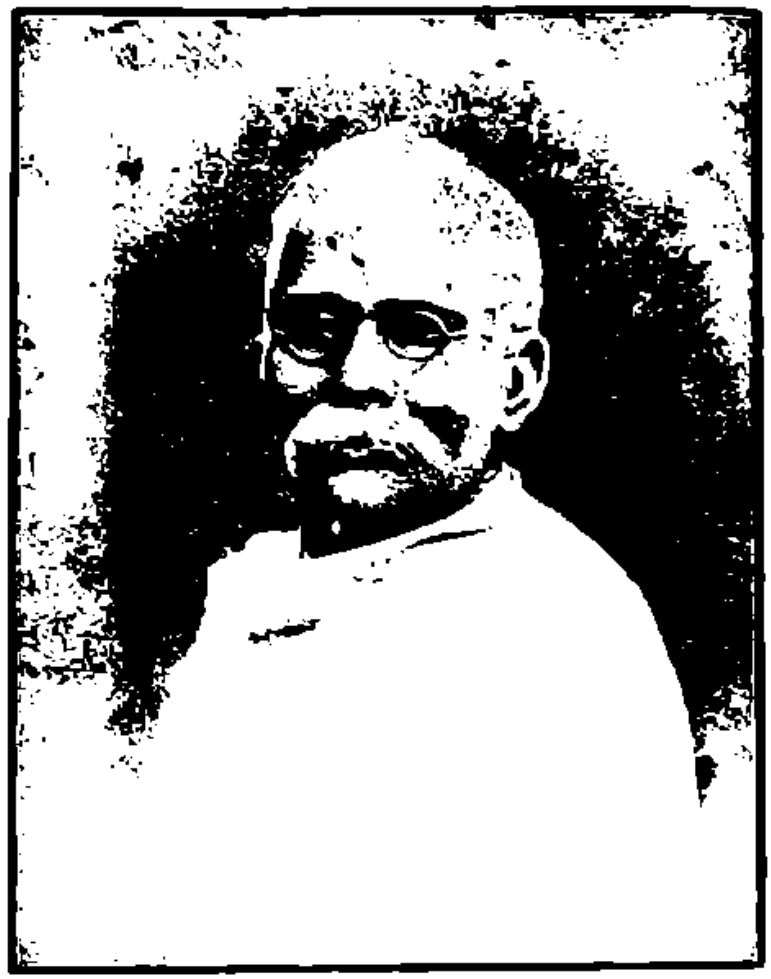

বিগত ১৯২৩ সনের এই দিনে শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত পরলোক গমন করেন। আজ তাঁর মৃত্যুবার্ষিকী দিবস। তাঁর চারিত্রিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা শুধু তাঁর নিজের জেলা বরিশালেই সীমাবদ্ধ ছিল না। উত্তর বাংলার সর্বত্র তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে ছিল। অশ্বিনীকুমারকে আমরা উজ্জ্বল চরিত্র ও কোমল হৃদয়ের অধিকারীরূপে দেখেছি। তিনি ছিলেন যুব-বাংলার একাধারে গুরু, শিক্ষক ও পথনির্দেশক। তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। তিনি রামতনু লাহিড়ী, কেশবচন্দ্র সেন ও রাজনারায়ণ বসুর অনুগত ভক্ত ছিলেন। বরিশালের যুব-সমাজ তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবানের মত শ্রদ্ধা করত। যুবকদের চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থ রচনা করেন। বহু বৎসর আর কোনও বাংলা পুস্তক উহার মত এত অধিক সংখ্যায় বিক্রয় হয় নাই। দুঃস্থ, দরিদ্র ও অনাথদের সেবার জন্য অশ্বিনীকুমার যুবকদের লইয়া একটি সেবাদল গঠন করেছিলেন। বাংলা দেশে ঐরূপ প্রতিষ্ঠান উহার পূর্বে প্রায় ছিল না।

মার্ক ও ইনারসনের রচনাবলী সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। মধ্যযুগের হিন্দু সংস্কারক কবীর নানক, চৈতন্য, দাদু, তুকারাম এবং তুলসী দাসের মতবাদ ও রচনা তিনি বিশেষ পছন্দ করতেন। স্বনামখ্যাত পার্শী সুফী কবি হাফেজের রচনাবলী পড়েও তিনি বিমল আনন্দ উপভোগ করতেন।

বরিশালের চারিত্রিক আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক জীবনে অশ্বিনীকুমার দত্তের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। আইন পাশ করে তিনি অধ্যাপনা-ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তদানীন্তন শাসন কর্তৃপক্ষ অশ্বিনীকুমারের জনপ্রিয়তা দেখে বিশেষ চিন্তান্বিত হয়েছিলেন। বিচারালয়ে তাঁর বিরুদ্ধে হিন্দু মুসলমাননির্বিশেষে কেউই সাক্ষ্য দিবে না, এ ধারণাও তাঁদের মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। তাঁরা বুঝে-ছিলেন যে, কোনও অজুহাতে অশ্বিনীকুমারকে কারারুদ্ধ করলে তাঁর জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে যাবে। সরকার মনে করতেন যে, চারিত্রিক সংগঠন ক্ষেত্রে অশ্বিনীকুমার দত্ত সমসাময়িক রাজনৈতিক নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিপিনচন্দ্র পাল, হ'তেও উচ্চস্তরের নেতা ছিলেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন

অধ্যাপক বিভূরঞ্জন গুহ

তোর, বকবকানী, কোঁস কোঁসানী
তাও কবিত্বের ভাব মাখা।
তাও ছাপালি গ্রন্থ হোল
নগদ মূল্য একটাকা।

একদিন রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে এই ছিল অধিকাংশ তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তির ধারণা। ক্রমে ক্রমে এ ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে, বিশেষ করে, যেদিন থেকে ইয়োরোপ কবিকে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার Nobel Prize দিয়ে সম্মানিত করেছিলেন। আজ কবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি শিক্ষিত সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত কিন্তু শিক্ষাবিদ্ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ এখনও দেশের কাছে যথোচিত সমাদর লাভ করেন নি। বাস্তবিক পক্ষে তাঁর শিক্ষাদর্শ, বিশেষ করে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী সম্বন্ধে সাধারণের মনে বিরূপ ধারণা রয়েছে। খুব অল্পদিন হোল এ প্রতিষ্ঠানগুলির ভার ভারত সরকার নিজ হাতে গ্রহণ করেছেন এবং বিশ্বভারতী একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু এর পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে একাই প্রায় সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব বহন করতে হয়েছে। দেশবাসীর কাছে আর্থিক আনুকূল্য তিনি সামান্যই পেয়েছেন। খুব সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ ও তাঁর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত, এবং সমাজে যশস্বী বাঙালীর বিরূপ মতের সারমর্ম উল্লেখ করছি।

"রবীন্দ্রনাথ কবি ও সাহিত্যিক। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভা ও শোভন রুচি অনস্বীকার্য। কিন্তু কবি বলেই তিনি কল্পনাবিলাসী। তদুপরি তিনি বিত্তশালী জমিদার। শান্তি নিকেতন তাঁর খেয়ালী মনেরই কল্পনা-বিলাস। সঙ্গীত, শিল্প-কলার কেন্দ্র হিসাব বড়লোকের অলস ছেলেমেয়েদের পক্ষে হয়ত এমন প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা আছে কিন্তু তিনি যে শিক্ষার আদর্শ স্থাপন করেছেন তা নিতান্তই 'মেয়েলী'। এতে বিদেশের কাছে তিনি অনেক বাহবা পেতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাঁর শিক্ষানীতি দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। শান্তিনিকেতন ও 'বিশ্বভারতী'র পরীক্ষা নিষ্ফল হয়েছে।"

এ সব সমালোচনা ধীর বিচারসাপেক্ষ। উপরোক্ত বিরূপ মত কয়েকজন দায়িত্বজ্ঞানহীন অর্বাচীনের মত নয়, দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মনে এমন মত ছড়িয়ে আছে। কাজেই এর আলোচনার প্রয়োজন আছে। এখানে দুটি প্রশ্ন আলাদা বিচার করা প্রয়োজন (১) রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ কি? তা কি বাস্তবিক পক্ষে কল্পনাশ্রয়ী ও আমাদের বর্তমান জীবনের পক্ষে অনুপযোগী? (২) শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী কি তাঁর শিক্ষাদর্শের সার্থক রূপ? তারা কি সফল হয়েছে? দ্বিতীয় প্রশ্নটির বিচার আমাদের আলোচনার বহির্ভূত। বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিশনের মত বিশেষজ্ঞ বিদ্বজ্জন ও শিক্ষাব্রতী সমাবেশের দ্বারাই এর উপযুক্ত বিচার সম্ভবপর। আমাদের আলোচনা প্রথম প্রশ্নটি নিয়ে। আমরা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ এবং তিনি এই আদর্শকে কি ভাবে রূপায়িত করতে চেষ্টা করেছেন তাই আলোচনা করব।

একথা নিশ্চয়ই স্বীকৃত হবে যে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেছিলেন এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বা কয়েকটা নূতন পরীক্ষা তিনি করে গেছেন। কোন সংস্কার আন্দোলন—তা সে ধর্মসংস্কারই হোক, রাজনৈতিক সংস্কার হোক বা শিক্ষাসংস্কার হোক, আকস্মিক ব্যাপার নয়। তার পেছনে একটা বেদনা,

ও রুচিবিকাশের ইতিহাস থাকে। তাই রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শকে বুঝতে গেলে তার ঐতিহাসিক পট-ভূমিকাটি জানা দরকার।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও কর্মজীবন উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত। আমাদের দেশের পক্ষে একালটি বিশেষ সংকট ও গৌরবের কাল। যে ইংরেজ বণিক একদিন ব্যবসায়ের সুযোগ প্রার্থনা করে এক খণ্ড ভূমি ভিক্ষা চেয়েছিল তারা তখন সমগ্র দেশের একছত্র অধিপতি। শুধু যে রাষ্ট্র-নৈতিক প্রভুত্বই তারা বিস্তার করেছিল তা নয়—দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরাজয়ও প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল। আমরা সে পরাভবকে শুধু মেনে নিয়েছিলাম তা নয়, সে গিল্টি করা নৃখল নিয়ে গৌরব করতেও সুরু করেছিলাম। দেশের সমস্ত ঐশ্বর্য শোষণ করে বিদেশী প্রভুরা যে স্বর্ণ রেখে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—তার বাহন হিসাবে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ও কিছু কিছু স্বর্ণবৃষ্টি প্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ হিসাবে লাভ করেছিলেন। ইংরাজী ভাষা, ইংরাজী রুচি, ইংরাজী আচার, ইংরাজী শিক্ষাই তখন শিক্ষিত সমাজের আদর্শ হয়েছিল। রবীন্দ্র নাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বাল্য বয়সে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষার জন্যে কলকাতায় হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয় এবং সেকালে ডিরোজিও ও রিচার্ডসন প্রমুখ কৃতী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষকদের প্রভাবে ছাত্রদের মন নিজ দেশীয় ধর্ম আচার, সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি বিমুখ হয়ে উঠেছিল। একদিকে প্রাচীনপন্থীদের অন্ধতা, সংকীর্ণতা, বিচার-হীনতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা ও কুৎসিৎ রুচিহীনতা, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী, দেশের ঐতিহ্যের প্রতি সম্পূর্ণ অশ্রদ্ধাশীল—ধ্বংসপন্থীদের দলের উগ্র বিদেশীয়ানা দেশকে সর্বনাশের পথে ঠেলে দিচ্ছিল। প্রাণবন্ত ও আত্ম-বিশ্বাসী পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রবল সংঘাত অবশ্য তার পূর্বেই দেশের মর্মস্থলে আঘাত হানতে সুরু করেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পূর্বে মনীষী রামমোহন রায় এ-সংকট অনুভব করেছিলেন। খৃষ্টান পাদ্রীরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই দেশের ধর্ম, আচার ও সভ্যতাকে হেয় বলে প্রতিপন্ন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। রামমোহন রায় ও তৎপর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইত্যাদি দেশের চিন্তানায়কগণ খৃষ্টান সভ্যতার এ আঘাতকে প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করেছিলেন। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মন নিয়ে তাঁরা একদিকে দেশের অন্ধ কুসংস্কারগুলি দূর করবার চেষ্টা করেছেন আর একদিক দিয়ে শ্রদ্ধাশীল হয়ে দেশের শ্রেষ্ঠ আত্মিক-সম্পদ, দেশের ধর্ম, আচার ও সভ্যতার সত্য ও মহনীয় রূপ বেদ, উপনিষদ, শাস্ত্রাদি চর্চার দ্বারা দেশের সামনে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছিলেন। তাই উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আমরা দেখি একদিকে ইংরাজী শিক্ষার ও সাথে বিদেশীদের প্রভাববৃদ্ধি অন্যদিকে নানা সমাজসংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দেশের আত্মরক্ষার ও আত্মোপ-লব্ধির আকুল প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ যে পরিবারে জন্মেছেন তার গৌরবকাহিনী দেশের সমস্ত সমাজসংস্কার ও রাজ-নৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা থাকবে। ভারতের জাগ্রত ও সমন্বয়ী চিত্তের শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে এই পরিবারটিতে। পাশ্চাত্য সভ্যতার সবচেয়ে মূল্যবান চিন্তার ধারা—জ্ঞান, বিজ্ঞান ও দর্শন—মুসলমান সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার সাহিত্য ও শিল্পকলা আর প্রাচীন হিন্দুসভ্যতার গভীর অধ্যাত্মবাদ ও শান্ত ধ্যানপরায়ণতা এই ত্রিধারার মিলন ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের জীবনে তাঁর পরিবারের মধ্য দিয়ে। তাঁর বিশ্বভারতীর আদর্শের মধ্যে এই আশ্চর্য সমন্বয়ের পরিচয় মিলবে। তিনি তাঁর পিতা ও পরিবারের কাছ থেকেই গভীর স্বাজাত্যাভিমান উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। বাংলাদেশে জাতীয় আন্দোলন সুরু হয় বঙ্গভঙ্গের পর (১৯০৫ সালে) কিন্তু তার বহুদিন পূর্ব থেকেই ঠাকুর পরিবারে স্বদেশী হাওয়া সবেগে বইতে সুরু করেছিল। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন, 'বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটা

স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত, সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নহে। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোন নূতন আত্মীয় ইংরাজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকট তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।" বাল্যকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনে মাতৃভাষার প্রতি নিবিড় অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছিল এবং ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁর শিক্ষানীতির এটি একটি মূল কথা।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি বুঝতে গেলে তাঁর বাল্য-জীবনের অভিজ্ঞতা কিছু জানা দরকার। সাবেকী আমলের ঘনেধী ঘরে, বিশেষ করে ঠাকুর বাড়ীর মত বৃহৎ পরিবারে শিশু ও বালকদের জন্যও অন্তঃপুরের দ্বার উন্মুক্ত ছিল না। মায়ের কোল তাই শিশু রবির কাছে খুব সুলভ ছিল না। তাঁর বাল্যকাল তাই কেটেছে "ভৃত্যরাজতন্ত্রে"র শাসনে ও তত্ত্বাবধানে। বাড়ির বাইরে সমবয়সী অন্য ছেলে মেয়েদের সঙ্গে মেশবার সুযোগও তিনি পান নি। মাতৃ-স্নেহ বঞ্চিত শিশুর মনে যে অভিমান জেগে ছিল শান্তি-নিকেতন বিদ্যালয় স্থাপনকালে সে কথাটি তিনি স্মরণ রেখেছিলেন। সে বয়সে প্যারীদাসী, শ্যামাদাসী, ব্রজেশ্বর, আদুল ইত্যাদি ভৃত্য ও প্রজার মুখে নানা ভূতের গল্প, ডাকাতের গল্প, সুয়োরাণী দুয়োরাণীর গল্প আর মা ও দিদিমার ঘরে রামায়ণ কাহিনী শিশু রবির কল্পনাকে রাঙিয়ে তুলেছিল। কল্পনায় নানা কাহিনী বানিয়ে তাতে আনন্দ পাওয়ার অভ্যাস অল্প বয়সেই তাই তাঁর আয়ত্ত হয়েছিল। তাঁর 'ছেলে বেলা' থেকে তাঁর কল্পনার খেলার নমুনা কিছু দেওয়া যাক—"এই তো পালকির ভিতর আমার চাকর, পালকির বাইরে এক একদিন ছিল আমার মাষ্টারি, রেলিংগুলো আমার ছাত্র। ওরে থাকতো চুপ। এক একটা ছিল ভারি দুষ্ট, পড়াশুনোয় কিছুই মন নেই। তার দেখাই যে বড়ো ছেলে তুলিগিরি করতে হবে। মার খেয়ে আগাগোড়া গায়ে দাগ পড়ে গেছে, দুষ্টুমি থামতে চায় না, কেন না থামলে যে চলে না, খেলা বন্ধ হয়ে যায়।" বিধাতা তখন থেকেই বুঝি শিক্ষক রবীন্দ্রনাথকে তৈরী করে নিচ্ছিলেন। "আরো একটা খেলা ছিল সে আমার কাঠের সিঙ্গিকে নিয়ে। পূজায় বলিদানের গল্প শুনে ঠিক করেছিলুম সিঙ্গি বলি দিলে খুব একটা কাণ্ড হবে। তার পিঠে কাটি দিয়ে অনেক কোপ দিয়েছি। দস্তুর বানাতে হয়েছিল, নৈলে পূজো হয় না।

"সিঙ্গিমামা কাটুম
আশ্বিনোসের বাটুম
উলুকুটু চুলকুট ঢ্যামকুড়কুড়
আমরোট বাখরোট খটখট খটাস।
পটপট পটাস।"

বাইরের সম্পর্কে এ বারণনিষেধ শিশু রবিকে বহুং অধিকতর কৌতূহলী করে তুলেছিল। তিনি জীবন স্মৃতিতে লিখেছেন "বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল, এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন খুসি যাওয়া আসা করিতে পারিতাম না। সেই জন্য বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্ত প্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ যার জানলার নানা ফাঁক ফুকর দিয়া এদিক ওদিক হইতে আমাকে চকিতে ছুঁইয়া যাইত। সে যেন পরদার ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে ছিল মুক্ত আমি ছিলাম বদ্ধ—মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্য তাহার আকর্ষণ ছিল প্রবল।" আর এক জায়গায় লিখেছেন "ছেলেবেলার দিকে যখন তাকানো যায় তখন সবচেয়ে এই কথাটা মনে পড়ে যে জগৎটা এবং জীবনটা রহস্য পরিপূর্ণ। সর্বত্রই যে একটি অভাবনীয় আছে এবং

কখন যে তাহার দেখা পাওয়া যাইবে তাহার ঠিক নাই এই কথাটা প্রতিদিনই মনে জাগিত। প্রকৃতি যেন হাত নাড়া দিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিত "কী আছে বলো দেখি।" বাল্যকালে প্রকৃতির এ আকর্ষণ তিনি জানেন নি। যতই বড় হয়েছেন ততই এই আকর্ষণ প্রবলতর হয়েছে। এবং মানুষের অন্তর প্রকৃতির সঙ্গে বহিঃ-প্রকৃতির একটা নাড়ির সংযোগ আছে, প্রকৃতির সাহচর্য মানুষের আত্মার পক্ষে অন্ন জলের মতই অপরিহার্য এ কথাটি তাঁর শিক্ষানীতির একটি মূল কথা। প্রকৃতির রহস্য এ শিশুকে বিমুগ্ধাবিষ্ট করেছে, কৌতূহলী করেছে এবং তার জন্যেই নানা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণে তিনি প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং সে পথেই তিনি সন্ধান পেয়েছেন শিক্ষার মূলমন্ত্র, এ পথেই ঘটেছে তাঁর আত্মশক্তির উদ্বোধন। তাঁর উন্মেষশালিনী প্রতিভা আবিষ্কার ও আত্মবিকাশের আনন্দের মধ্য দিয়ে জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আহরণ করেছে।

বিশ্বপ্রকৃতির অখণ্ডতা ও সমগ্রতার মধ্যে মানুষ যখন নিজের অন্তরতম সত্যটি খুঁজে পায় তখনই মানুষের গভীরতম শান্তি এই নিবিড় উপলব্ধি তাঁর জীবনে তিনি লাভ করেছিলেন। শিশুকালেই এই অনুভূতির অস্পষ্ট আভাস তিনি পেয়েছিলেন। যা খণ্ডিত তা অর্থহীন এই কথাটি তাঁর শিশুমন দিয়েও তিনি সহজে জেনেছিলেন। অল্প বয়সেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার হিমালয় ভ্রমণের সঙ্গী হয়ে গিয়েছিলেন। এই তাঁর প্রথম দেশ ভ্রমণ। সংসারের গণ্ডীর থেকে এ মুক্তি তাঁর সৌন্দর্যপিপাসু মনকে প্রকৃতির প্রতি আরো অনুরাগী করে তুলেছিল।

বাল্যে ও কৈশোরে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার দুঃসময় অভিজ্ঞতা তাঁকে সেই ছোট বয়স থেকেই ইস্কুলের গতানুগতিকতা, শাসননির্মমতা ও সর্বপ্রকার স্বাধীনতার খর্বকারী আবহাওয়ার প্রতি বিরূপ করে তুলেছিল। গৃহশিক্ষকদের শিক্ষাও এর চেয়ে বেশী আকর্ষণীয় ছিল না। 'ছেলেবেলা'য় তিনি লিখেছেন "মাষ্টার মশাই মিটমিটে আলোয় পড়াতেন প্যারী সরকারের ফার্ষ্টবুক। প্রথমে উঠতো হাই, তারপর আসতো ঘুম, তারপর চলত চোখরগড়ানি। বারবার শুনতে হোত মাষ্টার মশায়ের অন্য ছাত্র যতীন সোনার টুকরো ছেলে, পড়ায় আশ্চর্য মন, ঘুম পেলে চোখে নস্যি ঘষে। আর আমি? সে কথা বলে কাজ নেই। সব ছেলের মধ্যে একটা মূর্খ হয়ে থাকবার মতো বিশ্রী ভাবনাতেও আমাকে চেতিয়ে রাখতে পারতো না।" আবার লিখছেন "সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পড়াশুনার জাঁতাকল চলছেই। ঘর্ঘর শব্দে এ কলে দম দেওয়ার কাজ ছিল আমার সেজ দাদা হেমেন্দ্রনাথের হাতে। তিনি ছিলেন কড়া শাসন কর্তা। তম্বুরার তারে অত্যন্ত বেশি টান দিতে গেলে পটাং করে যায় ছিঁড়ে। তিনি আমাদের মনে যতটা বেশি মাস বোঝাই করতে চেয়েছিলেন তার অনেকটাই ডিঙি উলটিয়ে তলিয়ে গেছে একথা এখন আর লুকিয়ে রাখা চলবে না। আমার বিদ্যেটা লোকসানি মাল।" রবীন্দ্রনাথের ভাগিনের সত্য ইস্কুলে পড়ে তাই সখ হোল ইস্কুলে ভর্তি হবার। কান্না সুরু করলেন ইস্কুলে পড়বার জন্যে। সেদিন বাড়ীর মাষ্টার মশাই বলেছিলেন 'আজ ইস্কুলে যাবার জন্যে কাঁদচো, কিন্তু এর পর অনেক বেশী কাঁদতে হবে ইস্কুল না যাবার জন্যে।" সে ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছিল। প্রথম ইস্কুলের পাঠ সুরু ওরিয়েন্টাল সেমি-নারিতে। সে সম্বন্ধে "জীবনস্মৃতিতে" লিখেছেন শিক্ষাদান ব্যাপারের মধ্যে যে-সমস্ত অবিচার, অধৈর্য, ক্রোধ, পক্ষপাতপরতা ছিল, অন্যান্য শিক্ষনীয় বিষয়ের চেয়ে সেটা অতি সহজেই আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলাম।" তারপর ভর্তি হলেন নর্মাল স্কুলে। সে সম্বন্ধে লিখেছেন "নর্মাল স্কুলের স্মৃতিটা যেখানে কাপসা অবস্থা পার হইয়া উঠিয়াছে সেখানে কোন অংশেই তাহা লেশমাত্র মধুর নহে। ছেলেদের সঙ্গে যদি মিশিতে পারিতাম, তবে বিদ্যাশিক্ষার দুঃখ তেমন অসহ্য বোধ হইত না। কিন্তু সে কোন মতেই ঘটে নাই। অধিকাংশ ছেলের সংস্রব এমন অশুচি ও অপমানজনক ছিল যে, ছুটির

সময় আমি চাকরকে লইয়া দোতলার রাস্তার দিকের এক জানলার কাছে একলা বসিয়া কাটাইয়া দিতাম। .....শিক্ষকদের মধ্যে একজনের কথা আমার মনে আছে, তিনি এমন কুৎসিত আচার ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধাবশত তাঁহার কোন প্রশ্নেরই উত্তর করিতাম না।.....এমন করিয়া সেই ক্লাসে এক বছর যখন কাটিয়া গেল তখন মধুসূদন বাচস্পতির নিকট আমাদের বাংলার বাৎসরিক পরীক্ষা হইল।" সকল ছেলের চেয়ে আমি বেশি নম্বর পাইলাম। আমাদের ক্লাসের শিক্ষক কর্তৃপুরুষদের কাছে জানাইলেন যে পরীক্ষক আমার প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করিয়াছেন।" অল্পবয়সে বাড়ীতে ইংরেজী শিখতে হয়েছিল সে দুঃখের কথা লিখেছেন "সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যেবেলায় টিমটিমে বাতি জ্বালাইয়া বাঙালী ছেলেকে ইংরেজি পড়াইবার ভার যদি স্বয়ং বিষ্ণুদূতের উপরেও দেওয়া যায়, তবু তাহাকে যমদূত বলিয়া মনে হইবেই তাহাতে সন্দেহ নাই।" আবার লিখেছেন "একে সন্ধ্যাবেলায় শরীর ক্লান্ত ও মন অন্তঃপুরের দিকে, তাহার পরে সেই বইখানার মলাট কালো এবং মোটা, তাহার ভাষা শক্ত এবং তাহার বিষয়গুলির মধ্যে নিশ্চয়ই সরসতা কিছুই ছিল না, কেন না শিশুর প্রতি সেকালে মাতা সরস্বতীর মাতৃভাবের কোন লক্ষণ দেখি নাই।" তাঁদের পরিবারে বালকদের ইংরেজি শিখবার আগে বাংলাভাষা শিখবার দিকে জোর দেওয়া হত তার সুফল তিনি কখনো ভোলেন নি। তিনি লিখেছেন—"ছেলেবেলায় বাংলা পড়িয়াছিলাম বলিয়াই সমস্ত মনটায় চালনা সম্ভব হইয়াছিল। শিক্ষা জিনিষটা যথাসম্ভব আহার ব্যাপারের মতো হওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবামাত্রই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়, পেট ভরিবার পূর্বেই হইতেই পেটটি খুশি হইয়া জাগিয়া উঠে তাহাতে তাহার আরকরসগুলির আলস্য দূর হইয়া যায়। বাঙালির পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার এটি হইবার জো নাই। তাহার প্রথম কামড়েই দুইপাটি দাঁত আপাগোড়া নড়িয়া উঠে—মুখবিবরের মধ্যে একটা ছোটখাটো ভূমিকম্পের অবতারণা হয়। তারপরে, সেটা যে লোষ্ট্রজাতীয় পদার্থ নহে, সেটা যে রসে-পাক-করা মোদকবস্তু, তাহা বুঝিতে বুঝিতেই বয়স অধিক পার হইয়া যায়। সানানে ব্যাকরণে বিষম লাগিয়া নাক-চোখ দিয়া যখন অজস্র জলধারা বাহিয়া যাইতেছে, অন্তরটা তখন একেবারেই উপবাসী হইয়া আছে। অবশেষে বহুকষ্টে অনেক দেরিতে খাবারের সঙ্গে যখন পরিচয় ঘটে তখন ক্ষুধাটাই যায় মরিয়া।" যাক্, ইস্কুলের পালা তখনো সবে সুরু। এর পর ভর্তি হলেন বেঙ্গল একাডেমি নামে এক ফিরিঙ্গি স্কুলে। সেখানে কিছুটা স্বাধীনতা পাওয়া গেল—বিশেষ করে পড়া শিখবার জন্যে কোন তাড়া ছিল না কারণ "ছোটো ইস্কুল, আর অল্প, ইস্কুলের অধ্যক্ষ আমাদের একটি সদগুণে মুগ্ধ ছিলেন। আমরা মাসে মাসে নিয়মিত বেতন চুকাইয়া দিতাম। এই জন্য ল্যাটিন ব্যাকরণ আমাদের পক্ষে দুঃসহ হইয়া উঠে নাই এবং পাঠচর্চার গুরুতর ত্রুটিতেও পৃষ্ঠদেশ অনাহত ছিল।" কিন্তু এই ইস্কুলও তাঁর মনকে আকর্ষণ করতে পারে নি কারণ, "হাজার হইলেও ইহা ইস্কুল। ইহার ঘরগুলা নির্মম, ইহার দেয়ালগুলা সাদারা-ওয়ালার মতো।—ইহার মধ্যে বাড়ির ভাব কিছুই নাই, ইহা খোপওয়ালা একটা বড়ো বাক্স। কোথাও কোন সজ্জা নাই, ছবি নাই, রঙ নাই, ছেলেদের হৃদয়কে আকর্ষণ করিবার লেশমাত্র চেষ্টা নাই। ছেলেদের যে ভাল মন্দ লাগা বলিয়া একটা খুব মস্ত জিনিষ আছে, বিদ্যালয় হইতে সে-চিন্তা একেবারে নিঃশেষে নির্বাসিত। সেইজন্য বিদ্যালয়ের সেউড়ি পার হইয়া তাহার সংকীর্ণ আঙিনার মধ্যে পা দিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সমস্ত মন বিমর্ষ হইয়া যাইত—অতএব, ইস্কুলের সঙ্গে আমার সেই পালাইবার সম্পর্ক আর ঘুচিল না।" এর পরের ইস্কুল সেন্টজেবিয়ার্স। তিনি লিখছেন "সেন্টজেবিয়ার্সে আমাদের ভরতি করিয়া দেওয়া হইল, সেখানেও কোন ফল হইল না।

একদিন বড়দিদি কহিলেন "আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম, বড়ো হইলে রবি মানুষের মত হইবে, কিন্তু তাহার আশাই সকলের চেয়ে নষ্ট হইয়া গেল।" আমি বুঝিতাম, তত্ত্বসমাজের বাজারে আমার দর কমিয়া যাইতেছে, কিন্তু তবু যে-বিদ্যালয় চারদিকের জীবন ও সৌন্দর্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন তেলখানা ও হাঁসপাতাল জাতীয় একটা নির্মম বিভীষিকা তাহার নিত্য-আবর্তিত ঘানির কাছে কোনমতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না। দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ এখানেই তাঁর শেষ। তারপর গেলেন সতেরোবছর বয়সে বিলেতে। সেখানে ব্রাইটনে এক ইস্কুলে তাঁকে ভর্তি করা হোল। সেখানের অভিজ্ঞতা তেমন দুঃখকর নয়। তবে সেখানে বেশি দিন পড়েন নি। তখন তাঁর মেজদা ও ভারকনাথ পালিত মহাশয়ের নির্দেশক্রমে তাঁকে বাসা করে দেওয়া হোল লণ্ডনে। সেখানে নানা গৃহশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ল্যাটিন ও অন্যান্য বিদ্যাভ্যাস সুরু হোল। তাতে যে তিনি খুব বেশী কিছু আয়ত্ত করেছিলেন তা নয়। তবে এ সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি মানুষ ও পৃথিবীর সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং বিভিন্নদেশের মানুষের হৃদয়ের মধ্যে যে গভীর ঐক্য তা তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর বিশ্বমানবতার ধারণা এ সমস্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই পুষ্টিলাভ করছিল তাতে সন্দেহ নেই। সে দেশে মানুষদের কর্মপ্রেরণা ও মহৎ ঔদার্যও তাকে আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে নিজ দেশ, ধর্ম, আচারকে বিষম উগ্রতার সঙ্গে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করবার এই অপরিণত বয়সের স্বাভাবিক ঝোঁকও দেখা দিয়েছিল তার পরিচয় সে সময় ভারতীতে প্রকাশিত "য়ুরোপ-যাত্রী কোন বঙ্গীয় যুবকের পত্র"গুলিতে আমরা পাই। এর পর লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজেও তিনি কিছুদিন পড়েছিলেন। কিন্তু কোন পরীক্ষা পাশ তিনি করেন নি, কোন ডিগ্রীও তিনি পান নি। পরিবারের ইচ্ছা ছিল তিনি ব্যারিষ্টার হবেন কিন্তু সে আশা সফল হয়নি। পরীক্ষাপাশ, ডিগ্রীলাভ, প্রচলিত অর্থে "ভালো ছেলে" হওয়ার প্রতি তাঁর অন্তরের মধ্যে বিমুখতা ছিল। ইস্কুল কলেজে পড়ার কড়াকড়ি, বাঁধাবাঁধির মধ্যে তাঁর সৃজনী প্রতিভা মুক্তি পায় নি। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা প্রাণহীন, ব্যক্তিত্ববিকাশের বিরোধী, নিতান্তই ব্যবসাবুদ্ধিচালিত, হীন জীবিকা অর্জনের উপায় মাত্র। যে শিক্ষা সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের সহায়ক নয়,—সে শিক্ষাকে কোন দিন শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারেন নি। আমাদের শিক্ষার সঙ্গে আমাদের জীবনের কোন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নেই—তা নিতান্ত আমাদের জীবনের বাইরের কোঠার জিনিষ। তিনি "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" প্রবন্ধে লিখেছেন "অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে আমার মনে এই কথাটি জেগে উঠেছিল, ছেলেদের মানুষ করে তোলবার জন্যে যে একটা যন্ত্র তৈরী হয়েছে, যার নাম ইস্কুল, সেটার ভিতর দিয়ে মানব শক্তির শিক্ষার সম্পূর্ণতা হতেই পারে না।"

ইস্কুল কলেজে পড়ে তিনি বড় হন নি, বিদ্বান হন নি। তিনি যে যশ অর্জন করেছেন তা তাঁর নিজ চেষ্টায় আয়ত্ত। অবশ্য এর পেছনে ছিল তাঁর পিতার উৎসাহ ও পরিবারের সজীব আবহাওয়া। শিশু-কালেও পিতা তাঁকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছেন—নানা পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণে, নানা কর্মোদ্যমে। দু-একটি উদাহরণ নেওয়া যাক্,—'জীবনস্মৃতি' থেকে—"যদিচ আমি নিতান্ত ছোটো ছিলাম কিন্তু পিতা কখনো আমাকে যথেচ্ছ বিহারে নিষেধ করিতেন না। বোলপুরের মাঠের মধ্যে স্থানে স্থানে বর্ষার জলধারায় বালিমাটি ক্ষয় করিয়া প্রান্তরতল হইতে নিম্নে, লাল কাঁকর ও নানাপ্রকার পাথরে রচিত ছোটো ছোটো শৈলমালা, গুহা-গহ্বর, নদী-উপনদী রচনা করিয়া, বালচিত্তদের দেশের ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছে। এখান হইতে জামার আঁচলে নানা প্রকারের পাথর সংগ্রহ করিয়া পিতার কাছে উপস্থিত করিতাম। তিনি আমার এই অধ্যবসায়কে তুচ্ছ বলিয়া একদিনও উপেক্ষা করেন নাই। তিনি উৎসাহ প্রকাশ করিয়া বলিতেন, 'কী চমৎকার। এ-সমস্ত তুমি

কোথায় পাইলে!' আমি বলিতাম, "এমন আরও কত আছে! কত হাজার হাজার! আমি রোজ আনিয়া দিতে পারি।" তিনি বলিতেন, "সে হইলে তো বেশ হয়। ওই পাথর দিয়া আমার এই পাহাড়টা তুমি সাজাইয়া দাও।" আবার আর এক জায়গায়—"ভগবদ্গীতার পিতার মনের মতো শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা অনুবাদ সমেত আমাকে কপি করিতে দিয়াছিলেন। বাড়িতে আমি নগণ্য বালক ছিলাম, এখানে আমার পরে এই সকল গুরুতর কাজের ভার পড়াতে তাহার গৌরবটা খুব করিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম।" আর একটি দৃষ্টান্ত—"পিতা বোধ করি আমার সাবধানতা বুদ্ধির উন্নতিসাধনের জন্য আমার কাছে দুই চারি আনা পয়সা রাখিয়া বলিতেন, হিসাব রাখিতে হইবে, এবং আমার প্রতি তাঁহার দামি সোনার ঘড়িটি বন্ধ দিবার ভার দিলেন। ইহাতে যে ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল সে চিন্তা তিনি করিলেন না, আমাকে দায়িত্বে দীক্ষিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। পথের মধ্যে ভিক্ষুক দেখিলে, ভিক্ষা দিতে আমাকে আদেশ করিতেন।" বাস্তবিক পক্ষে পিতার উৎসাহ ও সুশৃংখল জীবন রবীন্দ্রনাথকে বিকশিত হতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। তাঁর সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যে রুচি ও বিজ্ঞান চর্চা বিশেষতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার মূলে ছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উৎসাহ। রবীন্দ্রনাথ দেশের ধর্ম, আচার ও শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে যে গভীর অনুরাগ পোষণ করতেন তার প্রধান উৎস ছিলেন তাঁর পিতা। বাস্তবিক পক্ষে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মজীবন তাঁর পিতার সাধন দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। তাঁর ইস্কুলের পড়া খুব সুফলপ্রসূ হয়নি সে কথা বলেছি। গৃহে তাঁর বিভিন্ন শিক্ষার জন্য যে ব্যবস্থা হয়েছিল তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল এ কথা মনে হয় না। বাড়ীতে বাংলা ভাষার চর্চা তো যথেষ্টই করতে হোত—তা ছাড়া সংস্কৃত ব্যাকরণ, কাব্য ইত্যাদিও পড়তে হোত—বিজ্ঞান চর্চার জন্যে গৃহশিক্ষক ছিলেন।—দৈহিক চর্চাও নিয়মিতই করতে হোত—তার ফলে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন সুস্থ সবল দেহ।—আর একটা শিক্ষা পেয়েছিলেন যা তাঁর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল—তা হোল সঙ্গীত চর্চা। তাঁর কৈশোরে দৈনিক নানা পাঠ ও ব্যায়ামের যে তালিকা তিনি 'ছেলেবেলা' ও অন্যত্র দিয়েছেন তা থেকে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সাধারণের মধ্যে যে ধারণা প্রচারিত—যে রবীন্দ্রনাথ আরাম, আয়েস ও বিলাসের মধ্যে মানুষ হয়েছেন—একথা একেবারেই সত্য নয়। শিক্ষা সম্বন্ধে যে সর্বাঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গী তাঁর শিক্ষানীতির বিশেষত্ব তা তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই লাভ করেছিলেন—তাঁর অভিভাবকদেরও এবিষয়ে দৃষ্টি ছিল বলে মনে হয়। একটা মস্ত কথা যে তাঁর বাড়ীর আবহাওয়া তাঁর বাড়ন্ত এবং গ্রহণেচ্ছু মনকে নানা দিক দিয়েই উৎসুক করে তুলেছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই আবহাওয়া সৃষ্টি যে মস্ত কথা এটা তিনি তাঁর শান্তিনিকেতন গড়বার সময় বিশেষ করে মনে রেখেছেন। তিনি তাঁর বাড়ির আবহাওয়া সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন "ছেলে বেলায় আমার একটা মস্ত সুযোগ এই ছিল যে, বাড়িতে দিনরাত্রি সাহিত্যের হাওয়া বহিত।" শুধু সাহিত্য কেন, ইতিহাস, ধর্ম সমাজ-সংস্কার, স্বদেশী অনুরাগের নানা আলোচনা ও আয়োজন রবীন্দ্রনাথের সজীব মনটিকে নানাদিক দিয়ে পুষ্ট ও সরস করেছে। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতি তাঁর জীবনের বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত—সেটা নিতান্তই পুঁথিগত জিনিষ নয়। তাই এতটা বিস্তারিতভাবে তাঁর বাল্য ও কৈশোর জীবন কাহিনী আলোচনা করা হোল।

রবীন্দ্রনাথ যৌবনে উপনীত হলেন। পাশ করলেন না, ব্যারিষ্টার হলেন না, সিভিল সার্ভিস উত্তীর্ণ হয়ে জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হলেন না। হলেন কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, গল্প রচয়িতা। ক্রমে ক্রমে তাঁর লেখা ছাপা হতে লাগল—সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাত সঙ্গীত, বউ ও

মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, কথিকা, কাহিনী, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য ইত্যাদি বঙ্কিমচন্দ্রের মত সাহিত্যরথীর হাত থেকে সম্মানের মালা পেলেন, আবার স্যারেজ সমাজপতির মত ধুরন্ধর সমালোচকের কাছ থেকে নিন্দাও কম পেলেন না। জমিদারী দেখতেন, পদ্মার বুকে বোটে করে বেড়াতেন, সাহিত্য চর্চার নেশায় মগ্ন হয়ে রইলেন। কিন্তু কবি তাঁর গজদন্ত নির্মিত কল্পনার সৌধে তাঁর সোনার স্বপ্নে ভুলে থাকতে তো পারলেন না। জমিদারি দেখা উপলক্ষে দেশের লোকের দুর্গতি, হীনতা, অসহায় নিশ্চেষ্টতা, মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত অবমাননা তাঁর চারদিকে প্রত্যক্ষ করলেন। সংবেদনশীল মন তাঁর চঞ্চল হয়ে উঠল। এ আত্মধিক্কার ধ্বনিত হয়ে উঠেছে "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় :

সংসারে সবাই যবে সারাক্ষণ শত কর্মে রত ;
তুই শুধু দিবসের প্রান্তে ক্লান্ত বালকের মতো
মধ্যাহ্নে মাঠের মাঝে একাকী বিষণ্ণ তরুচ্ছায়ে
দূর বন গন্ধবহ মন্দগতি ক্লান্ত তপ্ত বায়ে
সারাদিন বাজাইলি বাঁশি। ওরে তুই ওঠ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা ? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
ক্রীতদাস অপমান
অবনের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোন্মত্ত অবিচার, সংকুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে।.....
প্রাণে তার আহ্বান এসে পৌঁছল—
এই সব মূঢ়, ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ;.....
কবি তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু।
সাহসবিস্তৃত বক্ষপুট। এ দৈন্যমাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি "

স্মরণ রাখতে হবে এ কবিতা ১৩০০ সালে লেখা। বঙ্গভঙ্গজনিত রাজনৈতিক আন্দোলনের বহুপূর্বেই কবির মনে গভীর বেদনা জেগেছিল। দেশের এ দুর্গতি দূর করবার জন্যে তাঁরও দায়িত্ব আছে এ কথাটি কবির মনকে আন্দোলিত করতে লাগলো। তাঁর পরিবারের আবহাওয়াটিও অনুকূল ছিল। জীবন স্মৃতিতে লিখেছেন "আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল (ইং ১৮৭৫)। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা এই প্রথম হয়। নেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের গুণগান, গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প, ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।" একটি গুপ্ত সমিতি (যার সাংকেতিক নাম ছিল "হাম্ চুপা মুহাক") ও তাঁরা গঠন করেছিলেন। "এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের কর্ণমন্ত্রে, কথা আমাদের চুপি চুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত। আর বেশি কিছুই প্রয়োজন ছিল না। সেই সভায় আমরা একটি খ্যাপামির গুপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম...এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো।" এই 'খ্যাপামি, শুধু একটা ক্ষণিক উত্তেজনাতেই শেষ হয়ে যায় নি। শুধু মাত্র উত্তেজনার হুজুগে মেতে ওঠা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। এবং সেই কারণেই স্বদেশী আন্দোলন বা পরবর্তী রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির মাতামাতিকে তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতে পারেন নি। তাঁর মনের মধ্যে দেশ সম্বন্ধে বেদনা ক্রমশঃ গঠনমূলক পরিণতি লাভ করেছিল। তা শুধুই নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক ছিল না।

দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দুর্গতি তাঁকে ব্যথিত করে তুলেছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেশের একটি ধ্যানের কল্যাণমূর্তি তাঁর অন্তরে ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাস তাঁকে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করতে লাগলো—দেশের প্রকৃত আত্মার স্বরূপটি তিনি প্রাচীন যুগের মধ্যে যেন প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। 'কথা' (১৩০৬) ও 'কাহিনী' (১৩০৬)তে এ পরিচয় আমরা পাই—পরিচয় পাই নানা প্রবন্ধে। 'নৈবেদ্য' (১৩০৮) ও 'খেয়া'—'শান্তিনিকেতন' আশ্রম স্থাপনা হোল। অবশ্য তারও কিছুদিন রবীন্দ্রনাথ ও আরও কয়েকটি গ্রামের ছেলেদের পড়াবার জন্যে গুরু বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নিজেই পড়াতে সুরু করলেন—সঙ্গে জুটে গেলেন এক বা দুজন শিক্ষক, সংখ্যা। তাঁর শিক্ষানীতির প্রথম পরীক্ষা সুরু করলেন। যে ছিনিমকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন সেখানে ফাঁকি করলেও কেন কি নিজের কাছে সে পরীক্ষাতেই পরিণতি

শিক্ষক রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন, ১৯০৮।

প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মহান আদর্শের আহ্বান তাঁকে মুগ্ধ করেছে দেখতে পাই। তিনি তাঁর কর্তব্যের আহ্বান শুনেছিলেন, রাজনীতির ক্ষেত্রে মুখ্যভাবে নয়, গ্রাম সংগঠনের ক্ষেত্রে। তাঁর মন বিশেষ করে আকৃষ্ট হচ্ছিল দেশের শিক্ষা সংস্কারের দিকে—যার দ্বারা দিয়ে গড়ে উঠবে সুস্থ, স্বাভাবিক, স্বাধীন, কর্মকুশল, সুখী মানুষ। তাঁর সন্তানের শিক্ষার সমস্যাও তখন তাঁকে পীড়িত করে তুলেছিল—তাঁর মনে তাই জাগল শান্তরসাস্পদ প্রাচীন তপোবন আশ্রমের

'শান্তিনিকেতন' আ গেই সূচনা সম্বন্ধে তিনি এক প্রবন্ধে লিখেছেন "কোন্ ভিনিসের আরম্ভ কী করে হয় তা বলা যায় না। সেই আরম্ভকালটি হচ্ছে আড়ালে থাকে। আমি চল্লিশ বৎসরপূর্বে পদ্মার বোটে কাটিয়েছি, আমার প্রতিবেশী ছিল বালিচরের চক্রবাকের দল। তাদের মধ্যে বসে বসে আমি বই লিখেছি। চলতো চিরকাল এই ভাবেই কাটাতুম। কিন্তু মন হঠাৎ কেন বিদ্রোহী হল, কেন ভাবজগৎ থেকে কর্মজগতে প্রবেশ করলাম?

বাল্যকালের শিক্ষাব্যবস্থায় মনে বড়ো পীড়া অনুভব করেছি। সেই ব্যবস্থায় আমাকে এত ক্লেশ দিত, আঘাত করত যে বড়ো হয়েও সে অন্যায় আমি ভুলতে পারি নি। কারণ প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানব জীবনের সংস্পর্শ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে শিশুকে বিদ্যালয়ের কলের মধ্যে ফেলা হত। তার অস্বাভাবিক পরিবেষ্টনের নিষ্পেষণে শিশুচিত্ত প্রতিদিন পীড়িত হতে থাকে। ...আমরা—যাদের শিশুপ্রকৃতির মধ্যে প্রাণের উদ্যম সতেজ ছিল,—এতে বড়োই দুঃখ পেতাম। প্রকৃতির সাহচর্য থেকে দূরে থেকে আর মাষ্টারদের সঙ্গে প্রাণগত যোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের আত্মা যেন শুকিয়ে যেত। মাষ্টারেরা সব আমাদের মনে বিভীষিকার সৃষ্টি করত।

প্রাণের সম্বন্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই যে বিদ্যালাভ করা যায় এটা কখনও জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না।

আমি এ বিষয় নিয়ে কখনও কখনও বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন দেখলাম আমার কথাগুলি প্রতিমধুর কবিত্ব হিসাবেই সকলে নিলেন এবং যাঁরা কথাটাকে মানলেন তাঁরা এটা কাজে খাটাবার কোনো উদ্যোগ করলেন না, তখন আমার ভাবকে কর্মের মধ্যে আকার দান করবার জন্যে আমি নিজেই কৃতসংকল্প হ'লাম। আমার আকাঙ্ক্ষা হল, আমি ছেলেদের খুসি করব, প্রকৃতির গাছপালাই তাদের অন্যতম শিক্ষক হবে, জীবনের সহচর হবে—এমনি করে বিদ্যার একটি প্রাণ নিকেতন নীড় তৈরী করে তুলব।" 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' এর আর একটি প্রবন্ধে—বিদ্যালয় স্থাপন ও শিলাইদহে শিক্ষার পরীক্ষা সম্পর্কে লিখেছেন—"রবীন্দ্রনাথকে পড়াবার সমস্যা এল সামনে। তখন প্রচলিত প্রথায় তাকে ইস্কুলে পাঠালে আমার দায় হ'ত লঘু, এবং আত্মীয় বান্ধবেরা সেইটেই প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু বিশ্বক্ষেত্র থেকে যে শিক্ষালয় বিচ্ছিন্ন সেখানে তাকে পাঠানো আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমার ধারণা ছিল, অন্ততঃ জীবনের আরম্ভকালে নগরবাস প্রাণের পুষ্টি ও মনের প্রথম বিকাশের পক্ষে অনুকূল নয়। শহরে যানবাহন ও প্রাণযাত্রার অন্যান্য নানাবিধ সুযোগ থাকে, তাতে সম্পূর্ণ দেহ চালনা ও চারিদিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভে শিশুরা বঞ্চিত হয়, বাহ্য বিষয়ে আত্মনির্ভর চিরদিনের জন্যে তাদের নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। ...দেহটাকে সম্যকরূপে ব্যবহার করবার যে শিক্ষা প্রকৃতি আমাদের কাছে দাবী করে, এবং নাগরিক 'ভদ্র' শ্রেণীর রীতির কাছে যেটা উপেক্ষিত অবজ্ঞাভাজন, তার অভাব-দুঃখ আমার জীবনে আজ পর্যন্ত আমি অনুভব করি।"

শিলাইদহে তিনি রবীন্দ্রনাথকে কি রকম শিক্ষা দিচ্ছিলেন? "শিলাইদহের বিশ্বপ্রকৃতির নিকটসান্নিধ্যে রবীন্দ্রনাথ যে রকম ছাড়া পেয়েছিল সে রকম মুক্তি তখনকার কালের সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থেরা আপন ঘরের ছেলেদের পক্ষে অনুপযোগী বলেই জানত এবং তার মধ্যে যে বিপদের আশঙ্কা আছে, তারা ভয় করত তাকে স্বীকার করতে। রথী সেই বয়সে ডিঙি বেয়েছে নদীতে। সেই ডিঙিতে করে চলতি ষ্টীমার থেকে সে প্রতিদিন রুটি নামিয়ে আনত, তাই নিয়ে ষ্টীমারের সারঙ্গ আপত্তি করেছে বারে বারে। চরে বনবাউরের জঙ্গলে সে বেরোত শিকার করতে—কোনদিন বা ফিরে এসেছে সমস্ত দিন পরে অপরাহ্নে। তা নিয়ে ঘরে উদ্বেগ ছিল না তা বলতে পারিনে, কিন্তু সে উদ্বেগ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যে বালকের স্বাধীন গতিরোধ করা হয়নি।" শিলাইদহে বালকদের শিক্ষার যে আয়োজন সুরু করেছিলেন, কিছুদিন পরে বোলপুর শান্তিনিকেতন আশ্রমে তা স্থায়ীভাবে স্থাপন করলেন। এ আশ্রম তাঁর ও তপবদ্‌বিশ্বাসী মানুষদের সাধনার ক্ষেত্র হিসাবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এখানে নির্মুক্ত প্রান্তরের মাঝখানে ছোড়া ছাতিমগাছের তলে রৌদ্রতপ্ত খর মধ্যাহ্নে তৃষা পীড়িত দেবেন্দ্রনাথ একদিন পেয়েছিলেন "প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি।" তাই আশ্রমের নাম দিয়েছিলেন "শান্তিনিকেতন।" কবির মনে

যখন তপোবনের পরিবেশে সন্তানদের শিক্ষা-সাধনার ক্ষেত্র স্থাপনের সংকল্প মনে জাগল তখন এই শান্তিনিকেতন আশ্রমের কথাই স্বভাবতঃ তাঁর মনে পড়ল। তিনি "আশ্রমের রূপ ও বিকাশ" এর একটি প্রবন্ধে লিখেছেন—"শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে প্রথম সম্পূর্ণ ছাড়া পেয়েছি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি। উপনয়ন অনুষ্ঠানে ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করবার যে দীক্ষা পেয়েছিলেম পিতৃদেবের কাছ থেকে, এখানে বিশ্বদেবতার কাছ থেকে পেয়েছিলেম সেই দীক্ষাই।" "তার পরে সেদিনকার বালক যখন যৌবনের প্রৌঢ়বিভাগে তখন বালকদের শিক্ষার তপোবন তাকে দূরে খুঁজতে হবে কেন? আমি পিতাকে গিয়ে জানালেম, শান্তিনিকেতন এখন প্রায় শূন্য অবস্থায়, সেখানে যদি একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারি তা হলে তাকে সার্থকতা দেওয়া হয়। তিনি তখনই উৎসাহের সঙ্গে সম্মতি দিলেন।" বাং ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ মহর্ষির দীক্ষার দিনটিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই আশ্রম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখানে একথাটা আলোচনা করা যেতে পারে—এ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় কি "বড়লোকের একটা খেয়াল" মাত্র? রবীন্দ্রনাথ যখন এ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন তখন বাস্তবিক পক্ষে তিনি "বড়লোক" ছিলেন না। বরং তাঁর কাঁধে ঋণের বোঝাই ছিল। "তখন আমার ঘাড়ে মস্ত একটা দেনা ছিল।...সে দেনার পরিমাণ লক্ষ টাকারও অধিক ছিল। আমার এক পয়সার সম্পত্তি ছিল না, মাসিক বরাদ্দ সামান্য। আমার বইয়ের কপিরাইট প্রভৃতি আমার সাধ্যায়ত্ত সামগ্রীর কিছু কিছু সওদা করে অসাধ্যসাধনে লেগে গেলাম। আমার ডাক দেশের কোথাও পৌঁছয় নি।" এ বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করতে তাঁর স্ত্রীর অলংকারও তিনি নিতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর নিজের পুস্তকের সমস্ত উপস্বত্ব তিনি দান করেছেন "বিশ্বভারতী"কে। আজীবন নিজ চেষ্টা দ্বারা এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষার চেষ্টা করেছেন, এদের গড়ে তুলবার জন্যে চিন্তা করেছেন শ্রম করেছেন, সমস্ত উদ্বেগ বহন করেছেন। বরং বিদেশ থেকে অনেক সাহায্য তিনি পেয়েছেন তার তুলনায় দেশবাসীর সাহায্য সামান্য। এ বিদ্যালয়, তার ক্ষণিকের খেয়াল নয়—কোন একটি উত্তেজনাকর মুহূর্তের ফল নয়। এ তাঁর জীবনের সাধনা—এ তাঁর কাব্যসাধনারই আর একটি রূপ। তিনি A poet's School প্রবন্ধে কেন তিনি কাব্যজগৎ ছেড়ে এ কর্ম জগতে প্রবেশ করলেন তার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে বলেছেন, "The poet may be compared to (that) foolish butterfly He...tries to translate all the festive colours of creation in the vibration of his verses, then why should he imprison himself in an interminable coil of duty, bringing out some good, tough and fairly respectable result? Why should he make himself accountable to those sane people who would judge the merit of his produce by the amount of profit it will bring?

Suppose this individual poet's answer would be, that when he brought together a few boys, one sunny day in winter, among the warm shadow of the Sal trees, strong, straight and tall, with branches of a dignified moderation, he started to write a poem in a medium not of words."

প্রত্যেক সংস্কারের মধ্যেই একটি প্রতিবাদ থাকে। এ আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের মধ্যেও সে প্রতিবাদ ছিল—সে প্রতিবাদ প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থা, সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। রুশোর শিক্ষানীতির মধ্যেও অনুরূপ প্রবল প্রতিবাদ সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের মনে তাঁর বাল্যের শিক্ষা সম্বন্ধে গভীর বেদনা ও ক্ষোভ ছিল সে কথা পূর্বেই বলেছি। A poet's school প্রবন্ধেও তিনি লিখেছেন "In these self-conscious days of psycho-analysis clever minds have discovered the secret spring of poetry in some obscure stratum of repressed freedom, in some constant fretfulness of thwarted self-realisation. Evidently in this case

they are right. The phantom of my long-ago boyhood did come to haunt the ruined opportunities of its early begining ; it sought to live in the lives of other boys, to build up its missing paradise as only children can do with ingredients which may not have any orthodox material, prescribed measure or standard value."

তিনি দেখেছিলেন আমাদের শিশুদের দেহ মন আছে নানা নিষেধের শৃঙ্খলে বাঁধা। আমাদের সমাজ শিশুকে কেবলই নিষেধ করে, বাধা দেয়—কোন বড় মুক্তির আহ্বান মনাজের কাছ থেকে আমরা পাই না। দেশের যে বিদেশী শাসক তাঁরাও তাঁদের শাসনযন্ত্রের প্রয়োজনে আমাদের কেরানী হবার জন্য যতটুকু দরকার সেটুকু শিক্ষা দিতে ইচ্ছুক। আমাদের সম্বন্ধে তাঁদের কোন শ্রদ্ধা নেই কোন বড় প্রত্যাশাও নেই। তাই এই শিক্ষা শিশুদের মনে কোন স্বাভাবিক উদ্যম জাগায় না। এ একটা বিদেশী কল, তাতে শালাব ধারা পথ হইতে একচুল সরিয়া গেলে তাহা ঘুরাইতে হয়, সে দেশে মানুষ হইবার পক্ষে গোড়াতেই একটা প্রকাণ্ড বাধা। সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতেছেই এবং ঘটিবেই, কেহ তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না—অথচ ব্যবস্থাকে সনাতন রেখার পাকা করিয়া রাখিলে মানুষের পক্ষে তেমন দুর্গতির কারণ আর কিছুই হইতে পারে না।.....সামাজিক বিদ্যালয়ের তো এই বদ্ধ দশা, তাহার পরে রাজকীয় বিদ্যালয়। সেও একটা প্রকাণ্ড ছাঁচে ঢালা ব্যাপার। দেশের সমস্ত শিক্ষাবিধিকে সে এক ছাঁচে শক্ত করিয়া জমাইয়া দিবে, ইহাই তাহার একমাত্র চেষ্টা। যাহে দেশ আপনার স্বতন্ত্র প্রণালী আপনি উদ্ভাবিত করিতে চায়, ইহাই তাহার সবচেয়ে ভয়ের বিষয়। দেশের মনঃপ্রকৃতিতে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া, সে আপনার আইন খাটাইবেই, ইহাই তাহার মতলব। সুতরাং এই বৃহৎ বিদ্যার ফল কেরানিগিরির ফল হইয়া উঠিতেছে। মানুষ এখানে নোটের গুড়ি কুড়াইয়া ডিগ্রীর

নন্দলাল বসু কর্তৃক লাইব্রেরী ভবনের সম্মুখভাগের দেওয়ালে চিত্রাঙ্কন

ডিগ্রী পাওয়া যায় যার ফলে কেরানীগিরি চাকুরী পাওয়া যায়, বড় জোর জজ ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত হওয়া যায় কিন্তু সম্পূর্ণ ও সুষম মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে এ শিক্ষা সম্পূর্ণ নিষ্ফল। 'শান্তিনিকেতন' আশ্রম প্রতিষ্ঠার সময় এসব তাঁর মনকে আন্দোলিত করেছিল—তার পরেও এ মত বরং দৃঢ়তর হয়েছে। ১৩১৯ সালে 'শিক্ষাবিধি' প্রবন্ধে লিখছেন "...যে দেশে সামাজিক শিক্ষা-বস্তু বোঝাই করিয়া তুলিতেছে, কিন্তু তাহা জীবনের খাদ্য নহে। তাহার গৌরব কেবল বোঝাইয়ের গৌরব, তাহা প্রাণের গৌরব নহে।" তিনি সে প্রাণের গৌরবের সন্ধান পেলেন প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে। সম্ভবতঃ সমসাময়িককালে বিবেকানন্দের চিন্তা ও বাণী তাঁর ধারণাকে প্রভাবান্বিত করেছিল। তা ছাড়াকিছুদিন পূর্বে ব্রাহ্মসমাজে বিবাহবিধি নিয়ে যে

আন্দোলন চলেছিল তাতে ব্রাহ্মরা হিন্দু ব'লে নিজেদের পরিচয় দেবেন কিনা এ নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব উগ্র হয়ে উঠেছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মনে এ সম্বন্ধে কোন দ্বিধা ছিল না। তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারকে সবলে অস্বীকার করেছেন কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্ম হিন্দু ধর্মের সার্থক উদার প্রকাশ এ বিশ্বাসে তিনি অবিচল ছিলেন। প্রাচীন হিন্দু ধর্মের মধ্যে যে উদার সত্য আছে তাকে তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন—এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিশুদ্ধ আদর্শকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন, তাই নিজেকে হিন্দু বলে প্রচারে তাঁর কোন লজ্জা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শটি পিতার কাছ থেকে পেয়েছিলেন তাই প্রাচীন তপোবনের আদর্শ স্বভাবতই তাঁর মনকে আকর্ষণ করেছিল। এই তপোবনের আদর্শ কি? এটি বিদ্যার্থী ও শিক্ষকের সম্মিলিত সাধনার প্রাণময় ও আনন্দময় ক্ষেত্র। সে সাধনা সত্যকে আয়ত্ত করার, সত্যকে উপলব্ধি করার, সত্যাগ্রহী হয়ে ওঠার সাধনা। জীবনের পূর্ণ ও সার্থক বিকাশের জন্যই শিক্ষা—ভারতীয় প্রতিভা সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যে আধারটি রচনা করেছিল—তাই তপোবন। ১৩৩১ সালে ২রা পৌষ শান্তিনিকেতন মন্দিরে উপদেশ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "আমার মনে হয়েছিল জীবনের কী লক্ষ্য এই প্রশ্নের মীমাংসা যেন শিক্ষার মধ্যে পেতে পারি। আমাদের দেশের পুরাতন শিক্ষা প্রণালীতে তার আভাস পাওয়া যায়। তপোবনের বিকৃত তপস্যা ও অধ্যাপনার মধ্যে যে শিক্ষা সাধনা আছে তাকে আশ্রয় করে শিক্ষক ও ছাত্র জীবনের পূর্ণতা লাভ করেছিলেন। শুধু পরা বিদ্যা নয়, শিক্ষা-কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দ জ্যোতিষ প্রভৃতি অপরা বিদ্যার অনুশীলনেও যেমন প্রাচীনকালে গুরুশিষ্য একই সাধনক্ষেত্রে মিলিত হয়ে ছিলেন, তেমনি সহযোগিতার সাধনা যদি এখানে হয় তবেই শিক্ষার পূর্ণতা হবে। তপোবনে গুরুগৃহের শিক্ষা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষকে প্রীতির সম্বন্ধে ঔৎসুক্যের সম্বন্ধে যুক্ত করে আবার মানুষের সঙ্গে মানুষকেও শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ করে। এ সংযোগ শুধু স্বার্থের সংযোগ নয়, প্রয়োজনের সংযোগ নয়, একাত্মবোধের সংযোগ।" 'তপোবন' (১৩১৬) প্রবন্ধে লিখেছেন "এই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা।" যা খণ্ডিত, যা বিচ্ছিন্ন—তা অসার্থক, তা সঙ্গতিহীন ভয়ঙ্কর একথাটি সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুভূতিতে জেনেছিলেন, তাই ভারতের তপোবনের আদর্শে যে ভূমা ও সমগ্রতার কল্পনা রূপ পেয়েছে তাকে তিনি তাঁর শিক্ষার একটি মূল উদ্দেশ্য বলে চিরকাল বিশ্বাস করেছেন। "অতএব যদি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের এই সাধনাতে দীক্ষিত করা ভারতবাসীর শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, তবে এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে প্রধান স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানার দক্ষতা শিক্ষা নয়, স্কুল-কলেজে পরীক্ষা পাশ করা নয়, আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনে—প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে, তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়ে।" ১৩২৯ সালে লেখা আর একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন……"তপোবনের শিক্ষা প্রণালীতে খুব একটি বড়ো সত্য আছে। যে বিরাট বিশ্বপ্রকৃতির কোলে আমাদের জন্ম তার নিকটতা থেকে বঞ্চিত বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে মানুষ সম্পূর্ণ শিক্ষা পেতে পারে না। বনস্থলীতে যেমন এই প্রকৃতির সাহচর্য আছে তেমনি অন্যদিকে তপস্বী মানুষের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসম্পদ এই প্রকৃতির মাঝখানে বসে যখন লাভ করা যায় তখনই যথার্থ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে বাস করে বিদ্যাকে গুরুর কাছ থেকে পাওয়া যায়।……এতে করে শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে যথার্থ যোগ স্থাপিত হয়, গুরুশিষ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ সত্য ও পূর্ণ হয়, বিশ্বপ্রকৃতির ও মানব প্রকৃতির সঙ্গে মিলন মধুর ও স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে। তাই আমার মনে হয়েছিল যে, তখনকার দিনে তপোবনের মধ্যে মানবজীবনের বিকাশ একটি সহজ ব্যাপার ছিল বটে, কিন্তু তার সময়টি এখনও উত্তীর্ণ হয়ে

যায় নি; তার মধ্যে যে সত্য ও সৌন্দর্য আছে তা সকল কালের। বর্তমান কালেও তপোবনের জীবন আমাদের আদর্শের অগম্য হওয়া উচিত নয়।" এ আদর্শ শুধু একটা "ফাঁকিবাজনা" নয়, তাকে সার্থক রূপ দিতেই তিনি শান্তিনিকেতনে আজীবন নানা পরীক্ষা ও চেষ্টা করে গেছেন। এ আশ্রমে সপরিবারে তিনি বাস করতেন। তাঁর ছেলে রথীন্দ্র ও শমীন্দ্র ছাড়াও আরও কয়েকটি ছেলে একত্রিত হয়েছিল। দালান কোঠা, ডেস্ক, সরঞ্জাম ছিল না। গাছের তলায়ই ছোট ক্লাস, অল্প যে কয়েকজন এ আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে এসেছিলেন —যেমন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বেবাচাঁদ, পরে সতীশ চন্দ্র রায়, অজিত চক্রবর্তী, জগদানন্দ রায়, ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী ইত্যাদি, তাঁরা ছাত্রদের সঙ্গেই বাস করতেন। তাঁরা অর্থের লালসায় আসেন নি, এসেছিলেন আদর্শের আকর্ষণে। ঐশ্বর্য তাঁদের ছিল না বেশে-বাসে—ঐশ্বর্য ছিল ছাত্রদের প্রতি স্নেহের প্রাচুর্য আর জ্ঞানের সঞ্চয়ে। থাকতেন তাঁরা কুটিরে। রবীন্দ্রনাথ নিজে সপরিবারে ছিলেন এই আশ্রমের কেন্দ্র—শিক্ষকদের মধ্যে একজন। ছাত্রদের পুঁথিপত্রের মধ্য দিয়ে, শাসনের ভীতি দিয়ে আবদ্ধ করে রাখেন নি। প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তরে তাদের যথেচ্ছ বিচরণের সুযোগ দিয়েছেন। বই মুখস্থ করে পরীক্ষা পাশের জন্য তাড়া দেন নি। তাদের চারপাশের প্রকৃতির প্রতি তাদের কৌতূহলী করে তুলেছেন—তাদের প্রশ্ন করতে সাহস দিয়েছেন —নানা পরীক্ষা ও কর্ম উদ্যমে উৎসাহ দিয়েছেন। গল্প ও খেলার মধ্য দিয়ে জ্ঞানের পথে আনন্দ পেতে শিখিয়েছেন। একটি প্রবন্ধে লিখেছেন "আমি পাঁচ-ছয়টি ছেলে নিয়ে জামগাছতলায় তাদের পড়াতাম। আমার নিজের বেশি বিদ্যে ছিল না। কিন্তু আমি যা পারি তাই করেছি। সেই ছেলে কয়টিকে নিয়ে রস দিয়ে, ভাব দিয়ে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়েছি—তাদের কাঁদিয়েছি, হাসিয়েছি, ঘনিষ্ঠভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের মানুষ করেছি।" ১৩৪২ সনে ৮ই পৌষ আশ্রমের প্রার্থনাগৃহে উপদেশে বলেছেন "ছেলেদের জন্য নানা রকম খেলা মনে মনে আবিষ্কার করেছি, একত্র হয়ে তাদের সঙ্গে অভিনয় করেছি, তাদের জন্য নাটক রচনা করেছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে যাতে তারা দুঃখ না পায় এ জন্য তাদের চিত্ত বিনোদনের নূতন নূতন উপায় সৃষ্টি করেছি, তাদের সময় সময়ই পূর্ণ করে রাখবার চেষ্টা করেছি।.....তাদের আপন অন্তরের মধ্যে তাদের জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। কোন নিয়ম দ্বারা তারা পিষ্ট না হয়, এই আমার মনে অভিপ্রায় ছিল। এই চেষ্টার সঙ্গী পেয়েছিলাম কিশোর কবি সতীশ চন্দ্রকে—শিক্ষাকে তিনি আনন্দে সরস করে তুলতে পেরেছিলেন, সেক্সপীয়রের মতো কঠিন বিষয়কেও তিনি অধ্যাপনার গুণে শিশুদের মনে মুদ্রিত করে দিতে পেরেছিলেন। তারপর ক্রমশঃ নানা ঋতু উৎসবের প্রচলন হয়েছে, আপনার অজ্ঞাতসারে প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের আনন্দের যোগ এই উৎসবের সহযোগে গড়ে উঠবে এই আমার লক্ষ্য ছিল।" ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার বেলায় শিলাইদহে যে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন সে কথা বলেছি। এখানেও তার অনুরূপ পরীক্ষাই চললো। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্, "এক সময়ে নিজের অনভিজ্ঞতার খেদে আমার হঠাৎ মনে হল যে, একজন হেডমাষ্টারের নেহাত দরকার। কে যে একজন লোকের নাম করে বললে, 'অমুক লোকটি একজন ওস্তাদ শিক্ষক, যাকে তাঁর পাশের সোনার কাঠি ছুঁইয়েছেন সেই পাশ হয়ে গেছে।' তিনি তো এলেন, কিন্তু কয়েকদিন সব দেখে শুনে বললেন, 'ছেলেরা গাছে চড়ে, চেঁচিয়ে কথা কয়, দৌড়ায়, এ তো ভাল না।" আমি বললুম, 'দেখুন আপনার বয়সে তো কখনও তারা গাছে চড়বে না। এখন একটু চড়তেই দিন না। গাছ যখন ডালপালা মেলেছে, তখন সে মানুষকে ডাক দিচ্ছে। ওরা ওতে চড়ে পা ঝুলিয়ে থাকলই বা।" শিক্ষাকে আনন্দময় করবার চেষ্টার সঙ্গে ছিল তাদের রুচিকে বিকশিত করার এবং আত্মকৃতিত্ব বোধ জাগ্রত করার চেষ্টা।

গান লিখিয়েছেন, অভিনয় শিখিয়েছেন—ছবি আঁকতে, মূর্তি গড়তে, করতে উৎসাহ দিয়েছেন এ সব অবশ্য পরে অনেক বেড়েছে। কিন্তু শুধু স্নেহ, শুধু আনন্দ, শুধু স্বাধীনতাই নয়, ছিল কৃচ্ছ্রসাধনের শিক্ষা, সরল ও শুচি জীবনের তপশ্চর্যার শিক্ষা, শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধার শিক্ষা, সামাজিকতা ও ভদ্র আচরণের শিক্ষা। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা দিবসের উপদেশকাদে তিনি বলেছিলেন, "আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিরূপ শিক্ষা ও ব্রত অবলম্বন করতেন? তাঁরা বাল্যকালে গৃহ ছেড়ে নির্জনে গুরুর বাড়ীতে যেতেন। সেখানে খুব কঠিন নিয়মে নিজেকে সংযত করে রাখতে হত। গুরুকে একান্ত মনে ভক্তি করতেন, গুরুর সকল কাজ করে দিতেন। গুরুর জন্যে কাঠ কাটা, জল তুলে আনা, তাঁর গরু চরানো, তাঁর জন্যে গ্রাম থেকে ভিক্ষে করে আনা, এই সমস্ত তাদের কাজ ছিল, তা তারা যত বড় ধনীর ছেলেই হোক না। শরীর মনকে একেবারে পবিত্র রাখতে হবে—তাঁদের শরীরে ও মনে কোন রকম দোষ একেবারে স্পর্শ করতো না। গেরুয়া বস্ত্র পরতেন, কঠিন বিছানায় শুতেন, পায়ে জুতো নেই, মাথায় ছাতা নেই—সাজসজ্জা বড়োমানুষি কিছু মাত্র নেই। সমস্ত মনের সমস্ত চেষ্টা কেবল শিক্ষালাভে, কেবল সত্যের সন্ধানে, কেবল নিজের দুষ্প্রবৃত্তি দমনে, নিজের ভাল গুণকে ফুটিয়ে তুলতে নিযুক্ত থাকত।

তোমাদের সেই রকম কষ্ট স্বীকার করে সেই কঠিন নিয়মে সকল প্রকার বড়োমানুষিকে তুচ্ছ করে দিয়ে এখানে গুরুগৃহে বাস করতে হবে। গুরুকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা করবে, মনে রাখো যাতে তাঁকে লেশমাত্র অবজ্ঞা করবে না।" শারীরিক শ্রম ও স্বাস্থ্যবিধি পালন শিক্ষক ছাত্র সকলের পক্ষেই অবশ্য কর্তব্য ছিল। এ থেকে এটা বুঝা যাবে শান্তিনিকেতনের আদর্শ "মাচপ্যান স্কুলের আড্ডা" নয়।

[আগামীবারে সমাপ্ত]

দীঘা ঃ স্মৃতি

প্রভাকর মাঝি

সকাল থেকে ঢেউয়ের গান শুনি
বুঝি নে ভাষা, জানি নে তার মানে।
সাগরে-নেখে করছে কোলাকুলি
কুয়াশা ছিঁড়ে সূর্য আসে। আসে।

পাইন-বনে হাওয়ার ফুল ফুল,
ইতস্তত: কেয়ার ঝালিয়াড়ি।
মেলে সাগর বলাকারা
নিরুদ্দেশের উদ্দেশে দেয় পাড়ি।

দেখছি ভেবে,—ছেলেরা মাছ ধরে
কঠিন শ্রমে শরীরে বলি—রেখা।
কি শুধু নৎস্য ধরে যাবে?
বহু নৎস্য-পরীর দেখা?

নিমেষ-হারা রয়েছি বসে তীরে
সমুদ্রকে দেখতে ভাল লাগে।
হঠাৎ খুশি উলসে উঠে প্রাণে,
আরেক মন মনের কোণে জাগে।

দৈনিকের যুদ্ধে অরোজরো
কুঁকড়ে-পড়া সে মন নয় এ তো।
এই পৃথিবীর গণ্ডী ছেড়ে দিয়ে
অনেক দূরে পালিয়ে গেছে সে তো।

আরেক মন আরেক দ্বার খুলে,
সমুদ্রের সঙ্গে সুর তুলে।

প্রথম শীতের চিঠি

শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ

যে-মেয়ে হারিয়েছিল ফাল্গুনের প্রথম সকালে
ফেলিল নিশিরস্নেহে কাশ-বনে পাখিদের গানে।
বারে বারে স্মৃতি যার মুছে গেছে কুয়াশার জালে
নীলিমা বিকেল শেষে সন্ধ্যার বসন্তের প্রাণে।

ছ'হাতে তুষার ঢেলে পৌষের নতুন নদীতে
মাঘের মলিন মেঘে, তীক্ষ্ণমুখ শীতের বর্শাতে
নিপুণ কণার ঘায় অতর্কিত এঁকে সেই মুখে,
বসন্তবাহার দিয়ে, গ্রীষ্মশেষ-বর্ষার অসুখে
শরতে ঝুরিয়ে দিয়ে, সেই তুমি আবার কি এলে,
নবান্নের গানে-গানে ঘরে-ঘরে দীপ জেলে জেলে?

শান্তির জোয়ার ডেকে পাহাড়ী-পাথুরে সমতল
কাঠিন ভূমিকে ছুঁয়ে, যুথরিত শ্যামল উজ্জ্বল
আসন্নসম্ভবা বধূ ভ'রে দাও মৃত্তিকার কূলে,
হে শীত—শীতের কন্যা এসো জীবনের উপকূলে
অমৃতের বাণী নিয়ে আশ্বাসের নগর পোহাতে
নতুন দিগন্ত ভ'রে ভোরের মঙ্গলদীপ হাতে।
আবার ছড়াও তুমি পূর্বরাগ। ফের ঘরে-ঘরে
খবর ছড়িয়ে গেছে হাটে-বাটে-শহরে-বন্দরে।
হাজারো হৃদয় জুড়ে আলোর পতাকা উজ্জীন
পাখির মিছিল বনে, আজকে আশ্চর্য নাকি দিন!
সমুদ্রের মতো তার আদিগন্ত ভরা আয়োজন
যে-দিনে প্রেরণা জ্বলে, খুশি জ্বলে আলোর মতন।

তাইতো খুঁজেছি তাকে রিক্তপাত্রে কার্তিকে-অঘ্রাণে,
হে শীত—শীতের কন্যা পূর্ণ যৌবনের গানে-গানে।

বাঁকা

[গল্প]

. শ্রীতারাপদ রাহা

সুলতার সমুদ্র দর্শন এই প্রথম। অসীম নীলকান্তি চোখে নেশা লাগিয়েছে যেন তার। রিক্সা থেকে আর নামতে চায় না সে। রিক্সাওয়ালা চেঁচামিচি সুরু করে দিলে। সমুদ্র ত পাশেই রইল,—যখন খুশি যতখুশি দেখতে পারবে,—ব'লে—কোন রকমে তাকে নামিয়ে নিয়ে হোটেলে ঢুকলাম। তখনও দেখি ফিরে ফিরে চাইছে সুলতা সমুদ্রের দিকে।

জিনিষপত্র রিক্সাওয়ালাই করিডারে রেখে গেল। এইবার ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে ঘর নির্বাচনের পালা।

ভিতরের বারান্দার এক পাশেই ম্যানেজারের অফিস, সুলতাকে সঙ্গে নিয়েই এগিয়ে গেলাম তাঁর কাছে। আর এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন তিনি,—সুতরাং ভদ্রতার নিয়মে তার সঙ্গে কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম আমি। হঠাৎ সুলতা আমার বাম বাহুতে চাপ দিয়ে চাপা গলায় বলে উঠল দেখ, দেখ, এদিকে একবার চেয়ে দেখ। চোখে মুখে তার রীতিমত বিস্ময়।

সুলতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাকিয়ে দেখি কয়েক হাত দূরে এক ইঁদারার নীচু পাড়ের উপর দাঁড়িয়ে একটি লোক মহাবিক্রমে জল তুলে পাশের চৌবাচ্চা ভর্তি করছে। শুধু দৃশ্যটা না হলেও লোকটার মূর্তিটা দাঁড়িয়ে দেখবারই মত। মেদবর্জিত পেশীবহুল দেহ, দড়ির টানে টানে শুধু দুলছে নয়, যেন নাচছে, লজ্জা নিবারণের জন্য সামান্যমাত্র কটি-বাস তার কৌপীনের মত করে পরা, দেহের অধিকাংশ স্থানই অনাবৃত,—সেই অনাবৃত দেহের প্রতি পেশী যেন তার নাচছে। গায়ের বর্ণ ঘোরতর কালো দেহের গঠন আর বর্ণ দেখে মনে হয় শিল্পীর গড়া কষ্টি পাথরের একটি মূর্তি যেন সহসা জীবন্ত আর চঞ্চল হয়ে উঠেছে, আবার মনে হয় কোন যাদুমন্ত্রে যেন আমরা মোগল আমলে চলে গেছি,—দেখতে পাচ্ছি একটা হাবসী ক্রীতদাস কোন বেগমের গোসল খানার জন্য ত্বরিত হস্তে জল তুলে চলেছে। হঠাৎ উপর থেকে হাঁক এল,—বাঁকা, জল। কণ্ঠস্বর অবশ্য উর্দুভাষী কোন বেগমের নয়, একজন বাঙালী মহিলার।

মহিলার কণ্ঠস্বরে লোকটা মাথাটা একটু তুলিয়ে কি এক অস্ফুট শব্দ করলে। পরক্ষণেই মহিলা আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, এই বাঁকা,—জল দিলি না,—শীগ্‌গির জল নিয়ে আয়।

পশুর গোঙানির মত অর্ধস্ফুট অস্পষ্ট এক হুঁ হুঁ শব্দ করতে করতে লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে একবার উপরের দিকে তাকাল। এইবার আমরা তার মুখ দেখতে পেলাম। এতক্ষণ সে আমাদের দিকে পিছন ফিরে ছিল, সুতরাং মুখ দেখবার কোন সুযোগ ছিল না। কিন্তু এ সুযোগ না পেলেই বুঝি ভাল ছিল। মুখ দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের মাঝে কেমন এক ধাক্কা দিয়ে গেল,—সুলতার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি তারও ঠিক আমারই মত অবস্থা।

লোকটার মুখের বাঁ দিকের ভুরুর উপর থেকে সুরু করে থুতনীর নীচে পর্যন্ত সমস্ত গালটা কবে কোন অগ্নি-কুণ্ডে পুড়ে—দুমড়ে কুঁচকে বীভৎস হয়ে উঠেছে। বাঁ দিকের ঠোঁটের কিছুটা অংশও পুড়ে কুঁচকে কেমন যেন বাঁকা হয়ে গিয়েছে। বাঁ চোখের দুটি পাতা সঙ্কুচিত বিকৃত। মুখের দগ্ধ অংশ দেহের স্বাভাবিক বর্ণ হারিয়ে কেমন এক অস্বস্তিকর বিকৃতির সৃষ্টি করেছে।

লোকটা একবার ঘাড় ফিরিয়ে তখনই আবার জল তোলায় মন দিয়েছিল, কিন্তু একমনে কাজ করবার ত উপায় নেই, উপর থেকে আর এক মহিলা এবার মুরুব্বিয়ানার সুরে হাঁকলেন, বাঁকা আমায় জল দিয়ে যা। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত মহিলা বলে উঠলেন, আমায় জল আগে দিয়ে যাবি, বাঁকা, আমি কতক্ষণ থেকে ডাকছি!

বাঁকা এবার জল তোলা থামিয়ে ই দারার পাড় থেকে নেমে কাঠের বাঁট বাঁধা দুটো টিনের জের জল ভর্তি করে দুই হাতে ধরে অতি স্বচ্ছন্দে উপরে নিয়ে চলল। গায়ে যেন তার অসুরের বল।

এরপর যতক্ষণ আমরা ওখানে ছিলাম ততক্ষণের মধ্যে এক মুহূর্ত তার বিরাম দেখিনি। উপর থেকে হাঁকের পর হাঁক আসছেই—বাঁকা, জল,—আর বাঁকা অসুরের মত, ছাবসী ক্রীতদাসের মত তাঁদের হুকুম তামিল করছে। মুখে তার কথা নেই।

আমার তখনই কেমন মনে হচ্ছিল বাঁকা বোধ হয় ভাল করে কথা বলতেও পারে না, আমার ধারণা যে অমূলক নয় তার প্রমাণ পেতেও অবশ্য বেশি বিলম্ব হ'ল না আমাদের।

ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে নীচেরই একটা নিরালা ঘর ঠিক করলাম আমরা—পাশেই সংলগ্ন স্নানাগার। কোন কারণেই দূরে যেতে হবে না আমাদের।

নীচে ঘর নেবার একটা প্রচ্ছন্ন কারণ আছে আমাদের। সে কারণটা হচ্ছে সুলতা একটু শুচিবায়ুগ্রস্তা, এবং এই জন্যই তার একটু জলের প্রয়োজন বেশি,—এবং কিঞ্চিৎ দক্ষিণা অর্থাৎ ঘুষ দিয়েও জলদাতার কাছ থেকে কিঞ্চিৎ বেশিমাত্রায় জল পেতে হলেও—উপরের তলার চেয়ে নীচের তলা থেকেই তা সহজ।

ঘর নেবার একটু পরেই অন্যান্য মহিলার মত সুলতাকেও হাঁক দিতে হল,—বাঁকা, জল। কানে এল ম্যানেজারবাবুও—আমরা নবাগত বলে বাঁকাকে আমাদের ঘরেই তাকে জল দিতে নির্দেশ দিচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে সুলতা মৃদু হেসে আবার হাঁকলে, বাঁকা, জল। বাঁকা উত্তর দিলে। আমাদের কানে এল একটা বিকৃত, অস্পষ্ট, আড়ষ্ট কণ্ঠস্বর : যাঃ—চি।

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই দুই হাতে দুটো টিন ভরতি জল নিয়ে ঢালতে গেল স্নানের ঘরের চৌবাচ্চায়, কিন্তু সুলতা তখনই অমনি রা রা করে উঠল, এই, কি করিস, কি করিস,—আগে ব্লিচিং পাওডার নিয়ে আয়, স্যাঁতলা পড়া—কতজনের নোংরা করা চৌবাচ্চা তার ঠিক কি।

দেখলাম বিরক্তির রেখা ফুটে উঠল বাঁকার মুখে চোখে, গোঁ গোঁ করে কি যেন সে বলতে চাইল,—তার পর, চুপ চাপ করে চলে গেল সে ব্লিচিং পাউডার আনতে। বাঁকা ফিরে এলে সুলতা তাকে বললে, বাঁকা, লক্ষ্মী,—একটু বেশি করে জল এনে চৌবাচ্চাটা ভাল করে পরিষ্কার করে দে, তোকে বকশিস্ দেব আমি। বকশিসের কথা শুনে ঐ পোড়া কোঁচকানো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়লো তার।

পর পর কয়েক টিন জল এনে ব্লিচিং পাওডার ঢেলে ঝাঁটা ঘসে বাঁকা চৌবাচ্চা পরিষ্কার করে দিলে,—কিন্তু সুলতার কিছুতেই যেন মনঃপূত হয় না, বাঁকা, লক্ষ্মীটি আর দু'টিন জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে দে, তোকে বকশিস্ দেব।

বাঁকা বিরক্ত হয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে যেমন করে তাকালে তা দেখেই সাধারণ মানুষের একটু ভয় পেয়ে যাবার কথা —এর উপর ছিল আবার তার আপত্তিসূচক—কেমন এক অস্ফুট ঊঁ ঊঁ শব্দ। কিন্তু শুচিবাই-গ্রস্তার এতে ভ্রূক্ষেপে তার পবিত্রতা রক্ষা হয় না, তাই সুলতা মৃদু হেসে স্বর আরও কোমল করে বললে,—রাগ করে না, লক্ষ্মী, এত কষ্টই করলি, আর দু' টিন দিলেই হবে,—আর বিরক্ত করব না তোকে, ভাল বকশিস্ দেব।

সঙ্গে সঙ্গে ম্যানেজার বাবুরও কণ্ঠস্বর কানে এল, বাঁকা, যা যা বলছেন করে দে।

বাঁকা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দিকে কেমন করে তাকিয়ে এক হেঁচকা টানে দুই টিন নিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

পরিষ্কৃত চৌবাচ্চার টলটলে জলে তৃপ্তির সঙ্গে স্নান করে খুশি হয়ে সুলতা আবার যখন বাঁকাকে ডাকলে—তাকে বকশিস্ দিতে—তখনও তার সকল ঘরে জল তোলা শেষ হয় নি। ডাক শুনে সে আমাদের ঘরে এল, তখনও তার চোখে মুখে বিরক্তি আর অবিশ্বাসের চিহ্ন। এই বুঝি আবার জল আনতে বলে। লক্ষ্য করে দেখলাম, কটিবাস থেকে সুরু করে সর্বাঙ্গ তার সিক্ত,—ঘামে না জলে ঠিক বুঝবার উপায় নেই। কানে একটি বিড়ি গোঁজা।

সুলতা তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললে, অমন করে তাকাচ্ছিস কেন, আর তোকে জল আনতে বলছি না,—এই নে তোর বকশিস্ নে,—বলে একটা চক্‌চকে আধুলি বাঁকার দিকে এগিয়ে ধরলে।

সঙ্গে সঙ্গে বাঁকার মুখের অস্বস্তিকর রেখা মুছে গিয়ে মুখখানা হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, আধপোড়া ঠোঁটের মাঝ দিয়ে সাদা দাঁতগুলি প্রায় সবই প্রকাশিত হয়ে পড়ল। হেঁ হেঁ করতে করতে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে সে আধুলিটা নিলে, তার পর সে সেটা কানে গুঁজবার চেষ্টা করলে। বাঁকার কানটা একটু ছোট বলে সেটা সেখানে ঠিক দাঁড়াচ্ছিল না দেখে আমি তাকে পাল্টে দুটো সিকি দিলাম। সে তৎক্ষণাৎ সে দুটো দুই কানে গুঁজে—আনন্দে দুই নিতম্বে করাঘাত হেনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ফিরে এল। কান থেকে বিড়িটা নামিয়ে সে দেশলাই জ্বালার ভঙ্গী করে আমার দিকে চেয়ে বললে,—দে, দে।

তার ইঙ্গিত বুঝে পকেট থেকে দিয়াশলাইটা বের করে তার হাতে দিলাম, তা ছাড়া তাকে খুশী করবার জন্য একটা সিগারেটও তাকে উপহার দিলাম। বাঁকা বিড়ি ধরিয়ে সিগারেটা আবার কানে গুঁজে রাখল। বললাম, দেখিস, ওটা যেন আবার ভিজিয়ে ফেলিস না।

বাঁকা অস্ফুট একটা শব্দ করে ছোট ছেলেদের মত মাথা ঘুরিয়ে জানালে,—না। পরক্ষণেই কোন মহিলার হাঁকে—ওঁকে জল দেবার জন্যে বাঁকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিকেলে সুলতার রোজই গা ধোবার অভ্যাস, সুতরাং সেই দিনই বিকেলে সুলতা আবার বাঁকাকে ডাকলে, বাঁকা লক্ষী, আমাদের চৌবাচ্চায় কয়েক টিন জল দিয়ে যা ত। কাল আবার তোকে বকশিস্ দেব।

প্রথম বকশিসটা বাঁকার হয়ত আশাতিরিক্ত হয়েছিল, তাই সে আর "না" করলে না, তা ছাড়া এ বেলা তার কাজের চাপও কম। এ বেলা শুধু সে অনেকের ঘরে দুপুরে ধোয়া শুকনো কাপড়গুলি তুলে দেয়।

পরের দিন সকালেই সুলতার কাছ থেকে—আগের দিন বিকেলের গা ধোয়ার জল তুলবার জন্য বাঁকার বকশিস মিলল দু' আনা। বাঁকা এতেই কত খুশি! দুপুরে স্নানের পর সুলতা নিজের কাপড় যখন নিজে নিঙ্ড়াচ্ছিল বাঁকা তখন স্নানের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে বললে,—তুঃ তুঃ দে,—আমমি ধু, দেব।

তুই পারবি?

হুঁ, হুঁ—

আর ওদের মত কাপড় ধোয়া নয় কিন্তু আমার একটু সাবধান হয়ে ধুতে হবে, গায়ের সঙ্গে লাগবে না, তা ছাড়া শেষবার ধোওয়ার বেলায় বালতির হাকে ডুবাবি না,—পাত্র থেকে জল ঢেলে ধুবি,—পারবি?

হ, হ,—তুঃ তুঃ দেঃ!

কাপড় তুলেও আনবি নাকি তুই?

হুঁ, হুঁ।

তখন আবার হাত ধুয়ে গায়ের সঙ্গে না লাগিয়ে আনতে হবে,—পারবি ত?

হুঁ, হুঁ,—

সেই থেকে বাঁকা আমাদের কাপড় চোপড় ধোয়া ও তোলার ভার নিলে। এর জন্য অন্যান্য সকলে তাকে কিছু দেবেন কিনা জানি না,—কিন্তু সুলতা তাকে প্রতি দিনই দুই-এক আনা বকশিস্ দিত, আর বলত, তুই ভাল করে কাজ কর, যাবার সময় তোকে আমি ভাল বকশিস্ দিয়ে যাব—। আমি দিতাম তাকে প্রতিদিনই দুই একটা সিগারেট।

দরকার দিয়াশলাই দরকার হলেই সে বিড়ী হাতে আমাদের ঘরে ক্রমে এসে হাজির হ'ত। আমরা যখন যে অবস্থায়ই থাকি না কেন ঘরে ঢুকবার আগে কোন রকম সাড়া দেবার প্রয়োজন সে বোধ করত না। নানা কারণে বারবার আমাদের ঘরে যাতায়াত করায় ঘরে কোথায় কি আছে,—কোথায় কি রাখি সব তার জানা হয়ে গিয়েছিল। বিড়ী ধরাতে ধরাতে মাঝে মাঝে সে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখত,—বিশেষ করে ঘরের যে কোণের আলনায় আমাদের কাপড় চোপড় থাকত সেই দিকে। এ জন্য মাঝে মাঝে আমাদের মনে যে একটু আধটু সন্দেহ না হ'ত—তা নয়। সুলতার সঙ্গে মাঝে মাঝে একটু আলোচনাও হ'ত। সে বলত,—বাঁকা সে ধরণের নয়, তবু আমাদের একটু সাবধান থাকলেই চলবে।

সুলতার এ আশ্বাসে আমার মনের বোঝা কিন্তু পুরোপুরি কিছুতেই কাটত না: ভাবতাম বাঁকা সুলতার অপরিহার্য বলেই এমন কথা বলছে সে।

এক দিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমরা শুয়েছি, দরজা ভেজানো আছে। সুলতা ঘুমিয়ে গেছে আমি ঘুমাই নি, চক্ষু বুজে শুধু প্রতীক্ষা করছি, এমন সময় দরজা খোলার মৃদু শব্দ কানে গেল। চক্ষু ইষদুন্মোচিত করে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম বাঁকা ঘরে ঢুকেছে। আমার ইষৎ সন্দেহ এবার ক্রোধ ও বিরক্তিতে পরিণত হল। বাঁকার আস্পর্ধা বড় বেশি বেড়ে গেছে···এ অবস্থায় ঘরে ঢোকা তার নিতান্ত অন্যায়।—

শুধু মনের উষ্মা চেপে বাঁকার গতিবিধির উদ্দেশ্য ভাল করে বুঝে নেবার জন্য চক্ষু মুদ্রিত করে মৃতের ন্যায় পড়ে রইলাম।

আমরা ঘুমন্ত জেনেও বাঁকা চলে গেল না, ধীরে ধীরে সে আমাদের বিছানার দিকে এগিয়ে এল। তারপর অতি সন্তর্পণে আমার বালিশের নীচে হাত ঢুকালে সে। ভাবলাম ও চয়ত মনে করেছে আমাদের বালিশের নীচে স্যুটকেসের চাবি আছে; আমরা ঘুমিয়েছি ভেবে এই সুযোগে ও কিছু আত্মসাৎ করতে চায়। সুলতা এবং বাঁকা দুই জনের উপরেই রাগে আত্মসংবরণ করা কঠিন হচ্ছিল—তবুও অনেক চেষ্টা করে কাঠ হয়ে পড়ে রইলাম: বাঁকাকে হাতে নাতে ধরে সুলতাকে দেখিয়ে দেব তার আস্কারা পেয়ে বাঁকা আমাদের কি সর্বনাশ করতে যাচ্ছিল।

বাঁকা কিন্তু আমার বালিশের নীচে হাত দিয়ে কিছুই খুঁজলে না, চিরাভ্যাসের মত সেখান থেকে সে বের করলে একটা দেশলাই। সমুদ্রের জলো হাওয়ায় খারাপ হয়ে যাবে—ভয়ে দেশলাইটা আমি ঐখানেই রাখি। বাঁকা ধীরে সুস্থে তার কান থেকে একটা বিড়ী লাগিয়ে সেটা ধরিয়ে দেশলাইটা আবার আমার বালিশের নীচে সন্তর্পণে রেখে ধীরে ধীরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মনটা আমার তখনই হালকা হয়ে গেল: এমন লোকের উপরও রাগ করতে হয়! নিজের মনকেই ধিক্কার দিলাম আমি। কিন্তু মন তখনই আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলো: কিন্তু আমরা স্বামী স্ত্রী যখন ঘুমাচ্ছি...সে কথা জেনে.. বিশেষ করে কোন মেয়ে ছেলে ঘুমুচ্ছে সেই অবস্থায় কারো সে ঘরে প্রবেশ করা উচিত কি?

বাঁকাকে আরও কয়েকদিন দেখবার পর এ প্রশ্নের উত্তরও আমার নিজের মনের কাছেই পেয়েছিলাম। উত্তরটা অবশ্য বাঁকার একটা মহৎ গুণেরই পরিচয় বহন করে এনেছিল. কিন্তু মানুষের সে গুণ ঠিক মত বুঝাতে গিয়ে তাকে যার সঙ্গে তুলনা করতে হয়—সে নামটা না নিতে পারলেই ভাল; প্রভুভক্ত গৃহপালিত বিশেষ কোন জীবের যেমন কোন অবস্থাতেই তার প্রভু ও প্রভু পত্নীর কাছে আসতে বাধা নেই, বাঁকার যেন তাই।

সুলতার ঘুম ভাঙলে ব্যাপার তার কাছে খুলে বললাম। সুলতা মহা বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে বললে, আমি কোন অবস্থাতেই ওকে একটুখানি অবিশ্বাস করবার মত কিছু নেই। আমি দেখেই চিনেছি ও একটি রত্ন।

কিন্তু সুলতার এই রত্নটিই কিন্তু কয়েক দিন পর থেকে বিশেষ এক বায়না ধরে সুলতাকেই একেবারে অতিষ্ঠ করে তুললে।

সুলতার আগেকার শাড়ীগুলি ময়লা হওয়ায় ধোপার বাড়ী গেছে. সুটকেস থেকে বেরিয়েছে অন্য ধরণের কয়েক খানা শাড়ী। তার মাঝে একখানা বড় সুন্দর: হালকা রঙের চেক. পাড়টাও অতি মনোরম। শাড়ীটা রঙিন হলেও তাতে বিশেষ করে গাম্ভীর্য আছে, সুতরাং নিম্ন শ্রেণীর লোকের হয়ত তেমন পছন্দ হবে না। কিন্তু আশ্চর্য বাঁকা ঐ শাড়ীটাকে বড় পছন্দ করে গেল। ও যখনই ঘরে আসে আলনায় ঝুলানো ঐ শাড়ীখানার দিকে বারবার তাকায়, সুলতা শাড়ীখানা পরে থাকলে তার দিকে চেয়ে থাকে, তা ছাড়া নিজে যখন ধুয়ে শুকিয়ে আনে—আলনায় রাখতে দিয়ে সেটা যেন সে পরম আদরে স্পর্শ করে।

বাঁকার কীর্তি দেখে তার অসাক্ষাতে একদিন আমি সুলতাকে বললাম, তোমার ঐ শাড়ীখানা বাঁকার বড় পছন্দ। সুলতা হেসে উত্তর দিলে আমিও লক্ষ্য করেছি।

একদিন বাঁকা তার মনোভাব স্পষ্ট প্রকাশ করেই বললে। সুলতা বিশেষ কি এক কারণে বাঁকাকে যাবার সময় ভাল বকশিস্ দিতে চাইলে, সে অকুণ্ঠ চিত্তে বলে বসল, তোর ঐ সাড়ি খান্ দেঃ—

কি ?

ঐ সাড়ি খানা দি যারে।

সুলতা হেসে বললে, তুই শাড়ী দিয়ে কি করবি ?

বৌ পরবে।

বৌ ?—তোর আবার বৌ আছে নাকি ?

বাঁকা মাথা দুলিয়ে জানালে, হ্যাঁ।

কোথায় থাকে সে ?

বাইতে।

ছেলে পিলে আছে তো ?

সেই সময়ই ওপর থেকে কে হুঙ্কার দিলে, বাঁকা, চল। বাঁকা মাথা দুলিয়ে সুলতার শেষ প্রশ্নের কি যে উত্তর দিল, ঠিক বুঝে উঠলাম না।

এর পর কখনও সুলতা যে বাঁকাকে দৈনিক দু' এক আনা বকশিস্ দেয় সে সময়,—কখনও বা কাপড় শুকিয়ে এনে আলনায় রাখবার সময়—বাঁকা হয়ত আকারে ইঙ্গিতে কখনও নয়ত কথায় ঐ শাড়ীখানা প্রার্থনা করেছে।

সে ঐ শাড়ী পাবার আশাতেই হয়ত আমাদের আরও বেশি মন যুগিয়ে চলতে সুরু করলে। এদিকে দেখতাম সুলতা পড়েছে দোটানায়, বাঁকার নিদারুণ আকুতি দেখে একবার হয়ত মন হত—শাড়ীটা ওকে দিয়ে দেবে.—আবার শাড়ীটা ছিল তার অতি প্রিয়, তাই সেটা ছাড়তেও তার মন চাইত না। এই নিয়ে সে মাঝে মাঝে আলোচনাও করত। এমনি সময় একদিন এক অদ্ভুত ব্যাপার আমরা আবিষ্কার করলাম।

কালী বলে যে চাকরটা রোজ সকাল বিকাল আমাদের চা জলখাবার দিয়ে যেত,—তাকে একদিন হঠাৎ সুলতা প্রশ্ন করে বসল, হারে কালী,—বাঁকা বিয়ে করেছে ? বউ আছে ওর ?

প্রশ্নটা শুনেই দেখলাম কালী যেন একটু থতমত খেয়ে গেল, কিছু জবাব না দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করেই রইল সে।

কি রে কথা বলছিস না যে ?

কি বলচ, মা,—

কেন কি হয়েছে,—খুলেই বল না !

বিয়ে ত ও করেছিল মা,—একবার নয়,—দু' দু'বার. —কিন্তু দু' দুটো বউই ওকে ছেড়ে অন্য লোকের সঙ্গে ঘর করছে। বাঁকা চেষ্টাও করেছে অনেক—তাদের ফিরিয়ে আনতে,—কিন্তু তারা আসে নি, অথচ বাঁকা তাদের কি ...মানে কি যত্নটাই না করত।

শুনে সুলতা আমার মুখের দিকে তাকালে,—আমি কোন জবাব দিলাম না। কালী ঘর থেকে চলে গেলে সুলতা আমায় বললে, শুনলে ?

শুনলাম ত···বড় দুঃখের কথা।

দুঃখের কথা সে ত নিশ্চয়ই.—কিন্তু ও শাড়ী চায় কেন বল ত,—বউ নেই, অথচ—

সুলতাকে বুদ্ধিমতী বলেই জানতাম, কিন্তু বুঝলাম মেয়েরা হয়ত মেয়েদের মনই ভাল বুঝতে পারে. পুরুষের

মন নয়। বললাম,—ওর হয়ত ধারণা, আবার বিয়ে করে সেই বউকে ও যদি অমনি একখানা শাড়ী দেয়, তা হলে সে আর ওকে ছেড়ে যাবে না।

সুলতা শুনে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে গভীর সহানুভূতির সুরে বললে,—আহা!

বাঁকা এর পর আবার যখনই শাড়ী চেয়েছে তখনই আরও যেন বেশি মমতা জেগেছে তার 'পর। এখন শাড়ী দেবার প্রয়োজন নেই বুঝে সুলতার মনে কিছুটা স্বস্তি লেগেছে, আর সে মনের কাছে এদিক থেকে রেহাই পেল তারই প্রতিদানে বাঁকার প্রতি ব্যবহার তার আরও মধুর আরও স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে।

একদিন বাঁকা শুকনো কাপড় ঘরে রাখতে এলে—সে শাড়ী না চাইলেও সুলতা তাকে সান্ত্বনা দিতে বললে, এবার তোকে ভাল বকশিস্ দিয়ে যাব,—তুই ভাল দেখে একটা লক্ষ্মী মেয়ে বিয়ে কর, এর পর আবার যখন আসব তোর বউকে খুব ভাল একখানা শাড়ী দিয়ে যাব।

কথাটা শুনে বাঁকা কেমন করে সুলতার মুখের দিকে তাকাল,—কোন জবাব দিলে না। ওর মুখের ভাব দেখে মনে হল ও বোধ হয় বুঝতে পেরেছে আমরা ওর বউয়ের ব্যাপার সব যেমন করেই হ'ক জেনে ফেলেছি। অন্যান্য দিন কাপড় রাখতে এসে ও আমার কাছ থেকে দিয়াশলাই নিয়ে বিড়ি ধরায়, সেদিন আর দিয়াশলাই না চেয়ে কানের বিড়ি কানে রেখেই চলে গেল। দেখে বেদনা লাগল মনে, সুলতার ওকথা বলা ভাল হয়নি!

যেদিন পুরী ছেড়ে আসব তার আগের দিন রাত্রির কথা। রাত্রির খাবার পর সমুদ্রের ধারে এসে বসা অথবা পাদচারণা করা আমার এতদিনের অভ্যাস। কোনদিন সুলতা সঙ্গে থাকে, কোনদিন আমি একা। রাত্রি দশটা সাড়ে দশটায় অবশ্য অন্যান্য দিন ফিরে যাই, কিন্তু সেদিন আর ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছা করছিল না। এমনি রাত্রির সমুদ্র কি এক দুর্নিবার আকর্ষণে আমায় টানে, তারপর চাঁদ উঠেছিল আকাশে, শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীর চাঁদ। সুলতা সেদিন সঙ্গেই ছিল আমার। হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে গিয়েছিলাম আমরা। মুখে কারো কথা ছিল না,—সুদূর দিগন্ত থেকে কাণে ভেসে আসছিল—শুধু বোম্—বোম্ ধ্বনি। মনে হচ্ছিল—এই জন্যই বুঝি এখেলের সমুদ্র তীরে মন্দির গড়ে উঠেছে। সহসা সুলতা মৌন ভঙ্গ করে বললে,—ঘড়িটা দেখ ত?

বারোটা।

দূরে আমাদের হোটেলের দিকে কুকুর ডাকছে, ফিরে চল।

একটু রাগ হতে যাচ্ছিল সুলতার উপর,—কিন্তু তখনই মনে পড়ল আগে পাশের হোটেলে কয়েকদিন পর পর বড় রকমের চুরি হয়ে গেছে। সুতরাং ফেরাই উচিত।

একটুকরিত পদেই ফিরতে আরম্ভ করলাম। ক্রমে বুঝতে পারলাম আমাদের হোটেলের কাছাকাছিই কুকুর ডাকছে, আর তার সঙ্গে মিশানো আছে অদ্ভুত ধরণের এক শব্দ। সে গোঙানি, কাতরানি, না মাতলামির অস্ফুট বাণী ঠিক বুঝে উঠছিলাম না।

আমাদের হোটেলের ঠিক সামনেই আগে যে ইঁদারাটা ছিল,—পরে বুজিয়ে ফেলা হয়েছে, এখন হয়ে রয়েছে একটা উঁচু বেদীর মত, তারই উপর কে যেন শুয়ে রয়েছে। সুলতা দূর থেকে দেখে বললে,—এতরাতে শেষে মাতালের হাতে পড়ব না কি?

ভয় নেই,—এসো।

আরও কাছে,—একেবারে কাছে এসে দেখি,—এ আর কেউ নয়,—আমাদের বাঁকা। বাঁকা দিনের কাজ শেষ করে খাওয়া দাওয়া সেরে নিজের খুশি মত সময় কাটাবার ফুরসুৎ পেয়েছে এখন। তাই সে কঠিন পাষাণের উপর শুয়ে জ্যোৎস্নালোকিত আকাশের দিকে চেয়ে এক মনে গান গাইছে। এই গানকেই আমরা দূর থেকে মাতালের মাতলামি বলে মনে করেছিলাম। কাছে দাঁড়িয়ে আমরা তার গানের বাণী শুনতে চেষ্টা করলাম। সুলতার মুখে স্মিত হাসি।

—শুনলাম, বাঁকা গান গাইছে—আঁধের হাড়ি আঁধ এজেছে উথ্‌তে পড়ে আছো,—অর্থাৎ চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে উছলে পড়ে আলো।

শুনে—কেন জানি না আমার দুই চোখ ঝাপ্সা হয়ে এল, সুলতাও দেখি কেমন করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

বাঁকা তন্ময় হয়ে গাইছিল, আমাদের উপস্থিতি আর টের পেলে না,—আমরা ধীরে ধীরে দরজা খুলে আমাদের শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলাম।

পরদিন বিকেলে পুরী ছেড়ে কলকাতা রওনা হবার জন্য তোড়জোড় করছিলাম। হোটেলের ঠাকুর চাকর একে একে দেখা দিয়ে তাদের বকশিস্ নিয়ে গেল। বাঁকা ঘরে এলে সুলতা তার হাতে দুটো টাকা তুলে দিলে। বাঁকা টাকা পেয়ে খুশি নিশ্চয়ই হ'ল,—কিন্তু তবু তার মুখখানি যেন আঁধার। হয়ত আমাদের ছেড়ে দিতে তার কষ্ট হচ্ছিল, হয়ত মনে মনে সেই শাড়ীখানা সে তখনও কামনা করছিল,—কিন্তু মুখ ফুটে আর বলতে পারছিল না।

কয়েক মিনিট পরে রিক্সা গাড়িতে আমাদের বেডিং সুটকেস তুলে দিয়ে বাঁকা আমাদের গাড়ির পাশেই এসে দাঁড়াল। বাঁকাকে কিছু একটা সান্ত্বনার কথা বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল, কিন্তু কি বলে সান্ত্বনা দেবার আছে—খুঁজে পেলাম না। একদিন আমাদের বাড়িতে কাজ করবে বলে সে আমাদের সঙ্গে কলকাতা আসতে চেয়েছিল, কিন্তু এখানে এসে সে কি কাজ করবে? সুতরাং কিছুই বলা হ'ল না আমার। সুলতা বাঁকার দিকে চেয়ে পরম স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে,—তুই দুঃখ করিস নে বাঁকা,—আবার আমরা আসব,—তোকে আবার বকশিস্ দেব,···তোর···বলছি মানে—তোর পছন্দ মত একখানা খুব ভাল শাড়ী দিয়ে যাব।

নিকষ পাথরের স্থির মূর্তি—গণ্ড বেয়ে দুই এক ফোটা জল গড়িয়ে পড়ল। রিক্সা চলা সুরু করলে।

সুলতা ও আমি—দুইজনেই কয়েকবার ফিরে ফিরে বাঁকার দিকে তাকিয়েছি। বীচ রোডে শেষ প্রান্তে এসে গাড়ী মোড় ঘুরবার আগেও ফিরে তাকিয়েছি। বাঁকা সেইখানিই—দাঁড়িয়ে আছে।

এইবার সমুদ্র আমার দৃষ্টিপথের আড়ালে পড়ে যাবে,—পূর্বাভ্যাস মত বিদায় নেবার আগে অনন্তের এই সাকার প্রতীককে আমি আমার প্রণাম জানাতে গেলাম। কিন্তু অন্যান্য বারের মত মনটা আমার খুশি হয়ে উঠল না,—স্রষ্টা ও আমার প্রণামের মাঝে বাঁকা এসে দাঁড়িয়েছে। ওকে যদি অমনি করে গড়বারই দরকার ছিল, তবে ওর মনে ভালবাসা দিলে কেন,—গান দিলে কেন?

বহুব্রীহি

হবুপুরের সংস্কৃতি প্লাবন
[বোপদেব]

কলিকাতার স্নামী গোপালী সেনের রক্ত ক্লাবে মালয়ের বনমানুষ লইয়া যে-আলোচনা সুরু হইয়াছিল, পাঠকরা তাহা জানেন। লাড্ডুগোপাল সেন, সুকচাচা বাইলেন, হিগিনবোথাম রো—অর্থাৎ কলিকাতার সকল অলিগলি এবং নিভৃত পাড়ার গণপার্লামেন্টে এই রসাল বিষয়টি চাঁদা করিয়া কাঁটাল খাওয়ার মত সমারোহে আলোচিত, বিতর্কিত, বিকম্পিত এবং বিচর্চিত হইয়াছে। কাঁচের কাঁটাল খাওয়ার মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে—মুখের ভিতরটা থাকে রসে ভর্ত্তি কিন্তু হাতের চেটো থাকে আঠায় চট্‌চটে, হাত চাটিতে গিয়াছ কি পোঁকে হাতে অবিচ্ছেদ্য মিলন ঘটিয়া যায়। তারপর সলয় মত সর্ষের তেল আসিয়া উপস্থিত না হইলে পোঁকের একদিন না হয় তোমার একদিন।

রক-ক্লাবে এই সব আন্তর্জাতিক সমস্যার আলোচনায় একটা মানসিক আঠা থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত আর একটা যুগান্তকারী বিষয় আসিয়া না জোটে ততক্ষণ উহা মনের হাতে-পাঁকে লাগিয়া থাকে। হিমালয়ের বরফ-মানুষ, মার্কিণ-পাকিস্থানী অস্ত্রীদোক্তি প্রভৃতি মশলাদার সংবাদেও এ-আঠা সম্পূর্ণ ছাড়িতেছে না। মহম্মদ আলি এবং ডালেস্ সাহেবের ফাঁকে ফাঁকে বনমানুষীর চকিত হাসির চমক যেন ধমক দিয়া ফিরিতেছে। টেষ্ট ম্যাচের দরুণ টিকিটের মূল্য উদ্যোক্তাদের ট্যাক্সিভাড়া ও জলপানের খরচাধিক্য সম্বন্ধে একদিন আবার বেশ গরম হইয়াছিল। সর্বসম্মতিক্রমে কমিটীর উর্দ্ধতন অধস্তন অষ্টাবিংশ পুরুষের আদ্যশ্রাদ্ধ বেশ গড়াইতেছে, এমন সময়ে—

ভট্‌চায্যি মশায় বলিয়া উঠিলেন, "ব্যাটারা মানুষ নয়, বনমানুষ।"

পল্টু বলিল, "বনমানুষের বদনাম দেবেন না। তাদেরও একটা ডিসেন্সি জ্ঞান আছে।"

ভট্‌চায্যি বোকা নহেন। অন্তরমহলের দৃষ্টিকোণ হইতে জগৎ দেখার ফলে তাঁহার ভূয়োদর্শন ভূয়া দর্শন হইতে পারে নাই। কাজেই বনমানুষের সহবৎ সম্বন্ধে তরুণের সমকদারী ও দরদকে তিনি অগ্রাহ্য করিলেন না। বিশেষ, পল্টুর বেকারত্ব ঘুচাইবার উদ্দেশ্যে কয়দিন হইল তিনি তাহার মায়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে একটি মোক্ষম গ্রহ-যজ্ঞ করিয়া সারিয়াছেন। সেই যজ্ঞোদ্ভূত সর্বার্থকরী কবচটা বর্ত্তমানে পল্টুর দক্ষিণবাহুতে সার্টের অন্তরালে শোভা পাইতেছে। এখন গ্রহদের দয়ায় যাহার একটা চাকরী হইয়া গেলে ভালমন্দ কিছু প্রাপ্তব্য হয়। এ ছাড়া পল্টুর মা-কে বছর ঘুরিতে না ঘুরিতে অপর একটি অর্থকরী সম্ভাবনার আশ্বাসও দেওয়া হইয়াছে, সেটি যাহাতে সার্থক হয় সেজন্য তিনি যজমান মহলে তদ্বির করিতেও সুরু

করিয়াছেন। এমতাবস্থায় তারুণ্যের প্রতি দাক্ষিণ্য হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই তিনি আপত্তি করিলেন না।

চক্রোত্তি বলিলেন, "মানুষে আর বনমানুষে তফাৎটা কি? এই মানুষই বনে গেলে বনমানুষ হয়।"

এই কথায় আমার অন্ত একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, এবার আপনাদের নিকট তাহাই বলিব।

হবুচন্দ্র রাজা ও গবুচন্দ্র মন্ত্রীর দেশের কথা নিশ্চয়ই সকলের জানা আছে। সে দেশ কোথায় এবং তাহার রাজধানীর নাম কি, তাহা অবশ্য কাহারো জানা নাই, কারণ পাঠ্য এবং অপাঠ্য ভূগোল পুস্তকে উহার উল্লেখ নাই। উল্লেখ না থাকিলেও অস্তিত্ব থাকিতে পারে। ধরুন, আমরা যে-ভূগোলের কেতাব পড়িয়া মধ্যবৃত্তির আগড় পার হইয়াছিলাম তাহাতে পাকিস্তানের বিষ্ণু-বিসর্গও ছিল না, কিন্তু বর্তমানে পাকিস্তান যে রূঢ় সত্য, তাহা শ্যামবাজারে মাছের দর হইতেই হৃদয়ঙ্গম হয়। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, ভূতগণের অর্থাৎ কিনা আপনার আমার মত বাস্তব ভূতদের, আদি অব্যক্ত থাকে, মধ্যাংশ ব্যক্ত থাকে, শেষ আবার অব্যক্ত হইয়া যায়। যাহা ছিল না, এ বিচারে তাহা নিশ্চয়ই অব্যক্তভাবে ছিল, এবং আবার একদিন অব্যক্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু সেকথা থাক্। হবু-দেশের কথা বলিতে-ছিলাম।

আমার জানতঃ হবুদেশ আছে। উহার সীমানার চৌহদ্দি বা রাজধানীর নাম আপাততঃ বলিব না, কারণ বন্ধুবিচ্ছেদ বা অন্তপ্রকার বিচ্ছেদের আশঙ্কা আছে। তবে সেখানকার ঘটনাবলী বলিতে বাধা নাই। আপনাদেরও জানা দরকার আছে।

হবু-রাজত্ব বর্তমান থাকিলেও হবুদেশে রাজা নাই এবং মন্ত্রীর নামও গবুচন্দ্র নয়। রাজধানীর নাম—ধরিয়া লওয়া যাক্, হবুপুর। গবুপুর বলিলেও চলিত, কারণ রাজধানীতে যতরকমের মেলা, সম্মেলন, তামাসা এমন কি পালাপার্বণ হয়, মন্ত্রীমহাশয়ের দেড়ঘণ্টার বক্তৃতা ছাড়া কোনটিই নান্দীমুখ হইতে পারে না। কিন্তু রবি-ঠাকুর হবুপুর নামটা পত্তন করিয়া গিয়াছেন, সে নাম বদল করিলে আপনারা অসুখী হইবেন নিশ্চয়। চাণক্য ঠাকুরও বিদ্বত্বকে নৃপত্বের চেয়ে ভারী বলিয়াছেন। রাজার স্থান স্বদেশে (কিন্তু হবুরাজ্যের মন্ত্রীর বিদেশের খবরের কাগজে স্থান আছে) কিন্তু বিদ্বানের স্থান সর্বত্র। এই আন্তর্জাতিক বিচারে হবুপুর নামই বহাল রহিল।

হবুপুরের তরুণ-তরুণীরা অত্যন্ত প্রগতিশীল, বিশেষ করিয়া তরুণীরা। বাংলাদেশের তরুণরা—উত্তর লিঙ্গের কথাই বলিতেছি—চা-কফির দোকানে, কলেজের ডিবেটিং ক্লাবে এবং মাথার চুলে প্রগতি ফলাইয়া থাকে। ডায়লেক-টিক্ হইতে গণবিপ্লবের প্রস্তুতি প্রভৃতি প্রগতিমূলক ব্যাপারে সরস উৎসাহ দেখাইলেও বঙ্গ তরুণ আচারে-ব্যবহারে আসলে খোঁড়া। শ্রেণীবিহীনতার বুনিয়াদের উপরে বৈপ্লবিক সমাজ গড়িতে তাহারা যতই অগ্রসর হউক না কেন, বাঙালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গায়ের একটি আঁশ খসাইয়াছে কি পেল্লায় কাণ্ড। হবুপুর মহাভারতের আমলের হইলে কি হয়, তাহার প্রাচীন ঐতিহ্যের বালাই নাই। লঙ্কায় যে যখন রাজা হইত মন্দোদরী তাহারই সরকারী রাণী হইতেন। হবুপুরে যে যখন রাজা হইয়াছে তাহারই সংস্কৃতি তখনকার মত চালু হইয়াছে। সুতরাং হিন্দু-বৌদ্ধ-পাঠান-মোগলের ভিন্ন ভিন্ন জংশন ষ্টেশন পার হইয়া, বৃটিশের সীমান্ত ষ্টেশন ছাড়াইয়া, হবুপুরের সাংস্কৃতিক মেলট্রেন বর্তমানে সব চেয়ে আধুনিক সংস্কৃতির প্রয়াগ তীর্থ আমেরিকার ধারে কাছে পৌঁছিয়া হুইসেল্ বাজাইতেছে। অর্থাৎ হবুপুর-নাগর-নাগরীরা চামড়ায় চিকণ কালো বা ফিকে সফেদ হইলেও "মন হেতিয়ে" আছেন।

এ হেন হবুপুরে যখন মালয়ের প্রায়-নরদের সংবাদ রাষ্ট্র হইল, তখন উত্তেজনার প্লাবনে সহর ভাসিয়া যায় আর কি! বিশিষ্ট তরুণ তরুণীরা লিবার্টি ট্যাক্সার্ণ-এ জমায়েৎ হইয়া কম বেশী সোডাযটিত হুইস্কি সহযোগে বানর সভ্যতার কিন্নতের তারিফ করিতে লাগিলেন।

সুরেশ্বরী দেবী আট পেগে দৈনিক তাইল্য গ্রহণের

চমকিয়া নিজ ভগ্নে তরুণ সন্ন্যাসের মাথার রতন হইয়া আছেন। তাঁহার তারুণ্য মুনিয়ানী, অর্থাৎ অনুমান বিশ বৎসর করিয়া তিনি একবিংশ বর্ষীয়া আছেন। তিনি মালয় বানরীর চমকপ্রদ ব্যবহারের একটি বেশ আধুনিক বিশ্লেষণ পেশ করিয়া সভার কাজ সুরু করিলেন।

"বানরীর রকমটা বুঝ্‌লেন! কী সংস্কারমুক্ত! কতখানি সহিষ্ণুতার মুক্তি থাকলে সহজভাবে ভিন্‌জাতের লোক মানুষকে নিয়ে অমন খেলা করা যায়! কোন কুণ্ঠা নেই, সঙ্কোচ নেই! আবার তার ওপর দেখুন, সাথে যে সব বানররা ছিল, তা'রা হেসে' দিলে! মানুষরা এতটা সহজ হ'তে পারে?"

ইয়াঙ্কি চরণ গভীর গবেষণায় মগ্ন হইয়া সিগারেটের ধূম্রজাল সৃষ্টি করিতেছিলেন। তাঁহার নাম আসলে জানকী চরণ, কিন্তু তিনি উক্ত নাম নামকে বিপুল অধ্যবসায়ে আপ-টু ডেট্ করিয়া লইয়াছেন। স্বর্গ মার্কিন মাটিতে পদার্পণ অবশ্য করেন নাই, কিন্তু সে-দেশ সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তাহা সিনেমা হইতে আহরণ করিয়া লইয়াছেন। জ্ঞানের ফাঁকে ফাঁকে যাহা কিছু বাকী ছিল তাহা বিগত লড়াই-এর সময় যে সব মার্কিনী জলী সোয়া আসিয়াছিল তাহাদের চাল-চলন মনোযোগ সহকারে পর্যবেক্ষণ করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া লইয়াছেন। কাবলী স্যাণ্ডালের উপরে আঁটসাঁট পাৎলুন, তাহার উপরে বিবাগা তারকাদের (স্ট্রাং) ছবি ছাপা নকল সিল্কের নামাবলীর হাতকাটা হাওয়াই শার্ট পরিয়া তিনি তাঁহার আন্তরিক ইয়াঙ্কি শুভেচ্ছার খোলা ইঙ্গিত দিয়া সাধারণ্যে প্রকাশমান হইয়া থাকেন। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "পারে।"

তার পর দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়া স্বর্গের দিক নির্দেশ করিয়া ধরাগলায় বলিলেন, "আমেরিকায়।"

শ্রীমান ফণীরাম তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া উঠিলেন। ফণীরামের গার্হস্থ্য নাম রুচিরানন, কিন্তু শোলোকভের একখানি উপন্যাস পাঠ করিবার পর তিনি নামান্তর গ্রহণ করিয়াছেন। মাদ্রাজী চন্নলের উপরে গোলাপায়রার পায়জামা এবং গেরুয়া কুর্তার উপরে জহরজ্যাকেট চাপাইয়া কাঁধে একটি রক্তবর্ণ ঝোলা ঝুলাইয়া তিনি তাঁহার আত্মিক সত্তা জাহির করিয়া থাকেন। আমেরিকার জাতিবৈষম্য, বর্ণবৈষম্য নাই, এ-দাবীর বিরুদ্ধতা তাঁহাকে করিতেই হইবে, নহিলে ধর্মে গাফিলতি হয়। যুলগানিন টের পাইলে কী লজ্জার কথা!

ফণীরাম কহিলেন, "আপনার কথা অগ্রাহ্য। আমেরিকায় বর্ণবৈষম্য আছে। একজন নিগ্রো যদি সাদা নারীকে স্পর্শ করে তবে তা'কে ঝুলতে হয় গাছের ডালে। সায়েবরা তখন যে হাসি হাসে তা'কে আর যাই হোক, সহজ হাসি বলা যায় না। শোষক জাতির আবার সংস্কৃতির বড়াই কিসের?"

সুরেশ্বরীর পিতা ইংরাজ আমলের বড় গোলাম ছিলেন, তাঁহার সাক্ষীটিও তথৈবচ। শুনা যায়, তারুণ্য প্রাপ্তির প্রত্যুষে তিনি বিলেত দেশটা ঘুরিয়া আসিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার মনটা সেই "হোমে"র রীতি-নীতি-সংস্কৃতির দুয়ার বাঁধা আছে; মার্কিনের স্বর্গ-সংস্কৃতি আর রুশের গণ-সংস্কৃতি, কোনটারই গৌরব তিনি স্বীকার করেন না। হযুপুরের সনাতন সংস্কৃতি যাহা, সে তো "হোমের"ই ওক্‌গাছের শাখা—কেবল মাটিটাই যা আলাদা। কিন্তু সম্প্রতি গযুচন্দ্র কি জানি কেন ভারতীয় সংস্কৃতির ঘুসি ধরিয়াছেন। ব্যাপার ক্রমশঃ গোলমেলে হইয়া উঠিতেছে। অধুনা একজন মহা সম্ভ্রান্ত মন্ত্রসভার তাঁহার নিজের অধিকরণের হিজিবিজি হটাখটওয়ালীকে—অর্থাৎ টেনো-টাইপিষ্টকে—দ্বিতীয় পক্ষের অবশায়িনী করায় গযুচন্দ্র তাঁহাকে নির্বাসনে পাঠাইয়াছেন। এসব দুর্লক্ষণ তো বটেই। সুরেশ্বরীর ভজকবৃন্দ ক্রমশঃ সংখ্যায় কমিয়া যাইতেছে, সে কি এজন্য, না তাঁহার তারুণ্যের ফীস টকিয়া ষোল হইয়া দাঁড়াইতেছে, সেজন্য?

কিন্তু আপাততঃ সুরেশ্বরী এসব কথা ভাবিতেছিলেন না। তাঁহার মনে সাময়িক গোলাপী আভায় ভাসিয়া উঠিয়াছে মালয় বানরীর সাম্যবোধের উদাত্ত মহাসাহসিক বার্তা। ফণীরামের কথার খেই ধরিয়া তিনি বলিলেন, "সংস্কৃতির এই মুক্তি, এ আপনারা যাই বলুন, সত্যতার

কপটতার কপাট খুলে দিয়েছে। বর্ণবৈষম্য থেকেই যে কেবল এরা সম্পূর্ণ মুক্তি পেয়েছে তা' নয়, যে সব সংস্কার সম্পূর্ণ মুক্তির বাধা, আমার মনে হয় তার বাঁধন কেটে পুরোপুরি প্রকৃতিতে ফিরে গিয়েছে।"

প্রারম্ভের যে সমস্ত সমর্থক উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই তখন পেগে চড়িয়া প্রকৃতির কাছে পৌঁছিয়াছেন। তাঁহারা সুরেশ্বরীর কথায় একবাক্যে সায় দিলেন।

প্রগতির এই প্রথম দলের মধ্যে নন্দিকেশ্বরণ্ করিতকর্মা লোক। তিনি কাহারো গোলামী করেন না, এবং তাঁহার স্বদেশবাসী তৈলঙ্গরা এমন কথাও জানে না যে, তাঁহার পৈত্রিক অবস্থা ভাল। তবু হবুপুরে আজ পনের বৎসর তিনি সংস্কৃতির ঢেউ গুণিয়া ছহুল বহুল অবস্থায় আছেন এবং সুরেশ্বরী প্রভৃতি সমাজ নেত্রীকে সোমরসে সিক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সাদা কথায়, বিদেশীদের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদের—অর্থাৎ, এখানকার ওখানকার নাচিয়ে গাইয়েদের—হবুপুরে জড় করিয়া, তাহাদের খেল দেখাইয়া তিনি সামাজ হু'পয়সা করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতে স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিবার ভরসা রাখেন।

একবার হাওয়াই দ্বীপ হইতে হলা-হলা নৃত্যপটীয়সী-দের একটা সাংস্কৃতিক ডেলিগেশন আমদানী উপলক্ষ্যে বড়ই হজ্জুত হইয়াছিল। দু' চারেজন দুষ্টলোক কুচক্র করিয়া রটনা করিয়াছিল নন্দিকেশ্বরণের হাওয়াই দ্বীপের আসল ঠিকানা কলিকাতার জোড়া গির্জা অঞ্চল। সেটা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলেও তখনকার বড় সায়েবরা হুলিনীদের নেকনজরে দেখার জন্য কেলেংকারীটা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল। তারপর কিছুদিন নন্দিক সায়েব একটু সাবধানী হইয়াছিলেন, কিন্তু সাংস্কৃতিক ডেলিগেশনের আজকাল যে রকম জোর মরশুম, তাহাতে সাবধানতার আর কোন প্রয়োজন নাই। খবরের কাগজগুলিকে কেবল হাতে রাখিতে পারিলেই হয়। তা' ম্যানেজারকে সস্ত্রীক পাশ, সম্পাদককেও তথৈবচ, বার্তা সম্পাদককেও চা এবং অনুরূপ তরল পদার্থ পানের নিমন্ত্রণ—ইত্যাদি মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিলেই সে সমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়। আর বিজ্ঞাপন? হাঁ, খরচা আছে বটে, কিন্তু মাছ ধরিয়া তুলিতে গেলে আগে তো জাল কিনিতে হয়। রবিঠাকুর কাজলের খরচা বাঁচাইয়া ছাড়া চোখে জল আনিয়া দুয়ার দুয়ারে ঘা দিতে বলিয়াছেন বটে, কিন্তু সেটা কাজের কথা নয়। গণ্ডদেশে চুণকাম, ঠোঁটে সিন্দুর, চোখে মাস্কারা এবং অঙ্গসৌষ্ঠবের জন্য এটা ওটা, এমনি একগুচ্ছ জিনিষ না থাকিলে আজকাল চোপ ড্যাবা ড্যাবা করিয়াই বর বা বর্বর কাহাকেও ধরা যায় না, সেকথা হবুপুরের সন্তানস্থলে তিন চার বৎসরের কিশোরীরাও জানে। ('কিশোরী' বলিলাম এই জন্য যে, হবুপুরে শিশুও নাই, বালিকাও নাই। মেয়েরা জন্মিলেই কিশোরী এবং অতঃপর তরুণী হন্) কিন্তু সেকথা থাক।

নন্দিক প্রস্তাব করিলেন, মালয়ের প্রায়-মানুষদের একটা সাংস্কৃতিক ডেলিগেশন হবুপুরে আনিলে কেমন হয়! ইহারা এশিয়ার একটি জাতি তো বটেই, তা ছাড়া ইহাদের সংস্কৃতি গণ-সংস্কৃতি নিশ্চয়ই, কারণ বনমানুষদের মধ্যে নূতন বা পুরাতন কোন বুর্জোয়া সংস্কৃতিই নাই। এই শ্রেণীহীন সমাজের সংস্কৃতি হইতে হবুপুর নাগরিকদের নিশ্চয়ই অনেক শিক্ষা করিবার থাকিবে।

নন্দিকের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল, যেহেতু কারণ থাকিলেই তবে কার্য হয়। এই সব নিবিড় সাংস্কৃতিক অনুসন্ধিৎসায় নন্দিকই ছোতা এবং তাঁহার স্যাঙ্গাৎরা নন্দিকের লাভে লাভবান হইয়া থাকেন। সুতরাং সকলে মিলিয়া একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করিয়া ফেলিলেন, নন্দিক তাহার সম্পাদক।

অতঃপর কাগজে কাগজে এই নবীনতম সাংস্কৃতিক ডেলিগেশনের সংবাদ বাহির হইতে লাগিল। খোঁড়া কাগজগুলি চুপ করিয়া রহিলে কি হয়, পাঠকরা 'চিঠিপত্র' স্তম্ভে বানর-সংস্কৃতি সম্বন্ধে এতই কচ্‌কচি করিতে সুরু করিলেন যে রুশ-মার্কিন রেষারেষির খবরও চাপা পড়িয়া গেল। আট কলম লম্বা একটি বিশেষ প্রবন্ধে কেকৃত্তিল

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিধারী ডক্টরের মহাবাক্য চোখে আঙুল দিয়া দেখাইলেন, মানবের প্রাক্-মানুষদের সভ্যতার যে কয়টি বিষয় জানা গিয়াছে তাহা এই : (১) নারীর অবাধ আচরণ। মহাভারতে উক্ত আছে, শ্বেতকেতুর পূর্বে উহা আর্যভারতে প্রচলিত ছিল। শ্বেতকেতুই বিবাহাদি সংস্কার চালু করিয়া নারীজাতিকে বাঁধিয়া ফেলেন। (২) বসন বিবর্জন। আর্যরা নির্মোম হইবার পর পশুচর্মে গাত্রাচ্ছাদন করিতেন, অর্থাৎ কৃত্রিম লোমশতা অর্জন করিতেন। ইহাদের লোমশতা স্বাভাবিক, সুতরাং কৃত্রিমতার প্রয়োজন নাই। (৩) গাত্র দৌর্গন্ধ্য। পুরাকালে ইহাই স্বাভাবিক ছিল। মুনিরা প্রায়ই স্নান করিতেন না, কারণ তপস্যায় বসিলে স্নানের অবসর থাকিত কোথায়? ওটার-রাডিতে, রোমে-বকলে ঘাম ও ময়লা জমিয়া একটি নিবিড় ঘন গন্ধ রচনা করিত, সেজন্য মশা হইতে মাইক্রোব পর্যন্ত কেহই মুনিদের কাছে ঘেঁসিতে পারিত না। উর্বশী-মেনকারা অবশ্য পারিজাতের এসেন্স মাখিয়া কয় গজ দূর পর্যন্ত আসিতেন। (তারপর মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ এবং সঞ্চিত পুণ্যের সঙ্গে দাড়ি-জটা উকুন প্রভৃতি সকল বিসর্জন।) তপস্বিনী মুনিপত্নীরাও তথৈবচ, সুতরাং মুনিদম্পতিরা সর্বদা সুরভিত জীবন যাপন করিতেন ইহা অনুমান করা যায়। মহাভারতের যুগে পরাশর মুনি ইহারই মধ্যে একটু ছিমছাম ছিলেন নিশ্চয়ই, কারণ সত্যবতীর গায়ের ঝাঁসটে গন্ধটা তাঁহার নাকে লাগিয়াছিল। মুনিমশায়ের সম্ভবতঃ সাজিমাটির ব্যবহার জানা ছিল, বোধ হয় অপ্সরীদের নিকট হইতে ফুলের রেণুর ব্যবহারও জানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু সে কথা অবান্তর। ডক্টর মহাবাকের মতে প্রায়-মানুষদের সভ্যতা প্রাক্ মহাভারত যুগের, এবং দক্ষিণ ভারতের যে বানর সভ্যতার পরিচয় রামায়ণে পাওয়া যায় তাহার সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

এই গবেষণা দেখিয়া হবুপুরে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। ইংরাজ কবি শেলী তাঁহার গন্ধে ও বাহ্যিতার সাম্যিধ্যে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, বাঙালী বৈষ্ণব কবিরা নন্দনের চন্দন-গন্ধ-বিনিন্দিত অঙ্গ বন্দনা করিয়া কীর্তনে আখর চড়াইয়া রসের নেশায় বুঁদ হইতেন, অজানিতা জীবনদেবতার দেহসৌরভে রবিঠাকুর আকুল হইয়া পঁচিশ তলুম কাব্যগ্রন্থ ও তিন সহস্র গান লিখিয়া ফেলিলেন, এসব কথা সাহিত্যরসিকদের জানা আছে। কিন্তু হবুপুরের প্রগতিবাদীরা দুর্গন্ধ লইয়া যাহা করিল, তাহার একটিমাত্র তুলনা আছে এ মহীমণ্ডলে—পাকিস্তানীদের জেহাদ্ জিগীরে। নকল করিবার জন্য একটা নূতন সংস্কৃতি পাওয়া গিয়াছে, হবুপুরে এ একটা আধ্যাত্মিক এটম্ বোমা পড়িবার মত বিস্ফোরক ব্যাপার। আমেরিকা যখন হবুপুরের হৃদয় জয় করিয়াছিল তখন যে উৎসাহ দেখা গিয়াছিল, এখনকার উৎসাহ তার চেয়ে অনেক বেশী। কারণ, তখন হবুপুর পরাধীন ছিল। আজ স্বাধীন হইয়াছে। আগে নকলবাজী ছিল পরাধীনতার ভারে নতশীর্ষ, এখন মাথা উঁচু করিয়া গর্বভরে পরের নকল করা যায়। আর, নকল কাহাকে? বৃটিশকে নয়, মার্কিনকে নয়, সোভিয়েৎ রুশকে নয়, এমন কি বন্ধুবর মাও-সে-তুং এর নবীন চীনকেও নয়। রুশেরা যতই বিপ্লবের ধুলি ঝাড়িয়া ফেলুক না কেন, যতই শ্রেণী বিভাগকে জল করিয়া দিক না কেন, পুরাতন সংস্কৃতিকেই বালিয়া ছাঁটিয়া চালাইতেছে। সম্প্রতি সোভিয়েতের যে সব নাচগান-ওয়ালারা এদেশে আসিয়াছিল তাহাদের দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় যে কালিদাসের রাজা দুষ্মন্তের মত কম্যুনিষ্ট রুশের লালকর্তারা পুরাতন পুকুরের ভাঙলা ঘেরা পদ্মগুলিকে বেশ তারিফ তোয়াজ করিতেছেন। সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবালেনাপি রম্যং।

কিন্তু হবুপুরের সৌভাগ্য বড়ই বলবান। নকলনবিশী করিতে করিতে প্রাচীনের পানাপুকুরও খুঁজিয়া গিয়াছে, এখন ভাঙার কাগজের পদ্মফুল পুঁতিয়া ভান করিতে হয়, সৈয়াটির ঘাটে পইঠার পাটে বসিয়া ফুল জলে ভাসাইয়া খেলা করিতেছি, পায়ের নীচে গলা তরজভঙ্গে চলিয়াছে। শুক্না ডাঙার সাঁতার কাটে বলিয়া হবুপুরের প্রগতিপন্থীরা ভাল মন্দ বিচার করার অবসর পায় না, করিতে

ইচ্ছাও করে না, নতুন একটা কিছু পাইলেই হয়। ঝোটের উপর হবুপুরের কৃষ্টি সরকারী কর্মচারীদের বাসার ফার্নিচারের মত সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড। গণ্ডুচন্দ্র মধ্যে মধ্যে জাতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনত্বের কথা বলিয়া থাকেন। বোসাহেবরা তাঁহাকে এশিয়ার নেতা বলিয়া তোষামোদ করার ফলে তিনি আজকাল এই এক খেউড় তুলিয়াছেন। আরে বাছা অতীত লইয়া তো ঘুইয়া খাওয়া চলিবে না! ও সব ক্রপদ-খেয়াল সদারং অদারং ছাড়ো—আজকার যুগসঙ্গীত গাও, লারেলাপ্পা, লারেলাপ্পা! অথবা 'চাঁদ উঠেছে আকাশে, এসো বসি বা পাশে!"

কিন্তু হবুপুরের পুলিশ প্রগতিশীল নয়। মালয়ের বনমানুষদের ব্যবহার ও বসনভূষণ নকল করিতে গিয়া বত্রিশটি তরুণ-তরুণী গ্রেপ্তার এবং কৌজদারী মামলায় সোপর্দ হইবার পর বানরবাদীদের সম্বিৎ হইল যে কৃচি বিপ্লবও রহিয়া-সহিয়া করিতে হয়। পুলিশ-লাঞ্ছিত প্রগতি তখন নিবিরোধের পথ ধরিল, অর্থাৎ আইন বাঁচাইয়া যা খুসী করার পথ—ইংরাজীতে যাহাকে বলে কন্‌ষ্টিট্যুশনাল এজিটেশন। সেদিকে একটি মাত্র রাস্তা খোলা—সেটি দেহদৌর্গন্ধ্যের। প্রগতিশীলেরা এবার উঠিয়া পড়িয়া বোটকা হইবার চর্চা করিতে শুরু করিলেন। হবুপুরের বনিয়াদী নিবাসীরা শীতকালে বড় একটা স্নান করেন না, শুরু বৃটিশদের মতন হস্তমুখাদিমাত্র সাবান ও কবোষ্ণজলে মার্জনা করিয়া থাকেন। সুতরাং গায়ে দুর্গন্ধ তাঁহাদের এমনিই অল্পবিস্তর হইয়া থাকে। তাহার উপর গেঞ্জী মোজা এবং অন্যান্য অবাস্য অন্তর্বাস যদি সময়মত বদল করা না যায়, তবে উক্ত দেহসৌরভ যে নদীর জলে চাঁদের ছবির মত শতভঙ্গে বাড়িয়া যায় সেকথা বলা বাহুল্য। ক্রমে কে প্রগতিশীল কে নয় তাহা বুঝিবার জন্য চোখ খুলিয়া দেখার দরকারও রহিল না, দূর হইতেই বৃদ্ধ পাঁঠার বিনিন্দিত খোসবু শুঁকিয়াই বুঝা যাইত। অবশ্য ঐ সঙ্গে অপ্রগতিশীলদের কিঞ্চিৎ বিবমিষা হইত। তবে সময়ে সব সহিয়া যায়, এ যাতনাও সহিল।

এদিকে নন্দিকেশ্বরণ বসিয়া নাই। হবুপুরে কয়েকজন বৃদ্ধ ধনী আছেন, তাঁহারা খবরের কাগজে নিজেদের নাম জাহির করিবার জন্য প্রাগতিক ব্যাপারে নগদ মূল্য দিয়া সভাপতিত্ব করিতে ইচ্ছুক। দশ হাজার টাকার বিনিময়ে নন্দিক এমনি একজন রসিক ব্যক্তিকে বাগাইয়া ফেলিলেন। লুঠুরাম চন্ডামল যুদ্ধের বাজারে অজস্র সুতা চালাইয়া কত টাকা করিয়াছেন, ইন্‌কাম ট্যাক্সের লোকেরাও তাহা জানে না। সম্ভবতঃ লুঠুরাম নিজেও ঠিক জানেন না, জানেন এক অন্তর্যামী। তিনি সিদ্ধির সরবৎ ছাড়া অন্য কোন মাদক স্পর্শ করেন না, মন্দিরে ভোগ না চড়াইয়া কালোবাজারে কারবার করেন না এবং বিধিমত গ্রহ-উপগ্রহতুষ্টি না করিয়া ফাটকা খেলেন না। বানর প্রগতির ডাকে তাঁহার শুদর বলিয়া যাহা কিছু আছে তাহা দুলিয়া উঠিল।

অতঃপর হবুপুরের রংএর গোলাম মহলে জোর চাঁদা উঠিতে লাগিল। বানর সংস্কৃতির জলসার প্রোগ্রাম একটা স্থির হইল এবং সিজন টিকিটের রীতিমত কালোবাজার বসিয়া গেল। দুর্গন্ধে এবং সোপন বাঁদরামিতে হবুপুর ভরপুর হইয়া গেল। দেহ মনের সেই বস্তু এখনো হবুপুরের আকাশ বাতাসকে থর-থরর সূক্ষ্ম ধুলার মত আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

নন্দিকের টাকা এখনো উঠিতেছে কিন্তু আসল বাঁদররা নিখোঁজ হইয়াই রহিয়াছে।

এই জন্য বলিতে চাহিয়াছিলাম, চকোত্তির কথা সত্য এবং সত্য নয়। কোন কোন মানুষ বনে না গিয়াও বনমানুষ হয়।

দুই নারী

[গল্প]

সুভাষ সমাজদার

যাই বলো না কেন, ইংরেজী সাহিত্যের মোড়ই ঘুরিয়ে দিয়েছেন বার্নাড শ—চায়ে চুমুক দিয়ে বলল সুদাম, 'পিগম্যালিয়নে'র ভূমিকাটা পড়েছো ত ?

হাঁ—আমি বললাম 'পিগম্যালিয়নে'র ভূমিকায় উনি খুব গর্বের সঙ্গে বলেছেন, মহৎ সাহিত্য মাত্রেই উদ্দেশ্য-মূলক—

মীর্জাপুরের 'ওয়েসিস' কেবিনে আমাদের সান্ধ্য আড্ডা জমে উঠেছে। চায়ের দোকানটি বেশ ছোট এবং নিরিবিলি। নিওনলাইটের স্নিগ্ধ নীলাভ আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চারিদিকের ফিকে সবুজ রঙের দেওয়াল। বেলী ফুলের একটা মালা জড়ানো রয়েছে গান্ধীর ছবির ফ্রেমে। ঠিক তার নীচে একটা অলস ধূপকাঠির নীলাভ ধোঁয়া পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠছে কড়িকাঠের দিকে। আমরা পর পর তিন কাপ চা খেয়েও, দোকান ছেড়ে নড়ছিলাম না। ছিলেপড়া জীর্ণ জামাটার কলারটা ঠিক করতে করতে সুদাম বলল—শ, বিংশ শতাব্দীর মানুষের লেউলিয়া মনোবৃত্তিকে বিদ্রূপ করেছেন, তেমনি মহাকবি ইলিয়টও করেছেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ওয়েইস্ট্যাণ্ড'—মুখর হয়ে উঠল ইংরাজী সাহিত্যের ছাত্র সুদাম। শ ইলিয়টকে ছাড়িয়ে, সিনক্লেয়ার লুইস, ড্রেজার, হেমিংওয়েকে ছুঁয়ে সে রাশিয়ার প্রাক্ বিপ্লবকালের সাহিত্যিক শেকভ, টলষ্টয়ের দিকে যেই পা বাড়াতে যাবে, ঠিক এমনি সময়ে এল প্রচণ্ড বাধা। হঠাৎ ঘরের এক কোণ থেকে ভেসে এল বাজ পড়ার মত একটা চিৎকার—মশাই, আপনারা কি শ ইলিয়টের দেশের লোক না ভারতবর্ষের ? বলি গান্ধী, অরবিন্দ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, এই নামগুলো শুনেছেন কখনও ? বুড়ো দোকানদারের এবড়ো-খেবড়ো মুখে নিদারুণ উত্তেজনা। তার বোতামহীন খোলা জামাটার ফাঁকে ভুঁড়িটা থর থর করে কাঁপছে।—দেখুন এরকম কথা বলার মানে ? অপমানিত হয়ে বলল সুদাম—সোজাসুজি বললেই হতো, অনেকক্ষণ জায়গা জুড়ে বসে আছেন, এখন রাস্তা দেখুন—

একটা কথাও বলল না দোকানদার ; পাছুটো, চেয়ারের ওপর তুলে মাথাটা নীচু করে বসে রইল পাথরের মূর্তির মত। লোকটা পাগল না কি ? ব্যবসা করতে বসে খরিদ্দারকে.....

—শুনুন, আপনারা দুইজনেই আমার ছেলের বয়সী —কেবিনের মালিক তারী গলায় বলল—হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে ফেলেছি মনে কিছু করবেন না। তার কোঁচকানো দুটো চোখে বিষাদের ছায়া নামল।—আমরা বিদেশী সাহিত্য নিয়ে আলাপ করছিলাম তাতে কি অন্যায়টা হলো শুনি ? উত্তপ্ত হয়ে বলল সুদাম।

—না, না, অন্যায় হবে কেন ? কে বলেছে অন্যায়—নিমেষে ভদ্রলোক যেন একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। কয়েক মুহূর্ত পর স্পষ্ট গলায় অভিশাপ উচ্চারণের মত প্রত্যেকটি কথা কেটে কেটে ধীরে ধীরে বলল—আপনা-দের আগে চার-পাঁচজন যুবক এক নাগাড় দুই ঘণ্টা বসে বিদেশী সিনেমার স্রেগরী পেগ্ না কি বলে আর হেপবার্ণ না কেপবার্ণ, তাদের অভিনয় খ্যাতি নিয়ে তর্কের ঝড় তুলেছিল। তারপর এল আর একদল। তারা ইংল্যাণ্ডের ফুটবলার ক্রিকেটার আর ভারতের খেলোয়াড় দের তুলনামূলক আলোচনা করতে করতে তো প্রায় মারামারির অবস্থা করল। তারপরেই এলেন আপনারা শ ইলিয়ট হেমিংওয়ের দল। মনে কিছু করবেন না। সেই বিকেল থেকে আমি এসব আলোচনা শুনছি আর ভাবছি, বাংলাদেশের কলকাতার নয়, আমি বোধ হয়

প্যারী কি লণ্ডনে বসে আছি। কেউ একবার ভুলেও উচ্চারণ করে না নিজের দেশের ঐতিহ্যের কথা, দেশের সমাজের মঙ্গলের কথা!

রহস্য জমল। মনে হল, আমরা কোন দুর্বোধ্য রহস্যময় নাটকের কোন দৃশ্য দেখছি। আচ্ছা, আদর্শ-পাগলা বুড়ো তো! পল্লীগ্রামের দেশ থেকে আসা কোন রাজনৈতিক নেতা? না জালালাবাদের রক্তাক্ত বিপ্লবের কোন সৈনিক! হয়তো এমনি কোন সুমহান অতীত ইতিহাসের মহিমা মাথায় নিয়ে জীবিকার দায়ে চায়ের দোকান খুলে বসেছে।

বিশ ত্রিশের যুগে ঘুরলেন—অস্ফুটস্বরে আপন মনে বিড় বিড় করে সে বলল—আপনাদের মত এক একটা জোয়ান ছোকরা ছিল এক একটা আগুনের গোলার মত। আখড়ায় লাঠি তলোয়ার খেলা শিখতো, পড়তো গীতা আর ভক্তিযোগ—আর আজ? বিদ্রূপের একটা তীক্ষ্ণ হাসি ঝিকমিক করে উঠল তার শীর্ণ মুখখানায়।

কয়েক মুহূর্ত পর ঘৃণায় মুখখানা কুঞ্চিত করে আবার সেই বৃদ্ধ দোকানদার বলল—আজ সেই দেশেরই যুবকরা সিনেমার নটনটী আর খেলার আলোচনা ছাড়া অন্য কিছু জানে না, শুনতে চায় না—

—কিন্তু এজন্য আপনি আমাদের দায়ী করছেন কেন? বিরক্ত হয়ে সুদাম বলল। দায়ী! যেন চমকে জেগে উঠল সেই বৃদ্ধ।—না, না, দায়ী কাউকে করছি না ভাই, নিজের মনে দেশের দুরদৃষ্টের কথা ভাবি—আমার মনে হল, হয়তো কোনদিন মহৎ কোন আদর্শের তেজে উদীপ্ত ছিল এই বৃদ্ধের জীবন কিন্তু আজ আঘাতের পর আঘাতে দুঃখে কষ্টে তার মাথাটাই খারাপ হয়ে গিয়েছে। তা না হলে—আপনি নিশ্চয়ই 'টেররিষ্ট' পার্টিতে ছিলেন—কতকটা যেন কৌতুকের সুরেই সুদাম বলল—কোন দলে ছিলেন? যুগান্তর না অনুশীলন?

—না, না, সেকথা শুনতে চাইবেন না—হঠাৎ যেন খুব সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল সেই 'ওয়েসিস' কেবিনের মালিক। ব্যথাতুর, নিষ্প্রভ দুটো চোখ দেয়ালের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে ছাড়া ছাড়া গলায় সে বলল—দেখুন, থেকে থেকে কি মনে হয় জানেন? নিরীহ, নিরেট একটা সংসারী লোক হয়ে জীবন কাটানোই ভাল। বড় আদর্শের জন্য, মহৎ কোন প্রেরণার জন্য মানুষকে বড় বেশী মূল্য দিতে হয়—

—দেশের কাজ করেছেন—মুচকি হেসে সুদাম বলল, ভালই তো করেছেন, তার জন্য এত আক্ষেপ কেন?

আক্ষেপ! খোলা চোখদুটো যেন ধক্ করে জ্বলে উঠল। অসহ্য একটা যন্ত্রণায় যেন ফেটে পড়ে সে বলল—কেন? আক্ষেপ হবে কেন? হঠাৎ তীক্ষ্ণ কুঞ্চিত চোখে সুদামের দিকে তাকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে সে বলল, সামান্য একটা চায়ের দোকানদার হয়ে বড় বড় কথা বলছি বলে ঠাট্টা করছেন না? অনন্ত স্থির দৃষ্টিতে বৃদ্ধ সুদামের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। দুষ্কৃতির ভার লাঘব করার জন্যই হয়তো হঠাৎ সে বলে উঠল—এই অবস্থায় আমাকে কোনদিন দেখতে পেতেন না যুবকদের? যদি ছিলিতে দার্জিলিং মেল ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে না পড়তাম...

সর্বনাশ! কী বললেন? হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে গলা চিরে চিৎকার করে উঠল সুদাম—আপনি কি ছিলি মেল ডাকাতিতে ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—আপনার বাড়ী কি দিনাজপুর জেলার পারিলাহাটে?

—আরে আশ্চর্য! আপনি কি করে জানলেন?—যেন লুঠ করার পর ওরা আত্রাই নদী সাঁতরে পালাতে গিয়ে আপনি কি পুলিসের গুলীতে আহত হয়েছিলেন? সেখানেই ধরা পড়ে, পরে বিচারে আপনার দ্বীপান্তর হয়েছিল?

—হ্যাঁ—বিস্ময়, উত্তেজনা, কৌতূহল সব জড়িয়ে বৃদ্ধের মুখখানা যেন একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছে।

—আপনি নিশ্চয়ই প্রাণকৃষ্ণদা, সুদাম তার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল—সাঁপাহারের নরেশ মিত্রের বড় মেয়ে কৃষ্ণাকে আপনার মনে পড়ে?

কৃষ্ণা! অদ্ভুত একটা অস্থিরতায় বৃদ্ধের চোখদুটো ছটফট করে উঠল। পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ক্ষীণ আলোয় যেমন করে পাখি পড়ে তেমনি করে সুদামের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—তোমার মুখের আদল

অবিকল কৃষ্ণার মত দেখছি আপনি—তুমি নও না?

—হাঁা, সুদাম বলল—কৃষ্ণা আমার বড়দি। ছিলি যেল ডাকাতির সময় আমার বয়স মাত্র তিন বছর ছিল। সে ওদের কয়েক বছর আগে আপনি ছাড়া পেয়েছেন কাগজে দেখেছিলাম। তারপর আমরা আপনাকে কত খুঁজেছি—

—কৃষ্ণা কেমন আছে নও, নিশ্চয়ই সুখে ঘরকন্না করছে? তোমার মা বাবা কেমন আছেন—এক নিশ্বাসে অনেকগুলো প্রশ্ন করলেন প্রাণকৃষ্ণ বোস।

—মা বাবা আজ আট নয় বছর হলো মারা গেছেন—সুদাম বলল—দেশভাগের পর আমি বড়দিকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসি। 'রিফিউজি লোন' নিয়ে বারাকপুরের কাছে সুহচরে অশোক নগর কলোনীতে কোন রকমে একটা চালাঘর মত করেছি। সেখানেই মাথা গুঁজে আছি। সাঁপাহারের আরও আছেন সেখানে—

—কৃষ্ণার তাহলে বিয়ে হয় নি? একটু যেন অসহিষ্ণু হয়েই প্রাণকৃষ্ণ বোস বললেন। দেখলাম, তাঁর তামাটে চামড়া ঝুলানো মুখখানায় বেদনার ছায়া ভেসে উঠল।

—তোমাদের চলে কি করে?

—দিদি ওখানকার মহিলা সমিতিতে তাঁত শেখায়, সেলাই শেখায়, তারা কিছু দেয় আর আমি দিনে একটা ব্যাঙ্কে চাকরী করি। রাত্রে কলেজে পড়ি। আমাদের দুজনের উপার্জনে কোন রকমে চলে যায়—

—কৃষ্ণা কেমন আছে তা তো বললে না নও?—আছে ভাল, তবে—নীচের দিকে তাকিয়ে নখ দিয়ে মেঝের সিমেন্ট খুঁটতে লাগল সুদাম।

—তবে কি তার শরীর অসুস্থ?

শরীর নয়। মনের রোগে প্রাণকৃষ্ণ দা! অদ্ভুত শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়েছেন বড়দি। দিনরাত বাড়ী গোবরজল দিয়ে ধুচ্ছেন। গঙ্গায় দিনের ভেতরে চারবার স্নান করছেন। ওদিকে দিনে দিনে তার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে। বিকেলের দিকে জ্বর হয় সামান্য—

হুঁ—গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল প্রাণকৃষ্ণ বোসের বুকের ভেতর থেকে।

—কৃষ্ণা আমাকে চিনতে পারবে নও?

—নিশ্চয়ই পারবে। যাবেন প্রাণকৃষ্ণ দা?

ব্যাকুল গলায় সুদাম বলল—আপনি বললে যদি দিদি শোনেন। যদি তার মতিগতির পরিবর্তন করতে পারেন! মা-র মুখে শুনেছি, একদিন আপনার কথায় দিদি—

—আমি যাবো নও, তুমি কৃষ্ণাকে বলো—

আমি একপাশে দাঁড়িয়ে নির্বাক দর্শকের মত এই নাটক দেখেছি। কিন্তু সুদামের বড়দির কথা উঠতেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল কৃষ্ণাদির গম্ভীর আর কঠিন মুখখানা। ছুটো বড় বড় চোখে বিষাদের ছায়া। কতদিন সুদামের বাড়ীতে তাঁকে দেখেছি। ধ্যানস্থ হয়ে চোখ বুজে বসে আছেন কৃষ্ণাদি তাঁদের গৃহদেবতা মদন মোহনের সামনে। ভক্তির প্রাবল্যে কি হয়তো কোন স্তুতির আবেগেই কণা কণা জল গড়িয়ে পড়ছে তাঁর দীর্ঘ ছুটো গাল বেয়ে। আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল··· কিন্তু না, সন্দেহ করতে হয় নি। সুদাম আমার অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু কলোনীতে পাশাপাশি থাকি। সে সবই আমাকে বলেছিল।

হুঁ। ভালবাসা। আঠারো বছরের কৃষ্ণাদি ভালবেসেছিলেন বাইশ বছরের তরুণ প্রাণকৃষ্ণ বোসকে। সে ভালবাসা; পারিলাহাটের ঘু ঘু মাঠে, শাল সেগুন আর তালগাছের ছায়ায় ছায়ায় একটা সতেজ স্বর্ণলতার মত বেড়ে উঠেছিল। কিন্তু দেশের কাজে তাঁর দীর্ঘ মেয়াদী কারাবাস হওয়ার পর থেকেই কেমন যেন হয়ে যান কৃষ্ণাদি। সুদামের মা তাঁর হাত ধরে কেঁদে অনুরোধ করেছিলেন, বাবা কৃষ্ণা গলায় আদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু 'বিয়ে করবো না'—কৃষ্ণাদির এই বলিষ্ঠ শুভ্রের মত প্রতিজ্ঞাটা কেউ টলাতে পারে নি। এই কি তবে সেই প্রাণকৃষ্ণ বোস? একটা সামান্য চায়ের দোকানের মালিক!

সেই সন্ধ্যায় প্রাণকৃষ্ণ বোসের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে আমি আর সুদাম সুহচর ফিরছি। বাসে পাশাপাশি

দুজনে বসেছি। একটা কথা বলছে না সুধাম। 'ওরেসিস' কেবিনের নাটুকে ঘটনাটা চিন্তা করতেই কেমন যেন সিনেমার সস্তা গল্পের মত মনে হলো। কিন্তু সস্তা নয়। গল্প নয়। এতটুকু অবাস্তব নয়। পরে বুঝতে পেরেছিলাম। হঠাৎ দীর্ঘ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সুধাম একটা ছেলেমানুষী প্রশ্ন করে বসল—আচ্ছা দেখ বিকাশ, চুয়াল্লিশ বছরে বিয়ে করা কি অসম্ভব?

—কেন? বিস্মিত হয়ে আমি বললাম—কেন বলছিস একথা—

প্রাণকৃষ্ণদা যদি এখনও বড়দিকে বিয়ে করেন, তা হলে আমার মনে হয় ওর ওসব যাই—একটু চুপ করে থেকে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ধারে সারি সারি কৃষ্ণচূড়ার পাতায় পাতায় ঝিলিমিলি চাঁদের আলোর দিকে তাকিয়ে বলল—ইস্ ও যে কী প্রাণবন্ত মেয়ে ছিল রে! ছল্ ছল্ করে উঠল সুধামের চোখের পাতা দুটো। আমারও মনে হলো, আঠারো উনিশের প্রথম যৌবনে কৃষ্ণাদির কাছে যা ছিল মনের দিগদিগন্ত রাঙানো রামধনুর মত রঙীন স্বপ্ন, তার সার্থকতায় তাঁর রুক্ষ ধূ ধূ জীবনটা ফুলে ফলে, সবুজের স্পর্শে হয়তো ভরে উঠবে। বিশ বছর ধরে তাঁর আকুল করা বাসনাটাই যখন মূর্তি ধরে দাঁড়াবে, তখন হয়তো ভাটার নদীর মত ক্লান্ত, নির্জীব কৃষ্ণাদির জীবনে প্রাণের তরঙ্গ উঠবে। বয়স? প্রাণকৃষ্ণ বোসের চুয়াল্লিশ। কৃষ্ণাদির আটত্রিশ। আজকাল তো বেশী বয়সে বিয়ে হচ্ছে। এমন ঘটনা তো অবিরল নয়।

প্রাণকৃষ্ণ বোস অশোকনগর কলোনীতে এসেছিলেন। যখন এসেছিলেন, তখন সুখচরে রাধামাধবের মন্দিরে সন্ধ্যা আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজছিল। শেষ সূর্যের আলো বিশাল গঙ্গার বুকে তরল অগ্নিধারার মত জ্বলছিল। গঙ্গার ওপর দিয়ে বয়ে আসা শোঁ শোঁ করা বাতাসের আর্তনাদকেও ছাপিয়ে রায় চৌধুরীদের পোড়ো দালানে মহিলা সমিতির ক্লাস থেকে ভেসে আসছিল কৃষ্ণাদির উঁচু গলার স্বর—২ সোজা, ৩ উল্টা, ৩ ঘর একসঙ্গে উল্টো সোজা। ডান হাতের কড়ে আঙুলে একবার পাক বাইরে নাও। তারপর অনামিকা আর তর্জনীর নীচ দিয়ে এনে—ছবিটা দেখ না—

—বড়দি, প্রাণকৃষ্ণদা এসেছে—আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে সুধাম গিয়ে তাঁকে খবর দিল। সেলাই শিক্ষার্থী মেয়েগুলোকে উলের প্যাটার্ন শেখাচ্ছিল কৃষ্ণাদি। তিনি শান্ত গলায় বললেন—এসেছেন! আচ্ছা, আমাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাগে যা—আমি যাচ্ছি একটু পরে মেয়েদের ছুটি দিয়ে। ম্লানায়মান সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে কৃষ্ণাদি ধীর পায়ে এসে দাঁড়ালেন প্রাণকৃষ্ণ বোসের সামনে। প্রাণকৃষ্ণ দেখলেন, মোটা চওড়া কালো পেড়ে শাড়ি জড়ানো কৃষ্ণাদির হাড় জিরজিরে শরীর। একফালি চাঁদের মত কপালটায় সুস্পষ্ট ত্রিবলী রেখা। দীর্ঘ বিশ বছরের দুঃখকষ্ট আর অজস্র অবসাদের চিহ্ন লেখা আছে তাঁর মুখের রেখায় রেখায়। একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস গোপন করে হেসে প্রাণকৃষ্ণ বললেন—চিনতে পারো কৃষ্ণা?

—চিনতে পারবো না কেন? নন্দর মুখে সব শুনেছি যে—যেন বহু দূর থেকে ক্ষীণ গলায় বললেন কৃষ্ণাদি। কিন্তু তপস্বিনীর মত তাঁর দুটো কঠিন চোখে কোন উল্লাসের ঝিকিমিকি জাগল না। নেহাতই মামুলী অভ্যর্থনা করলেন কৃষ্ণাদি। চা-জলখাবার খাইয়ে তাঁকে বিদায় দেবার সময় বললেন—আবার কিন্তু এসো প্রাণকৃষ্ণদা—

প্রাণকৃষ্ণ বোস প্রতিদিনই যান সুধামদের বাড়ী। কতদিন দেখেছি, ছুটির নিরালা দুপুরে, সকালে, সন্ধ্যায় তাঁরা দুজন পাশাপাশি বসে গল্প করছেন। উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে চলেছেন প্রাণকৃষ্ণদা কত কথা। কিন্তু তার একটা কথা কৃষ্ণাদি শুনছে কিনা, আমার সন্দেহ হতো। একদিন দেখলাম, প্রাণকৃষ্ণ বোস তাঁর কাছে থেকে বিদায় নিয়ে বাইরে যাওয়া মাত্র, তিনি বারান্দার যে জায়গাটায় বসেছিলেন, সেই জায়গাটা গোবরজল দিয়ে লেপে দিতে গেলেন কৃষ্ণাদি।

—ও কী? ও কি করছো তুমি বড়দি? রাগে দুঃখে চেঁচিয়ে উঠল সুধাম—প্রাণকৃষ্ণদা ওখানে বসেছিলেন, ওখানে গোবরজলের ছড়া দেবার কি আছে?

—আরে থাম তুই—বিরক্ত হয়ে কৃষ্ণাদি বললেন—ঐ এক কাপড়ে ও বারো মুহুরি ঘোরে—ছুপ করে রেখে যাওয়া ছাতাটা নিতে এসে স্বচক্ষে প্রাণকৃষ্ণদা দেখলেন কৃষ্ণাদির ঐ মূর্তি। শুনলেন তাঁর উক্তি। স্পষ্ট দেখেছিলাম তাঁর কোঁচকানো দুটো চোখের কোল বেয়ে জলের বিন্দু চক্ চক্ করছে।

আমার কিন্তু মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, একদিন প্রেম ভালবাসার আগুন ওদের দুজনের ভেতরেই ছিল। এবং সে আগুন হয়তো সবচেয়ে বেশী জ্বলে উঠেছিল কৃষ্ণাদির ভেতরেই। তাই তিনিই সবচেয়ে আগে পুড়ে ছাই হয়ে গেছেন।

• •

[৪]

হাতে বাগ ঝুলিয়ে ডক্টর চৌধুরী যে একটু বাদেই বিদায় নিয়ে বাড়ীর হিসীমানা ত্যাগ ক'রেছেন, সেটুকু দেখা এড়ায়নি। আজ আর নতুন প্রেস্‌ক্রিপসন নিয়ে আমাকে তাঁর চেম্বারে ছুটতে হ'লো না, সে কাজটা নিজে উদ্যোগী হ'য়ে জামাইবাবুই ক'রলেন। এই ফাঁকে অণিমাকে চিঠিটা না দিলেই নয়, টেলিগ্রামের চাইতেও জরুরী। অণিমার প্রস্তুতির উপরেই নির্ভর ক'রছে আমার গোটা ভবিষ্যৎ। শুধু একটি মাত্র কথা : 'তুমি তৈরী থেকো, আমি রওনা হচ্ছি।' অণিমার উচ্চারিত শুধু এই কথাটি মাত্র। সেই একটি কথা দিয়েই আমি গেঁথে তুলতে পারবো আমার নব জীবনের ভিৎকে, রচনা ক'রতে পারবো আমাদের প্রেমবৃদ্ধ বাসরশয্যা। এ মিথ্যা নয়, অলীক নয়। অণিমাকে শুধু আমিই তো প্রাণ দিয়ে চাইনি, সেও যে সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমাকেই প্রতিমুহূর্তে কামনা ক'রেছে! দু'জনে যেখানে আমরা প্রেমের একই বিদুরেখায় দাঁড়িয়ে দ্বৈত-সঙ্গীতের মূর্ছনা তুলেছি—সেখানে তার একটি সুরের অসঙ্গতি কি সমস্ত জীবনটাকেই একেবারে তছ্‌নছ্‌ ক'রে দেবে না?

বিঘূর্ণিত চক্রের মতো মাথাটা কেবলই ঘুরছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল না—একটা মুহূর্তও আর পিতৃআশ্রয়ে থেকে দ্বিতীয়বার গিয়ে মার মুখের সামনে দাঁড়াই। এতবড় আত্মগ্লানি আর আত্মদ্রোহ বোধ করি মানুষের কখনও হয় না। অথচ বেরিয়ে যে প'ড়বো—তারই বা পথ কোথায়? আমার এই বিপর্যস্ত বেহার জীবনকে দুরন্ত স্বাধীনতার স্বপ্নে কে এমন আত্মজ-ধর্মে লালন ক'রবে? দেখলাম—এতকালের শিক্ষা আমাকে শুধু বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারে ব'সে কেবল তর্কজাল রচনা ক'রতেই শিখিয়েছে, সাহস-বিস্তৃত-বক্ষপুটে মুক্তির যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত ক'রে অগ্নিমন্ত্রে হোমসিদ্ধ করেনি। নিজের এই দুর্বল চিত্তবৃত্তিকে বার বার ধিক্কৃত ক'রেও গ্লানি মিটলো না। অলক্ত ফার্পেসের মতো গম্‌গম্‌ ক'রছে ঊর্ধ্বমস্তিষ্কের শিরা-উপশিরাগুলি। অলক্ষ্যে কখন্‌ অণিমার চিঠির একটা লাইন অকস্মাৎ এসে খচ্‌ ক'রে বুকে বিঁধলো : "তোমার পাশে দ্বিতীয় নারী দেখলে আমি কি সত্যিই স্থির থাকতে পারবো?' এই ছোট্ট একটি কথা দিয়েই কি আজকের আমার এই জীবন-সমস্যার সমস্তগুলো পর্দাকে ঢেকে দিতে চায়নি অণিমা! আমিও যে তিলে তিলে সেই আচ্ছন্ন সুখেই একটি একটি ক'রে স্বপ্নের মালা গেঁথে এতদিনের এতগুলি মুহূর্তকে নির্বিবাদে চোখ বুজে কাটিয়ে দিচ্ছিলাম! আজকের ঘটনা যে এমন ক'রে এসে দুরন্ত ঝড়ের বেগে আমার সেই স্বপ্ন-মালার পাঁপ্‌ড়িগুলিকে ছিঁড়ে দিয়ে যাবে, এ যে কল্পনারও অতীত ছিল।

কিছুক্ষণের জন্ত একবার মাথাটাকে হাল্কা ক'রতে চেষ্টা ক'রলাম। সময় ব'য়ে যায়; সে আর যা-ই করুক, আমার জন্ত কোথাও সে এতটুকু স্নেহ-কর প্রসারিত ক'রে দাঁড়াবে না, বরং মুখের উপর একটা দারুণ বিদ্রূপ হেনে উল্কাপিণ্ডের মতোই অগ্নি-কটাক্ষে সে দূরে স'রে যাবে। কাগজ-কলম টেনে নিয়ে অণিমাকে তাই চিঠি লিখতে ব'সলাম এবারে।—

'সুচরিতাসু,

তোমার জবাবের প্রতীক্ষা না ক'রেই আজ আবার

নতুন ক'রে তোমাকে চিঠি লিখতে ব'সলাম। বহু কথা বিস্তৃত ক'রে লেখার সময় এটা নয়। একটা ভয়ঙ্কর বিষ্ণুনিশ্বাসের সামনে দাঁড়িয়ে কথাগুলো উচ্চারণ ক'রছি, পাশে দাঁড়িয়ে মৃত্যু। কথাটা বুঝে নেওয়া তোমার পক্ষে শক্ত হবে না। একদিন তন্দ্রশ্রীর সামনে তোমার উপস্থিতিকে বিজয়গর্বে ঘোষণা ক'রে আত্মপক্ষ সমর্থনের যে উৎসাহকে তুমি উপহাস ক'রেছিলে, আজ সেইটেই সত্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। নারী দেখে পুরুষকে, কিন্তু পুরুষ দেখে সত্যকে, সত্যকে সে পায়ও। আমার গর্ভধারিণী তাঁর সন্তানের মতামতকে উপেক্ষা ক'রেই তন্দ্রশ্রীর সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ পাকা ক'রেছেন। জীবনে শুধু একটিমাত্র যায়গা ভিন্ন কোথাও কোনোদিন পরাজয় স্বীকার করিনি,—সেটা হ'চ্ছে জীবিকার্জনের ক্ষেত্র। সে গ্লানিও আমি মন থেকে মুছে দিতে পারি—যদি তুমি এই মুহূর্তে রাজি হ'য়ে আমার প্রতীক্ষিত মালা এসে সাদরে তোমার গলায় তুলে নাও। সংসারে একটা দারুণ ঝড় উঠবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার পরেই নির্মল নক্ষত্রাকাশে চাঁদ উঁকি দেবে। সত্য চিরদিন এইভাবেই প্রতিষ্ঠা পেয়ে থাকে। তুমি আসবে, তোমার আসার উপরেই আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর ক'রছে, জানি না—হয়ত তোমারও: এইটেই আজকের শেষ কথা। ইতি—

সুমন্ত।'

চিঠিখানিকে খামে আটকিয়ে মনে হ'লো—আজকের আর, এম্, এস্, ডাকের সময়টা কখনই উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। উপস্থিত মতো টেলিগ্রাম ভিন্ন গতি নেই। চিঠিটাকে কালকের ডাকের জন্ম রেখে চিঠির বিষয়বস্তুকে সংক্ষেপে উল্লেখ ক'রে আপাতত অধিক মাশুল দিয়ে একটা টেলিগ্রামই ক'রে দিলাম অনিমাকে। জানি টেলিগ্রাম পেয়ে একটা দিনও সে দেরী ক'রবে না জবাব দিতে। চিঠিটা পৌঁছাতে আর একটা দিন মাত্র।

পোষ্ট অফিস থেকে ঘুরে এসে দেখি—আমার অধ্যয়ন কক্ষে ব'সে দিদি আর জামাইবাবু কি সব আলোচনা ক'রছে।

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'ডাক্তার নতুন কিছু অষুধ দিল?'

জামাইবাবু ব'লুলেন, 'দিয়েছে, তবে তা কাজে আসবে ব'লে মনে হ'চ্ছে না।'

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'কেন?'

উত্তরটা এবারে দিদি দিলো। ব'লুলো, মা 'একেবারে জীবের প্রতিজ্ঞা ক'রে ব'সেছেন—খাস থাকতে তিনি আর এ সংসারে জলটুকুও স্পর্শ ক'রবেন না। এ তো দেখছি—শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নিলেন মা!'

জামাইবাবু ব'লুলেন, 'এ ক্ষেত্রে তুমি যদি বিয়েতে মত না দাও ভাই, তবে আসন্ন কিছু একটা বজ্রপাত থেকে উদ্ধার পাওয়া কারুর পক্ষেই সম্ভব হবে না। তুমি রাজি হও ভাই।'

ব'লুলাম, 'আপনারও শেষ পর্যন্ত এই মত?'

উত্তরে জামাইবাবু ব'লুলেন, 'তোমার দিদির মুখ থেকে আমি সবই শুনেছি। জানি—ভালোবাসার মতো পবিত্র জিনিষ পৃথিবীতে আর কিছুই নেই। কিন্তু যে ভালোবাসা সংসারের বৃহত্তর শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেকে বড় ক'রে তুলে ধরতে গিয়ে ঝড়ের সঙ্কেতকেই কেবল ব'য়ে আনে, সে ভালোবাসা পবিত্র হ'লেও তাতে ডুবে যেতে নেই। পৃথিবীতে এই নিয়েই নানা দেশে নানা শাস্ত্র গ'ড়ে উঠলো। ভালোবাসার প্রতিমাকে প্রাত্যহিক অভিঘাতের মধ্যে টেনে এনে দেখা যায়—ভালোবাসা সম্পর্কে নিজের মনেই বিধার সৃষ্টি ঘটেছে। ভালোবাসাকে চিরকালের ক্লাসিক ক'রে রাখতে হ'লে দূর থেকেই তাকে তার নিজের আসনে প্রতিষ্ঠিত রেখে শ্রদ্ধার্ঘ্য দিতে হয়, প্রতিদিনের দুঃখ-যাতনার সঙ্গে মিশিয়ে তাকে দেখতে গেলেই তার পাপড়ি শুকিয়ে যায়। প্রেমে আর ফুলে কোনো পার্থক্য নেই ভাই। জীবনকে নানা দিক দিয়ে দেখবার প্রয়োজন আছে। দর্শনের কথা তুলে অনধিকার চর্চা ক'রবো না। আমি শুধু এইটুকুই বলতে পারি, প্রেমকে স্ত্রীরূপে পেয়ে কেউ কোনোদিন সার্থক হয় নি, স্ত্রীকে ভালোবেসেই প্রেমকে জয়ী ক'রেছে মানুষ। গৃহীর জীবনে এত বড় দর্শন বোধ করি ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোনো দেশে নেই। মা আমাদের মধ্য থেকে বিদায়

নেবার আগে অন্ততঃ এইটুকু তুমি ভেবে দেখতে চেষ্টা করো ভাই।'

কোনোদিন জামাইবাবুর সঙ্গে এমন ক'রে কথা হয়নি। আজ কথা ব'লতে গিয়ে অবাক হ'য়ে গেলাম। তাঁর কথাকে যে এক নিশ্বাসে ঠেলে দিতে পারলুম, তা নয়; কিন্তু সহজে স্বীকার ক'রেও নিতে পারলুম না। ব'লুলাম, 'সংসারে সব প্রেমই যে প্রেম নয়, এটুকু তো জানেন জামাইবাবু! যাকে ভালোবেসে অতি সহজে সংসারকেও ভালোবাসা যায়, তাকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলে সংসারের মোহ ব'লে আর কিছু থাকে না। ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে যে প্রেম ক্ল্যাসিক হবার অবকাশ পায় না—সে প্রেমের স্থিতনে সত্য ব'লে কিছু নেই। মেকী প্রেমের অভিনয়ে দর্শকের চিত্তস্বাচ্ছন্দ্য হয়ত ঠিকই ঘটে, কিন্তু অভিনেতার হাহাকার তাতে নিবৃত্ত হয় না। জীবনে হাহাকার নিয়ে সংসারে কদিন এমন অভিনয় ক'রতে পারবো, বলুন?'

কথা কেড়ে জামাইবাবু ব'লুলেন, 'যে খাঁটি অভিনেতা তার কাছে আসল আর মেকী ব'লে কিছু নেই। বয়োজ্যেষ্ঠতার অধিকারেই আশীর্বাদ ক'রে বলি, নার ঘট্‌কালীতে বিয়ে ক'রে তুমি সুখী হবে। জীবনে সুখকে নিজে থেকেই প্রতিষ্ঠা ক'রতে হয়। কারুর সুখ যেমন কেউ কেড়ে নিতে পারে না, তেম্‌নি হাতে তুলেও দিতে পারে না কেউ।'

দিদি এতক্ষণ নীরবে হাঁ ক'রে ব'সে শুনছিল। এবারে ব'লুলো, 'লক্ষী ভাইটি, আমাদের কথা রাখ তুই সুমু। না আজ উপোষ ক'রে ম'রলে তুই যে অনিমাকে নিয়েও জীবনে সুখী হতে পারবি না রে!'

এই ব'লে কি অভিশাপের বাণী উচ্চারণ ক'রতে চাচ্ছে দিদি? ব'লুলাম, 'দোহাই তোমাদের, আমি আপাততঃ কিছুই ভাবতে পারছি না, একটা সপ্তাহ অন্ততঃ তোমরা আমাকে সময় দাও।'

—'কিন্তু মা উপোষ দিয়ে একটা সপ্তাহ বাঁচবেন কেমন ক'রে?' উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে চোখ দু'টো কেটে পড়তে চাইলো দিদির।

বলুলাম, 'সে জন্যে তো বাবা আর তোমরাই আছো!'

—'বাবা নিশ্চিকার পুরুষ। এ ব্যাপারে বাবা একটুও মাথা গলাতে চান না। আমাকে ডেকে ব'লুলেন—সুমুকে যা বলবার তোরাই বল, আমি এই নিয়ে মুখোমুখি তাকে কিছু ব'লতে ইচ্ছা করি না।' থেমে দিদি ব'লুলো, 'বাবাকে এর মধ্যে টেনে আনাটাই কি ভালো? মানসিক অবসাদ নিয়ে অনবরত তিনি ঘরে বাইরে ছুটোছুটি ক'রছেন। প্রাইভেট কন্‌সাল্‌টেশনের জন্যে সিভিল সার্জেনের দুয়োরে অবধি দৌড়োদৌড়ি ক'রতে বাকী রাখছেন না। এ অবস্থায় বাবাকে কি ব'লতে পারি বল? তোর জামাইবাবুর কথাগুলিকে তুই বুকে দেখ সুমু। তোর ভালো হবে, ঈশ্বর তোর জীবনকে সুখী ক'রবেন, তুই এইখানেই বিয়ে করে আমাদের সকলকে সুখী কর ভাই। তোর আজকের দুঃখ জীবনে থাকবে না। সংসারের অনেক কিছু পেতে হ'লে অনেক কিছু ছাড়তে হয়। তুই তো অবুঝ ন'স, কথা দে সুমু মার কথায় তুই রাজি আছিস!'

উত্তরে সহসাই কিছু একটা ব'লতে পারলুম না। ব'লতে গেলে পুরণো কথারই পুনরাবৃত্তি হ'তো মাত্র। থেমে জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'মাকে কিছু পথ্য করিয়েছ!'

দিদি ব'লুলো, 'আমার সাধ্যে কুলোলো না, এখন যদি তুই নিজে গিয়ে পারিস।'

ব'লুলাম, 'বেশ, আমিই যাচ্ছি।' ব'লে বিন্দুমাত্র আর অপেক্ষা ক'রলাম না; উঠে দিদির পরিত্যক্ত দুধের বাটিটাকে পুনরায় সাজিয়ে নিয়ে মার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে ব'লুলাম, 'এই দুধটুকু এক চুমুকে খেয়ে নাও দিকি!'

রাগেই হোক কিম্বা অভিমানেই হোক, প্রথমটা মা কথা ব'লুলেন না, দ্বিতীয়বার ব'লতে যেতেই ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন: 'দুধ দিয়ে একদলা ছাই এনে দে, তাই খাই, তাই খেয়েই নিশ্চিন্তে চক্ষু বুজি। খাওয়া তো এ জীবনে আমার চুকেই গেছে, বার বার দুধের বাটি সামনে এনে ধ'রে তবে আর এমন ভড়ং কেন তোদের? যা, নিয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে, তাপাড়ে নিয়ে ঢেলে দে গিয়ে বাটি শুদ্ধো।'

বুঝলাম—কড় যখন একবার উত্তুরে মেঘকে কাঁপিয়ে নিয়েছে, তখন শান্ত হ'তে দেরী হবে না। বিচলিত না হ'য়ে পুনরায় কথাটা পেড়ে তাই ব'ললাম, 'তাগাড়ে নিয়ে ঢেলে দেবার জন্যে যখন গোয়ালাকে পয়সা দেওয়া হয় না, তখন অমন কথাটা নাই বা তুললে। নাও, লক্ষ্মী মেয়ের মতো এখন খেয়ে নাও দিকি!'

এবারে শুমোট মেঘের গুরুতা। এখনই হয়ত আবার ঝোড় হাওয়া বইবে! কিন্তু কিছুই হ'লো না। নীরবে একবার গাঢ় মেঘে আমার মুখের দিকে তাকালেন মা। দেখলাম—ইতিমধ্যেই চোখ দু'টো লাল হ'য়ে উঠেছে। ভিতরে ভিতরে কিছু একটা উদ্গত অশ্রুকে গোপন ক'রে নিলে চোখের যে-বর্ণ প্রতিভাত হয়, অবিকল সেই বর্ণ নিয়েছে চোখ দু'টি।

ব'ললাম, 'তোমার কথার তো আমি অমর্যাদা করিনি মা, শুধু পাত্রী নির্বাচনে যা মত-পার্থক্য! আপাতত দিন কণ না হয় পিছিয়েই দিলে। তোমার শরীর শুধরে না উঠলে সত্যিই তো কিছু আর একটা বিয়ে হ'তে পারে না। নাও, ধরো, দুধটুকু এবারে খেয়ে নাও।'

এবারেও কিছু একটা উত্তর ক'রলেন না মা। তেমনি গাঢ় দৃষ্টি প্রসারিত ক'রে আমার মুখের দিকে চোখ দু'টি তুলে ধ'রতেই অশ্রুতে সারা মুখ ভেসে গেল।

ব'ললাম, 'ছিঃ, এমনি ক'রলে একুণি তুমি আবার দুর্বল হ'য়ে প'ড়বে। নাও, গরম থাকতে থাকতে দুধটুকু খেয়ে নাও; ওঠো, উঠে মাথা তুলে বসো।'

আপত্তি না ক'রে এবারে সত্যি সত্যিই আঁচলে চোখ দু'টি মুছে নিয়ে উঠে ব'সলেন মা। তারপর এক চুমুকে দুধটুকু খেয়ে নিয়ে নীরবেই আবার শুয়ে প'ড়লেন।

ঠিক এই মুহূর্তেই মন্টুকে কোলে নিয়ে দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়ালো দিদি।

ব'ললাম, 'এবারে আর ভাবনা নেই, মন্টু বাবু এসে গেছে; নিশ্চিন্তে এখন মন্টুকে নিয়ে শুয়ে শুয়ে খেল। এরপর দিদি তোমাকে ছানা আর ফলের রস এনে দেবে, খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পোড়ো'।—

কথাটা শেষ করার আগেই মন্টু এসে মার বুকে ঝাঁপিয়ে প'ড়লো।

দিদি জিজ্ঞেস ক'রলো, 'এই তো একবার বাইরে থেকে এলি, রাত্রি ক'রে আবার কোথাও বেরোবি নাকি?'

ব'ললাম, 'না; শরীরটা ভাল নেই, মাথাটা কট্‌কট্ ক'রে কামড়াচ্ছে, বোধ করি ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জাই হবে। শুয়ে প'ড়বো গিয়ে।' ব'লে দিদির আর দ্বিতীয় কথার অপেক্ষা না রেখেই নিজের ঘরে গিয়ে টান্ টান্ হ'য়ে শুয়ে প'ড়লাম।

মার দিকের দুর্ভাবনাটা আপাতত কিছু চুকে গেল বটে, কিন্তু মন থেকে দুঃসহ তাপটাকে কিছুতেই দূর ক'রে দিতে পারলুম না। অনিমার বদলে মনের সামনে এসে দাঁড়ালো এবারে তনুশ্রী। তার বিগত দিনগুলির আচরণকে যতই বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে গেলাম, ততই যেন একদিকে কেমন একটা মোহ, অন্যদিকে কেমন একটা বিদ্রূপে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগলো। স্বল্প-শিক্ষিতা তনুশ্রী, অঙ্গে তার লাবণ্য থাকলেও মনে কি বিন্দুমাত্র মিষ্টের লালিত্য আছে? পারে কি সে অনিমার মতো অন্তরের উন্মাদিনী চেতনাকে গানের আর আবৃত্তির যা দিয়ে জাগিয়ে দিতে? পারে কি মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত টেনে শুধু বিভ্রান্ত ক'রে দিতেই নয়, আচ্ছন্ন ক'রে দিতেও? ভাবতে গিয়ে অলক্ষ্যে মনোবিজ্ঞানের বহু-পঠিত পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে কখন্ যে সমস্ত চেতনাকে হারিয়ে ফেললাম, নিজেই বুঝতে পারলুম না। নিশুতি রাত্রি ঝম্ ঝম্ ক'রতে লাগলো চারপাশে। চিন্তার জালে প্রহিবদ্ধ হ'য়ে ধীরে ধীরে কখন্ যে একসময় ঘুমিয়ে প'ড়লাম, নিজের কাছেই তা অজ্ঞাত থেকে গেল।

[ন]

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার আক্রমণ থেকে অল্পতেই রেহাই পাওয়া গেল। দু'একটা দিন কাটতেই বুঝলাম—ওটা দেহধর্মী নয়, মনোধর্মী। চিন্তার ভার দেহের উপর এসে ভর ক'রলে দেহ আর তা বইতে পারে না। মনের সঙ্গে সঙ্গে

শরীরটাও সত্যি সত্যিই অবসন্ন হ'য়ে প'ড়ছিল। এতদিন তবু যাহোক্ অধ্যাপক সিদ্ধান্ত এখানে ছিলেন : সুখে-দুঃখে তাঁর সামনে গিয়ে ব'সে সান্ত্বনা পাওয়া গেছে। সহরে আজ সবাই থেকেও কেমন যেন নিঃস্ব ব'লেই বোধ হ'চ্ছিল সব কিছুকে। এর চাইতে ভিক্ষার ঝুলি সম্বল ক'রেই কেন পথে বেরিয়ে প'ড়লাম না? তীর্থদর্শনে তো মানুষ নিঃসম্বল হ'য়েই যায়, সংসারে চিরকালের যাযাবর যারা—তারা তো কই আশ্রয়ের জন্য কোথাও দুর্ভাবনায় প'ড়ে বেড়ায় না, পথে পথেই তাদের ঘর, পথে পথেই তাদের আহার সংগ্রহ। তেমনি ক'রে বেরিয়ে প'ড়লে জীবন-যুদ্ধে ভাগ্যলক্ষ্মীকে জয় ক'রে নেওয়া সত্যিই কি কঠিন ছিল কিছু? বোধ করি না। তবু কেন এই মন্থর, তবু কেন এই মনের স্বাধীন চিন্তা নিয়ে সংসারে ব'সে থাকা? অনিমার সঙ্গে এতকাল মনোবিজ্ঞানের এত কথা নিয়ে তর্কের ঝড় বইয়ে দিয়েছি, কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে কই আজ আমি তো কোনো বিজ্ঞানের শেষ সীমায় গিয়েই উপনীত হ'তে পারছি না। মনোবিজ্ঞানে এ অবস্থাটাকে কী বলে? একুনি হয়ত এ প্রশ্নের কিছু একটা সমাধান হ'য়ে যেতে পারতো, কিন্তু যিনি সমাধান ক'রবেন—তিনি হয়ত বৃন্দাবনের পথে পথে আজ শ্যাম নাম শুনে বেড়াচ্ছেন! তিনি অধ্যাপক সিদ্ধান্ত। সাই-কোলজির অত বড় পণ্ডিত হ'য়েও নিজের জীবনের সাইকোলজিকে তিনি কোনোদিন ইকুয়েশন ক'ষে বুঝে নিতে পারলেন না। জ্ঞানের সঙ্গে আমাদের মনের যে কত পার্থক্য, কল্পনা করা যায় না। আর কল্পনা করা যায় না ব'লেই মন নিয়ে এমন মন্বন্তরে আমরা জর্জরিত হই।

মার প্রতিজ্ঞা কিন্তু মা ত্যাগ ক'রলেন না। যখনই কেউ কোনো খাবারের পাত্র নিয়ে মার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, অমনি বিরক্তিতে বঙ্কার দিয়ে উঠেছেন মা। বাধ্য হ'য়ে প্রতিবারই আমাকে গিয়ে সে-পাত্র নিজের হাতে তুলে নিতে হ'য়েছে। এ যেন সাপের মাথায় ওঝার মন্ত্র। কিন্তু এমন মন্ত্র পাঠ ক'রেই বা ক'দিন কলিকে ভুলিয়ে রাখা চলে! বাধ্য হ'য়ে নিজে থেকেই একসময় ব'ললাম, 'তুমি যদি প্রতিবারেই এমনটা ক'রবে, তবে বলো—আমি তোমার সংসার থেকে চ'লে যাই। আমাকে নিয়েই যখন তোমার এত সমস্যা, তখন আমার চ'লে যাওয়াটাই বোধ করি শ্রেয়।'

তবাবে মা কিন্তু একটি কথাও ব'ললেন না। দু'পাটি দাঁতের মধ্যে নিজের ঠোঁটটাকে চেপে ধ'রে একটা উদ্‌গত আবেগকে রোধ ক'রবার প্রয়াস পেলেন। তারপর ধীরে ধীরে শিয়রের বালিশের নিচে থেকে মুখ-খোলা একটা খাম টেনে বের ক'রে আমার হাতের কাছে এগিয়ে দিলেন।

খামের উপরে ডিহিরীর দিল। মার নিজের নামেই স্পষ্ট ক'রে ঠিকানা লেখা। খুলতে কিছুই অসুবিধা হ'লো না। তবু উপস্থিত মতো মাকে আশ্বস্ত করবার জন্যই খামের ভিতর থেকে চিঠিখানাকে খুলে বার ক'রে অক্ষর-গুলোর দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। মাত্র বারোটা লাইনেই মহাভারতের সমস্ত পর্বগুলি স্পষ্ট হ'য়ে গেল : ...'আপনার পত্রানুযায়ী আমরা এদিকবার কাজ প্রায় সম্পূর্ণই গুছাইয়া আনিয়াছি। গহনাও ইতিমধ্যে তিনপ্রস্থ তৈরী হইয়া আসিয়াছে। খুড়ীর মরচেন পরিতে আদৌ ইচ্ছা নয়, তাহার ইচ্ছানুসারেই নতুন ডিজাইনের লকেট হার গড়াইতে দিয়াছি। বিছানাপত্র আর দানসামগ্রীর জিনিষগুলি কলিকাতায় আনাইতে পাঠাইব। দিন বোধ করি আরও সপ্তাহ দু'য়েক পিছাইয়া দিতে হইবে। নতুবা আমরা কিছু অসুবিধায় পড়িব। আপনার অনুমতি সাপেক্ষ। আপনি ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিতে চেষ্টা করুন দিদি। ক্রিয়াকর্মের সময় আপনি শয্যাশায়ী হইয়া থাকিলে আমরা মোটেই শান্তি পাইব না।...ইত্যাদি।

চিঠির মর্ম সম্পর্কে কিছু ব'লবার প্রয়োজন বোধ ক'রলাম না। যেমন ক'রে নীরবে মা খামখানিকে আমার হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েছিলেন, চিঠি পড়া শেষ ক'রে কাগজখানিকে পুনরায় খামের মধ্যে ভ'রে আমিও তেমনি নীরবেই এবারে খামখানিকে মার শিয়রের পাশে রেখে দিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

এরপর বোধ করি কয়েকটা দিনও মাত্র গড়ালোনা। এক্সপ্রেস্ তাকে অনিমার চিঠি এসে পৌঁছালো হাতে। আমার টেলিগ্রাম ও চিঠি দু'টোই যথাসময়ে সে হাতে পেয়েছিল। হাতে পেয়ে দু'টো দিন সে ভাববার অবধি সময় পেয়েছে। তারপর এই চিঠি। চিঠির কোথাও বা ভাষা অসংলগ্ন, কোথাও বা ঘন সন্নিবিষ্ট; সব কিছু মিলিয়ে একটা সুসংবদ্ধ স্থির-চিন্তার বলিষ্ঠ প্রকাশ। দ্রুত ঐকবার চোখ বুলিয়ে গেলাম অক্ষরগুলোর উপর দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাছেই নিজের হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব ক'রতে পারলুম। এমন স্পন্দন আগে কোনোদিন অনুভব করিনি। প্রথমটা বিশ্বাস হ'লো না নিজের চোখকে, অক্ষরগুলোকে ঠিক ঠিক ভাবে দেখতে পাচ্ছি তো চোখের জ্যোতি দিয়ে, ভুল নয় তো এর একটি অক্ষরও? আর একবার প'ড়লাম চিঠিখানিকে:

'সু—

শিশুরা সাধ ক'রে খেলাঘর রচনা করে, এক সময় সে খেলাঘর ভেঙেও যায়। শিশু তাতে দুঃখ পায় ঠিকই, কিন্তু কালের অমোঘ নিয়মকে সত্যিই কি ভেঙে ফেলা যায়! যায় না। আমরাও সেই মানব-শিশু। মহাকালকে অতিক্রম ক'রে ঊর্ধ্বতন কোনো মাহেন্দ্র মুহূর্তের স্পর্শ পাবো কেমন ক'রে? জীবনকে বিশ্বাস ক'রেও জীবনকে ডিঙিয়ে যাবার শক্তি আমাদের হাতে নেই। তার জন্য দুঃখ ক'রে কালক্ষেপ করা বোধ করি আরও বেশী ছেলেমানুষি হবে! তুমি বিয়ে করো, সত্যিই তুমি বিয়ে করো সুব্রত। আগে আগে ছেলেমানুষের মতো অনেক কিছু লিখেছি, সেগুলোকে আঁকড়ে ধ'রে তুমি ব'সে থেকো না। যে নিজে থেকে দুয়োরে এসে ভিক্ষাপাত্র তুলে ধ'রলো সামনে, তাকে ফিরিয়ে দিলে যে তুমি আমার ভালোবাসাকেও অপমান ক'রবে। নারীর ভালোবাসা যে কি, সেটুকু তো আমি জানি। মানুষকে অবহেলা ক'রলেও প্রেমকে কখনও অবহেলা ক'রতে নেই। আমাদের দর্শন আমাদের সে শিক্ষা দেয় নি। আমার প্রেম চিরকাল তার অনির্বাণ দীপশিখাটিকে অনায়াসেই এদিন থেকে আগামী দিনের মধ্যে উজ্জ্বল রেখায় সাজিয়ে রাখতে পারবে, সেই উজ্জ্বল শিখায় তিলে তিলে পুড়ে পুড়েই সে সার্থক হবে; কিন্তু তদুশ্রী? সে কেন পারবে তপশ্চর্যার পথে হৃদয়ের সুপ্ত প্রেমকে মহিমান্বিত ক'রে তুলতে? সে যে আমার মতো এমন ক'রে তোমাকে কোনো দিন পায় নি! তদুশ্রীকেই তুমি গ্রহণ করো সুব্রত। মিথ্যে ছেলেখেলা ক'রে মায়ের মৃত্যুর কারণ হ'লে ভগবান বোধ করি সে-অপরাধ তোমার সইবেন না। তোমাকে সুখী ক'রতে পারলে সে-সুখ যে আমার অদৃষ্টে এসেই জোড়া লাগতো, কিন্তু মহাকালের ইতিহাসে যেখানে একদণ্ডও স্থির নয়, সেখানে মনের এই অস্থিরতার মূল্যই বা কতটুকু! এতকাল মনে মনে অনেক মহাকাব্যই রচনা ক'রেছি, কিন্তু দেখলাম—নিজেকে রচনা ক'রতে পারিনি এতটুকুও। রাশীকৃত দেনার বোঝা মাথায় নিয়ে বাবা আজও একই নিয়মে আইনের পুঁথা গেঁটে চ'লেছেন। বাবাকে ঋণমুক্ত না ক'রে আমিই বা মুক্তি পাই কি ক'রে। যাঁদের রক্ত থেকে আমার এই অস্থি, চর্ম, মেধা আর মজ্জার জন্ম, আমার আশা, আনন্দ আর প্রেমের সৃষ্টি, তাঁদের চোখ থেকে দুঃখের আর অপমানের অশ্রু মুছে দিতে না পারলে আমিই বা কোন্ সান্ত্বনা নিয়ে জীবনকে সুখী ক'রে তুলতে পারবো! একথা আগেও তো কতবারই তোমাকে ব'লেছি! তুমি আমি যেখানে এক, সেখানে চিরকালই কি আমরা এক নই? সেই ঐক্যে যদি তুমি বিশ্বাস করো, তবে সংসারের জন্য জীবনের স্বতন্ত্র বন্ধনকেই বা তোমার এত ভয় কেন? যেখানে তুমি সংসারের, সেখানে সংসারের হ'য়েই তুমি সংসারকে সুখী করো; আর যেখানে তুমি আমার, সেখানে তুমি চিরকালই আমার হ'য়ে রইলে। এইটেই হোক্ আজকের শেষ কথা। তোমার ডাকে আজ সাড়া দিতে পারলুম না ব'লে আমার সমস্ত

অপরাধ তুমি ক্ষমা করো। ব্যথা যেটুকু থেকে গেল —তাকে সাদরেই সারা বুকে টেনে নিলাম, তা নিয়ে মনকে কখনও প্রশ্ন ক'রবো না। পারো তো অতীতের পৃষ্ঠাগুলিকে ঝরাপাতার মতো ঝরিয়ে দিয়ো মন থেকে। তনুশ্রীকে তুমি বিয়ে করো সুমন্ত, এই আমার শেষ মিনতি। ইতি—

অনিমা।'

পড়া শেষ ক'রে শুদ্ধ বিস্ময়ে কিছুক্ষণ আত্মনিমগ্ন হ'য়ে রইলুন। কি ব'লতে চায়, কি ব'লতে চাইল চিঠিতে অনিমা? তার প্রেম চিরকাল আপন মহিমায় পুড়ে পুড়েই সার্থক হবে, আর আমার প্রেম কিছু নয়, আমার প্রেম শুধু ঝরাপাতার মতো নিজেকে ঝরিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত হবে! কোথায় যেন টুং ক'রে একটা আওয়াজ হ'য়ে বীণাযন্ত্রের একটি তার সহসা ছিঁড়ে গেল। বুঝতে পারলুম, কিন্তু রুখতে পারলুম না। অনিমা তার প্রেমের কাছে আমার দারিদ্র্যটাকেই বড় ক'রে তুলে ধ'রেছে, আমি সেখানে একেবারেই তুচ্ছ। আজ আমি অর্থকরী কিছু একটা বৃত্তি গ্রহণ ক'রলে সমস্যাটাকে হয়ত ঠিক এতবড় ক'রেই দেখাতে পারতো না অনিমা! 'ইট ইজ অনলি এ সাইকোলজিকাল এ্যাক্‌শন,: এর পিছনে মনোবিজ্ঞানের কাজ কমখানি নেই। ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান ভাবলাম—জবাবে এবারে একটা শক্ত কিছুই লিখি অনিমাকে, লিখি—আমার ভালোবাসা নিয়ে এমন ক'রে পুতুলখেলার অবকাশ তার হ'লো কি ক'রে? কিন্তু মিথ্যে বাগাড়ম্বরের প্রশ্ন। অনিমার মিনতি হয়ত তার এই চিঠির পৃষ্ঠার মধ্যেই চিরকাল বুজে থাকবে, সত্যিই কি পারবো তাকে একটা দিনের জন্যও ভুলতে, তাই কি পারা যায়? যে শুধু আমার জীবনে কাব্যের সুরধুনীই বইয়ে দেয়নি, সেই সঙ্গে প্রথম যৌবনকেও লক্ষরাগে রাঙিয়ে দিয়েছে হাসি দিয়ে, কথা দিয়ে, চুম্বন দিয়ে, তাকে জীবন থেকে নিঃশেষে ঝরিয়ে দেওয়া কি এতই সহজ! চিঠির অক্ষরগুলো সম্বন্ধে যেদিন অন্ততঃ কিছুটাও সচিৎ ফিরে আসবে অনিমার, সেদিন বুঝি লজ্জায় মুখ ঢাকবার পথ পাবে না সে! কিন্তু তা হলেও কি আজকের সমস্যা কিছু মিটলো? সেখানে একটা দারুণ বিশ্ববিনাশের সামনে আমার অতীত আর ভবিষ্যৎকে একই তরীতে রেখে নিয়ে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা কেবলই মুমূর্ষুর মতো চিৎকার ক'রে উঠ্‌ছে, সেখানে নিতান্ত আত্মস্বার্থের খাতিরে এ কোন্ অভিনয় ক'রতে চাইলো অনিমা? হঠাৎ অতীতের একটা টুকরো ইতিহাস চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌লো। প্রথম যেদিন অধ্যাপক সিদ্ধান্তর ঘর থেকে অনিমাকে নিয়ে বেরিয়ে আসি, কথায় কথায় ঠাট্টা ক'রে একবার বলেছিলাম: 'মিথ্যাচারিণীর প্রণয় আলেয়ার মতো না একদিন আঘাত ক'রে ব'সে! তাই তো এত সতর্কতা।' উত্তরে ঠাট্টা ছেড়ে হঠাৎ কিন্তু গম্ভীর হ'য়ে গিয়েছিল অনিমা, ব'লেছিল: 'মেয়েরা ছেলে নয় যে সাত ঘাটে ডুবে ডুবে জল খায়। তারা এক ঘাটেই ডোবে। সেই অনিমা এ আজ কোন্ চিঠি লিখলো আমাকে! সে-দিনের প্রেম কি আলেয়ার মতই আজ একটা বিভ্রান্তিকর কঠিন আঘাতে আমার সমস্ত অস্তিত্বকে গুঁড়িয়ে দিলনা?

ঝাঁ ঝাঁ ক'রছিল মাথার ভিতরটা। আর ভাবতে পারলুম না, হঠাৎই কেমন যন্ত্রচালিতের মতো দ্রুত উঠে প'ড়ে মার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে প'ড়লাম। আজ অপেক্ষা-কৃত অনেকটা সুস্থ ছিলেন মা। খাটের উপর উঠে ব'সে চিরুনী দিয়ে নিজের হাতেই চুল আঁচ্‌ড়াচ্ছিলেন। কিছু-মাত্র ভূমিকার অবতারণা না ক'রেই ব'ল্‌লাম, 'তুমি ডিহিরীতে চিঠি দিয়ে বিয়ের যা কিছু ব্যবস্থা করো মা, আমি প্রস্তুত, আমার আর বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।'

মেঘমেদুর আকাশে চাঁদের আলো ছড়িয়ে প'ড়লে আকাশের বর্ণচ্ছটায় যে লালিমা দেখা দেয়, মার রোগ পাণ্ডুর বিষণ্ণ মুখখানিতেও তেমনি একটা প্রচ্ছন্ন হাসির স্পর্শ লেগে অতিবড় গাম্ভীর্যের মধ্যেও কেমনই একটা প্রসন্নতা ফুটে উঠলো। মাথা থেকে চিরুনী নামিয়ে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে নীরবে তাকিয়ে রইলেন মা, তারপর আবেগমিশ্রিত কণ্ঠে ব'ল্‌লেন, 'তুই তবে সত্যিই আমার মুখ রাখ্‌লি খোকা?'

ব'লুলাম, 'রাখ্লাম।'

হাত বাড়িয়ে একেবারে কাছে টেনে বসাতে চাইলেন না। ব'লুলেন, 'আর একটু কাছে এসে ব'স আমার, কেবল তো ঘড়িধরা সময় নিয়ে এসে রোগীর শুশ্রূষা ক'রেই যাচ্ছিস, এর বাইরে আর কি কোন কথা নেইরে খোকা?'

উত্তর দেবার কিছু ছিল না। যথাসম্ভব নিজেকে কিছুটা পাশ কাটিয়ে নেবার প্রয়াসেই ব'লুলাম, 'এক্ষুণি আমাকে একবার না বেরুলে নয়। দিদিকে তোমার পথ্যের কথা ব'লে যাচ্ছি।' ব'লে ত্বিলার্ধ আর বিলম্ব না করে ঘর থেকে বেরিয়ে প'ড়লাম।

বাইরে যে সত্যিই কিছু কাজ ছিল, তা নয়। তবু গৃহ-পরিবেশের মধ্যে নিজেকে নিয়ে বড় বেশী তিষ্ঠোতে পারছিলাম না। ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম ক'রে এক-সময় আমাদের সেই নির্দিষ্ট মাঠের কৃষ্ণচূড়া গাছটার সামনে এসে ব'সলাম। আজও তার কচি পাতাগুলোর ফাঁক দিয়ে দেখা গেল বটে এক ফালি চাঁদকে, কিন্তু এ চাঁদ যেন সে-চাঁদ নয়! মরা হলদের মতো চাঁদেও যেন পাণ্ডুরতার চিহ্ন। মনে প'ড়লো আর একটি দিনের কথা। সেদিনও ছিল এমনিই ধূসর তামসী রাত্রি, আমার দুই বাহুবন্ধনের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষে ছেড়ে দিয়ে অণিমা আবৃত্তি ক'রে ব'লেছিল—

…'যে মালা গেঁথেছি আজি তোমারে সঁপিতে উপহার
তারি দলে দলে
নামহারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষা কাহিনী
আঁকা অশ্রুজলে।
সদ্য সেচনসিক্ত নবোদ্ভুক্ত এই গোলাপের
রক্ত পত্রপুটে—
কম্পিত কুণ্ঠিত কত অগণ্য চুম্বন ইতিহাস
রহিয়াছে ফুটে।

অমর বেদনা মোর হে বসন্ত, রহি গেল তব
মর্মর নিঃশ্বাসে।
উত্তপ্ত যৌবনমোহ রক্তরৌদ্রে রহিল রক্তিত
চৈত্র সন্ধ্যাকাশে।'

সেদিন হয়ত সত্যি সত্যিই চৈত্রের সন্ধ্যা ছিল। সেই সন্ধ্যাটাকে ঘিরেই মনের ভিতরটা আর একবার মোচড় দিয়ে উঠলো। সেই সন্ধ্যা আজ চিরদিনের জন্যই নিঃশেষ হ'য়ে গেল জীবন থেকে। ভাঙা হাটে আর যাহোক্ পসার কোথাও জমে না। আর ফিরে আসবে না সেই সন্ধ্যা এই জীবনে। তার উপর দিয়ে বুঝি নিজের অলক্ষ্যেই যবনিকার কালো পর্দাখানি টেনে দিল অণিমা! সেই পর্দা কি সত্যিই আর উঠবে, দেখা দেবে কি স্মৃতিমঞ্চের সেই সব সুসজ্জিত দৃশ্যপট, খুলে যাবে কি চোখের সামনে আলোর সহস্রদল? যে জীবন সুরু হ'য়েছিল আমাদের অধ্যাপক সিদ্ধান্তর ক্লাসে, আর কি সে জীবনে সহস্র পাপড়ি-দলে প্রজাপতির ডানা কাপটানি দেখা যাবে, দেখা দেবে কি এই পাণ্ডুর বিষণ্ণ রাত্রির শেষে নবীন সূর্যোদয়?

[ক্রমশঃ]

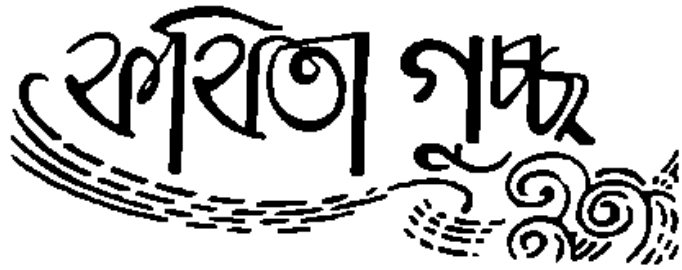

অপরাহ্ণ

পারুল ঘোষ

জীবনের ভালো দিনগুলি
কেটে যায় খেলায় খেলায়—
কাজের আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে
তারপর এক অবেলায়।

যখন মধ্যাহ্ন অবসান,
পশ্চিমে পড়েছে সূর্য্য হেলে—
উন্মাদের মত বিহঙ্গেরা
কুলায়ে ফিরিছে খেলা ফেলে,
তখন জাগ্রত আশা নিয়ে
যেতে চাই দূর দূরান্তর—
অতীতের ব্যথা অপচয়
ভেবে ভেবে কাতর অন্তর···
কিন্তু হায়, বহু দীর্ঘ পথ,
সম্মুখেতে আসন্ন আঁধার—
মহাপথে পড়ে যবনিকা,
সব খেলা সাঙ্গ এইবার।

সন্ধ্যাসাথীকে

বিবেককুমার রায়

সাহসের সাথে এসো। কথা বলো, আমি
শুনবো তা' আকাশের দিকে তুলে মাথা,
যা খুশী ব'কতে পারো ;লাভ ক্ষতি নেই,
আবোল তাবোল এলোমেলো ব'লো যা' তা'।

জানি তা', জানি তা আমি তোমার করুণ
দু'চোখের ভাষা। মনে কোনও আগুন
হয়তো জ্বলেছে তার দাবদাহজ্বালা
দাবাগ্নি ছড়ায়, লাভ নেই ছিঁড়ে মালা।

কাছে এসো, বসো আজ। এক ঝাঁক পাখী
গান গায় এই বনে ; দুইধারে ফুল
ফুটেছে হাসির মতো। তুমি জানো নাকি
লজ্জা নেই যদি করো একটুক ভুল।

সিমেন্ট কংক্রীটে বাঁধা পথ জীবনের
ছেড়ে দুলোকাদা মাখা কোনও গ্রামের
ছায়াপথে নেমে এসো : নাগরিক বাধা
হয়তো হারাবে ঠিক, হারাক মর্যাদা।

অনন্ত যাত্রা

অম্ভোপতি দাসগুপ্ত

তুমি কি ভেবেছ মনে এ-পথের শেষ আছে কোনো
বিশ্রামের বেদী আছে পথপ্রান্তে কুজ্ঝটিতলে ?
ভ্রান্ত এই মিথ্যা আশা, আমি জানি স্থির বলি শোনো
দিগন্তকে পার হ'য়ে এই পথ চলে আর চলে।

এ-জিজ্ঞাসা সীমাহীন, ক্লেদ নেই ক্লান্তিহরা যতি,
এ পথের শেষ নেই,—এ প্রেমের শেষ নেই জেনো ;
অতৃপ্ত এ অভিসারে সঙ্গী শুধু অবিশ্রান্ত গতি—
রক্তাক্ত চরণে শুধু ঘুরে ঘুরে এ পৃথিবী চেনো।

জন্মের প্রথম হাসি, মরণের শীর্ণ মধুরিমা—
পার হ'য়ে যাত্রী তোর চলে গেছে অন্তহীন পথ ;
সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, আকাশেতে অনন্ত নীলিমা,
হাজার নক্ষত্র জ্বেলে নিয়ে তার উজ্জ্বল শপথ।

দিগন্তের ছায়াতলে কালের রাখাল ডাকে দূরে,
অসীমের বাঁশী হাতে ; শুধু ভেসে চলি তার সুরে।

প্রণাম

অমলকান্তি ঘোষ

বর্তমানের নোঙর তেঙে
মনের জাহাজ চলল ভেসে,
কুজ্ঝটিকায় ঘুমভরা
অতীত মহা-সমুদ্রেতে,
তোমার দেশে খামল এসে,
আবার তোমার সঙ্গ নিতে।

ব্যর্থ প্রয়াস, সঙ্গ তোমার
আর পাব না এই জীবনে।
বিহঙ্গ যে পালিয়ে গেছে,
অশেষ আয়াস করেও তারে
দেখতে পাব আর কি বনে!
পড়বে জীবন তাপ-পাথারে।

মাগো, তোমার পড়লো মনে
সন্ধ্যাবেলায় পড়ার ফাঁকে।
তোমার হাসি, স্নিগ্ধ তবু
অন্তরে তার কান্না বলে।
রাখলে সারা জীবনটাকে
অশ্রুজলের অতল তলে।

পড়লো মনে পল্লী-সহর
পল্বলে যার পদ্ম ফোটে!
সেই সহরে কাঁঠাল তলে
টিনের কোঠার কোণায় কোণায়
অনেক স্মৃতি চমকে ওঠে,
দমকা হাওয়ায় কান্না শোনায়।

কান্না শোনায় বর্ষারাতে,
কান্না সে কার, বলবে কে তা'!
কার সে ব্যথা দেয় অযথা
মনের দেশে বজ্রধারা!
করুণ কেন জাগছে দেখা,
চৌদিকে তার অন্ধকারা!
অশ্রু, সে আজ শুকিয়ে গেছে,
কান্না সেত' কণ্ঠছাড়া,
চিনেছি এই বিশ্বটাকে,
তাই ভরা মন অট্টহাসে;
ব্যথার গাথা, পাগল যারা
তারাই গা'সে রুদ্ধ শ্বাসে।

এই পৃথিবীর অক্টোপাসের
শক্ত পাকে জড়িয়ে আছি!
রুক্ষ কলুষ অলক্ষিতে
অন্তরে মোর চিত্র আঁকে।
করছি সবাই নাচানাচি
অহঙ্কারের বিষম ফাঁকে।

তাইত আমি মুক্তি মাগি।
চিত্ত যে মোর তপ্ত নরক;
বুষ্টিধারায় ধৌত এই—
বক্ষে জ্বলে দগ্ধজ্বালা;
নেইক সেথায় শান্তিতরু,
নেইক শ্যামল কাননমালা।

শুধুই মুক্তি স্নিগ্ধ স্নেহ।
কিন্তু বিপদ, রয়না মনে,—
কাঙাল কভু পায় না নাগাল
জনমপ্রিয় আকাঙ্ক্ষিতের;
পায়ের নীচের মাটির সনে
নেই মিতালি লুব্ধ চিতের।

তাইত ভাবি, ভুলব তোমায়,
ভাবব না আর তোমায় নিয়ে!
অজস্রতার অকূল নীরে
ডুবুক তোমার স্মৃতির তরী।
কিন্তু তোমায় ভুলতে গিয়ে
শক্ত করে জড়িয়ে ধরি।

মাগো, তোমায় পড়ল মনে
সন্ধ্যাবেলায় পড়ার ফাঁকে,
তোমার হাসি, স্নিগ্ধ তবু
অন্তরে তার কান্না বলে।
রাখলে সারা জীবনটাকে
অশ্রুজলের অতলতলে।

অশ্রুজলের অতল তলে,
অমানিশার বিষম ঘোরে
হারিয়ে গেছ; হারিয়ে গেছে
মোর জীবনের একটু আশা;
আজকে দেখি, উষর তোরে
নেইক আলো, তাই কুয়াশা।

প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্র

শ্রীপ্রভাংশু গুপ্ত

নাট্যগুরু পরম ধার্মিক ভরত মুনি সবে জপ শেষ ক'রেছেন,—আশে-পাশে বসে আছেন তাঁর ছেলেরা, শিষ্য প্রভৃতি। এমন সময়ে অত্রির ঋষি ও আরো কয়েকজন মুনি এসে ভরতকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে বসলেন।

হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন ভরত।

অত্রি বললেন—নাট্য-বেদ সৃষ্টি ক'রেছেন আপনি। আমরা এই নাট্য-বেদ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবার জন্য আপনার কাছে এসেছি। নাট্য-বেদ সৃষ্টি হ'ল কি ক'রে? নাট্য-বেদের স্বরূপ ও সংজ্ঞা কি, কয় অংশে এই নব বেদ বিভক্ত ও কাদের মঙ্গলের জন্য এই বেদ রচনা ক'রেছেন, তা আপনাকে বলতে হবে।

বললেন ভরত—তবে শোনো মন দিয়ে। স্বয়ম্ভুব মনুর রাজত্ব শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সত্য বা স্বর্ণ যুগেরও অবসান হ'ল। শুরু হ'ল ত্রেতা বা রৌপ্য যুগ,—তখন বৈবস্বত মনুর রাজত্ব। ঐ সময়ে লোকচরিত্র নীচের দিকে নামতে লাগলো। ভোগ-বিলাস, লোভ, হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ,আকাঙ্ক্ষা মানুষের জীবনে আনতে লাগলো অশান্তি দুঃখ ও দুর্দশা। জম্বুদ্বীপ—নামে এই ভারতবর্ষে তখন দেবতা, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগের সংখ্যাও বড় কম ছিল না। দেবরাজ ইন্দ্র একদিন অন্যান্য দেবতাদের নিয়ে উপস্থিত হ'লেন পিতামহ ব্রহ্মার কাছে। ব'ললেন করজোড়ে—পিতামহ, এমনধারা জীবনে বৈচিত্র্য আনবার জন্য এমন একটি জিনিষ সৃষ্টি করুন যা শুধু দর্শনীয় নয়, শ্রবণীয়ও বটে। বেদে অধিকার নেই শূদ্রের—দয়া ক'রে আপনার সকলের জন্য সৃষ্টি করুন আর একটি বেদ।

[পঞ্চম বেদ]

ব্রহ্মা ইন্দ্রের অনুরোধ ফেলতে পারলেন না। ব্রহ্মা ধ্যানে বসলেন এবং মনে-মনে চতুর্বেদকে স্মরণ করলেন। স্থির করলেন সৃষ্টি করবেন তিনি আর একটি নূতন বেদ—নাট্য-বেদ। এই নব বেদ মানুষকে কর্তব্য-পালনে, অর্থ ও যশ অর্জনে, ধর্ম, লোকাচার ও আইন রক্ষণে হবে সহায়ক। এই নূতন বেদে থাকবে সৎযুক্তি ও উপদেশ এবং মানব-কল্যাণের আরো বহু বিষয়-বস্তু। মানুষকে দেবে এই বেদ পথ-নির্দেশ, শুধু চিন্তায় নয়, কাজেও বটে। শাস্ত্রের যাবতীয় মূলকথা থাকবে এই বেদে। তাছাড়া শিল্প-কলার পর্যালোচনাও থাকবে এই পঞ্চম বেদে।

এই ভেবে পিতামহ ব্রহ্মা চতুর্বেদকে স্মরণ করলেন। প্রতিটি বেদ থেকে কিছু কিছু নিয়ে তিনি এই অপূর্ব নাট্য-বেদের সৃষ্টি করলেন। আবৃত্তির অংশ গ্রহণ করলেন ঋগ্‌বেদ থেকে, সংগীত নিলেন সাম বেদ থেকে, যজুঃ থেকে নিলেন অভিনয়-কলা ও অথর্ব থেকে নিলেন ভাব ও রস।

সৃষ্টি হ'ল এইভাবে জগতের কল্যাণের জন্য পঞ্চম বেদ বা নাট্য-বেদ।

ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বললেন—নাট্য-বেদের জন্ম হ'ল। এর ভেতর ইতিহাস ও কাহিনীর ইঙ্গিতও আছে। তা' নাট্যাকারে রূপান্তরিত ক'রে উপযুক্ত দেবতাদের দ্বারা অভিনয় করাও।

দেবরাজ উত্তর দিলেন—পিতামহ! নাট্য-বেদ দেবতাদের বোধগম্য হবে না। তারা যথোপযুক্ত এর ব্যবহার করতে পারবে না। নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে তারা অজ্ঞ ও অনুপযুক্ত। একমাত্র বেদ-জ্ঞানসম্পন্ন মুনিরাই এই নাট্য-বেদের মর্ম বুঝতে পারবেন। তাঁরাই এই শাস্ত্র লোকের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত করতে পারবেন।

ভরত মুনি এইবার থেমে গেলেন। আত্রেয় ও অন্যান্য মুনিরা প্রশ্ন করলেন—তারপর?

বললেন ভরত মুনি—ব্রহ্মা আমাকে ডেকে বললেন—ভরত। এই নাট্য-বেদ তোমায় কাজে লাগাতে হবে। তুমি তোমার একশত পুত্রকে নিয়ে নাট্য-বেদের সদ্ব্যবহার করো।

[অভিনয় রীতি]

তারপর ভরত ব'লে চললেন—এই নির্দেশ পেয়ে আমি পিতামহের নিকট থেকে নাট্য-বেদ সম্বন্ধে শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করলাম। আমি নিজে আমার উপযুক্ত পুত্রদের নাট্য-বেদ অধ্যয়নে সাহায্য করলাম। তারপর আমি এক অভিনয়েরও ব্যবস্থা করলাম—আমার পুত্রদের দিলাম অভিনয়ের বিভিন্ন ভূমিকা। ভারতী (বাচনিক), সাত্বতি (উচ্চভাব) ও আরাভতী (প্রাণবাণ) নাট্য-অভিনয়ের তিন নীতি বা রীতি অভিনয়-ব্যবস্থায় প্রবর্তন করলাম।

ব্রহ্মার কাছে গিয়ে আমার প্রচেষ্টার কথা নিবেদন ক'রতে তিনি আমাকে অভিনয়ে কৈশিকী-রীতি (কমনীয় ভাব) প্রবর্তন করতে বললেন। শিব-নৃত্যে আমি এই রীতি লক্ষ্য করেছিলাম—এই রীতি প্রেম-ভাব প্রকাশের পক্ষে উপযুক্ত। কিন্তু অভিনয়ে এই ভাব বা রীতির রূপ দিতে গেলে দরকার হয় সুদৃশ্য পোষাক-পরিচ্ছদ, রস ও ভাব। এর প্রধান বস্তু হ'ল নাটকীয় ঘটনা প্রবাহ। নারীদের বাদ দিয়ে শুধু পুরুষের দ্বারা এই রীতি অভিনয়ে উপযুক্তভাবে প্রয়োগ ও প্রকাশ করা যায় না।

সুতরাং পিতামহ তাঁর মন থেকে সৃষ্টি করলেন অপ্সরাদের। নাটকের ও নাট্যাভিনয়ের রূপ ও শোভা বর্ধনে এই অপ্সরাদের কৃতিত্ব ছিল অপরিসীম। নাট্যাভিনয়ে সাহায্য করবার জন্য ব্রহ্মা এই অপ্সরাদের আমায় অর্পণ করলেন। তাদের নাম—মুক্তকেশী, সুকেশী, মিশ্রকেশী, সুলোচনা, সৌদামিনী, দেবদত্তা, দেবসেনা, মনোরমা, সুদতী, সুন্দরী, বিদগ্ধা, সুমালা, সম্ভতি, সুনন্দা, সুমুখী, মাগধী, অর্জুনি, সরলা, কেরালা, ধৃতি, নন্দা সুপুষ্কলা, ও বলাভা।

ব্রহ্মা তারপর স্বাতী, ঋষি ও তাঁর শিষ্যদের দিয়ে বাদ্যযন্ত্রের ও বাদ্যের এবং গন্ধর্ব—যথা নারদ ও অন্যান্যদের—দিয়ে সংগীতের ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। এইভাবে নাট্য-বেদে সম্পূর্ণ ব্যুৎপত্তিলাভ করবার পর আমি আমার শত পুত্র, স্বাতী ও নারদকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মার নিকট পুনরায় উপস্থিত হ'য়ে নিবেদন করলাম—আপনার কৃপায় নাট্য-বেদের জ্ঞান সম্পূর্ণ অর্জন করেছি। এখন আপনার আদেশ কি?

এ-কথা শুনে পিতামহ বললেন—নাট্যাভিনয়ের অপূর্ব সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। দেবরাজ ইন্দ্রের পতাকা উৎসব আরম্ভ হয়েছে—ঐ স্থানে নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা কর।

[বিজয় উৎসব ও অভিনয়]

চ'লে গেলাম সেথা ঐ উৎসবক্ষেত্রে। দেবাসুরের যুদ্ধে অসুর নিধনের পর ইন্দ্রের এই বিজয় উৎসব। সব দেবতাই উৎসব উপলক্ষে ঐ স্থানে উপস্থিত ছিলেন। আমি দেবাসুরের যুদ্ধ নাট্যাকারে রূপান্তরিত ক'রে তা' মঞ্চস্থ করলাম। অভিনয় দেখে ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতারা খুশী হয়ে আমাদের পুরস্কার দিলেন। ইন্দ্র দিলেন তাঁর পতাকা, ব্রহ্মা কুটিলকা (বিদূষকের ব্যবহারের জন্য বক্র দণ্ড), বরুণ স্বর্ণ-কলস, সূর্য ছত্র, শিব সিদ্ধি (সাফল্য), বায়ু পাখা। বিষ্ণু দিলেন সিংহাসন, কুবের মুকুট, ও দেবী সরস্বতী দিলেন দর্শন ও শ্রবণের বিশেষ শক্তি।

উৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত অবশিষ্ট দেবতারা, গন্ধর্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগগণ আমার পুত্রদের বিভিন্ন অংশে অভিনয়ার্থে বাক্ কুশলতা, ভাব, রস, শারীরিক স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য শক্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন ও ভাবভঙ্গী প্রকাশ করবার ক্ষমতা প্রদান করলেন। তাছাড়া, তাঁরা চমৎকার অলঙ্কারও উপহার দিলেন।

যখন অভিনয় পুনরায় আরম্ভ হ'ল ও দৈত্য-নিধনের দৃশ্যের অবতারণা করা হ'ল, তখন অভিনয়ে উপস্থিত দৈত্যেরা বিঘ্ন বা অশরীরী দুরাত্মাদের ডেকে পাঠালো। তারা তাদের নেতা বিরূপাক্ষ সহ উপস্থিত হলে দৈত্যেরা বললে—এস, ঐ অভিনয় আমরা হ'তে দোব না, কিছুতেই দোব না।

তারপর ঐ বিঘ্নেরা অসুরদের সঙ্গে একজোট হ'য়ে মায়ার আশ্রয় নিয়ে মায়াবী শক্তি অভিনেতাদের ওপর প্রয়োগ করলো। সঙ্গে-সঙ্গে হারালো বাক্‌শক্তি ও স্মরণ শক্তি অভিনেতারা। তারা হ'য়ে গেল নিশ্চল—নিথর—নীরব।

সহসা অভিনয়ে এই বাধার সৃষ্টি হওয়াতে ইন্দ্র ধ্যানে বসে কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখলেন নাট্যাচার্য্য (সূত্রধর) ও অন্যান্য অভিনেতাদের ঘিরে ব'সে আছে অশরীরী দুরাত্মারা—চোখে তাদের দেখা যায় না—তাদেরই মায়ার প্রভাবে অভিনেতাদের ঐ দুরবস্থা।

ক্রোধে ইন্দ্র তখন ধ্যানাসন থেকে উঠে মণি-মুক্তা খচিত বিচিত্র জর্জ্জর হাতে নিয়ে অসুর ও বিঘ্নদের দারুণ প্রহারে নিধন করলেন। দেবতারা তখন আনন্দে ভরতকে বলে উঠলেন—তুমি এক দেবাস্ত্র লাভ করলে। এই অস্ত্র প্রহারে অসুরদের ও দুরাত্মাদের জর্জ্জরিত ক'রে বধ করা হ'য়েছে—এর নাম হবে জরজর। অবশিষ্ট শত্রুরা যদি আবার বাধা দিতে আসে, তাদেরও অনুরূপ দুরবস্থা হবে।

ইন্দ্র দেবতাদের বললেন—তাই হোক্ এই জরজর অভিনেতাদের ক'রবে রক্ষা।

পরে যখন আবার অভিনয় সুরু হ'ল এবং ইন্দ্রের বিজয় উৎসব মহাসমারোহে চললো, বিঘ্নেরা বা অশরীরী দুরাত্মারা পুনরায় অভিনেতাদের আশে-পাশে বিভীষিকার সৃষ্টি করতে লাগলো।

ভরত একটু থেমে আবার ব'লে চললেন—অভিনয় কাহিনী ও দৃশ্যে দৈত্যদের অপমান এই সব উৎপাতের মূল কারণ, এই ভেবে আমি আমার পুত্রদের নিয়ে ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হ'য়ে নিবেদন করলাম—অসুর ও বিঘ্নেরা অভিনয় পণ্ড করতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। অভিনয় রক্ষার কি ব্যবস্থা করা যায় আদেশ দিন।

পিতামহ ব্রহ্মা তখন বিশ্বকর্মাকে ডেকে একটি চমৎকার রঙ্গালয় নির্মাণ করবার নির্দেশ দিলেন।

[প্রথম রঙ্গালয়]

রঙ্গালয় নির্মাণ হবার পর বিশ্বকর্মা পিতামহের কাছে গিয়ে ঐ রঙ্গালয় পরিদর্শন করবার জন্য অনুরোধ করলেন। অতঃপর ব্রহ্মা, দেবরাজ ও অন্যান্য প্রধান দেবতাদের নিয়ে রঙ্গালয় পরিদর্শন করতে গেলেন। রঙ্গালয় দেখবার পর ব্রহ্মা দেবতাদের বললেন—তোমরা প্রত্যেকেই রঙ্গালয় রক্ষার জন্য পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। চন্দ্র রক্ষা করবে মূল অট্টালিকা, অট্টালিকার পার্শ্ব রক্ষা করবে লোকপালরা। মারুত পাহারা দেবে চতুষ্কোণ, বরুণ অট্টালিকার মধ্যস্থল। মিত্র নৈপথ্য, অগ্নি ভিত্তি, মেঘ বাদ্যঘর, বর্ণ স্তম্ভরাজী, আদিত্য ও রুদ্র স্তম্ভের মধ্যবর্তী স্থান, ভূত রঙ্গালয়ের আসন, অপ্সরা ঘর, যক্ষিণীরা সমগ্র অট্টালিকা, সমুদ্রের দেবতা ভূমি, ঘর প্রবেশ-দ্বার, নাগরাজ-দ্বয় বাসুকী ও অনন্ত দ্বারের দুই পার্শ্ব।

নিঋতি ও যমকে প্রবেশদ্বারের প্রহরী করা হ'ল। স্বয়ং ইন্দ্র রইলেন মঞ্চের পাশে। জরজর অর্থাৎ ইন্দ্রের পতাকা-দণ্ডে বজ্র রাখা হ'ল। রঙ্গালয়ের সবচেয়ে ওপরের স্থানে বসলেন ব্রহ্মা, তারপর যথাক্রমে শিব, বিষ্ণু, কার্ত্তিক ও নাগ-শ্রেষ্ঠ শেষ বাসুকী ও তক্ষক। রঙ্গালয়ের অন্যান্য স্থানে অবশিষ্ট শক্তিশালী শ্রেষ্ঠ দেবতাদের মোতায়েন করা হ'ল।

ব্রহ্মা বললেন—ইন্দ্র রক্ষা করবে অভিনয়ের নায়ককে, সরস্বতী নায়িকাকে ও শিব অন্যান্য অভিনেতাবৃন্দকে।

(ক্রমশঃ)

BENGAL JUTE MILL

COMPANY LIMITED

6, Dalhousie Square East,
CALCUTTA.

Manufacturers of all Qualities of

JUTE GOODS

FASHIONABLE JUTE CARPETS
For All Purposes and at Economical Rates

Available in Various Shades and Designs

JACQUARDS, DOBBIES, FLOOR RUNNERS,
CHAIR CLOTHS & SCHOOL MATTINGS.
ALSO JUTE WEBBINGS

Twines, Spool and Cops Our Specialities

WANTED AGENTS FOR UNREPRESENTED AREAS

TELEGRAMS & CABLES
CALCUTTA-(INDIA).
"HEMPBALER"

TELEPHONES
MILLS: HOWRAH-13
OFFICE 22-6853-58

দেশ ও বিদেশ

জেনেভা বৈঠক

চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলন শেষ হইয়াছে। সম্মেলনে যে সমস্ত প্রশ্নের আলোচনা হয় তাহার কোন একটি সম্পর্কেও মীমাংসার সন্নিকটবর্তী হওয়া গেল না: জার্মানীর পুনর্বিন্যাস, ইওরোপীয় নিরাপত্তা, নিরস্ত্রীকরণ, পূর্ব-পশ্চিম সংযোগের উন্নতি বিধান।

বস্তুতঃ যুদ্ধোত্তর ইওরোপে ইহাই প্রধান রাজনৈতিক সমস্যা। যুদ্ধে যাহারা হারিবার তাহারত হারিয়াছে এবং যাহারা জয়ের গৌরব পাইবার তাহারও তাহা পাইয়াছেন। কিন্তু বিভক্ত জার্মানীতে পুনরায় যে কূটনৈতিক খেলা শুরু হইয়াছে তাহা আবার ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সৃষ্টি করিল।

এই ঠাণ্ডা লড়াই যে চিরকাল ঠাণ্ডা থাকিবে তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। দুই শিবিরেই—অর্থাৎ (সোভিয়েট শিবির ও ইঙ্গ-মার্কিণ শিবির) কর্মতৎপরতা চলিতেছে। এবং গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় উভয় শিবির—কাহার কোথায় সবলতা ও দুর্বলতা তাহা টের পাইয়াছে। কাজেই কোন পক্ষই আজ কাহারও নিকট Unknown quantity নহে। এই অবস্থার মধ্যে রাষ্ট্রপ্রধানেরা একবার জেনেভায় বসিলেন, আবার পররাষ্ট্রসচিবেরা বসিলেন। মূল সমস্যার কেন্দ্র হইতে কেহই এক তিল নড়েন নাই।

প্রথমতঃ জার্মানীর অবাধ নির্বাচন—ডালেস ভায় মতে ইহার গুরুত্ব সোভিয়েটের নিকট অনেক বেশী। কেননা একবার অবাধ নির্বাচন শুরু হইলে ইহার প্রতিক্রিয়া নাকি সোভিয়েট কবলিত সর্বদেশে ব্যাপক হইয়া পড়িবে। অতএব সোভিয়েট রাশিয়া তাহা চায় না। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব ম্যাকমিলান ভায় মতে ইহা একটি পশ্চাদ্বর্তী পদক্ষেপ এবং সোভিয়েট মনোভাব দেখিয়া মনে হয় যে জার্মানীরও যে স্বাধীনতা দাবীর অধিকার আছে, তাহা সে স্বীকার করে না।' বস্তুতই ইহা এক পক্ষের মতবা। অন্য পক্ষ অর্থাৎ সোভিয়েট পক্ষ জার্মানীর সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়াছে কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। গত তিরিশ বছরের মধ্যে জার্মানী দুই যুদ্ধ বাধাইয়া সমগ্র বিশ্বকে তটস্থ করিয়া তুলিয়াছে, ইহার পরও যদি জার্মানীকে পুরাতন জঙ্গী জার্মানী করিয়া ছাড়িয়া দিতে হয় তাহা হইলে সম্ভবত ইওরোপে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি বৃদ্ধি করা হইবে। সোভিয়েটের সন্দেহ এই পর্যায়ে উঠিয়াছে। অবশ্য এই সন্দেহ যুক্তিযুক্ত কিনা তাহাও ভাবিয়া দেখিবার। কেননা, একটা জাত কোন কারণ না থাকিলেই যে জঙ্গী হইয়া উঠিবে তাহার প্রমাণ কি?

মধ্যপ্রাচ্যের ঘূর্ণাবর্ত

মধ্য প্রাচ্যে এত দিন নিছক আরব ইস্রায়েল দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু মিশরে স্বাধীন সত্তা প্রকটিত হইবার পর রাজনীতি—কূটনীতির স্রোতটা উল্টো পথে ধাইতেছে। যাহা এক কালে ইঙ্গ ফরাসী প্রভাবপুষ্ট এলাকা ছিল তাহা গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইঙ্গ-মার্কিন হইয়াছে। শক্তির এ ভারসাম্য বদলে মধ্যপ্রাচ্যে যে কিছু প্রতিক্রিয়া হয় নাই এমন নহে। মার্কিনরা তেলের সন্ধানে ফিরিতেছে, মধ্য প্রাচ্যের খেজুরের ব্যবসায়কে টাকা দাদন করিতেছে। আর ব্রিটিশ রাজনীতি সুয়েজ হইতে ঘরে ফিরিবার পথে তাই চাহিয়া দেখিতেছে। এই রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতেই মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতির বিচার হওয়া প্রয়োজন। ব্রিটিশ কূটনীতির একটা বিশেষ ভরসা এই যে সে কোন অবস্থায়ই একক নহে। সে যুক্তভাবেই কাজ করিতেছে। মিশর

ব্রিটিশ কূটনীতিকে একবার স্থদানে চ্যালেঞ্জ করিয়াছে—অর্থাৎ ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়াছে। ইহাতে ব্রিটিশ কূটনীতি মুখ্যত ধমকিয়া দাঁড়াইয়া অন্য পথে চাপ বৃদ্ধি করিবার প্রয়াস পাইতেছে। ব্রিটেনের স্থষ্ট ইহুদী রাষ্ট্র আজ আবার জাতির দুশ্চিন্তার কারণ। ব্রিটেন ও মার্কিন এই ইহুদী রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধির পথে চাপ দিতেছে। ফলে মিশরকে আবার তাহার আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্রের সন্ধানে ছুটিতে হইতেছে। মিশর নিজে স্বীকার করিয়াছে যে, আমরা মার্কিনী অস্ত্রশস্ত্র কিনিতে প্রস্তুত ছিলাম—কিন্তু দাম বেশী। পূর্ব ইওরোপীয় রাষ্ট্রেরা অর্থাৎ সোভিয়েট রাষ্ট্রগোষ্ঠী ইহার সুযোগ লইয়াছে। তাই চেকোশ্লোভাকিয়া ভাবা দরে অস্ত্র সরবরাহ করিতে রাজী হইয়াছে। শীকার হাত ছাড়া হইতেছে দেখিয়া ব্রিটেন ও মার্কিন গোসা করিয়াছেন। এবং মধ্যপ্রাচ্যে রুশ প্রভাব বৃদ্ধির একটা জিগির তুলিয়াছেন। রুশরা কূটনীতিতে ইঙ্গ-মার্কিনের সঙ্গে টক্কর দিয়া চলিতেছে। তাহারা কূটনীতি ওজন করিয়া এবার ব্যবসায় নামিতেছে। 'সস্তা দরে ভাল মাল দিব, সম্পর্ক একবার গড়িয়া উঠিলে—প্রভাব ও রাজনীতি আপনা হইতেই আসিবে।' সম্ভবত বর্তমানে রুশ কূটনীতি এই পথেই চলিতেছে। রুশরা বিশ্ববাণিজ্যে নামিয়া পেশাদার ধনতন্ত্র দেশকে বিপদে ফেলিয়াছে। কেননা, পণ্যদ্রব্য উৎপাদনে ইহাদের costing (অর্থাৎ ব্যয়) আর ধনতন্ত্রী দেশের ব্যয় একরূপ নহে। ফলে ইঙ্গ-মার্কিনদের প্রতিযোগিতায় আটিয়া ওঠা মুস্কিল হইয়াছে। রাজনৈতিক বিপদের চেয়ে এ বিপদ ভয়াবহ। মধ্যপ্রাচ্যে মিশরকে অস্ত্র সরবরাহ-বিভ্রাটের মূলে এই সব শক্তি ক্রিয়া করিতেছে। মিঃ ইডেন, মিঃ ডালেস ধমকাইতেছেন। লাঠি উঁচাইয়া খুব সতর্কতার সহিত মহাশূন্যে ঘুরাইতেছেন। যেন কোন ক্রমে মিশরের গায়ে না পড়ে। কেননা, ঘা খাইয়া একবার বিমুখ হইয়া দাঁড়াইলেই-ত রুশদের শক্তি বৃদ্ধি হইবে।

দ্বিতীয়তঃ নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা। ইওরোপীয় শক্তিবর্গ এতাবৎকালের মধ্যে শস্ত্রকে প্রাধান্য দিয়া আসিয়াছে। এবং শস্ত্র যেখানে প্রবল সেখানে মাথা নত করিয়াছে। এই দর্শনই ইওরোপীয় রাষ্ট্রদর্শন। ইহার বহু পরীক্ষা বহুবার হইয়া গিয়াছে, এবং শক্তিবর্গ জানে যে, শস্ত্র-শক্তি যদি তাহাদের থাকিত তবে তাহারা এশিয়ার ঔপনিবেশিকবাদ চালাইতে পারিত না। কোন রাষ্ট্রের মনের এই পটভূমির পরে নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব কি? তবু যে বারে-বারে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে আলোচনা চলিতেছে তাহার কারণ হইল, প্রতিটি রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক সমস্যা। কেননা, দেখা গিয়াছে এক যুদ্ধের উন্মাদনা ব্যতিরেকে কোন রকমেই জঙ্গীবাজেট গঠন করা যায় না। অথচ নিরাপত্তার ভিত্তিতে শস্ত্রের প্রতিযোগিতা না করিয়াও কোন উপায় নাই। বাজেটে শস্ত্রের জন্য বেশী পয়সা খরচ করিলে জনসাধারণের পেটের দানা-পানীতে টান পড়ে এবং আভ্যন্তরীণ জনমত ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। এই বিক্ষুব্ধ অবস্থার হাত হইতে রেহাই পাইবার নিমিত্তই দল বাঁধিয়া অস্ত্র কমাইবার সলা-পরামর্শ। কিন্তু সব রাষ্ট্রই জানে যে, অস্ত্র ছাড়া কাহারো কোন গতি নাই। বর্তমানে যে, অস্ত্র-শস্ত্র কমাইবার জন্য প্রচেষ্টা দেখা যাইতেছে তাহা ঐ আভ্যন্তরীণ গণবিক্ষোভের ভয়ে মাত্র। আসলে শান্তি কোন ইওরোপীয় রাষ্ট্রের দর্শন নহে। তাহা যদি হইত তবে এশিয়া আফ্রিকাতে তাহার বাস্তব ব্যাখ্যা পাওয়া যাইত। আর আসল বক্তব্য হইতেছে যে, এই দুইটির মৌলিক সমস্যার মধ্যেই ইওরোপীয় রাজনীতির সমস্ত উপাদানগুলি নিহিত রহিয়াছে।

রাষ্ট্র সঙ্ঘে নূতন সদস্য গ্রহণ

রাষ্ট্র সঙ্ঘে নূতন সদস্য গ্রহণের প্রশ্ন বিবেচনার্থে অবিলম্বে বৈঠক আহ্বানের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্থস্তি পরিষদের সভাপতিকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাহারা রাষ্ট্র সঙ্ঘে সদস্য পদপ্রার্থী ১৮টি রাষ্ট্রের মধ্যে মাত্র ১৩টি গ্রহণের পক্ষে ভোট দিবেন। চারিটি রাষ্ট্র গ্রহণ সম্পর্কে ভোট দানে বিরত থাকিবেন। আর কম্যুনিষ্ট নিয়ন্ত্রিত বহির্মঙ্গোলিয়াকে গ্রহণ সম্পর্কে বিরোধিতা করিবেন। এইভাবে মার্কিন

মত জানা গেল। কিন্তু সোভিয়েট মত ও সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ মহল বলিতেছেন যে, যদি রহিংগোলিয়াকে গ্রহণ করা হয় তবে সে সবার আবেদনই সমর্থন করিবে। ব্রিটেন বলিতেছেন: কানাডার 'পাইকারী হারে' নূতন সদস্য গ্রহণের প্রস্তাব সমর্থন করিবেন। ইহার মধ্যে ব্রিটেন ও রাশিয়া এক সূতার দুই সীমান্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া কিছু সুতা হাতে রাখিয়া কূটনীতির ঘুড়ি উড়াইতেছে। আর ব্রিটেনের লাটাইয়ের সব সুতা ছাড়াইয়া দিয়া খেলিতে শুরু করিয়াছে। এখন এই দুয়ের মধ্যে কে জেতে, কে হারে তাহা দেখিবার বটে। কিন্তু এ ব্যাপারে কানাডা কেন হঠাৎ অগ্রণী হইল? সম্ভবতঃ রাষ্ট্র সংঘে আজ এশিয়াকে তুষ্ট করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। এশিয়াকে এই স্তুতি ব্যাজনের একমাত্র কারণ হইল এশিয়ার অনগ্রসর অর্থনীতিতে কে কত যন্ত্রপাতি দিবে, এ বিষয়ে কানাডা, ব্রিটেন উভয়ই

ভারত-নেপাল মিতালী

নেপালের রাজা মহেন্দ্র বর্তমানে ভারত ভ্রমণ করিতেছেন। তিনি নেপাল ভারত সৌহার্দ্য সমিতির উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন, এই সদ্য সমিতির সমন্বয়ের দ্বারা আমাদের মধ্যে যে সৌভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বিদ্যমান আছে তাহা অক্ষয় হইবে।

পুনরায় বাস্তুহারা

গৌহাটি সহরের উপকণ্ঠে এক বিশিষ্ট এলাকায় ১০৫ ঘর উদ্বাস্তুর উপর রাজ্য সরকার উচ্ছেদের নোটিশ দিয়াছেন বলিয়া খবরে প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে আসাম উদ্বাস্তু সমিতির সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতিতে বলেন, "গৌহাটির উপকণ্ঠে কাছাড়ী পাড়ার ১৯৫০ সালে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন তহবিল হইতে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকায় ৯০ বিঘা জমি ক্রয় করিয়া সেখানে ২০০ উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু সেই পরিকল্পনা আজ পরিত্যক্ত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত টাকার অপব্যবহের আর একটি নমুনা ১০ লক্ষ টাকা (?) ব্যয়ে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য গৌহাটির উপকণ্ঠে নির্মিত বাজারটি। বাজারটি আজ পুলিশ ব্যারাকে পরিণত হইয়াছে।" এইরূপ আরো পুনর্বাসনের নামে কত কি হইতেছে কে তাহার খোঁজ রাখে।

নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ

৫ই নভেম্বর হইতে ভারতের সর্বত্র নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ সূচনা হয়। পশ্চিমবঙ্গের সমবায় কর্মীরাও এই সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান প্রতিপালন করেন। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় তাঁহার বাণীতে বলেন, 'একথা সকলেই স্বীকার করেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় সমবায়কে অবশ্যই এক নূতন ও ব্যাপকতর ভূমিকা গ্রহণ করিতে হইবে এবং গ্রামীণ অর্থ ব্যবস্থার পুনর্গঠনে এক মুখ্য যন্ত্ররূপ হইতে হইবে। আমাদের বিশ্বাস এই আদর্শের উপর নির্ভর করিলেই ভারতের গ্রামীণ সংস্কৃতি, অর্থ ব্যবস্থার পুনরুদ্ধার হইবে।'

সমাজ ও জাতীয় জীবন

[র. কু. সে.]

সাহিত্যে সমাজ-কর্মের একটি বড় দিক আছে। সে দিকটি যদি সাহিত্যক্ষেত্রে আড়াল প'ড়ে থাকতো, তবে বোধ করি পৃথিবীর এতবেশী উন্নতি হ'তো না। যে দেশ যত বেশী এগিয়ে গেছে, বুঝতে হবে—সে দেশের সাহিত্যের কাছ থেকে সেই দেশ তত বেশী প্রেরণা পেয়েছে। একটা জাতির শ্রেষ্ঠ পরিচয় তার সাহিত্য। সে সাহিত্য পর্ণগ্রাফীর দুষ্ট পাতা নয়, বরং বলিষ্ঠ সমাজ চেতনার ঐতিহ্য। গ্রীকসাহিত্য আজও সেই ঐতিহ্যবহন করে; রেনেসাঁর স্বাক্ষর নিয়ে শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় দেশগুলি আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এমন কথা ব'লবো না যে এই দেশগুলিতে সমাজ-কল্যাণমূলক রচনার বাইরে বিকৃত রচনাসমূহকে চাপা দিয়ে রাখা হ'য়েছে বা দুর্বল মস্তিষ্কজাত রচনার অনুশীলনকে বাড়তে দেওয়া হয়নি। হ'য়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তা তৃপ্তিকর পাঠের আনন্দ ব'য়ে নিয়ে আসে, সন্দেহ নেই, কিন্তু সে আনন্দ দেশের সামগ্রিক উন্নতিকে চাপা দিয়ে নয়। যেখানেই চাপা দিতে যাওয়া হ'য়েছে, সেখানেই ফল উল্টো হ'য়েছে, মানসিকতার দিক থেকে দেশ এগিয়ে যাবার পথ পায়নি।

যেখানে দেশের এই অবরুদ্ধ গতি, যেখানে আনন্দটাও বিকৃত হ'তে বাধ্য। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থার দিকে তাকিয়ে আজ একথাই মনে হয় নাকি—আমাদের জাতীয় জীবনের সামগ্রিক আনন্দে আজ অনেকাংশে সেই বিকৃতি দেখা দিয়েছে। তার প্রধানতম কারণ হ'চ্ছে—সাহিত্যে একদিকে যেমন বলিষ্ঠ সমাজ-চিন্তার অভাব দেখা দিয়েছে, তেমনি সেই অনুপাতে চিন্তার যথেচ্ছাচারও বেড়েছে। যে দেশে একদা বেদ, উপনিষদ, গীতা থেকে সুরু ক'রে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর পর্যন্ত সৃষ্টিশীল সমাজ কল্যাণকর রচনায় সাহিত্য উন্নত হ'য়েছে, দেশ উন্নত হ'য়েছে, সে দেশে আজ একদিকে যেমন চটুল কথা-সাহিত্যের একমুখী প্রাবন ব'য়ে চ'লেছে তেম্‌নি বাড়তির মুখে এগিয়ে চ'লেছে মক্ক ও পর্দা বিষয়ক অভিনেতা অভিনেত্রীদের বহুল চিত্রসম্বলিত সাময়িক পত্রিকাসমূহ। চিন্তাশীল সমাজবাদী রচনার সংখ্যা আজ এগুলোর তুলনায় এত নগণ্য যে সেগুলোকে গণনার পর্যন্ত আনা যায় না। একটা বলিষ্ঠ জাতির রুচি ও মননশক্তির যে কতখানি অধঃপতন ঘটতে পারে, তার উজ্জ্বল উদাহরণ আমাদের এই—সাম্প্রতিককালের দেশ। এখানে যেমন বিভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সুরের পত্র-পত্রিকা তেম্‌নি সেই সুরের যোগান দিয়ে অত্যধিক জনপ্রিয়তা-অর্জনকারী লেখকেরা সুসঙ্গত চিন্তাধারা থেকে বিচ্যুত হ'য়ে প'ড়েছেন। পাঠকের রুচি অনুযায়ী যৌনধর্মী রোমান্টিক গল্প-উপন্যাস না লিখলে এখানে নাকি জনপ্রিয়তা অর্জন করা সম্ভব নয়, এম্‌নি একটা কথা কিছুকাল ধ'রে শোনা যাচ্ছে। তখন মনে হয়—এই জাতীয় কোনো রচনা না লিখেও উনবিংশ শতাব্দীর মনীষীবৃন্দ কি ক'রে জনপ্রিয় হ'য়ে এখনও জাতির জীবনে টিকে আছেন?

যৌনধর্মী রোমান্টিক গল্প-উপন্যাসের তাগিদটা আসলে জনসাধারণের—যে জনসাধারণের পাঁচ পার্সেন্ট লোকও এখনও যথোপযুক্ত শিক্ষার আলো পায়নি। তারা চিন্তাশীল কোনো রচনার ধার ধারে না, তাদের কাজ হ'চ্ছে সস্তাধরণের গানবাজনা শুনে ও থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখে চটুল রহস্যময় কাহিনী শোনা। এটা জাতির অশিক্ষাগত ব্যাধি। এই ব্যাধি থেকে অনেক সময় উচ্চ-শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও মুক্তি পেতে দেখি না।

সুতরাং ব্যাধি যখন কোনো দেহকে এসে ভর করে, তখন প্রয়োজন হয় ডাক্তারের। ডাক্তার চক্ষুদান দিয়ে তাকে ভালো ক'রে তোলার দায়িত্ব নেন। সংস্কৃতিক্ষেত্রে সেই ডাক্তার হ'চ্ছে শিল্পী ও সাহিত্যিক। তাদেরও দায়িত্ব হ'চ্ছে ব্যাধিগ্রস্ত জনসাধারণের মনকে উচ্চতর শিল্প-রসিক ক'রে তোলা। ব্যাধিগ্রস্তদের আবেদনে সাড়া না দিয়ে যদি তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের চিন্তাশীল বিষয়বস্তুগুলিকে জনসাধারণের মনে প্রবেশ করাবার প্রয়াস পায়, তবে আমার মনে হয়—তাদের জনপ্রিয়তার বিন্দুমাত্র অপচয়ও হয় না এবং জনসাধারণের কাছে শিল্পী সাহিত্যিককে স্ব স্ব সাধনক্ষেত্রে উপযুক্ত হ'য়ে দেশ তথা জাতিগঠনমূলক রচনা পরিবেশন করা। এই পদ্ধতি অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে দেশ যখন উন্নতির পথে অগ্রসর হ'লো, তখন শিল্পী সাহিত্যিকেরা নিছক আনন্দ পরিবেশনমূলক রচনা লিখুন, তাতে অভিযোগের কোনো প্রশ্ন ওঠে না।

আসলে জনসাধারণের দাবীর কোন মান নেই! সেই মান (standard) হীন দাবী মিটিয়ে যে জনপ্রিয়তা—তা লেখকের অনুকূলে না এসে বরং প্রতিকূল পরিবেশেরই সৃষ্টি করে। কোনও তা পৃথিবীর কোনো দেশকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম নয়। দেশের অন্তরা যেখানে আছে পড়ে, সেখানে জনসাধারণের রুচি মেটাবার যে সাহিত্য—তা বিকৃত শিল্প ভিন্ন আর কিছুই নয়। আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই বিকৃত শিল্পের অধিকতর প্রকাশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখানে রাষ্ট্রের সঙ্গে, সমাজের বা বৃহত্তর জীবনবোধের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ ইদানিং ক্রমেই নগণ্য হ'য়ে উঠছে। অথচ রাষ্ট্র, সমাজ ও বৃহত্তর জীবনবোধের উপর ভিত্তি ক'রেই এদেশে একদা রামায়ণ, মহাভারতের মতো এপিক সৃষ্টি হ'য়েছে। হাতের কাছে বিগত উনবিংশ শতাব্দী তো 'রিনেইসেন্স'ই সৃষ্টি ক'রলো। চিন্তায়, জ্ঞানে, কর্মে, আদর্শে, চরিত্রে, ত্যাগে সুবর্ণময় যুগ ব'য়ে গেল উনবিংশ শতাব্দীতে। সে যুগেও জনসাধারণ ছিল, পাঠক ছিল, লেখক ছিল। তখনকার লেখক লেখাকে ক্রীড়ামোদ ব'লে মনে না ক'রে জাতির রক্ত ব'লে মনে ক'রতো। তাই নিছক জনসাধারণের মনস্তুষ্টি বিধান ক'রে তাদের হাততালি কুড়িয়েই সে যুগের লেখকশ্রেণী ক্ষান্ত ছিলো না, সচেষ্ট ছিলো বৃহত্তর জাগতিক চেতনাকে স্ব স্ব সাধনা সহযোগে নিখুঁত সত্যিকারের জীবন সৃষ্টি ক'রতে। সেই সৃষ্টি প্রয়াসের পথই ছিল শ্রেষ্ঠতর পথ। আজ জনসাধারণের দাবী মেটাতে গিয়ে সৃষ্টিশীল শিল্পীরা সে পথ থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে একদিন যেমন নিজেদের জীবনকে মহৎ উপাদানে গ'ড়ে তুলতে পারছে না, তেমনি পারছে না দেশকে জ্ঞানে কর্মে, আদর্শে ও চিন্তায় সুষমামণ্ডিত ক'রে তুলতে। সামাজিক মান তাতে ক্রমেই নিম্নগামী হ'য়ে প'ড়েছে।

সামাজিক এই ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার আশু পথ হ'চ্ছে শিল্পীশ্রেণীকে যথার্থ জ্ঞান চর্চা ক'রে সেই জ্ঞানের আলোয় জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা। শিল্পী অর্থে এখানে লেখক ও গায়ক উভয়কেই বুঝায়। চটুল সাহিত্যের ন্যায় চটুল সঙ্গীতও আজ দেশের কাণে ঝড় তুলেছে। সেই ঝড়কে প্রতিহত না করতে পারলে সুখকরোজ্জ্বল নবীন উষার প্রত্যাশা ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।

আপনার লাভই হয় নিঃসন্দেহ ইহা যখন ক্রয় করেন

ক্যা ল ভা র্ট র

ক্লান্তি অপনোদক ও বলপ্রদ

ফ্রু ম টো

[ফ্রুট কর্ডিয়াল]

ইহা বয়স্ক ও শিশুনির্বিশেষে

স্বাস্থ্যোন্নতির সহায়ক

সুখাদ্য ও ক্ষুধাবর্ধক

স্নিগ্ধ ও রসনাতৃপ্তিকর

ফ্রুট সিরাপ ও স্কোয়াশ

বাগানের টাট্‌কা ফল ও উৎকৃষ্ট

আখের চিনি থেকে প্রস্তুত।

সুদৃশ্য টিনের কৌটায় রক্ষিত

পু ষ্টি ক র ও উ পা দে য়

মোগলাই মাটন, বিরিয়ানি ও কারি,

আলফন্সো আমের টুকরো ও শাঁস এবং

বিভিন্ন সব্জী।

ক্যালভার্টের প্রস্তুত সামগ্রী

ভারতে ও বিদেশে সর্বত্র আদৃত

সর্বদা টাট্‌কা জিনিষ সরবরাহ করা হয়।

এ, ক্যালভার্ট এণ্ড কোং

৯০-৯২, মাজাগন রোড, বম্বে—১০

বাংলা ও আসামের জন্য এজেন্ট চাই।

সদ্য প্রকাশিত দুই খানা বই

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত [সচিত্র দ্বিতীয় সংস্করণ] ১৲

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

[বাংলা সাহিত্যে শিশুদের উপযোগী বই বেশী নাই। এই বইখানি সেই অভাব কিছুটা পূরণ করিবে।]

"কিশোর-কিশোরীদের জন্য লেখা লাইনো টাইপে ভালো কাগজে ছাপা ছবিভরা একখানা ঝকঝকে বই। লেখক চন্দ্রগুপ্ত এবং তৎকালীন ইতিহাসকে অবিকৃত রাখিয়া ছেলে মেয়েদের জন্য সুন্দর, সহজ ভাষায় এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ, পুরু প্রভৃতির সহিত তাঁহার যুদ্ধের ইতিহাসও কিশোর-কিশোরীরা এই কাহিনীর মধ্য দিয়া বিস্তৃতভাবে জানিতে পারিবে।" —যুগান্তর

দিনকাল ৩৷৷০

প্রভাত দেবসরকার

রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। কালে কালে তাহার বিরুদ্ধে অনেক ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে জমিদার-প্রজার যে বিরোধ ঘনাইয়া উঠিল 'দিনকাল' তাহারই বাস্তব রূপ। উপন্যাসের কাহিনীকে যাঁহারা প্রাণসঞ্চার করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কয়েকজন—জমিদার রমাপতি ঘোষ, তদীয় দৌহিত্রী অষ্টাবক্রী মাধুরী, জমিদার বধূ ইন্দুমতী কৃষকনেতা জগবন্ধু রায়, সবজনমান্য দেশকর্মী ডাক্তার ইত্যাদি।

মন্মথ রায়ের পাঠক

মহাভারতী ২৷৷০

মন্মথ রায়

বিগত ৪১ বৎসরের মুক্তিআন্দোলনে উদ্বেল, মধ্যবিত্ত এক চাষীপরিবারের জীবন নাটকই এই গ্রন্থের মূলাধার।

"নাট্য জগতে অন্নদার দিনে এমন একটি বলিষ্ঠ রাজনীতিক নাটকের যে মূল্য আছে, সে কথা অনস্বীকার্য।" —দেশ

সরস্বতী লাইব্রেরী

৬নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

[অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লাইব্রেরী]

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য

আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা স্থাপনের পথে—

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃই অনুভূত হয়ে চলেছে। কিছুকাল থেকে বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলির উৎপাদনক্ষম বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নের জন্য একটি আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা স্থাপনের আলোচনা চলে আসছে। ভারতবর্ষ এ ব্যাপারে অগ্রণী দেশগুলির মধ্যে অন্যতম। কিন্তু গোড়া থেকেই বাধা এসেছে বৃটেন এবং আমেরিকা থেকে। সম্প্রতি বৃটেন তার মত পরিবর্তন করেছে। বিশ্বব্যাংকের তত্ত্বাবধানে এই সংস্থা স্থাপিত হবে। এ পর্যন্ত কানাডা, চিলি, কলম্বিয়া, কোষ্টারিকা, কিউবা, ইকোয়াডর, গুয়াটেমালা, মেক্সিকো, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, বৃটেন, গ্রীস প্রভৃতি নিয়ে মোট বিশটি দেশ চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করেছে। এছাড়া বিশ্বব্যাংকের ৫৮টি সভ্যদেশের মধ্যে ২৯টি, এই সংস্থার সভ্য হবার পক্ষে মত দিয়েছে। ভারতবর্ষকে এই সংস্থার সভ্য হবার জন্য ২ কোটি ১১ লক্ষ টাকা দিতে হবে। এই টাকা অর্থ দপ্তরের কোন বরাদ্দকৃত সঞ্চয় থেকে দেওয়া হবে।

এই চুক্তিনামায় ত্রিশটি দেশ স্বাক্ষর করলে ইহা কার্যকরী হবে। এই সংস্থার মোট মূলধন হবে ১০ কোটি ডলার এবং তার ৭৫ ভাগ সভ্য দেশগুলির কাছ থেকে আদায়ীকৃত হওয়া চাই। এখন পর্যন্ত আমেরিকা এই চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করে নাই। তবে আমেরিকা যে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করবে, তা এখন একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে বলা চলে। স্বাক্ষর করবার পরে আমেরিকা এই সংস্থার বৃহত্তম অংশীদার হবে, এবং তার অংশের পরিমাণ হবে ৩,৪১,৬৮,০০০ ডলার। চলতি সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই চুক্তিনামা স্বাক্ষরের জন্য খোলা রাখা হবে। অনুন্নতদেশগুলির বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন সাধন করাই এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য এবং এজন্যে তা নিম্নরূপ কাজ করবে।

(ক) যদি কোন উৎপাদনক্ষম প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য ন্যায্য সর্তে প্রয়োজনীয় মূলধন পাওয়া না যায়, তা হলে এই সংস্থা বিনা সরকারী গ্যারান্টিতে অন্যান্য বে-সরকারী নিয়োগকারীদের সঙ্গে একযোগে সেখানে অর্থ বিনিয়োগ করবে।

(খ) লভ্যাংশ বিনিয়োগের সুযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, এই সংস্থা বে-সরকারী মহল থেকে মূলধন এবং প্রয়োজন হলে অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপক সংগ্রহ করতে চেষ্টা করবে।

(গ) এই সংস্থা সভ্য দেশগুলির অভ্যন্তরস্থ ও বহিঃস্থ বে-সরকারী মূলধনের অবাধ চলা-ফেরা করার অনুকূল আবহাওয়া গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে। এর সংবিধান এবং কার্যবিধি মোটামুটী বিশ্ব-ব্যাংকের মতই হবে। তবে কিছু কিছু পার্থক্য অবশ্যই থাকবে। যেমন, মূল সভ্য-দেশগুলিকে বিশ্ব-ব্যাংকের সভ্য হতে হবে। বিশ্ব-ব্যাংকের সকল সভ্যগণ এতে যোগদান করলে সমস্ত মূলধনই তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে। বিশ্ব-ব্যাংকের বেলায় কিন্তু মূলধনের দশ ভাগ নূতন সভ্যদের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছিল। নূতন সভ্য গ্রহণ করবার জন্য অবশ্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই সংস্থার বোর্ড অব গভর্ণরসগণ ইচ্ছা করলে মূলধন আরও শতকরা দশ ভাগ বাড়াতে পারবেন।

মূল সত্তাদের বিশ্বব্যাংকে তাদের অংশ অনুযায়ী এই সংস্থার অংশ কিনতে হবে এবং কোন সভ্য এই সংস্থার যোগদান না করলেও অপর সভ্যদের অংশের কোন পরিবর্তন হবে না।

বিশ্ব-ব্যাংক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হবে এই আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা এবং এদের তহবিলও থাকবে সম্পূর্ণ পৃথক। এই সংস্থার একটি বোর্ড অব গভর্নরস্, একটি বোর্ড অব ডিরেক্টরস্, একজন প্রেসিডেন্ট এবং অন্যান্য কার্যনির্বাহক থাকবে এবং এর সমস্ত ক্ষমতা বোর্ড অব গভর্নরসদের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে।

বহু আশা নিয়ে যে সংস্থা গড়ে তুলবার চেষ্টা চলেছে, তার গুরুত্ব যথেষ্ট। এই শুভ কাজ ত্বরান্বিত হোক। সমস্ত দেশের লোক উদ্‌গ্রীব হয়ে লক্ষ্য করবে এর পরিণতি ও কার্যবিধি।

ভারতের শিল্প মেলার গুরুত্ব

নয়াদিল্লীতে ভারতীয় শিল্প মেলা বিশ্বের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকবে। আজ পর্যন্ত এশিয়া মহাদেশে এত বড় শিল্প মেলা আর কোন দিন হয় নাই। এই শিল্প মেলায় ২১টি বৈদেশিক রাজ্য অংশ গ্রহণ করেছে। এতে আছে, আমেরিকা, বৃটেন, পশ্চিম জার্মেনী, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন, জাপান, পোলাণ্ড, হাঙ্গেরী, চেকো-শ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লোভিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর শিল্পে উন্নত প্রায় সকল দেশগুলি। পৃথিবীর বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক মতবাদের দেশগুলি এই শিল্প মেলায় যোগ দিয়ে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে 'সহ অবস্থিতির' নিদর্শন দেখিয়েছেন। তা ছাড়া বৃহদায়তন ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির একই সঙ্গে উৎকর্ষের মহড়াও দেখানো হয়েছে এই শিল্প মেলায়।

এই শিল্পমেলা থেকে আমাদের দেশ অন্যান্য দেশ থেকে শিল্পে কত পিছনে পড়ে আছে, তা জানবার সুযোগ পাওয়া যাবে। ভারতবর্ষ যখন শিল্পায়নের দিকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, তখন এই শিল্প মেলা তার ভবিষ্যতের পক্ষে খুব উপযোগী। শিল্পক্ষেত্রে সরকারী ও বে-সরকারী অংশ, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্পের গতী প্রভৃতি বিচার করে নিয়ে একটি রূঢ় বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা প্রয়োজন, যাতে যে ভুল অন্যান্য দেশ প্রথম প্রথম করেছে, ভারতও আবার তার পুনরাবৃত্তি না করে।

প্রায় সকল দেশগুলি আজ শিল্পে ক্রমোন্নতি করে চলেছে। আজ যে মেসিন প্রথম শ্রেণীর বলে আখ্যা পেল, কাল তার থেকেও ভাল মেসিন এসে তার স্থান অধিকার করে বসল। ফলে, ভারতকে শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হলে, তাকে সকল দেশের সেরা জিনিষ গ্রহণ করতে হবে। প্রধান মন্ত্রী শিল্প মেলার উদ্বোধনকালে একে 'সৃষ্টি সংগ্রামের' সূচনা বলে অভিহিত করেছেন। বর্তমান যুগ মেসিনের যুগ। বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা বর্তমান সভ্যতার অন্যতম কারণ। পৃথিবীর শান্তি ও সভ্যতার জন্য আজ প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। এই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে পরমাণু তেজকে শিল্পে প্রয়োগ করা সম্ভব করে তুলতে হবে। প্রধান মন্ত্রী যথার্থই বলেছেন যে, এখন যদি কারও সঙ্গে কারুর কোন দ্বন্দ্ব থাকে, তা হওয়া উচিত মানুষের চিত্তসাধন সম্পর্কে। যে দেশ মানুষের অধিক কল্যাণসাধন করতে পারবে, সেই দেশই হবে "সৃষ্টি-সংগ্রামের" বিজয়ী বীর।

কৃষির প্রশ্ন

ভারতে বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৭৬ লক্ষটি কৃষক পরিবার আছে। এরা প্রায় পাঁচ লক্ষ গ্রামে ছড়িয়ে আছে। এদেরকে আজ কাজ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়েছে। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে হায়দ্রাবাদে শ্রম মন্ত্রীদের যে অধিবেশন গেল, তাতে দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষক পরিবারের জন্য উপযুক্ত কর্মের সংস্থান রাখবার সুপারিশ করা হয়েছে। ঐ অধি-বেশনে কৃষির শ্রমিকদের নিম্ন মজুরী নির্ধারণ ও তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্পর্কেও আলোচনা হয়। নিম্ন মজুরী নির্ধারণ করা সম্পর্কে সকলে একমত হলেও, এই ব্যবস্থা বর্তমান কৃষি ব্যবস্থায় প্রয়োগ করার অসুবিধাও সকলে স্বীকার না করে পারেন নি। পল্লীঅঞ্চলের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন আজ একান্ত দরকার হয়ে পড়েছে। কিন্তু নিম্ন মজুরী নির্ধারণ সেখানে বর্তমানে খুব ফলদায়ক হবে বলে ঐ অধিবেশন মনে করেন নি। আশু প্রয়োজন পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের প্রচুর পরিমাণে কর্ম-সংস্থান করা এবং এজন্য তাঁরা সরকারকে গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কে একটি পরিষ্কার নীতি নির্ধারণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন।

এই অধিবেশনে পল্লী অঞ্চলের শিল্পগুলিকে অধিক পরিমাণে অর্থ, উৎপাদন ও বিক্রয় সংক্রান্ত সকল প্রকার সাহায্য দিয়ে সমবায় পদ্ধতিতে গড়ে তুলবার প্রয়ো-জনীয়তা উল্লেখ করেছেন। পরিশেষে, তাঁরা মন্তব্য করেছেন যে, পল্লী অঞ্চলের বিক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি হলে সমস্ত দেশের উপকার হবে, কারণ কৃষি বিত্তাগই হোচ্ছে জাতির জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের মাপ-কাঠি।

বর্তমান যুগ বৃহৎ শিল্পের যুগ। বৃহৎ শিল্প ক্ষুদ্র শিল্পকে দূর করে দিয়ে তার জায়গায় বসবার জন্য সচেষ্ট। তাই শিল্পকে সরকার কিছু সাহায্যভূতি দেখান বলে শিল্পের ক্ষোভের শেষ নেই। পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণদের বাঁচাতে চাইলেও সরকারের সাহায্যভূতি ছাড়া উপায় নেই কিন্তু সাহায্যভূতির নাম শুনলেই বৃহৎ শিল্পপতিগণ নানাভাবে বাধা দিতে এগিয়ে আসবেন। এজন্য সরকারের সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট কর্ম-পন্থা অবলম্বন করে বিনা কালক্ষেপে পল্লীর নৈরু অপসারণে এগিয়ে যাওয়া দরকার।

১৯৪৫-৪৬ সালে পৃথিবীতে তুলার সরবরাহ বৃদ্ধি আন্তর্জাতিক তুলা উপদেষ্টা কমিটি ১৯৪৫-৪৬ সালে পৃথিবীর বাজারে তুলার সরবরাহ ৩০ লক্ষ গাঁট প্রতি গাঁট ৪৭৮ পাউণ্ড বৃদ্ধি পাবে বলে ঘোষণা করেছেন। কমিটির মতে তুলার মোট সরবরাহ ৫ কোটি ৫ লক্ষ গাঁট দাঁড়াবে এর মধ্যে মজুত মাল ১ কোটি ৯৮ লক্ষ গাঁট এবং নূতন উৎপন্ন ৩ কোটি ৭ লক্ষ গাঁট।

আমেরিকায় তুলার সরবরাহ ২ কোটি ৫ লক্ষ গাঁট দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হয়েছে। মেক্সিকো, মধ্য-প্রাচ্য, পাকিস্তান, তুর্কীস্তান, সিরিয়া এবং আরও কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র দেশেও তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে। কমিটি মন্তব্য করেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রের বাহিরে ১৯৪৭-৪৮ সনের পরে তুলার উৎপাদন বিস্তৃতি হয়েছে। পূর্বে যে সকল অঞ্চলে তুলা শিল্প একপ্রকার নগণ্য ছিল, এখন সেখানে উহা একটি প্রধান শিল্পে পরিণত হয়েছে। এরকম চলতে থাকলে যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতিরেকে বহির্ভূত অঞ্চলগুলি নিজেদের তুলার চাহিদা মিটাতে পারবে।

পরে কমিটি মন্তব্য করেছেন যে গত দুই বছরের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম য়ুরোপ, ভারতবর্ষ ও জাপানে তুলার কাটতি একরকম সমান আছে। আমার কিছু কিছু দেশে তুলার কাটতি বেড়েছে, যেমন, পাকিস্তান, তুর্কীস্তান, মেক্সিকো, ব্রেজিল এবং মিশর। বর্তমান বাজারের গতি দেখে কমিটি অনুমান করেছেন যে আগামী বছর কাটতি মোটামুটী একরকম থাকবে।

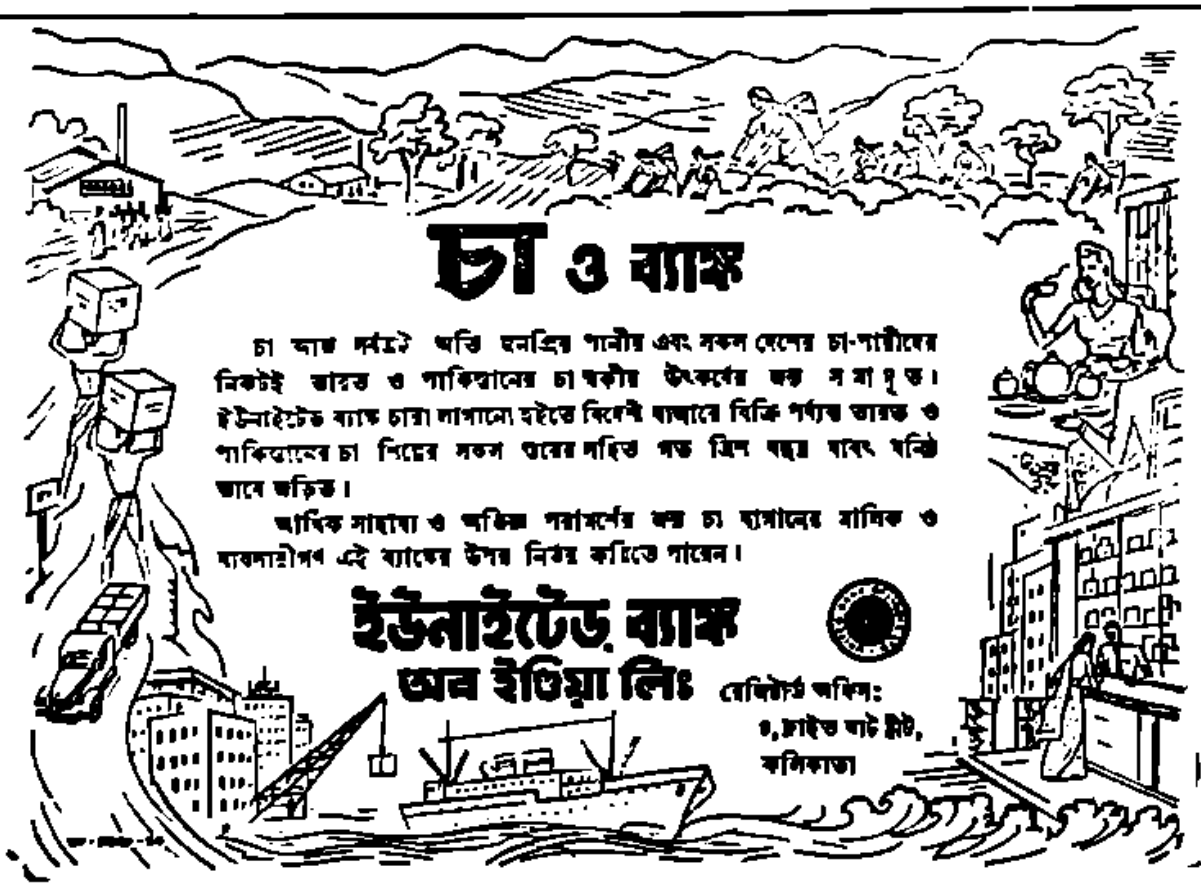

নূতন বীমার কাজে

বিপুল সাফল্য

১৯৫৪ সালে

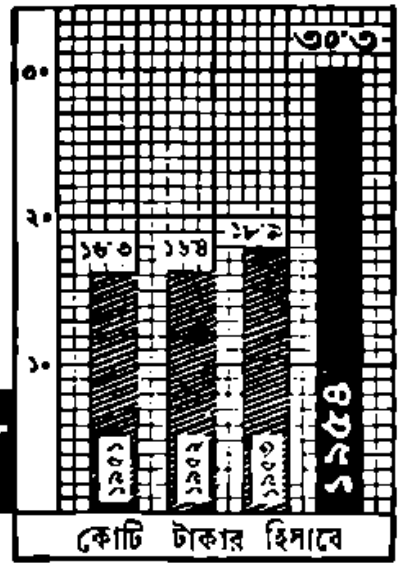

৩০ কোটি টাকার উপর

জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই হিন্দুস্থানের প্রতিষ্ঠা এবং গত ৪৮ বৎসর ধরিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া ইহা নূতন গৌরব অর্জন করিয়াছে এবং দেশ ও দশের সেবায় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। এই সাফল্যের মূলে রহিয়াছে ত্রিবিধ নিরাপত্তার ভিত্তি :

★ *সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত পরিচালনা*

★ *জনসাধারণের অবিচলিত আস্থা*

★ *লগ্নী ব্যাপারের নিরাপত্তা*

বোনাস আজীবন বীমায় ৪৭৷৷৹
মেয়াদী বীমায় ১৫৲

(প্রতি বৎসর প্রতি হাজার টাকার বীমায়)

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্‌সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্

হেড অফিস : হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা - ১৩

পুস্তক পরিচয়

বঙ্গদেশ ও মালয় এশিয়া : চুণীলাল গঙ্গোপাধ্যায়। পাঠশালা গ্রন্থাগার। ৬, বেনিয়াপুকুর লেন, কলিকাতা ১৪।

আধুনিক বিশ্বের আপাতদৃষ্টিতে বঙ্গদেশ ও মালয় এশিয়াকে বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক সীমায় সীমিত বলিয়া মনে হইলেও অন্তরক্ষেত্রে উভয় দেশের সঙ্গে উভয় দেশের যে একটি নিবিড় ভগ্নী সম্পর্ক রহিয়াছে, ইতিহাস অনভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রের কাছেই ইহা আজ বিস্ময় বলিয়া বোধ হইবে। বাংলার দুর্দিনে বাঙালীপ্রাণ চুণীবাবু সেই বিস্মরকর ইতিহাস জাতির সামনে তুলিয়া ধরিয়া দেশের একটি মহৎ হিতসাধন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তিনি দেখাইয়াছেন : 'আজকের মুসলিম মালয় এশিয়ার অতীতের হিন্দু নার মালয়দেশ। বঙ্গবাসীর মতোই মালয় এশিয়াবাসীর ধমনীতে 'অষ্ট্রিক-মানবশাখা'র শোণিত-প্রবাহ প্রবাহিত। ...বাঙলার সাথে মালয়-এশিয়ার সম্বন্ধ সুপ্রাচীনকাল হ'তে সুসংবদ্ধ। আদি বঙ্গবাসী 'মুণ্ডাগণ' আদি মালয়-এশিয়াবাসী 'মন্থরগণের' সঙ্গে শোণিত-সংস্কারে সংযুক্ত।' সংস্কৃতি-ইতিহাসের সাধক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক চুণীবাবু। তাঁহার গবেষণালব্ধ তথ্যের দ্বারা এইভাবে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাঙালী-সংস্কৃতির সম্পর্কের ইতিহাস রচনা করিয়া একদিকে যেমন তিনি পারস্পরিক দেশগুলির মধ্যে সংস্কৃতির নতুন সেতু রচনা করিতেছেন, তেমনি আজিকার খণ্ডিত বঙ্গভূমির জায়া দাবীকে উদার হৃদয়বৃত্তিতে জগৎবাসীর সামনে উজ্জীবিত করিয়া তুলিতেছেন সন্দেহ নাই। তাঁহার এই সংস্কৃতি-কর্ম সার্থক ও জয়যুক্ত হইলে বাংলার নবপ্রাণচেতনার অভ্যুদয় ঘটিবে—একথা নিশ্চিত ॥

পরিমল গোস্বামীর শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প : পরিমল গোস্বামী। বিহার সাহিত্য ভবন লিঃ, ২৪।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা ৪।

বাংলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ রচনা বোধ করি সব চাইতে কঠিন, এবং সেই কঠিন রচনার অদ্বিতীয় শিল্পী পরিমল গোস্বামী। কোনো কোনো লেখক পানিং-এর সাহায্যে বা এক একটি অপ্রাকৃত কথার ঘুরনির দ্বারা হাসি ও উষ্মার সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কিন্তু পরিমলবাবুর ব্যঙ্গ-রচনাগুলি মূলতঃ তাঁহার কাহিনীর বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করিয়াই সৃষ্ট। জাতীয় সমস্যাগুলিকে তিনি এমন এক একটি অতিসাধারণ গল্পের মধ্য দিয়া তুলিয়া ধরেন যে, আপাততঃ হাসি সম্বরণ করিতে না পারিলেও পরে, চিন্তা-প্রাবিত হইতে হয়। ব্যঙ্গ রচনার সার্থকতা এইখানেই। আলোচ্য গ্রন্থে মোট সাইত্রিশটি গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার প্রায় প্রত্যেকটি গল্পই স্ব স্ব সার্থকতায় উজ্জ্বল। পরিমলবাবু জীবন-শিল্পী। জীবনকে তিনি নানা দিক দিয়া দেখিয়াছেন, বিচার করিয়াছেন। কিন্তু জীবনসম্পর্কে কোথাও তিনি নির্মম হন নাই। ব্যঙ্গের ছলে তিনি জীবনের সত্যমূল্য পাঠকের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই দিক দিয়া তিনি ব্যঙ্গচরিতাদের অগ্রগণ্য শিল্পী। তাঁহাকে আমাদের সাদর অভিনন্দন।

পঞ্চদশী : গল্প সঙ্কলন। নির্মল দত্ত সম্পাদিত। ভারতী লাইব্রেরী, ৩, শ্যামাচরণ দে-ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা মাত্র।

'পঞ্চদশী' পনেরোজন খ্যাত ও অখ্যাত কাহিনীকারের পনেরোটি গল্পে সংগ্রথিত। ইহাদের মধ্যে আছেন: দক্ষিণা রঞ্জন বসু, আশাপূর্ণা দেবী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিকুমার, কণপ্রভা ভাদুড়ী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, অরুণ সরকার, হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ রায়, অমিল নিয়োগী, অন্নপূর্ণা গোস্বামী, নীহাররঞ্জন সিংহ, রণজিৎ কুমার সেন, বাণী রায় ও নির্মল দত্ত। বাংলার বিভিন্ন সমস্যা লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এক একটি গল্প। প্রায়

প্রত্যেকটি গল্পই চমকপ্রদ ও সুলিখিত। রচনা চাতুর্যে অখ্যাত লেখকদের গল্পগুলিও প্রসাদগুণশালী হইয়া উঠিয়াছে। বাংলা দেশে এই জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যম আধুনিককালের, এবং সার্থক উদ্যম সন্দেহ নাই। গল্পপ্রিয় পাঠক মহলে গ্রন্থখানি বিশেষভাবে আদৃত হইবে বলিয়া মনে করি।

সূর্য-ঘোষণ-বাড়ী : (উপন্যাস)—আবু ইসহাক প্রণীত। নবযুগ প্রকাশনী, ১-সি, সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলিকাতা। দাম—দুই টাকা বারো আনা মাত্র।

বাংলা সাহিত্যে অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর জীবন বিশ্লেষণের যে ধারাটি মাত্র কয়েকবৎসর যাবৎ দেখা দিয়াছে, বর্তমান বৎসর পর্যন্ত বোধ করি তাহার সর্বশেষ শিল্পী আবু ইসহাক। বইটির বিশেষত্ব এই যে, আবহ পরিবেশটি পূর্ববঙ্গীয় হওয়ায় যে অগুন্নত জীবনগুলি গ্রন্থে সংযোজিত হইয়াছে, লেখক আগাগোড়া তাহাদের মুখ দিয়া পূর্ব-বঙ্গীয় ভাষাই ব্যবহার করাইয়াছেন এবং গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত কোথাও তাহাতে ভেজাল মিশ্রিত হইয়া রসহানি ঘটে নাই। বাংলা কথাসাহিত্যে এই জাতীয় গ্রন্থের সংখ্যা অধিক নয়। বাংলা সাহিত্যে লেখকের আবির্ভাব নতুন হইলেও সার্থক আবির্ভাব। তাঁহার সাধনা জয়যুক্ত হউক। আশা করি তাঁহার এই উপন্যাসখানি বিদগ্ধ সমাজে উপযুক্ত সমাদর পাইবে।

গ্যাং টক্ গ্যাং টক্ : ছোটদের ছড়ার বই। শ্রীশ্যামাপদ ঠাকুর। হসন্তিকা প্রকাশিকা, ৫৯-বি, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ২৯। দাম—বারো আনা মাত্র।

এককালে রবীন্দ্রনাথ 'অবদানশতক' নাম দিয়া কিছু কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত কবিতাগুলির কোনো সুসংবদ্ধ অর্থ না থাকিলেও সমস্ত পংক্তিগুলি মিলিয়া এক অদ্ভুত আবেদন সৃষ্টি করিত। শিশুকাব্যের ক্ষেত্রে সুকুমার রায় অনেকখানি সেই সুরের প্রবর্তন করিয়াছেন। আলোচ্য কাব্যের ছড়াগুলিতে তাহার অনুকরণ না থাকিলেও আবেদনের দিক হইতে উহারা প্রায় একই ধর্মী। শ্যামাপদবাবু শিশুদের মনের খবর রাখেন, শিশু-জগতের তিনি একজন শুদ্ধ নাগরিক। তাই শিশু-মনকে ছন্দের যাদুদণ্ডে কি ভাবে বশ করা যায়, তাহা তিনি জানেন। আবোল তাবোল নানা কথাকে ছন্দে ও সুরে বাঁধিয়া তিনি এমনভাবে গ্রন্থখানি পরিবেশন করিয়াছেন যে, শিশুরা একবার পড়িলে সহসা ভুলিতে পারিবে না। সেই সঙ্গে আছে শিল্পী বীরেন দে'র কার্টুন। সব মিলিয়া গ্রন্থখানি অনবদ্য।

নবীন যাত্রী : শিশু নাটিকা। শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সাহা। ভারতী লাইব্রেরী, ৪, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম—দশ আনা মাত্র।

'নবীন যাত্রী' স্ত্রী চরিত্র বর্জিত ছোটদের নাটক। ইতিপূর্বে লেখক 'ভয়া' 'প্রিয়া ও পরকীয়া', 'তরঙ্গ' প্রভৃতি উপন্যাস ও কাব্য রচনা করিয়া সাহিত্যকীর্তির পরিচয় দিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁহার প্রথম রচিত শিশু নাটক। অবিনাশবাবু যে শিশুনাট্য রচনাতেও সমান দক্ষ, 'নবীন যাত্রী' তাহার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। একটি আদর্শ মূলক কাহিনী লইয়া নাটকটি রচিত। চরিত্রগুলি তাহাদের নিজের নিজের ভূমিকায় প্রত্যেকেই স্পষ্ট। ছোটদের উপযোগী নাটকের ঘুনিনে এই জাতীয় গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক। 'নবীন যাত্রী' শিশুদের নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করিবে, নিঃসন্দেহ।

—র।

সঙ্গীত পরিক্রমা : নারায়ণ চৌধুরী। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ। ২৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭। দাম ৩।০।

চিন্তাশীল প্রবন্ধকাররূপে নারায়ণবাবু পাঠক সমাজের নিকট সুপরিচিত। চারুকলার বিভিন্ন বিভাগে তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ এবং তীক্ষ্ণ সৌন্দর্যবোধ রসজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ভারতীয় সঙ্গীতশ্রবণোৎসুক লোকের সংখ্যা নগণ্য নয়, কিন্তু বোদ্ধা বোধ হয় বেশী নেই। আর সাহিত্যে তার আলোচনা তো নিতান্তই বিরল। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি দুই একজনের কথা হয়তো এ প্রসঙ্গে মনে পড়বে, কিন্তু ঐ

দুই একজন। আলোচ্য গ্রন্থ বিষয়ের দিক্ থেকে চর্বিত-চর্বণ নয়, রচনাভঙ্গীর দিক্ থেকেও স্বতন্ত্র। প্রথমেই লেখক ভারতীয় সঙ্গীতের প্রধান ধারাগুলির পরিচয় দিয়েছেন : ধ্রুপদ, খেয়াল, তেলেনা টপ্পা, ঠুংরি, গজল প্রভৃতি। তারপর রাগসঙ্গীতের বিশেষত্ব নির্ণয় এবং তার প্রধান গায়কদের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আবদুল করিম ও ফৈয়াজ খাঁ, কেশরবাঈ ও হীরাবাঈ রাধিকা গোস্বামী ও জ্ঞান গোস্বামী, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ও তারাপদ চক্রবর্তী—প্রত্যেকের বিশিষ্ট ভঙ্গীর কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর আলোচনায় অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু তা বলে কারও দোষত্রুটি নজরে পড়লে তিনি সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে যান নি। 'সঙ্গীতে তিন-পুরুষে' আলাউদ্দীন, আলি আকবর ও আলীখাঁয়ের স্বাক্ষোদ্ঘাটন : গীতিকার ও সুরকারদের মধ্যে এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, দিলীপকুমার, দ্বিজেন্দ্রলাল, অজয় ভট্টাচার্য, তিনিবরেণ। মনে হয়েছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের কথা কি লেখক ভুলে গেলেন? পরে দেখলাম, একেবারে ভোলেননি, 'যৌথসঙ্গীতে' তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন।

রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে যাঁরা অনুভূতি ও চিন্তার সহ-যোগিতার পক্ষপাতী, তাঁরা এ বই পড়ে আনন্দ পাবেন।

একা : শ্রীসন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রাপ্তিস্থান : ১এ, রামকৃষ্ণদাস লেন, কলিকাতা ৯। দাম ৸০।

কবিতাগুলিতে চমক-লাগানো নূতনত্ব নেই,-কিন্তু আন্তরিক সহানুভূতির পরিচয় আছে। যাঁরা সহজ সুরে সুখদুঃখের কথা শুনতে ভালোবাসেন তাঁরা আনন্দ পাবেন। 'সার্থক প্রেম', 'শহরের এরা' প্রভৃতি কবিতায় দৈনন্দিন জীবনের ছবি সুন্দর ফুটে উঠেছে।

মধুপর্ক : শারদীয়, ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক ১৩৬২। সম্পাদক : সমর চক্রবর্তী। ২৩।১ চক্রবেড়িয়া রোড্ সাউথ, কলিকাতা ২৫। দাম ৸০।

সদ্যপ্রকাশিত এই কবিতাপত্রিকাখানি উত্তরোত্তর উন্নতিপথে চলেছে। এটি তৃতীয় বৎসরের প্রথম সংখ্যা। এই সংখ্যায় প্রথমেই আছে 'ফাল্গুনী'র আলোচনা-সম্বলিত রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি, তারপর জীবনানন্দের দু'টি অপ্রকাশিত কবিতা। সমর ভট্টাচার্য, দুর্গাদাস্তি, স্নেহাকর ভট্টাচার্য, সমর চক্রবর্তী এবং দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা কয়টিও ভালো লাগলো। জগদীন্দ্র (?) মণ্ডলের লেখা 'জীবনানন্দের উপমা' প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। অনেক অসাধারণ উপমার তাৎপর্য তিনি সুন্দর ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন। —বী।

অনিবার্য কারণে এবারে "বহ্নিবন্যা" উপন্যাস প্রকাশ করা সম্ভব হল না। আগামী অগ্রহায়ণ সংখ্যা হ'তে যথারীতি ক্রমশঃ প্রকাশিত হবে। —মঃ সঃ

শুভেচ্ছা

শারদীয় উৎসবান্তে এই প্রথম আবার আমরা পাঠক সাধারণের কাছে উপস্থিত হতে চলেছি। এই অবকাশে আমাদের সমস্ত পাঠক, পৃষ্ঠপোষক ও হিতৈষীগণকে আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিবেদন করছি। শরতের এই এক মাস বাঙালীর জীবনে নিয়ে আসে উৎসবের সমারোহ। দরিদ্রতম পরিবারেরও জীবনে এর প্রভাব আছে। দূর অতীতের কোন এক অধ্যাত্মিক প্রেরণাকে উপলক্ষ্য করেই সম্ভবতঃ প্রবর্তিত হয়েছিল এই সব পূজা ব্যবস্থা. কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে সে মূল প্রেরণা ক্রমশঃ প্রায় নিঃশেষ হয়ে এলেও সেই উপলক্ষ্যটাই বাঙালীর জীবনে একটা জাতীয় উৎসবের রূপ নিয়েছে। এই উৎসবের শত কৃত্রিমতার মধ্যেও এমন কিছু আছে যা আন্তরিকতায় নিবিড়, যা দূরকে কাছে আনে. সমস্ত মানুষকেই যেন, অন্ততঃ স্বল্প কিছুক্ষণের জন্য হলেও, অন্তরে আপন করে তোলে। সেই অনুভূতি নিয়েই আমরা এই অবসরে কাছের এবং দূরের সকলকে আমাদের গভীর অন্তরের কল্যাণেষণা জ্ঞাপন করছি।

চতুঃশক্তি সম্মেলন

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতির অন্যতম প্রধান উপায় হিসাবে জেনিভায় চতুঃশক্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ইংলণ্ড. ফ্রান্স. সোভিয়েট ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র—এই চার দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা এই বৈঠকে যোগদান করেন। বৈঠক সুরু হয়েছিল গত ২৭এ অক্টোবর এবং শেষ হয়েছে ১৬ই নভেম্বর—শেষ হয়েছে ব্যর্থতার মধ্যে। এই বৈঠকে প্রধান আলোচ্য ছিল তিনটি বিষয়: (১) ইউরোপীয় নিরাপত্তা ও জর্মানীর ঐক্য, (২) নিরস্ত্রীকরণের কার্যকরী ব্যবস্থা এবং (৩) রাশিয়া ও সোভিয়েট প্রভাবিত দেশগুলি এবং পশ্চিমের তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে সম্পর্কের উন্নতিসাধন। ...বর্তমানে যুদ্ধের ফলাফল কল্পনাতীত ভাবে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে, সুতরাং যুদ্ধ এড়াবার ইচ্ছাটা যুদ্ধের ইচ্ছাকে ছাপিয়ে উঠেছে আজ প্রায় সব দেশে—জনসাধারণের মধ্যে ত বটেই, সম্ভবতঃ শাসকদের মধ্যেও। কিন্তু যুদ্ধ যদি বাস্তবিক এড়াতে হয়, তবে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বন্ধুত্বমূলক করে গড়ে তোলা দরকার। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের বহু লোক সত্যই আশা করেছিলেন যে, ইউরোপ ও আমেরিকার বৃহত্তম চতুঃশক্তির প্রতিনিধিরা মিলিত হলে বর্তমানের সন্দেহ ও বিদ্বেষবিষাক্ত রাজনৈতিক আবহাওয়া অনেক পরিমাণে পরিচ্ছন্ন হওয়ার পথ হবে। সে আশা সফল হোলো না। সংবাদে প্রকাশ যে, আলোচ্য তিনটি বিষয়ের একটি সম্পর্কেও দুই পক্ষ—সোভিয়েট ও পশ্চিমী গণতন্ত্র—এক মত হতে পারেন নি। একমাত্র আশ্বাসের কথা এই যে, আলোচনা একেবারে বন্ধ হবে না—কূটনীতিক প্রতিনিধিগণের মারফৎ আলোচনা চলবে, এবং আগামী বছর কোন সময় রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠকও আবার হতে পারে।

রুশ-ভারত মৈত্রী

মার্শাল বুলগানিন ও মঃ ক্রুশ্চেভ ভারতে এসেছেন এবং আমরা গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে

সরকার ও দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁদের প্রত্যুজ্জীবনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা হয়েছে। বস্তুতঃ সোভিয়েট নেতাদের এইভাবে ভারতে আগমন—এ শুধু দুজন সোভিয়েট নাগরিকের ভারত ভ্রমণ নয়, এ চক্ষে সমগ্র ভারত ও সমগ্র রাশিয়ার পরস্পরকে অভিনন্দন। ভারতবাসী যে রাশিয়ার জনগণের প্রতি আন্তরিক সৌহার্দ্য পোষণ করে তার সুস্পষ্ট চিত্র তাঁরা দেখতে পাচ্ছেন। পৃথিবীব্যাপী সন্দেহ ও অবিশ্বাসের বিষাক্ত আবহাওয়ার বিরুদ্ধে শান্তির দিক থেকে ভারত ও রুশ এই দুই মহাজাতির এই সৌহার্দ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নিকিতা সার্গেইভিচ ক্রুশ্চেভ

নিকোলাই আলেকজান্দ্রোভিচ বুলগানিন

এই আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি, যা সর্বদাই বাঞ্ছনীয়, আজকার বিশ্বরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আরো অধিকতর বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠেছে। অত্যন্ত সাম্প্রতিক জেনিভা বৈঠকের ব্যর্থতার অব্যবহিত পরেই রুশ-ভারত মৈত্রীর এই অভিব্যক্তি বিশেষ চমকপ্রদ হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। এই অভিব্যক্তির মধ্য থেকে এটা প্রকাশ হচ্ছে যে, রাজনৈতিক আদর্শবাদ বিভিন্ন জাতির মধ্যে বন্ধুত্বের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবার কোন কারণ নেই। ভারতবর্ষ কম্যুনিজম গ্রহণ করে নি। সোভিয়েট রাশিয়াও তার নিজস্ব আদর্শ পরিত্যাগ করে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের প্রধান মন্ত্রী আমন্ত্রিত হয়ে রাশিয়ায় গিয়েছেন এবং সেখানে আন্তরিক অভিনন্দন পেয়েছেন। এবার সোভিয়েটের শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধিদের মধ্যে দু'জন ভারতে এসেছেন এবং

জীবনের মূল্য

রাজপথে বাস-সাইকেল সংঘর্ষে নিহত সাইকেল আরোহীর মৃত্যু সম্পর্কিত এক সাম্প্রতিক মামলায় কলিকাতার সিটি ম্যাজিস্ট্রেট যে রায় দিয়েছেন সেটা কর্তৃপক্ষের বিশেষ বিচার্য। দুর্ঘটনার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ম্যাজিস্ট্রেট বলেছেন যে, যদি চলাচল নিয়ন্ত্রণকারী পুলিশ (ট্রাফিক) সতর্কতার সঙ্গে কাজ করত তবে এই দুর্ঘটনা ঘটতে পারত না। তিনি আরো বলেছেন, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়স্বজনদের প্রতি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ব্যবহার অত্যন্ত অসঙ্গত হয়েছে। ...যে ঘটনা উপলক্ষ্যে এই মন্তব্য সেটা এমন কিছু নয় যা কদাচিৎ ঘটে। বরং এই জাতীয় ঘটনা প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক হয়ে উঠেছে। রাস্তায় অধিকাংশ দুর্ঘটনা যে ট্রাফিক পুলিশের গাফিলতি-

তেই ঘটে এটাও পুরানো কথা এবং আজকাল বহু হাসপাতালেই যে অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয় কাণ্ড ঘটতে সুরু করেছে এটা প্রায় কারো অজানা নেই। কিন্তু আশ্চর্য এই যে এসবের সুনিশ্চিত প্রতিকারের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা যাঁদের হাতে, মনে হয় তাঁদের কাছেই এসব সংবাদ কোনদিন পৌঁছায় না। বস্তুতঃ, ব্যাপার দেখে ধারণা হয় যে, কর্তৃপক্ষের মতে সম্ভবতঃ মানুষের জীবনই হচ্ছে একমাত্র বস্তু যার কোন মূল্য নেই বা থাকলেও অন্ততঃ তার জন্য কোন জবাবদিহি করতে এ রাজ্যে কেউ বাধ্য নয়। তবু কলিকাতার সিটি ম্যাজিস্ট্রেট যে সাহস করে একটা বিরূপ সমালোচনা প্রকাশ্যে করতে পেরেছেন তার জন্য আমরা তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

ভাষা ও শিক্ষা

সাম্প্রতিক এক বক্তৃতায় শ্রীনেহেরু বলেছেন হিন্দী বনাম মাতৃভাষা নিয়ে ঝগড়া করলে চলবে না, হিন্দী শিখতেই হবে; শুধু তাই নয়, এই দুটি ছাড়াও দেশী ও বিদেশী আরো দুই একটি ভাষা শিক্ষা করা ছাত্রদের উচিত। ইউরোপে, শ্রীনেহেরু বলেছেন, বহুলোকে তিন-চারটা ভাষা শেখে, অনেকে পাঁচটাও শেখে, ইত্যাদি... কারণে অকারণে ইউরোপের উপমা দেওয়াটা আমাদের অনেকের অভ্যাসগত হয়ে গেছে। অভ্যাসটা বহুদিনের, সুতরাং এটার জন্য কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। কথাটাই বিচার্য। অবশ্য যদি এটা রাজনৈতিক সভায় অসুবিধাজনক প্রশ্ন ধামাচাপা দেওয়ার কসরৎ মাত্র হয়, তা হলে কথাটাও বিচার্য নয়, কিন্তু যদি একথার মধ্যে সরকারিশিক্ষানীতির কোন ইঙ্গিত থাকে—আছে বলেই আমাদের আশঙ্কা হয়—তা হলে এ সম্পর্কে দুই একটি আপত্তির কথা সবিনয়ে শ্রীনেহরুর গোচরে আনা দরকার বিবেচনা করি। প্রথমতঃ শুধু ইউরোপ নয়, বহু-ভাষাবিদ্ লোক দুই একজন পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই পাওয়া যায়, কিন্তু পাঁচ বা চার বা এমনকি তিন ভাষাবিদ্ লোক ইউরোপে যেমনটা দেখতে পাওয়া যায় এটা বোধ হয় তথ্যের দিক থেকে সত্য নয়। দ্বিতীয়তঃ, সেটা সত্য হোক বা মিথ্যা হোক, শিক্ষনীয় ভাষার সংখ্যাবৃদ্ধির চেয়ে বিষয়গত শিক্ষার গভীরতার দিকে বেশী দৃষ্টি দেওয়াই নিশ্চয়ই প্রকৃষ্টতর শিক্ষানীতি। দশটি ভাষা জেনেও কোন লোক পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে প্রায় অজ্ঞ থাকতে পারে, আবার শুধু একটি মাত্র ভাষার মাধ্যমে অপর একজন পরম পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারে। প্রথম ব্যক্তি সম্ভবতঃ রাজনীতিকের আদর্শ, রাজনীতিককে বক্তৃতা করতে হবে, বক্তব্য বিষয় না বুঝলেও বিশেষ কিছু ক্ষতি নেই,—কিন্তু ছাত্রের আদর্শ নিশ্চয়ই দ্বিতীয় ব্যক্তি। স্বাধীনতা লাভের আট বছর পরেও যে দেশে একটা ভাষার মাধ্যমেও ভাল করে কিছু শেখাবার একটা ভাল ব্যবস্থা হোলো না, সেখানে বহু ভাষা শিক্ষার ওপর এই জোর দেওয়াতে এই মনে হয় যে সম্ভবতঃ এদেশে শিক্ষিত লোকের আর দরকার হবে না, সবাই যদি বহু-ভাষিক বক্তা হয়ে উঠতে পারে তা হলেই কাজ চলে যাবে। কিন্তু এই রকম নীতি চালু হলে দেশের ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যজনক হবে।

অন্তহীন আশ্বাস

এমন কোন সপ্তাহ বা মাস যায় না যখন ভারতের কোন-না-কোন প্রসিদ্ধ নেতা অ-হিন্দীভাষী অঞ্চলকে এই বলে আশ্বস্ত না করছেন যে, আঞ্চলিক ভাষাকে হারিয়ে যাবার বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় হিন্দীভাষাভাষীদের নেই। কথাটা খুবই সুন্দর, কোন সন্দেহ নেই। অপরপক্ষে, কথাটা অসাত্ত্বর, এতেও সন্দেহ প্রায় নেই বললেই চলে; কারণ যে সব ভাষায় ভাল সাহিত্যের বিকাশ হয়েছে ইতিমধ্যেই, এমন কাউকেই উৎখাত করা হিন্দীর পক্ষে সম্ভব হবে না—চেষ্টা থাকলেও হবে না, চেষ্টা না-থাকছে যদি ত ভালই। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে দাবানো হবে না—সাত বৎসর পূর্বে একথা প্রথম শুরু হয়েছে—এ আশ্বাসবাণী এমনি নিরন্তর দিনের পর দিন ধ্বনিত করে যাওয়ার প্রয়োজনটা আদৌ হচ্ছে কেন? এ আশ্বাস উচ্চারিত যখন হয়েই চলেছে, হবার কারণ আছেই। সম্ভবতঃ এ অনুমান অসঙ্গত হবে না যে

নেতাদের আশ্বাস সত্ত্বেও দাবানোর চেষ্টা এক পক্ষ থেকে এখানে-ওখানে হচ্ছেই, অথবা চেষ্টা কার্যতঃ না হলেও ছবার আশঙ্কাটা অন্যপক্ষের মনে নিয়ত রয়েছে। ফলে এমন একটা সমস্যা রয়েছে যার কথা লোকে, কোন পক্ষই, কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে একই ধাঁচা আশ্বাস-বাণীর অন্তহীন পুনরুক্তি না করে আঞ্চলিক ভাষার উপর অত্যাচার কোথায় কোথায় হচ্ছে বা হওয়া সম্ভব এবং কি উপায়ে এই সব অত্যাচার বা সম্ভাবিত অত্যাচার বন্ধ করা যায় সে সম্বন্ধে চিন্তা ভাবনা করে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারলে অনেক বেশী হিতকর কাজ করা হোতো।

সীমানা পুনর্বিন্যাস

সীমানা কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে এবং হচ্ছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এ রিপোর্ট বিবেচনা করেছেন এবং, সংবাদে প্রকাশ, মোটামুটি সন্তুষ্ট হয়েছেন। তবে, তাঁদের মতে, সামান্য কিছু রদ-বদল প্রয়োজন হবে, এবং সেটা করবার জন্য শ্রীনেহেরু প্রমুখ চারজন নেতার এক শক্তিশালী কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর এই কমিটির হাতেই সমস্ত ভার। সংবাদে আরো প্রকাশ যে রদ-বদল যাই করা হবে, সংশ্লিষ্ট বাদী-বিবাদী পক্ষের আপোষের দ্বারাই করা হবে—এটাই শ্রীনেহেরুর সংকল্প। তবে আপোষ যেখানে সম্ভব হবে না, শ্রীনেহেরু মনে করেন, সেখানে সীমানা কমিশনের নির্দেশই মেনে নেওয়া হবে—অর্থাৎ, পরিষ্কার ভাষায়, বাদী-বিবাদী পক্ষের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না রেখে প্রস্তাবিত পরিবর্তন সরকারি নির্দেশে সংসাধিত হবে।... এই শেষোক্ত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে বুঝতে পারা শক্ত কমিশন আদৌ কেন নিযুক্ত হয়েছিল। ভদ্রতার খাতিরে যেটা সামান্য রদ-বদল বলা হচ্ছে, আসলে সেটা সামান্য নয়। মারাঠা, গুজরাট, বিশালান্ধ্র প্রভৃতি রাষ্ট্র যদি সৃষ্টি করা হয় তা হলেও কমিশনের সুপারিশের অন্তই পরিবর্তন হোলো এ কথা বলে ভাষার ওপর জবর-দস্তিটা বড় বেশী করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, নীতির দিক থেকেও—কমিশন অবশ্য নীতির কোন বালাই রাখেন নি, কিন্তু যতটুকু রেখেছেন—এই পরিবর্তনে তারও বাতায় হবে। তৃতীয়তঃ শেষ পর্যন্ত সবটাই সরকারি পাঞ্জার জোরে ঘটিয়ে তোলা হবে। কমিশনের রিপোর্টে এমন কোন তথ্য নেই যা অভিনব, যা সরকারের জানা ছিল না, বা যা সরকারি দপ্তরখানায় বসে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। শেষ পর্যন্ত যদি আপোষের মাধ্যমে বা এমন কি আপোষ না করেই নিছক সরকারি নির্দেশেই সীমানার পরিবর্তন করা হয় তবে আসমুদ্রহিমাচল সর্বত্র প্রতি-বেশীর বিরুদ্ধে প্রতিবেশীর তিক্ততা সঞ্চারের উপলক্ষ হিসাবে সীমানা কমিশনের কি প্রয়োজন ছিল?

নীতিহীন নীতি

অবশ্য একথা মানতেই হবে যে সীমানা কমিশনের সুপারিশের কিছু কিছু রদ-বদল না করে উপায় ছিল না। রিপোর্টে বহু ভাল ভাল কথা আছে। কমিশনের সদস্যেরা বিজ্ঞ লোক, তাছাড়া জাতীয় ঐক্য এমন একটা জোরালো যুক্তি যার সম্বন্ধে ভাল কথা দুটো একটা না বলতে পারাই বরং অসম্ভব। কমিশন এই ঐক্য রক্ষার উপায় সম্বন্ধে নিছক তত্ত্বমূলক যা বলেছেন সে ভালো ভালই। কিন্তু সীমানা রদ-বদল ব্যাপারটা নিতান্তই কাজের কথা, এবং এ সম্পর্কে বিশেষ মূল্যবান কিছু সুপারিশ কমিশন করতে পারেন নি। তার অবশ্য কারণ, তাঁদের ব্যক্তিগত দুর্বলতা ছাড়াও, যে নির্দেশনামা (terms of reference) নিয়ে তাঁদের কাজ করতে হয়েছিল তার মধ্যে। কোন সুনির্দিষ্ট নীতি নিয়ে তাঁরা কাজ করেন নি। ছয় দফা নীতি ছিল তাঁদের হাতে। এরকম ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের মধ্যে যুক্তির চেয়ে পক্ষপাতীত্বের প্রাধান্য হওয়া প্রায় অনিবার্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় পশ্চিম বাংলার দাবীর কথা। যে দাবীগুলা তাঁরা মানতে চাননি সেগুলি ঐ 'ছ' দফা নীতির যেখানে যেটা প্রয়োগ করে খণ্ডন করা যায় তা তাঁরা করেছেন। এ সম্বন্ধে বহু বিশদ্ আলোচনা নানা দৈনিক ও অন্যান্য পত্রিকায় হয়ে গেছে। সে সবের পুনরুক্তি করা বাহুল্য। সিদ্ধান্তের সংক্ষেপে এই বলাই যথেষ্ট যে কমিশনের সীমানা-ঘটিত কোনটাই কোন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অনেক সময় মনে হয় আগে সিদ্ধান্ত স্থির করে পরে সেই সিদ্ধান্তের সমর্থন তাঁরা খুঁজেছেন তাঁদের ব্যাপক নির্দেশ-নামার মধ্যে। বলা বাহুল্য, এ রকম সিদ্ধান্তে কেউ খুশী হতে পারে না। বাংলা, দেশ খুশী হয় নি। বাংলার পশ্চিম সীমানা কি রকম হবে তা এখনও জানা যাচ্ছে না। কিন্তু সীমানা কমিশন বাংলার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করেছেন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এটা যদি এখনও বোঝেন তবে জাতীয় ঐক্যের পক্ষে মঙ্গল।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত
এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত

মন্দিরা

অষ্টাদশ বর্ষ | অগ্রহায়ণ—১৩৬২ | অষ্টম সংখ্যা

স্মৃতি-কথা

[বাল্য জীবন]

কবিশেখর কালিদাস রায়

ইহা হইল নিত্যকার আহারাদির ব্যবস্থা। এখন নৈমিত্তিক আহার্য্যের তালিকা দিই। নবান্ন হইতেই আরম্ভ করি। নবান্ন উপলক্ষে আমার যাহা তৈরী হইত —তাহা ফল দুধের মিশ্রণে উপাদেয় হইত এবং সেদিন বহব্যঞ্জনে অন্নপাত্র সজ্জিত হইত। সেদিন ভিল পিঠাদি হইতে আখভাজা নারিকেল ভাজা পর্য্যন্ত ১২।১৩ প্রকারের ভাজা হইত এবং পায়সও হইত—যদিও তাহা আখের গুড়ের। এইসব ব্যঞ্জনাদি বৎসরের অন্য কোনদিন খাইতে নাই—এইরূপই ধারণা ছিল। তারপর পৌষ-পার্ব্বণে চালের গুঁড়ি দিয়া নারিকেলছাঁই, তিলের ছাঁই ক্ষীর ইত্যাদির পুর দিয়া শক্তশক্ত পিঠা এবং পিটালি দিয়া আসুকে তৈরি হইত। ডাল দিয়া তেলে ভাজা পিঠাও তৈরি হইত। ঝোলা গুড় দিয়া খাইতে হইত। মহুয়া, ঘি, ক্ষীর, চিনি, নারিকেলকোঁড়া ইত্যাদির যোগে কিরূপ উৎকৃষ্ট পিঠা পুলি তৈরি হইতে পারে—তাহা পল্লীগ্রামের লোকদের অজ্ঞাত ছিল। ঐ পিঠা পুলিও বৎসরে একদিনের জন্য। অন্য কোনদিন ইহা যেন খাইতে নাই। সরস্বতী পূজার দিন আমরা পূজার পর খাইতাম ই, কলা, বাতাসা কইএ মাখিয়া। অপূর্ব্ব লাগিত তাহা। অন্য কোনদিন খাইবার সৌভাগ্য হইত না। সেইজন্যই বোধ হয় খুব ভালো লাগিত। সেদিন নিরামিষ ব্যঞ্জনের সঙ্গে দিঁচুড়ি খাওয়া হইত। এই দুর্ভাগীন দিঁচুড়ি কোন কোন বর্ষার দিন তরকারীর অভাব থাকিলে হইত। তাহাও উপাদেয় বোধ হইত। রোলের দিন নানা রঙের অবিমিশ্র চিনির ছাঁচ ও মটরভাজা একটা বিশিষ্ট খাদ্য। মটর ভাজাকে বলা হইত কুটকড়াই। রোলের দিন ঘরের ঠাকুরের লুচি ভোগ হইত। পুরোহিত ২।৪ খানা দয়া করিয়া রাখিয়া যাইতেন।

চৈত্রসংক্রান্তিতে ঘরের ছাতু খাওয়া হইত। ছোলার ছাতু আমাদের অঞ্চলে পাওয়া যাইত না। মুর্শিদাবাদে গিয়া প্রথম যেদিন ছোলার ছাতু খাইলাম—তখন মনে হইয়াছিল—ইহাতে ছোলা ভাজাই গুঁড়া করা, তরকারীর অভাবে শিলে গুঁড়ানো ছোলা ভাজা-ত কতদিন খাইয়াছি —উহা যে এত চমৎকার হইতে পারে, তাহাত কোনদিন কল্পনা করি নাই। ছোলা ভাজা গুঁড়া আমাদের ছিল ব্যঞ্জন, আর ইহাই ছাতুর আকারে পশ্চিমা গরিবদের দৈনিক খাদ্য। তখন মনে হইয়াছিল, ভাতের চেয়ে কত উপাদেয় খাদ্যই না তাহারা খায়!

মাসের বৈকালে শীতলপ্রসাদ আমাদের বিশেষ ভক্তযোগ ছিল। মুগের ডাল ভিজে, তার একটু ছানা, ২।৪ কুচি পেঁপে, কুচি, কলা, নারিকেল, বাতাসা, বরবটী ভিজে ইত্যাদি। চল্লিশ প্রহর উপলক্ষে মেলা বসিত। এই উপলক্ষে রসিক প্রসাদ রামানন্দের কীর্তন হইত।

আষাঢ়ের পরম উৎসব। বৎসরান্তে পাঁপর ভাজা খাইতে পাইতাম। কি অপূর্ব খাদ্য এইটি, অথচ এত সস্তা! ছোট একখানা পাঁপর খেতে খেতে কতই জুড়িয়া বড় বড় হইয়া উঠিতেছে, দেখিয়া বিস্ময় বোধ হইত। ভাবিতাম এই দেবদুর্লভ খাদ্য পাঁচে প্রত্যহ কেন কিনিতে পাওয়া যায় না? তাহা পাওয়া গেলে প্রত্যহ পিসীমার কাছ হইতে ১টা করিয়া পয়সা নিশ্চয়ই লইতাম। এই উপলক্ষে কাকা পিসীমা অন্যান্য আত্মীয় আত্মীয়ারা খাবার কিনিবার পয়সা দিতেন। জিলিপি, রসগোল্লা, পানতুয়া ইত্যাদি কিনিয়া খাইতাম। তেলেভাজা কচুরি, সিঙারা, ফুলুরি, সে সবই কি কম উপাদেয়? এসব পাঁচে অল্প সময় কিনিতে পাওয়া যাইত না। মনে মনে বলিতাম, রসসংকীর্তন তুমি বৃন্দদের জন্য আনিতে চরিতকি, আর আমার জন্য আনিতে পাপর পানতুয়া। তুমি বড়ই মধুর। ঐ রসসংকীর্তন নিঃশব্দে নিভৃতে আমার মর্মস্থলে আরও কি যে আনিত তখন তাহা অনুভব করিতে পারি নাই। ঘুলোটের দিন পাইতাম একডাব মালসা ভোগ, তুলসীপত্রবাসিত সেই চিপিটক পিণ্ড কি মধুরই লাগিত! পিতৃ-পুরুষদের মৃত্যু তিথিতে মালসাভোগ আমাদের বাড়ীতে দেওয়া হইত, তাহার অংশও পাইতাম। চিড়েদই বাতাসা—তাহাও ছিল আমাদের নৈমিত্তিক খাদ্য—নিত্যকার নয়।

মনসা পূজা উপলক্ষেও একটা মেলা বসিত। সে মেলায় তেলেভাজা, পাঁপর, ফুলুরি, বেগুনী, কচুরি, সিঙারা খাইতে পাওয়া যাইত।

জন্মাষ্টমীর দিন বাড়ীর ঠাকুরের কাছে লুচি ভোগ দেওয়া হইত। আমাদের কোন ভগিনী ছিল না কাজেই বাড়ীর জামাইও ছিল না। জামাই না আসিলে বাড়ীতে লুচিভাজা হয় না। লুচিভাজা বাড়ীতে বৎসরে এইরূপ দুই একদিনই হইত। পূজার সময় অবশ্য তিন দিন লুচিপ্রসাদ দুই একখানা খাইতে পাইতাম—তাহা পূজাবাড়ীতে। লুচি বড়ই দুর্লভ বস্তু ছিল। সাধ করিয়া কেহ কোনদিন বাড়ীতে লুচি খাইবে—ইহা কেহ কল্পনা করিতে পারিত না। কাহারও শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ থাকিলে লুচি খাওয়া হইত।

কোন বৃদ্ধের কঠিন পীড়া হইলে পাড়ার লোক বলাবলি করিত—"লুচিফলার পাকেলো বোধ হয় হরির দয়ায়।" বিবাহে, অন্নপ্রাশনে, উপনয়নে লুচি খাওয়ানোর প্রথা ছিল না।

নক্ষোৎসবের দিন হইত তাদের বড়া। তাহা তেলে ভাজা ও চালের গুঁড়ি দিয়া তৈরী। তাহাই কত উপাদেয় লাগিত।

পূজার সময় পূজাবাড়ীতে তিন দিন নিমন্ত্রণ থাকিত। সে নিমন্ত্রণ ভাত ডাল তরকারির।

সেকালে শ্রাদ্ধে পাকা ফলার খাওয়ানো হইত। তাহাতে থাকিত শক্ত শক্ত বড় বড় লুচি, চিনি, ছোলা দিয়া শাকভাজা, কুমড়ার ছক্কা ও ছোলার ডাল (আলোনা নুন মাখিয়া খাইতে হইত), পাতলা টাকো দই, এক চামচ ক্ষীর, দুই একটা রসগোল্লা কিংবা এক মুঠো বুঁদে।

ব্রত, মৃত্যুদিবসী, সপিণ্ডীকরণ ইত্যাদি উপলক্ষে হইত কাঁচা ফলার। চিড়েদইএর ফলারকে বলা হইত কাঁচা ফলার। ইহা কেবল ব্রাহ্মণদের জন্য। বৌভাত, অন্নপ্রাশন ইত্যাদিতে হইত ভোজ। মোটা চাউলের ভাত, তাহাতে থেবু থাকিত পিঁপড়ের ভয়ে আর চামচ দুর্গন্ধ ঘি, শাক, মোচার ঘন্ট (বড়ি ভাজা দেওয়া), লাউয়ের ঝাল, একটা চড়চড়ি, একটা সুক্তানি, একটা ডালনা, একটা ভাজা, বড়া, তিলপিটুলি, নামমাত্র মাছের ঝোল, মাছের টক, টকো পাতলা দই, গুড়ের পায়স তাহার উপর কয়েকটি বুঁদে। কোন জিনিষ দুইবার দেওয়া হইত না। মাছ ঝোলে এককুচি, অম্বলে এককুচি। মনে আছে একটা ভোজে রসগোল্লা দেওয়া হইতেছিল, আমি হাত পাতিয়া আছি, কিন্তু আমার কাছ পর্যন্ত আসিবার আগেই তাহা ফুরাইয়া গেল। পরিবেশক আমার এবং অন্যান্য

বালকদের হাতে একটু করিয়া রস ঢালিয়া দিলেন। আমি বাড়ী আসিয়া রসগোল্লার জন্য ঝোঁক ধরিলাম, কিন্তু গ্রামে কিনিতে পাওয়া গেল না। কয়েকদিন পরে কাকা কৈখন হইতে এক পোয়া রসগোল্লা আনিয়া দিলেন।

জ্যৈষ্ঠমাসে গ্রামের খোঁসাই বাড়ীতে ব্রাহ্মণগণ রাধামাধব বিগ্রহ আসিতেন। প্রসাদের নিমন্ত্রণ থাকিত। সুগন্ধ বিচি আতপ চাউলের অন্ন একমুঠা, তাহার পরই মোটা চাউলের ভাত, বহুবিধ ব্যঞ্জন, শেষে কলা ও নারিকেলকোঁড়া দিয়া ঘন দুধে চিনি দিয়া পায়সকরা সরু সুবাসিত চাউলের পরমান্ন এক চামচ পরিমাণে। চাউল যে কত উপাদেয় সুখাদ্য হইতে পারে তাহার আস্বাদ পাইতাম বৎসরান্তে এই উপলক্ষে।

ডিম মাংস খাওয়ার রেওয়াজ ছিল না। হাঁসের ডিম নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই খাইত। যাহারা শাক্ত তাহারা অনেকে দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও মনসাপূজা এই তিন পূজায় মাংস খাইতে পাইত। পাঁজোলায় এক কুটুম্ব বাড়ীতে কালীপূজার নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম পূজার পরদিন। সেখানে গিয়া ৪।৬টা পাঁঠার ছাল ছাড়ানো হইতেছিল। সে বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া একাই দৌড়াইয়া দেড় মাইল মাঠ পার হইয়া বাড়ী পলাইয়া আসিয়াছিলাম। আমাদের বাড়ীতে মাংস ডিমের প্রবেশাধিকার ছিল না।

পৌষমাসে ধানকাটার সময় গোরুর গাড়ী চড়িয়া মাঠে যাইতাম। আকর্ষণ ছিল—মুসুরি সিদ্ধ, ফুলুরি ও গুড়-পিঠালি। এইগুলি মাঠে বিক্রীত হইত। ধানে বোঝাই গাড়ীর উপরে চড়িয়া ফিরিয়া আসিতাম। আলু তোলার সময় ক্ষেতে যাইতাম—ক্ষেতে আলু পোড়ানো হইত। বিনা সবলেই তাহা খাইতে পারিতাম। সবচেয়ে আমোদ হইত আখের শাল উঠিলে। পেট ভরিয়া আখের রস ও তাতারসি খাওয়া হইত। সারাদিন শালেই কাটিত। আখ চিবাইয়া দাঁতের মাড়ি ছিঁড়িয়া যাইত।

সে সময়ের জীবনযাত্রা আমাদের এইরূপই ছিল। তখন কাহারও বাড়ীতে ইন্দারা কুয়া ছিল না, সকলেই পুকুরের জল খাইত। যে পুকুরে সকলে স্নান করে, হাঁস চরে, মাছ ধরা হয়, সেই পুকুরের জলই খাইতাম। পানা ঢাঁসাতলী ও নানাবিধ শৈবালের গন্ধে ভরা। নানা অনেক্য বস্তুর মিশ্রণে একটা অপূর্ব স্বাদযুক্ত আবহাওয়া জলই আমাদের পানীয় ছিল। ঐ জল খাইয়া কতি বৎসর দলে দলে গাঁয়ের লোক কলেরায় মারা যাইত। ঐ জল যে ফুটাইয়া লইয়া খাইতে হয়—তাহা কোন বাড়ীর লোকই জানিত না—আমিও জানিতাম কলেরার সময় ভগবানকে ডাকিতাম। মনে হয় শুধু ভগবানের কৃপায় সেই সব ডামাডোল হইতে কোন ক্রমে বাঁচিয়া গিয়াছি। যাহাদের ঐ রোগ হইত তাহাদের কেহই বাঁচিত না।

পায়খানা কাহারও বাড়ীতে ছিল না। গ্রামের স্ত্রী পুরুষ সকলকেই শৌচের জন্য মাঠে যাইতে হইত। পুকুরেই নরনারী সকলে স্নান করিত। দুই একটি পরিবারের বাড়ীর সঙ্গে অনেকটা করিয়া গাছপালায় ভরা পড়ো-জায়গা ছিল—সেই পরিবারের স্ত্রীলোকরাই বাহির হইত না। লোকে আহারের পর পাতের উচ্ছিষ্ট কুকুর ডাকিয়া খাইতে দিয়া পুকুরে আঁচাইত।

এখন আমি আর গ্রামের বাড়ীতে থাকি না—পরিবারের কেহ কখনও কচিৎ যায়। কিন্তু আজকাল আমাদের বাড়ীতে পায়খানা হইয়াছে, টিউবওয়েল হইয়াছে—দোতলা ঘর হইয়াছে—কিন্তু বাল্যকালে আমি এসব সুযোগ পাই নাই। গ্রামের ভদ্রপরিবারের অনেকেরই জীবনযাত্রা বদলাইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক বাড়ীর এক আধ জন বিদেশে চাকরি করে—যানবাহনের সুবিধা হওয়ায়, তাহারা ঘন ঘন বাড়ী আসে। এখন তাহারা শহরে ভাব গ্রামে আমদানী করিয়াছে। এখন বৈবাহিক আদানপ্রদানে আমাদের অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়—অনেক দূরবর্তী স্থলেও গ্রামের পুত্রকন্যার বিবাহ হইয়াছে। ইহার ফলে জীবন-যাত্রার পরিবর্তন হইয়াছে।

সেকালে বহির্জগতের সঙ্গে লোকের যোগাযোগ বিশেষ কিছু ছিল না। গ্রামের ২।৪ জন লোক বিদেশে কাজকর্ম করিত। এখন আর সেদিন নাই। এখন অর্থের তাড়নায় অধিকাংশ ভদ্র পরিবারের যুবকরা গ্রামের বাহিরে

গিয়াছে। এখন কোন পরিবারই আর শুধু জমির ফসলের উপর নির্ভর করে না। এখন গ্রামে টিউবওয়েল হইয়াছে, কলেরা আর হয় না, গ্রামে হাইস্কুল হইয়াছে, এখন অনেকেই জুতা ব্যবহার করে, গায়ে জামা দেয়, ছেলেরা ফুটবল খেলে, বিছানাপত্রের উন্নতি হইয়াছে, প্রত্যেক বাড়ীতে ষ্টীল ট্রাঙ্ক ও হারিকেন লণ্ঠন আছে। সকাল বেলায় প্রায় সকলের বাড়ীতে চা খাওয়ার রেওয়াজ হইয়াছে, গ্রামে মিঠাইয়ের দোকান হইয়াছে, বিস্কুট, পাঁপর, চীনাবাদাম ইত্যাদি পাওয়া যায়, নানাস্থান হইতে ফলমূল, মাছ ইত্যাদি বিক্রয়ের জন্য আসে, কফি, টমেটো ইত্যাদির চাষ হয়, অনেক বাড়ীতে পায়খানা হইয়াছে, কাহারো বাড়ী হইতে লুচি ভাজার গন্ধ আসিলে—ব্যাপার কি? জানিবার জন্য লোকে ছুটিয়া যায় না। লোকের বাড়ীতে চেয়ার, টেবিল, আলমারি পর্যন্ত স্থান পাইয়াছে

লোকে এখন ধোপাবাড়ীতে কাপড় কাচিতে দেয়। পাকা বাড়ী হয় নাই বটে, তবে অনেকের বাড়ীর মেঝে পিঁড়ে বাঁধানো। অবশ্য এখনো যাহারা কেবল জমির ফসলের উপর নির্ভর করিয়া আছে তাহাদের জীবনযাত্রা বিশেষ কিছু বদলায় নাই। এখন লোকে বুঝিতে পারিয়াছে ঘরে চাষ রাখিলে ভদ্রলোকদের পক্ষে লোকসানই হয়। এখন খুব কম লোকেরই ঘরে চাষ আছে। আমাদের ঘরে চাষ ছিল কিন্তু শহর হইতে টাকাও আসিত। তবু আমাদের জীবনযাত্রার মান অনুন্নত ছিল। তাহার কারণ গ্রামের অন্যান্য সকলের জীবনযাত্রার অনুন্নতাবে অনুন্নতি। আর একটা কারণ বাবা বছরে মাত্র একবার বাড়ী আসিতেন এবং তিনিও চালবাড়ানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। এখন কথা হইতে পারে—দেশে এত জমি, পরিজন এত কম, শহর হইতে মাসে মাসে টাকা আসিত—তবু যদি জীবনযাত্রা এইরূপ তবে টাকা কড়ির যায় হইত কিসে? টাকা কি জমিত? আদৌ না, বরং মাঝে মাঝে দোকানে ধার হইত।

বাড়ীতে চাষ রাখা তখনকার দিনে একটা পারিবারিক মর্যাদা (লোকে বলিত ইজ্জত) বলিয়া গণ্য হইত। মুনিষ রাখাল গাড়ী পাল্কী গোরু মহিষ লইয়া গৃহস্থ হইত পল্লী অঞ্চলে সম্ভ্রান্ত। এই চাষ রক্ষাটা ছিল বহু ব্যয় সাপেক্ষ। ভদ্রলোক বাড়ীতে চাষ করিয়া সেকালে কখনও লাভবান হইতে পারিত না। প্রতি বৎসর এই চাষে আমাদের লোকসান হইত। এই লোকসানটা বাবা কাকা বুঝিতেন না। তাঁহারা পারিবারিক মর্যাদার কথাটাই ভাবিতেন। আমি বড় হইয়া কলেজে পড়িবার সময় হিসাব করিয়া বাৎসরিক লোকসানটার পরিমাণ বুঝাইয়া দিয়া চাষ বন্ধ করিয়া দিলাম। কাকা বলিলেন, "আমি কি নিয়ে থাকি, বল।" আমি বলিলাম,—"আপনি এখন হরিনাম করবেন।" কাকা খুশী হইলেন না।

অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ইত্যাদিতেও আমরা এখন আর ব্যয় করি না—অযথা অপব্যয়ে লোকজনকে আমরা আর খাওয়াই না। কিন্তু আমার বাবা কাকা প্রত্যেক পারিবারিক অনুষ্ঠানই করিতেন ঘটা করিয়া লোকজন খাওয়াইয়া। এক একবার ধান বিক্রয় করিয়া যে টাকাটা হাতে আসিত—তাহা এক একটা অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হইয়া যাইত। ইহাও ছিল পারিবারিক মর্যাদা রক্ষার জন্য।

মাছতরকারির ব্যয়ের চেয়ে তামাকের ব্যয় ছিল ঢের বেশী। তেল অপেক্ষা ঘুটের ব্যয় ছিল বেশী। তাহা ছাড়া চাষের ধান চাউল বলিয়া ধানচালের উপর কোন দরদ ছিল না। অন্নদান ও অন্নের অপব্যয় ছিল অত্যন্ত বেশী। টাকাপয়সা দিতে কষ্ট বোধ করিতেন কাকা, কিন্তু ধান চাল, গুড় ইত্যাদি সম্বন্ধে ছিলেন দরাজহস্ত। বড় বড় ঘরগুলির মেরামতী খরচ কম ছিল না। বহু দিনের সঞ্চিত ধানে একটি পুকুর কাটানো হইয়াছিল। সে পুকুর এখন আমাদের বিক্রয় করিতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া, নিষ্কর্মা আত্মীয় স্বজনদের আসাযাওয়া এবং বহুদিন ধরিয়া থাকিয়া যাওয়া ও গরীব প্রতিবেশীদের জন্য ব্যয় ছিল।

আমি যাঁহারা ভদ্রজাতীয় গৃহস্থদের কি নিদারুণ দুর্দশাই না দেখিয়াছি! তাহারা প্রতিদিন কি খায় তাহাও স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তাহাদের তুলনায় নিজেদের জীবনযাত্রাকে কোন দিন দুঃস্থ বলিয়া মনে হয় নাই। ভদ্র সমাজের দাবি

মিটাইতেই তাঁহাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে—রান্নাঘরের দাবি মিটাইবার শক্তি কিছুই অবশিষ্ট থাকে নাই। যথাযোগ্য খাদ্যের অভাবে তাহারা অল্পায়ু হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছে। পথের পাঁচালীতে বিভূতি অপুর মায়ের যে দারিদ্র্যের আভাস দিয়াছে, সেই দারিদ্র্য আমি অসহায় বহু পল্লীনারীগণের মধ্যে দেখিয়াছি। দেখিয়াছি—অসহায়া নারী হয়ত একটি পুত্র বা কন্যা লইয়া বিধবা হইয়াছে। কর্মক্ষমতা থাকিলেও গ্রামে তাহার কোন কর্ম নাই। রাঁধুনী বা ঝি-এর কাজ পাইলে তাহাও করিতে পারিত। এ বাড়ী ওবাড়ীতে ঘুরিয়া অযাচিতভাবে কোন কোন কাজের সহায়তা করে—আর দুপুর বেলায় কোন একটা বাড়ীতে আঁচল পাতে। এক ছটাক চাউলও ঘরে নাই, চাউল কয়টি পাইলে উনুন জ্বলিবে। পুকুরের ধারে কচুর ডাঁটা পাওয়া যায়, চাহিয়া চিন্তিয়া দুটা আলু বা একফালি বেগুনও মিলে, নুনও একটু মিলে! সেদিনের সংস্থান হইল। কোন বাড়ীতে রাঁধা ভাতও কোন কোন দিন মেলে, এইভাবে দিনের পর দিন চলে। দশ বছরের ছেলে পাঠশালায় ২।১ বছর পড়ে। বামুন কায়েতের ঘরের ছেলে না হইলে রাখালি করিতে পারিত।

বেকার ভদ্র গৃহস্থ, জমির ভাগের ধান ৪।৫ মাসেইশেষ হইয়াছে। কোন কাজে গ্রামে জুটে না, কামার নয়, কুমোর নয়, চাষী নয়, গোয়ালা নয়, বাঁশী ডোম চাঁড়ালও নয়, জাতিতে ব্রাহ্মণ। কি কাজ সে করিবে? পৈতাগাছটিকে সম্বল করিয়া গোটা গ্রামের ব্রাহ্মণেতর জাতির সে হইত প্রতিপাল্য। আমি যখন ছোট ছিলাম, গ্রামের বহু মূর্খ ব্রাহ্মণকে অন্যত্র পাচকের কাজ অথবা খাবারের দোকানে হালুইকরের কাজ করিবার জন্য শহরে যাইতে দেখিয়াছি।

গ্রামের ভদ্রজাতীয় পরিবারের অধিকাংশই ছিল দুঃস্থ। দুই বেলা শাকান্ন কোন প্রকারে তাহাদের জুটিত। গ্রামের লোকেরা এটা ওটা ভিক্ষা দিয়া তাহাদের বাঁচাইয়া রাখিত।

পুকুরে মাছ ধরানো হইলে দেখিয়াছি কোন কোন ভদ্রজাতীয় লোক সারাক্ষণ জেলেদের পিছে পিছে ঘুরিয়া শেষে তাহাদের কাছ হইতে দুটি পুঁটি মাছ ভিক্ষা করিতেছে। নয়ত যেখানে মাছ ভাগ হইতেছে সেখানে বকের মত প্রতীক্ষা করিতেছে—যদি ২।১টা কাঁটাও চাহিয়া পায়।

দেখিতাম সকাল হইতে গ্রামে বাহির হইয়া কেহ একশত ঘোর কি একটা পুঁইলতা কেহ একমুঠা দালের ফুল, কেহ দুটি মূলা, কেহ একটি ডাল কি বেল, কেহ এক আঁটি শাক সংগ্রহ করিয়া সানন্দে গৃহে ফিরিতেছে।

কত লোকের ঘরের চালে খড়ের অভাবে বর্ষায় জল পড়ে, দিয়াশলাইএর অভাবে মেয়েরা অন্য বাড়ীতে আগুন ভিক্ষা করিতে আসে, যাইবার সময় লাউ কুমড়ার খোলাগুলি কুড়াইয়া লইয়া যায়। সেলাইএর উপর সেলাই দিয়া একখানা কাপড়কে দু'বছর চালায়। গামছা পরিয়া একখানা কাপড়ই শুকাইয়া লয়, দরিদ্র গৃহিণীরা পাশের বাড়ী হইতে রাঁধা তরকারি ভিক্ষা করিয়া লইয়া যায়। কোন উপলক্ষে কোন বাড়ীতে নিমন্ত্রণ হইলে এই সকল পরিবারের মহামহোৎসব হইত। ভাতের নিমন্ত্রণে তুলিয়া আনিবার কিছু থাকিত না—ছেলেরা কাঙালিনী মায়ের জন্য চুনকি করিয়া পায়স লইয়া আসিত। এই সকল দৃশ্য দেখিয়া আমার বালক-হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত! আমি বাড়ী হইতে কত জিনিষ চুরি করিয়া সঙ্গীসাথীদের বাড়ীতে দিয়া আসিতাম। আমার নিজের কোচড় ভরা মুড়ি মুড়কি পাটালি তাহাদের সঙ্গে ভাগ করিয়া খাইতাম। এই সব দুঃস্থ পরিবারের আতিকুলের বন্ধনই হইয়াছিল কাল। কোন নিম্নজাতীয় পরিবারের যত দুঃখই থাকুক এতটা অন্নকষ্ট ছিল না! তাহাদের একটা দশ বছরের মেয়েও গোবর কুড়াইয়াও নিজের অন্নের সংস্থান করিত আর দুঃস্থ ভদ্র পরিবারের দশ বছরের মেয়েকে পরের দেওয়াল হইতে চুরি করিয়া ঘুঁটে খসাইয়া লইতে হইত। এই পরিবেষের মধ্যে আমাদের জীবনযাত্রাকে ধনি-পরিবারের জীবনযাত্রাই বলিতে হইবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন

অধ্যাপক—বিজুরঞ্জন গুহ

[পূর্বানুবৃত্তি]

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদানপদ্ধতির মধ্যেও দেখি তিনি সহজ ও ফাঁকির প্রশ্রয় দেননি। ছাত্রদের কাছে অনেক সময় কঠিন বিষয়ের আলোচনা করেছেন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কীটস্‌ ব্রাউনিং, কালিদাস, ভবভূতি ইত্যাদি বিশ্ববিখ্যাত কবি ও মনীষীদের লেখা প'ড়ে শুনিয়েছেন। তারা হয়তো অনেক সময় সে সব আলোচনা বুঝতে পারে নি। কিন্তু তাই বলে অতিরিক্ত সহজ করে ব্যাখ্যা করে অত্যন্ত

করে নিয়ে তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেননি। তাদের কল্পনা উদ্বুদ্ধ হোক, তাদের সাহস ও আত্মনির্ভরতা বাড়ুক এই ছিল তাঁর আদর্শ। ভীরুতা নয়, আলস্য নয়, কঠিন ও দুরূহকে জয় করবার, আয়ত্ত করবার বীর্য ও উদ্যম তাদের আয়ত্ত হোক এই তিনি চেয়েছেন। তাদের বুদ্ধির অনুপাতে অনেক কঠিন বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতেও তিনি কোনদিন নিষেধ করেন নি। ছাত্রদের জন্যে নানা বিষয়ে বই তিনি লিখেছেন। শুধু গল্প, উপন্যাস, নাটক নয়, পাঠ্যপুস্তক, বিজ্ঞানের বই—সর্বত্রই ছোটরা কি করে জ্ঞানের বস্তুকে ভালবাসতে শিখবে সে চেষ্টা আছে কিন্তু কোথাও ফাঁকি দিয়ে মন ভোলাবার চেষ্টা নেই। তাঁর 'বিশ্বপরিচয়' বইএর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "এর নৌকোটা অর্থাৎ এর ভাষাটা যাতে সহজে চলে সে চেষ্টা এতে আছে, কিন্তু মাল খুব কমিয়ে দিয়ে একে হালকা করা কর্তব্য বোধ করিনি। দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না। আমার মত এই যে, যাদের মন কাঁচা তারা যতটা স্বভাবতঃ পারে নেবে, না পারে আপনিই ছেড়ে দিয়ে যাবে, তাই ব'লে তাদের পাতটাকে প্রায় ভোজ্যশূন্য করে দেওয়া সদ্ব্যবহার নয়। যে বিষয়টা শেখবার সামগ্রী, নিছক ভোগ করবার নয়, তার উপর দিয়ে অবাধে চোখ বুলিয়ে যাওয়াকে পড়া বলা যায়। মন দেওয়া এবং চেষ্টা করে বোঝাটাও শিক্ষার অঙ্গ, সেটা আনন্দেরই সহচর। ...এক বয়সে দুধ যখন ভালবাসতুম না, তখন গুরুজনদের ফাঁকি দেবার জন্যে দুধটাকে আগাগোড়া কেনিয়ে বাটি ভরতি করার চক্রান্ত করেছি। ছেলেদের বই যাঁরা লেখেন, দেখি তাঁরা প্রচুর পরিমাণে ফেনার যোগান দিয়ে থাকেন। এইটে ভুলে যান, জ্ঞানের যেমন আনন্দ আছে তেমনি তার মূল্যও আছে, ছেলেবেলা থেকে মূল্য ফাঁকি দেওয়া অভ্যাস হোতে থাকলে যথার্থ আনন্দের অধিকারকে ফাঁকি দেওয়া হয়। চিবিয়ে খাওয়াতেই একদিকে দাঁত শক্ত হয় আর একদিকে খাওয়ার পুরো স্বাদ পাওয়া যায়।"

১৩২৯ সালের একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "আমাদের দেশবাসীরা 'ভূমৈব সুখম্' এই ঋষিবাক্য ভুলে গেছে। ভূমৈব সুখং তাই জ্ঞানতপস্বী মানব দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করেও উত্তর মেরুর দিকে অভিযানে বার হচ্ছে, আফ্রিকার অভ্যন্তরপ্রদেশে দুর্গম পথে যাত্রা করেছে, প্রাণ হাতে করে সত্যের সন্ধানে ধাবিত হচ্ছে। তাই কর্মজ্ঞান ও ভাবের সাধন পথের পথিকেরা দুঃখের পথ অতিবাহন করতে নিক্রান্ত হয়েছেন; তাঁরা জেনেছেন যে, ভূমৈব সুখং—দুঃখের পথেই মানুষের সুখ। আজ আমরা সে কথা ভুলেছি, তাই অত্যন্ত ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও অকিঞ্চিৎকর জীবনযাত্রার মধ্যে আত্মাকে প্রচ্ছন্ন করে দিয়ে দেশের প্রায় সকল লোকেরই কাল কাটছে। শিক্ষালয় স্থাপন করবার সময়ে প্রথমেই আমার একথা মনে হল যে, আমাদের ছাত্রদের জীবনকে মানসিক ক্ষীণতা থেকে ভীরুতা থেকে উদ্ধার করতে হবে।"

এ আদর্শ নিশ্চয়ই "ললিত লবঙ্গলতা নরম সরম মেয়েলী" আদর্শ নয়।

যদিও তিনি প্রাচীন ভারতের তপোবনের আদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী, তবুও তিনি জানতেন, সেই তপোবনের আদর্শ সম্পূর্ণভাবে বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার উপযোগী নয়। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান সাধনা, তাঁদের কর্মক্ষেত্রে মহৎ কীর্তিকে তিনি অশ্রদ্ধার চোখে দেখেন নি। বরং গোড়া থেকেই তিনি এই প্রাণবান্ সভ্যতার দুঃসাহসিক নানা পরীক্ষা এবং কর্মোদ্যমকে অনুকরণীয় বলে মনে করেছেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান ত্রুটি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত লোভ—জাতিগত ঔদ্ধত্য ও নির্লজ্জ ভোগবাদিতা। একে তিনি কখনও গ্রহণ করেন নি—কিন্তু তাদের সত্যানুসন্ধিৎসা নিষ্ঠা, কর্মকুশলতা মহৎ ও অনুকরণীয় গুণ বলেই মনে করেছেন। তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শের সমন্বয় করতে চেয়েছেন তাঁর শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে। 'A Poet's School' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "I had intently wished that the introspective vision of the universal soul which an Eastern devotee realises in the solitude of his mind could be united with this spirit of its outward expression in service, the exercise of will unfolding the wealth of beauty and well-being from its shy obscurity to the light" তাই তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষার মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ ব্যক্তিবিকাশের যে আদর্শটি কল্পনা করেছেন সেটি হচ্ছে "to be vitally active and mentally civilized."

দেশের যে প্রচলিত শিক্ষা তা জীবনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন। জীবনের সমস্যা সমাধানে এ আমাদের সাহায্য করছে না। এ শিক্ষা আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠছে না, তাই এ আমাদের কোন বল দিচ্ছে না। তাই তিনি চেয়েছেন শিক্ষাকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করতে। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ছাত্ররা এমন শিক্ষা পাবে যে জীবনে কোন নূতন অবস্থায়ই তারা নিজেদের অসহায় বোধ করবে না এবং যে সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান তারা শিখছে তা সরস, সজীব ও অর্থপূর্ণ হয়ে তাদের জীবনকে সমৃদ্ধতর করবে। এ অস্বাভাবিক অবস্থার একটা মস্ত কারণ, আমাদের শিক্ষার বাহন হচ্ছে বিদেশী ভাষা—তাই তিনি বহু প্রবন্ধে একথা আলোচনা করেছেন এবং তাঁর বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার মাধ্যমেই উচ্চতর শিক্ষা দেবারও ব্যবস্থা করেছেন। সর্বত্র তিনি সফল হন নি, বহু বাধা পেয়েছেন, কিন্তু এটা স্বীকার করতেই হবে—বিশেষ করে তাঁর চেষ্টার ফলেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী মর্যাদা পেয়েছে। শিক্ষাকে দেশের 'চিত্তে প্রবাহিত করবার উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি বাংলা ভাষায় ছাত্রের পুস্তক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন এবং যারা ইংরেজি স্কুলে পড়বার সুযোগ পায়ে না তারাও যাতে জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্রস্থাপন করে বাংলা ভাষায় নানা পরীক্ষা গ্রহণ ও উপাধিদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। (লোক শিক্ষা সংসদ) আমাদের দেশের শিক্ষার এই অস্বাভাবিক অবস্থা সম্বন্ধে দুঃখ করে শিক্ষার বিকিরণ প্রবন্ধে লিখেছিলেন "ইংরেজি খানার টেবিলে আহারের জটিল পদ্ধতি যার অভ্যস্ত নয় এমন বাঙালির ছেলে বিলেতে পাড়ি দেবার পথে পি এণ্ড ও কোম্পানীর ডিনার কামরায় যখন খেতে বসে তখন ভোজ্য ও রসনার মধ্যপথে কাঁটাছুরির দৌত্য তার পক্ষে বাধাগ্রস্ত বলেই ভরপুর ভোজের মাঝখানেও ক্ষুধিত উদরের দাবি সম্পূর্ণ মিটতে চায় না। আমাদের শিক্ষার ভোজেও সেই দশা—আছে সবই, অথচ মাঝখানে অনেকখানি অপচয় হয়ে যায়। 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' ঘটে না বলেই শিক্ষা আমাদের পাথেয় না হয়ে, বোঝা হয়। এজন্যে শিক্ষাকে প্রাণময় ও সরস করবার জন্যে তাঁর চেষ্টার অবধি ছিল না। কি পদ্ধতি অবলম্বন করলে এ উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে তা নিয়ে তিনি নিজেও যেমন নানা চিন্তা করেছেন, তাঁর সহকর্মী শিক্ষকদেরও নানা পরীক্ষার স্বাধীনতা দিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন।

বাস্তবিক পক্ষে তাঁর বিদ্যালয়ের কেন্দ্র ছিলেন শিক্ষক। তাঁদের চরিত্র, তাঁদের ব্যক্তিত্ব, তাঁদের বিদ্যার

সাধনা হবে। তাঁরা ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করবেন। তাঁরা শুধু বেতনভুক্ কর্মচারী নন তাঁরা সত্যিকারের শিক্ষাব্রতী গুরু। তাঁরা হবেন ছাত্রদের শুভার্থী সুহৃদ, তাদের ভুলে ও প্রলোভনের দিনে রক্ষক, তাদের আনন্দের সহচর তাদের জীবনের জীবন্ত আদর্শ। তাঁরা হবেন অনলস, ধৈর্যশীল, শান্ত সুবুদ্ধিযুক্ত। শাসন ও ভিত্তির দ্বারা তাঁরা ছাত্রদের ভয়ের কারণ হবেন না—প্রীতি, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে তাঁরা ওদের উচ্চাসনে বসবার অধিকার লাভ করবেন। 'আশ্রমের শিক্ষা' (১৩৪৩ বাং) প্রবন্ধে লিখেছেন 'দেখেছি মনে মনে তপোবনের কেন্দ্রস্থলে গুরুকে। তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ, নিষ্ক্রিয়ভাবে মানুষ নন, সক্রিয়ভাবে; কেননা মনুষ্যত্বের লক্ষ্যসাধনেই তিনি প্রবৃত্ত। এই তপস্যার গতিমান ধারায় শিষ্যের চিত্তকে গতিশীল করে তোলা তাঁর আপন সাধনারই অঙ্গ। শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবহিত সঙ্গ থেকে। নিত্যজাগরূক মানবচিত্তের এই সঙ্গ জিনিষটি আশ্রমের শিক্ষার সবচেয়ে মূল্যবান উপাদান।" প্রচলিত বিদ্যালয়গুলিতে এটি ঘটে না বলেই শিক্ষাদান বহুল পরিমাণে নিরর্থক হয়ে যায়। 'শিক্ষাসংস্কার' প্রবন্ধে লিখেছেন "আমরা যাঁহাকে ইস্কুলের শিক্ষক করি তাঁহাকে এমন করিয়া ব্যবহার করি যাহাতে তাঁহার জীবনের অতি অল্প অংশই কাজে লাগে। যন্ত্রের সঙ্গে একখানা বেত এবং কতকটা পরিমাণ মগজ জুড়িয়া ইস্কুলের শিক্ষক তৈরি করা যে পারে। কিন্তু এই শিক্ষককেই যদি গুরুর আসনে বসাইয়া দাও, তবে স্বভাবতই তাঁহার হৃদয় মনের শক্তি সমস্ত ভাবে শিষ্যের দিকে ধাবিত হইবে। অবশ্য, তাঁহার যাহা সাধ্য তাহার চেয়ে বেশি তিনি দিতে পারিবেন না। কিন্তু তাহার চেয়ে কম দেওয়াও তাঁহার পক্ষে লজ্জাকর হইবে।" বহু বিদ্যালয়ে ছাত্রদের 'ডিসিপ্লিন' কথাটাতেই জোর দেওয়া হয়। এটা শিক্ষকেরা অনেক সময় ভুলে যান, বালক বয়সে কিছুটা পরিমাণ চাঞ্চল্যই স্বাভাবিক। এটাকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। শুধু স্বীকার করা নয়, একে তিনি মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি চেয়েছেন ছেলেরা প্রাণবান ও দুঃসাহসী হোক্। কিছু উৎপাত তারা করবেই, কারণ যেখানে প্রাণ আছে সেখানেই চাঞ্চল্য। তাই তিনি 'শিক্ষাসংস্কার' প্রবন্ধে লিখেছেন— "ডিসিপ্লিনের যন্ত্রটাকে যে পরিমাণ পাক দিলে ছেলেরা সংযত হয়, তাহার চেয়ে পাক বাড়াইবার চেষ্টা দেখা যাইতেছে—ইহাতে তাহাদিগকে নিঃসত্ত্ব করা হইবে। ছেলেদের মধ্যে ছেলেমানুষের চাঞ্চল্য যে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর, তাহা স্বদেশের সম্বন্ধে ইংরেজ ভালো করিয়াই বোঝে। তাহারা জানে এই চাঞ্চল্যকে দমন না করিয়া যদি নিয়মিত করিয়া পুষ্ট করা যায়, তবে ইহাই একদিন চরিত্র ও বুদ্ধির শক্তিরূপে সঞ্চিত হইবে। এই চাঞ্চল্যকে একেবারে দলিত করাই কাপুরুষতা সৃষ্টির প্রধান উপায়। ছেলেদের যাহারা যথার্থ-হিতৈষী তাহারা এই চাঞ্চল্যের মধ্যে প্রকৃতির মহৎ উদ্দেশ্য স্বীকার করে, তাহারা ইহাকে উপদ্রব বলিয়া গণ্য করে না। এই জন্য কালোচিত চাঞ্চল্যের নানাবিধ উৎপাতকে বিজ্ঞলোকেরা সস্নেহে রক্ষা করেন।"

আশ্রমের পরিধির মধ্যেই ছাত্রদের শিক্ষা সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় তাদের সংসারের আবিলতা ও কোলাহল থেকে দূরে গুরুগৃহের শান্ত নির্মল পরিবেশে স্থাপন করা তিনি অবশ্য প্রয়োজন মনে করেছেন। "সংসার কাজের জায়গা ও নানা প্রকৃতির লীলাভূমি। সেখানে এমন অনুকূল অবস্থার সংঘটন হওয়া বড়ো কঠিন যাহাতে শিক্ষাকালে অক্ষুব্ধভাবে ছেলেরা শক্তিলাভ ও পরিপূর্ণ জীবনের মূলপত্তন করিতে পারে।" কিন্তু তাদের সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিজেদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রাখলে তাদের হৃদয় ও মনের প্রসার বাড়তে পারে না। তাই যেমন দেশ বিদেশের কাহিনী তাদের শুনিয়েছেন, তেমনি ব্যবস্থা করেছেন— তাদের আশেপাশের গ্রামের লোকদের সঙ্গে তারা মিশবে, তাদের জীবন ও আচার প্রণালী সম্বন্ধে তারা উৎসুক হবে তাদের সুখ দুঃখের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করে তাদের সঙ্গে সেবা প্রীতি ও প্রাণের সম্বন্ধ স্থাপন করবে।

আম্রকুঞ্জে বসন্তোৎসব—শান্তিনিকেতন

বিদ্যালয়ে যেমন নানা বিদ্যাচর্চা, খেলা, ধুলা, কর্মোদ্যম সচেতন ভাবে কাজ করবে তেমনি অচেতন ভাবে একটি শান্তি, উৎসাহ, শুভবুদ্ধি, প্রীতি, ক্ষমা ও আনন্দের পরিবেশও থাকা চাই। বাস্তবিক পক্ষে সেই সংজ্ঞাতীত পরিবেশের মধ্যেই আশ্রমবিদ্যালয়ের প্রাণকোরক নিহিত। তাই A Poet's School প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন "Children have their active sub-conscious mind which, like the tree has the power to gather its food from the surrounding atmosphere. For them the atmosphere a great deal more important than rules and methods, building appliances, class teachings and text books. The earth has her mass of substance in her land and water, But, I may be allowed figurative language, finds her inspiration of freedom the stimulation of her life from her atmosphere..... In his society man has the diffuse atmospere of culture always about himself. It has the effect of keeping his mind sensitive to his racial inheritance, to the current of influences that come from tradition ; it makes it easy for him unconsciously to imbibe the concentrated wisdom of ages..... I tried to create an atmosphere institution, giving it the principal place in our programme of teaching"

রবীন্দ্রনাথের চোখে বিদ্যার দান ও গ্রহণ শুধু স্বার্থের ব্যাপার নয়, এ সম্বন্ধ পারমার্থিক। তাই ঈশ্বরকে জাগ্রত রাখা এ শিক্ষার শেষ উদ্দেশ্য। তাই তিনি একনিষ্ঠ হয়ে এ ব্রত গ্রহণ ও পালনের জন্যে আহ্বান করেছেন ছাত্রদের। তিনি বলেছেন "আজ থেকে তোমরা

সত্যব্রত গ্রহণ করলে। মিথ্যাকে কায়মনোবাক্যে দূরে রাখবে।.....আজ থেকে তোমাদের অভয়ব্রত। ধর্মকে ছাড়া জগতে তোমাদের ভয় করবার কিছু নেই। আজ থেকে তোমাদের পুণ্যব্রত। যা কিছু অপবিত্র কলুষিত, যা কিছু প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ হয়, তা সর্বপ্রযত্নে প্রাণপণে শরীর মন থেকে দূর করে নির্মলনির্মল ফুলের মত পুণ্যে ধর্মে বিকশিত হয়ে থাকবে।.....আজ থেকে তোমাদের মঙ্গলব্রত। যাতে পরস্পরের ভালো হয় তাই তোমাদের কর্তব্য...এক কথায় আজ থেকে তোমাদের ব্রহ্মব্রত.....তিনিই তোমাদের একমাত্র ভয়, তিনিই তোমাদের একমাত্র অভয়।

এই ধর্মচর্চা কি বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের, বিশেষ কোন জাতির ? তা নয়। এ ধর্ম সর্বমানবের ধর্ম, বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলনের মন্ত্র—তাই তিনি ছাত্রদের উপদেশ দিয়েছেন প্রত্যহ এই মহান্ মন্ত্র উচ্চারণের জন্য

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গ
দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

রবীন্দ্রনাথ এ গায়ত্রী মন্ত্রের এ ভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই অংশ গায়ত্রীর ব্যাহৃতি নামে খ্যাত। চারি দিক হইতে আহরণ করিয়া আনার নাম ব্যাহৃতি। প্রথম ধ্যানকালে ভূলোক, ভুবর্লোক ও স্বর্লোক অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ব জগৎকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে—তখনকার মতো মনে করিতে হইবে আমি সমস্ত বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়াছি...বিশ্বজগতের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিশ্বজগতের যিনি সৃষ্টিকর্তা তাঁহারই বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করিতে হইবে। মনে করিতে হইবে এই ধারণাতীত বিপুল বিশ্বজগৎ এই মুহূর্তে এবং প্রতি মুহূর্তেই তাহা হইতে বিকীর্ণ হইতেছে।...কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিব। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন সেই বীর্যস্বরূপেই তাঁহাকে ধ্যান করিব।...বিশ্বজগতের সবিতা আমাদের মধ্যে অহরহ যে বীর্যশক্তি প্রেরণ করিতেছেন, যে শক্তি থাকার দরুণ আমি নিজেকে ও বাহিরের বিশ্বব্যাপারকে উপলব্ধি করিতেছি—সেই বীর্যশক্তি তাঁহারই শক্তি এবং সেই বীর্যশক্তি দ্বারাই তাঁহারই শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অন্তরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ রূপে অনুভব করিতে পারি...বাহিরে জগৎ এবং আমার অন্তরে যে, এ দুইই একই শক্তির বিকাশ—ইহা জানিলে জগতের সহিত আমার চেতনার এবং আমার চেতনার সহিত সেই সচ্চিদানন্দের ঘনিষ্ঠ যোগ অনুভব করিয়া সংকীর্ণতা হইতে, ভয় হইতে বিষাদ হইতে মুক্তিলাভ করি।" পাঠারম্ভের পূর্বে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্মিলিত প্রার্থনা হবে

সহ বীর্যং করবাবহৈ।
আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া যেন বীর্য প্রকাশ করি।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু।
তেজস্বীভাবে আমাদের অধ্যয়ন অধ্যাপনা হউক।
মা বিদ্বিষাবহৈ।
আমরা পরস্পরের প্রতি যেন বিদ্বেষ না করি।
ভদ্রন্নো অপি বাতয়ঃ মনঃ।
হে দেব, আমাদের মনকে মঙ্গলের প্রতি সবেগে প্রেরণ করো।

এ বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও শিক্ষারীতি কি তার পরিচয় হয়তো স্পষ্টতর হবে যদি তাঁর রচিত "শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের আদর্শ ও শিক্ষাপ্রণালী"র আলোচনা হতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করি।

১। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য এই যে এখানে ছাত্রেরা বিদ্যাশিক্ষাকে তাদের অখণ্ড প্রাণপ্রকৃতির ও মনঃপ্রকৃতির বিচিত্রলীলার অঙ্গরূপেই গ্রহণ করতে পারে।

২। এই আদর্শকে যদি মানি তবে প্রথম দরকার বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে এখানকার শিশুদের আন্তরিক যোগসাধন। লোকালয়ের কৃত্রিম জীবনযাত্রায় এই যোগ বিচ্ছিন্ন ও বিকৃত হয়।

৩। এই আশ্রমে গাছপালা পশুপাখি যা কিছু আছে ছাত্রেরা তাদের সম্পূর্ণভাবে জানবে এটি খুবই দরকার। আমাদের অধ্যাপনায় পুঁথিগত বিদ্যার পরেই আমাদের একান্ত সতর্কতা, কিন্তু কত বিদ্যা আমাদের চোখের কাছে কানের কাছে, হাতের কাছে আমাদের মনোযোগের প্রতি অপেক্ষা ক'রে প্রত্যহই ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। তা'তে করে শুধু একটা দেশ জোড়া চিত্তবৈকল্য ঘটছে তা নয়, দেশের প্রতি আমাদের অনুরাগের সম্পূর্ণতাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।... নিজের পর্যবেক্ষণের দ্বারা যাতে ছেলেরা তা জানে তার উৎসাহ দেওয়া ও ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক।...এর মধ্যে শক্ত হবে, যিনি পরিচয় সাধনে সহায়তা করবেন এমন একজন সুদক্ষ উৎসাহী চোখ-কান-খোলা মানুষ পাওয়া।

৪। শিক্ষার যেমন জানার দিক আছে তেমনি আবার কাজের দিকও আছে। আশ্রমের গাছপালা পশুপক্ষীকে সেবা করাও একটা বড়ো সাধনা।

৫। প্রকৃতির সঙ্গে যোগের কথা হল, তেমনি লোকালয়ের সঙ্গে যোগও চাই। ভুবনডাঙাগ্রাম ও সাঁওতাল পাড়াগুলির সম্যক পরিচয় যাতে ছেলেরা পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। তাদের সঙ্গে আমাদের ছাত্রদের যোগে সেবার সম্বন্ধ রাখা আবশ্যক।

আশ্রমে ব্রতীবালক সম্প্রদায় গড়া হয়েছে। নিকটবর্তী পাড়ায় ব্রতী সম্প্রদায় স্থাপন ক'রে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে চারদিকের পাড়ার কাজে আমাদের ভালো ক'রে চালাতে হবে।...আশ্রমের মধ্যে যেখানে কোনো জঙ্গল বা গর্ত ডোবা আছে, যেখানে চলাচলের রাস্তা ভেঙেচুরে গেছে, যেখানেই কোথাও জল জমে মশার, ও মরলা জমে মাছির উৎপত্তির কারণ হয়েছে, সেখানেই সংস্কারকার্যে ব্রতীরা যেন মনোযোগ করে। ছেলেদের শোবার ঘরের মেঝে ও তাদের বিছানাপত্র মাঝে মাঝে কার্বলিক প্রভৃতি নৈয়ায়িক পদার্থ দ্বারা বিশেষ বিশেষ দিনে ভালো ক'রে ধুইয়ে দেওয়াও তাদের কাজ।

৬। ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্বন্ধ কেবল শিক্ষাদানের সম্বন্ধ হলে চলবে না, যথার্থ আত্মীয়তার সম্বন্ধ হওয়া চাই। ...গুরুপল্লীর সঙ্গে ছাত্রনিবাসের স্নেহসেবার সম্বন্ধ নানা উপায়ে নানা উপলক্ষ্যে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের প্রত্যেক ছাত্রনিবাস এক একটি গুরুপরিবারের সঙ্গে সংলগ্ন হওয়া যদি অবাধে হওয়া সম্ভবপর হতে পারত তবে সেইটিই সবচেয়ে ভালো হ'ত।

৭। আর একটি গুরুতর শিক্ষার বিষয় আছে, সেটি হচ্ছে লোকব্যবহার। মানুষ সামাজিক জীব, এইজন্যে যেমন তার সামাজিক নীতি আছে, তেমনি সামাজিক রীতিও আছে। সেই রীতি পালনের দ্বারা মানুষের পরস্পরের সম্পর্ক সুন্দর ও সুসহ হয়।

...আজকাল শিক্ষাঘটিত ও অর্থঘটিত পরিবর্তনে গ্রাম্য জীবনের সংস্কারগুলি অনেক নষ্ট এবং অনেক শিথিল হয়ে গেছে। সুতরাং সে সমাজের রীতিও নেই, আর সাধারণ ভাবে পৃথিবীর দূর নিকট সকল মানুষের সঙ্গে আমাদের কী রকম ব্যবহার করা শোভন তারও কোন রীতি আমাদের অভ্যস্ত হয়নি। এমনতরো রীতিবিরলতার মতো কুশ্রী আর কিছুতেই হতে পারে না। নিজের ব্যবহারের এইরকম রূঢ়তা যে আমাদের নিজের পক্ষেই অপমানজনক তাও আমরা বুঝতে পারিনে।

...মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ স্বীকারের প্রথম সাধারণ উপায় হচ্ছে অভিবাদন ও নমস্কার। এ সম্বন্ধে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে ভদ্র অভ্যাস পাকা করিয়ে দেওয়া চাই।

ছাত্রেরা আপন পরিবারের বাইরে গুরুজনকে পাদ গ্রহণ করবে এটা আমি পালনীয় মনে করিনে। কিন্তু নত হয়ে নমস্কার করা তাদের কর্তব্য। আর তাঁরা সম্মুখে এলে উঠে দাঁড়ানো চাই। যেখানে অনেকে সমবেত, সেখানে সকলে মিলে একসঙ্গে নমস্কার করাই শোভন।.....গুরুপত্নীদের সম্বন্ধেও এই নিয়ম।

বাহিরের অতিথিরা দর্শক রূপে ক্লাসে উপস্থিত হলে ছাত্রেরা সমবেতভাবে তাঁদের নমস্কার করবে। দিনের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎকালে ছাত্রেরা পরস্পরকে নমস্কার করবে।

৮। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে যে-সব ছাত্র আসে বাঙালী ছাত্রদের জানা উচিত যে তারা বিশেষভাবে তাদেরই অতিথি। সকল বিষয়ে তাদের আনুকূল্য করা বাঙালী ছাত্রদেরই কর্তব্য।

৯। সকল কাজে সময় পালন করাও এই রীতিপালনের অঙ্গ। ক্লাসে, সভায়, উপাসনাগৃহে বা ভোজনশালায় যথাসময়ে উপস্থিত না হওয়া অন্যের অসম্মান একথা মনে রাখা কর্তব্য।

১০। মন্দিরে ক্লাসে বা সভায় অপরিচ্ছন্ন হয়ে যাওয়াও অভদ্রতা। ভারতবর্ষে এ সম্বন্ধে মুসলমানদের আচার ভদ্র আচার।

কিছুকালপূর্বে ছেলেরা খালি পা ক'রে পরিবেশন করত, এখন সে নিয়ম আছে কিনা জানিনে, কিন্তু থাকা উচিত।

১১। বাস সম্বন্ধেও ভদ্রতার রীতি আছে। ঘর ও ঘরের আসবাব ও নিজের ব্যবহার্য সামগ্রী নোংরা ও কদর্য হতে দেওয়া অভদ্রোচিত

১২। বিদ্যালয়ের নানা প্রকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের নিজের ইচ্ছাচালনার বহুবিধ উপায় থাকা চাই। এতে তাদের সেই আত্মকর্তৃত্বের চর্চা হয়, যে কর্তৃত্ব দায়িত্ব বোধের দ্বারা পদে পদে নিয়ন্ত্রিত।"

ছাত্রদের শিক্ষা প্রণালী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা

১। মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকলপ্রকার শক্তির মধ্যে একটি অখণ্ড যোগ আছে। পরস্পরের সহযোগিতায় তারা বললাভ করে।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের প্রচলিত শিক্ষার প্রথায় আমরা সাধারণতঃ পুঁথিগত কয়েকটি বিষয় বাছাই করে নিয়ে আর সমস্তকেই স্বীকার করি।...আমাদের দেশে স্কুল কলেজের বাহিরে ছাত্রদের জন্য শিক্ষার ক্ষেত্র নেই বললেই হয়।

তাই নোট-নেওয়া মুখস্থ-করা বিদ্যায় তাদের মন যে পরিমাণ বস্তু পায় সে পরিমাণ খাদ্য পায় না।

দেহের শিক্ষা যদি সঙ্গে সঙ্গে না চলে তাহলে মনের শিক্ষার প্রবাহে বেগ পায় না।

……দেহের চর্চা বলতে, আমি ব্যায়াম বা খেলার চর্চা বলছিনে।—দেহের দ্বারা আমরা যে সব কাজ করতে পারি সেই সব কাজের চর্চা—সেই চর্চাতে দেহ সুশিক্ষিত হয় তার জড়তা দূর হয়।

আমাদের আশ্রমে প্রত্যেক ছাত্রকেই বিশেষ ভাবে কোনো না কোনো হাতের কাজে যথাসম্ভব সুদক্ষ করে দেওয়া চাই। হাতের কাজ শিক্ষাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। আসল কথা, এই রকম দৈহিক কৃতিত্ব চর্চায় মনও সজীব সতেজ হয়ে ওঠে।…… যার দেহ শিক্ষিত হয়নি সে যতো বড়ো পণ্ডিতই হোক সংসার ক্ষেত্রে অধিকাংশ বিষয়েই তাকে পরাসক্ত হয়ে জীবন যাপন করতে হয়—সে অসম্পূর্ণ মানুষ। এই অসম্পূর্ণতা থেকে আমাদের প্রত্যেক ছাত্রকেই বাঁচাতে হবে।

দেহের শিক্ষার সঙ্গে মনের শিক্ষার, দেহের সচলতার সঙ্গে মনের সচলতার যোগ আছে এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।…এই কারণেই আমি মনে করি পথচারী বিদ্যালয়ই বিদ্যালয়ের আদর্শ। ইস্কুলের বদ্ধ ঘরে শিক্ষা দিলে আমাদের জীবন লীলার অধিকাংশ উদ্যমই সেই শিক্ষা-প্রণালী থেকে বাদ পড়ে। তেমন খাঁচার পাখিকে বুলি শেখানো অসম্ভব হয় না, কিন্তু তাকে উড়তে শেখানো যায় না।

ভ্রমণ করতে করতে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। তার কারণ কেবলমাত্র এ নয় যে, ভ্রমণে নানা বিষয় পর্যবেক্ষণের দ্বারা আরও হয়। তার কারণ এই যে, নিত্যই নূতনের সংযোগে এবং অন্তর ও বাহির উভয়ের সম্মিলিত পদক্ষেপে আমাদের জাগরূক চিত্তবৃত্তি সর্বদাই উৎসুক হয়ে থাকে।"

১৩০৯ সালে কুঞ্জ ঘোষ মহাশয়কে আশ্রমের আদর্শ ও পরিচালনা সম্পর্কে যে দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন—তার থেকেও কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি…তাতেও আশ্রমের রীতি কি হওয়া উচিত সে আলোচনা তিনি বিস্তারিত করেছেন। আশ্রমের খুঁটিনাটি বিষয়েও তাঁর কতটা দৃষ্টি ছিল এতে বোঝা যাবে। অধ্যাপকদের সম্পর্কে কিছু উপদেশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"আমি আশা করিয়া আছি, যে অধ্যাপকগণ, আমার অনুশাসনে নহে, অন্তরস্থ কল্যাণবীজের সহজ বিকাশে ক্রমশই আশ্রমের সহিত আনন্দের সহিত ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সঙ্গে নিজের জীবনকে একীভূত করিতে পারিবেন। তাঁহারা প্রত্যহ যেমন ছাত্রদের সেবা ও প্রণাম গ্রহণ করিবেন তেমনি আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের দ্বারা ছাত্রদের নিকট আপনাদিগকে প্রকৃত ভক্তির পাত্র করিয়া তুলিবেন। পক্ষপাত অবিচার, অধৈর্য, অল্প কারণে অকস্মাৎ রোষ, অভিমান, অপ্রসন্নতা ছাত্র ও ভৃত্যদের সম্বন্ধে চপলতা, লঘুচিত্ততা ছোটোখাটো অন্যায় দোষ, এ সমস্ত প্রতি-দিনের প্রাণপণ যত্নে পরিহার করিতে থাকিবেন। নিজেরা ত্যাগ ও সংযম অভ্যাস না করিলে ছাত্রদের নিকট তাঁহাদের সমস্ত উপদেশ নিষ্ফল হইবে এবং ব্রহ্মচর্যাশ্রমের উজ্জ্বলতা ম্লান হইয়া যাইতে থাকিবে। ছাত্রেরা বাহিরে ভক্তি ও মনে মনে উপেক্ষা করিতে যেন না শেখে।

…অধ্যাপকদের প্রতি ছাত্রদের নির্বিচারে ভক্তি থাকা চাই। তাঁহারা অন্যায় করিলেও তাহা বিনা বিদ্রোহে সহ্য করিতে হইবে। কোনো মতে তাঁহাদের সমালোচনা বা নিন্দায় যোগ দিতে পারিবে না। অধ্যাপকেরা যদি কখনো পরস্পরের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন তবে সে সময়ে কোন ছাত্র সেখানে উপস্থিত না থাকে তৎপ্রতি যত্নবান হইতে হইবে। কোন অধ্যাপক ছাত্রদের সমক্ষে অন্য অধ্যাপকদের প্রতি অবজ্ঞাজনক ব্যবহার, অসহিষ্ণুতা বা রোষ প্রকাশ না করেন, সেদিকে সকলের মনোযোগ থাকা কর্তব্য।" কিন্তু নিয়মকেই তিনি কখনও বড়ো করে তোলেন নি। এ বিদ্যালয়ে তিনি সকলের চেয়ে দাম দিয়েছেন স্বাভাবিক শুভবুদ্ধির ও আন্তরিক নিষ্ঠার। তিনি সেই উল্লিখিত চিঠিতে লিখেছিলেন, "প্রধানতঃ নিয়মের সাহায্যেই বিদ্যালয় চালনার প্রতি আমার বিশেষ আস্থা নাই। কারণ, শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়টি পড়া গিলাইবার কল মাত্র নহে। স্বত-উৎসারিত মঙ্গল ইচ্ছার সহায়তা ব্যতীত ইহার উদ্দেশ্য সফল হইবে না।"

লাবণ্য

শ্রীইলা দেবী

সত্যিই অবাক হয়ে গেলাম। আশ্চর্য না হয়ে উপায় নেই। পৌনে দুটার ট্রেন ধরতে হবে,—তাড়াতাড়ি করে পথে নেমেছি, অপূর্ব আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করালো। সামনের প্রসন্ন বাবুর বাড়ীর সদর দরজা খুলে পথে পা দিয়েছেন এক ভদ্র মহিলা। বয়স নিঃসন্দেহ চল্লিশের ঊর্ধ্বে। রং তামাটে, দোহারা চেহারা। পরণে শাদা শালোয়ার, গায়ে একটা শাদা মেরে পুলিনি কোট তাতে ভালো করে কোমরে বেল্ট আঁটা। কিন্তু শুধু এই-ই নয় এর ওপর আবার একটা শাদা চাদর ঘোমটার মত মাথার ওপর দেওয়া। মুখখানা সৌন্দর্যসম্পদে কিছুমাত্র আহামরি নয় কিন্তু করুণ, বিষণ্ণ। এক নজর চোখ তুলে আমাদের দিকে তাকালেন, সে দৃষ্টিতে যেন বিশ্বের বেদনা পুঞ্জীভূত।

ভালো করে ভোর হয়নি তখনও। পথে আমরাই তিনটি প্রাণী। শীতশেষের সেই ভোর বেলার অবহা কুয়াশার পটভূমিকায় সে মূর্তি যে কি অদ্ভুত লাগলো! আমার কেবলই মনে হতে লাগলো মৃত্যুকে যদি রূপ দেওয়া যায় তবে সে বুঝি এমনই হবে।

থমকে পড়েছিলাম। অপূর্ব চমকে দিয়ে বলে, দেখ শুদ্ধু সব পাগল হোল নাকি রে?

কথা বলতে ইচ্ছে করলো না, শুধু সপ্রশ্ন চোখ তুলে তার দিকে চেয়ে রইলাম।

পোষাক দেখলি?

সংক্ষেপে বললাম—যার যা পোষাক!

মানে? বাঙালীর আবার এ পোষাক কবে হোল? যা ইচ্ছে তাই পরলেই হোল নাকি?

বাঙালী? পাঞ্জাবী নয়?

তাই—ভেবেছিস বুঝি? পাঞ্জাবী ও বাড়ীতে কোত্থেকে আসবে? প্রসন্নবাবুর ঐ ত ছোট্ট পায়রার খোপ বাড়ী, ওতে তো আর ভাড়াটে নেই নিশ্চয়ই, প্রসন্ন বাবুর বাড়ীরই কেউ হবে। আর তা ছাড়া আমার যেন কেমন চেনা চেনা মনে হচ্ছিল চেহারাটা—

তাড়া হুড়ো করে বাস ধরা গেল। বাস যখন প্রায় ষ্টেশনের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অপূর্ব প্রায় চীৎকার করে উঠ্‌লো—হয়েছে রে, মনে পড়েছে।

কি হোল? চ্যাচাচ্ছিস কেন? আর একবার চমকে উঠ্‌লাম। ভোর বেলার প্রশান্তির মধ্যে মনটা কেমন মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। আর থেকে থেকে কেবলই চোখে ভাসছিল দুত্যুর মত শাদা গুণ্ঠন-ঢাকা ঐ মুখখানা।

লাবণ্য, ও নিশ্চয়ই লাবণ্য।

লাবণ্য! কে লাবণ্য? কোন লাবণ্য?

মনে পড়ছেনা তোর? সেই যে রমানাথ কবিরাজ লেনের মেসে যখন থাকতাম, তখন সামনের ঐ ভাঙা বাড়ীটায় থাকতো যে ওরা। উৎসাহে যেন উপচে পড়ছে অপূর্ব। মুচ্‌কি হেসে বল্লে সেই নিত্যকার ট্রামের ব্যাপারটা মনে পড়ছে না তোর?

মনে পড়লো এতক্ষণে। আর অস্পষ্ট নেই। তাই বুঝি এতক্ষণ ধরে মনে মনে সেই পরিচয়কেই হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম।

ট্রেনের দোলানীতে বেঞ্চিতে ঘাড় কাত করে অপূর্ব ভোরে ওঠার শোধ তুলতে লাগলো, কিন্তু আমার মন এক পা এক পা করে পিছিয়ে যেতে লাগলো বাইশ বছর আগেকার জীবনে।

সামান্য পঁচিশটি টাকা মাসোহারার বন্দোবস্ত করে

বাবা পাঠিয়ে দিলেন কলেজে পড়তে কোলকাতা সহরে। কাজেই নগণ্য সরু গলির দীনতারণের ঐ ভাঙাচোরা সেই বাড়ীটাই আমাদের পক্ষে তখন স্বর্গরাজ্য ছিল। আমার মত ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখটাকার স্বপ্নবিলাসী আরও কয়েকজন জুটেছিল সেখানে। আজ জীবনের পথে পথে তারা কোথায় ছিটকে ছড়িয়ে গেছে শুধু যোগসূত্র আছে আজও এই অপূর্বের সঙ্গে।

সে দিনের সেই বয়সটারই যে কি মাধুর্য ছিল চোখে যা তাই সুন্দর তাই অপূর্ব বোধ হত। আমাদের মেসের সামনেই যে দেড়কাঠা পোড়ো জমিটুকু ছিল, সেটাও যেন তুচ্ছ নয়। তাকেও আমরা মনশ্চক্ষে স্বীকৃতি দিয়েছি। মাঝে মাঝে সেখানেই আমাদের আড্ডা বসতো। চিনেবাদাম আর চালভাজা চিবোতে চিবোতে মোহন বাগান বনাম ইষ্টবেঙ্গলের জোর সমালোচনা চলতো। ঐখান থেকেই নজরে পড়তো সুরঙ্গুরে ভাঙা ইট বার করা বাড়ীটার এক তলার ছুটো ঘরে লাবণ্যদের ঘরকন্না। মা আর ছুটি ভাই বোন, তিন জনের সংসার। ভাইটি বুঝি আই-এ পাশ করেছে। একটা ছেঁড়া হাফ্‌সার্ট, ময়লা ধুতি আর হাড় বের করা স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়ে এক একদিন আমাদের পাশ দিয়েই বাসায় ফিরে ঢুকতো, ক্লান্ত আর বিবর্ণ তার চেহারা। তিন কেজির ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়ার মত যেন জোর করে নিজেকে টেনে নিয়ে চলেছে। তাকে দেখলেই আমরা স্তব্ধ হয়ে যেতাম। বুঝতাম—আজকের দিনটাও মিথ্যে কাটলো। চাকরী আজও জোটেনি হিরণের। তারপর দম বন্ধ করে শুনতাম ঘরের মধ্যে রুগ্ন মার কণ্ঠের প্রশ্ন—খোকা, কিছু হোল রে?

না মা।

উত্তরও দিতনা হিরণ, যেন তার পাঁজরা খসিয়ে একটা নিঃশ্বাস এসে পড়তো। ঘরের হাওয়াটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত। তারপর যেন আর একটা ঝড় উঠ্‌তো, মা নিঃশ্বাস ফেলে বলতেন তাইত রে, কি হবে তবে?

কান্না নয়, কিন্তু মনে হোত কথা ক'টা প্রায় উপবাসী দীর্ঘ দেহ ছুড়ে যেন কেঁদে বেড়াচ্ছে।

অপূর্ব গলা বাড়িয়ে দেখতো অন্ধকার ঘরের তক্তপোষের ওপর ছুই হাঁটুতে মাথা গুঁজে শ্রান্ত ক্ষুধার্ত কুড়ি বছরের ছেলেটি পাথরের মত বসে রয়েছে। কে জানে, কাঁদছে কি? অমর খিদে সহ্য করতে পারত না। গভীর সমবেদনার সঙ্গে বলতো আহা রে! নির্ঘাত খিদের কাঁদছে রে ছেলেটা। কম হাঁটতে ত হয়নি সারাটা দিন। সকাল বেলার সেই ছুটো ভাতের পর আর নিশ্চয়ই কিছু জোটেনি। আমি হলে তো ঠিক মরে যেতাম।

আমাদের মনও কেমন দমে যেত। স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতাম। বাদামগুলো পড়েই থাকতো। কারও যেন হাত উঠতো না।

সেই সময় ছাত্রী পড়িয়ে বাড়ী ফিরতো লাবণ্য। মাজা রং-এর ওপর সুশ্রী মুখ, স্বাস্থ্যবতী চেহারা, বছর আঠারো বয়স হবে হয়তো। সে বয়সের অনুসন্ধিৎসা! খবর জোগাড় হয়েছিল লাবণ্যও ম্যাট্রিক পাশ করেছে। কর্পোরেশন স্কুলে মাষ্টারী করে আর ছাত্রী পড়ায়। সংসার চলছে তারই জন্যে। সেই সকাল বেলায় রেঁধে বেড়ে সকলকে খাইয়ে গিয়েছে আর এই ফিরছে। ঘরে উঠলো লাবণ্য। আমরা একটু উসখুস করে এতক্ষণে সোজা হয়ে বসলাম। আশা হোল এতক্ষণে ঐ নীরন্ধ্র অন্ধকার রুদ্ধশ্বাস ঘরে একটু আলো জ্বলবে একটু প্রাণের স্পর্শ জাগবে। তাই হোত। লাবণ্য ঘরে ঢুকে তাক হাতড়ে দেশলাই বার করতো, হারিকেনটা জেলে প্রথমেই মাকে জিজ্ঞাসা করতো শরীর কি তোমার ভালো নেই মা! আলো আলো নি যে? তারপর উঠে দাঁড়াতেই আলোটা যখন এধিকে এসে হিরণের ওপর পড়তো, তার গলার স্বরটা কেমন আশ্চর্য্য কোমল হয়ে উঠতো। দাদা কখন ফিরলে? বসে রয়েছে কেন এমন করে? ষ্টোভটা ধরিয়ে চা খেলেই ত পারতে।

তারপর বাইরে যাবার কাপড়খানা সন্তর্পণে খুলে রেখে ষ্টোভ ধরাতে বসতো।

কলেজ যাবার সময় এক একদিন ছেঁড়া কাপড়ের পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখেছি ছুটো কলাই করা থালায় ভাত

নিয়ে খেতে বসেছে ভাই বোনে—ডাল ভাত আর হয়তো একটু আলু সেদ্ধ।

এমনি যখন অনেকটা সহ্য হয়ে এসেছে তখন একদিন একটা নতুনত্ব ঘটলো। অনেকটা হেঁটে, অনেকগুলো ঝাঁকা ঝাঁকা গলি পার হয়ে আমাদের বড় রাস্তায় উঠ্‌তে হোত। একদিন নজরে পড়লো এই গলির এক জায়গায় একজন সুদর্শন সুপুরুষ সুসজ্জিত চেহারার ভদ্রলোক লাবণ্যর সঙ্গ ধরেছে। সে বয়সে এ একটা ভয়ানক আবিষ্কার। দলের মধ্যে খবর হতেই সকলেই পর্যায়ক্রমে আপা যাওয়ার সময় নজর রাখতে লাগলাম।

উত্তেজিত হয়ে একদিন খবর দিল অপূর্ব—জানিস, লাবণ্য আজ আচ্ছা ধমক দিয়েছে ভদ্রলোককে।

কেন আপনি এমন করে আমার পিছু নিয়েছেন বলুন তো? জানেন তো আমি গরীব। কষ্ট করে আমার দিন চালাতে হয়।

ভদ্রলোকটি মুখ টিপে কেমন একটু হাসলো। সে আমি সবই জানি মিস্ দাস।

রাগে যেন লাল হ'য়ে উঠলো লাবণ্য। অপূর্ব বলে স্কুলেই বোধ হয় খিটিমিটি হয়েছিল আগে। রাগে যেন তার কথা বেধে যেতে লাগলো।

তবে কোন অধিকারে এমন করে আমার পেছনে লেগেছেন? জানেন, দুর্নাম রটে গেলে আমার চাকরী থাকবে না। এমনি তো দাদার চাকরী নেই,—তারপর পথে দাঁড়িয়ে উপোষ দিয়ে মরতে হবে যে আমাদের। বলতে বলতে সেই রাস্তার ওপরই কেঁদে ফেললো লাবণ্য। তাগ্যে গলিতে অনেক দূরে দূরে গ্যাসের মিটমিটে আলো, আর লোকজনের যাতায়াতও কম। আমি তাড়াতাড়ি পিছিয়ে পড়লাম। চোখে না পড়ে যাই।

তারপর? ঘরশুদ্ধ সবাই ঔৎসুক্যে অধীর।

তারপর সেই ভদ্রলোকটি লাবণ্যর কাছ ঘেঁসে এসে দাঁড়ালো। লাবণ্যর একটা হাত ধরে বললে তোমার অপমান করতে আমি চাইনে মিস্ দাস। তুমি বিশ্বাস কর তোমায় আমি সাহায্য করতে চাই। তুমি যদি মত দাও, তোমাকে আমি বিয়ে করবো।

শুনে লাবণ্য যেন পাথর হয়ে গেল। ঘ ছয়ে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে ভদ্রলোকের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো। তারপরই হনহন করে বাড়ীর দিকে রওনা হোল।—

ভদ্রলোক জোরে জোরে চলে তবে তার নাগাল পেল —হাত ধরে বলে উত্তর দাও লাবণ্য।

'কিন্তু'—অপূর্ব যেন দুঃখের সঙ্গেই বাধা দিলো, লাবণ্য কিছু বললো না রে।

এক মুহূর্তে আমরা সবাই থম্‌কে গেলাম। তারপরই গবেষণা আরম্ভ হোল। কি হবে এরপর? কি হবে গল্পের শেষ?

ক্রমে খবর পাওয়া গেল লাবণ্যর পাণিপ্রার্থী ভদ্রলোক পরেশদত্ত রীতিমত ধনীলোক। আমাদের সেই সময়ের মন সত্যিই কামনা করলো এতদূর যখন ঘটলো তখন আসুক লাবণ্যর জীবনে রাজপুত্র। ওদের দুঃখের ঘরটা রাতারাতি হাসি আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠুক। সেই নোনা ধরা অন্ধকার ঘরটি থেকে মুখ কালো করে আধছেঁড়া জামা জুতো পরে হিরণ যখন পথে নামে সেই সময়েই সুপুরী চিবোতে চিবোতে কর্সা জামা গায়ে দিয়ে দল বেঁধে হল্লা করে আমরা কলেজে বেরোতাম। হিরণের সেই দীন উপস্থিতিটি আমাদের অকারণেই বিদ্ধ করতো, আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তাম।

একটা একটা করে দিন যায়—প্রতীক্ষিত খবরটি আর পাওয়া যায় না। আমরা আগ্রহে ছটফট করছি অথচ লাবণ্যকেও আজকাল আর গলির মোড়ে সন্ধ্যেবেলা দেখা যায় না। অপূর্ব অনেক সন্ধ্যে গলির মোড়ে পায়চারী করে পা ব্যথা করে ফেলেছে, কিন্তু না সেই ভদ্রলোক, না লাবণ্য। প্রায় রাত আটটায় ফেরে লাবণ্য—কে জানে নতুন টিউশানী নিল নাকি?

একদিন মাঠে শুয়ে আড্ডা দিচ্ছি এমন সময় হিরণকে ফিরে আসতে দেখা গেল। আশ্চর্য! পায়ে কিন্তু সেই বিবর্ণ

স্যাণ্ডেলটি নেই। চলার ভঙ্গিটিও অন্য দিনের মত দ্রুত নয়। বসতে হোল—ঠিকই। অনেকগুলো কাগজ জড়ানো প্যাকেট হাতে। নতুন উৎসাহ আর আশার আলোয় ঝলমল করছে রোগা কালো মুখখানা।

দু'একদিনের মধ্যেই ব্যাপারটি বোঝা গেল। ঘর্মাক্ত কলেবর পরে উজ্জ্বল মুখে হিরণ আজকাল রোজই সন্ধ্যের সময় বেরিয়ে পড়ে দেখি। চাকরী পেল নাকি?

তাই হবে। সেদিন আর একটা খবর এল ওটার মা'র কাছ থেকে। আর পরেশ দত্তকে নাকি রূপবাণীতে দেখে এসেছে অনেক। জমে উঠেছে ব্যাপারটা। লাবণ্য বোধ হয় মত দিয়েছে এতদিনে। কিংবা কে জানে অভাবগ্রস্ত সংসার মেয়েটাকে নিয়ে খেলাই করছে হয়তো পরেশ দত্ত।

সত্যিই একদিন ওদের বিয়ে হয়ে গেল। আমাদের তখন গরমের ছুটি। কিন্তু খবর নিয়েছিলাম এ বাসা থেকে বিয়ে হয়নি। সমস্ত না আগডুমাডাঙায় কে আত্মীয় আছে তার বাসা থেকে বিয়ে হয়েছে।

ফিরে এসে মনে হোল গলিটা যেন বড্ড ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। চারদিকের ঘেঁষাঘেঁষি করা পুরোণো বাড়ীগুলো যেন দাঁত বার করে ভ্যাংচাচ্ছে। এর কোথাও কোন সৌন্দর্য নেই। লাবণ্যদের জানালার ছেঁড়া কাপড়ের পর্দাটা বদলেছে ঘরের মধ্যেটা আগের চেয়ে সুসংস্কৃত হয়েছে, লাবণ্যর মা'র শয্যাটা আর পাতা নেই। ঘরের মধ্যে এটা সেটা নাড়া চাড়া করে তিনিই কাজকর্ম করছেন, হিরণ আজকাল নীস্ দিতে দিতে বাড়ী ফেরে। এবার পুজোয় পাড়ার নাকি পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়েছে। লাবণ্য বাসা করেছে সেই বালীগঞ্জের দিকে। এক একদিন ট্যাক্সি করে লাবণ্য আসতো মা'র কাছে। কেমন যেন ঝলমলে চেহারা। সমস্ত উপস্থিতিতেই তার যেন কেমন একটা সোহাগে গলে যাওয়া ভাব। এ রকমটা নতুন বিয়ের পর অনেক মেয়েরই দেখেছি। কেমন যেন নতুন নতুন আর অচেনা লাগতে লাগলো চোখে। ধবধবে নতুন শাড়ী আর ঝকঝকে অলঙ্কারহীনতা রূপে লাবণ্যকে ত কখনও দেখিনি। আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। আমাদের দিকে চোখ পড়তেই একটা হাসির ধাক্কায় আমাদের তুচ্ছ করে দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল। পরেশ দত্ত মিটার দেখে তাড়া চুকোতে চুকোতে সিগারেট চাপা ঠোঁট আর চোখ মুখের ভঙ্গীতেই কেমন করে যেন হাসলো, পরিষ্কার মনে হোল ছোট করে দিল যেন আমাদের। যাক্। মোটের ওপর গল্পটা ভালই জমলো। রূপকথা সত্যি হোল, এ নিজের চোখেই দেখলাম।

হিরণরা এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার আগেই দেখেছিলাম লাবণ্যকে আর একদিন। কোলে একটা ফুটফুটে শিশু।

তারপর নিজের জীবনেই একটা ওলট পালট ঘটে গেল। কলেজ ছাড়তে হোল। মার্চেন্ট অফিসে একটা চাকুরী জুটে গেল। এক রাজত্ব থেকে এ আর এক রাজত্বে গিয়ে পৌঁছালাম। ভবানীপুরে মেস। রোজ সাতে ন'টায় পান চিবুতে চিবুতে ট্রাম ধরি আর ক্লাইভ ষ্ট্রীটে গিয়ে নামি। দিনের পর দিন এক নিয়ম। এ পথটা যত মুখস্থ হয়ে উঠ্‌ছে কলেজ পাড়াটা তত ভুল হয়ে যাচ্ছে। ভুল হয়ে যাচ্ছে জীবনের আর একটা দিকও, যেখানে অনেক সাধ অনেক স্বপ্ন নিয়ে এক অবোধ এক কিশোর এসে দাঁড়িয়েছিল।

এই ট্রামের মধ্যেই একদিন দেখলাম লাবণ্যকে। অবাক হয়ে দেখলাম চেহারায় যেন আর কোন জলুস নেই। তার সারা দেহ থেকে একটা রিক্ততা যেন সরবে আত্মপ্রকাশ করছে। কেমন যেন মনে হোল একটা চকচকে পয়সা বুঝি মোহর বলে চলতে গিয়েছিল, আজ বড় শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। বার বার তার আরও কালো হয়ে যাওয়া রং কাতাতুর ঘুণক্ষয়ি আর বিষণ্ণ ক্লান্ত ভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম আশ্চর্য ত! এই মেয়ের মধ্যেই আমরা একদিন কত কী-ই-না দেখেছি।

ধর্মতলায় নেমে হাঁটতে লাগলো লাবণ্য। হাতে কয়েকটি বইখাতা, বিবর্ণ একটা ছাতা, জুতো জোড়ার

দশাও খুব ভালো নয়। কোথায় চলেছে লাবণ্য? কাজ করতে কি? কেন? সিঁথিতে কি সিঁদুর দেখি নি? বলে করতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না।

তারপর থেকে রোজই ওর সঙ্গে দেখা হয় কিন্তু কথা বলিনি কোন দিন। ইচ্ছে করতো খুবই, কিন্তু মুখোমুখি আলাপ তো কখনও নেই। লক্ষ্য করেছি একটা রক্তিম রেখা আছে সিঁথিতে, তবে বড় অস্পষ্ট, বড় বিবর্ণ। সন্দেহ হোল যে-সোহাগে সিঁদুর দীপ্তি পায় সে কি তবে শেষ হয়েছে?

সেদিন নিজের সিটে বসে সিমুচ্ছি। সামনের একটা বেঞ্চে একা বসে আছে লাবণ্য। হঠাৎ দেখি এক ভদ্রলোক এসে বসলো তার পাশে। চম্‌কে সোজা হয়ে বসলাম। পরেশ দত্ত। সেই চেহারা, মুখে চোখে ঠোঁটে চাপা হাসি, সেই ফিটফাট বেশভূষা।

লাবণ্য ছিটকে সরে বসলো। আরো ঘেঁসে বসলো পরেশ দত্ত মৃদু স্বরে বললে, এই চল, মাঠে নামি। লাবণ্য শক্ত কাঠ হয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বসে রইলো। মুচ্‌কে হেসে পরেশ দত্ত বললে, রাগ করে রয়েছ নাকি, কথা বলবে না?

উত্তর নেই।

রাতের রাগটা এখনও গেল না? গলাটা চড়িয়ে দিল পরেশ দত্ত। মুখে আরও একটু স্পষ্ট হয়ে সেই বিশ্রী হাসিটা। গন্‌ গন্‌ করছে লাবণ্যের মুখ, জ্বলে উঠে কি বলতে গিয়ে ফিরলো লাবণ্য। পাশেই রড্‌ ধরে দাঁড়িয়ে কয়েকজন ভদ্রলোক। তাদের কৌতূহলী চোখ কান এদের দিকেই দরাজ করে খোলা। দাঁতে দাঁত চেপে উঠে দাঁড়ালো লাবণ্য—নামবো এখানে। তাইত বলছি চল, বলে আগ বাড়ালো পরেশ দত্ত। এক সঙ্গেই নামলো দুজনে। লাবণ্য ছিটকে সরে যাবে প্রকাশ্য রাস্তাতেই, হাত ধরে ফেললো পরেশ দত্ত। সেই প্রথম দিনের মতই তার দিকে ক্যালফ্যালে চোখ তুলে দাঁড়িয়ে রইলো লাবণ্য। জানালা দিয়ে তাকিয়েছিলাম স্পষ্ট মনে হোল মস্ত বড় অভিমান একটা এখুনি বুঝি জল হয়ে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। দাম্পত্য কলহ।

পরেশ দত্ত হাত ধরেই লাবণ্যকে মাঠের দিকে টেনে নিয়ে চললো। তাকিয়ে রইলাম।

ফেরবার সময় হঠাৎ দেখা হয়ে গেল অপূর্বের সঙ্গে। তাকে সব বলতেই সে মহা উত্তেজিত হয়ে বললো, আবার পিছনে লেগেছে পরেশ দত্ত। আচ্ছা হারামজাদা ত!

এত গালাগালি দিচ্ছ কেন হে? দাম্পত্য কলহে—বলতেই দিল না অপূর্ব, দাম্পত্য কলহ না ছাই! তুমি জান না বুঝি, বছর দেড়েক পরেই ত ওদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। সে ত আজ তিন চার বছরের বেশী হয়ে গেল।

তাই নাকি?

তবে আর বলছি কি? পরেশ দত্ত ঘুঘু লোক। তার নাকি বৌ ছিল—এক ঘর সংসার। লাবণ্যের ঐ ছেলেটি হবার পর থেকেই পরেশ ঢিল দিতে আরম্ভ করে। বালীগঞ্জের বাসায় যাওয়াই বন্ধ করে দিল—শেষকালে একেবারে হাওয়া হয়ে গেল। নিরুপায় হয়ে লাবণ্য আবার হিরণের কাছেই ফিরে এসেছে। এখন বাড়াবাড়ির মধ্যে আবার ঐ ছেলেটি। আমার শ্বশুর বাড়ীর পাড়াতেই ত হিরণ থাকে আজকাল—তাই সব খবর পাই। লাবণ্য আবার স্কুলে চাকরী করছে।

আর ওর ছেলে?

ওর মা রাখেন। আগে এক রকম দুঃখ হোত, এখন লাবণ্যকে দেখলে অন্য রকম দুঃখ হয় রে! বেচারীর বিয়ে হোত বা না হোত সে এক রকম, কিন্তু ভালো মানুষটিকে নিয়ে এমন ছলনাময়ী খেলা এ বড় নিষ্ঠুরতা। আবার তুই যা বলছিস তা যদি হয়, তবে তো আরও ভয়ানক। বেহায়াটা আবার ওর পেছনে লেগেছে। হারামজাদার মতলব কি?

বৃষ্টি নেমেছিল বলেই দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম। সে বৃষ্টি আর ছাড়ে না। ফেরার পথে ভিজতে হোল। ভেজাটা অমনি গেল না। দিন সাতেক ভুগিয়ে ছাড়লো। সাতদিন পরে ট্রামে উঠে দেখি লাবণ্য আর পরেশ দত্ত অন্তরঙ্গ ভাবে পাশাপাশি বসে। লাবণ্যের মুখের মেঘ কেটে গেছে।

—আবার দোলা লেগেছে মনে। টল টল করে উঠছে সমস্ত শরীর। মাঠের মধ্যে দিব্যি আনন্দে নেমে গেল দুজনে। দেখলাম ট্রামের নিত্যচারী ক'জনের মধ্যেও চোখে চোখে একটা হাসি ছড়িয়ে গেল। তাদেরও নজরে পড়েছে।

আমার যেন ভাবনা জেগে উঠ্‌লো। ঘড়ি দেখলাম, পৌনে দশটা। সাড়ে দশটায় স্কুল হলে লাবণ্য কি ঠিক সময়ে স্কুলে পৌঁছাতে পারবে? না পারলে চাকরী থাকবে কেন? আর এই বা কেমন? বিবাহিত দম্পতী লুকিয়ে চুরিয়ে দেখা করার কি দরকার? মিছিমিছি লোকে হাসানো, একসঙ্গে থাকলেই ত হয়।

ক'দিন এমনি চল্‌লো। ট্রামের লোকেরা হাসে, আমরা হাসি, কিন্তু ওদের যেন ভ্রূক্ষেপই নেই। নতুন প্রেমে পড়া যুবক যুবতী যেন। অনন্তও সেদিন দেখে গেল। এর পরেই দেখি পরেশ দত্ত আর ট্রামে নেই, লাবণ্য একা। কিন্তু নামে মাঠের মধ্যেই। ব্যাপারটা কি? ভালো করে চারদিক চাইতে দেখি সেখানেই একটা ট্যাক্সির পাশে দাঁড়িয়ে পরেশ দত্ত। তারপর থেকে দেখি কোনদিন বা মাঠের থেকে আর কোনদিন বা ট্যাক্সি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে পরেশ আর নির্দ্ধারিত জায়গায় নেমে যায় লাবণ্য। অপূর্ব আর একদিন খবর আনলো। ওরে ভাই, সেদিন যা খাওয়া।

কি হোল আবার?

ট্রামের এই ব্যাপারের কথা হিরণ কি করে শুনেছে আর লাবণ্যকে যাচ্ছেতাই করে বকুনী। বলে ঐ লোকটার সঙ্গে কি বলে তুই আবার মিশ্‌তে যাস্? তোর কি লজ্জাও নেই? তোর আজ কি দশা একবার ভেবে দেখেছিস্? একটা ছেলে শুদ্ধু বৌকে রাস্তায় বার করে দিল যে হতভাগা, কোথায় যাবি ভাবলো না, কি খাবি ভাবলো না, তোর মান সম্মানের কথা পর্যন্ত চিন্তা করলো না, কোন প্রাণে তুই তার কাছে গিয়ে দাঁড়াস লাবণ্য—তোর না হয় লজ্জা নেই, কিন্তু আমার যে মাথা কাটা যায়। আর ওটাই বা কি, তাও বুঝি না, ঘর করবে না অথচ আচ্ছা মারবে—হতভাগা!

হিরণের সে কি গজগজ। লাবণ্য মাথাটি নীচু করে ছেলে নিয়ে বসে রইলো। আমার চিলার ঘর থেকে ওদের ঘরটা স্পষ্ট দেখা যায় কি না।

হিরণ আবার বললে এমনি করলে তোর চাকরীও তো থাকবে না। কে বিশ্বাস করবে ও তোর স্বামী? লোকে যে অপবাদ দেবে।

একথা শোনার পরও কিন্তু মাঝে মাঝে ওদের আমি এখানে সেখানে দেখেছি। একদিন সিনেমায়। আর এক রবিবারে বোটানীক্যাল গার্ডেনে একটা ঝোপের পিছনে দুজনে অনর্গল কথা বলছে দেখলাম। এমনি আরও দুচার জায়গায় দুজনকে লক্ষ্য করেছি।

তারপর এতকাল কেটে গেছে আর ওদের খবর রাখিনি। আজ এতদিন পরে লাবণ্যকে দেখলাম। মনটা খারাপই হয়ে গেল। শনির কোপ কি মেয়েটার সারা জীবনই চলবে? ষ্টেশনে গাড়ী থামতেই কাঁকানী লেগে অপূর্ব চোখ চাইলো। বললো ভাবছিলাম রে। লাবণ্যকে এমন অদ্ভুত বেশে দেখলাম কেন বল্‌তো? ওর-ও মাথা খারাপ হয়ে গেল?

কেমন করে বলবো? আচ্ছা ওর যে একটা ছেলে ছিল তার ত এতদিনে বেশ বড় হবার কথা।

আর ওর ছেলে। অপূর্ব কোভের একটা শব্দ করে উঠ্‌লো, কেন তুই দেখিস নি নাকি? মাঝখানে ত বছর খানেক ধরে আনন্দবাজারে রোজ বিজ্ঞাপন বার হোত। ছেলেটী ত নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে।

তাই নাকি? কতদিন? অল্প হাসির ভান করে বল্লাম, কারণ?

ইঙ্গিতটা ধরতে পারলো অপূর্ব। না, না সে সব কিছু নয়। ছেলে হারিয়েছে সেই ভয়ানক অকালের দিনটায়। বুঝতেই পারিস, সেই দুর্দিনে সামান্য স্কুল টিচারের আয়। কত কষ্টে লাবণ্যকে সংসার চালাতে হোত। তারপর তখন আবার ছেলেটা কলেজে ঢুকেছে। তার কলেজের মাইনে জামা-কাপড় হাজার খরচ।

কেন, হিরণ?

হিরণ কোথায়, সে তখন যুদ্ধের মৌকায় বড় কাজ জোগাড় করে চলে গিয়েছে দিল্লীতে। শ্বশুরবাড়ী গেলেই দেখতাম লাবণ্যর সঙ্গে ছেলের প্রায়ই খিটি-মিটি লাগছে। লাগতেই পারে, অত দুঃখ কষ্ট সংসারের অভাব অভিযোগ সতেরো বছরের কাঁচা ছেলে বুঝবে কেন বলতো। ছেঁড়া জামা পরে কলেজে যদি সে না যেতে চায়, যদি নতুন একটা জামার জন্ত বায়না করে, তবে তো তাকে খুব বেশী দোষ দেওয়া চলে না। অবাক হয়ে বলি, কিন্তু এই সামান্ত একটা জামার জন্তে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল একটী সুস্থ জোয়ান ছেলে? বলিস কি অপূর্ব?

জামার জন্ত বল্লাম নাকি? বলছি এই সব অভাব নিয়ে কথা কাটাকাটি চলতো। নিরুদ্দেশ যে হয়ে গেল, আমার মনে হয়, ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

সোজা কথাটা সোজা করেই বল্‌না কেন, এত রেখে ঢেকে বলছিস কেন?—অপূর্ব কথার ভঙ্গীতে প্রায় চটিয়ে তুললো আমাকে।

এই দেখ্। রেখে ঢেকে কি বলছি? পাঁচজনের মুখে শোনা কথা। সত্যি মিথ্যে তা কি ঠিক জানি যে ঠিক ঠিক বলবো? সেই ত বোমার হিড়িকে বেশ শুদ্ধ কটি কাঁচা বুড়ো বুড়ী কি বৌ সব দেশে পাঠিয়ে দিব্যি মুক্ত পুরুষ হয়ে বিরাজ করছি। আমার শ্বশুর বাড়ীতেই সকলে আচ্ছা গেড়ে বসেছি। আমরা তাই ক'জনে, আমার ভগ্নীপতি সুরেশবাবু আর আমার শালারা। সে এক জমজমাট মেস। পাড়ার অনেক বাড়ীই খালি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু লাবণ্য ছিল। যাবেই বা কোথায় বেচারা? আপিস থেকে এসে একদিন আমাদের চাকরের কাছে শুনলাম লাবণ্যর কি এসে নাকি বলছে যে তাদের দাদাবাবু ক'দিন ধরে বাড়ী আসে নি। লাবণ্য রান্না খাওয়া বন্ধ করে দিন রাত খালি হাসপাতাল করে বেড়াচ্ছে।

তারপর চোখের একটা বিশেষ ভঙ্গী করে বললে, জান তাই আমাদের জাতীয় চরিত্র। কৌতূহলের আর অবধি নেই। সুরু হোল কি-কে হাজারো জেরা।

খবর মিললো, পরিমল ইদানীং প্রায়ই সারা দিন ধরে কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াতো, বাড়ী ফিরতো সেই অনেক রাতে। উস্কো খুস্কো চুল, ময়লা জামা কাপড়, ভালো করে খেত না, কথা কইতো না। সে এক কেমন যেন।

কে একজন বললে এমনটা হঠাৎ হোল কেন? অসুখ বিসুখ করেছিল? না না কিছু বলেছিল? ঠোঁট উল্টে কি বল্লে—সে সব কিছু নয়। অসুখ বিসুখ হতে তো কখনও দেখিনি দাদাবাবুর। গোরাদের মত রং, এতখানি চেহারা সে ত তোমরাও দেখেছ। আর মা বকবে বল কি? যার তো প্রাণতুল্য ছেলে। বরং মা-ই ছেলের কাছে দুচার কথা শুনতো। গলাটা নামিয়ে বল্‌লে আজকালকার টানাটানির দিন ত জান। খুঁটিনাটি নিয়ে ছেলে তো হামেশাই রাগারাগি করতো। তারপর কি হতে কি হোল জানি না; একদিন তো ঘর ঝাঁট দিতে দিতে শুনছিলাম দাদা রেগে রেগে বলছে—কেন, দেবে না কেন বাবা? বাবার অত টাকা থাকতে আমরা কেন এত কষ্ট করবো? আমি যাব বাবার কাছে নিজে গিয়ে বলবো।

গিয়েছিল বুঝি সেখানে। তারাই কিছু চুকতাক করলে কিনা কে জানে, সেই যে ফিরে এলো ছেলে, তারপর থেকেই উদাস উদাস। আজ ক'দিন তো বাড়ীই ফিরলো না। যে মিলিটারী লরী চলছে রাস্তায় রাক্ষসের মত, বাঁচলো না গেল, তাই বা কে জানে?

ভীড়ের মধ্যে একজন মন্তব্য করলেন, তা কিছু আশ্চর্য নয়। তবে তা হলেও লাসটা পাওয়া যাবে। আর পাগল হয়ে গিয়ে থাকে যদি তবে আর তার খোঁজ হবে কোথায়?

আমরা সবাই বড় দমে গেলাম। মনটায় বড্ড ধাক্কা লাগলো। ছেলেটাকে দেখছি এতটুকু থেকে; সুন্দর ছেলে, ব্যবহারটাও ভালো। তারপর লাবণ্য, তাকে জানি এত দিন ধরে—

বড্ড খারাপ লাগতে লাগলো। একে সেই ঘুমিয়ে মনটা সবসময়ই কেমন আচ্ছন্নগ্রস্ত, আরও যেন হতবুদ্ধি হয়ে উঠলাম। জিজ্ঞেস করলাম ওর বন্ধুদের কাছে খোঁজ নেওয়া হয়েছে? তারা কিছু বলতে পারলো না?

ভীড় দেখে এ আর পির এক ছোকরা এসে জুটেছে। সে সময়টাতে ত জানি, পাঁচজনকে একসঙ্গে কথা বলতে দেখলেই ভীড় এসে জমতো। সবারই মনে, কি জানি কি নতুন খবর বুঝি এসেছে। খুনের কোন জটিল ব্যাপারই বুঝি বা আলোচনা হচ্ছে। সেই ছোকরাই আমাদের বললে, পরিমলের কথা বলছেন ত? পাগল, পাগল, ছেলেটার একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে মশাই।

গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বেশ রাজনীতি কায়দায় বললে প্রাইভেট কথা মশাই, বলতাম না তবে আজ বিপদের দিন বলে বলছি। আপনারা জানেন কি না জানি না পার্ক ষ্ট্রীটের ইকবাল ম্যানসনের মালিক পরেশ বক্স নাকি পরিমলের বাবা। মস্ত মার্চেন্ট, তিনটে মোটর।

সেদিন গুপ্তাগার এ আর পি সেন্টারে আমার ডিউটি ছিল। ইকবাল ম্যানসনের সামনেই আমাদের সেন্টার অফিস। হঠাৎ একটা গোলমাল শুনে গিয়ে দেখি ওপরের বারান্দায় পরেশ বক্স দাঁড়িয়ে। দারোয়ান ঘাড় ধরে একটা লোককে বাইরে ঠেলে দিচ্ছে। দেখি পরিমল। সে কি চেহারা পরিমলের! চোখ লাল, চুলগুলো কপালে ঝুলে পড়েছে। জামা ছিঁড়ে ফর্দাফাই। ভীড় দাঁড়িয়ে গেল, কি হয়েছে কি ব্যাপার?

দারোয়ান মুখ কুঁচকে ঠোঁট উল্টে বললে বাঙ্গালী হায়। বোলতা ইয়ে মেরা বাপকা মাকান। মাঝে বাপসে মোলাকাত করনা। বাপ, বাপ হাম তেরা বলে বিশ্রী ভঙ্গী করে একটি অশ্লীল কথা বললে। পরিমল তক্ষুনি আবার ঘুরে দাঁড়ালো। সে কী অঙ্গী যেন পাগলা ষোড়। একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়লো দারোয়ানের ওপর। কিন্তু পারবে যেন সেই বন্যার মত চেহারার দারোয়ানের কাছে? ও তো একটা বালক মাত্র। উল্টে ঘুষি খেয়ে একেবারে মাটি নিল, সমস্ত মশাই সেই পরেশ বক্সর চোখের সামনে। আশ্চর্য লোক। আর কিছু না, ছোক তারই বাড়ীতে একটি ছোট ছেলেকে, না হয় ছোলই পাগল, এত মারবার করা হচ্ছে তার কি দু'কথা বলা উচিত ছিল না? দারোয়ানটাকে বারণ করা তো উচিত ছিল ও? কিন্তু কেমন একরকম হাসি মুখে কুটিল চোখে তাকিয়ে রইলো। পরিমলকে তুলে এনে আমাদের সেন্টারে বসাই। কি হয়েছিল এত করে জিজ্ঞাসা করলাম কিন্তু কিছুতেই ঠোঁট ফাঁক করলো না ছেলে। দু'হাতে মুখ ঢেকে প্রথমটা ও ছেলেমানুষের মত খুব কাঁদলো। তারপর চোখ মুছে পাথরের মত বসে রইলো। এত বললাম, বাড়ীও গেল না, এক কৌটা জল অবধি খেল না। আমরা অফিস শুদ্ধ লোক হিমসিম খেয়ে গেলাম কিন্তু একটা কথাও বলাতে পারলাম না একেবারে ঘুমুতে পারার মত কাতরকেলে চোখ মেলে বসে রইলো— কোন কথা যে তার কানে যাচ্ছে এমন ভরসাও হোল না। একটি বার শুধু বলেছিল, তাড়িয়ে দিল! আমায় তাড়িয়ে দিল! দারোয়ান দিয়ে তাড়িয়ে দিল!

তারপর থেকে ক'দিন ধরেই ত দেখছি আমরি পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইথাবীং ত চোখ মুখের চেহারা পাগলের মতই হয়ে গিয়েছিল। দেখলে ভয় হোত।

দেখা গেল লাবণ্য আসছে। পথ ছেড়ে দিল সকলে, ঠিক সেই চেহারা—অমন্ধরে বিষণ্ণ মুখ, ছলছল চোখ, শ্লান্তি ভরা মন্থর চলা—সেই চেনা ছবি। দুর্ঘটনার পর উপরন্তু কিছু পরিবর্তন কোথাও নেই।

পরের দিন ও আপিস থেকে এসে শুনলাম পাওয়া যায় নি পরিমলকে।

পরিমল গেল। এবার পাগল হয়ে উঠলো লাবণ্য, ঘর আর হাসপাতাল, ঘর আর বাসা। খায় না যায় না, সময়ে বাড়ী ফেরে না। ছেঁড়া ময়লা কাপড় রুক্ষ শুকনো মুখ। দুয়োরে তালা দেয় নি, সর্বস্ব চোরে নিয়ে গেল। সেই অবস্থায় কার কাছে খবর পেয়ে হিরণ এসে নিয়ে গেল দিল্লীতে।

তারপর এই দেখছি।

দিন দুই পরে প্রসন্নবাবু একদিন সকাল বেলায় আমার ঘরে এসে উপস্থিত।

প্রসন্নবাবু মোটেই আলাপী লোক নন। পথে ঘাটে দেখা হলে কোন রকমে ঘাড় নেড়ে কিংবা বড় জোর হাসির ভাব করে পরিচয় স্বীকার করেন এই মাত্র, কিন্তু পদধূলি পাত হয়ে আমার ঘরে তিনি কখনও এসে বসেন নি। কাজেই বিস্মিত হোলাম।

কাজের কথাই পাড়লেন। সরকারে পড়েই এলাম। আপনার যে আত্মীয় লালবাজারে আছেন শুনেছি। একটি খবর এনে দিতে পারেন?

কিসের খবর?

আজ্ঞা, গবর্ণমেণ্ট যে মেয়ে-পুলিশ নিয়েছে তার কি বয়সের কোন রেস্ট্রিক্‌শন্ নেই?

কেন বলুন ত?

আর কেন বলেন? ঐ একটা আধ পাগলা মেয়ে আছে না আমাদের বাড়ী; দেখেছেন হয়তো, আমার বড়ই ভগিনী, সে মেয়ে পুলিশ হবে। বয়স প্রায় চল্লিশ হবে—এত বয়সে কখনও চাকরীতে নেয়? তা বললে বুঝবে না। বলে দিয়ো মেয়ে, আপনি খবর এনে দেবেন।

বাঙালী মেয়ে?

বাঙালী বৈকি।

অবাক করে দিলে যদি বড় অদ্ভুত লোক দেখছি!

লোক ঠিক নয় এটা ওর ব্যামিয়া হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা কি জানেন, অনেক দিন হোল ওর একমাত্র ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে। আগুন বিজ্ঞাপন দিয়ে পুলিশ নিযুক্ত করে বহু খোঁজাখুজি করেছে 'তবু খবর পাওয়া যায় নি। ও নিজেও তীর্থে তীর্থে সাধুর আখড়ায় লোকের বাড়ীতে এতদিন ধরে ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এখন মেয়ে-পুলিশ নেওয়া হচ্ছে শুনে ওর ধারণা হয়েছে যে নিজে পুলিশ হয়েও ছেলেকে খুঁজে বার করবে।

এ ত পাগলামী।

পাগলামী বৈকি। সে কথা বোঝায় কে? আপনি মজা কি জানেন; ছেলে যে খুঁজবে, ছেলের মুখটাই ওর মনে নেই। আমায় কাল জিজ্ঞেস করছিল চাকা খোকার মুখখানা আপনার মনে আছে? বলে আবার কি ছেলে উঠলেন।

[পূর্বানুবৃত্তি]

(৭)

দুই হস্ত দলিনের ওড়নায় মুখ ঢাকিয়া আমিনা এক সময় ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। তখন পান-ভোজন শেষ হইয়াছে—কিন্তু আমোদ আহ্লাদের আয়োজন শুরু হয় নাই। এমন কি অন্য দিনের মত প্রসন্ন হাস্যের চঞ্চল এবং মেমসাহেবদের কলহাস্য রঙতরাগও শোনা যাইতেছে না। আমিনা ঢুকিতে ঢুকিতে দেখিল সাহেব মেমরা উপস্থিত ভারতীয়গণ একটু তফাতে দাঁড়াইয়া উত্তেজিত অথচ চাপা গলায় কী আলোচনা করিতেছেন।

আলোচনার বিষয় বস্তুটা অনুমান করিতে আমিনার বিলম্ব হইল না। একটা অতি চাপা হাসিও তাহার ওষ্ঠ-প্রান্তে দেখা দিল কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্য। তারপরই একটা অপরিসীম প্রশান্তি টানিয়া আনিয়া আমিনা সাহেবদের দিকে অগ্রসর হইল।

আমিনা কথা কহে নাই, অথবা তাহার পায়ের মুক্তা-খচিত স্বেলভেটের জুতাতেও কোন শব্দ উঠে নাই কিন্তু তাহার ব্যক্তিত্বের মধ্যেই বোধ করি কোন চৌম্বক শক্তি ছিল—নানাসাহেব এবং তাঁহার অতিথিবৃন্দ তাহার আগমনের অল্পক্ষণ মধ্যেই সচকিত হইয়া উঠিলেন। সাধারণ অপর কোন রমণীর পক্ষে যাহা শুধুই আগমন—এই স্ত্রীলোকটির পক্ষে তাহা যেন আবির্ভাব। মুগ্ধ বিস্মিত নেত্র মেলিয়া উজ্জ্বল মুখে নানাসাহেব অগ্রসর হইয়া আসিলেন। সাহেব মেমদেরও বৈঠক নিমেষে ভাঙিয়া গেল—তাঁহারাও সকলে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন।

নানাসাহেব সহাস্যবদনে খাঁটি বিলাতী ভঙ্গীতে পরিচয় করাইয়া দিলেন—'ইনিই হুসেনী বেগম—মিঃ মুর, কর্ণেল এওয়ার্ট, মিসেস এওয়ার্ট, লেফ্‌টেনাণ্ট হুইটিং, মিসেস হুইটিং—

মধুর হাসিতে মুখ রঞ্জিত করিয়া আমিনা বাঁ হাতের তর্জনী তুলিয়া নানাসাহেবকে নিরস্ত করিল, 'একটু আস্তে—পেশোয়াজী—এমনভাবে কি পরিচয় করায়? দাঁড়ান, একে একে পরিচয়টা পাকা করে নিই।'

এই বলিয়া বিস্মিত সাহেবদের অধিকতর বিস্মিত করিয়া আমিনা তাহার ক্ষুদ্র কোমল শুভ্রের হাতখানি কর্ণেল এওয়ার্টের দিকে বাড়াইয়া দিয়া কহিল, 'Glad to meet you Colonel Ewart, how do you do?'

এওয়ার্টের বহু দিনের অভ্যস্ত মিলিটারী শিক্ষাও কিছুক্ষণের জন্য গোলমাল হইয়া গেল। এমন কি বাড়াইয়া দেওয়া হাতখানির দিকে হাত বাড়াইতেও তাঁহার কয়েক লহমা দেরী হইয়া গেল। বস্তুত শুধু তিনি নন—উপস্থিত সকলেই যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ে জড় হইয়া গিয়াছিলেন। যাহা হউক, এওয়ার্টই সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন সর্বাগ্রে। তিনি শ্বেতপদ্মের মত সেই হাতখানি

নিজের ছুরাতে ধরিয়া ঝাঁকানি দিতে দিতে বিলাতী আপ্যায়নের গৎগুলি আওড়াইয়া গেলেন।

পরিচয়ের পর্ব শেষ হইতে আমিনা ইসারায় একজন খিদমৎগারকে ডাকিয়া তাহার হাতের ধরা বিক্রীর কাজকরা হায়দ্রাবাদী থালায় সাজানো বিলাতী সুরার ক্ষুদ্র পাত্রগুলি একে একে হাতে তুলিয়া দিল। এবং সকলকে দেওয়া শেষ হইতে অবশিষ্ট পাত্রটি হাতে লইয়া সে যখন আর কেহ বাকী আছেন কিনা লক্ষ্য করিতেছে তখন অকস্মাৎ মুর তাঁহার নিজের হাতের পাত্রটি বাড়াইয়া 'You health, maa'm !' বলিতেই, অনায়াসে ও স্বচ্ছন্দে তাঁহার পাত্রের সহিত নিজের পাত্র ঠেকাইয়া অতি সহজ ভাবেই সে পাত্রটি নিজের মুখে তুলিল।

নানা ঠিক এতটা আশা করেন নাই। কিন্তু খুশীই হইলেন। গর্বে তাঁহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ইংরেজদের অবজ্ঞা লক্ষ্য না করিবার মত মূর্খ তিনি নন। নির্বোধ নন বলিয়াই তিনি তাহা লক্ষ্য না করিবার ভান করেন। আজ যে কোন তুচ্ছ ব্যাপারেই হউক, তাহাদের উপর এক হাত লইতে পারিয়া তাঁহার আনন্দের অবধি ছিল না। তিনি তখনই মনে মনে হুসেনী বিবিকে পুরস্কৃত করিবার একটা সংকল্প করিয়া ফেলিলেন।

পানাদি শেষ হইতে সাহেবমেমেরা আমিনাকে বেষ্টন করিয়া ঘিরিয়া বসিলেন। আমিনা তাঁহাদের কাছে এখন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। নানার রক্ষিতা উপপত্নী—এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজী কথা কহিবে, এ তাঁহাদের কাছে স্বপ্নেরও অগোচর বৈকি।

মিসেস মুর প্রশ্নটা করিয়াই বসিলেন, 'আপনি কি কোন মেমসাহেবের কাছে লেখাপড়া শিখেছিলেন? না বিলেত গিয়েছিলেন কখনও?'

আমিনা উত্তর দিল, 'না বিলেত যাইনি—এখানেই শিখেছি।'

'কার কাছে বলুন ত?' মিসেস মুরের কৌতূহল প্রবল হইয়া ওঠে।

'কন্‌ভেণ্টে।'

'ও তাই বলুন! মিসেস এডওয়ার্ডস বলিয়া ওঠেন।

মিসেস মুর বলেন, 'কোন কন্‌ভেণ্ট বলুন ত?'

আমিনা প্রশ্নটা এড়াইয়া যায়—'Somewhere the hills. ছেলেবেলায় পাহাড়ে থাকতাম।'

মিসেস মুর বলেন, 'মাপ করবেন—এমন উঁচু দরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যে এদেশে আছে তাই আমাদের জানা ছিল না। নামটা জানাতে পারলে ভাল হ'ত।'

আমিনা মাথা নত করিয়া ঈষৎ অস্বস্তি নিম্নস্বরে কহিল, 'যাঁদের কাছে পড়েছি, তাঁদের আমি দেবীর মতই শ্রদ্ধা করি। আজ এমন জায়গায় নেমেছি যে, তাঁদের নাম মুখে আনাই পাপ বলে মনে হয়। সুতরাং আপনার অনুরোধ রাখতে পারলাম না।'

মিসেস মুর ক্ষুণ্ণ হইলেন কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের স্বজাতীয়দের প্রতি এতাদৃশী শ্রদ্ধা দেখিয়া খুশীও না হইয়া পারিলেন না।

আমিনা কহিল, 'আমি যাই এবার। মনে হ'ল আপনাদের কোন জরুরী আলোচনার ভেতর এসে পড়ে ব্যাঘাত ঘটিয়েছি। সুতরাং—'

'না না—কিছুতেই না—'

চারিদিক হইতে প্রতিবাদের ঝড় উঠিল।

'এমন কোন কথা নয় বেগম সাহেবা।' হুইটিং বুঝাইয়া দিলেন, আমাদের এক সার্জেণ্ট ম্যাসকাথী আজ এই মাত্র কলিকাতা থেকে এসে পৌঁছেছে। সে-ই সব খবর দিচ্ছিল। কতকগুলো বদমাইস লোক নানারকমে কোম্পানীর সঙ্গে শত্রুতা করছে।'

'কী রকম, কী রকম?' কৌতূহলে আমিনা সোজা হইয়া বসে, 'তাদের সাহস ত কম নয়। আজ কোম্পানীই ত তামাম হিন্দুস্থানের বাদশা। মুঘলরাও এমনভাবে তামাম দেশটা দখল করতে পারে নি। অতবড় শিবাজী মহারাজের বাদশাহী তাও ত কোম্পানীর হাতে—সেই কোম্পানীর সঙ্গে দুশমনী করে এ সাহস কার?'

লেফ্‌টেনাণ্ট হুইটিং 'With your permission ma'am' বলিয়া পাইপে তামাক ভরিতে ভরিতে জবাব

'কলকাতায় একটা বদমাইসের আড্ডা হয়েছে—তারা প্রকাশ্যে বদমাইসী করে বেড়াচ্ছে। হে ধর্ম মহাসভা।'

'ধর্ম!' অবজ্ঞার সুরে আমিনা বলিয়া উঠে, 'ধর্মের কথা আজকাল আর কে শুনছে।'

ম্যাম্—ধর্মের কথা শোনে বৈকি। এই সব অশিক্ষিত বর্বরদের কাছে এখনও ঐ শব্দটার মূল্য আছে। আর সেই অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে ঐ বদমাস বেটারা নানা কথা রটনা করছে। "জানেন সেদিন কী হয়েছে? এক বেটা জাহাজী লস্কর এসেছিল কলকাতার কেল্লায়—তেষ্টা পায় তার, এক সিপাহীর কাছে জল চেয়েছিল। জানেন ত সিপাহীদের ছুঁই-ছুঁই-এর ব্যাপার! সে লোটা ক'রে আলগোছা ঢেলে দিতে চেয়েছিল কলাপাতার নল লাগিয়ে, তাতে লস্করটা একটু চটে যায় বলে লোটাটা দাও, আমি জল ঢেলে খাচ্ছি। সিপাহী বলে লোটা তোমার হাতে দিলে আমাকে ফেলে দিতে হবে। লস্করও গরম—লোটা মেজে নিও না হয়। সিপাহী তার জবাবে যে তোমার ছোঁয়া লোটা ঘরে নিলে আমার জাত তখন লস্করটা—জল না খেয়েই চলে যায়। বলে যায় যে—আমারই ভুল হয়েছিল তোমার কাছে জল চেয়ে চাওয়া। তোমার জল খেলে আমারই জাত যেত। তোমার আছে কি? শুয়োরের চর্বি মুখে তুলেছ—যা নাকি মুসলমানেরও হারাম। তোমরা যে নতুন টোটা দাঁতে কেটে বন্দুক ভরো—তার মোড়কে শুয়োরের চর্বি আছে জান না? সে লোকটা ত এই অজিটি করে দিয়ে সরে পড়ল—এখন তাই নিয়ে নাকি মহা হৈ চৈ পড়ে গেছে।

আমিনা এতক্ষণ পাথরের মূর্তির মত অবিচল মুখে বসিয়া শুনিতেছিল, এখন তাহার অঙ্কিত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, 'সত্যিই তাই আছে নাকি?'

'আপনি কি পাগল হয়েছেন ম্যাম্? স্রেফ ওটা ওর বানানো কথা। রাগের মাথায় একটা শেষ কামড় দিয়ে যাওয়া—'

'তা আপনারা সে কথাটা জানিয়ে দেন না কেন?' নিতান্ত ভালমানুষের মত প্রশ্ন করে আমিনা।

'আর বলবেন না! সব জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকাশ্য প্যারেডে প্রশ্ন করা হয়েছে যে কারুর কোন সন্দেহ আছে কিনা। যারা সন্দেহ প্রকাশ করেছে তাদের দিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে ও কাগজগুলো এমনই তৈরী—তাতে চর্বি মাখাবার দরকার হয় না। আগুনে ধরে দেখানো হয়েছে যে সহজে পোড়ে না। কিন্তু কে কার কড়ি ধারে বলুন। কুসংস্কার এমনই জিনিষ যা চোখকেও ঠিক দেখতে দেয় না, কানকেও ঠিক শুনতে দেয় না। ওরা যে উল্টোটা বিশ্বাস করবার জন্যই প্রস্তুত হয়ে আছে। ওদের কানে যে আগে থেকেই বিষ ছড়ানো হচ্ছে। ফলে ভেতরে ভেতরে নাকি গোলমাল বেড়েই চলেছে।'

'কারা এ বিষ ছড়াচ্ছে? তাদের কী স্বার্থ?' আমিনা আবারও সরলভাবে প্রশ্ন করে।

'কারা যে ঠিক করছে সেইটেই এখনও জানা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই কোন স্বার্থান্বেষী লোক আছে যারা স্বপ্ন দেখছে যে ইংরেজদের তাড়িয়ে দেশে আবার অরাজকতা আনবে—আর সেই সুযোগে নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধি করবে। ওখানে ঐ ধর্ম মহাসভাই খানিকটা কাজ করছে। আর এখানে এক মৌলবী—মক্কা থেকে কাশী পর্যন্ত লোক ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এদেরও পেছনে লোক আছে বেগম সাহেবা, এ আপনি নিশ্চিত জানবেন।'

আমিনা কতকটা নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের সুরে বলিল, 'কারা আছে, তাদের খোঁজ ক'রে ধরে লটকে দিলেই ত হয়!

'মুস্কিল কি হয়েছে জানেন ম্যাম্—আমাদের বড়লাট বাহাদুর হয়েছেন বড়ই ভদ্রলোক। তিনি কেবলই ভাবেন যে এই বুঝি ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হ'ল—ঐ বুঝি নেটিভ্‌রা মনে ব্যথা পেলে। অবশ্য এবার নাকি তাঁর সুমতি হয়েছে। আপাততঃ ঐ মৌলবীটাকে গ্রেপ্তার করার হুকুম হয়েছে।'

'ধরা পড়েছে সে?'

আমিনার কণ্ঠে কি উদ্বেগের ইঙ্গিত ফুটিয়া ওঠে?

'না। ভয়ানক ধূর্ত আর ধড়িবাজ। আজ তিনচার দিন থেকেই আমাদের চোখে ধুলো দিচ্ছে। আসলে পুলিশগুলোও হয়েছে কাঁকিবাজ। বুঝলেন না! নইলে একটা লোক আর এতগুলো পুলিশ—কী ক'রে চোখে ধুলো দেয় বলুন ত!'

আমিনা একটা বিদ্বেষগরলকে ইসারায় ডাকে। আবারও পানীয় পরিবেশন চলে।

অবশেষে আমিনা হুইটিংকেই সুনম্র প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা, এদের, মানে মৌলভীদের পেছনে কারা আছে আপনি মনে করেন?'

হুইটিং নীচু গলায় উত্তর দেন, 'আমার ত মনে হয়—মাফ করবেন বেগম সাহেবা—কোন কোন দেশীয় রাজারা আছেন। নইলে টাকা জোগাচ্ছে কে? We have not yet seen enough of them! এরা বড় সাংঘাতিক জীব। এঁদের সায়েস্তা করার জন্য ডালহাউসীর মত ক্যালিবারের লোক দরকার।'

আমিনার চোখে নিমিষে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল, কিন্তু সে নিমিষের জন্যই। যথা-সম্ভব নিরাসক্তভাবেই সে বলিল, 'কিন্তু আপনি কি মনে করেন না যে এদের ভেতর যদি সে অসন্তোষ এসেই থাকে ত সেজন্য প্রধানত ঐ লর্ড ডালহাউসীই দায়ী। তিনি অকারণ বহু রাজাকে বা রাজপরিবারকে শত্রু করেছেন।'

'তা হয়ত করেছেন। কিন্তু তা না হলেও অসন্তোষ কিছু থাকতই বেগম সাহেবা, কে আর অল্পে খুশী থাকে বলুন! রাজত্ব থাকলেও স্বাধীনরাজাদের সুযোগ সুবিধে ত তাঁরা ঠিক পেতেন না।'

'তা পেতেন না। তেমনি পেতেন নিরাপত্তা, পেতেন নিশ্চিন্ত আরাম।...না লেফ্‌টেনাণ্ট হুইটিং—এদের আপনারা বন্ধুরূপেই পেতে পারতেন—অন্তত অধিকাংশকেই!'

এই সময় মিসেস হুইটিং স্বামীর কাঁধে হাত রাখিয়া ঘড়িটার দিকে দেখাইলেন। ঘরের চারিদিকেই ঘড়ি—ছোটবড় নানা আকার ও মূল্যের। প্রায় সব ঘড়িতেই একই সময়—বারোটা বাজে।

'বাই জোভ্। এবার ত তাহলে উঠতে হয়!'

সকলেই উঠিয়া পড়িলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই আর কিছুক্ষণ হাসি-তামাসা চলিল—তাহার পর যথারীতি বিদায় সম্ভাষণান্তে সাহেব মেমরা সকলেই বিদায় লইলেন। রহিলেন শুধু নানাসাহেবের অন্তরঙ্গ দুই চারি জন লোক। কিন্তু নানাসাহেব ইঙ্গিতে তাহাদেরও দূরে থাকিতে বলিয়া আমিনার কাছে আসিয়া বসিলেন। তাহার একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কি এই জন্যেই বাংলা মুলুকে গিয়েছিলে হুশেনী?'

'হাঁ জনাব—এই জন্যেই। আর এই জন্যেই হুশেনী মাঝে মাঝে টাকা টাকা ক'রে আপনাকে বিরক্ত করে। নইলে তার প্রয়োজন সামান্যই। জানেন ত আপনার এ বাঁদী কখনও কোন অলঙ্কার চেয়ে নেয়নি আপনার কাছ থেকে।' হুশেনীর কণ্ঠে বিজয়-গর্ব চাপা থাকে না।

'হুশেনী, কিন্তু এ যে বড় সাংঘাতিক খেলা। আংরেজ জাত সাপের চেয়েও সাংঘাতিক, বাঘের চেয়েও ভয়ঙ্কর।'

নানাসাহেবের ললাটে স্বেদবিন্দু দেখা দিয়াছিল।

তাহা লক্ষ্য করিয়া আমিনা নিজের রেশমী রুমালে নানাসাহেবের ললাট মুছাইয়া লইয়া কহিল, 'মিছিমিছি এত বেশী ভাববেন না—হিন্দুস্তানের ভাবী বাদশা! সাপের মন্ত্র আছে, বাঘকেও ফাঁদে ফেলা যায়। তাছাড়া আপনার ভয় কি, আপনি ত কোন ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে যাচ্ছেন না। আপনাকে বাদ দিয়েই আপাতত চলুক না। দেখুন না ঘটনা স্রোত কোন দিকে নিয়ে যায় আমাদের।'

'কে জানে হুশেনী, বড় ভয় করে। একদিকে তুমি আর একদিকে আজিমুল্লা খাঁ—বন্ধু ও প্রেয়সী। দুজনে তোমরা একই দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছ আমাকে, জানিনা এর পরিণাম কি?। কোথায় ছিল এই সব বাঁদীর বাচ্চা তিন্নিরীর দল ভেবে দেখ হুশেনী—সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে

এসে এত বড় মুঘল শক্তি, এত বড় মারাঠা শক্তি—ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। এদের সঙ্গে তোমরা পারবে?'

'এরা কিছুই ভাঙ্গে নি পেশোয়াজী মুঘল শক্তি আর মারাঠাশক্তি নিজেদের পাপের ভারে নিজেরাই ভেঙ্গে পড়েছে তেমনি এদেরও পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়ে এসেছে। এরাও যাবে। আপনি ত কিছু কিছু ইতিহাস পড়েছেন জানি, রুমসাম্রাজ্যের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই। সারা দুনিয়ার অর্দ্ধেকটাই নাকি তাদের ছিল। সে শক্তিও থাকেনি। কিছুই চিরকাল থাকে না। আমরাও থাকবো

এত ভয় কিসের? ভেবে দেখুন কয়েকজন লোক নিয়েই শিবাজী মহারাজ আলমগীর বাদশার শক্তির অহঙ্কার চূর্ণ করেছিলেন। আপনি সেই দেশেরই লোক, সেই জাতিরই নেতা। আপনার সাহস এত কম, উচ্চাশা এত কম!'

নানাসাহেব লজ্জিত বোধ করিলেন।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, 'হুসেনী—তুমি আমার ঘর বাড়িরই লিক্ষা। তুমিই ঠিক আমার সহধর্ম্মিনী হবার উপযুক্ত! ভাগ্যদোষে মুসলমানের ঘরে গিয়ে পড়েছিলে!'

নানা তাঁহার অন্তরঙ্গগণ যেখানে চক্রাকারে বসিয়া আড্ডা জমাইয়াছিল, সেই দিকে রওনা হইলেন। আমিনা কিছুক্ষণ স্থির-দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া অস্ফুটকণ্ঠে কহিল, 'ঠিকই ধরেছ পেশোয়া। ভাগ্যদোষই বটে, তোমারও—আমারও।'

তারপর যেমন নিঃশব্দে এক সময় তাহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল তেমনিই নিঃশব্দে এক সময় সে অন্তর্হিত হইল।

(৮)

বীরাটে আসিয়াও হীরালাল মামার হাত হইতে অব্যাহতি পাইল না। কারণ ভাগ্য বিরূপ। মৃত্যুঞ্জয় অফিসে গিয়া দেখিলেন যে কোন এক অজ্ঞাত কারণে মেজর সাহেবের মেজাজ গরম হইয়া আছে। মৃত্যুঞ্জয়ের আভূমিনত সেলামেও তাঁহার ভ্রুকুটি সরল হইল না—এমন কি ঘর হইতে আনা আমসত্ত্ব ও মোরব্বা বাহির করিয়া সামনে রাখিতেও বিশেষ কোন কাজ হইল না। মুখটা যেমন মেঘাচ্ছন্ন ছিল তেমনিই রহিল।

বেগতিক দেখিয়া মৃত্যুঞ্জয় কথাটা সেদিন পাড়িতে সাহস করিলেন না। ফলে বাসায় ফিরিবার পর কালটা সম্পূর্ণ পড়িল আসিয়া হীরালালের ঘাড়ে।

'অপয়া! অপয়া! ছোঁড়াটা বিষ অপয়া। জান হে মুখুজ্জে, সকালে উঠে ছোঁড়ার মুখ দেখলে হাঁড়ি ফাটে।'

মুখুজ্জে অবাক হইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'কোন্ ছোঁড়া?'

'কে আবার—আমার ঐ শুশুর ভায়ে। এই ত এতদিন চাকরি করছি। বাড়ী থেকে আমসত্ত্ব এনে দিলে মুখে হাসি ফোটেনা সাহেবের, এ ত আমি কখনও দেখিনি রে বাবা।...মুখে যেন গেরণ লেগেছে। মনে হচ্ছে যেন সাত খানা সুনের জাহাজ ডুবে যাবার খবর পেয়েছে।'

'না হে গাঙ্গুলী, বোঝ না। এর ভেতর ঢের ব্যাপার আছে।'

'ব্যাপার আমার মাথা আর মুণ্ডু। এবার বেরিয়ে ইস্তক এই ব্যাপার চলেছে।'

'কেন পাঁজি দেখে বেরোওনি।'

'তা কেন বেরোবনা। তাতে কী হবে। মূর্ত্তিমান অযাত্রা যে আমার সঙ্গে। সারা পথ জলেছি ছোঁড়ার জন্যে, এখানে পৌঁছেও ত এই। চাকরী যা হবে তা ত বুঝেছিই, চু-চু—অষ্টরম্ভা। এখন বসে থাক আমার ঘাড়ে বামুনের বিধবার মত। আর কি! অদেষ্টে যা ছিল তাই হবে। আমি কি করব।...শালাটাকে আনলে এ সব হ'ত না। তাদের এখন দিন ভাল চলেছে।...মাঝখান থেকে হ'ল এই যে গিন্নী রইলেন বেঁকে—আমাকে জব্দ করবার জন্যে অর্দ্ধেক মাল পাচার করে দেবেন বাপের বাড়ীতে, সে আর দেখতে হবে না। মাথার ঘাম পায়ে ফেলা পয়সা আমার—তা কি সুখদরশ করবে ভেবেছ? রামচন্দর্। মেয়েমানুষ জাতটাই এমনি নেমোখারাম।'

এক নিঃশ্বাসে তাগিদের হইতে সুরু করিয়া বিশ্বের তাবৎ স্ত্রীলোকের সদ্গতি করিয়া বোধকরি বা নিঃশ্বাস লইবার জন্যই মৃত্যুঞ্জয় থামিলেন। হীরালালের এতদিনে অনেকটা গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল, পথে আসিতে আসিতে বহুবারই সে পাতাল প্রবেশের প্রাক্কালে সীতা-দেবীর মনোভাবটা উপলব্ধি করিয়াছে কিন্তু তবু আজকের

এই অপমানটা তাহার গলাধঃকরণ করা কঠিন হইয়া পড়িল। কোনমতে দাঁতে দাঁত চাপিয়া কান্নাটা দমন করিল এবং সকলের অলক্ষ্যে দুই ফোঁটা অবাধ্য অশ্রু উড়ানীর প্রান্তে মুছিয়া ফেলিল। পথে আসিতে আসিতে যাহাদের সামনে অপমানিত হইয়াছে তাহারা মুসাফির—তাছাড়া অধিকাংশই অবাঙালী। তাহাদের সঙ্গে জীবনে আর হয়ত কখনও দেখাই হইবে না। এখানকার কথা আলাদা। কমিসারিয়েটে যতগুলি বাঙালী কাজ করেন প্রায় সকলেই থাকেন এই বাসায়। কেহ কেহ নিজে রাঁধিয়া খান—কিন্তু বেশীর ভাগই মেস করিয়া বাস করেন। কনৌজী পাচক আছে একটি সে ই রাঁধিয়া দেয়। যদি সত্যিই হীরালালের চাকরী হয় ত তাহাকেও এখানে থাকিতে হইবে—ইহারা সকলেই দীর্ঘদিনের নিত্যসঙ্গী হইয়া থাকিবেন। তাঁহাদের সামনে, বলিতে গেলে প্রথম পরিচয়েই, এই ধরণের অপমানে চোখে জল আসিবারই ত কথা।

মুখুজ্জে এতক্ষণে কথা কহিবার সুযোগ পাইয়া বলিলেন, 'ওহে, ব্যাপারটা আগে শোনই না।··· কলকাতায় কী সব গোলমাল বেধেছে, সেপাইরা নাকি গোলমাল করছে। এধারে লক্ষ্ণৌ ফৈজাবাদেও এক মৌলভী নাকি সিপাইদের ক্ষেপিয়ে বেড়াচ্ছে। ···মেজর সাহেব মনে করেন যে একটা বড় রকমের গোলমাল বাধা বিচিত্র নয়।···আসলে তাহতেই মেজাজ খারাপ—ভয়, বুঝলে গাঙ্গুলী, ভয়।'

'হ্যাঃ। তোমার যেমন কথা। সাহেবদের আবার ভয়।'

'যা বলছি শোন না। বাবারও বাবা আছে।···কটা সাহেব আছে বলত এদেশে? জোর তো এই সব সিপাইদেরই।'

'দেশ থেকে গোরা আনাবে রে বাবা। জাহাজ জাহাজ গোরা আনিয়ে ফেলবে।' মৃত্যুঞ্জয় জাহাজের আকৃতিটা দেখাইতে দুই হাত বিস্তার করিয়া অনেকখানি শূন্য দেখাইলেন।

'তা হ'লে ত কথাই ছিলনা। আসল কথা হচ্ছে কি—এই সব সাহেবরা যারা সিপাইদের সঙ্গে হাতে-কলমে কাজ করে তারা যতটা ভয় পেয়েছে বড় সাহেবরা তত ভয় পায়নি। সেই ত হয়েছে বিপদ। কাল সকালেই মেজর সাহেব জেনারেলের কাছে কথাটা পাড়তে গিয়েছিলেন, জেনারেল হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাতেই সাহেবের মেজাজ অত গরম ছিল।'

'দেবেই ত। দেবেই ত। হেসে উড়িয়ে দেবারই ত কথা। দিশি সিপাই, সাহেব দেখলে যাদের কাপড় নোংরা হয় তারা করবে গোলমাল গোরাদের সঙ্গে। তুমি ক্ষেপেছ, মুখুজ্জে!'

'কে জানে ভাই। ওরা যখন ভয় পাচ্ছে'—

'মেনিমুখো। ওরা সব মেনিমুখো। আসলে আমাদের এই মেজরটি হয়েছে পয়লা নম্বরের গাড়ল।'

তাহার পরই প্রচণ্ড এক হাই তুলিয়া তাগিনেয়ের উদ্দেশ্যে হুঙ্কার ছাড়িলেন, 'কৈ হে নবাবপুত্তুর। দয়া ক'রে একটু সন্ধ্যে-আহ্নিকের যোগাড় করে দেবে—নাকি, সেটাও নিজেকে করে নিতে হবে? কুঁড়ে পাতর গেলবার সময় ত দুনো খোরাক উগুল করো!—একটু গতর নাড়তে পার না?'

'কী কর গাঙ্গুলী।' ওদিক হইতে চৌধুরী মৃদু ধমক দিলেন, 'খামোকা ছেলেটাকে এসে ইস্তক খিঁচোচ্ছ কেন?'

বয়োজ্যেষ্ঠ শুধু নয়—মাহিনাও পান মোটা। এ বাসায় চৌধুরীর প্রতিপত্তি বেশী। সুতরাং তখনকার মত মৃত্যুঞ্জয় চুপ করিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

পরের দিনও মেজরের মুখের মেঘ কাটিল না। কিন্তু আর কতকাল অপেক্ষা করা চলে? অগত্যা আমতা আমতা করিয়া বারকতক ঘাড় চুলকাইয়া মৃত্যুঞ্জয় কথাটা পাড়িয়াই ফেলিলেন, 'স্যার ইয়োর অনার—মাই নেফিউ স্যার—মাই সিষ্টারস্ সন।'

'ইয়োর হোয়াট?' সাহেব যেন গর্জন করিয়া উঠিলেন!

সে গভীর সাহেব ইংরাজী বিদ্যা যেটুকু জানা ছিল তাও ভুলিয়া গেলেন, ওখানের এই দারুণ শীতেও উঁহার গায়ে ঘাম দেখা দিল, 'ইয়োর অনার বাত শিয়া যা হুজুর—একঠো নোকরী, আই মিন সার্ভিস দেগা। মেরা বহিনকা লেড়কা—মা-বাপ কোই নেহি হ্যায়—আপনি মা বাপ হ্যায় হুজুর।'

নেহি মাংতা। কোইকো নেহি মাংতা। নেটিভ আউর নেহি লেঙ্গে। বেইমান কাঁহেকা। তুম লোগ সব বেইমান হ্যায়। কোইকা নোকরী আউর নেহি লেঙ্গে। যাও ফিঁয়াসে ভাগো!'

খরচ কম হইলেও মাসে তিন চার টাকা। ভাগিনেয়কে বলিয়া খাওয়াইতে হইবে নাকি?

নৃত্যাঞ্জয় মরীয়া হইয়া আবারও কী বলিতে গেলেন। কিন্তু মেজর সাহেব এবার একেবারে অগ্নিমূর্তি, চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'গো টু হেল। ডু ইউ হিয়ার—ড্যাম্‌ড্‌ সোয়াইন। ফিন বাত বোলনেসে জুরমানা কিয়া যায়গা—ভাগো ফিঁয়াসে।'

নৃত্যাঞ্জয় কাঁপিতে কাঁপিতে বাহির হইয়া আসিলেন। বুঝিলেন বলিতে স্ত্রীই শুরুকন; তাহার কথাটা ঠেলা ঠিক হয় নাই। শ্যালককেই আনা উচিত ছিল।

সেদিন রাত্রে নৃত্যাঞ্জয় আহার করিলেন না—হীরালালের আহারের ত কথাই ওঠে না। চৌধুরী, মুখুজ্জে, ঘোষাল—অনেকেই অনুরোধ করিতে আসিলেন কিন্তু নৃত্যাঞ্জয় জলস্পর্শ করিলেন না। হীরালালের একটা ঘাড়ে দশটা মাথা নাই যে সেক্ষেত্রে সে একা আহারে বসিবে। আগে হইলে চৌধুরীই ভরসা দিতেন—'চাকরীর জন্য ভাবনা কি সে হয়ে যাবে খন' কিন্তু গত কয়েক দিন অফিসের হাওয়াটা তেমন ভাল লাগিতেছে না। তিনি কোন আশ্বাসই দিতে পারিলেন না।

ইহার পরেরও দুই তিনটা দিন হীরালালের যেভাবে কাটিল তাহার বর্ণনা দেওয়া অনাবশ্যক। পাঠক পাঠিকারা যতটা পারেন আঁচ করুন, তবুও অনেকখানি পিছনে পড়িয়া থাকিবেন—এটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব। শেষ অবধি তৃতীয় রাত্রিও বিনিদ্র কাটাইবার পর হীরালাল সংকল্প করিল সে গঙ্গাতে প্রাণ দিবে। চুপি চুপি এই দুই তিন ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া গড়মুক্তেশ্বর যাইবে এবং সেখানেই গঙ্গাতে ঝাঁপ দিয়া মরিবে। তাহার অদৃষ্টে এই মৃত্যু আছে—তাই মাগজা পূর্বেই টানিয়াছিলেন। মাঝখান হইতে যবনী তাহাকে বাঁচাইয়া ঘটনাটা অনর্থক বিলম্বিত করিল। লাভের মধ্যে এই কয়েকদিনের অতিরিক্ত কষ্টভোগ।

সে চতুর্থ দিন প্রাতঃকৃত্যে সেই সংকল্প মতই খালিপায়ে আলোয়ানটা গায়ে জড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িল। গড়মুক্তেশ্বর কোন দিকে তা সে জানে না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে পারিবে। আপাতত সে পথে পড়িয়া যে, কোন একদিকে হন্‌ হন্‌ করিয়া হাঁটিতে শুরু করিল। বাসা ও মামার কাছ হইতে আগে অনেকটা দূরে যাওয়া আবশ্যক।

কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরই এক বাধা।

লক্ষ্য করিল একটা একা তাহার পিছনে পিছনে ছুটিয়া আসিতেছে—এবং সে একার একমাত্র আরোহী বোধ হয় তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া কি বলিতেছে।

প্রথমটা বুকটা ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। মামা নয়ত?

পরেই ভুল ভাঙিল। ইহার মাথায় টুপি আছে। লোকটা এদেশীয় কেহ হইবে। মামা ও পাহলা আঁটেন মাথায়। সে দাঁড়াইয়া গেল।

একা কাছে আসিয়া থামিতে আরোহী নামিয়া আসিয়া বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানী ভাষায় প্রশ্ন করিল, 'তুমি কি বাঙালী?'

লোকটি এদেশীয় বটে। সাধারণ বেশভূষা, কম দামী ধুতি ও পিরাণ পরণে—অর্থাৎ চোমরা-চেমরা কেহ নয়।

হীরালাল মাথা নাড়িয়া জানাইল যে সে বাঙালীই বটে।

লোকটি হাসিয়া বলিল, 'নাকা শির দেখে তাই আন্দাজ করেছি। তেলেঙ্গী নয় ত বাঙালী। তা তেলেঙ্গী আর এদেশে কোথায় এত—আচ্ছা, এখানে বাঙালীদের একটা বাসা আছে কোথায় চেনো?'

হীরালাল ব্যবসায়ী হিন্দীতেই 'বাতচীত' চালাইল। সে বলিল, 'চিনি।'

'তুমি কি সেখানে থাকো?'

'থাকি।'

'হীরালাল চাটার্জি বলে এক ছোকরা এসেছে?'

হীরালাল ত স্তম্ভিত। তাহার খোঁজে আবার কাহার প্রয়োজন পড়িল। তাহাকে এখানে চেনেই বা কে? কেমন একটা ভয়ও হইল মনে মনে।

এবারে তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া লোকটি পুনশ্চ প্রশ্ন করিল, 'কী, জানো নাকি?'

শুষ্ক ওষ্ঠে একবার জিহ্বা বুলাইয়া লইয়া হীরালাল জবাব দিল, 'আমারই নাম হীরালাল।'

'চাটার্জি?'

'হ্যাঁ।'

'সোহি সোচা থা। কেত্ত কি অয়সাই উমর হোগা বাত্তা দে গিয়া।

'কিন্তু কে—মানে আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না। ঠৈ কেউ তো আমাকে চেনে না।'

'কানপুর থেকে খবর এসেছে বাঙালী বাবু। একঠো জরুরী চিঠি আছে। হুশেনী বেগমকে চেনো?'

'বেগম টেগম কাউকে আমি চিনি না। নিশ্চয় ভুল হয়েছে।'

'উহু। ভুল হয়নি। তোমার চেহারাও মিলে যাচ্ছে। ভালো করে ভেবে রাখো।'

অকস্মাৎ বিস্মৃতির মেঘ কাটিয়া গেল। তাহার যবনী প্রাণ-দাত্রী—হ্যাঁ হ্যাঁ, এই রকমই কি একটা নাম বলিয়াছিল সে। সে কি তাহার ঋণের বদলে কিছু চায়? মন্দ কি? মরণের আগে ঋণটা শোধ করিয়া মরিবে।

'হুশেনী বিবি একজনকে চিনি বটে—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ওই। যে হুশেনী বিবি সেই হুশেনী বেগম। তিনি এই চিঠিটা তোমাকে দিতে বলেছেন। বলেছেন যে তোমার এখানে কমিসারিয়েটে চাকরী পাবার কথা। যদি কোন কারণে না পাও ত এই চিঠি যার নামে আছে সেই সাহেবকে দিও, চাকরী মিলবে।

খামে মোড়া একখানা চিঠি সে পিরাণের ভেতর হইতে বাহির করিয়া হীরালালের হাতে দিল। তারপর কহিল, 'ব্যস—আমার কাজ খতম। যদি কিছু বকশিস দেবার থাকে ত দিতে পারো।'

দাঁত বার করিয়া লোকটা হাসিল একবার—কাঠ হাসি।

বিব্রত হীরালাল বলিল, 'কিন্তু আমি ত—আমার কাছে ত এখন কিছুই নেই। মা রাহা খরচের টাকা বলিয়া মামার হাতেই কয়েকটা টাকা দিয়াছেন আর গোপনে দিয়াছেন তাহার হাতে মাত্র দুইটি টাকা। কিন্তু সেও ত তার পুটুলিতে কাপড়ের মধ্যেই বাঁধা আছে।

'হ্যাৎ তেরী—বেসরম বাংগালী!

অবজ্ঞাসূচক স্বরে কথা কয়টা বলিয়া সে লোকটা এক্কায় উঠিয়া বসিল এবং এক্কা ঘুরাইতে বলিয়া নিজেও মুখ ঘুরাইয়া বসিল।

মামার অপমানের কাছে এ অপমান তুচ্ছ—তবু জাতিগত ধিক্কারে হীরালালের তরুণ রক্ত গরম হইয়া উঠিল। কিন্তু একা এই অপরিচিত জায়গায় সে কীই বা করিতে পারে। বিশেষত—দোষ ত তাহারও কিছু আছে। সুসংবাদ বহন করিয়া আনিলে পুরস্কৃত করাই উচিত।

মোদ্দা হীরালালের আর মরা হইল না। কে এক অপরিচিতা তরুণী, অজ্ঞাতকুলশীলা—নিহিত মৃত্যু বার বার তাহার জীবন রক্ষা করিতেছে। সে যেই হউক—মনে মনে সেই দেবী-স্বরূপিনীকে সে হাত জোড় করিয়া নমস্কার জানাইল।

বাসায় পা দিতেই মামা যেন বোমার মত ফাটিয়া পড়িলেন, 'বলি কোথায়, কোথায় যাওয়া হয়েছিল নবাব-পুত্তুরের তাই শুনি। তোমার বাবা কি আমার এক তিল উপকার করে না। সকাল বেলাই উধাও। হাওয়া খেতে গিছলে নাকি সাহেবদের মত? তাও ত পারলে বুঝতুম; মেজর সাহেব ভোর বেলা যখন হাওয়া খেতে বেরোয়

তখন পায়ের কাছে গিয়ে সটান উপুড় হয়ে পড়লেও ত একটা কাজ হয়। আখো বাপু, এই সাপ বলে দিলুম চাকরী বাকরী যদি না হয় ত ঐ রসুয়ে ঠাকুরের কাছে থেকে রান্নাবান্নাটা শিখে নাও। খোরাকী ছাড়া মাসে দু'টাকা মাইনে—কম যাচ্ছে না ত। সেটাই না হয় রোজগার করো।'

আজ কিন্তু হীরালাল মাথা হেঁট করিল না। সাহসে ভর করিয়া চিঠিখানা বাড়াইয়া ধরিয়া কোনমতে ঢোক গিলিয়া গিলিয়া বলিল, 'চাকরী বোধ হয় হবে।'

হীরালাল যে কোনদিন তাঁহার বকুনির পর উত্তর দিতে পারিবে ইহা মামার স্বপ্নেরও অগোচর। তাছাড়া তিনি কথাটা ঠিক বুঝিতেও পারিলেন না। খানিকটা হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, 'তার মানে? তার মানে কি বাপু?'

'এই চিঠিখানা যাঁর নামে আছে—তাঁকে দিলে বোধ হয় আমার চাকরী হবে।'

'এ কার নামে চিঠি। তোমাকে কে দিলে?'

কিন্তু মামা হাত দিবার আগেই চৌধুরী মহাশয় চিঠিটা টানিয়া লইলেন, 'এ কী! এ যে খোদ জেনারেল সাহেবের নামে দেখছি। লিখেছেও ত সাহেব কেউ—এমন জড়ানো লেখা ত নেটিভ কারুর নয়! কে দিয়েছে এ চিঠি বাবা হীরা?'

হীরালালের ঠিক এতখানি হাটের মাঝে কথাটা বলিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মামাই জেরার পর জেরা করিয়া অস্থির করিয়া তুলিলেন। তখন সব কথাই খুলিয়া বলিতে হইল—শুধু আত্মহত্যার সংকল্পটা বাদ রহিল।

মামার মুখে এতক্ষণ পরে সকৌতুক হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি মৃত্যুঞ্জয়ের দিকে চাহিয়া চোখ টিপিয়া বলিলেন, 'বলি ভায়ের আমার চেহারাটি ত খারাপ নয়, একে খুবসুরৎ চেহারা তায় কাঁচা বয়স—যোচলমান মাগী চলেছে আর কি! তা মন্দ কি, এই কাঁকে যদি গুছিয়ে নিতে পারিস ত নে। তবে ওরা সব কাঁচা খেগো—দেখো যেন জাতধর্ম খুইয়ে বসে থেকো না।'

হীরালাল লজ্জায় আপাদমস্তক রাঙা হইয়া উঠিল। তাহার চেহারাটা সত্যই ভাল। দীর্ঘ গঠন, গৌরবর্ণ এবং কৈশোরে নিয়মিতভাবে আখড়াতে গিয়া কসরৎ করার ফলে এই বয়সেই পেশীগুলি সুগঠিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এতগুলি বয়োজ্যেষ্ঠ লোকের সামনে গুরুজনের মুখে এই ধরণের ইঙ্গিত শুনিয়া মনে হইল—এ চেহারাটা কোথাও গোপন করিতে পারিলে সে বাঁচিয়া যাইত। তাছাড়া সে দেবী সম্বন্ধে—অন্ততঃ হীরালালের অন্তর-লোকে সে মহিলা দেবীর আসনেই অধিষ্ঠিতা—এ ধরণের কটূক্তিতে সে একটু ব্যথাও অনুভব করিল।

'কিন্তু চিঠিটা কে দিয়েছে—কী লেখা আছে তাও ত জানা গেল না।'

মৃত্যুঞ্জয়ই কথাটা তুলিলেন।

'লেখাটা যে খাঁটা রয়েছে।'

'তাতে কি, দাও আমি খুলে দিচ্ছি।' ঘোষাল হাতটা বাড়াইয়া দিলেন। এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া ভাতের হাড়ির ভাপ লাগাইয়া সুকৌশলে খামখানা খুলিয়াও ফেলিলেন।

জড়ানো জড়ানো লেখা। কোনমতে এইটুকু বোঝা গেল কানপুর গ্যারিসনের কোন সাহেব এখানকার জেনারেল সাহেবের কাছে জনৈক হীরালাল চট্টোপাধ্যায়ের চাকুরীর জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।

সকলেই নিশ্চিন্ত হইলেন। খামখানিও বেমালুম আবার জোড়া হইল। এখন কথা উঠিল জেনারেলের কাছে লইয়া যাইবে কে? এবং ঘোড়া ডিঙাইয়া ঘাস খাইলে মেজর সাহেব যদি মৃত্যুঞ্জয়ের কোন অনিষ্ট করেন?

অনেক যুক্তির পর স্থির হইল চৌধুরী পরদিন ভোর বেলা লইয়া গিয়া দূর হইতে জেনারেল সাহেবকে দেখাইয়া দিবেন এবং হীরালাল সেলাম করিয়া চিঠিখানি তাঁহার হাতে দিবে। আপাততঃ মৃত্যুঞ্জয়ের পরিচয় দিবার কোন কারণ নেই। জেনারেল সাহেব ভোর বেলা ঘোড়ায় চড়িয়া নদীর দিকে বেড়াইতে যান—সেই সময় তাঁহাকে ধরাই সমীচীন।

অনেকদিন পরে হীরালাল ভাল করিয়া আহার করিল এবং মামা অফিস চলিয়া গেলে প্রাণ ভরিয়া দিবানিদ্রা দিল। মৃত্যুঞ্জয় কিন্তু মনে মনে অপ্রসন্ন হইয়াই রহিলেন। ভাগিনেয়ের চাকুরী পাওয়ার ষোল আনা কৃতিত্বটা তাঁহার রহিল না—বরং ভাগিনেয়র দিকেই বেশীটা পড়িল—এটা মনে করিয়া তিনি একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। তবে—শেষ পর্যন্ত এই বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন—'আমি সঙ্গে করে না নিয়ে এলে ত আর ঐ মাগীর সঙ্গে পরিচয় হ'ত না।'

(ক্রমশঃ)

দুটি কুঁড়ি

অশোক কুমার সেন

খুকি ! ও খুকি...হাতের কাজটা ফেলে রেখে সুচিত্রা দেবী ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন. "অনেকক্ষণ থেকে দেখতে পাচ্ছি না, কোথায় গেছে জানেন মা ?" শাশুড়ীকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তিনি।

কি জানি মা, পেছনের গলিটায় ওরা নাকি বাগান করেছে ; সেইখানেই তো সকাল থেকে আছে। এইতো একটু আগে জল নিতে এসেছিল। দেখো না একবার ওদিকে।

বাড়ির পিছনে গলির মত একটুকরো জমি পড়েছিল। ছেঁড়া কাগজপত্র আর জঞ্জালে জায়গাটা সব সময় ভর্তি হয়ে থাকে। খুকি এবং পাড়ার আর কয়েকটি ছেলেমেয়ে মিলে সেই জায়গাটা পরিষ্কার করেছে। তার মাঝখানে ছেলেরা কোথা থেকে একটা গোলাপ গাছ যোগাড় করে লাগিয়েছে আর খুকী তার ওপর ঘটি ঘটি জল ঢালছে।

হেসে উঠলেন সুচিত্রা ওদের পাগলামি দেখে, বললেন "করছিস কি, অত করে জল ঢাললে কি কখনও গাছ বাঁচে !" মাকে দেখে খুকীর আনন্দ আর ধরে না, তবু গম্ভীর হয়ে বলল, "তুমি জান না মা ; খোকনদা বলছিল —অনেক করে জল দিবি; জল না দিলে গাছ বাঁচে না। হ্যাঁ মা, দেখেছ কেমন একটা কুঁড়ি হয়েছে, কত বড় ফুল হবে মা জান ? ফুলটা কিন্তু কাউকে তুলতে দেব না। তুমি আবার যেন ঠাকুরের জন্য নিয়ে যেয়ো না।"

সুচিত্রা এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নি, সূর্যের তাপে ঝুরে পড়া পাতাগুলোর মাঝখানে একটা ছোট কুঁড়ি বেশ ভাল ভাবে দেখা যাচ্ছে।

তার পরদিন সকালে সুচিত্রা দেবী অভিজিৎ বাবুর কাছে চা দিতে যেয়ে দেখলেন খুকী তার বাবাকে টেনে নিয়ে যেয়ে পিছনের জানলাটা দিয়ে তার গাছ দেখাচ্ছে। খুকী বলছে "দেখ বাবা কুঁড়িটা কত বড় হয়েছে, আজই ফুটবে না বাবা ? আরও কত কুঁড়ি হবে, সমস্ত বাগানটা ফুলে ভরে যাবে। তখন আর তোমাকে বাজার থেকে ফুল কিনতে হবে না বাবা।"

"আর তখন তো তোমার বাগানের একজন মালী রাখা দরকার হবে খুকু, তুমি তো আর অত কাজ করতে পারবে না।"

সুচিত্রার কথা শুনে অভিজিৎ বাবু সভয়ে বলে উঠলেন "আমি কিন্তু ওসব বাগানের কাজ টাজ মোটে পারি না ; কিছু করতে গেলে সব নষ্ট করে ফেলব।"

খুকু তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "না না, তাহলে তোমাকে কিছু করতে হবে না।" তার পরেই কিছু না বুঝলেও মায়ের দেখাদেখি হেসে উঠল।

সেদিন সন্ধ্যায় খুকুর একটু জ্বর মত হোল। সুচিত্রা ভাবলেন ঠাণ্ডা লেগে জ্বর এসেছে, ও সেরে যাবে। সেদিনটা কমের উপর দিয়ে কেটে গেল কিন্তু পরদিন জ্বরটা সহসা বিশ্রী ভাবে মোড় ফিরল। অভিজিৎ বাবুকে অফিস থেকে ডেকে আনা হল। ডাক্তার বললেন, "ভয়ের কিছু নেই, আমি ওষুধ দিচ্ছি। কিন্তু শেষ রাত্রে হঠাৎ মাথায় জ্বর উঠে সব শেষ হয়ে গেল,— খুকু ঘুমের দেশে চলে গেল, যেখানে তার মত করে পড়া শিশুরা অমর শৈশব নিয়ে খেলা করে, রাত্রিবেলা তারার মধ্য দিয়ে তাদের মায়ের দিকে মিটি মিটি চেয়ে থাকে।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে খুকু মায়ের সঙ্গে কথা বলেছিল একবার, কিন্তু সে জ্বরের বিকারে ; বলল, "দেখেছ মা কুঁড়িটা কেমন ফুটেছে, কত বড় হয়েছে ফুলটা, চারিদিকে কত ফুল, ওঃ !

সুচিত্রা স্তম্ভিত, বহুক্ষণ ঘন্টার মধ্যে যে বিপর্যয়টা ঘটে গেল সেটা যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। এ আঘাত তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর চেতনা যেন লুপ্ত হয়ে গেল। সুচিত্রা কাঁদতেও পারছেন না— একদৃষ্টে খুকুর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন—এখনও সজীব, সতেজ, প্রফুল্ল রয়েছে ওর মুখখানা, ঠোঁটের কোণে এখনও মাখানো রয়েছে সেই হাসি হাসি ভাব— যেন একটি আধফোটা ফুল।

সহসা কি ভেবে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। পিছনের জানালাটা খুলে বাইরে তাকালেন— কালরাত্রির যবনিকা আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। পূর্বাকাশে এখনও রক্তের পরশ লাগেনি, নিষ্কলঙ্ক নির্মল শুভ্রতা চারিদিকে আর সেই একটুকরো জমির মাঝখানে গোলাপ গাছটার মাথায় একরাশ কচি কচি সবুজ পাতার মধ্যে সেই কুঁড়িটা ফুটে রয়েছে সম্পূর্ণভাবে—সজীব, লাবণ্যময়। ওই ফুলটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ধীরে ধীরে সমস্ত জগৎ অস্পষ্ট আবছা হয়ে গেল তাঁর চোখের সামনে।

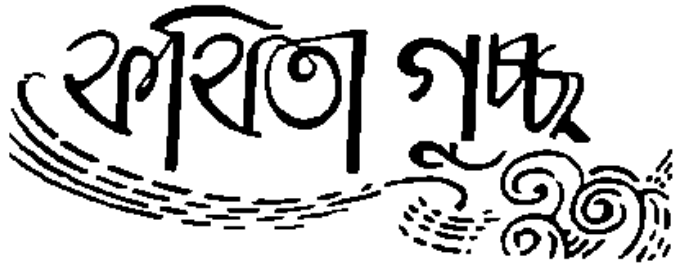

বিকিনী অটল

নগেন দত্ত

গহনের তীর-বেঁধা পাখী
পলকবিহীন নিমীলিত আঁখি
ক্ষত ছেঁড়া কমলের দল,
ভাসিছে তীরবিদ্ধ পৃথিবীর পরে।

প্রহরেরা ঘনাবে আসে
ভয় কক্ষ পথে,
এ সৃষ্টির শ্বাসযন্ত্রে ঘন বায়ু বহে,
ওঠে নাভিশ্বাস।
পৃথিবীতে প্রাণ নেই,
শুধুই উচ্ছ্বাস।

পরস্পর ঠোকাঠুকি
বিদ্যুতের কণা,
কাঁপেন কুমারী বসুমতী
অগ্নিগর্ভা অকাল প্রসূতি।

রাত্রির তৃতীয় যামে
টেলি প্রিন্টার—
ক্লাস! ক্লাস!! ক্লাস!!!
সাংবাদিক অতন্দ্র প্রহরী,
অনুক্ষণ ধরি।
চরমের নির্ভাজ বুদ্বুদ,
ঘুনে চলে,
সংবাদের শঙ্খ নালা খাঁখা
শ্বেত পত্র গলে।

হতভাগ্য সন্ধ্যা-দিবা
সন্ধিক্ষণ কালে
আণবিক বোমা ফাটে
বিকিনী-অটল-এ
সভ্যতার আলোহীন নীরন্ধ্র আঁধারে
বৈশাখের তাল ঠুকে নাচে।
জ্বলে মহাহোম।
বিকিনী অটল, আণবিক বোম।

জাপানের হাসপাতাল
নৃশংসতার বেডিও এ্যাক্টিভ,
এশিয়ার আকাশেতে নীল নেই
ধূমল বর্ণের গায় রক্তের টীপ।

এয়োতী বিধবা,
গৃহস্থের ঘরের কানায়
কালপেঁচা ডাক দিয়ে যায়।
ভবিষ্যৎ বিভ্রাটের ধূত ধূসর বরণ।
তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, তীক্ষ্ণতায় নখাগ্র চরণ।

তমার্ত রাত্রির তারায় নিদ্ নাই,
চিতা জ্বলে নিমতলা ঘাটে।
আবার এ্যাটম্ বোম ফাটে।
বিকিনী অটল
নীল জলে নিশ্চিহ্ন অতল
প্রশান্ত সাগর।
তরঙ্গের বুকে নেইসেই কথা লেখা।
ভবিষ্যৎ নাবিকের সাথে তার
কবে হবে দেখা।

শীতের প্রার্থনা

শ্রীঅনিলকুমার রায়

.....the winter
It was the pretty winter,—
.....the gentler work begun
By nature, softening and concealing
And busy with a hand of healing."
(Wordsworth)

হে শীত নির্মল রুদ্র সন্ন্যাসী
অগ্নিতেজ দেহ অমৃতধার
দীপকে দীপ জেলে দৈন্য মুছে ফেলে
হে যৌবন এসো তপস্যার!
সকল শান্তির অমৃতনৃত্যেই
কৃষাণ-কন্যা গো, বাজাও শাঁখ,
নব বসন্তের ডমরু ডিমি ডিমি আহা বাজাক।

মাঠের সই সীতা মাটির সই সিতা
বরণ ক'রে তোলো সে-উমাকেই
উলুধ্বনি দাও ঘুনির ঢেউ তুলে
এ-শুভ-মিলনের নবারেই।
কৃষাণ-কন্যাগো, কৃষাণ-কুমারের
শপথে নাচে ওই ভীষণ ঝড়
তুফান ভেঙে তারা জাহাজ বাঁধবেই
ভরবে ফুলে-ফলে এ-বন্দর।
কৃষাণ-কন্যা গো বাজাও শাঁখ
নব বসন্তের ডমরু ডিমি ডিমি আহা বাজাক॥

হে শীত সুন্দর শ্যামল-সন্ন্যাসী
মধুরপক্ষীর সে-সংসার
সোনার ফসলেই পূর্ণ করো তাকে
হে যৌবন এস তপস্যার!

যশিডি জংসনে (তোমার জন্য)

শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়

তেমনি চেনা গাছের সারি—বাদামী মেয়ে দিন
ফুরালো দেখি! পাখিরা ফেরে। লাইনে গাড়ী যেই
বাজালো বাঁশী—আকাশে হোঁয়া ক্রমশ হলো ক্ষীণ!
যেখানে তুমি এখনি ছিলে সেখানে কেহ নেই!

কত সে কথা ধরেছ ছিল এলো না তারা শেষ!
দু'চোখে বুঝি পড়েছে বালু—কেবলি ভরে জল!
তুমি তো গেলে আমারে একা রেখে তো গেলে বেশ!
কবে সে ফিরে আবার আসো আবারো অবিকল।

মনের বাঁশী সহসা দেখি ভুলেছে চেনা সুর!
একেলা ঘরে কি করে ফিরি কি করে তীক্ষ্ণ পায়?
সাঁঝের গাড়ী তোমারে নিয়ে গেলো তো কতদূর!
কেন সে আঁখি কেবলি তবু পিছনে ফিরে চায়!

তেমনি চেনা গাছের সারি – পাহাড়ে দাবানল
এখনি জ্বলে! বনের গায়ে—সোনালী আভা সেই
অনেক দূরে! সহসা দেখি চাঁদের চোখে জল!
যেখানে তুমি এখনি ছিলে সেখানে কেহ নেই!

যেটুকু আলো আকাশে ছিলো ক্রমশ সেও ঘরে:
কবে যে তুমি আবার আসো আবারো দেওঘরে!

জীবন জিজ্ঞাসা

(কবি জীবনানন্দ দাশকে)

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

ক্ষয়িষ্ণু জীবন তবু টেনে টেনে জাদুর সুতোর মতো প্রায়
আমরা চলেছি এক অনিশ্চিত সময়ের গোলক ধাঁধায়।
বৃক্ষ-নীড় শূন্য মেরু-তুষারের শ্লেজের গাড়ীতে ছোটা মন
কোথায় আশ্রয় পায়? ঈষদুষ্ণ বিশ্রাম—আরাম
কিছুক্ষণ!

তুমি তো সমুদ্র-তীর্থ। কাটিয়েছ জীবনের অনেক প্রহর
নদীনারী নক্ষত্রকে ভেবে, আর অন্ধকার ঘাসের ভিতরে
পৃথিবীকে স্পর্শ করে, দেখে নিয়ে দর্শকের মন
শ্রাবস্তী ও ব্যাবিলনে—এসিরিয়া মালয়ে মিশরে।
আশ্চর্য নারীর মুখ অচেনা নক্ষত্র হয়ে এসেছে কখন—
যার স্মৃতি আলো করে তমিস্রার হাজারো বছর।
হিংসা স্বার্থপরতায় স্বপ্ন ভাঙে, ব্যথা আনে;
জীবন জর্জর,
ডুবে যাও মাটি খুঁড়ে মানুষের মনের গভীরে।
সেখানে শূন্যের স্বাদ, মুষ্টিমেয় ইতিহাসে কী
আছে স্বাক্ষর

চেতনার। বাস্তবের তীর ঘাও—হৃদয়ের মৃদু উষ্ণ নীড়ে।
জীবনের শুরুতায় পিরামিড গড়েনিতো মৈরাজ্যের
ভিড়ে।

তবু তুমি জীবনের জাদুর সুতোকে টেনে টেনে
বুনেছে অনেক স্বপ্ন—রৌদ্রমুখ পাহাড়ের ধারে;

পাখির ডানায় বুকে হৃদয়ে ও সমুদ্রের নির্জন বিস্তারে
মূর্খ মাছরাঙা দেখে—সময়কে অফুরন্ত জীবনকে
ভঙ্গুর জেনে;
আরেক সৈকত থেকে অন্য এক আলো-বিন্দু এনে।

নিরুদ্দেশে

সন্তোষকুমার অধিকারী

কতদূর যেতে পারে এই লাল সুড়কির ধুলো ধুলো পথ,
এই পথ শালবনে উন্মন বাতাসের মন ছুঁয়ে ছুঁয়ে?
কোথায় মাটির কুঁড়ে বুক কুঁড়ে মাথা তোলে সাঁওতাল মেয়ে
অবাক রয়েছে চেয়ে,—গোধূলি দিগঙ্গনে চোখ তার মাখা;
যেন আঁকা লাল নীল ছাই ছাই মেঘ দিয়ে অবাক সে মেয়ে।
পলাশ ফুলের এক গুচ্ছের মন চেয়ে হারিয়েছি মন,
উন্মন প্রান্তরে গোধূলির দিশা নেই···যাই কতদূর?
শুনেছি যে সুর এই ধুলো আর কাঁকরের মাখামাখিতে
কিছু তার এঁকে রাখি কোন্ রাগে গান গেয়ে, কতদূর গিয়ে?

পথ নেই, মাঠ নেই, বন নেই, মাটি নেই, হারিয়েছি সব;
ফাগুনের উৎসব জীবনের আনন্দে হারিয়ে যাওয়ায়।
যদি যেতে চাও যাও, যদি থাকো দিশাহীন রক্ত রঙীন
পলাশ মহুয়া বনে চঞ্চল বাতাসের সঙ্গ ধরে।
এলোমেলো আবেগের বেহাল খুশীকে নিয়ে, মৌমাছিদের
গুণ্ গুণ্ গুঞ্জনে রঙীন হৃদয়ে মনে উতলা বনে।

পথ শুধু চলে যায়, যায় মাঠ বন ছেড়ে উধাও হ'য়ে,
এ পথে হৃদয় নিয়ে ভেসে যাই জীবনের নিরুদ্দেশে।
মহুয়া মাতাল মেয়ে লালফুল আনে তার দু'হাত ভরে
গুণ্ গুণ্ গান করে অকারণ আবেগের ঝর্ণা হ'য়ে।
শেষ নেই এ চলার, শুধু তাই চলে যাই এ পথ যেথায়
শেষ হ'য়ে শেষ নয়; নতুন চলার দেশে হৃদয় হারায়।

প্রেম ও ক্ষুধা

শ্রীসুলতা কর, এম. এ.

স্বপ্ন দেখছিলাম।

যেন এক সুন্দর ফুলের বাগানে বসে আছি। ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় চারদিকে শান্ত সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়েছে। এমন সময় আকাশের কোল থেকে নেমে এল দুটি দেবদূত।

প্রথম দেবদূতের দেহের তুষার-শুভ্র রংয়ে ঈষৎ গোলাপীর আমেজ লেগেছে। মুখের দুপাশে দুলছে কাজল কালো কোঁকড়া চুলের রাশি। দীর্ঘ পল্লবে ঘেরা হরিণীর মত চোখ দুটির দৃষ্টিতে কত রকম ভাব খেলা করছে। কখনও কৌতুক কখনও বা চাতুরী, কখনও বা গভীর আবেশ উছলে পড়ছে। পরম সুন্দর মুখের ভাবেও কখনও ফুটে উঠছে কোমলতা, কখনও ফুটে উঠছে চাতুর্য। টুকটুকে লাল গোলাপের সদ্য বিকশিত দলগুলির মত রাঙা ঠোঁট দুটি কি এক আবেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে। মিষ্টি হাসিতে মুখখানি ভরে আছে। সদ্য ফোটা লাল গোলাপের মালা দিয়ে জড়ান রয়েছে কোঁকড়ানো কালো চুলের রাশ। কোমরে জড়ান রয়েছে উজ্জ্বল নানারঙা ফুলের পাপড়ীর অঙ্গবাস। বিরাট দুখানি পাখা থেকে রামধনুর সাতরঙা রংয়ের আলো ঠিকরে পড়ছে। দেবদূতের চারপাশ ঘিরে রয়েছে এক অপূর্ব আলোর জ্যোতি।

থেকে থেকে ভোরের হাওয়ায় দুলে উঠছে দুখানি পাখা, আর সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব এক মধুর সুর বেজে উঠেছে। যেন শরৎকালের বেণুবনের পাতায় পাতায় ঈষৎ বৃষ্টির ঝরঝরানি গান শোনা যাচ্ছে।

চোখ জুড়িয়ে গেল প্রথম দেবদূতের মধুর মূর্তি দেখে, যেন কোমলতার আধার, যেন আনন্দের জীবন্ত প্রতিমা। চাইলাম পাশে তার সঙ্গীর দিকে, এও এক ভাস্করের হাতে খোদাই করা শিল্পমূর্তি, কিন্তু কত লক্ষের তার সঙ্গী প্রথম দেবদূতের দেহের আকৃতির থেকে।

দ্বিতীয় দেবদূতের সমস্ত শরীর থেকে এক নিষ্ঠুর কঠিনতা ফুটে বেরোচ্ছে। দেহের কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গই তার সঙ্গী দেবদূতের মত কোমল পেলব নয়।

দেহ তার ক্ষীণ, দেহের বর্ণে পাণ্ডুর বিবর্ণতা। বড় বড় দুটি চোখের তারা ঘোলাটে রংয়ের। সেই ঘোলাটে রংয়ের চোখের তারা থেকে অদ্ভুত তীব্র জ্যোতি বেরোচ্ছে। সুউচ্চ নাক, দীর্ঘ চিবুক, প্রশস্ত ললাট দৃঢ়তা আর কঠোরতার প্রতীক।

দুটি দেবদূত যেন দুই কিশোর ভাই পরস্পরের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

অবাক হয়ে আমি এই দুই দেবদূতের দুই বিপরীত মূর্তি দেখছি, এমন সময় শুনলাম এক দৈববাণী। কে যেন কোথা থেকে মধুর সুরে বলে উঠল—"তোমার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রেমের দেবতা আর ক্ষুধার দেবতা, দুই যমজ ভাই। এই দুই ভাই জীব জগতের প্রাণস্বরূপ।

প্রেমের জন্য আর ক্ষুধার জন্যই পৃথিবীর যত কিছু প্রাণী, মানুষ থেকে কীট পতঙ্গ পশু সবলেই জীবন ধারণ করছে আর জীবন যুদ্ধ করছে। পদে পদে বিঘ্ন বিপদকে পরাজিত করছে, জীবনকে বহৎ সুন্দর করে তুলছে।

ক্ষুধা আর প্রেম—উভয়ের লক্ষ্য এক। সে লক্ষ্য হল যে—জীবনের গতি যেন থেমে না যায়। মানুষের জীবন, কীট পতঙ্গের জীবন, বিশ্ব জগতের জীবন যেন প্রাণময়, আনন্দময় হয়ে ওঠে।

স্বপ্ন

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা।

স্বপ্ন শব্দের ব্যুৎপত্তি—স্বপ্ ধাতু নিদ্রিত হওয়া + অনট্, কর্তৃভাবে—নিদ্রাবস্থায় বিষয়ানুভব। "স্বপ্নো নিদ্রায়ুপেতস্য বিষয়ানুভবস্তু যঃ"—সাহিত্য-দর্পণে।

আরেকটি শব্দ তত্তুল্য—সুষুপ্ত, অর্থ গভীর নিদ্রিত, অচেতনাবস্থাযুক্ত। "যত্র সুপ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি তৎ সুষুপ্তম্।" ব্যুৎপত্তি—সু অত্যন্ত—স্বপ্ নিদ্রিত হওয়া + ক্ত (ক্ত)—ক।

স্বপ্ন চারি প্রকার—ভবিষ্যদ্ভাবদ্যোতক, উপদেশাত্মক, দুরার্থপ্রকাশক, অলীক অর্থাৎ কাল্পনিক। স্বপ্নে ভবিষ্য ঘটনা জানাইয়া দেয়, তাই ভবিষ্যদ্ভাবদ্যোতক—'Coming events cast their shadows before.' উপদেশ দিয়া থাকে সেই জন্য উপদেশাত্মক। গূঢ় বিষয় প্রকাশ করে বলিয়া দূরার্থপ্রকাশক। কল্পনায় পরিপূর্ণ, বাস্তব নহে, তদ্নিমিত্ত অলীক। স্বপ্নে ভবিষ্যৎ ঘটনা জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা Iamblichus Agathocles * কেও বলেন। হোরেস কবিরাও অবিশ্বাস করিতেন না—

Jessica, my girl,
Look to my house.—I am right loth to go,
There is some ill a-brewing towards my rest,
For I did dream of money-bags to-night.
—Shakespeare.

* * For I this Night,
Such night till this I never pass'd, have dream'd,
If dream'd, not as I oft am wont, of thee,
Works of day pass't, or morrows next designe,
But of offence and trouble, which my mind
Knew never till this irksom night;
—Milton.

Dryden এর Virgil, Aeneid VI এর তর্জ্জমায়—

(আ-তরুজমা)

Two gates the silent house of Sleep adorn:
Of polished ivory this, that of transparent horn
True visions through transparent horn arise;
Through polished ivory pass deluding lies.

প্রাচীন গ্রীস এবং রোম দেশেও স্বপ্ন সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস ছিল প্রবল। দেবতারা যদি তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জানিতে পারেন, মানবও তাহা হইলে পরাঙ্মুখ হইবে কেন? যাহা শরীরের রাত্রিকাল, আত্মার তাহাই দিবা —"যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী"— গীতা।

---

* Neoplatonist philosopher, a native of Chalcis in Coele-Syria, and died about 333 A.D. In his hands the Neoplatonist philosophy degenerated into theurgy and demonology. He wrote on Pythagoras, mathematics, and philosophy.—Chambers's Biographical Dictionary. London, 1926, p. 517, col. 1; * (361—280 B.C.), Tyrant of Syracuse from 317, for four years fought unsuccessfully with the Carthaginians in Africa. A favourite killed him with a poisoned toothpick. See German Life by R. Schubert (1887).—Do., Do., Do., p. 13, col. 2.

২।১৯। প্রাচ্য দেশে বড় স্বল্প নহে। আর্য্যদের ধর্মগ্রন্থ সামবেদের কায় শাখায়, কোন্ স্বপ্নে কি পুণ্য, কি শুভফল হয়, তাহাদের বিষয়ে অবগত হওয়া যায়। অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে, শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ডে, ৭৭, ৮২ অধ্যায়ে দেখা যায়—নন্দ শ্রীভগবান্‌কে সুস্বপ্ন ও দুঃস্বপ্নের প্রকার এবং ভেদ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। ভগবান্ প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিতেছেন। দুঃস্বপ্নের প্রশমনের কথাও ঐ ৮২ অধ্যায়ে উল্লেখ আছে। অপর পুরাণও নীরব নহে, যেমন—বায়ু পুরাণের ১৯ অধ্যায়ে "অরিষ্ট নিরূপণ", কালিকা পুরাণের ৮৬ অধ্যায়ে "পুণ্য স্নানাদি", মৎস্য পুরাণের ২৪২ অধ্যায়ে "যাত্রানিমিত্তে স্বপ্ন-ব্যাহৃঃ", ঋগ্বেদে, অথর্ববেদে, রামায়ণে, মহাভারতেও মিলে। স্বপ্নে, সুখ এবং দুঃখ দেয়। বৌদ্ধেরাও স্বপ্ন বিশ্বাসী। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ "মিলিন্দার প্রশ্নাবলি অধ্যায়।" ছয় প্রকার কারণে মনুষ্যের স্বপ্ন দর্শন হয়—বায়ু-প্রধানে, পিত্ত-প্রধানে, শ্লেষ্মা-প্রধানে, ধাতুবিশিষ্টে, সৎ-শক্তির বিকাশে এবং ভাবী ঘটনাসূচকে। শেষোক্ত প্রকৃত, অপর অলীক। ভাবী ঘটনা আপনিই মনে উঠে। শুভাশুভ নির্ণীত হয় অপরের ব্যাখ্যায়। না নিদ্রিত, না জাগ্রতাবস্থায় সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় নাই, তখনই স্বপ্ন-দর্শনের কাল। মন যখন কার্য্যক্ষম, তখনই স্বপ্ন দৃষ্ট হয়। জাগ্রৎ ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে না—যেহেতু, তাহার নিকটে ঐশী ইচ্ছা উন্মীলিত হয় না। 'কপি-নিদ্রা'—নিদ্রার মধ্য। মন আপনার মধ্যে আপনি লীন যখন হয়, তখনই নিদ্রার সমাপ্তি। মানুষ এই 'কপি-নিদ্রা'তেই স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। জাগ্রদবস্থা বিবাদ-কোলাহল সম, 'কপি-নিদ্রা' নির্জ্জন কানন সদৃশ। মনুষ্য মাত্রেই কখন না কখনও স্বপ্ন দেখিয়াছেন। স্বপ্নের প্রভাবে জীবনের গতি অন্য ধারায় পরিচালিত হয়, নূতন পথ অবলম্বিত হয়। স্বপ্নে মানুষকে হাসিতে, কাঁদিতে, ভীতিবিহ্বল হইতে, ক্রোধের উত্তেজনায় আস্ফালন করিতে সময়ে সময়ে দেখা যায়। স্বপ্নতাত্ত্বিক ডাঃ সিরীন্দ্রশেখর বসু বলেন—"যদি স্বপ্নের প্রকৃতি ও উৎপত্তি জানিতে হয়, তবে বৈজ্ঞানিক মার্গ ধরিতে হইবে। এই মার্গের তিন পাদ আছে। প্রথম পাদে নানা লোকের অনুভবের যথাযথ বর্ণনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় লক্ষণ নিরূপণ, তৃতীয়ে সিদ্ধান্ত। যিনি এই মার্গে চলিতে না শিখিয়াছেন, তিনি পদে পদে ভ্রান্ত হইবেন।" বৌদ্ধ গান ও দোহার তুলনাচ্ছলে দেখা যায় এরূপ—'নিংদ বিহনে সুইনা হইলো।' প্রাচীন বাঙ্গালায়—"সুইনা"। চট্টগ্রামের কথ্য ভাষায়—(হিন্দু কথ্য)—"সপ্পন"। মুসলমানের—"হপ্পন"। বীরত্ব-ব্যঞ্জকভাবে "মেঘনাদবধকাব্যে" ব্যক্ত—"নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা।" 'স্বপ্ন' শব্দের কোমলরূপ—"স্বপন"। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গলে" একটিতে—"কৃষ্ণ দেখিবারে খেদ, স্বপনে পাইল ভেদ। নীলমাধবের এই না স্থান।" তুলনামূলক ফার্সী ভাষায় স্বপ্ন দেখিবার আগারকে "খোয়াবগাহ্" বলে।

পরিবারের মধ্যে গৃহদেবী থাকেন। তিনি সকলের শুভাশুভ দেখেন। রক্ষাকর্ত্রীস্বরূপে তিনি বাস করেন। কাহারও অনিষ্ট করেন না। পারিবারিক অমঙ্গল ঘটিলে স্বপ্নে আবির্ভূতা হন। রামচন্দ্রপুত্র কুশ যখন অযোধ্যার রাজা তখন তিনি নিশীথে গৃহদেবীর আগমন উপলব্ধি করেন। কালিদাসের রঘুবংশের ১৬।৮-৮৮ শ্লোকে দেবী কুশের নিকটে আবির্ভূতা হইয়া অযোধ্যার শোচনীয়া অবস্থা বর্ণনা করেন। কুশ তাঁহাকে কি ভাবে দেখেন, তাহা লিপিবদ্ধ করা হইল—

অথার্দ্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে
শয্যাগৃহে সুপ্তজনে প্রবুদ্ধঃ।
কুশঃ শ্রমাসম্ভবলব্ধবোধাম্
অদৃষ্টপূর্ব্বাং বনিতামপশ্যৎ॥ রঘু, ১৬।৪

রাত্রির অদ্ভুত বৃত্তান্ত রাজা কুশ প্রভাতকালে সভায় ব্রাহ্মণবর্গের নিকটে প্রকাশ করেন—

তদদ্ভুতং সংসদি রাত্রিবৃত্তং
প্রাতর্দ্বিজেভ্যো নৃপতিঃ শশংস।
শ্রুত্বা তে এনং কুলরাজধানীং
সাক্ষাৎপতিত্বে বৃতমত্যনন্দন্॥ রঘু, ১৬।২৪

শুভ স্বপ্ন দেখিলে নিদ্রা যাওয়াই অনুচিত। নিদ্রা গেলে বিপরীত ফল দর্শে। অশুভ স্বপ্ন দর্শনে নিদ্রা ভাঙ্গিলে পুনরায় নিদ্রা যাওয়াই সমীচীন। একই রাত্রে শুভাশুভ স্বপ্নদর্শনে পশ্চাৎ দৃষ্ট স্বপ্নের ফল হয়। গার্গ্য মুনির অভিমতও তাহাই—"দৃষ্টে। স্বপ্নে শোভনং নৈব স্বপ্যাৎ পশ্চাদ্দুষ্টে যদি পাপকং বিদন্তে। সংসেদিরে তত্র সাধু-বিদেভাস্তে চাশীর্ভিঃ শ্রীনয়েদুনরেন্দ্রম্॥" ঘটনা টীকাকার মল্লিনাথের মতে স্বপ্নবৎ—"ইত্যপি স্বপ্নতুল্যমিতি ভাবঃ।" নিদ্রিতাবস্থায় দেবতার আদেশ হয়—"স্বপ্ন হৈল সংহিতের"—অর্থাৎ মঙ্গল। স্বপ্নে কেহ কেহ মন্ত্র পাইয়াছেন কঠিন দুরারোগ্য রোগের উপশমের জন্য ঔষধ কেহ কেহ বা পাইয়াছেন। শাক্যসিংহের মাতা স্বপ্নে দেখেন এক শ্বেত হস্তী তাঁহার উদরে প্রবেশ করিতেছে। ফলে, শাক্যসিংহের জন্ম এবং তাহা হইতে 'বুদ্ধত্ব' প্রাপ্তে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তন। এ সবই শুভ প্রতীক! অশ্বারোহণ, গজারোহণ, পর্বতারোহণ স্বপ্নে—অর্থ লাভ; নরমাংস ভোজন করার স্বপ্নে—উচ্চাকাঙ্ক্ষা লাভ; পূর্ণ জলপাত্র দৃষ্টে—ধনপুত্রে লক্ষ্মী লাভ; অগম্যাগমনে—ভার্য্যা লাভ; হাসো—দুঃখভোগ; কৃষ্ণাম্বর পরিধান, পঙ্কে নিমজ্জন, গর্ত্তাদিতে পতিত হইয়া পুনঃ বহির্গমন বার না প্রাপ্তি, গোলায় আরোহণ, স্রোতে ভাসিয়া যাওয়া, রক্তমাল্য ধারণ, প্রভৃতি অমঙ্গলসূচক। শুষ্ক মাল্য, জীর্ণবস্ত্র ধারণ, শত্রুবধ, শোণিতদর্শন, শিরশ্ছেদন, প্রভৃতি স্বপ্ন মঙ্গলজনক। তাবী অমঙ্গল সূচনা করে স্বপ্নে, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ হইতে তাহা উদ্ধৃত করা হইল—লেখার :

The 25th Sraban, 1356 B. S.

পরম কল্যাণীয়বরেষু,

আমি গত রাত্রে একটী পরম সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়াছি—উহা তোমার নিকট ব্যতীত আর কাহার নিকট বলিব? (১) তোমার পিতৃদেব বরিশালের বাসায় একটী তাকিয়ার উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া আছেন—আমি মনে করিলাম—তিনি অসুস্থ, তাই বলিলাম, "আপনি ঔষধটি খাইলেই ত পারেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "বার বার ঔষধ খাইলে শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে"—"একটু গরম জল হইলেই চলিতে পারে।" আমি উনুনে বাইল দিয়া ধরাইয়া জল গরম করাইয়া দিলাম। তিনি সুস্থ বোধ করিলেন। এই পর্য্যন্ত।

(২) কয়েকদিন পূর্ব্বে দেখিলাম তিনি কলিকাতার বাসায়। হাইকোর্ট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এক নূতন বাড়ী ভাড়া করিয়াছেন—৪ তালা, খুব বড়, নবুজ রংয়ের দেয়ালগুলি—উপরে উঠিয়া যাইতেছেন, আমরা সকলেই নীচে বসিয়া গল্প করিতেছি। তিনি অনেকগুলি টাকা দান করিয়াছেন—আমরা যেন উহাতে অসন্তুষ্ট বোধ করিতেছি—উহা তিনি বুঝিতেছেন, কিন্তু আমাদিগকে কিছুই না বলিয়া সরাসরি উপরে চলিয়া গেলেন।

(৩) উহারও পূর্ব্বে আর একদিন স্বপ্নে দেখিলাম—তিনি ৺শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার পূর্ব্বে কলিকাতা হইতে সপরিবারে বাড়ী (রামচন্দ্রপুর) যাইতেছেন। বরিশাল হইয়া বাড়ী যাইবেন। একখানা বোধ নৌকা ভাড়া করিয়াছেন। আমাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। কিন্তু আমি বড়ই বিলম্ব করিতেছি। তাই তিনি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, "তুই, এখন যাইতে না চাও বেশ, তোর কাজকর্ম্ম একটু বাকী থাকে, উহা শেষ করিয়া ছোট একখান নৌকা করিয়া পরে যাইস্।" ইহা বলিয়াই তিনি চলিয়া গেলেন। প্রত্যেক বারই তাঁহার শরীর খুব সুন্দর। বদন প্রফুল্ল appearance-every commanding দেখিলাম। আর কতদিন তাঁহাকে এইরূপ স্বপ্নে দেখিতেছি—তাহা আর কত বলিব।

তোমার নিকট এই কথাগুলি বলিতে পারায় আমার মনটা একটু হাল্কা বোধ করিব। শোকটাও একটু লাঘব হইবে আশা করি! ইতি।

আঃ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায়

D. N. Guha Chowdhury, Esq.

এই সব স্বপ্ন অমঙ্গলসূচক। নৌকার স্বপ্নে, মহিষের স্বপ্নে মৃত্যু সন্নিকট প্রকাশ করে। গভীর জলরাশির স্বপ্নে

ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনা বুঝায়। তেমন, মুক্তার স্বপ্নে অশ্রু বুঝায়। পত্রলেখকের পত্র দেওয়ার প্রায় আট মাস পরে অর্থাৎ ১২ই চৈত্র, রবিবার, অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকা, ১৩৪৩ সনে, বরিশালে তাঁহার কলেজ রো এর বাসায় মৃত্যু হয়। ইনি ঢাকা জিলার রোয়াইল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী, পূত-স্বভাব, মিষ্টভাষী, আদর্শ-চরিত্র বলিয়া সর্বত্র ইঁহার খ্যাতি ছিল।

উপদেশাত্মক—গূঢ়ার্থপ্রকাশক পত্র :

৩০ শ্রাবণ, ১৩৪৩ সন।

To D. N. G., Esq.

পরম কল্যাণীয়বরেষু,

গত রাত্রে সুদীর্ঘ whistle পড়িবার পূর্বক্ষণেই তোমার ৺পিতৃদেবের সম্বন্ধে আর একটী স্বপ্ন দেখিয়াছি। তাহা যথাযথরূপে বর্ণনা করিলাম। তোমার নিকট উহা না জানাইলে মনের ভার কমে না,—তাই তোমাকে জানাইতেছি।

তোমার পিতৃদেব কোনও বিশেষ বৈষয়িক কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা হইতে বাড়ীতে রওয়ানা হইয়া গেলেন। অন্যান্য সকলেই কলিকাতা রহিয়া গেল। ছেলেপিলেরা ও আর সকলেই ইহাতে দুঃখিত। সন্ধ্যার পরই তোমার ঠাকুরমা শুইয়া পড়িলেন। আমি বালকের ন্যায় তাঁহার নিকট বসিয়া পড়িলাম। তোমার মাতাঠাকুরাণী একখানা কালো চারখানার মশারি ফেলিয়া তাঁহার এক পার্শ্বে শুইয়া পড়িলেন। তোমার পিতৃদেবের বৈঠকখানার ভিতর বাড়ীর দিকে আসিবার যে দরজা ছিল, উহার পরদাটী ছেঁড়া ছিল। তাই, তিনি বাড়ী যাইবার সময়ে তোমার মাতাঠাকুরাণীকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে পরদাটা ছেঁড়া হইলেও উহা যেন ফেলিয়া না দেওয়া হয়। পরদাটা এমন threadbare হইয়া গিয়াছিল যে উহা আর রাখা যায় না। তাই, তোমার মাতাঠাকুরাণী তোমার ঠাকুরমার অনুমতি ক্রমে উহা ফেলিয়া দিতে চাহিলেন। কিন্তু তোমার ঠাকুরমা তাঁহার ছেলের মত না পাইয়া কোন কাজই তোমার মাতাকে করিতে দিতে রাজী হইতেন না। ইহা আমি পূর্ব হইতেই জানিতাম। তাই, আমি উত্তরের মাঝখানে বসিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে কোথা হইতে একটা শাদায়-কালায় মিশ্রিত রং এর বিড়াল তোমার ঠাকুরমা ও মাতাঠাকুরাণীর মাঝখানে মশারির মধ্যেই আসিয়া পড়িল ও তাঁহাদিগকে বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিল। তোমার মা উহাকে তাড়াইয়া দিলেন বটে। কিন্তু, বিড়ালটা পুনরায় আসিয়া বিরক্ত আরম্ভ করিল। আবারও তোমার মা উহাকে তাড়াইতে ছিলেন। এমন সময়ে whistle পড়ায় আমার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল।

তখনই এই স্বপ্ন ও বিড়াল সম্বন্ধে আমার যে ধারণা হইল, তাহা তোমাকে জানাইতেছি। "ছেঁড়া পরদা রাখিয়া দিতে হইবে"—ইহার অর্থ—তিনি প্রাচীন হিন্দু-ধর্মের ও সমাজের আচার-ব্যবহারের বিশেষ পক্ষপাতী। শাদায়-কালায় মিশ্রিত রং এর বিড়াল represents ইউরোপীয় ও দেশীয় ধর্ম সম্বন্ধীয় ও সামাজিক রীতি-নীতির অযৌক্তিক মিশ্রণ। যে মিশ্রণ আমাদের ধর্মবন্ধন ও সামাজিক আচার-ব্যবহার নষ্ট করিয়া দিতেছে। তোমাদের রসংসারে এইরূপ খচ্চরী আচার-ব্যবহার তোমার মাতাঠাকুরাণী কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। তাই, উহাকে দূরে তাড়াইয়া দিলেন। ইহাতে তোমার পিতার ও ঠাকুরমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও মত ছিল বলিয়াই তিনি উহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সুতরাং আশা করা যায় তোমার পিতৃদেবের বংশধরেরাও কোনও রূপ খচ্চরী আচার-ব্যবহার গ্রহণ না করিয়া বা half-anglicised না হইয়া তাঁহাদের পিতৃ-পিতামহ অনুসৃত পথেই চলিতে থাকিবেন (Further comment is unnecessary & useless)। স্বপ্ন সত্য, সত্য, সত্য!

আং শ্রীঅনুকূলচন্দ্র রায় *

ভবিষ্যদ্ভাষণাত্মক—

অজ্ঞান হেতু অথবা প্রমাদবশতঃ বা অন্য কোন কারণে ষোড়শ শ্রাদ্ধ বা সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ যথাকালে না

† কলিকাতা মহানগরীতে ১৮ই ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩৪৩ সনে বেলা ২ ঘটিকার সময়ে মৃত্যু হয়।

হইলে কৃষ্ণা একাদশীতে বা অমাবস্যাতে করা কর্ত্তব্য। ঐ সময়ে রক্তপাত বা রোগাদি বিষয়ে বিপজ্জনক আশঙ্কা না হইলে পরবর্ত্তী দ্বাদশীতে বা কৃষ্ণা একাদশী কিংবা অমাবস্যায় করা কর্ত্তব্য। স্বপ্নে রক্তপাতজনিত ঘটনা দুঃখপ্রদায়ক বটে! তাহাই নিম্নে প্রদর্শিত হইল: পিতৃদেব তখন কলিকাতায়। জ্যেষ্ঠা ভগিনী নলিনীবালা রায়চৌধুরী সঙ্কটাপন্ন রোগে অন্যস্থান রামচন্দ্রপুর গ্রামে শয্যাশায়িনী। পিতৃদেব স্বপ্নে দেখিলেন তাঁহার একটি দন্ত ভাঙ্গিয়া রক্তপাত হইতেছে। তিনি তাহাতে প্রমাদ গণিলেন! ফলে, সংবাদ আসিল কিছুদিন পরে ভগিনী নলিনীবালার মৃত্যু (২৯শে ভাদ্র, রবিবার, সনে) হইয়াছে। ইনি নিঃসন্তানা ছিলেন। বিবাহের পর মাত্র আড়াই বৎসরের কিছু বেশী কাল জীবিতা ছিলেন। কদমদীপুর—ওলপুর কোঠাবাড়ী নিবাসী ৺বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরীর তৃতীয় পুত্র শ্রীযীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর সহিত ৭ই বৈশাখ, শনিবার, ১৩১৯ সনে ইঁহার বিবাহ হয় †

আরেকটি ঘটনা ভীতিবিহ্বল সমাহিত—

পিতৃদেবের কলিকাতায় রোগাক্রান্তাবস্থা। অসুখের মধ্যে তিনি কখনও কখনও 'মা', 'মা', বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেন। স্বপ্নে তিনি মাতা দুর্গামণিকে দেখেন। সেই হইতে পিতৃদেব কেমন যেন নমিত হইয়া পড়িলেন। মন ভাঙ্গিয়া পড়িল! তথাপি পত্নী প্রভাতকামিনীকে আশ্বাস দিয়া স্বপ্নের বিষয়ে উহা অলীক বলিয়া তিনি প্রবোধ দিতেন। কিছুদিন অতীতে স্বপ্ন বাস্তব্যে পরিণত হইল। পিতৃদেব ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন! মাতা পুত্রের জন্য মায়াবশতঃ আসেন, পিতা বংশ-রক্ষার্থে পুত্রের নিকটে বড় আসেন না। মাতাপিতার মৃত্যু পুত্রের জীবদ্দশায় হইলে ঐরূপ ঘটে! লেখকের পিতৃদেবের অসুখের অবস্থায় লেখক মহিষের স্বপ্ন দেখে। তদবধি সে বিমনাঃ থাকে। যমরাজের বাহন মহিষ। তাঁহার স্থানের দ্বার দক্ষিণ দিকে। ফলে, মৃত্যু ঘটিল পিতৃদেবের। ঘুম ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়া উঠিয়া যায় অনির্দ্দিষ্ট স্থানে, লক্ষহীন ভাবে। তখন কখনও হাসি, কখনও ক্রন্দনরত হইতে কাহাকেও কাহাকেও দেখা যায়, সেই পরিভ্রমণ কার্য্য 'স্বপ্ন সঞ্চরণ' অথবা 'স্বপ্নাটন' নামে অভিহিত হয়। ইংরাজীতে ইহাকেই Somnambulism বলে—নিদ্রিতাবস্থায় জাগরিতবৎ কার্য্য সম্পাদনা। ইহা যে ভীতি-সম্ভূত, তাহাতে আর সন্দেহ কি?

স্বপ্নের সব কথা স্মরণ থাকে না। জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় সুষুপ্তির কথাও মনে আসে না। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় জাগ্রৎ ও স্বপ্নের কথা স্মরণ হয়। স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রদবস্থার বিষয় স্মৃতি বহির্ভূত হয় না। স্বপ্নাবস্থায় আত্মা সূক্ষ্ম-জগৎ ভোগ করেন, তখন হয় 'তৈজস' (astral), সুষুপ্তিতে আনন্দ ভোগ করেন, 'প্রাজ্ঞ' তখন হয়। প্রগাঢ় নিদ্রায় সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিকটেই ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে। নিদ্রা সূক্ষ্মদেহের সংক্রমণ মাত্র। নিদ্রার সময়ে সূক্ষ্মদেহ স্থূলোপাধি হইতে নিষ্ক্রামিত হইলেও স্থূলদেহ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না, বৈদ্যুতিক অতি সূক্ষ্ম সূত্রের দ্বারায় স্থূলদেহের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। নিদ্রা এবং মৃত্যুর ইহাই প্রভেদ। মৃত্যুও নিদ্রা, তবে তাহাতে স্থূলদেহ হইতে সূক্ষ্মদেহ সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়। যোজক সূত্র থাকে না।

সুষুপ্তি অবস্থায় অনেক সার সত্যের অনুভূতি হয়, অনেক জটিল রহস্যের মীমাংসা হয়। সাধকপ্রবর মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনেও প্রতিফলিত হইত—

* স্বনামখ্যাত পিতৃদেব অবিনাশচন্দ্রের মাতুল-পুত্র, বয়োকনিষ্ঠ; বরিশাল—নরোত্তমপুর নিবাসী ৺বৈকুণ্ঠচন্দ্র রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র।

† ইঁহার বিবাহে কলিকাতার তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয় "ষ্টার থিয়েটারের" প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অভিনেতা, অভিনেত্রীদের পরিবেশে দুই রাত্রি বরিশালের রামচন্দ্রপুর গ্রামে জমীদার বাড়ীতে অভিনয় হয়। ঐ থিয়েটারের অভিনয় ঐ জিলায় ঐ বাড়ীতে সর্ব্বপ্রথম সম্পন্ন হয়। তদুপলক্ষে দেশ-দেশান্তর হইতে দুই দিনে অগণিত লোকের সমাবেশ হইয়াছিল।

একবার একটি ভারবাহী বোঝা লইয়া আসিয়াছে। তিনি উহার ভিতরে কাহাকে যেন দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। তখন কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার পদতলে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন: ভারবাহীর অশ্রুসিক্ত হইল। সে দৃশ্য অপূর্ব! যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। সুষুপ্তি-চৈতন্যের আনন্দ-প্রবাহ জাগ্রৎ-চৈতন্যে আসিত বলিয়াই প্রভুপাদ গোস্বামীর ঐরূপ হইত! তাই, তিনি ভগবান্ সম্বন্ধে বলিতেন—"তিনি সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতা, ইহা কল্পনা নয়। তাঁহাকে দেখা যায়, ধরা যায়, আস্বাদন করা যায়, শুনা যায়। এ কথার কথা নয়, আমি স্বয়ং পরীক্ষা করিয়াই বলি!" প্রভুপাদের এ দৃষ্টে নাস্তিকেরও ঈশ্বর-বুদ্ধি প্রণোদিত হয় না?

জ্যোতিষের দিকে স্বপ্ন-সিদ্ধির, অসিদ্ধির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানে নিবন্ধের উপসংহার করি। ব্যক্তিবিশেষে, অবস্থাভেদে, রূপপার্থক্যে স্বপ্নফলের ফল বিভিন্ন হয়। প্রথম প্রহরে স্বপ্নদৃষ্ট হইলে সংবৎসরের ভিতরে, দ্বিতীয় প্রহরে সপ্তমাসের, তৃতীয় প্রহরে ত্রিমাসের এবং চতুর্থ প্রহরে অর্থাৎ প্রত্যূষে স্বপ্নদর্শন হইলে দশম দিবসের মধ্যে ফল প্রাপ্তি হয়। প্রত্যূষের স্বপ্ন সদ্য এবং দিবাভাগের স্বপ্ন সমধিক ফলপ্রদ হয়। তিথি অর্থাৎ প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা বা অমাবস্যাভেদে স্বপ্নের ফল পৃথক হয়। চন্দ্রের আপেক্ষিক গতির নামই 'তিথি'। শুক্লপক্ষে—প্রতিপদের স্বপ্ন—সুখের। দ্বিতীয়ার—নিষ্ফল। তৃতীয়ার—সফল। চতুর্থীর—নিষ্ফল। পঞ্চমীর—কতকাংশ সফল। ষষ্ঠীর—সহসা সফলের সম্ভাবনা অল্প। সপ্তমীর—গোপন সিদ্ধি। অষ্টমী এবং নবমীর—সত্বর সিদ্ধি। দশমী এবং একাদশীর—অসিদ্ধি। দ্বাদশীর—কদাচিৎ সিদ্ধি। ত্রয়োদশীর—সত্বর সিদ্ধি। চতুর্দশীর এবং পূর্ণিমার—বিলম্বে সিদ্ধি। কৃষ্ণপক্ষে—পঞ্চমীর—বিলম্ব সিদ্ধি। একাদশীর—অবশ্য সিদ্ধি। ষষ্ঠী এবং দ্বাদশীর—অলীক। ত্রয়োদশীর—মন্দ ফল। চতুর্দশীর—শুভ। বস্তু-বিবেকে—সমস্ত শুক্লবর্ণের পদার্থ শুভজনক এবং প্রশস্ত, তন্মধ্যে কার্পাস, তন্তু এবং অস্থি বর্জিত। সমস্ত কৃষ্ণবর্ণের পদার্থ অমঙ্গলজনক এবং কুলক্ষণযুক্ত, তন্মধ্যে গো, হস্তী, ব্রাহ্মণ এবং দেবতা বর্জিত। অন্তরীক্ষ-মণ্ডলে নিস্তব্ধ বাতাসের উপরে জ্যোতিশ্চক্র অবস্থান করে। ইহা তুল্য ৩৬০ ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগকে এক এক 'অংশ' বলে। প্রত্যেক ৩০ অংশ লইয়া এক এক 'রাশি' এবং প্রত্যেক রাশি সপাদ দুইটি করিয়া নক্ষত্র লইয়া গঠিত। কাজেই, সর্বশুদ্ধ দ্বাদশটি রাশি এবং সপ্তবিংশতিটি নক্ষত্র। ইহার অপর নাম—'রাশিচক্র', 'নক্ষত্রচক্র'। রাশি ভেদে অর্থাৎ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ এবং মীনভেদে মনুষ্যের দৃষ্ট স্বপ্ন বিভিন্ন ফল উৎপাদন করে—যেমন, আনন্দে, যষ্ট্যাদি-দর্শনে, জলদর্শনে, জলমধ্যে জীবিত জন্তুদর্শনে, সৌভাগ্যদর্শনে, অট্টালিকাদর্শনে, সঙ্গীতে, বন্ধুসমাগমে, স্থানপরিবর্তনে, অগ্নিদর্শনে, অশ্বাদি আরোহণে, হত্যা-দর্শনে, শবদর্শনে, রুদনদর্শনে, মৃত্তিকাদিদর্শনে, পীড়াদি-দর্শনে, ক্রন্দনে, ভয়ে, চিত্রবিলনে, ইত্যাদি, ইত্যাদি।*

* এতৎসম্পর্কে নিম্নলিখিত গ্রন্থনিচয় পঠিতব্য—Freud (1856-1939) Researches on Dreams, Myers (1843-1901). Human Personality and its Survival of Bodily Death (1903). Leadbeater, Dreams, etc.; শ্রীকিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত—স্বপ্নতত্ত্ব (সম্ভবতঃ বঙ্গভাষায় ধারাবাহিক প্রথম গ্রন্থ), স্বপ্ন—শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, জ্যোতিষ-রত্নাকর—বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, কলিকাতা।

[৭]

কয়েকটা দিন একরকম উত্তেজনা ভাবেই কাটলো। অস্থির মন নিয়ে এ কটা দিন কেবলই ঘর আর বার ক'রেছি। কোথাও নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারিনি। বাড়ীতে তাই ব'লে কেউ নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে ছিল না। রোগক্লিষ্টতার মধ্যেও মা এবারে অনেকখানি প্রাণচাঞ্চল্যে মেতে উঠলেন। ডক্টর চৌধুরী ব'লেছেন, 'এটা শুলক্ষণ'। জামাইবাবু তাঁর চক্রধরপুরের কর্মস্থলে টেলিগ্রাম ক'রে আরও সপ্তাহ দু'য়েকের ছুটি নিতে বাধ্য হ'লেন। মার এখন জামাইবাবুই একমাত্র ধ্যান। মা ব'লেন, 'কল্পনাকে দিয়ে আমি কেনকে চিঠি লিখেছি, বিয়ে এই ফাল্গুনেই দিতে হবে; তারা যেন সেইভাবেই তৈরী হয়। এদিককার কাজকর্মগুলো এবারে কর্তার সঙ্গে বুদ্ধি যুক্তি ক'রে তুমি করে ফেল তবেশ। দিন তো আর ব'সে নেই, রাত পোহালেই কাল শাঁখ বাজবে। আমাদের এমন আর কেউ কোথাও নেই—যাকে চিঠি লিখে জানাবার ঝামেলা আছে. বাউতলীর বিলে হরিমোহনকে কেবল একটা চিঠি দিতে হবে; সে তুমি তোমার শ্বশুর মশাইর সঙ্গে কথা ব'লে দু'কলম মুশাবিদা ক'রে লিখে দিলেই হ'লো।'

কোন একটি কথাও প্রচ্ছন্ন নয়! এ দু'টো কানে স্পষ্টই তো ভেসে এলো। ঠাট্টা ক'রে জামাইবাবু এসে একসময় কাছে ব'সে ব'লেছিলেন, দার্শনিকেরা স্বভাবে কিছু গম্ভীর, কিন্তু সংসারের যা কিছু রসবস্তু—তাও যে দার্শনিকেরাই পরিবেশন করে! সে-অর্থে দার্শনিকেরা রসিক। তা—তুমি এমন হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে উঠলে কেন, বলো দিকি ভায়া?'

বলেছিলাম, 'কই, না তো। বিয়ে ক'রতে যাচ্ছি, মনের ভিতরটা খুসীতে কিছু উচ্ছল হ'য়ে উঠেছে বৈকি। হাঁড়ির রস উনুনে জাল না পেলে তো গান বাঁধে না, মুখের আদলে বোধ করি সেই উনুনের আঁচ এসেই খানিকটা লেগে থাকবে!'

—'উঃ, পারোও বটে ব'লতে!' হেসে জামাইবাবু বলেছিলেন, 'সবার ক্ষেত্রেই এরকম হয়। আমি যখন তোমার দিদিকে বিয়ে করি,—তখন মনে আছে—ইচ্ছে অনিচ্ছার প্রশ্ন নিয়ে বাড়ীতে কার উপর রাগ ক'রে যেন গুঁতো মেরে ঘরের ড্রেসিং টেবলটাই ভেঙে ফেললাম। তোমার দিদিকে ঘরে নিয়ে গিয়ে শেষটায় আপশোষ হ'লো। ওরে এ বাজারে একটা ড্রেসিং টেবলের দাম তো কম নয়। সবার ক্ষেত্রেই দেখলাম—রাগের ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত অনুরাগে এসেই মেশে। রাগের মুহূর্ত্তটার জন্যে তখন আর অনুশোচনার অন্ত থাকে না। তোমার গাম্ভীর্য দেখেও আমার কতকটা সেইরকমই তাক্ লেগেছিল। এবারে অনেকটা আশ্বস্ত হ'চ্ছি।'

বুঝলাম—কি বলতে চান জামাইবাবু। কথা না ব'লে তাঁর মুখের দিকে একবার স্বল্পক্ষণের জন্য স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে চোখ দু'টো নামিয়ে নিতে যাচ্ছিলাম, তেমনি মৃদু হেসেই জামাইবাবু ব'লেছিলেন, 'বলেছিলাম না, মিষ্টিমুখের অদৃষ্ট নিয়ে এসেছি, ঠেকাবে কি ক'রে বলো?'

বললাম, 'তা বটে। সংসারে ইতরজনেই মিষ্টার পরিবেশিত হয়।'

—'এ ব্যাপারে আমি হাজারবার ইতর হ'তে রাজি আছি।' জামাইবাবু বললেন, 'কাউকে দলে টানতে পারলেই আমি নিশ্চিন্ত। ও ভাই দর্শনই বলো আর যা-ই বলো, বিয়ের জল গায়ে না পড়লে মানুষের জীবন-দর্শনই আসলে পারফেক্ট হয় না। জীবনে যেখানে ফাঁক থেকে গেল, সেখানে অনুভূতির সম্পূর্ণতা কোথায়?'

দেখলাম—বক্তৃতার ব্যাপারে জামাইবাবুও কম যান না। এটা বাঙালী-চরিত্রের স্বভাব, জামাইবাবুর দোষ নেই। বললাম, 'অনুভূতির ক্ষেত্রে এতদিন সত্যিই হয়ত কাঁচা ছিলাম, এবারে পাকবো।'

—'পেকো।' তাই ব'লে শিল্পীকে যেন হঠাৎই কিছু পাকিয়ে বোসো না।' পুনরায় ঠাট্টার সুর তুললেন জামাইবাবু: 'অন্ততঃ গোটা দুই বছর যেতে দিয়ো, নইলে রোমান্সে ঘাঁটতি পড়বে।'

—'তাই নাকি?'

উত্তরে কি-একটা ব'লতে যাচ্ছিলেন জামাইবাবু, ইতিমধ্যে উঠোন থেকে বাবার গলার শব্দ ভেসে আসতেই ত্রস্ত আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

খানিকটা হাঁপ ছেড়ে যেন বাঁচা গেল এবারে। মনে মনে তনুশ্রীকেই খানিকটা কল্পনা ক'রতে চেষ্টা করলাম, সেই সঙ্গে তার মা হৈমন্তীকেও। ব'লেছিলেন: 'এ ক'দিন বুড়ীর মুখে তোমার কথা ছাড়া আর কথা ছিল না, কেবলই বলতো—ভারী অদ্ভুত লোক তুমি। কথাটা কিন্তু একটুও মিথ্যে নয় বাবা।' বুড়ী মানে তনুশ্রী। মনে মনে সত্যিই কি তবে তনুশ্রী আমাকে ভালোবেসেছিল? দু'দিনের উড়ো উড়ো পরিচয়ের মধ্যে এত গভীরতা? প্রতিটি দিন তাকে তো শুধু অবহেলা দিয়েই সরিয়ে দিয়েছি, কাছে এলে একটিবারও বলিনি যে বসো; অথচ সে-ই তো আজ আমার গোটা জীবনের মধ্যেই তার চিরদিনের আসন পেতে বসতে যাচ্ছে। আর যাকে চিরদিনের ক'রে বসিয়েছিলাম, আজও যাকে ছাড়া জীবনটা অর্থহীন ব'লে মনে হচ্ছে, সে কিন্তু নির্বিবাদে নিজেকে আড়াল ক'রে নিতে পারলো। অপিমা আর তনুশ্রী। একজন আমার উদয়উষার রাগমুহূর্ত তৈরবী, আর একজন বিষণ্ণ সন্ধ্যার সকরুণ পূরবী। জীবন-বীণার দুটি তারের দুটি সুর-মূর্ছনা। তার সঙ্গে আমার কণ্ঠকে মিলিয়ে তবেই বুঝি 'কোরাস', তবেই বুঝি আমার দ্বৈত প্রাণ-সাধনার উচ্ছ্বসিত সঙ্গীতের সম্পূর্ণতা। নারী যেমন দুর্জ্ঞেয়, তেমনি দুর্জ্ঞেয় ঈশ্বরের বিধান। সেই ঈশ্বরকে স্মরণ ক'রেই মনে মনে একবার বললাম, 'তোমার মত মিথ্যা অস্তিত্বকে নিয়ে পৃথিবী আর কতকাল মাটির পুতুল রচনা ক'রবে জানিনা, কিন্তু আমার জীবনে এমন মূর্খতা আর কোনোকালেই ঘটবে না। নো মোর্স্ কর ইউ ইন্ দিস্ ওয়ার্ল্ড।'

শুনে আড়াল থেকে পৃথিবীর এতকালের বিশ্বাসভাজন ঈশ্বর ব্যক্তিটি হাসলেন কিনা জানিনা, কিন্তু দরজার দিকে চোখ ফেরাতেই দেখলাম—নীলা এসে কখন থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। বিস্ময়ে কাছে ডেকে নিয়ে বললাম, 'আরেঃ, কখন এলে তুমি?'

—'অনেকক্ষণ, আপনি দেখতেই পাননি।' কৌতূহল সৃষ্টি করে নীলা বললো, 'এতক্ষণ বুঝি বসে বসে বৌদির কথা ভাবছিলেন সুমন্তদা?'

—'বৌদি?' বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতই বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন কেমন ক'রে উঠলো।

হেসে নীলা বললো, 'জানি, সব জানি, দিদি আমাকে সব কিছু লিখেছে। এবারে বৌদিকে ঘরে আনছেন, জানিনা বুঝি?'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি লিখেছে দিদি?'

নীলা বললো, 'দেখতে শুনতে বৌদি কেমন হলো, জানাতে লিখেছে দিদি। কবে জানাতে পারবো, বলুন তো সুমন্তদা?'

বললাম, 'সামনের ৭ই রওনা হবো, ৭ই বিয়ে; ৯ই নাগাদ তোমার বৌদি নিশ্চিত এ বাড়ীতে পৌঁছে যাবে। ১০ই তারিখের ভাকেই তুমি চিঠি দিতে পারবে দিদিকে।

তা—তুমিও চলোনা আমার সঙ্গে, বেড়ানোও হবে, ঘুরধামও করতে পারবে।'

শীলা বললো, 'গেলে ভালই হতো, কিন্তু মা ছেড়ে দেবেন না, যে রকম রাগী বাবা:, তা ছাড়া আমাদের পরীক্ষাও যে এগিয়ে এলো!'

বললাম, 'দু'টো দিনের পড়া তো তারী, আসলে মাকে মত করানোটাই মুস্কিল, তাই না?'

—'না আবার?' শীলা বললো, 'এখানে থাকতে দিদি কি এতদিন কম বকুনিটা খেয়েছে! এমন কি চাকরি নিয়ে অবধি। আচ্ছা আপনিই বলুন সুমন্তদা, দিদি কি ছেলে যে তাকে কিছু-একটা চাকরী না নিলেই অমনি বকাবকি সুরু হবে। না যেন কি! একা প'ড়ে গিয়ে আমি এখন শুয়ে শুয়ে থাকি, পাছে আমার উপর হঠাৎ আবার মাবমুখো হ'য়ে না ওঠেন।'

বললাম, 'না, না, তা কেন, তোমাকে সবাই ভালোবাসে।'

অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে শীলা বললো, 'হাঁা, ভালোবাসে—না ছাই।'

সান্ত্বনা পেয়ে অভিমান বেড়ে গেল শীলার!

অণিমার চিঠির একটা লাইন মনে প'ড়ে গেল: শীলার দিকে একটু লক্ষ্য রেখো। ও বড় একা প'ড়ে গেছে। জানো তো—সংসারে গরীবদের জীবনে স্নেহটুকুও দুর্লভ।' অণিমার অনুরোধ যে ঠিক ঠিক রাখতে পেরেছি, তা নয়, তবু চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। প্রসঙ্গটাকে ঘুরিয়ে নেবার জন্য এবারে প্রশ্ন ক'রলাম, 'দিদি কেমন আছে, কবে আসবে কিছু লিখেছে?'

শীলা বললো, 'আমার কথা কিছু লেখেনি। শরীর নাকি ক'দিন ধ'রে একেবারেই ভেঙে পড়েছে, কি যে হয়েছে কিছু জানায় নি; শুধু লিখেছে—মনটা ক'দিন ধ'রে কেমনই যেন করছে, একটা মুহূর্তও ভালো লাগছে না। ছুটি নিয়ে ঘরে বসে থাকলে পাছে মনটা আরও পেয়ে বসে, তাই স্কুলে গিয়ে নিয়মিত ক্লাশ নিই, কী যে পড়াই—তা ছাই নিজেই জানি না। তোকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে।' বলতে বলতে শীলার চোখ দুটো বেদনা-কাতর হ'য়ে উঠলো।

বুঝতে কিছুই বাকী রইল না। চিঠিটা যে আমাকে একেবারেই সহজ মনে লিখতে পারে নি অণিমা, সে কথা নিশ্চিত। লিখতে ব'সে মনের সঙ্গে অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে তাকে। সেই সংগ্রামেরই আভাস ফুটে উঠছে শীলার কণ্ঠে।

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'আমার কথা কিছু লেখেনি?'

—'বাঃ রে, সে তো আগেই বললাম।' বলে খানিকটা অবাক দৃষ্টিতেই আমার মুখের দিকে তাকালো শীলা।

বললাম, 'সে তো বৌদির কথা, তার সাথে আমার কি?'

এবারে কিছু-একটা জবাব না দিয়ে শুধু কৌতুকের হাসি হাসতে লাগলো শীলা। তারপর হাসির বেগ রুদ্ধ না করেই বললো, 'বৌদির কথা মানেই তো আপনার কথা, আপনাকে বাদ দিয়ে তো আর বৌদি নয়!'

নিজে এত কথা জেনেও শীলার কথার সঙ্গে কিছু কোনো কালেই পেরে উঠলাম না। ওর ঐ নিষ্পাপ-সুলভ রুচি মনের দুয়োর থেকে আমার যৌবনোদ্দীপ্ত মনের প্রহরী চিরকালই কাতিহত হয়ে ফিরে এলো।

থেমে শীলা বললো, 'ভেবেছিলেন—কথাটা গোপন ক'রে গিয়ে মিষ্টি না খাইয়ে পারবেন, কিন্তু দিদির চিঠিটাই দেখা গেল—যত গণ্ডগোল বাধালো।'

বললাম, 'দুই, বোঝাবার, দিদির চিঠি না পেলেই বুঝি এতবড় একটা কাণ্ড তুমি জানতে পেতে না? মিষ্টি মানুষদের মিষ্টি খাওয়াতে আমি খু—ব ভালোবাসি।'

ঠোঁটের কোণে হাসি গোপন ক'রে নিয়ে শীলা জিজ্ঞেস ক'রলো, 'আমি বুঝি মিষ্টি মানুষ?'

বললাম, 'তেতো তো আর নও!'

—'সত্যি নাকি? যাক্, নতুন একটা কথা শোনা গেল।'

মনে মনে কম খুসী হ'লো না শীলা। সেই খুসীর শিহরনে এতটুকুও প্রচ্ছন্ন পীড়া নেই। কী যে ঘটতে যাচ্ছে

—কিছুই বুঝতে পারলো না শীলা। যদি আগামী দিনের কোনো একটা মুহূর্তে এ ঘটনার মর্মের দিকটা শীলার কাছে ব্যক্ত হ'য়ে যায়, তবে অনিমার বলমে যে-শব্দটা এসেও আসেনি, সেই শব্দটিকেই অস্ত্ররূপে আমার প্রতি নিক্ষেপ ক'রে শীলা বলবে: 'এত নিষ্ঠুর, এত নির্মম আপনি সুমন্তদা, আপনি কি মানুষ!' এমন একটা চকিত দিনের আগমন খুব-বেশী বিচিত্র কি!

কিছু-একটা অনুরাগক্ত দিনের মধ্যেই মনটা প্রধাবিত হ'তে যাচ্ছিল, হঠাৎ দরজার বাইরে পাচক ঠাকুরের গলার আওয়াজ পেয়ে কাছে ডাকলাম, তারপর শীলাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বলো কি খাবে, রসগোল্লা, সন্দেশ, ক্ষীরমোহন, চমচম্—কোনটা, না সবটাই, বলো?'

লজ্জায় এবারে মাথা নিচু ক'রে নিয়ে চুপ ক'রে রইল শীলা। বুঝলাম—মাথা কুটলেও এ ব্যাপারে শীলা আর একটি কথাও বলবে না। পাচক ঠাকুর এসে সামনে দাঁড়ালে নিজের বুদ্ধিতেই তাই ফরমাস ক'রে বললাম, 'আমাদের কিছু চমচম্ আর সন্দেশ পাঠিয়ে দাও দিকি।'

মুখ টিপে হেসে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল পাচক ঠাকুর। উঠোনের দিক থেকে বাবা আর জামাইবাবুর আলাপ কিছু কিছু কানে আসছিল, সেই সঙ্গে দিদিও বাদ যায় নি। মাঝে মাঝে মন্টুর অসহিষ্ণুতাকে যে নরম শাসনে দাবিয়ে দেবার প্রয়াস পাচ্ছিল দিদি, সেটুকু অবধি আমার কানে এসে পৌঁছাচ্ছিল। বিয়ের দশকর্ম থেকে লৌকিকধর্ম রক্ষা পর্যন্ত যাবতীয় খরচ-খরচার বিস্তৃত হিসেব। চিরকালের হিসেবী মানুষ বাবা, অতএব এ ব্যাপারে তিনি উদাসীন থাকতে পারেন না। দিদি আর জামাইবাবুর সাহচর্যে বাবার সেই হিসেবের খাতা যে ক্রমেই পাকা হচ্ছিল—শীলা এসে এমনি ক'রে পাশে না বসলে নিজের ঘরে বসে সেটুকু অনুমান ক'রে নিতে একেবারেই বাধা ছিল।

এতক্ষণে বোধ করি খানিকটা লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারলো শীলা, বললো, 'আচ্ছা, আপনি কী বলুন তো সুমন্তদা?'

—'কেন, জীব জন্তু জানোয়ার কিছু নাকি?'

—'যান, আপনি ঠাট্টাটুকুও বোঝেন না।'

—'কেন, ঠাট্টার আবার কি হ'লো?'

—'হোল নাই বা কি! এখন বুঝি বসে বসে মিষ্টি খাবো?'

আরও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল শীলা, ইতিমধ্যে দু'হাতে দু'টি প্লেটে সন্দেশ আর চমচম্ সাজিয়ে পাচক ঠাকুর পুনরায় এসে ঘরে প্রবেশ করায় কথা থেমে গেল শীলার।

বললাম, 'নাও, হলো, এবারে প্রতিযোগিতায় নামা যাক্। তুমি যদি আমার আগে প্লেট খালি করতে পারো, তবে বুঝবো—আসচে পরীক্ষায় তুমি নিশ্চিত ফার্ষ্ট হবে।'

—'যান, আপনি আর দুষ্টুমি ক'রবেন না। এমনি করলে আর আসবো না আমি।' ব'লে মুখের মধ্যে একটা চমচম্ পুরে নিয়ে ঠোঁটের কোণে হাসি গোপন ক'রে নিল শীলা।

বললাম, 'আচ্ছা, এবার থেকে ঠাকুরকে বলবো তোমার জন্যে নিমপাতার বড়া ভেজে রাখতে। তবু এসো তুমি।'

জবাবে চিরকালই চটপটে শীলা। বললো, 'ও—বুঝতে পেরেছি, বৌদি আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তবে তেতো মানুষ হয়ে যাবো!'

অবাক হয়ে গেলাম কথা শুনে। বলতে গিয়ে একটুও বোধ করি ভাবলো না শীলা—কথাটার পিছনে কতবড় ব্যথা লুকিয়ে আছে! বললাম, 'ছিঃ, তেতো কেন হবে, বৌদি এলে তোমাকে আরও বেশী মিষ্টি লাগবে। মিষ্টি কি কখনও তেতো হয়।'

—'হয় আবার না!' আরও কিছু একটা বলবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল শীলা, অকস্মাৎ ঘড়ির বেল কানে এসে বাজতেই সচকিত হয়ে উঠলো: 'বাব্বাঃ, এরই মধ্যে সাতটা বেজে গেল। বাড়ী গেলে মা আর রক্ষা রাখবেন না।'

বিকেল গড়িয়ে কখন যে সন্ধ্যার আবছায়া নেমে

এসেছিল, টের পাইনি এতক্ষণ। ঘড়ির বেলের শব্দে এবারে তা স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো।

প্লেটের অবশিষ্ট সন্দেশটাকে মুখের মধ্যে পুরে নিয়ে দ্রুত বাইরের পথে পা বাড়ালো শীলা, বললো, 'কিছু মনে ক'রবেন না সুমঙ্গলা, চলি; অদৃষ্টে আজ মার বকুনি আছে।'

ভাবলাম—নিজে গিয়েই এগিয়ে দিয়ে আসি শীলাকে, ব'লে আসি অরুণাংশু দেবীকে—'শীলা এতক্ষণ আমাদের বাড়ীতেই ছিল।' কিন্তু উঠে বাইরে এসে দাঁড়াবার আগেই শীলা বহুদূর এগিয়ে গেছে। সন্ধ্যার ঘনঘনে ধূসর পাণ্ডুরতায় এতটুকুও আর নজরে প'ড়লো না সে।

[ক]

মার রোগটা ইতিমধ্যে আর বাড়েনি। মনটা স্বভাবতঃই কিছু খুশী ছিল। ক'নে পক্ষকে কথা দিয়ে তিনি কথা রাখতে পেরেছেন, একি কম-বড় জয়ের কথা! মনের খুশীর সঙ্গেই রোগের নিরাময়তার সম্পর্ক। ডক্টর চৌধুরীর তাই বলে আসার কামাই নেই; নিয়মিত এসে তিনি নানা স্বস্তিবচন পাঠ করে নতুন প্রেস্‌ক্রিপসন লিখে রেখে যান। হার্টের রোগ, অতএব সবদিকেই আন্তরিক হবার প্রয়োজন, নইলে আবার কিছু-একটা এ্যাটাকের প্রশ্ন। আন্তরিকতার সূত্রেই একসময় তাই বাড়ীর টেইডীতে সানাই বেজে উঠলো। গায়ে হলুদ হ'লো, বিধি হ'লো, শুধু এই পুরুষই নয়, ঘট পেতে চৌদ্দ পুরুষকে আমন্ত্রণ ক'রে তবে ক'নে-বাড়ীতে তত্ত্ব পাঠানো হ'লো। কর্তব্য আর দেশাচারের দিক থেকে কিছুই বাকী রইল না। তারপর এলো ফাল্গুনের ৭ই।

৭ই ফাল্গুন। বসন্তের কোকিল মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে এ-গাছে সে-গাছে। ডিহিরীতে তাই ব'লে শীতের কুহেলী একেবারে কাটেনি। অকস্মাৎ একটা কৃষ্ণচূড়ার শাখা চোখে পড়তেই মনের ভিতরটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠলো; মোচড় দিয়ে উঠলো বুকখানি অপিনার জন্ত। প্রেমের অতিবড় বিশ্বাসের নির্ভরতায় অসঙ্কোচে তার চোখ দু'টি আবার মুখের উপর নিবদ্ধ ক'রে ব'লেছিল: 'আমাদের এই 'আজি'কে চিরন্তন রূপ দিয়ে জীবনকে সার্থক ক'রে তুলবে তুমি, বলো—এই চাঁদকে সাক্ষী করে ব'লো তুমি'। জবাবে নিজেও আমি সেদিন দৃঢ় প্রত্যয়ে ব'লেছিলাম: 'আসলে হৃদয়ে আমরা যদি এক হ'য়ে থাকি, তবে জীবনেই বা এক হ'তে বাধা কি!' কিন্তু সে যে কতখানি বাধা—তার পরিচয় আজকের এই ৭ই ফাল্গুন। কৃষ্ণচূড়ার ঝরা পাতার মতই সেদিনের প্রেম বুঝি আজকের জীবন থেকে ঝ'রে গেছে? কিন্তু সত্যিই কি তাই?

বাড়ী থেকে যাত্রালগ্নে বরযাত্রীদলে আমার বন্ধু-বান্ধবদের কাউকে সঙ্গে আনবার প্রশ্ন তুলেছিলেন বাবা। কিন্তু সে-প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে গেছে, আমার পক্ষ থেকে তাতে কোনো সাড়াই জাগেনি। সাড়া দেবার মতো মনের সুস্থতা নিয়ে ডিহিরীতে রওনা হইনি। অবশেষে বরযাত্রীদলে এলেন বর ছাড়া সর্বসাকুল্যে দু'জন: বাবা আর জামাইবাবু। ক'নে পক্ষকে খুশী ক'রবার জন্ত একা বাবাই অবশ্য যথেষ্ট ছিলেন, জামাইবাবু তাঁর শালা-বউকে তুলে নিয়ে যেতে শ্বশুরের অনুগমন করলেন মাত্র। ক'নে পক্ষের অভ্যর্থনা খুব-যে একটা সুখকর হ'লো তা নয়। এ ক্ষেত্রেও বাবা খুশী হ'লেই হ'লো—এই গোছের একটা মত নিয়ে নিজের মধ্যে সমস্ত আবহাওয়াটাকে যথাশক্তি চেপে যেতেই চেষ্টা ক'রলাম।

একসময় বছর বারো-তেরোর একটি ছেলে এসে সেন্ট লাগানো একখানি উপহারের কাগজ আমার হাতের সামনে এগিয়ে ধ'রে ব'ললো, 'দেখুন আমাদের উপহার!'

হাতে নিয়ে দেখলাম—শিরোনামায় বড় বড় অক্ষরের ছাপা: 'দিদির বিয়েতে ভক্তি-উপহার,' নিচে একগাদা নামের স্বাক্ষর: পিন্টু, মান্ত, ঘোতনা, রাজু, ফড়িং, কানু প্রভৃতি।

থেমে ছেলেটি পুনরায় ব'ললো, 'আপনি বুঝি কারুর সঙ্গে বড়-একটা কথা বলেন না জামাইবাবু?'

ব'ললাম, 'লোক পেলে বলি।' তারপর উপহারের

পৃষ্ঠায় স্বাক্ষরিত নামগুলোর দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ ক'রে জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'এদের ম'ধ্যে তুমি কোন জন ?'

অসঙ্কোচেই ছেলেটি ব'ললো, 'প্রথম দু'জন বাদ দিয়ে।'

ব'ললাম, তুমি বুঝি দিনরাত শুধু পোঁৎ-পোঁৎ করো, নামটা তাই ঘোতনা হ'য়েছে ?'

মুখ টিপে হেসে ঘোতনা ব'ললো, 'ওটা তো আমার ঠাকুরমার দেওয়া ডাক-নাম, ভালো নাম আমার জানকীবল্লভ।'

ব'লতে গিয়ে যুক্তাক্ষরটা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে অদ্ভুত একটা উচ্চারণের সৃষ্টি ক'রলো। স্পষ্ট দেখা গেল—সামনের দিকে নিচের মাড়ীর দু'টো দাঁতই ভাঙা। ঘোতনাকে যদি জানকীবল্লভ করা যায়, তবে নামের উচ্চারণ ক'রতে গিয়েও দাঁত দু'টো ভেঙে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

ব'ললাম, 'রামচন্দ্র, তুমি তবে রামচন্দ্র, বলো ?'

ঘোতনা এবারে উত্তর না ক'রে মাথা নিচু ক'রে নিল। বুঝলাম—লজ্জা পেয়েছে। সেই লজ্জার উপর আরও কিছুটা লজ্জা দেবার জন্যই পুনরায় ব'ললাম, 'তা—জানকীবল্লভ, এমন প্রজাপতি-নির্বন্ধের দিনে তোমাদের সঙ্গে এই ফড়িংটিকে আনলে কোত্থেকে ? এরপরও কি গিরগিটি, ব্যাঙাচি আর বিচুটিরা আছে নাকি ?'

—'নেই আবার, গিয়ে পিঁড়িতে বসুন না, দেখতেই পাবেন।' একদমে কথাটা ব'লে সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্ধান হ'লো ঘোতনা। বিয়ের পিঁড়িতে গিয়ে না বসা পর্যন্ত আর বড় একটা কেউ কাছাকাছি ঘেঁষলো না।

পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করলেন। ক্রমে আসরে এনে শুভশ্রীকে সাতপাক ঘোরাবার পর শুভদৃষ্টি হ'লো তার সঙ্গে। বাধ্য হয়েই লোকাচার রক্ষা ক'রতে হ'লো, নইলে শুভশ্রীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় তো আজকের নতুন নয়! সে দৃষ্টি শুভ ছিল কি অশুভ ছিল—বলা শক্ত, তবে তা'তে কিছু-একটা সংশয়ের কালোমেঘে আচ্ছন্ন ছিল, তাতে ভুল নেই। দেখলাম—চন্দনচর্চিত আননখানি, শুভ্র-ললাটে চন্দনের গাঢ় তিলক, কণ্ঠে দোলায়িত রজনীগন্ধার মালা। নিজের কণ্ঠ থেকে ধীরে ধীরে সেই মালা খুলে নিয়ে আমার গলায় পরিয়ে দিল শুভশ্রী, নিজেও তাকে মাল্যভূষিতা ক'রে আর-একবার তাকালাম তার মুখের দিকে। স্মিতহাস্যে ঠোঁট দু'টি লজ্জায় একবার ঈষৎ কাঁপলো। প্রথমবার সে গাঢ় দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রেই তাকিয়ে ছিল আমার চোখের দিকে, এবারে কিন্তু সে-দৃষ্টি আর মাটি থেকে উর্দ্ধে উঠলো না। বেশ লাগছিল এই মুহূর্তে শুভশ্রীকে দেখতে, সব মেয়েকেই বোধ করি ভালো লাগে এই মুহূর্তে! আজ থেকে স্ত্রীরূপে শুভশ্রীকে গ্রহণ ক'রতে হ'লো; ভালো না লাগলেও ভালোবাসতে হবে তাকে, ভালোবাসার অভিনয় করে যেতে হবে চিরজীবন। গোটা জীবনটাই কাঁকা বেলুনের মতো কৃত্রিমতায় ভরা, কোথাও সে সহজ নয়, স্বাভাবিক নয়, স্বস্থ নয়। এই জীবন নিয়েই আমরা শিক্ষা আর সংস্কৃতির সৌধ গ'ড়ে তুলি, এই জীবন নিয়েই আমরা নানা জীবনের মধ্যে বাসা বেঁধে অমর হ'তে চাই।

বাসর রাত্রির নির্জন মুহূর্তটা এলো কিন্তু অনেক দেরীতে। যত রাজ্যের যত শিস্টু, মান্টু, ঘোতনা, রাঙ্গু ফড়িং আর কানুর দল মধ্যরাত্রি অবধি বাসর জাগিয়ে রেখে তবে উঠলো। ঘুমে তখন শুভশ্রী ঢুলে ঢুলছে। ব'ললাম, 'তোমার ভাইবোনেরা এতক্ষণে যখন দয়া করে উঠলো, তখন আর মিথ্যে কালক্ষেপ না ক'রে এবারে শুয়ে পড়াটাই কি ভালো নয় ?'

মাথার ওপর থেকে ঘোমটা সরিয়ে নিয়ে এতক্ষণে একবার ভালো ক'রে তাকালো আমার মুখের দিকে শুভশ্রী, তারপর উঠে বাতিটাকে নিভিয়ে দিয়ে এসে পাশ ফিরে শুয়ে প'ড়লো।

ব'ললাম, 'ওভাবে শুতে হয়না, হয় এই ভাবে।' ব'লে আমার দিকে ঘুরিয়ে আনলাম শুভশ্রীকে। তারপর একটুকাল থেমে পুনরায় ব'ললাম, 'কথা কইবার জন্যে তো গোটা জীবনটাই প'ড়ে র'য়েছে, আপাতত এক ঘুমে রাতটাকে কাটিয়ে দিতে পারলে বোধ করি মন্দ হয়না।'

অস্ফুটকণ্ঠে এবারে তনুশ্রী ব'ললো,

'আজও তুমি আমাকে আপনি ক'রে

তনুশ্রীর কণ্ঠ এবারে রুদ্ধ।

—'সংসারে স্বামীকে কেউ কখনো আপনি ক'রে

অন্ধকারের মধ্যেই একবার দু'চোখ বিস্ফারিত ক'রে লক্ষ্য ক'রতে চেষ্টা ক'রলাম তনুশ্রীর মুখখানিকে। হ'লো—বাতিটাকে নিভিয়ে দিয়ে একেবারেই বেমানান ঘটিয়েছে তনুশ্রী, নইলে আমার এত বড় একটা প্রশ্নের পর তনুশ্রীর মুখের রংটা একবার দেখতে পেয়ে অনায়াসেই কৌতূহল নিবৃত্ত ক'রতে পারতুম।

স্বল্পক্ষণ নীরবে কাটার পর এবারে তনুশ্রীই প্রশ্ন তুললো 'আমাকে আপনার একটুও মনে ধরেনি, তাই না?'

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'পৃথিবীর ভাষা-সমুদ্রে এত কথা আর শব্দ থাকতেও হঠাৎ এমন প্রশ্নটা ক'রলে কেন তুমি, বলো তো?'

শুনছিলাম কিনা, তাই—।' অসঙ্কোচেই কথাটা উচ্চারণ ক'রলো তনুশ্রী।

একটা স্বাভাবিক বিস্ময়েই মনটা অকস্মাৎ একবার থেমে দাঁড়ালো, জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'কি, কি শুনছিলে বলো?'

—'শুনছিলাম—বিয়ে ক'রতে আপনি রাজি ছিলেন

—'রাজি না থাকা আর তোমাকে মনে না ধরা কি এক হ'লো?'

—'বলুন, আমাকে তবে ভালোবেসেছেন, ভালো লেগেছে তবে আমাকে আপনার?' কথার মধ্যে এতটুকুও জড়তা নেই, এতটুকুও অস্পষ্টতা নেই উচ্চারণে।

অণিমা কিন্তু একটা দিনও এমনি ক'রে প্রেমকে এত সস্তা ক'রে দেয়নি। অন্ধকারের গভীরতায় সারা ঘর-খানিতে যখন আর কিছুই চোখে প'ড়ছিল না, তখন একখানি কমনীয় মুখই শুধু বার বার এসে ঠিকরে প'ড়ছিল আমার চোখের তারা দু'টিতে। অণিমার সেই ললিত শুভ্র চন্দ্রাননে। কেবলই সেই মুখখানি আমাকে আকুল ক'রে তুলছিল। ভাবছিলাম—তনুশ্রীকে ভুল ক'রে কখনও অণিমা ব'লে ডেকে বসবো না তো! তবে যে তনুশ্রীর প্রস্ফুটিত প্রথম রাত্রেই চৈত্রের মধ্যাহ্নের মরুতাপ জেগে উঠবে! ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, আমি কি পাগল?'

তনুশ্রীর কথার জবাবে কিন্তু যথাযথ কিছু-একটাও বলতে পারলুম না। বললাম, 'এই না ঘুমে এতক্ষণ তোমার দু'চোখ ভেঙে আসছিল, সে ঘুম গেল কোথায়? রাত বোধ করি এখন আড়াইটের কম হবে না। সারাদিন উপবাসের পর রাত্রি জাগলে কাল যে অসুখ ক'রবে।'

তনুশ্রী কিন্তু তবু শুনলো না, বললো, 'করুক গে, অসুখকে আমি ভয় করি না। তা ছাড়া ঘুম আমার অনেক আগেই চ'টে গেছে।'

কিছুটা সোহাগের লজ্জাশায় মুখখানিকে এবারে আমার বুকের মধ্যে এনে লুকোলো তনুশ্রী। ভাবলাম—যে বুকে সমস্ত আনন্দ শুকিয়ে একেবারে পাথর হয়ে গেছে, সেখান থেকে বোধ করি স্পন্দনটুকুও অনুভব করতে পারবে না তনুশ্রী! তবু সে কিছুতেই মুখখানিকে সরিয়ে নিল না। বললো, 'আগে আমি যখন কাছে গেছি, নিজেকে কেবল এড়িয়ে নিয়েছেন; আজ আমি কাছে পেয়েছি, এবারে যান তো এড়িয়ে, কেমন পারেন?' ব'লে লতিয়ে দিল তার হাতখানি আমার গলার উপর দিয়ে।

বললাম, 'সংসারে ভুল বুঝে যারা দুঃখ পেতে চায়, চেষ্টা ক'রেও কোনদিন তারা সুখী হ'তে পারে না। যদি এড়িয়েই যাবো, তবে আর এমনি ক'রে নিজে থেকে এসে আজ ধরা দেবো কেন?'

—'দিয়েছেন, সত্যিই দিয়েছেন তবে ধরা?'

—'কেন, বিশ্বাস হয় না?'

—'সংসারে কোনো পুরুষ মানুষকেই কোনোদিন বিশ্বাস করা যায় না।' ব'লতে গিয়ে বোধ করি মুখ টিপে একবার হাসলো তনুশ্রী।

বললাম, 'তা হ'লে সৃষ্টির গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে নর-নারীর যা কিছু সম্পর্ক, তা শুধু অবিশ্বাসের উপরেই গড়ে উঠেছে?'

—'জানি না, যান।' ব'লে একবার থামলো তনুশ্রী, তারপর একটুকাল বাদে নরম কণ্ঠে প্রশ্ন তুললো, 'রাগ করলেন?'

বললাম,

—'কেন?' মুখখানি এবারে কাছ আমার মুখের কাছেই নিয়ে এলো তনুশ্রী।

বললাম, 'আপনি শব্দটাকে তুমি তুলতে পারছো না ব'লে।'

—'তুলবো।' থেমে তনুশ্রী বললো, 'আমাদের ফুল-শয্যার দিন থেকে আর ব'লবো না।'

—'বেশ, তাই বোলো না।'

তনুশ্রীর ওষ্ঠাধরে একটি চুম্বন ক'রলে বোধ করি এই মুহূর্তে তার আর আনন্দের অন্ত থাকতো না, হয়তো প্রত্যাশাও করেছিল একটি চুম্বন, কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'তে পারলুম না সেই অধরে চুম্বন ক'রতে। যে মুখের সমস্তটুকু ভাগ একবার অনিমাকে দিয়েছি, সে কি আর কাউকে দেওয়া যায়? সমাজের মানুষ আজ তাকে হয়ত পরকীয়ার ধুয়ো তুলে পাপ ব'লে আখ্যায়িত ক'রবে, কিন্তু এককালে যা সত্য ছিল, আর-এককালে তা যে একেবারেই মিথ্যে হ'য়ে যাবে, এমন কিছুও কি কথা আছে? প্রথম বাসর রাত্রে নববধূকে চুম্বন করবার স্পৃহা যদি আমার না জাগে তো কী ক'রতে পারি আমি?

একসময় তনুশ্রী বললো, 'কেমন লাগলো আমাদের বাড়ীটাকে কিছু বললেন না তো?'

এসে অবধি গোড়া থেকেই যে এ বাড়ীর এই পরিবেশের সঙ্গে নিজের রুচিকে মেলাতে পারিনি, সে-কথাটা চেষ্টা ক'রেও নির্লজ্জের মতো বলতে পারলুম না তনুশ্রীকে। অন্য কথার অবতারণা ক'রে তাই পাল্টা প্রশ্ন ক'রলাম, 'ঘটা করে যারা তাদের দিদির বিয়েতে উপহার ছেপে বিলি ক'রেছে, তারা তোমার কে কিরকম ভাই বোন?'

উপহারের পর পর সাজানো নামগুলো তনুশ্রীর মুখস্থই ছিল। বললো, 'পিন্টু আর বান্টু হচ্ছে পিসতুতো ভাই-বোন, খোকন আর রাজু হ'লো দুতোতো ভাই, ফডিং আর কানু হ'লো মামাতো ভাই। ফডিংটা হচ্ছে সব চাইতে বেশী বজ্জাত। মামা ওকে পাঁচ বছরের রেখে মারা যান, অল্প বয়সেই বজ্জ পেকে গেছে ফডিং।'

বললাম, 'ফডিংগুলো একটু ডাঁটো থাকতেই মজে। তা—দেখতে পাচ্ছি আত্মীয় স্বজন তোমাদের কম নেই।'

—'তা সত্যি।' তনুশ্রী বললো, 'বিয়েতে যারা এসেছে তাদের মধ্যে অনেকেই প্রণম্য। প্রণাম করতে করতে কিন্তু ঘাড় ব্যথা হ'য়ে যাবে।'

বললাম, 'প্রণাম টণাম আমার বড় বেশী আসে না। যাকে শ্রদ্ধা ক'রতে শিখিনি, তাঁর পায়ে হাত দিতে স্বভাবতঃই আমি কুণ্ঠিত হই।'

তনুশ্রী বললো, 'ছিঃ, অমনি করলে মার অপমানের শেষ থাকবে না।'

বললাম, 'আমার হ'য়ে প্রণামগুলো তুমিই সেরো, তবে তোমার মার মান রোল আনাই বজায় থাকবে।'

—'এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হবে! বাড়ী শুদ্ধো সবাই দুঃখিত হবে এই নিয়ে।' ব'লে আমার গায়ের উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে নিলো তনুশ্রী।

বললাম, 'দুঃখ করলেও যে আমার কিছু ক'রবার নেই। যার-তার পায়ে হাত দিতে আমার রুচিতে বাধে।'

তনুশ্রীর কণ্ঠ কিন্তু এবারে দৃঢ় হ'লো। বললো, 'যেখানে আমার মা বাবার অপমান—সেখানে ব্যক্তিগত

রুচির পরিচয়টা না দিলেই কি চলবে না ?'

মনে বিরক্ত হ'লেও নিজের কণ্ঠকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক ক'রেই বললাম, 'আজকের এই রাত থেকে তোমার জীবনে আমার চাইতে বেশী আপন বোধ করি তোমার বাবাও ন'ন্। আমার রুচি যদি তোমার রুচিকে স্পর্শ না করে, তবে বুঝতে হবে—আমাদের শুধু বিয়েই হয়েছে, স্বামী-স্ত্রী হ'তে আমরা পারি নি।'

এ কথায় তনুশ্রী কি বুঝলো জানি না, কিন্তু একটি কথাও আর বললো না। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে এবারে সে পাশ ফিরে শুলো। রাত্রি প্রভাত হ'তেও আর বিশেষ বাকী ছিল না। জানালার ফাঁক দিয়ে উষালগ্নের একটা প্রচ্ছন্ন আভাস স্পষ্টই অনুভব করা যাচ্ছিল। প্রভাতের জানান দিয়ে গাছের ডালে ডালে পাখীগুলি একবার কিচির মিচির ক'রে উঠলো। এবারে আর ইচ্ছে ক'রেই তনুশ্রীকে ডেকে পাশ ফিরে শুতে বললাম না। শেষ পর্যন্ত তার ক্ষোভের একাশটা যত নীরবে ঘটলো, ঠিক ততখানি নীরবেই কিন্তু আমার কাছে ধরা দিল না। মনোবিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে সাইকোলজির এ অধ্যায়টা যে একেবারেই কিছু নয়, সেটুকুও কি ব'লে দিতে হবে তনুশ্রীকে ? অন্ধকারেই আর একবার চোখ মেলে তাকালাম : দেখা যায় কি অপিমার মুখখানিকে ? কিন্তু অন্ধকারের কালিমায় সেই ললিতগুপ্ত চন্দ্রাননের দর্শন আর একটিবারও মিললো না। অন্ধকারটাই কেবল বার বার মাকড়সার জালের মতো চোখের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

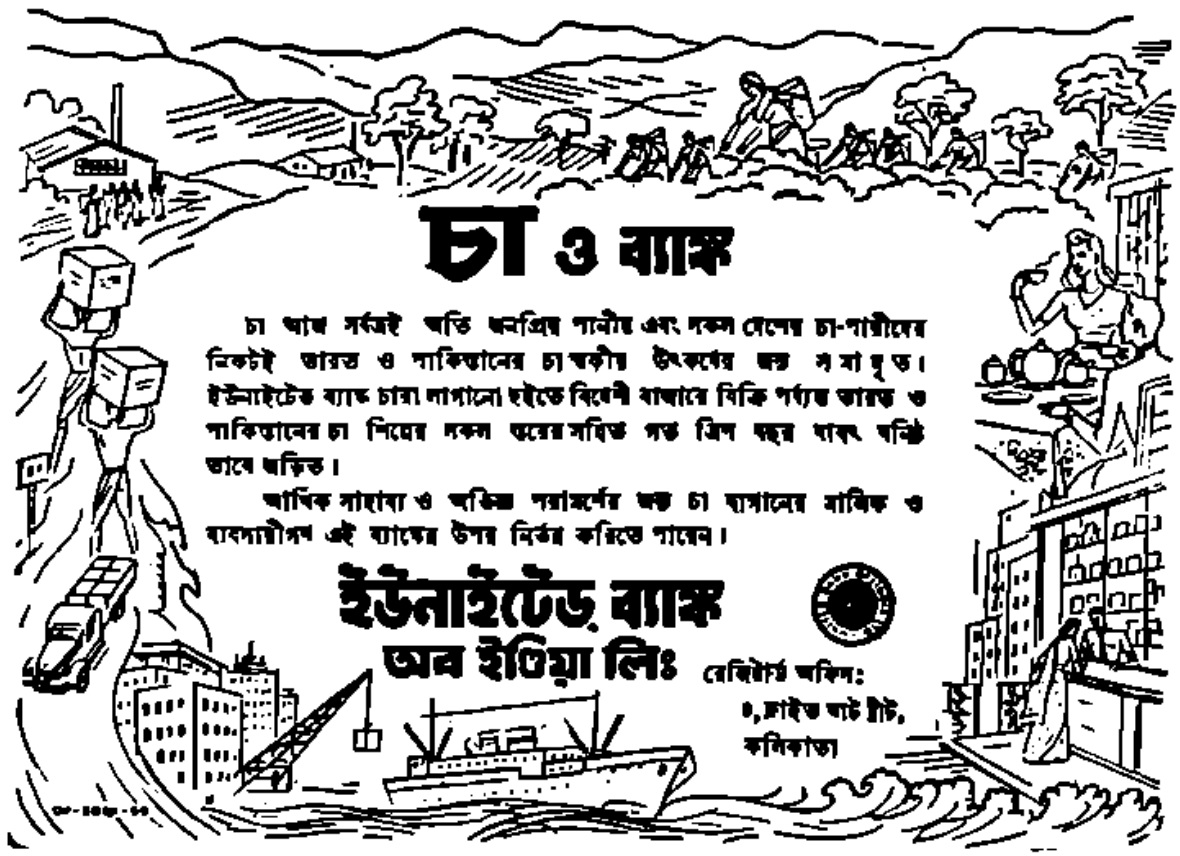

কী বই পড়ি নি

সরোজ আচার্য

অবশেষে রোমন্থন। অথবা স্মৃতির অতলে অবগাহন। ঋষিবাক্য হল, শব্দশাস্ত্র অনন্তপার, অথচ আয়ু স্বল্প এবং শাস্ত্রচর্চায় অর্থাৎ আমাদের যুগের ভাষায় বলতে গেলে বই-এর পড়ায় বিঘ্ন বহু। অতএব বিজ্ঞজনের উচিত সারবস্তু সংগ্রহ করা, জলীয় অংশ বাদ দিয়ে জ্ঞান ভাণ্ডারের ক্ষীর আত্মসাৎ করা। উপদেশ সহজ, মুনি ঋষিদের যুগে এই উপদেশ মেনে চলা সম্ভবতঃ খুব কঠিন ছিল না। কারণ তাঁরা ছিলেন স্মৃতিধর ও শ্রুতিধর। ছাপাখানা, দৈনিক কাগজ, মাসিক সাপ্তাহিকের উত্তাল তরঙ্গে আশ্রম, রাজসভা ও বিদ্যাপীঠ ভেসে যাবার আশঙ্কা কখনও ঘটেনি। সক্রেটিস অথবা প্লেটোর সঙ্গে কিছুদিন আলাপচারী করলেই অনন্তপার শাস্ত্র-সমুদ্রে কূল পাওয়া যেত বোধ হয়। আরিষ্টটল মহামনীষী ছিলেন সন্দেহ নাই। তবে মনে হয় না যে, আমাদের যুগে জন্মালে তিনি সর্বশাস্ত্র বিশারদ হতে পারতেন। মহাজ্ঞানী নিউটনের আক্ষেপ নিতান্ত বিনয়ের পরিচয় নয়। সত্যিই সত্যতা যতই এগিয়ে চলেছে পুঁথিপত্রের বৈচিত্র্য এবং বাহারে ততই আমরা দিশাহারা হয়ে পড়ছি। তার উপরে পৃথিবী একাত্মা না হলেও একাকার—ঘরে ও বাইরে এত বই, এত রকমারি বই ও লেখকের আনাগোনা এখন যে, ঋষিদের উপদেশ মত সার সংগ্রহও কোনো একজন মানুষের একটা জীবনের কাজ নয়।

সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং দর্শন এই ক'টি বিষয়ের সঙ্গে মোটামুটি পরিচয় না রেখে উপায় নেই। সেও সহজ ব্যাপার নয়। বাংলা ও ইংরেজীর মধ্যস্থতায় এই ক'টি বিষয়ের বই আমরা পড়ি এবং পড়বার চেষ্টা করি। কত পড়েছি, কী পড়ি এবং এখনও পড়বার আশা করি তার হিসেব কেউ দেবার চেষ্টা করবেন না। সেইটাই সুবুদ্ধির কাজ হবে, এবং শোভনও। কি কি বই পড়িনি, পড়ে উঠতে পারিনি, অথবা চেষ্টা করেও পড়বার উৎসাহ পাই নি তা নিয়ে স্মৃতি মন্থন করলে বেশ অদ্ভুত একটা আনন্দ পাওয়া যায় বোধ হয়। নিজের অনুরাগ বিরাগ, অজ্ঞতা ও অন্ধতা এবং অক্ষমতার হিসেব নিকেশ করার ক্ষতি নেই, লাভ কিছু আছে। তবে কী বই এবং কোন্ বই পড়িনি তার গোপন কাহিনী বলায় কোনো গৌরব নেই। নানা জনের নানা রুচি এই আপ্তবাক্য উল্লেখ করে আত্মপক্ষ সমর্থন করা যায় হয়ত, তবু ত্রুটি রয়ে যায়। জীবিত ও মৃত বহুজনের প্রিয় লেখক যাঁরা তাঁদের কারো কারো উপরে অবজ্ঞা প্রকাশের অপরাধে অপরাধী গণ্য হওয়ার আশঙ্কা আছে। তবে সে আশঙ্কা যুক্তিসঙ্গত নয়। যাঁরা ভালো লেখক অতীতের ও বর্তমানের, আমি পড়িনি বলাতে তাঁদের খ্যাতি এবং ক্ষমতা একটুও হীন হবে না। পরীক্ষা এবং পেশার দাবীর কথা বাদ দিলে বই পড়া না পড়া সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা নিরঙ্কুশ। কাজেই কী বই পড়িনি সে বিষয়ে প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বীকারোক্তি স্বচ্ছন্দে করতে পারেন।

স্ব-নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ গল্প, শ্রেষ্ঠ গল্প, দেশ বিদেশের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ এবং রম্যরচনার বিরাট এবং বিচিত্র প্রদর্শনী আমরা ঘুরে ফিরে বারে বারে দেখে থাকি। স্ব-নির্বাচিত অপঠিত—পাঠযোগ্য এবং অপাঠ্য—বইএর তালিকার কথা শোনা যায় নি। তার কারণ এই তালিকা তৈয়ারী করা অসম্ভব প্রায়। আর পাঁচ জনে যা পড়েছে এবং পড়ে থাকে তার দিকে নজর রেখে মোটামুটি বলা যায় হয়ত কী বই পড়িনি। রবীন্দ্রনাথ যে ভদ্রলোকের কথা

বর্ণনা করে গেছেন তাঁর কথা স্মরণ করে সাহস পাওয়া যায়। ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথের নাম ধাম পরিচয় জেনে বলেছিলেন তিনি অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা পড়েননি, তবে বাড়ীর মেয়েরা পড়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ পড়েননি অথবা নিতান্ত অবজ্ঞাভরে সামান্য দু-একটা লেখা তাঁর পড়েছেন, এরকম ভদ্রলোক উচ্চ শিক্ষিত মহলে ত্রিশ বৎসর আগে দেখেছি। এই রকম অন্ততঃ একজনকে জানি, তিনি আমাদের অধ্যাপনা করতে এসে রোজ একবার করে মনে করিয়ে দিতেন, মাইকেলের পরে বাংলায় আর কোনো কবি জন্মায় নি। আধুনিক বাংলা কবিতা যাঁরা পড়েন না এবং পড়েননি তাঁদের ধারণা প্রায় ঐ রকম—রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কাব্যে লক্ষ্মীর চির বিদায় ঘটেছে। যা হোক এ হল অন্য কথা।

কী বই পড়িনি নিয়ে কথা হচ্ছিল। প্রশ্নটা অনেক দিন আগে একবার কয়েকজন ইংরেজ সাহিত্য রসিককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তাঁরা যে রকম সরল স্বীকারোক্তি করেছিলেন তাতে আমাদের উৎসাহিত হবার কথা। আলডুস্ হাক্সলী বলেছিলেন, তিনি গোল্ড স্মিথের "ভিকার অফ্ ওয়েকফীল্ড," হুগোর "লে মিসেরাবল্স্" পড়েননি, জর্জ মেরেডিথের বেশীর ভাগ উপন্যাসেরই ১০০ পাতার উপরে তিনি পড়তে পারেন নি। রবার্ট লিণ্ড গিবনের বিখ্যাত "রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস" পড়েননি। হ্যামিল্টন রাইফ স্পেন্সরের "ফেয়ারী কুইন শুধু পড়েননি তা নয়, তাঁর মতে ও বই অপাঠ্য। "ক্লাসিক্স" সম্বন্ধে অনুরাগ বিরাগ প্রায়ই এই রকম মাত্রা ছাড়িয়ে যায় অনেকেরই।

বিজ্ঞাপনের ভাষায় যাকে বলা হয় "অমর গ্রন্থরাজি" তার অমরত্ব আমাদের সকলের পড়া না-পড়ার উপরে নির্ভর করে না। কাজেই ভক্তিভরে ভয়ে ভয়ে বলতে হয় অনেক "অমর" গ্রন্থই পড়িনি, অথবা পড়বার চেষ্টা করে হার মেনেছি। এবিষয়ে অজ্ঞতা অক্ষমতা এবং উদাসীনতার এলাকা জরীপ করার চেষ্টাও বিড়ম্বনা। যে সব "অমর" গ্রন্থের দু-এক কালি স্কুল কলেজে আমাদের অবশ্য পাঠ্য ছিল তাদের সঙ্গে দ্বিতীয়বার নিজের খুসীমত পরিচয় করতে উৎসাহ হয়নি। ঐ কারণে মাইকেলের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের একসর্গ মাত্র শুদ্ধের মত গিলবার পরে মাইকেলকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিদায় নমস্কার জানাতে হয়েছে। এই না-পড়ার সংবরে দ্বিতীয় বিখ্যাত বিস্মৃতি হল মিল্টনকে নিয়ে। "প্যারাডাইস লষ্ট" অমর গ্রন্থ, একথা জেনেই আনন্দ, কিন্তু তার বহু সর্গের সিঁড়ি ভাঙতে কজন সাহস করতে পারেন? স্কুল কলেজে পাঠ্য হলেও একমাত্র শেক্সপীয়র ও রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় উৎরে গেছেন খাঁটি অমরত্বে—বোধ হয় তাঁরা নিজেরাই স্কুল কলেজে পলাতক ছিলেন বলে এটা সম্ভব হয়েছে। পরীক্ষার জাঁতাকলে একবার যে সব অমর লেখক ও লেখা পেষাই হয়েছে তাদের সঙ্গেই আমাদের অপরিচয় সবচেয়ে বেশী। এইজন্য সুইফ্‌টের "গালিভার্স ট্রাভল্‌স" ও সার্ভান্টিসের "ডন কুইক্সট্" আমাদের জানা বই হলেও একেবারে না-পড়ার সামিল। সুইফ্‌ট এবং সার্ভান্টিসের ক্ষুরধার ব্যঙ্গ এবং গভীর জীবনদর্শন সব ঘুরে মুছে আমরা পেয়েছি শুধু আজগুবী রূপকথা।

কবিতা উপন্যাস এবং গল্পে আমাদের সকলেরই আসক্তি অল্পবিস্তর প্রবল। তবে দেশী বিদেশী প্রাচীন ও নবীন লেখক মিলিয়ে সাহিত্যের এই তিন বিভাগের ঐশ্বর্য অফুরন্ত। কাজেই নিজের পছন্দমত কবিতা, উপন্যাস এবং গল্প সব পড়তে পারা কারো পক্ষেই বোধ হয় সম্ভব নয়। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ সব পড়েছি দাবী করাও দুঃসাহসের ব্যাপার এবং প্রায় অবিশ্বাস্য। শেক্সপীয়র, কালিদাস, শরৎচন্দ্র এদিক দিয়ে সহজ আয়ত্তের মধ্যে; গ্যেটে, হুগো, বার্নার্ড শ নয়। লজ্জার কথা হলেও স্বীকার করতে হবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য পড়ার রেওয়াজ বিশেষজ্ঞ এবং পরীক্ষার্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিদ্যাসুন্দর এবং বিদ্যাপতি একাকার ধারণা করার মূঢ়তা কাটাতে বয়সের চল্লিশের কোঠা পার হতে হয়েছিল। তবে অন্নদামঙ্গলের লেখকই বিদ্যাসুন্দরের রচয়িতা জেনে খুশী হওয়া যায়নি।

সাহিত্যের আড়ালঠনে কলমল খোলা আসর থেকে বেরিয়ে আশে পাশে নজর দিলে দেখা যাবে আমাদের অজ্ঞতার অন্ধকার কী ভয়ানক নিশ্ছিদ্র প্রায়। বাংলা সাহিত্যের প্রবন্ধসম্ভার হয়ত খুব বেশী নয়। তবু যা আছে তার অনেক কিছুই আমাদের "কী পড়িনি"র এলাকায় অন্ধকারে: অক্ষয় দত্ত, রামেন্দ্র সুন্দর, ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—কয়েকজনের দৃষ্টান্ত দিলেই আমাদের অনেকের অজ্ঞতা অথবা উদাসীনতার পরিমাণ অনুমান করা যায়।

কিন্তু তা নয়, পাঠক সাধারণের কর্তব্য এবং কর্তব্যচ্যুতি নিয়ে আলোচনা করার আমার সরঞ্জ নেই। তার কারণ আমার ভূমিকা অনুতপ্ত অপরাধীর নয়। অনেক ধর্মগ্রন্থ পড়িনি, পড়তে পারিনি এটা হয়ত অপরাধই। তবে রবীন্দ্রনাথ পড়া মানেই ভারতের ধর্মসাধনার শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এ ছাড়া "পরম-পুরুষীয়" প্রচারের অপেক্ষা না করেই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালী বুদ্ধিজীবী ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিল। ইংরেজীর কল্যাণে এবং টলষ্টয় ও গান্ধীজীর প্রভাবে বাইবেল অনেকেই পড়েছেন অথবা না পড়েও খ্রীষ্টিয় ভাবধারার পরিচয় পেয়েছেন। অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদির চর্চা বাংলায় খুবই কম, হয়ত সম্প্রতি এর অনুশীলনে উৎসাহ বাড়ছে।

ডিটেক্‌টিভ গল্প উপন্যাস পড়িনি এবং সেজন্য অনুতপ্ত নই, এরকম কথা কেউ কেউ বলতে পারেন। তাঁদের সংখ্যা খুব বেশী না হলেও মন্দাদ্য তাঁরাই ভারী। আমার পরিচিত অন্ততঃ একজনকে জানি যিনি রোজ একখানি (ইংরেজী) ডিটেক্‌টিভ নভেল পড়েন। তাঁর অবশ্য অন্য নানা ধরনের বইএর উপর অনুরাগ কম নয়।

সম্প্রতি বন্ধুবরেণ্য প্যাটেল নাকি ১৯৪২ সনে আহমদ-নগর জেলে বন্দী থাকার সময় কখনও গীতা পড়েননি। তাঁর মত দুর্লভ ব্যক্তির পক্ষেও আমাদের দেশে এই রকম সগর্ব স্বীকারোক্তি দুঃসাহসিক মনে হয়। কথায় আছে, লোক চেনা যায় তার সঙ্গীদের দেখে। আমরা কি বই পড়ি এবং কি বই পড়ি না তা দিয়ে কি আমাদের মনোভাব জানা যায়, চরিত্র চেনা যায়? হয়ত যা সেজন্য কি বই পড়েছি এবং কি বই পড়িনি তা আমরা কেউ-ই ছলফ করে স্বীকার করতে রাজী হব না, তবে হয় অন্ততঃ ক্ষেত্র বিশেষে আমরা সত্য গোপন করতে চেষ্টা করব। বিদগ্ধজনমণ্ডলীতে বসবার সৌভাগ্য যদি ঘটে তবে সেখানে নিশ্চয়ই স্বীকার করব না যে শৈলেন্দ্রকুমার রায়ের "রহস্য লহরী সিরিজ" সবই পড়েছি, পড়িনি "গীতার ভূমিকা"। কি পড়েছি বলতে যাওয়ার অনর্থের সম্ভাবনা, কি পড়িনি স্বীকার করাতেও তাই। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা নিশ্চই স্মরণ রাখবেন, স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী ভেবে চিন্তে বলতে হবে কি বই পড়ি নি আর কি বই পড়েছি। কারণ বিষ্ণুশর্মার উপদেশ, "অক্ষরাণ্যরবৎ প্রাজ্ঞঃ বিস্রাব্যর্থক চিন্তয়েৎ"।

শক্তিউপাসক জার্মাণ দার্শনিক নীট্‌শে

শ্রীহরিপদ ঘোষাল, এম. এ. বিদ্যাবিনোদ

ডারউইন বলেছিলেন, দুনিয়াতে দুর্বলের স্থান নাই। যোগ্যতম প্রাণীই শ্রেষ্ঠত্বে উন্নীত হয়, দুর্বল পশ্চাতে পড়ে থাকে কোথা থেকে এবং কি ভাবে প্রাণশক্তি পৃথিবীতে প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল তা জানা না থাকলেও যুগ যুগ ধরে সূক্ষ্ম জীবাণু পরিবেশের সঙ্গে যে নিজেকে খাপ খাইয়ে জীবনের পথে অভিযান শুরু করেছিল এবং অবশেষে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জীব মানুষে পরিণতি লাভ করেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। একদিকে যেমন দেহের পরিবর্তন ঘটেছিল, অন্যদিকে তেমনি মন ও বুদ্ধির উন্নতি হয়েছিল। মানুষ আজ বুদ্ধিবলে প্রকৃতি জয় করেছে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ধ্বংস করার শ্রেষ্ঠ মারণ-অস্ত্র আবিষ্কার করেছে। আজিকার উন্নত মস্তিষ্ক এবং অভিজ্ঞ চিন্তাশক্তির অধিকারী মানুষই অন্ধতম অতীতের ক্ষুদ্রতম জীবাণুর দূরতম বংশধর।

নীট্‌শে বলেছেন ডারউইনের সিদ্ধান্তের ফলে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জীবন যদি সংগ্রাম হয় এবং সেই সংগ্রামে যদি যোগ্যতমেরই উদ্ভব হয়, তাহলে বলতে হয় যে শক্তিই শ্রেষ্ঠত্ব এবং দুর্বলতাই একমাত্র পাপ। সুতরাং শক্তিশালী জীবই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হয় ও টেকে এবং দুর্বল জীব পরাজিত হয় ও মৃত্যুবরণ করে।

ডারউইন ও তাঁর অনুসারিগণ খৃষ্টান নীতিতত্ত্বের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু বিনয়, দয়া, মানবতা প্রভৃতি খৃষ্টান ধর্মের গুণগুলিকে ত্যাগ করার মত সাহস তাঁদের ছিল না। তাঁরা খৃষ্টান ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্গত না হলেও খৃষ্টান ছিলেন। তাঁরা খৃষ্টান ধর্মানুমোদিত-নীতি-শাস্ত্রের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন কিন্তু তার উপর হস্তক্ষেপ করেন নি। বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রই জানেন, যাকে আমরা জীবন-সংগ্রাম বলি, তাতে জয়ী হতে হলে কোমলতার চেয়ে কঠোরতার, বিনয়ের চেয়ে গর্বের, মানবতার চেয়ে স্বার্থ-বোধের প্রয়োজনীয়তা আছে। সাম্য ও গণতন্ত্র, প্রাকৃতিক নির্বাচন ও উদ্বর্তনের পরিপন্থী। ক্রমবিকাশের চরম অভিব্যক্তি জনগণ নয়, মহামানব সৃষ্টি। সমস্ত বিভেদ দূর করে ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করার একমাত্র উপায় শক্তি, ন্যায়বুদ্ধি নয়।

বিসমার্ক ছিলেন শক্তিউপাসক নীট্‌শের আদর্শ পুরুষ। তিনি স্পষ্ট ভাষায় দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করেছিলেন যে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে মানবতার স্থান নাই। রক্ত ও তলোয়ার ছাড়া ভোট ও আলাময়ী বক্তৃতা বর্তমান কালের জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে না। কল্পনা-বিলাসী ইয়োরোপের, গণতান্ত্রিক আদর্শে মোহাচ্ছন্ন ইয়োরোপের পুথিপড়ুয়ার রাজনৈতিক আকাশ কটিকাধর্মী বিসমার্কের আবির্ভাবে পরিষ্কৃত ও নির্মল হয়েছিল। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই মৃতকল্প অষ্ট্রীয়া তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল, আর কয়েক মাসের মধ্যেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী নেপোলিয়নের ব্যক্তিত্বে বিপ্লবী ফ্রান্সের গর্বোন্নত শির ধুলোয় লুটিয়ে পড়েছিল। বিসমার্কের প্রতিভার মায়া-কাঠিস্পর্শে কয়েক মাসের মধ্যেই শতধা বিচ্ছিন্ন জার্মানীর অসংখ্য জমিদার, রাজা ও মহারাজাদের ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড রাজ্যগুলি একটা বিরাট অখণ্ড শক্তিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। নবগঠিত জার্মানীর ক্রমবর্ধমান সামরিক ও শিল্পশক্তির একটি প্রতীকের প্রয়োজন ছিল এবং বিসমার্কের ব্যক্তিত্বে সেই প্রতীক মূর্তিমান হয়ে উঠেছিল। খৃষ্টান ধর্ম পাশবিক বলের নিন্দা করে কিন্তু ডারউইনের মতবাদে তার সমর্থন আছে। সাহস ও আত্মবিশ্বাস অসাধ্যসাধন করে। নীট্‌শে এই যুগের শক্তি সাধনার উদ্গাতা হয়ে উঠলেন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর নীট্‌শে প্রুশিয়ার রকেন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। এই দিনেই প্রুশিয়ার রাজার জন্ম হয়েছিল। এজন্য রাজার নামানুসারে নীট্‌শের নাম রাখা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, এই দিন সমস্ত রাজ্যে আমার জন্মদিন পালন করা হয়।

পাড়ার যে সকল দুষ্ট বালক পাখির ছানা চুরি করত ফলের বাগান লুঠ করত, সৈনিকের অভিনয় করত এবং মিথ্যা কথা বলত, তিনি তাদের পছন্দ করতেন না। শৈশবে নির্জন স্থানে তিনি বাইবেল পড়তেন এবং এমন ভক্তিরসসহিত অপরকে শোনাতেন যে তাতে তার মর্মস্পর্শ করত। আঠারো বৎসর বয়সে তাঁর সন্দেহশীল মন ভগবানের স্থানে মহামানবকে বসিয়ে দিল।

তাঁর জীবনে হঠাৎ এক পরিবর্তন ঘটে গেল। তিনি বন্ এবং লিপ্‌জিগে কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গে ইন্দ্রিয় লালসায় গা ভাসিয়ে দিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁর মোহ কেটে গেল। তিনি মদ্য নারী ও ধূমপান ত্যাগ করলেন। সোপেনহাউরের দর্শন তাঁর মনের উপর গভীর রেখাপাত করেছিল কিন্তু যখন তিনি সোপেনহাউরের দুঃখবাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন, তখন বিয়োগান্ত নাটককে আনন্দের বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে আত্ম প্রবঞ্চনা করেছিলেন। একমাত্র স্পাইনোজা বা গ্যেটের দর্শন তাঁকে সোপেনহাউরের প্রভাব থেকে রক্ষা করতে পারত কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেন নি। তাঁর প্রকৃতিতে প্রজ্ঞা ও ধৈর্যের স্থান ছিল না।

তেইশ বৎসর বয়সে তিনি সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করতে বাধ্য হলেন কিন্তু অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পতনের ফলে তাঁর বুকের শিরা তখন হয়ে গেল। তিনি সৈনিকের কার্য ত্যাগ করলেন কিন্তু সৈনিকের কঠোর জীবন,আজ্ঞানুবর্তিতা এবং সহনশীলতা তাঁর মনে সৈনিকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা উদ্রেক করেছিল।

সামরিক জীবন ত্যাগ করার পর তাঁর অধ্যাপনার জীবন আরম্ভ হয়। ভাষাতত্ত্বে উচ্চতম উপাধি নিয়ে তিনি বেসেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। শিক্ষকের বীরত্বরহিত শান্ত জীবন তাঁর ভালো লাগে নাই! এর চেয়ে চিকিৎসকের কর্মময় জীবন শ্রেয় বলে তাঁর মনে হয়েছিল। এই সময় তাঁর মন সঙ্গীতের দিকে আকৃষ্ট হল। তিনি পিয়ানো বাজাতে শিক্ষা করলেন এবং কয়েকটি স্বরলিপিও রচনা করলেন। তিনি বলেছিলেন, সঙ্গীতহীন জীবন একটা বিড়ম্বনা মাত্র।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বরশিল্পী রিচার্ড ওয়াগনারের আমন্ত্রণে তাঁর নিকট কিছুকাল অবস্থান করেন এবং তাঁর প্রথম রচনায় ওয়াগনারকে আধুনিক যুগের ইস্কিলাস বলে প্রচার করেন। কাব্য, নাটক, দর্শন ও সঙ্গীতের মোহ কাটিয়ে তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন কিন্তু দুষ্টশক্তির দোষের জন্য তিনি রোগীর পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ করলেন। যুদ্ধে রক্তপাতের ভয়াবহ দৃশ্য তাঁর সহ্য হল না। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে স্বগৃহে প্রেরণ করা হল।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁর "সঙ্গীতে বিয়োগান্ত নাটকের জন্ম" নামক পুস্তক প্রকাশিত হল। এতে তিনি বলেছেন, গ্রীক শিল্পী দুইটি দেবতার পূজা করতেন। প্রথম যুগের দেবতা ডাইনোসিয়াস্ ছিলেন মদ্য ও আমোদ-প্রমোদের দেবতা। তিনি ছিলেন উচ্ছল জীবনের, আনন্দময় কর্মের, ভাবাবেগ ও দুঃসাহস ও দুঃখভোগের দেবতা,—সঙ্গীত, সুরা, মৃত্যু ও নাটকের অধিষ্ঠাতা। পরবর্তী যুগের দেবতা আপোলো ছিলেন শান্তি, অবসর, সৌন্দর্যানুভূতি, চিন্তা, ছায়ানুগ সামঞ্জস্য ও ধৈর্যের দেবতা—চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য ও মহাকাব্যের দেবতা। ডাইনোসিয়াসের চঞ্চল পুরুষোচিত শক্তির সঙ্গে আপোলোর নারীসুলভ সৌন্দর্যের মিলনে গ্রীক শিল্পের চরম বিকাশ হয়েছিল।

শিল্পকলা সাহায্যে দুঃখ ও নৈরাশ্য জয় করাই ছিল গ্রীক নাটকের অন্তর্নীন উদ্দেশ্য। প্রাচীন কালের গ্রীকগণ জীবনকে দুঃখময় বলে জানত এবং এর শোচনীয় অসারতা তারা গভীরভাবে উপলব্ধি করত। 'কোন অবস্থা মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ?' মিডাসের এই প্রশ্নের উত্তরে সাইলিনুস বলেছিলেন, দুঃখ ও দুর্ঘটনায় জর্জরিত মানুষের ক্ষণস্থায়ী

জীবনের কথা শুনতে চাও কেন? শুনতে না চাইলেই ভাল হত। একেবারে না জন্মিতে পারাই শ্রেষ্ঠ অবস্থা। কিন্তু তা তো হয় না। অল্প বয়সে মরে যাওয়াই শ্রেষ্ঠতর অবস্থা।

প্রাচীন কালের গ্রীকগণ জানত যে জীবন দুঃখময়। এজন্য তারা নাটাশিল্পের আনন্দ বা সৌন্দর্য সৃষ্টি করে জীবন ও পৃথিবীকে সহনীয় করে তুলেছিল। শক্তিমান দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করে এবং সংগ্রামই যে জীবন তা উপলব্ধি করে আনন্দ পায়। কিন্তু গ্রীকগণ দুঃখবাদী ছিল না। গ্রীক ট্র্যাজিডি এর প্রমাণ। এই মনোবৃত্তিতেই ইস্কিলাসের ট্র্যাজেডি এবং প্রাক্-সক্রেটিক দর্শনের জন্ম। এজন্য সে যুগ ছিল গ্রীসের গৌরবময় যুগ। যৌবনে তিনি প্রকৃতিকে জীবন্ত দেখে এবং কাব্য রচনা করে। বার্ধক্যে দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্র লেখে। যৌবনে গ্রীস হোমর ইস্কিলাসের জন্ম দিয়েছিল এবং বার্ধক্যে নৈয়ায়িক ইউরিপিডিস্ নাট্যকার হয়েছিলেন।

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কঠিন রোগের কবল থেকে মুক্তিলাভ করার পর নীট্‌শের জীবন উপভোগের অনুভূতি প্রবল হল। তিনি নিজেকে গভীরভাবে চিনতে পারলেন। তিনি বোঝলেন, আমরা যাকে দুঃখ-কষ্ট বলি তার ভিতরেও সুখ আছে, আনন্দ আছে। স্বাস্থ্য, আলো, হাসি, নৃত্য এবং আমোদের জন্য তিনি উন্মুখ হয়ে উঠলেন। বাস্তব-জীবনের স্বাভাবিক সংকীর্ণতা ও অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তিনি একে নিয়তির অমোঘ নিয়ম ভেবে গভীর আত্মোপলব্ধি করলেন। দুঃখকে নিছক দুঃখ হিসাবে গ্রহণ করলে আমাদের উপলব্ধি অসম্পূর্ণ হয়। দুঃখের ভিতর সুখ আছে বলেই জীবন উপভোগ্য হয়।

পর্বতের উপর নির্জন স্থানে তপোময় জারাথুষ্ট্রার ধ্যান ভঙ্গ হল। তিনি পর্বত থেকে নিচে নেমে এলেন এবং জনমণ্ডলীর ভিতর তাঁর শিক্ষা প্রচার করতে লাগলেন। তখন পাশে একজন দুঃসাহসিক ব্যক্তি দড়ির উপর চলার কসরৎ দেখাতে দেখাতে পড়ে গিয়ে মরে গেল। জারাথুষ্ট্রা দৌড়ে এলেন, মৃত ব্যক্তিকে কোলে তুলে নিলেন, বললেন—তুমি বিপদকে জীবিকা অর্জনের উপায় বলে গ্রহণ করেছিলে। আমি তোমার মৃতদেহ নিজে হাতে গোর দিব। জারাথুষ্ট্রা প্রচার করতে লাগলেন—বিপদের ভিতর বাস কর। বিসুভিয়স পর্বতের পাশে তোমার বাসগৃহ নির্মাণ কর। অজানা অনধিকৃত সমুদ্রের উপর তোমার জাহাজ চালনা কর। যুদ্ধের মধ্যে বাস কর।

নীট্‌শে বলেছিলেন, নীতি দুই প্রকার—প্রভুনীতি ও দাস নীতি। রোমানগণ প্রথম নীতির এবং পরাধীন অবস্থায় ইহুদীগণ দ্বিতীয় নীতির দৃষ্টান্ত হল। পরাধীনতার বিনয়ের জন্ম, অসহায় অবস্থায় মানবহিতৈষণার উৎপত্তি হয়।

যিশু খৃষ্টের শিক্ষা দাসনীতির শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। যিশু বলেছিলেন, সকল মানুষের সমান অধিকার আছে, সবল মানুষ সমান। তাঁর শিক্ষার ফলে গণতন্ত্র, হিতবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম হয়েছে। এই ধরণের নিম্নস্তরের ধার্মনিক মতবাদ প্রগতির মাপকাঠি। দয়া ও স্বার্থত্যাগের মহত্ব প্রচার অবনতির চরম অবস্থায় সম্ভব। সক্রিয় সহানুভূতি ন্যায়সঙ্গত কিন্তু দয়া একটা শক্তিক্ষয়কর মানসিক বিলাসিতা মাত্র।

শক্তিমান যুক্তি বা বিচারের আচরণে ইচ্ছাকে ঢেকে দেন না। শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির বিশুদ্ধ হৃদয়ের অভীপ্সাই তাঁর কার্যের সমর্থন। সেখানে বিবেক, দয়া, অনুশোচনার স্থান নাই। এক নূতন ধরণের বৌদ্ধ-ধর্ম ইয়োরোপকে গ্রাস করতে বসেছে। শক্তিমান এক্ষণে নিজের স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্য লজ্জা বোধ করেন। লোভ, হিংসা, এমন কি ঘৃণা, সংগ্রাম নির্বাচন এবং উত্থর্তনের জন্য অপরিহার্য। অমঙ্গলই মঙ্গল। তা না হলে পৃথিবীতে অমঙ্গলের স্থান থাকত না। অতি ভাল না হওয়ার জন্য সতর্ক থাকা উচিত। ব্যক্তি, দল বা জাতির প্রকৃত পরীক্ষার কষ্টিপাথর উদ্যম, সামর্থ্য ও শক্তি। খাদ্যের প্রকৃতি অনুসারে মনের প্রকৃতি গঠিত হয়। অন্নভোজীদের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের জন্ম হয়েছিল। মদ্যপান জর্মাণ অধ্যাত্মবিদ্যার জনক।

শক্তিই একমাত্র নীতি। সকল মানুষকে উন্নত করে তোলার চেয়ে শক্তিমান ও উন্নত ব্যক্তিসৃষ্টিই আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও মনুষ্য জাতির উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হন না, কারণ মনুষ্য জাতির উন্নতি হয় না, এমন কি মনুষ্য জাতি বলে কিছু নাই। এটা একটা অবাস্তব কাল্পনিক বস্তু। প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মহামানবের প্রতি তিনি নিষ্ঠুর। নির্বোধের প্রতি তাঁর করুণা অসীম। নির্বাচন, সুপ্রজনন এবং সুষ্ঠু শিক্ষাই মহামানবের রক্ষাকবচ।

উচ্চতর মানুষকে প্রেমের জন্য বিবাহ করতে দিলে সুপ্রজননে ব্যাঘাত ঘটে। যে কার্যের ফল সারা জীবন ভোগ করতে হয়, প্রেমান্ধ ব্যক্তিকে তা করতে দেওয়া উচিত নয়। প্রেমান্ধ ব্যক্তির বিচার বুদ্ধি থাকে না। শ্রেষ্ঠতম পুরুষ শ্রেষ্ঠতম নারীর পাণিগ্রহণ করবে। প্রেম নিম্নশ্রেণীর মানুষের ধর্ম। বিবাহের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সন্তানোৎপাদন নয়, এর উদ্দেশ্য উন্নয়ন।

সাহসী ব্যক্তিই সৎ। বিবাদ ও সংঘর্ষকে ভালবাসা মহামানবের প্রধান লক্ষণ। সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ করতে পারলে যে কোন কারণ পবিত্র হয়।

মহামানবের প্রধান গুণ শক্তি, বুদ্ধি ও গর্ব। অভিজাত বংশেই মহামানবের আবির্ভাব। গণতন্ত্র নাসিকা গণনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বাতিক দূর করতে না পারলে মহামানবের আবির্ভাব সম্ভব নয়। খৃষ্ট ধর্মের উচ্ছেদ এর প্রথম ধাপ। যিশুখৃষ্ট বিশেষ অধিকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি সকল মানুষের সমান অধিকার দাবী করেছিলেন। তোমাদের মধ্যে যারা বড়, তারা তোমাদের ভৃত্য হোক্', বর্তমান যুগ এই ধরণের শিক্ষা প্রচার করলে তাঁকে সাইবেরিয়ায় প্রেরণ করা হত। খৃষ্টধর্মের ইয়োরোপ-বিজয় প্রাচীন আভিজাত্যের সমাধি রচনা করেছিল। ফলে টিউটনিক যোদ্ধাদের অভিযান ও ইয়োরোপ-বিজয় সম্ভব হয়েছিল। তথা-কথিত নীতিজ্ঞান এদের মর্ম অবদমিত করেনি, সামাজিক বাধা নিষেধের বাঁধ এদের মুক্তপ্রাণের স্বচ্ছ আনন্দ ধারা ব্যাহত করতে সমর্থ হয়নি। এরাই জর্মানী, স্ক্যান্ডিনেভিয়া, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইটালি এবং রাশিয়ার শাসকশ্রেণী সৃষ্টি করেছিল।

গণতন্ত্র ও খৃষ্ট ধর্মের অবশ্যম্ভাবী কুফল স্ত্রী স্বাধীনতা আন্দোলন। নর ও নারীর সমানাধিকার অবাস্তব, তাদের মধ্যে সাম্য অসম্ভব। তাদের সম্বন্ধ খাদ্য-খাদকের সম্বন্ধের মত ভয়াবহ। পুরুষের মত পুরুষের কাছে নারী বশ্যতা স্বীকার করে সন্তুষ্ট থাকে। মাতৃত্বে নারী-জীবনের সার্থকতা ও পূর্ণতা। নারী দুর্বোধ্য। তার জীবনের চরম সার্থকতা—গর্ভধারণ। নারী পুরুষকে উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় হিসাবে গ্রহণ করে। তার উদ্দেশ্য সন্তানলাভ।

সকল মানুষ সমান নয়। প্রকৃতি সাম্যকে ঘৃণা করেন। ব্যক্তি, শ্রেণী ও গোষ্ঠি বিভাগ স্বাভাবিক। সমাজতন্ত্র প্রাণিবিজ্ঞান বিরোধী। জাতি, শ্রেণী গোষ্ঠি বা ব্যক্তির দুর্বলতার উপর ক্রমবিকাশের ধারা প্রতিষ্ঠিত। সবল দুর্বলকে পরাজিত করে স্বাধিকার প্রমত্ত হয়। বৃহৎ মৎস্য ক্ষুদ্র মৎস্যকে গলাধঃকরণ করে। দুর্বল ও ক্ষুদ্র জীবকে সংহার করে বলবান ও বৃহৎ প্রাণী জীবজগতে প্রভুত্ব স্থাপন করে।

বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সম্পত্তির অধিকারী হবে। অল্পবুদ্ধি মানুষ সম্পত্তির জন্যই সম্পত্তি অর্জন করে। বর্তমান যুগের জাতিগুলি উন্মত্তের মত উৎপাদন বৃদ্ধি করছে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ঐশ্বর্যবৃদ্ধি। তারা অল্পমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করে উচ্চমূল্যে পণ্য বিক্রয় করে প্রচুর লাভ করে। বণিকের বাণিজ্যনীতি সুসংযত দস্যুতার নামান্তর মাত্র।

দুর্বল ও বিলাসী জাতির পক্ষে যুদ্ধ মহৌষধ। রণোন্মাদনায় তার ধমনীর শীতল রক্ত উষ্ণ হয়ে ওঠে। নিরবিচ্ছিন্ন শান্তি জাতীয়-জীবনের সমাধি রচনা করে। যে জাতি যুদ্ধ ও রাজ্য জয়ে পরাঙ্মুখ সে জাতি দুর্বল। দুর্বল জাতিই গণতান্ত্রিক ও বৈশ্য শাসনের উপযুক্ত। বণিক ও ব্যবসায়ীদের শাসনকার্য থেকে দূরে রাখাই রাজনৈতিক সমস্যা। প্রতিভাবান ব্যক্তির শাসন করার

অধিকারে বিধি-প্রদত্ত। সাধারণ লোকের স্থান সিংহাসন নয়। উৎপাদনকারী, কর্মকারী এবং শাসক নিয়েই আদর্শ সমাজ গঠিত। একমাত্র জ্ঞানীই শাসনকার্যের উপযুক্ত। এই বিষয়ে প্লেটোর মত যুক্তিসিদ্ধ।

শক্তি-উপাসক নীট্‌শের মহামানব সোফেনহাউয়ের প্রতিভাবান ব্যক্তি নয়, কার্লাইলের বীর নয়, অথবা ওয়াগনারের লিবফ্রিড নয়। তাঁর মহামানব বিপদকে গ্রাহ্য করেন না। তিনি বিপদের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করেন, নিজের নিরাপত্তার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সংখ্যা-গরিষ্ঠের শুভবিধান করেন।

নীট্‌শের মতে সৈনিকের স্থান নাগরিকের উপরে এবং অভিজাতের নীচে। গৌরব অর্জনের জন্যই সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যচালনা করেন এবং সৈন্যগণ মৃত্যুকে আলিঙ্গনের সহিত আলিঙ্গন করে। নিষ্পত্তি লাভের যজ্ঞে মানুষকে পেষণ করে ঐশ্বর্যশালী হয়। সেনাপতির স্থান শিল্পপতির উপরে। নেপোলিয়ন কসাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন চিন্তাকাঙ্ক্ষী। এজন্য বোতাম তৈয়ারীর ফ্যাক্টরির কাজ ছেড়ে লোক দলে দলে এসে তাঁর পতাকার নীচে সমবেত হয়েছিল।

সমাজে ও শাসন ব্যবস্থায় নীট্‌শে অভিজাত ও মহামানবকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, অভিজাত শাসন সভ্যতা ও সংস্কৃতি উন্নয়নের যুগ, কিন্তু ইতিহাস অন্যরূপ সাক্ষী দেয়। উচ্চবংশেই সকল সময়ে মহামানবের আবির্ভাব হয়নি। নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যেও তাঁর আবির্ভাব ঘটে। অভিজাত শাসনের যুগ সাংস্কৃতিক উন্নয়নের যুগ নয়। এথেন্সে পেরিক্লিসের যুগে, ফ্লোরেন্সে মেদিচিদের যুগে, ইংলণ্ডে এলিজাবেথের যুগে এবং রোমান্টিক যুগে ঔদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অর্থ সাহায্যেরসে পুষ্ট হয়ে সাহিত্য, শিল্প ও সভ্যতার তরুটি মুকুলিত বিকশিত পুষ্পিত ও ফলিত হয়েছিল। ঐ সকল যুগের প্রতিভাবান ব্যক্তিগণ অভিজাত বংশের সন্তান ছিলেন না, সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁদের জন্ম হয়েছিল। সক্রেটিস্, ভল্টেয়ার এবং সেক্সপীয়র অজ্ঞাত নামা পিতার পুত্র ছিলেন। সমাজ চেতনার উদ্বুদ্ধন ও পরিবর্তন নূতন সৃষ্টি-শক্তির উন্মেষণ করে, নূতন ও শক্তিশালী শ্রেণীর অভ্যুদয়ে জাতীয় মানস বসন্ত-সমাগমে প্রকৃতির নববেশ ধারণের ন্যায় সৃষ্টিধর্মী ভাবে ভরপুর হয়ে ওঠে। তখন জাতির মানস-সমুদ্রে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয় তাতে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য ও শিল্পের অমৃত উত্থিত হয়।

উচ্চবংশে জন্ম না হলেও প্রতিভাবান ব্যক্তিকে শাসন কার্যের দায়িত্ব থেকে বঞ্চিত করলে দেশের অকল্যাণ হয়। প্রতিভাকে সর্বাগ্রে স্থান দিতেহবে। রাষ্ট্র-পরিচালনার জটিল ও দুরূহ কার্যে শ্রেণী ও জন্ম নির্বিশেষে যোগ্যতম ব্যক্তির স্থান সর্বাগ্রে। প্রতিভা অভিজাত শ্রেণীর একচেটে সম্পত্তি নয়। পদ্মে পদ্মের মত নীচ বংশেও প্রতিভা জন্মে। যে অভিজাত শ্রেণীর শ্রেষ্ঠতা—একমাত্র জন্মের উপর নির্ভর করে, যার ভিতর নূতন রক্তের সঞ্চার না হয়—যে শ্রেণী সাধারণ মানুষের চলমান শক্তি-স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন, কালক্রমে সে শ্রেণী নির্বীর্য হয়ে মৃত্যুবরণ করে। যারা—'ধরেতে বসি গর্ব করে পূর্ব-পুরুষের,' তারা প্রতিভার বেউলে হয়ে যায়। তাদের থাকে শুধু শূন্যগর্ভ আস্ফালন, বৃথা অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা।

নীট্‌শে তাঁর সময়ের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন। এজন্য তাঁকে শাস্তি পেতে হয়েছিল। প্রখর চিন্তার অগ্নি-শিখায় তাঁর দেহ দগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অন্তর ও বাইরের শত্রুর আক্রমণে তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। জীবনের শেষ দিকের রচনার ভিতর দিয়ে তিনি বিস্ফোরণ করে-ছিলেন। তিনি ব্যক্তি ও চিন্তার শত্রু হয়ে উঠলেন। এমন কি ওয়াগনার ও খৃষ্টও তাঁর আক্রমণের হাত থেকে অব্যাহতি পাননি। তিনি লিখেছিলেন, জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবের মনে ভিক্ততা থাকে না কিন্তু তিনি নিজের লেখনীকে সংযত করতে পারেন নি। ব্যঙ্গ তাঁর সঙ্গে সহিত তাঁর হাস্যও বিদ্রূপাত্মক হয়ে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন, প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র মানুষই হাসে। যন্ত্রণা দূর করার জন্য মানুষ বাধ্য হয়ে হাসি আবিষ্কার করেছে। এই উক্তিই তাঁর অন্তরের বিষজ্বালা প্রকাশিত করে। 'ইকো হোমো' নামক তাঁর সর্বশেষ রচনা আত্মম্ভরিতায় ভরপুর। এর ভিতর তাঁর প্রকৃতির সত্যকার রূপ ধরা দিয়েছে।

তাঁর অবহেলিত ও অবজ্ঞাত জীবন পৃথিবী ও মানুষের প্রতি ঘৃণায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। দীপ নির্বাণের প্রাক্কালে তাঁর প্রতিভার আদর হয়েছিল কিন্তু প্রশংসার ক্ষীণ আলো তাঁর ঘন তিমিরাবৃত হৃদয় ও মনের এবং ধ্বংসোন্মুখ সৃষ্টি-শক্তির স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে পারেনি। বিকৃত-মস্তিষ্ক নীট্‌শে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে একটি হাসপাতালে জীবনলীলা সম্বরণ করলেন। বিরাট প্রতিভার অধিকারী হয়েও আর কোন মানুষ এত বড় প্রায়শ্চিত্ত করেনি।

প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্র

শ্রীপ্রভাংশু গুপ্ত

[দুই]

ভরত মুনি আত্রেয় ও অন্যান্য সমবেত ঋষিদের ব'লে চললেন—এদিকে দেবতারা সব একজোটে ব্রহ্মাকে ব'ললেন—ভালো কথায় বুঝিয়ে প্রথমে বিঘ্ন বা অশরীরী দুরাত্মাদের ঠাণ্ডা করুন। তাতে যদি তারা না শোনে, তা'হলে তাদের কিছু উপহার দিয়ে খুশী করে দিন। এতেও যদি কোনো ফল না হয়, তাহ'লে তাদের ভেতর একটা ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি ক'রে দিলেও মন্দ হয় না। এই সব উপায় ব্যর্থ হ'লে তবেই শেষ অস্ত্র আপনাকে প্রয়োগ করতে হবে,—তাদের প্রহার ক'রে সোজা ক'রতে হবে।

দেবতাদের মুখে একথা শুনে পিতামহ ব্রহ্মা ঐ দুরাত্মাদের ও দৈত্যদের ডেকে পাঠালেন। তারা উপস্থিত হ'লে পিতামহ মৃদু হেসে বললেন—তোমরা অভিনয় পণ্ড করবার চেষ্টা ক'রছো কেন?

দৈত্য ও দুরাত্মাদের মুখপাত্র বিরূপাক্ষ তখন নম্রস্বরে উত্তর দিলে—দেবতাদের অনুরোধে আপনি যে নাট্য-বেদ তথা নাটকের সৃষ্টি ক'রেছেন, তাতে আমাদের চরিত্র চিত্রনে নিন্দা ও অপবাদের অন্ত নেই। দেবতাদের স্নেহ করেন ব'লেই আপনি তা ক'রতে পেরেছেন। কিন্তু দেবতা দানব,—সকলেরই আপনি পিতামহ। আপনা থেকেই ত্রিভুবনের সৃষ্টি। আপনার কাছে সকলেই সমান। আপনার এই পক্ষপাতিত্ব উচিত নয়।

পিতামহ ব'ললেন—তোমাদের দুঃখ করবার কিছু নেই। আমার নাট্য বেদ দেবতা-দানব, উত্তমেরই ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত ক'রবে। শুধু তাই নয়, তোমাদের ও দেবতাদের আদর্শ এই নাট্য-বেদের অন্তর্ভুক্ত হবে। শুধু দেবতা অথবা দানব,—কারুর আদর্শের একক প্রতিচ্ছবি এই নাট্য বেদে স্থান পাবে না, যে হেতু নাটক ত্রিভুবনের প্রতিচ্ছবি। বুঝলে? তাই নাট্য-বেদে কখনো দেখবে আছে কর্তব্যের কথা, খেলা ধূলো, অর্থ, নীতি, হাসি-কান্না ও যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা,—আবার কখনো দেখবে প্রেমের মাধুর্য,—আবার কখনো দেখবে চতুরা বিদূষিকা।

পিতামহ আরো বললেন—যারা কর্তব্য প্রতিপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাদের দেখিয়ে দেবে নাট্য-বেদ কর্তব্যের পথ। প্রেমের প্রতিদান নিতে যারা চায়, তাদের প্রেম সার্থক ক'রতে সহায় হবে নাট্য-বেদ। অভদ্র ও উচ্ছৃঙ্খল, তাদের শাস্তি বিধানের পথ নির্দেশ দেবে আমার এই নাট্য-বেদ। যারা নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলে, তাদের ভেতরে আনবে আত্মসংযমের গৌরব এই নাট্য-বেদ। ভীরুকে দেবে সাহস, বীরকে দেবে প্রেরণা, অশিক্ষিতকে দেবে শিক্ষা ও শিক্ষিতকে দেবে জ্ঞান আমার এই নাট্য-বেদ।

পিতামহ তারপর বললেন—রাজা ও শাসকের জীবনে ও মনে আনবে বৈচিত্র্য, শোকাতুরকে দেবে মানসিক বল,

অর্থ উপাত্ত নবীনকে দেবে বিত্ত সংগ্রহের পথের ইঙ্গিত, বিক্ষিপ্ত মনকে ক'রবে শান্ত আমার এই বেদ-নাট্য।

[নাটক

দৈত্য ও দুরাত্মারা নির্বাক হ'য়ে নাট্য-বেদের মহিমা শুনতে লাগলো। পিতামহ ব'ললেন—নাট্য-বেদে নাটকের যে রূপ আমি কল্পনা ক'রেছি তা' জনগণের কার্য-কলাপ ও চরিত্রের প্রতিচ্ছবি ছাড়া আর কিছু নয়। এই কার্যকলাপ ও চরিত্র নানা ভাবাবেগে পূর্ণ এবং নানা ঘটনা প্রবাহের ইঙ্গিত। নাটকে থাকবে উত্তম, মধ্যম ও অধম ব্যক্তিদের কার্যকলাপ। ঘটনাপ্রবাহ ও ভাবের মাধ্যমে নাটক সকলকে বিতরণ ক'রবে নির্বিশেষে সাহস সুখ, শান্তি ও আমোদ-প্রমোদ। দুঃখ ও শোকে মুহ্যমান দুর্ভাগাদের অথবা অতি পরিশ্রমে ক্লান্ত-শ্রান্ত দুর্ভাগাদের হৃদয়ে নাটক দেবে শান্তির প্রলেপ। কর্তব্য ও ধর্মপালনে ধৃতি, বুদ্ধি ও মেধা অর্জনে এবং যাত্রা অর্জনে আগ্রহ-শীল সকলের পাবে পথ নাটকের ভেতর। নাটক লোকে দেবে শিক্ষা।

পিতামহ ব'ললেন—নাটকের মহিমা আরো শোনো। নাটকের ভেতর পাবে সব।এমন কিছু ত্রিভুবনে জ্ঞানগর্ভ কথা নেই, এমন কিছু বিদ্যা নেই, এমন কিছু শিল্প ও চারু-কারু কলা নেই, এমন কিছু কার্যকলাপ নেই যার অস্তিত্ব এই নাটকের গণ্ডীর বাইরে থাকতে পারে। আমি সৃষ্টি ক'রেছি সর্বজ্ঞান সম্ভারপূর্ণ এই নাটক।

দেবতা, দানব, রাজা এবং সাধারণ গৃহস্থের সুখ-দুঃখ ও কার্যকলাপের প্রতিচ্ছবি, নাটক। সুতরাং তোমরা দেবতাদের ওপর রাগ ক'রো না।

জগতে আনন্দের সৃষ্টি করতে পারে এমন যে সব কাহিনী ও ইতিকথা বেদ ও ইতিহাসে পাওয়া যায়, তাকেই বলা হয় নাটক। হাসি-কান্না, ভাব-ভঙ্গী, কথা, পোষাক-পরিচ্ছদ মারফৎ যে কাহিনীকে রূপ দেওয়া হয়, তাকেই আমরা বলি নাটক।

ভরত মুনি আত্রেয় ও অন্যান্য ঋষিদের ব'ললেন—পিতামহের কথা শুনে দৈত্য ও দুরাত্মারা চুপ ক'রে বসে রইলো। তারপর পিতামহ সমবেত দেবতাদের ব'ললেন—রঙ্গালয়ে হোম, মন্ত্র ও জপের সাহায্যে পূজার আয়োজন কর। তারপর অভিনয়। সর্বসময়েই অভিনয়ের পূর্বে যেন পূজার ব্যবস্থা হয়। পূজা বাদ দিয়ে যে মূঢ় রঙ্গালয়ে অভিনয় ব্যবস্থা ক'রবে, নাট্য-কলার জ্ঞান সে কোনো-দিনই কাজে লাগাতে পারবে না। শুধু তাই নয়, সেই নির্বোধ পতিত হয়ে পশু-যোনীতে জন্মগ্রহণ ক'রবে। সুতরাং নাট্যাচার্য বা প্রয়োগ-কর্তাকে মঞ্চে অভিনয়ের পূর্বে পূজার ব্যবস্থা ক'রতেই হবে।

পিতামহ আরো ব'ললেন—যদি কোনো নাট্যাচার্য প্রয়োগ-কর্তা, অভিনেতারা রঙ্গালয় অধিকারী পূজা বাদ দিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করে, তার অর্থক্ষতি হবেই। আবার যথারীতি পূজার আয়োজন ক'রে যদি কোনো নাট্যাচার্য প্রয়োগ-কর্তা, অভিনেতা বা রঙ্গালয় অধিকারী নাটক মঞ্চস্থ করে, তার অর্থলাভ হবেই। শুধু তাই নয় জীবনান্তে সে বৈকুণ্ঠে' গমন ক'রবে।

ভরত তারপর আত্রেয় ও অন্যান্য মুনিদের ব'ললেন—এইবার পিতামহ ও অন্যান্য দেবতারা আমাকে ডেকে ব'ললেন—ভরত! এইবার রঙ্গালয়ের মঞ্চে প্রথমে পূজার ব্যবস্থা কর।

[প্রথম পর্ব সমাপ্ত]

সমাজ ও জাতীয় জীবন

[র. কু. সে.]

সমাজ শিক্ষার ভূমিকা

বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে 'সমাজ-শিক্ষা দিবস' পালিত হ'তে শুরু হয়েছে এবং সরকার পক্ষ থেকে সমাজ-শিক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ ক'রে তাকে বাস্তবায়িত করবার নীতি গ্রহণ করা হ'য়েছে। এটা অত্যন্ত আশা এবং আনন্দের কথা। সরকার প্রযোজিত 'Social Education' বিভাগীয় কর্ম গত কয়েক বছর ধরে কার্যকর হবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-শিক্ষার ব্যবহারিক দিকটির গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছিল। এ পর্যন্ত Social Education বিভাগের তরফ থেকে বাংলার বিভিন্ন আঞ্চলিক পাঠাগারে শুধু কিছু সংখ্যক নির্বাচিত গ্রন্থ পরিবেশন ভিন্ন অন্য কোনো রকম কাজের বড় একটা পরিচয় পাওয়া যায় নি। আমরা তখন থেকেই এ বিষয়ের আলোচনা ক রে বলেছিলাম যে, শুধু গ্রন্থ পরিবেশন দ্বারাই সমাজের শিক্ষার মান বাড়বে না। আমাদের দেশ প্রায় নিরক্ষর দেশ। 'শিক্ষা' কথাটির দ্বারা কি বুঝায়, এ দেশের অধিকাংশ লোক তা জানে না। সাধারণ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যেও, শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত পাঠ্যতালিকাগত জ্ঞানকেই অনেকে শিক্ষা বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু 'শিক্ষা' শব্দের মূলগত অর্থ অত সঙ্কীর্ণ নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ছাত্র সমাজের বুদ্ধিবৃত্তি-উন্মেষের সহায়ক হ'তে পারে, কিন্তু জনসাধারণের চিত্ত-বিকাশের পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। যদি যথেষ্ট হ'তো, তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বিগত একশো বছরে এদেশের জনসাধারণ এমন বিমূঢ় অবস্থায় কাটাতে বাধ্য হ'তো না। জনসাধারণ একশো বছর আগেও যে অবস্থায় ছিল, এখনও প্রায় সেই অবস্থার মধ্যেই রয়েছে। তার আদৌ কোনো দিকে বড় একটা বদ্‌লাবদ্‌ল হয়নি। এর কারণ হচ্ছে—সমাজের উর্ধ্বতন শ্রেণীর মুষ্টিমেয় লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয় জ্ঞান নিয়ে মসীজীবী হ'লেও নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অগণিত মানুষ শিক্ষাগত সর্বপ্রকার জ্ঞান থেকেই বঞ্চিত হ'য়ে রইলো। উর্ধ্বতন শ্রেণীরাও যে জ্ঞান লাভ ক'রেছেন তা প্রকৃত জ্ঞান নয়, জ্ঞানের অংশ মাত্র। সুতরাং একদিকে নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী যেমন একেবারেই অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে আছে, অন্যদিকে তেমনি উচ্চশ্রেণীরাও প্রকৃত জ্ঞানার্জনের অভাবে অর্ধ-মানবে পরিণত হ'য়ে রইলেন। দেশে ইদানীং যদিও কিছু শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, কিন্তু তা ব'লে মনুষ্যত্বের প্রসার বাড়েনি। শিক্ষার মূলগত অর্থকে বিশ্ববিদ্যালয়-প্রযোজিত জ্ঞানের মধ্যে গ্রহণ করা হয়নি ব'লেই দেশের এই বিপত্তি উত্তরোত্তর বেড়েছে। এই বিপত্তির একটি প্রধান কারণ ছিল এদেশে পৌনে দু'শো বছরের ইংরেজ শাসন। এদেশে নিজেদের রাজকার্য পরিচালনার সুবিধের জন্য ইংরেজেরা কিছু সংখ্যক উঁচুশ্রেণীর লোককে শিক্ষিত ক'রে বাকী গোটা দেশের শিক্ষা ও শিক্ষাগত অন্যবিধ সুবিধেগুলোর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রইল। ফলে এদেশের শতাব্দীসঞ্চিত যে অন্ধকার, সেই অন্ধকারই থেকে গেল। ইংরেজ-প্রযোজিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার যে নীতি গ্রহণ করা হ'লো, তা এদেশের বৃহত্তর জীবনের উপকারে এলো না। 'জার'-শাসিত রাশিয়ার শিক্ষানীতিতেও একদা এমনটাই ঘটেছিল—যে সম্বন্ধে উল্লেখ করতে গিয়ে পরবর্তীকালে সুপ্রিম সোভিয়েট পেলিডিয়ামের চেয়ারম্যান ভি. আই. লেনিন বলেছিলেন :···'were completely turned into an instrument of bourgeois class domina-

tion; they were saturated, through and through, with the bourgeois caste spirit; and their purpose was to give the capitalists obsequious servants and efficient workers.'

নতুন সোভিয়েট-শিক্ষার সূত্রপাত ঘটলো এই অতল অন্ধকারের অর্গল ভেঙে।

দেশগত পার্থক্য থাকলেও এদেশে ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষাও কমবেশী অনুরূপ আকারেই জাতীয় জীবনে দেখা দিয়েছিল। ১৯৪৭ সালে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত ভারত প্রথম উপলব্ধি ক'রলো যে, ইংরেজ-রচিত পুরনো এই অর্গল ভেঙে দিতে না পারলে নতুন পৃথিবীর আলো এসে এদেশের মাটিতে পৌঁছাবে না। তাই ১৯৪৮ সালে ভারতের আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড ও বৃটিশ কমনওয়েলথের বিদ্যালয় সমিতির কার্যনির্বাহক পরিষদের যুক্ত-অধিবেশনের উদ্বোধন-ভাষণে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্পষ্টই বললেন: 'নতুন যুগ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপর যে কর্তব্য আরোপ ক'রেছে, তা সম্পাদন করতে হ'লে বিশ্ব বিদ্যালয়সমূহকে মানব সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করতে হবে এবং সেই সঙ্গে বিশেষ শ্রেণীর অংশ হিসেবে না থেকে সমগ্র মানব সমাজের জীবনধারা ও আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে।—আজ পর্যন্ত মানবসমাজের বিবর্তনের ইতিহাসে শক্তিরই প্রাধান্য হয়েছে। ইতিহাসের প্রায় সমস্ত পুস্তকের অধিকাংশ অংশেই যুদ্ধ ও সংঘর্ষের বিষয়ে আলোচনা আছে, সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ ও আদর্শের বিবর্তন সম্পর্কে খুব কমই আলোচনা আছে।—নতুন নতুন সৃষ্টির জন্যই মানুষ জীবনধারণ করে। অক্লান্ত সৃজন প্রচেষ্টা এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কার্যকলাপের দিক দিয়ে মানব-ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা করতে হবে। কারণ কেবলমাত্র এর দ্বারাই পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত পশু থেকে মানুষ পৃথক হয়ে গিয়েছে।—সঠিকভাবে মন গ'ড়ে তোলা সমাজজীবনে এবং ঐক্যপ্রতিষ্ঠার মনোভাব সৃষ্টি করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাথমিক কাজ।'

দুঃখের বিষয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই প্রাথমিক কাজই অদ্যাবধি সমাধা করে উঠতে পারেনি। না পারার কারণ হচ্ছে, স্বাধীনতার পর নতুন বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হলেও অদ্যাবধি মূল শিক্ষানীতির কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়নি। বহু স্কীম বহু আলোচনা এখনও ফাইলবন্দী হয়ে আছে। আধুনিক বিশ্বের প্রগতিশীল দেশগুলির দৃষ্টান্ত অনুযায়ী যতক্ষণ না আমাদের দেশের শিক্ষানীতির আমূল পরিবর্তন ঘটছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বৃহত্তর এই জাতির নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও উচ্চশিক্ষার মান-উন্নয়ন আদৌ সম্ভব নয়।

বর্তমানের এই অপরিবর্তিত অবস্থার মধ্যেই আশার কথা এই যে, জাতীয় সরকারের পক্ষ থেকে Social Education Board এর মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষাসম্প্রসারণের একটা সাধু চেষ্টা দেখা দিয়েছে। কিন্তু শুধু বিভিন্ন গ্রন্থাগারকে গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি দ্বারা সাহায্য করলেই এ কাজের কর্তব্য পালন করা হবে না; যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে এ কাজের ব্রত, সেই উদ্দেশ্যজাত গ্রন্থ প্রণয়ন ক'রে আপামর জনসাধারণের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে হবে, এবং সেই সঙ্গে আদর্শবাদী জ্ঞাননিষ্ঠ ইনস্পেক্টর নিয়োজিত ক'রে জাতীয় সরকারকে রিপোর্ট নিতে হবে—কোন্ কেন্দ্রে কত সংখ্যক লোক উক্ত গ্রন্থগুলির দ্বারা কতখানি জ্ঞানার্জন ক'রতে সক্ষম হয়েছে। এই ভাবের কর্মপদ্ধতির দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে সাধারণ জ্ঞানের সম্প্রসারণ অধিকতর সম্ভব ছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, জাতীয় সরকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নিয়ন্ত্রণের মতো এ কাজটিও শৃঙ্খলার সঙ্গে এ পর্যন্ত সমাধা ক'রে উঠতে পারেননি। আমরা আশা ক'রবো, আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্যান্য কাজের ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গে এ-কাজটিও সরকার অধিকতর যত্নের সঙ্গে গ্রহণ ক'রবেন। কারণ শিক্ষা হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড। শিক্ষাহীন জাতি কোনো-ক্রমেই আজকের পৃথিবীতে টিকে থাকতে পারে না।

এই শিক্ষার কতকগুলি ধারা পূর্বাহ্নেই আমাদের নির্ণয় ক'রে চলা কর্তব্য। শিশু ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই

তাকে কতকগুলি অভ্যাসের অনুশীলন ক'রে চ'লতে হয়। এই অভ্যাসই শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা। সেই শিক্ষা যতবেশী সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত হবে, শিশুর ক্রমবর্ধমান জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তার চরিত্রবিকাশও ততবেশী সুষ্ঠু হ'য়ে উঠবে। এই সঙ্গে প্রয়োজন নৈতিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা। স্কুল ও কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই শিক্ষাগুলির অনুশীলন অত্যাবশ্যক। তারপর বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর পক্ষে সব চাইতে যা অধিকতর প্রয়োজন, তা হ'চ্ছে পৌরজ্ঞান (civic knowledge) ও সমাজশিক্ষা (Social Education)। এ দু টি জ্ঞানের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। সামাজিক ব্যক্তি হিসেবে প্রত্যেকটি মানুষকে সর্বাগ্রে এই জ্ঞান ও শিক্ষায় জ্ঞানী ও শিক্ষিত হ'য়ে দাঁড়াবার প্রয়োজন, অন্যথায় দেশ সংস্কৃতিবানের শিবির না হ'য়ে বর্বরের ক্ষেত্রে পরিণত হয়। আমরা আজ তা থেকে উত্তীর্ণ হ'তে পেরেছি ব'লে মনে করি।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে সমাজ-শিক্ষা-দিবস পালনের কয়েকটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হ'য়ে আমরা খুসী হ'তে পারিনি। উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, এই উদ্যমের মধ্য দিয়ে একদা দেশ যে অনেকদূর অগ্রসর হ'তে পারবে, তাতেও সন্দেহ নেই; কিন্তু কথা হ'চ্ছে—যে কাজের বনিয়াদ দৃঢ় নয়, সে কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হ'তে পারে না। সাম্প্রতিক অনুষ্ঠানগুলির কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়ে বক্তা ও কর্মকর্তাদের বক্তব্য শুনে আমাদের একথাই মনে হয়েছে যে, সমাজশিক্ষা বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের দেশের অনেকের জ্ঞানই এখনও সীমাবদ্ধ। এজন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন সরকারী ব্যবস্থায় Social Educational training Corps গ'ড়ে তুলবার। এই 'Corps' থেকে শিক্ষকশ্রেণী তৈরী ক'রে দলে দলে তাঁদের গ্রামে ও সহরে মফঃস্বলে পাঠাতে হবে জনসাধারণকে সমাজশিক্ষায় উৎসাহী ক'রে তুলবার জন্য; প্রয়োজন সমাজশিক্ষামূলক গ্রন্থপ্রকাশনের। বিনামূল্যে বা স্বল্পমূল্যে জনসাধারণের বিতরণ করতে হবে। এইভাবে যতদিন কাজ এগোচ্ছে, ততদিন সমাজ-শিক্ষা বিষয়টি শুধু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বক্তৃতায় উচ্চারিত একটি শুষ্কলিত শব্দ হয়েই বিরাজ ক'রবে, যে উদ্দেশ্যে এ কাজ, তার কোনোকিছুও ফল ফলবে না।

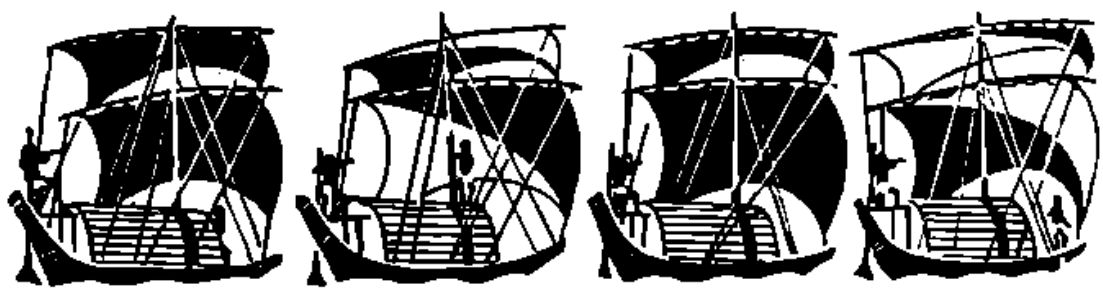

BENGAL JUTE MILL

COMPANY LIMITED

8, Dalhousie Square East,
CALCUTTA.

Manufacturers of all Qualities of

JUTE GOODS

FASHIONABLE JUTE CARPETS
For All Purposes and at Economical Rates

Available in Various Shades and Designs

JACQUARDS, DOBBIES, FLOOR RUNNERS,
CHAIR CLOTHS & SCHOOL MATTINGS.
ALSO JUTE WEBBINGS

Twines, Spool and Cops Our Specialities

WANTED AGENTS FOR UNREPRESENTED AREAS

TELEGRAMS & CABLES
CALCUTTA-(INDIA).
"HEMPBALER"

TELEPHONES :
MILLS : HOWRAH-13
OFFICE : 22-6853-58

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ও কার্ভে কমিটির রিপোর্ট

ভারতের অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্পের গুরুত্ব যথেষ্ট। এই গুরুত্বপূর্ণ শিল্পটির উন্নয়নের জন্য জাতীয় সরকার কিছুদিন থেকে খুব সচেষ্ট হয়েছেন। কিছুদিন আগে প্ল্যানিং কমিশনের এক প্রস্তাব অনুসারে গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্প কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন অধ্যাপক ডি. জি. কার্ভে এবং তাঁর নামানুসারে এই কমিটি কার্ভে কমিটি নামে পরিচিত। শিল্প হিসাবে এবং সম্ভব হলে রাজ্য হিসাবে গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করাই ছিল এই কমিটির প্রধান কাজ। আর এই পরিকল্পনা রচনাকালে যে কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে তা হচ্ছে—(ক) গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের মাধ্যমে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি (খ) এই সকল শিল্পের দ্বারা কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি এবং (গ) সমবায়ের ভিত্তিতে এই সকল শিল্পের উৎপাদন ও ক্রয় বিক্রয় ব্যবস্থা।

কার্ভে কমিটি তাদের অনুসন্ধান কার্য সমাপ্ত করে প্ল্যানিং কমিশনের কাছে যে রিপোর্ট দাখিল করেছেন তাতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিকল্পিত সরবরাহ ও সুসংগঠিত ক্রয়-বিক্রয় ও অর্থ সম্পদের কথা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

এই কমিটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য ২৫৯ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষ একটি কর্মসূচী দিয়েছেন। তাঁদের মতে এই কর্মসূচী কার্যকরী হলে ৪৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হবে। সুতরাং কর্মসংস্থানের দিক থেকে কার্ভে কমিটির রিপোর্ট বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বেকার সমস্যায় জর্জরিত ভারতবর্ষের কাছে যে কোন পরিকল্পনা কর্মসংস্থানের ইঙ্গিত দেবে তা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সকল শিল্পের বিভিন্ন সমস্যার কথা কমিটি আলোচনা করেছেন। তাঁরা বিশেষ করে শিল্পগুলির বিকেন্দ্রীকরণ, কলা কৌশল, পরিকল্পিত সরবরাহ, অর্থ সংস্থান, বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করেছেন। তা ছাড়া কারীগরী উন্নয়ন শিল্পের পরিচালন ব্যবস্থা, নিম্নতম মূল্য নিয়ন্ত্রণ, বিপণন ও উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা, ষ্টেট ব্যাংকের কর্তব্য প্রভৃতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছেন। কমিটি তাঁদের রিপোর্ট রচনা কালে, তাঁত, খাদি, উদ্ভিজ্জ তৈল, গুড়, দেশলাই প্রভৃতি শিল্পের উল্লেখ করেছেন এবং সর্বত্রই সরকারী সহযোগিতা ও সংযোগের উপর জোর দিয়েছেন।

ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকবে কিনা, এ সকল শিল্পজাত দ্রব্যের দ্বারা এই বিশাল দেশের চাহিদা মেটানো সম্ভব কিনা, বৃহদায়তন শিল্পের সঙ্গে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারবে কিনা এ নিয়ে বহু সমালোচনা হচ্ছে। কিন্তু এ সকল সন্দেহ নিরসনের জন্য জাপানের উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্ষুদ্র শিল্পে কতটা উন্নতি সাধন সম্ভবপর, জাপান তার পরিচয় দিয়াছে কেবল তার দেশের মধ্যেই নয়, সারা

দুনিয়াই। ভারতের এই সুবৃহৎ বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য ক্ষুদ্র ও গ্রামা শিল্প অপরিহার্য। আমাদের অর্থনীতি অন্যান্য দেশ থেকে অন্যরূপ এবং আমাদের সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনায় আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির কথা স্মরণ রাখতে হবে। আধুনিক ও সুদক্ষ উৎপাদন পদ্ধতি গ্রহণ করলে ক্ষুদ্রায়তন ও বৃহদায়তন শিল্পগুলির মধ্যে সুসমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা মোটেই অসম্ভব কাজ নয়।

পুনর্বীমা (Re-insurance) সংস্থা স্থাপনের প্রচেষ্টা

বে-সরকারী মহলের দ্বারা পরিচালিত বীমা ব্যবসায়ে, ব্যবসায়ের ঝুঁকি দ্বিতীয়বার বীমা করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ব্যাপারটি মোটামুটি এই। 'ক'-কোম্পানী কোন ব্যক্তির ১লক্ষ টাকার জীবন বীমা করল। এখন বীমার মেয়াদ শেষ হবার আগে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হলে 'ক'-কোম্পানীকে বীমার পুরো টাকাটাই ঐ ব্যক্তির উত্তরাধিকারী বা অপর কোন মনোনীত ব্যক্তিকে দিতে হবে। 'ক'-কোম্পানী এত টাকার ঝুঁকি হয়ত একা নিতে চাইবে না, তাই সে অপর কোন কোম্পানীর সঙ্গে এই ব্যক্তির জীবনের উপর কতক টাকার (ধরা যাক ৫০,০০০ টাকার) বীমা করবে। দ্বিতীয় কোম্পানীর সঙ্গে ঐ ব্যক্তির কোন সম্পর্ক নেই, কিন্তু তার মৃত্যু হলে দ্বিতীয় কোম্পানী 'ক'-কোম্পানীকে আনুপাতিক ভাবে টাকা দিয়ে দেবে। এই ব্যবস্থার ফলে 'ক'-কোম্পানীর ব্যবসায়ের ঝুঁকি অনেকটা কমে গেল। বীমা ব্যবসায়ের দিক থেকে তাই পুনর্বীমা গুরুত্বপূর্ণ। বীমা ব্যবসায়ে উন্নত দেশগুলিতে কেবলমাত্র পুনর্বীমা করবার জন্য এক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান আছে। দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে সেরকম কোন প্রতিষ্ঠান আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠে নাই। অথচ বীমা ব্যবসায় আমাদের দেশে দ্রুত প্রসার লাভ করছে এবং পুনর্বীমার কাজও সঙ্গে সঙ্গে চলছে। এই পুনর্বীমার কাজগুলো প্রধানতঃ বিদেশীয় বীমা কোম্পানীগুলো করছে, আর, তার ফলে পুনর্বীমার প্রিমিয়াম বাবদ প্রচুর অর্থ আমাদের দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। দেশের সম্পদের এরূপ অবক্ষয় প্রতিরোধ করতে হলে একটি শক্তিশালী পুনর্বীমা সংস্থা স্থাপন করা দরকার। এই প্রয়োজনীয়তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়ে আসছে এবং তা নিয়ে বহু আলাপ-আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আসলে কাজ কিছু হয় নি। সম্প্রতি সরকারের বীমা দপ্তর একটি পুনর্বীমা কোম্পানী স্থাপনের আশু প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন বলে মনে হচ্ছে।

বীমা ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি একটি পুনর্বীমা সংস্থা স্থাপনের জন্য এক পরিকল্পনার খসড়া করেছেন। এই খসড়া অনুযায়ী এই পুনর্বীমা সংস্থার অনুমোদিত মূলধন হবে ১০ কোটি টাকা এবং প্রতিটি শেয়ারের অভিহিত মূল্য হবে ১০০ টাকা। প্রথম অবস্থায় ২ কোটি টাকা মূলধন বিলী করা হবে এবং তার মধ্যে ১ কোটি টাকা হবে আদায়ীকৃত। মূলধনের গোটা অংশই ভারতীয় সাধারণ বীমা (General Insurance.)-কোম্পানীগুলি যোগাবে, তবে তাদের প্রত্যেকের অংশের একটা সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মাত্রা থাকবে। এই মাত্রা নির্ধারিত হবে প্রত্যেক কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিলের পরিমাণ অনুযায়ী।

এই সংস্থার পরিচালন ব্যবস্থা একটি বোর্ড অব ডিরেক্টরসের উপর ন্যস্ত করা হবে। এদের মধ্যে দুজন হবেন, যাঁরা বীমা ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট নন, কিন্তু অসাধারণ বিচক্ষণ। আর এই বোর্ডের প্রধান কর্মকর্তা হবেন বীমা ব্যবসায়ে অভিজ্ঞ একজন ভারতীয়।

এই পরিকল্পনা নিয়ে বীমা ব্যবসায়ী মহলে কিছুদিন থেকে আলাপ-আলোচনা চলছে। অনেকে মনে করছেন যে এই প্রতিষ্ঠানের খুব বেশী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা নেই, এবং অল্প মূলধন নিয়েই এই প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে কার্য-পরিচালনে সক্ষম হবে। বলা বাহুল্য, এই প্রতিষ্ঠান নিঃসন্দেহে একটি লাভজনক প্রচেষ্টা এবং এতে যাঁরা অর্থ বিনিয়োগ করবেন তাঁরা বিচক্ষণতারই পরিচয় দেবেন। এই প্রতিষ্ঠান যত সত্বর স্থাপিত হয়, ততই মঙ্গল। বর্তমান ভারতের উন্নয়নমূলক কার্যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন,

এখন যাতে একটি পয়সাও এদেশ থেকে অযথা বিদেশে চালান হতে না পারে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য।

দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় বাণিজ্য-পোত

বাণিজ্যপোতের মালিকদের আলোচনা কমিটির পঞ্চম অধিবেশনে বক্তৃতাকালে রেলপথ ও পরিবহণ মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ভবিষ্যতের উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারী মনোভাব কিছু পরিষ্কার করে ব্যক্ত করেছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বর্তমান সম্পদের সঙ্গে আরও তিন লক্ষ টন যোগ করা হবে। এই সম্প্রসারণে ৬০ কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। সম্প্রসারণের পর ভারতের মোট টনেজ হবে প্রায় ৮০ লক্ষ। প্ল্যানিং কমিশনের প্রাথমিক পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টন সম্প্রসারণের কথা ছিল এবং আশা করা গিয়েছিল যে তাতে উপকূলবর্তী বাণিজ্যের সম্পূর্ণ অংশ, সন্নিকট বাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা ২০ ভাগের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে।

ভারতবর্ষ বাণিজ্যপোতের ব্যাপারে অন্যান্য সমৃদ্ধ উপকূলস্থ দেশগুলির তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে আছে এবং জগতের তুলনায় তার মোট টনেজ মোটেই উল্লেখ-যোগ্য নয়। বর্তমানে পৃথিবীর মোট টনেজ ১০ কোটি টনের উপরে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র শতকরা ৩০ ভাগ, ইংলণ্ড ২০ ভাগ, এবং নরওয়ে ৭ ভাগের অধিকারী। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভারতবর্ষের মোট টনেজ আরও ১০ লক্ষ টন বাড়ালেও তা এই সুবৃহৎ দেশের পক্ষে অতি সামান্যই হবে। কিন্তু শ্রীশাস্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আমাদের দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে মোট টনেজ বৃদ্ধি হবে তিন লক্ষ টন।

প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় মোট ৬ লক্ষ টন লক্ষ্য রাখা হয়েছিল, কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয় নি। প্ল্যানিং কমিশনের ষ্টাডি গ্রুপের সাড়ে চার লক্ষ টনের সম্প্রসারণের সুপারিশ সরকার অনুমোদন করলেও, প্ল্যানিং কমিশন ৬০ কোটি টাকায় মাত্র তিন লক্ষ টনেজ সম্প্রসারণ সম্ভবপর বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই ৬০ কোটি টাকার ৫০ কোটি আসবে সরকারী মহল থেকে এবং বাকী ১০ কোটি টাকা আসবে বে-সরকারী মহল থেকে।

এই ঘোষণাকালে রেলমন্ত্রী অবশ্য স্বীকার করেছেন যে এতে ভারতীয় জাহাজ-শিল্প-মালিকদের মধ্যে কিছু অসন্তোষ হওয়া স্বাভাবিক এবং এজন্যে তিনি নিজেও দুঃখিত। কিন্তু অর্থসংস্থান ও কারীগরী সহায়তার কথাও আমাদের ভেবে দেখতে হবে। তবে তিনি বলেছেন যে, তাঁর এই ঘোষণাই যে চূড়ান্ত, তা নাও হতে পারে। যদি জাহাজশিল্পের মালিকেরা সাহসিকতার সঙ্গে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং অভীপ্সিত লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই উপনীত হতে পারেন, তাহলে প্ল্যানিং কমিশন হয়ত মোট টনেজের ও অর্থের বরাদ্দ বাড়াতে রাজী হবেন।

শ্রীশাস্ত্রীর ঘোষণা থেকে বিশেষ আশাব্যঞ্জক কিছু পাওয়া যায় না। এমন একটি শিল্প সম্পর্কে আরও সুচিন্তিত পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। বিশেষ করে, বিশাখাপত্তন ছাড়া আরও একটি জাহাজ তৈরীর কারখানা স্থাপনের কথা কেবল আলোচিতই হয়ে আসছে। এ সম্পর্কে রেলমন্ত্রী কোনই উল্লেখ না করে আরও হিধার সৃষ্টি করেছেন।

নূতন বীমার কাজে
বিপুল সাফল্য
১৯৫৪ সালে

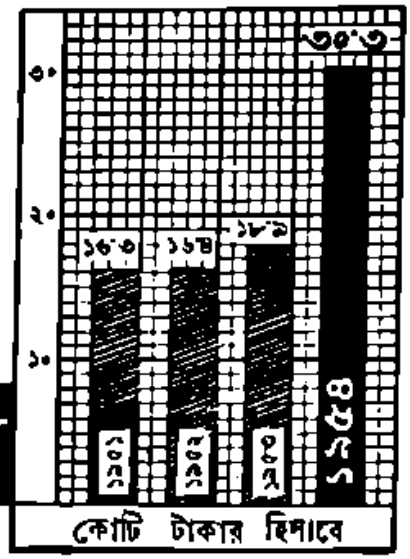

৩০ কোটি টাকার উপর

জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই হিন্দুস্থানের প্রতিষ্ঠা এবং গত ৪৮ বৎসর ধরিয়া জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপেই ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। আজ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়া ইহা নূতন গৌরব অর্জন করিয়াছে এবং দেশ ও দশের সেবায় কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার এক মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছে। এই সাফল্যের মূলে রহিয়াছে ত্রিবিধ নিরাপত্তার ভিত্তি :

★ *সুষ্ঠু ও সুচিন্তিত পরিচালনা*
★ *জনসাধারণের অবিচলিত আস্থা*
★ *লগ্নী ব্যাপারের নিরাপত্তা*

বোনাস আজীবন বীমায় ৪৭৷৷৷
মেয়াদী বীমায় ১৫৲

(প্রতি বৎসর প্রতি হাজার টাকার বীমায়)

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড্
হেড অফিস : হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা - ১৩

কিরণদা।

আজ এক বছর হোলো দীর্ঘ বিপ্লবী-জীবনের কাজ সাঙ্গ করে তিনি চলে গেছেন—আমাদের কিরণদা, অগ্নি-যুগের বাংলার অন্যতম পরিকৃৎ। 'পরিকৃৎ'—এই কথাটাই একটা বড় পরিচয়। কিন্তু আমাদের কিরণদা সম্পর্কে এই পরিচয়ই যথেষ্ট নয়; বলতে হয় মানবযাত্রীর অন্তহীন তীর্থপথে তিনি একজন চিরজাগ্রত সাত্ত্বিক পরিকৃৎ। সঙ্গীদল যখন দুঃখে, বেদনায়, বিহ্বল হয়েছে, তিনি তাঁর আদর্শের অরুণবহ্নি অম্লান রেখেছেন, অন্যেরা যখন পথশ্রমে ঘুমিয়ে পড়েছে, তিনি তখনও অতন্দ্র অধ্যবসায়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছেন। এই পথচিহ্নহীন মরুযাত্রার ত শেষ নেই, কত পথ চলা হোলো তার হিসাবও তাই রাখা সম্ভব নয়। শুধু চলাটাই সত্য। আজ তাঁর মৃত্যু-বার্ষিকীতে এই সত্যটাই আমাদের বিশেষ করে মনে হচ্ছে। মহত্ত্ব এবং একটা শুষ্ক ক্ষুদ্রতার মধ্যে যে মহত্ত্ব গোপন রাখার শক্তি—দুই-ই ছিল তাঁর অসাধারণ। তাই কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছেন যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ, তাঁরা ছাড়া বেশী কেউ তাঁকে ভাল করে জানবার সুযোগ পান নি। কিন্তু এর জন্য দুঃখ করা নিরর্থক; যাঁরা তাঁকে জেনেছিলেন তাঁদের মনেও তাঁর স্মৃতি ক্রমশঃ ক্ষীণতর হয়ে আসবে নিশ্চয়। ব্যক্তি থাকে না, তার স্মৃতিও মুছে যায়, কিন্তু কিরণদার মত অনলব্রত তাপসরা যে আলো জ্বেলে যান তা হয়ত একেবারে কোনদিন নেভেনা, হয়ত অভিযাত্রী মানুষের অন্ধকার অবচেতনার মধ্য থেকে এই সব অলক্ষ্য আলোর কিছু বিচ্ছুরিত রশ্মি তার সম্মুখের পথে বিকীর্ণ হতে থাকে এবং তাই তার চলা সম্ভব হয়। এই বিশ্বাস নিয়ে প্রণতি জানাই সেই অবিনশ্বর আলোক-উৎসের উদ্দেশে।

অভ্যর্থনা—

মাদাম সান-ইয়াৎ সেন আজ ভারতের অতিথি। স্বর্গত ডাঃ সান-ইয়াৎ সেন বিশ্ববিখ্যাত; নতুন চীন জাতির জনক হিসাবে চীনে তাঁর স্থান ভারতবর্ষে গান্ধীর বা সোভিয়েট রাশিয়ার লেনিনের সমান। চীনের ইতিহাসে এই ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জননায়কের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। কিন্তু মাদাম সান-ইয়াৎ সেন তাঁর স্ত্রী হিসাবেই শুধু শ্রদ্ধেয়া তাই নন, অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বিপ্লবী স্বামীর উপযুক্ত সহকর্মী হিসাবেও চীনের গত ত্রিশ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসে এঁর একটা বিশেষ স্থান আছে। বস্তুতঃ আধুনিক চীনের সংগঠনে এই মহীয়সী মহিলার দান অপরিমিত। ডাঃ সান-ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে যুগ-যুগান্তের অবসাদ কেটে গিয়ে চীনে যে অপূর্ব বৈপ্লবিক উদ্দীপনা স্ফূর্ত হয়ে উঠেছিল, তাঁর মৃত্যুর পর আবার তা ক্রমশঃ তিমিত হয়ে পড়তে থাকে। অবশেষে এক সময় এমনও আশঙ্কা করার কারণ ঘটেছিল যে জাতি হিসাবে চীনের আবার আত্ম-বিস্মৃতি ঘটেছে, ডাঃ সানের সাধনা ব্যর্থ হয়েছে। এ ইতিহাস অবশ্য সকলেরই জানা। যা সকলেরই হয়ত অত পরিষ্কার জানা নেই সে হচ্ছে এই যে রাষ্ট্রজীবনের সেই ব্যাপক মোহ ও বিভ্রান্তির মধ্যে যে কয়েকজন মানুষ ডাঃ সানের আদর্শের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস ও নিষ্ঠা নিয়ে সমস্ত বিশৃঙ্খলা ও আদর্শহীনতার সঙ্গে যুঝে চলে-ছিলেন এই মহীয়সী মহিলা তাঁদের অন্যতমা। এই

হিসাবে পৃথিবীর বিপ্লবী সমাজের কাছে মাসান সান-ইয়াৎ সেন বরেণ্য। তাঁর সাধনা আজ সাফল্যের পথে অগ্রসর হচ্ছে নতুন চীনের সৃষ্টি হয়েছে। ভারতবর্ষও বহুদিনের পরাধীনতার পর আজ নতুন করে নিজেকে গড়তে সুরু করেছে। চীন ও ভারতবর্ষ আবার নতুন করে পারস্পরিক মৈত্রী বন্ধন দৃঢ়তর করতে চেষ্টা করছে। এই প্রেক্ষাপটে মাদাম সান-ইয়াৎ সেনের ভারতে আগমন শুধু আনন্দের ও আমাদের পক্ষে গৌরবের কথাই নয়। এর একটা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনীয়তাও ছিল। মাদাম সান এদেশে আন্তরিকভাবে অভ্যর্থিত হবেন কোন সন্দেহ নেই, এবং আমরা আশা করি আমাদের নতুন জাতীয় জীবনের ভাল মন্দ সব দিক সম্বন্ধেই চিরদিনী বন্ধুর মত তিনি আমাদের আরো সচেতন করে তোলার চেষ্টা করবেন।

যুক্ত বিবৃতি

সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মিঃ বুলগানিন ও উচ্চতম সোভিয়েট শাসনপরিষদের সদস্য মিঃ ক্রুশ্চেভ প্রায় তিন সপ্তাহ যাবৎ ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ করেছেন, অতীত ও বর্তমানে ভারতের জীবনের নানাদিক পরিদর্শন করেছেন এবং বিশেষ করে দেখেছেন নদী-বাঁধ ও কলকারখানা—যেখানে ভাবী ভারতের ভিত্তি প্রস্তুত হচ্ছে। তাঁরা যেখানেই গেছেন, জনসাধারণ কর্তৃক উচ্ছ্বসিতভাবে সম্বর্ধিত হয়েছেন, এবং তাঁরাও সোভিয়েট জনসাধারণের পক্ষ থেকে ভারতের জনসাধারণের প্রতি গভীর সৌহার্দ্যের ভাব ব্যক্ত করেছেন। বিদায়ের প্রাক্কালে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুর সঙ্গে এক যুক্ত বিবৃতি তাঁরা প্রকাশ করেছেন। এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই বিবৃতিতে যা বলা হয়েছে সেটা আবশ্যক ও অতিথির পারস্পরিক সৌজন্যপ্রসূত মন-রাখা কথা নয়; দুটি প্রতিবেশী ও সহযোগী দেশের প্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়করা বিশ্বের সাম্প্রতিক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে যে মনোভাব পোষণ করেন তার এবং এই দুই দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ব্যাপারে পারস্পরিক কর্তব্যের একটা সুস্পষ্ট ঘোষণা। এই দিক থেকে এই যুক্ত বিবৃতি একটা রাজনৈতিক দলিল।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

এই দলিলে বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা সংক্ষেপে এই : (১) জেনেভায় চতুঃশক্তির পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠক ব্যর্থ হলেও সে ব্যর্থতাকে নিছক সাময়িক ব্যর্থতা বলে গণ্য করতে হবে এবং আলাপ আলোচনার দ্বারা মতবিরোধের অবসান ঘটাবার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। (২) আশা করা যাচ্ছে যে, নয়া-চীন ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি সাধনের জন্য দুই দেশের রাষ্ট্রদূতদের সাহায্যে যে আলোচনা সম্প্রতি সুরু হয়েছে তা সফল হবে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত নয়া চীনকে রাষ্ট্রসংঘে আসন না দেওয়া হবে ততদিন এশিয়ায় স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার বিঘ্ন থাকবেই। তবে আশা করা যায় যে, কয়েকটি সমস্যারও একটা সমাধান হয়ত অদূর ভবিষ্যতে হবে। (৩) দূর প্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কোরিয়া সমস্যার সমাধান করতে হবে, কোরিয়ার জনগণের মত অনুসারে তাদের নিজ রাষ্ট্র গঠন করতে দেওয়াই এই সমাধানের উপায়। (৪) এটা দুঃখের বিষয় যে ইন্দোচীনের সমস্যা সমাধানের জন্য জেনিভায় যে চুক্তি হয়েছিল তার সর্ত ঠিক মত পালিত হচ্ছে না এবং এই কারণে ভিয়েৎনাম ও লাওসে অকলে সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। (৫) আঠারোটি রাষ্ট্রকে একযোগে রাষ্ট্রসংঘের সদস্যভুক্ত করে নেওয়ার প্রস্তাবটি সমর্থন করা হচ্ছে এবং আশা করা যায় যে এ প্রস্তাব গৃহীত হবে। (৬) সর্বপ্রকার আণবিক ও পরমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন, পরীক্ষা ও ব্যবহার বিনাসর্তে বর্জন করা উচিত এবং প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস করা উচিত। (৭) বিভিন্ন অকলে যে জঙ্গী-গোঠ (military bloc) গড়ে তোলা হয়েছে তাতে আন্তর্জাতিক সন্দেহ ও তিক্ততা বৃদ্ধি পাবে এবং বিশ্বশান্তির ব্যাঘাত হবে, এই জন্য এই সব জঙ্গীগোঠের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে। (৮) ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে যে

অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত হোলো, এমনি সম্পর্ক অন্যান্য সমস্ত দেশের মধ্যেও ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হওয়া উচিত।

ভারত সোভিয়েট সম্পর্ক

ভারত ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে সেটা উপরে উল্লিখিত মূলনীতিগুলিরই কয়েকটির সম্প্রসারণ মাত্র। মূল নীতি হচ্ছে এই যে ভারত এবং সোভিয়েট রাশিয়া—এই দুই দেশই শান্তির পথে আত্মবিকাশ করতে চায় এবং সেই জন্য প্রত্যেকেই অপর সকল দেশের সঙ্গে শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন মনে করে। ভারত ও সোভিয়েটের মধ্যে এই সহযোগিতার সম্পর্ক ব্যাপকভাবে গড়ে তোলা হবে। এই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি এই দুই দেশেই পারস্পরিক সহানুভূতির সম্পর্ক নিবিড়তর করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে—এবং হবে। বাণিজ্যিক আদান প্রদান ছাড়াও যাতে নিয়মিতভাবে এই দুই দেশের বৈজ্ঞানিক, কারিগর, অর্থনীতিবিদ্, আইন সভার সদস্য, লেখক ও অন্য নানাবিধ সাংস্কৃতিক কাজে ব্যাপৃত ব্যক্তিরা সহজে একে অন্যের দেশে বেড়িয়ে প্রত্যেক দেশ নিজ নিজ রাজনৈতিক মতবাদ অনুযায়ী কেমন বিকশিত হচ্ছে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হবে।

শিল্পোন্নয়ন

ভারতকে উন্নতি করতে হলে সর্বাগ্রে চাই তার বৃহৎ শিল্পের উন্নয়ন। সোভিয়েট রাশিয়ার সহযোগিতায় মধ্যপ্রদেশের ভিলাইএ যে লোহার কারখানা গড়ে উঠছে, যুক্ত বিবৃতিতে তাতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে এবং এই রকম কার্যকরী সহযোগিতার ক্ষেত্র ক্রমশঃ প্রশস্ত করার চেষ্টা চলতে থাকবে তারও আভাষ দেওয়া হয়েছে। এই যুক্ত বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতার পদ্ধতি ও বিষয় সম্বন্ধে সরকারি বিশেষজ্ঞদের রচিত আরো একটি ঘোষণা প্রকাশিত হয়েছে। এই ঘোষণায় দেখা যাচ্ছে যে ভারতবর্ষ আগামী তিন বছরে রাশিয়া থেকে দশ লক্ষ টন ইস্পাত আমদানী করবে, এবং তা ছাড়া আরো নানাবিধ আবশ্যকীয় দ্রব্য আমদানী করতে পারবে। সোভিয়েট রাশিয়া ভারত থেকে প্রধানতঃ কাঁচা মাল এবং আরো কিছু কিছু জিনিস কিনবে। ভারত রাশিয়া থেকে যা আমদানী করবে তার মোট মূল্য যত হবে, রাশিয়াও মোটামুটি ভারত থেকে সেই মূল্যের জিনিষই নেবে। দ্বিতীয়তঃ এই সব জিনিষ পৌঁছে দেওয়া এবং নিয়ে যাওয়ার জন্য সোভিয়েটের পণ্যবাহী জাহাজ ব্যবহৃত হবে এবং ক্রমশঃ ভারতও যাতে তার নিজস্ব পণ্য-পোত গড়ে তুলতে পারে তার জন্য সোভিয়েটের সাহায্য পাবে। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, বিশেষ করে, এই শেষোক্ত বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পণ্যপোত ভারতের প্রায় নেই বলেই হয়। পণ্য বহনের জন্য ভারতকে বিদেশী পণ্যপোতের মালিকদের শরণাপন্ন হতে হয়। এর জন্য বিপুল অর্থ প্রতি বৎসর জাহাজ ভাড়া বাবদ বাইরে চলে যায়। শুধু তাই নয়, এই পরনির্ভরতার ফলে আমদানী রপ্তানীর ব্যাপারে ভারত সব সময় তার নিজস্ব নীতি অনুযায়ী কাজও করতে পারে না। সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি একটা ইতিপূর্বেও হয়েছিল। কিন্তু মাল আনা-নেওয়ার সুবিধার অভাবে সে চুক্তি বিশেষ কাজে পরিণত হয় নি। এখন ভারত যদি তার নিজস্ব পণ্যপোত সৃষ্টি করতে পারে তাহলে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তার বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের ব্যাপারেই শুধু সুবিধা হবে তাই নয়, ভারত থেকে রাশিয়ায় আশা যাওয়ার পথে আরো বহু বন্দরে এই সব জাহাজ ভিড়তে পারবে এবং ফলে আরো নানা দেশের সঙ্গে তার বাণিজ্যিক সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত সহজে সম্প্রসারিত হতে পারবে।

শান্তির পথ

আদান প্রদানের ব্যাপারে যে সব জিনিষের উল্লেখ করা হয়েছে, সেইগুলিই শেষ নয়। বরং সেগুলি নিয়ে এই সম্পর্কের সুরু বলা যেতে পারে। এই দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বমূলক সহযোগিতার জন্য আগ্রহই এই যুক্ত

বিস্তৃতির বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়। আরো লক্ষণীয় হচ্ছে এই যে এই আন্দোলনের পিছনে রয়েছে সারা পৃথিবীর মানুষের কল্যাণের জন্য একটা গভীরতর আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা ভারতের জনসাধারণেরও প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। তাই মিঃ বুলগানিন ও মিঃ ক্রুশ্চেভ এদেশের যেখানে যেখানে গেছেন সর্বত্র বিপুল ভাবে অভ্যর্থনা পেয়েছেন। ভারতের জনসাধারণ কম্যুনিষ্ট মতবাদ গ্রহণ করেনি, সুতরাং কুশল কম্যুনিষ্ট জননেতাকে এত সমর্থন করবার আগ্রহ তাদের সাধারণতঃ হবার কথা নয়। কিন্তু বস্তুতঃ কম্যুনিষ্ট বলে তারা সমর্থন করেছে এটাও সত্য নয়। তারা এইটুকু বুঝেছে যে সোভিয়েট রাশিয়ার এই নেতারা শান্তির পথে, সর্বমানবের কল্যাণের আদর্শের ভিত্তিতে প্রত্যেক জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ নিষ্কণ্টক করতে চাইছেন। মিঃ বুলগানিন ও মিঃ ক্রুশ্চেভকে সম্মান করে তারা এই আদর্শের প্রতি তাদের অন্তরের অনুরক্তি ও শ্রদ্ধেয়তা জানিয়েছে। আমাদের বিশ্বাস ভারতের জনসাধারণ গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে তাদের প্রত্যাশা বিফল হয়নি। ভারত ও রুষের মধ্যে আদান-প্রদান বিষয়ক ও অন্যান্য যা কিছু কথাবার্তা হয়েছে তার একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে শান্তির সঙ্গে আত্মবিকাশের এই আদর্শ। অন্যকে বঞ্চিত করে বা কাউকে জব্দ করে নিজ স্বার্থ সিদ্ধির বিন্দুমাত্র অভিপ্রায় কোথাও ব্যক্ত হয়নি। সোভিয়েট নেতারা তাঁদের তরফ থেকে যা বলেছেন সবই খুব স্পষ্ট এবং কোন কথাই কোন দুরভিসন্ধিপ্রসূত বলে মনে করবার কোন কারণ নেই, যদিও, দুঃখের বিষয়, কোন কোন দেশের নেতারা ও সংবাদপত্র এ সম্বন্ধে অনেক অপপ্রচার করেছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে কাশ্মীর ও গোয়ার কথা। সোভিয়েট নেতারা স্পষ্টই বলেছেন যে কাশ্মীর ও গোয়া ভারত রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কতকগুলি বৃহৎ শক্তি এ পর্যন্ত এই ব্যাপারে নানা কৌশলে ভারতের বিরোধিতা করছে। এই সব কৌশল অপকৌশলের মূলে রয়েছে দুরভিসন্ধি ও শঠতা, এবং যতদিন এই দুর্নীতি পরিবর্তিত না হবে, ততদিন বিভিন্ন দেশের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হবার সম্ভাবনা নেই। সোভিয়েট নেতারা এটা বুঝেছেন যে শান্তি ও সম্প্রীতি স্থাপিত করতে হলে শুধু কূটনৈতিক চালই যথেষ্ট নয়, মানুষের তথা জাতির ন্যায্য অধিকার স্বীকার করতে হবে। কাশ্মীর ও গোয়া সম্পর্কে তাঁরা অকুণ্ঠ ভাবে তাই করেছেন। এদিক থেকেও তাঁরা ভারতের জনসাধারণের অভিনন্দনের যোগ্য।

প্রাদেশিকতা ?

মধ্যপ্রদেশের নাগপুরে একটি বিরাট মেডিকেল কলেজ ও হাঁসপাতাল আছে। তার প্রতিষ্ঠাতা একজন বাঙালী —লেফটেনাণ্ট কর্ণেল এ, এন্, বসু। তিনিই ঐ কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। পূর্বে নাগপুরে ছিল একটি ছোট মেডিকেল স্কুল। ডাক্তার বসু জীবনের সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে ঐ কলেজটি গড়ে তোলেন। জার্মানি থেকে বহু অর্থ ব্যয়ে তিনি ওর প্ল্যান তৈরী করিয়ে আনেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর নামানুসারে ঐ কলেজের নাম করবার কথা হয়েছিল। একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠারও প্রস্তাব হয়েছিল। এখন পর্যন্ত তা হয়নি। একপ্রান্তে একটি ফোয়ারার নীচে প্রস্তর-ফলকে লিখে দেওয়া হয়েছে, প্রথম প্রিন্সিপাল এ, এন্, বসুর স্মরণে। শোনা যাচ্ছে, এখন তাঁর নামের পরিবর্তে অভয়ঙ্করের নামে হাঁসপাতাল ও কলেজটিকে চিহ্নিত করবার চেষ্টা হচ্ছে। ডাঃ বসু বাঙালী বলে নাকি স্থানীয় কেউ কেউ তাঁর নামে কলেজ ও হাঁসপাতালটির নামকরণের বিরোধী। এ কথা সত্য হলে দুঃখের বিষয়। যিনি লক্ষ লক্ষ টাকা ওর জন্যে দান করে নিজের স্বপ্নকে রূপ দিয়ে গেলেন, তাঁর উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষায় কারও আপত্তি থাকা উচিত নয়। প্রস্তর-ফলকটিতেও তাঁকে প্রিন্সিপাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতিষ্ঠাতা বলে উল্লেখ করা হয়নি।

পরিকল্পনা আয়োগ (Planning Commission)

মন্বন্তর নিবারণ সম্বন্ধে এক অনুসন্ধান কমিটি বসেছিল। এই কমিটির সভ্যমণ্ডলী এমন ভাবে নিযুক্ত হয়েছিল যে এর সুপারিশ সম্বন্ধে প্রথম হতেই কারও মনে কোন

সন্দেহ ছিলনা। এই কমিটি সম্প্রতি তার রিপোর্ট পেশ করেছে; তাতে বলা হয়েছে ১৯৬৮ সালের ১লা এপ্রিলের ভিতর ভারতবর্ষের সর্বত্র মদ্যপান নিবারক ব্যবস্থা (Prohibition) অবলম্বন করতে হবে। মদ্যপান যে ব্যক্তিগত জীবনে ও সামাজিক জীবনে বহু অমঙ্গল সাধিত করে, তাতে হয়ত বিশেষ দ্বিমত হবে না। স্থান বিশেষে বা স্বাস্থ্যের কোন বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পরিমিত মদ্যপান হয়ত ততটা অনিষ্টকর নয়—কিন্তু মোটের ওপর বলা চলে অবাধ মদ্যপান সমাজের অমঙ্গলই সাধন করে আসছে। তাই সামাজিক চরিত্র নীতির (Social Morality) দিক হতে মদ্যপান নিবারক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বলবার বিশেষ কিছু নেই, তাছাড়া ভারতীয় সংবিধানের ৪৭ ধারায় বলা হয়েছে যে ভারতীয় রাষ্ট্র স্বাস্থ্যের হানিকর মদ্যপান নিবারণের চেষ্টা অবলম্বন করবে।

কিন্তু এখানে প্রশ্ন হচ্ছে আইন করে বাধ্যতামূলক সর্বব্যাপক মদ্যপান নিবারণ সম্ভব কিনা? বোম্বে, মাদ্রাজ ও মধ্যপ্রদেশে এই প্রকার আইন আজ কয় বৎসর যাবৎই চালু হয়েছে। মাদ্রাজ বিভক্ত হওয়ার পর অন্ধ্ররা তা মদ্যনিবারক আইন সম্বন্ধে বেশ বিতর্কের উদ্ভব হয়। মদ্যপান নিবারক ব্যবস্থা অনুসন্ধানের জন্য অন্ধ্র গভর্ণমেণ্ট একটা কমিটি স্থাপন করেন। মদ্যপান নিবারক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করার জন্য ঐ কমিটি সুপারিশ করেছিল এবং এই বিতর্কের উপরই অন্ধ্রের প্রথম মন্ত্রীসভার পতন হয়। মধ্যপ্রদেশে মদ্যপান নিবারক ব্যবস্থার কঠোরতার কিছুটা হ্রাস করা হয়েছে। বোম্বের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এই ব্যাপারে অত্যন্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ; তাই এর বিরুদ্ধে কোন সমালোচনা বোম্বে রাজ্যে তিনি হতে দেন না, কিন্তু বোম্বের সাধারণ লোক প্রায় সকলেই জানে যে মদ্যপান নিবারক ব্যবস্থা বোম্বাই রাজ্যে সফল হয়নি। মদের চোরাই কারবার সেখানে প্রায় প্রকাশ্যেই চলছে। মদ্যপান নিবারণের ভার যে সব কর্মচারীদের উপর দেওয়া আছে তাদের সততা সম্বন্ধেও বিশেষ কোন আস্থা জন-সাধারণের মধ্যে নেই। এমন কথাও বোম্বাইতে শোনা যায় যে, কোন একটা বিষয়ে যদি সরকারী কর্মচারীদের আচরণের মধ্যে অসততা প্রশ্রয় পায় তাহলে সমস্ত শাসন ব্যবস্থার মধ্যেই সততার প্রতীরে তালন ধরতে থাকে কারণ, অসততা একটা সংক্রামক ব্যাধি। বোম্বাই জেলের বন্দীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক হবে মদ্যনিবারক আইন ভঙ্গের জন্য।

কাজেই যে সামাজিক চরিত্রনীতির জন্য মদ্যপান নিবারণ করার প্রশ্ন আসে তা যখন সাধিত হচ্ছে না বরং উল্টো উৎপত্তিই হচ্ছে তখন সমগ্র ভারতব্যাপী বাধ্যতা-মূলক মদ্যপান নিষেধক ব্যবস্থা কতটা সফল হবে এবং মোটেই তা করা উচিত কিনা তা ভাববার বিষয়।

কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতির মধ্যে ও প্রতিজ্ঞাপত্রে মদ্যপান নিবারণের উল্লেখ অনেক বৎসর যাবৎ চলে এসেছে। মহাত্মা গান্ধী মদ্যপান সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠোর মত পোষণ করতেন এবং তাঁরই আগ্রহে কংগ্রেসের মধ্যে এই বিষয় এতটা প্রাধান্য পেয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর সামাজিক ও আর্থিক মতবাদই স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেসের সামাজিক ও আর্থিক মত বলে গণ্য হ'ত। আমরাও ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর আর্থিক ও সামাজিক মতের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা পোষণ করি কিন্তু কেবল গান্ধীজীর প্রতি বা তাঁর মতের প্রতি শ্রদ্ধার বশে তাঁর মতকে আজ চালু করা বুদ্ধিমানের কাজও হবে না এবং গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধা দেখানও হবে না।

তাঁরই নির্দেশে লবণের প্রতি শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে এবং তার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার বছরে ১০।১২ কোটি টাকার রাজস্ব হারিয়েছে। অথচ সাধারণ ক্রেতা এতে মোটেই লাভবান হয়নি, কেননা চতুর ব্যবসায়ীগণ মাঝখান থেকে ঐ টাকা আত্মসাৎ করছে। গান্ধীজী যে উদ্দেশ্যে লবণ কর রদ করতে বলেছিলেন তা সফল হয়নি। আমাদের আশঙ্কা মদ্যপান নিষেধে গান্ধীজীর যা উদ্দেশ্য ছিল তা বাধ্যতামূলক সরকারী ব্যবস্থায় সফল হচ্ছে না। তিনি এই বিষয়ে একবার লিখেছিলেন "I suggest a larger and constructive side to prohibition.

People drink because of the condition to which they are reduced. It is the factory labourers and others who drink. They are forlorn, uncared for and they take to drink."

অন্যত্র তিনি লিখেছেন, "They forget, lasting and healthy deliverence comes from within i.e., from self purification. Constructive workers make legal prohibition easy and succesful even if they do not pave the way for it."

তিনি বলেছেন যে, শ্রমিকদের মদ্যপান থেকে নিবারণ করবার জন্য তাদের কারখানার সামনে চিত্ত বিনোদের জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে ক্লান্ত শ্রান্ত শ্রমিক মদ্যপানের মধ্য দিয়ে চিত্ত বিনোদনের প্রয়োজন সম্পূর্ণ করতে পারে। অন্যত্র তিনি বলেছেন, "The work in connection with the liquor habit has got to be personally done by us. The utmost that the govt. can do or be made to do in this respect is to seize the toddy licences, but it can hardly win the drunkard from the ill habit That part of the work will still have to be undertaken by private effort."

তিনি যে অবস্থা তাঁর এই সকল উক্তির মধ্য দিয়ে আশা করছেন তার কোন ব্যবস্থা আজও সমাজে নেই। যে তিন চারটি রাজ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়েছে সেখানে মদের চোরাই কারবার যে চলছে তার প্রধান কারণ গান্ধীজীর পরিকল্পিত ব্যবস্থা ঐ সকল রাজ্যে প্রবর্তন করা হয়নি, অথচ ভারতব্যাপী মদ্য নিবারণ ব্যবস্থা অবলম্বন করলে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের বার্ষিক অর্থ লোকসান হবে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তাতে অন্তত দুই হাজার বা আড়াই হাজার কোটি টাকা ঘাটতি পড়ে। মদ্যপান নিবারণ ব্যবস্থার ফলে এই ঘাটতির পরিমাণ আরও দু'শো কোটি টাকা বেড়ে যাবে। প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কার্যের জন্য এই টাকা যে কি করে সংগ্রহ হবে তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তান্বিত। তার উপরে এমনি একটা সন্দেহজনক ব্যবস্থার হাত দিয়ে আরও দু'শো কোটি টাকার ঘাটতি বাড়ান মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। আশা করি পরিকল্পনা আয়োগ ও কেন্দ্রীয় সরকার এসব বিষয়ে চিন্তা করে কাজে অগ্রসর হবেন। গান্ধীজীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অশিক্ষিত, দরিদ্র শ্রমিক ও কৃষকদিগকে তাড়ি ও বিভিন্ন প্রকারের দেশীয় মদ্যপান থেকে বিরত করা। তার জন্য যে সব গঠনমূলক কাজের কথা তিনি বলেছেন সেদিকে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের ও কংগ্রেস কমিটির দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

শুদ্ধিসংশোধন : মন্দিরা'র গত কার্তিক সংখ্যার ৫৬০ পৃষ্ঠায় "প্রথম শীতের চিঠি" শীর্ষক কবিতাটির লেখক শ্রীঅনিলকুমার ঘোষের স্থলে শ্রীঅনিলকুমার রায় হবে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

মন্দিরা

অষ্টাদশ বর্ষ পৌষ—১৩৬২ নবম সংখ্যা

অমৃতলাল রায়

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত হইয়াছে। আমেরিকার কর্মব্যস্ত নিউইয়র্ক নগরের কর্মকোলাহল যেন শ্রান্ত হইয়াছে—একেবারে শান্ত হয় নাই। একটি দীন আবাসে শয্যায় শয়ন করিয়া এক জন বাঙালী যুবক আপনার অবস্থা চিন্তা করিয়া আতঙ্কানুভব করিতেছিল। তাহার শরীর রুগ্ন—তাহার সম্মুখে অনাহারে মৃত্যুর বিভীষিকা। তাহার নয়নে নিদ্রার স্পর্শ আসিতেছিল না—সে ভাবিতেছিল। কত আশা লইয়া সে বিদেশে আসিয়াছিল—এই কি তাহার পরিণতি? প্রবাসে সে কি অনাহারে থাকিবে? কয়দিন পূর্ব্বে সে যে সামান্য অর্থ লইয়া আমেরিকায় আসিয়াছিল, তাহা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। আমেরিকায় আসিয়াই সে ব্রঙ্কোনিউমোনিয়ায় শয্যাশায়ী হইয়াছিল—শরীর এখনও দুর্ব্বল। কিন্তু দরিদ্রের বিশ্রামের অবসর কোথায়? যেমন করিয়াই হউক তাহাকে অর্জ্জন করিতে হইবে। সে স্থির করিল পরদিন প্রথমে যে কাজ পাইবে তাহাই করিবে। প্রবাসে অনাহারে মৃত্যুই কি তাহার নিয়তি?

যুবকের নাম—অমৃতলাল রায়।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পিতৃগৃহে—গরিফা গ্রামে অমৃতলালের জন্ম হয়। ২৪ পরগণার গরিফা গ্রামে দেওয়ান রামকমল সেনের ও তাঁহার পৌত্র কেশবচন্দ্র সেনের এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পৈতৃক বাস। অমৃতলালের পিতা মধুসূদন হুগলী কলেজে সিনিয়র পাঠান্তে কিছুদিন কলিকাতায় নীলস ফ্রী কলেজে শিক্ষকের কাজ করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে চাকরী লইয়া এলাহাবাদে গমন করেন এবং তথা হইতে হাওড়ায় বদলী হইয়া আসিয়া কিছুদিন সপরিবারে শালকিয়ায় বাস করেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে হাওড়া হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অমৃতলাল কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। তিনি যখন দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তখন ওল্ডিপাড়ার উমানারায়ণ সেনের প্রথমা কন্যার সহিত অমৃতলালের বিবাহ হয়। উমানারায়ণ তখন কলিকাতার কোন য়ুরোপীয় সওদাগরী অফিসে বেনিয়ান। এফ্ এ পাশ করিয়া ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে অমৃতলাল কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। পরবৎসর অমৃতলাল ডাক্তারী বিদ্যা লাভের জন্য এডিনবরায় যাইবেন স্থির হয়। পিতা

মধুসূদনের বৃহৎ পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করিয়া পুত্রের বিদেশে শিক্ষা লাভের ব্যয় নির্বাহ করিবার সামর্থ্যই ছিল না। স্থির হয়, পিতা সে ব্যয়ের কতকাংশ মাত্র দিবেন—শ্বশুর অধিকাংশ দিবেন। সেই ব্যবস্থা হইলে অমৃতলাল বিদেশে গমন করেন। কোন কারণে উমা-নারায়ণের মনে হয়, জামাতা পাঠে আবশ্যক মনোযোগ দিতেছেন না এবং অকারণ অধিক অর্থ চাহিতেছেন। উভয়ের মধ্যে যে মনোমালিন্যের উদ্ভব হয়, তাহার জন্য অভিমানী ও আত্মসম্মান সম্বন্ধে সচেতন অমৃতলাল আর শ্বশুরের সাহায্য লইতে অসম্মত হয়েন এবং যখন তিনি আর অধ্যয়ন করিবেন না, তখন পিতার নিকট হইতেও আর সাহায্য লইবেন না—জানাইয়া দেন। এই অবস্থায় আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কাহাকেও না জানাইয়া ডাচ ষ্টীমারে জাহাজের ডাক্তারের সহকারীর কাজ লইয়া কাজের বিনিময়ে বিনা ভাড়ায় তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আমেরিকা যাত্রা করেন। জনারণ্য নিউইয়র্ক শহরে পৌঁছিবার পর এক সপ্তাহ মধ্যে তিনি ফুসফুসের প্রদাহে পীড়িত হইয়া পড়েন। রোগমুক্ত হইতে না হইতে অর্থাভাবে তাঁহাকে একটি সীসের কারখানায় কুলীর কাজ গ্রহণ করিতে হয়। সেই কায়িক শ্রমের কাজে সাড়ে তিন মাস কাটাইবার পর তিনি আর একটি চাকরী সংগ্রহ করেন। ডক্টর লুইস ও তাঁহার পত্নী একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতেছিলেন। সামান্য বেতনে ও আহারের ব্যবস্থায় অমৃতলাল সেই পত্রে চাকরী গ্রহণ করেন। লুইস দম্পতির ব্যবহার অত্যন্ত মধুর ছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের ব্যবসাবুদ্ধি ছিল না—ফলে এক বৎসরেই পত্রের আয়ুষ্কাল শেষ হয়। অমৃতলাল আবার বেকার হন। সেই সময়ে তিনি নানা সংবাদপত্রে রচনা পাঠাইয়া কিছু কিছু অর্থ উপার্জন করিয়া কোনরূপে দিন কাটাইতে থাকেন। সম্বল কেবল—সুদিনের আশা। 'সান' পত্রে তিনি গীতার কোন ইংরেজী সংস্করণের সমালোচনা করিয়া যে প্রবন্ধ দেন, তাহা প্রকাশের অযোগ্য বিবেচিত হয় বটে, কিন্তু ঐ পত্রের সহকারী সম্পাদক তাঁহাকে ভারতে খৃষ্টান ধর্মযাজকদিগের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ দিতে বলেন। অমৃতলাল পরদিনই ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ দেন এবং তাহার জন্য যে পারিশ্রমিক লাভ করেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী দুই সপ্তাহে ঐ পত্রে ভারত সম্বন্ধীয় দুইটি প্রবন্ধ লিখিয়াও তিনি উপার্জন করেন। এদিকে অমৃতলাল একটি ছাপাখানায় টাইপ সেটারের (অর্থাৎ কম্পোজিটার) কাজ গ্রহণ করেন ও প্রায় দেড় বৎসর সেই কাজ করেন। সেই সময়ে তিনি একাধিক সংবাদপত্রাদিতে প্রবন্ধ দিতেন। 'নর্থ আমেরিকান রিভিউ' পত্রের সহকারী সম্পাদক কেমল রেডপাথ এই সময় অমৃতলালের প্রতি আকৃষ্ট হয়েন এবং ঐ পত্রে প্রকাশিত অমৃতলালের ভারতে বৃটিশ শাসন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এদিকে অমৃতলালের আত্মীয়স্বজন ২ বৎসরের অধিক কাল তাঁহার কোন সংবাদ পায়েন নাই। ঘটনাক্রমে ব্রাহ্ম প্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সেই সময়ে (১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে) আমেরিকায় গমন করেন। সে বিষয়ে তিনি স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ববর্তী। প্রতাপবাবু পরিষ্কার অমৃত-লালের পরিবারের প্রতিবেশী ছিলেন। প্রতাপচন্দ্র অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে বিদেশে অমৃতলালকে পাইয়া তাঁহার পিতার নিকট সে সংবাদ পাঠাইলেন। মধুসূদন তখন জামালপুরে (মুঙ্গের) রেল অফিসে একটি বিভাগে হেড ক্লার্ক।

প্রতাপচন্দ্রের প্ররোচনায় অমৃতলাল স্বদেশে ফিরিতে সম্মত হইলেন। তখন 'নর্থ আমেরিকান রিভিউ' পত্রে তাঁহার বৃটিশ শাসন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। হয়ত অমৃতলালের মনেও তখন স্বজনদিগের সহিত সম্মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা উদ্রিক্ত হইয়াছিল।

অমৃতলালের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন তাঁহার পরিবারস্থ-দিগের—বিশেষ তাঁহার পিতার—পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের কারণ হইল না। কারণ হিন্দু সমাজ—বিশেষ, সমাজের ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সম্প্রদায়দ্বয়—'বিলাত ফেরত'—দিগকে বিনা প্রায়শ্চিত্তে গ্রহণ করিতে অসম্মত। বিদেশ হইতে

আগত কাহাকেও সমাজে গ্রহণ করিতে হইলে ব্রাহ্মণদিগের সম্মতির প্রয়োজনও হইত; প্রায়শ্চিত্তও তখন ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল। সেই জন্য পুত্রের প্রায়শ্চিত্তে মধুসূদনকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হয়। তিনি তাঁহার চাকরীর "প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের" সঞ্চিত অর্থ অসময়ের জন্য রাখিয়া ছিলেন। তাহা হইতেও ঋণ করিতে হয়। এই ব্যাপারে তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ৫৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

এই স্থানে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহারের উল্লেখ করিলে, আশা করি, তাহা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র নানা বিষয়ে তাঁহার সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন—সমাজে উন্নতির আদর্শ প্রতিষ্ঠায়ও উৎসুক ছিলেন। তিনি "বিলাত ফেরত"-দিগকে সমাজে গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ শ্যামাচরণ তাহার বিরোধী ছিলেন। সেই জন্য বঙ্কিমচন্দ্র এক দিন অমৃতলালকে কাঁঠাল পাড়ায় তাঁহার পৈত্রিক গৃহে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন ও শ্যামাচরণ বাবুকে বলেন, তিনি অমৃতলালকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন—হয়ত তাহাতে আপত্তি হইবে—তিনি কি অমৃতলালকে আসিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইবেন? ভ্রাতৃবৎসল শ্যামাচরণ বলেন, "সে কি! খেতে নিমন্ত্রণ করেছ—আবার আসতে বারণ করে পাঠাবে! সে কি কখন হয়?" বঙ্কিমচন্দ্রের কৌশলে অমৃতলাল সমাজে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া আহারে পরিতৃপ্ত হইলেন। সমাজের অনেক আপত্তি দূর হইয়া গেল।

পিতার মৃত্যুতে বিরাট পরিবারের ভার জ্যেষ্ঠ পুত্র অমৃতলালকে গ্রহণ করিতে হইল। সংসারে তখন বিধবা মাতা, অমৃতলাল ও তাহার পত্নী, পাঁচ ভাই ও এক ভগিনী। ভ্রাতৃগণের মধ্যে ২জন তখন কলেজে ও ৩জন স্কুলের ছাত্র—ভগিনীর বয়স ২ বৎসর মাত্র। সম্বল কেবল পিতার "প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের" টাকা। ঋণের পরিমাণ—১৫ হাজার টাকা। তাহা শোধ করিয়া মাত্র ৪ হাজার টাকা অবশিষ্ট থাকিল।

তখন শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি চন্দননগর হইতে 'বিশ্বার' নামক একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতেন। তাহাতে অল্প বেতনে একটি চাকরী পাইয়া অমৃতলাল তাহাই গ্রহণ করিলেন। তাহার পরে তাঁহার 'অমৃত বাজার পত্রিকা'র সম্পাদকীয় বিভাগে চাকরী জুটিল। 'অমৃত বাজার পত্রিকা' তখনও সাপ্তাহিক পত্র।

কিন্তু এইরূপ কার্যে অমৃতলালের আয় যেমন অল্প হইতেছিল—তাঁহার তেমনই তৃপ্তি হইতেছিল না। সেই-জন্য ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি পরিবারের যে কিছু অর্থ ছিল তাহার সহিত মাতার অলঙ্কার বিক্রয়লব্ধ অর্থ যোগ করিয়া একটি ছাপাখানা কিনিলেন ও আপনার একখানি সাপ্তাহিক ইংরেজী পত্র প্রচার আরম্ভ করিলেন। সে পত্রের নামকরণ হইল—'হোপ'—বহুজনের পত্র। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক লাবুশিয়ার যখন তাঁহার 'ট্রুথ' পত্র প্রচারের সঙ্কল্প করেন, তখন সে সম্বন্ধে তিনি তাঁহার কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন—অতঃপর লাথি মারিবার জন্য আমি আপনার এক জোড়া জুতাই ব্যবহার করিব। অমৃতলাল, বোধ হয়, তাহাই মনে করিয়াছিলেন।

অমৃতলালের রচনাগুণে 'হোপ' পত্রের প্রচার বাড়িতে লাগিল। ভাগ্যক্রমে সেই সময় একটি ঘটনায় সংবাদপত্রের সুযোগ উপস্থিত হইল। ইংরেজ সরকার ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে যখন সহবাস সম্মতি আইন বিধিবদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন দেশে প্রবল আন্দোলন আরম্ভ হইল। তাহার পূর্বে ইংরেজ সরকার এ দেশের লোকের সামাজিক বা ধর্ম বলিয়া বিবেচিত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার লইয়া আইন প্রণয়ন করেন নাই। পূর্বে যে সতীদাহ নিবারণ জন্য আইন হইয়াছিল, তাহাতেও শাস্ত্রের তর্ক উঠিয়াছিল। তাহার পরে ঈশ্বর-চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বিধবার বিবাহ সিদ্ধ করিবার জন্য যে আইন হয়, তাহাও বাধ্যতামূলক নহে—ইচ্ছাসাপেক্ষ। এবার সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল।

এমন কি বিদ্যাসাগর মহাশয় ও কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারক রমেশচন্দ্র মিত্রও প্রস্তাবিত আইনের প্রতিবাদ করিলেন। হিন্দু সমাজে যে আন্দোলন উত্থিত হইল, পূর্বে কখন সেরূপ আন্দোলন দেখা যায় নাই। বাঙ্গালার সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব 'বঙ্গবাসী' পত্রের হস্তে আসিল এবং 'বঙ্গবাসীতে' প্রকাশিত কয়টি প্রবন্ধের জন্য সরকার "বঙ্গবাসীর" বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ উপস্থাপিত করিলেন। এ দেশে তাহাই সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে প্রথম রাজদ্রোহের মামলা। সেই আন্দোলনের ফলে সাপ্তাহিক পত্র 'অমৃত বাজার পত্রিকা' দৈনিকে পরিণত হয়। আইনের প্রতিবাদে কলিকাতার গড়ের মাঠে যে সভা হয়, তত বড় সভা পূর্বে তখন হয় নাই। কংগ্রেস তাহার পাঁচ বৎসর মাত্র পূর্বে —ইলবার্ট বিলের ফলে সৃষ্ট আন্দোলনের পরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন পরোক্ষভাবে কংগ্রেসকে প্রস্তাবিত আইন সমর্থন করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; আশা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা হইলে সরকার কংগ্রেসের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া লইবেন। তাহার পূর্বে বড়লাট লর্ড ডাফরিণ কংগ্রেসকে তুচ্ছ—microscopic minority ও big jump into the unknown বলিয়াছিলেন। অমৃতলালের 'হোপ' সেই আন্দোলনের আরম্ভে অগ্রসর হইতে দ্বিধা বোধ করিল না—বিদেশী সরকারের পক্ষে প্রজার সামাজিক ও ধর্ম্ম ব্যাপারে হস্তক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল। তখন ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্র কলিকাতায়—'অমৃত বাজার পত্রিকা', 'বেঙ্গলী', 'হিন্দুপেট্রিয়ট', 'রইস ও রায়ৎ' এবং 'ইণ্ডিয়ান নেশান।' তখন 'হোপের' প্রচারসংখ্যা প্রায় ১২শত হইল। তাহা পূর্বোক্ত পত্রগুলির প্রচারসংখ্যার তুলনায় অল্প নহে। তখন লোক দৈনিক পত্রের আদর করিতে পারিত না। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, তাঁহার 'বেঙ্গলী' পত্রের একজন মুসলমান পাঠক তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, তিনি সপ্তাহ ধরিয়া 'বেঙ্গলীর' এক সংখ্যা পাঠ করেন। সে সময়ে 'হোপ' যে আদর লাভ করিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

'হোপ' পত্রের প্রচারের ও আদরের ফলে অমৃতলাল একটি কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। তাহাই তাঁহার স্থায়ী কীর্ত্তি—বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে নামে প্রথম স্বদেশী রেলওয়ে প্রতিষ্ঠা। তাহার ইতিহাস অবিস্মরণীয়।

তিনি যখন 'হোপ' পত্র শক্তিশালী করিতেছেন, সেই সময় অমৃতলালের সহিত দুই জন ভদ্রলোকের পরিচয় হয়—অন্নদাপ্রসাদ রায় ও শ্রীরাম চন্দ্র ঘোষ। অন্নদা বাবু এঞ্জিনিয়ার—তখন কাজ হইতে অবসর লইয়াছেন। শ্রীরাম বাবু বাঙ্গালা সরকারের দপ্তরে চাকরীয়া। এই তিন জন পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, প্রধানতঃ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীদিগের নিকট হইতে অল্প অল্প টাকায় মূলধন সংগ্রহ করিয়া হুগলী জিলায় একটি রেলপথ প্রতিষ্ঠিত করিবেন—বাঙ্গালীর দ্বারা সেই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইবে। তাঁহারা স্থির করিলেন, পরিকল্পিত রেলপথ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলপথের মগরা ষ্টেশন হইতে শাখাপথে সীমান্ত ষ্টেশন তারকেশ্বর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইবে। তত দিনে অমৃতলাল যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাতে হুগলী জিলায় ও কলিকাতার কয়জন সম্ভ্রান্ত অধিবাসী তাঁহার প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানে অগ্রণী হইতে সম্মত হইলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ১০ টাকা মূলের ৫শত, নন্দলাল গোস্বামী ৫শত, ঈশানচন্দ্র মিত্র ২৫০ খানি, কানাই লাল খান ২৫০ খানি ও ব্রহ্মমোহন সেন ১৫৭ খানি শেয়ার ক্রয় করিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে যথানিয়মে ইহার প্রস্তাবপত্র প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে ইহাতে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করা হইল। তখন দুর্গাপূজার ছুটি। অমৃতলালের ভ্রাতারাই ছাপাখানায় প্রস্তাবপত্র ছাপিবার কাজ করিতেন। তাঁহার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতার বয়স তখন দশ বৎসর মাত্র।

'হোপ' পত্রে এই প্রস্তাবিত রেলের বিষয় বিশেষ-

ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর হুগলী জিলাবোর্ড রেল কোম্পানীর সহিত চুক্তিতে স্বাক্ষর দিলেন এবং এক বৎসরের মধ্যে ৮০ হাজার শেয়ারের মধ্যে ৭১ হাজার টাকার শেয়ার বিক্রীত হইয়া গেল। পূর্বে যাঁহাদিগের নাম লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা ব্যতীত যাঁহারা অধিক সংখ্যক শেয়ার কিনিলেন তাঁহাদিগের নাম—অবসর প্রাপ্ত রেলওয়ে এঞ্জিনিয়ার রামপতি মুখোপাধ্যায় (২৬০ খানি), নগেন্দ্রনাথ বসু (৪ শত খানি) চক্রধরপুরের রেলে মাল বোঝাই ও খালাসের ঠিকাদার কেশবলাল (১৫০ খানি)। রামপতি বাবু বিস্তৃত সরকারী রেলপথ রচনার সময় কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট সব শেয়ার মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীরা দুই চারিখানি করিয়া কিনিয়াছিলেন। এক বৎসরের মধ্যে, সে সময়ে, এত শেয়ার বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করা সাধারণ কার্যদক্ষতার পরিচায়ক নহে।

তখন বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ে যৌথ কারবাররূপে রেজেষ্টারী করা হইল। অমৃতলাল এতদিন বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিয়াছিলেন—তাঁহাকে মাসিক ২শত টাকা বেতনে সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করা হইল।

অমৃতলাল বেঙ্গল উইভিং অ্যাণ্ড স্পিনিং মিল নামক আর একটি স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার বন্ধু হাইকোর্টের উকীল হেমচন্দ্র মিত্র বোম্বাইয়ের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিবণ ইব্রাহিমের সহিত একযোগে এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সে কলে যে সুতী ও শাড়ী হইত তাহা এত মোটা যে সে প্রতিষ্ঠানে বাঙ্গালীর আগ্রহ আকৃষ্ট করা সম্ভব হইল না। সেই কারণে এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে এক ভ্রাতার মৃত্যুতে অমৃতলালের কার্য্যে আগ্রহের অভাবে কল অল্পদিনে অচল হয়।

আরও একটি অনুষ্ঠান অমৃতলালের ভ্রাতৃশোকজনিত অবসন্নতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি তাঁহার বন্ধু সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে 'হিন্দু ম্যাগাজিন' নামক সাময়িক পত্র প্রচার করিতেছিলেন। এই সুরেন্দ্রনাথ পরে প্রেমানন্দ ভারতী হইয়া আমেরিকায় যাইয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় পুস্তক বিখ্যাত মনীষী টলষ্টয়ের মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছিল।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ এই পাঁচ বৎসর 'হোপের' খ্যাতিকাল। তখন প্রেমানন্দ ভারতী ও "ডন সোসাইটির" সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রায় প্রতিদিন 'হোপ' কার্যালয়ে যাইতেন: আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর জীবনী লেখক দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং অমৃতলালের পুরাতন বন্ধু কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের বিখ্যাত অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত প্রায়ই তথায় যাইতেন। হিন্দু সমাজের মুখপত্র 'বঙ্গবাসীর' পরিচালকগণও অনেক সময় অমৃতলালের সঙ্গে যাইতেন—অমৃতলাল বসু ও অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী তাঁহাদিগের সহযাত্রী ছিলেন। আর এক জনের নামও উল্লেখ করিতে হয়—তিনি ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত। পরবর্ত্তীকালে প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও 'পুরাতন প্রসঙ্গের' লেখক বিপিনবিহারী গুপ্ত তখন যুবক: তিনি 'হোপের' নিয়মিত লেখক ছিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল কয় বৎসর 'হোপের' সম্পাদকীয় বিভাগে ছিলেন এবং শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী 'হোপে' প্রথম সাংবাদিকের কাজ শিক্ষা করেন। ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে যখন কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তখন এলাহাবাদের পণ্ডিত অযোধ্যা নাথ প্রমুখ বহু প্রতিনিধি অমৃতলালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

কিন্তু সাংবাদিকরূপে সাফল্য ও ভারতে প্রথম স্বদেশী রেল কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতার খ্যাতি—অমৃতলালের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে পারিল না। তিনি আহার ও পরিধেয় সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু তাঁহার দান সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনার অভাব তাঁহাকে বিব্রত করিত। যখন তিনি স্বয়ং অভাবগ্রস্ত তখনও তিনি বন্ধুদিগের প্রয়োজনে তাঁহাদিগকে অকাতরে অর্থ দিয়া

সাহায্য করিতেন। রাস্তায় পথে কোন সাধু বা সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তিনি পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত মূল্যবান শাল তাহাকে দিতেন। ভ্রাতার মৃত্যুর পরে অমৃতলালের সাধু-সন্ন্যাসী দিগের প্রতি আকর্ষণ অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সুযোগ বুঝিয়া বহু সন্ন্যাসী, বৈরাগী প্রভৃতির সমাগম হইতে লাগিল। তাঁহাদের মধ্যে এক জন—অক্তুলকৃষ্ণ চম্পটি। ইনি এক সময়ে মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশনে শিক্ষক ছিলেন; পরে গৈরিকধারী হইয়া অদ্ভুত সম্প্রদায়ের উন্নতি-সাধন জন্য কলিকাতার মাণিকতলার ডোম পাড়ার ডোমদিগের মধ্যে বাস করিতেন। পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের শিষ্য "সান্ন্যাল মহাশয়" ও মগরার নিকটবর্তী চন্দ্রহাটির স্বামী সচ্চিদানন্দ যেমন অমৃতলালের নিকট আসিতেন, তেমনই আবার কতকগুলি ভণ্ড সন্ন্যাসীর বেশে আসিতে থাকে।

ব্যবসাবুদ্ধির অভাবে 'হোপ' দিন দিন অবনতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে। মাতার অলঙ্কারের মধ্যে অধিকাংশ ছাপাখানা ক্রয়ের সময় বিক্রয় করিতে হইয়াছিল—যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহাও ১৮৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে এক ভ্রাতার রোগের জন্য বিক্রয় করিতে হইল। তখন অমৃতলালকে স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয় করিতে হইল। মা যতক্ষণ পারিলেন, পুত্রবধূর অলঙ্কার রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু সরলা পুত্রবধূ অনেক সময় শ্বাশুড়ীর অজ্ঞাতে স্বামীকে আপনার অলঙ্কার দিতেন। টাকার প্রয়োজন বাড়িয়া চলিল। ক্রমে ঋণ বাড়িতে লাগিল। 'হোপ' লাভজনক মনে করিয়া ঋণদাতারা ঋণ দিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ঋণের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকায় দাঁড়াইল। এই সময় কনিষ্ঠা ভগিনীর বিবাহের জন্য আরও ঋণ গ্রহণ করা হইল। ঋণের ভার দুর্বহ হইয়া দাঁড়াইল।

এই সময় বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলের প্রধান কার্য্যালয় কলিকাতা হইতে মগরায় স্থানান্তরিত হইল। ফলে উত্তমর্ণদিগের অবিরাম তাগাদা হইতে অব্যাহতি লাভ ঘটিল বটে, কিন্তু এক দিকে অমৃতলাল ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইলেন, আর এক দিকে তাঁহার সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যে অবহেলা অনিবার্য্য হইল। আশা নিরাশায় পর্য্যবসিত হইল—১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে ১০ বৎসর পরিচালনার পরে 'হোপ' বন্ধ হইয়া গেল।

ছাপাখানা প্রভৃতি বিক্রয় করা হইল: কিন্তু তাহাতে ঋণের অতি সামান্য ভাগ পরিশোধ করা সম্ভব হইল। এদিকে আজমীর হইতে সংবাদ আসিল—তথায় অমৃতলালের এক বিকৃতমস্তিষ্ক ভ্রাতা অতর্কিত ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। অমৃতলাল সেই শোকে কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি আর্থিক হিসাবে সর্ব্বস্বান্ত ও ভগ্নস্বাস্থ্য। কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিতে হইল। দুইটি ভ্রাতাকে কলেজের ছাত্রাবাসে দেওয়া হইল—স্ত্রীকে তাঁহার দুই কন্যা ও এক পুত্র লইয়া পিতৃগৃহে যাইতে হইল। মাতা ও কনিষ্ঠা ভগিনীকে পূর্ব্বেই পূর্ব্ব বিভাগে চাকরিয়া এক ভ্রাতার নিকট আজমীরে পাঠান হইয়াছিল। অমৃতলাল কলিকাতা হইতে মগরায় গমন করিলেন এবং পরে ২০ বৎসরেরও অধিক কাল অবহেলিত গরিকার সংস্কারাভাবে জীর্ণ গৃহে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ ম্যালেরিয়ার আক্রমণ ফলে অমৃতলালের পক্ষে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলের কাজ করা অসম্ভব হইয়া উঠায় তিনি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করিলেন।

পাওনাদারদিগের তাগাদায় অতিষ্ঠ ও রোগে জীর্ণ হইয়া অমৃতলাল লক্ষ্ণৌ নগরে গমন করিলেন। তথায় তাঁহার দুই জন বাল্যবন্ধু ছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়া ও দুশ্চিন্তা হইতে কিছু অব্যাহতি পাইয়া অমৃতলাল লক্ষ্ণৌ সহরে অল্পদিনের মধ্যেই সুস্থ ও সবল হইতে পারিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময় অযোধ্যার তালুকদারেরা তাঁহাদিগের মুখপত্র 'একস্‌প্রেস' প্রকাশ করিবার আয়োজন করিয়া অমৃতলালকে সম্পাদকীয় কার্য্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। অমৃতলাল সাগ্রহে সেই ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পত্নী ও পুত্রকন্যারা তাঁহার নিকট গমন করিলেন।

ভাগ্যদেবী যেন অমৃতলালের প্রতি প্রসন্ন হইলেন। পঞ্জাবের জমিদার সর্দার দয়াল সিংহ মাজেরিয়া তথায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য কলেজ ও লোকশিক্ষার জন্য 'ট্রিবিউন' পত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্বন্ধাতিশয়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ পত্রের জন্য ছাপাখানা কিনিয়া দেন এবং তিনিই শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়কে ঐ পত্রের সম্পাদক মনোনীত করিয়া পাঠান। তদবধি বহুদিন বাঙ্গালীরাই পর পর ঐ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। অমৃতলাল যখন 'একসচেঞ্জ' পত্রে যোগ দিয়াছেন, তখন 'ট্রিবিউনের' সম্পাদকীয় পদ শূন্য হয়। ঐ পত্র সম্পাদককে মাসিক ৫শত টাকা বেতন দিতে স্বীকৃত ছিল। ঐ পদের জন্য ভারতের নানা স্থান হইতে প্রার্থীরা আবেদন করিয়াছিলেন। সর্দার দয়াল সিংহের ব্যবস্থায় ঐ পত্র কয়জন ছাত্ররক্ষকের দ্বারা পরিচালিত। তাঁহারা প্রাথমিক নির্বাচনে ২ জনকে মনোনীত করেন—মাদ্রাজের শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও অমৃতলাল রায়। পাঞ্জাব চীফ কোর্টের উকীল যোগেন্দ্রনাথ বসু ছাত্ররক্ষদিগের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার সমর্থনে অমৃতলালই ঐ পদ লাভ করেন।

এই সময় হইতে (১৯০০ খৃষ্টাব্দ) দশ বৎসর অমৃতলাল লাহোরে শান্তিতে ও সুখে ছিলেন। তখন তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানরা তাঁহার কাছে ছিলেন। লালা লাজপত রায় ও বিচারক প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন—তাঁহাদিগের সহিত অমৃতলালের বিশেষ ঘনিষ্ঠতাও জন্মে। আর এই সময়ের মধ্যে তিনি তাঁহার বন্ধুক না দিয়া গৃহীত ঋণের অধিকাংশ পরিশোধ করিতে পারেন।

কিন্তু অমৃতলালের ভাগ্যে স্থায়ী সুখলাভ ছিল না। তাঁহার অদৃষ্টাকাশ আবার শোচনীয় অবস্থার বজ্রগর্ভ থেকে অন্ধকার হয়। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পত্নীবিয়োগ ঘটে। তাঁহার সাধু-সন্ন্যাসী-প্রীতির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পত্নীবিয়োগের পরে তাঁহার সেই দৌর্বল্য এত বাড়িয়া যায় যে, তিনি বিশেষ ভাবে বিচলিত হইয়া পড়েন। 'ট্রিবিউন' পত্রের ছাত্ররক্ষকদিগের সহিত মতান্তর ঘটায় তিনি সে পত্রের সম্পাদকত্ব ত্যাগ করেন এবং কিছুদিন 'পঞ্জাবী' পত্রের সম্পাদকের কাজ করিবার পরে লাহোরের সনাতন ধর্মসভার প্রচার বিভাগের ভার গ্রহণ করেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে অমৃতলাল পীড়িত হইয়া পড়েন এবং তাহার পরে আর তাঁহার পক্ষে শ্রমসাধ্য কোন কাজ করা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় শোকের পর শোক তাঁহাকে পিষ্ট করে। তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা আগ্রা কলেজে অধ্যাপকের কার্যে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী-রূপে দেখা দেয়। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা বিসূচিকায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রে তাঁহার স্নেহ কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। তাহার মাতার মৃত্যুর পরে তিনিই তাহার পিতা মাতা হইয়া তাহাকে লালন পালন করিয়াছিলেন। প্রথম বিভাগে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পক্ষকাল মধ্যে সে জ্বর রোগে আক্রান্ত হইয়া চারি দিনেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জীবনের সায়াহ্নে দুঃখের ঘনায়িত অন্ধকারে অমৃতলাল মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন।

অমৃতলালের মাতা ও ভ্রাতারা তাঁহাকে লাহোর হইতে তাঁহাদিগের কাছে যাইতে বলিলেন। তিনি সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কিছুদিনের জন্য লাহোরে যাইয়া তাঁহার কাছে থাকিবেন—তিনি তাহাতেও সম্মত হইলেন না। তিনি নিঃসঙ্গ থাকিতেই চাহিতেছিলেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে লাহোরে—কনিষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুর পক্ষকাল মধ্যে—অমৃতলালের হৃদ্রোগ প্রাণ দেহত্যাগ করিল। পরে জানিতে পারা যায়, তিনি প্রায়োপবেশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

কি শোচনীয় পরিণতি! অমৃতলাল গিয়াছেন; কিন্তু তিনি যে ভারতে প্রথম স্বদেশী রেলপথের প্রতিষ্ঠাতা তাহা তাঁহার দেশবাসীরা কখন ভুলিতে পারিবেন না।

ভঙ্গুর

সন্তোষকুমার অধিকারী

একটি মৃত্যুর করুণ মুহূর্ত। যে মুহূর্তে নিঃশ্বাস রোধ করে মন অপেক্ষা করে। সব শেষ হয়ে যাওয়ার, একটি জীবনের সমারোহ নিঃশেষে ফুরিয়ে যাওয়ার, বেদনাকে চড়িয়ে চড়িয়ে দেখে। কত সেই; এ যেন একটিমাত্র টিপে আলো জলে জলে পুড়ে যাচ্ছে, এ যেন তার ফুরোবার মুহূর্তকে নীরবে প্রত্যক্ষ করা।

তবুও মানুষ ভেঙে পড়েনা। তবু ভেসে যায় না সে। জীবনকে যখন একেবারেই রিক্ত বলে মনে হয়, তখনও আবার নতুন করে ফুল ধরার সম্ভাবনা জেগে ওঠে।

বুড়ো হেড্ মাষ্টারের মেয়ে শঙ্করীর চোখের সামনেটা একেবারে বর্ণালিপ্ত হয়ে গেলো। পিতৃশোকে যত নয়, নিজের অসহায়তার কথা ভেবে সে তার চেয়ে বেশী আকুল হয়ে উঠ্‌ল। কিন্তু সেই মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে আর একটি লোকও তখন কম অসহায় বোধ করছেন। তার কালো বয়স্ক মুখে মনের ভাব হয়ত স্পষ্ট নয়, তবু কিন্তু ভেতরটা হাতড়ালে দেখা যায়, সেও আকুল হয়ে উঠেছে শঙ্করীর মতই। পাঁচ বছর ধরে মাষ্টারী করে এলেও ভূপেন যে হেড্ মাষ্টারের মাষ্টারীর ভারার ছাড়া চলতে পারতো না, এ' আর কে জানবে?

মৃত্যুর প্রথম উচ্ছ্বাসটা কমে এলো। শঙ্করী বুঝলো এখন কান্নার চেয়ে শ্মশানযাত্রার ব্যবস্থা করাটাই আগে দরকার। তখনই চোখ মুছে কণ্ঠকে তীক্ষ্ণ করে সে বললো—তুমি বেটাছেলে, অমন হাঁ করে কাঁদছো কেন মা? যাও লোক ডাকো। না, আমি যাবো?

এতক্ষণে হুঁস হলো ভূপেনের। সে ছুটলো লোক ডাকতে। কিন্তু সেই শীতের সন্ধ্যায় দরজায় দরজায় ছুটোছুটি করেও পাওয়া যায় না লোক। কে আসবে অন্তরঙ্গীর শব বইতে?

তবুও ভূপেন পুরুষ। ইস্কুলের দু তিনটে ছেলেই এলো তার ডাকে। তাদেরই সাহায্যে শেষ ব্যবস্থা যা করার সেই করলো।

যা আসর তার উপস্থিতি মনকে অভিভূত করে রাখে। কিন্তু তার অবসানে ভবিষ্যতের কথা ভাবে মানুষ। শঙ্করীর সামনে ভাববার কিছুই ছিলো না। বাপের সঞ্চয় সে জানে। যা ছিলো এ'অসুখে খরচ করেছে সে। এখন একটা তামার পয়সাও মিলবে না আর। বাড়ীটারও ভাড়া গুণ্‌তে হয়। ভাড়া দিতে না পারলে বাড়ীওয়ালা বলবে উঠে যেতে।

শঙ্করীর চিন্তা করার ছিল না। তাই সে চুপ করে বসে রইলো। কিন্তু দিশেহারা হয়ে গেলো ভূপেন। এ' যেন তার চিন্তার বাইরে ছিলো। তাছাড়া তারও চিন্তার পরিধি বেশীদূর এগোয় না।

মাত্র তিনমাস হলো সে এখানে এসেছে। অত কোথাও চাকরী জুট্‌বে না, এ যেন তার জানাই ছিল। এই পল্লীগ্রামের ইস্কুলের চাকরী—এও যদি তার পিতৃবন্ধু বিরূপাক্ষ বাবু তার হাতে তুলে না দিতেন—তাহলে সে কি পাওয়ার আশা করতে পারতো? যে ছেলে এম, এস, সি পাশ করেও নির্বোধ থেকে যায়, অচেনা লোক দেখলে আজও যে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, তাকে ত' নিত্য বলা চলে। যতদিন বাপ বেঁচে ছিলেন, যতদিন স্কলারশিপের টাকায় চলেছে, বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে থেকেছে ভূপেন। তারপর একদিন যখন সেদিকটা শূন্য হয়ে গেলো, ভূপেন নির্বোধের মত এদিক ওদিক তাকিয়ে ভাবলো— এবার?

মুখে শুধু বসন্তের দাগ না, কপালে একটা কাটার চিহ্নও রয়ে গেছে। গোল গোল চোখ, চেহারাটা এতই বেমানান যে, শঙ্করী প্রথম দেখেই হেসে ফেলেছিলো। কিন্তু আজ মাত্র তিন মাস পরেই ও'র মুখের দিকে তাকিয়ে তাকালো শঙ্করী।

ভূপেন এক সময় এসে দাঁড়ালো, বললো—কি করবে এবার?

শঙ্করীর মুখ ভাববর্ণহীন। সে উত্তর দিলো—জানিনা।

—তোমার পিসী, মাসী, কেউ নেই কোথাও?

—কেউ না।

—ঠিক আমার মত।

আপন মনেই বললো ভূপেন।

দেখতে দেখতে মাসখানেক কেটে গেলো। তারপর একদিন ম্লানমুখে স্কুল থেকে ফিরে এলো ভূপেন। সেক্রেটারী ডেকে বলেছেন তাকে, যে ছুর্নাম রটছে চারিদিকে। মৃত হেডমাষ্টারের আইবুড়ো মেয়ের সঙ্গে একবাড়ীতে থাকা কোন্ ভদ্রলোকেই বা বরদাস্ত করতে পারে? তবে ভূপেন ভদ্রলোক। তাকে একমাসের সময় দিয়েছেন সেক্রেটারী।

ভূপেন মলিনমুখে এসে দাঁড়ালো। শঙ্করী তখন রান্নাঘরে বসে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিলো। বললো—কিছু বলবেন?

—হ্যাঁ, মানে·····

ভূপেন মাথা চুলকোতে লাগলো। শঙ্করী আবার বললো—বলুন।

—বলছিলাম, না থাক·····।

প্রস্থানোদ্যত হলো ভূপেন। কিন্তু শঙ্করী ছাড়লোনা, বললো—দাঁড়ান, যা বলতে এসেছেন, বলে যান। বুঝেছি, কেউ নিশ্চয়ই কিছু ব'লেছে?

—হ্যাঁ, তোমার কেউ কোথাও নেই শঙ্করী? এই ধরো, মাসী, পিসী, কিম্বা·····মানে, যেখানে গিয়ে থাকতে পারো তুমি।

—কেউ নেই আমার।

—আমি যদি মাসে মাসে টাকা দিই।

—আপনি শুধু শুধু টাকা দেবেন কেন? আমি কে আপনার?

এ প্রশ্নে রাঙা হ'য়ে উঠলো ভূপেন। কেন সে টাকা দেবে শঙ্করী? কিন্তু এ ছাড়া উপায় বা কি?

হঠাৎ শঙ্করী এগিয়ে এল। ওর হাত ধরে বললো—ঘরে এসো ভূপেন দা, বলছি। শুধু তোমায় নয়, আমায় যে লোকে কত কথা বলেছে তা শুনলে অবাক হয়ে যাবে তুমি। আর লোকে ত বলবেই।

ঘরে এসে বললো সে—বোসো!

ভূপেন মাথা নিচু করে বসলো।

—আচ্ছা ভূপেনদা, আমার ত' কেউ নেই; তোমার কে আছে?

—আমার? বাবা মারা গিয়েছেন। মা আছেন। আর সৎ ভায়েরা। কিন্তু তারা সম্বন্ধ রাখেনা।

—তার মানে তোমারও কেউ নেই। আমায় তুমি কতদিন টাকা দিয়ে সাহায্য করবে, কতদিন খেতে দেবে?

—কতদিন মানে?

ভূপেন বিস্মিত হলো—আর কে দেবে তাহলে?

—কেউ দেবেনা; যম ছাড়া। তাই বলছি তোমারও কেউ নেই, আমারও না। আমার মাত্র দুটো পথ আছে।

—বলো।

—আমি যে মেয়েমানুষ। এ'সব কথা তোমারই ভাবা উচিত। কিন্তু তুমি যে নিজের থেকে কিছুই ভাবোনা। দেখছি ত তোমাকে। খেতে না বললে সারাদিন খাবেনা। চান করতে না পাঠালে চান করবেনা। তুমি যে লোকটাই বেহদ্দ।

শঙ্করীর মুখে রক্তের আভা। নির্লজ্জ হয়েই সে বলে চললো—দুটো পথ আছে সামনে। একটা উপায় আত্মহত্যা করে মরা;·····

ভূপেন শিউরে উঠলো। শঙ্করী চোখ বুজে মুখস্থের মত বললো—আর একটা উপায় বেঁচে থাকা……যদি আমায় বিয়ে করো তুমি।

চোখ খুললো না শঙ্করী। না খুলেও সে বুঝতে পারলো অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। আশ্বাসের সম্ভাবনার আলোতে রঙীন হয়ে উঠছে আকাশ। ভূপেন উঠে এসেছে তার সামনে। তার একখানি হাতকে তুলে নিয়েছে নিজের হাতে।

ঘটনার পর ঘটনার নিখুঁত বিবরণকে ছাপে সংবাদ-পত্র। কিন্তু ঘটনার দৈর্ঘ্যকে সংক্ষিপ্ত করে আনতে হয় গল্পে। নইলে বৈধতাতি ঘটবে পাঠকের।

কেমন করে তাদের বিয়ে হ'লো আর বিয়ে করার পরও কিভাবে গ্রাম থেকে বাস ওঠাতে হ'লো তাদের, সে সব কথার অবতারণা এখানে অবান্তর।

ইস্কুল থেকে বিতাড়িত হলো। শঙ্করীর হাত ধরে বেরিয়ে পড়বার জন্যে প্রস্তুত হয়েছে ভূপেন আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ইস্কুলের পিয়নই তার নামের একটি চিঠি বয়ে আনলো। কলকাতার এক নামকরা ওষুধ তৈরীর ফার্মে কেমিষ্ট নিযুক্ত হ'য়েছে সে।

বছর দুই পার হয়ে এসে তবে গল্পের সুরু।

এ' দুবছরের মধ্যে বলবার মত কিছুই ছিলোনা! কিন্তু দু'বছরের পরে ওদের আবার দেখতে পাওয়া গেলো। টালিগঞ্জের একটি নিভৃত পল্লীতে ছোট একটি ফ্লাটে। একতলা বাড়ীর ফ্লাট। সামনেটা ফাঁকা। ঘরের একটি কোণে জানলার কাছে টেবিলে যে লোকটি বই আর খাতাপত্রের অতল সমুদ্রে তলিয়ে রয়েছে তাকে চিনতে মোটেই অসুবিধে হয়না। তার চেহারার বা ভাবে কোন পরিবর্তন নেই। শুধু চোখে এসেছে পুরু লেন্সের চশমা। আর মুখে অতিরিক্ত যোগ হয়েছে চুরুট।

ঘরের আর এককোণে শঙ্করীকে চেনা যায়না। পরিবর্তন শুধু তার বেশভূষায় নয়, তার চেহারাতেও। তার এখনকার সুন্দর ও উগ্র প্রসাধনযুক্ত মুখ দেখে অতীতের শঙ্করীকে চিন্তায় পাওয়া শক্ত।

দোলনায় ছেলেকে দোলাতে দোলাতে সুরু করে গান গাচ্ছিলো শঙ্করী। হঠাৎ বলে উঠলো—দেখো খোকা তোমার দিকে কেমন চেয়ে আছে।

কথাটা ভূপেনের কাণে গেলো কিনা বোঝা গেলোনা। তার দিকে চেয়ে শঙ্করী আবার বললো—দেখোনাগো, খোকন কেমন গাল ফুলিয়ে হাসছে।

অনেক পরে ভূপেন যখন সচেতন হলো, তখন শঙ্করী খোকনকে কোলে নিয়ে জানলায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার গলা তখনও শোনা যাচ্ছে—খোকনবাবু তুমি ওই রাস্তার লোক দেখো, রাস্তার লোক দেখাই ভালো।

ভূপেনের অনুনয় ভরা গলা এসে যেন আঘাত করলো তার উচ্ছ্বাসে—দেখনা একটু, কাল যে বইটা আনলাম সেটা আর খুঁজে পাচ্ছিনা। "গান্ধীবাদের পুনর্বিচার" বইখানার নাম।

ব্যস্তসমস্ত ভাবে খুঁজতে লাগলো ভূপেন। তার চোখেই পড়লোনা শঙ্করীর মুখভরা কৌতুকের হাসি।

—বইটা কি খুব দরকারী?

—হ্যাঁ হ্যাঁ দরকারী, ভীষণ দরকারী।

ভূপেনের খোঁজার বেগে হঠাৎ টেবিলের সমস্ত বই মেঝের উলটে পড়লো। বিরক্ত হয়ে শঙ্করী বললো—থাক আর তোমায় খুঁজতে হবেনা। দিলে গোছানো টেবিলটাকে নোংরা করে। শঙ্করী এসে বইটাকে বার করে দিলো।

—আঃ বাঁচালে।

চটিজোড়ায় পা গলিয়ে বললো ভূপেন—আমি চললাম। একটু দেরী হবে আসতে, তুমি বরং খেয়ে দেয়ে নিও। হ্যাঁ, যদি দেরী হয় তুমি জেগে থেকোনা। শরীর খারাপ হ'বে। আমি বরং ডেকে তুলবো……

—রোজ রোজ এমনি একা থাকতে পারিনা আর। মুখ বিষণ্ণ হ'লো শঙ্করীর। ভূপেন প্রস্থানোদ্যত হয়ে আবার ফিরে দাঁড়ালো।

—সত্যিই ত'। তা তুমি গান শিখছো না? সেই ছোকরা……যে গান শেখায় তোমাকে, সে আসেনা?

সে যদি না আসে ত' আর একজনকে না হয় ট্রিপ করো। বেশী কিছু লাগে দেওয়া যাবে।

—থাক্। অত ভেবে আর কাজ নেই তোমার। যেখানে যাচ্ছো যাও।

শঙ্করী গুম্ হয়ে এসে দাঁড়ালো। ভূপেন আর দ্বিরুক্তি না করে বার হ'য়ে গেলো। যাওয়ার সময় ফিরেও চাইলো না সে। শঙ্করীর চোখের জল বুঝাই ঝরে পড়লো।

কিন্তু বেশীক্ষণ সময় গেলো না। ঘরের গুমোট হাওয়াটা আবার কেটে গেলো। যে মুহূর্তে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে একটা নভুন উপন্যাস হাতে তুলে নিলো শঙ্করী সেই মুহূর্তেই যেন ঘরের কড়াটা মিঠে সুরে বেজে উঠলো।

বই ফেলে এসে দরজা খুললো সে। আর তার সুন্দর মুখখানার ওপর দিয়ে হাসির একটা ঢেউ বয়ে গেলো।

—ওমা, আপনি?

ঘরে যে এলো তার চেহারাটা বেশ সুশ্রী। কোঁকড়ানো চুলের নীচে প্রশস্ত ললাট। দুটি চোখে মেঘের স্বপ্ন। চন্দ্রশেখর চুলের মধ্যে হাত চুকিয়ে বললো—ভাবলাম আজ একটু সকাল সকাল যাই। সেই গানটা আজ তুলে দিয়ে যাবো।

হারমোনিয়মের রিড টিপে ধরে বললো চন্দ্রশেখর—আপনার এমন অদ্ভুত গলা। অথচ এতদিন কেন গান শেখেন নি ভাবলে আশ্চর্য লাগে।

অনেক রাত্রে ফিরলো ভূপেন। শঙ্করীকে জেগে থাকতে দেখে সে যেন কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়লো। ভীরু কোমল গলায় বললো—বড্ড দেরী হয়ে গেলো। তুমি খেয়ে নিয়েছো ত'?

শঙ্করী উত্তর না দিয়ে খাবার সাজাতে সুরু করলো।

—জানো শঙ্করী, আজ একটা মস্ত সভায় আমায় বক্তৃতা দিতে হ'লো। আমি বললাম ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা। ব্যক্তিস্বাধীনতার অর্থকে বুঝতে হ'লে ব্যক্তিকে সাধনা করতে হবে। সাধনা দিয়ে তাকে বুঝতে হবে এক মহানিয়মের রূপকে। আবার আত্ম অভিমান, স্বার্থবুদ্ধি থেকে মনকে দিতে হবে মুক্তি।

শঙ্করী ঘুঘনো ভাত নামিয়ে বললো—খেতে বোসো।

ভূপেন নিঃশব্দে বসে পড়লো। ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে হঠাৎ এক সময়ে সে আবার বললো—অনেক ভেবে দেখলাম শঙ্করী, বন্ধনের মধ্যে রয়েছে আড়ষ্টতা, আনন্দ নেই। কৃত্রিম বন্ধন শুধু দুঃখই বহন করে আনে। সামাজিক অধীনতা মানুষের মনের ওপরে করে অত্যাচার। আমি সকলকে তার যুক্তিসঙ্গত পথে চলতে দেওয়ার পক্ষপাতী। তোমরা মেয়েরা যদি আজ শুধু স্বামীর মুখ চেয়েই সময় কাটাও, তাহলে তোমাদের পরাধীনতা ঘুচবে কি করে?

শঙ্করী কৌতুক বোধ করলো। ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলো—কি করবো তবে? পুরুষের মত বাইরে ঘুরে বেড়াবো?

—দরকার হ'লে বেড়াবে। রান্নাঘরটাই ত জগৎ নয়। আমাদের যদি বাইরের পৃথিবী থাকে তোমাদেরও আছে।

—মনে করো বাইরে ঘুরতে ঘুরতে একদিন একেবারেই বাইরে চলে গেলাম। জানো ত শাস্ত্রে বলে, মেয়েদের ছেড়ে দিয়ে বিশ্বাস করতে নেই।

শঙ্করী মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো। আর ভূপেন বললো—যা হবেই তাকে মেনে নিতেও হয়। যন্ত্রণা ভোগ না করলে মনের সঙ্কীর্ণতা কাটে না।

খাওয়া শেষ হ'লে সমস্ত কাজ শেষ করে যখন শুতে গেলো শঙ্করী, ভূপেন তখন আবার ঝুঁকে পড়েছে বইয়ের স্তূপে। শঙ্করী ডাকলো—এত রাত্রে আবার বসলে বই নিয়ে।

—আমি এইটুকু শেষ করেই যাচ্ছি। তুমি শোওগে, লক্ষ্মীটি।

শঙ্করী শুধু একটি পরিপূর্ণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে শয্যার দিকে এগিয়ে গেলো।

ইদানীং চোখটার জন্যে বড় অসুবিধে হচ্ছিলো। শঙ্করীই একদিন ঠেলেঠেলে পাঠালো ডাক্তারের কাছে। ফলে পুরোনো চশমাটার বদলে অনেক বেশী পাওয়ারের মোটা একটা চশমা উঠলো চোখে।

নতুন চশমা চোখে দিয়ে ভারী মজা লাগলো তার। কিন্তু শঙ্করীর শাণিত দৃষ্টির সামনে পড়লেই দুইয়ে পড়ে। একদিন হঠাৎ বসে বসলো—আমাকে এসব মোটেই মানায় না।

—কি মানায় না?

—এই চশমা। তোমার চোখে উঠলো এর সৌন্দর্য ফুটে উঠতো। এই যেমন ধরো, আমার চেহারার পাশে তোমাকে মানায় কি?

মাঝে মাঝে অবাধ্য কল্পনার চোখে এসব কথা শঙ্করীও ভাবে। তবুও স্বামীর মুখে শুনতে চায় না সে। শঙ্করী লজ্জিত হ'য়ে বললো—তুমি একটা পাগল।

নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন হচ্ছে কলকাতায়। গানের মাষ্টার চন্দ্রশেখর এসে বললো—চলুন দেখে আসবেন আজ। দুটো টিকিট কেটেছি অনেক কষ্টে।

শঙ্করী নেচে উঠলো—অনেকে আসবেন?

—নিশ্চয়ই। সমস্ত ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা এসেছেন।

এক মুহূর্তে যেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলো শঙ্করী, আবার নিভে গেলো হঠাৎ—খোকনকে কার কাছে দিই?

ভূপেন বললো—ওকে আমি রাখবো। তুমি যাও।

শঙ্করী লজ্জা পেলো। বললো—তাই কি হয়? তুমিও চলো।

কিন্তু টিকিট ত মাত্র দুখানা। এখন আর পাওয়াও যাবে না। যা ভীড়। চন্দ্রশেখরের মুখে প্রশ্ন।

ভূপেন বললো—আমি যাবো না। ও সব গান বাজনা আমি বুঝি না।

অগত্যা শঙ্করী একাই গেলো চন্দ্রশেখরের সঙ্গে।

খোকনের বয়েস মাত্র একপূর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে এত দুষ্টু হয়েছে ছেলে, যে বলার নয়। বোধ হয় ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছিলো। তারপর উঠে কাঁদতে সুরু করলো।

ভূপেন ছেলেকে কোলে নিয়ে অনেকক্ষণ ভোলাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু সে থামে না। অগত্যা ছেলেকে কাঁধে নিয়ে সে রাস্তায় ঘুরতে লাগলো। তার ফলে খানিকটা চুপ করলেও আবার কাঁদতে সুরু করলো সে। গান গেয়ে কথা বলে কত রকম চেষ্টা করলো ভূপেন। কিন্তু খোকন বোধ হয় ক্ষুধার্ত। সে আর বাপকে চায় না, চায় মাকে। শঙ্করী কখন ফিরবে কে জানে। বেচারী ত কোনদিনই বাড়ী থেকে বেরোতে পায় না। ক্রন্দনরত সন্তানকে কোলের ওপর দোলাতে দোলাতে ভূপেন শঙ্করীর কথাই ভাবতে লাগলো।

রাত বোধ হয় নিশুতি। কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে খোকন। সমস্ত পাড়াটা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। চোখের চশমাটা আর একবার মুছে পরিষ্কার করলো ভূপেন। শঙ্করী এখনও ফেরেনি।

শঙ্করী আর ফিরলো না। সারারাত্রি জেগে কাটালো ভূপেন। পরদিন সকালটাও সে অপেক্ষা করেছে। খুঁজেছে পাগলের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, মিউজিক কন্‌ফারেন্সের দরজায় দরজায় এসে প্রশ্ন করেছে। চন্দ্রশেখর মেসে থাকে। তার ঘর কাল থেকেই তালা বন্ধ। অবশেষে বুঝতে পেরেছে সে নিজের ভ্রম। ঘরে ফিরে এসে শিশু পুত্রকে বুকে চেপে ধ'রে নিজেও শিশুর মত আবেগে হু হু করে কেঁদে উঠলো ভূপেন। জীবনে এই প্রথম সে এমন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কাঁদতে লাগলো। দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে কাঁদলো সে।

চার বছর পরে। বাড়ী বদল হয়েছে। সল্‌ফক্লার রোডের একটি নতুন একতালা বাড়ীতে বাস করে অধ্যাপক ভূপেন বোস। বাড়ীটায় মাত্র দুখানা ঘর। একটি তার ষ্টাডি, অপরটি শোবার ঘর। শোবার ঘরে পাশাপাশি দুটি চৌকি। একটিতে সে নিজে শোয়, অপরটিতে পাঁচ বছর বয়সের বালক অভিজিৎ।

বাড়ীতে তৃতীয় প্রাণী এক বৃদ্ধা। সম্পর্কে সে ভূপেনের কিরকম দিদি হয়। সেই বাড়ীর প্রকৃত অভিভাবক।

আগেকার চাকরী অনেকদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছিলো ভূপেন। কিছুকাল আগে ডক্টরেট ডিগ্রী পেয়েছে সে। সম্প্রতি একটি ভালো কলেজে অধ্যাপনা করছে।

বলেজ আর বাড়ী—এছাড়া তৃতীয় কোনস্থানে যায় না ভূপেন। অভিজিৎই তার সমস্ত সময় জুড়ে রয়েছে। অভিজিৎকে নিয়ে জীবনের নতুন স্বপ্ন দেখছে সে।

বিকেলে যখন বাড়ীর পাশের ছোট্ট মাঠটায় বেড়াতে যায় সে, তখন অভিজিৎ তার গলা জড়িয়ে ধরে থাকে।

—বাপি, আমায় একটা ছোট্ট ট্যাক্সি কিনে দেবে?

—কি করবে বাবু?

—আমি ট্যাক্সি চড়ে অনেক দূর চলে যাবো। তুমি আর আমায় দেখতে পাবে না।

—আমায় একা ফেলে তুই চলে যাবি?

—সত্যি সত্যি না। আমি ঠাট্টা করছি।

খোকন বাপের গলা আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরে।

খোকনকে বুকে জড়িয়ে রাত অবধি পায়চারী করে ভূপেন।

একদিন সহকর্মী বাংলার অধ্যাপক চক্রবর্তী এসে চেপে ধরলেন। তাঁর একটি বই নাকি সিনেমাতে উঠছে স্যুটিং দেখতে যেতে হবে।

ভূপেন হেসে তার চশমার মোটা কাচের দিকে দেখালো। বললো—ভাই, আমি ত' চোখে ভালো দেখতে পাইনা। আমায় নিয়ে কি লাভ?

চক্রবর্তী ছাড়লোনা। কোন ওজরই সে শুনবেনা। একরকম জোর করেই টেনে নিয়ে গেলো।

অনেকক্ষণ ধরে বসে স্যুটিং দেখতে বিরক্ত লাগে। একঘেয়ে ট্রায়াল বারবার। নোংরা পরিবেশ। ভূপেন উঠে পড়লো; বললো কিছু মনে করোনা চক্রবর্তী. আমি আজ চললাম।

ষ্টুডিওর দরজা পার হয়ে গলির রাস্তায় তিন চার মিনিট হাঁটতে হয়। তারপরে ট্রাম। ভূপেন দ্রুত হেঁটে চললো। কিন্তু খানিকটা হেঁটেই মনে হ'লো পেছনেও কে যেন দৌড়োচ্ছে। ভূপেন একবারও ফিরে চাইলোনা। বরং হাঁটাকে আরও জোর করে দিলো সে!

কিন্তু একটি বাচ্চা ছেলে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে সামনে দাঁড়ালো।—একটু সরে, একটু দাঁড়ান!

—কেন? অত্যন্ত বিরক্তভাবে প্রশ্ন করলো ভূপেন

—একটু। ওইযে দিদি এসে পড়েছেন।

হাঁপাতে হাঁপাতেই ভূপেনের সামনে এসে দাঁড়ালো একটি তরুণী। এসে দাঁড়লোনা শুধু; নত হয়ে প্রণাম করতে গেলো। কিন্তু পেছিয়ে গেলো ভূপেন। অত্যন্ত রুষ্ট হ'য়ে উঠলো তার মুখ। বললো—কি চাই? কে আপনি?

—আমি? আমাকে চিনবেনা। আমি অভিনেত্রী লীলা। একটু কথা আছে। দয়া করে শোনো।

—আমার সময় নেই।

ভূপেন গমনোদ্যত হ'লো। কিন্তু তরুণী তার পথ-রোধ করে দাঁড়ালো,—না, যেতে পাবেনা। আমার কথা শুনে তবে যাবে। আমি অন্য কিছু চাইছিনা। শুধু একটি ভিক্ষা। ভেবেছিলাম লুকিয়ে যাবো তোমার বাড়ীতে। দু'দিন গিয়ে ঘুরে এসেছি। সাহস পাইনি ঢুকতে। তুমি বিশ্বাস করো, দু'দিন সারারাত্রি ধরে কেঁদেছি। আমি তোমার অনুমতি চাইছি। তোমার ছেলেকে দেখবো একবার। একটিদিন আমার কাছে তাকে রাখবো। একটিদিন মাত্র। আমায় দয়া করো।

ভূপেনের নিরীহ ভাবহীন মুখে ততক্ষণে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সমস্ত মুখটা তার রক্তাক্ত। দুটি চোখ বিস্ফারিত হ'য়ে উঠেছে ক্রোধে। বোধ হয় কথা বলবার চেষ্টা করলো, কিন্তু বাকস্ফূর্তি হলোনা। অসহ্য ক্রোধে বোধ হয় কণ্ঠরোধ ঘটেছে।

কয়েক মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিলো সে। সঙ্গে সঙ্গে তরুণীকে পাশ কাটিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলো ট্রাম লাইনের দিকে। ভয়ঙ্কর দ্রুতগতি তার চরণে। এই প্রথম সে চলন্ত ট্রামে লাফিয়ে উঠে পড়লো। মাত্র দুটো ষ্টপেজ পরেই বাড়ীর রাস্তা।

বাড়ীতে পৌঁছে আরও ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো সে। দিদিকে ডেকে জানিয়ে দিলো, সন্ধ্যের ট্রেনেই বাইরে যাচ্ছে সে। অভিজিৎকে নিয়েই। বিশেষ দরকার।

সেই রাত্রেই উঠে বসলো সে দিল্লী এক্সপ্রেসে। এক মাসের ছুটির দরখাস্তও ডাকে পোষ্ট করে দিয়ে এলো।

একমাস কিন্তু দেখতে দেখতেই শেষ হ'য়ে এলো। সময় যত নিকট হয়ে এলো ততই চিন্তাতুর হ'য়ে পড়লো ভূপেন। শেষপর্যন্ত সে ঠিক করলো—বাসা বদল করবে।

কলকাতায় পৌঁছে একমুহূর্তের জন্যেও অভিকে একা রাখবেনা বলে ঠিক করলো ভূপেন। কলেজ যাওয়ার সময় সঙ্গে করে নিয়ে বেরোয় সে। ভবানীপুরে বন্ধু সন্তোষের সহীক একটি ফ্লাটে থাকে। সন্তোষের স্ত্রীর কাছে অভিকে রেখে নিজে কলেজে যায়। ফেরবার পথে আবার সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

একদিন হঠাৎ অভি বেঁকে বসলো। বললো—আমি আর ওখানে যাবোনা।

—কেন বাপি? স্নেহের প্রশ্ন করে ভূপেন।

অভি ঠোঁট ফুলিয়ে বললো—মীনু ও'র মাকে মা মা বলে ডাকে, আমিও মা বলে ডাকলুম ত' আমায় বললে—তোর মা ত' নয়; তুই ডাকছিস কেন? তোর মার কাছে যা তুই। বাপি, আমার মা কোথায়?

কিছুক্ষণ নিরুত্তর স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো ভূপেন; তারপর বললো—থাক্, তুই দিদীর সঙ্গে বসে গল্প কর।

বন্ধুকে অনেক উপদেশ দিয়ে কলেজে বার হ'লো ভূপেন।

বিকেলে আজ তাড়াতাড়ি ফিরলো সে। ট্রাম থেকে গলফ্‌ক্লাব রোডে ঢুকবে, ঠিক সেই মুহূর্তে অপেক্ষমান একটি প্রাইভেট গাড়ীর দরজা খুলে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে একটি তরুণী এসে দাঁড়ালো সামনে।

ভূপেন পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু তরুণী তার পথ রোধ ক'রে দাঁড়ালো। তার মুখের দিকে চাইলে দেখতে পেতো যে ক্রন্দনে আরক্ত সে মুখ। কিন্তু ভূপেন তাকালোনা। অপরিসীম ঘৃণায় অন্ধ হ'য়ে রয়েছে তার চোখ।

তরুণী কাঁপতে কাঁপতে বললো—আমায় তাড়িয়ে দিয়োনা; তোমার পায়ে পড়ি। কেউ ত' জানবেনা। শুধু একটিবার দেখবো, কোলে নেবো আমার ছেলেকে।

জোর করে পথ ক'রে নিয়ে এগিয়ে গেলো ভূপেন। যতক্ষণ তাকে চলতে দেখা গেলো ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো তরুণীটি। কিন্তু ভূপেন ফিরে তাকালোনা।

জ্যোৎস্না রাত। মধ্যরাত্রেও যেন পৃথিবীকে অসুস্থ বলে মনে হতে লাগলো ভূপেনের। ইন্‌সমনিয়া রোগীর মত তার চোখে অনিদ্রার ধূসরতা। ঘর থেকে বেরিয়ে ছাতে উঠলো সে। আর হঠাৎ চোখে পড়লো তার কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে রাস্তায়। একটি ছায়ামূর্তি। সর্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত। চোখে তার অনুনয়ের কাতরতা; অধর করুণ একটি লেখা।

চাঁদ ডুবে গেলো। এতক্ষণ যাকে ছায়ামূর্তি বলে মনে হচ্ছিলো এবারে দেখা গেলো একটা বাউয়ের ছায়া সেটি! ভূপেন নীচে নেমে এলো।

পরেরদিন সকালে ভূপেন সোজা এসে উঠলো তার সহকর্মী অধ্যাপক চক্রবর্তীর বাড়ী।

—আপনি ত' ষ্টুডিও মহলে ঘোরেন, না?

চক্রবর্তী স্বীকার করলো—কিছু কিছু।

—তাহলে লীলাকে চেনেন? অভিনেত্রী লীলা?

—চিনি বইকি। তিনিইত আমার বইটার নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। বইটার সাকসেস নির্ভর করছে লীলাদেবীর ওপরেই। আপনি ত' বইটা পড়েছেন না? সন্তানহারা জননীর শোক লীলাদেবীর অভিনয়ে এমন সজীব হয়ে উঠেছে……

বাধা দিয়ে বললো ভূপেন—আমি একটু তার সঙ্গে দেখা করতে চাই তার বাড়ীতে। আজ এখন হলেই ভালো হয়।

বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে চেয়ে রইলো চক্রবর্তী। ভূপেনের মত নীতিবাদী লোকের কি কাজ থাকতে পারে লীলার কাছে—তার বাড়ীতে। তাও এত জরুরী।

—She is a real beauty, মন্তব্য করলো চক্রবর্তী। চলুন, আপনি বলছেন যখন, এখনই যাচ্ছি।

বীডনষ্ট্রীটের একটা তেতলাবাড়ীর ফ্লাট। ফ্ল্যাটের দরজায় পৌঁছিয়ে চক্রবর্তী ঈষৎ হাসলো—আপনার দরকার কি গোপনীয়, না আমি থাকতে পারি।

চক্রবর্তীর মুখে স্নেহ পড়বার মতো মন ভূপেনের ছিলোনা। সে মাথা নেড়ে বললো—না, আপনি যান। আমার কথা গোপনীয়।

লীলার কাছে এ' এক অকল্পনীয় ঘটনা। বাইরে বসবার ঘরে সে এসে বসেছে, তাকে সে ষ্টুডিওমহলের কোন একটি স্টাবক বলে ভুল করেছিলো। কিন্তু ভূপেনের সামনে দাঁড়িয়ে সে বিস্ময়ে বিমূঢ় হ'য়ে গেলো।

কিন্তু ভূপেনের ব্যবহারে কোন ভাবাবেশ নেই। কঠিন অকম্প্র তার কণ্ঠস্বর। প্রথম সম্বোধনেই সে বললো—তোমার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।

—প্রার্থনা? আমার কাছে?

কিন্তু লীলা পরমুহূর্তেই আত্মসংবরণ করলো। বললো, ভেতরের ঘরে এসো।

ভেতরের ঘরে এসে সোজা দাঁড়িয়ে রইলো ভূপেন। লীলা নতজানু হয়ে বসলো পায়ের কাছে।

—তোমার কাছে একটি প্রার্থনা আছে। তার আগে একটি কথা জিজ্ঞেস করি,—আজও কি একবিন্দু স্নেহ আছে তোমার মনে? ছেলের কল্যাণ কামনা কি করো?

দুচোখ ছাপিয়ে জল এলো লীলার। বললো—কেমন করে বোঝাবো?

—তাহলে কথা দাও আমাকে। কথা দাও যে কোনদিন ছায়া মাড়াবেনা ছেলের; তাকে জানতে দেবেনা বা তার কাছাকাছি দাঁড়াবেনা, তার নাম করবেন, তার কথা ভাববেনা কোনদিন। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার কোন দরকার পড়লে আমি আসবো। দরকার হ'লে টাকাকড়ি সাধ্যমত দেবো।

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বললো লীলা—মনে রাখবো।

—তাহলে আজ আমি যাচ্ছি। তোমায় আশীর্বাদ করে গেলাম শঙ্করী।

ভূপেন চলে গেলে শঙ্করী মেঝের ওপরেই লুটিয়ে পড়লো।

কিছুদিন নিশ্চিন্ত হয়ে সময় কাটালো ভূপেন। এটুকু বিশ্বাস তার আছে যে শঙ্করী কথা রাখবে। শঙ্করীকে সে ক্ষমা করেছে। সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছে। অভিনয়কে শ্রদ্ধা করে সে। সেও ত' মনেপ্রাণে সৌন্দর্যের পূজারী।

কিন্তু অভির ভবিষ্যৎকে গড়ে তুলতে হবে। অভির জীবনে লীলার সাহচর্য ক্ষতিকর। অভিকে সে গড়ে তুলতে চায় তার জীবনের স্বপ্ন দিয়ে।

একদিন কলেজ থেকে বাড়ী ফিরে এসে অভির সঙ্গে খেলতে বসেছে ভূপেন; হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো অভি—আচ্ছা বাপি, মা কোন্ তারাটা?

ভূপেন বুঝতে না পেরে বললো—তার মানে?

—পিসী বলেছে, মা তারা হয়ে রয়েছে আকাশে! কোন তারাটা বাপি?

ভূপেন কথা বলবার চেষ্টা করলো। কিন্তু উত্তর দিতে পারলো না। একরাশ খেলনা ও টিন লজেন্সের মধ্যে অভিকে বসিয়ে রেখে সে হঠাৎ ছাতে উঠে গেলো।

নীচের পৃথিবীতে অন্ধকার। কিন্তু অনেক দূরের আকাশে অজস্র তারার সমারোহ। মানুষের মনও ঐ আকাশেই সঞ্চরণ করে। মন ত' এতটুকু ছোট্ট একটু কানুষ নয় যে সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ণ হবে তার গতি। জীবন ত' ডোবার শুদ্ধ জল নয়, যে একঘেয়ে রঙ, একই ছবি থাকবে চিরদিন।

সেই অনন্ত তারাময় আকাশের দিকে চেয়ে নিজেকে হঠাৎ বড় অসহায় মনে হ'লো ভূপেনের। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে দিয়ে সে হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

মানুষ ত' কাদা নয়, তার মন পাথরও নয়। মানুষ যে রক্তে মাংসে পরিপূর্ণ মানুষ।

শশী

শ্রীঅক্ষয় নাথ ঘোষাল।

[১]

হরি বাহেন, ননী ঘরামি, চাষীপাড়ার দু'তিনজন, মুসলমানপাড়ার লতিফ, আবু সেখ, ঘোষপাড়ার নন্দ, জগাই ছাড়াছাড়াভাবে নিজেদের মধ্যে যে যার ঘরের আর মনের কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে বলতে চলছিল হাটের পথ ছেড়ে মধুরাপুরের দিকে। শশী আসছিল সলতিয়া থেকে গামছা কাঁধে ফেলে হনহন করে উল্টোদিক থেকে। মেজাজটা তার ভাল নেই। আখের চালান আনার জন্যে গাড়ীখানা নিয়ে গিয়েছিল। বাবুরা বলে মঠ পেরিয়ে তাঁদের আগটা দিয়ে আসতে তাঁদের ঠাঁয়। শশী রাজী হ'ল বটে, কিন্তু গত বর্ষার ধসে য'ওয়া পুলের ওপর দিয়ে যাবার সময় চোরা গর্তে প'ড়ে ডানদিকের চাকাটা তার গেছে। এখন এই খেলারতের উত্তল দেয় কে? বাবুদের কথা নয় তো হুকুম। একটা জন নিয়ে যে কাজ হয় সেখানে কত্তাস্তির দেমাকে গরীবের এই ফেসাদ। তিনটাকা ভাড়া পেতে ছটাকা গুণগার। শশী গামছাটা ডান কাঁধ থেকে বাঁ কাঁধে, আর বাঁ কাঁধ থেকে ডান কাঁধে করছিল।

শশীর হন্তদন্ত ভাব দেখে হরি বাহেন হাঁক পাড়ল: বলি এমনি হনহন ক'রে চললে কোথায়? হেঁটে কেন, গাড়ী নে'গিছিলে না?

শশী হাত পা নেড়ে মাঝে মাঝে গলাটা চড়িয়ে নামিয়ে, কোঁস কোঁস করতে করতে আদ্যোপান্ত গড়গড় করে বলে গেল। ব'লে তার মনের রাগ কমে এল, গামছা দিয়ে একবার মুখ মুছল, তারপর সবার মুখের দিকে ঠাহর করল; অবাক হয়ে শুধোল: তোমাদের সব ব্যাপার কি? এত পাড়ার মাতব্বর সব একসঙ্গে হাট থেকে ঘরে না ফিরে চলেছ কোথায়?

ননী ঘাড় নাড়ল, দল ভারী করবার জন্যে, সাহসের কাজে লোকবল করে নেবার জন্যে শশীর গর্বের খোঁচে তা দিয়ে দিলে: সেই কথাই তো আমরা সব এতক্ষণ বলাবলি করছিলাম যে, শশী নেই আমাদের সংগে কি করে কি হ'বে। সেখানে সব নেকাপড়াশেখা বিদিশী বাবু, দুটো কথা জিজ্ঞেস করলে মানুষের মত হাঁ করবে কে?

আবু সেখ হা হা করে হাসল: আমরা তো বুঝলে কিনা, হ্যাঁ বললেও যা বুঝি, না বললেও তাই।

শশী এসব কথার কিছুই বুঝল না, সুতরাং তার কৌতূহল বাড়ল। অধৈর্য হয়ে লতিফের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল: কে বাবুরা, কি ব্যাপার, বাবুরা কেন, ভোটাভুটির সময় তো এ নয়?

নন্দ ছেলেমানুষের মত হাসল: শশী বোকদার কিনা সব কথাতেই তার কেবল সন্দ আর অবিশ্বেস। বুঝলে মোড়ল, সেসব কিছু নয়, এ সব বাবুরো ভাল। সতু সিকদারকে মনে আছে? ঐ যে সে সালে সেই কাজের সময়, "ফসল নেই তো খাজনা নেই" বলে জমিদার বাবুদের সঙ্গে লড়াই করতে জোট বেঁধেছিল রুজবপুরে, সেই তেনাদের মত। এ বাবুরা এবার কায়েম ক'রে আপিস বসিয়েছে মোথরাপুরে। সিন্ধু, চেতল, বগলা এরা সব মেম্বার হয়েছে। আমাদের সব যেতে বলেছে, বলেছে মেম্বর হই আর না হই, দুটো কথা শুনতে দোষ কি।

লতিফ বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়ল: না, তা আর দোষ কি। কত কথাই তো শুনছি চাদ্দিকে……

জগায়ের ভাল লাগল লতিফের সায় দেওয়া: কত বলে কত, স্বরাজ, গান্ধী মহারাজ, লড়াই, আবার জাপানী……

শশীর ভাল লাগলনা এসব। মাথায় তার ঘুরছিল ভালা চাকার কথা। বলদ দুটোকে এক চাষীর বাগানে বেঁধে রেখে এসেছে, আখের খোসা সেজাৎ পার করে দেবে বলেছে, কিন্তু মনে তার স্বস্তি নেই। মানিকের বোয়ের খোকা কাল পরশু কবে হয় ঠিক নেই। মানিকের মা কেবলই খুঁত খুঁত করছে, এটা নেই, ওটা নেই, সেটা নেই বলে। বলে, পাঁয়ে মানে না, আপনি মোড়ল। সাতখানা পাড়ার মন্দ ভালোর খবর ক'রে বেড়াও, বলি, আমরাও তো পাঁয়ের মধ্যে, তুমি তো তবে আমাদেরও মোড়ল, আমাদের কি আছে, কি চাই তা দেখোনা কেন? বৌ ঠেস দিয়ে কথা বলে অমনি। ঐ জন্যে ওকে ভাল লাগে শশীর। 'সাতপাড়ার মোড়ল', কথাটা মিথ্যে নয়।

বাবু যখন জিজ্ঞেস করল, কি গো তাই আসছ নাকি? তখন শশী গামছাটা ভাল ক'রে কাঁধে ফেলে বলল: চল দেখি। যাচ্ছিল শশী দক্ষিণ থেকে উত্তরে তখন একটু পিছিয়ে চলল সোজা পশ্চিমে।

বোসপাড়ার ফুটবল খেলার মাঠের ধারে বছর কয়েক আগে নিরুদ্দেশ নয়ন বাক্ষীর বিধবার পোড়ো ঘরখানা সারিয়ে "কৃষক সমিতির" আপিস। সামনে কাগজের সাইনবোর্ড টাঙান।

বঙ্গীয় কৃষক সমিতি
মথুরাপুর শাখা, ২৪, পরগণা।

আপিসে একজন বাবু আর একজন চাষী মেম্বর অষ্টপ্রহর থাকেন। তাছাড়া আছে মুখুজ্জে মাষ্টার, মাষ্টারের ছাত্তোর চেলারা আরো দু'চারজন ভদ্দর লোক।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। বাবুটি বাইরে কেরাসিন কাঠের চেয়ার টেবিলে বসে সেদিনের কাগজ পড়ছেন হেরিকেন জেলে, চাষীটি রান্না করছে নয়ন বোয়ের চৌকিশালে।

বাবুটির বয়েস এক কুড়ির ওপর। চোখে সোনার চশমা, কোঁকড়ানো আধাবাবরি চুল, রং গোরা, পরণে আধ ময়লা পাঞ্জাবী পাজামা—শশী দেখছিল বাবুটিকে মন দিয়ে। বাবুটি চুপি চুপি বলল: ওই দত্তবাবু, এখানকার মেনাজার।

কাগজ থেকে মুখ তুলে দত্তবাবু বললেন: বল তোমরা। জগাই হাতজোড় করে বললে: বাবু, আমরা অনেক দূর থেকে আপনার কথা শুনতে এসেছি।

বাবু যাতে আমাদের ঘরের লোক মনে করেন এই জন্যে নম্র গর্বের হাসি হেসে জানালো: আমাদের পাঁয়ের বগলা আপনাদের আপিসের নেম্বর।

লতিফ বলল: আমাদের মতিনও। আমাদের মতিন দেখাবেন বাবু একেবারে ফকিরের মত। তবে তার মেজাজটা কেমন যেন একটু চড়া, কিন্তু সে কিছু নয়, মিষ্টি কথায় সে না করে কি……

দত্তবাবু চালচুলো, চাষবাস, জমিদার মাহাজন, খাজনা-দেনা, সুদ-তামাদি, জোর-জুলুমের খবর নিলেন, তারপর বল্লেন: তোমরা আবার একদিন এসো, সেদিন ভালো করে পরিচয় হবে।

সবাই নিরাশ হ'ল। এ আবার কি ধরণের কথা। এমন কথা তো সবাই বলে। হাল বলদের খোঁজ, ছেলের সাদি, মেয়ের সম্বন্ধ তত্ত্বতালাস সবাই করে পাঁয়ে ঘরে। তবে আর চাষী বাবুতে ফারাক কি, দুধু শিক্ষের প্রভেদ কিসে। চোখে চশমা এঁটে বাবুটি তাহলে এত কি পড়ে দিনরাত?

শশীর কেবল ভাল লাগল বাবুটিকে। জিজ্ঞেসা-জবাবের ভেতর দিয়ে বাবু অনেক কথা বলেছে। পথে যেতে যেতে শশী সেই সব খোঁচ ফুলকির সন্ধান দিল; শুনে সবাই একবাক্যে বলল শশীর মাথা আছে। কিন্তু গরম গরম কথা নেই, ঝাঁজ নেই, বন্দুক কামানের গন্ধ নেই, চুপি চুপি লুকিয়ে খোঁচা চাষীবাসী পছন্দ করে না। যে ফুলকিতে আগুন ধরে না মনে তার আবার সামর্থ্য কি। বল সোজা কথা, সরল বাকি, শুনে মনে হবে জমিদার মহাজনের চোদ্দপুরুষ যেন কেঁটিয়ে নরকস্থ হ'ল, হ্যাঁ।

ঘরে এল শশী, চালে সে নতুন খড় দিয়েছে। গোহালে

নতুন গাই এসেছে। ওপাশে ঘর তুলবে বর্ষার আগেই। বাঁশের আলনায় শশীর কাপড় কোলে পরিষ্কার। ঘরে তার নানান দেবদেবীর কাঁচে বাঁধানো ছবি। শশী মৃদু হাসে। শশী নেকাপড়া জানে না, কিন্তু শশী ভক্তোর।

(২)

সমাদ্দার মশাই খেয়ে উঠে দাওয়ায় বসে পান চিবোচ্ছিলেন, শশী দাওয়ার নিচে বসে খেজুরের রস জাল দিচ্ছিল। অন্দর মহলের ওধার থেকে একটানা ঢেঁকিতে পাড় দেবার শব্দ আসছিল, সামনের গাছে একটা কাক নষ্ট গলায় ডাকছিল—মাঘ মাসের পাড়াগেঁয়ে নির্জন দুপুর। সমাদ্দার মশাই ফুটন্ত গুড়ের দিকে চেয়ে নিয়ে বল্লেন, শশী, দেখি একটু মুখে দিয়ে কেমন হল, বেড়ে সুবাস বেরিয়েছে।

শশী বলল, কত্তা, মুখে পান দিয়েছেন, গুড়ের তার পাবেন না।

সমাদ্দার সমজদারের হাসি হাসলেন, শশী, এ আর কেউ নয়, জগদীশ সমাদ্দার, রেতের অন্ধকারে গাছের দিকে চেয়ে বলতে পারি পক্ষীটে কাক না কোকিল।

শশী আর জবাব না ক'রে একটু গুড় কাটিতে তুলে এনে বলল। সমাদ্দার মুখের পান ফেলে কাটি হাতে নিলেন, তারপর অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে একমনে অনেকক্ষণ নীরবে রসাস্বাদন করে মাথা নাড়লেন, না শশী, পানটাই নষ্ট হ'ল। যেমন বাস যার করেছ, বুঝলে, গুড় তেমন হয়নি।

শশী জবাবের জন্য চেয়েছিল কত্তার মুখের দিকে। শুনে মনক্ষুণ্ণ হ'ল, বলল, কত্তা, গুড়ের নয়, পানের দোষ, আপনি মুখ ধুয়ে এসে আর একবার দেখেন, আমিও আজ ত্রিশ বছর গুড় জাল দিচ্ছি, আমার পেত্যয় গুড় ভাল হয়েছে।

সমাদ্দার হাত নাড়লেন, ওই তোর বড় দোষ শশী, কথার ওপর কথা বলিস, আমি নিজে চেখে দেখলাম ভাল হয়নি আর তুই বলছিস্, ইয়ে……

শশী তবু থামবে না, না কত্তা, গুড় আজ খারাপ হয়নি।

সমাদ্দার চটে গেলেন, শশী তুক করিস নে। বলদ চিনির স্বাদ কি জানেরে? বলি কাটি নাড়লেই বুঝি হ'ল। আমি খাই বুঝেছিস্, পঞ্চাশ বছর ভালমন্দ গুড় খাচ্ছি। ও বিচারটা আমার থাক, তুই আর ওতে ভাগ বসাসনি, যা কচ্ছিস কর।

শশীর কি হল। মাথাটা তার দপ্ ক'রে জ্বলে উঠল। কত্তার কথায় দত্তবাবুর মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলো তার মুখ ছেঁদা করে যেন আবার বেরিয়ে এল, ফস ক'রে বলল, কত্তা, বলদের জাত বেশী মূল্যবেন না, তাতে চিনিও যাবে, খানও যাবে।

সমাদ্দার অবাক, নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। ধাতস্থ হ'য়ে অগ্নিশর্মা হ'লেন, চোখ পাকালেন, ডান হাতের তর্জনী সংকেতে বাগানের পথ সোজা দেখিয়ে বললেন, দূর হ'।

শশীও কোন কথা না ব'লে গামছাটা তুলে নিল। সমাদ্দার নিজেই অনেক কষ্টে গুড়টা তুলে নিলেন, মনে মনে ভাবতে সুরু করলেন, এ সেই শশী, যাকে……

ভাবনায় বাধা পড়ল। বলরাম মোক্তার কাছারী যাচ্ছিলেন ঐ পথে, বললেন, কি হে সমাদ্দার, মুখখানা বেজার কেন?

সমাদ্দার গম্ভীরভাবে জবাব দিলেন, ছোটলোকের আস্পর্ধা অসহ্য। আজ মাথায় পা দিয়ে অপমান করে গেল।

সোঁদা গন্ধে বলরামের মন উৎফুল্ল হ'ল। মুখ শুকনো ক'রে বললেন, তাই নাকি, অ্যা, বল কি! এ, এমন সাংঘাতিক কি হ'ল। তাইতো, কিছু বুঝতে পারছি না তো।

মোক্তার দাওয়ায় দেহ ও ছাতি রক্ষা করলেন।

শুনতে শুনতে বলরামের মুখ গম্ভীর হ'ল এবং গম্ভীর হয়ে শুনতে শুনতে মনে আন্তরিকতা এল, তাতে ক'রে রাগ হ'ল এবং শেষকালে মাথা নেড়ে ভারি গলা বার করলেন, এ যদি সত্য হয়, আর সত্যি তো নিশ্চয়, তাহলে, এ ব্যাপার বড় গুরুতর। এখনি বিহিত না হ'লে

লকলকিয়ে বেড়ে যাবে। ডালপালা গজিয়ে শাখাপল্লবে ফুলে ফলে এ একেবারে গেঁড়ে বসবে, এ শেষকালে ওপড়ানো দায় হবে। সেদিন ঘোষপাড়ার এমনি একটা ব্যাপার ঘটেছে. মাছের বাজারে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা চরমে উঠেছে, জন মজুরের দল দুটো কথা শোনার ধৈর্য ধরে না, চক্ষু খুয়ি নিজের হাতে চালাবার আস্পর্ধা হয়েছে ছোটলোকদের। শশী এক মাতব্বর। শশীকে ঠাণ্ডা করতে পারলে……বলরাম উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠেন, বলেন, সমাদ্দার আজ কোবরেজের বৈঠকে যেয়ো, কথাটা আমিই পাড়ব।

[৩]

ঘরের দাওয়ায় উঠে শশীর রাগ পড়ে গেল। মনে হ'ল কাজটা ভাল হয়নি। কত্তাবাবুর কাছে সে এক-আধ দিন নয়, ত্রিশ বছর আছে। এমন কথা তো কত্তা কতদিন বলেছে, দরকার ছিলনা জবাব করবার। কত্তা বাবুকে সে কি আজো চেনেনি। কত্তার মুখখানা শশীর চোখের সামনে ভেসে উঠল—আহা, অন্তরে অন্তরে যে মাটির মানুষ। তখন কত ছোট-বড় সুখ-দুঃখের কথা, কত দিনের কত ঘটনার কথা শশীর মনে পড়ল। সেবার নৌকো ক'রে চৌরো যাবার পথে ঝড় উঠল চাঁদুরের আজনের মুখে। কত্তা তখন যোয়ান পুরুষ। শশীকে বল্লেন: শশী, রতনের মাকে আমি দেখছি, রতনকে তুই দেখিস।' ফিরে এসেই কত্তা শশীকে দিলেন দশ বিঘে জমি। বরাত ঘুরে গেল শশীর। তারও আগে কত্তার ঘরে আগুন দিল হারু পরলা। কত্তার তখন খড়ের চাল। শশী ছিলনা গাঁয়ে। ফিরে যখন এল তখন করবার কিছু নেই। শশী আর পূর্ণ দুজনে মিলে চাল ছেয়ে দিল এক হপ্তায়। শশীর দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। লোকে বলত পুণ্ড-শশী। তাই না হয়েও পুণ্ড ছিল তার প্রাণের চেয়েও বেশী। ওলাবিবি তাকে কাছে টেনে নিলেন। আহা, কেমন বাঁশী বাজাত। শশী বলত: পুণ্ড, এবার ঘরে যা, রাত অনেক হ'ল। বাঁশি থামিয়ে কি যে ভাবত, তারপর ফোঁস ক'রে নিশ্বেস ফেলত। সেও যে কতদিনের কথা। যাঃ, কাজটা তার ভাল হয়নি। ছোট খোকার সঙ্গের দোলায় শুয়ে ঘুমতে ঘুমতে শশীর তন্দ্রা লাগে. সত্যিই কাজটা ভাল হয়নি।

মানিকের মা ঘাট থেকে এসে অবাক হয়। হ্যাগা, এই ভর দুপুরে মানুষটা দোলায় শুয়ে ঘুমোচ্ছে। কাজ কর্ম নেই, দোলাটাও যায় যে।' শশী বলল: গাটা ম্যাজ ম্যাজ করছে।

তার মানে কাজে মন নেই। শশীকে মানিকের মা ভাল ক'রে জানে। তবু গজগজ করতে করতে সে গেল হেঁসেলে।

সারাদিন শশীর অন্যমনে কাটল। পরদিন সকাল-বেলা রোদ না উঠতেই পশ্চিম বাগানে গিয়ে শশীর চোখে জল এল। বুড়ো কত্তা নিজেই বাঁখারি নিয়ে বেড়া বাঁধছেন। জন যে আর নেই খাঁয়ে তা নয়, শশী বুঝল, এ তার ওপর অভিমান। নিঃশব্দে বাঁখারিটা কত্তার হাত থেকে টেনে নিল তারপর উঁচু হ'য়ে বাঁধতে বসে গেল। শশীর হাতের ওঠাপড়া সবল পেশীর দিকে চেয়ে সমাদ্দার মশাইয়ের স্নেহ হ'ল। শশীটা ঐ রকম চিরকালে। দপ ক'রে যেমন জ্বলে ওঠে দপ ক'রে তেমনি নিভে যায়। কিন্তু ওঁর মুখের ওপর শশী এভাবে কথা কখনও বলেনি: বলবার কথা বোধ হয় ওর মনেও হয়নি। আজ কেন এমন হ'ল। নিচ্ছিদ্র কৃষক সমিতির ওই কোলকাত্তার বাবু ছোকরাদের উস্কানি। সেদিন মধুরাপুরে গিয়ে শুনেছিলেন বটে শশী ওখানে গিয়েছিল। সরল, মাথাপাগলা চাষা, যা বুঝিয়েছে তাই বুঝেছে। সমাদ্দার মশাই ডাকলেন সস্নেহে: শশী।

শুনে শশী এতক্ষণ যা ভাবছিল মুখ ফিরিয়ে মনে মনে, মুখ ফুটে তাই বলল: কত্তাবাবু, আমার জিভ তখন খসে গেল না কেন। আমার মহাপাতক হ'য়েছে, মরেও আমার পাপ যাবেনা। আমায় মাপ করুন, আপনার পায়ে ধরছি।

সমাদ্দার গলে গেলেন: তুই যে আমায় কতখানি শশী তা কি বলব। একটু চুপ ক'রে থেকে তারপর

আরম্ভ করলেন : কাল কোবরেজের বৈঠকে তোর নামে অনেক কথা বলেছিরে. ওরা আবার তোর কিছু না করে।

শশী অভয় দেয় : আপনি যদি আমায় চরণে রাখেন কত্তা, তাহলে আমি দুনিয়ার কাউকে ডরাই না।

সমাদ্দারের মন গর্বে ভরে গেল, শশীর মত মানুষ কার ঘরে কটা আছে।

দলবল নিয়ে সমাদ্দারের বাড়ীর দিকে এগিয়ে এসে বাগানের কাছে মোক্তার থমকে দাঁড়ালেন। তাইতো ব্যাপার সুবিধের নয় মনে হচ্ছে। কেমন যেন আপোষ আপোষ ভাব। উহুঁ ভাল চেহারা নয় দুজনের। তবু নির্ঝঞ্ঝাটে দুজনকে একজায়গায় পাবার সুযোগ নষ্ট করলেন না মোক্তার। ঘোষ, মিত্তির, মুখুজ্জের মত নুরুল্লি রয়েছে, খাবটে গন্ধ পেয়ে দু'চারজন ছোকরাও এসেছে, বেশ সুবিধে এখন। তন্ত্র পঞ্চায়েতের রাহু আর শান্তিপনেটা একসঙ্গেই হয়ে যাক। শশীকে ডেকে বলরাম বল্লেন : শশী, বাবুর সামনে নাকে খৎ দাও দশ হাত। যে থুথু ফেলেছ তা চেটে না নিলে ভিটে মাটি চাটি করে দেব তোমার।

শশীর আবার গত কালকার মত হল। খপ ক'রে বলল : আপনি হুকুম করবার কে ? আপনার খাই, না পরি, না ধারি! আর নাকে খৎ দিতে আমার বাপ আমায় শেখায়নি।' দাও ফেলে যাবার জন্ত উঠে দাঁড়াল শশী।

নিজেদের কানকে শক্ত ব'লে মনে হল সবারের। তন্ত্রবংশের রক্ত অপমানে টগবগ করে ফুটতে লাগল। চিৎকার ক'রে ঘোষ বল্লেন : ধীরেন, হারামজাদার কান পাকড়ে বিস ঘা জুতো মার মুখে।

শশী যাবার জন্তে পিছন ফিরেছিল, শুনে ফিরল, বলল : শশীর কান কেউ কোনদিন টানেনি, খুব নরম, ঘোষ মশাই, টানতে আপনার খুব আরাম হবে। কিন্তু হাত দুখানা বড় শক্ত। যে আসবে তার আঙুলগুলো চাঁপা ফুলের মত পেড়ে আনব।

সমাদ্দার ভয়ে পিছিয়ে গেলেন। বল্লেন : মোক্তার, ও শশী নয়, ওকে ভূতে ভর করেছে। পরশু সন্ধ্যেবেলা কবরখানার পাশ দিয়ে ফিরেছে, তার পর থেকেই''

সবাই একটু যেন কেমন হ'য়ে গেলেন। শশীও অবাক হল - সত্যি নাকি। বাগানের পথ ধ'রে চলতে চলতে তার মনে হল, সত্যি বোধ হয়।

মোক্তার কেমন যেন ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছিলেন এতক্ষণ। কিন্তু আবার চাঙ্গা হ'য়ে উঠলেন : বল্লেন : ভূতই বটে। তবে এর ওরা আলাদা, দাওয়াই আরো কড়া। আচ্ছা, দেখি ভূত ছাড়ে কি না। আমিও বলরাম মিত্তির।

[৪]

কৃষক সমিতির সামনে বসে সুরেশ দত্ত রিপোর্ট লিখছিলেন সদরে। গত মাসের কার্যকলাপের সবিস্তার ইতিহাস : মাস্তীয় দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণ করা, সরল করা। লিখছিলেন আশা আছে চেতনা জাগাবার, সংগ্রামে দানা বাঁধাবার উপকরণ বেশ প্রথম শ্রেণীর।

শশী এসে দত্তবাবুকে বলল সব কথা। বলল : দত্ত-বাবু, সত্যিই আমাকে ভূতে পেয়েছে। আমি তো এমন ছিলাম না কোনদিন। হালিকের নাকে গায়ে হাত তোলা দূরের কথা, গালমন্দ পর্যন্ত করিনি।

দত্ত উঠে দাঁড়ালেন, সামনে তাঁর জীবন্ত রিপোর্ট। হাসিমুখে বললেন : শশী ভূতেই তোমাকে পেয়েছে, তবে এ ভূত মানুষ মরে হয়না, ম'রা মানুষ বাঁচলে হয়। এ ভূত মানুষকে পশুত্ব থেকে মুক্ত করে। এতদিন যে অপমান, অত্যাচার, অবিচার তুমি বড় লোকেরা তোমাদের করেছে, আজ এসেছে তার জবাব দেবার দিন। ভূতেই বলছে তোমার মুখ দিয়ে, তোমার মত ভূতে পেয়েছে আজ সারা দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ সর্বহারাকে, এই পচা ঘুণ দুনিয়ার চেহারা তারা বদলে দিচ্ছে দুখানা হাতের জোরে। বাঁচতে হবে শশী, বাঁচতে হবে। শেয়াল কুকুরের মত নয়, মানুষের মত। তোমার মধ্যে সেই মানুষের মত বাঁচার তাগিদ এসেছে।

লম্বা লম্বা কথা শশীর কানে গেলনা। অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে, বকবক করেছে, তেষ্টা লেগেছে। বলল: দত্তবাবু, এক ঘটি জল।' চকচক ক'রে জল খেয়ে ঠাণ্ডা হল শশী। বাপরে কি রাগ। ছোঁড়াটা যদি এগিয়ে আসত তাহলে কি হত বলা যায়না। যোয়ান বয়েসের বিয়ের আগের মত রাগ কেন তার। ঠাণ্ডা মাথা শশীর অবাক হ'ল। উঠে পড়তেই দত্ত বলল: শশী, কাল রোববারের মিটিংএ তুমি এস, আমি সবাইকে বলে দেব।

ভদ্রলোকের ছেলে বলছে, শশী না করতে পারলনা।

ঘরে আসতে মানিকের মা একগাল হাসল: মানিকের খোকা হ'য়েছে। টুকটুকে সোনার চাঁদ।

শশী মানিকের মার দিকে চাইল। তাইত, পরণের কাপড়খানা মানিকের মার আস্ত নেই। কাল সকালে একবার কণ্ট্রোলের দোকানে লাইন দিতে হবে। শশী বসে বসে ভাবতে লাগল। মানিকের খোকা, তার নাতি বংশের বাতি। এর মধ্যে নতুন কোন আমোদ আর নেই। তবু শুনতে আনন্দ হল, গাটা শিরশির করল এই বয়েসেও।

মানিকের কি হ'ল। ঘরে এসে হাপ ছাড়ল না, পা ধুলো না, ছেলের কথা শুনে সব ভুলে গেলনা, বাবাকে ডাকল চুপি চুপি বলল: আজকের কাজটা ভাল হয়নি। শশী যেন কাল কৃষক সমিতির মিটিনে না যায়। বাবুরা আজ বিকেলে বৈঠক করেছে, নানান সলা পরামর্শ করছে। কোর্টের পেয়াদা বাবু তাকে বলেছে সে যা শুনেছে তাই কম নয়।

মানিক তয় না দেখালে শশী হয়তো যেতো না। গেলেও এমন ক'রে বক্তিমে করত না। মিটিংএ এসে শশী অবাক। কোলকাতার বাবুরা সকলে নানান কথা বলে শেষকালে শশীকে ধ'রে পড়লেন বক্তিমে করতে। গাঁয়ের ছোঁড়াগুলোর যেন ফুর্তি লেগে গেল। তারাও নাছোড় বান্দার মত লেগে রইল তার পেছনে। শশীকে দাঁড়াতেই হ'ল। বাবুদের মত কায়দা সে জানেনা, সোজা সাদামাটা কথা সে বলল: চাষা ভুষো বাগ্দী মিটিন করে শশীর মত মুখ্যুর কথা শুনবে শশী বাপের জন্মে এমন কথা ভাবেনি। দিনকাল সব বদলে গেল। ভদ্দর লোক যদি ভদ্দর থাকত তাহলে শশীর কথা শুনতো কে। তাই সব, ভদ্দর আজ চামার-কশাইয়ের অধম হয়েছেন, মাক্তি তাঁরা আর পাবেন না।

চড়বড় চড়বড় ক'রে হাততালি পড়ল, ছোকরাদের ভেতর থেকে। নন্দ অবাক হ'ল, শশী 'ভাই' সব' কথাটা কেমন কায়দা ক'রে লাগাল। দিনকাল সত্যিই বদলাল।

ঘরে এল শশী খুশি মনে। সভার মধ্যে বাবুদের মত সে বক্তিমে করেছে। সবাই শুনেছে, বাবুরা তালি দিয়েছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শশী স্বপ্ন দেখল, ছোটজাত সব ক্ষেপে গেছে। ভদ্দর লোকের ঘরবাড়ী ভাঙছে-লুটছে, সবার আগে সে আর দত্তবাবু। কত্তার ঘরের সামনে এসে দত্তবাবু বলে: ওকে শশী প্রথম মারবে। শশী কি তা পারে? তাকে লড়তে না দেখে নন্দ তুলল লাঠি। শশী নন্দকে ঠেলে ফেলে দিতেই, ফলওয়ালা ইমাম সেখ বলল: শশী বেইমান। দালাল। তাই শুনে পেছন থেকে গোলমাল উঠল, দলে দলে লোক তাকে তাড়া করল। ঘরে গিয়ে শশী হুড়কো দিতেই দমাদম লাথি মারতে লাগল দরজায় মারমুখো লোকেরা। .....শশীর ঘুম ভেঙে গেল। সত্যিই তো দরজার জোরে জোরে ধাক্কা পড়ছে। ঘুম চোখে দোর খুলতেই একটুখানি ফর্সা আকাশের আলোয় শশী অবাক হ'ল—জমাদার সিংজী, পেয়াদা গোলোক, মতি, হনুমানদাস—কি ব্যাপার? পরশু শৈল মুখুজ্যের বাড়ীর চুরিটা মানিক করেছে বলে সন্দেহ করছে ভদ্রলোক। শশী কি এখনও ঘুমোচ্ছে নাকি? ঘুমন্ত লোকের মত শশীর মুখটা ফাঁক হয়ে গেল, নীচের ঠোঁটটা অর্থহীন ঝুলে পড়ল, কেবল চোখ দু'টো বিস্ময়ে হ'য়ে উঠল ভাঁটার মত। ঘটি বাসন ফেলে ছড়িয়ে, বালিশ কাঁথা ছিঁড়ে খেঁড়ে পেয়াদা সেপাই তছনছ করে দিল। মানিকের মা সকলের পায়ে পড়ে

...ড়াড়ি ছিল। বলবার কি আছে। সত্যি করে শশী যদি লুকিয়ে থাকতে পারত, ঐ ঘটির কি কাঁথার ভেতর। কিন্তু শশী তো ঘটি কাঁথা নয়।

বাইরে সকালে আঁতুড় ঘরের সামনে এসে জমাদার উঁকি মেরে ফ্যাস ফ্যাস করে হাসল, বাঃ, বাঃ, বেশ ফুটফুটে ছেলে তো, বলি ছেলেটা কার, মানিকের না মানিকের বৌয়ের?

শশীর মাথার মধ্যে বিদ্যুতের ঝলক চড়াৎ করে চলে গেল। জমাদারের টসটসে গালে তার শির বারকরা হাতের কটিকাটা আঙুলগুলো বসে গেল—ঠাস্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল।

মানিক খালাস হ'ল না, শশীও না। ঘরে জমাদারকে শুধু শশীই মারে নি। শশী জানে না তার সামনে দাঁড়িয়ে মানিকও মেরেছে, রক্ত মেরেছে, শুধু তাই নয়, অনেকক্ষণ ধরে মেরেছে। শশী আর মানিক মেরে মেরে ক্লান্ত হয়ে গেলে তবে তারা ছাড়া পেয়ে কোন রকমে থানায় এসেছে। জমাদার পেয়াদা কিন্তু কিছু বলেনি কেবলমাত্র অপেক্ষা করেছে। আদালতে মামলার আইনের সাহায্যে শাস্তি দেবার জন্য চুপ ক'রে থেকেছে। শশী আর মানিক পরে জমাদার পেয়াদাকে ফাঁসাবার জন্যে ইচ্ছে ক'রে ঘটিবাটি ভেঙেছে, বালিশ কাঁথা ছিঁড়েছে, নিজেরা নিজেদের মেরে মেরে কালশিটে বানিয়েছে। তারপর নিজের ছেলের বোয়ের নামে বলতেও শশীর বাধেনি। জমাদার ওমন কুৎসিৎ রসিকতা করবে-ই কি কথা, আর তার দরকারই কি, মামলার সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই যখন। আর এ সব যে মিথ্যে তার সাক্ষী নারাণ, হাবু, ভক্ত। কোশ পাঁচেক ঘুরে তিন পেয়াদে তারা গিয়েছিল বটে, সেদিন বিকেল বেলা, কিন্তু সারারাত হেঁটে ঠিক সময়টিতে তারা শশীর বাড়ীর সামনে এসে নিজেদের চোখে সব দেখেছে, কোর্টে সাক্ষী হবার জন্যে সব খুঁটিনাটি কথাবার্তা মুখস্থ ক'রে রেখেছে।

মানিকের তিন বছর আর শশীর হ'ল চার বছর। জমাদারকে মেরে ফেলার ইচ্ছে ছিল না শশীর। কতদিন সরকারী হাসপাতালে থাকতে হয়েছে তাকে।

(৪)

কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে শশী পৌঁছাল গাঁয়ে। এই পথ, পথের ধারে গাছ, তার শেষে ক্ষেত খামার সব তার চেনা। মনটা তার হু হু করে উঠল। সামনে থেকে আসছিল বিশু বায়েন। শশী গাঢ় গলায় ডাকল, বায়েন। বায়েন দাঁড়াল, ঠাহর করে দেখে বলল, কে শশী না? শশী অবাক হ'ল, বায়েন কোন দিন তাকে নাম ধরে ডাকে নি। আর কোন কথা না বলে সে চলতে সুরু করল। পথে কত পরিচিতের সঙ্গে দেখা হ'ল, শশী তাদের দিকে লোভীর মত চাইতে লাগল। আশ্চর্য হ'ল শশী, তারা কেউ একটু হাঁ হুঁ করল না।

ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল শশী। ছখানা চালাই পড়ে গেছে। ভাঙা চাল কাৎ হয়ে আছে মরা ভিটেটার ওপর। মানিকের মা নেই, মানিক নেই, মানিকের বৌ নেই। পঞ্চাশের মন্বন্তরে কোলকাতা গিয়েছিল সবাই, কানু শেখ, মধু ছাজরা, বিশু বায়েন, আরো অনেক অনেক, মানুষ এক সঙ্গে। মানিক চলে গেছে চটকলে, হাওড়া না কোথায়। আবছা আবছা অনেক কথা কানে এসেছে জেলখানার হাজার লোকের চলতি কথার আনা-গোনায়। কুষক সমিতি বে-আইনি হয়ে গেছে। গুপ্তবাবু কয়েদ হয়েছেন শুনেছিল সে দেখেছিল কয়েকটি ভদ্রলোকের সঙ্গে, দু'দিন ছিলেন ওখানে মুখুজ্জে মাষ্টার সরকারী লঙ্গরখানার কর্তা হয়েছিলেন, অনেক লোক নাকি বেঁচেছে তাঁর দয়ায়। শশী ফিরল।

ওপাড়ার নারাণ জেলে ঘর থেকে উঁকি মেরে বলল, কে, আমাদের শশী শেখর না? তারপর কবে বেরুলে? বাইরেটা অনেকদিন দেখা নেই তো, তাই খাপছাড়া মনে হচ্ছে। বস বস, এক ছিলিম তামাক নাও। তারপর এদের খবর টবর কিছু পেলে? নারাণ সহানুভূতি জানায়, আহা, সংসারটা তোমার ভেঙে গেল শশী। তা বলব আর কি, সংসারও করেছিলে তেমনি। ভদ্দর লোকেরা কতকরে

বলল, তা কিছুতে মাণিকের মা-বৌ নজরখানায় উঠল না। মাণিকের বৌটাকে মোক্তার বাড়ীতে কাজ নিতে একরকম সাধাসাধি করেছিল···বাঘের মুচকি হাসল, মাণিকের খবর কিছু পেলে? শুনলুম চটকল ছেড়ে বছমান না কোথায় কয়লা খাদে গেছে, সেখানে একটা নিকেও নাকি করেছে।

নিকে কথাটা খট করে লাগল গায়ে। শশী চেঁচিয়ে উঠল, তোর তাতে কি, তোর মেয়েকে টেনে নিয়ে গেছে।

নারাণ হাঁ করল। বাবা, শশীর মুখে পেঁয়াজীর ঝাঁঝ! তবু মোলায়েম করে হেসে বলল, যার বৌ বেমুক্তে হয়ে যায়, আমার মেয়েকে বার করবার জোর তার কোমরে নেই। মাণিকের বৌকে রতন স্বচক্ষে কোলকাতায় দোকান দিতে দেখে এসেছে। রতনকেও সে হাতছানি দিয়ে ইসারা করেছিল। রাম, রাম, মুখ তোমার পুড়েছে শশী, ও মুখ আর সমাজে নেড়ো না। শুনতে পাই সাতখানা গাঁয়ের লোক তোমার কথা শুনতো। আজ যাওনা ঘুরে এস একবার।

গাল ঢোকা একমুখ দাড়ি ভরা মুখে কজিতাল হাত বুলিয়ে উদ্বত খুথুটা শশী গিলে ফেলল। কয়েদ হয়ে সেই শুধু পাটকাটি হয়নি। সরকারের নতুন হাসপাতালের দারোয়ান হয়ে নারাণও ভারি হয়েছে। তবু অনেকদিন পরে প্রাণ খুলে চেঁচাতে পেরে আরাম হ'ল শশীর। মরা বাঘকে মারতে নেই, প্রবাদটা মনে পড়ল নারাণের। সহানুভূতি জানিয়ে বলল, হাতখানা তোমার জ্বালল কি ক'রে শশী। পড়ে টড়ে গিছিলে নাকি? ডান পা'টা শশী টেনে টেনে চলছিল, ওটার কথা নারাণ আর জিজ্ঞাসা করল না, পাঁচ বছর আগে ওটার ইতিহাস সে নিজেই জানে। প্রবাদটার সঙ্গে তার মনে পড়ল ভগবানের কথা, বিবিলিপি কে খণ্ডাবে বল।

চলতে চলতে নারাণের কথাগুলো মনে হল শশীর। মাণিকের বৌ তাহলে সত্যিই কোলকাতায় দোকান দিয়েছে। কথাটা কয়েদখানায় সে বিশ্বাস করেনি। বৌটা একটু গোরা ছিল বটে। শশীর আরও মনে হল মোক্তার বাগানের পুকুর ঘাটে আসত বটে ঘন ঘন। কিন্তু গলায় আঁচল দিয়ে কেমন প্রণাম করত তুলসীতলায়, শাঁখ বাজাত ভক্তি করে। মাণিককে কৈ তো অযত্ন করত না। মাণিকের মা তো একদিনও সঙ্গ করেনি। মেয়েছেলের চোখকে ফাকি দেওয়া এমনি সোজা। কয়েদে যাবার দিনের কথা মনে হল। উপুড় হয়ে পড়েছিল বৌটা জমাদারের পায়ে, চোখের জলে ভারী বুটটার ধুলো কাদা হয়ে গিয়েছিল। মাণিকের মা মরেছে রাস্তায় পড়ে। তা মরতই একদিন। গোয়ালের নিকোন তকতকে দাওয়ায় শীতলপাটি বিছিয়ে বসা দিনগুলোর কথা মনে হল শশীর। পূর্ণিমা সুন্দর ছিল। ঘাটের মেয়েরা বলত, আহা, শশীর বৌ পূর্ণিমা। শশী নিজের কানে শোনেনি। কেউ বলত, মিথ্যে কথা নয়?

চলতে চলতে ইষ্টিশন এসে গেল। একটা লোকাল এসে দাঁড়াল। যাত্রীদের খাওয়া দেখে শশীর খিদে পেল। সামনেই একটা গদিওলা গাড়ী। শশী নিজেই অবাক হল, কেমন আপনি আপনি ভাঙা পা'টা টেনে শক্ত বজ্জি হাতটা বাড়িয়ে করুণ মুখ করে সে ভিক্ষে চাইল। বাবু একটা আনি দিলেন। গাড়ী চলে গেল। তবু শশী ইষ্টিশনের চাতালে বসে রইল কতক্ষণ। লাইনের এপারে ওপারে নতুন ধানের শীষ দেখা দিয়েছে, হলুদ হল বলে ধানের মাথা। আকাশের নীল আরো মোটা হবে, মেঘ আরো সাদা হবে, বান পাকবে। এক ঝাঁক শালিখ কিচকিচ করতে করতে এসে বসল রেলের তারে—ছুটো ফিঙে, ক'টা চড়াই·····

বেলা পড়ে এল। আনিটা ফেলে শশী হঠাৎ সন্ধ্যে হয়ে আসা মাঠে আলের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল। অনেক দিন পরে তার চোখ ভরে জল এল। একটা সাপ ঘুরতে বেরিয়েছিল সেই পথে হাওয়া খেতে। শশীকে দেখে তার ফুর্তি হল, ঝপ করে ছোবল দিল পায়ে। এবার আর শশী প্রতিবাদ করল না।

কবি নজরুল

শ্রীঅনন্তদেব মুখোপাধ্যায়

নজরুল যেদিন ভূমিষ্ঠ হলেন, সেদিনের কথা অপ্রয়োজনবোধে কেউ আর মনেও করেন না। সেদিনটি সেদিন ছিল জানিনা। জ্যৈষ্ঠের ঘন দুর্যোগ আর ঝঞ্ঝাই হয়ত কবিশিশুকে সেদিন আবাহন জানিয়েছিল বিদ্রোহী সম্ভারে। তাই তাঁর কবিতায় চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস বিদ্রোহের সাইক্লোন তার নৃত্য-পাগল ছন্দের অনুরণন জাগিয়ে তুলেছে।

কিন্তু এই বিদ্রোহের সুরটুকু তাঁর কাব্যের সবটুকু নিয়ে নয়। জ্যৈষ্ঠমাস বিদ্রোহী; তবুও, শুধু ঝড়-ঝঞ্ঝার ঝাপ্টা নিয়েই এ-মাসটি শেষ হয়না। এরও মাঝে আছে বর্ষণস্নিগ্ধ সুন্দর দিন। জ্যৈষ্ঠের কবি নজরুলের কাব্য-সঞ্চিতার মাঝেও তেমনি বহু রসোত্তীর্ণ, সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী কবিতা ও উৎকৃষ্ট গানের ফুলঝুরি ফুল ফুটিয়েছে। শুধু ধ্বংস আর শ্মশান নয়—তাঁর কবিতা লোকালয়, তাঁর কবিতা সৃষ্টি। নিজেই তিনি তাই বলতে পেরেছেন, মন একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতূর্য। বিদ্রোহী তিনি, তিনি স্রষ্টা সুখন। তাঁর হাতে কখনও শিনাকপাণির ডমরু, কখনো বা অফিয়াসের বাঁশরী। এই ডমরু আর এই বাঁশরী, এ-দুই যে নিনাদ, যে-সুর তুলেছে, তার সংশ্লেষণে কবিকৃতিকে মোটামুটি-ভাবে গ্রহণ করা চলে। এ ছাড়া তাঁর প্রাণখোলা হাসি-উল্লাসে উল্লসিত হাস্যরসসিঞ্চিত কবিতা-মঞ্জরী রয়েছে। এ কবিতাগুলো জ্যৈষ্ঠের বিদ্যুৎঝিলিকের মত। ক্ষণ-প্রভার মত হলেও এর কিন্তু প্রভা আছে। এরই আভায় তাঁর কবিতার বৈচিত্র্যপূর্ণ আভাস কিছুটা পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠের হাওয়া ও আবহাওয়ার মধ্যেই তাই হয়ত কবি নজরুল-মানসের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যাবে।

জ্যৈষ্ঠের বেড়া পার হই। পার হই বছরটির গণ্ডী। অবতরণিকা পার না হলে অবগাহন হবে কেমন করে?

অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে আসি সেই যুগের কাছে। রবীন্দ্রোত্তর যুগ। রবীন্দ্র-প্রভাব-মুক্তি-প্রচেষ্টার যুগ। কবি নজরুল, যতীন্দ্র সেনগুপ্ত, মোহিতলাল প্রমুখ বিশিষ্ট সাহিত্য-রসিকেরা এই যুগটির পরিচালনায় সর্বপ্রথম উদ্যোগী হন। সমালোচক আজহারউদ্দীন খান বলছেন, এই সময়েই "প্রথম মহাযুদ্ধের আঘাত যখন মধ্যবিত্তের সাবেকী জীবনযাত্রার উপর এসে লাগল, তখন আশা-বাদের চিহ্ন একটুও দেখা গেলনা। মনের মত জগৎ নয় বলেই যতীন্দ্র সেনগুপ্তকে দুঃখবাদ পেয়ে বসল, বুদ্ধদেব-অচিন্ত্যপ্রমুখ হামসুন-লরেন্সীয় রক্তমাংসের প্রেমের মধ্যে আত্মগোপন করলেন, কেউ কেউ আবার বক্তব্যের দুর্বোধ্যতা দিয়ে নিজের চারধারে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তুললেন।" এ-কথা বলার পরেও বোধহয় যুগ-সম্পর্কে আর একটু কিছু বলা দরকার। শুধু ত যুদ্ধের আঘাত নয়, সে-সময়ে বিদেশী প্রভুর প্রতি অনাস্থা, জালিয়ান-ওয়ালাবাগের অমানুষিক অত্যাচার, রাশিয়ার সাধারণ মানুষের জাগ্রত বৈপ্লবিক অভিযান প্রভৃতি সে-যুগের ঘটনা-তরঙ্গাভিঘাত সে-যুগের সাহিত্যের মধ্যে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠে। এ-সব ঘটনা কবি নজরুলের কবিতাতেও প্রতিফলিত হল। "বিদেশী-শাসকের আধিপত্য-মুক্ত এক স্বাধীন স্বদেশের বন্দনায় সে-কাব্য মুখর; মধ্যযুগীয় ন্যায়ধারণাকে অতিক্রম করে সমাজে নারীপুরুষ-অভেদে ব্যক্তির পূর্ণপ্রতিষ্ঠার আবেগে সে-কাব্য অধীর।" মূল কথা এই, যে, সেই হতাশা আর দুঃখবাদের যুগে কবি নজরুল ভগীরথের মত আশাবাদের গঙ্গা আনলেন বাংলার সাহিত্য-উপত্যকায়।

একই যুগে থেকে এবারে পৃথিবীর অন্য পৃষ্ঠটির দিকে লক্ষ্য করি। সেই যুগেই, সেই প্রথম মহাযুদ্ধের কয়েক বছরে দেখা যায় প্রতীচ্যের দুই তরুণ কবিকে—Wilfred Owen ও Rupert Brooke কে। এঁরা দুজনেই যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। আর বাঙালী কবিও তো বাঙালীদের পল্টনে মেসোপটেমিয়ায় গিয়েছিলেন। তাই আলোচ্য কবি-প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে সহজেই দুজন ইউরোপীয় কবির কথা মনে পড়ে। নজরুলের কবিতার কবি Owen এর মত "Pity" আছে। "কামাল পাশা" কবিতাটিতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ব্যঙ্গভরে বলেছেন :

মরলে কুকুর ওদের, ওরা শহীদ গাথার বই লেখে!
খবর বেরোয় দৈনিকে,
আর একটি কথায় দুঃখ জানায়, "তোর মরেছে
দশটি হাজার সৈনিকে!"

কবি Owen ও এক কথায় না হোক, একই ভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে একই বক্রোক্তির সাহায্যে বলে উঠেছেন :

The frontline withers,
But they are troops who fade, not flowers,
For poets' tearful fouling ;

কিন্তু Owen এর পাশে নজরুলকে রাখলে তাঁর কবি-প্রতিভার উজ্জ্বলতার স্ফুরণ, সার্থকতর পরিণতি চোখে পড়ে। কবি Owen দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বিড়ম্বনাময় হতাশ দুঃখবাদের গভীর খাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছেন। নজরুল দুঃখ, সমবেদনা ও আন্তরিক সহানুভূতি জানিয়েই আশাবাদের উত্তুঙ্গ, দুর্লঙ্ঘ্য গিরি-শৃঙ্গকে পদানত করেছেন। তাঁর যে আশাবাদ, তা Ruskin বা Rupert Brooke এর মতই। তাই ত তিনি সেই পুরনো লাটিন প্রবাদকে Owen এর মত অস্বীকার না করে Dulce et decorum est Pro Patria mori-র জয়গান গেয়ে উঠেছেন :

মৃত্যু এরা জয় ক'রেছে, কান্না কিসের?
• • •
দেশ বাঁচাতে আপনারি প্রাণ শেষ করেছে।
বেশ করেছে!!

কবি নজরুলের সঙ্গে কবি Owen এর আরও একটি জায়গায় বিশেষ পার্থক্য অনুভূত হয়। বিদেশী কবি "যুদ্ধ" ও যুদ্ধে-যাওয়া সৈনিকদের প্রতি সমবেদনশীল। তাঁর সহানুভূতি খণ্ডিত। ভারতীয় কবি কিন্তু খণ্ডের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ থাকতে পারেন নি। তাঁর মানবতাবাদ আংশিক নয় কখনই : তাই তিনি সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষকে এক মোহনায় দাঁড় করিয়ে এক মিলনের বাণী শোনাতে পেরেছেন। তাঁর এই জীবন-বাদই তৎকালীন সাহিত্যিকদের থেকে তাঁকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। এই মানবতাবাদই তাঁর বিদ্রোহের আগুনভরা কবিতাগুলোর জন্ম দিয়েছে। এই মানবতাবাদই তাঁর অগ্নি-বীণায় সুর তুলেছে। এই মানবতাবাদই তাঁকে বঞ্চিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত সর্বহারাদের সাথে এক আসনে বসিয়ে দারিদ্র্যে মহান হবার সুযোগ দিয়েছে—সর্বহারাদের জীবন-বন্দীদের অন্তর-ভাশাভাল সঙ্গীত রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু বিশ্বমানবতাবোধ তাঁকে যে ভাবে, যে ভাষায় অগ্নিগর্ভ এবং অগ্নিবর্ষী কবিতা রচনা করতে সাহায্য করেছে তা কোন রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষণ-জীবিত প্রচার-বাণী নয়। তাই ত তাঁকে সকল দল, সব গোষ্ঠীই বিরোধী দলের লোক বলে প্রচার করেছেন। আমুকোরা যত নন্‌ভায়োলেন্টই নন্‌কোর দল মনে করে তিনি "ভায়োলেন্সের ভায়োলীন" বাজিয়ে বিপ্লবী মনের দীপ্ত উত্তেজনা প্রকাশ করেছেন; অপর পক্ষে বিপ্লবী দল নিঃসন্দিহান যে তিনি অহিংস, "নয় চরকার গান কেন গাবে?" তিনি কোন পক্ষের সেই নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করে গোঁড়া-রামের দল আর পাতি-রামের দল। 'স্বরাজীরা ভাবে নারাজী, নারাজীর ভাবে তাহাদের অখুশি।" এইখানেই নজরুল-বিচারের আসল ভুল ঘটে থাকে। "নজরুলের মানবিক চেতনা" প্রকৃতপক্ষে "একাদীন রাজনৈতিক মতবাদ-সম্ভূত নয়, এর সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা আছে উনিশ শতকের উদার-নৈতিক জীবনবাদের।"

তিনি রাজনৈতিক মতবাদের ফাঁদে নিজেকে ধরা না

দিয়ে, জাতীয়তাবাদকে স্বীকার করে বরণ করেছেন জীবনদেবতাকে,—আলিঙ্গন করেছেন যুক্তিসম্পন্ন, বিচার-বুদ্ধি-প্রসূত আন্তর্জাতিকতাবাদকে। তাঁর জাতীয়তা-বাদ সম্পর্কে যে বোধ, যে জ্ঞান, যে ধারণা, তা গিয়ে মিশেছে আন্তর্জাতিকতার তথাকথিত জ্ঞানের গভীরে। তাই ত তিনি জগৎটাকে দেখতে চেয়েছেন, জীবন-বন্দনা করেছেন, বিশ্বের সাথে জীবনের পথে যারা আগুয়ান, যারা পুরোধা তাদের গান গেয়েছেন আর উল্লসিত হয়ে বলে উঠেছেন যে, তিনি তাঁর সীমার বাঁধন টুটে দিগন্তরেখায় লুটিয়ে পড়বেন। তিনি পাতাল ফেঁড়ে নেমে আর আকাশ ফুঁড়ে উঠে বিশ্বজগৎকে হাতের মুঠোয় পুরে দেখতে চেয়েছেন। এখানে অনেক অতিশয়োক্তি আছে, অনেক রোমান্টিক কল্পনা-বিলাসের অবকাশ চোখে পড়ে, শুধু তার মাঝে আছে এক চরম সত্য—যে সত্যের বলে তিনি স্বরাজীতে হয়েছেন নারাজী, ভবিষ্যতের কবি হতে চান নি। চিরকেলে বাণী, অমরকাব্য লিখে রাখতেও প্রয়াস পান নি। বড় কথা, বড় ভাব মাথায় আসেনা বলেই যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস, তাঁর রক্তলেখায় তাদের সর্বনাশ লিখে রেখে যেতে চেয়েছেন। এই একই ভাবের তাড়নায় তাঁর কবি-মন বারবার পীড়ন অনুভব করেছে, সাম্যের বীজমন্ত্র জপে, সর্বহারাদের গান গেয়ে হয়েছে বিদ্রোহী।

কিন্তু এখানেই কবির কাব্যপরিচিতি শেষ হয় নি। নিজেকে তিনি শুধু বেদুইন, চেঙ্গিস্, ঈশান-বিষাণে ওঙ্কার কিংবা ইস্রাফিলের শিঙার মহা হুঙ্কার বলে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করলেও তিনি নিজেও জানেন যে, তিনি শ্যামের হাতের বাঁশরী। তাই শুধু বিদ্রোহী কি কুলি-মজুর, আমার কৈফিয়ৎ কি সাম্যবাদী, কিংবা ঈশ্বর, নারী আর সর্বহারা পড়ে নজরুলকে বিদ্রোহী কবি-রূপে দাঁড় করালেই তাঁর যথার্থ পরিচয় দেওয়া যাবে না। তাঁর যে গীতি-কবিতা সেদিকেও আমাদের রস-পিপাসু মনকে ফিরতে হবে রসলিপ্সা নিয়ে। তিনি তাই নিজেই বলেছেন যে, কখনো বীণা তাঁর তরবার হয়েছে, আর কখনো বা অসিতে বেজেছে বাঁশী। তাঁর বিদ্রোহী কবি-মন নিয়ে তিনি থাকতে পারেন নি। 'জীবন দেবী'কে বলে উঠেছেন যে, তাঁর সমরজয়ী অমর তরবারি দিনে দিনে ক্লান্তি এনে ভারী হয়ে উঠেছে। তিনি এ তার সমর্পণ করে হেরে যেতেও রাজী হয়েছেন। আর যত ফুল তাঁর মালায় পুরে তিনি নয়নজলে ভেসে বিজয়ী হতে চেয়েছেন। এখানেই তাঁর গীতি-ধর্ম বিদ্রোহধর্মের ওপরে স্থান পেয়েছে। গীতি-ধর্মী হয়ে তিনি 'বিদ্রোহী' কবিতাটিতেও একেবারে চুপ করে থাকতে পারেন নি। ভাবের আবেগ বাণীমূর্তিতে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে—

আমি অভিমানী চির-ক্ষুব্ধ হিয়ার কাতরতা,
ব্যথা সুনিবিড়,
চির চুম্বন-চোর, কম্পন আমি থর থর থর
প্রথম পরশ কুমারীর!
আমি গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি,
ছল ক'রে দেখা অনুখন,
আমি চপল মেয়ের ভালোবাসা,
তার কাঁকন চুড়ির কনকন্।

সিন্ধু-হিন্দোল, দোলন-চাঁপা, ছায়ানট ও তাঁর গানের, সুরের মূর্ছনা, ভাব-ব্যঞ্জনা, অগ্নি-বীণা আর বিষের বাঁশীতে জাগানো সুরকে ছাপিয়ে গেছে। এ সুরকে পেছনে ফেলে রেখে সে সুর উচ্চাঙ্গ সৃষ্টির মাঝে স্থান পেয়েছে। বাংলার সাহিত্য-সমাজ তাঁকে যে বিশেষণে বিশিষ্ট করে তোলার চেষ্টা করেছে, সেই 'বিদ্রোহী' কি 'সাম্যবাদী' কি 'সর্বহারার কবি' প্রভৃতি বিশেষণে তাঁর কবি-প্রতিভা খণ্ডিতরূপে প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর প্রতিভার প্রকৃত ও অখণ্ড পরিচয় সেখানে নেই।

অন্য প্রসঙ্গে আসি। কবি T. S. Eliot আজকের মানুষদের কথা বলতে গিয়ে তাদের "Hollow Men" আখ্যা দিয়েছেন। নিজেকেও তিনি এদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে পারেন নি। এরা আমাদের মতই। কিন্তু তারা আমাদের মত হলেও কবি নজরুলের সঙ্গে বোধ হয়

এদের মিল কোথাও নেই। তাঁর প্রাণ আছে, স্পন্দন আছে, স্রোত আছে, তাই ত প্রেমের বান বয়ে গেছে তাঁর অন্তর ছুইয়ে দিয়ে, গান ছুঁয়ে ছুঁয়ে আছে তাই কবিতার গুচ্ছে গুচ্ছে। তাঁকে গীতি-ধর্মী প্রেমের কবি স্বাভাবিক ধারণা নিয়ে বললেও অনেকেই হয়ত দ্বিধা, সংশয় কিংবা ইতস্ততঃ প্রকাশ করবেন। কিন্তু কোনরকম অন্ধার প্রশংসা ও অযথা চাটুবাক্য বর্ষণ করার কোন ইচ্ছা না নিয়েই নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, তাঁর প্রেমের কবিতা-গুলো নিটোল মুক্তার মত সুন্দর, সুডোল আঙুরের মতই রসসিঞ্চিত। অনেক প্রেমের কবিতা পড়েই মনে হয়, এ যেন সেই তাঁর অমর কাব্য লিখতে না চাওয়া মনের স্ফুরণ নয়, এ যেন অন্ত কোন রসিক-মন-মধুচক্রের ক্লান্তিহীন অনায়াস করণ।

প্রেমের পটে তিনি নারীকে প্রেমময়ী ও ছলনাময়ী, এই দুই রূপে রূপায়িত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোন' ই তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে। বর্ষা ও বসন্তের মত তারা দুজন। কিন্তু রবীন্দ্র-কল্পিত সমুদ্র মন্থন করি' উঠেছিল যে দুই নারী; তাদের অস্বীকার না করে তিনি একটি তৃতীয় মূর্তি কল্পনা করেছেন। কিন্তু সে প্রেমের পটে রূপ পায় নি। সে মহীয়সী কবির বিজয়লক্ষ্মী, সে সে রক্তাম্বরধারিণী মা। সেদিক থেকে এ আলোচনা সরে আসে; কারণ, তার পটও ভিন্ন, সে যে পটভূমিকায় রূপায়িত, সে পটভূমিকাও অভিন্ন নয়।

প্রেমময়ীর পাশাপাশি তিনিও ছলনাময়ীকে দেখেছেন। অন্য কবিদের মত তিনিও তাকে না দেখে থাকতে পারেন নি; এড়িয়ে যাবারও ব্যর্থ চেষ্টা করেন নি। এখানে তিনি স্পষ্টবাদী।

এরা দেবী, এরা লোভী, যত পুজা পায় এরা
চায় তত আরো।
ইহাদের অভিলোভী মন
একজনে তৃপ্ত নয়, এক পেয়ে সুখী নয়
যাচে বহু জন!...

বার্নার্ড শ'ও একদিন এই সুরেই বলেছিলেন, "The whole world is strewn with snares, traps, gins and pitfalls for the capture of men by women.

প্রেমের কবিতারই সমাদর বেশী। কাব্যের জন্মক্ষণ থেকেই তার চলা সুরু হয়েছে। ঝর্ণার মত ধাপে ধাপে সুরের নূপুর বাজিয়ে নেমে এসেছে বর্তমানের ধাপে। কালিদাসের কাল কেটে গেছে, পণ্ডিতেরা সাল তারিখ নিয়ে যত পারেন বিবাদ করুন না কেন, যক্ষ বিরহিণীর কথা, শকুন্তলার কাহিনী রসিকের মনে রস জোগাবে অনাদি-অনন্তকাল ধরে। Shakespeareই প্রকৃত লেখক কি Marloweর লেখা চুরি করে নিজের নামে যেসব অমর সৃষ্টি তিনি প্রকাশিত করেছেন সে প্রসঙ্গ তথা জিজ্ঞাসুদের হাতে দিয়ে কাব্যপিপাসীরা চিরকাল ধরেই Miranda Ferdinand ও Romeo Julietএর প্রেম গাথা স্মরণ করবে। তেমনি আলোচ্য কবির প্রেমের কবিতার Origin কোথায়, সে তত্ত্ব ছেড়ে রসে মত্ত হবার চেষ্টা করাই শ্রেয়।

প্রেম সে অন্তরের প্রাণ-স্পন্দন। দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ আঙা-গড়ার মাঝে সে নেই—তাতে প্রেম ম্লানও হয় না। নিত্যকার জীবনের অন্তরে অন্তরালে সে চলেছে ফল্গুধারার মত। সেই ফল্গুধারার মাঝে মাঝে জোয়ার-ভাঁটা খেলে। কখনো জোয়ার, কখনো ভাঁটা। জোয়ারে সে উত্তাল, উদ্বেল। ভাঁটায় সে উদ্বিগ্ন। মিলন বিরহ যেন পূর্ণিমা অমাবস্যা। দুয়েতেই ফল্গুধারা দুকূল ছাপিয়ে ভেসে যায়। তবু বিরহের কবিতাতেই সেই 'Sweetest songs are those that tell of saddest thought'এর মত প্রাণ নেচে ওঠে, রসের কলাপ বিকাশ করে।

'অবেলার ডাক' তেমনই একটি অনবদ্য কবিতা। বিরহিণীর মনে আলার শেষ নেই। কিন্তু সে বাইরে গম্ভীর, স্থির। অন্তরে তার কেবলই মনে হয়,

আজ পেলে তাঁর হুমড়ি খেয়ে পড়তুম মাগো যুগল পদে।

বুকে ধরে পল কোকনদ ম্লান করাতাম আঁখির জলে।
কিন্তু তার মনের কথা, সে বড় গোপন বেদনা। সে কথা যদি আর কেউ জানতে পারে তবে বড় লজ্জা লাগে। তাই সে নিজের কাছেই নিজের দুঃখ, নিজের ব্যথা গোপন করে। অবেলার ডাকে চঞ্চলা যে, সে তাই বলে ওঠে, ছিঃ মা! তুমি দুকরে কেন উঠছ কেঁদে অমন করে? গোপন করার ছলেই সে এমন কথা বলে নিজের ব্যাকুলতা ঢাকতে চায়। এই যে প্রেমিকার মনে মনে ওঠা গোপন কথা, এ কথা শুধু কবিরাই জানতে পেরেন। তাঁরাই একমাত্র এই-বেদনা, অন্তর্জ্বালার রসঘন শব্দ-ছন্দ-মূর্তি মানস-গোচর করে তুলতে সক্ষম হন। হৃদয়ের সঙ্গে কবি-হৃদয়ের যোগ অলক্ষ্যে অবিচ্ছেদ্যভাবে ঘটেছে। তাই কবি অচেতন থাকলেও তাঁর অবচেতন কবি-মন হৃদয়ের ভরাস্রোতে ছন্দের পাল তুলে দিয়ে অনায়াসে পারাপার করে। এইভাবেই কবির প্রেমের কবিতাগুলো ভাব-ব্যঞ্জনায় ও রস-মাধুর্যে সার্থক হয়ে উঠেছে। বৈষ্ণব পদাবলীর রসোত্তীর্ণ সুরই যেন এই কবিতাগুলোর মধ্যে ধ্বনিত। যখন পড়ি—

পড়ে মনে সে কোন্ রাতে
এক তরীতে ছিলেম সাথে,
এমনি গাঙে ছিল জোয়ার
নদীর দুধার এমনি আঁধার,

তখন জ্ঞানদাসের সেই যেখানে রাধা স্বপ্নে কৃষ্ণকে দেখে রোমাঞ্চিত হয়ে পড়েছে, সেই পদগুলি মনে ভেসে আসে। বাবধান ঘুচে যায়; মনে হয় প্রেম সত্য, প্রেম চিরন্তন। আর সেই সঙ্গেই মনে হয়, পৌনের কাব্যও শাশ্বত।

Wordsworth তাঁর কোন লেখায় বলেছেন যে, প্রকৃতির সঙ্গে প্রত্যেক কবি বিবাহের বন্ধনে আবদ্ধ। এই প্রকৃতিই কবির প্রেয়সী। এই প্রকৃতিই অসীম, নিঃসীম ব্যাপ্তি। কবি আশা করেছেন, যেখানে ঐ নত আকাশ চুমছে, বনের সবুজ রেখা যেখানে তার সাথে দেখা হবে। স্বপন পারের অলকায়, গগন সীমায়, সাঁঝের ছায়ায় তিনি তাঁর হারানো ঘরের সন্ধান করেছেন। এই যে অসীমতার থেকে বিচ্যুতি, অখণ্ডের থেকে খণ্ডের ভ্রমণ, এখানেই যুগ-যুগান্তের সুদূর পিয়াসী কবিগণের মনোবেদনা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। Wordsworth একদিন আশার মন বেঁধে এই কথাই বলেছেন—

Our destiny, our being's hearth and home,
Is with infinitude, and only there

With hope it is, hope that can never die,...

এই যে সুদূরের আহ্বান, এই ডাক প্রত্যেক কবির কানেই বেজেছে। সে কী Wordsworth, কী Keats, কী রবীন্দ্রনাথ, কী নজরুল—সবলেই সুদূরের এই বাঁশী শুনে বিবশা রাধার মত ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। নজরুল সেই একই অন্তরবেদনায় ছায়ানটে সুর মিলিয়েছেন। "সিন্ধু" কবিতার তিনটি স্তরকে তিনি সেই অসীম সুন্দরের বিরহের কথাই আবেগ-স্পন্দিত ভাষায় ভাবসম্পূর্ণ করে তুলেছেন। সেখানেও সেই সে আদিম শব্দ 'সেই আদি কথা, সেই বুঝি নির্জনের স্বজনের ব্যথা' ধ্বনিত হয়েছে বারবার। যখন সুন্দরকে চিনলেন তখনই হলেন সুন্দরের প্রেমিক, আর তখনই সুন্দরের অনুপস্থিতিতে বিরহী হয়ে পড়লেন। তখন তিনি অনুভব করলেন—

শাখা ও শাখীতে যেন কত জানাশোনা,
হাওয়া এসে দোলা দেয়, সেও যেন ছিল জানা
কত সে আপনা!

পরে সেই একইভাবে 'অনন্ত আড়াল' ঘুচল না বলে কাঁদতে সুরু করেছেন। কিন্তু তিনি আশাবাদী। তাই নিজের ভুল বুঝতে পেরে সিন্ধুর সঙ্গে শ্রাবনের বাজায়ে বিষাণ বলে উঠেছেন, 'প্রেম করে না দুর্বল, ওরে করে মহীয়ান!' কিন্তু তবু থাকতে পারেন নি। সুন্দরের বিরহে শেষে আবেগের মধ্য দিয়ে চরম সত্যে পৌঁছেছেন—

তুমি শূন্য, আমি শূন্য শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধার, সীমাহীন রিক্ত হাহাকার!

সত্য-সুন্দরের উপাসক কবি নজরুল যখনই সত্যের,

যখনই সুন্দরের অপমান ঘটেছে, তখনই বিদ্রোহী রূপে উঠেছেন। ফণিমনসার একটি কবিতায় তিনি তাই যোগভরে বলেছেন, 'থাকতে নারি যেথে শুনে সুন্দরের এই চীন অপমান।' শুধু বিদ্রোহী, সর্বহারার সাম্যবাদী কবি নন, তিনি সত্য ও সুন্দরের পূজারী কবি। সত্য ও সুন্দরের জন্যই তিনি প্রলয়, প্রাবন, সাইক্লোন, অগ্নিবের বন্দনা গেয়েছেন। তিনি সিন্ধু ও ক্ষুদ্রে, সহজ ও কঠিনে, গদ্য ও ছন্দে কাব্যোচিত উপায়ে মিলিয়ে দিয়ে অনায়াসে সুন্দরের আরাধনা করেছেন। তাই তিনি কখনও শান্ত, কখনও দুরন্ত, কখনও সুন্দর কখনও ভয়ঙ্কর। ভারতবর্ষ যে অর্ধ নারীশ্বরের পূজা করেছে, তার একদিকে অপরদিকে নারী। নজরুলের কবিতা নর-নারীর জীবন-বন্দনা গেয়ে তাঁর পায়ে বলিষ্ঠ অর্ঘ্য অর্পণ করেছে। ভারতের যে উদার আকাশ : দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে, সেই আকাশেই মাতা দিয়ে তিনি বিদেশী সাহিত্য থেকে সুর, ধ্বনি, শব্দ, ছন্দ চয়ন করেছেন। কোন এক সমালোচকের কথায়, "His mind nourished on the myths and legends of both was at home as much the Gangetic plains as in the Arabian desert." দেওয়া নেওয়ার মধ্য দিয়ে এইভাবে নজরুলের কবিতা প্রতিভার ইঙ্গিত বহন করে চলেছে শাশ্বত মহাকালের অভিমুখে। এ প্রতিভার যথোচিত মূল্য যথার্থ উপলব্ধিতে। আজও, দুঃখের কথা, সম্যক-ভাবে তাঁর কবিতা উপলব্ধ হয় নি।

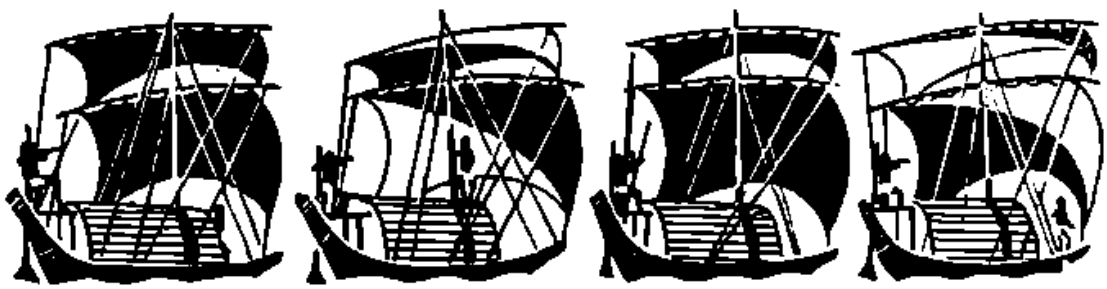

অকবির অভিজ্ঞতা

শ্রীসুভাষ সমাজদার

রবিবারের সকালে পি-ডেতাল্লিশ- ভূপেন বোস এ্যাভিনিউয়ের ছোট্ট লালরঙা বাড়ীর হলঘরে আড়া জমে উঠেছে। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের গ্রাউণ্ড-ইঞ্জিনীয়ার হাবুদা কি একটা কথায় ব্যঙ্গ করে আমাকে বললেন—ওসব নদী, চাঁদ, ফুল, তারা যারা তোমাদের ব্যাপার। ওসব মহো আমি নেই ভাই। ওসব কবিতার পানে প্যানানি—

—না না হাবুদা, দয়া করে তারা যারা বলবেন না—আমি একটু আহত হয়ে বললাম—আনন্দ বেদনা, হাসি-কান্নার অনুভূতি নিয়ে সাহিত্যের কাব্যের কারবার। আর মানুষ মাত্রেরই ঐসব জীবনবোধ আছে—

—আরে রাখো, রাখো—ওয়াকিং শার্টের কলারটা ঠিক করতে করতে গোল্ড ফ্লেকে একটা শেষ সুখটান দিয়ে হাবুদা বললেন—ধমদমে গিয়ে আমার মত আধঘণ্টা হাতুড়ি পিটলে আমার কাব্য—

হাবু! সস্নেহ গম্ভীর গলায় জিতুদা বললেন—তোর সেই অভিজ্ঞতাটা বল তো ওকে—বলেই আমার দিকে আধবোজা চোখে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসলেন। ডাক্তার জিতেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী। রহস্য অতল। ডাক্তার মানুষ। স্বভাবতই ওদের কথাবার্তা, চালচলন কেমন ধোঁয়াটে অস্পষ্ট।

—কোন এক্সপিরিয়েন্সটা দাদা? টুলের ওপর কোমরটা সোজা করে, বুক চিতিয়ে বসলেন হাবুদা। ছয়ফিট লম্বা, দোহারা চেহারাটা নিয়ে।

—ঐ যে রে তোর সেই পাইলট বন্ধু গিলবার্ট—জিতুদা বললেন—সেই ভাইজাগ থেকে আসতে আসতে—

—মনে করতে পারছিস না? মিষ্টি হেসে অমিতদা বললেন—সেই যে ঝড়ের মুখে পড়িছিলি—ও! কী হরিবল্ এক্সপিরিয়েন্স!—আর্তনাদ করে উঠলেন হাবুদা—না না, সেকথা তোমরা মনে করিয়ে দিও না—তার বড় বড় চকল দুটো চোখে ভয়ের ছাপ পড়ল। অপলক স্থির দৃষ্টিতে জিতুদার শোবার ঘরের দরজার ওপরে একটা ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন হাবুদা। বিলিতি আর্টিষ্টের আঁকা ছবি। ঘন কালো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে ছেয়ে আছে আকাশ। নদীর ধারে গাছপালা, বড়ো বাতাসের বেগে মাটিতে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ছে।

—কী ইঞ্জিনীয়ার সাহেব, 'মুড্' এসে গেল নাকি, খিল খিল করে হেসে বৌদি বললেন—তোমাদের সবলের চা জুড়িয়ে গেল যে—ও হ্যাঁ হ্যাঁ—যাচ্ছি—যেন বহুদূর থেকে বললেন হাবুদা।

"হঠাৎ ভাইজাগ যাওয়ার একটা সুযোগ মিলেছিল, বুঝলে সুনীল—বলতে সুরু করলেন হাবুদা—চীফ গ্রাউণ্ড ইঞ্জিনীয়ার বললেন—দুটো প্লেন বিকল হয়ে পড়ে আছে ভাইজাগ এরোড্রামে। এখুনি যেতে হবে সেখানে—

মাত্র তিনঘণ্টায় আমরা ভাইজাগে পৌঁছলাম। সারা দুপুর প্রাণপণে খেটে সন্ধ্যায় আমাদের কাজ শেষ হলো। পাইলট গিলবার্ট খুব ছটফটে ছেলে। সে তখুনি কলকাতা ফিরতে চায়। ভাইজাগের এরোড্রাম কণ্ট্রোলার রঙ্গনাথন বার বার অনুরোধ করলেন—মনসুন ওয়েদার। রাত্রে গিয়ে কাজ নেই। ঝড়ের ভেতরে পড়তে পারেন। যে অব বেঙ্গলের কোষ্ট লাইন ধরে যেতে হবে তো—কার কথা কে শোনে? গিলবার্ট নাছোড়-বান্দা। তার কো পাইলট জন, ওয়্যারলেস অপারেটর জকী, সকলের মন রাত্রির চৌরঙ্গী পাড়ার মদের বারের আনাচে কানাচে ঘুরছে। ওদের কানে বাজছে রঙ্গ নাচের বাজনা। ওরা যাবেই, বলে জেদ ধরল।

সন্ধ্যা ছটায় আমরা রওনা হলাম। ভিজাগাপট্টম থেকে কলকাতা যাত্র তিনঘণ্টার 'জার্নি।' রাত্রে নটায় বাড়ীতে পৌছে আরামে ঘুমোন যাবে ভেবে মনটা বেশ পুলকিত হয়ে উঠল।

রাত্রির অন্ধকার আকাশে হাল্কা মেঘের ভেতর দিয়ে পোঁ পোঁ করে উড়ে চলেছে প্লেন।

—ওহে চারটে পেট্রোল-ট্যাঙ্ক ভরেই পেট্রোল নিয়েছো তো—স্থির চোখে কম্পাসের দিকে তাকিয়ে বলল গিলবার্ট।

—হ্যাঁ ওসব ঠিক আছে—বলল জন। কানে হেড-ফোন লাগিয়ে অপারেটর জকী ক্রমাগত ভাইজাগ কন্ট্রোলকে ডাকছে—হালো!—হালো—হোয়াটস দি এক্সাক্ট লোকেশন অফ আওয়ার প্লেন……হালো? নো রিপ্লাই? ওয়াণ্ডার! আমাদের দিকে তাকিয়ে সে বলল—ওহে শুনেছ, দেখেছো কাণ্ড, ভাইজাগ থেকে প্লেন কম 'ক্লাই' করে বলে ওদের কন্ট্রোল রুমের অপারেটররা সব সকাল সকাল বাড়ী চলে যায়—একটু থেমে চিন্তিত হয়ে সে আবার বলল—কোথায় দিয়ে যে উড়ে চলেছি—বুঝতে পারছি না, লাইনটা ঠিক আছে কি না—

—ড্যাম ইট্—মুখ বেঁকিয়ে চাপা গলায় বলল গিলবার্ট আর আড়াই ঘণ্টার মধ্যে পৌছেই তো যাচ্ছি।

কিন্তু—

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই নীচে বঙ্গোপসাগরের নীলাভ বিশাল জলরাশি আর মাথার ওপরে আকাশ কে যেন ঘন কালি দিয়ে একাকার করে দিল। গিলবার্টের মুখে আশঙ্কার ছায়া পড়ল। যে অব বেঙ্গলের জুন জুলাই মাসের ঝড় অতি মারাত্মক। হঠাৎ প্লেনটা ভয়ানক ভাবে দুলতে লাগল। আমি ভয়ে চীৎকার করে উঠলাম—'বাম্প' করছে—বাম্প করছে!

—বড়ো মেঘকে কাটাতে গিয়ে ওরকম হবে। চুপ করো। চেঁচিওনা—শান্ত গম্ভীর ভরাট গলায় বলল গিলবার্ট।

—হালো!—হালো ক্যালকাটা কন্ট্রোল? এক্সাক্ট লোকেশান! ইয়েস—ইয়েস—সমানে চেঁচিয়ে চলেছে জকী।

উঃ সে কী অবস্থা! ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পোঁ পোঁ শব্দ করে একটানা উড়ে চলেছে বিশাল সেই যান্ত্রিক পাখীটা। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের বাচ্চা, মজবুত শক্ত চেহারা গিলবার্টের—সাদা হাফসার্টটা ঘামে জবজবে হয়ে ভিজে গেছে। হাতের পেশীগুলোকে লোহার মত শক্ত করে ষ্টিয়ারিংটা ধরে খ্যাপা ঘোড়ার মত উচ্ছৃঙ্খল বাতাসের চেউ সামলাচ্ছে। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। সর্বনাশ! নয়টা যে বাজে—গিলবার্ট। আর্তনাদ করে উঠলাম।

—শাট আপ—ডোণ্ট টক্ নাউ—পাইলট চীৎকার করে উঠল।

চারটে পেট্রোল ট্যাঙ্কের পেট্রোল একটার পর একটা ফুরিয়ে আসছে। প্রায় তিনঘণ্টা উড়ছি। হা ভগবান! কোথায় কলকাতা! কোথায় কতদূরে সেই মাতামমতা স্নেহ দিয়ে ঘেরা বাড়ী, মা বাবা……গৌরী। এই সেদিন যে একটা পরের মেয়েকে ঘরে এনেছি। জেগে জেগে দুঃস্বপ্ন দেখছি। বুকের ভেতর কান্না শাক দিয়ে উঠল। আকাশের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলাম। কড়াং কড়াং করে লাল বিদ্যুতের এক একটা শিখা, লক লক করে জ্বলে উঠছে কালো আকাশের গায়ে। সেই আলোয় দেখলাম, কালো সমুদ্রের এক একটা হাতীর দন্ত ঢেউ ফুলে উঠছে আকাশের দিকে—

—কোষ্ট ছাড়িয়ে আমরা যে ক্রমশই সমুদ্রের ভেতরে চলে যাচ্ছি—কান্নাভরা গলায় চীৎকার করে উঠল কোপাইলট জন—কি করছো গিলবার্ট?

—আমি কি করবো? কম্পাস ডিসঅর্ডার হয়ে গেছে, পা ছেড়ে দিয়ে অবিচল গলায় বলল গিলবার্ট। সঙ্গে সঙ্গে প্লেনটা ডানদিকে কাত হয়ে গেল।—হোয়াট আর ইউ ডুয়িং গিলবার্ট?—চীৎকার করে উঠল জন।

বাঁচার কোন আশাই নেই। প্লেনটাকে টি লেভেলে নামিয়ে দিচ্ছি—গম্ভীর গলায় বলল গিলবার্ট।

সবনাশ ! এই সমুদ্রের মাঝ দিয়ে। ফিরে উপরে ৭—বলল শুকী। হুহু করে নেমে আসছে ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে ঘেরে গুলীবিদ্ধ একটা পাখীর মত। নীচে উত্তাল সমুদ্রের কালো জলের বুকে নিরেট কালো অন্ধকার, আকাশের অন্ধকার সব মিলিয়ে মনে হলো, আমরা যেন কোন অতল অন্ধকারের পাতালে চলেছি—

গল্প বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন হাবুদা। দাঁতে সিগারেট কামড়ে ধরে হাত ছুড়ে ছুড়ে গল্প বলছেন। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

—"নিশ্চিত মৃত্যু। বিয়ে করেছি এই সেদিন। চোখের সামনে ফুটে উঠল ফোটা ফুলের মত কিশোরী স্ত্রীর মুখে বৈধব্যের যন্ত্রণা। মা-বাবা-ভাই-বোন সবাই যেন বুকের ভেতরে কলরব করে উঠল। আঃ ভগবান! এত ছোটে দুলছে প্লেন যে মেঝের ওপরে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। বুকে হেঁটে হেঁটে সাপের মত টয়লেট রুমের দিকে এগিয়ে গেলাম।

টয়লেট রুম! বৌদি বিস্মিত গলায় চীৎকার করে উঠলেন—মরবার আগে প্রসাধন?

—না বৌদি। শেষবারের মত মুখটা দেখতে গেলাম। চুলোয় ওপর ভর দিয়ে তাকালাম আয়নার দিকে। আয়নার বুকে মুখের ছবি ফুটে উঠল—চোখদুটো জলে ভাসছে। সারা মুখে ঘাম করছে। চুলগুলো খাড়া খাড়া —উঃ মা গো! অবাক একটা যাদায় আর্তনাদ করে বৌদি বললেন—কী করে বেঁচে এলে হাবু ঠাকুর পো?

—সেদিন সুনীল—আর্কিমিডিস যেমন 'ইউরেকা' বলে লাফিয়ে উঠেছিল ঠিক তেমনি করে জিতুদা লাফিয়ে উঠলেন। বললেন হাবুদাকে—তুমি যে ওকে 'তারাফারা' বলে ঠাট্টা করেছিলে, দেখলে তো তোমার অনুভূতি, তোমার দৃষ্টি কোন কবির চেয়ে কম নয়। এটুকু না থাকলে তোমার অভিজ্ঞতাটাও এরকম করে বলতে পারতে না। প্রত্যেকের ভেতরে কবি বাস করে বুঝলে হাবু, কবি সাহিত্যিকের কারবার সেই ভেতরটাকে নিয়ে—হাবুদা চুপ। আমি এতক্ষণে বুঝলাম, হাবুদার এই গল্প সুরু হওয়ার আগে জিতুদা কেন আধবোজা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হেসেছিলেন। কী করে বেঁচে এলেন হাবুকাকা? জিতুদার ছেলে ধ্রুব প্রশ্ন করলো। তার চোখের তারা দুটো ছটফট করছে!

—আরও দুইঘন্টা ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছটাং ডাঙ্গার কাছে গঙ্গার ঘোলা জল দেখে বুঝতে পেরেছিলাম—কলকাতায় এসে পড়েছি। শেষরাতে দমদমে এসে নামলাম রে ধ্রুব—বলে আবেগে ধ্রুবকে জড়িয়ে ধরলেন হাবুদা।

স্মৃতিকথা

শ্রীকালিদাস রায়

সাহিত্যিকের জীবনে ৫ হইতে ১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই কয় বছরে তার মনের মুকুর যে প্রতিবিম্বন সঞ্চয় করে তার পরিমাণ অপরিসীম। সেই সঞ্চয়ই তার সাহিত্য-সৃষ্টির প্রধান উপাদান হয়।

শরৎচন্দ্র তাঁর দেবানন্দপুর গ্রামের বাড়ীতে ১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছিলেন। শেষ জীবনে হাওড়া জেলার সামতাবেড়ে কিছুকাল বাস করেছিলেন। তখন তাঁর প্রধান সৃষ্টিপর্ব শেষ হয়ে এসেছিল। মাঝখানের সুদীর্ঘ জীবনটা তাঁর গ্রাম্য জীবনের বাইরে বাইরেই কেটেছিল।

ঐ ১১ বৎসর বয়সের মধ্যে তিনি যে তথ্যগুলি, যে স্মৃতিচিত্রগুলি সংগ্রহ করেছিলেন—সমস্ত জীবনের সাহিত্য সৃষ্টিতে সেই সবই প্রধান উপাদান হয়েছিল। বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সংসারের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর জানবার সুযোগ পরবর্তী জীবনে আর হয়নি।

আমি ১১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গ্রামের বাড়ীতে ছিলাম। ঐ সময়ের মধ্যে আমার মনে অজ্ঞাতসারে রাশিরাশি তথ্য ও স্মৃতিচিত্র সংগৃহীত ও পুঞ্জীভূত হয়েছিল। সেইগুলিই আমার কবিতার প্রধান উপাদান।

তাই একদিন লিখেছিলাম।—

শৈশবের সেই সঞ্চয়ই আজ পুঁজি আমার যৌবনে,
আজকে আমার প্রাচ্যতা তাই তারি উপচৌকনে।
তরুণ প্রাণের অনুভূতি আগ্রহ বিস্ময় আকুতি
আসছে আমার স্মৃতির পুটে তপ্তশোণিত রঞ্জনে,
লক্ষ্মীছাড়া যৌবনে আজ ধনী আমি সেই ধনে।

নিসর্গশ্রীকণ্ঠে ছিল তখন বাহুর আলিঙ্গন,
লতায় পাতায় রবি তারার পেতাম সদাই আমন্ত্রণ।
হইনি তখন শৌখীনী ছিলাম কেবল কৌতূহলী,
যার ছিল না কেবল ছিল সঞ্চিতধন সংগোপন,
আজ তাদের এ নিরুপায় পাচ্ছি ফিরে অনুক্ষণ।

গন্ধশোভা গানে বোঝাই নৌকা কত আজ ভিড়ে,
রঙিন আশার পাল তুলে এই যৌবনের এ মন-তীরে।
কল্পনারা উড়ে উড়ে ছুটছে আমার চিত্ত ছুঁড়ে,
বাল্য স্বপন ভিড় করে রয় আমার কলামন্দিরে,
বাল্য ত্রিদিব হতেই রসের মন্দাকিনী বয় ধীরে।

হারায়নিক শিশুলোকের অশ্রুবারি একবিন্দু,
শুকায়নিক কুহেলিকায় কোন কোরক কল্পনা।
হাসির ধ্বনি ক্ষীণ অতিক্ষীণ দিগন্তে তাও হয়নি বিলীন,
যৌবনের এ তন্ত্রীতে আজ লভে সবাই মূর্ছনা,
ছন্দে লভে রঙিন রূপ বর্ণে অভিব্যঞ্জনা।

বিভূতির গাঁয়ের মত আমার গাঁয়ে প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য কিছুই ছিল না। একমাইল দূরে একটা নেটো নদী ছিল, বর্ষাকালেই তাতে জল থাকত। তার দুই তীরে কোন গাছপালা ছিল না। ধুধু করত চারিপাশে খোলা মাঠ—তার শোভা হ'ত আশ্বিন হ'তে পৌষ মাস পর্য্যন্ত ধানগাছের জন্য। মাঠের মধ্যে দুই একটা অশ্বত্থ বটের গাছ ছিল—কোন-না-কোন পুকুরের ধারে। জলসেচের জন্য মাঠের মধ্যে যে অনেক পুকুর ছিল, বৎসরের ৮ মাসকাল সেগুলো শুকনোই থাকত। একসময়—কতকাল কে জানে সেগুলো জমিতে জল সেচের জন্যই কাটানো হয়েছিল।

গ্রামেও শ্যামশ্রীর অভাব ছিল। গ্রামের চারি পাশ দীঘি পুকুর দিয়া ঘেরা। সেই দীঘি পুকুরের পারে তাল, তেঁতুল, বট, অশ্বত্থ, নিম, পিঠালি, আমড়া ইত্যাদি গাছ

আর ছিল শিয়ারা কুল বেল তাল খেজুর ছাড়া কোন ফলের গাছ আমাদের গ্রামে ছিল না।

বৃক্ষের দুর্লভতার জন্য বৃক্ষ আমার খুবই ভালো লাগত। এক একটি বৃক্ষকে আমার পরিমূর্ত বিস্ময় ব'লে মনে হত। ঘরের আশ্রয়ের চেয়ে বৃক্ষের ছায়া আমার খুব ভালো লাগত। গাছের সংখ্যা বাড়াবার জন্য বাল্য জীবনে কত চেষ্টাই না করেছি! কত গাছ যে লাগিয়েছিলাম—তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু সেগুলির পালনে কেউ আমাকে সাহায্য করেনি—সবই আমার শিশু হৃদয়ে দাগা দিয়ে ম'রে গিয়েছে। এক একটি গাছ মরে যেত আর বুকে কি আঘাতই না পেতাম!

আমাদের গ্রামের মাটি নীরন্ধ্র, তাতে একফোঁটা পর্যন্ত আর্দ্রতা নেই। কাজেই অবিরত জলের যোগান না পেলে গাছ মরে যায়। যে সকল গাছ কঠোর প্রাণ, তারাই শুধু নীরন্ধ্র স্তর ভেদ করে নিম্নতর স্তরে শিকড় চালাতে পারে।

আমার যখন দশ বছর বয়স সেই সময়ে বাবা একটি পুকুর কাটিয়েছিলেন। সেই পুকুরের পাড়ে আমি বহু গাছ লাগিয়েছিলাম—তোলা মাটিতে পুকুরের ধারে বহু গাছই বেঁচে গিয়েছিল। সেগুলি তখন চারাগাছ ছিল, মাঝে মাঝে গিয়ে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে আসতাম। সেসব গাছের অনেকগুলি আজো বেঁচে আছে—নোনা-আতা, সেবু, চাঁপা, লিচু ইত্যাদি সুকুমার প্রকৃতির গাছগুলো মরে গিয়েছে। সে বাগানও আজ হস্তান্তরিত।

বাড়ীর পাশেই পুকুরের ধারে একটি প্রাচীন বটগাছ ছিল—সেই গাছটির তলায় দিনের অনেক সময় কাটত। সে গাছটি যখন রক্তবর্ণের বর্তুল ফলে ভরে যেত তখন তা অসংখ্য পাখীর কলরবে মুখরিত হয়ে থাকত। তখন সে গাছটি আমার চোখ ও কান দুইই জুড়িয়ে দিত। এই বটগাছটির উপর পরবর্তী জীবনে আমি একটা কবিতা লিখেছিলাম। কবিতাটা এই—

এক যে আছে মোদের গাঁয়ে ক্ষীরপুকুরের পাড়ে,
বড্ড বড় বুড়ো বট এক গয়লাপাড়ার ধারে।
শিশু জীবন তাহার কোলে কাটল আমার সুখে,
আমার বুকের সকল স্মৃতি আঁকা তাহার বুকে।
ঐ তরুটির পাঠশালাতে আমার লেখাপড়া,
ঐ খানেতেই ক্ষুদ্র আমার জীবনটুকু গড়া।
আজো যখন স্মরি তাহায় চক্ষে আসে জল,
বক্ষ আমার শীতল করে পল্লীবটের তল।

আজো যখন স্মরি তাহায় উজান বহে প্রাণ,
চমকে উঠে বাল্যকালের দুঃখ অভিমান।
নামাল ধ'রে দোল খাওয়া আর শিকড় চড়ে খেলা,
সঙ্গিগণের সঙ্গে হোথা সকাল সন্ধ্যাবেলা,
ধারাপাত আর বাড়াভাতের ভয়ে হেথায় এসে
দুপুরবেলা লুকিয়ে পড়া ঘুমিয়ে পড়া শেষে।
আরো কত জাগায় স্মৃতি মধুর অবিরল,
আমার শিশু-স্বর্গভূমি পল্লীবটের তল!

আবার তেমন মধুর লাগে যেমন শিশুকালে
পল্লীবধূর কাপড় কাচা নাচের তালে তালে।
বাসনগুলির ঝনঝনানি গয়লাপাড়ার ঘাটে
হাঁসের দলের বটপটানি কাপ্‌টা জলের ছাটে,
লুব্ধ ক'রে বালক পরাণ ক্ষুব্ধ ক'রে তাকে,
রুই কাতলা পালায় কেমন ঢেউএর ঘায়ে ঘায়ে,
পাড়ার মেয়ে জল নিয়ে যায় মধুর বাজে মল।
কত কথাই জাগায় মনে পল্লী বটের তল।

দুপুর বেলা গামছা পেতে ঘুমায় রাখাল যত
এ ডাল ও ডাল ঘুরে বেড়ায় কাঠবিড়ালী কত।
বাছুরগুলি চক্ষু মুদে হেথায় আবর কাটে
ছাগল তাহার বাচ্চা দুটির নরম দেহ চাটে।
বেকার যুবক ছিপটি হাতে বসে থাকে ঠায়
অবিশ্রান্ত কাঠ-ঠোকরা ঠুকছে গাছের গায়।
শুধ গাবিয়ে পড়ে জলে লোহিত বরণ ফল,
অনেক স্মৃতি জাগায় আমার পল্লীবটের তল।

সকল গাঁয়ের সকল পাখীর এই গাছে কি বাসা?
মধুর কারো গলার আওয়াজ পুচ্ছ কারো খাসা।

সমস্ত দিন কলর বলর নিত্যি ভোজের ধুম,
রাত্রি হলে আপন আপন তৈরি বাসায় ঘুম।
জমায় সাঁজে গল্পসভা কুষাণ রাখালেরা,
বাঁশের বাঁশী লয়ে কেহ তানটি ভাঁজে সেরা।
অন্ধকারে চিরে চিরে ডাকে ঝিঁঝিঁর দল,
আরো কত জাগায় স্মৃতি পল্লীবটের তল।

মাছরাঙাটি বেড়ায় চুপে কলমীশাকের বনে
এক পায়ে রয় বক যোগিবর মুদ্রিত নয়নে।
শাপ্‌লা বনে পানকৌড়ি খুঁজতেছে শিকার,
পানার সোঁদা গন্ধে ভরা সারা পুকুর ধার।
যে চোকে পাঁর পা ধোয় তার বটতলাটির ঘাট,
পড়ন্ত বেলা বসে সেথায় পাড়ার ছোট হাট।
গাছের ছায়া দুলায় ধীরে ঢেউ নাচানো জল,
তেম্‌নি ক'রে দুলায় এ প্রাণ পল্লীবটের তল॥

পাড়ার নাটমন্দিরের আঙিনায় একটি জিউলি গাছে মালতীর লতা উঠেছিল। এই লতার পোড়াটা একটা গাছের গুঁড়ির মতোই মোটা ছিল। জিউলি গাছটা আর লতাকে ধরতে পারছিল না। তাই বাঁশের খুঁটি পুঁতে পুঁতে মালতী লতার একটা বিতান তৈরি হয়েছিল। সারা বর্ষাকালটা ঐ বিতানটা ফুলে ভরে থাকত। ঐ বিতানটিকে আমার খুব ভালো লাগত। ফুলনের উৎসবে ঐ বিতান পদ্মাধিবাসনের কাজ করত। ঐ বিতানটি আমার মনে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। আমার মালতী নামক কবিতায় তার স্মৃতিচিত্র আছে।

গ্রামে সবচেয়ে বেশি ফুটত চীনে করবীর ফুল। ছোট বেলায় ঐ ফুলের বোঁটা চুষে মধু পান করতাম। গন্ধের জন্ত মনে আছে—আউচ ফুলকে। আউচ ফুটত গ্রীষ্মকালে। আজো নাসায় যেন আউচের গন্ধ পাই। আর মনে পড়ে তিক্ত নিম ফুলের মিঠে গন্ধ। এগুলি ছাড়া টগর, কুড়চি, কাঠমল্লিকা, করবী, জবা, বক ইত্যাদি ফুলগাছের খুব অভাব ছিল না। যাদের বাড়ীতে কোন ফুলগাছ থাকত তাদের ভাগ্যবান গৃহস্থ ব'লে আমার মনে হ'ত। মাঠের ফুল আকন্দ, গলঘেষ (ধ্রোণ), সোঁদাল—এদের আজো ভুলি নি। মাঠের সরষে ও মটর ফুলে এবং বেওয়ালের উপরে সিম ও কিঙে ফুলে যে সৌন্দর্য আছে তা আমার চোখ এড়াত না। পোড়ো বাড়ীর ফুলরা—কাল-কাসিন্দাকেও উপেক্ষা করা চলে না। ঘোষাই বাড়ীর দুয়ারে একটা বকুল গাছ ছিল—এখনো তার ফুলের গন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে লেগে আছে।

পদ্ম, কাঁসাতলী (কহ্‌লার), শাপ্‌লা (কুমুদ) ইত্যাদি জলজ কুসুমের সঙ্গে পরিচয় হ'তো পুকুরে স্নান করতে গিয়ে। পদ্ম কেউ তুলত না; পুকুরে ফুটেই থাকত। পদ্মফুলে কারো প্রয়োজন ছিল না, প্রয়োজন ছিল পদ্ম পাতার। পদ্মে ভরা গ্রামের দীঘির উপর আমি কবিতা লিখেছি পরবর্তী জীবনে।

তাহার দুইটি স্তবক—

ডুবিয়া বিদায় লয় তব বুকে পল্লীর দিনগুলি।
তোমা সম্ভাষে হেসে উষা আসে পূব দুয়ার খুলি
আধ ঘুম ঘোরে প্রভাত তপন
তোমারি নয়নে নেহারে স্বপন
বিদায় বেলায় ছল ছল চাঁদ কাঁপে তার ঢেউগুলি
কুমুদীর সাথে নাচে চাঁদ তব তরঙ্গে দুলি দুলি।
প্রতিদিন বধূ প্রাণের বার্তা কয়ে যায় তব কানে,
পাগরী ভরণে তব বাণী তারা শুনে যায় কলতানে।
জুড়ায়ে অঙ্গ সোহাগিনী বধূ
রেখে যায় তার হৃদয়ের মধু
কমলে তাহাই সঞ্চিত কিনা অলি ছাড়া কেবা জানে।
পাদের আলতা কোকনদে তারা রেখে যায় প্রতিদানে॥

বাড়ীর কাছেই একটা দীঘি ছিল। এর নাম সাতপুকুর (বোধ হয় সাতটা পুকুরের সমান ব'লে)। সেই দীঘির ধারে ধারে অনেকটা জায়গা জুড়ে আমার এক আত্মীয় পরিবারের বাড়ী। এরা এক সময়ে ধনী ছিল। এই দীঘির ধারটা বাঁশবনে এবং অন্যান্য বৃক্ষলতায় ছিল ভরা। এই দীঘির ধারটা ছিল আমার নির্জন বিহারের ঠাঁই। যখনই আমার নিজের বালকরূপটি কল্পনা করি—তখনই এই সাতপুকুরের তরুলতা ভরা ধারটি তার পরিবেশ রূপে

মনে জেগে ওঠে। গ্রাম হতে কিছু দূরে আর একটি দীঘি ছিল—তার ধারে ছিল ঐ আত্মীয়দের আমবাগান। গাছগুলির বয়স দেড় শত বছরের বেশি হবে। ঐ বাগানের সঙ্গে পরিচয় হতো কালবোশেখীর ঝড়ের সময়।

বালককালে একবার দাঁইহাটের কাছে মাসীর বাড়ী গিয়েছিলাম—সেখানে অজস্র তরুলতার সমাবেশ দেখে আমাদের গ্রামের কথা ভেবে বড় ব্যথা পেয়েছিলাম। সেখানে দেখলাম প্রত্যেক বাড়ীর শোভা বর্ধন করেছে কলাগাছ ও নারিকেল গাছ। তখন থেকে আমার ধারণা হ'লো বাংলার পল্লীর লক্ষ্মীশ্রীর নিদর্শন নারিকেল গাছ ও কলাবাগান। বাড়ীর উঠানে বহু নারিকেল চারা রোপণ করেছিলাম কিন্তু তাদের বাঁচাতে পারি না।

প্রকৃতির ঐশ্বর্যলয় অঙ্কে আমি জন্মগ্রহণ করি নি—নিজের চোখে প্রকৃতির শ্রীহীন দারিদ্র্য আমাকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের প্রতি চিরদিন লুব্ধ করে রেখেছে। যখানে যেটুকু প্রকৃতির সম্বল আমি পেয়েছি তার প্রত্যেক কণাটি আমি উপভোগ করেছি এবং তাকে ছন্দে রূপ দিয়ে রেখেছি।

আমিত সামান্য কবি। আমার গুরুদেব বিশ্বকবির বাল্যকাল কেটেছিল প্রকৃতির সংসার হতে বহু দূরে—নগরপ্রান্তরে। তার ফল হয়েছিল তাঁর জীবনে প্রকৃতির প্রতি অত্যন্ত গভীর অনুরাগ কোন দিন শিথিল হয়নি। প্রকৃতির ঐশ্বর্য তাঁর কাছে সকল ঐশ্বর্যের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল তাই প্রকৃতির মনোজ্ঞ পরিবেশেই তিনি জীবন কাটিয়ে গেছেন।

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে ভূমি যতই কার্পণ্য প্রকাশ করুক, গগনের দান ছিল মুক্তহস্ত। আষাঢ়ে ঘনঘটার উদয় হলে আমার বালক চিত্ত উন্মনা হয়ে যেত। আমার হৃদয় সত্যই ময়ূরের মতই নেচে উঠত। পরবর্তী জীবনে কখনো সে উন্মাদনা উপলব্ধি করিনি—রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েও না—মেঘদূত মুখস্থ ক'রেও না। আষাঢ় হতে আশ্বিন পর্যন্ত ৪ মাস আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল আকাশের সঙ্গে। পথঘাট কাদায় দুর্গম হয়ে উঠত—তাতে ধূলাভরা গ্রামে একটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হ'তো। খড়ের চাল বেয়ে সহস্র ধারায় বৃষ্টির জল নেমে আসত—তার ফাঁক দিয়ে সৃষ্টিকে অপূর্ব ব'লে মনে হ'ত। জনহীন পথ দিয়ে নদী বয়ে যেত, সে এক অপূর্ব দৃশ্য। দীঘিপুকুর ভরে টইটুম্বুর হ'তো, কচুরির পানা বেগুনী রঙের ফুলে তাতে শোভার সৃষ্টি করত—নানা প্রকার জলচর পাখীর আবির্ভাব হ'তো, সারা রাত্রি ব্যাঙ ডাকত, কেয়া মালতী কদম্বের গন্ধ বাতাসে ভেসে আসত—সবে মিলে একটা স্বপ্ন জগতের সৃষ্টি করত। শুষ্ক নীরস মরুপ্রায় রাঢ়দেশে বর্ষার মতো উপভোগ্য কিছুই নেই। চাষীর গ্রাম, কাজেই বর্ষার দুর্যোগে কেউ বিরক্ত বা দুঃখিত হ'ত না। যত বেশি বৃষ্টি হ'তো গ্রামের লোকের আনন্দও তত উচ্ছ্বসিত হ'ত। বৃষ্টির অভাব হলেই দেখতাম সবার মুখ বিষণ্ণ, সবার চোখ আকাশের দিকে।

বর্ষাবৃষ্টি আকাশের পানে চেয়ে আমার শৈশবে কি মনোভাব হত—তা পরে একটা কবিতায় ব্যক্ত করেছিলাম।—

বজ্রবাদল বাজায় মাদল মেঘের বনে,
অবাক হয়ে দুষ্টু ছেলে বাজনা শোনে।
বিশ্বভুবন হঠাৎ এমন পাগলপারা,
দেখে খোকন হলো এমন আত্মহারা?
আকাশশিশুর দস্যিপনা যতই নামে,
ধরার শিশুর দাপাদাপি ততই থামে।
দুষ্টু শোনে শূন্য মনে ঘরের কোণে,
দেবশিশুদল বাজায় মাদল মেঘের বনে।
আজ সে হঠাৎ গান করেছে কিসের সুখে?
ভুলেই গেল একেবারে কি ক্ষুধা তৃষ্ণা?
অবাক হয়ে দাওয়ায় রয়ে বিকেল বেলা,
দেখছে সে যে গগন মাঝে আতশ খেলা।
চমকে উঠে মেঘের গভীর আওয়াজ হলে,
লুকাতো সে ভয়ত্রাসে মায়ের কোলে।
আকাশ পাতাল কী ভাবে আজ আপন মনে?
দেবশিশুদল বাজায় মাদল মেঘের বনে।

মোহন সুদূর গহন মাদুর মধুর গীতে,
আজকে প্রথম মুগ্ধতা তার জন্মে চিতে।
শঙ্কা সাহস হর্ষবারার মিশ্র রসে,
প্রকৃতি আজ তাহার প্রাণে প্রথম পশে।
সৃষ্টি তাহার সৃষ্টিধারার মানস হরে,
বিস্ময়ও আজ প্রথম তাহার জিনল ভরে।
মনের মাঝে আজ তা প্রথম স্বপ্ন বোনে,
পাগলা বাদল বাজায় মাদল মেঘাজনে।

পরবর্তী জীবনে এক একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পরিচয় পেয়ে যেমন মনে বিস্ময় জেগেছে—মনে পড়ে বাল্যকালে আমার সব প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে তেম্‌নি বিস্ময় জাগত। একটি ছোট বীজ হতে অত ফুলে ফলে ভরা মস্ত একটা গাছ—আগাগোড়াই আমার বিস্ময়ের বস্তু ছিল। মাটির তলা হতে বীজ হতে বেরুলো একটা অঙ্কুর, তাতে ক্রমে সবুজ পাতা বেরুতে লাগল, সেটা ডালে পালায় পাতায় ভরে উঠল—সবুজ রঙের ঐ গাছে লাল, সাদা হলুদে কত রকমের ফুল—তার পর ধরল ফল—সেই ফল পাকলো,—তার রস মিষ্টি—এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। বোটানিও পড়িনি—বিজ্ঞানও জানতাম না। বিস্ময় কেননা না জন্মাবে?

আবার দেখ—প্রখর রৌদ্রে আকাশটা প্রকাণ্ড তপ্ত কড়াইয়ের মত—উত্তাপে জীবজন্তু ছটফট করছে—কোথাও এককুচি মেঘ নেই। হঠাৎ কোথা হতে দলে দলে মেঘ চলে এল গুরুগুরু গর্জন করতে করতে, সমস্ত আকাশের চেহারা বদলে গেল দেখতে দেখতে, তার পর ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি—পৃথিবী শীতল হয়ে গেল।

ভূগোল বা বিজ্ঞান তখনও পড়িনি, কাজেই বিস্ময়ের অবধি থাকত না। এই বিস্ময়ের ঘোর আজও আমার কাটেনি এখন তবু বিজ্ঞান পড়েছি। এখন প্রকৃতির রাজ্যে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাটাই বিস্ময় জাগায়। শৈশবের সেই বিস্ময়-বিমূঢ় দিনগুলির কথা স্মরণ করে লিখেছিলাম।—

অবাক করিত মোরে
কেমনে শীর্ণ শিরের লতাটি ফুলে ফুলে গেল ভরে।
সেদিনের লতা কোথা হতে এত হলুদিয়া রঙ পায়,
সবুজ কেমনে হলুদ হইয়া খড়ের চালাটি ছায়।
বিকাল বেলায় হলুদিয়া রোদ করি পান তার হাসি,
ঘটে কি উঠিল চালাটি ভরিয়া ফুল হয়ে রাশি রাশি।

অবাক করিত মোরে,

কেমন করিয়া সারাটি আকাশ ঢেকে যেত ঘন ঘোরে।
কাঁ কাঁ রোদ্দুরে খাঁ খাঁ চারিদিক ঝলসিয়ে যেত আঁখি,
চিল চাতকের দুর্বল গলা ফেটে যেত ডাকি ডাকি।
শুনিয়া ক্ষটিক জল,
ঝরাইত জল তৃষ্ণা হরিতে তাই কি মেঘের দল।

অবাক করিত মোরে,

শূন্য সে মাঠ সবুজ ঘাসে ভরিত কেমন করে।
বৈশাখে শুধু করিত যা ধূধূ সহিত তপ্ত হাওয়া,
এমন শ্যামল সুষমা সেখানে কেমনে যাইত পাওয়া?
আকাশের মেঘগুলোকে মাটিতে বেঁধে কি রচিত কেউ,
উড়িতে না পারি চঞ্চল হয়ে তুলিত কেবল ঢেউ।

মৌমাছিগুলি কেমন করিয়া মৌচাক তোলে গড়ে।
ফুলে মধু থাকে, কোথা এত ফুল কেমনে বা পায় খোঁজ,
কতটুকু মধু ছোট মুখটিতে বয়ে আনে তারা রোজ।
গুমগুমু স্বরে গুঞ্জন করে কি জানি কি কথা বলে?
তাই কি গলিয়া মোম হয় আর তাই মধু হ'য়ে গলে?

অবাক করিত মোরে,

বাবুই বাসাটি গড়ে তালগাছে কত দিনরাত ধরে।
বাচ্চারই তরে দোলা বাসা বাঁধে ভিজে ভিজে মরে নিজে,
চেয়ে থাকিতাম ভাবি সেত পাখী তার ভালবাসা যে কি।
আহার আনিতে কতদূরে যায় বাসা চিনে ঠিক চোখে,
স্নেহের সুতায় সেকি বাঁধা ঘর দেখিতে পাইনা চোখে?

আমার বাল্যজীবনে বিস্ময়ের মত ভয়ও আমাকে অনেক সময় অভিভূত করে রাখত। পূর্বেই বলেছি—বিদ্যালয়ে আমি কখনো প্রহৃত হইনি। কিন্তু শিক্ষকরা যদি কাকেও প্রহার করতেন—তাহার প্রত্যেকটি আঘাত আমার গায়ে বাজত। শিক্ষকরা যখনই একটা ছড়ি

নিয়ে আয়' বলে গর্জন করে উঠতেন—৩।৪ জন ছেলে উৎসাহের সঙ্গে ছুটে যেত, কেউ খেজুরের ডাল ভেঙে আনত, কেউ একটা বাকারি, কেউ বা একটা জিউলির ডগালি নিয়ে আসত। আমার তখন বুক কাঁপতে থাকত। কোথাও মারামারি বাধবার উপক্রম হলে আমার বুক টিপ টিপ করত, কি পশু কি মানুষ কারো রক্তারক্তি দেখতে পারতাম না। এই ভয়ই আবার আমাকে অনেক অবাঞ্ছিত আচরণ থেকে রক্ষা করত। অসাফল্যের ভয়ই আমাকে পাঠে নিবিষ্ট রাখত। অপমানের ভয় আমাকে সুবোধ সুশীল করে রেখেছিল।

বাল্য জীবনে সবচেয়ে আমার ভয়ের উদ্দীপক ছিল তিনটি। একটি সর্প, আর একটি মহামারী আর তৃতীয়টি অগ্নিতে গৃহদাহ।

আমাদের গ্রামে বন ছিলনা। কিন্তু ধানের জন্য প্রতি গৃহেই ইঁদুরের উপদ্রব ছিল। সেজন্য সর্পভয় ছিল খুব বেশী। ভাণ্ডারঘরে পিসীমা একদিন সর্পদংশন হতে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন। লাল ডাকা হ'ল। লাল প্রকাণ্ড দুইটা খরিশ সাপ ধরল—স্বচক্ষে দেখলাম। তার পর হতে চৈত্র মাস থেকে আশ্বিনমাস পর্য্যন্ত সর্পভয়ে বড়ই ব্যাকুল হয়ে থাকতাম! ঘরের চালে চেনা সাপ ঘুরে বেড়াত। সকলে বলত—চেনা সাপে কামড়ায় না, কিন্তু ভয়টা সমানই হত। একবার আমাকে ইঁদুরে কামড়িয়েছিল—তাতেও কম ভুগিনি।

চৈত্রমাসে গ্রামে কলেরা হত। প্রত্যহ ৩।৪ জন করে মরত। যারই কলেরা হত সেই মরত, একজনও বাঁচত না। কোন প্রতিকার ছিলনা। গোটা মাসটা যে কিভাবে কাটত তা বুঝিয়ে বলা যায়না। জল ফুটিয়ে খেলে যে আক্রমণ রোধ করা যায়—তা জানতাম না, কেউই জানত না। তখনও গ্রামে নলকূপ বসেনি। চৈত্র মাসেই বংশের সকলের বাৎসরিক মৃত্যুদিবস। পিসীমাকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম—সকলেই কলেরায় মারা গিয়েছেন।

কলেরার সময় গ্রামে খুব তারস্বরে নামকীর্তন হ'ত। এক ভগবানকে ডাকা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিলনা। এই সময়ে পড়াশুনায় মন দিতে পারতাম না—রাত্রে চারিদিকে ক্রন্দনের রোলে ঘুমাতে পারতাম না। তবুই আমার বালকহৃদয়ে ভগবানকে ডেকে এনে দিয়েছিল। ভগবানের কৃপাতেই বেঁচে গেছি। আমার কেবল মনে হত—গ্রামে কলেরার সংবাদ ত আসে। বাবাকে ২।১ দিন অন্তরই দিয়েছেন। বাবা-মা কি উদ্বেগেই না জীবন যাপন করেছেন! আবার এও মনে হত ফাল্গুনের শেষে বাবা আমাকে যেন তাঁর কাছে নিয়ে যান না। চৈত্র ফুরালে মনে হত আর একবৎসর বেঁচে গেলাম।

চৈত্র ফুরিয়ে গেলে চড়ক গাজনের ঢাক ঢোল বেজে উঠত। ভক্তির নিশ্বাস ফেলে তাতে মেতে উঠতাম। পরবর্তী জীবনে সেই সময়ের অনুভূতিকে রূপ দিয়েছি।

চৈত্র মাসে বর্ষে বর্ষে পল্লীগ্রামে এসেছে মড়ক,
সাথে তার এনেছে নরক।
বর্ষের শ্মশান কৃত্য গাজন চড়ক।
ঘরে ঘরে রোদনের রোল,
তাহারে ডুবায়ে দিতে বাজিয়া উঠেছে ঢাক ঢোল।
বৎসরের মহাযাত্রা—সেও হয় শ্মশানের শব,
সে শবে ঘিরিয়া চলে অন্ত্যেষ্টি উৎসব।

মড়ার মাথায় ওরে সকল শ্মশান,
চিতায় চিতায় জ্বলে বহ্নি লেলিহান।

শৃগাল কুকুর গৃধ্র চারিপাশে তোলে কলরোল,
তার সাথে বাজে ঢাকঢোল।

বৎসরান্তে শ্মশানের মহা মহোৎসবে,
আমরা প্রেতের সাথে মেতেছি তাণ্ডবে।
সন্ন্যাসীর বেশে মহাসন্ন্যাসীর সহ,
মুণ্ডের কন্দুক ক্রীড়া করিয়াছি সেথা অহরহ।
মোরা নীলকণ্ঠের পূজারী,
কণ্ঠে ধরিয়াছি বিষ পান করি মৃৎপাত্র উজাড়ি।
উড়াইয়া সেকথা নিশান,
সারা বরষের দুঃখে ভরিয়াছি রুদ্রের বিষাণ।

মৃত্যুরে করিনি ভয় ছড়িয়াছি তার বিভীষিকা,
মেতেছি তাহার সাথে, খেকে সেত মায়া মরীচিকা।

উৎসবে দেয়নি যারা কাল বৈশাখীর,
শুষ্কপত্র সনে তারে উড়ায়েছে শুন্যের সমীর।

খেয়েছি চড়ক গাছে পিঠ কুঁড়ি বেপে ঘুরপাক,
ডুবায়েছে আর্ত্তনাদ শত শত শিঙা ঢোল ঢাক।

তৃতীয় ভয় গৃহদাহের। আমাদের বাড়ীর নিকটেই একটি পাড়াকে পাড়া পুড়ে গিয়েছিল ধরে আগুন লেগে। সে দৃশ্য আমি দেখেছিলাম, শুনেছিলাম বহু কণ্ঠের আর্ত্তরোল। তার পর হতে এক মাইল দূরে ঘরে আগুন লাগলেও বুক কাঁপত। শোবার আগে নিজে রান্নাঘরে গিয়ে উনুনে দুই ঘটি জল ঢেলে দিয়ে আসতাম। ঘর পুড়ে আমার মামা মারা গিয়েছেন রাজশাহি জেলার এক কাছারিতে সেকথাও মায়ের কাছে শুনেছিলাম। এতেও অগ্নিভয় বেড়ে গিয়েছিল। চারদিকে চালে চালে লাগানো খড়ের ঘর। কাহার অসতর্কতার ফলে যে সর্বনাশ হবে, তা কে জানে? খরানির সময় এই ভয়টাই হ'ত বেশী।

পল্লীজীবনে খরানির দৃশ্য আমাকে উদাস ক'রে তুলত। বর্দ্ধমান জেলায় গ্রীষ্মের দৃশ্য অত্যন্ত শোচনীয়। এই দৃশ্য আমাকে শুধু উদাসী নয়, ব্যথাতুরও করত। এই দৃশ্য সম্বন্ধে পরবর্ত্তী জীবনে একটি কবিতা লিখেছিলাম—সেই কবিতাটি এই—

ধূ ধূ করে মাঠ নক্ষত্রের প্রায় মরীচিকা নাচে খালি,
হহ ক'রে বয় তপ্ত বাতাস উড়াইয়া ধূলাবালি।
পলের ছ'ধারে দুর্বাটি নাই গোষ্ঠ জীবনহীন,
তড়াগে নাহিক পদ্মকুমুদ, জলাশয়ে নাই মীন।
মহিষ পিয়েছে কর্দমজল মেষ চাটিতেছে পাঁক,
অশথের তলে গাভীগুলি ভয়ে শুনিতে মরণ ডাক।
নালার কাদায় শূকর ছুটার কাক নিবাক চালে,
তৃষায় আতুর বিড়াল কুকুর ঘুরিতেছে চেকিশালে।
চারাগাছ যত মুড়ায়ে খেয়েছে ক্ষুধিত ছাগলগুলি,
উপাড়ি খেয়েছে গলখেসে-গুলো মূথা মূল সহ তুলি'।
রয় না তিলেক পাতাটি খসিয়া পড়িলে ঘটের তলে,
ঘুকিতেছে তক্র নয়ন মুদিয়া দাতার রজ্জু গলে।
ঝলসিয়া পড়ে তুলসী-কৃষ্ণ ঘুতরাও মুরছায়,
শুষ্ক লতায় শুষ্ক মাচান খাঁ খাঁ করে আঙিনায়।
শুকানো পুকুরে বাছুরগুলা ডাকে ঘুঘু ডাকে ভাঙা ছাদে,
খাঁচায় খাঁচায় নয়না চেঁচায়, আকাশে চাতক কাঁদে।
প্রাণহীন হ'য়ে পাখীর শাবক তরুমূলে গড়াগড়ি,
অহি-নকুলের দ্বন্দ্ব বেধেছে মৃত-দেহটির পরি।
কাৎরানি উঠে তালবাগড়ায় নলখাগড়ার বনে,
নারিকেল-গুটি বোঁটা হ'তে টুটি খ'সে পড়ে খনে খনে।
বাসা বাঁধিবারে পাই না কপোত তৃণখণ্ড একগাছি,
নাহি প্রজাপতি মৌমাছি অলি গুনগুনে গেছে মাছি।
নীরস মাটিতে ফাটল ধরেছে পথে ঘাটে মাঠে মাঠে,
সন্ধান লাগি তোমার, জননি, আজি কি হৃদয় ফাটে?

(৮)

বাড়ীর পথে মাঝখানে একবার নতুন সুর তুলেছিলেন জামাইবাবু : 'আগে তো কখনও দেখিনি, এখন তো দেখছি—বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে। এমন চাঁদ পেয়েও কেউ আপত্তি তোলে!'

ব'ললাম, 'সংসারে যত কলঙ্ক যে ঐ চাঁদেই।'

জামাইবাবু ব'ললেন, 'কলঙ্ক নিয়েই যে কারবার। কৃষ্ণকলঙ্কিনী শ্রীরাধাকে নিয়েই না অতবড় একখানা মহাকাব্য গড়ে উঠলো! কলেজি প্রেম বাদ দিয়ে এবারে ঘরে বসে যত পারো ঠেসে প্রেম করো।'

হাসি পেলো জামাইবাবুর কথা শুনে। ব'ললাম, 'জীবনে প্রেম আর হবে না, প্রয়োজনের কাছে প্রেমের দাঁড়াবার যায়গা কোথায়?'

ঠাট্টার সুরেই জামাইবাবু ব'ললেন, 'আছে ভায়া, খুব আছে; দুটো দিন গেলে আমাকে এসে আর তখন ব'লে দিতে হবে না। দেখবো—ইতিহাসের পাতা উল্টে গেছে। নামের সঙ্গে আকৃতির এমন অপূর্ব সামঞ্জস্য কোনোদিন চোখে পড়েনি। তনুশ্রী—তেরী পোয়েটিক নেম, না কি বলো?'

—'আপনিই যখন সবটা বলে দিচ্ছেন, তখন আবার আমি কেন!' জামাইবাবুকে কিছুটা উৎসাহিত ক'রবার প্রয়াসেই ব'ললাম, 'বলুন না—আর কি কি আছে, বলুন?'

—'হিউজ এ্যাণ্ড মেনি মোর।' জামাইবাবু ব'ললেন, 'সবই কি বলাসাপেক্ষ, অনুভূতিসাপেক্ষও যে অনেক কিছু! একদিন সব কিছুই তোমার অনুভূতিতে জেগে উঠবে। দার্শনিকের জীবন-দর্শনের খবর দূর থেকে তখন আমরা টেরও পাবো না।'

কৌতুক ক'রে ব'ললাম, 'হঠাৎ এমন সেন্টিমেন্টাল হ'য়ে পড়লেন কেন? মার হ'লে শেষ অবধি ঘটকালিটা যখন আপনি করতে পেরেছেন, তখন কোন কিছুই যে আপনার কান অবধি না পৌঁছে থাকবে না, একথা ধ্রুব। মা নিজেই রিপোর্টারের কাজ করতে পারবেন।'

—'তবে তো বাঁচি।' ব'লে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন জামাইবাবু।

বাড়ী ফিরে এসে বৌভাতের অনুষ্ঠানেও তাঁকেই নিজের হাতে সমস্ত ভার নিয়ে কাজ করতে হ'লো। এবারও বোধ করি বাবাই উপযাচক হ'য়ে ব'লেছিলেন, 'খোকা তার ক'জন বন্ধুকে নেমন্তন্ন ক'রবে, একবার জিজ্ঞেস কোরো তবেশ।' কিন্তু জিজ্ঞেস ক'রে জামাইবাবু ঠকলেন। আগেও ডাকিনি, এবারও এ ব্যাপারে কাউকে ডাকবার মতো উন্মাদনা বোধ ক'রলাম না, এমনকি শীলাকে পর্যন্ত না।

তাই ব'লে শীলা কিন্তু নিশ্চেষ্ট থাকে নি। নির্দিষ্ট তারিখটির কথা স্পষ্ট তার মনে ছিল। বর্ষাদিনেই সে এসে উপস্থিত হ'য়ে ধ'রে বসলো : 'কই, বৌদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিন সুমন্তদা!'

ব'ললাম, 'আগে আমার সঙ্গে করো, তবে তো বৌদি!'

শুনে মুখ টিপে একবার হাসলো শীলা, তারপর ব'ললো, 'আপনিও কি আজ নতুন হলেন নাকি, বেশ মানুষ তো আপনি!'

মনে মনে ভাবলাম—নতুন বৌ কি! পুরোপো মানুষ যে ছিল, ঐ ফাল্গুনের সঙ্গে সঙ্গেই সে ম'রে ভূত হ'য়ে গেছে। এ মানুষটার আকৃতিতে পুরনো দিনের আভাষ থাকলেও প্রকৃতিতে সে কি একেবারেই বদলে যায়নি? দিন-বদলের সঙ্গে সঙ্গে মনটাও যে বদলায়! কিন্তু সেটুকু শীলার কাছে কি সত্যিই খুলে বলা যায়? ব'ললাম, 'নতুন বৌ কি, দু'দিন আগে বৌদি ছিল না, আজ বৌদি এলো, ব্যাপারটা সত্যিই নতুন নয় কি?'

—'নতুন হ'লেও আপনি সেই পুরনোই!' ব'লে একবার স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালো শীলা।

এবারে আর জবাব দিতে পারলুম না। ব'ললাম, 'তোমার কাছে অন্ততঃ। এস, আলাপ করিয়ে দিই বৌদির সঙ্গে।' ব'লে পাশের ঘরের দিকে পা বাড়াতে যেতেই শীলা হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো। জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'কি হ'লো?'

একটুকাল থেমে আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস ক'রে শীলা জিজ্ঞেস ক রলো, 'কি ব'লে আলাপ ক'রবো, বলুন তো?'

কথা শুনে এবারে না হেসে পারলুম না। ব'ললাম, 'মেয়েদের সঙ্গে মেয়েদের আলাপে আবার ভাবতে হয় নাকি? কি দিয়ে রান্না হ'লো ব'লে সুরু ক'রে শাড়ী গয়নার একটা ফিরিস্তিতে বক্তব্য টেনে দিলেই তো হ'লো!'

কথা শুনে শীলা এবারে সশব্দে হেসে উঠলো। —'আপনি তো বেশ মজার মানুষ সুমন্তদা! কিন্তু কি ব'লে আলাপ করি, বলুনই না ছাই।'

—'টিপ্ এই ব'লেই তো ক'রতে পারো। বাকীটুকু না হয় আমি ধরিয়ে দেবো।' ব'ললাম, 'সেটুকু দিয়েই গুছিয়ে নিতে পারবে। কিছু আটকাবে না।'

আর দ্বিরুক্তি না ক'রে সলজ্জেই এবারে পা বাড়ালো শীলা। কিন্তু তনুশ্রীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে তার আর লজ্জায় শেষ রইল না। মুখ তুলে যে একটিবারও তনুশ্রীর মুখের দিকে তাকাবে, এমন কোনো অবস্থাই তার মধ্যে দেখা গেল না। ব'ললাম, 'কই, কি হ'লো, বৌদির সঙ্গে আলাপ করো!' কিন্তু এসে অবধি মুখ নিচু ক'রে সেই যে কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল শীলা, একটিবারও আর নড়লো না। এমনি ক'রে মিনিট দু'তিন কাটবার পর কি ভেবে হঠাৎ একবার তনুশ্রীর মুখের দিকে সলজ্জে তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গেই একদৌড়ে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল সে। কণ্ঠ উচ্চগ্রামে তুলে ডাকলাম—'শীলা, শীলা—।' কিন্তু শীলার আর দেখা নেই।

তনুশ্রী জিজ্ঞেস ক'রলো, ভারী লাজুক তো!'

ব'ললাম, 'আমার বন্ধুর বোন। ও শুধুই শীলা নয়, লজ্জাশীলা।'

কথাটা একেবারেই বোধ করি মিথ্যে ব'ললাম না তনুশ্রীকে। অনিমার মত বন্ধু এ জীবনে সত্যিই কি আর কাউকে পেয়েছি? বন্ধুর বোন বলেই যদি শীলার পরিচয় দিই, সে কি মিথ্যে দেওয়া কিছু? শীলার চিঠিটা সম্পর্কে মনে মনে এবারে কিছুটা কৌতুক বোধই ক'রলাম। অনিমাকে যখন সে তনুশ্রীর বর্ণনা দিয়ে চিঠি লিখবে, সে চিঠি শীলার উপযুক্ত হ'লেও তা যে কতখানি অবাস্তব আর অর্থহীন হবে—সে কথা ভেবে মনে মনে হাসিও পেলো কম নয়।

তনুশ্রী জিজ্ঞেস ক'রলো, 'না বলেই যে চলে গেল, লজ্জা পেলো বুঝি?'

—'তাই হয়তো পেলো।' ব'লে প্রসঙ্গটা শেষ করতে চাইলুম। তনুশ্রীকে ঘরে এনে আসলে আমি নিজেই যে নিজের কাছে লজ্জা পাচ্ছি, একথা বোঝাই কাকে? অগ্নি সাক্ষী ক'রে স্ত্রীরূপে তাকে গ্রহণ ক'রেছি, এইটেই যদি শেষ কথা হ'তো, তবে সুখের ছিল। কিন্তু অনিমাকে যে একটা মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারছি না, ভুলতে পারছি না আমাদের অতীত দিনগুলিকে। পারলে হয়ত সুখের আজ অন্ত থাকতো না! তনুশ্রীকে তবে সারা বুকের মধ্যে নিবিড় ক'রে আঁকড়ে ধ'রে সমস্ত চেতনা দিয়ে বলতে

পারতুম : 'জীবনে তোমাকেই চিরদিন চেয়ে এসেছি, আমার সমস্ত কল্পনা দিয়ে এতদিন তোমাকেই এঁকেছি মনে মনে। মর্ত্যবাসী প্রাণ-প্রতিমা তুমি।'

ভাবতে গিয়ে নিজের উপরেই ধিক্কার এলো। কি ক'রেছি, সত্যিই এ আজ আমি কি করলাম! এত বড় একটা ভুলের উপর বাসা বেঁধে জীবনের বাকী দিনগুলিকে কোন্ ফসলে আমি ভ'রে তুলবো? আমার ঔদ্ধত্যকে স্বীকার ক'রে নার অপমানের বালাই হয়ত দু'দিনেই ঘুচতো, কিন্তু নার প্রতিশ্রুতিকে রক্ষা ক'রে নিজে থেকে আমি আজ প্রেমের যত বড় অপমান ক'রলাম—তার প্রায়শ্চিত্ত হয়ত আমার এই একটা জীবনেই শেষ হবে না। তনুশ্রীকে নিরপরাধিনী জেনেও মনকে তবু সান্ত্বনা দিতে পারলুম না। মা একদিন গর্ভে ধারণ ক'রেছিলেন, তার পরম পুরস্কার স্বরূপ তনুশ্রীকে এনে তাঁর হাতে তুলে দিয়ে ব'ললাম, 'এই নাও তোমার বউ, এবার আমার চিরকালের ছুটি।'

—'তাই ব'লে চাকুরী ক'রতে তুই কোথাও বেরোতে পারবি নে খোকা।' থেমে তনুশ্রীকে লক্ষ্য ক'রে মা ব'ললেন, 'খোকার এই পাগলামী তোমাকে থামাতে হবে বৌমা।'

জবাবে তনুশ্রী কি ব ললো, সেটুকু আর কানে এলো না। তার আগেই মার সামনে থেকে চ'লে এসে নিজের অধ্যয়ন-কক্ষেই প্রবেশ ক'রতে যাচ্ছিলাম, ইতিমধ্যে অলক্ষিত আক্রমণ মন্টুর। কোথেকে দৌড়োতে দৌড়োতে হঠাৎ এক লাফে এসে কোলে উঠলো, তারপরেই অস্ফুট উচ্চারণে আধো আধো কণ্ঠের ছড়া :

'তাই তাই তাই, মামাবাড়ী যাই,
মামাবাড়ী দুধ-ভাত, কিল চড় নাই,
মামী এলো ঠ্যাঙা নিয়ে, ফুরুৎ ক'রে উড়ে যাই।'

দিদি ভিন্ন এ ছড়া আর কে শেখাবে মন্টুকে? আদর ক'রে মন্টুর গালে চুমু খেয়ে ব'ললাম, 'দেখি তো কেমন ক'রে পারো উড়ে যেতে?'

সঙ্গে সঙ্গেই আকাশের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে মস্ত বড় একটা ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল মন্টু। শক্ত ক'রে না ধ'রলে মাটিতে প'ড়ে গিয়ে সমস্ত বাড়ীটাকে একমুহূর্তেই সে সজাগ ক'রে তুলতো।

ব'ললাম, 'দুষ্টু ছেলে, এই তুমি উড়তে শিখেছ!'

—'হ্যাঁ তো।' ব'লে হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেল মন্টু।

লক্ষ্য প'ড়লো—রান্নাঘরের আড়ালে দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল দিয়ে হাসছে দিদি। ব'ললাম, 'ছেলেকে দিন দিন খুব বাহোক তৈরী ক'রছো। আমার মতো কোনো একজন পালোয়ান না বানিয়ে তোমরা ছাড়বে না মন্টুকে, দেখতে পাচ্ছি।'

হাসতে হাসতেই দিদি বললো, 'মামা হয়ে সেই আশীর্বাদই কর খোকা। কবি-দার্শনিকের বাংলাদেশে অন্ততঃ একজনও পালোয়ান হোক, নইলে দেশ যে বৈষ্ণব হ'তে হ'তে নিজের ব'লে আর কিছুই থাকলো না রে!'

হাসিচ্ছলে কথাটা ব'ললেও এমন কিছু-একটা উচ্চারণ ক'রলো দিদি, যার মধ্যে যথেষ্ট চিন্তাপ্রবণতা র'য়েছে। ইচ্ছে ছিল—মন্টুকে মধ্যস্থ রেখে কথাটা নিয়ে দিদির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথালো হ'য়ে উঠি, কিন্তু তার আগেই তনুশ্রীর আহ্বানে সাড়া দিতে হ'লো দিদিকে।

বিয়ের আগে দিদির সঙ্গে তনুশ্রীর পরিচয় ছিলনা। কিন্তু মেয়েরা যে কত অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে যেতে পারে, তার প্রমাণ দিদি আর তনুশ্রী। এখানে এসে অবধি দিদির সঙ্গে নিজেকে এত বেশী জমিয়ে নিয়েছে সে যে, দেখলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। মন্টুকে তো কিছুতেই সে কোলছাড়া ক'রতে রাজী নয়। পারে তো বুকের মধ্যে সিঁধে নেয় সে মন্টুকে। ঠাট্টা ক'রে একসময় দিদি ব'লেছিল, 'দু'দিন অপেক্ষা করো, মন্টুর মতো তোমারও একদিন কোলজোড়া ছেলে আসবে।'

উত্তরে সলজ্জে মুখ নিচু ক'রে নিয়ে তনুশ্রী ব'লেছিল : 'যান, আপনি যেন কী দিদি। এতটুকুও যদি আপনার মুখের লাগাম থাকে!'

দিদি ব'লেছিল, 'লাগাম যেন থাকবে ভাই! মেয়েদের জীবনে সেই তো বড় সুখ। মেয়েরা যা হবার

আগে এ সুখ কল্পনাই করা যায়না। আমিও ভাবতে পারিনি কোনদিন।'

—'নিন, রাখুন, হ'য়েছে।' ব'লে আলোভাবেই পাশ কাটিয়ে উঠে গিয়েছিল তনুশ্রী।

ফুলশয্যার রাত্রে এ ঘটনার কিছু-একটা ছিটে ফোঁটা আভাষ না পেলেও দু'একদিন পরেই পেলাম। তনুশ্রী কিন্তু তার কথা রেখেছিল, ফুলশয্যার রাত্রি থেকে আমার প্রতি আর সে 'আপনি' সম্বোধনটা নিক্ষেপ করলো না। প্রথমটা 'আপনি' 'তুমি' মিলিয়ে, তারপর পুরোপুরি 'তুমি'তে এসেই থেমে দাঁড়ালো। কথায় কথায় একদিন বললো, 'দিদি কিন্তু ভারী মজার লোক, যাই বলো!'

—'কি রকম?'

—'কি রকম আবার! মেয়েদের আশা আকাঙ্খা নিয়ে মনটাকে ভারী নাচিয়ে দিতে পারেন।'

—'মানে?'

—'জানিনা, যাও।' ব'লে দুষ্টু চোখের একটা অদ্ভুত দৃষ্টি আমার মুখের উপর কিছুক্ষণের জন্য তুলে ধ'রে ভীত বেগেই কোথায় একদিকে উঠে গেল তনুশ্রী।

নারী রহস্যময়ী। তনুশ্রী সেই রহস্যজালে আবৃত হ'লেও তার এ চাহনীর অর্থ বুঝে নিতে আমার বেগ পেতে হলো না। বড় চঞ্চল, বড় চটুল, বড় ভাবপ্রবণ তনুশ্রী। স্বভাবের এতগুলো দিক নিয়েই যদি সে আয়ত্ত হ'তো, তবে হয়ত সুখের ছিল, কিন্তু তার চাইতেও আরও একটা বড় স্বভাব তার মুখরতা, আর সেই মুখরতা থেকেই মুখরা। চিরদিন এইখানেই আমার সব চাইতে বড় ভয়, বড় ঘৃণা। কয়েকটা দিন কেটে গেলে তার সেই স্বভাবের শেষের দিকটাই একদিন স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। ব্যাপারটা সামান্য, বিয়ে সম্পর্কিত ভিড়ীরির সেই আত্মীয়দের প্রণাম-সমস্যা নিয়ে।

যাঁদের কোনদিন দেখিনি, যাঁদের নামটা অবধি কোনোদিন আমার কানে এসে পৌঁছয়নি, নিতান্ত বিয়ের সম্পর্কটাকেই বড় ক'রে দেখাতে গিয়ে তাঁদের পায়ের ধুলো এ মাথায় স্বচ্ছন্দে তুলে নিতে পারিনি। ব্যাপারটা সেইখানেই চুকে যেতে পারতো, কিন্তু সংসারের সব জিনিষই সর্বত্র সোজা পথে চলে না! ইতিমধ্যে ভিড়ীরি থেকে হৈমন্তী ইনিয়ে বিনিয়ে চিঠি লিখলেন তনুশ্রীকে: '.....কপাল মন্দ, তাই হয়ত সুখী হইতে পারিলাম না। ইতিপূর্বে সুমন্তর সঙ্গে আলাপ করিয়া কিন্তু তাহার চরিত্রের এই দিকটা সম্পর্কে আদৌ কল্পনা করিতে পারি নাই। যে কাণ্ডটা এখানে সে করিয়া গেল, ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ, তাহার জন্য আত্মীয়-স্বজনের কাছে যে আমাদের মাথা কতখানি হেঁট হইয়া গেল, ভাবিতেও গা রী-রী করিয়া ওঠে। বেহান ঠাকরুণকে আমি আর এ বিষয়ে স্বতন্ত্র ভাবে কিছু লিখতে ইচ্ছা করি না, পারিস তো এই চিঠিই তাঁহাকে একবার দেখাবি। মেয়ে বিবাহ হ'লেই পর হইয়া যায়, আমাদের সমাজে একথা কাহারই বা অজানা! তাই বলিয়া জামাই এইভাবে সকলের সামনে শ্বশুর শাশুড়ির অমর্যাদা করিয়া অপমান করিয়া যাইবে, ইহা কেহই সহ্য করিতে পারে না। পারিস তো সুমন্তকে একথা একবার বুঝাইয়া দিস।—'ইত্যাদি

মেয়ের কাছে মার ব্যক্তিগত চিঠি, অতএব গোপনেই ছিল। কিছুটা সোহাগের সূত্রে নানা কথার অবতারণা করে অতঃপর আসল কথায় নেমে এলো তনুশ্রী।—তুমি কিন্তু কাজটা ভালো করে আসোনি, যাই বলো।'

কিছুটা যে অনুমান ক'রতে না পেরেছিলাম, তা নয়। তবু জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন কাজটা?'

বিনা দ্বিধাতেই বিষয়টা উল্লেখ ক'রলো তনুশ্রী।

ব'ললাম, 'ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি অপ্রবৃত্তির প্রশ্ন নিয়ে আমি কারুর কাছে কোনো কৈফিয়ৎ দিতে রাজি নই। জীবনে আমি কোনোদিন কারুর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে শিখিনি।'

—'না শিখলেও স্থান-কাল ভেদে শিখবার প্রয়োজন আছে তো বটেই!' থেমে তনুশ্রী বললো, 'তুমি না শিক্ষিত, লেখাপড়া জানা মানুষ, তোমাকে কেন ব'লে দিতে হবে একথা?'

তর্ক করতে প্রবৃত্তি হ'লোনা এই নিয়ে তনুশ্রীর সঙ্গে। ব'ললাম, 'বলবার প্রয়োজন ছিলনা, এখনও নেই।'

তথাপি তর্ক তুললো তনুশ্রী।—'না থাকলে তো বাঁচতুম, কিন্তু তেমন বাঁচাই বা বাঁচতে দিলে কোথায়? সবাই চেয়েছিল—বিনা তকরারীতে বিয়েটা আমাদের সুশৃঙ্খল ভাবে হ'য়ে যাবে। কিন্তু তুমি জিদ করেই তার শেষ রক্ষা ক'রে এলে না। মার মনে যে এতে কত আঘাত লেগেছে, তা কি একটুও বুঝতে পারোনি? তুমি তো শুনেছি দর্শন নিয়ে পাশ ক'রেছো, বইয়ের স্তূপের উপরে শুয়ে কাটিয়েছ এতকাল, মানুষের মন বুঝবার মতো কি কোনো একখানি বই থেকেও কিছু পাওনি?'

কথাটা ব'লে তনুশ্রী এবারে আমার সমস্ত নিষ্ঠার মূলেই আঘাত ক'রলো। মার অবশ্য প্রয়াসের বলিহারী। এতদিনে এই তবে সহধর্মিনী পেলাম? বিয়ের আগে এই মেয়ের মুখেই কি আমার প্রশংসা ধ'রতো না তার মার কাছে? এই মন নিয়েই তবে একদিন তনুশ্রী আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমার অধ্যয়নকক্ষে এসে বই গুছিয়ে রেখে গিয়েছিল? এই মেয়ের প্রেমকে অযুত করবার জন্যেই কি অনিমা চিরদিনের মতো দূরে সরে দাঁড়ালো? মুহূর্তকালের মধ্যে মনে মনে একটা বিরাট কালকে প্রদক্ষিণ ক'রে এলাম। তনুশ্রী তখনও অবিরাম তর্ক ক'রবার জন্য উদ্যত।

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'তোমার উদ্দেশ্য কি আমাকে অপমান করা—না এইভাবে অনর্গল তর্ক ক'রে যাওয়া?'

—'আমি তার্কিকও নই, কলহাটেও নই, মা দুঃখ ক'রে কেঁদেকেটে লিখেছেন ব'লেই দুটো কথা ব'ললাম। দেখ না, চিঠিখানাই না হয় প'ড়ে দেখ—কি লিখেছেন।' ব'লে হৈমন্তীর চিঠিখানি এবারে আমার সামনে ছুড়ে দিল তনুশ্রী।

স্নেহপ্রবণা মাতৃহৃদয়ের মতই চিঠি বটে! এতবড় বিদ্বেষ আর জ্বালা কোথায় লুকিয়ে ছিল এতদিন? ব'ললাম, 'তবে আর কি, যাও, তোমার মার যেখান ঠাকুরকে পড়িয়ে হাতে কবচ ক'রে রাখো সে চিঠিখানি। তারপর হ'বেলা ঐ ঘুরে ঘুরে জল খেয়ে স্বামীধর্মের বিচ্যুতি ক'রে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন কোরো।' ব'লে চিঠিখানি এগিয়ে ধ'রলাম তনুশ্রীর দিকে।

এবারে কিন্তু একটি কথাও আর বললো না সে। আমার চোখের দিকে একবার তীব্র কটাক্ষপাত ক'রে ছোঁ মেরে চিঠিখানি নিজের হাতে টেনে নিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তনুশ্রী।

বিবাহিত জীবনে এই বুঝি প্রথম রোমাঞ্চের স্বাদ! মনে প'ড়লো অনিমাকে, অপমার আয়ুষ্কিকে:

"আমার কাছে কী চাও তুমি ওগো খেলার সঙ্গী,
কেমন খেলার ধারা।
চাও কি তুমি যেমন ক'রে দুলো দিনের শুভ্র
তেমনি হবে সারা।—'

কোথায় সুরু হ'য়েছিল জীবন-নাট্য, মনে পড়ে কি? মনে পড়ে কি অধ্যাপক নিত্যানন্দর সেই প্রথম ক্লাস-আরম্ভকে? স্মৃতির অতলে সব স্মৃতি আজ হারিয়ে যেতে ব'সেছে! সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষেপে ভেসে ভেসে প'ড়ছে সৈকত-ভূমি। সহধর্মিনী তনুশ্রী। প্রতিমুহূর্তের তীব্র অপমান বুকে চেপে নিয়ে তবু তাকে বিনীত নম্রতায় নিবিড় সান্নিধ্যে টেনে এনে হৃদয়ের সমস্ত উচ্ছ্বাস ঢেলে ব'লতে হবে: তুমি আমার, একান্ত ক'রে আমার। আমার যা-কিছু আশা আনন্দ স্বপ্ন সাধ—সে তবু তোমাকে কেন্দ্র ক'রেই। আমার সুরাধরী রাত্রিকে তুমিই যে মধুর ক'রে তুলেছ। আমার প্রাণলক্ষ্মী প্রিয়তমা তুমি।'

হাসি পাচ্ছিল ভাবতে গিয়ে। কিন্তু সেই হাসির মুহূর্তেই বুকের কোথায় যেন একটা তীব্র ব্যথা বড় টন্‌টন্ ক'রে উঠ্‌লো। সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে একটা বালিশ চেপে নিয়ে শুয়ে প'ড়লাম, তারপর কখন্ যে একসময় অবসন্ন মনের অবসাদে নিদ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়লাম, টের পেলাম না।

[৬]

কিছুকাল কেটে গেলে ভাবলাম—কৃতকর্মের পরিচয়

দিয়ে এবারে অনিমাকে একটা চিঠি দিই। মান-অভিমানের একটা শেষ বোঝাপড়া অন্তত: তাতে হবে। যদি লিখি—'আমার বিয়ে করায় তোমার প্রেমের মর্যাদা যদি কিছু ঘটে, তবে তা ঘটেছে। কিন্তু তাই ব'লে এ জীবনে তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটাবো কেমন ক'রে?'—তবু কি নিজের নারীত্বের অধিকারকে একটি মুহূর্তের জন্যও বড় ক'রে তুলে ধ'রে সুখ কিনিয়ে থাকতে পারবে অনিমা? কিন্তু চিঠিটা লিখতে গিয়ে কেমন যেন একটা বিবাগত লজ্জায় বারবারই কলম বন্ধ ক'রে যাচ্ছিলে হ'লো। কলম বন্ধ ক'রে অনিমার পুরনো চিঠিগুলোই বাক্সের তলা থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে বহুবারের মতো আরও কয়েকবার চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে নিলাম। চোখের এই কারণে যে, তরুশ্রীর সামনে পড়লে এ চিঠিকে নিশ্চয়ই সে সহ্য ক'রে নেবে না। সে সম্ভাবনা যদি বা অনিমার আছে, তরুশ্রীর নেই। কিন্তু সেই ব'লেই যে অনিমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে আমি কেমন ক'রে মিথ্যা ক'রে দেবো, তাও কি হয়! চিঠিগুলির মাঝ দিয়ে যে অনিমাকেই পাই। পড়া শেষ হ'লে আমার লিখে তারা বাক্সের তলাতেই আশ্রয় নেয়। যদি বা কখনও তরুশ্রী এসে জিজ্ঞেস করে: 'হঠাৎ এমন বাক্স নিয়ে প'ড়লে যে বড়, কি চাই বলো না?'

উত্তরে বলি: 'চাইবার মতো সত্যিই কি কিছু আছে? আপাতত একটা দাঁই, কি পাঞ্জাবী পেলে বেরোতে পারি।'

অমনি তর্ক সুরু করে তরুশ্রী।—'বাজলে কি এতক্ষণ আমিই পারতুম না যাও ক'রে দিতে! আর বেরোবেই বা তোমার তুমি? দিনরাত যদি বাইরে বাইরেই কাটাবে, তবে ঘরের দিকে তাকাবে কে? আমিও তো একটা মানুষ রয়েছি, দুদণ্ড আমার কাছে ব'সতে কি তোমার একটুও ইচ্ছে করে না?'

বলি: 'এমন কথা কি আমার বিবাগাই ব'লতে পারেন? সারাদিনে আজকাল আর কতটুকুই বা বেরোই। আগে যেখানে আমার চিঠির নাগালই পাওয়া যেতো না, আজকাল সেখানে চিঠি আমার অস্তি-মাত্রার বাড়া হ'য়েই আছে। এমন সভাগ চিঠি থাকতেও যদি ঘর শূন্য থাকে, তবে সে শূন্যতা বোধ করি ভোলোকালেই আর পূর্ণ হবে না।'

তর্ক ছেড়ে এবারে আলোয়ে মেতে ওঠে তরুশ্রী। বলে: 'বেশ তো, দেখাও লিখি এই মুহূর্তে না বেরিয়ে কেমন পারো তুমি ঘরে থাকতে?'

—'বেশ, বেরোব না। কাছে এসে বোসো, কবিতা পড়ি।' মৃদু হেসে বলি: 'ন'তের রবীন্দ্রনাথের মানস-সুন্দরী'?—

'আজ তোমো যাও নয়। নয় ফেলে দিয়ে
ছন্দোবন্ধগ্রন্থগীত, এসো তুমি নিয়ে,
আজিমলাবনের সুন্দরী আমার—

এতক্ষণ যতটুকু যা কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, এবারে দু'পা স'রে গিয়ে একেবারে দরজার পাশে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালো তরুশ্রী, ব'ললো, 'তুমি কি পাগল না মাথা-খারাপ, হাইডেন একটা কিছু নিয়ে আরম্ভ ক'রে দিলেই হ'লো! তার চে' ঘুম যাওয়ারো ব'লে ঘণ্টাকে ব'লিয়ে রেখে এসেছি, না খেলে তিনি কি ভাববেন?' বলে সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্ধান।

মনোযোগের মনের কপাটে একটা আঘাত লাগে। মাঝে মাঝে অতিরিক্ত ভালোবেসে ফেলতে চাই তরুশ্রীকে, কিন্তু সেই ভালোবাসার মুহূর্তটাকে এমনি ক'রেই সে অবহেলায় ক্ষুণ্ণ ক'রে দেয়। পুকুর আর মাঠের তরুশ্রীর অপরিসীম আনন্দ, বাঁশ দিয়ে দাঁতার কাটতে পারলে তার আর কিছু চাই না; কিন্তু প্রকৃতিকে দেখলে সে ভয়ে শিউরে ওঠে। পৃথিবীতে সব চাইতে বড় শত্রু তার বই। যখন বেরোবার অবকাশে এসে আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে আমার বইগুলিকে পরিপাটি ক'রে গুছিয়ে রেখেছিল সে, তখন তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়েও একটা কিন্তু মেরে মনে মনে খুশী হ'য়েছিলাম যে, অনিমার মতো এ মেয়েরও তবে দুই সংসারে চিত্ত। কিন্তু আজ দেখলাম—সে যে

কতবড় মিথ্যা ভাবনা ছিল—তা বলবার নয়। এই কারণেই খুব সম্ভব প্রবেশিকা পরীক্ষার সদর দরজাটা অবধি ছুঁয়ে আসতে পারেনি সে। কবিতাকে তাই ছাইভস্ম ব'লে উড়িয়ে দিতে তার একটুও বাধে না। কোথায় অনিমা আর কোথায় তনুশ্রী! তবু নিজের কাছেই নিজে আশ্চর্য হ'য়ে যাই এই ভেবে যে, তনুশ্রীকে নাকে মাঝে কেমন ক'রে, হঠাৎ ভালোবেসে ফেলতে পারি। এ যে কতবড় মনোবিজ্ঞান—তা ভেবে পাইনা। সামান্য লোক-দেখানো অভিসাকী ক'রে তাকে বউ ক'রে ঘরে এনেছি ব'লেই কি তার প্রতি এই মমতা—না এ আমার ফিরিয়ে যাওয়া যৌবনের আগত ধর্ম? কোনো কোনো সময়ে একেবারেই ভুলে যেতে চেষ্টা করি অনিমাকে, সেই সময়টা একান্ত ক'রে তনুশ্রীকে পেতে চাই। কিন্তু আমার চাওয়ার সঙ্গে তার ধরা-দেওয়া কোথাও আজ-অবধি এক যায়গায় এসে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালো না। বিবেক তাতে আহত হয়, হৃদয় অশান্ত হয়, মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হয়। সংসারে স্ত্রী হওয়া আর সহধর্মিনী হওয়ার মধ্যে যে কত পার্থক্য তা যদি তনুশ্রীকে তার সপ্রমাণের সময় কেউ শিখিয়ে দিত তবে হয়ত আজ অনেক সমস্যাই অনায়াসে মিটে যেতে পারতো; কিন্তু তনুশ্রীকে কোনো সমাধানের সহজ পথ দিয়েই এগোতে দেখা গেল না। অনিমা দিয়েছিল আমাকে কাব্যের উন্মাদনা, তনুশ্রী সেখানে একেবারেই বঞ্চনার দাগ কেটে দিল। বিয়ের ক'মাস আগে আর পরে। সেদিন যাকে বিমুখী মনে হ'য়েছিল, আজ সে যে আমার আশা আর স্বপ্নকে এতখানি বিমুখ ক'রবে, এ যে অনিমার চিঠি পেয়েও বোধ করতে পারিনি। পারলে মাত্রুহত্যা হ'লেও প্রাত্যহিক জীবনের এমন আত্মঘাত থেকে অন্ততঃ রক্ষা পেতাম। সুখ শান্তি ব'লে আজ আর কি রইল আমার? যে সামন্ত-তান্ত্রিক মনিবকারী বিবেকে নিজের সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে এতকাল ঘৃণা ক'রে এসেছি, তিলে তিলে আজ তাকেই স্বীকার ক'রে নিয়ে বাবার পিতৃ-হৃদয়ে সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়ে চ'লেছি। কিন্তু কৈ, চেষ্টা ক'রে তো নিজের বেকারত্ব ঘোচাতে পারলুম না! নিজের ব্যক্তিত্বকে বস্তুজগতের কষ্টি-পাথরে যাচাই ক'রে নেবার আগেই পিতৃ-পুরুষের ঐতিহ্যের চাপে ঘাড় আমার নুয়ে প'ড়লো। মা সুখী হলেন, বাবা শান্তি পেলেন, দিদি আর জামাইবাবু আশ্বস্ত হ'লেন, পাড়ার প্রতিবেশীরা দেখে শুনে মৃদু হাসি হাসলেন; কিন্তু সবার অলক্ষ্যে যার জীবন থেকে চিরদিনের মতো হাসি শুকিয়ে গেল—তাকে বুঝে দেখবার অবকাশ পেলোনা কেউ। এই ভাবেই প্রত্যহ সংসারের গড্ডালিকা প্রবাহ ব'য়ে চ'লেছে।

মাঝখানে জামাইবাবু একবার চক্রধরপুরে ফিরে যাবার কথা তুলেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মা আর-একদিন অতিরিক্ত অস্থির হ'য়ে পড়ায় বাধা হ'য়ে যাওয়া বন্ধ ক'রতে হ'লো। ডক্টর চৌধুরী মাঝখানে কিছুদিন আসছিলেন না; যা প্রেসক্রিপসন ক'রে দিয়েছিলেন, তা-ই নিয়মিত চলছিল। এবারে আবার তাঁকে ফল্ দিতে হ'লো। এসে আবার তিনি দু'কোর্স নতুন ইন্‌জেকশন দিয়ে গেলেন। বললেন, 'এই নিয়ে ভাববেন না, এ রোগ মাঝে মাঝে এ রকম রিলাপ্স ক'রে থাকে। নার্সিংটা যেন ভালোভাবে চলে, এটুকু দেখবেন।'

এ পর্যন্ত অন্ততঃ তাতে ত্রুটি হয়নি। দিদি এসে অবধি মার শিয়রের পাশেই প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছে। ভেবেছিলাম—জ্বরের অস্থিরতা কমলে হৃদ-রোগের লক্ষণগুলোও ধীরে ধীরেই ক'মে আসবে। কিন্তু মার রোগটা যে ডাক্তারী শাস্ত্রের মতবড় একটা জটিল অধ্যায়ে গিয়ে বাসা বেঁধেছে, একথা পূর্বে বুঝতে পারিনি।

দিনকয়েক কেটে গেলে মা পুনরায় কিছুটা সুস্থ হ'য়ে উঠতেই একদিন সকালের দিকে দেখলাম—জামাইবাবু রওনা হ'য়ে পড়বার প্রায় সমস্ত ব্যবস্থাই পাকাপাকি ক'রে ফেলেছেন। পাশে দাঁড়িয়ে দিদি বাঁধাছাঁদার ব্যাপারে জামাইবাবুকে সাহায্য ক'রছে।

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'ছুটি কি আর ক'টা দিনের মোটেই পাওয়া যাবেনা ?'

জামাইবাবু বল্লেন, 'পাওয়া গেলে কেউ কি শ্বশুর বাড়ীর আরাম ছেড়ে নড়ে! এরপরে গেলে একেবারেই ছুটি নিতে হবে।'

—'দিদিকেও কি সঙ্গে না গেলেই নয় ?'

প্রশ্নটার জবাব এবারে দিদি নিজেই দিল।—'না গেলে ওখানে তোর জামাইবাবুকে দেখবে কে ?'

মুখ টিপে হেসে জামাইবাবু ব'ল্লেন, 'দেখবার লোকের অভাব হবে না। তার চাইতে সোজা কথাটাই স্পষ্ট ক'রে বলোনা কেন—আমাকে ছেড়ে তোমারই মন টিকবে না।'

দিদি ব'ল্লো, 'বাপের বাড়ী এলে মেয়েরা আর কিছু চায়না।'

কথাটা নিতান্তই জামাইবাবুকে শোনাবার জন্ত। হাতের কাজের দিকে চোখ রেখেই জামাইবাবু তাই ব'ল্লেন, 'বেশ, তবে তুমি থাকো, আমি নিজেই রওনা হ'ছি।'

—'গিয়ে তো ওখান থেকে বানিয়ে বানিয়ে মাকে চিঠি দেবে—হঠাৎ রোগে শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়েছি, মন্টু ওদের অবিলম্বে এখানে চলে আসা প্রয়োজন।' সকৌতুকে হেসে ফেলে দিদি বল্লো, 'তার চাইতে সঙ্গে গেলে এখানকার ঝামেলা কিছু কমবে। মাকে নিয়েই একে ঝঞ্ঝাটের অন্ত নেই, তারপর তুমি যদি গোদের উপর বিষফোঁড় সৃষ্টি করো, তবে মাঝখানে থেকে মিছেমিছি দৌড়োদৌড়ি ক'রে মরবে শুধু।'

ব'ল্লাম, 'তাতে আর আমার বিশেষ কি কষ্ট হবে!'

দিদি ব'ল্লো, 'দরকারই বা কি ঝামেলা বাড়িয়ে! ঘরে এতদিনে লক্ষ্মী এসেছে। মাকে দেখাশোনার ভার এখন থেকে তনুশ্রীই নিতে পারবে। ওখানে গিয়ে তোর জামাইবাবুর সত্যিই খুব কষ্ট হবে, নইলে আপত্তি ক'রবো কেন, বল্ ?'

নতুন ক'রে ব'ল্বার আর কিছুই ছিলনা। তাই চুপ ক'রে গেলাম।

যাত্রালগ্নে একসময় গোপনে ডেকে নিয়ে দিদি জিজ্ঞেস ক'রলো, 'এতদিনে তা হ'লে সত্যিই তুই সুখী তো সুমু ?'

ব'ল্লাম, 'দেখে সত্যি সত্যিই সুখী ব'লে কী তোমার মনে হয় ?'

—'হওয়া অন্ততঃ উচিৎ।'

—'কারণ ?'

—'এর মধ্যে কারণ ব'লে কিছু নেই।' থেমে দিদি ব'ল্লো, ভালবাসা কখনও একদিনে জন্মায় না; স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও তাই। ক্রমে ভালোবাসা গাঢ় হয়, ক্রমেই সুখী হয় তারা।'

এবারে অকপটেই ব'ল্তে হ'লো: 'যাকে তুমি ভালোবাসা ব'ল্ছো, সে ভালোবাসা আমি আজও বাসতে পারিনি তনুশ্রীকে; পারবো কিনা, তা ভবিষ্যতই জানে।'

—'মেয়েটাকে কি সারাজীবন তবে মিথ্যে কষ্ট দিবি বলেই ঠিক ক'রেছিস ?'

—'কষ্ট নিয়ে যদি আসে, তবে আমি চেষ্টা করেও তাকে শান্তি দিতে পারবো না।' থেমে বল্লাম, 'তবে হ্যাঁ, একটা দিকে আমার সান্ত্বনা আছে, তোমাদের সবাইকে তো অন্ততঃ সুখী করতে পেরেছি।'

—'তুই নিজে সুখী না হ'লে আমরাই কি সুখ পাবো ?'

এবারও অকপটেই বল্লাম, 'আমাকে নিয়ে তো কারুর কোনো প্রশ্নই ছিলনা! তোমরা যাকে চেয়েছিলে তাকে এনে দিয়েছি; এ সংসারে সুখের দরজা তাতেও কি খোলেনি, ব'ল্তে চাও ?'

কথা না ব'লে এবারে চোখ ফিরিয়ে নিল দিদি।

ব'ল্লাম, 'গিয়ে নিয়মিত চিঠি দিও। মার অবস্থাটা তো নিজের চোখেই দেখে গেলে, খবরাখবর ঠিকই পাবে, দরকার মতো আবার চলে এসো।'

এবারে ছোট্ট ক'রে দিদি শুধু ব'ল্লো,—'আসবো।'

সদর-দরজায় ঘোড়ার গাড়ী অপেক্ষা করছিল। আর দ্বিরুক্তি না ক'রে গাড়িতে গিয়েই উঠে ব'স্লো দিদি। তনুশ্রী একবার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। সাদরে তার চিবুক স্পর্শ ক'রে দিদি একবার ব'ল্লো, 'মাকে তোমার হাতেই রেখে গেলাম, দেখো।'

তারপর গাড়ী ছেড়ে দিল। [ক্রমশঃ]

BENGAL JUTE MILL

COMPANY LIMITED

8, Dalhousie Square East,
CALCUTTA.

Manufacturers of all Qualities of

JUTE GOODS

FASHIONABLE JUTE CARPETS
For All Purposes and at Economical Rates

Available in Various Shades and Designs

JACQUARDS, DOBBIES, FLOOR RUNNERS,
CHAIR CLOTHS & SCHOOL MATTINGS.
ALSO JUTE WEBBINGS

Twines, Spool and Cops Our Specialities

WANTED AGENTS FOR UNREPRESENTED AREAS

TELEGRAMS & CABLES
CALCUTTA-(INDIA).
"HEMPBALER"

TELEPHONES :
MILLS : HOWRAH-13
OFFICE **22-6853-58**

প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্র

শ্রীপ্রভাংশু গুপ্ত

দ্বিতীয় পর্ব

—রঙ্গালয়—

আত্রেয় ও তাঁর সঙ্গী আরো দু' চারজন ভরতকে জিজ্ঞেস ক'রলেন—নাটক মঞ্চস্থের পূর্বে রঙ্গালয়ে পুজো দেবার ব্যবস্থার কথা তো শুনলাম, কিন্তু এই পুজো কি রকমভাবে দিতে হবে, একটু খুলে বলুন।

বললেন ভরত তখন মৃদু হেসে—আগে শোনো! নাট্যশালা কিভাবে নির্মাণ করতে হবে এবং ঐ সময়ে কিভাবে পুজো দিতে হবে। দেবতাদের অট্টালিকা বল, আর উদ্যানই বল, তাঁদের ইচ্ছানুসারে ওগুলোর হয় সৃষ্টি, কিন্তু মানুষের বেলায় এ-কথা মোটেই খাটে না। মানুষকে এর জন্য চেষ্টা তো করতেই হবে, তা ছাড়াও বড় কথা, মানুষকে এ বিষয়ে শাস্ত্রের বিধি-নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে নিতে হবে। খেয়াল ও খুশীমত নাট্যশালা তৈরী করা চলে না,—শাস্ত্রের নিষেধ। এখন মন দিয়ে শোনো!

(ত্রিবিধ রঙ্গালয়)

ভরত ব'লে চললেন—স্বর্গের স্থপতি, বিশ্বকর্মা তিন প্রকার রঙ্গালয়ের কথা ব'লেছেন। প্রথম—আয়তক্ষেত্র, দ্বিতীয় চতুষ্কোন, তৃতীয় ত্রিকোন আকারের—এই তিন রকম ধরণের রঙ্গালয়। মানে, রঙ্গালয়ের-কাটামো ঐ তিন রকমের। তাও আবার বড়, মাঝারি ও ছোট। বড় নাট্যশালা দেবতাদের, মাঝারি রাজরাজড়ার ও ছোট নাট্যশালা সাধারণ মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট,—বিশ্বকর্মা তাই-ই বলেছেন। আবার নাট্যশালা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে কত হবে, তাও পরিস্কার বলা হয়েছে। কিন্তু আমি তা বলবার আগে পরিমাপের মানদণ্ড সম্বন্ধে কিছু বলবো, কারণ তা না হলে তোমাদের বোঝবার অসুবিধে হবে।

আত্রেয় সাগ্রহে ব'ললেন—বলুন।

ব'ললেন ভরত—পরিমাপের মানদণ্ডগুলো হ'ল এই—অণু, রজ, বল, লিক্ষা, যুকা, যব, অঙ্গুল, হস্ত ও দণ্ড।

মন দিয়ে শোন, ব'ললেন ভরত—৪ অণুতে ১ রজ, ৪ রজে ১ বল, ৪ বলে ১ লিক্ষা, ৪ লিক্ষায় ১ যুকা, ৪ যুকায় ১ যব, ৪ যবে ১ অঙ্গুল, ২৪ অঙ্গুলে ১ হস্ত ও ৪ হস্তে ১ দণ্ড।

মানুষের জন্য রঙ্গালয়ের হবে হবে আয়তক্ষেত্র শ্রেণীর —লম্বায় হবে ১৬ দণ্ড এবং চওড়ায় হবে ৮ দণ্ড। তোমরা ব'লতে পার এর চেয়ে বড় রঙ্গালয় নির্মাণে বাধা কি! তাহ'লে শোনো' খুব বড় রঙ্গালয়ে অসুবিধা এই যে মঞ্চ থেকে যে-সব দর্শক দূরে ব'সে থাকবে, তারা অভিনেতার কণ্ঠস্বর, মানে আবৃত্তি, কথাবার্তা স্পষ্ট শুনতে পাবেন না। সঙ্গীত লহরীর মাধুর্যও উপভোগ করতে পারবেন না। তাছাড়া অভিনেতার ভাবের অভিব্যক্তি তাঁরা স্পষ্ট দেখতে পাবেন না। অথচ ভাবের অভিব্যক্তি অভিনয়ের মেরুদণ্ড। কারণ নাটকীয় চরিত্রের মনোভাব অর্থাৎ

মানসিক ঘাত-সংঘাত এই অভিব্যক্তি মারফৎই প্রকাশ পেয়ে থাকে,—বুঝলে? কাজেই নির্মকর্মার চেয়ে বড় রঙ্গালয়ের চেয়ে মাঝারি রকমের রঙ্গালয়ই ভালো—এ ধরণের রঙ্গালয়ে আবৃত্তিই বল, গানই বল, সব কিছুই দর্শকরা সহজেই শুনতে পাবেন, তাদের অভিব্যক্তিও স্পষ্ট দেখতে পাবেন।

এইবার রঙ্গালয়ের সৌধ নির্মাণের কথা ব'লচি। প্রথমে জমি নির্বাচন,—জমি হবে বেশ শক্ত মাটির,—মাটির রং হয় কালো বা সাদা ধরণের। জমি নির্বাচনের কাজ শেষ হ'লে ঐ জমি পরিস্কার ক'রে ফেলতে হবে। একবার লাঙল চালিয়ে জমিটা পরিস্কার করতে হবে, তারপর আগাছা, ঝাড়-পোড় ও অপবিত্র জিনিষ সরিয়ে ফেলে দিতে হবে। এ কাজ শেষ হ'লে তখন মাপতে হবে জমি অর্থাৎ রঙ্গালয়-সৌধ কতটা জমির ওপর উঠবে, তার সঠিক পরিমাপ নিতে হবে।

আত্রেয় জিজ্ঞেস করলেন—কি দিয়ে জমি মাপতে

ব'লসেন ভরত একটু হেসে—ব্যস্ত হয়ো না,—বলচি, দড়ি দিয়ে—তুলো, পশম, ঘাস বা গাছের ছাল দিয়ে তৈরি দড়ি দিয়ে জমি মাপতে হবে। দড়ি যেন বেশ মজবুত হয়,—অপলক্ষণ হ'লে সমূহ বিপদ।

অবাক হ'য়ে আত্রেয় ও তাঁর সঙ্গীরা ব'লে উঠলেন, —কেন?

ভরত ব'লসেন—শাস্ত্র মতে যদি ঐ দড়ি ছিঁড়ে দু'টুকরো হয়ে যায়, তাহ'লে প্রস্তাবিত রঙ্গালয়ের প্রধান কর্তা বা মালিকের মৃত্যু হবে নিশ্চিত। যদি ঐ দড়ি তিন টুকরো হ'য়ে যায়, তাহ'লে ঐ অঞ্চলে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে। আর যদি চার টুকরো হ'য়ে যায়, তাহ'লে মৃত্যু হবে নাট্যাচার্যের। জমির মাপ-জোপ করবার সময় দড়ি যদি হাত থেকে ফস্কে প'ড়ে যায়, তা হ'লেও অন্য কোনো রকম ক্ষতি হবে। কাজেই দড়িও বেশ সাবধানীভাবে হাতে ধ'রে জমি মাপতে হবে।

জমি মাপের পূর্বে পুনিমা তিথির কোনো শুভক্ষণে ঘোষণা ক'রতে হবে ব্রাহ্মণদের দানে তুষ্ট করা হয়েছে। তারপর ঐ দড়ির ওপর শান্তি জল ছিটিয়ে দড়ি শুদ্ধ ক'রে নিয়ে জমি মাপের কাজ আরম্ভ করতে হবে।

ভরত একটু থেমে ব'লসেন—দৈর্ঘ্যে ৬৪ হস্ত পরিমিত ভূমি মেপে নিয়ে ঐ ভূমিকে আড়ে লম্বায় দুটি সমানভাগে ভাগ করে নিতে হবে। মনে কর ভূমি জমি মাপচো। সমানভাগে অর্ধেক ভাগ করে আবার সেই জমি সমান ভাগে ভাগ করে নিতে হবে। তোমার পেছনের যে ভূমিখণ্ড থাকবে, তার ওপর নির্মাণ করতে হবে রঙ্গশীর্ষ, মানে মূল নাট্যমঞ্চ। তার পেছনের অর্থাৎ সবচেয়ে পেছনের ভূমিখণ্ডে নেপথ্য বা সাজ-সজ্জার ঘর নির্মাণ করতে হবে।

(ভিত্তি স্থাপন)

এইবার রঙ্গালয়ের ভিত্তি স্থাপনের পালা। ভিত্তি স্থাপনের সময় যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র, যথা—শঙ্খ, দুন্দুভি (ঢাক) প্রভৃতির শুভধ্বনির ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। ঐ শুভ অনুষ্ঠানের সময় ধর্মভ্রষ্ট ব্যক্তি, অঙ্গহানি ব্যক্তি ও সংসারত্যাগী বিবাগী ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে তাদের ঐ স্থান থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

ভরত ব'লে চ'লসেন—ভিত্তি স্থাপনের পর ঐ রাত্রেই ঐ ভূমিখণ্ডের দশদিকে পুজোর নৈবেদ্য ও দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

আত্রেয় জিজ্ঞেস করলেন—দশদিকে কেন?

ব'লসেন ভরত—পূর্বেই ব'লেছি পিতামহের আদেশ অনুসারে রঙ্গালয়ের দশদিকে দেবতারা সতর্ক হয়ে পাহারা দেন,—কাজেই ঐ দেবতাদের প্রীত করবার জন্য তাঁদেরই উদ্দেশ্যে এই পুজো, নৈবেদ্য ও দানের ব্যবস্থা। নৈবেদ্যতে থাকবে পুষ্প, সুগন্ধি, ফল ও অন্যান্য সাত্ত্বিক শ্রেণীর খাদ্যদ্রব্য। ভূমিখণ্ডের মূল চার দিকে,—অর্থাৎ পূব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর কোণে নৈবেদ্য হিসেবে যে খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হবে, সেই খাদ্যদ্রব্যের রং এই রকম হওয়া চাই,—পূর্বে শ্বেতবর্ণের খাদ্যদ্রব্য, পশ্চিমে নীলবর্ণের খাদ্যদ্রব্য, দক্ষিণে হলুদবর্ণের ও উত্তরে রক্তবর্ণের খাদ্যদ্রব্য। এই সব

নৈবেদ্য দেবার পূর্বে দশ দিকেই দেবতাদের উদ্দেশে পূত-পবিত্র পূজা-মন্ত্র উচ্চারণ করতে হবে।

আত্রেয় ও সমবেত মুনিদের ভরত জিজ্ঞেস ক'রলেন—তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না তো?

আত্রেয় ব'ললেন—বিন্দুমাত্র নয়। পদ্মের মতোই আপনার বিবৃতি চিত্তাকর্ষক।

তারপর ভরত ব'ললেন—ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানের সময় ব্রাহ্মণদের দিতে হবে ঘৃত ও সুপাচ্য পায়স, ভূমিষ্ঠ মধুপর্ক দিতে হবে নৃপতিকে ও নাট্যাচার্যকে দিতে হবে গুড় সহ অন্ন।

ভিত্তি স্থাপনের পক্ষে সবচেয়ে শুভ সময় মূলানক্ষত্রের দিনে। ভিত্তি স্থাপনের পর চারদিকের দেওয়াল নির্মাণ করতে হবে। দেওয়াল নির্মাণের কাজ শেষ হ'লে রঙ্গালয়ের ক্ষেত্রের স্তম্ভগুলি নির্মাণ করতে হবে। এই স্তম্ভ নির্মাণের কাজ রোহিণী অথবা শ্রবণা নক্ষত্রের দিনে করাই যুক্তিসঙ্গত।

(স্তম্ভ নির্মাণ)

রঙ্গালয়ে ব্রাহ্মণদের নির্দিষ্ট আসনের সীমারেখায় বিপ্রস্তম্ভ নির্মাণের সময় যে অনুষ্ঠানের বিধি-ব্যবস্থা আছে, তাতে সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণের জিনিষ ব্যবহার করতে হবে,—তার পূর্বে এই দ্রব্যগুলি ঘৃত ও সরিষা দ্বারা শোধন ক'রে নিতে হবে। এবং এই অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদের বিতরণ করতে হবে সুপাচ্য পায়স। বিপ্রস্তম্ভের রং হবে ধবধবে শাদা। ক্ষত্রিয়দের নির্দিষ্ট আসনের সীমারেখায় ক্ষত্রিয় স্তম্ভ নির্মাণের সময় যে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে, তাতে রক্তবর্ণের দ্রব্য ব্যবহার করতে হবে—বস্ত্র, মালা ও চন্দন—সবই রক্তবর্ণের হওয়া চাই। ক্ষত্রিয় স্তম্ভের রং লাল। অনুষ্ঠানের সময় গুড় সহ অন্ন বিতরণ করতে হবে ব্রাহ্মণদের।

বৈশ্যদের আসনের নির্দিষ্ট সীমারেখায় স্তম্ভ নির্মাণ করতে হবে উত্তর পশ্চিম কোণে। অনুষ্ঠান সংশ্লিষ্ট দ্রব্যগুলির বর্ণ হবে হলুদ। ঐ সময় ঘৃত সহ অন্ন বিতরণ করতে হবে ব্রাহ্মণদের। বৈশ্য স্তম্ভের রং হবে হলুদ। শূদ্রদের নির্দিষ্ট আসনের সীমারেখায় স্তম্ভ নির্মাণ করতে হবে উত্তর-পূর্ব দিকে। অনুষ্ঠানের দ্রব্যাদির রং হওয়া চাই নীল। ঐ সময় খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করতে হবে ব্রাহ্মণদের।

বিপ্র স্তম্ভ নির্মাণ হ'লে ঐ স্তম্ভের পাদদেশে নিক্ষেপ করতে হবে মালা, চন্দন ও স্বর্ণ। ক্ষত্রিয় স্তম্ভ নির্মাণ হ'লে ঐ স্তম্ভের পাদদেশে নিক্ষেপ করতে হবে মালা, চন্দন ও তাম্র। বৈশ্য স্তম্ভ নির্মাণ হলে ঐ স্তম্ভের পাদদেশে নিক্ষেপ করতে হবে মালা, চন্দন ও রৌপ্য। শূদ্র স্তম্ভ নির্মাণ হ'লে ঐ স্তম্ভের পাদদেশে নিক্ষেপ করতে হবে মালা, চন্দন ও লৌহ।

নির্মাণ শেষে স্তম্ভগুলি নির্দিষ্ট স্থানে রাখবার পূর্বে ঐ স্তম্ভগুলি আম্র পল্লবের মালা দ্বারা ভূষিত ক'রে স্বস্তিবচন উচ্চারণ করতে হবে—'আজকের দিন শুভ হোক।'

এর পর গাভী, বস্ত্র ও স্বর্ণ উপহার দিয়ে ব্রাহ্মণদের পরিতুষ্ট ক'রে স্তম্ভগুলি যথাযথ স্থানে স্থাপন করতে হবে। এমনভাবে স্তম্ভগুলি রাখতে হবে,—যেন একটুও সেগুলি নড়ে বা ঘুরে না যায়। কারণ স্তম্ভ যথাযথ স্থানে রক্ষিত হবার পর যদি নড়ে যায়, তাহ'লে অনাবৃষ্টির আশঙ্কা থাকবে, যদি স্তম্ভ ঘুরে যায়, তাহ'লে মৃত্যু-ভয় উপস্থিত হবে, যদি স্তম্ভ হেলতে থাকে, তাহ'লে শত্রু-রাজ্য থেকে বিপদের আশঙ্কা উপস্থিত হবে।

বিপ্র স্তম্ভ স্থাপিত হবার পর শিল্পী বা নির্মাতাদের দক্ষিণা হিসাবে একটি গাভী দিতে হবে। অন্যান্য স্তম্ভ স্থাপিত হবার পর শিল্পী বা নির্মাতাদের গুড় পরিপূর্ণ ভোজনের ব্যবস্থা করতে হবে। মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা খাদ্যদ্রব্য শুদ্ধ ক'রে নাট্যাচার্য এই খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন ক'রবেন। পরিশেষে নাট্যাচার্য দুগ্ধ, তিল ও অন্ন মিশ্রিত খাদ্য লবণ সহ গ্রহণ ক'রবেন।

এই সব বিধি-ব্যবস্থা পালনের পর ও সর্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ধ্বনির পর মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে স্তম্ভ স্থাপন অনুষ্ঠানের যবনিকাপাত করতে হবে। মন্ত্রে ব'লতে হবে—'মেরু পর্বত যেরূপ নীরব ও নিশ্চল, হিমালয় যেরূপ সুদৃঢ়, তোমরাও অনুরূপ নিশ্চল ও সুদৃঢ় হও—এবং আমাদের নৃপতির বিজয় গৌরবের প্রতীক স্বরূপ অবস্থান কর।'

ভরত ব'ললেন—এইভাবে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা শাস্ত্র-নির্দিষ্ট বিধি অনুযায়ী রঙ্গালয়ের স্তম্ভ, দ্বার, পার্শ্ব ও সাজ-সজ্জাগৃহ নির্মাণ ক'রবেন।

(দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত)

(পূর্বানুবৃত্তি)

৯

মুন্সী কালীকাপ্রসাদ কিছুদিন হইতেই বড় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। চিন্তার কোন কারণ নাই—একথা যতই তিনি মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন, মন ততই বেশী করিয়া চিন্তা করে। আজ কয়েক দিন হইল তিনি সে চেষ্টাই ছাড়িয়া দিয়াছেন।

চিন্তার কারণটা প্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ সত্যকে এড়াইয়া যাওয়ার উপায় কি?

কালীকাপ্রসাদ গ্রীনওয়ে সাহেবের মুন্সী। পদটা এমন কিছু গৌরবের নয়,—মূল্যবানও নহই। তবুও, সাধারণ লোক ঠিক মুন্সী শব্দটার সমাক্ অর্থ অবগত না থাকায় এবং একটি ছোক্‌রা চোক্‌রা সাহেবের সহিত পদাধিকারটি জড়াইয়া থাকায়, প্রায় সকলেই কালীকা-প্রসাদকে সম্ভ্রমের চোখে দেখিত। বাজারে তিনি ধার পাইতেন প্রচুর, এবং মহাজনরা তাগাদা করিতে সাহস পাইত না। যেখানে তিনি যাইতেন সেখানেই সকলে তাঁহাকে সম্মানের আসনটি ছাড়িয়া দিত। এই পদাধিকার বলেই তিনি এই বয়সে রামশঙ্করের সর্বাঙ্গ-সুন্দরী দশমী কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিয়াছেন। তিনটি স্ত্রী বিদ্যমানে এমন সুন্দরী কন্যা তাঁহাকে কে দিত?

কিন্তু এখন সেই সম্পদই দায় হইয়া দাঁড়াইল যে! কেহ মুখে কিছু বলে না—কিন্তু তাহাদের চোখে চোখে চাপা সেই অবজ্ঞার আভাস পান। হয়ত বা কিছু বিদ্রূপও। গুজব প্রায়ই কানে আসে। কিন্তু খোদ সাহেব সে কথা আলোচনা করেন না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করারও সাহস নাই কালীকাপ্রসাদের। পদের লোকের সহিত কিছু এসব কথা আলোচনা করা যায় না। সাধারণ মানুষের মত যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে সঙ্কোচ বাধে। বিশেষত লোকে তাঁহার নিকট হইতেই আসল খবরটা আশা করে। হাজার হোক সাহেবের মুন্সী।

সুতরাং চিন্তিত না হইয়া উপায় কি?

কয়েকদিন ধরিয়া ভিতরে ভিতরে ছটফট করিলেন ভদ্রলোক। তাহার পর আর ধৈর্য ধরিতে না পারিয়া একদিন ভোরবেলাই রওনা হইয়া গেলেন বন্ধু কানুহাইয়া লালের বাড়ী। কানুহাইয়ালাল বহুদিনের বন্ধু—তাহার কাছে অত লজ্জা-সরম করার প্রয়োজন হইবে না।

কালীকাপ্রসাদ যখন রওনা হইলেন তখনও ভাল করিয়া ফরসা হয় নাই। পথে বিশেষ লোকজনও চলিতেছে না। সারারাত দুশ্চিন্তায় ঘুম হয় নাই বলিয়া একটু বেলা সকালেই উঠিয়া পড়িয়াছেন, তখনও পর্যন্ত রাস্তায় একা চলিতে শুরু করে নাই। কিন্তু কালীকাপ্রসাদ সেজন্য পিছ্‌পা হইলেন না—প্রয়োজন হইলে সারা পথটাই হাঁটিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া জোরে জোরে পা চালাইলেন।

অবশ্য বেশী দূর যাইতে হইল না। নবাবগঞ্জের প্রান্তে

পীর সাহেবের আস্তানা, তাহার ধারেই একটা এক্কার আড্ডা। দূর হইতে দেখা গেল—ভোর ভোরেই একখানা এক্কা প্রস্তুত হইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া আছে। এতটা পথ হাঁটিবার সঙ্কল্প করা আর হাঁটা এক কথা নয়। এক্কা দেখিয়াই কালুকাপ্রসাদের গতি মন্থর হইয়া আসিল।

এক্কাওয়ালা আলিজান মিয়া পরিচিত লোক। সে এই অঞ্চলে আজ ত্রিশবছর এক্কা চালাইতেছে, এখানকার সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদের সকলকেই চেনে। দূর হইতে কালুকা-প্রসাদকে দেখিয়া সে-ও এক্কা লইয়া আগাইয়া আসিল, 'আলায়কম্ সেলাম মুন্সিজী, কঁহি চল্‌না হ্যায়, কেয়া?'

কালুকাপ্রসাদও জবাবে 'সেলাম আলায়কম্' জানাইয়া একেবারে এক্কায় চড়িয়া বসিলেন এবং কাল্‌হাইয়ালালের বাড়ীতে লইয়া যাইবার নির্দেশ দিয়া পুনশ্চ গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন।

কিন্তু আলিজান তাঁহাকে বেশীক্ষণ চিন্তা করিতে দিল না। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে গাড়ী চালাইবার পর মৃদু কাশিয়া গলাটা সাফ করিয়া লইয়া ডাকিল, 'মুন্সিজী।'

কালুকাপ্রসাদ যেন ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন। সারারাত্ত বিনিদ্র কাটাইবার পর হয়ত বা ভোরাই হাওয়াতে, চিন্তার ভিতরেই, একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। তিনি চমকিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'কী? কি হয়েছে?'

'না, কিছু হয়নি। একটা কথা জিজ্ঞাসা করব যদি ওস্তাকি না হয়েন।'

'কী কথা?'

মুখে প্রশ্ন করিলেও কথাটা অনুমান করিতে দেরী হইল না কালুকাপ্রসাদের। এই ত—এখানেই ত একটা উপায় হইয়া গেল।

আলিজান আরও একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, 'কী সব গুজব শুনছি মুন্সিজী—এসব কি সত্যি?'

'গুজবটা কি শুনেছ আগে তাই বলো—তবে ত বুঝব!' তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই যেন কথাটা বলেন কালুকা-প্রসাদ।

আলিজান মিয়া উৎসাহিত হইয়া বলিল, 'শুনছি নাকি আংরেজদের শাহী আর থাকবে না? সিপাইরা নাকি খুব গরম হয়েছে? শুনেছি যে বিলায়েৎ থেকে ওখানকার বাদশা-বেগমের হুকুম এসেছে লোকের সবাইকে কেরেস্তান করতে হবে। সেই হুকুম-মোতাবেক এখানে শোক আর শুয়োরের চর্বি খাইয়ে নাকি রাতারাতি হিন্দু মুসলমান সবাইকার জাত মারবার চেষ্টা হয়েছিল—একটুর জন্যে নাকি সব বেঁচে গেছে। তাইতে সব সিপাহী খাপ্পা হয়ে উঠেছে—আংরেজ-শাহী ঘুচিয়ে দিয়ে মুঘল বাদশার হাতে আবার বাদশাহী ফিরিয়ে দেবে? এসব কি সত্যি?'

কালুকাপ্রসাদ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'গুজবটা যারা ছড়িয়েছে তাদের মাথা আছে—মানতেই হবে। ওহে বাপু—দেশের বাদশাহীটা কি এই সব সিপাহীরা হাতে ক'রে তুলে দিয়েছিল আংরেজদের হাতে—যে এখন ইচ্ছে করলেই ফিরিয়ে দেবে? আংরেজেরা নিজেদের ইচ্ছতে কেড়ে নিয়েছে। একটা আংরেজ একশ'টা সিপাহীর মাথা নিতে পারে—তা কি জান না? সিপাইরা লড়বে আংরেজদের সঙ্গে? পাগল আর কি?'

একটা পরিপূর্ণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া আলিজান বলিল, 'বাঁচলাম বাবুজী। খবরটা শুনে পর্যন্ত আমার ভাবনায় ঘুম হচ্ছিল না। সত্যি কথা বলতে কি—আংরেজদের হাতে শাহী পড়ে তবে একটু শান্তির মুখ দেখেছি। আবার কী হবে—কার হাতে মুলুক যাবে—এই সব ভেবে যতই অশান্তি হচ্ছিল। আমার ত বয়স কম হ'ল না বাবুজী, চার কুড়ী হতে চলল—অনেক দেখলাম। আমি ত বেরিলীর লোক—রোহিলা-নবাবদের রাজত্বে বাস করেছি। বলতে গেলে কানপুর শহরে পালিয়ে এসেছিলুম। জোর যার মুলুক তার—এ সবাই জানে। কিন্তু একজন ভরসাস্থল বাদশার শাসনে থাকা ঢের সুবিধে, নিশ্চিন্ত হয়ে থাকা যায়। তাই না বাবুজী?'

কালুকাপ্রসাদ সত্যই মনে মনে খানিকটা বল পাইয়া-

ছিলেন। হোক না সামান্য এজাওয়ালা, ইহারাই ত দেশের সাধারণ লোক। ইহার মনোভাব নিশ্চয়ই আরও অনেকের মনোভাব।

তিনি কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া কহিলেন, 'নিশ্চয়ই। একশ বার।'

আরও খানিকটা নিঃশব্দে এঞ্জা চালাইবার পর আলিজান কহিল, 'আচ্ছা, ও কেরেস্তান করবার খবরটা তাহ'লে বিলকুল ঝুট—কী বলেন?'

'বিলকুল!'

উৎসাহিত হইয়া আলিজান বলিল, 'তাই ত আমিও বলি মুন্সিজী, এত বড় জাত, এত এলেমদার লোক ওরা—ওরা কি এমন ঘুশমনী করতে পারে রাজতদের সঙ্গে? তাহ'লে আমরা ওদের এত বড় করবেন কেন?···আসল কথাটা কি জানেন, ঐ কেরেস্তান করবার খবরটা শুনেই একটু নমে গিয়েছিলুম।'

কালকাপ্রসাদ বেশ জোর দিয়াই কহিলেন, 'ওসব কতকগুলো মতলব-বাজের কাণ্ড, বুঝলে না? ওসব গুজবে কান দিও না।'

কানহাইয়ালাল দীক্ষিত ও কিছু চিন্তিত মুখেই বসিয়াছিলেন। এমন কি গুড়গুড়িতে যে তামাকটা পুড়িয়া যাইতেছে সেদিকেও তাঁহার খেয়াল ছিল না। এখন অকস্মাৎ কালকাপ্রসাদকে দেখিয়া যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইলেন।

'আরে এসো এসো কালকাপ্রসাদ—ঠিক তোমার কথাই ভাবছিলুম।'

'কেন, বলো ত—ব্যাপার কি?' কালকাপ্রসাদ যতটা সম্ভব হালকা ভাবে কথা বলার চেষ্টা করেন।

কানহাইয়ালাল তাঁহার বাড়ীর বাহিরে একটা নিম-গাছতলায় চারপাই পাতিয়া বসিয়াছিলেন। কালকা প্রসাদের প্রশ্নের উত্তরে তখনই কোন জবাব দিলেন না—গুড়গুড়ির নলটা কালকাপ্রসাদের দিকে বাড়াইয়া দিয়া উঠিয়া গেলেন এবং বাড়ীর ভিতর যাইবার দরজাটা বেশ করিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া স্থানে বসিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'এসব কী শুনছি বলো ত কালকাপ্রসাদ—আমি ত মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কালকাপ্রসাদ বলিলেন—'কী শুনছ তাই আগে শুনি।'

'শুনেছ নিশ্চয় তুমিও—আর তাই এত তোরবেলা ছুটে এসেছ।' কানহাইয়ালাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বন্ধুর মুখের দিকে তাকান।

কালকাপ্রসাদ তবু জানেন না। বলেন, 'তবু তুমি ঠিক কি শুনেছ আগে তাই বলো না।'

কানহাইয়ালাল গলা আরো খাটো করেন। বলেন, 'গুজব ত নানা রকম। তবে এটা ঠিক যে একটা বড় গোছের গোলমাল বাধবে। বাংলা মুলুকে যে সব হিন্দুস্তানী সিপাই আছে তারা ত ক্ষেপেই উঠেছে—আবার তারাই চেষ্টা করছে এ মুলুকের সিপাইদের ক্ষেপাতে। কী সব নাকি চাপাটি পাঠানো চলছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে—সারা মুলুকই নাকি ক্ষেপে উঠবে। আংরেজ রাজত্ব নাকি আর থাকবে না।···তুমি কী শুনেছ বলো ত?'

কালকাপ্রসাদও গলা নামাইলেন, 'তুমি যা শুনেছ তা সবই আমি শুনেছি। বাংলা মুলুকে গোলমাল ত রীতিমত লেগেই উঠেছে। বিলাতের মহারাণী সাহেবা নাকি হুকুম দিয়েছেন যে, এ মুলুকের সবাইকে ক্রেস্তান করতে হবে। তা করতে গেলে আগে সিপাইদের হাত করা দরকার। শুধু আংরেজ ফৌজের আর জোর কত? সিপাহীদের যদি ক্রেস্তান করা যায় ত তারাই তখন সাহেবদের দিক টানবে—তারা চাইবে যে তাদের যখন জাত গেছে তখন সকলেরই জাত চলে যাক। আর সেই মতলবেই নাকি নতুন এক টোটা আনিয়েছে, তাতে গোরু আর শুয়োর—দুই জানোয়ারেরই চর্বি আছে। দাঁতে কেটে বন্দুকে পুরতে হবে, আপনিই জাত চলে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। এ ছাড়া নাকি আটার সঙ্গে গোরুর হাড়ের গুঁড়ো মিশিয়ে দিচ্ছে—যাতে রুটি খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাত চলে যায়।'

কানুহাইয়ালাল কিছুকাল নির্বাক থাকিয়া কহিল, 'এসব তুমি বিশ্বাস করো ?'

'আমি ত তাই করি না। কিন্তু—'

'কিন্তু কি ?'

'অনেকেই ত করে দেখছি।···বাজারে আটার দর আগুন হয়ে উঠেছে, তবু সিপাইরা বাইরে থেকে আটা কিনছে, ব্যারাকে যে সব আটা দেওয়া হচ্ছে তা খাচ্ছে না। গুজব বেশ ভাল করেই ছড়িয়েছে। এখন আমাদের কর্তব্য কি ?'

কানুহাইয়ালাল বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। গুড়গুড়ির মাথার আগুন অনেকক্ষণ নিভিয়া গিয়াছে। তবু অন্যমনস্কভাবে তাহাতেই গুটি দুই টান দিবার চেষ্টা করিলেন। তারপর বলিলেন, 'আমো কাল্‌কাপ্রসাদ—আমিও এই কথাটাই কদিন ধরে ভাবছি। একটা গোলমাল বাধাবার চেষ্টা চলছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাধাচ্ছে কারা ? এ গুজব সিপাহীদের মধ্যে কেউ বেশ ভাল ভাবেই ছড়াচ্ছে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়—রোজ রোজ নতুন নতুন। কিন্তু কেন ? কার এতে স্বার্থ ? এদেশী রাজারা আর নবাবরা ? তাদের স্বার্থ আছে স্বীকার করি—তারা হয়ত আবার স্বাধীন রাজা হবার স্বপ্ন দেখছে তাও ঠিক—কিন্তু তারা এত মিলেমিশে কাজ করতে পারবে বলে ত বিশ্বাস হয় না। তাই ভাবছি কাল্‌কাপ্রসাদ—এর পেছনে কারা আছে আর তাদের শক্তি কত। শত্রুকে দেখতে পেলে ভয় কমে যায়—অদৃশ্য শত্রুই বেশী ভয়ঙ্কর।'

কাল্‌কাপ্রসাদও খানিক গুম্ খাইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর প্রশ্ন করিলেন, 'আচ্ছা, সিপাইরা কি সত্যিই আংরেজদের বিরুদ্ধে যেতে সাহস করবে শেষ পর্যন্ত—তুমি কি মনে করো ?'

কানুহাইয়ালাল কহিলেন, 'যেতে পারে। কারণ কি জানো—সাহস দুঃসাহসের কথা নয়। পেটের কথা। একটা গোলমাল বাধা মানেই লুঠতরাজের সুযোগ। এর আগে ওরা মাইনে পেত না—মুঘল বাদশাহের আমলে ত দু'বছর তিন বছর করে মাইনে বাকী পড়ে থাকত কিন্তু তখন মাইনের অত তোয়াক্কা করত আংরেজ আমলে জবরদস্তিটা বন্ধ করতে হয়েছে যে। তাতে ভারি মুস্‌কিল।'

'কিন্তু ভবিষ্যৎ ?'

ভবিষ্যৎ অত ভাববার মত যদি মাথা থাকত কাল্‌কাপ্রসাদ ত তারা ফৌজে যাবে কেন ?—তোমার মত মুন্সীগিরি করত।'

'আচ্ছা, এ ক্রেস্তান করার কথাটা তুমি কি বিশ্বাস করো ?'

'না করিনা। এ বিলকুল ঝুটা। আংরেজরা অত বোকা নয়। আর তাদের তাতে লাভই বা কি ? আলমগীর বাদশা পর্যন্ত যা করতে পারেননি—ভাল করে বাদশা বনবার আগেই তারা তা করতে সাহস করবে—এ ত মনে হয় না।'

আবার কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ।

কাল্‌কাপ্রসাদ খানিক পরে উঠিয়া কানুহাইয়ালালের চারপাইতেই আসিয়া বসিলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের মত ফিস ফিস করিয়া কহিলেন—'এখন তোমার আমার কর্তব্য কি ?'

কানুহাইয়ালাল উত্তর দিলেন, 'সেই কথাই ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম। তুমি ত সাহেবের সঙ্গে বাস করো—কী রকম বুঝছ বলো দিকি ?'

'কিছুই বুঝছি না। তা নইলে আর এই সাত সকালে প্রাণের দায়ে ছুটে আসব কেন ?···কোন কথাই তোলে না। তবে মনটা যে খুব ভাল নেই তা মুখ দেখেই বুঝতে পারি। চিন্তিত একটু—কিন্তু সে ঐ পর্যন্তই।'

কানুহাইয়ালাল নিঃসঙ্গে কিছুক্ষণ ভাবিয়া লইয়া বলিলেন, 'তাহ'লে আমাদের এখন কিছুদিন চুপচাপ থাকাই ভাল, বুঝলে ? ব্যাপারটা কোনদিকে গড়ায় দেখা যাক। সিপাইরা যদি সত্যিই ক্ষ্যাপে—তা হ'লেও যে শেষ পর্যন্ত কোন সুবিধে করতে পারবে তা মনে হয় না। ইংরেজ জাত বড় শক্ত জাত—বুঝলে কালকাপ্রসাদ।

ওদের এখনও পুরো চেনেনি এরা। এরা মার খেয়ে হাল ছাড়তে শেখেনি—এইটে বড় কথা। না, আরো কিছুকাল যাক।'

'কিন্তু' কালীপ্রসাদ কহিলেন, 'আমাদের অবস্থাটা যে সাংঘাতিক। আমরা যে আগেই বিষদৃষ্টিতে পড়ব। ধনপ্রাণ নিয়ে যে টানাটানি—'

'পয়সাকড়ি এইবেলা সরাও। মেয়েদের না হয় কোন ছলছুতোয় দেহাতে পাঠিয়ে দাও। তারপর বেগতিক দেখলে নিজেরাও গা-ঢাকা দেবে। এ ছাড়া ত আর কোন উপায় দেখছি না।'

কালীপ্রসাদ কহিলেন, 'না কি—গোপনে গোপনে এদের একটু সাহায্য ক'রে হাতে রাখব? দু দলেই থাকা যাক না?'

'উঁহু' দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়েন কানুহাইয়ালাল, 'দু-নৌকোয় পা দেওয়া ঠিক নয়। ওভাবে তুমি কাউকেই খুশী করতে পারবে না। দুদলই চটে থাকবে। তাছাড়া কথাটা বেশীদিন গোপনও থাকবে না। তখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি—কেউই বিশ্বাস করবে না। না না—কালীপ্রসাদ, ও কাজে যেওনা। দীর্ঘদিন আংরেজের নৌকরী করেছি, নিমক খেয়েছি—আমাদের এখন তোল্ পাল্টাতে যাওয়া ঠিক হবেনা। সিপাইদের আমি বিশ্বাস করিনা, তাদের যারা ক্ষেপাচ্ছে, তাদেরও না। আংরেজের বাদশাহীর সবে শুরু। ভগবান তাদেরও কিছুদিন সময় দেবেন—এই আমার বিশ্বাস।'

'কিন্তু সারা দেশ যদি ক্ষেপে ওঠে?'

'তা সম্ভব নয়। দেশের লোককে তুমিও চেন, আমিও চিনি! আর তা যদি ক্ষেপেও আমরাও তখন ক্ষেপব। নদীতে বান এলে ঘরদোর ভাসাবেই—ইচ্ছে করলেও ত তুমি স্থির থাকতে পারবে না ভাই।'

কালীপ্রসাদ অনেকক্ষণ শুম্ খাইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর কহিলেন 'তোমার কথাগুলোই ঠিক বলে মনে হচ্ছে। সেই জন্যেই ত ভাই তোমার কাছে ছুটে এলুম। হাজার হোক একের বুদ্ধি বুদ্ধিই নয়।.....তাহলে তাই করি, কি বলো? মেয়েদের সব দেহাতে রওনা করিয়ে দিই?'

'হ্যাঁ—কিন্তু সবাইকে একসঙ্গে নয়। আমিও সরাতে শুরু করেছি। স্ত্রীপুত্রকে পাঠিয়েছি তাদের বাপের বাড়ী। ছেলেমেয়েরা যাচ্ছে আজকে আমার বহিনের বাড়ী। এই ভাবে সরাচ্ছি। রটিয়ে দিয়েছি বহিনের ননদের বিয়ে—তাই ওদের পাঠাচ্ছি। নইলে নানারকম গুজব উঠবে।'

'ঠিক। ঠিক। আমিও তাই করব। দেখি বাড়ী গিয়ে মার সঙ্গে পরামর্শ করি।'

কালীপ্রসাদ উঠিয়া পড়িলেন।

কানুহাইয়ালাল কহিলেন, 'চললে নাকি? একটু বসোনা—গরম দুধ খেয়ে যাও একটু।'

'না ভাই আজ থাক। পূজাপাঠ হয়নি এখনও—চলি।'

কানহাইয়ালাল গলির মোড় পর্যন্ত বন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া গেলেন। প্রশ্ন করিলেন, 'একা ডেকে দেব নাকি?'

'না থাক। এখন খানিকটা হাঁটি—দরকার হয় একটা চল্তি এক্কায় উঠে পড়ব।'

বড় রাস্তায় উঠিয়া কালীপ্রসাদ খানিকটা স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। ততক্ষণে শহর কর্মমুখর হইয়া উঠিয়াছে। পথে-ঘাটে পুরাদমে লোক চলাচল শুরু হইয়াছে। খালি এক্কার অভাব নাই। কিন্তু কালীপ্রসাদের সত্য সত্যই গাড়ী চড়িতে ইচ্ছা হইল না। মাথাটা যেন কেমন গোলমাল হইয়া গিয়াছে, কোন কথাই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছেন না। খানিকক্ষণ হন হন করিয়া হাঁটিতে পারিলে বোধ হয় সুস্থ হইতে পারিতেন।

কালীপ্রসাদ প্রথমটা বেশ জোরে জোরেই পা চালাইলেন।...

বেলা প্রথম প্রহর তখনও উত্তীর্ণ হয় নাই কিন্তু প্রখর বসন্তের সূর্য তখনই প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। উষ্ণ বাতাস দুঃসহ না হইলেও সুখসেব্য আর নাই। কাল্‌কাপ্রসাদ ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন। চারিদিকেই অস্বস্তি।

না, এভাবে আর হাঁটা চলিবে না।

তিনি ইঙ্গিতে একখানা এক্কাই ডাকিলেন।

এক্কায় চড়িয়া অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত ভাবে আর একবার শহরের দিকে তাকাইলেন। কর্মব্যস্ত শহরের রাজপথে যে যাহার কর্মে চলিয়াছে। দোকানপাটে স্বাভাবিক বেচাকেনার ভীড় সবই প্রতিদিনকার মত ঠিক চলিতেছে কিন্তু তবু কাল্‌কাপ্রসাদের কেমন যেন মনে হইল—কোথায় একটা কি ভাবী বিপর্যয়েরই চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। সব ঠিক আগেকার মত নাই। শান্ত নগরী যেন ঝড়ের পূর্বের শান্ত সমুদ্রের মত—ঈশাণ কোণে মেঘ দেখা দিলেই তুফান উত্তাল হইয়া উঠিবে। এ স্তব্ধতা সেই তুফানেরই পূর্বাভাস।.....

এ কী তাঁহার অকারণ আতঙ্ক?

তাঁহার ভীত মনেরই প্রতিক্রিয়া?

অথবা এই আপাত-শান্ত জনতার গতিবিধির মধ্যে সত্যই কোন ঝড়ের সঙ্কেত বোঝা যাইতেছে?

কে জানে!

কাল্‌কাপ্রসাদ কাঁধের গামছাখানা টানিয়া ললাটের ঘাম মুছিলেন।

জীবনে বুঝি সুখশান্তি বলিয়া কোন জিনিষ সত্যই নাই। ওটা কবির কল্পনা।

১০

আজিমুল্লা খাঁ সাধারণত একটু অধিক বেলাতেই শয্যাত্যাগ করিতেন। বিলাত যাওয়ার ফলে এই অভ্যাসটি তাঁহার হইয়াছিল—এখানে ফিরিয়াও তাহা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সুতরাং সেদিন যে চাকরের ডাকাডাকিতে অত ভোরে উঠিতে হইল বলিয়া বিরক্ত হইবেন—তাহাতে আর বিচিত্র কি? গায়ের মোটা চাদরখানা সরাইয়া রীতিমত ভ্রূকুঞ্চিত করিয়াই প্রশ্ন করিলেন, 'কী ব্যাপার কী? বাড়ীতে কি ডাকাত পড়েছে নাকি?'

ভৃত্য আলিমদ্দী সে দৃষ্টির সামনে ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল। কিন্তু তাহার যে উভয় সঙ্কট। দরজার বাহিরে যে দৈত্যটা দাঁড়াইয়া আছে সে-ও কিছু অবহেলার নহে। সে মাথাটা চুলকাইয়া উত্তর দিল, 'আজ্ঞে বিঠুর থেকে—'

'বিঠুর থেকে কি? লোক এসেছে? তার জন্যে এই শেষরাত্রে ঘুম ভাঙালি?'

আজিমুল্লার কণ্ঠস্বর আরও উগ্র হইয়া উঠিল।

এই বেয়াদব ও মূর্খ ভৃত্যটাকে আজই তাড়াইতে হইবে। এতদিনে তাহার বুঝা উচিত যে আজিমুল্লা নানাকে এতটা পরোয়া করেন না যে নানা লোক পাঠাইলেই আজিমুল্লাকে ভোরের সুখনিদ্রাটি ত্যাগ করিতে হইবে।

আলিমদ্দী তাড়াতাড়ি বলিল, 'আজ্ঞে নানা নন—হুশেনী বেগম।'

'হুশেনী বেগম? লোক পাঠিয়েছে?'

আজিমুল্লার ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল। কণ্ঠস্বরও অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আসিল।

'হুশেনী বেগম? কী চায় তার লোক?'

'আজ্ঞে খুব নাকি জরুরী খবর। একেবারে দানোর মত একটা লোক পাঠিয়েছে, সে এসেই ঘুষুম করতে শুরু করেছে! এখনই আপনাকে না ডাকলে সে বোধ হয় আমায় তুলে আছাড় দিত।'

'ও, তা আচ্ছা—নিয়ে আয় তাকে।'

খাটিয়া ত্যাগ করিয়া আজিমুল্লা একখানা চেয়ারে আসিয়া বসিলেন।

তিনি একটু বিস্মিত হইলেন।

হুশেনী তাঁহার এই বাসস্থানের খবর পাইল কেমন করিয়া?

কানপুরে আজিমুল্লা খাঁর নির্দিষ্ট কোন বাসা নাই। বাড়ী অবশ্যই একটা আছে—এই বাড়ী—কিন্তু এখানে

তিনি কচিৎ রাত্রিবাস করেন। এক একদিন রাত বেশী হইয়া গেলে বিঠুরেই থাকিয়া যান—সেখানে তাঁহার জন্য একটি ঘর নির্দিষ্ট আছে, খানসামাও একজন আছে। এ ছাড়া শহরের তিন চারটি জায়গায় তাঁহার সম-সংখ্যক রক্ষিতা আছে, তাহাদের বাড়ীতেও পালা করিয়া থাকিতে হয়। পূর্বাহ্নে কাহাকেও খবর দেন না—রাত্রি প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হইলে কোথায় যাইবেন সেটা ঠিক করেন। কেবল যেদিন অখণ্ড বিশ্রামের প্রয়োজন হয়, সেদিনই এখানে আসেন। কারণ এ বাড়ীতে বিশ্রামের ব্যাঘাত করার মত কেহ নাই। তাঁহার বিবি বড়লোকের মেয়ে, সে বেশীর ভাগই তাহার পিত্রালয় জৌনপুরে থাকে। থাকার মধ্যে এক বুড়ী নানী—তিনি আজিমুল্লার গতিবিধির কোন খবরই রাখেন না, বিশেষ কোন কৌতূহলও নাই।

কাল বহরাচে আজিমুল্লা ঠিক করিয়াছিলেন এখানে আসিবেন—সে খবর ত কাহারও পাইবার কথা নয়। তবে? তবে কি হুসেনী বেগম তাঁহার গতিবিধির উপর গোয়েন্দাগিরি করে?

আজিমুল্লা খাঁর ভ্রূ আবারও কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

আলিমদীর পিছু পিছু আসিয়া ঘরে ঢুকিল হুসেনীর লোক। ইহাকে আজিমুল্লা কোথায় দেখিয়াছেন—কিন্তু ঠিক স্মরণ করিতে পারিলেন না। তবে আলিমদী বড় মিছা বলে নাই, লোকটা সাক্ষাৎ দানো বা দৈত্যই বটে! হুসেনী বিবি এমন ভূতটিকে কোথা হইতে খুঁজিয়া বাহির করিল? এ-ত বিঠুরের কোন ভৃত্য নয়! অন্তত বিঠুরে ইহাকে তিনি বেশি দেখেন নাই। লোকটা একটা সেলামের ভঙ্গী মাত্র করিয়া বিনা ভূমিকাতেই কাজের কথা পাড়িল, 'আলেকাম্ হুসেনী বেগম সাহেবা একবার আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। কখন কোথায় আপনার সুবিধা হবে জানতে চেয়েছেন।'

আজিমুল্লা সে কথার কোন উত্তর না দিয়া প্রশ্ন করিলেন, 'আমি যে কাল এখানে থাকব—বেগম সাহেবা জানলেন কি করে?'

'আমাকে খবর দিতে বলেছিলেন।' প্রশান্ত মুখেই সর্দার খাঁ উত্তর দেয়।

'তুমিই বা খবর দিলে কি করে?' আজিমুল্লার কৌতূহল প্রবল হইয়া উঠে।

'বাইরে বসে অপেক্ষা করছিলাম। আপনি গাড়ীতে উঠে গাড়ীবানকে এখানেই আনতে হুকুম করলেন—শুনলাম।'

'ও', বিস্ময়, নিশ্চিন্ততা ও প্রশংসা মিলিয়া এই একটি স্বরই আজিমুল্লার কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল।

তাহার পর অপেক্ষাকৃত সহজ কণ্ঠে কহিলেন, 'হুঁ্যা—কী বলছিলে? বেগম সাহেবা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান? সে ত সৌভাগ্যের কথা। তাঁকে বলো যে তাঁর এ বান্দা তাঁরই মর্জির অপেক্ষা করবে।'

'তাহলে আজ সন্ধ্যার পরে?'

'তাঁর যদি হুকুম হয় ত তাই হবে?'

'কোথায়?'

'এখানে? কিংবা যেখানে তিনি হুকুম করবেন!'

'তাহলে এখানেই তিনি আসবেন—সন্ধ্যার পর।'

লোকটা আবারও সেলামের ভঙ্গীমাত্র করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। আজিমুল্লা ইঙ্গিতে নিরস্ত করিলেন।

চেয়ারের পাশেই দামী মেহগনি কাঠের ডেস্ক। সেটার টানা খুলিয়া একটা টাকা বাহির করিলেন। টাকাটা লোকটির হাতে দিয়া কহিলেন, 'তোমার বখশীষ।'

টাকাটা হাত পাতিয়া লইয়া সে আবারও সেলামের ভঙ্গীতে মাথাটা ঝুঁকাইল।

কিন্তু সে চলিয়া যাইবার জন্য ঘুরিয়া দাঁড়াইবার আগেই আজিমুল্লা সোপায়েম কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, 'তোমার নাম কি ভাই—সেটা ত জানা হল না?'

'আমার নাম সর্দার খাঁ।—আপনার বান্দা।'

'তুমি বিঠুরে কতদিন কাজ করছ—তোমাকে ত দেখিনি?'

'আমি ত বিঠুরে কাজ করিনা।'

'অ।.....তা তবে তুমি কী করো?'

'আমার বাজারে মাংসের দোকান আছে।'

'তাহলে—তোমার সঙ্গে বেগম সাহেবার যোগাযোগটা—' বিস্ময় চাপিতে পারেন না আজিমুল্লা।

'যদি দরকার বোধ করেন ত বেগম সাহেবাকেই জিজ্ঞাসা করবেন!'

সর্দার খাঁ আর কিছুমাত্র প্রশ্নোত্তরের অবকাশ না দিয়া আর একবার মাত্র মাথাটা হেলাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নীচে তখন সদরের কাছে বসিয়া আলিমর্দী দাঁতন করিতেছিল। তাহার পাশ দিয়া সর্দার খাঁ প্রায় ঝড়ের বেগেই বাহির হইয়া গেল—কিন্তু সেই সচল পর্বতের অপসরণজনিত দমকা হাওয়াটা আলিমর্দীর গায়ে আসিয়া লাগার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা কি পদার্থ তাহার কোলের উপর আসিয়া পড়িল। প্রথমটা সে দস্তুরমত ভয় পাইয়াছিল—কিন্তু তাহার পর আশ্বস্ত হইয়া দেখিল—জিনিষটা কোন অসার বস্তু নহে, একটি গোলাকার রূপার টাকা!

আজিমুল্লা সারাটা দিন বলিতে গেলে অধীর আগ্রহে হুশেনী বেগমের অপেক্ষায় রহিলেন। সময়টা—এই প্রথম তাঁহার মনে হইল—বড় দীর্ঘ, সূর্যদেবের গতি বড়ই মন্থর।

হুশেনী তাঁহার কাছে আসিতেছে—হুশেনী!

স্বেচ্ছায়। তাঁহাকে তাহার প্রয়োজন পড়িয়াছে।

তিনি কি অকারণেই এত অধীর হইতেছেন?... তাঁহার মত তীক্ষ্ণ-ধী লোকের বুঝি এতটা অধীরতা শোভা পায়না।

অথচ আজিমুল্লা বুদ্ধিজীবী লোক। আর যাহাই থাক তাঁহার বুদ্ধির অভাব আছে, এমন অপবাদ শত্রুতেও দিতে পারিবে না। সামান্য খিদমৎগারের পুত্র তিনি। সেনা-ব্যারাকের এক সাহেবের খিদমৎগারী করিতেন আজিমুল্লার পিতা. এ ত এই সেদিনও—বেশ বড় হইয়াও—আজিমুল্লা দেখিয়াছেন। এবং সেজন্য তিনি লজ্জিতও নন। পিতার সেই খিদমৎগারীই আজিমুল্লার জীবনে উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। বরং—সে পরিচয় আজ সম্পূর্ণ রূপে ঢাকিয়া দিতে পারিয়াছেন, নিজের এই কৃতিত্বে আজিমুল্লা গর্বিতই।

ব্যারাকে ব্যারাকে খিদমৎগার পিতার সহিত ঘুরিয়া বালোই মেধাবী আজিমুল্লা বহু ইংরাজী শব্দ আয়ত্ত করেন, এমন কি কিছু ফরাসীও। সে ইংরাজী ব্যাকরণ-সম্মত না হইলেও খাঁটি সাহেবী ইংরাজী। উচ্চারণের ভঙ্গীটা পর্যন্ত সাহেবী। আরও একটা সুবিধা—বহু উচ্চশিক্ষিত লোকও সাহেব, বিশেষত স্কচ্ সাহেবের মুখের উচ্চারণ এক বর্ণও বোঝেন না—কিন্তু আজিমুল্লা শুনিয়াই শিখিয়াছিলেন, সে অসুবিধা তাঁহার নাই।

আজিমুল্লা নিজেও অনেক রকম কায়িক শ্রমের কাজ করিয়াছেন। কাফিখানায় পেয়ালা ও সান্‌কি ধোওয়ার কাজও একসময় তাঁহাকে করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সাহেবদের সংস্পর্শে গোটা বাল্যকালটা কাটার ফলেই হউক বা সহজাত বলিয়াই হউক—উচ্চাভিলাষ তাঁহাকে কখনও ত্যাগ করে নাই। সেই উচ্চাভিলাষেই একদা তিনি কানপুর শহরে পৌঁছিয়া ইংরাজী স্কুলের হেডমাষ্টার গঙ্গাদীনকে খুঁজিয়া বাহির করেন এবং তাঁহার কাছে লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। শুনিয়া শুনিয়া ইংরাজী ভাষায় যতই দখল থাকে—লিখিতে ও পড়িতে না পারিলে সবই বৃথা—একথাটা আজিমুল্লা ভালই বুঝিয়াছিলেন।

তাঁহার সে ঘুরদৃষ্টি ও অধ্যবসায়ের ফল ফলিতেও দেরী হয় নাই। গঙ্গাদীনের কাছে মোটামুটি পাঠ সমাপ্ত করিয়া ঐখানেই শিক্ষকতা করিতে শুরু করেন বটে কিন্তু তাঁহাকে কেহই সাধারণ স্কুল মাষ্টার বলিয়া কোনদিন অশ্রদ্ধা

করিতে পারে নাই। তাঁহার সুশ্রী চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত চাহনী এবং ইংরেজদের মতই ইংরেজী উচ্চারণ শীঘ্রই তাঁহার একটি খ্যাতি রচনা করিল। তখনকার দিনে সে-ধরণের ইংরেজীনবিশ লোক এত ছিল না সুতরাং—খ্যাতি না রটাই বিচিত্র। সে খ্যাতি একদা নানাসাহেবের কানেও পৌঁছিল। তিনি তাহার পূর্ব হইতেই কোম্পানীর অবিচারের বিরুদ্ধে মহারাণীর কাছে নালিশ করিবার কথা ভাবিতেছিলেন। আজিমুল্লা খাঁকেই তাঁহার এ বিষয়ে উপযুক্ত লোক বলিয়া বোধ হইবে—তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

নানার উকীল আজিমুল্লা গেলেন নবাবের মতই। বিলাতের লোক অত বোঝেনা; ধনী ভারতীয় হিন্দু মাত্রেই তাহাদের কাছে রাজা, ধনী মুসলমান মাত্রেই নবাব। আজিমুল্লারও নবাব বলিয়া খ্যাতি রটিতে বিলম্ব হইল না। আজিমুল্লা মুঠা মুঠা করিয়া—নানা সাহেবের সুবর্ণ ওখানে ছড়াইতে লাগিলেন। ফলে লণ্ডন শহরের বহু ধনী ও অভিজাত পরিবারের দ্বারই তাঁহার সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া গেল। নাচিয়া ও নাচাইয়া আজিমুল্লা শীঘ্রই রীতিমত খ্যাতি-সম্পন্ন ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এধারে চতুরতা যতই থাক—ইংরেজ কার্যকালে বিগলিত হয়না কখনও—আজিমুল্লাকেও শুধু হাতেই ফিরিতে হইল। মক্কেলের সত্তরলক্ষ টাকা খরচ করিয়া রিক্তহস্তে ফেরাটা উকীলের পক্ষে মোটেই গৌরবের নয়—এক্ষেত্রে মক্কেলের বিষদৃষ্টিতেই পড়িবার কথা—কিন্তু তীক্ষ্ণ-ধী আজিমুল্লার পক্ষে দোষটা অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দেওয়া এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। আজিমুল্লা অনায়াসেই নানা সাহেবকে 'বুঝাইয়া' দিতে পারিলেন।

তবে ইংল্যাণ্ড হইতে একেবারেই শুধু হাতে ফেরেন নাই। ইংল্যাণ্ড যাত্রার সময় তাঁহার সেক্রেটারী হিসাবে তিনি পাইয়াছিলেন মহম্মদ আলি খাঁকে। এই ছেলেটি উচ্চশিক্ষিত। বেরিলী কলেজের ছাত্র, রুড়কী কলেজের পাসকরা ইঞ্জিনিয়ার—কিছুদিন কোম্পানীর কাছে ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে চাকরীও করিয়াছিল। কিন্তু সে অল্প কালের জন্যই। সে চাকরী ছাড়িয়া তাল ইংরেজী-নবিশ হিসাবে জঙ্গবাহাদুরের কাছে সেক্রেটারীর চাকরী শুরু করে। তাহার সহিত সে বিলাতেও গিয়াছিল। ছেলেটি শুধু মেধাবী বা বিদ্বান নয়—সে যেন মন্ত্রশক্তিও রহিছে। এত ইংরাজ-বিদ্বেষ আজিমুল্লা আর কাহারও দেখেন নাই। বোধ করি নানা সাহেবেরও না। তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত চাকুরীর ক্ষেত্রে তাহার প্রতি অবিচারই এই বিদ্বেষের হেতু। তাহার চেয়ে অনেক কম-শিক্ষিত সাহেব বা আধা-সাহেব তাহার চেয়ে অনেক বেশী মাহিনা পাইত এবং কর্তৃত্ব করিত—সেই অপমানেই সে চাকরী ছাড়ে এবং আজও সে-অপমান ভুলিতে পারে নাই।...কিন্তু আজিমুল্লা তাহা বিশ্বাস করেন নাই। আরও গূঢ় কারণ সন্দেহ করিয়াছেন। যদিচ সে-সন্দেহের আপাত কোন কারণ খুঁজিয়া পান নাই।

কিন্তু সে যাহাই হউক—এই ছেলেটি দীর্ঘকালের সাহচর্যে তাহার সেই তীব্র ইংরেজ-বিদ্বেষ আজিমুল্লার মনেও সংক্রামিত করিয়াছিল। শুধু তাহাই নয়—ঐ ছেলেটি ইংরেজের শক্তির প্রতি তাঁহার অখণ্ড শ্রদ্ধাকেও বিচলিত করে। সে-ই প্রথম শোনায় যে ইংরেজ অপরাজেয় নয়। নেপোলিয়নের কাছে সে রণযুদ্ধে কতুর মার খাইয়াছিল—এবং ভারতেও তার যে সুদীর্ঘ বিজয়ের ইতিহাস, তাহা রচনা করিয়াছে দেশী সিপাহীরাই—নহিলে ইংরেজ কিছুই করিতে পারিত না। ইংল্যাণ্ড দেশ এতটুকু—ইংরেজও মুষ্টিমেয়। সাত সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া তাহাকে লড়াই করিতে হইয়াছে। দেশী সিপাহীরা না থাকিলে ক্লাইভ কী করিতে পারিতেন? ফরাসীরাই আজ ভারতের অধীশ্বর হইয়া বসিত..... ইত্যাদি।

এক কথায় মহম্মদ আলি খাঁ তাঁহার শোণিতে নূতন নেশা ধরাইয়া দিয়াছিল। তাহারই প্ররোচনায় তিনি ফিরিবার পথে কুস্তুনিয়া* হইতে যাত্রা পাল্টাইয়া

* কনষ্টান্টিনোপল্

ফিরিয়া যান সেখানে ইংরেজ সৈন্যদের দুরবস্থা ও তাহাদের হতদারিদ্র্য স্বচক্ষে দেখেন। ১৮ই জুন ইংরেজদের শোচনীয় পরাজয়ের দিনে তিনি সে পরাজয় নিজের চোখেই প্রত্যক্ষ করেন। তাহাতে মহম্মদ আলি খাঁর কথার যাথার্থ্যই প্রমাণিত হয়। ইংরেজ অপরাজেয় নয়—ইংরেজদের শক্তি বা সম্পদও অফুরন্ত নয়।

তবু ফিরিয়া আসিয়া আজিমুল্লার একার পক্ষে হয়ত কিছুই করা সম্ভব হইত না। নানাকে তাতানোই মুস্কিল। বাকী যে সব শক্তিমান রাজা আছেন, তাঁহাদের সহিত আজিমুল্লার পরিচয় নাই। ভাগ্যান্বেষী একজন তরুণ মুসলমানের কথা তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন কেন? তাহাড়া সতর্ক ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি রেসিডেন্ট-রূপে প্রত্যেকেরই ঘরে জাঁকিয়া বসিয়া আছে। এ ক্ষেত্রে সহায় সম্বলহীন আজিমুল্লা কীই বা করিতে পারিতেন?

কিন্তু খুদার ইচ্ছা বুঝি অন্যরূপ।

নহিলে ঠিক সেই বিশেষ মুহূর্তে হুসেনী বেগম তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইবে কেন?

একটা বিদ্বেষের স্রোত আর একটা প্রবলতর স্রোতের সহিত মিলিবে কেন? একটা সর্বনাশা বহ্নি আর একটা প্রলয়ঙ্কর বহ্নির সহিত আসিয়া মিশিবে কেন?

নানা ধুন্ধুপন্থ একদিন প্রীতির আকস্মিক অতিশয্যে আজিমুল্লাকে সঙ্গে করিয়াই গিয়াছিলেন হুসেনী বেগমের মহলে—সে কোন্ এক অশুভ লগ্নে। সে-ই প্রথম চারিটি চোখ মিলিয়াছিল।

অশুভ আজিমুল্লার পক্ষে ত অশুভ লগ্ন বটেই।

সে-ই হইতে আজ পর্যন্ত আজিমুল্লা মনে শান্তি পান নাই। ঐ রমণী-রত্নকে তাঁহার বক্ষ-লগ্ন না করিতে পারিলে বুঝি শান্তি পাইবেনও না।

সম্ভোগ? বহু স্ত্রীলোককেই তিনি এ বয়সে সম্ভোগ করিয়াছেন—দেশী বিলাতী বহু। কিন্তু সে কোন স্ত্রীলোকের সহিতই বুঝি এই স্ত্রীলোকের তুলনা হয় না।

রূপ?

না, শুধু রূপ নয়। আরও কি আছে হুসেনী বেগমের। কী এক আগুন—যাহা দেখিলে মন-পতঙ্গ ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিঃশেষে নিজেকে দগ্ধ করিতে না পারিলে বুঝি শান্তি পায় না।...

আজিমুল্লা সেদিন ফিরিয়াছিলেন মূর্চ্ছাহতের ন্যায়।

কিছু ব্যথিতও হইয়াছিলেন বৈ কি! নিজে খানদানী ঘরের লোক না হইলেও আজিমুল্লা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় চিনিতে কিছুমাত্র ভুল করেন নাই।

সামান্যা রূপোপজীবিনী কখনই নয় হুসেনী বেগম, কোন খানদানী ঘরেরই কন্যা। সে কিনা ঐ স্থূলোদর কাফেরটার কাছে আত্ম-বিক্রয় করিতেছে!

আজিমুল্লা সুযোগের জন্য ব্যগ্র হইলেন। তাঁহার মত লোক কোন একটা সুযোগ খুঁজিলে তাহা মিলিতেও বিলম্ব হয় না। বিশেষত প্রয়োজনবোধে মুক্ত হস্তে টাকা ছড়াইতে তিনি জানেন।

হুসেনী বেগমেরই এক দাসী আসিয়া একদিন আজিমুল্লার বক্তব্য নিবেদন করিল—আজিমুল্লা নির্জনে দর্শন-প্রার্থী।

সেদিন বিচিত্র এক হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল আসিনার মুখে। রহস্যময়, কুটিল এবং—ভয়ঙ্কর সে হাসি।

অনুমতি এবং নির্দেশ দুই-ই মিলিয়াছিল, আজিমুল্লা নিশীথ রাত্রে একা হুসেনীর মহলে আসিয়াছিলেন। এবং নির্বোধ প্রথম প্রণয়ীর মতই আবেগকম্পিত-কণ্ঠে হুসেনীর প্রণয়-ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

হুসেনী তখন হাসিয়াছিল। পরিষ্কার সহজ কণ্ঠে ঈষৎ বিদ্রূপের সুর মিশাইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, 'বিশ্ব মনিবকে ছেড়ে চাকরের ঘর করতে যাবো কিসের দুঃখে বলতে পারেন খাঁ সাহেব?'

আজিমুল্লার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিলেও কথাটার ভাল জবাব দিতে পারেন নাই সেদিন।

আরও মর্মভেদী আঘাত হানিয়াছিল হুসেনী, 'আপনি ত নানাসাহেবের টাকাতেই জীবন ধারণ করেন—নানা সাহেবের চেয়ে বেশী কী দেবার আশা করেন? বা, এমন লোভ দেখাতে চান আমাকে?'

তখনও প্রথমটা আজিমুল্লাকে নিরুত্তর থাকিতে হইয়াছিল।

অনেক কষ্টে অনেকক্ষণ পরে উত্তর দিয়াছিলেন, 'আমি আপনাকে ঘর দেব, মর্যাদা দেব—সেবা করব আপনাকে!'

'এ পথে যখন এসেছি খাঁ সাহেব, তখন ওসব ভুয়ো সম্মানের লোভ আমার নেই। ...আপনার অনেকগুলি পত্নীর একজন হওয়ার চেয়ে নানাসাহেবের উপপত্নী হওয়াতেও লাভ বেশী!'

তাহার পর সহসা নিরুত্তর আজিমুল্লার নিকটে আসিয়া সর্পিনীর মতই হিস্ হিস্ করিয়া বলিয়াছিল, 'আমি তোমাকে চিনি আজিমুল্লা খাঁ। তুমি আমাকে আজ দেখছ—আমি তোমাকে দেখেছি বহুদিন। তোমার সব গতি বিধির খবর রাখি। তোমার উচ্চাভিলাষ আছে আমি জানি। আমারও উচ্চাভিলাষ আছে জেনে রাখো। অনেক বড় আশা আমার। হিন্দুস্তানের তক্তে, চাঁই আনি। পারবে দিতে? যেদিন সেই আসনে উঠবে—সেইদিন তোমার সেবা করবে তোমার এই বাঁদী—তার আগে নয়।'

সামনে সাপ দেখিলে অন্ধকার রাত্রে পথিক যেমন চমকিয়া ওঠে, তেমনিই বুঝি সেদিন চমকিয়া উঠিয়াছিলেন আজিমুল্লা। মনের অতল গহনে সীমাহীন অন্ধকারে যে উচ্চাশা সবে মাত্র অঙ্কুরিত হইয়া সেখানেই চাপা পড়িয়া আছে, যাহার অস্তিত্ব তিনি নিজের কাছেও স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন—তাহার খবর কেমন করিয়া পাইল এই মায়াবিনী?

হুশেনী তেমনিই বলিয়া চলিয়াছে, 'তুমিও যেমন তাতাচ্ছ নানাসাহেবকে, আমিও তেমনি। দুজনেরই লক্ষ্য এক—ইংরেজ বিতাড়ন। তার জন্য চাই উপলক্ষ। নানা সাহেব সেই উপলক্ষ মাত্র। নানা সাহেবের নামে সিপাহীরা বশ হবে। যদি নানা সাহেবকে কোনদিন ভারতের তক্তে বসাতে পারো ত তাকে সরাতে কতক্ষণ?...কেমন, এই না তোমার মতলব?...নিজেকে ঠকিও না আজিমুল্লা খাঁ, স্বীকার করো।'

আজিমুল্লা নত মস্তকে বসিয়াছিলেন—জবাব দিতে পারেন নাই। অস্বীকার করিতেও না।

হুশেনী তাঁহার একটা হাত ধরিয়াছিল।

'তুমি একা পারবে না আজিমুল্লা। আমিও একা পারব না। এসো আমরা মিলিত হই। তুমি ও আমি। আমরা মিলিত হ'লে সম্ভব হবে। নানাকে তাতাবার ভার তোমার। অঙ্গ বহু ব্যবস্থা আমি করতে পারব। কিন্তু নানা হিংসেবী, নানা বুদ্ধিমান—যে নিতান্তই তার পদলেহনকারী তার কথায় নানা ভরসা করবেন না। তুমি এই তার নাও। আজ থেকে তুমি আমার অংশীদার হও। কাজ যদি কোন দিন ফতে করতে পারো সেই দিন তুমি পুরস্কার পাবে। রাজত্ব আর রাজকন্যা—যেমন রূপকথায় লেখা থাকে...আখো, রাজী?'

সেই কোমল রক্তপদ্মের মত হাত দুটি চাপিয়া ধরিয়া আজিমুল্লা উত্তর দিয়াছিলেন, 'রাজী। খুদা তামিন!'

সেই দিন হইতে সুরু হইয়াছে তাঁহাদের এই বিচিত্র অভিযান। বিচিত্র ব্যবসায়। আজিমুল্লাকে বহু সাহায্য করিয়াছেন হুশেনী—আড়াল হইতে। বহু পথ খুলিয়া দিয়াছে আজিমুল্লার সামনে। কিন্তু হুশেনী কোথায়?

তাঁহারা দেখেন পরস্পরকে ঠিকই—কিন্তু দেখাশুনা হয় না। যোগাযোগ আছে—কাজও করেন পরস্পরের নির্দেশমত, তবে নির্জনে দেখা হওয়ার সুযোগ মেলে না। আজ সেই দুর্লভ সুযোগ মিলিয়াছে। যা ছিল একেবারেই নাগালের বাহিরে, আজ বুঝি তাই স্বেচ্ছায় আসিয়া হাতে ধরা দিতেছে।

তবে কি, তবে কি—হুশেনীর মন এতদিনে তিনি পাইয়াছেন?

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনুষ্যচরিত্রে অভিজ্ঞ আজিমুল্লার মুখে হতাশার হাসি ফুটিয়া ওঠে।

সে 'চীজ' হুশেনী নয়।

নিশ্চয়ই কোন ভয়ঙ্কর খবর আছে। কোন জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে কোথাও। তবু—তবু একটু অধীরতার সহিতই অপেক্ষা করেন আজিমুল্লা। হোক সে

সুদূর—তবু একান্তে কাছে পাওয়ার সৌভাগ্যই কি কম?...

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিবারও অনেক পরে হুসেনী বেগমের ডুলি আসিয়া পামিল। প্রায় নিঃশব্দেই আসিয়াছিল—তবু যেটুকু শব্দ উঠিয়াছিল, অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষমান আজিমুল্লার কানে তাহা এড়ায় নাই। তিনি নিজেই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন এবং সসম্ভ্রমে ডুলির উপরের তেলতেটের ঘেরাটোপটা সরাইয়া ধরিলেন।

রাজেন্দ্রাণীর মতই ধীর ও নিরুদ্বিগ্ন ভাবে নামিয়া আসিল আমিনা। তাহার সর্বাঙ্গে চাকাই মসলীনের উপর লক্ষ্ণৌয়ের চিকন কাজ করা বুরখা। সে এক হাতে বুরখার কাপড় সামলাইয়া আজিমুল্লার পিছনে পিছনে আসিয়া বাড়ীতে ঢুকিল এবং সিঁড়ি বাহিয়া উপরে তাহার খাস কামরায় আসিয়া বসিল।

বিলাত হইতে ফিরিবার সময় আজিমুল্লা অনেক আসবাবপত্র আনিয়াছিলেন—বিলাতী 'অভিয়ান' আসবাব, ভাল ভাল চামড়ায় ঢাকা কুসী, মেঝেতে ইস্পাহানী কার্পেট। দরজায় মূল্যবান দামাস্কের পরদা। সেকালের প্রবাসী ধনী ইংরাজের মতই গৃহসজ্জা।

আমিনা একখানা চেয়ারে বসিয়া নিঃসঙ্কোচে মুখের উপর হইতে বুরখা সরাইয়া দিল। ইতিমধ্যেই, বোধকরি পূর্ব নির্দেশমত, আলিমদ্দী বিলাতী কাটা-কাঁচের দামী পাত্রে সরবৎ আনিয়া রাখিয়া গিয়াছে। আলিমদ্দী চলিয়া গেলে দরজার পর্দাটা ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া আজিমুল্লা খাঁ নিজের চেয়ারে আসিয়া বসিলেন।

'তারপর? বেগম সাহেবা? বলুন কী করতে পারি আপনার জন্যে?'

'শুধু কি আমারই জন্যে?'

বিশুদ্ধ ইংরাজীতে আমিনা উত্তর দেয়। এক্ষণে বিদ্রূপের আভাস তাহার কণ্ঠে।

আজিমুল্লাও ইংরাজীতে বলেন, 'হ্যাঁ—শুধু তোমারই জন্য। যা কিছু সব তোমার জন্য বেগম সাহেবা!'

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া হাসেন।

সে হাসিতে উত্তেজনা ও হতাশা দুই-ই বুঝি ফুটিয়া ওঠে।

স্মিত আমিনার মুখের হাসি মিলাইয়া যায়। কণ্ঠে তাহার রীতিমত উদ্বেগ। বলে, 'শোন—মৌলভী সাহেব ধরা পড়েছেন।'

'বল কি? কে বললে?'

কাল রাত্রে খবর পেয়েছি। ইংরেজরা তাকে ধরেছে—লক্ষ্ণৌয়ের কয়েদখানায় পুরেছে তাকে। বিচার একটা হবে নিশ্চয়ই—কিন্তু সে কবে তা কেউ জানেনা। মৌলভী সাহেব তার ভেতরই আমাকে খবর পাঠিয়েছেন। আশ্বাসও দিয়েছেন যে, আমি যেন না ভাবি। ইংরেজের কোন জেলখানা তাঁকে বেশীদিন ধরে রাখতে পারবে না। তিনি বেরিয়ে আসবেনই।'

'বেশ ত। তা'হলে অত ভাবছ কেন?'

অন্যমনস্ক ভাবেই কথা কয়টা বলেন আজিমুল্লা। আমিনার রূপে বুঝি নেশা আছে। সুরার চেয়েও তেজকর।

ঈষৎ অসহিষ্ণু ভাবেই আমিনা কহিল,

না। নানা সাহেবকে সামলাবে কে?'

'নানা সাহেব?'

'আঃ! খাঁসাহেব, আজ তোমার হ'লকি? মৌলভীকে আমি এ কাজে লাগিয়ে রেখেছিলুম কেন?.....নানা সাহেবকে এখনও তোমরা কেউ পুরো চেনোনি। তার উচ্চাশা যতটা, লোভ যতটা—হিসাব বুদ্ধি তার চেয়ে বিন্দুমাত্র কম নয়। তুমি এবং আমি—যতই তাতাই, তিনি কিন্তু এখনও ইতস্তত করছেন, এ ব্যাপারে নামবেন কিনা। মনে মনে ইংরেজের শক্তির পরিমাণ বিচার করছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে একটা বিষয়ে রাজী করেছি চৈত্রের কিস্তি খাজনা ধরে উঠে গেলে তিনি নিজে বেরোবে দেশের অবস্থা বুঝতে। এটা নানা সাহেব বোঝেন যে—একদল দুদল সিপাহী ইংরেজকে তাড়াতে পারবে না। দেশের সাধারণ লোক কী চায় এবং তারা

যথেষ্ট হয়েছে কিনা—তিনি তা জানতে চান। সেই সঙ্গে নানান রাজ্যের সিপাহীদের মনোভাব এবং ইংরেজদের জোর তিনি বুঝতে চান। এ আমি জানতুম, বেগমসাহেবকে এটুকু আমি চিনেছি। তিনি নিজে না দেখে এবং না বুঝে এ কাজে কিছুতে নামবেন না। যা আয়তের বাইরে তার লোভে—হাতে যেটুকু আছে সেটুকুও খোয়াতে তিনি রাজী নন।'

'তারপর?' আজিমুল্লার দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা ও বিস্ময় ঘুমি চোখের পাত ছাপাইয়া ওঠে।

হুজুরপুর যে এ প্রস্তাব করবেন তা আমি জানতুম। তাই আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিলুম। হোলকারী বহুদিন থেকেই অযোধ্যার গ্রামে গ্রামে গুজব প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন।...এখন ত তিনি কালে-খানায় চলে গেলেন।...তিনি কবে বেরোতে পারবেন তা জানিনা। আমাদের কিন্তু অপেক্ষা করার সময় নেই।

সাহেব যখন বেরোবেন তখন তিনি যেন আমাদের উদ্যোগের প্রতিকূল কিছু না দেখেন—না শোনেন। তিনি যেখানে যাবেন সেখানেই যেন তিনি দেখতে পান যে দেশের লোক তাঁকেই চাইছে, তাঁর রাজ চাইছে। কোম্পানীর ওপর তাদের কোন আস্থা নেই। এই ব্যবস্থাটা এখন আপনাকে করতে হবে। আমি স্ত্রীলোক—একা যতটা করবার তা করেছি। এবার আমায় আয়তের বাইরে চলে যাচ্ছে। এবার আসছে পুরুষের কাজ। এবার তুমি তার নাও খাঁ-সাহেব। আমি টাকা যোগাব কিছু, বুদ্ধিও—। ভেতর থেকে যতটা পারি সাহায্য করব।'

অনেকক্ষণ নিরব থাকিয়া আজিমুল্লা উঠিয়া দাঁড়াইলেন।...একবার ঘরের এ প্রান্ত হইতে ও প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারী করিয়া লইলেন তাহার পর আমিনার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, 'বেশ, এ ভার আমি নিলাম হুশেনী বেগম। কাজের কোন ত্রুটি হবে না।'

'আমি নিশ্চিন্ত রইলাম!'

অকস্মাৎ আবেগের প্রাবল্যে আজিমুল্লার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল, 'তোমার সব হুকুমই আমি তামিল করব হুশেনী, তোমার জন্য সব-কিছু করব। তোমার কোন কাজ কোথাও এতটুকু আটকাবে না। শুধু তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও—আমি, আমি যে আর পারিনা!'

উত্তেজনার আতিশয্যে আজিমুল্লা সহসা আমিনার কাঁধ দুইটা চাপিয়া ধরিলেন। তিনি থরথর করিয়া কাঁপিতেছিলেন।

আমিনা সামান্য একটা ভঙ্গী করিয়া কাঁধ দুইটা মুক্ত করিয়া লইয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল।

'পহ্‌লে কাম, পিছে সেলাম—মীর মুন্সী জি!'

কণ্ঠে সেই বিদ্রূপের সুর।

সে বিদ্রূপ চাবুকের মত আসিয়া আজিমুল্লাকে আঘাত করিল। তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় আবেগ সংবরণ করিয়া লইলেন।

আমিনা আবারও ঘুর্ঘাটা মুখের উপর টানিয়া দিয়া সহজ নিরুদ্বিগ্ন ভাবে মহিমময় ভঙ্গিতে সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া আসিল। আজিমুল্লাও পূর্বের মত সসম্ভ্রমে পিছু পিছু আসিয়া বিদায় দিয়া গেলেন।

'সেলাম বেগম সাহেবা। আদাব।

'সেলাম মীর মুন্সীজি, আদাব।'

ডুলিতে উঠিবার সময় আমিনা অনুচ্চকণ্ঠে কোথায় বাহককে নির্দেশ দিল—'তাঁতিয়া টোপীজীর বাড়ী।'

[ক্রমশঃ]

সমাজ ও জাতীয় জীবন

[র. কু. সে.]

মানুষের সার্থকতা তার পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্যে। যে মানুষ সমাজে, বিশ্বে নিজেকে বিকশিত করতে চায়নি, তার মধ্যে বুঝতে হবে চৈতন্য নেই, সে অচেতন—জীব। কিন্তু স্বভাবধর্মী মানুষ, আমাদেরই চতুর্দিকে যারা সীমাহীন পাঁচিলের মতো ভিড় করে আছে, তাদের দিকে লক্ষ্য ক'রলে দেখি—আত্মবিকাশের জন্যে কী তাদের কঠোর অধ্যবসায়, কী তাদের কঠিন কৃচ্ছ্রসাধন! স্বচ্ছ আয়নার ভিতর দিয়ে আমরা যেমন নিজেদের প্রতিমূর্তি দেখে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে আমাদের দৈহিক লাবণ্যকে প্রকাশ ক'রে অপরের কাছ থেকে নিজেদের সৌন্দর্য-সুখ্যাতি শুনবার আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ হ'য়ে উঠি, চিত্তের দিক দিয়েও এমনটাই বটে। যে শিল্পী, সে চায় জগতের মনের মুকুরে নিজেকে প্রতিবিম্বিত দেখতে, বিশ্ববাসীর প্রাণমন্দিরে খ্যাতির গরিমা নিয়ে বাঁচতে। এইটেই হচ্ছে মানুষের পূর্ণ-সাধনা ও জ্ঞানের দিক। দেহের লাবণ্য আজ আছে, কাল থাকবেনা, অর্থের প্রাচুর্য আজ স্বাচ্ছন্দ্যে ভরে গেছে, কাল হয়তো নিঃশেষ হ'য়ে যাবে, ঔদ্ধত্যের রক্তনিশান আজ হয়তো দিগন্তকে ঢেকে ফেলেছে, কাল ভেঙে পড়বে, কিন্তু মানুষের যে জ্ঞানের দিক, ত্যাগ ও সাধনার জগৎ—তা কোনোকালে ধ্বংস হবার নয়, চিরদিন তার বুদ্ধি থেকে বুদ্ধি, কীর্তির থেকে কীর্তির মধ্যে তার শাশ্বত যুগের বাস। বুদ্ধের সাধনা তাই নিঃশেষ হ'য়ে যায়নি, বিটোভেনের বাঁশীর সুর আর র‍্যাফেলের শিল্প তাই কালের আবর্তে তলিয়ে যায়নি, তাজমহল দর্শকের দৃষ্টি থেকে আজও ছুটি পায়নি, কালিদাস আর সেক্সপিয়রের কাব্য আজও বেঁচে আছে, মার্ক্সের দর্শন আজও তাই সাম্যের গান প্রচার ক'রে চলেছে। জ্ঞানের স্পর্শলাভে মানুষের 'ক্ষুদ্র আমি'টা অনবরত তার এই বৃহৎ আমি'র দিকে ধাবিত হ'য়ে চলেছে, ব'লছে: 'অপূর্ণতার মাঝ থেকে আমি মুক্তি চাই, Light more light, জীবনকে আমি আলোয় আলোয় ইন্দ্রধনুর রঙে রঙে রাঙিয়ে তুলতে চাই।'

এই চাওয়াই তো তার সুখের চাওয়া, মাধুর্যের চাওয়া! যে চাইতে জানে, সে পেতেও জানে। সেই will force বা ইচ্ছাশক্তি যার মধ্যে নেই, জগতের অনন্ত সাধনার মধ্যেও সে শান্তি পেলো না, নিতান্ত বিড়ালের মতই জীবন তার ব'য়ে গেল; আর যে তার ইচ্ছাশক্তিকে মহৎ কীর্তির দ্বারা নিয়োজিত ক'রতে পারলো, জগতের অমৃতের স্বাদ তারই জন্য সঞ্চিত রইলো। Traditional Law of Nature বা প্রকৃতির ধারাবাহিক নিয়ম এই পরম সত্যটিকেই আমাদের কাছে খুলে ধরেছে।

কিন্তু এখানে কি তাই ব'লে একথা ব'লবো যে, পৃথিবীর লোকেরা সংসারের কাজের বোঝা ফেলে দিয়ে সেই অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে এসে সকলে একসাথে ঠাঁই নাও! এ কথা বাতুলের উক্তি। বস্তুতঃ, মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও বিকাশের মূলে, সাধনা ও জ্ঞানের মূলে আসলে বেঁচে থাকবার সমস্যাটাই প্রধান। লক্ষ্যে পৌঁছাতে হ'লে উপলক্ষ্যের প্রয়োজন। তবে দেখতে হবে—বাঁচার নামে বাগাড়ম্বরিতাই শুধু প্রকাশ না পায়, পেশার নামে ব্যবসার নামে বাক্তিচারিতা এসে জীবনে ঠাঁই না নেয়। প্রলোভনের আশ্রয় না নিয়েও তো আমাদের জীবিকানির্বাহ হয়, স্বার্থ আর লোভকে হত্যা করেও তো আমরা বাঁচতে পারি। অথচ জীবনের অপরিহার্য এমন সুলভ ধর্মকে আমরা স্বভাবতঃই গ্রহণ করিনা। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে এক

একটি রসিকতলভ কুটতা। তাদের দ্বারা আমরা বাঁচতে চাইনা, তাদের মধ্য দিয়েই আমরা পরিতৃপ্তি চাই। এই সন্তোগলিপ্সাই আমাদের নাড়ীতে হিংসার আগুন জ্বালিয়ে দেয়, পরস্বাপহারী করে তোলে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে। অথচ ভালমন্দের দোহল্যমান আমাদের বিবেকে প্রতিনিয়ত এসে প্রতিফলিত হচ্ছে। Will force বা ইচ্ছাশক্তির দ্বারা আমরা ক্রমাগত সেই ভালোর দিকে পুণ্যের দিকে অগ্রসর হতে পারি। তবু পদে পদে আমরা মোহগ্রস্ত হ'য়ে পাপের রাজ্যে সৈন্য আমদানি করছি। এইটেই আমাদের জীবনের প্রধান অলঙ্ঘ্যীয় পথ। শান্তি তাই মোহের শান্তি হ'য়ে দু'দিন পরে আলেয়ার মত উড়ে যায়। খেয়াখেয়ের বৈঠা হাতে তখন আমরা কাঁদতে বসি। যৌবনের স্বপ্ন বার্ধক্যে এসে দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হয়। দার্শনিকপ্রবর Seneca এই কথাটাই একদিন যুক্তির দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন—'Many men spend much of their time in making the rest miserable. Lusty blood in youth hath attempted those things which aching bones have repented in age.'

তাই তিনি নির্দেশ দিলেন—'How well it would be if men would but excercise their brains as they do their bodies, and take as much pains for virtue as they do for pleasure.'

যে Virtue-র কথা Seneca প্রকাশ ক'রেছেন, সেইটেই মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পরিবৃত শুভ বা জ্ঞানসত্তা। আসলে মানবীয় শুভ বা ধর্ম হচ্ছে তার মনুষ্যত্বে। এই মনুষ্যত্বকে জাগ্রত রেখে চিত্তের ইচ্ছাশক্তি বা will powerকে অবলম্বন ক'রে মানুষ তার নিজেকে মৃত্যু থেকে অমৃতে, অন্ধকার থেকে আলোকে, অজ্ঞানতার থেকে জ্ঞানানুশীলনের মধ্যে প্রবিষ্ট করাতে পারে। কারণ, তার মধ্যে এমন একটা Supreme power বা অর্থনৈতিক শক্তি আছে, যাকে আগুনে দগ্ধ করা যায়না, অস্ত্রে বিধ্বস্ত করা যায়না, বিরুদ্ধ কোনো বলের কাছেই পরাভব নেই তার কোনোকালে। সেই শক্তিকে জানতে হবে, উপলব্ধি করবার প্রয়োজন তাকে সর্বাগ্রে। তবেই ইচ্ছার দ্বারা ইচ্ছার পরিপূরণ হবে, সত্তার দ্বারা আমরা কামনাসিদ্ধ হবো।

Jean Paul Richter তাই ব'লেছেন—'What you wish to be, that you are, for such is the force of our will, joined to the supreme, that whatever we wish to be seriously, and with a true intention, that we become.

তাই দেখতে পাই, জগতের যথার্থ পূর্ণ মানুষ যিনি—তাঁর মধ্যে সেই ইচ্ছাশক্তিই জীবনকে সমস্ত দিক থেকে ছেঁকে তুলিয়ে এনে সমগ্র শক্তির মূলে যে-সত্য ও অখণ্ড পূর্ণসত্তা বিরাজ করছে, তারই মধ্যে নিয়োজিত ক'রে অমৃতময় ও দীপ্তিমান হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকের জীবনেই এই সংযোজনশক্তি ও ইচ্ছা প্রয়োজন, প্রত্যেকটি মানুষেরই লক্ষ্য ও কর্তব্য হ'চ্ছে জীবনকে সেই ঊর্ধ্বায়ন গতির পথে পূর্ণলোকের অবিচ্ছিন্ন পরিপূর্ণতার মধ্যে এনে ঠাঁই দেওয়া। দার্শনিকপ্রবর Humboldt তাই ব'লেছেন, 'The aim of every man should be to secure the highest and most harmonious development of his powers to a complete and consistent whole'

বৈষয়িক জীবনের আবর্ত আছে, লালসা ও নীচতা আছে, হিংসা ও স্বার্থপরতা আছে; কিন্তু এর মধ্যেই নিজেকে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত না করে মানুষ যদি মৃত্যুর পটভূমিকে সামনে রেখে প্রকৃত বিবেকবুদ্ধির ইঙ্গিতে পরিতৃপ্ত ত্যাগ ও প্রেমের দ্বারা, জ্ঞান ও ভাবের দ্বারা সেই স্থির লক্ষ্যের দিকে একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে চলতে পারে, তবে তো তার সত্তা ইঁদুর আর ছুঁচোর গর্তের পাশে ঘুরে মরে না, শকুন আর কুকুরের মতো শুধু নিশ্চিহ্ন জৈবিক সমস্যার মধ্যেই বিচরণ করেনা। তার যে তখন বস্তু ও ভাব, লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য এক হয়ে মিলে মিশে সত্যিকারের আনন্দ রাগিণীর 'মিল'-এ এসে জীবনের পরিপূর্ণ রসমাধুর্যে অনুরঞ্জিত ও স্পন্দিত হয়ে ওঠে! বৈরাগ্য-সাধনেই জীবনের শান্তি নয়, অসংখ্য বন্ধনের মধ্যেও চিত্তের আনন্দস্বরূপকে যে একবার ধরতে পেরেছে, মুক্তি ও সিদ্ধি, শান্তি ও কল্যাণ তারই জন্য অপেক্ষা করে থাকে। তাই কর্মমুখর জগৎ ও জীবনের স্তরে স্তরে বিষয় ও ভাবকে মিলিয়ে অন্তরের বিরুদ্ধ দুটি ধারার মধ্যে যে ব্যক্তিটি তার পরিপূর্ণ মানবীয় জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা সাধনা ও প্রেমের সেতু গড়ে তুলতে পেরেছেন, তিনিই সত্যি সত্যি মনীষী ও নিত্যকালের দীপশিখাটি।

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় কাগজ শিল্পের গুরুত্ব

পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশের তুলনায় ভারতে মাথা পিছু কাগজের কাটতি অত্যন্ত কম। প্রথম পরিকল্পনা যখন গ্রহণ করা হয়, তখন ভারতীয় কাগজ শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১,৩৬,০০০ টন। কিন্তু তারপরে কানোরী পেপার মিল, বালারপুর পেপার ও ট্রেবোর্ড মিল, এবং পেপার ও পাল্প কর্পোরেসন্ লিমিটেড স্থাপিত হওয়ায় এবং তাছাড়া সাতটি মিলে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করায় ভারতীয় মিলের বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা কিছু বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ভারতে মোট ২০টি কাগজের মিল আছে এবং তাদের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১,৮৫,৬০০ টন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কাগজের উৎপাদন ২,১১,০০০ টন স্থির করা হয়েছিল। জানা গিয়েছে, সরকার এ পর্যন্ত উৎপাদন বাড়াবার জন্য যত লাইসেন্স মঞ্জুর করেছেন তাতে উৎপাদন ক্ষমতা এই নির্দিষ্ট লক্ষ্য অতিক্রম করে যাবে।

ভারতীয় মিলে প্রস্তুত কাগজে দেশের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয় বলে প্রতি বছর বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে কাগজ এদেশে আমদানী হয়ে থাকে। একমাত্র নিউজপ্রিন্টের জন্য প্রতি বছর বিদেশ থেকে পাঁচ কোটি টাকার কাগজ আমদানী করতে হয়। সম্প্রতি সরকারী তত্ত্বাবধানে বছরে ৩০,০০০ টন নিউজপ্রিন্ট উৎপাদনক্ষম একটি মিল স্থাপিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কাগজ শিল্পের যে যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে একথা অবশ্যই স্বীকার্য। প্রতি বছরই কাগজের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রতি দিনই যে কাগজের চাহিদা বেড়ে চলবে তা সহজেই বলা যায়। প্রতি বছর শতকরা দশভাগ চাহিদা যদি বেড়ে যায় তাহলে নিউজ-প্রিন্ট বাদেই ১৯৬০-৬১ সালে কাগজের চাহিদা ৩,৬০,০০০ টনে দাঁড়াবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছোতে হলে আরও ১,৩৫,০০০ টন কাগজের উৎপাদন বাড়াতে হবে। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে সরকারকে আরও নূতন লাইসেন্স মঞ্জুর করতে হবে। কেবলমাত্র নূতন লাইসেন্স মঞ্জুর করলেই অবশ্য কাগজের সমস্যার সমাধান হবেনা। এই নূতন শিল্পকেন্দ্রগুলি যাতে লাভজনক প্রতিষ্ঠান হয়ে গড়ে উঠতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ছাড়া আর একটি দিক আছে—ভারতীয় মিলে প্রস্তুত কাগজ সাধারণতঃ নিকৃষ্ট শ্রেণীর; সুতরাং কাগজের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও কাগজের আমদানী বন্ধ হবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত দেশীয় মিলে প্রস্তুত কাগজ বিদেশীয় মিলের কাগজের সমান মর্যাদা অর্জন করতে না পারে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাগজ হয়ত প্রস্তুত করা কঠিন হবে না, কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে যে এই কাগজ ন্যায্য মূল্যে সাধারণের কাছে ক্রয়যোগ্য হওয়া চাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যাতে এ দিকগুলির প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া হয়, সেজন্য কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

ভারতের খনিজ তৈল

ভারতে খনিজ তৈলের উৎপাদন অত্যন্ত সামান্য।

বস্তুতঃ দেশের চাহিদার অতি সামান্য অংশই এখানে উৎপাদিত হয়। ফলে, ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য ভারতকে বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে পেট্রোলিয়ম বা খনিজ তৈল আমদানী করতে হয়। খনিজ তৈলের উৎপাদন বাড়াবার জন্য সরকার কোন কোন তৈল কোম্পানীকে দেশের অভ্যন্তরে খনিজ তৈলের অনুসন্ধান করবার জন্য লাইসেন্স মঞ্জুর করেছিলেন। এ প্রতিষ্ঠান-গুলি সবগুলিই বিদেশীয়। জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়াও তাদের কর্মসূচীর একটি অঙ্গ হিসাবে খনিজ তৈলের প্রাথমিক অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। দেশীয় বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত কারীগরী জ্ঞান ও মূলধনের অভাবহেতু সরকার সম্প্রতি খনিজ তৈলের অনুসন্ধান কার্য স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যেই তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস বিভাগ স্থাপন করবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমেই অনুসন্ধান কার্য আরম্ভ করা হবে রাজস্থানের জেসালমীর অঞ্চলে।

সম্প্রতি ভারত সরকারের উৎপাদন মন্ত্রণালয় ব্যাপক ভাবে খনিজ তৈলের অনুসন্ধান কার্য চালাবার জন্য একটি তৈল কমিশন নিয়োগের প্রশ্ন বিবেচনা করছেন। এই কমিশন নিযুক্ত হলে, তাঁরা রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, সৌরাষ্ট্র এবং গঙ্গার অববাহিকা সুন্দরবনে তৈলের অনুসন্ধান কার্য চালাবেন। এই সব কাজ চালাবার জন্য উৎপাদন মন্ত্রণালয় দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় ত্রিশ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখবার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন। এই মন্ত্রণালয়ের মতে ভারতের খনিজ তৈল সম্পর্কে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া উচিত, কিন্তু যে সব বিদেশীয় কোম্পানী তৈলের অনুসন্ধান কার্য করছেন তারা ভারতীয় শিক্ষানবীশদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করছেন না। সোভিয়েৎ নেতাদের সফরের সময় তাঁদের বৈষয়িক প্রতিনিধিদের সঙ্গে যে চুক্তি হয় তদনুযায়ী ইতিমধ্যেই রাশিয়া থেকে নয়জন তৈল বিশেষজ্ঞ ভারতে এসে পৌঁছে গেছেন। এঁরা আগামী তিন কিংবা চার মাসের মধ্যে তাঁদের কাজ সমাপ্ত করে দেবেন বলে আশা করা যায়। ভারত সরকার ইদানীং খনিজ তৈল সম্পর্কে যে সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন, তাদের উন্নয়নে এঁরা পরামর্শ দেবেন। তৈল শিল্পে কি ধরণের যন্ত্রপাতি ভারতবর্ষ ব্যবহার করবে এ সম্পর্কেও তাঁরা পরামর্শ দেবেন। সোভিয়েৎ বিশেষজ্ঞদের আগমন সার্থক হোক। সরকার খনিজ তৈলের উৎপাদন বাড়াবার জন্য যে তৎপর হয়েছেন তা অবশ্যই আনন্দের কথা।

অন্ধ্রে নাগার্জুন সাগর পরিকল্পনা

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে সকল পরিকল্পনা এ পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়েছে, নাগার্জুন সাগর পরিকল্পনা তার মধ্যে অন্যতম। এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত হলে, কেবলমাত্র অন্ধ্র প্রদেশ নয় সমস্ত দাক্ষিণাত্যের মধ্যে এ-টি বৃহত্তম সেচ পরিকল্পনা বলে পরিগণিত হবে। ভাকরা কিংবা হীরাকুঁড় পরিকল্পনায় যে জলাধারের ব্যবস্থা হয়েছে, তা থেকেও বৃহত্তর জলাধারের ব্যবস্থা এই পরিকল্পনায় রাখা হয়েছে। এই জলাধার থেকে দুটি খাল দিয়ে মোট ৩৩,০০০ কালেক পরিমিত জল পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে সিক্ত করবে। ডান দিকের খালটি হবে পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম সেচ-খাল। এটি দিয়ে ২১,০০০ কালেক পরিমিত জল প্রবাহিত হবে এবং এর ফলে মোট ৩৪ লক্ষ একর জমিতে সেচকার্য করা সম্ভব হবে ও খাদ্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে ১২ লক্ষ টন। এ ছাড়া জলবিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে ৭৪,০০০ হাজার কিলোওয়াট্।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নেহেরু এই পরিকল্পনার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেছেন। পরিকল্পনায় মোট ব্যয় হবে ১২২ কোটি টাকা। পরিকল্পনার প্রথম সাত বছরে ব্যয় হবে ৭৪ কোটি টাকা এবং তার ফলে ২৪ লক্ষ একর জমিতে সেচ কার্য সম্ভব হবে। বাকী অংশ শেষ হতে আরও তিন বছর লাগবে। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হলে সমস্ত অন্ধ্রের অর্থনৈতিক কাঠামো আরও সুদৃঢ় হবে। কারণ এর ফলে কেবলমাত্র কৃষি-বিভাগেই

উন্নতি হবে না, শিল্পও গড়ে উঠবে সঙ্গে সঙ্গে। সহস্র সহস্র লোকের কর্মসংস্থান করে দেবে এই পরিকল্পনা। জনসাধারণ ও সরকারের সহযোগিতা পেলে এ পরিকল্পনা অবশ্যই সফল হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারতের সমৃদ্ধিকে আরও বাড়িয়ে দেবে।

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের ডিভিডেণ্ড ভারতীয় শিল্পসমূহকে অর্থ সাহায্য দিয়ে তাদের উন্নয়নের জন্য ১৯৪৮ সালে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের কার্য-কলাপ সম্পর্কে অনেক ত্রুটি এপর্যন্ত সাধারণের গোচরে এসেছে। যাহোক মোটের উপর প্রতিষ্ঠানটি যে খুব লাভজনক হয়ে ওঠে নাই তা বলাই বাহুল্য। যে বিশেষ আইনের সাহায্যে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়, তার ৪নং ধারা অনুযায়ী, কেন্দ্রীয় সরকার এই কর্পোরেশনের শেয়ারের উপর শতকরা ২১ টাকা ডিভিডেণ্ড ও মূলধন সম্পর্কে গ্যারাণ্টি দিয়েছিলেন। যে বছর কর্পোরেশনের লাভ ডিভিডেণ্ড দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট হবে না, সে বছর কেন্দ্রীয় সরকার ডিভিডেণ্ড দেবার জন্য যে ঘাটতি হবে তা পূরণ করে দেবেন। ১৯৪৯-৫০ সাল থেকে ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার কর্পোরেশনকে ৩০,২৫,০০০ টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন।

চলতি বছরে কর্পোরেশন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ১১'২৫ লক্ষ টাকা ডিভিডেণ্ডের জন্য মঞ্জুর করতে আবেদন করেছিলেন। ১৯৫৫-৫৬ সালের বাজেটে এই খাতে ৭ লক্ষ টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। পরে বাকী ৪'২৫ লক্ষ টাকাও দিতে হয়েছে।

বলা বাহুল্য, এ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের এত টাকা দিয়ে কর্পোরেশনকে সাহায্য করার প্রধান কারণ, কর্পোরেশনের উপযুক্ত পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটি। এ সম্পর্কে বহু সমালোচনা ইতিপূর্বে হয়ে গিয়েছে এবং এখানে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ভবিষ্যতে যাতে কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ তাঁদের পরিচালন ব্যবস্থার জন্য সাধারণের সমালোচনার পাত্র না হন, সেজন্য তাঁদের সতর্ক থাকা উচিত।

এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অফ কমার্সের অধিবেশন

কয়েকদিন আগে কলকাতায় এসোসিয়েটেড চেম্বার্স অফ কমার্সের বাৎসরিক অধিবেশন হয়ে গিয়েছে। এই অধিবেশনে, কোম্পানীর লাভের উপর করপোশন, ব্যক্তিগত আয়ের উপর কর নির্ধারণ, পণ্যাদির উপর কর হ্রাস এবং বহু-শিল্প শ্রম বিধি ও শিল্পীয় বিরোধ, রেল ও পরিবহন, মাল সরবরাহের পর দাম হেটাতে সরকারী শৈথিল্য এবং ভারতীয় কোম্পানী বিল ১৯৫৫ সম্পর্কে আটটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য যে এর মধ্য দিয়ে ব্যবসায়ী মহলের অনুযোগগুলি সরকার পেয়ে থাকে। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে, বহু-শিল্প, রেল ও পরিবহন প্রভৃতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রস্তাবে নূতন কিছু বলা হয় নাই, যেহেতু এ অনুযোগগুলো অনেকদিন থেকেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। তবে শ্রম-বিধি, ব্যক্তিগত কর নিরূপন প্রভৃতি সম্পর্কে প্রস্তাবগুলি অবশ্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

বৈদেশিকী

দুই শিবিরের দ্বন্দ্ব

বর্তমানে বিশ্ব শান্তিতে বাস করিবে কি, যুদ্ধ করিয়া উৎসন্নের দিন গুনিবে ইহা লইয়া রাজনৈতিক নেতাদের দুশ্চিন্তার অবধি নাই। বিশ্বের রাজনৈতিক শক্তিগুলির মোট দুইভাবে দুই শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে, খুব

দড়ি টানাটানি চলিতেছে—এই মন্থনে পড়িয়া সাধারণ ছোট রাষ্ট্রের প্রাণ যায়-যায়—অথচ ছোট রাষ্ট্রগুলির নিরিখে রাগ করিবার উপায় নাই। তাহাদের বাঁচিতে হইলেই অন্যের দারস্থ হইতে হইবে। কোন বিষয়ে কিছু পাহারো যার হাত পাতিলেই—অর্থাৎ প্রার্থিত বস্তু পাইতে হইলে বৃহৎ রাষ্ট্রের শিবির অন্যান্যেরা সমঝাইয়া দিবেন। নিয়ম-কানুন বুঝাইয়া বলিয়া দিবেন ভাল ছাত্রের মত পাঠে অভ্যস্ত হইলেই 'যে সাহায্য চাও তাহা মিলিবে।'

বর্তমান বিশ্বের রণক্লান্ত তাহা ইয়োরোপে যে রাজনীতি দানা বাঁধিবার তাহা ত এত দিন এই ভাবেই ছোট পাকাইয়া দানা বাঁধিল। গোটা বিশ্বের মাঝে বাকী রহিল এশিয়া এবং আফ্রিকা। আফ্রিকায় এখনও কিছুদিন শোষণ চলিবে—চোখ রাঙাইয়া শাসন ও শোষণ দুই চলিবে। কিন্তু অসাধ্য এশিয়াকে লইয়া বিপদ হইল যে! দ্বিতীয় যুদ্ধের পর ইয়োরোপের তেমন কোন সমস্যা নাই—একমাত্র মৃতপ্রায় দেহে নতুন রক্ত সঞ্চার করিবার ক্রিয়া-কৌশল ছাড়া। সমস্যা এশিয়াকে কেন্দ্র করিয়া। এশিয়া রক্তাক্ত বিপ্লব (চীন) ও করিয়াছে, আবার Revolution by consent ও (ভারত) করিয়াছে—আবার নিজের সম্পদ—(মৌলী আরব, পারস্য) বিক্রয় করিয়া পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের হুকুমের সেবক হইয়াছে। কিন্তু ইহার সামগ্রিক ফল এশিয়ার জাতিগুলির মাঝে সাড়া আনিয়াছে। এই নবচেতনার জোয়ার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরের কখনও-বা পক্ষে গিয়াছে কখনও-বা বিপক্ষে গিয়াছে। অথচ মজা হইতেছে যে, একপক্ষ যখন আওতায় রাখিতে সমর্থ হইল না অমনি অন্যপক্ষের ছোট রাষ্ট্রগুলি তাহার (অর্থাৎ আর একটি শিবিরের) দোষারোপ করিয়া আত্মকীর্তন শুরু করিল। এক পক্ষ আর পক্ষের আদর্শবাদকে নিন্দা করিয়া যে কাহাকে দলে টানিবে—তাহারই ইচ্ছা।

সম্প্রতি বিশ্ব-রাজনীতির এই খেলা শুরু হইয়াছে। সোভিয়েট নেতারা ভারত, ব্রহ্ম ও আফগানিস্থান ভ্রমণ করিয়া যাইবার পর হইতেই কূটনীতির নূতন স্রোত এশিয়ায় বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তাহার State of the Union message দিতে গিয়া সমগ্র বিশ্বের একটা রাজনৈতিক হিসাব নিকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন জেনেভায় বৃহৎ পঞ্চশক্তির যে সম্মেলন হইয়াছিল তাহাতে সোভিয়েট রাষ্ট্র নিরাপদ ও স্থায়ী শান্তির পথ নির্দেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইহা একপক্ষ দোষারোপ এবং সোভিয়েটের বিরুদ্ধে। ইহার পরই তিনি বলিতেছেন, আদর্শবাদই আমাদের মোক্ষম অস্ত্র। এই অস্ত্রের কথা বলিতে-বলিতে তিনি আবার উল্লেখ করিতেছেন, We have improved the effectiveness and combat readiness of our forces by developing and making operational new weapons and by integrating the latest scientific developments, including new atomic weapons, into our military plans.' ইহার তাৎপর্য

এইরূপ দাঁড়ায় যে, আমরা নবনব অস্ত্রের ব্যবহার দ্বারা আঘাত হানিবার শক্তির সমধিক উন্নতি সাধন করিয়াছি। বৈজ্ঞানিক তথ্যের সর্বশেষ আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করিয়া নূতন আণবিক অস্ত্রও আমাদের সামরিক পরিকল্পনার অঙ্গীভূত করিয়াছি। তার মানে আমরা বসিয়া নাই। অস্ত্রসজ্জা যতখানি সম্ভব তাহা সাজ-সজ্জা সম্পূর্ণই আছে—তবে কিনা?

যদ্য প্রাচ্যের মিশর, অস্ত্র-শস্ত্র মার্কিন দেশ হইতে ক্রয় করে নাই। ইহা মূলত অর্থনৈতিক স্বার্থের খাতিরে করে নাই। কিন্তু মার্কিন কূটনীতি এইরূপ সন্দেহ দোষে দুষ্ট যে, এই অস্ত্র ক্রয়ের মধ্যে কম্যুনিষ্ট প্রভাবের গন্ধ পাইয়াছে। টাকা বেশী দিয়া অস্ত্র না ক্রয় করিলেই রাজনীতি আসিয়া পড়িবে। কাজেই মার্কিন বন্ধুত্বও বিষম। সোভিয়েট শক্তিবর্গ হয়ত মার্কিনদের এমনই একটা মারাত্মক ভ্রমের প্রতীক্ষায় ছিল। তাহারা সরাসরি রাজী হইয়া গেল। আজ নিজেদের ভ্রম উপলব্ধি করিতে পারিয়া ইঙ্গ-মার্কিন কূটনীতি অনুতাপ করিতেছে। জেনেভায় কূটনীতির যে অভিনয় হইয়াছিল তাহার শেষ অঙ্ক এই সময় হইতেই আসিয়া পড়ে। এবং রাশিয়া আণবিক বোমা ফাটাইয়া এই অঙ্কের যবনিকা পাত করিল। বিশ্বের অন্যান্য কূটনীতিবিদ্‌দের তুলনায় রুশ কূটনীতিবিদ্‌দের এক মহা সুযোগ বর্তমান। তাহারা সব সময় একশ্রেণীর সর্বহারার হইয়া কথা বলিতে চাহে। কাজেই শোষণ নাই এমন দেশ নাই, আর শোষিত হয়না এমন জাতিও বড় দেখা যায়না। ধরুন ইংরেজ যখন রোমানদের আওতায় ছিল, তখন যদি কোন বিপ্লবী দেশ ব্রিটেনের স্বপক্ষে এবং রোমানদের উপনিবেশবাদের কথা বিরুদ্ধ বলিত তবে কি ইংরেজরা তুষ্ট হইতেন? মার্কিন কূটনীতিবিদেরা গোয়াকে—পর্তুগীজ এলাকা বলিয়া স্বীকার করিতে চাহিয়াছে, গোয়া ভারতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাহার সার্বভৌম অধিকার একদিন পর্তুগীজেরা অস্ত্রবলে হরণ করিয়াছিল। মার্কিন কূটনীতি তাহাকে সাময়িক সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের নিজেদের ইতিহাস পৌনে দুইশত বৎসর পূর্বে কি ছিল তাহা একবারও ভাবিয়া দেখে নাই। সেই সময় যদি ইংরেজ শক্তিকে সাধুবাদ দিয়া মহামান্য সম্রাটের প্রজা বলিয়া মার্কিনদের কেহ স্বীকার করিয়া লইত তবে কি মার্কিনরা তাহাদের উপর সন্তুষ্ট হইতেন? রুশ কূটনীতি আপন স্বার্থেই পর্তুগীজ উপনিবেশবাদের নিন্দায় করিয়াছে, মার্কিন কূটনীতি অনাবশ্যক গায় ধূলা মাখিলেন। ভারতকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়া মার্কিন এশিয়ার বিশ্বে খ্যাতি বৃদ্ধি করিলেন। ইহা রাজনীতির হিসাবের ঠিকে ভুল। শোনা যাইতেছে আণবিক বোমার বিশেষ কোন কাঁচা মালের জন্য পর্তুগীজ সরকার আফ্রিকার কোন অঞ্চল মেয়াদ বাড়িবার পরিবর্তে এই রাজনৈতিক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু 'গোয়ার' এই রাজনৈতিক স্বীকৃতি যে ভারতের ঘাড়ের উপর দিয়া আদায় হইল তাহা মার্কিন কূটনীতির বোঝা উচিত ছিল, তাছাড়া আর একটি বিষয় এখানে ভাবিয়া দেখা উচিত ছিল। এশিয়ার বন্ধুত্ব পাইতে হইলে ভারতের বন্ধুত্ব একান্ত কাম্য। Strategic raw materials সংগ্রহের ঝোঁকে পড়িয়া মার্কিনদের আর এক Strategy তে হার হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। আশা করি মার্কিন কূটনীতিবিদেরা একথা ভাবিয়া দেখিবেন।

সর্ব্বদাই পুরোভাগে

লক্ষ লক্ষ লোকের
ভবিষ্যৎ জীবনের আর্থিক দায়িত্ব ধারণ ও বহন
করিয়া ভারতীয় জীবনবীমার অগ্রগতির
পথে 'হিন্দুস্থান' সর্ব্বদাই পুরোভাগে রহিয়াছে।
যে আর্থিক সারবত্তা, সংহতি ও
সম্পত্তি-শক্তি হিন্দুস্থানের বৈশিষ্ট্য, ১৯৫৪ সালের
৪৮তম বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতেও তাহাই
পুনরায় প্রকাশ পাইয়াছে।

নূতন বীমা
৩০ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার উপর

মোট চলতি বীমা	১১০,৯৮,২০,৬৫৩৲
মোট সংস্থান	২৮,২০,৪৭,১৮৮৲
জীবনবীমা ও বিবিধ তহবিল	২৫,২২,৮৯,৪০০৲
প্রিমিয়ামের আয়	৪,৮৭,৯৫,৩৬৭৲
দাবী শোধ (১৯৫৪)	১,২৩,৩২,১৫৩৲

বোনাস
আজীবন বীমায়—১৭৷৷০
মেয়াদী বীমায়—৯৫৲
প্রতি বৎসর প্রতি হাজার টাকার বীমায়

লক্ষ লক্ষ বীমাকারীর ভবিষ্যৎ আর্থিক দায়িত্বের ধারক ও বাহক —

হিন্দুস্থান

কো-অপারেটিভ্ ইনসিওরেন্স সোসাইটি, লিঃ
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস ৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ কলিকাতা-১৩

• শাখা ও এজেন্সি : ভারতের সর্ব্বত্র ও বাহিরে •

পুস্তক পরিচয়

সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত : শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ। সরস্বতী লাইব্রেরী। ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—১৲।

কিশোরদের জন্য লেখা চন্দ্রগুপ্তের জীবনকথা। বইখানির বিশেষত্ব এই যে এতে কিংবদন্তী নয়, নানা ঐতিহাসিক তথ্য সযত্নে সংগৃহীত হয়েছে। শিশুপাঠ্য ও বালকপাঠ্য গ্রন্থে আমরা আজকাল খাদ্যের সঙ্গে যে পরিমাণ জল মেশাই, মানসিক পুষ্টির দিক থেকে বোধহয় তা বাঞ্ছনীয় নয়। এ বইখানিতে তেমন জলের আধিক্য নেই। চন্দ্রগুপ্তের জন্ম, পিতার মৃত্যুর পর তাঁর পাঞ্জাব গমনের উদ্যোগ, নির্যাতিত প্রজার পক্ষ সমর্থন, আলেক-জান্দারের সেনানিবাসে যুদ্ধশিক্ষা, গণতন্ত্রী সিন্ধুদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম দর্শন, চাণক্যের সহায়তায় মগধের সিংহাসন অধিকার, গ্রীকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, সেলুকসের পরাজয়, শাসন-ব্যবস্থা—সমস্ত কথাই সরল গল্পের মত করে লেখক বর্ণনা ক'রে গেছেন। ছোটদের উপযোগী এমন নিষ্কণ্টক অথচ সুখপাঠ্য গ্রন্থ সচরাচর চোখে পড়েনা। বহিঃসজ্জাও মনোরম।

সংসদ বাংলা অভিধান : শ্রীশৈলেন্দ্র বিশ্বাস এম্. এ. সংকলিত ও ডাঃ শ্রীশশিভূষণ দাসগুপ্ত, এম্. এ, পি-এইচ-ডি, সংশোধিত। সাহিত্য-সংসদ্, ৩২এ, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ৯। মূল্য— ৭৷৷০।

জিজ্ঞাসু পাঠক মাত্রই নির্ভরযোগ্য অভিধানের প্রয়োজন বোধ করেন। আর সচরাচর ব্যবহারের পক্ষে অভিধানখানি ক্ষুদ্রায়তন অথচ সারগর্ভ হলেই ভালো। পূর্বপ্রকাশিত সংক্ষিপ্ত অভিধানগুলির মধ্যে শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' এবং কাজি আবদুল ওদুদের 'ব্যবহারিক শব্দকোষ' উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য কোষগ্রন্থ পূর্বেকার ছোটবড় অভিধানগুলির সাহায্য নিয়ে সযত্নে সংকলিত হয়েছে। বিদেশী ভাষা থেকে নেওয়া শব্দ, বিশিষ্টার্থক শব্দ সমষ্টি এবং সম্প্রতি গৃহীত বহু পারিভাষিক শব্দ এতে স্থান পেয়েছে। পারিভাষিক শব্দ নিয়ে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ই এতে যোজিত হয়েছে। ব্যাক্তনামা লেখকদের রচনা থেকে শব্দ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত অর্থবোধে সহায়তা করবে। অল্প পরিসরের মধ্যেও এরূপ দৃষ্টান্ত সন্নিবেশ কৃতিত্বের পরিচায়ক। শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশেও সংকলয়িতা যত্ন করেছেন। মজবুৎ কিন্তু পাতলা কাগজে ছাপা হয়েছে বলে বইখানি দেখতে খুব বড় হয়নি। অথচ এর পৃষ্ঠা-সংখ্যা ন'শোর উপর। সাধারণতঃ প্রয়োজনীয় প্রায় সব শব্দই এতে সংগৃহীত হয়েছে। এমন কি, 'আউট' (out), 'আওল' (=আদিল), 'আওলাত' (=স্থাবর সম্পত্তি) প্রভৃতির মত শব্দও বাদ পড়েনি। লেখক, সাধারণ পাঠক এবং ছাত্রগণের পক্ষে অভিধান-খানি অত্যন্ত উপযোগী হয়েছে, সন্দেহ নেই।

শিল্পী : শ্রীতারাপদ রাহা। বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম—২৷৷০।

সিনেমা অভিনেত্রীর জীবন নিয়ে লেখা মনোজ্ঞ উপন্যাস। অভিনেতা অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত জীবন সাধারণের কাছে অস্পষ্ট। তা নিয়ে অনেকে জল্পনা-কল্পনা করে থাকেন। লেখক দেখিয়েছেন, তাঁদেরও আছে ভালোবাসবার, সংসার-সুখ উপভোগ করবার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। সুমিত্রার চরিত্র সুন্দর ফুটেছে। বিষয়ের নূতনত্বে এবং মনোবিশ্লেষণের নৈপুণ্যে কাহিনীটি মনকে আকর্ষণ করে।

বিদ্যাসাগর ও পরমহংস : শ্রীঅমল কুমার রায়। বসিরহাট, ২৪, পরগণা; মূল্য—২৲।

দু'জনই স্মরণীয় মহাপুরুষ, কিন্তু জীবন সম্বন্ধে

দুজনের দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র। সেই স্বাতন্ত্র্য রেখেছে লেখক উভয়ের মহত্ত্ব বর্ণনা করেছেন।

তপস্বিনী : শ্রীশরৎচন্দ্র প্রসন্ন সেন। প্রকাশক : শ্রীরাধিকা মোহন মুখোপাধ্যায়। ৪১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা ১৬। মূল্য—২৲।

লেখকের বক্তব্য, বাল্মীকির পরবর্তী রামায়ণ-সংক্রান্ত কাব্যে সীতার চরিত্রমহিমা ভালোভাবে ফোটেনি। এই নাটকে তিনি তপস্বিনী সীতার চরিত্র মনোমত করে আঁকতে চেষ্টা করেছেন। নাট্যরস ভালো জমেনি, কিন্তু ভূমিকাটি সারগর্ভ।

রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী : মুখোপাধ্যায়। শান্তি লাইব্রেরী, ১০বি, কলেজ রো, কলিকাতা ৯। মূল্য—২৲।

কাব্যরসিক অধ্যাপক গ্রন্থকার 'সোনার তরী' কাব্য-খানিকে নানা দিক থেকে দেখেছেন। অহং : আত্মা ; প্রকৃতি : প্রেম ; প্রেম : মানব ; মৃত্যু : জীবন এবং শিল্প : ছন্দ—বিভিন্ন অধ্যায়ের এই শিরোনামগুলি তার পরিচয় বহন করছে। তাঁর আলোচনা প্রাঞ্জল, সরল ও চিন্তাপূর্ণ। তত্ত্ববিচার যা আছে তাও কবিত্বময় হয়ে দেখা দিয়েছে। কাব্যব্যাখ্যার এমনি কবিত্বের সুরটি না লাগলে যেন আমাদের হৃদয় তৃপ্তিবোধ করেনা। এ আলোচনা পড়ে রসিকজন আনন্দ পাবেন, ছাত্রেরাও উপকৃত হবেন।

ভ্রম সংশোধন : মন্দিরার কার্তিক (১৩৬২) সংখ্যায় 'গ্যাংটক গ্যাংটক' নামক পুস্তকের সমালোচনায় অনবধানক্রমে একটি ভুল থেকে গেছে। আলোচনার প্রথম পংক্তি থেকে "অবদানশতক নাম দিয়া" অংশটি বাদ যাবে। তৎপরিবর্তে বসবে "শিশুদের জন্য"।

প্রাদেশিক সীমানা নির্দেশ :—

রাজ্যপুনর্গঠন আয়োগ (States Re-organisation Commission) যে কাজের জন্য নিযুক্ত হয়েছিল তা অত্যন্ত কঠিন এবং নানাবিধ মতবিরোধ এই বিষয়ে অবশ্যম্ভাবী। এই আয়োগের সুপারিশ নিয়ে নানা বিতর্ক উঠেছে ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সহস্থান হ'তে অনেক কটূক্তি এই আয়োগের সভ্যদের উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। এই সুপারিশে যে আমরা খুশী হইনি তা পূর্ববর্তী এক সংখ্যায় বলা হয়েছে। এই সুপারিশের যে দোষ ত্রুটি নেই তা হয়ত আয়োগের সভ্যগণও দাবী করবেন না। কেন্দ্রীয় সরকারও এই সুপারিশের মধ্যে নানাপ্রকার অদলবদল প্রয়োজন মনে করেছেন। গত প্রায় দেড়মাস যাবৎ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিশিষ্ট কয়েকজন সভ্য এই আয়োগের সুপারিশ নিয়ে নানাপ্রকার আলোচনা চালাচ্ছেন। এই ব্যাপারে বিভিন্ন প্রদেশের দাবী ও মতের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য সাধন করা তাতেও সম্ভব হয়নি। আমাদের মনে হয় দীর্ঘকাল বসে আলোচনা করার ফলে বিদ্বেষ ও তিক্ততা বরং অনেক বেড়েই যাচ্ছে। তাই কেন্দ্রীয় সরকার যে তাদের সিদ্ধান্ত সেদিন ঘোষণা করেছে সেটা মোটের উপর ভালই। তাদের ঘোষিত সিদ্ধান্তের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হ'ল আঞ্চলিক পরিষদ (Zonal Council)। ভারতবর্ষ একটা দেশ; এর সর্বত্রই নাগরিকের অধিকার সমান থাকা উচিত। কে কোন অঞ্চলে জন্মেছে বা কে কোন ভাষায় কথা বলে সেটা নাগরিক অধিকারের বিষয়ে বিচার্য নয়। এতদিন এ দারে বিভিন্ন রাজ্যে বা প্রদেশে যা ঘটেছে সে সম্বন্ধে রাজ্যপুনর্গঠন আয়োগ তীব্র মন্তব্য করেছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে এর প্রতিবিধান করা হবে এটা এখন প্রায় সুনিশ্চিত। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যে সন্দেহ ও বিদ্বেষের ভাব এই ভাষাজনিত কারণের জন্য বেড়ে উঠেছিল তা মূলতঃ ভারতীয় জাতীয়তার পক্ষে হানিকর। এর প্রতিকার করা বিশেষ দরকার, আমরা মনে করি এই আঞ্চলিক পরিষদ তা সাধন করতে পারবে। বর্তমানে বাংলার সংগে বিহার ও আসামের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত, অথচ এই তিনটি রাজ্যের মধ্যে সমস্বার্থের যোগ অনেক ক্ষেত্রেই আছে। বিরোধের বিষয় যা আছে তার চেয়ে অনেক বেশী বিষয় আছে মিলনের ও সৌহার্দ্যের। আমরা আশা করি আঞ্চলিক পরিষদ বিরোধের বিষয়গুলি মীমাংসা করতে পারবে এবং সমস্বার্থের যোগে বিভিন্ন প্রদেশ বা রাজ্যের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধন সৃষ্টি করবে।

রাজ্যপুনর্গঠন আয়োগ যে ভাবে সুপারিশ করেছিল তাতে প্রত্যেকটি রাজ্য মোটামুটি স্ব স্ব—প্রধানভাবে গঠিত ও চালিত হত এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগ ও মৈত্রী স্থাপনের কোন প্রয়াসই এতে ছিল না। লোক-সভায় যখন প্রধান মন্ত্রী এই প্রস্তাব প্রথম উত্থাপন করেন তখন সভ্যগণ বিশেষভাবে এই প্রস্তাবের সমর্থন জ্ঞাপন করেন; দীর্ঘসময় পর্যন্ত সমর্থনসূচক হাততালির ধ্বনিতে সভাগৃহ মুখরিত হতে থাকে। সরকারী ইস্তাহারে বলা হয়েছে পাঁচটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হবে। পূর্বঅঞ্চলের অন্তর্গত থাকবে—বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবাংলা, আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরা। এ ভিন্ন আরও চারটি অঞ্চলে সমস্ত ভারতবর্ষকে ভাগ করা হয়েছে।—

উত্তর অঞ্চল, মধ্য অঞ্চল, পশ্চিম অঞ্চল, ও দক্ষিণ অঞ্চল। সরকারী ইস্তাহারে আরও বলা হয়েছে যে ভবিষ্যতে বিভিন্ন রাজ্য অঞ্চলের একই রাজ্যপাল (Governor) এবং একই প্রধান বিচারক (High Court Judge) ও একই কর্মচারী নিয়োগ অধিকার (Public Service Commission) স্থাপন করার কথাও কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তা করেছে। আশা করি কেন্দ্রীয় সরকারের এই ইচ্ছা অনেক ক্ষেত্রেই কার্যে পরিণত হবে; যদিও আঞ্চলিক পরিষদকে নিতান্তই উপদেষ্টা সংস্থা করা হবে তবুও আমরা মনে করি ক্রমেই এই পরিষদ অনেক ব্যাপারে কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

রাজ্য পুনর্গঠন আয়োগের নিকট—পশ্চিম বাংলা হ'তে আসাম ও বিহারের অনেক অঞ্চল দাবী করা হয়েছিল। বাংলার দিক থেকে দেখতে গেলে সে দাবীর যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না; তেমনি বিহার ও আসামেরও ঐ সম্বন্ধে কিছু বলার থাকতে পারে। তবুও আমরা মনে করি দেশবিভাগজনিত অবস্থা বিবেচনা ক'রে বাংলার প্রতি সহানুভূতি মূলক ব্যবস্থা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একথাও মনে রাখা উচিত যে প্রতিবেশী প্রদেশ বা রাজ্যের মনোভাবকে একবারেই উপেক্ষা করে চলা বা কিছু করা কোন প্রদেশেরই উচিত নয়। আয়োগ বিহার থেকে কতকঅংশ বাংলাকে দেওয়ার সুপারিশ করেছিল। বিহার তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার মোটামুটী সেই সুপারিশ বজায় রেখেছে; অল্প একটু অঞ্চল (প্রায় ৪০০ বর্গ মাইল) তার থেকে কেটে বিহারের অন্তর্গত রাখা সাব্যস্ত করেছে, এই অঞ্চল প্রায় ৪০ বছর পূর্বে বাংলা থেকে বিহারের অন্তর্গত করা হয়। এর মধ্যে—বাংলা থেকে এসব অঞ্চল ফিরে পাবার জন্য বিশেষ কোন আন্দোলন বা দাবী করা হয়নি। আজকে যে এই দাবী বাংলায় উঠেছে তার প্রধান কারণ হল বিহার গভর্ণমেণ্টের ভাষামূলক কিছু নীতি ও আচরণ।

আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হ'লে সেই সব দুষ্কীয় নীতি ও আচরণ সংশোধন হবে সেটাই আমরা আশা করি। এবং আমাদের মনে হয় এতে কোন সংশয়ের কারণ নেই। নাগরিক অধিকারমূলক (Citizenship) আইনও ইতিমধ্যে পাশ করা হয়েছে। সমস্ত ভারতে এই নাগরিক অধিকার প্রচলিত থাকবে, সরকারী ইস্তাহারে সে সম্বন্ধে আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমরা আশা করি যে অবস্থার দরুণ ঐ সব অঞ্চল ফিরে পাবার দাবী করা হয়েছিল তার মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হবে। পঃ বাংলার পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হচ্ছে উত্তরবঙ্গের সাথে যোগ সাধন করা। রাজ্য পুনর্গঠন আয়োগে সে জন্য পূর্ণিয়ার অন্তর্গত কিষণগঞ্জ অঞ্চলকে পঃ বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে কথা উঠেছিল যে কিষণগঞ্জ অঞ্চল বাংলাকে দেওয়া হবে না, কারণ ওখানকার মুসলমান অধিবাসীরা বাংলায় যেতে রাজী নয়, পুরুলিয়া থেকেও অনেকখানি অংশ কেটে রাখা হবে এমনকথাও উঠেছিল। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ও পশ্চিম বঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ এই জন্য দিল্লী যান। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহও দুজন সহচর সহ ঐ তারিখে দিল্লী যান। উভয় পক্ষের সংগে আলোচনা করার পর কেন্দ্রীয় সরকার যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছে তা সহজভাবে মেনে নেওয়া আমাদের উচিত। এই দুই রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে কোন পারস্পরিক বিরোধ থাকলে তা মীমাংসার একমাত্র পন্থা হল—উভয় পক্ষকে কিছুটা দাবী ত্যাগ করতে হবে। স্ব স্ব দাবী নিয়ে জিদ্ করে বসে থাকলে একসঙ্গে একই রাষ্ট্রের অন্তর্গত হয়ে বাস করা চলে না। বিশেষ করে যেখানে বিহার ও বাংলার মধ্যে স্বার্থের যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সেখানে আপোষের রাস্তা না নিলে উভয় রাজ্যের পক্ষে তা আত্মঘাতী হয়। পশ্চিম বাংলা মোটের উপর বিহার থেকে তিনহাজার বর্গমাইল জমি নিয়েছে। বিহার এতে কষ্ট হবে এ খুব স্বাভাবিক।

বাংলা আরও জমি পায়নি বলে দুঃখিত হয়েছে এও আমরা জানি। তবুও উভয় রাষ্ট্রের উচিত, এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে পারস্পরিক মৈত্রী ও সহযোগিতার পথে অগ্রসর হওয়া।

যে পাঁচটি অঞ্চল গঠনের প্রস্তাব হয়েছে তন্মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদে ও ইণ্ডাষ্ট্রীর উন্নতির সম্ভাবনায় পূর্ব-অঞ্চলই সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। ভারতীয় মোট ইণ্ডাষ্ট্রির সংস্কার মধ্যে—প্রায় অর্ধেক ঐ অঞ্চলে এখনও আছে। দুটি ইস্পাত কারখানা ঐ অঞ্চলে নূতন স্থাপিত হচ্ছে—রুড়কেলায় ও দুর্গাপুরে, এর পরবর্তী ইস্পাত কারখানা ঐ অঞ্চলে সিন্ধ্রিতে স্থাপিত হবে। মোটের উপর ইস্পাত ও কয়লা প্রায় সবই ঐ অঞ্চলে, চা ও পাট সবটাই ঐ অঞ্চলে; অভ্র, লাক্ষা, তেল—তাও ঐ অঞ্চলে। ভারতের মধ্যে সব চেয়ে বড় বন্দর কলিকাতা ঐ অঞ্চলে। ভারতের সমগ্র যান্ত্রিক কারখানার (engineering factories) মধ্যে বোধ হয় অর্ধেকের বেশী ঐ অঞ্চলে। এর মধ্যেও আবার পশ্চিমবাংলা ও বিহারের মধ্যে ঐ সব সম্পদ সব চেয়ে বেশী। তাই ঐ অঞ্চলের বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার ও বিহারের অধিবাসীদের উচিত ধীর স্থির ভাবে আঞ্চলিক উন্নতি সাধনে মন দেওয়া। ঐ দুই রাজ্যেই হয়ত বর্তমান মীমাংসায় জনমত ক্ষুব্ধ হবে; কিন্তু বৃহত্তর মঙ্গলের দিকে তাকিয়ে এইসব সাময়িক বিক্ষোভকে দমন করা উচিত। ঐ দুইরাজ্যে প্রতিনিধি-মূলক বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও দল যেন সহজভাবে এই মীমাংসাকে মেনে নেয়। তাতেই ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের ও সমগ্রভারতের মঙ্গল সাধিত হবে।

পাকিস্তানের সংবিধান :

বহু প্রয়াসের পর পাকিস্তান সংবিধানের খসড়া গণপরিষদের নিকট উপস্থিত করা হয়েছে। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান একই সংগে স্বাধীন হয়। আজ পাঁচ বছর হল ভারতের সংবিধানগঠিত হয়েছে ও চালু হয়েছে আর পাকিস্তান এখনও তার সংবিধান রচনার কাজে নিয়োজিত আছে। যে চিন্তাধারা ও মানসিক আবেষ্টন থেকে পাকিস্তানের জন্ম তাতে তার সংবিধান রচনা এক হিসাবে অনেকটা সহজ ও তাড়াতাড়ি হওয়া উচিত ছিল. কিন্তু দলগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসংবাদের জন্য এই কাজে তারা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি। প্রথম গণপরিষদ এই কাজ সম্পন্ন করতে পারেনি, তাকে ভেঙে নূতন গণপরিষদ গঠন করা হয়েছে সংবিধানের জন্য। এই গণপরিষদে মুস্লিমলীগ দলের সংখ্যাধিক্য নেই, তাই পূর্ব-বাংলার যুক্তফ্রন্ট দলের সংগে মিলে এক সংযুক্ত মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করা হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট দলের মধ্যে অমুসলমান সভ্য অনেক আছেন সংযুক্ত মন্ত্রীমণ্ডলী গঠনের পূর্বে উভয় দলের মধ্যে সংবিধান সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয়ে একটা চুক্তি হয় সেই চুক্তির মূলসর্ত ছিল এইরূপ :

প্রাদেশিক সরকারের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকবে এবং মাত্র তিন চারিটি বিষয়ের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে। যেমন—

(ক) প্রতিরক্ষা (Defence)

(খ) বৈদেশিক ব্যাপার (External Affairs)

(গ) মুদ্রা (Currency)

যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তন হবে।

ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে।

বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকার করা হবে।

সংবিধানের যে খসড়া প্রকাশিত হয়েছে তাতে এক বাংলা ভাষার স্বীকৃতি ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে এই সর্তগুলি মানা হয়নি।

পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে অমুসলমান প্রায় নেই বললেই চলে, পূর্বাংশে এখনও শতকরা প্রায় ২০।২২ জন অমুসলমান বা হিন্দু আছে। মোট জনসংখ্যার মধ্যে অমুসলমানের সংখ্যা হয়ত শতকরা ১০।১২ জনের বেশী হবেনা। এবং সেভাবে হিন্দু পূর্ব বাংলা থেকে এখনও বেরিয়ে আসছে তাতে এই অনুপাতও বজায় থাকবে না। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট যে বরাবর মুসলমান

হবে এতে কোন সংশয়ের কারণ নেই কিন্তু তবুও সংবিধানে বিশেষ ক'রে বলা হয়েছে রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি মুসলমান ভিন্ন কেউ হতে পারবে না। এই বিশেষ বিধানের ফলে পাকিস্তানের সমগ্র অমুসলমান অধিবাসীদের প্রতি যে ঘৃণা ও অবিচারের রূপ দেওয়া হচ্ছে সেটাই এই উপসংহারের বলার কথা।

আরও বলা হয়েছে যে কোরান ও সান্নাহের সংগে মিল না থাকলে বা ইসলাম ধর্মে অনুমোদিত না হলে কোন আইন পাকিস্তানে চালু হতে পারবে না। সংবিধানের এই ধারার ফলে সমাজ-সংস্কার মূলক কোন আইন পাশ হওয়া পাকিস্তানে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। এমন কি অর্থনৈতিক অনেক আইনও এই বিধানের ফলে বাতিল হতে পারবে। বর্তমান যুগের কোন রাষ্ট্র এমনি করে নিজেদের অগ্রগতির পায়ে শৃঙ্খল পরাতে রাজী কিনা সন্দেহ। খৃষ্টিয় রাষ্ট্রসমূহ বাইবেলের দোহাই দিয়ে সমাজ-সংস্কারমূলক ব্যবস্থার পথে বাধার সৃষ্টি করেনি; ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখযোগ্য।

পূর্ববাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটা বিরোধ ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে। কতকটা পূর্ব বাংলাকে কাবু রাখার জন্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ সমূহের অস্তিত্ব ঘুচিয়ে এক পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশে পরিণত করা হয়েছে তাতে পূর্ব বাংলার মনে সন্দেহ আরও প্রবল হয়ে উঠেছে। তাই তারা দাবী করছিল প্রাদেশিক সরকারের হাতে পর্যাপ্ত ক্ষমতা থাকবে, কিন্তু সে দাবী এই সংবিধানে রক্ষা করা হয়নি। পূর্ব বাংলায় ইতিমধ্যেই বিক্ষোভ সুরু হয়েছে। মুসলমান জনতার বিক্ষোভ ভিন্নও পূর্ব বাংলার বিধান সভায় ও কেন্দ্রীয় গণপরিষদে যে সব হিন্দু সভ্য আছে তারাও খসড়া সংবিধানের বিরুদ্ধে তীব্র মনোভাব জ্ঞাপন করছে; সংযুক্ত দল ত্যাগ করার নোটিশ পর্য্যন্ত তাদের অনেকে দিয়েছে। এইসব অমুসলমান সভ্যগণ যদি যুক্তফ্রন্টদল ত্যাগ করে তাহলে পূর্ব বাংলায় ও কেন্দ্রে নন্দীমণ্ডলীর পতন প্রায় অনিবার্য। সে অবস্থায় এই খসড়া সংবিধানের পরিণতি কি হবে বলা যায়না।

মোটের উপর এই খসড়া সংবিধান আধুনিক যুগের ভাবধারায় অনুমোদিত নয় এবং গণতান্ত্রিক নীতির সাথে সংগতিও এর নেই। গণতন্ত্রের মূলকথা হল প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তি সমান ভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হবে। তাদের প্রত্যেকে স্ত্রী পুরুষ ও জাতি ধর্ম নির্বিশেষে একযোগে প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। এই সংবিধানে এই নীতির মর্যাদা রক্ষা করা হয়নি। তাছাড়া পাকিস্তানের ভৌগোলিক ও মানসিক আবেষ্টনের জন্য যে সব সমস্যার উদ্ভব হতে পারে, তাও বাস্তব দৃষ্টিতে স্বীকার করা হয়নি। এই রাষ্ট্রের পূঃ ও পঃ অঞ্চলকে একই সংগে বাঁধা বা একই সংগে ছুড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। পঃ পাকিস্তানের অধিবাসীরা পূঃ বাংলাকে তাদের উপনিবেশ হিসেবে দেখতে চায় এবং সেখানকার অধিবাসীদের অবজ্ঞার চোখে দেখে। গত ৭।৮ বছরের অভিজ্ঞতায় পূঃ বাংলার মুসলমান জনতা পঃ পাকিস্তান সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে সন্দিগ্ধমনা ও শংকিত হয়েছে। এ সত্যকে অস্বীকার করে সংবিধান রচনা করলে সে সংবিধান পূঃ বাংলার অধিবাসীরা সহজ ভাবে গ্রহণ করবে কিনা সন্দেহ। কেবল ধর্মের দোহাই দিয়ে তাদের ভুলিয়ে রাখা এখন সহজ নয়। সাধারণতঃ পৃথক নির্বাচন দাবী করে সংখ্যা লঘিষ্ঠ; পাকিস্তানে তার উল্টো দৃষ্টান্ত দেখতে পাই কারণ সংখ্যা গরিষ্ঠরা পৃথক নির্বাচন দাবী করছে। এর কারণ ধর্মবিদ্বেষ জীইয়ে রেখে দরকার মত ধর্মের দোহাই দেওয়ার পথ রাখা।

আজ পাকিস্তানের প্রধান সমস্যা অর্থনৈতিক। বিশেষ করে পূঃ বাংলায় এ সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। এই সংবিধান রচয়িতারা সে সমস্যার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে দৃষ্টি দিয়েছেন ধর্মান্ধতাকে দীর্ঘজীবী করার দিকে।

তাই এ সংবিধানের ভবিষ্যত সম্বন্ধে লোকের মনে সংশয় জাগবে। আর পূর্ব বাংলার লোকেরা এই সংবিধানকে সাধারণ ভাবে গ্রহণ করছেন এই জন্যেই।

পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দু নিষ্ক্রমণের কারণ

পূঃ বাংলার আওয়ামী লীগের নেতা মৌলানা ভাসানী

সম্প্রতি এক ভাষণে বলেছেন যে অর্থনৈতিক কারণেই পূঃ বঙ্গ থেকে হিন্দুরা পঃ বাংলায় চলে আসছে। তিনি বলেছেন যে পূঃ বাংলার আর্থিক অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়েছে যে মানুষের জীবন ধারণ সেখানে কষ্টসাধ্য। হিন্দুরা মনে করে যে ভারতবর্ষে এসেই তাদের এই ভাত-কাপড়ের দুঃখ অনেকটা ঘুচবে, তাই তারা দলে দলে পঃ বাংলায় বা আসামে চলে যাচ্ছে। মৌলানা সাহেব আরও বলেছেন যে অনেক মুসলমানও এই অর্থনৈতিক কারণে পূঃ বাংলা ত্যাগ করে ভারতে চলে আসছে।

পাকিস্তানের ভারতস্থ রাষ্ট্রদূত রাজা গজনফর আলীও কতকটা এমনি ধরণের কথা বলেছেন। পাকিস্তানের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা যে শোচনীয় একথা অবশ্য তিনি বলেন নি। তবে তিনি বলেছেন উদ্বাস্তুদের এখানে যে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় তাতে প্রলোভিত হয়েই হিন্দুরা পাকিস্তান ত্যাগ করছে। সাধারণতঃ উদ্বাস্তুদের গৃহ নির্মাণের জন্য ৪০০৲ টাকা, চাষ ও ব্যবসা বাণিজ্যের বাবদ ৭০০ টাকা এই মোট ১২০০ টাকা দেওয়া হয়। এই ১২০০ টাকার লোভে নিজেদের বাড়ী ঘর ও বিষয় সম্পত্তি ত্যাগ করে লোক যদি চলে আসে তাহলে তার মূল এখানকার ১২০০ টাকার প্রলোভন নয় ওখানকার আর্থিক দুর্গতি। যে সব উদ্বাস্তু ৩।৪ বছর পূর্বে পঃ বঙ্গে বা আসামে গিয়েছে তাদের শতকরা ৯০ ভাগ এখনও দুঃস্থ জীবন যাপন করছে। এরা অনেকেই মাঝে মাঝে পূর্ব বাংলায় যায় এবং এখানকার দুঃস্থ জীবনের কাহিনী তাদের আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবাসীদের নিকট অবশ্যই তারা প্রকাশ করে। কাজেই এখানে যে খুব একটা সুখের আশা নেই তা পূঃ বাংলার হিন্দু অধিবাসীরা প্রায় সকলেই জানে।

কিন্তু সুখ-দুঃখ সব সময়েই তুলনামূলক। পাকিস্তানের জীবন যখন তাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠে তখনই এখানকার এই ১২০০ টাকার প্রলোভন তাদের মোহিত করতে পারে।

রাজা গজনফর আলীর পরামর্শ হল ভারত সরকার আর যেন কোন উদ্বাস্তু গ্রহণ না করে। তাতে তাঁর রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার অনাচার ও অপকর্মের একটা আবরণ হয়ত হবে; কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে যদি আজকালকার রাষ্ট্র গঠিত হয় তার মর্যাদা রক্ষায় ভারতবর্ষের গুরুতর ত্রুটি হবে। ভারত ও পাকিস্তানের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতির কথা বাদ দিলেও বর্তমান সভ্য সমাজে ও সভ্য রাষ্ট্রের স্বীকৃত নীতিকে ভারতবর্ষ অগ্রাহ্য করতে পারেনা। কোন রাজ্যে কোন শ্রেণীর প্রতি ধর্ম বা রাজনৈতিক কারণে জুলুমের ফলে যদি সেখানকার অধিবাসীরা অন্য রাজ্যে আশ্রয় নিতে চায় তাহলে প্রতিবেশী রাজ্য সে আশ্রয় দেয়। আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু সমস্যা সমাধানের জন্য তার একটি বিশেষ সংস্থা স্থাপন করা হয়েছে।

মৌলানা ভাসানীর অভিমত মূলতঃ সত্য এবং সদিচ্ছা প্রণোদিত, কিন্তু সবটা সত্যই তাঁর এই উক্তির মধ্যে নিহিত নেই। তিনি যদি একটু তলিয়ে দেখেন তাহলে উপলব্ধি করবেন যে পাকিস্তানের সমস্ত শাসনযন্ত্র অমুসলমানদের বিরোধী। পূঃ বাংলায় প্লাবন হল, তার পর সরকারী সাহায্য বিতরণের সময় দুঃস্থদের ধর্ম বিচার করে সাহায্যের তারতম্য করা হল। একথা আজ সর্বজন বিদিত যে দরিদ্র পীড়িত মুসলমান হিন্দুর সম্পত্তি লুণ্ঠন করলে সে হিন্দু কোন প্রতিকার পাবেনা। হিন্দুনারীর মর্য্যাদা হানি করলে অপরাধীকে দণ্ড দেওয়ার তেমন আগ্রহ সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দেখা যায় না। ব্যবসায়-বাণিজ্যে হিন্দুদের ক্ষেত্র ক্রমেই সঙ্কুচিত হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও হিন্দুদের মনোভাব ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতি কোন সম্মান দেখান হয়না। একথা ঠিক যে আজ হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোন পাইকারী দাঙ্গা-হাঙ্গামা নেই কিন্তু ছোট খাট জুলুম অনবরত চলেছে এবং তার কোন প্রতিকার নেই।

মৌলানা ভাসানী একজন প্রকৃত জননেতা, তাঁর এটা বোঝা উচিত যে ধর্মভিত্তিতে কোন রাজ্য আজকাল চলতে

অবস্থার তুলনা খুবই স্বাভাবিক। তারা যখন পূ: বা লাদ নানারকমের উন্নয়ন কার্য হচ্ছে এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রা অনেকটা সহজ ও সচ্ছল তখন নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য পূ: বাংলার দিকে আসবার প্রলোভন তাদের মনে হবে স্বাভাবিক। এখানে হিন্দু মুসলমানের কোন পার্থক্য নেই, কেবল মুসলমানরা এলে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সাহায্য তারা পাবেন না। কিন্তু পাঁচে ছোট খাট ব্যবসা বাণিজ্য করে দিন যাপন করার পথ তাদের কাছে উন্মুক্ত। মৌলানা সাহেব আশঙ্কা করেছেন যে অনেক মুসলমানও পাকিস্তান থেকে ভারতবর্ষে আসছে। এতে ভারতবর্ষের আর্থিক দায়িত্ব বাড়ছে। কিন্তু এটা ভারতের গৌরবের কথা যে পূ: পাকিস্তানের মুসলমান অধিবাসীরাও এখানে এসে জীবিকা নির্বাহ করছে বা এখানে আসবার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে।

৩৫৮
শুধু হিন্দু নয়
আসছে ও আসবে।

পূ: ও পূ: বাংলার মধ্যে যোগাযোগ আজও বেশ রয়েছে, ৫ বছর পূর্বে এই দুটি একই একই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল পূ: বাংলার অবস্থার সঙ্গে পূ:

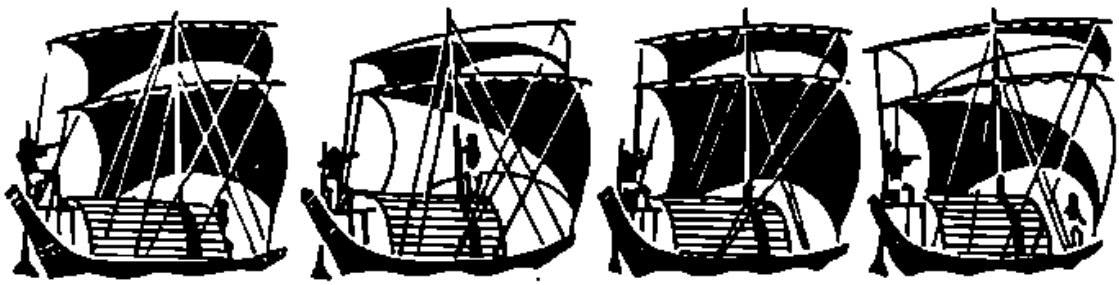

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

মন্দিরা

অষ্টাদশ বর্ষ | মাঘ—১৩৬২ | দশম সংখ্যা

প্রমথ নাথ বসু

শ্রীনলিনী কুমার ভদ্র

বৎসর দশেক পূর্বে জামশেদপুরে অবস্থানকালে প্রমথনাথ বসুর আবক্ষ প্রস্তরমূর্তি দেখিতে পাই এবং টাটার কারখানা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে তাঁহার সম্পর্কের কথা জানিতে পারি। কিন্তু এই লোকান্তরিত কৃতী বাঙালী সম্বন্ধে স্থানীয় শিক্ষিত লোকদের ঔদাসীন্য দেখিয়া মনে বেদনা অনুভব করিয়াছিলাম। ভারতে লোহা এবং ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জে. এন টাটার উত্তরসাধকগণ যখন মধ্য প্রদেশের লৌহপ্রস্তর (Iron-ore) সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছিলেন তখন প্রমথনাথই ময়ূরভঞ্জের গরু-মহিষানী পাহাড়ে লৌহপ্রস্তরের বিদ্যমানতার কথা জানাইয়া তাঁহাদিগকে পত্র লেখেন। তার পর টাটা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের পূর্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্বক কি ভাবে সিংভূম জেলার সাকচিতে ক্রমে ক্রমে এশিয়ার বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা গড়িয়া তোলেন সে এক পরম চিত্তাকর্ষক কাহিনী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই কাহিনীর যিনি মধ্যমণি, ভারতের শিল্পায়নের ইতিহাসে যাঁহার নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে জাজ্বল্যমান থাকিবার যোগ্য, সেই বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসুর কোনো জীবনী না থাকায় তাঁহার গৌরবোজ্জ্বল জীবন-কথা অবগত হইবার কোনো উপায় তখন ছিল না। এক মহাজীবনের অমূল্য ঘটনাবলী যে ধীরে ধীরে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইতে চলিয়াছিল সে সম্বন্ধে প্রমথনাথের দেশবাসী আমরা ছিলাম না।

প্রমথনাথ রাঁচিতে পরলোক গমন করেন ১৯৩৪ সালের ২৭শে এপ্রিল তারিখে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁহার একখানি সংক্ষিপ্ত জীবনীও যে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা আমাদের পক্ষে ঘোর লজ্জার কথা। এই ভূবিজ্ঞানী এবং মনীষীর মহাপ্রস্থানের বাইশ বৎসর পরে তাঁহার একখানি পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রণয়ন করিয়া বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল শুধু যে এর পুণ্যতিথি সম্পাদন করিয়াছেন তাহা নহে আত্মবিস্মরণের অভিশাপে অভিশপ্ত বাঙালী জাতির কলঙ্ক ক্ষালন করিয়া দেশবাসীকে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুস্তকের উপকরণ সংগ্রহে তিনি প্রমথনাথের কন্যা শ্রীযুক্তা সেনের নিকট হইতে সহায়তা লাভ করিয়াছেন। যোগ্য ব্যক্তির উপরেই যে প্রমথনাথের জীবনী রচনার ভার অর্পিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশ এবং কৃতী বাঙালীদের সম্বন্ধে দীর্ঘকাল যাবৎ গবেষণায় নিরত থাকিয়া যোগেশবাবু বাংলাসাহিত্যে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ও বাঙালী সম্বন্ধে তাঁহার মত প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। আমাদের মাতৃভূমির সর্বাঙ্গীণ উন্নয়ন-কল্পে প্রমথ-

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কাজেই ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যে সামাজিক পটভূমিকায় প্রমথনাথের জীবন গৌরবোজ্জ্বল মহিমায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সহিত পরিচিত না হইলে এই বৈজ্ঞানিক-মনীষীর জীবন-সাধনার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে যোগেশবাবুর বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়ন এবং মননশীলতা এই জীবনীগ্রন্থকে একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে এবং ইহাতে প্রমথ নাথের ব্যক্তি-জীবনের স্বরূপ উদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অনুশীলন এবং শিল্পায়নের ইতিহাসের ধারাটিও অনুসৃত হইয়াছে।

কি বিচিত্র কর্মময় গৌরবদীপ্ত জীবন প্রমথনাথের! গোবরডাঙার সন্নিহিত গৈপুর গ্রামে ১৮৫৪ সালের ১২ই প্রমথনাথের জন্ম। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণনগর কলেজে সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসে অধ্যয়ন কালে উচ্চশিক্ষা লাভার্থে বিলাত যাত্রার সংকল্প তাঁহার মনে উদিত হয়। ১৮৭৪ সালে তিনি গিলক্রাইষ্ট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার পূর্বক পাঁচ বৎসরের জন্য বৃত্তিলাভ করিয়া অক্টোবর মাসে বিলাত যাত্রা করেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উচ্চতর অধ্যয়নসহ অধ্যয়ন এবং বৈজ্ঞানিক শিক্ষার মাধ্যমে দেশের শিল্পের পুনরুজ্জীবন এই দুই আকাঙ্ক্ষাই প্রমথনাথকে বিজ্ঞান সাধনার পাদপীঠ পাশ্চাত্যে গিয়া বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণে প্রণোদিত করিয়াছিল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সঙ্গে বি এস সি পাস করিয়া অধিকতর শিক্ষালাভের জন্য তিনি রয়্যাল স্কুল অব মাইনস-এ—যাহা পরবর্তী কালে "রয়্যাল কলেজ অব সায়েন্স" নামে পরিচিত হয়—ভর্তি হন। এখানকার পরীক্ষাগুলিতে অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া তিনি অধ্যাপকমণ্ডলীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা অর্জন করিতে সমর্থ হন। ইংলণ্ডে থাকিতেই প্রমথনাথ ১৮৮০ সালের ১৩ই মে ভারত সরকারের জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়াতে যোগদান করেন এবং ছয় বৎসর বিলাতে অবস্থানের পর এই বহুমূল্য ধারণা লইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন যে, তাঁর স্বদেশে শিল্পের পুনরুজ্জীবন করিতে হইলে দেশবাসীকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ১৮৮১ সালে রমেশচন্দ্র দত্তের ভবনে তিনি তাঁহার কন্যা কমলাকে দেখেন এবং তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন। ১৮৮২ সালের ২৪শে জুলাই তারিখে কমলার সহিত তাঁহার বিবাহ অনুষ্ঠান বিশুদ্ধ হিন্দুমতে সম্পন্ন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র ও যুবক রবীন্দ্রনাথ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

১৮৮০ সালের ৩০শে জুলাই প্রমথনাথ জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার এসিস্ট্যাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রূপে কর্মে যোগদান করেন। স্বীয় কর্মদক্ষতার গুণে ক্রমশঃ তাঁহার উন্নতি হইতে থাকে। ১৮৮৭ সালে আগষ্ট মাসে তিনি সেকেণ্ড গ্রেড ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে উন্নীত হন। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার কার্যকালে তথা প্রদেশের সোনাপুর জঙ্গলপুর, হিমালয় অঞ্চলে দার্জিলিং, আসামের খাসিয়া, জৈন্তা পাহাড়, এমন কি সুদূর ব্রহ্ম দেশের টেনাসেরিম অঞ্চলে খনিজ বিশিষ্টপ্রস্তর (ore) ইত্যাদি আবিষ্কার করিয়া প্রমথনাথ প্রতিষ্ঠালাভ করেন। এমনি ভাবে সুদীর্ঘ তেইশ বৎসর কাল সরকারী কর্মে নিয়োজিত থাকিয়া ১৯০৩ সালে প্রমথনাথ অবসর গ্রহণ করেন।

সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের দেওয়ান মোহিনী মোহন ধরের চেষ্টায় প্রমথনাথ উক্ত রাজ্যে খনিজ দ্রব্যের অনুসন্ধান কার্যে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার জীবনে আসিল অবিস্মরণীয় কীর্তি অর্জনের সুবর্ণযোগ। ১৯০৩-৪ সালের শীতকালে গরুমহিষানী পাহাড়ের পাদদেশে এবং ঢালু অংশে তিনি আবিষ্কার করিলেন লৌহ প্রস্তরের অফুরন্ত ভাণ্ডার। এই যুগান্তরকারী আবিষ্কারের উপর ভিত্তি করিয়া টাটা কোম্পানির কর্তৃপক্ষ জামশেদপুরে প্রতিষ্ঠা করিলেন তাঁহাদের লৌহ এবং ইস্পাতের কারখানা। আযৌবন দেশের শিল্পোন্নয়নের যে স্বপ্ন প্রমথনাথ দেখিয়া আসিতেছিলেন, অবশেষে তাহা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করিল—প্রমথনাথ অমর কীর্তি অর্জন করিয়া মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল করিলেন—বিংশ শতাব্দীতে ভারতের বৃহত্তম শিল্প প্রচেষ্টার সঙ্গে তাঁহার নাম বিজড়িত হইয়া রহিল অবিচ্ছেদ্য ভাবে। শুধু গরুমহিষানীর লৌহ-প্রস্তর আবিষ্কারই প্রমথনাথকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে, কিন্তু ইহা তাঁহার বহুমুখী কর্ম প্রচেষ্টার একটি দিক মাত্র, আরো বহুক্ষেত্রে অগ্রণী হইয়া বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তিনি যে জাতিকে নূতন পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন সে কথা আমরা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। যোগেশবাবু বিপুল পরিশ্রমে বিভিন্ন সূত্র হইতে তথ্য-রাজি সমাহরণ পূর্বক যে জীবনালেখ্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে আমরা দেখিতে পাই—প্রমথনাথ শুধু একজন

শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীই ছিলেন না। তিনি ছিলেন মনীষী, চিন্তানায়ক মহাপণ্ডিত, স্বদেশ প্রেমিক এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিক আদর্শে আস্থাবান এক বিরাট পুরুষ। স্বদেশপ্রেমে তাঁহার হৃদয় ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ এবং জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভ হইতেই তিনি স্বদেশী শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টার কথা প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। বর্তমান যুগের সঙ্গে সমান তালে চলিতে হইলে যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দ্বারা কাপড়ের কল প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্পের প্রসার সাধন করিতে হইবে সে কথা ১৯০৫ সালেই দেশবাসীকে তিনি স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতীয় সংস্থা বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠায় প্রমথনাথের যে অনেকখানি হাত ছিল, তিনি যে ইহার অনারারী প্রিন্সিপাল ছিলেন, এবং পরে ইহার ডিরেক্টর নিযুক্ত হইয়াছিলেন এ সকল কথা হয়ত আজ অনেকেরই জানা নাই। এই বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটই, ১৯২৯ সালের যে মাসে "কলেজ অব ইঞ্জিনীয়ারিং এণ্ড টেকনোলজি যাদবপুর," রূপে নামান্তরিত হইয়া আজ শুধু বাংলায় নহে সমগ্র ভারতে যন্ত্রশিল্প শিক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে।

কিন্তু প্রমথনাথের প্রকৃত মাহাত্ম্য এই খানে যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অনুরাগী এবং দেশে যন্ত্রশিল্পের প্রসার সাধনে একান্ত উদ্যোগী হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভারতের চিরন্তন আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই। তাঁর কর্মবহুল জীবনে গ্রন্থ রচনার বিরাম ছিল না, অর্ধ শতাব্দীরও উর্ধ্বকালযাবৎ অবিশ্রান্ত ভাবে লেখনী চালনা করিয়া তিনি দেশবাসীকে ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগসম্পন্ন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। নবজীবন ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। সাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি মাতৃভাষায় প্রাকৃতিক ইতিহাস, শিশু পাঠ প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রমথনাথের মননশীলতা এবং রচনা শক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁহার তিনখণ্ডে বিভক্ত A History of Hindu Civitlisation During British Rule নামক মহামূল্যবান্ গ্রন্থ।

Essays and Lectures, Epochs of Civilisation প্রভৃতি নানা গ্রন্থে এবং অন্যান্য বহু রচনায় প্রমথনাথ পাশ্চাত্ত্যে আধুনিক শিক্ষায়নের কুফল সম্পর্কে দেশবাসীকে সচেতন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং জাতি যাহাতে আত্মস্থ হইয়া নিজস্ব সংস্কৃতির মাধ্যমে পরিপূর্ণ রূপে উপলব্ধি করিতে পারে এবং স্বীয় সংস্কৃতিকেই একান্ত ভাবে আঁকড়াইয়া ধরে, এই মনীষীর তাহাই ছিল একান্ত কাম্য। তিনি স্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন "All that is needed is that we should be guided by the ideals of our ancient culture. The maintenance of the supremacy of that culture is the essential pre-requisite of the scucess of the negative method."

ভারতের প্রকৃত কল্যাণ যে হিন্দু সংস্কৃতির সনাতন আদর্শের অনুসরণে, পাশ্চাত্ত্যের অন্ধ অনুকরণে নয়, আজ হইতে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে সে সম্বন্ধে দেশবাসীকে অবহিত করিবার প্রয়াস পাইয়া ছিলেন প্রমথনাথ। তাহার বহু উক্তিতে দূরপ্রসারী ভবিষ্যদৃষ্টির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতে হয়।

১৯০৮ সাল হইতে প্রমথনাথ রাঁচিতে গৃহনির্মাণ করিয়া সেখানে সপরিবারে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ভারতীয় আদর্শের প্রতি অনুরাগই বশতঃই রাঁচি ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়ের সহিত একাত্মতা অনুভব করিয়া তিনি প্রতিষ্ঠাকাল হইতে ইহার সহিত যুক্ত হন। স্থানীয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রমথনাথের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ স্থাপিত হইয়াছিল। রাঁচিতে তিনি ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মিশিতেন। এমন কি মুণ্ডা ওরাওঁ প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের কল্যাণের প্রতিও তাঁহার সজাগ দৃষ্টি ছিল। এই প্রসঙ্গে বর্তমান পুস্তকে সন্নিবিষ্ট Homage

to Acharya Pramatha Nath Bose নামক নিবন্ধে ডক্টর কালিদাস নাগ লিখিয়াছেন—"I have seen how devoted to him were the Adibasis and the poor folk coming to express to him their profound gratitude. অর্থাৎ, "আদিবাসী এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা তাঁহার প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধাবান ছিল এবং নিজেদের গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিমিত্ত যে তাঁহার নিকট আসিত, ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি।" সকল সম্প্রদায়ের লোকই তাঁহাকে একান্ত আপনার জন বলিয়া মনে করিত। তাই তো ১৯৩৪ সালের ১৮ই এপ্রিল প্রমথনাথ যেদিন রাঁচিতে পরলোক গমন করেন, সেদিন হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান সকল শ্রেণীর লোকেরা শ্রদ্ধাবনত মস্তকে তাঁহার শবানুগমন করিয়াছিল।

যোগেশবাবুর গ্রন্থ হইতে প্রমথনাথের জীবন ও কৃতির অতি সংক্ষিপ্ত সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম, কিন্তু এই ক্ষীণ প্রয়াস সূর্যকে প্রদীপ জ্বালিয়া দেখানোর মত। শুধু বাংলাদেশের নয়, সমগ্র ভারতের ইতিহাসে যিনি একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছেন, সেই মনীষী ও 'মানুষ' প্রমথনাথের সামগ্রিক পরিচয় পাওয়া যাইবে বহুবর্ষ পরিশ্রম ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে রচিত তাঁর এই জীবন চরিতে। রাষ্ট্রপতি শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ, ডক্টর শ্রীরাধাকৃষ্ণন এবং পণ্ডিত শ্রীজওয়াহর লাল নেহরু এই ত্রয়ীর বাণী পুস্তকখানিকে বিশিষ্ট একটা মর্যাদা দান করিয়াছে। ডক্টর মেঘনাদ সাহা ইহার একটি মূল্যবান্ ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। প্রমথনাথের পত্রব্যবহার জামাতা প্রভৃতির যে সকল স্মৃতিকথা গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—তাহা হইতে 'মানুষ' প্রমথনাথের স্নেহপ্রবণ কোমল হৃদয়টির পাওয়া যায় এবং তাঁহার জীবন যাত্রা যে কেমন সহজ সরল অনাড়ম্বর ছিল তাহা জানিতে পারিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। প্রমথনাথের লেখা এবং প্রমথনাথকে লেখা যে সকল পত্র এই পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, সেগুলি হইতেও তাঁহার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে নানা তথ্য জানিতে পারা যায়। তন্মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্তের পত্রগুলি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

মোট কথা পুস্তকখানিকে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই এবং সে চেষ্টা যে সর্বাংশে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। স্বাধীন ভারতে আজ যাঁহারা জাতিগঠন কার্যে ব্রতী তাঁহারা প্রমথনাথের গঠনমূলক চিন্তাধারা হইতে নব প্রেরণা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। এমন একখানি মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য আমরা লেখককে অভিনন্দিত করিতেছি। ইহার একখানি বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া সমীচীন বলিয়া আমরা মনে করি। কেন না তাহা হইলে সকল শ্রেণীর বাঙালী পাঠকের পক্ষেই বঙ্গভূমির এই সুসন্তানের জীবন কথা অবগত হওয়ার পথ সুগম হইবে এবং বাংলার রচিত প্রমথনাথের জীবনী গ্রন্থ আমাদের মাতৃভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি করিবে।

* Pramatha Nath Bose by Jogesh Chandra Bagal, Foreword by Dr. Meghnad Saha D.sc. F. R. S. The Elm Press. 63 Beadon Steet. Calcutta-6. Price Rs. 6/-

সেই যে নীলা ছুটে সেদিন পালিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে, আর একটি দিনের জন্যও সে এ-মুখো হয়নি। মাঝে মাঝেই মনে পড়েছে ওর কথা, ভেবেছি—নিজে থেকেই গিয়ে একবার খোঁজ নিয়ে আসি; অন্তিমার খবরটাও তো অন্ততঃ পাওয়া যাবে! কিন্তু অরুণাংশু দেবী আর অমূল্যধন বাবুর কথা ভেবে ইচ্ছে ক'রেই ওপথে আর পা বাড়াইনি। জীবনে কতভাবের লজ্জা আর সঙ্কোচ এসে যে মানুষকে প্রতি মুহূর্তে সঙ্কুচিত ক'রে তোলে, মাঝে মাঝে সেই কথাটাই ভাবি, ভাবি আর আশ্চর্য হই।—ইতিমধ্যে তনুশ্রীও আর-একদিন নীলার প্রশ্ন তুলেছিল, কিন্তু জবাব দেবার প্রয়োজন হয়নি, তার আগেই প্রসঙ্গান্তরে চ'লে গিয়েছিল তনুশ্রী। আমিও নির্বিবাদে গায়ে জামাটা পাল্টে নিয়ে পথে বেরিয়ে প'ড়েছিলাম। বেরিয়ে প'ড়বার উদ্দেশ্য ছিল। কলেজে গিয়ে আবার যদি চাকরীর তদারক ক'রে কিছু-একটা করাযায়! আপাততঃ এম. এ পড়বার স্বপ্ন যখন সব দিক থেকেই প্রতিহত, তখন প্রফেসারীর পরিবর্তে কলেজের হেড-ক্লার্কের পোষ্টটাই একমাত্র ভবিষ্যৎ। যিনি আছেন, তাঁর এক্সটেনশনের মেয়াদটা যদি কোনো-ক্রমে হঠাৎ ক'মে আসে, তবে খানিকটা এগিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ভাগ্যদেবীর কঠিন অভিশাপ থেকে মুক্তি পেলাম না। এ যাত্রাও ব্যর্থ হ'য়েই ফিরে আসতে হ'লো। এ ফিরে আসায় দুঃখ ছিল না—যদি ঘরে এসে সান্ত্বনা পেতাম। দিদিরা এসে এতদিন কাছে থাকায় বাড়ীটা তবু ভরা-ভরা ছিল, সেই সঙ্গে মনটাও। তাঁরা চ'লে গিয়ে বাড়ীটা যেন এবারে আরও বেশী শূন্যতায় খাঁ খাঁ ক'রছে। গৃহ-পরিবেশের সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ না থাকলেও সে-শূন্যতা স্বভাবতঃই এসে বুকে বাজ্‌লো। স্নেহের জগতের যোড়-সওয়ারী চিরকাল এই ভাবেই চলে।···

একসময় আমাদের পাচক ঠাকুর এসে হঠাৎ হাঁটু গেড়ে সামনে বস্‌লো। এমন ক'রে কিন্তু আর কোনদিন সে বসে নি।

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'ব্যাপার কি, কিছু বল্‌বে?'

পাচক ঠাকুর বল্‌লো, 'আমার জবাব হয়েছে, আমাকে এবারে বিদায় নিতে হলো দাদাবাবু।'

—'সে কি, কে বিদায় ক'রলো তোমাকে?' বিস্ময়ের কণ্ঠেই ব'ল্‌লাম, 'মা যে এখনও উঠে ভালো ক'রে হাঁটা-চলাই ক'রতে পারে তুমি বিদেয় হ'লে এদিকে হেঁসেল সাম্‌লাবে কে?'

ম্লান হেসে পাচক ঠাকুর ব'ল্‌লো, 'যিনি সামলাবার, তিনি যে অনেক আগেই এ বাড়ীতে এসে গেছেন! হেঁসেল সাম্‌লাতে সংসারে বৌদিদিমনিদের কোথাও জুড়ি নেই। বৌদিদিমণিই আমাকে অন্য কোথাও চাকরী ঠিক ক'রে নিতে বলেছেন।'

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'মা কিছু ব'লেছেন?'

—'না, শুনে চুপ ক'রে গেলেন মা ঠাকুরুণ।' মাথা নিচু ক'রে নিল পাচক ঠাকুর।

ব'ল্‌লাম, 'আচ্ছা আমি একবার জিজ্ঞেস ক'রে দেখ্‌বো। তুমি বরং আপাততঃ হেঁসেলটাই সাম্‌লাওগে।'

এবারে আর দ্বিরুক্তি না ক'রে নীরবে আমার মুখের

'চোখ দুটো একবার কুলে ঠ'রে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পাচক ঠাকুর। দীর্ঘ দিন এ-বাড়ীর সে নুন খেয়েছে, হঠাৎই তাই এখান থেকে ছেড়ে যেতে তার এই মায়া। মায়ার সঙ্গে দায়টাও কম নয়। এ বাজারে চাকরী গেলে হঠাৎই কিছু-একটা চাকরী জোটানো সহজ নয়।

তনুশ্রী ঘরে এলে একসময় জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'ব্যাপার কি তুমি নাকি পাচক ঠাকুরকে জবাব দিয়েছ?'

'কিছু-মাত্র দ্বিধা না ক'রেই তনুশ্রী ব'ল্‌লো, 'হ্যাঁ।—।'

—'রান্নাবান্নার তবে কি ব্যবস্থা হবে?' ব'ল্‌লাম, 'মা'র শিয়র ছেড়ে তোমার তো একদণ্ডও ছুটি নেই! ঠাকুর উঠিয়ে দিলে মার পরিচর্যারই বা কি হবে, আর ছেলে নিয়েই বা কে থাকবে!'

—'কেন, উপোষ দিতে পারবে না? তবে যে সব সমস্যাই মিটে যায়।' কৌতুকের কণ্ঠেই কথাটা উচ্চারণ ক'রলো তনুশ্রী, তারপর ব'ল্‌লো, 'ঠাকুরকে আমি কাজ খুঁজে নিতে ব'লেছি, কিছু-একটা কাজ পেলেই তবে সে এখান থেকে যাবে।'

হাঁ, 'মার মতামতের প্রশ্নটাও তো র'য়েছে! পাচক ঠাকুরকে মা-ই একদিন এ বাড়ীতে বহাল ক'রে-ছিলেন; যদি কুলে দিতে হয় তো মা-ই কুলে দেবেন, এই নিয়ে তোমার হঠাৎ এমন মাথা ঘামানো কেন?'

—'মেয়ে হ'লে বুঝতে পারতে—কেন মাথা ঘামাই।' খেমে তনুশ্রী ব'ল্‌লো, 'তা ছাড়া আমার নিজেরও তো একটা-কিছু কাজ চাই, দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা কতক্ষণ এক-ভাবে কাটে মানুষের! তুমি থাকবে বাইরে বাইরে, মা থাকবেন রোগে প'ড়ে, ঠায় ব'সে ব'সে আমি কী করি, বলতে পারো?'

ব'ল্‌লাম, 'ঘরে এত বই থাকতে ইচ্ছে করে না একখানিও ছুঁয়ে দেখতে, ইচ্ছে করে না কি খবরের কাগজখানাও ওল্টাতে? সারা পৃথিবীতে আজ নানা বিষয় আর নানা সমস্যার ঢেউ, সেই ঢেউয়ে কি ইচ্ছে করে না নিজেকে ভাসিয়ে দিতে?'

তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই এবারে তনুশ্রী ব'ল্‌লো, 'যত রাজ্যের যত ছাইভস্ম, ও দিয়ে আমি কি করবো? মেয়ে-দের জীবনে তাদের সংসারটাই সব কিছুর বাড়া। তার মধ্যেই তাদের যা কিছু বিস্ময় আর আনন্দ। আমরা সমস্যা চাই না, চাই সুখী হ'তে।'

ব'ললাম, 'হেঁসেলটাই যদি তোমার সেই সুখের একমাত্র আকর হ'য়ে থাকে, তবে সেই নিয়েই তুমি থেকো। ঘরের বইগুলো নিয়ে একদিন তোমার উৎসাহের অন্ত ছিল না, আজ সেগুলোই যখন তোমার কাছে আবর্জনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন আর সমস্যা কি! পারো তো কখনও নিয়ে আলমারির কাছে দাসিও। খরচ বাঁচা-বার সূত্রে আমিও তবে আমার পিতৃঋণের দায় থেকে কিছু মুক্ত হ'তে পারি।'

কথা না ব'লে এবারে একটা বাঁকা কটাক্ষ হেনে আমার মুখের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল তনুশ্রী। স্বল্পক্ষণ কেটে গেলে তারপর ব'ল্‌লো, 'বাঁকা কথা ছাড়া তোমার মুখে কি একটাও কথা নেই? এত বই মগজে ঢুকিয়ে শেষ পর্যন্ত যদি এই-কথাই শিখে থাকো, তবে কাজ নেই আমার অমন বইয়ে।'

ব'ল্‌লাম, 'বাঁকা কথা কে বলে, তা যদি শুদ্ধবার লোক থাকতো, তবে আর আমাকে এভাবে উদ্যত হ'তে হ'তো না। তা যাক্। কোনোদিন এভাবে আর বই নিয়ে খোটা দিও না, ওটা আমার সইবে না।'

—'তোমার তো কিছুই সয় না।' তনুশ্রী ব'ললো, 'কথা সয় না, বউকে সয় না, এতই যদি—তবে বিয়ে ক'রেছিলে কেন?'

ভেবেছিলাম—কথাটার জবাব দেবো না; কিন্তু নীরবে চুপ ক'রেও থেকে পারলুম না। হঠাৎ এসে এতবেশী মুখর হওয়া অন্ততঃ নববধূর পক্ষে শোভা পায় না। ব'ল্‌লাম, 'কেন বিয়ে ক'রেছিলাম, সেটুকু নাই বা শুনলে!'

ঠোঁট বেঁকিয়ে তনুশ্রী ব'ললো, 'লজ্জা কি, বলেই ফেলনা!'

বল্লাম, 'ক্রমেই বড়বেশী উদ্ধত হ'য়ে উঠছো তুমি। এটা ঠিক শোভন হ'চ্ছে না।'

—'মেয়েদের ব্যাপার কিছুই শোভন নয়, যত শোভন ছেলেদের।' থেমে তনুশ্রী ব'ললো, 'তুমি কি ভেবেছ নিজেকে আড়াল ক'রে নিয়ে আমাকে দিয়ে কেবল দাসী-বাঁদির মতো কাজ করিয়ে নেবে? সুখী হবার মত আমারও কি কিছু নেই? এই যদি মনে ছিল, তবে কেন বিয়ে ক'রে নিয়ে এসেছিলে আমাকে? বাড়ীতে একটা ঝিও বোধ করি আমার চাইতে সুখে থাকে!'

আবার সেই সুখের প্রশ্ন। নতুন ক'রে জবাব দিয়ে লাভ নেই কিছু। ব'ল্লাম, 'কেন নিয়ে এসেছিলাম, সেটা তোমার আর আমার মা-ই ভালো জানেন। যথাস্থানে প্রশ্ন ক'রলেই তো জবাব পেয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারো! তা নিয়ে মিথ্যে এত রকমারীর কি আছে?'

—'আমিই তো যত রকমারী বাধাই।' ব'লে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে খাটের একপাশে স'রে ব'সলো তনুশ্রী।

ব্যাপারটা মন্দ নয়। গায়ে প'ড়ে ঝগড়া ক'রে শেষ পর্যন্ত তাই নিয়ে অশ্রুপাত। উঠে কাছে গিয়ে এবারে ব'ল্লাম, 'কি ছেলেমানুষি করছো, বলো দিকি! কথাটা উঠলো পাচক ঠাকুরকে নিয়ে, শেষ পর্যন্ত যা কিছু টেনে নিলে নিজের উপরে। তুমি কি পাগল না আর কিছু?'

অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠেই তনুশ্রী বল্লো, 'মাও হ'য়েছে, যথেষ্ট দেখেছি, আর আদিখ্যেতা ক'রতে হবে না।'

ব'ল্লাম, 'তা না হয় নাই ক'রলাম, কিন্তু মিছে-মিছি এম্‌নি ক'রে ব'সে ব'সে কাঁদতে পারবে না তুমি। তার চাইতে উঠে বরং ও-ঘরে মার পাশে গিয়ে বসো।'

—'ঘরে যে স্থান নেই, তা তো জানিই।' আর্দ্র-কণ্ঠে তনুশ্রী ব'ল্লো, 'মার শিয়রে ছাড়া এ বাড়ীতে আমার আর যায়গা কোথায়! যাচ্ছি, তাই যাচ্ছি—।'

একটুকালও আর অপেক্ষা ক'রলো না তনুশ্রী। চোখ দু'টোকে আঁচলে রগড়ে নিয়ে সঙ্গে-সঙ্গেই সে উঠে প'ড়ে বাড়ীর ভিতরের দিকে চলে গেল।

বিটোভেনের 'সোনাটা' কখনও শুনিনি, কিন্তু সে সোনাটার সপ্তরাগের মধ্যে এতক্ষণ অক্টোপাসের মতো কাটছিল, তনুশ্রী উঠে যাবার পরেও তার সুরমূর্ছনা কতক্ষণ যে আমার সীমায়িত বাহুমণ্ডলের ইথারে ইথারে স্পন্দন তুলে গেল, ব'লতে পারবো না। বেদনার বিষবাষ্প ক্রমেই চারদিক থেকে ঘনায়িত হ'য়ে উঠছে। তার মধ্যে আচ্ছন্ন হ'য়ে যেতে দুঃখ নেই, যদি সেই আচ্ছন্নতার মধ্যেও পাশে থাকে সুর-লক্ষ্মী। কেমন একটা দারুণ অস্বস্তিতে সমস্তটা মন কেবলই উদ্বেলিত হ'য়ে উঠছিল। আত্মপ্রশমিতির প্রয়াসেই পাশ থেকে অন্যমনস্কভাবে একখানি বই টেনে নিলাম হাতের ঘুঠোয়: 'দেওয়ান-ই হাফিজ।' তারপর সমস্ত মনটাকে তার চিত্র-বিচিত্র সুশোভন পৃষ্ঠাগুলোর মধ্যেই ছেড়ে দিলাম—

…'কী যে হ'য়ে গেছি—তুমি তো তা জানো,
জানো আমাদের বেদনা জড়ানো
কত যে কাতর প্রাণ!
পেয়ে হারায়েছি, ধরা দিয়ে শেষে—
কোথা গেল কোন্ অজ্ঞাত দেশে!
এ কি তার অভিমান?
ওগো তব প্রেম-ঈক্ষণপাতে
সোনা হ'য়ে যাবো ক্ষণ-সাক্ষাতে,
তব হেম তনু সম!
তোমার রচিত ল'য়ে লিপিখানি
যে দূত আসিবে, সেই জেনো রাণী
আমাদের প্রিয়তম!
আমি আসিয়াছি পূজিতে তোমারে,
তুমিও বাড়ায়ে দিবে না কি তারে
অতন্দ্র দু'বাহু তব?
হোক্ সঙ্গীত অন্তর মাঝে
প্রেমের নিষ্ঠা বচনে ও কাজে,
বেদনায় নব নব।'…

আমার বেদনা-মথিত অন্তর্লোকে আকস্মাৎ হাফি-

ভের শীত-আবির্ভাব লক্ষ্য ক'রে নিজেই চম্‌কে উঠলাম। বিজ্ঞানের যুগে এ এক অদ্ভুত মনোবিজ্ঞানের খেলা। জীবন-দর্শনে কি তবে ছাড়িয়ে আর আমাতে এতটুকুও ফাঁক রইল না কোথাও! বেদনার মধ্য দিয়েই যে প্রেমের চিরন্তন জয়। সংসারে বড় বেদনাই যে বড় কেরকে রচনা করে! অদিনাই হয়ত এ কথাটা কোনদিন কোনো অলক্ষিত মুহূর্ত উচ্চারণ ক'রে থাকবে! আজ তার কিছু-একটাও মনে নেই। বেদনার পারাবারে আজ শুধু খেয়া পাড়ি দিয়েই চ'লেছি, জানিনা—কোথায় কোন্ কূলে গিয়ে তবে তার যাত্রা শেষ হবে!

* * *

সপ্তাহ-খানেক কেটে গেলে অকস্মাৎ মা নিজে থেকেই আর-একদিন কাছে ডেকে নিয়ে বসালেন। ব'ল্‌লেন, 'ডিহিরী থেকে হৈমন্তী চিঠি দিয়েছে, তোকে আর বৌমাকে যেতে লিখেছে। যা, দু'দিন গিয়ে ঘুরে আয়। হৈমন্তীর ইচ্ছা—বৌমা যাতে কয়েক দিন গিয়ে ওখানে থেকে আসে।'

ব'ল্‌লাম, 'লোক পাঠিয়ে তবে মেয়েকে নিয়ে গেলেই তো পারে! কয়েকটা দিন কেন, তোমার আপত্তি না থাকলে দীর্ঘদিনই তো ওঁরা রেখে দিতে পারেন ওঁদের মেয়েকে!'

—'লোক পাঠাতে পারলে আর তোকে যেতে লিখবে কেন!' রোগক্লান্ত কণ্ঠেই উচ্চারণ ক'রলেন মা: 'তাদের বাড়ীর একমাত্র জামাই তুই, তোকেও তো দু'দিন কাছে পেতে তাদের ইচ্ছে হয়। যা, কয়েকটা দিন বরং ঘুরে আয়।'

ব'ল্‌লাম, 'জামাইয়ের প্রতি তাদের দরদ কত, তা আর বুঝতে বাকী নেই আমার। শাক দিয়ে কখনও মাছ ঢাকা যায়না। তুমি লিখে দাও, মেয়েকে নেবার দরকার থাকলে তারা যেন প্রয়োজন মতো লোক পাঠিয়ে দেয়। আমার যাবার সময় হবে না।'

—'ও মা, সে কি কথা, সময় হবে না কি রে? তোর কী এমন কাজটা যে সময় নেই খোকা?' বেশে মা ব'ল্‌লেন, 'সব ব্যাপারেই পাগলামী ক'রতে নেই, তাতে আত্মীয়তা বা সামাজিকতা রক্ষা পায় না।'

মনে মনে এবারে হাসি পেলো মার কথা শুনে। সমাজটা কোথায় যে, সামাজিকতা! ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজ কবেই তো ভেঙে খান্ খান্ হ'য়ে গেছে। সমাজ-বন্ধন বা লোক-লৌকিকতা ব'লে আজ আর কিছু নেই। আর আত্মীয়তা? ব'ল্‌লাম, 'অমন লোকদের সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা না ক'রলে আমার সামাজিকতা নষ্ট হবে না।'

বিস্ময়ে এবারে গলা একধাপ উপরে তুললেন মা: 'তুই কি ব'ল্‌ছিস খোকা?'

—'মিথ্যে কথা ব'লতে বাধ্য না হ'লে আমি কখনও মিথ্যের আশ্রয় নিই না। এটুকু তুমি অন্ততঃ বিশ্বাস ক'রতে পারো মা।'

—'কিন্তু বৌমারও তো সাধ আহ্লাদ আছে, তারও তো মান-মর্যাদা ব'লে কিছু আছে!'

—'কে অস্বীকার ক'রছে!' ব'ল্‌লাম, 'বাপের বাড়ী গিয়ে সে মর্যাদা রেখে আসুক। পারো তো বাবাকে দিয়েও পাঠাতে পারো তনুশ্রীকে। বাড়ীতে বাবা দু'দিন না থাকলে তোমার এমন কিছু বিপর্যয় ঘটবে না।'

—'বেশ তো, সেই কথাটা একবার তোর বাবাকে গিয়েই বল্‌না?' বেশে মা ব'ল্‌লেন, 'রোগে প'ড়ে আছি, তবু যদি আমার স্মৃতি থাকে, সংসারে যার যত ঝামেলা —শুয়ে শুয়েও আমাকেই পোয়াতে হবে।'

ব'ল্‌লাম, 'মনগড়া ঝামেলা নিয়ে যদি কষ্ট পাও, তবে আমি কি ক'রতে পারি বলো?'

—'তা হ'লে তুই যাবিনা বল্‌ছিস?' প্রশ্নটার পুনরুল্লেখ ক'রে আমার মুখের দিকে চোখ দু'টোকে বড় বড় ক'রে তাকালেন মা।'

ব'ল্‌লাম, 'না। তারপর আর একমুহূর্তও অপেক্ষা না ক'রে মা'র শিয়রের পাশ থেকে উঠে এলাম।

তনুশ্রী বোধ করি এ-সময়ে পাচক ঠাকুরের সঙ্গে রান্নাবান্নার কিছু কিছু জোগাড় দিচ্ছিল। রাত্রির দিকে

একসময় দেও ঐ একই প্রশ্ন তুলে ব'রে ব'ললো, 'মা তোমাকে বাবার জন্তে বিশেষ ক'রে লিখেছেন। আমাকে নিয়ে ক'দিন কাছে রাখবার ইচ্ছে মার। চলোনা ক'দিন পথে কোথাও ঘুরে তারপর ডিহিরী হ'য়ে আসবো।'

ব'ললাম, 'স্বেচ্ছায় সর্বত্র ঘুরবার মতো অর্থ কোথায়? এ সংসারের অর্থের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। যদি ঘুরতে ইচ্ছে হ'য়ে থাকে, তবে বাবাকে ব'লে তাঁকে নিয়েই তোমাকে বেরোবার দরকার।'

কথা শুনে হঠাৎ যেন কেমন নিশ্রভ হ'য়ে গেল তনুশ্রী। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে তারপর ব'ললো, 'কেন, এ বাড়ীর টাকা কি তোমারও টাকা নয়? তুমি কি এবাড়ীর একমাত্র উত্তরাধিকারী নও?'

ব'ললাম, 'শুধু ঐটুকুই জানো, বাকীটার জন্তে আমাকে জানার প্রয়োজন ছিল। সে প্রয়োজন কি একটি দিনের জন্তও তুমি বোধ ক'রেছ?'

—'প্রয়োজন নেই ব'লেই করিনি। বিয়ের আগে থেকে তোমাদের সম্বন্ধে যে ভাবে অভ্যস্ত হয়েছি, তারপরেও নতুন কিছু জানার আছে ব'লে মনে হয়েনি।'

—'তবে জেনো না, সেই অভ্যস্ততা নিয়েই তুমি থাকো। এই নিয়ে জিজ্ঞাসাও কোরোনা কিছু।'

তনুশ্রী ব'ললো, 'তা না হয় না-ই ক'রলাম, কিন্তু কবে রওনা হবে, বলো?'

—'রওনা হতে হ'লে যা প্রয়োজন, ব'ললাম তো—আমার তা নেই। বেকারবৃত্তি না ঘুচ্‌লে সে-অভাব পূর্ণ হবারও নয়। তাছাড়া ডিহিরী যাবার ইচ্ছে আমি আর কোনো কালেই রাখিনা।'—কথাটা অপ্রিয় হলেও স্পষ্ট করেই ব'লতে হ'লো তনুশ্রীকে। ব'লতে হ'লো আত্মমর্যাদার সম্পর্কেই। আর যদি সহধর্মিণী ব'লে সে নিজেকে স্বীকার ক'রে থাকে, তবে এ মর্যাদা তারও।

সাড়ম্বরে নিক্ষেপ ক'রেই প্রশ্ন ক'রলো তনুশ্রী: 'কেন, কি অপরাধ ক'রলো ডিহিরী?'

অকপটেই ব'ললাম, 'যারা ইতর, যারা মানুষের মর্যাদা রেখে কথা ব'লতে জানে না, আমি তাদের ছায়া মাড়াতেও ঘৃণা বোধ করি।'

শুনে মন অবদমিত হ'লো না তনুশ্রীর। ব'ললো, 'কথাটা স্পষ্ট ক'রেই বলো। ইতরামো ক'রেছে কে, আমার মা?'

ব'ললাম, 'খুলে না বললেই কি স্বস্তি পাচ্ছোনা? মা বাবার কথাটা কানে শুনতে কি খুব প্রতিসুখর লাগবে?'

—'উঃ, তুমি এত নিষ্ঠুর, এত নীচ! মাকে তুমি ইতর বলতে পারলে? এই তোমার শিক্ষা, শিক্ষার গর্ব? একটা কুলীর সন্তানেরও যে তুমি যোগ্য নও!'—বলতে বলতে ঝরঝর ক'রে কেঁদে ফেললো তনুশ্রী, কাঁদতে কাঁদতেই বললো, 'সাধ ক'রে খুব জামাই পেয়েছিলেন মা, যা-হোক। মাকে ব'লবো, তাঁকেও এখন থেকে সংযত হওয়াই উচিত।'

ব'ললাম, 'পারো তো তা-ই বোলো। অন্ততঃ তাঁর চিঠির একটা জবাব তাতে তিনি পাবেন।'

উত্তরে আর একটি কথাও তুললো না তনুশ্রী। অনেকক্ষণ সাশ্রুনয়নে মাথা নিচু ক'রে গুম্ হ'য়ে ব'সে রইল, তারপর আমার অলক্ষ্যেই কখন্ একসময় কোথায় একদিকে উঠে চ'লে গেল।...

দিন কয়েক বাদে দেখলাম—ডিহিরী থেকে লোক এসে উপস্থিত। তনুশ্রীকে নিতে এসেছে সে। তার সঙ্গেই একসময় রওনা হ'য়ে গেল তনুশ্রী।

মা ব'ললেন, 'হৈমর যখন ইচ্ছে হ'য়েছে, আমার তো তখন আপত্তি করা উচিত নয় সৌম্য। থেকে এসগে মার কাছে কয়েকটা দিন। তবে খুব বেশীদিন দেরী কোরো না যেন।'

উত্তরে হাঁ কি না কিছু-একটাও বললো না তনুশ্রী। যাবার সময় গেটের কাছে গিয়ে একবার পিছন ফিরে আমার মুখের দিকে তাকালো। অর্থাৎ—মার মতো আমিও কিছু-একটা বলি কিনা! কিন্তু বলার থাকলেও বলা

আর হ'লো না। তনুশ্রীও সেই-যে ঘোমটার আড়ালে আবার মুখ ঢাকলো, গাড়ীতে উঠেও সে ঘোমটা আর খুললো না।

ডিহিরীতে গিয়ে কিন্তু মার ইচ্ছা সে পূর্ণ করতে পারেনি। একটা সপ্তাহও পুরো কাটলো কিনা সন্দেহ। আবার দেখলাম সেই ব্যক্তি এসে তনুশ্রীকে দরজায় পৌঁছে দিয়ে সেই গাড়ীতেই রওনা হ'য়ে পড়তে উদ্যত হ'লো। সম্পর্কের দিক থেকে লোকটি তনুশ্রীর কিরকম মামা হয়, নাম নিশিকান্ত, বয়স বছর ত্রিশেকের উর্ধ্বে নয়। বাবার সঙ্গে দেখা হ'য়ে যেতেই শুনে বাবা বললেন, 'সে কি, দু'একটা দিন না থেকেই যাবে মানে কি? অন্ততঃ বিশ্রাম নিয়ে চান খাওয়া-দাওয়াটা তো আগে সারো, তারপর না হয় দেখ্‌বো কোন্ গাড়ীতে যাবে।'

কিন্তু বাবার এ অনুরোধ আদৌ কানে তুললো না নিশিকান্ত। ব'ললো, 'না আপনার বাড়ীতে দ্বিতীয়-বার আর জলগ্রহণ করবার মতো প্রবৃত্তি আমাদের নেই।'

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুললেন বাবা: 'সে কি, এ তুমি কি ব'লছো নিশিকান্ত? এমন কি ঘটেছে, যার জন্যে এমন রূঢ় কথাটাও তুমি মুখে আনতে পারলে?'

—'যা ঘটেছে, তা আপনার পুত্রবধূর কাছ থেকেই সব জান্‌তে পারবেন।' থেমে নিশিকান্ত ব'ললো, 'যাবার আগে শুধু একটা কথা ব'লে যাই। আত্মীয়ে আত্মীয়ে সম্পর্ক পাতানো যে কত পাপ—এতদিনে সে কথা দিদি বুঝতে পেরেছে। আমরা মেয়ে পক্ষ বলে সব ব্যাপারেই যে গলবস্ত্র হ'য়ে থাকবো, এমন ঠেকা ঠেকিনি। জামাই-মেয়েকে কোনোদিনই আর ডিহিরীতে যেতে হবে না, এই ব'লে গেলুম। আচ্ছা, নমস্কার।'

এক মুহূর্তও আর অপেক্ষা ক'রলো না নিশিকান্ত, সঙ্গে সঙ্গেই আবার সে ষ্টেশনের পথ ধরলো। ব'লতে লজ্জা হয় যে, সম্পর্কে নিশিকান্ত আমার মামাশ্বশুর। গেটে বাবার সঙ্গে দেখা না হ'য়ে আমার সঙ্গে দেখা হ'লে কি ঘটতো জানি না, কিন্তু নিশিকান্ত চ'লে গেলে আত্মাবমাননায় বাবার মুখখানি যে কি আকার নিল, আড়াল থেকে তা স্পষ্টই দেখতে পেলাম।

আসল ঘটনাটা খানিক বাদেই জানা গেল। তনুশ্রীর হাত দিয়ে আবার সুযোগ্য শ্বশ্রূমাতা পত্র দিয়েছেন মাকে। এ পর্যন্ত তিনি যে ক'খানি ডাক-টিকেট খরচ ক'রেছেন জানিনা, তবে এ চিঠির পরে যে আর তাঁকে নতুন ক'রে কলম ধরবার প্রয়োজন হবে না, এটা স্পষ্টই অনুমান ক'রে নেওয়া গেল। এ-যাত্রাও মা-ই উপযাচক হ'য়ে আমাকে ডেকে চিঠিখানি হাতে তুলে দিলেন। প্রবৃত্তি ছিল না যে প'ড়ে দেখি, কিন্তু চোখ বারণ মান্‌লো না। চিঠির অক্ষরগুলো স্পষ্টই এসে চোখে ঠিকরে পড়লো:

'বৈবাহিকা মহোদয়া,

জামাইয়ের দ্বারা যে অপমান পাইয়াছি, তাহা আপনাদের দ্বারা সমর্থিত বলিয়াই মনে করি। এমন মেয়েকে আমি পেটে ধরি নাই—যে মুখের উপর আমাকে দু'কথা মিথ্যা বলিবে। যদি দেমাক দেখানোই প্রশ্ন হইয়া থাকে, তবে সেই দেমাকের আমরাই-বা কোন্ ধার ধারি! পূর্বে আত্মীয় জ্ঞান করিয়াই মেয়েকে সঙ্গে লইয়া কয়েকটা দিন আপনার ঘরে গিয়া কাটাইয়া আসিয়াছিলাম। বিবাহের ব্যাপারে আপনি কথা রাখিয়াছেন, কিন্তু তৎপূর্বে শ্রীমান সুমন্তর অশিষ্ট মনো-বৃত্তির যদি ভিলার্ধও পরিচয় পাইতাম, তবে মেয়েকে এমন নিজের হাতে আস্তাকুঁড়ে ঠেলিয়া দিয়া প্রতিমুহূর্তে আজ অপমানের জ্বালায় দগ্ধ হইতাম না। যে ভুল করিয়াছি, তাহা সংশোধনের বাহিরে। হিন্দু সমাজ, মেয়েকে বাখিয়া দিলে পাঁচ দিকে পাঁচ কথা উঠিবে; বুড়ীকে তাই এবারে চিরদিনের জন্যই বিদায় দিতেছি। কোনো দিনের জন্যই আর তাহাকে এখানে আসিতে হইবে না। আমরা মনে করিব—মেয়ে আমাদের মরিয়া গিয়াছে, আমাদের মেয়ে নাই। সংসারে ইতর-ভদ্র কাহারো গায়ে লেখা থাকে না; সব চাইতে বড় দুঃখ রহিয়া গেল এই যে, আজ সন্তানদের নিকট হইতেও অপমান সহ্য করিতে হইতেছে। বুড়ী এখন আপনার ঘরের বৌ, সে মরুক বাঁচুক—অতঃপর তাহা লইয়া আমাদের আর কোন দায়িত্ব বা চিন্তা রহিল না। ইতি—

—হৈমন্তী।'

পড়া শেষ ক'রতে গিয়ে হাতখানি আমার কেমন একটা উত্তেজনায় অনবরত কাঁপছিল। ইচ্ছে হ'ছিল—এই মুহূর্তে তনুশ্রীকে গিয়ে একটা দারুণ সাজা দিই। এটুকু অন্ততঃ বুঝুক তনুশ্রী—পৌরুষ জেগে উঠলে কতখানি সে নির্মম, নির্দয় এবং হিংস্র হয়। কিন্তু হ'লো না। চিঠিখানি যার হাতে ফিরিয়ে দিতে যেতেই লক্ষ্যে প'ড়লো—আবার কিট হয়েছে মার।

[ক্রমশঃ]

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনার অর্থ-সংস্থান

প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হতে আর মোটামুটি দু মাস বাকী আছে। পরিকল্পনা কমিশন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়াকে চূড়ান্ত রূপ দিবার জন্য খুব ব্যাপৃত আছেন। এখন পর্যন্ত যতটা ঠিক হয়েছে, তাতে দ্বিতীয় পাঁচ-সালা পরিকল্পনায় সরকারী মহলে মোট ৮৮০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে এবং এই টাকার সংস্থান সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন।

১।	চলতি হারে রাজস্ব	৩৫০	কোটি টাকা
২।	অতিরিক্ত কর	৪৫০	" "
৩।	রেল পথ	১৫০	
৪।	প্রভিডেন্ট ফণ্ড ইত্যাদি	২৫০	
৫।	জনসাধারণ ও ক্ষুদ্র সঞ্চয়ীদের কাছ থেকে ঋণ	১২০০	
৬।	বৈদেশিক সাহায্য	৮০০	
৭।	ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং	১২০০	
৮।	অবশিষ্ট আভ্যন্তরীণ কিংবা বহিঃস্থ কোন উৎস থেকে	৪০০	
	মোট ব্যয়—	৪৮০০	

স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে যে, আভ্যন্তরীণ উৎস সমূহথেকে মোট ২৪০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে ধরা হয়েছে এবং বাকী ২৪০০ কোটি টাকা সম্পর্কে বহিঃস্থ সাহায্য কিংবা ডেফিসিট ফাইন্যান্সিংয়ের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। খসড়া-পরিকল্পনায় ১০০০ কোটি টাকা থেকে ১২০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ডেফিসিট ফাইনান্সিংয়ের মাত্রা সীমাবদ্ধ রাখবার সুপারিশ করা হয়েছিল। স্যানেল অব ইকনমিষ্টগণও ডেফিসিট ফাইন্যান্সিংয়ের মাত্রা ১০০০ কোটি টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবার পরামর্শ দিয়েছেন। দেশের মধ্যে যাতে মুদ্রাস্ফীতি দেখা না দেয় এবং অর্থ-নৈতিক স্থিতিমানের মধ্য দিয়ে উন্নয়নমূলক কাজগুলি স্বচ্ছন্দ ভাবে অগ্রসর হতে পারে সে জন্য ডেফিসিট ফাইনান্সিংয়ের মাত্রা স্থির করবার ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন আছে। তবে একথাও স্বীকার্য যে কোন অর্দ্ধোন্নত দেশের অর্থ-নৈতিক সমৃদ্ধি আনবার জন্য কিছু ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং অপরিহার্য। ১২০০ কোটি টাকার ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং অবশ্যই সামান্য ব্যাপার নয়। তাই পরিকল্পনার প্রতি স্তরেই ডেফিসিট ফাইন্যান্সিংয়ের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন হবে।

বৈদেশিক সাহায্য ৮০০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে অনুমান করা হয়েছে। কিন্তু এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত করে কিছু বলা চলে না। প্রথম পাঁচ-সালা পরিকল্পনায় গড়ে প্রতি বছরে ৪০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গেছে। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় গড়ে প্রতি বছরে প্রায় ১৬০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে ধরা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভারতের উন্নয়নে বিশেষ আগ্রহ দেখালেও এত টাকা প্রকৃত পক্ষে পাওয়া যাবে কিনা স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে।

১২০০ কোটি টাকা ডেফিসিট ফাইন্যান্সিং করে এবং ৮০০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য হিসাবে পাওয়া যাবে ধরে নিলেও ৪০০ কোটি টাকার সংস্থানের সমস্যা থেকে যায়। প্ল্যানিং কমিশন এই ৪০০ কোটি টাকা আভ্যন্তরীণ কিংবা বৈদেশিক উৎস থেকে সংগ্রহ করবার পরামর্শ দিলেও, আপাততঃ সেরকম কোন উৎসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে এনসিডেন্ট যথেষ্ট আশা করা হয়েছে। নূতন কর ধার্য করে কত টাকা পাওয়া সম্ভব হবে তা সঠিক বলা যায় না।

কর নির্ধারণ কমিশনের সমস্ত সুপারিশগুলি গ্রহণ করলেও ৪৫০ কোটি টাকা নূতন কর আদায় হবে কিনা তা বলা কঠিন। কাজেই এদিক থেকেও অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান আশা করা চলে না। তারপর সরকারী ঋণ ও স্বল্প সঞ্চয়কারীদের কাছ থেকে পরিকল্পনার পাঁচ বছরে ১২০০ কোটি টাকা আশা করা হয়েছে। সরকারী ঋণ চলতি বছরে ১০০ কোটি টাকা কিংবা তারও কিছু বেশী পাওয়া খুব কঠিন নাও হতে পারে, কিন্তু স্বল্প সঞ্চয়কারীদের কাছ থেকে পাঁচ বছরে মোট ৭০০ কোটি টাকা পাওয়া খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না।

এই প্রসঙ্গে বে-সরকারী মহলের কথা স্বভাবতঃই এসে পড়ে। প্রথম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় বে সরকারী মহলের উপর যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনার খসড়াতে ততটা না হলেও খুব কম গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। বেসরকারী মহলে কৃষি, গ্রাম্য শিল্প, পরিবহন, বিদ্যুৎ সরবরাহ শিল্প ও খনি খনন এবং ব্যবসার বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় অর্থ প্রভৃতির জন্য মোট ২৩০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে অনুমান করা হয়েছে।

পশ্চিম বঙ্গে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণ

পশ্চিম বঙ্গে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। যাতে গ্রামাঞ্চল ও নব প্রতিষ্ঠিত উপনগরী গুলিতে নূতন নূতন শিল্প গড়ে ওঠে সেদিকেই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। এই শিল্পগুলির উৎপন্ন সামগ্রীর চাহিদা যাতে বাড়ে, সেজন্য বিক্রয়কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনাও করা হয়েছে।

কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রশিল্পের যথোপযুক্ত উন্নতিসাধন করতে পারলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বেকার সমস্যার কিছু লাঘব হওয়া সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাই এই পরিকল্পনা প্রণয়নকালে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীরাও যাতে ঘরে বসেও কিছু অর্থের সংস্থান করতে পারেন সেদিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। মাটি, কাঠ, কাপড়ের টুকরো, টিন প্রভৃতির দ্বারা নূতন নূতন ডিজাইনের খেলনা, চীনামাটি ও সাধারণ মাটির তৈয়ারী সৌখিন জিনিষপত্র ইত্যাদির সাহায্যে নারীরা ঘরে বসেও অর্থোপার্জন করতে পারেন: এজন্য চীনামাটি ও অন্যান্য কাঁচামাল সরবরাহ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের মারফৎ পরামর্শদানের যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে কুটির শিল্প ও ছোটখাট ব্যবসা গড়ে তোলবার জন্য ১৯৫৬-৫৭ সালে আনুমানিক ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে জানা গিয়েছে। তার মধ্যে অন্যূন ২৫ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকার দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ঋণ ও সাহায্য হিসাবে দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে পূর্ববর্তী বছরে (৫৫-৫৬) পশ্চিম বঙ্গে মোট প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল প্রায় ৪ লক্ষ টাকা।

আলোচ্য পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত কুটিরশিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। (১) ধান ভানা (২) মাটির বাসনপত্র (৩) আখের গুড় ও 'খাণ্ডেসারি' চিনি (৪) ঘানির তেল (৫) দেশলাই (৬) কাঠ, টিন প্রভৃতির খেলনা (৭) কামারশালা ও ছুতোরের কাজ (৮) চামড়ার কাজ (৯) কল্যাণীতে শিল্পব্যবসায়ে তালিম দেওয়া ও পণ্য উৎপাদন (১০) কাঞ্চননগর ও দার্জিলিংয়ের ঘুমে ছুরি-কাঁচি তৈরী (১১) বাঙ্গইপুরে শল্যচিকিৎসার ছুরি কাঁচি তৈরী (১২) দড়ি দড়া (১৩) নারিকেলের ছোবড়া থেকে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরী (১৪) কুটির শিল্পে

কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা (১৫) ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে কারখানা তৈরী (১৬) উৎপন্ন পণ্যাদির বিক্রয় ব্যবস্থা। এই সব ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁত, গুড়, মাদুর, কাঁসা-পিতলের বাসন, খাদি, হাতে তৈয়ারী কাগজ প্রভৃতির উন্নয়নের জন্য ও ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বলে জানা গিয়েছে।

সরকার যে পরিকল্পনা নিয়েছেন তাতে যথেষ্ট বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। বস্তুতঃ এ শিল্পগুলি যে সরকারী সহযোগিতা পেলে উন্নতি লাভ করবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের কাছে এই পরিকল্পনা খুব সমাদর লাভ করবে বলে আশা করা যায়।

ইস্পাত শিল্পে কারিগর শিক্ষা-নবীশ

ভারত সরকারের লৌহ ও ইস্পাত দপ্তর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও শিল্পে কারিগরী শিক্ষানবীশের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করবেন বলে জানা গিয়েছে। এ জন্য ১০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই কমিটি অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি ও সুদক্ষ কর্মচারী সম্পর্কে সুপারিশ করবেন। শিক্ষানবীশদের শিক্ষা সম্ভবতঃ দুই পর্যায়ে ভাগ করা হবে। প্রথম পর্যায়ে বর্ত্তমান শিক্ষাকেন্দ্রে কিংবা কোন শিল্পকেন্দ্রের মধ্যে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষা দেওয়া হবে কোন ইস্পাত কারখানায়। রুরকেলা, ভিলাইয়া ও দুর্গাপুরে যে তিনটি সরকারী ইস্পাত শিল্পকেন্দ্র স্থাপিত হতে চলেছে, তাদের জন্য সুদক্ষ কর্মচারী তৈরী করার জন্যই সরকার এই কমিশন নিয়োগে তৎপর হয়েছেন।

বৈদেশিক মুদ্রা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হবে। বৈদেশিক মুদ্রার—সরবরাহ বাড়াবার জন্য পার্লামেন্টের আগামী অধিবেশনের সময় রিজার্ভ ব্যাংক অব্ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের উপর একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনা হবে বলে জানা গিয়েছে। বর্ত্তমান আইন অনুসারে রিজার্ভ ব্যাংকের কাগজী মুদ্রার শতকরা ৪০ ভাগ সোনা এবং বৈদেশিক সিকিউরিটি সমূহ জমা রাখতে হয়। বর্ত্তমানে ১৩১৪ কোটি টাকার নোট বাজারে চালু আছে এবং এর জন্য রিজার্ভ ব্যাংকের সোনা ও বৈদেশিক সিকিউরিটি সমূহে ৫৪০ কোটি টাকা আটকে পড়ে আছে। দ্বিতীয় পাঁচ-সালা পরিকল্পনায় যে প্রকার ডেফিসিট্ ফাইন্যান্সিংয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে দেশের অভ্যন্তরে নোটের পরিমাণ খুব বৃদ্ধি পাবে এবং তার ফলে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা কমে যাবে। এই জন্যে রিজার্ভ ব্যাংক আইনের নোটের 'ব্যাকিং' শতকরা ৪০ ভাগ থেকে ৩০ ভাগে কমাবার প্রস্তাব হয়েছে, বর্ত্তমানে যে পরিমাণ নোট বাজারে চালু আছে সেই হিসাবে নোটের 'ব্যাকিং' শতকরা ৪০ থেকে ৩০ ভাগে কমালে আরও ১৩৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে কেবল মাত্র নোটের ব্যাকিং কমালেই আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার অভাব মিটবে না। প্রকৃত পক্ষে বৈদেশিক মুদ্রার প্রধান অংশের জন্য রপ্তানী বাণিজ্যের উপরই আমাদের নির্ভর করতে হবে। এ জন্যে খুব সুদৃঢ় রপ্তানী নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। আমাদের স্বাভাবিক পণ্যের বাজার গুলিতে জিনিষের কাটতি বাড়াবার চেষ্টা করলেই কেবল হবে না, যে সব বাজারে এতদিন আমাদের কোন সংযোগ ছিল না সেখানে সংযোগ স্থাপন করে আমাদের পণ্যের চাহিদা সৃষ্টির অনুকূল আবহাওয়া গড়ে তুলতে হবে।

জীবন বীমা জাতীয় করণ

গত ১৯শে জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি এক অর্ডিনান্স জারী করে দেশের সমস্ত জীবন বীমা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনভার সরকারের হাতে গ্রহণ করেছেন। এই অর্ডিনান্সের ফলে ১৪২টি ভারতীয় ও ১৮টি বিদেশীয় কোম্পানীর পরিচালন ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন। কোন কোন বীমা কোম্পানী অর্থের অপপ্রয়োগ করায় এবং জনসাধারণের সঞ্চয়কে নিরাপত্তা দেবার জন্য এবং দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য, জন স্বার্থের খাতিরেই সরকার এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সমূহের মালিক পক্ষদের ন্যায্য ক্ষতি পূরণ দেওয়া হবে বলা সত্ত্বেও, তাঁরা সরকারের এই সিদ্ধান্তকে তীব্র নিন্দা করেছেন। অপর পক্ষে দেশের বহু অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিক ও বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মচারিগণ সরকারের এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দিত করেছেন। শীঘ্রই এ সম্পর্কে পার্লামেন্টে একটি বিল উত্থাপন করা হবে। এই বিলে পলিসি—গ্রহীতাদের স্বার্থ, কর্মচারীদের স্বার্থ ও কোম্পানীর এজেন্টদের সম্পর্কে কি রকম বিধি নিষেধের ব্যবস্থা করা হবে, তার উপর বিষয়টির সমস্ত গুরুত্ব নির্ভর করছে।

সমাজ ও জাতীয় জীবন

[র. কু. সে.]

সম্প্রতি জাপানের একটি সংবাদে প্রকাশ : সেখানকার কোন এক বড় 'টোবেকো কোম্পানী' স্থির করেছে—ভগবান বুদ্ধের নামে তারা সিগারেট বার ক'রবে, সিগারেটের নাম হবে 'বুদ্ধ সিগারেট।' তাদের বিশ্বাস সারা এশিয়া মহাদেশ যখন বুদ্ধবাদী, তখন এশিয়ার জনসাধারণের মধ্যে এই সিগারেটের অত্যধিক প্রসার ঘটবে এবং অল্পকালের মধ্যেই এটি একটি অতুলনীয় লাভের ব্যবসায়ে পরিণত হবে। এই সংবাদ শুনে জাপানের বুদ্ধিষ্ট সোসাইটি প্রতিবাদ জানিয়ে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ক'রে ঘোষণা ক'রেছেন যে—ভগবান বুদ্ধের নামে এই জাতীয় মাদকদ্রব্য প্রচারের প্রয়াস অত্যন্ত আইনবিরোধী। বুদ্ধদেব নিজে শুধু যে মাদকদ্রব্য বিবর্জিত পুরুষ ছিলেন, তাই নয়, মানুষ যাতে মাদকদ্রব্যকে বিষের ন্যায় পরিহার করে—জীবনব্যাপী তিনি এ জন্য প্রচার ক'রে গিয়েছেন। শুধু মাদকদ্রব্যই নয়, যে কোনোরকম বিলাসিতাকেও তিনি ঘৃণা ক'রতেন। সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে কি ক'রে বিশ্বকল্যাণের স্বার্থে নিজেকে বৃহত্তর ভাবে ব্যয় করা যায়—তার নানারকম সংজ্ঞা নিরূপণ ক'রে জগৎবাসীকে সেই ত্যাগের পথে তিনি উদ্বুদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। মানুষের কল্যাণের জন্যই তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন, এবং মানুষের কল্যাণের কাজেই তিনি জীবন বিসর্জন দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর নামে সিগারেটের নামকরণ শুধু তাঁর নামের প্রতি উপহাস ও অবজ্ঞারই বিষয় নয়, একটা গুরুতর পাপ।

এই পাপ কার্যে যারা রত, তাদের প্রতি সামাজিক ও রাষ্ট্রিক শাস্তির বিধান আরোপিত হওয়া প্রয়োজন। যে জাপানে রাজার অপবাদ কানে শুনলে রাজানুগৃহীত ব্যক্তিরা হারিকিরি ক'রে জীবন বিসর্জন দেয়, সেই জাপানের মূল ধর্ম বৌদ্ধধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার একশ্রেণীর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কি ক'রে যে এই জাতীয় ধর্ম বিরোধী কাজে সাড়া দিতে পারে, এইটেই আশ্চর্যের বিষয়।

বস্তুতঃ মহাপুরুষদের নামে এই জাতীয় ব্যবসায়ীর বস্তু ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এই নতুন নয়। ভারতবর্ষেও একাধিকস্থলে এই জাতীয় কার্যের উদাহরণের সঙ্গে আমরা পরিচিত। পাঠকসম্প্রদায় অবশ্যই লক্ষ্য ক'রে থাকবেন—রবীন্দ্রনাথের নামে 'রবীন্দ্র বিপণি' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামে 'বিদ্যাসাগর লণ্ড্রী', নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নামে 'নেতাজী বিড়ি' প্রমুখ বহু বস্তু ও প্রতিষ্ঠান। এই মহাপুরুষদের প্রতি যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নেই, এমন নয়। মানুষ সাধারণতঃ যেমন দেব-দেবীর নামে নিজেদের সন্তান-সন্ততির নামকরণ ক'রে থাকে, প্রতিষ্ঠানের পিছনেও এই রকম একটা মানসিক ভাব অসম্ভব নয়। কিন্তু দেবদেবী সাধারণতঃ মানুষের কল্পনা-প্রসূত; কল্পনার দ্বারা মানুষ চালিত হ'তে ভালোবাসে, কল্পনায় মানুষের মনোবল বাড়ে, নিজের প্রচলিত অবস্থা থেকে উত্তীর্ণ হ'তে পরোক্ষ কল্পনা প্রেরণা জুগিয়ে থাকে। এই প্রেরণার অনুগামী হ'য়েই মানুষ তার সব চাইতে প্রিয় দেব-দেবীর নামানুসারে নিজেদের সন্তান-সন্ততির নাম করণ ক'রে থাকে। সেখানে কোন দুর্জটিপ্রসাদ যদি অদৃষ্টচক্রে কিঙ্করে পরিণত হয়, তাতে পিতৃ-পিতামহের একমাত্র আক্ষেপ করা ছাড়া আর কিছু করবার থাকেনা। কিন্তু যে মহামানবের আবির্ভাবে বিশ্বের সকল কলুষ ও দৈন্য ঘুচে যায়, সেই মহাপুরুষদের নামে কোনো ইতর শ্রেণীর ব্যবসা প্রচলন হীনমনোভাবের পরিচায়ক। এই জাতীয় ব্যাপার বাড়তে দেওয়া বা এগুলির স্থায়িত্বকে পোষণ করা আদৌ কল্যাণকর নয়। এখানেও একথা ব'লতে বাকী না যে, এই সব ব্যবসায়ীশ্রেণী মহাপুরুষদের প্রতি কম শ্রদ্ধাশীল। বরং শ্রদ্ধাশীল ব'লেই তাঁরা তাঁদের প্রিয় ও কষ্টকল্পিত ব্যবসাকেন্দ্রকে কোনো

মহাপুরুষের নামের সঙ্গে সংযুক্ত রাখতে চান। কিন্তু যেখানে দেখতে পাচ্ছি—বুদ্ধদেব চিরকাল মাদকতা বিরোধী ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ দোকানদারী ক'রতেন না এবং বিদ্যাসাগর বা নেতাজী লণ্ডী বা বিড়ির ব্যবসায়ে জড়িত ছিলেন না, সেখানে তাঁদের মহৎ নাম ব্যবহার ক'রে এই জাতীয় অর্থকারী প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তোলার সার্থকতা কোথায়? এর দ্বারা মহাপুরুষদের পরোক্ষে অপমানই করা হয়। আর সেই অপমান শুধু মহাপুরুষদেরই নয়, সমগ্র জাতিরই অপমান। এই অপমানের লজ্জা থেকে মুক্তি না পেলে জাতীয় গৌরব বাড়বে না।

বৈদেশিকী

আগামী বিদেশ মালয়

অগাষ্ট মাস সত্যসত্যই এশিয়াবাসীর কাছে একটী বিশেষ মাস বলিয়া মনে হইবে। আগামী কালের ইতিহাসে এই মাসটি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ভারত এই মাসে ব্রিটিশ স্বাধীনতা হইতে মুক্তি পায়। আবার খবর আসিয়াছে মালয় আগামী বৎসর এই মাসে ব্রিটিশ অধীনতা হইতে মুক্ত হইবে। মালয় দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের ভয়াবহ বীভৎস রূপ দেখিয়াছে। ইহার বুকের উপর দিয়া যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে—তাহা এশিয়ার ইতিহাসে পরম অপ্রীতিকর বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু মালয়ের সে দুঃখের দিন পার হইয়া যাইতেছে। গত সাত বছর ধরিয়া মালয়ের অরণ্য দেশে কম্যুনিষ্টপন্থীরা যে বিদ্রোহ করিয়াছে, তাহাই মালয়ের স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দিয়াছে—যদিও আমরা তাহাদের পন্থায় বিশ্বাসী নই। ইহা বিশেষ প্রমাণিত হইয়াছে যে কম্যুনিষ্ট হিংসায়—কোন মালয়বাসীই লাভবান হয় নাই। তাই সাত বছর তীব্র বিরোধের মধ্য দিয়া উভয় পক্ষই ইহা অনুভব করিয়াছে। মালয়ের রবার হইতে বহু অর্থ ব্রিটিশ বণিকেরা অর্জন করিয়াছে; কিন্তু দেশবাসীর বৈষয়িক উন্নয়নে তাঁহারা কিছু মাত্র খরচ করেন নাই। কাজেই দেশবাসী—অর্থাৎ মালয়বাসী নিজেরাই নিজেদের কথা ভাবিতে শুরু করিয়াছে। ইহার অর্থ নিজেদের আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত আন্দোলনে ব্রতী হইয়াছে। এই আন্দোলন আজ সাফল্য লাভ করিয়াছে। ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে অগাষ্ট মালয় স্বাধীন হইবে।

ইজ মার্কিন পরামর্শ বৈঠক

ইজ মার্কিন নীতিতে আবার নূতন পথে মোড় ফিরিতেছে। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াই এই নূতন মত পরিবর্তনের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইবে। সম্প্রতি এক ইজ মার্কিন পরামর্শ বৈঠক হইয়া গেল। এই পরামর্শের ফল যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে মনে হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হইতে ব্রিটেন আপনার শক্তির কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িতেছে। তাই বহু বিষয়েই ইজ মার্কিনে সলা পরামর্শ করিয়া কাজ করিতে হয়। অবশ্য পররাষ্ট্র বিষয়ে এই রূপ নির্ভরশীলতা ইতিপূর্বে ব্রিটেনে বড় একটা দেখা যায় নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেন ব্রিটেনের পক্ষে কাল হইল। ভারত হাতছাড়া হইয়াছে অতএব দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে নেতৃত্বের খাঁটি বেরুল হইল। কাহাকেও ধমক দিয়া কিছু করাইবার নাই।—তাই যত —'মাথা' সম্ভব একজোট হইয়া 'Braintrust' কাজ করিতে হইতেছে। বোগদাদ চুক্তিতে মার্কিনী সমর্থন পুরাপুরি না পাইলে ব্রিটেনের মন নিশ্চিন্ত নহে—তাই সেইদিন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ সেলুইন লয়েড বলিয়াছেন, "The U. S. expression on solid support for the Baghdad Pact as one of the important factors……" অর্থাৎ বোগদাদ চুক্তিতে মার্কিনদের অকুণ্ঠ সমর্থন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহার পর আরো কথা আছে তাহা সেলুইন লয়েড খুলিয়া বলেন নাই। বিশেষ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইবে যে বিপন্ন ব্রিটেন নিজ নিরাপত্তা রক্ষায় বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব খুব স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, 'যদি স্বাধীন দুনিয়ার নিরাপত্তার চাবি কাঠি ঠিক রাখিতে হয় তবে সাইপ্রাসকে কম্যুনিষ্ট হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। সাইপ্রাসবাসী স্বাধীনতা ও আত্ম নিয়ন্ত্রণের দাবী তুলিতেই ব্রিটেন এই সব যুক্তি প্রদর্শন করিতেছে। ফলে সাইপ্রাসের স্বাধীন সত্তা স্বীকৃত হইবার পথে বিশেষ বিঘ্ন দেখা দিল। ব্রিটেন

সুযোগ বুঝিয়া সাইপ্রাসের দাবীর সঙ্গে বিশ্ব-রাজনৈতিক পরিস্থিতি জুড়িয়া দিল। অথচ আমরা জানি যে এই পরিস্থিতির উল্লেখ মাত্রের প্রয়োজন নাই। কেন না স্বাধীন সাইপ্রাসবাসীরা আপনাদের স্বার্থেই, নিরাপত্তার স্বার্থেই বিভিন্ন শক্তিবর্গের সহিত মিলিত হইয়া থাকিতে চাহিবে। ইহার একমাত্র কারণ বর্তমান বিশ্ব যুদ্ধের দিনে এইরূপ ছোট ছোট দ্বীপ সামরিক দিক হইতেই একরূপ ভাবে নিরাপদ নহে। ইহার কারণ ভৌগোলিক সংস্থান। এই নিরাপত্তার চেতনা অন্য কোথা হইতে চাপাইয়া না দিয়া সাইপ্রাসবাসীদের নিজেদের ভিতর হইতে জাগ্রত হইলেই শোভন হইত। এবং সাইপ্রাসও স্বাধীনভাবে সামরিক নিরাপত্তার দায়িত্বশীল অংশীদার হইতে পারিত। কিন্তু দেখা যাইতেছে ব্রিটিশ কূটনীতি সে পথে যাইতেছে না। ইহা পরিতাপের বিষয়।

আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট পার্টি কংগ্রেস

ইহার নাম ইতিহাসের যে সব ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া ইতিপূর্বে রাশিয়াতে দেখা দিয়াছিল, তন্মধ্যে লেনিন ও ষ্টালিনের নাম বিশেষ উল্লেখ যোগ্য, লেনিনের মৃত্যুর পর ষ্টালিন ক্ষমতা হাতে লইয়াছেন (আপনা হইতেই পাইয়াছেন কিনা বলা কঠিন)। ষ্টালিন যে কূটনীতির পথ ধরিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদের হত্যা করিয়াছেন, নির্বাসন দিয়াছেন, ও দুর্নাম রটাইয়াছেন—সে কূটনীতিই আজ তাঁহার উপর বিক্রিয়া করিতেছে, তাঁর নশ্বর দেহ আজ অবশ্য নাই—কিন্তু অনেক সময় ইতিহাসে মানুষ মরিয়াও বাঁচে, আবার বাঁচিয়াও মরিয়া থাকে। এই বাঁচা ও মরা বিভিন্ন কারণে ঘটিয়া থাকে। ইহার মধ্যে একটি বিশেষ কারণ হইল রাজনৈতিক গঠনশীলতা। কেন না ইহার অব্যবহিত ফল রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া সহসাই প্রকাশ হইয়া পড়ে। ষ্টালিন যে রাষ্ট্রের কর্ণধার হইয়া তাঁহার রাজনৈতিক কর্মকুশলতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাকে বাহির-বিশ্ব পুলিশ-ষ্টেট বলিয়া জানিত। যাহারা এই পুলিশ ষ্টেটের প্রত্যক্ষ লক্ষ্যস্থল ছিল তাহারাই আজ রাশিয়াতে কথা বলিতে শুরু করিয়াছে। ষ্টালিন ব্যক্তি হিসাবে যতই সক্ষম হন না কেন, তাঁহার ব্যক্তিত্ব যে রুশ জাতির কাছে ভয়াবহ ছিল তাহা আজ সর্ব সমক্ষে ধরা পড়িয়াছে: গুপ্ত সত্যের বেলুনটা আজ ফাটিয়া যাওয়ায় রাশিয়াতে স্বস্তির বাতাস বহিতেছে। যে ভয়াবহ একনায়কতন্ত্র এত দিন রাশিয়ার বুকের উপর দিয়া ষ্টীম রোলারের মত চলিয়া ছিল—আজ তাহার গতি স্তব্ধ হইয়াছে। আজ রুশ নেতারা স্বীকার করিয়াছেন যে, ষ্টালিন ব্যক্তি ছিলেন, একক ছিলেন। তাঁহার সমগ্র কর্ম ও চিন্তার একটা অ-গণতন্ত্রীয় মনোভাব ছিল। তিনি ও তাঁহার গোষ্ঠী রাশিয়াতে রাজত্ব চালাইয়া গিয়াছেন। বস্তুত রাজনীতির এই গোষ্ঠী-প্রাধান্য সর্বত্রই অন্তর্বিস্তর রহিয়াছে। ক্ষমতার এমনই মোহ তাহা পাইলে আর রক্ষা নাই। এই মোহই মহাঅস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। রাশিয়ার ক্ষেত্রে এই কথাটি বিশেষ ভাবে প্রযোজ্য, কেন না রাশিয়া যে রাষ্ট্র-দর্শন গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে মানুষের মধ্যে শুভ বুদ্ধির কোন মূল্য নাই। কেবল মাত্র পীড়ন ও পেষণ-অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়া তাহারা রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিজ কবলে রাখিতে চায়। এই দুর্ধর্ষ ইচ্ছা শক্তি পরমতকে তিল মাত্র সম্মান না করিয়া আপনার উদ্যত আবেগে ছুটিতে চায় বলিয়াই সমাজে একটা ত্রাসের সঞ্চার করে। ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রের ইতিহাসে এই ত্রাসার্ত জীবনের সন্ধান বহুস্থলে পাওয়া যায়। এবং ত্রাস-সঞ্চারী নেতৃত্ব করিবার জন্যই বোধ হয় হিটলার, মুসোলিনী ও ষ্টালিনের জন্ম হইয়াছিল। হিটলার ও মুসোলিনী নিতান্ত ঐতিহাসিক বাস্তব বোধের অভাবেই অতি সত্বর ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিদায় লইলেন। ষ্টালিন অপেক্ষাকৃত বাস্তববাদী, তাই নিজস্ব বাগানের ফুলের মালা গলায় পরিয়া জীবিত কালের মধ্যে সকলকে চোখ রাঙাইয়া গিয়াছেন; কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি যে, ইতিহাসে কেউ বাঁচিয়া মরে—কেউবা মরিয়া বাঁচে। ইয়োরোপের দুর্ভাগ্য যে এই তিনটি প্রাণীর হাতে ইয়োরোপ যথেষ্ট গ্লানি সহিয়াছে। গ্লানি সহিয়াও কিছু করিতে পারে নাই। মূক বধির বালকের মত ক্যাল ক্যাল করিয়া তাকাইয়াছে। এবং অধিকাংশ সময়ই যন্ত্র চালিতের মত কাজ করিয়াছে। মনে হয় ইয়োরোপীয় জীবনের একটা বিশেষ অংশের কোন সত্তা ছিল না, তাই। উদগ্র ক্ষমতা-প্রিয় কাইজারের পরই তিনটি ব্যক্তিত্বের বিকাশ হইল—এবং প্রায় প্রত্যেকেই ইতিহাসের ধূলি মুঠি হইয়া রহিল। আজ রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট-পার্টি-কংগ্রেসে যাহা ঘোষণা করা হইল তাহাই ইতিহাসের সিদ্ধান্ত। ষ্টালিন সম্মিলিত নেতৃত্বে আস্থাবান ছিলেন না। ইহার ফলে অনেক বিরোধ, ভুল ত্রুটি, ক্ষয় ক্ষতি রুশ জাতিকে সহ্য করিতে হইয়াছে। গোটা জাত যেন যান্ত্রিক প্রথায় গড়িয়া উঠিতে ছিল। ইহার না ছিল স্বাধীন চিন্তা, না ছিল আত্ম-বিশ্বাস। সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র জাত কাপড়ের ভয় দেখাইয়া জাতির অন্তরাত্মাকে পিষিয়া মারিয়াছিল। সিকোয়াসের বক্তৃতা সেই মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চারের সম্ভাবনা আনিয়াছে;

অতীতের একটি দিন

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(১)

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকে সুধীন্দ্র। দীর্ঘ কাল কারাগারে রয়েছে সে, জীর্ণ শীর্ণ চেহারা হয়েছে তার। দীর্ঘকাল আগে যারা তাকে দেখেছে, তারা তার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করবে, কিন্তু বিস্মিত হবে না। জেলখানার মধ্যে কেউ আরামে বাস করে না,—বিশেষ করে রাজবন্দীরা; স্বীকৃতির জন্য তাদের উপর চলে হাজার রকমের পীড়ন, বহু অত্যাচার, অর্দ্ধাহারে অনাহারে তবুও তারা শেষ দণ্ড বইবার জন্যও বেঁচে থাকে।

তথাচ্ছাদিত অগ্নিই বটে।

এত যে জীর্ণ তবু তার মধ্যে আছে দর্প, আছে গর্ব, তার প্রতিভার পরিচয়। আদালত সুদ্ধ লোক তাকিয়ে থাকে তার পানে, চোখ ফিরাতে পারে না।

দীর্ঘ দিন ধরে বিচারের নামে প্রহসন চলেছে, দিনের পর দিন পড়ছে।

খাস বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের বিচার, ভুলত্রুটি এতটুকু হওয়ার যো নেই। সাক্ষীর পর সাক্ষী সংগ্রহ হচ্ছে; কারণ ঠিক প্রমাণ চাই। সোজা ব্যাপার নয়, হত্যাকারী সন্দেহে ফাঁসি দেওয়া চলে না, প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট আইন বাঁচিয়ে চলছেন।

ফাঁসির আসামী—সোজা কথায় নরহত্যাকারী।

আসামীর বিপক্ষে বহু সাক্ষী আছে, স্বপক্ষে কেউ কোনদিন ছিল না, আজ ও কেউ নাই।

আসামী হত্যার কথা অস্বীকার করে না। স্পষ্টই সে বলেছে, সে হত্যা করেছে, আর এ হত্যা আকস্মিক উত্তেজনাপ্রসূত নয়, বহু পূর্বে সে এর পরিকল্পনা করে রেখেছিল। সুযোগ এবং সুবিধা সে পায় নি তাই, নচেৎ অনেক আগেই সে হত্যা করতো।

প্রথম হতে স্পষ্ট সে অপরাধ স্বীকার করে আসছে, তবুও চলে বিচারের আড়ম্বর, আদালতগৃহ লোকে পূর্ণ হয়, উকিল ব্যারিষ্টারের জেরা চলে, তার বিরুদ্ধে বহু প্রমাণ সংগৃহীত হয়।

প্রমাণ ছাড়া আর কি,—সুধীনের হাসি আসে।

সুধীনের মতে—একটু একটু করে বধে না মেরে—যাকে মারবে তাকে একেবারেই মেরে ফেলা উচিত। তার মনে পড়ে, কোন্ সেই ছোট বেলায় তার ছিল এক পোষা কুকুর। কার কাছে শুনেছিল কুকুরের লেজ কেটে দিলে কুকুর নাকি অত্যন্ত শক্তিশালী হয়। কিন্তু একেবারেই কেটে দিলে কুকুরটা বড় ব্যথা পাবে, সে তাই একটু একটু করে প্রতিদিন তার লেজ কাটতো এবং তার ধারণা ছিল অল্প অল্প করে কাটলে বেশী ব্যথা লাগবে না।

কিন্তু সে ছিল শিশু, তার সহজ বুদ্ধিতে সে যা অভ্রান্ত সত্য বলে জেনেছিল, আইনজ্ঞ এবং বিশেষ শক্তিশালী এই গভর্ণমেণ্টও তাই জেনেছেন।

মৃত্যুদণ্ড সুধীনকে দিতে হবে জেনেও বিচারের অছিলায় দিন বাড়িয়ে চলেছে—। দীর্ঘ দিন আসছে, চলে যাচ্ছে, জীবনের মেয়াদ ফুরিয়েও ফুরাচ্ছে না। অন্ধকার কারাকক্ষে বসে তার অন্য চিন্তা করে তার দিন কাটছে না সে কথা, কে বুঝবে, কেই বা জানবে?

জেলখানার নীতিতত্ত্বের আলোচনা করতে আসেন এক পণ্ডিত, প্রতি রবিবার এ তাঁর ডিউটি।

চোর, ডাকাত, খুনী, জেলখানার মধ্যে

সকলকেই তিনি ধর্মকথা শোনান, এ জন্মে যে মহাপাপ সঞ্চয় করেছে তারা, তার জন্য অনুতাপ তারা করুক। ঘোর ঘনঘটা এর পর যেন নৈঃশব্দ্য জীবন যাপন করে, মুক্তি পেয়ে তারা যেন পরের অনিষ্ট চিন্তা আর না করে। খুনীকে তিনি ধর্মকথা শুনান সে অনুতাপ করুক, তার পতিত আত্মার জন্য ভগবানের করুণা প্রার্থনা যেন সে করে, পরজন্মে যদি আসতেই হয় ধূলার ধরণীতে, সে জন্মে সাধু জীবন কাটিয়ে যায়, সৎচিন্তা করে।

হো হো করে হেসে ওঠে সুধীন।

স্পষ্টই বলেছে, জানিনে, এই বাঁধাধরা পুণ্য কথাটুকু প্রচার করে আপনি কত টাকা পান। ও সব ধর্মবাণী ওদেরই শোনান শাস্ত্রী মশাই, যারা পরজন্ম মানে, সে জন্মে সুখলাভের জন্যে লালায়িত হয়। আমাকে ও সব উপদেশ দিয়ে কোন লাভ হবে না, কারণ অনুতাপ আমি কোন দিনই করব না। তা ছাড়া আমি স্বর্গ নরক জন্মান্তর, পাপপুণ্য এ সব কিছু মানি নে, বরং জোর করেই বলব—আপনার কার্যানুসারে যদি আবার আমার জন্ম হয়, সে জন্মেও আমি এমন জীবন যাপন করব,—দেশের স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতে ব্রিটিশকে নিজের দেশে ফিরে পাঠাতে যদি লক্ষ নরহত্যা করতে হয় তাও করব।"

শাস্ত্রী মহাশয় যেন চমকে ওঠেন; আশ্চর্য চোখে তার পানে তাকিয়ে থাকেন। খুনী খুন করে গৌরব বোধ করে এ দৃশ্য তিনি এর আগে দেখেন নি। খুন অবশ্য মানুষই করে, কিন্তু সেটা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র, তারপরই জাগে তার রক্তের বিতৃষ্ণা, সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে, ইহ জগতে না হোক, পরজগতে এতটুকু শান্তি তৃপ্তি পাওয়ার আশায় সে উন্মাদ হয়ে যায়। হাঁ সত্যই সে উন্মাদ হয়, সে হাসে, কাঁদে, অবোল তাবোল কথা বলে; কিন্তু এই খুনী আসামী ভদ্র সন্তান, কথাবার্তা শুনে তাকে রীতিমত শিক্ষিত বলেই মনে হয়, এ সে শাস্তি তৃপ্তি চায় না বরং ধর্মকথা শুনে সে হেসে ওঠে, কানে আঙুল দেয়।

ব্যতিক্রম—সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম সে; বেশ ধীরে সুস্থে কথা বলছে, রীতিমত আহারাদি করছে, ঘুমাচ্ছে, গান গাইছে, এ লোককে কি বলা চলে?

শাস্ত্রী মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন, তোমার ভাব দেখে মনে হয়, রক্তে তোমার বিতৃষ্ণা জাগে না, হাসতে হাসতে নরহত্যা করে যাচ্ছো। জিজ্ঞাসা পারি করতে তুমি এ পর্যন্ত কতগুলি হত্যা করেছো—?"

সুধীন হেসে ওঠে, "নিশ্চয়, নিশ্চয়, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে সত্যই আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে শাস্ত্রী মশাই। হিসেবটা ঠিক দিতে পারব না, কত যে মেরেছি তার ঠিক নেই। বোম ফেলেছি, ডিনামাইটে কত উড়িয়েছি, কিন্তু সকলের আগে আমার মাকে হত্যা করেছি শাস্ত্রী মশাই—"

মনে হয় আসামীর কণ্ঠস্বরটা হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে গেল, মুখের হাসিটা অকস্মাৎ মিলিয়ে গেল। আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠেন শাস্ত্রী মহাশয়, অ্যাঁ, "মহাপাপী- মাতৃহত্যা করেছো তুমি? যে মা তোমায় গর্ভে ধারণ করেছেন, নিজের বুকের সুধা দিয়ে আদর যত্ন, স্নেহ, মমতা দিয়ে তোমায় মানুষ করেছেন, সেই মাকে তুমি হত্যা করেছো, এত বড় মহাপাতকী তুমি—?"

সুধীন আবার হেসে ওঠে "আঃ, অত চেঁচান কেন শাস্ত্রী মশাই, পাহারাদারগুলো ভাববে আমি বুঝি আপনার গলা টিপে ধরেছি। না না, অত চেঁচাবেন না, আস্তে কথা বলুন। আগে শুনুন, কেন আমি আমার দেবীর মত মাকে হত্যা করেছি। যাদের টাকা খেয়ে আজ আপনি আমাকে হিতোপদেশ দিতে এসেছেন, আমার পরলোকের পথ সরল সুগম করতে এসেছেন, তাদেরই অত্যাচার হতে বাঁচবার জন্যই আমার মাকে আমি নিজের হাতে হত্যা করেছি। শুনতে চান আরও শুনুন, আমার মায়ের বুকের রক্ত হাতে নিয়ে আমি শপথ করেছি"—

থেমে যায় সে, দুই হাতে নিজের মাথার চুল মুঠো করে চেপে ধরে।

শাস্ত্রী মহাশয় ততক্ষণে দুই পা পিছনে সরে দাঁড়িয়েছেন, মাতৃহত্যাকারীর মুখখানা যেন আর না দেখতে হয়, সে জন্য তিনি পিছন ফিরবার চেষ্টা করেন।

মুহূর্তে আত্মসম্বরণ করে সুধীন, চেঁচিয়ে বলে—"যাবেন না শাস্ত্রী মশাই, কথাটা শুনলেনই যদি—সবটা শুনে যান। হ্যাঁ, মাকে পৃথিবী হতে বিদায় দিয়ে হত্যা করেছি পর পর পাঁচজনকে—শেষটায় মেজর কেনেডি—"

কিন্তু ততক্ষণ পায়ে পায়ে সরে পড়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, মনে মনে শপথ করেছেন, এ মহাপাপিষ্ঠের কাছে আর নয়। কথায় আছে "চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী, কিন্তু বাস্তবিক সে কথা সত্য নয়। বরং চোর ডাকাতেরা অনেকে ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মের কাহিনী শোনে, শুনলে না কেবল এই খুনী ছেলেটা। ভগবান, ওকে সত্যের আলো দেখাও, ওকে সত্যজ্ঞান দাও।

তিনি অদৃশ্য হতেই হেসে উঠেছিল সুধীন, হো হো, হা হা, হি হি,—

হাসতে হাসতে তার চোখ ফেটে জল বার হয়ে পড়েছিল, সে হাসি তার থামে না। হাসি শুনে দরজার বাইরে বিচরণশীল শাস্ত্রী উঁকি দিয়ে দেখেছিল, মনে করেছিল আসামী উন্মাদ হয়ে গেছে। খুনী আসামীদের যে এমনই অবস্থা হয় তা শাস্ত্রী জানে, তারা হাসে কাঁদে, গলাগালি করে, চেঁচায়, নৃত্যও এতে কিছুই নাই।

দু একদিনের মধ্যেই বিচার শেষ হবে, ফাঁসী যে হবেই তা সুধীন জানে।

একই সঙ্গে পর পর কয়জনকে হত্যা করেছে সে। সুখের কথা পাঁচ সাতজনকে হত্যা করলেও তার ফাঁসি হবেই একবারই, একবারই সে ঝুলবে।

নিজের গলায় একবার সে হাত বুলায়, কেমন যেন সুড় সুড় করছে, মনে হয় এই মুহূর্তে দড়িটা লাগালেই হতো, সে শান্তি পেতো। এ যেন দারুণ অস্বস্তি, এই সুড় সুড় ভাবটা কিছুতেই যায় না। অস্থির ভাবে সে নিজের গলা দুহাতে টিপে ধরে, পেষণ করে, তবু এতটুকু শান্তি পাওয়া যায়।

ফাঁসির দৃশ্যটা একবার মনে করে সে। দেখতে পায় তার দেহটা ফাঁসিতে ঝুলছে, দোলা খাচ্ছে। অপলক দৃষ্টিতে সুধীন তাকিয়ে থাকে।

ছোট্ট ছেলে সুধীন।

দিনাজপুর শহরে গণেশতলায় তাদের বাড়ী, দিনাজপুর স্কুলে সে পড়েছে। জেল দারোগার ছেলে অরিন্দমের সঙ্গে ছিল তার খুব ভালোবাসা। কর্তৃপক্ষের অজ্ঞাতে অরিন্দমের সঙ্গে গোপনে সে জেলখানায় একজনের ফাঁসি দেখেছিল। আজ এতকাল পরে সেই বিভীষিকাময় দৃশ্যটাই তার মনে জেগে উঠেছে।

আজ কোথায় সে অরিন্দম?

আই বি, ডিপার্টমেন্টে সে কাজ করছে; এরই মধ্যে সে সরকারের প্রদত্ত বিশেষ উপাধি ও যথেষ্ট পুরস্কারও লাভ করেছে। সুধীনকে সে বিলক্ষণ চেনে, সুধীনের বিচারের সময় সে নিজে সাক্ষ্য দিয়েছে, সুধীন আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে হেসেছে।

বন্ধু—বন্ধুপ্রীতি, বন্ধুর ভালোবাসা,

বিশ্বাস করোনা কেউ। প্রকৃত বন্ধু কয়জন পেয়েছে যে বন্ধু বন্ধুর জন্য জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে পারে? বর্তমান জগতে বন্ধুর ছদ্মবেশে এসেছে পরম শত্রু, বিশ্বাস করোনা, তাকে এড়িয়ে চলো—।

সুধীন সেই ছোটবেলার কথাই মনে করে।

সেই দিনাজপুর আর সেই গণেশতলা। পথের ওধারে মস্ত বড় অশ্বত্থ গাছটার ফোকরে ফোকরে পাখীর ছানা,—সাহস করে সেই পাখীর ছানা সংগ্রহ করতে ছিল কত আনন্দ। মস্ত বড় পুকুরে কালো জল টল করছে, তার বুকে দাঁতার কাটতো পাড়ার ছেলেরা, তোলপাড় করতো সমস্ত পুকুর।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সুধীন—

দিন চলে গেছে—সে আজ ফাঁসির আসামী, দুদিনে সে ফাঁসির দড়ি গলায় দিয়ে; দু চারবার হয়তো হাত

পা দুটো ভেঙে, জিভটা এতখানি বার হয়ে পড়বে, চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠবে।

সেই প্রতীক্ষার ফল আসে—

সুধীনের ফাঁসির হুকুম হয় একদিন।

নিশ্চিত ফাঁসি হবে জেনেও হঠাৎ কেমন যেন স্তম্ভিত হয়ে যায় সুধীন, তারপরই অকস্মাৎ পাগলের মত হেসে ওঠে—হা হা হা হা—হা—হা—"

উন্মত্ত হাসি তার মানা মানে না, ফোয়ারার মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রহরীরা ধমক দেয়, তাকে কাঠগড়া হতে নামানোর চেষ্টা করে,"—এই বাউরা, উতারো—চলো"—

কিন্তু কে মানবে, কে চলবে?

ততক্ষণ বিকট হাসিতে চারিদিক শব্দায়িত করে তুলেছে সুধীন, তার চোখ ফেটে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়ছে।

আদালত অবমাননার জন্য তার দণ্ড হতে পারতো যদি তার চরম দণ্ডের আদেশ না হতো। চরম শাস্তি দিয়েই বিচারক নিশ্চিন্ত, তাঁর কর্তব্য শেষ হয়ে গেছে। এখন তার ফাইন নাই, বেত্রদণ্ডও চলে না, শেষদণ্ড মাথায় নিয়ে জয়ীর গৌরব লাভ করেছে সে।

কি অদ্ভুত এই লোকটি—

আদালতসুদ্ধ লোক পরম বিস্ময়ে তার পানে তাকিয়ে থাকে, এমন আশ্চর্য লোক তারা বুঝি কোনদিনই দেখে নি, কানেও তারা এ রকম লোকের গল্প শোনে নি। হতে পারতো বিকৃতমস্তিষ্ক—কিন্তু সে তা নয়, নিজেই দৃঢ়তার সঙ্গে সে কথা সপ্রমাণ করছে। বাঁচতে সে আর চায়না, তাই খুসী হয়ে ওঠে।

ফাঁসির আদেশে প্রত্যেক আসামী মুসড়ে পড়ে; অত বড় গুণ্ডা সর্দার বুদ্ধরাম পর্যন্ত হু হু করে কেঁদে উঠেছিল, বিচারকের পায়ে ফিরে হাতজোড় করে অনুনয় করেছিল—তাকে মিথ্যে দণ্ড দেওয়া হচ্ছে, জজসাহেব ইচ্ছা করলে তার দণ্ড মকুব করতে পারেন।

প্রীতিমত সুস্থ লোক সুধীন। বাঁচতে সে চায়না, জগৎ তার কাছে বিভীষিকা, মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা পেয়ে সে মহা খুসী হয়েছে।

প্রহরীরা তাকে জোর করে নামিয়ে নিয়ে চলে। তার আগে আভূমি প্রণত হয় সে, হাসি থামিয়ে বলে, আপনার হুকুম শুনে ভারি খুসী হয়েছি আমি। আরও খুসী হতে পারতাম যদি এ ভাবে আমায় ঝুলিয়ে না রেখে পোড়াতেই সরাসরি বিচার করে এই হুকুমটা দেওয়া হতো। আমি প্রথম হতেই বলে আসছি—যতগুলো হত্যা হয়েছে সব আমিই করেছি। আমি এখনও বলছি কেনেডিকে আগে পেলে এদের মারতাম না। যাই হোক, দীর্ঘদিন আমায় কষ্ট দিয়ে শেষকালটায় যে বাঁচালেন, এর জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে যাচ্ছি।"

ঝন ঝন করে শিকল বাজিয়ে লম্বা পা ফেলে সে প্রহরীদের সঙ্গে চললো।

আগামীকাল প্রত্যুষে হবে তার ফাঁসি।

রাত্রি,—নিবিড় অন্ধকারময়ী নিশীথিনী, জীবন্ত মানুষের কাছে সে মনোরম সুন্দর, জীবিতের রাজ্যে সে আজও বর্তমান।

চোখে ঘুম আসে না—

শেষবার ঘুমোতে চায় সুধীন, অনেক চেষ্টা করেও চোখ মুদতে পারে না, গভীর অন্ধকারের মধ্যেও সে চোখ মেলে থাকে।

কত আসে ওপারের যাত্রীরা, ভিড় করে ঘিরে দাঁড়ায় তাকে, অভিনন্দন জানায়। নিজেরা তারা কত কথা বলে, খিল খিল শব্দ মাত্র কানে আসে। কালোর মধ্যে সাদা সাদা অসংখ্য সিঁদুর মত তারা সেই জমাট অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়, সুধীন তাদের ঠিক চিনতে পারে না।

মৃতের রাজ্য সীমানায় পা দিয়েছে সুধীন, চেনা মুখ খানাকে সে খুঁজে ফেরে।

"বাসবী—তুমি এসেছো—বাসবী—?"

নামটা নিজের অজ্ঞাতেই তার মুখে ভেসে আসে, সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে ওঠে।

কে সে বাসবী, আজ তার সঙ্গে সুধীনের কি সম্পর্ক আছে? কবে এসেছিল বাসবী, আবার কবেই বা চলে গেল?

পিতা দুর্দান্ত পুলিস কমিশনার,—তাঁর নামে নাকি বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়। নিজে তিনি বাই হোন, মাতৃহীনা বাসবী ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন, এবং এখানেই ছিলেন তিনি একেবারে কোমল।

বি, এ, পড়েছে বাসবী, সব দিক দিয়ে সে নাকি উজ্জ্বল রত্ন; সহজে কেউ তার নাগাল পায় না। সুন্দরী, অতি আপ টু ডেট এবং ধনী পিতার একমাত্র কন্যা। নিজেই সে মোটর চালিয়ে কলেজে আসে আবার ফিরেও যায়।

বড় লোকের আদরিণী মেয়ের খেয়াল; একদিন নিজেই ড্রাইভ করে বেড়াতে গিয়েছিল সহর হতে দূরে দক্ষিণ গড়িয়ার দিকে। এ রকম ভাবে বেড়ানো তার একটা নেশা, উদ্দেশ্যহীন ভাবে খোলা পথে ছোট মোটর-খানা ঝড়ের বেগে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া তার একটা খেয়াল।

মা থাকলে তবু হয়তো একটা বন্ধন থাকতো, পিতার নাগাল পায় না বাসবী, তিনি থাকেন তাঁর বহু কাজকর্ম নিয়ে—সেখানে বাসবীর স্থান নাই।

মাঠের মাঝখানে উঁচু নিচু পথে চলতে মোটরখানা হঠাৎ যে এমনভাবে অচল হয়ে পড়বে, বাসবী তা ভাবতে পারি নি। বিশেষ করে এ এমন জায়গা যেখানে সভ্য শিক্ষিত লোকের দেখা মিলবে না, অন্ততঃ পক্ষে বাসবীর বিশ্বাস তাই।

মেম সাহেবের গাড়ী দেখতে ছুটে আসে কুঁড়ে ঘরের লোকজন, যাদের পোষাক পরিচ্ছদ বা পরিচ্ছন্নতার বালাই নাই, কোন রকমে লজ্জাই নিবারণ করেছে মাত্র। ছোট ছেলেমেয়েরা একেবারে বিবস্ত্র, রুক্ষ মাথা, নোংরা দেহ এই ছেলেমেয়েদের পানে তাকিয়ে বাসবীর সভ্য শিক্ষিত মন কিরূপ হয়ে ওঠে। কুটিরবাসিনী মেয়েরা পায় পায় এগিয়ে আসে, পরম বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে আলট্রা-মডার্ণ বাসবীকে, যার পরণে সালোয়ার পাঞ্জাবী, পায়ে একটা ওড়না যার উপরার্দ্ধে শোভা পাচ্ছে, মাথায় ছেঁট করা রুক্ষ সুন্দর চুল বাতাসে উড়ছে, ক্রিমে আটকান থাকায় মুখে চোখে পড়তে পারছে না। কুটিরবাসিনীরা এ পোষাক কোনদিন দেখে নি, তাই পরম বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখে।

বাসবীও তাকায়, মলিন সাততালিযুক্ত শাড়িতে কোন রকমে তারা দেহ আচ্ছাদন করেছে। অর্দ্ধাহারে অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ চেহারা এরা কে? এরাই দেশের জনগণ, এই মেয়ে এবং ছেলেরাই আমাদের খাদ্য উৎপাদন করছে, এরা নিজেদের ধ্বংস করে সকলকে বাঁচাচ্ছে।

তাদের দিকে তাকিয়ে ধনীর দুলালী মেয়ে ঘৃণায় আতঙ্কে শিউরে ওঠে। মানুষ যে এমন দুরাবস্থার মধ্যে থেকেও জীবন যাপন করে, তা সে কোনদিন কল্পনাও করে নি। সে জানে না দুর্ভিক্ষ, মহামারী, রোগ শোক, পদে পদে অভাব অনটন, নিত্যকার দুঃখবেদনা এদের জীবনে চিরসাথী। কবির রচনায় যে এদের কথাই পড়েছে, এরা সব কিছু সইয়ে নিয়েছে, বিধাতাকে এরা নিন্দা করে না, কাউকে এরা দোষী করে না, জানে এই তাদের ভাগ্যলিপি।

মেয়েরা দূরে দূরে দাঁড়িয়ে অবগুণ্ঠনের আড়াল হতে অদ্ভুত এই মেয়েটীর পানে তাকিয়ে থাকে শিশুরা একেবারে গা ঘেঁসে দাঁড়ায়। মাঠের কাজ ফেলে পুরুষেরা ও এগিয়ে আসে, পরম কৌতূহলের সঙ্গে নিরীক্ষণ করে।

এদেরই একজনকে সাহায্যের জন্য বাসবী কাছে ডাকে; সঙ্কুচিতভাবে সে পিছনে সরে যায়, এগিয়ে আসে আর একজন।

খানিকক্ষণ মোটরের যন্ত্রপাতি নিয়ে ধস্তাধস্তি চলে, বাসবীর সুগৌর মুখখানা আরক্ত হয়ে ওঠে, দরদরধারে ঘাম করে, তার শ্রম ব্যর্থ হয়ে যায়।

ভিড়ের মধ্য হতে কে একজন বলে, "এসব কি আমরা না জানি, আমরা কালে কস্মিনে এ সব গাড়ী দেখলেও একেবারে আনাড়ি ঠাকরুণ। তবে লোক যে এখানে নেই তা নয়, বলেন যদি—আমাদের দা-ঠাকুরকে খবর দিতে পারি, তিনি শুদ্দর লোকের ছেলে লেখাপড়াও অনেক জানেন,—তিনি আপনার এ কাজ ঠিক পারবেন।"

বাসবী খুশী হয়ে উঠলো, যে কোন একজন ভদ্র-লোকের সাহায্য পেলে সে বেঁচে যায়, এই সব অসভ্য অশিক্ষিতের আওতা হতে মুক্তি পায়।

দা ঠাকুরকে ডেকে আনবার জন্য সে বিশেষভাবে অনুরোধ করে, বিশেষভাবে পুরস্কৃত করবার প্রলোভন ও দেখায়।

দা ঠাকুর, সুধীন—।

আসবার ইচ্ছা তার মোটেই ছিল না। নিশ্চিন্ত-ভাবে এখানে একটা পাঠশালা তৈরী করে এই সব অসহায় দরিদ্র গ্রামবাসীর ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভার নিয়ে সে এখানে বাস করছিল। সে জানতো এত দূরে এই কদর্য পল্লীতে কেউ তার সন্ধান পাবে না, যতদিনের জন্যই হোক, পলাতক জীবন এখানে সে যাপন করবে। এর মধ্যে আবার একি ফ্যাসাদ,—কোন মেমসাহেব মোটর নিয়ে বেড়াতে এসে অচল করে বসলেন তাঁর মোটরখানাকে? এ রকম মেমসাহেবদের একা পথে বার হওয়া—বিশেষ এ রকম গ্রামাঞ্চলে আসা মোটেই উচিত নয়। কথাটা সে শুনিয়ে দেবে নিশ্চয়ই।

যদি তার সাহায্য কাজে লাগে—বিশেষ করে একটি বিপদগ্রস্তা মেয়ের যদি উপকার হয়, সেই জন্যই সে এলো।

বিস্মিত চোখে তার পানে তাকিয়ে থাকে বাসবী।

এই কাদামাটি ও এই অসভ্য অশিক্ষিত পরিবেশের মধ্যে এ লোককে দেখার কল্পনা সে মোটেই করে নি। সুশ্রী স্বাস্থ্যবান, দীর্ঘকায় একটি তরুণ: মোটা আটহাতি একখানা ধুতি তার পরিধানে, হাতকাটা বুকখোলা একটা বেনিয়ান তার গায়ে, রিক্ত দুখানি পা—তা হলেও তার চেহারায় তার অভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

অভিজ্ঞ সুধীন মোটরের কলকব্জা পরীক্ষা করেই বুঝতে পারে কি খারাপ হয়েছে।

যে কোন অচল যন্ত্র এ লোকের হাতে পড়লে সচল হয়ে উঠতে পারে তা বাসবী বুঝতে পারে সুধীনের কাজ দেখে।

মেটের উপর বাসবীর প্রিয় বাহনটীকে সচলঅবস্থায় এলে সুধীন বললে, "এবার আপনি স্বচ্ছন্দে মাইল কুড়ি পঁচিশ লম্বা পাড়ি দিতে পারবেন আশা করছি। আপনি এবার কলকাতায় ফিরে যেতে পারেন, তবে গাড়ীখানাকে বিশ্বাস না করে একে স্থায়ীভাবে মেরামত করতে দেবেন।

ধন্যবাদ জানায় বাসবী—

পারিশ্রমিকের কথা সে মোটে মুখে আনতে পারে না, কেবল বলে, 'কিন্তু এই সব বাচ্চা—মানে ছোটদের জল খেতে আমি যদি কিছু দেই, আপনি দয়া করে ওদের দেবেন কি?"

শান্ত হেসে সুধীন বললে, "সেটা আপনার করুণা, আপনি দিলে আমি নিশ্চয়ই ওদের দেব। তবে আপনি এ কথাটা জেনে রাখুন, এই সব গ্রামের লোক দুঃখী হলেও এতটুকু উপকারের বিনিময়ে পুরস্কারের প্রত্যাশী হয় না। আপনি বাঙালী, আপনার কথা শুনে তা বুঝেছি সেই জন্যেই জানাচ্ছি, গরীব হলেও অভাব তেমন এরা বোধ করে না যেমন সহরের লোক করে থাকে। কোন রকমে দুবেলা দুটো ভাত আর পরণের একখানা কাপড় পেলেই এরা সন্তুষ্ট থাকে, তার বেশী এরা কিছু চায় না।

লাল হয়ে উঠলো বাসবীর মুখ খানা; নিঃশব্দে সে ভ্যানিটী ব্যাগ খুলে দুইখানা দশ টাকার নোট বার করে সুধীনের হাতে দিলে; তারপর জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনার নামটা দয়া করে বলবেন কি?"

"আমার নাম—?"

সশব্দে হেসে ওঠে সুধীন।

তারপর বললে, "দরিদ্র গ্রামের দরিদ্র গুরুমশাই এরা দয়া করে থাকতে দিয়েছে, দুবেলা খেতে দিচ্ছে, বিনিময়ে আমি ওদের ছেলেপুলেদের সামান্য একটু পড়াচ্ছি! নিজের বিদ্যে এমন কিছু নেই যা দিয়ে ব্যবসাদারী ভাবে মাস্টারী করতে পারি, তাই যা পাই তাতেই খুসি হয়ে থাকি। কি হবে আমার নাম নিয়ে বলুন?"

বাসবী বললে, 'তবু তো একটা নাম আছে, নাম বলতে দোষ কি?

কি ভেবে সত্য পরিচয়টাই দেয় সুধীন,—"আমার নাম সুধীন্দ্র লাহিড়ী। কিন্তু পথ চলার ফাঁকে এইটুকু পরিচয় নাই বা রইলো, বাইরে ফিরে তার প্রাচুর্যের মাঝে ছোট্ট এই গ্রাম—এর স্মৃতি সবই তো হারিয়ে যাবে।"

নামটা নোট বুকে লিখে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বাসবী বললে, "নাও হারাতে পারে। অনেক সময় পথের ক্ষণেকের পরিচয়টাই জীবনব্যাপী শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে থাকে মিঃ লাহিড়ী—"

অধৈর্যভাবে সুধীন বললে, "না না, ওই বিলিতি ধাঁজে সম্বোধন করবেন না, সোজা দেশীয় ধারায় আমার নাম ধরে ডাকলেই সুখী হব। কিন্তু ওই যে মনে রাখার কথা বললেন, আমার মনে হয় সেটা না থাকাই ভালো,—পথের পরিচয় পথেই হারিয়ে যাক, এ কামনাই আমি করছি।"

বিস্মিত চোখে বাসবী তার পানে তাকায়, তারপর বললে, "সে যা হয় হবে এখন—আপনার তা নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না সুধীন বাবু।"

তারপর নোট বুকের একটা পাতা ছিঁড়ে তাতে নিজের বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে অনুনয়ের স্বরে বললে, "আপনাকে নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ীতে এই সপ্তাহে বুধবারে একবার আসতে হবে সুধীন বাবু, না এলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব। হ্যাঁ; আমি আশা করে থাকব আপনি নিশ্চয়ই আসবেন। আমি আমার বাবার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব, যাতে আপনি ওখানে থেকে একটা ভালো কাজ করতে পারেন সে জন্যে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব।"

সুধীনের মুখখানা মুহূর্তের জন্য বিবর্ণ হয়ে যায়, তার পর সে হেসে উঠে হাত দুখানা যোড় করে বললে, "না না ওইটি করবেন না বাসবী দেবী, আমার পরিচয় কাউকে দেবেন না। আর কাজ—কিন্তু আমার এ বিদ্যের কোন কাজ আমার দ্বারা হবে না, এখানে এই চাষা পাঁড়ে চাষা হয়ে থাকব এই আমার একান্ত ইচ্ছে! আমি যাব কথা দিচ্ছি কিন্তু কবে আর কখন যাব সে কথা বলতে পারছি নে।"

বাসবী ক্ষুণ্ণ হয়—

বুধবার তার জন্মদিন, সেদিন সে সুধীনকে ডেকে পেলে না।

হয় তো বাসবী আশা করে থাকবে, কিন্তু সুধীন যে কোনদিন যাবে না, সে জানা কথা।

অনেক কাজ, এখনও অনেক বাকি, প্রতিহিংসা তার আজ ও নেওয়া হয় নি। মেজর কেনেডিকে হত্যা করতে ছুরির চেষ্টা করে সে ব্যর্থ হয়েছে। ওয়ারেন্ট ঘুরছে তার নামে, যে তাকে ধরে দিতে বা সন্ধান ঠিক দিতে পারবে সে সরকার হতে মোটা টাকা পুরস্কার পাবে।

এর জন্যে বহু অপরাধ করেছে সুধীন লাহিড়ী, তার তার মধ্যে হত্যাপরাধও আছে। ফাঁসির দড়ি সুধীন এখনই গলায় দেবে না, তার সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ এখনও বাকি।

দুর্দান্ত পুলিস কমিশনারের বাড়ী তাঁর একমাত্র আদরিণী কন্যার জন্মদিনের উৎসবে যোগ দিতে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব।

বেশ নিশ্চিন্ত আরামে আছে সে। সহর হতে বহু-দূরে এই কৃষকপল্লীর দরিদ্রতম পরিবেশের মধ্যে তার দিন চমৎকার স্বচ্ছন্দে কাটছে। এই নিরক্ষর গ্রামবাসীরা তাকে ভালোবাসে, আপনার জন বলে জানে, তাদের দুঃখে আনন্দে উৎসবে, তাদের রোগে শোকে দারিদ্র্যে, সে

সাথী হয়েছে, তার উপদেশ তারা মনে প্রাণে মেনে চলে। এদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার, মানুষ করে গড়ে তোলার ভার নিয়েছে সে। লেখাপড়া শিখবার জন্য প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ সে আনিয়েছে লোক দিয়ে, শ্লেট ও এসেছে প্রচুর।

দিনে পড়ে ছেলে মেয়েরা, রাত্রে আসে তাদের অভিভাবকেরা—সরল নিরীহ গ্রামের লোকেরা। লেখা পড়ার সঙ্গে সুধীন শিক্ষা দেয় আদর্শ দেশপ্রীতির, মাটিকে মাটি না ভেবে মা বলে পূজা করতে হবে, এই তার উপদেশ শুধু নয়, অনুরোধ, তার মিনতি।

মা—মাটি মা—

নিরক্ষর গ্রামবাসীরা আশ্চর্য হয়ে যায়, পরস্পরের পানে তাকায়।

যে মাটিকে তারা চিরদিন পায়ের তলায় রেখে এসেছে, যে মাটির গরম বুক লাঙ্গল দিয়ে তারা চিরে ফেলে, ফসল উৎপাদন করেই তারা খালাস, সেই মাটি না কি মা।

সুধীন তাদের বুঝিয়ে দেয়—

কৃষকদের মুখ আনন্দে দৃপ্ত হয়ে ওঠে, মাটি মা,—আমাদের ঘরৈশ্বর্যময়ী, কল্যাণদাত্রী মাটি মা।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী···

সুধীনের কাছে শেখা বাক্যটি তারা বার বার আবৃত্তি করে।

আবার দেখা হয় একদিন,

ছোট্ট বেবি অষ্টিন হাঁকিয়ে সহরের অবহেলিত সেই চাষী গাঁয়ে একদিন এসে পড়লো সহরের অতি আধুনিকা মেয়ে বাসবী।

আজ সে এসেছে শাড়ী পরে,—রীতিমত মেয়ের পোষাকে, কেউ তাকে দেখে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে না।

প্রথম বর্ষার বর্ষণে কাদা হয়ে উঠেছে গাঁয়ের কাঁচা পথঘাট, মাটির নরমবুক লাঙলের ফলায় ফালা ফালা হয়ে উঠেছে, চলছে ধান বোনার উৎসব। পিতা-পুত্র, মাতা কন্যা সবাই ঘর ছেড়ে ভিড় করে এসেছে উদার বিপুল মাঠের বুকে। গ্রীষ্মের প্রখর রোদে কাঠফাটা মাঠ নূতন বর্ষার জলে সরসতা লাভ করেছে, মাঠের নূতন রূপ সবাইকে আজ মুগ্ধ করেছে। আকাশে মেঘের সমারোহে মাঝে মাঝে মেঘের বুকে বিদ্যুতের চকমকি, ঝরঝর করে নেমে আসছে বৃষ্টিধারা, এই ধারায় এরা সিক্ত হচ্ছে, ছেলে মেয়েরা আনন্দে নাচানাচি করছে। ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মাটির বুকে কৃষক ছড়াচ্ছে ধানের বীজ, কৃষক বধূ ধামায় ভরে বীজ বয়ে নিয়ে চলেছে সাথে সাথে, ছেলে মেয়েদের কলহাস্যে, গানে গল্পে মাঠ ভরে উঠেছে।

মোটর হতে নেমে বাসবী কাদাভরা পথের উপর দাঁড়িয়ে উৎসুক চোখে তাকায় পথের পানে।

এই নিরক্ষর কৃষক পল্লীতে নিতান্ত অকস্মাৎ সুধীনকে আবিষ্কার করে সে সত্যই বিস্মিত হয়ে গেছে। নিজেকে মূর্খ নামে পরিচিত করলেও তার কথাবার্তায় প্রমাণ পাওয়া গেছে—উচ্চশিক্ষা না পেলেও খানিকটা শিক্ষা সে লাভ করেছে। যন্ত্রপাতির কাজে তার দক্ষতা প্রমাণ দিচ্ছে এ সব দিকেও পারদর্শিতা তার নিতান্ত কম নয়।

আবিষ্কারের নেশা বাসবীকে পাগল করে তুলেছে। তার জন্মদিনে অনেকের মধ্যে সে সদ্য পরিচিত সুধীনকে হয়তো দেখার আশা করেছিল, যদিও জানতো সুধীন আসবে না। এ পর্যন্ত কারও কাছে সে তার সেদিনকার ভ্রমণকাহিনীর একটী বর্ণ প্রকাশ করে নি, অন্তরের অন্তস্তলে অতিগোপনে সে দিনকে সে প্রচ্ছন্ন রেখেছে। সত্যকার পরিচয় সে পেতে চায় তাই। নিতান্ত গোপনে ছোট বারে আবার সে একাই এসে উপস্থিত হয়েছে সহরের অবহেলিত এই অজ্ঞ কৃষক পল্লীতে।

চাষীদের সঙ্গে মিশে চাষীরূপে মাঠে কাজ করছে সেই ছেলেটি, সেও ধান ছড়াচ্ছে, পরম আনন্দে সে গান ধরেছে।

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি। মোটরখানা চোখে পড়তে সে থেমে যায়। বাসবীকে নামতে দেখে সে কাছে এলো, কাদা মাখা হাত তুলে হাসিমুখে নমস্কার করলে, কিন্তু ওই টুকু ভদ্রতা রক্ষা করেই শেষ, সে ফিরে যায় আবার মাঠের মাঝখানে আবার ঘাস বপনের কাজে ব্যস্ত হয়।

বাধ্য হয়েই বাসবীকে সে দিন ফিরতে হয়।

কিন্তু আবার আসে বাসবী তার পরদিনই।

এবার সত্যই উৎকণ্ঠিত হয় সুধীন, তার উন্নত ললাটে চারটা রেখা জেগে ওঠে।

এবার আর মাঠে নয়, পথেও নয়। সুধীনের নিজস্ব-করা ঘরে সন্ধ্যার পরে প্রদীপের ম্লান আলোয় মেটে মেঝের একখানা মাদুরের উপর কাগজ পত্র ছড়িয়ে নিয়ে সে যখন বসেছিল, এমনই সময় সহরের শিক্ষিতা মেয়ে বাসবী যে এসে তার রুদ্ধ দরজায় আঘাত হানতে পারে, একথা যে সুধীন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

তাই দরজা খুলে বাসবীকে দেখেই সে একেবারে স্তম্ভিত বিবর্ণ হয়ে যায়।

স্তম্ভিত সুধীনের পাশ কাটিয়ে গিয়ে বাসবী একেবারে পাতা মাদুরের উপর বসে পড়ে। অনুমতি যে সুধীন দেবে না তা সে জানে, তাই তার অনুমতি নেওয়ার অপেক্ষাও সে করে না।

স্মিত হাসি হেসে বললে, "মাপ করবেন, বড় ক্লান্ত, আমি তাই না বলতে বসে পড়েছি। জানি, আপনি আমায় এই রাত্রে এই গ্রামের মধ্যে একা আসতে দেখে একেবারে আকাশ হতে পড়েছেন, তাই অভ্যর্থনা করা দূরে থাক—একেবারে নীরব হয়ে গেছেন, মনে হয়, বড় বিপদে পড়ে গেছেন, তাই নয়, ?" সুধীন মাথার এলোমেলো চুলগুলাকে সুবিন্যস্ত করার অবকাশে ভেবে নেয় এখন সে কি করবে, ছুটে পালিয়ে যাবে, আবার এখান হতে গা ঢাকা দেবে অথবা যে দুর্ভোগ এসেছে, বীরের মত তাকেই বরণ করে নেবে। একচক্ষু হরিণের মত বিপদের আশঙ্কা করে সে যে দিকে দৃষ্টি রেখেছিল বিপদ এলো ঠিক তার বিপরীত দিক হতে, এ তার অদৃষ্ট ছাড়া আর কি? কাগজপত্রগুলা ততক্ষণ স্তিমিত প্রায় প্রদীপের আলোতে দেখতে সুরু করেছে বাসবী—

"কি সর্বনাশ সুধীনবাবু, আপনি তো সাধারণ লোক নন, একজন নাম করা বিপ্লবী, এত বড় বৃটীশ সাম্রাজ্য-টাকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিতে প্রতিজ্ঞা করেছেন? শুধু তাই নয়, আপনি রীতিমত হত্যাকারী, মানুষ খুন করেছেন—তাও একটি নয়, জানিতভাবে চারটি। তা ছাড়া আরও কত করেছেন তা আপনিই জানেন। দেখতে আপনাকে বেশ শান্ত নিরিরোধী লোক মনে হয়, এই গাঁয়ের মূর্খ লোকদের মাঝে মূর্খ সেজে দিব্যি দিন কাটাচ্ছেন তো—"

বাসবীর মুখ বিষণ্ণ দেখায় না, বরং উজ্জ্বল দেখায়।

সুধীন তার মুখের উপর পলকের দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়, গম্ভীর মুখে বললে, "সে কথা ঠিক, কতলোক যে আমার হাতে মরেছে তার ঠিক পাই নি, মনে করুন ট্রেন উড়িয়ে দিয়েছি, সে ট্রেনে কত লোকও নিশ্চয় ছিল, সঙ্গে সঙ্গে তারাও মরেছে। দেশ বিদেশে কত কত বোমের কাণ্ড করেছি তারই ঠিক নেই। কিন্তু জানেন না বাসবী দেবী, আমার হাতে খড়ি হয়েছে আমার মায়ের মৃত্যুতে, আমার মাকে আমি নিজের হাতে হত্যা করেছি।"

বাসবীর মুখখানা ম্লান হয়ে যায়, বাষ্পিত কণ্ঠে সে উত্তর দেয়, "আমি সব খবর পেয়েছি সুধীনবাবু, খুঁজে খুঁজে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেছি।"

সুধীন বলে চলে, "আমি জানি—একদিন আমি ধরা পড়বই, চিরদিন এ রকমভাবে আত্মগোপন করতে পারব না। চরমশাস্তি আমার মাথা পেতে নিতে হবে, কিন্তু তাতে আমার ভয় নেই বাসবী দেবী, কেবল ক্ষোভ নিয়ে যাব জীবনের শেষ কাজ আমি করে যেতে পারব না আমার প্রতিজ্ঞা পালন করা হবে না।" জানি—আপনি একটা কোন উদ্দেশ্য নিয়েই আজ এই বর্ষার রাতে মেঘে যখন আকাশ ছাওয়া, পথে জমেছে

কারাগার, সেই পথ দিয়ে এসেছেন। পালাতে আমি পারব না, চারিদিক জলে থই থই করছে, ডজন খানেক বা ডজন দুই কনেষ্টবল নিশ্চয়ই আপনার রক্ষক এবং আমার ভক্ষক হয়ে এসেছে। না:, পুলিস কমিশনার মিঃ চ্যাটার্জিকে আমি তারিফ করছি, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলেই নিজে পিছনে থেকে মেয়েকে এগিয়ে দিয়েছেন। এবার আপনার কারেকশনের ফলে তিনি নিশ্চয়ই স্যার—চাই কি নর্ড উপাধিটাও লাভ করবেন দেখছি; চমৎকার। সামান্য পুলিসের দারোগা হতে বর্তমানে যে সম্মানীয় পদ অলঙ্কৃত করেছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়, বাসবী দেবী। ইংরেজ সত্যই সদাশয় তাই প্রভুপরায়ণতার পুরস্কার দিতে—"

অসহিষ্ণুভাবে বাসবী হাত তোলে, "থাক থাক সুধীনবাবু, নাই বা তুললেন আমার হতভাগ্য পিতার কথা, অন্ধকারে যা চাপা আছে তা অন্ধকারেই থাক, সন্তানের সামনে পিতার সেসব কাহিনী নাই বা বিবৃত করলেন। আমার তরফ হতে আমি বলছি সম্পূর্ণ নির্ভয় নিশ্চিন্ত হোন আপনি, জনপ্রাণী আমার সঙ্গে নেই, কেউ জানে না আমি এখানে এসেছি। কেন এসেছি তাও বলি। আমার বাপের আজীবনব্যাপী পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমার আজীবনব্যাপী সাধনায় করতে চাই। যুগে যুগে তাই না হয়ে আসছে সুধীনবাবু, পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে সন্তান, আমিও তাই করতে চাই। আমার এই প্রায়শ্চিত্তে কি তাঁর পাপ ক্ষয় হবে না, বলুন?"

সে দুই হাতে মুখ ঢাকে।

বিস্ময়ে নির্বাক সুধীন—

বাসবীকে সে চিনতে পারে না।

গুপ্ত বাসস্থানের সন্ধান পুলিস পেয়েছে।

সন্ধানদাতা সুধীনের পরম বন্ধু রামেশ্বর সাহেন,—যে তাকে দীর্ঘদিন নিজের বাড়ীতে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে যার ছেলেমেয়েরা সুধীনের কাছে শিক্ষালাভ করে, মানুষ হওয়ার সাধনা করে।

নিত্যকার মত পিতার অফিসে তাঁকে আনতে গিয়ে বাসবী সুধীনের ফটো দেখতে পেয়েছে, তার পরিচয় এবং বর্তমান বাসস্থানের ঠিকানাও পেয়েছে।

আজ রাত্রিটা প্রভাত হওয়ার আগে পুলিশ বিপ্লবী হত্যাকারী সুধীনকে গ্রেপ্তার করবে, তার আশ্রয়দাতা দরিদ্র রামেশ্বর সরকারের প্রতিশ্রুত পুরস্কার পাঁচহাজার টাকা লাভ করবে।

বেবি অষ্টিন তীরবৎ ছোটে দক্ষিণ গড়িয়ার পথে।

নির্বাক হয়ে থাকে সুধীন, বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা সত্যই তাকে বড় আঘাত দেয়। আজকের পৃথিবী সত্যই স্নেহ মমতা, ভালোবাসা প্রীতি সব কিছুই স্বার্থপরতার ধূপকাষ্ঠে বলি দিচ্ছে—এ কথাটা যেন বিশ্বাস করা যায় না।

রুদ্ধরোষে গর্জন করে বাসবী,—"গুলি করুন, ওকে কুকুরের মত হত্যা করুন, ওর বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি হোক।"

সুধীন ম্লান হাসি হাসে, না, ওকে মারব না। জানেন বাসবী দেবী, বেচারা বড় গরীব, নিজের বলতে এক ছটাক জমি পর্যন্ত ওর নেই, পরের জমিতে কাজ করে, ফসলের ভাগ যা পায় তাও সামান্য। সেই সামান্য পাওয়ায় ওর পাঁচটা কাচ্চা বাচ্চার পেট ভরে না। আমি নিজে জানি বাসবী দেবী এরা কতদিন খেতে পায় না, দেখুন গিয়ে রামেশ্বরের স্ত্রী কাপড় অভাবে বার হতে পারে না, বড় মেয়েটার আঠারো উনিশ বছর বয়স হয়েছে আজও তার বিয়ের কিছুই যোগাড় করতে পারলে না এ সবই সবই তো পয়সার অভাবে। এ রকম লোককে প্রলোভনে ভুলানো এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। আমি বেশ জানি সে নিজে হতে এ কাজ করে নি, তাকে দিয়ে কেউ করিয়েছে। ক্ষমার পাত্র এরা বাসবী দেবী, কারণ এরা জানে না কি করতে যাচ্ছে, আমি তাই সব জেনে শুনেও একে ক্ষমা করছি।

সুস্পষ্ট নতি জানায় বাসবী—

"আর আমি ও এই মুহূর্তে আপনাকে গুরুর পদে বরণ করে নিলাম সুধীন বাবু, আমার শ্রদ্ধা ভক্তি গ্রহণ

করুন। কিন্তু আর দেরী করবেন না আপনি, এখনই আপনার দরকারী কাগজ পত্র গুছিয়ে নিন, আমার গাড়ী আছে, আপনাকে আমি নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাব বলে এসেছি।"

হাসিতে ভরে ওঠে সুধীনের মুখ, সকৌতুকে সে বললে "এর চেয়ে নিরাপদ স্থান আর যে কোথাও থাকতে পারে আমি তা ভাবতে পারি নে। একমাত্র স্থান আছে আমার জন্য নির্দিষ্ট—উলঙ্গিত থানায়, সেখানেই নিয়ে যাবেন কি?"

দৃঢ় কণ্ঠে বাসবী বললে, "সে কথা আপনিই কেবল বলতে পারেন, আর কেউ পারে না। আপনাকে সত্য কথাই বলি, সঙ্গে আছে আমার মাসতুতো ভাই, আপনাদেরই সোমনাথ—যে দেশমাতৃকার পূজায় নিজেকে উৎসর্গ করেছে আর তার জন্যেই আমাদের বাড়ীর দরজা তার কাছে চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে। সোমনাথ চৌধুরীকে আপনি নিশ্চয়ই চিনবেন সুধীন বাবু—।"

"সোমনাথ—আমাদের সোমনাথ, আপনি সোমনাথের বোন—?"

এবার বুঝি সত্যই বিশ্বাস আসে।

পথের ধারে অন্ধকারে মোটরে অপেক্ষা করছিল সোমনাথ, অন্ধকারেই পা টিপে টিপে বাসবী বার হয়ে গিয়ে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে।

মনে হয় যেন তারা সহোদর ভাই বোন। বাসবীর চেয়ে দু তিন বৎসরের ছোট কিশোর সে

কত দুঃখ কষ্ট সয়েছে ধনীপুত্র সোমনাথ! আই সি এস, পিতা তাকে ত্যাজ্যপুত্র করেছেন, তাঁর ভবানীপুরের বাড়ীর ত্রিসীমানার মধ্যে সোমনাথের পদার্পণ নিষিদ্ধ হয়েছে। কতবার সে পুলিসের হাতে ধরা পড়েছে, কত বার তার বিচার হয়েছে, নিজের কোন পরিচয় সে দেয় নি, পিতার নাম সে উল্লেখ করে নি।

হায় হতভাগ্য পিতা, এমন সন্তান থাকতেও তিনি সন্তানহীন। জেল হতে কিছুদিন হল সে মুক্তিলাভ করেছে, বাসবীকে সে টেনে এনেছে নিজের পথে, দেশসেবা মন্ত্রে তাকেও সে উদ্বুদ্ধ করেছে। বাসবীর এম এ পড়া এ যাত্রা স্থগিত রইলো, পিতা তার কোন খবরই পেলেন না।

ঘরের মধ্যে যেখানে যে সব কাগজ পত্র ছিল, সুধীন সব কুড়িয়ে এক করলে, তারপর সেই বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রে সন্তর্পণে তিনজন ঘরের বাহির হল। ওদিককার ঘর তখন অন্ধকার, ঘর তো রাত্রোত্থর গারেন সেই অন্ধকার ঘরে বসে পুলিসের একটি সঙ্কেতের প্রতীক্ষা করছে, সুধীন যে এই ফাঁকে সরে পড়বে সে কথা সে ভাবতেই পারে নি।

অনির্দিষ্ট পথে ভেসে চললো সেই রাতে তিনটি প্রাণী।

অন্ধকার আকাশে সেদিন জাগে নি একটি নক্ষত্র, পথ দেখালে না কেউ। এক হাঁটু গাদা জল ভেঙে এগিয়ে চললো আগে সুধীন, যাকে বাসবী আর তারই হাতখানা ধরে পিছনে রইলো সোমনাথ।

আবার কোথায় যেতে হবে, কোথায় আশ্রয়নীড় রচনা করতে হবে সে কথা লেখা আছে ভবিষ্যতের বুকে। একমাত্র সেই ভবিষ্যৎই সে কথা বলবে, বর্তমান নয়।

"এর পর—ওগো, এরপর কি হবে তা আমায় বল,—বল, তোমায় হারাতে হবে না তো?"

অন্ধকারের মধ্যে চোখের সামনে ভেসে উঠছে এক খানা অনিন্দ্যসুন্দর মুখ, চোখে তার অশ্রুধারা, সে প্রশ্ন করছে, উত্তর তার চাই।

উত্তর—?

কিন্তু ভয় কি, ভয় কি বাসবী—পুলিসের গুলিতে সোমনাথ মরেছে, সুধীন আজও বেঁচে আছে। ভয় নেই, অনেক বিপদ এড়িয়ে এসেছে সে, আজও এড়িয়ে চলবে।

কিন্তু কোথায় গেল সে বাসবী? পথের সাথী যেমন এসেছিল কাছে, তেমনই ভেসে গেল কোথায়?

ঘরে একা ছিল বাসবী, সুধীন বার হয়েছিল পেন্সা দেখিয়ে সেদিনকার আহারের উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করতে।

বেদে এবং বেদেনী, বর্তমানে এই তাদের পরিচয়।

মুর্শিদাবাদ জেলার একপ্রান্তে ধারকানদী যে ছোট রূপার কোল ঘেঁসে চলে গেছে, সেইখানেই আশ্রয় নিয়েছে তারা—পলাতক দুইটি প্রাণী।

স্বেচ্ছায় সুধীনের গলায় বরমাল্য অর্পণ করেছে ধনীর দুলালী বাসবী, স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করে নিয়েছে। এ বিবাহে ছিল না কোন অনুষ্ঠান, হয় নি কোন মঙ্গল আচরণ, পায় নি তারা কারও মঙ্গলকামনাসহ আশীষ, তবু আছেন ভগবান সাক্ষী, তারা স্বামী স্ত্রী এই তাদের একমাত্র পরিচয়। বালিগঞ্জের বিশাল অট্টালিকা, পিতার বিপুল ঐশ্বর্য স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে এসেছে বাসবী, অনভ্যস্ত হাতে সে করতে যায় গৃহকর্ম, সুধীন তাকে সাহায্য করে।

গ্রীষ্মের ও পাশে একখানি কুঁড়েঘর তারা পেয়েছে, গ্রামের কৃষকেরা দুঃখী স্বামী স্ত্রীকে এই ঘরখানি বাস করতে দিয়েছে।

সম্পূর্ণ নিরক্ষর বেদে ও বেদেনী, সভ্যতার ধার তারা ধারে না। সুধীনের ঝুলিতে থাকে লম্বা একটা হাড়, কত সাপ পালা কত শিকড় বাকড়। দুইটা বানরও কোথা হতে কিনে ফেলেছে সে,—এদের নিয়েই সে খেলা দেখাতে বার হয়।

বানরদের খাওয়ার ভাবনা করতে হয় না, গ্রামের ছেলেমেয়েরা যথেষ্ট খাবার সংগ্রহ করে এনে দেয়, এ জন্য সুধীন শুধু নয়—বাসবীও তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

রাতের ভাত জল দেওয়া থাকে, তাই খেয়ে সকালেই বার হয়ে যায় সুধীন, যায় দূর দূরান্তরে, হাতের ডুগডুগি বাজে, ছেলেমেয়েরা ছুটে আসে। সকাল বেলাই তার থলির মধ্যে সব কিছু গুছিয়ে রাখে বাসবী, এ তার নিত্যকার কাজ।

আজ তাদের দেখে কেউ চিনতে পারবে না। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ রোদে পুড়ে তামার মত হয়ে গেছে। সুধীনের মুখে লম্বা দাড়ি গোঁফ, মাথায় লম্বা চুল; —বাসবীরও আমূল পরিবর্তন হয়েছে, আজ তার পিতাও হঠাৎ দেখে চিনতে পারবেন না।

ছেঁড়া আয়নাতে মুখ দেখে নিশ্চিন্ত হয় বাসবী,—চেহারা দেখে কেউ তাকে চিনতে পারবে না এ তার পরম সৌভাগ্য।

দুদিন বাসবী ও সুধীনের সঙ্গে বার হয়েছিল, উপস্থিত সমস্যা বাসবীকে সুধীন আর সঙ্গে নিয়ে যায় না।

বাসবী হবে মা—

এই উপলক্ষে হতো কত আনন্দ উৎসব, লোকে জানতে পারতো বাসবীর সন্তান আসছে, যে হবে পুলিশ কমিশনার মিঃ চ্যাটার্জির বিপুল সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। তারপর আলোয় উজ্জ্বল ঘরে পরম সমারোহের মধ্যে ভূমিষ্ঠ হতো বাসবীর সন্তান, জনে জনে বয়ে আনতো কত মূল্যবান উপহার, ফুলে ফুলে ছেয়ে যেতো কক্ষতল, —চলতো কত হাসি, কত গান, কত নৃত্য।

হলনা কিছুই।

বাসবীর সন্তান আসছে দরিদ্রের পর্ণ কুটিরে, কেবল তার পিতা মাতাই চিনলো তাকে, তারাই আনন্দে দুঃখে ফেলবে চোখের জল, মঙ্গল আশীষে নবজাত শিশুকে করবে অভিষিক্ত, আর কেউ তার পরিচয় পাবে না। একটু সাগু বালি জোটে, একটা জামা পরতে পায়, সে তার পরম সৌভাগ্য। সে বেড়াবে তার ভাগ্যহীন অথচ গর্বিত পিতা মাতার সঙ্গে, বেড়াবে পথে পথে, চলবে দেশ বিদেশে।

কিন্তু তার শিক্ষা—তার শিক্ষার কি হবে—সে কি মূর্খ হয়ে থাকবে?

সুধীনের বেদনাময় উচ্ছ্বাসে বাসবী বাধা দেয়, "এত ভাবছোই বা কেন? এই হবে আমার সন্তানের মাথার মুকুট, তার দেহের অভেদ্য বর্ম। মানুষ তাকে নাই বা দিলে উপহার, প্রকৃতি দেবে আনন্দময় স্নিগ্ধ আলো, দেবে নির্মল বিশুদ্ধ বাতাস, যে পরিবেশের মধ্যে তার দেহ হবে লোহার মত কঠিন, মনও সেই অনুপাতে ইস্পাত হয়ে উঠবে। কয়টি ছেলের সে সৌভাগ্য লাভ হয় সে কথাটা একবার ভাবো।

তাই মনে করে শান্তি পেতে চায় সুধীন।

তারপর সে একদিন—

মেঘে ঢাকা আকাশ, শুধো হাওয়া বয়ে চলেছে গাছের পাতা উড়িয়ে দিয়ে। দিনের আলো নিভে এসেছে, পাতলা অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর বুকের উপর।

সেই সন্ধ্যায় ফিরে এসে সুধীন পেলে না বাসবীকে। ঘরের দরজা তালা, জানালা কে উপড়ে ভেঙে দিয়েছে, বেড়ার দেওয়াল গুলো কে যেন নিষ্ঠুর আঘাতে ক্ষত-ক্ষত করেছে, ক্ষুদ্র ঘরের নগণ্য জিনিষ পত্র তালা চোরা অবস্থায় উঠানে ছড়ানো।

কে—কে এ কাজ করলে,—বাসবী কোথায়?

"বাসবী—বাসবী—

চীৎকার করে সুধীন—কোথায় গেলে বাসবী, সুধীন এসেছে, তুমি এসো।

কেউ দিলে না সাড়া, সমস্ত দিনের শ্রমক্লান্তি, ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল সুধীনের তাকে বাসবী তো এলো না ছুটে। গাঁয়ের লোক কোথায় আত্মগোপন করেছিল, রাতের অন্ধকারে চোরের মত তারা গাঁয়ে ফিরলো।

পুলিশ—হ্যাঁ, লাল পাগড়ী পুলিশ এসেছিল,—

"পুলিশ এসেছিল—?"

সুধীন যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়—বিস্ফারিত চোখে সে কেবল চেয়ে রইলো।

পুলিশ এসেছিল, ট্রাক ভর্তি লাল পাগড়ী, তাদের সঙ্গে ছিল মস্ত বড় একজন ফিরেঙ্গী সাহেব, লাল মুখ তার, কি সব কথা বলে ছিল। আর ছিল কয়েকজন পোষাক ধারী লোক—তারা বাংলায় কথা বলে ছিল।

সুধীনকে তারা খুঁজে বেড়িয়েছে, প্রত্যেক বাড়ীতে জোর করে ঢুকেছে, ভেঙে চুরে জিনিষ পত্র তছনছ করে দিয়েছে, গাঁয়ের মোড়ল ও আর ছ একজন লোককে তারা ধরে নিয়ে গিয়েছে।

বেদেনী বউ কিছুতেই যেতে চায় নি, উপুড় হয়ে মাটি আঁকড়ে ধরেছিল। তাকে সেই সাহেব আর বড় পুলিশ সাহেবরা অনেক কথা জিজ্ঞাসা করেছে, বেদেনী বউ একটি উত্তরও দেয় নি। বৃদ্ধ একজন বাঙ্গালী সাহেব যখন তাকে যাওয়ার কথা বলেছিল, বউটি তখনই বলে-ছিল—আমি যাব না, এখানে এমনই ভাবে দিন কাটিয়ে দেব।"

কিন্তু কেউ তার কথা শোনে নি, তাকে তারা টেনে নিয়ে সাহেবের জিপে তুলেছিল, তারপর কি হল ওরা তা জানে না!

এসেছিলেন বাসবীর পিতা—পুলিশ কমিশনার মিঃ চ্যাটার্জি।

সুধীন এত জোরে অধর দংশন করে যে রক্ত বার হয়ে পড়ে।

দেখা হল দীর্ঘ একটি বৎসর পরে।

জানালা দিয়ে বাসবী দেখতে পায় ফেরিওয়ালাকে, দাসীকে দিয়ে ডেকে পাঠায়।

ফেরিওয়ালাকে কেউ না চিনুক, বাসবী চিনেছে, শীর্ণ বাসবীর দুই চোখ ছাপিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়ে—।

হয়েছিল একটি ছেলে,—

চাঁপা ফুলের মত তার গাত্র বর্ণ, মাথা ভরা তার কালো চুল, সুধীনের অবিকল প্রতিকৃতি। মাটিতে পড়ে সে একবার মাত্র ওয়া ওয়া করে কেঁদে উঠেছিল,—সে যেন তার কচি মুখে প্রথম ও শেষ মা মা আহ্বান, তারপরই সে চিরদিনের মত ঘুমিয়ে পড়লো। বাসবী তাকে একবার পাশে পেতে চেয়েছিল, একবার তার ললাটে তার হাতখানা রাখতে চেয়েছিল, ইউরোপীয়ান নার্স কঠিন হাসি হেসেছিল মাত্র। গোপনে বাসবী জেনেছে—বংশের সুনাম রাখতে কলঙ্কচিহ্ন শিশুটিকে হত্যা করা হয়েছে, কঠিন বিচারক পুলিশ কমিশনার মিঃ চ্যাটার্জির নিষ্ঠুর আদেশ।

বাসবীও মরতো, কিন্তু মরতে সে পারলে না। একবার সুধীনকে সে দেখবে, তাকে জানাবে তার দান সে রাখতে পারলে না। পিতা তার বিবাহ অস্বীকার করছেন, আবার তার বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

সবা ইউরোপ প্রত্যাগত আই সি এস কুমের আচারের সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেছে, কেবল বাসবী একটু স্তব্ধ হলেই হয়।

রুক্ষপ্রকৃতি পিতাকে ভয় করে বাসবী, মুখ তুলে তাঁর সামনে কথা বলবার সাহস নাই।

ঝিল ঝিল করে এ সব কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গে সে ঝিলিল কেনে,—রঙীন চিন্তা, সুদৃশ্য দিন, আরও কত কি।

কাগজে মোড়া বিষ তার হাতে তুলে দিলে সুধীন, দৃঢ় কণ্ঠে বললে, "তোমার মুক্তি তোমায় দিয়ে যাচ্ছি— একদিন আমার দুর্ভাগিনী মাকেও আমি মুক্তি দিয়েছি, আজ সেই কথাই মনে পড়ছে বাসবী। রিভলভার যদি থাকতো সদম্ভে সকলের সামনে তোমায় গুলি করে আত্মহত্যা করতে পারতাম। তা নেই বলেই এই বিষ সংগ্রহ করে মাসের পর মাস আমি এ বাড়ীর আশ পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আজ নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছি বাসবী, কাল সকালে আবার আমি তোমার দেহটাকে শেষবার দেখব, তুমি আমায় আর দেখতে পাবে না।

কড়ায় গণ্ডায় পয়সা হিসাব করে নিয়ে ফেরিওয়ালা বিদায় হল।

সত্যই আবার দেখা হল—।

কেওড়াতলার শ্মশানে চিতায় শুয়েছে বাসবী, ঘুমিয়ে পড়েছে সে, মুখে এখনও শান্ত হাসির রেখা জেগে রয়েছে।

কে যেন চেঁচিয়ে ওঠে "ফুল দিয়ে শুধু সাজিয়েছ কেন? হাতে শাঁখা, পায় আলতা, কপালে সিন্দুর দাও, আয়ুষ্মতীকে সেই বেশে সাজাও।"

কে—কে একথা বললে—

অনুসন্ধানের আগেই কোথায় সরে পড়েছে সে লোক, তাকে পাওয়া গেল না। শ্মশানের একপাশে শীর্ণকৃতি গৌরবর্ণ এক উন্মাদ আপন মনে গাইছে—

পেয়ে মাণিক হারিয়েছি মা—
আমি অতি লক্ষীছাড়া।

গানের সঙ্গে সঙ্গে দু চোখের জলে তার বুক ভেসে যাচ্ছে, সে জলভরা চোখে চায় অনন্ত চিতার দিকে, মাকে মাকে কান্নাভরা সুরে গায়—

আবার যেন তোমায় ফিরে পাই,
চোখে তোমায় হারিয়ে প্রিয়া
মনের মাঝে চাই।

সোনার দেহ বাসবীর চিতায় পুড়ে ছাই হয়ে গেল, রইলো শুধু তার প্রিয়জনের মনে তার আসা এবং স্বল্পকাল থাকার স্মৃতি মাত্র।

তিন বৎসরের সঙ্গিনী, তাই কি বড় কম দিন? দীর্ঘ কালের প্রিয়া, তার সত্তাকে জগতে এনেছিল, ধরে রাখতে পারলে না অভাগিনী? সুধীনের স্ত্রী, তার সহ-ধর্মিণী বাসবী—অতীতকে ভুলে সে বর্তমানকেই মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিল। অনভ্যস্ত হাতে সে কাজ করতে শিখেছিল, আজ স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করে সে জীবনের চেয়েও ভাস্বর হয়ে উঠলো!

কিন্তু আর ভালো লাগে না জীবনের বোঝা বয়ে বেড়াতে। আর কেন—এবার অবসর নিলেই তো ভালো হয়। সবই পেয়েছিল সুধীন, সব আবার হারিয়ে ফেললে। বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন কেউ আজ নাই। সর্বহারা সুধীন, তার জীবনের মূল্য আছে কি?

ঘুরতে ঘুরতে সে একদিন নিজের জন্মভূমিতে গিয়েছিল, তার ভিটে সে আর খুঁজে পায়নি, সেখানে চলছে এখন ধানের চাষ।

"জাগো আমার চির দুঃখিনী মা"—

সজল চোখে তাকিয়ে থাকে সুধীন, ছবির মত তার মনের পরদায় ভেসে ওঠে অতীতের কাহিনী—এই খানে ছিল আর ভিটে, তার পিতৃপুরুষের জন্মভূমি।

মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে প্রণাম করে, খানিকটা মাটি তুলে নিয়ে বুকে কপালে লেপন করে—

"কে গো, কে তুমি, কোথা হতে আসছো, কোন গাঁয়ে ঘর—"

চাষীরা সুধায়।

কে যেন উত্তর দেয়—"ও পাগল, বড্ড পাগল, পাগলের আবার বাড়ী ঘর আছে নাকি? যখন যেখানে যায় সেখানেই থাকে, সেখানেই ওর বাড়ী ঘর।

সুধীন শুধু শুনে যায়।

আবার—আবার যদি সে জন্মায়, যেন এই সোনার বাংলার বুকেই জন্মায় ভগবান, তার হারানো মায়ের কোল যেন সে খুঁজে পায়। বাধাহীন ভাবে সে-অঙ্কে শ্রীরূপে যেন পায় বাসবীকে, পায়, যেন তার সন্তানকে।

স্বাধীন দেশের বুকে বেঁচে থাকতে চায় সে, প্রার্থনা করে—পরাধীনতার শিকল খসিয়ে দাও, আমায় স্বাধীন দেশের অধিবাসী হওয়ার সুযোগ দাও।"

ঘুম আসছে না।

রাত্রি বাড়ছে; দরজার বাইরে শান্ত্রীর ভারি জুতার শব্দ শোনা যায়, আজকের এই শেষ প্রহরা তার, আজ শেষ পরিক্রমা, কাল সে পাবে ছুটি। আবার কবে কোন ফাঁসির আসামী আসবে;—এ রকম আসামী খুব কমই আসে।

শেষ বারের আরাম, শেষ বারের তৃপ্তি, একটু আরাম করে হাত পা মেলে শোওয়া—কথাটা ভাবতে হাসি আসে।

আজ এই রাত্রিটা মাত্র তার জীবনের সীমা, এই কয়েক ঘণ্টা মাত্র সে ষড়ৈশ্বর্যময়ী ধরিত্রীর কোলে জীবন্ত রূপে বর্ত্তমান রয়েছে। কয়ঘণ্টা পরে তার জীবনের মেয়াদ ফুরাবে। মাটি-মার কোলে পড়ে থাকবে তারই দত্ত দানে সমৃদ্ধ এই দেহখানা মাত্র। এই রাত্রি-প্রভাতে মিটে যাবে তার দেনা পাওনা, জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে সে তবু চায় এতটুকু আরাম, তৃপ্তি।

পরম স্নেহময়ী মা ছাড়তে চায় না তার প্রিয় সন্তানকে। রূপরসগন্ধময়ী জননী বসুমতী, তোমার বত্রিশ নাড়ির বন্ধনে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়েছ তোমার সন্তানকে, এ বন্ধন ছাড়াতে গেলে ওকে ব্যথা বাজে।

কবি বলেছেন—

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই,
ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে—।

মুক্তি দাও, এ বন্ধন হতে মুক্তি দাও, আর কেন বেদনা বাড়াও?

বৈকালেই সে শেষ করে নিয়েছে তার শেষ আহার। সে কি খেতে চায়, কাকে দেখতে চায়, তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। কারও সঙ্গে সে দেখা করতে চায় নি, খেতে চেয়েছে—পান্তাভাত আর আলুসিদ্ধ। যা কেউ চায় না সে তা চেয়েছে এবং পেয়েছে। পরম তৃপ্তির সঙ্গে আহার করতে গিয়ে অকস্মাৎ বন্যার মতই হু হু করে নেমে এসেছে চোখের জল।

বাসবীর শেষ স্মৃতি—।

পান্তাভাত আর আলুসিদ্ধ সুধীনের সামনে ধরে দিয়েছিল সে, সকালবেলায় পরম তৃপ্তির সঙ্গে তা গলাধঃকরণ করে সারাদিনের মত বার হয়েছিল সুধীন, সঙ্গে ছিল পোষা বানর দুইটা। সন্ধ্যার আগে পেলে মুক্তি, বনের বানর বনেই হয় তো চলে গেল, বেদের ঝুলি ভেসে গেল যমুনানদীর খরস্রোতে।

তারপর কতদিন এলো, কতদিন চলে গেল, কত কি ঘটেছে অদৃষ্টে,—কতদিন অনাহার, অর্দ্ধাহার, জুটলো না পান্তাভাত আর আলুসিদ্ধ।

জেলরক্ষক শুধু নয়, শান্ত্রীরা ও জানে—মৃত্যু ভয়ে সে উন্মাদ হয়ে গেছে। তাই হয়। কাল সকালে নিশ্চিত মৃত্যু জেনে নিশ্চিন্ত প্রাণে ঘুমাতে পারে কয়জন?

সহজভাবে খানিকটা জল গলাধঃকরণ করতে গিয়ে গলার মধ্যে কেমন করে বেধে গিয়েছিল, তার ফলে বিষম লেগে অনেকক্ষণ তাকে রীতিমত কাশতে হয়েছে।

কিন্তু কেন—কেন তার মধ্যে এ দুর্বলতা জাগলো, সে নিজেই তা বুঝতে পারে না। লঘুভাবে পা ছড়িয়ে সে শুয়ে পড়লো।

বিশ্রাম তাকে করতেই হবে। না আসুক ঘুম, তবুও সে চোখ বুজে পড়ে থাকবে, মনে করবে তার দীর্ঘ আটাশ বৎসর ব্যাপী জীবনকালের মধ্যে কি কাজ

করেছে ? ম্যাট্রিক পাস করেছে সে, বৃত্তি পেয়েছে, আই-এ ক্লাসে একটা বৎসর কাটিয়েছে, তারপরই এলো তার জীবনে দুর্বিপাক, তার উপর দিয়ে বয়ে গেল কাল বৈশাখীর ঝড়।

রক্তস্রোতে ভিজিয়ে দিয়েছে ধরণীর বুক ; রক্তে তার বিভীষিকা জাগে নি, বরং প্রচুর আনন্দ পেয়েছে। লুট-পাট, ট্রেনধ্বংস, ডাকাতি এ সব ছিলতো নিত্যকার কাজ। এক আধ জন নয়, বাসন্তীকে নিয়ে সাত জনকে হত্যা করেছে সে—তবু বিচারে তার সাতবার ফাঁসি হবে না এই আশার কথা।

সুধীন আড়ামোড়া ছাড়ে, হাই তোলে।

রক্ত দেখে একদিন এই সুধীনই শিউরে উঠেছিল। অবস্থা যখন ভালো ছিল, পূজার সময় বাড়ীতে হতো পাঁঠা-বলি। বলির রক্ত গড়িয়ে দিয়েছিল মাটির বুকে, আর সেই রক্ত দেখে তার জ্বর এসেছিল। জ্বরের ঝোঁকে সে শুধু তাজা রক্তের বিভীষিকা দেখেছে, যার জন্য তাকে আর কোনদিনই বলি দেখতে দেওয়া হয়নি।

কল্পনার অতীত—স্বপ্নেরও অগোচর—

যে মায়ের চোখ দিয়ে সে জগৎ চিনেছিল, যে মাকে সে বড় ভালোবাসতো, সেই মাকেই সে হত্যা করেছে।

দুই হাতে মুখ ঢেকে দুলে দুলে কাঁদে সুধীন ; মায়ের চরম লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারে নি। সুধীনকে ঘরের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দরজা বন্ধ করে দিয়ে তার মাকে মেজর কেনেডির লোকেরা বন্দিনী করে নিয়ে গেল। লম্পট কেনেডি,—পিশাচ কেনেডি—

নিজের কণ্ঠ দুইহাতে পেষণ করে সুধীন,—না, না, না, সে দিনকার কথা ভুলতে চায় সে, আজ এই ক্ষণে ও সে মনে করতে চায় না। নিষ্কৃতি দাও ভগবান, ক্ষণকালের জন্য তার নিষ্কৃতি দাও।

সেই মা হারিয়ে গেছেন একদিন নিশীথের অন্ধকারে।

পিতা ছিলেন রাজনৈতিক অপরাধে অপরাধী। ঘর তাঁকে বাঁধতে পারে নি, স্ত্রী-পুত্রের মায়া তাঁকে জড়াতে পারে নি, জীবনের বেশীর ভাগ সময় তিনি কখন কোথায় কি ভাবে কাটিয়েছেন তা কেউ জানে না। কদাচিৎ কোনদিন তিনি বাড়ী ফিরেছেন রাতের অন্ধকারে আত্মগোপন করে, আবার ভোর না হ'তে কখন চলে যেতেন, সুধীন তা জানতো না।

একদিনকার কথা—

সুধীন কলকাতায় কলেজে পড়ে, গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী এসেছে।

এমনই সময় একদিন বাড়ী হতে যাওয়ার সময় পিতা পুলিসের হাতে ধরা পড়েন। এই ব্যাপার নিয়ে তাদের মা ছেলের ওপর নির্যাতন বড় কম হয় নি। সুধীন ও তার মাকে পুলিসের পাহারায় বাইরে প্রখর রৌদ্রে দাঁড় করিয়ে রেখে চললো তাদের বাড়ী ঘর অনুসন্ধান। তারা দেয়াল ভাঙ্গলো, সমস্ত ঘরের মেঝে খুঁড়লো, ঘরের জিনিষপত্র তেঙ্গে চুরমার করলো। কি যে তারা পেলে কে জানে ; যাওয়ার সময় সুধীনকে ঘরের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দরজা বন্ধ করে তার মাকে তারা বন্দিনী করে নিয়ে গেল।

কিন্তু সুধীন কি অত সহজেই তাদের ধাক্কা মেনে নিয়েছিল ? সে দু চার জনকে ফিল, চড় ঘুসি মেরেছিল। কিন্তু সামর্থ্যে তার শেষ পর্যন্ত কুলায় নি।

পিতাকে সে আর দেখতে পায় নি। শোনা যায় তাকে দ্বিপান্তরে পাঠানো হয়েছিল, সেই জায়গাতেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন, দ্বীপান্তরে বাস করার গ্লানি তাঁকে সইতে হয় নি।

তারপর—একদিন ফিরে এলেন তার মা, সর্বস্বহারা নির্যাতিতা, অভাগিনী নারী, তাঁর ঘর, তাঁর সন্তান তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। সুধীনের স্বর্গাদপি গরীয়সী মাকে কোন পঙ্কিলতার মাঝে বিসর্জন দিলে নরপিশাচের দল—?

মা পালিয়ে এসেছেন, ক্ষীণদেহ—দুর্বল মা, চলতে তাঁর পা দুখানা কাঁপে, তবু তিনি কোন রকমে পথ চলেছেন।

নারীত্বের লাঞ্ছনা,—যে নারী সুধীনের মা—সুধীন

দুইহাতে শীর্ণা কম্পিতদেহা মাকে জড়িয়ে ধরে হাহাকার করে কেঁদে ওঠে, "মা আমার দুর্ভাগিনী মা—"

"আমার ছুঁসনে রে, আমায় ছুঁসনে সুধি—"

মা মাটিতে উপুড় হয়ে পড়েন, এই মাটি মায়ের বুকে তিনি তাঁর দুনিবার লজ্জা, বেদনা, কলঙ্ক ঢাকতে চান।

"ওরা হয় তো আসছে। ওদের অপরাধের জীবন্ত প্রমাণ আমি, আদালতে সেই শাস্তির ভয়ে কেনেডির লোকজন এতক্ষণে ছুটে আসছে। না না আমি বাঁচতে চাই নে, ব্রিটের মরব বলে আমি এতদূর হেঁটে এসেছি। তুই আমার হত্যা কর সুধি, তোর হাতেই আমি মরব, আমার আশা পূর্ণ কর।"

দুই হাতে মাথা টিপে ধরে সুধীন,—পথ সে পেয়েছে।

দৃঢ়কণ্ঠে বললে, "তাই করব, তোমায় আর নির্যাতন সইতে হবে না দুঃখিনী মা আমার—"

পিতার রিভলভার লুকানো ছিল—সুধীন বার করে আনে।

মায়ের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে "আঃ, তাই কর, আমায় মুক্তি দে, আমায় রক্ষা কর, আমার ছেলের কাজ কর।"

তীক্ষ্ণ লক্ষ্যে গুলি করে পুত্র,—হাত একটু কাঁপলোনা; অব্যর্থ লক্ষ্য ঠিক হৃৎপিণ্ডটাকেই ভেদ করেছে বটে। মায়ের মুখে প্রশান্ত হাসি ফুটে উঠেছে, একটী মাত্র কথা শোনা যায়—যাই চলে সুধি, ওরা এখনই এসে পড়বে —"তোকে যেন না পায়—।"

মায়ের বুকের তাজা রক্তে নিজের বুক ললাট সুধীন রঞ্জিত করে, মাখায় করে নেয় সে রক্ত, প্রতিশোধ সে নেবে, নিষ্ঠুর প্রতিশোধ। মাতৃহত্যার পাপকে কেনেডি এবং তার সহকারীদের রক্তে ধুয়ে ফেলবে।

অত্যাচারী শাসকের শাস্তি হয়নি, বরং সে বিপ্লব দমনের পুরস্কার পেলে, কেনেডির পদোন্নতি হল, সে একটা বিভাগের বড় কর্তার পদ লাভ করল। দারোগা সাতকড়ি চৌধুরী পুলিস সুপার, এবং কনেষ্টবলেরাও বড় পোষ্টে উন্নীত হল মেজর কেনেডির অনুকম্পায়।

যুবক সুধীনের চোখে আগুন জ্বলে।

বিপ্লবী পিতার পুত্র বিপ্লবকেই জীবনে বরণ করে নিয়েছে। পিতৃরক্ত তার ধমনীতে বইছে, পিতার কামনা তার মনে,- সুধীন এগিয়ে চললো অকম্পিত পদে, পিছন পানে সে আর ফিরে চাইলো না।

হায় বিদেশী শাসক, এ দেশে রাজত্বারম্ভের সময় হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত কি নির্যাতনই না করেছো! তোমাদের নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচারের কাহিনী রইলো ইতিহাসের বুকে রক্তাক্ষরে লেখা। দেশমাতৃকার নির্যাতীত আত্মা ডাক দিয়েছে দেশের ছেলে মেয়েদের—জাগো, জাগো, আর ঘুমিয়ো না সন্তান সম্প্রদায়। সারা দেশের বুকে, জাতির বুকে, মাতৃজাতির উপর নির্মম অত্যাচার নিপীড়ন চলেছে, এ অত্যাচার সংহত করতে তোমরা এগিয়ে এসো। উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে জাগো বাংলার সন্তান, জাগো দেশের শক্তিশালী তরুণ তরুণী, জাগো দেশের বিদ্রোহী বিপ্লবী—জাগো,—বিদ্রোহী কবির বাণী শোন—

ওরে ও তরুণ ঈশান, বাজা তোর প্রলয় বিষাণ
ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচীর প্রাচীর ভেদি—

কত দেশ কত গ্রাম এদের অত্যাচারে শ্মশানে পরিণত হয়েছে। কাঁচের খেলনা নিয়ে যারা এলো বেসাতি করতে, আজ তারাই হল রাজা—আর রাজা মহারাজ হল পথের ভিখারী। দেশসেবার নাম এরা দিয়েছে বিপ্লব,—সত্য কথা বলা বার করার নাম বিদ্রোহ। দেশের কত অধিবাসী রইলো জীবন্মৃত হয়ে, কত মরলো অনাহারে নির্যাতনে। কত মেয়ে গেল চিরদিনের জন্য ঘর ছেড়ে, কত মেয়ে মরলো তার মায়ের মত নিঃশেষে সব হারিয়ে।

কই, এ সব কাহিনী কিছু তো প্রকাশ হল না। আইনের নাগপাশে জড়িয়ে সংবাদ পত্রের মুখ বন্ধ করা হয়েছে, বেফাঁস কিছু প্রচার করা চলবে না।

সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপার হতে একদিন এসেছে সাদা মানুষেরা, যাদের আচার ব্যবহার ভাষা আহার সবই আলাদা। এরা ঘৃণা করে কালো মানুষদের, তাই পোষা কুকুরের মত তাদের ব্যবহার করে, এদেরই

একজনকে দিয়ে আর একজনের সর্বনাশ করে। লৌকিক আদব কেয়ার, দরকার হলে পদাঘাতও করে। এরা আমাদের দেশের রাজা, আমাদের জীবন মরণের কর্তা, আমাদের খেতে পরতে দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে এরাই। এদের পদাঘাত সহ্য করে গায়ের ধুলো ঝেড়ে দাঁত বার করে হাসতে হবে, সেলামের পর সেলাম ঠুকতে হবে, তাহলেই হবে রাজভক্ত, সাদা মুখের সহাস সম্বোধনও কপালে জুটতে পারে।

জীবনে হীনস্মৃহ সুধীন, ছায়ার মত কেনেডির পিছনে পিছনে ঘোরে।

দেশের শত্রু—জাতির শত্রু—

দাঁতের উপর দাঁত রাখে সুধীন।

কৈশোরে এই কেনেডি তার দেবী প্রতিমাকে ধ্বংস করেছে। আজ না নাই, আছে তাঁর রক্তের শপথ নারী নির্যাতনকারীকে চরম শাস্তি দিতে হবে।

কুকুরের মত তাকে হত্যা করবে সুধীন। না জানিয়ে তাকে হত্যা করবে না; জানাবে তার পিতা মাতার পরিচয়, দেবে নিজের পরিচয়, তারপর গুলি করবে।

পুলিশ সুপার সাতকড়ি চৌধুরীকে গুলি করেছে সে, জানিয়ে দিয়েছে—মায়ের চরম লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিচ্ছে সন্তান।

চমকে উঠে রিভলভার টানতে গিয়েছিলেন সাতকড়ি চৌধুরী তার আগে অগ্নি উদ্গীরণ করে সুধীনের হাতে অটোমেটিক রিভলভার, চৌধুরী এবং তার ড্রাইভার দুজনেই নিহত হল, বিনা বাধায় সুধীন পলায়ন করে।

দেশের বুকে জেগেছে দারুণ বিপ্লব, ওদিকে সুরু হয়েছে মহাযুদ্ধ; এই মহা যুদ্ধ উপলক্ষ্য করে এ দেশের জনগণের নির্যাতনের সীমা নাই।

কেনেডি মিলিটারীতে প্রবেশ করেছেন। তাঁর আদেশে সৈন্যদল মার্চ করে চলেছে, গ্রামের অধিবাসীদের উৎখাত করে মিলিটারী ছাউনি গড়ে উঠছে। জনগণ উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, চোখের সামনে স্ত্রী পুত্রের লাঞ্ছনা, অনাহার অর্ধাহারে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। গৃহহারা চরছাড়া জনগণের উদরে জোটে না একমুষ্টি অন্ন, তাদের আহার্য কেড়ে নিয়ে সরকারের লোক বিলাসিতা করছে যা খুসি খাচ্ছে, ফেলছে, ছড়িয়ে দিচ্ছে পথের উপরে।

এবার কেনেডির পালা।

নিজেকে প্রস্তুত করে সোজা সে কেনেডির ক্যাম্পে প্রবেশ করেছে। অধ্যয়নরত কেনেডির ললাট লক্ষ্য করে রিভলভার তুলে বলেছে, "অত্যাচারিতা নারীর চরম লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে এসেছে আজ তার সন্তান। মায়ের কলঙ্ক, পিতার শোচনীয় মৃত্যুর বেদনা আজ তোমার রক্তে ধুয়ে দিচ্ছি মেজর কেনেডি। তোমার সাহায্যকারী সকলকে পৃথিবী হতে বিদায় দিয়েছি, তোমায় বিদায় দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত ভাবে মৃত্যু বরণ করতে পারব।

সাহেব তাকে চিনেছিলেন, একটি কথাও তিনি বলতে পারেন নি। রিভলভারটা হাতে তুলে ছিলেন মাত্র সুধীনের অব্যর্থ গুলি তাঁর ললাট দেশ ভেদ করা মাত্র তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

ইচ্ছা করেই ধরা দিলে সুধীন। তার কাজ শেষ হয়ে গেছে, এখন সে বিদায় নিতে পারে। হাত দুখানা নিজেই সে বাড়িয়ে দিলে শৃঙ্খলিত করবার জন্য।

আজ অন্ধকার কারাকক্ষে বসে সে মনে করছে—আর কি কিছু বাকি রইলো?

"বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক—"

আত্মবিস্মৃত ভাবে চীৎকার করে ওঠে সে।

বাংলা দেশ জন্মাণ দিয়েছে নির্যাতিতের বুকে আছে অটুট শক্তি, বিপুল সাহস নিয়ে তারা এগিয়ে যেতে পারে।

ঐতিহাসিক ঘটনা এই দেশের বুকে প্রেমের ঠাকুর গৌরাঙ্গের আবির্ভাব। ভক্ত প্রাণের আকুতি তাঁর সিংহাসন হতে তাঁকে ধূলার ধরণীতে প্রেমের বাণী প্রচারের জন্য টেনে এনেছিল। প্রেমের স্রোতে ভেসে গেল বীরপ্রসবিনী বাংলা দেশ,—হিংসা ভুলে গেল বাঙ্গালী, রক্ত দেখে সে শিউরে উঠলো, সভয়ে চোখ মুদলো।

আর সেই পরম মুহূর্তের অবকাশ নিলে বিদেশীরা। তাই না বাংলার বীর রাজা লক্ষ্মণ সেন বাধা দিতে পারলেন না বৈদেশিককে। বিদেশীর রচিত ইতিহাস তাঁকে চিত্রিত করলে কাপুরুষ রূপে আর বীর নামে

পরিচিত করলে সেদিনকার সেই দুর্দান্ত আক্রমণকারীকে,—যে ঘরে ঘরে ভাই ভাইয়ের মধ্যে বিভেদের বাণী প্রচার করেছিল। প্রেমের বন্যায় দেশের বুকে যখন প্লাবন নেমেছে, কীর্তনের সুর যখন ঘরে ঘরে গিয়ে পৌঁছেছে, দেশের মর্মস্থলে তখন পাতা হয়েছে প্রেমিক দেবতার জন্য নব সিংহাসন। নিপীড়িত বাংলা দেশের সে ধ্বংস কাহিনী বুকের রক্ত দিয়ে লেখা রইলো। ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, রক্ত দিয়ে রইলো পাতায় পাতায় ছবি আঁকা এ লেখা এবং আঁকা কোনদিন মুছবে না।

জেগেছে জনগণ জেগেছে আজ নয়, বহুদিন আগে। তুলের আগুন গুমে গুমে ধরেছে, ধূ ধূ করে জ্বলেছে এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, তাই ছিল মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা মায়ের সন্তান একযোগে মন্ত্র উচ্চারণ করলে—বন্দে-মাতরম্—

এই মন্ত্র সাধনার ফলে তারাই সইলো কত নির্যাতন, কত না লাঞ্ছনা। এ যন্ত্র ভুলাতে শাসক করলে কত আয়োজন, চললো লাঠি, বেয়নেট, বন্দুকের গুলি, কিন্তু সবই হল ব্যর্থ, বাংলার সাধক উদাত্ত কণ্ঠে শুনালেন—

বেত মেরে কি মা ভুলাবে
আমি কি মার সেই ছেলে,
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,
কে পালাবে মা ফেলে?

এলো মন্বন্তর, মড়ক মহামারী, দেশের বুকে জ্বলে উঠলো দাবানল, লক্ষ কোটি কণ্ঠে ঘোষিত হল "মরেছে ইয়ে মরেছে—"

শ্মশানে নৃত্য করছে ভূত প্রেত, দৈত্য দানবের দল, এরা শ্মশান জাগানোর ভার নিয়েছে।

গেলই বা সুধীন, তার সৈন্যবাহিনী রইলো বেঁচে, তারা আসছে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তারা সঙ্গীন সহায়ী। স্বাধীন ভারতের জয়গান গেয়ে, স্বাধীন ভারতের পতাকা বয়ে তারা এগিয়ে যাবে, তাদের দুর্দান্ত বসিয়ে দেবে অত্যাচারীকে, গড়ে তুলবে অখণ্ড ভারত সাম্রাজ্য, তারা ভুলবে না তাদের ভাই সুধীনকে, শুধু সেইটুকুই রইলো সুধীনের সান্ত্বনা, তার পুরস্কার।

মরা গরু নাকি ঘাস খায় না—

না খাক ঘাস, তবু বেঁচে থেকে সে যে কাজ করে গেল, মনে তার স্মৃতিটাকেই উজ্জ্বল করে তুলবে। তার আত্মদান দেবে জনগণকে শক্তি, তারা এগিয়ে চলবে এবং তাদের হাতের আলো অনুবর্তীদের পথ দেখাবে।

"স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ,—কংগ্রেসের জয় হোক—"

কারা চীৎকার করে, কারা বিবর্ণ জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে উন্নত বক্ষে সদর্প পদক্ষেপে পথ চলে, ঘর বাড়ী ফেলে, পিতামাতা ভাই বোন ছেড়ে এই সংবাহারার দলে যোগ দিতে আসছে—ও কারা? পুরুষ নারী, শিশু সবাইকে যে ভেসে এলো—সবাই যে চীৎকার করছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কণ্ঠের ধ্বনি কোলাহলে কোথায় উড়ে গেল বিদেশীর সিংহাসন, মুকুট, রাজদণ্ড? স্বাধীন দেশের জনগণ প্রচুর শক্তি লাভ করেছে—প্রায় দুইশত বৎসর পরে দাসত্ব শৃঙ্খল হতে মুক্তিলাভ করেছে নাকি?

স্বপ্ন দেখছে সুধীন—

দোর্দণ্ডপ্রতাপ বৃটিশের কারাগারে সে বন্দী, বিচার তার শেষ হয়ে গেছে, আজ এই রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে সে গলায় দেবে ফাঁসির দড়ি। আজ রাত্রে সে দেখেছে স্বাধীনতার স্বপ্ন,—এ কি শুধুই কল্পনা।

দুই হাতে চোখ মুছে সুধীন তাকায়।

উপরের ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো দেখা যাচ্ছে কি? পূর্বের প্রথম লাল আলো অন্ধকার ধরণীর মুখে প্রথম পরশ দিয়েছে, এখনই সকাল হয়ে যাবে। ঘুমন্ত পাখীর ঘুম ভাঙছে, আবিল চোখে সে বুঝি তার সুখময় নীড়ের মধ্য হতে আলোময় পূব আকাশের পানে তাকিয়েছে।

সুধীন তাকিয়ে থাকে সেই এতটুকু আলোর রেখার পানে। মনে মনে বিদায় চায়—সুন্দরী পৃথিবী আলোময় মোহময় ধরিত্রীর কাছে। হাত দুখানা জোড় করে বুকের উপর রেখে বার বার প্রার্থনা করে "যদি আবার আমায় আসতে হয়, ওগো আমার পরম স্নেহময়ী শ্যামলা বাংলা মা, যেন তোমার কোলেই ফিরে আসি, স্বাধীন ভারতের সন্তান নামে যেন আত্মপরিচয় দিতে পারি।"

কল কল কল—

দরজা আস্তে আস্তে খুলে যায়।

পাদ্রীকে দেখা যায়, সুকঠিন শব্দটা ক্রমে ভেসে আসে—"সময় হয়েছে—"

সুধীন যেন প্রস্তুত ছিল, উঠে দাঁড়াল
"চল, আমি প্রস্তুত।"

অকম্পিত পদে নিঃশব্দে পাদ্রীদের মাঝখানে সে এগিয়ে চলে ফাঁসির মঞ্চের দিকে—। একটা গানের লাইন সে শুধু শুধু করে গাচ্ছিল—

সময় হয়েছে নিকট—এখন বাঁধন ছিঁড়তে হবে।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব

চিত্ত মিত্র

পুরোনোদের কাছে এ আজ অস্পষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে তো তোলাই চলে

তাঁদের কেউ বলেন, ওহো মনে পড়েছে বটে; আর কেউবা উত্থাপন করেন অন্য প্রসঙ্গের। অথচ এমন একদিন ছিল যখন দেশী বিদেশী শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই শুধু নয়, বাংলার অতি সাধারণ মানুষের মনেও সাড়া জাগাত ব্রহ্মবান্ধবের নাম, তাঁর উদাত্ত আহ্বান বাংলার সেরা দেশপ্রেমিকদের কণ্ঠস্বরের চেয়ে কম মর্যাদা অর্জন করত না সেদিন।

দেশপ্রেম ছাড়া সমাজ ও ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রেও ব্রহ্মবান্ধবের অস্তিত্ব ছিল বড় চমকপ্রদ আর নতুনত্বপূর্ণ। আজকের অবস্থার সঙ্গে তাঁর সেই চিন্তাধারা যথেষ্ট অসামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হলেও, সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তা যে এক নতুন আকর্ষণের বিষয় বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। অথচ রহস্যাবৃত তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয় বছরের মধ্যেই কি করে যে দেশের মানুষ তাঁকে ভুলতে আরম্ভ করল তা বড় বিস্ময়কর। ১৯১৪ সালে দি বেঙ্গলী পত্রিকায় জ্ঞানসুন্দর চক্রবর্তী লিখেছিলেন :

Upadhyay Brahmobandhab is now an almost forgotten man. In his case we find a complete justification of the adage that the world knows very little of its greatest men.

(উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব আজ বিস্মৃত প্রায়। পৃথিবী তার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের সম্বন্ধে অতি অল্পই জানে—এই প্রাচীন প্রবাদ বাক্যটির সম্পূর্ণ যথার্থতা পাই আমরা তাঁর ক্ষেত্রে।) জ্ঞানসুন্দর চক্রবর্তীর সেদিনের এ বক্তব্য আজকের পক্ষেও প্রযোজ্য।

১৮৬১ সালের খানাকুল গ্রামে ব্রহ্মবান্ধবের জন্ম। শিশুর নামকরণ করা হয়েছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোটোবেলায় মাতৃহীন অবস্থায় তিনি বুড়ী ঠাকুরমার কোলে মানুষ হয়েছিলেন। দস্যিপনাও ছিল মন্দ নয়। ছয় বছর বয়সে চূড়ান্ত স্কুলে ভর্তি হলেন। লেখাপড়ায় তিনি শিক্ষকদের অতি প্রিয় হ'য়ে ওঠেন।

ছোটোবেলা থেকেই ব্রহ্মবান্ধবের অস্থিমজ্জায় যে স্বদেশপ্রেমের নিঝর ছিল তার প্রথম অভিব্যক্তি ঘটে তাঁর কলেজ জীবনে। সে সময়ে তাঁর পরিচয় ঘটে আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে। কিন্তু তাঁদের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন তাঁকে বিশেষ সাড়া দিতে পারে নি। তলোয়ার না হ'লে ইংরেজ তাড়ানো সম্ভব নয়—খোলাখুলিই একদিন প্রকাশ করেছিলেন একথা। শেষে ঠিক করলেন গোয়ালিয়রে পালিয়ে গিয়ে সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখাবেন; যুদ্ধের ট্রেনিং নেবার জন্যে।

কিছুদিনের মধ্যেই জন তিনেক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়লেন গোয়ালিয়রের দিকে। গিয়েও পৌঁছলেন, কিন্তু কেমন করে ঐ বন্ধুদের এক অভিভাবক তাঁদের ঠিকানা জানতে পেরে যাওয়ায় সব পরিকল্পনা ফেঁসে যায়। চাপে পড়ে ফিরতে হ'ল তাঁদের, মনের কষ্ট মনে চেপে। ফিরে এসেও কিন্তু হাল ছাড়েন নি ভবানী-চরণ। কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর বেরিয়ে পড়লেন আবার নিঃসঙ্গ অবস্থায়। কিন্তু গোয়ালিয়রের প্রধান সেনাপতি তাঁকে সৈন্যবাহিনীতে গ্রহণ করতে অপারগ হওয়ায় ক্ষুণ্ণমনে ফিরে এলেন আবার।

পড়াশুনায় মন ছিল না আর। দেশের কাজে

সঙ্গেই ধাক্কা খেয়ে একটু ব্যর্থতাবোধ এসেছিল হয়ত। সুরু করলেন শিক্ষকতা করতে, খানাকুলের কাছাকাছি এক গাঁয়ে। সেখান থেকে কিছুদিন পর গেলেন অকল-পুর, তারপর কলকাতায়। এরই মধ্যে ধীরে ধীরে ধর্ম-জীবনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন তিনি।

ধর্মের মধ্যে দিয়ে দেশকে মুক্তির পথ দেখাবেন, ঠিক করলেন ভবানীচরণ। এই সময়ে স্বামী বিবেকানন্দের (তখনও নরেন) সংগে দেখা হয়। পরস্পরের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। ক্রমে দুজনেই আকৃষ্ট হ'য়ে পড়লেন সাধারণ সমাজের দিকে। এইখানে তাঁরা ত্রিপুরানাথ মল্লিকের মাধ্যমে ব্রাহ্ম সমাজের কেশব সেনের সঙ্গে পরিচিত হন; কালক্রমে ভবানী হয়ে পড়লেন কেশবের মতানুবর্তী, নরেন দেখা পেলেন রামকৃষ্ণের।

তারপর ধীরে ধীরে কিভাবে কেশব সেনের ব্রাহ্মমত থেকে তিনি খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হলেন, তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু বললে যথেষ্ট হবে যে ১৮৯৪ সালে আমরা দেখা পেলুম ভবানীচরণের পরিবর্তে এক নতুন ধর্মান্তরিত সন্ন্যাসীর, যিনি নিজেকে একই সংগে হিন্দু আর ক্যাথলিক খৃষ্টান বলে দাবী করলেন এবং সুরু করলেন সন্ন্যাস ধর্মের সুরুতে গৃহীত নিজের স্বনির্বাচিত নাম: উপাধ্যায় ব্রহ্মবন্ধু। পরবর্তী কালে ব্রহ্মবন্ধু শব্দটি ব্রহ্মবান্ধবে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

একই সংগে হিন্দু আর ক্যাথলিক?…

এ সম্বন্ধে উপাধ্যায়ের মত ছিল বড় অভিনব এবং নিশ্চয়ই অনুশীলনযোগ্য। হিন্দুবাদ ছিল তাঁর কাছে সমাজধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সাধনধর্মের ওপর নয়। বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্মের ওপরেই হিন্দুসমাজের ভিত্তি। এই বর্ণাশ্রম ধর্মকে মেনে চলাই হ'ল হিন্দুর সমাজ ধর্মকে মানা…চার বর্ণের যে কোন একটিতে নিজেকে অন্তর্গত করা; এই সমাজধর্মকে পালন করার সংগে কোনো বিশেষ সাধনধর্মকে পালন করার সর্ত নেই হিন্দুর। তা যদি থাকত তবে হিন্দু সমাজের মধ্যে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি চূড়ান্ত পরস্পরবিরোধী সাধনমার্গের সহাবস্থান অসম্ভব হত হিন্দুসমাজে, এই হ'ল ব্রহ্মবান্ধবের মত।

নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করলেন উপাধ্যায়। স্বমত প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করলেন সোফিয়া, ১৮৯৪ সালে। সোফিয়ার কাজ হল বেদ আর উপনিষদের মর্ম উদ্ঘাটন এবং সেই সংগে খৃষ্টীয় চিন্তাধারাকে প্রকাশ করা। এই সংগে বিভিন্ন সভা সমিতিতে প্রচার করতে লাগলেন তাঁর মতামত।

বেদান্তদর্শনের ঈশ্বরধারণার সংগে ক্যাথলিক ব্রহ্ম-বান্ধবের ঈশ্বর-ধারণার কিছুমাত্র পার্থক্য ছিল না। বস্তুতঃ খৃষ্টধর্মের বিভিন্ন তত্ত্বকে তিনি বেদান্তদর্শনের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। এই সময় অ্যানি বেসান্ত তাঁর থিয়সফি সোসাইটির পক্ষে মতপ্রচারে প্রবৃত্ত হলে ব্রহ্মবান্ধব তাঁকে তর্কযুদ্ধে ডাক দেন…কিন্তু বেসান্ত রাজী হন নি। ১৮৯৬ সালে তিনি ভারতব্যাপী প্রচার সফরে বার হলেন। ঐ বছরে বোম্বাইয়ে তাইস রানাডের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় ব্রহ্মবান্ধব তাঁর ধর্মমতকে এমনভাবে তুলে ধরেন যে রাগাডে তাঁর ভাষণে বলেন, বক্তা যা বলেছেন তাই যদি ক্যাথলিকবাদ হয় তবে আমি নিজে ক্যাথলিক হতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করব না।

দুঃখের বিষয় ব্রহ্মবান্ধবের ক্যাথলিক চিন্তা সরকারী ক্যাথলিকদের ভাল লাগে নি। আরও যেটা তাঁদের ভাল লাগে নি সেটা বোধ হয় তাঁর হিন্দুয়ানী। ফলে অতি প্রথম থেকেই তাঁর সংগে কিছু না কিছু সংঘর্ষের সূচনা হয় সরকারী ক্যাথলিকদের।

উপাধ্যায়ের "জাতীয়তার ভিত্তিও ছিল এই হিন্দুত্ব।" কথাটা এই অর্থে সত্য যে ব্রহ্মবান্ধব তাঁর যীশুকে গোড়া থেকেই চেষ্টা করলেন হিন্দুর "ঠাকুরে" রূপান্তরিত করতে। খৃষ্টান সন্ন্যাসী হয়ে অবধি গায়ে পরতেন গৈরিকবস্ত্র, সংগে থাকত লোটা আর কম্বল। খৃষ্টকে বলতেন "ঠাকুর"। খৃষ্টের ধর্মকে ব্যাখ্যা করতেন বেদান্তের ভাষায়। আর কাগজ পত্রে প্রকাশ করতেন ভারতীয় বিশপদের একত্র করে একটি সম্পূর্ণ জাতীয় মিশন বা চার্চ গড়ে তোলার

আকাঙ্ক্ষা। এই মিশনের খৃষ্টানদের হতে হবে জীবনযাত্রায় সম্পূর্ণরূপে হিন্দু, মাছমাংস সম্পূর্ণ বর্জন করবেন তাঁরা, পরতে হবে সন্ন্যাসীর গেরুয়া কাপড়।

একথা ভাল লাগে নি বিদেশী মিশনারীদের।

ব্রহ্মবান্ধবের সম্পাদিত সোফিয়াকে বয়কট করার জন্যে ক্যাথলিকদের ওপর সার্কুলার জারী করা হল। সোফিয়া বন্ধ হবার পর ব্রহ্মবান্ধব বার করলেন 'দি টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী'। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার ওপরেও হুকুমনামা জারী করতে দেরী করেন নি তাঁরা।

উপাধ্যায়ের সংগে এর মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের আলাপ হয়। সেদিন বোলপুরে স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা চলছে। একদিন কবির সংগে বোলপুরে গিয়ে উপস্থিত হলেন উপাধ্যায়···তারপর গড়ে উঠল ব্রহ্মচর্য আশ্রম।

এই সময় রবীন্দ্রনাথের সংগে প্রায়ই বসতেন তিনি উপনিষদের আলোচনায়। শঙ্করের অদ্বৈতবাদের সংগে লাগত রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ঠোকাঠুকি। তবে ঘটনাক্রমে এ অবস্থা চলতে পারেনি বেশীদিন। শান্তিনিকেতনে উপাধ্যায়-শিষ্য শিক্ষক রেওয়াচাঁদের সংগে কর্তৃপক্ষের ভুল বোঝাবুঝির ফলে রেওয়াচাঁদ তাঁর ছাত্রদের নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন।

আগেই বলা হয়েছে বিদেশী মিশনারীরা উপাধ্যায়ের সমাজতন্ত্রের বা নতুন ধরণের ক্যাথলিক ব্যাখ্যাকে ভাল চোখে দেখেন নি। তাঁদের মধ্যে অনেকে তাঁকে সমর্থন করলেও ক্ষমতাবান বহু ক্যাথলিক বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর। এঁদের সম্বন্ধে নাজেরেথের ক্যাথলিক মুখপত্র "দি ইলাস্ট্রেটেড ক্যাথলিক মিশন" মন্তব্য করেছিলেন: "ভারতের দেশীয় নায়কের বৈধ জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষা ও শাসনতান্ত্রিক অভিযোগ সম্পর্কে ইউরোপীয় মিশনারীদের বিরূপ মনোভাব লক্ষ্য করছি আমরা। এর ফলে সাধারণের চোখে খৃষ্টের ধর্মকেই হীন করা হবে।" পত্রিকাটি ঠিকই লিখেছিলেন। উপাধ্যায় বা হিন্দুদের জাতীয় চিন্তার মর্ম অনুধাবন করতে বিন্দুমাত্র ভুল হয়নি তাঁদের।

১৯০২ সালে ব্রহ্মবান্ধব ইউরোপ যাত্রা করেন। ইউরোপীয়দের বেদান্ত দর্শনের মর্ম বোঝাতে হবে—এই ছিল সংকল্প। ইউরোপে অক্সফোর্ড আর কেমব্রিজের শিক্ষিত সমাবেশে বক্তৃতা দিলেন হিন্দুর দর্শন আর সমাজ-ধর্মের ওপর। অধ্যাপক ম্যাক্ডোনাল্ড, ডাঃ বেরার্ডের মত নামজাদা বিজ্ঞরা সভাপতিত্ব করেছিলেন তাঁর বক্তৃতা সভায়। বলা বাহুল্য, ব্রহ্মবান্ধব যথেষ্ট পরিমাণে সফল হয়েছিলেন তাঁর মিশনে।

দেশে ফিরে এসে আরও কয়েক বছর ধর্ম আর দর্শন নিয়ে দিন কাটালেন উপাধ্যায়। বিলেত যাবার আগেই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সারস্বত আয়তন বিদ্যালয়ের, তারই কাজকর্ম দেখাশুনা করতে লাগলেন। তারপর স্কুলে সরস্বতী-প্রতিমার পুজো সমর্থন করায় শিষ্য রেওয়াচাঁদের সংগে মতান্তর হয়—উপাধ্যায় আয়তন ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর বহু পরে রেওয়াচাঁদ বুঝতে পারেন তাঁর ভুল।

বেদান্তজ্ঞানী ক্যাথলিক পৌত্তলিকতা সমর্থন করতেন না···কিন্তু প্রতিমাকে গ্রহণ করতেন প্রতীক বা সংজ্ঞার অর্থে। বুদ্ধত্বে উপনীত হওয়ার জন্যেই ক্ষুদ্র প্রতীকের প্রয়োজন—খৃষ্টান অশিক্ষানন্দ খৃষ্টান গুরুর এ তত্ত্বকে মেনে নিতে পারেন নি সেদিন।

তারপর এলো উদ্দাম ঝড়ের সেই যুগ···স্বদেশী আন্দোলনের তরঙ্গ।

কার্জন বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব ঘোষণা করলেন।

বাংলার একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত আন্দোলিত হয়ে উঠল প্রবল জনমত।

বিপিন পাল, অরবিন্দ এগিয়ে এলেন।

বাংলার ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সেই ভয়ঙ্কর যুগে কলকাতা সহরের ছোট্টো এক কোণ থেকে একটি স্ফুলিংগ বার হয়ে ছড়িয়ে পড়ল একদিন সন্ধ্যাবেলায়···

ব্রহ্মবান্ধবের সম্পাদিত ছোটো একটি সান্ধ্যদৈনিক···নাম তার সন্ধ্যা।

বাংলাদেশে সেদিন পত্র-পত্রিকার অভাব ছিলনা। হিতবাদী, বঙ্গবাসী, নবশক্তি—প্রত্যেকটির মধ্যে দিয়ে বাংলার দেশপ্রেম অল্প অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করছিল সেদিন। তবু এদের প্রত্যেকটির থেকে সন্ধ্যার ছিল বিরাট প্রকৃতিগত পার্থক্য। সন্ধ্যার জন্ম হয়েছিল ১৯০৪ সালে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই সে দায়িত্ব নিল বাংলার অতি সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদেরই ভাষায় দেশপ্রেমের বাণীকে পৌঁছে দেবার। বম্বেক্রনিকলের প্রাক্তন সম্পাদক বিপিন বিহারী দাস লিখেছিলেন :

Sandhya became a most powerful vernacular organ of the new school of thought. Its style, its biting sarcasm, its refreshing wit, its ruthless criticism won for it a unique place in Bengali vernacular journalism. (সন্ধ্যা নতুন চিন্তাধারার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী মুখপত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর ভঙ্গী, মর্মদংশী শ্লেষ, এর আনন্দদায়ী রসিকতা, এর বেপরোয়া সমালোচনা একে বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটি অদ্বিতীয় স্থান দান করেছে।)

সন্ধ্যার ভাষার যথাযথ পরিচয় দেওয়া আজ আর সম্ভবপর নয়। অবশ্য দমন নীতির ফলে সন্ধ্যার বেশীর ভাগ কপিই নিখোঁজ হ'য়ে যায়, যা পড়ে থাকে তাও আর বিশেষ পাওয়া যায় না বর্তমানে! তবু অশিমানন্দ কৃত তার কয়েকটি পংক্তির ইংরিজী অনুবাদ তুলে দিচ্ছি এখানে। পড়লে বোঝা যাবে যে কি তেজস্বিতা ও অসমসাহসিকতার জন্য ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সেদিন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা হিসেবে পরিগণিত হয়েছিলেন।

"See how the mother plays and the Firinghi bull has lost all self-control." "Your University is a Golamkhana." "When we think of going to jail we cannot help laughing outright a revolution is impending and we leap with joy and clap our hands."

("দেখ মা কেমন হাসছেন আর ফিরিঙ্গী ষাঁড তার আত্ম সংযম হারিয়ে ফেলেছে।" "তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হল গোলামখানা।" আমরা যখন জেলে যাবার কথা ভাবি তখন না হেসে পারি না···একটি বিপ্লব এগিয়ে আসছে. আমরা আনন্দে লাফিয়ে উঠে হাততালি দিচ্ছি।")

সন্ধ্যার ভাষায় যে কি উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন, তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। "তাঁর দীক্ষায় বাঙালী আত্মস্থ হল। ব্রহ্মবান্ধব বাংলা দেশে আত্মশক্তি উন্মেষের নায়ক···চরমপন্থী দলের অন্যতম স্রষ্টা।"

এরই মধ্যে কলকাতায় বালগঙ্গাধর তিলকের উপস্থিতিতে সাড়ম্বরে শিবাজী উৎসব পালন করা হয়। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন এর প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যার ওপর সরকারী দমননীতির খড়্গ নেমে এল। ১৯০৫ থেকেই পর পর 'সন্ধ্যা' অফিস খানাতল্লাসী হয়। আন্দোলন দমনের জন্যে সরকারী নীতির সংগে তাল রেখে সন্ধ্যার ভাষাও উগ্রতর হ'য়ে উঠল। সেই সময়ে সন্ধ্যার বক্তব্য ছিল : লাঠি সড়কি দা এবং আগ্নেয়াস্ত্র জমা কর। প্রত্যেকটি গ্রামে প্রায় ছজন করে ভদ্রলোক আর জন পঁচিশ করে বাগ্দী বা চণ্ডাল তৈরী থাকুক। মারের বদলে মার দাও।

("Let lathis, sarkis, daos and a few fire arms be kept." "In all villages have about six bhadroloks and twenty five men of Bagdi and chandal caste." "Strike when you are struck.")

সন্ধ্যার জনপ্রিয়তা তখন এত বেশী ছিল যে প্রতিদিন ১২,০০০ কপি ছেপেও চাহিদা মেটানো যেত না। শেষ অবধি মরীয়া হয়ে পড়ল ফিরিঙ্গী বাহাদুর। ১৯০৭ এর ১০ই সেপ্টেম্বর ব্রহ্মবান্ধব গ্রেপ্তার হলেন। সংগী হলেন

আরও দুজন, সন্ধ্যার ম্যানেজার সারদা সেন আর মুদ্রাকর হরিচরণ দাস।

কিংসফোর্ডের এজলাসে মামলা শুরু হয়। এই মামলা সেই যুগে যথেষ্ট বিশেষত্ব লাভ করেছিল। এজলাসে দাঁড়িয়ে কিংসফোর্ডের অধমনা আচরণের বিরুদ্ধে শপথের সংগে নিজের অভিমতকে প্রকাশ করলেন উপাধ্যায়। তাঁর কৌতুহলী তাঁর বসবার জন্যে বিচারককে একটি চেয়ার দেবার জন্যে অনুরোধ করবেন কিনা প্রশ্ন করায় ব্রহ্মবান্ধব ঘৃণার সংগে উত্তর দিলেন: ফিরিঙ্গীর কাছে ভিক্ষে! কখনই না। কিংসফোর্ড ভদ্রলোক হলে নিজেই আমায় বসবার চেয়ার দেবে।

ইংরেজ সাহেবের সে ভদ্রতাবোধের বালাই ছিল না।

তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উত্তরে এজলাসে দাঁড়িয়ে উপাধ্যায় যা বলেন তাতে সাহেব কিংসফোর্ড বিচলিত হয়ে ওঠেন। "আমি এই বিচারে অংশ গ্রহণ করতে রাজী নই। যে বিজাতীয়রা তাদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে আমার জাতির বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের কাছে ঈশ্বর-নির্দেশিত স্বরাজ-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য আমার হিসেব দিতে হবে এ কথা বিশ্বাস করি না আমি।"

সাহেব চীৎকার করে ওঠেন: ওঃ ওঃ·····।

মামলা শুরু হবার অনেক আগে থেকেই স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে। মামলা চলার সময় এজলাসে ক্রমাগত দাঁড়িয়ে থাকার ফলে পুরোনো অন্ত্রের রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা ছাড়া উপায় ছিল না। ক্যাম্বেল হাসপাতালে ভর্তি করে সামান্য ধরণের এক অস্ত্রচিকিৎসা করা হল তাঁর। অল্পদিনের মধ্যেই ভালো হয়ে উঠলেন বটে কিন্তু হঠাৎ একদিন হাসপাতাল ছাড়ার আগেই আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং মৃত্যু ঘটল তাঁর।

১৯০৭ সালে ২৭শে অক্টোবর তাঁর দেহত্যাগ।

উপাধ্যায়ের মৃত্যু স্বাভাবিকভাবে হয়েছিল কিনা সে সম্বন্ধে এক জনরব ওঠে। এ প্রসঙ্গে সেই সময়কার একটি পত্রিকার বক্তব্যের কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি। "এ-কি-এ, বুঝিয়ে দিবে কে? উপাধ্যায় মহাশয় স্বর্গে গিয়াছেন·····কিন্তু কেমন পাপ মন, মনে একটু খটকা লাগিয়াছে। ..উপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু কি রোগে ঘটিল?···গত ১৮ বৎসরের মধ্যে উপাধ্যায় মহাশয়কে কুকুরে কামড়ায় নাই। তবে কেন জলাতঙ্ক রোগের কথা উঠিল···তিনি জল ও বরফ দেখিয়া চমকান নাই। তবে জলাতঙ্ক রোগ বলিব কিসে? ফিরিঙ্গী ডাক্তার হেওয়ার্ড···কোনো চিকিৎসাই করেন নাই অথচ প্রকাশ হইল কেন যে ডাক্তার হেওয়ার্ড ফিরিঙ্গীই তাঁহাকে শেষ অবস্থায় ক্লোরোফর্ম প্রয়োগ করিয়াছিল আর সেই প্রয়োগেই তাঁহার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটে।···অনেকের মনেই ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে।"

ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যু অসংখ্য আজন্ম দেশপ্রেমিকের মতই রহস্যাবৃত থেকে গেছে আজও। তা জানার কৌতূহল মেটানো আজ হয়তো সম্ভব নয় আর। তাঁর মৃত্যুকে জানার চেয়ে তাঁর জীবনকে জানার মূল্যই বোধ হয় আজ বেশী, অন্ততঃ দেশ আর জাতির ক্রম-বিকাশের ইতিহাসকে জানার প্রয়োজনে।

[পূর্বানুবৃত্তি]

(১১)

এখন যাঁহারা বিলাত যান তাঁহারা ওখানকার আধুনিক রাস্তাঘাট ও যানবাহন দেখিয়া শতবর্ষ পূর্বেকার অবস্থা কিছুতেই কল্পনা করিতে পারিবেন না। গ্রামাঞ্চলের কথা ছাড়িয়াই দিন, শহরের অবস্থাও ছিল অবর্ণনীয়। খাস লণ্ডন শহরের পাথর-বাঁধানো রাস্তারই এক এক জায়গায় কাদাতে জুতার অর্ধেকটা পর্যন্ত বসিয়া যাইত। অপর শহরগুলির কথা ত না তোলাই ভাল।

আজ আমরা এমনিই একটি শহর—ডোভারের কথা বলিতে বসিয়াছি। ডোভারের অবস্থা বেশ বেশী খারাপ। কারণ এই শহরটি হইল বলিতে গেলে ইউরোপে যাওয়ার সদর দরজা। ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে ক্যালে—এপারে ডোভার। ক্যালে হইয়া সারা ইউরোপের ডাক যায় এখান হইতে। তা ছাড়াও—অপর কতকগুলি ডাক সোজা ডোভার হইতে অন্যান্য বন্দরে যায়। শুধু ডাকই নয়, নানা প্রয়োজনের মানুষও আসে এখানে, ইউরোপের পথে। মাল পাঠাইবার কাজে যদিও লিভারপুল, পোর্টস্‌মাউথ প্রভৃতি বন্দরগুলি বেশী প্রাধান্য লাভ করিয়াছে এবং সরকারও সেই কারণে বাধ্য হইয়া সেখানকার পথঘাট নির্মাণে বেশী মনোযোগ দিয়াছেন—তবু ডোভারের ভীড় এবং ঝামেলা কিছুমাত্র কমে নাই।

তখনও ডাকগাড়ী বলিতে ঘোড়ায়-টানা গাড়ীই বোঝাইত। রেল-গাড়ীর শুরু হইলেও ঘোড়ায় টানা ষ্টেজ-কোচ বিলুপ্ত হয় নাই। বরং বেশীর ভাগ লোকই ঐ গাড়ীতে চলাচল করিতেন। এই গাড়ীগুলির এক-দিকের প্রধান আড্ডা ছিল ডোভার। অর্ধেক-কাঁচা পথ-ঘাট গাড়ীর চাকায় ভাঙিয়া ও বৃষ্টির জলে গলিয়া তীন-গোড্ডায় পরিণত হইত। এক এক জায়গায় গাড়ীর চাকা এমনই বসিয়া যাইত—যে সেখান হইতে টানিয়া তুলিতে ঘোড়া বা সহিস-কোচম্যানে কুলাইত না—যাত্রীদেরও মধ্যে মধ্যে আসিয়া চাকা ঠেলিতে হইত।

পথের ত ঐ অবস্থা। শহরের বাসিন্দাদের অবস্থাও তথৈবচ। যাত্রীদের জন্য অসংখ্য সরাইখানা চারি-দিকে। নানারকমের লোক সেখানে আসিয়া জড়ো হয়। মদের হল্লোড় চলে প্রায় দিনরাত। সরাইখানা গুলিতে মদ, পিঁয়াজ-রসুন এবং আস্তাবলের গন্ধ মিলিয়া ভিতর ত বটেই, বহুদূর পর্যন্ত বাতাস ভারী হইয়া থাকে। হৈ-হল্লা, চিৎকার এবং গালিগালাজ—এ সব এখানকার লোকের সহিয়া গিয়াছে। হঠাৎ নূতন কোন লোক আসিলে সে কিছু বিস্মিত হয়।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি—১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে—ডোভারের হৈ-হল্লোড় যেন কিছু বাড়িয়াছে। তাহার কারণ ক্রিমিয়া-প্রত্যাগত হাইল্যাণ্ডার সৈন্যদের ডোভারেই জড়ো করা

হইয়াছে। কঠিন বন্ধুর দুর্গম হাইল্যাণ্ড বা স্কট-ল্যাণ্ডের পার্বত্য-অঞ্চলের এই অধিবাসীগুলি এমনিতেই যথেষ্ট বুনো—বরং বলা চলে অনায়াসে। ইহারা এখনও বিশ্বাস ও আচার আচরণে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারকে বহন করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের বংশগত বিবাদের শেষ হয় না কখনও—পুরুষানুক্রমে গড়াইয়া চলে। সৈন্য হিসাবে ইহাদের খ্যাতি খুব, কারণ প্রাণের মায়া রাখে না ইহারা—প্রাণ নিতেও যেমন কুণ্ঠা নাই ইহাদের, তেমনি দিতেও দ্বিধা করে না।

সে বছর শীতে যে হাইল্যাণ্ডারগুলি ডোভারে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল তাহাদের হৈ-হল্লোড় চরমে পৌঁছিবার কারণও ছিল। ক্রিমিয়াতে তাহাদের কঠোর পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে—ব্রিটিশ প্রেস্টিজেরই অগ্নিপরীক্ষা বলা যায়। যুদ্ধের জয় পরাজয় জাতির জীবন মরণের প্রশ্ন হইয়াছিল। সেখানে যে লড়াইয়ের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল তাহা কোন ক্রমেই সৌখীন লড়াই নয়। এবং বলিতে গেলে এই হাইল্যাণ্ডারগুলির জন্যই সেখানে কোনমতে সম্মান রক্ষা হইয়াছে। সেই লড়াই হইতে ফিরিয়া যদি তাহারা কিছু বেশী মাত্রাতে উদ্দাম হইয়া ওঠে ত দোষ দেওয়া যায় না। একে ত এমনিতেই—তখনকার দিনে যাহারা লড়াই করিতে যাইত তাহাদের অধিকাংশেরই অক্ষর-পরিচয় মাত্র সম্বল—তাহার উপর হাইল্যাণ্ডারদের সরস্বতীর সহিত প্রায় সম্পর্কই থাকিত

অশিক্ষিত বর্বর উদ্দাম এই পার্বত্য সৈন্যগুলি সভ্য চুনিয়ার দরজা হইতে ফিরিয়া আসিয়া—যে ধরণের আচরণ এ ক্ষেত্রে আশা করা যায় সেই ধরণের আচরণই করিতেছিল। মদ এবং স্ত্রীলোকে তাহারা আকণ্ঠ চুবিয়াছিল, এবং বলা বাহুল্য তাহার সহিত আনুষঙ্গিক হিসাবে যাহা যাহা থাকা স্বাভাবিক—তাহা সবই ছিল। এক কথায় ডোভারের নাগরিকদের অবস্থা সেদিন আর যাহাই হউক ঈর্ষার বস্তু ছিল না।

ইহারই মধ্যে একদিন হঠাৎ খবর আসিল হাইল্যাণ্ডস্ রেজিমেণ্টগুলির পুনর্গঠন হইবে। চীনে গোলমাল বাধিয়াছে, তাহাদের সায়েস্তা করার জন্য লোক পাঠানো দরকার। এবং 'যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল' হিসাবে এই হাইল্যাণ্ডারদেরই পাঠানো হইবে। নচেৎ সে 'হনুদে শয়তানগুলি'র সহিত পারিয়া ওঠা যাইবে না।

স্থির হইল তিরানব্বই সংখ্যক সাদারল্যাণ্ড হাইল্যাণ্ডার রেজিমেণ্ট বা সৈন্যবাহিনীটিকেই আপাতত চীনে পাঠানো হইবে। তবে তাহাতে যথেষ্ট লোক নাই—যাহারা আছে তাহাদেরও অনেকের বয়স বেশী হইয়া গিয়াছে—অথবা চাকরীর মেয়াদ ফুরাইয়া গিয়াছে। তাছাড়া ক্রিমিয়ার অনেকেই এমন আহত হইয়া পড়িয়াছে যে তাহাদের লইয়া অন্তত আর দূর দেশে যুদ্ধযাত্রা করা সম্ভব নয়। সুতরাং—উপর হইতে হুকুম আসিল অশক্ত ও বয়স্কদের ছাঁটিয়া বাদ দিয়া নূতন তরুণদের দ্বারা সংখ্যা পুরাইতে হইবে, তবে হাইল্যাণ্ডারদের দ্বারাই তাহা পূরণ করা হইবে। সেই কথা মত ৪২ নং, ৭২ নং, ৭৯ নং এবং ৯২ নং হাইল্যাণ্ড-বাহিনী হইতে কিছু কিছু লোক চাহিয়া পাঠানো হইল। তবে একথাও জানাইয়া দেওয়া হইল যে যাহারা স্বেচ্ছায় আসিতে চাহিবে—কেবল তাহারাই আসিবে—অবশ্য যতক্ষণ না এই রেজিমেণ্টের এগারোশত সংখ্যা পূর্ণ হইতেছে!

এসব কাজ দুই একদিনে হয় না, তাহা বলাই বাহুল্য। ফলে আরও বেশ কিছুদিন ঐ পাহাড়ে-গোরা-সিপাহীরা ডোভারে ভীড় জমাইল। ডোভারের উঁচুনিচু সড়কের দুই পাশে, অথবা জলের ধারের সরাইখানা গুলিতে তেমনি ভীড় জমিতে লাগিল—পথে ঘাটে হৈ-হল্লা ও গুণ্ডামিও কিছুমাত্র কমিল না।

ইহারই মধ্যে একদিন অপরাহ্নে সাতটি স্কচ্ সিপাহী ১৩ নম্বরের আফিসঘরের সামনে আসিয়া জড়ো হইল। ইহারা সকলেই ৭২ নং রেজিমেণ্টের লোক, চীন-অভিযানে যোগ দিতে আসিয়াছে। ৭২ নং রেজিমেণ্টের ঘাঁটি একটু দূরে, চ্যাথামের রাস্তায়। কিন্তু ইহারা হাঁটিয়া আসে নাই—কোথা হইতে একটা গাড়ী জোগাড়

করিয়াই আসিয়াছে। ফলে ইহাদের চেহারা দাঁড়াইয়াছে অদ্ভুত। কারণ কয়দিন জলবৃষ্টি হয় নাই—পথে কাদা নাই, তাহার বদলে আছে প্রচুর ধূলা। এবং সে ধূলা সাদা—ময়দার মতই। কারণ ডোভার সহরটি বলিতে গেলে খড়ি-পাথরের পাহাড়ের গায়ে। সেই পাথরই চক্রে পিষ্ট হইয়া নিয়ত চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছে। অশ্বক্ষুর নিক্ষিপ্ত এবং চক্রোৎক্ষিপ্ত সেই সূক্ষ্ম শ্বেত ধূলিকণা ইহাদের কেশে, ভ্রূ-যুগলে, ত্বকে এবং পোষাকে বেশ পুরু হইয়াই জমিয়াছে!

অফিসের বাহিরে আসিয়া ইহারা শুনিল সেনাপতি আম্রিয়ান হোপ এবং ক্যাপ্‌টেন ডসন দুজনেই অফিসে আছেন—এখনই দেখা করা সুবিধা। আগন্তুকদের তিনজন ভীড় করিয়া অফিসে ঢুকিয়া গেল, শুধু একজন বাহিরের বারান্দায় অপেক্ষা করিতে লাগিল।

যে ছয়জন ভিতরে আসিল তাহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই ক্যাপ্‌টেন ডসনের পরিচিত। বিশেষত একজনকে খুবই অন্তরঙ্গ মনে হইল। তাহাকে দেখিয়া ডসনের মুখ মধুর হাস্যে প্রসন্ন হইয়া উঠিল! তিনি বলিয়া উঠিলেন 'কী খবর জন ম্যাকলিয়ড? লড়াইয়ের আশ মেটেনি?'

ম্যাকলিয়ড হাসি হাসি মুখে জবাব দিল, 'কৈ আর মিটল! তাইত আপনার খাতায় নাম লেখাতে এসেছি!'

'বেশ বেশ। ভালইত। তোমরা থাকলে চীনে ব্যাটাদের জব্দ করতে আর বেশীক্ষণ লাগবে না। লর্ড এলগিনের কাজটা সহজ হয়ে যাবে।...আর একেও ত চেনা চেনা মনে হচ্ছে। ডোনেলি না?'

ডোনেলি একটু আগাইয়া আসিয়া কহিল, 'হ্যাঁ সার।'

'তুমিও চীনে যেতে চাও নাকি?'

'হ্যাঁ সার।'

'আর তুমি—তোমার নাম! মারে না!'

মারের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে কহিল, 'আপনার মনে আছে ত দেখছি!'

'ওহে, তোমাদের কি ভোলা যায়! তোমাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করতে পারা ত সৌভাগ্য!'

সেনাপতি অনারেবল আম্রিয়ান হোপ এই সময় তাঁহার কামরা হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ডসন সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সকলেই তাঁহাকে যথারীতি সামরিক কায়দায় সেলাম দিল।

আম্রিয়ান হোপ বলিলেন, 'কী, এরা সব চীনে যেতে চায় নাকি?'

'হ্যাঁ সার।'

'ভাল। নাম ঠিকানা সব ঠিক ক'রে লিখে নাও। ২০শে মে আমরা রওনা হবো কিন্তু। তৈরী ত?'

'আপনার হুকুম তামিল করতে আমরা সর্বদাই তৈরী কর্ণেল!'

হোপ হাসিলেন। তাহার পর সহসা বাহিরের দিকে চাহিয়া পর্দার মধ্য দিয়াই অপেক্ষমান সপ্তম ব্যক্তির অস্তিত্বটা অনুভব করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'বাইরে কে দাঁড়িয়ে? তোমাদেরই সঙ্গে কেউ এসেছে নাকি?'

'হ্যাঁ কর্ণেল, ও হ'ল কোয়েকার ওয়ালেস!'

'কোয়েকার ওয়ালেস? সে আবার কে?'

ম্যাকলিয়ড সামনে আসিয়া আর এক দফা অভিবাদন করিয়া বলিল, 'যদি অনুমতি দেন ত বলি—ও একটি অদ্ভুত চীজ।...ওর নাম ওয়ালেস নয়, সেটা বেশ বুঝতে পারি কিন্তু কী যে নাম তাও জানি না। ঐ নামেই ও পরিচয় দেয়। এমনি সিপাহীর চাকরী করে—কিন্তু লেখাপড়া ভালই জানে। এমন কি ল্যাটিন ফরাসী পর্যন্ত ভাল জানে।'

বাধা দিয়া হোপ বলিয়া উঠিলেন, 'বলো কি? ল্যাটিন ফরাসী জানে—আর সে করে সিপাহীর চাকরী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কী করা যাবে বলুন। ওকে অনেকবার কর্তারা প্রমোশন দিতে চেয়েছিলেন—ও-ই নেয় না। বলে যে ও নাকি বিশেষ এক উদ্দেশ্যেই সেনাদলে নাম লিখিয়াছে, উন্নতিতে ওর দরকার নেই। তা থাকলে ও অন্য কাজে যেত।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি। ঐ ভাবেই থাকে। ওর যে কোন

কূলে কেউ আছে তাও ত মনে হয় না। না ও কাউকে চিঠি লেখে—না কেউ ওকে চিঠি দেয়। কারুর সঙ্গে মেশে না, মদ খায় না—মুখ-খারাপ করে না। রবিবারে রবিবারে নিয়মিত উপাসনায় যোগ দেয়—যখন তখন ভগবানের নাম করে। হাসিঠাট্টা ত কখনও শুনিইনি ওর মুখে। সেই জন্যেই আমরা ওকে কোয়েকার • ওয়ালেস নাম দিয়েছি।'

'আশ্চর্য! অদ্ভুত লোক ত! আচ্ছা ও-ও কি ১৩তে নাম লেখাতে এসেছে?'

'তাইত বলেছিল।'

'তবে বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? একজন কেউ ওকে ডাকোনো।'

হেণ্ডারসন নামে একজন গিয়া ওয়ালেসকে ডাকিয়া আনিল। ধীর গম্ভীর ভাবে সে ভিতরে আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল। তাহার সেলাম করা ও দাঁড়ানোর ভঙ্গী নিখুঁত।

ডসনই প্রথমে প্রশ্ন করিলেন, 'তুমিও কি ভিরানডুইতে নাম লেখাতে চাও?'

'আজ্ঞা হাঁ।' শান্তকণ্ঠে উত্তর দেয় ওয়া

'তাহলে বাইরে দাঁড়িয়েছিলে কেন?'

'নাম লেখাবার আগে আমার একটা প্রশ্ন জানবার ছিল।···খবরটা পেলে তবে নাম লেখাতুম। সেই জন্যেই আগে এসে বিরক্ত করিনি। এঁদের কাজ চুকে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলুম।'

'এঁদের কাজ চুকে গেছে। এবার বলো কি জানতে চাও।'

'আচ্ছা হোপ বলে কি কেউ এই রেজিমেণ্টে নাম লিখিয়েছে?'

'হোপ?' কর্ণেল হোপ চমকিয়া ওঠেন।

'মাপ করবেন কর্ণেল হোপ। আপনাকে কে না চেনে! আমি একজন সাধারণ সৈনিকের কথা জিজ্ঞাসা করছি। সেও বাহাত্তর দলে ছিল।'

'আচ্ছা দেখছি।'

ডসন কতকগুলি খাতাপত্র দেখিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁ এই তো, কালই সে এখানে এসেছিল।'

'তাহলে আমারও নামটা লিখে নিন। দয়া করে যদি হোপ যে কোম্পানীতে থাকবে—আমাকেও সে কোম্পানীতে রাখেন ত বড় বাধিত হবো!'

ডসন একটু বিস্মিত হইয়া তাকাইলেন। বলিলেন, 'আমার কাছেই আছে দেখছি। আচ্ছা তোমার নামও আমি এইখানে লিখে রাখলাম।···বলো—নাম ধাম বিবরণ?'

লেখার হাঙ্গামা চুকিয়া গেলে ডসন প্রশ্ন করিলেন, 'হোপ তোমার বিশেষ বন্ধু বুঝি?'

কয়েক মুহূর্ত মৌন হইয়া রহিল ওয়ালেস। বোধ হইল যেন তাহার চক্ষু দুইটা বারেক হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলিয়া উঠিল কিন্তু পরক্ষণেই সে মাথা নামাইয়া শান্তকণ্ঠে উত্তর দিল, 'না, ঠিক তা নয়।'

তাহার পর আর ধন্যবাদের অবসর না দিয়া পুনশ্চ অভিবাদন করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

কর্ণেল হোপ দ্বার-প্রান্তেই অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি প্রায় তাহার পিছু-পিছুই বাহির হইয়া আসিলেন। পিছন হইতে ডাকিলেন, 'ওয়ালেস, শোন!'

ওয়ালেস ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

'তুমি নাকি খুব ভাল ল্যাটিন ও ফরাসী জানো?'

'আজ্ঞে সে কিছু নয়। সামান্যই।'

'হিব্রু জানো নাকি?

'সে আরও কম। কাজ-চলার মত।'

'আশ্চর্য! এত লেখাপড়া করে—শেষ পর্যন্ত—। আচ্ছা, এই সিপাহীর কাজ ভাল লাগে তোমার?'

'ভাল লাগবে বলেই ত এসেছি কর্ণেল।···জীবনে আর কিছুই ভালো লাগার নেই আমার!'

বোধকরি সেনাপতির প্রতি সম্মানবশতঃই আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া ওয়ালেস তাঁহাকে পুনশ্চ অভিবাদন জানাইয়া চলিয়া গেল।...

• অত্যন্ত গোঁড়া ধার্মিক এবং নীতিবাগীশ একটি খ্রীষ্টান সম্প্রদায়।

আন্দ্রিয়ান হোপ যদি সে সময় তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতেন ত দেখিতে পাইতেন—সে তাহার সঙ্গীদের সহিত ভিন-তল্লুক চিহ্নিত পানালয়ে ঢুকিয়া মদ্যপান করিতে বসে নাই। সে সেখান হইতে বাহির হইয়া কিছুদূরে সমুদ্রের ধারেই গিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেখানে আর কেহ নাই, খড়ি-পাথরের পাহাড়ের যে অংশটা খাড়া সমুদ্রের উপর ঝুলিয়া আছে, সেই বড় পাথরের চাঁইটার উপরই গিয়া দাঁড়াইয়াছে ওয়ালেস। তাহার পায়ের নীচে, অনেক নীচে বড় বড় নৌকাগুলা হইতে মদমত্ত কোলাহলের রেশ ভাসিয়া আসিতেছে। কিন্তু তাহার কান বা দৃষ্টি সে দিকে নাই। সে চাহিয়া আছে দূর সমুদ্রের ঢেউগুলার দিকে। সেখানে একটা জাহাজের মত বড় নৌকা শুভ্র পাল তুলিয়া দূর চক্রবালে মিলাইয়া যাইতেছে। ওয়ালেসের চোখের দৃষ্টি স্থির, বোধ করি বা পলকও পড়িতেছে না। তাহার দীর্ঘ ঋজু দেহটাও তেমনি অনড়, শুধু বাতাসে তাহার মাথার চুল ও গায়ের কামিজটা সামান্য উড়িতেছে মাত্র। পশ্চিমের অস্তরাগ তাহার মুখের শুভ্র ধূলিকণায় পড়িয়া অপূর্ব এক বর্ণ-বিপর্যয় ঘটাইয়াছে।

অনেকক্ষণ সেই ভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার পর কামিজের মধ্যে হাত ঢুকাইল সে। গলায় ঝুলানো সূক্ষ্ম চেন-এ বাঁধা একটি ক্রস আর তাহার সহিত সুকৌশলে লাগানো একটি লকেট। ওয়ালেস লকেটটি বাহির করিয়া খুলিতেই দেখা গেল এক রমণীর চিত্র তাহার ভিতর সযত্নে অঙ্কিত রহিয়াছে। কঠোর-হৃদয় সংযত-চরিত্র ওয়ালেসের এই গোপন রহস্যটুকুর সন্ধান পাইলে শুধু হোপ কেন, অনেকেই বিস্মিত হইতেন। এ যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ওয়ালেস। তাহার চালচলন ভাবভঙ্গীর সহিত কোন মতেই স্ত্রীলোকের যোগাযোগ ভাবা যায়না। বিশেষত যে পুরুষ নারীর প্রতিকৃতি বুকে ঝুলাইয়া রাখে—সে ধরনের পুরুষ ওয়ালেসের ঘৃণার পাত্র—এই কথাই সকলে এতকাল ভাবিয়া আসিয়াছে। আরও বিস্মিত হইতেন তাঁহারা— যদি তাহার কাঁধের পিছন হইতে উঁকি মারিয়া ছবিখানি দেখিবার সুযোগ তাঁহাদের মিলিত। কারণ ছবিটি কোন শ্বেতাঙ্গিনী নারীর নয়। অ-ইউরোপীয় কোন মহিলার।

ওয়ালেস অনেকক্ষণ একদৃষ্টে ছবিটির দিকে তাকাইয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন পূর্বক আবার লকেটটি বন্ধ করিয়া জামার মধ্যে পুরিয়া ফেলিল। তাহাকে এখনই ব্যারাকে ফিরিতে হইবে। দিবাস্বপ্নের সময় কোথা?

(১২)

তাত্যা টোপীর বাড়ী হইতে বহু রাত্রে আমিনা যখন নিজের মহলে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার কতকটা উদ্‌ভ্রান্তের মত অবস্থা। সন্ধ্যাবেলাকার সেই নিষ্ক্রিয় শান্ত ভাব নাই। চোখের কোলে যেন কে কালি লেপিয়া দিয়াছে। বিলাতী প্রসাধনের প্রলেপ ভেদ করিয়াও ললাটে ফুটিয়া উঠিয়াছে সারি সারি দুশ্চিন্তার রেখা। তাহাকে বয়-পরোনাস্তি ক্লান্তও দেখাইতে ছিল। কিন্তু নিজের ঘরে ফিরিয়াও একান্তে বিশ্রামের অবসর পাইল না সে। মহলের প্রবেশ পথেই সংবাদ পাইল আজিজন বিবি তাহার সহিত দেখা করার জন্য ঘরের মধ্যেই অপেক্ষা করিতেছেন।

ঈষৎ উদ্বিগ্ন মুখে আমিনা শুধু প্রশ্ন করিল, 'পেশো-য়াজী?'

মুসম্মৎ হাসিয়া বলিল, 'ভয় নেই। ঘরে গেছেন।'

যে সংবাদে অপর কোন স্ত্রীলোক ঈষিত হইত —সে সংবাদে যে তাহার মালেকান খুশী হন—এ তথ্যটি মুসম্মৎ ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করিয়াছিল।

কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া আমিনা নিজের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। ঘুর্ঘাটা খুলিয়া মুসম্মতের হাতে দিয়া একটা বড় গালিচায় একেবারে শুইয়া পড়িয়া সে আদেশ করিল, 'জুতোটা খুলে নে। আর বনফুলার সরবৎ তৈরী ক'রে দিতে বল্, জল্‌দি!'

আজিজন আমিনার মুখের দিকে চাহিয়া উদ্বিগ্ন হইলেও সে উদ্বেগ প্রকাশ করিল না। সে বুঝিয়াছিল যে অপরিসীম ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তার কোন কারণ ঘটিয়াছে—নহিলে আমিনা এত বিচলিত হইত না। সুতরাং সর্বাগ্রে তাহাকে বিশ্রামের অবকাশ দেওয়া প্রয়োজন।

খানিক পরে বলকারক বনফ্সার সরবৎ পান করিয়া আমিনা সুস্থ হইয়া উঠিল। একটা তাকিয়ায় ভর দিয়া খানিকটা কাৎ হইয়া কহিল, 'কী খবর আজিজন?'

'লিকা সিং আর শামসুদ্দিন খাঁ কুঁয়ার সিং-এর কাছে গিয়েছিল।'

'তারপর?'

'কুঁয়ার সিং আমাদের দিকে যোগ দিতে রাজী হয়েছেন কিন্তু একটা সর্তে।'

'কি সর্ত?'

'বাহাদুর শা বা নানা সাহেব—যে খুশী দোয়াবের নায়ক হোন তাঁর তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু দোয়াবের পূব দিকে পাটনা পর্যন্ত তাঁর চাই। এবং তিনি সেখানে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করবেন।'

আমিনা হাসিল। ক্লান্ত ম্লান হাসি।

কহিল, 'আশ্চর্য! এখনও এরা এই সব সর্তে বিশ্বাস করে! যুদ্ধে সর্ত করতে কি নানা কোনদিন পিছ্‌পা-হবে। তারপর সে সর্ত থাকবে কিনা—সে ত গায়ের জোর যুদ্ধে। কুঁয়ার সিং-এর যদি সে জোর থাকে ত তিনি পাবেন বৈ কি!'

তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'আজিজন তুই ত কুঁয়ার সিংকে দেখেছিলি—কেমন লোক?'

আজিজন বলিল, 'খাঁটি ইস্পাত। সে লোক তুমি নানার এই সব মোসাহেবদের দেখে কল্পনা করতে পারবে না দিদি। অমন সাচ্চা মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি। তাছাড়া এত বয়স হয়েছে—শালের চারার মত সোজা আছেন এখনও। কে বলবে বুড়ো। কোন মানুষকে ত পরোয়া করেনই না, যমকেও না!'

আমিনা আর কথা কহিল না। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে আজিজনের তেলতেটের পাজামায় সলমা-চুমকির ফুলটার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। চোখের দৃষ্টিতে যেন কোন্ এক সর্বনাশের ছায়া ঘনাইয়া আসিয়াছে, সে ছবি ভীষণ অথচ মনোমুগ্ধকর। ললাটে চিন্তার রেখাগুলি আবারও একে একে ফুটিয়া উঠিল।

আজিজন তাহা লক্ষ্য করিল কিন্তু কোন প্রশ্ন করিল না। স্থির হইয়াই বসিয়া রহিল।

অনেক, অনেকক্ষণ পরে আমিনা একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তাইত ভাবছি আজিজন, এই সব লোক-গুলোকেও এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলছি! বেশ ছিল ওরা, হয়ত এমনিতে তাদেই থাকত। ওদের এই নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে টেনে আনছি—ভাবতে বড় খারাপ লাগছে আজিজন—!'

আজিজন কোন উত্তর দিল না। চুপ করিয়াই বসিয়া রহিল। এমন ভাবান্তর আমিনার একেবারে নূতন নয়। এ ভাব আবার আপনিই কাটিয়া যাইবে।

খানিক পরে আজিজন কহিল, 'তুমি তাত্যা টোপীর বাড়ী গিয়েছিলে!

'হ্যাঁ—' নড়িয়া চড়িয়া বসিল আমিনা, 'সেই খানে গিয়েই মনটা খারাপ হয়ে গেল।'

'কেন?'

'ওখানে ছিলেন হেড মাষ্টার গজাধীন। তাঁকেই তাত্যা পাঠিয়েছিল ঝাঁসীতে। রাণী লক্ষ্মীবাই রাজী হয়েছেন আমাদের দিকে যোগ দিতে।'

'সে ত আনন্দের কথা।'

'ঠিক আনন্দের কথা নয়, আজিজন। এ যুদ্ধের পরিণাম কি আমি জানি না ভাবছিস? দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি ইংরেজই শেষ পর্যন্ত জিতবে। কতকগুলো ইংরেজ মরবে এইটে দেখবার নেশায় এ কী ছেলেমানুষী করে ফেললুম! যে আগুন জ্বলবে সে আগুনে আমরা পুড়ি, নানাসাহেবের মত লোক পোড়ে তাতে ত দুঃখ নেই—কিন্তু লক্ষ্মীবাই, কুঁয়ার সিং—এদের কথা যে আলাদা। বেচারী লক্ষ্মীবাই, ছেলেকে সিংহাসনে বসাবে এই ওর স্বপ্ন। সে স্বপ্নের কী পরিণাম তা যদি জানত!'...বলিতে বলিতে আমিনা আবার নীরব হইয়া গেল।

আরও কিছুক্ষণ একদিকে স্থির দৃষ্টিতে চুপ করিয়া তাকাইয়া থাকিবার পর আমিনা পুনশ্চ কহিল, 'আমি—আমি তাত্যাকে অনুরোধ করলাম, লক্ষ্মীবাইকে এই আবর্তের মধ্যে টেনে না আনতে। অনুনয় করলাম কিন্তু তাত্যা রাজী হ'ল না। সে হেসে বললে ঐ জন্যেই স্ত্রীলোক এসব কাজের অনুপযুক্ত। অত বাছবিচার করতে গেলে চলে না। আমাদের প্রাণ কি প্রাণ নয়? লক্ষ্মীবাইয়ের প্রাণেরই কি এত বেশী মূল্য?...'

আবারও একটু ম্লান হাসি হাসিল আমিনা।

এবার আজিজন কথা কহিল, 'ঠিকই বলেছে তাত্যা, দিদি। মানুষের পাপের ভরা যখন পূর্ণ হয় তখনই খুদা দৈব দুর্বিপাক আনেন। আসে বান, ওঠে ঝড়,

ভূমিকম্পে মাটি কেঁপে ওঠে। ঈশ্বরের সেই কোপ যখন পড়ে তখন কি তুমি বলতে চাও শুধু অপরাধীরাই শাস্তি পায় আর নির্দোষরা বেঁচে যায়? তা হয় না দিদি। যখন গ্রামকে গ্রাম তলিয়ে নদীর বন্যা আসে—তখন যে সব ঘরবাড়ী ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তার মধ্যে কি কোন সাধু-সন্ত ফকীরের আস্তানা পড়ে না?···নিশ্চয়ই পড়ে। এ সব বৃহৎ কাজে, ভয়ংকর আয়োজনে নিতান্তই তুচ্ছ হৃদয়াবেগের কোন মূল্য নেই দিদি। মরবে বৈকি, কুঁয়ার সিং লক্ষ্মীবাই—সবাই হয়ত মরবে। আর দ্যাখো—এ কী নিতান্তই আমরা ওদের জড়াচ্ছি? ওদের লোভই ওদের জড়াচ্ছে। আশীবছরের কুঁয়ার সিং স্বপ্ন দেখছে সমস্ত বিহারের মসনদ—লক্ষ্মীবাই স্বপ্ন দেখছে স্বাধীন ঝাঁসীর সিংহাসন। সেই লোভেই ওরা আসছে!···তুমি মিছে মন খারাপ করে কি করবে?'

আমিনা যেন একটা ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল।

'ঠিক বলেছিস তুই। এসব আর ভাববনা। সমিধ্। ওরাও সমিধ্ মাত্র। যজ্ঞ এখনও অপূর্ণ—এখন এসব ভাববার সময় নেই!'

আজিজন কহিল, 'তাত্যাকে কেমন দেখলে?'

'তাত্যা ঠিক আছে।' আমিনা হাসিয়া ফেলিল, তাত্যাও কি আমাদের জন্যে এগোচ্ছে! তাত্যারও স্বপ্ন আছে আজিজন—সেও চোখের সামনে দেখছে মারাঠা সাম্রাজ্য—এক ব্রাহ্মণ সেখানে সম্রাট। কিন্তু সে ব্রাহ্মণ কি নানা ধুন্ধুপন্থ! বোধ হয় না—সেই অখণ্ড ভারত-সাম্রাজ্যের সিংহাসনে তাত্যা নিজেকেই মনে মনে কল্পনা করছে এ আমি বাজী রেখে বলতে পারি আজিজন! তার স্বপ্নে বাহাদুরও নেই, নানাও নেই!'

আজিজনও হাসিল। কহিল, 'মানুষের এই লোভ ঈর্ষা প্রভৃতি গুণ-গুলো আছে বলেই ত আমাদের সুবিধে দিদি। এরাই ত আমাদের প্রধান সহায়!'

আজিজন তাহার ওড়না গুছাইয়া লইয়া উঠিয়া পড়িল।

আমিনাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার গলাটা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, 'আসল কথাটা কি জানিস বহিন? আজ সন্ধ্যার পর আজিমুল্লার বাড়ী থেকে বেরিয়ে তাত্যার ওখানে যেতে যেতে এক আশ্চর্য খোয়াব দেখেছি! খোয়াবই বা বলি কেন—আমি তোকে সত্যিই বলছি, আমি একটুও ঘুমুইনি। তুলির চারদিকে ত ঘেরাটোপ দেওয়া—ভেতর অন্ধকার, আমি ভাবতে ভাবতে চলেছি—তারই মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পেলুম তাকে, যেন একটা সাদা পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে সে আমার দিকে চেয়ে আছে, তার দুই চোখে অনুনয়। সে যেন বলতে চাইছে—ফিরে যাও, ফেরো—তুমি এ সবে এসোনা। এ সর্বনাশের আগুন জ্বেলো না।...একেবারে স্পষ্ট চোখের সামনে!'

বলিতে বলিতে আমিনার গলা কাঁপিয়া উঠিল বার বার, শুধু গলা নয়, সারা দেহই কাঁপিতে লাগিল।

শুনিতে শুনিতে আজিজনের মুখও বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মসৃণ উজ্জ্বল ললাটে বিন্দু বিন্দু স্বেদ জমিয়া উঠিল, ঠোঁট দুইটি কিছুক্ষণ ধরিয়া থর থর করিয়া কাঁপিল। তাহার পর, যেন প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত এবং কঠিন করিয়া লইয়া, শুষ্ক স্বরে কহিল, 'ঘুমিতে যেতে যেতে ঘুমিয়েই পড়েছিলে দিদি—আর, আর তোমার বোধ হয় পেট গরম হয়েছে। তাইতেই ঐ রকম খোয়াব দেখেছ।'

আমিনার বাহু পাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া আজিজন ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। তাহার কঠিন সংযমে ধা খাইয়া আমিনার হৃদয়াবেগ যেন লজ্জিত, সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছিল। সে যেন নিজেকে গোটা-কতক ঝাঁকানি দিয়া প্রকৃতিস্থ করিয়া লইল: ছিঃ ছিঃ। একী করিতেছে সে! সত্যই পাগল হইয়া গেল নাকি?...

খানিকটা সেই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কণ্ঠস্বরকে সহজ করিয়া লইয়া মুসম্মৎকে ডাকিয়া আদেশ করিল, 'গোসল খানায় গরম পানি দিতে বল্—আমি স্নান করব!'

'স্নান করবেন? এত রাত্রে?'

'হ্যাঁ। আমার শরীরটা ভাল নেই, স্নান না করলে ঘুমোতে পারব না। আর শোন্—হাকিমের কাছ থেকে সেদিন যে ঘুমের ওষুধ আনিয়েছিলুম, আছে ত? আমাকে রাত্রে দুধের সঙ্গে সেই ওষুধ একটু দিস্ মনে ক'রে।'

শর্মিলা ও নীরজা

সিপ্রা ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' এবং 'দুইবোন' উপন্যাস দুটি সংকীর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত! প্রেমের মনস্তত্ত্ব যে গল্পের মূল কথা, সেই গল্প আরও একটু বড় হওয়া উচিত ছিল! মালঞ্চ 'Modern comedy' নয়, তাতে Great tragedyর সম্ভাবনা ছিল।

শুধু কুৎসিত বীভৎস একটা ভাব আমরা দেখতে পাই এই গল্পে!

'দুইবোনে'র 'শর্মিলা' এবং 'মালঞ্চের' নীরজা—দু'জনের জীবনে একই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। 'ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়—'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থে এই দু'টি উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন "নীরজার ঈর্ষা কিছুমাত্র অপরাধের নয়। তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং শুধু দয়া নয়, ক্ষমা এবং অনুকম্পারও যোগ্য!" কিন্তু সংশয় জাগে। হয়ত সহজ মানবিক করুণার দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ সত্যিই 'নীরজা'কে দেখেন নি, কিন্তু তাই বলে সে পাঠক পাঠিকার শ্রদ্ধা বা আহরণ করতে পারে একথাও স্বীকার্য নয়। 'নীরজার' জন্যে আমাদের মনে সহানুভূতি জাগে, কিন্তু তাই বলে তাকে আমরা ক্ষমা করতে পারিনা। 'নীরজা'র শুষ্ক রুক্ষ তাপিত মরুর মত ক্ষমাহীন স্নেহহীন হৃদয় আমাদের মনে ভয় ও বিরাগের উদ্রেক করে।

'নীরজা' যদি নিজের হাতে 'আদিত্যের' সঙ্গে 'সরলা'র মিলন ঘটিয়ে দেবার চেষ্টা করত, অন্ততঃ মনেও সে ইহার স্থান দিত, তাহ'লে হয়ত 'নীরজা' চরিত্র পাঠক পাঠিকার মনে অনেকখানি দাগ রেখে যেতে পারত! কেবলমাত্র 'নীরজা' নয়, নায়ক আদিত্যের আচরণও নির্মম নিষ্ঠুর! মৃত্যু শয্যায় শায়িতা 'নীরজা'কে সে যা বলেছিল তা কি স্বাভাবিক ও সঙ্গত? যেন 'নীরজা'কে বলেছে 'যা' নিজে ভোগ করতে পারবে না তাও প্রসন্ন মনে দান করতে পারনা যাকে এতদিন এত দিয়েছ!'

নীরজার সৌভাগ্যের ভরাঘট যে মুহূর্তে ভেঙে গ্যাছে সেই মুহূর্তে সে চুকিয়ে দিয়েছে তার অন্তরের দাক্ষিণ্যকে! 'আদিত্য' নিজের দুর্বলতাকে 'নীরজার' সামনে প্রমাণ করতে চায়নি, বলেছে—"আমাদের মধ্যে এই ভাগ হ'য়ে গেল কবে থেকে?"

"কবে থেকে তোমার রইল বিশ্বের আর সমস্ত কিছু, আর আমার রইল কেবল এই ঘরের কোণ"—'নীরজার প্রবঞ্চিত তৃষ্ণার্ত নারীহৃদয়ের এই অশ্রুসিক্ত উক্তি আমাদের মনে ব্যথার উদ্রেক করে। যৌবন তার আজও ফুরোয়নি। আজও সে তার কাছে ফিরে আসছে—তার দাবী জানাচ্ছে। বিদায় নিয়েও সে নীরজাকে ছেড়ে চলে যায়নি—হায় রে অদৃষ্ট! তবুও চলে গেল তার মহিমা! স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করে জেগে উঠল কেবল হীনতা!

রবীন্দ্রনাথ 'নীরজা'কে এমন শক্তি দেননি যা' তাকে সংসারের আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারে, হতভাগিনীর অশান্ত হৃদয়কে মুক্ত পৃথির অমৃতে অভিষিক্ত করে দিতে পারে, তার অভিশপ্ত জীবনে নতুন মহিমা জাগ্রত করতে পারে। তাই তার প্রেমের পরশমণি পড়ে রইল বহুদূরে পথের ধূলায়; মিথ্যার আলোকে বহুদিনের প্রবঞ্চিত লাঞ্ছিত জীবন আজ মসীলিপ্ত হয়ে গেল!

কিন্তু পারেনি সে যাবার বেলায় তার স্মৃতিকে নতুন মহিমা দিয়ে যেতে, পারেনি সে সারা জীবনের দাক্ষিণ্যকে শেষ মুহূর্তে বড় করে যেতে, পারেনি সে যাকে বড় করে

পেয়েছিল তাকে বড় করে ছেড়ে দিতে—তাই তার প্রবঞ্চিত হৃদয়ের অসহনীয় অন্তর্দাহ আমাদের মনে কেবল মাত্র সহানুভূতি বা দয়ার উদ্রেক করেনা, অবজ্ঞার ভাবও সঞ্চার করে।

ঠিক নীরজার' পাশেই আমরা দেখতে পাই 'দুই-বোনের' শর্মিলা'কে— প্রেম ক্ষমা ত্যাগ ও বাৎসল্যের অপূর্ব প্রতিমূর্তি—এ যেন নিষ্কম্প দীপশিখার মত নির্মল উজ্জ্বল স্পষ্ট ও জীবন্ত। শর্মিলার প্রতি রবীন্দ্রনাথ নিজেও শ্রদ্ধান্বিত! শর্মিলা যেন দৈনন্দিন সুখ দুঃখ ও বিশ্ব-সমাজের ক্ষুদ্রতার—অনেক উর্ধ্বে! অপার ধৈর্য ও ক্ষমা দিয়ে সে শশাঙ্ককে জয় করেছে, প্রশ্রয় দিয়েছে 'ঊর্মির' উন্মাদনাকে! তার বুদ্ধির ধৈর্য ও অন্তরের পবিত্রতাও কম প্রশংসনীয় নয়! তার মহত্ত্ব ও ঔদার্য অসাধারণ হ'লেও অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না। শর্মিলা চরিত্রে কোথাও complexity নেই, এ চরিত্র সহজ সরল অনাড়ম্বর!

'নীরজা' সরলাকে আদিত্যর হাতে দান করে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেও ব্যর্থ হয়েছে। অস্বাভাবিক রূঢ় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছে—"জায়গা হ'বেনা তোর রাক্ষসী, জায়গা হবেনা। আমি থাকব—থাকব—থাকব!" 'নীরজার মৃত্যুদৃশ্য প্রশান্ত গাম্ভীর্যে পরিপূর্ণ নয়—উজ্জ্বল অসংযত হৃদয়াবেগের মধ্যে দিয়ে 'নীরজার' মৃত্যু ঘটেছে। অনুরূপ ভাব আমরা দেখতে পাই দুইবোনে! 'শর্মিলা' মৃত্যু মুহূর্তে স্বামীর হাত ধরে বলেছে "ঊর্মিকে দিয়ে গেলুম তোমার হাতে। তার মধ্যে আমাকেই পাবে—আরও অনেক বেশী পাবে যা আমার মধ্যে পাওনি! মরবার সঙ্গেই আমার সৌভাগ্য পূর্ণ হ'ল—তোমাকে সুখী করতে পারলুম!" 'রবীন্দ্রনাথ' শর্মিলাকে কেবল মাত্র ভালবেসেই ক্ষান্ত হননি, ধৈর্যে, বীর্যে, দয়ায়, ক্ষমতায়, স্নেহে, ত্যাগে ও সর্বোপরি প্রেমের অনির্বচনীয় মহিমায় নিপুণ হস্তে জীবন্ত তুলিকায় ফুটিয়ে তুলেছেন এই অপূর্ব সুন্দর কল্যাণময়ী নারী চরিত্র।

এই নারীই—

"ফিরাইয়া আনে
অক্ষুব্ধ শিশির স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায়,
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায়,
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদ পানে
অচঞ্চল অরণ্যের স্মিত-হাস্য সুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবন দুয়ার
পবিত্র সঙ্গমতীর্থ তীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

এই নারীকে কল্যাণের ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত করে কামনা লালসা! স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিতা কল্যাণী নারীর উদ্দেশেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন"

তোমার নাহি শীত-বসন্ত
ভরা কি যৌবন,
সর্বকালে সর্ব ঋতু
তোমার সিংহাসন।
নিভে নাক প্রদীপ তব
পুষ্প তব নিত্য নব
অচলা শ্রী তোমায় ঘেরি,
চির বিরাজ করে।"

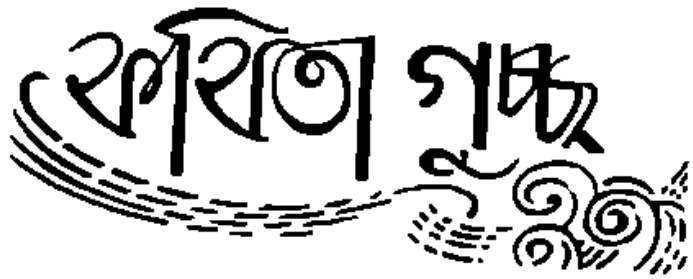

আজ সারাদিন

প্রশান্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

সারাদিন তোর অবাক আলোর একি আল্পনা এঁকে
খালে-মাঠে-বনে স্বপ্ন ছড়াও ! আহা সে স্বপ্ন মেখে—
শুভ্র-চরিণ দু'চোখে রঙীন নেশা নিয়ে ছুটে ছুটে,
কতো না কথাই লিখে রাখে তার প্রাণের পত্রপুটে !

অবচেতনার খুলে দেয় দ্বার হাওয়ার প্লাবন এসে,
নীল সুদূরের ব্যাকুল কাকলি মনের গভীরে মেশে !
কোনদিন যাকে ভাবিনি কো, তাকে ভাবনার ভরা স্রোতে
না খুঁজেই বুঝি সহসাই পাই ভেসে-আসা স্বপ্নতে।

আলো আর ছায়া হুডালো কি মায়া মুগ্ধ মনের মাঠে
একি স্বপ্নের সমুদ্র স্নানে আজ সারাদিন কাটে !
সব কিছু ভুলে তাই চোখ তুলে দিগন্তে চেয়ে থাকি :
অসীমের বুকে হারাতে যে চায় আমার প্রাণের পাখি।

অদেখা পাখায় সে যে ভেসে যায় দূর থেকে কত সুরে
ছন্দিত মন ভরে অনুখন নানা গানে, নানা সুরে।
সারাদিন ধরে এ-মন-মুকুরে কতো ছবি ফুটে ওঠে,
সারাদিন আজ মনের মৃণালে স্বপ্ন কমল ফোটে॥

লীলাপলাশ

শ্রীকৃষ্ণদাস

সবুজ ফেনায় ফেনিয়ে উঠে বন
নিউরে দিল নিউরে দিল মন
পুরোন নাম গুনগুনিয়ে কেউ ;
জানলা খোল, পর্দা তুলে দাও—
পলাশ বনে হঠাৎ এলো ঢেউ।

রঙ এলো কি রঙিন হয়ে ডালে !
রঙের ছায়া ফুলের গালে গালে
ছড়িয়ে গেছে সহসা কোন ফাঁকে।
মৌমাছিদের ভীরুকথার কিছু—
মাতাল হলে অলস হয়ে থাকে।

শালিক দিলে খুসির শীসে টান,
উতল হোল উতলা কোন গান !
কচি পাতার বুকের কাছে কাছে ?
চল না যাই সিঁড়ির কাছে বসি
পলাশ বন মদির হ'য়ে আছে।

সহসা কি অবাক লাগে গায়,
রোদ এলিয়ে সহজ হয়ে যায়।
মাঘের বন ফুল লিখেছে ডালে—
পলাশলীলা মৌন কথার ছল,
আমায় কেন এমন মাতালে !

ছুটীর কান্না

প্রভাকর মাঝি

দীর্ঘ ছুটি। হাতে প্রচুর অবসর
সামনে নির্বাধ নীল আকাশ।
রোদের লুটোপুটি, অবাধ স্বাধীনতা—
তথাপি মন ফেলে দীর্ঘশ্বাস।
অবাধ স্বাধীনতা যা খুসি করবার
যিজি ঘর ছেড়ে এলাম দূর।
চারটে দেয়ালের বন্দী মাথা তোলে—
সামনে থৈ থৈ সমুদ্দুর।
শবরী-সন্ধ্যার সহসা অবসান,
কত কী হিজিবিজি লিখতে চাই।
এ ছুটি শুরুবোই নতুন ফসলেতে,
লিখতে গিয়ে কেন হোঁচট খাই।
ঘড়ির কাঁটা ধ'রে করি তো সব কাজ,
কি করি জানি নেকো হায় কপাল!
সমুখে নীল জল, মাথায় নীলাকাশ,
মন না তাহাদের পায় নাগাল।
প্রচুর ছুটি দিল প্রচুর অবসাদ।
আগুন যে মনের সর্বদাই
উঠতো হু হু জ্বলে' দিনের সংগ্রামে
ছন্দে গানে সুরে। আজ তা ছাই।
সাগরে কল্লোল; হৃদয়ে এলো কই?
কপোত ডানা মেলে। সময় যায়।
বাইরে আয়োজন নানান্ রকমের,
আকস্মিকা তবু এলোনা হায়!
কাগজে হিজিবিজি আঁচড় সার,
মন যে চলে গেছে কাছে তোমার।

অন্য ভূমিকায়

অতুলকৃষ্ণ সিংহ

জীবিকা সংগ্রামে নেমে রমণীর আরেক ভূমিকা।
অঞ্জনের রেখা মুছে উপাক্ত-শোভিতা মালবিকা—
আতপ্ত পাষাণ পথে অগ্নিকল্প বৈশাখ দুপুরে—
কুটীর সন্ধানে ফেরে। নিশ্চিন্ত আরামে অন্তঃপুরে
এতদিন ছিল যারা গৃহলক্ষ্মী, জীবিকার নামে
তারাও বেরিয়ে এলো, গৃহ ছেড়ে, জীবন-সংগ্রামে।
লক্ষ্মী আজ লক্ষ্মী খোঁজে! বিদ্যালয়ে, অফিসে-অফিসে,
কারখানা, আদালতে, পথে-পথে, দেশে ও বিদেশে,
ছড়িয়ে পড়েছে আজ নারী। পত্রিনিকা অবন্তিকা,
কঠোর বাস্তবে নেমে, পথে এসে হ'লো সাহসিকা!
অবলা প্রবলা আজ! স্বপ্নভাঙা হ'য়েছে মুখরা!
বাস্তবের ছোঁয়া লেগে, কোমলাঙ্গী কাঠিন্যেতে ভরা!
গণ্ডী টেনে' স্বপ্ন দেখা, জীবনের অলস প্রহরে;
ভেঙ্গে গেছে যেন আজ। গ্রামে গ্রামে, নগরে-সহরে,
পুরুষের পাশে এসে, দৃপ্তকণ্ঠে অন্তঃপুরচারী,
বলে আজ—অন্ন চাই, অন্ন চাই, জাগো সব নারী!
শক্তিরে জাগ্রত কর—নেমে এস জীবিকা-সংগ্রামে।
লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা কর—যারা আছে সহরে ও গ্রামে
দাঁড়াও পুরুষ-পাশে। অন্তঃপুর বেড়া হ'য়ে যায়,—
বাহির আলোকে এস। অবলা দুর্বলা নহে আর।
উচ্চকিত বংশী রবে ছুটে' যেত কত গোপনারী—
প্রেমের আহ্বানে। আজ তারা ছোটে সারি সারি,
কলের বাঁশীর শব্দে। তবু যদি লক্ষ্মী দেন ধরা,
স্বপন নেদুর চক্ষু, শূন্যগর্ভ-হতাশায় ভরা—
দাঁড়ালো পুরুষ পাশে। আজ, শক্তি—শাক্ত অভিযান,
দিকে দিকে, দেশে-দেশে! পায় কি-সে লক্ষ্মীর সন্ধান?

ফুলের মতো

সমরকুমার মিত্র

কি ক'রে তাকে—এ কথা বলি ? কি ক'রে এই মন
পাপড়ি খুলে দেখাবে তার পরাগ সঞ্চয় !
একটু আলো না যদি করে—নয়ন মন্থন,
কি ক'রে তবে—দু'হাতে ঠেলি, লজ্জাহীন ভয় ?

খেলার ছলে ছড়ানো—তার হাজার হাসি-গান,
কুড়িয়ে সব ভরেছি আমি মনের অঞ্জলি ;
তারা যে আজ তারার মতো আলোয় ভরে প্রাণ,
কি ক'রে তাকে দু'চোখ তুলে এ কথা আজ বলি !

প্রস্ফুটিত হবার এক বেদনা বুকে নিয়ে
প্রহর গনি ! কখন তার আলোকময় প্রাণ
স্পর্শ দেবে ? কুয়াশা ছিঁড়ে, সিঁদুরে চুমু দিয়ে,
আমিও দেব পাপড়ি মেলে,—আমার সুঘ্রাণ !

আকাঙ্খাকে এখনো তাই আঁচলে ঢেকে রাখি,
যতই হোক নয়ন মোর অশ্রুজল ছলোছলো ;
অঙ্গ দিয়ে রূপোলে যত আলপনাই আঁকি,
মনের কথা বলি না তাকে ! কি ক'রে বলি—বলো ?

জন্মদিন ॥

শ্রীকুমারকান্তি ঘোষ

স্বপ্নে শোনা এক কলি গানের মতন
ভুলে গেছি জন্মদিন মোর। কী বা হবে
মনে রেখে অন্তর্হিত সে-প্রহরটাকে !
তবু আমি কবে যেন ভেবেছি হয়তো
দেবে চিঠি,—স্মরণের শান্ত এ সায়রে
হয়তো ফেলবে এক স্মৃতির আকর্ষ
নুড়ি। চক্রাবৃত্ত বলিরেখা ধীরে ধীরে
লুপ্ত হ'য়ে যেত। হঠাৎ তখন মনে
হ'ত—আহা, জন্মদিন বৃথা যেত চ'লে
না জানিয়ে চলে যাওয়া অতিথির মতো
না থাকতে তুমি যদি ! শুভেচ্ছা পাঠিয়ে
তবে বলতেম,—তুমি ছিলে তাই আছে
মোর জন্মদিন ; না হ'লে রাখত কেবা
ভুলে যাওয়া পঞ্জিকার তারিখের খোঁজ ?
কেন যে হঠাৎ আজ খুঁজলেম—কাল
চলে গেছে জন্মদিন ! না জানাই ছিল
ভালো। না-জানাই উচিত বাকি ! আর
তুমি-ও দিলে না চিঠি। তোমার-ই কী দোষ।

দুরন্ত বাতাস আনে বালু রাশি রাশি—
মুছে যায় বেলাভূমে কবে-আঁকা ছবি ॥

মৃত্যু তীর্থ

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

দেখেছি ঝড়ের রাত : সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন,
উত্তুংগ পাহাড় ধ্বসে মিশে গেছে মাটির জঠরে ;
দেখেছি দুর্ভিক্ষ মারী—মরণের তাণ্ডব নর্তন—
উলংগ পিশাচ-লীলা সভ্যতার চিতাভূমি 'পরে।

অবন্তী বিদিশা কতো, কতো কাঞ্চী কতোনা কোশল—
আজ ইতি-কথা শুধু। কত ট্রয় পুড়ে হলো ছাই !
নিষ্ঠুর মন্থনে ওঠে বারে বারে হিংসার গরল—
ভুলের মন্থের নেশা—তবু যেন এর শেষ নাই।

আবারো শুনেছি আমি মেঘে মেঘে বজ্রের কল্পনা,
সমগ্র পৃথিবী কাঁপে আরো আরো—সে-এক প্রলয় !
নিশান্তে আদিত্য হাসে, ঘাসে ফুলে আলোর আল্পনা ;
দুর্যোগ রাতের কথা মনে হয়, যেন কিছু নয়।

থাক ধ্বংস মহামারী হিংসা ক্ষয় ক্ষতি অফুরান ;
তবু মৃত্যুতীর্থে জানি, জীবনের শিখা অনির্বাণ।

এই ভালবাসা

লাংষ্টন হিউজেস

অনুবাদ—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

[নিগ্রো সমাজের ওপর লাঞ্ছনার খবর পৃথিবীর সব মানুষের কাছেই সুবিদিত। মানুষের ওপর মানুষের এই ঘৃণিত লাঞ্ছনার যুগ শেষ করার জন্যে, আজ পৃথিবীর দেশে দেশে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সচেতন হয়েছে। বর্ণ বৈষম্য আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে ঘৃণ্যতম জিনিষ। বর্ণ বৈষম্যের পাশাপাশি আছে সামাজিক আর অর্থনৈতিক বৈষম্যজনিত লাঞ্ছনা। এই লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে এবং আজও হচ্ছে আমেরিকার, আফ্রিকার বা এমনি অনেক দেশে।

নিগ্রো লেখক লাংষ্টন হিউজেসের অপূর্ব লেখনীতে নিগ্রো সমাজের এই লাঞ্ছনার কাহিনী আছে। কিন্তু নেই শাদা মানুষদের ওপর ঘৃণা। ঘৃণা দ্বারা অবিশ্বাসের মাঝ দিয়ে এই বর্ণ বৈষম্যের কলঙ্ক ঘোচান যাবে না, তা হিউজেস্ বিশ্বাস করেন। আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মাঝেই, এই লাঞ্ছনার অবসান হবে, তারই কাহিনী হিউজেস উপস্থিত করেছেন তাঁর 'নট উইদাউট লাফটারের' কিশোর নায়ক স্যাণ্ডির মধ্য দিয়ে। স্যাণ্ডির দিদিমা গরীব, তবু সে আশা রাখে স্যাণ্ডি তার একদিন মানুষ হয়ে নিগ্রো সমাজের মুখ উজ্জ্বল করবে, দুঃখ ঘোচাবে। স্যাণ্ডির ছোট মাসিমা হ্যারিয়েট নর্ত্তকী, পেশাদার গায়িকা, তবু তার সংগ্রামের সঙ্গে বুড়ী মার স্যাণ্ডিকে ঘিরে এই আশা আকাঙ্ক্ষার একাত্মতাই সে অনুভব করে।

বর্তমান অংশটী হিউজিসের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'নট উইদাউট লাফটার' এর প্রকাশিতব্য বাংলা তরজমা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।]

হ্যারিয়েট চলে গেছে কার্নিভালের সঙ্গে নর্ত্তকী হিসাবে। স্যাণ্ডির মা অ্যানজী ওকে দিদিমার কাছে রেখে, স্যাণ্ডির বাবার কাছে ভেট্টরেটে চলে গেছে।

বুড়ী হেগার তাই নিজের দিনগুলোর সঙ্গ খোঁজে স্যাণ্ডির। সান্ত্বনা পেতে চায় নাতির সঙ্গে কথা বলে। গ্রীষ্মের দীর্ঘ সন্ধ্যায় ওরা দুজনে বসে থাকে সামনের বারান্দায়। দিদিমা নাতিকে গল্প বলে। কখনও কখনও হেগারের প্রতিবেশিনী মিসটার জনসন এসে বসে ওদের সঙ্গে, পাইপ খেতে খেতে। কিন্তু অধিকাংশ সময় দিদিমা নাতি দুজনে একলাই থাকে—একটা কালো বুড়ী মেয়ে মানুষ মাথায় পাকা চুল আর কটারডের একটা ছেলে। কত না গল্পই করে হেগার, নিগ্রোদের দাসজীবনের গল্প থেকে সুরু করে, ভূতকথা, লোকগাথা, ভগবানের কথা, সংগ্রাম আর ভালবাসার কত কাহিনী, হেগার গল্প শুনিয়ে যায় তার নাতিকে গ্রীষ্মের সন্ধ্যাগুলোয়। দূরে আকাশে তারাগুলো ঝিকমিক করে, জোনাকিগুলো মিটমিট করে জ্বলে। পঙ্গপালগুলো কিচ্‌কিচ্ শব্দ করে।

স্যাণ্ডি এখন বড় হয়ে গেছে। এখন ও আর পত বছর শীতকালের মত দিদিমার কোলে বসে ঘুমোয় না; এখনও দিদিমার পাশে একটা ছোট টুল পেতে বসে থাকে। ক্লান্ত লাগলে দিদিমার কোলের ওপর মাথা রাখে। কখনও কখনও বারান্দার মেঝের ঠিং হয়ে শুয়ে পড়ে আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে স্যাণ্ডি। আজ হেগার ওকে মানুষের ভালবাসার কথা বলছে।

...'বুঝেছিস স্যাণ্ডি, আজকালকার ছেলেরা আমাদের বুড়োহাবড়া বলে, আর শাদা লোকেরা বলে কালো আদমী, কেননা তাদের মত সব সময় আমরা রঙীন খাতা

করে রাখতে চাই না। যদিও আমাদের দিনগুলো খুব কষ্টের, তবুও সোনা, তুই যখন আমাদের মত বুড়ো হবি, তখন বুঝবি এই ভাবে পাগলের মত অপরকে ঘেন্না করতে শিখে, নিজেদের মনটাকে বিষিয়ে তোলায় কোন লাভ নেই। শাদা লোক শাদা আছে, কালো কালোই; কেউ ত একে অপরের কাছে খারাপ নয়। প্রায় সত্তর বছর ধরে শাদা কালো সব লোককেই আমি দেখে আসছি, কাউকে আমি ঘেন্না করি না; শাদাকেও নয়, কালোকেও নয়। একবার যদি লোককে ঘেন্না করতে শিখিস্, তাহলে যাকে ঘেন্না করবি, তার চেয়ে তোর মন নীচু হয়ে যাবে। আর মনটাকে নীচু করে দেওয়ার মানে হল শয়তানকে প্রশ্রয় দেওয়া, তাই আমি কাউকে ঘেন্না করি না।

...আমরা নিগ্রোরা যখন দাস ছিলাম, ওরা তখনকার কথা বলে। ওরা বলে, এর চেয়ে খারাপ সময় আমাদের আসি আর হয়নি। কিন্তু তুই বিশ্বাস করবি না সোনা, সবটাই কি সত্যি খারাপ ছিল? এখনকার লোকেদের চেয়ে তখনকার সময়ের কয়েকজন শাদা লোক যে অতি সুন্দর ছিল, এ কি করে না বলে পারি বল? এখনই যা বেঁচে থাকার জন্যে দরকার, তাই—খাটিয়ে—শাদা লোকেরা দিতে চায় না; আর তখন ত কালোদের পুরো-পুরি ভরণপোষণ করতে হত। প্রত্যেক শাদা লোকই যে তার দাসদের মালিক তা নয়। অবিশ্যি বলছি না তখন স্বর্গ ছিল, তবে এও বলতে পারব না, আমরা তখন নরকে থাকতুম। আর আমি ত অন্য কালো লোকদের মত ক্ষেতেতে কাজ করিনি, শাদা মনিবদের বাড়ীতে বাড়ীতেই থেকেছি, তাই ভালো দিকটাই আমি দেখেছি। মা আবার বড় বাড়ীর রাঁধুনী ছিল: আমি মার কাছে মার মনিবের রান্নাঘরেই বড় হয়েছি, খেলেছি দিদিমনি মিস্ জিয়ানের সঙ্গে। মিস্ জিয়ানেই আমাকে পড়তে শেখাল, তারই জন্যে যেটুকু শিখেছি আমি। মিস্ জিয়ানে বড় হল, আমিও বড় হলুম; ও আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে রাখল। দুজনে আমরা দু'জনকে ভালবাসলুম। মিস্ জিয়ানে ত মনিবের মেয়ে কিন্তু ওর সঙ্গে আমার কোনই তফাৎ ছিল না। খালি ও আমাকে হেগার বলে ডাকত, আর আমি বলতাম মিস্ জিয়ানে। কিন্তু এই মিস্ কথাটার ব্যবধান মনের ভালবাসার কি রকম ফের করতে পারে? কিছু পারে না বুঝলি সোনা, কিছু পারে না। ভালবাসা যদি থাকে, তবে কথায় কিছু এসে যায় না।

ঠিক মনে নেই কবে যুদ্ধ বাধল, তবে শাদা লোকেরা ভয় পেল, আমরাও ভয় পেলাম। জানি না কি ঘটবে, সারা দক্ষিণ দেশ জুড়ে আব্রাহাম লিনকনের নাম আমরা শুনলুম। আমাদের বুড়ো মনিব বন্দুক নিয়ে যুদ্ধে গেল। তারপর তার ছেলে, ক্ষেতের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ওভারসীয়ার সবাই চলে গেল। শুধু রয়ে গেল মেয়ে মানুষ আর ক্ষেতের দাস কালো মানুষরা। শাদা মেয়েরা ত কান্নাকাটি সুরু করে দিলে, কালো দাসেরা বেচারী শাদা লোকেদের জন্যে তাই দুঃখ করে। আহা!

হাঁরে স্যাণ্ডি! এই যুদ্ধের সময় মিস জিয়ানে আর মাষ্টার রবার্টের যে বিয়ে হয়ে গেছে, একথা তোকে আগে বলেছি? সেই যে সুন্দর ম্যাগনোলিয়া ফুলগুলো বিয়ের জন্যে যেন বাতির আলোর মত থরে থরে ফুটে উঠেছে। বলেছি না? থাকগে, শত্রুর আক্রমণের খবর পেয়ে মাষ্টার রবার্টকে ত তার লোকজন নিয়ে চলে যেতে হল ঠিক বিয়ের সময়টাতেই। মাষ্টার রবার্ট সৈন্য বাহিনীর বড় অফিসার কিনা! মাষ্টার রবার্ট ত চলে গেল বিয়ের পোষাক পরে, মিস জিয়ানে বড় শাদা বারান্দার একটা থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কেউ নেই শুধু আমি রয়েছি ওর চোখের জল পুঁছিয়ে দিতে। কর্তা মারা গেছে, আর পুরুষ মানুষেরা ত সবাই যুদ্ধে চলে গেছে। অত বড় বাড়ীটায় কেউ নেই। বাড়ীর দেখাশোনার জন্যে আছে শুধু বদ্ধ কালা আষ্ট প্রাণী জোনস, আর আমি রয়েছি আমার দিদিমার কাছে।

তখনকার মত শাদা লোকেদের কালো লোকেদের দরকার কোনদিন হয়নি। পুরুষেরা সব চলে গেছে। শাদা মেয়েরা খালি কাঁদছে আর মূর্ছা যাচ্ছে। অবশ্য

ওর! তখন এমন কথায় কথায় মূর্ছাই যেত। সে একদিন গেছে!

যাক, তোকে এখন মিস জিয়ানের কথাই বলি। রবার্ট চলে যেতে ঘরে বসে ও' ও কাঁদতে সুরু করে দেয়। আর ওর এই কান্না আর শেষ হয় না। ঘরে বসে থাকে চুপচাপ আর কাঁদে। সংসারের কিছু দেখেনা বাড়ীর খবর নেয় না। খামারের ঘোড়া, তুলোর ক্ষেত কিছুরই খবর নেয় না। কিন্তু কালোলোকেরা ত' তাই বলে মিস জিয়ানের কিছু চুরিও করবেনা, ওকে ঠকাবেও না।

একদিন খবর এল ওর ভাই ভার্জিনিয়ায় আঘাত পেয়ে মারা গেছে, আবার ওর ভাইপো ভাইঝিদেরও পীতজ্বর হয়েছে। তারপর একদিন খবর এল ওর স্বামী মাষ্টার রবার্ট আর নেই, যুদ্ধে মারা গেছে! আমি ভাবলাম মিস জিয়ানে এই সব শোকে বুঝি পাগল হয়ে যাবে। স্বামী ওর মারা গেছে যুদ্ধ করতে করতে, খবরে এটাই লেখা আছে। খবরটা শুনে ও দেরাজ খুলে বিয়ের ওড়নাটা পরে হাতে ফুল নিয়ে এসে দাঁড়াল, যেন ও গির্জার পবিত্র পোপের কাছে বিয়ে করতে চলেছে। তারপর মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে ওর কি কান্না ছোট্ট মেয়ের মত! আমিই তুলে ধরি মিস জিয়ানেকে।

···তারপর আমাদের নিগ্রোদের স্বাধীনতা এল। সমস্ত কালো লোকেরা বন্দুকের গুলির মত এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ল, ছুটল শহরে থাকবার জন্যে। আমি স্বাধীন হয়েও, ওদের দলে যাচ্ছিনা বলে, কালো লোকেরা আমায় বলে বোকা বুড়ী। আমি ওদের বললাম আমি থাকব মিস জিয়ানের কাছে, থেকেও গেলাম। আমি ত জানি ওদের মধ্যে কেউ আমায় মিস জিয়ানের মত চায় না, তাই ওদের সঙ্গে গেলাম না।

সময় কেটে যায়, থামে না একবারও। বড় বাড়ীটায় রঙ পড়ে না, জিনিষপত্র ভেঙ্গে যায়। মিস জিয়ানে বলে, 'হেগার, তুমি ছাড়া এ পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। আমি বললুম, 'আমারও তাই, তুমি ছাড়া আমারই বা আর কে আছে?'

মিস জিয়ানে বলে ওর স্বামীর কথা, কি মহান সাহসী বীরের মত না ও মারা গেল! বিয়ের দিন গির্জায় যাবার সময়টুকুও পেলনা, বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার আগে ওকে শেষ আলিঙ্গনটুকুও দিয়ে যেতে পারল না।

···আমরা দুজনে কথা বলতে বলতে বসে থাকতাম উঁচু পাথরের থামগুলা বড় বারান্দাটায়। গোধূলির আলো মিলিয়ে আসত, মাথার ওপর চামচিকেগুলো উড়ে বেড়াত, সূর্যের আলোর আভা আর নেই। মিস জিয়ানের পরনে শাদা স্কার্টটা ওর কোমরের কাছে ঝুলে থাকত আর আমার পরনে থাকত সাদাসিধে এ্যাপ্রন আর মাথায় সাদা একটা রুমাল বাঁধা। এই যে গলায় চেনটা দেখছিস, এটা মিস জিয়ানে আমাকে দিয়েছিল, এখন প'রে প'রে সরু হয়ে গেছে।

···বারান্দার সামনে উঠোনে মানুষের মত লম্বা একটা তালা গাছের গুঁড়ি ছিল। গুঁড়ি থেকে দুটো ডাল শূন্যে হাতের মত উঠে গেছে। আমরা প্রায়ই চেয়ে থাকতাম গাছটার দিকে। মিস জিয়ানে ওপর তলায় শোবার ঘর থেকেও এই গাছের গুঁড়িটা দেখতে পেত। মাঝে মাঝে মনে হত, গুঁড়িটা যেন লোকের মত রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

একদিন ত মিস জিয়ানে শুয়ে পড়েছে। বসন্তের রাত, রাত অনেক হয়েছে, চাঁদ আকাশে ঝলমল করছে। হঠাৎ শুনলুম মিস জিয়ানে কাঁদছে আর চীৎকার করছে, 'ও এসেছে হেগার, আমার রবার্ট ফিরে এসেছে।' বিছানা থেকে লাফিয়ে আমার শোবার ঘর থেকে ছুটে পাশের ঘরে এলাম। শাদা রাত্রিবাস পরে ও ঘরের সামনে ছোট বারান্দাটায় চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে রয়েছে আর উঠোনে সেই তাল দুটো তুলে ধরা গাছের গুঁড়িটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মাষ্টার রবার্ট ওকে ডাকছে যেন! মাষ্টার রবার্ট যেন যুদ্ধ থেকে সামরিক পোষাক

অবস্থাতেই ফিরে এসেছে। আমি শুনতে পাচ্ছি বলছে। 'আমি যাচ্ছি রব্, আমি যাচ্ছি।' ওর সেই ডাক আজও যেন কানে আসছে আমার।

ও যে কি করছে আমি তখন তা ভাবতে পারছি না। 'যাচ্ছি যাচ্ছি' বলে মিস জিয়ানে ছোট বারান্দাটার রেলিং ডিঙিয়ে এগিয়ে চলেছে, যেন চাঁদের আলোয় ও সহজভাবে হেঁটে চলেছে। শুনতে পাচ্ছি আমি, 'আমি যাচ্ছি রব্, তুমি দাঁড়াও।'

তারপর সব শেষ। মিস জিয়ানে ত' আর কোন উইল করে যায় নি। বাড়ী আর সব-কিছু সরকারের সম্পত্তি হল, আমার সম্বল বলতে কিছুই রইল না।

তাতে আমার কিছু যায় আসে নি। ওর সবকে পেলাম, সব সময় ওর সঙ্গে আমি ছিলাম, ও যে আমার বন্ধু ছিল! ওর জন্যে আমার দুঃখ হয়। ভালবাসায় ওর অন্তর কত বিকত হয়ে যাচ্ছিল, আমি ছাড়া আর কেই বা ওকে সান্ত্বনা দেবার ছিল।

এরপর অনেক শাদা লোক আর মেয়ের সঙ্গে আমি মিশেছি; কেউ আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে, কেউ করেনি, কেউ গালমন্দ করেছে আমায়, কেউ আমাকে খাটিয়ে আমার পাওনা দেয় নি, আমায় বিশ্রী মনোকষ্টও দিয়েছে! কিন্তু তবু শাদা লোকদের জন্যে আমার দুঃখ হয়, মনে হয় ওদের এরকম করার পেছনে কোন উত্তেজনার কারণ আছে, ভেতরে ভেতরে যে কারণটা আমরা জানি না। তবু ওদের জন্যে আমার মনে জায়গা খোলাই আছে সোনা। ওরা যদি একথাটা নাও জানে, তবু এটা ঠিক ওদের জানানোর না হলে চলবে না। পাকী বকাটে ছেলে-পুলেরা যেমন সব কিছু হাতের কাছে পেয়েও নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি ওদেরও তাই হয়েছে।

স্যান্ডি, আমি কতদিন ধরে এই পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছি, বুড়ী হয়ে গেছি আমি; আমি ত বুঝি এই পৃথিবীতে ভালবাসা নেই, এমন কোন জায়গা সত্যিই নেই রে! হ্যাঁরে সত্যি তাই। এ পৃথিবীতে সব কিছুই আছে, তবু মাত্র একটা জিনিষ এই ভালবাসা না থাকলে তোর মন অশান্তিতে ভরেই থাকবে। আর ভালবাসাতেই যদি হয়, সকলের জন্যে মনে জায়গা রাখতে হবে, বড় হোক ছোট হোক, শাদা হোক, কালো হোক, ভালো মন্দ সকলের জন্যে। ভালোবাসা ত' এমন জায়গার জিনিষ নয়, যেখানে খালি ভালো লোকের ভিড় থাকবে, মন্দ মানুষেরা ঢুকতেই পাবে না। সে রকমটি যদি হয়, তাহলে তা আর ভালবাসা থাকে না।

শাদা লোকেরা তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারে, ঘেন্না করতে পারে কিন্তু সেই ঘেন্না তুমি যখন ফিরিয়ে দেবে, জানবে নিজেকেই তুমি আঘাত করলে। ঘেন্না যে তোমার মনকে খারাপ করে দেয়। ঘেন্না জীবনের সুন্দর দরজাটা বন্ধ করে দেয়, সব কিছু মনে হয় ছোট আর নোংরা। এই পৃথিবীতে ঘেন্নার কোন জায়গা নেই। শাদা লোকেরা কালো লোকদের ঘেন্না করবে, কালো লোকেরা শাদাদের পালটা ঘেন্না করবে, এ হতে পারে না। স্যান্ডি, এই পৃথিবীতে ভালবাসা ছাড়া আর অন্য কিছুর জায়গা নেই। তোকে মানুষ হতে হবে স্যান্ডি, বড় মানুষ। জানবি স্যান্ডি মানুষকে না ভালবাসতে না পারলে কেউ বড় হতে পারে না। কেউ না!

আমি তোকে বলছি সোনা খালি ভালবাসার জন্যে জায়গা আছে এ পৃথিবীতে, খালি ভালবাসা।

BENGAL JUTE MILL

COMPANY LIMITED

8, Dalhousie Square East,
CALCUTTA.

Manufacturers of all Qualities of

JUTE GOODS

FASHIONABLE JUTE CARPETS
For All Purposes and at Economical Rates

Available in Various Shades and Designs

JACQUARDS, DOBBIES, FLOOR RUNNERS,
CHAIR CLOTHS & SCHOOL MATTINGS.
ALSO JUTE WEBBINGS

Twines, Spool and Cops Our Specialities

WANTED AGENTS FOR UNREPRESENTED AREAS

TELEGRAMS & CABLES
CALCUTTA-(INDIA).
"HEMPBALER"

TELEPHONES :
MILLS : HOWRAH-13
OFFICE **22-6853-58**

স্বপন পসারীর কবি ও কবিতা

প্রশান্তকুমার রায়

'স্বপন-পসারী' কবি মোহিতলালের যৌবন-কাব্য। কবির যৌবনে লিখিত হইয়াছে বলিয়াই কোন কাব্যকে যৌবন কাব্য আখ্যা দেওয়া যাইতে পারেনা। বস্তুতঃ যৌবনের যে ধর্মগুলি চিন্তায়, চেষ্টায়, মননে কবি মানস গঠন করিয়া জাগরিত করিয়া তোলে, যে ধর্ম যাহা বিমুক্ত মুক্তবিহঙ্গের মত স্বেচ্ছাবিহারী তাহাই যখন রূপে, রসে, স্বপ্নে কল্পনায় ছন্দের নিয়ন্ত্রিত ঝঙ্কার তুলিয়া প্রাণ ভরিয়া দেয়, তখন যে 'রীতি'র বিশেষ প্রয়োগ কথাকে কথার অতীত করিয়া তোলে তাহাই কাব্য—যৌবন কাব্য। মোহিতলাল মজুমদারের 'স্বপন-পসারী'ও এই হিসাবেই যৌবন কাব্য, যে যৌবনের আশা আকাঙ্ক্ষা কবির একান্ত ব্যক্তিগত চেতনার স্বাক্ষর বহন না করিয়া নিখিল যৌবনের বাসনালোকে রস-স্নাত, উজ্জীবিত।

কিন্তু ঐ নিখিল যৌবনের সংজ্ঞাটি কি? কি তাহার স্বরূপ? কি তাহার আকাঙ্ক্ষা? আশা করি, ইহা কাহাকেও বলিয়া বুঝাইতে হইবে না যদি তিনি জন্ম জরার আক্রান্ত না হন এবং বার্ধক্যে অতীতের যৌবনকে বিস্মৃত হইয়া না থাকেন। যৌবন জীবন গড়ার কারীগর। সেই কারীগরি বিদ্যার উপাদানের অন্ত নাই। আর কেবল গড়াই নহে, ভাঙ্গার কাজেও সে দুর্বার। ভাঙ্গিতে চায় আবার নূতন করিয়া গড়িবার জন্যই। গতির পর গতি সঞ্চার করিয়া সৃষ্টির নেশায় যৌবন যখন মাতিয়া ওঠে তখন কত অজানার ডাক, কত সুদূরের স্বপ্ন তাহার মধ্যে বেগের সঞ্চার করিতে থাকে, কেহ কি তাহা প্রতিদিনের ডায়রীতে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? যৌবনের কোন বাঁধানো ডায়রী নাই। সে লিখিতে লিখিতে মুছিয়া ফেলিবে, আবার লিখিবে। ইহার মধ্য দিয়াই আকাঙ্ক্ষার রূপ ফুটিয়া ওঠে যেমন রঙের পরে রঙ, আঁকাযোকা করিয়া চিত্রী তার স্বরূপের সাধনা করে। মোহিত-লালের প্রথম কবি-কর্ম 'স্বপন পসারী' কাব্যেও এই আঁকা মোছার এই স্বপ্ন রচনার সমারোহ অতি উজ্জ্বল, অতি মধুর ভাবে কেবল মাত্র রেখা সম্পাৎ করিয়াই পাঠককে বিস্মিত করিয়া তুলিতে সমর্থ। বিস্ময়ের কথা বলা হইল কেন? তিনি এমন কি করিয়াছেন যাহা পূর্বে আমরা দেখি নাই, শুনি নাই কিংবা ভাবি নাই? যৌবনের গান তো ইহার পূর্বেও আমরা শুনিয়াছি। শুনিয়াছি বটে কিন্তু তাহা জ্ঞানের ও রুচির দোহাই পাড়া কানাকানি অথবা গুঞ্জরন মাত্র। মোহিতলালে যাহা প্রাণের সঙ্গীত হইয়াও গলা ছাড়িয়া ডাক দিবার স্পর্ধা রাখে, রুচির শুচিতার নব্য ভাব আকারে যাহা আপনি যৌবনের অভিজ্ঞানে শুদ্ধ হইয়া আরেক যৌবনের আকাঙ্ক্ষাকে ঘর ছাড়ার মন্ত্রে দীক্ষিত করে ইতিপূর্বে তাহা এমন করিয়া আর কোথাও কীর্তিত হয় নাই। হয় নাই যে তাহার কারণ ঐ আগেই ইঙ্গিত করিয়াছি অর্থাৎ যৌবনের সংজ্ঞা হারাইয়া বিজ্ঞ এবং বার্ধক্যের মিছক সংস্কারে আচ্ছন্ন বানানো শুচিতার আবরণে আবৃত হইয়া সেখানে কেবল যৌবনের ভান করা হইয়াছে। স্বীকার করিতে বাধা নাই, সেখানেও কিছু সত্যের আলোক স্পর্শ আছে, স্মৃতি আছে, রীতি আছে কিন্তু সহজতা নাই, কল্পনার একান্ত স্বাভাবিকতা নাই। মোহিতলালে আমরা তাহাই পাইতেছি। 'স্বপন পসারী'র মূলতঃ দুইটি দিক বর্তমান এবং ঐ উভয় দিকই যৌবনের কামনায় অধীর। একদিকে বাঁধ-ভাঙ্গা, না-মানা শক্তির সাধনা,

অন্যদিকে জীবনের গভীরতম ব্যথাবেদনার জন্য অসহায়ের আর্তি। এই আর্তিও যৌবনের সত্যই বরণ করিতেছে। 'স্বপন-পসারী'তে কোথাও অন্ততঃ প্রাজ্ঞ-জনোচিত উপদেশের ছিটা-ফোঁটা নাই; কেবল অভিজ্ঞতার বর্ণলিপি কখনও তাহা মানুষের সাধ্যের অতীত বলিয়া মর্মান্তিক, কখনও তাহা মানুষের অন্ধ-সংস্কার ও প্রথা-রীতির দংশনে রক্তরাগ লাঞ্ছিত পরিণাম-বোধের চিত্র। সেইখানে কবির জিজ্ঞাসার অন্ত নাই, খোঁজার নেশায় অঘোর তান্ত্রিক হইয়া পড়িতে তাঁহার বাধা নাই।

এইবার কবিতাগ্রন্থটিকে উদ্ধৃতির কাজে লাগানো যাইতে পারে। যে-যৌবনে গতির নেশা রঙ ফলাইয়াছে সে-যৌবনের পাথেয় কি? কবি গ্রন্থারম্ভে-ই বলিয়াছেন তাহা আর কিছুই নহে কেবল মাত্র স্বপ্ন সম্বল :—

"ফিরি দ্বারে দ্বারে স্বপনের ফিরি—স্বপন-ব্যাপারী আমি,
নাহি অহরত-পান্না কি হীরা মুকুতার হার দামী।
যে বীণা বাজাতে আলো নীহারিকা ছায়া পথে যায় থামি
তারি সুরে হেঁকে পথ চলি ডেকে স্বপন-পসারী আমি।"

কবি স্বপন ব্যাপারী। স্বপ্নই তাহার মূলধন; যৌবনের এই স্বপ্ন-বীজ হইতেই একদিন জীবনের-সোনা ফলিয়া ওঠে। (প্রসঙ্গতঃ এইখানে লক্ষ্য করিতে বলি, উদ্ধৃত অংশের 'ফিরি' ও 'হেঁকে' এই শব্দ দুইটির সহজ ও স্বাভাবিক প্রয়োগবিধি। এই জাতীয় শব্দের বহুল প্রয়োগ মোহিত লালের কবি-কর্মের বৈশিষ্ট্য) স্বপ্নে ভরপুর হৃদয় লইয়া এই কবি যে 'দিলদার' কবিতায় এমন মুখর হইয়া উঠিবেন তাহাই স্বাভাবিক :

"দিল্ দিল্ মজিল তালাবের সরা'য়ের—
করে' তুলি রঙ্গিল আর ভাই মুসাফের।"

"বড় মিঠা ধর্ পরবৎ!—কের ভর পেয়ালি
কানে বাজে নওবৎ চোখে লাগে দেয়ালি।"

অথবা 'গজল-গান' কবিতাটির কয়েকটি লাইন :

"চিবুকের সেই তিলটি যে তার দিল-দাগা :—
এত দিনের স্মৃতি-সুখের ভুল ভাগে।
পিয়ারী! ও তোর ঠোঁটের দু'খানি লাল চুনী
জুড়াবে দরদ—আমি সে স্বপন-জাল বুনি!
মজনুঁর গোরে এখনো যে তার বুক জুড়ে'
লায়লী-অধর-লালা-ফুলটির মুদ ভাগে!"

তারপর 'ইরাণী' কবিতার অংশ :

"কালো ডানার শ্বেত-মরালী!—স্নানের ঘরে হাম্মামে
ছড়িয়ে পড়ে চুলের পালক শুভ্র-তনুর ডান্ বামে।
গোলাব ফুলের তাজটি মাথায়, জাফরানী-রং পায়জামা
যুবতী নয়, বালক কিশোর বসন্ত এসে তাজাকে!"

'আগন্তুক' শব্দের নিপুণ প্রয়োগগুলি পরিবেশ রচনায় কতখানি আবেশের চমৎকৃতি সৃষ্টি করিয়াছে পাঠক বা শ্রোতার কানে না বাজিয়া পারে না। বলা বাহুল্য মোহিতলালের অনুকারক—আরেকজন যৌবনবাদী কবিও এই কবির শব্দ প্রয়োগ পদ্ধতিটি অনেকাংশে স্বীকরণ করিতে পারিয়াছিলেন বিশেষ করিয়া তাহার গানে—গজল গানে। তিনি নজরুল ইসলাম। বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাসও মোহিত লালের আবরূপ ঠিক না হইলেও ভাষা ও ভঙ্গীর অনুকারক ছিলেন অন্ততঃ প্রথম বয়সে তাঁর 'ঝরা-পালকে'র যুগে।

আগেই বলিয়াছি বাঁধ-ভাঙা শক্তির সাধনা যৌবন ধর্মেরই একটি বিশেষ দিক। 'অঘোর পন্থী' কবিতায় তাহারই স্বাক্ষর মুদ্রিত :

"জীবন মধুর! মরণ নিঠুর—তাহারে ধরিব পা'য়,
যতদিন আছে মোহের মদিরা ধরণীর পেয়ালায়!
দেবতার মত কর সুধাপান—
দূর হয়ে যাক হিতাহিত জ্ঞান!
আমরা বাজাব প্রলয়-বিষাণ শঙ্কুর মত তুলি,—
চিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে, ধর মতার মাথার খুলি!
চুমুকে চুমুকে দাও বার বার পড়গো সবাই ঢুলি।"

এই উদ্ধৃতি হইতে একথা যেন কেহ মনে না করেন যে জীবনের সব কিছুকে অস্বীকার করা কবির উদ্দেশ্য।

তা নয়। ঐ সব কিছুর নূতন অর্থ খুঁজিয়া বাহির করিবার কৌতূহল যৌবনের ধর্মই বটে। ইহারই প্রভাবে কবি ইতিহাস ও পুরাণ কাহিনী অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক চরিত্রেও অর্থ সন্ধান করিয়াছেন। এই পর্যায়ের কয়েকটি কবিতা 'নাদির-শাহের আগমন' 'নাদির শাহের শেষ' (দুইটিকে পাশাপাশি পড়িতে হইবে,) 'শেষ শয্যায় নুরজাহান', পূরবরু। কাহিনী কাব্য বলিতে যাহা বোঝায় ইহারা ঠিক সেই অর্থে কাহিনী কাব্য নয়, কারণ কাহিনী ইহার মুখ্য তো নয়ই, ঘটনা সংঘাতের চমকপ্রদ বিবরণ দেবার অবসরও খুব একটা গ্রহণ করা হয় নাই। ইহার মধ্যে চরিত্রের ভাব সংঘাতটাই প্রধান এবং সেইটাই উপজীব্য।

অর্থ খুঁজিতে যাইয়া মোহিতলাল আরেকটি আকাঙ্ক্ষা নর ও নারীর রহস্য উদ্ঘাটন—সম্পর্কে যে অনুভব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যৌবনেরই আনন্দ অভিলাষ। কবিকে কাব্যের বাহিরে আসিয়া সব চাইতে এই বিষয়টি লইয়াই বেশী জবাবদিহি করিতে হইয়াছে, তাহাদের কাছেই যাহারা সত্য ও সহজকে নির্বাসন দিয়া প্রথা ও প্রচলিত সংস্কারের আবরণেঘেরানীতিকে আঁকড়াইয়া ধরিতে বেশী পছন্দ করেন এবং যাহারা বৈষ্ণব কবিতার বাস্তব রস অস্বীকার করিয়া অধ্যাত্ম-রসে অবগাহন করেন—ঐ যাদের লক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথকে একদা যৌবনে জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছিল, 'সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণবকবি, কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেম ছবি : সে কি দেবতার'? ভারতীয় দর্শনেও নারীকে 'প্রকৃতি' বলিয়াই আখ্যাত করা হইয়াছে যে 'প্রকৃতি, লীলাবৈচিত্র্যে অহরহ চঞ্চল, যাহা পূর্ণ হইবার জন্য পুরুষের অপেক্ষা রাখে। একা পুরুষ বা নারী কেহই পূর্ণ নয়, উভয়ের মিলিত সত্তায় উহারা সাম্যশ্রী ধারণ করে। মোহিতলাল এই তত্ত্বের ভাব-রূপটি বাস্তব জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। ইহা কোন ভোগবাদীর দৃষ্টি নয়। যদি বলিতেই হয় তবে বলা যাইতে পারে, ইহা এক অঘোর-পন্থী রূপ-তান্ত্রিক কবির রূপ পিপাসার লীলা রহস্য। যদিও মোহিতলাল তাঁর কাব্যে এই রূপ পিপাসার কারণগুলি উপস্থিত করিয়াছেন তথাপি আমরা বলিব, যাহা রহস্যাবৃত, যাহা প্রকৃতির লীলাসঙ্গিনী তাহাকে প্রাণে সঞ্চারিত করাইয়া অনুভবের সৃষ্টি করিতে না পারিলে উপমা রূপক বা উদাহরণের আয়োজন ব্যর্থই বলিতে হইবে। আমার মনে হয়, মোহিতলালের এই কবিতা গ্রন্থে সে আয়োজন যেমন প্রচুর তাহার সার্থকতাও যথেষ্ট। তবে এই কবির পরবর্তী কাব্য গ্রন্থত্রয়—বিস্মরণী, অর-গরল, হেমন্ত-গোধূলী—একসঙ্গে পাঠ না করিলে কবির ভাবপরিক্রমা কাহারও পক্ষে সম্পূর্ণ হইতে পারে না। 'স্বপন-পসারী'তে কেবল নারীরহস্যের বীজ ছড়ানো হইয়াছে, বিস্মরণীতে তাহার সুস্পষ্ট অঙ্কুরোদ্গম এবং 'অর-গরল ও 'হেমন্ত-গোধূলী'তে উহার পরিণাম অতি পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। অতএব 'স্বপন পসারীর' মধ্যে যে দেহ ও দেহাতীত সত্তার দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে তাহাই পরিণামে পৌঁছিয়াছে। দেহ ও দেহাতীতের জন্য যে ক্রন্দন প্রথমে ধ্বনিত হইতেছিল একসময় তাহা সংগীতে উত্তরণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। 'পরমক্ষণ' নামে যে কবিতাটি আছে তাহার কিছুটা এই :

"কালো-ফুলের গন্ধ—চুলের—
উথলে ওঠে নিশ্বাস—বশে,
ঠোঁটের ঠোঁটায় চুমায় চুমায়
চুমুক দিলাম হাসির রসে।
তোমার সাথে মিলন-রাতে
সেই পরিচয় নিবিড় তম!
ক্ষণেকলাগি দু'জন জাগি
গৌরী-হর মূর্তি সম!
দেহের মাঝে আত্মা রাজে—
ভুল সে কথা, হয় প্রমাণ,
আত্মা দেহ ভিন্ন কেহ—
নয় যে কভু—এক সমান।"

দেহসম্ভোগের মধ্যেও হর-গৌরীর (গৌরী-হর-

মূর্তি সমান।) অবিশ্ব ও মাধুর্যময় উপমাটি কবির উদ্দিষ্ট হইবার তাৎপর্যটি লক্ষ্যণীয়। রূপ-বিশ্লেষণের কথা বলা হইয়াছে উক্তি উদ্ধার করিতেছি :

"রূপ -সে যে রূপে গড়িয়াছে দেবা, কোথা নহে নিরাকার
অরূপ-রূপের উপাসনা— সে যে অবৈধ অনাচার।"

'স্বপন পসারী'র 'প্রেম ও সতীধর্ম ও নারীত্বকে' কবিতা দুইটিতে যে বিদ্রোহের সুর ধ্বনিত হইয়াছে সেখানেও লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে মাতৃত্ব, সতীত্ব বা সতীত্বের কোন ফাঁকা আওয়াজকেই কবি নারীর চরম সার্থকতা বলিয়া মানেন না। তিনি বলিতে চান, নারীর মহিমা নারীত্বেই নয়। সেই নারীত্বের প্রধান কথাই প্রেম আর সে প্রেমও দেহবিমুক্ত নিরালম্ব কিছু নয় ইন্দ্রিয়ের বাহিরে তাহার যে প্রতিষ্ঠা সে প্রতিষ্ঠার নাম নারীনিবাসন ছাড়া আর কিছু নয়। দুঃখ সুখের লক্ষ্য ধারার অতিরিক্ত অতি কাছের যে মানুষ তাহাকে রক্তে, মাংসে, রূপে, রসে, গুণে ভরপুর করিয়া নিবিড়ে পাইবার নাম কোন ইন্দ্রিয় বিলাস নহে। ইহা ছন্দের প্রয়োজন। এই সোজা এবং সত্য কথাটা মোহিতলাল কবিতায় কবিতায় ঘুরিয়া ফিরিয়া দিবার আগ্রহ দেখাইয়াছেন ইহাতে পাপ বোধের স্থান নাই কারণ,—

"প্রেম দিয়ে ছেঁকা শোধন করা যে কামনার সোমরস
সে রস বিষম হতে পারে কভু ? হবে তায় অপযশ ?"

ঐ অভাব ইন্দ্রিয়বিলাস সেখানেই অনর্থ ঘটায়। ভালবাসার মধ্যে ঐক্যিত হইয়াই কবি 'আঁধারের-খেয়া' কবিতায় এমন চমৎকার উপমা উপহার দিতে পারিয়াছেন :

"মধু সৌরভ — সৌরভ মধু ! মধু আর শুধু মধু !
আপনারি প্রাণ দুইখানি করে চল বর চল বধূ।
একখানি তার ফুলের মতন চড়াইল চারিদিকে,
আর একখানি প্রস্ফুটিত চাঁদে বুক দিল ফুলটিকে।
পাপড়ি, কি পাখা—চেনা নাহি যায়, কার
মধু— কার মুখ,
নাই শুরু শুধু দুজন ! সুধাপান- শুধু সুখ !"

যৌবন সর্বাবস্থায় সুখই কামনা করে। তাহার মধ্যে পাড়ি দিতে যাওয়ার উদ্দেশ্যও সুখান্বেষণ ছাড়া আর কিছু নয়; ট্রাজেডি-রস অনুভব করবার মধ্যে যে আনন্দ সম্ভব অনেকটা সেই রকমই বটে। স্বপন-পসারীর কবি যেখানে যাহা রূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকেই স্বাদ গ্রহণে ব্যগ্র। প্রকৃতির সঙ্গে যে নারীর যোগ বর্তমান কবি তাহা আঁকিয়াছেন— নর ও নারীকে বহিঃপ্রকৃতির অংশভূত করিয়া তাহাদের বিভিন্ন পরিবেশে নিরীক্ষণ করিয়াছেন, কান পাতিয়া তাহাদের ব্যগ্র হৃদস্পন্দন অনুভব করিয়াছেন। সেই ব্যগ্রতা স্বপন-পসারীর' প্রত্যেকটি কবিতায় স্পন্দিত হইতেছে এবং সেই স্পন্দনই যৌবনের তারে সুর-বাঁধা যৌবন-কাব্য।

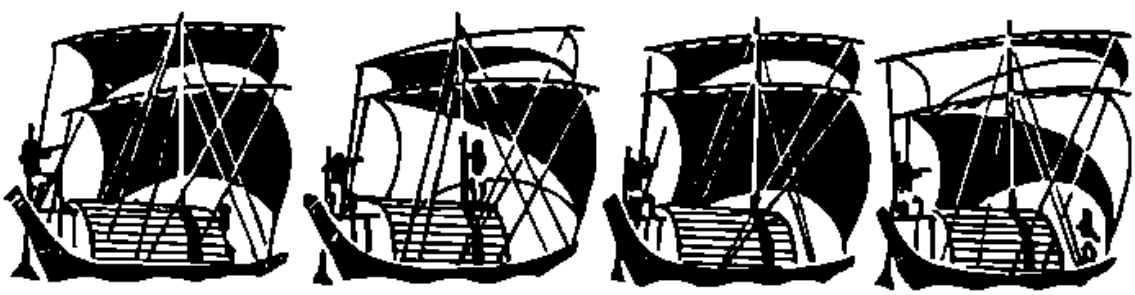

রাজ্য পুনর্গঠন

ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের যে আয়োজন হয়েছিল তা আপাততঃ স্থগিত রয়েছে। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের প্রস্তাব সকলের মনঃপূত হয়নি। সর্বজনগ্রাহ্য কোনও বিকল্প প্রস্তাবও কেউ উপস্থিত করতে পারেন নি। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, হায়দরাবাদ নানা-স্থান থেকে নানারকম প্রতিবাদ উঠেছে। কোথাও কোথাও লাঠালাঠিও হয়েছে, যেমন বোম্বাইয়ে। বোম্বাই শহর মহারাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে, মারাঠিদের এই দাবী। সংখ্যাধিক্য না হলেও ঐ শহরে বহুসংখ্যক গুজরাটী আছেন এবং তাঁরা প্রভাবশালী। তাঁরা এ প্রস্তাবে রাজি নন।

মতের পার্থক্য যতই থাক, এ নিয়ে মারামারি বা খুনোখুনি অত্যন্ত শোচনীয়। দু'জনেরই এ ক্ষেত্রে দায়িত্ব আছে। মারাঠী, গুজরাটী উভয়েই ভারত সন্তান, সমগ্র ভারতবাসীই এক জাতি, এই উপলব্ধি উভয়ের মনে দৃঢ় হওয়া উচিত।

উড়িষ্যা—'সেরাইকেল্লা' এবং 'খরসোয়ান' ফিরে পেতে চায়। যখন ঐ দু'টি ভাষাগা বিহারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তখনই সে আপত্তি করেছিল। তার মতে, ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে ঐ দুই স্থানের অধিবাসীরা উড়িয়া। কাজেই তাদের উড়িষ্যার মধ্যে আসা উচিত। কথাটা হয়তো অযৌক্তিক নয়, কিন্তু গভর্নমেন্টকে দিয়ে এই দাবি স্বীকার করিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে যারা পুরী ষ্টেশন পুড়িয়ে দিয়েছে এবং কয়েক কোটী টাকার জিনিস ধ্বংস করেছে, তারা নিজেদেরই সর্বনাশ করেছে। উড়িষ্যার তারা বন্ধু নয়; শত্রু। তাদের কাজের ফলে সেরাইকেল্লা বা খরসোয়ান উড়িষ্যার মধ্যে ফিরে আসার পথ সুগম হয়নি। পরন্তু জনসাধারণের যে ক্ষতি হয়েছে তার সহজে পূরণ হবে না। ভারত এমন সমৃদ্ধ নয় যে প্রজাবর্গ যার যেমন ইচ্ছে কোটি কোটি টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে আর কেন্দ্রীয় সরকার অবলীলাক্রমে ক্ষতিপূরণ করবে। একদিকে ব্যাপকবহুল পরিকল্পনা নিয়ে জাতির সমৃদ্ধি গড়ে তোলবার চেষ্টা, আর অন্যদিকে পদে পদে তাকে ব্যাহত করবার দুর্বুদ্ধি। এ মূঢ় আত্মহত্যা থেকে জাতিকে বাঁচাবে কে?

মধ্যপ্রদেশ-বিদর্ভ, হায়দরাবাদ—তেলেঙ্গানা-বিশাল অন্ধ্র সমস্যা তেমন গুরুতর আকার ধারণ করেনি, সুখের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গ বিহার সমস্যা কিছুদিন থেকেই জটিল। পশ্চিমবঙ্গ মনে করে, বিহারের বাংলাভাষী অঞ্চলগুলি তার ফিরে পাওয়া উচিত। বিহার সেগুলি ফিরিয়ে দিতে নারাজ। বাদ-প্রতিবাদের মুখে কোন কোন নেতা দায়িত্বহীন অশোভন উক্তি দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের মনে তীব্র বিরক্তির সঞ্চার করেছেন। এমন করে কোনও সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব নয়। বিহার ও আসামে বাঙালীদের শিক্ষাদীক্ষা এবং জীবিকার্জনের পথেও বাধা সৃষ্টির অভিযোগ বহুবার শোনা গিয়েছে। বস্তুতঃ সংকীর্ণ মনোভাব নিয়ে 'জাতীয়' আদর্শ অনুসরণ সম্ভব নয়।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন বাঙালীদের প্রার্থিত সমগ্র অঞ্চল বিহার থেকে এনে বাংলায় জুড়ে দিতে বলেন নি; কিছু অংশ দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। তা নিয়েও মতানৈক্য ঘটেছিল। এমন কি পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কংগ্রেস নেতাদের মধ্যেও মতের মিল হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গ-বিহার-সংযুক্তি

এমন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের মুখ্যমন্ত্রী একটা পাল্টা প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, উভয় রাজ্য মিলিয়ে একটি যুক্তরাজ্য গড়ে তোলা হোক্। প্রস্তাবটির অভিনবত্ব অনেককে বিস্মিত ক'রলো। অনেকে বাদ-বিসংবাদ নিরস্ত করবার প্রকৃষ্ট উপায় মনে করে একে অভ্যর্থনা করলেন, কেউ কেউ বাঙালী বা বিহারী সংস্কৃতির এবং স্বার্থের পরিপন্থী মনে করে এর নিন্দা করলেন। এখনও মতামত দ্বিধাবিভক্ত। তবে বিহারের বিধান-পরিষদে ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ-বিধান সভাতেও অধিকাংশে এ-প্রস্তাব সমর্থন করেন ব'লে মনে হয়েছে। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় তাঁর বিবৃতিতে ব'লেছেন, এই সংযুক্তি পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর হবে। এতে কেবল বিরোধের অবসান হবে তাই নয়, এই সংযুক্ত রাজ্য অর্থনৈতিক দিক্ দিয়ে দ্রুত উন্নতি লাভ করবে। কেননা শিল্প বাণিজ্য ও খনিজ সম্পদে এ রাজ্য হবে বিশেষরূপে সমৃদ্ধ। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অনেক কাজ এই দু'টি অংশের সহযোগিতার উপর নির্ভর করছে। উদ্বাস্তু-পুনর্বাসনের পক্ষেও এ সংযুক্তি অনুকূল হবে। পরস্পরের সন্দেহ নিরসন ও স্বার্থরক্ষার জন্য কতকগুলি রক্ষাকবচ রাখা যেতে পারে। যাতে আভ্যন্তরিক ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের স্ব স্ব অধিকার বজায় থাকে এবং উভয়রাজ্যে হিন্দী এবং বাংলা দু'টি রাষ্ট্রভাষা স্বীকৃত হয়, এমনতরো অঙ্গীকার থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী এক অঞ্চল থেকে হ'লে তাঁর সহকারী অপর অঞ্চল থেকে নেবার এবং পালাক্রমে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একবার ও বিহার থেকে পরবর্তীবার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করবার রীতিও গৃহীত হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভার কংগ্রেসীসদস্য শ্রীযুক্ত শঙ্করপ্রসাদ মিত্র এই প্রস্তাব সমর্থন প্রসঙ্গে যে আট দফা রক্ষাকবচের পরামর্শ দিয়েছেন তা যুক্তিযুক্ত। তন্মধ্যে একটি সর্ত এই যে, প্রস্তাবিত যুক্তরাজ্যের এক অংশ ভবিষ্যতে বিযুক্তির দাবি করলে সে দাবি গৃহীত হবে।

সংযুক্তি প্রস্তাবের বিরোধীরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, বিহারের সঙ্গে যুক্ত হলে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি বিপন্ন হবে; অনুন্নত বিহারকে উন্নত করবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের অপ্রচুর রাজস্বের বেশীর ভাগ খরচ করতে হবে; পৃথক থাকলে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাদীক্ষায় যতটা এগোতে পারত, একত্র হলে তাও পারবে না; আর যুক্তরাজ্যে বিহারীদের সংখ্যাধিক্য থাকবে বলে পশ্চিমবঙ্গ সর্বদাই তাদের অনুগ্রহভাজন হয়ে থাকবে। বিশেষতঃ, তাঁরা বলেন, বিহারে বঙ্গ-প্রীতির নিদর্শন এতদিন পাওয়া যায় নি; সংযুক্তি হ'লেই সেখানে নীতির সরকার হবে এমন সম্ভাবনা নাই।

আশঙ্কার কারণ নেই এমন নয়। কিন্তু প্রত্যেক পরীক্ষাতেই ঝুঁকি নিতে হয়। যদি ভাষা ও সম্প্রদায়গত পার্থক্যকে প্রাধান্য না দিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর নূতন ভারত গড়তে চাই তবে ঝুঁকি নিতে হবে; উপযুক্ত রক্ষাকবচ হয়তো সন্দেহ নিরসনে সাহায্য করবে। আর আমাদের মনে হয়, সংযুক্তি-নীতি কেবল বঙ্গ বিহারে প্রয়োগ না ক'রে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও প্রয়োগ করলে বাঙালী ও বিহারীর সংশয় অনেকটা প্রশমিত হবে। আজ হয়তো তারা ভাবছে, অন্যত্র যদি ভাষাভিত্তিক রাজ্যই র'য়ে গেল, তবে অখণ্ড ভারতের পরীক্ষাটা কেবল আমাদের ক্ষেত্রে চলছে কেন? আর-সব জায়গাতেও সংযুক্তির ব্যবস্থা হ'লে এ প্রশ্ন তাদের বিক্ষুব্ধ করবেনা।

পণ্ডিত নেহরু সাম্প্রতিক নানাবিধ গোলযোগ লক্ষ্য করে ব'লেছেন, রাজ্যগঠন ব্যাপারে ভাষাকে এতটা প্রাধান্য না দিয়ে যদি সমগ্র ভারতকে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, মধ্য প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলে (Zone) ভাগ করে নেওয়া হয়, তা হলেই সম্ভবতঃ দেশের উন্নতি-সাধন অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে, রাজ্যপুনর্গঠন কমিশন-রিপোর্ট সাধারণ্যে প্রকাশের পূর্বে—কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র গুহ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, ভাষার ভিত্তিতে না করে শাসনতান্ত্রিক (administrative) এবং অর্থনৈতিক

রাজ্যপুনর্গঠন বাঞ্ছনীয়।

নির্বাচিত প্রতিনিধি-

কথার প্রতি বোধহয় উপযুক্ত মনোযোগ দেননি। আজ কথাটা আবার ভেবে দেখবার দিন এসেছে।

আমাদের উৎসব

দুর্গাপূজা, দোল প্রভৃতি উপলক্ষ্যে আমাদের তরুণ সম্প্রদায়ের কুরুচির কথা আমরা পূর্বে কয়েকবার উল্লেখ করেছি। এবারের সরস্বতী পূজার সময়েও এই কুরুচির নিদর্শন পেলাম। বড়ই দুঃখের বিষয়, যে ধর্মভাব নিয়ে পূজায় অগ্রসর হওয়া উচিত, অনেক ক্ষেত্রে তারই অভাব। যদি তাই হয়, তবে পূজা না করাই তো ভালো। দেব-প্রতিমা গ'ড়ে যদি কেউ তা নিয়ে ফুটবল খেলতে চায়, তাকে বলতে হয়, ফুটবল নিয়েই ফুটবল খেল, দেবপ্রতিমার অপমান ক'রোনা।

যাঁকে নির্মল শুভ্র জ্ঞানের প্রতীক রূপে ধ্যান করি, তাঁর সামনে তালে তালে ইঁদারা-নৃত্য অথবা গুম্ফধারী তরুণের কোমর-দোলানো ঢেউটা নৃত্য কি ক'রে সম্ভব ভেবে পাইনা। আরও আশ্চর্য, এই তরুণেরা কেউ কেউ ছাত্র। আমরা বালিগঞ্জ এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায়তনের পূজামণ্ডপেও এই ধরণের নৃত্য দেখে এসেছি। প্রতিমা বিসর্জনের দিন এই সব কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী এমন নির্লজ্জ-ভাবে প্রকাশ পায় যে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ভদ্রসন্তান তাদের দেখতে গিয়ে সংকোচ বোধ না করে পারেন না।

আমাদের মনে হয়, নেতাদের, সমাজহিতৈষী তরুণদের, পূজা উদ্যোক্তাদের এবং দেশহিতকামী সাধারণের এবিষয়ে দায়িত্ব আছে। পরিবেশকে সুস্থ ও সুন্দর ক'রে তুলতে না পারলে, ছেলেমেয়েদের মানুষ করা কঠিন। নিজেদের মঙ্গলের জন্যই প্রত্যেকের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া আবশ্যক।

ডক্টর প্রবোধ বাগচী

ডক্টর প্রবোধ বাগচীর মৃত্যু আমাদের জ্ঞান-জগতের একটি অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করলো। বিশ্বভারতীর উপাচার্যরূপে তিনি নিষ্ঠার ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। শুধু তাই নয়। তাঁর প্রধান দান প্রাচ্য-সংস্কৃতির লুপ্তরত্ন-উদ্ধারের চেষ্টা। প্রাচ্যজগতের ইতিহাসে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল গভীর। তিব্বতী, চীনা, ফরাসী প্রভৃতি ভাষা আয়ত্ত করে' তিনি ঐতিহাসিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেছিলেন। বৌদ্ধতন্ত্র, চর্যাপদ প্রভৃতি বিষয়কে আলোচনায় তাঁর অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর বাংলা গ্রন্থগুলির মধ্যে 'ভারত ও ইন্দোচীন' এবং 'ভারত ও মধ্য এশিয়া' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ছোট হলেও বই দু'খানি যেমন তথ্যসমৃদ্ধ ও তেমনি সরস ভাষায় লেখা; ইংরেজীতেও তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। আজ প্রাচ্যজগৎ সাংস্কৃতিক মিলনকে সুদৃঢ় করবার পথ খুঁজছে, তাঁর রচনাবলী এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করবে।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

মন্দিরা

অষ্টাদশ বর্ষ | ফাল্গুন—১৩৬২ | একাদশ সংখ্যা

মেঘনাদ সাহা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

ক্ষুদ্র গ্রামের বৈশ্য সম্প্রদায়ের দরিদ্র দোকানীর পুত্র নানারূপ অসুবিধার মধ্যে দিয়া প্রতিভা ও পরিশ্রমের ফলে বিদ্যাগৌরব অর্জন করিয়া গ্রামে আসিয়াছেন। পিতা শুনিয়াছেন, পুত্র লিখাপড়া শিখিয়া বড় হইয়াছেন—পুত্রের বিদ্যাখ্যাতির স্বরূপ বুঝিবার সাধ্য পিতার নাই। কিন্তু তিনি বহুদিন পরে আগত পুত্রকে পাইয়া আনন্দিত। পুত্রকে ভাল করিয়া খাওয়াইবার অভিপ্রায়ে পিতা বাজারে যাইয়া কয়টি বড় সরল পুঁটি মাছ ও সের দুই দুধ কিনিয়া আনিতেছিলেন। পথে থানা;—দারোগা বাবু তাঁহাকে দেখিয়া ডাকিলেন—"এই—এদিকে আয়।" পিতা সভয়ে প্রবল-প্রতাপ দারোগার কাছে আসিলে দারোগা বলিলেন, "মাছ আর দুধ কেন?" পিতা বলিলেন, পুত্র লিখাপড়া শিখিয়া অনেক দিন পরে গৃহে আসিয়াছেন, তিনি তাহাকে ভাল করিয়া খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। দারোগা বলিলেন, "ছেলে লিখাপড়া শিখেছে! আমাদের মত লিখাপড়া শিখেছে? মাছ আর দুধ এখানে রেখে যা।" তিনি আজ্ঞাবহ কনষ্টেবলকে দুধ আর মাছ তাঁহার জন্য লইয়া যাইতে বলিলেন। পিতা রিক্তহস্তে ব্যথিত চিত্তে সাশ্রুনেত্রে গৃহে ফিরিলেন। পিতার অবস্থা দেখিয়া পুত্র কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সব শুনিয়া পিতাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন "তার জন্য দুঃখ কি, বাবা? কাল মাছ আর দুধ আনা যা'বে।" গ্রামের শিক্ষিত তরুণের দল সেই দিন অপরাহ্নে জমীদার বাড়ীতে পুত্রের সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিয়াছিল। যথাকালে সকলে তথায় সমবেত হইলেন—আমন্ত্রিত হইয়া দারোগাও আসিলেন। আগন্তুকদিগের সহিত যখন গ্রামের জমীদার ঐ পুত্রের পরিচয় করাইয়া দিতেছিলেন, তখন তিনি দারোগার কাছে আসিয়া যখন বলিলেন, "ইনি আমাদের থানার দারোগা বাবু"—তখন পুত্র বলিলেন "তোমার সঙ্গে আমি পরিচিত হ'তে চাই না।" দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" উত্তর হইল, "তুমি অত্যাচারী—লোকের জিনিষ-পত্র কেড়ে লও।" দারোগা উগ্র ভাবে বলিলেন, "মিথ্যা কথা।" পুত্র পিতাকে দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ লোকটিকে চিন? আজই সকালে তুমি ওর কাছ হতে মাছ আর দুধ কেড়ে নিয়েছ।" দারোগা বিব্রত হইলেন—নরম সুরে—বলিলেন, "আমরা গ্রামের লোকের রক্ষক—তাই এরা ইচ্ছা ক'রে আমাদের সময় সময় কোন কোন জিনিষ খেতে

নেয়।" পুত্র দৃঢ় ও দৃপ্তভাবে বলিলেন, "মিথ্যা কথা। তুমি জেনেছিলে, উনি ছেলের জন্য মাছ আর দুধ কিনে আনছিলেন। তুমি কেড়ে নিয়েছিলে। এত বড় অত্যাচারী তুমি!" দারোগার মুখে আর কথা ফুটিল না। তখন পুত্র বলিলেন, "আমি ওঁর ছেলে—উনি আমার বাবা।"

সেদিন ঢাকা জিলার শেওড়াতলী গ্রামের সামান্য দোকানী জগন্নাথ সাহার পুত্র মেঘনাদ সাহা অত্যাচারীর সম্বন্ধে যে নির্ভীক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন, পরবর্তী জীবনে তিনি সেই মনোভাবেরই অনুশীলন করিয়াছিলেন। সেই জন্যই স্বায়ত্তশাসনশীল ভারতে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু অনেক সময় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহার তীব্র আক্রমণে বিব্রত হইতেন—উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরা অনেকে তাঁহার সমালোচনার ভয় করিতেন—বহু বৈজ্ঞানিক তাঁহার স্পষ্টবাদিতায় কুণ্ঠিত হইতেন। মেঘনাদের বন্ধু ডক্টর জ্ঞানেন্দ্র ঘোষ যখন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মন্ত্রিত্ব ত্যাগের পরে—ভারত সরকারের দপ্তরখানা ত্যাগ করিয়া শিক্ষা বিভাগে চাকরী লইয়া পশ্চিমবঙ্গে আসেন এবং হিজলীর বিদ্যালয় হইতে আসিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্যের কাজ গ্রহণ করেন তাহার পূর্বেই তিনি ভারতের শিল্পোন্নয়ন সম্বন্ধে বিস্তৃত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া আসিয়াছিলেন। ভারত সরকারে তাঁহার পরবর্তীরা বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকের সেই মন্তব্যে আবশ্যক গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন মনে করেন, হয়ত সে যোগ্যতাও তাঁহাদিগের ছিল না। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাঁহার এক বক্তৃতায় ভারতে নানা শিল্প-প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করিলে ডক্টর মেঘনাদ সাহা বলিয়াছিলেন, ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষের মন্তব্য পাঠ করিয়া কর্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, তখন কোন লোক কি ভারত সরকারের দপ্তরখানায় নাই? কারণ, ভারতের শিল্প-প্রয়োজন সম্বন্ধে সব কথাই সে মন্তব্যে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। ফলে ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার সমিতিতে যোগ দিবার জন্য আহ্বান করিতে হয়। তাঁহার বন্ধু ডক্টর মেঘনাদ কিন্তু তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই—তিনি বলিয়াছিলেন, জ্ঞানচন্দ্রকে ভারত সরকারের উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী করিয়া তাঁহাকে নীতি প্রবর্ত্তনের অধিকার দিলেই তাঁহার যোগ্যতার সমাদর ও সদ্ব্যবহার করা হইত।

মেঘনাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—তিনি স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন—সেই জন্য তাঁহাকে নানা কাজে নানারূপ অসুবিধাও ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু প্রতিভাবলে তিনি সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়াছিলেন।

মেঘনাদ সাহা ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জিলার বালিয়াটী থানার এলাকার শেওড়াতলী গ্রামে দরিদ্র বৈশ্য পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। পূর্ববঙ্গে এই "সাহাদের" "জলচল" বলিয়া বিবেচনা করা হইত না। এমন কি মেঘনাদ যখন পাঠ্যদশায় কলিকাতায় আসিয়া হিন্দু হোষ্টেলে থাকিতেন তখন তথায়ও তাঁহাকে নবশায়কদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র স্থানে আহার করিতে হইত। নবশায়ক বলিলে বুঝায়—

গোপো মালী তথা তেলী তন্ত্রী যোদকবারুজী।

কুলালঃ কর্ম্মকারশ্চ নাপিতো নব শায়কং॥

পশ্চিম বঙ্গে ইঁহারা "জলচল"। কিন্তু পূর্ববঙ্গে সাহারা তাহা নহে। মেঘনাদের পিতা জগন্নাথের একখানি ক্ষুদ্র দোকান ছিল—দোকানে হাঁড়ি, সরা প্রভৃতি ও পান বিক্রীত হইত—আর জগন্নাথ মাল কিনিতে ও বিক্রয় করিতে নিজেই হাটে হাটে যাইতেন। সামান্য আয়ে বৃহৎ পরিবার প্রতিপালন করিতে হইত; সুতরাং অভাব অনুচিত না—যশোদার দন্তীর দুই মুখ এক করা দুঃসাধ্য ছিল।

বালক মেঘনাদকে গ্রামের পাঠশালায় দেওয়া হইল বটে, কিন্তু প্রয়োজনে দোকানেই বসাইতে হইল—কারণ, পিতার অনুপস্থিতিতে দোকানে এক জনের থাকা প্রয়োজন। এক দিন গ্রামের পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয় জগন্নাথকে বলিলেন, মেঘনাদ বুদ্ধিমান বালক—তাহাকে

পাঠশালায় রাখিলেই ভাল হয়—সে বিদ্যালিক্ষা করিতে পারিবে। পণ্ডিত মহাশয়ের কথায় জগন্নাথ পুত্রের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য আগ্রহশীল হইলেও অর্থাভাব হেতু কি করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেধাবী মেঘনাদ বিশেষ সাফল্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু গ্রামে ঐ বিদ্যালয় ব্যতীত অন্য কোন বিদ্যালয় ছিল না। প্রায় সাত মাইল দূরে সিমুলিয়া গ্রামে একটি মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু প্রতিদিন ১৪ মাইল পথ অতিক্রম করা বালকের পক্ষে দুঃসাধ্য। সৌভাগ্যক্রমে সিমুলিয়ার ডাক্তার অনন্ত কুমার দাস বালকটিকে স্বগৃহে বাসের ও আহারের ব্যবস্থা করিয়া সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। ঐ ভাবে পরাশ্রয়ে থাকিয়া অধ্যয়ন করিয়া মেঘনাদ পরীক্ষায় ঢাকা জিলার পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি লাভ করিলেন। বৃত্তি পাইয়া তিনি ঢাকায় যাইয়া কলেজের স্কুলে ভর্তি হইলেন।

পরবৎসর এক অপ্রত্যাশিত বিঘ্ন উপস্থিত হইল। বাঙ্গলা বিভক্ত হইলে যে ব্যামফাইল্ড কুলার পূর্ব বঙ্গের ছোট লাট হইলেন, তিনি স্কুল পরিদর্শনে আসিলে যে সকল ছাত্র জাতির আত্মসম্মান জ্ঞানের পরিচয় দিয়া স্কুলে অনুপস্থিত থাকেন—মেঘনাদ তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন। ইহা তাঁহার দেশাত্মবোধের পরিচায়ক। অনুপস্থিতির "অপরাধে" তাঁহাকে স্কুল হইতে বিতাড়িত করা হয়। তিনি কিশোরীমোহন জুবিলী স্কুলে স্থান লাভ করেন। তথায় বিনাবেতনে পাঠের ও বৃত্তির সুযোগ লাভ করায় তাঁহার আর্থিক কষ্টের হ্রাস হয়। তিনি এই সময়ে স্থানীয় ব্যাপটিষ্ট মিশনের বাইবেল শ্রেণীতে যোগ দেন এবং মিশনের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এক শত টাকা পুরস্কার লাভ করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় পূর্ব বঙ্গের ছাত্রদিগের মধ্যে প্রথম স্থান এবং ইংরেজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও অঙ্ক চারিটি বিষয়ে সকল ছাত্রের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। তাহার পরে তিনি ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন করিয়া আই, এস, সি, পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে তৃতীয় স্থান লাভ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। তখন প্রেসিডেন্সী কলেজে যে দুই জন বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক —জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়—অধ্যাপক ছিলেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন—ভারতে আর কোন বৈজ্ঞানিক তাঁহাদিগের সমকক্ষ নহেন। ইঁহাদিগের মধ্যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র কেবল বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপকই ছিলেন না; তিনি উৎসাহ দিয়া ও সাহায্য করিয়া বহু ছাত্রকে খ্যাতির পথে প্রতিষ্ঠিত হইতে সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার "জ্ঞানেত্রয়"—ডক্টর জ্ঞানেন্দ্র ঘোষ, ডক্টর জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ও ডক্টর জ্ঞানেন্দ্র রায়—ব্যতীত ডক্টর নীলরতন ধর, ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নিখিলরঞ্জন সেন প্রভৃতির খ্যাতি আজ সর্বত্র ব্যাপ্ত। মেঘনাদও আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের নিকট প্রেরণা লাভ করিয়া বিজ্ঞান-চর্চায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বি, এস, সি পরীক্ষায় মেঘনাদ গণিত শাস্ত্রে দ্বিতীয় স্থান ও ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে এম, এস, সি পরীক্ষায় চলিত গণিত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

এ দেশে চলিত কথা "যেমন তেমন চাকরী—ঘী ভাত।" বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া দরিদ্রের সন্তান মেঘনাদ প্রথমেই চাকরী পাইবার চেষ্টা করিলেন। তিনি সরকারের অর্থ বিভাগে পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ভাগ্যদেবী তাঁহাকে সে দুর্ভোগ ভোগ করিতে দিলেন না। বাল্যে তিনি ছোট-লাটের পরিদর্শন কালে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হইয়াছিলেন, যৌবনে তিনি "বাঘা যতীন" ও পুলিনচন্দ্র দাস প্রমুখ ব্যক্তিদিগের অনুরক্ত ছিলেন। সুতরাং পুলিসের খাতায় তাঁহার নাম লিখিত ছিল। তিনি সে পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইলেন না। সে অনুমতি পাইলে বিজ্ঞান জগৎ ডক্টর মেঘনাদ সাহার অসাধারণ গবেষণা ফলে বঞ্চিত থাকিত এবং মেঘনাদ সাহার প্রতিভা ইংরেজ সরকারের দপ্তরখানার হিসাব পরীক্ষায় অতিবাহিত হইত—তিনি হয়ত "রায় বাহাদুর" উপাধি লইয়া অবসর গ্রহণ করিতেন।

যে সময় মেঘনাদ সরকারী পরীক্ষা দানের সুযোগ লাভ করিতে পারিলেন না, তখন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে নূতন ভাবে গঠিত করিবার কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আশুতোষ সম্বন্ধে কেহ কেহ অভিযোগ করেন, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার মান খর্ব করায় শিক্ষার মান ও লব্ধ বিদ্যার আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তিনি ইচ্ছা করিয়াই তাহা করিয়াছিলেন। যখন ভারত সরকার প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতা-মূলক করিবার বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য সমিতি গঠনের প্রস্তাবেও অসম্মত হয়েন, তখন হইতে আশুতোষ এ দেশে শিক্ষার বিস্তার সাধনের উপায় চিন্তা করিতে-ছিলেন। তিনি স্থির করেন, প্রবেশিকা পরীক্ষার মান খর্ব করিয়া বহু ছাত্র ছাত্রীকে বিদ্যালয়ে আকৃষ্ট করিবেন—বিদ্যা সমাজের সকল স্তরে ব্যাপ্তি লাভ করিবে: কিন্তু প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীরা বা যাহারা উচ্চ শিক্ষার আবশ্যক জন্য ব্যয় করিতে সমর্থ তাহারা উচ্চ হইতে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করিতে ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিতে পারিবে। সেই জন্য তিনি পরীক্ষা গ্রহণকারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়কে শিক্ষাদানের কেন্দ্র ও করিয়া তাহার উদ্দেশ্য—জ্ঞানের অগ্রগমন—সার্থক করেন। কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে "পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট" শ্রেণী প্রতিষ্ঠিত হয়। আশুতোষ তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মেধাবী ব্যক্তি-দিগকে মনোনীত করিতে ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনিই সরকারের দপ্তরখানার প্রতিভাশালী কার্য্য হইতে আনিয়া চন্দ্রশেখর রমণকে শিক্ষাব্রতী করেন। মেঘনাদ তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তিনি মেঘনাদকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নব প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান কলেজে কার্য্যে নিযুক্ত করেন। মেঘনাদের প্রতিভা অনুশীলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র লাভ করে। তিনি পদার্থবিদ্যার গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েন।

মেঘনাদ পাঠদশায় জার্ম্মান ভাষা শিখিয়াছিল। তাহাতে তাঁহার মনীষীদিগের আবিষ্কারের বিবরণ পাঠ করিবার সুবিধা হয়। তিনি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি, এস, সি উপাধি ও পর বৎসর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গবেষণার ফল প্রথম পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রকাশিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাজের প্রশংসা অর্জন করে। তাপের প্রভাবে কিরূপে বৈদ্যুতিক শক্তি-সম্পন্ন অণু গঠিত হয় তাহা প্রতিপন্ন করিয়া তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজকে স্তম্ভিত করেন, তিনি দেখাইয়া দেন, তাঁহার আবিষ্কৃত পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়া গ্রহসমূহের স্বাভাবিক গঠন ব্যাখ্যা করা যায়। আইজাক নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব যেমন বিজ্ঞানের একটি মূল সূত্র বলিয়া পরিগৃহীত, মেঘনাদের এই আবিষ্কারও তেমনই। তাঁহার এই আবিষ্কার এত গুরুত্বপূর্ণ যে, ১৬১০ খৃষ্টাব্দে গ্যালি-লিওর দূরবীক্ষণই আবিষ্কারের পরে এ পর্যন্ত যে দশটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সর্ব্বপ্রধান—ইহা সেই সকলের অন্যতম।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে মেঘনাদ বৈজ্ঞানিক গবেষণার পর্য্য-বেক্ষণ জন্য য়ুরোপে গমন করেন এবং বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক-দিগের গবেষণাগারে কাজ করিয়া দেড় বৎসর কাল তথায় অতিবাহিত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। স্বদেশে ফিরিয়াই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার বিভাগে "খয়রা অধ্যাপক" নিযুক্ত হয়েন। কিন্তু অল্পদিন পরেই (১৯২৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে) তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে আহূত হয়েন। সেই নিয়োগাবধি পরবর্ত্তী ১৫ বৎসর কাল এলাহাবাদই তাঁহার কার্যস্থান ছিল এবং তিনি তথায় একাগ্রচিত্তে গবেষণা করিতে থাকেন।

মাত্র ৩৫ বৎসর বয়সে মেঘনাদ রয়াল সোসাইটীর সদস্য মনোনীত হইয়া তুল্যরূপ সম্মান লাভ করেন। তাহা তাঁহার আবিষ্কারের পুরস্কার। সঙ্গে সঙ্গে নানা দেশের বৈজ্ঞানিক সমিতি সমূহ তাঁহাকে সম্মানিত করিতে থাকেন।

এলাহাবাদে অবস্থিতিকালে মেঘনাদ তথায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান অধ্যাপনার যে উন্নতি সাধন করেন, তাহার ফলে নানা প্রদেশ হইতে মেধাবী ছাত্রগণ তথায় সমাগত হইতে থাকেন। তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকে উত্তরকালে খ্যাতিলাভ করিতে পারিয়াছেন। এলাহাবাদে অধ্যাপক থাকিবার সময় তিনি যে সকল কাজ করিয়াছিলেন, সে সকলের মধ্যে মাত্র দুইটির উল্লেখ করিতেছি :—

(১) ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে তিনি সর্বপ্রথম এ দেশে সমাজের কল্যাণ সাধন জন্য বিজ্ঞানের প্রয়োগ করিতে বলেন। তাঁহার সেই মতানুসারে যে "ন্যাসনাল ইন্‌স্টিটিউট অব সায়েন্স" অর্থাৎ জাতীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটীর সহিত তুলনা করা যায়। তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের নিয়মাদি রচনায় উৎসাহী ছিলেন এবং কয় বৎসর সভাপতিরূপে ইহার কার্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া ইহার উন্নতির পথ সুগম করেন।

(২) সহকর্মীদিগের সহিত একযোগে তিনি 'বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি' নামক ইংরেজি মাসিকপত্র প্রচার করেন। এই পত্রে বহু বিশেষজ্ঞ এ দেশের নানা সমস্যার যে আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা ভবিষ্যতে সমস্যার সমাধানে সাহায্য করিয়াছে। ইহাতে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহের মধ্যে মাত্র কয়টির উল্লেখ করিতেছি :—

(ক) দামোদর নদ-সংস্কার
(খ) উড়িষ্যার সংস্কার
(গ) খাদ্যদ্রব্য ও দুর্ভিক্ষ
(ঘ) ভারতের জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান
(ঙ) দেশ শিল্পপ্রাণ করিবার প্রয়োজন ও দার্শনিক তত্ত্ব
(চ) কয়লা সংরক্ষণ
(ছ) খনিজসম্পদ সম্বন্ধীয় নীতি
(জ) ভারতে পাট শিল্পের সমস্যা
(ঝ) জাতীয় গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা
(ঞ) সোভিয়েট বিপ্লব
(ট) নদী-নিয়ন্ত্রণের মূল নীতি
(ঠ) আণবিক শক্তি

ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়। এই বৈজ্ঞানিক সঙ্ঘ দেশের প্রকৃত সমস্যা কতদিন পূর্বে বুঝিয়া সে সকলের সমাধান জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তখনই দামোদর নদ সংস্কারেরও প্রয়োজন তাঁহাদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। আজ যাহা হইতেছে তাহার গৌরব তাঁহাদিগের প্রাপ্য।

মেঘনাদ রাশিয়া সম্বন্ধে তাঁহার পর্যবেক্ষণফল বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার পরিদর্শন-নৈপুণ্য সপ্রকাশ। সে পুস্তক বিশেষ আদৃত।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার য়ুরোপে ও আমেরিকায় বৈজ্ঞানিকদিগের যে শুভেচ্ছাদ্যোতক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিয়াছিলেন, মেঘনাদ তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি ঐ প্রতিনিধিদিগের মতামত বিবৃত করিয়া এক রিপোর্ট রচনাভার পাইয়াছিলেন। তিনি সে কাজ সম্পন্ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার রচিত রিপোর্ট যে এখনও প্রকাশিত হয় নাই, তাহা সরকারের পক্ষে লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই। হয়ত সেই খনি হইতে মণি সংগ্রহ করিয়া কেহ কেহ ধনশ্রী হইবার সুযোগ লইতে কার্পণ্য করেন নাই।

নানা দেশ হইতে বিজ্ঞান সম্মিলনে ও বৈজ্ঞানিক অনুষ্ঠানে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত। সে সকল আমন্ত্রণ গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

কয় বৎসর পূর্বে যখন মেঘনাদের বয়স ৬০ বৎসরে পূর্ণ হয়, তখন তাঁহার ছাত্র, সহকর্মী ও গুণমুগ্ধ ব্যক্তিরা তাঁহাকে সাদরে সম্বর্ধিত করিয়াছিলেন। তখন সকলেরই আশা ছিল, তিনি আরও দীর্ঘ কাল বাঁচিয়া থাকিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা নানা তথ্য আবিষ্কার করিয়া মানবসমাজের কল্যাণ সাধন করিবেন; কারণ, বিজ্ঞানকে মৃত্যুর ও ধ্বংসের জন্য প্রযুক্ত না করিয়া তাহার দ্বারা মানব-

সাধন করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল।

যে সকল হয় নাই, তাহা কেবল তাঁহার দেশবাসীর নহে—সমগ্র মানব জাতির পক্ষে দুর্ভাগ্যদ্যোতক।

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে যখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়, তখন মেঘনাদ তাঁহাকে প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ে অবহিত করেন—

দেশ শিল্পপ্রধান করা

বৈদ্যুতিক ও অণুবিৎ শক্তি উৎপাদন করা

সমগ্র দেশের জন্য উন্নতিসাধন পরিকল্পনা রচনা করা।

পরবর্তীকালে—ক্ষমতা লাভ করিয়া যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই সকল বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন, তাহার উৎস সন্ধান করিলে আমরা সহজেই মেঘনাদের প্রেরণায় উপনীত হই। পৃথিবীর অনেক ঘটনার মূল আবিষ্কার করা সহজসাধ্য নহে। কোন্ সন্ন্যাসীর কোন্ কথায় গৌতম সিদ্ধার্থ চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়া নির্বাণ মুক্তির সন্ধান পাইয়াছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে?

বিজ্ঞানচর্চা কোন দেশের সীমায় বদ্ধ নহে—বদ্ধ থাকিতেও পারে না। কিন্তু তাহার কেন্দ্র থাকে। মেঘনাদের বিজ্ঞানচর্চার বিস্তার যত ব্যাপ্তই কেন হবেনা, তাঁহার স্বদেশ তাহার কেন্দ্র ছিল। বাল্যাবধি তিনি কি উপায় স্বদেশের দুঃখদুর্দ্দশা ও দৈন্য দূর হইতে পারে, সেই চিন্তা করিতেন—পরে তাঁহার প্রতীতি জন্মিয়াছিল, বিজ্ঞানের বলেই তাহা করা যায়। যে উৎস সন্ধানের কথা বলিয়াছি, তাহার প্রসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ এই স্থানে করিব। পাঠদশা হইতেই সুভাষচন্দ্রের প্রতি মেঘনাদের বিশেষ শ্রদ্ধা ও স্নেহ ছিল এবং সুভাষচন্দ্রও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। সুভাষচন্দ্র যখন ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজী প্রমুখ নেতৃগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও বহুমতে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়া দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তখন মেঘনাদের প্রস্তাবে তিনি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা সমিতি গঠিত করেন এবং উদারহৃদয় কংগ্রেস সভাপতির নির্দ্দেশে সেই সমিতি দুই বৎসর পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে সম্মিলিত হয়। মূল সমিতির সভাপতি ও দুইটি শাখা সমিতির (শক্তি ও শিক্ষা) সভাপতিরূপে মেঘনাদ সেই কার্যে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই সময়েও পণ্ডিত নেহরু মেঘনাদের উপদেশে উপকৃত হইয়াছিলেন।

তিনি সরকারের অনুরোধে বহু কমিটীতে ও কাউন্সিলে যোগ দিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহাকে বহু সরকারী কর্মচারীর—বড়লাটের, মন্ত্রীদিগের, রাজ্যপাল-দিগের সহিত—কাজ করিতে হইয়াছিল। তিনি কখনও আপনার স্বাধীন মনোভাব ও স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হইতে দেন নাই এবং কখন বিরুদ্ধ মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া তাহা খণ্ডন করিতে দ্বিধানুভব করেন নাই। বিরোধীরা তাঁহাকে ভয় করিতেন; কারণ, তিনি অত্যন্ত স্পষ্টবাদী ছিলেন এবং কখন বিনয়ের নিকট দৃঢ়তা নত করেন নাই। প্রধানমন্ত্রী যে তাঁহার মৃত্যুতে কোন বিবৃতি দেন নাই এবং পশ্চিম বঙ্গের প্রধান সচিব যে স্বীয় বিবৃতিতে তাঁহার বিজ্ঞানসম্পর্কিত কার্য্য ব্যতীত আর কোন কাজের উল্লেখ করেন নাই—মেঘনাদের স্পষ্টবাদিতাই, বোধ হয়, তাহার কারণ। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার অবদানও উপেক্ষণীয় নহে—তবে তাহার মূল দেশপ্রীতি ও দেশবাসীর সেবার আগ্রহ। গত জানুয়ারী মাসে (১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে) ভারতের প্রধানমন্ত্রী যখন দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা আলোচনা করিবার জন্য পার্লামেন্টের কয়জন সদস্যকে আহ্বান করিয়াছিলেন, তখন মেঘনাদ কত জন বিশেষজ্ঞের ভুল দেখিয়াই দিয়াছিলেন।

মেঘনাদ কত সমিতি প্রভৃতিতে কাজ করিয়াছিলেন এবং দেশবিদেশের কত প্রতিষ্ঠানের দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

মেঘনাদ ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার (পালিত

প্রফেসার) অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া নবোদ্যমে বিজ্ঞান কলেজে কাজ করিতে থাকেন। এ দেশে আণবিক গবেষণায় তিনি অগ্রণী বলিলে অসঙ্গত হয় না। তাঁহার চেষ্টায় যে "নিউক্লিয়ার ফিজিক্স" প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা ভারত সরকারের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ পরিচালনাধীন। তাঁহার কার্যে গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ভারত সরকার তাহার জন্য বহুঅর্থ প্রদান করিয়াছেন ও করিতেছেন। সেই অর্থে মেঘনাদ এই প্রতিষ্ঠান গঠিত করিয়াছেন। ইহাতে বহু ছাত্র গবেষণাকার্যে আত্ম-নিয়োগের সুযোগ পাইয়াছেন।

কলিকাতায় ফিরিবার পরেই তিনি বিজ্ঞান সভার উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। এই সভা ("ইণ্ডিয়ান এসোসিয়ান ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স) বহুদিন পূর্বে ডক্টর মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার অনুষ্ঠান পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন—

"সভা স্থাপন করিবার জন্য একটী গৃহ, কতকগুলি বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র এবং কতকগুলি উপযুক্ত ও অনুরক্ত ব্যক্তি বিশেষের আবশ্যক। অতএব এই প্রস্তাব হইয়াছে যে, কিছু ভূমি ক্রয় করা ও তাহার উপর একটী আবশ্যকানুরূপ গৃহ নির্মাণ করা, বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক ও যন্ত্র ক্রয় করা এবং যাঁহারা এক্ষণে বিজ্ঞানানুশীলন করিতেছেন, কিম্বা যাঁহারা এক্ষণে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াছেন অথচ বিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়নে একান্ত অভিলাষী কিন্তু উপায়াভাবে সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারিতেছেন না, এরূপ ব্যক্তিদিগকে বিজ্ঞানচর্চা করিতে আহ্বান করা হইবে।"

"এই অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশের আড়াই বৎসর পরে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' (১২৭৯ বঙ্গাব্দ) দুঃখ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"এই অনুষ্ঠান পত্র আজ আড়াই বৎসর হইল প্রচারিত হইয়াছে, এই আড়াই বৎসরে বঙ্গসমাজ চল্লিশ সহস্র টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন। মহেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন যে, এই তালিকাখানি একটি আশ্চর্য দলিল। ইহাতে যেমন কতকগুলি নাম থাকা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে, তেমনি কতক-গুলি নাম না থাকাতে উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে। তিনি আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন না।"

কলিকাতায় বহুবাজার ষ্ট্রীটে জমী কিনিয়া সভার গৃহ নির্মিত হয়। এই সভা এ দেশে এই শ্রেণীর প্রথম প্রতিষ্ঠান। প্রথমে কলিকাতার অধিকাংশ কলেজে বিজ্ঞানবিষয়ক উপযুক্ত যন্ত্রাদি ছিল না এবং বহু ছাত্র এই সভায় যাইয়া পাঠ্য পুস্তকের লিখিত বিষয়গুলি বক্তৃতায় ও পরীক্ষায় শিখিতে চেষ্টা করিত: তখন এই প্রতিষ্ঠান মধ্যকলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনতিদূরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে মেঘনাদ বিজ্ঞান সভার আজীবন-সদস্য ছিলেন এবং যখন সভা একটি দলের দ্বারা অধিকৃত হইবার উপক্রম হয়, তখন তিনি ইহাকে সেই গ্রাসমুক্ত করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া মেঘনাদ কালোপযোগী পরিবর্তন করিয়া সভার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হয়েন এবং ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ হইতে কার্যতঃ তিনিই—প্রথমে সম্পাদক, পরে সহকারী সভাপতি এবং শেষে সভাপতি হইয়া—ইহার কার্যপরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় ভারত সরকারের ও পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অর্থ সাহায্য লইয়া কলিকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরে ৩০ বিঘা জমী লইয়া তাহাতে প্রয়োজনানুযায়ী গৃহ নির্মিত হইয়াছে এবং তাহাতে বৈজ্ঞানিক বিষয়ে গবেষণার সুব্যবস্থা সাধিত হইয়াছে। ইহার পরিবর্ধনও মেঘনাদের অন্যতম কীর্তি।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিশন নিযুক্ত হয়, তাহার অন্যতম সদস্যরূপে মেঘনাদ এ দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার সুযোগ লাভ করেন এবং নানা বিষয়ে তিনি যে মত প্রকাশ করেন, তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কোন কাজই বিশেষ মনোযোগ না দিয়া করিতেন না। তাহা তাঁহার বৈজ্ঞানিকোপযোগী মনোভাবের পরিচায়ক।

দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়া—আপনার চেষ্টায় উন্নতি লাভ করিয়া মেঘনাদ কখন জনগণের প্রয়োজনে

উদাসীন হইতে পারেন নাই—তাহাদিগের কল্যাণসাধন তাঁহার জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান রূপে তিনি ব্যবসা-বুদ্ধি উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য বৈষয়িক ব্যাপারে তিনি সর্ব্বদা সাফল্য লাভ করিয়া গিয়াছেন।

জাতীয়তাবাদ তাঁহার মজ্জাগত ছিল। তিনি যখন হেয়া কলেজের স্কুল ছাত্র, তখন তিনি ছোটলাট ফুলারের পরিদর্শনকালে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকিয়া সেজন্য দণ্ডিত হইয়াছিলেন। যৌবনে তিনি "বাঘা যতীন" ও পুলিন দাসের সহিত ঘনিষ্ঠত্বের অপরাধে সরকারী চাকরীর জন্য পরীক্ষা দিতে পারেন নাই।

তিনি এম, এস,-সি, পরীক্ষার জন্য অধ্যয়ন করিতেছিলেন, তখন ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে দামোদরের বন্যায় যাহারা সর্ব্বস্বান্ত তাহাদিগকে সাহায্যদান কার্য্যে তিনি স্বেচ্ছাসেবক হইয়াছিলেন। সেই সময় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার মনে প্রথম দামোদরের জল নিয়ন্ত্রণের চিন্তা স্থান পায়। তিনি বঙ্গীয় আর্ত্তত্রাণ সমিতির সেবা-কার্য্যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সুযোগ্য সহকারী ছিলেন। দেশ বিভাগের পরে যখন পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সর্ব্বহারা হিন্দুরা মান ও প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য দেশ ত্যাগ করে তখন তিনি ভারতে তাহাদিগের সেবাকার্য্যে অন্যতম নেতৃরূপে কাজ করিতে থাকেন। সেই কারণে তিনি ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে উদ্বাস্তুদিগকে প্রাথমিক সাহায্য প্রদান জন্য পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বাস্তু সাহায্যদান সমিতি গঠিত করেন। দেশের জনগণের অবস্থার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকায় তিনি উদ্বাস্তুদিগের বেদনা আপনার হৃদয়ে অনুভব করিতেন। সরকারের কর্ম্মচারীদিগের অনেকেরই—উদ্দেশ্য যত সাধুই কেন হউক না—তাহা-দিগের অবস্থার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় না থাকায় তাঁহারা যে সকল বহুব্যয়সাধ্য পরিকল্পনা করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য দিতে চাহিতেন সে সকলে বহু ত্রুটি অনিবার্য্য। মেঘনাদ আপনার অভিজ্ঞতাফলে সেই সকল ত্রুটি দেখাইতেন এবং তিনি নির্ম্মমভাবে সেই সকল ত্রুটি দেখাইয়া অনেক উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর অপ্রীতিভাজন হইতেন। কিন্তু তিনি বীরের মত আপনার মত প্রতিষ্ঠিত করিতেন এবং তিনি বৈজ্ঞানিকোপযোগী প্রমাণ ও যুক্তি উপস্থাপিত করায় তাঁহার উক্তির প্রতিবাদ করা লোকের পক্ষে দুঃসাধ্য হইত—বিরোধীরা তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইতেন—কিন্তু তাঁহাকে ভয় করিতেন।

বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ পরিণত বয়সের পূর্ব্বে কখন সক্রিয় ভাবে রাজনীতিক কাজ করেন নাই—তিনি বিজ্ঞানচর্চ্চায় এ দেশের লোকের কল্যাণ-চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন। বিশেষ :—

"The game of politics is a crude business anywhere. It requires a coarseness of fibre, a hardness of integument, that makes it no fit affair for a man of sensitive mind."

কিন্তু ভারতবর্ষ খণ্ডিত হইয়া স্বায়ত্তশাসন লাভের পরে মেঘনাদ রাজনীতিক্ষেত্রে আগমন করিলেন—অবশ্য সম্ভোগের প্রয়োচনায় নহে,—দেশসেবার আগ্রহে। বিশেষ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে বাধ্য হইয়া ভারতে আগত নর-নারীর পুনর্ব্বাসন-ব্যবস্থায় সরকারের ত্রুটি লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিবার জন্য ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে লোকসভায় নির্ব্বাচনপ্রার্থী হয়েন। তিনি স্বাধীনভাবে নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইলেন—অর্থাৎ কংগ্রেসের কলমা পড়িতে সম্মত হইলেন না। সেই জন্য যে কংগ্রেস দেশের মুক্তির জন্য ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছেন সেই কংগ্রেসের বর্ত্তমান পরিচালকগণ তাঁহার পূর্ব্বেতিহাস বিবেচনা না করিয়া এবং তাঁহার সহযোগ লাভের জন্য আগ্রহশীল না হইয়া তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিলেন। ইহাই দলগত নীতির কাজ। কিন্তু কলিকাতার একটি নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে তিনি বহুমতে নির্ব্বাচিত হইয়া—কলিকাতা হইতে শরৎচন্দ্র বসু ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নির্ব্বাচনের কথা লোককে মনে করাইয়া দিলেন।

মেঘনাদ বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারের পরিচিত শান্ত পরিবেশ হইতে লোকসভার অপরিচিত উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে যাইয়া নূতন অবস্থায় কাজ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্পষ্টবাদিতার জন্য সময় সময় প্রধান মন্ত্রীর সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হইত এবং তাঁহাকে তাঁহার প্রাপ্য শ্রদ্ধা প্রদানেও কেহ কেহ কার্পণ্য করিতেন। কিন্তু সাধারণতঃ সদস্যরা তাঁহার যুক্তির অকাট্যতা উপলব্ধি করিতেন এবং অনেকে শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার মন্তব্য শ্রবণ করিতেন। বিশেষ তাঁহার বক্তৃতা পরিশ্রমের ও চিন্তার বৈশিষ্ট্য-সম্পন্নই হইত। অর্থনীতিক ব্যাপারে, দেশকে শিল্প-প্রধান করিবার উপায় সম্বন্ধে, শিক্ষাসম্পর্কিত সমস্যার, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে, তাঁহার মূল্যবান মত যে বিশেষ ভাবে ও শ্রদ্ধা সহকারে বিবেচনা করাই সঙ্গত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অন্ধ্রকে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনে বাধ্য হইবার পরে—অন্যান্য প্রদেশে বিক্ষোভের আশঙ্কায় ভারত সরকার যে রাজ্যপুনর্গঠন কমিশন নিযুক্ত করেন, তাহার নির্দ্ধারণে মেঘনাদ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রধান কারণ, তিনি পূর্ব্বকালের কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের এবং অরবিন্দ প্রমুখ ব্যক্তিদিগের মত মনে করিতেন—জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন প্রয়োজন। রাশিয়ার যে ভাবে বহু ভাষাভাষীদিগের ভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া সুগঠিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য ও অধ্যয়ন করিয়া সে বিষয়ে তাঁহার মত আরও দৃঢ় হইয়াছিল। সেই জন্য ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের জন্য আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার বিশ্বাস ছিল—সেই পথেই রাষ্ট্রের উন্নতি ও রাষ্ট্রের লোকের পূর্ণ পরিণতি সম্ভব—অন্য পথে নহে। পশ্চিমবঙ্গে এই বিষয়ে আন্দোলনে তাঁহার সাহায্য অসাধারণ। আন্দোলনের জন্য তিনি তাঁহার চিন্তা ও সময় দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ হইবে মনে করিতেন না—সে জন্য অকাতরে অর্থও দিতেন।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের ফলে বোম্বাই প্রদেশে ও উড়িষ্যায় যে বিক্ষোভ হইয়াছিল, তাহার পরেও ভারত সরকার তাহার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি গ্রহণ না করিয়া সমগ্র রাষ্ট্রকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিবার জন্য যে প্রস্তাব করেন, তাহা সুচিন্তিত হইবার পূর্বেই প্রকাশ করা হয় এবং তাহারই সূত্র লইয়া পশ্চিম বঙ্গের ও বিহারের প্রধান সচিবদ্বয়—ঐ প্রদেশদ্বয়ের একীকরণের জন্য এক বিবৃতি প্রদান করেন। মেঘনাদ সে প্রস্তাব সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই। সেই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবার জন্য ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ) শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হলে এক সভা হয়। তাহাতে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে হইবার কথা ছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন তিনি উপস্থিত হইতে না পারায় মেঘনাদ সভাপতি হইয়া সে সভার কার্য্য পরিচালিত করেন। সোমবারে তিনি লোক সভার অধিবেশনের জন্য দিল্লী যাত্রা করেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী সকাল ১০টায় রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রের উন্নয়ন পরিকল্পনার এক শাখাসমিতির অধিবেশন ছিল। তিনি যথাকালে তাহাতে যোগ দিবার জন্য আবশ্যক কাগজপত্র লইয়া ট্যাক্সীতে যাত্রা করেন। কিন্তু পথে তাঁহার যান আর অগ্রসর হইতে পারে না; কারণ, সে দিন ইরাণের রাজা দিল্লীতে আসিতেছেন—তাঁহার আগমনের শোভাযাত্রার জন্য—জনসাধারণের যত অসুবিধাই কেন হইত না—তাহা অবজ্ঞা করিয়া—শোভাযাত্রার গমনকালে যান চলাচল নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন মেঘনাদ—পাছে অধিবেশনে যাইতে বিলম্ব ঘটে এই আশঙ্কায় যান ত্যাগ করিয়া—কাগজ পত্র লইয়া—পদব্রজে যাইতে থাকেন। সহসা রাষ্ট্রপতি ভবনের দ্বারের সম্মুখে তিনি পতিত হয়েন। তখনই অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁহার হৃদয়যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের গৃহে জন্ম অল্প অবস্থার প্রতিভাবলে জয়ী হইয়া বিজ্ঞানের অধিষ্ঠার দ্বারা অমরত্ব লাভ করিয়াছেন—তাঁহার দেশের দেশবাসীকে সভ্য করিয়াছে। তাঁহার জীবনে তিনি তাঁহার দেশের—দরিদ্র, নিরক্ষর লাঞ্ছিত—জনগণের চেষ্টা করিয়া যে দেশাত্মবোধের তাহা তাঁহাকে চিরদিন অবহিত

তিনি কেবল বৈজ্ঞানিকই ছিলেন না, মানবপ্রেমিকও ছিলেন এবং সেই প্রেমের প্রথম ও শেষ লক্ষ্য তাঁহার দেশ। জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি ও চিন্তকারী ছিলেন। তিনি প্রতিভার প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন—দেখাইয়া গিয়াছেন প্রতিভা কাহাকেও ভয় করে না—বিদ্রুতেই তাহার প্রতিরোধ করা সম্ভব নহে। সে জন্য প্রয়োজন—নিষ্ঠার; সে জন্য প্রয়োজন—পরিশ্রমের; সে জন্য প্রয়োজন—একাগ্রতার; সে জন্য প্রয়োজন—সাধনার। সেই জন্য তাঁহার জীবনের কার্য্য লক্ষ্য করিয়া বলিতে হয়—

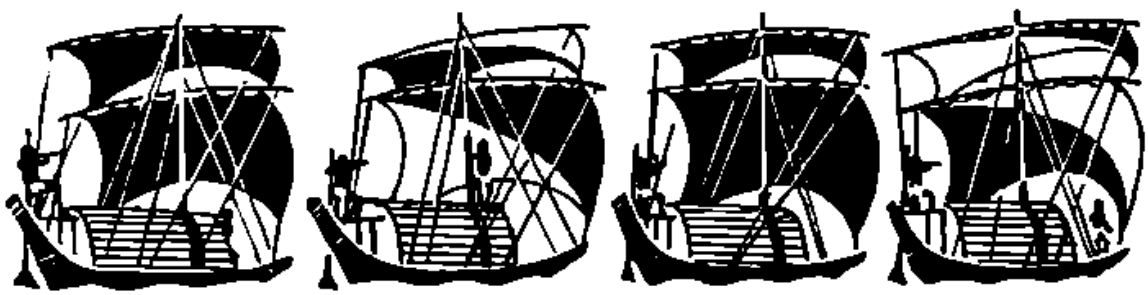

জয়দেব চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি

ডাঃ নিহির কুমার মুখোপাধ্যায়।

চৈতন্য পূর্বযুগের বৈষ্ণবপদ অতল আত্মময় অনুভূতি প্রবণতায় মর্মস্পর্শী। রাধাকৃষ্ণের বিরহ মিলনের যে দ্বন্দ্ব-মধুর চিত্র দিয়ে জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি বিদগ্ধ লোকদের ভাব-বিহ্বল করে তুলেছিলেন, পরবর্তী যুগে বৈষ্ণবকবির লেখনীমুখে তার চরমোৎকর্ষ। দুঃখে বেদনায় মানুষ অসহায়ভাবে অশ্রুপাত করে কিন্তু তার নিগূঢ় সৌন্দর্যে সমস্ত আর্তির নিবৃত্তি, ভক্তির উল্লাসে মানুষের বিহ্বল আত্মবিস্মৃতি ঘটে, মানসলোকের পূর্ণ-পরিণতি সেই প্রেমোন্মুখ সমর্পণে, বস্তু-গ্রাহ্য আত্মিক সম্ভোগের মাধ্যমেই রস স্বরূপের পূর্ণ জ্ঞান,—বৈষ্ণব কবি ভাড়া প্রেম-ভক্তির এই দুরূহ তত্ত্ব আর কেউ এত সরল ভাবে বলতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। চতুর্দশ শতাব্দীতে অজয় নদের তীরবর্তী কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেব এর সূচনা করেন।

বাংলা লিরিকে শ্রীরাধার ভাবাবেগরক্ত স্নিগ্ধ-মধুর প্রেমের অনুপ্রবেশ মুহূর্ত থেকে বৈষ্ণবপদাবলীর প্রারম্ভ। বৈষ্ণবমত প্রচলিত ছিল বহু পূর্ব থেকেই, রাধাকৃষ্ণের মাধুর্যরস নয়। বেদ, পৌরাণিকসাহিত্য, ভাগবত, হরিবংশ, মহাভারত কোথাও শ্রীরাধার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবেনা, শ্রীরাধা বাঙালী কবিদের মানসলোক-প্রসূত দিব্য-সৃষ্টি। ইতিহাস শ্রীরাধার অস্তিত্ব সমর্থন করেনি, বাঙালী-মানস সে-সমর্থনের অপেক্ষায় না-থেকে এমন সুষ্ঠু ও সুপরিকল্পিতরূপে হৃদয়ে গ্রহণ করেছে যে সেখান থেকে স্থানচ্যুতির সম্ভাবনা নেই। ভাব-বিলাসী বাঙালী-মানস ভক্তি-মাধুর্য দিয়ে প্রস্তুত করেছে প্রীতি-রসের সংযোগক্ষেত্র, প্রকাশের স্বাদুতা সংগতি রক্ষা করে চলেছে বর্ণবিলাসময় রসনিবিড়তার সংগে—বৈষ্ণব মহাজনরা সাধনাকে কেবল আশা-আকাঙ্ক্ষার পীঠস্থান করেননি, মধু ঢেলেছেন অরূপণ হস্তে। কল্পলোকে এসে মিলেছে অনাবিল আনন্দের সৌন্দর্য, সক্রীয়মান আত্মচেতনা। আত্মবোধের পরিস্ফুরণে আনন্দময় অনুভূতি লোভনীয় সন্দেহ নেই, সাধক ও মিষ্টিকদের আদর্শও তাই। আবার সেখানে মাধুর্যের সারসত্তা অন্তর্লীন থাকলে সে রূপায়ণ ভাব-পরিমণ্ডলের যে কত উচ্চনিস্বরে অধিষ্ঠিত তা সাধারণ-কল্পনার বাইরে। বাইরে হলেও অচিন্তনীয় নয়, সে-স্বজনী-প্রতিভা মানুষের আয়ত্তে, পার্থিব রস-বস্তুর মধ্যেই তার জ্ঞান সম্ভব। কায়াপ্রেমের মধুর উজ্জীবনে যে এই রসসত্তা, বৈষ্ণব কবি এর নামকরণ করেছেন, "রাগানুগ প্রেম"।

রাগানুগ প্রেমের প্রতীক পরমরূপবতী অনুরাগমীনা শ্রীরাধা। যে প্রেম-তন্ময়তা দিয়ে জয়দেব "রাধা" অবয়বের সৃষ্টি করেছেন, যে রূপলাবণ্য ও বিলাস-কৌতুক বিদ্যাপতি-রাধার শাশ্বত কিশোরী-আঙ্গিক, চণ্ডীদাসের চিরদুঃখী রাধার সাত্ত্বিকা-চিত্র, সেই ভাগীরথীর আকুলতা একান্তভাবে বাঙালী মানসের অবদান। বৈষ্ণবকবিরা পৃথিবী-সংস্পর্শ-বর্জিত ভাবরাজ্যের বর্ণ-বিলাসে সন্তুষ্ট হননি, নিত্যদৃষ্ট সুপরিচিত বিলাসকলা সম্ভোগনিরত রস-কলাবতী নারী রূপের সৃষ্টি করেছেন। কৃষ্ণ রাধা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নায়ক নায়িকা, সাধারণ মানুষের মত তাঁদের রংগ-রস, অথচ তার সৌন্দর্য তার আবেগ ও নিষ্টত্বে এমন গভীর আন্তরিকতা আছে যে তাকে নিরুপম বলতে অতিরঞ্জন হয় না।

সংস্কৃতে রচিত হলেও জয়দেবের "কোমলকান্ত পদাবলী" ধ্বনিমাধুর্য ও পদ-লালিত্যে বাংলা ভাষার

নিকটাত্মীয়, তাছাড়া রাধাকৃষ্ণের ভুমিষ্ট রসভাব সাধারণের মনে অনুপ্রবিষ্ট "গীতগোবিন্দের" প্রভাবেই। "গীতগোবিন্দে" প্রত্যক্ষদ্রষ্টার জ্ঞানের সহিত মিলেছে শিল্পীজনোচিত ভাবতন্ময়তা, প্রত্যক্ষদৃষ্ট নায়ক-নায়িকার মিলন ও বিরহের ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ের গতি-প্রকৃতি ভিত্তি-ভূমি করে সুষ্ঠু পরিকল্পনার নিদর্শন দেওয়া হয়েছে, ফল রস-সুন্দর রূপায়ণ, ভারতের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে স্নিগ্ধ-মাধুর্যে যুগ যুগ ধরে দিয়েছে অপূর্ব আস্বাদ।

রাধাকৃষ্ণের লীলা 'গীতগোবিন্দে' আরম্ভ হয়েছে তা নয়, সমসাময়িক কবি উমাপতিধর, 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের' মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণের বিলাসলীলা নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন, তবে পদাবলী সাহিত্যের যে চমৎকার রসানুভূতি আর বহিঃপ্রকাশের সৌষ্ঠবে রসিকচিত্ত স্বপ্নাবিষ্ট, পূর্ববর্তী সাহিত্যে তার একান্ত অভাব। পদাবলীর সাহিত্য সার্থক প্রেমলীলার ললিতভাব বিজড়িত। প্রেম যেমন একটি কেন্দ্রগত ভাবনিবিড় বৃত্তি, লীলাও তেমনি প্রীতিরংগে বিলাস গৌরবে উজ্জ্বল —জয়দেবে এ-দুটির চমৎকার সমন্বয় প্রত্যক্ষভাবে পদাবলীর সূত্রপাত করেছে। কবির মানসলোকসম্ভূত নিগূঢ় রসমাধুর বস্তু—জগতের বিচিত্র সুষমা জীবনানুভূতি, বিশ্বপ্রকৃতির মনোগ্রাহী পরিবেশ কবির আত্মগত সৌন্দর্য-প্রেরণা, গীতময় মানসিকতা,—ব্যাপকরূপ ছন্দ, সমস্ত এসে মিলেছে নরলোকের বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত এই গীতিকাব্যখানিতে। কাব্যকলা বিভাগে যা অনবদ্য কবিনৈপুণ্যে, সাধকের কাছে তা উপাদেয় ভক্তিগ্রন্থরূপে পরিগণিত। মহাপ্রভু ও উত্তরসাধক বৈষ্ণবমণ্ডলী স্বীকার করে নিয়েছেন 'গীতগোবিন্দের' অমূল্য অবদান। এর একদিকে যেমন মানবহৃদয়ের কামনা কল্পনা প্রীতিরসে স্নিগ্ধ, অপরদিকে ভক্তের অতীন্দ্রিয় অনুরাগ ভগবৎ প্রেমের অপূর্ব নিদর্শন হিসাবে অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছে শতাব্দীকে অতিক্রম করে। পদাবলী সাহিত্য গীতিপ্রাণ, এই কাব্যখানিতে তার পূর্বাভাষ; রাগবহুল ও ছন্দময় শ্লোকগুলি ব্যঞ্জনা-নিপুণ, আখ্যান-ভাগ বিষয়ে ও সমারোহের বৈচিত্র্যে গানের ভারসাম্য রক্ষা করেছে মনোরমভাবে। জয়দেবের কাব্য বাঙালী মনকে কতদূর প্রভাবিত করেছে তার একটি উদ্ধৃতি দিই :— ১

"জয়দেবের কাব্য পড়িতে গেলে চোখের সামনে ফুটিয়া উঠে গোকুল, সেখানে তমালতলে কৃষ্ণ নাচিতেছেন সঙ্গে রাধা, কৃষ্ণের চূড়ায় শিখিপুচ্ছ, গলায় পীতধড়া, রূপ দেখিয়া ভুল হয়—বুঝি বা মেঘে বিজলী চমকাইতেছে। কৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়া যমুনা যেমন কল কল বহিয়া যাইত, কোকিল মিষ্ট গান গাহিত, ময়ূরী নাচিত, জয়দেবের সুন্দর পদাবলী শুনিয়াও লোকের মনে সেইরূপ ভাবের উদয় হয়।"

রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাস এ-কাব্যের উপজীব্য তবে এ-প্রেম মানুষের পরিধির বাইরে নয়, পরিদৃশ্যমান চলতি জীবন ও জগৎ থেকে রসের অনেকখানি আহরিত। বিশ্বজগতের লীলাবৈচিত্র্য কবিমানসে রেখাপাত করেছে গভীর, প্রকৃতির বর্ণবিলাসের ছায়া তাঁর মানসপটে, এই দুইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট অমর প্রেমকাহিনী, বস্তু-চেতনা-অনাদৃত নয়। কবির সরস ব্যক্তিজীবন ও কাব্য অভিন্ন; কান্তাপ্রেমের মৃদু-মধুর প্রভাতে মানসলোকে চলছিল দিবা-পরিণতি পরম-প্রেমময়ের রসানুভূতি প্রকীর্ণ নিভৃত সাধনাও প্রাণময়। সেই প্রেম-বিহ্বল চিত্ত কিরূপে কাব্যে রূপায়ণের উৎস হয়ে দাঁড়ায় তার বর্ণনা প্রসংগে একজন লেখক বলেছেন :—

"কৃষ্ণের অপূর্ব সৌন্দর্যের ধ্যানে দেখিতে পাই প্রেমমাতোয়ারা কবিদম্পতি—জয়দেব ও পদ্মাবতী। অনুরাগ অভিমান, বিরহ, মিলনের অপরূপ ঘাতপ্রতিঘাতে দম্পতিজীবন প্রণয়লীলার মধুময় গুঞ্জিমায় নিত্য নবরঙে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিতেছে, আর সেই লহরীমালা শ্রীগীতগোবিন্দের ছন্দে শ্লোকে লীলায়িত হইতেছে, আকার পরিগ্রহ করিতেছে।" ২

যথা.

ললিতলবঙ্গলতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে।
মধুকরনিকর করম্বিতকোকিল কূজিত কুঞ্জকুটীরে॥
বিহরতি হরিরিহ সরসবসন্তে।
নৃত্যতি যুবতি জনেন সমং সখি বিরহিজনস্য দুরন্তে॥

[প্রঃ সঃ ৩।২৮

অজয় ও যমুনা, কেন্দুবিল্ব ও বৃন্দাবন, কবিপতি জয়দেব পদ্মাবতী ও লীলাময় কৃষ্ণরাধা নিঃসংশয়ে এক হয়েছেন; ধ্যানলোকে সৌন্দর্য্য অনুভব ক'রে রচনা। দৈনন্দিন জীবনে রস-তন্ময় ভাব বার বার এসেছে তাই,

নীরন্ধ্রে পথিকৈঃ কথং কথমপি ধ্যানাবধানক্ষণ
প্রাপ্তে প্রাণসমা সমাগম রসোল্লাসৈরমী বাসরাঃ॥

[ঐ ৩।৩৮

লেখা সম্ভব। মিলনের রসোল্লাস কল্পনার বস্তু নয়, উপলব্ধির। নায়ক নায়িকা মানবিক গুণসম্পন্ন, পরিবেশ একান্তভাবে পার্থিব, বাসনা—কামনা পর্যন্ত মানবোচিত, বেশ চেনা চেনা।

তামহং হৃদি সঙ্গতামনিশং ভৃশং রময়ামি।
কিং বনেঽনুসরামি তামিহ কিং বৃথা বিলপামি॥

[কৃঃ সঃ ৭।৬

দয়িত যে প্রিয়তমের অন্তরে থাকেন অনুক্ষণ, তবে বাহিরে অনুসন্ধানের প্রয়োজন কোথায়, অথবা মধুরস কখনও সৌন্দর্য্যযুক্ত নয়, সেই ইংগিত! কামনা বাসনা পার্থিব, লালিত্যের আবরণ সৃষ্টিতে চিত্ররূপ বস্তু-সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি।

বৈষ্ণবগীতিপদের সুমধুর প্রস্তাবনা করেছেন আরও দুজন মহাকবি, মৈথিল বিদ্যাপতি ঠাকুর ও নানুরের চণ্ডীদাস। ভাষার চারুচিক্যে ও ভাবের গভীরতায় বর্ণনার মনোহারিত্বে ও পরিবেশনের শিল্প-কুশলতায় এঁদের পদ পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ লিরিকের সমকক্ষ। প্রাকচৈতন্য যুগের পদাবলী লালিত্য ও ভাবব্যঞ্জনার প্রশংসা করা হয় শতমুখে, সে প্রশংসার দাবীদার এঁরা। উভয়েই গীতিপদ রচনা করেছেন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা নিয়ে, উভয়েরই রচনায় ভাবতন্ময়তা অপর সকল ধর্মমহিমা ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে ছাপিয়ে উঠে মর্যাদা দিয়েছে মনুষ্যত্বের আদর্শকে। এঁদের ব্যক্তিগত জীবন ও কামনা-কল্পনার রঙে রঙিন এক একটি অনবদ্য কাব্য; বিদ্যাপতির প্রেয়সী রাণী লছিমাদেবী সকল প্রেরণার উৎস; পূজারী ব্রাহ্মণ চণ্ডীদাস ভালবেসে ছিলেন রজকিনী রামীকে। মনে হওয়া অসংগত নয়, ব্যক্তিজীবন ও পরিপার্শ্বিকতার দুরতিক্রম্য প্রভাব লেখা আছে এঁদের সৃজনী প্রতিভায়. সংবেদনশীল মানসিকতা একজনের কাব্যের প্রাণবস্তুকে করেছে সৌন্দর্য্যের আদর্শ অপরের কাব্যে সূক্ষ্ম ভাবানুভূতির পরিচয়। সৌন্দর্য্য দেহসর্বস্বতায় পর্যবসিত হলে দূরে সরে থাকে মাধুর্যরস। এখানে ইন্দ্রিয়ের জগতকে আশ্রয় করে অতীন্দ্রিয় ভাবজগতে উপনীত হওয়া যায়, প্রকৃত সাহিত্যের সূচনা এইখান হতে। প্রাক-বৈষ্ণব যুগের 'দোহা' 'কৃষ্ণকীর্তনী' এমনকি 'চর্যাপদ' ও অশ্লীলতা দোষ দুষ্ট, তাকে সাহিত্য পদবাচ্য করতে অনেকেরই দ্বিধা থাকবে চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্যে ইন্দ্রিয়জগতের সহিত ভাবলোকের সম্বন্ধ প্রীতিকর ও ইংগিতময়।

জয়দেব বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস প্রত্যেকেই ইন্দ্রিয়সুখ পারংগম সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে কুশলী. জাগতিক ভোগোপাচারের সুধাকে ভিত্তি করে অতীন্দ্রিয় ভাবলোকের মাধুর্য উপলব্ধির প্রয়াস করেছেন। মানবিক প্রেম ও মিলন, মানবিক বিরহ ও হৃদয়ার্তি, আকুলতা, লীলার লঘু চাপল্য প্রত্যেকটি পর্যায় সজীব হয়ে উঠেছে প্রাণ-সম্পদের উপকরণ থেকে এবং ভাব-পরিমণ্ডলের অন্তর্নিহিত রসসত্তা প্রকাশে শাশ্বত রূপে সমাহৃত। এ-রূপ ব্যক্তিসীমায় নিবদ্ধ থাকলে রসময়, ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে যখন প্রেম-তন্ময়তা ব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বরূপের আভাস পায়। জয়দেবের কৃষ্ণরাধা মিলন শৃংগার-সরস—প্রকৃতি ধর্মের অপরিমেয় সৌন্দর্য্যে অম্লান, কবিদৃষ্টি অত্যন্ত সজীব ও সুনিষ্ট। বিদ্যাপতি ও সংগে দীনেশ সেন বলেন, "এই রাধা জয়দেবের রাধার

স্থায় শরীরের ভাগ অধিক, হৃদয়ের ভাগ অল্প। কিন্তু বিরহে পৌঁছিয়া কবি ভক্তি ও প্রেমের গীতি গাহিয়াছিলেন, তখা হইতে কবি অলঙ্কার শাস্ত্রের সহিত সম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া পরম ভাগবত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার উপমা ও কবিতার সৌন্দর্য্য চক্ষের জলে ভিজিয়া নব লাবণ্য ধারণ করিল। বিরহ ও বিরহান্তর মিলন বর্ণনায় বিদ্যাপতি বৈষ্ণব কবিদের অগ্রগণ্য "৩

চণ্ডীদাস অদ্বিতীয় ভাবগভীরতায়, অতীন্দ্রিয় বেদনার প্রকাশে; চণ্ডীদাসে দৈহিক রূপের একটি স্নিগ্ধ জ্যোতি মনকে বিস্ময়-চকিত করে পরমরূপের উপলব্ধিতে, উপমা অলংকারে যে ভাব ঢাকা পড়বার নয়, দিব্য-সাধনায় উদ্বুদ্ধ করে মনকে, সে সাধনা সৌন্দর্য্যেরই হোক বা মধুরসেরই হোক। বাঙালীমানসের ভাবালুতা ও মিষ্টরসের প্রাধান্য এই কবির রচনাকে অতি প্রিয় করেছে সাধারণ বাঙালীজনের কাছে, তাঁর ভাষাতেই বলা চলে,

তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী সদাই ভাবনা মোর।
করি অনুমান সদা কাঁর গান তব প্রেমে হয়ে ভোর॥
চণ্ডিদাসে কয় ঐছা পিরিতি জগতে আর কি হয়।
এমন পিরিতি না দেখি কখন ইহা না কহিলে নয়॥

আবার অলঙ্কার—ঐশ্বর্যে কমনীয় পদছন্দে—জয়-দেবের তুলনা মেলা ভার।

রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্॥
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।
নীলপয়োধর পরিসরবর্ত্তিন চপলকর যুগশালী॥

[গীঃ গোঃ পঞ্চমঃ ১১

এর সহিত বিদ্যাপতির ভাষার মিষ্টিসুর ও ভাবোচ্ছ্বাসের বেশ মিল আছে:

আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইনু
পেখনু পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মাননু
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মাননু
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
• •
অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।

প্রিয়মিলনের সুখানুভূতি চণ্ডীদাসে আরও সূক্ষ্ম:

বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে॥
অঙ্গে দিয়া চন্দন বলে মধুর বচন,
আর যায় বাঁশী সুমধুরে।
তৃতীয় প্রহর নিশি মুই কৃষ্ণ কোলে বসি
নেহারিনু সে চাঁদ বদনে।
ঈষৎ হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি,
বিয়াকুল হইল মদনে॥

বৈষ্ণব কবিদের নিকট পূর্বরাগ একটি প্রিয় বর্ণনা। কুল শীল মান ত্যাগ করে যে নায়িকা স্বতঃপ্রবৃত্ত আত্মসমর্পণে উন্মুখ তার আকর্ষণ-উন্মাদনা কত অধিক তা সহজেই অনুমেয়।

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

এই অবশ-করা ভাব-উপলব্ধি শুধু সুন্দর নয় মাধুর্যে নিরুপম।

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥

আকুল স্পর্শে যে সর্বস্ব দিতে ইচ্ছা হয়:—

নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার সেখানে থাকিয়া গো
যুবতী-ধরম কৈছে রয়॥

সমস্ত বাংলা সাহিত্যে ভাবমাদকতাপূর্ণ পদ এমন একটিও নেই, শুধু ইন্দ্রিয় দিয়ে এ-অপূর্ব প্রেমরস আস্বাদ করা কঠিন।

প্রিয় মিলনে আনন্দরস পানের অভিলাষ চরিতার্থ, পারিপার্শ্বিক জনসমাজ ও বিশ্বজীবনের সহিত সম্পূর্ণ নতুন রূপে সম্পর্ক স্থাপিত হতে আরম্ভ করে, এ-রূপান্তর কেবল ব্যক্তিমনে নয় সারা বিশ্ব জুড়ে এর গতি অব্যাহত। জয়দেব ও বিদ্যাপতিতে আনন্দের এই আসক্তি-ভরা ছবি চমৎকার :

বিগলিতবসনং পরিহৃতরসনং ঘটয় জঘনমপিধানম্।
কিশলয়শয়নে পঙ্কজনয়নে নিধিমিব হর্ষনিধানম্॥
[গীঃ গোঃ পঞ্চম। ১১। ১৪]

আপনা নিহরি নিহরি তনু মোর।
দেই আলিঙ্গন ওএ বিভোর॥

বা,—

দিনে দিনে উন্নত পয়োধর লীন।
বঢ়ল নিতম্ব মাঝে ভেল খীন॥ [বিদ্যাপতি]

পার্থিব রসানন্দের সন্ধান চণ্ডীদাসে অনুপস্থিত সেই তবে সে উল্লাস সংযত সংকেতে বন্দী :

এমন পীরিতি কভু দেখি নাই শুনি।
নিমিখে মানয়ে যুগ, কেড়ে দূর মানি॥
সমুখে রাখিয়া করে বসনের বা।
মুখ ফিরাইলে তার তরে কাঁদে গা॥
একতনু হইয়া মোরা রজনী গোঙাই।
সুখের সাগরে ডুবি অবধি না পাই॥

সম্ভোগ-বিলাস বর্ণনা বৈশিষ্ট্যে ও সুখব্যঞ্জক অনুভূতিতে পূর্ণতার সন্ধান দিচ্ছে এ-স্বীকার করতে হবে। আধুনিক রুচিসম্মত হয়ত নয় তবে রসমাধুর্য অক্ষুণ্ণ। জয়দেব সৌন্দর্যসাধনার কবি, বিদ্যাপতি বিলাস-লালিত্যের, চণ্ডীদাসে দৈহিক বিরহ মিলনের অনুভূতি ভাবলোকের স্পর্শসঞ্জাত, ইন্দ্রিয় সুখভোগ করছি অথচ নৈর্ব্যক্তিক নির্লিপ্ততা রয়েছে তনুমন আচ্ছন্ন করে।

বাঙালী একটু বেশী ভাবুক, ভক্তিপ্রবণতা তুলনায় অধিক, মর্মবেদনা নিরুদ্ধ রাখা স্বভাব-বিরুদ্ধ। জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলীর সুমধুর সংগীতের পীযূষধারা মন ভিজিয়ে দিল তবে হৃদয়কে অভিভূত করেনি। প্রাণের আকুলতা তত বেশী ছিল না যত নিরাবরণ বিলাসলীলা, বিদ্যাপতির শব্দ নির্বাচন পদলালিত্য ও গীতিময় সাবলীল ভংগী প্রাণের রস করে তুলেছে রাধাকৃষ্ণলীলাকে। আত্ম-সমর্পণ, পরিপূর্ণ আত্মদান, ভগবৎ প্রেমের অপরিহার্য পন্থা চণ্ডীদাসে বাঙ্ময়রূপে প্রতিভাত। চণ্ডীদাস গ্রাম্য কবি, অমার্জিত কথা, নিরাবরণ অশ্লীল মনোভাবও পাওয়া যায়, তবে যে মধুরস কান্তাপ্রেমের সারসত্য, অনুরাগে সম্ভোগে যে রূপতন্ময়তা মানুষকে প্রায় উন্মত্ত করে তোলে সেই অতি পরিচিত একান্ত নিজস্ব মনুষ্যভাবটিই অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরে আশ্রয় দিতে পারে—একথা তিনিই লিখিয়েছেন। দ্বিধা নেই, ভয় নেই, মনোবিকারের নেই কোন প্রয়োজন, শুধু মধুমাখা প্রেম দিয়ে শুধু হৃদয়-ভরা ভক্তি দিয়ে অপাংগে আত্মনিবেদন, উন্মুক্ত হয়ে যায় নিখিলরসামৃতের আনন্দময় ভোরণদ্বার। কিন্তু সে আত্ম-নিবেদন সহজ নয়, ইউরোপের জ্ঞানরাজ্যে একমাত্র মনীষী বার্গসঁ ভাবরাজ্যের এই গভীরতার সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর কথায়—

Let us seek, in the depths of our experience, the point where we feel ourselves most intimately within our own life..... we feel the spring of our will strained to its utmost limit. We must, by a strong recoil of our personality on itself, gather up our past which is slipping away, in order to thrust it compact and undivided, into a present which it will create by entering.....But the more the feeling is deep and the coincidence complete, the more the life in which is replaced us absorbs intellectuality by transcending it."

[Creative Evolution, 210-11.]

কিন্তু সাধারণ মানুষ কিসের প্রেরণায় আত্মসমাহিত তাত্ত্বোপলব্ধির রাজ্যে যাবে! যেতেই হবে, কারণ,

শ্যাম সুন্দর, শ্যাম আমার, শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন, শ্যাম প্রাণ মন, শ্যাম সে গলার হার॥
শ্যাম ধন বল, শ্যাম জাতি কুল, শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন অমূল্য রতন, ভাগ্যে মিলাইল বিধি॥

বার্গস'-দর্শনের অনবদ্য ভাষায়:

"From this Ocean of life, in which we are immersed, we are continually drawing something, and we feel that our being, or at least the intellect that guides it, has been formed therein by a kind of local concentration. Philosophy can only be an effort to dissolve again into the whole." [Ibid, 202.]

চণ্ডীদাসে এ রূপলোক সুস্পষ্ট:

তোহার লাগিয়া, যাই বনে বনে,
সুবল বেশ ধরি হে।
তিলে শত যুগ, ধরণনে মানি,
ছেড়ে কি রহিতে পারি হে॥
মুখের বরণ, কস্তুরী চন্দন,
হৃদয়ে মাখিয়ে রাখি।
ও দুটি চরণ পরাণে ধরিয়া
নয়ন মুদিয়া থাকি॥

সৌন্দর্য্যাসংগ ও ভাব-তন্ময়তার দিক থেকে এরূপ পংক্তি যে কোন সাহিত্যের গৌরব। কবি জয়দেব রাধারূপ সুবহুর কান্তি ধ্যানতুলিকায় ফুটিয়ে উপহার দিয়েছেন রসিকচিত্তকে; মধুর আবেগ রূপযৌবনের সুন্দর বিলাস হলরসের মনোহর শিল্প ও আকুলতার জন্ম বাংলা সাহিত্য বিদ্যাপতির নিকট ঋণী, নারীর ভালবাসা কি বিচিত্ররূপে প্রকাশ পায় বিদ্যাপতিই তা প্রথম দেখিয়েছেন; চণ্ডীদাসের আকুতি আর আকাঙ্খা, বেদনাবিধুর মানবী, অশ্রুসজল প্রেমময়ী নারীর প্রতি পুলকিত বিস্ময়ে চেয়ে থাকি।

মরিব মরিব সখী নিশ্চয় মরিব,
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব।

কোমলাংগী তরুণীর কাজলকালো চোখ ভেসে ওঠে, নিভৃতে অলক্ত রাগাঙ্কিত কপোলে ঝরে ঝরে পড়া চোখের জল, তীব্র মর্মবেদনায় কাতর হৃদয়—প্রকাশের পথ নেই উপায় নেই। বাঙালী বধূর চরিত্র সৃষ্টি করতে ঔপন্যাসিকরা কি এই শাশ্বত রূপটিই ব্যবহার করেননি! চণ্ডীদাসের রাধা রূপক, মানসলোকের যোগিনী, প্রেম সাধনার প্রতিরূপ; নৈরাশ্যে নয় আত্মত্যাগে, ব্যাকুলতায় নয় বিশ্বকল্যাণের উপলব্ধিতে এ-চিত্র ভাস্বর। জয়দেবে ও চণ্ডীদাসে নারী হৃদয়ের ঐকান্তিক ভালবাসা ফুটে উঠেছে গভীর ভাবে। কি বিরহে কি মিলনে, মানে বা আত্মসমর্পণে তীব্র আবেগ মিশ্রিত ব্যক্তিগত অনুভবের আন্তরিকতায় তুলনাবিরল, প্রেমময়ী শাশ্বত নারীচিত্ত এর উদ্গাতা। এই অবিমিশ্র প্রেমপ্রবণতা বাইরের দুঃখ-বেদনাকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করে, উতলা হয়ে ওঠেনা, অপরিসীম ধৈর্যে প্রতীক্ষানিরত চিরকাল হৃদয়ের সমস্ত আশা নিয়ে। বিশ্বকবির একটি তুলনামূলক সমালোচনা আছে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস সম্বন্ধে, একটি পংক্তি উদ্ধার করি তা থেকে:—

"বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি! বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতি ও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ, কিন্তু হৃদয় আরও গভীর।"

জীবন যেন একটি দুরন্ত তীর্থযাত্রা; কবির মনে চণ্ডীদাসের ভাব স্থায়ী বাসা বেঁধেছে তার পরিচয় এই পদ্যাংশটিতে:—

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে, ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙীন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।
আমার লজ্জা ভাঙে যখন পায় দেবার মত ধন।
যখন রূপ ধরিয়ে বিশ্বময় প্রাণের আরাধন।
আমার বন্ধু যখন রাঙিয়েদেবে পরশ তারে করবে এ
ফুরিয়ে গিয়ে দলগুলি সব চরণে তার লুটবে।

স্পষ্টতই বৈষ্ণবভাব প্রভাবিত। উত্তর কালের বাঙলা সাহিত্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব (অর্থাৎ মিলনাত্মক ও শাশ্বত প্রেমের সংঘর্ষ, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা অসামর্থ্য বৈরাগ্যের গ্লানিকে অপসারিত করে মনুষ্যত্বের চিরন্তন বৈরাগ্য ও ত্যাগ ভাবই ধ্বনিত হয়েছে, সে বৈরাগ্য সংযম ও পরার্থপরতার মহিমায় উজ্জ্বল আবার বেদনার মিষ্টত্ব ও আছে।

কহিবে রাধারে
সদাই আছি যে বাঁধা।
করে করি কর তলি নিরন্তর
এ-দুই অক্ষর রাধা।

রসিক সুজনের মনে স্থায়ী রেখাপাত করেছে এ-উক্তি। এবং চণ্ডীদাসের বৈষ্ণবকবিদের রাধা বেশবাস বিন্যাস, রাধাকৃষ্ণ লীলা ও অন্তর্ভাবনি মাধুর্যে ও চাক্ষুষে রতিভাব-বৈচিত্র্যকে অনুসরণ করেছে। নায়ক-নায়িকার নিরাবরণ সম্ভোগেচ্ছা বৈষ্ণবগোস্বামীরা অলৌকিক বলে প্রচার করেছেন কিন্তু রাধার সৌন্দর্যমাধুর্য-যুক্ত অনন্ত সাধনা যে সর্বমানুষের সর্বকালের শক্তি-সাধনার প্রেমবিলাস, প্রেমময়ী শ্রীরাধা যে মানবমনের চিরন্তন নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি বাঙালীশ্রেষ্ঠ শ্রীচৈতন্য এ-কথা সম্পূর্ণ বুঝেছিলেন। তাই রাধাভাবকে সাধনার শ্রেষ্ঠ রূপ বলে পরিচয় দিয়ে রাধা ভাবে ভাবিত হয়ে সারাজীবন সন্ধান করে বেড়িয়েছেন পরম আনন্দময়ের।

(১) আমাদের সাহিত্য : শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ :
(৩) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য : দীনেশ চন্দ্র সেন

[৬]

মায়ের সম্পর্কে ডক্টর চৌধুরী যা নির্দেশ দিয়েছিলেন, কোনদিক দিয়েই তা আর শেষ পর্যন্ত রক্ষা ক'রে চলা তনুশ্রীর ছেলেমানুষি আর একগুঁয়েমিই তার প্রধান কারণ। বিষয়টা নিয়ে তনুশ্রীকে যে কিছু ব'লবো কিম্বা প্রয়োজন হ'লে শাসন ক'রবো—মনের এমন অবস্থা ছিলনা। ফিট সেরে গিয়ে আবার কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে এবারে বেশ কিছু সময় নিল মায়ার।

কিন্তু এ ক'দিনে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম—তনুশ্রীও ঠিক প্রকৃতিস্থ নেই। মাঝখানে কদিন একরকম কারুর সঙ্গেই ভালো ক'রে কথা বলেনি সে, যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখেই চ'লেছে।

লক্ষ্যে প'ড়লো—বাবা একদিন স্নেহভরে তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বসালেন, তারপর জিজ্ঞেস ক'রলেন, 'ক'দিন ধ'রে তোমার কি হয়েছে বলো তো বৌমা?'

কথা না ব'লে মাথা নেড়ে তনুশ্রী বুঝোতে চাইলো যে, কিছু নয়।

বাবা ব'লুলেন, 'কিছু যদি না-ই হবে, তবে ক'দিন ধ'রে এমনি ক'রে র'য়েছ কেন? এখনও ছেলেমানুষ, হাসবে, কথা ব'লবে, ফুর্তি ক'রবে। সংসার করতে গেলে অনেক সময় অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে; এসব ঘটনাকে কখনও মনে ঠাঁই দিতে নেই।'

উত্তরে এবারও কিছু-একটা বললো না তনুশ্রী, মাথা নিচু ক'রে নীরবে ব'সে রইল।

থেমে পুনরায় বাবা ব'লুলেন, 'তোমার মামা নিশিকান্ত সম্পর্কে—আমার বেয়াই হয়। তা ছাড়া তার যা বয়স, তাতে আমার মুখের উপর ওভাবে কিছু-একটা রূঢ় উক্তি ক'রে যাওয়া তার পক্ষে শোভন হয় নি। আমার আর খোকার মার দিক দিয়ে কোনো ত্রুটি আছে ব'লে আমি বিশ্বাস করিনা। খোকার মার শরীরের এই অবস্থায় এতবড় আঘাতটা তাঁর না পাওয়াই উচিত ছিল।'

এবারে তনুশ্রী ব'লুলো, 'মামার অপরাধের সীমা নেই, তিনি যে এতটা বাড়াবাড়ি ক'রে যাবেন, ভাবতে পারিনি।'

—'কিন্তু যিনি ভাব্‌বার, তিনি ঠিকই ভেবেছিলেন।' ব'লতে গিয়ে নিজেকে যথাসম্ভব সংযত ক'রে নিলেন বাবা। প্রসঙ্গতঃ তিনি তনুশ্রীর মার কথাটাই উল্লেখ ক'রতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শ্বশুর হ'য়ে পুত্রবধূর মুখের উপর অতবড় রূঢ় কথাটা শ্রুতিমধুর হবেনা মনে ক'রেই থেমে গেলেন। থেমে গিয়ে ভালোই ক'রলেন, নইলে তনুশ্রীর বোধ করি এবারে আর অশ্রু রোধ করা সম্ভব ছিল না।

উত্তরে সম্ভবতঃ কিছু-একটা ব'লতে যাচ্ছিল সে, বাধা দিয়ে পুনরায় বাবা ব'লুলেন, 'তোমার বোধ করি এখানে মন টিকছেনা মা, খোকা নিজেও চিরকাল পাগ্‌লাটে ধরণের, খোকাকে কিছুটা সাম্‌লাতে পারলে অনেক বেশী সুখী হ'তে পারতে তুমি। এ সুখকে তোমার নিজের হাতে তৈরী ক'রে নিতে হবে মা।'

কথাটা কানে আসায় মনে মনে বড় হাসি পেলো আমার। বাবা এতদিনে তাঁর ছেলের আসল পরিচয়টা তবে জানতে পেরেছেন। সংসারে পাগল ব'লে কতিপয় হবার মতো সুখ আর কিছুতে নেই। শুনে নিজেকে এখানে যেন অনেক বেশী সুখী বলেই মনে হলো।

বাবার কথার জবাবে তনুশ্রীর মুখে কিন্তু আর কথা জোগালো না। পুনরায় মাথা নিচু ক'রে নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে নখ দিয়ে কি একটা খুঁটতে লাগলো।

থেমে বাবা ব'লুলেন', 'তোমার মা যদিও রাগ ক'রে আমাদের কাছে চিঠি লিখেছেন, কিন্তু এ তো আর চিরকালের রাগ হ'য়ে থাকতে পারেনা। তাঁর একান্ত ইচ্ছে ছিল তোমাকে নিয়ে কিছুদিন কাছে রাখবার; যাওনা, এরপর সুযোগমতো কিছুকাল গিয়ে থেকে এলে তোমার মনেরও পরিবর্তন হবে।'

তনুশ্রী সেই যে চুপ ক'রলো, তারপর আর একটি কথাও উচ্চারণ ক'রল না। পরে একসময় ঘরে এসে একরকম অতর্কিতেই আমাকে জিজ্ঞেস ক'রলো, 'বাবার কথা কিছু শুনতে পেয়েছ কি?'

ভেবেছিলাম—অস্বীকারই ক'রবো, কিন্তু পারলুমনা। ব'লুলাম, 'পেয়েছি।'

তনুশ্রী ব'লুলো, 'আমাকে নিয়ে তোমরা পুতুল খেলতে সুরু ক'রেছো, দেখতে পাচ্ছি।'

ব'লুলাম, 'কথাটা ঠিক পরিষ্কার হ'লো না।'

একদণ্ড স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে বিনা দ্বিধাতেই তনুশ্রী ব'লুলো, 'জীবনে আমি লেখাপড়া বেশীদূর শিখিনি ঠিকই, কিন্তু তাই ব'লে বোকা নই। মনে কোরো না—তোমরা যা কিছু করো কি বলো, আমি কিছু বুঝতে পারিনে।'

ব'লুলাম, 'কথাটা উঠেছিল—বাবার কথা আমি কিছু শুনতে পেয়েছি কিনা, তার সঙ্গে একথার সত্যি কি কিছু যোগ আছে?'

—'না, যোগ নেই, সব কিছুই বিয়োগ।' চাপা কণ্ঠে যতটা উষ্মা প্রকাশ করা সম্ভব, তাতে ত্রুটি রাখলো না তনুশ্রী। বলুলো, 'বিয়ে হ'য়ে আচ্ছা মজায় পড়েছি যাহোক। যেমন আমার ডিহিরী, তেম্‌নি আমার এখানে। তার চাইতে পারো এক গাছা দড়ি এনে দিতে, কড়িকাঠে ঝুলে তবে নিশ্চিন্ত হই!'

বিষয়টাকে যথাসম্ভব লঘু করতে চেয়েই ব'ললাম, 'সে কি, তুমি কি শেষ পর্যন্ত আমাকে খুনের দায়ে ফেলতে চাও নাকি?'

—'বাকীই রেখেছ বড়ো খুন ক'রতে! দায় নিয়ে এখন আর আদিখ্যেতা ক'রতে হবে না। এমন খুন যেন আমার সাতজন্মের শত্রুও হয় না।' ব'লে সঙ্গে সঙ্গেই চোখে আঁচল চাপা দিল তনুশ্রী।

অদ্ভুত স্বভাব তনুশ্রীর মতো মেয়েদের। কথা যখন এদের ভাষার দীনতায় রুদ্ধ হ'য়ে আসে, তখন অশ্রুই থাকে একমাত্র শেষ ভাষা। সংসারে এ ভাষার মূল্য অনেকখানি হ'লেও আমার মনে কিন্তু একটুকুও রেখাপাত ক'রলো না। এর আগেও কয়েকবার এমনই নাটকীয় দৃশ্য ঘ'টেছে। এখানে দৃশ্যান্তর থাক্‌লেও দৃশ্যান্তরের কিছু বোঝাই নেই। বরং মুহুর্মুহুঃ একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তিতে মন কণ্টকিত হ'য়ে ওঠে। সেটুকু বোধ করি তনুশ্রী বুঝলো না, এবং বুঝবার চেষ্টাও ক'রলো না।

এরপর সপ্তাহ দু'য়েক কেটে গেলে পূর্বেকার ইতিহাসেরই আবার খানিকটা পুনরাবৃত্তি ঘট্‌লো।

সকালের দিকে পাচক ঠাকুর জানালো—ইতিমধ্যে এখানে ওখানে খোঁজাখুঁজি করে সম্প্রতি স্বতন্ত্র একটা চাকরীর ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছে, এবারে তার জলব মিটিয়ে দিলেই এবাড়ী থেকে বিদায় হ'তে পারে।

ব'ললাম, 'কথাটা আমাকে না ব'লে কর্তাবাবুকে গিয়ে বলো।'

পাশেই তনুশ্রী ব'সে ব'সে কি একটা সূচির কাজ ক'রছিল, মুখ তুলে ব'ললো, 'তোমাকে গিয়ে আর

ব'লতে হবে না, অপেক্ষা ক'রো, আমি গিয়েই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

হাতের কাজ ফেলে রেখে তন্দ্রে পাশ কাটিয়ে উঠে গেল তনুশ্রী।

পাচক ঠাকুর বললো, 'মাইনেটাই কি সব? এতকাল কাজ ক'রলাম, তার জন্যে যাবার সময় কি দু'টো টাকা বকশিস্‌ও মিল্‌বে না দাদাবাবু?'

বললাম, 'আমার নিজের থাক্‌লে দিতাম, কিন্তু উপায় নেই। যাও না, গিয়ে মার কাছে দু'দণ্ড ব'সে কিছু বলো না?'

কথা রাখলো পাচক ঠাকুর। কিন্তু গিয়ে মার মুখের দিকে তাকিয়ে বকশিসের কথাটা কিন্তু একটি বারের জন্যেও উচ্চারণ ক'রতে পারলো না।

মা ব'ললেন, 'এ সহরেই যখন আছো, তখন মাঝে মাঝে এসে আমাকে দেখে যেয়ো; ক'দিন আছি এ সংসারে কিছু ঠিক নেই।'

পাচক ঠাকুরের চোখ দু'টো কেমন যেন বড় ছল-ছল ক'রে উঠলো এবারে। বললো, 'কাজে কর্ম্মে অনেক সময়ে অনেক ত্রুটি হ'য়েছে মা, কোনোদিন মুখ ফুটে ক্ষমা চাইনি। আজ আমার সব ত্রুটি ক্ষমা করুন।'

—'ছিঃ ত্রুটি কেন ক'রবে!' কাতরকণ্ঠে মা ব'ললেন, 'আমি অসুখে পড়ে থাকায় তোমাকে বরং অনেক বেশী পরিশ্রমই ক'রতে হ'য়েছে, তার জন্যে তোমাকে তো কিছু হাতে ধ'রে দিতে পারিনি। অসুখে-ডাক্তারেই সব কিছু বেরিয়ে যাচ্ছে; তোমার কর্ত্তাবাবুর মুখের দিকে অবধি আজ আর ভালো করে তাকানো যায় না, অর্থকড়ির চিন্তায় এরই মধ্যে যেন দশ বছর বয়স বেড়ে গেছে তাঁর।'

কথা না ব'লে এবারে মাথা নিচু ক'রে নিল পাচক ঠাকুর। তারপর হিসেব-পত্র মিটে গেলে একসময় যুক্তহাতে মার উদ্দেশে নমস্কার ক'রে এবাড়ীর সীমানা ছাড়িয়ে পথে বেরিয়ে প'ড়লো সে। ফুলকাটা একটা টিনের সুটকেশ আর অর্দ্ধপরিচ্ছন্ন একটা কুঞ্চলীতে জড়ানো তেলচিটে একটা বালিশ। সম্বলের মধ্যে এই নিয়েই এতকাল এবাড়ীতে সুখশয্যা রচনা ক'রে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় রাত্রির প্রহরগুলিকে কাটিয়ে দিচ্ছিল সে। এ বাড়ীর অতীত ঐতিহ্যের একটা মূর্ত্তিমতী ব্যঙ্গ। ইচ্ছে হচ্ছিল—তার মতো আমিও এবাড়ীর এই রুদ্ধশ্বাস ছেড়ে দূরে কোথাও পালিয়ে যাই। তন্ত্র সামন্ততন্ত্রের ব্যর্থ অহঙ্কারের পিঁঠে পিঁঠে জড়িয়ে প'ড়ে আমি যে ক্রমেই আমার দীপ্ত যৌবনের জাগ্রত পৌরুষকে অবমাননা ক'রে চ'লেছি! এ অপমান কবে না-জানি বিষ্ণুভিরাসের মতো ফেটে প'ড়ে তার গলিত লাভায় আমার সমস্ত চেতনাকে একেবারে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলবে! কিন্তু একটি ক্ষেত্রে পাচক ঠাকুর যে আমার চাইতে কত সার্থক—তা এই মুহূর্ত্তে উপলব্ধি ক'রে একটা দারুণ গ্লানিতে জর্জ্জরিত হ'য়ে মরলাম। সে অনায়াসে তার জীবিকার সংস্থান ক'রে নিতে পারলো। মাটির পৃথিবী তাদের কোনোদিন বঞ্চিত করে না; যাদের মাথা নেই, যারা চিরদিন হাতে কাজ ক'রে এসেছে, দু'বেলা পেট ভরে দু'টি আহার পেলেই যারা সুখী, পৃথিবীর কোনো দরজাই কোনোদিন তাদের কাছে বন্ধ নয়। সারা দুনিয়ার মালিকানা-শক্তি চিরকাল তাদের কাছে ক্ষমতার দাস হ'য়ে আছে। মূল্য নেই শুধু আমার মতো হাজার হাজার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত গ্রাজুয়েটদের, মেয়েদেরও আজ সর্বত্র একটা প্রবেশাধিকার দাঁড়িয়ে গেছে; তার উজ্জ্বল প্রমাণ অণিমা। প্রবেশাধিকার নেই শুধু আমার মতো শিক্ষিত বেকার ছেলেদের। চাকরীর জন্য ঘুরে ঘুরে জুতোর গোড়ালী ক্ষইয়ে ফেল্‌লেও সৌভাগ্যলক্ষ্মী যথাসম্ভব তাদের সঙ্গে ব্যবধান রচনা ক'রেই চলে। তার একটা স্পষ্ট উদাহরণ কি আমি নিজেই নই?

মনটা স্বভাবতঃই বিষণ্ণ হ'তে প'ড়ছিল। চেষ্টা করলাম কোনো একখানি বইয়ের মধ্যে মনটাকে ছেড়ে দিতে, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই পাকা গৃহিণীর মতো তনুশ্রী এসে ফরমাস ক'রলো, 'যাও, কুঁড়ের বাদ্‌শা হ'য়ে বইয়ের

পাতার মুখ গুঁজে বসে না থেকে বাজারটা একবার ঘুরে এস। মার জন্যে দু'টো পাতি লেবু, এক পো আঙুর আর দু'টো বড় দেখে বেদানা আনতে হবে। সেই সঙ্গে পারো তো তরকারীর বাজারটাও একবার ঘুরে এস।'

পাচক ঠাকুরকে তুলে দিয়ে হেঁসেলের ভারটা ইতিমধ্যেই তনুশ্রী নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল, তরকারীর বাজারের উল্লেখটা সেই কারণেই ক'রলো। কোনোদিন যে নিজে বাজারে গিয়ে কখনও আমি কেনাকাটা সম্পর্কে কিছু-একটাও অভিজ্ঞতা অর্জন করিনি, একথাটা কিন্তু তনুশ্রীকে মুখ ফুটে বলতে পারলুম না। তার সম্ভাষণের দিকটা লক্ষ্য করে মনে মনে বরং কিছুটা হাসিই পাচ্ছিল। সংসারে আমার সব চাইতে ত্রুটি কোথায়, তা বোধ করি আমার চাইতে আর কেউ ভালো জানে না, কুঁড়ের বাদশা ব'লে কেউ কোনোদিন আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে এমন কথাও মনে প'ড়লো না।

অপেক্ষা করবার অবকাশ ছিল না তনুশ্রীর, আমার হাতের কাছে একখানি পাঁচ টাকার নোট তুলে ধ'রে বললো, 'এই নাও, পারতো দাম-দস্তুর ক'রে অল্প পয়সার মধ্যেই সব সেরে এসো।'

ব'ললাম, 'বাড়ীর চাকর যখন নই, তখন হিসেবের কড়াকড়িটা হঠাৎ এত উচিয়ে তুলবারই বা হেতু কি?'

মুখর কণ্ঠেই তনুশ্রী বললো, 'চাকর ভিন্ন কি! বাপের সংসারে চাকর হয়েই তো আছো তুমি। ছেলের মতো অধিকার নিয়ে কোথাও আছো ব'লে তো দেখতে পাচ্ছি না!'

শুনে স্বভাবতঃই মনটা তিক্ত হয়ে উঠ্‌লো। এ যে কোথায় আঘাত ক'রলো তনুশ্রী, তা সে নিজেও বুঝতে পারলো না।

উত্তরে কিছু-একটা শক্ত কথাই উচ্চকিত কণ্ঠে উচ্চারণ করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু মুখে এসেও বেধে গেল। ভেবে দেখ্‌লাম—অপ্রিয় হলেও হয়ত অতি বড় কথাটাই এতদিনে তনুশ্রী ব্যক্ত ক'রলো। অপরাধ তার নয়, অপরাধ আমার নিজের অদৃষ্টের, আমার কৃতকর্মের। ব্যক্তিত্বের অধিকারে নিজের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে চ'লতে পারলে আজ তনুশ্রীর স্বভাবেও খানিকটা লক্ষ্মীশ্রী লক্ষ্য ক'রে আশ্বস্ত হতে পারতাম, কিন্তু ইতিহাসের পাতা কবে যে কোথা দিয়ে বেঁকে গেছে, চোখে পড়েনি। যখন প'ড়লো—তখন আমি আর আমার পূর্বের আমি নই। মৃত অতীতের একটা বিকৃত 'ফসিলে' তখন আমার সমস্ত সত্তা রূপান্তরিত।

কথা শেষ ক'রে তনুশ্রী আর একদণ্ডও অপেক্ষা করলো না, বাড়ীর ভিতরেই কোথায় একদিকে চ'লে গেল। অপেক্ষা করলেও তার কথা নিয়ে অবশ্য তার সঙ্গে আর দ্বিতীয়বার তর্ক তুলতাম না। ব্রাকেট থেকে ছাতা-কাটা ফতুয়াটাকে আলগোছে টেনে নিয়ে নীরবেই বাজারের পথে বেরিয়ে পড়লাম।

ফিরে এসে বাড়ীর গেটে পা দিতেই অকস্মাৎ দেখা হ'য়ে গেল শীলার সঙ্গে। অনেকদিন পর আজ এই প্রথম আবির্ভাব তার। এসে গেটেই অপেক্ষা করছিল। ব'ললাম, 'এত অল্পদিনেই সুমন্তদাকে ভুলে যেতে পারলে তো শীলারাণী?'

শীলা ব'ললো, 'কে কাকে ভুলেছে, তা দেখাই আছে। মাঝখানে ক'দিন অসুখে ভুগ্‌লাম, কই, একটিবারও তো দেখ্‌তে গেলেন না!'

শুনে দুঃখ হ'লো। ব'ললাম, 'মাথার কি আমার কিছু ঠিক আছে! নইলে তোমাকে দেখতে যাবো না, এও কি একটা কথা? এদিকে মার অসুখটা ক'দিন ধ'রে এমন বাড়াবাড়ি গেল যে,—এক দণ্ডও যদি কোনোদিকে মন দিতে পারি!'

কথাটার পিছনে আংশিক সত্য থাকলেও আসলে যে মিথ্যে, এটুকু বুঝলো না শীলা। ব'ললো, 'অসুখের ঘোরে সেদিন নাকি দিদির আর আপনার নাম ক'রে আমি খুব চেঁচিয়ে উঠেছিলাম! রেমিশন হ'লে জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'সুমন্তদা আসে নি?' মা ব'ললেন, 'কই, না তো?'

শুনে মনের দুঃখটা এবারে হাহাকারে ভেঙে পড়লো। শীলা কিন্তু একটি দিনের জন্যও আমাকে ভুল বোঝে নি।

তার কৈশোরের সমস্ত সত্তা দিয়ে আমাকে তার নিজের দাদার মতো ভালো বেসেছে ব'লেই অকপটে তার মনের শিশুচপলতাকে অনায়াসে আমার কাছে তুলে ধরতে পেরেছে। আজও তাতে কিছুমাত্র দ্বিধা ক'রলো না।

বাজারের সওদা তনুশ্রীর হাতে তুলে দিয়ে এসে ব'ললাম, 'দিদির খবর বলো, চিঠি পাও তো মাঝে মাঝে, আছে তো ভালো?'

চিরাচরিত সেই একই প্রশ্ন।

শীলা বললো, 'শুনেছি ভালো নেই, ইদানিং মাথার নাকি কেমন একটা রোগ দেখা দিয়েছে, আগেকার মতো আজকাল আর বেশীক্ষণ পড়াশুনো করতে পারে না। লিখেছে—সামনের গরমের ছুটিতে দেওঘর না ভাগলপুর কোথায় যাবে, সুবিধে মতো বাড়ী এসেও ক দিন থেকে যেতে পারে। কেন, দিদিকে আপনি চিঠি লেখেন না?'

—'অনেকদিন লিখিনি, এবারে লিখবো।' কথাটা ব'লে আত্মপ্রতারণায় নিজেকেই নিজে অপমান ক'রলাম।

শীলা ব'ললো, 'আর লিখেছেন! এরপর দেখবেন—আপনার চিঠি নিতে নিতে দিদি নিজেই কবে এসে উপস্থিত হ'য়েছে।'

ব'ললাম, দিদি এলে কিন্তু খুব মজা হয়, তাই না!'

—'হয় না আবার! দিদি চ'লে যাবার পর থেকে ঘরটা এত খালি-খালি লাগছে যে, মন টিকতে চায় না। অথচ মাও চ'লেছে তেম্‌নি, একটুও যদি কোথাও বেরোতে দেয় আমাকে! আজ আপনার কথা ব'লে তবে জোর ক'রে এসেছি।'

ব'ললাম, 'তাহ'লে আমাকে সত্যি সত্যিই তুমি ভোলো নি!'

এবারে কথা না ব'লে জিভ বার ক'রে কেমন একটা অদ্ভুত ভঙ্গী করে এই কথাটাই ব্যক্ত করতে চাইল শীলা—'নিন্, খুব হ'য়েছে, এমন কথাটা এত ক'রে আর না ব'ললেও চ'লবে।'

বললাম, 'এবারে তোমাকে এমন একটা নতুন জিনিস দেবো—যা অনেককাল ব্যবহার ক'রতে পারবে।'

ঔৎসুক্যের বশেই শীলা জিজ্ঞেস ক'রলো, 'কি জিনিস, বলুন?'

—'আগে চক্ষু বোজো, তবে ব লবো।'

সঙ্গে সঙ্গেই দু'হাতে চোখ বুজলো শীলা।

বিয়েতে অনেক যৌতুক পেয়েছিলাম, তার মধ্যে স্যাউভেনির পেনই অনেকগুলো। বাক্স খুলে তা থেকেই একটা বেছে নিয়ে শীলার ফ্রকে এঁটে দিলাম।

চোখ খুলে খুসীতে ফেটে প'ড়লো শীলা। তার কাছে এটা অভাবিত। জিজ্ঞেস ক'রলো, 'এটাকে কি কলম বলে?'

ব'ললাম, 'ফেকার্স'। এখন থেকে এ কলম দিয়েই তুমি লিখো।'

ইত্যবসরে হেঁসেলের কাজের ফাঁকে তনুশ্রী এসে একবার সামনে দাঁড়ালো। বড় লজ্জা তাকে শীলার। সঙ্গে সঙ্গে উঠে প'ড়ে শীলা ব'ললো, 'এখন তা হ'লে যাচ্ছি সুমন্তদা!'

ব'ললাম, 'এই তো এলে, একটু বসেই না হয় যাবে! বৌদির সঙ্গে আজ ভালো ক'রে আলাপ ক'রে যাও।'

—'আগে দিদি আসুক, তারপর।' ব'লতে গিয়ে তনুশ্রীর সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় হ'তেই লজ্জায় মুখখানি তার লাল হ'য়ে উঠলো, এবং আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা না ক'রে সঙ্গে সঙ্গেই ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল। আগের দিনও ঠিক এম্‌নি ক'রেই চলে গিয়েছিল শীলা।

তনুশ্রী জিজ্ঞেস ক'রেছিল, 'মেয়েটি কে, ভারী লাজুক তো!'

ব'লেছিলাম, আমার বন্ধুর বোন। ও তবুই শীলা নয়, লজ্জাশীলা।'

আজ কিন্তু অনুরূপ কিছু-একটাও প্রশ্ন তুললো না তনুশ্রী। বরং বিনা দ্বিধাতেই ব'ললো, 'কলমটা কি তা হ'লে দান ক'রলে?'

ব'ললাম, 'দান আবার কি, এম্‌নিই দিলাম।'

—'তার মানেই তো দান হ'লো!' তনুশ্রী বললো,

'বিয়ের জিনিষগুলোকে নিয়ে তা হ'লে তুমি দানসত্র সুরু ক'রেছ, বলো।'

ব'ললাম, 'একে যদি দানসত্র খুলে বসা বলে, তবে তা-ই।'

নিরস্ত হ'লো না তনুশ্রী, ব'ললো, 'তা নয় তো কি? মানুষ চেষ্টা ক'রেও একটা জিনিস ক'রে উঠতে পারে না, আর উপহার পেয়ে তুমি সুরু ক'রেছ দান ক'রতে। যারা তোমায় দিয়েছিল, তারা কি তোমাকে দান ক'রতে দিয়েছিল—না ব্যবহার ক'রতে দিয়েছিল?'

ব'ললাম, 'কোনো উপহারে পিছনেই এমন কিছু মাথার দিব্যি ছিল না।'

—'থাকবে কেন! মানুষের ভদ্রতা অভদ্রতা ব'লেও তো কিছু আছে। তাঁদের মর্যাদা তা হ'লে এম্‌নি ক'রেই তুমি রাখবে?'

—'সেটুকু তুমি নাই বা দেখালে! ব'ললাম, 'সামান্য একটা কলমের ব্যাপার নিয়ে তুমিই বা এমন জ্বলে-পুড়ে মরছো কেন? যাও, নিজের কাজে যাও।'

কিন্তু এক পাও ন'ড়লো না তনুশ্রী। ব'ললো, 'ব্যাপারটা সামান্য হ'লেও অসামান্য হ'তে কতক্ষণ! আজ বন্ধুর বোনকে কলম, কাল কোনো বান্ধবীকে আর একটা-কিছু,...এই ক'রে যেটুকু সোনা আমার গায়ে আছে, সেটুকুও যাক।'

আশ্চর্য হ'লাম তনুশ্রীর কথা শুনে। তার মুখের দিকে চোখের দৃষ্টিকে একবার ছুঁচ ক'রে জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'কি ব'লতে চাচ্ছো তুমি?'

কিন্তু এ কথার কিছু-একটাও যথাযথ উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন ক'রলো সে: 'তোমার এই নীলারাণীর দিদিটি কে? বন্ধুর বোন ব'লে যে—বন্ধুটিকে ঘুষোতে চেয়েছিলে, সেই কি?'

বিরক্তিতে সারা গা জ্বলে যাচ্ছিল। ব'ললাম, 'হলেই বা ক্ষতি কি?'

কণ্ঠস্বরে এবারে পানিকটা রং চড়িয়ে তনুশ্রী ব'ললো, 'না, ক্ষতি আর কি! বাইরে যখন রঙ্গ-তামাসার লোক আছে, ঘরের লোকের দু'টো ভালো কথাও তখন বিস্বাদই লাগবে বৈ কি!'

সমস্ত শরীরটা তখন অসাধারণ ক্রোধে জ্বলে উঠেছে। ব'ললাম, 'এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আর তোমার সঙ্গে কথা বলবার প্রবৃত্তি আমার নেই।'

—'ইস্ যেন আমারই আছে!' ব'লে ঠোঁট উল্টিয়ে আরও কিছু-একটা ব'লতে যাচ্ছিল তনুশ্রী, ইতিমধ্যে বড় ঘর থেকে তার উদ্দেশে নারী কণ্ঠ ভেসে আসতেই সাড়া দিয়ে বড় ঘরের দিকে পা বাড়াইলো তনুশ্রী।

ঘরের পরিবেশটা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল বিনা জানি না, কিন্তু মনে হ'লো—মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কিছু যেন দু'চোখে আমার অন্ধকারে ঢাকা প'ড়ে গেছে। উর্ণনাভের মতো নিজের মধ্যে নিজে খিঁচে খিঁচে নানা জাল রচনা ক'রে তার মধ্যে আমার চেতনা আর বুদ্ধি দিয়ে কেমন ক'রে যে প্রতিমুহূর্তে বিচরণ ক'রছি—ভাবতে গিয়ে আমার এত কালের দম্ভের চেতনা একেবারেই ঘুলিয়ে গেল।

বাইরের আকাশে তখন দীপ্ত-সূর্যের খরতাপ।

[২]

মাঝখানেক দিন দু'য়েক বাড়ী ছিলাম না। সহর-তলীতে এক পুরনো বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী যেতে হ'য়েছিল। ফিরে এসে দেখলাম—অনর্থ ঘটবার আর বাকী নেই কিছু। ইতিমধ্যে ঘরের যাবতীয় বাক্স-পেটরা ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে সবকিছু তছ্‌নছ্‌ ক'রে নিয়েছে তনুশ্রী। এ-বাক্সের জিনিষ সে-বাক্সে আর সে-বাক্সের জিনিষ এ-বাক্সে এনে সাজিয়ে গুছিয়ে গৃহিণী-পনার এক চমকপ্রদ ইতিহাস রচনা ক'রে নিয়েছে সে। আমার নিজের প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র ব্যবহারের জন্য ক্যাসবাক্সের মতো ছোট্ট একটি বেতের বাক্স ছিল। ব্যক্তিগত কাজকর্মের সুবিধের দিক থেকে চাবিটি আমার নিজের জিম্মাতেই থাকতো। সহর-তলীতে বরযাত্রী যেতে গিয়ে নিজের অলক্ষ্যেই কখন্ না-জানি সেই চাবিটি ভুলবশতঃ ঘরের কোথাও প'ড়ে

গিয়ে থাকবে। তনুশ্রী হাতে পেয়ে শুধু যদি সেটা তুলে রাখতো, তবে বোধ করি তার পাতিব্রত্যের কোথাও অঙ্গহানি হ'তো না, কিন্তু চাবিটিকে তার যথাযথ কার্যে ব্যবহার ক'রেই তবে সে নিশ্চিন্ত হ'য়েছে। ফলে যে সংশয় আর সন্দেহ নিতান্তই অনিবার্য ছিল, এবারে তা প্রকট হ'য়ে উঠলো। আমাকে লিখিত অণিমার চিঠিগুলি পর-পর তারিখ মিলিয়ে ভাঁজ করা ছিল। কোনো দুঃসহ মুহূর্তে অণিমাকে স্মরণ ক'রে যখনই মনটা অকস্মাৎ দূর-প্রসারি হ'য়ে পড়তো, নিভৃতে খুলে ব'সতাম চিঠিগুলি। টেলিভিসন যন্ত্রের মতো চিঠির অক্ষরগুলোর মধ্য দিয়ে যেন স্পষ্ট দেখতে পেতাম অণিমাকেই। তারপর নিভৃতেই আবার চিঠিগুলোকে যথাযথ ভাঁজ ক'রে যথাস্থানে তুলে রাখতাম। আমার অনুপস্থিতির সুযোগে এতদিনে সেই চিঠি গিয়ে প'ড়লো তনুশ্রীর হাতে। শুধু তনুশ্রী কেন, সংসারে কোনো স্ত্রীর পক্ষেই বোধ করি এই জাতীয় কোনো চিঠি বরদাস্ত করা সম্ভব নয়। তনুশ্রীও ক'রলো না।

আমি ফিরে আসতেই লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে আইন-আদালতের উকিলের মতোই জেরা সুরু ক'রে দিল সে। চিঠিগুলো প'ড়ে তনুশ্রী স্পষ্টই বুঝে নিয়েছিল—শীলা অণিমারই বোন। না বুঝবার কারণ নেই, চিঠিতেই তা স্পষ্ট উল্লেখ ছিল। ব'ললো, 'তোমার অণিমা রাণী না ব'ললে আমাকে তবে তুমি বিয়ে করতে না, না কি বলো?'

চ'মকে উঠলাম কথা শুনে: 'অণিমা! অণিমাকে তুমি কোথায় পেলে?'

—'কেন, স্বামীর সঙ্গে শুয়ে যে বিছানায় রাত কাটাই, তার সবটুকু জায়গা জুড়েই তো অণিমা সুন্দরী র'য়েছে!' তনুশ্রী বললো, 'উঃ, শয্যা যে এমন কণ্টক শয্যা হবে, আগে বুঝতে পারিনি। এতদিন মিথ্যেই তবে অভিনয় ক'রে চ'লেছ! আমার উপর তোমার যা-কিছু রাগ, এতদিনে তার সবটুকু অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হ'য়ে গেল। তোমার অণিমাকেই যদি সমস্ত মনপ্রাণ সমর্পণ ক'রেছ, তবে মিথ্যে কেন আমাকে তুমি এমনি ক'রে ঠকালে?'

'ব'ললাম, কোথা থেকে কেমন করে এ ধারণা তোমার জন্মালো, বুঝতে পারছি না। ইতিমধ্যে শীলা এসে তার মুখ থেকে কিছু শুনেছ কি?'

—'শীলা, শীলা, শীলা, শীলার মুখ থেকে শোনাটাই বড় কথা, আর এগুলো কিছু নয়?' ব'লে উঠে গিয়ে তার জিম্মা থেকে এবারে অণিমার চিঠির তাড়াটা এনে আমার সামনে ছুঁড়ে দিল তনুশ্রী। ব'ললো, 'কি! চিনতে পারো এর একটি অক্ষরও? তোমার এতকালের তিলে তিলে সঞ্চিত প্রেমের মহেশ্বরী গো, নয় কিনা বলো?'

স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম এবারে অণিমার চিঠিগুলোর দিকে তাকাতে গিয়ে। ভুল করে যে চাবিটা বাড়ীতে ফেলে গিয়েছিলাম, এতক্ষণে তা মনে পড়লো। চিঠিগুলি সেইভাবেই বিস্রস্ত অবস্থায় সামনে লুটোপুটি খেতে লাগলো। উত্তরে একটি কথাও ব'লতে পারলুম না।

তনুশ্রী ব'ললো, 'শীলারাণীকে আদরের ঘটাটা একদিন বুঝতে পারিনি; তাইতো ভাবি—এত কেন? এ যে দিদির অভাবে ছোট বোনকে আদর, এতদিনে তার আসল অর্থটা খুঁজে পাওয়া গেল। একটুখানি থেমে পুনরায় তনুশ্রী বললো, তা—তোমার প্রেমময়ী অণিমারাণী তার বাপের দেনাটা শোধ ক'রে দিলেই না হয় তাকে বিয়ে করে এনে তোমার এমন সোনার পাঠ-মন্দিরে বাগ্দেবী প্রতিষ্ঠা ক'রতে! আমার মাকেও তবে এমন অপমানিত হ'তে হ'তো না, আমাকেও প্রতি-মুহূর্তে এমন দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার নারী-জীবনের সমস্ত সাধ-আহ্লাদকে মিথ্যেই ভাসিয়ে দিতে হ'তো না।' ব'লতে গিয়ে একদিকে ক্রোধে চোখ দু'টি যেমন লাল হয়ে উঠলো তনুশ্রীর, অন্যদিকে তেমনি সেই লাল আভাকে আচ্ছন্ন ক'রে বিন্দু বিন্দু অশ্রুকণা জ'মে উঠলো।

ব'ললাম, 'এ প্রশ্নটা বোধ করি ডিহিরীতে তোমার মাকেই লিখে পাঠালে তুমি বুদ্ধিমতীর কাজ ক'রতে?'

তনুশ্রী ব'ললো, 'মাকে দু'দুবার অপমান ক'রেও কি তোমার রাগ মেটে নি? কি ক'রেছে, কি অপরাধ ক'রেছে মা, তোমাকে ব'লতে হবে।'

এবারও যথাসম্ভব শান্তকণ্ঠেই ব'লতে চেষ্টা করলাম, 'কোনো জিনিষ নিয়েই বেশী বাড়াবাড়ি ভালো নয়। দেখ্ বেশী চটুবালে ভেঁতো হয়। হয় নিজের কাজে যাও, না হয় চুপ করো।'

কথা শুনলো না তনুশ্রী, ব'ললো, 'কেন চুপ ক'রবো, কিসের জন্য চুপ ক'রবো শুনি? ঘরে দাসী বাঁদির উপরে চোখ রাঙিয়ে বাইরে বাইরে পালিয়ে পালিয়ে তুমি প্রেম করবে, আর তা মুখ ফুটে ব'লতে গেলেই চুপ ক'রতে হবে। কেনা বাঁদী নই, এ কথাটা মনে রেখো।'

ক্রমেই অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠছিলাম। ব'ললাম, 'কিন্তু বাগ্‌বাহুল্যেরও একটা সীমা আছে। তোমার কোনো প্রশ্নেরই আমি জবাব দেবো না। ইচ্ছে হ'লে অনায়াসে তুমি তোমার মার কাছে চ'লে যেতে পারো। এখানে থেকে প্রতিমুহূর্তে ভ্রূ কুঁচকে চিৎকার ক'রে সারা বাড়ীটাকে মাথায় ক'রে নিতে পারবে না। এ বাড়ীর ছেলে হ'লেও আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আর ইজ্জত ব'লে কিছু আছে। কোনো অবস্থার চাপেই সে ইজ্জৎ আমি খোয়াতে দিতে রাজি নই। যদি স্ত্রী ব'লে নিজেকে মনে করো, তবে শেষ বারের জন্য এটুকু তোমার জানা রইল।'

কিন্তু থামলো না তনুশ্রী, ব'ললো, 'স্ত্রী ব'লে পরিচয় দেবার মতো প্রবৃত্তি আজ আর আমার নেই। সে প্রবৃত্তি ফুলশয্যার রাতটুকু কাটবার পর থেকেই কখন্ নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। ব'লতে পারো—একটা দিনও তোমার অণিমাকে ভিন্ন আমাকে ভাবতে পেরেছ তুমি? সংসার আর সমাজের চোখে আমাকে স্ত্রী ক'রে রেখে মনে মনে তোমার অণিমাকে নিয়েই তুমি সুখ-স্বপ্ন রচনা ক'রেছ। তা যদি না ক'রবে, তবে কপাল পুড়বে কেন আমার! দূর থেকে যাকে ফুল ভেবেছিলাম, কাছে এসে দেখলাম কাঁটা ভিন্ন সে আর কিছুই নয়। আমার মন সেই কাঁটায় কাঁটায় ছ'ড়ে গেল। তবু আমায় চুপ ক'রে থাকতে হবে, তবু পাড়াপাঁয়ের নোলকপরা বউয়ের মতো ধর্মের ভয়ে ভয়ে বলতে হবে—তুমি আমার পতি-দেবতা? ছিঃ ছিঃ, এই নাকি স্বামী, পর-যুবতী ভিন্ন যার স্বপ্ন নেই; সে নাকি আবার স্বামী! এর চাইতে ডিহিরীতে আমার অনূঢ়া জীবনও যে ভালো ছিল!'

দু'চোখ আচ্ছন্ন ক'রে এবারে ধারায় অশ্রু নেমে এলো তনুশ্রীর। সেটুকুকে কিছুতেই সে আর রোধ ক'রতে পারলো না। বিছানায় গিয়ে বালিশে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ ধ'রে ডুকরে ডুকরে কাঁদলো সে। ডিহিরীতে চ'লে যাবার জন্য ইতিপূর্বেই যে সে তার মাকে চিঠি দিয়েছিল, সেটুকু জানতে পারিনি। আমার অনুপস্থিতিতে অণিমার চিঠি উদ্ধার ক'রে সঙ্গে সঙ্গেই তনুশ্রী তার কর্তব্য স্থির ক'রে ফেলেছিল। কিন্তু বাপের বাড়ীর দরজাও যে অবশেষে একেবারেই বন্ধ হবে, এত বড় ঘটনাটা কিন্তু সে আগে কল্পনা ক'রতে পারে নি। কয়েকটা দিন পরেই সেটুকু বুঝতে পেরে বোধ করি মনে মনে নতুন কোনো সিদ্ধান্তেরই আশ্রয় খুঁজছিল তনুশ্রী। তার চিঠির জবাবে ডিহিরী থেকে হৈমন্তী লিখলেন:

> বুড়ী, তোর চিঠি পাইয়া স্তম্ভিত হই নাই, সুমন্তর চরিত্র সম্পর্কে এবারে বরং আরও বেশী পাকা হইলাম। কিন্তু এইসঙ্গে তোকেও ধিক্কার দেই; যে মেয়ে তার নিজের স্বামীকে ফিরাইতে পারেনা তার মরাই উচিত। হয় মুণ্ড করিয়া নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর, না পারিস তো ও-মুখ আর কাহাকেও দেখাইস না। এ সংসারে তোকে আনিয়া নূতন করিয়া আমরা আর অপমানিত হইতে চাইনা। মা হইয়া আজ এতবড় কথাটা লিখিতেও দুঃখে বুক ভাঙিয়া যাইতেছে। ঈশ্বর তোকে সুখী করুন।
>
> ইতি—আশীর্বাদিকা—মা।'

তনুশ্রীর নামে খামে মোড়া চিঠি। ডাকপিয়নের কাছ থেকে চিঠিখানি অবশ্য আমার হাতে এসেই

প'ড়েছিল, কিন্তু কারুর কোনো নামীয় চিঠি খুলে প'ড়বার অভ্যাস আমার কোনোকালেই নেই। তনুশ্রী নিজে খুলেই প'ড়লো, প'ড়লো অবশ্য আমি জানতে না পারি—এই ভাবেই। যদি সে চিঠিটা প'ড়ে কুটি-কুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেলতো, তবে চিঠির ভাষা বা অর্থবোধ দু'টোই আমার অজ্ঞাত থেকে যেতো; কিন্তু অসাবধানে তোষকের নিচে থেকে কখন্ কাগজখানি গড়িয়ে প'ড়ে আমার পায়ের কাছে উড়ে আসতেই অক্ষরগুলো বড় স্পষ্ট ভাবে এসে চোখে ঠেকলো। প্রবঞ্চনা ক'রতে চাইলুম না চোখ দু'টোকে, কিন্তু আশ্চর্য হ'লাম তনুশ্রীর প্রবঞ্চনা-বোধ লক্ষ্য ক'রে। পদে পদে আমার প্রতি অবিশ্বাস, সন্দেহ আর সংশয় পোষণ ক'রে নিজেকে ক্রমেই সে আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে। এতদিন মুখে-মুখে তার তর্ককে বড় বেশী মূল্য দিইনি, তর্কের প্রতি তার স্বাভাবিক প্রবৃত্তির দিকটা আমার অজানা ছিল না, কিন্তু কোমর বেঁধে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঝগড়া ক'রলেও আমাকে যে তার বাপের বাড়ীতে চাকডোল পিটিয়ে এমন ক'রে হীনচরিত্রের পুরুষ ব'লে খাড়া করবে, একথা ভাবতেও সারা গা রী রী ক'রে উঠ্‌লো।

রাত্রে শুতে এসে দেখলাম—তনুশ্রী শয্যায় এলো না। মেঝেয় একটা মাদুরের উপরে চাদর বিছিয়ে তার উপরেই আলাদা ভাবে শুলো সে।

বললাম, 'কি সব ছেলেমানুষি ক'রছো, এস, উঠে এস।'

কিন্তু তনুশ্রী নড়লো না। মনে মনে বোধ করি কিছু-একটা যুদ্ধের জন্যই প্রস্তুত হ'চ্ছিল সে।

থেমে পুনরায় বললাম, 'রাত এখন অনেক, তোমাকে আবার তো সেই ভোরবেলাতেই উঠতে হবে! পাগলামি রেখে এস, উপরে উঠে এসে ঘুমোও।'

তনুশ্রী বললো, 'নিজে ঘুমোও, তা হলেই হবে।'

বললাম, 'সারা রাত যখন জেগে ব'সে থাকতে পারবোনা, তখন ঘুমোবো তো নিশ্চয়ই! এস, উঠে এস।'

কিন্তু একবারও কিছু একটা জবাব দিল না তনুশ্রী।

এবারে খাট থেকে নেমে তার শিয়রে গিয়ে মুহূর্তের জন্য একবার বসলাম। বললাম, 'সংসারে সব চাইতে যেখানে আমার বড় অপমান, সেখানে তুমিই কি কিছু সম্মান আশা ক'রতে পারো? আমার অসম্মানে যদি কোথাও তুমি কিছুমাত্র গৌরব বোধ করো, তবে কোনোদিনই তাতে বাদ সাধবো না। তাই বলে নিজের সংসারকে তুমি বিকারে বিকারে এমন শাপগ্রস্ত ক'রে তুলোনা। তাতে তোমার নিজেরই ক্ষতি। ওঠ, চলো' উপরে গিয়ে শোবে।'

এবারে পাশ ফিরে বসুইয়ের আড়ালে মুখ ঢেকে কাঠ হ'য়ে শুলো তনুশ্রী। বললো, 'না।' তারপর আর একটি কথাও উচ্চারণ ক'রলো না বা মেঝে থেকে খাটে এসে শুলোনা সে।

এম্‌নি ক'রেই বাকী রাত্রিটা কেটে গেল। পরদিন উঠে একটি কথাও আর তার সঙ্গে হলো না। নিত্য যেমন সংসারের কাজ ক'রছিল তনুশ্রী, তেমনি করেই নিজেকে কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিল। কিন্তু মনটাকে যে একটা মুহূর্তের জন্যও প্রকৃতিস্থ ক'রতে পারেনি, কয়েকটা দিন অতিবাহিত হ'লে স্পষ্টই তা অনুভব ক'রলাম।

সেদিন দুপুরের আগে-আগেই মাকে মাথা ধুইয়ে সারা গা গরম জলে স্পঞ্জ্ করে দিয়ে পিঁড়ি পেতে খাবার এনে দিতে চেয়েছিল তনুশ্রী।

মা বললেন, 'সকাল থেকে পেটে দুধ, ফলের রস আর লেবু-জল তো কম পড়েনি মা, এখনও তেমন খিদে হয়নি।'

তনুশ্রী বললো, 'রোজ রোজ মাথার উপর সূর্য্য না উঠলে খাবেন না, এই বা কেমন!'

মা বললেন, 'এই নিয়মেই যখন এতকাল চ'লে এলো, তখন আর এই নিয়ে কথা বলে লাভ কি বৌমা?'

উত্তরে কিছু-একটাও না বলে নীরবে আবার রান্নাঘরে গিয়েই হেঁসেলের কাজ সারতে বসলো তনুশ্রী। বোধ

হয় আধ ঘণ্টাও হবে না, উঠে এসে আমার ঐ একই প্রশ্ন তুলে ধরলো মাকে : 'এখন তো অনেকটা সময় কেটেছে, এবারে আপনাকে খেতে দিই মা ?'

মা বললেন, 'তোমার শ্বশুর ঠাকুর যে এখনও ঘরে ফিরলেন না ! তিনি না খেয়ে উঠলে কি মুখে আমি খাবার তুলতে পারি ? হিমুর ঘর, অসুখ হোক যা হোক চিরদিন যে নিয়ম চ'লে আসছে, তাকে কি ইচ্ছে করেই ভেঙে দিতে পারি বৌমা ?'

কথা শুনে মেজাজটা হঠাৎ যে কোথা দিয়ে কেমন ক'রে তিরিকি হ'য়ে উঠলো তনুশ্রীর, বুঝতে পারলেন না মা। তনুশ্রী বললো, 'সংসারে আর একটি প্রাণীর খেটে খেটে হাড়-মাস এক হলেও যদি আপনাদের এই হিমুয়ানী ঘোচে ! আমাকে কি বাড়ীশুদ্ধ সবাই দাসীবাঁদী পেয়েছেন যে, এক-একজনের জন্যে খাবার পাহারা দিয়ে আমি বসে থাকবো ?'

কথা শুনে শরীরের গ্লানি এবারে মনে গিয়ে ঠেকলো মার ! এতক্ষণ শুয়ে ছিলেন, এবারে মাথা তুলে উঠে বসে বললেন, কি, 'কি বললে বৌমা ? কাজের খোঁটা দিয়ে তুমি আমাকে চোখ রাঙাতে চাচ্ছো ? সংসারে এতদিন রাঁধুনী বামুন ছিল, খাবার পাহারা দেওয়া নিয়ে কখনও প্রশ্ন ওঠেনি ! ঘরের বউ তুমি, কার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয়, এটুকুও কি এতকাল শেখনি ? খেটে খেটে এতই যদি হাড়মাস এক হয়ে থাকে, তবে নিজে খেয়ে দেয়ে যাও শোওগে, এসংসারে কারুর ভাত পাহারা দিয়ে তোমাকে বসে থাকতে হবে না

মার সঙ্গেও যে এমন ক'রে আজ এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘ'টে যাবে, তনুশ্রী তা কোনদিন কল্পনাও ক'রতে পারেনি। মা নিজে পছন্দ করে কথা দিয়ে তবে তাকে একদিন ঘরে এনেছিলেন। তার পিছনে যে এতবড় ক্রূর ইতিহাস লুকিয়ে ছিল, মনোবিজ্ঞানের ছাত্র হয়ে এটুকু এতদিন বুঝতে পারিনি। হয়ত এমন একটা ইতিহাসই ঘটবার প্রয়োজন ছিল মার জীবনে, সেটুকু আজ ঘটে গেল। কাছে ডেকে নিয়ে তাঁর পুত্রবধূ সম্বন্ধে আমাকে দু'কথা নালিশ জানাতে পারতেন মা, কিন্তু তা জানালেন না। নিজের ঘরে বসে সকর্ণে নিজে থেকেই সব শুনতে পেলাম। এ সম্বন্ধে হয়ত আমার নিজের দিক থেকে কিছু করণীয় ছিল, কিন্তু কেমন একটা নিষ্ক্রিয় অবসন্নতায় সমস্তটা মন অকস্মাৎ আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

তনুশ্রী ততক্ষণে আমার অধ্যয়ন কক্ষের দ্বার রুদ্ধ ক'রে আলুলায়িত বেশে মেঝেয় গিয়ে শুয়ে পড়েছে।

আগামী বারে সমাপ্য]।

স্মৃতি-কথা

কবিশেখর কালিদাস রায়

অনাবৃষ্টির জন্য আমার জন্মভূমির কি শোচনীয় দৃশ্যই না দেখেছি তা আগেই বলেছি! ৪৮ বৎসর আগে সেই দৃশ্যের একটি বাণীচিত্র অঙ্কন করেছিলাম—

জমিতে উড়িছে ধুলো ফুলালো না শীষগুলো
গোরুর খোরাকে হল যেন শুষ্ক ঘাস।
নিরাশায় ভালে হাত কৃষক জাগিছে রাত,
দীর্ঘশ্বাসে তপ্ত করি মুখে তোলে গ্রাস।
দেহ অস্থিচর্মসার কেহ নাহি দেয় ধার
মহাজন তুষ্ট নয় কেবল সেলামে।
আশ্বিনের কিস্তি বাকী গোমস্তা বলেছে ডাকি
না দিলে, বলদ জোড়া চড়াবে নিলামে।
ভরেছে পুকুর পাঁকে মাছ নাই, ব্যাঙ ডাকে
জালী কাঁদে জেলেবউ ফেরে ম্লান মুখ।
ছেলেগুলো কি যে খাবে আশ্বিনে তাই ভাবে
পুঁজি সাথে শুধু ছুটো ওগলিশাম্বুক।
অস্থিসার শীর্ণকায় গোরু চাল টেনে যায়,
নাই তৃণগাছা হায় ভরে পগারে।
বাদাজল পান ক'রে একে একে যায় ম'রে,
রোগে ভুগে ভুগে শেষে চলেছে ভাগাড়ে।
মাসে হাট আট দিন ভীড় ক্রমে হয় ক্ষীণ
কিনিবার বেচিবার নাইক কিছুই।
মাঠ শুধু জলাভাবে রবিশস্য কে লাগাবে?
পড়ে আছে মেদে বাদা আউশের খুঁই।
পিপাসিত পাখীগুলি দেশ ছেড়ে গেছে চলি,
রাতে শুধু পেঁচা ডাকে, দিনে চিল কাক।
জলবিন্দু নাই তাবে, মধুবিন্দু কোথা পাবে?
ফুল নাই মৌমাছিরা রচে না মৌচাক।
শুষ্ক নলখাগড়ায় মরা তাল বাগড়ায়
অকূলন্ত শরবনে উঠে হাহাকার।
ত্রিয়মাণ লতাতরু এদেশ হয়েছে মরু
বর্ষাজননীর স্নেহ না পেয়ে এবার।

এইরূপ কবিতা আর কাউকে লিখতে হবে না। অনাবৃষ্টির জন্য এইরূপ শোচনীয় অবস্থা পশ্চিমবঙ্গে আর হবে না। দুর্গাপুর হ'তে গ্রামে খাল কাটা হয়েছে।

আমাদের অঞ্চলে আষাঢ়ের প্রারম্ভ থেকে আশ্বিনের শেষ পর্যন্ত যদি সুনিয়মিত বৃষ্টিপাত না হ'ত তা হলে আশানুরূপ ধান জন্মাতনা। প্রায় প্রতিবৎসরই এই চারিমাসের মধ্যে কোন-না-কোন মাসে বৃষ্টির অল্পতা ঘটত। তার ফলে সময়ে আবাদ হলেও ধানের খুবই ক্ষতি হ'ত। কোন কোন বৎসরে বর্ষণ বিলম্বিত হ'লে শ্রাবণ মাসে আবাদ করতে হ'ত তাতে ফসল ভালো হ'ত না। আশ্বিনমাসের শেষের দিকে জল না হলে কার্ত্তিক মাসে জমিতে জলটান পড়ত, তাকে 'কেতেরা' বলে। তাতেও তৈরি ধান ম'রে যেত। নয়ত ধানার বদলে চিটা বা আগড়া জন্মাত। আষাঢ়ে বৃষ্টি না হ'লে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে দু-এক পশলা বৃষ্টিতে মাঠের পুকুরে যে সামান্য জল জমত তারই সাহায্যে পুকুরের ধারের দুইচারি বিঘা জমিতে আবাদ করা চলত। একে 'সেঁচে কুঁড়ে' আবাদ বলে। এই আবাদের জমির ধানও সময়মত আকাশের জল না পেলে বাঁচত না। যদি বেশী দিন বৃষ্টি না হ'ত তা হলে শ্রাবণ মাসে আবার ঐ জমিতে নূতন ক'রে আবাদ করতে হ'ত! ময়া গাছ গোরুর খাদ্য হ'ত। মাঠের পুকুরগুলি কত কাল আগে কাটানো জানিনা,

বোধ হয় মহীপালের সময়ে কাটানো হয়ে থাকবে, সেগুলির গভীরতা মোটে ছিল না। ঐ গুলিতে অতি সামান্যই জল ধরে। সেগুলির জলের সম্বল এত অল্প যে সেগুলির আবেষ্টনীর সকল জমি সেঁচের জল পেতনা। যে জমিগুলি জল পেত—সেগুলিতে সেঁচের জলে ধানগাছের গোড়া ভিজত, এর বেশি কিছু হত না। সেঁচের পুকুর গুলির পঙ্কোদ্ধার কখনও হ'ত না। কে করবে? 'সাজার বা গলা পায় না।'

কার্ত্তিকমাসে ঐ সকল পুকুরের জলের সাহায্যে চৈতালি ফসল রবিশস্য, আলু ইত্যাদি লাগানো হত। পুকুরগুলিতে জলের অভাব থাকলে চৈতালি ফসল লাগানো সম্ভবই হত না। জলের অভাবে অনেক জমিতে দুইটা ফসল তোলার সুবিধা ছিল না। আখের জন্য জমিতে ৮।৯ মাস জলের প্রয়োজন—সেঁচের সুবিধা না থাকায় আখের চাষ সামান্য হ'ত। আমাদের অঞ্চল কৃষিপ্রধান, শতকরা ৯০জন লোক জীবিকার জন্য চাষের উপরই নির্ভর করে। ভদ্রজাতীয় লোকদেরও জীবিকার উপায় চাষ। তাই গোটা জেলার লোকই বৎসরের অধিকাংশ কাল আকাশের পানে চেয়ে থাকত চাতকের মত।

কিন্তু আমাদের অঞ্চলে চাষের জমির পরিমাণ খুবই বেশি। এক ছটাক জমিও ফেলে রাখা হয়না। অধিকাংশ জমিতে আমন ধানের চাষ হয়। চাষীরাও খুব পরিশ্রমী। সেইজন্যই বৃষ্টির অভাব সত্ত্বেও আমাদের অঞ্চলে যে ধান হয়—তাতে ঐ অঞ্চলের লোকের অন্নসংস্থান হয়েও কিছু উদ্বৃত্ত হত। কিন্তু তাতেও তাদের দারিদ্র্য ঘুচেনি, ভাতের সঙ্গে ডাল তরকারীর যোগাড়ও হ'তনা। ধানই ত ঐ অঞ্চলের লোকের একমাত্র সম্বল—সেই ধান বিক্রয় ক'রে অন্যান্য খরচ চালাতে হতো।

গ্রামের নৈতিক পরিবেশ আমার বড়ই অপ্রীতিকর প্রায় ছিল। গ্রামের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সর্বত্রই সুরা পান করে। কিন্তু আমাদের গাঁয়ের অনেক ভদ্রজাতির লোকেরাও শুঁড়ি বাড়ি গিয়ে সুরাপান করত। মাতাল দেখলে আমার বড় ভয় হ'ত।

গ্রামে যখন 'চল্লিশপ্রহরের' উৎসব হত তখন স্ত্রীপুরুষ লোকেরা নাম জপ করত, কীর্ত্তন শুনত, ধর্মভাবে আবিষ্ট হ'ত। আর তখন কতকগুলি যুবক কুৎসিত আমোদ-প্রমোদে মেতে উঠ্‌ত। সে যেন জগাই মাধাইএর রাজ।

গ্রামের লোকে বড় বেশি মামলা মোকদ্দমা করত—আপোষে কিছুই মিটিয়ে নিত না। গ্রামে মাত্র গণ্য এমন কোন লোক ছিল না যে, বিবাদবিসংবাদ মিটিয়ে দেবে বা লোকে তার সালিশনিষ্পত্তি মেনে নেবে। বহু লোকই মামলার জন্য কাটোয়া হাটাহাটি করত। ৯।১০ মাইল পথকে কেহ দূর বলে মনে করত না। একজন মামলাবাজ শেষ রাত্রে যাত্রা ক'রে ২৪ মাইল হেঁটে গিয়ে বর্ধমানের আদালতে হাজির হ'ত, আবার মামলার পর ২৪ মাইল হেঁটে বাড়ী ফিরত। তাদের তাদের মিল ছিল না, একান্নবর্তী পরিবার খুব কমই ছিল। গ্রামে বিবাদ বিসংবাদ লেগেই থাকত। ভদ্রপল্লীর গায়েই নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা বাস করত। তাদের মুখের অশ্লীল ভাষণ ভদ্র পরিবারের ছেলেরা শিখত। তারা—বিশেষতঃ তাদের স্ত্রীলোকেরা—উচ্চৈঃস্বরে কলহ করত, কুপিত অবস্থায় অশ্লীল নোংরা কথা উচ্চারণ করত।—সেগুলি ভদ্রসমাজে প্রবেশ করত। তাদের কেউ শাসন করত না, সকলের সমস্তই কাণে গা-সহা হয়ে গিয়েছিল।

আর একটা দোষ লক্ষ্য করতাম, সামাজিক দলাদলি। কারো বাড়ীতে কোন পারিবারিক অনুষ্ঠান হ'লে খাওয়া খাওয়া নিয়ে ভারি গোলযোগ বাধত। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে একটা ঘোঁট বাঁধানো যেন চিরন্তন রীতিই ছিল। অহিলা অনেক রূপই শুনা যেত—অমুক রেঁধেছে, অতএব আমরা খাব না। অমুকের নিমন্ত্রণ হয় নি, অমুকের নিমন্ত্রণ সামাজিক নিয়মানুসারে হয় নি। অবাঞ্ছিত পরিবারে পুত্র কিংবা কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়েছে ইত্যাদি। বেলা ২টার সময় ভোজন করার কথা, কিন্তু ভোজনপর্ব সন্ধ্যা

বেলায় সমাপ্ত হ'ত। ৪।৫ ঘণ্টা ধ'রে অনেক বাদ বিচার তর্কাতর্কি হ'ত। তারপর বিপন্ন গৃহস্থ হয়ত কয়েকজনের পায়ে ধরত কিংবা কিছু অর্থদণ্ড দিত, তখন সকলে খেতে যেত। ক্ষুধিত বালক বালিকা এবং যুবকরাও ক্ষুধায় ছট-ফট করত, গ্রামবৃদ্ধদের মনে মনে গাল দিত। তবে আশা রাখত শেষ পর্যন্ত মিটবেই। অনুষ্ঠান গুলিতে নিমন্ত্রণ না করলেও বিপদ, করলেও বিপদ। নিমন্ত্রণ করে আহারের আয়োজন করে বহু নিরীহ গৃহস্থের চোখের জল হ'তে দেখেছি।

একটি উপলক্ষের কথা মনে আছে—ট্রেন ধরে দূরবর্তী স্থানে চলে যাবে বলে আগে একজন নিমন্ত্রিতকে খাওয়ানো হয়েছিল। যথাস্থানে সে সংবাদ গিয়ে পৌঁছল তখন সে কি গোলযোগ! আগে খাওয়ানোর কয়েকজনটা স্বীকার করে নিয়েও নিমন্ত্রিতগণ বসলেন তাদের কাছে অনুমতি নেওয়া হয়নি কেন?

জাতি হিসাবে আগে পাছে খাওয়ানোর ব্যবস্থা ছিল একচুল এদিক ওদিক হবার যো ছিল না। কয়েক বৎসর আগে গ্রামে একটা অনুষ্ঠান উপলক্ষে গিয়েছিলাম—দেখলাম সকল জাতির লোক শহরের মত এক পংক্তিতে ভোজন করছে। দেখে ভাবলাম-এইদিন—আর সেইদিন!

বরযাত্রী হয়ে গেলেই পাত্রীর বাড়ীতে উপদ্রব করতে হয়, পাত্রীর পিতাকে কাঁদাতে হয়, পায়ে ধরাতে হয় এই ছিল দস্তুর। ভিন্ন গ্রামে বিয়ে দিতে গিয়ে নানারূপ উপদ্রব ক'রে গ্রামে ফিরে এসে অনেকে গর্ব করত।

সেকালে আর একটা গর্বের বিষয় ছিল, রাক্ষুসে ভোজনের। কেউ ৪৮টা রসগোল্লা খেয়েছে, কে এক হাঁড়ি ক্ষীর বা দই খেয়েছে, কে একটা গোটা পাঁঠা খেয়েছে। কে পরিস্থিতিসহকারে ভোজনের পরও একটা গোটা কাঁটাল খেয়েছে—এইরূপ গল্প প্রত্যেক ভোজ কাজের পর শোনা যেত। এই সকল রাক্ষসদের গর্বের অবধি ছিল না। সাধারণতঃ বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েই এই রূপ অসাধারণ কৃতিত্ব দেখান হ'ত।

শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ, রামুনের মেয়ে, পণ্ডিত মশাই, অরক্ষণীয়া ইত্যাদি পুস্তকে পল্লীর সামাজিক অবস্থার যে বর্ণনা আছে—আমাদের গ্রামের সেই বর্ণনাই দেওয়া চলে।

তখন ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া, নৈহাটি-বহরমপুর, বর্ধমান কাটোয়া ইত্যাদি রেললাইন হয় নি। গ্রাম থেকে মুর্শিদাবাদ যাওয়া খুব দুরূহ ছিল। গ্রাম থেকে বরাবর গোরুর গাড়ী করে (৪৮ মাইল) যেতে হ'ত। তাও আশ্বিন কার্তিক মাসে কাটোয়া থেকে আজিমগঞ্জ পর্যন্ত ষ্টীমার চলত। ঐ তিনমাস যাতায়াতের সুবিধা ছিল। কাটোয়া থেকে নৌকাপথে তিনদিনে যাওয়াও হ'ত। বাবা আশ্বিন মাস ছাড়া অন্য মাসে বাড়ী এলে কাশিমবাজারের মহারাজার হাতীতে চ'ড়ে আসতেন। গ্রামে তখন হৈ চৈ পড়ে যেত। আমাদের মান মর্যাদা ও খুব বেড়ে যেত। আমি যখন প্রথম বার গ্রীষ্মের সময় বাড়ী থেকে কাশিম বাজার ফিরে গিয়েছিলাম, কি ভাবে গিয়েছিলাম তা উল্লেখযোগ্য।

গ্রাম থেকে কাটোয়া গেলাম হেঁটে, কাটোয়া থেকে উটের গাড়ীতে বর্ধমান রওনা হলাম। পথে গাড়ী উল্‌টে গেল—তখন একটা মালবোঝাই গোরুর গাড়ী পেয়ে বর্ধমান পৌঁছলাম, তার বস্তার উপর ব'সে তারপর ট্রেনে সাঁইথিয়া—সেখান থেকে ব্রাঞ্চলাইনে আজিমগঞ্জ, আজিম-গঞ্জ থেকে নৌকায় খাগড়াঘাট, খাগড়াঘাট থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে কাশিমবাজার। সেকালের যানের মধ্যে হাতীটা বাকি ছিল। বহির্জগতের সঙ্গে আমার গাঁয়ের কিরূপ যোগাযোগ ছিল এ থেকে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

গ্রাম ত্যাগ করে শহরে আসার পরে, যে সকল বালক ইস্কুলে পড়াশুনা করতো না, তাহাদের সঙ্গে মিশতে পারতাম না। কিন্তু গ্রামে থাকতে জাতি-কুল নির্বিশেষে নিম্নস্তর ছেলেদের সঙ্গে মেশামিশি করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ হ'ত না। যাদের সঙ্গে পড়াশুনা করা হয় নি, তাদের সঙ্গে খেলা করেছি, গায়ে গায়ে বসে সারা রাত্রি যাত্রা শুনেছি। উৎসবে মাতামাতি করেছি, ক্ষীরগ্রাম, পঞ্চাননতলা, জামালপুরের মেলায়

গিয়েছি স্নানের ঘাটে উপদ্রব করেছি, তাদের সঙ্গে বান্ধবতা কোনদিন শিথিল হবে তা কোনদিন ভাবিনি। যাদের সঙ্গে পাঠশালায় পড়েছি—যাদের সঙ্গে পড়িনি কিন্তু খেলা করেছি—এই লেখার বন্ধু ও খেলার বন্ধুদের কথা স্মরণ করে পরবর্তী জীবনে কবিতা লিখেছিলাম তার কয়েক ছত্র এই—

ওগো আমার বাল্যসখাগুলি
কেমন ক'রে তোমাদেরে আজকে থাকি ভুলি ?
কেউবা আজি খাঁদের পুকুর কেউবা গাঁয়ের চাষী
একবেলা কেউ পাচ্ছ খেতে কেউবা উপবাসী।
কেউবা পিয়ন পোষ্টাপিসের কেউবা গেছ রেলে
কেউ বসেছ মহকুমায় দোকানখানি মেলে।

* *

আজকে বুঝি তোমরা ছিলে কী যে
বাল্যস্মৃতি কাঁপছে শীতে আঁখির জলে ভিজে।
খালি পায়ে আদুল গায়ে গাঁয়ের মাঠে বাটে
ছুটাছুটি সাঁতার কাটা রথ্যা-দীঘির ঘাটে।
আটচালায় সেই পাঠশালাতে নামতা মুখে মরা
বর্ষাদিনে মেঘের ডাকে আঁকড়ে বুকে ধরা।
আম কুড়ানো শিল কুড়ানো যাত্রা শোনার ঘুম,
কোজাগরের রাতে কারো নেইক চোখে ঘুম
পল্লীপথের সঙ্গী সাথী আজ তোমাদের স্মরি,
বকুল ছায়ার মাধুরীতে পরাণ উঠে ভরি। (পর্ণপুট)

পল্লীগ্রামে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ হলে বেলা ২টার আগে ডাক পড়ত না। রান্না-শেষ হলে একজন পাড়ার পাড়ায় চীৎকার ক'রে জানিয়ে দিত। "পাত পড়েছে", তখন সাজ-সাজ রব পড়ত। কারা অবেলায় লোকের বাড়ীতে শুকনা ভাত খেতে খেতে দিতে চাইতেন না। কিন্তু সঙ্গীদের সঙ্গে একটা গেলাস হাতে করে সেই ভোজ খেতে যাবার উৎসাহ কিছুতেই বাধা মানতে চাইত না। এমন কাঁদাকাটি সুরু করতাম যে কাকাকে শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হ'ত। এটা তুচ্ছ ব্যাপার কিন্তু তা নিয়ে পরবর্তী জীবনে একটা একটা কবিতা লিখেছিলাম—তার কয়েক ছত্র এই···

যেনেদের মধু যায় সেনেদের বধূ যায়
পাড়ার সবাই আজ যেতেছে যেথায়,
কি কারণে কি দোষেতে সেখানে পাবে না যেতে
ননী যে তাহার কিছু খুঁজিয়া না পায়।
সেখানে সবার সাথে মিলে মিশে কলাপাতে
কড়কড়ে ভাত খাওয়া বসিয়া উঠানে।
সে আনন্দ সে উল্লাস হৃদয়ের সে উচ্ছ্বাস
মিলিবে সেদিন কিগো বাড়ীর দালানে ?
খাইয়া নিজের ঘরে নিত্য বটে পেট ভরে,
কবে মিলিয়াছে হেন বুকভরা সুখ ?
সেথা চেয়ে চেয়ে পাওয়া না চাইতে ঢের পাওয়া
চেয়ে না পাওয়ার মাঝে কত যে কৌতুক।
কাণে গুঁজি দুটী পান বড়ই দয়ার দান
এলানো কোঁচাটি তার বামহাতে ধরে
পুকুরে আঁচানো হায় কত যে আনন্দ তায়
ভোজের বাড়ীর গল্প মার কোলে চ'ড়ে,
একটি দিনেরো তরে বসিয়া ধূলির পরে
ঘুচায়ে বনেদী আঁক বাধা ব্যবধান
পাড়ার সবার সঙ্গে মিলে মিশে রসরঙ্গে
নিজেরে ভাবিতে পারা সবার সমান—
তাহাতে যে কত সুখ নাচায় সে কচি বুক
এখন পিতার তাহা স্বপনের মত
সে কথাটি বুঝিবার নাহি সে শকতি আর
সরল শৈশব যার বহুদিন গত।

কেবল পল্লীসঙ্গীদের সঙ্গে নয় পল্লীর সমবয়স্কা সঙ্গিনীদের সঙ্গেও খেলাধূলা করতাম। তাদের সকলের সঙ্গেই ভগিনী সম্বন্ধ। বিশেষতঃ আমার কোন ভগিনী ছিল না, প্রাতৃদ্বিতীয়ার ফোঁটা বৎসর বৎসর তাদের হাতেই পেতাম। তাদের কথা স্মরণ করে পরবর্তী জীবনে-কবিতা লিখেছিলাম। সে কবিতার ১ম দুই স্তবক এই—

তোমার ফোঁটাটি বিনে
ললাট আমার করে হাহাকার আজি এই শুভদিনে।

এক পরিবারে তোমার আমার জন্ম হয়নি বটে,
পাইলাম তোমা জীবন ধারার প্রভাত প্রান্ত তটে।
জাতিজাতিকুলে কোন যোগডোরী ছিলনা তোমার সাথে
তোমারি চিন্তা ললাটের তলে তবু জাগে আজ প্রাতে।

ছিলে তুমি ত পাড়ার মেয়ে
বাল্যজীবনে কেবা ছিল তবু আপন তোমার চেয়ে?
একটি কৌটার প্রীতি
লাগায় এ মনে গোটা পল্লীও সারা বাল্যের স্মৃতি।
মনে পড়ে বুড়ী দিদিমার ঘরে কুলের আচার চুরি।
লাটাইএর সুতা তুমি দিতে মেকে আমি উড়াতাম ঘুড়ি
পুতুলের বিয়ে ভেঙে দিয়েছিনু সেদিন কী তব শোক!
মনে পড়ে সেই কাতর চাউনি ছল ছল রাঙা চোখ।
সবচেয়ে পড়ে মনে—
আজিকার দিনে যে কৌটা কপালে দিতে চুয়া চন্দনে।

(পর্ণপুট)

আমি বড় কলেজীয়ী ছিলাম—কপাটী, গুলিদাণ্ডা, ফুলবাঁপ ইত্যাদি খেলায় আমি দর্শক হয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলতাম। সঙ্গীরা বেশ সাঁতার দিতে পারত, আমি সাঁতার শিখতেও পারিনি! ছোটখাটো গাছে উঠতে পারতাম, কিন্তু বড় গাছে বা তালনারিকেল গাছে উঠতে পারতাম না। সঙ্গীরা ছিপ দিয়ে বেশ মাছ ধরত। আমিও তাদের সঙ্গে মাঠের পুকুরে ছিপ ফেলতে সুরু করলাম। বহুদিনের চেষ্টায় আমি একটা পুঁটিমাছ ধরেছিলাম। সঙ্গীদের কৃতিত্ব আমাকে অবাক করল। এক একজন ২।৩ সের মাছ ধ'রে ফেলত। নিজের মধ্যে একটা কৃতিত্বপিপাসা তমুরাতে লাগল। শীঘ্রই তাস খেলা শিখে ফেললাম এবং তাতে আমি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাতে পারলাম। কিন্তু এই পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ। এখন যেমন বাপ-মায়েরা ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেশ তাস খেলে—তখন সে প্রথা ত দূরের কথা, তাস খেলা ছেলেদের পক্ষে মহা অপরাধ বলে গণ্য হ'ত। আমাদের দাদা-শ্রেণীর যুবকরা আমাদের তাস খেলতে দেখলেই তাস কেড়ে নিয়ে হয় বাজেয়াপ্ত করত, নয়ত ছিঁড়ে ফেলে দিত। ভাঙা চালার মধ্যে লুকিয়ে খেলতে গিয়েও ধরা পড়েছি। যাঁরা শাসন করতেন তাঁরা গাঁয়ের ইস্কুলের পড়াও সমাপ্ত করেন নি। তাঁরা ছিলেন সবাই স্বচ্ছন্দচারী ও স্বেচ্ছাচারী বেকার যুবক।

এইত গেল বালকদের কৃতিত্বের কথা। তারপর দেখলাম যুবকদের অপূর্ব কৃতিত্ব। যাত্রাভিনয়ের শখের দল হ'ল। একজন যাত্রার পালা রচনা করতেন। তিনি ছিলেন আত্মীয় একজন কবিরাজ। তিনি পালা রচনা করতেন, আমি তাঁর কাছে বসে থাকতাম। আমিই হতাম তাঁর পালার প্রথম রসবেত্তা শ্রোতা। এতে আমি কৃতার্থ হতাম। এ ব্যক্তিকে মনে করতাম অসামান্য মানুষ, এর শক্তি সাধারণ লোকের অনধিগম্য।

আমাদের অতিপরিচিত প্রতিবেশী যুবকেরা যখন রাম, লক্ষ্মণ, অর্জুন, অশ্বত্থামা, নারদ, সীতা, দ্রৌপদী ইত্যাদি সেজে অদ্ভুত অভিনয় করতে লাগল এবং আমাদের সঙ্গী বালকদের কেউ কেউ যাত্রার ছোকরার দলে পান গাইতে লাগল তখন তাদের কৃতিত্ব দেখে অবাক হয়ে গেলাম। যে রামায়ণের নাটকে হনুমান বা মহাভারতের নাটকে ভীম সেজে ভীষণ তর্জন গর্জনের সঙ্গে বক্তৃতা কর'ত, তাকে আমার অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি বলেই মনে হ'ত। আমাদের বৈঠকখানাতেই আমাদের তামাক পুড়িয়ে যাত্রার রিহার্সেল হ'ত। তাদের মহড়ার বক্তৃতা আমার কর্ণে প্রবেশ ক'রে আমার পাঠনিবিষ্ট চিত্তকে অবিরত চঞ্চল করে তুলত। আমার চিত্ত তখন স্বপ্নলোকে বিচরণ করত। গ্রামের যাত্রার দল গ্রামে একটা সাংস্কৃতিক (?) পরিবেষ্টনীর সৃষ্টি করল। বহুব্যক্তির মধ্যে যে অপূর্ব শক্তি ছিল তা প্রকট হবার সুযোগ পেল। কেবল অভিনয়ে নয়, গানে, বেহালা, ঢোল তবলা হারমনিয়ম ইত্যাদি বাদনে, নেপথ্যরচনায়। তখন দেখলাম অনেকেরই মধ্যে প্রতিভা সুপ্ত হয়েই ছিল। এদের কৃতিত্ব আমাকে মুগ্ধ করল, পরবর্তী জীবনে

এদের সম্বন্ধে কবিতা লিখেছিলাম। যাত্রার দলের একজনের নাম ছিল মধু—তাকে মধুসরকার (মুদী) বলে উল্লেখ করেছি। সেই কবিতার কিয়দংশ এই :—

প্রথম গুণীর দেখা পাইলাম মধুসরকারে
প্রথম রসজ্ঞ আমি হইলাম পাইয়া তাহারে।
ছোট গ্রাম, ছোট শিল্পী, আমি ছোট ছেলে,
অসঙ্গতি কিছু নেই, বর্ণে বর্ণে মেলে।

* * *

মরে নাই মোর মধ্যে সেই শিশুমন।
বিস্ফারিত একে শুধু। শিল্পীদের অসামান্য জন
জানি আমি। বনস্পতি তারা:
কেতাবী খেতাবী ধনী পদমত্ত মদমত্ত যারা
তাহারা এরওসব। কেহ তারা নয়ক আপন
তাহাদের সাথে নাই হৃদয়ের সংযোগ-বাঁধন।
যদি মধু সরকারও অন্তরঙ্গজন।
তারি হতে সুরু মোর মুগ্ধতার অর্ঘ্য নিবেদন,
প্রথম আমার চিত্তে রোমাঞ্চিকা বিস্ময় মোদন
রসদেবতারে মধু করিল বোধন।

মধু কেবল বিস্ময়মুগ্ধতা নয়, আমার চিত্তের কৃতিত্ব-পিপাসাকে উদ্দীপিত করে তুলল। বলতে লজ্জা করে, আমি এগারো বৎসর বয়সেই ছন্দ গাঁথতে সুরু করলাম। তখন কি লিখেছিলাম মনে নেই—তবে আমার মাকে কৃতিত্ব-উদ্দীপন ও উপাদান আহরণের প্রেরণার অভাব ছিল না।

কেবল পল্লীর আবেষ্টনী ও পল্লীর নরনারীর আচরণই যথেষ্ট নয়, পল্লীর দৈন্য, ব্যথা, পাপতাপ, অনাচার, সরলতা, তরলতা—সমস্তই আমার চিত্তকে বিচলিত করত। তখনও আমি ভাবপ্রকাশের ভাষণ পাইনি কবিতা কাকে বলে তাও দেশের অধিকাংশ লোকের মতই আমিও জানতাম না। আমি শুধু তখন পয়ার ছন্দ রচনা করতে পারতাম। গ্রামের উৎসব পার্বণের মধ্যে আমি প্রাথমিক উপাদান উপকরণ অনেক পেয়েছি। এই সকল আমার চিত্তের কুমারী ভূমির অলীভূত হয়ে ছিল। পরে সে ভূমি কর্ষণা লাভ করলে ফুলের গাছ তাতে না জন্মাক, বহুবিধ তৃণগুল্ম জন্মেছে। চিত্ত-ভূমি বন্ধ্যা হয়ে পড়ে নেই।

জ্যৈষ্ঠমাসে চন্দ্রিশপ্রহর উৎসবের সময় পশ্চিম বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তনিয়া একজন না একজন এসে পদাবলী কীর্তন গাইতেন। মন দিয়ে তা শুনতাম। গাজনের সময় বৎসর বৎসর দুইটি ক'রে যাত্রার দল আসত দূরবর্তী স্থান থেকে। আমাদের একজন প্রতিবেশী দুর্গোৎসবের সময় যাত্রার দল আনাতেন। তিনি দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু পূজায় ছিল তাঁহার রাজসিক ঘটা। অনেক কাজেই ঘটা করে তিনি সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। গ্রামে কবির দল ছিল, কবির গান প্রায়ই হত। গোঁসাই বাড়ীতে কথকতা হ'ত। এ সমস্তের প্রভাব আমার চিত্তে ব্যর্থ হয় নি।

রথযাত্রা ছাড়া গ্রামে বারো মাসের তেরো পার্বণের কোনটিই বাদ ছিল না। প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের বাংলার সংস্কৃতির সংযোগ আছে। এই পার্বণগুলির যা কিছু শুচি সুন্দর তা বালকচিত্তকে কৃতার্থ করত।

আমার মনে হয় গ্রামের সংস্কৃতি দুইটি বস্তুকে প্রধানতঃ আশ্রয় ক'রে আছে। পুরুষদের চণ্ডীমণ্ডপ—আর নারীদের ষষ্ঠীতলা; পরবর্তী জীবনে এই দুটিকে আমি বাণীরূপ দিয়েছি। বৈঠকখানা ও চণ্ডীমণ্ডপ এক নয়। চণ্ডীমণ্ডপে সাধারণতঃ দুইপাশের দুইটি কুঠরি থাকে—মাঝ খানটা থাকে খোলা, সেখানেই দেবীর প্রতিমা বসানো হয়—একটা বড় বারেন্দা থাকে কাটা চালের তলায়। চণ্ডীমণ্ডপ পথের ধারেও থাকতে পারে—বাটির বহিরংশেও থাকিতে পারে।

চণ্ডীমণ্ডপ

বড়—এ ঘরখানা কাহার ভাবি,
দেখি যে এই ঘরে সবারি দাবি।
পথের পান্থ যে দণ্ড তরে
হেথায় বসে যায় পৈঠাপরে।

মায়ের পূজা হয় শরৎ এলে
গাঁয়ের নরনারী হেথায় মেলে।
সবাই অঞ্জলি হেথায় সঁপে,
প্রবীণ প্রবীণারা মন্ত্র জপে।

হেথায় ভাগবত কথক পড়ে,
শতেক শ্রোতা এর বক্ষ ভরে।
গাঁয়ের পাঠশালা হেথায় বসে
ছেলেরা হেথা যোগ বিয়োগ কষে।

গাঁয়ের পাঠশালা ইহাই সাঁঝে
যাত্রা মহড়াতে সেহালা বাজে।
কীর্তনিয়াদল এ গাঁয় এলে
এখানে বাসা পায় মাদুর মেলে।

দূরের বর যায় করিতে বিয়ে
বাজনা বাজাইয়া এই গাঁ দিয়ে।
এখানে হয় তার নান্দীমুখ
বহিছে বসুধারা ইহার বুক।

সেবার পুড়ে গেল বাগ্দীপাড়া
পাইল ডেরা হেথা বাস্তহারা।
বাউল দরবেশ মেলিয়া কাঁথা,
হেথায় বর্ষায় বাঁচায় মাথা।

গাঁয়ের মোড়লেরা হেথায় মিলি
নালিশ শুনে করে সালিস বিলি।
বিধান করে হেথা পঞ্চায়েত
কাহারো জরিমানা কাহারো বেত।

কপোতকুল লভে কূজন সুখ,
মৃদু নয় কভু ইহার বুক
কাঠামো প্রতিমার দাওয়ায় থাকে
ছুতার নেই এর সবারে ডাকে।

চণ্ডীমার কোলে সবারি ঠাঁই,
চণ্ডীমণ্ডপ নাম যে তাই।

পল্লী নারীদের মাতৃত্বেই জীবনের চরম সার্থকতা। গ্রামের ষষ্ঠীতলায় পল্লীনারীরা বৎসরে দুই তিন বার সম্মিলিত হয়ে মাতৃত্বের দেবতার উদ্দেশে কাতর আবেদন জানায়। কোন প্রাচীন বট বা অশ্বত্থের মূলে একখণ্ড পাথর—এরই নাম ষষ্ঠীতলা। গৃহ যদি হয় আশ্রয়, বটও অশ্বত্থ যদি তরু তবে উপাশ্রয়। এই উপাশ্রয়ে প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে—ষষ্ঠীমাতা প্রচ্ছন্ন থাকেন। জননীরা হৃদয়ের আর্ত আবেদনে ঐ পাথরে আপনাদের দেবতাকে পূজার দিনে উদ্বোধিত করেন।

ষষ্ঠীতলা—কবিতার কিয়দংশ—

গ্রামের শেষে অশথবটে,
জড়ায় দোঁহে দোঁহার গলা।
গাঁয়ের তীর্থ উহার তলে,
ওটা মোদের ষষ্ঠীতলা।
গাঁয়ের মায়ের দেবতা হেথায়
সিঁদুরমাখা পাথরখানি
উহায় ঘিরে কমলকলি
রচে হাজার কোমল পাণি।
রচে শ্যামল গণ্ডী উহার
মটর-কলাই-ছোলার চারা
গন্ধে ভরায় ওর মাটিরা
সচন্দনা সলিল ধারা।

* * *

নেইক দেউল, নেই পূজারী
নেই আরতি সকাল সাঁঝে
নিত্য ভোগের নেই আয়োজন
ঘণ্টা সানাই ঢোল না বাজে
নেই লোকালয় আশে পাশে
পাতাহারা—নেই ওতাপনা
যে না আসে প্রাণের টানে
লাগে কি তার উপাসনা।

* *

ডালে ডালে পাখীর বাসা

সর্প—পেচক কোটর ফাঁকে,
দুপুর বেলা ঘুমায় কুকুর,
রাতে শেয়াল প্রহর হাঁকে।
ঐ বিলারে বালিশ করে
বাদুরগুলি শোয় আবাসে।
কাঠ বিড়ালী সিঁদুর চাটে
গিরগিটিরা ওঠে নামে,
উইএর ঢিপির আশে পাশে
ছাগল ছেবার বিহার স্থানা
জগন্মাতার কোলের কাছে
আসতে কারো নেইক মানা।
নিখিল জীবের অন্ন হোথা
মায়ের সোহাগ আঁচল পাতা
ষষ্ঠীতলায় বিরাজ করেন
বিশ্ব শিশুর ধাত্রী মাতা।

ষষ্ঠীমাতার পরেই আর একটি দেবীর সঙ্গে পল্লী নারীদের ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতা। তিনি হলেন লক্ষ্মীদেবী। ষষ্ঠীমাতা সন্তানের কল্যাণদায়িনী আর লক্ষ্মী অন্নদায়িনী। অন্ন যারা কিনে খায়, তারা অন্নকে লক্ষ্মীর দান মনে করে না। পল্লীর অন্ন বাজার থেকে আসে না। ভূমি থেকে ঘরে আসে। লক্ষ্মীই ভূমিমাতার ভাণ্ডার থেকে গৃহে গৃহে বছর বছর ধন-ধান্য পাঠিয়ে দেন।

পল্লীজীবনের প্রধান উপজীব্য চাষ। আমাদের নিজের বাড়ীতেই চাষ ছিল। কাজেই চাষের সমস্ত খুঁটি নাটি আমার জানা ছিল। ১১।১২ বৎসর বয়সের মধ্যেই তা জেনেছিলাম। একবার এই অভিজ্ঞতা আমার খুব কাজে লেগেছিল। আমি যখন রঙ্গপুর জেলার একটি স্কুলে প্রধান শিক্ষক ছিলাম, তখন রঙ্গপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন কিছুদিনের জন্য ভারতবিখ্যাত রাজপুরুষ স্যার বি, এন, রাও। তিনি শহরে গিয়ে স্কুল পরিদর্শন করেন এবং ডাকবাংলায় আমাকে ডেকে পাঠান। তিনি জিজ্ঞাসা করেন আমি কোন জেলার লোক। আমি বর্ধমান জেলার লোক এই কথা বলায় তিনি বর্ধমান জেলার ধান, আলু, আখ ইত্যাদি চাষের খুঁটি-নাটি সব কথা জিজ্ঞাসা করেন এবং চাষের অবস্থা, জমির উর্বরতার তারতম্য সার, জলসেচ ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান ল'ন। আমি প্রত্যেক প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারায় খুবই সন্তোষ প্রকাশ করে যান। আমার হেডমাষ্টারির কৃতিত্ব এতেই তাঁর কাছে সাব্যস্ত হ'ল, স্কুল পরিদর্শন ক'রে নয়।

আমি আবাদের সময় কাকার সঙ্গে মাঠে যেতাম। আলু তোলা, আখ কাটা, ডগা বসানো ইত্যাদির সময় ক্ষেতে উপস্থিত থাকতাম। কখনও কখনও মুনিষদের জন্য মুড়ি নিয়েও ক্ষেতে দিতে যেতাম। সব চেয়ে আমোদ পেতাম ধানকাটার সময়। ধান কাটার সময় আমার উপর বিড়া গোণার ভার পড়ত। কোন জমিতে কত পণ বিড়া হ'ল শেষ পর্যন্ত কত কাহন বিড়া পাওয়া গেল এই হিসাব আমাকে রাখতে হ'ত। গাড়ীতে ধানের বিড়া বোঝাই হলে তার উপর বসে বাড়ী ফিরতাম। তারপর ধান পিটানো, নরাই বাঁধা, ধান মাপ ইত্যাদি সবই আমার দ্রষ্টব্যের মধ্যেই ছিল।

অঘ্রাণ, মটর, ছোলার দানাপুষ্ট হলে শুটির খোসা ছাড়িয়ে প্রচুর পরিমাণে তিতাতিন ভক্ষণ করা এবং আখ উঠলে প্রচুর পরিমাণে আখের রস চুমুক দিয়ে পান করা একটা উৎসবের অঙ্গের মত হ'ত। বহুদিন পরে পৌষের মাঠের ও পল্লীগৃহের স্মৃতিকে বাঙ্ময়রূপ দিয়ে একটি কবিতা লিখেছি তা এখানে উৎকলন করে এই প্রসঙ্গের উপসংহার করি—

প্রথম দেখিতেছি একমনে এক টানা
পথে হেঁকে যায় বর্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানা।
একজন ফেরিওলা।
চমকি উঠিনু এবে একেবারে একান্ত চেনা গলা।
বর্ষের পরে জোর দিয়ে হেঁকে যায়,
উচ্চারণের ভঙ্গীতে তাবে প্রতিবেশী মনে হয়।
প্রথম দেখা মোর করে দিয়ে গেল মাটি,
বেড়ে গেল যত ভুল করে কাটাকাটি,

চলে গেল মন আমার গাঁয়ের মাঠে
এই দেখেছে চাষী যেথা ধান কাটে।
চলে গেল মন আমার গাঁয়ের মাঠে,
এই শেষ মাসে যেথা চাষী ধান কাটে,
পিঠা বাঁধে আর গলা ছেড়ে গায় গান,
মাতায় তাহারে সোনালী রঙের ধানের শীষের ঘ্রাণ।
কোথা মধুর উঁচু আওয়াজ তুলি
ধান বয়ে চলে গাড়ী পলে পলে উড়ায়ে মাঠের ধূলি।
গাঁয়ে পশে মন সে গাড়ীর পিছু পিছু
যেখানে ধানের চাঁচা ছোলা, তার নাই আর উঁচু নীচু।
নিকানো চুকানো উঠান যেখানে, নাই তায় ধূলি কণা
দুয়ার চইতে আঁকাবাঁকা আলিপনা।
ঘরে ঘরে বাজে শাঁখ
মনে হয় যেন বৎসরান্তে অঞ্জনা মার ডাক।
ঘরে ঘরে চলে নবান্ন উৎসব
নূতন চালের আস্বাদ পেয়ে শিশুদের কলরব।
ধূপের গন্ধে মোহিত বাতাস নিশ্বাসে যায় বুকা
দিনরাতই গাঁয়ে চলেছে লক্ষ্মীপূজা।
কলসীর জলে ডোবা ও পুকুর ভরা।
গাহিছে মেয়েরা পুণ্যিপুকুর সাঁঝ পুকুনীর ছড়া।
ঘরের মেঝের ইতুঘট আছে পাতা।
ভিখারীরে কেউ ফিরায় না আর কৃপণও হয়েছে দাতা।
বটতরুগুলি ধরেছে নতুন জট,
খেজুর গাছের গলায় দুলিছে ঘট।
মঠের উঠানে ফুটেছে কৃষ্ণ অতসী অপরাজিতা
শীমলতাগুলি বেগুনী-কুসুমে হইয়াছে বিভূষিতা।
লাউ-ডগাগুলি শাখা বিস্তারি উঠিয়াছে চালে চালে,
নানান রঙের পক্ষীরা গায় ডালে ডালে পালে পালে।
চলে যায় মন ফ্রকের কাপড় ফেলি
আমার গাঁয়ের দীঘি-জলে যেথা হাঁসেরা করিছে কেলি।
বিলের কিনারে এক পায় বক আছে যেথা ওৎ পেতে
তেল হলুদের উৎসব যেথা সরিষার ক্ষেতে ক্ষেতে।
চলে যায় মন ছাড়ি কোলাহল ধূলি ধূম নগরীর
ধূপধূন যেথা কুণ্ডলীপাকে রচে বেদী লক্ষ্মীর।

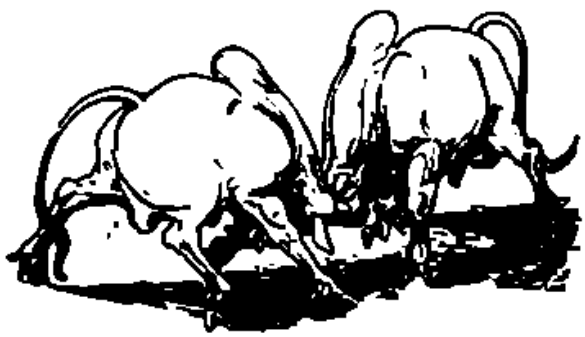

সমাজ ও জাতীয় জীবন

[র. কু. সে.]

সাম্প্রতিককালের কথাসাহিত্যে যতবেশী মনস্তাত্ত্বিক বিষয় এসে আশ্রয় ক'রেছে, সমাজবিষয়ক সমস্যা ততবেশী এসে আশ্রয় ক'রছে না। ইদানীন্তনকালের প্রশ্নই উঠেছে মন নিয়ে, সমাজতাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে খুব বেশী নয়। অথচ লক্ষ্য করবার বিষয়, সামাজিক সমস্যাকে সাহিত্যে তুলে ধ'রে ঐ সমস্যাগুলি সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতেই এতকাল সাহিত্যিকেরা প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেছেন। সমাজ তো সামাজ একটা বিষয় মাত্র নয়, সমুদ্রের মতো তা ব্যাপক। সেই ব্যাপক সমাজ-জীবনের সমস্যাগুলিও বহু বিস্তৃত। তার সঙ্গে মানুষের যোগ না থেকে উপায় নেই। মানুষ মাত্রেই Rational Being. মানুষের জন্যই সমাজ, এবং সমাজের জন্যও মানুষ বটে। যেখানে এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ, সেখানে একের সমস্যা উভয়ের সমস্যা। যা জীবনে ঘটছে, তা সমাজকে আশ্রয় ক'রেই ঘটছে। সেখানে শুধু ব্যক্তির একক জীবন নয়, একক জীবন নিয়ে কখনও সমাজ সৃষ্টি হয় না; সেখানে একাধিক ব্যক্তির প্রশ্ন। সুতরাং এককে অতিক্রম ক'রে যেখানে একাধিক জীবন কোনো সমস্যায় জর্জরিত হ'য়ে ওঠে সেখানে একাধিকের মধ্যে এককও আছে; অতএব যা কিছু সমস্যা, তা সকলের সমস্যা। সেই সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত বহন ক'রে এতকাল সাহিত্যিকেরা শিল্পীরা তাঁদের স্ব স্ব শিল্পকর্মকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন। যদিও তাঁরা সমাজে সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণ করেন নি, তবু একথা নিশ্চিত যে, তাঁদের স্ব স্ব সাহিত্যিক ভূমিকায় তাঁরা সমাজ-সমস্যার যে চিত্র তুলে ধরেছেন, সেই চিত্রের পথ ধরে কর্মী এগিয়ে এসেছেন তাকে বাস্তবে রূপায়িত ক'রে তুলতে। রূপ পেয়েছেও। এমনি করেই প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও পরোক্ষে সমাজ উন্নয়ন মূলক কাজ ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর আজকের সাহিত্যে সেকালের রোমান্স বেশ কমই নেই। এখন মনই প্রধান, সমাজ তারপর। মনই যে একটা বিরাট সমুদ্র; সেই সমুদ্রে মুক্তা খুঁজে বার করা কঠিন। এই কঠিন পথের ব্রত হচ্ছে মনোবিশ্লেষণ বা Psycho-analysis-এর ব্রত সমাজ বিষয়ক সাহিত্যেও যে এ ব্রত অনুপস্থিত ছিল, তা নয়। ক্রমে যুগপরিক্রমার সঙ্গে সঙ্গে এই দিকটিই আজ বড় হয়ে উঠেছে। তার পিছনে প্রধান যুক্তি হচ্ছে এই যে, মনই সর্ব বিষয়ের একমাত্র কারক মন থেকে যা উদ্ভাসিত হচ্ছে, তারই রূপের প্রকাশ ঘটছে ব্যবহারিক জগতে। অতএব মনের ক্ষেত্র আগে, পরে আর সব। কিন্তু অগ্রাধিকার সূত্রে মনোবিশ্লেষণের বিষয় নিয়ে আজকের সাহিত্যের অধিকাংশক্ষেত্রে যা ঘটছে, তা আর যাই হোক, সমাজ-কল্যাণের ধ্রুববেশী অনুগামী নয়। মনোবিশ্লেষণের উপর জোর দিতে গিয়ে অধিকক্ষেত্রেই লেখক ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েন; ফলে সাহিত্যের যে ব্যাপক ক্ষেত্রটি, তা সঙ্কুচিত হয়ে প'ড়তে বাধ্য হয়। মনোবিশ্লেষণের দিক থেকে তাতে বৃহত্তর ত্রুটি না ঘটলেও সমাজ কর্মের দিক থেকে তাতে কম বাতায় ঘটে না।

আসলে শিল্প-সাহিত্যের একটা বড় কাজই হচ্ছে মানুষ ও সমাজের মানকে উন্নত ক'রে তোলা; এবং সেই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও উন্নতি। একটা জাতির পরিচয় থাকে তার শিল্প-সাহিত্য-ইতিহাসে। জাতির জীবন-কাহিনী যে-সাহিত্যে বড় হ'য়ে দাঁড়ালো না, সে-

সে যেমনই মহৎ হোক,
...যেকে ...র মানুষের খুব বেশী অগ্রগতি নয়।

...ধুনাতন কালের ন্যায় একমাত্র
...বিশ্লেষণই বিষয়ই সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে না
...সঙ্গে সমাজকল্যাণের কাহিনীর ভিত্তিতে জাতির
...বিষয়টিই প্রধান হয়ে উঠবে। পণ্ডিত
...বিষয়টি সম্পর্কেই হাত দেবেন।
...যে কিছুনে যা বুঝি তা উপন্যাসেই ব্যক্ত হয়েছে।
...ধুনাতন নিছেই মনোবিশ্লেষণী সাহিত্যের বাইরে
...ই জাতীয় গ্রন্থের পরিচয় যে আমরা একেবারেই পাই
...নয়। সম্প্রতি ভারতীয় সাহিত্যিক মহল থেকে
...ই জাতীয় একটি ব্যাপক কাজের ভার গ্রহণ করা
...তাঁদের উদ্যম—'ভুবনডাঙা' উপন্যাস।
...ধারণার সমাজ বিজ্ঞানের ভিত্তিতে এই উপন্যাসের মূল
...বিষয় গড়ে ভারতীয় বিভিন্ন প্রদে-
...বিভিন্ন ভাষা ...য়ে সর্বভারতীয় নব-
...গড়ে উঠছে এর একটি রূপ।
...এগ্রন্থও যদি সমস্তকাজে সমাপ্ত

সংবাদের ভিত্তিতে এ গ্রন্থের উল্লেখ ক'রলেও এটা একটা মস্তবড় উপাহরণ—ভারতীয় সমাজের রূপ আজ ক্রমেই পাল্টে যাচ্ছে। পূর্বে বিচ্ছিন্ন সমাজের বিচ্ছিন্ন আচার পদ্ধতির দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রিত হতো। আজ ক্রমে সেই বিচ্ছিন্নতা ঘুচে গিয়ে ঐক্যসূত্রে সকলে আবদ্ধ হচ্ছে। সাহিত্যের নব উপাদান আজ এখান থেকেই সুরু। আজ একটি বিশেষ মানুষের মন শুধু সেই বিশেষ মানুষটিরই নয়, বহু মানুষের এবং বহুতর প্রদেশবাসীর, সুতরাং আজ সাহিত্যে শুধু মনোবিশ্লেষণ টেনে আনা হ'লেই চলবে না, তার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজ-নীতিকে তুলে ধরতে হবে। ভারতীয় সাহিত্যিক সঙ্ঘ তাঁদের 'ভুবনডাঙাকে' কেন্দ্র ক'রে যদি এই রীতি অনুসরণ করতে পারেন, তবে ভারতীয় সাহিত্যিকদের কাছে তাঁরা নিজ জগতের একটা নতুন পথ খুলে দেবেন সন্দেহ নেই।

BENGAL JUTE MILL

COMPANY LIMITED

8, Dalhousie Square East,
CALCUTTA.

Manufacturers of all Qualities of

JUTE GOODS

FASHIONABLE JUTE CARPETS
For All Purposes and at Economical Rates

Available in Various Shades and Designs

JACQUARDS, DOBBIES, FLOOR RUNNERS,
CHAIR CLOTHS & SCHOOL MATTINGS.
ALSO JUTE WEBBINGS

Twines, Spool and Cops Our Specialities

WANTED AGENTS FOR UNREPRESENTED AREAS

TELEGRAMS & CABLES
CALCUTTA-(INDIA).
"HEMPBALER"

TELEPHONES
MILLS : HOWRAH-13
OFFICE : **22-6853-58**

প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্র

শ্রীপ্রভাংশু গুপ্ত

তৃতীয় পর্ব

—রঙ্গশীর্ষ বা রঙ্গমঞ্চ—

এইবার আত্রেয় ও অন্যান্যদের বললেন—রঙ্গশীর্ষ অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে কিছু বলবার আগে মত্তবারণির কথা কিছু আলোচনা করা দরকার। মত্তবারণি বলতে বোঝায় রঙ্গশীর্ষের পার্শ্ব-ঘর বিশেষ। প্রতিটি রঙ্গশীর্ষের দুপাশে এক একটি অর্থাৎ মোট দুটি পার্শ্বঘর তৈরী করতে হবে। এক একটি মত্তবারণিতে চারটি স্তম্ভ থাকবে। রঙ্গশীর্ষের দৈর্ঘ্যের যে পরিমাপ, মত্তবারণির বিস্তারও অনুরূপ হওয়া উচিত। এই পার্শ্ব-ঘরের রঙ্গমঞ্চের ভূমিক্ষেত্রের চেয়ে সামান্য কিছুটা আর নাট্যশালার ভূমিক্ষেত্র ও মত্তবারণির ভূমিক্ষেত্রের উচ্চতা হবে সমান।

এই মত্তবারণি দুটি নির্মাণের সময় ভূতলের উদ্দেশ্যে মালা, ধূপ, সুগন্ধি, ও নানাবর্ণের বস্ত্র ইত্যাদি নিবেদন ক'রতে হবে।

ভরত একটু থেমে বললেন—এইবার আমি রঙ্গপীঠ নির্মাণ মানে রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ সম্বন্ধে নাট্য শাস্ত্রের বিধি-নির্দেশ কিছু বলবো। মূল রঙ্গশীর্ষটি তৈরী করতে হবে আগাগোড়া কাঠ দিয়ে—এই উদ্দেশ্যে মোট ছয় খণ্ড কাঠ ব্যবহার করার উপদেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। সাজ-ঘরের জন্য দুটি দরজার ব্যবস্থা করতে হবে রঙ্গশীর্ষ ঠিক যে ভূমির ওপর গ'ড়ে তুলতে হবে, সেই জমি ভরাট করতে হবে কালো রং-এর মাটি দিয়ে। এই জমির মাটিতে যেন পাথরের টুকরো বা ঘাস-আগাছা না থাকে। শাস্ত্রে তাই বলা হয়েছে ঐ জমি পরিষ্কার করবার জন্য একজোড়া শ্বেতবর্ণের বলদ দিয়ে লাঙ্গল একবার চালানো উচিত। আরো একটা কথা এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। যারা এই লাঙ্গল চালাবার ভার নেবে, তাদের ভেতর যেন কোনো অঙ্গহানি ব্যক্তি না থাকে। বুঝলে?

আত্রেয় উত্তর দিলেন—কোনো অসুবিধা হ'চ্ছে না বুঝতে।

ভরত ব'লে চললেন—এইভাবে রঙ্গশীর্ষের জমি তৈরী করতে হবে। জমি পিটে ঠিক করবার পর পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে জমি সমতল হয়েছে কিনা। জমি যেন কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশের মতো উঁচু গোলাকার না হয়। জমি হবে সমতল—মসৃণ,—অনেকটা আয়নার মত মসৃণ। রঙ্গশীর্ষের এই ভূমির নীচে বহুমূল্য রত্নাদি স্থাপন করতে হবে। পূর্বে রাখতে হবে স্বচ্ছ হীরক, দক্ষিণে রাখতে হবে উজ্জ্বল নীল রত্ন বা নীলমণি, পশ্চিমে রাখতে হবে স্ফটিকমণি, উত্তরে রাখতে হবে প্রবাল ও মধ্যস্থলে রাখতে হবে স্বর্ণ।

রঙ্গশীর্ষের ভূমিক্ষেত্রের ভিত্ তৈরী হ'য়ে গেলে পর ঐ জমির ওপর কাঠের কাজ আরম্ভ করতে হবে। শাস্ত্র

নির্দিষ্ট সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী এই কাজ শুরু ও সম্পন্ন করতে হবে। কাঠের ওপর কারুকার্য থাকবে নানাবিধ—যেমন খোদাই করা হস্তী, ব্যাঘ্র ও সর্পের প্রতিমূর্তি। তাছাড়া পৃথক পৃথক একক কাষ্ঠ প্রতিমূর্তি দিয়ে রঙ্গশীর্ষ সাজাতে হবে। কাঠের কাজ সেরে ফেলবার পর দেওয়াল তৈরীর কাজ শেষ করতে হবে।

[রঙ্গমণ্ডল বা রঙ্গালয়]

রঙ্গমণ্ডল মানে মূল নাট্যশালাটি হবে অনেকটা পর্বত গুহার মতো। এবং এতে থাকবে মোট দুটি গৃহতল বা মেঝে, কিন্তু এই দুই গৃহতলের উচ্চতা এক রকম হবে না। রঙ্গমণ্ডলের জানালাগুলি হবে ছোট,—বড় নয়। রঙ্গমণ্ডলের ভেতর খুব বেশী বাতাস চলাচল যেন না করতে পারে। রঙ্গমণ্ডলের অভ্যন্তর নির্মাণের সময় শব্দ-প্রতিধ্বনির জটিলতার দিকটাও মনে রাখতে হবে। কারণ অতিরিক্ত বাতাস যদি রঙ্গমণ্ডলের ভেতরে চলাফেরা না করে, তাহলেই দর্শকরা অভিনেতা ও গায়কের কণ্ঠস্বর এবং বাদ্যযন্ত্রধ্বনি স্পষ্ট শুনতে পাবেন।

রঙ্গমণ্ডলের দেওয়ালগুলি ইট, চুন ইত্যাদি দ্বারা তৈরী হ'লে পর তা শ্বেতবর্ণে রঞ্জিত ক'রে ঐ দেওয়ালের ওপর চিত্রাঙ্কন করতে হবে—লতাপাতা, নরনারী এবং প্রেমের দৃশ্যাবলী। এই ভাবে স্থপতি নির্মাণ করবেন আয়তক্ষেত্র শ্রেণীর রঙ্গমণ্ডল।

ভরত একটু থেমে বললেন—এখন আমি চতুষ্কোণ শ্রেণীর রঙ্গমণ্ডলের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি বলবো। শোনো মন দিয়ে। দিন ক্ষণ দেখে-শুনে এক শুভ মুহূর্তে আট দণ্ড পরিমিত ভূমি, মানে দৈর্ঘ্যে আট দণ্ড ও প্রস্থে আট দণ্ড পরিমিত ভূমি মেপে নিতে হবে। নির্বাচিত সেই ভূখণ্ডের ওপর অভিজ্ঞ স্থপতি নির্মাণ করবেন চতুষ্কোণ শ্রেণীর রঙ্গমণ্ডল। আয়তক্ষেত্র শ্রেণীর রঙ্গমণ্ডল নির্মাণের বিধি-নির্দেশগুলি এক্ষেত্রেও সযত্নে অনুসরণ করতে হবে। ভূমির পরিমাপ যেন একটু এদিক-ওদিক না হয়,—পরিমাপ হওয়া চাই নির্ভুল। রঙ্গমণ্ডলের ভেতরের প্রয়োজনীয় অংশগুলিও সঠিকভাবে মেপে নিতে হবে। রঙ্গমণ্ডলের বাইরের দিকের দেওয়ালগুলি তৈরী করতে হবে খুব মজবুত ইট দিয়ে। ঠাস গাঁথুনি যাতে হয়, সেদিকে স্থপতিকে রাখতে হবে সজাগ দৃষ্টি। মূল রঙ্গশীর্ষের ভেতরে থাকবে মোট দশটি স্তম্ভ। এই দশটি স্তম্ভের ওপর রঙ্গমঞ্চের ছাদ নির্মাণ করতে হবে।

রঙ্গমণ্ডলের ভেতর সুদৃঢ় ছয়টি স্তম্ভ স্থাপন করতে হবে। রঙ্গমণ্ডলের ছাদের ভার বহন করবে এই ছয়টি স্তম্ভ। ঐ সব স্তম্ভগুলির আশেপাশে আরো অপেক্ষাকৃত লঘুভার বা হাল্কা আটটি শাখাস্তম্ভ নির্মাণ করতে হবে। এছাড়াও দুই দণ্ড পরিমিত ভূমি নিয়ে মূল স্তম্ভটি তৈরী করতে হবে। এইসব স্তম্ভগুলির সংগে রঙ্গমণ্ডলের ছাদের সংযোগ কারেমি ভাবে নিষ্পন্ন করতে হবে। স্তম্ভগুলির ওপর নারীমূর্তি ও বৃক্ষের চিত্র অঙ্কিত থাকবে।

স্তম্ভগুলির বাইরের দিকের পরিসরে ব্যবস্থা করতে নাট্যামোদী দর্শকদের আসনশ্রেণী। ইট ও কাঠ দিয়ে তৈরী করতে হবে এই সব আসন,—সোপান শ্রেণীর কায়দায়। প্রতি সারি আসনের পরের সারির উচ্চতা বেশী হবে এক চতুর্থাংশ দণ্ড।

এই সব কাজ শেষ হ'লে পর স্থপতিকে দৃষ্টি দিতে হবে সাজ-ঘর তৈরীর দিকে। সাজ-ঘরে থাকবে মোট দুটি দরজা। প্রথম দরজা দিয়ে রঙ্গশীর্ষে যাবার সরাসরি পথ থাকবে। এই পথ ধ'রে অভিনেতা অগ্রসর হ'লে তিনি রঙ্গশীর্ষে দর্শকদের একেবারে সামনেই এসে উপস্থিত হ'তে পারবেন। আর একটি দরজা থাকবে প্রেক্ষাগৃহের ঠিক সামনাসামনি।

ভরত থেমে যেতে আত্রেয় বললেন—তারপর—বলুন।

ভরত বললেন—চতুষ্কোণ শ্রেণীর রঙ্গমণ্ডল নির্মাণবিধি সম্বন্ধে মূল কথাগুলি শেষ হ'ল। এইবার আমি ত্রিকোণ রঙ্গমণ্ডল সম্বন্ধে কিছু বলবো। ত্রিকোণ রঙ্গমণ্ডল-গৃহ দেখতে শুধু তিনকোণা হবে না, এর ভেতরের রঙ্গশীর্ষটিও তিনকোণাভাবেই তৈরী করতে হবে এই ধরণের রঙ্গমণ্ডলের এক কোণে থাকবে একটি দরজা। এটাকে তোমরা মূল বা প্রধান দরজা বলতে পারো। এ ছাড়াও রঙ্গশীর্ষের পেছন দিকেও একটি দরজা থাকবে। চতুষ্কোণ শ্রেণীর রঙ্গমণ্ডল নির্মাণে দেওয়াল ও স্তম্ভসম্বন্ধে যা বলেছি, এই ত্রিকোণ রঙ্গমণ্ডল নির্মাণকালে অনুরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

[তৃতীয় পর্ব সমাপ্ত]

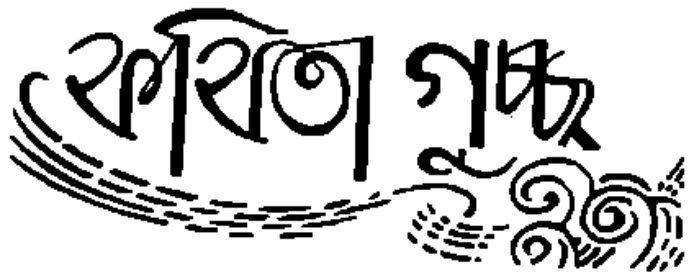

বৃত্ত

শ্রীঅনিরুদ্ধ কর

শুনেছি জগতে সখী, ফাল্গুনের সুর নেই আর !
নেই আর নাকি শুধুই বলার সুখে কথা বলা ;
তারপর সবকথা ফুরোলেই কলহ শোনার
মতো দুঃসাহসী আশা। সেই ব্যাধ নিপুণ ছিলায়
তূণ তীর নানা অছিলায় নিক্ষেপ করে না ;
শ্রাবণও ফুরিয়ে গেছে অশ্রুকণ জলের সিলায়
বৃষ্টি ; অহরহ: 'ভালোবাসি প্রিয়া' ইত্যাদি বলাও
ভাবালুতা। যায় নাকো চিঠি নিয়ে মেঘ প্রেয়সীর
কাছে, দমুস্ত্রের গৌরব রণনে ; তবুও উধাও
মন বারবার, তোমার দুচোখে। এক তীরন্দাজ
অযোধ্যা শরেতে শুধু গেঁথে যায় কালের কদ্রাক্ষ
দুর্যোধন সুরে। মোর এই কাল, আর তার কাজ
শিল্পিত নিপুণ। এখানে—শাদল স্বপ্নে ভরা চর
সে জেনেছে : তাই সখী আনো তুমি আলোর সুস্বর ॥

কচুর পাতায় বৃষ্টি বিন্দু

শ্রীসুধীর গুপ্ত

বৃষ্টি-বিন্দু জমিয়াছে কচুর পাতায়,—
তরলিত দুধারের—স্ফটিকের পারা ;
কাঁপিতেছে অভ্র-শোভা সূর্য-রশ্মি-ধারা
সোহাগের সকম্পনে আনন্দে—আভায়।
সমীরণ মৃদু-মৃদু আন্দোলিয়া যায়
কোমল কচুর বৃন্ত—কচি কচি চারা।
ব্রাত্য বৃক্ষ-গুল্ম লতা ঝোপে-ঝাড়ে যা'রা
একপ্রান্তে শোভা পায়, তা'দের সভায়
একান্তে অন্ত্যজ আজ আনন্দের ভরে
সুধা-ভরা বারি-বিন্দু পত্র-পুটে ধরি'
পথের প্রান্তরে শুধু সুখেতে শিহরে,—
ক্ষণ-স্থায়ী জীবনেরে রাখে আলো করি'।

কুজনে-গুঞ্জনে-মেশা স্বর্গ-হর্ষ-করে
কী মিষ্টি বৃষ্টির জল ! আহা মরি মরি।

তবু

অমিতা মুখোপাধ্যায়

পৃথিবী অনেক বড়ো, তার চেয়ে বড়ো নীলাকাশ—
সেখানে অবাধ-গতি চিলের মতন পাখা মেলে
বেশ তো বেড়ানো যায়. মানুষ তবুও সব ফেলে
রচনা করেছে তার ছোট নীড় ;—বিবর-বিলাসী !
আকণ্ঠ জ্যোৎস্নার মদ পান ক'রে তামসী মাতাল,
আবার ভোরের সূর্য দশদিক সোনায় ভরালো,
আরো কিছু আশা ক'রে মানুষীরা তবু এতকাল
তুলসী মঞ্চেতে জ্বালে প্রতি সাঁঝে প্রদীপের আলো।
এখানে অনেক লোক—ভিড়, কত খুশিয়ালী মন,
অনেক মুখর হাসি গান ; তবু নায়িকা কখন
খুঁড়িয়ে নিয়েছে শুধু একজন সঙ্গীর হৃদয়,
নায়ক পেয়েছে খুঁজে একখানি নিভৃত আশ্রয়।
একটি প্রদীপ, এক বাসা আর কিছু ভালোবাসা ॥
এই নিয়ে অমৃতের যাত্রীদের নিত্য যাওয়া-আসা ॥

ডায়েরি থেকে

প্রভাকর মাঝি

দশটার থেকে কলম চালাই কষে
সাড়ে পাঁচটায় বেরোই ইচ্ছে করে'।
আহা, আজো আছে মনে এইটুকু আশা
বড়ো সাহেবের পড়ি যদি সুনজরে।
সাত তাড়াতাড়ি বেরোলাম তারপর,
সওয়া সাতটায় এনগেজমেণ্ট আছে।
(ঘুণ্ডেরি গেল ভাঙালটার কিতে)
মিলি সেন নয়—কাবুলিওলার কাছে।
ওরি কাঁকে কোন রেষ্টুরেণ্টে বসে
ছাও কাপ চায়ে খিদেটা মারতে হবে।
রামু গোয়ালাটা শুনচে না আর কথা—
(এখনো কি চাঁদ, ওঠো তুমি নীল নভে ;)
দেড় বছরের পিলে-পেটা মেয়েটা যে
জ্বরের থেকে একটানা ভুগচেই।
টেম্পারেচার বেড়েছিল সকালেতে
খবর নেবার এখন সময় নেই।
তারপর ফের প্রাইভেট টিউসানি
সার্কাস যেনে আটটায় হবে খেতে।
(আজকে তোমাকে দেখবে কে আর, চাঁদ ?)
তিনি তো এখন টেলিফোন আপিসেতে।
জপিয়ে জপিয়ে তোষকে এনেছি বাগে
ফেরবার পথে আর একটু দেব তাড়া।
সহদেব সেন তাকাচ্ছে আড় চোখে,
দামী শিকারটা হয় যদি হাতছাড়া।
(আজো নাকি চাঁদ, ওঠো তুমি জলো-জলো,
তোমাকে নিয়ে কি কবিতা লিখতে বলো ?)

চৈত্রের দুপুরের গান

রাধারমণ প্রামাণিক

এখানে হৃদয় মনে হয় তার দুপুর-দ্বীপের মতো নির্জন !
সহে না এখানে আদগু এই দুপুর-চৈত্র, সহে নাকো তার
খাঁ খাঁ প্রান্তর, শুকনো নদীর করানো পাতার এই আলোড়ন
সহে না একাকী শুষ্ক নয়নে বলিরাড়ি আঁকা
দূর-দিগন্ত-অরণ্য-নীল ধূ ধূ অম্বরে শুধু চেয়ে থাকা,
সহে না এখানে, সহে নাকো তার !
এই যে হলুদ ঘাসের হৃদয় হৃত-কল্পনা,
এখানে কিছু কী আর সে পাবেনা ?
ওর জাগে তার : পাবে কিনা পাবে, কতোদূর যাবে,
সহে না অস্থহীন এই দূর
দূর-অনুভবে উদাস হাওয়ার বুকের উষ্ণ দুপুরের সুর !
তবু সুদীর্ঘ এই নির্জন সময়ের তিলে
কাউকে বুকিয়া তুলে যেতে গিয়ে প্রাণের নিখিলে
একা ছবি আঁকে, একা একা আঁকে
আঁকে আর আঁকে। সহসা মনের বৈকালে কাঁপে
কোনো আষাঢ়ের কাজল মেঘের অনুরাগে ঘন-কটাক্ষ ভুরু,
দুরু দুরু কাঁপে, কাঁপে আর কাঁপে ;
তবে কী এবার বর্ষণ হবে সুরু
নির্জন দ্বীপে ঝিরি ঝিরি কাউ হাওয়া

হারানো-বারতা

সিপ্রা ঘোষ

বাইবান যবে আমাদের মাঝে—
নামিবে অশ্রু জলে ;
ভাঙা মন লয়ে দূরে সরে যাব,
কালের অতল তলে !
বিবর্ণ হবে কপাল তোমার—
শীতার্ত চুম্বন,
ভবিষ্যবাণী সহিবে সেদিন ;
দুঃখের এ জীবন,
প্রভাতে ছড়াবে শীতল-শিশির—
শুভ্র-ললাট 'পরে,
এ যেন তাহার সাবধান-বাণী ;
বেদনায় মন ভরে।
কাঁতি তোমার যবে হবে ম্লান—
ভেঙে যাবে তব ব্রত,
লজ্জা তোমার ঢাকিবে আমারে ;
চেনা বন্ধুর মত।
জানে না তাহারা চিনি যে তোমারে,
হায় রে কে এত জানে !
যুগ যুগ ধরি' কত পরিচয়
দু'টি সুরভিত প্রাণে !
গোপনে মিলেছি তব সাথে ওগো
দিয়েছি অনেক ব্যথা,
তবু অন্তর ছলিবে কি মোরে
ভুলিবে কি ব্যাকুলতা ?
বহুদিন পরে যদি দেখা হয়—
ধরণীর এক কোণে,
শুধাব তোমার কুশল-বারতা
নীরব অশ্রু জলে।

তবুও নিশ্চিন্ত আমি

সিদ্ধার্থ গংগোপাধ্যায়

আমার আকাশে কেন মরালেরা যায়নাকো উড়ে
আমার আশায় কেন স্বপ্ন নেই আসন্ন জ্যোতির,
মননে আমার কেন জলে বৃথা শুষ্ক মরুভূমি,
সুনিবিড় নৃত্য নামে সর্বদা বিষণ্ণ স্থবির ?
আমার ক্ষেতের সোনা ঝড়ের কপায় ঝরে যায়,
মন আঁকে জলছবি ক্ষণস্থায়ী অস্থির স্মৃতিতে
আমার আকাশ-নীল কালো মেঘ ঢেকে দিয়ে যায়
স্বপ্ন তার ডানা মেলে হোরে যায় উধাও-উধাও।
তবুও নিশ্চিত আমি আমার আকাশ হবে নীল,
আমারো প্রাণের গানে একাকার পাখীদের গান,
অকূল সাগর পারে সোনালীপ হবে ঝিলমিল
আলো রোদে ভেসে যাবে মিশে যাবে আমারো এ প্রাণ।

হুড়্‌কো পিসি

ইন্দুমতী ভট্টাচার্য

নতুন শ্বশুর বাড়ীতে এসে বড় মজা লেগেছিল নামটা শুনে—হুড়্‌কো পিসি—ঘরজা নয়, গোবরাট নয়, হাঁসকল নয়, একেবারে হুড়্‌কো।

বেঁটে খাটো, পুষ্ট নধর টুকটুকে আন্‌টি—খান কাপড় পরা প্রায় হাঁটার পর্যায়ে ফেলা যায় এমন ছোট ক'রে চুল ছাঁটা সামনের দুটো দাঁতও গত—তবু রূপের অবধি নেই, খুরখুরে বুদ্ধা, শশব্যস্তে পথ ক'রে দেয় সবাই—চাপা স্বরে শুনি 'হুড়্‌কো পিসি, 'হুড়্‌কো পিসি', সবিস্ময়ে, মুখ তুলতেই চোখাচোখি। "ওঃ বাবাঃ' দিব্যি যে ডাগর ডোগর বউ—তা এখন কার এমনি হ'য়েছে—একেবারে মাদুর বগলে ক'রে এসেই জিগ্যেসা, শোব কোথায়?" মরমে ম'রে গেলাম—বাক্য নয়ত মধু—নামটিও তাই হুড়্‌ হুড়্‌ করছে, আর মুখে থুনিবার মত ঘৃণা বিদ্বেষ যেন জড়ো হ'য়ে আছে।

নামের মাহাত্ম্য কয়েকদিন পরে শুনলাম। চার-পাঁচদিন হট্টগোলে কাটার পর আত্মীয়স্বজন যখন প্রায় চলে গেছে, দুপুরে রোদে চুলটা শুকিয়ে নিচ্ছি, নিভৃতে—হুড়্‌কো পিসির আবির্ভাব—হড়াৎ ক'রে উঠলো বুকটা—কি আবার বলেন। "ও বাবাঃ, চুল শুকোন হ'চ্ছে? তাবন কত আজকালকার মেয়েদের। রূপতো ঐ! চুলের বাহার না ক'রলে বুঝি মন মজানো যায়না? যেমন সব বেলেল্লা মেয়ে, তেমনি সব সোয়ামী।" সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠি। "দিনের বেলা সোয়ামীর সঙ্গে দেকা করার মতন ইমুতি কাও, আবার মাতায় সিঁদুর সোয়ামীকে দেকালে পরমাই কম হয় তাওতো শিকো নেই।" উনি আমার মুখোমুখীই বসেছিলেন দুহাতে চুলের গুচ্ছ ধরেই, "টক্ দেড়ে সব বউ, ছস্তি দীগ্যি জ্ঞানগম্যি নেই," বলেই চলেছেন হুড়্‌কো পিসি।

ওঁর কাছেই পরে শুনেছিলাম আমার মুখটা নাকি তখন সিঁদুরের মতই লাল হ'য়ে উঠেছিল—রোদের তাপ্। সেই মুখের দিকে তাকিয়েই উনি বললেন, "সত্যি হুড়কো পিসি, আজকালকার মেয়েরা সত্যি বড় বেহায়া, দেখনা স্বামীকে দেখে কোথায় পালাবে ছস্তি-দীগ্যি আর জ্ঞানগম্যির বোঝা নিয়ে, তা নয় তার সঙ্গে এতো মাখামাখি।"

"কি পিসী বললিরে, ছোঁড়া? হুড়কো? ওঃ আড়ালে আবডালে এসব ব'লে থাক তোমরা—আজ বেরিয়ে গেছে মুখ দিয়ে—হুড়্‌কো, হুড়কো—তা আমি কেন হবরে হতভাগা? তোর মা মাসী কে আছে তাই দেখ্‌গে।" দেই দেই নাচন আরকি! "আলেল্লা পেত্নীতো বলিনি, হুড়্‌কোই বলেছি, তাতে আর হ'য়েছে কি পিসি?"

"কি আমি পেত্নী? আলেল্লা? বড় আস্পদ্দা দেকিতো তোর, ডেকে আনি আমি মহিন্দরকে—গলা টিপলে দুধ বেরোয় ছোঁড়ার, বউ পেয়ে পেয়ন্ত হ'য়ে উঠেচ নয়? চোকে কানে দেকতে পাচ্চনা?" মহিন্দর শ্বশুরের নাম। প্রমাদ গনি, ভরদুপুরে একি উৎপত্তি!

মা অর্থাৎ শাশুড়ী এসে উদ্ধার করেন। "পিসীমা, একি—ওদের কথায় রাগ করবেন না—ওরা কি আর কাকে কি বলতে হয় শিখেছে এখনও? যাক্, বউমা, যাওতো মা নিচে থেকে আমার পানের বাটা নিয়ে এসো—রঞ্জি, যা বাবা, কদিন তো বড় হট্টগোল গেছে, দুপুরে ঘরে গিয়ে শুগেযা।" হাফ ছেড়ে বাঁচি। ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা মনটাকে তীব্র তিক্ততায় বিরূপ ক'রে দেয় বৃদ্ধার উপর।

নিচে যেতেই দেখা দিদিশাশুড়ীর সঙ্গে। কাঁথা সেলাই করছেন আজ আসীর কোঠায় এসেও।' চুপ ক'রে বসে থাকতে পারিনা বাবা, হাত পা কোলে ক'রে, "কেউ বল্‌লেই বলেন। "কিগো, আমাকে একা রেখে কুঞ্জ অন্ধকার ক'রে চলে আসা হ'ল যে?" ভারী দরদী আর রসিকা ঠাকুমা। একটু আগে আমি নিচেই ছিলাম উনিই পাঠিয়েছিলেন ওপরে আমাকে।

"মা পানের বাটা নিয়ে যেতে বল্‌লেন।"

"রঞ্জি কোথায়?"

"ঘরে গেছেন।"

বউমা যেন কি, পানের বাটা নিজে নিয়ে গেলেইতো হ'ত, আর দাসীও তো রয়েছে।

"হুড়্‌কো পিসি এসেছেন, মা কথা কইছেন।"

"তুমিও হুড়্‌কো পিসি ব'লতে আরম্ভ করেছ? বুড়ী অবশ্য ও সরকারী, বাপ, ঠাকুদ্দা, নাতি সবাইকার। তোমাকে দেখে কিছু বললেন না?" "বলেছেন।"

"তাতো বল্‌বেই—ওর ওইতো দোষ। নতুন বিয়ে হ'য়ে হ'য়েছে তাদের ও দুচক্ষে দেখতে পারেনা।"

কৌতূহল উবন্ত হ'ল। দাসীর হাতে পানের বাটা ওপরে পাঠিয়ে দিতে বলে ঠাকুমা বল্‌লেন—রঞ্জি একাই থাক্—হুড়্‌কো যতক্ষণ আছে। নাতো ঠিক গিয়ে হাজির হবে হাজার ঘুড়ি কথা নিয়ে—তুমি ব'সো এখানে—বলি তোমায় ওরই গল্প।"

বল্‌বার সাগ্রহেই।

..."হুড়্‌কো তা ব'লে আসল নাম নয় ওর—ওর নাম রূপ, রূপবতী—আমাদেরই সমবয়সী—এইতো সেদিনের কথা—লালপেড়ে কাপড় প'রে, চুল এলিয়ে, নাকে নোলোক, গলায় কেঁসো হার আর কানে বার বাকড়ি প'রে যখন এসে দাঁড়াতো সত্যি রূপবতীই মনে হ'ত—বলে চলেন ঠাকুমা—ওই হুড়্‌কো পিসি, কে? তা হবেনা কেন, এখনও যা রূপ!

"গৌরীদান করলেন তখনকার পেরথা মতন, আট বছরের মেয়ে আর বাইশ বছরের ছেলে এই পণ্ডা মার্কা চেহারা। এ গেরাম ও গেরাম শ্বশুরবাড়ী, বাপের বাড়ী—তোমার গিয়ে শিরামপুর, শেওড়াফুলি। বিয়ে হবার পর কিছুদিন রইল বাপের বাড়ী—তারপর ঘর-বসতে গেল। কিন্তু....." ব'লে থাম্‌লেন ঠাকুমা - আগ্রহে তাকিয়ে রইলাম ঠাকুমার দিকে—" কিন্তু ঘর ক'রতে পারলেনা।"

"পারলেন না?" বেশ হ'য়েছে যেমন পাজী, ভাবি আমি। "কি ক'রে আর পারবে? শ্বশুড়ী ননদের জ্বালা তো ছিলই সে আর কোম্ বোয়ের না থাকতো। তখনকার দিনে—" "জ্বালা?"

"তানয়? সরষে ছড়িয়ে দিয়ে বলল' নে ঘর নিকো। বোকা বউ তাইতেই জিভে জ্বাতা বোলাতে লাগ্‌ল—আর সরষেও উঠলনা, তখন খোয়ারের একশেষ—বাপ চোদ্দপুরুষ যে যেখানে আছে সকলের বাপন্ত পিতন্ত। ঠোনা খেতে খেতে গালে কড়া।"

"চালাক বোয়েরা?"

"চালাক বউ আগে কাঁটা দিয়ে সরষে বেঁটিয়ে নিয়ে জ্বাতা বোলাতো।"

"তাহ'লে আর বকুনি খেতো না?"

"আরে দুরাত্মার কি ছলের অভাব ছিল—কত ফন্দী বার করত। একটা দশ এগারো বছরের মেয়ে আর কতক্ষণ?"

'বাবা:।"

"বাবা নয়, বাবার বাবা? তাইতো বলি তোরা রামরাজত্বে আছিস্। আমাদের সে একদিন ছিল।"

"আপনারও?"

"তা আমি কি আর সিষ্টিছাড়া? না বাংলা দেশের বাইরে?"

"তাহ'লে—"

"ঘর করেছিলুম বইকি—নাহ'লে তোরা সব এলি কোত্থেকে? কিন্তু যা বল্‌ছিলুম, ভগো পারলে না।"

"কেন?"

"ঐ যে আসল মানুষটি। দুনিয়ার লোক যারকু

কাটুক, ঐ একজনের কাছে ছিল সব শান্তি। সেটুকু না পেলে আর কি করবে বল ?" আসল মানুষটি মনে হ'তেও শাফিয়ে ওঠে হৃৎপিণ্ডটা। বিদ্যুৎ চমকে যায় শুধুতে শুধুতে।

"ওপর সোয়ামীর চেহারাটাও যেমন মার্কস, মানুষটাও তেমনি কাঠ পোঁয়ার।"

শিউরে উঠি। "কাঠ পোঁয়ার ?"

"তা নয়ত কি ? ঐখানেই তো ভাগ্যের জোর মেয়ে মানুষের, পাশার দান। মারধোর, শাসন, উপদেশ এছাড়া জানতো না। তবে কাট হয়ে থাকত' ওপ। দেখলেই কাঁপতো যেতে চাইতো না ঘরে। জোর জার ক'রে পাঠালে চেঁচিয়ে মেচিয়ে রসাতল করত। তখন মার—চোরের মার।"

"স্বামী মারবে স্ত্রীকে ?" ভাবতেও যেন পারি না।

"কোথায় আছ, মা ? দিব্যি কেতাদুরস্ত গদো গদো, সাত চড়ে রা কাড়ে না সোয়ামী পেয়ে ভেবেছ আগেও বুঝি এমনি ছিল ? রাম কহ। তবে কি সবাই ? কিন্তু বেশীর ভাগই জানতো শুধু মেরে চিট্ ক'রতে। দেখই না ভেবে নাতবউ, একটা দশ এগার বছরের মেয়ে শিশু বইতো নয়—ঐতো আমাদের মন্টিটা—কি বোঝে আর কি ই বা জানে—আর বাইশ তেইশ বছরের ধাঁই পেয়ে ছোঁড়া একটা—না না, লজ্জা নয়—মাথা নিচু করছিস্ যে—কি অন্যায় ছিল তা তোরা কল্পনাই করতে পারিস্ না—উত্তেজনায় লাল হ'য়ে ওঠে ঠাকুরমার মুখ। "যাইহোক, মেঠো পথ ধ'রে রাত্তিরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে চুপি চুপি পালিয়ে আসতো।"

"ভয় করতো না ?"

"ঘরের ভয় আরও বেশী ছিল।"

"ইস্।"

"এর মধ্যেই ইস্ ! এখনও তো সীতেহরণ বাকী। পালিয়ে আসতো বাপের বাড়ী—ভোর মাগাদ পৌঁছুতো। মাথায় সরা ক'রে কাঠকয়লার আগুন ক'রে আনতো, পথ দেখার জন্যে মাঝে মাঝে এক মুঠো ধুনো দিত ফেলে, দপ্ ক'রে খানিকটা পথ আলো হোতো, আবার চলতো।"

"কি ভয়ানক !"

"ওদেরই তো হুড়কো বউ কি আদেখা পেত্নী বলতো, দূর থেকে আগুন সরে সরে যাচ্ছে এক এক বার দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলে জ্বলে উঠছে, আর ছায়ার মত কালো মূর্তি দেখা যাচ্ছে।"

"কেউ টের পেলে ?"

"এসে মেরে ধ'রে পাকড়ে নিয়ে যেতো, নয়ত জন্মের শোধ বাড়ী ঢোকার পথ বন্ধ ক'রে দিত।"

"এতদূর !"

"শোন, এখনও আছে। বাড়ীতো তো এলো—তখনকার বাপেরাও সব এমন কড়া ছিল—সেখানে আবার একচোট মার ধোর ক'রে ধুলো পায়ে শ্বশুর বাড়ীর লোকের হাতে পায়ে ধ'রে গচিয়ে দিয়ে আসবার জন্যে তখনই যাত্রা করতো। সেখানে না খেতে দিয়ে হাত পা বেঁধেও ফেলে রাখা হ'ত দিনকতক। তারপর কল্কে পুড়িয়ে ছাঁকা সর্বাঙ্গে।"

"সে আবার কি ?"

"ঐ যে বললুম—ওপর গায়ে এখনও দেখা যাবে, কত দাগ। অনেক মেয়েরই থাকতো, তারপর নিরুপায় হ'য়ে থেকেই যেত শেষ পর্যন্ত কত মেয়ে, কেউ করত আত্মহত্যে, আর কেউ যেত জন্মের মত জাহান্নমে।"

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকি আমি।

"ওপ কিন্তু আত্মহত্যেও করলো না জাহান্নমেও গেল না। একবার ওর বাবা ও আসার পর খুব মেরে লাল কোলা পিপড়ের গর্তের মুখে বাগানে ওকে রোদ্দুরে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখল সারাদিন ঠাণ্ডা করবার জন্যে। সেদিনই তো হয়ে যাবার কথা, কিন্তু মেয়েমানুষের প্রাণ। ওর মা শেষে রক্ষে করল

ওর স্বামী ?"

মেয়েরা আবার বিয়ে না করে।

স্তম্ভিত হয়ে বসে আছি—ঠাকুমা আবার বলতে লাগলেন বিয়ে ছিলো তবু—কিন্তু তাদের বিয়ে হলেও তখন আর বাপের বাড়ী থাকা চলতো না। তার ঐ মেয়েদের পেছনে লাগতো। তখন ঐ বাপেদের পাশে একখানা চালা ঘরে আলাদা ব্যবস্থা করে দিল তাদেরই। কি স্বভাব তাই কপালও অমনি, না ভেবে পারি না।

কাল আর সেকাল মেয়েমানুষ তেড়াতেও অমন—ঠাকুমাকে বাধা দিয়ে কি একটা বলতে যাব এমন সময় মা হুড়কো দিদিকে নিয়ে নেমে এলেন।—

আমাকে ঠাকুমার কাছে বসে থাকতে দেখেই বললেন দিদি—"বড় বেহায়া বাপু তোমাদের বউ. দিনদুপুরে ছাতে মাথার কাপড় খুলে বসে রঙের সঙ্গে গল্প করছিল—রঙ আবার হেসে কার্ত্তিক. বো'য়ের চুল নিয়ে খেলা করছিল—কতই দেখব মা কালে কালে—বলতে গেলুম ভালো কথা তা না কোঁস করে উঠলো ছোঁড়া—কি কাল এলো ধারা—তাই এত আকাল। তাই এত অপমিত্যু। বলতে বলতে যে বকুনা নাগুল নিয়ে নিয়ে বিলের পর বিল কেটে দিয়ে গেছে তারই ইতিহাস-মাখানো তাঁর মুখ রাগরঙে ভরে উঠলো। আমি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালাম—মা ঠাকুরমার মুখে ফুটে উঠল সহজভাবে—আন্তরিক আবেগেই প্রণত হলাম হুড়কো দিদির পায়ের তলায়।

THE
UNION BANK OF INDIA LIMITED
Estd : 1919
Head Office : Apollo St., Fort, Bombay, 1.
Capital Paid-up Rs. 40,00,000
Reserve and other Funds Rs. 35,00,000
Chairman Mr. M. S. CAPTAIN
Banking business of every description transacted including Foreign Exchange.
F. K. F. NARIMAN
General Manager.

বৈদেশিকী

মস্কো কম্যুনিষ্ট সম্মেলন—

রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টি তাহাদের ঘরোয়া সম্মেলনে যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন—তাহার প্রতিক্রিয়া ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা দিয়াছে। এশিয়ার অন্যান্য জাতিগুলির মধ্যেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। যাহা প্রস্তাবে পাশ করা হয় ও আলোচনা করা হয় তাহাই যদি সবাই কার্যে পরিণত করিতে পারিত তবে হয়ত অনেক রাজনৈতিক সমস্যা বিশ্বরাজনীতিতে দেখা দিত না। রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতিতে যে পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে তাহা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার এবং সেই সব নীতি কার্যকরী করিতে গিয়া কোন্ কোন্ শক্তি বাধাস্বরূপ তাহা বিশ্লেষণ করা আবশ্যক। ব্রিটেনের প্রতিক্রিয়ার কথা বিবেচনা করা যাউক। স্যার এ্যান্টনি ইডেন যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্মার্থ এইরূপ যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক প্রবর্তিত সহ-অবস্থিতির নীতিও মানিয়া চলিব, আবার বিদেশী কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিকে উৎসাহ দান করিব—এইরূপ দুমুখো নীতি কিভাবে চলিতে পারে? স্যার এ্যান্টনি এই নীতির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পান নাই। বস্তুতঃ এই প্রশ্ন সবারই মনে জাগিবে যে, একে অন্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে না—অথচ রুশিয়ার বাহিরের কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলিকে রুশীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি সমর্থন করিবে এই জাতীয় সমর্থন বা উৎসাহদানের পশ্চাতে যে কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বা উস্কানী নাই তাহা ধরিয়া নেওয়া যাইবে কি প্রকারে?

আর একটি প্রশ্ন স্যার ইডেন করিয়াছেন। আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে শুধু ধনতন্ত্রবাদী দেশগুলিই ধ্বংস হইবে ইহা কিরূপে সম্ভব? ধনতন্ত্রবাদী দেশগুলি আপনাদের মধ্যে ঠোকাঠুকি করিয়া মরিবে—এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া এইরূপ মন্তব্য রচিত হইয়াছে। ইহা ষ্টালিনের আমলেও অনেকবার শোনা গিয়াছিল যে ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি আপনাদের স্বার্থের বিরোধ বাধাইয়া আপনারাই ধ্বংস হইবে। কিন্তু ইতিহাস দৃষ্টে মনে হয় যে ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিরোধিতা যতই থাকুক না কেন—কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রকে আঘাত হানিতে কেহই পশ্চাৎপদ নহে। এবং আপৎকালে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র দুই রাষ্ট্রই হাত মিলাইয়া একই শত্রু জার্মানীকে মারিতে কসুর করেন নাই। কোন কোন সময় রাজনৈতিক স্বার্থ অর্থনৈতিক স্বার্থের উপর টেক্কা মারিয়া থাকে। বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইহার একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। কাজেই বোমা—আণবিক বোমার কথাই হইতেছে—দুই পক্ষের সাধ্যমত বোমাযানে চড়িয়া আকাশে উড়িবে এবং যন্ত্রতন্ত্র ছড়াইয়া পড়িবে: বায়ু-তাড়িত হইয়া তেজস্ক্রিয় ভস্ম কোথায় যাইবে তাহা এখনও পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন। ব্রহ্মাস্ত্র যাহা আবিষ্কার হইয়াছে তাহা শেষ পর্যন্ত কাহাকেও রেহাই দিবে না। ইহা যে রাশিয়া না বোঝে এমন নহে, তবে প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে সত্যগোপন করিবার ভাবণ অন্যরূপ। মূলকথা, আণবিক বোমা কাহাকেও রেহাই দিবে না—ইহা বুঝিয়াই বিশ্বরাজনীতি আজ স্থির হইবার সময় আসিয়াছে।

কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্মেলন সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের সচিব মিঃ ডালেস বলিয়াছেন, "সম্ভবতঃ এই নীতি পরিবর্তন একটা স্থায়ী দিক্-পরিবর্তনের সূচনা করিতেছে। দশবৎসরে স্নায়ু যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নীতি অনুসরণ ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে এই দিক্-পরিবর্তন তাহারই

ফল।" এই মন্তব্য মিঃ ডালেসের একান্ত প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। কেননা, গত দশ বছরের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই ও স্নায়ু যুদ্ধে যাহা ঘটিয়াছে তাহাতে একমাত্র কোরিয়া ও ইন্দোচীনই ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে এবং দুর্ধর্ষ শক্তিবর্গের শীকার হিসাবে তবে বলির পাঁঠার মত কাঁপিয়াছে। হাঁ, তবে, যুক্তরাষ্ট্রকে কিছু পরিমান গুলিবারুদের ত্যাগস্বীকার করিতে হইয়াছে। এ জাতীয় ত্যাগ স্বীকারকেই রাজনীতির মোড়ক পরাইয়া বিশ্ব-কূটনীতির বাজারে 'ত্যাগবটিকা' নামে চালানো হইতেছে। মূলত কোরিয়ার যুদ্ধেই যে রুশকে ও চীনকে হুমকাইবার একটা কৌশল মাত্র তাহা রুশ ও চীন কাহারো বুঝিতে বাকী নাই। ফলে কোরিয়া ও ইন্দোচীনকে কেন্দ্র করিয়া রুশ ও চীন উভয়েই শক্তির ক্রীড়াক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়াছে।

সিয়াটো চুক্তি ও ব্রিটেন

পাকিস্তান রাজনৈতিক বিশ্বে আপনার অস্তিত্ব লইয়া যেরূপ বিপন্ন বোধ করিতেছে তাহাতে তাহার দল বাঁধিবার প্রবৃত্তিই বেশী হইবে। বস্তুতঃ বাগদাদ চুক্তিতে নিজের অস্তিত্ব বাঁধা দিয়া ইহার সমর্থনে বিশ্বময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অতীতেও দেখা গিয়াছে যে, সামরিক জোট কার্যকালে বিশেষ কাজের না হইয়া অনেক ক্ষেত্রে বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ইতালী জার্মানীর একদিন জাঁতাত ছিল এবং অষ্টে-পুষ্টে-লসাটে বাঁধিয়া উভয়ই উভয়ের সামরিক সাহায্য হাঁয়াছিল, দেখা গেল আপৎকালে কেহই বিশেষ কাজের কিছু হয় নাই। কারণ, সাধারণত সামরিক জোট সৃষ্টি হয় কোন এক বিশেষ রাষ্ট্রের সামরিক দুর্বলতাকে গোপন করিবার উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ যদি বিপদ আসে তবে সবাই মিলিয়া তাহা ঠেকাইব—এই তথাকথিত দৃঢ়তাই সামরিক জোটের ছোটখাট অংশীদারগণের মনে থাকে। বড়রা (ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) অবশ্য সেরূপ ভাবেন না, তাঁহারা এসব ছোট শক্তিবর্গকে কাজে লাগাইয়া থাকেন। এবং ট্র্যাটেজি নামক অতি আবশ্যকীয় ব্যাপারে ইহাদের তেমন পাত্তাও দেননা। কিন্তু ছোটর আশা—আপৎকালে সাহায্য পাইব। কিন্তু এই ছোট যদি কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের প্রতিবেশী হয় তবে সেই বৃহৎ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধতা করিয়া অভিযুর হইতে সামরিক সাহায্য লাভ করিতে পারে। সামরিক জোটের ছোট রাষ্ট্রেরা কোন অবস্থাতেই বড় রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করিতে পারেনা—যদি সেই ভৌগোলিক স্থানটুকু ট্র্যাটেজির দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিষময় ট্র্যাটেজি হইল সোভিয়েটকে ঠেকানো—সে যে-কোন অবস্থায় হোকনা কেন, এবং যে-কোন স্থানে হোক-না-কেন। এই বিশ্বজোড়া ট্র্যাটেজির মুখে পড়িয়া গিয়াছে পাকিস্তান। পাকিস্তান ভারতকে শত্রু কল্পনা করিয়া সর্বত্র সাহায্যের জন্য হাত পাতিয়া বেড়াইতেছে। অথচ স্থির ভাবে, বিশেষ যুক্ত মনে একবার যদি ভাবিয়া দেখিত—তাহা হইলেই বুঝিত যে ভারতের সহিত বিরোধিতা করিয়া তাহার লোকসান বই লাভ নাই। ভারতকে জব্দ করিবার উদ্দেশ্যে যে শক্তির অপচয় সে করিয়াছে তাহা যদি রাষ্ট্র-সংগঠন-মূলক কাজে নিয়োজিত করিত তবে পাকিস্তানের মুসলমান সমাজ বর্তমান শাসকগোষ্ঠীকে তাহাদের মনে স্থায়ী আসন দিত। কিন্তু তাহা হইবার নহে—পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী মুসলমান সমাজকে শাসন করিতে চায় এবং তাহা কোনরূপ ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা না করিয়াই।—রাষ্ট্র গঠনে হাত দিলে তাহারা দেখিতে পাইত যে, কি বিপুল সহযোগিতা প্রয়োজন একটি দুর্বল সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করিতে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইত যে পাক-রাষ্ট্রে নূতন মানুষ গড়িয়া তুলিব তবে তাহাদের আক্রমণের ভয়ে আতঙ্কিত হইবার কিছুই ছিলনা। কেননা যে জনসাধারণ রাষ্ট্রের বনিয়াদ তাহারাই রাষ্ট্র রক্ষা করিত। আজ পূর্বপাকিস্তানে যাহা ঘটিতেছে তাহা উন্নত রাষ্ট্রের পরিচয় নহে। পশ্চিমপাকিস্তানেও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই।

অথচ সেদিকে দৃষ্টি পাত করিবার কেহ নাই। কেবল কল্পিত শত্রু ঠেকাও, সোনা বাঙ্কর আনো, নিজেদের শিল্প গড়িবার কোন তাগিদ নাই—এই অনুন্নত অবস্থার মধ্যে পড়িয়া বর্তমান পাক শাসকেরা যাহা কিছু করিবে তাহাই তাসিয়া যাইবে। নিজেরা উপযুক্ত না হইলে পরের সাহায্যে বাঁচা যায় না। এ কথাটা পাক-শাসকেরা কবে বুঝিবেন? 'সিয়াটো' সম্মেলনের আসীদারগণ বেশ ভাল ভাবেই জানেন যে, ভারতের বিরুদ্ধে উস্কানী দিয়া সামরিক যেটুকু সুবিধা হোকনা কেন—নিশ্চিত ভবিষ্যতে কোন সুফল লাভ হইবেনা। তর্ক ছলে যদিও ধরা যায় যে ভারত-পাক লড়াই বাধিল (অবশ্য বাধিবার সম্ভাবনা কম) তাহা হইলে ইংল্যাণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার কোনও সুবিধা হইবে না। ভারতের বাজার মাটি হইলে ইংল্যাণ্ডকেই বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইবে,—মণিক ব্রিটেন তাহা বানিয়া লইবেনা। মার্কিনরা অনেক ক্ষেত্রে ব্রিটেনকে টানিয়া আনে—এ ক্ষেত্রে বুদ্ধিমান ব্রিটেন আসিবে কিনা তাহাতে প্রচুর সন্দেহ আছে। তাহার কারণ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ভারত গণতন্ত্রের প্রহরী। এই প্রহরীকে ব্রিটেন অযথা উত্যক্ত করিবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কাজেই সিয়াটো বৈঠকী সভা ছাড়া বিশেষ কিছু নয়, অন্ততঃ ভারতের পক্ষেত বটেই।

সিয়াটো ও মার্কিণ—

সতর্ক ব্রিটেন এশিয়ার জাতিগুলির সঙ্গে বহুদিন ধর করিয়াছে। এই সব জাতির সবলতা কোথায়, দুর্বলতা কোথায় তাহা জানে। কিন্তু মার্কিনরা এশিয়া অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের। পূর্ব অভিজ্ঞতা ইহাদের ভারত সম্বন্ধে একেবারেই নাই। ভারতের মত এমন বিশাল জাতি প্রয়োজনে কি দুঃখবরণ করিতে পারে, কি সাহসের পরিচয় দিতে পারে, তাহা ব্রিটেন জানে, কিন্তু জানে না মার্কিনরা—তাই নিছক রাজনৈতিক বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া তাহারা একটা সামরিক সাহায্য পাকিস্তানকে দিয়া বসিয়াছে। ইহার ফলে ভারতের বন্ধুত্ব এক-প্রকার যায় যায়। কার্যত এখনও কিছু বন্ধুত্ব যায় নাই বটে, বন্ধুত্বের রজ্জুতে টান পড়িয়াছে। এবং বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, রাজনীতিজ্ঞ মার্কিনদের টনক নড়িয়াছে। যাহা রাজনীতির প্রয়োজনে 'সোভিয়েট' ঠেকাইতে গিয়া করা হইয়াছে তাহা কার্যত ভারতের বিপক্ষে গিয়াছে এবথা মার্কিন কূটনীতিবিদেরা বুঝিয়াছে। যাহাতে যতই অস্ত্রসস্ত্রে করিয়া তোলা হউক না কেন—ব্যাপক ভারতের তুলনায় কতটুকু দেশ, কি পরিমাণ তাহার জনশক্তি? ভারতের বৈজ্ঞানিক বিদ্যা বুদ্ধির প্রস্তুত রহিয়াছেই। এশিয়ার বিশাল মানচিত্রে ভারত-চীন বাদে কাহার কতটুকু স্থান তা সহজেই অনুমেয়। এবং এই দুই স্থান হইতেই নব চিন্তা, নব উদ্ভাবনী শক্তি বিকাশলাভ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অতীতেও এই দুইটি পুণ্যস্থান হইতে মহামানবের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এই বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ দেশ দুইটির একটিকে ইতিমধ্যেই মার্কিনরা শত্রু শিবিরে ঠেলিয়া দিয়াছে, আর একটি দেশ সম্পর্কেও কি সেইরূপ কিছু ঘটিবে? আমাদের মনে হয় বুদ্ধ মারপাঁচ প্রভৃতির উর্ধে রহিয়াছে দৌহার্দ্য ও সহযোগিতা। এই দৌহার্দ্য মার্কিনরা পর্তুগীজের মত একটি ক্ষুদ্র দেশকে তোষণ করিতে গিয়া প্রায় হারাইতে বসিয়াছিল। আবার ইহার পর সিয়াটো সম্মেলনে কাশ্মীর প্রসঙ্গ! মার্কিন কূটনীতি দেখিয়া মনে হয় যে এশিয়ার শক্তিকেন্দ্র চিনিতে ইহার এখনও বেশ বেশ দেরী হইতেছে। যন্ত্রশিল্পে কলা-কৌশলের পীঠস্থান আমেরিকা কেবল যন্ত্র শক্তিতেই দক্ষতা দেখাইয়াছে। সেই যন্ত্রের শুভ প্রয়োগ করিতে হইলেই অন্যান্য জ্ঞানের জন্মভূমি ভারতকে বিরূপ জানে দেখিলে চলিবে না বা ভারতকে সামরিক শৃঙ্খলে বাঁধিয়া বন্ধুত্ব আদায় করা সম্ভব হইবে না।

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাতে মার্কিন যন্ত্র সাহায্য প্রদান করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পশ্চাতে রাজনৈতিক দরকাষী ও সামরিক চাল থাকিলে তাহা ভারত প্রত্যাখ্যান করিবার শক্তি রাখে। পাকিস্তানকে সামরিক ফাঁদে ফেলানো যতটা সম্ভব ভারতকে ততটা সম্ভব নহে। এই কথা স্মরণ করিয়াই বোধ হয় আবার ভারতে মিঃ ডালেস আসিলেন।

অরণ্য কন্যা

শ্রীপরেশ কুমার দত্ত

রাজেনদের বাড়ী পৌঁছবার আগেই বেলা পড়ে এলো। রূপনারায়ণের পশ্চিম তীরের ছায়া নিবিড় বনরেখার আড়ালে অস্ত গেল হেমন্তের রক্ত সূর্য।

সাত বছর নিশ্চয় কম নয়। তবু বাঁধের ধূলি ধূসর পথে একা হাঁটতে হাঁটতে মনে হল, এগ্রাম ছেড়ে বুঝি কোনো দিনই কোথাও যাইনি। ভীড় করে এগিয়ে এলো কৈশোর আর প্রথম যৌবনের চঞ্চল দিনগুলো। স্মৃতি যে এমন বেদনা-বিধুর কোনো দিন ভাবিনি।

বন্ধুর বাড়ীর কাছাকাছি যখন পৌঁছলাম, বাঁধের নিগড়লীন, জনবিরল পথের ছায়াঘন তরুশ্রেণীর শাখায় শাখায় নীড়ে ফেরা পাখীর কলকূজন তখন স্তিমিত হয়ে আসছে। কিন্তু রাজেনের সঙ্গে সেদিন এমন করে দেখা হবে কে জানত? দেখা না হলেই বুঝি ভালো ছিল।

বাঁধের পুবে তাদের প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ীর কাছে এসে পা দুটো যেন আটকে গেল। হৃৎপিণ্ডটা থমকে গেল নিমেষের জন্য। একি! সারা বাড়ীটা এমন খাঁখাঁ করছে কেন? জানলা কপাট বন্ধ ওই প্রকাণ্ড নির্জন বাড়ীটাই যে রাজেনের মামার বাড়ী, চিন্তা করতেও মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করে উঠল। সাত বছর আগের সেরেস্তার লোক জনে জম জমাট, এই কি সেই বাবুন ডাঙ্গার জমিদারী মহল!

বাঁধ থেকে কখন আবিষ্টের মতো দেউড়ীর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছি জানিনা। দেখি দেউড়ীর একটা ভারি পাল্লা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে, আর একটার কোনো অস্তিত্বই নেই। বাড়ীর ভিতর পর্যন্ত লাল কাঁকর বিছান টানা ঘুনো ঘাস আর শেয়াল কাঁটার ঝোপে সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। রাত্রি নামার আগেই সন্ধ্যা ঝিল্লীরব মুখর হয়ে উঠেছে ঘুনো ঝোপে ঝাড়ে।

শিয়াল কাঁটার বনের মধ্যে দিয়ে সরু পথটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হল, এবাড়ীতে এখনো মানুষের যাতায়াত রয়েছে। সহস্র স্মৃতিবিজড়িত বাড়ীখানা যেন আমায় নিঃশব্দে হাতছানি দিয়ে ভিতরে ডাকতে লাগল। টর্চ জ্বালিয়ে এগিয়ে গেলাম। ওইতো বাগানের মাঝখানে সেই শ্বেত পাথরের ফোয়ারা। শিবের জটা আজ কতদিন শুকিয়ে গেছে কে জানে। শুনেছিলুম রাজেনের দাদু কলকাতা থেকে অনেক টাকা খরচ করে তৈরী করিয়ে আনিয়েছিলেন। শুকনো ফোয়ারার ধারে শ্বেত পাথরের বেদিতে রুমালে ধুলো ঝেড়ে বসলাম। মনে পড়ল ছোটোবেলায় স্কুল থেকে ফেরবার পথে কতদিন এখানে বসে রাজেনের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছি। স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবতে লাগলাম, মহাকাল মানুষের জীবনে কী অভাবনীয় পরিবর্তনই না নিয়ে আসে।

কতক্ষণ এই ভাবে তন্ময় হয়ে বসেছিলাম জানিনা। হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠলাম। কাছারি বাড়ীর দিক থেকে কে যেন উচ্চ কণ্ঠে ডাকতে ডাকতে এদিকেই এগিয়ে আসছে।—না বনমালিকে নিয়ে আর পারা গেল না, বনমালী, ওরে বেটা তোকে যে বলে দিলুম, চা নেই এনে রাখিস···

আবছা অন্ধকারে মুখ না চেনা গেলেও গলা চিনতে দেরী হলনা।

বিস্ময়ে আনন্দে উঠে দাঁড়ালাম···কে মাই গুড্‌নেস্—রাজেন তুই···

রাজেন তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এল, আরে কে বিমল নাকি! এখানে এমন ভূতের মতো বসে রয়েছিস —আমাকে ডাকিসনি কেন?

আমার তখনো বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি, বললাম, আশ্চর্য, এই বাড়ীতে কি থাকিস নাকি···।

রাজেন সম্মুখের পাথরের বেদিতে বসে বললে, না থাকিনা ঠিক, লায়লাবাদ থেকে কলকাতায় এলে মাঝে মাঝে এক-আধদিনের জন্ত ঘুরে যাই। তোরা তো সহরে গিয়ে দেশের কথা বেমালুম ভুলেই গেছিস।

—ইস্, এতোদিন পর তোর সঙ্গে আবার দেখা হবে ভাবতেই পারিনি।

রাজেন রুমালে মুখ মুছে বললে, আমার কিন্তু মনে হচ্ছিল তুই আজ আসবি, আর···আর···! হাঁ তোর খবর কি বল, কি করছিস এখন?

কলকাতায় দুটো কলেজে পড়াই। দিন কয়েক ছুটি নিয়ে দাদুর কাছে বেড়াতে এসেছি···। এখানে এসেই কিন্তু তোর কথা আগে মনে পড়েছে। তা' কলকাতা ছেড়ে অতদূরে আছিস্ কেমন করে!

গলা নামিয়ে বললাম, ভাল কথা, তোর তপতীর খবর কি?

উত্তর না দিয়ে রাজেন হাঁটু দোলাতে দোলাতে কয়েক মুহূর্ত কি যেন চিন্তা করলে। তারপর বললে, আচ্ছা বিমল, তুই আত্মা বিশ্বাস করিস? মানুষের মরণের পরও···

বাধা দিয়ে বললাম, হঠাৎ আত্মার কথা কেন বলতো? সায়েন্স পড়ে এবার কি আত্মা নিয়ে রিসার্চ সুরু করেছিস না কিরে?

রাজেনের মুখে কোন পরিবর্তনই দেখা দিল না। আলিস্তি ভেঙে সোজা হয়ে বসে বললে, জানিস, বিশ্বাস আমিও ঠিক করতাম না, কিন্তু আমার অবস্থায় তুইও বিশ্বাস না করে পারতিস না। লায়লাবাদে কি দারুণ অবস্থায় পড়েছিলাম শুনবি?

ব্যস্ত হয়ে বললাম, না ভাই আজ থাক ওসব আজগুবি গল্প। ফিরতে রাত হয়ে যাবে—অন্ধকার পথ।

উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠল রাজেন—কলকাতায় থেকে থেকে তুই দেখছি একেবারে বদলে গেছিস। ভূতের ভয় নাকি—আচ্ছা আমি তোকে পৌঁছে দিয়ে আসবখন, তা হলে হবে তো! আজগুবিও অনেক সময় সত্যি হয়···একথা মানিস তো···শোন আজ তোকেই কথন বলি আমার লায়লাবাদের কথা।

বি-এস, সি, পাশ করার পর সামান্ত কারণে বাবার সঙ্গে রাগারাগি হয়ে গেল। চলে এলুম কলকাতায়, উঠলুম রমেনদের বাড়ীতেই। চাকরির জন্ত মাস কয়েক অনেক সাধ্য আর কালো চামড়ার দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে শুধু হাঁটাহাঁটিই সার হল। এমন সময় বড়বাজারের মুলচাঁদ আগরওয়ালার গদীতে ডাক এলো। সুযোগটা ছাড়া ভাল মনে করলুম না। কিন্তু তাদের কাজ কলকাতায় নয় বিহারে লায়লাবাদে।

প্রথমে মনটা দমে গেল। কিন্তু যখন দেখলুম মামার বাড়ী থেকে চলে আসায় তপতীর বাবার দৃষ্টিরও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে—আর তার কারণটা অনুমান করাও কঠিন নয়—বুঝলুম তপতীর কথা ভেবেও তখন আমার কলকাতা ছাড়া একান্ত প্রয়োজন। বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়ানর পরিণতি তখন বোঝবার বয়স হয়েছে।

লায়লাবাদ জায়গাটা বিহারের বেশ অভ্যন্তরেই বলা চলে। দুপুরে ট্রেণ থেকে নেমে পনর মাইল বাসে, তারপর আরও মাইল দশেক গরুর গাড়ীর ঝাঁকুনি খেয়ে যখন পৌঁছুলুম তখন অচেনা দেশের আকাশ-দিগন্ত জোড়া পাহাড়ে আর অরণ্যে সন্ধ্যার ছায়া নিবিড় হয়ে আসছে।

ছোট বেডিং আর সুটকেশটা গাড়ী থেকে নামাবার আগেই আমাদের কোম্পানীর ধরণীবাবু হাসি মুখে বাইরে এলেন—আপনিই রাজেন বাবু!

প্রতি নমস্কার করে বললুম, কলকাতা থেকে আসছি।

ধরণীবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, থাক থাক ও সব নমস্কারের ব্যবস্থা আমি করছি ওরে, কিষণ সিং...আসুন ভেতরে আসুন রাজেনবাবু।

বাঁশের বেড়া ঘেরিয়ে ছোট্ট বাগানে ফুলের মিশ্র সুরভি। বাগানের শেষে খড় ছাওয়া লাল মাটির ঘর। তা'ছাড়া পরিচ্ছন্নতার ত্রুটি নেই বাঙালীর হাতের ঐটুকু চারিদিকে মণ্ডিত।

ধরণীবাবু ডাকলেন, হতভাগা কিষণটা গেল কোথায়! বলা একটা আলো দিয়ে যা ত' না।

বারান্দার একটা টুলে বসে কুণ্ঠিতভাবে বললাম, ব্যস্ত হবার কিছু নেই ধরণীবাবু।

—না সে কি, কাল রাত্রি থেকে এই গাড়ীতে গাড়ীতে আসছেন—আপনি হাত পা ধুয়ে নিন, কিষণটা গেল কোথায় দেখি।

কিন্তু বাড়ীর ভিতর দিকের দরজা দিয়ে আলো নিয়ে লজ্জা জড়ান পায়ে যে এগিয়ে এল সে কিষণ নয় ধরণীবাবুর কিশোরী কন্যা রমা।

পাহাড়ের দিক থেকে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে গেল, তার সঙ্গে অজানা ফুলের ঘন গন্ধ।

ধরণীবাবুর পিছনে খাবারের থালা নিয়ে প্রবেশ করল রমা। থালা নামিয়ে আসন পেতে দিয়ে বাবার কানে চুপি চুপি কি বললে। ধরণীবাবু বললেন, লজ্জা কি মা, উনি তোমার দাদার মতো, যখন যা দরকার হবে নিজেই জিজ্ঞেস করে নেবে। যাও আরো কিছু লুচি নিয়ে এসো। আমার দিকে ফিরে বললেন, ভয় করে খাবেন না রাজেন বাবু। এ আপনার কলকাতার ঘি নয়—দেখবেন মাঝরাতেই আবার খিদে পেয়ে যাবে।

অবসন্ন দেহে বিছানায় শুতে পরিতৃপ্তিতে মন ভরে উঠল। বিদেশ বাসের কল্পনায় মনের মধ্যে যে অপ্রসন্নতা জমে উঠেছিল তখন তা' সরে যাচ্ছে।

দূর বিদেশে—নিজের দেশ থেকে শত শত মাইল দূরে বিহারের এক অজ্ঞাত নিভৃত প্রান্তে এক অপরিচিত পরিবারের মধ্যে আমার জন্য এমন এক স্নেহের আসন পাতা ছিল কল্পনাও করতে পারিনি। তন্দ্রার আবেশে ভাবতে লাগলাম, বিদেশে মানুষের সহজ আত্মীয়তার মধ্যে সমস্ত কৃত্রিম নিগড় এমন করে বুঝি খসে পড়ে—তাদের আত্মীয়তাই সকলের বড় হয়ে ওঠে।

তবু যে অভ্রান্বিত মুখ একটা গোপন ব্যথার মতো ঘুমের মধ্যেও সুস্পষ্ট হয়ে রইল—সে মুখ তপতীর।

এবুঝি কোন রূপকথার দেশ।

মিসমী নদীর ধারে ধারে ঘোড়ার পিঠে চলতে চলতে ধরণী বাবু আঙুল বাড়িয়ে দেখালেন..নদীর উত্তরে ওই যে পাহাড়টার নীল মাথায় মেঘের মতো কুয়াসা জড়িয়ে রয়েছে ওর নাম ধীরগিরি, ওরই হেঁট ঢালে গেছে পশ্চিমে গয়া পর্যন্ত।

সকাল বেলার সোনারঙা রোদের ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে পড়েছে নতুন মেঘের গিরি নদী আর অরণ্যে। চোখ বুঝি আর ফেরান যায় না। উত্তর থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত গিরিসানুর নিবিড় অরণ্যের কোলে নাম না জানা পীত কুসুমের সমারোহ। ধরিত্রী যেন তার নীলোত্তত বক্ষে টেনে দিয়েছে পীত উত্তরীয়।

ধরণীবাবু বললেন, অদ্ভুত দেশ রাজেনবাবু, মাস খানেক থাকুন, দেখবেন আর কোথাও গিয়ে থাকতেই পারবেন না।

বললাম যতই বলুন, এই বনবাসে সারা জীবন কি কাটান যায়!

ঘোড়া তখন একটা উৎরাইয়ে নামছিল, ধরণীবাবু রাশ টেনে ধরে বললেন, আপনি বিশ্বাস করেন রাজেন বাবু অরণ্যেরও আত্মা আছে? জানেন পাঁচ বছর আগে চাকরি নিয়ে এখানে যখন আসি ভেবেছিলাম কলকাতায় ভাল চাকরি পেলেই ফিরে যাব। কিন্তু এখন আর এখান থেকে চলে যাবার কথা ভাবতেই পারি না। খুব যে ভাল লাগে তা নয়, কিন্তু এই স্বচ্ছ নদী, ঘন নীল পাহাড় আর অরণ্য এর যে কী আকর্ষণ আপনাকে বোঝাতে পারব না।

সেদিন ধরণীবাবুর মুখে শুনলাম লায়লাবাদের ইতিবৃত্ত।

অপর্যাপ্ত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ এই গিরি উপত্যকার বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমি। শালের শাখায় লুকানো আছে লাক্ষা আর মধুচক্র, পাহাড়ের কোলে কোলে শাল মেহগিনির প্রাচুর্য। প্রকৃতির এই অফুরন্ত ঐশ্বর্যের সন্ধানে পঞ্চাশ বছর আগে যে ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করতে যারা আসত, তাদের সাময়িক আস্তানার জন্য প্রথমে দেখা যেত দু'চার খানা চালাঘর। তার সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধিই পেতে লাগল। তার সঙ্গে বসল দোকান পাট। এল দেবতা, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, ফকির আর মোল্লা। গাছের মাথায় দেখা দিল মন্দির আর মসজিদের চূড়া। নদীর ঘাটে ঘাটে ধরা পড়ল গৃহ লক্ষ্মীদের চরণ-চিহ্ন, তাদের কল-গুঞ্জনে মুখরিত হ'ল মিসমি নদীর তীর।

দিন দিন গ্রাম আরও সমৃদ্ধির পথে। কোনো দূর ভবিষ্যতে হয়ত বা রূপান্তরিত হবে বিখ্যাত নগরে। কিন্তু সে কথা আজ শুধু কল্পনাবিলাসমাত্র। গভীর রাত্রির ঘুমন্ত অন্ধকারে মিসমি নদীর ওপারে পাহাড়ের অরণ্যে শোনা যায় হায়নার হাসি আর বাঘের গর্জন। অসহায় শুদ্ধ গ্রাম তখন রুদ্ধশ্বাসে থরথর্ করে কাঁপতে থাকে।

সেইদিন ধরণীবাবু আমাকে কাজ বুঝিয়ে দিলেন। নদীর ধারে গুদামে নৌকায় চালানের মালের হিসাব পত্র রাখাই আমার কাজ। ধরণীবাবুর কাজ পঁচিশ মাইল দূরের ষ্টেশনে রেলে মাল চালান দেয়া। সবদিন রাত্রে বাড়ী ফিরতে পারেন না।

ভাতের থালা নামিয়ে রমার মা বললেন, লজ্জা করে খেও না বাবা, তুমি আমাদের ছেলের মতো। থালার পাশে বাটি সাজিয়ে দিয়ে বললেন—এপোড়া দেশে কি আছে যে ছুটো ভালমন্দ রান্না করব। তোর দাদাকে বলিয়ে যাওয়া বাবা।

অস্বীকার করব কেমন করে—ভাত মাখতে মাখতে মনে পড়ে অনেকদিন আগের হারান মা আর ছোট বোনটির কথা।

রান্নাঘরের দরজা থেকে রমার মা বলেন, বসে গেও রাজেন।

মুখের গ্রাসটা গিলে নিয়ে বলি—তা'হলে এই দুপুরে আপনাকে আবার হাঁড়ি চড়াতে হবে মাসিমা।

হেসে বললেন, বেশতো। মাছের অম্বলের বাটিটা নামিয়ে দেন—দেখতো রাজেন, রমা কাড়াকাড়ি করে রাঁধলে, কেমন হয়েছে।

বেশ হয়েছে মাসিমা কিন্তু নুন দিতে ভুলে গেছে।

ওমা সেকি, রমার মা, গালে হাত দিয়ে বলেন, ও রমা কি রান্না করেছিস, নুন দিসনি।

রমা ততক্ষণে পাখা বন্ধ করে প্রবল আপত্তিতে দাঁড়িয়ে উঠেছে—না মা নুন দিয়েছি যে, আমার ঠিক মনে আছে।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আসল ব্যাপারটা আন্দাজ করে, রমার মা মুখ টিপে হাসছেন।

জীবনে যে এমন রোমান্স থাকতে পারে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবিনি। সহরের বিরামহীন কোলাহল আর ধুলো—কাদা-ধোঁয়ার বাইরে এমন শান্ত, সুন্দর জগতের সন্ধান কত জন জানে।

বিকালে হিসাবপত্র মিটিয়ে ব্রিচেস এঁটে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। মিসমি নদীর কোল ঘেঁষে সংকীর্ণ চড়াই উৎরাই পাহাড়ী পথ। পূর্বে কিছু দূর গিয়ে কাঠের সাঁকোর উত্তরে···পাহাড়ের শাসুতে গিয়ে শেষ হয়েছে। এদিকে জন বসতি নেই। পাহাড় আর অরণ্য এখানে নিশিদিন নিঝুম রাত্রির মতো ধ্যান-মৌন-অবগুণ্ঠনে নিস্তব্ধ। কাছে দূরে পাখির ঝাঁক—তাদের কলকাকলি সেই নিস্তব্ধ অরণ্যকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে।

পাহাড়ের কোল থেকে নেমে এসেছে একটা ছোট ঝরণা। যেন ছোট মেয়েটি মায়ের কোলের পাশে সারা দিন নেচে গেয়ে খেলা আর শেষ হয় না।

একটা প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডের একধারে বসে থাকি। উঠতে আর ইচ্ছা হয় না—কিন্তু সন্ধ্যা নামার আগেই ফিরে যেতে হয়। ধরণীবাবু বার বার সাবধান করে

দিচ্ছেন, পাহাড়ে মাঝে মাঝে বাঘ দেখা যায়—বিশেষ করে করণার ধারে।

ফেরার পথে সন্ধ্যার ঘনায়মান ছায়ায় সারা বনভূমি নীড়ে ফেরা পাখীর কলকাকলিতে নিবিড় করুণ হয়ে ওঠে, আর সেই শান্ত নির্জনতায় অন্তরের বেদনা-নিবিড় স্মৃতি সন্ধ্যা-তারার মতো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আর তপতীর মুখ সারাপথ সমস্ত অন্তর করুণ করে রাখে।

অন্যমনে পথ চলতে চলতে থমকে দাঁড়াই। বহু-দূরের বাঁশীর মতো—কানে আসে কার ডাক···

রাজু-উ-দা-আ আ।

ঘোড়া থামিয়ে চারিদিকে তাকাই। রমার গলা যেন। তখনই ফিরে আসে প্রতিধ্বনি।...

অনেক দূরে কিন্তু ঠিক চিনেছি।···সন্ধ্যার ছায়া—নীল আকাশের নীচে দূরের সাদা পাথরের ঢিবির ওপর দাঁড়িয়ে রমা। উদ্দাম বাতাসে উড়ছে তার চুল আর নীল সাড়ির আঁচল···কাঁখে কলসি।

এদিকটাতেও তেমন লোকালয় নেই।

ঘোড়া থেকে নেমে অপেক্ষা করি। রমা কাছে এসে দাঁড়ায়। হাসিমুখে বলে, কোথায় গিয়েছিলেন, শারেলি করণায়। আপনি আমায় দেখতে পাননি তো, আমি কিন্তু সেই সাঁকোর কাছ থেকে আপনাকে দেখতে পেয়েছি।

ওর কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, এতদূরে তুমি একা একা এসেছিলে ভয় করে না?

রমার কালো চোখে বিস্ময় ঘনিয়ে ওঠে···
ভয় কিসের রাজুদা?

তারপরই খিল খিল করে হেসে ওঠে, ও বাঘের কথা বলছেন আপনি, সে কি দিনের বেলায় এদিকে আসে নাকি!

চুপ করে গেলাম। বাঘের চেয়ে আরও সাংঘাতিক প্রাণীও যে পৃথিবীতে আছে ওকে তা বোঝাব কেমন করে।

আমার পাশে পাশে রমা পথ চলে। উদার উন্মুক্ত শ্যামল পাহাড়ী প্রান্তর। হু হু করা অফুরন্ত বাতাসে ওর নীল সাড়ির আঁচল বার বার আমার গায়ে উড়ে আসে। খোঁপায় রজনীগন্ধার মালার গন্ধে বাতাস মদির হয়ে ওঠে।

অবচেতন মন ভাল লাগার নিবিড় অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কথা বলতে ভুলে যাই।

এই তো সেদিন, তিনটে মাসও পুরো হয় নি। তবু মনে হয় কত দিন, কত যুগ যেন দেশ ছেড়ে চলে এসেছি। চলে এসেছি শত শত মাইল দূরে। কোনো-দিনই হয়ত আর তাদের কাছে ফিরে যেতে পারব না। বন্ধু-স্বজন সকলে যেন কোন বিস্মৃতির অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। সেই প্রদোষ অন্ধকারে তপতীর মুখ সন্ধ্যা-তারার মতো অশ্রুভারে কেঁপে কেঁপে ওঠে।

দুপুরে হিসাবের খাতাপত্র পড়ে থাকে। দু'চোখের দৃষ্টি চলে যায় দূরে অনেক দূরে যেখানে ধূসর-নীল পাহাড়ের মাথায় মাথায় গ্রীষ্মের নীল মেঘ কালো হয়ে ঘনায়।

কলকাতার অতি সামান্য দিনের স্মৃতিও আজ রূপকথার মতো অপরূপ মায়াময়।

নিঝুম নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন। এমনি অনেক মধ্যাহ্নের স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বোটানিক্যাল গার্ডেনের ছায়াচ্ছন্ন নিরালা শুকতলে কোলে মাথা রেখে চোখ বুজিয়ে শুয়ে আছে তপতী। আঙুলে জড়ানো তার মিষ্টি আঙুল।

তপতী চোখ বুজিয়ে বলে, জান রাজুদা, কি মনে হয়·····ঠিক এই রকম করে তোমার কোলে মাথা রেখে চিরদিনের মতো ঘুমিয়ে পড়ি।

সমস্ত কাননভূমি যেন আমাদের দিকে হাসি মুখে চেয়ে থাকে।

কি একটা শব্দে দুজনেই চমকে উঠি। কিছু না, একটা কাঠবিড়ালি শুকনো পাতার ওপর দিয়ে তড়তড় করে নেমে গেল পাশের গাছ থেকে।

পিছনে খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে রমা। তারপরই

কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলে, অপরাধ নেবেন না, ধ্যান ভঙ্গ করলাম।

চেয়ে দেখি তাইতো কখন বিকাল হয়ে গেছে। রোদ্দুর এসে পড়েছে দরজার পাশে। চা'য়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে রমা।

ওর দিকে হাসি মুখে তাকিয়ে বলি, পুরাকালে ধ্যান ভঙ্গ করার কি শাস্তি হ'ত জানতো রমা?

—জানি গো মশাই জানি।

রমা টেবিলে চায়ের কাপটা নামিয়ে রেখে পিছনে চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে বলে, পুরাকালের মুনি ঋষিরা যে চা খেতে জানতেন না। নইলে শকুন্তলা যদি দুর্বাসা মুনিকে জলের বদলে এক কাপ চা এনে দিত, তা হলে মুনিবর তাকে শাপ না দিয়ে বর দিতেন।

চায়ে চুমুক দিয়ে বলি, তাই বলে আমি কিন্তু তোমায় বর দিতে পারব না রমা।

ঝরণার পৌঁছে বড় পাথরটায় হেলান দিয়ে বসে আজ অনেক কথা মনে এলো। এর আগেও যে কথা অনেক দিন ভেবেছি সেই কথাটাই নতুন করে ভাবতে বসলাম। এতদিন যা অস্পষ্ট ছিল, আজ তা' একটুও আবছা নয়। একান্ত অন্ধ হয়ে না থাকলে রমার মুখের রেখা পড়তে দেরি হবার কথা নয়। দুপুরে নদীর ধার থেকে ফেরার সময় ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে যখন বাইরে এসে দাঁড়ায়—উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ওর মুখ। আর এক জনের মুখও যে অমনি দীপ্ত হয়ে উঠত সে কথা স্মরণ করে শঙ্কিত হয়ে উঠি। দিনের মধ্যে কাজের ফাঁকে ফাঁকে কেন বারবার ছুটে আসে আমার ঘরে, তা অনুমান করা কি সত্যিই কঠিন?

কিন্তু তপতীর আসনে কোনোদিন কাউকে যে ঠাঁই দিতে পারব, এ কথা আজও চিন্তা করতে পারি না।

কিন্তু ওকি!

চকিতে তীব্র বিদ্যুৎ স্ফুরণে চমকে মুখ তুলে দেখি কালোপুঞ্জিত মেঘে মেঘে একাকার হয়ে গেছে পশ্চিমের সারা দিগন্ত। রাশি রাশি মেঘ দ্রুত ছেয়ে ফেলছে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। আসন্ন প্রলয়ের ইঙ্গিতে শিউরে উঠছে কালো আকাশ।

গাছে বাঁধা ঘোড়াটা অস্থির ভাবে পা ঠুকছে। তখনই ঘোড়ায় লাফিয়ে উঠে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিলাম।

কিন্তু নদীর সাঁকো পার হতে না হতেই বায়ু-কোন থেকে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলে ঝঞ্ঝাটির ক্ষিপ্ত অশ্বের মতো ছুটে এলো উন্মত্ত ঝড়। নিরন্ধ্র অন্ধকারে হারিয়ে গেল পথের নিশানা। কণা-বৃষ্টির মধ্যে আতঙ্কিত অশ্ব উদ্‌ভ্রান্তের মতো আজানা দিকে ছুটে চলল। সে তখন আমার আয়ত্তের বাইরে। অনিবার্য বিপদের আশঙ্কায় রুদ্ধনিঃশ্বাসে অবাধ্য ঘোড়ার পিঠে বসে রইলাম।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। অকস্মাৎ কঠিন অদৃশ্য বস্তুর সংঘর্ষে ঘাড় গুঁজে পড়ল ঘোড়া। আর মাটিতে ছিটকে পড়ে মাথায় ভয়ঙ্কর আঘাতে জ্ঞান হারালাম।

মাথায় দুঃসহ যন্ত্রণার সঙ্গে জ্ঞান এল পরদিন সকালে। পনের মাইল দূরের সহর থেকে এসেছে ডাক্তার। ধরণীবাবু নত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কেমন বোধ করছ লালেন।

চোখের সুমুখে সব যেন অর্থহীন অস্পষ্ট। আরো দু'দিন উপরি উপরি ডাক্তার এলেন। আরো দিন পাঁচেক কাটতে বললেন, আর ভয় নেই। কিন্তু খুব সাবধানে রাখবেন। নিউমোনিয়া দাঁড়াবার ভয় আছে।

ধরণীবাবুর কাছে শুনলাম, অন্ধকারে পথ হারিয়ে আমার ঘোড়া পাশের গ্রামে প্রবেশ করেছিল। একটা বাড়ীর বেড়ায় পা আটকে পড়েছিলো ঘোড়াটা।

তখনও সামান্য জ্বর ছিল, তবু সুস্থ বোধ করছিলাম। সেই রাতেই ফিরবেন জানিয়ে ধরণীবাবু ক'দিন পর আবার রেশনের জন্যে যাওয়া কাজে বেরোলেন।

বাইরে চমৎকার বৃষ্টি-ধোয়া রোদ্দুর। সেদিকে চেয়ে থেকে থেকে রোগশয্যায় আজ সকলের আগে যার কথা মনে পড়ল, সে তপতী। আজ যদি সে কাছে থাকত অনেক যন্ত্রনাই বুঝি ভুলে যেতে পারতাম।

মাঝার দিকের দরজা দিয়ে বার্লি হাতে নিয়ে প্রবেশ করল রমা। দাঁড়াল বিছানার পাশে, রাজুদা বার্লিটা খেয়েনিন।

কদিন পর ভাল করে চেয়ে দেখলাম রমাকে।

আশ্চর্য! মানুষের মুখ কি ক'দিনে এমন বদলে যায়?

রমার মুখের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত যুক্তি কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। তারপর বললাম, তোমার শরীর কি ভাল নেই রমা?

রমা মৃদু হেসে বলল, আমার শরীর খারাপ হতে যাবে কেন, নিন্‌তো বার্লিটা খেয়ে নিন, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই বড়ো চামচে দিয়ে সব বার্লিটুকু খাইয়ে মুখ মুছিয়ে দিলে। কপালে হাত দিয়ে উত্তাপ পরীক্ষা করে বললে, কম আছে আজ। কিন্তু জানেন তো, ডাক্তারবাবু বলে গেছেন এখনো পনেরদিন আপনাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। কেমন, বেশ জব্দ হয়েছেন তো?

সম্পূর্ণ সেরে উঠতে মাস খানেকই লাগল। এই ঘটনার পর কলকাতায় ফিরে যাবার জন্য মন অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল।

বর্ষা তখন শেষ হয়ে এসেছে। অনেক দিন পর সেদিন আবার রমার সঙ্গে নদীর ধারে গিয়ে বসলাম। বিদায়ী-বর্ষার নীল আকাশে লঘু সাদা মেঘের মন্থর গতি।

চৈত্রের সে ক্ষীণা নদী—তখন চেনে কার সাধ্য। ক্ষয়ে যাওয়া যে প্রকাণ্ড শিলা খণ্ডের ওপর বহুদিন সন্ধ্যায় বসেছি—তার নীচে দিয়ে দুকূল ছাপান ঘোলা রাঙা জল পাক খেয়ে ছুটে চলেছে। পা ঝুলিয়ে বসতেই গোড়ালি পর্যন্ত বন্যার স্রোতের জলে ডুবে গেল।

নদীর তীরে তীরে তখন সন্ধ্যা নামছে। ঘুরের শৈল চূড়ার অন্তমান সূর্য বর্ষা-ধোয়া শ্যাম ধরিত্রীর বুকে, নীল আকাশের সঞ্চরমান মেঘে মেঘে আর বলাকা শ্রেণীর বুকে চড়িয়ে দিয়েছে তার অনুরাগ।

সেদিনের সেই সন্ধ্যা যে আমার জীবনের গতি চিরদিনের মতো ফিরিয়ে দেবে তা সেদিন কে জানত।

পা দিয়ে জলে আঁক কাটতে কাটতে রমা বললে, রাজুদা বাবা বলছিলেন, আপনি নাকি এখানকার চাকরি ছেড়ে কলকাতায় ফিরে যাবেন?

বললাম, না এখনই কিছু ঠিক করিনি। তারপর মৃদুহেসে বললাম, তবে সত্যিই যদি কোনো দিন যাই তোমরা আমার জন্য যা করলে, তা' কোনোদিন ভুলবনা রমা। তোমাদের ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না।

—শোধ করতে তো আপনার পায়ে ধরছিনা। —ওর কণ্ঠের রুক্ষতায় বিস্মিত হলাম।

রমা মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। সূর্যের শেষ অস্তাভায় অপরূপ ওর মুখ।

স্তব্ধ হয়ে বসে ভাবতে লাগলাম,—পুরুষ আর নারীর মধ্যে সহজ বন্ধুত্বকি সম্ভব নয়! তপস্বীর আসনে অপর কোনো জনকে কোনোদিন বসাবার কথা চিন্তা করতেও পারিনা। ছোট সে তরী—কোথায় তোমায় স্থান দেব রমা! হৃদয়ের অন্তরতম আকাশে আজও যে এক জনের অশ্রু-সিক্ত সকরুণ মুখ সন্ধ্যা তারার মতো উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

উঃ!

রমার অস্ফুট আর্তস্বরে চিন্তা জাল ছিন্ন হয়ে গেল। চমকে ফিরে দেখি রমা একটা পা উপরে তুলে নিয়েছে। আর পায়ের বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রান্তে দু'ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। শঙ্কিত মুখে তৎক্ষণাৎ চেপে ধরে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললাম, কি হল রমা?

পায়ের দিকে তাকিয়ে ভীত কণ্ঠে বলে উঠল, কি যেন একটা কামড়াল রাজুদা।

শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম, দেখেছ কি কামড়েছে?

রমা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, না, তা'ত' দেখিনি।

প্রথমে মনে হল জলের ধারে বড় বড় কাঁকড়া

থাকে, তাই হয়ত কামড়েছে। কিন্তু পরক্ষণেই একটা কথা মনে করে শিউরে উঠলাম—বন্যার জলে অনেক বিষাক্ত সাপও যে ভেসে যায়, যদি……

চিন্তার শক্তিটুকুও লোপ পেয়ে গেল। পকেট থেকে রুমাল বার করে ওর পায়ের গোড়ালির ওপর কষে বেঁধে দিলাম।

কিন্তু তার—মধ্যেই ওর চোখের দৃষ্টি কেমন আচ্ছন্ন হয়ে এল। বোধ হয় বেশী নার্ভাস হয়ে পড়েছিল।

রমার লঘু দেহটা দু'হাতে বুকের কাছে তুলে নিয়ে দ্রুত বাসার দিকে এগিয়ে গেলাম। এক হাতে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করে রমা মৃদু কণ্ঠে ডাকল, রাজুদা।

দু'চোখে জল বুঝি আর বাধা মানেনা। রুদ্ধশ্বাসে বললুম, কি রমা।

তুমি এখান থেকে চলে যেওনা রাজুদা। বল যাবেনা!

অশ্রু রুদ্ধ কণ্ঠে বললাম, না যাবনা রমা।

তখনই আরও এলিয়ে পড়ল ওর মাথা। শিথিল বাহু খসে পড়ল আমার কণ্ঠ থেকে।

দাওয়ায় শুইয়ে দিতেই রমার মা শঙ্কিত মুখে ছুটে এলেন, কি হল রাজু আমার রমার।

—কি জানি মাসিমা। বোধ হয় সাপে কামড়েছে—বলে, বাইরে ছুটে গেলাম। সর্প দংশনে মৃত্যু এখানে আকস্মিক ব্যাপার নয়। কিছুক্ষণের মধ্যে এক জন গ্রামা ওঝা সঙ্গে নিয়ে যখন ফিরে এলাম তখন সর্প দংশনের সমস্ত লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চেষ্টার ত্রুটি রইল না। কিন্তু ওরা বললে, বাবুজী এ একেবারে সাক্ষাৎ কালনাগিনী।

রাত্রে ধরণীবাবু যখন ষ্টেশন থেকে ফিরলেন, তখন রমার জীবনের ক্ষীণতম লক্ষণও আর অবশিষ্ট নেই।

শোকাকুল গৃহের মর্মান্তিক দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে বাইরে চলে গেলাম।

সেই প্রথম নয়, জীবনে একাধিকবার মৃত্যুর রূপ দেখেছি। কিন্তু রমার মৃত্যু আমাকে বিস্ময়ে বেদনায় যেন স্তম্ভিত করে দিলে। মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারলাম না মৃত্যুবিষে নীল ওর অনুপম মুখের ছবি।

টেবিলে নিবিষ্টমনে হিসাবের খাতা লিখছি পাশের তক্তপোষে উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে মুখ ডুবিয়ে, পিছনে উঁচু করা পা দোলাতে দোলাতে রমা পড়ছে বই। হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠল রমা। খাতা থেকে মুখ তুলে তাকালাম—ওকি আবার এতো হাসির কি পেলে।

রমা হাসি থামাতে না পেরে মাথা ঝাকিয়ে বলে, কিছু না কিছু না, আপনি আপনার কাজ করুন।

কদিন আগেও যে এমনি বাস্তব, এমনি সত্য, এ পৃথিবীতে কোথাও আর সে নেই, কেমন করে মেনে নেবো এমন কথা। সমস্ত মন বলে উঠল, আছে সে নিশ্চয় আছে।…আর সেই দিনই প্রথম অনুভব করলাম ওই দিগন্তবিসারী গিরি অরণ্যের সঙ্গে তাদের বনদেবীকেও কবে ভাল বেসেছি।

রুক্ষ এলোচুলে আকুল মুখ ভেসে যাচ্ছে রক্তে। তবু তার মাথা খোঁড়ার বিরাম নেই। বক্ষ-বিক্ষুব্ধ রাত্রির দিকে ভেঙ্গে পড়ছে তার ব্যাকুল কান্না।

রাজেন বললে, আমার গল্প শেষ হয়ে এসেছে। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ইস, একটা ভারি ভুল হয়ে গেছে তো। বস একটু বিমল, আসছি এখুনি।

আর এলো না। অনেকক্ষণ পরে দেউড়ীর দিকে দেখা গেল একটা আলো। কে একজন কণ্ঠন হাতে এগিয়ে আসছে। কিছুটা দূরে মানুষটা থমকে দাঁড়িয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। অন্ধকারে আমাকে একা বসে থাকতে দেখে অস্ফুট ভীত কণ্ঠে বলে উঠল, কে, কে আপনি বাবু।

সোজা হয়ে বসে হেসে বললাম, কে বনমালী নাকি, চিনতে পারলেনা আমি বিমল। তুমি এখানেই থাক বুঝি।

বনমালী এবার সাহস করে এগিয়ে এলো।—আপনি এখানে বসে কেন বাবু?

—তোমাদের রাজেন বাবুর জন্যে বসে আছি।

বনমালী আরো কাছে এগিয়ে এসে চাপা গলায় বললে, কার কথা বললেন, ছোট বাবু। আপনি শোনেন নি, কর্তাবাবু মারা যাবার পর তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন।

মুহূর্তের জন্য চোখের সুমুখে একটা কালোপর্দা নেমে এলো কিন্তু সামলে নিয়ে বললাম, না, কিছুনা।

তোমার আলোটা নিয়ে আমায় একটু এগিয়ে দিতে পার বনমালী?

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য

ভারতীয় জীবন বীমা ব্যবসায় রাষ্ট্রীয়করণ—

সরকারী অর্ডিনান্সের বলে ভারত সরকার এদেশে জীবন বীমা ব্যবসায়কারী সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যভার গত ২০শে জানুয়ারী থেকে গ্রহণ করেছেন। নিয়মমাফিকভাবে রাষ্ট্রীয়করণ সমাপ্ত করতে কিছু বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক। অর্ডিনান্স জারী থেকে রাষ্ট্রীয়করণ পর্যন্ত সময়ে যাতে ব্যবসায়ে কোন ত্রুটি না হয়, সেজন্য সরকার প্রত্যেক জীবন বীমা প্রতিষ্ঠানে custodian বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছেন। এই তত্ত্বাবধায়কগণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বময় কর্তা হলেও, ব্যবসায় প্রথা এবং কার্যপ্রণালী যথাসম্ভব আগের মত একইভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন। জীবন বীমার ভবিষ্যৎ রূপ নিয়ে নানারকম জল্পনা কল্পনা শোনা যাচ্ছে। এরকম ব্যাপারে তাই স্বাভাবিক। আর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই পার্লামেন্টে জীবন বীমা রাষ্ট্রীয় করণ বিল উত্থাপিত হবে এবং তখন জীবন বীমার ভবিষ্যৎ রূপটি জনসাধারণ জানবার সুযোগ পাবেন; এপর্যন্ত জানা গিয়েছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার "জীবন বীমা কর্পোরেশন" নামক একটি সংস্থার উপর ভারতের জীবন বীমা ব্যবসা হয় পরিচালনা ভার ন্যস্ত করবেন। এদের একটি কেন্দ্রীয় কার্যালয় থাকবে। তাছাড়া কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও দিল্লীতে চারটি আঞ্চলিক প্রধান কার্যালয় থাকবে। বর্তমান পলিসি গ্রহীতাদের নিজ নিজ পলিসির সর্তাদির কোন পরিবর্তন হবে না এবং তাঁরা আগের মত সমস্ত সুযোগ সুবিধার অধিকারী থাকবেন। আর যাঁরা নূতন পলিসি গ্রহণ করবেন, তাঁরা ভারতের যেখান থেকেই পলিসি গ্রহণ করুন না কেন, একই রকম প্রিমিয়াম হার ও উদার পলিসি সর্তের সুযোগ পাবেন। প্রিমিয়ামের হার সরকার ওরিয়েন্টাল গভর্ণমেন্ট সিকিউরিটি লাইফ এস্যুরেন্সের প্রিমিয়ামের হার থেকে প্রতি হাজারে সমস্ত বয়স ও সর্তের জন্য এক টাকা কম বেঁধে দিয়েছেন। জীবন বীমার এজেন্টদের নিয়োগও আগের মতই বহাল থাকবে। আর কর্মচারীদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ছাঁটাইয়ের কোন প্রশ্ন নেই। শিল্পের পুনর্বিন্যাসের ফলে হয়ত কিছু কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে, কিন্তু তাই বলে ছাঁটাই করা সরকারী মনোভাব নয়। কর্মচারীদের বেতনের স্তর একভাবে বেঁধে দেবার জন্য সরকার কর্মচারীদের বেতন পরিবর্তনের ক্ষমতা হাতে রাখবেন। এসম্পর্কে সরকার অতি সুচিন্তিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশা করা যায়। কারণ ব্যাংক কর্মচারীদের বেতনের ব্যাপার নিয়ে সম্প্রতি সরকারের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে বীমা কর্মচারীদের বেতন পরিবর্তনে তিক্ততার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সরকার তা অবশ্যই দেখবেন।

বৈদেশিক স্বার্থ ও ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্তৃপক্ষগণ এই রাষ্ট্রীয়করণকে অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ বলে আখ্যা দিয়েছেন। জনসাধারণ কিন্তু এই ব্যবস্থাকে অতি সুবিবেচনার কাজ বলেই মনে করেছেন। কারণ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ প্রতিষ্ঠায় বীমার রাষ্ট্রীয়করণ

একটি সুদৃঢ় ও সবল পদক্ষেপ। অন্যান্য সমাজ ব্যবস্থার তুলনায় বীমার রাষ্ট্রীয়করণ অবিবেচনা প্রসূত বলে মনে হতে পারে কিন্তু সার্বভৌম ভারতীয় সাধারণতন্ত্রে ইহা সময়োপযোগী ও সুবিবেচনা প্রসূত।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া

কিছুদিন পূর্বে পরিকল্পনা কমিশন জনসাধারণের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশ করেছেন। সকলের মতামত পরিপূর্ণরূপে বিচার বিবেচনা করে পরে পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনাটি প্রকাশ করা হবে। এই খসড়াটিতে ১৪টি পরিচ্ছেদ এবং মোট দুই শতাধিক পৃষ্ঠা আছে। দেশের চিন্তানায়কগণের মতামত নিয়ে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমূহের বিভিন্ন স্তরের বহু কর্মীর পরিশ্রমে এই পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত হয়েছে।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হবে জাতীয় অর্থ-নীতির দ্রুততর উন্নয়ন এবং দেশের সর্ব ক্ষেত্রে উৎপাদন শক্তি এমন ভাবে বৃদ্ধি করা, যাতে করে পরবর্তী কয়েকটি পরিকল্পনা কালেও দেশের উন্নয়নের গতির ক্রমবৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। জন সাধারণের জীবন ধারণের মান উন্নয়নের জন্য জাতীয় আয় উপযুক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি করা, দ্রুত শিল্পায়ন (বিশেষ করে মূল ও বৃহৎ শিল্পের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে), কর্মসংস্থানের বিরাট সম্প্রসারণ, সম্পদ ও আয়ের বৈষম্য দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকতর সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বছরে (১৯৫৬-১৯৬১) উন্নয়ন খাবদ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমূহের মোট বিনিয়োগের পরিমান হবে ৪,৮০০ কোটি টাকা। বে-সরকারী উদ্যোগেও এই সময়ে ২৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে বলে আশা করা হয়েছে। সরকারী বিনিয়োগের শতকরা ৪৮ ভাগ পরিবহণ ও যোগাযোগসহ শিল্প ও খনিজ খাতে, ১৮ ভাগ সেচ বিদ্যুৎ খাতে, ১২ ভাগ সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনা সহ কৃষি খাতে এবং ২০ ভাগ গৃহনির্মান ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সহ সমাজ সেবা খাতে বরাদ্দ করা হয়েছে।

সামগ্রিক ভাবে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দেশের উন্নয়ন সাধনের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক ও ঋণদান ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পল্লী ঋণ ব্যবস্থা সুসংগঠিত ও সম্প্রসারণ করবার উদ্দেশ্যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করে স্টেট ব্যাঙ্কে পরিণত করা হয়েছে। পল্লীঋণসমীক্ষা কমিটির সুদূর প্রসারী সুপারিশ সমূহ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কার্যকরী করে চলেছে। সমবায় প্রতিষ্ঠান গুলির জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং রাষ্ট্র একযোগে যে কার্যপদ্ধতি গ্রহণ করেছে, তাতে সুবিধাজনক হারে ভারতের সর্বত্র পল্লী অঞ্চলে ঋণ সরবরাহের ব্যবস্থা স্বচ্ছন্দিত হবে। শিল্পক্ষেত্রে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির বিশেষ প্রয়োজন মেটাবার জন্যে শিল্প অর্থ-সংস্থা (ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন) এবং শিল্প ঋণদান ও অর্থ বিনিয়োগ সংস্থা (ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কর্পোরেশন) গঠিত হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পকে সাহায্য করবার জন্য বিভিন্ন রাজ্যের অর্থ সংস্থা ও কেন্দ্রীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন স্থাপন করা হয়েছে। জীবনবীমা রাষ্ট্রায়ত্ত করণের যে সিদ্ধান্ত সম্প্রতি করা হয়েছে, তাতে সরকারী শিল্পক্ষেত্রে সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং পরিকল্পনার প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ বিনিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের আরও সুবিধা হবে।

ভারতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনই অর্থ-নৈতিক নীতির লক্ষ্য বলে গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ সমাজের লাভের পরিমাণে দেশের উন্নতির উপায় নির্ধারণ করতে হবে, ব্যক্তিগত মুনাফার নিরিখে নয়। উৎপাদন, বণ্টন, দ্রব্য ব্যবহার, অর্থ বিনিয়োগ অর্থাৎ যাবতীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তগুলি সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত সংস্থার মাধ্যমে গৃহীত হবে। সমাজে যারা বেশী সুযোগ সুবিধা পায় নাই, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে সেই সকল শ্রেণীর লোকেরা যাতে ক্রমে বেশী সুযোগ-

সুবিধা পাবে তার ব্যবস্থা আয়, সম্পদ ও অর্থনৈতিক সমতা যাতে কেন্দ্রীভূত না হতে পারে ক্রমে ক্রমে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্য সমগ্র সমাজের মুখপাত্র হিসাবে রাষ্ট্রকে গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে এবং সরকারী উদ্যোগের পরিধি আরও বাড়াতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেট—

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী সি. ডি দেশমুখ গত ২৯শে ফেব্রুয়ারী ভারতীয় সংসদে ১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেট পেশ করেন। করের বর্তমান হার অনুসারে আগামী বৎসর রাজস্ব খাতে ৪৯৩ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা আদায় এবং ৫৪২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। কাজেই রাজস্ব খাতে ঘাটতি পড়বে কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। এছাড়া মূলধনী ঘাটতি পড়বে ৩৩৬ কোটি টাকার মত। সুতরাং মোট ঘাটতি দাঁড়াবে ৩৯০ কোটি টাকা।

মোটা বুনি শাড়ি বাতীত সমস্ত সুতী কাপড়ের উৎপাদনশুল্ক বর্গগজ প্রতি দু'পয়সা করে বাড়ানো হবে। সাধারণ ও জরুরী তারের মাশুল যথাক্রমে এক আনা ও দু আনা হারে বাড়ানো হবে। রেজিষ্ট্রী যোগে চিঠি পত্র ইত্যাদি পাঠানোর ফি ও দু' আনা করে বাড়বে। এছাড়া উদ্ভিজ্জ তৈল, ডিজেল্ ও কারোসিন তৈল, সাবান ইত্যাদি আরও কতকগুলি বিষয়ের উপর শুল্ক কিছু বাড়ানো হবে। এর ফলে ৩৪ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা নূতন রাজস্ব আদায় হবে এবং আগামী বৎসরে রাজস্ব খাতে ৪১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ১৭ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি হবে বলে ধরা হয়েছে। চলতি বছরে রাজস্ব খাতে ১৭ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি হবে বলে পূর্বে ধরা হয়েছিল। কিন্তু উৎপাদন শুল্কে বেশী অর্থ আদায় হওয়ায় এবং প্রতিরক্ষা খরচের ব্যয় কিছু বেঁচে যাওয়ায় এখন ১২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে বলে দেখা যাচ্ছে। সুতরাং চলতি বছরে পূর্ব অনুমিত সামগ্রিক ঘাটতি ৩২৭ কোটি টাকার স্থলে ২২২ কোটি টাকা পড়বে। শ্রীদেশমুখ ঘোষণা করেন যে, আগামী বছরে সমস্ত ঘাটতি (৩৯০ কোটি টাকা বলে অনুমিত) সম্ভবতঃ ট্রেজারী বিল বাড়িয়ে পূরণ করা হবে।

অন্যান্য বারের মত এবারেও অর্থ মন্ত্রী তার বাজেট পেশ করবার কালে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করেন। তিনি বলেন- ১৯৫৩ এবং ১৯৫৪ সালে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতির দিকে চলতে থাকে এবং ১৯৫৫ সাল তার ভিত্তি দৃঢ়তর হয়েছে। অধিকাংশ শিল্পের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনও সন্তোষজনক হয়েছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন খাতে ব্যয় অনেক বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু তাতে মুদ্রা স্ফীতির লক্ষণ দেখা দেয়নি। তিনি আরও বলেন যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাটি সন্তোষজনক পর্যায়ে সফল করা গিয়েছে এবং এরফলে দেশের দ্রুততর উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বহির্বাণিজ্যের অবস্থা সন্তোষজনক হওয়া সত্ত্বেও অর্থমন্ত্রী এই বলে সাবধান করে দেন যে দেশে উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হওয়ায় ভবিষ্যতে ভারতে বহির্বাণিজ্যের উদ্বৃত্তের উপরে চাপ খুবই বেড়ে যাবে। কাজেই রপ্তানী সম্পর্কে উৎসাহ দানের জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টার প্রয়োজন হবে। অর্থের অপচয় বন্ধ করা এবং যতদূর সম্ভব মিতব্যয়ের জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাযুক্ত কমিটি গঠন করা হবে। এই কমিটি কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার সমূহের এবং বড় বড় পরিকল্পনাগুলির কার্যপ্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করে দেখবেন।

অর্থ মন্ত্রী অবশ্য কর্মসংস্থান পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করতে ভুল করেন নি। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নতি হলেও কর্মসংস্থান সমস্যার বিশেষ উন্নতি হয়নি। কর্ম-সংস্থান সংক্রান্ত যে সামান্য তথ্য পাওয়া যায় তাতে সহরাঞ্চলে বেকার সমস্যা বেড়ে যাচ্ছে। আজকাল অধিক সংখ্যায় লোক কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলিতে নাম তালিকাভুক্ত করায় এবং গ্রামাঞ্চল থেকে সহরে বেশী লোক চলে আসায় বেকারদের সংখ্যার এই বৃদ্ধি ঘটেছে কিনা বলা কঠিন। কাজেই উন্নয়নের গতি বাড়িয়ে দেওয়া এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী হয়ে পড়েছে।

পুস্তক পরিচয়

দিনকালে : প্রভাত দেব সরকার। সরস্বতী লাইব্রেরী। ৬ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য ৪৲।

উপন্যাসখানি ধারাবাহিক ভাবে 'মন্দিরা'য় প্রকাশিত হয়েছিল। তখনই আমরা এর বিশেষত্ব লক্ষ্য করেছিলাম। আজ আমাদের 'ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড়' গ্রামগুলিও পারিপার্শ্বিক ঘটনার আঘাতে কেঁপে উঠেছে। মানুষের জীবনের ধারা বদ্‌লাচ্ছে। কৃষাণ আন্দোলনের মুখে ভাঙন ধরা জমিদারির এবং আন্দোলন উপলক্ষ্যে নানা শ্রেণীর লোক সমাবেশের চিত্র এ উপন্যাসে সুন্দর ফুটে উঠেছে। জমিদারের অত্যন্ত মর্যাদাবোধ এবং বর্তমান নিরুপায় অবস্থা, চাষীদের বিধাদ্বন্দ্ব, অভিজাত নারীর জীবনে নবযুগের তরঙ্গাভিঘাত—সমস্তই স্বাভাবিক অথচ কৌতূহলোদ্দীপক ভাবে বর্ণিত হয়েছে। সাহিত্য-সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রেখেই যে উপন্যাসে রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাবলীর অবতারণা করা যায়, এ গ্রন্থে তার নিদর্শন মেলে। নবীন উপন্যাসিকদের মধ্যে গ্রন্থকার যে সম্মান-জনক স্থান পূর্বেই অধিকার করেছেন, এবারে তা আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হলো।

কৃত্তিবাস : ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সম্পাদক : সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। ২-সি, বৃন্দাবন পাল লেন, কলিকাতা ৩। বার্ষিক চাঁদা সডাক ২৲।

'তরুণতম কবিদের মুখপত্র।' আলোচ্য সংখ্যাটি ষষ্ঠ সংকলন- ১৩৬২ সালে প্রকাশিত। নতুন কবিদের রচনায় আঙ্গিকের নতুন পরীক্ষা কিছুটা আছে, তবে কিছুদিন পূর্বেকার কবিদের মত এঁরা স্বপ্ন-কল্পনার প্রতি বিরূপ নন। প্রকৃতি ও প্রেমের বিচিত্র পরিবেশে এঁদের কবিতা সমুজ্জ্বল। অলোকরঞ্জনের 'অন্ধ সাউল', প্রণবকুমারের 'অন্তরতমা' এবং শোভন সোমের 'মাটি ছড়া চা বাগানে' বিশেষ ক'রে ভালো লাগলো।

সুর ও শিল্প : সুনীল সাহা ও অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ১৪৩, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা, ২৬। বাৎসরিক চাঁদা ৫।০। মাঘী সংখ্যা ১৩৬২।

'সঙ্গীত ও কলা বিষয়ক……মাসিক পত্রিকা।' উদ্দেশ্য ভালো, কিন্তু সম্পাদনায় আরও দায়িত্ববোধ বাঞ্ছনীয়। সঙ্গীত এবং অন্যান্য কলা-বিদ্যা সাধনার বস্তু, হেলা ফেলার জিনিষ নয়।

স্বপ্নজাগর : অনিলেন্দু চক্রবর্তী। অরুণা প্রকাশনী পরিবেশক : এ. কে. সরকার এণ্ড কোং। ৬।১ বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট। কলিকাতা ১২। দাম ২৲।

২৭টি কবিতা। কোনটি কল্পনা-মধুর, কোনটি আদর্শদীপ্ত, কোনটি বিদ্রূপ-তীক্ষ্ণ। সর্বত্রই একটি অনায়াস বলিষ্ঠ প্রকাশ ভঙ্গীর সাক্ষাৎ মেলে। প্রথম কবিতা 'জলার কাহিনী' : "আমি এক জলা
কত কাল।

ওগো আলোর সন্তান,
উন্নত ভূমির স্বপ্নতপ্ত সন্তান
আমাকে উদ্ধার করো।"

বদ্ধজলার প্রাণপিপাসা আবেগ কম্পিত সুরে ধ্বনিত হয়েছে। বদ্ধজলার মত আমাদেরও জীবন—তাই কি ?

'ফুটপাথে যা', 'অন্ধগলি', 'কী দেব উত্তর'—
দারিদ্র্য পীড়িত জনতা—লাঞ্ছিত দেশের বাস্তব চিত্র।
কবি হৃদয়ের বেদনা ও উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছে
কবিতাগুলিতে।

স্বপ্ন-আবেশরঙে মেশানো কবি-দৃষ্টির আলোকে
জীবন ও জগৎ মনোজ্ঞ রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে।

যাত্রা সহচরী—শ্রীমধুসূদন। সান্যাল কোম্পানী ১।১এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। মূল্য ৪৲। বইখানি পুরোপুরি ভ্রমণবৃত্তান্ত নয়, ঠিক উপন্যাসও নয়। দুইয়ের মিশ্রণ। দিল্লী-আগ্রা-মথুরা-বৃন্দাবন-ভ্রমনের গল্পের মধ্যে রহস্যময়ী শ্রীমতীর কাহিনী মিলিয়ে লেখক রসসৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। গ্রন্থবিশেষের সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরী এক সময়ে বলেছিলেন, ভ্রমণ এবং কাহিনী মিলিয়ে ভ্রমণ-কাহিনী। এ গ্রন্থের পরিচয়ও সেই ভাবে দেওয়া যেতে পারে। চমকদার করবার জন্যে গ্রন্থকার শ্রীমতীর আচরণে ও কথাবার্তায় ঘৃণিমত রং লাগিয়েছেন তবু, মোটের উপর বেশ লাগে, স্বচ্ছন্দমনে পড়ে যাওয়া চলে। ভাষার বা ছাপার ভুল মাঝে মাঝে আছে : যেমন, 'নৃত্যাহিক' (পৃ, ৫৪), 'গৌড়কাত্তি' (পৃ, ১৮৪)।

রাজঘাট—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস। ডি. এম্. লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৩৲।

প্রথম গল্প 'রাজঘাট'। ভাগ্যচক্রের আবর্তনে সাম্প্রদায়িকতার কুহেলিজাল ছিন্ন হয়ে গেছে, মনুষ্যত্বের দীপ্তি ফুটে উঠেছে এই গল্পে। অন্যগল্পগুলিও দৈনন্দিন জীবনের সুখে দুঃখে মনোরম। ঘটনা স্বাভাবিক,—অথচ বিন্যাসের গুণে চিত্তাকর্ষক। আজকাল অনেক ছোট গল্প কৌশল-প্রধান হয়ে উঠছে ; এগুলি তা নয়। এর অনাড়ম্বর মাধুর্যে পাঠকের মন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে, তৃপ্তি পায়।

—মী।

ডক্টর মেঘনাদ সাহা—পরপর কয়েকজন মনস্বী ব্যক্তিকে আমরা হারালাম। ডক্টর মেঘনাদ সাহা তাঁদের অন্যতম। শুধু তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভার জন্য নয়, স্পষ্টবাদিতা, নির্ভীকতা এবং সরল জীবনযাত্রার জন্যও লোকে তাঁকে শ্রদ্ধা করত, ভালোবাসত। পার্লামেন্টে বিরোধীদলের সভ্য হিসাবে অনেক সময়ে তিনি সরকার পক্ষের ভুল ত্রুটির কঠোর সমালোচনা করেছেন কিন্তু তা বলে তিনি তাদের শত্রু ছিলেন না। গঠনের দিকেই ছিল স্বাধীনতা লাভের পূর্বে তাঁরই উদ্যোগে ন্যাশনাল থেকে পরিকল্পনা-সমিতি গঠিত হয়েছিল, সুভাষ চন্দ্র এর সভাপতি হয়েছিলেন তার পরিচালন-ভার। এরূপ পরিকল্পনার কাজে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। আর উদ্যান্ত-পুনর্বাসনের কথাও তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতেন জ্ঞান-সাধক বলে' সমাজ জীবন থেকে তিনি কে বিচ্ছিন্ন রাখেননি। দেশের মঙ্গল চিন্তায় এবং তদনুযায়ী কর্মসাধনায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

পশ্চিমবাংলা-বিহারের মিলন প্রস্তাব

পশ্চিমবাংলা ও বিহারের মিলন প্রস্তাব নিয়ে অনেক রকম বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি হ'য়েছে। কিছু-দিন যাবৎ ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের দাবী নিয়ে সমগ্র ভারতে নানাপ্রকার তীব্রতা ও হিংসাবিদ্বেষের সৃষ্টি হ'য়েছে। মহারাষ্ট্রে বিশেষ করে বোম্বাইতে এবং উড়িষ্যার ইদানীং যা ঘটেছে তাতে দুনিয়ার কাছে ভারতের মর্যাদার হানি হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিদেশের বিভিন্ন কাগজে এ নিয়ে ভারত সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। বিদেশের মতামত ও মর্যাদার চেয়ে বড় কথা হ'ল আমাদের সভ্যতার দুর্বলতার পরিচয়। এ ক'মাস ভাষাগত হিংসাবিদ্বেষের যে পরিচয় আমরা পেয়েছি তাতে ভারতের সংহতি ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমাদের মনে সন্দেহ জাগে। ভারতের ইতিহাসের অতি প্রাচীনকাল হতে ভারতীয় সংস্কৃতিরই একটা পরিচয় আমরা পেয়ে এসেছি। রামায়ণ-মহাভারতের পূর্বের কথা তুলতে চাই না; কিন্তু সেই যুগ থেকে বরাবর দেখছি সমগ্র ভারতে একটা সংস্কৃতি প্রচলিত আছে। বুদ্ধ, মহাবীর, শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, নানক প্রভৃতি সবাই যুগযুগান্তর ভারত পরিক্রম করেছেন; নিজ নিজ ক্ষুদ্র আবেষ্টনে এঁরা নিজেদিগকে আবদ্ধ রাখেন নি; তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল যাতে সমগ্র ভারত তাঁদের বাণী গ্রহণ করে।

আজ ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতির দাবী নানাদিক থেকে উঠছে। পূর্বে সাংস্কৃতিক ঐক্য থাকা সত্ত্বেও রাজনীতিক ঐক্য ছিল না। তার ফলে বার বার আমরা বিদেশীর হাতে মার খেয়েছি। আজ সাংস্কৃতিক বৈসম্যের দাবীর সঙ্গে সঙ্গে আসছে রাজনৈতিক পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্যের দাবী। এটা দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক। সমস্ত জাতিকে আজ যেন একটা বিপ্লবের পেয়ে বসেছে। ঠিক এর মুখেই পশ্চিমবাংলা ও বিহারের দুই মুখ্যমন্ত্রী উভয় প্রদেশের একীকরণের প্রস্তাব করলেন। এঁদের স্বাক্ষরিত ঘোষণাপত্র কতকটা আকস্মিক এবং হয়ত বা চমকপ্রদ। বাংলা ও বিহারের সীমানা নিয়ে উভয় প্রদেশের মধ্যে তীব্র মনোমালিন্য চলছিল। মানভূম ও পূর্ণিয়া অঞ্চলে অনেক অপ্রীতিকর

ঘটনাও এ নিয়ে ঘটে গিয়েছে। তারপর হঠাৎ দুই মুখ্য মন্ত্রীর এ মিলন প্রস্তাবে একটা নূতন আশা সকলের মনে জাগা উচিত। তাঁদের এ প্রস্তাব আকস্মিক বলেই লোকের চিন্তাশক্তিতে একটা আঘাত দেওয়া স্বাভাবিক। ইংরাজীতে তাকে বলে শক ট্রিটমেন্ট। (shock treatment)—একে সেভাবে নেওয়া যেতে পারত। কিন্তু হয়ত প্রস্তাবটার গ্রহণে ও প্রকাশে কিছুটা ত্রুটি ছিল। আবার কিছু রাজনৈতিক দলগত বুদ্ধিও এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। আমাদের মনে হয় ধীরস্থির ভাবে বিচার ক'রে না দেখেই এর বিরুদ্ধে একটা আতঙ্কের মনোভাব সৃষ্টি ক'রে তোলা হচ্ছে।

এ উভয় প্রদেশের মিলন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে সব আপত্তি উঠছে তা প্রধানতঃ ভীতিপ্রসূত। এ দাবী কেউ করবে না যে এ প্রস্তাব একেবারে দ্বিধাহীন মনে গ্রহণ করা যায়; বা এতে বিপদের সম্ভাবনা মোটেই নেই। বিপদের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়; কোন জনসমষ্টির পক্ষেও তা সম্ভব নয়। রাস্তায় বেরুলে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় (accident) মৃত্যুর আশংকা আছে, কারণ এমন দুর্ঘটনা রোজই রাস্তায় ঘটে। ঘরে বসে থাকলেও একেবারে বিপদ থেকে মুক্ত থাকার দাবীও করা যায় না। তা বলে লোকে রাস্তায় যাওয়া বা ঘরে বাস করা বন্ধ করে না। বিপদের সম্মুখীন হওয়া এবং তাকে অতিক্রম করাতেই মানুষের জীবন, ব্যষ্টি-মানুষই হোক আর সমষ্টি-মানুষই হোক। এই মিলন প্রস্তাবের মধ্যে একটু আধটু বিপদের আশংকা যদি থাকেই, তা বলেই তাকে বর্জন করতে হবে—এটাও বুদ্ধিমানের কথা নয়।

আমাদের এটা মনে রাখা উচিত যে পশ্চিমবাংলা ও বিহারের মঙ্গল নির্ভর করে প্রধানতঃ ভারতের সংহতি, স্থায়িত্ব ও উন্নতির উপর। আজ যখন ভারতের সংহতি ও স্থায়িত্বই বিপন্ন, তখন সেদিকে আমাদের প্রথম দৃষ্টি দেওয়া উচিত। অবশ্য এ দাবী আমরা করব না যে বাংলা বা বিহারকে একদম ডুবিয়ে দিয়ে সেই ঐক্য ও সংহতির প্রচেষ্টা করতে হ'বে। কিন্তু এ প্রস্তাবে পশ্চিম বাংলা বা বিহারকে একেবারে ডুবিয়ে দেওয়ার কথা আসছে না। এই দুই প্রদেশেরও মঙ্গল এতে সাধিত হবে এটা মনে করা যায়। আধ্যাত্মিকতার দাবীর যে বিকৃতি চলছে তার গতি ফিরিয়ে দিতে হলে এমনি মিলনের প্রয়োজন আছে; তার পরিচয় পাওয়া গেছে অন্ধ্রসভা কংগ্রেসে।

এখন আমাদের দেখা দরকার এতে পশ্চিম বাংলার লাভ ক্ষতির হিসাবে কি দাঁড়ায়। প্রধান আপত্তিটা উঠছে বিহারের জনসংখ্যাধিক্য নিয়ে। অনেকে আশংকা করছেন যে, বিহারের জনসংখ্যাধিক্যের জন্য বাঙালী ও বাঙলা ভাষার পৃথক অস্তিত্ব লোপ পাবে। আমরা মনে করি, এ আশংকা সম্পূর্ণ অমূলক। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য আজ যে স্তরে উঠেছে তাকে হঠাৎ কেউ দাবিয়ে রাখবে—এ আশংকা করার কোন কারণ নেই। তবে এটাও ঠিক যে কোন ভাষা বা সাহিত্যই চিরস্থায়ী নয়। এককালে ভারতবর্ষে সংস্কৃত ছিল প্রচলিত ভাষা, তারপর পর্যায়ক্রমে পালি, প্রাকৃত ও বিভিন্ন স্থানীয় ভাষার উদ্ভব হল। ৪।৫ শ' বছর পূর্বে বাংলা ভাষার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়না, আবার ৪।৫ শ' বছর পরে এভাষা থাকবেই এরও কোন স্থিরতা নেই। সংস্কৃত, পালি বা প্রাকৃত ভাষায় আজ কেউ কথা বলেনা, কিন্তু ভারতীয় সাহিত্য পড়তে হলে লোকে সংস্কৃত পাঠ করে, বেদ উপনিষদ ছেড়ে দিলেও কালিদাস, ভবভূতি প্রভৃতির কাব্য আজও আমরা পাঠ করি। তেমনি বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে হ'লে পালি সাহিত্যের মাধ্যমেই তা করতে হয়, জৈন দর্শনের আলোচনায় যেতে হলে প্রাকৃত ভাষার আশ্রয় নিতে হয়। যদি কোন দূরভবিষ্যতে লোকের কথ্য ভাষা হিসাবে বাংলা লোপ পায় তাহলেও রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্রের আদর চিরকাল জগতে থাকবে। পূর্বে আমরা বলেছি যে বিহার বাঙলার মিলন

থেকে বাঙলাভাষা লোপ পাবার কোন আশংকা নেই, ইতিহাসের গতিতে দূর অতীতে যেমনি একদিন বাঙলা ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি ইতিহাসের গতিতে সুদূর ভবিষ্যতে বাঙলা ভাষা বা যে কোন ভাষা একদিন লোপ পেতে পারে। সেটা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু এই মিলনে বাংলা ভাষার বিপদের কোন আশংকার কারণ দেখি না।

এক সময় আসাম, বিহার, উড়িষ্যা বাংলা থেকেই শাসিত হত এবং একই শাসনের অধীন ছিল; তা সত্ত্বেও উড়িষ্যা ভাষা বা মাত্র কয়েক লক্ষ লোকের কথিত ও তখনকার দিনে একান্ত অনুন্নত আসামী ভাষাও লোপ পায়নি; বিহারের মৈথিল অঞ্চলে স্বতন্ত্র বাঙলা ভাষা তখন চালু হতে পারেনি, যদিও বাঙলার সাথে তার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য অত্যন্ত উন্নত, তা সত্ত্বেও আমাদের মনে এ আশংকা অত্যন্ত অহেতুক ও নিতান্ত অন্ধ ভয় থেকে সঞ্জাত। অপর দিকে একটু সুস্থভাবে বিচার করলে বাঙালীরা বুঝবে এ মিলনের ভিতর দিয়ে বাঙলা ভাষা প্রসারের সম্ভাবনা বাড়ছে। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা হিসাবে পূর্ণত হয়েছে; কাজেই নিজেদের বৈষয়িক স্বার্থের জন্যেও বাঙালীকে একদিন যেমন ইংরেজী শিখতে হয়েছিল, আজ তেমনি হিন্দী শিখতে হবে। বিহারীদের পক্ষে বাঙলা শেখার কোন বাধ্য-বাধকতা ছিলনা; এই মিলনের ফলে সে বাধ্যবাধকতা তাদের আসবে, কারণ মিলনের একটা সর্ত উভয় ভাষাকেই পরস্পরের অঞ্চলে মোটামুটি শেখাতে হবে এবং যুক্তরাজ্যে দুই ভাষাতেই রাষ্ট্রকার্য সাধিত হবে। কাজেই প্রত্যেক বিহারীকে বাংলা ভাষা শিখতে হবে।

বিহারের ৩,৮৫,০০,০০ অধিবাসী, সাতে ৪ কোটী নয়। অধিবাসীর মধ্যে প্রায় সোয়াকোটী দেড় কোটীর মত লোক মৈথিলভাষী। তাদের ভাষার রূপও বাংলা রূপের মতো। তাদের ভাষার সঙ্গে বাংলার সাদৃশ্য অত্যন্ত নিবিড়। এই সোয়াকোটী বা দেড়কোটী মৈথিলী সহজেই বাংলা শিখতে পারবে এবং শিখবার একটা আগ্রহ তাদের হবে। কারণ তাতে তাদের চাকরী বাকরীর সুবিধে হবে। তা ছাড়া পঞ্চাশ ষাট লক্ষ বাঙালী বিহারের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে আছে। হয়ত ২৫।৩০ লক্ষ লোক হবে যাদের বলা হয় আদিবাসী। এদের মধ্যে সাঁওতালের সংখ্যা খুব কম নয়। সাঁওতাল পরগণার সাঁওতালরা কতকটা দ্বিভাষী; নিজেদের সাঁওতালী ভাষা ব্যতীত বাংলা ভাষাও তারা ব্যবহার করে। মানভূমের যে অংশ বিহারের মধ্যে থাকছে তাতে বাঙলা-ভাষীর সংখ্যাও নিতান্ত কম নয় আর অন্যান্য আদিবাসী যারা আছে তাদেরও অনেকে বাংলা বা উড়িষ্যা ভাষা ব্যবহার করে। সিংভূম ও ধলভূমে অন্তত ১০।১৫ লক্ষ উড়িষ্যা-ভাষী লোক আছে। রাজ্যপুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশের পর পশ্চিম বাংলা ও বিহারের যে সীমা নির্দিষ্ট হয়েছে তাতে পশ্চিমবাংলার লোক সংখ্যা হবে ২,৬৫,০০,০০০ আর বিহারের লোক সংখ্যা হবে ৩,৮৫,০০,০০০ পার্থক্য হচ্ছে এক কোটী বিশ লক্ষের। এর মধ্যে বাংলা ভাষা-ভাষী ও আদিবাসী ও উড়িষ্যা-বাসীর সংখ্যা প্রায় কোটীখানেক হবে, তা ছাড়া মৈথিল-ভাষীর সংখ্যা কম হলেও সোয়া কোটী হবে। তাই সংখ্যার আধিক্যে এতটা ভীত হওয়ার কারণ আছে বলে আমরা মনে করিনা। নিজেদের উপর আস্থা হারিয়েছি বলেই এ সংখ্যার ভীতি আমাদের মনে এত প্রবল হ'য়ে দেখা দিয়েছে।

পশ্চিম বাংলা অথবা ভারতের বাঙালীদের আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা হল উদ্বাস্তু পুনর্বাসন। আজ একটা প্রায় সবাই মেনে নিয়েছে যে পূর্ববাংলা কোন হিন্দুর বাসের পক্ষে অনুকূল হবে না। এখনও পূর্ববাংলায় প্রায় আশী লক্ষ হিন্দু আছে। এরা সবাই চলে আসতে পারবে তা মনে হয় না। কিন্তু যেভাবে তারা আসছে তাতে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থার উপরে বাঙালীর ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করছে। যে কারণেই হোক বাঙলার বাইরে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আজ

পর্যন্ত হতে পারে নি। ভাষাগত ঈর্ষা ও বিদ্বেষ যতদিন জেগে থাকবে ততদিন অন্তত তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হওয়া একান্ত কঠিন। কাজেই অন্তত: এই লক্ষলক্ষ মূলোৎপাটিত হতভাগ্য বাঙালীদের রক্ষার জন্যও যদি বাংলা বিহারের মিলন সহায়ক হয়, তবে তার উপযোগিতা অস্বীকার করা চলেনা। দুঃখের বিষয়, বিরোধীদল এ দিকটা ভালো করে ভেবে দেখছে না। হয়তো তারা বলবে—হবার হ'লে তো এখনও বিহারে এদের একটা ব্যবস্থা হতে পারতো। আমাদের মনে হয় যুক্তরাজ্য হলে একই শাসনাধীনে বর্তমানের অনেক বাধা বা অসুবিধাই অতিক্রম করা যাবে এবং তা যে হবে না—সে পক্ষে অপর পক্ষ কোন যুক্তি দেখায় নি।

বাংলার উন্নয়ন কার্যে এ ক'বছর যে সব অসুবিধা পশ্চিমবাংলা সরকার অনুভব করেছে, তা নিয়ে আমরা এখানে বিশদ আলোচনা করতে চাইনা, কারণ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নানা বিবৃতিতে তার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। প্রতিপক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে একই রাষ্ট্রের অন্তর্গত দুটী প্রদেশের মধ্যে উন্নয়ন কার্যের এসব অসুবিধা থাকা উচিত নয়, উচিত অনুচিতের কথা তুলে লাভ নেই, যা আছে তা নিয়েই আমাদের বিচার করতে হবে। ভাষাভিত্তিক রেষারেষি যতদিন থাকবে, ততদিন বাংলার উন্নয়ন কার্যে বিহারের সহযোগিতা পাওয়া কঠিন হবে, তেমনি বিহারের উন্নয়ন কার্যেও বাংলার সহযোগিতা পাওয়া খুব সহজ হবেনা। মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি অঞ্চলের প্রায় সব নদীরই উৎপত্তি বিহারে। এ ক'বছরের অভিজ্ঞতা থেকে ডাঃ রায় বলছেন বিহারের সহযোগিতা না পেলে ঐসব নদী-উপত্যকার উন্নয়ন-কাজ অত্যন্ত কঠিন হবে এবং প্রতিপদেই তিনি তা নিয়ে অসুবিধে ভোগ করেছেন। শুধু তাই নয়, বিহারের অন্তর্গত যে সব অঞ্চলে ঐ নদীর উৎপত্তিস্থল, এবং যেখানে বহুসংখ্যক বাঙালী ও আদিবাসীর বাস, তার উন্নয়ন কার্যে বিহার সরকার মনোযোগী হয়নি এবং না হওয়ার একটা প্রধান কারণ এই ভাষাভিত্তিক বিদ্বেষ। অথচ পশ্চিমবাংলা ও বিহারের সীমানার নিকটবর্তী ঐ সব অঞ্চল ভারতের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদে সবচেয়ে ধনী। এইসব অঞ্চলের দ্রুত উন্নতি সাধিত হ'লে বাংলারও মঙ্গল, বিহারেরও মঙ্গল এবং সমস্ত ভারতবর্ষের মঙ্গল। এই বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য মামুলি ভয় থেকে আমাদের মনকে মুক্ত রাখা উচিত।

পশ্চিমবাঙলা ও বিহারের মিলন হ'লে আশা করা যায় অদূরভবিষ্যতে উড়িষ্যা তার সঙ্গে যোগ দেবে। ভাষা দাবী প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলে উৎকলবাসী আজ অত্যন্ত বিচলিত; সুস্থ মনোভাব আজো তাদের ফিরে আসে নি। তাই উড়িষ্যা সম্বন্ধে জোর করে কেউ কিছু বলতে সাহস করছে না, কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মেই উৎকলবাসীদের মনে এই মিলিত রাজ্যে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা জাগা স্বাভাবিক।

পরস্পরের ভুল বোঝাবুঝির পালা যত শীঘ্র শেষ হয় ততই ভালো। বিহারে বাঙালী অনেক সময়ে ভালো ব্যবহার পায় নি এও যেমন সত্য, তেমনি বাংলার বাইরে বাঙালী অনেক সময়ে আত্মাভিমানের বশে অপরকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে, এও সত্য। পুরোনো ইতিহাস ঘাঁটতে গেলে উভয় পক্ষ থেকেই অপ্রীতিকর কথা উঠবে। সে সব ব্যাপার ছেড়ে দিয়ে জাতীয় জীবনে নতুন অধ্যায় রচনা সম্ভব কিনা চিন্তা করা উচিত।

বিহার থেকে মিলন প্রস্তাবকে মোটামুটিভাবে অভিনন্দিত করা হয়েছে। এ মিলিত রাজ্যের রাজধানী কলকাতা হবে—এটা বিহারীরা স্বীকার করেছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এ মিলিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হবেন তাও তারা সম্ভবতঃ মেনে নিচ্ছে। কলকাতা রাজধানী হলে বাঙালীদের আশংকার কারণ একটু কম ঘটবে,—এও আশা করা যায়। এই সমস্ত বিষয় বাঙালীদের আজ বিচার করা প্রয়োজন।

তার ফলে বাঙালীর আর্থিক ও ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা অনেক বাড়বে। উভয় প্রদেশের

কতকটা স্বাতন্ত্র্য অন্ততঃ প্রথম অবস্থায় বজায় রাখার প্রয়োজন আছে,—তা সবাই স্বীকার করে। ডাঃ রায় তাঁর বিবৃতিতে অনেকগুলো শর্তের উল্লেখ করেছেন যাতে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধ অনেকটা বজায় থাকে। আস্তে আস্তে হয়তো উভয়াঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে আস্থা ও মৈত্রীর বন্ধন স্থাপিত হবে; তখন ঐসব শর্তের কাঠিন্য অনেকখানি হ্রাস করা যাবে। বিহারে কয়েক লক্ষ বাঙালীর বাস; এই মিলনের ফলে তাদেরও অনেক সুবিধা হবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার বাড়বে এটা প্রায় নিশ্চিত। অবশ্য, বিহার ও বাংলার একের উপর অন্যের অধিপত্য করার মনোভাব থেকে এ মিলনের সমর্থন আমরা করি না। আমাদের মূল কথা হল, সমগ্র ভারতের মঙ্গলের জন্য, তথা বাংলা ও বিহারের কল্যাণের জন্য এ সংযুক্তির সার্থকতা থাকে, তবে তাত্ত্বিকভাবে এ মিলন প্রস্তাবকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা ঠিক নয়। জীবনের পরীক্ষায় সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। সতর্কতার জন্য যে সব রক্ষাকবচ দরকার তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা চলতে পারে। এই মিলিত রাজ্য প্রাকৃতিক সম্পদে ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে ধনী হবে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ উদ্যোগ (industry) এই অঞ্চলেই স্থাপিত থাকবে।

আমরা এই প্রস্তাব মূলত সমর্থন করি, অবশ্য কিছু শর্তসাপেক্ষে। বিরোধী দল এই প্রস্তাবে রাজনৈতিক সুযোগ গ্রহণ করছে। এই বিষয়ে জনসাধারণের সতর্ক থাকা দরকার। অপরদিকে কর্তৃপক্ষেরও কতকগুলো ত্রুটি আমাদের চোখে পড়ছে। পশ্চিমবাংলা ও বিহারের দুই মুখ্যমন্ত্রী হঠাৎ দিল্লী বসে এক যুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে যেন সেটাকেই চরম সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করার মনোভাব দেখাচ্ছেন। আজ পর্যন্তও এই প্রস্তাবটাকে জনসাধারণের নিকট ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়াস হয়নি। ডাঃ রায় একবার একটা বিবৃতিতে কতকগুলো শর্তের উল্লেখ করে এ প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের পক্ষে এটা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। আজ পর্যন্তও আমরা সঠিক জানিনা যে, দুই প্রদেশের মিলন হলে তার সীমানা কি হবে। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশের উপর কেন্দ্রীয় সরকার বিহার ও বাংলার সীমানা সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সেই নির্ধারিত সীমানা নিয়ে দুই প্রদেশের মিলন হবে কিনা এটাও আজ পর্যন্ত পরিষ্কার বলা হয়নি। অথচ ইতিমধ্যেই কথা উঠেছে যে উভয় রাজ্যই যে কোন সময়ে এ মিলনের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে। এই রকম মনোভাব নিয়ে মিলনের আমরা খুব পক্ষপাতী নই, কিন্তু যদি আবার কোন দিন আলাদা হওয়ার অবস্থা আসে তাহলে পশ্চিমবাংলা আজ যেটুকু জমি পাচ্ছিল তা থেকেও যাতে ভবিষ্যতে বঞ্চিত না হয় তার ব্যবস্থা রাখা দরকার। বর্তমানের সীমানা নিয়েই দুই রাজ্য মিলিত হলে ঐ আশংকা থেকে যায়—যদি কোন দিন আবার বিচ্ছেদ ঘটে। এ মিলন প্রস্তাবের পক্ষে এটা অত্যন্ত বিশেষগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

তাছাড়া এতদিনের মধ্যে পশ্চিমবাংলা সরকার বা কংগ্রেসের তরফ থেকে এ প্রস্তাবের পক্ষে তেমন কোন প্রচারকার্য চালানো হয় নি। এতবড় একটা জিনিষ শুধু দুই প্রদেশের দুই মুখ্যমন্ত্রীর স্বাক্ষরিত বিবৃতির উপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বিরোধী দল সম্মিলিতভাবে এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারকার্য চালাচ্ছে আর অপরদিকে এই প্রস্তাবের পক্ষে আজ পর্যন্ত বিশেষ কোন প্রচার কার্যই হয় নি। লোকের মনে কতকগুলো সন্দেহ ও প্রশ্ন স্বভাবতই জাগছে। বিরোধীদলের প্রচারের ফলে তা আরো বেড়ে তীব্র বিরোধিতার আকার নিচ্ছে। একদিকে সুস্থভাবে বিচারের বিরুদ্ধেই মনোভাব গড়ে তোলার চেষ্টা;—অপরদিকে সুস্থভাবে বিচার করার অনুকূল আবেষ্টন সৃষ্টির কোনো চেষ্টা আমরা দেখতে পাই না। এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনমত গঠন করার বিশেষ দরকার আছে। বিরোধীদল দেখছে কংগ্রেসকে একটা ঘা দেওয়ার

সুযোগ এসেছে; অপরপক্ষে কংগ্রেসের যতখানি সক্রিয় হওয়া উচিত ছিল—তা সে হচ্ছে না। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। তা হলে কি ধরে নিতে হবে, মিলনের ফলাফল সম্বন্ধে বিরুদ্ধ পক্ষের যেমন বাস্তবের চিন্তার অভাব, কংগ্রেসের মনেও তেমনি স্পষ্ট ধারণা ও বিশ্বাসের অভাব?

জীবনবীমা রাষ্ট্রায়ত্তকরণ

জীবনবীমা কার্যতঃ ভারতের একটি নূতন উদ্যোগ (industry)। প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে এ শতাব্দীর প্রথম দশকে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে জাতীয় জীবনবীমা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়। বিদেশী সরকার এই প্রচেষ্টার প্রতি খুব খুশী ছিল না, তবু স্বদেশীত্বের গতি আনুগত্যের জন্য এ উদ্যোগ অনেকটা সহায়তা প্রাপ্ত হয়। তারপর গত দুইটা মহাযুদ্ধে স্বদেশী জীবনবীমা প্রতিষ্ঠার রাস্তা অনেকটা সুগম হয়। মোটের উপর বলা যায় এখন পর্যন্ত জীবনবীমা আমাদের দেশে একটা শিশু প্রতিষ্ঠান। তবু গত কয়েক বছরে এর অনেক উন্নতি সাধিত হ'য়েছে। এখনও পর্যন্ত ভারতে মোটের উপর মাথাপিছু জীবনবীমার পরিমাণ মাত্র পঁচিশ টাকা। ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সমগ্র জনসংখ্যার হিসাবে মাথাপিছু জীবনবীমার পরিমাণ সাতহাজার টাকা। এখন ভারতে মোটের উপর পঞ্চাশ লক্ষ জীবনবীমা প্রচলিত আছে। এই সমস্ত জীবন বীমার বার্ষিক প্রিমিয়াম প্রায় পঞ্চাশ কোটী টাকা। সমস্ত জীবনবীমার সঞ্চিত মূল টাকার পরিমাণ প্রায় তিনশো পঁচাত্তর কোটী টাকা। কাজেই এই উদ্যোগ (industry) যতই আধুনিক বা অনুন্নত হোক, এর মাধ্যমে টাকার লেনদেন যা হয় তার পরিমাণ মোটের উপর কম নয়।

সম্প্রতি সরকার জীবনবীমা রাষ্ট্রায়ত্ত করার সংকল্প গ্রহণ করেছে এবং সেই উদ্দেশ্যে গত ১৯শে জানুয়ারী একটি অর্ডিন্যান্স ঘোষণা ক'রে সমস্ত জীবনবীমা কোম্পানী সমূহের উপর সরকার নিজেদের নিয়োজিত পরিচালক বসিয়েছে। এর পর পার্লামেণ্টে আইন পাশ ক'রে জীবনবীমা রাষ্ট্রীয় আয়ত্তে আনা হবে। প্রতি বছর এ সমস্ত জীবনবীমা কোম্পানীর বারো কোটী টাকা নীট মুনাফা হয়। তা ছাড়া কোম্পানীর কর্মকর্তাগণ লম্বা লম্বা বেতন নিয়ে থাকে। এ ভিন্ন এসব কোম্পানীর তহবিল থেকে টাকা অপব্যয়ের দৃষ্টান্তও এর মধ্যে অনেকগুলো এসেছে। সম্প্রতি ভারত ইন্সিওরেন্সের দু'কোটী টাকা তহবিল তছরূপের অভিযোগে একজন ধনীকে গ্রেপ্তার করা হ'য়েছে। আরো আট দশটী কোম্পানীর উপর অনেকদিন পূর্বেই সরকারী পরিচালক বসানো হ'য়েছে। জীবনবীমা কোম্পানী ঠিক ভাবে পরিচালনা করলে খুব সহজে নষ্ট হ'তে পারেনা। অথচ গত দশ বছরে পঁচিশটি জীবনবীমা কোম্পানী লিকুইডেশনে (liquidation) গিয়েছে এবং আরো পঁচিশটি কোম্পানীর টাকা এমন ভাবে নষ্ট করা হ'য়েছে যে জীবনবীমাকারী ব্যক্তিদের দাবীর পরিমাণ কমিয়ে অন্য কোম্পানীর সঙ্গে তাদের মিলিয়ে দিতে হ'য়েছে। জীবনবীমা কোম্পানীর মূলধনের পরিমাণ খুবই সামান্য; কিন্তু জীবনবীমাকারী ব্যক্তিদের দেয় টাকা তাদের হাতে যা জমা থাকে তার পরিমাণ বিরাট। তাই পরের ধনে পোদ্দারী করার সুযোগ জীবনবীমা কোম্পানী কর্তৃপক্ষের প্রচুর থাকে। টাকা যা মারা যায় তা প্রধানতঃ এই পঞ্চাশ লক্ষ বীমাকারী লোকের।

ব্যাঙ্ক ও জীবনবীমা জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে। এদের বলা হয় ক্রেডিট সংস্থা (credit institutions)। লক্ষ লক্ষ নাগরিকের জমানো টাকা এদের হাতে থাকে এই টাকার সদ্ব্যবহারের দিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তাছাড়া একটু চেষ্টা করলেই জীবনবীমার টাকা আরো অনেক বাড়ানো যায়। বর্তমানে এক হাজার কোটী টাকার জীবনবীমা চালু আছে জনসংখ্যার তুলনায় মাথাপিছু মাত্র পঁচিশ টাকার বীমা আছে। একটু চেষ্টা করলেই এই উত্তর সংখ্যাকে আটগুণ বাড়ানো যায়;—একথা জীবনবীমা কোম্পানী

সমূহের কর্তাব্যক্তি স্বীকার করেছে। কিন্তু বেসরকারী কর্তৃত্বে থাকলে এ উন্নতি যে কতদিনে হবে, তা বলা কঠিন। অথচ জাতীয় উন্নয়ন কাজের জন্য আজ আমাদের টাকার প্রয়োজন আছে এবং সেজন্য নানা ক্ষেত্রে লোকের সঞ্চয় বাড়াবার চেষ্টার প্রয়োজন। বে-সরকারী কর্তৃত্বে একাজ সুষ্ঠুভাবে হবে সে ভরসা করাও যেমন কঠিন, তেমনি টাকা জমা হলেও তার সুপ্রয়োগ তা আশা করা আরো কঠিন। বাংলাদেশে একটার পর একটা বহু ব্যাঙ্ক ফেল প'ড়ে মধ্যবিত্ত জনসাধারণের প্রায় তিন কোটী টাকা নষ্ট হ'য়েছে। জীবনবীমা কোম্পানীর কাহিনীও বাংলাদেশে খুব উৎসাহজনক নয়। দু'একটা কোম্পানী ছাড়া আর কোনটা সম্বন্ধেই খুব জোর করে কিছু বলবার নেই। তাই সরকারের এই সংকল্প বিশেষ সময়োপযোগী হ'য়েছে বলেই আমরা মনে করি।

এ সম্বন্ধে বহুদিন হ'রেই আলাপ আলোচনা চলছিল। জীবন বীমা কোম্পানীসমূহের কর্তৃপক্ষ একদিকে যেমন তীব্র আপত্তি জানাচ্ছিল, অপরদিকে কোম্পানীসমূহের কর্মচারীবৃন্দ এ প্রস্তাবে আনন্দ জানিয়েছিল। পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission) এবিষয়ে আলোচনা করে এ প্রস্তাব সমর্থন করেছেন। সরকারী এ প্রস্তাবের পেছনে তিনটি কারণ আছে।

১) বহু বীমা কোম্পানীর কার্যকলাপে গলতি ধরা পড়েছে। কোম্পানী সমূহের কর্তাদের খেয়াল খুসীমত টাকার বহু অপব্যবহার হ'য়েছে এবং জীবনবীমাকারী লোকদের অর্থ তাতে নষ্ট হয়েছে। অর্থ মন্ত্রী শ্রীদেশমুখ তাঁর বেতার ভাষণে বলেছেন যে বীমা রাষ্ট্রীয়করণের একটা বিশেষ কারণ হ'ল ক্ষমতা ও অর্থের অপব্যবহার বন্ধ করা। তিনি মনে করেন বর্তমান ব্যবস্থায় এমনি অপব্যবহারের বহু সুযোগ আছে এবং থাকবেও।

(২) বর্তমানে যে পরিমাণ জীবন বীমা হয়, অদূর-ভবিষ্যতে তাকে বিশেষভাবে বাড়িয়ে তোলা বর্তমান ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। দেশের প্রতিটি অঞ্চলে এবং আপামর জনসাধারণের মধ্যে জীবন বীমার উপকারিতার কথা প্রচার করে বীমার সংখ্যা বাড়ানো সরকারের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। দেশের জনসাধারণ যখন বুঝবে যে তাদের জীবন বীমার ফলে কোন ব্যক্তি বিশেষের মোটা মাইনে বাড়ছে না বরং তাতে তাদের পরিবারের ও জাতির মঙ্গল সাধিত হচ্ছে, তখন তারা বিনা দ্বিধায় ও নিঃসঙ্কোচে জীবন বীমায় আত্মনিয়োগ করবে।

(৩) জীবন বীমার যে টাকা সঞ্চিত হয় বা ভবিষ্যতে হবে তাকে জাতির উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত করা দরকার। পাঁচশালা পরিকল্পনায় উন্নয়ন কাজের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ যাতে কোন প্রকারে নষ্ট না হতে পারে, তা দেখা সরকারের পক্ষে বিশেষ দরকার। পূর্বেই বলেছি যে অনেক কোম্পানীতে সঞ্চিত টাকা অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়েছে। কাজেই এ টাকার সুষ্ঠু প্রয়োগের জন্যও জীবনবীমা রাষ্ট্রীয় আয়ত্তে আনা দরকার।

ইতিমধ্যেই প্রিমিয়ামের টাকা ফিরিয়ে দেবার নির্দেশ সরকার থেকে দিয়েছে। কর্মচারীদেরও বলা হ'য়েছে তাদের স্বার্থ যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে সরকারী দৃষ্টি থাকবে। ব্যাঙ্কের ব্যাপারে যেমন আমানতকারীদের স্বার্থই সর্বোপরি, জীবনবীমা কোম্পানীতে তেমনি বীমাকারীদের স্বার্থই সর্বোপরি। তাদের টাকা যাতে কোন প্রকারে নষ্ট না হতে পারে সে আশ্বাস সরকার দিয়েছেন। ভবিষ্যত বীমাকারীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে—বেসরকারী ব্যক্তিগত কর্তৃত্বে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান ফেল পড়তে পারে এবং তাতে তাদের টাকা নষ্ট হতে পারে কিন্তু সরকার কোন-দিন ফেল পড়ে না; তাই বীমাকারীদের অর্থহানি হবার কোনো আশঙ্কা নেই। মাত্র কয়েকমাস পূর্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্তে আনা হ'য়েছে; কোম্পানী আইনের সংস্কারসাধন করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থ যাতে কেউ অপচয় করতে না পারে বা তা থেকে যাতে কেউ অত্যধিক মুনাফা শিকার করতে না পারে, তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন জীবন বীমা রাষ্ট্রীয়করণ করা হল। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে দেশ ও জাতিকে গড়ে তোলার পক্ষে এ আর একটি পদক্ষেপ। আমরা আশা করি জীবন বীমার সংখ্যা ও পরিমাণ এখন দ্রুত বেড়ে যাবে।

শ্রীগুরুস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'অগ্নিবীণা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

মন্দিরা

অষ্টাদশ বর্ষ | চৈত্র—১৩৬২ | দ্বাদশ সংখ্যা

স্মৃতি-কথা

(ছাত্রজীবন)

শ্রীকালিদাস রায়

অশিক্ষা, কুসংস্কার, অসংযম, অমিতব্যয়িতা, অবিবেচনা, অদূরদর্শিতা ইত্যাদির জন্যই সেকালের লোকের এত দুঃখদারিদ্র্য তাহা বালককালেই বুঝতে পারতাম। বাল্যকালে গ্রামে একটি বেশ বড় কোঠা বাড়ী দেখেছিলাম। বাড়ীটি ভগ্নদশায়, মেরামতের অভাবে ভেঙে পড়ছিল—এর গায়ে ও ছাদে অশ্বত্থ বটের গাছ উঠেছিল এবং নানাবিধ লতাগুল্মে তা বেষ্টিত ছিল। তার চারিপাশে অনেক ভাঙা প্রাচীর ও ইষ্টকস্তূপ। নিকটবর্তী স্থানে পাকা পাঁচিরের উপরে ছাওয়া খড়ের চালের ঘরে কেউ কেউ বাস করত।

কাকার কাছে শুনেছিলাম—ওটা ছিল জমিদার বাড়ি—। নানাবিধ অনাচার, অত্যাচার, অমিতব্যয়, মামলা মোকদ্দমা ইত্যাদিতে জমিদার বংশ ধ্বংস পেয়েছে। ঐ জমিদার বাড়ি ছাড়া আরো একটি জমিদারপরিবার গ্রামে ছিল। দুই পরিবারের মধ্যে প্রতিযোগিতা, দেখা-দেখি ও মামলা মোকদ্দমায় দুই পরিবারই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিল। প্রথম জমিদার পরিবারের এক অন্ধ বংশ-ধর গ্রামেই অতি দরিদ্র জীবন যাপন করত।

এদেরই আচরণের ধারা গ্রামে অনুসৃত ও সংক্রামিত হয়েছিল ফলে একাধিক সঙ্গতিপন্ন পরিবার দুর্দ্দশাগ্রস্ত অথবা বিধ্বস্ত হয়েছে। বাবার মুখে শুনতাম গ্রামের বহু পরিবারের অবস্থা বেশ ভালোই ছিল। আমি কিন্তু বাল্য কালে গ্রামে কোন সঙ্গতিপন্ন লোক দেখিনি। শুধু ইষ্টকালয়ের চিহ্ন কোন কোন বাড়ীতে দেখেছিলাম।

কোন কোন পরিবারের কুটুম্বিতা ছিল স্থানান্তরের সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারের সঙ্গে। কিন্তু এদের তাতে কোন আর্থিক উন্নতি হ'য়নি। বোধ হয় অশিক্ষিত ও দরিদ্র হওয়ার জন্য এরা কুটুম্বদের কাছে অনাদৃত ছিল।

গ্রামে একটি ব্রাঞ্চ পোষ্টাপিস বহুকাল হতেই ছিল —বোধ হয় গ্রামখানি বড় ব'লে একটা পোষ্টাপিস হয়েছিল। গ্রামে এম-ভি (M.V.) স্কুল একটি ছিল। কিন্তু তার নিজের একটা আস্তানা ছিল না, কোন-না-কোন লোকের বৈঠকখানায় স্কুল বসত। আমার গ্রামত্যাগের এক বৎসর আগে এ স্কুল নিজের চালাঘরে এম-ই স্কুলরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে, মাত্র একবৎসর আমি গ্রামে ইংরাজি পড়বার সুবিধা পেয়েছিলাম।

গ্রামে অনেকগুলি দেবমন্দির এবং দুইটি বৃহৎ পুষ্করিণীর বাঁধাঘাট অতীত সমৃদ্ধিসম্পন্নতার সূচনা করত। দেবমন্দিরগুলির কোন-কোনটি ভগ্ন দশায়। একটি বৈষ্ণববংশের নাট-মন্দির সহ দেবমন্দির বেশ সুস্থ সবল ছিল। বহু গ্রামের গোপগণ একে বাঁচিয়ে রেখেছিল। কারণ, ঐ বৈষ্ণববংশের আটটি পরিবারেরই বৃত্তি ছিল আমাদের অঞ্চলের সকল গোপ পরিবারের গুরুগিরি। এই পরিবারগুলির কোন দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল না, গোপগণের গুরুগিরি ছাড়া অন্য কোন বৃত্তি ছিলনা। গোপগণই রাধাগোবিন্দের নিত্য ভোগ যোগাত। এ পরিবারের প্রবীণ লোকেরা খুব কীর্তন-সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

গ্রামের অধিকাংশ লোকেরই কোন কাজ ছিল না। সামান্য জমিজমাগুলা সকলেরই ছিল। সেই জমি ভাগে দিয়ে তারা যে সামান্য ধান পেত, তাতে কি করে ঐসকল পরিবারের চলত ভেবে বিস্মিত হতাম। কয়েকটি পরিবার জনমুনিষ রেখে চাষ করত—এভাবে চাষ করা ছিল ব্যয়সাধ্য। যারা নিজেরাই চাষ চালাত, তারা অবশ্য চাষের তত্ত্বাবধানের কাজই করত—উচ্চ জাতির লোক হলেও দুর্বৃগৃহস্থ পুরুষ মুনিষদের সঙ্গেই চাষে খাটত, কেবল লাঙ্গলের বোঁটাটা ধরত না।

আশ্চর্য্যের, নিয়ত জীবিকার কোন সংস্থান না থাকলেও, দারুণ অর্থাভাব থাকলেও কারও পুত্র অবিবাহিত থাকত না। জীব যে দিয়েছে আহারও সেই দেবে—এই যুক্তির উপর সকলেই নির্ভর করত। কেবল তাই নয় —সন্তানসন্ততি থাকলেও পঞ্চাশ বৎসর বয়সের পরও অতিদরিদ্র মৃতদার ব্যক্তিরাও একাদশী বাদশী বালিকাকে কৌমার্য্যদায় থেকে মুক্তি দিত।

যার শুধু কন্যাসন্তান আছে, অথবা কোন সন্তান নেই তার যুক্তি ছিল—বংশরক্ষা। ইহলোকে পিণ্ডের অভাব থাকতে পারে, পরলোকেও পিণ্ডের অভাব হ'লে চলবে কেন? আর যার পুত্রকন্যা থাকত তার যুক্তি অন্নজলের সংস্থান ও গৃহরক্ষা। বলা বাহুল্য, অল্প দিনের মধ্যেই হতভাগিনীরা বিধবা হ'ত দুই একটা কচি কাঁচা কোলে। এইভাবে চির দারিদ্র্যের ধারা বহমান থাকত।

ব্যাধিগ্রস্ত যুবকদেরও বিবাহ হত। এদের অনেকের বিবাহ গ্রামেই হত। সব খবর জেনেশুনেই দরিদ্রতর গৃহস্থ এদের কন্যাদান করত। কন্যাকে ত বিদায় করতেই হবে, তাই গঙ্গাযাত্রীর হাতেও তাকে সম্প্রদান করা হত!

গ্রামে যক্ষ্মা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখেছি—কোন কোন পরিবার এই রোগে নির্মূল হয়ে গিয়েছে। যক্ষ্মা রোগের সংক্রামকতা বা সাংঘাতিকতা সম্বন্ধে কারও জ্ঞান ছিলনা। আমার নিজেরও ছিলনা। যক্ষ্মারোগী পাড়ার সকল বৈঠকখানায় বসে শ্লেষ্মাযুক্ত নিষ্ঠিবন ত্যাগ করত। নিমন্ত্রিতের পংক্তিতেও বসে ভোজ খেত, সকল উৎসব আমোদে যথাসাধ্য যোগ দিত এইভাবে রোগের বীজাণু গ্রামময় ছড়াত। কুষ্ঠরোগীরাও এইভাবে চলা ফেরা করত।

গ্রামে সুচিকিৎসার বালাই ছিলনা। এম-বি ডাক্তার দূরে থাক, সাব এসিষ্টাণ্ট সার্জনও ছিলনা। কোন ডিস্‌পেনসারিতে যে কিছুকাল কম্‌পাউণ্ডারি করেছে সেই চিকিৎসক হয়ে পড়ত। তাকে বলা হত ডাক্তার। আর কবিরাজের পুত্র হ'লেই তাকে বলা হ'ত—কবিরাজ। ফলে, গ্রামে কেবল কলেরায় নয়, বহু রোগেই অকাল মৃত্যুর সংখ্যা ছিল খুব বেশী।

লোকে যে জীবিকার সংস্থান না থাকলেও কোন মতে সংসার চালাতে পারত, তার একটা কারণ সন্তানসন্ততির মুখে বেশী দিন অন্ন যোগাতে হ'ত না। এক এক জনের একাধিক পক্ষে সন্তান কম জন্মাত না—কিন্তু দুই একটির বেশি বাঁচত না। সূতিকাগার হ'ত একটি অস্থায়ী চালার, হাড়ীদাত্রী করাত প্রসব, সূতিকাগারে কাঠের আগুন জ্বালানো হত। সে চালা ঘরে ধোঁয়ার প্রাচুর্য্য অয়জান বায়ুকে অবরুদ্ধ করত। সেপটিক সম্বন্ধে কারও জ্ঞান ছিল না। কাজেই সূতিকাগারেই অধিকাংশ মরত। আর প্রসূতিকে মৃতবৎসা

দুর্নাম দেওয়া হত। হতভাগিনী দেবতাকে মানত মানসিক করত। কত উপবাস করত, আর নানাবিধ কবচ মাদুলী ধারণ করত।

পরবর্তী জীবনে এদের কথা স্মরণ করে মৃতবৎসার উপর একটা কবিতা লিখেছিলাম। কবিতাটার নাম —গঙ্গার প্রতি মৃতবৎসা।

একে একে গর্ভে ধরে বিষম ব্যথায় প্রসব ক'রে
গঙ্গা মাগো তোর ও ক্রোড়ে একে একে দিলাম বিসর্জন।
নিঠুর হয়ে আপন ছেলে দিয়ে নদীর গর্ভে ফেলে
পরের ছেলে ছিনিয়ে নেওয়াও হলো মা তোর রীতি চিরন্তন।

ভূলোক হতে স্বর্গপথে তরঙ্গ তোর বিমান রথে
তুরঙ্গমের মতোই নিতি কতজনে যাচ্ছে বয়ে নিয়ে।
পথের মত এ জীবন হায় কোথায় থেকে কোথায় নে'যায়
আসা যাওয়া করেন কারা জানিনা এ জীবন পথটি দিয়ে।
তাই যদি, এ বক্ষে কেন দিলি স্নেহের পীযূষ হেন?
দেহের ব্যথা সইতে পারি স্নেহের ব্যথা কেমন ক'রে সই?
একটি কথা বলে না কেউ যেন তারা তোর জলটেউ
শূন্য বালু বেলার মত আমি হেথায় একলা প'ড়ে রই।
নগরভরা কলোৎসবে আমার গৃহই রয় নীরবে
পাররাগুলার গুমরানিতে ভিতর বাহির ওরছে হাহাকারে।
কিসের লাগি সন্ধ্যা আলা কাহার লাগি পর্ব্বশালা
ভূতের বেগার খেটে মরি মিছে শুধু ভূতেরই সংসারে।
মিছে ঠাকুরের দোর ভাবিয়ে মাসী-পিসীর বাড়ী গিয়ে
প্রসব ক'রে কি ফল হ'ল? ঠাঁই বদলে কি গুণ বল আছে?
জন্মে যারা বন বাদাড়ে গাছতলে বা পুকুর ধারে
তারাও বাঁচে, এত ক'রেও আমার বাছা একটিও না বাঁচে।
হয়না চিকিৎসারো ত্রুটী খেলাম কতই ওষুধ ঘুঁটি,
বদ্যি ওঝা পাণ্ডা পুরুত দিল সবাই যার যা ছিল পুঁজি।
যাগযজ্ঞ স্বস্ত্যয়নে কি ফল ব্রত উদ্‌যাপনে?
অভাগিনীর কান্নারোলে দেবতাগুলো বধির হ'লো বুঝি।
বাঁচল কিসে কাহার ছেলে জেনে নানান নিয়ম পেলে
তোমার জলে অঞ্জ ঢেলে রক্ত দিলাম বক্ষ করে ক্ষত,
এ গায়ে কি গয়না সাজে? মাদুলিতে ওরল তা যে,
চৌদ্দ ক্রোশও রৌদ্রে হেঁটে দেব দেউলে ধর্ণা দিলাম কত।
সাধু ফকির গণক গুণী হাড়ী ডোমও বা কয় শুনি
আঁতুড়ঘরেই পরকে বেটি নাম রাখি তাই পাঁচকড়ি কি খুদু,
শুধাই মা বল কি তুচ্ছ আছে কিসে আমার একটি বাঁচে
হোকনা কালো খাঁদা খোঁড়া হোকনা মেয়ে বাঁচুক আমার শুধু।

প্রথমবারে খেলাম যে সাধ পরের বারে ছিলাম তা হায়,
নবম মাসে সইল বলে দশম মাসেই সইল তবু কই?
বেটা ছেলে সয় না বলে ভেবেছিলাম মেয়ে হলে
বাঁচবে বুঝি, প্রতিবারই উল্টা পেলে বৃথা আশায় রই।
একটি বাছার জন্য সাধি শুধু কি আর আমরা কাঁদি?
শ্বশুরকুলে পিতৃপুরুষ পিতৃলোকে ফেলছেন আঁখি নীর।
চান তাঁরা হায় দীননয়নে আর্ত্তআশায় মর্ত্তপানে
দুদিন পরে তাঁদের ঘরে বাজবেনা ত শঙ্খ আরতির।
আমার চেয়ে বাঁজাও সুখী, পুষেনা সে এমুক বুকি
দেয়নি বিধাতা পেটেধরে বছর বছর এমন সোনার চাঁদে।
সইনু সকল জননীর দুখ পেলাম না মা মা হওয়ার সুখ
স্বপনে সব চাঁদপারা মুখ আমায় হেরি ওরা ওরা কাঁদে।
একে একে সাতটি ছেলে দিলি জলের গর্ভে ফেলে
চিরদিনের মতন গেলি একটিকে-ও রেখে পতির কাছে।
তেমনি একটি বাছায় রেখে যেতে রাজী বিশ্ব থেকে
অভাগিনীর জীবন নিয়ে ঐটি যদি পতির কোলে বাঁচে।

মদ্যপানের কথা আগেই বলেছি। কেউ কেউ এতবেশী সুরাসক্ত ছিল যে তার স্ত্রীকে পুত্রকন্যাসহ পিতৃগৃহে আশ্রয় নিতে হ'ত। ঘরে চুরি করে মদ চোলাই করার জন্য কোন কোন সুরাসক্তকে ধরা পড়তে শুনতাম। সুরাসক্ত ব্যক্তির জাত্যাভিমান, তাকে নীচসংসর্গ থেকে রক্ষা করতে পারত না। সুরাসক্তি ছিল বহু পরিবারের দারিদ্র্যের কারণ। ভদ্রবাড়ির পুরুষ শুঁড়িবাড়ী হতে মদখেয়ে টলতে টলতে চলেছে এদৃশ্য এখনো মনে পড়ে। অনেক যুবকের একটা কি কুৎসিত রোগ হ'ত। সে রোগ যে কি তা তখন বুঝতাম না। এখন দেখি—ঐ রোগের

সেই শুধু ভোগ করে না—বংশধররাও তার কুফল ভোগ করছে।

মাতৃশ্রাদ্ধ, দুর্গোৎসব এইরূপ কোন কোন অনুষ্ঠান ঘটা করে সম্পাদন ক'রে জমি মহাজন দিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়েছে এমন লোকও দেখেছি—পরে সেই ঋণের ফলে সর্বস্বান্ত হয়েছে।

বিদেশে গিয়ে কেউ কেউ নানাভাবে—অর্থার্জন ক'রে ফিরত। তাদের উচিত ছিল গ্রামের লোকের হিংসা থেকে আত্মরক্ষার জন্য উপার্জিত অর্থের পরিমাণ গোপন করা, তা না করে—তারা গ্রামে এসে দুই হাতে ব্যয় করত, নিজেদের মানমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। তার ফলে লোকের হিংসার উপদ্রবে তাদের দারিদ্র্য ঘটত।

• • • •

আমার বয়স যখন এগারো বৎসর তখন বাবার হঠাৎ খেয়াল হ'ল—আমাকে আর গাঁয়ের ইস্কুলে ফেলে রাখা চলে না। হেমন্তকালের একদিন বাবার বড় ভাগ্নে—বিনোদ দাদা এসে হাজির আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। একেবারে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। আমিত কান্না জুড়ে দিলাম—আমি বলে দিলাম বিনোদ দাদাকে আমি এখান হতে মাইনার পাশ না ক'রে যাব না—আমার শিক্ষকরা আমাকে সমর্থন করলেন। কিন্তু বিনোদ দাদার হাত ছিল না। তিনি বললেন—বড় মামার হুকুম আমি মানতে বাধ্য।

আমাকে যেতেই হ'ল কাঁদতে কাঁদতে দিদীমা, কাকা ও কাকীমাকে কাঁদিয়ে। কাটোয়া হতে নৌকা যোগে উজান বেয়ে তিন দিনে কাসিমবাজারে বাবার কর্মস্থানে গিয়ে পৌঁছলাম।

একেবারে নতুন হতে যেন। কাসিমবাজার আমার গ্রামের ঠিক বিপরীত। আমার গ্রামে ছিল গাছপালার অভাব—এখানে একেবারে বৃক্ষের অরণ্য—বড় বড় বাগান বনে পরিণত। কাজেই এ অরণ্য আমকাঁঠাল নোনাআতা লিচু জামরুল নারকেল বেল কুল বাতাবি দেবু ইত্যাদি গাছের জঙ্গল।

কাসিমবাজার আমার কিশোর জীবনের লীলাভূমি। পৌরজীবন আর বন্য জীবনের এমন অজানি সমাবেশ আর কোথাও দেখিনি। একদিকে বিরাট অট্টিকার সৌধমালা মানুষের শিল্পচাতুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যবিলাসের চরমোৎকর্ষের নিদর্শন—অন্য দিকে শ্যামসমারোহে সমৃদ্ধ অজস্র ফুলে ফলে মণ্ডিত লতাজালপিহিত নিরবচ্ছিন্ন তরুবীথি। একদিকে সুপরিচ্ছন্ন পারিপাট্যমণ্ডিত নানা বর্ণের গোলাপফুলের সৌরভে আমোদিত বৃক্ষবাটিকা—অন্যদিকে অনিয়ন্ত্রিত সংগ্রামে চঞ্চল অজ্ঞাতনামা গুল্মের বন।

একদিকে অশ্বক্ষুরক্ষুণ্ণ রথচক্রনিষ্পেষিত পাটলবর্ণের পুরপথ—অন্য দিকে শুষ্কপুষ্পপত্রমর্মরিত ছায়াচ্ছন্ন আলো আঁধারের আলিম্পনে বিচিত্র বিবিক্ত বনপথ।

একদিকে নানা বাদ্যভাণ্ডের সংগীতে মুখরিত ঘৃত-গন্ধবাসিত বায়ুপ্রবাহ,—অন্য দিকে সহস্র সহস্র বিহগের কলকণ্ঠে মুখরিত বনপুষ্পবাসিত সমীরণ। প্রহরে প্রহরে রাজবাড়ীর দেউড়িচূড়া হইতে নহবৎ বাজে—প্রহরে প্রহরে অন্য দিকে যামঘোষের ঘন্টা তার পাল্টা জবাব দেয়। এই হলো আমার বৈশোর স্মৃতির কাসিমবাজার।

এখানে একদিকে প্রাসাদপালিত প্রসাদলালিত যুবক ও বালকদের অবজ্ঞা লাভ করেছি—অন্য দিকে প্রকৃতিমাতার স্নেহবিগলিত লালনমাধুর্য্য ও অকুণ্ঠিত বাৎসল্য লাভ করেছি।

এই কাসিমবাজার আমার জীবনের অপরিণতি, অপুষ্টতা, দৈন্য ও রিক্ততার সাক্ষী।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একটা নীরব সংগ্রাম এখানে লক্ষ্য করেছি। এক দিকে ধনজনমানবলে গরীয়ান দুই জন ভূস্বামী—অন্য দিকে শ্যামা প্রকৃতি। বহু কাল হতেই এই সংগ্রাম চলছে। এ সংগ্রামে বারবার মানবের পরাজয় হয়েছে—মানব তবু দানবের মত সংগ্রাম করতে ছাড়েনি। মানুষ এখানে ইটের প্রাচীর দিয়ে ঘিরে উদ্যান রচনা করেছে। প্রকৃতি কোথাও

প্রাচীর লঙ্ঘন ক'রে কোথাও প্রাচীর ভেঙে সে উদ্যানকে বনে পরিণত করেছে। মানুষ ইটপাথর দিয়ে ঘাট বাঁধিয়েছে। প্রকৃতি তার ফাটলে ফাটলে শ্যাম পত্রের অঞ্জলি তুলেছে; ক্রমে সে ঘাটের ইষ্টকাবরণ শুদ্ধ-সমাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। মানুষ এখানে বাণিজ্যের জন্য কত কুঠী, গদি, কারখানা, আড়ৎ বানিয়েছিল—প্রকৃতি তার নিঃশব্দ পেষণে তাকে ভগ্নস্তূপে পরিণত করেছে। মানুষ উপাসনার জন্য কত দেবমন্দির তৈরি করেছিল শিল্পকলায় মণ্ডিত ক'রে, প্রকৃতি তাতে বট অশ্বত্থের শিকড় চালিয়ে তা বিদীর্ণ ক'রে দেবতাকে মুক্তি দিয়েছে।

ধনী ভূস্বামীদের প্রসাদে সারাবৎসর ধরে দান ধ্যান ব্রাহ্মণভোজনের উৎসব আমোদ পূজাপার্বণের কত ঘটা, কত সমারোহ, কত আড়ম্বর—হীয়তাম্ ভুজ্যতাম্। প্রকৃতি নেমিনাথের মন্দিরের চারিপাশে তপোবন রচনা ক'রে যেন বলেছে "এহো বাহ্য আগে কহ আর।" শান্তি পেতে চাওত—প্রকৃত ধর্মের সন্ধান লাভ করতে চাওত রাজসিকতা ত্যাগ করে সাত্ত্বিকতা আশ্রয় কর—এদিকে এসো।"

প্রকৃতির রাজ্য আক্রমণ ক'রে মানুষ ঐশ্বর্য্যের কত ঘটাছটার বিস্তার করেছে—প্রকৃতি তাকে শ্মশানে পরিণত ক'রে বলেছে 'সব ঝুটা হ্যায়'—এই শ্মশানেই পরম ধনের সন্ধান পাবে। খাঁটি গঙ্গাকে কাটি গঙ্গায় পরিণত ক'রে প্রকৃতি বলেছে—"ধূরন্ধরগণ, তোমাদের ধ্বংসের বীজ এখানে লালন করছি।"

উৎসবের দুদিন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সন্ধি দেখতাম। বোধনের দিন মানুষ নানা বাদ্য বাজিয়ে অশ্ব হস্তী ধ্বজা পতাকা—নিয়ে মহাসমারোহে বনপথ দিয়ে এসে কাটি গঙ্গার জলে বোধনঘট ভরে নিয়ে যেত। জল ভরবার কলস্বনে ঘট যেন বলত—"মা প্রকৃতি, তোমার এই জলটুকু না হলে মৃন্ময়ী প্রতিমায় জগজ্-জননীর উদ্বোধন হবে না। আর একদিন দেবীপ্রতিমার বিসর্জ্জনের দিন। এই রূপ ঘটাসমারোহের সঙ্গে বনপথকে অশ্বক্ষুরক্ষুণ্ণ হস্তিপদবিদলিত করে মানুষ দেবী প্রতিমাকে ঐ কাটি গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিত।

এখানে দুই রাজবাড়ীতে মহাসমারোহে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি। কি ঐশ্বর্য্যের ঘটা, কি দীপাবলীর ছটা, কি বিপুল বাদ্যোদ্যম, হীয়তাম্ ভুজ্যতাম্ ভোজনোৎসব। তাতে আমার বালক প্রাণে উল্লাসের সাড়া পেতাম না। এতে আমি ছিলাম দর্শকমাত্র। আমার গাঁয়ের দরিদ্র রাজবাড়ীর চালাঘরে মাটির সাজ ও শোলা রাঙতায় সজ্জিতা প্রতিমার মুখখানি মনে পড়ত। সেখানে ঘটা আড়ম্বর কিছুই ছিলনা। পাঁচখানা কাঁসর ৫০।৬০টা ঢাকঢোলের বদলে সারা গ্রাম খানিকে প্রকম্পিত করত। সে পূজায় আমার প্রাণের যোগ ছিল—একখানা কাঁসর আমি বাজাবার সৌভাগ্য লাভ করতাম।

একটি জাতির অদৃষ্টসূর্য্যের অস্তাচলের জীর্ণ স্তূপ এখানে। একটি সংস্কৃতিরও শ্মশান এখানে। আবার একটি বিদেশী জাতির অভ্যুন্নতির উদয়াচলের ভিত্তিও এখানে।

বাঙলার অদৃষ্টের দশান্তরের ইতিহাসে এর মাটির তলে বিরাজ করছে।

কাসিমবাজার শতশত বিদেশী বণিকের অন্তিমকাল শতশত সমাধির অন্তরালে বহন করেছে—শতশত কুঠী-য়ালের দেহভস্ম এর মাটিকে উর্ব্বরা করেছে। শতশত পণ্যভরা নৌকার পঞ্জরাস্থি আজ কৃষকদের হালের মুখে জেগে ওঠে। বাণিজ্যকোলাহলমুখর বন্দর আজ কন্দরে পরিণত। পুরললনাদের রক্তচরণের মুখর মঞ্জীর-ধ্বনি আজ কিন্নীধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সুপরিচ্ছন্ন মর্ম্মরফলকমণ্ডিত গোরস্থানগুলিই সংক্ষিপ্তাকারে কাসিম বাজারের প্রকৃত ইতিহাস।

অতীত গৌরবের, শ্মশানভূমিতে দাঁড়িয়ে বর্ত্তমান যুগের ঐশ্বর্য্যের ঘটা-সমারোহের পানে অবাক হয়ে চেয়ে থাকতাম। কত চিন্তাই না মনে উদিত হ'ত! তার মধ্যে একটা কথা এই—লক্ষ্মীর ভোরণে যেরূপ সান্ত্রী প্রহরীর উপদ্রব সেখানে ত প্রবেশ লাভের কোন আশা নেই। মা সরস্বতীর পদ্মবনেও ত কোন প্রহরী নেই—সেখানে কি একদিন আশ্রয় মিলবেনা?

সবচেয়ে মনে পড়ে বসন্তের কাসিমবাজার। চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত কাব্যে যে বসন্তের পরিচয় পেয়েছিলাম —কাসিমবাজারে সেই বসন্তকে মূর্ত্তিমান দেখতাম। বসন্তকালে কাসিমবাজারের আকাশ পলাশ,—শিমুল ও অশোক ফুলে এবং রক্তবর্ণ বাদাম পাতায় লালে লাল হ'য়ে যেত।—চারদিকে হাজার হাজার আম গাছ—সবই মুকুলিত। সারাদিন ভ্রমরের গুঞ্জনে কাসিম বাজার মুখরিত হয়ে থাকত। সব চেয়ে মনে পড়ে সর্ব্বাঙ্গপুষ্পাভরণ কর্ণিকারতরুগুলিকে। পূর্ববঙ্গে একে বলে সোনালু, আর পশ্চিম বঙ্গে বলে সোঁদাল। নিষ্পত্র বৃক্ষে শুধুই সোনালী রঙ্গের গুচ্ছগুচ্ছ ফুল।

বসন্ত বিলাস নিত—ফুলের মাধুর্য্যের স্থান ফলের ঐশ্বর্য্য অধিকার করত। বাংলাদেশে যত প্রকারের ফল জন্মে, সকল প্রকার ফলেরই প্রাচুর্য্য ছিল এখানে। ফলভারানত বৃক্ষের শোভা ছিল স্তনন্ধয় শিশুদের জননীর মত।

কাসিমবাজারের শরৎসৌন্দর্য্যও তুলনার নয়। শরৎ আসত বনপথে, প্রকৃতি বরা সেফালিফুলে পথের ধূলা ঢেকে দিত। মদিরগন্ধি ফুলে ভরা ছাতিমের ছাতি শুভ্র রাজছত্রকেও লজ্জা দিত। কাটিগঙ্গার বক্ষ কমলকুমুদে ভরে যেত। শরতের আহ্বানে রাজভবনে বন্দী রাজহংসের দল মুক্তির জন্য আর্ত্তনাদ করত।

কাসিমবাজার বহরমপুর শহরের উপকণ্ঠ, বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত। কিন্তু দুইটি রাজবাড়ী বাদ দিলে একে গ্রামই বলা যেতে পারে। কাজেই এ ঠাঁই গ্রাম নগরের মাঝামাঝি। এর প্রধান রাস্তাটি পাকা, পথে জলের কল আছে, রাস্তায় ল্যাম্পপোষ্ট আছে, রাত্রে কেরোসিনের মিটমিটে আলো জ্বলে। তৈলাভাবে তা মধ্যরাত্রে নিভে যায়। লোকালয়ের অধিকাংশেই জুড়ে আছে দুই রাজবাড়ী· বিরাট হর্ম্ম্যমালা, আস্তাবল, পিলখানা, তোপখানা, পুষ্পবাটিকা ইত্যাদি। বাকি অংশ বনে পরিণত বাগান—তার মাঝে মাঝে এক-তালা জীর্ণ অর্দ্ধজীর্ণ কতকগুলি কালা দিয়ে গাঁথা ছোট ছোট ইটের বাড়ী। দিনেও শিয়াল ডাকে, বন্য ওড়ে। এখানে আমি ৭ বছর ছিলাম তিনটি বাড়ীতে। যে বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম সে বাড়ী পাকা রাস্তার ধারে বড় রাজবাড়ীর নিকটে। এ বাড়ীতে বহু বড়বড় ঘর —আমরা ২টি মাত্র ব্যবহার করতাম বাকি সব খালি পড়ে থাকত। বিষেখানেকের উঠোন। বাড়ীর গায়ে একটি প্রকাণ্ড ফলের বাগান—রাজার বাগান কিন্তু আমাদের অর্দ্ধভোগ্য। আর এক পাশে ইংরাজ কুঠিয়ালদের গোরস্তান, সুন্দর ফুলের বাগানের মধ্যে কবরগুলি মার্বেলে মোড়া। এখানে ওয়ারেন হেষ্টিংসের পত্নী ও কন্যার কবর আছে। কেবল সেই কবরটির মাথায় ছাদ ছিল। গোরস্থানটি এমন সুরক্ষিত এবং মনোহর পরিবেশে অবস্থিত যে গ্রীষ্মের জ্যোৎস্না রাত্রে সেখানে একলাই কবরের মার্বেলের উপর অনেক সময় শুয়ে থাকতাম।

যে বাড়ীটিতে বেশিদিন ছিলাম সে বাড়ীটি পাকা রাস্তা থেকে কিছু দূরে—কাঁচা বনপথের উপর। এটি একটি রেশমকুঠি ছিল, নাম শীলের কুঠি। বাড়ীটার হাতা প্রথম বাড়ীটার তিনগুণ—তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম অংশে ছিল একটি বাহিরের ঘর এবং দ্বিতীয় অংশের দরজা পর্য্যন্ত কামিনী গাছের বীথি। দ্বিতীয় অংশেই বাসভবন—তার দরজাটা দুর্গের দরজার মত। এই অংশে অনেকগুলি ঘর। দুটি মাত্র ঘরে আমরা পাঁচ জনে বাস করতাম—বাবা, মা আর আমরা তিন ভাই। তৃতীয় অংশ বাগান। বাড়ীর পাশে একটা পরিখার মত লম্বা সিঙ্ঘিবনেভরা জলাশয়। ঐ পরিখার ওপারে ছিল আমাদের নিজের বাড়ী। সে বাড়ীতে নিতান্ত শিশু-কালে ছিলাম। সে বাড়ী বাবা বিক্রী ক'রে দিয়েছিলেন। পাঁচ বছর এই শীলের কুঠিতেই আমরা ছিলাম—কোন মানুষের সাড়াশব্দ সে বাড়ীর ভিতর থেকে পাওয়া যেত না। মাঝখানে কিছুদিন কবি সৌরীন্দ্রনাথের বাড়ীর গায়ে পাকা রাস্তার উপরের একটা বাড়ীতে

ছিলাম। রাস্তার পরপারে ছিল প্রসন্ন ডাক্তারের গোলাপ ফুলের বাগান। ফুলের গন্ধটা আমাদেরই ভোগে লাগতো—ডাক্তার কেবল দেখেই তৃপ্তি পেতেন।

৪৭ বৎসর পরে সেই নীলের কুঠি দেখতে গিয়েছিলাম ফিরে এসে লিখেছিলাম—

বহুবর্ষ পরে
গেলাম দেখিতে তারে একদিন বর্ষার বাসরে,
যে বাড়ীতে কৈশোর জীবন
একদা কাটিয়াছিল তাহারে দেখিতে হ'ল মন।
চারি পাশে রহ যারা অবাক হইয়া তারা চায়
তাহাদের একজনো চিনে না আমায়।
তাহারা ভাবিল হাসি এ কোন পাগল
ভাঙাবাড়ী পানে চেয়ে ফেলে আঁখিজল।
একখানি ছোট ঘর ছাড়া
বাকি সব ভগ্নস্তূপ কিংবা ছাদহারা
যেই ঘরে পড়িতাম করিতাম মক্‌শো কবিতার
হায় তার চিহ্ন নাই আর।
একটি বরজা আছে পাল্লা নেই তাতে
যার হাতে আঁকা চিহ্ন সিঁদুরের তাহার মা
দেখিয়া নোয়ায়ু মাথা, নেই সেই দ্বার
যে দ্বারে দাঁড়ায়ে মাতা পথপানে নিত্য বারবার
চাহিত আমার লাগি, বাড়ীতে ফিরিতে হ'লে দেরি।
সেই সে দ্বারের চিহ্ন আপসা নয়নে তাই হেরি।
সেই সে কাহিনী বাঁধি, নেই সেই লিচু গাছটিও
আমার ডিলের ঘায়ে ফল যেবা দিত রোচনীয়।
সেই ঘরখানি আছে ঢুকি তার মাঝে
দেখিলাম ভিতে তার রাজে
স্বর্গত ভ্রাতার হাতে কয়লার লেখা তার নাম,
আর দেখিলাম
বহুধারা দাগ যাঁরা আজো গায়ে তাজা ভিতটার
অস্ত্রশাসনের চিহ্ন কনিষ্ঠ ভ্রাতার।
ঝুলে গেছে কূপ
লালের খোলসে ভরা চারিদিকে শুধু ভগ্নস্তূপ
নিসিন্দা জামাল কোটা ঘেঁটু কালকিসিন্দা জঙ্গল
তেমনি রয়েছে আজো চারিপাশে। করেছে দখল
তেমনি সিন্ধির বন ডোবার অর্ধেক, বরষায়
ভরেছে ইঁটের স্তূপ শিয়াল কাঁটায়।
ফুলের সুগন্ধ পাই সেইরূপই ঘ্রাণে
তেমনি পাখীর ডাক পশিতেছে কানে।
কাঠবিড়ালীরা ঘোরে পাখায় পাখায়
চকিত চঞ্চল হয়ে তেমনি তাকায়।
চিরন্তন যাহা কিছু সবি আছে আজো একরূপ
মানুষের গড়া সবি আজি ভগ্নস্তূপ।
পরিচিত সব গাছ লুপ্ত এক বেল গাছ ছাড়া
শ্মশান বেরের প্রিয় সেই বেল শ্মশানে পাহারা।
ভগ্নস্তূপে ঘুরে ঘুরে খুঁড়ে কিছু মাটি
পেলাম খুঁজিয়া সেথা বাবার নতুন এক পাটি
সে পত্তম মাথায় ধরিয়া
ষ্টেশনে এলাম ফিরে মোর তীর্থ

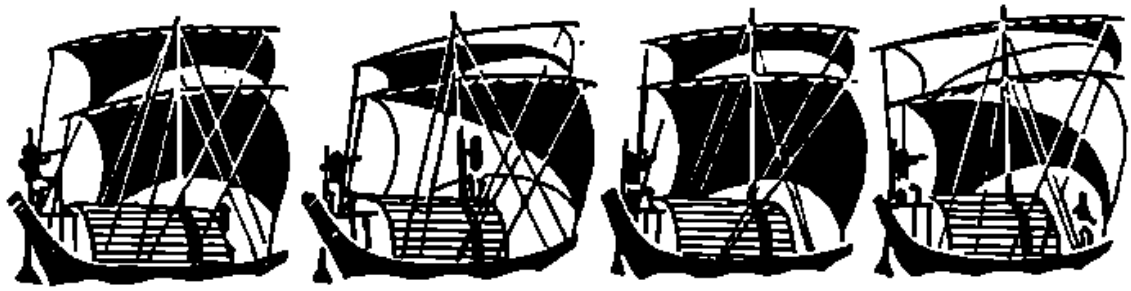

সমাজ ও জাতীয় জীবন

[র. কু. সে.]

...জন্ম হ'য়ে উঠবার মতো কোনো প্রবৃত্তি ... কাজ করে, সেখানে প্রতিটি জন্তুর জন্ম ... প্রতিটি জন্তুর সহনশীলতাও স্বপ্রকট। কিন্তু আমাদের ... এই মানব-জীবনে কোথায় আজ সেই আত্মজ-ধর্ম? ... কোই, দেখতে পাই শাক্ত আর বৈষ্ণবে বিরোধ, শূদ্র আর ব্রাহ্মণে দ্বন্দ্ব; ওপাশে তাকাই, চোখে পড়ে—প্রোটেস্টাণ্ট আর রোমানক্যাথলিকের স্বাতন্ত্র্য, কালো চামড়ার আর শাদা চামড়ায় কগড়া। এই ছলনাময় নৈতিক আচার আর ভেদবুদ্ধি নিয়েই সমস্তটা দেশ, সমস্তটা বিশ্ব আজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আকিংখোরের মতো ঝিমোচ্ছে। জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, সমাজে সমাজে বৈষম্য, দেশে দেশে বিদ্রোহ আর বর্ণে বর্ণে দ্বন্দ্ব যেন পিরিচুফের মতো মানুষের ক্ষমাহীন দুর্মতির উপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে হা হা শব্দে কী মহাক্ষুধার অট্টহাসিই না হাসছে! যুগে যুগে কত মহা মহাত্মার পুণ্যশ্লোকে আকাশ বাতাস ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো, মহামানবের মিলন-সঙ্গীতে কত মহাপ্রাণ কত গ্রন্থ রচনা ক'রে গেলেন, কত তত্ত্বে কত আদর্শে কত ইতিহাস রচিত হলো,—পৃথিবীর বুক থেকে হীনতার স্পর্শলাগা এই জগদ্দল পাথর তবু অপসারিত হ'লো না।

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এ যে কত বড় কলঙ্ক তা প্রকাশের নয়। পরিতাপের সঙ্গে তাই বলতে হয়—যুগ বিবর্তনের ক্রমধারায় মানুষ আজও আত্মসমাহিত হ'য়ে পূর্ণ জ্যোতির্ময়ের রূপ উপলব্ধি করে' মহৎ প্রাণের চির সত্যের তটে এসে দাঁড়াতে পারেনি। বাইরের চাকচিক্যে সে ভিতরকে কাঙাল ক'রে রেখেছে, মন্দিরের তোরণদ্বার সাজাতে গিয়ে বেদীর প্রতিমাকে করেছে সে উপেক্ষা। কারণ নিজের সম্বন্ধেই আজও তার কাঙালপনা ঘোচেনি। অত্যন্ত জৈবিক সাধারণ্যের মাপকাঠিতে প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে সে কেবল ভেসে ভেসেই চলেছে। যে মহৎ শিক্ষা ও বলিষ্ঠ আদর্শবাদের দ্বারা সভ্যতা উৎসারিত ও পরিমার্জিত, সেই শিক্ষা ও আদর্শই আসলে আজ মানুষের কাছে কৃত্রিম হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তাই মানবতার নামে সভ্যতাও আজ তার কাছে কৃত্রিমতা ভিন্ন কিছু নয়। এই জন্যই দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে আজ এত ঘোর সংগ্রাম, বৈয়ক্তিক মনোবৃত্তিতে সমস্তটা পৃথিবী মোহাচ্ছন্ন। অসংখ্য ধারার রাহাজানি আর খুনি হামলায় মানুষ আজ পশুরোগের ডিপো হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই যখন মানুষের কাছে অমৃতের বাণী আসে, সেই বাণী শুনেও মানুষ তার স্নেহমজ্জা হতে মুক্ত হয়ে কিছু একটা বিশ্বভ্রাতৃত্ব বা সৌহার্দ্যের আশ্রয় নিতে পারে না। এইখানেই সে নিজের মধ্যে পশুত্বহাবাসীর মতো অবরুদ্ধ। এখানে আলোময় লীলার অভাব, সুর সমৃদ্ধির অভাব, জীবনের অস্তিত্ব সত্ত্বেও জীবনবেদের বাণী এখানে জাগে না। সবাই যার যার নিজের মধ্যে একেবারে স্তব্ধ হয়ে আছে। এখানে ত্যাগের দ্বারা ভোগের আনন্দ মেলে না, সুর দিয়ে কিছু-একটাও ঐক্যতানিক ছন্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। দেখা যায়, এর মূলে রয়েছে চিরাচরিত ব্যষ্টিবাদী স্বাতন্ত্র্য ও আদিম বর্বরতা।

এই স্বাতন্ত্র্য অর্থে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিষয়টা সামান্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়। মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ-ধারা নিয়ে সর্বপ্রথম কবে থেকে গবেষণা সুরু হয়েছে, যদিও অদ্যাবধি তা বোধিমণ্ডলে একরকম অজ্ঞাতই রয়ে গেছে, তথাপি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর য়ুরোপীয় Naturalists বা প্রকৃতিবাদীদের মতে দেখতে পাই—

মানুষের উৎপত্তি তির্যকশ্রেণী থেকে; এবং এই কারণেই আদিম যুগের মানুষের মধ্যে পাশবিক প্রবৃত্তির তাড়নাই ছিল প্রবল। প্রতি মানুষ তার স্ব স্ব বাসনা চরিতার্থ করার জন্য প্রতি মানুষের সাথে স্বার্থ ও বিদ্রোহ নিয়ে থাকতো মত্ত। সমষ্টিগত প্রাণের মিলন ছিল দুঃসহ। ব্যক্তিগত সুখপ্রবৃত্তি যেখানে, চিত্ত তাদের সেইখানেই আকৃষ্ট হয়ে উঠ্‌তো। ক্রমে যুগ-পরিবর্তনের সাথে সাথে এই মোহ থেকে মানুষের নিবৃত্তি আসে এবং তাদের চিন্তায় ও আচারে অনেকখানি ভব্যতা লাভ করে পরস্পরের সাথে কার্যকারণ যোগস্থাপনে উৎসাহী হয়ে ওঠে। এম্‌নি করেই মানুষের সভ্যযুগের সূর্যোদয়।

পরবর্তীকালে ওই প্রকৃতিবাদীদের মত নিয়ে যদিও সুধীসমাজে যথেষ্ট বিতর্ক হয়, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর চরম আদর্শবাদী মিঃ বিশপ বাট্‌লার যদিও মানব-প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখাতে চেষ্টা করেন যে, ব্যষ্টিস্বার্থ বা আত্মপ্রত্যয়ের সাথে সাথে তার পরার্থ-পরতা বা পরহিতৈষণা বৃত্তিও সম্পূর্ণ স্বভাবগত, তবুও তথাকথিত সভ্যতার পূর্ণ বিকাশের দিনেও আজ দেখ্‌তে পাচ্ছি—আত্মপুষ্টি ও পরশ্রীকাতরতাই মানুষের মনকে দৃঢ় প্রাচীরবদ্ধ ক'রে রেখেছে। প্রাচীন রোম ও গ্রীক-কৃষ্টি-পরবর্তী য়ুরোপ-প্রবর্তিত 'ইইসিজ্‌ম্' ও 'এপিকিউরিয়ানিজ্‌ম্' নীতিই চিরাচরিতরূপে আজও মানুষের মধ্যে বদ্ধমূল হ'য়ে আছে। মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁকে রোদ হাসার মতো এক একখণ্ড 'কস্‌মোপলিটান মন' এসে হঠাৎ মাটিকে চম্‌কে দিয়ে যায় বটে, কিন্তু সেই দীপ্তি ক্ষণকালের। ধরিত্রীর মরু-বালুকায় তা ওয়েসিসের সৃষ্টি করে না। বিস্তীর্ণ এই পৃথিবী, বিস্তীর্ণ এক একটি খণ্ড নগর ও পল্লী, সর্বত্রই স্বাতন্ত্র্যের জয়ধ্বনি। সেই আদিম বর্বরতার জোয়ার আজও প্রতিনিয়ত মানুষের শিরায় শিরায় বয়ে চলেছে। কোথাও সেই গতির ক্ষীণতা নেই, কোথাও যৌক্তিকম নেই। তাই আজ ব্যবসাগত, জাতিগত, স্থানগত স্বাতন্ত্র্য ও আধিপত্য নিয়ে এক দেশ আর এক দেশকে আক্রমণ করছে, এক জাতি আর এক জাতিকে প্রতিহত করছে। এই আন্তর্জাতিক বর্বরতা বলেই নয়, ঘরে বাইরে, মসজিদে মন্দিরে, চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, অসুরে অমরে—সর্বত্রই আজ সমাজ ও ব্যষ্টিস্বাতন্ত্র্যের ঘাত দিয়ে মানুষের অন্তর-লক্ষিত আদিম প্রবৃত্তির মুখ থেকে সভ্যতার কৃত্রিম মুখোসটা খসে পড়েছে। স্রোতের সঙ্গে তাই মনে হয়—এতকালের মানুষকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর যে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে উঠলো, তার মূল কোথায়? ভিত্তি কি তার শুধু নীচতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত?

কিন্তু তা তো নয়! মানুষ তো পশু-বলেই শুধু বলীয়ান নয়, দৈব-বলেও যে শক্তিমান সে। এই পশুত্বে আর দেবত্বে সর্বদা সংগ্রাম চলেছে তার অন্তরে অন্তরে। দেবের দৃষ্টি ত্যাগের দৃষ্টি, সত্য ও প্রেমের দৃষ্টি, আর পশুর দৃষ্টি ভোগের দৃষ্টি, লালসা ও স্বার্থের দৃষ্টি। দেবত্বলাভ তপস্যাসাপেক্ষ, কিন্তু পশুত্ব স্বতঃস্ফূর্ত। আহারসর্বস্ব মানুষ ভোগের আস্বাদেই দিনে দিনে তার স্নায়ুকে ধাড়িয়ে তুলে মাটির বুকে নিজের শক্তি খাটিয়ে মৃত্যুর পথে ধাবিত হ'য়ে চলে। তার প্রতাপের ভাণ্ডার আর মুখের গ্রাস থেকে দানের আদর্শ মেলে কারণ, সে যে পাবার লোভে, আপাত সুখের লালসায় স মোহগ্রস্ত। সময়সাপেক্ষ ও তপস্যাসাপেক্ষ দেবত্ব লাভের মহৎ ধ্যানকে তাই সে বর্জন ক'রে চলে। এই চলাই তার পশুত্বের চলা, এই চলাই সমগ্র থেকে অন্ধের মতো বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখে দেয় তাকে। দেবত্বের সিঁড়িপথ তার সম্মুখে থেকেও অদৃশ্য। তাই এত বর্ণভেদ, দেশ ভেদ, রাষ্ট্র ভেদ। এই ভেদনীতি আজ সর্বত্র পরিস্ফুট।

অথচ মানুষ ইচ্ছা দ্বারা, শক্তি দ্বারা, সাধনা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা প্রকৃতিগত নীচ প্রবৃত্তিকে মহৎ করে গড়ে তুলতে পারে, সকলপ্রকার ভেদ বৈষম্যের উপর মৈত্রী ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সেই Conscience বা বিবেকসত্তা এবং wisdom বা জ্ঞান-

সত্তা তার মধ্যে রয়েছে। কারণ, মানুষ তো যথার্থই পশু নয়, সে যে বুদ্ধিজীবী, Rational Being. পশুত্ব তবে তার মধ্যে আসবে কেন? নতুবা বিশ্বের সৃষ্টিশালায় পশু থেকে মানবত্বের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? সৃষ্টিজগতে যখনই তার একটা বিশেষ শ্রেণীকে 'মানব'-সংজ্ঞা দেওয়া হলো, তখনই তাকে যে আর আর প্রাণীকেন্দ্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে একটা পরম গৌরবময় কোনো শ্রী-জগতের প্রাণসামগ্রী বলে উপলব্ধি করা হলো। সর্বকেন্দ্রিক এই শ্রীজনিত superiority বা শ্রেষ্ঠত্বই তাকে সৃষ্টিজগতের পশুশালা থেকে অতি উর্ধ্বে মহৎ ও প্রোজ্জ্বল করে রেখেছে। কিন্তু সে কি শুধু ইতিহাসে, শুধু ঋষি বাক্যে, শুধু 'এ্যানথ্রোপলজিতে?' নইলে পদে পদে এমন দীন কাঙালের মতো সার্বভৌম মানবতার দ্বারে তার এই পশুত্ব স্পর্শাতুর নিষ্কৃতির কেন? অথচ এরই মধ্য দিয়ে পৃথিবীর বুকে বুকে কত স্বর্ণযুগ, কত জুবিলী উৎসব বয়ে গেল। প্রতিটি ধনতান্ত্রিক দেশ জুড়ে কত বিজ্ঞান খাড়া হয়ে উঠলো, প্রাচীরের পর প্রাচীর গড়ে উঠলো, শ্রীকমে আর প্রমোদভবনে হাজার হাজার বছরের ভগ্নস্তূপ বস্তিগুলি ঢাকা পড়ে গেল; তবু হলো না, মানুষের প্রাণের রাজ্যে এমন একটি স্বরনা প্রেক্ষাগৃহের সৃষ্টি হলো না—সকল দেশের সকল জাতির মানুষ এসে সেখানে একত্রে যুক্ত হয়ে মহামিলনের তীর্থক্ষেত্র করে তুলতে পারে। যে হাতে মানুষ আজ বীণার তার বাঁধছে, সেই হাতেই সে কেমনেট ধরে গুলি চালাচ্ছে তার ভাইয়ের বুকে। 'Universal Fraternity' বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব সেই তোপের মুখে তুড়ির মতো উড়ে যাচ্ছে; গান তখন Machine-Gun হয়ে দেখা দিচ্ছে প্রকাশ্যে। সংস্কৃতির এতবড় দৈন্যকে আজকের এই সভ্যতার ভাঁড়ামি দিয়ে ঢেকে রাখবার নয়।

পৃথিবীর এই এত বছর পর্যন্ত মানুষ শুধু মাটি খুঁড়ে ভাল ভাল সোনা আবিষ্কারই ক'রেছে, রাজা আর ইমারৎ গ'ড়ে গ'ড়ে আবার আত্মলীলায় ভ্রাতৃকলহে বিজ্ঞানী অস্ত্রবাজদেরই মাত্র ভূরভি উড়িয়েছে,—সভ্যতার নামে সে সংযমী হ'তে পারেনি, সাহসিকতার নাম দিয়ে মনের স্থৈর্যকে সে হারিয়ে ফেলেছে; সংস্কৃতির নামে শুধু সংহার লীলাই তার সকল সুখের সার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। জীবনের যে যথার্থ সত্যতা ও শুভ আদর্শকে ভিত্তি ক'রে সভ্যতার চূড়া গ'ড়ে ওঠা সম্ভব, মানবজীবনের সে-দিন আজও জ্ঞানের দ্বারে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। প্রসিদ্ধ প্রাবন্ধিক Clive Bell তাই দুঃখের ও দৃঢ়তার সাথে ব'লেছেন—'I shall need a police-force to protect civilisation, not to impose it, (civilisation cannot be imposed by force). He who would civilize his fellows must allow, them to discover for themselves that he has got hold of a better way of life.'

সংস্কৃতির আদর্শ হ'চ্ছে—জ্ঞানের পথে অখণ্ড মানব-সমাজের সাথে সখ্যভাবে ও সমবেদনার মধ্য দিয়ে এক জাতি ও এক ধর্মের প্রতি আর এক জাতির ও ধর্মের সৌজন্য, সৌহার্দ্য ও সহনশীলতা বাড়িয়ে তোলা। শুধু ভোগেই জীবনের পরাকাষ্ঠা নয়, তাতে দুর্ভোগই বেড়ে ওঠে; ত্যাগ, সহনশীলতা ও পর-স্বীকৃতির মাধুর্য দিয়ে মানুষের প্রাণের নিকেতনকে সৌন্দর্যময় করে তুলতে পারাই না হচ্ছে প্রকৃত মানবধর্মের পরম আদর্শ। এই মানবীয় জ্ঞান ও সংস্কৃতির পরিপূর্ণতার বিকাশই হচ্ছে বিশ্বকল্যাণ ও সভ্যতার আদি কথা। এই জ্ঞানের পথে সেই 'Better way of life'-এর সংজ্ঞা নিরূপণ করে নেবার প্রয়োজন প্রতি মানবটির অন্তরে অন্তরে। সৌন্দর্যের পূজারী মানুষ কেমন করে লক্ষ্মীর আরাধনা করতে গিয়ে শান্তিকে বিসর্জন দিয়ে অশুভ কোনো পৈশাচিক অরাজকতার মধ্যে এসে বাসা বাঁধতে পারে এইটেই হচ্ছে মস্তবড় সমস্যা ও আশ্চর্যের কথা। য়ুরোপের ইতিহাস আজ এই কথাই প্রমাণ করছে যে, সেখানে যুদ্ধের নামে, বিপ্লব ও তীব্রতার নামে মানুষ মানুষকে শত্রু করে জিইয়ে রাখছে, নইলে তাদের Progressive and evolutionary force of nation বা জাতির প্রগতিশীল বিবর্তনশক্তি নাকি বাড়তির পথে এগোয় না। Constant revolution বা ক্রমাগত যুদ্ধবিদ্রোহের দ্বারা এই evolutionকে সজীব রেখেই য়ুরোপ আজ ধর্মের ও সভ্যতার বড় বড় মনুমেন্ট, বড় বড় গ্রন্থ রচনা করে বিশ্ব-মানবের দরবারে চাল-মাতাই চেকির মতো সগর্বে খাড়া হয়ে আছে, বলছে: 'অয়মহং ভোঃ—এই যে আমি, আমাকে দর্শন করো।' এই আমিত্বই তার অশান্তির সোপান, এই আমিত্বই তার অনন্তীয় প্রবেশপথ।

বাংলাভাষায় বর্ণচোরা শব্দ

অমলেন্দু সেন

মাঝারি আকারের একখানা বাঙলা অভিধান থেকে গুনে দেখলাম যে, সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষা থেকে এসে বাঙলায় প্রচলিত হয়েছে এমন শব্দের সংখ্যা মোট ২৮২২টী। এই ২৮২২টী ছাড়া আর কোনও জাতীয় শব্দ বাংলায় কখনও ব্যবহৃত হয় নি, এমন কথা অবশ্য বলা চলে না। তবু এ থেকে একটা মোটামুটি ধারণা করা যেতে পারে যে আমরা বাঙালীরা অন্যভাষার কথা বড় কম ব্যবহার করি না।

এই ২৮২২টীর মধ্যে ২০৬টী হচ্ছে অন্যান্য ভারতীয় ভাষা থেকে নেওয়া। এক হিন্দী থেকেই এসেছে ১৯৭টি। তা ছাড়া, বাংলায় গুজরাতী শব্দ আছে তিনটী (খদ্দর, গরবা, তকলি), তামিল থেকে এসেছে তিনটী (চুরুট, টোটা, প্যাণ্ডাল), মালয়ালম শব্দ আছে একটী (টেণ্ডল), আর পশতু শব্দ আছে ওটি দুই (আখরোট, তপসে)।

বাকী রইল যে ২৬১৬টী শব্দ, সেগুলিকে কোনও না কোনও অ-ভারতীয় ভাষা থেকে হয় আস্ত, নয় ভেঙেচুরে, নিয়ে বাঙলাভাষার সামিল করে নেওয়া হয়েছে। এ-সব শব্দের সঙ্গে নানারকম প্রত্যয় যোগ করে, কিংবা নানারকম শব্দের সমাস করে, আরও অজস্র পদের সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রচলন আছে, কিন্তু তাঁদের কথা এ হিসেবের মধ্যে ধরা হচ্ছে না। এই ২৬১৬টী শব্দের মধ্যে ১৯০০টীই ফারসী-আরবী-মূলক, ৫৪৮টীর উৎসমূল হচ্ছে ইংরেজি।

এই-সব বিদেশী শব্দের মধ্যে এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলি এমন আকারে এবং এমনভাবে বাঙলাভাষায় চলে আসছে যে, সেগুলি যে বিদেশী শব্দ সে কথা সহজে মনে হয় না। কতকগুলো তো হুবহু সংস্কৃত সেজেই বসে আছে—তাদের কথা স্থানান্তরে উল্লেখ করেছি। এখন এখানে এমন কতকগুলো বাঙলা শব্দের কথা বলব যাদের চেহারা দেখে মনেই হয় না যে এরা বিদেশী শব্দ।

বাংলাভাষার মধ্যে ফারসী-আরবী শব্দের সংখ্যা যেমন বেশী, ফারসী-আরবী বলে চেনা যায় না এমন শব্দের সংখ্যাও নগণ্য নয়। অল্প কয়েকটা মাত্র দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া যেতে পারে। 'তালিকা' 'বিদায়' 'মর্মর' 'ছবি' 'আদায়' 'জালা' 'জিনিষ' 'তোকমারি' 'পরকলা' 'পিলসুজ' 'কসল' ইত্যাদি শব্দ যে হয় খাঁটি আরবী-ফারসী শব্দ, নয় তো সেই জাতের কোনও শব্দের অপভ্রংশ, একথা সহজে মনে হয় কি?

আজকাল ফারসীভাষার সঙ্গে সাধারণ বাঙালীর পরিচয় বিশেষ নেই বলেই হয়তো ঐ ধরণের শব্দগুলিকে চেনা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ইংরেজী শব্দ সম্বন্ধে তো সে যুক্তি চলবে না। তাই বাংলায় চলে এমন ইংরেজী শব্দ তত সহজে আমাদের ফাঁকি দিতে পারে না—Box, glass আর stamp যখন 'বাক্স' 'গেলাস' 'ইষ্টাম্বর'-এর ছদ্মবেশে দেখা দেয়, তখনও না। তবু বেশ কয়েকটা ইংরেজী শব্দ আছে যারা এমন বে-মালুমভাবে বাংলায় মিশে গিয়েছে যে ইংরেজী-জানা লোকেরও সহজে মনে হয় না যে সেগুলো আসলে ইংরেজী শব্দ।

'অতলান্তিক' শব্দটীকে সংস্কৃত বলে মনে হয়, কেন না, একে তো অতল আর অন্তিক শব্দ দুটোই সংস্কৃত, তার ওপর একটা সমুদ্রের নামের মধ্যে অতল দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ওটা ইংরেজী Atlantic শব্দকে ভেঙে গড়া হয়েছে মাত্র।

সেইরকম, 'অন্তরীণ' শব্দের মধ্যেও একটী সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে একটী সংস্কৃত প্রত্যয়ের যোগ লক্ষ করে আমরা হয়তো নিশ্চিন্ত থাকি, মনে করি যে ওটী ষোলোই

সংস্কৃত নয়—ইংরেজী intern শব্দের মোলায়েম চেহারা।

আল কথাটাও বাংলা, পাকা শব্দটাও তাই। কিন্তু আলপাকা' কথাটা ইংরেজী থেকে নেওয়া।

'একটিনি' (acting) শব্দের বাংলা রূপান্তর তেমন পাকা না হতে পারে, কিন্তু বোতলের 'কাক' ইংরেজী cork শব্দের অপভ্রংশ হয়েও অন্ত কাক-দের ঝাঁকে নিজের নিয়ে নিয়েছে। আর 'কাষ্টকি' যে caustic, তা না জানা থাকলে বোঝবার উপায় নেই।

Court মানে খেলবার জন্ত চিহ্নিত জায়গা, তা থেকে এসেছে 'কোর্ট' শব্দ, ঐ একই অর্থে। গায়ে দেবার কোট কিংবা জেল-অর্থে কোর্ট শব্দ আলাদা হতের।

'খাঁটি' বলে একটা শব্দ আছে, যার মানে হচ্ছে দেশী

খাঁটি মি-এর খাঁটি শব্দের মত দেখতে হলেও তাতে এতে কোনও সম্পর্ক নেই, এটা এসেছে ইংরেজী country (liquor) শব্দ থেকে।

সেই রকম, 'গেঞ্জী' কথাটিও বিলকুল ইংরেজী। ইংলাণ্ডের কাছে আছে ছোট্ট দ্বীপ Guernsey, সেখানে বোনা এই ধরণের জামাকেও বলে গের্নসি। তার থেকেই বাংলায় গেঞ্জি। কাছাকাছি আর একটি দ্বীপের

থেকে যে জামার নাম হয়েছে জার্সি, তা অধিকৃত রূপেই প্রচলিত আছে খেলোয়াড়দের পোষাক হিসাবে।

চায়ের সঙ্গে 'চা-খড়ি' কথাটার কোনও সম্পর্ক নেই; chalk আর খড়ি শব্দ সন্ধি করে পাওয়া গিয়েছে শব্দটা। বাংলা 'জোলাপ' শব্দটি ইংরেজী jalap শব্দের রূপান্তর। জালাপ হচ্ছে মেকসিকো দেশীয় একরকম গাছের বিরেচক কন্দ।

বাংলাভাষা tandem থেকে টমটম, attorney থেকে 'টর্নী', আর turine থেকে 'টোন' (স্থতা) শব্দ বানিয়ে নিয়ে আত্মসাৎ করেছে। পরিষ্কার বাঙালীর চেহারার হলেও 'তারপিন' এসেছে turpentine থেকে, 'তেরপল' এবং 'ত্রিপল' আসলে হচ্ছে tarpaulin শব্দ, আর 'তোরঙ্গ' শব্দটা trunk ভেঙে বানানো। তেমনই 'দেরাজ' কথাটির মূল হচ্ছে drawer, আর শিক্ষানবিস শব্দের 'নবিস' শব্দটা ইংরেজী novice ছাড়া আর কিছু নয়।

'পলস্তারা' আর 'বেলেস্তারা' এসেছে plaster এবং blister থেকে। Pinnace থেকে হয়েছে 'পানসি' কার সাধ্য তাকে বিদেশী শব্দ বলবে? এক pint, (পাইণ্ট) তরল দ্রব্য ধরে এমন বোতলকে বলে 'পাইট' বা 'পাঁচ'।

যে পাঁপড় ভেজে খাওয়া হয়, সে হোল গিয়ে হিন্দী। কিন্তু আর এক রকম 'পাঁপর' এর কথা আইনে লেখে—তাকে কোর্টফী দিয়ে মামলা করতে হয় না—সে শব্দটা ইংরেজী pauper শব্দের নকল। 'পল্টন' কথাটি শুনলে কি ইংরাজী platoon বলে চেনা যায়? তেমনি, pasteboard হয়েছে 'পিচবোর্ড', আর putty যে বাংলায় করা হয়েছে 'পুটিন'। যে যন্ত্রটাকে মিস্ত্রিরা বলে 'প্লাস্' সেটি আসলে হচ্ছে pliers শব্দ। গোরা-বারিকের 'বারিক' শব্দটা barrack শব্দের বাংলা চেহারা।

ধূনা-জাতীয় এক রকম জিনিষকে ইংরেজীতে বলে mastic, সেটা বাংলায় হয়ে দাঁড়িয়েছে 'মস্তকি'—এর সংস্কৃত মস্তক শব্দ আর কি? Man-of-war কে আমরা বলি 'মানোয়ার'। American কে আমরা করে নিয়েছি 'মার্কিন'—বাংলাভাষার হামানদিস্তায় পড়ে শ্যামচাচাও রেহাই পান নি।

কামার-মিস্ত্রীরা rivet না বলে বলে 'রিপিট'। পুলিসে রাত্রিবেলা 'রোদ'-এ বেরোলে বিস্ময়ের কিছু নেই, কেননা ও-শব্দটা আসলে হচ্ছে round, অর্থাৎ চক্কর।

ঠণ্ঠন আর লুণ্ঠন-এর মত দেখতে হলেও 'লণ্ঠন' অন্ত জাতের শব্দ, ইংরেজী lantern শব্দ তার পূর্বপুরুষ।

মং-উপাধিধারী বলে যেমন একটা গোটা জাতই 'মগ' নাম পেয়েছে, তেমনি প্রথমে সকলেই Lord-উপাধিক

হতো বলে ইংরেজ খাঁসেরা এদেশে 'লাট' বলে পরিচিত। বহুদিন আগে এক লাট-পত্নী কলকাতায় মারা যান। তাঁর স্মরণার্থে Lady Canning নাম দেওয়া হয়েছিল পুর-দেওয়া পান্থয়ার। মহারানী ভিকটোরিয়ার স্মৃতিসৌধ দেখেনি, এমন লোকেও সেই লাট-পত্নীর স্মৃতিচিহ্নটিকে জানে—তার নাম 'লেডিকেনি'।

'লেবেনচুষ' যে চুষতে হয় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐ চুষ-কথাটি সে চুষ নয়, lozenges শব্দই লজেঞ্চুস, লজেঞ্চুস, লেবেনচুস' ইত্যাদি রূপে বাঙালী ছেলে-মেয়েদের ভুলিয়ে আসছে।

দেখতে শমন-এর মত হলেও 'সমন' শব্দটার মূল খুঁজতে যেতে হবে ইংরেজী summons শব্দে। আর একটী প্রায় সমার্থক শব্দ হচ্ছে 'সমিনা', সেটি নিছক ইংরেজী snb-poena শব্দ।

হ-ব-র-ল বইয়ের লেখাটা বলেছিল যে সজারু ক্যাঙারু দেবদারু শব্দ যদি ঠিক হয় তবে মজারু শব্দও আলবৎ হবে। সেই নজীর ধরে 'সান্ত্রী' শব্দটাকে মন্ত্রী কিংবা যন্ত্রীর জ্ঞাতি বলে মনে হওয়া অন্যায় নয়, যদিও আসলে sentry শব্দই বাংলায় এসে 'সান্ত্রী'-ত্ব লাভ করেছে।

আবার, sloop, hundred weight, artichoke এবং hammer শব্দকে 'সুলুপ, হন্দর, হাতিচোক' আর 'হাবর' রূপে পরিণত করে তাদের আর বিদেশী শব্দ বলে চেনবার উপায় রাখি নি আমরা। "বঙ্গ তারে আপনার গুণেতে অতিরিক্ত করি" বেমালুম আপনার করে নিয়েছে।

এই গেল কতকগুলি বর্ণচোরা ইংরেজী শব্দের কথা।

অন্যান্য ভাষার শব্দও বাংলায় মিশে আছে, তবে তাদের সংখ্যা অনেক কম। এদের ভিতর পর্তুগীজ শব্দের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী—মোট ৯০টী। পর্তুগীজদের আমরা ভুলে গিয়েছি, কিন্তু তাদের স্মৃতি বাংলাভাষা হয়তো চিরদিন বহন করবে।

ফলের নামের মধ্যে আতা (ata), কাজু (caju) আনারস (ananas), নোনা (anona), পেঁপে (papaya), পেয়ারা (pera), সপেটা (zapota), সান্তারা (cintra) কমলালেবু) যে পর্তুগীজ ভাষার শব্দ, একথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে না কি?

নানারকমের খাদ্যবস্তুর নাম, যথা, আচার (achar), কপি (couve), কাফি (cafe), পাঁউ (pao, রুটি), বিস্কুট (biscoito), সাগু (sagu) পর্তুগীজ শব্দ।

গৃহস্থালীর নানা জিনিস, যথা, আলমারি (armario), ইস্তিরি (eostirar), কেদারা (cadeira), গামলা (gamella), তিজেল (tigela), তোলো (talha), পরাত (prato), পিরিচ (pires), বয়াম (boiao), বালতি (balde), বেসালি (vasilha), মেজ (mesa, টেবিল);

নানারকম ধাতুদ্রব্য, যেমন, আলপিন (alfinette), ইস্পাত (espada), কাতান (catana, কাটারি), কানেস্তারা (canastra), গরাদে (grade), চাবি (chave), পেরেক (prego), বরগা (verga);

বিদেশী কয়েকটি জাতির নাম, যথা,—ইংরেজ (inglez), ওলন্দাজ (Hollandaise), কাফ্রি (cafre), ফিরিঙ্গী (Francez);

তাসখেলা-সংক্রান্ত শব্দ, যথা—কোরেস্তা, তেরেস্তা, প্রেমারা, বিস্তি (Vinte);

বস্ত্রজাত দ্রব্যের নাম, যথা—কামিজ (camisa), তোয়ালে (toalha), ফিতা (fita), লবেদা (loba), সায়া (saia);

এবং খৃষ্টধর্মসংক্রান্ত কয়েকটি শব্দ, যথা—পাদ্রী (padre), যীশু (Jesu), গির্জা (igreja);

এ সবই আসলে পর্তুগীজ শব্দ। একেবারে বাংলা শব্দ বনে গিয়েছে, সেগুলিরও উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে—আয়া (aia), আলকাতরা (alcatra), এনতার (entaro), কাবার (acabar), কাকাতুয়া (cacatu), কামরা (camara), গুদাম (gudas), জানালা (janella), খানা (cana, গর্ত), খোঁপা (coifa), টোকা (touca, শোলার টুপি), তামাক (tobaco),

সাবান (sabao), নীলাম (leilas), পিপা (pipa), ফর্মা (formal), বোতল (boteiha), পিস্তল (pistola), বয়া (boia), বেহালা (viola), বোমা (bomba), বোম্বেটে (bombardeiro), মার্কা (marca), মাস্তুল (mastro), মিস্ত্রী (mestre), রেস্ত (resto), সালসা (salsa), সুরতি (sorte), সেঁকো (arsenico), হারমাদ (armada)।

সংখ্যা হিসেবে পর্তুগীজের পরেই আসে তুর্কী শব্দ। বাংলায় যে ৪৪টি তুর্কী শব্দ দেখা যায়, তাদের মধ্যে যেগুলি বিশেষ পরিচিত, মাত্র সেগুলির উল্লেখই এখানে করবো। পোষাকের মধ্যে 'আলখাল্লা' (আল-খালিক), 'উর্দি', 'কোর্তা' এবং শালের কোণে আঁকা 'কলকা' (কলগা) তুর্কী শব্দ। 'দারোগা' তাঁর 'কৌতকা' (কুৎকা) নিয়ে, 'খান-বাহাদুর তাঁর 'বাদুর, বিবি, বেগম ইত্যাদি নিয়ে তুর্কী ভাষা থেকেই এসেছেন; সঙ্গে এসেছে 'বোঁচকা' (বোকচা) নিয়ে 'কুলী' 'সওগাত' নিয়ে 'বখশী' আর 'কোর্মা' রাঁধবার জন্য 'বাবুর্চি'। বিবিদের জন্য 'চিক' আর নিজেদের শিবিরের জন্য 'কানাত'-ও আমদানি হয়েছে সেই সঙ্গেই। 'তোপ আর 'বারুদ-ও এসেছে, কাজেই 'লাস' শব্দটিও যে এসে জুটেছে, তা বড় বিচিত্র নয়। ঘরে 'গালিচা' পেতে, অথবা বাড়ীর 'রোয়াক'-এ বসলেই তুর্কী ভাষার শরণ নেওয়া হয়। তাছাড়া, 'কাবু' হয়ে পড়লে এবং সম্পত্তি 'ক্রোক' (কুর্ক) হলেও সেই তুর্কী শব্দেরই দেখা পাওয়া যায়।'

ওলন্দাজ এবং ফরাসীরা যে কিছুকাল এদেশে ছিল, তার চিহ্ন তারা বাংলা ভাষাতেও কিছু রেখে গিয়েছে। তাদের 'হরতন' (harten), 'রুইতন' (ruiten), 'ইস্কাবন' (schofen) এবং 'তুরুপ' (troef) শব্দগুলি ওলন্দাজী ভাষা থেকে বাংলায় নেওয়া। তাছাড়া বোধহয় 'ইস্ক্রুপ' আর 'বোম' শব্দ দুটি এসেছে তাদেরই schroef এবং bomba শব্দ থেকে।

ফরাসী শব্দের মধ্যে, শেমিজ' (chemise), 'কার্তুজ' (cartouche) এবং পরিবর্তিত আকারে 'কুরুশ' (crochet, কাঠির সাহায্যে বোনা জিনিস) বাংলায় সুপরিচিত। লেখবার টেবিলকে 'ইস্কাতর', আর জার্মান জাতিকে 'এলেমান' কোথাও কোথাও বলা হয়েছে, ফরাসী escritoire এবং allemande শব্দের অনুকরণে। তাছাড়া, এনকোর (encore), রুজ (rouge, লাল রং) রেনেসাঁস (renaissance) ইত্যাদি ফরাসী শব্দও বাংলায় কিছু কিছু চলে, যদিও এগুলিকে কেউ বাংলা শব্দ বলে মনে করেন না নিশ্চয়।

ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশের ভাষা থেকে আমরা পেয়েছি তিনটি শব্দ। তাদের লৌজি হয়েছে আমাদের 'লুঙ্গি', আর লুঙ্গি-শব্দটি 'লুঙ্গি'-রূপে কোনও কোনও অঞ্চলে প্রচলিত। 'মগ' জাতির নাম দেওয়া হয়েছে বর্মী মং-শব্দটি একটু বদলে নিয়ে। আরাকানের অধিবাসীরা নামের আগে মং কথাটা ব্যবহার করে, তাই গোটা জাতটারই নাম হয়েছে মগ। যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকায় বেশীর ভাগ ভারতীয়ই মাদ্রাজী এবং তাদের মধ্যে অনেকেরই নামের শেষে স্বামী-শব্দটা আছে বলে সেখানকার শ্বেতাঙ্গরা ভারতীয় মাত্রকেই বলে Sammy.

মালয় উপদ্বীপের ভাষায় 'কিরিচ' (kris) ইত্যাদি গুটি তিনেক শব্দ, এবং সিংহলী ভাষার 'বেরি-বেরি' (beri-beri, অতি দুর্বলতা) শব্দ বাংলায় চলে, কিন্তু সেগুলো বোধহয় সরাসরি আসেনি, ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়ে আমাদের হাতে পৌঁছেচে।

সুদূর চীনদেশ থেকে আমরা নিয়েছি 'চা' এবং 'সামপান' শব্দ দুটিকে, অপরিবর্তিত আকারে। কিন্তু চীনা শব্দ তাই-ফুং আর লি-চি রূপান্তরিত হয়েছে 'তুফান' আর 'লিচু' শব্দে। ইংরেজীতে এ দুটিকে বলে typhoon এবং lichi, তাই এ কথাও মনে হয় যে হয়তো শব্দ দুটি সরাসরি না এসে ইংরেজীর ভিতর দিয়ে এসে বাংলায় স্থান করে নিয়েছে।

জাপানী কয়েকটি শব্দও বোধহয় ঐরকম ঘুরপথে, এবং আধুনিক কালে, বাংলা ভাষায় এসে পড়েছে। আমরা 'রিকশা' (jinrikisha) চড়ি, 'জুজুৎসু'-র (ju-jutsu) প্যাঁচের কথাও আমাদের অপরিচিত নয়, 'হাসুনোহানা' ফুলই বা না চেনে কে? কিন্তু এগুলি যে আসলে জাপানী শব্দ, এমন সন্দেহ খুব কম লোকেরই হয়, নয় কি?

জাপানীরা অবশ্য হাসুনোহানা বলে পদ্মফুলকে, তা বলুক। আমরা শব্দটা নিয়েছি, ব্যস, ঐ পর্যন্ত। তা নিয়ে আমরা কি করবো, সেটা আমাদের অভিরুচি। ইংরেজী গিনী-শব্দটাও আমরা নিয়েছি। কিন্তু ইংরেজরা যাকে গিনী বলে, আমাদের গিনী তো সেটা নয়।

শুধু বর্ষেরই নয়, ভাষারও গতি সূক্ষ্ম—অনির্বচনীয়ও বটে।

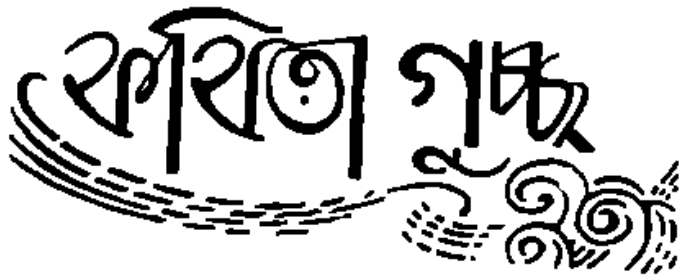

আজকে ভোরের গান

মানিক মুখোপাধ্যায়

আজকে ভোরের শিশির ভেজা ঘাসে
হারানো দিন হঠাৎ এলো ফিরে;
আবার কোনো পুরোনো গান
আকাশে ডানা মেলে
আজকে তাই হাওয়ার তালে এ মন চঞ্চল।

আজকে যেন তোমার পাশে
আকাশও পেলো মিল,
তোমায় নিয়ে পদ্মদীঘির ঢেউয়েরা উজ্জ্বল!

তোমার আলো ফিরেছে তাই মনের মুকুরে।
তোমায় নিয়ে আবারো তাই আবারো গান বাঁধি,
তোমার প্রেমে আনন্দ মদিরা;
আজকে ভোরের ফুলে ও ফলে
তোমার ছোঁয়া, তোমার আলো
অফুরন্ত উজ্জ্বল!...

তোমার গান বেজেছে এই ভোরের নূপুরে!...

তোমার জ্বর

অমলকান্তি ঘোষ

তোমার জ্বর,
চিঠি পেলাম।
(করব কী!)
তিন'শ মাইল লক্ষ যোজন দূর!

ওখানে তুমি নিঃসহায়,
জ্বরের মাঝে তৃষ্ণা পায়,
কে-ই-বা দেয় জল!
এখানে বসে শুধুই ভাবি,
সারাটা দিন শুধুই ভাবি,
সব-ই ত নিষ্ফল।

তোমার জ্বর,
চিঠি পেলাম।
করব কী!
আকাশ বৃথা প্রার্থনাতে ভরবো না।

তুমি ত জানো সবাই ওরা গড়লে হয় একত্র
অনেক উঁচু অনেক উঁচু দেয়াল ছাড়পত্র।

"চিরন্তনী"

শিপ্রা ঘোষ

ক্লান্তার্ত তাপিত রাত্রি—অন্ধকার নেমে আসে ধীরে,
সংসার-জনতা-মাঝে ব্যর্থতম জীবনের তীরে।
অগ্নিময়ী-বীণাতারে বেজে ওঠে কি অপূর্ব সুর,
কুহেলী-গুণ্ঠন তলে সুগভীর সরস মধুর।
প্রলয়ন্ধর-সিন্ধুবক্ষে তরঙ্গের ব্যথিত গর্জনে,
লীলায়িত-তনু কার নৃত্য করে অট্টহাস্য সনে,
অতল-অম্বর-লীলা মিশে যায় শ্রান্ত কলরোলে,
অনন্তের অনুভূতি জীবনের প্রতিছন্দে দোলে

ক্ষুব্ধ-তরঙ্গের-মত, দক্ষিণের উদ্‌ভ্রান্ত-সমীর,
পলাশ তরুর-মর্মে চঞ্চলতা হতেছে অধীর,
বনে বনে জাগে তাই বাতাসের নব-উন্মাদনা,
অনন্ত-কলের-বক্ষে বেজে ওঠে সকরুণ বীণা।
দিগন্ত-ললাটে জ্বলে চিরশুভ্র তারকার টিপ্,
প্রেয়সী-রাত্রির বুকে জ্বলে ওঠে কামনা-প্রদীপ।
সহস্র রাতের মাঝে ব্যর্থতম আজি এ রজনী,
পূর্ণতার-বক্ষে বাজে রিক্ততার সেই চিরন্তনী।

পাপিয়া

আনোয়ার হোসেন

কোন্ স্বপ্নপুরী হ'তে কবে কোন্ বিস্মৃত দিবসে
কণ্ঠ ভরি সুধা নিয়ে, পাখি তুই এসেছিলি নামি
ধরণীর কুঞ্জমাঝে ; তাই তব গানের পরশে
নিরন্তর ঝরে সুধা—চিত্ততায় মত্তদিবা যামি।
ভুলে যাই দুঃখ যত প্রাণে জাগে সুদূরের মায়া,
ধরিত্রীরে মনে হয় স্বপ্নময় যেন শুধু ছায়া !

(২)

আনন্দ উচ্ছল কাল কোথা হায় হোয়েছে বিলীন,
চঞ্চল যৌবন আজি ব'য়ে যায় বক্ষে জাগে আশা ;
পি-উ-পি-উ ছন্দে তোর প্রাণে মোর জাগে রাত্রিদিন
নব নব ছন্দ সুর আর জাগে অনন্ত পিপাসা ;
শুধু তাই শুধু জাগে—পাখি, তোর স্বপ্নোদীপ্ত গানে
আনাগী জীবনে মোর ছন্দ তৃষা জাগিবে কী প্রাণে ?

(৩)

মধুক্ষরা গানে তোর আজো কুঞ্জে চাহিরে উদাস
বিস্মৃতির বালাবেলা উঁকি মারে স্মৃতির দুয়ারে,—
সন্ধানিয়া তোরে যবে প্রাণে লয়ে প্রদুপ্ত প্রয়াস
কাননে কাননে কত ফিরেছিনু মিছে বারে বার ;
নিকুঞ্জে, হে-মধুকর। গাহ তবু অলক্ষ্যে ফিরিয়া,
আর মম চিত্তে জাগে আশাতৃষা তোমারে ঘিরিয়া।

(৪)

কল্পনা বিহগী তুই, কায়া কিম্বা আত্মাচিরন্তন,
কি নামে ডাকিব তোরে, রহস্য না শুধু সুর-শিখা
কোথায় বসতি তব, স্বপ্নময়ি কোন মায়াবন ?
মর্তের বেদনা ঊর্ধ্বে জ্বলে তব সুরের দীপিকা !
তব সুর মূর্চ্ছনায় কাঁপে কুঞ্জ রহিয়া রহিয়া,—
অমনি আনন্দে গানে যাবে কী এ-জীবন বহিয়া ?

[পূর্বানুবৃত্তি]

১৩

সুখ বস্তুটা সংসারে যুক্তি শান্তির মতই দুষ্প্রাপ্য। আমাদের হীরালাল এ কথাটা আজকাল কতক কতক বুঝিতে শুরু করিয়াছে।

অথচ, কিছুদিন আগেও যে অবস্থাটা সুখের সব প্রধান অন্তরায় বলিয়া বোধ হইয়াছিল সে অবস্থা এখন আর নাই। সে চাকরী পাইয়াছে। চৌধুরীর পরামর্শ ঠিক ঠিক খাটিয়াছে—কতকটা দৈববাণীর মতই। কাজও ভাল—বেতন আরও ভাল। মৃত্যুঞ্জয় একদা যে বেতনে কাজে ঢুকিয়াছিলেন তাহার চেয়েও পাঁচটাকা বেশী বেতনে সে বহাল হইয়াছে। সে জন্য মৃত্যুঞ্জয় লোকাভেই একটু ঈষিত যদিচ ভাগিনেয়কে একটু একটু যেন সমীহ করিয়া চলিতেছেন আজকাল। তবু হীরালালের মনে তেমন সুখ নাই।

প্রথমত মামার ঈর্ষ্যায় সে ব্যথিত—সে জন্য বেশ একটু অসুবিধাও বোধ করে। কারণ সময়ে অসময়ে কোথা দিয়া যে তাহার মর্মভেদী বাণ আসিয়া বেঁধে তাহার ঠিক নাই।

কিন্তু সেটাও বড় কথা নয়।

আসলে ইদানীং একটা চিন্তা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে তাহার জীবনধাত্রীর চিন্তা।

কে এই হুসেনী বেগম—বার বার নিয়তির মতই তাহার জীবনে আবির্ভূতা—হইতেছেন? এ কি সত্যই ঈশ্বরের অনুগ্রহ? তাহার মা প্রত্যহ মা কালীকে ডাকেন, তাঁহার পটের সামনে জবাকুল দিয়া অঞ্জলি দেন—আবার তুলসীতলাতেও নিত্য সন্ধ্যায় প্রদীপ দেন, নিত্য প্রত্যূষে জল দেন, মার্জনা করেন—এই দৈব অনুগ্রহ তাহারই ফল? এক এক বার এইটাই বিশ্বাস করিতে মন চায়—আবার সংস্কারাচ্ছন্ন চিত্তমন তাহার—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কুণ্ঠিত, সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। চিরু দেবীদের কোন অনুচরীকে মুসলমান মহিলারূপে কল্পনা করিয়া অপরাধ করিয়া ফেলিতেছে না ত? মা-কালীর কোন ডাকিনী যোগিনীকে কল্পনা করা হয়ত তত দোষের হইতেও পারে—কিন্তু এই দেবী প্রতিমার মত সুন্দরী মহিলার সহিত সে রকম যোগাযোগ ভাবিতেও ত ঠিক মন চায় না। এবং এই প্রসঙ্গে এমন কথাও তাহার মনে এক-এক সময় উঁকি মারে—এসব কথা মনের সুদূর কোণে উদয় হইলেও—তাহার দ্বারা হয়ত সে মুসলমানদের নবী বা পীরদের কাছেই কিছুটা অপরাধী হইয়া পড়িতেছে উহাদের দেব দেবী নাই, ঈশ্বর আছেন—আর আছেন পীররা,—এই কথাই সে জানে। মোট কথা তাহার অপরিপক্ক অপরিণত মনে প্রশ্নটা লইয়া অশান্তির অবধি নাই।

এই যখন অবস্থা—তখন সহসা, হীরালালের উপর

বুঝি ঈশ্বর প্রসন্ন হইলেন। মীরাট হইতে কতক গুলি মাল কানপুর স্যারিসনে পাঠানো হইবে, তাহার যাইবেই, একজন বাবুকেও যাইতে হইবে—এখান হইতে হিসাব বুঝিয়া লইয়া সেখানে বুঝাইয়া দিবার জন্য। জেনারেল সাহেব হঠাৎ হীরালালেরই নাম করিয়া বলিলেন। মেজর তাহাকে ডাকিয়া জেনারেলের ইচ্ছা জানাইয়া প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি যাবে ত? আপত্তি নেই?'

হীরালাল মনিবের এ ইচ্ছার মধ্যে ঈশ্বরেরই অনুগ্রহ দেখিতে পাইল। কিছুদিন ধরিয়াই সে ভাবিতেছিল যে যদি কখনও কানপুর যাইবার সুযোগ-সুবিধা মেলে ত সে একবার চন্দ্রেশী বিবির খোঁজ-খবর করিবে। সে অবশ্য তাঁহার ঠিকানা জানেনা, তিনি ঠিকানা দেনও নাই। কিন্তু তাহাকে যে সুপারিশ চিঠি পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আসিয়াছিল কানপুর স্যারিসন হইতে। কানপুর হইতেই সেই লোকটি আসিয়াছিল উক্ত চিঠি বহন করিয়া। সুতরাং মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা তাহার ছিল যে ওখানে গেলে একটা হদিশ হইলেও হইতে পারে। তবে সে সুযোগ যে এত শীঘ্র মিলিবে—তাহা ভাবে নাই। মনে মনে আর একবার সে মাকে তথা মা-কালীকে ধন্যবাদ জানাইয়া মুখে বলিল, 'নিশ্চয়ই সাহেব। মনিবের আদেশ পালন করতে আমি সর্বদাই প্রস্তুত।' সাহেব খুশী হইলেন। মাথা নাড়িয়া বলিলেন, ভাট্স্ গুড। ভাট্স্ প্রপার র‍্যাটিচুড্। অল রাইট্—তুম্ যাও, কাল সুবহ রওনা হোনে পড়েগা। তৈয়ার হো লেও।

...ইউ যে গো—চ্যাটার্জি!"

হীরালাল বাসায় ফিরিয়া দেখিল সংবাদটা তাহার আগেই পৌঁছিয়াছে। নরক গুলজার উঠিয়াছে। জেনারেল সাহেবের এই নির্বাচন পক্ষপাতেরই নামান্তর—অতএব চৌধুরীর যে বরাত ফিরিয়া গেল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এ পক্ষপাতের হেতু লইয়াই সকলে আলোচনা শুরু করিয়াছেন। কী সূত্রে কেন সে বড় সাহেবের নজরে পড়িল, ইহাই সকলে চিন্তা।

চৌধুরী বলিয়াছেন, 'অল্প বয়স, ছুটফুটে দেখতে, মন দিয়ে কাজ করে—তাই সাহেবের চোখে লেগেছে। এতে আর অত গভীর অর্থ খোঁজার কী আছে।

মুখুজ্জে মাথা নাড়িয়া বলিলেন 'রেখে ব'সো দিকি! তারী ছুটফুটে—সাহেবদের কাছে আবার বাঙালী ছুটফুটে।'

'না—মানে বাঙালী যারা আছে তাদের মধ্যে ত—'

'উঁহু—উঁহু অত সহজ নয় রে বাবা—আর কোন ব্যাপার আছে। সেই যে সাহেব ওকে চিঠি দিয়েছিল সে নিশ্চয়ই সাহেবের কোন প্রিয় বন্ধু!'

'তাতে কি? প্রিয়বন্ধু লিখেছে, চাকরী দিয়েছে। ফুরিয়ে গেছে ব্যাপার।' দত্ত মশায় বলিয়া উঠিলেন, 'তার জন্যে এ-রকম আ-দেখলে কাণ্ড করান কেন? আমরা এতগুলো লোক থাকতে—আমাদের ডিঙিয়ে ও—ছোকরাকে দেবার মানেটা কি? কী কাজ জানে ও, কতদিন এসেছে, বয়সই বা কত!...এখনও মুখে দুধের গন্ধ, উঁতুলতলায় গেলে গলায় দই বসে।' ...তাই কি ওরই লাভ হবে। এই যে যাওয়া, এর কতদিক থেকে কত উপরি রোজগার হ'তে পারে সে জ্ঞান ওর আছে? ওরও লাভ হবেনা—আমাদেরও লোকসান গেল।' সাক্ষাতে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন দত্ত মশাই।

'ও সেই মোচলমান মাগী।' হুঙ্কার ছাড়িয়া ওঠেন মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলী—'আসলে সেই মোছলমান মাগীর কাণ্ড, এটা বুঝলেনা বাপু? কে জানে সে বেটী কার কে, হয়ত জেনারেল সাহেবের সঙ্গেই তার আসনাই আছে।'

কিম্বা তাকে খুশী করলে জেনারেল সাহেবের লাভ। মোদ্দা—এই আমি বলে দিলুম। তা নইলে আমরা সব থাকতে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাবে কেন? এমন ডিঙিডাঙা আছেনা কাণ্ড বাপের জন্মে দেখিনি!... যদি কাজেরও জানেই বা কি, বোঝেই বা কি! কাজের দরকার থাকলে আমাদেরই বলত।'

সত্যই—একথাটা ত হীরালাল ভাবিয়া দেখে নাই।

তবে কি ইহার মধ্যেও সেই দেবীর কোন হাত আছে? তবে কি—তবে কি তাহারই আশা সফল হইতে চলিয়াছে?

এই যে বাপু নবাব সাহেব এসেছ। শোন এদিকে—শুনে রাখো।···যা বলছি মন দিয়ে শোন। হঠাৎ বড় সাহেবের নজরে পড়ে গেছ বলে যেন ওরাকে সরা দেখো না। ও আমরা অমন ঢের দেখলুম। আজ মুনজরে আছ, কালই হয়ত খুটের ঠোক্কর মারবে। কথাতেই বলেছে 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ—ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।' কাজেই এখন যা বলি মন দিয়ে শুনে রাখো। যখন দিন দিয়েছেন ভগবান দিন কিনে নাও!

এই বলিয়া মৃত্যুঞ্জয় বিস্তৃত এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নির্দেশ দিতে লাগিলেন: কোন বস্তুর চোরাবাজারে কী মূল্য; কোন্ বস্তু কীভাবে সরাইতে হয়; সাহেবদের হিসাব বোঝানো কত সোজা; হিসাবের মার প্যাঁচ কত প্রকারের হয়; মালের রক্ষকদের সহিত কী বন্দোবস্ত; কতর বেশী ভাগ দিলে বাজার খারাপ হয়—ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিতে দিতে রাত্রি ঘনাইয়া আসিল। অন্য বাবুরা পূজা আহ্নিকে চলিয়া গেলেন। সর্বশেষে সর্বাধিক মূল্যবান উপদেশটি দিলেন—টাকা কড়ি উপরি যা করবে নিজের কাছে রেখো না, ধরা পড়লে বিপদ। আমার কাছে রেখে দিও। মারা ত যাবে না।

তাহার পর কণ্ঠস্বর আর এক পর্দা চড়াইয়া বলিলেন খাওয়া দাওয়াটি খুব সাবধান বাপু। দুটো পয়সা রোজগারের অঙ্কে বিদেশে এসেছ; তাই বলেই যে জাত-ধর্ম খোয়াতে হবে, তার কোন মানে নেই।··· হিন্দু সেপাইদের অঙ্কে রান্না হবে বটে, তা তাদের সঙ্গেও না-ইবা খেলে। নিজে দুটো ভাতে ভাত গাছ-তলায় ফুটিয়েই খেও। বলে ত বামুন—ও বেটাদের কি জাতের ঠিক আছে। বিশ্বাস ত হয় না।

এই বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

'শ্রীহরি! শ্রীহরি। পরমানন্দ মাধব।···নাও, তুমিও এবার মুখহাত ধুয়ে সন্ধ্যেটা সেরে। তোমাকে আবার রাতের মধ্যেই গোছগাছ করে নিতে হবে তো। যাই আমিও পুজোয় বসিগে। তোমার সঙ্গে বকতে বকতে বাপু সন্ধ্যে হয়ে গেল। এখন আর পুজো না সেরে দুটো খেতে পারবো না। জয় মা!

তিনি চলিয়া গেলেও হীরালাল বসিয়া রহিল। কত কী ভাবিতে লাগিল বসিয়া বসিয়া। নূতন কাজ নূতন কর্তব্য। একদিকে গুরুজনের অসাধু উপদেশ আর একদিকে অন্তরের উচ্চ আদর্শ—যার নির্দেশ—অধর্ম ক'রোনা কখনও, সত্যপথে থাকবে, অধর্মের পয়সা কখনও থাকে না! নূতন দেশ দেখার মোহ, তাও কতকটা আছে বৈ কি। আর আছে তার সঙ্গিত—একটা আশা। হয়ত এবার সে তার জীবনযাত্রীর দেখা পাইবে আর একবার।

খড়মে খটাখট শব্দ তুলিয়া পট্টবস্ত্রপরিহিত মুখুজ্জে বাহির হইয়া আসিলেন, কহিলেন, কী বাবাজী এখনও ওঠোনি। নাও সন্ধ্যেটা সেরে। একটু দুধ আর মোহনভোগ মুখে দাও। তোফা মোহন ভোগ করেছে ঠাকুর।...

তাহার পর এদিক ওদিক চাহিয়া গলাটা নামাইয়া বলিলেন, মাটনেই বলো, আর উপরিই বলো—মামার হাতে যেন ভুলেও ধরে দিও না। যা পাবে নিজের কাছে রাখবে, নয়ত আজকাল ডাকে দিব্যি যাচ্ছে—পাঠিয়ে দেবে। নইলে এদেশের বেনিয়াদের গদীতে জমা দিয়ে হুণ্ডী নেবে। মামার খপ্পরে পড়েছ কি গিয়েছ। সে পয়সার মুখ আর দেখতে হচ্ছে না।

এই পর্যন্ত বলিয়া আবার ও এদিক ওদিক দেখিয়া লইলেন তিনি, তাহার পর গুনগুন করিয়া একটি টপ্পা গাহিতে গাহিতে নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। হীরালাল উট্টিল বটে, তবে তাহার তখন অভিভূতের মত, মোহাবিষ্টের মত অবস্থা। এক একবার সকলের অজ্ঞাতসারে মাথাটা ঝাঁকি দিয়া দেখিল, সে প্রকৃতিস্থ আছে ত?

পরের দিনই যাত্রা শুরু হইল। কিছু জরুরী মাল আছে, নৌকায় বা বলদে টানা গাড়ীতে পাঠানো চলিবে না। ঘোড়ায় টানা মালগাড়ীতেই পাঠানো সাব্যস্ত হইয়াছে। মালের সহিত আটজন সিপাহী এবং একজন সার্জেন্ট যাইবে। তাহারাও ঘোড়ায় চড়িয়া যাইবে। হীরালাল ঘোড়ায় চড়িতে জানে না—মেজর হুকুম দিয়াছেন সে একটি মালের গাড়ীতে চালকের পাশে বসিয়া যাইবে। হীরালাল বাঁচিয়া গেল, তবে তাহার সঙ্গে যে সার্জেন্ট যাইতেছিল সে সাহস দিয়া বলিল—'ডোনট্ ফিয়ার বাবু, হাম্ তুমকো তিন রোজমে শিখলায় দেগা। সমঝা?

হীরালালও প্রতিজ্ঞা করিয়াছে সার্জেন্ট সাহেবের এই অনুগ্রহ সে অবহেলা করিবে না, ঘোড়ায় চড়াটা সে শিখিয়াই লইবে।

যাত্রার প্রথম কয়েকদিন কতকটা একঘেয়ে ভাবেই কাটিল। প্রত্যূষে যাত্রা শুরু হয়—বেলা দ্বিতীয় প্রহর পর্যন্ত একটানা গাড়ী চলে। তাহার পর একস্থানে গাড়ীর বোঝা খোলা হয়। পরেই সহিস পাওয়া যায়—তাহারা ঘোড়াদিগকে আহার ও বিশ্রাম করাইয়া স্নান করে। সিপাহীরাও দুই দলে রন্ধন করিতে বসে। মুসলমান সিপাহীদের সহিত সার্জেন্ট ও আহার করে, হীরালাল পড়িয়াছে হিন্দুর দলে। মায়ার নির্দেশ সে রাখিতে পারে নাই—রাখিতে চাহে ও নাই। সিপাহী রামলগন তেওয়ারীকে তাহার মায়ার অপেক্ষা শুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়াই বোধ হইয়াছে। তাহার কাছে আহারে আপত্তি কি? রামলগনেরই বরং ঘোড়ার দিকে আপত্তি ছিল। কারণ একে সে মগধী খোর বাংগালী তায় সে আবার 'চাওল' বা ভাত খোর। তাহার জন্য ভাত ফুটাইতে হয়। সে গজ গজ করিত। সার্জেন্টের শাসনে ও হীরালালের বিনত ব্যবহারেই সে রাজী হইয়াছিল। আহার বলিতে ডাল আর ভাত এবং একটা আলুর তরকারী—কিন্তু তাহাতে হীরালালের বিশেষ আপত্তি ছিল না।

আহারাদির পর তৃতীয় প্রহরে আবার গাড়ী ছাড়া হয়। রাত্রির প্রথম প্রহর পর্যন্ত চলিয়া অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে—মিলিটারী ঘাঁটি বা কোন থানায়—পৌঁছিলে তবে যাত্রা বিরতি ঘটিত। তখন আবার সেই ঘোড়ার পরিচর্যা, আহার প্রস্তুত এবং শয়ন। এই চলিতেছিল।

অকস্মাৎ একটু বৈচিত্র্য দেখা দিল পঞ্চম দিনে মেচ্* পৌঁছিয়া। সন্ধ্যার পর আসিয়া ঘাঁটিতে পৌঁছানো হইয়াছে। প্রাথমিক ব্যবস্থাদির পর হীরালাল নিশ্চিন্ত হইয়া একটা গাছতলায় আশ্রয় লইয়াছে, অর্থাৎ কম্বলখানা বিছাইয়া সটান হইয়া শুইয়াছে। সারাদিন গাড়ীর চালে বসিয়া কোমরের যা অবস্থা হয় তাহা অবর্ণনীয়। এখন ভুক্তভোগীও কেহ নাই যে বুঝিবেন। তখন পাকা সড়ক বলিতে কিছু খোয়া বা পাথর বিছানো রাস্তা বোঝাইত—তাহার উপর দিয়া লোহা বাঁধানো চাকা গড়াইয়া আসার সময় যে ঝাঁকানী লাগে তাহা এখনকার পীচ্ বাঁধানো পথে রবার-টায়ার চালার চড়িয়া অনুমান করা সম্ভব নহে। হীরালাল সারাদিন ধরিয়া এই মুহূর্তটিরই স্বপ্ন দেখে—কখন কোমরটা সোজা করিয়া গড়াইতে পারিবে।

অতদিন এইভাবে শয়নের সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুম পায়। আজ কে জানে কেন পায় নাই। সে শুইয়া শুইয়া অলসভাবে চাহিয়াছিল দূরের বড় আমগাছটার তলায় যেখানে সিপাহী রামলগন তেওয়ারী রান্না চড়াইয়াছে এবং গলানন্দন চৌবে আটা সানিতেছে সেইদিকে। অকস্মাৎ লক্ষ্য করিল অন্ধকারে ছায়া মূর্তির মত আর দুটি তিনটি লোক তাহাদের কাছে আসিয়া বসিল। চেনা লোক এবং স্বজাতি নিশ্চয়, নহিলে বিনা প্রতিবাদে রসুইকার কাছে থাকিতে দিবার কথা নয়। সুতরাং হীরালালের তখন কোনও কৌতূহল হইল না। লোকগুলি অনেক ক্ষণ ধরিয়া এই দুইজনের সহিত 'বাত চীত' চালাইল কিন্তু খুব নিম্নস্বরে। খুব কাছে না হইলেও—হীরালাল

* বর্তমান নাম হাথরাস।

খুব ঘুমেও ছিল না, তবু একটা শব্দও সে শুনিতে পাইল না, একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন ছাড়া। সেদিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার চোখের পাতা অবশেষে বুজিয়াই আসিল।...

একেবারে খুব তাড়িল আহারের ডাক আসিতে। দূরে মুসলমান সিপাহীদেরও খানা তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে, একটা চাদর বিছাইয়া তাহারাও আহারে বসিয়াছে—সার্জেন্টের দেখা নাই, সে এখানেই কোথায় শৌণ্ডিকালয় আবিষ্কার করিয়াছে সুতরাং অচিরে ফিরিবার আশা কম। তাহার রুটি ও কাবাব সরানো আছে।...হীরালাল দূর হইতে তাহাদের খাওয়া লইয়া আমগাছতলায় আসিয়া আহারে বসিল। খানার আশ পাশে এক এক লোটা ছিল। লোটা লইয়া একটু দূরে গিয়া চোখে মুখে জল দিয়া আসিল। গাড়ী হইতে নামিয়াই মুখ হাত ধুইয়া সন্ধ্যা গায়ত্রীটা সারিয়া লইয়া ছিল—কিন্তু কাপড় ছাড়া হয় নাই। এত কাপড় ঘুসাফিরিতে কাচা ও শুকানো অসম্ভব। প্রত্যুষে সকলের সঙ্গে সেও স্নান করিয়া যাত্রা করে—পথে যাইতে যাইতেই ভিজা কাপড় শুকানো চলে। ওসব আর বার বার সম্ভব নয়।

আহারে বসিবার সময় পর্যন্ত ঘুমটা ভাল করিয়া ছাড়ে নাই, খানিক পরে ছাড়িল। দৃষ্টি পরিষ্কার হইলে দেখিল তাহার অদূরে বসিয়া যাহারা খাইতেছে তাহাদের মুখভাব অস্বাভাবিক গম্ভীর। কারণটা বুঝিতে না পারিয়া সে রুটি চিবাইতে চিবাইতে বার-বার সেদিকে তাকাইতে লাগিল (রাত্রে কেহ আর ভাতের হাঙ্গামা করে না তাহার জন্য অনত্যন্ত রসনায় রুটি চিবাইতে বহু বিলম্ব হয়) কিন্তু তবু ওপক্ষ হইতে হইতে কোন সাড়া আসিল না। অবশেষে অনেকক্ষণ পরে রামলগন গুরুতা ভঙ্গ করিয়া নীচু গম্ভীর গলাতেই বলিল, বাংগালী বাবু—এক বাত! লেকিন কসম খাও পহ্‌লে কোইকো বোলোগে নেহি।

উৎসুক—কিছু বা উৎকণ্ঠিত ভাবেও—মুখ তুলিয়া চাহিল হীরালাল। মাথা নাড়িয়া খুসি সম্মতি জানাইল তখন গলাটা সাফ করিয়া লইয়া রামলগন আসল কথাটা পাড়িল।

ভারতের সিপাহীরা সব মন স্থির করিয়াছে—তাহারা আর বিধর্মী ইংরাজের শাসনে থাকিবে না। আকাশের থমথমে ভাব দেখিয়া কিছু বুঝা যাইতেছে না কিন্তু শীঘ্রই ঝড় উঠিবে—

নিঃশব্দে অলক্ষ্যে তাহার আয়োজন চলিয়াছে সে মহাপ্রলয়ে ক্রিস্তান কেহ ভারতে থাকিবে না ইহা একেবারে নিশ্চিত। এখন কথা হইতেছে যে সে রকম সময়ে বাংগালী বাবুরা কী করিবে—সিপাহীদের দিকে যোগ দিবে না বেইমানী করিবে?

কথাটা এতই অবিশ্বাস্য—অন্তত হীরালালের কাছে যে সবটা মাথার মধ্যে ধারণা করিয়া লইতে কিছু সময় লাগিল। তাহার পর মুখের খাদ্যটা যত শীঘ্র সম্ভব গলাধঃকরণ করিয়া কহিল কিন্তু এইটেই যে বেইমানী!

'কোন্‌টা?'

'এই আংরেজদের সঙ্গে লড়াই করাটা।

'কেন?'

'আমরা তার নিমক খাই। মাইনের চাকর।

সে মাইনে তারা কোথা থেকে দেয়?...তারা বেইমানী করে এদেশের রাজগী নেয়নি? তারা কি করতে এসেছিল? মুঘলদের কাছ থেকে ভিক্ষে করে একটুকরো জমি নিয়ে দোকান খুলতে? বেইমানদের সঙ্গে আবার ইমান্দারী কিসের? গঙ্গানন্দন বেশ বক্তৃতার ভঙ্গীতেই বলিল।

হীরালাল খানিকটা চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর কহিল, সে বিচার ভগবানের। কিন্তু আমরা ওদের চাকরী করি আমরা ওদের নিমক খাই এটা ত ঠিক? আমরা কেমন করে নিমকহারামী করব?

'তাহলে তোমরা কেউ আমাদের দিকে আসবে না? দুষমনী করবে?

সকলের কথা কেমন করে বলব? তাছাড়া তোমাদের দিকে না এলেই বা দুষমনী করব কেন? কিন্তু মনে মনে ইচ্ছা থাকলেও···তোমরা ত মহাভারত পড়েছ, স্বয়ং ভগবান কি পাণ্ডবদের ভালবাসতেন না? রাজত্ব ত তাদেরও—কিন্তু তবু দুর্যোধনের কাছে বেতন নিয়েছিলেন বলে তার হয়েই লড়াই করতে হোল, পাণ্ডবদের দিকে যেতে পারলেন না।

'তবে?'

বোঝা গেল ইহারা মহাভারত পড়ে নাই, অথবা তাহাকে প্রামাণ্য বলিয়া মনে করে না। সুতরাং সে কথায় তাহারা বিশেষ আমল দিল না। বরং আপোষে গুজ গুজ করিয়া বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই কী সব বলাবলি করিতে লাগিল। তাহার মধ্য হইতে 'ডসুট' 'বেইমান' 'বেসরম' প্রভৃতি বিশেষণগুলি মাত্র হীরালালের কানে গেল। সে গোলমাল করিল না, করিয়া লাভও নাই, ইহারা পাঁচ জন আর সে একা—সুতরাং নীরবে বসিয়া বাকী আহারটুকু সম্পূর্ণ করিয়া লইল। একেবারে লোটা ও থালা হাতে যখন সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন রামলগন আবার কথা বলিল—দেখো কসম খেয়েছ মনে রেখ। কথাটা কাউকে বলবে না। আর যদি বলো ত তোমার জানের কোন দাম থাকবে না হুশিয়ার।

হীরালাল বলিল দোস্তির এটাই যে বড় কথা তা জানি ভাই চুকলি খাব না কিছুতেই আমি। কিন্তু তোমরা কথাটা ভেবে দেখ এখনও।

বহুত ভেবে দেখেছি আমরা। এখন তোমরা আসলে তোমরা ভীরু—তাই সাহেবদের সঙ্গে লড়াই শুনলেই কাঁপো—কেমন করে গোলমালটা এড়াবে তাই ভাবতে বসো। একজন টিটকারী মারিয়া বলিল।

থালা মাজিয়া থালা ও লোটা জমা করিয়া দিয়া হীরালাল আসিয়া নিজের আসনে বসিল। এখনও ঠাণ্ডা বেশ—ঘরেই শয়নের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু সে তখনই কম্বল গুটাইল না—সেইখানেই বসিয়া বসিয়া কত কী ভাবিতে লাগিল।

একটা গোলমালের আভাস সে মীরাটেই পাইয়াছিল সাহেবদের চোখে মুখে বাবুদের কথার টুকরায়। কিন্তু সেটা যে এত আসন্ন এবং এমন অবশ্যম্ভাবী তাহা ত কল্পনাও করে নাই।

অনেকক্ষণ সেই ভাবে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল সে—তবু তাহার ক্লান্ত দেহে তন্দ্রার আভাস পর্যন্ত নামিল না।

১৪

আর ও দিন তিনেক পরে কানপুর পৌঁছিবার মুখে এক অঘটন ঘটিয়া গেল।

আর মাত্র একদিনের পথ তখন বাকী। আগামী কালই মধ্যাহ্নে কানপুর পৌঁছানো যাইবে ভাবিয়া হীরালালের মনটা খুশী। ফেরার মুখে দাস্তিক থাকিবেনা—ক্লান্তিও কম হইবে। খালি গাড়ী অনেক দ্রুত টানিয়া লইয়া যাইবে ঘোড়ারা। সেখানে ফিরিয়া অবশ্য অদৃষ্টে দুঃখ আছে, কারণ উপরি সম্বন্ধে মাথার উপদেশ নির্দেশ একটাও সে কাজে লাগাইতে পারে নাই। সিপাহীরা উসখুস করিয়াছে, তাহার জন্যই তাহারাও ফাঁকে পড়িয়াছে—ফলে আরও বেশী রকম বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহার উপর, তাহাও সে জানে, তবু পারে নাই। তা না হোক—মাথার তিরস্কার একরকম গা-সাওয়াই হইয়া গিয়াছে—তাহা আর বেঁধেনা—বিবেকের তিরস্কার আরও সাংঘাতিক। সেটার হাত এড়াইতে পারিয়াছে, এই জন্যই সে কতকটা তবু নিশ্চিন্ত।

যাহা হউক—সে-রাত্রে সে একটু হাল্কা মনেই ছিল। ঘোড়া খোলা হইলে মালের পাহারা ঠিক আছে কিনা দেখিয়া সে নিজের বোঁচকা-বুঁচকি সিপাহীদের কাছে রাখিয়া গুন গুন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে বাহিরে আসিল এবং লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরিতে ঘুরিতেই

ডাকখানার পাশের বিরাট আমবাগানটায় ঢুকিয়া পড়িল। অন্ধকার রাত ঠিক নয়—শুক্লপক্ষের প্রথম দিক। তবে অস্তগামী চাঁদের লালচে আলো তখনও আমগাছগুলির—ডগায় লাগিয়া আছে—ফলে বাগানের মধ্যে পায়চলা-পথ বেশ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। হাঁটিতে কোন অসুবিধা নাই। তাছাড়া এদেশের লোক আমবাগানেরও 'পাট' করে—অযত্নের উপর ছাড়িয়া রাখেনা—ফলে গাছ-তলাগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘাস পাতার চিহ্ন মাত্রও নাই। ঘনপল্লব গাছগুলির পাতার ফাঁক দিয়া দুই-এক জায়গায় প্রতিফলিত আলোতেই চমৎকার আলো-আঁধারির সৃষ্টি করিয়াছে। হীরালালের তরুণ মন এখনই একেবারে টাকা-আনা পাইয়ের মধ্যে নিজের সমস্ত কিছু বাঁধা দিয়া বসে নাই—তাই প্রকৃতির বিচিত্র রূপ আজও তাকে আকৃষ্ট করে, আজও সে প্রতিদিন সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের সময় বিস্মিত, উন্মনা হইয়া ওঠে।

সেদিনও এই আম্রবীথির মধ্য দিয়া এ নিঃসঙ্গ অনর্থক ঘুরিয়া বেড়াইতে ভারি ভাল লাগিতেছিল। এমন কি এক সময় তাহার নিজের কণ্ঠের গুনগুন সঙ্গীতও কোলাহল বলিয়া বোধ হইল। চারিদিকের নির্জন নিস্তব্ধতার সহিত নিজেকে একাত্ম করিতেই বুঝি সে চুপ করিয়া গেল এবং নিঃশব্দে লক্ষ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।.....

এই ভাবেই কতক্ষণ যে ঘুরিয়াছে তাহার নিজেরই খেয়াল নাই, অকস্মাৎ তাহার খুব কাছে—একেবারে পিছনেই মৃদু পদশব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। মুখ ফিরাইতে দেখিল কে একজন মানুষই বটে—তবে অবস্থায়া অন্ধকার—ভাল করিয়া কিছুই ঠাওর হইল না। সে ভাবিল যে সে বুঝি এমনি অনেকক্ষণ বেড়াইয়াছে, ইতিমধ্যে সিপাহীদের খাওয়া প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে, তাই বুঝি তাহারা ডাকিতে আসিয়াছে।

সে বলিল, 'কে ভাই রামলগন?'

সাড়া মিলিল না। যে আসিতেছিল সে গতি কমাইলেও সোজা তাহার দিকেই আসিতেছে।

'গঙ্গানন্দন?'

সাড়া নাই।

'আশরফীলাল?'

তবুও সাড়া নাই।

অকস্মাৎ গা-টা ছমছম্ করিয়া উঠিল। চোর ডাকাতও হইতে পারে—তবে তাহার কাছে কী-ই বা আছে, চোর ডাকাত কেন পিছু লইবে? যা সামান্য কাপড় চোপড় তা-ও ত ডাকখানার সিপাহীদের জেম্মাতে। তবে? তবে কি 'ওরাদের' কেহ?...না, এত নির্জনে অন্ধকার বনপথে থাকাটা তাহার ঠিক হয় নাই। ...দেখিতে দেখিতে গলাটা শুকাইয়া উঠিল। গায়ত্রী জপ করিলে নাকি এরূপ অবস্থায় সুরাহা মিলে—অন্তত একথাটা সে বহুবার বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে শুনিয়াছে কিন্তু অদৃষ্ট এমনই খারাপ—ঠিক এই মুহূর্তে—তাহার গায়ত্রীও মনে পড়িলনা।

কিন্তু এসব চিন্তায় তাহার কয়েক মুহূর্তের বেশী যায় নাই। এদিকে যে আসিতেছিল অমোঘ নিয়তির মতই সে একেবারে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষীণ পাণ্ডুর প্রেতাত্মা—কিন্তু তাহারই অস্পষ্ট আলোতে যতটা চোখে পড়িল তাহাতেই হীরালালের হাত পা হিম হইয়া আসিল। তাহার সন্দেহই ঠিক। এ কোন অপদেবতা। সাধারণ ভূতও নয়—খারাপ রকমের কোন প্রেত। কারণ যে আকার ধারণ করিয়া আসিয়াছে সে—সেটা দৈত্যাকৃতি। দীর্ঘমূল দেহ, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, একরাশ দাড়ি গোঁফ এবং ক্ষুদ্র চোখের মধ্যে ভয়ঙ্কর দৃষ্টি (এটুকু হীরালালের অনুমান)। সে যে কেন সেই মুহূর্তেই তাহাকে ধরিয়া ঘাড়টা মটকাইয়া দিলনা তাহা বুঝিতে না পারিয়া শুধু তাহার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল সে।

কিন্তু অপদেবতাই হউক আর যাহাই হউক যে, আসিয়াছিল সে মানুষের মতই কথা কহিল। বরং আকৃতি হিসাবে কণ্ঠস্বরটা যেন কিছু মোলায়েমই শুনাইল। বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানীতে প্রশ্ন করিল,'আপনিই হীরালাল বাবু?

হীরালালের কাছে ইহা অধিকতর বিস্ময়। উপর্যুপরি বিস্ময়ের আঘাতে সে তখন হতভম্ব। কোনমতে মাথা নাড়িল। সে মাথা নাড়া তাহার চোখে পড়িল না: সে কিছু অসহিষ্ণু ভাবেই বলিল, 'হীরালাল চাটার্জ্জী আপনি?'

এতক্ষণে কণ্ঠে স্বর ফুটিল—হাঁ।'

'ঠিক চলেছে। আমার সঙ্গে আসুন।'

'কো-কোথায় যাবো?' কোনমতে প্রশ্ন করে হীরালাল।

'মালেকান আপনাকে ডেকে নিয়ে যেতে বলেছেন।'

'কে' কে বলেছেন?'

'মালেকান হুশেনী বেগম সাহেবা।'

একসঙ্গে বুঝি মনের সেতারে সবকটি ঝঙ্কারে ঘা পড়িল। হীরালালের মনে হইল সে চীৎকার করিয়া ওঠে।

'হুশেনী বেগম? হুশেনী বিবি?'

'হাঁ। হাঁ—তিনিই।' একটু অসহিষ্ণু ভাবেই উত্তর দেয় লোকটা।'

'তিনি—মানে তিনি এখানে?'

'হাঁ—হাঁ।'

'কোথায়?'

দূরে একটা ক্ষীণ আলোর দিকে আঙুল দেখাইয়া কহিল, 'এই বাগানের বাইরে ঐখানে একটা বাড়ীতে তিনি অপেক্ষা করছেন।'

'চলো।'

হীরালাল সাগ্রহেই লোকটার সঙ্গে চলিল। কোন বদ মতলবে কেহ তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া যাইতে পারে একথাটা একবারও তাহার মাথাতে গেলনা —কারণ তাহার এতকী দাম? তা ছাড়া হুশেনী বিবি বা হুশেনী বেগমের নাম গত কয়েকদিন ধরিয়া বলিতে গেলে সে জপ করিয়াছে; হুশেনী বিবির দেখা মিলিবে এ সম্ভাবনা ছিল একেবারেই সুদূর। কানপুর বিরাট সহর—সেখানে শুধু হুশেনী বেগম বলিলে কে তাহাকে সন্ধান দিবে?.....এসব প্রশ্ন বার বারই তাহার মনে জাগিয়া তাহাকে নিরুৎসাহ করিয়াছে। সেই হুশেনী বেগম অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহাকে নিজে আসিয়া দেখা দিবেন—এ যে তাহার স্বপ্নেরও অগোচর। অত্যধিক আগ্রহে কোন একার অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার একটি কথাও তাহার মনে জাগিলনা। সে সেই জীবন্ত দানবটার পিছু পিছু যথাসম্ভব দ্রুতই চলিতে লাগিল।... আম বাগান পার হইয়া সংকীর্ণ একটি রাস্তা, তাহারই উপর একতলা খাপড়ার চালের একটি এদেশী বাড়ী—অর্থাৎ জানলা-হীন গারদখানার মত পদার্থ একটা। বাড়ীটির সামনে পাঁচীল দেওয়া একটি 'হাতা'বা খালি জায়গা—পড়িয়া আছে। ফটক দিয়া সেই হাতাতে ঢুকিতেই নজরে পড়িল বহমূল্য জেনতেটের ঘেরাটোপ দেওয়া একটি ডুলি, তাহার চারিজন বাহক ডুলিটার মতই নিশ্চল নিস্তব্ধ ভাবে— অপেক্ষা করিতেছে। অর্থাৎ মালেকানের এটা বাসস্থান নয়—তিনিও এখানে আগন্তুক।

বাড়ীটা খাঁ খাঁ করিতেছে, একান্তই জনহীন পোড়ো বাড়ী বলিয়া মনে হয়। শুধু বারন্দার সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া সামনেই যে ঘরটা তাহারই ভিতর আলো জলিতেছে। সেই আলোটাই বাগান হইতে নজরে পড়িয়াছিল।

পথপ্রদর্শকের নির্দ্দেশ ক্রমে সিঁড়ি দিয়া উপরে হীরালাল সেই ঘরজাটার সামনে থমকিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে যিনি ছিলেন তাঁহাকে দেখা গেলনা। কিন্তু তিনি তাঁহার উপস্থিতি টের পাইলেন। বলিলেন, 'এসো—ভেতরে এসো।'

ঘরে একটা কুলুঙ্গীতে জোড়া মোমবাতি জলিতেছে তাহার আলো খুব বেশী না হইলেও কিন্তু অন্ধকার হইতে আসায় হীরালালের কাছে উহাই যথেষ্ট উজ্জ্বল লাগিল। এক লহমা চাহিয়াই সে বুঝিল তাহার অনুমানই ঠিক— বাড়ীটা পোড়ো বাড়ীই। বহুকাল হইতেই খালি পড়িয়া আছে নিশ্চয়—ঘরের মেবেতে পুরু হইয়া ধুলা জমিয়া আছে। সে ধুলা কেহ পরিষ্কার করিবারও চেষ্টা করে নাই। ঘরে আসবাব পত্রও বিশেষ নাই মাঝখানে একটা খাটিয়ার উপর কে একটা ছোট জাজিম বিছাইয়া

দিয়াছে, তাহারই উপর, খাটিয়ার একদিকের কাঠে সোজা হইয়া সন্তর্পণে বসিয়া আছে হুসেনী বেগম। আর ঠিক তাহারই সামনা সামনি—একটা কাঠের বাক্স, তাহার উপরও সাদা চাদর পাতা। সেই অধিতীয় আসনটিই আঙুল দিয়া দেখাইয়া মধুর হাস্যে ও মধুর কণ্ঠে হুসেনী বলিল, 'ঐটেতেই বসো—আর ত জায়গা নেই!'

যে দৈত্যটা পথ দেখাইয়া আনিয়াছিল সে আর ভিতরে ঢুকে নাই—অন্ধকারকে যেন গাঢ়তর করিয়াই বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে উদ্দেশ করিয়া হুসেনী কহিল, 'সর্দার—তুই বাইরে থাক, আর দোরটা ভেজিয়ে দে। কেউ যেন না ভেতরে আসে।'

একখানা হাত শুধু ভিতরে আসিয়া কপাটের দুটি পাল্লাই টানিয়া বন্ধ করিয়া দিল। নির্জন ঘরের মধ্যে রহিল শুধু হীরালাল ও হুসেনী বেগম।

'কৈ বসো। বসছনা কেন?' অমন ক'রে অবাক হয়ে তাকিয়ে কী দেখছ?'

হুসেনীর কথায় হীরালালের যেন চমক ভাঙিল। সত্যই সে বড় অভদ্রের মত তাকাইয়া আছে। কিন্তু না তাকাইয়াই উপায় কি? ছিল। হুসেনীকে সে ইহার আগে আর একবার মাত্র দেখিয়াছে —কিন্তু তখন ভাল করিয়া দেখিবার মত অবস্থা বা মনোভাব ছিলনা। সাধারণ সুশ্রী চেহারার একজন মহিলা—এই পর্যন্ত একটা ধারণা ছিল। সে যে এমন অসামান্য সুন্দরী, এমন অসাধারণ লাবণ্যবতী—তাহা যেন সে এ-ই প্রথম দেখিল। সে রূপ আর সে রূপসজ্জা অতিভূত করিয়া দেওয়ার মতই। সুতরাং হীরালালকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না।

হীরালাল আত্মসম্বরণ করিয়া চোখ নামাইল, তাহার পর নমস্কার করিবে কি সেলাম জানাইবে আজও তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া দুটার মাঝামাঝি একটা ভঙ্গী করিয়া বাক্সটার উপর গিয়া বসিল।

হুসেনী আবারও হাসিল। মধুর—অতল তরা হাসি। 'কী বাবুজী, আমাকে চিনতে পারো?'

নিমেষে কত কি উত্তর ভীড় করিয়া হীরালালের কণ্ঠে ঠেলাঠেলি লাগাইয়া দিল। সে যেন চিৎকার করিয়া বলিতে চাহিল, 'চিনতে? আপনাকে চিনতে পারবনা। তবে দিনরাত কাকে ধ্যান করছি এত কাল? যার দয়ায় আজও বেঁচে আছি, যে আমাকে দু-দুবার প্রাণে বাঁচিয়েছে—তাকে চিনতে পারবনা? আপনাকে কি ভোলা সম্ভব?' কিন্তু কেমন একপ্রকার সঙ্কোচ তাহার কণ্ঠ রোধ করিয়া ধরিল। এসব কিছুই বলা হইল না। শুধু নীরবে ঘাড় নাড়িল মাত্র।

'আমার লোক মীরাটে যে চিঠি তোমাকে পৌঁছে দিয়েছিল তাতে কাজ হয়েছে কিছু? না, আগেই নৌকরী পেয়ে গিয়েছিলে?'

'না।' এতক্ষণে গলার স্বর ফুটিল, 'আপনার চিঠি না গিয়ে পৌঁছলে কিছুই হ'ত না।' তাহার পর কেমন একটা অসংলগ্ন ভাবে বলিয়া উঠিল, 'আমি—আমি সেদিন হতাশ হয়ে গঙ্গায় ডুবে মরতে যাচ্ছিলাম।'

খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল হুসেনী। তাহার পর একটা চু চু শব্দ করিয়া কহিল, 'এত ছেলে মানুষ তুমি। দুদিন এসে চাকরী পেলেনা ত গঙ্গায় ডুবে মরতে হবে।...তোমাদের বুকের ছাতি বড় ছোট। ছিঃ। পুরুষ মানুষ, কত কীই ত করবার আছে। ক্ষেতে কাজ করে, দোকান দিয়ে, পাথর ভেঙে—কত রকমে অন্ন সংস্থান করতে পারতে। দরকার হ'লে এক্কা হাঁকাতে —তাতেও সরম ছিলনা। আংরেজের নৌকরীতে এত সুখ তোমাদের? ছিঃ।

হীরালাল অধোবদনে বসিয়া রহিল। তাহার অবস্থা কেমন করিয়া বোঝাইবে সে?

'আংরেজের কাছে চাকরী ক'রে এত সুখ পাও তোমরা? এরা দুদিন আগে কী ছিল তা জানো বাবুজী? ঐ মুঘলদের কাছে মারাঠাদের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে এতটুকু করুণা ভিক্ষা করেছে। তুমিত ব্রাহ্মণ, ওরা ত ম্লেচ্ছ—ওদের কাছে চাকরী করো কি করে?'

'ওরা রাজার জাত। রাজা দেবতা।'

'কিসের রাজা ওরা, আজও বাহাদুর শা বসে আছেন তখতের উপর।...ওরা বেনে—ব্যবসা করতে এসেছিল। যেমন ইদানীং সার্থবাহরা আজও আসে, তেমনি। কৈ, তাদের ত রাজা বলোনা। ছলনা প্রবঞ্চনা করে নানা রকমের বেইমানী ক'রে ওরা বাদশাকে কোণ ঠাসা ক'রে বাদশা হয়ে বসেছে, ওরা রাজা?'

হীরালাল এবার মুখ তুলল। বলিলি, আমার বয়স কম। আমি বেশী দিনের কথা জানিনা। আমি জ্ঞান হয়ে দেখছি যে ওরাই এ মুলুকের মালিক। মুঘলবাদশার নাম এদেশে আমরা শুনছি—আমাদের দেশে আজ কেউ নামও জানেনা।'

'তবু নামে তিনিই আজও মালিক। আংরেজ এখনও মালিকের নাম নিতে সাহস করেনি।'

হীরালাল চুপ করিয়া রহিল। এসব তর্কের জন্য সে প্রস্তুত হইয়া আসে নাই। প্রাণদাত্রীর দেখা পাইলে কৃতজ্ঞতা জানাইবে—শুধু এই কথাই এতকাল ভাবিয়াছে। তাঁহার কাছে তিরস্কৃত হইবে—একথা যে তাহার কল্পনারও অতীত।

বোধকরি হুসেনী তাহার মনোভাব বুঝিল। সে কণ্ঠস্বর নরম করিয়া আনিল। কহিল, 'শোন বাবুজী। তোমাকে ডেকে এনেলি তার কারণ আছে। তুমি একদিন গুণের কথা তুলেছিলে। আমি বলেছিলাম যে সময় হলে আমি একদিন কড়ায় গণ্ডায় সে গুণ শোধ করে নেব—মনে আছে?'

'আছে বৈকি!' হীরালালের আবেগে গলা কাঁপিয়া গেল, 'আপনি জানেন না—আমি জানি যে আপনি একবার নয় দুবার আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন। সে ঋণ আমি—প্রয়োজন হয়ত প্রাণ দিয়েই শোধ করব।'

আবারও খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল হুসেনী। মুক্তাঝরা সে হাসি। হাসিলে মানুষকে এত সুন্দর দেখায় তাহা হীরালালের জানা ছিলনা। একজোড়া মোমবাতির আলোতে যে এমন মোহ ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে পারে তাহাও ছিল স্বপ্নের অগোচর।

'না, না। অত ভয়ানক কিছু করতে হবেনা তোমাকে। আর যা করতে হবে—তা একদিক দিয়ে তোমার কর্তব্যও।'

এই বলিয়া একটু চুপ করিল হুসেনী। তাহার পর পুনশ্চ কহিল, 'শোন বাবুজী, তোমরা যত সহজে আংরেজকে মেনে নিয়েছ, আমরা তত সহজে পারিনি। তামাম হিন্দুস্থানের অনেকেই পারেনি। সিপাহীরা ক্ষেপে উঠেছে, কারণ তাদের ধর্ম নষ্ট করবার কথা হচ্ছে। রাজারা ক্ষেপেছেন কারণ তাদের বংশগত অধিকার ও মর্যাদায় হাত পড়েছে। হিন্দুস্থানব্যাপী আয়োজন চলছে—একটা বিরাট অগ্নিকাণ্ডের। সেই অগ্নিতে পুড়ে শুদ্ধ হয়ে, পবিত্র হয়ে স্বাধীন হয়ে বেরিয়ে আসবেন দেশ মাতা।'

'কিন্তু—কিন্তু সে যে বিদ্রোহ।'

'কিসের বিদ্রোহ? কে কার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ন্যায্য অধিকার দাবী করা কি বিদ্রোহ? ইংরেজ যেদিন মুঘলদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছে সেদিন সে বিদ্রোহ করেনি? যেদিন মারাঠা মুলুকে পেশোয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল সেদিন সে বিদ্রোহ করেনি? মহীশূরে টিপুসুলতানকে উচ্ছেদ করা বিদ্রোহ নয়?' আজ যদি বাদশা তাঁর অধিকার ফিরে পেতে চান সেইটি হবে বিদ্রোহ?'

হীরালাল বিব্রত মুখে কহিল, 'দেখুন অত আমি জানি না—তবে শুনেছি লড়াই এমনি ওঁরা বাধাননি সব সময়ে। এদের তরফ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা, চুক্তি ভঙ্গ—এসব ছিল।'

'ঝুট!' যেন গর্জন করিয়া ওঠে হুসেনী, বেইমানী বিশ্বাসঘাতকতা এরাই শিখিয়েছে। এদের চেয়ে আর কেউ বেশী জানে?'

বাহিরে এই সময় খুব মৃদুভাবে শিকল নড়িয়া উঠিল, যে দানবটা হীরালালকে সঙ্গে আনিয়াছিল সে-ই বোধ হয়, কপাটে মুখ রাখিয়া কহিল, 'মালেকান, ওদের খাবার এতক্ষণে তৈরী হয়ে গিয়ে থাকবে।'

বেশী দেরী করলে বাঙ্গালী বাবুকে হয়ত খুঁজতে বেরোবে ওরা।'

'ঠিক আছে সর্দার। আমি তাড়াতাড়ি সেরে নিচ্ছি।'

তাহার পর হীরালালের চোখের উপর চোখ রাখিয়া কহিল, 'তোমার দুবার জীবন রক্ষা করেছি তুমি নিজেই স্বীকার করেছ। তার বদলে দুটি জিনিষ আমি চাইছি। তাহলেই আমার ঋণ শোধ করা হবে।'

হীরালাল কথা কহিল না, কেবল ব্যগ্র অথচ ভীত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে যেন কেমন করিয়া মনে মনে বুঝিতে পারিয়াছে যে, যে হিসাব নিকাশের জন্য সে ব্যস্ত তাহার শেষ জমাখরচ অত সহজে হইবেনা।

হুসেনী কহিল, 'সিপাহীদের সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত। আজও যাদের দিবা আছে তাদের দিবা থাকবেনা। শুধু কমিসারিয়েট নিয়েই গোলমাল, কেননা ওটা পুরোপুরি আছে আংরেজ আর বাঙ্গালীদের হাতে। তোমাকে দুটি কাজ করতে হবে—প্রথম, বাঙ্গালী বাবুদের বুঝিয়ে আমাদের দলে আনতে হবে—দ্বিতীয়, যখন দরকার হবে কোথায় কী আছে রসদ টসদ, আমাদের খবরটা জানাবে। ভাখো—এই দুটি কাজ করে দিলেই তোমার ছুটি, ঋণ শোধ!'

সে একটু উদ্বিগ্ন উৎসুক চোখে স্থির দৃষ্টিতে হীরালালের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

হীরালালের সুগোল মসৃণ কপালে অনেকক্ষণই ঘাম দেখা দিয়াছিল। কতকটা ঘরের বদ্ধ আবহাওয়াতেও বটে, কতকটা উত্তেজনাতেও বটে। এখন সেই ঘর্মবিন্দুগুলি বড় বড় মুক্তার আকারে ঝরিয়া পড়িতে শুরু করিল। তাহার সমস্ত মুখখানায় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পরপর দ্রুতগতিতে অনেকগুলি বর্ণ খেলিয়া গিয়া শেষ পর্যন্ত একেবারে শোণিতহীন বিবর্ণ হইয়া উঠিল।

এটা যুগপৎ পরম সৌভাগ্য ও একান্ত দুর্ভাগ্য তার।

ঋণ শোধ করিবার কাম্য সুযোগ সামনে—অথচ তাহার কী চরম উপায়হীনতা। ভগবান একী বিপদে তাহাকে ফেলিলেন?

তাহার মুখের সেই বর্ণান্তর সামান্য বাতির আলোতেও হুসেনীর চোখ এড়ায় নাই। সে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণতর বিদ্রূপের সুরে কহিল—'কী' চুপ করে রইলে যে?

এবার হীরালালকে কথা কহিতেই হইল। স্খলিত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'কী বলব তাইত ভেবে পাচ্ছিনা। কিন্তু আবাল্য এই শিক্ষাই পেয়েছি বেইমানী বা নিমক হারামীর তুল্য পাপ নেই। ইংরেজের নুন খেয়েছি আমি—সে নুনের অপমান করতে পারবনা।'

'কিন্তু সে নুন যে আদৌ ইংরেজের নয়।···আমাদেরই নুন ইংরেজ চুরি করেছে।'

আবারও পুরাতন যুক্তি দিতে হইল।

'দেখুন আমরা হিন্দু। মহাভারত আমাদের কাছে অতি পবিত্র বই। সে বইয়ের সবচেয়ে বড় চরিত্র হচ্ছেন ভীষ্ম। কৌরবরাও পাণ্ডবদের রাজ্য অধর্ম করে ভোগ করছিল। ভীষ্ম সেই সময়ই কৌরবদের কাছে চাকরী করেন—যদিও সে বিষয়ে সবচেয়ে আগে সবচেয়ে বেশী অধিকার ছিল ভীষ্মদেবেরই, তিনি তা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছিলেন।—তবু তিনি যুদ্ধের সময় পাণ্ডবদের দিকে যেতে পারলেন না। অথচ পাণ্ডবদেরই তিনি ভালবাসতেন। তিনি চেয়েছিলেন ওদেরই জয় হোক। তিনি যেতে পারলেন না—এই একই কারণে—কৌরবদের নিমক খেয়েছিলেন বলে।'

এক নিঃশ্বাসে, কতকটা বক্তৃতার ধরণে কথাগুলি বলিয়া—অপ্রতিভ হইয়া চুপ করিয়া গেল হীরালাল।

সে মাথা হেঁট করিয়াছিল—নচেৎ দেখিতে পাইত হুসেনীর মুখভাব কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। সে কঠিন কণ্ঠেই কহিল, 'তাহলে এই তোমার ঋণ শোধের আগ্রহ, আমার ঋণ কি কিছুই নয়—আংরেজের নুন কি আরও বড়?'···

হীরালাল কাপড়ের প্রান্ত তুলিয়া ঘামটা মুছিয়া লইল, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, 'আপনি প্রাণ দিয়েছেন আমাকে। আপনার জন্য প্রাণ দেওয়া আমার পক্ষে ঢের সহজ। হয়ত তাই দিয়েই আমাকে প্রমাণ করতে হবে যে আপনার ঋণ আমি শোধ করতেই চেয়েছিলাম।'

থাক।' ক্লিষ্টস্বরে বলে হুসেনী, 'তোমার ও প্রাণের এত দাম নেই। তোমার প্রাণ নিয়ে তুমি ঘরে খাঁচলের তলায় লুকিয়ে থাকোগে।'

এই সময় সময়টাই কিন্তু হুসেনীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এক বারও হীরালালের মুখ হইতে সরিয়া যায় নাই। এখনও—কাজটা বলিয়া—সে তেমনি ভাবেই চাহিয়া রহিল।

আবারও একবার আরক্ত হইয়া উঠিল হীরালালের মুখ। কিন্তু কিছু পরে তেমনিই বিবর্ণ হইয়া গেল সে যেন কি জবাব দিতে গেল কিন্তু দিতে পারিলনা। খানিকটা ইতস্তত করিয়া সে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। হাত জোড় করিয়া কহিল, 'আমি হতভাগা —আপনার কাছে পেয়েই গেলাম –কিছু দিতে পারলাম না। আমাকে ক্ষমা করতেও পারবেন না তা জানি। কিন্তু ঈশ্বর জানেন, আমার উপায় নেই।···আপনার সামনে থেকে অকারণ আর বিরক্ত বাড়াতে চাইনা। আমাকে [illegible] দিন।'

'দাঁড়াও!' তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিয়া ওঠে হুসেনী, যেন এক লাফে কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। দুই হাতে হীরালালের দুটা কাঁধ চাপিয়া ধরিয়া বলে—'এখনই গিয়ে সাহেবদের খবরটা দেবে ত? প্রচুর ইনাম পাবে —না?

'ছি!' জিভ কাটিয়া হীরালাল বলে, 'আমি অপদার্থ কিন্তু ঠিক অতটা অমানুষ নই বেগম সাহেবা। আমার দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকতে একথা কেউ শুনবেনা।'

'তোমার কাছ থেকে এটুকুও আমি আর আশা করিনা। তবু তোমাকে ছেড়েই দিলাম। নইলে—' একটু থামিয়া, কঠিন একরকমের হাসি হাসিয়া সে বলিল, 'নইলে ঐ বাইরে যে দাঁড়িয়ে আছে তোমার মুণ্ডুটা শুধু হাতে করে ছিঁড়ে নিতে ওর এক লহমার বেশী লাগতনা।'

তারপর ছাড়িতে গিয়াও আবার সে হীরালালকে একেবারে নিজের দিকে টানিয়া লইল—বুকের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল—'তাখো—ভালও ভেবে তাখো। ধন দৌলত ছাড়াও আরও কিছু পেতে পারতে। আমার দিকে তাকিয়ে দেখেছ? ভাল করে চেয়ে তাখো। আমি ধরা দেব তোমার কাছে। আমি ···অথচ ভেবে তাখো এতে তোমার লোকসান কিছু হ'ত না। আমরা জিতলেও তুমি বড় চাকরী পাবে, ইংরেজ জিতলেও কিছু টের পাবেনা, যেমন আছো তেমনি থাকবে। এতে তোমার ক্ষতি কিছু নেই, লোকসান নেই। সবই লাভ। না হয় দুটো দিন ভাববার সময় নাও।'

সে সস্নেহে নিজের রেশমী ওড়না দিয়া হীরালালের মুখ মুছাইয়া দিয়া তাহার মুখখানা ধরিয়া আনত দৃষ্টি নিজের চোখের দিকে তুলিয়া ধরিল।

হীরালালের সমস্ত দেহটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল সে স্পর্শে। কিছুক্ষণের মত যেন সমস্ত সম্বিৎ চলিয়া গেল—অবশ হইয়া আসিল তাহার সব অনুভূতি।

তাহার পরই প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলাইয়া দুটি হাত জোড় করিয়া কহিল, 'আমাকে মাফ করবেন। আমি আপনার কোন কাজেই লাগলুমনা। শুধু যদি এই অপদার্থ প্রাণটাকে কোনদিন আপনার দরকার হয় ত আদেশ করবেন—দেখবেন এক মুহূর্তও বিলম্ব হবেনা তা আপনার সেবায় লাগাতে।···আপনি আমার জীবন-দাত্রী আপনি দেবী, আমি আপনাকে সেই চোখেই দেখি—সেই চোখেই দেখব চিরকাল!'

এই বলিয়া কাঁধটা সঙ্কুচিত করিয়া কোনমতে হুসেনীর হাত ছাড়াইয়া একরকম ছুটিয়াই দরজার কাছে আসিয়া কপাটটা খুলিয়া ফেলিল।

কিন্তু তখনই বাহির হওয়ার কোন উপায় ছিলনা। সর্দার খাঁ পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া। সে প্রশান্ত কণ্ঠে সম্বোধনেই প্রশ্নটা করিয়া লইল, 'বালেকান!'

পাথরের মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল হুসেনী, তেমনি ভাবেই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবলেশহীন কণ্ঠে জবাব দিল, 'যানে দেও!'

সেখান হইতে একরকম ছুটিয়াই বাহির হইয়া আসিল হীরালাল। বারান্দা হইতে নামিয়া হাতাটা পার হইয়া আমবাগানে পড়িয়াও সেই ভাবেই খানিকটা দ্রুত হাঁটিয়া চলিল সে। তারপর একেবারে যখন পা-দুটা কোনমতেই চলিতে চাহিল না—তখন অবসন্ন মূর্ছিতের মত একটা গাছতলাতেই বসিয়া পড়িল।

দূরের সে আলোটা ততক্ষণে নিভিয়া গিয়াছে।

[ক্রমশঃ

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম্, এ

সাহিত্য সাধক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আজ বাঙ্গালী পাঠক ভুলিতে বসিয়াছে। শুধু তাঁহার পালামৌ" ভ্রমণ কাহিনী এখনো বাঙ্গালী পাঠকের চিত্ত অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার এই স্বজনসদৃশ অগ্রজের মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিভার নিদর্শন পাইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সাহিত্যিকপথে ব্রতী করাইয়াছিলেন। বঙ্কিমপ্রতিভার প্রভায় সঞ্জীবপ্রতিভা কিছুটা ম্লান হইলেও তাহা তাহার বৈশিষ্ট্য হারায় নাই। সঞ্জীবচন্দ্রের ভিতরে সহজ সরল যে কবি মন ছিল, তাহাই তাঁহার সাহিত্য সাধনার পাথেয় হইয়াছিল। বিশেষ জটিল কোন চরিত্র সৃজন-কার্য্যের মধ্যে স্থান না পাইলেও একটা বিশিষ্ট ধরণের জন্য সঞ্জীবচন্দ্র বাঙ্গালী পাঠকের নিকট আদৃত হইয়া আছেন।

যদিও লেখকজীবনের প্রারম্ভে তিনি তথ্যমূলক আলোচনার আশ্রয় লইয়া Bengal Rayats লিখিয়াছিলেন এবং তদানীন্তন বাঙ্গালী মনীষী ও ইংরাজের নিকট সমাদর লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি সে পথকে তিনি জীবনের পথ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার যাত্রা সমালোচনা ও আরও ২।৪টি আলোচনা তাঁহার মৌলিক গবেষণার পরিচয় দেয়। হয়ত, এই পথে চলিতে চলিতে তিনি একজন নির্ভরযোগ্য সমালোচক হইতে পারিতেন, কিন্তু সে পথ তিনি শেষ পর্য্যন্ত অবলম্বন করেন নাই। তাঁহার "জাল প্রতাপচাঁদ" বাস্তব ও কল্পনার মিশানো একটা তথ্য বিচার।—যে বর্ণনারীতি অবলম্বন করিয়া তিনি জাল প্রতাপচাঁদের বিচারপ্রসঙ্গ বিবৃত করিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রসংসনীয়। ন্যায়ের বিচারে, তথ্যের বিচারে জাল প্রতাপচাঁদ প্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলেও, তাঁহাকে তিনি বিশ্বজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন; তাঁহার রচনার গুণে জাল প্রতাপচাঁদ অলৌকিক প্রভাব বিশিষ্ট সন্ন্যাসীরূপে জন সাধারণের হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিলেন। এইরূপ রচনার বা চরিত্র চিত্রণের বৈশিষ্ট্য সঞ্জীবচন্দ্রের একান্ত নিজস্ব।

সঞ্জীবচন্দ্র মাধবীলতা, কণ্ঠমালা, রামেশ্বরের অদৃষ্ট ও দামিনী নামে আরও চারিখানি আখ্যান রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্লেষণধর্ম্মের দিক দিয়া এই চারিখানি গ্রন্থের কোন চরিত্রই শিল্পীর যুগান্তকারী প্রতিভার পরিচয় দেয় নাই। তথাপি তাঁহার সাধারণ দুই একটা চরিত্র অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়া আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। মাধবীলতা, রামেশ্বরের অদৃষ্ট ও দামিনী আখ্যায়িকার পাগল চরিত্রগুলি সাধারণ-শ্রেণীর নয়। মাধবীলতার মূলআখ্যান অংশে শিবুর পাগল প্রধান হইয়া দেখা দেয়—সে রাজার পাশে বসে, নানারূপ তত্ত্বকথা বলে। এ যেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের আর এক বিশেষ সংস্করণ। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা কমলাকান্তের অন্ধ অনুকরণ মাত্র নয়। "রামেশ্বরের অদৃষ্টে" ক্ষুদ্র সংসারধর্ম্মের, অভাব অনটনের মধ্যে রামেশ্বরের দুঃখবরণ অপরূপ—দীপান্তরবাসে রামেশ্বর যে পাগল প্রায়, তাহাতে সে মাঝে মাঝে তাহার অনাথ শিশু আনন্দদুলালের কথা চিন্তা করে। সমুদ্রের ফেন-কল্লোলের মধ্যে স্নেহের আনন্দদুলালের ক্রীড়াচঞ্চল রূপ সে দেখিতে পায় এবং তাহার পুত্র-স্নেহাতুর পিতৃহৃদয় সেই প্রাণপ্রিয় পুত্রধনের স্পর্শসুখ লাভে ক্ষুব্ধ হইতে চায়। দামিনী গল্পের দামিনী চরিত্র আমাদের নিকট প্রধান রূপে দেখা দেয় না—সেখানে তাহার পতিশোকাতুরা পাগলিনীপারা মায়ের কারুণ্যকারিতা পাঠকের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। পত্নীত্বের আদর্শ এই মহীয়সী পাগলিনীর মধ্যে এতটা প্রকট যে, স্নেহের দুলালি দামিনীর পত্নীত্বের আদর্শের অবমাননা সে সহ্য করিতে পারে না। যে সমাজের পাপে তাহার স্নেহশীলা কন্যা সমাজবহির্ভূতা হইয়া স্বামীসোহাগ বঞ্চিতা হইল তাহার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ জানায় এবং মায়ের স্নেহ-নীড়ে আপন-কন্যাকে আশ্রয় দিয়া কন্যার মৃত্যুর জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী, পত্নীত্বের অবমাননাকারী জামাতাকে দলিয়া পিষিয়া মারে এবং সমাজের পাপের নিজ হস্তে বিচার করে।

এই সব গল্প উপন্যাসের ধারায় সঞ্জীবচন্দ্রের যে ধরণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অনন্যসাধারণ-বৈশিষ্ট্যে আদর্শরূপে তাঁহার গল্প উপন্যাসের পরিণতিকে আশ্রয় করে। এসব ছাড়া সঞ্জীবচন্দ্রের যে স্বভাব সরল কবি মন তাঁহার রচনার প্রধানতম উপাদান, তাহা চরম পরাকাষ্ঠা লাভ করে তাঁহার "পালামৌ" কাহিনীতে। "পালামৌ" শুধু একটি ভ্রমণ কাহিনী নয়,—ইহা সঞ্জীবচন্দ্রের মৃণ্ময়কারী প্রতিভার অমূল্য অবদান—ইহা একখানি অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ বিশেষ। এই একখানি কাব্য সঞ্জীবচন্দ্রকে সাহিত্যজগতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। এই গ্রন্থে সঞ্জীবচন্দ্রের রচনা শৈলী এক বিশেষ রূপ অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। মনীষী চন্দ্রনাথ বসুর কথায় এই রচনাশৈলীর যে পরিচয় দেওয়া যায় তাহা নিম্নরূপ—

"সঞ্জীবচন্দ্র তেমন করিয়া পথে চলেন না। তিনি যাইতে যাইতে প্রায়ই একটু দাঁড়ান। একটা গাছ দেখিবার জন্য, একটা লতা দেখিবার জন্য, একটা পাখী দেখিবার জন্য, একটা পাতা দেখিবার জন্য, একটা ফুল দেখিবার জন্য, একটা ঘাস দেখিবার জন্য।
যে দেখী আমি আমি এটি সেটি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে যান, সকলের তাহার সঙ্গে যাইতে ভাল লাগে
অনেকে তাহার সঙ্গে অধিক দূরে যাইতে চায় না।"

তথাপি তিনি যে পথে চলেন, যে পথের কথা বলেন তাহা শুনিতে বেশ ভাল লাগে। পালামৌয়ে সেই ভাল-লাগার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ভাষা বালকের ন্যায় সহজ সরল, বালকের ন্যায় সর্বজন মনোরম। সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁহার যে তত্ত্ব-পরিচয়, তাহা অপরূপ। সেখানে তিনি প্রকৃত স্বভাব কবি। তিনি বলিয়াছেন,—"আমি কখনো কবির চক্ষে রূপ দেখি না। চিরকাল বালকের মত রূপ দেখিয়া থাকি, এই জন্য আমি যাহা দেখি, তাহা অন্যকে বুঝাইতে পারি না। রূপ যে কি জিনিষ, রূপের আকার যে কি, শরীরের কোন স্থানে তাহার বাসা, এসকল বার্তা আমাদের বলিয়া দিবেন, আমি জানিনা। আমি যে প্রকারে রূপ দেখি, তাহা নির্লজ্জ হইয়া বলিতে পারি। একবার আমি দুই বৎসরের একটি শিশু গৃহে রাখিয়া বিদেশে গিয়াছিলাম। শিশুকে সর্বদাই মনে হইত, তাহার ন্যায় রূপ আর দেখি নাই। অনেক দিনের পর একটা ছাগ শিশুতে সেই রূপরাশি দেখিয়া আহ্লাদে তাহাকে বুকে করিয়াছিলাম, আমার সেই চক্ষু! আমি রূপরাশি কি বুঝিব। তথাপি যুবতীকে দেখিতে লাগিলাম। যুবতীতে যে রূপ, লতায় সেইরূপ, পক্ষীতেও সেইরূপ, ছাগেও সেইরূপ। সুতরাং, রূপ এক, পাত্রভেদে ভিন্ন।"

রূপতত্ত্বের এই উচ্চকথা এইরূপ সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করিতে খুব কম লোকই পারে। তাঁহার সৌন্দর্য কেবল তত্ত্ব নয়, একটা বিশেষ প্রণালী। এই প্রণালীতে তিনি পালামৌর কোলকামিনীদের দেহ "কৈলাহল" দেখিতে পাইয়াছিলেন—শান্ত সমুদ্রের সুগভীর প্রবাহে রামেশ্বরের আনন্দদুলালের সন্ধান পাইয়াছিলেন। নিজের পাগলের আপন ভোলাভাবের মধ্যে জ্যোৎস্নাময়ীর প্রেমের অনুরাগ চিহ্নিত করিয়াছিলেন।

সঞ্জীবচন্দ্র মাঝে মাঝে সহজ সরল বর্ণনায় সত্যদর্শন করিয়াছেন। পালামৌতে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন—"বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে"—"ঋষি কেবল পতিবিদেশীত্যাগী গৃহী"—মানুষ বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না ইত্যাদি। তাঁহার কবি মন অপরাহ্নে যেখানে প্রকৃতির শোভা দেখিবার জন্য কুলবধূর মন ছুটিয়া যায়, সে দিকে ধাবিত হয় এবং নিজের সতেহার পাহাড়ে যাবার জন্য ব্যগ্রতার সাদৃশ্য দেখে—যে সময়ে প্রাঙ্গণে ছায়া পড়ে। জল আছে বলিলেও জল ফেলিয়া জল আনিতে হইবে। জলে যে যাইতে পারিল না, সে অভাগিনী। যে গৃহে বসিয়া দেখে উঠানে রং ফিরিতেছে, বাহির হইয়া সে তাহা দেখিতে পাইল না। তাহার কত দুঃখবোধ আমিও পৃথিবীর রং ফেরা দেখতাম; কিন্তু আর একটু আছে, সেই নির্জনস্থানে মনকে একা পাইতাম, এবং বালকের ন্যায় মনের সহিত ক্রীড়া করিতাম।"

অবান্তরের দিকে কবির আসক্তি বাস্তব বর্ণনার মাধ্যমে সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়। বাস্তবতার প্রতি তাঁহার উদাসীনতা সেজন্য স্বাভাবিক। বাস্তব-অভিজ্ঞতা বিরহিত ছিলেন বলিয়া তিনি কর্মজীবনে সাফল্য অর্জন করিতে পারেন নাই। বঙ্কিম তাঁহার অগ্রজের এই স্বভাবের পরিচয় রাখিতেন এবং তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। "বঙ্গদর্শন" মাসিকপত্রের দ্বিতীয় সম্পাদক-রূপে ও "ভ্রমর" পত্রিকার সম্পাদকরূপে তাঁহাকে ব্রতী করান তাঁহার আর্থিক ও সাহিত্যিক সঙ্গতি রক্ষার নিমিত্ত।

সঞ্জীবচন্দ্র অপরিমিত ব্যয়ী ছিলেন, কিন্তু তদনুরূপ তাঁহার কর্মসংস্থান ছিল না। তাঁহার প্রতিভা ছিল অলৌকিক, কিন্তু তদনুরূপ তিনি কর্মক্ষমতা দেখান নাই।

[৯]

কয়েকটা দিন কি ভাবে যে একটা দারুন অস্থির-চিত্ততার মধ্য দিয়ে কাটলো, নিজেই বুঝতে পারলুম না। ভেবেছিলাম—তনুশ্রী ইতিমধ্যে অনেকখানি সহজ হয়ে উঠতে পারবে, কিন্তু ভুল। সহজ না হ'য়ে বরং নিজেকে সে আরও বেশী নিজের মধ্যে আড়াল ক'রে নিল। এ সংসারে এসে অবধি এতদিন সে কথায় কথায় তর্ক ক'রেছে, আব্দার না জানাতে নিজে থেকেই উপস্থিত হ'য়ে নীরব পরিবেশকে মুখর ক'রে তুলেছে, এবারে সেই যে সেদিন থেকে মুখ বন্ধ ক'রলো, আর খুললোনা। ভেবেছিলাম—দু'দিনের অভিমান দু'দিনের বেশী থাকবে না; কিন্তু সেই দু'দিন এসে যখন দশদিনে ঠেকলো, তখনও সেই একই অবস্থা।

বললাম, 'এই ভাবেই কি আমাদের জীবন-তরণী ভবে ব'য়ে চ'লবে? এস, অতীতের সমস্ত ইতিহাস থেকে বাইরে এসে আমরা নতুন ক'রে আমাদের ভবিষ্যৎ গ'ড়ে তুলি।'

শুনে আমার মুখের দিকে মিনিট খানেকের জন্য একবার দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে নীরবে মাথা নিচু ক'রে নিল তনুশ্রী।

ব'ললাম, 'কি, পারলে না তবে সাড়া দিতে?'

এবারও কিছু-একটা ব'ললো না তনুশ্রী।

ব'ললাম, 'শোনো, এস, কাছে এস, কথা আছে।'

মুহূর্তের জন্যই আর-একবার চোখ দু'টোকে আমার মুখের দিকে তুলে ধরলো তনুশ্রী।

হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলাম, কিন্তু পারলুম তার আগেই ছুটে ঘর থেকে সে পালিয়ে গেল।

এম্‌নি ক'রে আরও কয়েকটা দিন কাটবার পর একদিন সত্যিসত্যিই আকস্মিক আবির্ভাব ঘটলো অণিমার। সামারস্যাকেশনের আগেই কয়েকদিনের 'ক্যাজুয়াল লিভ' নিয়ে বেরিয়ে প'ড়েছে সে পুণিয়া থেকে। কয়েকটা দিন বাড়ীতে থেকে দেওঘরের ঐদিকে কোথাও গিয়ে পুরো ছুটিটা কাটিয়ে দেবার ইচ্ছে।

খবর পেয়ে আমাকে আর ছুটে যেতে হ'লো না, লীলাকে নিয়ে অণিমা নিজেই এসে উপস্থিত হ'লো আমার অধ্যয়ন-কক্ষে। একদিন আমি আর অণিমা সাহিত্য-পাঠের ফাঁকে ফাঁকে সাইকোলজির সূক্ষ্ম তত্ত্ব নিয়ে মুখর হ'য়ে উঠতাম এই ঘরে, মুখর হ'য়ে উঠতাম অধ্যাপক সিদ্ধান্ত আর ব্যর্থ প্রণয়ী মনোতোষকে নিয়ে; লজ্জারাঙা মুখখানি দেখতে দেখতে পলাশ-রাঙা হ'য়ে উঠতো অণিমার, কখনও বা গাম্ভীর্য্যের কৃত্রিম ছায়ায় অকস্মাৎ কালো মেঘের মতো থম্‌থমে হ'য়ে উঠতো। সেই পলাশরাঙা মুখের আগল, মনে মনে কৌতুক বোধ ক'রে নিজের মনেই হাসতাম। অধ্যাপক সিদ্ধান্তকে নিয়ে তার সংশয়েরও যেন সীমা ছিলনা, শ্রদ্ধারও অন্ত ছিলনা তেম্‌নি। আজ বৃন্দাবনের কোথায় কোন্ পথে তাঁর নিভৃত জীবনের বিশ্রামকক্ষ রচনা ক'রে নিয়েছেন তিনি, কে জানে! মাঝে মাঝে কুশল-বিনিময়ের প্রশ্ন তুলে যাত্রালয়ে অনেক ক'রে ব'লে গিয়েছিলেন অধ্যাপক সিদ্ধান্ত, কিন্তু প্রশ্নটা আজও প্রশ্ন হ'য়েই

আছে, সমাধান হয়নি। দীর্ঘকাল বাদে অনিমাকে কাছে পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে অতীতের সবগুলি অধ্যায় যেন একসঙ্গে এসে একেবারে মনের সামনে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো।

ঘরের চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়ে শীলা ব'ললো, 'চিনতে পারছেন সুমন্তদা, কে এসেছে?'

কৌতুক ক'রে ব'ললাম, 'পরিচয় দাও, তবে তো চিনবো!'

পাশে দাঁড়িয়ে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো অনিমা।

শীলা ব'ললো, 'খামের পয়সাটা আপনার বাঁচলো; যা ব'লেছিলাম, তাই হ'লো তো? আপনি চিঠি লিখবার আগে আগেই এসে গেল তো দিদি!'

ব'ললাম, 'এতদিন শুধু দুঃখ ক'রেছ, এবারে আর কিছুতেই ছেড়ে দিওনা দিদিকে।'

শুনে কিছু-একটাও না ব'লে কেমন একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শীলা নীরবে একবার তাকালো অনিমার মুখের দিকে। অর্থটা হ'চ্ছে—'তুমি আবার সত্যি সত্যিই চ'লে যাবেনা তো দিদি?'

অনিমার সেটুকু না বুঝবার কথা নয়, কিন্তু শীলার কথার কিছু একটাও জবাব না দিয়ে ঘরে এসে বসতে বসতে অনিমা ব'ললো 'কেমন আছো সুমন্ত?'

ব'ললাম, 'দেখে কেমন মনে হচ্ছে বলো?'

অনিমা ব'ললো, 'বিয়ের জল গায়ে পড়লে শুনেছি সবাই মোটা হয়, সেই তুলনায় তোমাকে আগের চাইতেও অনেক কৃশ দেখাচ্ছে। বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর অত্যাচার ক'রছো বলো?'

অত্যাচারই বটে। ব'ললাম, 'একথার জবাবটা আপাতত উহ্য থাক্। শীলার মুখে শুনেছিলাম—ইদানিং শরীর তোমার আদৌ ভালো যাচ্ছে না, মাথার কম্প্লেন শুরু হ'য়েছে; এখন কেমন বোধ ক'রছো?'

উত্তরে অনিমা ব'ললো, 'যদি ব'লে থাকে, তবে এতদিন শীলা তোমাকে সব বানিয়ে বানিয়ে ব'লেছে। চাকরী ক'রছি, টাকা রোজগার করছি, আমার কেন শরীর খারাপ হবে? আগের চাইতে স্বাস্থ্য বরং আমার ভালো হ'য়েছে।'

—'ভালোর যা লক্ষণ, তা সারা চেহারাতেই ফুটে উঠেছে। তা যাক—'

বাধা দিয়ে অনিমা বল'লো, 'কই, তোমার বউকে যে দেখতে পাচ্ছি না! একবারটি ডাকো, আলাপ করি।'

ব'ললাম, 'সে জন্যে অনেক সময় প'ড়ে আছে। এতকাল পরে এলে, এসেই এত ব্যস্ত কেন? প্রলাপ যখন বকছিনা, দু'দণ্ড না হয় আমরাই দু'জনে কথা ব'ললাম!'

এ কথার কিছু একটাও জবাব দিল না অনিমা।

শীলা ব'ললো, 'এবারে তুমি বসো দিদি, আমি পালাই।'

বললাম, 'সে কি, এসে এরই মধ্যে পালাবে মানে কি?'

শীলা ব'ললো, 'সব কিছুরই কি আর মানে আছে! দিদির কি, দু'দিনের জন্যে না হয় বেড়াতে এসেছে, এদিকে আমি দেরী ক'রলে ওদিকে মার গাল ফুলতে শুরু হবে।'

যেমন করে কথাটা উচ্চারণ ক'রলো শীলা, তাতে না হেসে থাকতে পারলুম না। হাসি গোপন ক'রে অনিমা ব'ললো, 'আজকাল দেখছি বড্ড ফাজিল হ'য়ে গেছিস তুই, কিচ্ছুই মুখে আট্‌কায় না। যা বাড়ী যা।'

দিদির কথার যে প্রতিবাদ ক'রবে শীলা, এমন সাহস তার ছিল না। বরং সমর্থন পেয়ে এবারে সে সঙ্গে সঙ্গেই চৌকাঠের বাইরে পা বাড়ালো।

অনিমা ব'ললো, 'কি, বৌকে কি শো-কেসে আট্‌কে রেখে ধ্যান-জপ ক'রছো না কি? আপত্তি না থাকে তো বলো আমি নিজে গিয়েই তাকে ধ'রে নিয়ে আসি।'

ব'ললাম, 'ধ্যান জপ ক'রতে পারলে বোধ করি সুখী হ'তাম। বসো ডাকছি।'

তনুশ্রী উনুনে আগুন দিয়ে বৈকালিক রান্না নিয়েই এতক্ষণ হেঁসেলে ব্যস্ত ছিল। তাই ব'লে শীলা আর অনিমার উপস্থিতি সম্পর্কে সে উদাসীন ছিল না। শীলার উপস্থিতিতে তার দিদির পরিচয়টা আপনি থেকেই

বুকে নেবার কথা। উঠে গিয়ে ভিতর বারান্দায় দাঁড়িয়ে তনুশ্রীর উদ্দেশে গলা ছেড়ে ব'ললাম, 'এ ঘরে এসে একবার শুনে যেয়ো।' তারপর ফিরে এসে ব'সতেই অণিমা ব'ললো, 'আজকাল তুমি অনেক প্র্যাক্‌টিকাল হ'য়েছো, দেখতে পাচ্ছি সুমন্ত।'

জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'কি রকম?'

—'ঘরের চেহারা একেবারেই পাল্টে ফেলেছ। প্র্যাক্‌টিকাল না হ'লে এমনটা কখনও হয়?'

ব'ললাম, 'এর পিছনে নিজের কৃতিত্ব আমার কানা-কড়িও নেই। সংসারে সব চাইতে বেশী প্র্যাক্‌টিকাল মেয়েরা। ঘরের যদি চেহারা পাল্টে থাকে, তবে তার জন্যে সমস্ত ক্রেডিট তনুশ্রীর। এ ক্রেডিট তনুশ্রীর না হ'য়ে আর কারুরও হ'তে পারতো।'

ইতিমধ্যে পিছন থেকে এসে ঘরে প্রবেশ ক'রলো তনুশ্রী। ভেবেছিলাম রান্নার কাপড়টা অন্ততঃ পাল্টে আসবে সে। কিন্তু সেদিকে তার কিছুমাত্র লক্ষ্য দেখা গেল না। কাপড়ের এখানে ওখানে হলুদের ছাপ, সারা কপাল জুড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম, কিন্তু তাতেও নিজের রূপের কাছে তাকে ম্লান দেখাচ্ছিল না।

পরিচয় দিয়ে ব'ললাম, 'এই হচ্ছে মিস অণিমা মিত্র, আমার দিদি, আমরা একসঙ্গে একই বছরে বি-এ পাশ ক'রেছি; এতক্ষণ তোমার খুব প্রশংসা ক'রছিল অণিমা।'

দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে এবারে অণিমাকে ছোট্ট একটা নমস্কার জানিয়ে তনুশ্রী ব'ললো, 'প্রশংসার যোগ্য কোনো কাজ ক'রেছি ব'লে তো মনে পড়ে না আমার!'

ব'ললাম, 'মানে—ঘরের এই সাজসজ্জা এটা ওটা লক্ষ্যেই বিশেষ ক'রে ব'লছিল অণিমা।'

তনুশ্রী একথার-কিছুও একটা জবাব দিল না। অণিমার সঙ্গে এ ভাবে যে অকস্মাৎ তার মুখোমুখি পরিচয় হ'বে, এটুকু বোধ করি অণিমার চিঠি খুলে প'ড়বার সময়ও কল্পনা ক'রতে পারেনি তনুশ্রী।

তাকে কাছে টেনে নিয়ে এবারে অণিমা ব'ললো, 'তোমাকে কিন্তু আমি 'তুমি' ক'রেই ব'লবো, তাতে যেন কিছুটি মনে কোরোনা ভাই। এস, কাছে এসে ব'সো।'

এবারে অণিমার পাশ ঘেঁষে ব'সতে গিয়ে বোধ করি নিজের পরিধানের প্রতি দৃষ্টি যেতেই মনে মনে কিছুটা লজ্জিত হ'লো তনুশ্রী। অণিমা যে বেনারসী কিম্বা জর্জেট কিছু-একটা প'রে এসেছিল, তা নয়; চিরকাল যেমন সাদাসিধে ভাবে কাটিয়েছে, তেমনি সাধারণ একখানি শাড়ীতেই সারা দেহ আবৃত ক'রে হাতে ছোট্ট একটা ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে এসেছিল। তাতে ঔজ্জ্বল্য কিছু ছিল না, ছিল পরিচ্ছন্নতা। সেই পরিচ্ছন্নতার দিক থেকে তনুশ্রীকে তার নিজের কাছে একেবারেই ম্লান মনে হ'লো। তাই যথাসম্ভব নিজেকে অণিমার কাছ থেকে খানিকটা সরিয়ে নিয়েই ব'সলো সে।

অণিমা ব'ললো, 'নিশ্চয়ই রান্না নিয়ে ব্যস্ত ছিলে, তাই না? সুমন্তই বা কিরকম, এই তো সেদিন মাত্র বিয়ে হ'লো, এর মধ্যেই কি বৌকে হেঁসেলে না ঠেললে চলতো না!'

তনুশ্রী কি একটা জবাব দিতে গিয়ে থেমে গেল।

নিজের জিহ্বাকে এবারে সংযত ক'রতে পারলুম না, ব'ললাম, 'ঐটেই বোধ করি মেয়েদের আসল যায়গা, আর যা-কিছু সব কৃত্রিম। ঠেলেছি আমি নই, নিজের গরজেই উনি পাচককে উঠিয়ে দিয়ে হাতা আর খুন্তি নিয়েছেন হাতে।'

অণিমা ব'ললো, 'আ বাপু, তোমাদের জন্য ক'রতে হ'লে ও দু'টো অস্ত্র মেয়েদের একান্ত ক'রে চাইই। তোমরা কি সোজা মানুষ!'

ব'ললাম, 'স্কুল মাষ্টারনী হ'য়ে শেষ পর্যন্ত তুমিও এসব উচ্চারণ করতে পারলে?'

মুখ টিপে হেসে অণিমা ব'ললো, 'স্কুল মাষ্টারনী হ'লেও আমিও তো সেই মেয়েদের জাত! পুরুষেরা চির-কাল স্বার্থবাদী। মেয়েদের মেয়েরা না দেখলে কে দেখবে!'

কথাটা হয়ত তনুশ্রীকে খুসী ক'রবার জন্যই ব'ললো

অনিমা, কিন্তু তনুশ্রী তেমন খুশী হ'লো ব'লে মনে হ'লো না।

একটুকাল কেটে গেলে নিজে থেকেই উঠে দাঁড়ালো সে ব'ললো, 'আপনারা গল্প করুন, আমি ততক্ষণে আপনার চা ক'রে নিয়ে আসি।'

বাধা দিয়ে অনিমা ব'ললো, 'এখুনি আমার চা খাবার কিছু প্রয়োজন নেই। একটু আগেই বাড়ী থেকে চা খেয়ে বেরিয়েছি।' তারপর তার ভ্যানিটি ব্যাগের মুখ খুলে সোনার একছড়া দামী হার হাতে তুলে নিয়ে সযত্নে সেটি তনুশ্রীর গলায় পরিয়ে দিয়ে সে ব'ললো, 'দেওয়া হিসেবে কিছুই নয়, তবু ছোট্ট একটা উপহার, পছন্দ হ'য়েছে তো বোন?'

হার ছড়ার দিকে মুহূর্তের জন্য একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল তনুশ্রী, কিন্তু উত্তরে পছন্দ অপছন্দ সম্পর্কে ভালো মন্দ কিছু একটাও ব'লতে পারলো না।

অনিমার কাণ্ড দেখে এতক্ষণ নিজেই মনে মনে বিস্মিত হ'চ্ছিলাম, এবারে ব'ললাম, 'এটা কিন্তু তোমার বড্ড বাড়াবাড়ি হ'লো। এমন ক'রে এতগুলো টাকা এভাবে বাজে খরচ না ক'রলেই কি হ'তো না!'

অনিমা ব'ললো, 'কোনটা বাজে খরচ আর কোনটা কাজের, তার হিসেব আমি আজ পর্যন্তও বুঝতে পারলুম না। যোগ্য পাত্রে প'ড়লে সব জিনিষেরই সার্থকতা আছে। এই নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে তর্ক কোরো না, তবে রাগ ক'রবো?'

তনুশ্রী ব'ললো, 'পাত্র নির্বাচনে আপনি কিন্তু সত্যিই ভুল ক'রেছেন। এতবড় ভুল আপনার পক্ষে শোভা পায়নি।'

কথা শেষ ক'রে একটি মুহূর্তও কিন্তু অপেক্ষা ক'রলো না তনুশ্রী, পাশ কাটিয়ে দ্রুত রান্নাঘরের দিকে উঠে গেল।

দরজার দিকে তাকিয়ে মিনিটখানেক চুপ ক'রে থেকে অনিমা ব'ললো, 'ও ভাবে কথাটা ব'লে তুমি অন্যায় ক'রেছ সুমন্ত। মেয়েদের মন—হাজার হ'লেও অন্ততঃ আমি তো বুঝি। ছিঃ ছিঃ, তুমি কী বলো তো?'

ব'ললাম, 'আমি যা ঠিক তা-ই, তার বাইরে একটুও নই।'

—'যদি না-ই হবে, তবে সাইকো-এ্যানালিসিসে এমন ভুল ক'রবে কেন?' ব'লে দুই চোখে একবার তাকালো অনিমা আমার মুখের দিকে।

ব'ললাম, 'মনের উপরই তো মনোবিজ্ঞান নির্ভরশীল, মনের অপমৃত্যু ঘটলে মনোবিজ্ঞান কিসের উপর ভিত্তি ক'রে দাঁড়াবে?'

অনিমার কণ্ঠে এবারে কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ পেলো। ব'ললো, 'মনের অপমৃত্যু? বলো কি সুমন্ত? তোমার মতো এমন উজ্জ্বল মন যে আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি।'

বললাম 'তার সঙ্গে যদি ইতিহাসের পাতাগুলোকেও একবার উল্টে দেখতে, তবে ভালো ক'রতে। তা যাক্। ক'দিন এখানে থাকবে ব'লে ঠিক ক'রেছ?'

—'কিছুই স্থির করিনি; দু'দিনও হ'তে পারে, আবার এক সপ্তাহও হ'তে পারে। সব নির্ভর ক'রছে পুণিয়া থেকে একটা টেলিগ্রামের উপর। প্রোগ্রাম আমাদের সব ঠিক হয়ে আছে। পুণিয়া থেকে আর-একজন মিস্ ট্রেসও দেওঘর যাবেন; তাঁর টেলিগ্রাম এসে পৌঁছলে একটা বেলাও অপেক্ষা করা চ'লবে না।' থেমে অনিমা ব'ললো, 'সঙ্গীসাথী ভিন্ন কি একা একা কোথাও যেতে ভালো লাগে?'

ব'লতে যাচ্ছিলাম, 'সাথী পেয়েও কি সাথী চেয়েছে কোনোদিন? জীবনে যে তোমার প্রথম সঙ্গী হ'তে চেয়েছিল, তাকে ইচ্ছে ক'রেই নিজে থেকে বিদায় ক'রেছ; নইলে দেখতে দেশভ্রমণটা আরও বেশী ভালো লাগতো।' কিন্তু বলা হ'লো না, অনিমার জন্য চা আর জলখাবার নিয়ে এসে ইতিমধ্যে উপস্থিত হ'লো তনুশ্রী।

দেখে আঁতকে উঠলো অনিমা: 'সে কি, এখন এ সময়ে রেটগুলি এত খাবার কে খাবে? এটা তুমি ফিরিয়ে নাও বোন, আমি চায়ের কাপটাই শুধু নিচ্ছি।'

তনুশ্রী ব'ললো, 'তা হয় না। চায়ের সঙ্গে এটুকু আপনি বেশ খেতে পারবেন, একটুও কষ্ট হবে না।'

—'তবে তুমিও এসে খানিকটা ভাগ নাও।' ব'লে পুনরায় তনুশ্রীকে কাছে টানতে চাইল অণিমা, কিন্তু এবারে আর ধরা না দিয়ে সোজা আবার সে বাড়ীর ভিতরের দিকেই ছুটে চ'লে গেল।

স্বল্পক্ষণ থেমে অণিমা ব'ললো, 'বেশ বউ কিন্তু পেয়েছ তুমি, যাই বলো।'

ব'ললাম, 'তোমার চাইতে নিশ্চয়ই ভালো নয়।'

শুনে হঠাৎই চুপ ক'রে গেল অণিমা, তারপর ব'ললো, 'একথা ব'লে নিজের জীবনটাকে অন্ততঃ তুমি বাজে কোরো না সুমন্ত। অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে মানুষ কখনও সুখী হয় না।'

বললাম, 'কিন্তু অদৃষ্ট যাকে পরিহাস করে, সুখ যে তার কোনোকালেই নেই, একথা অস্বীকার করি কেমন ক'রে?'

কি একটা ব'লতে গিয়ে এবারে কথা হারিয়ে ফেললো অণিমা।

ব'ললাম, 'কথার গরমে এদিকে কি চা'টাকে ঠাণ্ডা ক'রে ফেলতে চাও? খেতে খেতে বরং কথা বলো।'

প্লেটটার দিকে আর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে অণিমা ব'ললো, 'আমি আর হাতে এখন জল লাগাবো না; হা করেছি, তুমি বরং ঐ থেকে কিছু একটুকরো তুলে আমার মুখে দিয়ে দাও।'

কথা না বাড়িয়ে তাই দিলাম, দিতে গিয়ে হাত-খানি একবার অণিমার মুখের সঙ্গে লেগে যেতেই ব'লে উঠলো: 'ভারী অসভ্য তুমি সুমন্ত, বিয়ে ক'রে কখনও তোমার দুষ্টুমী যায়নি দেখতে পাচ্ছি।'

ঠিক এই মুহূর্তেই দরজার আড়ালে স্পষ্ট একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ অনুভব ক'রলাম। সেই সঙ্গে পা টিপে টিপে কে-একজন বোধ করি স'রে গেল! তনুশ্রী কি? সামনে থেকে পালিয়ে গিয়ে তবে নেপথ্য থেকে সে কেবলই আমাদের অনুসরণ ক'রছে?

অণিমার কথার উত্তরে ব'লতে যাচ্ছিলাম—'যাওয়াতে পারলে কই এ-দুষ্টুমী? নিজেকে আড়ালে রেখে তুমি যে কেবলই তাকে খোঁচা দিয়ে দিয়ে বাড়িয়ে তুলেছ! কিন্তু মুখে এসেও কেন যেন কথাটা বেধে গেল। উঠে দরজার দিকে একবার এগিয়ে গেলাম, দেখলাম—কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই। একটুকাল থেমে অণিমা ব'ললো, 'কি দেখলে অমনি ক'রে সুমন্ত? ডাকোনা, তোমার তনুশ্রীকে আর একটিবার ডাকো, বিদায় নিয়ে এবারে উঠি।'

ব'ললাম, 'কেন, এতই বা তাড়া কিসের, এতদিন পর এই তো কেবল এসে, তোমার তো আর নীলার মতো আজকাল ঘরে গিয়ে রাঁধতে হয় না!'

—'শুধু ভয়টাই দেখলে, ভক্তিটা দেখলে না?' ব'লে একটা নরম দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকালো অণিমা।

ব'ললাম, 'সংসারে এক আমি বাদে সব ছেলেদেরই বাপ-মাকে ভক্তি করে; তাতে নতুনত্ব কিছু নেই।'

—'নতুনত্ব না থাকলেও ধর্মের আদর্শগত ঐতি-হাসিকতা আছে।' থেমে অণিমা ব'ললো, 'হাতে কাজ না থাকে তো চলো বেরোই, আমাকে পৌঁছে দিতে দিতে পথে কথা ব'লবে!'

আপত্তি ক'রলাম না, ব'ললাম, 'বেশ, চলো।' তারপর অল্পসময়ের মধ্যেই জামা-কাপড় পরিবর্তন ক'রে তৈরী হ'য়ে নিলাম। অণিমার অনুরোধ কিন্তু তাই বলে এড়ানো গেল না; যাবার সময় তনুশ্রীর সঙ্গে দেখা না ক'রে যেতে সে কিছুতেই রাজি নয়।

তনুশ্রী এসে সামনে দাঁড়ালে তার মুখের না মুখ নিয়ে অণিমা জিজ্ঞেস ক'রলো, 'সুমন্তকে কেমন লাগলো তোমার, মনে ধ'রেছে তো?'

একমুহূর্ত কি ভেবে নিয়ে তনুশ্রী ব'ললো, 'একথা জিজ্ঞেস ক'রবার সময় বোধ করি এতদিনে উত্তীর্ণ হ'য়েছে! বিষয়টা এত চুনকো যে একথার কোনো মানে হয় না।'

—'যাকে ঠুন্‌কো ব'লছো, তা যে পৃথিবীতে কত গভীর, তা যদি জান্‌তে বোন, তবে আর ঠুন্‌কো ব'লে তাকে উড়িয়ে দিতে পারতে না।' অনিমা ব'ললো, 'ভালোলাগা আর ভালোবাসা—এই তো পৃথিবীর চির-কালের বড় ধর্ম।'

—'সে ধর্ম আপনারা করুন, আমার ওতে কাজ নেই।'

বুঝতে পারলুম না—কথাটা ব'লতে গিয়ে অলক্ষ্যে একবার বিদ্যুৎ জ্ব'লে উঠলো কিনা তনুশ্রীর চোখে!

অনিমা বললো, 'তার আগে যে তুমি একেবারে নিঃশেষেই কেড়ে নিয়েছ সুমন্তকে, ধর্ম রক্ষার আর সুযোগ দিলে কোথায়?' ব'লে আপন উচ্ছ্বাসেই খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো অনিমা।

ভাবলাম, এ বলে কি অনিমা, স্কুল মিষ্ট্রেসী ক'রে শেষ পর্যন্ত কি বুদ্ধিবৃত্তিটুকুকেও আজ হারাতে ব'সেছে? দু'পা এগিয়ে এবারে ঘরের মেঝে ছেড়ে চৌকাঠের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

অনিমার কথার জবাবে তনুশ্রী বললো, 'আমার সুযোগ দেবার অপেক্ষাতেই তবে এতদিন আপনারা ছিলেন, শুন্‌লেও হাসি পায়।'

অনিমা আর অপেক্ষা ক'রতে চাচ্ছিল না। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছিল যে তনুশ্রী ক্রমেই সিরিয়াস হ'য়ে উঠছে। এবারে সহাস্যে তাই নরম হাতে তার গাল টিপে দিয়ে ব'ললো, 'সতীন, সতীন, আমার সাত-জন্মের সতীন তুমি, বুঝেছ দুষ্টু মেয়ে? হ'লো তো, চলি ভাই এবারে।'

তনুশ্রী বোধ করি কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল ক'রে তার দিকে তাকিয়ে রইল। অনিমা ততক্ষণে পথে নেমে এসেছে।

সন্ধ্যার মৃদু হাওয়ায় প্রকৃতি শান্ত ছিল। পথে অন্ধকার থাকলেও দিক ভ্রম হবার কথা নয়। কিছু-দূর এগিয়ে এসে ব'ললাম, 'সোজাই কি বাড়ী যেতে চাও, দু'দণ্ড দেরী ক'রে গেলে কি হয় না?'

অনিমার কণ্ঠেও তেম্‌নি পাল্টা প্রশ্ন জাগ্‌লো: 'কেন পথে কোথাও এন্‌গেজমেণ্ট রেখেছ নাকি?'

ব'ললাম, 'রাখলেই বা মন্দ কি, চলোনা এগোই।'

বিশেষ কিছু-একটা আপত্তি ক'রলো না অনিমা।

হাটতে হাটতে আবার সেই উন্মুক্ত ময়দানে আমাদের সেই প্রথম কলেজ-জীবনের কৃষ্ণচূড়ার গাছটার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালাম। আজ আর সেখানে চাঁদের আভাস-মাত্রও নেই: সারা প্রকৃতিতে আজ কৃষ্ণপক্ষের দুরন্ত ছায়া। কিন্তু এই ছায়ার মধ্যেই না জানি কত মায়া। ক্লান্ত পথিক চিরকাল ছায়াই তো খুঁজে এসেছে, সংসারে চিরকাল যে আমরা ছায়া খুঁজেই মরি! ছায়ার আল্পনা দিয়ে আমরা চাই চিত্তের গহন প্রাঙ্গণকে রাঙাতে। এতকাল পর অনিমাকে আবার সেই পূর্বস্মৃতির মধ্যে নিবিড় ক'রে কাছে পেয়ে পারলুম না নিজেকে ধ'রে রাখতে। ব'ললাম, 'সেদিন কৃষ্ণচূড়ার মাথার উপরে ছিল চাঁদের রেখা, তুমি সেই চাঁদ সাক্ষী ক'রে প্রতি-শ্রুতির বাণী উচ্চারণ ক'রে আমাদের প্রেমকে অক্ষয় ক'রে রাখতে চেয়েছিলে। মনে পড়ে আজ সে দিনের একটি কথাও?'

অস্ফুটকণ্ঠে অনিমা ব'ললো, 'পড়ে।'

ব'ললাম, 'পুলিয়া থেকে চিঠিতে জানিয়েছিলে—আমার পাশে কোনো দ্বিতীয় নারী দেখলে তোমার পক্ষে তা অসহ্য হবে। মনে পড়ে না কি তার একটি অক্ষরও?'

তেমনি অস্ফুট শান্ত কণ্ঠেই অনিমা জানালো, 'পড়ে।'

—'তবে? তবে কেমন ক'রে তুমি এত নির্মম হ'তে পারলে? কোন মুখে তবে তুমি তনুশ্রীকে বিয়ে ক'রতে ব'লে শুধু তোমার নিজেকেই তুমি সরিয়ে নিলে না, সেই সঙ্গে আমার জীবনটাকেও চিরদিনের জন্যে নষ্ট ক'রে দিলে?'

শুনে সঙ্গে সঙ্গেই কিছু একটা ব'লতে পারলো না অনিমা। স্বল্পক্ষণ কেটে গেলে একসময় শান্ত কণ্ঠে ব'ললো, 'নিজেকে সত্যিই কি আমি সরিয়ে নিতে পেরেছি! পারলে বোধ করি এমন তিলে তিলে মৃত্যু থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচতে পারতুম। যে সমাজের সমস্ত সুখ শান্তি একমাত্র অর্থনীতির উপরে

দাঁড়িয়ে আছে, সে-সমাজে আমাদের প্রেম যুদ্ধি জীবনের একটা অপ্রত্যাশিত ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। একথা কি তুমিও একদিন বলোনি? প্রতি মুহূর্তেই তো তাই আমরা বিকৃত হচ্ছি, দিচ্ছি আমাদের শাশ্বত যৌবনকে। সে জন্যে দুঃখ ক'রে লাভ নেই সুমন্ত। সে দিনের ইতিহাসকে একবার স্মরণ করো। যেমন ক'রে তোমার মার মুমূর্ষু অবস্থার কথা ব'লে চিঠি দিয়েছিলে, তাতে ও কথা লেখা ছিল না! জীবন যেখানে নানা সমস্যায় কণ্টকিত, সেখানে ফুলের স্বপ্ন একেবারেই অলীক নয় কি? তনুশ্রীকে নিয়েই তুমি সুখী হও, অন্ততঃ জানবো—আমাদের মধ্যে একজনও তবু সুখী হ'য়েছে।'

ব'ললাম, 'জীবনে সুখ কি কখনও জোর ক'রে আনা যায়! সুখ তো বাজারের পণ্য নয় যে তাকে দাম দিয়ে কিনে আনবো! তা ছাড়া তুমি, তোমার নিজের দিকটাও কি একবারও চিন্তা ক'রে দেখেছ লক্ষ্মীটি?'

কিছুমাত্র দ্বিধা ক'রলো না অনিমা, ব'ললো, 'দেখেছি। একদিন ব'লেছি তো, মেয়েরা যেখানে ডোবে, একেবারেই ডোবে; অন্নপরতন আশা ক'রে যে রূপসাগরে একদিন আমি ডুবেছি, তা থেকে আমাকে তুলে নিতে পারে এমন মানুষ পৃথিবীতে নেই। প্রেমের তপশ্চর্য্যা যে আমার সারা জীবনেও শেষ হবে না সুমন্ত! তোমার কাছে আমার ঋণ কি কম! যদি আমার সারা জীবনের তপস্যা দিয়েও ভালোবেসে যাই, তবু বোধ করি সে ঋণের এক কণাও শোধ হবে না।'

চারদিকে থম্ থম্ করছে অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যেই স্তব্ধ বিস্ময়ে একবার চোখ দু'টোকে মেলে ধরলাম অনিমার মুখের দিকে। দেখলাম আত্মপ্রত্যয়ের বিপুল বীর্যে স্থির হ'য়ে একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে অনিমা। তার কথার জবাবে চেষ্টা ক'রেও কিছু-একটা ব'লতে পারলুম না। নীরবে শুধু তার একখানি হাত নিজের হাতের মুঠোয় টেনে এনে অধরে স্পর্শ ক'রলাম। ইচ্ছে ছিল সেই প্রথম দিনের মতো বলি: তুমি যে আমাকে তোমার এই হাতখানি দিয়েছ, সে কতখানি দেওয়া, তা ভেবে শেষ করতে পারিনে। কবিরা শিরার মুখ নিয়েই যত কথা ক'য়েছে। কিন্তু হাতের মধ্যে প্রাণের কত ইসারা। ভালোবাসার যত কিছু আদর, যত কিছু সেবা, ঘরের যত দরদ, যত অনির্বচনীয় ভাষা, সব যে ঐ হাতে।' কিন্তু সেদিনের মতো আজও খুলে ব'লতে পারলুম না কথাটা।

খানিকক্ষণ বোধ করি নীরবেই কেটে থাকবে। তারপর এক সময় অনিমা ব'ললো, 'চলো, ফিরি।'

ব'ললাম, 'চলো।'

ঘড়ির কাঁটা কোথাও মন্থর ছিল না। রাত বোধ করি অনেকটাই হ'য়েছিল। সেটুকু এসে বুঝতে পারলুম বাড়ীর দরজায় পা দিয়ে। বড় ঘর থেকে বাবার গড়্‌গড়া টানার শব্দ আসছে। বুঝলাম খেয়ে দেয়ে তবে বাবা তান্ত্রকূটের সাধনায় মন দিয়েছেন। তনুশ্রী নীরবে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী একটা লক্ষ্য করছিল। ব'ললাম 'একা একা দাঁড়িয়ে কি ক'রছো? চলো, ঘরে যাই।'

কিন্তু একবার কিছু-একটাও জবাব দিল না তনুশ্রী।

ঘরে এসে জামা কাপড় ছেড়ে অল্পসময়ের মধ্যেই হাতমুখ ধুয়ে খাবার জন্য তৈরী হয়ে নিলাম। অন্যান্য দিন রান্না ঘরে বসেই খাই, আজ খাবার এলো আমাদের শোবার ঘরে; নিতান্তই আমার একার খাবার। ব'ললাম, 'তুমিও এস না, এক সঙ্গেই ব'সে পড়ি।'

কিন্তু একবারও কিছু-একটা জবাব দিল না তনুশ্রী। আসনের সাম্‌নে পরিপাটি ক'রে খাবার সাজিয়ে দিয়ে নীরবে আবার হেঁসেলঘরের দিকে গিয়েই গা ঢাকা দিল। এমন অনুকূল পরিবেশ ছিল না যে গলা ছেড়ে তনুশ্রীকে ডাকতে পারি। বড় ঘরে মা হয়ত এতক্ষণে ঘুমিয়ে প'ড়েছেন, কিন্তু বাবা এখনও হেরিকানের সল্‌তে কমিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েন নি। শত হ'লেও বাবাকে শুনিয়ে স্ত্রীর নাম ধ'রে ডাকাটা কেমনই যেন রুচিকর ব'লে মনে হ'লো না।

নীরবেই খাওয়া শেষ ক'রে এক সময় উঠে প'ড়লাম। হেঁসেলের কাজ গুছিয়ে আসতে আসতে তনুশ্রীর প্রায় ঘণ্টা খানেক দেরী হ'লো। এর মধ্যে কখন যে সে খেলো, বুঝতে পারলুম না। আমার খাওয়া না হওয়া অবধি কোনোদিনই সে অন্ন গ্রহণ করেনি, আজও করবার কথা নয়। কিন্তু আমি খেতে বসা অবধি হেঁসেলের এটাওটা পাঁটাঘাঁটি আর বোয়ামোছারই কেবল আওয়াজ পেয়েছি, তার মধ্যে নিশ্চয়ই খাওয়া শেষ ক'রে ওঠা সম্ভব নয়। হেঁসেলের পাট চুকিয়ে তনুশ্রী ঘরে এসে দাঁড়ালে তার মুখের দিকে লক্ষ্য ক'রেই সেটুকু বুঝতে পারলুম। জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'কৈ, তুমি খেলে না?'

অস্ফুটকণ্ঠে তনুশ্রী ব'ললো, 'খেয়ে দেয়ে কাজ কর্ম্ম সেরেই তো তবে এলাম।'

ব'ললাম, 'মিথ্যে ক'রে ব'লছো, পেটে কিছু প'ড়লে মুখখানি তোমার এত শুকনো লাগ্‌তো না।'

—'চোখে তোমার এত দরদ!' কেমন একটা প্রগাঢ় দৃষ্টিতে মুহূর্ত্তের জন্য আমার মুখের দিকে চোখ দু'টোকে স্থির ক'রে তনুশ্রী ব'ললো, 'তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষাটুকুও আমার নেই।'

ব'ললাম, 'নাই বা জানালে সেটুকু! তা যাক, গলার দিকটা যে একেবারেই খালি দেখ্‌ছি, এরই মধ্যে হারটা খুলে রাখলে?'

মনে কিছুমাত্র দ্বিধা না রেখেই তনুশ্রী ব'ললো, 'এ গলায় ও হার মানায় না।'

শুনে খুসী হ'তে পারলুম না। ব'ললাম, 'তবে কি মানায় ব'লতে পারো?'

উত্তর দিতে গিয়ে আর একবার আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে পরে সে ব'ললো, 'যদি পারি তবে কাল ব'লবো।'

—'বেশ, তাই বোলো।' বলে বিন্দুমাত্র আর অপেক্ষা না ক'রে বিছানায় এসে শুয়ে প'ড়লাম। কেমন একটা আকস্মিক ক্লান্তিতে অনবরত হাই উঠ্‌ছিল, ঘুমে দু'চোখ বুজে আসছিল অনবরত। ব'ললাম, 'এস, শোবে না? বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে এস।'

কথা রাখলো তনুশ্রী। বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে এসে শয্যার 'পরে উঠে বসলো সে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শুলোনা। কতক্ষণ যে ব'সে ব'সে হাতপাখাখানি হাতে নিয়ে মৃদুভাবে নাড়তে লাগলো, বুঝতে পারলুম না। পাখার মৃদু হাওয়ায় অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হ'য়ে প'ড়লাম। কোথা দিয়ে যে কেমন ক'রে রাত্রিটা কেটে গেল, জানতে পারলুম না।

অন্যান্য দিন ভোরের দিকে নিজে থেকেই ঘুম ভেঙে যায়। আজ কিন্তু প্রভাত হ'লো বাবার হাঁকাহাঁকিতে। বাড়ীতে বাবাই চিরকাল সব চাইতে আগে ওঠেন। কাক ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই বিছানার সঙ্গে সম্পর্ক চুকে যায় বাবার। কিন্তু কোনোদিন স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে তিনি আমার ঘুম ভাঙাননি। আজ কিন্তু উঠোনে পা দিয়েই বুকফাটা চিৎকারে সারা বাড়ীটাকে কাঁপিয়ে তুললেন বাবা: 'খোকা, এখনও কি শুয়ে তুই? শীগগির উঠে এসে দেখ—কি সর্ব্বনাশ হ'য়েছে!'

ঘুম ভেঙে গিয়ে দারুণ একটা আতঙ্কে বুকখানি ঢিপ ঢিপ ক'রে উঠলো। পাশে তাকিয়ে দেখলাম তনুশ্রী নেই। সম্ভবতঃ সে তবে আমার আগেই উঠে গিয়ে থাকবে। এমন তো কতদিনই উঠে গেছে সে! তবে কি মা সত্যি-সত্যিই এবারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে আমাদের সবাইকে ফাঁকি দিয়ে চিরদিনের জন্য পালালেন? সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে উঠোনে এসে দাঁড়াতেই দুর্ঘটনাটা স্পষ্ট চোখের সাম্‌নে দেখতে পেয়ে বিভীষিকাগ্রস্ত রুগীর মতো নিজেই এবারে চিৎকার ক'রে উঠতে যাচ্ছিলাম, বাবা ব'ললেন, 'এ কেন হ'লো, এ কেমন ক'রে হ'লো, ঘরের লক্ষ্মী এমন ক'রে আজ কি ক'রে চ'লে যেতে পারলো? আমার সাজানো সংসারে এ আজ কী বজ্রাঘাত হ'লোরে খোকা!'

ঘরের ভিতরে মা তখনও বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। এত কান্না কি মারই সইবে?'

বাবার প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ হ'লোনা। উত্তর দিতে গিয়ে তাই চুপ ক'রে গেলাম। আবছ

পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে কোনোমতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারছিলাম না। বাবার মতো আমার নিজের কাছেও সেই একই প্রশ্ন : এ কেন হ'লো, এ কেমন ক'রে হ'লো?—নিজের আভিজাত্য নিয়ে বিজয়িনীর মতো চিরদিনের জন্য এ পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চ'লে গেল তনুশ্রী। একটুও জানতে দিল না কাউকে, এতটুকুও ভাববার অবকাশ দিল না কাউকে। বারান্দার কড়ি-কাঠে শক্ত ফাঁসির দড়িতে তার সমস্ত শরীরটা ঝুলে আছে। নিঃশব্দ রাত্রির অন্ধকারের নিভৃতে মৃত্যুকে সে সাদর আহ্বান জানিয়েছিল। মৃত্যু তাকে প্রতারণা করেনি। একবার মনে করতে চেষ্টা করলাম গতকালের ঘটনাগুলি : অণিমার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে অকস্মাৎ সিরিয়াস হয়ে উঠছিল তনুশ্রী, তারপর অণিমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে যখন এসে বারান্দায় দাঁড়ালাম, দেখলাম—আপন মনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি একটা লক্ষ্য করছে তনুশ্রী। বোধ করি এই কড়িকাঠটাকেই লক্ষ করছিল সে একান্তচিত্তে। রাত্রে যখন অণিমার দেওয়া হারের কথাটা উল্লেখ ক'রলাম, তখন বিক্ষুব্ধ চিত্তেই জানিয়েছিল—'এ গলায় ও হার মানায় না।' সহ্য ক'রতে পারিনি কথাটা, জিজ্ঞেস ক'রেছিলাম, 'তবে কি মানায় ব'লতে পারো?' উত্তরে কিছুমাত্র দ্বিধা না করেই সে জানিয়েছিল, 'যদি পারি তবে কাল ব'লবো।'—এই বলাই তবে ব'লতে চেয়েছিল তনুশ্রী? হারের পরিবর্তে একগাছা ফাঁসির দড়ি। এ দৃশ্য দেখবার জন্যেই তবে আজ পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রতে ব'লেছিল সে? তনুশ্রীর সমস্ত ঔদ্ধত্য, সমস্ত ত্রুটি মুহূর্তে যেন কেমন একটা স্নেহাতুর করুণ রসে সিক্ত হ'য়ে সমস্ত মনটাকে আমার ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আর একবার সেই প্রশ্নটাই মনের মধ্যে উদ্বেলিত হ'য়ে উঠলো : 'এ কেন হ'লো? এ কেমন ক'রে হ'লো? কোনোদিন এমন ক'রে ম'রবার মতো তো মন ছিল না তনুশ্রীর! স্বভাবে মুখরা ছিল সে, মুখে মুখে ঝগড়া ক'রেছে, নিজের বাপ-মার দিকে টেনে নিজের মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠ ক'রতে চেয়েছে সে আমার কাছে, কিন্তু নীরবে হেরে গিয়ে কখনও মৃত্যুবরণ দেখেনি, অন্তত: দেখেছে ব'লে একটা দিনও মনে পড়ছে না। পারলে ইতিহাস কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো জানিনা। আর-একবার তনুশ্রীর মৃত দেহটার দিকে মুখ তুলে তাকাতেই মার বুকফাটা কান্নার শব্দে বুকের ভিতরটা আমার হু-হু করে উঠলো।

—'আমাদের এ আজ কি ভাবে ফেলে রেখে তুই চ'লে গেলি মা? আমি যে সোনা দাদুর মুখ দেখবো বলে আশায় আশায় বুক বেঁধেছিলাম! নিজে গিয়ে দাদুকেও যে তুই নিয়ে গেলি রে!-খোকা, তুই কেন দেখলি না রে খোকা?'

কান্নার ধ্বনিতে মার মুখে এ আজ কী কথা? তনুশ্রী তবে একাই গেল না সংসার থেকে? তার গর্ভে তবে আমারই উত্তর-পুরুষ-ভ্রূণ হয়ে মিশে ছিল! চমকে উঠলাম নিজের মধ্যে; যে ঈশ্বরকে মিথ্যা বলে ভেবে-ছিলাম, এবারে তাঁকেই আবার পরম সত্য বলে বিশ্বাস ক'রে মনে মনে ডাক ছেড়ে একবার বলতে চাইলাম : 'এ তোমার কি বিধান, বিধাতা?'

দেখতে দেখতে পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে খবরটা রটে গেল, তারপর এ-পাড়া থেকে সে-পাড়ায়, সে পাড়া থেকে সারা সহরে। অণিমার কানে গিয়েও বিষয়টা না পৌঁছাবার কথা নয়, কিন্তু একটিবারের জন্যও আর সে এমুখো হ'লো না। হয়ত এমন দৃশ্য নিজের চোখে দেখে সহ্য করতে পারতো না সে, তাই দূরে থেকেই নিভৃতে জানালায় দাঁড়িয়ে দূরের পথে ব্যাকুল দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে রাখলো সে! বহির্বাটির দরজায় তখন লোকে লোকারণ্য, এমন কি থানা থেকে পুলিস এসে উপস্থিত হ'তেও বাকী রইল না। এমন একটা অভাবিত মৃত্যুকে সহজে কেউ স্বীকার ক'রে নিতে রাজি নয়! অবশেষে বাবাকেই অগ্রণী হ'তে হ'লো। তাঁর শুদ্ধ সামন্ততান্ত্রিক রক্তে আজ একটা দারুণ কালো রেখার দাগ দৃঢ় হ'য়ে বসে গেল, সন্দেহ নেই। সারা বুকে সেই কলঙ্কিত কালিমা নিয়েই বাবাকে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ব'লতে হ'লো সবলের সঙ্গে।

কেউ একান্তে দুঃখ জানালো, কেউ দু'টো সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করে নীরবে গা ঢাকা দিল। তারপর যা কিছু করণীয় কাজ, নিজের হাতেই আমি করলাম। যাকে চেষ্টা ক'রে একটা দিনের জন্যও হৃদয় দিতে পারি নি, আজ স্বেচ্ছায় তার নশ্বর দেহে নিজের হাতে গিয়ে অগ্নি সংযোগ করে যখন ঘরে ফিরে এসে দাঁড়ালাম, কেমন একটা নিদারুণ একাকিত্বের বেদনায় সেই ঘরটা সহসা বজ্রাহত বনস্পতির মতো আন্দোলিত হয়ে উঠলো। আজ তনুশ্রীর কোনো কিছুই আমার কাছে অপ্রিয় ব'লে বোধ হলো না, বরং তার অভাবটাই সমস্ত বুকের মধ্যে বার বার ক'রে বেজে উঠতে লাগলো। ঘরের এপাশে ওপাশে তাকিয়ে দেখলাম—কোথাও এতটুকু স্বাক্ষর রেখে গেছে কিনা, কিন্তু বৃথাই অনুসন্ধান। নিঃশেষে স্বাক্ষর রেখে যাবার মতো মেয়ে নয় তনুশ্রী। অনিমার দেওয়া হার ছড়াকে পাওয়া গেল অনিমারই চিঠির তাড়ার সঙ্গে। বুঝতে কষ্ট হ'লো না যে, দানের মর্যাদা রেখে অনিমাকেই আবার হার ছড়া ফিরিয়ে দিয়ে গেছে সে। এত বড় অভিমানী মেয়েও আজকের পৃথিবীতে আছে? কিন্তু পৃথিবীকে এতকালের মধ্যে একটিবারও জানতে পারি নি। এ যে কত বড় সত্য, তা বলে বুঝোতে পারবো না। মনোবিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করে যে-অহমিকাকে এতকাল মনে ঠাঁই দিয়েছিলাম—সে অহমিকা কখনই না জানি ভেঙে চুরমার হয়ে গেল! তা নিয়ে ভেবে দেখবারও অবকাশটুকু পেলাম না।

এমনি করেই দিন দু'তিন কেটে গেল। এই দু'তিন দিনের মধ্যেও যখন অনিমা আর দ্বিতীয়বার এসে আমার অধ্যয়ন-কক্ষের দুয়োরে দাঁড়ালো না, তাবলাম তবে হয়ত ইতিমধ্যে সত্যি সত্যিই টেলিগ্রাম পেয়ে দেওঘরে রওনা হয়ে পড়েছে অনিমা। ভাবতে গিয়ে অভিমানও বড় কম হ'লো না। আমার এত বড় দুঃসময়ে দু'টো সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করেও কি আমাকে চ'খও ভুলিয়ে রাখতে পারতো না সে? এটুকুকে কি তবে কর্তব্য ব'লে মনে করেনি অনিমা?

সেদিন সন্ধ্যায় ঘরে বসে কিছুতেই মন টিকছিল না। কলেজ-জীবনের গোড়া থেকে তনুশ্রীর মৃত্যু পর্যন্ত সমস্তগুলো ঘটনা একে একে মনে প'ড়ে কেবলই আকুল ক'রে তুলছিল। অনেকক্ষণ সেই অবস্থায় নিমজ্জিত হ'য়ে থেকেও যখন নিদারুণ একটা অস্থিরতা থেকে কিছুতেই মুক্তি পেলাম না, নীরবে এসে পথে দাঁড়ালাম; তারপর নিজের অলক্ষ্যেই কখন হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে উপস্থিত হলাম অনিমাদের দরজায়। সন্ধ্যা ততক্ষণে উত্তীর্ণ হয়েছে। দরজা খোলাই ছিল, চোখে প'ড়লো—একান্তে দাঁড়িয়ে সামনের পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে কি একটা লক্ষ্য ক'রছে শীলা। বিন্দু বিন্দু অশ্রুতে চক চক ক'রছে চোখ দু'টি। আমাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে উচ্ছ্বসিত আবেগে কেঁদে ফেললো। আশ্চর্য হলাম; চাঁদের মতো যে মুখখানিতে হাসি দেখতেই চিরদিন অভ্যস্ত ছিলাম, আজ তারও চোখে জল। শীলার বেণীবদ্ধ ছোট্ট মাথার উপর দিয়ে স্নেহের হাত বুলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'কি হয়েছে শীলারানী?'

উচ্ছ্বসিত কান্নার বেগ থামিয়ে শীলা বললো, 'দিদি এই গাড়ীতেই চলে গেল। আপনার সব কথাই আমরা শুনেছি সুমন্তদা। যাবার আগে আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে দিদি বললো, তোর সুমন্তদাকে সান্ত্বনা দিতে পারি—এমন ভাষা আমার নেই। যাবার আগে তাই তাঁর সঙ্গে দেখাটুকু অবধি ক'রে যেতে পারলুম না। পারিস তো তুই তাঁকে বুঝিয়ে বলিস, আমার হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিস্ তাঁর কাছে।'

শুনে শুধু বিস্ময়ে কতক্ষণ যে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলুম বলতে পারি না। পরে জিজ্ঞেস ক'রলাম, 'গাড়ী ক'টায়, কিছু জানো শীলারানী?'

শীলা ব'ললো, 'কি জানি, বোধ করি আটটা দশ কি সওয়া আটটায় হবে; বাবাকে একবার ব'লতে শুনেছিলাম।'

মনে মনে হিসেব ক'রে দেখলাম—এখনও তবে সময় কিছু আছে। এখনও ষ্টেশনে গেলে অনিমার সঙ্গে দেখা

চলে পারে। ব'লুলাম, 'এতদিন বৌদির সঙ্গে লজ্জার কথা বলেনি নীলারানী, আজ সে নিজেই লজ্জায় এ সংসার ত্যাগ ক'রে চলে গেছে।'

নীলার চোখের জল তখনও শুকোয় নি। তার চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখলাম—আর একবার উদ্যত অশ্রুতে সেই চোখ দুটি নতুন করে ভারী হয়ে উঠেছে।

বললাম, 'দিদির জন্যে দুঃখ করে লাভ কি? বিদেশে চাকরী করতে হলে এমনি করেই তো তাকে এসে এসে আবার ফিরে যেতে হবে! তার জন্যে দুঃখ করতে নেই নীলারানী। মাঝে মাঝে গিয়ে আমাকে দেখা দিয়ে এসো, কেমন?'

মাড় কাঁৎ করে স্বীকৃতি জানালো নীলা।

আর অপেক্ষা করে মিথ্যে কালক্ষয় করলুম না। ঘড়িতে এখন প্রায় পৌনে আটটা। ষ্টেশন কাছে নয়, দ্রুত হেঁটে গেলেও পনেরো মিনিটে ফুলোবে না। এক-রকম উর্দ্ধশ্বাসেই তাই ছুটে পড়লাম। এ ক'দিনের কোনো ফাঁকে অণিমা চলে গেলে মিথ্যে অনুশোচনা নিয়ে দুঃখ করতাম না, কিন্তু দু'দণ্ড এগিয়ে গেলে যাকে এখনও কাছে পাওয়া যায়, এখনও চেষ্টা করে যাকে ফিরিয়ে আনা যায়, তার জন্য পথের সামান্য কষ্ট স্বীকৃতি —সে কি সত্যিই বড় কিছু?

উর্দ্ধশ্বাসেই তাই পা দুখানিকে দ্রুত এগিয়ে দিলাম ষ্টেশনের পথে। এমন করে ছুটলে বোধ করি একটা রাত্রির মধ্যে পায়ে হেঁটে আমিও গিয়ে পৌঁছাতে পারি পুণিয়ায় কিম্বা দেওঘরে! পথ দুস্তর হলেও বন্ধুর নয়, মানুষই দিনে দিনে রচনা করেছে পথ আর জনপদ। সেই পথকে জয় করে নিতে এতই কি দুঃসাধ্য প্রয়াস মানুষের?

যখন এসে প্লাটফর্মে পৌঁছালাম, গাড়ী ছাড়বার তখন বেল পড়েছে। এতক্ষণের দ্রুত হাটার ফলে পা দুখানি অনবরত ভেঙে আসছিল। তবু শেষ চেষ্টা; কথা বলার অবকাশে না পাই অন্ততঃ একটিবার কি অণিমার মুখখানিও দেখতে পাবো না?

বেশী খুঁজতে হলো না। লেডিস্ কম্পার্টমেন্টে জানালায় মুখ বাড়িয়ে বসে ছিল অণিমা। মুখখানির অবস্থা স্বাভাবিক ছিল না। নীলার চোখের জল বুঝি অণিমারও চোখের কোণাও লুকিয়ে ছিল; ঘনঘনে মেঘাবৃত আকাশের মতো মুখখানি তাই বড় ভারি দেখাচ্ছিল। কাছে এগিয়ে গিয়ে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়েই তার একখানি হাত নিজের হাতের মুঠোয় টেনে নিয়ে স্বোচ্ছাসে বলে উঠলাম, 'তুমিও তবে এমনি করে আজ ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে? প্রেমের দাবীতে তোমাকে কি কাছে ধরে রাখবার কোন অধিকারই আমার নেই! জীবনে যে ভুল করেছিলাম, তার প্রায়শ্চিত্ত হতেও দেরী হলো না। তনুশ্রী চলে গিয়ে আমাকে মুক্ত করে দিয়ে গেছে। এস, নেমে এস, আমার চরম দুঃখের দিনে তুমি এসে আজ পাশে, দাঁড়াও অণিমা। তোমার মধ্য দিয়ে আমাকে আবার নতুন হয়ে উঠতে দাও। এস, নেমে এস লক্ষ্মীটি।'

অণিমার চোখ দুটি বুঝি একবার অলক্ষ্যে চক্ চক্ ক'রে উঠ্লো। অস্ফুট কণ্ঠে বল্লো, 'তা হয় না সুমন্ত! আমার যে এখনও প্রায়শ্চিত্ত করা বাকী র'য়েছে। সে প্রায়শ্চিত্ত হয়ত আমার সারা জীবনেও শেষ হবে না! তুমি আমাকে ভুলে যাও সুমন্ত!'

পুণিয়া থেকে চিঠিতেও একদিন এমনই একটা কথা লিখেছিল অণিমা। পড়ে সেদিন মনে মনে অট্টহাসের সঙ্গেই হেসেছিলাম, আজ কিন্তু কথাটা আঘাত দিল! সে আঘাত আমার মর্ম ভেদ করে কোথায় গিয়ে যে পৌঁছালো, বলতে পারবো না। আমার হাতের মুঠো থেকে ক্রমশঃই তার হাতখানি শিথিল হয়ে আসছিল। বল্লাম 'এক যুগের সৃষ্টি আর এক যুগের দুর্গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু নয়, কিন্তু ইতিহাস কিছুই ভোলে না। মানুষের জীবনও তো তাই! সে চেষ্টা করলেই কিছু ভুলতে পারে দু'জনে মিলে যে

বৈত-সঙ্গীত একদিন আমরা রচনা করেছিলাম, মনের ইতিহাসের পাতায় তা কি আজও অবিনশ্বর হয়ে নেই? সেই পাতাগুলোর দিকে একবার লক্ষ্য করে দেখ।'

অণিমা বল্‌লো, 'শীত এলে গাছের জীর্ণ পাতা ঝরে পড়ে, জানত সুমন্ত? তোমার ডাকে সাড়া দিতে না পেরে তোমাকে যে কত আঘাত ক'রেছি, জানি; কিন্তু তার চাইতে বেশী আঘাত কি আমার নিজেকেই করছি না? সঙ্গীতের দিন আমাদের জীবনে কবেই ফুরিয়েছে, আজ ধ্যানের দিন। যদি সেদিনের প্রেম আমার এতটুকুও সত্য হয়ে থাকে, তবে তার ধ্যান করেই যেন বাকী দিনগুলি আমি কাটিয়ে দিতে পারি। তুমি আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করো সুমন্ত।'

অলক্ষ্যে টস্‌ টস্‌ করে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে প'ড়ে গালের দুটো পাশ ভিজে গেল অণিমার।

বল্‌তে যাচ্ছিলাম, 'সেতারার সুর কি তবে এখন থেকে একতারাতেই বাজবে? আর একটা তার কি তাতে আর কোনো দিনই এসে যোগ হবে না?' কিন্তু মুখ ফুটে বল্‌বার আগেই পিছন থেকে গার্ডের হুইসেল বেজে উঠ্‌লো এবং সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ছেড়ে দিল।

আর একবার তাকিয়ে দেখতে গেলাম অণিমার মুখখানিকে, কিন্তু দেখা আর হলো না। ইঞ্জিনের ধোঁয়ায় ততক্ষণে সে মুখখানি ঢাকা পড়ে গেছে।

এতকাল পা দুখানি দিয়ে কতই না চলেছি, এতক্ষণে এসে সেই পা দুখানি কিছুতেই আর চল্‌তে চাইল না। গাড়ীটা চলে যাবার পর দেখতে দেখতে ষ্টেশনটা একেবারেই ফাঁকা হয়ে গেল। চারদিকে শুধু অন্ধকারের ছায়া-বিস্তার, রাত্রি থম্‌ থম্‌ করছে চারপাশে। দূরে সিগ্‌নালের ক্ষীণ বাতি আর ষ্টেশনমাষ্টারের ঘরে নিস্তব্ধপ্রায় একটা পেট্রোমাক্স ভিন্ন আর কিছুই চোখে পড়ে না। সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে একটানা নিবিড় নিস্তব্ধ রাত্রির পদসঞ্চার। কতক্ষণ যে তারই মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে রইলাম, বলতে পারি না। কিছুটা সম্বিৎ ফিরে এলে নিজের দিকে একবার দৃষ্টি দিতে গিয়ে দেখলাম, কোথাও সেখানে আলোর ইসারা মাত্রও নেই; আমার জীবনেও সেই রাত্রি, আমার জীবনেও সেই ফাঁকা ষ্টেশনেরই নিঃসঙ্গতা। রাত্রির এই নিঃসঙ্গতা ভেদ ক'রে কোনো দিনই বুঝি আর প্রভাত-সূর্য মুখরিত হয়ে উঠবে না।

সমাপ্ত

BENGAL JUTE MILL

COMPANY LIMITED

8, Dalhousie Square East,
CALCUTTA.

Manufacturers of all Qualities of

JUTE GOODS

FASHIONABLE JUTE CARPETS
For All Purposes and at Economical Rates

Available in Various Shades and Designs

JACQUARDS, DOBBIES, FLOOR RUNNERS,
CHAIR CLOTHS & SCHOOL MATTINGS.
ALSO JUTE WEBBINGS

Twines, Spool and Cops Our Specialities

UNREPRESE.

TELEGRAMS & CABLE.
"CALCUTTA-(INDIA).
"HEMPBALER"

HOWRAH-13
22-6853-58

চেতনা

শ্রীপ্রশান্ত কুমার সিংহ

এই একটু আগে ট্রাম ডিপোতে ঢং ঢং করে ঘণ্টাটা বেজে চলেছে ঘোষণা করল। রাস্তায় লোকচলাচল খুব বেশী নেই। এটা আবার একটা রাস্তা! দুদিকে দুসারি বাড়ীর লোকজন যেন বের হতে পারে তার জন্যই হয়ত এই অনাদীর্ঘ স্বল্পপরিসর এঁদো গলিটা। মাঝে মাঝে আনাজের টুকরো, উনুনের পোড়া কয়লা পড়ে রাস্তাটা প্রায় ভর্তি করে ফেলেছে। একটা গ্যাসের ল্যাম্পপোষ্ট মিট মিট করে একদিকে জ্বলছে। অন্ধকারে চোখ মেলে চলতে হবে: একটু অসাবধান হলেই গতিক কিন্তু বেগতিক। ভাড়াটিয়ারা অনেকে আবার বাসনমাজা জল রাস্তায় ফেলে যেন সুতরাং পথিকের সেদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

পাশাপাশি বাড়ীর প্রত্যেক বাড়ীতেই বাতি নিভে গেছে। সকলে আবার দশটায় পাঁচটায় আপিস করতে ছুটেন, সুতরাং একটু আগে বিছানায় কাৎ না হলে শরীর কেমন করে টিকবে!

তখনও কিন্তু এগারনম্বর বাড়ীতে মিটমিট করে আলো জ্বলছে। আজ ওটা নূতন নয়, দেখে দেখে গাসওয়া হয়ে গেছে: নিজের তেল খরচ করে কে পরের চক্ষুকায় তেল লাগাতে যাবে! প্রথম প্রথম পাড়ার মেয়েমহলে এবিষয় আলোচনা হত দুপুরের বৈঠকে। ঘোষেগিন্নি তিন খিলি পান একসঙ্গে মুখে পুরে বলতেন, আমরা বাপু সংসারের খরচ বাঁচাবার জন্যে ন'টা বাজতে না বাজতে বাতি নিভিয়ে দিই। আর দেখেছ এগার নম্বরটা? কোনদিন ত পৌনে এগারটার আগে বাতি নিভাতেই চায় না।

আর একজন বলেন, তা আর হবে না? বাপ বেটা দুহাতে উপায় করছে এখন। তা ওরকম খরচ না করলে জমাবে থাকবে কি করে? টাকা যে উপায় করছে সেটা দেখাতে হবে ত!

মেয়েদের পেটে নাকি কথা থাকে না—অন্তত কথায় তাই বলে। খরিদ্দার যেমন দর জিজ্ঞাসা করতে করতে এক দোকান থেকে আর এক দোকানে চলে যায় এবং এইভাবে অনেকগুলি দোকান ঘুরে শেষে কিনিস কেনে উপরোক্ত খবরটিও তেমনি এঘর ওঘর করতে করতে একেবারে এগারনম্বর গৃহিনীর কানে উঠল। তিনি শুনে কি করলেন? অনেকে চোখ বুজে জজ সাহেবের মত আদেশের স্বরে বললেন, ঝগড়া। কিন্তু সত্যি তা হয়নি তার কারণ এগার নম্বরের বাড়ীর গিন্নী সে ধাতের মেয়েই নন। নিজের মধ্যে জ্বলে পুড়ে মরবেন কিন্তু ঝগড়া করবেন না পরের বৌ-ঝিদের সঙ্গে। এ তাঁর একেবারে স্বভাব বিরুদ্ধ। কতকটা বুঝি এজন্যই বাপ-মায়ের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মন্মথবাবু বিয়ে করেছেন প্রসন্নময়ীকে।

মনে মনে রাগ হল ছেলের উপর। না হয় একটা চাকরী পেয়েছে তাবলে যা ইচ্ছা তাই করবে? মা বাবা কি আদেশ করবার কেউ নন? মাসান্তে পঞ্চাশটা টাকা হাতে তুলে দেয় বলে হরিনাথ কি মাথা কিনে নিয়েছে? সে উপায় করতে শিখেছে বলে কি স্বাধীনতা পেয়েছে যা ইচ্ছে তাই করবার?

ঘরের মধ্যে টেবিলঘড়ির কাঁটা একপা একপা করে এগিয়ে চলেছে। টিক্ টিক্ টিক্ টিক্ করছে ঘড়িটা। প্রসন্নময়ী ঠিক করলেন মনে মনে— এভাবে আর চলা যায় না। নিজের শরীর আছে এবং তার উপরে আছে এই সংসারের ভার। এখন থেকে একটু শক্ত না হলে ছেলে পরে বাবার অবর্তমানে যে কি করতে পারে সে কথা ভেবে মনে মনে শিউরে উঠলেন।

মন্মথবাবু পাশ ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখনও বসে? হরিনাথ এখনও আসেনি বুঝি? দিন দিন একেবারে কি যেন হয়ে উঠছে ব্যটা টাকা রোজগার করে বলে। কিছু না বলে বলে আস্কারা বেড়েই চলেছে। আজ সে একবার ফিরে আসুক। ঘড়ির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রসন্নময়ী মনেমনে বললেন, ঠিক ঠিক।

সাড়ে দশটা মাঝল পড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠল দরজার কড়া। প্রসন্নময়ী উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল হরিনাথ, মুখে সস্তা সিগারেটের গন্ধ। অন্য দিন প্রসন্নময়ী তবু জিজ্ঞাসা করেন, এত দেরী কেন রে? কিন্তু ঐ পর্যন্তই, ওর বেশী নয়। আজ প্রসন্নময়ীকে চুপ থাকতে দেখে হরিনাথের বুকের ভিতরটা আকস্মিক এক ঝড়ের আশঙ্কায় থাঁ থাঁ করে উঠল। হঠাৎ বলে উঠল, মা, আজ একটু দেরী হয়ে গেল।

উত্তর দিলেন মন্মথবাবু। বললেন, দেরী তোমার কোন দিন না হয়? মানুষের শরীর বলে একটা জিনিস ত আছে। যার মাথায় সংসারের সব ভার তার শরীরের দিকে ত একটু লক্ষ্য রাখতে হবে, নাকি তুমি রোজগার করতে শিখেছ বলে সে নিয়মটুকুও মানতে নারাজ?

একটু রাগ হল হরিনাথের, অবশ্য মনে মনে। সে কাজ করে হাওড়ার একটা ব্লেডের ফ্যাক্টরীতে। বিকেলে ছুটি হয় পাঁচটার সময়। সেখান থেকে ফিরে আসতে না আসতে অমনি ছটা। এরপর মুখ হাত ধুয়ে কিছু মুখে দিতে হয়। এরপর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে রোয়াকে বসে একটু আড্ডা না দিলে শরীর ও মন দুইই অবসন্ন হয়ে পড়ে। সেহেতু ফ্যাক্টরী থেকে ফিরে একটু হাওয়া খেতে না বেরুলে কিংবা বন্ধুবান্ধবদের বাড়ীতে না গেলে কি মজা পাওয়া যায়? এইভাবে বেশ চলছিল হঠাৎ যেন পথে খেতে খেতে হোঁচট লাগল।

কোন কথা না বলে সে খেতে বসল। কোন রকমে খাওয়া সেরে সে বিছানায় শুয়ে পড়ল। অন্যদিন চলে অবশ্য একটু গল্প করত। ওটা তার একটা অভ্যাস।

এইভাবে দিন কেটে যায় আসে সপ্তাহ, তার পরে আসে মাস এবং বৎসর। তবুও মাঝে মাঝে ওরকম দেরী হরিনাথের প্রায়ই হয়। ক্লাবে যায় নিয়মিতভাবে কারণ সেখানে পাওয়া যায় দই আর আছে তাসের আড্ডা। বিশ্রামের পক্ষে এ রকম মনের খোরাক যথেষ্ট।

হরিনাথের এখন মাইনে বেড়েছে। পঞ্চাশ থেকে ধিরের মত লাফ দিয়ে মাইনে হয়েছে সত্তর টাকা। প্রথম যে মাস সত্তর টাকা মাইনে পেল সে দিন হরিনাথের কি আনন্দ। প্রসন্নময়ী স্বামীকে কিছু খাবার আনতে বললেন। মন্মথবাবু অনেক ঘুরে ঘুরে নিয়ে আসলেন "প্রাণহরা"—ওটা একটা মিষ্টির নাম। মিষ্টি পেয়ে ভাই-বোনেদের সে কি চেঁচামেচি। সুলেখা, অলকা আর খোকন—তিন জনে মিষ্টি নিয়ে ঘরের মধ্যেই লাফালাফি সুরু করে দিল। মায়ের মনটাও হালকা মেঘের মত আকাশের গায়ে ঘুরে বেড়াতে চাইল।

কিন্তু দু'একমাস পরে কি যেন হয়ে গেল। সবে মাত্র ফাল্গুন মাস পড়েছে। শীত বেশ কমে গেছে তবুও গরম পড়তে আরম্ভ করেনি।

মাইনের টাকা মায়ের হাতে তুলে দিয়ে হরিনাথ বেরিয়ে পড়ল। প্রসন্নময়ী জল-খাবারের জায়গা তুলবার পরে টাকাগুলি বাক্সে রাখবার জন্য ঘরের ভিতরে গেলেন। টাকা গুনে প্রথমে মনে হল তাঁর ভুল হয়েছে; আবার গুনলেন কিন্তু এবারেও তাই। সুলেখা বড় মেয়ে, তাকে ডেকে বললেন, টাকা কটা গুনে দেখত কত আছে। সে গুনে বলল, মা এতে পঞ্চাশ টাকা আছে। বাক্সের তালা ধরে প্রসন্নময়ী কি যেন ভাবছিলেন। সুলেখা আবার বলল, মা, এখানেত পঞ্চাশ টাকা আছে। প্রসন্নময়ী এবার যেন

চেতনা ফিরে পেয়েছেন এমন তার দেখালেন। বললেন, আমিও প্রথমে শুনে দেখলুম মাত্র পঞ্চাশ টাকা। গত মাসে হরিনাথ সত্তর টাকাই দিয়েছিল, হঠাৎ এমাসে টাকা—। আর কথা বের হল না।

দরজার ওধারে দাঁড়িয়ে আছে হরিনাথ। প্রসন্নময়ী একটু বিব্রত বোধ করলেন। তাড়াতাড়ি বাক্স বন্ধ করে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

এই ঘটনার পর থেকে কি যেন একটা হয়ে গেল। ঠিক আগের মত আর ছেলের সঙ্গে কথা বলতে হরিনাথের মনোও মাকে এড়িয়ে চলবার প্রচেষ্টা কাজ থেকে হরিনাথ ফিরলে প্রসন্নময়ী নিজের হাতে তাকে জলখাবার দিতেন। এখন কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম। সুলেখার হাতে পাঠিয়ে দেন জলখাবারের ডাবগুটা। সে কোনদিন কাজে ব্যস্ত থাকলে নিয়ে যায় অলকা কিংবা খোকন। যেটুকু কথা একেবারে না বললে নয় সেইটুকুর জন্যই দুজনের মধ্যে কথাবার্তা।

ব্যাপারটা মন্মথবাবুর চোখে যে না পড়েছে তা তিনি তেমন গ্রাহ্য করেননি। বড় মেয়ে সুলেখা মাকে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। একবার ভাবল বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে ক্ষতি কি? তবুও কিন্তু তার সাহস হল না। প্রত্যেকেই মনে মনে ভয়ে মরছে অথচ কেউ অপরকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছে না। বেলুনে হাওয়া দিতে থাকলে এমন এক সময় আসে যখন সত্যিই বাতাস আর যায়না ফলে সশব্দে ফেটে যায় বেলুনটা।

দু'একদিন পরের ঘটনা। বিকেল পড়ে গেছে। রান্নাঘরে প্রসন্নময়ী আর সুলেখা জলখাবার তৈরী করতে ব্যস্ত। বড় ঘরটার মধ্যে খেলা করছে দুই ভাইবোন—খোকন আর অলকা। খোকন একটু বেশী লাফালাফি করছে। তার হাতে ছোট একটা লাঠি। অলকার হাতে একটা কাঠের হরিণ। কাঠের হরিণটা নিয়ে অলকা পালাবার চেষ্টা করছে আর খোকন তাকে ধরবার চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছেনা। রাগ তার ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। বলল, দেখ্ দিদি, আমার হরিণটা দিয়ে দে বলছি, এটা ভাল হচ্ছেনা কিন্তু।

একসময় অলকা খোলা দরজার দিকে দৌড়ে গেল, বোধহয় খোকনকে এড়িয়ে যাবার জন্য। খোকনও নাছোড়বান্দা হয়ে উঠেছে। সে দেখল দিদিকে আর ধরা যাবে না। বেশ রাগও হয়েছে ধরতে না পারার জন্য। হাতের ছোট লাঠিটা ছুঁড়ে মারল অলকাকে লক্ষ্য করে। ঠিক সেই সময় কাজ থেকে ফিরে ঘরে ঢুকছিল হরিনাথ। আর যায় কোথায়? সজোরে গিয়ে তার মাথায় লাগল। সারাদিনের পরিশ্রমের পর কে এমন অনাচার সহ করবে? সুতরাং হরিনাথ ঘরে ঢুকে খোকনের গালে কয়েকটা চড় মেরে সেই লাঠিটা তুলে নিয়ে বেশ কয়েক ঘা দিয়ে দিল।

খোকন মার খেয়ে ডাক ছেড়ে কান্না আরম্ভ করে দিয়েছে। ব্যাপারটা জানবার জন্য প্রসন্নময়ী এগিয়ে এলেন। হাতের আঙুলের পাঁচটা দাগ খোকনের গোলগাল কচি গালে বসে গেছে। যন্ত্রণায় সে চীৎকার করছে। এর জন্য বাড়ীর কেউ প্রস্তুত ছিল না।

প্রসন্নময়ীই আগে কথা বললেন। সুলেখা গোলমাল শুনে একপাশে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রসন্নময়ী হরিনাথকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুই কি ভেবেছিস বল দেখি? ছোট ছেলে, একটা দোষ না হয় করে ফেলেছে। এর জন্য তাকে অমন করে খুন্নি মারতে হয়? ফ্যাক্টরীতে হয়ত হরিনাথ কারও সঙ্গে ঝগড়া করে থাকবে। তারও মেজাজ বিগড়ে ছিল। ফস করে বলে ফেলল, ছেলেকে শাসন করতে পারনা? অমন করে আস্কারা দিলে পরে ফল পাবে।

বেলুনটা আর বাতাস রাখতে পারল না, ফেটেই গেল শেষ পর্যন্ত। প্রসন্নময়ী তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, তোমাকে আস্কারা দিয়ে ত শিক্ষা অনেক আগেই পেয়েছি। তা বলে এইভাবে কেউ

কখন মারে? এই বলে খোকনকে তার কাছে নিয়ে গিয়ে মুখটা তুলে ধরলেন। ঠিক যেন পাঁচটা লোহার শিক আগুনে লাল করে কে পাশাপাশি সাজিয়ে দিয়েছে। এতক্ষণ খোকন প্রায় চুপ করে এসেছিল কিন্তু হঠাৎ মায়ের অপর্যাপ্ত স্নেহের এরূপে আবির্ভাব হতে দেখে সে আরও জোরে কেঁদে উঠল।

হরিনাথ দেখল সত্যিই এতটা করা ঠিক হয়নি। তবু মনের রাগ তখনও যায়নি। জোর গলায় বলে উঠল, মেরেছি ঠিক করেছি। ইচ্ছমনে আগুন দিলে যা হয় ঠিক তাই হল। প্রসন্নময়ী বললেন, মাসের শেষে কটা টাকা দিল বলে তুই ভেবেছিস যা ইচ্ছা তাই করবি? ওসব এখানে চলবে না। যদি এরকম করতে চাস তবে অন্য জায়গায় যা যেখানে তোর কথার কেউ প্রতিবাদ করবে না।

হরিনাথ নিঃশব্দে মুখ হাত ধুয়ে জলখাবার খেতে বসল। মনে মনে ঘটনাটার একবার পুনরুক্তি করবার চেষ্টা করল মাথার মধ্যে। একবার ভাবল মাকে দুএকটা ভাল কথা বলা যাক, মা তবে এসব ভুলে যাবেন। কিন্তু মনের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে বিদ্রোহ। কেন, সেকি এ বাড়ীর কেউ নয়?

সুলেখা চায়ের কাপটা টেবিলের উপর রাখতে তার চমক ভাঙল। তার দিকে একবার দেখে আবার খাওয়ায় মন দিল। সুলেখা চলে গেল প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই। খাবার খেয়ে কাপটায় চুমুক দিয়ে "উঃ" বলে কাপটা জোরে টেবিলের উপর রাখল। চা এইমাত্র গরম করে সুলেখা দিয়ে গেছে সুতরাং বেশ গরম ছিল। ঠিক জিভ পুড়ে গেছে। চায়ের কাপ ফেলে সে উঠে দাঁড়াল। জামাটা গায়ে গলাতে গলাতে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। যাবার সময় দেখল তার বাবা বাড়ীতে ঢুকছেন।

মন্মথবাবুর সাড়া পেয়ে সাংসারিক কর্মব্যস্ততার স্রোতে কিছুক্ষণের জন্য ভাটা পড়ল। প্রসন্নময়ী মুখ ধোবার জল ও গামছা একদিকে রেখে স্বামীর হাত থেকে ঘামে জবজবে ফতুয়া ও জামাটা ধরে নিলেন। ওদিকে সুলেখা বাবার জলখাবার ঠিক করতে ব্যস্ত। লোকটা সারাদিন খাটে তার ও যত্ন করা দরকার বৈকি!

সুলেখা মাথার চুল একটু আগে বেঁধেছে। কপালের ঠিক মাঝখানে কুমকুমের টিপ। পরেছে কয়েকদিন আগে বাবার কিনে আনা সাড়ীটা। কুমকুমের কৌটার ঠিক উপর দুই পাশে আঁচড়ানো চুলের মধ্যেরেখা আজ খুবই স্পষ্ট। সবেমাত্র পাটভাঙা সাড়ীটার আঁচল দিয়ে যত্নের সঙ্গে তাক থেকে পেড়ে নেওয়া বেকাবিখানা মুছে নিল। খাবারগুলি একে একে এর উপর সাজিয়ে দিল। খাবারের প্রতিটি অংশে লেগে আছে উজাড় করে দেওয়া স্নেহের প্রতিটি কণা। বাবার মত আর সত্যিই কাউকেও সে অত ভালবাসেনা।

এতক্ষণ স্ত্রীর মুখের দিকে মন্মথবাবু দেখেননি। অন্যদিন খোকন এতক্ষণে বাবার কাছে ছুটে আসত। মন্মথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, খোকনকে দেখছিনা তো? সংক্ষেপে প্রসন্নময়ী উত্তর দিলেন, শুয়ে আছে। সে কি! অসুখটুখ হল না কি—বলতে বলতে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন মন্মথবাবু।

কাঁদতে কাঁদতে খোকন ঘুমিয়ে পড়েছিল। কপালে হাত দিতে গিয়ে তিনি জোরে বলে উঠলেন 'কি সর্বনাশ এমন করে কে মারলে খোকনকে?' প্রসন্নময়ী কিছু বললেন না। সুলেখা ঠিক এই সময়ে ঘরে ঢুকল হাতে খাবারের জায়গা। বলল, বাবা এই তোমার খাবার।

সত্যিই কি চমৎকার আজ মানিয়েছে সুলেখাকে। অল্পক্ষণের জন্য মন্মথবাবু সব ভুলে গেলেন। হাতে খাবারের জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুলেখা যেন অন্নপূর্ণার প্রতিমূর্তি। বললেন, বল্ তো মা অন্নপূর্ণা, আমার খোকনকে অমন করে কে মেরেছে? বাবার সামনে খাবার রেখে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে বিকালের ঘটনা বলল, কেবল বাদ দিল মা রেগে গিয়ে যে কথাগুলি বলেছিলেন।

সন্ধ্যার দিকে কথা হচ্ছিল স্বামীস্ত্রীতে। মন্মথবাবু স্ত্রীকে বললেন, আজ তোমার জন্য একটা জিনিস এনেছি।

স্ত্রী একটু রেগে গিয়ে বললেন, ছেলেমেয়ে রয়েছে ঘরে, তাদের জন্য না এনে আনলে কিনা আমার জন্য? সেটি কি জিনিস? আরও একটু হেসে মন্মথবাবু বললেন, এ জিনিস দেখা যায় না, মন দিয়ে শুনতে হবে। জিনিসটা হচ্ছে একটা খবর। এরপর নিজের আপিসের কথা তুললেন ও বললেন, একটা ভাল পাত্র আছে সন্ধানে। ছেলের বাবা আমারই আপিসে কাজ করেন। ছেলেটি নাকি বেশ লেখাপড়া করেছে, আর মোটামুটি বেশ ভাল। আর দেখনা, সুলেখারও বয়স হয়েছে; কতদিন আর ঘরে রাখা যায়? প্রসন্নময়ী বললেন, দেখ ভবে চেষ্টা করে। আর তোমার যদি ইচ্ছা থাকে তবে—। না না সে কি, কথাটা শেষ করতে দিয়ে মন্মথবাবু বলে উঠলেন। বলছিলাম কেন, জানা লোক কিনা তাই।

এরপর মন্মথবাবু বাইরে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, আজ সে একবার ফিরে আসুক, তারপর দেখা যাবে কত ধানে কত চাল। তাকে আর শাসন না করলে চলছে না।

একটা রিক্সাওয়ালা টুং টাং করতে করতে এসে থামল মন্মথবাবুর বাড়ীর ঠিক সামনে। সন্ধ্যা অনেক আগেই উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। রাস্তার বাতিগুলি জ্বলে উঠেছে। হরিনাথ সোজা ঘরে ঢুকে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে লাগল। কাপড় চোপড় খুঁজতে দেখে সুলেখা মাকে বলল, মা, দাদা বোধহয় কাপড়-চোপড় নিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রসন্নময়ী ঘরে ঢুকে সব দেখলেন। সুলেখার কথাই ঠিক। একটু দুঃখ পেলেন মনেমনে। হরিনাথ সত্যিই কি এত অভিমানী? গলা নীচু করে বললেন, এসব নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস? মায়ের দিকে হরিনাথ একবার চাইল, মায়ের চোখ ছলছল করছে, বেদনায় আচ্ছন্ন ওরা। বেশ কঠিন স্বরেই জবাব দিল, যেখানে আমার কথার কেউ প্রতিবাদ করবে না, যা ইচ্ছা তাই করতে পারব, সেখানে যাচ্ছি। মায়ের জলভরা উদাস চোখ দুটির মধ্যে যেন মিনতির সুর। কিন্তু ঠিক করে ফেলেছে হরিনাথ, মন যখন স্থির করেছে তখন তার নড়চড় কিছুতেই হতে পারেনা।

ফিরে এসে মন্মথবাবু সব শুনলেন। মন্তব্য করলেন, কয়েকদিন যাক সে নিজেই ফিরে আসবে। আহা মায়ের মন ত, প্রতিদিনই ছেলে থাকে। বুকি বা আজ আসল না, কালটকই আসবে। কিন্তু সেই কাল বুকি মহাকালের গর্ভেই বিলীন। মা মনে ভীষণ দুঃখ পেয়েছেন দেখে সুলেখা মাকে আর দাদার কথা বলে না। একদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে প্রসন্নময়ী স্বামীকে বললেন, একটা চিঠি লিখে দাও না তাকে যেন তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। বিরক্তির সুরে উত্তর এল, সে কি আর আমাকে ঠিকানা দিয়ে গেছে? হরিনাথ যেখানে কাজ করে তার ঠিকানাও মন্মথবাবু জানতেন না, কেবল জানতেন হাওড়ার কোন এক ফ্যাক্টরীতে তাঁর ছেলে কাজ করে।

সেদিন সকাল থেকে বাড়ীঘর পরিষ্কার করা হচ্ছে। মন্মথবাবু আপিস যাবার আগে সব ব্যবস্থা একরকম ঠিক করে গেছেন। বিকেলে সুলেখাকে ওরা আজ দেখতে আসবে। বাড়ীতে সবাই আজ ব্যস্ত।

মন্মথবাবু কিছুই গোপন করেননি। গোপালবাবুকে নিজের অবস্থা প্রকাশ করে সবই বলেছিলেন। গোপালবাবু সত্যিই লোক ভাল। আর আজকালকার অবস্থাও সবই জানেন এবং সেই কারণে আশ্বাস দিয়েছিলেন মন্মথবাবুকে।

আপিসফেরতা দুজনেই এলেন একসঙ্গে। মুখে জল দিয়ে দুজনে ভিতরে বসে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। একটুপরে দুখানা রেকাবিতে খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকল সুলেখা। আজকের বেশভূষায় একটু বৈচিত্র লক্ষ্যণীয়। মা আজ গয়ের সঙ্গে নিজের হাতে সাজিয়ে দিয়েছেন। গায়ের দু'একটা আভরণ সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলেছে। মুখমণ্ডল এক কমনীয় লাবণ্যে পরিপূর্ণ। কুসকুসের ছোট টিপটা যেন আর মানাচ্ছে না। যদি একখানা বড় সিন্দুরের টিপ ওর জায়গায় থাকত, সূর্যাস্তের মত সমস্ত কপালটাই যদি লাল করে দিত পারত তবেই যেন মানাত। এই পরিবেশের সঙ্গে পরণের আসমানী নীল সাড়ীটা চমৎকার মানিয়ে গেছে।

সেদিনের সেই কথাটা মনে পড়ল মন্মথবাবুর যেদিন সুলেখাকে বলেছিলেন—অন্নপূর্ণা। আজও হাতে সেই খাবারের জায়গা। রূপেগুণে সুলেখা অন্নপূর্ণার চেয়ে কিসে কম!

গোপালবাবুই প্রথমে প্রস্তাব করলেন, এই বুঝি খালনার মেয়ে? মাড় নেড়ে মন্মথবাবু সম্মতি জানালেন। লজ্জাবতী লতার মত সুলেখার মুখটা লজ্জায় মুহূর্তের মধ্যে নিচে নেমে গেছে। কিছুক্ষণ পরে একরকম ছুটেই সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচল। মনে এরকম আনন্দ অনুভব করছিল কিন্তু কেন যেন এক অজানা বিচ্ছেদের চিন্তা এই সঙ্গে মনে জাগছিল। মা বাবা ভাই-বোনেদের ছেড়ে দিয়ে অনেকদূরে.....।

যাবার আগে গোপালবাবু বলে গেলেন, গোলাপটা যাতে অন্য কেউ না ছিঁড়ে নিয়ে যায় তাই আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, আমার ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দেব।

আপিস থেকে আগাম কিছু নিয়ে ও বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে ধার করে মন্মথবাবু সুলেখার বিয়ে দিলেন। যাবার সময় সুলেখার সে কি কান্না! ছোট ভাইবোনেরা ত কেঁদেই অস্থির। মন্মথবাবুরও আজ চোখে জল। একবার মনে ভাবেন, এই সময়ে যদি হরিনাথ থাকত বাড়ীতে! সে চলে যাবার পর একটা চিঠিও আসেনি আজ পর্যন্ত। সে যে ফিরে আসবে বা কোন সংবাদ দেবে এমন আশাও নেই। গোপালবাবু আজ একটু ব্যস্ত। মন্মথবাবুকে একসময় কাঁদতে দেখে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। আশ্বাসের সুরে বললেন, বৌমাকে শীঘ্রই পাঠিয়ে দেব, সেজন্য ভাববেন না। গোপালবাবুর ছেলের নাম নবীন, দেখতে শুনতে ও বেশ। পরদিন বরকনে চলে গেল খুলনায়।

এরপর এল স্বাধীনতার বান। ঠিক তার আগেই হল হিন্দুমুসলমানে মারামারি। ইংরেজী ১৯৪৬ সাল। দেশের অনেক কিছুই ওলটপালট হল, এর সঙ্গে হল মন্মথবাবুর সংসার। সুলেখার জন্য মনটা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। খোঁজ নিলেন গোপালবাবুর কাছে। চিঠিপত্র যেতে লাগলেন তাঁর বাড়ী। সেদিন খবর পেলেন তার বর্ণনা না দেওয়াই ভাল। তিনি একেবারে ভেঙে পড়লেন। ক্রমে ক্রমে যাওয়াদাওয়া ও ছেড়ে দিলেন। প্রসন্নময়ীর ভয় হল, তিনিও বুঝি দুঃখে পাগল হবেন। তবু স্বামীকে বললেন, যে মারা গেছে তার জন্য আর ভেবে কিংবা কষ্ট করে নিজের শরীরকে কষ্ট দেওয়াটা বৃথা। মুখ তুলে মন্মথবাবু বললেন, প্রসন্ন, তুমিও আমাকে ঐ কথা বলছ? কিন্তু সে এসে যায়নি, এই সঙ্গে আমাকেও যেরে পঙ্গু করে রেখে গেছে।

মন্মথবাবু বেশীদিন বাঁচেননি। প্রসন্নময়ী এরকম কিছুর জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। শিয়রে বসে স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিলেন। স্বামীর মুখ থেকে শেষ কথা বের হল—'সুলেখা'। তারপর আর চোখ খোলেননি, কথাও আর বলেন নি।

বিপদ এলে দল বেঁধেই আসে। মুস্কিল হল সংসার চালান নিয়ে। ক্রমেই বাকী পড়তে লাগল ঘরের ভাড়া। মুদিখানার কথা আরও খারাপ। হঠাৎ যেন নিরাপদ ছাদের উপর থেকে কে ঠেলে ফেলে দিল নীচে। প্রসন্নময়ী মাথায় হাত দিয়ে মাঝে মাঝে ভাবেন।

খোকন পরিমাণ মত খেতে না পেয়ে প্রথম প্রথম চেঁচামেচি করত কিন্তু সেও আজ কাল যেন বুঝতে পেরেছে। মাকে আর আগের মত জ্বালাতন করে না। অলকা কাছাকাছি দু-একটা বাড়ীতে কাজ করে, কিন্তু যা পায় তা খুবই কম। অনটনের সংসারে এই অল্পের মূল্য অনেক বেশী।

সাংসারিক অবস্থার ক্রমেই অবনতি হচ্ছে। খোকা বড়ই—অস্থির হয়ে উঠেছে, লাগাম আর ধরে রাখতে পারছেন না। ছেলেমেয়েদের চেহারা দেখলে প্রসন্নময়ীর চোখে জল আসে। বিশেষ করে খোকনকে দেখলে। অমন সুন্দর গোলাকৃতি পাকা আমের মত মুখখানা শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। প্রসন্নময়ীর বুকের মাঝখানেও যেন কিছু আর নেই, সবই শূন্য। আশা ভরসা বলতে যা কিছু তা সবই যেন নিঃশেষ।

শেষে একদিন বাকী জিনিষপত্রগুলি বিক্রী করে আশ্রয় নিলেন একটা বস্তীতে। মনে ভয় হয় সব সময়। অলকা বেশ বড় হয়ে গেছে তার উপর এটা আবার একটা বস্তি। সব কিছু রাখবার জায়গা আছে কিন্তু ভয় রাখবার জায়গা নেই। কেবল মনে মনে প্রসন্নময়ী বলেন, ভগবান মুখ তুলে চাও।

ভগবান বুঝি সত্যই মুখ তুলে চাইলেন। ছোট একখানি মাত্র ঘর। সরঞ্জাম মাত্র একটা, জানালার নাম গন্ধ মাত্র নেই। সমস্ত বস্তিটার জন্ত মাত্র একখানি জলের কল, পাইখানাও ঐ একটা। দু-জায়গাতেই সকালে ভীড় থাকে। লোকজনের যাতায়াত অনবরত। সেদিন অলকার কয়েকবার পায়খানা হল। প্রসন্নময়ী ভাবলেন পেট খারাপ করেছে, সেরে যাবে শীঘ্রই। অলকা নিজেও তাই ভাবল। কয়েকবার যখন বমিও এই সঙ্গে হল, প্রসন্নময়ী ভাবলেন নিশ্চয়ই এটা বিসূচিকার লক্ষণ। ডাক্তার ডাকেন তেমন সামর্থ্যও নেই, ভিজিটের টাকা কোথায়?

অলকা নিজেকে বুঝেছিল এটা নিশ্চয়ই কলেরা। শরীরে আর শক্তি বলতে কিছু নেই। হাতে পায়ে টান ধরেছে। কেরোসিনের বাতিটা টিম টিম করে জ্বলছে। অলকার জীবনপ্রদীপটা ক্রমেই নিষ্প্রভ হয়ে আসছে, তেল যে আর নেই। সেদিন রাত্রেই বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। প্রতিবেশীদের কয়েকজন এসে সান্ত্বনার কথা বলল। প্রসন্নময়ী ঠিক করলেন, নিজে ভেঙে পড়লে চলবে না। ভগবান তবে সত্যিই মুখ তুলে চাইলেন?

প্রথম প্রথম কয়েক দিন খোকন বাসের 'ষ্টপেজে' দাঁড়িয়ে থাকত। মাঝে মাঝে দু'একটা নোট বইবার লোক দরকার হয়। বয়স তার এখন কতই বা আর হবে? তবুও সে বুঝেছে, পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তাকে রোধ করতে হলে চাই অন্ন, চাই টাকা। কিন্তু কেমন করে!

কাজের খোঁজে সে সকালে বেরিয়ে যায় কিন্তু প্রতিদিনই বিফল হয়ে ফিরে আসে। আসলে মা জিজ্ঞাসা করেন, কিরে, কিছু হল? মা জানেন প্রত্যুত্তরে সে কি বলবে তবুও মানুষের মধ্যে একটা জিনিস আছে—আশা। যেখানে কোন সম্ভাবনা থাকেনা সেখানেও আশার আলো জ্বলে উঠে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা খোকন ফিরে এসেছে। মা ও ছেলে একসঙ্গে খেতে বসেছে। ডালের বাটিটা খোকনের দিকে এগিয়ে দিয়ে প্রসন্নময়ী দুটো কাঁচা লঙ্কা নিয়ে বসলেন। খোকন মায়ের বাসনে শুধু ভাত দেখে বলল, মা, তোমার ভাগের ডালটাও আমাকে দিয়েছ? তুমি খাবে কি? সত্যি, সেই মা যেন আর নেই, অনেক বদল হয়েছে। মাথার দু'একটা চুল পাকতে আরম্ভ করেছে। শরীরে পূর্বের স্বাস্থ্য আর নেই। বড় মেয়ের শোক, স্বামীর শোক, এরপর অলকার মৃত্যু আর সবচেয়ে বেশী দারিদ্র্যের করাল হস্ত। আজ যদি হরিনাথ থাকত তবে···। না, মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে। ছেলেকে কি কেবল জন্ম দেবার জন্তই তাঁকে দায়িত্ব নিতে হয়েছিল? ছেলের সঙ্গে নিজের কি এতটুকুও সম্বন্ধ নেই? দরকার নেই অমন ছেলে। যে নিজের বাবা মাকে একবার খোঁজ করল না তেমন ছেলের সঙ্গে কিসের সম্বন্ধ?

পরদিন একটা খবর পাওয়া গেল। খবরটা আনল খোকনের এক সমবয়সী। একই বস্তিতে থাকে। তাদের কারখানায় নতুন লোক নিচ্ছে। প্রথম প্রথম মাইনে একটু কম কিন্তু কাজ বেশী হলে মাইনেও বাড়বে। মায়ের মুখটা একটু আনন্দে ঝলমল করে উঠল! মনেমনে প্রসন্নময়ী বললেন, দীনের গতি তুমি, দেখো ঠাকুর। বিছানায় শুয়ে খোকন আগামী-কালের কথা চিন্তা করছিল। একসময় মা তাকে বলেন, আচ্ছা খোকন, তুই যখন উপায় করতে শিখবি তখন আবার তোর দাদার মত আমাকে ফেলে চলে যাবিনে, বল? দাদার নিষ্ঠুরতার কথা মনে করতে গিয়ে চোখে জল এল। মার বুকে মুখ

ওঁকে বলল, মা এতদিনেও কি আমাকে যথেষ্ট চিনতে পারনি? দুজনে প্রাণ ভরে চোখের জল ফেললেন।

বড়সাহেব বসে আছেন আপিসে। ইনিই হচ্ছেন আমার হরিনাথবাবু। তিনি ধাপেধাপে উঠতে উঠতে শেষপর্যন্ত এক ব্যবসায়ীর মেয়েকে বিয়ে করেন। মধুপবাবুর নদীতে যখন তাঁটা হরিনাথ তখন জোয়ারের স্রোতে ভেসে চলেছেন, বাবামার চিন্তা করবার সময় তখন কোথায়?

পরদিন কারখানায় একটা কাজ সত্যিই জুটল। দুপুরে ছুটি হলে মায়ের তৈরী করে দেওয়া আটার রুটি খেয়ে একটু জল খেল। বিকেলে সাড়ে চারটার সময় ছুটি। খোকন যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। নেহাত প্রথম দিন ত!

ছুটির আগে বড়সাহেব একবার নিজে ঘুরে যান। আজ আবার নতুন ভর্তি হয়েছে। পাশের লোকটি হঠাৎ খোকনকে বলল, ভাই সাবধান! বড়সাহেব আসছে। সে ভাবল দেখতে হবে বড় সাহেবকে, কাছে আসুক আগে।

হঠাৎ একটা ভীষণ চীৎকার হল কারখানার মধ্যে বড়সাহেব শুনেছিলেন কথাটা। খোকন দাদাকে দেখে নিজের অজ্ঞাতসারে চীৎকার করেছিল 'দাদা' বলে। বড়সাহেব এগিয়ে এলেন তার দিকে। মনের মধ্যে ভেসে উঠল একটা কচি মুখ, পাঁচটি আঙুলের দাগ। হরিনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি? উত্তর এল, খোকন। বাবামায়ের নাম কি? খোকন বলল, বাবার নাম ৺মধুসূদনাথ—। কথা শেষ হল না। বাবা কি তবে নেই? বিদ্যুতের মত হরিনাথবাবু জিজ্ঞাসা করেন। ধীর ও সংযতকণ্ঠে খোকন সংক্ষেপে বলে, না, অনেকদিন আগেই তিনি গত হয়েছেন। বাকীর মধ্যে আছি আমি আর মা।

'মা' কথাটি বারবার হরিনাথবাবুর মনের দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিগতদিনের প্রত্যেকটি ঘটনা মনে আসে। যিনি নিজের হাতে ছেলেকে খাওয়াতেন, ছোটবেলা থেকে যাকে প্রতিপালন করেছেন সেই মা। যাঁর সজলচোখের কাতরচাহনি উপেক্ষা করে হরিনাথবাবু চলে এসেছিলেন, মনে পড়ল সেই মায়ের কথা। আজ হঠাৎ এমন পরিবেশের মধ্যে পড়ে মা-হারার শূন্যতা সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়ল। কোথায় সেই মা? নিজের দুটি চোখ সজল হয়ে ওঠে।

জিজ্ঞাসা করেন, মা কোথায়? হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, সব কর্মীরা তাঁদের দুজনের দিকে নির্বাক হয়ে চেয়ে আছে। নিজেদের মধ্যে নীচু গলায় কথা বলছে। হরিনাথবাবু লজ্জা পেলেন। খোকনকে বললেন, এস আমার সঙ্গে।

দরওয়ান দরজাটা খুলে দিয়ে সেলাম করল। আজ আর সবুর সইছে না। আজ ড্রাইভিংসীটে হরিনাথ নিজে। পাশে বসে আছে খোকন। গাড়ী তীরবেগে ছুটে চলেছে। খোকন রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে চলেছে—সেই রাস্তাটা যেটা চলে গেছে বস্তি পর্যন্ত। গাড়ীর বেগ বাড়ছে ক্রমেক্রমে। গাড়ীটাও আজ সকল। হরিনাথ বাবু আজ নিজেও অস্থির, কারণ আজ সন্ধান পেয়েছেন তাঁর অবহেলিত মাকে।

DENA BANK

The Saving Services offered by the Dena Bank will help you to save for the future.

General Banking
Business Transacted.

DEVKARAN NANJEE BANKING CO., LTD.
HEAD OFFICE:
DEVKARAN NANJEE BLDGS., HORNIMAN CIRCLE, BOMBAY 1.

শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভট্টাচার্য

১৯৫৫ সালে কয়লা শিল্প

১৯৫৫ সালে কয়লা শিল্পের প্রধান ইন্‌স্পেক্টরের অনুমান অনুযায়ী ১৯১১ সালে কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮২ লক্ষ হয়েছে। ১৯৫৪ সালে কয়লার উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩৬৮ লক্ষ টনের কিছু বেশী। ১৯৫৫ সালে খনি অঞ্চল থেকে বাইরে কয়লার চালানও ৩২০ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ৩২৮ লক্ষ টনে গিয়ে দাঁড়ায়।

১৯৫৫ সালে কয়লা শিল্পে দৈনন্দিন গড়ে নিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৪০. ৬১৭। কিন্তু পূর্ববর্তী বৎসরে তার পরিমাণ ছিল কর্ম থেকে অনুপস্থিতির পরিমাণ ১৯৫৪ সালের শতকরা ১৩৩ ভাগ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫৫ সালে শতকরা ১৪ ভাগে দাঁড়ায়, কিন্তু শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা ঐ সময়ে ০'৫৮ টন থেকে শ্রমিকের আর্থিক আয়ও ঐ সময়ে টাকা ২ আনা থেকে বেড়ে গিয়ে ১২ টাকা ৫ আনা হয়। সাপ্তাহিক কাজের সময়টা সামান্যকিছু বৃদ্ধি পেয়ে ৪৭ ঘণ্টা দাঁড়ায়।

কয়লাশিল্পে এবৎসর আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার কিছু বৃদ্ধি পায়। এ বছর ৮৫ লক্ষ টন কয়লা, কয়লা-কাটার আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে কাটা হয়েছে, ১৩ লক্ষ টন যান্ত্রিক উপায়ে চালান দেওয়া হয়েছে এবং ১২০,০০০ টন যান্ত্রিক উপায়ে ভর্তি করা হয়।

মোটামুটি-ভাবে ১৯৫৫ সালে ভারতীয় কয়লা শিল্পের কার্যক্রম সন্তোষজনক হয়েছে বলা চলে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গত ১লা এপ্রিল থেকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকাল শুরু হয়ে গিয়েছে। পরিকল্পনাকমিশন ১৯৬০ সালে কয়লার ৬০০ লক্ষ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি করবার সুপারিশ করেছেন। এ থেকে আশা করা যায় যে চলিত বৎসরেও কয়লা শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে।

ইক্ষু উন্নয়ন পরিকল্পনা

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আখের উন্নয়ন উৎপাদন বৃদ্ধি করবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। কৃষিমন্ত্রী ডাঃ পাঞ্জাব রাও দেশমুখ বলেছেন যে এজন্যে চাষীদের সমস্ত উপায়ে সহায়তা করা হবে। গুড়উৎপাদন এলাকাগুলিকেও আখ-উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আখ-উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ভারত সরকার পাঁচকোটি টাকা বরাদ্দ করে রেখেছেন। এই পরি-কল্পনাগুলিকে অর্থসাহায্য করা সম্পর্কে সরকার পরিকল্পনাকমিশনের সঙ্গে আলোচনা করে কয়েকটি নীতি গ্রহণ করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এখন পাঁচকোটি টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ করা সম্ভব না হলেও, যে সকল রাজ্যে আখের চাষ মোটেই ভালো না সেখানে যাতে আখের চাষ সম্প্রসারণের জন্য স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অতিরিক্ত সাহায্য করা হয় সরকার তা দেখবেন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে দেশে আখের

চাষ বৃদ্ধি করবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আন্তরিক সদিচ্ছা রয়েছে। কিন্তু এই সদিচ্ছাকে কার্যে পরিণত করবার দায়িত্ব রাজ্যসরকারগুলির উপর। কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যকে বিচক্ষণতার সঙ্গে এমন সব পরিকল্পনায় ব্যয় করতে হবে যার ফলে একর পিছু উৎপাদন বৃদ্ধি ও আখের শর্করা অংশ বৃদ্ধি সম্ভব হয়। এজন্যে চাষীদের মাটির গুণাগুণ ও সার ব্যবহার সম্পর্কে অবহিত করে তুলতে হবে। ভারত সরকার চাষীদের সার ক্রয়ের জন্যে রাজ্যসরকারগুলির মাধ্যমে ঋণ দিতেও প্রস্তুত আছেন। এই সকল সুযোগ সুবিধা চাষীদের কাছে পৌঁছে দেবার গুরুদায়িত্ব রাজ্য সরকার সমূহের উপর এবং তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করে দেশের উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করে দেবেন এই আশাই দেশবাসী পোষণ করেন।

সূতী বস্ত্রের রপ্তানী বৃদ্ধি পরিষদ্

ভারতীয়মিলপ্রস্তুত সূতীকাপড়ের উৎপাদন ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে তার রপ্তানীর পরিমাণও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৫৫ সালে ভারতীয় মিলগুলিতে কাপড়ের উৎপাদন ৫০,০০০ লক্ষ গজ থেকেও বেশী হয়েছে। এই উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বিদেশে বেশী পরিমাণ কাপড় রপ্তানী করবার সুযোগ হয়। ১৯৫২ সালে বিদেশে ৪৪৮৫ লক্ষ গজ কাপড় রপ্তানী হয় কিন্তু ১৯৫৫ সালে তার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৮১৫০ গজ হয়। ১৯৫৬ সালে ভারতবর্ষে সূতী বস্ত্রের রপ্তানীতে দ্বিতীয়স্থান অধিকার করে খ্যাতি অর্জন করে। এর মূলে ছিল ভারতীয় মিলগুলির প্রতিযোগীতামূলক মূল্যে সূতীকাপড় সরবরাহ করবার ক্ষমতা। সঙ্গেসঙ্গে একথাও চিন্তা করা হয়েছিল যে রপ্তানীর পরিমাণবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হলে খুব সুসংগঠিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এরজন্যেই আহমেদাবাদ বোম্বাই ও দক্ষিণ ভারতে গবেষণাগার স্থাপিত হয়। আন্তর্জাতিক বাজারের ও ক্রেতাদের রুচি সম্পর্কে খবরাখবর রাখা, কাপড়ের রকমের মান বজায় রাখা ও ভারতীয় সূতীবস্ত্রের প্রচারকার্যের দ্বারা রপ্তানী-কারকদের সহায়তা করবার জন্য ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার দুটি সংস্থা স্থাপন করেন। তার প্রথমটি হল সূতীবস্ত্র তদন্তবিল কমিটি পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাতে বিদেশে সূতীবস্ত্র রপ্তানীর পূর্বে তা নিরীক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আর দ্বিতীয়টি হোল সূতীবস্ত্র রপ্তানী বৃদ্ধি পরিষৎ। ইংলণ্ড ও জাপানের প্রতিযোগীতা থেকে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য শিল্প ও বাণিজ্য-মন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী এই পরিষৎ গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং এই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ শুরু করে। প্রথমে এতে ২৫টি সভ্য ছিল এবং ভারত সরকার এর ব্যয়ভার বহন করবার দায়িত্ব নেন। এই পরিষদের কার্য পরিচালনার জন্য একটি কমিটিও গঠিত হয়।

তুলাজাতদ্রব্যের রপ্তানী বৃদ্ধি করাই এই পরিষদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। বিদেশে বাণিজ্যপ্রতিনিধিদল পাঠিয়ে এবং অফিসার ও প্রতিনিধি নিয়োগ করে বিদেশের বাজার সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করবার চেষ্টা করা হয়। প্রচারকার্য, বিভিন্ন পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও বিদেশে সূতীবস্ত্রের প্রস্তুতপ্রণালী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ প্রভৃতি নানাবিধ কাজও এই পরিষৎ করে থাকেন। ভারতীয় সূতীবস্ত্রের রপ্তানী সম্পর্কে সমস্ত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এ পরিষৎ সরকার ও চেম্বার্স অব্ কমার্সগুলিকে নানান সুপারিশ করে থাকেন। ১৯৫৬ সালের জুনমাসে সর্ব-প্রথম এই পরিষদের প্রচেষ্টায় উৎপাদক ও ব্যবসায়ী-দের প্রতিনিধি নিয়ে একটি দল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পাঁচটি দেশে যান। এরা ঐ সব দেশে গিয়ে সেখানকার বাজারের সম্ভাবনা, ক্রেতা ও তাঁদের রুচি, ভারতীয় সূতীবস্ত্রের আপেক্ষিক সুযোগ সুবিধা, আমদানীকারিদের অসুবিধাসমূহ এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের রপ্তানীবৃদ্ধির কৌশল প্রভৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এই প্রতিনিধি দলের সুপারিশসমূহ বিবেচনাধীন আছে। ইতিমধ্যে

একাধিক অনুরূপ দল পাঠাবার কথা
পরিষদের বৈদেশিক পরিচালনাকে চূড়ান্ত
হয়েছে বিদেশের বাজারে কিছু
যোগাযোগ ব্যবস্থা হচ্ছে। এই সব
পরিষদের প্রধান কার্যালয়
বোম্বাইয়ে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে ভারতীয়
দেশের কার্যালয় দুটি ইতিমধ্যেই খোলা হয়েছে
মোম্বাসা, ও সিংহলে আরও
আরও কার্যালয় শীঘ্রই খোলা হবে। ছোট কম
গুরুত্বপূর্ণ যে কার্যালয় না খুলে সেখানে সংযোগ
রক্ষার নিয়োগ করে এদের কাজ হবে বিদেশের
এদের পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষদকে সর্বদা অবহিত

করবার আশা রাখেন।

রপ্তানী সংক্রান্ত অভিযোগসমূহের
যে ভার রপ্তানী-বৃদ্ধি-পরিষদ একটি কমিটির উপর
টেক্সটাইল কমিশনার ও অপর তিনজন
সভ্য নিয়ে গঠিত এই কমিটি প্রতি দু-সপ্তাহে একবার
করে বসেন এবং অভিযোগগুলি আদায়ের
পর দুই মীমাংসার জন্য উচ্চ পক্ষকে পরামর্শ দেন।

ইঙ্গ-ভারত সহযোগিতা

ভারতের সঙ্গে ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বহু-দিনের এবং আজ পর্যন্ত তা অব্যাহত। ভারতের রপ্তানীর সব বৃহৎ বাজার আজও ইংলণ্ড মোট রপ্তানীর শতকরা ভাগ ইংলণ্ড নিয়ে থাকে অপরপক্ষে, ভারতের আমদানীর এক বৃহত্তম অংশ ইংলণ্ড থেকে দেশ থেকে আমদানীর শতকরা ভাগ আসে। থেকে আজ ইংলণ্ডে কেবলমাত্র কাঁচা মালই রপ্তানী হয় না, তার সঙ্গে ভারতীয় বস্ত্র প্রভৃতিও রপ্তানী হয়ে থাকে। ইংলণ্ড থেকেও আবার ব্যবহারিক দ্রব্যই কেবল আমদানী হয় না, তার সঙ্গে আসে কল-কব্জাও যন্ত্রপাতি।

ভারতের দ্রুতশিল্প উন্নয়ন পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কে পাশ্চাত্যের কারিগরী জ্ঞান অপরিহার্য। ইংলণ্ড ভারতের সরকারীও বে সরকারী মহলের অর্থ-নীতিতে এ পর্যন্ত যথেষ্ট কারিগরী ও আর্থিক সাহায্য করে এসেছে। দুর্গাপুরে লৌহ কারখানা স্থাপন সম্পর্কে ইঙ্গ-ভারত চুক্তি এই দুই অর্থ-নৈতিক সহ-যোগিতার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। অবশ্য এই ঢাল পরিকল্পনা সাফল্যের উপর অনেকখানি নির্ভর করছে।

বর্ষ শেষ :

পুরোনো বছর শেষ হতে চল্‌লো। নতুন বৎসরকে অভিনন্দন জানাই। গত বৎসরে যাঁরা আমাদের প্রাহক অনুগ্রাহক ও উৎসাহদাতা ছিলেন, আগামী বৎসরেও আমরা তাঁদের সহানুভূতি পাবো ব'লে আশা করি। অতীতের ভুল-ভ্রান্তি, দোষ-ত্রুটির জন্য তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। তাঁদের শুভেচ্ছা আমাদের সম্মুখের পানে এগিয়ে চলবার প্রেরণা দিক্।

পণ্যমূল্য বৃদ্ধি :

জীবনযাত্রার অপরিহার্য পণ্যের মূল্য সহসা বেড়ে গেলে জনসাধারণ বিপন্ন হয়ে পড়ে। বিশেষ ক'রে চাউল বা গমের মূল্য বাড়লে অধিকাংশ সংসারেই দুশ্চিন্তা দেখা দেয়। আমাদের বেশীর ভাগ লোককেই কায়-ক্লেশে দিন চালাতে হয়। প্রায় সব সংসারেই ঘাঁটতি বাজেট। পাশ্চাত্য—এবং কোন কোন প্রাচ্য দেশের তুলনায় এদেশে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান নিচু। এঁরা প্রতিদিনপ্রয়োজনীয় খাদ্যাদি স্বল্প সংখ্যক লোকের ভাগ্যে জোটে। এ অবস্থায় সম্প্রতি যে ভাবে চাউলের মূল্য বেড়ে চলেছে, তাতে অনেকেই উদ্বেগ অনুভব ক'রছেন। স্বাধীনতা লাভের পর আমরা খাদ্যে স্বাবলম্বী হয়েছি ব'লে কতকটা আশ্বস্ত হয়েছিলাম। নানাবিধি পরি-কল্পনার ফলে এ বিষয়ে আরও সফলতা দেখা দেবে এও মনে আশা করছি। কিন্তু অকস্মাৎ মূল্য বৃদ্ধির সংবাদ এসেছে।

গতবার কলিকাতার বাজারে কিছুদিন ধ'রে চোরা-কারবার চলছে।

হানা দিয়েছে।

নানাক্ষেত্রেই লক্ষ্য করছি, শহরের ব্যবসা ও শিল্পক্ষেত্রে বড়-কারবারীর খুঁটোর জোর গিয়ে পড়েছে। তাঁদের কৌশলে কলকাতার বাজারে মাঝে মাঝে কোন কোন জিনিষের অভাব ঘটে, দাম বেড়ে যায়, আবার ক্রমে ক্রমে ঐ জিনিষের পুনরাবির্ভাব হয়। সরকারের সঙ্গে এরা নির্বিবাদে লুকোচুরি খেলে চলবে, এ অবস্থা বাঞ্ছনীয় নয়।

অসাধুতা ও দায়িত্ববোধের অভাব :

জাতীয় জীবনের নানান্ দুর্গতির মূলে বহুল পরিমাণে রয়েছে আমাদের অসাধুতা ও দায়িত্ববোধের অভাব। কি সরকারী কি বে-সরকারী—সকল মহলেই এক অবস্থা। চরিত্রগত দুর্বলতার সংশোধন না হ'লে কোন সমস্যারই তুষ্ট সমাধান সম্ভব নয়। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, শান্তিরক্ষা, সমাজ-উন্নয়ন, শিক্ষা-সংস্কার নানা ক্ষেত্রেই সরকারী কাজের জন্য দায় বরাদ্দ হচ্ছে মন্দ নয়, কিন্তু অনেক স্থলেই আশানুরূপ কাজ পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও বা উৎসাহের অভাব, কোথাও বা দক্ষতার অভাব। পরের সমালোচনায় আমরা প্রায় প্রত্যেকেই শত-মুখ। তার আগে যদি প্রত্যেকে একটু আত্ম-সমালোচনা করতাম, নিজের কর্তব্য কতটুকু পালন করছি ভেবে দেখতাম, তবে অনেক উপকার হ'ত।

ভারত পাকিস্তান :

দেশ বিভাগের ফলে পাকিস্তান-দাবিদার মুসলমানদের

[illegible] করবে, অনেকে এরূপ অনুমান করে থাকেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আজও তা হ'লোনা। পাকিস্তানের বর্তমান শাসকবর্গ একদিকে পক্ষের মুখাপেক্ষী হ'য়ে দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়া চুক্তি প্রভৃতি স্থির মেরুতে আছেন, অন্যদিকে নিকটতম প্রতিবেশী এবং এতদিন একরাষ্ট্রভুক্ত রাজ্যের বিরুদ্ধাচরণ করছেন। তবু তাঁদের মনোভাবের ওঁরা বদলাচ্ছেন না। পূর্ববঙ্গে চাউলের অভাব, আমেরিকা চাউল দিয়ে সাহায্য করবে জানিয়েছে। ভারত নানা-ভাবে সাহায্য ক'রেও কৃতজ্ঞতা বা বন্ধুত্বের পরিবর্তে [illegible] নিন্দাবাদ। কাশ্মীর-সমস্যায় নিজের অন্যায় [illegible] ক'রে পাকিস্তান ভারতের উপর দোষারোপ ক'রে চলেছে। ইউ-এন্-ও'র সালিসি প্রার্থনা করে সে জানিয়েছে ভারতকে শুদ্ধ করবে। কিন্তু এ নীতি তার নিজেরও মঙ্গল করবে না। পাকিস্তান একরোখা হয়ে গঠনকর্মে আত্মনিয়োগ করলে হয়ত শক্তিশালী হতে পারত। অদূরবর্তী ভবিষ্যতে নাতির ক্ষতি সে কেবল তার প্রতিবেশীর [illegible] করছে এ নয়, নিজেরও সমূহ ক্ষতি সাধন করছে। [illegible] যাহাকে সহসা মুমূর্ষু, সে ছাড়া সে কেহ নাহি [illegible]।"

ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বনেতা তাঁর সহযোগিতা আবেদন জানিয়েছেন এবং বিরোধের [illegible] সহৃদয়তার সঙ্গে দূর করবার চেষ্টা করেছেন। তাদের চেষ্টা সার্থক হয়নি, এটা দুঃখের বিষয়।

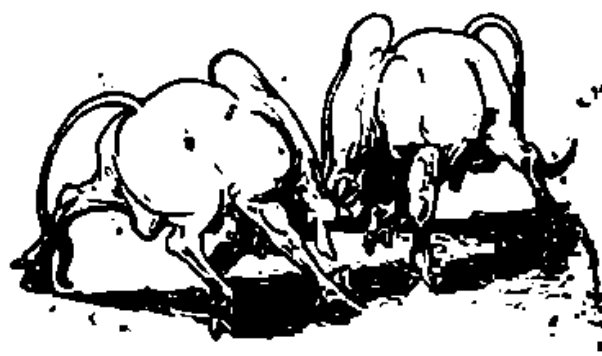

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ নং আপার সার্কুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত